প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

৩৫শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩৪২

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

বৈশাখ—আশ্বিন

৩৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড—১৩৪২

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নব বর্ষ

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪২

১ম সংখ্যা

অসমাপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভালোবেসে মন বললে
"আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে।"
অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অত্যুক্তি ;
দিতে পারবে কেন ?
সবটার নাগাল পাব কেমন ক'রে ?
ও যে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্ব্বাক্ অনতিক্রমণীয়।
তার মাথা উঠেছে মেঘে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়
তার পা নেমেছে আঁধারে ঢাকা গহ্বরে।
এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা,
বাষ্প আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে,
দূরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।
যাকে বল্‌তে পারি আমার সবটা,
তার নাম দেওয়া হয় নি,
তার নক্‌সা শেষ হবে কবে ?

তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার ?
নামটা রয়েছে যে পরিচয়টুকু নিয়ে,
টুক্‌রো জোড়া-দেওয়া তার রূপ,
অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা।
চারদিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সখান থেকে নানা বেদনার রঙীন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে ;
হাওয়ায় লাগে শীত বসন্তের ছোঁওয়া ;
সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হোলো ?
ভাষার অঙ্গুলিতে
কে ধরতে পারে তাকে ?
জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে
কর্ম্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়
আর এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা
বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হোলো শূন্যে,
মরীচিকা হয়ে আঁক্‌ছে ছবি ।

এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল
জন্মমৃত্যুর সঙ্কীর্ণ সঙ্গমস্থলে।
তার আলোকহীন প্রদেশে
বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে
আত্মবিস্মৃত শক্তি,
মূল্য পায় নি এমন মহিমা,
অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়।
সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা,
প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা,
অখ্যাত ইতিহাস,
আছে আত্মাভিমানের
ছদ্মবেশের বহু উপকরণ,—

সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জ্জনা।

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে ?
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু সাধনায় বাঁধা হোতে চল্‌ল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে,
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষী।
অপ্রকাশের পর্দ্দা টেনে কাজ করেন গুণী :
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে ;
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি,
তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা ;
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,
কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসে নি ;—
সবাই রইল দূরে,—
যারা বল্‌লে "জানি", তারা জান্‌লো না॥

২৭।৩।৩৮
শান্তিনিকেতন

উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

উড়িষ্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। শ্রীচৈতন্যভাগবৎ ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থদ্বয় হইতে কেবল উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, রাজমন্ত্রী রামানন্দ, রাজকর্ম্মচারীর ও মন্দিরের সেবকদের কাহারও কাহারও নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু তথাকার সমাজ ও অধিবাসীদের উপর তাঁহার প্রভাব কিরূপ ছিল তাহার বিশেষ কোনও ইতিহাস আমাদের জানা নাই। গত বিশ বৎসরের অধিক কাল এই সম্বন্ধে আমি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার একটা সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দিতে চেষ্টা করিব, তবে তাহা বিষয়সূচীর মতই ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নীলাচলযাত্রা:—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তাঁহার নীলাচলযাত্রা বিষয়ে ভাগবত ও চরিতামৃতে কোনও মিল নাই। বৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাঢ়ের বক্রেশ্বর তীর্থ সংলগ্ন বিজন অরণ্যে নির্জ্জনবাস করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন।

> প্রভু বোলে, বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
> তথায় যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জ্জনে।
>
> চৈ. ভা., অন্ত্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়।

তাঁহার গুরু কেশব ভারতীর নিকট বিদায় লইবার সময়ে শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন,—

> অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
> প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাও যথা।
>
> চৈ., ভা., অন্ত্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়

মনে মনে এই দৃঢ়সংকল্প করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা আপনহারা সন্ন্যাসী যুবক অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ব্যাকুলভাবে অনন্তের সন্ধানে ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার আকুল আহ্বান—মর্ম্মবেদনার দারুণ আর্ত্তনাদ শুনিলে কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইত, পাষাণ গলিয়া যাইত—পশুপাখী স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিত।

> হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসি চূড়ামণি:
> ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি।
>
> চৈ., ভা., অন্ত্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়

এই প্রেমোন্মত্ত যুবা—যাঁহার পাণ্ডিত্যের সৌরভে নবদ্বীপ মাতিয়া উঠিয়াছিল, সমগ্র বঙ্গে একটা সাড়া পড়িয়াছিল, যাঁহার কষিত-কনক-কান্তি-বর্ণ ও মনোরম সৌন্দর্য্য লোকে অনিমিষ নেত্রে চাহিয়া দেখিত—যাঁহাকে দেখিলে মনে হইত—

> কাঞ্চন দরপণ বরণ সুগোরারে
> বরবিধু জিনিয়া বয়ান।
> দুটি আঁখি নিমিখ মুরুখ বড় বিধিরে
> নাহি দিল অধিক নয়ান।

সেই লাবণ্যপিচ্ছল মূর্ত্তি—কুঞ্চিত কেশ মুণ্ডন করিয়া শিখাসূত্র ফেলিয়া দিয়া সামান্য কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া যখন ব্যাকুল অন্তরে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে উন্মত্তের মত ছুটিলেন—অজানা পথের সন্ধানে—তখন তাঁহার অনুগামী অনুরাগী ভক্ত সঙ্গীরা তাঁহার সঙ্গে সমান ভাবে একসঙ্গে চলিতে পারেন নাই—তাঁহারা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতেন। তাঁহারা যখন বক্রেশ্বর তীর্থের চারি ক্রোশ দূরে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন তখন তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। কারণ—

> ক্রোশ চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
> সেই স্থানে ফিরিল শ্রীগৌরসুন্দর।
> নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
> পূর্ব্বমুখ পুন হইলেন নিজসুখে।
> পূর্ব্বমুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য রসে।
> অন্তরে আনন্দ—প্রভু অট্ট অট্ট হাসে।
> বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতুহলে।
> বলিলেন আমি চলিবাঙ নীলাচলে।
> জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
> নীলাচলে তুমি ঝাট—আইস সত্বরে॥
>
> চৈ., ভা., অন্ত্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়

এখানে বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন যে তিনি নীলাচল-নাথের আদেশ পাইয়া নীলাচল যাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে

ফিরিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস গোস্বামী কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন যে তিনি রাঢ়ের পথে বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন। বৃন্দাবনভাবে এত বিহ্বল ছিলেন যে নিত্যানন্দ প্রভু রাখাল-বালকদের সাহায্যে তাঁহাকে ভুল পথ ধরাইয়া একেবারে শান্তিপুরের অপর পারে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। বৃন্দাবন-ভাবোন্মত্ত গৌরচন্দ্র যমুনাভ্রমে স্তবপাঠ করিতে করিতে গঙ্গায় অবগাহন করিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈত গোস্বামী তাঁহাকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবার জন্য নৌকাযোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরচন্দ্রের তখনও ভাবের ঘোর কাটে নাই, তিনি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমরা বৃন্দাবনে কবে আসিলে? আমি বৃন্দাবনে আছি, তুমি কেমন করিয়া জানিলে?" শ্রীচৈতন্য বুঝিলেন এই সব নিত্যানন্দের চক্রান্তে হইয়াছে।

প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাতীরে আনি মোরে যমুনা কহিলা॥
আচার্য্য কহে—মিথ্যা নহে—শ্রীপাদ বচন
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥

চৈ., চ., মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুতরাং নিত্যানন্দের কথা অন্যায় বা মিথ্যা হয় নাই এবং শ্রীচৈতন্যের যমুনাস্তব ও যমুনাস্নান অনর্থক হয় নাই। অদ্বৈত বলেন—

পশ্চিমে যমুনা বহে তাহা কৈলা স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি কর শুষ্ক পরিধান।

নূতন কৌপীন বহির্বাস অদ্বৈত প্রভু সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন কেন না তিনি শুনিয়াছিলেন যে "এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান।"—পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বলিলেন—

প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস॥
একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছো পাক।
শুখা রুখা ব্যঞ্জন কৈল সুপ আর শাক॥
এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘর।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর।

চৈ., চ., মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এইরূপে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে আসিলেন। দশ দিন তিনি তথায় থাকিলেন। আচার্য্যরত্ন নবদ্বীপ হইতে দোলায় চড়াইয়া শচীমাতাকে লইয়া আসিলেন। নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দও শচীমাতার অনুগমন করিলেন। শচীমাতা নিমাইকে দেখিয়া বাৎসল্যে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু

মাতার বৈরাগ্য দেখি প্রভুর ব্যগ্রমন।
ভক্তগণে একত্র করি বলিল বচন॥
তোমা সবাকার আজ্ঞা বিনে চলিলাম বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস॥
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥

ইহার উত্তরে শচীমাতা ভক্তবৃন্দকে জানাইলেন যে

তিঁহো যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই যুক্তি হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে সেই দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥

চৈ., চ., মধ্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ

কিন্তু এই সময়ে নীলাচলের পথ এত সহজগম্য ছিল না। গৌড় ও উড়িষ্যায় তখন ঘোরতর যুদ্ধ। ইহা ইতিহাসের কথা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাসও তাহার কিছু বর্ণনা করিয়াছেন।

উড়িষ্যা ও বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা :—বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে যেদিন প্রভাতে শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে জানাইলেন যে তিনি নীলাচলে যাত্রা করিবেন এবং তথায় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া পুনরায় গৌড়ে প্রত্যাগমন করিবেন তখন সকলে সমস্বরে বলিলেন,—

তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয়॥
দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ—
যাবত উৎপাত কিছু উপশম হয়।
তাবত বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥

এই সঙ্কটকালে শচীমাতা তাঁহার একমাত্র পুত্রকে নীলাচলে যাইতে বলিবেন কিনা ইহা সুধীগণের বিচার্য্য। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস কিছু মাদলা পঞ্জিতে লিপিবদ্ধ

আছে। মাদলা পঞ্জিতে দেখা যায় যে মহারাজ অনঙ্গভীমদেব গোদাবরী হইতে গঙ্গার কূল পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তিনি "শ্রীবীর শ্রীগজপতি গউড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট" প্রভৃতি উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। সিংহাসনসূত্রে উড়িয্যার রাজা প্রতাপরুদ্রও এই বিস্তৃত রাজ্য প্রাপ্ত হন। গৌড়ের রাজসিংহাসনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইলিয়াস শাহের পর হাবসী ক্রীতদাস-বংশ গৌড়-সিংহাসন দখল করেন—তাহাদের অত্যাচারে উৎপীড়নে দেশ অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে গৌড়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে রাজতক্তায় বসাইলেন। এই ঐতিহাসিক কাহিনী বৃন্দাবন কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর ভক্তদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীচৈতন্য গঙ্গার তীর-পথ দিয়া গৌড়ের শেষ সীমা ছত্রভোগে আসিয়া উপনীত হইলেন। ছত্রভোগ সে-সময়ে একটি দেশপ্রসিদ্ধ তীর্থ। এই গৌড়-সীমান্তের অধিকারী ছিলেন রাজকর্ম্মচারী রামচন্দ্র খাঁ। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে যাইবার জন্য আকুল ভাবে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে আর্ত্তি দেখিয়া রামচন্দ্র খাঁ ব্যথিত হইলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গী সহচরেরাও তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যাহাতে তাঁহারা পরপারে ও উড়িষ্যার সীমানায় গিয়া নীলাচল যাত্রা করিতে পারেন। কারণ এই ঘোরতর যুদ্ধের সময় রাজ-অনুমতি ব্যতীত কেহ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারিত না।

রামচন্দ্র শ্রীচৈতন্যকে বলিতেছেন—

> সবে প্রভু হইয়াছ বিষম সময়।
> সে দেশ এদেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
> রাজার ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে।
> পথিক পাইলে "জাসু" বলি লয় প্রাণে॥
> কোন দিগ দিয়া বা পাঠাও লুকাইয়া।
> তাহাতে ডরাও প্রভু! শোন মন দিয়া॥
> মুঞি সে নমস্কর, এথাকার মোর ভার।
> নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার॥

চৈ, ভা., অন্ত্যখণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ

যাহা হউক, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নৌকায় আরোহণ করিয়া রামচন্দ্র খাঁর সাহায্যেই গঙ্গাপার হইয়া উড়িষ্যারাজের সীমায় পৌছাইতে সমর্থ হইলেন।—পর্ত্তুগীজ ডোমিঙ্গস পায়েস (Domingo Paes) এই সময়কার উড়িষ্যা-রাজ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন

> "And this Kingdom of Orya of which I have spoken above is said to be much larger...since it marches with all Bengal and is at war with her."

এই রকম যুদ্ধের সময় শচীমাতা তাঁহার একমাত্র দুলালকে নীলাচল যাইতে বলিবেন ইহা সম্ভবপর হয় না, এবং পথ দুর্ঘট ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বীরভূমের বিজন অরণ্যে বাস করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত এ-ক্ষেত্রে অধিকতর ঐতিহাসিক এবং সত্য ঘটনামূলক বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে অবস্থান:—বৃন্দাবন দাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করার পর গৌড়ে প্রত্যাগমন করেন; কারণ মহারাজ প্রতাপরুদ্র উৎকলে ছিলেন না, যুদ্ধ করিতে বিজয়নগরে গিয়াছিলেন।

> যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
> তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
> যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয় নগরে।
> অতএব প্রভু না দেখিলেন সেই বারে॥
> ঠাকুর থাকিয়া কথোদিন নীলাচলে।
> পুন গৌড় দেশে আইলেন কুতূহলে॥

চৈ., ভা., অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ে কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিজয়নগরের সহিত উড়িষ্যায় যুদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদের আমল হইতেই চলিতেছিল এবং উড়িষ্যার সীমাও দক্ষিণে বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রদেশে নেলোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালে পর্ত্তুগীজেরাও গোয়া দখল করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। Duarta Barbosa নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত পর্ত্তুগীজ ভ্রমণোদ্দেশে এদেশে আসেন এবং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত "Descriptions of the East Indies and Countries on the seaboard of the Indian Ocean in 1514" প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি João de Novaর রণতরীতে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনিও বিজয়নগরের সহিত উড়িষ্যার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মাদলা পঞ্জিতেও প্রতাপরুদ্রের সহিত দক্ষিণের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত আছে।—"এ রাজাঙ্ক ৮ অঙ্কে সেতুবন্ধ কটকাই কলে। বিদ্যানগর গড় ভাজি ঘউড়াই দেলে।" অর্থাৎ এই রাজার সাত বৎসর রাজত্বকালে সৈন্যসহ সেতুবন্ধ আক্রমণ করিলেন। বিদ্যানগরের কেল্লা ভাঙিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় নেলোর জেলায় অবস্থিত উড়িষ্যার উদয়গিরি আক্রমণ করেন—সে যুদ্ধে উড়িষ্যার শাসনকর্তা পরাজিত হন এবং রাজার সম্পর্কীয় কোনও অন্তঃপুরমহিলাকে বন্দী করিয়া বিজয়নগর-রাজ লইয়া যান। পরে কোণ্ডারিডের যুদ্ধে স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র পরাস্ত হন। রাজা কৃষ্ণদেব রায় কোণ্ডাপল্লী তিন মাস অবরোধ করিয়া জনৈক রাজপুত্র এবং তাঁহার মাতাকে (অর্থাৎ উড়িষ্যার রাজমহিষী প্রতাপরুদ্রের পত্নী) বন্দী করিয়া বিজয়নগরে প্রেরণ করেন। অবশেষে রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া রাজা কৃষ্ণদেব রায় ছয় মাস উক্ত নগর অবরোধ করিয়া রাখেন। অবশেষে বিপন্ন হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র দেব তাঁহার সহিত রাজকন্যার পরিণয় দিয়া উড়িষ্যা-রাজাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করেন এবং নিজেও রক্ষা পান। কোণ্ডারিডে এবং কাঞ্চীর বরদরাজস্বামীর মন্দিরে এই সব কাহিনী উৎকীর্ণ হইয়া লিপিবদ্ধ আছে।

শুধু তাই নয়, সুযোগ বুঝিয়া আবার এই ভীষণ যুদ্ধকালে গৌড়ের রাজা হোসেন শাহ উড়িষ্যা-রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রতাপরুদ্র ভোই বিদ্যাধরকে রাজ্যশাসনের ভার দিয়া স্বয়ং বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। ভোই বিদ্যাধর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গৌড়রাজের সহায়তা করে। মাদলা পঞ্জিতে আছে যে রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের ১৭ অঙ্কে "গউড়রু মুগল বাহিলে। কটক নিকটে সে টারা পকাইলে। কটক রখিয়া হোইথিলে ভোই বিদ্যাধর। সে যাঁই ধরিলে সারঙ্গ গড়। পরমেশ্বরঙ্ক চকা চড়াই চাপরে বসাই চড়াই গুহাপর্ব্বতে বিজে করাইলে। শ্রীপুরুষোত্তম আসি গৌড় পাতিশা অমরা সুরথান প্রবেশ হোইলে। বড় দেউলে যেতে পিতুলিমানে থিলে সবকুহি খুন কলে। দখিন কটকাইরে যে রজা যাইথিলে সেঠারে রন্ধা বারতা পাইলে বড় ক্রোধ করি মাসকবাট দশদিনে আইলে।" ইত্যাদি—অর্থাৎ গৌড় হইতে মুসলমান আক্রমণ করিল। কটকের নিকটেই তাহারা তাম্বু ফেলিল। কটক-রক্ষার ভার ছিল ভোই বিদ্যাধরের। সে সারঙ্গ গড়ে গিয়া রহিল। শ্রীজগন্নাথকে নৌকায় চড়াইয়া—চড়াইগুহাতে লুকাইয়া রাখিল। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গৌড় বাদশাহের ওমরাহ সুলতান প্রবেশ করিল, বড় দেউল অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে যত দেবদেবী বিগ্রহ ছিল সব নষ্ট করিয়া ফেলিল। রাজা দক্ষিণে যুদ্ধে ছিলেন—সংবাদ পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এক মাসের পথ দশ দিনে আসিলেন।" ইত্যাদি। এই মাদলা পঞ্জিতে আছে যে রাজা প্রতাপরুদ্র গৌড়-সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া গড় মন্দারণ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে তিনি ভোই বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে অবরুদ্ধ হন। শেষে ভোই বিদ্যাধরের মধ্যস্থতায় সন্ধি হয়। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ভোই বিদ্যাধরের হস্তে প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। এই বিষম সঙ্কটময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নীলাচলে অবস্থান ও দক্ষিণে ভ্রমণ কি সম্ভবপর? বৃন্দাবন দাস এই অসম্ভব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি হোসেন শাহের নামোল্লেখে বলিয়াছেন—

> "যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
> দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥"

অপর স্থলে

> স্বভাবেই রাজা মহাকাল যবন।
> মহাতমোগুণ বুদ্ধি জন্মে ঘন ঘন॥
> ওড় দেশে কোটী কোটী প্রতিমা প্রাসাদ।
> ভাঙ্গিলেক, কত কত করিলে প্রমাদ॥

বৃন্দাবন দাসের বর্ণনার সহিত মাদলা পঞ্জি, পর্ত্তুগীজ-বৃত্তান্ত এবং উৎকীর্ণ শিলালিপির মিল আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে আধুনিক শ্রীচৈতন্য-জীবনী-লেখকগণও মহাপ্রভুর প্রথমবারেই নীলাচলযাত্রা ও দক্ষিণ-ভ্রমণ উল্লেখ করেন। দুঃখের বিষয়, শ্রীচৈতন্যভাগবত অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিতাবস্থায় পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ গ্রন্থ থাকিলে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সম্পূর্ণ প্রকৃত জীবন-কাহিনী কতকটা পাওয়া যাইত।

শ্রীচৈতন্য যখন দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সন্ন্যাসের পঞ্চম বৎসরে গৌড়ে যাত্রা করেন, তখন রেমুণা

পর্য্যন্ত রামানন্দ রায় তাঁহার অনুগমন করেন এবং তাহার পর ওড্রদেশের সীমান্ত-অধিকারীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। এই সীমান্তের পরই গৌড়ের অধিকার। সেখানকার পাঠান-অধিকারীর দুর্দ্দান্ত শাসন ছিল।

পিছল দা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥

সুতরাং এই সময়ে সুদূর গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত উড়িষ্যা রাজ্য আর নাই। গৌড়ের পাঠান-রাজ্য তখন বালেশ্বর জেলার কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে ঐতিহাসিক আলোকপাতে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নীলাচলে গমন, তাঁহার দক্ষিণ-ভ্রমণ, প্রতাপরুদ্রের সহিত তাঁর মিলন ও নীলাচলে তাঁহার অবস্থিতি এবং ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতির সময় ও যথাযথ ইতিহাস নির্ণয় করিতে হইবে। তাহার বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে অসম্ভব।

উড়িষ্যার ধর্ম্মসংস্কৃতির আন্দোলন :—বহুদিন হইতেই উড়িষ্যা ধর্ম্মসংস্কৃতির কেন্দ্র, বিশেষ নীলাচলধাম। প্রাচী, চিত্রোৎপলা বৈতরণীর কূলে কূলে; উদয়গিরি, খণ্ডগিরি এবং ললিতগিরির গাত্রে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ধর্ম্ম-প্লাবনের দাগ এখনও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। অতীত ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া এখনও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে—গোরক্ষনাথ, মল্লিকানাথ, লোহিদাস, বীরসিংহ, বলিঙ্গাদাস প্রমুখ যোগী-সম্প্রদায়ের যোগধর্ম্মের ধারা—নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক দর্শনের ভিতর দিয়া বৌদ্ধ আসঙ্গের যোগাচারের সঙ্গে মিশিয়াছিল—জৈনমত ও জৈনদর্শনও সে ধারায় লুপ্ত হয় নাই—গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। নীলাচল চারি ধামের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ধাম। শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্থাপিত গোবর্দ্ধন মঠের একাদশ মঠাধিপতি শ্রীধরস্বামী সকল ধারাকে ভক্তিপথে প্রবাহিত করিয়া ভাগবতধর্ম্মে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে এক সমন্বয় স্রোতের উৎস খুলিয়া দেন—সে উৎস ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে চলিতেছিল। শ্রীচৈতন্য সেই উৎসকে দুকূলপ্লাবী প্রবল প্রেমবন্যায় নীলসিন্ধুতটে এক মহামিলনক্ষেত্রে পরিণত করেন। শ্রীরামানুজ, তুলসীদাস, কবীর, নানক প্রমুখ ভারতবর্ষের প্রত্যেক ধর্ম্মাচার্য্যই এই স্থানে বাণী ও কর্ম্মধারা রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল ধারা হইতে উৎকলে এক অপূর্ব্ব অদ্ভুত বৈষ্ণব ধর্ম্ম উত্থিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের পাঁচ জন আচার্য্য ছিলেন। ইঁহাদের সকলকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একত্র করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে নিয়োজিত করেন। বাংলার কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহাদের উল্লেখ বা লীলা-প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু উৎকলীয় বৈষ্ণবগ্রন্থে এই সকল মহাপুরুষ স্বয়ং এবং কোথাও তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তাঁহাদের গুরু এবং অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উৎকল-বৈষ্ণবসমাজে এই পাঁচ জন আচার্য্য পঞ্চশাখা বা পঞ্চসখা নামে পরিচিত।

পঞ্চশাখা বৈষ্ণব :—এই পঞ্চশাখার মূলতরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই পঞ্চসখার নাম শ্রীজগন্নাথদাস, শ্রীবলরাম, শ্রীযশোবন্ত দাস, শিশু অনন্ত ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস। অচ্যুতানন্দ লিখিয়াছেন—

বৈষ্ণব মণ্ডল খোল করতাল বজাই বোলন্ত হরি।
চৈতন্য ঠাকুর মধ্যে নৃত্যকার দণ্ডকমণ্ডলু ধারী॥
অনন্ত অচ্যুত যেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এপঞ্চ সখাহি নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গচন্দ্র সঙ্গত॥

শ্রীচৈতন্য স্বয়ং তাহাদের কাহাকে কাহাকেও নিজে গান গাহিয়া সুরলয়তান দেখাইয়া কীর্ত্তন শিখাইয়াছেন এবং কীর্ত্তন প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

তুম্ভ পঞ্চ সখাঙ্কু কো মো জন্ম জন্ম আশ।
তুম্ভ পাঁই—অবতাই লীলা অভিলাষ।
যাও অচ্যুত অনন্ত যশোবন্ত দাস।
বলরাম জগন্নাথ কর যা প্রকাশ॥

ইঁহারা সকলেই উৎকলে ধর্ম্মরাজ্যের রাজা। সহস্র সহস্র নর-নারী তাঁহাদের আশ্রয় করিয়া আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেছেন। সমগ্র হিন্দুস্থানে যেমন তুলসীদাসের রামায়ণ, বাংলায় যেমন কাশীরামদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ, উৎকলে তেমনই বলরামদাসের রামায়ণ ও জগন্নাথদাসের ভাগবত। প্রত্যেক পল্লীতে প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক কুটীরে ইহা পঠিত হয়। উড়িষ্যার প্রতি গ্রামে ভাগবতঘর ও ভাগবতগদি আছে। সে ভাগবত সংস্কৃত ভাগবৎ নয়, উড়িয়া ভাষায় উড়িয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মুকুটমণি, জগন্নাথদাসের ভাগবত। এই পাঁচ আচার্য্য শুধু ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, উৎকল ধর্ম্ম ও

কাব্য সাহিত্যকে ইঁহারা পরিপুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গেলে বিরাট গ্রন্থ হয়।

মূল কথা আমরা দেখিতে পাই শ্রীচৈতন্যযুগে শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে তাঁহারা প্রচারকেন্দ্র বা মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন; খোলকরতাল-সহযোগে কীর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন—সর্ব্বসাধারণের ভিতর—সমাজের নিম্নতম স্তরও বাদ যায় নাই।

বাংলার বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রচারক বলিয়া অবজ্ঞা করেন এবং কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক তাঁহাদিগকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই স্বয়ং জগন্নাথদাসকে অতি-বড় আখ্যা দিয়াছিলেন এবং কি উৎকলে কি অন্যান্য দেশে তিনি অতি-বড় গোঁসাই বলিয়া পরিচিত। সপ্তদশ শতকের উৎকলীয় কবি ও জীবনীলেখক শ্রীজগন্নাথ-শিষ্য দিবাকর দাস তাঁহার শ্রীজগন্নাথচরিতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই অতি-বড় আখ্যা দেওয়াতে উৎকলী ও গৌড়ীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটে। এমন কি কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গৌড়ীয় ভক্ত ও শিষ্য নীলাচলধাম ত্যাগ করিয়া যাজপুরে চলিয়া যান। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথদাসকে সঙ্গে লইয়া তথায় যান এবং দুই দলকে মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল। এই অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা বলা বড় শক্ত। তবে শুধু এক দেবকীনন্দদাস ব্যতীত আর কেহ ইঁহাদের নামোল্লেখ করেন নাই—ইহা কি আশ্চর্য্য নয়? উৎকলের ভাবধারায় যাঁহারা শুধু রাজা নয়, সম্রাট্—যাঁহাদের জীবন অলৌকিক, যাঁহারা নীজে মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রভাব শুধু স্বীকার করেন নাই, মান্য করিয়াছেন, আজও যাঁহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যের নামে মস্তক নত করে—তাঁহাদের কথা বাংলার বৈষ্ণব মহাজনেরা আদৌ উল্লেখ করেন নাই, তাহারই বা কারণ কি? বাস্তবিক ইঁহাদের জীবনকথা, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সহিত তাঁহাদের মিলন ও প্রচার প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-লীলারই অঙ্গীভূত। শ্রীচৈতন্যের জীবনীগ্রন্থে তাহার উল্লেখ না থাকিলে তাহা অসম্পূর্ণই রহিয়া যায়।

নীলাচলে এখনও শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিচিহ্ন জলন্তভাবে দীপ্তি পাইতেছে। সম্প্রতি শ্রীমন্দিরের অন্তর্বেষ্টনীতে অর্থাৎ ভিতর-বেড়ায় ঈষৎ উত্তরপূর্ব্ব কোণে তাঁহার মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে—যে বেষ্টনীর ভিতরে এক দেবদেবী মূর্ত্তি ছাড়া অপর কোনও ধর্ম্মাচার্য্য বা অবতার পুরুষেরা স্থান পান নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সেবার তত্ত্বাবধানকারিগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাঁহার বিগ্রহে রং দিয়া এবং বেশভূষায় সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাইয়াছেন—যেমন এই মহাপুরুষকে জীবনলীলায় তাঁহারা করিয়াছেন। নবাবিষ্কৃত মন্দিরের কাষ্ঠময় মূর্ত্তি যোগারূঢ় পদ্মাসনে আসীন ধ্যানস্তিমিতলোচনে করজপ করিতেছেন—যেন শ্রীমন্দিরের শীর্ষদেশের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন এবং বলিতেছেন

প্রাসাদাগ্রে নিবসতিপুরঃ স্মের বক্তারবিন্দো
মামালোকা-স্মিত সুবদনো বালগোপাল মূর্ত্তিঃ।

অনন্তের কোন্ রসমূর্ত্তি বিগ্রহের লীলা নীলাম্বুধির গভীর গর্জ্জনের তালে তালে নৃত্য করিতেছে কে জানে? আজও নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের রসমাধুরী নীলাম্বুর অনন্ত প্রবাহে মিশিয়া অপূর্ব্ব প্রেমঘন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রেমের তরঙ্গে ভাসিতেছে! জগতে কি তাহার তুলনা আছে?

আবৰ্ত্ত

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রবীন আর পুলিন দুই বন্ধু।

সদর মহকুমা হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল।

অনেকটা পথ, শেয়ারের গাড়ীও পাওয়া যায়, কিন্তু পুলিন পণ করিয়াছে, ওইটুকু রাস্তা হাঁটিয়াই শেষ করিবে। একে ত আসিবার সময় 'বাস'-ভাড়া লাগিয়াছে দুই আনা, ফুটবলের মাঠে ঢুকিতেও গিয়াছে দুই আনা, জল খাবারে দুই এক পয়সা করিয়া একটি চকচকে আনিই বাহির হইয়াছে, আধুলি হইতে যাহা আছে তাহাতে বাস-ভাড়া কুলাইলেও ভবিষ্যতের সঞ্চয় কিছু রহিবে না। সুতরাং পদযানই সর্ব্বোত্তম। বন্ধুর পণের প্রাণটুকু হরণ করিতে রবীনের সাহসে কুলায় নাই, অর্থাৎ অর্থের আশু অপকারিতা সম্বন্ধে তর্ক তুলিয়াও ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ীর যুক্তিকে সে কাটিতে পারে নাই।

অনেকটা রাস্তা কিন্তু খেলাটাও যা হইয়াছে চমৎকার। দিব্য তাহার আলোচনা করিতে করিতে হাঁটিয়া যাওয়া যায়। এমন ত চলিয়াছেও অনেকে।

সন্ধ্যা অত্যাসন্ন, রৌদ্রের উত্তাপ নাই। ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের পাকা রাস্তা। দু-ধারে বন আছে, বাগান আছে, সারি সারি খড়ের চালাযুক্ত গ্রামও এ-পাশে ও-পাশে পড়িতেছে। শীত থাকিলেও বা বাঘের ভয় করিত! দিব্য চলিয়াছে সকলে।

কিন্তু চলিতে গিয়াই পুলিনের পণরক্ষা বুঝি আর হয় না! গ্রামের মাঠে গতকল্য যে-খেলাটি হইয়া গিয়াছে, বল রুখিতে গিয়া পুলিনের পা তাহাতে একটু মচ্‌কাইয়া যায়। সামান্য ব্যথা পুলিন গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে নাই। এখন খানিকটা আসিয়া সেই ব্যথাটাই দিব্য জীবন্ত হইয়া উঠিল। এ-পাশ ও-পাশ পা হেলাইয়াও ব্যথা সমান তালে পাল্লা দিতে লাগিল।

একবার মুখ দিয়া বুঝি 'উঃ' শব্দও বাহির হইয়াছিল।

রবীন বলিল—কিরে? পা চালিয়ে চল।

পুলিন বন্ধুর পানে করুণ নেত্রে চাহিয়া বলিল—সেই মচ্‌কানির ব্যথা।

রবীন বলিল—তবে! দু-আনা পয়সার মায়া ক'রে বাসে চাপলি নে যে বড়?

পুলিন বলিল—বাস ত এখনও পাওয়া যায়। দাঁড়া না একটু।

রবীন দাঁড়াইল এবং অর্থের মিতব্যয়িতা লইয়া বেশ একটু হুলফুটানোগোছ বক্তৃতাও দিতে লাগিল।

পুলিন বলিল—বল, বল, 'মাতঙ্গ পড়িলে দকে—পতঙ্গেতে কিনা বলে'! বল।

রবীন হাসিতে লাগিল।

এমন সময় হর্ণ দিয়া মৃদু মন্থর গতিতে বাস আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

চালক বলিল—আসেন, বাবু, আসেন। বহুৎ খালি।

খালি অবশ্য ছিল না, তবে দাঁড়াইবার জায়গাটুকু ছিল। পল্লীর পথে যে-সব বাস চলে তাহাতে সোজা হইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব। সর্ব্বক্ষণ বিনয়ীর মত মাথা নীচু করিয়া যাইতে হয়। যাত্রাশেষে নামিবার সময় আড়ষ্ট ঘাড়ের বেদনায় কিছুক্ষণ ম্রিয়মাণ থাকিতে হয়।

যাহা হউক, এ-ক্ষেত্রে পায়ের মচ্‌কানির চেয়ে ঘাড় খানিক ক্ষণ আড়ষ্ট হইলেও ক্ষতি নাই।

পুলিন হিসাবী, কহিল—কিন্তু দু-আনা পাবে না, আমরা অনেকটা হেঁটে এসেছি—না হয় হেঁটেই যাব।

যথালাভ মনে করিয়া চালক বলিল—যা খুশী দেবেন, উঠুন। দুই বন্ধু বাসে উঠিল।

যথাস্থানে নামিয়া পুলিন যেমন একটি আনি বাহির করিয়াছে রবীন অনুযোগভরা স্বরে বলিল—ছিঃ! ন্যায্য ভাড়া যা তাই দাও। কাউকে ঠকাবার প্রবৃত্তি যেন কখনও না হয়।

পুলিন প্রতিবাদ করিল—বাঃ রে—ঠকানো কিসের? এতখানি পথ হাঁটলাম, ওই ত বললে—

রবীন বলিল—পথ যতখানিই হাঁট—পায়ের ব্যথাটা তোমার ত সত্যি। গাড়ি নইলে আসতেই পারতে না। যেটা সত্যিকারের দরকার—তার ওপর ফন্দী ফিকির দিছে। ও যাই বলুক, তুমি কেন খাটো হ'তে গেলে।

পুলিন দুই আনাই দিল। দিয়া গজ-গজ করিতে করিতে চলিল। পথে আরও কয়েক জন জুটিয়াছিল। পুলিনের উপর সমবেদনা প্রকাশ করিয়া উহারই মধ্যে কে এক জন বলিল—ভারি আমার সাধু রে! বাপ ক'রলে দোকান লুট, ছেলে বেড়ায় সাধুত্বের বক্তৃতা দিয়ে। বলিহারি সাধু রে!

কথাটা শুধুই রবীনের কানে গেল না, মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল। মুখখানি তাহার আরক্ত হইয়া উঠিল। ভাগ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে চারি দিক ঢাকিয়া গিয়াছিল নহিলে রবীন এ-লজ্জা লুকাইত কোথায়?

* *

জনশ্রুতিতে যদি বিশ্বাস করা যায় তবে পুলিনের সমব্যথীর মন্তব্য বহুলাংশে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

রবীনের পিতা কোন আত্মীয়ের দোকানে কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন।

প্রকাণ্ড দোকান; মালিক কালেভদ্রে দোকানে পদার্পণ করিলেও হিসাব-নিকাশের ধার দিয়াও যাইতেন না। তিনি দেখিতেন সুদৃশ্য 'শো-কেসে' সুন্দর সুন্দর শাড়ী ব্লাউজের পারিপাট্য, শুনিতেন কোথাকার রাজা বা জমিদার তাঁহার দোকানের খাতায় নাম লিখাইয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন তাহারই কাহিনী, আর কর্ম্মচারীদের পানে চাহিয়া সগর্ব্বে ভাবিতেন এতগুলি প্রাণী আমারই কৃপাশ্রিত। বেশ প্রসন্ন মনেই তিনি দোকান পরিদর্শন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতেন।

একদিন রবীনের পিতার বিরুদ্ধে কে এক জন তাঁহাকে কি কথা বলিল। তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অকপটে যে বিশ্বাস এক জনের উপর ন্যস্ত করা যায়—সে লোক কখনও তাহার অপচয় করিতে পারে না।

এক দিন দুই দিন করিয়া অনেকবার অনেক লোকই তাঁহার কান-ভারি করিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন, দেখাই যাক এক দিন এই ঈর্ষালুব্ধ মানুষগুলির অভিযোগ কতটা সত্য।

সহসা এক দিন দোকানে আসিয়া তিনি খাতাপত্র তলব করিলেন। ফলে যাহা বুঝিলেন তাহাতে সন্দেহের বীজকণা পল্লবিত হইয়া উঠিল।

তার পর কি হইয়াছিল কেহ জানে না। মাস-কয়েক পরে শহর ছাড়িয়া রবীনের পিতা গ্রামে আসিয়া বসিলেন। যে-কেহ কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কালমাহাত্ম্য ও আত্মীয়ের অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে শতমুখ হইতেন। বয়স হইয়াছিল, কাজকর্ম্ম তিনি বিশেষ কিছুই আর করিয়া উঠিতে পারিলেন না, অথচ সংসার দিব্য নিরুদ্বিগ্নে চলিয়া যাইতে লাগিল। কেবলমাত্র সংসারের অসচ্ছলতার দোহাই দিয়া পুত্রের পড়া ছাড়াইয়া দিলেন। আর একটি বৎসর হইলেই সে হোমিওপ্যাথিক কলেজ হইতে পাস করিয়া বাহির হইতে পারিত!

* * *

বাড়ি আসিয়া রবীন হাত মুখ ধুইয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল।—

মা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলেন—আবার বসলি যে? আয় খেয়ে নিবি।

মুখ ভার করিয়া রবীন বলিল—পরে খাব।

পুত্রের মুখ ভার দেখিয়া মা উদ্বিগ্ন হইলেন—হাঁ রে, অমন মুখ ভার কেন? কি হ'ল?

রবীন মুখ তুলিয়া মায়ের পানে চাহিতে পারিল না।

মা কাছে আসিয়া তাহার মাথায় একখানি হাত রাখিয়া বলিলেন—কি হয়েছে রে?

বন্ধুর কথার খোঁচায় যে-টুকু উত্তাপ জমিয়াছিল স্নেহময়ীর স্পর্শে সেই ব্যথার বাঁধ চোখের জলে গলিয়া পড়িল। রবীন মায়ের কাছে সব খুলিয়া বলিল।

মা খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—লোকে অনেক কথা বলে, সব কি বিশ্বাস ক'রতে আছে, বাবা।

—কেন লোকে বলে ও কথা।

মা হাসিলেন—তাহ'লে লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বেড়াতে হয়।

করবার সাহায্য আমা দ্বারা হবে না, তা সে যত টাকাই দিক না কেন।

রবীনের দীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া পুলিন এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু রাগ সে করিল না। সাংসারিক অসচ্ছলতার মধ্যেও বন্ধু অন্তরে যে সততার অগ্নিকণা জ্বালিয়া রাখিয়াছে, সে আগুনকে পবিত্র হোমানলের মতই তার মনে হইল।

* * * *

আরও কয়েকটি বৎসর পরে।

রবীনের আয় যৎসামান্য হইয়াছে, কিন্তু তদনুপাতে পোষ্য সংখ্যা হইয়াছে দ্বিগুণ। উপার্জ্জনের সামান্য কয়টি টাকা মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত। অভাব-অনটনের সঙ্গে যুঝিয়া আপন স্নেহপক্ষপুটে আগুলিয়া রবীনের মা এই কয়টি প্রাণীকে বাহিরের ঝড় জল হইতে এতকাল বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। কি করিয়া কোথা হইতে যে তিনি টাকা সংগ্রহ করিয়া অভাব-অভিযোগ মিটাইয়া দেন—সে-সংবাদ রবীন জানে না, রবীনের বউও জানে না।

শ্রাবণের এক অপরাহ্ণে মেঘ করিয়া বৃষ্টি নামিল। রবীনের মা ছাদের উপর ভিজা কাঠ শুকাইতে দিয়াছিলেন, ভিজিতে ভিজিতে সেগুলি তুলিলেন। বৃষ্টির জলে ভাল সুসিদ্ধ হয় বলিয়া কলসী কয়েক জল ধরিলেন। এমনই করিয়া ঘণ্টাখানেক ভিজিয়া যখন কাপড় ছাড়িতে গেলেন তখন বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল।

বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—বউমা, সন্ধ্যেটা তুমিই দেখিও আমার শীত শীত করছে, একটু শুই। কাঁথাখানা দিও ত মা।

ব্যস, সেই শোওয়াই শোওয়া। তিন দিন পরে রবীনকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—দেখ্ বাবা, একটা কথা তোর কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম, ইচ্ছে করেই বলি নি, পাছে তুই দুঃখ করিস। শোন।

রবীন কাতর কণ্ঠে বলিল—আজ থাক, ভাল হ'য়ে ব'লো।

—না, বাবা; রোগের কখন কি হয় বলা যায় না, শুনে রাখ। তুই একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলি, হাঁ, মা, আমাদের নাকি অনেক ভাল ভাল কাপড় আছে? আমি বলেছিলাম, আছে। তবে সেগুলো না বলে নেওয়া নয়, ওঁর পাওনা।

রবীন চঞ্চল হইয়া বলিল—আজ থাক না, মা।

—না রে, শোন। শুনেছি যারা চাকরি করে, তাদের চাকরি ছাড়িয়ে দিলে হয় পেনসান দেয়, না-হয় মোটা টাকা। বুড়ো বয়সে খাটবার ক্ষমতা ত থাকে না, তাই কোম্পানী দয়া করে। কিন্তু বিনি-দোষে বুড়ো বয়সে ওঁকে চাকরি ছাড়িয়ে দিলে, এক পয়সা দিলে না। রাগ ক'রে উনি যা পেয়েছিলেন কাপড়, জামা, টাকাকড়ি এনেছিলেন।

রবীন যেন পাথর বনিয়া গিয়াছে। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মায়ের পানে চাহিয়া আছে।

মা বলিতে লাগিলেন—লোকে ব'লবে অন্যায়, কিন্তু উনি ধর্ম্মত কোন অন্যায় করেন নি। মরবার দিন আমায় ব'ললেন, দেখ, ছেলেটা যেন না শোনে এ-কথা। হয়ত রাগ ক'রে যা করেছি, তা অন্যায়ই। লোকে আমায় দুর্নাম দিচ্ছে। আমি বললাম, না, অন্যায় করনি। আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাই যদি, লোকে চেয়েও দেখবে না। তুমি স্থির হও; যদি অন্যায়ই হয়, সে অন্যায় যেন তোমার আমার মধ্যেই শেষ হ'য়ে যায়, ছেলেকে যেন না ছুঁতে পারে। তাই করেছি, বাবা। ওঁর আনা সব জিনিষই একে একে বিক্রী ক'রে দিয়েছি। আজ যদি আমি মরি, কাল তোকে অন্যায় ক'রে নেওয়া জিনিষের এক টুকরো দিয়েও সংসার চালাতে হবে না। সব শেষ ক'রে দিয়েছি। বলিয়া শ্রান্তিতে তিনি চক্ষু মুদিলেন।

বহু ক্ষণ পরে চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, রবীন তেমনই চিত্রার্পিতের মত বসিয়া আছে।

আপনার একখানি উত্তপ্ত হাত দিয়া রবীনের ডান হাতখানি তিনি বুকের উপর টানিয়া আনিয়া বলিলেন—জানি, দুঃখু পাবি, কিন্তু না ব'লে যে আমি শান্তিতে মরতে পারতাম না, রে। বড় দুঃখু, নয় রে?

রবীন শুধু বলিল—না।

* * * *

পুরাপুরি সংসার ঘাড়ে পড়িতেই রবীন দেখিল, এখানে ছিদ্র বহু। এদিকে তালি দিতে গেলে ওদিকের ফাঁক বাড়িয়া যায়, ওদিকের অভাব মিটাইতে গেলে এদিকের

অনশন ভ্রূকুটি হানে। মাথার উপর আবরণ নাই, পাশে দেওয়াল নাই, কোথাও বসিয়া যে ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলিবে ততটুকু সময়ও হাতে নাই।

ছোট ছেলেমেয়েগুলি অবুঝ; সময়ে-অসময়ে বাপের কাছে হাত পাতে, আব্দার করে, না পাইলে রাগ করিয়া কাঁদিয়া জ্বালাতন করে। অভাবের তীব্র তাড়নায় ঠাণ্ডা মেজাজের রবীন কেমন যেন রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ধমক ত দেয়ই, চড়টা-চাপড়টাও চলে। বউ অবশ্য সব সময়েই সুধা বর্ষণ করে না। ছেলেমেয়ের পক্ষ লইয়া দু-কথা বলিতে গেলেই পাশের বাড়ির লোকে কৌতুকে কান পাতিয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়ায়। লজ্জিত হইয়া রবীন সরিয়া পড়ে।

আগের দিন রাত্রিতে বউ জানাইয়া দিয়াছিল, একটিও পয়সা আর ঘরে নাই, উপার্জ্জন না করিতে পারিলে কাল প্রাতে হাঁড়ি চড়িবে না। দুশ্চিন্তায় রবীন সারারাত্রি ঘুমায় নাই। সংসারের চিন্তা ছাড়িয়া সে কেবল বাবার কথাই ভাবিয়াছে, মৃত্যুকালে মা যে-সব কথা বলিয়া গিয়াছিলেন সেই সব কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছে। ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, অন্যায় তাঁহারা কিছুমাত্র করেন নাই। সততার পুরস্কার যেখানে মুখের সামান্য একটি সাধুবাদেও লোকে উচ্চারণ করিতে চাহে না, সেখানে সাধুতা মূর্খতারই নামান্তর। মা ঠিকই বলিয়াছিলেন, অন্যায় কিছু নাই। যেখানে লোকে নিজের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়া লইতে চায়, জনমত ধিক্কার দিয়া অমনি কালি ছিটাইতে থাকে। অন্যায় তাহার পিতা কিছুমাত্র করেন নাই। আর যদি অন্যায়ই করিয়া থাকেন সে অন্যায় তাঁহাদের সঙ্গে শেষ হইয়াছে কে বলিল? সে-অন্যায় বংশ-পরম্পরায় চলিতে থাকুক। সন্তানদের সে শিক্ষা দিয়া যাইবে, নিজের গ্রাস মুখে তুলিতে নিজের যে-কোন চেষ্টা (অবশ্য আইন-বিগর্হিত এমন কিছু নহে) নিন্দনীয় নহে। অক্ষম সাধুতার মত পাপ আর নাই।

প্রভাতে উঠিয়া মন বাঁধিয়া সে ডাক্তারখানায় গিয়া বসিল।

প্রথমেই আসিল পরাণের বিধবা স্ত্রী।

—আর বাবা, কাল রাত থেকে তেমনি জ্বর, চোঁয়া-ঢেঁকুর—রবীন শক্ত হইয়া বলিল, দিনকতক ওষুধ খেতে হবে; আর পয়সা চাই, বুঝলে?

—পয়সা কোথা পাব, বাবা। ধান ভেনে খাই, গরিব দুঃখী মানুষ—

—তা হ'লে ভাল ওষুধও পাবে না। পয়সা না দিলে ওষুধ কিনবো কি দিয়ে?

—অগত্যা পরাণের স্ত্রী আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া চারিটি পয়সা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল,—হেই বাবা, আর নেই, দুঃখী মানুষ। ভাল ওষুদ দিস বাবা।

রবীন টেবিলের পানে চাহিল না, ঔষধ ঢালিয়া বলিল—চার দাগ—চার ঘণ্টা অন্তর, বুঝলে?

পরাণের স্ত্রী গমনোন্মুখী হইতেই রবীনের ইচ্ছা হইল উহাকে ডাকিয়া পয়সাকটা ফিরাইয়া দেয়। আহা! দুঃখী মানুষ। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে অন্য কয়েকটা রোগী আসিয়া পড়ায় সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। ভাবিল, কাল ফিরাইয়া দিব।

রোগীরা রবীন-ডাক্তারের ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল, যে যাহা পারিল দিয়া ঔষধ লইল।

অবশেষে গাঙ্গুলী-বুড়াকে পয়সার কথা বলিতেই তিনি বলিলেন—তুই বলিস কিরে, রবে, এক শিশি জল দিয়ে পয়সা নিবি?

রবীন বলিল—না হ'লে আমার চলবে কিসে?

গাঙ্গুলী হাসিলেন—হাঁ, তোর আবার চলবার ভাবনা। তোর বাবা যা রেখে গেছে—

তীব্রস্বরে রবীন বলিল—পরের ধন কেউ কম দেখে না। ওসব বাজে কথা রেখে, শুনুন, পয়সা যদি দিতে পারেন ত ওষুধ পাবেন, নইলে পথ দেখুন।

গাঙ্গুলী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ইঃ—পয়সা দেবে? পয়সাই যদি দোব ত তোর জল ওষুধ খেয়ে মরি কেন? গাঁয়ে কি আর পাস-করা ডাক্তার নেই? ভারি অহঙ্কার, বাপ দোকান লুট ক'রে রাজা করেছে বলে আমরা ভয় ক'রে চলবো নাকি? বলিতে বলিতে তিনি কোমরের কাপড়টা ভাল করিয়া কষিয়া পরিলেন। কাপড় পরিবার সময় ট্যাঁকে গোটা-কয়েক টাকা ঈষৎ শব্দ করিয়া উঠিল এবং উহারই মধ্যে একটি টাকা গড়াইয়া নিঃশব্দে পাপোষের উপর পড়িল।

কুঞ্জ গাঙ্গুলী জানিতেও পারিলেন না, ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তারখানা বন্ধ করিবার সময় রবীন টাকাটা দেখিতে পাইয়া পাপোষের উপর হইতে তুলিয়া লইল। মনে মনে হিসাব করিল, কাহার টাকা হইতে পারে? কিন্তু বহুক্ষণ ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিল না। ভাবিল, কাল যাহারা ঔষধ লইতে আসিবে তাহাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে।

জিজ্ঞাসা করিবার কথা মনে হইতেই সে আপন মনে হাসিয়া উঠিল। কি মূর্খ সে? যাহাকে সে টাকার কথা সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করিবে সেই যে টাকার দাবি করিবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এই বিতরণের কোন মানেই হয় না।

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় রবীন আর একবার হাসিল। হাসিয়া টাকাটা পকেটে ফেলিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া দিল।

লোকে বলাবলি করে রবীনটা কি চশমখোর দেখেছ? ওই ত জল ওষুধ তাই দিয়ে গরিব-দুঃখীর কাছে টাকা নেয়। টাকা চাইবার সে কি ধুম, কাবলীকেও হার মানায়।

কিন্তু যে যাহাই বলুক, রবীন চিকিৎসা করে ভাল। গরিব-দুঃখীরা সামান্য পয়সা দিয়া তাহার ঔষধ লইয়া যায়। সেই সামান্য পয়সায় রবীনের ক্রমবর্দ্ধিত সংসারের ফাঁক অবশ্য ঢাকে না। কিন্তু যেটুকু ঢাকে তাহাই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে মনটার ভিতর কেমন খচ্ খচ্ করিতে থাকে। এই সব দুঃখীর রক্ত-জল-করা সামান্য পয়সা লইয়া এ দুর্নাম কেনা কিসের জন্য? কিসের জন্য সে-কথা বাড়ির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলে প্রতিক্ষণে মনে হয়। যেখানে সে নামিয়াছে সেখান হইতে কেহ কোনদিন পা তুলিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসে নাই। কূলে আছাড় খাইয়া যে-স্রোত নদীর গর্ভে ফিরিয়া যায় তাহার টানে নিম্নাভিমুখী হওয়াই বিধান। চারি পাশে এই ফিরিয়া-আসা স্রোতের আকর্ষণ, উপরের তীরভূমির পানে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া কি লাভ?

পুলিনকে ডাকিয়া সেদিন বলিল—কিহে 'কল-টল' আর আসে না? তোমাদের সেই বুড়ো গয়লা কি বলে? কথাটা পুলিন প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, রবীন বৎসর-কয়েক পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে পুলিন বুঝিতে পারিল। হাসিয়া বলিল—আচ্ছা যা হোক, কবে কি একটা অন্যায় অনুরোধ করেছিলাম, তার খোঁটা দেওয়া আজও গেল না।

রবীন গম্ভীর মুখে বলিল—না রে, খোঁটা দেওয়া নয়। সত্যিই আজ তেমন 'কল' পেলে নিই। এখন যে টাকাটা বড় দরকার।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পুলিন সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

—হাসলি যে বড়?—

—তোমার মুখ দেখে আর কথা শুনে। যেন সত্যিই অমন কাজ পেলে তুমি বর্ত্তে যাও।

—সত্যিই বর্ত্তে যাই।

—যাও যাও, তোমায় যেন আমরা চিনি নে। সেই 'বাসে' আসার কথা কোন দিন ভুলব না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রবীন বলিল—তবে শোন, পুলিন, আজই এমন ধারা একটা 'কল' নিয়েছিলাম, বাউরি-পাড়ায়। টাকা অবশ্য একটাই পেয়েছি।

একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল—তাই বা দেয় কে?

—সত্যি? তুমি?—

—আমিই। বলিয়া রবীন হাসির মাত্রা বাড়াইয়া দিল।

পুলিন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—আমি যাই। ও-বেলা এসে তোমার প্রলাপ শুনব।

বাড়ির মধ্যে আসিয়া রবীন ডাকিল—ওগো, শুনচ। পুলিন ত বিশ্বাসই করলে না, আমি অমন কাজ করতে পারি? বউ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—কি যে আদিখ্যেতা কর! কাজটা মন্দ কিসে? রোগ হয়েছে ওষুধ দিয়েছ—টাকা নিয়েছ, ব্যস। এ নিয়ে আবার ঢাকপেটা কেন?

রবীন হাসিয়া বলিল—সত্যি খুব খানিকটা চেঁচাতে ইচ্ছে করছে। ভারি আনন্দ হচ্ছে।

—মরণ—বলিয়া বউ পিছন ফিরিল।

রবীন ডাকিল—ওগো শোন, মরণ না হয় আমার, কিন্তু পাওনাদার শুনবে কেন? আজ টাকা না দিলে চাল-ডাল বন্ধ।

—কেন, আজকের টাকাটা কি হ'ল ?

—পথেই কলুমাগী ধরলে, ছ'-মাসের দাম পাওনা। মুখ ছুটিয়ে আদায় করে নিলে।

—সকালে ডাক্তারখানায় কিছু হয় নি ?

—অষ্টরম্ভা। লোকের রোগ হ'লে ত আসবে।

—তবে কি আমার চুড়ি কগাছা খুলে দেব ?

—যদি দয়া হয়।

বউ এইবার বিষম রাগিল। রাগিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলিতে লাগিল। পাশের বাড়ির জানালার কপাট খুলিতেই রবীন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে আত্মগোপন করিল।

রোয়াকে পা ছড়াইয়া বসিয়া বউ মড়াকান্না কাঁদিতে লাগিল।

ঘরের মধ্য হইতে রুক্ষ গলায় রবীন বলিল—ভাল আপদ! শোন এদিকে!

বউ রোয়াক হইতে ক্রন্দনের সুরে ঝাঁঝিয়া উঠিল—শুনব আবার কি? তোমার হাতে যখন পড়েছি অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে। হাতে মালা—

—তবু বক্ বক্ করে, শোন না।

বউয়ের কান্না সহসা থামিয়া গেল। দীপ্ত কণ্ঠে কহিল—কি? শুনব আবার কি? ঘরের মধ্যে যাই আর হাত মুচড়ে চুড়ি কগাছা কেড়ে নাও!

এ-কথায় রবীন স্তব্ধ হইয়া গেল। বহুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিল না। বুকের মধ্যে কান্নার সমুদ্র তোলপাড় করিয়া উঠিল। সেই বধূ—সেই ভালবাসা! কাহার জন্য আজ তীর ছাড়িয়া পাঁকভরা নদীতে সে নামিয়াছে! কাহার জন্য দিনের পর দিন এই উঞ্ছবৃত্তি? বৃথাই কলঙ্কের মালা গলায় পরিয়া জনসমাজে সে হেয় হইয়া রহিল!

রাগের মাথায় কথাটা অত্যন্ত রূঢ় হইয়া গিয়াছে বউ সে-কথা বুঝিল! বুঝিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল—কি? কেন ডাকচো?

রবীন ধরাগলায় বলিল—তুমি ঠিকই বলেছ, অভাবের তাড়নায় হয়ত কোন দিন তোমার গহনায় হাত দিতে পারি। যাও, যাও, সামনে থেকে সরে যাও।

বউ সরিয়া গেল না। আরও নিকটে আসিয়া রবীনের গায়ে একখানি হাত দিয়া বলিল—রাগের মুখে বেরিয়ে গেছে। দিনরাত কিচি-কিচি, এতে শরীর যে জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যায়। বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষণপূর্ব্বের কান্নার চেয়ে এই কান্নার কতই না প্রভেদ!

* * * *

স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া খানকয়েক বাসন বাঁধা রাখাই ঠিক করিল।

সে টাকা ফুরাইলে রবীনের নজর পড়িল, বহুদিনকার অব্যবহৃত বাক্সবন্দী হারমোনিয়মটার উপর। সচ্ছল অবস্থার দিনে এটি কেনা ছিল; যাহার ঘরে অন্নপূর্ণা বিমুখ তাহাকে গান গাহিয়া দেবী বীণাপাণির বন্দনা শোভা পাইবে কেন?

ভাল খাটখানি কেন ঘর জোড়া করিয়া আছে? মেঝের খোয়া কোথাও উঠে নাই, মাদুর পাতিয়া উহাতেই শোওয়া চলে। এত ছোট ঘরে আবার শো-কেস? কাপড়-জামা সাজাইয়া রাখিবার মত একখানিও নাই, আছে—কারিকরের হাতে-গড়া এক রাশ মাটির ফলমুল। যাহারা সাজাইয়া রাখিতে পারে তাহারাই রাখুক; এ-বাড়িতে ওই একরাশ মাটি শিল্পনৈপুণ্যের জন্য প্রশংসা পাইবে না, বরং উনুন গড়িলে কতকটা কাজে লাগিতে পারে। মস্ত বড় দাঁড়া আয়না! সাজিয়া-গুজিয়া মুখ দেখিতে কে উহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে? যেমন কাপড়ের শ্রী তেমনি দেহের!

রান্নাঘরের মাচায় অনেকগুলি কোদাল, কুড়ুল, দা রহিয়াছে। যেন নূতন করিয়া একতলার উপর ঘর উঠিবে! উহার একখানি করিয়া থাকিলেই যথেষ্ট। দালানে খানকয়েক কাঁঠাল কাঠের তক্তা বহুদিন হইতে রাখা হইয়াছে। ও-গুলি রাখিবার খানিকটা জায়গা জোড়া করা বইত নয়!

এই রূপে একে একে অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিষ সংসার হইতে বিদায় লইল।

* * * *

সেদিন বাহিরের ডাক্তারখানায় বসিয়া আছে, এমন সময় পুলিনকে দেখিতে পাইয়া রবীন ডাকিল।

পুলিন বলিল—সময় ক'রে উঠতে পারি নে। রবিবারে একটা দিন ছুটি, সংসারে কাজও যেন অফুরন্ত। দু-দণ্ড ব'সে গল্প করার সময় মেলে না।

রবীন হাসিয়া বলিল—সংসার এমনিই বটে। সংসারের চাবুক আছে বলেই আমরা চলি, নইলে বেতো ঘোড়ার মত এক জায়গায় শুয়েই পড়তাম। তোমরা তবু চাকরি কর, মাস গেলে বাঁধা মাইনে, আর আমাদের ?

—না রবীন, তোরাই বরং সুখী—কারও তাঁবেদারী করতে হয় না, অসুখ হ'লে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

—বেশ—বেশ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কি রকম সুনাম পাড়ায় পাড়ায় শুনছ ?

পুলিন বলিল—তোমাকে যারা জানে না তারাই অনেক কিছুই ব'লবে, যারা জানে তারা শুনে মনে মনে হাসবে।

—তুমি দেখছি আমার বেজায় ভক্ত। এ ভক্তির হ্রাস বোধ করি কোনো কালে হবে না !

—আশা ত করি। বলিয়া পুলিন উঠিল।

উঠিয়া বলিল—ভাল কথা, একটা গরু কিনতে হবে, একটু সন্ধান রেখ ত। ছেলেদের দুধ কিনে আর পারা যায় না।

বাড়ির মধ্যে আসিয়া রবীন বলিল—একটা উপায় যেন হবে মনে হচ্ছে। আমার এখনও কিছু মূলধন পুঁজি আছে দেখলুম।

বউ আনন্দিত হইয়া বলিল—পোষ্টাপিসে রেখেছ বুঝি ? কত টাকা ?

—সে পুঁজি নয়। গরুটা অনেক দিন থেকে বেচবো মনে করছি, কিন্তু খদ্দের হয় না। খদ্দের যদি হয় দাম ওঠে না।

বউ বলিল—ওই পুঁজি ! পোড়াকপাল ! কার মরণ যে ওই ভাগাড় পয়সা দিয়ে কিনবে ?

—কেন যার ভক্তি আছে। মনে করছি পুলিনকে বেচবো। তার একটি গরুর দরকার।

বাজে কথা মনে করিয়া বউ আর সেখানে দাঁড়াইল না।

বৈকালে পুলিনকে ডাকিয়া রবীন বলিল—গরু কিনবে ? আমারই বাড়িতে আছে।

পুলিন বলিল—তোমার ছেলেরা দুধ খাবে না ?

রবীন বলিল—পয়সা হ'লে বাঘের দুধ কিনতে মেলে, গরুর দুধ ত ছার ! কিন্তু ভাই, কুড়ি টাকা দিতে হবে। একটানে দু-সের দুধ দেয় গরুটা।

পুলিন বলিল—টাকার কথা পরে, কিন্তু তোমায় বঞ্চিত ক'রে ও-গরু আমি কিনবো না।

রবীন বলিল—নাই যদি কেন—অন্য জায়গায় যেতে হবে। টাকা আমার চাই। হয়ত টাকা-পাঁচেক কমই হবে।

পুলিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবীনের পানে চাহিল। না, রহস্য সে করিতেছে না। বয়স রবীনের কতই বা, তবু মুখে অনেকগুলি রেখা পড়িয়াছে। মাথার চুলও যেন দুই-এক গাছি পাকিয়াছে। কৌতুকপ্রিয়তায় চোখের দৃষ্টি মোটেই চঞ্চল নহে, কেমন যেন অবসন্নতার স্তিমিত জ্যোতি।

একটু থামিয়া সে বলিল—বেশ, ওই দরই ঠিক রইল। আসছে রবিবার—

রবীন তাড়াতাড়ি বলিল—আজই আমার টাকা চাই, গরুও তুমি আজ নিয়ে যাও।

পুলিন বলিল—টাকা আর লোক নিয়ে আমি আসছি।

খানিক পরে পুলিন ফিরিয়া আসিল।

রবীনের হাতে নোট দুখানি দিয়া বলিল—এই দুখেকে দেখিয়ে দাও ভাই—গরুটা নিয়ে যাক।

পুলিন বাড়ির বাহিরে কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল, দুখেকে লইয়া রবীন বাড়ির মধ্যে ঢুকিল।

খানিক পরে গরু লইয়া দুখে চলিয়া গেল। পুলিন রবীনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় বাড়ির ভিতর হইতে স্বামী-স্ত্রীর কথোপ-কথন শোনা গেল।

বউ বলিতেছে—ওমা, সত্যিই ও ভাগাড় নিয়ে গেল ! আট বিয়েনের গাই দুধ দেবে, না ছাই।

রবীনের কণ্ঠস্বর—ব'লেছিলাম না, কিছু মূলধন পুঁজি আছে এখনও ? দেখলে ত। ও বিশ্বাসই ক'রতে চায় না যে, আমি কাউকে ঠকাতে পারি।

বউ বলিল—তা যাই বল বাপু, বন্ধু মানুষ তাকে ঠকানো তোমার ভাল হয় নি। হয়ত কত গাল দেবেন।

রবীন বলিল—গাল দেবে? গাল দেবে? তা দিক। কিন্তু একটু আক্কেল ত হবে। বলিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া এই প্রতারণার কাহিনী শুনিয়াও পুলিনের চক্ষু দুইটি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল না। ডানহাতে খুঁটটা তুলিয়া চোখের কোণ ঘষিতে ঘষিতে সে দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল।

বাংলা শিখাইবার প্রণালী

শ্রীঅনাথনাথ বসু

মানবশিশু আপনা হইতেই স্বভাবের প্রেরণায় ও তাড়নায় চলিতে শেখে; এই চলার ক্ষমতা সহজে লাভ করা যায় বলিয়া চলিতে শেখার যে একটা বিশিষ্ট ধারা ও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে, যাহার সাধনায় চলার ভঙ্গী সুন্দর ও সার্থক হয় তাহা আমরা সাধারণতঃ ভুলিয়া যাই। তাই আমরা সকলেই চলি বটে কিন্তু সে চলা সুন্দর হয় না; তাহাতে কাজ সারা যায় কিন্তু তাহা সঙ্গত, সুষ্ঠু ও সাবলীল হইতে পারে না। এমনি করিয়া যে বিদ্যার খানিকটুকু সহজেই লাভ করা যায় তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিবার যে একটি সাধনা আছে তাহা আমাদের চোখে পড়ে না। সকল শিশুই কিছু পরিমাণ মাতৃভাষা শেখে, কিন্তু সেই মাতৃভাষা সম্পূর্ণরূপে শিশুর আয়ত্তাধীন করিতে হইলে যে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন তাহা আমাদের দেশের লোকে সাধারণতঃ ভুলিয়া যায়। ফলে বাংলা ভাষার যেটুকু জ্ঞান আপনা হইতেই অনায়াসে আসে সেইটুকু লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকি, সে জ্ঞান পূর্ণতর করিবার কোন প্রয়োজন আমরা বোধ করি না। ইহার দুইটি কারণ আছে; এক আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা; দ্বিতীয়, বাঙালীর ছেলে সহজেই বাংলা শেখে, তাহার জন্য কোন আয়াসের প্রয়োজন থাকিতে পারে না, এই মনোভাব। আমাদের এই মনোভাব সব সময়েই যে প্রকাশ্যভাবে দেখা দেয় তাহা নহে, কিন্তু ইহার অস্তিত্বের পরিচয় পরোক্ষভাবে নানাক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃভাষার প্রতি আমাদের অবজ্ঞাও নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সুতরাং তাহার আলোচনা না করিলেও চলে।

ফলে বাঙালীর ছেলে বাংলা শেখে না, কথায় বা রচনায় মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পরীক্ষায় বাঙালী ছেলে ফেল হয়। এমন একটি দিন ছিল যখন বাংলা ভাষায় অজ্ঞতা প্রকাশ্যে স্পর্দ্ধার বিষয়রূপে গণ্য হইত। সে দিন সৌভাগ্যক্রমে কাটিয়া যাইতেছে; কিন্তু এখনও এক-আধ জন বাঙালী দেখা যায় যাহারা ভাল করিয়া বাংলা বলিতে না-পারাকে লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করে না। বিদেশে থাকিতে এরূপ এক জন বাঙালী ছেলের সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল। যাহাই হোক্, সাধারণ বাঙালী আজকাল আর প্রকাশ্যে এরূপ মনোভাব দেখায় না; কিন্তু প্রকাশ্যে না করিলেও কার্য্যতঃ ফল একই দাঁড়ায়। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাহার সহিত সম্যক পরিচয় সাধনের চেষ্টার অভাব পদে পদেই দেখা যায়। বিশেষ করিয়া প্রবাসী বাঙালী এই দোষে দোষী।

এদিকে কিন্তু কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে; শুধু তাহাই নহে, সম্প্রতি বাংলা ভাষা সেখানে শিক্ষার বাহনরূপেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাংলা শিখাইবার প্রণালী

সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার কথা শোনা উচিত ছিল, কিন্তু সেরূপ কোন চেষ্টার পরিচয়ই কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। এমন কি ট্রেনিং কলেজগুলিতেও কোথাও মাতৃভাষা শিখাইবার সুষ্ঠুতম প্রণালী আবিষ্কার করিবার চেষ্টা বা আলোচনা চলিতেছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ সেখানে method of teaching English সম্বন্ধে নানা গবেষণা ও আলোচনা হইতেছে। শুধু ইংরেজীর কথাই বা কেন বলি, মাতৃভাষা বাদে ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক ইত্যাদি আর সকল বিদ্যা শিখাইবার প্রণালী সম্বন্ধে পঠন-পাঠন সেখানে হয়। ইহার কারণ ইহাই নয় কি যে আমরা মনে করি বাঙালীর ছেলে সহজেই বাংলা শেখে, তাহাকে সে বিদ্যা শিখাইবার জন্য কোন বিশেষ প্রণালী আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষা লইয়া যাহাদের কারবার তাহাদেরই যখন এরূপ মনোভাব, তখন বাইরের লোকের মনোভাব যে এইরূপই হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

ইংরেজীর পরিবর্তে যখন মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করিবার প্রস্তাব হয়, তখন প্রতিপক্ষের একদল বলিয়াছিলেন যে তাহার দ্বারা ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলি শেখার বাধা ঘটিবে। কাশী-বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ কিছুদিন ধরিয়া হিন্দী শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সেখানকার এক জন শিক্ষককে বর্তমান ছাত্রগণের ভূগোলের সম্যক জ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শুনিলাম ইংরেজী বাহনরূপে ব্যবহার না-করার ফলেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে, কিন্তু ব্যাপার কি সত্যই তাই? সহজবুদ্ধিতে মনে হয় যে মাতৃভাষার সাহায্যে অধীত বিদ্যা সহজে আয়ত্তাধীন হয়; যখন তাহার অন্যথা ঘটে তখন দোষ মাতৃভাষাকে বাহনরূপে ব্যবহার করার নহে, অন্য কিছুর। মাতৃভাষায় অধিকার যদি সম্পূর্ণ না হয় তবে তাহার সাহায্যে যে-কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বাংলা দেশেও ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষায় অধিকার সম্পূর্ণ না হইলে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইবে, একথা আজ আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ আমাদের সর্ব্বাগ্রে বিচার করা আবশ্যক কি ভাবে কোন প্রণালী অবলম্বন করিলে বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষার জ্ঞান পূর্ণ হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়িয়া গেল ইংরেজী ভালভাবে নূতন প্রণালীতে শিখাইতে গিয়া বিফল হইয়া ঢাকা ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার মাইকেল ওয়েষ্ট বাংলা শিখাইবার উপযুক্ত প্রণালী উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁহার মতে মাতৃভাষার অধিকার পূর্ণ হয় নাই বলিয়া বহু ছাত্রছাত্রী ইংরেজী ঠিকমত শিখিতে পারে না।

কথা উঠিতে পারে বাংলা যখন পড়ান হয় তখন নিশ্চয়ই কোন-না-কোন প্রণালী অনুসৃত হয়, অবশ্য সেটা হয়ত প্রাচীন ধরণের হইতে পারে। বাংলা যে পড়ান হয় সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই, কিন্তু সেটা যে কি ভাবে পড়ান হয় সেটিও এই সঙ্গে মনে করা প্রয়োজন। কিছু দিন আগে পর্য্যন্তও কোনমতে কাজ-সারা হিসাবে বাংলা পড়ান হইত এবং বাংলা পড়াইবার জন্য শিক্ষকের পক্ষে সংস্কৃত জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন গুণ থাকা প্রয়োজন মনে করা হইত না। বিহারে (তখনও বিহার বাংলার অন্তর্গত ছিল) এক কলেজে পণ্ডিতমহাশয় বিহারী হইয়াও সংস্কৃতজ্ঞের অধিকারের দাবিতে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। আজ যে হঠাৎ এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এরূপ মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। আজও পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ইংরেজীর জন্য দুইটি প্রশ্নপত্র হয়, কিন্তু মাতৃভাষার জন্য একটি প্রশ্নপত্রই (তাহার স্বরূপ বিবেচনা নাই করিলাম) যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়।

সে কথা যাক্ কিন্তু যখন একথা অস্বীকার করিলে চলে না যে সাধারণতঃ বাংলা কোনমতে কাজ-সারা হিসাবেই পড়ান হয়; এই অবস্থায় সেই সঙ্গে ইহাও মানিয়া লইতে হয় যে যেন-তেন-প্রকারেণ বাংলা শিখাইবার পিছনে যদি কোন প্রণালী থাকে তাহা হইলে তাহাও সেই প্রকার; তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা বা গতি ও সুনির্দ্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নাই।

যাহারা বলেন, প্রণালী একটা আছে তবে সেটা প্রাচীন ধরণের, তাঁহাদের প্রশ্ন করা যায় যে প্রাচীন ধরণের সেই প্রণালীটি কি? তাহার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ধারা আছে

কি? এককালে সংস্কৃতের মত করিয়া একভাবে বাংলা পড়ান হইত; তখন বাংলা ব্যাকরণ বলিয়া একটি বিষয় ছাত্রেরা পড়িত। সে বাংলা ব্যাকরণ আর যাহাই হোক্ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নহে। মনে আছে তাহাতে সংস্কৃতের ছাঁচে বাংলায় তৃতীয়া বিভক্তির প্রত্যয় বলা হইয়াছিল, "দিগের দ্বারা"। এ বাংলা আপনারা জানেন কি? সেই সংস্কৃত পড়াইবার নকল বাংলা পড়াইবার কিস্তূত-কিমাকর প্রণালীকে প্রণালী বলিয়া স্বীকার করা অন্যায় হইবে সেদিনকার লেখা বাংলা ব্যাকরণকে যেমন আমরা বাংলা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ বলিয়া স্বীকার করি না, সেদিনকার বাংলা পড়াইবার তথাকথিত প্রণালীকেও আমরা আজ স্বীকার করিতে পারি না।

সুতরাং বাংলা শিখাইবার একটি বা একাধিক প্রণালী উদ্ভাবন করা আজ একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এ-বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু সে কাজ করিবে কে? যাঁহারা শিক্ষার ব্যাপারী স্বভাবতই এ কাজ তাঁহাদেরই; কিন্তু দেশের সুধীমাত্রেরই এ-বিষয়ে উদ্যোগী হইতে হইবে। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা দেশের শিক্ষক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমাত্রেই এ-বিষয়ে আলোচনা করা আজ একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আর একটি কাজ করিতে হইবে। মুখে আমরা বাংলার প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও মনে মনে যে তাহা করি না তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান বিদ্যালয়-চালনা-প্রণালীতেই রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে যিনি ইংরেজী পড়ান তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চে, আর যিনি বাংলা পড়ান সেই পণ্ডিত-মহাশয় ছাত্র-শিক্ষক-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অনাদৃত, অবজ্ঞাত; শিক্ষকদের মধ্যে তাঁহার স্থান সবার শেষে, সবার নীচে। শিক্ষা-প্রণালীতে বাংলাকে তাহার উপযুক্ত স্থান দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাংলা-শিক্ষককে তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা ও আসন দিতে হইবে। ঠিকভাবে দেখিতে গেলে তিনিই ত সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, তাঁহার কাজ সকলের চেয়ে গুরুতর। তিনি যে-বিষয় পড়ান তাহার দাবি সকল বিষয়ের চেয়ে বেশী।

এই সঙ্গে পাঠ্যক্রমের (syllabus) পরিবর্ত্তন করাও একান্ত আবশ্যক। সেখানে বাংলাকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিয়া বাংলারও একটি সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ পাঠ্যক্রম স্থির করিতে হইবে। সেই সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হইবে ছাত্রগণকে বাংলা ভাষায় যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ অধিকার দান।

ভাবের আদান ও প্রদানের জন্যই ভাষার প্রয়োজন। সুতরাং ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য কি-ভাবে ভাবের এই আদান-প্রদান সহজ ও সুন্দর হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

ভাষা-শিক্ষার চারিটি অঙ্গ আছে,—পড়া ও শোনা, বলা ও লেখা; এই চারিটি অঙ্গের প্রথম দুইটি ভাবের আদানের জন্য ও শেষ দুইটি ভাবের প্রকাশের জন্য। কোন একটি ভাষা শুনিয়া ও পড়িয়া আমরা সেই ভাষায় প্রকাশিত ভাবের সহিত পরিচয় স্থাপন করি; সেই ভাষায় কথা বলিয়া ও লিখিয়া তাহার সাহায্যে পরের নিকট আমাদের মনোভাব প্রকাশ করি।

কোন ভাষা শিখিতে গেলে এই চারিটি অঙ্গেরই ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই চারিটি অঙ্গে অধিকার লাভ করিলে তবেই ভাষায় অধিকার জন্মে। কিন্তু সে-অধিকার পূর্ণ হয় না যতক্ষণ-না আমরা সুন্দর ভাবে ভাষা প্রয়োগ করিতে শিখি। সহজে বাংলা বলিতে বা লিখিতে পারিলেই সুন্দর ভাবে বাংলা বলা বা লেখা যায় না। সুতরাং ভাষা-শিক্ষার মধ্যে রসবোধ-জাগরণের স্থান অতি উচ্চে। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে তাহার কোন ব্যবস্থাই নাই। ফলে ছেলেমেয়েদের মনে সাহিত্যবোধ ও রসবোধ জাগ্রত হইতে পারে না। এই জন্যই ভবিষ্যৎ জীবনে অতি অল্প লোকেই উপন্যাস গল্প ছাড়া বাংলা-সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গের সহিত কোন পরিচয় রাখে না। বাংলা-সাহিত্যের যোগ্য পাঠকের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

ইহার জন্য যদি কাহারও দোষ থাকে তবে সে দোষ ভাষাশিক্ষা-প্রণালীর। যেভাবে আজকাল ছেলেমেয়েরা বাংলা শেখে তাহাতে আনন্দ উপভোগের কোন স্থান নাই; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নীরস কতকগুলি পাঠ্যের (তাহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুরচিত নহে) অন্বয়ব্যাখ্যা ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল চর্ব্বিত ইক্ষুদণ্ডেরই মত সেগুলি রস-অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। সে শেখায় কোন আনন্দ থাকে না। অথচ যেমন ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করিতে হইলে জারক রসের প্রয়োজন হয় তেমনই ভাষা-শিক্ষাকে

কার্য্যকরী করিতে হইলে তাহাকে আনন্দরসে জীর্ণ করিয়া লইতে হয়। এই আনন্দ রসবোধ-জাগরণের। ভাষা-শিক্ষায় তাহার একান্ত প্রয়োজন।

অধিকাংশ বাংলা পাঠ্যপুস্তক দেখিলে মনে হয় যে সেগুলির উদ্দেশ্য ভাষাজ্ঞানদান নহে, অন্য কিছু। উদাহরণ-স্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করি ; ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কবিতা পাঠ করিবে নীতিশিক্ষার জন্য নহে, ছন্দ ও রসের পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য, আনন্দ লাভ করিবার জন্য। কিন্তু অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকেই অল্প যে কয়েকটি কবিতা দেওয়া হয় তাহাদের সাহায্যে না-ছন্দোবোধ, না-রসবোধ কিছুই হইতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি একান্তই ছন্দহীন ও নীরস। শুনিয়াছি নাকি কপিরাইটের ভয়ে ভাল ভাল কবিতা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। একথা যদি সত্য হয় তবে বাংলার কবিগণের কর্ত্তব্য তাঁহারা যেন কপিরাইটের অধিকারের দাবিতে এই ভাবে ছেলে-মেয়েদের বাংলা শিখিবার অন্তরায় না ঘটান।

প্রসঙ্গক্রমে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষায় শিশু ও বালপাঠ্য গ্রন্থের একান্ত অভাব। বাঙালী সাহিত্যিকগণ চিরদিনই পরিণতবয়স্ক পাঠক-পাঠিকার মনের খোরাক জোগাইয়া আসিয়াছেন ; দেশের ছেলেমেয়েদের দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ তাঁহাদের বিশেষ হয় নাই। ফলে ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার গ্রন্থ পাওয়া কঠিন। আমার মনে হয়, এ-বিষয়ে সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য সম্মিলনের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা সেই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইলে ভাষাশিক্ষার প্রণালী উদ্ভাবনও অনেকটা সহজ হইয়া যাইবে।

ভাষাশিক্ষার চারিটি অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছি ; এইবার সংক্ষেপে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করি।

বর্ত্তমানে বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থায় লেখা ও পড়ার কিছু পরিমাণ আয়োজন আছে ; (কিন্তু সে আয়োজনও সম্পূর্ণ নহে।) কিন্তু বলা ও শোনার কোন আয়োজনই সেখানে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ এই দুইটি বিষয়ই ভাষা শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ।

দৈনন্দিন প্রয়োজনে মনোভাব যেন-তেন-প্রকারেণ প্রকাশের জন্য যেটুক বাংলা বলিতে হয় সেইটুকু লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। অথচ ভাল করিয়া বাংলা বলিবার একটি যে ভঙ্গী ও ধারা আছে এবং সেটা যে একটা আর্ট, ভাল উচ্চারণ যে গৌরবের বিষয় সেটা আমরা মনেই করি না ; সুতরাং আমাদের বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থায় তাহার কোন আয়োজন নাই। অবশ্য মাঝে মাঝে ডিবেটিং সোসাইটি বলিয়া একটি ব্যাপার হয় ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে আলাপ-আলোচনা ইংরেজীতেই হয়, যদি কখনও বাংলা ব্যবহৃত হয় তাহা হইলেও তাহার পিছনে বিশেষ চেষ্টা থাকে না। বাংলা ভাল করিয়া বলাটাও যে শিক্ষণীয় বিষয় তাহা আমরা জানি না।

আমেরিকার একটি বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণীতে দেখিয়া-ছিলাম প্রতিদিন কিছু সময় এই ভাবে কথা বলার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ছেলেমেয়েরা সেই সময়টাতে ইংরেজীতে বলিবার অভ্যাস করিত। কেহ হয়ত তাহার পূর্ব্বদিনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলিত কেহবা তাহার নিজের একটি গল্প ভাল লাগিয়াছে তাহাই আর সকলকে বলিল। এমনি করিয়া সকল ছাত্র-ছাত্রীই মাতৃভাষায় সহজ ও সুন্দর ভাবে মনোভাব প্রকাশ করিবার শিক্ষা পাইতেছিল। সেখানে ইহাকে ভাষাশিক্ষার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া পাশ্চাত্যের সকল বিদ্যালয়েই আলাপ-আলোচনা-সভার প্রচুর আয়োজন দেখিয়াছি। সেগুলির ভিতর দিয়া সেখানকার ছেলেমেয়েরা ভাষার এই দিকটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমানে ভাষাশিক্ষা-প্রণালীতে যেমন বলার শিক্ষার ব্যবস্থা নাই তেমনি শোনার শিক্ষার ব্যবস্থারও অভাব রহিয়াছে। অথচ সাধারণ মনের বিকাশে ও বিশেষ করিয়া ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে শ্রুতির স্থান অতি উচ্চে। ভাল ভাল গ্রন্থ হইতে পড়িয়া শোনাইলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে একাধারে রসবোধ ও সাহিত্যবোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু আমরা বাংলার জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াই খালাস। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যিনি বাংলা পড়ান তাঁহার বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানও বিশেষ উচ্চাঙ্গের নহে, সুতরাং পড়িয়া শোনানর যে একটি আনন্দ আছে, ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভাল ভাল কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প শোনা যে ভাষাশিক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহা

তাঁহার মনে থাকে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে নানাগ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া শোনান বাংলা পাঠ্যক্রমের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। ইহার জন্য প্রথমটা হয়ত শিক্ষকের উপযোগী গ্রন্থের তালিকা করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু ধীরে ধীরে পরে শিক্ষকগণ আপনারাই আপনাদের উপযোগী তালিকা প্রস্তুত করিয়া লইবেন।

এইবার পড়ার কথা বলি। এখানে গোড়াতেই গলদ রহিয়াছে; যেভাবে বাংলা বর্ণপরিচয় করান হয় তাহাতে যে ভাষাশিক্ষার আনন্দ একেবারেই চলিয়া যায় এ-কথা পূর্ব্বে একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছি। ভাষাশিক্ষার প্রথম ধাপ বর্ণ নহে শব্দ। শব্দের সহিত আমাদের প্রথম ও সহজ পরিচয়। শব্দের বিকলনে বর্ণপরিচয়। এই বিকলনী বৃত্তি অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের বৃত্তি, ভাষাশিক্ষায় তাহার স্থান দ্বিতীয় ধাপে। "ক" বলিয়া কোন শব্দ (কথা) বাংলায় নাই, সেটা ধ্বনিমাত্র; তাহার পরিচয় কান শব্দে পাই; সে শব্দ সুপরিচিত ও নির্দ্দিষ্ট সুতরাং চিত্তাকর্ষক। তাহার সহিত পরিচয় প্রথমে হয় পরে মনের বিকলনী বৃত্তির সাহায্যে আমরা ধ্বনির পরিচয় লাভ করি। এই জন্য কথা দিয়া আরম্ভ করিয়া কথারই সাহায্যে বর্ণপরিচয় বিধান করিতে হইবে।

এ ত গেল গোড়ার কথা। তাহার পরে কি ভাবে বাংলা পড়ার শিক্ষা দিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু অল্প যে কয়টি পুস্তক রহিয়াছে তাহাদের ব্যবহারও আমরা করি না। তাহার পরিবর্ত্তে একখানি পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করি। এ-কথা বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন যে বাংলার একটি মাত্র পাঠ্যপুস্তক হইতে পারে না। প্রত্যেক ছাত্রকেই নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া এবং নিজে লিখিয়া নিজের নিজের পাঠ্যপুস্তক তৈয়ারি করিতে হইবে। একটি মাত্র পাঠ্যপুস্তকের অন্বয় পদপরিচয় ও ব্যাখ্যা করিতে করিতে তাহা জীর্ণ ও নীরস হইয়া যায়, তাহার দ্বারা ভাষাশিক্ষা চলে না। অপরের মনোভাবের সহিত পরিচয়-সাধনই যদি পড়ার উদ্দেশ্য হয় তবে সে-পরিচয় যতদূর বহুব্যাপী হয় তাহার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অধিকাংশ বাঙালী ছেলেমেয়েরই পড়িবার অভ্যাস হয় না; তাহার কারণ শিক্ষকগণের এ-বিষয়ে উৎসাহের অভাব। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই সুনির্ব্বাচিত সকল প্রকার বাংলা গ্রন্থের সংগ্রহ থাকা একান্ত আবশ্যক। শিক্ষকগণ ছাত্রদের গ্রন্থনির্ব্বাচনে সহায়তা করিয়া নানাভাবের গ্রন্থ পাঠ করিবার উৎসাহ দিবেন কারণ ইহা ভাষাশিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ।

লেখার কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই মনে হয় লেখার দুইটি উদ্দেশ্য, প্রথম নিজের মনোভাব পরের নিকট প্রকাশ করা এবং দ্বিতীয় নিজেকে ব্যক্ত করা। এই দ্বিতীয় প্রকারের রচনা মুখ্যতঃ পরের জন্য নহে; আপনার আনন্দে আপনার মনের কথাগুলি প্রকাশ করিবার আগ্রহ স্বাভাবিক। সে প্রকাশের সময় পাঠকের কথা মনে থাকে না। এই শ্রেণীর রচনা রসসাহিত্যের সুতরাং সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা যে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকারগম্য নহে এমন নহে; বরং শিখাইতে পারিলে ছাত্রেরা এ-শ্রেণীর সুন্দর রচনা লিখিতে পারে এবং লিখিয়া আনন্দ লাভ করে। ভাষাশিক্ষায় ইহার স্থান ও মূল্য অনেক উচ্চে।

পরের জন্য যে-সকল রচনা লিখিত হয় বিদ্যালয়ে সেরূপ রচনা লেখার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু রচনার বিষয়নির্ব্বাচনে বিচারের অভাবে সেগুলি অপাঠ্য হয় এবং ছেলেরা সেরূপ রচনা লিখিয়া কোনরূপ আনন্দ বোধ করে না। চতুর্থ বর্গের যে ছাত্রটি "গরু একটি রোমন্থনকারী, চতুষ্পদ জন্তু" বলিয়া আরম্ভ করিয়া গরু সম্বন্ধে যে রচনাটি লিখিল তাহা কোন্ পাঠকের আনন্দ ও জ্ঞানবর্দ্ধন করিবে? কিংবা ষষ্ঠ বর্গের যে ছাত্রীটি "সাধুতাই প্রশস্ততম উপায়" বা "পরিশ্রমই সুখের মূল" শীর্ষক যে নীতিগর্ভ রচনা লিখিল তাহা কাহার জন্য? এরূপ রচনা লিখিবার কি উদ্দেশ্য আছে? রচনা লেখার একটা সঙ্গত কারণ থাকা চাই। বরং "আমাদের (ছাত্রের) গরু" সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গের জানিবার কৌতূহল হইলেও হইতে পারে; কিংবা কোন ছাত্রী কেমন করিয়া পরিশ্রম করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার কাহিনী আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে।

রচনার বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করা শিক্ষকের পক্ষে একান্ত

আবশ্যক অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা গতানুগতিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সকল প্রকারের রচনাই শিক্ষণীয় ব্যাপার। অথচ বিদ্যালয়ে গল্প লিখিলে শিক্ষক তাহা অন্যায় মনে করেন, কবিতা লেখাটা ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই লুকাইয়া করিতে হয়। যেন এগুলি সাহিত্যের অঙ্গ নহে। এইখানে চিঠিলেখার কথাটাও উল্লেখ করা উচিত হইবে। চিঠিলেখাটা যে একটা আর্ট, তাহাও যে শিক্ষার বস্তু এটা আমরা ভাবিই না। ফলে আমাদের চিঠিগুলা কাজ সারে বটে কিন্তু সেগুলি আদরের ও আনন্দের বিষয় হয় না। সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা যথাবৎ সকল প্রকার রচনা লেখে, চিঠিও তাহাতে বাদ পড়ে না।

রচনার ভাষা সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। বাল্যকালে এক শিক্ষক-মহাশয়ের জন্য রচনা লিখিতে হইলে—সে যে-কোন বিষয়েই হোক্ না কেন—পরম কারুণিক পরমপিতা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া আরম্ভ করিতে হইত এবং প্রবন্ধের নানাস্থানে "ওতপ্রোত" "অবলীলাক্রমে" ইত্যাদি কতকগুলি "সাধু" শব্দ ছড়াইয়া দিতে হইত। কোন কোন শিক্ষক আবার এরূপ শব্দের তালিকা দিতেন। অনেক সময়ে এই সাধুশব্দের অযথা ও অস্থানে প্রয়োগের ফলে হাস্যকর ব্যাপারের সৃষ্টি হইত। "কতিপয় পিতাঠাকুর মহাশয়ে"র গল্প হয়ত আপনারা শুনিয়া থাকিবেন।

সংক্ষেপে বাংলা শিখাইবার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নহে; সুতরাং এই প্রবন্ধে অনেক কথাই বলা হয় নাই। এ-সম্বন্ধে বহু আলোচনা, চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন রহিয়াছে। যদি দেশের শিক্ষকগণের ও সুধীবর্গের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তাহা হইলেই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।*

* প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে পঠিত।

অনির্ব্বাণ

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

বাবু সুখেন্দ্রলাল পাণ্ডে মহাশয়ের বত্রিশ বৎসরব্যাপী কর্ম্মজীবনে যে-সব বালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই জানিত যে তাঁহার পৈতৃক ব্যবসায় ছিল যজন-যাজন-অধ্যাপন, তাঁহার 'মুলুক' পশ্চিমে, তাঁহার পথ্য গোধূমচূর্ণ নির্ম্মিত রুটি (তবে বঙ্গদেশে তিনি একবেলা অন্নপথ্য করেন) এবং এই ভূতের বেগার অর্থাৎ রেলের ষ্টোর-বাবুর চাকরি তাঁহার পোষাইতেছে না। তিনি যখন 'আসানশুলে' চাকরি লইয়া আসেন তখন রেলের রাম-রাজত্ব। মাসান্তে, ত্রিমাসান্তে, অর্দ্ধবৎসরান্তে এবং বৎসরান্তে চৌদ্দ গণ্ডা নিকাশ, রাশি রাশি মালের শ্রেণী-বিভাগ ও তালিকাপুস্তক, উঠিতে বসিতে রিকুইজিসন্, ইমুনোট ইত্যাদির কোন বালাই ছিল না। পিচ্ঢালা ভাল ভাল রাস্তা, ভারী ভারী 'মকান' এ-সব কিছুই ছিল না। কোথায় গেল সেই সব 'গ্রেস্‌বি', পিচার্ড, কর্ণেল্ হাণ্টার; হাঁ, যাহারা ছিল 'অফ্‌সার'; কাহারও দুই বোতলের কম হুইস্কিতে দিন চলিত না, হাতে থাকিত 'হাণ্টার' আর মুখে ড্যাম ব্লাডি, শূয়ার; আর আজকাল? আরে রামঃ! যে-সব কৃষ্ণকায় ভারতীয় ছোকরাগণ কলেজি শিক্ষার দৌলতে রেলে 'অফিসার' হইয়া ঢুকিতেছে, 'ফেয়ারলি প্লেসের' একখানি চিঠি আসিলে যাহারা কাপড়ে-চোপড়ে নিতান্ত শিশুজনোচিত কার্য্য করিয়া বসে, তাহাদের নীচেও কাজ করিতে হইল। আর নয়; কোনরূপে পঞ্চান্ন বৎসরটি পূর্ণ হইলেই তিনি নিজের মুলুকে চলিয়া যাইবেন।

ক্রমবর্দ্ধমান পেটপরিধির উপর হস্তাবলেপন করিয়া তিনি

বলিতেন, বঙ্গদেশে তাঁহার শরীর টিকিতেছে না। বিশেষতঃ তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাঁহার কি পোষায় রেলে চাকরি। ১৮৯৭ সালে তাঁহার একবার জ্বর হইয়াছিল। ডাক্তার কুমুদবাবু বলিয়াছিলেন, 'পাণ্ডেজি, এটি বঙ্গদেশ আছে, এখানে একবেলা অন্নভোজন করতে হোবে।' পাণ্ডেজি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'সে কি ডাক্তার-মোশায়, অন্নভোজন করবে কি? অন্ন ত বিলকুল পানি।' কিন্তু তদবধি তিনি একবেলা অন্নপথ্য করেন, এ-কথা কে না জানে।

এইরূপে বালকেরা বৃদ্ধ হইতে চলিল, বনিতারা কুমারীত্ব হইতে দিদিমা পদবী লাভ করিল, কিন্তু পাণ্ডে-মহাশয় তেমনি অচল অটল ভাবে পিতৃপুরুষের দোহাই দিয়া, বঙ্গদেশে এক বেলা অন্নভোজন করিয়া, মাস ভরিয়া রাশি রাশি মালের রিকুইজিসন্ ও ইস্যুনোট নাকচ মঞ্জুর করিয়া, মাসান্তে বহু বহু নিকাশ দিয়া এবং সর্ব্বোপরি কৃষ্ণকায় ভারতীয় অফিসারগণের মুণ্ডপাত করিয়া পঞ্চান্ন বৎসরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি চাকরিতে ঢুকিবার সময় নিজের বয়স কত লেখাইয়াছিলেন কেহ জানে না। অতএব তাঁহার পঞ্চান্ন বৎসরই বা কবে পূর্ণ হইবে তাহাও কেহ জানিত না। তবে এ-কথা অবশ্য সকলেই জানিত যে রেলের চাকরি তাঁহার কোন কালেই পোষায় নাই।

অবশেষে সত্যই একদিন বাবু সুখেন্দ্রলাল পাণ্ডে চাকরি হইতে অবসরগ্রহণের দরখাস্ত দিলেন। প্রথমে কথাটি কেহ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু ঘটনাটি সত্য। ১৯৩০ সাল হইতে রেল-কোম্পানীর দুর্দ্দিন আরম্ভ হয়; উপর হইতে হুকুম আসিল যাহারা বহুদিন যাবৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারা ইচ্ছা করিলে চাকরি হইতে অবসরগ্রহণ করিতে পারে। কোম্পানী তাহাদিগকে পাওনা থাকিলে আঠার মাস পর্য্যন্ত পুরা বেতনে ছুটি, প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা, ভাতা ইত্যাদি সবই দিবে। পাণ্ডে-মহাশয় এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণের পূর্ব্বে আঠার মাসের ছুটি লইলেন।

একদিন এই সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের শেষসম্বল-স্বরূপ তিন হাজার সাত শত সাত টাকা তিন আনার একখানি 'চেক' লইয়া যখন তিনি 'আসানশুল' আপিস হইতে বহির্গত হইলেন তখন কর্ম্মচারী-মহলে যথারীতি বিদায়-অভিনন্দনের আয়োজন হইল, পুষ্পমাল্য-বিভূষিত বাবু সুখেন্দ্রলাল পাণ্ডে নিবিষ্টচিত্তে বিদায়-সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন, প্রচুর পরিমাণে জলযোগ করিলেন, ১৮৯৭ সনের জ্বরের বিবরণ এবং তদবধি একবেলা অন্নভোজনের ইতিহাস বর্ণনা করিলেন, গ্রেস্‌বি, পিচার্ড, কর্ণেল্ হাণ্টার প্রমুখ অফিসার-পুঙ্গবদের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন, আলোকচিত্র-গ্রহণের সম্মতি দিলেন এবং একরাত্রিতে পথিমধ্যে নানাস্থানে থামিবার অনুমতি সহ দিল্লী পর্য্যন্ত এক পাস লইয়া ঈ. আই. রেলের কোন পশ্চিমগামী গাড়ীর এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আরোহণ করিলেন।

বাবু সুখেন্দ্রলালের আপনার বলিতে কেহ ছিল না। তাঁহার যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে পশ্চিমদেশবাসিনী জনৈকা তিন বৎসর বয়স্কা কুমারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। তাঁহার সাত বৎসর বয়সে পত্রযোগে সেই পত্নীর পরলোকগমনবার্ত্তা তাঁহার পিতৃদেবের চক্ষুগোচর হয়। তৎপরে নবম বৎসর বয়সে বিবাহিতা ষষ্ঠবর্ষীয়া পত্নী এক বৎসর পরে এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে পরিণীতা নবমবর্ষীয়া সহধর্ম্মিণী দুই বৎসর পরে একই পন্থা অবলম্বন করিলে তাঁহার পিতৃদেবেরও স্বর্গলোক-প্রাপ্তি ঘটে। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে পুত্রকে কি করাইতেন জানা নাই। কিন্তু পিতার অবর্ত্তমানে পুত্র আর চতুর্থবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি পিতৃমুখে শুনিয়াছিলেন জৌনপুর জেলার কোন গ্রামে তাঁহার ঘর ছিল কিন্তু স্বগ্রামের প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন ছোট সস্তা ও স্বাস্থ্যকর শহরে ক্ষুদ্র একখানি ঘর ভাড়া করিয়া তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিবস কাটাইয়া দিবেন। মনে মনে আর একটি ইচ্ছা ছিল যে শহরটি এমন হওয়া চাই যে তিনি দুই বেলা রুটি খাইয়া হজম করিতে পারেন।

চুণার শহরটি নানাদিক দিয়া সুখেন্দ্রলাল বাবুর মনোমত হইল। কিন্তু সমস্ত শহর খুঁজিয়া তিনি বাড়ি ভাড়া করিতে পারিলেন না। যে-অংশে হিন্দুরা বসবাস করিত তাহাতে যে দুই-চারিখানা বাসোপযোগী বাড়ি ছিল তাহার কোনটিতে একাধিক যক্ষ্মারোগীর থাকিবার ইতিহাস কর্ণগোচর হইল; কোনটির মালিক ছয় মাসের ভাড়া অগ্রিম

চাহিল। অবশেষে তিনি এংলো-ইণ্ডিয়ান পল্লীতে খোঁজ করিলেন এবং মিসেস উডের বাংলোখানি দেখিয়াই পছন্দ করিলেন। বাংলোটির বর্ত্তমান মালিক মিষ্টার পিটার ইহার যে ক্ষুদ্র ইতিহাস দিলেন তাহা যেমনি করুণ তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। মিষ্টার উড্ সৈন্য-বিভাগে 'মেজর' ছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তিনি প্রথমে স্বাস্থ্য ক্রমে চাকরি এবং অবশেষে জীবন হারান। মিসেস উডের পুনরায় বিবাহ করিবার মত বয়স রূপ ও অর্থ ছিল; তাঁহার পাণি-প্রার্থীরও অভাব ছিল না, কিন্তু নিজের অবশিষ্ট জীবন তিনি দানধ্যান ও ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন; ইহার পরে তিনি আরও পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তিনি কোন আমোদ-প্রমোদে যোগদান করেন নাই, কাহারও সহিত যাচিয়া বাক্যালাপ করেন নাই। এক কথায় বলিতে গেলে অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া এই শ্বেতকেশা শ্বেতবস্ত্রা শ্বেত-কায়া নারী মূর্ত্তিমতী জরা দুঃখ ও নির্জ্জনতার প্রতীকের মত 'লো লাইন্‌স্'-এর নিম্ববৃক্ষ-সমাকুল রাস্তায় রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়াইতেন। একদিন ভোরে সকলে গিয়া দেখিল বৃদ্ধা নিজ শয্যায় প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া আছেন। মিষ্টার পিটার ব্যবসায়ী লোক; তিনি পূর্ব্বেই বাংলোখানি সস্তাদামে কিনিয়া লইয়াছিলেন। যখন জানিলেন বাবু সুখেন্দ্রলাল স্থায়িভাবে বসবাস করিবার জন্য একটি বাড়ি খোঁজ করিতেছেন, তিনি নানা ভণিতা করিয়া অতি সন্তর্পণে বদ্ধদ্বারগবাক্ষ বাংলোটির সম্মুখের দরজাটি খুলিলেন। অন্ধ-কার অল্প-পরিসর 'হল' ঘরে আলোক প্রবেশ করিতেই সুখেন্দ্রলাল বাবুর মনে হইল যেন তিনি এক রহস্যলোকে প্রবেশ করিলেন।

ঠিক সম্মুখে কণ্টক-কিরীটধারী যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি, দক্ষ চিত্রকরের নিপুণ তুলিকাপাতে যীশুর মুখে যে করুণ-উজ্জ্বল ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা নাই। গ্রীবাদেশ হইতে মস্তক একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে; দুই-দিকে দুই কুদর্শন তস্করের মূর্ত্তি। কবে কোন্ যুগে বেথেল্-হেমের কোন্ অশ্বশালায় কুমারী মাতার গর্ভে জন্মিয়া যে মহামানব পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্যকে আপনার স্কন্ধে লইয়া আপামর সাধারণে প্রেম ও মঙ্গল বিতরণ করিয়াছিলেন তাঁহার দেবত্ব হয়ত গবেষণার বিষয়, তাঁহার জীবনের অলৌকিক কাহিনী হয়ত প্রমাণযোগ্য নহে, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম হয়ত আর নরনারীর মনে ভক্তির আলোড়ন উপস্থিত করে না, কিন্তু যে প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসার তিনি প্রতীক, দুই সহস্র বৎসর ক্রুশবিদ্ধ হইয়াও তাহা মরে নাই। সুখেন্দ্রলাল বাবু দেখিলেন মহাত্মার প্রতি অঙ্গ হইতে যেন উহার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়া জগতকে ধ্বংশ হইতে রক্ষা করিতেছে।

বাম দিকের দেওয়ালে মেরী মাতার ছবি। অনুদ্ধত কমনীয় নাসিকা ও লঘুক্ষুদ্র ওষ্ঠপুটে জগতের যত নির্দ্দোষিতা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। এ মূর্ত্তি দেবীর না মানবীর বলা চলে না; বোধ হয় অম্লান শুভ্রতার কিংবা অনবদ্য পবিত্রতার, ডান দিকের দেওয়ালে যীশুখ্রীষ্টের আর একখানি আবক্ষ মূর্ত্তি। ইহা ভিন্ন দেওয়ালের বিভিন্ন স্থানে 'শেষভোজন' ও বিভিন্ন সেণ্ট্‌দিগের ছবি। তিনখানি ক্ষুদ্র টেবিলে সামুদ্রিক শঙ্খ, ঝিনুক ও স্তূপীকৃত ক্রিষ্ট্‌মাস্ কার্ড; অত্যন্ত সযত্নে রক্ষিত, উহারা বৎসরের পর বৎসর স্বর্গতা বৃদ্ধার জীবন-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, কত শুভেচ্ছা, কত ভালবাসা তাঁহার যৌবনকে প্রৌঢ়ত্বে এবং প্রৌঢ়ত্বকে বার্দ্ধক্যে ও অবশেষে মৃত্যুতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

মিষ্টার পিটার ও বাবু সুখেন্দ্রলাল শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও বহুবিধ ছবিতে দেওয়াল শোভিত। কিন্তু সকলের চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আদি-দম্পতির একখানি অনতিবৃহৎ তৈলচিত্র। ইডেন-উদ্যানে আদিজনক এডাম সঙ্গিনী ইভ্‌কে ডাকিতেছে। জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদনে সদ্যবুদ্ধিশালিনী আদিজননী বৃক্ষান্তরালে দেহ স্থাপন করিয়া বলিতেছেন—তিনি উলঙ্গ। পৃথিবীর প্রথম মানবের মুখের সেই অপূর্ব্ব বিস্ময় আর নবোন্মেষিণী বুদ্ধিবৃত্তির সেই ঈষৎ স্ফুরণ অবর্ণনীয়। সুখেন্দ্রলাল বাবু মোহিত হইলেন। বৃদ্ধা মিসেস উডের মৃত্যুর পর একটি দ্রব্যও স্থানান্তরিত হয় নাই। তাঁহার সুনিপুণ হস্তের সুশৃঙ্খলা চতুর্দ্দিকে সুস্পষ্ট। শয়ন-গৃহের দুইটি খাটের মধ্যে একটি রাত্রিতে ব্যবহৃত হয় বলিয়া বোধ হইল; তাহাতে তখনও বিছানা মশারি ইত্যাদি রহিয়াছে। মিষ্টার পিটার

সুখেন্দ্রলাল বাবুর ঔৎসুক্য অনুমান করিয়া বলিলেন যে, কিছুকাল যাবৎ তাঁহার নিজের বাড়ি মেরামত হইতেছে বলিয়া সেখানে স্থানসঙ্কুলান হয় না; তাঁহার পুত্র রবার্ট এখানে শোয়।

অব্যবহৃত বাড়ির কবোষ্ণ ও পুরাতন গন্ধবাহী বায়ুর মধ্যে একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। ঘরের আসবাবপত্রে দেওয়ালে ছাদে পূর্ব্ব অধিবাসীদের একটা ছাপ লাগিয়া থাকে। বিশেষতঃ এই গৃহখানির পরিচ্ছন্ন দেওয়ালের মৃদুউজ্জ্বল বর্ণলেপে, সুদৃশ্য চিত্রের যথাযথ-স্থাপনে এবং গৃহ-সজ্জা ও সরঞ্জামের সুচারু শৃঙ্খলায় বাবু সুখেন্দ্রলালের মনে হইল যেন বৃদ্ধা মিসেস উড্ তাঁহাকে ডাকিয়া এই গৃহের ভার লইতে বলিতেছেন। তিনি হিন্দু সন্তান, কিন্তু তবু যেন তাঁহার মনে হইল এক অদৃশ্য বন্ধনে তিনি তাঁহার সহিত বাঁধা, তাঁহাকে যেন আদি-দম্পতির সম্মুখের তাকে স্থাপিত দীপাধারটিতে দীপ জ্বালাইতে হইবে; ক্রুশবিদ্ধ যীশুর পুরোভাগে স্থাপিত পুষ্পাধারে পুষ্প স্থাপন করিতে হইবে। তিনি মিষ্টার পিটারকে বলিলেন, 'মিষ্টার পিটার, আমার বাংলোটি পছন্দ হইয়াছে; ভাড়া অত্যধিক না হইলে আমি এখানেই থাকিব।'

মিষ্টার পিটার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন যে ভাড়া লইয়া কোন গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই; স্থায়ী বাসিন্দা পাইলে তিনি নিতান্ত কমেই রাজী হইবেন। এ-কথাও তিনি জানাইলেন যে বাবু সুখেন্দ্রলাল কিছু দিন এ-বাড়িতে থাকিয়া দেখুন যে তাঁহার কোন অসুবিধা হইতেছে কি না। আজ যদি তিনি তাঁহার সরলতার সুবিধা লইয়া তাঁহাকে এ-বাড়িতে দীর্ঘকাল থাকিতে বাধ্য করেন এবং পরে তাঁহার কোন অসুবিধা হয় তবে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে।

বাবু সুখেন্দ্রলাল মিষ্টার পিটারের স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ হইলেন এবং তিনি যে এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাহা বলিলেন। মিষ্টার পিটার তাঁহাকে এ-কথাও জানাইলেন যে এ-স্থানটিতে স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার একটি প্রধান উপায় খুব ভোরে ও বৈকালে অন্ততঃ ক্রোশ-দুই হাঁটা। তিনি নিজে অসুস্থ বলিয়া ভোরে উঠিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার পুত্র রবার্ট খুব ভোরে উঠিতে অভ্যস্ত। যদি তাঁহার কোন আপত্তি না থাকে তবে তিনি তাহাকে বলিয়া দিবেন সে প্রত্যহ ভোরে যেন সুখেন্দ্রলাল বাবুকে জাগাইয়া দেয়।

মিষ্টার পিটারকে বিদায় দিয়া সুখেন্দ্রলাল বাবু তাঁহার নবলব্ধ বাসস্থান ও অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। আঠার মাস পর্য্যন্ত তিনি মাস-মাস পুরা বেতন পাইবেন এবং ইহার পরে আরও হাজারখানেক টাকা তিনি পাইবেন। কিন্তু কতদিন তিনি বাঁচিবেন তাহার স্থিরতা কি? চার হাজার টাকার সুদ হইতে বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিয়া এক জনের জীবনযাত্রা চলে না; অথচ টাকা ভাঙিয়া খাইলে আর কতদিন যাইবে? একদিন যখন তাঁহার শরীরে শক্তি থাকিবে না—বার্দ্ধক্যের পীড়নে তিনি জীর্ণ হইয়া পড়িবেন, কে তাঁহাকে সেবা করিবে —কে তাঁহাকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে? ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই তিনি নিজকে নিতান্ত অসহায় মনে করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে সম্মুখের নিমগাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে এবং পশ্চাতের ক্ষীণকায়া 'জরগুর' শূন্য বুকে বুকে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। পশ্চিমের ধূলিধূসরিত বায়ুমণ্ডল প্রারব্ধশীতের পাতলা কুয়াসার সহিত মিলিয়া একটি অস্পষ্টতার সৃষ্টি করিল। সুখেন্দ্রলাল বাবু মিসেস্ উডের বাংলোর শয়নকক্ষে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে তিনি এখানে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছেন। মিসেস্ উড্ যেন মরেন নাই। তাঁহার অশরীরী আত্মা যেন দিবাশেষের এই আলো-অন্ধকারের ব্যোমস্তরে লঘুক্ষিপ্র পক্ষসঞ্চালন করিয়া মুহুর্মুহু ক্রুশবিদ্ধ যীশু, অপাপবিদ্ধা মেরীমাতা ও আদি-দম্পতির চরণযুগলে প্রণতি জানাইতেছে। তিনি হিন্দু হইয়া এ-গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাল করেন নাই। নিজহস্তে তিনি বাহিরের কাঠগোলাপের গাছ হইতে দুইটি পুষ্প চয়ন করিয়া ক্রুশবিদ্ধ যীশু ও মেরীমাতার চরণতলে রাখিলেন; আদি-দম্পতির সম্মুখে দীপ জ্বালাইলেন এবং খুব ঘটা করিয়া ধুনা জ্বালাইয়া ঘর-বারান্দা সুরভিত করিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরেই সুখেন্দ্রলাল বাবু রুটি ভোজন করিয়া শুইয়া পড়িলেন। খাটখানি এরূপভাবে স্থাপিত

ছিল যে শুইয়া চাহিয়া থাকিলে দৃষ্টি একেবারে সম্মুখের আদি-দম্পতির ছবিখানির উপরে পড়ে। ঘরে আর কোন আলো ছিল না; শুধু ছবিখানির সম্মুখে স্থাপিত ক্ষুদ্র দীপাধার হইতে নির্গত অগ্নি-শিখা ছবিখানিকে আলোকিত করিতেছিল। বাবু সুখেন্দ্রলাল বাইবেলের গল্প জানিতেন। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার কোন সঙ্গী ছিল না, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহারই পঞ্জরের একখানি অস্থি লইয়া নারী সৃষ্টি করিলেন এবং আদিমানবকে কহিলেন, এই নারী তোমার সাথী; রক্তে মাংসে অস্থিতে এ ও তুমি এক; প্রজা সৃষ্টি কর ও বর্দ্ধিত হও। তিনি নিজে কি ভগবানের এই বাণী গ্রহণ করিয়াছেন, এই আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন? তাঁহার এই সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের ফল কি, পরিণতি কি? একদিন যখন মিসেস্ উডের মত তিনিও এই শয্যায় মরিয়া কঠিনশীতল মাংসস্তূপ হইয়া থাকিবেন তখন কি আদি-দম্পতি তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিতে থাকিবে না, 'তুমি পাপী, তুমি আত্মপরায়ণ, তুমি ভগবানের আদেশ মান নাই। আমরা একদিন সৃষ্টির প্রথমে যে প্রাণের প্রদীপ জ্বালাইয়াছিলাম তাহা তুমি অনির্ব্বাণ রাখ নাই।'

* * * *

জ্যোৎস্নালোক ম্লান হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রিশেষের অন্ধকারকে 'জরগু'-বক্ষাবলম্বী কুয়াসাপুঞ্জ একেবারে পাণ্ডুর করিয়া তুলিয়াছিল। নিশাচর পশুপক্ষী আত্মগোপন করিয়াছে কিন্তু দিবাচরেরা তখনও সুপ্ত। রাত্রির নিঃশেষ মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু দিবসের জন্ম হয় নাই। সুখেন্দ্রলাল বাবু চিরকালের অভ্যাসমত দরজা জানালা খোলা রাখিয়া শুইতেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন তাঁহার বাংলোর পশ্চাৎ দিক দিয়া 'জরগু' পার হইয়া নিম্ববৃক্ষচ্ছায়া-আচ্ছাদিত যে রাস্তা ষ্টেশনের দিক হইতে আসিয়াছে সেই রাস্তা দিয়া আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা এক রমণী-মূর্ত্তি বাংলোর দিকে আসিতেছে। রমণীর গায়ের রং এত ফর্সা ছিল যে, পরিহিত বস্ত্রের সহিত কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছিল না। হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল এ মানবী কি না? কুয়াসান্তরের পশ্চাতে বলিয়া তাহাকে অত্যধিক লম্বা দেখাইতেছিল এবং আলোকের অল্পতাহেতু তাহার বহিরবয়ব-রেখা অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। চাকরকে ডাকিবেন কিনা ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় অদূরস্থিত গির্জ্জা হইতে ঢং ঢং করিয়া প্রাতঃকালীন ঘণ্টা বাজিতে লাগিল এবং রবার্ট ডাকিতে লাগিল, 'বাবু সুখেন্দ্রলাল বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে।'

সমস্ত দিন ব্যাপিয়া সুখেন্দ্রলাল বাবুর মনে উষাকালে দৃষ্ট স্বপ্নের কথা জাগিয়া রহিল। বৃদ্ধা মিসেস্ উড্ কি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে কিছু বলিতে চান? একবার মনে হইল বাংলোটি হয়ত ভূতের বাড়ি; প্রতি রাত্রে হয়ত মিসেস্ উডের প্রেতাত্মা এখানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

মানুষ যখন বহুদিন যাবৎ একই আবেষ্টনীর মধ্যে বস-বাস করিতে থাকে তাহার চিন্তাধারা সেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সহজ হইয়া থাকে; হঠাৎ কোনরূপ আকস্মিকতা দ্বারা উহা বিব্রত হয় না। সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের সোজা পথ ধরিয়া সুখেন্দ্রলাল বাবুর দিনগুলি নিত্যনৈমি-ত্তিক কার্য্য-ধারার মধ্যে ফুরাইয়া যাইত। কোনকালে তাঁহাকে যে চাকরি ছাড়িয়া কর্ম্মহীন অলস জীবন কাটাইতে হইবে তাহা তিনি ভাবেন নাই। কিন্তু আজ হঠাৎ এই বিদেশে তিনি নিজকে নিতান্ত অসহায় মনে করিতে লাগিলেন। ভবিষ্য-জীবনের চিন্তা তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনো-মধ্যে জাগিয়া উঠিল। নিজকে তিনি অতি করুণার চক্ষে দেখিলেন, পৃথিবী ব্যাপিয়া পশু-পক্ষী কীটপতঙ্গ আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—ভগবানের রাজত্বে মৃত্যু নাই; আর তিনি নিজে কি করিলেন।

বিশেষ করিয়া তিন হাজার টাকা তাঁহার নিকট বড়ই অল্প মনে হইল। কত দিন তিনি বাঁচিবেন? কে জানে? হয়ত বিশ, কিংবা ত্রিশ কিংবা আরও বেশী। এ-টাকার সুদ দিয়া এক জনের চলে না—আসল ভাঙিতেও ভয় হয়; কি জানি যদি বহুদিন বাঁচেন? জীবনের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করিয়া যিনি একদিন তাঁহার চিরজীবনের সঞ্চিত এই মূলধনকে আশ্রয় করিয়া একটি অনাবিল শান্তমধুর জীবন-সায়াহ্ন কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহারই মনের দীর্ঘ-জীবী হইবার গোপন আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া

বারংবার জীবনের সেই অকিঞ্চিৎকর মূলধনকে নিতান্ত অপ্রচুর বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন তিনি জরা ও ব্যাধিতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছেন, মুখে জল দিবার কেহ নাই।

*　*　*　*

মৃদু দীপালোকে সুখেন্দ্রলাল বাবু স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন একটি রমণী তাঁহার মশারির বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ 'কোন্ হ্যায়' বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন; সঙ্গে সঙ্গেই রমণী অস্ফুট ক্ষীণ চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বাবু সুখেন্দ্রলাল দেখিলেন, প্রেতাত্মা নয়, সত্য রক্তমাংসে গড়া এক ইংরেজ তরুণী। তিনি নিজেও অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কে এই নারী? এই রাত্রিশেষে কেন তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল? হয়ত চোর হইতে পারে। কিন্তু তাহার সুকুমার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কিছুতেই মনে হইল না যে সে চুরি করিতে আসিয়াছে।

মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতেই তরুণীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সুখেন্দ্রলাল বাবুর দিকে চাহিয়া সে অবিরল ধারায় কাঁদিতে লাগিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কে, কেনই বা আমার ঘরে আসিয়াছ?' সে কোন উত্তর না দিয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিল।

—কাঁদিলে আমি ছাড়িব না; নিশ্চয়ই তোমার কোন দুরভিসন্ধি আছে; আমি তোমাকে পুলিসে দিব।

—আপনার ইচ্ছা হইলে দিতে পারেন; কিন্তু আমি দুরভিসন্ধি লইয়া এখানে আসি নাই। আর আপনি যে এখানে আছেন তাও জানি না। আমি আমার রবার্টকে দেখিতে আসিয়াছি; যেমন প্রায় প্রতি রাত্রেই আসি।

—রবার্ট্ তোমার কে হয়?

তরুণী মুখ নীচু করিল এবং বর্দ্ধিত ক্রন্দনবেগ কোনরূপে সংবরণ করিয়া কহিল,—আমি তাকে ভালবাসি, সেও একদিন আমাকে খুব ভালবাসিত কিন্তু এখন সে আমার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না, গত ছ-মাসের মধ্যে সে আমার একখানি চিঠিরও উত্তর দেয় নাই। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে বহুবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পারি নাই। সে আমার মুখদর্শন করিতে চাহে না। একদিন সে আমাকে জীবনের সাথী করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু আজ সে লোকের কাছে সে প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া হাসি-তামাশা করে, আমার নামে কুৎসা রটায়। ভদ্রলোক, আপনার নাম কি? আপনি এখানে কবে আসিয়াছেন?

—আমার নাম বাবু সুখেন্দ্রলাল পাণ্ডে; আমি মিষ্টার পিটারের ভাড়াটেরূপে কাল এখানে আসিয়াছি। কিন্তু তুমি কোন্ সাহসে এই গভীর রাত্রে জনশূন্য পথ অতিক্রম করিয়া পরগৃহে প্রবেশ করিয়াছ?

—বাবু সুখেন্দ্রলাল, আমার উপায় কি? রবার্টকে না পাইলে আমি বাঁচিব না। আমি জানি সে এখানে শুইত; বহুবার রাত্রির অন্ধকারে নির্জ্জন পথে আমি ভূতের মত বিচরণ করিয়াছি। কোন দিন বা তাহাকে শুধু একবার দেখিবার লোভে ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ ভাবিয়াছিলাম আমার সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে দরজা খোলা রহিয়াছে। ইচ্ছা ছিল একবার রবার্ট্কে জিজ্ঞাসা করিব সে আমাকে গ্রহণ করিবে কি না? আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, পৃথিবীতে আর আমি বিচরণ করিতে পারি না। তাহাকে আমি আমার হৃদয় মন সর্ব্বস্ব দান করিয়াছি; সে আজ লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায় যে ইচ্ছা করিলে আমি অন্য কাহাকেও তাহা দান করিতে পারি। বাবু সুখেন্দ্রলাল, আপনি ত এক জন হিন্দু; ধর্ম্ম ত আপনাদের প্রাণ; বলুন ত একি সত্য কথা? রবার্ট্ও জানে যে এ-কথা মিথ্যা; সে জানে যে আমি একমাত্র তাহারই। আমি বিষ সংগ্রহ করিয়াছি, আজ যদি তাহাকে পাইতাম একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতাম সে আমাকে সত্যই এরূপ মনে করে নাকি। যদি তাহার মনে হইয়া থাকে যে আমি অন্যকেও ভালবাসিতে পারি তবে তাহার সম্মুখেই এই বিষ খাইয়া মরিব।—এই বলিয়া তরুণী একটি ক্ষুদ্র কৌটা সুখেন্দ্রলাল বাবুকে দেখাইল। তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; কি জানি অবশেষে ইংরেজ-তরুণী-হত্যার দায়ে না পড়িতে হয়।

'বাবু সুখেন্দ্রলাল জাগিয়াছেন নাকি' বলিতে বলিতে রবার্ট ঘরে প্রবেশ করিল এবং তরুণীকে দেখিয়া বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। 'আইভি, তুমি এখানে?'

আইভি দুই হাতে রবার্ট-এর হাঁটু জড়াইয়া ধরিল এবং অশ্রুতে দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া কেবলই বলিতে লাগিল, 'রবার্ট, রবার্ট, আমার প্রিয় রবার্ট', এবং এই বলিয়া চুম্বনে চুম্বনে রবার্টকে প্লাবিত করিয়া দিল।

সুখেন্দ্রলাল বাবু প্রেমের এই বিচিত্র অভিনয় দেখিয়া বিচলিত হইলেন। বহু বৎসর ব্যাপিয়া তিনি আল্‌পিন হইতে ষ্টীম এঞ্জিন্ পর্য্যন্ত রেলের মাল-তালিকা-পুস্তকের যাবতীয় পদার্থের সহিত আদ্যোপান্ত পরিচিত ছিলেন; কিন্তু নরনারীর হৃদয়-উদ্ভূত এই অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসের সন্ধান তিনি কোন তালিকাতেই খুঁজিয়া পাইলেন না। ইহাই কি ভালবাসা—এই নারী কি চায়?

রবার্ট কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'বাবু সুখেন্দ্রলাল, এ আপনার ঘরে প্রবেশ করিল কেন?'

'তোমাকে দেখিতে। মিস্ আইভি জানিত তুমি রাত্রিতে এ-ঘরে শোও; তাই সে প্রায় প্রতি রাত্রেই এই বাংলোর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, আমি কালও ইহাকে দেখিয়াছি।'

'এ আপনি বিশ্বাস করেন?'

'নিশ্চয়ই করি। আইভি তোমাকে ভালবাসে; তুমি তাহাকে গ্রহণ কর।'

'বাবু সুখেন্দ্রলাল, আপনি সরল হৃদয় হিন্দু, আমাদের সমাজের কথা জানেন না। এখানে ভালবাসার মূল্য বেশী নয়। আজ আইভি আমাকে ভালবাসে, কাল সে আর এক জনকে ভালবাসিবে।'

সুখেন্দ্রলাল বাবু ও আইভি একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'মিথ্যা কথা।'

রবার্ট বলিতে লাগিল, 'আমিও একদিন আইভিকে ভালবাসিতাম; তখন আমি উপার্জ্জন করিতাম, এখন কাহাকেও ভালবাসিবার মত আর্থিক অবস্থা আমার নয়। বিশেষতঃ একদিন এক জনকে ভালবাসিলেই কি তাহাকে চিরজীবনের জন্য গ্রহণ করিতে হইবে? আমরা রোমান ক্যাথলিক; বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া বড় কঠিন; এজন্য চির-জীবনের জন্য কাহাকেও সহজে গ্রহণ করিতে চাই না।'

'কিন্তু গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা মানুষ, প্রেমকে আমাদের চিরস্থায়ী করিতে হইবে।'

'কিন্তু প্রেম এক জনের প্রতি চিরস্থায়ী নাও হইতে পারে।'

'রবার্ট তুমি আমার পুত্রের বয়সী। আমার নিজের জীবনে ভালবাসার সঙ্গে পরিচয় হয় নাই, যদিও বিবাহ আমি তিনবার করিয়াছি; কিন্তু এ-কথা আমি বলিতেছি নরনারীর জীবনে ভালবাসাই শেষ কথা নয়; প্রজাসৃষ্টিই আসল। যতই তুমি ভালবাস, যতই তুমি প্রেমের জয়গান কর, অনাদিকাল হইতে যত নারী যত পুরুষকে, যত পুরুষ যত নারীকে ভালবাসিয়াছে তাহার কোন পরিচয় আজ আর জগতে নাই; আছে শুধু সন্তানসন্ততি। একদিন আদিজনক ও আদিজননী জীবনের যে দীপশিখা জ্বালাইয়াছিলেন, তাহা আজও অনির্ব্বাণ; সেই আলোক-শিখা তোমাকেও জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে। আজ তুমি যুবক, ভাবিতেছ ভালবাসাই সব; কিন্তু তা নয়। তুমি জান ভগবান মানুষ সৃষ্টি করিলেন, বিশ্বসংসারে তাঁহার কোন সাথী ছিল না। ভগবান নারী সৃষ্টি করিলেন, বলিলেন, 'ফলবান হও; আপনাকে বৰ্দ্ধিত কর।' নরনারীর সম্পর্কের সেই প্রথম কথা, সেই শেষ কথা। 'উপরের দিকে চাহিয়া দেখ।' রবার্ট ও আইভি দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিল আদি-দম্পতির তৈলচিত্রের সম্মুখের সন্ধ্যাকালে প্রজ্বলিত দীপশিখা তখনও মৃদু উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। বাহিরে রাত্রি প্রভাত হইতে দেরি নাই। সমস্ত জগৎ সৃষ্টির সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। আলো-অন্ধকারের সন্ধিস্থলে আদিজনকজননীর পদতলে দাঁড়াইয়া রবার্ট ও আইভির মনে হইতে লাগিল ঐ যে ক্ষুদ্র দীপ উহা যেন লক্ষ বৎসর যাবৎ জ্বলিতেছে; উহার শিখা যেন সহস্র সহস্র যোজন দূর হইতে তাহাদের শিরে আলোক বর্ষণ করিতেছে। তাহাদের সাধ্য নাই উহাকে নির্ব্বাপিত হইতে দেয়। যুগে যুগে যত নরনারী তাহাদের রক্তস্নেহ ঢালিয়া এ-শিখাকে অনির্ব্বাণ রাখিয়াছে তাহারা যেন সমস্বরে বলিতেছে—'সাবধান, এ-দীপ নিবিতে দিও না।' রবার্ট পদতলে আসীন আইভির দিকে চাহিল এবং সুখেন্দ্রলাল বাবুকে বলিল, 'কিন্তু সুখেন্দ্রলাল বাবু স্ত্রী কিংবা সন্তান প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি এখনও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পিতার মুখাপেক্ষী; আপনি কি

আমাকে স্ত্রী ও সন্তান লইয়া তাঁহার দয়ার ভিখারী হইতে বলেন ?'

'না ; কিন্তু প্রথমে তুমি পৃথিবীর প্রথম জনক-জননীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর, আইভিকে গ্রহণ করিবে।'

রবার্ট যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল ; প্রতিবাদ করিবার শক্তি ছিল না। সে আইভিকে ধরিয়া তুলিল এবং ভক্তি-বিনম্রকণ্ঠে কহিল, 'প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি মিস্ আইভি ফ্রেজারকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব।'

তাহারা বাহির হইয়া যাইতেছিল ; বাবু সুখেন্দ্রলাল বলিলেন, 'দাঁড়াও। তিনি বালিশের নীচ হইতে তিন হাজার সাত শত সাত টাকা তিন আনার চেকখানি বাহির করিলেন এবং উহার পৃষ্ঠে লিখিলেন, "মিসেস্ আইভি পিটারকে দেয়।" চেকখানি আইভির হাতে দিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। তখন গির্জ্জার প্রাতঃকালীন ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।

* * * *

'লো-লাইন্‌স্'-এর বাসিন্দারা সেদিন হইতে বিশালবপু কৃষ্ণকায় ভারতীয় ব্যক্তিটিকে আর দেখিতে পাইল না। কিন্তু 'আসানশুলের' আবালবৃদ্ধবনিতা দেখিল সুখেন্দ্রলাল বাবু তেমনি পরম নিশ্চিন্তে ডিভিসনাল্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আপিসে যাতায়াত করিতেছেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিতেন, 'আরে ভাই, আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, দেশ পশ্চিমে ; আমার কি পোষায় এই ভূতের বেগার !'

কারা-মাণিকপুর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ইতিহাসপাঠক মাত্রেই কারা-মাণিকপুরের কথা জানেন। এলাহাবাদ হইতে কারার দূরত্ব একচল্লিশ মাইল। এই কারা একদিন ঐশ্বর্য্যশালী সুন্দর নগর ছিল, আজ তাহা ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে। এই কারা শহরেই সুলতান আলাউদ্দীন খাল্‌জী তাঁহার খুল্লতাত ও শ্বশুর জলালউদ্দীন খালজীকে হত্যা করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ আসিয়া অনেক বন্ধুবান্ধবের কাছে কারার কথা শুনিয়াছি, অনেক কিছু ওখানে দেখিবার আছে জানিয়া উৎসাহিত হইয়াছি, কিন্তু সঙ্গী জোটে নাই, সুযোগও মিলে নাই, কাজেই চুপ্‌চাপ্ বসিয়াছিলাম,—ভাবিয়াছিলাম, একদিন একাই সেখানে যাইব। এইবার একদিন সুযোগ ঘটিল।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সেন এলাহাবাদ হিসাব-বিভাগের এক জন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। নলিনী বাবুর বেড়াইবার উৎসাহ আছে, শক্তিও আছে। শিকারের প্রতিও তাঁহার অদম্য অনুরাগ। এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কোথাও বড়-একটা যাওয়া হয় না। এইবার নলিনী বাবুর শ্যালিকাপতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় পূজাবকাশে এলাহাবাদে বেড়াইতে আসিয়া নলিনী বাবুর অতিথি হইয়াছিলেন। আমি ক্ষিতীশ বাবুকে বলিলাম—চলুন একদিন কারা বেড়াইয়া আসি। ক্ষিতীশ বাবুর দেখিলাম এ-বিষয়ে অসাধারণ উৎসাহ! এইরূপ উৎসাহ ও উদ্যম না থাকিলে কি সিমলা-দিল্লী করিতে পারিতেন, না বজেট লইয়াই তর্কযুদ্ধ করিতে পারিতেন! কিংবা সাতসমুদ্র-তের-নদী ডিঙ্গাইয়া আসিতে পারিতেন। এইবার নলিনী বাবুর টনক নড়িল। তিনি রাজী হইলেন। মিসেস্ সেন—শ্রীমতী ইলাদেবী আমাদের জলযোগের ব্যবস্থা করিবার ভার লইলেন, এ-বিষয়ে তাঁর বেশ সুনাম আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। ১২ই নবেম্বর ২৬শে কার্ত্তিক আমরা কারা দেখিতে রওনা হইলাম।

সঙ্গী জুটিল মন্দ নয়। ক্ষিতীশ বাবু, নলিনী বাবু, তাঁহার মামা বগুড়ার উকীল নরেন্দ্রশঙ্কর বাবু, নলিনী

বাবুর দুই ছেলে আর ডাঃ মেঘনাদ সাহার পুত্র শ্রীমান্ অজিত। ডাঃ সাহার আমাদের সঙ্গী হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি একটা জরুরি কাজে আট্‌কা পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার ছেলে শ্রীমান্ অজিতকে প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। শিল্পী শ্রীমান্ সুধীন সাহাকেও সঙ্গে লইলাম।

বেলা বারটার সময় এলাহাবাদ ছাড়িলাম। নলিনী বাবু গাড়ী চালাইতে লাগিলেন। সঙ্গে জলের কুঁজো হইতে আরম্ভ করিয়া, জলযোগের প্রচুর আয়োজন ছিল। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই শহরের পথ ছাড়াইয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া পড়িলাম। সিরাথু পর্য্যন্ত আমাদিগকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া যাইয়া সেখান হইতে কাঁচা রাস্তায় কারা যাইতে হইবে।

কার্ত্তিক মাস। শীত তেমন করিয়া পড়ে নাই। শীতের আমেজটুকু কিন্তু বেশ লাগিতেছিল। কাজেই গরম কাপড়-জামা পরায় বেশ আরামবোধ হইতেছিল। নলিনী বাবুর শিকারের সখ খুবই বেশী। যখন যেখানে যান বন্দুকটি সঙ্গে লইতে ভুল করেন না। এ-যাত্রায়ও সে ভুল তাঁহার হয় নাই। ক্ষিতীশ বাবু সারা পথ বন্দুকটি কাঁধে করিয়া চলিলেন। আমরা চারি দিকের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। দুই দিকে বিস্তৃত মাঠ। বাংলার শ্যামলশ্রী এখানে নাই। তবু এ-সময়ে ক্ষেতে ক্ষেতে সবুজ শস্য শোভা পাইতেছিল। কোথাও উটের পাল পিঠে বোঝা ও সোয়ার লইয়া ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। মহিষের দল পথের পাশের দুই-একটা ডোবার মধ্যে সারা শরীর ডুবাইয়া মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে। দুই ধারে আমরুতের (পেয়ারা) বাগান। ইঁদারা হইতে মেয়েরা জল সংগ্রহ করিতেছে, কেহ দাঁড়াইয়া আছে। মাথায় মস্তবড় পাগড়ী বাঁধিয়া, লাঠি হাতে এবং পিঠে বোঝা লইয়া পথিকেরা পথ চলিয়াছে। পথের মধ্যে দুই-একটি গ্রামও পাইতেছিলাম। গ্রামের বাড়িগুলি গায়ে গায়ে লাগা, মাটির দেয়াল-দেওয়া এবং উপরে খোলার ছাউনি। দুই-একটি মন্দিরও আছে। বর্ত্তমান বিলাতী আবহাওয়ার প্রভাব এই সব দূর পল্লীতেও আসিয়া পড়িয়াছে। দরজী সিঙ্গারের সেলাইয়ের কল চালাইয়া কুর্ত্তা সেলাই করিতেছে দেখিলাম।

বেলা বারটায় রওনা হইয়া ঠিক্ দেড়টার সময় আমরা সিরাথু আসিলাম। এখান হইতে কাঁচা রাস্তা আরম্ভ হইল। সিরাথু হইতে কারা পাঁচ মাইল দূর। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুই দিকে যেমন তরুশ্রেণী ছায়া করিয়া চলিয়াছে, সিরাথুর পথও সেইরূপ ছায়াশীতল—দুই পাশেই গাছের সারি। কাঁচা রাস্তা তাই ধূলিভরা। হাওয়া-গাড়ীর দ্রুতগতিতে পিছনে ও দুই পাশে ধূলির মেঘ উড়িতেছিল। সাইনি ও দারানগর নামে দুইটি প্রসিদ্ধ পল্লী পাশে রাখিয়া আমরা কারা আসিয়া পৌঁছিলাম। অনেকটা দূর হইতেই বন-জঙ্গলে, পথের এ-পাশে ও-পাশে কবরের পর কবর, ভাঙা দেওয়াল, ইঁদারা এ-সব দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম যে কারা আসিয়া পৌঁছিয়াছি। গ্রামের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া বাজারের শেষপ্রান্তে এখানকার এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান অধিবাসীর বহির্বাটির অঙ্গনে একটি নিমগাছের ছায়ায় আমাদের গাড়ীখানি আসিয়া থামিল। এইবার আমরা দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম।

দুই দিকের দুইটি উচ্চ স্তূপের সংকীর্ণ পথ দিয়া নদীর দিকে যাইতেই একটি খোলা জায়গায় আসিয়া চারি দিকের দৃশ্য আমাদের চোখে পড়িল। বিস্তৃত প্রান্তর—প্রান্তরের বুকে স্তূপের পর স্তূপ। সর্ব্বত্র অসমতলভূমি—এখানকার বাড়িঘরগুলিও পুরাতন বাড়িঘরগুলিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

আমরা প্রথমে আসিলাম জয়চাঁদের দুর্গের কাছে। এই জয়চাঁদ ছিলেন গড়েবাল-বংশীয়। ইনি ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই জয়চাঁদের সহিতই পৃথ্বীরাজের বৈরিতা ছিল। কারা শহরটি জয়চাঁদেরও অনেক আগে জনাকীর্ণ ও প্রসিদ্ধ ছিল। এই শহর হিন্দু রাজাদের এক সময়ে রাজধানী ছিল। হিন্দু রাজাদের সময় কারা যে প্রসিদ্ধ নগরী ছিল, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কনৌজের পরিহার নৃপতি যশঃপাল ১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার গায়ের খোদিত লিপিটি এখানকার দুর্গের তোরণদ্বারে সংলগ্ন ছিল—এখন উহা এখান হইতে অপসৃত হইয়াছে। কাজেই কারা-শহর জয়চাঁদেরও আগে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জনপ্রবাদ এই যে, কারা-শহর জয়চাঁদই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

লঙ্কা-দহন কালে
শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

জয়চাঁদের দুর্গের সাধারণ দৃশ্য

এ-অঞ্চলের হিন্দুদের কাছে কারা পবিত্র তীর্থরূপে পরিচিত। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন্‌বতুতা তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে কারার কথা বলিয়াছেন। কারার পুরাতন নাম কাল নগর। এখনও শহরের উত্তর দিকে কালেশ্বরের মন্দির রহিয়াছে। আষাঢ় মাসের আট তারিখে এখানে খুব বড় মেলা হয়। তখন প্রায় লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। চৈত্র, আশ্বিন মাসেও মেলা হয় বটে, তবে তেমন লোকসমাগম হয় না। কালেশ্বরের মন্দিরটি ধ্বংসের পথে বসিয়াছিল—আশী বৎসর আগে কারা-নিবাসী শীতলপ্রসাদ উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বারদুয়ারীটি নূতন করিয়া তিনিই প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রাচীন বারদুয়ারীর ধ্বংসাবশেষ এখনও মন্দিরের পশ্চিম দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ মন্দিরটি কৃষ্ণ পণ্ডিত নামে এক জন মহারাষ্ট্র-দেশীয় আমিল ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রেওয়ার রাজা রামচন্দ্রের একখানা তাম্রলিপি এখানে পাওয়া গিয়াছে, সেখানার তারিখ হইতেছে ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। তাহাতে কারার নাম রহিয়াছে কালোখাল বা করকোটক নগর। পৌরাণিক কিংবদন্তী এই যে, সতীদেহের কর (হাত) এখানেই পড়িয়াছিল বলিয়াই এই স্থানের নাম করা। কারা, করকোটক নগর, কালোখাল ইত্যাদি নানা নাম হইয়াছে। এখন কিন্তু এ-স্থান কারা নামেই পরিচিত। আমরা সংক্ষেপে কারার ইতিহাস বলিলাম।

প্রথমে দুর্গ দেখিতে চলিলাম। বিরাট বিস্তৃত স্তূপ। একটি সংকীর্ণ পথ দিয়া স্তূপের উপর উঠিতে লাগিলাম। স্তূপের উচ্চতা ৯০ ফুট হইতে ১০০ ফুট হইবে। লাল বেলে পাথরের তৈয়ারি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখনও রহিয়াছে। আমরা আঁকাবাঁকা পথ বাহিয়া দুর্গের উপরে আসিলাম। উপরে সমতলভূমি। কৃষকেরা চাষ আরম্ভ করিয়াছে, ইট-পাথর এদিকে-সেদিকে ছড়াইয়া আছে। নদীর দিকে দুর্গের উচ্চতা প্রায় এক শত ফুট হইবে। এক পাশে একটু ঢালু হইয়া গিয়াছে। দুর্গ-প্রাকারের এক দিকের ইট-পাথরে-গড়া কতকাংশ এখনও দাঁড়াইয়া আছে, কতক ভাঙিয়া গিয়াছে,

কতক গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এখানে এখনও দুর্গের মধ্যস্থিত একটি ছোট ঘর রহিয়াছে। একেবারে গঙ্গার দিকে। কিনারায় দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া যায়। দুর্গের উপর হইতে গঙ্গার শোভা মনোরম। গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দুর্গের চরণ ধোয়াইয়া বহিয়া যাইতেছে। স্বচ্ছ-শান্ত-শীতল জল, একটিও ঢেউ নাই। খেয়া-নৌকা এপার-ওপার করিতেছে। দুই-একখানি মহাজনী নৌকা ধীর গতিতে

হিসম-উল-হকের সমাধি

চলিয়াছে। ওপারে মাঠ, মাঠের পরে গ্রাম। গ্রামের গাছপালাগুলি ঘন কালো রূপে চোখের সম্মুখে আসিয়া প্রতিভাত হইতেছে। আর দেখা যাইতেছে নদীর তীরে এক মাইলেরও উপর বিস্তৃত দুর্গের ধ্বংসস্তূপ, কালেশ্বর মন্দিরের সাদা চূড়া—শহরের দিকে স্তূপের পর স্তূপ, সমাধির পর সমাধি, মস্‌জিদ ও অন্যান্য বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপ। যাঁহারা প্রাচীন দিল্লীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছেন কিংবা কনৌজের ধ্বংস-চিহ্ন দেখিয়াছেন তাঁহারা এই বিলুপ্ত নগরীর ধ্বংসলীলার অনেকটা আভাস পাইবেন।

দুর্গের উপরে ঠিক মধ্যভাগে একটি গোলাকার প্রস্তরস্তম্ভ আছে। স্তম্ভটি বেশ বড় এবং গোলাকার। পাশ দিয়া সিঁড়ি আছে। এই স্তম্ভটি খুব পুরাতন বলিয়া মনে হইল না। শ্রীমান্ অজিত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়াছিল, আমিও উঠিয়াছিলাম। সেখান হইতে চারি দিকের দৃশ্যের তুলনা মিলে না। মুহূর্ত্তের মধ্যে গঙ্গার সাবলীল গতি রজতশুভ্র ধারার অপরূপ শোভা, আর চারি দিকের বিস্তৃত প্রান্তরের ধ্বংসলীলার ছবি আসিয়া দেখা দেয়। এখন দুর্গ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। অনেকটা গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

দুর্গের ভিতরকার একটি ছোট ঘর

তবু যাহা আছে তাহার পরিমাণও বড় কম নয়। দুর্গটির আকার সমকোণী চতুর্ভুজের মত। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় ৯০০ শত ফুট আর চওড়া হইবে ৪৫০ ফুট।

আমরা দুর্গের উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া আর যাহা যাহা দেখিবার আছে তাহা দেখিতে আরম্ভ করিলাম। নীচে নদীর তীরে একটি ঘাট। ঘাটটির নাম বাজারঘাট বা বৃন্দাবনঘাট। পাথরের চত্বরের ঘাটের উপর একটি মন্দির। মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছেন, কিন্তু এখানে কেহ পূজা করে না, যে-কোন কারণেই হউক ইহা কলুষিত হইয়াছে। এখানে দেওয়ালের গায়ে একটি ফার্সী খোদিত লিপি—লিপির তারিখ ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরের পাশে একটি সমাধি। নদীর পাড় ধরিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম একটি কূপের বেষ্টনী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার গাঁথুনি এখনও দৃঢ় ও অটুটভাবে রহিয়াছে। কে জানে এই কূপটির বয়স কত! এই কূপটি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় প্রাচীন শহরের কতটা অংশ নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। গঙ্গার উপর এখনও কয়েকটি বাঁধান

ঘাট রহিয়াছে। একটি বেশ বড় মন্দিরের চারি দিকে উঁচু প্রাচীর। দরজা বন্ধ ছিল, তাই ভিতরে কি আছে দেখিতে পাইলাম না।

মৌলানা খাজগীর সমাধি

এইবার এখানকার অন্যান্য যে-সকল মন্দির ও মসজিদ দেখিয়াছিলাম তাহাদের কথা বলিতেছি। শহরের উত্তর দিকে বাজারের মধ্যে জামি মস্‌জিদ বিরাজিত। ঐ স্থানটির নাম 'বাজার কারা।' মৌলবী ইয়াকুব খাঁ ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই জামি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে কুবরান্ আলি নামে এক জন ধার্ম্মিক মুসলমান উহার সংস্কার করেন।

এখানকার সবচেয়ে পুরাতন সমাধি-মন্দির হইতেছে খাজা করেক নামক সুপ্রসিদ্ধ ফকীর-সাহেবের। ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফকীর-সাহেবের মৃত্যু হয়। সুলতান আলাউদ্দীন যখন কারা নগরীতে তাঁহার খুল্লতাত জলালউদ্দীন ফিরোজ খালজীকে হত্যা করেন (১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দ), তখন এই মহাপুরুষ জীবিত ছিলেন। খাজা-সাহেবের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়,—'তারিখ জহুর কুৎবি' নামক গ্রন্থে ঐ সব গল্প ও কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। খাজা-সাহেব

দুর্গের এক দিকের প্রাচীর

দিল্লীর সুলতানের নিকট হইতে ছয়খানি গ্রাম নিষ্কর জায়গীর পাইয়াছিলেন। এখনও চারিখানি গ্রাম তাঁহার বংশধরদিগের অধিকারে আছে। সমাধিটি শহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। উহার উপরে ছাত আছে। দেওয়ালের গায়ে যে খোদিত লিপিটি আছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে এই সমাধি-মন্দিরটি একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছিল—১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার সংস্কার সাধিত হইয়াছে। সুলতান জলালউদ্দীনের সমাধিও এখানে অবস্থিত।

এখানকার অন্যান্য সমাধি-মন্দিরগুলির মধ্যে কামাল খাঁর সমাধি-মন্দিরটিও প্রসিদ্ধ। কামাল খাঁ কে ছিলেন জানা যায় না। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে কামাল খাঁর মৃত্যু হয়। ইঁহার সমাধি-মন্দিরটি একটি সমচতুষ্কোণ অট্টালিকা। উপরে গম্বুজ রহিয়াছে। বিস্তৃত অঙ্গনের মধ্যে সমাধিটি অবস্থিত। সমাধির পশ্চিম দিকে একটি মস্‌জিদ। প্রবেশ-পথের দুই দিকে কয়েকটি গুম্বজওয়ালা ঘর। সমাধির চারি পাশে সচ্ছিদ্র প্রাকার। এতদ্ব্যতীত কাগজিয়ানা মহল্লার শেখ সুলতানের সমাধি এবং সৈয়দ কুতবউদ্দীনের সমাধি দুইটি উল্লেখযোগ্য। শেখ সুলতানের সমাধির নির্ম্মাণ-তারিখ ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

সৈয়দ কুতবউদ্দীনের নামে একটি মেলা বসে। কুতবউদ্দীন ছিলেন মুসলমান সেনাপতি। তাঁহার আর এক নাম ছিল মালিক আহ্‌সান। কারা যে যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে আসে, সেই যুদ্ধের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন

খাজা কয়েক সাহেবের ও জলালউদ্দীনের সমাধি

১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মৌলানা খাজগী দিল্লীর বিখ্যাত নাসিরউদ্দীন চিরাগের উত্তরাধিকারী এবং জৌনপুরের কাজী সাহেবউদ্দীনের শিক্ষক ছিলেন। মৌলানা সাহেব সেকালের এক জন অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এখানে একটি কিংবদন্তী আছে যে, অতিবড় মূর্খ ব্যক্তিও যদি মৌলানা সাহেবের পাশে বসিয়া একমনে চল্লিশ দিন অধ্যয়ন করে তাহা হইলে সেও পর্য্যন্ত পণ্ডিত হইয়া যায়।

খাজা কাবর সাহেবের সমাধির পাশে মেদিনার অধিবাসী সৈয়দ কুতুবউদ্দীনের সমাধি। কথিত আছে, সৈয়দ সাহেব মুসলমান সেনার সহিত আসিয়াছিলেন। চৈত্র মাসে এখানে এক বৃহৎ মেলা হয়। এ মেলায়

মালিক আহ্‌সান। সে-সময়ে বিনি হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁহাকে জ্যোতিষীরা বলিয়াছিল যে যদি কোন মুসলমান সেনাপতি দুর্গের প্রাচীর স্পর্শ করিতে পারেন তাহা হইলে কারা মুলমানদের অধিকারে আসিবে। কুতবউদ্দীন এ-কথা জানিতে পারিয়া হিন্দু সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করিয়া অসীম সাহসিকতার সহিত আসিয়া দুর্গ-প্রাচীর স্পর্শ করিলেন। জ্যোতিষীর বাক্য কি মিথ্যা হইতে পারে? অমনি দুর্গ মুসলমানের হাতে পড়িল। এমন করিয়াই মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় ঘটিয়াছিল! দুর্গের প্রাচীরের নীচে মালিক আহ্‌সানের কবর রহিয়াছে। কারার অধিবাসীরা মালিক আহ্‌সানকে মুস্কিল আসানে পরিণত করিয়াছেন এবং সমাধির উপরকার দুর্গের দেওয়ালে চূণকাম করিয়া বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছেন। এই কিংবদন্তীর মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না, কেন-না, এই সমাধির গায়ের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে ১১০৯ খ্রীষ্টাব্দে কুতবউদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছিল! এখানকার লোকেরা বলে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার সময় এই কবরের নিকট যে প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হয় তাহা অতি প্রবল ঝড় বাতাসেও কখনও নিবিয়া যায় না।

গঙ্গার তীরে কুব্‌রিঘাটে মৌলানা খাজগীর সমাধি রহিয়াছে। উহার গায়ের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে

শীতলা-মন্দিরের গায়ে লাগান বিষ্ণুমূর্ত্তি

স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী হয়। বন্ধ্যা-নারীরা সৈয়দ সাহেবের কবরের পাশে যে হরীতকী গাছ আছে

তাহার নীচে নূতন কাপড় বিছাইয়া রাখে। ঐ গাছের ফল পাড়িলে উহা সংগ্রহ করিয়া বন্ধ্যা রমণীগণ তাহা খায়, তাহাদের বিশ্বাস তাহা হইলে তাহাদের বন্ধ্যা-দোষ দুর হইবে। এই হরীতকী গাছের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত রহিয়াছে। গল্পটি এই যে, মুসলমানেরা যখন কারা অধিকার করিল তখন সৈয়দ সাহেব রাজপণ্ডিতকে পুস্তকালয়ে এককোণে লুক্কায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। সৈয়দ সাহেব ও পণ্ডিতের মধ্যে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সৈয়দ কুতুবউদ্দীনের সমাধি

পণ্ডিতের নাম ছিল গঙ্গা। পণ্ডিত-মহাশয় সৈয়দ-সাহেবের হাতের জপমালা দেখাইয়া বলিলেন মালার গুটিগুলির কি কোন গুণ আছে? সৈয়দ-সাহেব বলিলেন—হাঁ। ইহার সামান্য একটু অংশ সেবন করিলে সে পুরুষই হউক কি স্ত্রীলোকই হউক তাহাকে সন্তান প্রসব করিতে

গোলাকার স্তম্ভ

হইবে। পণ্ডিত-মহাশয় সত্যমিথ্যা পরীক্ষার জন্য উহার একটি সামান্য অংশ সেবন করিলেন, যথাসময়ে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। পুত্র জন্মিবার পরই তাঁহার মৃত্যু হইল। পিতা ও পুত্র মৃত্যুর পরে সৈয়দ-সাহেবের কবরের পাশে হরীতকী গাছ হইয়া জন্মিলেন। একটি গাছ মরিয়া গিয়াছে, আর একটি এখনও বাঁচিয়া আছে। যে গাছের ফল খাইলে পুরুষদেরও সন্তান প্রসব করিবার ভয় ছিল, সে গাছটি মরিয়া গিয়াছে।

সৈয়দ কুতবউদ্দীনের সমাধির পাশে আবদুল জহর শহীদ নামে এক জন মুসলমানের সমাধি রহিয়াছে। খাজা জারক সাহেবের সমাধির উত্তর-পশ্চিম দিকে মিঠ্ঠু শাহশরীদ শহীদের সমাধি। মিঠ্ঠু শাহ ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন। এই সমাধি-মন্দিরের গম্বুজটি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। গল্প আছে যে, যখন সমাধি-মন্দিরটির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে সমাধিগর্ভ হইতে ফকীর-সাহেবের বাণী শোনা গেল—যেন তিনি বলিতেছেন আকাশ ভিন্ন অন্য কোনরূপ আচ্ছাদনে আমার প্রয়োজন নাই, অমনি সঙ্গে সঙ্গে গম্বুজটি ভাঙিয়া পড়িল। এখানেই মাণিকপুরের হিসামউল হকের সমাধি রহিয়াছে। এখন যেখানে কবরের পর কবরের সারি চলিয়াছে, একদিন সেখানে ছিল জনতাপূর্ণ বিস্তৃত শহর। আজ সমাধির পর সমাধি দেখিতে দেখিতে মনে হইল—এই ত মানুষের জীবন, এই ত মানুষের দম্ভ ও অহঙ্কার। বর্ত্তমান কারা-শহরের মাঝখানে মাতা মালুকদাম বা চন্দ্রমলুক শাহের বাসভবন। এই মহাপুরুষ ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। সম্রাট

কামাল খাঁর সমাধি ও প্রাকার

আওরংজীব বাদশাহ এই হিন্দু সাধুকে সিরাথু গ্রামখানি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। এই সাধুর শিষ্যদের কারাতে ও সিরাথুতে আশ্রম আছে। বর্ত্তমান সেবায়েতের নাম হনুমানদাস। হনুমানদাস বাবাজী এখন কারাতে নাই, সিরাথুতে আছেন। ফিরিবার পথে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছিলাম। সেকথা পরে বলিব।

কারায় আরও দুইটি প্রসিদ্ধ মসজিদ আছে। একটি ভাঙ্গট মহল্লায়, অপরটি ইস্‌মাইলপুর নামক মহল্লায়। প্রথমটি ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইসমাইলপুরেরটি তৈয়ারি হইয়াছিল ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে।

ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে বেলা কমিয়া আসিতেছিল। সাড়ে চারিটার সময় আমরা আমাদের গাড়ীর কাছে আসিলাম। সেখানে খাদিমের বাড়িতে একটা ভোজের আয়োজন চলিতেছিল। এক জন ভদ্রলোক বলিলেন—"এত সাহেব! কবরের শহর।... হনুমানদাস বাবাজীর কাছে অনেক পুরাতন ছবি আছে দেখিয়া যাইবেন।" কথাটা শুনিয়া আমাদের খুব আনন্দ হইল। সকলেই স্থির করিলাম যে যাইবার সময় দেখিয়া যাইব। জয়চাঁদের দুর্গের মধ্যস্থিত মাটি খুঁড়িয়া অনেক ঘরের চিহ্ন, মূর্ত্তি, প্রস্তরস্তম্ভ, এমন কি খোদিত লিপিও পাওয়া গিয়াছিল এখন তাহা নানা স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আমরা নদীর পাড়ে—গাছের নীচে অনেক ছোট-বড় মূর্ত্তি, কার্নিশের গায়ে খোদাই মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। ইহার কতক মূর্ত্তি এলাহাবাদ যাদুঘরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বাকী সব এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

আমরা জয়চাঁদের দুর্গের উপর হইতে গঙ্গার তীরে আর একটি দুর্গ দেখিতে পাইয়াছিলাম। দূরবীনের সাহায্যে মনে হইল উহার আয়তনও বড় কম নহে। স্থানীয় লোকেরাও তাহা বলিল। কারা হইতে উহা চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। নৌকায় যাইতে হয়। আমাদের সেখানে যাওয়া হইল না। মাণিকচাঁদ কে ছিলেন জানি না, স্থানীয় জনপ্রবাদ, তিনি জয়চাঁদের ভাই ছিলেন।

কারার বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। লোকজন তেমন নাই। রেলপথ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কারা বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল। নদীর তীরে শত শত নৌকা বাঁধা থাকিত—নানা দেশের ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যসম্ভার লইয়া আসিত। এখন তাহার কিছুই নাই। এক সময়ে এখানে প্রচুর পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইত। কিন্তু কাগজের কলের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখানে এখন শুধু কম্বল তৈয়ারি হইয়া থাকে। কম্বলের ব্যবসায়ের

গঙ্গার তীর হইতে জয়চাঁদের দুর্গের দৃশ্য

জন্য এখনও কারার প্রসিদ্ধি আছে। কারার বাজারটি বেশ বড়—অধিবাসীর সংখ্যা মুসলমানই বেশী। একটি ডাকঘর দেখিলাম—শুনিলাম কারাতে স্কুল নাই, স্কুল দয়ানগরে আছে।

আমরা কারা ছাড়িয়া তিন মাইল দূরে শীতলাদেবীর মন্দির দেখিতে চলিলাম। পথের দুই দিকে লম্বা লম্বা ঘাস, বাড়ির ধ্বংসাবশেষ—আর গঙ্গার তীরে বন-জঙ্গলে মাঠে কবরের পর কবর। শীতলা-মন্দিরের অদূরে পথের কিনারায় গাড়ী দাঁড়ান মাত্রই পাণ্ডারা আসিয়া ভিড় জমাইল। এমন জাগ্রত দেবতা আর নাই। মহাবীরের মন্দিরটি এখানে বেশ সুন্দর। মন্দিরটির প্রসিদ্ধি আছে, মনে হইল এখানে অনেক লোক আসিয়া থাকে নতুবা এতগুলি পাণ্ডার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কিরূপে হয়? মুল মন্দিরের গায়ে আর একটি মূর্ত্তি ছিল। আমরা এখানে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির ছবি দিলাম।

পাণ্ডাদিগকে নিরাশ করিয়া আমরা সিরাথু গ্রামে হনুমানদাসের আশ্রমে আসিলাম। সেদিন সিরাথুর বাজার ছিল। বাজারে লোক জমিয়াছিল। তরিতরকারী খুব সস্তা। হনুমানদাস বাবাজীর আশ্রমটি রাস্তার উপর অতি সুন্দর। তাঁহার আমরুত (পেয়ারা) বাগানের গাছগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফল ফলিয়াছিল। ছবি দেখিবার আমার যেমন উৎসাহ জন্মিয়াছিল তেমনি পাকা পাকা পেয়ারাগুলি দেখিয়া আমাদের বাবাজীর আশ্রমের উপর একটা মায়া জন্মিয়া গেল। আমরা আশ্রমের বারান্দায় যাইবামাত্র বাবাজী পরম আগ্রহের সহিত বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমরা হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া আরামে উপবেশন

মালিক আহ্সানের সমাধি—চূণকাম করা দেওয়ালের নিকট

করিয়া ছবির কথা বলিলাম। এ-সময় ক্ষিতীশবাবু যে-কাজটি করিলেন তাহা আপনারা অনুমোদন করিবেন কিনা জানি না! তিনি বারান্দা-সংলগ্ন পেয়ারা গাছটি হইতে একটা পাকা পেয়ারা মুখে ফেলিয়া দিয়া পরমানন্দে বলিলেন—'বাবাজীর আমরুত বড় মিষ্টি।' বাবাজী বলিলেন—'বেশ ত আপনাদের যত ইচ্ছা আমরুত খাইবেন।' তিনি অমনি

মালীকে ডাকিয়া ভাল ভাল আমরুত পাড়িয়া আনিতে বলিলেন। আমাদের আশ্রমের প্রতি অনুরাগ আরও একটু বেশী বাড়িয়া গেল। সকলে মনের আনন্দে ইচ্ছানুরূপ পেয়ারা খাইতে লাগিলাম। হনুমানদাস বাবাজী হাসিতে লাগিলেন।

আমরা তাঁহার সযত্নে রক্ষিত ছবিগুলি যখন দেখিতে আরম্ভ করিলাম তখন সকলেরই মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। ভারতীয় চিত্রশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন এই চিত্রগুলি। পৌরাণিক কাল্পনিক ও ঐতিহাসিক এই চিত্রগুলি দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম। মাতা যশোদার কোলে শিশু কৃষ্ণের যে সুন্দর ছবিখানা দেখিলাম তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে এমন চিত্র বর্ত্তমান যুগের দক্ষ শিল্পীদের হাতেও ফুটিয়া উঠে নাই। একে একে আমরা পঁয়ত্রিশখানি ছবি দেখিলাম। আমরা ইহা ছাপাইবার জন্য চাহিলাম, কিন্তু ঐ এক কথা—কখনও দিব না। আমি অনেক মিনতি করিয়া 'বাবা নানক ও মর্দ্দানার' একখানা ছবির প্রতিলিপি লইয়াছিলাম। হনুমানদাস বলিলেন যে, আমার অনেকগুলি ছবি চুরি গিয়াছে। ক্ষিতীশ বাবু বলিলেন—বড়ই আপশোষের কথা, কি ভাবে চুরি গেল, বলুন ত? বাবাজী এ-কথায় আর কোনও উত্তর দিলেন না। আমরা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও ছবিগুলির পরিচয় কিংবা প্রতিলিপি গ্রহণ করিবার অনুমতি পাইলাম না। শিল্পী শ্রীমান সুধীনের করুণ মিনতিতেও কোন ফল হইল না।

আশ্রমের বিপরীত দিকের আমবাগানে বসিয়া আমরা জলযোগ করিলাম এবং যিনি এইরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাঁহাকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম।

এলাহাবাদ ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। নলিনী বাবু মধ্যে মধ্যে তাঁহার পেট্রোলের বিলের কথা তুলিতেছিলেন, সে ভয় আমাদের ছিল না, বোধ হয় ক্ষিতীশ বাবুকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছিলেন—জানি না এতদিনে বিলটি তাঁহার কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে কি না!*

* এই প্রবন্ধের ছবিগুলির জন্য আমরা এলাহাবাদ যাদুঘরের অধ্যক্ষ মিঃ ভিয়াস্, শ্রীমান সুধীন সাহা এবং শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর নিকট ঋণ-স্বীকার করিতেছি।

প্রবাসী বাঙালীর বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে দুই-একটি কথা

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়, রাঁচি

১

প্রবাসী বাঙালীর বর্ত্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করা, এবং নৃতত্ত্ব এই সমস্যার সমাধানে কিরূপ সাহায্য প্রদান করিতে পারে সেই সম্বন্ধে দুই-একটি কথার অবতারণা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনেক দিনের কথা নহে—পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের সর্ব্বত্র প্রবাসী বাঙালী সমাদৃত হইতেন, এমন কি কোনও কোনও স্থলে চরিত্র-প্রভাবে পূজিত হইতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু অধুনা সাধারণ প্রবাসী বাঙালীর আর সে সুদিন নাই। তাঁহাদের অনেকেই আজ স্বদেশে অপরিচিত এবং প্রবাসে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত।

সাধারণের ধারণা এই যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আন্তর্প্রাদেশিক ঈর্ষ্যাই আমাদের এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের একমাত্র বা অন্ততঃ প্রধান কারণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একথা আংশিকভাবে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। ধীরভাবে আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের স্বকৃত অপরাধ, ত্রুটি ও অনবধানতাও এজন্য আংশিকভাবে দায়ী।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যথাযথ চেষ্টা করিলে বঙ্গজননীর

কৃতী সন্তানদের সম্মিলিত প্রযত্নে এখনও আমরা প্রবাসে আমাদের জাতীয় মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। তবে তাহা আর সম্পূর্ণ পুরাতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পুরাতন ভিত্তির আংশিক সংস্কারেরও প্রয়োজন হইবে। এ-সম্বন্ধে দুই-একটি সাধারণ উপায় দিগ্দর্শন উদ্দেশ্যে যে-ভাবে আমি চিন্তা করিয়াছি তাহা নিবেদন করিতেছি।

প্রবাসে আমাদের জাতীয় মর্য্যাদা যথাসম্ভব পুনঃস্থাপিত করিতে হইলে দেখিতে হইবে—প্রথমতঃ, তাহার ভিত্তি কি কি উপাদানে গঠিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, তাহার মধ্যে কোন্ উপাদান সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহার কারণ কি; তৃতীয়তঃ, তন্মধ্যে কোন্ লুপ্ত উপাদানের পুনরুদ্ধার এখনও সম্ভবপর; এবং চতুর্থতঃ, যে বিনষ্ট উপাদানের পুনরুদ্ধার অসম্ভব তাহার অভাব অন্য কোন উপায়ে পূরণ করা যাইতে পারে কি না।

প্রবাসী বাঙালীর পূর্ব্বগৌরবের ভিত্তির প্রধানতঃ পাঁচটি উপাদান ছিল। প্রথমতঃ, তাঁহাদের উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের অনেকের রাজকীয় উচ্চপদ অধিকার, এবং ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীরূপে ও অন্যান্য কার্য্য-পরিচালনায় সবিশেষ কৃতিত্ব-প্রদর্শন ও প্রতিপত্তিলাভ। তৃতীয়তঃ, প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি। চতুর্থতঃ, বাঙালী নেতাদের স্ব স্ব প্রবাসভূমির স্থানীয় প্রাকৃত জনসাধারণের শুভকামনা ও লোকহিতকর অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও ঐকান্তিকী প্রচেষ্টা। পঞ্চমতঃ, প্রবাসী বাঙালীদের অনেকের চরিত্রবল, ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতা।

এইরূপে জাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে ও প্রবাসী প্রখ্যাতনামা বাঙালী নেতাদের সাধনা ও চরিত্রবলে বাঙালীর যে জাতীয় গৌরব প্রবাসেও গড়িয়া উঠিয়াছিল অনেকে আশঙ্কা করেন তাহা বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু যদিও তাহা সম্প্রতি কিছু ম্লান হইবার লক্ষণ দেখা যায়, আমার বিশ্বাস যে, এই ম্লানিমা সাময়িক অবস্থা মাত্র। চেষ্টা করিলে আমাদের আপাততঃ-নিষ্প্রভ জাতীয় গৌরব পুনরায় দীপ্যমান হইতে পারিবে।

আক্ষেপের বিষয়, আমাদের অনবধানতাবশতঃ অনেক দিন হইতে তাহার ভিত্তির এক অংশ অলক্ষ্যে কীটদষ্ট হইতেছিল। কৃতকর্ম্মা প্রবাসী বাঙালী নেতৃগণের কীর্ত্তি ও বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির অভিমান কিয়ৎপরিমাণে সাধারণ প্রবাসী বাঙ্গালীকে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছিল এ-কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না।

প্রবাসী বাঙালীদের নেতারা স্থানীয় অধিবাসীদের শুভকামনা করিয়া আসিতেছেন সত্য, কিন্তু সাধারণ প্রবাসী বাঙালীর মধ্যে অনেকে পরিহাসচ্ছলে অথবা অনবধানতা-প্রযুক্ত সময়ে সময়ে 'ছাতুখোর', 'মেড়া' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগ করায় স্থানীয় লোকেরা অন্তরে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হইতেন। যত দিন বিহারী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া প্রভৃতি অপরাপর জাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় বাঙালীর সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, তত দিন এই অবজ্ঞা ও কল্পিতলাঞ্ছনা অগ্রাহ্য অথবা নীরবে সহ্য করিতেন এবং প্রবাসী বাঙালী যে আপন যোগ্যতাবলে উচ্চপদ অধিকার করিতেন তদ্দ্বারা তদ্দেশের অযথা 'শোষণ' (exploitation) করা হইতেছে এরূপ মনে করিয়া প্রচ্ছন্ন ঈর্ষ্যা অন্তরে পোষণ করিতেন। কিন্তু ক্রমে যখন ইংরেজী উচ্চশিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের কেহ কেহ যোগ্যতায় বাঙালীর প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব প্রদেশে উচ্চরাজকার্য্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনে সমর্থ হইলেন তখন অতীতের পুঞ্জীভূত অবজ্ঞা ও কল্পিত লাঞ্ছনার স্মৃতি কল্পনাসাহায্যে অতিরঞ্জিত হইয়া তাঁহাদের অনেকের মধ্যে বাঙালী-বিদ্বেষে পরিণত হইল। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোন কোন বিষয়ে প্রবাসী বাঙালীদিগকে নির্যাতন বা অন্ততঃ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব (racial discrimination) প্রসূত অন্যায় ব্যবহার সহ্য করিতে হইতেছে। ইহাতে অনুযোগ করিবার বিশেষ কারণ আমাদের নাই। কালের বিধানে এইরূপ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর যে অন্যায় ব্যবহারে আমরা বর্ত্তমানে ক্লিষ্ট তাহার জন্য আমরাও আংশিকভাবে দায়ী এ-কথা অস্বীকার করা যায় না।

অধুনা প্রবাসী বাঙালীর পূর্ব্বগৌরবের উপরিউক্ত উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি আংশিকভাবে বিনষ্ট

বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রায় দেড় শত বৎসর হইল ব্রিটিশরাজের প্রথম রাজধানী কলিকাতায় অবস্থানের জন্য পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে প্রেরণা, উৎসাহ ও সুবিধালাভ করিয়া বাঙালী ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রণী হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে সে সুবিধা ও সুযোগ ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। জাতীয় সংস্কৃতিতে এবং নূতন সংস্কৃতি নিজস্ব করিয়া লইবার ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যে বাঙালী জাতির স্থান অতি উচ্চে হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ উচ্চশিক্ষায় ভারতের অন্যান্য প্রধান জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নতির দাবি বাঙালী আর বেশী দিন করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কার্য্যদক্ষতা ও কৃতিত্ব হিসাবে প্রবাসী বাঙালীর উচ্চতর স্থান চিরস্থায়ী থাকিবে কিনা বলা সন্দেহ। অবশ্য প্রতিভা ও সবিশেষ যোগ্যতার বলে কতিপয় বাঙালী স্ব স্ব প্রবাসভূমিতে এখনও আইন, চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যবসায়ে এবং স্বাধীন কার্য্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছেন ও ভবিষ্যতেও করিবেন এইরূপ আশা করা যায়।

কিন্তু অল্পসংখ্যক প্রবাসী বাঙালীর ভাগ্যেই ভবিষ্যতে রাজকীয় উচ্চপদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। অতএব, দেখা যাইতেছে যে প্রবাসী বাঙালীর পূর্ব্বগৌরবের ভিত্তির উপাদানগুলির মধ্যে ইংরেজী উচ্চশিক্ষায়, ক্ষমতায় ও রাজকীয় পদগৌরবে প্রাধান্য ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে ও হইবে। বর্ত্তমানে প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে সদুপায়ে ও সসম্মানে ধনার্জ্জনের নূতন স্বাধীন পন্থা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বাঙালীর স্বাভাবিক কর্ম্মনিষ্ঠা ও সাধুতাদ্বারা উপার্জ্জনের পন্থাগুলি সম্মানার্হ করিয়া রাখিতে হইবে; এবং আমার বিশ্বাস যে বাঙালী আপন বৈশিষ্ট্যে প্রবাসে নিজ জাতীয় মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিবার জন্য নূতন নূতন ক্ষেত্র উদ্ভাবন করিতে পারিবেন।

এইরূপে পূর্ব্বগৌরবের ভিত্তির সংস্কার করিতে পারিলে বাঙালীর জাতীয় উচ্চসংস্কৃতির গৌরব প্রবাসেও অব্যাহত থাকিবে আশা করা যায়।

প্রবাসী বাঙালীর পূর্ব্বগৌরবের ভিত্তির তৃতীয় উপাদান নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি। কিছু দিন হইতে ইহা অনেক স্থলে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে বা পড়িতেছে এরূপ দেখা যায়। আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক ও অন্যান্য প্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের দিনে ঐক্য ও সংহতি আরও দৃঢ়তর হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন এ-কথা বলা বাহুল্য। প্রবাসী বাঙালী-সমাজকে পুনরায় দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানের বাঙালী-সমাজের নেতৃগণকে পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যথাযথ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রবাসে আমাদের পূর্ব্বগৌরবের ভিত্তির চতুর্থ উপাদান স্ব স্ব প্রবাসের প্রাক্তন জনসাধারণের সহিত প্রবাসী বাঙালীদের সদ্ভাব ও তাহাদের হিতকল্পে প্রবাসী বাঙালী নেতাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা। যদিও প্রবাসী বাঙালী নেতাদের স্থানীয় জনসাধারণের শুভকামনা ও লোকহিতকর অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ ঐকান্তিকী প্রচেষ্টার হ্রাস হয় নাই তথাপি সাধারণ প্রবাসী বাঙালীর মধ্যে কাহারও কাহারও মনে প্রাক্তন অধিবাসীদের প্রতি শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির হ্রাস হইতেছে এরূপ লক্ষণ দেখা যায়। ইহা বস্তুতঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। প্রবাসী বাঙালীদের কাহারও মনে যদি কোনও প্রকার আন্তর্প্রাদেশিক অসদ্ভাব বা ঈর্ষার উন্মেষ হইয়া থাকে, সমস্ত আনুপূর্ব্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট করা প্রয়োজন। প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বাঙালী জাতির উদার স্বভাবের বিরুদ্ধ। জাত্যভিমানপ্রসূত ঔদ্ধত্য পরিহার করা ও নিজ প্রেমদ্বারা অপরের দ্বেষভাব বিনষ্ট করা শ্রীচৈতন্যদেবের স্বজাতীয় বাঙালীরই পক্ষে সমীচীন।

আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার অবনতি নিবারণের জন্য নূতন উপায় উদ্ভাবনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এইরূপে বাঙালীর পূর্ব্বগৌরবের ভিত্তির সংস্কার করিতে পারিলে বাঙালীর জাতীয় উচ্চসংস্কৃতির গৌরব প্রবাসেও অব্যাহত থাকিবে আশা করা যায়।

আর এখন আমাদের পূর্ব্বগৌরবের ভিত্তির অবশিষ্ট উপাদান দুইটির অর্থাৎ চরিত্রের উৎকর্ষের এবং পরহিতব্রতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। প্রবাসী বাঙালীর পূর্ব্বনেতারা চরিত্রের যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে-আদর্শ সাধারণতঃ প্রবাসী বাঙালী

এ-পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, সম্ভব হইলে তাহা আরও উজ্জ্বলতর করিতে হইবে।

প্রবাসের জনসাধারণের শুভকামনা করা ও তাহাদের হিতকল্পে পূর্ব্বনেতৃগণের প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানগুলির শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করা এবং তদুদ্দেশ্যে অধিকতর ফলপ্রদ উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

এতাবৎকাল প্রবাসী নেতারাই সাধারণতঃ এই পরহিতব্রতে মনোযোগ দিতেন; সাধারণ প্রবাসী বাঙালী এ-সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিতেন না বা করিবার অবসর পাইতেন না। কিন্তু আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত প্রবাসী বাঙালী মাত্রেরই সুবিধা ও অবসর করিয়া লইয়া এই সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ কর্ম্মীর সংখ্যা এবং কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি করিতে পারিলে প্রচুর সুফলপ্রাপ্তির আশা করা যায়।

স্থানীয় লোকদের সহিত সদ্ভাব বৃদ্ধির নূতন উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছি। কিরূপ নূতন বা অতিরিক্ত উপায় অবলম্বন করিলে সুফল ফলিতে পারে তাহা বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন স্থানে পারিপার্শ্বিক এবং সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তত্রত্য বাঙ্গালী সমাজের নেতৃগণকে নির্ণয় করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে দুই-একটি সাধারণ উপায় যাহা আমার মনে হয় তাহা নিবেদন করিতেছি।

বলা বাহুল্য, প্রবাসী ও স্থানীয় উভয় সমাজের সমভাব-ও-চিন্তা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মিলন ও সহযোগিতা পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধির অন্যতম প্রশস্ত উপায়। এই প্রসঙ্গে দুই প্রকার সহযোগিতার কথা সকলেরই মনে হইবে। প্রথমতঃ, উভয় সমাজের লোকসেবকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতিনির্ব্বিশেষে লোকসেবার উপায় উদ্ভাবন ও কর্ম্ম পরিচালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে স্বতঃই একত্ববোধ প্রবুদ্ধ ও দৃঢ়ীভূত হয়। দ্বিতীয়তঃ, উভয় সমাজের সাহিত্যসেবীদের সম্মিলিত সংসদ এই উদ্দেশ্যে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সুকুমারকলা-সেবীদের একত্র সম্মিলনে প্রাদেশিক ভেদ বা জাতিভেদ জ্ঞান অন্তর্হিত হয়, এই সত্যের উপলব্ধি আমাদের সকলেরই আছে। এই জন্য উভয় সমাজের সাহিত্যসেবিগণ সম্মিলিত হইয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা ও তত্ত্বানুসন্ধানে পরস্পরের সহায়তা ও সহযোগিতা করা উভয় সমাজের মধ্যে সদ্ভাববৃদ্ধির একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বিশেষতঃ, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও জাতীয় ইতিহাসের অনুশীলন এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অতীব উপযোগী। ইহাতে কেবল যে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে তাহা নহে, পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতি হইতে পরস্পরের দান ও প্রতিদানে প্রবাসী বাঙালী সমাজ ও প্রাক্তন অধিবাসী সমাজ উভয়ই উপকৃত ও সমৃদ্ধ হইবেন। ব্যায়াম প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও দুই সমাজের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উন্নতির চেষ্টা, সৌহার্দ্দ্যবৃদ্ধি ও ঐক্যস্থাপনের সহায়তা করিতে পারে।

আন্তঃপ্রাদেশিক সদ্ভাব বৃদ্ধির পক্ষেও বৃহত্তর বঙ্গের মধ্য দিয়া বৃহত্তর ভারত গঠনের পক্ষে **নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ও জাতীয় ইতিহাসের তত্ত্বানুসন্ধান** কিরূপে সাহায্য প্রদান করিতে পারে সেই সম্বন্ধে দুই-এক কথা নিবেদন করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

দুইটি পরিবারের মধ্যে কুটুম্বিতা বা বিশেষ আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হইলে, পরস্পরের কুলশীল ও পারিবারিক ইতিহাস অনুসন্ধান করার রীতি আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই নিয়ম পালন যে পরম কল্যাণকর ইহা আমরা স্ব স্ব পারিবারিক অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিয়া থাকি। দুইটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে এই নিয়ম যেমন প্রযোজ্য, দুইটি সমাজের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে তাহা সমভাবে প্রযোজ্য, ও অতীব শুভফলপ্রদ হইবার কথা।

প্রবাসী বাঙালী যদি স্থানীয় প্রাক্তন অধিবাসীদের সমাজের কুলপঞ্জী বা জাতীয় ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব, জাতীয় চরিত্র ও প্রকৃতি, রীতি-নীতি, সংস্কার, ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার ও জীবনের ও সমাজের আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে পরস্পরের সৌহার্দ্দ্যের পথ সুগম হইতে পারে। প্রাদেশিক সমাজতত্ত্ব ও জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করিয়া স্থানীয় সমাজের সহিত বাঙালী সমাজের কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐক্য বা সাদৃশ্য আছে ও কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিলে মিলনের পথ সহজ হয়। সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের সাহায্যে দুই সমাজের সংস্কৃতির মূলগত সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করিয়া তাহার উপর একতার ভিত্তিগঠন আয়াসসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

অবশ্য এইরূপ অনুশীলন বা গবেষণা করিবার সুযোগ বা অবসর সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানে আগ্রহান্বিত ও সমর্থ তাঁহারা ইহার অনুশীলন করিলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইতে পারে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক সমাজের নেতৃবর্গের মধ্যে অন্ততঃ কতিপয় উদারচেতা ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদেরই সম্মিলিত চেষ্টা ও প্রযত্নে উভয় সমাজ একত্বের অভিমুখে চালিত হইতে পারে। তাঁহারা যদি সংসদে সম্মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ণ জাতিগত স্বার্থ অপেক্ষা সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উভয় সমাজের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেন তাহা হইলে উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হইবে। উভয় সমাজের এই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সেবীদের সিদ্ধান্তগুলি নেতাদিগকে পথনির্দ্দেশ করিতে পারিবে।

স্থানীয় সমাজের ও সংস্কৃতির সহিত প্রবাসী বাঙালী সমাজের কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐক্য ও কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া বৈশিষ্ট্যের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য করিয়া এবং ঐক্যে গুরুত্ব আরোপ করিয়া দুই সমাজের ভিত্তি দৃঢ় করিবার উপায় স্থির করিতে হইবে। নৃতত্ত্ব ও জাতীয় ইতিহাস আলোচনার ফলে আন্তর্প্রাদেশিক ও আন্তর্জ্জাতিক মিলনের পক্ষে আমাদের যে জাত্যভিমান-রূপ অন্তরায়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহার অপসারণ ও পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। কারণ নৃতত্ত্ব অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে।

২

নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে ভারতে ধারাবাহিকভাবে যে জাতিগুলি বসবাস করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন ছিল সম্ভবতঃ একটি মৃগয়াজীবী, কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বকায়, অধুনা-বিলুপ্ত নিগ্রিটো বা নিগ্রোপ্রায় জাতি। তৎপরে আসে কৃষিকার্য্য ও গ্রাম্য সভ্যতার প্রবর্ত্তক সঙ্ঘবদ্ধ মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি 'কোল' জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা। ইহারা সম্ভবতঃ ককেশীয় জাতির একটি নিম্নতর শাখা। তদনন্তর ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমিতে উদ্ভূত লম্বাটে মস্তকবিশিষ্ট (dolichocephalic) ভূমধ্যসাগরোপকূলস্থ (Mediterranean) জাতির দ্রাবিড়ী বা 'অসুর' শাখা এদেশে আগমন করে। তাহারাই সম্ভবতঃ এদেশে প্রথমে ধাতুদ্রব্য নির্ম্মাণ ও ব্যবহার, কৃত্রিম জলসেচন দ্বারা কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সাধন এবং নাগরিক সভ্যতা প্রবর্ত্তন করে। তাহাদের অনেক পরে আল্পস্ ও তৎসংলগ্ন পর্ব্বতমালার সানুদেশে উদ্ভূত আল্পাইন (Alpine) জাতির একটি শাখা সম্ভবতঃ পামীর গিরিবর্ত্ম হইয়া এখানে আগমন করে। ইহাদেরই মিশ্র বংশধর বর্ত্তমান বাঙালী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয়, কুর্গী ও আরও দুই-একটি অল্লাধিক গোলাকৃতি মস্তকবিশিষ্ট (Brachycephalic) জাতি। লম্বাটে মস্তকযুক্ত আর্য্যজাতি ও অল্লাধিক গোল মস্তকযুক্ত ভোটচীন (Tibeto-Chinese) মোঙ্গোলীয় জাতি আল্পাইন জাতির অনেক পরে ভারতে আগমন করে।

বাঙালীদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন, তখন এই দেশ প্রধানতঃ 'কোল' জাতিদের আবাসভূমি ছিল, আর এখানে দ্রাবিড়ভাষী 'অসুর'-বংশীয় কতক লোকেরও বসতি ছিল এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। নবাগত আলপাইন জাতির সহিত এই আদিম নিবাসী কোল ও দ্রাবিড়ীদের অল্লাধিক সংমিশ্রণে যে জাতির উদ্ভব হয় তাহার উচ্চশ্রেণীগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে 'আর্য্য'-শোণিতের সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির উৎপত্তি, আধুনিক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেকেই এইরূপ অনুমান করেন।

যদিও রিস্‌লির কল্পিত মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে বাঙালীর উৎপত্তির ('Mongolo-Dravidian origin of the Bengalis') মত ভ্রমাত্মক বলিয়া এখন সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তথাপি বাংলা দেশের আসাম-সীমান্ত-বাসী বাঙালীদের মধ্যে কোনও কোনও স্থলে মোঙ্গোলীয় শোণিতের অতি সামান্য সংমিশ্রণের আভাস দৃষ্ট হয়।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে শ্বেতাভ আলপাইন জাতির সহিত কৃষ্ণবর্ণ "কোলমুণ্ডা" ও ধূসর বা পাণ্ডুবর্ণ

বা ঈষৎ কৃষ্ণাভ দ্রাবিড়ী ও শ্বেতাভ 'আর্য্য' জাতির টানা-পড়েনে বাঙালী জাতি গঠিত এবং স্থলবিশেষে পীতাভ মোঙ্গোলীয়ান্ রঙের ছিটাফোঁটায় ঈষৎ রঞ্জিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালীর সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ দ্রাবিড়ী ও মুণ্ডা বা কোল জাতির সহিত কোনও অংশে কম নহে।

জাতিতত্ত্ব ছাড়িয়া সমাজতত্ত্ব ও সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে সভ্যতা সম্বন্ধেও বাঙালীর ঋণ কেবল আর্য্যজাতির নিকটে নহে, মুণ্ডা বা কোল এবং দ্রাবিড় উভয়ের নিকটেই অল্পবিস্তর আছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এবং নৃতত্ত্বের গবেষণা দ্বারা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

সকলেই অবগত আছেন যে সভ্যতার প্রাচীনত্ব হিসাবে বাঙালী ভারতের পুরাকালের প্রধান জাতিদের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ। মহাভারতে বাসুদেব, চন্দ্রসেন প্রভৃতি বঙ্গদেশের রাজগণের উল্লেখ থাকিলেও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাঙালী প্রজাপুঞ্জ কর্ত্তৃক গোপালদেবকে প্রথম রাজারূপে নির্ব্বাচন দ্বারা পালরাজবংশ স্থাপনার পূর্ব্বে বাংলা দেশে খাঁটি বাঙালীর সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ষষ্ঠ শতাব্দীর যে বঙ্গরাজ আদিশূরের উল্লেখ আছে তাঁহারও অস্তিত্ব ঐতিহাসিকেরা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন না। কেবল, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হঠাৎ শশাঙ্কের আকস্মিক আবির্ভাবে গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ও তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজ্যও বিলুপ্ত হয় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু শশাঙ্ক বাঙালী ছিলেন কি না ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তার পর অষ্টম শতাব্দীতে বাংলা দেশের প্রজাগণ গুর্জ্জর, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি জাতির আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য ও দেশের অরাজকতা নিবারণ করিবার জন্য যে পালবংশের আদিপুরুষ গোপালদেবকে বঙ্গসম্রাট মনোনীত করেন, তিনিও খাঁটি বাঙালী ছিলেন কি না তাহাও অনিশ্চিত। তবে এই রাজ-নির্ব্বাচন বাঙালীদের প্রবল প্রজাশক্তির পরিচয়, এবং এই প্রজাশক্তিই বাঙালী জাতির একটি বৈশিষ্ট্য। তৎপরে একাদশ শতাব্দীতে যে সেন-বংশীয় রাজাদের আদিপুরুষ সামন্ত সেন পালবংশকে মগধে বিতাড়িত করিয়া বঙ্গ অধিকার করেন, তিনি "কর্ণাটক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচিত এবং সম্ভবতঃ চালুক্যদের বঙ্গদেশে অভিযান উপলক্ষে আগত কর্ণাট-দেশীয় যে কয়েকটি সামন্ত পরিবার বঙ্গে বসবাস করেন ও পরে খণ্ডরাজ্য স্থাপন করেন তাঁহাদেরই একটি বংশ হইতে সেনবংশ উদ্ভূত।

অপর পক্ষে কলিঙ্গ, অন্ধ্র, চের বা কেরল, চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র প্রভৃতি দ্রাবিড়ী রাজবংশগুলি বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রবলপ্রতাপান্বিত ছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজ সুশর্ম্মা মগধের কণ্ববংশীয় শেষ সম্রাটকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন। ঐ শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজ সাতকর্ণী শক, যবন ও পল্লব প্রভৃতি জাতিকে যুদ্ধে পরাভূত করেন, এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে কলিঙ্গরাজ খরবেল একাধিক বার মগধদেশ আক্রমণ করেন এবং মগধ-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। ঐ শতাব্দীতে দ্রাবিড়ী ভারশিব রাজবংশ সবিশেষ প্রতাপশালী হন, এবং জনৈক খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের (কাশীপ্রসাদ জয়সয়ালের) মতে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করেন। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে পল্লব ও চালুক্যেরা রাজশক্তিতে প্রবল হইয়া উঠেন।

এইরূপে দেখা যায় যে বাঙালী সাম্রাজ্যিক সভ্যতায় ভারতের অন্যান্য প্রধান জাতিদের অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিলেন।

আবার, ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়াও দেখা যায় যে এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। অপর পক্ষে, খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দ হইতেই দ্রাবিড়ী তামিল ভাষায় সাহিত্যের অনুশীলন হইত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তামিল সাহিত্য উন্নতির এরূপ উচ্চশিখরে আরূঢ় ছিল যে এমন কি তাহাদের "সঙ্গম" বা কবিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক উচ্চ অঙ্গের রচনা বলিয়া অনুমোদিত না হইলে কোনও কবিতা প্রকাশিত হইতে পারিত না। বাঙালীদের পূর্ব্বেই অন্ধ্র, পল্লব, চালুক্য প্রভৃতি দ্রাবিড় জাতি স্থপতিবিদ্যা ও ভাস্কর্য্যেরও উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল। ভারতের বাহিরে উপনিবেশ স্থাপন ও হিন্দু সভ্যতা বিস্তার কার্য্যে যদিও বাঙালী জাতির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তবু সেই ক্ষেত্রেও দ্রাবিড়ীরা বাঙালীর

বহু পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছিল ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

যাহা হউক, বাঙালী জাতি সভ্যতায় দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির বয়োকনিষ্ঠ হইলেও অধুনা সংস্কৃতিতে গরিষ্ঠ। বাংলা দেশ ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত থাকায় বহুকাল আর্য্যসভ্যতার কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দেশ আর্য্যদের পরিহার্য্য ও পরিত্যক্ত ছিল এবং বাঙালীরা গ্রীক্, সিরিয়ান্, পারথিয়ন্ বা অন্য কোনও তদানীন্তন সভ্যতর জাতির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও আসেন নাই। জাতীয় প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন; অন্যান্য জাতির সংস্পর্শেই শিক্ষার বৃদ্ধি হয় এবং তাহা দ্বারাই সংস্কৃতির সৃষ্টি ও উৎকর্ষসাধন হয়। যাহা হউক, ইত্যবসরে সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল যাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে পল্লীসমাজের মধ্য দিয়া বাঙালীর নিজস্ব স্বতন্ত্র সভ্যতার ভিত্তি গঠিত হইতেছিল। পরে যখন বৌদ্ধ প্রচারকগণ বঙ্গে আগমন করিলেন তখন হইতেই বাঙ্গালীর সংস্কৃতি যথেষ্ট অনুরূপ উপাদান পাইয়া পরিপুষ্টিলাভ করিতে লাগিল এবং আর্য্য-সভ্যতার সংস্পর্শে নব নব উপাদান সমাহরণ ও সমীকরণ করিয়া বাঙালী জাতি নব উদ্যমে সভ্যতার সোপানে ক্ষিপ্রপদে আরোহণ করিলেন এবং কালক্রমে ভারতের অন্যান্য পূর্ব্বজ জাতিদিগকে অতিক্রম করিয়া ফেলিলেন। যদিও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় বাঙালী জাতি আর্য্য, দ্রাবিড়, শক, যবন ও হূণ প্রভৃতির ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই, তবু বাঙালী জাতি কালে একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে-ছিলেন। "গৌড়ী" নামক স্বতন্ত্র প্রাকৃত ভাষার এবং কাব্যরচনার "গৌড়ীয় রীতি"র উল্লেখ দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শ' নামক পুস্তকে করিয়াছেন। নালন্দার ও তক্ষশীলার দুইটি খ্যাতনামা অধ্যাপক শীলভদ্র ও অতীশ দীপঙ্কর জাতিতে বাঙালী ছিলেন বলিয়া খ্যাত। দীপঙ্কর (৯৮০-১০৫৩ খ্রীঃ) তিব্বতদেশের রাজা কর্ত্তৃক সনির্ব্বন্ধে আহূত হইয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার-কার্য্যে শেষজীবন অতিবাহিত করেন।

সভ্যতার নূতন উপাদান আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা বাঙালী জাতির সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য; সেজন্য কালে বাঙালী পণ্ডিতেরা ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতার জন্য ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও 'আর্য্য' সভ্যতাকে নিজভাবে গ্রহণ করিয়া বঙ্গে ও বঙ্গেতর দেশে সভ্যতা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের নব্য ন্যায়ের কেন্দ্র বাঙালীর সমাহৃত সংস্কৃতির উপাদানকে নিজরূপ দানেরই পরিচায়ক। গৌড়-মগধ-রীতির ভাস্কর্য্য, যাহা বরেন্দ্রভূমিতে সাতিশয় উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, তাহাতেও বাঙালীর সমীকরণশীলতা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও সমীকরণ ও আয়ত্ত করিবার ক্ষমতায় বাঙালী ভারতে অগ্রণী, এবং বাংলার বাহিরেও পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিস্তারে তাঁহারাই অগ্রদূত।

প্রাচীন বাংলা দেশে সাম্রাজ্যিক সভ্যতার বিশেষ বিকাশ না হইবার এক কারণ সম্ভবতঃ বাঙালী জাতির গণতান্ত্রিকতা। যদিও বর্ত্তমান যুগে অনেক স্থলে বাঙালীদের পরস্পরের মধ্যে মিলনের অভাব ও গণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধ ভাব লক্ষিত হয়, তথাপি স্বরূপতঃ বাঙালী চিরকালই সাম্যবাদী ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বৌদ্ধ সভ্যতার সহিত এই সমস্ত বিষয়ে সাদৃশ্য থাকাতেই বোধ হয় এককালে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সম্যক্ বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

সে যাহাই হউক, ভারতের বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিলে আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব দেখিতে পাই। আর্য্যগণের প্রতিভাবলে যে সর্ব্ব-সংস্কৃতি-সমন্বয়-কারী হিন্দু সভ্যতা ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছে ও এক বিরাট একতায় সংযুক্ত রাখিয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্যত্র নাই। এখন ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দু সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে অর্দ্ধেক বা ততোধিক অংশ একই অখণ্ড ভারতীয় সভ্যতা; অবশিষ্টাংশের কিয়দংশ ভারতীয়ত্বের প্রাদেশিক রূপান্তর মাত্র; অপর অবশিষ্টাংশের এক ভাগ অন্যান্য জাতির দান ও কেবল সামান্য উদ্বৃত্ত অংশই স্ব স্ব অবিমিশ্র জাতীয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতির এই জাতীয় উপাদানগুলিতেই প্রত্যেক জাতির আপন আপন বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়,—যেমন তামিল জাতির কর্ম্মপটুতা ও বাস্তবিকতার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি; তেলুগুর ভাবপ্রবণতা; ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী মহারাষ্ট্রজাতির কর্ম্ম-পরায়ণতা, অসাধারণ দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার তীব্র

আকাঙ্ক্ষা ; বৈশ্যধর্ম্মী গুজরাটির ব্যবসায়বুদ্ধি ; বিপ্রধর্ম্মী বাঙালীর কল্পনাশক্তি, আদর্শপ্রবণতা, আধ্যাত্মিকতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপ্রিয়তা, পল্লীসভ্যতা ও স্বভাবপ্রীতি। জাতীয় সংস্কৃতির এই সমস্ত মৌলিক উপাদানের ও আদর্শের প্রতিচ্ছবি প্রত্যেক জাতির সমগ্র সভ্যতাকে রঞ্জিত করে। বাস্তব সভ্যতার (material cultureএর) প্রভেদ সাধারণতঃ ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য দ্বারা অনেকটা নিয়মিত হয়।

নৃতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশের পরস্পরের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক যোগ এবং জাতিগত সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রদেশিক সঙ্কীর্ণতার ও ঔদ্ধত্যের প্রতিষেধক। এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা এক পক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের সভ্যতার সাধারণ ভিত্তির পরিচয়ে, অপর পক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বিষয়-বিশেষে উৎকর্ষের পরিচয়ে, ভারতের বিভিন্ন জাতি পরস্পর লাভবান্ হইবে ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে এবং জাত্যভিমানপ্রসূত ঔদ্ধত্য দূরীভূত হইবে। জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনত্ব সম্বন্ধে সাধারণ সংস্কার ভ্রমাত্মক।

আভিজাত্য অপেক্ষা কৃষ্টিই শ্রেয়ঃ। বাঙালীর দৃষ্টি চিরকালই কৃষ্টির উপর। গুণগ্রাহিতা, সমীকরণশীলতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপ্রিয়তা বাঙালীর সার্ব্বজনীন উদার ভাবের ভিত্তি। এই বৈশিষ্ট্য দ্বারাই বাঙালী ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অনুদারতা ও প্রাদেশিকতাসম্ভূত ঈর্ষা হিংসা প্রভৃতি দোষসমূহ দূরীকরণে সমর্থ।

ভারতের জাতীয়তা গঠনে বাঙালীর দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কারণ জাতীয়তার মূল উপাদান বাঙালী-চরিত্রে বর্ত্তমান। এখন যদি আমাদের মন অপর প্রদেশবাসিগণের দোষানুসন্ধানে ব্যাপৃত না থাকিয়া পরস্পরের কৃষ্টির ও ভাবধারার আলোচনা এবং এ-সম্বন্ধে শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহা হইলে বাঙালীর প্রভাব প্রবাসেও ক্ষুণ্ণ না হইয়া আরও মহীয়ান্ হইবে। আমাদের অর্থনৈতিক আত্মরক্ষার দিকে সজাগ ও সচেষ্ট থাকিয়াও ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। বাঙালী চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া জাতীয়তার উপাদানসমূহের যথাযথ গবেষণাদ্বারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে এক বিরাট জাতিতে পরিণত করিতে পারিবে,—আমার ন্যায় নৃতত্ত্বসেবীরা এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা অন্তরে পোষণ করেন।

নৃতত্ত্ব-জ্ঞান হইতেই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আসিবে, শ্রদ্ধা হইতেই প্রেম আসিবে ও প্রেম হইতেই সেবা আসিবে। তখন আন্তর্প্রাদেশিক হিংসা-বিদ্বেষ দূর হইয়া সার্ব্বজনীন ভারত-প্রেমে প্রবাসী ও স্থানীয় প্রাক্তন সমাজের মধ্যে ব্যবধান অন্তর্হিত হইবে। কবি-সার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "প্রবাসী" শীর্ষক কবিতায় গাহিয়াছেন :—

> "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
> দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া ;
> পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
> তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
> কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধান লব বুঝিয়া।
> ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে ফিরি আমি খুঁজিয়া।
> প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়,
> চিরজনমের ভিটাতে ;
> আপনার যারা আছে চারিভিতে,
> পারিনি তাদের আপন করিতে।
> যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই, ধূলারেও মানি আপনা ;
> ছোটোবড়োহীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা।"

সংস্কৃতিতে গরিষ্ঠ প্রবাসী বাঙালীর স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি দায়িত্ব—তাহাদের অন্তরে প্রবেশের সন্ধান বুঝিয়া তাহাদিগকে জানিয়া চিনিয়া আপন করিয়া লওয়া। বর্ত্তমানে স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রবাসী বাঙালীর প্রতি ঈর্ষ্যার ভাব দৃষ্ট হইলেও আমাদের পূর্ব্বতন মহাপুরুষ-গণের পথ অনুসরণ করাই জাতির ও দেশের কল্যাণকর হইবে।

> "মারবে বলে কলসীর কাণা,
> তাই বলে কি প্রেম দিব না ?"

—ইহা বাঙালী মহাপুরুষেরই প্রাণের উক্তি।

প্রেমভক্তির দিক্ ছাড়িয়া জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই জানিবার, চিনিবার ও আপন করিবার,—অন্য জাতির অন্তরে প্রবেশ করিবার,—একটি প্রশস্ত পথ, নৃতত্ত্বের অনুশীলন। নৃতত্ত্ব এই শিক্ষা দেয় যে, বাঙালী কেবল বাঙালীই নয়, ভারতীয়। সমগ্র ভারতই আমাদের "ভিটা"। নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বাঙালীর জাতীয় গৌরব সম্পূর্ণ

ভাবে রক্ষা করিয়াও ভারতের অন্যান্য জাতির সহিত একত্বের অনুভূতিদ্বারা বাঙালীকে পূর্ণভাবে ভারতবাসী হইতে হইবে। তাহা হইলেই,—

"এক সত্তাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব,
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করিবে ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
—এক পুণ্য ভারতের নামে।"*

* প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে কলিকাতার টাউন হলে পঠিত।

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

মমতাদের বাড়ি সকাল হইতেই আজ ধুম বাধিয়া গিয়াছে। মমতা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাই এত ঘটা। তাহার বন্ধুবান্ধব সকলকে খাওয়ানো হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু সকলেই আসিয়া জুটিবে। ইহাই বাঙালীর সংসারের নিয়ম। কাহাকেও বাদ দিয়া কাহাকেও ডাকিবার জো নাই। তাহা হইলেই মনকষাকষি বাধিয়া যায়, হাঙ্গামের অন্ত থাকে না।

মমতার পিতা সুরেশ্বর বনিয়াদী বড়মানুষ। চালচলন তাঁহার পিতার আমল পর্য্যন্ত অতি সনাতন রকম ছিল। কলিকাতায় বাসও তিনি প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর সকলেই গ্রামের বাড়িতে বাস করিয়াছেন। লেখাপড়া এ পরিবারে ছেলেদেরই বিশেষ হইত না, মেয়েদের সম্বন্ধে সে ভাবনা কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। ছেলে বাংলা পড়িতে শিখিলে, হিসাব বুঝিতে পারিলে এবং ইংরেজীতে নাম সই করিতে পারিলেই যথেষ্ট কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য হইত। সুরেশ্বরই প্রথম তাঁহার মায়ের আগ্রহে ইউনিভার্সিটির গণ্ডী অতিক্রম করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার আঁচ মনের ভিতর একটু বেশী রকম লাগায় তিনি হাতে সম্পত্তি পাইবামাত্র দেশের বাড়ি বন্ধ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এখানে নিজের ইচ্ছামত বাড়িঘর সাজাইয়া, নিজের নির্ব্বাচিত বন্ধুবান্ধব লইয়া আনন্দে দিন কাটাইতে আরম্ভ করেন।

মমতার পিতামহীর এ সকল পছন্দ হইল না। একে স্বামীবিয়োগের নিদারুণ দুঃখে তিনি মুহ্যমান হইয়াছিলেন, তাহার উপর পুত্রের স্বেচ্ছাচার এবং বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের অনুকরণ তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার মতামতকে পুত্র যে বিশেষ গ্রাহ্য করিবে না তাহাও বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। ছোটছেলে শিশির তখনও বালক, মায়ের প্রয়োজন তাহার ঘোচে নাই, তাহাকে ছাড়িয়া থাকার চিন্তা করিতেও মায়ের বুকের ভিতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিত, কিন্তু বড়ছেলের অনাচার তাঁহাকে ক্রমেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল। একবার ভাবিলেন দিন-কতকের জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া যাইবেন, মা না-থাকার সুখ কয়েক দিনেই সুরেশ্বর বুঝিতে পারিবে। তখন তাহার মন মায়ের জন্য একটু কাতর হইবে হয়ত। তাঁহার কথামত চলিতে ছেলে হয়ত রাজী হইলেও হইতে পারে। তখন না-হয় আবার ফিরিয়া আসিয়া কিছু দিন ছেলেদের সঙ্গে সংসারে বাস করিয়া যাইবেন। ছেলেগুলির বিবাহ দিয়া মনের মত দুটি বউ আনিবার ইচ্ছাটাও থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনে উঁকি দিতে লাগিল। তিনি তীর্থযাত্রার সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। সুরেশ্বর তাহাতে মত দিতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করিল না। মা তীর্থে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু নদীর স্রোত একবার শৈলজননীর কোল ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিলে আর কখনও সেখানে ফিরিয়া

যায় না। মায়ের স্নেহের প্রয়োজন সুরেশ্বরের বিশেষ আর ছিল না। বহির্জগতের বিচিত্র সুরের আহ্বান তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার সমস্ত মন তখন পড়িয়া ছিল ঐ দিকে। নব্যসমাজে ঘুরিবার, শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিবার একটা উগ্র আগ্রহ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। মায়ের ইচ্ছামত বিবাহ কখনই যে সে করিবে না, তাহা সে স্থিরই করিয়া রাখিয়াছিল।

মা তীর্থে যাইবার মাস-দুইয়ের মধ্যেই সে নৃপেন্দ্রনাথ সরকার নামক এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের কন্যা যামিনীকে বিবাহ করিয়া বসিল। এক বন্ধুর বিবাহসভায় এই তরুণীটির অসাধারণ সৌন্দর্য্য সুরেশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একরকম নিজে উপযাচক হইয়াই সে যামিনীকে বিবাহ করে, অবশ্য যামিনীর মা জ্ঞানদা দেবীও তাহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। কিন্তু কন্যার বিবাহের কিছু পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুরেশ্বরের মা যথাকালে খবরটা পাইলেন। সংসারে ফিরিবার আর চেষ্টা না করিয়া তিনি কাশীতেই থাকিয়া গেলেন। সুরেশ্বর বিবাহের পর সস্ত্রীক গিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিল। মা কিন্তু অভিমান ত্যাগ করিয়া ছেলেকে সস্নেহে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর দুই দিন পরেই স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল। যামিনীর সঙ্গে তাহার পর শাশুড়ীর আর সাক্ষাৎ হইল না। সুরেশ্বর ও শিশির কালেভদ্রে মধ্যে মধ্যে গিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিত, এই পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছেলেদের সম্পর্ক রহিল।

এখন কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠেই প্রাসাদতুল্য বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সুরেশ্বর রায় বাস করিতেছেন। কলিকাতার একেবারে ভিতরেই তিনি প্রথমে বাড়ি করেন, কিন্তু পত্নী যামিনীর স্বাস্থ্য চিরকালই দুর্ব্বল, প্রথমা কন্যা মমতার জন্মের পর তাহা আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ডাক্তারে একটু ফাঁকা জায়গায় থাকিবার পরামর্শ দেওয়ায় নূতন বাড়ি নির্ম্মাণ করিয়া সুরেশ্বর এইখানে চলিয়া আসিলেন। পুরাতন বাড়িটি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ফিরিঙ্গী ভাড়াটের আড্ডা হইয়া উঠিল।

প্রথমা কন্যা মমতার এখন বয়স ষোল বৎসর, তাহারই পরীক্ষা-পাসের উৎসবে আজ বাড়িতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মমতার জন্মের বছর-চার পরে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যামিনীর তাহার পর আর সন্তানাদি হয় নাই। পুত্রের নাম সুরেশ্বর রাখিয়াছেন সুজিত। তাহার স্বাস্থ্যও ভাল নয়। স্কুলে তাহাকে দেওয়া হয় নাই, বাড়িতেই সে মাষ্টারের কাছে পড়ে।

যামিনী চিরকালই গম্ভীর স্বভাবের, ঝগড়াঝাঁটি তর্কাতর্কি প্রভৃতিকে তিনি মারাত্মক রকম ভয় করিতেন। লোকের সঙ্গে খুব বেশী কথাবার্ত্তা কহাও তাঁহার ধাতে ছিল না। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে মায়ের কথামত চলিয়া চলিয়া তাঁহার প্রকৃতি বড়ই পরনির্ভর হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার নিজের সব ব্যবস্থা চিরকালই অন্য এক জন কেহ করিয়া দিলে তাঁহার সুবিধা হইত। বিবাহটাও তাঁহার ঘটিয়াছিল এই অতিরিক্ত বাধ্যতার ফলে। সুরেশ্বরের অর্থের প্রতি তাঁহার কোনো লোভ ছিল না, মানুষটির প্রতিও তাহার হৃদয়ের কোনো আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু যামিনীর মা জ্ঞানদা এই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেলেন, সুতরাং বিবাহ হইয়াই গেল।

বিবাহের পর বেশ কিছুদিন পর্য্যন্ত যামিনীর স্বভাবের কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। অর্দ্ধঘুমন্ত ভাবে আগেও তাঁহার যেমন দিন কাটিত, এখনও তেমনি কাটিতে লাগিল। মমতা কোলে আসিয়া তাঁহার অবসর অনেকখানি সংক্ষেপ করিয়া দিল বটে, কিন্তু প্রকৃতি তাঁহার খুব বেশী কিছু যে বদলাইয়া গেল তাহা বোধ হইল না। স্বামীর সহিত বিরোধ তাঁহার মনে মনে যতই ঘটুক, বাহিরে তাহার প্রকাশ ছিল না তত কিছু।

প্রথম খিটিমিটি বাধিতে আরম্ভ হইল মমতার শিক্ষাদীক্ষা লইয়া। সুরেশ্বর চান মেয়ে ঠিক বড়মানুষের মেয়ের উপযুক্তভাবে পালিত হয়, যামিনী বেশী বড়মানুষী ফলাইবার মোটেই পক্ষপাতী নহেন। সুরেশ্বর খুঁজিয়া-পাতিয়া চওড়া লাল পাড়ের শাড়ী পরা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা একটি মাদ্রাজী আয়া জোগাড় করিয়া আনিলেন। তাহার নাকে, কানে, গলায় বেশ মোটা মোটা সোনার গহনা, পায়ে স্যাণ্ডাল। মাহিনা শোনা গেল চল্লিশ টাকা।

দুই-তিন দিন পরে সুরেশ্বরের চোখে পড়িল যে মমতা

আয়ার কোলে না বেড়াইয়া, এক জন থান-পরা বাঙালী ঝিয়ের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছে। তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুকির আয়া কোথায় গেল ?"

যামিনী বসিয়া খুকির একটা ফ্রকে রেশমের কাজ করিতেছিলেন ; স্বামীর দিকে চাহিয়া বেশ শান্তভাবেই বলিলেন, "তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছি।".

সুরেশ্বর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন ? জবাব দেবার আগে আমাকে কি একবার জানানও যেত না।"

যামিনী বলিলেন, "ঝি-চাকর রাখা না-রাখার কোনোদিনই ত তুমি ব্যবস্থা কর না, আমাকেই করতে হয়, কাজেই তোমাকে বলতে যাই নি।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "বেশ, কিন্তু তার অপরাধটা কি তাও কি আমার শুনতে নেই ?"

যামিনী ফ্রকটা একদিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। তাঁহারও মেজাজে একটু বিরক্তির সঞ্চার হইতেছে বোঝা গেল। বলিলেন, "বাঙালীর মেয়ে প্রথমে বাংলা ভাষা না শিখে ভুল হিন্দী আর ইংরেজী শিখুক এটা আমি চাই না। তা ছাড়া আয়ার কথাবার্ত্তা ভাল না, বড় বেশী গালাগালি করে। চুরুট খায়, আমি নিজের চোখে দেখেছি। খুকি গোড়ার থেকে এই সব দেখুক এ আমি চাই না।"

সুরেশ্বর স্ত্রীকে একটু খোঁচা দিয়া বলিলেন, "নিজেও ত মানুষ হয়েছ খোট্টানী আয়ার হাতে। তারা চুরুট না খাক, হুঁকোয় করে তামাক খায়। তোমার বেলা যা চল্‌ল, এর বেলা তা চল্‌বে না কেন ?"

যামিনী বলিলেন, "আমার শিক্ষাদীক্ষায় যেগুলি ত্রুটি হয়েছে, আমার মেয়ের বেলাতেও সেগুলি ঘট্‌তে হবে, এমন কিছু আইন আছে নাকি.?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তোমার মা-বাবার চেয়ে, আমার চেয়ে, সকলেরই চেয়ে তুমিই বেশী বোঝ এটা মনে করবার কারণ ?"

যামিনীর মুখখানা অত্যন্তই গম্ভীর হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "বেশী বোঝা কম বোঝার কোনো প্রশ্ন উঠছে না। আমার মেয়েকে আমি নিজে যে-রকম ভাল মনে করি, সেই ভাবে মানুষ করব। মা বাবা যা ভাল মনে করেছেন, তাঁরাও তাই-ই করেছেন।"

সুরেশ্বর কথাটা শেষ হইতে দিতে চান না। বলিলেন, "তাঁদের শিক্ষার ফল ভাল হয় নি, এই তবে তুমি বলতে চাও ?"

যামিনী বলিলেন, "এ-বিষয়ে এত মাথা ঘামাবার কি যে দরকার তা ত আমি বুঝতে পারছি না। খুকির ভালমন্দ কি সত্যিই আমি তোমার চেয়ে কম বুঝি ? তা'হলে ত আমার উপর কোনো ভার না থাকাই উচিত।"

এতদূর অগ্রসর হইতে অবশ্য সুরেশ্বর রাজী নন। যামিনী বিশেষ কর্ম্মিষ্ঠা নহেন, কিন্তু সুরেশ্বর একেবারেই অকর্ম্মণ্য। কোনো-কিছুর ভার লইতে হইবে এ কথা মনে করিতেই তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। তাহা ছাড়া তাঁহাদের বিবাহ এখনও খুব বেশী দিন হয় নাই, যামিনীর সৌন্দর্য্যের ও স্বভাবের মাধুর্য্যের নেশাও এখন পর্য্যন্ত একেবারে ছুটিয়া যায় নাই। তাঁহাকে পাকাপাকি রকম চটাইয়া দিতে সুরেশ্বরের মন উঠিল না। তবু স্ত্রীর ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময়, শেষ বাণ নিক্ষেপের মত কয়েকটা কথা না বলিয়া যাইতে তাঁহার পৌরুষে আঘাত লাগিল। বলিলেন, "তবে ওসব ফ্রক, জুতো মোজা-টোজা খুলে নিয়ে, কোমরে একটা ঘুন্‌সী বেঁধে ছেড়ে দাও। ফিডিং বোতলটা আছড়ে ভেঙে ফেল, ঝিনুকে ক'রে দুধ খাওয়াও। দিশী শিক্ষা দিতে চাও ত পুরো দিশী শিক্ষাই দাও।"

যামিনী বলিলেন, "ফিরিঙ্গী বানাতে চাই না ব'লে আমি ধাঙড়ও বানাতে চাই না। সভ্যতা বা পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে দিশী শিক্ষার কিছু বিরোধ নেই।"

খুকি চার বৎসরের যখন, তখন তাহার ভাই সুজিত জন্মগ্রহণ করিল। সুরেশ্বর বলিলেন, "খুকিকে এবার লোরেটোতে দিয়ে দিই না ? তোমারও একটু রিলিফ্ হবে।"

যামিনী তাহাতেও সম্মতি দিলেন না। বলিলেন, "মেয়ে এখনও অ, আ, পড়তে শিখল না, এরই মধ্যে ওকে ইংরিজী বুক্‌নি, আর গালাগালি শিখতে যেতে হবে না। আগে ঘরে বাংলাটা শিখুক।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "নিজে যে যেমন, সেই রকমটাই তার কাছে শ্রেষ্ঠ বোধ হয় ব'লে জানতাম। তুমি দেখি সকল দিকেই উল্টো। নিজে ত ছিলে পুরো ফিরিঙ্গী, মমতার বেলা এত গোঁড়ামী কেন?"

যামিনী বলিলেন, "ফিরিঙ্গী শিক্ষা পেয়েছিলাম বলেই সেটা যে কতখানি ভূয়ো তা বুঝতে পেরেছি। তোমরা সেটা পাও নি, কাজেই তার মোহে এখনও মুগ্ধ হয়ে আছ।"

সুরেশ্বর এবং যামিনীর স্বভাবের এক জায়গায় মাত্র একটা মিল ছিল। দু-জনেরই ইচ্ছাশক্তি কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল। নিজের ইচ্ছা গায়ের জোরে ফলাইয়া তুলিবার মত জোর তাঁহারা সব সময় মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেন না। বিশেষ সুরেশ্বর। তর্ক করিতেন, স্ত্রীকে বিদ্রূপ করিতেন, তাহার পর বৈঠকখানায় ফিরিয়া গিয়া সে-সব কথা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতেন। তাঁহার তাসপাশা খেলা, ঘোড়ায় চড়া, সিনেমায় যাওয়া প্রভৃতিতে প্রায় সব সময় চলিয়া যাইত। ঘর-সংসারের ব্যবস্থা করিবার সময় কোথায়? তিনিই যদি সব করিবেন, তাহা হইলে লোকজন এবং স্ত্রী আছেন কি করিতে? অতএব সমালোচনা করিবার কাজটুকু মাত্র করিয়া তিনি সরিয়া পড়িতেন। যামিনীর এ-সব বিরোধ-বিসংবাদ ভাল লাগিত না বটে, তবু মনে ক্রমেই যেন তাঁহার দৃঢ়তার সঞ্চার হইতেছিল। মমতাকে ভাল ভাবে মানুষ করিবার সঙ্কল্পটা তাঁহাকে নেশার মত পাইয়া বসিতেছিল। তিনি জীবনে যদিও কোনোদিন ঝগড়া করেন নাই, ইহার জন্য দরকার হইলে তাহা করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং মমতা লোরেটোতে ভর্ত্তি না হইয়া ঘরেই এক বাঙালী শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিল। মায়ের কাছে বাজনা শিখিতে লাগিল, ছবি আঁকা শিখিতে লাগিল।

সুজিত যখন চার বৎসরের হইল, তখন তাহাকেও ইংরেজী স্কুলে দিবার জন্য সুরেশ্বর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিজে তাঁহাকে অনেক কষ্ট করিয়া ইংরেজী আদবকায়দা শিখিতে হইয়াছে, অনেক জায়গায় ঠকিয়াছেন, অনেক জায়গায় অপ্রস্তুত হইয়াছেন। এখনও মাঝে মাঝে ঠেকিয়া যাইতে হয়। খোকার যাহাতে এ-বিষয়ে গোড়াপত্তনটা ভাল করিয়া হয়, এই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। বড়মানুষ জমিদারের ছেলে, তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা ত দিতে হইবে। সুতরাং এ-বিষয়ে বেশ লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই তিনি স্ত্রীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু যামিনী মোটেই এক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন না দেখিয়া সুরেশ্বর রীতিমত অবাক হইয়া গেলেন। বলিলেন, "এর বেলা বুঝি তোমার কিছুই বক্তব্য নেই? ছেলের শিক্ষাটা কি মেয়ের শিক্ষার চেয়ে কম দরকারী ব'লে তোমার ধারণা?

যামিনী বলিলেন, "সব মানুষেরই শিক্ষা সমান দরকার, কিন্তু ছেলেকে তুমি যেমন বোঝ তাই শিক্ষা দাও। মেয়ের জীবন যে কেমন হবে, তা আমি অনেকটাই অনুমানে বুঝি, তাকে সেই জীবনের জন্য প্রস্তুত করতেও চেষ্টা করি। কিন্তু ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা তত পরিষ্কার ক'রে আমি দেখিতে পাই নে, তোমার পক্ষেই সেটা বেশী পারা সম্ভব। তুমিও বুঝে দেখ তাকে কি ভাবে মানুষ করা দরকার।"

অত ভাবিতে আবার সুরেশ্বর নারাজ। ভাবিবার ক্ষমতাও তাঁহার খুব বেশী আছে কিনা সন্দেহ। স্ত্রী একটা কিছু ব্যবস্থা করিলে তাহার খুঁৎ বাহির করা খুবই সহজ, তাহার ঠিক উল্টাটা বলিলেই হইল। কিন্তু নিজে ব্যবস্থা করা ভারি হাঙ্গামের ব্যাপার, কত ভাবনাই যে ভাবিতে হয় তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। কিন্তু স্ত্রীর কাছে হার মানাই বা চলে কি করিয়া? কাজেই সুরেশ্বর উঠিয়া গেলেন এবং কয়েক দিন পরেই খোকা সুজিত ইংরেজী স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিল।

মমতা স্কুলে যাইতে পাইলে বাঁচিয়া যাইত, বাড়িতে পড়ার ধাক্কায় কোনো সময়েই সে ছুটি পায় না। পড়াশুনা ত আছেই, তাহার উপর দেশী এবং বিলাতী বাজনা শেখা, সেলাই ও শিল্পকাজ শেখা, এমন কি একটু একটু গৃহকর্ম্ম শেখা এও সে ইহারই মধ্যে আরম্ভ করিয়াছে। যামিনী নিজে যখন যাহা-কিছুর জন্য ঠেকিয়াছেন, কন্যাকে সে-সব কিছুর জন্য ঠেকিতে না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাড়ির লোকে হাসাহাসি করে, সেটা বুঝিয়াও তিনি নিজের সঙ্কল্প ছাড়েন না। সুজিতের পড়াশুনার বিশেষ বালাই নাই। রোজ বাড়ি ফিরিয়া নিত্যনূতন বিলাতী উচ্ছ্বাস

এবং গালাগালি শুনাইয়া সে মাকে বিরক্ত এবং বাপকে চমৎকৃত করিয়া তোলে। তাহার আজ নূতন পোষাক চাই, কাল ব্যাগ চাই, পরশু টুপি চাই। চাঁদা চাওয়ার অন্ত নাই, পোষাক-পরিচ্ছদ জুতা-মোজার ঘটায় সে বাপকেও হার মানাইতে বসিয়াছে। যামিনী মনে মনে জ্বলিয়া যান, কিন্তু মুখে স্বামীকে কিছুই বলেন না।

২

মমতা স্কুলে প্রথম যখন ভর্ত্তি হইল তখন তাহার প্রায় তেরো বৎসর বয়স। এই প্রথম এক রকম তাহার বাহিরের সংসারের সহিত পরিচয়। তাহারা থাকে এমন জায়গায় যেখানে বাঙালী-পাড়া নাই, কাজেই সারাক্ষণ প্রতিবেশিনী সমাগম হয় না। নিজের বয়সের মেয়েদের এ-পর্য্যন্ত সে দূর হইতে চোখে দেখিয়াছে মাত্র, আলাপ-পরিচয়ের সুবিধাটা পায় নাই। উৎসব, নিমন্ত্রণাদিতে মায়ের আঁচল ধরিয়া গিয়াছে, তেমনি ভাবেই ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার রকম দেখিয়া যামিনীর নিজের কৈশোরকাল মনে পড়িয়া যাইত। তিনিও সর্ব্বত্র এই রকম মায়ের আঁচল ধরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মা জ্ঞানদা ইহাই অবশ্য পছন্দ করিতেন। মেয়েকে পুতুলের মত সুন্দরভাবে সাজাইয়া-গুজাইয়া লইয়া বেড়াইতে এবং সকলের মুখে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিতে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। কিন্তু মেয়ে স্বাধীন মানুষের মত চলাফেরা করিবে, যাহার সঙ্গে খুশী-মত কথা বলিবে, ইহা ভাবিলেই তাঁহার মন বিরক্তিতে ভরিয়া যাইত। নিজে ছিলেন তিনি অতিমাত্রায় প্রভুত্বপরায়ণ, তাই নিজের ধারে কাছে স্বাধীন মতের আঁচ সহ্য করিতে পারিতেন না।

যামিনীর স্বভাবে প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছাটা একেবারেই ছিল না। বাল্যে ও প্রথম যৌবনে অনেক ঘা খাইয়া এই জিনিষটির প্রতি তাঁহার একটা মারাত্মক রকম ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল। মেয়ে যেন কাহারও হাতের খেলার পুতুল না হয়, ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত কামনা। সে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ুক, দুঃখ ভোগ করুক, কোনো কিছুতেই তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতাটুকু যেন না হারায়, নিজের ভাবনা নিজে ভাবিতে পারে, নিজের পথ নিজেই বাছিয়া লইতে পারে। তাই মেয়ের এই আঁচলধরা ভাব দেখিলেই তিনি তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। তবে বাহিরে যাওয়া তাঁহাদের এতই কালভদ্রে ঘটিত যে মমতার এই স্বভাবটা সংশোধিত হইবার কোনোই সুযোগ পায় নাই।

স্কুলে যখন যামিনী তাহাকে প্রথম রাখিয়া চলিয়া আসিলেন, মমতা ত তখন প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল। ক্লাসের মেয়েরা এত বড় মেয়েকে কাঁদিতে দেখিয়া বেশ খানিকটা কৌতুক অনুভব করিল, কিন্তু একেবারে প্রথম দিন বলিয়া কেহ আর তাহার পিছনে লাগিল না। বরং নানারকম গল্পগাছা করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। টিফিনের সময় প্রকাণ্ড বড় চাতলাটায় যেন মেয়ের মেলা বসিয়া গেল। চেঁচামেচি, গল্প, খেলা, খাবার কিনিয়া খাওয়া, সে এক মহা ফুর্ত্তির ব্যাপার। মমতা হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। মোটা মোটা গোল গোল থামগুলির সামনে পিছনে লুকাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মেয়ের দল মহা হুড়াহুড়ি বাধাইয়া দিয়াছে। মমতাকেও ক্লাসের মেয়েরা খেলিতে ডাকিল, কিন্তু সে লজ্জায় অগ্রসর হইতে পারিল না।

সেদিন বাড়ি ফিরিয়া যাইতেই সুরেশ্বর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, স্কুল কেমন লাগল?"

মমতা সংক্ষেপে বলিল, "ভাল না।"

সুরেশ্বর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল লাগল না কেন?"

মমতা বলিল, "বাড়ি ছেড়ে সারাদিন বাইরে ব'সে থাকতে আমার ভাল লাগে না।"

সুরেশ্বর যেন মহা উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, যামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুন্‌ছ গো, তুমি ত ভাল শিক্ষা দেবার জন্যে মেয়েকে বাড়িতে বসিয়ে রাখলে, এখন এই বয়সেও স্কুলে গিয়ে তার মন টিকছে না। আরও বছর পাঁচ-ছয় পরে পাঠালে পারতে।"

যামিনী বিদ্রূপটা গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, "তা পাঠাতে পারলে সত্যিই ভাল হ'ত। স্কুলে সুশিক্ষা যত হোক-না-হোক, পাঁচ রকম পরিবারের পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে মিশে কুশিক্ষা তার চেয়ে বেশী হয়। তবে কুণো হওয়ার

দোষ ঢের, সেটা কাটানোর জন্যেই স্কুলে যাওয়া দরকার।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "সুজিতকে দেখ দেখি। একদিনও স্কুলে যেতে তার আপত্তি দেখেছ?"

যামিনী বলিলেন, "না, স্কুলে যেতে তার আপত্তি দেখি নি বটে,' তবে পড়াশুনা করাতে তার মারাত্মক আপত্তি। সেখানে যত লক্ষীছাড়া ফিরিঙ্গী ছেলের সঙ্গে মিশে হুড়োহুড়ি করতে পায়, সেখানে যেতে আপত্তি হবে কেন?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "ফিরিঙ্গী, ফিরিঙ্গী ক'রেই তুমি গেলে। ওদের ওপর তোমার এত ঝাল কেন বল দেখি? ওরা কি তোমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে? নিজেও ত আগাগোড়া ফিরিঙ্গী-শিক্ষাই পেয়েছ।"

যামিনী বলিলেন, "কেন যে অত বিতৃষ্ণা সে বল্‌তে গেলে ঢের কথা বলতে হয়। অত বলবারও আমার সময় নেই, শুনবারও তোমার সময় নেই। তবে খোকার শিক্ষা ভাল হচ্ছে না, এটা তুমি জেনে রেখো।"

"সে ত জেনে রেখেইছি। আমি যখন ব্যবস্থাটা করেছি, তখন তার ফল ভাল হবে কোথা থেকে?" বলিয়া সুরেশ্বর চলিয়া গেলেন। স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা বেশীর ভাগ এই রকমই চলিত। একটা কিছু বিষয়ে তর্ক করিয়া কথা সুরু হইল, এবং তর্কের মীমাংসা হইবার আগেই হয় যামিনী না-হয় সুরেশ্বর অসহিষ্ণু ভাবে সরিয়া পড়িতেন। সেটা অবশ্য এক দিক দিয়া ভালই হইত। দু-জনের মতামত ছিল একেবারে উল্টারকম, কাজেই তর্ক বেশীক্ষণ ধরিয়া চালাইলে লাভের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া যাইত। মাঝপথে সব কথা থামিয়া থাকায় রীতিমত ঝগড়াটা খুব কমই হইত।

যাহা হউক, মমতা ইহার পর রীতিমত স্কুলে যাইতে সুরু করিল। পড়াশুনায় সে ভালই ছিল, শেলাই, আঁকা, গানবাজনা, সবই সে বাড়িতে অনেকখানি শিখিয়াছে, স্কুলে কিছুর জন্য তাহাকে ঠেকিতে হইল না। বরং শীঘ্রই ভাল মেয়ে বলিয়া তাহার নাম রটিয়া গেল। অতএব মমতারও ইহার পর স্কুল ভাল লাগিতে আরম্ভ করিল। তবে সারাটা দিনই মাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইত বলিয়া এখনও মধ্যে মধ্যে তাহার মন কেমন করিত।

সুরেশ্বর মেয়েদের খুব বেশী পড়াশুনা পছন্দ করিতেন না। নিজে যদিও শিক্ষিতা মেয়েই বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা সত্য সত্যই শিক্ষার প্রতি কোনো আকর্ষণবশতঃ নয়। যামিনীর সৌন্দর্য্য তাঁহাকে অতিশয় অভিভূত করিয়াছিল ইহাই সে বিবাহের প্রধান কারণ। অন্য একটা কারণ, শিক্ষা বা জ্ঞানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ থাক্‌ বা নাই থাক্‌, চালচলনে, বেশভূষায়, কথাবার্ত্তায়, খুব কায়দা-দুরস্ত এবং আধুনিক হওয়ার দিকে তাঁহার একটা প্রগাঢ় রকম ঝোঁক ছিল। স্ত্রীও চাহিয়াছিলেন তিনি সেই রকম। তাঁহাদের বাড়িতে তিনি যে-সব বধূ আসিতে দেখিয়াছেন, তাহারা আসিয়াছে লাল বেনারসী শাড়ীর পুঁটলির মত, আগাগোড়া অবশ্য হীরামুক্তাখচিত। তাহাদের মুখ কাহাকেও দেখাইতে হইলে এক জন মানুষকে ঘোমটা খুলিয়া দিতে হইত, আর এক জনকে মুখ তুলিয়া ধরিয়া, এবং ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরাইয়া দর্শককে দেখাইয়া দিতে হইত। পাছে বধূর মানবত্ব চোখের দৃষ্টিতেও ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে চোখও বন্ধ রাখিত। ঠিক যেন মানুষকে পুতুল সাজাইয়া রাখা। এই সব বধূর মত একটি বধূ নিজের ঘর আলো করিতে আসিবে মনে করিলেই সুরেশ্বর চটিয়া যাইতেন। তাঁহার পুতুলখেলায় কোনো উৎসাহ ছিল না, বরং ঘর-সাজানতে উৎসাহ ছিল। যামিনীকে দেখিয়া ঘরের বাহিরে সকলে যখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল, তখন গর্ব্বে সুরেশ্বরের বুক দশ হাত হইল। এই ত চাই?

কিন্তু স্ত্রী ত শুধু গৃহসজ্জার উপকরণ নহেন, তিনি সজীব সজ্ঞান মানুষ। এইখানেই বাধিল গোলমাল। আগেকার কালের স্ত্রীগুলির ব্যবহারে আর যারই অভাব থাক, বাধ্যতার অভাব ছিল না। তাহাদের সাধ্য ছিল না স্বামীর কোনো কথার একটা প্রতিবাদ করিবার। ডাহিনে চলিতে বলিলে ডাহিনে চলিত, বাঁয়ে চলিতে বলিলে বাঁয়ে চলিত। কিন্তু এই আধুনিক মেয়েগুলি কথা ত শুনিতে চায়ই না, তদুপরি প্রমাণ করিতে বসিয়া যায়, যে, এই রকম কথা বলিবারই স্বামীদের কোনো অধিকার নাই। এতটা সহ্য করিতে সুরেশ্বর একান্তই নারাজ ছিলেন। বাহিরের দিকে যতই আধুনিকতা ফলান, মনের ভিতরটা তাঁহার এই স্থানে একেবারে খাঁটি সনাতনপন্থী ছিল। যতই লেখাপড়া শিখুক,

স্ত্রীলোক সর্ব্বক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে হীন ইহা তিনি ভুলিতে পারিতেন না। যামিনী উগ্ররকম আধুনিক ছিলেন না, তাই বিবাহ হইবা মাত্রই বিরোধ বাধিয়া যায় নাই। প্রথম বৎসর দুই তিন তিনি সত্যই সুরেশ্বরের মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে পাথরে গড়া প্রতিমা বলিয়াই ভ্রম হইত। রাগ বা অনুরাগ, কিছুরই লীলা তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত না। নিজের ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেই তিনি যেন বাঁচিয়া যাইতেন।

কিন্তু মমতার মা হইয়াই যামিনী বদ্‌লাইয়া গেলেন। স্বামীর সঙ্গে ছোট-বড় নানা বিষয়েই তাঁহার বিরোধ বাধিতে লাগিল এবং সুরেশ্বরের দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তি ও অসহিষ্ণুতা প্রত্যেকবারেই তাঁহার পরাজয় ঘটাইতে লাগিল। সুরেশ্বরের ইচ্ছা ছিল খানিকটা পোষাকী শিক্ষা দিয়াই তিনি মেয়ের বিবাহ দিয়া দিবেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও স্ত্রীর বিরুদ্ধতা তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। যামিনী বলিলেন, "ঐটুকু মেয়ের বিয়ে আমি কিছুতেই দিতে দেব না। সংসারের কি বোঝে ও, বিয়েরই বা কি বোঝে?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তবে কবে বিয়ে দিতে হবে? চল্লিশ বছর বয়সে?"

যামিনী বলিলেন, "চল্লিশ আর বারোর ভিতর আরও অনেকগুলি বছর আছে, তার যে-কোনো একটাতে দিলেই হবে।" স্বামীর ভয়েই এক রকম তিনি মেয়েকে তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। মমতার সম্বন্ধ নিয়মমত আসিতে লাগিল এবং ভাঙিতে লাগিল, সে এদিকে একটার পর একটা করিয়া ক্লাস ডিঙাইয়া ম্যাট্রিক্যুলেশনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এখন আর স্কুল তাহার খারাপ লাগে না, বরং অনেকগুলি বন্ধু জোটাইতে পারায় বেশ ভালই লাগে। বাড়িতে ত কথা বলিবারই মানুষ নাই। মা এমন চুপচাপ মানুষ যে তাঁহার সঙ্গে দুইটার বেশী তিনটা কথা বলিতে পারা যায় না। সুজিত নিজের মহিমায় এমন বিভোর যে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে গেলে বিরক্তিই আসে। বাড়িতে আরও আত্মীয়া যাঁহারা আছেন, তাঁহারা অবশ্য গল্প করিতে সদাই প্রস্তুত, তবে যামিনীই মেয়েকে তাঁহাদের কাছে ঘেঁষিতে দেন না। কবে কাহার বিবাহ হইয়াছে, কত অল্প বয়সে কে সন্তানবতী হইয়াছেন, কাহার শাশুড়ী ননদ কেমন, কে কত রূপবতী এবং স্বামী-সোহাগিনী ছিলেন, এ-সব গল্প মমতার খুব বেশী শোনা তিনি পছন্দ করেন না।

তাহার চেয়ে স্কুলে থাকা ভাল। মমতা দেখিতে ভাল, পড়ায় ভাল, বড়মানুষের মেয়ে, তবু তাহার অহঙ্কার নাই, এই সব কারণে সে সকলেরই খুব প্রিয়। ক্লাসে আরও একটি বড়মানুষের মেয়ে আছে তাহার নাম অলকা। পড়াশুনার দিকে তাহার বিন্দুমাত্রও নজর নাই, তবে গানবাজনায় ভাল। সাজসজ্জা করিতে তাহার বোধ হয় সারা সকালটাই কাটিয়া যায়। স্কুলে আসে এমন বেশে, ঠিক যেন বিবাহ-বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেছে। মাথার ফিতা হইতে পায়ের জুতা পর্য্যন্ত তাহার এক রঙের এবং মানানসই হওয়া চাই, না হইলে জগৎ তাহার চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। হাতে, গলায়, কানে, চুলে তাহার দশ রকম গহনা, তাও দুই দিন অন্তর বদল হয়। মুখে পাউডার স্নোর চাকচিক্য, পরিচ্ছদে এসেন্সের গন্ধ। বই পড়ুক বা নাই পড়ুক সেগুলির যত্ন খুব। বই রাখিবার ব্যাগ, পেন্সিল রাখিবার চামড়ার কেস, ঘটা কত রকম। টিফিনের সময় অন্য মেয়েরা যখন খাইতে এবং খেলা করিতে ব্যস্ত থাকে, অলকা তখন বোর্ডিঙের কাপড় পরিবার ঘরে ঢুকিয়া আবার চুল ঠিক করে, মুখে পাউডার দেয়, শাড়ী ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঠিক করে। অন্য মেয়েরা প্রায়ই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে অলকার ভাল লাগে না। মমতা খুব বড়লোকের মেয়ে শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি তাহার সঙ্গে ভাব করিতে গিয়াছিল, কিন্তু মমতার চালচলনের যথোপযুক্ত আভিজাত্যের অভাব দেখিয়া সে আবার পিছাইয়া গিয়াছে। অলকা বেচারী জাত বাঁচাইবার জন্য একলাই ঘোরে। মমতার এদিকে বন্ধুর ভীড়ে কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিবারই অবসর হয় না।

ছায়া বলিয়া একটি মেয়ে নূতন আসিয়াছে। সে সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। ইহার আগে সেও নাকি ঘরেই পড়িয়াছে। পড়াশুনায় বেশ ভাল। প্রথম দিনই মমতার তাহাকে বড় ভাল লাগিয়া গেল, হয়ত তাহার

করুণ মুখখানি দেখিয়াই। নিজের প্রথম স্কুলে আসার দিনটা মনে পড়িয়া গেল বোধ হয়। এমনিতে সে বড় অগ্রসর হইয়া কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু ছায়ার সঙ্গে সে যাচিয়া গিয়া ভাব করিল, সমস্তটা দিন তাহার পাশে বসিয়া রহিল, টিফিনের সময় তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইল। ছায়ার বাড়ি এখানে নয়, সে দূরসম্পর্কের এক মাসীর বাড়ি আসিয়া উঠিয়াছে। সেখানে যদি থাকিবার সুবিধা না হয় তাহা হইলে অগত্যা তাহাকে বোর্ডিঙে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে।

সেকেণ্ড ক্লাস হইতে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠিতে-না-উঠিতেই মমতার বয়স পনের ছাড়াইয়া ষোলয় গিয়া পড়িল। সুরেশ্বর একেবারে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এবার কন্যার বিবাহ না দিলেই নয়। সম্বন্ধ আশার ঘটা মাঝে কমিয়া গিয়াছিল। আবার ঘটক-ঘটকীর ভীড় লাগিল, নিত্য-নূতন বরের খবর শোনা যাইতে লাগিল। যামিনী গম্ভীর মুখে খালি শুনিতে লাগিলেন, ঝগড়া করিবারও চেষ্টা করিলেন না। সুরেশ্বর তাহাতে আরও চটিতে লাগিলেন, একটু ঝগড়াঝাঁটি তর্কাতর্কি হইলে তবু নিজের উৎসাহ-টাকে জিয়াইয়া রাখা যায়। এমনিতে একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে হয়।

মমতা একদিন স্কুল হইতে আসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার মা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে? কাঁদছিস্ কেন?"

মমতা বলিল, "কি তোমরা সব আমার নামে যা-তা রটাচ্ছ? ও রকম করলে আমি বোর্ডিঙে চলে যাব, একেবারে বাড়ি আসব না।"

যামিনী কিছু বলিবার আগেই সুরেশ্বর ঘরে ঢুকিয়া মমতার পাশে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "এ কি কান্নাকাটি কেন? তুমি ওকে বকেছ বুঝি গো?

যামিনী বলিলেন, "হ্যা, আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। স্কুলে কার কাছে কি শুনে এসে কাঁদতে বসেছে!"

সুরেশ্বর কথাটা কি না-শুনিয়াই চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এরকম হওয়া ত ঠিক নয়, আমি চিঠি দেব। ছেলেমানুষ মেয়েকে যা-তা বলবে কেন?"

মমতা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "না বাবা, তোমায় চিঠি দিতে হবে না। আমাকে কেউ ত গালাগালি দেয় নি? কে একটা ছাই গুজব রটিয়েছে, তাই সবাই মিলে আমাকে ঠাট্টা করছিল।"

ব্যাপারটা কি তাহা এতক্ষণে সুরেশ্বর বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "ছাই গুজব কেন? হিন্দুসমাজের মেয়েদের বিয়ে ত এই সময়ই হয়? তাতে অত চট্‌ছিস্ কেন বুড়ী?"

মমতা রাগের চোটে খাট ছাড়িয়া উঠিয়াই পড়িল। বলিল, "ছাই না ত কি? একেবারে পচা। আমায় পড়াশুনো করতে হবে না বুঝি? আমি কক্ষনো ওসব শুনব না। আমি পরীক্ষা দেব, কলেজে পড়ব।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "দেখ যে কালের যা ছাঁদ তা যাবে কোথায়? এত ফিরিঙ্গী ফিরিঙ্গী ক'রে তুমি লাফাও, মেয়ের ত সেই ফিরিঙ্গী-আদর্শই পছন্দ দেখি। তোমার স্বদেশী শিক্ষায় লাভ হ'ল কি?"

যামিনী বলিলেন, "বেশ লাভ হয়েছে। যাও ত মা তুমি এখান থেকে।" নিজেদের ভিতরের মতভেদটা ছেলেমেয়ের চোখের উপর তুলিয়া ধরিতে তিনি একান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। মমতার যদিও অনেক কথা আরও বাবা মাকে শুনাইবার ছিল, তবু মায়ের কথার অবাধ্য না হইয়া সে বাহির হইয়াই গেল।

যামিনী তখন বলিলেন, "লেখাপড়া শিখতে চাওয়াটা আদর্শ-হিসাবে খারাপ কিসে হ'ল শুনি?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "আমাদের ঘরে অত কলেজের পড়ার রেওয়াজ নেই বাপু। মেয়েদের আসল শিক্ষা ঘরের শিক্ষা।"

যামিনী বলিলেন, "সেটা ত শুনছি জন্মাবধি, কিন্তু বাড়িতে শিক্ষার ব্যবস্থা কই? কোথাও ত দেখলাম না? বাড়িতে ব'সে ব'সে খুব শিক্ষালাভ ক'রে উঠেছে এমন একটা মেয়ের নাম কর ত তুমি?"

সুরেশ্বর কথা ঘুরাইয়া বলিলেন, "মেয়ে কি পাস ক'রে উকীল হবে নাকি? ঘর-সংসারই যারা করবে তারা ঘর-সংসারেরই কাজ শিখুক।"

যামিনী বলিলেন, "তোমার মত বদলাতে পারে খুব শীগ্গির শীগ্গির। এই তুমিই ওকে লোরেটোতে দেবার

জন্যে একেবারে ক্ষেপে উঠেছিলে। ঘর-সংসারের সব কাজই সে শিখেছে, তোমার ভাবনা নেই। কিন্তু লেখাপড়াটাও ঠিক তার সমান প্রয়োজনীয়।"

"যত সব আজগুবি কথা। মেয়েছেলেকেও এর পর পিএইচ-ডি হ'তে হবে।" বলিয়া সুরেশ্বর চলিয়া গেলেন। কিন্তু মনটা তাঁহার দমিয়া গেল। এতকাল খালি স্ত্রীই বিরুদ্ধাচরণ করিতেন, এখন যদি আবার মেয়েও সঙ্গে সুর ধরে, তাহা হইলে আর কিছু করিবার থাকে না। তাঁহার বাড়ির মানুষগুলিও তেমনি, কেহ যদি একবার উঁকি মারিয়া দেখে। দলে ভারি হইলে মানুষের কত জোর বাড়ে। এদিকে কিন্তু মমতার পড়াশুনা আগের মতই চলিতে লাগিল। বিবাহের সম্বন্ধ আসাটা অবশ্য একেবারেই থামিয়া গেল না।

(ক্রমশঃ)

বাংলার রেশম-উৎপাদন শিল্পের উন্নতি

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে রেশম-শিল্পের স্বভাব, শাখা এবং বিভিন্ন শাখার কার্য্য ও প্রয়োজনীয়তা কি, সে-সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার পর ট্যারিফ্ বোর্ডের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে এবং ভারত-গবর্ন্মেণ্ট এই রিপোর্ট গ্রহণ করিয়া আমদানী রেশমের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং ব্যবহার-শিল্পের উন্নতিকল্পে গবেষণার জন্য বাৎসরিক সাড়ে পাঁচ লক্ষ এবং উৎপাদন-শিল্পের গবেষণার জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা পাঁচ বৎসরের জন্য বরাদ্দের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই টাকা বিভিন্ন প্রদেশে কার্য্যের ও প্রয়োজনের পরিমাণ অনুসারে বিতরিত হইবে বলিয়া শুনা যায়। আমদানী রেশমের উপর সংরক্ষণ-শুল্কের সাহায্যে এবং গবেষণার দ্বারা উন্নতি ও বিস্তারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ যাহাতে এই সুযোগ না হারায় তাহার বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন। বঙ্গদেশে সরকারী রেশম-বিভাগ বহুদিন হইতে আছে, কিন্তু প্রকৃত পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়া কার্য্য করিতে না পারায় এই বিভাগ বঙ্গে রেশম-শিল্পের কোনই উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং অবনতি রোধ করিতে পারে নাই। মহীশূরের রেশম-বিভাগ প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ট্যারিফ্ বোর্ডের রিপোর্টে ইহার বিবরণ পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। কাশ্মীরে একচক্রী পলু পালিত হওয়ায় ইহার স্বাভাবিক সুবিধা আছে। বঙ্গদেশ যদি এই সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া শিল্পের উন্নতিবিস্তার সাধন করিতে না পারে তাহা হইলে মহীশূর ও কাশ্মীরের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইবে। এখন কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে বঙ্গদেশ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারে নিম্নে তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

ভাল জাত পলু

প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে সুফল পাইতে হইলে সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন উৎকৃষ্ট গুটী অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গুটী-উৎপাদনকারী ভাল জাত পলু। ব্রহ্মদেশে রেশম-গবেষণালয়ে পর পর পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে বন্দোবস্ত করিতে পারিলে বিভিন্ন জাত পলু পালন করিয়া ইহাদের গুটী হইতে গড়ে নিম্নলিখিত রূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে।

পলুর জাত	প্রত্যেক গুটীতে রেশমের পরিমাণ কত গ্রেন	প্রত্যেক গুটী হইতে কত গজ রেশম-খাই পাওয়া যায়
ইতালীয় এক চক্রী	৪ হইতে ৪॥	৭০০—৮০০
একচক্রী ও বহু-চক্রীর সঙ্কর ১ম বংশ	৩—৩॥	৬০০—৭০০
বহুচক্রী সঙ্কর	২—২॥	৪০০—৬০০
দেশী বহুচক্রী	১—১॥	২০০—৩০০

উপরে বর্ণিত ইতালীয় একচক্রী পলু ব্রহ্মদেশে পাঁচ বৎসর পালিত হইতেছে। ইহাদের পালনের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন (১) নিরোগ ডিম, (২) ডিমগুলিকে চারি-পাঁচ মাস ৪০ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট ঠাণ্ডা খাওয়ান, (৩) বসন্তকালে পালন, (৪) পলুদিগকে তেকলপের পর হইতে কিংবা অন্তত-পক্ষে রোজে উঠিলে গাছতুঁতের পাতা খাওয়ান। (পলু ডিম হইতে ফুটিবার পর যেমন বড় হয় কয়েকদিন পর পর খোলস ছাড়ে। খোলস-ছাড়াকে কলপ বলে, প্রথমবার খোলস-ছাড়াকে মেটে-কলপ, দ্বিতীয়বারকে দো-কলপ, তৃতীয়বারকে তে-কলপ এবং চতুর্থবারকে সোদর-কলপ বলে। সোদর-কলপ ছাড়িয়া উঠিলে রোজে-উঠা বলে। রোজে উঠিয়া কয়েক দিন খাইয়া পলু গুটী করে)।

জাপানে সাধারণ ক্ষেতে জন্মান ঝুপি তুঁতের পাতা খাওয়াইয়াই প্রায় সমস্ত পলু পালিত হয়। কিন্তু জাপানী ঝুপি তুঁত বঙ্গদেশের মত ডাঁটা হইতে জন্মান হয় না, কলম হইতে উৎপন্ন হয় এবং কলমের গুঁড়ি বেশ পরিপক্ক ও মোটা হইতে দেওয়া হয়। অতএব এই কলমের পাতা গাছ-তুঁতের পাতার মতই উত্তম। এইরূপ কলমের প্রচলন বাংলায় প্রয়োজন। তাহা হইলে একচক্রী পলু পালনোপ-যোগী পাতা প্রায় তিন বৎসরের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। সাধারণ ভাবে গাছ জন্মাইয়া পাতা পাইতে সাত-আট বৎসর সময় লাগে। পতিত স্থান থাকিলে সাধারণ গাছও জন্মান উচিত, কারণ ইহাতে পাতা উৎপাদনের খরচ কম পড়ে। এইরূপ গাছও কলম হইতে জন্মান উচিত। ইহাই জাপানে প্রথা। এইরূপে উপযুক্ত খাদ্যের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে বৎসরে অন্ততঃ এক বন্দ একচক্রী এবং প্রথম বংশ-সঙ্কর পালন করা যাইতে পারে।

বৎসরের যে সময়ে একচক্রী পলু-পালন শেষ হইবে তখন গরম পড়িবে এবং পলু-পালন উত্তম হইবে না। কিন্তু সঙ্কর প্রথম বংশ এবং বহুচক্রী সঙ্কর পালিত হইতে পারে। এই বহুচক্রী উত্তম খাদ্য পাইলে মান্দালয়ের মত উষ্ণ স্থানেও জুলাই আগষ্ট মাসে এমন গুটী করে যে তাহাতে তিন সাড়ে তিন গ্রেন রেশম থাকে।

ইহা ছাড়া জাপানে আজকাল ঠাণ্ডা এবং হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড্ প্রয়োগ দ্বারা সময়-মত ডিম ফুটাইয়া একচক্রী পলুর দুই বন্দ পালিত হয়। দ্বিচক্রী এবং এক-চক্রীর সঙ্করতা দ্বারা আর এক বন্দ উত্তম গুটী উৎপন্ন হয়।

এইরূপে উত্তম গুটী-উৎপাদন-প্রথা পরীক্ষাদ্বারা আমাদের দেশে প্রথমে স্থির করিয়া লইতে হইবে। সাধারণ পলু-পালক বা বসনীরা একচক্রী বা দ্বিচক্রী পলুর সংরক্ষণ দ্বারা সময়মত ডিম জোগাড় করিতে পারিবে না বা প্রথম বংশ-সঙ্কর উৎপাদন করিতে পারিবে না। প্রয়োজনমত গবেষণা, পরীক্ষা ও কর্ম্মকেন্দ্র গঠন ব্যতীত এই কার্য্য হওয়া অসম্ভব। জাপানে সমস্ত দেশের নানা স্থানে স্থাপিত ৪৯টি গবেষণাগারের এবং ইহাদের ২৭টি শাখার প্রধান কার্য্যই হইল এইরূপ পলুর উন্নতিসাধন ও সংরক্ষণ এবং সময়মত ডিম উৎপাদন করিয়া প্রায় আট হাজার ডিম-উৎপাদকদিগকে এই ডিম সরবরাহ। ডিম-উৎপাদকেরা এই ডিম পালন করিয়া বাড়াইয়া যে ডিম পান তাহাই সাধারণ পলু-পালকদিগকে বিক্রয় করা হয়।

প্রথম প্রবন্ধে ডিম-সরবরাহের বিষয় আলোচনা করিবার সময় পলুদের পেব্রিন্ নামক পৈতৃক রোগের কথা বলা হইয়াছে। মাতার শরীরে এই রোগের বীজ থাকিলে সন্তানদেরও হয়। মাতার রক্ত অনুবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষাদ্বারা পেব্রিন্‌হীন ডিম উৎপাদন করা যায়। প্রত্যেক বারই সমস্ত চোকড়ীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া পলুদিগকে নীরোগ রাখা প্রয়োজন। এইরূপে ডিম উৎপাদন অতি ব্যয়সাধ্য, এই কারণে কোন দেশেই সাধারণ পলু-পালকেরা এইরূপ ডিম পালন করে না। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে এইরূপে প্রত্যেকটি পরীক্ষিত (সেলুলার) ও সংরক্ষিত পলুর প্রথম বংশ ভালভাবে পালিত হইলে নীরোগ থাকে। এই প্রথম বংশের প্রত্যেকটি পরীক্ষা না করিয়া শতকরা দশটি পরীক্ষা করিয়া দেখার প্রথা আছে। ইহাদ্বারাই বুঝা যায় ইহাদিগকে পালন করিলে কিরূপ ফল পাওয়া যাইবে। এইরূপ ডিমকে পালন-ডিম বা পালন সঞ্চ (ইনডাষ্ট্রীয়াল্ সিড্) বলে।

রোগের প্রতিকার

পেব্রিনশূন্য ডিম হইলেও যদি পেব্রিনদুষ্ট ঘরে বা ঐরূপ যন্ত্রপাতি লইয়া বা পেব্রিনদুষ্ট পলুর সহিত পালন

করা যায় তাহা হইলে পলুরা পেব্রিনাক্রান্ত হয়। পেব্রিন ব্যতীত পলুদের আরও তিন প্রকার মারাত্মক রোগ হয়। এগুলি পৈতৃক না হইলেও এই সকল রোগাক্রান্ত হইয়া হীনবল হইলে তাহাদের সন্তানেরাও প্রায়ই দুর্ব্বল হয় এবং রোগাক্রান্ত হইতে পারে। সেই জন্য সম্পূর্ণ নীরোগ পলু হইতেই ডিম রাখা কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া পেব্রিন যেমন পলুদের হানিকর, অপর রোগও প্রায় একই রূপ হানিকর। গরম আবহাওয়া, রুদ্ধ বাতাস এবং যথেষ্ট বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব, মন্দ, ভিজা ও ময়লা যুক্ত খাদ্য এবং পালন-প্রথার অনিয়মে প্রধানতঃ এই সকল রোগ হয়, উত্তম খাদ্য এবং প্রকৃষ্ট পালন-প্রথা ব্যতীত অতি উত্তম জাত পলু হইতেও উত্তম গুটি পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব নীরোগ ডিম যেমন দরকার, উত্তম খাদ্য এবং উত্তম পালন-প্রথাও সেইরূপ দরকার।

উত্তম খাদ্য

পলুদের খাদ্য তুঁতপাতা। প্রায় চারি শত প্রকার তুঁতগাছ আছে। তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ স্থানের উপযোগী এবং কাহার গুণাগুণ কিরূপ এবং স্থানবিশেষের গুণে কিরূপ হইবে পরীক্ষা ব্যতীত স্থির করা যাইতে পারে না। পলু-পালন-কার্য্যের অর্থাৎ রেশম-উৎপাদন শিল্পের যাহা প্রয়োজন ও খরচ তাহার মধ্যে পাতা উৎপাদন ও সরবরাহ খরচ প্রায় দশ আনা এবং অপরাপর খরচ প্রায় ছয় আনা। তার পর খাদ্য ভাল ও যথেষ্ট না হইলে অতি উৎকৃষ্ট জাত পলুও ভাল গুটি করিবে না। এই সকল কারণে তুঁত লইয়া গবেষণা ও পরীক্ষাদ্বারা উৎকর্ষসাধন জন্য জাপানে চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়, তিনটি রেশম-বিজ্ঞান কলেজ এবং ৫৫টি রেশম-পরীক্ষা-কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে তুঁতবিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছে। ইহা ছাড়া প্রায় ৬৩,০০০ তুঁতের কলম-উৎপাদক চাষীদিগকে উত্তম প্রথা শিক্ষা দিবার ভার ৩৪৩টি তত্ত্বাবধান-কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত আছে।

শিক্ষা

উত্তম পালন-প্রথা এবং তৎসঙ্গে উৎপাদন-শিল্পের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য জাপানে চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়, তিনটি কলেজ, ২৪১টি স্কুল এবং ৪৭টি গবেষণা-কেন্দ্রের বন্দোবস্ত আছে। জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সকল বালক-বালিকাই শিক্ষা পায় এবং যাহা প্রয়োজন, সহজেই শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে। আমাদের দেশে এখন তাহা স্বপ্নমাত্র। এখন আমাদের দেশে স্কুলে রেশম-বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে ততটা ফল পাওয়া যাইবে না যতটা রেশম-পালকদের মধ্যে দৃষ্টান্তকেন্দ্র স্থাপন দ্বারা সম্ভব। পলু-পালকদের পুত্রকন্যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখাপড়ার সহিত সম্পর্করহিত।

উত্তম কাটাই

নীরোগ ডিম, উত্তম খাদ্য এবং উত্তম পালন-প্রথা দ্বারা উত্তম গুটী উৎপাদিত হইলেও যদি উত্তম কাটাই না হয়, তবে উত্তম সুতা পাওয়া যায় না। অতএব সঙ্গে সঙ্গে উত্তম কাটাইয়ের বন্দোবস্ত প্রয়োজন। কাটাইয়ের বিষয় পূর্ব্বপ্রবন্ধে যথাসম্ভব মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। জাপানী পা-যন্ত্র এবং বানক-যন্ত্র দ্বারা উত্তম কাটাইয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

সুতা যাচাই

এক নমুনার সুতা কাটাই, সমতাসাধন এবং শ্রেণী-বিভাগের সার্টিফিকেট জন্য যন্ত্রপাতি সহ যাচাই-আগার প্রয়োজন। যাচাইয়ের মোটামুটি বিবরণও পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

প্রয়োজন

উপরে বর্ণিত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কি কি প্রয়োজন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

প্রথম, প্রধান গবেষণা-কেন্দ্র। ইহার কার্য্য, (ক) উত্তম পলু নির্দ্ধারণ এবং সকল সময়েই প্রত্যেকটি পরীক্ষিত ডিম হইতে পালনদ্বারা উত্তম পলু নীরোগ অবস্থায় সংরক্ষণ। বাংলায় এখন যে নিকৃষ্ট পলু আছে তাহার স্থলে উত্তম জাত পলু আমদানী করিতে হইবে এবং সঙ্করতা দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। (খ) তুঁতবিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা উত্তম ও নানা স্থানের উপযোগী তুঁত উৎপাদন ও সংরক্ষণ।

দ্বিতীয়, যেখানে যেখানে পলু পালন হয় বা হওয়া সম্ভব সেই সেই স্থানে দৃষ্টান্তকেন্দ্র স্থাপন। ইহাদের কার্য্য—

(ক) প্রধান গবেষণা-কেন্দ্র হইতে ডিম লইয়া পালন দ্বারা পালন-সক্ষ উৎপাদন ও সাধারণ পলুপালকদিগকে সরবরাহ, (খ) পালনপ্রথা এবং তুঁতচাষ-প্রথার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, (গ) কলম তুঁত সরবরাহ।

তৃতীয়, পা-যন্ত্র ও বানক-যন্ত্র দ্বারা কাটাই-কার্য্য চালাইয়া আদর্শ কাটাই কার্য্য প্রদর্শন। ইহা দেখিয়া লোকে ছোট-খড় কাটাই কারখানা আরম্ভ করিতে পারে। পা-যন্ত্রের জন্য কোন ঝঞ্ঝাট নাই। কিন্তু বানক-যন্ত্রের জন্য (১) জল, (২) বাষ্প, এবং (৩) যন্ত্র ঘুরাইবার জন্য বিজলী কিংবা বাষ্প শক্তি প্রয়োজন। বাংলা দেশের সর্ব্বত্র বিজলী পাওয়া দুষ্কর। অতএব কয়লার দ্বারা উৎপাদিত শক্তিতে বানক চালান প্রয়োজন এবং এইরূপে বাষ্পচালিত বানকের আদর্শ দেখান প্রয়োজন।

চতুর্থ, যাচাই-আগার।

এইগুলি হইল উৎপাদন-শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারের ভিত্তি।

বর-কনে

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

কোজাগরী সাঁঝে দু-জনে নেমেছি
গাঁয়ের ইষ্টেশনে ;
হাটাপথে এই এক কোশ পথ
যেতে হবে—তাও জেনে
ইচ্ছা করেই গাড়ী পাল্কীর
না ক'রে যোগাড় কিছু
আমি হাঁটি তার পেটরাটি নিয়ে
সে আসে আমার পিছু।
আলের দু-পাশে শরতের শীষ
শিশিরে পড়েছে নুয়ে
সেই জলে ভিজি পাতলা শাড়ীর
জল পড়ে চুঁয়ে চুঁয়ে ;
ক্ষেত হ'তে ক্ষেতে কুলকুল ক'রে
জল করে আনাগোনা—
শরৎ-সন্ধ্যা গান গায়, ভেবে
কান পেতে ওর শোনা
ক্ষেতের পগারে আকন্দ ফুল
ফুটে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে
এই ফুলেরই ত মালা দিয়েছিনু
বিয়ের রাত্রে তাকে!
দু-পাশে কতই লজ্জাবতীর
লতা আছে পাতা মেলে
আল্‌তা-রাঙানো পায়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
খুকীর মতন খেলে ;
ও যেন আবার ফিরে পেয়েছে সে
বালিকা-জীবনটিকে—
শরৎ-চাঁদের স্বপন ছড়ায়
সবুজের দিকে দিকে।

হিঙুল নদীটি পার হ'তে হবে—
তার ওপাশেই গ্রামে
সন্ধ্যাপ্রদীপ ভর ক'রে যেথা
ঘুমের পরীরা নামে,—
গ্রামের বাহিরে মৃণালদীঘির
কুমুদের সৌরভে
জোছ্‌নার মেয়ে সারা রাত জেগে
কাটায় মহোৎসবে,
সেইখানে এসে বসি দু-জনায়
শিরীষ গাছের তলে
পায়ের তলায় জলরেখাটুকু
নেচে নেচে গেয়ে চলে।
আঁচলের সব কাঞ্চন ফুল
সেই জলে দিল ফেলে
মেঘকালো নদীজলে যেন ভাই,—
বিদ্যুৎবালা খেলে।
মাছপরী সব জ্যোছনা-আলোয়
চিক্ চিক্ ক'রে ওঠে
জ্যোছনা-আলোয় ওরও হাসিখানি
চিক্ চিক্ ক'রে ঠোটে ;
ঝোপে ঝাড়ে কোথা কে জানে ফুটেছে
নাম-না-জানা কি ফুল
শ্যামলতাগুলি এলায়ে দিয়েছে
ফুল দিয়ে বাঁধা চুল
ঠোঁটের আঘাতে আড়বাঁশীখান
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা—
সহসা দেখি যে ওরও দুটি চোখে
নেমেছে জলের ধারা!

বীর আশানন্দ—শ্রীচণ্ডীচরণ দে। বীরাষ্টমী, ১৩৪১। দাম পাঁচ আনা। শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত।

বাংলার পল্লীবাসী বীর আশানন্দের নাম এতদিন লোকের মুখে মুখে ছিল, কখনও বা প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে, এতদিনে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইল। গল্পগুলি উপভোগ্য, প্রবীণদের চিত্তবিনোদন করিবে, দৈহিক বলের এই কাহিনীগুলি কিশোর-হৃদয়ে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন রচনা করিবে। কেহ কেহ বলেন, আশানন্দ বীরের উল্লেখ উনবিংশ শতাব্দীর কোনও সংবাদপত্রে নাই, সুতরাং ইহা কি প্রামাণ্য? লেখকের স্বকপোলকল্পিত নহে? ইহার উত্তর এই যে এতদিনব্যাপী কিম্বদন্তীর মূল্য আছে, তাহা হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া যায় না; দ্বিতীয়তঃ, আশানন্দের বংশপরম্পরার সন্ধান লেখক দিয়াছেন, গ্রামের ও বংশের এই পরিচয় তাঁহার বাস্তব অস্তিত্ব সূচিত করিতেছে; তৃতীয়তঃ, আশানন্দ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বের লোক, এক শত কি সোয়া শত বৎসর পূর্ব্বের কোনও সাময়িক ঘটনা-পঞ্জীতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু থাকিবার কথা নয়। বাংলার গৌরব বীর আশানন্দের এই সুলিখিত জীবনকথার বহুলপ্রচার কামনা করি।

সটীক পবিত্র যোহন লিখিত যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার—১৯৩১। সটীক পবিত্র মার্ক লিখিত যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার—১৯৩১। চট্টগ্রাম কাথলিক মিশন হইতে Rev. O. Desrochers, C.S.C. কর্তৃক প্রকাশিত।

এই দুইখানি পুস্তক লাটীন ভালগেট হইতে মূল গ্রীকের সহিত তুলনাক্রমে অনুবাদ করা হইয়াছে; বাংলা ভাষার বিশেষত্ব রক্ষার চেষ্টা অনুবাদক সাধ্যমত করিয়াছেন। এই দুইটি গ্রন্থ নিত্য পাঠের জন্য রচিত,—অন্য সুসমাচার দুইখানিও এই ভাবে প্রকাশিত করা চট্টগ্রাম কাথলিক মিশনের অভিপ্রায়।

অনুবাদের এই চেষ্টা সাধু, সন্দেহ নাই; বাংলায় বাইবেলের একখানি সুপাঠ্য সংস্করণ হওয়ার প্রয়োজন আছে, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহাতে বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য—বিশেষতঃ ধর্ম্মসাহিত্য—পরিপুষ্ট হইবে।

তবে ভাষার দিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে এই পুস্তক দুইখানিও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। যেমন, "প্রচুর দণ্ড মোচন লাভ করা যায়," "চিহ্নকার্য্য," "তাহার উপরের ঈশ্বরের ক্রোধ অবস্থিতি করে," "পক্ষাঘাতী," "বীজ বাপক," "পরাক্রমকার্য্য তাঁহা দ্বারা সাধিত হইতেছে"—ইত্যাদি। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অল্প, এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে পূর্ণতর বিশুদ্ধি দেখিতে পাইব আশা করি।

রক্তচক্র—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। রহস্য-চক্র সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। বার আনা। বৈশাখ, ১৩৪০।

সুপরিচিত ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ গল্পের বাংলা সংস্করণ। ভাষা ভাল, এবং বাংলা দেশের সমাজের পক্ষে খাপছাড়া হইলেও পাঠকের চিত্ত-বিনোদন হইবে নিশ্চয়। রাজনীতির সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বইখানি পড়িয়া এই কথা মনে করিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে এই বইও সরকারী দপ্তরখানার নির্দ্দেশানুসারে এক সময় "নিষিদ্ধ" হইয়াছিল,—পরে সে নিষেধাজ্ঞা অবশ্য প্রত্যাহার করা হইয়াছে! প্রচ্ছদপটের উপরে অঙ্কিত নারীকরধৃত রিভলভারের চিত্র পরীক্ষকের চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া থাকিবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

নানা প্রসঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, প্রণীত এবং সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস, পোঃ সৎসঙ্গ, পাবনা, হইতে প্রকাশিত ১৩৮ পৃঃ. মূল্য ১।০ টাকা ও ।৵০ সিকা।

এই বইখানিতে "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত" লেখকের নানা বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে কোন অধ্যায়-বিভাগ নাই বটে, কিন্তু আলোচনা একই বিষয়েও নয়। পুনর্জন্ম (৪৫ পৃঃ), স্বরাজ (৫৫ পৃঃ), প্রেসিডেন্সী কলেজের লেবরেটরীতে যে গবেষণা হয় তার মূল্য (৫৮ পৃঃ), প্রভৃতি অনেক বিষয়ই ইহাতে বিবেচিত হইয়াছে। ঠাকুরের অনেকগুলি উপদেশ বাস্তবিকই অনুপম; যেমন, ৭১ পৃষ্ঠায় 'উৎকর্ষে উদ্‌গ্রীবতা', 'উদ্ভাবন শ্রমশিল্প', 'বিশ্রাম-বিহীন ক্রমাগতি,' ও 'উৎকর্ষলিপ্সু বুদ্ধিপ্রাণতা', ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না।

বইখানার আর একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ঠাকুর যেখানে যাহা বলিয়াছেন, লেখক তাহারই প্রতিধ্বনি বেদ, উপনিষদ, ধম্মপদ, চরক-সংহিতা, পরাশর-সংহিতা, এবং বার্ণার্ড-শ, ইমার্সন প্রভৃতির লেখায় দেখাইয়াছেন। সেই জন্য বইয়ের পাদটীকা প্রায় মূলের সমান হইয়াছে।

ঠাকুরের কথোপকথনের ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা নহে, ইংরেজী-মিশ্রিত বাংলা। কিন্তু লেখক বন্ধনীর ভিতর প্রত্যেকটি ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দিয়াছেন; তবে, সহজবোধ্য কোন্‌টি তাহা সব সময় বলা যায় না। এ-কথা অবশ্য মানিতেই হইবে যে, ঠাকুরের ইংরেজীর তর্জ্জমা করাও সহজসাধ্য নহে।—যথা, sexually nourished (৯১ পৃঃ), 'de-elevating intellectualism' (৯৯ পৃঃ), 'unsolved solved complexes' (১০২ পৃঃ), ইত্যাদি।

লেখক ভূমিকায় নিবেদন করিয়াছেন—"প্রশ্ন উঠ্‌ত, বুকের ভিতর কেমন একটা আঁকুপাঁকু, অস্বচ্ছন্দতায় উদ্বিগ্ন হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম, আবোল-তাবোল তাঁর কাছে মুক্ত করে দিতাম,—উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকতাম মীমাংসার খোঁজে,—শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন শুনতাম,—মাঝে-মাঝে বুক কেঁপে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ত।" এইভাবে লেখক যাহা পাইয়াছেন তাহাই মুদ্রিত করিয়াছেন; "আশা,—এগুলি দিয়ে যদি কারু সুবিধা হয়, চোখ খোলে, পথ ধরতে পারে,—আর চলায় সুখে সুখী হয়!" ভগবান্ করুন, তাই হউক।

মানুষের দেহত্যাগ ও পরবর্ত্তী জীবন—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক, সেণ্ট্রাল পাবলিশিং হাউস, ৫৪।এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৪৭ পৃঃ, ১৷৹ আনা মাত্র।

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে"—(কঠোপনিষৎ, ১।১।২০)—"মানুষের ভিতর প্রেত-লোক নিয়া যে বিচার গবেষণা হয়, কেউ বলেন উহা আছে, কেউ বলেন নাই"—তাহাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থকারের অধ্যায়-বিভাগ অনুসরণ না করিয়া তাঁহার বিষয়-বিবৃতি অনুসারে বইখানাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক অংশে প্রেতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার রহিয়াছে; অন্যত্র উহার প্রমাণ-স্বরূপ নানাস্থান হইতে সংগৃহীত ভৌতিক ঘটনার বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। দার্শনিক বিচারে আপ্ত-বাক্যের উপরই নির্ভর করা হইয়াছে বেশী; সেই গীতা, পুরাণ ইত্যাদি, আর তার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে 'থিওসফির' মতবাদ।

প্রেতোপাখ্যানে যাঁদের রুচি আছে, তাঁহারা উপাখ্যানগুলি পড়িয়া প্রীত হইবেন। প্রশ্নের মীমাংসা এবং তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন কিনা জানি না, তবে অবসর-বিনোদনের পক্ষে এ-সব কাহিনী মন্দ নয়।

বইখানিতে ছাপার ভুল প্রচুর; শুদ্ধিপত্রে কুলায় নাই। ভাষাও মাঝে মাঝে ভৌতিক আবেশের অধীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়; যথা, ৮০ পৃষ্ঠায়—"শীত ঘুরে, গ্রীষ্ম ঘুরে, সুদিন ঘুরে, বর্ষা ঘুরে, আম ঘুরে, জাম ঘুরে, ধান ঘুরে, সরিষা ঘুরে। তা ছাড়া আমাদের মন ঘুরে, স্মৃতি ঘুরে, বুদ্ধি ঘুরে, ইত্যাদি।"

এত ঘুরিলে ত ভৌতিক দৃষ্টি অনিবার্য্য! কোন এক বইয়ে গ্রীষ্ম-বর্ণনায় পড়িয়াছিলাম—"আম পাকিল, জাম পাকিল, চুল পাকিবে না কেন?" এ-ও দেখিতেছি প্রায় তাই!

বইখানা বাঁধিবার সময় হয়ত কোন সূক্ষ্মদেহ ভূত দপ্তরীর ঘাড়েও চাপিয়া থাকিবে—নইলে ২০৮ পৃষ্ঠার পর ২২৫ এবং ৩৩২ পৃষ্ঠার পর ৩৪৫ পৃষ্ঠা পাইতাম না। 'প্রেতে বিচিকিৎসা' বেশী হইলে বর্ত্তমানে ভুল-ভ্রান্তি হইবেই।

দোষগুলি সব বাদ দিলে বইখানা সুখপাঠ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অভিমানিনী—শ্রীযদুনাথ খাস্তগীর। প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা, পৃঃ ১১৭।

চারিটি অঙ্কে, বারো দৃশ্যে সমাপ্ত ঐতিহাসিক নাটক। সম্ভবতঃ ইহা লেখকের প্রথম রচনা, তাহা হইলেও শক্তির পরিচয় আছে। জায়গায় জায়গায় নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান চমৎকার জমিয়া উঠিয়াছে। চরিত্রগুলিরও কয়েকটি বেশ জীবন্ত। ছাপা, বাঁধাই চলনসই।

শ্রীমনোজ বসু

বম্বের মোহ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু। ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকে "বোম্বের মোহ," "তিন সপ্তাহ" ও "রক্তের টান" নামক তিনটি আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই তিনটিতেই নবযুগের বাঙালীর বহির্জ্জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সে জীবনের কেন্দ্র বম্বে প্রেসিডেন্সী, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র। "বোম্বের মোহ" নামক আখ্যায়িকাটি নায়ক রমেন্দ্রনাথের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে, বাঙালী যুবক রমেন্দ্রনাথ কর্ম্মোপলক্ষ্যে বোম্বাই শহরে আসিয়া "রেবা" নাম্নী মহারাষ্ট্রীয় তরুণীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিল; নানা কারণে ও ঘটনা-বৈগুণ্যে তাহাদের বিবাহ হইল না, পরে তাহারা একই কাজে আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়া পরস্পরের প্রতি আসক্তি দেশসেবায় নিযুক্ত করিল। "তিন সপ্তাহ" নামক আখ্যায়িকার বর্ণনাকারীও এক জন বাঙালী যুবক, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিবার জন্য সুদূর মহারাষ্ট্র দেশে গিয়া প্লেগের আবির্ভাবের নিমিত্ত একটি পল্লীগ্রামে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেখানেই সে এক জীবন্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিল, অভিজাতবংশীয়া সুমিত্রা ও শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়র বাবু রাওয়ের পূর্ব্ব প্রেম এবং বাবু রাওয়ের জীবনচক্রের নির্ম্মম আবর্ত্তন। তৃতীয় আখ্যায়িকা "রক্তের টান"-এ একটি প্রবাসী বাঙালী খ্রীষ্টান যুবকের প্রেমের কাহিনী ব্যক্ত হইয়াছে, ডাক্তারী স্কুলে অধ্যয়নকালে এক মহারাষ্ট্রীয় খ্রীষ্টান তরুণীর জীবনান্তের সময়ে নিজের শরীর হইতে রক্ত দান করিয়া তাহার অপরূপ রূপচ্ছটাতে আসক্ত হইল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভগিনী শারদা যখন সেইরূপ স্নিগ্ধ ও সতেজ মূর্ত্তি লইয়া যুবকের নিকট উপস্থিত হইল, তখন বাঙালী যুবক তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না, পূর্ব্বের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। আখ্যায়িকা তিনটি সুপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক এবং প্রবাসী বাঙালী জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া উহারা নূতনত্বের দিক্ দিয়াও মনোজ্ঞ। কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিক বলা কঠিন; কারণ ঐগুলি না গল্প, না উপন্যাস, উভয়ের মিশ্রণে এক বিচিত্র পদার্থ। বর্ণনাভঙ্গীতে জড়তা আছে এবং ভাষাও সর্ব্বত্র সরল নহে। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ সুন্দর।

সন্ধ্যার পরে সাবধান—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, হইতে এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ আটটি গল্প আছে,—কামরা আর আমরা, মূর্ত্তি, কী, ওলাই-তলার বাগানবাড়ী, বাঁদরের পা, বাদলার গল্প, বাড়ী ও মাথা-ভাঙ্গার মাঠে। গল্পগুলি ভূতের ব্যাপার লইয়া লিখিত এবং ছেলেদের মনোরঞ্জনের উপযোগী রসধারায় পূর্ণ। হেমেন্দ্রবাবু এক জন প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী, সুতরাং বর্ণনাচাতুর্য্যের দিক দিয়া যে তাঁহার রচনা চিত্তাকর্ষক হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার ভাষাও সুন্দর ও ঝরঝরে। তবে শিশুপাঠ্য গল্প-পুস্তক হিসাবে তাঁহার রচিত "যখের ধন" বা "আবার যখের ধন" নামক পুস্তকদ্বয়ের নিকট সমালোচ্য পুস্তকটি দাঁড়াইতে পারে না। শিশুদিগের নিকট "য়্যাডভেঞ্চার" যেরূপ সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ, ভৌতিক কাহিনী তদ্রূপ নহে। পুস্তকের চিত্রগুলি গল্পের উপযোগী হইয়াছে। বাঁধাই, চিত্র, কাগজ ও ছাপা সকলই সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

পথের ডাকে—মঃ আবদুর রউফ, বি-এ, এল-টি। প্রাপ্তিস্থান—করিমবক্স ব্রাদার্স, ৯ আন্তনি বাগান লেন, কলিকাতা।

বইখানি মুসলমান ধর্ম্ম এবং সমাজ জীবন লইয়া মাঝারি-গোছের একখানি নভেল। লেখা এক এক জায়গায় যেমন উচ্চ অঙ্গের, মাঝে মাঝে আবার তেমনি খেলো—বিশেষ করিয়া কবিতাগুলি; ফলে একটু গুরুচণ্ডালী দোষ হইয়াছে। একটু বাছাই করিয়া প্রকাশ করিলে

বইখানি উঁচুদরের জিনিষই হইত। ধর্ম্মই বইখানির উপজীব্য হইলেও এবং মুসলমান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা এর প্রতিপাদ্য হইলেও সুখের বিষয় এই যে কোনখানেই উগ্র গোঁড়ামি প্রশ্রয় পায় নাই এবং কি ভাবে, কি ভাব সব বিষয়েই লেখক মনে রাখিয়া গেছেন যে তাঁহার পাঠকের মধ্যে হিন্দুও থাকিবে। বইয়ের ছাপা বড়ই খারাপ হইয়াছে। মূল্য ১।০

খরস্রোতা—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাতৃহারা স্বজন-বিরহিত একটি শিশুর জীবন নানা অনুকূল-প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া পরিণত বয়সে তাহার জীবনের ধ্রুবলক্ষ্যের সন্ধান পাইল—বইখানি তাহারই কাহিনী।

লেখক লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার এই বইখানি আগাগোড়া তৃপ্তি দিতে পারিল না। প্রথমাংশে মাসামার চরিত্রের ক্রূরতা আর ব্রহ্মচারী শশিশেখরের ঘরে যুবতীদের উপদ্রব অতিরঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। সান্যাল-দম্পতির কথাবার্ত্তাতেও ইপ্সিত রসটি জমে নাই—বাড়াবাড়ি রকম গ্রাম্যতা দোষের জন্যই।

বইখানি প্রথম দিকের চেয়ে শেষের দিকে ভাল লাগিল। গল্পাংশটাও জমিয়াছে এবং রচনার দিকেও লেখকের সাধা হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ভাল। মূল্য ২৲।

প্রেমের বিচিত্র ধারা—শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মন্মথ ভট্টাচার্য্য। অরিন্দম এণ্ড কোম্পানী। ১০, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা।

দশটি ছোট গল্পের বই। বিখ্যাত ফরাসী লেখক গী-দ্য-মোপাসাঁর গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত; সুতরাং এর খ্যাতি-অখ্যাতি মূলত মোপাসাঁরই প্রাপ্য।

লেখকদ্বয়ের প্রশংসা এইখানে যে তাঁহারা বেশ সরস, মনোহর ভাষায় গল্পগুলি লিখিয়া গিয়াছেন। বৈদেশিকত্ব কোনখানেই রূঢ়ভাবে ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই।

ছাপার সামান্য দু-একটা ভুল থাকিয়া গিয়াছে। বহিরাবরণ মামুলী। মূল্য ১৲।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গৃহধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু। কলিকাতা, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীগুরু লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "পারিবারিক প্রবন্ধ," "সামাজিক প্রবন্ধ" ভিন্ন বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর পুস্তক অধিক নাই। গ্রন্থকার বিবাহ, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, চরিত্র, সঞ্চয়, দাস-দাসীর প্রতি আচরণ, সন্তান পালন ও তাহাদিগের শিক্ষা, নারী-জাগরণ, রোগীর চিকিৎসা ও সেবা প্রভৃতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রতি গৃহে এই পুস্তকখানি রক্ষিত, পঠিত ও আলোচিত হইলে সংসার শান্তিময় ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

রোগ ও পথ্য—কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, কবিশেখর, এম-এসসি প্রণীত, ১৯৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। পৃঃ ।৵০+১৫৬।

কবিরাজী শাস্ত্রের দৃষ্টিতে রোগ ও তদুপযোগী পথ্যের সম্বন্ধে বই। কবিরাজ মহাশয় বোধ হয় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কতকটা লোকের মন রাখিবার জন্যই "ভাইটামিন্‌" ইত্যাদির অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা না করিলেই ভাল হইত, কেন না, ঐ চেষ্টার ফলে ধনুষ্টঙ্কার রোগ "Diseases of the nervous system"এর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। বরং খাদ্যতত্ত্বের সম্বন্ধে পুরাকালে যে-সকল জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছিল বর্ত্তমান সময়ে সেগুলির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিলে অনেক ফললাভ হইতে পারিত। তবু শুধু পথ্যের সম্বন্ধে প্রাচীন মতামত কি ছিল তাহার একটা ফর্দ্দ হিসাবে বইটি কাজে লাগিতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্লোক-রত্নাবলী—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি, এ, এম্‌. বি. কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনূদিত। পৃঃ ৩৪০, মূল্য ১।০

সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার হইতে নানা প্রকারের সুভাষিত শ্লোক সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এক হাজারেরও অধিক শ্লোক এবং দুই শতেরও বেশী খণ্ডিত শ্লোক ও প্রবচন এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। গীতা, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, চাণক্য, শঙ্কর-ভাষিত, মূর্খশতক, এবং উদ্ভট প্রভৃতি হইতে মূল শ্লোক এবং তাহার সরল গদ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ সংকলন-পুস্তক বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিল। আশা করি সংস্কৃতানুরাগী বাঙ্গালী পাঠকের কাছে এই গ্রন্থের যথোচিত আদর হইবে।

শ্রীরমেশ বসু
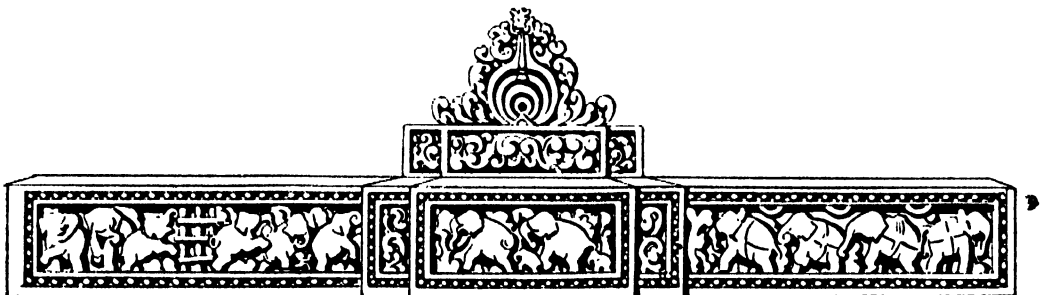
স্বপ্ন

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেন

ছয় বৎসরের মঞ্জু সকালবেলা রোদে বসিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল আর মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "হুসিয়ার—খবরদার—ডোণ্ট্ টক্—ভাগো—।" জ্বর তাড়াইবার যে অপূর্ব্ব উপায়টা কালই সে মেজদাদা মুকুলের কাছ হইতে আয়ত্ত করিয়াছে আজই তাহার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হইতেছিল।

ওপর হইতে বড়মা ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে ও মঞ্জু, ওরে ও মাণিক, যা রে ঘরে যা। এই আমি আস্ছি, এই আমি এলুম ব'লে।"

তরকারী-কোটা তখনও শেষ হয় নাই, দু-বেলারটা কুটিতে হইবে, এদিকে ছেলেটার জ্বর আসিয়া পড়িল। এত ঘন ঘন জ্বর হয় কেন কে জানে। ছেলের মা'র কিন্তু এদিকে মোটেই নজর নাই, বড়মার উপর ছাড়িয়া দিয়াই সে খালাস। ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে যেন তাহার কোন সম্পর্কই নাই।

ছোটর দল কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, "ওমা, মা, এই নাও তোমার চিঠি এসেছে।" "কই দেখি।" মা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, চিঠিখানা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "আমার চিঠি নয় রে, বড়মার, দিয়ে আয়।" ছেলের দল আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তাহারা জানিত মা-দেরই শুধু চিঠি আসে। বড়-মাদেরও (ঠাকুরমাকে ইহারা বড়মা বলে) যে আবার চিঠি আসিতে পারে ইহা তাহাদের ধারণায় কুলায় না। বলিল, "দেখ না ভাল ক'রে।" মা বলিলেন, "দেখেছি যা।"

বড়মার চিঠি! সত্যই! তবে ত কিছু আদায় করিবার একটা সুযোগ মিলিয়াছে! ছেলেমেয়ের দল আবার কলরব করিয়া ছুটিল, "ও বড়মা, বড়মা, তোমার জন্য একটা জিনিষ এনেছি।" মুকুল বলিল, "বল ত কি, ও বড়মা বল ত কি?" লাভের আশায় মঞ্জুও কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দলে ভিড়িয়াছিল, সে বলিল, "না না দেওয়া হবে না, কখ্খনো দেওয়া হবে না, আগে একটা পয়সা দাও।" রাণী বলিল, "একটা না, একটা না দুটো—ও বড়মা দাও না দুটো পয়সা।" সকলের ছোট দীপ্তি ভারী মজা পাইয়াছিল, নাচিতে নাচিতে সে বলিল, "আমি বলব না—কিচ্ছুতেই বলব না—ব-ড়-মা তোমার একটা চ-এ হ্স্বিকারে চি, ঠ-এ হ্স্বিকারে ঠি—।"

আর যায় কোথায়! বিশ্বাসঘাতকের উপর একসঙ্গে কিলচড় বৃষ্টি হইতে লাগিল। আততায়ীদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দীপ্তি গিয়া বড়মার পিছনে লুকাইল। বড়মা তরকারী কুটিতে কুটিতে কি ভাবিতেছিলেন, ইহাদের আকস্মিক আগমন ও আক্রমণের দিকে তেমন নজর দেন নাই। এখন ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া বলিলেন, "দেব রে দেব দুটো পয়সা, ছেড়ে দে ওকে।"

মুক্তি পাইয়া দীপ্তি হাঁপাইতে লাগিল। বড়মা কহিলেন, "দে দেখি চিঠিখানা, কে লিখেছে দেখি।" সকলের বড় মণ্টু ক্লাস সিক্স-এ পড়ে। বিদ্যার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়া সে বলিল, "থাম থাম আমি দেখছি। ইতির দিকটা দেখব ত? এই যে লেখা আছে ইতি আং শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন। ইতি আং শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন কে বড়মা?" "আমার দাদা।" "তোমার দাদা? তোমার দাদা আছে?" মণ্টু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। বড়মাদের বুঝি আবার দাদা থাকে! দূর, ফাঁকি দিতেছে নিশ্চয়। বলিল, "হ্যা তোমার আবার দাদা আছে।" বড়মা আঁচল হইতে পয়সা বাহির করিতে করিতে বলিলেন, "নেই? দাদা আছেন, বাবা আছেন, বাড়ি আছে, ঘর আছে—তোদের যেমন-যেমন আছে আমারও তেমনি-তেমনি সব আছে জানিস্? এই নে পয়সা, চিঠি দে।"

পয়সা লইয়া ছোটর দল চলিয়া গেল।

দাদা পত্র লিখিয়াছেন আজ দুপুরে এখানে আসিবেন। যে স্কুলে কাজ করিতেন, টাকার অভাবে সে স্কুল উঠিয়া গিয়াছে। শরীরে আর তেমন শক্তি নাই, কিন্তু চাকুরী না করিলে নিজেই বা খাইবেন কি, আর আশী বছরের বুড়া বাপকেই বা খাওয়াইবেন কি দিয়া? এদিকে নাকি কোন স্কুলে একটা চাকুরী খালি আছে, তাহারই খোঁজে আসবেন।

সত্যই, বড় কষ্টেই পড়িয়াছে উহারা। মাষ্টারী করিয়া দাদা যে চল্লিশ টাকা পাইতেন তাহাতে কিছুই হইত না, টিউশনির টাকা, বাবার পেন্‌সনের টাকা একত্র করিয়া কোন রকমে চলিত। বাড়িতে লোকজনও ত কম নয়। দাদার নিজেরই ত সাতটি ছেলেমেয়ে—বুলু, কালু, ভুলু, বিমলা, তার পর তরলা, তার পরেরটির নাম মনু না কি যেন, তার পরেও আর একটি আছে। ইহা ছাড়া বড় বুড়ির দুই ছেলে—রমেন, জ্যোতিষ, পিসীমার ছোটমেয়ে কমলা, দাদা, বৌঠান, বাবা, পিসীমা, তারিণী-কাকা ত আছেনই…খরচপত্র এখন কেমন করিয়া চলিতেছে কে জানে।…আসুক, চেষ্টা করিয়া যাক। আর কিছু না হয় দেখাটা ত হইবে।

দাদা আসিয়াই বলিতেছেন আজই শেষরাত্রে চলিয়া যাইবেন, তাঁহার অনেক কাজ। দাদা যে খরচপত্রের অভাবে থাকিতে চাহিতেছেন না তাহা তাঁহার চোখমুখ দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। কিন্তু তবু তাঁহাকে দুই দিন রাখিতে ইচ্ছা করে।

দাদার চেহারাটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। কেমন যেন রোগা-রোগা, কেমন-কেমন যেন হাসেন,—কষ্ট হয় দেখিয়া।…

এই দাদারই চেহারা আগে কেমন ছিল! গোলগাল ফর্সা, যেন রাজপুত্র। কার্ত্তিকের মত জামাই লইবার জন্য মেয়ের বাপদের কত টানাটানি।…ও-পাড়ার দাসঠাকুর দেখিতে আসিলেন। ছেলে দেখিয়া বলিলেন এ-ছেলে তিনি লইবেনই। ভিটামাটি বন্ধক দিতে হইলেও এমন জামাই তিনি ছাড়িবেন না।…সেবারকার কথা মনে পড়ে। বিবাহের পরের বৎসর নৌকায় করিয়া এখানে আসিবার সময় সঙ্গে ছিল দাদা। জাজিমতলার ঘাটের কাছে আসিয়া ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া গেল। উনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দাদা আমরা ত যাই।" দাদা বলিলেন, "ভয় কি, বিপদবারণ মধুসূদন রক্ষা করবেন।" নৌকার মাঝিটা ঝড়ঝাপটায় কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল, দাদা একাই সকলকে টানিয়া পারে উঠাইল। উনি দাদার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "দাদা, তুমিই আমার বিপদবারণ, তুমিই আমার মধুসূদন।"

দাদা যেন বড় বেশী বুড়ো হইয়া গিয়াছেন। ভাল লাগে না—তাকাইতে পারা যায় না উঁহার দিকে। দাদা যেন আর সেই দাদা নয়, নূতন একটা মানুষ।

বড়ছেলে সমরেশ আপিস হইতে আসিয়া বলিল, "হঠাৎ এলেন যে মামা?" সমরেশকে দাদার চিঠিখানা দেখান হয় নাই; তাহা হইলে সে-ও অমন জিজ্ঞাসা করিত না, দাদারও অত দুঃখ লজ্জা পাইতে হইত না।

সমরেশের কথার উত্তর দিতে গিয়া দাদার মুখখানা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। এই বয়সে চাকুরী গিয়াছে বলিতে কি কম কষ্ট হইতেছে ওঁর! আমৃতা-আমৃতা করিয়া বলিতেছেন, "সে চাকরিটা আর নেই—ছেড়ে দিয়েছি।—এদিকে নাকি একটা খালি আছে—ভাবলাম যাই একবার ঠোক্কর মেরে আসি। তাছাড়া তোমাদের সঙ্গেও ত অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি, দেখাটাও ত করা দরকার, কি বল?"

আগের কথাগুলি কোনরকমে সারিয়া শেষের কথাটা দাদা জোর দিয়া বলিলেন, যেন সেইটাই আসল কথা। কিন্তু সমরেশটার কি একটুও বুদ্ধি নাই? দেখিতেছে দাদা কষ্ট পাইতেছেন, তবু কেন ও বার-বার ওই কথাই তুলিতেছে? বলিতেছে, "আজকাল চাকরির যে-রকম বাজার চেষ্টা করিয়াও লাভ যে বিশেষ কিছু হইবে মনে হয় না।"

বয়সে দাদার চোখ দুইটা ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে নাকি?…ছল্ ছল্ করিতেছে না? সমরেশ দেখিতে পাইল না ত?

দাদা জোর করিয়া হাসিতেছেন,—বিশ্রী লাগিতেছে দেখিতে,—বলিতেছেন, "বরাতে থাকে ত হবে, না-হয় না

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গৃহস্থের যীশুখৃষ্ট
এ ডি মিলার
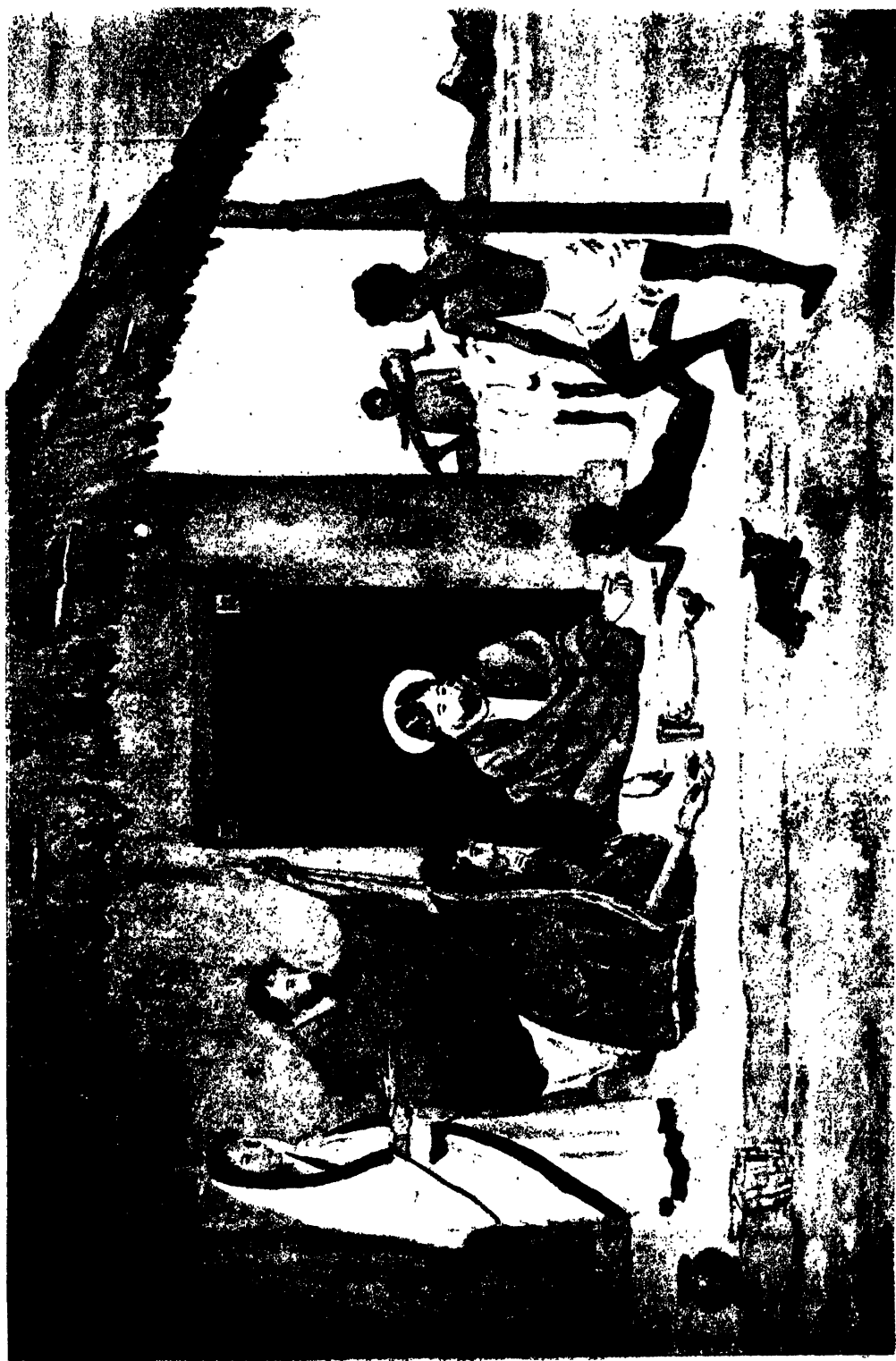
হবে। ওর জন্য আমার বড়-একটা ইয়ে নেই।...যাক্ গে সে কথা। শোনো সমর! আমি কিন্তু আগে থাক্‌তেই ব'লে রাখ্‌ছি, এবার আমি কোন কথাই শুনব না, ছোট বুড়িকে কয়েক দিনের জন্য নিয়ে যাবই। সেই জন্যই আমি এসেছি। বাবার শরীরে কিছু নেই। কবে আছেন কবে নেই তার ঠিক কি?"

বেচারী দাদা! ভাগ্নেদের কাছে মান বাঁচাইবার জন্য এত মিথ্যাও বলিতে হইতেছে।

বিকালে দাদা ও সমরেশ চাকুরীর তদ্বির করিতে বাহির হইয়া গিয়াছে। আজ আর বড়মার কাজে মন লাগিতেছে না, কত কথাই মনে আসিতেছে।

বাবার কথা মনে পড়ে। কত বছর তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই, ওঃ কত বছর! বাবা যে আছেন তাই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে—ই যে শুলুর অন্নপ্রাশনের সময় দেখা হইয়াছিল তাহার পর আর হয় নাই।...আচ্ছা, এখনও কি তিনি সেই রকমই আছেন? সেই রকম হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন, সেই রকম খাইতে পারেন, সেই রকম বিনা-চশমায় বই পড়িতে পারেন? না বোধ হয়, তাহা বোধ হয় আর পারেন না। দাদা যে বলিলেন বাবার শরীর একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। কেমন হইয়া গিয়াছেন তিনি? এখন বোধ হয় তাঁহাকে আর চেনা যায় না। চোখে কম দেখেন বলিয়া বোধ হয় তাঁহার পড়িতে কষ্ট হয়, চলিতে গিয়া বোধ হয় তাঁহার পা কাঁপিতে থাকে—হাত ধরিয়া ঘরের বাহির করিতে হয়, জোর করিয়া কেহ খাওয়ায় না বলিয়া বোধ হয় কোনদিন পেট ভরিয়া খাওয়াটাও আর হয় না।...কেই বা খাওয়াইবে? বার মাসের রোগী বৌঠান ত থাকিয়াও নাই, আর মা ত চলিয়াই গিয়াছেন। বাবার হয়ত এটা-সেটা একটু খাওয়ার ইচ্ছা হয়, কিন্তু টাকা-পয়সার টানাটানি বুঝিয়া চুপ করিয়াই থাকেন। সংসারে বাবা এখন প্রায় অতীতের কোটায়, বর্ত্তমানদের ফেলিয়া তাঁহার অভাবের কথা ভাবিবার কারই সময় আছে।

সন্ধ্যার পর দাদা ও সমরেশ ফিরিয়া আসিল। স্কুল-কমিটির মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়াও কোন আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। সেক্রেটারী ত স্পষ্টই বলিয়াছেন গ্রামের স্কুলের বুড়া মাষ্টার-টাষ্টার তাঁহাদের পোষাইবে না, শহরের চালাক-চতুর 'আপ-টু-ডেট' ছোকরা-মাষ্টার ছাড়া আর কাহারও উপর তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। দাদা নাকি একটু 'রোখ করিয়া' দুই মাস বিনা-বেতনে খাটিয়া দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, সেক্রেটারীবাবু তাহা ঠাট্টা করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

দাদার দিকে আর তাকাইতে সাহস হয় না। কিন্তু দাদা যেন বড় বেশী বেশী আরম্ভ করিয়াছেন। ফিরিবার সময় বাজার হইতে ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের জন্য দুইটি করিয়া কমলালেবু আনিয়াছেন, মঞ্জুটার জ্বর বলিয়া তাহার জন্য আনিয়াছেন দুইটি ডালিম। এতগুলি ছেলেপিলের ঘরে বেচারী শুধু-হাতে আসেনই বা কি করিয়া?

দাদার নাকি আর একদিনও দেরি করিবার উপায় নাই। রাত পোহাইতে না-পোহাইতেই তাঁহার রওনা হইতে হইবে। 'ছোটবুড়ি' যেন তৈয়ার হইয়া থাকে।

দেখা হইতেই দাদা বলিলেন, "রাত পোহালেই যেতে হবে কিন্তু, জিনিষপত্র ঠিকঠাক ক'রে নাও।"

বড়মার মন কেমন করিতেছে। যাইতে ইচ্ছা করে বড়। কিন্তু ওখানকার অবস্থা ত জানা আছে সবই। এখনই কি কষ্টে উহাদের সংসার চলে, ইহার উপর বোঝা চাপিলে উহাদের অচল হইবে। থাক কাজ নাই এখন যাইয়া। কপালে থাকিলে পরে যাওয়া হইবে।

বলিলেন, "এখন থাক্ না দাদা, তোমার চাক্‌রি হোক্, তার পর একদিন যাব।"

দাদা মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, "কিন্তু কবে আর যাবে বল। বাবা কি আর তত দিন থাক্‌বেন?...আদর-যত্ন অবিশ্যি কিছুই ক'র্‌তে পার্‌ব না, কিন্তু তুমি গেলে দুটো শাকভাতের যোগাড় হবেই। এই গরিবের ঘরেরই ত মেয়ে তুমি, সেটা মনে রেখো।

বড়মার চোখে জল আসিল। দাদা যে তাঁহার কথায় কষ্ট পাইবেন তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই। দাদা আরও বলিতেছেন, "আদরযত্ন কর্‌বার কে-ই বা আছে। তবু যদি একবার যাও বাবার সঙ্গে দেখাটা হ'তে পারে, মা'র সঙ্গে ত শেষদেখা হ'লই না। অসুখের সময় শুধু তিনি কাঁদ্‌তেন আর তোমার কথাই ব'ল্‌তেন।"

আবার চোখে জল আসিল। শেষদেখা আর কই হইল

সেবার আসিবার সময় হাতখানা ধরিয়া কত কাকুতি-মিনতি করিয়া মা বলিয়াছিলেন, "আর একটা দিন থাকিয়া যা," কিন্তু থাকা আর হয় নাই। শ্বশুরঠাকুরের যে রাগ!...তার পর মা'র অসুখের খবর যখন আসিল তখন এখানে শ্বশুরঠাকুর মরণাপন্ন, সমরেশের ১০৫ জ্বর। সে সময়টা কি ভাবেই গিয়াছে!...মা'র সঙ্গে দেখা হইল না, বাবার সঙ্গেও হয়ত হইবে না।......না, তিনি যাইবেনই। দুই দিন থাকিয়াই চলিয়া আসিবেন।

দাদা শুনিয়া সুখী হইলেন। কিন্তু সমরেশকে যে কিছুতেই বুঝান যায় না। সে বলে, গেলেই উঁহাদের খরচপত্র বাড়িবে। মামার চাকুরী নাই, এখানে আসিবার টাকাটাও নিশ্চয় তাঁহাকে ধার করিয়া আনিতে হইয়াছে। এখন যাওয়া মানে তাঁহাদিগকে কষ্ট দেওয়া; না-গেলে তাঁহাদের মনে যে কষ্ট হইবে, গেলে আদর করিতে না পারিলে কষ্টটা তাহা অপেক্ষা কম হইবে না।

বার-বার বলাতে অবশেষে সমরেশ বলিয়াছে, "যা ভাল বোঝ কর।"...কিন্তু এদিকে যে বড় মুস্কিল হইল। বাক্সের একেবারে তলায় অনেক দিন আগেকার জমান দুইটি টাকা আছে বটে, কিন্তু এই রাত্রে এখন বাবার জন্য লইয়া যাইবার কি জিনিষ পাওয়া যায়?...কিছু সরু আতপ চাউল আর নূতন গুড়ের পাটালী। বাবা নূতন গুড়ের পায়েস বড় ভালবাসেন।...ইলিশমাছ আর এখন পাওয়া যাইবে না, নইলে কাটিয়া লবণ মাখিয়া লইয়া যাইতে পারিলে বেশ হইত।

রাত্রে সকলে খাইতে বসিলে ছেলেবেলার কত গল্প হইল। রথতলার মেলার কথা, বাবুগঞ্জ খালের কথা, মল্লিক-বাড়ি যাত্রার কথা—কত কথা—কথাই আর ফুরাইতে চায় না।

কিন্তু সমরেশ যেন কেমন ভার-ভার। কেমন যেন ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না। বড়মাকে ছাড়িয়া একদিনও চলে না উহার। সত্যই, উহার বড় কষ্ট হইবে।

খাইয়া শুইতে যাইবার সময় সমরেশ ঘরে মাকে ডাকিয়া লইয়া আবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে বলিল। বুঝাইল ইহার চেয়ে মামার সঙ্গে দাদামশাইকে কয়েকটা টাকা পাঠাইয়া দিলে অনেক বেশী ভাল হইবে। এদিকে আবার মন্টুটার গায়ে হাত দিয়া দেখা যাইতেছে জ্বর বাড়িয়াছে, ১০৩° ত হইয়াছেই, বেশীও হইতে পারে।

রাত্রে শুইয়া আর ঘুম আসিল না। কেবলই ভাবনা আসে, কেবলই ভাবনা আসে। এক-একবার মনে হয় পাশের ঘরে মন্টুটা বড় বেশী কোঁকাইতেছে।...বড় ভুগিতেছে একরত্তি ছেলেটা। সারাদিন কেমন টক্ টক্ করিয়া কথা কয়, কেমন হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, কিন্তু জ্বর হইলেই একেবারে নেতাইয়া পড়ে। শরীরে মোটেই মাংস নাই, কেবল কয়েকখানা হাড়। পিঠের শিরদাঁড়াটা যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।...

...ধীরে ধীরে চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিল।...

...দাদা বলিলেন, "এটা কি গ্রাম মাঝি? রহমৎপুর কি পার হ'লাম? বাবুগঞ্জের খাল আর কত দূর?" দাঁড়ে ঠেলা দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাঝি বলিল, "রহমৎপুর তো অনেক ক্ষণ ছাড়িয়া আইছি কত্তা, সামনের এইডাই তো বাবুগঞ্জের খাল।" মাঝির উচ্চারণ শুনিয়া হাসি আসে। অনেক দিন পরে অনেক দিন আগেকার পরাণ-মাঝির কথা মনে পড়ে। বহুদিন হইল সে নাই, কবে নাকি সে মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ বাপের বাড়ি ফিরিবার পথে সে-ই যেন প্রথম অগ্রসর হইয়া গ্রামের শিশুকে গ্রামে ফিরাইয়া লইতে আসিল।...

...বাবুগঞ্জের খালে আসিয়া পড়িয়াছি? তবে তো দেরি আর নাই। বাঁক ফিরিলেই তো গ্রাম দেখা যাইবে।...

...ঐ যে কুণ্ডুবাবুদের মঠ না দাদা? আর ঐ তো রথতলার সেই পুরনো বটগাছটা। আচ্ছা, সেই নারিকেল-গাছ দুটো কোথায় গেল, যার তলায় গোপালবাড়িতে বিয়ের সময় এসে 'ওঁরা' ছিলেন? প'ড়ে গেছে? বাইশ সনের বানে? ও।...

...এই তো সেই গোপালবাড়ি। এর পরে দাশঠাকুরদের কাছারী-বাড়ি, তার পর মল্লিকদের নাটমন্দির, তার পর স্মৃতিরত্নের টোল, তার পর—তার পরই তো—!...এই তো বাড়ির ঘাট। ঘাটে দাঁড়াইয়া কে কে? বাবা আর মা। মা? হ্যাঁ মা-ই তো! কিন্তু মা কেন? মা অমন করিয়া কাঁদেনই বা কেন? কি বলিতেছেন?—ওরে আমার মা—ওরে মা—মা-আ-আ-আ-আ...ধড়মড় করিয়া বড়মা বিছানায় উঠিয়া

বসিলেন। ও-ঘরে মঞ্জুটা গোঙাইয়া গোঙাইয়া কাঁদিতেছে না? জ্বর কি আরও বাড়িল নাকি? সমরেশটা কি করিতেছে? বৌমাও কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নাকি? ছেলেটা যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল একেবারে! নাঃ, ইহারা মোটেই ছেলেপিলে মানুষ করিতে জানে না।

আজ আবার সেই সকালবেলা। ভোরে দাদা চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত সরু চাল নূতন গুড় আর দশটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। এদিকে জ্বর কমিয়া যাইতেই মঞ্জু আবার বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছে। আর মণ্টু মুকুলরাণীর দল 'দাদু' যাইবার সময় যে একটা করিয়া পয়সা দিয়া গিয়াছেন তাহা লইয়া মহাস্ফুর্ত্তিতে হৈ-চৈ করিতেছে। বড়মা আবার সেই তরকারী কুটিতে বসিয়াছেন: দীপ্তি তাঁহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিতেছে, "ছোটবুড়ি, ও ছোটবুড়ি, একটা পয়সা নেবে?"

বড়মা যেন সেখানে নাই।···

···প্রৌঢ় জীবনের একঘেয়ে দিনগুলির মধ্যে লঘু-স্বপ্নের মত অনেক দিন আগেকার চেনা একটা দিন কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল আবার কোথায় মিলাইয়া গেল। মনে হয় উহা যেন আসে নাই, উহা যেন ছিল না। মনে হয় পরশু যে দিন গিয়াছে তাহার পরের দিনই আজ।··· স্বপ্নের উত্তেজনার পর শরীর আজ ঘন অবসাদে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, ক্লান্ত মন ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া সম্মুখ ও পশ্চাতের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছে—কত দূর আসিয়াছি গো? আর কত দূর? উত্তর পাওয়া যায় না। সম্মুখে যতই চাওয়া যায়, অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। পশ্চাতে কিছু কিছু দেখা যায়, কিছু কিছু বুঝা যায়,—কিন্তু বড় অস্পষ্ট, বড় ছায়া-ছায়া,—চোখের জলে ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা।

অপূর্ব্বা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

দু-দিন আগেই তোমারে দেখেছি
দেখেছি এ দু-চোখেই,
তুমি ত সে তুমি নেই!
ঐ মুখ, ঐ দিঠি,
ঐ বাহু, ঐ নিটোল গ্রীবার
শুভ্র, কোমল, সুন্দর আর
অনিন্দ্য ভঙ্গিটি,
মাত্র দু-দিন আগে
তোমাতেই ছিল?—সন্দেহ মনে জাগে!

আজ এ যে তুমি পথ দিয়ে চলে যাও,
আমার মনের গহন-কিনারে
বহে বসন্ত-বাও।
ঘরেও যখন থাক,
দূরে থেকে আরও গূঢ় রহস্যে
আপনারে যেন ঢাক!
ফিরে ফিরে সারাখন
কেবলি ভাবনা
কোথায় তোমার মন!
তার সাথে একে একে
মনে পড়ে থেকে থেকে
পায়ের পাতার উপরে
কেমন বেঁকে—
লুটায় শাড়ীর লাল পাড়খানি ধীরে।
কানের দু-পাশ ঘিরে
কালো অলকের লীলা চলিয়াছে নামি।
কি কথা ভাবিয়া মুখ ফিরাইতে
চোখে চোখ প'ড়ে চলা তব যায় থামি।
শঙ্খের মত কণ্ঠ তোমার
রেখায় রেখায় আঁকা,

হাল্‌কা দেহটি স্বপ্নের মত ফাঁকা!
বেতস না প্রজাপতি!
তুমি যে তুমি-ই—
তোমারে ছাড়িয়া
আর কিছু মনে
জাগে না ত সম্প্রতি!
যা-ই করো তুমি
সকলি তোমায় সাজে,
খুঁৎটুকু,—তা-ও চাঁদে কলঙ্ক,
না থাকিলে চলে না যে।
বলো ত এ কোন্ লীলা,
এতকাল ধরি তোমাতে যা-কিছু
আছিল অন্তঃশীলা
তবে কি সে একা আমারি প্রাণের টানে
উঠিছে ফুটিয়া
নব নব রূপে নিতি নব সন্ধানে!
হয়ত একদা শেষে
শাখা হবে খালি
ফুল যাবে ঝ'রে
ধোঁয়া-ধূলি-জালে দিক্ আঁধারিয়া
আসিবে সর্ব্বনেশে
কালবৈশাখী ঝড়।
ধরাতল থরথর
চৌচির হয়ে ধ্বসে যাবে সব,
প্রলয়োৎসব
সুরু হবে নিদারুণ।
বিরাগ-আগুন
পুড়ে ছারখার ক'রে দিবে এই
আজিকার স্মৃতিটিরে।
প্রাণের শ্মশানতীরে
প্রেতের মতন ফিরিবে জ্বলিয়া
দিশাহারা আশাগুলি
ব্যথায় কাঁদিবে অট্টহাস্য তুলি'।
নূতন বরষে আবার ভরসা
আসে যদি তারও পরে,
মন যদি বিস্ময়ে
অতীতের বরষারে,
নবীন জলদধারে
তোষে যদি নব চাতকীর নব তৃষা,
নূতন শরতে ভুলে যায় যদি
আজি শরতের এই পূর্ণিমা-নিশা,
সেদিন ফাগুনবেলা
তোমারে ভুলিয়া আর কোনো বনে
হেরে যদি আঁখি
নূতন রঙের খেলা,—
তাই আগে বলে রাখি—
তোমারে পাইয়া প্রথম খুলিল
ভাল দেখিবার আঁখি;
ভাল লাগিবার প্রাণ
সবাকার আগে তোমারে করিনু দান।
হ'তে পার নিরুপমা
তার চেয়ে তুমি এ-কথাও জেনো,
সেই সত্যই বড় করি মেনো,—
অন্তত এই আজিকার তরে
মোর অন্তরে
একেশ্বরী গো তুমি আছ প্রিয়তমা।
বিশ্বাস ক'রো সখি
ঘটনার পাকে পরে যে-ই জিতি ঠকি,
ক্ষণতরে হোক্, হোক ছুটি কথা
তবু তা-ই তুচ্ছ কি?
যাই হোক্, তবু এই ত প্রথম —
প্রেমের এ অনুভব;
এমন করিয়া এ-জীবনে কভু
হওয়া সে কি সম্ভব?
তাই নিবেদিনু অগোচরে,—এতে
হও যদি হ'য়ো বাম;
এ-ও ভেবে দেখো,—হ'তেও ত পারে,
যা দিনু তোমারে
চিরকালে আর মিলিবে না তার দাম।

আলোচনা

ভদ্রলোকের মাপকাঠি কি

কাজী সেরাজুল হক্

গত ফাল্গুনের প্রবাসীতে শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের অভিভাবণটি পড়ে স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—ভদ্রলোক কে? ভদ্রলোকের মাপকাঠি কি? কোন্ জাতীয় লোক ভদ্র-পদবাচ্য? "ভদ্রলোক" কথাটি কি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ? চন্দ-মহাশয় বলেছেন—"ভদ্রলোকের হস্তগত চাকুরী এখন করিবেন মুসলমান এবং অনাচরণীয় হিন্দুগণ।" চন্দ-মহাশয়ের মতে একমাত্র মুসলমান এবং অনাচরণীয় হিন্দুগণ ভদ্রলোক-পদবাচ্য নন। কেন নন চন্দ-মহাশয় তা বলেন নি, বলা দরকার মনে করেন নি। আমরা জানতাম 'ভদ্রতা' trade-mark নয়! যিনি শিক্ষাদীক্ষায় উচ্চ, ব্যবহার যাঁর অমায়িক, চলাফেরা যাঁর শালীনতাসম্মত, যিনি গর্ব্বিত নন প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই ভদ্র। শিক্ষিত না হলেও ভদ্র হ'তে পারা যায়। পরের চাকুরী করলেই ভদ্র হওয়া যায় না। কেবল মাত্র উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাই চাকুরী করেন না—আরও অনেকে ক'রে থাকেন।

সম্পাদকের মন্তব্য

লেখক মহাশয়ের চিঠিখানি সংক্ষিপ্ত করিয়া ছাপিলাম। তাঁহার যে মন্তব্যগুলি বাদ দিলাম, তাহাও প্রধানতঃ "ভদ্রলোক" কথাটির অন্তর্গত "ভদ্র" শব্দের অর্থ লইয়া। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ইচ্ছা করিলে ও আবশ্যক বোধ করিলে এ-বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন। আমাদের বক্তব্য এই, যে, "ভদ্রলোক" কথাটি অনেক সময় যোগরূঢ় ভাবে ব্যবহৃত হয়, এবং সেইরূপ অর্থে ইংরেজীতেও উহার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, চট্টগ্রাম বা মেদিনীপুরে যখন সরকারী হুকুমে নির্দ্দিষ্ট একটা বয়সের হিন্দু "ভদ্রলোক"-দিগকে সন্ধ্যা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বাড়ির বাহিরে যইতে নিষেধ করা হয়, তখন অন্য হিন্দুরা ক্রুদ্ধ হইয়া "ভদ্রলোক" শ্রেণীভুক্ত হইতে চান না, কারণ তাঁহারা জানেন, গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে ভদ্রতাশূন্য বলেন নাই

বঙ্গে অষ্টম শতাব্দীতে নৃপতি-নির্ব্বাচন

শ্রীমনোজ বসু

প্রবাসী ফাল্গুন (১৩৪১) সংখ্যায় বিবিধ প্রসঙ্গে 'বঙ্গে অষ্টম শতাব্দীতে নৃপতি নির্ব্বাচন' নিবন্ধে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের দিব্য-স্মৃতি-উৎসবের অভিভাষণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে পাইলাম—

"...জনসাধারণের দ্বারা আহূত বা নির্ব্বাচিত হইয়া, রাষ্ট্রীয় সাধন-সমরে অবতীর্ণ হইয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সুলভ নহে। সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ দুই জন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দুই জনের এক জন, পালরাজ-বংশের প্রথম রাজা গোপালদেব…দ্বিতীয়, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সংঘটিত রাষ্ট্রবিপ্লবের নায়ক দিব্য…"

এ-সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বৃহৎ বঙ্গ' পুস্তকের (যাহা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অতিশীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে) ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

'...প্রজারা মেষবৎ নিরীহ এবং রাজভক্ত ছিল না। অনেক সময়ে ইহারা রাজাদের হননকারী ও ভাগ্যবিধাতা ছিল। প্রজাদের অসন্তোষে ত্রিপুর-রাজ প্রতাপমাণিক্য (১৪৩৩ খ্রীঃ), জয়মাণিক্য (১৫৯৬ খ্রীঃ) অহংরাজ সুহেন ফা (১৪৯৩ খ্রীঃ) সুজিন ফা (১৬২৭ খ্রীঃ) ভগরাজা সুয়ান ফা (১৬৪৪ খ্রীঃ) এবং লক্ষ্মণ সিংহ (১৭৮০ খ্রীঃ) নিহত হন। …আমরা বাহুল্যভয়ে এই তালিকা বাড়াইলাম না। …রাজার বংশধর না থাকিলে রাজোচিত গুণের পরিচয় পাইয়া ইহারা (প্রজারা) রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছে। যে যে স্থানে তাহারা রাজাকে হত্যা করিয়াছে, পরবর্ত্তী রাজাকেও তাহারাই মনোনয়ন করিয়াছে। ত্রিপুররাজ যশোমাণিক্যের পরে রাজবংশের কেহ উত্তরাধিকারী ছিল না; "রাজপুত্র পৌত্র নাহি, নাহি রাজভ্রাতা। কাহাকে করিব রাজা জানিয়া সর্ব্বথা॥ সেনাপতি মন্ত্রিগণ চিন্তিয়া তখন। কাহাকে করিব রাজা না দেখে লক্ষণ॥ মহা মাণিক্য-বংশে কল্যাণ নাম খ্যাতি। যশোধর কালে কৈলাগড়ে সেনাপতি॥ করেছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান্। সেই রাজযোগ্য হয় দেখ বিদ্যমান॥ এ সব চিন্তিয়া সেনা পাত্র মিত্রগণ। কল্যাণ নাম সেনাপতি বসে সিংহাসন॥" এই ব্যক্তিও পালবংশীয় গোপালের ন্যায়ই নানা যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়া স্বীয় রাজযোগ্য গুণাবলীর পরিচয় প্রদানান্তর প্রজাদের কর্ত্তৃক রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনিই একমাত্র প্রজানির্ব্বাচিত রাজা ছিলেন না। খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের মহারাজ ধর্ম্মপালও এই ভাবে প্রজাদের মনোনয়নে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আসামের বৈষ্ণবদের দ্বারা লক্ষ্মীসিংহ মহারাজ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হইলে, বৈষ্ণবেরা মোয়ামারিয়া বড় গোস্বামীর পুত্র বনাগণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বনাগণের পিতা পুত্রকে সাংসারিক প্রতিষ্ঠার লোভী হইতে দেন নাই।…'

অতএব দেখা যাইতেছে, চন্দ-মহাশয়ের উল্লিখিত কেবলমাত্র "দুই জন" নহে অনেক মহাজনই জনসাধারণের দ্বারা আহূত ও নির্ব্বাচিত হইয়া রাজত্ব পাইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বৃহৎ বঙ্গের লোক। এ-বিষয়ে চন্দ-মহাশয়ের অভিমত জানিতে চাহি। চন্দ-মহাশয় হয়ত কেবল তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া দেশের অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্রগুলির প্রতি ততটা মনোযোগ দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু এক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত বিষয়-গুলিকে অগ্রাহ্য করিবার সঙ্গত কারণ নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক শ্রীহট্টের দুই ব্রাহ্মণ টিপরা ভাষা হইতে বৃদ্ধ চন্তাইর সহায়তায় ত্রিপুরা-রাজ্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন। রাজসভার পণ্ডিতেরা পরবর্ত্তীকালে সেই গ্রন্থে নূতন বিষয় যোজনা করিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি করেন। রাজমালার প্রাচীন ও জরাজীর্ণ বহু পুঁথি রাজপাঠাগারে রক্ষিত আছে, উহা তাম্রশাসনাদি অপেক্ষা কম বিশ্বসনীয় নহে। আর আসামের অহম রাজাদের যে ইতিহাস আছে তাহা গেট (Gait) সাহেবের মতে একেবারে নিখুঁত। তিনি লিখিয়াছেন, অহমদের মত ইতিহাস-লেখক জগতে বিরল; এক্ষেত্রে মুসলমানেরাও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, প্রায় এক মাস ধরে ঘুরেছি। এবারে বেরিয়েছিলুম পশ্চিম-ভারতের অভিমুখে। গিয়েছি লাহোর পর্য্যন্ত। এই কারণে চিঠিপত্র অনেক কাল বন্ধ। শান্তিনিকেতনে যখন আপনাদের ভাবে ও কাজে বেষ্টিত হয়ে থাকি, তখন সমগ্র ভারতের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক রূপটা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই নে। এবারে মূর্ত্তিটা দেখা গেল। তুমি যে মহাদেশে আছ সেখানে মানুষের চিত্ত-সমুদ্রে সুরাসুরের মন্থন চল্‌ছে, আবর্ত্তিত হয়ে উঠছে বিষ এবং অমৃত প্রকাণ্ড পরিমাণে। সেখানে চিন্তা বলো, কর্ম্ম বলো, কল্পনার লীলা বলো সমস্তের মধ্যেই একটা বিরাট বেগের উৎক্ষেপ বিক্ষেপ নিরন্তর চলেছে—প্রত্যেক মানুষের জীবনে সেখানে সমস্ত মানুষের উদ্বেল জীবনের আঘাত প্রতিঘাত কেবলই কাজ করছে। সেখানে মানুষের সম্মিলিত শক্তি ব্যক্তিগত শক্তিকে অহরহ রাখছে জাগিয়ে। ভারতবর্ষের দিগন্ত আবদ্ধ হয়ে রয়েছে সঙ্কীর্ণতার প্রাচীরে। সেই বেড়ার মধ্যে যা হচ্ছে তাই হচ্ছে, তার বাইরের দিকে বেরোবার কোনো গতি নেই। যেখানে জীবনের ভূমিকা এত ছোট সেখানে মানুষের কোনো চেষ্টা চিরন্তনের ক্ষেত্রে কোনো বৃহৎ রূপ প্রকাশ করবে কিসের জোরে। ইতিহাসের যে পটে আমাদের ছবি উঠেছে সে ছিন্ন ছিন্ন পট, তার চিত্রের রেখা ক্ষীণ, বর্ণ অনুজ্জ্বল, তাতে প্রবল মনুষ্যত্বের স্পষ্টতা ব্যক্ত হবার পরিপ্রেক্ষণিকা পাওয়া যায় না। তাই আমাদের পলিটিক্স, সাহিত্য, কলাবিদ্যা সব কিছুরই মাপকাঠি ছোট। এই নিয়ে মহাজাতির পরিচয় গড়ে তোলা অসম্ভব। এই পরিচয়ের অভাবে আমাদের আত্মসম্মানবোধের আদর্শ নীচে নেমে যায়।

সর্ব্বত্রই দেখা গেল হোয়াইট পেপার নিয়ে আলোচনা চলছে। ছেলেবেলায় কাঙালীবিদায়ের যে দৃশ্য দেখেছি তাই মনে পড়ে। ধনীর প্রাসাদ অভ্রভেদী, তার সদর ফাটক বন্ধ। বাহিরের আঙিনায় জীর্ণ চীর পরা ভিক্ষুকের ভীড়। কেউ পায় চার পয়সা, কেউ দু-আনা, কেউ চার আনা। তক্‌মা-পরা দ্বারীদের সঙ্গে তাদের যে দাবীর সম্বন্ধ তা কেবল কণ্ঠের জোরে। এই জন্যে তার স্বরের চর্চ্চাটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। সব চেয়ে যেটা লজ্জা, সে এই ভিক্ষুকদের নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি নিয়ে। যে ব্যক্তি দান করছে, সুদূর ঊর্দ্ধে দোতলার বারান্দায় তাদের আত্মীয়কুটুম্বের মজ্‌লিশ। যত কম দিয়ে যত বেশি দেওয়ার ভড়ং করা যেতে পারে স্বভাবতই তাদের সেই দিকে দৃষ্টি। রাজদ্বারীদের এক হাতে সিকি দুয়ানির থলি, আরেক হাতে লাঠি; সেটা পড়ছে, যারা বেশি চীৎকার করে তাদের মাথার 'পরে।

দেখতে দেখতে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল, এর মধ্যে ভাবী কালের যে সূচনা দেখা যাচ্ছে তা রক্ত-পঙ্কিল। লক্ষৌয়ে এক জন মুসলমান ভদ্রলোক আক্ষেপ ক'রে বলছিলেন, কী করা যায়। আমি বল্‌লুম, রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে মিলতে হবে। আজকাল পল্লীগঠনের যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টার ঐক্যবন্ধন সৃষ্ট হ'তে পারে। তিনি বললেন আগা খাঁ এই কাজে মুসলমানদের স্বতন্ত্র হয়ে চেষ্টা করতে মন্ত্রণা দিচ্ছে। পাছে গান্ধিজীর অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আপনি মিলন ঘটে সেই সম্ভাবনাটাকে দূর করবার অভিপ্রায়ে এই দৌত্য। বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হওয়াই মুসলমানের স্বার্থরক্ষার প্রধান উপায়। এতকাল ধর্ম্মে যে দুই সম্প্রদায়কে পৃথক করেছিল আজ অর্থেও তাদের পৃথক ক'রে দিল—মিল্‌বে কোন শুভবুদ্ধিতে আপীল ক'রে? না মিল্‌লে ভারতে স্বায়ত্তশাসন হবে ফুটো কলসিতে জল ভরা।

কোনো এক সময়ে য়ুরোপে যখন প্রলয়কাণ্ড ঘটবে তখন ইংরেজের শিথিল মুষ্টি থেকে ভারতবর্ষ খসে পড়বেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো এত বড় দেশে দুই প্রতিবেশী জাতির মজ্জায় মজ্জায় এই যে বিষবৃক্ষ আজ বর্দ্ধিত ও শাখান্বিত হ'ল কবে আমরা তাকে উৎপাটিত করতে পারব?

আমরা নিরস্ত্র আমরা নিঃসহায়, বিনাশের সঙ্গে লড়ব কী ক'রে? পঞ্জাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক এবং লজ্জাকররূপে অসভ্য। বাংলার অবস্থা তো জানোই—এখানে উভয় পক্ষের বিকৃত সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে প্রায়ই যে সব বীভৎস অত্যাচার ঘট্ছে তাতে কেবল অসহ্য দুঃখ পাচ্ছি তা নয়, আমাদের মাথা হেঁট ক'রে দিলে।

এখন দোহাই দেব কার? সভ্যতার দোহাই? কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষের যে সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্ত্তমান, সে সভ্যতা মানুষখাদক। তার জন্ত এক দল খাদ্য চাই-ই, চাই তার বাহন। তার ঐশ্বর্য্য তার আরাম, এমন কি তার সংস্কৃতি উপরে মাথা তোলে নিম্নতলস্থ মানুষের পিঠের উপর চ'ড়ে। এই নিয়েই য়ুরোপে আজ শ্রেণীগত বিপ্লবের লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে। লোভ প্রবৃত্তিটা সর্ব্বব্যাপী হ'তে পারে কিন্তু লোভের ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রের অধিকারীকে স্বল্পপরিমিত হ'তেই হবে। যে-কোনো কারণ বশতই হোক যার জোর আছে সে সেই ক্ষেত্রকে নিজে অধিকার ক'রে অন্যের উপর প্রভুত্ব করে। এমন অবস্থায় জোরের সঙ্গে জোরের সমানে সমানে লড়াই চলে, কিন্তু সেখানে ডিপ্লমাসির চাল চেলে নানা আকারের রফানিষ্পত্তি হ'তে থাকে। কিন্তু যেখানে এক পক্ষের জোর আছে অন্ত পক্ষের জোর নেই সেখানে নির্ব্বল পক্ষ আপনার প্রাণ দিয়ে অপরকে পোষণ করবার কাজে লাগে। যত ক্ষণ লোভ রিপু এই বর্ত্তমান সভ্যতার ও স্বাজাত্যের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে কাজ করে তত ক্ষণ এর থেকে বলহীনের নিষ্কৃতি নেই; কেননা, যে দুর্ব্বল এই সভ্যতা তারই প্যারাসাইট্। অতএব প্রবলের হাত থেকে যখন দানপত্র আসবে তখন তা অত্যন্তই হোয়াইট পেপার হয়ে আসবে, তাতে রক্তের লেশ থাকবে না; সেই পাতে যে উচ্ছিষ্ট আমাদের ভোগে পড়বে সেটা হবে কাঁটাচচ্চড়ি, তাতে মাছের গন্ধ থাকবে মাত্র—খাদ্যবস্তু অতি অল্পই থাকবে। লোভী মনিবের পাত থেকে সেই মোটা মাছের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করব কিসের জোরে? কেবলমাত্র পেটভরার চেয়ে বেশি জোগান তার নিজেরই যদি না থাকে তবে সেটাতে তার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেবে না; তার যে সভ্যতা প্রাচুর্য্য-অভিমানী তারও দাবী তো মেটাতে হবে। কী দিয়ে? যে দুর্ব্বল তারই ক্ষুধার অন্ন দিয়ে। এই ক্ষুধা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কত বড় চির-দুর্ভিক্ষের আসন পেতে আছে তা কি জানো না? এর অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক অনটনও যখন ওদের ভাগ্যে দৈবাৎ ঘটে তখন ওরা কী রকম ব্যাকুল হয়ে ওঠে তা তো আমরা দেখেছি।

এই পেটুক সভ্যতা-সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী ক'রে? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে? শুধু তাদের প্রাণরক্ষার জন্যে নয়, তাদের মানরক্ষার জন্যে, তাদের অতিরিক্তের তহবিলকে স্ফীত রাখবার জন্যে! এই যদি অপরিহার্য্য হয় তবে চার্চ্চহিলের জবাব দেব কী? এই সমস্যা তো সবলের সামনে নেই। তাদের সমস্যা বলের সঙ্গে বলের প্রতিযোগিতা নিয়ে। এই প্রতি-যোগিতা আজকাল সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এর প্রকাণ্ড আঘাতে ওদের দেহগ্রন্থি শিথিল হয়ে আছে, আরও আঘাতের আশঙ্কা চারদিকেই উদ্যত। এমন অবস্থায় যারা বুদ্ধিমান তারা দুর্ব্বলের সহায়তাকেও উপেক্ষা করে না। বিগত যুদ্ধে সেই সহায়তা পেয়ে চার্চ্চহিল্ও কৃতজ্ঞের বদান্যতায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আর কখনো যে সেই সহায়তার প্রয়োজন হবে না তা বলা যায় না। কিন্তু কৃতজ্ঞতার স্মৃতি স্বল্পস্থায়ী, তার উপরে ভর দিয়ে আমাদের আবেদনের ভিত্তি পাকা করবার ব্যর্থ চেষ্টা দুর্ব্বলের পক্ষে বিড়ম্বনা।

যখন সামনে এত বড় দুর্ভেদ্য নিরুপায়তা দেখি তখনই বুঝতে পারি যে দুর্ব্বলের প্রতি নির্ম্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হ'লে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষায় নিক্ষিপ্ত রুটির টুক্রো নিয়ে আমরা বাঁচব না। সভ্যতার বণিক্‌বৃত্তি যত দিন না ঘুচবে তত দিন ভারতবর্ষকে ইংরেজ মহাজনের পণ্যদ্রব্য হয়ে থাকতেই হবে, কোনো-মতেই তার অন্যথা হ'তে পারবে না। এক পক্ষে লোভ যে-রাষ্ট্রব্যবস্থার সারথি, সেখানে অপর পক্ষে দুর্ব্বলকে বল্গাবদ্ধ বাহন দশা যাপন করতেই হবে। অবস্থাবিশেষে

কখনো দানা বেশি জুটবে কখনো কম। অসহিষ্ণু হয়ে যে-জীব হ্রেষাধ্বনি করবে পা-ছোঁড়াছুঁড়ি করবে তার স্পর্দ্ধা টিঁকবে না।

য়ুরোপের যে সভ্যতার পিঞ্জরে বাঁধা হয়ে আছি আমরা, ঐশ্বর্য্যভোগের বিষবাষ্প তার তলায় তলায় জ'মে উঠেছে। সে কি নিরাপদ প্রতাপের কোনো মন্ত্রের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে তার লোহার ক্যাশবাক্সের মধ্যে? অনেক বড় বড় জাত লুপ্ত হয়েছে, অনেক উদ্দামগতি ইতিহাস হঠাৎ পথের মাঝখানে মুখ থুবড়ে প'ড়ে স্তব্ধ হয়েছে, আর আমরাই যে হোয়াইট পেপারের ক্ষুদকুঁড়ো খুঁটে খুঁটে খেয়ে চিরকাল টিঁকে থাকবো এমন আশা করি নে—মরণদশার অনেক লক্ষণ তো দেখতে পাই।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ ঘুরে অবশেষে ফিরে এলেম আপন কুলায়ের কোণে। ভারতে দেখলুম আলোহীন, মাহাত্ম্যহীন ধূলিনত জীবনের রঙ্গভূমি। অল্প কিছু সম্বল নিয়ে অভুক্ত প্রাণের ছোটখাটো প্রয়োজন, জীর্ণ আসবাব, উপস্থিত মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র দাবীর উপর বহুকোটি মানুষ প্রতিদিনের মাথা গোঁজবার পাতার কুঁড়ে বাঁধছে, তাতে বৃষ্টিজল রৌদ্রের তাপ নিবারণ হয় না। ধনী পথিক কটাক্ষে চেয়ে চলে যায় আর ভাবে এই এদের যথেষ্ট কেননা ওরা আমাদের থেকে অনেক তফাৎ—আমরাও ভাবি এই আমাদের বিধিলিপি। বুঝতে পারি ওরা যে-গ্রহের আমরা সে গ্রহের নই।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শতবর্ষ পূর্ব্বের বাংলার শর্করা-শিল্প

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম-এ, ভাগবতরত্ন

সরকারী বিবরণে দেখা যায় যে বাংলা দেশে ইক্ষুর চাষ যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই এমন কি আসাম হইতেও কম। সেই জন্য বাংলা দেশ শর্করা-শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে বলিয়া ভারত-সরকার কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়। ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার *Foundations of Indian Economics* (১৯১৬ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ কেবলমাত্র গুড় এবং অত্যন্ত কদর্য্য চিনি ভারতীয়দের চাহিদা মিটাইবার জন্য তৈয়ারি করিয়াছে (১০৬ পৃঃ)। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অবশ্য তৎপূর্ব্বে তাঁহার *India in the Victorian Age* গ্রন্থে দেখাইয়াছিলেন যে ১৮৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে এত চিনি ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়াছিল যে ইংরেজদের সমগ্র চাহিদার সিকি অংশ তাহাতে মিটিয়াছিল। দত্ত-মহাশয় কিন্তু বাংলার বা সমগ্র ভারতের চিনির ব্যবসায়ের কোন বিবরণ তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে দেন নাই। এই প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলা দেশে ইক্ষুর চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত এবং শর্করা-শিল্প যথেষ্ট সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ডক্টর ফ্রান্সিস্ বুকানন্ বাংলা ও বিহারের কয়েকটি জেলা পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল জেলার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার বিহার-সম্বন্ধীয় রিপোর্টগুলি পূর্ণ আকারে বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু বাংলা সম্বন্ধীয় রিপোর্টগুলির সংক্ষিপ্তসার মাত্র মার্টিনের *Eastern India* গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ আছে। উক্ত গ্রন্থের দিনাজপুর-সম্বন্ধীয় বিবরণে দেখা যায় যে দিনাজপুর শর্করা-শিল্পের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঐ জেলায় ৭৫,০০০. বিঘা জমিতে ইক্ষুর চাষ হইত। তিনি লিখিয়াছেন যে পূর্ব্বে আরও বেশী জমিতে ইক্ষু উৎপন্ন হইত, কিন্তু অনেক নদী শুকাইয়া যাওয়ার দরুন জলের অভাবে ইক্ষু-চাষের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। দক্ষিণ-

দিনাজপুরের জমিতে কৃষকগণ যত্ন করিয়া গোবর, পুকুরের পাঁক, ছাই ও খোল সার দিত বলিয়া সেখানে উত্তর-দিনাজপুর অপেক্ষা ভাল ইক্ষু অধিক পরিমাণে জন্মিত। তথায় এক বিঘা জমিতে ১৬৮ মণ ইক্ষু জন্মিত ও তাহা হইতে ১৪ মণ গুড় তৈয়ারি করা যাইত। ১৯৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পাটনা কলেজের চাণক্য-সোসাইটির রিপোর্টে দেখা যায় যে বিহারে এখন প্রতি-বিঘায় ২০০ মণ ইক্ষু জন্মে। বিহারের বিঘা বাংলার বিঘার প্রায় ডবল, এবং বিহারের কৃষি-বিভাগ দেশী ইক্ষুর চাষ উঠাইয়া দিয়া কোইম্বাটুরের উৎকৃষ্ট ইক্ষুর বীজ রোপন করাইতেছেন। তাহা সত্ত্বেও শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাংলার জমিতে অধুনাতন বিহার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইক্ষু জন্মিত। উত্তর-দিনাজপুরে প্রতি-বিঘার ইক্ষুতে গড়ে ১২ মণ গুড় প্রস্তুত হইত। সে-সময়ে গুড়ের কাঁচি মণ ছিল দেড় টাকা করিয়া। কেবল মাত্র দিনাজপুর জেলাতেই সাড়ে চার লাখ টাকার ইক্ষু জন্মিত।

ডক্টর বুকানন্ বলেন যে দিনাজপুর জেলায় ১৪১ জন চিনি-প্রস্তুতকারক গড়ে সওয়া দুই লক্ষ মণ গুড় তৈয়ারি করিত। ইহার সিকি পরিমাণ চিনি প্রস্তুত হইত। আট টাকা হন্দর চিনি বিক্রয় করিয়া দিনাজপুরবাসিগণ ৩৩৭,৫০০ টাকা পাইত। মাৎ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া আরও ১৫০,০০০ টাকা পাইত। বাদলগাছির চিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ফুলওয়ারীর চিনি মধ্যম, এবং করতোয়া-তীরের ঘোড়াঘাটের চিনি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত ছিল। দিনাজপুরের চিনির কিয়দংশ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খরিদ করিত, কিন্তু অধিকাংশ ভাগই মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় চালান হইত (Martin: *Eastern India*, vol. II, পৃঃ ৯৭৮-৯৮৬)।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট ভারতীয় চিনির উপর উচ্চতর হারের শুল্ক রহিত করেন। ইহার ফলে ভারতে চিনির ব্যবসা খুব প্রসার লাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুর চাষও খুব বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্লামেণ্ট ভারতীয় চিনি ও কফির অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্ত একটি সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ঐ কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। হার্ডম্যান নামক এক চিনি-উৎপাদক ঐ কমিটির সমক্ষে বলেন যে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যশোহর ও ত্রিহুতে ইক্ষুর চাষ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে (৮০৫ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর)। তিনি Haworth, Hardman & Co. নামক কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন এবং কাশীপুরে তাঁহাদের কারখানা ছিল। তিনি আরও বলেন যে তাঁহাদের কারখানার অধিকাংশ ভাগ গুড়ই যশোহর হইতে খরিদ করিয়া আনা হইত (৭০২ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর)।

১৮৩৬ হইতে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতায় ও তাহার আশপাশে ইংরেজেরা অনেকগুলি চিনির কারখানা খুলিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারখানা ছিল Dhobah East India Sugar Company। ঐ কোম্পানীর সভাপতি কেমশেভ্ সাহেব কমিটির সমক্ষে বলেন যে তাঁহার কোম্পানী শুধু ভারতের মধ্যে নহে, পৃথিবীর মধ্যে চিনি-প্রস্তুত বিষয়ে বৃহত্তম। উহার মূলধন ছিল বিশ লক্ষ টাকা। ১৮৪০ ও ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কোম্পানী প্রতি ১০০ পাউণ্ডের শেয়ারে—যাহার অর্দ্ধেকমাত্র অংশীদারেরা দিয়াছিলেন—১৮ পাউণ্ড লভ্যাংশ দিয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি-শেয়ারে চৌদ্দ-পনর পাউণ্ড লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। বাংলা দেশ যদি চিনি প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র না হইত তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম কোম্পানী কলিকাতায় কারখানা খুলিত না এবং এত অধিক লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইত না।

আলেকজান্দার নামক এক জন বাংলার চিনির ব্যবসায়ে নিযুক্ত বণিক তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, অনেকগুলি বড় বড় চিনির কারখানা কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। এক-একটি কারখানায় দুই-তিন হাজার টন চিনি তৈয়ারি হইত। কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী ব্যাগশ কোম্পানীর কারখানা ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আট লক্ষ টাকার চিনি বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল (১৮২৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর)।

এই সময়ে বাংলা দেশের চিনি ভারতের বহির্বাণিজ্যে তথা ইংলণ্ডে কি স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার বিবরণ উক্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায়। ১৮৩৪-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে তের লক্ষ উনিশ হাজার

নয় শত বাহান্ন টাকার চিনি গ্রেট-ব্রিটেনে রপ্তানী হইয়াছিল। ঐ বৎসর কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত সমগ্র জিনিষের মূল্য ছিল এক কোটী বাহান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাত শত আটান্ন টাকা। ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় ঐ সালে সর্ব্বসমেত এক কোটি সাতান্ন লক্ষ একচল্লিশ হাজার আট শত কুড়ি টাকার জিনিষ আমদানী হইয়াছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় চিনির অভূতপূর্ব্ব প্রসারহেতু বাংলা দেশের লোক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ অপেক্ষা শতকরা ১৬৯ ভাগ বিলাতী দ্রব্য খরিদ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। ১৮৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে বিলাতে এক কোটী পঁয়ষট্টি লক্ষ এক হাজার এক শত আটানব্বই টাকার চিনিই রপ্তানী হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে বিলাতে রপ্তানী সমস্ত দ্রব্যের মূল্য ছিল চার কোটী পঁয়তাল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুই শত একুশ টাকা। বিলাত হইতে ঐ বৎসর যে-সকল দ্রব্য কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল তাহার মূল্য হইয়াছিল চার কোটী চব্বিশ লক্ষ দশ হাজার সাত শত উনত্রিশ টাকা। দেড় কোটী টাকার জিনিষ হইতে সওয়া চার কোটী টাকার জিনিষ যে বাংলা প্রদেশ কিনিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ চিনির ব্যবসায়ের উন্নতি।

১৮৩৫-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কত পরিমাণ চিনি বাংলা দেশ হইতে বিলাতে রপ্তানী হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নলিখিত হিসাব হইতে পাওয়া যাইবে।

১৮৩৫-৩৬	৩,৬৮,৭৬০	মণ
১৮৩৬-৩৭	৬,২১,১১২	,,
১৮৩৭-৩৮	৮,১৪,০৬৫	,,
১৮৩৮-৩৯	৮,৬১,১০০	,,
১৮৩৯-৪০	৮,৪৩,৮৮৩	,,
১৮৪০-৪১	১৭,৮৪,৭৮৩	,,
১৮৪১-৪২	১৫,২২,০১২	,,
১৮৪২-৪৩	১৬,০৫,৭৩০	,,
১৮৪৩-৪৪	১৫,৪২,৫৮১	,,
১৮৪৪-৪৫	১৫,৩৯,১১৭	,,
১৮৪৫-৪৬	১৮,৩৯,৩৭৪	,,
১৮৪৬-৪৭	১৭,১৫,২১৭	,,

(১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট, ২৫-২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

বিলাত ছাড়া অন্যান্য দেশেও বাংলার চিনি রপ্তানী হইত। চিনির ব্যবসায়ী মিঃ আলেকজান্দার তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে অনুমান হয় ৭০,০০০ টন বাংলার চিনি পঞ্জাবের ভিতর দিয়া তাতার, পারস্য ও রুষ দেশে রপ্তানী হয় (১৮২০ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর)।

কলিকাতার আশপাশে চিনির ব্যবসা এতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল যে কারখানায় চিনি তৈয়ারির উপযোগী পাত্রাদি (যথা vacuum pan) কলিকাতায় প্রস্তুত হইত (৭১ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর)। পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ ব্যাগশ বলেন যে চিনির কারখানার জন্য ষ্টীম এঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিও কলিকাতায় প্রস্তুত হইত, যদিও ঐ সব জিনিষ তৈয়ারির খরচা বিলাতের চেয়ে কিছু বেশী পড়িত। তিনি আরও বলেন যে কলিকাতায় অনুমান পঞ্চাশ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি চিনি তৈয়ারীর জন্য খরচ করা হইয়াছে (২৮৫ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর)।

বাংলা দেশ গড়ে ষাট হাজার টন চিনি বিলাতে পাঠাইত। এই পরিমাণ চিনি তৈয়ারির জন্য ইক্ষু উৎপাদন করিতে কত জন লোকের কাজ জুটিত তাহারও ইঙ্গিত উক্ত রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায়। কুক সাহেব বলেন যে প্রতি-একর জমিতে চার হন্দর পরিমাণ চিনি হইতে পারে। সুতরাং ষাট হাজার টন চিনির জন্য তিন লক্ষ একর জমি চাষ করিতে হইত। তিন জন লোক এক একর জমি চাষ করিলে নয় লক্ষ লোক বিলাতের জন্য চিনি-রপ্তানীর উপযুক্ত ইক্ষুক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিতে পারিত। লিওনার্ড রে সাহেব তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, অনেক কৃষক এক কাঠা মাত্র জমিতেও ইক্ষু চাষ করিত, তবে গড়ে আধ একর জমিতে প্রত্যেক কৃষক তাহার স্ত্রীপুত্র লইয়া কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত, সুতরাং নয় লক্ষের চেয়ে বেশী লোকই বিলাতে চিনি-রপ্তানীর সুবিধা থাকায় কাজ পাইত।

প্রবন্ধে বাংলা দেশের কথা বলিয়াছি। তবে যে-সময়ের কথা বলিতেছি সে-সময়ে বিহারও বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ত্রিহুতেও অনেকটা চিনি তৈয়ারী হইত এ-কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

দুই রাত্রির ইতিহাস

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

ষ্টেশন বাংলা দেশেই বটে, কিন্তু গ্রাম বিহারে।

অবশ্য ঐ এক ষ্টেশনে নামিয়া পুরা ছয়খানা গ্রামের লোক বাড়ি যায়, তাহাদের মধ্যে দুইখানি মাত্র বাংলায়, বাকী বিহারে।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই; গ্রামে যাহারা থাকে তাহারা দেখিতে-শুনিতে সব দিক দিয়াই বাঙালী।

ছোট ষ্টেশন। প্লাট্‌ফর্ম নাই, ছোট একখানা ঘর, ষ্টেশনের আপিস, বুকিং ঘর, ষ্টেশন-মাষ্টার ও পোর্টারের দিবানিদ্রার কক্ষ, একাধারে সবই।

কত দিন পরে বিজন এই ষ্টেশনে পা দিল! নয়-দশ—না নয়-দশ কেন—প্রায় বারো বছরের কথা, ম্যাট্রিক দিয়া গ্রাম ছাড়িয়াছিল, আর তাহার পরে এ-গ্রামে ফিরে নাই। বিজন চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল। বারো বছরে খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই। এমন কি ষ্টেশনের বাহিরে যে ঢালু রাস্তা নামিয়া গিয়াছে, তাহার পাশের খেজুরগাছটি, আর গজ-কয়েক দূরে ছোট্ট কাঠের সাঁকোর ধারে খালের উপর হেলিয়া-পড়া অশ্বত্থগাছ, সব ঠিক তেমনি রহিয়াছে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে চোখে পড়িল ষ্টেশনের বাহিরে একটি দোকান, যেখানে চিনির তৈরি সন্দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পান, বিড়ি, এমন কি গোটা দুই-তিন মরিচাধরা টর্চ লাইট পর্য্যন্ত কিনিতে পাওয়া যায়।

এ-ষ্টেশনে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়া যাহারা আসে, ষ্টেশন-মাষ্টারের অপরিচিত তাহারা কেহই নহে। কিন্তু এ-লোকটিকে তাঁহার চেনা মনে হইল না। একটু সন্দিগ্ধ, অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়ের নিবাস?"

এ-ধরণের প্রশ্ন পল্লীগ্রামে কেহ অসঙ্গত মনে করে না। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক রাস্তায় দাঁড় করাইয়া নামধাম, জাতি, 'ঠাকুরে'র নাম, পিতামহের নাম জানিয়া লইবে। নিজের ঊর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষের নাম, ব্যবসা, জমিজমা, সকল খবর দিবে,—ইহাতে পল্লীগ্রামে অবাক বা বিরক্ত হইবার কিছু কেহ খুঁজিয়া পায় না। বারো বছর পরে প্রায় নূতন অভিজ্ঞতা হইলেও বিজন বিরক্ত হইল না। মৃদু হাসিয়া কহিল, "এইখানেই।"

"এইখানে ত অন্ততঃ ছখানা গাঁ আছে মশায়, মুকুন্দপুর, মধুখালি—"

"আমার নিবাস শিমুলডাঙা।"

"শিমুলডাঙা? সে কি মশায়, শিমুলডাঙার প্রত্যেকটি লোককে আমি চিনি, মায় বেড়ালটা পর্য্যন্ত; কিন্তু আপনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না ত! বোধ হয় সম্প্রতি আর এদিকে—?" প্রশ্ন সম্পূর্ণ না-হইতেই বিজন জবাব দিল; কহিল, "না, সম্প্রতি ত নয়ই, বারো বছর আন্দাজ এদিকে আসি নাই।"

ষ্টেশন-মাষ্টারের চোখ স্থানচ্যুত হইয়া প্রায় ললাটে গিয়া পৌছিল। হয়ত আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু বিজন গ্রামের দূরত্বের দোহাই দিয়া বিদায় লইল।

বাহিরে একটি লোক এতক্ষণ ধরিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। বিজন বাহিরে পা বাড়াইতেই নিঃশ্বাস প্রায় রুদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুর গোগাড়ী চাই না?"

গোগাড়ী! বিজনের বিষম হাসি পাইয়া গেল। ঠিক ত; এদেশের লোকের কথা ঠিক যে কলিকাতার মত নহে, সে-কথা বিজন এতক্ষণ খেয়াল করে নাই কেন? কিন্তু গাড়ী একটা হইলে মন্দ হইত না—প্রায় সাত মাইল রাস্তা!

সাত মাইল! বারো বছর আগের দিনগুলি মনে হইলে অবাক হইতে হয়। ছুটির দিনে কতবার সে দলবল-সহ এই সাত মাইল রাস্তা অক্লেশে পার হইয়া আসিয়া প্রায় তেমনই অক্লেশে ফিরিয়া গিয়াছে। আজ সেই রাস্তার জন্য গাড়ী! কিন্তু রাস্তা না-হয় হাঁটিয়াই চলিল, কিন্তু সুটকেসটারও ত একটা ওজন আছে! একটা লোক দরকার

বোধ করিয়া গোগাড়ীর মালিককেই ব্যাগের বাহক ঠিক করিয়া বিজন গ্রামের দিকে হাঁটিতে সুরু করিল।

কিন্তু একটা সুবিধা স্বীকার করিতেই হইবে। ষ্টেশন হইতে শিমুলডাঙা, একটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, দু-পাশে মেঠো রাস্তা, বুনো রাস্তার শাখা রহিয়াছে, কিন্তু পথ ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। হাজার হোক বারো বৎসর ত! বিজন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কারণ ঐ সঙ্গের লোকটি যে-ভাবে হাঁটিতেছে, তাহার সহিত চলিতে গেলে রাত নয়টা বাজিয়া যাইবে। বিজন জোরে পা ফেলিয়া চলিল।

ষোল বছরের কিশোর যে গ্রাম ছাড়িয়াছিল আজ আটাশ বছরের যুবকরূপে সেইদিকে চলিতে বিজনের অনেক কথাই মনে পড়িতে লাগিল। একটু আগে রাস্তা ভুল হওয়ার কথা ভাবিতেছিল মনে করিয়া বিজনের লজ্জা করিতে লাগিল। এই রাস্তা, এই আশপাশে বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়া, জিওলগাছের বনের পাশ দিয়া বাঁশপাতায়-ঢাকা যে-সব সরু সরু পথ চলিয়া গিয়াছে, চোখ বুজিয়া তাহার প্রত্যেকটি দিয়া সে যে-কোন গ্রামে পৌছিতে পারে, মুকুন্দপুর, তিলেডাঙা, মধুখালি, আরও কত!

মৃদু বৈকালিক রৌদ্রের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে কত কথাই না মনে আসে! সে কি দিনই গিয়াছে! রোদবৃষ্টির মধ্যে অবাধে ফুটবল খেলা, বৃষ্টিতে গ্রামের অকিঞ্চিৎকর পাহাড়ে নদী যখন ফুলিয়া উঠিত তখন তাহাতে সাঁতার কাটা, বাজি ধরিয়া পনরো বার দীঘি পার হওয়া!

সেই দীঘির সহিতই কি কম স্মৃতি জড়াইয়া আছে! অমন স্বচ্ছ জল এ-অঞ্চলে কোনও পুকুরে ছিল না। পাশের গ্রামের ছেলেরা দীঘি দেখিয়া ঈর্ষ্যায় মরিত। তাহাদের গ্রামে যাহা আছে তাহা দীঘি নয়, পুকুর, তাহা এত বড় নয়, তাহার জল এমন কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ কালো নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের কাছে—যাহাদের কোনটিতে এর শতাংশের একাংশও মাছ নাই। ছিপ লইয়া বিকালে আসিয়া বসিয়া পড়—সন্ধ্যার আগে খালুই ভর্ত্তি করিয়া লইয়া যাও—এত আরাম আর কোন্ গ্রামের কোন্ পুকুরে আছে?

আর পদ্মদীঘি? আকৃতিতে ছোট, কিন্তু এত পদ্ম যে এক পুকুরে ফুটিতে পারে, না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিত না। সারা পুকুর ভরিয়া ফিকে সবুজ রঙের পাতা, তাহাদের মাঝে লালচে বড় বড় পদ্ম, আর প্রায় তেমনই বড় বড় কুঁড়ি। পদ্মপাতার উপর বৃষ্টির জল পড়িলে যেন মুক্তার মত টল্‌টল করে।

কিন্তু এ-সবই বারো বছর আগেকার কথা। হয়ত আজ দীঘি মজিয়া গিয়াছে, শানবাঁধান ঘাট ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে; হয়ত পদ্মদীঘির পদ্মের পরিবর্ত্তে আছে শুধু পানার রাশি, পদ্ম কোথায় গিয়াছে কে জানে!

আকাশ কি সেই এক যুগ আগের মত গাঢ় নীল আছে? সেই নীল আকাশের গায়ে শরতের সাদা মেঘের খেলা তেমনই মনোরম রহিয়াছে?

হয়ত আছে। কিন্তু ষোল বছরের ছেলে সে-সব যে-চোখে দেখিয়াছিল, আটাশ বছরের যুবক—যাহার দিন কাটিয়াছে কলিকাতার ইট-কাঠ, লোহালক্কড়, আর ট্রাম-মোটরের ঘড়ঘড়ানির মধ্যে, সে কি আর এ-সব সেই স্বপ্নভরা চোখে দেখিতে পাইবে?

সাত মাইল রাস্তা ফুরাইয়া আসিল। পথের দু-ধারে ধানক্ষেত আর জঙ্গল, জঙ্গল আর ধানক্ষেত। সেই আগেকার দৃশ্য; পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা আছে, তাহা সহসা চোখে পড়ে না।

গ্রামে যখন পৌছিল, তখন সূর্য্যের শেষরশ্মি মিলাইয়া গিয়াছে। সুটকেস লইয়া লোকটা কখন আসিবে কে জানে! ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল দম দেওয়া হয় নাই, তিনটা বাজিয়া ঘড়ি থামিয়া গিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিলে মনে হয় প্রায় সাড়ে ছয়টা হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার আকাশ আর গ্রামের আকাশ এক নয়।

ছোট একটা মাঠের মধ্য দিয়া ক্ষীণ একটি পথ যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে ছোট্ট একটি খড়ের বাড়ি। বিজন বাড়ির দরজার শিকল ধরিয়া বার-কয়েক নাড়া দিল।

যে-লোকটি আসিয়া দরজা খুলিল তাহার বয়স প্রথম দৃষ্টিতে তেত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে যে-কোনটা হইতে পারে। কিন্তু আসলে সে বিজনেরই সমবয়সী। আধময়লা কোঁচার খুঁট গায়ে জড়ান, মুখে তিন-চার দিনের সঞ্চিত দাড়ি; আর বেশ বড়গোছের একজোড়া গোঁফ। বাঁ

পা-খানি রোগা এবং বেশ একটু বাঁকা। রং এককালে হয়ত ফরসাই ছিল, এখন ঘনশ্যাম।

বাহির হইতে যে-লোকটি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছে তাহাকে সে চিনিতে পারিল না। পায়ের ধুলায় জুতা ও কাপড় রক্তিমাভা ধারণ করিলেও তাকাইলে বুঝা যায় ধরণ-ধারণে এতটা আভিজাত্য গ্রামের লোকের থাকিতে পারে না।

বিজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে চান?"

বিজন কিছু ভূমিকা না করিয়া ভিতরে আসিয়া বলিল, "আমি বিজন; এবং তুমি যে অবিনাশ সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।"

বারো বছরের বিস্মৃতির ধোঁয়া কাটাইয়া উঠিতে অবিনাশের আর এক মুহূর্ত্তও লাগিল না। খোঁড়া পা লইয়া যতটা লাফানো যায় লাফাইয়া কহিল, "তুই বিজু? কতকাল পরে বল্ ত? তার পরে কি মনে ক'রে এই বেখাপ্পা গাঁয়ে, ব্যাপার কি?"

প্রশ্নের সংখ্যা কিছু বেশী হইয়া গেল। বিজন কহিল, "ভিতরে চল, সব বল্‌ছি। বাড়ির ভিতরে অন্য লোক নিশ্চয়ই আছে?" বলিয়া চোখ টিপিয়া হাসিল।

অন্য লোক অর্থে স্ত্রী এক জন অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও গুটিতিনেক প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইল, যাহাদের বয়স দুই হইতে সাতের মধ্যে।

অবিনাশ বিষম চীৎকার করিয়া কহিল, "প্রণাম কর্, গড় হয়ে, প্রণাম কর্, তোদের বিজু কাকা। উঃ, কতকাল পরে তোর সঙ্গে দেখা, কতকাল পরে; কতখানি যে চেহারার দিক দিয়ে বদ্‌লে গিছিস!"

বিজনের সঙ্গে যে তাহার অনেক কাল পরে দেখা হইয়াছে এইটাই যেন অবিনাশের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। বিজন তত ক্ষণে দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়াছে।

পা খোঁড়া হইলেও অবিনাশ লোকটি কিছু বেশী রকম ব্যস্তবাগীশ। চীৎকার করিয়া বলিল, "ঐ মাটিতেই ব'সে পড়লি রে হতভাগা? চল্ তোর বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ভুলেই গিয়েছিলাম। ওগো শুন্‌ছ? আমাদের বিজু এসেছে, কতকাল পরে। একবার বাইরে এস, আলাপ-আপ্যায়ন কর।"

একটি সুশ্রী সপ্রতিভ মেয়ে, বয়স কুড়ির চেয়ে খুব বেশী উপরে নয়, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিজন নমস্কার করিয়া কহিল, "বৌদি বল্‌ছি বটে, কিন্তু আমার যত দূর মনে পড়ে অবিনাশ আমার চেয়ে দিন-কয়েকের কি মাসখানেকের ছোটই হবে। কি বলিস্ অবিনাশ?"

অবিনাশ সগর্জ্জনে প্রতিবাদ জানাইল।

বারো বছর বিচ্ছেদের পরে দুই বন্ধুর পরিচয় জমিয়া উঠিল।

বারো বছর আগে গ্রামের হাই-স্কুল হইতে দুই জনে একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করিয়া বাহির হইয়াছিল। বিজন পাস করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গেল—অবিনাশ কি করিল সে খবর জানিল না।

এই দুটি ছেলে যে গ্রাম ও স্কুলের রত্নবিশেষ সে-কথা গ্রামের আবালবৃদ্ধ এবং মাষ্টারেরা সবাই স্বীকার করিতেন। লাষ্ট ক্লাস হইতে আরম্ভ করিয়া দু-জনে রেষারেষি করিয়া উপরের ক্লাসে উঠিয়াছে, কোনবারে বিজন ফার্ষ্ট হইয়াছে, কোনবারে অবিনাশ।

কিন্তু বিজন সেই সঙ্গে ছিল খেলার সর্দ্দার। ষোল বছরেই তাহার শরীর হইয়াছিল বিশ বছরের জোয়ানের মত লম্বাচওড়া, তাহার ফুটবল-খেলা লইয়া লোকে সগর্ব্বে পাশের গাঁয়ের লোকদের সহিত ঝগড়া করিত।

আর অবিনাশ ছিল ক্ষীণদেহ, তাহার উপর আবার একটা পা খোঁড়া। স্কুলগৃহের বাহিরে তাই তাহার প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল না। কিন্তু ক্লাসের ভিতরে সে কাহারও চেয়ে ছোট ছিল না। বিজন ইংরেজী একটু বেশী ভাল জানিত, সে অঙ্কে সে অভাব পুরাইয়াছিল। দুই জনের মধ্যে আবাল্য প্রতিযোগিতা চলিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু আশৈশব বন্ধু।

কিন্তু সেই যে বারো বছর আগে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল তাহার পর আর কেহ কাহারও খোঁজ লয় নাই।

তাহার পর অবিনাশের পিতৃবিয়োগে তাহার জীবনে যেন একটা ওলট্‌পালট ঘটাইয়া দিয়া গেল। কেমন করিয়া যে কি হইল তাহা সে নিজেও ভাল করিয়া মনে করিতে পারে না। বছর দুই-তিন কি করিয়া কাটিল

তাহা সে-ই স্থানে। দয়ার্দ্র প্রতিবেশীদের নিকট নানা রকম সাহায্য পাইয়া, কিছুদিন ছোট ছেলেদের অ আ শিখাইয়া কোন রকমে দিন চলিল। তাহার পরে কোন রকমে গ্রামের স্কুলে নিম্নশ্রেণীর মাষ্টারী জুটিয়া গেল, বেতন পঁচিশ টাকা।

অভাবের মধ্য দিয়াই দিন কাটে। যখন বয়স প্রায় কুড়ি, সেই সময় বৃদ্ধা মাতা আর পৌত্রমুখ দেখার লোভ সামলাইতে না পারিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া ফেলিলেন।

খোঁড়া ছেলে। তা হোক। পুরুষের তাহাতে বিবাহ আটকায় না। কাছেরই এক গাঁয়ের এক গরিবের ঘরের একটি শ্যামলা চতুর্দ্দশী মেয়ে এক জ্যোৎস্না রাত্রে খোঁড়া স্বামীর ঘর করিতে আসিল।

মা'র কিন্তু আর পৌত্রমুখ দেখা হইল না। শিবানী আসিবার মাস-কয়েক পরে ছেলে-বউয়ের হাতে সংসারের ভার দিয়া তিনি এপারের মায়া কাটাইলেন।

তাহার পরে আট বছর কাটিয়াছে।

নিজের ইতিহাস শেষ করিয়া অবিনাশ খানিক দম লইয়া কহিল—"তার পরে তোর কি খবর শুনি।"

বিজন সহসা কোনও উত্তর দিল না। একটু থামিয়া কহিল, "খুব বেশী কিছু নয়। বি-এস্‌সি পাস করেছিলাম। তার পরে টাকার অভাবে পড়া হ'ল না।"

"কেন, তোর বাবা?"

বিজন সংক্ষেপে কহিল, "নেই।"

তাহার পরে আরও খানিকটা সব চুপচাপ। আবার বিজন আরম্ভ করিল। "বাবা রেখে ত কিছু যানই নি, উপরন্তু বেশ কিছু দেনা রেখে গিয়েছিলেন। সেটা শোধ করতে কলকাতার বাড়িখানা গেল। চার বছর ধ'রে না-করেছি এমন কাজ নেই। খবরের কাগজ বিক্রী পর্য্যন্ত। একটা কেরানীগিরি পেয়েছিলাম, রাখতে পারলাম না।"

"কেন?"

"সাহেবের নাক দিয়ে রক্ত বার ক'রে দিয়েছিলাম।"

দু-জনে প্রাণ ভরিয়া হাসিল।

"এখন কি করছিস্?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিজন জবাব দিল, "একটা ক্যান্‌ভাসারের চাকরি পেয়েছি। বেশীর ভাগ কলকাতাতেই থাকতে হয়। মধ্যে মধ্যে বাইরে পাঠায়। তেম্‌নি এক সুযোগে তোর এখানে এসে পড়েছি। ষ্টেশনের নাম দেখে আর ব'সে থাকতে পারলাম না।"

"কত দেয়?"

"তিরিশ। তা ছাড়া টাকায় দু-পয়সা কমিশন। তাতে আরও গোটাকুড়িক টাকা হয়।"

"মোটে পঞ্চাশ? কলকাতায় চালাস্ কি ক'রে?"

"তুই এখানে তোর পঁচিশ টাকায় যেমন ক'রে চালাস্।"

"আমার কথা ছেড়ে দে। এ পাড়াগাঁ, জিনিষপত্র সস্তা। বাড়ির বাগানে তরীতরকারী যথেষ্ট হয়; আমার বেশ চলে যায়। তা ছাড়া, অবিনাশ একটু হাসিয়া কহিল, "আমার কষ্ট ক'রে থাকা চিরকালের অভ্যেস; তোর ত তা নয়।"

"নয় সত্যি। অভ্যেস করতে হয়েছে।"

নিজের ছোট মেয়েটির দিকে তাকাইয়া অবিনাশের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে করেছিস্ ত? না আইবুড়ো কার্ত্তিক?"

হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করিয়া বিজন কহিল, "করেছি ত একটা।"

শুধু পাড়াগাঁয়ের লোক যেমন করিয়া হাসিতে পারে তেমনই করিয়া হাসিয়া অবিনাশ কহিল, "মোটে? আমি বলি বা একগণ্ডা দেড়গণ্ডা হবে! তার পরে ছেলেপিলে?

"উঁহু।"

"বিয়ে করেছিস্ কতদিন?"

"তা প্রায় বছর-দেড়েক হবে।"

এতক্ষণে অবিনাশ যেন একটু ঈর্ষ্যা অনুভব করিল। সে বিবাহ করিয়াছে আজ আট বছর, তাহার মধ্যে চারটি ছেলেমেয়ে জন্মিয়াছে, তার মধ্যে একটি মারা গিয়াছে, আটাশ বছর বয়সে পুত্রশোকও বাদ যায় নাই।

শিবানী মেয়েটি চমৎকার।

মোটে ত একুশ-বাইশ বছর বয়স। তাহার মধ্যেই এমন গিন্নী হইয়া উঠিয়াছে যে বিজন না হাসিয়া পারিল না। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অতিরিক্ত লজ্জার অহেতুকী জড়সড় ভাব না থাকিলেও এমন একটা ব্রীড়াবনত ভাব আছে, যাহা

দিয়া শহরের মেয়ে ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ের তফাৎ চেনা যায়। শিবানীকে বিজনের ভারি ভাল লাগিল।

অবিনাশকে কহিল, "তুই ভাগ্যবান্।"

"অর্থ ?"

"লক্ষ্মীর মত বৌ পেয়েছিস্।"

অবিনাশ সগর্ব্বে শিবানীর লজ্জানত দেহের দিকে তাকাইয়া বলিল, "যা বলেছিস্। দেখ, নিজের ইয়ে বলে বল্‌ছি না—এই আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়ের জাতই আলাদা। আর শহরের মেয়ে—," অবিনাশ ভাতমাখা ডানহাত আর বাঁ-হাত সামান্য তফাতে রাখিয়া জোড় করিয়া প্রায় কপালে ঠেকাইল—"ক্ষুরে নমস্কার।"

শহরের মেয়ে কিন্তু অবিনাশ খুব বেশী দেখে নাই। মোটে দেখিয়াছে কিনা সে-বিষয়েও সন্দেহ।

বিজন মনে মনে হাসিল। বাহিরে কহিল, "ঠিক বলেছিস্।"

অবিনাশ বিনা কারণে গলার স্বর নামাইয়া কহিল, "হ্যাঁ রে, তোর বৌ কেমন ? নাম কি ?"

বিজন শিবানীকে শুনাইয়া কহিল—"লীলা। আর কেমন মেয়ে যদি জিজ্ঞেস করিস ত বল্‌ব শহরের মেয়ে যেমন হয়ে থাকে।"

"সুন্দরী ?"

"মন্দ না। তবে," এইবার বিজন চুপি চুপি কহিল, "সে-সব মেয়ের চাইতে তোর বৌ লাখোগুণে ভাল। তোকে ঠাট্টা ক'রে ভাগ্যবান বলি নি।"

অবিনাশ তৃপ্তির হাসি হাসিল। কিন্তু মনে মনে কোথায় যেন একটু বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে বিজন লীলাকে পাইয়া সুখী হয় নাই। হয়ত বৌয়ের মেজাজ কড়া। হয়ত বা বেলা আট্‌টা পর্য্যন্ত বিছানায় শুইয়া থাকে, আর বিজনের বিছানায় চা পৌছাইয়া দিতে হয়। ভাবিতেও অবিনাশ শিহরিয়া উঠিল। শিবানী যদি তেমনি হইত ?

কিন্তু শিবানী সে রকম মেয়েই নয়। সেই সাতসকালে উঠিয়া ঘর লেপা, উঠান ঝাঁট দেওয়া, গোয়াল মুক্ত করা, এমনই সব হাজার রকমের কাজ। তাহার উপর ছেলে-মেয়েগুলি বড় দুরন্ত। তাহাদের সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়া হাসিমুখে ঘরের কাজ করিয়া চলিয়াছে। স্বামীর খোঁড়া পা লইয়া দুঃখ করিতে কেহ তাহাকে দেখে নাই। অমন সুশ্রী মেয়ে, হইলই বা রং একটু ময়লা। কপাল খারাপ করিয়াই না দরিদ্র খোঁড়া স্বামীর ঘরে পড়িয়াছে! কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া দেখ, যেন কোন্ ভাগ্যবানের ঘরের বধূ!

সে রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা দাওয়ায় একমাদুরে পাশাপাশি শুইয়া দুই বন্ধু রাত প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল। তাহাদের চিরদিনের সুখসম্পদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সকল আশঙ্কা, সব একে একে বায়স্কোপের ছবির মত দুই জনের মনের পর্দ্দায় ছায়া ফেলিয়া চলিল। সেই যখনকার কথা ভাল করিয়া মনেও পড়ে না, যখন প্রথম বিজনের বাবা এ-গাঁয়ে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন, সে কি আজকের কথা ? প্রায় তেইশ বছর তাহার পরে কাটিয়া গিয়াছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ঐ পদ্মদীঘির ধার দিয়া ধানক্ষেতের আল বাহিয়া তাহারা একসঙ্গে গ্রামের প্রান্তে স্কুলে গিয়াছে, যখন ফিরিয়াছে তখন সূর্য্য পশ্চিম-গগনের এক কোণে রঙীন মেঘের আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছেন।

অবিনাশ হাসিয়া কহিল, "জানিস্ বিজু, মনে মনে কতবার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে হুকুম চালিয়েছি ; খোঁড়া পা ভাল হয়ে গিয়েছে, সকলের সঙ্গে মাঠে ছুটোছুটি ক'রে ফুটবল খেলছি।"

"আর আমি মনে মনে এরোপ্লেনে চড়ে পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরে বেড়িয়েছি, আটলান্টিকের ঝড়ের মধ্যে জাহাজে ক'রে পাড়ি দিয়েছি। কল্পনার উপরে ত কোনো ট্যাক্স নেই।"

"ভাগ্যিস্ নেই ; নইলে এত দিন আমি দেউলে।"

উঠানের পাশে একটা গাছে সারারাত ধরিয়া ঝিঁঝি ডাকিয়া চলিল, ঠিক যেমন করিয়া ডাকিত বারো বছর আগে। এই বারো বছর অবিনাশ এইখানে কাটাইয়াছে, কই এক দিনের জন্যও ত তাহার ছেলেবেলার দিনগুলির কথা তেমন করিয়া মনে পড়ে নাই। আর আজ বিজু আসিয়া এই দরিদ্র অর্দ্ধশিক্ষিত স্কুল-মাষ্টারের মনের কোন্ গোপন তন্ত্রীতে কি রাগিণী বাজাইয়া দিয়া গেল, যাহাতে লুপ্ত বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলি বারো বছরের বিস্মরণের

সেতুহীন নদী পার হইয়া আসিয়া হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিতেছে।

বিজন জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের ভিটেটার কি অবস্থা রে?"

"আসার পথে দেখিস্ নি? আর দেখলেই বা চিন্‌বি কি ক'রে? সে ত এখন বাবলা-বন। সেই যে দেশ ছাড়লি, আর ত এ-মুখো হ'লি নে!"

বিজন কথা কহিল না।

সকালে যখন বিজনের ঘুম ভাঙিল, তখন রৌদ্রে চারি দিক ভরিয়া গিয়াছে। ভাল করিয়া চারি দিকে তাকাইয়া দেখিয়া বিজন দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সুনিপুণ গৃহস্থালী দারিদ্র্যের সকল চিহ্ন ঢাকিতে পারে নাই। কিন্তু ম্যাট্রিক-পাস খোঁড়া স্কুল-মাষ্টারের ইহার চাইতে ভাল লক্ষ্মীশ্রীর দাবি কিছু থাকিতে পারে না।

সেদিন রবিবার। বিজনকে সঙ্গে লইয়া অবিনাশ গ্রাম দেখাইতে বাহির হইল। পরিচিত, অর্দ্ধপরিচিত অনেকের সঙ্গে আলাপ সমাধা করিয়া যখন ফিরিল তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

অবিনাশ বলিতেছিল, "আমাদের হেডমাষ্টার-মশায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, বিজু, দেখিস্ কি রকম জ্ঞানী লোক। বি-এ পাস, বছর চল্লিশ বয়েস হবে, কিন্তু বিদ্যের গাছপাথর নেই। আলাপ ক'রে খুশী হবি।"

বিজন অন্যমনস্কভাবে বলিল, "আচ্ছা।"

সারাজীবন যে স্কুল-মাষ্টার অজ পাড়াগাঁয়ে জীবন কাটাইয়া গেল, বি-এ পাস হেড-মাষ্টার যে তাহার কাছে জ্ঞান ও বিদ্যার আদর্শ হইবে তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই।

আহারাদি শেষ করিয়া উঠিতে প্রায় দুপুর গড়াইয়া গেল।

বিকালের দিকে বিজন কহিল, "হ্যা রে, নদীর ওপারে সেই যে সাঁওতালদের কি একটা গাঁ আছে না, নাম ভুলে যাচ্ছি।"

"লক্ষ্মীপুর?"

"হ্যা লক্ষ্মীপুর। এখনও তেমনই আগের মত ফিটফাট পুতুলের বাড়ি আছে?"

"চল্ না ঘুরে আসা যাক?"

"তোর কষ্ট হবে না ত?"

"খোঁড়া পায়ের কথা ভাবছিস্? এই পা নিয়ে পাহাড়ে উঠেছি জানিস্?" পাহাড় মানে প্রায় চারতলা-সমান উঁচু একটা মাটির ও পাথরের ঢিবি।

"তবে চল্।"

ছোট্ট পাহাড়ে নদী। এখন জল নাই বলিলেই হয়। অনেকখানি বালির চর পার হইয়া কোন রকমে পায়ের গোড়ালি ভিজানো যায় এমন নদী। কিন্তু কি পরিষ্কার জল! তলার ছোট পাথরের টুক্‌রাগুলিই বা কি সুন্দর! আশপাশে বালির উপর গর্ত্ত খুঁড়িয়া কাহারা যেন খাবার জল লইয়া গিয়াছে।

এ-সবই ছেলেবেলার কথা মনে পড়াইয়া দেয়। নদীর ওপারে আবার দীর্ঘ বালির চর। কত দিন নদী পার হইয়া ওপারে গিয়া সেই যে ঝিঁঝিঁপোকার মত দেখিতে, বালির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া থাকে, তাহাদের গোটাকতক বাহির করিয়া লড়াই বাধাইয়া মজা দেখিয়াছে।

সমস্ত সেদিনের কথা বলিয়া মনে হয়।

ছবির মত তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ছোট ছোট বাড়ি, খেলাঘরের পুকুরের মত গোটা তিন-চার পুকুর, এই লইয়া সাঁওতালদের গ্রাম। দুটি জিনিষ বিজনের চোখে নূতন ঠেকিল, সেটি মিশনরীদের বাংলো আর ছোট্ট একটি মিশনরী স্কুল।

রাত্রে বিজন কহিল, "অবিনাশ কাল ত যেতে হয়।"

অবিনাশ যেন কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। কহিল, "যেতে হয়? তার মানে?"

"মানে, আর ত কাজ কামাই করা চলে না!"

"ক্ষেপেছিস্, এর মধ্যে কি যাবি? যেতে দিলাম আর কি?"

কিন্তু বুঝিতে হইল সবই। তবুও বিজনকে ছাড়িয়া দিতে অবিনাশের মন সরিতেছিল না। মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল, "বুঝি রে সব, কিন্তু বারো বছর বাদে এমনই হঠাৎ তোর সঙ্গে দেখা—তার পরে এত সহজে ছেড়ে দি কি ক'রে বল্ ত?"

ফলে বিজনকে আর একদিন থাকিতেই হইল।

বারো বছরের বিচ্ছেদের সমস্ত ক্লেশ তাহারা একদিনে শেষ করিতে চাহিতেছিল। আরও একটা দিন কাটিল গল্প করিয়া, রাত কাটিল রাত জাগিয়া।

বেলা এগারটায় গাড়ী।

গরুর গাড়ীতে যাইতে হইলে আট্‌টার মধ্যে যাওয়া দরকার। হাঁটিয়া গেলে পরে যাওয়া চলে। বিজন হাঁটিয়া যাওয়া স্থির করিল।

বিচ্ছেদের আশঙ্কা যখন দুই বন্ধুর চোখ অশ্রুসজল করিয়া তুলিয়াছে, তখন বিজন অবিনাশকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

অপরাধীর কণ্ঠে কহিল, "একটা কথা বল্‌ব অবিনাশ, কিছু মনে করিস্ নে।"

"কি?"

"অবিনাশ, আমরা দু-জনেই গরিব, সে-কথাটা ত তুই ভাল করেই জানিস্?"

অবিনাশ একটু অবাক হইয়া বলিল, "নিশ্চয়ই, কিন্তু সে কথা কেন?"

"আচ্ছা, আমি যদি ধনী হ'তাম, তা হ'লে তুই কি আমার সঙ্গে ঠিক এম্‌নি ক'রে মিশ্‌তে পারতিস্?"

কথাটা অবিনাশ অস্বীকার করিতে পারিল না। কহিল, "কি জানি!"

"কি জানি নয়, আমি জানি তা হ'লে তুই ব্যবধান রেখে চল্‌তিস্। কিন্তু আমরা যখন দু-জনেই প্রায় সমান গরিব, তখন,...তখন, আমি যদি তোর ছেলেমেয়েদের কিছু সন্দেশ খেতে দি, তুই নিশ্চয়ই আপত্তি করবি না?"

আপত্তি অবিনাশ করিল, এবং প্রবল ভাবেই করিল।

কিন্তু বিজন ছাড়িল না। কহিল, "শোন্ অবিনাশ, যদি আমি ধনী হতাম, আর তোর ছেলেমেয়েদের এই নোট্‌খানা দিতাম, তুই সেটা দয়ার দান ব'লে নিতে দ্বিধা করতে পারতিস্। কিন্তু বিশ্বাস কর এ শুধু তোর ছেলেমেয়েদের কাকার উপহার। আমার ছেলেমেয়েদের তুই যদি এটা দিতিস্, আমি নিতাম।"

অবশেষে অবিনাশের লইতেই হইল। একবার শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, "কিন্তু তোরও ত টাকার অভাব, এটা থাকলে তোর কত সুবিধে হ'ত ভেবে দেখ্ ত!"

"হ'ত। কিন্তু আমার নিজের রোজগারের টাকা থেকে তোর ছেলেমেয়েদের উপহার দিতে পারছি, এ-আনন্দটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত করিস্ নে। আমি দ্বিগুণ খেটে আবার ওটা রোজগার করতে পারব।"

দরজার বাহিরে শিবানী চোখ মুছিল।

খোঁড়া অবিনাশের ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাওয়া হইল না। তা ছাড়া তাহার ইস্কুল। শুধু যত দূর দেখা গেল দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

লীলা জানলার বাহিরে তাকাইয়া কহিল, "বন্ধুকে অতগুলো মিথ্যে কথা ব'লে এলে?"

অবিনাশের খড়ের ঘরের রিক্ততার সহিত নিজের সুসজ্জিত ঘরের আস্‌বাবপত্রের একটা তুলনা মনে মনে করিয়া লইয়া বিজন কহিল, "হ্যাঁ। কিন্তু এত দিন গাদা-গাদা সত্যি কথা ব'লে যে পুণ্য সঞ্চয় করেছি, এই দু-দিনের মিথ্যে কথার পুণ্য আমার তার চাইতে কম নয়।"

"বন্ধুকে মিথ্যে কথা ব'লে ভুলান বুঝি যারপরনাই পুণ্যের কাজ?"

"এক্ষেত্রে তাই লীলা। আমরা দু-জনে জীবন আরম্ভ করেছিলাম প্রায় একসঙ্গে। তার পর পরিণামে আমি সফল হয়েছি, আর সে সেই অজ পাড়াগাঁয়ে তার নিষ্ফল জীবন সম্বল ক'রে পড়ে আছে। তুমি কি মনে কর আমি জীবনে এত সুখী হয়েছি জান্‌লে সে সুখী হ'ত? অবিনাশের জায়গায় নিজেকে বসালে দেখ্‌তে পাই, আমি অন্ততঃ হতাম না।"

"বন্ধুকে এত হীন মনে কর কেন?"

"মোটেই না। শুধু মানুষকে মানুষ ব'লে চিনি। জান লীলা, আমাকে তারই মত অকৃতকার্য্য ভেবে সে দুঃখিত যতটুকু হয়েছে, আনন্দ পেয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী। সে আনন্দকে আমার বিফলতায় নীচ প্রবৃত্তির ফল ব'লে মনে ক'রো না। সে খুশী হয়েছে, আমরা জীবন-পথে বেশী দূর পৃথক হয়ে যাই নি তাই ভেবে।"

"কিন্তু তুমি ত তাকে নানা রকমে সাহায্য করতে পারতে; তোমার যখন টাকার অভাব নাই—"

"এইখানেই তুমি মানুষ চেন নি লীলা। সে গরিব বন্ধুর কাছ থেকে যে নোটখানা উপহার ব'লে নিঃসঙ্কোচে নিতে পেরেছে, ধনী বন্ধুর কাছ থেকে মোটা রকমের একটা ভিক্ষা সে সে-রকম ভাবে নিতে পারত না-কোন মতেই না।"

খানিক চুপ করিয়া বিজন কহিল, "কিন্তু দুই দিনের জন্যে তার গরিব বন্ধু তাকে যতটা সুখী করতে পেরেছে, তার ধনী বন্ধু তার শতাংশের একাংশও পারত না। আমাকে সে সমধর্ম্মী ভেবে আদর ক'রে নিয়েছে, আমি চিরদিন তার কাছে সেই ভাবেই থাকতে চাই।

চিত্রে রুশ-বিদ্রোহের ইতিহাস

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্রোহী রাশিয়া আজ জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অনেকেরই ধারণা যে রাশিয়ার বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায় বলশেভিকরাই রুশীয় বিদ্রোহের প্রথম ও প্রধান পুরোহিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা ঠিক নহে। ইতিহাস আমাদিগকে অন্য কথা বলে। রুশীয় বিপ্লবের মূলে প্রজাদের গভীর অসন্তোষ ও নিদারুণ অভাব, এবং অত্যাচারী ঘুষখোর জারের খাম খেয়ালী, একদেশদর্শী কর্ম্মচারিগণের পীড়ন, সর্ব্বোপরি দুর্ব্বল অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিত্বহীন সম্রাটের হাতে রাজশক্তি, এই কথাই ইতিহাস বলে। প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি অথবা পরাধীনতাবোধশক্তি জা ং করিবার প্রচেষ্টা শুধু এই বলশেভিকরাই করে নাই। দেশে থম বিপ্লব-আন্দোলন সুরু হইবার বহু পরে বলশেভিক দলের জন্ম (১৯০৩ সালে)। ইহারা আসিয়াছে আন্দোলনের শেষভাগে এবং সৌভাগ্যক্রমে এমন এক মুহূর্ত্তে ইহারা বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে, যখন দেশ অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণের ধারাবাহিক সংঘাতে মুহ্যমান; অধিকাংশ জনসাধারণ বলশেভিকবাদ পছন্দ না করা সত্ত্বেও ইহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করে নাই। বিদ্রোহী দলগুলির মধ্যে বলশেভিক দল সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও সঙ্গীনের খোচা ও কামানের গুলিগোলার সাহায্যে এবং তীক্ষ্ণধী নেতার নেতৃত্বে অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্রোহী দলকে পরাজিত করিয়া রাশিয়ার সাধারণ জনমতের বিরুদ্ধেও দেশের রাজশক্তি ছিনাইয়া লইয়াছে এবং ১৯২০ সাল হইতে এই বিরাট দেশকে সামরিক শাসনে ও সুকঠিন আইনের নাগপাশে বাঁধিয়া নিজদিগকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে।

রাশিয়ার বিদ্রোহের ইতিহাস ঘটনার-পারম্পর্য্যে এমনভাবে স্বতঃই আগাইয়া গিয়াছে এবং অকিঞ্চিৎকর ঘটনাও এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজনৈতিক ঘটনা-স্রোতকে ফিরাইয়া দিয়াছে, যে, আমার মনে হয় রুশীয় বিদ্রোহের সাফল্যে বলশেভিক-দলের কৃতিত্ব অপেক্ষা নিয়তির হাতই প্রবল। বিদ্রোহের বহ্নি অনেক দিন হইতেই ধূমায়িত হইতেছিল; মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও আত্মপ্রকাশও করিতেছিল, তখন বর্ত্তমান বলশেভিক-দলের জন্ম হয় নাই।

১৮২২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম আলেকজান্দারের কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, কিন্তু বিফলকাম হয়। বিদ্রোহী রাশিয়ার ইতিহাসে ইহারা 'ডিসেমব্রিষ্টস্' নামে পরিচিত, কারণ ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পরে দ্বিতীয় আলেকজান্দার বিপ্লবী 'নিহিলিষ্ট'-সম্প্রদায়ের

দ্বিতীয় নিকোলাস

এক গুপ্তঘাতকের বোমায় নিহত হন। ইহার ফলে পরবর্ত্তী জার তৃতীয় আলেকজান্দার সমস্ত বিদ্রোহী এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগকে বন্দী ও নির্ব্বাসিত করেন এবং নিষ্ঠুর হস্তে দেশশাসন করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় নিকোলাস রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং প্রধান মন্ত্রী আরকাডিভিচ ষ্টোলিপিনের মন্ত্রণায় কঠোরভাবে দেশের স্বাধীনতাকামীদের কণ্ঠ রোধ করেন। দ্বিতীয় নিকোলাস অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত, অস্থিরমতি ও স্ত্রৈণ ছিলেন। কখনও কখনও প্রজাদের মঙ্গলের চেষ্টা তিনি করিতেন; প্রজাদের দাবি-অনুযায়ী 'ডুমা' বা পার্লিয়ামেণ্টও তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডল ও সম্রাজ্ঞীর পরামর্শে পুনরায় ডুমার সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া নিজের খেয়ালমত রাজ্য পরিচালনা করেন।

১৯০৫ সালের বিদ্রোহ

১৯০৪-৫ সালে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ জনসাধারণ প্রথম প্রকাশ্যে নিজেদের অভিযোগ ব্যক্ত করিবার সাহস সঞ্চয় করে। এই সময়ে রুশ-জাপান-যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হওয়ায় জনসাধারণ জারের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়, দেশে দারুণ অন্নকষ্ট হয়। এই অসন্তোষ প্রকাশ্যে ব্যক্ত হয় লেনিনগ্রাডের পিউটিলোভ লৌহ-কারখানায়। এখানে শ্রমিকগণ একসঙ্গে ধর্ম্মঘট করে। ২২শে জানুয়ারি, রবিবার গেপন নামে জনৈক ধর্ম্মগুরু এক বিরাট শোভাযাত্রায় ঐ সব শ্রমিক ও অসন্তুষ্ট জনতা পরিচালনা করিয়া জার নিকোলাসের কাছে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ জানাইয়া একটি দরখাস্ত লিখিয়া "উইণ্টার প্যালেস" প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু সম্রাট এই নিরস্ত্র শান্ত জনতাকে বিপ্লবী দল বলিয়া ভুল করেন এবং ইহাদের উপর উইণ্টার প্যালেসের সামনে নির্ব্বিচারে গুলি চলে। চিত্রের নার্ভা ট্রায়াম্ফ্যাল আর্কের (বিজয়-তোরণ) কাছে গেপন গুরুতর ভাবে আহত হন। এই রবিবার রাশিয়ার ইতিহাসে 'রক্তাক্ত রবিবার' (Bloody Sunday) নামে অভিহিত। এই হত্যার ফলে রাশিয়ার চতুর্দ্দিকে বিপ্লবানল জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু শক্তিমান জারের প্রবল প্রতাপে উহা নির্ব্বাপিত হয়। প্রজাদের শক্তি ও মানসিক অবস্থা বুঝিয়া দ্বিতীয় নিকোলাস প্রজাদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লিয়ামেণ্ট বা 'ডুমা' সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী আলেকজান্দ্রা ফিওডোরভ্‌না প্রজাদিগকে কোনো প্রকার সুবিধা না দিতে স্বামীকে উৎসাহিত করিতেন ও কঠোর হস্তে প্রজাপালন করিতে উত্তেজিত করিতেন। ইহাতে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর উপর প্রজাবর্গ ও মন্ত্রীমণ্ডল ক্রমশঃ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

১৯০৫ সালের বিদ্রোহের একটি দৃশ্য

গ্রিগরি রাসপুটিন (১৮৭৩-১৯১৬)

ঠিক এই সময়ে বিশ্ববিখ্যাত রাসপুটিন কুগ্রহের মত রাশিয়ার অদৃষ্টাকাশে উদিত হইল। সাইবেরিয়ার এক ধীবর-পরিবারে ১৮৭৩ সালে ইহার জন্ম। সারা যৌবন লাম্পট্যে ও নানা অত্যাচারে অতিবাহিত করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় রাসপুটিন ধর্ম্মগুরুর মুখোস প'রে। ইহার একটা ঐশ্বরিক বা সম্মোহন শক্তি সম্বন্ধে সকলেই একমত; অতি তীব্র বিষেও রাসপুটিনকে হত্যা করিতে পারে নাই, এমন কি গুলি খাইয়াও রাসপুটিন পলাইবার চেষ্টা করে। রাসপুটিন তাহার

রাসপুটিন

বাহিনীর প্রধান সেনানায়কের পদ হইতে অপসারিত হইলে জার নিজে ঐ পদ গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রে যান। রাজপরিবারে এই দুরাত্মার অত্যাচারের ফলে প্রজারাও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। অবশেষে জারের খুল্লতাত ভাই প্রিন্স ফেলিক্শ জুসুপোভ এবং পুরিশকেভিচ প্রমুখ জারের হিতাকাঙ্ক্ষীরা এক জন সুন্দরী ডাচেসকে পাইবার লোভ দেখাইয়া রাসপুটিনকে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেন। বিষ-মিশ্রিত মদ ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও রাসপুটিনের মৃত্যু না হওয়ায় তাঁহারা পুনঃ পুনঃ গুলি করিয়া রাসপুটিনকে ১৯১৬ সালে হত্যা করেন।

আশ্চর্য্য শক্তিবলে শহরের নানা পদস্থ পরিবারে প্রবেশ করিয়া পরে জার-পরিবারেও স্থানলাভ করে। জার-পত্নী প্রিন্সেস আলিক্স অপুত্রক ছিলেন; প্রবাদ, রাসপুটিনের কৃপাতেই তিনি পুত্রলাভ করেন; কিন্তু এই পুত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন ছিল। ইহার পর সম্রাজ্ঞী রাসপুটিনকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন ও তাহার আদেশ বিনা-দ্বিধায় পালন করিতেন। রাসপুটিন বরাবরই লম্পট ছিল এবং ধর্ম্মজীবন যাপনের সময়েও তাহার বাড়িতে অনেকগুলি যুবতী শিষ্যা-পরিচয়ে থাকিত। বহু বড়ঘরের মেয়েদের এমন কি জার-পরিবারের কন্যাদেরও সে সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহার শিক্ষাই ছিল "আগে পাপ কর তবে ঈশ্বরের করুণা পাইবে।" এই রাসপুটিনের প্রভাবে সম্রাজ্ঞীকে তথা জারকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত দেখিয়া জারের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও মন্ত্রীমণ্ডল এবং আত্মীয়েরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। রাসপুটিনের নির্দ্দেশে গ্রাণ্ডডিউক নিকোলাস মহাযুদ্ধে রুশীয়

এ এফ কেরেন্‌স্‌কী

মহাযুদ্ধে রাশিয়া যোগ দেওয়ার ফলে এবং সেনাপতিদের অজ্ঞতা ও অপটু সৈন্য পরিচালনের জন্য শীঘ্রই দেশে খাদ্যাভাব ও অসন্তোষ দেখা দিল। মহাযুদ্ধে তাহাদের স্বদেশবাসীদিগকে, আত্মীয়-স্বজনকে পশুর মত বলি দেওয়ায় প্রজাবর্গ ক্রমশঃ জারের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। জার্ম্মান-শিবিরে বন্দী রুশীয়দের মুক্তির জন্য সরকার কোনো চেষ্টাই করে নাই; যে-সব সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রয়োজনমত অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য, অশ্ব প্রভৃতি সরবরাহ করা হয় নাই; ফলে তাহারা অসহায় ভাবে প্রাণ দিয়াছে। প্রজাদের এই মানসিক অবস্থায় হঠাৎ সামান্য কারণে এমন একটা বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল যাহার ফলে প্রবল প্রতাপ, পৃথিবীর এক-দশমাংশ মানবসমাজের একচ্ছত্র সম্রাটের আসন টলিল, তাঁহাকে নিঃশব্দে বিনাবাধায় সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল।

খাদ্যাভাবে ক্ষুধার্ত্ত জনতা রুটির দোকানে ভিড় করিত; একদিন এইরূপ এক ভীড়ে সামান্য একটা গোলমালে পুলিস গুলি চালায়, ফলে সমস্ত শহরে (পেট্রোগ্রাডে) প্রবল

এ এফ কেরেন্‌স্‌কী

সপরিবারে বন্দী দ্বিতীয় নিকোলাস

উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত স্কুল-কলেজ ও কারখানায় পুলিসের এই অনাচারের প্রতিবাদে হরতাল ঘোষিত হয়। উত্তেজিত জনতা প্রকাশ্য রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা করে। পুলিস এবং সৈন্যদল শোভাযাত্রায় বাধা দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ক্রমে বহু সৈন্য ও বিদ্রোহী জনতার সহিত যোগ দেওয়ায় সরকারপক্ষ বাধা দিতে অপারগ হয়। ক্ষিপ্ত জনতা পুলিসকে যথেচ্ছভাবে হত্যা করে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে, কারাগারের দরজা ভাঙিয়া বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দেয়, রাজনৈতিক গোয়েন্দা ও পুলিসের প্রধান দপ্তরে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করে।

১২ই মার্চ্চ সোমবার, জার-প্রতিষ্ঠিত ডুমা রোডজিয়াঙ্কোকে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করিয়া প্রভিশ্যনাল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে এবং সোশ্যাল রেভলিউশ্যনিষ্ট নেতা কেরেন্‌স্‌কী শান্তি ও শৃঙ্খলার মন্ত্রী (Minister of Justice) নির্ব্বাচিত হন।

সপরিবারে বন্দী দ্বিতীয় নিকোলাস

প্রভিশ্যনাল গভর্ণমেণ্টের সংবাদ যখন নিকোলাসের কানে পৌঁছিল তখন তিনি মহাযুদ্ধে সৈন্যচালনায় ব্যস্ত। এই সংবাদ পাইয়া তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ ইভানোভ্‌কে সসৈন্যে বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠান; কিন্তু ইতিমধ্যে ১৫ই মার্চ্চ প্রভিশ্যনাল গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আসিয়া জারের কাছে পদত্যাগ-পত্র দাবি করিল। বিনা-বাধায় নিকোলাসকে পদত্যাগ করিতে হইল, তাঁহাকে পেট্রোগ্রাডের বাহিরে 'জারসকায়ে সেলো' প্রাসাদে বন্দী করা হইল। সাধারণ কয়েদীর মত হাতকড়া দিয়া রুদ্ধ গৃহে বন্দী না করিয়া সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় তাঁহাকে সপরিবারে উক্ত প্রাসাদে রাখা হইল। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহাকে টোবলস্ক (Tobolsk) গভর্ণর-জেনারেলের গৃহে লইয়া যাওয়া হয় এবং ১৯১৮ সালের এপ্রিলে একাটারিনবুর্গের এক ক্ষুদ্র গৃহে স্থানান্তরিত করিয়া বলশেভিক আমলে ১৯১৮ সালের ১৬ই জুলাই রাত্রে গুলি করিয়া সপরিবারে হত্যা করা হয়।

নিকোলাই লেনিন

সম্রাটের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবাগ্নি বিরাটভাবে দেশে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রমিক ও কৃষকেরা ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অট্টালিকায় আগুন ধরাইয়া দিল, লুণ্ঠন করিল, তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিল। সম্রাটের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজদিগকে সমস্ত

নিকোলাই লেনিন

আইনকানুনের নাগপাশ হইতে মুক্ত মনে করিয়া মত্ত হইয়া উঠিল। মার্চ্চ মাসেই শ্রমিকদলের নির্ব্বাসিত শক্তিমান নেতা নিকোলাই লেনিন সুইটজার্ল্যাণ্ড হইতে দেশে ফিরিয়া আসেন। লেনিনের জন্ম ১৮৭০ সালের ১০ই এপ্রিল; তাঁহার আসল নাম ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ্। লেনিন তাঁহার ছদ্মনাম। সিমব্রিস্ক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে লেনিনের জন্ম; তাঁহার পিতা স্কুল-ইনস্পেক্টর ছিলেন। ১৮৮৭ সালে তৃতীয় আলেকজান্দারের হত্যা-সম্পর্কে সন্দেহক্রমে লেনিনের বড় ভাইয়ের ফাঁসী হয়। এই আঘাত লেনিনকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। তিনি বিদ্রোহের অভিযোগে কাজানের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন। ইহার পর নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া লেনিন লণ্ডনে আসেন। লণ্ডনেই সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌দের সভায় মতভেদ হয় এবং নরম ও চরম পন্থী হিসাবে মেন-শেভিক ও বলশেভিক এই দুই দলে সভ্যেরা বিভক্ত হইয়া যায়। লেনিন বলশেভিক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মহাযুদ্ধের সময় তিনি জেনিভায় ছিলেন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিক দলকে উত্তেজিত করেন। ইহার ফলে পরে জার্ম্মান রাজ্যের মধ্য দিয়া ও জার্ম্মেনীর সাহায্যে তিনি দেশে ফিরিতে সমর্থ হন। রুশীয় বিদ্রোহের সময়ও জার্ম্মেনী অর্থ ও লোক বল দিয়া লেনিনকে সাহায্য করে, কারণ তাহারা ভাবিয়াছিল অন্তর্বিপ্লব বাধাইয়া শত্রুপক্ষের একটি মহাশক্তিকে তাহারা ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে। লেনিনও জার্ম্মেনীর অর্থসাহায্য বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করিয়া এক ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থে অন্য ধনতান্ত্রিক দেশের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছিলেন।

লেনিন ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই প্রভিশ্যনাল গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন, কিন্তু তখনও দেশের সম্পূর্ণ জনমত ও সৈন্যবাহিনী তাঁহার সপক্ষে না থাকায় ও কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ না করায় তিনি ব্যর্থকাম হন এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। পুনরায় তিনি অক্টোবর মাসে ফিরিয়া আসিয়া দেশবাসীকে ও সৈন্যদলকে প্রভিশ্যনাল গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও পেট্রোগ্রাড শহরের প্রধান প্রধান সরকারী দপ্তরখানা আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লন। ৬ই নভেম্বরের মধ্যে প্রায় সমস্ত পেট্রোগ্রাড শহর বলশেভিকদের দখলে আসে। প্রভিশ্যনাল গভর্ণমেণ্টের পতনের পর ক্রমে সমগ্র রাশিয়া বলশেভিকদের করতলগত হয়; তাহারা নির্ম্মমভাবে বিরুদ্ধবাদীদের কণ্ঠ রোধ করিয়া দেশে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

জেনারেল র‍্যাঙ্গেল

কিছুদিনের মধ্যেই রাশিয়ার নানা দিকে শক্তিশালী ভূতপূর্ব্ব সেনাপতিদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দিল। ব্রিটিশ, আমেরিকান, ক্যানাডিয়ান ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশী সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার এই অভ্যুত্থানকে সুচক্ষে দেখিল না, তাহারা সৈন্য ও অর্থ দিয়া বিদ্রোহী সেনাপতি-দিগকে সাহায্য করিতে লাগিল। এই সমস্ত বহিঃশত্রুর বা তাহাদের সাহায্যে গুপ্তভাবে পরিচালিত সৈন্যদলের আক্রমণে একদিক দিয়া বলশেভিক দলের খুব লাভ হইল।

দেশের যে সম্প্রদায় ইহাদিগের বিরোধিতা করিতেছিল তাহারাও বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় স্বদেশবাসী বলশেভিক দলকে সাহায্য করিতে লাগিল। দক্ষিণ-পূর্ব্বে কসাক সৈন্যেরা ও চেকোশ্লোভাক সৈন্যেরা প্রথম বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। জেনারেল আলেক্সিভ, জেনারেল ক্র্যাশনোভ এবং তাহার পর জেনারেল ডেনিকিন এই সব বিদ্রোহী সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও ১৯১৯ সালের জুন হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে খারকোভ, পোলটাভা প্রভৃতি শহর দখল করিয়া লন এবং নভেম্বরের মধ্যে মস্কো পৌঁছিবার আশা করেন। কিন্তু ইহারা জার-রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক জানিতে

জেনারেল র‍্যাঙ্গেল

পারিয়া দেশের লোকে এই দলকে সাহায্যের পরিবর্ত্তে বাধা দিতে থাকে, ফলে বলশেভিক সৈন্যদলের সংঘাতে ও দেশবাসীর বিরোধিতায় ইঁহারা পরাজিত হন। ইঁহাদের অবশিষ্ট সৈন্যদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ১৯২০ সালের বসন্তে জেনারেল র‍্যাঙ্গেল ক্রিমিয়া দখল করিয়া নিজেকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বলশেভিক দল কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। ১৮৭৯ সালে পেট্রোগ্রাডে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পুরা নাম ব্যারণ পিটার র‍্যাঙ্গেল; রুশ-জাপান-যুদ্ধে ও মহাযুদ্ধে ইনি সৈন্যচালনা করেন। উত্তর-পশ্চিম হইতে জেনারেল য়ুডেনিচ ১৯১৮ সালে ৩০,০০০ সৈন্যসহ পেট্রোগ্রাডের দিকে অগ্রসর হন এবং অনেক জায়গা দখল করেন, অবশেষে ট্রট্স্কীর বিরোধিতায় পরাজিত হন। বিদেশী শক্তিগুলি শুধু গুপ্তভাবে সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আমেরিকান, ব্রিটিশ, ক্যানাডিয়ান ও অন্যান্য শক্তিসমূহ সমবেত ভাবে উত্তর দিক হইতে ভীষণ ভাবে বলশেভিক রাশিয়াকে আক্রমণ করে এবং ব্রেজনিক্ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত ইহারাও বলশেভিক সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়। পূর্ব্বদিক হইতে য়্যাডমিরাল কোলচক মিত্র-শক্তির সাহায্য লইয়া সমগ্র সাইবেরিয়া দখল করিয়া মস্কোর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু দেশের লোকের সহানুভূতি না পাওয়ায় অবশেষে কোলচকেরও পরাজয় ঘটে। এই ভাবে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা রুশিয়ার একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করে।

রুটীর জন্য অপেক্ষানিরত ক্ষুধার্ত্ত রাশিয়াবাসী

কিন্তু বলশেভিক-শাসনে দেশের অন্নাভাব ঘুচিল না, বরং ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। বলশেভিকরা প্রত্যেকের খাদ্যের একটা মাপকাঠি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল (Universal rationing), কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল অজন্মা ও বিশৃঙ্খলার জন্য নির্দ্দিষ্ট খাদ্যও মিলিতেছে না। সরকারী খাদ্যশালায়, রুটির দোকানে দলে দলে লোক রুটির জন্য অপেক্ষা করিত; সব সময় অপেক্ষা করিয়াও রুটি মিলিত না। গ্রামে কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইল; তাহারা প্রথমে আশ্বাস পাইয়াছিল জমি তাহাদের হইবে, কিন্তু এখন দেখিল যে বলশেভিকরা তাহাদের উৎপাদিত শস্য বাজেয়াপ্ত করিতেছে। প্রথম প্রথম সরকারী হিসাব অনুযায়ী কৃষকদের খাদ্যের মত শস্য বাদ দিয়া উদ্বৃত্ত শস্য বাজেয়াপ্ত করা হইত, ইহাতে কৃষকেরা কেবল খাইবার মত শস্যই

উৎপন্ন করিতে লাগিল। অনেক সময় খামখেয়ালী সরকারী কর্ম্মচারীর হিসাব কৃষকের পারিবারিক প্রয়োজনের অনেক নীচে পড়িতে লাগিল, ইহাতে কৃষকেরা খাদ্যাভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল; দেশে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে বিদ্রোহের ছায়া দেখা দিল। গতিক দেখিয়া লেনিন কমিউনিজমের কড়া আইন কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিলেন।

কুটীরশিল্পীদের বাজার

১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে লেনিন কমিউনিষ্ট দলকে মতপরিবর্ত্তনে বাধ্য করাইলেন। অতঃপর কৃষকেরা নূতন নিয়ম অনুসারে (N. E. P.) নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য নিজেরাই পাইল, কুটীরশিল্পীরা নিজেদের শ্রমে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রয় করিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকার পাইল, কর্ম্মীরা কাজের যোগ্যতা অনুসারে বেতন পাইতে লাগিল। শুধু বড় বড় শিল্প, বাণিজ্য ও কলকারখানা সরকারের অধীনে চালিত হইতে লাগিল। কমিউনিজমের কড়া আইনের বদলে মধ্যপন্থা অবলম্বিত হইল। লেনিন ইহার নাম দিলেন 'রাষ্ট্রমূলধন-চালিত ব্যবস্থা' (State Capitalism)।

কুটীরশিল্পীদের বাজার

পুরোহিত টিখন

দেশের অবস্থা যখন নিজেদের করায়ত্ত হইয়া আসিল ও অন্তর্বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটিল সেই সময় বলশেভিকরা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সজোরে আঘাত করিল। দেশের লোককে তাহারা এই বলিয়া উত্তেজিত করিল যে, প্রচুর ধনৈশ্বর্য্য গির্জ্জাগুলির হাতে অনর্থক আটকাইয়া আছে; তাহার উপর জারের আমলে ধর্ম্মযাজকদের পরামর্শে (যেমন রাসপুটিন) রাজত্ব চালিত হইত এজন্য ধর্ম্মযাজক তথা ধর্ম্মের উপর সহজেই জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তোলা সম্ভব হইল। সমগ্র রাশিয়ার ধর্ম্মগুরু ও মস্কোর প্রধান পুরোহিত টিখনকে বলশেভিক সরকার গির্জ্জার অধীনস্থ সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি সরকারের হাতে দিবার আদেশ দিল, কিন্তু টিখন গির্জ্জার অর্থ সরকারকে দিতে অস্বীকার করায় বন্দী হইলেন।

রেড স্কোয়ার—সেণ্ট বেসিল গির্জ্জা

রেড স্কোয়ারে সেণ্ট বেসিল চার্চ্চ

দেশের প্রায় সমস্ত গির্জ্জাগুলিকে এইভাবে লুণ্ঠন করা হইল ও পুরোহিতদিগকে বিতাড়িত করিয়া গির্জ্জাগুলিতে

ধর্ম্ম-বিরোধী যাদুঘর, ক্লাব, সভাগৃহ প্রভৃতি স্থাপন করা হইল। মস্কোর রেড স্কোয়ারে যে বিখ্যাত সেণ্ট বেসিল গির্জ্জায় জারেরা উপাসনা করিতেন, তাহাও ধর্ম্মবিরোধী যাদুঘরে রূপান্তরিত করা হইল; কিন্তু ঠিক ইহার পাশেই একটি ছোটঘরে একটি গির্জ্জা ১৯৩৩ সালেও আমি নিজে দেখিয়া আসিয়াছি। প্রথমে জোর করিয়াই গির্জ্জাগুলি বন্ধ করা হয়, কিন্তু পরে দেশের লোকের মানসিক অবস্থা বুঝিয়া আইন করা হয় যে, স্থানীয় লোকের মতামত লইয়া তবে গির্জ্জা তুলিয়া দেওয়া হইবে। এখন আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালক-বালিকাকে গির্জ্জা, বিদ্যালয় বা কোনো সমিতি দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ দান আইন-বিরুদ্ধ। সরকার এখন জোর করিয়া ধর্ম্ম দমন না করিলেও ধর্ম্মকে সুনজরে না দেখায়, ইহা এখন ক্রমশই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

লেনিনের সমাধি—রেড স্কোয়ার, মস্কো

১৯২৩ সালের প্রথম দিকেই লেনিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অসুস্থ অবস্থায় কাজকর্ম্ম দেখা সম্ভব হইল না; এই সময় দলের কয়েক জন যুবক কর্ম্মী দলের কর্ত্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৯২৩ সালেই এই লইয়া বলশেভিক দলে একটা বিরোধ বাধিত, কিন্তু লেনিন তখনও বাঁচিয়া, তাই তাঁহার বিপুল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই বিরোধ মাথা তুলিতে পারে নাই। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি লেনিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃতদেহ বর্ত্তমানে রেড স্কোয়ারে এক প্রস্তর-সমাধির নীচে সযত্নে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত আছে। আজও দলে দলে তাঁহার দেশবাসী কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহাদের পরিত্রাতাকে দর্শন করিয়া ধন্য হয়।

লিঁও ডেভিডোভিচ ট্রট্স্কী

ইঁহার আসল নাম লিবা ব্রণষ্টিন; ইনি এক ইহুদী-সদাগরের পুত্র। জারের আমলে বিপ্লবী বলিয়া আর্কটিক প্রদেশে ট্রট্স্কী নির্ব্বাসিত হন। সেখান হইতে পলাইয়া প্যারিস ও নিউইয়র্কে তিনি সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন। জারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রট্স্কী আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিতেছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী বলিয়া ব্রিটিশ-সরকার নোভাস্কোটিয়ার হ্যালিফাক্স শহরে জাহাজেই তাঁহাকে আটকাইয়া রাখে, পরে রাশিয়ার প্রভিশ্যনাল গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে তিনি মুক্ত হন। ১৯১৭ সালে প্রধানতঃ ট্রট্স্কীর নেতৃত্বে বলশেভিক বিদ্রোহী দল কেরেন্স্কী গভর্ণমেণ্টের পরাজয় ঘটায়। ইনি একজন অসাধারণ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞ। লেনিন যখন প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, সে-সময় ট্রট্স্কী দেশের সামরিক-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। লেনিনের মৃত্যুর পর এই ব্যক্তিত্বশালী কর্ম্মী কমিউনিষ্ট দলকে অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক ভাবে গড়িবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তরুণ কর্ম্মী ষ্টালিনের সঙ্গে এই লইয়া বিরোধের সৃষ্টি হয়। ষ্টালিনের অপূর্ব্ব কূট বুদ্ধিতে ট্রট্স্কী পরাজিত হন এবং কয়েক বার লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে দেশ হইতে বিতাড়িত হন। আজও ট্রট্স্কী দেশহারা হইয়া একটা বিভীষিকার মত রাজ্যে রাজ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া ঘুরিতেছেন।
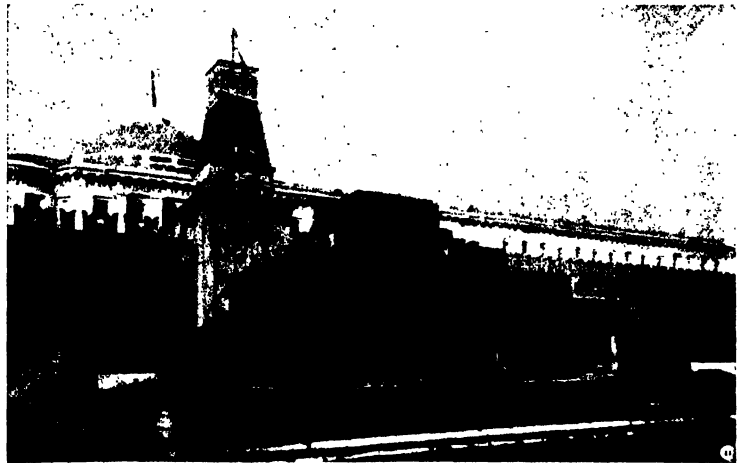
রেড স্কোয়ার—লেনিনের সমাধি

লি ও ট্রট্স্কী

জোসেফ ভিসারিওনোভিচ ষ্টালিন

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক কৃষক-পরিবারে ষ্টালিন জন্মগ্রহণ করেন। লেনিনের সময় ইনি কমিউনিষ্ট দলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যেই ইঁহার একাধিপত্যে দলের অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে এবং ট্রট্স্কী-প্রমুখ কর্ম্মীরা ষ্টালিনের ব্যক্তিগত নির্দ্দেশ ও প্রভাবের কবল হইতে দলকে মুক্ত করিয়া অধিকতর গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কমিউনিষ্ট দল প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, কৃষকদের বিষয়ে দলকে অধিকতর মনোযোগ দিবার জন্য দাবি করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ষ্টালিন সেক্রেটারীরূপে দলের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ও আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং দেশের বহু জায়গায় কমিউনিষ্ট দলের প্রধানরূপে স্বপক্ষীয় লোককে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, কাজেই যখন সত্যকার সংঘাত বাধিল, ট্রট্স্কী পরাজিত হইলেন। দলের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া ট্রট্স্কী সদলে নির্ব্বাসিত হইলেন। ইহার পর লেনিনের ব্যক্তিগত সহচর জিনোভিভ্ ও অন্যান্য কয়েক জন কমিউনিষ্টের সহায়তায় ট্রট্স্কী ষ্টালিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন, কিন্তু উহা পূর্ব্বেই প্রকাশ পাওয়ায় পণ্ড হইয়া যায়। ষ্টালিন নির্ম্মম ভাবে বিরোধী দলকে সাজা দিলেন এবং ১৯২৭ সালে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ষ্টালিন পূর্ব্বে কড়া কমিউনিষ্ট ছিলেন এবং লেনিনের পরিবর্ত্তিত মধ্যপন্থী নীতির (N. E. P.) পরিবর্ত্তে পুনরায় কড়া কমিউনিষ্ট নীতি প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু তখনও সেই একই ফল ফলিল; কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কাজেই দেশের লোকের মানসিক আবহাওয়ার সঙ্গে মত পরিবর্ত্তন করিয়া পরে তাঁহাকেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

জোসেফ ষ্টালিন

পঞ্চবার্ষিকী নীতি জগতের ইতিহাসে ষ্টালিনের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। ১৯২০ সালে একটি বিশেষ কমিটীর

রিপোর্ট মত রাশিয়ার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে একটি পঞ্চদশ-বার্ষিকী কার্য্য-পদ্ধতি (Plan) গৃহীত হয়। ইহা 'গোয়েল রো' নামে খ্যাত। এই কার্য্যপদ্ধতির সাফল্য দর্শনে ১৯২৭ সালে ষ্টালিন দেশের সমস্ত বিষয়ের উন্নতির জন্য একটা পঞ্চবার্ষিকী কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করেন। এই কার্য্য-পদ্ধতিতে দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, যানবাহন এবং শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি সব কিছুর উন্নতির পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমে সম্ভাবিত সাফল্যের পরিমাণের মাত্রা যথাসম্ভব কম ও বেশী ধরিয়া দুইটি রিপোর্ট তৈয়ারি হয় ও যেটিতে কম পরিমাণ ধরা ছিল সেটিকে 'পঞ্চবার্ষিকী' কার্য্যতালিকা বলিয়া গ্রহণ করা হয়। পরে ১৯২৯ সালে সোভিয়েট কংগ্রেসে আলোচনায় স্থির হয় যে, সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ধরিয়া যে রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে সেই কার্য্যক্রমটিই গ্রহণ করা উচিত এবং তাহাই করা হয়। যদিও পঞ্চবার্ষিকী কার্য্যপদ্ধতি পাঁচ বৎসরে পূর্ণ হইবার কথা, কিন্তু উহা ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবরে আরম্ভ হইয়া ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে অর্থাৎ চারি বৎসর তিন মাসে সম্পূর্ণ হইয়া যায় ও ১৯৩৩ সালে একটি "দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী কার্য্যপদ্ধতি" রাশিয়া গ্রহণ করে। উহা ১৯৩৭ সালে শেষ হইবে।*

* এই প্রবন্ধটী লেখকের "চিত্রে রুশ-বিদ্রোহের ইতিহাস" পুস্তকের অত্যন্ত সংক্ষিপ্তরূপ।

উক্ত পুস্তক রুশবিপ্লবের বিস্তৃত বিবরণসহ আর্টপেপারে ৪৩ খানি চিত্র সম্বলিত হইয়া ৭ই বৈশাখ প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবে। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

ছুটি

শ্রীশান্তা দেবী

কাল গৌরীর ছুটি। কথাটা ভাবিতেও তাহার ভরসা হয় না। মেয়েমানুষের আবার ছুটি! সে-সব বিয়ের মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে। মা থাকিতে তবু যাহা হউক মাঝে মাঝে তাহাকে টানিয়া-টুনিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া বাপের বাড়ি লইয়া যাইতেন, দুই চার দিনের জন্য হাতের সাঁড়াশি খুন্তি ছাড়িয়া ঝাঁটা ন্যাতার ভাবনা ভুলিয়া সে পাড়ার মেয়েদের গহনা কাপড় ও দেমাকের গল্প করিয়া মুখটা বদ্‌লাইয়া লইত। কিন্তু পোড়া অদৃষ্টে সে সুখ কয়দিনই বা সহিল? বিবাহের পর দুই বৎসর না-যাইতেই মা স্বামীপুত্রের কোলে মাথা দিয়া মেয়েটাকে চিরকালের মত সংসারের আগুনে দগ্ধ হইতে ফেলিয়া দিয়া সতীলোকে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় নিজের সৌভাগ্যের কথাই বলিয়া গেলেন, মেয়েটার দুর্ভাগ্যের কথা একবার ভাবিলেন না।

তখন ত গৌরীর বয়স মাত্র যোল বৎসর, আর আজ তাহার ত্রিশ বৎসর বয়স হইতে চলিল। এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে ছুটি কাহাকে বলে তাহা সে একদিনের জন্য পরখ করিয়া দেখে নাই। স্বামী সওদাগরি আপিসে কাজ করেন; রবিবারটা তাঁহার ছুটি। কিন্তু গৌরীর সেদিন দু-গুণ কাজ। হপ্তায় ছয় দিন স্বামী শুধু জলন্ত ভাত ডাল ও মাছভাজা খাইয়া আপিস যান, সন্ধ্যায়ও ভাল বাজার করা থাকে না বলিয়া ঝোলটা চচ্চড়িটার উপর আর কিছু হয় না। তাই রবিবার সকাল না হইতেই তেলধুতি পরিয়া গামছা-হাতে তিনি আপনি বাজারে বাহির হইয়া যান। গল্‌দা চিংড়ি, গঙ্গার ইলিশ, দিশী কই, ট্যাংরা, ভেটকি, যখনকার যা মনের মত মাছ কিনিয়া আনেন। আবার রাত্রের জন্য এক সের পাঁঠার মাংসও আসে। তরিতরকারির কথা ত না বলাই ভাল। কিবা তাহার এত দাম? কাজেই বাজারে যা চোখে ভাল লাগে তাহাই তিনি তুলিয়া আনেন। এই সৃষ্টির রান্না দুই বেলা বসিয়া বসিয়া করা কি আর কম কথা? সাহায্য করিবার মধ্যে ত ওই চার টাকা মাহিনার ঠিকা-ঝিটা! ঘস

ঘস্ করিয়া আধবাটা খানিকটা মশলা পাথরের রেকাবীতে তুলিয়া দিয়া আর দুম্ দুম্ করিয়া দুই ঘড়া জল মেঝেয় বসাইয়া দিয়াই সে খালাস। কটা মাছ কুটিয়া দিতে বলিলে বলিবে, "আজ বাপু, সব বাড়িতেই রোববারের হ্যাঙ্গাম, আমার অবসর কোথায়?" সে ত বলিবেই, মাহিনা-করা ঝি, কেনা বাঁদী ত আর নয়! পরের জন্য ভাবিতে যাইবে কেন? তুমি মর না তোমার হেঁসেলের ভিতর পচিয়া, তাহার কি গরজ পড়িয়াছে তোমার পিছনে ঘুরিতে?

মেয়েটা দশ বছরের হইয়াছে, কাজকর্ম্ম করাইলেই কিছু কিছু করিতে পারিত; তা গৌরীর একটু সুখ যাহাতে হয়, সংসারের কাহারও কি তাহাতে সহে? অমনি চোখ টাটাইতে থাকে। বাপ-কাকাতে পরামর্শ করিয়া বিবি মেয়েকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করা হইল—পড়িয়া মেয়ে টোল খুলিবেন কি না? মাষ্টারণীরা রবিবারে যত অঙ্ক আর লেখার গাদা করিতে হুকুম করিয়া দেন, মেয়ে সারাদিনই খাতাকলম লইয়া তাই করিতেছেন। শ্বশুরবাড়ি হইলে খাতা কলম সবই ত উনানে ফেলিয়া দিতে হইবে, তবু সে-কথা বাবু-সাহেবদের সামনে উচ্চারণ করিবার জো নাই। যাক, ও-সব কথা বেশী না ভাবাই ভাল; যাহাদের মেয়ে তাহারা যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই করিবে। মা ত ছেলেমেয়ের কেহই নয়, কেবল দশ মাস গর্ভে ধরিতে আর বুকের দুধ দিয়া মানুষ করিতে তাহার প্রয়োজন। ভাত-কাপড়ের টাকা দিবার ক্ষমতা যখন তাহার নাই, তখন ছেলেপিলের ভাল-মন্দর কথা বলিবার তাহার কিসের অধিকার? মুখ বুজিয়া খাটিয়া মরিবার জন্য স্ত্রীলোকের জন্ম, যত দিন হাত-পা আছে, খাটিয়াই মরিতে হইবে।

আপনার মনে সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে গৌরী আপনিই রাগিয়া উঠিতেছিল। বার মাস ত্রিশ দিন এমনি করিয়া ঘরের কোণে সংসারের ঘানিতে চোখ বাঁধিয়া ঘুরিয়াই তাহার কাটে, তবু ইহাকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে সে পারে না। কেহ তাহার আপত্তি ও অসন্তোষের কথা কানে তুলুক বা নাই তুলুক, যাহা বলিবার সে চিরকালই বলিয়া আসিতেছে।

এই যে এতবড় কলিকাতা শহর, ইহারই বুকে সে জন্মিয়া ত্রিশটা বৎসর কাটাইল; কিন্তু বলিলে কেহ কি বিশ্বাস করিবে যে কলিকাতার কিছুই সে দেখে নাই? লোকের মুখে শুনিয়াছে বটে যে এখানে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, পরেশনাথ, শিবপুরের বাগান, গড়ের মাঠ আর আরও কত কি আছে। কিন্তু নিজের এই পোড়াচক্ষু দুটি দিয়া সে কিছুই দেখে নাই। মা থাকিতে একবার কালীঘাটে দর্শন করিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু লোকের ভীড়ে ঠেলাঠেলিতে ভয়ে সে কিছুই দেখিতে পায় নাই। মাঝে হইতে কে একটা অসভ্য লোক তাহার হাত ধরিয়া টানিয়াছিল, শ্বশুরবাড়িতে জানাজানি হইবার ভয়ে মা পিসিমা লোকটাকে একটা উঁচুগলায় কথাও বলিলেন না। বাড়ি আসিতে বাবা রাগিয়া বলিলেন, "ইহজন্মে আর মেয়েকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাব না কোথাও।" সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু বাস্তবিকই তাহার পরজীবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কুটুম-বাড়িতে ছাড়া সে আর কোথাও যায় নাই।

যাহা না দেখিয়াছে তাহার জন্য তাহার খুব দুঃখ নাই, কিন্তু যাহা অহরহই দেখে অথচ কাছ হইতে ভাল করিয়া দেখিতে পায় না তাহার জন্য প্রায়ই আপশোষ হয়। ওই যে বাতাসের মুখে হাউইএর মত জোরে মোটর-গাড়ীগুলা বাঁশী বাজাইয়া ছুটিয়া যায়, গহনা-কাপড়-পরা মেয়েরা তাহার ভিতর হাসিয়া কথা কহিতেছে, এক মুহূর্ত্তের মত আবছায়া একটুখানি চোখে পড়ে, ওই গাড়ীগুলিতে চড়িতে গৌরীর বড় ইচ্ছা করে। স্বামীকে কত দিন একথা সে বলিয়াছেও, "হ্যাগা, খুব কি পয়সা লাগে ওই গাড়ীতে চড়তে? আমার বড় সাধ যায় এক-বার অমনি গাড়ীতে হুস ক'রে সারা শহরটা বেড়িয়ে আসি।" স্বামী বলেন, "পয়সা ত লাগেই; যাদের পয়সা আছে তারা কি আর ভাড়া ক'রে চড়ে? গাড়ী কিনেই চড়ে। ভাড়া মোটরে যাদের দেখ, তারা ভদ্রমেয়ে নয়।" কিন্তু কথাটা তাহার বিশ্বাস হয় না। পাড়াপড়শীদের মুখে কি আর কোন কথাই সে শুনিতে পায় না? এই ত সে-দিনই চন্দ্রা বলিতেছিল, বড়লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ থাকিলে তাহারা মোটরে ছাড়া কখনও যায় না। স্বামী যদি পয়সা খরচ করিতে না চান, নাই করিবেন। কিন্তু ছাদে উঠিলে বড় রাস্তায় ওই যে ট্রাম গাড়ীগুলা যাইতে দেখা যায়,

উহাতে ত নিত্য লোকে পাঁচবার চড়িতেছে। চার-পাঁচটা পয়সা খরচ করিলেই চড়া হয়। চন্দ্রা, বিধুর মা, রাণী-দিদি, সবাই ত ট্রামে চড়িয়া কত জায়গায় গিয়াছে। কিন্তু গৌরীর স্বামীর সবই অনাসৃষ্টি কাণ্ড। বলিলেই বলিবে, "হ্যাঁ, আর মেমসাহেবী ক'রে পুরুষের গা ঘেঁসে ট্রামে বসতে হবে না। তার পর কোন্ দিন ত ঘাঘ্‌রা প'রে নাচ্‌তে চাইবে ?"

ছিরির কথা শুনিলে হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়। বিশ্বসংসারে এত মেয়ে ট্রামে চলিতেছে, কর্ত্তার নিজেরই ত মাসতুতো বোনেরা রোজ ট্রামে চড়িয়া পুরুষের কলেজে পড়িতে যাইতেছে, তাহারা সবাই যেন নাচিবার ঘাঘ্‌রা ফরমাস দিয়া আসিয়াছে। আর নাচের কথাই যদি বল, তাইবা আজকাল বাদ যাইতেছে কোথায় ? গৌরীরই না-হয় তের বৎসর বয়সে মাথায় ঘোমটা তুলিয়া ঘরে শিকল দেওয়া হইয়াছিল ; এখনকার সব কুড়ি বছরের বুড়ীরা ত শুনি নাচ দেখাইয়া বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করিতেছে। বরেদের ত তাহাই পছন্দ। ক'টা মেয়ের জাত গেল তাহাতে। অদৃষ্ট বলিয়া একটি জিনিষ নিশ্চয়ই আছে। না হইলে গৌরীর বা তের বৎসরে বিবাহ হইল কেন, আর ইহাদেরই বা কুড়ি-বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত এত আনন্দে অবাধ স্বাধীনতার ভিতর দিন কাটিতেছে কেন ?

বড় একটা বারকোশে করিয়া ময়দা মাখিতে মাখিতে ও লেচি কাটিতে কাটিতে গৌরীর মাথার ভিতর দিয়া এত চিন্তা জলস্রোতের মত বহিয়া যাইতেছিল। বাবুরা দুই ভাই ও ছেলেমেয়েরা রোজই রাত্রে রুটি খান, তাছাড়া কাল সারাদিনের ছুটি পাইতে হইলে আজ হইতেই বাড়ি-সুদ্ধ লোকের সারাদিনের রসদ জোগাইয়া রাখিতে হইবে, এ ত জানা কথা। গৌরী ঠিক করিয়াছে সের-দেড়েক ময়দার লুচি নরম করিয়া ভাজিয়া ও এক খোরা আলুর দম রাঁধিয়া ধামা ও শিল চাপা দিয়া রাখিয়া যাইবে, তাহাতেই কালকের দুটো বেলা চলিয়া যাইবে। বুড়ী শাশুড়ীর জন্যই যা ভাবনা, একে দাঁত নাই, তাহাতে চোখ দুইটি প্রায় অন্ধ ; বাসি লুচিও চিবাইতে পারিবেন না, নিজেও হাত-পা নাড়িয়া কিছু করিয়া লইতে পারিবেন না। চারটিখানি চিঁড়া ভিজাইয়া রাখিয়া গেলে হয়। খোকাকে আজ বার-পাঁচেক মুখস্থ করাইয়া দিলে কাল সকালে হয়ত মনে করিয়া দোকান হইতে পোয়া-খানেক দই আনিয়া দিতে পারে। অবশ্য যা গুষ্টির ছেলে, হুঁস বলিতে ইহাদের কোন জিনিষ নাই। কাজেই বুড়ীকে না খাওয়াইয়া মরাও ইহাদের পক্ষে কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু কিইবা করা যায় ? ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি দিনের মাত্র ছুটি, তাহাও কি কেবল সংসারের চিন্তাতেই কাটিয়া যাইবে ? এ যেন ঠিক ঢেঁকির স্বর্গে গমন।

কোলের এক বছরের মেয়েটা তরকারির ঝুড়ির ভিতর হাত পুরিয়া খেলা করিতেছিল। হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করিয়া গৌরীকে চমক লাগাইয়া দিল। ময়দা-মাখা হাতে মেয়েকে তুলিয়া গৌরী লইয়া দেখিল একটা লাল টুকটুকে লঙ্কা হাতের মুঠায় ধরিয়া খুকী তাহাতে কামড় বসাইবার চেষ্টা করিয়াছে। ভাগ্যে চিবাইয়া ফেলে নাই, তাহা হইলে ত এখনই ঠোঁট ও জিব ফুলিয়া উঠিত, কাজ-কর্ম্মও ঘুরিয়া যাইত, বেড়াইতে যাইবার সখও মিটিয়া যাইত। এই মেয়েটাকে লইয়াই হইয়াছে সবচেয়ে বড় সমস্যা ! এটাকে ফেলিয়া যাইবে, কি লইয়া যাইবে, স্থির করা শক্ত। মেয়ে অর্দ্ধেক খান বোতলের দুধ, আর অর্দ্ধেক মায়ের দুধ। একটা দিন ঢোকাদুধ খাওয়াইয়া বাড়িতে রাখিয়া যে যাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু যা ছিনে-জোঁকের মত মায়ের দুধ টানা অভ্যাস, একদিন না পাইলে ক্ষুধায় না-হউক রাগেই চিলের মত চেঁচাইয়া মরিবে। ফিরিয়া আসিলে বুড়ী শাশুড়ী তখন গৌরীকে গাল দিয়া আর আস্ত রাখিবে না।

এক কাজ করিলে হয় ; রাণী-দিদির মেয়ে ত ছ-মাসের, দুধে তাহার এখনও যেন বান ডাকিয়া যায়। সে কি আর ইচ্ছা করিলে একটা দিন গৌরীর মেয়েকে দুধ দিতে পারে না ? কিন্তু দুধ দেওয়ার চেয়ে বড় হ্যাঙ্গাম যে সারাদিন ঐ পেত্নী মেয়ের ঝক্কি পোহান। রাণী-দিদি সৌখীন মানুষ, সে কি আর এত ঝঞ্ঝাট সহিতে রাজি হইবে ? নিজের ছেলেদেরই বলে তাহার দুইটা ঝি। হাঁ, ভাল কথা, ঝিগুলাকে আনা-চারেক পয়সা দিয়া মেয়েটা গছাইয়া দিলে হয় না ? কিন্তু তাহাতেও মুস্কিল আছে। বড়লোকের বাড়ি যে সারাদিন থাকিবে, এত জামা কাপড় তোয়ালে

তাহার মেয়ের কোথায়? বাড়িতে ত সে সারাদিন উলঙ্গই পড়িয়া থাকে। ওখানে অমন ভাবে দিলে ত ঝিয়েরাও বাঁ-পায়ের কড়ে-আঙুলে ছুঁইবে না। দেখা যাউক, মেজ খুকীর বয়স পাঁচ বৎসর হইলেও তাহার দুই-চারখানা জামা-কাপড় খুকীটা সেদিনকার মত পরিতে পারে কি না! না হইলে এত কাজের ভিতর এক দিনে কাপড় সেলাই করা কিংবা পয়সা খরচ করিয়া কিনিয়া আনা ত আর সম্ভব নয়।

একটা গোলাপী ফ্রক আগাগোড়া ধূলায় ধূসর করিয়া ডান হাতখানা মুখের ভিতর পুরিয়া চুষিতে চুষিতে মেজ খুকী লাবু আসিয়া মাতার সম্মুখে দাঁড়াইল। গৌরী একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়া বলিল, "হ্যাঁরে লাবি, বুড়ো হ'তে চল্‌লি, এখনও আঙুলচোষা রোগ গেল না?"

লাবি বলিল, "দাদা ল্যাবেনচুষ দিয়েছিল তাই খাচ্ছি, আঙুল ত চুষিনি।" তার পরই সে অন্য কথা পাড়িল, "মা, কাল তুই কোথায় যাবি, আমায় নিয়ে যাবি নে।"

গৌরী বলিল, "হ্যাঁ, তোমাদের ল্যাজে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্যেই আমি এত খাট্‌ছি আর কি? ঘরে ত অষ্ট প্রহরই হাড় জ্বালাতে আছ, আবার পথেও তোমাদের নিয়ে গেলেই হয়েছে।"

লাবি গাল ফুলাইয়া বলিল, "কেন হবে না? আমি ত আর বে'র যুগ্যি মেয়ে নয়, পথে বেরোলে আমার কি হবে? দিদিকে ঘরে রেখে যেও, আমি যাবই।"

গৌরী মুখনাড়া দিয়া বলিল, "একরত্তি মেয়ের কথার বাঁধন দেখ। ফের পাকামি করবি ত উনুন-কাঁদায় মুখ ঘসে দেব একেবারে। যা বেরো এখান থেকে এখ্‌খুনি।"

লাবি বাহিরে যাইবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। সেই-খানেই বসিয়া পড়িয়া মাটিতে পা ঘসিতে ঘসিতে নাকিসুরে "আঁমি যাঁব, আঁমি যাঁব" করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্নার শব্দ পাইয়া বড়খুকী ও পুঁটি কোথা হইতে আঁচল লুটাইতে লুটাইতে ছুটিয়া আসিয়া হাজির! "কোথায় যাবে মা, ও কেন কাঁদছে?" মা বলিল, "চুলোয় যাবার জন্য কাঁদছে; তুমিও ধর না প্যাঁ এইবার, তবে ত চার পোয়া ভর্ত্তি হয়।"

পুঁটি খানিক ক্ষণ মুখ গম্ভীর করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি বুঝি নেমন্তন্ন খেতে যাবে? ওকে কেন নিয়ে যাবে না মা? আমার ত দুখানা রাঙা শাড়ী আছে, একটা ওকে দেব, তাহলেই ত দু-জনেরই যাওয়া হবে।" গৌরী বলিল, "না গো না, দাতাকর্ণ, তোমায় শাড়ী দিতে হবে না, আমি নেমন্তন্নে যাচ্ছি না। তোমাকেও নিয়ে যাব না, ওকেও নিয়ে যাব না, আমি একাই যাব।"

পুঁটি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ছুটকীটাকেও নিয়ে যাবে না? ও কার কাছে থাক্‌বে?"

গৌরী রাগিয়া বলিল, "কার কাছে থাক্‌বে তার আমি কি জানি? একটা দিনের জন্যে বাইরে যাব তা এখন সুরু হ'ল কৈফিয়ৎ দেওয়া সাত গুষ্টিকে। ডেকে নিয়ে আয় না মনা, ধনা সবাইকে, কার কি বলবার আছে ব'লে নিক্। এমন অদেষ্টও মানুষের হয়! সাতকুলে কেউ যদি আছে একটু সাহায্য করতে। কাল যদি আমি মরি, তাহ'লেও তোদের গলায় বেঁধে মরতে হবে, না?" পুঁটি মাতার এমন আক্রোশের কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেল। গৌরী ছোট মেয়েটাকে মেঝে হইতে তুলিয়া পুঁটির কোলে চাপাইয়া দিয়া বলিল, "যা দিখি যা, এটাকে নিয়ে একটু বাইরের রোয়াকে বস্‌গে যা। আমার ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে এখনও। এই সব লুচি-তরকারী হ'লে পর মা'র কাপড় তুলে, কত্তার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাণীদির বাড়ি যেতে হবে মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করতে। সন্ধ্যে ত হয়ে গেল, কখন যে কি করব ভেবেই পাচ্ছি না। এদিকে ভোর না হ'তে দুধ জ্বাল দিয়ে ছুটকীকে একবার গিলিয়ে যেতে হবে। তারা ত ৭৷৷টাতেই এসে পড়বে নিতে।"

পুঁটি বাহিরে যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া পড়িয়া আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কারা মা, কারা?" গৌরী হঠাৎ সদয় হইয়া বলিল, "ঐ যে রে কত্তার বন্ধু তিনকড়ি বাবু, তাঁরই মা আর বোন। দেশ থেকে এসেছে অর্দ্ধোদয়-যোগে গঙ্গাচান করতে। কাল সকালে চান ক'রে সারাদিন শহর দেখ্‌বে আমিও যাব সেই সঙ্গে।" লাবি ও পুঁটি সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "মা আঁমরাও যাব তোর সঙ্গে।"

গৌরী বলিল, "কোথায় যাবি বাছা পরের সঙ্গে। তাদের গাড়ীতে অনেক লোক থাক্‌বে, আমি অমনি কোনো রকমে তার মধ্যে ঝুলেটুলে চলে যাব। ছেলেপিলে কি

র সঙ্গে নেওয়া চলে।" লাবির কান্না থামিল না, পুঁটি
খটা মুছিয়া লইয়া বলিল, "আমার জন্যে তাহ'লে গঙ্গার
থেকে একটা বৌ-পুতুল এনো।"

লাবি কাঁদিয়া কাঁদিয়াই বলিল, "আমারও।"

কাজকর্ম সারা হইলে গৌরী রাণীর বাড়ি গিয়া দেখিল
নেও যোগে স্নানের পরামর্শ চলিতেছে। গৌরীকে
খিয়া রাণী বলিল, "কি ভাই, যাবে নাকি আমাদের
? তুমি ত সাতজন্মে কোথাও যাও না, এই সুযোগে
টু ঘর থেকে বেরোনোও হ'ব, পুণ্যি করাও হবে।
মরা ট্রামে যাব দল বেঁধে, ট্রাম-চড়ার সখটাও ওই সঙ্গে
টয়ে নিতে পারবে।"

গৌরী একটু দুঃখের সহিত গর্ব্বের সুর মিলাইয়া বলিল,
া ভাই, তোমাদের সঙ্গে ট্রামে যাওয়া আর ঘটল না;
নে ওঁর বন্ধুর মোটরে যাবার ব্যবস্থা করেছেন।"

রাণী বলিল, "তবে ত তোমার পোয়া বার, আর
রবের সঙ্গে ট্রামে যাবে কেন?"

গৌরী বলিল, "গরিব যে কে তা ত ভাল করেই জান।
ব আর ঠাট্টা করছ কেন? সঙ্গে যাই আর নাই যাই,
মি এলাম তোমারই একটু দয়া ভিক্ষা করতে। বল্‌তে
যে হয় না, কি জানি কি ভাব্‌বে তুমি।" রাণী বলিল,
র্ভয়েই কও, অত ভেবে কি হবে?"

গৌরী বলিল, "আমি ত কলকাতা শহরের কিছুই
খি নি, তাই ওই সঙ্গে কাল সব দেখে আস্‌ব। তিনকড়ি
র মা বোনেরা কাল চানের পর সারাদিনই বেড়াবে,
রের এ-মোড় থেকে ও-মোড় কিছু আর বাকী রাখ্‌বে
তা পরের সঙ্গে ছেলেপিলে নিয়ে যাওয়া ত আর
না, ওগুলোকে ঘরেই ফেলে যেতে হবে। শুধু
টার জন্যে ভাবনা। তুমি যদি ওকে তোমার ঝিদের
ই একটু রাখ্‌তে দাও, আর—আর—কি বলে—একটু—
—"

গৌরী থামিয়া গেল। রাণী বলিল, "বাপ রে বাপ,
না কথা তার আবার এত আম্‌তা-আমতা! থাক্‌বে
ছুটকী এখানে, তাতে কি পৃথিবী উল্টে যাবে?"

গৌরী সলজ্জভাবে বলিল, "না, ও এখনও মাই-দুধ
ড় নি কি না!"

রাণী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তার জন্যে এত
আকাশ-পাতাল ভাবতে হবে না। তুমি লাবিটাকেও
এইখানে রেখে যাও।

মেয়েদের ব্যবস্থা ত হইল, এখন পুঁটি লক্ষ্মীছাড়ী না
বিপদ বাধাইলেই হয়। যে-কথাটি যাহাকে বলা বারণ, সবার
আগে তাহাকেই সেই কথা বলিয়া আসা মেয়ের রোগ।
সাধে কি আর গৌরী মেয়েদের কাছ হইতে এতক্ষণ কথাটা
লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পুঁটি সাত-তাড়াতাড়ি ঠাকুমার কাছে
গৌরীর নামে লাগাইতে ছুটিবে। এইবেলা কিছু ঘুষ
দিয়া উহার মুখ না বন্ধ করিলে অর্দ্ধোদয় দেখা তাহার মাথায়
উঠিয়া যাইবে। বৌমানুষের এই সব ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস
খাইবার চেষ্টা শাশুড়ী দু-চক্ষে দেখিতে পারেন না। বুড়ী
শাশুড়ী রহিল ঘরে পড়িয়া আর বৌ চলিলেন গঙ্গাস্নানের
পুণ্য করিতে। ভাগ্যি চোখে তেমন দেখিতে পান না,
তাই কোন প্রকারে লুকোচুরি করিয়া সরিবার আশা আছে।
নহিলে এ-সব কল্পনা সে স্বপ্নেও করিত না। পুঁটিকে এক
মুঠা আমচুর ঘুষ দিয়া আজিকার মত চুপ করাইয়া রাখিতে
পারিলে কাল যদি সে ঠাকুমাকে বলিয়াও দেয় ত কিছু
আসিয়া যায় না। ঘর হইতে একবার বাহির হইয়া পড়িলে
বুড়ী যতই গাল দিক না গৌরীর ত আর গায়ে লাগিবে না।
ফিরিয়া আসিলে অবশ্য এক পালা খুব চলিবে। তা' পেটে
খাইতে পাইলে পিঠে অমন দুই-চারি ঘা সহিয়া যায়।

গৌরী ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া সকাল-সকাল খাওয়াইয়া
শুইতে বলিল। মনা ধনা বলিল, "কেন মা, এখুনি শোব
কেন? রোজ ত কত রাত ক'রে পড়াশুনো ক'রে
তবে শুই।"

পুঁটি নাচিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি জানি, জানি।"

গৌরী তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "জান ত একেবারে
রাজা ক'রে দিয়েছ আর কি? চুপ ক'রে থাক্‌ এখন।"
তার পর মনাকে ডাকিয়া আদর করিয়া বলিল, "তুমি বাবা
লক্ষ্মীটি, কাল সকালে ৯টার সময় ঠাকুমাকে এক-পো দই
কিনে এনে দিও, এই তোমার কোঁচার খুঁটে আমি পয়সা
বেঁধে দিলুম। কিছুতেই এ কথা যেন ভুলো না। সকালেই
আমি গঙ্গা নাইতে চলে যাব, তুমি যদি না এনে দাও ত তাঁর
সারা দিন খাওয়াই হবে না।"

মনা বলিল, "তুমি কি সারাদিনই গঙ্গা নাইবে নাকি?"

হাসিয়া গৌরী বলিল, "সারাদিনই নাইব না। কিন্তু আমিও ত একটা মানুষ, আমারও ত সখ-টখ একটু-আধটু হয়। কাল চানের পর আমি কলকাতা শহর দেখ্‌তে যাব। তোরা সব যাদুঘর, চিড়িয়াখানা কত কি বলিস্‌, কাল আমি একেবারে সব শেষ ক'রে দেখে আস্‌ব।" মনা বিজ্ঞের মত বলিল, "দেখতে ত যাচ্ছ, কিন্তু সেখানে সব তিমিমাছ, উটপাখী, সিন্ধুঘোটক কত কি আছে, তোমাকে বুঝিয়ে দেবে কে? সব ইংরিজীতে লেখা, তুমি ত এ বি সি ডি-ও জান না।"

গৌরী বলিল, "না জানি ত কি হয়েছে! যারা ইংরেজী জানে না তারা বুঝি আর চোখে তাকিয়ে দেখ্‌তেও জানে না!"

মনা বলিল, "চোখ তাকালেই যদি সব বোঝা যেত তাহ'লে আর লোকে এত কষ্ট ক'রে দিনরাত খেটে পড়াশুনো করত না।"

আসরে গৌরীর স্বামী আসিয়া দেখা দিলেন। গৌরী তাড়াতাড়ি আসন পাতিয়া তাঁহাকে বসিতে দিয়া বলিল, "হ্যাগো, ভাল ক'রে ব'লে এসেছ ত? পথঘাট ঠিক ব'লে না দিলে তাদের গাড়ী আবার বাড়ি খুঁজে পাবে না। আমি এদিককার সব ব্যবস্থা সেরে রেখেছি, আমার জন্যে এক মিনিটও দেরি হবে না।"

কর্ত্তা শম্ভুনাথ আসনে বসিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "বলেছি গো বলেছি, আমাকে আর শেখাতে হবে না। কিন্তু তোমাদের ছেড়ে দিতেই যে আমার ভরসা হচ্ছে না। আজ শুনে এলাম পাঁচ লাখ লোক নাকি স্নান করতে এসেছে কলকাতায়। এই ভীড়ের মধ্যে তোমাদের ছেড়ে দিলে চাপা পড়েই ত মারা যাবে। এবারকার মত না-হয় চানটা বন্ধ থাক, পরে আবার কখনও গেলেই হবে।"

গৌরী একেবারে ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, "হবে পরে! আমি যমের বাড়ি গেলে গঙ্গার ধারে ত নিয়ে যেতেই হবে। একসঙ্গে চিরকালের মত পুণ্যি হয়ে যাবে। এই মতলব যদি ছিল ত আগে বল্‌লেই হ'ত, সারাদিন ধ'রে সাত-শ রকম কাজে আমি খেটে মরতুম না। দণ্ডবৎ বাবা এই গুষ্টিকে, মানুষের একটা ভাল যদি সইতে পারে!..."

গৌরীর সুর ক্রমেই চড়িতেছে দেখিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "যেও গো যেও, গাড়ীচাপা পড়তে যদি তোমার সখ থাকে আমি বারণ করব না। আমার জামা-কাপড়টা ঠিক ক'রে রেখে যেও, তাহলেই হবে।"

গৌরী কথার উত্তর দিল না। কয়েক মিনিট উত্তেজিত ভাবে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করিয়া আবার স্বামীর সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "গাড়ীচাপা পড়ে মরলে আর আমার ক্ষতিটা এমন কি বেশী হবে? তোমার উনুন-কাঁদায় বসে ত চারবেলা রাজ-সেবা পাচ্ছি না। সে তবু বুঝব ধর্ম্ম করতে গিয়ে প্রাণটা গিয়েছে। সেকালে ত লোকে রথের চাকাতে ইচ্ছে করেই প্রাণ দিত।"

শম্ভু চটিয়া বলিল, "তবে আর ঘটা ক'রে বেড়াবার আয়োজন করা কেন? সকালে উঠে একটা গাড়ীর চাকাতেই মাথা পেতে দিও এখন। একেবারে বৈকুণ্ঠলাভ হয়ে যাবে। তার আগে আজকের মত আমার ভাতটা বেড়ে দাও।"

গৌরী রাগে গর-গর করিতে করিতে শম্ভুর ভাতের থালাটা আনিয়া দুম্‌ করিয়া তাহার সম্মুখে বসাইয়া দিল। রাগের মাথায় এক বাটি ডালই ভাতের উপর ঢালিয়া দিল। তার পর কাহারও কিছু প্রয়োজন আছে কিনা খোঁজ না-করিয়াই আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

টিনের ট্রাঙ্ক ঘাঁটিয়া অনেক কষ্টে লাবির দুইটা ও ছুটকীর একটা পরিষ্কার ফ্রক বাহির হইল, তাহারও আবার সব কয়টাতে বোতাম নাই। ছেলেদের শার্টের বোতাম কাটিয়া গৌরী মেয়েদের জামায় লাগাইয়া দিল। ছেলেরা নিজের ঘরে থাকিবে একদিন জামায় বোতাম না থাকিলে কিছু আসিয়া যায় না। পরের বাড়িতে যাহারা যাইবে, তাহাদের জামাগুলা আগে ঠিক হওয়া দরকার। পাজামা লাবির দুইটা আছে, ছুটকীর একটাও নাই। সকাল-বেলা এই দুইটাই দুই জনকে পরাইয়া দিবে, আর ধনার ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্টের পা দুইটা মুড়িয়া ছুটকীর জন্য একটা বাড়তি পাজামা বানাইয়া রাখিয়া গেলেই হইবে। কিন্তু বাড়িতে একটা কাঁচিও নাই যে পা দুইটা ঠিক করিয়া কাটিবে। গৌরী হাফ-প্যাণ্টটা লইয়া বঁটিতে ঘসিয়া একটু কাটিয়া

বাকিটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তার পর পুরানো পাড় হইতে তোলা লাল সুতা দিয়া সেই দুইটাকে সেলাই করিয়া মেয়ের ভদ্র পরিচ্ছদের সমস্যা মিটাইল। তোয়ালে বলিয়া বাড়িতে কোন পদার্থ নাই, জোলার একখানা গামছা আছে, তাহাতেই বাড়িসুদ্ধ স্নান ও কর্ত্তার রবিবারের বাজার করার কাজ চলিয়া যায়। রাণীদিদির ছেলেরা আবার পরের গামছায় স্নান করে না। কাজেই বিছানার চাদরের ছেঁড়া টুকরাটা পাশ মুড়িয়া এই সঙ্গে দিয়া দিতে হইবে। বড়মানুষের বাড়ি এক বেলা থাকিতেও এক মাসের ব্যবস্থা দরকার। ভাগ্যে গৌরীর সাবান একখানা ছিল, না হইলে সাবান কিনিতে আবার পয়সা বাহির করিতে হইত।

গৌরীর নিজের ব্যবস্থাও একটু করা দরকার। স্নানের গামছাখানা একদিনের মত সে-ই লইয়া যাইবে, ছেলেরা ঠাকুরপোর গামছায় একদিন মাথা মুছিয়া লইলে সে নিশ্চয়ই মারিতে আসিবে না। স্নানের পর পরিবার জন্য একখানা ভাল কাপড় ত চাই,—কত ভাল ভাল জায়গায় লোকজনের সঙ্গে ঘুরিতে হইবে ত! চৌদ্দ বৎসর আগে মা পূজার সময় একখানা হাতী ও মাছ পাড়ের মাদ্রাজী শাড়ী দিয়াছিলেন তাহার এক দিকের পাড় বেগুনী, একদিক লাল। কাপড়খানা গৌরীর ভারী পছন্দ ছিল। কোথাও যাওয়া-আসা প্রায় নাই বলিয়া বেশী পরা হয় না। সেইখানাই গামছার মধ্যে জড়াইয়া লইয়া যাইবে, পাঁচ জনের মধ্যে পরিবার মত শ্রী সেখানার এখনও আছে।

রাত্রে গৌরীর চোখে ঘুমই প্রায় আসিল না। যত বারই ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়ে, তত বারই চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া যায়, কখন বুঝি ভোর হইয়া যাইবে। ভোরবেলা গোয়ালার কাল আসিবার কথা, দুধ জাল দিয়া একবার ছুট্‌কীকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া যাইতে হইবে, তার পর দুটো মেয়েকেই একটু মাজিয়া-ঘসিয়া তবে ত রাণীদির বাড়ি পৌছাইয়া দিবে। শীতকালের বেলা, সাড়ে সাতটা না-বাজিতে গাড়ী আসিয়া পড়িবে।

সকালে সাতটার সময় গৌরী যখন মেয়েদের রাণীর বাড়ি দিয়া আসিল, তখনই তাহারা স্নানযাত্রার উদ্যোগ করিতেছে। তাহারা সকাল-সকাল স্নান সারিয়াই ফিরিয়া আসিবে, বেশী ভীড়ের সময় থাকিবে না, বাড়িতে একেবারে কচি মেয়ে! তাহাদের বাড়িটা বড় রাস্তার প্রায় ধারেই, গৌরী বারাণ্ডা দিয়া দেখিল সারা কলিকাতার লোকই প্রায় ইতিমধ্যে পথে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। অনাবৃত দেহ পুরুষ ও মলিনবস্ত্রা নারীর ভীড়ে পথ ভরিয়া গিয়াছে। হারাইয়া যাইবার ভয়ে দূর গ্রামের মেয়েরা এখন হইতেই আঁচলে আঁচলে গিরো বাঁধিয়া চলিয়াছে। একটা ঘোড়ার গাড়ী দেখিলেই চাপা পড়িবার ভয়ে হাঁটুর কাপড় তুলিয়া দিগ্‌বিদিকে ছুটিতেছে। এক দল ছেলে লাল উর্দ্দি পরিয়া গলির মুখে মুখে ঘুরিতেছে, দুই-একটা নরিতে কাহারা যেন লুচি ও বোঁদে বোঝাই করিয়া লইয়া চলিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় মাড়োয়ারী। গৌরীর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিবার আর একটু ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কখন গাড়ী আসিয়া পড়িবে, আসল দেখাই হইবে না, এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি সে বাড়ি চলিয়া গেল।

গৌরীকে খিড়কির দরজায় দেখিয়াই শম্ভু বলিল, "ওগো, আজকের রবিবারে ত আর বাজার করা নেই, তোমার ত আজ অরন্ধন। কাপড়-জামাটা নিয়ে পথেই বেরোনো যাক্, ভীড় দেখাও হবে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে স্নানটাও হয়ে যাবে। তুমি ছেলেগুলোকে ব'লে দিও তুমি যাবার পর যেন বাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে রাখে। আজ খালি শহর পেয়ে চোর-ছ্যাঁচড় অনেক এদিক-ওদিক ঘুরবে।"

শম্ভু কাপড় লইয়া বাহির হইয়া গেল। গৌরী একবার ঘর ও একবার বাহির করিতে লাগিল। রান্নাঘরের উনানে আগুন নাই, মেঝেয় বসিয়া ছুট্‌কী কাঁদিতেছে না, লাবি তাহার পিছন পিছন আঁচল ধরিয়া ঘুরিতেছে না, দিনটা যেন কেমন কিম্ভূতকিমাকার ঠেকিতেছে। এমন একেবারে বিনা-কাজে মানুষ দিন কাটায় কি করিয়া? আধ ঘণ্টাতেই ত গৌরী হাঁপাইয়া উঠিতেছে। রাণীদি·চন্দ্রারাও বাড়ি নাই যে খানিক ক্ষণ গল্প করিয়া আসিবে। ছাদে উঠিয়া ভীড় দেখিলেও চলিত, কিন্তু গাড়ী আসিয়া ফিরিয়া যাইবার ভয়ে সেখানেও যাওয়া চলিবে না। গাড়ীটা কোনো রকমে আসিয়া পড়িলে সব গোল চুকিয়া যায়। সাড়ে সাতটা

কি আর বাজে নাই? তাহার কাছে ঘড়ি নাই বটে, কিন্তু রোদের রকম দেখিয়া ত আটটার কম মনে হইতেছে না।

খুট্ খুট্ করিয়া দরজায় কে যেন কড়া নাড়িতেছে। গাড়ীর চাকার ত কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না। মোটর-গাড়ী কি এমনই নীরবে আসে নাকি? "পুঁটি—দেখ ত রে, দোরটা খুলে কে কড়া নাড়ছে।"

পুঁটি দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিল অচেনা এক জন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। পুঁটিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইটা কি শম্ভুনাথ বাবুর বাড়ি?"

পুঁটি বলিল, "হ্যাঁ।"

লোকটা ছোট্ট এক টুকরা কাগজ পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিল, "বাবুরা এই চিঠি দিয়েছেন।"

পুঁটি বলিল, "বাবা ত বাড়ি নেই, মা জবাব দিতে পারবে না।"

সে বলিল, "জবাবে দরকার নেই। তুমি ভিতরে দাও গিয়ে।"

গৌরী মেয়েকে ডাকিয়া বলিল, "তুই পড়্ না, কি লেখা আছে।"

পুঁটি বানান করিয়া করিয়া পড়িল,

"কাল রাত্রে দেশ হইতে আর দুই জন আত্মীয়া আসিয়া পড়াতে গাড়ীতে আর জায়গা নাই। আপনার স্ত্রীকে গঙ্গাস্নানে লইয়া যাইতে পারিলাম না বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি। ইতি। শ্রীতিনকড়ি রায়।"

গৌরীর আজ অখণ্ড ছুটি। স্নান করিবার কষ্টটুকুও স্বীকার করিতে হইল না।

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

৬

কৈশোর যৌবনের সন্ধিকাল পরমাশ্চর্য্যকর। এ যেন হিমালয় গিরিশৃঙ্গে সূর্য্যোদয়। প্রথম অরুণরশ্মির স্পর্শে শুভ্র তুষারশৃঙ্গ রাঙা হইয়া ওঠে, পর্ব্বতের পাদতলে স্থির ধূসর মেঘস্তূপ আলোড়িত চঞ্চল হইয়া উড়ন্ত পাখীর ডানার মত কাঁপে, নবোদিত সূর্য্যের স্বর্ণধারা পান করিতে ঊর্দ্ধে উড়িয়া আসে, মেঘের সমুদ্রে কনকবর্ণের অপরূপ লীলা হয়। খণ্ড তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত রঙীন মেঘগুলি তুষারশৃঙ্গের চারিদিক ছাইয়া ফেলে। তেমনি, কিশোর-অন্তরে যৌবনের অরুণোদয়ে দেহ-মনে কি বিচিত্র আলোড়ন, কত অপূর্ব্ব আশা, রঙীন কল্পনা, নব নব অনুভূতি। জীবনের এই অংশটি বড় রহস্যময়। কখনও অভূতপূর্ব্ব অনুভবে অন্তর আনন্দপূর্ণ, কখনও অজানা আশঙ্কা, অস্পষ্ট ভাবনায় মন বিষণ্ণতাময়। কবিরা এই জীবনাবস্থাকে বসন্ত-প্রভাতের সহিত তুলনা দিয়াছেন। রাত্রে বৃক্ষগুলি পীতপত্রময়, পুষ্পহীন ছিল, ফাল্গুন-প্রভাতে উঠিয়া দেখ, কুটীর-প্রাঙ্গণে আম্রবৃক্ষে নব-মুকুল, রক্তকরবীকুঞ্জে রক্তিম পুষ্পোচ্ছ্বাস, বৃক্ষের শাখায় শাখায় বিকচোন্মুখ পুষ্পগুচ্ছ, পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে জাগরণের আলোড়ন।

কিশোর যখন যৌবনের দ্বারে আসিয়া পৌঁছায়, সে চমকিয়া ওঠে, বসন্ত-স্পন্দিত পৃথিবীর মত তাহার দেহে মনে প্রাণ-প্রকাশের আকুলতা জাগে, নব নব অনুভূতি লাভের তৃষ্ণায় সে চঞ্চল হয়। অপরিণত দেহ দিয়া নব বিকশিত প্রাণের পূর্ণশক্তি সে ধারণ করিতে পারে না, তরুণ অনভিজ্ঞ মন দিয়া সে বুঝিতে পারে না, তাহার জীবনে প্রকৃতি-লক্ষ্মী কোন্ স্বপ্ন কোন্ মায়া রূপ রচনা করিতে চায়। সে দিশেহারা, উদাস হইয়া যায়।

বস্তুতঃ জীবনের এই কাল অনেকের পক্ষে সুমধুর নয়। যৌবন-সিংহদ্বারের প্রবেশপথ বেদনাময়। বাল্যের সরলতা সহজ চপলতা হারাইয়া কিশোর সহসা গম্ভীর হইয়া যায়।

বালকদের দলে তাহার স্থান নাই, বয়স্করাও তাহাকে বয়সে বড় হইয়াছে বলিয়া মানে না। তাহার ইচ্ছা করে, সে খুব শীঘ্র বয়স্কদের সমান হইয়া ওঠে। এই গূঢ় ইচ্ছা নানা রূপে প্রকাশিত হয়। দাড়ি না থাকিলেও সে দাড়ি কামাইতে আরম্ভ করে, লুকাইয়া সিগারেট খাইতে শেখে, রূপকথা ছেলেদের গল্পের বই ছাড়িয়া বয়স্কদের পাঠ্য উপন্যাস লুকাইয়া পড়ে।

তাহার মনে নানা বাসনা জাগে। রূপরসগন্ধভরা পৃথিবী সে ভোগ করিতে চায়। অনুভূতির শক্তি সূক্ষ্ম তীব্র হইয়া ওঠে। ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য বোধ জাগে। অথচ স্বাধীনভাবে চলিবার কাজ করিবার পথ খুঁজিয়া পায় না। অত্যন্ত বেদনাপ্রবণ, আত্মাভিমানী হইয়া ওঠে। সামান্য অবিচারে সে অবমানিত, তুচ্ছ কারণে সে বিমর্ষ। বয়স্কদের শাসনে অবহেলায় সে সহজে বিদ্রোহ করে না বটে, কিন্তু অন্তরে রোষ সঞ্চিত হয়। বয়স্কদের ব্যবহার, জীবন-প্রণালীর বিচার করে। মনে মনে সঙ্কল্প করে, এই অত্যাচার, অপমান অধিক দিন সহ্য করিবে না। এ-ক্রোধও বৈশাখের ঝড়ের মত ক্ষণস্থায়ী। একটু প্রেম, স্নেহ পাইলেই মনে করে তাহার জীবনের দুঃখ দূর হইয়া গেল।

অরুণের জীবনে প্রথম যৌবনারম্ভ হইল বসন্ত-প্রভাতের পুষ্পগন্ধোচ্ছ্বাস বর্ণোৎসবে নয়, শিশিরসিক্ত শরৎ-রাত্রির স্বপ্নময় করুণতায়।

অরুণ অনুভব করিল, কোন নিগূঢ় প্রাণশক্তি তাহার দেহে অপরূপ ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতে চায়, কিন্তু কোথায় যেন বাধা পাইতেছে, তাহার অপরিণত দেহ এই অপূর্ব্ব প্রাণের উপযুক্ত বাহক নয়। সে অনুভব করিল, কোন চিৎশক্তি তাহার চৈতন্যে আপন মহিমা প্রকাশিত করিতে চায়, কিন্তু ক্ষুদ্র জ্ঞান ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া সে তাহার কতটুকু প্রকাশ করিতে সমর্থ! সে বুঝি ব্যর্থ হইল। এই উপলব্ধির ক্ষণগুলি দুঃখময়।

কোন প্রভাতে স্কুলের বই পড়িতে পড়িতে তাহার মনে হয়, তুচ্ছ এ পাঠ, সে কোন বৃহৎ কর্ম্মের জন্য এ-পৃথিবীতে জন্মাইয়াছে, তাহার সাধনা, তাহার আয়োজন কই? পাঠে ধৈর্য্য থাকে না। প্রভাত উদাস হইয়া ওঠে।

ক্লাসে পাঠ শুনিতে শুনিতে সে আনমনা হইয়া যায়। সে যে বন্দী। এ-স্কুলে সে কয়েদী, তাহার জীবনে কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য সফল হইবে, তাহার জন্য সে কি সাধনা করিতেছে?

সন্ধ্যায় সে বাগানে একা ঘুরিয়া বেড়ায়। কত অমূলক আশা অজানা স্বপ্ন জাগে। নিজ মনের এই সব অভিনব চিন্তায় নিজেই অবাক হইয়া যায়। এই সব অসম্ভব কল্পনা কোথায় সুপ্ত ছিল, আজ সুন্দরী বারুণীকন্যাদের মত অন্তর-সমুদ্রের অতলতা হইতে উঠিয়া তাহাকে ভুলাইতে আসিল।

কেবল সৎচিন্তা নয়, কুৎসিত সরীসৃপের মত কত অদ্ভুত কামনা অন্ধকার অন্তরগুহা হইতে বাহির হইয়া আসে, নিজেকে অশুচি মনে হয়।

সে ভাবে জীবন মহা দায়িত্বময়; মানবজন্ম সার্থক করিতে হইবে। স্কুলে যে-সকল উপদেশ শোনে, পুস্তকে যে-সকল নীতিকথা পড়ে, সেগুলি মহান্ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। বয়স্কদের জীবনযাত্রাহীন বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে কত দুঃখ, কত পাপ। সে-সব দূর করিতে তাহারা কি করিতেছে?

মাঝে মাঝে অরুণের মনে সন্দেহ জাগে। হয়ত সে সব ভুল বুঝিতেছে। "শান্তিনিকেতন" "কর্ম্ম-যোগ" নানা বই অধিক পড়িয়া হয়ত তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। এই সকল নূতন চিন্তা সে নিজমনে গোপন রাখে, কোন বন্ধুর সহিত আলোচনা করিতে পারে না।

রাত্রে তাহার প্রায়ই ঘুম ভাঙিয়া যায়। গ্রীষ্মের অগাধ রাত্রি; চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা; গাছের পাতা নড়ে না; খোলা জানালা দিয়া দেখা যায় পাণ্ডুর আকাশে বৃহৎ শীতল চন্দ্র, নারিকেল তালগাছের পাতাগুলি নীলাকাশে কালো ছোপের মত; জনহীন অন্ধকার গলিতে গ্যাসের আলো জ্বলে, কদমগাছের শাখায় রহস্যময় অন্ধকার। অরুণের মনে হয়, কে যেন ওই গাছের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে ডাকিতেছে, কোন্ গোপন দুর্গম দুঃখময় পথে তাহাকে লইয়া যাইতে চায়। অরুণের ভয় হয়। চারিদিক বড় নির্জ্জন! সে বড় একা। গা ছম্‌ছম্ করে। চুপ করিয়া বিছানাতে শুইয়া থাকে। এক নিশাচর পাখী উড়িয়া যায়।

ধীরে শীতল বাতাস বয়। কদম্ববৃক্ষ মর্ম্মরিত হইয়া

উঠে। অরুণ বিছানা হইতে উঠিয়া জানালার ধারে চুপ করিয়া দাঁড়ায়; বাতাস বড় স্নিগ্ধ, রাত্রি বড় শীতল। ভয় দূর হইয়া যায়। চোখে আবার ঘুম আসে। চন্দ্রমা যেন স্বপ্নতরী।

৭

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইল। অরুণ বাঁচিয়া গেল। সে ঠিক করিল, নিয়মিত পাঠাভ্যাস ও শারীরিক ব্যায়াম করিয়া মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিবে। ছুটি হইতেই সে এক রুটিন করিয়া ফেলিল, প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা স্কুলের বই পড়িবে; এক ঘণ্টা প্রতিমাকে পড়াইবে বা তাহার সহিত গল্প করিবে; এক ঘণ্টা নিয়মিত ভাবে বাগানে মাটি কাটা, পুকুরে স্নান, ব্যায়াম; দুই ঘণ্টা বেড়াইবে হাঁটিয়া গড়ের মাঠে যাইবে; আর এক ঘণ্টা রাখিল কবিতা লিখিবার জন্য।

সে কবি হইবে, ইহাই তাহার অন্তরের গোপন ধ্যান। মাঝে মাঝে সে কবিতা লিখিতে বসে, জয়ন্তের চেয়ে কিছু খারাপ লেখে না। কিন্তু তৃপ্তি হয় না, আপনার অন্তরের ছন্দ, ভাষা সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা ভাঙিয়া নূতন করিয়া সাজাইতেছে। কবিতাগুলি লিখিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলে। এই ফুল, পাখী, আকাশ, আলোক, প্রেম লইয়া সে কবিতা লিখিতে চায় না। সে হইবে জনগণের কবি; নবযুগের নব-মানবের দূত; কলের মজুর, ডকের কুলি, জাহাজের খালাসী, গাড়ীর গাড়োয়ান গণ-মানবের সে জয়গান গাহিবে। হর্ম্ম্যসঙ্কুল নগরের জনাকীর্ণ পথে যে-কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত, তাহারই সংঘাত, বেদনা, আনন্দকে বাণীরূপ দিবে।

কিন্তু মুস্কিল, লিখিতে বসিলেই কবিতাগুলি ভাবপ্রবণ, হৃদয়োচ্ছ্বাসময় হয়, তাহার মনের নানা আশা বেদনার কথা হয়। ছন্দ ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার অনুকরণ হইয়া পড়ে। সে অবাক হইয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ শুধু তাহার আনন্দকর পাঠ্য, তাহার তরুণ জীবনের অংশ হইয়া গিয়াছে, তাহার মানসপ্রকৃতির সহিত যে নিগূঢ় যোগে যুক্ত।

এবার গ্রীষ্মে সে নূতন ছন্দে, নূতন ভাবে কবিতা লিখিবে।

অজয় কিন্তু অরুণের সকল প্ল্যান উল্টাইয়া দিল।

সকাল হইলেই সে এক ভাঙা বাইসিকেল লইয়া হাজির হয়। অরুণকে পড়ার ঘর হইতে টানিয়া বাহির করে, বলে অরুণ তুই বড় কুণো হয়ে যাচ্ছিস, অত পড়ে না, চল্ সাইকেল-চড়া শিখ্‌বি।

অরুণ বাঁচিয়া যায়। পড়ায় তাহার মন লাগে না। প্রভাতের বহিঃপ্রকৃতি তাহাকে উন্মনা করিয়া তোলে।

বাড়ির সম্মুখে জনবিরল গলিতে সাইকেল-চড়া শিক্ষা আরম্ভ হয়। গাড়ীর চাকায় বিক্ষত সরু গলি সাইকেল চালানর পক্ষে সুবিধার নয়, কিন্তু নিকটে শিখিবার উপযুক্ত স্থানাভাব।

সাইকেল-চড়া শেষ হইলে পুকুরে স্নানের পালা। দীপ্ত সূর্য্যালোকে পুকুরের জল ঝিকিমিকি করে, গাছের ছায়া পড়ে; অজয় ও অরুণ দুরন্ত ধীবর বালকের মত জলে লাফাইয়া পড়ে, সাঁতার কাটে, চোখ লাল করিয়া উঠিয়া আসে। জলসিক্ত দেহে রৌদ্রে বসিয়া অরুণ এক অপূর্ব্ব আনন্দ পায়।

দুপুরে খাওয়ার পর সে প্রতিমার ঘরে গল্প করিতে বসে। প্রতিমার কোন সঙ্গিনী নাই, তাহাকে দেখাশোনা করা দরকার। বাজে কথা অনর্গল বকিয়া যাইবার কি অদ্ভুত ক্ষমতা প্রতিমার। শুনিতে বড় ভাল লাগে। কিন্তু কিছুক্ষণ গল্প করার পর প্রতিমা বলে, দাদা বড় ঘুম পাচ্ছে। প্রতিমার বিশ্রাম বিশেষ দরকার। যা রোগা সে।

অরুণ নিজের ঘরে আসিয়া কবিতার খাতা লইয়া বসে, যত আজগুবি কথা মাথায় আসে। আপন মনে হাসিয়া ওঠে। কবিতার খাতা রাখিয়া গল্পের বই লইয়া শুইয়া পড়ে—ডিকেন্সের টেল অফ্ টু সিটিজ, ডুমার থ্রী মাস্কেটিয়ার্স, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ—নিঝুম দুপুরে সে কোন্ কল্পলোকে চলিয়া যায়।

প্রতিমা ঘুমায় না। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সে লুকাইয়া বাংলা ডিটেকটিভ নভেল পড়ে।

বিকালে অজয় আসিয়া অরুণকে খেলিতে বা ম্যাচ দেখিতে টানিয়া লইয়া যায়।

সাত দিনে অরুণ সাইকেল-চড়া শিখিয়া ফেলিল। তাহার স্পোর্টস্-প্রীতি দেখিয়া উৎসাহ দিবার জন্ত শিবপ্রসাদ এক নূতন সাইকেল কিনিয়া আনিলেন। ঠাকুরমার আপত্তি টিকিল না।

নূতন গাড়ী আসাতে দুই বন্ধু দ্বিচক্রযানে কলিকাতা বিজয় করিতে বাহির হইল। বৈশাখের খররৌদ্রে তাহারা সাইকেলে লম্বা পাড়ি দিতে আরম্ভ করিল—বেহালা, দমদম, কত অজানা পথ, অপরিচিত শহরতলী; পথ ভুল হইয়া যাইত, পথ হারাইয়া ফেলিত, গাড়ীচাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যাইত; বরফ-দেওয়া সরবৎ খাইয়া মহা উৎসাহে তাহারা ঘুরিত।

একদিন বালীগঞ্জ ছাড়াইয়া গড়িয়াহাটার নির্জ্জন পথে অজয় হঠাৎ সাইকেল থামাইল; পকেট হইতে এক সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই বাহির করিয়া অরুণের হাতে দিয়া বলিল, খুলে ধরা দেখি।

অরুণ বিস্মিত হইয়া বলিল, এ কি? তুমি এ-সব খাচ্ছ না কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খোল্ না প্যাকেট। সিগারেট টানতে টানতে যখন জোরে সাইকেল চালাবি, দেখবি কেমন মজা লাগে।

—না ভাই।

—কি প্যান প্যান করিস।

অরুণ একটা সিগারেট বাহির করিয়া মুখে পুরিল। আগুন আর ধরিতে চায় না। দুই-তিনটি দেশলাই-কাঠি জ্বালিয়া বহু কষ্টে সিগারেট ধরাইল। দুই টান দিয়া কাশিতে লাগিল।

—ভাই, গলা জ্বালা করে।

—বাজে কথা, ও তোর ভয়, সিগারেট খেলে নাকি গলা জ্বলে? এত লোক খায় কি ক'রে!

অজয় নিজে একটা সিগারেট জ্বালাইয়া দু-এক টান দিল।

—চল, সিগারেট টানতে টানতে খুব জোরে যাওয়া যাক।

কিছু দূর গিয়া অজয় বলিল, হল্ট্।

অরুণ বলিল, কি ব্যাপার?

সাইকেল হইতে নামিয়া সিগারেট ফেলিয়া দিল। অজয় বলিল, ঠিক বলেছিস্, খেতে মোটেই সুবিধের নয়। গলা খুস্খুস্ করে। ভাবিস না, আমি খাই। তবে একটা এক্সপিরিয়ান্স করা গেল।

দুই বন্ধু এক গাছতলায় বসিল।

দিন-সাতেকের মধ্যে সাইকেল-চড়ার সখ মিটিয়া গেল। গরমও দিন দিন নিদারুণ হইয়া উঠিতেছে। মামীমা আর দুপুরের রোদে বাহির হইতে দেন না।

অরুণের জন্ত অজয়েরও ভয় করে। সে বড় অন্তমনস্ক হইয়া সাইকেল চালায়। চালাইতে চালাইতে হঠাৎ থামিয়া যায়। কোন পথিক, পথদৃশ্যের প্রতি বিস্মিত ভাবে চাহিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে চালাইলে কোন্ দিন বুঝি গাড়ীচাপা পড়িবে।

অজয় বিস্মিত ক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল?

অরুণ লজ্জিতভাবে বলে, কিছু নয়, চল্।

অরুণ তাহার নবকাব্যের কথা ভাবে।

একটি কুলি মাথায় ভারী ঝাঁকা লইয়া চলিয়াছে, বোঝার ভারে ক্লিষ্ট দেহ আনত, কালো পিঠের পেশীগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে, দেহ ঘর্ম্মাক্ত, ক্লান্তমুখে দৃঢ় ধৈর্য্য। অথবা, বিরাট কালো লোহার কল-চাপানো মহিষের গাড়ী, কলের ভারে গাড়ী সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, মহিষগুলি প্রাণপণে গাড়ী টানিতেছে, পথের কোন গর্ত্তে চাকা পড়িয়া আটকাইয়া গিয়াছে, মহিষেরা টানিয়া তুলিতে পারিতেছে না, নীরবে চাবুকের মার খাইতেছে, দীর্ঘ চোখে করুণ বিহ্বল দৃষ্টি।

অথবা প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। কোন ব্যাঙ্কের বাড়ি বা পাটের কোম্পানীর আফিস। কুলিরা মাটি কাটিতেছে, ইট বহিতেছে, রাজমিস্ত্রি দেওয়াল গাঁথিতেছে, গগনস্পর্শী লোহার ফ্রেম, লোহার মিস্ত্রি গর্ত্ত করিতেছে, আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে।

অমনি নানা দৃশ্যের সম্মুখে অরুণ হঠাৎ সাইকেল থামাইয়া ফেলে।

গরম অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রভাত স্নিগ্ধ থাকে, কিন্তু সমস্ত দিন সূর্য্যরশ্মি অগ্নিবাণের মত; আকাশ পিঙ্গলবর্ণ; অপরাহ্ণে ঈশানকোণে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে, রুদ্রের তৃতীয় নয়নের ক্ষুব্ধ দৃষ্টির মত বিদ্যুতের ঝিলকি; ধূলা

উড়াইয়া ঝড় ওঠে; বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি বেশী ক্ষণ হয় না। দিবসের দাহ জুড়াইয়া যায়। পশ্চিমাকাশে রঙের ঘন সমারোহে সূর্য্যাস্ত হয়। তারাভরা রাত্রি বড় স্নিগ্ধ, অশ্রুধৌত কৃষ্ণনয়নের মত।

ঝড়ের সন্ধ্যাগুলি অরুণের অপরূপ লাগে। দেহের রক্ত ঝিলমিল করে। ঝড়ের শেষে প্রকৃতির প্রশান্তি তাহার সত্তাতেও সঞ্চারিত হইয়া যায়। ঝঞ্ঝা যেন করাঘাত করিয়া তাহার হৃদয়ের কোন গোপন দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যায়। সে অনুভব করে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সে কোন নিগূঢ় আনন্দ-সূত্রে বদ্ধ।

এ আনন্দ-মুহূর্ত্তগুলি সুখস্বপ্নের মত।

মাঝে মাঝে আবার বিষাদ। একদিন সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চমকিয়া উঠিল। মাথায় সে খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে, হয়ত অজয়কে ছাড়াইয়া যাইবে। কিন্তু এ কি তাহার মুখের শ্রী! এ যেন তাহার মুখ নয়, মুখোস! তারুণ্য, কমনীয়তা নাই, মুখ এত দৃঢ়, রুক্ষ হইয়া গিয়াছে। কোন্ নিরুদ্ধ ভাবাবেগে স্পন্দিত।

৮

ছুটির পর স্কুল খুলিল বর্ষার আরম্ভে। প্রথম দিন অরুণ একটু ভিজিয়া স্কুল গেল।

ক্লাসে ঢুকিয়া দেখিল, চালিয়াৎ চট্টোকে ঘিরিয়া ছেলেদের মস্ত সভা বসিয়াছে। চশমার কালো ফিতা দুলাইয়া প্যাণ্টের পকেটে হাত রাখিয়া অরবিন্দ বক্তৃতার সুরে কি বর্ণনা করিতেছে।

নাকুর অসুখ করিয়াছে। ঘুসঘুসে জ্বর ছাড়িতেছে না। চালিয়াৎ চট্টো তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল। বাড়িতে নাকু নাকি একেবারে আলাদা মানুষ। অরবিন্দের সঙ্গে তিনি এক ঘণ্টা গল্প করিয়াছেন; তাঁহার স্ত্রী অরবিন্দকে বাজার হইতে জলখাবার আনিয়া খাওয়াইছেন।

বাগেশ্বর আর থাকিতে পারিল না, ব্যঙ্গের স্বরে বলিয়া উঠিল, ইলিশ মাছের সিঙাড়া, আঙুরের সরবৎ—যা, যা, সব মিথ্যে কথা, গাঁজা—

অরবিন্দ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, গাঁজা কি, তুমি গেছলে?

—না, আমি যাই নি। নাকুর অসুখ করেছে সত্যি, কিন্তু তোমার ঐ একঘণ্টা গল্প করা, খাবার খাওয়া, সব গাঁজা—আচ্ছা, বাড়ির নম্বর কত?

—নম্বর, এই—হাঁ—নম্বর?

—হাঁ, নাকুর বাড়ির নম্বর কত?

—নম্বর কে মনে রেখেছে, নম্বর হচ্ছে—

ক্লাসের সকলে হাসিয়া উঠিল,—বাবা, চাল দেখাবার জায়গা পাও নি। জয় বাগেশ্বর!

জয়ন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল। সে আর এক অসুখের খবর আনিল। ভূদো বৃন্দাবনের টাইফয়েড হইয়াছে। খবর শুনিয়া সকলে প্রথমে অবাক হইয়া গেল।

কে ভূদো, এই যে সেদিন দেখলুম মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘুঘ্‌নি দানা খাচ্ছে।

—যাক্, এবার একটু রোগা হবে।

সকলে বিমর্ষ হইল। স্থির হইল দল বাধিয়া তাহাকে দেখিতে যাইতে হইবে। হেডমাষ্টারের গলা শোনা যাইতে সকলে বেঞ্চে গিয়া বসিল।

টিফিনের সময় জয়ন্তকে ডাকিয়া অরুণ বলিল, 'কুহু ও কেকা' পড়েছিস?

—না, কা'র কবিতা বুঝি?

—হাঁ, কবি সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতার বই। আমি কিনেছি।

—কবির নাম শুনেছি বটে। দিস্ ভাই পড়তে। ভাল?

—খুব ভাল।

বাংলার এক নূতন কবিকে সে যেন আবিষ্কার করিয়াছে। অরুণ গর্ব্বিত ভাবে হাসিল।

স্কুলের দিনগুলি বৈচিত্র্যহীন কাটিয়া গেল; পূজার ছুটি পর্য্যন্ত একটানা পড়া কেবল পড়া। মেঘ ও রৌদ্রের লীলাময় বৃষ্টিমুখর দিনরাত সংস্কৃত ধাতুরূপ, জ্যামিতির থিওরেম, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর খ্রীষ্টাব্দ, পড়া মুখস্থ করিয়া কাটিয়া গেল। 'কুহু ও কেকা'র সকল গান নীরব।

আশ্বিন মাসে পূজার ছুটি হইল।

অরুণ সঙ্কল্প করিল, এ-ছুটিতে সে রীতিমত পড়িবে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল ভাল হওয়া চাই। গ্রীষ্মের ছুটির মত হেলাফেলা করিয়া কাটাইবে না।

শিবপ্রসাদ ছুটিতে মুসৌরী গেলেন। পরীক্ষার বৎসর

বলিয়া তিনি অরুণকে সঙ্গে লইলেন না। প্রতিমা একা যাইতে চাহিল না। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন, খোকা, খুব বেশী পড়িস না, রোজ বেড়াতে যাবি, মোটর-গাড়ী তোদের জন্য রেখে গেলুম, যত খুশী ঘুরে বেড়াবি।

মোটর-গাড়ী অরুণের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বে আছে জানিয়া অজয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল, এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, কি? কোথায় তোর বেড়াতে যাবার ইচ্ছে? অজয় বলিল, বেড়াতে যাবার কথা আমি বলছি না, আমি বলি, এই ছুটিতে হীরা সিঙের কাছ থেকে মোটর-গাড়ী চালানো শিখে নেওয়া যাক্।

—মোটর চালানো! কি হবে?

—তোমার ও ছাই a^3+b^3 মুখস্থ করেই বা কি হবে?

মোটর-ড্রাইভার হীরা সিং উৎসাহী যুবক। অলসতা অপেক্ষা এই বৃহৎ সুন্দর গাড়ীটি পথে চালাইয়া ঘুরিতে তাহার আনন্দ। জয়ন্ত তাহাকে দেখিলেই বলিয়া উঠে, পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে—হীরা সিং হাসিয়া মোটর-গাড়ীর বৈদ্যুতিক হর্ণ টেপে।

অজয় তাহার সহিত ভাব জমাইয়া লইল। আশা ছিল, ঘোষ-সাহেবকে বলিয়া তাহার মাহিনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিবে। হীরা সিং নববিবাহিত। অর্থের অসচ্ছলতার জন্য নবপরিণীতাকে কলিকাতায় আনিতেছে না। মাহিনা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা জানিয়া সে অরুণ ও অজয়কে মোটর-গাড়ী চালনার রহস্য বিদ্যা দান করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

সকালে দুই বন্ধু হীরা সিংকে লইয়া মোটরে গড়ের মাঠে চলিয়া যাইত, ঘোড়দৌড় মাঠের কাছাকাছি। শিখ-যুবক দুই কিশোরকে বর্ত্তমান যুগের যন্ত্রযানের রহস্যতত্ত্ব বুঝাইত; শরৎ-প্রভাতগুলি মোটর-গাড়ী চালানো শিখিতে কাটিয়া যাইত।

কোন কোন দিন অরুণ প্রতিমাকে সঙ্গে লইত। অরুণ যখন ষ্টিয়ারিং হুইল ধরিয়া বসিত, প্রতিমার কেমন ভয় করিত, সে হাসিয়া চেঁচাইয়া উঠিত, দাদা আমায় নামিয়ে দাও। তুমি কেমন চালাচ্ছ, আমি মাঠে দাঁড়িয়ে দেখব।

কিন্তু অজয় যখন মাঠে মোটর চালাইয়া যাইত, প্রতিমা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত, মাঝে মাঝে মুচকাইয়া হাসিত।

প্রতিমার ব্যবহারে অরুণ ব্যথিত হইত। মোটর-গাড়ী চালনার উত্তেজনায় কিছু বলিত না।

আইডিয়াটা চন্দ্রার।

চন্দ্রা একদিন বলিল, অরুণদা, তোমরা বাবা বেশ রোজ মোটর ক'রে বেড়াচ্ছ, আমাদের ত একদিন বেড়াতে নিয়ে যাও না।

—আচ্ছা, কাল নিয়ে যাব, কোথায় বেড়াতে যাবি।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায়!

—ও দেখে পচে গেছে। চল কোথায় পিক্‌নিক্!

—শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেন!

—না বাপু, সেদিন ত আমরা স্কুল থেকে গেছলুম। কোন একটা নতুন জায়গা, অনেক দূর।

—তোমার জন্যে নিত্য নূতন জায়গা এখানে কোথায় পাই।

চন্দ্রা তাহার পিতার শরণাপন্ন হইল।

হেমবাবু বলিলেন, তোমরা ব্যারাকপুরের পার্কে যাও, গঙ্গার ধার, সুন্দর বাগান, বেশ লম্বা ড্রাইভ হবে।

অরুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, মামীমার কাছে গিয়া বলিল, মামী, তোমায় যেতে হবে।

—আমি বাবা কেমন ক'রে যাই, তোমার মামাবাবুকে রেখে।

—বা, উনিও যাবেন।

—সে ডাক্তার কি দেবে যেতে, নড়াচড়া বন্ধ, জ্বর ত যাচ্ছে না।

—কি সুন্দর হবে, এমন শরতের দিনে নদীর ধারে ওঁর খুব ভাল লাগবে, তুমি চল মামী।

—কবে?

—যেদিন বল।

—আচ্ছা, পরশু ঠিক কর। আমার ডাক্তার বোসকে জিজ্ঞাসা করি।

উমা ধীরে বলিল, বেশ ত মা, তুমি যাও, ডাক্তার বাবু যদি বারণ করেন, আমি বাবার কাছে থাকব।

—না, না, তোরা সবাই না গেলে অরুণের ভাল লাগবে কেন!

—সত্যি, নাকি অরুণ! কি চুপ ক'রে কেন?

—তুমি না গেলে আমাদের চা তৈরি করবে কে?

—তাই বই কি! আমি গঙ্গার ধারে গঙ্গার শোভা দেখতে যাচ্ছি, খালি হাওয়া খাব আর ঢেউ গুণব।

স্থির হইল সপ্তমীর দিন সকাল-সকাল খাইয়া সকলে বারাকপুরে পার্কে যাইবে। সঙ্গে ফোলডিং চেয়ার, সতরঞ্চি, চায়ের সরঞ্জাম ও প্রচুর খাবার নেওয়া হইবে।

কিন্তু যাইবার দিন সকালে হেমবাবুর জ্বর বাড়িয়া গেল। শীলারও ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি-কাশি। ব্যাপার দেখিয়া চন্দ্রা মুষড়াইয়া পড়িল। অরুণ যখন মোটরগাড়ী লইয়া আসিল, দেখিল তুমুল তর্ক চলিতেছে। হেমবাবু বলিতেছেন, তোমরা সবাই যাও অরুণের সঙ্গে, আমি বাড়িতে একা বেশ থাকব।

স্বর্ণময়ী বলিতেছেন, বেশ ত ছেলেমেয়েরা যাক্, আমি যাব না। শীলা বলিল, আমি যাব না বাবা, আমার বোধ হয় ১০০° জ্বর, মা তুমি যাও।

স্বর্ণময়ী রাগিয়া উঠিলেন,—যা বাজে বকিস্ না।

চন্দ্রা মুখ ম্লান করিয়া ঘুরিতেছিল, অরুণকে দেখিয়া প্রফুল্লিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কই প্রতিমা দিদি?

—সে মোটরে ব'সে আছে।

—বা, আচ্ছা, আমি নিয়ে আসছি ডেকে।

বহু কথা-কাটাকাটির পর স্থির হইল, অজয়, উমা ও চন্দ্রা যাইবে অরুণ ও প্রতিমার সহিত। স্বর্ণময়ী সব খাবার ঠিক করিয়া দিলেন। ড্রাইভারকে বলিয়া দিলেন, যেন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসে।

মেঘছায়াবৃত দিনটি। হাল্কা শ্লেট-রঙের মেঘগুলি আকাশ ছাইয়া চারিদিক স্নিগ্ধ আবছায়াময় করিয়াছে। অরুণরা যখন পার্কে আসিয়া পৌছাইল তখন অপরাহ্ণ। পার্ক সাহেব মেম নানা বিচিত্রবেশী দলে ভরিয়া গিয়াছে। চারিদিকে জনতা।

প্রতিমা বলিল, এমা কি ভিড়। এখানে কোথায় বসবে, খাবে?

অজয় বলিল, হীরা সিং চল ওদিকে, গঙ্গার ধারে নিশ্চয় খালি জায়গা পাওয়া যাবে।

উমা বলিল, না হয় গাড়ীতে বসে খাওয়া যাবে।

হীরা সিং গাড়ী ঘুরাইয়া নদীর ধারে বাংলো বাড়িগুলির দিকে চলিল। একটি খালি বাড়ির সম্মুখে মোটর-গাড়ী থামাইল। গেট খোলাই ছিল। বাড়ীর মালী পলাতক। তাহার এক ছেলে বকশিসের লোভে ঘর হইতে চেয়ার টেবিল বাহির করিয়া নদীর তীরে বাগানে পাতিয়া দিল।

উমা এতক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়াছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া গঙ্গার উদার স্নিগ্ধ-ধারার দিকে চাহিয়া তাহার মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল। হাস্যে গল্পে কৌতুকে সে উচ্ছ্বসিতা হইয়া উঠিল।

উমা বলিল, আচ্ছা খেয়ে নাও সবাই, তার পর বেড়ান যাবে। সে খাবার সাজাইতে বসিল। টিফিনের বড় বেতের বাক্স হইতে বাহির হইল স্যাণ্ডউইচ, কেক, সন্দেশ, লুচি, থার্ম্মোফ্লাস্কে চা, নানা খাদ্যদ্রব্য।

অরুণ সাহায্য করিতে আসিয়া উমার ধমক খাইল, বেশী কর্ত্তাত্তি করতে হবে না, নিজের প্লেট নিয়ে খেতে বস।

প্রতিমা বলিল, আমার ভাই কিছু খিদে পায়নি।

উমা বলিল, সে সব চলবে না, এখন খেয়ে নাও ভাই। লক্ষ্মিটি। হৈ চৈ করিয়া খাওয়া শেষ হইল।

উমা বলিল, চল আবার বেড়িয়ে আসা যাক, ভারি সুন্দর জায়গা। অরুণ বলিল, বা তুমি কিছু খেলে না।

উমা হাসিয়া বলিল, বাবা, গিন্নিপনার চোটে গেলুম, আচ্ছা দাও একটা সন্দেশ।

প্রতিমা বলিল, আমি ভাই বসলুম, এমন সুন্দর বাগান, কোথায় যাবে বাহিরে বেড়াতে—এই বাগানে খানিকটা ঘুরে চলে যাওয়া যাবে।

অজয় সায় দিল—আমারও উঠতে ইচ্ছে করছে না।

উমা চঞ্চলা হইয়া বলিল, ও, যেন ঘুরেছেন, এত পথ মোটরে ব'সে গা হাত পা ব্যথা করে না—চল, অরুণ, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

চন্দ্রা বলিল, দিদি, আমি?

—তুইও আয়।

অরুণ ও উমা এক সরু পথ দিয়া নামিয়া গেল। চন্দ্রা দিদির সহিত গেল না, প্রতিমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, প্রতিমা-দি একটা গান গাও ভাই।
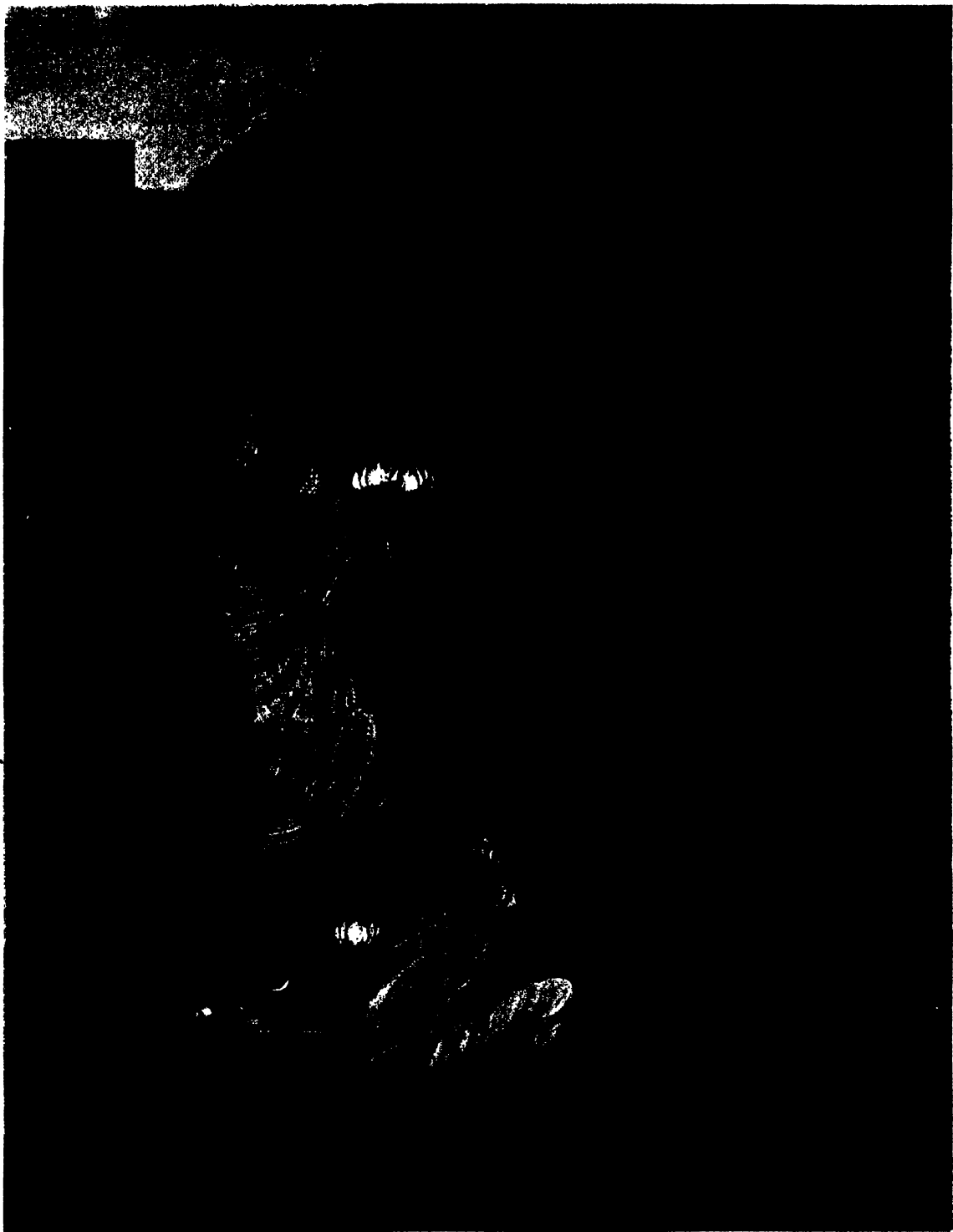
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অস্পৃশ্যের দেবদর্শন
শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার

—বাবা, এখানে এসেও গান গাইতে হবে!

—গাও না প্রতিমা।

উমা ও অরুণ নদীর জলের কাছাকাছি পৌঁছিল। তীরে এক বৃহৎ বৃক্ষ। উমা গাছের তলায় গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসিল। অরুণ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

—ব'সো না অরুণ।

অরুণ একটু দূরে বসিল।

—ওই ধূলোয় ব'সো না, না-হয় এখানেই বসলে, ক্ষয়ে যাবে না—কি সুন্দর, গঙ্গা যে এত সুন্দর আমি জানতুম না।

—তুমি ত আসতে চাইছিলে না।

—আচ্ছা, বেশ; মেনি থ্যাঙ্কস্, আমার কি ইচ্ছা করে জান, গঙ্গার ধারে এমনি একটি ছোট বাংলো ক'রে থাকতে।

ওপারে আবছায়াময় তীরে ঘননীল মেঘের স্নিগ্ধ যবনিকা সরাইয়া দীপ্ত সূর্য্য প্রকাশিত হইল, নদীর জলধারা আলোকরশ্মিতে ঝলমল করিয়া উঠিল, মৃদু বাতাস বহিতেছে, চারিদিকে মায়াময় আলো।

উমার কিশোরী মুখের ডৌল অপরূপ লাবণ্যে উদ্ভাসিত, চক্ষে অপূর্ব্ব দীপ্তি নিষ্কাষিত অসিলতার মত, কণ্ঠে কি আবেগময় সুর আসিল, প্রতিদিনের জানা উমার চারিদিক হইতে কোন্ স্বপ্ন-যবনিকা খসিয়া পড়িয়া গেল, এ আনন্দ-স্পন্দিতা জ্যোতিঃলতা যেন কোন অপরিচিতা।

সৌহার্দ্দ্যের কণ্ঠে উমা ডাকিল, অরুণ!

—বেশ ভাল লাগছে?

—কি জানো, মনে হচ্ছে এই সুন্দর দৃশ্য আমি যেন কোন স্বপ্নে দেখেছি, এ যেন আমার জীবনের স্বপ্ন, এমনি গাছের স্নিগ্ধ ছায়া, নদীর নির্ম্মল ধারা, তার তীরে একটি কুটীর স্নেহের নীড়ের মত, তার ওপর তরুরেখা-ঘেরা উদার আকাশ, সূর্য্যালোকে ভরা উজ্জ্বল দিন, তারাভরা শীতল রাত্রি, প্রেমময় শান্ত জীবনধারা এই গঙ্গার সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ স্রোতের মত, স্বপ্নের মত বহিয়া যাবে—

দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নদীর বঙ্কিম রেখার মত রেশমের শাড়ীর লাল পাড় কালো চুলে লুটাইয়া পড়িয়াছে, কয়েকটি চূর্ণকুন্তল চোখে-মুখে উড়িয়া আসিতেছে; ওপারের তীরভূমির প্রতি উমা উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া।

অরুণের মনে হইল এই শরৎ অপরাহ্ণের সোনার আলোয় বঙ্গমাতা এক কিশোরীর রূপ ধরিয়া গঙ্গার নির্জ্জন তীরে বৃক্ষচ্ছায়ায় মধুর উদাসিনী বসিয়া কোন ভাবী সুখশান্তিপূর্ণ সোনার যুগের স্বপ্ন দেখিতেছে। উমা যেন বাংলা দেশের প্রতিরূপ।

উমা হাসিয়া বলিয়া উঠিল, বড় কবিত্ব হয়ে যাচ্ছে—নয় —তুমি ত কবিতা লেখ।

অরুণ চমকিয়া বলিল, কে বললে?

—আমি জানি, আজকে, এই সন্ধ্যাটি বর্ণনা ক'রে একটি কবিতা লিখো।

—এ যে অবর্ণনীয়, কথায় আমরা কতটুকু প্রকাশ করতে পারি, আমাদের হৃদয়ের গভীর আশা বলতে পারি কি?

—ঠিক বলেছ, আমাদের হৃদয়ের গভীর আনন্দের বেদনার বুঝি ভাষা নেই।

পশ্চিমাকাশের কাঞ্চনবর্ণ মেঘপুঞ্জের আড়ালে সূর্য্য অস্ত গেল। নদীর জল রাঙিয়া উঠিয়াছে।

উমা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, চল, ওঠ, খুব কবিত্ব করা গেল। ওরা বোধ হয় ভাবছে, আমরা কোথায় হারিয়ে গেলুম।

অরুণ বলিল, সত্যি তুমি এমনি নদীর তীরে একটি কুটীরে থাকতে চাও?

হাসিয়া উমা বলিল, কি পাগল, সাধে কি তোমায় কবি বলে, জীবনটা স্বপ্ন নয় বুঝলে!

আবার সেই প্রতিদিনের জানা উমা। অরুণ ভাবিল উমা তোমায় কোনদিন বোধ হয় বুঝিতে পারিব না।

সে নীরবে চলিল।

৯

স্বপ্নের মত ছুটি শেষ হইয়া গেল। আবার স্কুল, একটানা পড়া, কেবল পড়া, একঘেয়ে জীবন।

নাকু অসুখ হইতে সারিয়া আসিলেন; তাঁহার স্বভাব আরও রুক্ষ, তাঁহার দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হইয়াছে।

বৃন্দাবনও দীর্ঘদিন অসুখে ভুগিয়া আসিল। সে রোগা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা তাহাকে 'ভুদো' বলা ছাড়িল না।

পড়া! পড়া! কবিতার খাতা, ডায়েরি, ডিকেন্সের উপন্যাস, সবডেস্কে চাবি দিয়া বন্ধ রহিল।

ডিসেম্বর মাসে টেষ্ট হইয়া গেল। টেষ্ট-পরীক্ষার ফল অরুণের তেমন ভাল হইল না। হেডমাষ্টার মহাশয় ডাকিয়া রীতিমত ধমকাইলেন।

পরীক্ষার ফি জমা দিয়া অরুণ আপিস হইতে বাহির হইতেছিল, কেরানীবাবু তাহাকে ডাকিলেন, ওহে, তোমাদের ক্লাসের যতীন দত্তের কি হয়েছে বলতে পার?

—না, তার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় নি।

—ছোকরা টেষ্টে খুব ভাল মার্ক পেয়েছে, কিন্তু ফি ত জমা দিয়ে গেল না, কাল জমা দেবার শেষ দিন, খোঁজ নিও ত।

আপিস হইতে যতীনের বাড়ির ঠিকানা জানিয়া লইয়া অরুণ তখনই তাহার বাড়ি চলিল।

বাড়িটি কিছুদূরে, গলির পর গলি। একটি ছোট একতলা জীর্ণ বাড়ির সামনে আসিয়া সে নম্বর মেলাইল।

যতীন বাড়িতেই ছিল। অরুণকে বিশেষ সাদরে অভ্যর্থনা করিল না। ঘরে এক ভাঙা চেয়ারে বসাইল।

—তোমার অসুখ করেছে নাকি? স্কুলে যাও নি, কাল পরীক্ষার ফি জমা দেবার শেষ দিন।

—আমি জানি, আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না।

—দিচ্ছ না কি রকম? তোমার টেষ্টের রেজাল্ট খুব ভাল হয়েছে।

—কি হবে পরীক্ষা দিয়ে, তার চেয়ে একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা করলে,

—না, পরীক্ষা তোমায় দিতেই হবে।

—না, আমি ঠিক করেছি, আমি দেব না।

—না, না, কি পাগলামি করছ।

তর্ক চলিল। যতীনের সঙ্কল্প অটল।

বাহিরে কে যতীনকে ডাকিল। অরুণকে বসিতে বলিয়া যতীন বাহিরে যাইতেই, পাশের দরজা খুলিয়া এক মহিলা ঘরে আসিলেন, মলিন থান-পরা, রুক্ষ কেশ, শীর্ণ দেহ।

অরুণ চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

—বস, বাবা, বস, আমি যতীনের মা।

অরুণ কোনমতে হেট হইয়া একটা প্রণাম সারিয়া লইল।

—থাক, বস, বাবা, তুমি যতীনের সঙ্গে পড়?

—আজ্ঞে হাঁ।

—আমার হয়েছে দায়। মরণও হয় না। তুমি ত এতক্ষণ বোঝালে, কি বললে, রাজী হ'ল?

—কেন ও ম্যাট্রিক দিতে চাইছে না?

—টাকা নেই, বাবা টাকা নেই। ফি'র টাকা দেয় কোথা থেকে? আমি বার-বার বললুম, আমার দু-চার-খানা গয়না এখনও রয়েছে, তুই তাই বেচে ফি জমা দে, তার পর জলপানি পেলে আমায় করিয়ে দিস—তা ছেলে যা গোঁয়ার—ওর বাবা ঠিক অমন ছিলেন, না হ'লে সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এক কথায় দেড়-শ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দেন।

—আচ্ছা আপনি ভাববেন না।

—হাঁ, বাবা, তুমি ওকে বুঝিয়ে বল, এত পড়লি, পরীক্ষাটা দে। কি হবে আমার গয়না। তুমি কিন্তু ব'লো না, আমি কিছু বলেছি।

যতীনের পদশব্দ শুনিয়া তাহার মা দৌড়িয়া চলিয়া গেলেন। অরুণ বলিল, যতীন, কাল স্কুলে নিশ্চয় এস। হেডমাষ্টার তোমায় ডেকেছেন।

পরদিন স্কুলে অরুণ যতীনের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিল। যতীন আসিল না। অরুণ আপিস গিয়া যতীনের নামে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফি জমা দিয়া দিল। টাকাগুলি সে সরকার-মহাশয়ের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছিল।

জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, শীতের দিনরাতগুলি পরীক্ষার পড়ায় কাটিয়া গেল। নানা ঐতিহাসিক ঘটনার খ্রীষ্টাব্দ, য়্যালজ্যাব্রার ফরমুলা, জিওমেট্রির ভেরি ইম্পরটেণ্ট থিওরেম ইত্যাদি ঘরের দেওয়ালে লিখিয়া দেওয়াল ভরিয়া তুলিল।

প্রথম দুই দিন অরুণ ভাল পরীক্ষা দিল। তৃতীয় দিন তাহার একটু জ্বর হইল। জ্বর লইয়াই পরীক্ষাগারে যাইতে হইল। শিবপ্রসাদ একটু ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া দিলেন। নিজে মোটর করিয়া তাহাকে পরীক্ষাগারে পৌঁছিয়া দিয়া আসিলেন। ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তরগুলি অরুণ যেন স্বপ্নের ঘোরে লিখিয়া গেল।

পরীক্ষা শেষ হইল। স্কুলের বই খাতা সব আলমারিতে পুরিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। ওগুলি দেখিলে যেন আবার জ্বর আসিবে।

প্রতিমা বলিল, দাদা বন্-ফায়ার কর।

অরুণ উত্তর দিল, রোস, রেজাল্ট বেরুক।

আবার রৌদ্র-উদাস স্বপ্নবিহ্বল দিন, জ্যোৎস্না-পাণ্ডুর দক্ষিণ সমীর মর্ম্মরিত রাত্রি।

বাগানে ফুটিয়াছে সূর্য্যমুখী, স্থলপদ্ম, রঙ্গন, রক্তজবা; পেয়ারে গাছে শুভ্র পুষ্পগুচ্ছ, আম্রমুকুল গন্ধে মৌমাছিরা উতলা। উমার-গাওয়া একটি গানের সুরে দিনের প্রহরগুলি ভরিয়া ওঠে—'একি আকুলতা ভুবনে, একি চঞ্চলতা পবনে—'

গত বসন্তে অরুণের দেহে মনে যে পরমার্থকর পরিবর্ত্তনানুভূতি হইয়াছিল, এ-বৎসর সে অনুভূতি আরও বেগবান, আরও রহস্যময় হইয়া উঠিল। যৌবন-লক্ষ্মী এই কিশোরের দেহে মনে প্রেমলাবণ্যের মায়ামন্ত্র পড়িয়া দিলেন। অনিশ্চিতের কুহকভরা পথে সে শঙ্কিত আনন্দচিত্তে অগ্রসর হইল। (ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

ওরে চিত্ররেখা ডোরে বাঁধিলো কে।
বহু পূর্ব্বস্মৃতি সম হেরি ওকে॥
কার তুলিকা নিল মন্ত্রে জিনি'
এই মঞ্জুল রূপের নির্ঝরিণী,
স্থির নির্ঝরিণী,
যেন ফাল্গুন উপবনে শুক্লরাতে
দোল-পূর্ণিমাতে,
এলো ছন্দ-মূরতি কা'র নব অশোকে॥
নৃত্যকলা যেন চিত্রে লিখা
কোন্ স্বর্গের মোহিনী মরীচিকা,
শরৎ নীলাম্বরে তড়িৎলতা
কোথা হারাইল চঞ্চলতা।
হে স্তব্ধবাণী কা'রে দিবে আনি'
নন্দন মন্দার মাল্যখানি,
বর মাল্যখানি
প্রিয় বন্দন-গান-জাগানো রাতে
শুভ দর্শন দিবে তুমি কাহার চোখে।

—"শাপমোচন"

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

[পা -া -া -া]

গা মা || পা_র্সা ণা ধা পা ধপা মা গা সা -গা -গা -মা পা -া না -না
ও রে || চি ০ ত্র রে খা ০ ডো রে বাঁ ধি ল ০ কে ০ ব হু

না না র্সা না র্সা -া না র্সা নর্সা -র্রা র্সা নধা পা -া -া -া
পূ র ব স্থ তি ০ স ম হেও ০ ০ ওও কে ০ ০ ০

গা মা পা ধা পা_র্সা ণা ধা
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে

র্সা_র্গা র্গা র্গা | র্গা -া র্গা র্মা | র্গর্মা -র্পা র্মা র্গা | র্রর্সা -া না না |
কা র্ তু লি | কা ০ নি ল | ম০ ন্ ত্রে জি | নি ০ এ ই |

না না র্সা র্সা না -না -র্সা র্সা নর্সা -র্রা র্সা র্সা | ধর্সা ণধপা পা ধা
ম ন্ জু ল রূ ০ পে র নি০ র্ ঝ রি | ণী০ ০০০ স্থি র

ণধা -র্সা ণা ধা | পা -া -া -া | -া -া -মা -গা মা -মা ধা -ধা
নি র্ ঝ রি | ণী ০ ০ ০ | ০ ০ যে ন ফা ল্ গু ন

ধা ণা পা ধা ণধা র্সা ণা ধা পা -া পা -পা | পা ধা মা পা
উ প ব নে শু ০ ভ্র রা তে ০ দো ল্ | পূ র্ ণি মা

মা -া মা -মা সা -সা রা রা গা রা গা -গা গা মা মা পা
তে ০ এ লো ছ ন্ দ মু র তি কা র ন ব অ শো

গা মা পা ধা পা র্সা ণা ধা
কে ০ ০ ০ ০ ০ ও রে

| সা -া রা রা | গা_রা গা গা মা -া মা গা গপা -া মা_গা
| নৃ ০ ত্য ক | লা ০ যে ন চি ০ ত্রে লি খা০ ০ কো ন্

মা মা মধা ধা সণা ধা পা ধা ধণা পা_র্সা সণা ধপা -া -া -া
স্ব র্ গে র মো ০ হি নী ম০ রি ০ চি কা ০ ০ ০

না -না -না -না -না -না -না -না -না র্সা -া না | র্সা -া র্সা_র্রা
শ র ৎ নী লা ম্ ব রে ত ড়িৎ ০ ল | তা ০ কো ০

| র্সা র্রা -া ণা | র্সা ণা ধা পা | পা ধপা মা গা | মা -া -া -া
| থা ০ ০ হা | রা ০ ই ল | চ ন্০ চ ০ | ত্তা ০ ০ ০

| -া -া র্সা -া | সর্জ্জা র্জ্জা র্জ্জা র্জ্জা | র্জ্জা -া র্জ্জা -া | র্জ্জর্মা -র্পা র্মা র্জ্জা |
| ০ ০ হে ০ | স্ত০ ব্ ধ বা | নী ০ কা রে | দি০ ০ বে আ |

| র্রর্সা -া -া -া | সা -সা রা -রা | রা -রা গা রা | গা -া মা গা |
| নি ০ ০ ০ | ন ন্ দ ন | ম ন্ দা র | মা ০ লী থা |

| মা -া পা পা | গা -া পা মা | পা -া মা গা | মা -া ধা পা |
| নি ০ ব র | মা ০ ল্য থা | নি ০ প্রি য় | ব ন্ দ ন |

| ধা -া ণা ধা | না -া র্সা না | র্সা -া না র্সা | নর্সা -র্রা র্সা ণা |
| গা ০ ন জা | গা ০ নো রা | তে ০ শু ভ | দ০ র্ শ ন |

| ধা পা ধা পা | পধা পধা পা পা | গা -মা -পা ধা | পা -র্সা ণা ধা |
| দি বে তু মি | কা হা র্ চো | থে ০ ০ ০ | ০ ০ ও রে |

"চার অধ্যায়" সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার 'চার অধ্যায়' গল্পটি সম্বন্ধে যত তর্ক ও আলোচনা উঠেছে তার অধিকাংশই সাহিত্য-বিচারের বাইরে পড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ, এই গল্পের যে ভূমিকা, সেটা রাষ্ট্রচেষ্টা-আলোড়িত বর্ত্তমান বাংলা দেশের আবেগের বর্ণে উজ্জ্বল ক'রে রঞ্জিত। আমরা কেবল যে তার অত্যন্ত বেশি কাছে আছি তা নয় তার তাপ আমাদের মনে সর্ব্বদাই বিকীরিত হচ্ছে। এই জন্যই গল্পের চেয়ে গল্পের ভূমিকাটাই অনেক পাঠকের কাছে মুখ্যভাবে প্রতিভাত। এই অধুনাতন কালের চিত্তআন্দোলন দূর অতীতে সরে গিয়ে যখন ইতিহাসের উত্তাপবিহীন আলোচ্য বিষয়মাত্রে পরিণত হবে তখন পাঠকের কল্পনা গল্পটিকে অনাসক্তভাবে গ্রহণ করতে বাধা পাবে না এই আশা করি। অর্থাৎ তখন এর সাহিত্যরূপ স্পষ্ট হ'তে পারবে।

এই রচনা সম্বন্ধে লেখকের তরফ থেকে আমার যা বক্তব্য সেটা ব'লে রাখি। বইটা লেখবার সময় আমি কী লিখতে বসেছিলুম সেটা আমার জানা, সুতরাং এই ব্যক্তিগত খবরটা আমিই দিতে পারি; সেটা কী হয়ে উঠেছে সেকথা পাঠক ও সমালোচক আপন বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে বিচার করবেন। সেই বুদ্ধির মাত্রাভেদ ও রুচির বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, সুতরাং আলোচনা হ'তে থাকবে নানা ছাঁচের ও নানা মূল্যের, কালের উপর নির্ভর ক'রে সে-সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই লেখকের কর্ত্তব্য।

যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা। নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়ক নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয় চারি দিকের

অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝর-প্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, এক দিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ, আর এক দিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মুর্তিমান করতে চেয়েছি। তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেই সঙ্গেই দেখাতে হয়েছে যে অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষপর্য্যন্ত কারবার করতে হ'ল তারও বিবরণ।

বাইরের এই অবস্থা যেটা আমাদের রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার নানা সংঘটনে তৈরি, সেটার অনেকখানিই অগত্যা আমার নিজের দৃষ্টিতে দেখা, ও তার কিছু কিছু আভাস আমার নিজের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেছে। তার সংবেদন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন রকমের হওয়ারই কথা, তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও পার্থক্য আছে। কিন্তু গল্পটাকে যদি সাহিত্যের বিষয় ব'লে মানতে হয় তা হ'লে এ নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক, গল্পের ভূমিকারূপে আমার ভূমিকাকেই স্বীকার ক'রে নিতে হবে। খ্রীষ্টানও যদি কুমারসম্ভব পড়তে চায় তা হোলে কালিদাসের বর্ণিত হরপার্ব্বতীর আখ্যানকেই তার সত্য ব'লে মানা চাই, তা নিয়ে ধর্ম্মতত্ত্বঘটিত তর্ক চলবে না। এই পৌরাণিক আখ্যানে সাংখ্যতত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে নিরূপিত হয়েছে কি না সে প্রশ্ন উত্তর দেবার যোগ্যই নয়, আসল কথাটা এই যে, এই আখ্যানের ভূমিকায় হরপার্ব্বতীর প্রেম ও মিলনটাই মুখ্যভাবে গোচর। এমন কি কুমারের জন্মবিবরণকেও কালিদাস উপেক্ষা করেছেন।

যদি কোনো পাঠক বলেন আমার গল্পের ভূমিকা কোনো কোনো অংশে বা অনেক অংশে আমার স্বকপোল-কল্পিত তা হ'লে গল্প লিখিয়ে হিসাবে সে অভিযোগ মেনে নিলেও ক্ষতি হবে না। ইন্দ্রনাথ দ্বারা চালিত প্রচেষ্টার কী পরিণাম হ'ল, কী হ'ল বটুর বা কানাইয়ের সে সংবাদটাকে কোনো স্থান দেওয়া হয় নি, উপসংহারে একমাত্র ব্যঞ্জনা অন্ত-এলার প্রেমের, এই উপসংহারের দ্বারা ঐ প্রেমের রূপটিকেই সম্পূর্ণতা দেওয়া হ'ল।

গল্পের উপক্রমণিকার উপাধ্যায়ের কথাটা কেন এল এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য। অতীনের চরিত্রে দুটি ট্র্যাজেডি ঘটেছে, এক সে এলাকে পেলে না, আর সে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি স্বভাববিশেষে মনস্তত্ত্ব হিসাবে বাস্তব হ'তে পারে তারই সাক্ষ্য উপস্থিত করার লোভ সম্বরণ করতে পারি নি। ভয় ছিল পাছে কেউ ভাবে যে, এই সম্ভাবনাটি কবি-জাতীয় বিশেষ মত বা মেজাজ দিয়ে গড়া। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ হ'লে এর বেদনার তীব্রতা পাঠকের মনে প্রবল হ'তে পারে এই আশা করেছিলুম। তা হোক তবু গল্পের দিক থেকে এর কোনো মূল্য নেই সে কথা মানি। গল্পের সাক্ষ্য গল্পের মধ্যে থাকাই ভালো।

এক জন মহিলা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন যে তাঁর মতে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাধ্যায়ের জীবনের বহিরংশ প্রকাশ পেয়েছে আর অতীন্দ্রের চরিত্রে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরতর প্রকৃতি। এ-কথাটি প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই।

আর একটা তর্ক আছে। গল্পের প্রসঙ্গে বিপ্লবচেষ্টা-সংক্রান্ত মতামত পাত্রদের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো মতই যদি কোথাও না থাক্‌ত তা হ'লে গল্পের ভূমিকাটা হ'ত নিরর্থক। ধরে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্রের সমর্থনের জন্যে এই সব মত। যদি কেউ সন্দেহ করেন এ সকল মতের কোনো কোনোটা আমার মতের সঙ্গে মেলে তবে বল্‌ব "এহ বাহ্য।" এ-কথাটা মিথ্যে হ'লেও গল্পের মধ্যে তার যে মূল্য, সত্য হ'লেও তাই। কোনো মত-প্রকাশের দ্বারা পাত্রদের চরিত্রের যদি ব্যত্যয় ঘটে থাকে তা হ'লেই সেটা হবে অপরাধ।

যদি কোনো অধ্যাপক কোনোদিন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে হ্যামলেটের মুখের অনেক কথা এবং তার ভাবভঙ্গী কবির নিজের, সেটা সত্য হোক আর মিথ্যে হোক তাতে নাটকের নাট্যত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। তাঁর নাটকে কোথাও তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব কোনো ইঙ্গিতে প্রকাশ পায় নি এমনতরো অবিশ্বাস্য কথাও যদি কেউ বলেন তবে তার দ্বারাও তাঁর নাটক সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

অবশেষে সংক্ষেপে আমার মন্তব্যটি জানাই—

চার অধ্যায়ের রচনায় কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কি না সে তর্ক সাহিত্যবিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালী নায়ক নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলা দেশের বিপ্লবপ্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা অংশ গৌণ মাত্র; এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দু-জনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িকপত্রের প্রবন্ধের উপকরণ।

৮ চৈত্র ১৩৪১।

ইতালী ও আবিসিনিয়ার বিরোধ

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল, এম-এ

ইউরোপের রাষ্ট্র-বিপ্লবের কথা ছাড়িয়া দিলে, অন্য দেশের মধ্যে মেক্সিকোর বিদ্রোহবহ্নির কাহিনী যুদ্ধ-বিরোধী ব্যক্তিগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। আফ্রিকার মধ্যে আবিসিনিয়াকে কেন্দ্র করিয়া ইতালীর যে মনোভাব সম্প্রতি দেখা গিয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় আর এক সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। স্বাধীন আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা আমাদেরই মত "কালা আদমী" অর্থাৎ কাফ্রী। পৌরাণিক যুগের গ্রীক-সাহিত্যে সমধিক প্রসিদ্ধ 'ইথিয়োপিয়া'ই বর্ত্তমান আবিসিনিয়া। নানাপ্রকার ধাতব দ্রব্য ও তৈলে সমৃদ্ধ প্রাচীন কাব্য-কাহিনী-বর্ণিত ইথিয়োপিয়া বহু বৎসর ধরিয়া ইউরোপের রাজ্যসম্প্রসারণ-ক্ষুধার খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ইহাকে গ্রাস করিবার জন্য লোলুপ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করিয়াছে। তাহার রাজ্য-বর্দ্ধন-ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি বুভুক্ষু ইতালী আবিসিনিয়ার উপর লালসা-সঙ্কুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের নিগ্রোজাতির কল্যাণকল্পে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার 'ক্রাইসিস্' পত্রে মিঃ রোজার্স নামক এক ব্যক্তি ইতালীর এই মনোভাব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইনি ১৯৩০ সালে বর্ত্তমান ইথিয়োপিয় সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের দিনে আবিসিনিয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

আফ্রিকার মধ্যে মাত্র এই রাষ্ট্র বৈদেশিকগণের কবল হইতে নিজেকে বাচাইয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান আবিসিনিয়া উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী বলিয়া পরিগণিত। ইহার রাজধানী আদিস আবাবা; সম্রাট মেনেলিকের রাজত্বকালে ইহার আয়তন ৩৫০,০০০ বর্গ-মাইল বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্ত্তমান পৃথিবীর মধ্যে ইহাই একমাত্র রাজ্য যেখানে সম্রাটের সার্ব্বভৌমত্ব এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সম্রাটের পূর্ব্বনাম রস তাফারি, ১৯৩২ সালে রাজ্যগ্রহণের সময় তিনি 'হেল সেলাসী' নাম গ্রহণ করেন। ইঁহার পুরা নাম—সম্রাট প্রথম হেল সেলাসী, "রাজার রাজা, ঈশ্বরের প্রতীক, জুদার বীর-কেশরী, রাজ্ঞী শেবার বংশধর।"

গোন্দারে অবস্থিত ইতালীয় দূতের আপিসে ও ওয়ালওয়ালে এই কলহ মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। প্রথমটিতে এক জন ইতালীয় এবং দ্বিতীয়টিতে দুই শত আবিসিনীয় ও ত্রিশ জন ইতালীয় নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। প্রথমটির জন্য আবিসিনিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে ও ক্ষতিপূরণ করিতে সম্মত আছে। আবিসিনিয়ার প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইতালী ওয়ালওয়াল জোর করিয়া অধিকারে রাখিয়াছে। বর্ত্তমানে এই অঞ্চলে তৈলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় ইথিয়োপিয়া ইতালীকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই কারণে ইতালীর

আক্রমণে দ্বিতীয় কলহের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। সুতরাং রাষ্ট্র-সঙ্ঘে ইহার বিচারের আবেদন গিয়াছে; এই সম্বন্ধে এক জন সমালোচক বলিতেছেন—

"......League of Nations will be faced with the toughest nut in its history, that is, if the disputants mean to act as defiantly as they talk. For if Geneva succeeds in cracking the outer shell it will find within a kernal of dynamite, namely Japan."

অর্থাৎ—

যদি বিবদমান দুই জাতি সমভাবে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে থাকে তবে এ-বিষয় মীমাংসা করা জাতিসঙ্ঘের পক্ষে কঠিন হইবে। কেন-না যদি জেনেভা কোনরূপে ইহার বহিরাবরণ চূর্ণ করিতে সক্ষম হয় তবে সে তাহার মধ্যে 'জাপান' নামক তীব্র বিস্ফোরকের বীজ দেখিতে পাইবে।

পূর্ব্ব হইতেই জাপান আবিসিনিয়ায় কিছু উপস্বত্ব ও সুযোগ ভোগ করিয়া আসিতেছে। নিপ্পনের একমাত্র কামনা ভারত-মহাসাগরে বাণিজ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠা করা। ইহাতে ইথিয়োপিয়া তাহাদের গুপ্তভাবে অনেক সাহায্য করিতেছে; কেননা, আফ্রিকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ ইউরোপবিদ্বেষী। জাপানকে তাহারা অধিকতর পছন্দ করে। এই নিমিত্ত জাপান ও আবিসিনিয়ার মধ্যে কোনও পারস্পরিক সাহায্য সম্বন্ধীয় সন্ধিসূত্র গুপ্তভাবে স্বাক্ষরিত হইয়াছে কি না তাহা কে বলিবে? দেখা যায় জাপানীরা আবিসিনিয়ার সৈন্যগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। সকলেই অবগত আছেন, ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের বিরোধিতার ফলে কিছুদিন পূর্ব্বে এক আবিসিনিয়ার রাজবংশীয় পুরুষের সহিত জাপানের এক সম্ভ্রান্ত মহিলার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে লণ্ডনের *Economist* লিখিয়াছেন :—

"Abyssinia in his turn has found a means of making Italy feel uneasy by flirting with Japan. Italy strongly resents the competition of Jap textile goods in the Abyssinian market."

অর্থাৎ—

জাপানের সহিত আবিসিনিয়ার সৌহার্দ হওয়ায় ইতালী খুশী নহে, কেন-না তাহার ইচ্ছা নয় যে জাপান এখানে ব্যবসা বিস্তার করে।

১৪ই ডিসেম্বর ইথিয়োপিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী রাষ্ট্র-সঙ্ঘকে পত্রযোগে জানাইয়াছেন—ওগাডেন প্রদেশে পশুচারণ-স্বত্ব স্থির করিবার জন্য যে ইঙ্গ-আবিসিনীয় বৈঠক সেখানে প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সহিত এক দল আবিসিনীয় সৈন্যও ছিল; আবিসিনীয় সীমান্তের দুই শত কিলোমিটারের মধ্যবর্ত্তী ওয়ালওয়াল প্রদেশে ৫ই ডিসেম্বর ইতালীয় সেনানী অকারণে ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনের সাহায্যে উক্ত বৈঠকের সহগামী আবিসিনীয় সেনা-বাহিনীকে আক্রমণ করে। আবিসিনিয়া ইহার অনুযোগ করিয়া পত্র লেখে; তাহা উপেক্ষা করিয়া পুনরায় তিন দিন পরে এরোপ্লেন হইতে দুই স্থানে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। তখন ১৯২৮ সালের ইতালী-আবিসিনিয় চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী আবিসিনিয়া ইহার সালিসী মীমাংসার প্রস্তাব করে। ইহাও উপেক্ষা করিয়া ১১ই ডিসেম্বর ইতালীর বৈদেশিক সচিব আবিসিনিয়ার নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করিয়া জানাইয়াছেন যে, এই ঘটনার যে কিরূপে সালিসী মীমাংসা হইতে পারে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছে না!

ইতালীও তারযোগে রাষ্ট্র-সঙ্ঘকে জানাইয়াছেন আবিসিনিয়ার অভিযোগের কোনও ভিত্তি নাই; আক্রমণের জন্য প্রধানতঃ তাঁহারাই দায়ী: ২৩শে নভেম্বর ইঙ্গ-আবিসিনীয় বৈঠক ওয়ালওয়ালের সম্মুখীন হয়; এই অঞ্চল ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের অন্তর্গত এবং ইতালী-সেনানী দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা অধিকার করিয়া আছে। এই সময়ে ইতালীয় সেনা-ছাউনীর অধিনায়কের সহিত বৈঠকের ইংরেজ ও আবিসিনীয় সদস্যগণের দেখা-সাক্ষাৎ ও পত্রাদি ব্যবহারও চলিয়াছিল; আবিসিনীয় সদস্যগণ অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, এই অঞ্চল তাঁহাদেরই অধিকারভুক্ত, সুতরাং ইহার মধ্য দিয়া তাঁহাদের সেনা-বাহিনী অগ্রসর হইতে পারে। ইতালীয় সেনানায়ক ১০০০ সেনাগঠিত আবিসিনীয় বাহিনীকে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া যাইবার অনুমতি না দিয়া জানাইয়াছিলেন যে, এই অঞ্চল কাহার অধিকারভুক্ত তাহা দুই দেশের রাষ্ট্রশক্তি বিচার করিবে। বৈঠকের সভ্যগণ সে স্থান ত্যাগ করিলেও আবিসিনীয় সেনা-বাহিনী ইতালীয় সেনা-শিবিরের সম্মুখে অবস্থান করিতে থাকে। ইহাতে ইতালীয় সেনাপতি অপর পক্ষের সেনাধ্যক্ষকে জানান যে উভয় পক্ষের সেনা-বাহিনীর জন্য একটি নির্দ্ধারিত সীমারেখা নির্দ্দেশ করা

হউক এবং এই নির্দ্দিষ্ট সীমান্তে দুই পক্ষের এক-একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যদলকে কিছু দূরে অপসারিত করা হউক। আবিসিনীয় সেনাপতি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এইরূপে উভয় পক্ষের সেখানে অবস্থান করিবার সময়ে আবিসিনীয়ার সৈন্যদল ইতালীর দেশীয় সৈন্যদলকে কর্ম্মত্যাগের প্রলোভন দেখায় ও যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করে। ৫ই ডিসেম্বর ইতালী অকারণে আক্রান্ত হয় এবং তাহার ফলে বহুসংখ্যক দেশীয় সৈন্য নিহত হয়; নূতন সেনাবাহিনীর সাহায্যে আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত

মুসোলিনী ট্যাঙ্কের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিতেছেন

সম্রাট হেল সেলাসী

করিয়া অবিলম্বে আদিস আবাবায় অভিযোগের বার্ত্তা প্রেরণ করা হয়। তাহাতে বলা হয়, স্থানীয় শাসন-কর্ত্তাকে এ-ঘটনার জন্য ক্ষমা চাহিতে, ইতালীয় পতাকাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে, দোষীদিগকে শাস্তি দিতে এবং মৃত ও আহত সৈনিকদের জন্য ক্ষতি-পূরণ করিতে হইবে।

আবিসিনিয়া এই অভিযোগেরও যে প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছে তাহা এই— ইতালীয় অভিযোগের সহিত আন্তর্জাতিক বৈঠকের নথিপত্রের কোনও মিল নাই; ওয়ালওয়াল কাহার অধিকারে তাহার আলোচনার চেষ্টা ইতালীয় সেনাপতি মোটেই করেন নাই; বৈঠককে অগ্রসর হইবার তিনি অনুমতি দেন নাই; বৈঠকের সদস্যগণ যখন ইতালীয় সেনাপতির সহিত এ-বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন তখন তাঁহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শনের নিমিত্ত মস্তকের উপরে এরোপ্লেন উড়িতেছিল; ব্রিটিশ ও আবিসিনীয় সদস্যগণ যুক্তভাবে ইতালীর এই ব্যবহারের অভিযোগ করিয়াছেন; উভয় সেনানীর সীমান্ত-নির্দ্দেশের চেষ্টা বৈঠকের সম্মুখেই হয়, তাঁহাদের সে-স্থান পরিত্যাগের পরে নহে; ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিন জন ইতালীয় সৈনিক কর্ম্মচারী ও কয়েকটি এরোপ্লেন আকাশপথে আবিসিনীয় বাহিনী পর্য্যবেক্ষণ করে; ইহারা প্রথমে যুদ্ধের সঙ্কেত করিবামাত্রই দুইটি এরোপ্লেন বোমা নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং একটি ট্যাঙ্ক মেশিনগানের দ্বারা গুলিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করে; আবিসিনীয় সৈন্যগণ তখন যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না; সুতরাং যখন সেনাপতির

ইতালী-আবিসিনিয়ার প্রথম চুক্তির কথা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা উচিত। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইতালীই সর্ব্বশেষে আফ্রিকায় রাজ্য-সম্প্রসারণ নীতির অনুসরণ করে; সুতরাং ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যে-রাজ্যের জন্য আদৌ ব্যগ্রতাপ্রকাশ করে নাই, ইতালী সেই আয়াসবহুল, শৈলসমাবৃত, মরুভূমিসদৃশ ত্রিপলিটানিয়া, ইরিট্রিয়া ও দক্ষিণ-সোমালিল্যাণ্ড লইয়াই খুশী হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই তিনটির কোনটিই ইউরোপীয়গণের বসবাসের উপযুক্ত স্থান নহে। ইরিট্রিয়া আবিসিনিয়ার উত্তরে এবং দক্ষিণ-সোমালিল্যাণ্ড ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত থাকায় সমস্ত অঞ্চলটি ইতালীর তিন গুণ স্থান অধিকার করিয়া আছে; তদুপরি এই অঞ্চল নানা ধাতব পদার্থে সমৃদ্ধ ও
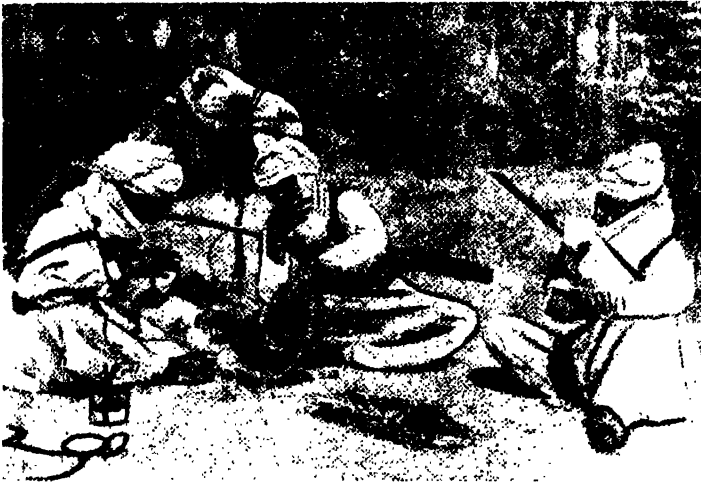
মুসোলিনীর মরু-বাহিনী—বিশ্রামের অবকাশে

সহকারী ঘটনা-পর্য্যবেক্ষণের জন্য শিবিরের বাহিরে আগমন করেন তখন সহসা তিনি ইতালীয়-বাহিনীর গুলিবর্ষণের ফলে আহত হন। ইত্যাদি।

ইতালী আবিসিনিয়ার এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জানাইয়াছে যে, তাঁহারা বোমা নিক্ষেপ করেন নাই এবং তাঁহারা পুনরায় সীমান্তনির্দ্দেশ করিতে রাজী আছেন যদি আবিসিনিয়া ওয়ালওয়ালে ইতালীকে অন্যায় আক্রমণ করিয়া যে ক্ষতি করিয়াছে তাহার জন্য ও উভয় প্রদেশের এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তিপত্রের যে মর্য্যাদা-হানি হইয়াছে তাহার জন্য যথারীতি ক্ষতিপূরণ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আবিসিনিয়াও উত্তরে ঘোষণা করিয়াছে তাঁহাদের দোষ সাব্যস্ত হইলে তাঁহারা ইতালীর ক্ষতিপূরণ করিতে সম্মত আছেন। ৩রা জানুয়ারি আবিসিনিয়া ইতালী কর্ত্তৃক পুনরাক্রমণের কথা জানাইয়া সঙ্ঘের ১১ নং সর্ত্তানুসারে উক্ত অঞ্চলে শান্তিপ্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানাইয়াছে।

যাহা হউক ইত্যবসরে ইহা ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী আরও কয়েকটি ঘটনার প্রাসঙ্গিক আলোচনা হইলে এ-বিষয়ে অনেক নূতন আলোকসম্পাত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা দ্বারা আবিসিনিয়ায় বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের কিরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস জানিতে পারা যাইবে।

ইতালীর দেশীয় বাহিনী। ইহারা সোমালিল্যাণ্ডের অধিবাসী

ইতালীর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এখানকার অসংখ্য নিরীহ কৃষ্ণজাতির উপর প্রভুত্ব করিবার ইতালীর একটি সুবর্ণ সুযোগ মিলিয়া গেল। নানা কারণে ইংরেজ ও ফ্রান্স ইহা অভুক্ত রাখিয়াছিল, ইতালী তাহা গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ১৮৬৮ সালে ইংরেজ অনায়াসে উহা অধিকার

করিতে পারিত ; কিন্তু তাহা করে নাই। এইরূপে ধীরে ধীরে ইতালী তাহার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল ; সম্রাট মেনেলিক্‌কে ১,০১০,০০০ ডলার ধার দিয়া আসমারা অঞ্চল আত্মসাৎ করিল। সম্রাটও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, কাহারও সহিত সন্ধি করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে তিনি ইতালীর পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। পরবর্ত্তী কালে আবিসিনিয়া বুঝিল সে ফাঁদে পা দিয়াছে ; তদবধি সে সূত্র খুঁজিতে লাগিল। ১৮৯৪ সালে একটি পোষ্টাল সার্ভিস প্রতিষ্ঠার সময়ে মেনেলিক আপনার মুদ্রাঙ্কিত টিকিট ব্যবহার করেন। ইতালী দেখিল এ-বিষয়ে তাহার সহিত পরামর্শ করা হয় নাই। কৃষ্ণ জাতির

ইতালীয় বাহিনা রোম ষ্টেশন হইতে আবিসিনিয়া যাত্রা করিতেছে

'জুদার বীর-কেশরী' রস তফারী

রাজার এই দুঃসাহস ও স্বাধীনতা তাহার হৃদয়ে কণ্টকের মত বিঁধিল ; নানা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল ; অবশেষে যুদ্ধ সংঘটিত হইল। ইতালীর তৎকালীন প্রধান সচিব কাউণ্ট ক্রিস্‌পির উদ্যোগে প্রথমে ইতালী জয়ী হইল ; জয়োল্লাসে মত্ত ইতালীর জাতীয় মহাসভা (Parliament) এই প্রাচীন দেশের সমস্তটাই তখন আত্মসাৎ করিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিল ; সভায় স্থিরীকৃত হয় এই যুদ্ধের জন্য ৪,০০০,০০০ ডলার ব্যয় করা হইবে। তদনুযায়ী জেনারেল্ বরাতরীর (General Baratari) অধীনে ২৫,০০০ ইতালীয় সৈন্য সাজ্জত করা হইল। সম্রাট মেনেলিক ১২০,০০০ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন এবং রস্ ম্যাকোনেনের (Ras Makonnen) অধিনায়কত্বে ইতালীর বিরুদ্ধে সেই বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন। আদোয়ার গিরিবর্ত্মে এই কৃষ্ণকায় জাতির গলদেশে বিজয়লক্ষ্মী বরমালা অর্পণ করিলেন ; মাত্র ৩০০০ ইতালীয় সৈন্য কোনক্রমে অব্যাহতি পাইল। প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট ক্রিসপি শাসন-পরিষদ হইতে বিতাড়িত হইলেন। অবশেষে যখন জেনারেল বলসিডেরা ঘোষণা করিলেন যে, ২৫০,০০০ জন সৈন্য, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ও ১,১০০,০০০,০০০ ডলার ব্যয় করিলে তবে এই কৃষ্ণরাজ্যকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তখন ইতালী বাধ্য হইয়া ইথিয়োপিয়ার সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইল। ইহাতে তাহার আত্মমর্য্যাদায় যথেষ্ট আঘাত লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। তদবধি ইতালী পরাজয়ের গ্লানি শিরে বহন করিয়া তাহার নিদারুণ প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য উপযুক্ত সময় সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষা করিতেছে।

অতঃপর ইংরেজ ও আমেরিকার কথা : আবিসিনিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে সানা-হ্রদ অবস্থিত। এখান হইতে নীল নদের

আছে, সেই ফ্রান্সই ইথিয়োপিয়ায় ইতালীর এই বিশেষ অধিকার মানিয়া লইয়াছে। এই বিষয়ে ফ্রান্স ও ইতালীর কিরূপে ও কি পরিমাণে ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছে ইহা তাহা সূচিত করিতেছে।

এই চুক্তিতে যে-যে বিষয় আলোচনা হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয় তাহা 'ইউরোপ' নামক ফরাসী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২৫শে মার্চ্চ তারিখের 'ফরওয়ার্ডে' ইহার যে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল :—

(1) France is to give a free hand to Italy to establish in Abyssinia the preponderance of her interests. (2) She is to retain Jibuti, a naval base indispensable for her relations with the Middle and the Far East. (3) A free Italian zone is to be created, be it at Jibuti or on a point in the neighbourhood of the Somali coast or British Somaliland, to serve as an opening of railways. (4) France to remain owner of the Jibuti-Addis-Ababa railway. Its administration to be vested in Italy, by means of a participation of the profits; its redemption could be provided for. (5) England to uphold its control on the lake Tsana and the Sudanese region of Abyssinia. (6) English or American Finances with a view to improve the land. In case of French finance, it is to be organised on a joint-stock basis.

অর্থাৎ—

(১) ফ্রান্স নির্ব্বিবাদে ইতালীকে আবিসিনিয়ায় তাহার স্বত্ব ভোগ করিতে দিবে, (২) মধ্য এবং সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য স্বাধিকৃত রাজ্যের সহিত যোগসূত্র রাখিতে একান্ত প্রয়োজনীয় জিবুটি অঞ্চল ফ্রান্স নিজের অধিকারেই রাখিবে, (৩) জিবুটি, সোমালি-সীমান্তের কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে অথবা বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে রেলপথ খুলিবার উপযোগী ইতালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি অঞ্চল থাকিবে; (৪) ফ্রান্স আদিস-আবাবা রেলের মালিক থাকিবে; লভ্যাংশের কিছু গ্রহণ করিয়া কিংবা ইহা না করিয়াও ইতালী এই রেলপথ পরিচালনার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে (৫) ইংরেজ সানা হ্রদ এবং আবিসিনিয়ার মধ্যবর্ত্তী সুদান অঞ্চল ভোগদখল করিবে (৬) দেশের উন্নতির জন্য ইংরেজ কিংবা আমেরিকার অর্থ নিয়োজিত হইতে পারিবে; ফ্রান্সের অর্থ হইলে তাহা 'জয়েণ্ট-ষ্টক' শ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত।

ফ্রান্স ইহা কতদূর মানিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই, তবে ফরাসীগণ শুধু ইতালীর সহিত সন্ধি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, গত ফেব্রুয়ারি মাসে লণ্ডনে ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাহাতেও নাকি এই বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। মার্চ্চ ১৯৩৫ সনের Current History নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে মিঃ এলান্ নেভিন্স লিখিতেছেন :—

"Despite denials, it was believed in many quarters that one result of the recent settlement of differences between Italy and France and of the Franco-British conversations in London at the beginning of February was an understanding that Italy should further extend her colonial domain at the expense of Abyssinia.

অর্থাৎ—

পুনঃপুনঃ 'না'-বলা সত্বেও অনেকেই এই ধারণা পোষণ করিতেছেন যে কিছু পূর্ব্বে ইতালী ও ফ্রান্স এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্স ও ইংরেজের মধ্যে লণ্ডনে যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে স্থির হইয়াছে যে ইতালী আবিসিনিয়ায় তাহার রাজ্য-সম্প্রসারণ নীতির অনুযায়ী কার্য্য করিবে।

রুশিয়াও পূর্ব্ব-আফ্রিকার এই অঞ্চল স্বাধিকারে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বিশেষরূপে সমর্থ হয় নাই। মিঃ জোশেফ ইস্‌রেলস্ লিখিয়াছেন :—

Not long ago, Russia thought of the great conglomerate mass of the Ethiopian people as a potential Communist State in East Africa. A Russian "trade" mission was quietly expelled from Addis Ababa when it was found that it had been forming Communist cells among the Ethiopian soldiers and people. Russia has shown no further interest. But Ethiopia remains the scene of the world's most interesting colonial intrigue.

অর্থাৎ—

ইথিয়োপিয়া কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া রুশিয়া মনে করিয়াছে। রুশিয়ার একটি বণিকদল কিছুদিন পূর্ব্বে আদিস আবাবা হইতে বিতাড়িত হয়, কেননা এই রুশীয় সম্প্রদায় তথন ইথিয়োপিয়ার সৈন্যগণের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মতবাদ প্রচার করিবার চেষ্টা করে। যাহা হউক এখনও পর্য্যন্ত এই দেশ পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগণের রাজ্য-সম্প্রসারণের একটি প্রকৃষ্ট স্থানরূপে পরিগণিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত বহুপূর্ব্ব হইতে জার্ম্মেনীও এখানে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ১৮৯৮ সালে ফন বুলো (Von Bulow) ঘোষণা করেন,

If Britain talk of a greater Britain, France of a New France, if the Russians extend to Asia, Germany has also the right to a greater Germany.

অর্থাৎ—

যদি ব্রিটেন 'বৃহত্তর ব্রিটেনে'র ও ফ্রান্স 'নবীন ফ্রান্সে'র কল্পনা করিতে পারে, যদি রুশিয়া এশিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার বাসনা পোষণ করে, তবে জার্ম্মেনীর এক 'বৃহত্তর জার্ম্মেনী'র পরিকল্পনা অযৌক্তিক হইবে কেন?

জার্ম্মেনীকে বাধা দিবার জন্য ১৯০০ সালে প্যারিস ও রোমের এক চুক্তি অনুসারে উভয়ে সম্মিলিত ভাবে তৃতীয় শত্রুকে বাধা দিবার জন্য আত্মনিয়োগ করে।

১৯০৫ সালে অষ্ট্রো-জার্ম্মান-আবিসিনিয়ান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বিগত মহাযুদ্ধের সময় অষ্ট্রীয়া-জার্ম্মেনী আবিসিনিয়ায় ধর্ম্ম-প্রচারক দল প্রেরণ করেন। ইতালী এই ধর্ম্ম-উপদেষ্টাদের উপর মোটেই খুশী ছিলেন না।

রাজ্যপিপাসু যে-সকল রাষ্ট্র সাম্রাজ্য-বিস্তার নীতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন আবিসিনিয়ায় বর্ত্তমানে তাঁহাদের সকলের সমন্বয় ঘটিয়াছে। প্যারিসের 'ইউরোপ' পত্র এই লোভাতুর রাষ্ট্রগুলির বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন :—

(a) Under pressure of the danger presented by Japan cum Germany, the tendency is towards an entente between France and the Anglo-Italian bloc.

(b) The presence of U. S. A. in Lake Tsana goes to influence at once the British policy and the attitude of Japan.

(c) France is faced with the complexity of the problem even of temporary security of her possessions.

(d) As for Italy, in all cases, she finds herself weakened in Abyssinia owing on the one hand to Japanese rivalry and German menace, and the attitude of Britain on the other.

অর্থাৎ—

(ক) জাপান এবং জার্ম্মেনীর চাপে পড়িয়া এখানে ফ্রান্স ও এংলো-ইতালীর মধ্যে একটি পরস্পর-সহযোগী রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব, (খ) সানায় আমেরিকার অবস্থিতির ফলে ইংরেজ ও জাপানের নীতি পরিবর্ত্তিত হইবেই হইবে। (গ) নানা সমস্যা উদ্ভবের ফলে ফ্রান্স কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে ও এমন কি অস্থায়িভাবে তাহার অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলি বিপদমুক্ত রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, (ঘ) সর্ব্বদিক দিয়া এবং বিশেষভাবে একদিকে জাপানী প্রতিযোগিতা ও জার্ম্মানের তাড়না ও অন্যদিকে ইংরেজের আচরণে ইতালী আবিসিনিয়ায় হৃতবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

দেখা যাইতেছে পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ শক্তি এই কৃষ্ণ-রাজ্যের প্রতি বিশেষ মমতাপূর্ণ লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন; আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইতালী, জাপান ও জার্ম্মেনী সকলেই এ-বিষয়ে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য জার্ম্মেনী সর্ব্বাপেক্ষা কম ও ইতালী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—তাহার ক্ষুধা বিশ্বগ্রাসী। ইহা ছাড়া আবিসিনিয়ায় আর একটি শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আবিসিনিয়া খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী; ইহার চারিদিকের রাষ্ট্র হইতে যে-কোনও মুহূর্ত্তে এক মুসলমান-অভ্যুদয় হইতে পারে। লিজ্ ইয়াসুর রাজত্বকালে এইরূপ এক মুসলমান-অভ্যুদয়ের সহিত তাঁহার সহানুভূতি থাকায় তিনি রাজ্যচ্যুত হন। মিঃ রোজাস্ লিখিয়াছেন—

Let Abyssinia once throw in her lot with the Muhamedans and the White man's day in East Africa, and perhaps all of Africa, would soon be at an end. Hence the reasons for the Europeans asserting that the Abyssinans are a white people, though in features, hair, and colour, they generally show much more of what is known as the Negro ..."

অর্থাৎ—

যদি একবার আবিসিনিয়া মুসলমান-অভ্যুদয়ের সহিত যোগদান করে, তবে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় কেন, সমগ্র আফ্রিকায় শ্বেতজাতির দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই কারণেই, যদিও আকৃতি বর্ণ প্রভৃতি বিষয়ে কৃষ্ণকায় নিগ্রোজাতির সহিত তাহাদের সাদৃশ্য রহিয়াছে তথাপি ইউরোপীয়রা আবিসিনিয়াকে 'শ্বেতজাতি' বলিয়া আপ্যায়িত করে।

এমত অবস্থায় ইতালী ও আবিসিনিয়ার বিরোধ যে অচিরে মীমাংসিত হইবে না তাহাতে একপ্রকার সন্দেহ নাই। উভয় পক্ষই প্রস্তুত হইতেছেন। সুদূর পূর্ব্ব-আফ্রিকার অর্দ্ধ-অসভ্য আবিসিনিয়ার সহিত বর্ত্তমান সময়ে ইতালীর যুদ্ধ সঙ্ঘটন সমীচীন হইবে কিনা রাজনীতিবিশারদগণ তাহা লইয়া চিন্তা করিতেছেন; তাহাতে যুগোশ্লাভিয়া ও 'লিটল আঁতাতের' অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া উঠিবে; কেননা তাহারা ইতালীর ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষ্যান্বিত। তাঁহারা অবিরত শুনিতেছেন—

The war against Abdel Krim ruined Spain and Spain had no European enemies then. Most political prognostications are vain but we predict that were Mussolini to be engaged in such a war and he did not win and that quickly he would fare worse than Crispi.

অর্থাৎ—

যদিও তখন স্পেনের কোনও ইউরোপীয় শত্রু ছিল না, তবুও আবদুল করিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় স্পেনের পতন হইয়াছে। রাজনৈতিক বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই বিফল হইয়া থাকিলেও আমরা বলি, যদি মুসোলিনী আবিসিনিয়ার সহিত ভীষণ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়া শীঘ্রই জয়ী না হন, তবে তাঁহাকেও কাউণ্ট ক্রিসপি অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।
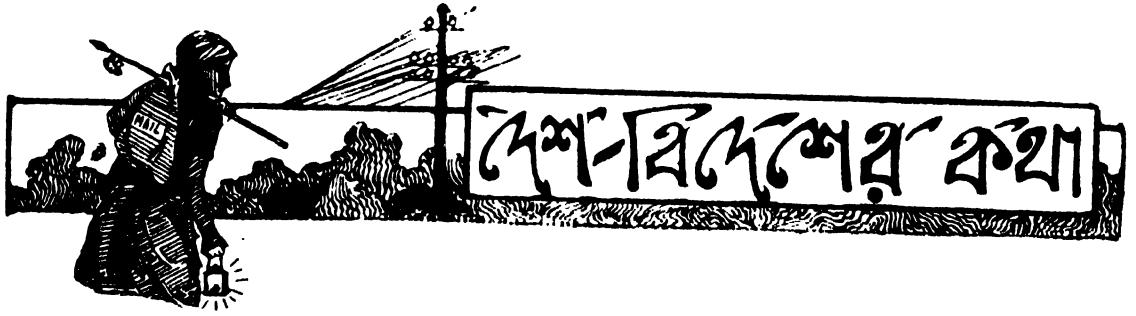
ভারতবর্ষ

মুষ্টিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালীর কৃতিত্ব—

ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুন শহরে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস।

মুষ্টিযুদ্ধে কৃতী প্রবাসী বাঙালী দল

রা নানা বিষয়ে বর্ম্মীদের অপেক্ষা অগ্রসর। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধে এপর্য্যন্ত কেহই বর্ম্মীদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। সম্প্রতি সেখানকার বেঙ্গল একাডেমীর বাঙালী ছাত্রগণ একটি মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বর্ম্মীদের হারাইতে সমর্থ হইয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীগণ মুষ্টিযুদ্ধ-শিক্ষায় পরাঙ্মুখ ছিলেন। বেঙ্গল একাডেমীর ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার চক্রবর্ত্তীর দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম এদিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। বালকগণ মুষ্টিযুদ্ধে অল্প সময়ের মধ্যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া নিখিল-ব্রহ্ম প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভূপর্য্যটক এ. কে. বুটওয়ালা—

শ্রীযুক্ত এ. কে. বুটওয়ালা ১৯২৮, ২০এ অক্টোবর একত্রিশ বৎসর বয়সে পদব্রজে ভূপর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। তিনি আশা করেন, ১৯৪৬, ২৮এ অক্টোবর ভূপর্য্যটন শেষ করিতে পারিবেন। তিনি এযাবৎ এশিয়া মহাদেশের বহু অঞ্চলে ২৩০৫০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ সের ওজনের বিছানা ও অন্যান্য জিনিবপত্র তাঁহার সঙ্গে থাকে। তিনি সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গ ও ব্রহ্মদেশ হইয়া চীন ও জাপানের দিকে অগ্রসর হইবেন স্থির করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এ. কে. বুটওয়ালা

বাংলা

পরলোকে সত্যরঞ্জন মজুমদার—

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জে সত্যরঞ্জন মজুমদারের জন্ম হয়। তিনি বহুকাল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে চাকরি করিয়া

একান্ন বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন যন্ত্রশিল্পী ছিলেন। বাংলা হরফের টাইপরাইটার যন্ত্র তিনি তৈয়ারি করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিলিপি বহু বৎসর পূর্ব্বে এই "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অর্থাভাব জন্য তিনি বিদেশে গিয়া এবিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় ইহা সাধারণে প্রচারিতও হয় নাই। তিনি সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী এক উন্নত ধরণের ধূমবিহীন কেরোসিন কুপী নির্মাণের চেষ্টা করিয়া কতকটা কৃতকার্য্য হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

বিদেশে বাঙালীর সম্মান—

গ্রন্থাগার-আন্দোলনে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের প্রচেষ্টার কথা প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকা অবগত আছেন। রাষ্ট্রসংঘের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সমিতি আছে। এই সমিতির আনুকূল্যে আগামী মে মাসে স্পেনের মাড্রিড শহরে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগারিক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। কুমার মুনীন্দ্রদেব ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য রাষ্ট্রসংঘ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

পদব্রজে ভূপরিক্রমণ—

শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯৩৩ সনের ১৭ই ডিসেম্বর আসাম তিনসুকিয়া হইতে একাকী পদব্রজে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিতে

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বহির্গত হন। তিনি গৌহাটী, কলিকাতা, পাটনা, কাশী, কানপুর, ঝাঁসি, গোয়ালিয়র, ধোলপুর, দিল্লী, আম্বালা, পাতিয়ালা, সিমলা, লাহোর, কাশ্মীর হইয়া গত নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পেশাওয়ার পৌঁছেন। সম্প্রতি তিনি রেঙ্গুন হইয়া চীনের দিকে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে তেইশ বৎসর।

শিবচন্দ্র স্মৃতি-উৎসব ও পাঠচক্র বার্ষিকী—

গত ৬ই জানুয়ারী কোন্নগর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের স্মৃতি উৎসব ও কোন্নগর পাঠচক্রের ষষ্ঠ বাৎসরিক উৎসব একত্রে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র দেবের জন্মভূমি কোন্নগরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক তাঁহার চিত্রপটে শ্রদ্ধাঞ্জলীসহ মাল্যদান করা হয় এবং পাঠচক্রের কয়েক জন সভ্য তাঁহার জীবনী ও এই উৎসবের জন্য রচিত তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভক্তি উপহার প্রভৃতি পাঠ করেন। পাঠচক্রের সম্পাদকের বাৎসরিক বিবরণী পাঠের পর সভাপতি মহাশয় "প্রকৃত জীবন" সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাঃ সুশীলচন্দ্র মিত্র, এম-এ, ডি-লিট, "রবীন্দ্র সাহিত্যের ভিত্তিভূমি" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভাশেষে নিমন্ত্রিত নর-নারীগণ সঙ্গীতে এবং শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসুর "নটরাজ" প্রভৃতি প্রাচ্য নৃত্যে পরম পরিতোষ লাভ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসব—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবের পরিচালকা-সমিতি, ১৯৩৫। ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সভাগণ।

পরলোকে ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত—

রায় বাহাদুর ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৭৮ সনে কলিকাতার প্রাতঃস্মরণীয় ৺দ্বারকানাথ গুপ্তের (ডিঃ গুপ্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল-কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া তিনি স্বদেশী যুগে নিজ বাটীতে পেন্ হোল্ডার, পেন্সিল ও নিবের একটি কারখানা স্থাপন করেন। ইহাই পরে, এফ্ এন্ গুপ্ত কোম্পানী নামে পরিচিত হয়। ১৯০৮ সাল হইতে ভারত-গভর্ণমেণ্ট এই কারখানা হইতে মালপত্রাদি গ্রহণ করিতে থাকেন। কারখানার কার্য্যপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ১৯১০ সালে তিনি এই-

রায় বাহাদুর ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত

কোম্পানী নিজ বাটী হইতে উঠাইয়া ১২নং বেলেঘাটা রোডে স্থাপন করেন। পরে ইহার বেশ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। পেন্, পেন্সিল নিব ও ফাউন্টেন পেনের কারখানা এ দেশে যত হইবে ততই মঙ্গল।

শ্রীযুক্ত এন্ মুখুজ্যে। ইনি এবং শ্রীযুক্ত পি. দাস ভারতীয় হকি দলের প্রতিনিধিরূপে নিউ জিল্যাণ্ড যাইতেছেন।

দেওঘরে মনস্বী রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাড়ির একটি দৃশ্য

শ্রীযুক্ত পি. সেন ও শ্রীযুক্ত পি-দাস। মোহনবাগান হকি দল প্রধানতঃ ইঁহাদের ক্রীড়া-কৌশলে সম্প্রতি বিজয় লাভ করিয়াছেন।

দেওঘরে মনস্বী রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাড়ি

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাচ খেলোয়াড় দল। ইঁহারা আন্তঃকলেজীয় বাচ-খেলায় প্রেসিডেন্সি কলেজকে হারাইয়া দিয়াছেন।
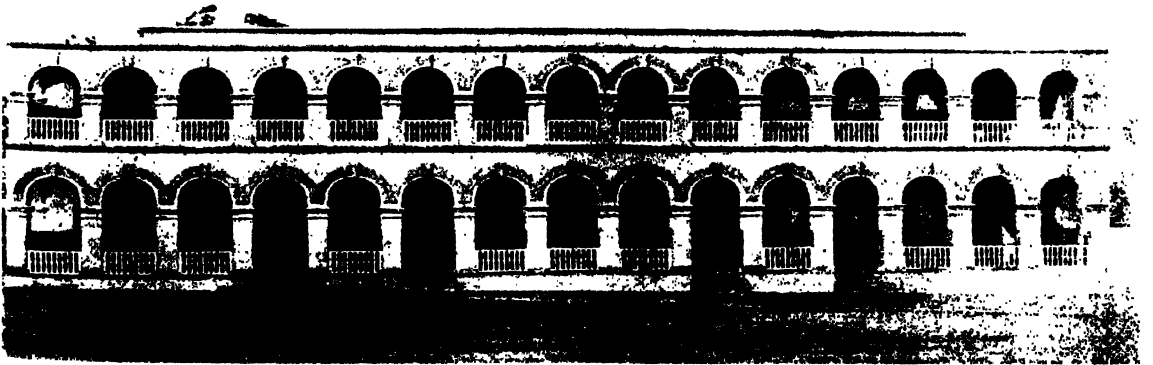
বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকাল স্কুল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে 'নফরচন্দ্র কোলে গৃহ'। পিতা নফরচন্দ্র কোলের স্মৃতিরক্ষার্থ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ কোলে ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কোলের দান হইতে এই গৃহটি নির্মিত। বঙ্গের লাট ১৯৩৭, ৫ই ফেব্রুয়ারি ইহার দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন।

নব-দিল্লীর চিত্র-প্রদর্শনী

শ্রীযামিনীকান্ত সোম, দিল্লী

গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনের নিউ বারলিংটন্ গ্যালারীতে ভারতীয় চিত্রকলার এক অতি উৎকৃষ্ট প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ভারতবাসীর, বিশেষ করিয়া বাঙালীর, আনন্দিত হইবার কারণ আছে। বাঙালীর আনন্দের কারণ এই জন্য যে, নব ভারতীয় চিত্রকলার অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল আমাদেরই বাংলা দেশে এবং ইহার প্রবর্ত্তক ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রমুখ বাংলার মনীষিগণ। বাঙালী মনীষিগণ প্রবর্ত্তিত চিত্রকলার এই নূতন ধারা ক্রমে ক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শিল্পের ঐক্য স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্যের অভিজাত সম্প্রদায়কেও ক্রমশঃ বাঙালী ভাবের ভাবুক করিয়া তুলিতেছে। বাংলার ও বাঙালীর পক্ষে এ শুধু আনন্দের কথা নয়, গৌরবেরও কথা।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল

শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল

ভারতীয় চিত্রশিল্পের এত বড় আর এত ভাল প্রদর্শনী ও-দেশে এর পূর্ব্বে আর হয় নাই। ভারত হইতে প্রায় পাঁচ শত ছবি ঐ প্রদর্শনীতে গিয়াছিল। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, মধ্যভারত, উত্তর-ভারত, বড়োদা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের শিল্পিগণের অঙ্কিত চিত্র ঐ প্রদর্শনীকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। এ ছাড়া, কয়েক জন দেশীয় নরপতি, যথা পাটিয়ালা এবং ইন্দোরের মহারাজা, বহুমূল্যে ক্রীত নিজেদের অনেক উৎকৃষ্ট ছবি ঐ প্রদর্শনীতে দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সমুদয় চিত্রই ভারতীয় শিল্পিগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত।
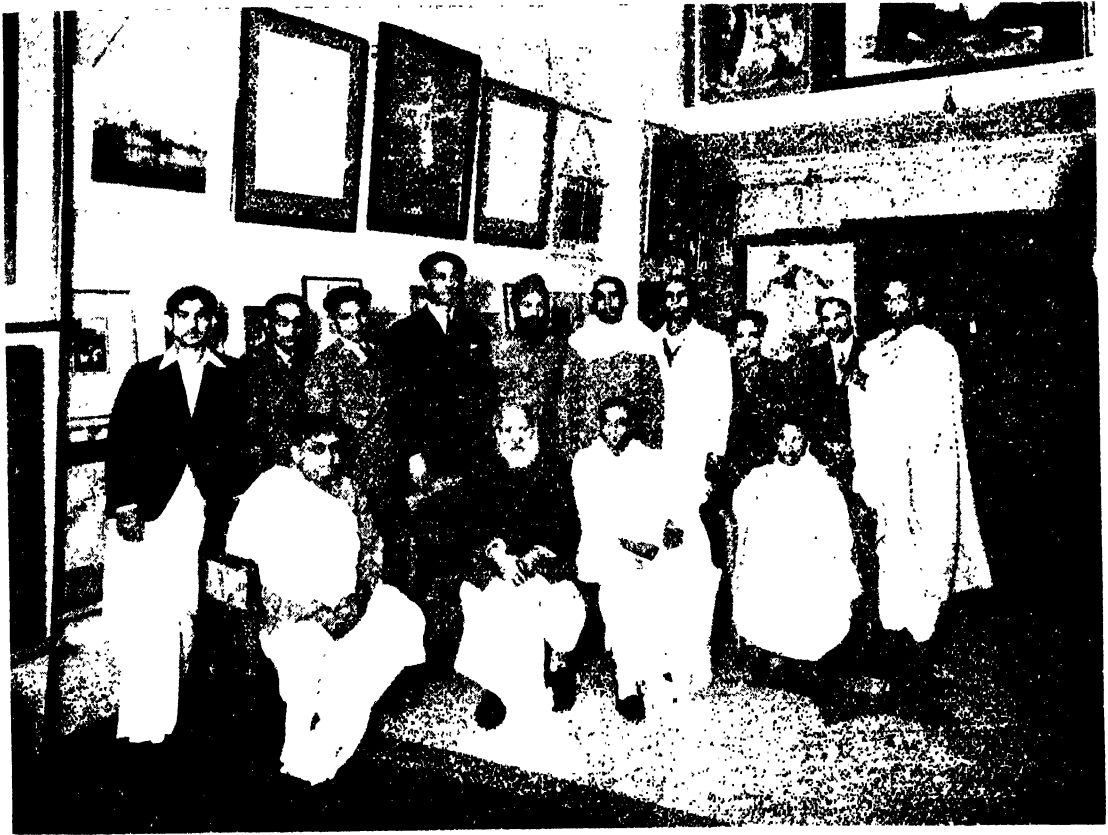
উকীল-ভ্রাতাদের নব-দিল্লীস্থিত আর্ট গ্যালারীতে—

(বামদিক্ হইতে ।) উপবিষ্ট—কুমুদকান্ত সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সারদাচরণ উকীল, যামিনীকান্ত সোম ;
দণ্ডায়মান—বি গাঙ্গুলী, রণদাচরণ উকীল, হিমাংশু চৌধুরী, বরদাচরণ উকীল, জি সি সিং, জে চক্রবর্ত্তী,
জ্ঞানদাচরণ উকীল, এস্ ভট্টাচার্য্য, এন্ চৌধুরী, ভবানীচরণ উকীল।

বিলাতের ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে এবারকার ঐ প্রদর্শনী হয় এবং ডচেস অব্ ইয়র্ক সাড়ম্বরে ইহার উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনী দেখিয়া ও-দেশের মনীষিগণ এবং বিখ্যাত চিত্রসমালোচকগণ ভারতীয় চিত্র-শিল্পের বহু সুখ্যাতি করিয়াছেন। অনেকে মুগ্ধ হইয়া অনেক কথাই বলিয়াছেন ; তার ভিতর এক জন যাহা বলিয়াছেন, আমাদের সকলের পক্ষে তা খুব বড় কথা। কথাগুলি এই :—

What astonishes the English visitor is not any discernible differences in expression between one part of India and another, but an essential unity of aesthetic feeling.

The most surprising impression is that the inhabitants of a country so vast as India have contrived so splendidly to "pull together."

তাৎপর্য্য—ভারতের এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের ভাব-প্রকাশের যে বিভিন্নতা আছে তাহাতে শুধু ইংরেজ-দর্শকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না কিন্তু ইহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার ভঙ্গীর মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায় তাহাই বৈদেশিকগণকে বিস্ময়ান্বিত করে।

ভারতের মত প্রকাণ্ড দেশের অধিবাসিবৃন্দ আপনাদিগকে সম্মিলিত রাখিবার জন্য যেরূপ অপূর্ব্ব কৌশল বিস্তার করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়।

বিদেশে বিদেশীয়দের মধ্যে ভারতীয় চিত্রশিল্পের এরূপ সমাবেশের প্রবৃত্তি ও উদ্যোগ শ্লাঘনীয় হইয়াছে।

উকীল-গ্যালারীতে লর্ড ও লেডী উইলিংডন।
বড়লাট তাঁহার পত্নীর ক্রীত একটি ছবি দেখিতেছেন।

কিন্তু এরূপ একটি ভাল প্রদর্শনী হঠাৎ ও-দেশে কি করিয়া সম্ভবপর হইল? ইহার উত্তরে গোড়ার কথা কিছু বলিতে হয়।

এবারকার প্রদর্শনী হইয়াছে বিলাতের ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বিলাতে দুই বার এবং ফ্রান্সে একবার নব-ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী হইয়াছিল। সে-সব প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিলেন দিল্লীর অল-ইণ্ডিয়া ফাইন্ আর্ট্ সোসাইটির সম্পাদক শিল্পী শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল। ১৯৩১ সালের শেষভাগে ইনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল-অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র লইয়া বিলাতে যান এবং বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবে একটি ছোটখাট প্রদর্শনী খোলেন। এ প্রদর্শনীটি ছোটখাট হইলেও অনেকে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রসিদ্ধ চিত্র-সমালোচক, রয়েল কলেজ অব্ আর্টের অধ্যক্ষ, উইলিয়াম রটেনষ্টিন্ বলেন—

The sensitive and disciplined work of Mr. Sarada Ukil has something in common with the lyrical poetry of Rabindranath Tagore. Refined and pensive, it gives us, like Indian music, an insight into the delicate moods of the Indian spirit.

তাৎপর্য্য—শ্রীযুক্ত সারদা উকীলের কমনীয় ও সংযত চিত্রাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার কোমলতা পরিদৃষ্ট হয়। সুমার্জ্জিত ও ভাবসঙ্কুল এই শিল্পকলা সঙ্গীতের ন্যায় আমাদের কাছে ভারতীয় হৃদয়ের কোমল সুর বহন করিয়া আনে।

বিলাতে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের এই প্রদর্শনীটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হইলেও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐ প্রদর্শনীর পর বরদাচরণ উকীল মহাশয় ঐ সব ছবি লইয়া প্যারিসে যান এবং সেখানেও এক প্রদর্শনী খোলেন। প্যারিসের Cherpentier নামক বিখ্যাত গ্যালারীতে প্রদর্শনী খোলা হয় এবং সেখানেও ঐ সব ভারতীয় চিত্রের যথেষ্ট আদর হয়।

শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল

ইহার দুই বৎসর পরে বরদাচরণ উকীল মহাশয় বিলাতে

উকীল-ভ্রাতাদের কলাশিক্ষালয়। বামদিকে রণদাচরণ।

দ্বিতীয় বার এক প্রদর্শনী খোলেন। এবারকার প্রদর্শনীর জন্য তিনি ভারতীয় বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত কতকগুলি বাছা বাছা ছবি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে বিলাতের বিখ্যাত ফাইন্ আর্ট সোসাইটির গ্যালারীতে প্রদর্শনী খোলা হয় এবং স্যর স্যামুয়েল হোর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি বলেন—

I welcome this exhibition as a means of bringing us more closely in contact in non-political fields, and I hope it will be a bridge not only between British and Indian Art, but between British and Indian public opinion.

তাৎপর্য্য—এই প্রদর্শনীকে আমি সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি; ইহা ভারতের অ-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সহিত আমাদের সম্যক পরিচয়ের পন্থা। ইহা দ্বারা শুধু যে ব্রিটিশ ও ভারতীয় শিল্পকলার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইবে তাহা নহে অধিকন্তু ইহা দ্বারা এই উভয় দেশের রাষ্ট্রীয় ভাব-ধারার সমন্বয় ঘটিবে।

এই দ্বিতীয় বারের প্রদর্শনীতে ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রতি ও-দেশের অভিজাত-সম্প্রদায় আরও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন।

গত ডিসেম্বরের প্রদর্শনীকে প্রকৃতপক্ষে ও-দেশে ভারতীয় চিত্রশিল্পের তৃতীয় প্রদর্শনী বলা যাইতে পারে। এবারের এই প্রদর্শনী ইণ্ডিয়া সোসাইটির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও শিল্পী বরদাচরণ উকীল মহাশয়কে এবারও ইহার সাফল্যের জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইয়াছিল। এই সম্পর্কে বিলাতের ইণ্ডিয়া সোসাইটির ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট এবং এক জন বিখ্যাত চিত্র-সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্যামদেশীয় নর্ত্তক।
শ্রীসুধাংশু চৌধুরী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

At Delhi there has also in recent years grown up a strong local artistic movement in which the brothers Ukil, themselves offshoots of the Bengal School, have taken an active part......At New Delhi we were fortunate in securing the energetic services of Mr. Barada Ukil, one of three artistic brothers to whom the present art movement in that part of India owes much of its vigour. Through the support of Mr. J. N. G. Johnson, Chief Commissioner of Delhi, and many influential art-lovers, both Indian and British, Mr. Ukil was able to bring to London a very noteworthy collection of works not only from Northern Indian artists, but also from the private collections of their Highnesses the Maharajas of Patiala and Indore.

তাৎপর্য্য—দিল্লীতে অধুনা শ্রীযুক্ত সারদা উকীল ও তাঁহার ভ্রাতারা কলাশিল্পে এক স্থানীয় প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহারা বাংলা দেশের চিত্রাঙ্কণ-রীতির অনুবর্ত্তক। এই প্রচেষ্টা প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত বরদা উকীলের অক্লান্ত কার্য্যকারিতার উপর যথেষ্ট নির্ভর করিয়াছে। দিল্লীর চীফ্ কমিশনার মিঃ জনসন ও অন্যান্য বহু দেশীয় ও বৈদেশিক কলানুরাগী ব্যক্তির আনুকূল্যে বরদা বাবু পাটিয়ালা ও ইন্দোরের মহারাজার সংগ্রহ ও উত্তর-ভারতের অন্যান্য বহু চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রাবলী লণ্ডন প্রদর্শনীর জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন।

এতৎ সম্পর্কে দিল্লীর অল্-ইণ্ডিয়া ফাইন্ আর্ট সোসাইটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু না বলিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ ভারতের বাহিরে ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রচারের মূলে দিল্লীর আর্ট সোসাইটির প্রচেষ্টা রহিয়াছে যদি বলা যায়, তাহা মোটেই অত্যুক্তি হইবে না। দিল্লীতে আর্ট সোসাইটির উদ্ভবের ইতিহাস মোটামুটি এইরূপ :—

শিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল রাজধানী দিল্লীকেই তাঁহার শিল্পপ্রচারের কেন্দ্ররূপে মনোনীত করেন। সে প্রায় দশ-বার বৎসরের কথা। পরে, তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্য দুই শিল্পী-ভ্রাতা (বরদাচরণ এবং রণদাচরণ উকীল) আসিয়া যোগ দেন। উত্তর-ভারতে একটি আর্ট সোসাইটি সংগঠনের পরিকল্পনা ইঁহাদের নিকট হইতেই আসে। কিন্তু সুযোগের অভাবে বহুকাল ইঁহাদিগকে এ-সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় থাকিতে হয়। পরে স্বর্গীয় সতীশরঞ্জন দাস (এস্ আর দাস) মহাশয় লাট-কৌন্সিলের সদস্যের পদ পাইয়া দিল্লীতে আসিলে প্রধানতঃ তাঁহারই সহায়তায় এবং দিল্লীর কোন-কোন ধনী ব্যক্তির আনুকূল্যে ১৯২৭ সালে প্রথম আর্ট সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং প্রতিবৎসর একটি করিয়া চিত্র-প্রদর্শনী হইতে থাকে। এই আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে ১৯৩০ সালে যে প্রদর্শনীটি হয়, তাহার মত উৎকৃষ্ট প্রদর্শনী ভারতের আর কোথাও ইহার পূর্ব্বে হয় নাই। এই প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দুই শত শিল্পীর আঁকা অন্যূন দেড় হাজার ছবির সমাবেশ হইয়াছিল। স্বয়ং বড়লাট এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। দিল্লীর তখনকার চীফ্ কমিশনার স্যর জন্ টম্‌সন্ ঐ আর্ট সোসাইটির সভাপতি রূপে সে-সময় ভারতীয় শিল্পীদের কল্যাণকর অনেক কাজ করিয়াছিলেন। কিরূপে করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য।

১৯২৯ সালে Standing Finance Committee এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন,—দিল্লীর লাটপ্রাসাদ ছবি দিয়া সুসজ্জিত করিবার জন্য। এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া দিল্লীর

দুর্গা।

শ্রীরণদাচরণ উকীল কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

লক্ষ্মী।

শ্রীরণদাচরণ উকীল কর্ত্তৃক অঙ্কিত।
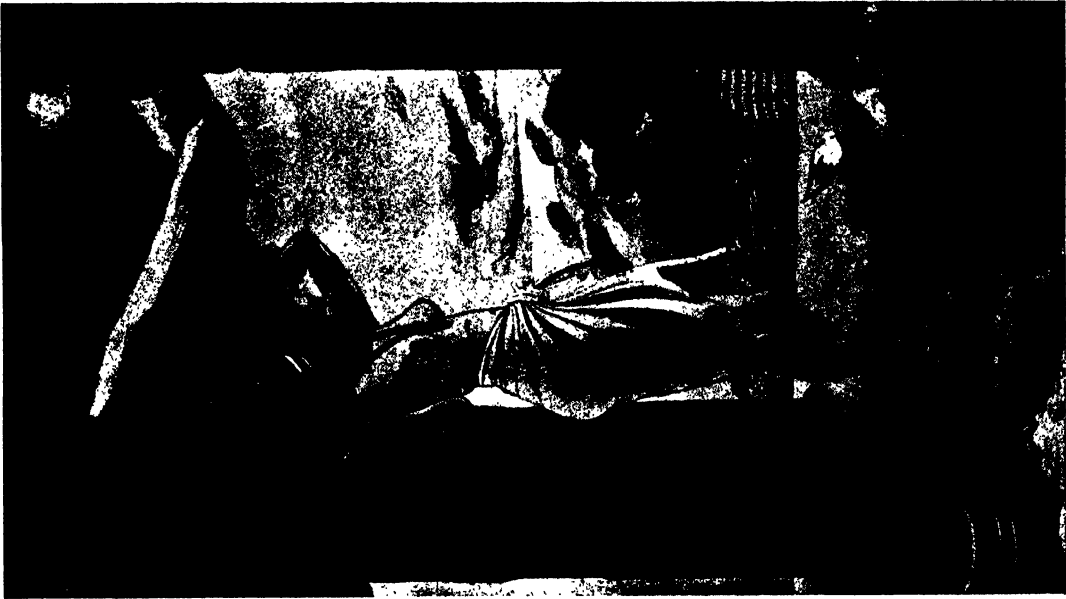
বারি-বাহিনী।

পরলোকগত ডি. রাম রাও কর্ত্তৃক অঙ্কিত।
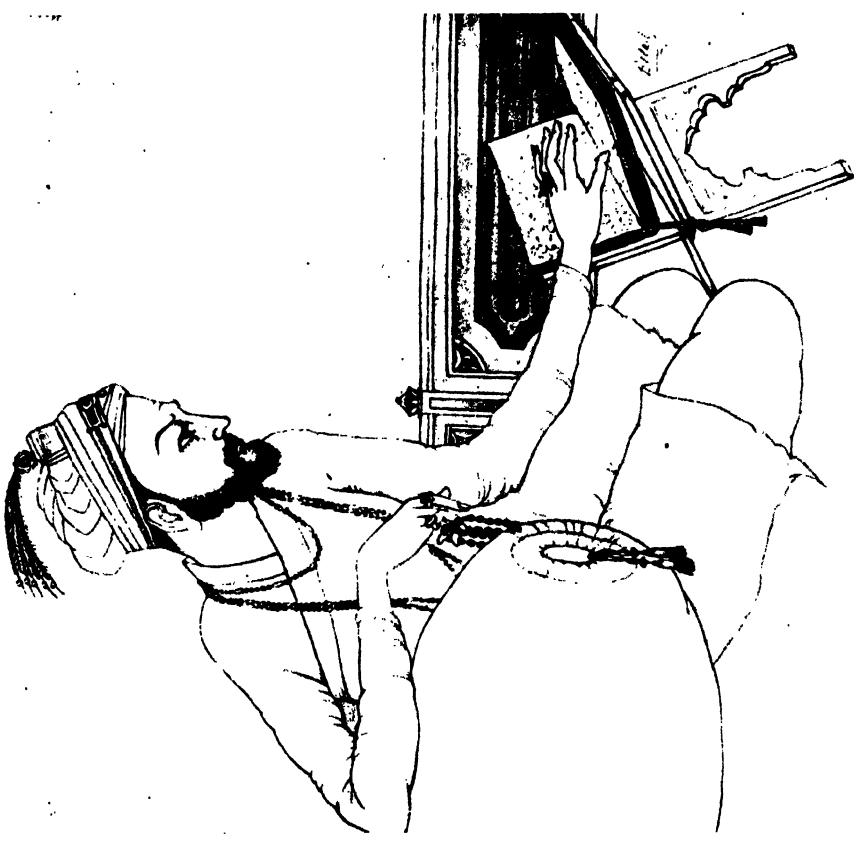
আওরংজেব কোরান পাঠ করিতেছেন।

শ্রীবরদাচরণ উকীল কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

গোপাল কৃষ্ণ।

শ্রীসারদাচরণ উকীল কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

জলসত্র।

গোয়ালিয়রপ্রবাসী শ্রীসুধীর খাস্তগীর কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

সন্ধ্যা-সঙ্গীত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

কৈকেয়ী ও মন্থরা।

শ্রীসারদাচরণ উকীল কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

লণ্ডন প্রদর্শনীতে (বামদিক হইতে) স্যর জন টমসন, স্যর সামুয়েল হোর, স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, বরদাচরণ উকীল, ই ডবার্ণ।

আর্ট সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক শিল্পী শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল এক প্রস্তাব (scheme) উপস্থিত করেন,—বড়লাট-সকাশে এবং চীফ্ কমিশনার স্যর জন্ টমসনের নিকট। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই, যাহাতে ভারতীয় শিল্পিগণকেও কাজে লাগান হয় এবং তাঁহারাও ঐ টাকার কিছু অংশ যাহাতে পান। স্যর জনের আনুকূল্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং বড়লাটের নির্দ্দেশক্রমে দিল্লীর আর্ট সোসাইটির উপর ভার পড়ে, ভারতীয় শিল্পীদের নিকট হইতে ছবি সংগ্রহের জন্য। এই উদ্দেশ্যেই দিল্লীর ১৯৩০ সালের প্রদর্শনী ওরূপ বিরাট ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় শিল্পিগণের কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-সকল ঐ প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল এবং প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল। ইহার ফলে দুই জন যোগ্য শিল্পীকে (শিল্পী অতুল বোস এবং লাল কাকা) রয়াল পোর্ট্রেট আঁকিয়া আনিবার জন্য বিলাতে পাঠান হয়। ইহা ছাড়া ঐ প্রদর্শনী হইতে কতকগুলি ভারতীয় চিত্র বড়লাট তাঁহার নব-দিল্লী প্রাসাদের জন্য ক্রয় করেন।

লেডী উইলিংডন প্রদর্শনীকে একটি ছবি দেখিতেছেন।

দিল্লীর আর্ট সোসাইটির বাৎসরিক চিত্র-প্রদর্শনী গত মাসে নব-দিল্লীতে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বারের মত এবারেও বহু চিত্রের সমাবেশ ঘটিয়াছিল,—বিশেষত্ব এই ছিল যে, লণ্ডনের নিউ বারলিংটন্ গ্যালারীতে প্রদর্শিত বহুসংখ্যক চিত্র নব-দিল্লীর উকীল-গ্যালারীতেও এবার প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে অন্যান্য বারের মত বিশিষ্ট জনসমাগমের অভাব ঘটে নাই।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ধরিতে গেলে নব-দিল্লীর এই প্রতিষ্ঠানটি একটি জাতীয় সম্পদ-বিশেষ। শিল্পী শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল সম্পাদিত "রূপলেখা" নামক শিল্প-পত্রিকা-

সন্ধ্যা-সঙ্গীত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

কৈকেয়ী ও মন্থরা।

শ্রীসারদাচরণ উকীল কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

আর্ট সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক শিল্পী শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল এক প্রস্তাব (scheme) উপস্থিত করেন,—বড়লাট-সকাশে এবং চীফ্ কমিশনার স্যর জন্ টম্সনের নিকট। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই, যাহাতে ভারতীয় শিল্পিগণকেও কাজে লাগান হয় এবং তাঁহারাও ঐ টাকার কিছু অংশ যাহাতে পান। স্যর জনের আনুকূল্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং বড়লাটের নির্দেশক্রমে দিল্লীর আর্ট সোসাইটির উপর ভার পড়ে, ভারতীয় শিল্পীদের নিকট হইতে ছবি সংগ্রহের জন্য। এই উদ্দেশ্যেই দিল্লীর ১৯৩০ সালের প্রদর্শনী ওরূপ বিরাট ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় শিল্পিগণের কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-সকল ঐ প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল এবং প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল। ইহার ফলে দুই জন যোগ্য শিল্পীকে (শিল্পী অতুল বোস এবং লাল কাকা) রয়াল পোর্ট্রেট আঁকিয়া আনিবার জন্য বিলাতে পাঠান হয়। ইহা ছাড়া ঐ প্রদর্শনী হইতে কতকগুলি ভারতীয় চিত্র বড়লাট তাঁহার নব-দিল্লী প্রাসাদের জন্য ক্রয় করেন।

লণ্ডন প্রদর্শনীতে (বামদিক হইতে) স্যর জন টমসন, স্যর সামুয়েল হোর, স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, বরদাচরণ উকীল, ই ডবার্ণ।

দিল্লীর আর্ট সোসাইটির বাৎসরিক চিত্র-প্রদর্শনী গত মাসে নব-দিল্লীতে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বারের মত এবারেও বহু চিত্রের সমাবেশ ঘটিয়াছিল,—বিশেষত্ব এই ছিল যে, লণ্ডনের নিউ বারলিংটন্ গ্যালারীতে প্রদর্শিত বহুসংখ্যক চিত্র নব-দিল্লীর উকীল-গ্যালারীতেও এবার প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে অন্যান্য বারের মত বিশিষ্ট জনসমাগমের অভাব ঘটে নাই।

লেডী উইলিংডন প্রদর্শনীকে একটি ছবি দেখিতেছেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ধরিতে গেলে নব-দিল্লীর এই প্রতিষ্ঠানটি একটি জাতীয় সম্পদ-বিশেষ। শিল্পী শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল সম্পাদিত "রূপলেখা" নামক শিল্প-পত্রিকা-

খানিও এই আর্ট সোসাইটির অন্যতম গৌরবের বস্তু। বরদা উকীল মহাশয়ের উদ্যোগিতা সত্যই অসাধারণ। আর্ট সোসাইটির পক্ষ হইতে তিনি দিল্লীতে অতঃপর একটি ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। বড়লাটকে ইহার পরিকল্পনা (scheme) পাঠান হইয়াছে এবং গ্যালারীর বাড়ি-নির্ম্মাণ উপলক্ষে কোন এক ধনী ব্যক্তির নিকট দুই লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে।*

* শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরীর শ্যামদেশীয় নর্ত্তকের চিত্র ছাড়া বাকী চিত্রগুলি লণ্ডন এবং দিল্লী প্রদর্শনাতে অর্থাৎ উভয় স্থানে দেখান হইয়াছিল।

মহিলা-সংবাদ

কুমারী এস্, ঘোষ, বি-এ, এন্-এফ-ইউ (লণ্ডন) বিহার-সরকারের বৃত্তি লইয়া বিলাত গমন করিয়াছিলেন। সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি 'ন্যাশন্যাল টিচার্স ডিপ্লোমা' প্রাপ্ত হন। পরে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়া সেখানকার শিক্ষাদান-পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। তিনি বর্ত্তমানে ময়ুরভঞ্জ ষ্টেটের লেডী ক্রেগার বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তিনি শিশুর মনস্তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। গত জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি শিশুর মনস্তত্ত্ব বিষয়ে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনস্তত্ত্ব-বিভাগের রেকর্ডারের কার্য্যও করিয়াছিলেন।

কুমারী এস্ ঘোষ

কাইরো নগরীতে উটের বাজারের একটি দৃশ্য

বেদুইন সমভিব্যাহারে লর্ড ল'রেন্স মরুভূমি পথে চলিয়াছেন
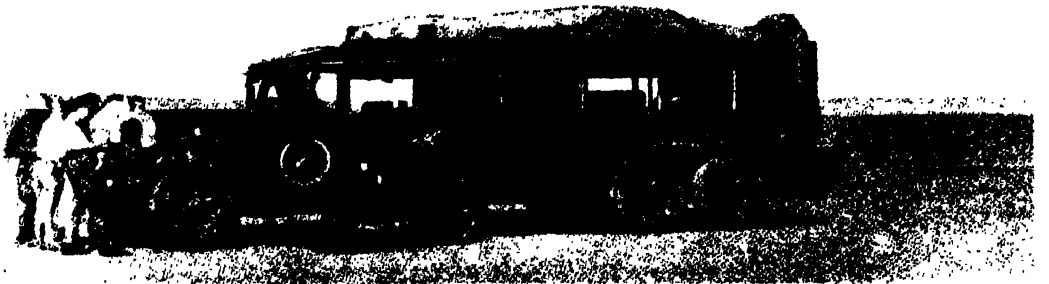
মরুভূমি পথে মোটর বাস
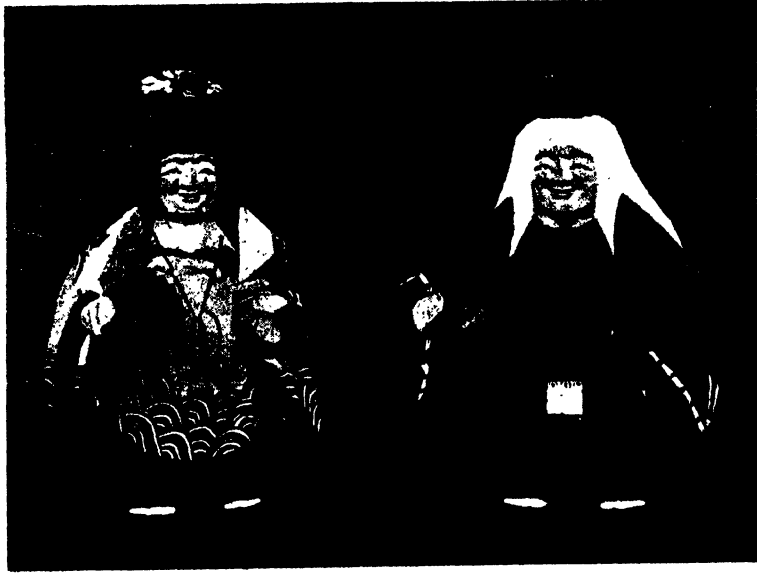
নারা পুতুল

মরুভূমির বিরুদ্ধে অভিযান—

'উট মরুভূমির অধীশ্বর'। কারণ সাধারণতঃ উটের পিঠে চড়িয়াই মরুভূমির পথে গমনাগমন করিতে হয়। স্মরণাতীত যুগ হইতে ব্যবসায়ীরা উটে চড়িয়া মরুভূমি অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিত। ইদানীং কিন্তু উটের আর সে কদর নাই। যন্ত্রদানব মরুভূমিকেও করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে!

নারা পুতুল—

নারা পুতুল জাপানীদের বড়ই আদরের। শিল্পী কাঠ হইতে এইরূপ পুতুল তৈরি করে। ১৯৩২ সালে নবেম্বর মাসে নিপ্পন-সম্রাট নারা শহর পরিদর্শনকালে দুইটি পুতুল পছন্দ করেন। এই চিত্রটি সেই পুতুল দুইটির প্রতিলিপি।

জাপানে বৃহত্তম বুদ্ধমূর্ত্তি—

টোকিও শহরের উত্তর দিকে পাহাড় কাটিয়া বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার মস্তক এখন পর্য্যন্ত তৈরি হইয়াছে। মস্তকটি প্রায় বাইশ হাত উঁচু।

পাহাড় গাত্র কাটিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি তৈরি হইতেছে। মস্তকই প্রায় বাইশ হাত উঁচু
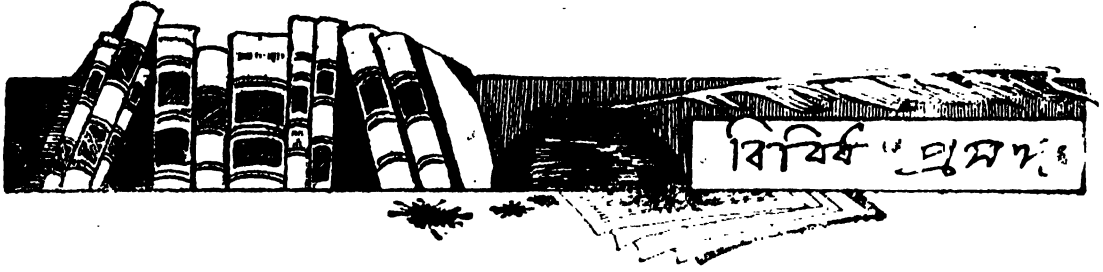
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

লোকহিতের জন্য আমরা রাজশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে স্বয়ং কি করিতে পারি, আমাদের সমুদয় সম্মেলনে তাহার আলোচনা প্রধানস্থানীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। আলোচনার পর আবশ্যক কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ এবং উপায় ও কার্য্যপ্রণালীর নির্দ্ধারণ। যে-সকল দেশে রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি দেশের লোকদের সমষ্টিগত শক্তি হইতেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে প্রাপ্ত এবং তাহারই প্রতিনিধিস্থানীয়, সেখানেও দেশের লোকেরা রাষ্ট্রশক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে স্বয়ং কি করিতে পারেন, তাহার চিন্তা করিয়া থাকেন এবং কর্ত্তব্য ও পন্থা নির্দ্দেশও করিয়া থাকেন। সেই সব দেশে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য চাহিলে কোন খোঁটা খাইতে হয় না, এবং তাহা লইলেও কোন লাঘব হয় না। তথাপি তথাকার লোকেরা আত্মনির্ভরপরায়ণ হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে রাষ্ট্রশক্তি ও প্রজাশক্তি আলাদা। এখানে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য চাহিতে কুণ্ঠা বোধ হয়, চাহিলে অনেক সময় খোঁটা খাইতে হয় এবং সকল সময়ে অগৌরব অনুভূত হয়। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য লইলে অনেক সর্ত্তে আবদ্ধও হইতে হয়। তদ্ভিন্ন, আমরা যে পরাধীনতার যোগ্য, তাহার প্রমাণস্বরূপ ইহা বলা হইয়া থাকে, যে, আমরা স্বয়ং স্বাবলম্বন দ্বারা কিছু করিতে পারি না; বিশেষ করিয়া এই কারণেও আমাদের স্বাবলম্বনমার্গে কৃতিত্বের প্রয়োজন আছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহার অধিবেশনাদি কংগ্রেসের নিয়ম অনুসারে হইয়া থাকে। ইহাকে লোকহিতকর যাহা করিতে হইবে, তাহা কংগ্রেসের নিয়মাবলীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া করিতে পারা যায়। কংগ্রেস "গঠনমূলক" যে কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তদনুসারে কাজ করিলে সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে, কৃষি ও গ্রাম্য পণ্যশিল্পসমূহের পুনরুজ্জীবন দ্বারা বিস্তর লোকের আয় বাড়িতে পারে, আলস্যে দলাদলিতে পরনিন্দায় ও ব্যসনে কালক্ষেপ অপেক্ষা পরিশ্রমে ও সৎভাবে জীবন যাপনের অভ্যাস জন্মিতে পারে, এবং শিক্ষার বিস্তারও কিছু হইতে পারে।

—

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

নিরক্ষরতা দূরীকরণ একান্ত আবশ্যক। কোন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সমিতি শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিতে মনোযোগী হইলে ভাল হয়। নিরক্ষরতা দূর হইলেই শিক্ষার বিস্তার হয় না জানি, লিখনপঠনক্ষমত্ব ও শিক্ষা এক জিনিষ নহে জানি, নিরক্ষর কোন কোন লোক বাস্তবিক শিক্ষিতপদবাচ্য হইতে পারেন জানি, খুব লেখাপড়া-জানা লোকও শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য না হইতে পারে জানি। কিন্তু ব্যাপক ভাবে সমগ্র একটি জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বা কোন কোন দিকে উন্নতির উপায় চিন্তা করিতে হইলে দেখা যাইবে, যে, নিরক্ষরতা উন্নতির একটা বড় বাধা এবং উন্নতির জন্য লিখনপঠনক্ষমত্ব আবশ্যক। এই জন্য আমরা দেশের মধ্যে লেখাপড়ার বিস্তার একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করি। প্রত্যেক প্রদেশে ও জেলায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কমিটি থাকা আবশ্যক। বঙ্গের এই কমিটিগুলির সভ্যেরা লেখাপড়া বিস্তারের কাজের এক একটি দশবার্ষিক পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক কাজের প্ল্যান বা পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন, দশ বৎসরে শিশু ভিন্ন বঙ্গের অন্য স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্য হইতে নিরক্ষরতা দূর করিবেন, পাঁচ বৎসরে ইহার অর্দ্ধেক কাজ শেষ করিবেন, এবং প্রতি বৎসর সমুদয় কাজটির দশ ভাগের এক ভাগ শেষ করিবেন। এই সমিতির এক একটি

কমিটি নিজের নিজের এলাকার সব গ্রামের ও শহরের প্রাপ্তবয়স্ক ও নাবালক নিরক্ষরদের সংখ্যা ঠিক করিয়া ফেলুন। তাহা স্থির হইলে প্রতিবৎসর ঐ সকল স্থানের কত লোককে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে, তাহা মোটামুটি বুঝা যাইবে। মোটামুটি বলিতেছি এই জন্য, যে, প্রতিবৎসর কতকগুলি নূতন শিশু জন্মিবে—তাহারা শুকদেব নহে, নিরক্ষর, এবং যাহারা হাতে-খড়ির বয়সের নীচে বলিয়া যাহাদিগকে কোন বৎসর শিক্ষার্থীর সংখ্যায় ধরা হয় নাই, পর বৎসর তাহাদের অনেকে শিক্ষার্থীর তালিকাভুক্ত হইবে।

এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন মনে হইতে পারে। কঠিন যে বটে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা দুঃসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নহে। কারণ, শুধু পড়িতে ও লিখিতে শিখাইয়া দেওয়া সামান্য লেখাপড়া-জানা বালকবালিকাদের দ্বারাও হইতে পারে। আট-দশ বৎসরের ছেলেমেয়েরাও এই বিদ্যাদান-কার্য্যে প্রভূত সাহায্য করিতে পারে। বস্তুতঃ পাঠশালায় যাহারা ন্যূনকল্পে অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণ পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছে, তাহারাও এই কাজ করিতে পারে। তাদের চেয়ে বেশী বয়সের ও বেশী লেখাপড়া-জানা লোকেরা ত নিশ্চয়ই তাহা করিতে পারে। চীনদেশে নিরক্ষতার বিরুদ্ধে অভিযানে ছোট ছেলেমেয়েরাও সাহায্য করিয়াছে। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে একটি সংবাদ ছাপিয়াছিলাম, যে, চীনের একটি ছোট ছেলে তাহার ষাট বৎসর বয়সের পিতামহী বা মাতামহীকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছে।

আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহে প্রাচীন কালের একটি রীতিই এই ছিল, যে, ছাত্রদের মধ্যে যাহারা বেশী শিখিয়াছে তাহারা তাহাদের চেয়ে অজ্ঞ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিত এবং তাহা করিতে হওয়ায় এই শিক্ষাদাতা ছাত্রদের জ্ঞান গভীরতর ও অধিকতর ভ্রান্তিশূন্য হইত।

আমরা যে ভাবে লেখাপড়ার বিস্তারসাধনের কথা বলিতেছি, তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে এবং শহরের পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা স্থাপন করিতে পারিলে এবং অবৈতনিক শিক্ষকদের দ্বারা তাহা চালাইতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু এই প্রকারে পাঠশালা স্থাপন না করিলে যে নিরক্ষতা দূর হইতেই পারে না, তাহা নহে। প্রত্যেক গৃহস্থের বাহিরের ঘর ও বারাণ্ডা, প্রত্যেক চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রামের প্রত্যেক বড় বড় গাছের তলা প্রভৃতি পুরুষজাতীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষাও এইরূপ সব জায়গায় হইতে পারে, অন্তঃপুরেও হইতে পারে। তার চেয়ে বড় মেয়েদের শিক্ষা প্রত্যেক অন্তঃপুরে হইতে পারে।

প্রত্যেক শিক্ষাদাতা বা শিক্ষাদাত্রীকেই যে কয়েক জন ছাত্র বা ছাত্রীকে এক সঙ্গে শিখাইতে হইবে, ইহাও অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে। কেহ কেহ কেবল মাত্র একটি ছেলে বা একটি মেয়েকে, একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে বা একটি প্রাপ্ত-বয়স্কা মেয়েকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইতে পারেন, তাহার লিখন-পঠনক্ষমতা জন্মিলেই আর একটিকে তিনি শিখাইতে আরম্ভ করিতে পারেন। এই কাজের জন্য প্রত্যেকে প্রত্যহ পনর মিনিট সময় দিলেও বৎসরান্তে দেখা যাইবে, যে, কয়েক জনের নিরক্ষরতা দূর হইয়াছে। যাহারা এই সব অবৈতনিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছে শিখিবে, তাহারা যদি আবার স্বয়ং অন্য অনেককে শিখায় তাহা হইলে শিক্ষা বিস্তারের কাজ খুব দ্রুত হইতে পারে, যেমন চক্রবৃদ্ধির নিয়মে সুদে আসলে মূলধন খুব দ্রুত বাড়ে।

সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক রাষ্ট্রে এইরূপ আইন হইয়াছে, যে, যাহারা কোন সার্ব্বজনিক (পাব্লিক্) বিদ্যালয়ে অর্থাৎ রাষ্ট্রের ব্যয়ে পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে কিছুকাল (ধরুন দু-তিন বৎসর) বিনা বেতনে বৎসরে ২০০ ঘণ্টা শিক্ষাদানের কাজ করিতে হইবে, তাহা না করিলে তাহারা কোন কোন পৌর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহা ন্যায্য আইন। 'রাষ্ট্রের ব্যয়ে'র অর্থ সর্ব্বসাধারণের প্রদত্ত করের ব্যয়ে। যাহারা সর্ব্বসাধারণের সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করে, তাহারা রাষ্ট্রের নিকট ঋণী। অপরকে শিক্ষা দিয়া এই ঋণ শোধ করিতে হইবে, এইরূপ আইন ন্যায়সঙ্গত। আমাদের দেশেও আমরা কেহ কেহ, অর্থাৎ যাঁহারা সরকারী বৃত্তি পান বা বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে ও কলেজে শিক্ষা লাভ করেন, শিক্ষার জন্য দেশের লোকের কাছে খুব বেশী পরিমাণে ঋণী, কেহ কেহ অংশতঃ ঋণী; কারণ সরকারী, সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত বা বে-সরকারী যেরূপ প্রতিষ্ঠানেই আমরা শিক্ষালাভ করি না কেন এবং বেতন যতই দিই না

কেন, শুধু ছাত্রদের বেতন হইতে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয় না—সরকারী সাহায্য, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির সাহায্য, প্রদত্ত গচ্ছিত টাকার সুদ, বার্ষিক ও মাসিক চাঁদা, অযথেষ্ট বেতনভোগী শিক্ষাদাতাদের ত্যাগ প্রভৃতি হইতে আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। অতএব, খুব উচ্চ বেতনের সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বেতন পূর্ণমাত্রায় দিয়া যাঁহারা শিক্ষা পান, তাঁহারাও তাঁহাদের শিক্ষার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট কতকটা ঋণী। অপরকে শিক্ষা দিয়া, নূনকল্পে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অর্থ দিয়া, আমরা এই ঋণ হইতে মুক্তি পাইতে পারি। এই ঋণ শোধ করিতে আমাদিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত সোভিয়েট রাশিয়ার মত আইন আমাদের দেশে হইবে না। এরূপ নিয়ম আমাদিগকে স্বয়ং প্রণয়ন করিয়া নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে।

স্বাধীন নানা দেশে সমর্থ বয়সের প্রত্যেক সুস্থ অবিকলাঙ্গ পুরুষকে নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে এবং, প্রয়োজন হইলে, যুদ্ধ করিতে হয়। ইহাকে কন্‌স্ক্রিপ্‌শুন্ বলে। এরূপ নিয়মের সমর্থক যুক্তি এই, যে, যাহারা দেশরক্ষার আয়োজন থাকায় দেশের স্বাধীনতার ও নিরাপত্তার সুবিধা ভোগ করে, সামর্থ্য থাকিলে দেশরক্ষার কাজ করিতে তাহারা বাধ্য। এই যুক্তির অনুরূপ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আমরা বলিতে পারি, যাঁহারা দেশের সভ্যতা ও শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগে শিক্ষা পাইয়াছেন বা পাইতেছেন, শিক্ষা-বিস্তারের কাজে যোগ দেওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

এইরূপ কথা আমরা আগে আগে অনেক বার লিখিয়াছি, অনেক বক্তৃতায় বলিয়াছি। কিন্তু তদনুসারে কাজ যত দিন অন্ততঃ কোন কোন শহরে ও গ্রামে না হইতেছে, তত দিন এই সব কথার ও যুক্তির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন থাকিবে।

কথিত হইতে পারে, আবালবৃদ্ধবনিতা অল্পাধিক শিক্ষা-প্রাপ্ত দেশের সব মানুষকে যে শিক্ষাদাতার কাজ করিতে বলা হইতেছে, এ আহ্বানে সকলে সাড়া দিবে না—অধিকাংশ লোকেই সাড়া দিবে না ; সুতরাং এরূপ পরামর্শ না দেওয়াই ভাল। এরূপ আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, যে, আমরা বাল্যকালে বর্ণ-পরিচয়ের বহি হইতে আরম্ভ করিয়া নানা সদ্‌গ্রন্থে নানা উপদেশ পড়িয়া আসিতেছি, বহু উপদেষ্টার মুখে বহু উপদেশ শুনিয়া আসিতেছি ; সমুদয় পাঠক ও সমুদয় শ্রোতা সমস্ত উপদেশ সকল সময়ে পালন করেন না—হয়ত অধিকাংশ পাঠক ও শ্রোতা অধিকাংশ উপদেশ অনেক সময়ে ভুলিয়া থাকেন বা অবহেলা করেন। কিন্তু তা বলিয়া উপদেশগুলি দেওয়া উচিত হয় নাই বা সেগুলি অনাবশ্যক এরূপ বলা সঙ্গত নহে। নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য আমরা যে আগ্রহ দেখাইতেছি এবং পন্থার যে আভাস দিতেছি, তাহাও সেইরূপ সর্ব্বানুমোদিত ও সর্ব্বজন-গ্রাহ্য বা সকলের কিংবা অনেকের দ্বারা অনুসৃত না হইতে পারে। আবালবৃদ্ধবনিতা কতক শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকেও যদি নিরক্ষরতা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাহাও সন্তোষের বিষয় হইবে, এবং সুফলপ্রদ হইবে।

ছোট বড়, পুরুষ নারী, প্রত্যেকেই চরখায় সুতা কাটিবে, মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অনুরোধ এই রূপ। কাজ তদনুসারে হয় নাই, কিন্তু তথাপি তিনি এই আদর্শটি ছাড়িয়া দেন নাই। সকলেই লিখনপঠনক্ষম হইবে, ইহা তাহা অপেক্ষা সংকীর্ণ বা কম আবশ্যক আদর্শ নহে। ইহা বাস্তবে পরিণত করিবার উপায় অবলম্বনও অসম্ভব নহে।

—

অরাজনৈতিক শিক্ষাসমিতি কেন চাই

নিরক্ষরতা দূর করিবার ভার অরাজনৈতিক কোন সমিতি বা প্রতিষ্ঠান লইলে ভাল হয় কেন বলিয়াছি, তাহার কিছু কারণ বলিতেছি। মানবজীবনের ও রাষ্ট্রীয় কার্য্যাবলীর কোন বিভাগই অন্য সব বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন নহে। রাষ্ট্রনীতির সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ নাই বলিলে ঠিক্ হইবে না—সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সামান্য পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলেও শ্রমবিভাগ আবশ্যক। দিয়াশলাইয়ের কাঠি যে-শ্রমিকেরা প্রস্তুত করে, তাহারাই উহার বাক্স, বাক্সের উপরকার প্রলেপ, বাক্সের উপরকার সচিত্র নামপত্র-মুদ্রণ প্রভৃতি করে না, এসব কাজ অন্য শ্রমিকরা করে। দেশের সরকারী কাজের বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিভাগ পৃথক্। তদ্রূপ, বেসরকারী লোকহিতপ্রচেষ্টাতেও শ্রমবিভাগ আবশ্যক। তাহাতে একনিষ্ঠ একাগ্র কর্ম্মী পাইবার

সুবিধা হয়, একাগ্রতা-প্রযুক্ত কাজও ভাল হয়। এই জন্য আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণের ভার অরাজনৈতিক কোন সমিতির লওয়ার পক্ষপাতী।

রাজনৈতিক প্রচেষ্টার উদ্দীপনা, উত্তেজনা ও উন্মাদনা সর্ব্বগ্রাসী হইয়া থাকে। এই জন্য তৎসংপৃক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলি অবহেলিত হয়। দু-একটি দৃষ্টান্ত লউন। বঙ্গবিভাগ-জনিত আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক "জাতীয়" শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে। বাঁচিয়া আছে কেবল সেই অতি অল্প কয়েকটি যাহার প্রধান কর্ম্মীরা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন হইতে আপনাদিগকে নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন। যেমন যাদবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানটি। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেও কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। সেগুলিও লুপ্ত হইয়াছে।

অবশ্য, কেবলমাত্র একনিষ্ঠ কর্ম্মীর অভাবেই যে এই সব প্রতিষ্ঠান লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রচেষ্টার সহিত তৎসমুদয়ের যোগ থাকায় গবর্ন্মেণ্ট সেগুলির প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, সুতরাং পুলিস তাহাদের পিছনে লাগিয়াই ছিল। তাহাদের শিক্ষক ও ছাত্রেরা পুলিসের অতিরিক্ত মনোযোগ বশতঃ তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে নাই। ইহাও বলা উচিত, তাহাদের শিক্ষক ও ছাত্রেরা রাজনৈতিক কর্ম্মে যোগ দেওয়ায় পুলিস তাহাদিগকে বিব্রত করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিল।

অবশ্য সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কোন সমিতি নিরক্ষরতা দূর করিবার কাজে লাগিলেই যে পুলিস ঘুমাইবে, সমিতির লোকদের চালচলনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না, এবং স্থানে স্থানে এই লোকদিগকে বিপন্ন হইতে হইবে না, এমন নয়। কর্ম্মীরা যাহাতে নির্বিঘ্নে ও একাগ্রতার সহিত কাজ করিতে পারেন, প্রথম হইতে যথাসাধ্য তাহার উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া আমরা অরাজনৈতিক শিক্ষাসমিতির প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছি। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিখিলভারতীয় "গ্রামসংগঠন" সমিতিকে যথাসাধ্য রাজনৈতিক প্রচেষ্টা হইতে স্বতন্ত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ইহা প্রকাশও করিয়াছেন, যে, কংগ্রেসের রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যাবলীর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই "গ্রামসংগঠন" সমিতির কর্ম্মীদিগকে তিনি রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ আন্দোলন ও কর্ম্মের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। তথাপি, ইহার সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্টের যে সার্কুলার বাহির হইয়াছে, তাহা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের গোচর হইয়াছে। সুতরাং কোন একটি সমিতিকে অরাজনৈতিক বলিলেই গবর্ন্মেণ্ট তাহাকে অরাজনৈতিক বলিয়া মানিয়া লইবেন, এরূপ বিশ্বাসে আমরা কিছু লিখি নাই।

সমগ্র বাংলা দেশের জন্য একটি বৃহৎ শিক্ষাসমিতি, এমন কি এক-একটি জেলার জন্যও এক-একটি শিক্ষাসমিতি স্থাপন করিতেই হইবে এমন নয়। প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে আলাদা আলাদা চেষ্টা হইলেই চলিবে। একাগ্র চেষ্টাই আবশ্যক, নামে কিছু আসিয়া যায় না। যদি বাংলা দেশে এমন একটি মাত্র গ্রাম দুই-এক বৎসরের মধ্যে দেখান যায় যাহার পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক প্রত্যেক পুরুষ ও নারী লিখন-পঠনক্ষম, তাহাও বিশেষ আশা ও উৎসাহের কারণ হইবে। আর কেহ না করুন, ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ গ্রামকে এইরূপ গ্রাম করিবার নিমিত্ত আগামী গ্রীষ্মাবকাশেই লাগিয়া যান।

—

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন ও বঙ্গের প্রতি অবিচার ও অবহেলা

দিনাজপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের আগামী অধিবেশনে, দেশের লোকেরা স্বাবলম্বন দ্বারা স্বয়ং লোকহিতকর যাহা করিতে পারেন, তদ্রূপ বিষয়সমূহের আলোচনার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ আগে করিয়াছি। সরকারী রাজস্ব আমাদেরই দেওয়া করের সমষ্টি। তাহা বিদেশ হইতে আগত বৈদেশিক ধন নহে। তাহা চাওয়া ভিক্ষা নহে। তথাপি, আত্মনির্ভর-পরায়ণতা ও তজ্জনিত কৃতিত্ব কেন আবশ্যক, তাহার আভাস আগে দিয়াছি।

প্রাদেশিক সম্মেলনে সেই সকল বিষয় ছাড়া অন্য কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করাও আবশ্যক। সরকারী যে-সকল আইনে ও ব্যবস্থায় সমগ্র ভারতের অসুবিধা ও

অনিষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইতে পারে, তাহার আলোচনা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে অবশ্য হওয়া উচিত। তবে প্রধানতঃ প্রাদেশিক বিষয়সকলের আলোচনার জন্যই প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই জন্য প্রাদেশিক বিষয়গুলিই আগামী সম্মেলনে বিশেষভাবে আলোচ্য।

আজ বলিয়া নয়, অনেক বৎসর আগে হইতে এরূপ অনেক আইন ও সরকারী ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে, যাহা বাংলা দেশের পক্ষে বিশেষ ভাবে অসুবিধাজনক ও অনিষ্টকর। এই সকল আইন ও ব্যবস্থার সমালোচনা ও প্রতিবাদ খবরের কাগজে যথাসময়ে হইয়াছে, এখনও হইতেছে। আমরাও প্রধান প্রধান অনেকগুলির সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়াছি। সংক্ষেপে কয়েকটির পুনরুল্লেখ করিতেছি।

—

রাজস্ব-বণ্টনে বঙ্গের প্রতি অবিচার

কোম্পানীর আমল হইতেই বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্ব বেশী পরিমাণে বঙ্গের বাহিরে ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে—বঙ্গের রাজস্ব ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাড়াইবার জন্য এবং অন্য কোন কোন প্রদেশের রাজস্বের ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে। বাংলা দেশ যখন ব্রিটিশ-শাসিত ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, তখন সমগ্রভারতীয় সরকারী ব্যয়ের একটা অংশ বাংলা দেশেরও নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। কিন্তু সেই অংশটা ন্যায্য হওয়া উচিত—এত বেশী হওয়া উচিত নয়, যাহাতে বঙ্গের ব্যয়ের জন্য টাকার অনটন ঘটে। বাস্তবিক কিন্তু তাহাই ঘটিয়াছে। ভারত-গবর্মেণ্ট বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের শতকরা যত টাকা লন, অন্য কোন প্রদেশের তত লন না। ফলে বঙ্গীয় রাজকোষে অনটন লাগিয়াই আছে। কোন্ প্রদেশে সংগৃহীত রাজস্বের শতকরা কত অংশ সেই প্রদেশকে প্রাদেশিক ব্যয়ের জন্য রাখিতে দেওয়া হয়, স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাহা তাঁহার একটি লেখায় কিছুদিন পূর্ব্বে দেখাইয়াছিলেন। তাহা অবলম্বন করিয়া নীচের তালিকাটি প্রস্তুত করা হইয়াছে।

প্রদেশ।	রাজস্বের প্রদেশে রক্ষিত অংশ।	ভারত-সরকারের গৃহীত অংশ।
বঙ্গদেশ	৩০.৩	৬৯.৭
আগ্রা-অযোধ্যা	৭৮.৪	২১.৬
মান্দ্রাজ	৬৯.৫	৩০.৫
বিহার-উড়িষ্যা	৯২.৮	৭.২
পঞ্জাব	৮৫.৯	১৪.১
বোম্বাই	৪০.৭	৫৯.৩
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৯০.১	৯.৯
আসাম	৮৫.৪	১৪.৬

বাংলা দেশ হইতে ভারত-সরকার শতকরা সকলের চেয়ে বেশী অংশ গ্রহণ করেন, এবং সকলের চেয়ে কম অংশ ইহাকে রাখিতে দেন। বাংলা দেশ হইতে শতকরা অংশই (পার্সেণ্টেজই) যে বেশী লন তাহা নহে। রেলওয়ে বাণিজ্য-শুল্ক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রাজস্বের সমষ্টি বাংলা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংগৃহীত হয়। তাহার সর্ব্বাধিক অংশ লওয়া হয় বাংলা দেশ হইতে। তাহার অর্থ, বাংলা দেশ ভারত-সাম্রাজ্যের ব্যয়ের জন্য যত টাকা দেয়, অন্য কোন প্রদেশ তত দেয় না। দিবার বেলায় বাংলা দেয় সকলের চেয়ে বেশী টাকা, কিন্তু সুবিধা পাইবার বেলা বাংলা পায় সকলের চেয়ে কম সুবিধা। তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দিব।

—

সামরিক ব্যয় ও বাংলা দেশ

ভারত-সরকার যত বিভাগে যত খরচ করেন, তাহার মধ্যে সামরিক ব্যয় সকলের চেয়ে বেশী। আগে বলিয়াছি, বাংলা দেশ ভারত-গবর্মেণ্টকে সকলের চেয়ে বেশী টাকা দেয়। সুতরাং সামরিক ব্যয় বৎসর বৎসর যত কোটি টাকা হয়, তাহারও সকলের চেয়ে বড় ভাগ বাংলা দেশ দিয়া থাকে। কিন্তু বাংলা দেশের লোকেরা এই খরচের কোন অংশ পায় না। বাংলা দেশ হইতে সিপাহী এবং সিপাহীদের অনুচর সংগৃহীত হয় না, সুতরাং সিপাহীদের ও তাহাদের অনুচরদের বেতন ও ভাতা বাবতে যত ব্যয় হয়, তাহার কোন অংশ বাংলা দেশে আসে না। সিপাহী

ও অনুচরদের রসদ বাংলা দেশ হইতে ক্রীত হয় না, সিপাহীদের তাম্বু প্রভৃতিও বাংলা দেশ হইতে ক্রীত হয় না। সুতরাং এই সব জিনিষের মূল্যের কোন অংশ বাংলা দেশ পায় না। সামরিক সব ব্যয় সিপাহী ও তাহাদের অনুচর, যুদ্ধের সরঞ্জাম, রসদ প্রভৃতির জন্য নহে। সৈনিক বিভাগের জন্য বিস্তর কেরানী, হিসাবরক্ষক, হিসাবপরীক্ষক, কারিগর, রসদ-সংগ্রাহক, নানা বৈজ্ঞানিক কর্ম্মচারী প্রভৃতির দরকার হয়। বাঙালীদিগের মধ্য হইতে সিপাহী আদি লওয়া হয় না বলিয়া ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ঐ সকল অযোদ্ধা কর্ম্মচারী বাঙালীদের মধ্য হইতে বেশী সংখ্যায় লইলে ন্যায়সঙ্গত হয়। কিন্তু তাহা লওয়া হয় না। সচরাচর বলা হয় বটে, যে, বাঙালীরা যোদ্ধার কাজের অনুপযুক্ত। কিন্তু বাছিয়া লইলে বাঙালীদের মধ্য হইতে বিস্তর যুদ্ধক্ষম লোক পাওয়া যায়। যাহা হউক, বাঙালী যুদ্ধনিপুণ হইতেই পারে না, যদি এই মিথ্যা কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও একথা ত কেহ বলিতে পারে না, যে, বাঙালী কেরানী, হিসাবরক্ষক, হিসাবপরীক্ষক, কারিগর, রসদসংগ্রাহক এবং নানা রকমের বৈজ্ঞানিকের কাজ করিতে পারে না। অথচ সৈনিক বিভাগে এই সকল কাজেও, বাঙালী অল্পসংখ্যক লইলেও, বেশী লওয়া হয় না।

—

জলসেচনের জন্য খাল বঙ্গে অতি অল্প

বাংলা দেশে যে জলসেচনের জন্য নানাবিধ পূর্ত্তকার্য্য ও খালের দরকার আছে, তাহা আগে কার্য্যতঃ অস্বীকৃত হইয়া থাকিলেও এ-বৎসর মুখে ও কাগজপত্রে সরকারী লোকেরা তাহা স্বীকার করিতেছেন। বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চল সকলের উন্নতিবিধান করিবার এবং ভরাট বা স্রোতহীন নদী-সকলকে স্রোতস্বিনী করিবার চেষ্টা করা হইবে বলা হইতেছে। তদর্থে বঙ্গে ডিভেলপমেণ্ট বিল নামক একটা আইনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন বুঝাইবার নিমিত্ত বঙ্গের ডিভেলপমেণ্ট কমিশনার মিঃ টাউনেণ্ড একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গে কৃষিকার্য্যের জন্য যে ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের প্রয়োজন আছে, তাহা তিনি বার-বার স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রয়োজন নূতন নহে—বরাবরই ছিল। অথচ গবন্মেণ্ট জলসেচনের জন্য খাল অন্য কোন কোন প্রদেশে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে করিয়া থাকিলেও বঙ্গে তুলনায় অতি সামান্য ব্যয় করিয়াছেন। এই বিষয়ে নানা সাংখ্যিক তথ্য (ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্) আমরা একাধিক বার প্রবাসীতে মুদ্রিত করিয়াছি। তথাপি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এতদর্থে ব্যয়িত থোক টাকার পরিমাণটা আবার নীচে মুদ্রিত করিতেছি। এই মোট ব্যয় ১৯৩১-৩২ সাল পর্য্যন্ত। তাহার পরবর্ত্তী বৎসরসমূহের সকল প্রদেশের এতদর্থে ব্যয় এখনও কোন সরকারী রিপোর্টে ছাপা হয় নাই।

প্রদেশ	জলসেচন-খালের জন্য ব্যয়িত টাকা।			
মান্দ্রাজ	১৩,	৪২,	৭০,	৭০০
বোম্বাই	২২,	৯৬,	৪৪,	৪১০
বাংলা		৮৭,	৮৭,	৩৯৫
আগ্রা-অযোধ্যা	২২,	২৭,	৩১,	৫১৮
পঞ্জাব	৩৩,	১৭,	৭০,	৭২৩

অন্য কোন কোন প্রদেশে তেত্রিশ, বাইশ ও তের কোটির উপর টাকা খরচ হইয়াছে। বঙ্গে এক কোটিও হয় নাই। কেহ কেহ যদি এমন অনুমান করেন, যে, গবর্ন্মেণ্ট আগে বঙ্গদেশকে অবহেলা করিয়া থাকিলেও পরে সম্প্রতি হয়ত এখানে জলসেচন-খালের জন্য বহু কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন, তবে বলি, সে অনুমানও সত্য নহে। ১৯৩১-৩২ পর্য্যন্ত কেজো জলসেচন-খালের জন্য গবর্ন্মেণ্ট বঙ্গদেশে মোট ৮৭,৮৭,৩৯৫ টাকা খরচ করেন। গত ১৩ই মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরীর প্রশ্নের সরকারী উত্তরে জানা যায়, যে, এতদর্থে ১৯৩২-৩৩ সালে সরকার ১৩,২৯,৪০১ টাকা এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে ৯,০৩,০০৩ টাকা খরচ করিয়াছেন। সুতরাং ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গে জলসেচন-খালের জন্য সরকারী ব্যয় মোট ১,১০,১৯,৭৯৯। উপরে উল্লিখিত অন্য প্রদেশগুলির তুলনায় ইহা নগণ্য।

আমরা কেবল "কেজো" অর্থাৎ উৎপাদক (প্রোডাক্টিভ) খালগুলিরই ব্যয় ধরিয়াছি, অনুৎপাদক (আন্‌প্রোডাক্টিভ্) অর্থাৎ অকেজো খালের জন্য বঙ্গে আরও ৮৪,৯২,০৫৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তাহা অপব্যয়। কিন্তু তাহা ধরিলেও বঙ্গে মোট ব্যয় উল্লিখিত প্রদেশগুলির কাছেও পৌঁছায় না।

আরও অনেক বিভাগে বঙ্গের প্রতি অবিচার ও অবহেলার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমরা আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। তাহা শিক্ষাসম্বন্ধীয়।

—

বঙ্গে ও অন্যান্য প্রদেশে সরকারী শিক্ষাব্যয়

বর্ত্তমান ১৯৩৫ সালে ১৯৩২-৩৩ সালের ভারতবর্ষের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। ইহাই আধুনিকতম সমগ্রব্রিটিশভারতীয় শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট। কোন্ প্রদেশে শিক্ষার জন্য গবন্মেণ্ট ১৯৩২-৩৩ সালে কত ব্যয় করিয়াছেন, তাহা ঐ রিপোর্ট হইতে সংকলন করিয়া দিতেছি।

প্রদেশ।	লোকসংখ্যা।	সরকারী শিক্ষাব্যয়।
মান্দ্রাজ	৪৬,৭৪০,১০৭	২,৪৪,৪৪,৩৮৯
বোম্বাই	২১,৯৩০,৬০১	১,৬৯,৫০,৬৬১
বাংলা	৫০,১১৪,০০২	১,৩৫,২১,৪৩৩
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৮,৪০৮,৭৬৩	১,৯৯,৪৮,৫৮৯
পঞ্জাব	২৩,৫৮০,৮৫২	১,৫৪,৪৯,৪০৭
বিহার-উড়িষ্যা	৩৭,৬৭৭,৫৭৬	৫১,৭২,৩১৪
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১৫,৫০৭,৭২৩	৪২,২৩,৫৩৮
আসাম	৮,৬২২,২৫১	২৭,৮৭,৫৪৯
উত্তম-পশ্চিম সীমান্ত	২,৪২৫,০৭৬	১৮,৭৫,৯৩৪

বঙ্গের লোকসংখ্যা অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী। কিন্তু বঙ্গে সরকারী শিক্ষাব্যয় মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাবের চেয়ে কম। বঙ্গে শিক্ষাব্যয় সম্বন্ধে সরকারী কৃপণতা নূতন নহে। আগেও এইরূপ ছিল। আগেও বাঙালীরা নিজে গবন্মেণ্টের চেয়ে বেশী টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছে, এখনও করিতেছে। অন্যান্য প্রদেশে সরকার বেশী টাকা দেন, প্রদেশের লোকেরা কম খরচ করে।

অতএব অন্যান্য বিভাগে যেমন, তেমনি শিক্ষা-বিভাগেও বাঙালী সরকারের নিকট হইতে সুবিধা পায় কম, যদিও বঙ্গদেশ হইতে রাজস্ব আদায় অন্য প্রত্যেক প্রদেশ অপেক্ষা অধিক হয়। গবন্মেণ্ট কোন্ প্রদেশে মোট শিক্ষা-ব্যয়ের শতকরা কত অংশ দেন তাহাও জানা ভাল। প্রদেশ অনুসারে তাহা এইরূপ—

প্রদেশ।	শতকরা অংশ।	প্রদেশ।	শত করা অংশ।
মান্দ্রাজ	৪৫·৯৮	আসাম	৫৭·০
বোম্বাই	৪৮·৪	উ-প সী	৬৮·৯
বাংলা	৩২·৪	কূর্গ	৫৪·৯১
আগ্রা-অযোধ্যা	৫৩·৭	দিল্লী	৪১·৩
পঞ্জাব	৫১·৪০	আজমের-মেরোয়ারা	৪৫·৭৩
বিহার-উড়িষ্যা	৩০·৯৬	বালুচীস্থান	৫৫·৯২
মধ্যপ্র.-বেরার	৪৩·১৩	বাঙ্গালোর	৩৬·৫

দেখা যাইতেছে, কেবল বিহার-উড়িষ্যা ছাড়া আর সব প্রদেশে গবন্মেণ্ট মোট শিক্ষাব্যয়ের অংশ বঙ্গদেশ অপেক্ষা বেশী দিয়া থাকেন। অনেকটা তাহারই ফলে বড় প্রদেশ-গুলির মধ্যে শিক্ষারবিস্তারে বাংলা দেশ মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৩ সালে মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও বঙ্গে লোকসমষ্টির যথাক্রমে শতকরা ৬.২, ৬.১, ও ৫.৭ জন শিক্ষা লাভ করিতেছিল।

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ভারতীয় মহাজাতি যতটুকু গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সংহতি লাভে বিশেষ বাধাজনক হইবে। ইহা মহাজাতিটিকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করিয়াছে, প্রত্যেককে সমভাবে অধিকার দেয় নাই, এবং তদ্দ্বারা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যাদ্বেষ জন্মাইবার বা বাড়াইবার কারণ হইয়াছে। সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পাধিক মনোমালিন্য অসদ্ভাব ঝগড়া বিবাদ আছে। সেই সেই দেশের হিতকামীরা অমিলের এই সব কারণ কমাইয়া মিল বাড়াইবার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা তাহা না করিয়া, বরং অমিলের কারণগুলাকে স্থায়িত্ব দিয়া সেগুলাকে প্রবলতর ও উগ্রতর করিবে। কোন দেশের মহাজাতির উন্নতি নির্ভর করে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের ও শ্রেণীর পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর—এই বিশ্বাসজাত কার্য্যের উপর, যে, প্রত্যেকের স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গল অপর সকলের স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের সহিত জড়িত। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এই মিথ্যা কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, যে, প্রত্যেক সম্প্রদায় ও শ্রেণীর স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গল অপরের স্বার্থের ও

মঙ্গলামঙ্গলের উপর নির্ভর ত করেই না, বরং প্রত্যেকের স্বার্থ অন্যের স্বার্থের বিরোধী। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার গতি সর্ব্বত্র সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের সহানুভূতি ও হিতৈষণা হইতে বঞ্চিত করিবার দিকেই হইবে, এবং সকল ভারতীয় সম্প্রদায়কে বিদেশী ইংরেজদের অনুগ্রহজীবী করিবার অভিমুখে হইবে।

এবম্বিধ নানা কারণে এই বাঁটোয়ারা ভারতীয় মহাজাতির পক্ষে মহা অনিষ্টকর। বঙ্গের অধিবাসীরা এই মহাজাতির অন্তর্গত বলিয়া দিনাজপুরের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনকে এই দিক দিয়া ইহার বিচার করিতে হইবে।

এই বাঁটোয়ারার আলোচনা আমরা ইহার প্রকাশের পর হইতেই মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে করিয়াছি। গত অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারতীয় সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা-বিরোধী কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে আমি যে অভিভাষণ পাঠ করি, তাহাতে আমার আলোচনার সার সংকলিত আছে। এই অভিভাষণ মডার্ণ রিভিয়ুর গত নবেম্বর সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

বাঁটোয়ারাটা সকলের পক্ষে, সমষ্টির পক্ষে অনিষ্টকর। মহাজাতির এক একটি অংশ ধরিলে অবশ্য হিন্দুদের, বিশেষতঃ বঙ্গের হিন্দুদের, প্রতিই ইহাতে বেশী অবিচার করা হইয়াছে। তাহা সুবিদিত বলিয়া তাহার বিস্তারিত বর্ণনা এখন আর আবশ্যক নহে। কিন্তু ইহা মুসলমানদের পক্ষেও অনিষ্টকর। কারণ, ইহা মুসলমানদিগকে কেবল মুসলমানকেই ভোট দিতে বাধ্য করিবে, যোগ্যতর ও অধিকতর দেশহিতকামী ও অধিকতর দেশহিতসাধনদক্ষ অমুসলমানকে ভোট না-দিতে বাধ্য করিবে, হিন্দুদের সহানুভূতি ও হিতৈষণা হইতে তাহাদিগকে বহুপরিমাণে বঞ্চিত করিবে, এবং বৈদেশিক ইংরেজদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ও অনুগ্রহজীবী করিবে। বঙ্গের মুসলমানদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় ইহা নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি আসন দিয়াছে। তাহা কিন্তু তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী নহে। অবাধ প্রতিযোগিতায় অচিরে বা কিছু কাল পরে তাহাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বেশী আসন পাওয়া অসম্ভব হইত না। বাঁটোয়ারাটা তাহা অসম্ভব করিয়াছে।

এবম্বিধ নানা কারণে সম্মেলনের দিনাজপুর অধিবেশনে সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতিনিধিদের বাঁটোয়ারাটার বিরোধিতা করা আবশ্যক।

—

বঙ্গদেশকে খণ্ডীকরণ

ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে এবং তাহার পূর্ব্বে নবাবী আমলেও, যে ভূখণ্ডের লোকেরা বাংলায় কথা বলে তাহা একই প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। বাংলাকে বিশেষ ভাবে খণ্ডীকৃত করা হয় লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ ব্যবস্থায়। তাহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হওয়ায় বঙ্গখণ্ডীকরণের সেই ব্যবস্থা রহিত হয়, কিন্তু যে-সব জেলা ও মহকুমার স্থায়ী অধিবাসীদের প্রধান ভাষা বাংলা সেগুলিকে একসঙ্গে রাখিয়া একটি অখণ্ড বাংলা প্রদেশ গঠিত হয় নাই, বরং নূতন রকমের বঙ্গবিভাগ হয়। তাহার ফলে বাংলার সীমান্তর্ভূত কয়েকটি জেলা ও মহকুমাকে বঙ্গপ্রদেশের বাহিরে ফেলা হইয়াছে। প্রদেশগুলির সীমা নির্দ্ধারণ জন্য আবার অনুসন্ধানাদি হইবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের এইরূপ একটি আশ্বাসবাণী ছিল, সাইমন কমিশনও সেইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সিন্ধুদেশকে আলাদা করা হইতেছে, বঙ্গের ঠিক্ সীমানির্দ্দেশ করিয়া সকল বাঙালীর পৈত্রিক বাসভূমিকে একপ্রদেশভুক্ত করিয়া অখণ্ড বঙ্গ প্রদেশ গড়িবার চেষ্টা করা হইতেছে না। এই বিষয়টির প্রতি বাঙালীদের মন দেওয়া আবশ্যক।

যাহারা এক ভাষায় কথা বলে তাহারা এক রাষ্ট্রে থাকিলে তাহাতে তাহাদের ও তাহাদের রাষ্ট্রের শক্তি ও প্রভাব বাড়ে। রাষ্ট্রটি যদি স্বাধীন হয়, তাহা হইলে এই শক্তি ও প্রভাব রাষ্ট্রের লোকেরা খুব বাঞ্ছনীয় মনে করে। তাহাতে তাহাদের আর্থিক, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিগত সুবিধাও হয়। একভাষাভাষীদের ভূখণ্ড যদি স্বাধীন না হয়, কিংবা উহা যদি রাষ্ট্র না-হইয়া উপরাষ্ট্র হয়, তাহা হইলেও, ঐরূপ শক্তি ও প্রভাব এবং উল্লিখিত রূপ আর্থিক সাহিত্যিক সংস্কৃতি বিষয়ক সুবিধা কম বাঞ্ছনীয় হয় না।

এই সব কারণে আমরা অখণ্ড বাংলা চাই।

পাঠকেরা জানেন, জার্মেনীর জার্ম্যানরা যে সার

প্রদেশের জার্মানদের সঙ্গে এক হইবার জন্য সফল চেষ্টা করিয়াছে এবং ফরাসীরা যে সে-চেষ্টার বিরোধিতা করিয়াছে, তাহার মূলে আছে উপরে বর্ণিত কারণসমূহ। ডান্‌জিগ্‌ লইয়া যে জার্মেনী ও পোল্যাণ্ডে মতভেদ হইয়াছে তাহারও মূলে উহা আছে। জার্মানভাষাভাষী অনেক লোক আছে, যাহারা জার্মানভাষী অষ্ট্রিয়ার সহিত জার্মেনীর একরাষ্ট্রীভবন চায়। ফ্রান্স তাহার বিরোধী, এবং সম্ভবতঃ ইউরোপের আরও কোন কোন জাতি তাহার বিরোধী। এসব সমস্যা ও প্রশ্নের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, আমরাও মানুষ বলিয়া কেবল গৌণ দূর সম্পর্ক মাত্র আছে। তবে যে এগুলির উল্লেখ করিলাম, তাহা আমাদের বক্তব্য বুঝাইবার নিমিত্ত। কারণ, যদিও ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র নহে, বাংলা দেশও স্বাধীন উপরাষ্ট্র নহে, তথাপি ভবিষ্যতে অল্প বা অধিক যতটুকু ক্ষমতা ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের ("ফেডারেটেড ইণ্ডিয়া"র) হাতে আসিবে, তাহাতে অন্যান্য উপরাষ্ট্রের মত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের প্রতিনিধিদের সংখ্যা ও যোগ্যতার উপর বঙ্গের উন্নতি অবনতি কতকটা নির্ভর করিবে। উপরাষ্ট্র বঙ্গ যত বড় হইবে ও তাহার প্রতিনিধির সংখ্যা যত অধিক হইবে, বাঙালীদের শক্তি ও প্রভাব তত বেশী হইবার সম্ভাবনা। অতএব, ব্রিটিশ-শাসিত বাংলাকে বড় করার দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকা অসঙ্গত ও অন্যায় নয়।

এ বিষয়ে গত চৈত্রের প্রবাসীতে ৮৮৬—৮৮৭ পৃষ্ঠায় "বাঙালীর প্রভাব হ্রাস" প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি, তাহা দ্রষ্টব্য। "বিহারে বাঙালী" প্রসঙ্গে আরও কিছু বলিব।

—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের প্রতিনিধির সংখ্যা

উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে ইহা সহজে অনুমেয়, যে, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের ন্যায্য-সংখ্যক প্রতিনিধি থাকা উচিত। যে গবর্মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া আইন অনুসারে বর্ত্তমান সমগ্রভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি গঠিত, তাহাতে বাংলা দেশের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। লোকসংখ্যা অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের যত প্রতিনিধি পাওয়া উচিত, বাংলাকে তত দেওয়া হয় নাই। সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, এবং বাণিজ্যের পরিমাণেও বাংলা অন্য কোন প্রদেশের নীচে নয়। ইহারও প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পও আছে।

অন্যূন আট বৎসর পূর্ব্বেও কয়েক বার ইংরেজী ও বাংলায় আমরা বঙ্গের প্রতি এই অবিচার স্পষ্টীকৃত করিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙালী সংবাদপত্রসম্পাদকদিগের ও জনসাধারণের এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই নাই। বাঙালীরা কয়েক বৎসর ধরিয়া এই অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলে কোন ফল হইত কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু আন্দোলন করা উচিত ছিল, ইহা বলিতে পারি।

এখন পার্লেমেণ্টে যে ভারতশাসন আইনের খসড়ার আলোচনা হইতেছে ও যাহার অধিকাংশ ধারা সম্বন্ধে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, সেই বিলের তপশীল অনুসারে ভারতের ভাবী ব্যবস্থাপক সভার দুটি কক্ষে বাংলা দেশের জন্য যে কয়টি আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। আমরা আমাদের ইংরেজী ও বাংলা মাসিক পত্রে তাহা আগেই দেখাইয়াছি। কিন্তু এবারেও বঙ্গীয় সাংবাদিকদিগের এবং জনসাধারণের এদিকে দৃষ্টি এখনও পড়ে নাই। তথাপি, জনসাধারণকে এবং প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের দিনাজপুর অধিবেশনে প্রতিনিধি ও অন্য যাঁহারা সমবেত হইবেন, তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, ভবিষ্যৎ ফেডারাল য়্যাসেম্ব্লীতে বঙ্গের ৪৮ (আটচল্লিশ)টি আসন পাওনা হয়, তাহাকে দেওয়া হইয়াছে ৩৭ (সাঁইত্রিশ)টি, এবং কৌন্সিল অব্ ষ্টেটে পাওনা হয় ত্রিশটি আসন, কিন্তু তাহাকে দেওয়া হইয়াছে কুড়িটি।

—

ভবিষ্যৎ ভারতশাসন আইন

পার্লেমেণ্টে যে ভবিষ্যৎ ভারতশাসন আইনের খসড়া বিবেচিত ও বিধিবদ্ধ হইতেছে, তাহার প্রবল প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক—তাহাতে আশু কোন ফল হইবে না জানা থাকিলেও প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। এই আইনটার সব দোষ উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে একখানা বড় বহি লিখিতে হয়। পার্লেমেণ্টে ভারতসচিব স্যর সামুয়েল হোর

বলিয়াছেন, ভারতবর্ষকে পরিণামে ডোমীনিয়ন করা হইবে বলিয়া আগে আগে যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল তাহা অপরিবর্ত্তিত ও অক্ষুণ্ণ আছে। মৌখিক আশ্বাসটা আবার আওড়ান হইল বটে; কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের যে কন্সটিটিউশ্যন আছে তাহা যদি বা কালক্রমে ডোমীনিয়নত্বে পরিণত হইতে পারিত, নূতন যে আইন হইতেছে তাহা সে পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিতেছে।

ভারত গবন্মেণ্ট বিলের ১০৮ ও ১১০ ধারা সম্বন্ধে গত মার্চ্চ মাসে যখন পার্লেমেণ্টে তর্কবিতর্ক হয়, তখন সেই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের প্রতি অত্যন্ত সদয় কোন সভ্য বলেন, যে, ভারতবর্ষ এই আইন দ্বারা ডোমীনিয়নগুলির চেয়ে বেশী ক্ষমতা পাইতেছে! তাহার প্রতিবাদ করিয়া বিলাতের এটর্ণী-জেনার্যাল স্যর টমাস ইন্সকিপ বলেন, "কোন ডোমীনিয়নের সম্বন্ধে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে আইন প্রণয়ন করা বহু বৎসর হইতে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের পক্ষে কন্সটিটিউশ্যন-বিরুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের পক্ষে ভারতের জন্য আইন প্রণয়ন করা কেবল যে বৈধ ও কন্সটিটিউশ্যনসম্মত হইবে তাহা নহে, বস্তুতঃ পার্লেমেণ্টের জন্য এরূপ ক্ষমতা স্পষ্টতঃ রক্ষিত হইয়াছে এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কোন ডোমীনিয়নের ব্যবস্থাপক সভার মত স্বাধীন হইবে না।" নূতন ভারতশাসন আইনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা পার্লেমেণ্টে পাস করা কোন ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় আইন নাকচ করিতে বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না অর্থাৎ ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের ইচ্ছা যে ভারতবর্ষকে চিরকালই শাসনবিধির কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের দ্বারস্থ হইতে হইবে। ইহা অতি চমৎকার ডোমীনিয়ন ষ্টেটস্!

আমরা চৈত্রের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি, ভারতবর্ষের বড়লাট এবং অন্য লাটেরা স্বাধীন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান নৃপতিগণের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা পাইবেন!

ইহা সুবিদিত, যে, নূতন আইন অনুসারে ভারতবর্ষের রাজস্বের শতকরা আশী অংশের উপর ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের কোন হাতই থাকিবে না, সামরিক-বিভাগ, পররাষ্ট্র-বিভাগ, মুদ্রা, বিনিময় প্রভৃতির উপর কর্তৃত্ব থাকিবে না, ভারতীয় পণ্যশিল্প বাণিজ্য ও যানবাহনের উন্নতি করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইবে—না-থাকার সমান হইবে, মন্ত্রীরা সিবিলিয়ানদের হাতের পুতুল হইবেন, সিবিলিয়ানরা মন্ত্রীদিগকে ডিঙাইয়া গবর্ণরের কাছে গিয়া খবর দিতে ও সলাপরামর্শ করিতে পারিবে, পুলিস মন্ত্রীদিগকে সব খবর জানাইতে বাধ্য থাকিবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। দেশী রাজ্যের রাজাদিগকে যেরূপ অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং হিন্দুরা ভারতবর্ষে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইলেও তাহাদিগকে যে অর্দ্ধেকেরও কম আসন ব্যবস্থাপক সভায় দেওয়া হইয়াছে, ইত্যাদি নূতন ভারতশাসন আইনের চমৎকারিত্ব বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে।

অন্ততঃ এক জন কেহ ইণ্ডিয়া বিলটি আদ্যোপান্ত পড়িয়া এবং এ-পর্য্যন্ত উহার যতগুলি ধারা গৃহীত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বক্তৃতাদি পড়িয়া দিনাজপুর সম্মেলনে একটি বক্তৃতা করিলে ভাল হয়। অবশ্য তাহাতে আইনের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না—কেবল শ্রোতৃবর্গের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে। পার্লেমেণ্টের আলোচনায় এই বিলটি ভারতবর্ষের পক্ষে ক্রমশঃ অধিকতর অনিষ্টকর ও শৃঙ্খলবৎ হইতেছে।

—

বিনা-বিচারে বন্দীদের মুক্তির চেষ্টা

বিনা বিচারে যে কয়েক হাজার বাঙালীর স্বাধীনতা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য লুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন, খবরের কাগজে আন্দোলন ইত্যাদি বরাবরই হইয়া আসিতেছে। তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। সাধারণ ভাবে মুক্তি তখন হইবে, যখন গবন্মেণ্ট বুঝিবেন, বিদ্রোহের ইচ্ছা ভারতবাসীর হৃদয় হইতে লোপ পাইয়াছে। গবন্মেণ্টের কখনও এরূপ উপলব্ধি হইবে কিনা, তাহা গবন্মেণ্টনামধেয় ব্যক্তিরাও বোধ করি জানেন না। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ যত দিন ইংরেজের প্রভুত্বের অধীন থাকিবে, তত দিনই শাসকদের মনে এই সন্দেহ থাকিবে, যে, শাসিতেরা বিদ্রোহচিন্তা করিতে পারে। কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যই নিজের মনের গতি অনুসারে অন্যদের মনের গতি অনুমান করিয়া লইয়া থাকে।

প্রাচীন কাল হইতে একটা রীতি চলিত আছে, যে, কোন রাজা সিংহাসন আরোহণ করিলে বা তাঁহার অভিষেক-বৎসরের স্মারক কোন উৎসব হইলে তখন

বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেই জন্য অনেকে আশা করিয়াছিলেন, যে, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের আগামী রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে বিনাবিচারে বন্দীদের মুক্তি হইবে। কিন্তু ভারতীয় ও বঙ্গীয় উভয় ব্যবস্থাপক সভাতেই প্রশ্নের সরকারী উত্তর হইতে জানা গিয়াছে, যে, সাধারণ ভাবে তাহাদের মুক্তি হইবে না, এক এক জনের বিষয় বিবেচনা করিয়া কচিৎ কাহাকেও মুক্তিদান নিরাপদ বিবেচিত হইলে বরাবর যেমন এক-আধ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়া আসিতেছে, পরেও তাহাই হইবে।

অন্য দিকে নূতন নূতন যুবাবয়স্ক লোকদিগকে ধরিয়া বিনা বিচারে আটক করা হইতেছে। অদ্য ২৭শে চৈত্রও একটি ছাত্রের এই প্রকারে স্বাধীনতা লোপের সংবাদ পাইলাম।

এই প্রকারে বন্দীকরণের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কতবার যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা লিখিয়া রাখি নাই। অন্য সম্পাদকেরাও তাহা করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরাও সেইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সরকারী উত্তর প্রায় একই প্রকার বরাবর হইয়া আসিতেছে। তাহারই প্রতিধ্বনি মধ্যে মধ্যে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের মত কাগজে পাওয়া যায়। এই কাগজে অল্প দিন আগেও লেখা হইয়াছে, যে, বিনা বিচারে কাহাকেও বন্দী করা হয় বলা ভুল, তাহাদের বিচার জজেরা করিয়া থাকে। কিন্তু রুদ্ধদ্বার কক্ষে সে কি প্রকার বিচার যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত প্রমাণ পরীক্ষা করিতে বা উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টারের দ্বারা পরীক্ষা করাইতে পারে না, তাহার বিরুদ্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাদিগকে জেরা করিতে বা করাইতে পারে না, তাহার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত প্রমাণ খণ্ডনার্থ আত্মপক্ষসমর্থক সাক্ষী ও প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারে না, এবং জজদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারে না? ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে লেখা হইয়াছে, অন্তরীন বা নজরবন্দী সকলের বিরুদ্ধেই যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রমাণ থাকিলেও আদালতে তাহাদের প্রকাশ্য বিচার কেন হয় না তাহার কারণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অতীব হাস্যকর। প্রাণভয়ে নাকি কোন সাক্ষী তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে চায় না! অথচ প্রকাশ্য আদালতের বিচারে কত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আদি অভিযোগে কত বিপ্লবীর কঠোর শাস্তি কত বার হইয়া গেল। কই সেগুলার কোন সাক্ষীকে ত কেহ খুন করে নাই, করিবার চেষ্টাও করে নাই। এখনও সেরূপ মোকদ্দমা কয়েকটা চলিতেছে, এবং সেরূপ নূতন মোকদ্দমার উদ্যোগ চলিতেছে। কবে কখন দু-একটা এরূপ মোকদ্দমার সাক্ষী খুন-জখম হইয়াছিল বলিয়া ত ঐ সব মোকদ্দমা করিতে পুলিস নিবৃত্ত হয় নাই।

—

যক্ষ্মাচিকিৎসালয়ের জন্য দান

বঙ্গে যক্ষ্মা রোগ খুব বেশী বাড়িতেছে। এই জন্য এখানে একাধিক যক্ষ্মাচিকিৎসালয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শেঠ রামকুমার বাঙ্গা কালিম্পঙে এইরূপ একটি চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য দুই লক্ষ বিরাশী হাজার টাকা দান করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

—

বাঁকুড়া সম্মিলনীর হাঁসপাতাল বিস্তার

বাঁকুড়ায় বাঁকুড়া সম্মিলনীর একটি মেডিক্যাল স্কুল আছে। তাহা ষ্টেট্ মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির অনুমোদিত। স্বর্গীয় নফরচন্দ্র কোলে মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভূতনাথ কোলে ও তাঁহার সহোদর ঐ স্কুলের হাসপাতালে অস্ত্রচিকিৎসা-বিভাগে শয্যার সংখ্যা বাড়াইবার জন্য বহু সহস্র টাকা দান করায় সেই টাকায় নূতন বাড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। বঙ্গের গবর্ণর তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আসিয়াছেন। ইহার ছবি অন্যত্র প্রকাশিত হইল। কোলে মহাশয়েরা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন। বঙ্গের সর্ব্বত্র সমুদয় চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে রোগীদের চিকিৎসার স্থান এইরূপে বৃদ্ধি পাইলে প্রভূত মঙ্গল হইবে।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলে পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে জমী ও অট্টালিকা আদি দান করিয়াছিলেন—বস্তুতঃ যাহা না দিলে বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইতে পারিত না, তাহার উপর আরও দান করিয়াছেন। বাঁকুড়ার এই বিদ্যালয়ে বঙ্গের সব জেলা হইতে ছাত্রেরা আসিয়া শিক্ষালাভ করে। মুখোপাধ্যায়

মহাশয় শুধু বাঁকুড়ার নয় সব জেলারই উপকার করিয়া সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

—

জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বিদ্যালয়

জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বিদ্যালয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আপাততঃ প্রাথমিক পরীক্ষা পর্য্যন্ত "অঙ্গীভূত" (য়্যাফিলিয়েটেড্) করিয়াছেন, ইহা সুসংবাদ। বঙ্গে সুশিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন যত আছে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা শিখাইবার বিদ্যালয় তত নাই। এইরূপ বিদ্যালয় আরও বাড়া আবশ্যক। আশা করি, এই বিদ্যালয়টি যথাসময়ে উচ্চতম পরীক্ষা পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইবে।

—

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের দান

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পালি, সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়াছেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষের নামে অনূদিত পুস্তকগুলির নাম "ঈশান অনুবাদমালা" রাখা হইবে। ঈশানবাবু নিজে অনেক বৎসর পরিশ্রম করিয়া পালি হইতে সমুদয় বৌদ্ধ জাতক অনুবাদ করিয়াছেন এবং নিজের ব্যয়ে তাহা প্রকাশও করিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠকবর্গ তাঁহার এই কীর্ত্তির যথেষ্ট কার্য্যগত সম্মান না-করিয়া থাকিলেও ইহার গৌরব স্বীকার বিদ্বজ্জনমাত্রেই করিবেন। তাঁহার পুত্র এইরূপ অন্যবিধ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের সহায় হইয়া যথাযোগ্য কাজ করিলেন।

ঈশানবাবুর জাতকমালার অনুবাদ যখন বাহির হয়, তখন আমরা লিখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়, যে, জাতকগুলি গল্পপড়ার আনন্দ দেয়, অধিকন্তু তাহা হইতে উপদেশ পাওয়া যায় এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস রচনার উপকরণও তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই বহিগুলি অন্ততঃ সমুদয় কলেজ লাইব্রেরীতে, বড় বড় স্কুলের লাইব্রেরীতে এবং বঙ্গের সমুদয় শহরের ও বৃহৎ গ্রামের সর্ব্বসাধারণ-ব্যবহার্য্য লাইব্রেরীতে রাখা উচিত।

—

বঙ্গের ও আগ্রা-অযোধ্যার ব্যবস্থাপক সভা

একটি-একটি করিয়া বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় নূতন ট্যাক্স বসাইবার সব আইনগুলিই পাস হইয়া গেল। আগ্রা-অযোধ্যার ব্যবস্থাপক সভাতেও আয়বৃদ্ধির জন্য কোন কোন নূতন আইন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সেখানে গবন্মেণ্ট বঙ্গের মত এমন ভক্ত সদস্যদল পান নাই। সেখানে সরকার সব আইন পাস করিতে পারিতেছেন না। অবশ্য বঙ্গের সব সদস্যই "জো হুকুম" নহেন।

—

চাকরীর জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

সরকারী চাকরী পাইবার জন্য কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে কিনা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য রক্ষিত চাকরী কে কে পাইতে পারে তাহা নিরূপণের জন্য পরীক্ষা আরম্ভ হইবার পর যদি কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে তবে তাহা বিবেচিত হয় না; পব্লিক সার্বিস কমিশন সন্দেহজনক ধর্ম্মান্তর গ্রহণের যে কয়েকটি ঘটনা বিবেচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ৬টি শিখধর্ম্ম, ১টি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও একটি মুসলমান ধর্ম্ম সম্পর্কে ঘটিয়াছিল; এক জন চাকুরীপ্রার্থী বলিয়াছিল, সে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়-সমূহের যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী!

স্বরাষ্ট্রসচিব যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা সন্তোষকর উত্তর দেওয়া হয়ত তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল। সংখ্যা-লঘিষ্ঠদিগকে চাকরী দিবার পরীক্ষা আরম্ভ হইবার পর কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে তাহাকে তাহার নব-অবলম্বিত ধর্ম্মের লোকদের সুবিধা দেওয়া হয় না বুঝিলাম। কিন্তু পরীক্ষা আরম্ভ হইবার আগেই কেহ ঐ কর্ম্ম করিয়া থাকিলে তাহাতে ত তাহার দাবী বিবেচিত হয়? সেরূপ ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ ঘটনার সংখ্যা কেহ বলিতে পারেন কি? স্বরাষ্ট্রসচিব কতকগুলি সন্দেহজনক ঘটনার সংখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু নিঃসন্দেহ ঘটনা কি একটিও ঘটে নাই? ঘটিয়া থাকিলে তাহা কয়টি?

বিশেষ কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে সাংসারিক সুবিধা দেওয়া দ্বারা সেই ধর্ম্মের অপমান করা হয়, এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে দণ্ডিত ও অনভিপ্রেত ভাবে সম্মানিত করা হয়।

আমরা অল্প দিন পূর্ব্বে বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, একটি ভদ্রবংশীয় হিন্দু যুবক চাকরী পাইবার আশায় মুসলমান হইয়াছিল, কিন্তু তাহা না-পাওয়ায় আবার হিন্দু হইয়াছে!

—

ভারতে দেশী ও বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানী

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি-প্রশ্নের উত্তরে স্তর যোসেফ ভোর বলেন, ১৯২৮ সালে ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীসমূহের আয় হইয়াছিল ৩,৩৪,৭৮,০০০ টাকা এবং বিদেশীগুলির ২,৯০,২৫,০০০ টাকা। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের আয়ও দেশী কোম্পানীগুলির কিছু কিছু বেশী হইয়াছিল। ইহা জীবনবীমা সম্বন্ধে। অগ্নিভয়, সমুদ্রে জাহাজ জলমগ্ন হইবার ভয় প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলিই বেশী কাজ করিয়াছে। তাহার কারণ বুঝা কঠিন নয়। অগ্নিভয়ের জন্ত বীমা বেশীর ভাগ কারখানাসমূহেরই করা হয়, এবং বেশী বেশী টাকার জন্ত করা হয়। অধিকাংশ বড় কারখানার মালিক বিদেশী, তাহারা বিদেশী কোম্পানীর আফিসেই বীমা করে। অগ্নিবীমার দেশী কোম্পানী আছেও কম। জাহাজ দেশী লোকদের অল্পসংখ্যক আছে, প্রায় সবই বিদেশী, এবং জাহাজ-বীমার দেশী কোম্পানীর সংখ্যাও কম। সুতরাং অধিকাংশ জাহাজ-বীমা বিদেশী কোম্পানীর আফিসে হয়।

জীবনবীমার কাজ বিদেশী কোম্পানীসমূহ যত পায়, তাহাও তাহাদের পাওয়া উচিত নয়। কারণ তাহাদের আয় ও লাভ বিদেশে যায়; এদেশে থাকিলেও এদেশে বিদেশীদের বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের কারখানার উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্ত ব্যবহৃত হয়। বিদেশী অনেক কোম্পানীর পুঁজি এত বেশী হইয়াছে, যে, তাহারা তাহাদের এজেণ্ট ও দালালদিগকে খুব বেশী কমিশন দিয়াও, বিজ্ঞাপনের জন্ত খুব বেশী খরচ করিয়াও, এবং বোনাস খুব বেশী দিয়াও কাজ বাড়াইতে সমর্থ। ভারতবর্ষে তাহাদের নেট্ লাভ কয়েক বৎসর কিছু না হইলেও, এমন কি কয়েক বৎসর লোকসান হইলেও, তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে। দেশী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহকে দেশী জীবনবীমা সম্বন্ধীয় আইন মানিতে হয়। বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানী-সমূহকেও ঠিক্ সেই সব আইন মানিতে বাধ্য করা উচিত।

—

ভারতবর্ষে মোটর গাড়ীর কারখানা

পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূলধনে ভারতবর্ষে একটি মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। তাহাতে বৎসরে পনর হাজার মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভারতবর্ষে বিদেশী মোটর গাড়ীর উপর শতকরা ত্রিশ টাকা বাণিজ্যশুল্ক দিতে হয়। দেশী কারখানায় নির্ম্মিত গাড়ীর জন্ত তাহা দিতে হইবে না বলিয়া এখানকার গাড়ীর দাম কম হইবে। এই উদ্যোগের মূলে এক জন বাঙালী আছেন।

—

বঙ্গে চিনির কারখানা

সকল প্রদেশের চেয়ে বঙ্গের লোকসংখ্যা বেশী, চিনি খাইবার লোকও বেশী। কিন্তু এই চিনির খুব বেশী অংশ বঙ্গের বাহির হইতে আসে, অথচ তাহা বঙ্গেই প্রস্তুত হইতে পারে। বিহারে ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে বিস্তর চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সবগুলি হইতে লাভ হইতেছে। বঙ্গে কেবল দিনাজপুর জেলার সিতাবগঞ্জে, জলপাইগুড়ি জেলার শিকারপুরে, রাজসাহী জেলার গোপালপুরে, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় ও ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে মোট পাঁচটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, এবং বর্দ্ধমান জেলায় একটি স্থাপিত হইতেছে। সবগুলির মালিক আবার বাঙালী নহে, বেশীর ভাগ অন্তেরা মালিক। আগে বঙ্গে খুব বেশী পরিমাণে আকের চাষ হইত, এখনও হইতে পারে। যে-সব অঞ্চলে বৃষ্টি বেশী হয় এবং জমী নীচু ও সরস, সেখানে যেমন আকের চাষ হইতে পারে, যে-সব অঞ্চলে বৃষ্টি কম হয় এবং জমী উঁচু ও শুষ্ক, সেখানেও তদ্রূপ ইহা চলিতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক জেলাতেই ইক্ষু উৎপাদন করিয়া চিনির কারখানা স্থাপন করা যায়। বড় বড় কারখানাই যে স্থাপন করিতে হইবে এমন নয়। ছোট ছোট কারখানা স্থাপন কম মূলধনে সহজে হয়। তাহার দ্বারা স্থানীয় অভাব মোচন করিলে কাজ বেশ চলিতে পারে।

ধবধবে পরিষ্কার দানাদার চিনির চেয়ে খাদ্য হিসাবে গুড়ের পুষ্টিকারিতা ও উপকারিতা বেশী। অতএব গুড় উৎপাদনে মন দিলে তাহাও লাভজনক হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়নী বিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন এবিষয়ে ইংরেজীতে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি তাহা বাংলায় লিখিয়া প্রকাশ করিলে অধিকতরসংখ্যক লোকে সে-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে ও তদনুসারে কাজ করিতে পারিবে।

বঙ্গে অতীত কালে চিনি উৎপাদন কি পরিমাণে হইত প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে।

—

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর বাসভবন

অনেক মাস হইল আমরা স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জন্মগ্রাম বোড়ালে গিয়া তাঁহার পৈত্রিক বাসভবনের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আসি। তাহার সম্মুখের অংশের কয়েকটি কক্ষের দেওয়ালগুলি আছে, ছাদ নাই। বাগানের জমীটি আগাছায় পূর্ণ হইয়া আছে, সম্মুখে পুষ্করিণীটি ভাল অবস্থায় আছে। বোড়াল গ্রামের লোকেরা এইগুলি যথাসম্ভব ভাল অবস্থায় রক্ষা করিলে তাহা সন্তোষের বিষয় হইবে। শুনিয়াছি, তথাকার কতকগুলি যুবক তাহার জন্য চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ও তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতাদের উত্তরাধিকারীদিগের সকলে একমত না-হওয়ায় কোন কাজ হয় নাই। বসু মহাশয়ের বাল্যকাল ও যৌবনকাল বোড়ালে অতিবাহিত হয়। কর্ম্মজীবনের বহুবৎসর মেদিনীপুরে যাপিত হয়। সেখানকার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা হইতে অবসর লইয়া তিনি বৈদ্যনাথ দেওঘরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানেই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছিলেন। শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই দেওঘর গেলে তীর্থ-দর্শনের মত তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত অল্প কালও কথোপকথন না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মনে সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন না। তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই ঋণের জন্য তাঁহার দেওঘরের বাড়িটি বন্ধক আছে। ইহা জীর্ণ ও স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে, কিন্তু ভাল করিয়া মেরামত করিলে ইহা ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিতে পারে। ঋণ পরিশোধ করিয়া এই বাড়িটি কোন সার্ব্বজনিক কাজে লাগাইলে ইহা বসু মহাশয়ের স্মৃতিমন্দির রূপে রাক্ষত হইতে পারে। অথবা কেহ যদি নিজের ব্যবহারের জন্য ক্রয় করেন ও ইহার কোন স্তম্ভগাত্রে রাজনারায়ণ বসুর স্মারক একটি প্রস্তর ফলক লাগাইয়া রাখেন, তাহাতেও চলিতে পারে। দেওঘর স্বাস্থ্যকর স্থান। বাড়িটি-বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। আমরা অন্য এক পৃষ্ঠায় ইহার দুটি ছবি মুদ্রিত করিলাম। দেওঘরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রিখিয়ার পুষ্পোদ্যানের স্বত্বাধিকারী গাঙ্গুলী মহাশয় এই দুটি ও আরও পাঁচটি ফোটোগ্রাফ তুলিয়া দিয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের বাড়িটি রক্ষিত হইলে, দেশে যখন স্বরাজ স্থাপিত হইবে, তখন লোকে ইহার মূল্য বুঝিবে; রক্ষিত না হইলে তখন এই ত্রুটি সকলের মনস্তাপের কারণ হইবে। যাঁহারা এ-বিষয়ে আরও সংবাদ চান, তাঁহারা কলিকাতার ৬ নং কলেজ স্কোয়ারের ঠিকানায় বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী লজ্জাবতী বসুকে চিঠি লিখিতে পারেন। আমরা তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই সব কথা লিখিলাম ও বাড়িটির ছবি প্রকাশ করিলাম। আশা করি কেহ চিঠি লিখিলে তিনি উত্তর দিতে পারিবেন।

—

বিহারে বাঙালী

এমন কতকগুলি অঞ্চল বিহার প্রদেশের মধ্যে ফেলা হইয়াছে যেখানে বহু শতাব্দী ধরিয়া বাঙালীরা পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছে, যেখানকার প্রধান অধিবাসী তাহারা এবং যেখানকার প্রধান ভাষা বাংলা। এই সব অঞ্চল ছাড়া খাস বিহারেও অনেক বাঙালী বাস করেন যাঁহাদের অধিকাংশ তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়াছেন। রেলের কাজ, সরকারী চাকরী, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি জীবিকা অবলম্বনে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও ইঁহারা বিহারে গিয়াছিলেন। বিহারে এইরূপ "ঔপনিবেশিক" বাঙালী যত আছেন, তাঁহাদের চেয়ে বেশী সংখ্যক বিহারী বঙ্গে আছেন। এই বিহারীরা প্রায়ই বঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা নহেন, তাঁহাদের মোট উপার্জ্জন বিহারের 'ঔপনিবেশিক' বাঙালীদের মোট উপার্জ্জনের চেয়ে বেশী, এবং তাঁহাদের উদ্বৃত্ত ও পুঁজি বিহারে প্রেরিত ও সঞ্চিত হয়। বিহারের

ঔপনিবেশিক বাঙালীদের উপার্জ্জন সেখানেই ব্যয়িত ও সঞ্চিত হয়।

এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও, বিহারে বাঙালীরা যাহাতে চাকরী না-পায়, ঠিকাদারী না-পায়, তাহার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে; বাঙালীদের অন্যান্য বৃত্তিতেও বাধা জন্মিতেছে। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। জীবন-সংগ্রামে প্রতিযোগিতা হইলে এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বিহারী ভ্রাতাদের বিবেচনা করা উচিত, যে, বিহারে বাঙালীদেরও টিকিয়া থাকিতে হইবে। তাহারা বিহারে উপার্জ্জন করিয়াছে ও করে বটে, কিন্তু শিক্ষা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং সমবায়-প্রথা প্রচলন ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবর্ত্তনের দ্বারা তাহারা বিহারের উপকারও করিয়াছে।

নূতন ভারতশাসন আইন প্রণীত হইতেছে। এখন কথা উঠিয়াছে বিহারের বাঙালীদের জন্য বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি আসন সংরক্ষিত থাকা আবশ্যক ও উচিত কিনা। এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস "বেহার হেরাল্ড্‌" কাগজে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতশাসন বিলে বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙালীদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত হয় নাই। বিহারের সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর জন্য ৮৯টি আসন রাখা হইয়াছে। বিহারের জন্য যে ফ্র্যাঞ্চিস্‌ কমিটি গঠিত হইয়াছে তাঁহারা কিন্তু ইচ্ছা করিলে বিহারী ও বাঙালী উভয় লোকসমষ্টির সম্মতিক্রমে বাঙালীদিগের জন্য কয়েকটি আসন রাখিতে পারেন, এবং বিহারের প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট ফ্র্যাঞ্চিস্‌ কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী নিয়ম করিতেও সমর্থ।

লোথিয়ান কমিটিকে সাহায্য করিবার জন্য বিহারে যে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা অধিকাংশের মতে বাঙালীদের জন্য দুটি আসন রাখিবার সুপারিস করেন (রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র রায় দেখান, যে, দুটি আসন যথেষ্ট নহে), কিন্তু বিহার প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন। বিহারের অন্যতম মন্ত্রী স্যর গণেশ দত্ত সিং সাইমন কমিশনকে প্রেরিত নিজ মন্তব্যে বলেন, যে, বিহারের প্রত্যেক ডিবিজনে বাঙালীদের জন্য একটি করিয়া আসন রাখা উচিত। অর্থাৎ বিহারে চারিটি ও উড়িষ্যায় একটি। উড়িষ্যার কথা এখন বলিতেছি না। বিহারীরা ৮৯টি আসনের মধ্যে ৪টি বাঙালীদিগকে দিলে তাঁহাদের শক্তিহ্রাস ও ক্ষতি হইবে না। অবশ্য বিহারের অধিবাসীদের শতকরা ৫·৬ জন বঙ্গভাষী বলিয়া তজ্জন্য তাহাদের অন্যূন ৬টি আসন পাওয়া উচিত। বিবেচক বিহারীরা ইহা বুঝিলে ভাল হয়।

আমরা কোথাও কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতির লোকদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আসন-সংরক্ষণের পক্ষপাতী নহি। সুতরাং বিহারের বাঙালীদের জন্য আসন-সংরক্ষণের আলোচনা কেন করিতেছি, তাহা বলা আবশ্যক। বিহারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বাবু নন্দকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সরকার-পক্ষ হইতে মাননীয় মিঃ হুইটি বলেন, "The idea has been that when a domiciled community takes its place in the province, it should take its place with the other natives of the soil as part of the people of Bihar and Orissa," "যে ধারণা অনুসারে কাজ করিতে হইবে তাহা এই, যে, যখন কোন লোকসমষ্টি এই প্রদেশে আসিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হয়, তখন তাহাদিগকে বিহার ও উড়িষ্যার লোকদের মধ্যে তথাকার পুরাতন অধিবাসীদের সঙ্গে স্থান লাভ করিতে হইবে", অর্থাৎ তাহারা বিহার-উড়িষ্যার চিরন্তন অধিবাসীদের সামিল হইয়া যাইবে।

এই ধারণা আদর্শ বা নিয়ম, যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু বিহারে বাঙালীদের প্রতি এই নিয়মে কাজ করা হয় না—তাহাদিগকে বিহারের লোকদের সামিল মনে করা হয় না। নানা বিষয়ে, বাঙালী যোগ্যতর হইলেও, তাহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া অন্যকে সুবিধা দেওয়া হয়। কোন একটা সুবিধার জন্য যদি পাঁচ জন বিহারী প্রার্থী হয়, তাহা হইলে যেমন যোগ্যতম ব্যক্তিকেই সুবিধা দেওয়া হয়, বিহারী বাঙালী প্রভৃতি সবাই প্রার্থী হইলে যোগ্যতম ব্যক্তিকেই সুবিধা দেওয়া হউক—সেই যোগ্যতম ব্যক্তি বাঙালী হইলেও তাহাকেই সুবিধা দেওয়া হউক, বাঙালীরা ইহাই চান; বাঙালী যোগ্যতম না হইলেও তাহাকে দেওয়া হউক ইহা তাঁহারা চান না।

কিন্তু বাঙালীদিগকে একদিকে মুখে বলা হইতেছে, "তোমরা বিহারেরই লোক বলিয়া আপনাদিগকে গণ্য

কর, আলাদা আসন কেন চাও", অন্য দিকে তাহাদিগকে কার্য্যতঃ বিহারী হইতে আলাদা বলিয়া নানা প্রকারে গণ্য করা হইতেছে, এবং বাঙালী ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান চলিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সেন্সাসের জন্য কাহার মাতৃভাষা কি তাহা নির্দ্ধারণের সময় বাংলাভাষীদের সংখ্যা কম দেখাইবার চেষ্টা বহু বৎসর হইতে হইয়া আসিতেছে। মানভূমের অন্তর্গত ধানবাদে জমিদারী-সেরেস্তার কাগজপত্র বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দীতে রাখিবার নিয়ম করা হইয়াছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী ছাত্রদিগকে সংস্কৃত প্রশ্নের উত্তর বাংলা অক্ষরের পরিবর্ত্তে নাগরীতে লিখিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা হয়। মানভূম, সাঁওতাল পরগণা ও সিংহভূমের কোন কোন অঞ্চলে দেশভাষার বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দীকে শিক্ষার বাহন করা হইয়াছে।

বিহারে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে আগত লোক বাস করে। কিন্তু কেবল মাত্র বাঙালীদিগকেই স্থায়ী বাসিন্দাত্বের (ডোমিসাইলের) সার্টিফিকেট লইতে বাধ্য করা হয় যদি তাহারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হইবার, ছাত্ররূপে সরকারী বৃত্তি পাইবার এবং সরকারী চাকরী পাইবার যোগ্য বলিয়া রেজিষ্টরীভুক্ত হইতে চায়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় ও অন্য এশিয়ানদিগকে রেজিষ্টরী-ভুক্ত করিবার নিয়মের বিরুদ্ধে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট পর্য্যন্ত লড়িয়াছেন, অথচ এইরূপ নিয়ম প্রকারান্তরে বিহারে বাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে। বিহারের এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে না—কাহারও পিতামহ সার্টিফিকেট পাইলে পরে তাহার পিতাকে, তদনন্তর তাহাকে এবং কালক্রমে তাহার পুত্র-পৌত্রাদিকেও নূতন করিয়া সার্টিফিকেট লইতে হয়! যে যে "নীতি" বা "নিয়ম" বা "সর্ত্ত" অনুসারে এই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, তাহা ক্রমশঃ কঠোরতর করা হইতেছে।

কিন্তু সার্টিফিকেট লইলেও বাঙালী ও বিহারীকে সমান চক্ষে দেখা হয় না। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি করিবার সময় খুব কম একটা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বাঙালী ছাত্রকে লওয়া হয়, যে-সব বিহারী ছাত্রকে লওয়া হয় তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বহু বাঙালী ছাত্র (ঐ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত থাকিলে এবং তাহা থাকেও) ভর্ত্তি হইতে পায় না, বিহারী ছাত্রেরা নিকৃষ্ট হইলেও তাহাদিগকেই এরূপ স্থলে ভর্ত্তি করা হয়। সরকারী চাকরীতেও শতকরা খুব কম কাজ বাঙালীর জন্য রাখিয়া তদতিরিক্ত কাজে, যোগ্যতর ও যোগ্যতম বাঙালী থাকিতেও, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বিহারীদিগকে কাজ দেওয়া হয়। সরকারী বৃত্তিতেও এইরূপ। সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এইরূপ নিয়ম থাকায় বহু ব্যয়ে পরিচালিত ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিখাইবার উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে অনেক অযোগ্য বিহারী ছাত্র লওয়ায় তাহারা অনেক স্থলে শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে বা পাস করিতে পারে না, কেবল তাহাদের জন্য কতকগুলা টাকা নষ্ট হয় মাত্র। বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য যে-সব সরকারী বৃত্তি আছে, ১৯২০ সালের পর এ পর্য্যন্ত তাহার একটিও বিহারের বাঙালী কোন ছাত্র বিশেষ কৃতিত্ব সত্ত্বেও পায় নাই। সরকারী চাকরীতে প্রাদেশিক বিভাগসমূহে (প্রভিন্স্যাল সার্ভিস-সমূহে) গত বারো-তের বৎসরে, যোগ্যতম হওয়া সত্ত্বেও খুব কম বাঙালীকে লওয়া হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত 'বেহার হেরাল্ডে' দেওয়া হইয়াছে। সরকারী চাকরীর কোন বিভাগে চাকর্‌য়ের সংখ্যা কমাইবার দরকার হইলে, হুকুম দেওয়া আছে যে আগে বাঙালী চাকর্‌য়েদিগকে ছাঁটিয়া দিতে হইবে। তাহার ফলে যোগ্য পনের-ষোল বৎসরের চাকর্‌য়ে অনেক বাঙালীর কাজ গিয়াছে, বিহারী তিন-চার বৎসরের চাকর্‌য়ের কাজ যায় নাই।

এই প্রকারে বিহারে বাঙালীরা স্থায়ী বাসিন্দা হইলেও তাহাদিগকে বিহারীর সমান অধিকার দেওয়া হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে বিহারী সদস্যদের প্রস্তাবে ও সমর্থনে বিহার ব্যবস্থাপক সভায় ধার্য্য হইয়াছে, কেবল বিহারীরাই ঠিকাদারী কাজ পাইবে, অর্থাৎ বাঙালীরা পাইবে না। গবর্ন্মেণ্ট ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। কেরানীগিরি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম হইয়াছে।

এই সকল কারণে বিহারের বাঙালীদের অভাব-অভিযোগ জানাইবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের জন্য কয়েকটি আসন রক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

তাহাতেই যে তাহাদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষিত হইবেই এমন আশা করা যায় না। কিন্তু তাহাদের অভাব অভিযোগ বিজ্ঞাপিত হইতে পারিবে।

লীগ্ অব্ নেশুন্সের উদ্যোগে ইউরোপের প্রায় ২০টি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার্থ যে-সব ট্রীটি (Minorities Protection Treaties) হইয়াছে, তাহাতে ভাষা, কৃষ্টি, সামাজিক প্রথা, ধর্ম্ম ও ব্যক্তিগত আইন (Personal Law) আলাদা হইলে সংখ্যালঘুদিগের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিবার নিয়ম আছে। বিহারের অধিকাংশ বাঙালীর ধর্ম্ম হিন্দু বিহারীদের মত বটে, কিন্তু তাহাদের ভাষা, কৃষ্টি, সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যক্তিগত আইন আলাদা। তদুপরি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলিয়া আসিতেছে। এই জন্য তাহাদের আলাদা আসনের দাবী গ্রাহ্য হওয়া উচিত। তাহারা বিহারের লোক, মুখে ইহা স্বীকার করিলেই তাহাদের আলাদা আসনের দাবী বাতিল হয় না। কারণ, বিহারের আদিম নিবাসীদের, খ্রীষ্টিয়ানদের, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন অভিযান নাই, কিন্তু তাহাদিগকে আলাদা আসন এবং আলাদা নির্ব্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, যদিও তাহারাও বিহারের লোক। বাঙালীরা আলাদা নির্ব্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাচন চান না। তাঁহারা কেবল কয়েকটি আসন চান, এবং সেইগুলির জন্য বাঙালী প্রতিনিধি বিহারী ও বাঙালী উভয়ে মিলিয়া নির্ব্বাচন করিবেন, এই চান।

বিহারের অধিবাসীসংখ্যা ৩২৩৭১৪৩৪। তাহার মধ্যে বাংলাভাষী ১৮১৬১৭২ অর্থাৎ শতকরা ৫.৬ জন। ঠিক সংখ্যা বিশ লক্ষের অধিক মনে হয়। কারণ, বাঙালীদের সংখ্যা নানা প্রকারে কম দেখাইবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে, যাহা হউক, শতকরা ৫.৬ হইলেও তাহারা প্রতিনিধি পাইবার যোগ্য।

খ্রীষ্টিয়ানরা বিহারে শতকরা এক জনও নহে, অথচ তাহাদিগকে শতকরা ৪টি আসন দেওয়া হইয়াছে, মুসলমানেরা মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে শতকরা ৪.৪, অথচ তথায় তাহাদিগকে শতকরা ১২.৫টি আসন দেওয়া হইয়াছে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অমুসলমানেরা শতকরা ৫ জনেরও কম, অথচ তাহাদিগকে তথায় তাহাদের সংখ্যার অনুপাতের বেশী আসন দেওয়া হইয়াছে।

—

রাণী রাসমণির স্মৃতি

পুণ্যশীলা রাণী রাসমণির স্মৃতি কিরূপে স্মরণীয় করিতে পারা যায় তাহা উদ্ভাবন করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে আলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতার নাগরিকগণের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রাণীর অসংখ্য দানের কথা লোকসমাজে প্রচলিত আছে। এই স্মৃতিসভা তাহা স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কর্পোরেশুনকে তাঁহার নামে কোনও রাস্তার নামকরণ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই অনুরোধ সমর্থনযোগ্য।

—

ভাষানুযায়ী প্রদেশ ও ভারতীয় মহাজাতি গঠন

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে নানাভাষাভাষী লোকেরা স্থায়ী ভাবে বাস করে। অনেক দেশী রাজ্যেরও স্থায়ী বাসিন্দারা নানাভাষাভাষী। সুতরাং ভারতবর্ষকে, কেবলমাত্র একভাষাভাষী, এরূপ অনেকগুলি প্রদেশে ও রাজ্যে ভাগ করা সম্ভবপর নহে। তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। কারণ, আমাদিগকে একটি ভারতীয় মহাজাতি গড়িতে হইবে। তাহাতে নানাভাষার লোক আছে ও থাকিবে। তাহাদের পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হওয়া উচিত। এক একটি প্রদেশে কেবল একভাষাভাষী লোক স্থায়ী ভাবে থাকা অপেক্ষা নানাভাষাভাষী একাধিক লোকসমষ্টি থাকিলে এইরূপ জীবনযাপনের শিক্ষা ও অভ্যাস ভাল করিয়া হয়। সেই জন্য, আমরা ভাষা অনুসারে নূতন নূতন প্রদেশ গঠন পছন্দ করি না। কিন্তু যে-ভাষার লোকেরা আবহমানকাল একপ্রদেশবাসী হইয়া আসিতেছে, রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া একাধিক প্রদেশভুক্ত করাও আমরা পছন্দ করিনা—আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি এমন হইত, যে, বরাবরই মানভূম বাংলা প্রদেশের বাহিরে ছিল, তাহা হইলে আমরা জোর করিয়া বলিতাম না, যে, ঐ জেলাকে বঙ্গের মধ্যে আনিতে হইবে। কিন্তু যে-যে ভূখণ্ড বরাবর বঙ্গপ্রদেশভুক্ত ছিল, তৎসমুদয়কে কেন অন্যপ্রদেশভুক্ত করা হইবে?

আমাদের বক্তব্য এই, যে, সাবেক ব্যবস্থা বা অবস্থা অনুসারে হউক, কিংবা নূতন ব্যবস্থা অনুসারেই হউক, ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীদিগকে কোন এক প্রদেশভুক্ত হইয়া থাকিতে হইলে, কোন ভাষাভাষীকেই কোন প্রকার অধিকার ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা অত্যন্ত অন্যায় হইবে। যোগ্যতা যাহাদের সমান, ভাষা ধর্ম্ম বংশ জাতি নির্বিশেষে তাহারা সমান সুবিধা পাইতে অধিকারী। যেহেতু কোন বাঙালী বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, বা অন্য কোন প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা, অতএব বাঙালী বলিয়াই কেন তাহাকে অসুবিধায় ফেলা হইবে?

বঙ্গের বাহিরের নানা প্রদেশের বাঙালীদের বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযানই চলুক, তাঁহারা আপনাদের যোগ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখুন, এবং নিজ নিজ শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভারতবর্ষের ও সেই সেই প্রদেশের কল্যাণ করিতে থাকুন।

সকলের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলুন। তাঁহাদের যোগ্যতা ও কল্যাণকারিতা ব্যর্থ হইবে না।

—

সমগ্র ভারতের বাঙালীদের কৃষ্টিগত প্রচেষ্টা

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বঙ্গ অখণ্ড থাক্ বা খণ্ডীকৃত হউক, বাঙালীদিগকে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও রাজ্যে অস্থায়ী বা স্থায়ী ভাবে বাস করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা বাংলার ভাষা, সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতির সহিত যোগরক্ষা না করিলে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিদের অপকার হইবে। পক্ষান্তরে সকল বাঙালীর পরস্পরের সহিত কৃষ্টিগত যোগ থাকিলে প্রত্যেকের ও সমষ্টির কল্যাণ হইবে। এই যোগ রাখিবার জন্য প্রতিষ্ঠান ও সমিতি চাই। "প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন" এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ও সমিতি। এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা ব্যাপক ও কর্ম্মিষ্ঠ আরও প্রতিষ্ঠান ও সমিতি আবশ্যক। কিন্তু প্রতিযোগিতার ভাব হইতে নহে, সহযোগিতার ভাব হইতে।

—

অমৃতবাজার পত্রিকা ও হাইকোর্টকে অবজ্ঞা

একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা কলিকাতা হাইকোর্টকে অবজ্ঞাস্পদ করিয়াছে, এই অভিযোগে ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ও ইহার মুদ্রক শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্তি বিশ্বাসের হাইকোর্টে সরাসরি বিচারানন্তর যথাক্রমে তিন মাস ও এক মাস অশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

এইরূপ স্থলে সরাসরি বিচারের ক্ষমতা হাইকোর্টের আছে কি না, আমরা স্বয়ং স্থির করিতে অসমর্থ। কিন্তু বিচারপতি স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত আমাদের যুক্তি-সঙ্গত মনে হয়। ইহাও মনে হয়, যে, এরূপ স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের সরাসরি বিচার করিবার অধিকার যদি হাই-কোর্টের থাকে, তাহা হইলেও এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার সরাসরি না করিয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সময় দিলে হাইকোর্ট ভাল করিতেন। তাহাতে হাইকোর্টের প্রতি জন-সাধারণের শ্রদ্ধা কমিত না, হয়ত বাড়িত। অমৃতবাজার পত্রিকায় যাহা লেখা হইয়াছিল তাহাতে আইনানুসারে দণ্ডনীয় আদালত-অবমাননা হইয়াছিল কি না, আমরা স্বয়ং বলিতে অসমর্থ; কিন্তু আমাদের মনে হয়, সরাসরি বিচার না-করিলে হাইকোর্ট ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপন্ন হইতেন না।

বিচারপতি লর্ট-উইলিয়মের রায়ে দেখিতে পাই, বিলাতের বিচারপতি লর্ড রাসেলের মতে আজকাল ব্রিটেনে আদালত-অবমাননার মোকদ্দমা হয় না, যদিও সেরূপ মোকদ্দমা তথাকার আইন অনুসারে এখনও হইতে পারে। বিচারপতি লর্ট-উইলিয়াম এরূপ অবস্থা ঘটিবার কারণ এই বলিয়াছেন, যে, বিলাতের পব্লিক ডীসেন্সীর অর্থাৎ কথায় ও লেখায় প্রকাশ্য সার্ব্বজনিক ভদ্রতা রক্ষার ষ্টাণ্ডার্ড বা মাপকাঠি আগেকার চেয়ে খুব উন্নত হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে, তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, আজকাল তথাকার আদালতগুলির বিচার ও জজদের সামাজিক ব্যবহার এরূপ আদর্শানুরূপ যে লোকে তাহার সমালোচনা করিবার কারণ পায় না, কিংবা সমালোচনার কারণ থাকিলেও ইংলণ্ডীয় ভদ্রতা ও সৌজন্যের আদব কায়দা রক্ষা করিয়াই তাহা করা হয়। এ-বিষয়ে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং কিছু বলিবারও নাই। কিন্তু ইংলণ্ডীয় পব্লিক আচরণ যে নিম্নস্তরের হয়ই না, ইহা স্বীকার করিতে পারি না। এখনও পার্লেমেণ্ট হাতাহাতি মারামারি গালাগালি হয়। এই সেদিন প্রধান মন্ত্রীকে পার্লেমেণ্টে এক জন পার্লেমেণ্ট-সদস্য "শূকর" প্রভৃতি বলেন এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে এক নারী অন্য রকম কটূক্তি করেন।

হাইকোর্টই ভারতবর্ষের উচ্চতম আদালত। হাই-কোর্টের বিচারপতিবৃন্দের কোন নালিশ থাকিলে তাঁহারা অন্য কোন আদালতে মোকদ্দমা করিতে পারেন না। নিজেদের অবমাননার বিচার আপনাদিগকেই করিতে হয়। ইহাতে অভিযোক্তা ও বিচারকের অভিন্নত্ব ঘটে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিনা, কিংবা অন্য কোন দেশে উচ্চতম আদালতের অবমাননা কেহ করিলে ঐ আদালত ভিন্ন অন্য কেহ বিচারক হন কিনা, জানিনা।

—

ভারতীয় বজেট অপরিবর্ত্তিত রহিল

প্রতি বৎসর ভারত-গবর্মেণ্টের ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট-গুলির আয়ব্যয়ের এক-একটা আনুমানিক হিসাব ব্যবস্থাপক সভা সকলে এই সময় উপস্থিত করা হয়। সদস্যেরা তাহাতে হ্রাসবৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে পারেন। এবার ভারত-গবর্মেণ্টের বজেটে সদস্যেরা লবণ-শুল্ক কমাইয়াছিলেন, ডাকমাশুল কোন কোন দিকে কমাইয়া-ছিলেন, এবং আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়লাট কোন পরিবর্ত্তনই গ্রহণ করেন নাই, ঠিক্ যেমনটি ছিল তেমনি বজেটটি চালাইয়া দিবার হুকুম দিয়াছেন। আইনে তাঁহার এরূপ করিবার ক্ষমতা আছে এবং সে আইন ইংরেজদেরই কৃত। দেশের প্রতিনিধি বলিয়া যাঁহারা গণিত হন, তাঁহারা একটা বিষয়েও ঠিক্ বুঝিলেন না, প্রত্যেক বিষয়ে ঠিক্ বুঝিলেন এক জন বিদেশী কিংবা তিনি ও তাঁহার অধীন কয়েক জন মোটাবেতনভোগী কর্ম্মচারী!

এখন ব্যবস্থাপক সভাকে অগ্রাহ্য করিয়া বড়লাটের এইরূপ কাজ করিবার যে ক্ষমতা বর্ত্তমান ভারতশাসন আইন অনুসারে আছে, তার চেয়ে বেশী বিষয়ে বেশী ক্ষমতা তাঁহাকে ও প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকে নূতন আইনে দেওয়া হইতেছে। কাহারও কাহারও এইরূপ আত্মপ্রতারণা করিবার প্রবৃত্তি আছে, যে, নূতন আইনে প্রদত্ত প্রভূত ক্ষমতাগুলার প্রয়োগ অত্যন্ত সঙ্গীন সঙ্কট অবস্থা ভিন্ন করা হইবে না। এখন ত কোন সঙ্কট অবস্থা হয় নাই, বজেটে উদ্বৃত্তই দেখান হইয়াছিল। তথাপি বড়লাট নিজের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেন। অতএব এখন আত্মপ্রতারকদের ভ্রান্ত ধারণার উচ্ছেদ হওয়া উচিত।

—

বালুরঘাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাট একটি বড় গ্রাম। ইহাকে শহর বলা চলে না, কেন-না এখানে মিউনিসিপালিটি নাই। ইহার অধিবাসীদিগের সার্ব্বজনিক লোকহিতকর কার্য্যে উৎসাহ প্রশংসনীয়। এখানে তাঁহারা একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় চালাইয়া আসিতেছেন। গত মাসে তাহার ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ তাহার "রজত রঞ্জনোৎসব" করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ বেসরকারী। ইহার পাকা ঘরবাড়ি স্থানীয় ভদ্রলোকেরা চাঁদা দিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন. চলতি খরচের জন্যও তাঁহারা সরকারী কোন সাহায্য গ্রহণ করেন না, প্রার্থনাও করেন না। তাহা সত্ত্বেও বিদ্যালয়টি সুপরিচালিত। তাহার একটি কারণ, ইহার শিক্ষক মহাশয়েরা অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে কাজ করেন এবং প্রাণ দিয়া কাজ করেন। এই বিদ্যালয়ে বালিকারাও শিক্ষা পাইয়া থাকে, ইহা আরও সন্তোষের বিষয়।

উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বহুসংখ্যক মহিলা বালকবালিকাদিগকে লইয়া সমবেত হওয়ায় সভামণ্ডপ উৎসবক্ষেত্রের মত শ্রীসম্পন্ন দেখাইতেছিল।

বালুরঘাটে শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ দেখিলাম, তাহাতে মনে হয়, এখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মন দিলে এই স্থান হইতে তাঁহারা নিরক্ষরতার সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন করিতে পারিবেন।

—

ব্রতচারী লোকনৃত্য

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের ব্রতচারী প্রচেষ্টা উন্নতি ও বিস্তার লাভ করিতেছে, ইহা সন্তোষের বিষয়। এক বার কোন্নগর ইংরেজী বিদ্যালয়ে বালকদের এক রকম ব্রতচারী নৃত্য দেখিয়াছিলাম। গত মাসে বালুরঘাটে ছাত্রদের নানা রকম লোকনৃত্য দেখিলাম। তাহারা বেশ শিখিয়াছে। এই সব সম্পূর্ণ সুরুচিসঙ্গত নৃত্যে নর্ত্তক ও দর্শকদিগের আমোদ হয় এবং নর্ত্তকদের ব্যায়াম হওয়ায় স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়। চাষের কোন কোন প্রক্রিয়ার অনুকারী নৃত্যগুলির আর এক গুণ এই, যে, তদ্দ্বারা কৃষির সম্বন্ধে মনে অবজ্ঞা বা অগৌরবের ভাব থাকিলে তাহা দূর হইয়া মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ব্রতচারীদের পণ ও প্রতিজ্ঞাগুলিও বেশ এবং কোন কোনটি কৌতুকাবহ।

ইহাদের চীৎকারগুলি বেশ মজার। এগুলি অর্থহীন। আমেরিকার এক এক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে এক এক রকম য়েল্ (Yell) বা চীৎকার আছে যাহার কোন মানে নাই। ব্রতচারীদের চীৎকার সেই জাতীয়। ইহাদের অভিবাদনও (গ্রীটিংও) নূতন রকমের। এই চীৎকার ও অভিবাদন অবশ্য অনভ্যস্তদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে, কিন্তু কালক্রমে হয়ত আর অদ্ভুত লাগিবে না।

—

বাংলা দেশের রাজনীতি

এই মাসে কয়েক দিন পরেই দিনাজপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ইহা কংগ্রেসের নিয়ম অনুসারে হইবে। এই উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে হইতে আমাদের মনে হইয়াছে, যে, বাংলা দেশে রাজনৈতিক-মতিবিশিষ্ট (পোলিটিক্যালি মাইণ্ডেড্) লোকদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রধান প্রধান মত এখন একই রকম হইয়া গিয়াছে। আগে কংগ্রেসের সভ্য এবং অগ্রসর উদারনৈতিকদের মধ্যে একটা প্রধান প্রভেদ এই ছিল, যে, উদারনৈতিকেরা অসহযোগ ও অহিংস আইনলঙ্ঘনে যোগ দিতে সম্মত ছিলেন না। এখন অসহযোগ ও অহিংস আইনলঙ্ঘন স্থগিত হওয়ায় অগ্রসর সব দলের রাজনৈতিকদের মত প্রায় এক ধাঁচের হইয়াছে। অন্য অনেক প্রদেশে কংগ্রেসের গোঁড়া দলের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতি সম্বন্ধে কংগ্রেসসভ্যদের মধ্যে মতভেদ যেরূপই থাক, বঙ্গে বাঁটোয়ারাবিরোধী দলই যে স্পষ্টতঃ সংখ্যাভূয়িষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গের মুসলমানেরা অবশ্য বাঁটোয়ারাটার পক্ষে।

বঙ্গে রাজনৈতিক মতের অবস্থা এইরূপ হওয়ায় আমাদের মনে হইয়াছিল, যে, সব দলের লোকদের একটা ঘরোয়া সামাজিক-গোছের সম্মেলন হইলে মন্দ হইত না। ইহাতে বক্তৃতা হইতে পারিত, কিন্তু কোন প্রস্তাব ধার্য্য করিবার বা কোন প্রকার ভোট লইবার প্রয়োজন হইত না। দিনাজপুরে যে সম্মেলন হইতেছে তাহার পরিবর্ত্তে এরূপ সম্মেলন হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমরা বলিতেছি না। ইহা "অধিকন্তু" হইতে পারিত, এই রূপ বলাই আমাদের অভিপ্রায়।

—

বঙ্গে সৈনিকদের ব্যয়

আমরা এই মাসের বিবিধ প্রসঙ্গে আগে দেখাইয়াছি, যে, বাংলা দেশ ভারতীয় সৈন্যদলের জন্য অনেক টাকা দিয়া থাকে, কিন্তু তাহা হইতে লাভবান হয় না। শুধু তাই নয়। দেখা যাইতেছে, বঙ্গে সন্ত্রাসক দলের দমন ও তাহাদের বিভীষিকা-পন্থার উচ্ছেদসাধনের জন্য যে-সব সৈন্যদল বঙ্গের নানা স্থানে রাখা হইয়াছে, তাহাদের জন্য পুনর্ব্বার বাংলা দেশকে টাকা দিতে হইতেছে। তাহা কেন হইবে?

ভারতবর্ষের সৈন্যদলের কতক দল বহিরাক্রমণ নিবারণের জন্য এবং কতক দল আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য। কোথায় কখন আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য কত সৈন্য রাখিতে হইবে, তাহার ফর্দ্দ এক-এক অঞ্চলের সেনাপতিকে প্রস্তুত করিতে হয়। পঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, বালুচিস্থানে, প্রভৃতিতে, যে-সব সৈন্যদল থাকে, তাহা কেবল বহিরাক্রমণ নিবারণের জন্য নহে, আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্যও বটে। কিন্তু তাহার জন্য ত ঐ ঐ স্থানের প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টগুলিকে স্বতন্ত্র টাকা দিতে হয় না, ভারত-গবর্ন্মেণ্টই সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। অথচ ঐ সব প্রদেশ হইতে সিপাহী, সিপাহীদের অনুচর, রসদ প্রভৃতি সংগৃহীত হয় বলিয়া তাহারা লাভবানও হইয়া থাকে। বাংলা দেশ কেবল টাকা দেয়, লাভবান কোন প্রকারে হয় না, অথচ বাংলা দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্যদল দরকার হইলে পুনর্ব্বার টাকা খরচ করিতে হয়। বঙ্গের প্রতি গ্রহ অপ্রসন্ন।

এ-বিষয়ে প্রমাণাদি কেহ জানিতে চাহিলে বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত "Cost of the troops in Bengal" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িতে পারেন।

—

মনুসংহিতার নূতন সংস্করণ!

রাজনৈতিক হিসাবে অনগ্রসর ও সামাজিক মর্য্যাদায় হীন বলিয়া বঙ্গের কতকগুলি জাতিকে গবর্ন্মেণ্ট একটা তপশীলভুক্ত করেন। তাহাতে বাগদী, ভুঁইমালী, ধোবা, হাড়ী, জেলে কৈবর্ত্ত, ঝালোমালো, কালোয়ার, কপালী, খণ্ডাইত, কোনোয়ার, লোহার, মালা, মুচী, নাগর, নমঃশূদ্র, নাথ, নুনিয়া, ওরাওঁ, পোদ, পুণ্ড্রী, রাজবংশী, সাঁওতাল, সাগ্দিপেশা, শুঁড়ী ও সুকলীরা তপশীলভুক্ত হইতে আপত্তি করেন। কিন্তু প্রতিবাদ সত্ত্বেও নিম্নলিখিত জাতিগুলিকে তপশীলভুক্ত করা হইয়াছে:—বাগদী, ভুঁইমালী, ধোবা, হাড়ী, জেলে কৈবর্ত্ত, মালো, কালওয়ার, লোহার, মাল্লা, মুচী, নমঃশূদ্র, নুনিয়া, ওরাওঁ, পোদ, রাজবংশী, সাঁওতাল শুঁড়ী।

প্রতিবাদ গ্রাহ্য করা গবর্ন্মেণ্টের উচিত ছিল। আমরা সবাই রাজনৈতিক হিসাবে অনগ্রসর। সুতরাং কাহাকেও রাজনৈতিক অগ্রসরতাহীন বলিলে অপমান হয় না। কিন্তু সামাজিক মর্য্যাদা প্রত্যেক জাতিরই অন্ততঃ তাহার নিজের কাছে আছে। অতএব, কেহ যদি সামাজিক মর্য্যাদায় হীন বলিয়া অভিহিত হইতে না-চায়, তাহা হইলে তাহাকে অধমশ্রেণীভুক্ত বলিবার অধিকার কাহারও নাই।

আমরা যদিও কাহাকেও অধমজাতীয় মনে করি না, তথাপি প্রবাসীর কোন-না-কোন লেখা উপলক্ষ্য করিয়া অনেক বার কোন-না-কোন লেখক কাহারও প্রতি সামাজিক হীনতা আরোপ করা হইয়াছে সন্দেহে প্রতিবাদ করিয়াছেন। গবর্ন্মেণ্ট যে অনেক জাতির লোককে সামাজিক হিসাবে অধম বলিতেছেন, তাহার প্রতিকার এই লেখকেরা করিবার চেষ্টা করুন।

—

বঙ্গে কাপড়ের কল

চিনির কারখানার সম্পর্কে যেমন বলিয়াছি, তেমনি কাপড়ের কল সম্পর্কেও বলি, বঙ্গের লোকসংখ্যা বেশী বলিয়া এখানে কাপড় বিক্রী হয় বেশী কিন্তু উৎপন্ন হয় কম। বাঙালীরা জেলায় জেলায় কাপড়ের কল স্থাপন করুন, এবং কৃষি-বিভাগের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া যেখানে যেখানে সম্ভব কাপাসের চাষ করুন।

—

বঙ্গে ফলের চাষ

ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল এবং আবশ্যক। দার্জ্জিলিঙ জেলা এবং পরোক্ষ ভাবে সিকিম বঙ্গের সামিল বলিয়া বঙ্গে শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বহুবিধ উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদিত হইতে পারে। বঙ্গের কৃষি-বিভাগ ও বঙ্গের জনসাধারণ—বিশেষতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা এ-বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করুন।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ
১ম } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ { ২য় সংখ্যা

শিখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাদশাহের হুকুম,—
সৈন্যদল নিয়ে এল আফ্রাসায়েব খাঁ, মুজফ্‌ফর খাঁ,
মহম্মদ আমিন খাঁ,
সঙ্গে এল রাজা গোপাল সিং ভদৌরিয়া,
উদইৎ সিং বুন্দেলা।

গুরদাসপুর ঘেরাই করল মোগল সেনা।
শিখদল আছে কেল্লার মধ্যে,
বন্দা সিং তাদের সর্দ্দার।
ভিতরে আসে না রসদ,
বাইরে যাবার পথ সব বন্ধ।
থেকে থেকে কামানের গোলা পড়ছে
প্রাকার ডিঙিয়ে,—
চারদিকের দিক্‌সীমা পর্য্যন্ত
রাত্রির আকাশ মশালের আলোয় রক্তবর্ণ।
ভাণ্ডারে না রইল গম, না রইল যব,
না রইল জোয়ারি ;—
জ্বালানি কাঠ গেছে ফুরিয়ে।

কাঁচা মাংস খায় ওরা অসহ্য ক্ষুধায়,
কেউবা খায় নিজের জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে।
গাছের ছাল, গাছের ডাল গুঁড়ো ক'রে
তাই দিয়ে বানায় রুটি।

নরক যন্ত্রণায় কাটল আট মাস।
মোগলের হাতে পড়ল
গুরদাসপুর গড়।
মৃত্যুর আসর রক্তে হোলো আকণ্ঠ পঙ্কিল।
বন্দীরা চীৎকার করে
"ওয়াহি গুরু, ওয়াহি গুরু,"
আর শিখের মাথা স্খলিত হয়ে পড়ে
দিনের পর দিন।

নেহাল সিং বালক ;
স্বচ্ছ তরুণ সৌম্যমুখে
অন্তরের দীপ্তি পড়েছে ফুটে'।
চোখে যেন স্তব্ধ আছে
সকাল বেলার তীর্থযাত্রীর ভজন গান।
সুকুমার উজ্জ্বল দেহ,
দেবশিল্পী কুঁদে' বের করেছে
বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে।
বয়স তার আঠারো কি উনিশ হবে,
শাল গাছের চারা,
উঠেছে ঋজু হয়ে
তবু এখনো হেলতে পারে দক্ষিণের হাওয়ায়।
প্রাণের অজস্রতা
দেহে মনে রয়েছে
কানায় কানায় ভরা।

বেঁধে আনলে তাকে।
সভার সমস্ত চোখ
ওর মুখে তাকাল বিস্ময়ে করুণায়।
ক্ষণেকের জন্যে
ঘাতকের খড়্গ যেন চায় বিমুখ হোতে।
এমন সময় রাজধানী থেকে এল দূত,
হাতে সৈয়দ আবহুল্লা খাঁয়ের
স্বাক্ষর-করা মুক্তিপত্র।

যখন খুলে দিলে তা'র হাতে বন্ধন
বালক সুধালো, আমার প্রতি কেন এই বিচার ?
শুনল, বিধবা মা জানিয়েছে
শিখধর্ম্ম নয় তার ছেলের,
বলেছে, শিখেরা তাকে জোর ক'রে রেখেছিল
বন্দী ক'রে।

ক্ষোভে লজ্জায় রক্তবর্ণ হোলো
বালকের মুখ।
ব'লে উঠল,—"চাই নে প্রাণ মিথ্যার কৃপায়,
সত্যে আমার শেষ মুক্তি,
আমি শিখ।"

নববর্ষ
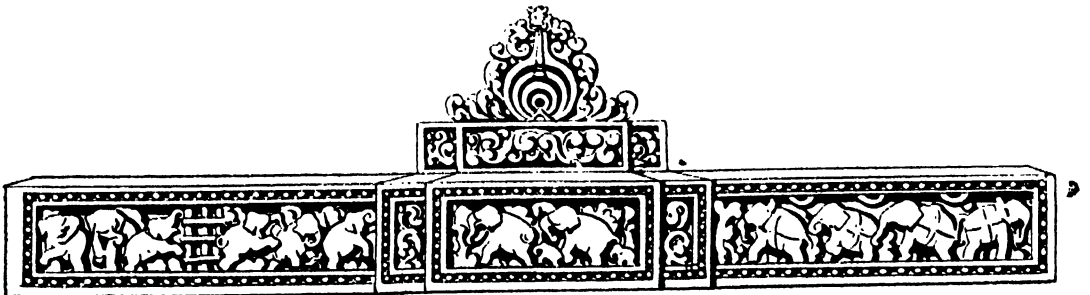
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের মাহাত্ম্য প্রভাতের সূর্য্যের মতো। দিগন্ত তার সম্মুখে বহুদূরে, আলোর মতো সে দূরে প্রসারিত। মানুষের জীবনযাত্রা বর্ত্তমান জীবনকে অতিক্রম ক'রে চলে, তার সঞ্চয় অজানা অধিকারীদের জন্য। মানুষের মধ্যে যাঁরা মহত্তম তাঁরা বাস করেন অনাগত কালে, তাঁরা প্রস্তুত করেন ভাবী যুগের আশ্রয়। বলব না যে তাঁদের জীবন দুঃখ থেকে মুক্ত। দুঃখ তাঁদের জীবনে সৃষ্টির অগ্নি, তাই নিয়ে চিরজীবনের সম্পদ মানুষের জন্য তাঁরা রচনা করেন, যেমন গাছ করে আপন অন্তরে সূর্য্যের তাপসঞ্চয়; সূর্য্যালোককে মজ্জাগত ক'রে ফলে ফুলে নিজেকে বিকশিত করাই তার তপস্যা। মানুষের সংসারে দুঃখ আছে, তার এই তাপের প্রয়োজন আপনার জগৎ নির্ম্মাণের জন্যে, আপনার মধ্যে আপনাকে পরিণতি দেবার জন্যে। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা সেই দুঃখকে তেজরূপে মর্ম্মের মধ্যে সঞ্চিত ক'রে জীবনকে শস্যসম্পদে ফলবান করেন, সেই সম্পদ দান করেন এমন সকল মানুষকে, যারা তাঁদের জানাও না, এখনও যারা আসে নি।

জীবজন্তু খুশি থাকে সদ্য পাওনা চুকিয়ে নিয়ে। কিন্তু মানুষের তো সেই সদ্য লাভই সব নয়, মানুষের শেষ কথা হচ্ছে প্রকাশ যা অধুনাতনকে উত্তীর্ণ হয়ে বিরাজ করে। শুধু লাভ-লোকসানের কথা যেখানে, মানুষ সেখানে বদ্ধ হয়, তার পরিচয় হয় বিকৃত, তার মূল্য চলে যায়। মানুষ বলেছে লাভ তুচ্ছ। কতবার সে বলেছে মান যদি না থাকে তবে যাক্ আমার প্রাণ। কী তার সে সম্মান? সে তো টাকার থলির মধ্যে নেই, দেনাপাওনার হিসাবের মধ্যে নেই, আছে আত্মার গৌরবে। যেখানে তার অহং প্রবল হয়েছে সেখানেই তার প্রকাশ অবরুদ্ধ। অথর্ব্ব বেদে বলেছেন—

> আবি র্বৈ নাম দেবতর্তে'নাস্তে পরীবৃতা
> তস্যারূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ।

দেবতার নাম হচ্ছে আবিঃ,—প্রকাশ—যার দ্বারা সমস্ত পরিবৃত, তাঁরই রূপের দ্বারা গাছগুলি সবুজ হয়ে উঠেছে, পরেছে সবুজের মালা।

সঞ্চয় করতে হবে, রক্ষা করতে হবে এ হ'ল জন্তুর কথা—আত্মা আবিঃ, তার কাজ আপনাকে প্রকাশ করা, আপনার রূপ সৃষ্টি করা।

> অন্তি সন্তং ন জহাতি,
> অন্তি সন্তং ন পশ্যতি,
> দেবস্য পশ্য কাব্যং
> ন মমার, ন জীর্য্যতি।

তিনি কাছে আছেন, তাঁকে ছাড়া যায় না, তিনি কাছে আছেন, তাঁকে দেখা যায় না। দেখো সেই দেবতার কাব্য, যে কাব্য না মরে না জীর্ণ হয়।

ঋষি বলছেন, যিনি অত্যন্ত কাছে আছেন, তাঁকে দেখবার জো নেই। কিন্তু দেখতেই যদি হয় তবে তাঁকে দেখা যাবে তাঁরই কাব্যে, কেন না তিনি যে প্রকাশ-স্বরূপ— তাঁর প্রকাশ অমর, তাঁর প্রকাশ অজর।

> অপূর্ব্বেণেষিতা বাচস্
> তা বদন্তি যথাযথম্
> বদন্তীর্যত্র গচ্ছন্তি
> তদাহু ব্র'হ্মণং মহৎ।

অপূর্ব্বের দ্বারা প্রেরিত হচ্ছে সৃষ্টির বাক্য, সেই বাক্যগুলি যথাযথ বলছে, বলতে বলতে যেখানে তারা যাচ্ছে সেইখানেই আছেন মহদ্‌ব্রহ্ম। তাঁর প্রেরিত বাক্য যথাযথ সত্যের সঙ্গে প্রকাশ করছে যাঁকে, তিনিই আবিঃ, তিনিই প্রকাশাত্মক ব্রহ্ম। অপূর্ব্বের দ্বারা প্রেরিত সেই সৃষ্টির বাক্য মানুষের আত্মায় যদি আবির্ভূত হয় তবে সে আপনাকে বিচিত্র আনন্দ রূপে প্রকাশ করে, এই তার চরম কাজ, আহার বিহার সংগ্রহ সঞ্চয় নয়। মানবাত্মার সেই যে প্রকাশ যা অপূর্ব্ব, যা অজর, যা অমর, এই আশ্রমে আমাদের তপস্যায় আমরা তাকেই সম্মান দিয়েছি। কোন্ সন্ন্যাসী এই প্রকাশের

বাণীকে অনাদরে অবরুদ্ধ করতে চায়? বসন্তের বাতাসে উদ্ভিদের প্রাণলোকে প্রকাশের প্রেরণা সর্ব্বত্র, তারই প্রাচুর্য্য বিচিত্র বর্ণে গন্ধে অরণ্যে অরণ্যে আপনাকে ঘোষণা করছে। অন্তহীন দেশে কালে সৌন্দর্য্যের এই যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য, একে কোন্ উদাসীন অবজ্ঞা করবে? বিশ্বের মর্ম্মস্থলে আছেন যে আবিঃ তাঁরই নব নব শোভাময় আবির্ভাবকে অসম্মান করার দ্বারা তপঃসাধনের কঠোরতাকে যদি জয়ী করতে চাই তবে সেই অবলুপ্ত প্রকাশকে নিয়ে মানুষের কিসের গৌরব? ধরণীতলে মরুভূমিই কি তপস্বী? জীবনকে রসহীন মরুক্ষেত্র ক'রে রাখব এই কি সাধনা? উদ্ধার করতে হবে মরুকে বিচিত্র রূপময়ী সফলতার পথে—পৃথিবী তো মানুষের কাছ থেকে এই সঙ্কল্পই প্রত্যাশা করে, কেন না মানুষের আত্মা আবিঃ, সে যে আপনার সৃষ্টিতেই আপনাকে প্রকাশ করে, আহার-বিহারের স্বচ্ছন্দতায় নয়। মানুষ হয়েছে কবি, মানুষ হয়েছে শিল্পী, জন্তুরা হয় নি। দেবতার মতোই মানুষও সেই কাব্যেই আপনার পরিচয় দিতে চায় যা "ন মমার, ন জীর্য্যতি।" নিত্য ব্যবহারের দ্বারা ম্লান ও মূল্যহীন হয় না যার সৌন্দর্য্য, যার মহিমা।

গ্রীসের ইতিহাস যখন প্রাণবান ক্রিয়াবান ছিল তখন সে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, তখন নিশ্চয় সে জীবিকা-সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল, ধন উৎপাদন করেছে, অর্জ্জন করেছে, সঞ্চয় করেছে, কিন্তু সেই সাম্রাজ্যবিস্তারে বিষয়-ব্যাপারে সেই ধন সংগ্রহে তার ঐশ্বর্য্যের প্রমাণ হয় নি। গ্রীসের প্রকাশস্বরূপ আত্মা যেখানে শিল্পে কাব্যে বিজ্ঞানে দর্শনে আপনাকে যথাযথ প্রকাশ করতে পেরেছে সেইখানেই তার কীর্ত্তি "ন মমার, ন জীর্য্যতি।" সেইখানে সে আত্মদা, আপনাকে দান করে গেছে সকল যুগের সকল মানুষের কাছে, সেইখানে গ্রীসের আত্মা সর্ব্বমানবের আত্মার মধ্যে সজীব সক্রিয়। আজ ইংলণ্ড পৃথিবীর সকল মহাদেশ জুড়ে আপন সাম্রাজ্যের পত্তন করেছে; তার বাণিজ্যের জাল প্রসারিত সকল সমুদ্রেরই কূলে কূলে; ভাবী কালে এক দিন এই সমস্ত প্রভূত জটিল ব্যাপারের কাহিনীমাত্র থাকবে, কিন্তু এর প্রেরণা থাকবে না, সে থাকবে মানুষের কানে কিন্তু তার প্রাণে নয়, যেমন আছে সেকেন্দর শাহের দেশবিজয়ের সংবাদ, যেমন আছে প্রাচীন ফিনিসীয়দের বাণিজ্যবার্ত্তা; কিন্তু ইংলণ্ডের আত্মা যেখানে আপন সাহিত্যে আপনাকে প্রকাশ করেছে সেখানেই সে থেকে যাবে মানুষের আত্মায়, কেবল তার কথায় নয়।

সুন্দরকে অবজ্ঞা করার শিক্ষা আজ এ দেশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। যে অসুন্দরে প্রকাশের পূর্ণতা ভ্রষ্ট হয়, তাকে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বরণ করবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে; দারিদ্র্যের অনুকরণ করাকে কর্ত্তব্য ব'লে মনে করছি; ভুলে যাচ্ছি দারিদ্র্যের বাহ্য ছদ্মবেশে আত্মার অবমাননা করা হয়। ঐশ্বর্য্যই বীরের। ঐশ্বর্য্য মহৎ, ঐশ্বর্য্য দাস নয়; ঐশ্বর্য্যকে ভোগ করতে অবজ্ঞা করে বীর, কারণ ভোগ করতে চায় লুব্ধ, বুভুক্ষু। যে ভোগাসক্ত সে দীনাত্মা।—কিন্তু ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করতে চায় বীর্য্যশালী, নির্লোভ নিরাসক্ত মনে। তাজমহলে প্রকাশ পায় সেই শাজাহান যে চিরকালের মতো নিরাসক্ত, যে সৌন্দর্য্যের তপস্বী। তাকে দীনতম দীনও ঈর্ষা করবে না, তার সৃষ্টির আনন্দে আনন্দিত হবে, জীর্ণ কুটীরবাসীও তার কীর্ত্তির ঐশ্বর্য্যকে আপনার ব'লে স্বীকার করবে। সংখ্যা গণনা করলে পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই বাক্যদীন, শিক্ষার অভাবে শক্তির অভাবে বাক্যের দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করতে জানে না; সেই বাক্যদৈন্যের সাধনাকেই যদি তাদের প্রতি মমতা প্রকাশের উপায় ব'লে গণ্য করি তবে সেই দীনদেরই সকলের চেয়ে বঞ্চিত করা হবে। যে-ভাষার ঐশ্বর্য্য কাব্যে মহাকাব্যে মহানাটকে, বাণীর সেই ঐশ্বর্য্যক্ষেত্রেই বাক্যদীনদের আনন্দ-সত্র। স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, চিত্রকলায় সকল মানুষই প্রকাশ-দীপ্তির আনন্দ পায়, সৃষ্টিশক্তিতে সে নিজে যতই অকৃতী যতই নিষ্প্রতিভ হোক। দেশের প্রতিভা দেশের প্রতিভা-দীনের প্রতি করুণা দেখাবার জন্যে যদি প্রকাশের ঐশ্বর্য্যকে খর্ব্ব করে, তবে সে ঐ দরিদ্রদেরই অপমানিত করে, কারণ তাদের ব্যবহারে এই কথাই বলা হয় যে সৃষ্টিকর্ত্তা মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ দীনদের জন্যে নয়, যেমন অবজ্ঞার সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু ব'লে থাকে তাদের পূজার দেবতা তাদের পূজার দেবমন্দির হরিজনদের জন্যে নয়। দেবতা যেমন সর্ব্ববর্ণনির্ব্বিশেষে সকল মানুষেরই, শিল্পৈশ্বর্য্যের প্রকাশও

তেমনই সকল মানুষেরই। তাকে বোঝবার স্বীকার করবার শিক্ষা অবস্থানির্ব্বিশেষে সকলেরই হোক এই কথাটাই বলবার যোগ্য। শোনা যায় এস্কিলস সফোক্লিস্ য়ুরিপিডীস প্রমুখ মহৎ প্রতিভাবান নাট্যকারদের নাটক এথেন্সের সর্ব্বসাধারণের জন্যেই অভিনীত হয়েছে—সর্ব্বসাধারণের প্রতি এই হচ্ছে যথার্থ সম্মান প্রকাশ। তাদের প্রতি দয়া করে নাটকের রচনাকে যদি দরিদ্র করা হ'ত তবে সেই গর্ব্বোদ্ধত দারিদ্র্য সাধনার প্রতি সর্ব্বকালের অভিশাপ বর্ষিত হ'ত।

ঋষি কবি বলেছেন—

পরিদ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্
উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।

আমি সমস্ত দ্যুলোক ভূলোক ভ্রমণ ক'রে এসে দাঁড়ালুম প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

সেই প্রথমজাত অমৃত তো আজও জরাজীর্ণ হয় নি, জলে স্থলে আকাশে তার ঐশ্বর্য্য তো বিচিত্ররূপে প্রকাশমান। আদিকালের সেই প্রথমজাত অমৃতই তো মানুষের আত্মায় "অপূর্ব্বেণেষিতা বাচস্" অপূর্ব্বের দ্বারা প্রেরিত বাণী, তার প্রকাশ তো আজও নব নব আনন্দরূপে উদ্ভাবিত হয়ে মানুষকে সর্ব্বোচ্চ গৌরবে মহীয়ান্ করেছে। এই আবিকে এই সুন্দরকে এই আনন্দকে ঈর্ষ্যা ক'রে আমরা যদি তার প্রতি বিমুখ হই তবে আমাদের জীবন মূঢ় অদৃষ্টের পায়ের তলায় শিকলে বাঁধা হয়ে কাটবে শুধুমাত্র খেয়ে প'রে। আমরা যে সৃষ্টিকর্ত্তার সরিক, আমাদের আত্মা যে প্রকাশ-স্বরূপ এই কথাই আজ নববর্ষে আমরা যেন স্বীকার করতে পারি।*

শান্তিনিকেতন, ১লা বৈশাখ ১৩৪২।

* শান্তিনিকেতন-মন্দিরে নববর্ষে আচার্য্যের উপদেশ। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার প্রেরিত দুখানা প্যাম্ফ্‌লেট্ শেষ ক'রে তোমাকে লিখতে বসলুম। মাদ্রাজ থেকে তোমাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছি, বোধ হয় পেয়েছ।

...হাসি পায় মনে করলে যখন ভাবি এই সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রনেতারা সমস্ত দেশ জুড়ে বক্তৃতামঞ্চে কংগ্রেসের উত্তেজনা বিস্তার ক'রে বেড়াচ্ছেন, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু কী স্তূপাকার অবাস্তবতা, কৃত্রিমতা। এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের অনৈক্য কেবল ভাষাগত নয়, স্থানগত নয়, মজ্জাগত। পরস্পরের মানব সম্বন্ধ কেবল যে শিথিল তা নয়, অনেক স্থলেই বিরুদ্ধ। আমরা ভোটের ভাগবিভাগ নিয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়েছি, যেন অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলেও ভোটের সামঞ্জস্যে এই ফাটলধরা দেশের সর্ব্বনাশ নিবারণ করতে পারবো। আজকাল আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিকভাবে দেখবার চেষ্টা করি; মরবার কারণ যেখানে আছে সেখানে মরা অনিবার্য্য—এর চেয়ে সহজ কথা কিছুই নেই। পার্লামেণ্টরি রাষ্ট্রতন্ত্র! এ কি বিলিতি দাওয়াইখানা থেকে ভিক্ষে করে আনলেই তখনই আমাদের ধাতের সঙ্গে মিলে যাবে! নিয়ুয়র্কের আকাশ-আঁচড়া বাড়ি আমাদের পলিমাটির উপর বসিয়ে দিলে সেটা তার অধিবাসীদের কবর হয়ে উঠবে। সাদা কাগজের মোড়কে আমাদের ভাগে কী দান কী পরিমাণে এসে পৌছল সেটা বেশী কথা নয়, যাকে দেওয়া হচ্ছে তারই পাঁচ

আঙুলের ফাঁক দিয়ে গ'লে গিয়ে কতটা টেঁকে সেইটেই ভাব্‌বার বিষয়। হয়ত ইংরেজের এই দানের সঙ্গে বিষয়বুদ্ধিও আছে। জগৎ জুড়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘূর্ণি বাতাস জেগে উঠছে তাতে ভারতবর্ষের মন না পেলে ভারতবর্ষকে শেষ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করা সম্ভব হ'তে পারে না। যাই হোক্, লুব্ধতা স্বভাবে প্রবল থাক্‌লে সুবুদ্ধির দূরদর্শিতা কাজ করতে পারে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস য়ুরোপের অন্য যে-কোনো জাত, এমন কি আমেরিকান কর্ত্তা হ'লে ভারতবর্ষের গলার ফাঁসে আরও লাগাত জোর—নিজেদের নির্ম্মম বাহুবলের 'পরেই সম্পূর্ণ ভরসা রাখত। আমাদের তরফে একটা কথা বলবার আছে, ইংরেজের শাসনে যতই দাক্ষিণ্য থাক্ আজ পর্য্যন্ত না মিল্‌ল আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা, না জুট্‌ল যথেষ্ট পরিমাণে পেটের ভাত, না ঘট্‌ল স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। শাসনতন্ত্রের কাঠামো রক্ষা করতেই পুঁজি শেষ হয়ে আসে, প্রজাদের মানুষ ক'রে তুলতে হাতে কিছুই থাকে না। এই ঔদাসীন্য আমাদের শতাব্দী ধরে হাড়ে মজ্জায় জীর্ণ ক'রে দিলে। আমাদের পাহারা আছে আহার নেই এমন অবস্থা আর কত দিন চলবে? অথচ ওদের নিজের দেশে প্রজার অন্নাভাব সম্বন্ধে ওদের কত চিন্তা কত চেষ্টা। কেননা ওরা ভাল করেই জানে আধপেটা অবস্থায় কোনো জাতের মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। আমাদের বেলায় সেই মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ওরা ছোট ক'রে নিয়েছে, তারই নির্ম্মমতা আমাদের সুদূর ভাবীকালকে পর্য্যন্ত অভিভূত ক'রে রেখেছে। তাই মনে হয় নিজেদের স্বভাবগত সমাজগত প্রথাগত সকল প্রকার দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও নিজের দেশের ভার যে-ক'রেই-হোক নিজেকেই নিতে হবে। পরের উপর নির্ভর ক'রে থাকলে দুর্ব্বলতাই বেড়ে চলে, তা ছাড়া ইতিহাসের আবর্ত্তমান দশাচক্রে অনন্তকাল ইংরেজের শাসন অচলপ্রতিষ্ঠ থাকতেই পারে না। নিজের ভাগ্য নানা ভুলচুক, নানা দুঃখ কষ্ট বিপ্লবের মধ্য দিয়েই নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা আমাদের পাওয়া চাই। সেই শিক্ষার আরম্ভ-পথ আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারেই আমি নিয়েছিলুম। য়ুরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়,—চিরদিনই চীনের মতো ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব, কী দুঃখ, কী অন্ধতা, কী শোচনীয় নিঃসহায়তা,—ব'লে শেষ করা যায় না। এইখানেই পুনর্ব্বার প্রাণসঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি, না পেয়েছি দেশের লোকের কাছ থেকে উৎসাহ, না পেয়েছি কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহায়তা। তবু আঁকড়ে ধরে আছি। দেশকে কোন্ দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার, ঐ গ্রামের কাজে। এত দিন পরে মহাত্মাজী হঠাৎ এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। তিনি মহাকায় মানুষ, তাঁর পদক্ষেপ খুব সুদীর্ঘ। তবু মনে হয় অনেক সুযোগ পেরিয়ে গেছেন—অনেক আগে সুরু করা উচিত ছিল, এ কথা আমি বার-বার বলেছি। আজ তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। স্পষ্ট না বলুন, এর অর্থ এই যে, কংগ্রেস জাতি-সংগঠনের মূলে হাত দিতে অক্ষম। যেখানে কাজের সমবায়তা স্বল্প সেখানে নানা মেজাজের মানুষ মিল্‌লে অনতিবিলম্বে মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে মরে। তার লক্ষণ নিদারুণ হয়ে উঠেছে। এই সম্মিলিত আত্মকলহের ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী কাজ কেউ করতে পারে না। আমার অল্প শক্তিতে আমি বেশি কিছু করতে পারি নি। কিন্তু এই কথা মনে রেখো পাবনা কন্‌ফারেন্স থেকে আমি বরাবর এই নীতিই প্রচার ক'রে এসেছি। আর শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এর সঙ্কল্পের মূল্য আছে, ফলের কথা আজ কে বিচার করবে? ইতি

১৫ নবেম্বর; ১৯৩৪ স্নেহানুরক্ত
শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

508 W. High Street,
Urbana, Illinois
U. S. A.

কল্যাণীয়েষু

অজিত, এখানে Mr. Vail নামে এক জন Unitarian

বাবু চন্দননগরে আসিয়াছেন, বক্তৃতা করিবেন, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে হইবে, এই আশাতে স্কুল হইতে বাটীতে আসিয়াই বই শ্লেট ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া ছুটিলাম পালপাড়াতে। আমি একা ছিলাম না, আমরা একটা দল বাঁধিয়া বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। পালপাড়ার হরিসভা আমাদের বাড়ি হইতে প্রায় আধ মাইল।

পালপাড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হরিসভার সম্মুখে রাস্তার উপর খুব বড় মেরাপ বাঁধা হইয়াছে, মেরাপের উপর সামিয়ানা ঢাকা। রাস্তার উপর দরমা পাতিয়া তাহার উপর সতরঞ্চ মাদুর প্রভৃতি পাতা। এক ধারে স্ত্রীলোকদিগের জন্য খানিকটা স্থান চিক দিয়া ঘেরা। আসরটি দেখিয়াই মনে হইল যেন যাত্রার আসর। হরিসভার ফটক লতাপুষ্পপত্র দ্বারা সাজান। ফটকের ঠিক সম্মুখে একটা টেবিল ও একখানা চেয়ার, টেবিলের উপর একটা রূপার গ্লাস, নিকটে একটা ছোট টুলের উপর একটা জলের কুঁজা। টেবিলের ডান দিকে ও বাঁ দিকে টেবিল হইতে দুই-তিন হাত দূরে দুই-তিনখানা করিয়া বেঞ্চ পাতা; সেই বেঞ্চের উপর দশ-পনর জন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ লোক বসিয়া, তিন-চারি জনের স্কন্ধে তানপুরা, কাহারও হাতে একতারা। দুই জনের কোলে খোল বা মৃদঙ্গ। বক্তার আসন শূন্য, কেশব বাবু তখনও সভাতে আসেন নাই, শুনিলাম, তিনি হরিসভার ভিতর বসিয়া আছেন।

আমরা যখন সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম, তখন সভা লোকে লোকারণ্য, কোথাও আর তিলধারণের স্থান নাই। যাহারা আসরে বসিবার স্থান পায় নাই, তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা বালক, আমাদের গতি কে রোধ করিবে? ভিড় ঠেলিয়া, ধাক্কা দিয়া এবং খাইয়া অবশেষে সেই বেঞ্চের কাছাকাছি গিয়া পঁহুছিলাম। তখন গায়কগণ চোখ বুজিয়া গান গাহিতেছিলেন

এস এস করি সবে নামসঙ্কীর্ত্তন।
নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভুর গুণানুকীর্ত্তন।
যে নামেতে মত্ত হয়েছিলেন সাধুগণ,
শিব শুক নারদ আদি হে,
ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি সবে হে,
ঈশা, মুসা, মহম্মদ হে,
নানক কবীর আদি সবে হে—

আমাদের বাটীতে একখানা "ব্রহ্মসঙ্গীত" ছিল, তাহাতে ঐ গানটি ছিল, সুতরাং গানটা আমাদের একরূপ মুখস্থই ছিল। বারংবার ঐ গানটি গীত হইতে লাগিল। গানটি শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বেই কেশব বাবু চারি জন ভদ্রলোকের সঙ্গে সভায় প্রবেশ করিলেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, হাসিমুখ, অথচ বেশ গম্ভীর, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু, বেশ সুন্দর গোঁফ, দাড়ি কামান; অতি সুন্দর মূর্ত্তি। সাদা ধুতি, সাদা লংক্লথের পিরাণ, লংক্লথের চাদর। পদে কিরূপ পাদুকা ছিল, তখন দেখিতে পাই নাই, পরে দেখিয়াছিলাম, নাগরা জুতা। তাঁহার সঙ্গে যে চার-পাঁচ জন লোক সভাস্থলে আসিলেন, পরে শুনিয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। নগেন্দ্র বাবুকে পরে আর কখনও দেখি নাই, শাস্ত্রী-মহাশয়ের সহিত পরে পরিচয় হইয়াছিল, সেকথা পরে বলিব।

কেশব বাবু সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন না, ধীর পদবিক্ষেপে আসিয়া চেয়ারের নিকটে চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। গান শেষ হইল, সভা নিস্তব্ধ, সূচিপতনের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে কেশব বাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া স্থির ভাবে বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আছে। কেশব বাবু নতমস্তকে হাতজোড় করিয়া—জানি না কোন্ অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করিলেন এবং টেবিলের উপরে একটা হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম কথাগুলি এখনও আমার মনে আছে। তিনি বলিলেন, "আমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু লোকে আমাকে বলে ব্রাহ্ম।" তাহার পর কি বলিয়াছিলেন মনে নাই। সেদিন বক্তৃতার বিষয় ছিল "শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিমার্গ।" তের-চৌদ্দ বৎসরের কিশোর আমরা সে বক্তৃতার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম, কেশব বাবুর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে লাগিল—সেই বিরাট নিস্তব্ধ সভাক্ষেত্র সেই একটি মানুষের কণ্ঠস্বরে যেন ভরিয়া গেল। কত লোকের চক্ষু হইতে বারিধারা ঝরিল, কেশব বাবুর বক্তৃতার বিরাম নাই, যেন ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল। বক্তৃতা করিতে করিতে পনর-কুড়ি মিনিট অন্তর জল পান করিতে লাগিলেন। তিনি যত বার জল পান করিলেন, তত

বারই এক জন ভদ্রলোক কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া গ্লাস পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, আলো জ্বালা হইল। তখন এসিটিলিন গ্যাস ছিল না। আলো জ্বালিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করা ছিল। এক বুক উঁচু একটা বাঁশের খুঁটি, তাহার ডগাটা প্রায় এক হাত চারিখানা করিয়া চেরা। তাহার উপর একখানা সরাতে আধ সরা তেল এবং প্রত্যেক সরাতে একটা সরিষার পুঁটুলি, সেই পুঁটুলির অগ্রভাগ—যে-অংশটা তৈলের উপরে ছিল সেই অংশটা জ্বালিয়া দেওয়া হইল। এইরূপ দশ-বারটা আলোকে সমস্ত সভাস্থল আলোকিত হইয়া উঠিল। বক্তার সম্মুখে টেবিলের উপর দুইটা সেজে বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইল।

কেশব বাবু বোধ হয় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইবা মাত্র সভাস্থল হরিধ্বনিতে বারংবার মুখরিত হইয়া উঠিল। বক্তৃতার পর নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল।

> মন একবার হরি বল,
> হরি হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল।
> জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি
> অনলে অনিলে হরি, হরি. হরিময় এই ভূমণ্ডল।

এই গানটি গাহিতে গাহিতে ভক্তের দল বাজারের দিকে গমন করিলেন। আমরা রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলাম।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সাক্ষাৎ লাভের দুই বৎসর কি দেড় বৎসর পরে আর এক জন মহাপুরুষের দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি জগদ্বিখ্যাত—

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব।

পরমহংসদেবকে একদিন চার-পাঁচ মিনিটের জন্য চোখের দেখা দেখিয়াছিলাম মাত্র। আমার পিতার এক মাতুল ৺অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামপুরে ওকালতি করিতেন। আমি কি একটা প্রয়োজনে তাঁহার বাসাতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার সময় একটা বাগানের নিকটে দেখিলাম যে দলে দলে লোক বাগানে যাতায়াত করিতেছে। মনে করিলাম যে ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কিছু দর্শনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, যে জন্য তথায় অত লোকসমাগম হইয়াছে। কৌতূহলবশতঃ এক জনকে সেই জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব ঐ বাগানে আসিয়াছেন, লোকে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছে। আমার ইচ্ছা হইল পরমহংস কিরূপ দেখিয়া আসি। তখন পরমহংস কাহাকে বলে, সে জ্ঞান আমার ছিল না। আমাদের বাটীতে একখানা পাতলা চটি বই ছিল, তাহার নাম "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের রচনাবলী।" সেই পরমহংসই যে এই পরমহংস তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, জনতার সহিত মিশিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। তখন বোধ হয় বেলা পাঁচটা। দেখিলাম একটা গাছতলায় এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন, একটু স্থূলকায়, দাড়ি-ছাঁটা, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অনেক লোক বসিয়া আছে। সকলেই নীরব, তিনি মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্ত্তী লোকের সহিত দুই-একটি কথা বলিতেছেন। অতি মৃদুস্বরে কথা হইতেছিল, আমি কিছুই শুনিতে পাইলাম না। যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় ভদ্রলোক। যুবক বালক এক জনকেও দেখিলাম না। তাই সাহস করিয়া আর অগ্রসর না হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি আমার নিকটবর্ত্তী একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরমহংস কোথায়?" তিনি সেই জনতার মধ্যে উপবিষ্ট দাড়ি-ছাঁটা লোকটিকে দেখাইয়া বলিলেন, "উনিই পরমহংস-দেব।" আমার সেই বয়সে আমি পরমহংসদেবের সহিত সাধারণ লোকের কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম না। চার-পাঁচ মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিলাম।

বাল্যকালে পরমহংসদেবকে দেখিয়া তাঁহার অসাধারণত্ব কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও পরে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য, জগদ্বিখ্যাত

বিবেকানন্দ স্বামীকে

দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, এক জন অসাধারণ মানুষকে দেখিলাম। স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার বৎসরেই হউক বা তাহার পর বৎসরেই হউক, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।

তাঁহার দর্শনলাভের পূর্ব্বেই শিকাগো ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে তিনি অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিয়া সমগ্র আমেরিকাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা একাধিক বার পড়িয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমার অতি উচ্চ ধারণা হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের অপর পারে বালীতে আমার শ্বশুরালয়। একদিন শ্বশুরবাটীতে গিয়া শুনিলাম যে, সেই দিন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ৺পরমহংসদেবের আবির্ভাব অথবা তিরোভাব উপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে। বিবেকানন্দ স্বামীর তথায় আসিবার কথা আছে। স্বামীজী কালীবাড়িতে আসিবেন শুনিয়াই আমি তথায় যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম, আমার সমবয়স্ক পাঁচ-সাত জন সঙ্গী জুটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া একখানা নৌকা করিয়া কালীবাড়িতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সে সুপ্রশস্ত অঙ্গন লোকে লোকারণ্য। বাঙালী অপেক্ষা মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীর সংখ্যাই অধিক বলিয়া মনে হইল। শুনিলাম যে স্বামীজী তখনও আসেন নাই, তবে আসিবেন, ইহা নিশ্চিত। আমি বন্ধুবর্গসহ নাট-মন্দিরে উঠিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলাম। নাট-মন্দিরের মধ্যস্থলে একটা ছোট গালিচা পাতা ছিল, বুঝিলাম যে, সেই আসন স্বামীজীর জন্য রিসার্ভড্ রাখা হইয়াছে। আমি গালিচা হইতে কিছু দূরে বসিয়া রহিলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে, বাহিরে হঠাৎ একটা হৈ হৈ শব্দ উঠিল—'পরমহংস রামকৃষ্ণজীকা জয়" "স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজকী জয়" ধ্বনিতে সেই প্রাঙ্গণ বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, বুঝিলাম স্বামীজী আসিতেছেন।

মনে করিয়াছিলাম, স্বামীজী সন্ন্যাসী, হয়ত ধীরগম্ভীর ভাবে, মৃদু পদক্ষেপে নাট-মন্দিরে আগমন করিবেন। কিন্তু আমার ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া যিনি নাট-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাতে ধীরতা বা গাম্ভীর্য্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। উদ্দাম চঞ্চল বালকের মত যেন অস্থির ভাবে তিনি নাট-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা বাহিরে জয়ধ্বনি শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। স্বামীজী নাট-মন্দিরে প্রবেশ করিবা মাত্র আমরা তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মুগ্ধ হইলাম, তেমন উজ্জ্বল আয়ত-লোচন আর কাহারও দেখি নাই। মুখে হাসি। স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে সাধারণতঃ যেরূপ উষ্ণীষ ও আপাদলম্বিত আলখাল্লা-পরিহিত মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামীজী ঠিক সেইরূপ পোষাকই পরিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও পাঁচ-সাত জন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচ্ছদও স্বামীজীর পরিচ্ছদের অনুরূপ। তাঁহারাও বেশ সুশ্রী, উন্নত ললাট, গৌরবর্ণ, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় তাঁহারাও ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান, বিদ্বান। কিন্তু স্বামীজীর চক্ষুর মত অত উজ্জ্বল চক্ষু কাহারও দেখিলাম না। স্বামীজীর পার্শ্বে তাঁহাদিগকে যেন একটু নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হইল।

নাট-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই স্বামীজী যাহা করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইলাম, মনে মনে একটু যে গর্ব্বও অনুভব করি নাই তাহা নহে। স্বামীজীকে দেখিয়া সকলেই করজোড়ে ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল, তিনি এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীরাও প্রতিনমস্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় প্রায় আদ-দশ হাত দূর হইতে তাঁহার সহিত আমার দৃষ্টি-বিনিময় হইবা মাত্র তিনি আমাকে নমস্কার করিয়াই একেবারে আমার নিকটে আসিলেন। আমার বন্ধুরা মনে করিলেন যে স্বামীজীর সহিত হয়ত আমার পূর্ব্বপরিচয় ছিল। কিন্তু সেই একদিন ব্যতীত আমি আর কখনও তাঁহাকে দর্শন করি নাই। তবে তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য আমার মনে এক এক সময় প্রবল ইচ্ছা হইত। জানি না, আমাকে দেখিবা মাত্র তিনি আমার সেই প্রবল আগ্রহের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না।

তিনি উপবেশন করিলে আমরাও উপবেশন করিলাম। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু কি কথা বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আজ এখানে বক্তৃতা করিবেন কি?" তিনি বলিলেন, "এ ভীষণ ভীড়ে বক্তৃতা করা অসম্ভব। করিলেও সকলে তাহা হয়ত শুনিতে পাইবে না।" স্বামীজীর সহিত আমার এই প্রথম বাক্যালাপ এবং বোধ হয় ইহাই শেষ। কারণ সেদিন তাঁহার সহিত আর কোন কথা হইয়াছিল কি না আমার

মনে নাই। স্বামীজী সেই নাট-মন্দিরে বোধ হয় কুড়ি মিনিট বসিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বোধ হয় দুই বার কি তিন বার তিনি মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া আবার বন্ধন করিয়াছিলেন। সমস্ত ক্ষণ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন এবং চঞ্চল শিশুর মত ছট্‌ফট করিতেছিলেন। তাঁহার সেই চঞ্চল ভাব দেখিলেই মনে হইত যেন একটা অদম্য শক্তিকে তিনি আপনার মধ্যে দমন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আর সেই শক্তি যেন বাহিরে ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসীরা কিন্তু ধীর, স্থির, গম্ভীর।

স্বামীজী নাট-মন্দির হইতে বাহির হইয়া গুরুস্থান অভিমুখে অর্থাৎ পরমহংসদেবের অধ্যুষিত কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জনতা সেইদিকে ধাবিত হইল। আমার সঙ্গীরা আর সেই জনতার মধ্যে যাইতে সম্মত না হওয়াতে আমরা বালী প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। শ্বশুরবাড়িতে (বালীতে) ফিরিয়া আসিবার পর এক মজার ব্যাপার হইয়াছিল, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমার শ্বশুরমহাশয়ের মাতামহীর ভগিনী তখন জীবিত ছিলেন, তাঁহার বয়স তখন বোধ হয় আশী বৎসরের কাছাকাছি হইলেও তিনি বেশ শক্ত ছিলেন। তিনি বাটীর গৃহিণী ছিলেন। রাত্রিতে আমরা আহার করিতে বসিয়াছি, এমন সময় আমার বড় শ্যালক (তিনিও আমাদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন) বলিলেন, "বিবেকানন্দ স্বামী যোগিনকে দেখিয়াই উহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন: আমরা মনে করিয়াছিলাম, বোধ হয় যোগিনের সঙ্গে তাহার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল।" সেই কথা শুনিয়াই বৃদ্ধা সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, "নমস্কার করবে না? হলেই বা বিবেকানন্দ। কুলীনের ছেলের মান রাখবে না? যোগিনকে নমস্কার করেছে একি বেশী কথা নাকি?" বলা বাহুল্য, তিনিও কুলীনের কন্যা, কুলীনের বধূ। সেকালের লোকের মনে কৌলীন্য গর্ব কিরূপ প্রবল ছিল তাহা তাঁহার এ-কথাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

যখন ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকদিগের কথা লইয়া আমার এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি তখন

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

মহাশয়ের কথাও বলি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কেশব বাবুর সঙ্গে শাস্ত্রী-মহাশয়ও পালপাড়ার হরিসভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু কেশব বাবুর সহচরগণের মধ্যে কে যে শিবনাথ শাস্ত্রী, তাহা তখন জানিতে পারি নাই। যখন কেশব বাবুকে দেখিয়াছিলাম, তাহার বোধ হয় তিন-চারি বৎসর পরে শাস্ত্রী-মহাশয়কে চন্দননগরে দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলাম। চন্দননগরের ষ্টেশন রোডের উপরে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে। এখন, "আছে" না বলিয়া "ছিল" বলাই বোধ হয় সঙ্গত, কারণ এখন উহা না থাকার মধ্যে। কিন্তু আমাদের বাল্য ও যৌবনে এই ব্রাহ্ম-সমাজের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। প্রতি রবিবারে অনেক-গুলি ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর সমাজ-গৃহে সমবেত হইতেন, উপাসনা, গান, সংকীর্ত্তন হইত, আমরাও মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া বসিতাম এবং সকলকে চক্ষু মুদিত করিতে দেখিয়া আমরাও চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিতাম এবং মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতাম যে, আর কেহ চাহিয়া আছেন কি না। সেই ব্রাহ্মসমাজের একবার মাঘোৎসবের সময় শাস্ত্রী-মহাশয় বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। কেন জানি না,—বোধ হয় স্থানাভাবের আশঙ্কায়, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাঙ্গণে বক্তৃতার ব্যবস্থা না হইয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী হাসপাতালের মাঠে বক্তৃতার স্থান নির্দ্ধারিত হইয়া-ছিল। কিন্তু সেখানে বক্তৃতা হওয়াও বোধ হয় বিধাতার অভিপ্রেত ছিল না, তাই সেই মাঠে বক্তৃতা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন অগত্যা সকলে নিকটবর্ত্তী বাজারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। শাস্ত্রী-মহাশয়ও বাজারে গিয়া আশ্রয় লইলেন। বাজারের মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় খোলার ঘর ছিল। সেগুলি ঠিক ঘর নহে, খোলার দ্বারা আচ্ছাদিত চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত লম্বা ও দশ-পনর হাত চওড়া স্থান, প্রাতঃকালে সেইখানে তরিতরকারি বিক্রয় হইত। সেইরূপ একটা চালার মধ্যে, একটা দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া শাস্ত্রী-মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লোক হইয়াছিল মন্দ নহে, বোধ হয় তিন-চারি শত হইবে। তখন শাস্ত্রী-মহাশয়ের বয়স বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক হইবে না, কারণ তখন তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়াছিলাম।

ইহার অনেক বৎসর পরে, শাস্ত্রী-মহাশয়ের দেহত্যাগের

দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে, শাস্ত্রী-মহাশয় বোধ হয় চিকিৎসকের পরামর্শে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় চন্দননগরের গঙ্গার ধারে একখানি বাটী ভাড়া লইয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই বাটীর কিয়দংশ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার ভাঙনে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, এখনও সেই বাটীর অবশিষ্ট অংশ বিদ্যমান আছে কি গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে তাহা জানি না। কারণ সেই বাটীর সম্মুখস্থ পথ গঙ্গায় ভাঙিয়া পড়াতে সে-পথে আমি বহুকাল যাই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে-বাটীতে বাস করিতেন, শাস্ত্রী-মহাশয়ের বাটি তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, হাটখোলা নামক পল্লীতে ছিল।

সে সময় একদিন দেখিলাম, আমার পিতার সহিত এক শুভ্র শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের বাটীতে আসিলেন। আমার এক জন বন্ধুও সেই সময় আমাদের বাটীতে ছিলেন। বাবা আমাদিগকে ডাকিয়া সেই আগন্তুককে প্রণাম করিতে বলিলেন। আমরা উভয়ে প্রণাম করিলে বাবা বলিলেন, "তোমরা ইঁহাকে জান না? ইনিই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।" বহুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণ শ্মশ্রুধারী শাস্ত্রী-মহাশয়কে একদিন মাত্র দেখিয়াছিলাম, সুতরাং এতদিন পরে সেই শ্বেত শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধকে চিনিতে পারি নাই, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বিশেষতঃ তিনি যে চন্দননগরে আসিয়াছেন, বা বাবার সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতাম না। পরে শুনিয়াছিলাম যে গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গিয়া বাবার সঙ্গে শাস্ত্রী-মহাশয়ের আলাপ হইয়াছিল। আমাদের বাটী হইতে যাইবার সময় শাস্ত্রী-মহাশয় আমাকে এবং আমার বন্ধুকে, অবকাশ পাইলেই তাঁহার আবাসে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। আমরা তাঁহার সেই আমন্ত্রণ রক্ষায় কখনই ত্রুটি করি নাই, সময় পাইলেই তাঁহার কাছে যাইতাম।

শাস্ত্রী-মহাশয়ের কাছে দুই-এক দিন গিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার ন্যায় উন্মুক্ত হৃদয়, সরলপ্রাণ এবং সর্ব্বহিতকামী ব্যক্তি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি আমাদের সঙ্গে যে কত বিষয়ের কত গল্প করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে-দিন যে-বিষয়ের কথা প্রথমে আরম্ভ হইত সে দিন দুই-তিন ঘণ্টা ধরিয়া সেই বিষয়েরই গল্প চলিত। বলা বাহুল্য যে, অধিকাংশ সময় তিনিই বক্তা হইতেন, আমরা শ্রোতা হইতাম। এক দিন বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে কথা হইল। শাস্ত্রী-মহাশয় বলিলেন, "বিদ্যানুরাগ কাহাকে বলে, তাহা আজকাল এ-দেশের ছেলেরা ধারণাই করিতে পারে না। আমি বিলাতে গিয়া এক অতি দরিদ্র গৃহস্থের বাড়িতে বাসা লইয়াছিলাম। সেই বাটীতে মাত্র চারি জন বাস করিতেন। গৃহস্বামীর বয়স বোধ হয় আশী বৎসর, তাঁহার স্ত্রীর বয়সও পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর বৎসর হইবে। দুইটি কন্যা—বড়র বয়স প্রায় ষাট, ছোটর বয়সও সাতান্ন-আটান্ন বৎসর হইবে। এই চারি জন লোক লইয়া সেই সংসার। অবস্থা অতি হীন বলিয়া আমাকে বোর্ডার বা ভাড়াটিয়া রাখিয়াছিলেন। আমার সমস্ত কার্য্য সেই দুই জন প্রৌঢ়া কুমারী করিতেন। আমার ঘর পরিষ্কার করা, বিছানা করা, পোষাক পরিষ্কার করা, মায় জুতা বুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহারা দুই ভগিনীতে করিতেন। আহার্য্যই তাঁহারা দিতেন। সংসারে সেই তিন জন স্ত্রীলোক—বৃদ্ধা এবং তাঁহারই কন্যারা সমস্ত দিন "লেস" বুনিতেন আর বৃদ্ধা সেই লেস ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহাদের উপজীবিকা। বৃদ্ধা সমস্ত দিন প্রায় বাহিরে থাকিতেন, দিনমানে বাটীতে তাঁহাকে বড় দেখিতে পাইতাম না। তিনি আসিতেন সন্ধ্যার পর। ঐ তিনটি স্ত্রীলোক গৃহকার্য্য করিয়া যে-সময় লেস বুনিতেন, সেই সময় কোলের উপর একখানি করিয়া বই খুলিয়া রাখিতেন। হাতে লেস বুনিতেছেন, আর আপন-মনে পুস্তক পড়িতেছেন, বাজে গল্প নাই, পরচর্চ্চা নাই, ঝগড়া-কলহ নাই, যেন কলের পুতুলের মত কাজ করিয়া যাইতেন। লেস বুনিতে বুনিতে মাঝে মাঝে পুস্তকের পাতা উল্টাইতেন। আমি তাঁহাদের শ্রমশীলতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতাম। আমি যে-কক্ষে শয়ন করিতাম তাহার পাশের কক্ষেই বৃদ্ধ গৃহস্বামী শয়ন করিতেন। একদিন রাত্রি প্রায় একটার সময় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিলাম যে বৃদ্ধের কক্ষে আলো জ্বলিতেছে; জানালার ফাটল দিয়া সেই আলোক আমার শয্যার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তত রাত্রিতে বৃদ্ধের কক্ষে আলো দেখিয়া আমার একটু ভয় হইল, ভাবিলাম হয়ত তাঁহার কোন অসুখ করিয়া থাকিবে। আমি সংবাদ লইবার

জন্য তাঁহার কক্ষের কবাটে মৃদু করাঘাত করিতেই বৃদ্ধ ভিতর হইতে বলিলেন—"Come in Mr. Sastri" (শাস্ত্রী-মহাশয় ভিতরে আসুন)। আমি দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ আলো জ্বালিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন! আমি ত অবাক! অসময়ে তাঁহার কক্ষে প্রবেশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলাম, "আপনার কক্ষে আলো জ্বলিতে দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছিল, ভাবিলাম হয়ত আপনি অসুস্থ হইয়াছেন।" বৃদ্ধ আমায় ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন, "না কোন অসুখ করে নাই। সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই, পড়িতে সময় পাই না, তাই রাত্রিতে একটু পড়াশুনা করি।" আশী বৎসরের বৃদ্ধ ফিরিওয়ালা রাত্রি একটা-দেড়টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিতে পারেন, ইহা ত আমাদের ধারণার অতীত। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি বই পড়িতেছিলেন, জানিতে কৌতূহল হইতেছে।" তিনি বলিলেন, "History of China" (চীনদেশের ইতিহাস)।

আমরা শাস্ত্রী-মহাশয়ের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। সত্য সত্যই আমরা ধারণা করিতে পারি না যে প্রকৃত বিদ্যানুরাগ কাহাকে বলে। শুনিয়াছি "টাইটানিক" ষ্টীমার জলমগ্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, ঐ ষ্টীমারের অন্যতম আরোহী বিখ্যাত "Review of Reviews" পত্রের সম্পাদক মিঃ ষ্টেড মৃত্যু আসন্ন জানিয়া একাগ্র মনে এক খানা পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া ষ্টীমারের কাপ্তেন তাঁহাকে সেই আসন্ন মুহূর্ত্তে পুস্তকপাঠের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মিঃ ষ্টেড বলিয়াছিলেন—"মৃত্যু ত এখনই হইবে। এই পুস্তকে কি আছে, তাহা আমি পড়ি নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে যতটুকু পারি জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া লই।" যে-দেশে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াও জ্ঞানসঞ্চয়ে বিরত হয় না, সেই দেশের আশী বৎসর বয়স্ক ফিরিওয়ালা যে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, ইহা বিষয়ের বিস্ময় নহে। শাস্ত্রী-মহাশয় সাধারণ সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহাদের সমাজে মহিলাদের অবরোধ-প্রথা নাই। শাস্ত্রী-মহাশয় চন্দননগরে সপরিবারে বাস করিতেন, আমি তাঁহার আবাসে বহুবার গিয়াছি, কোন কোন দিন একাদিক্রমে দুই-তিন ঘণ্টাও বসিয়া তাঁহার গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু কোন দিন তাঁহার পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোককে আমাদের সম্মুখে বাহির হইতে দেখি নাই। শাস্ত্রী-মহাশয় চন্দননগর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলে পরও আমি তাঁহার আবাসে গিয়া দেখা করিয়া আসিয়াছি। সেই সময় তাঁহার পত্নীকে দুই-এক দিন দেখিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম শাস্ত্রী-মহাশয়ের দুই বিবাহ ছিল, দুই পত্নীই জীবিত ছিলেন কি না জানি না, আমি তাঁহার আবাসে এক জনকেই দুই-তিন দিন দেখিয়াছিলাম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়কে কয়েক বার দেখিয়াছিলাম। আমাদের ছাত্রাবস্থায় মহর্ষি কিছুদিন চুঁচুড়ায় হুগলী কলেজের উত্তরে এবং ভূদেব বাবুর বাটীর দক্ষিণে গঙ্গার উপরেই একটা খুব বড় বাগানবাড়িতে বাস করিতেন। তাঁহার এক খানি প্রকাণ্ড বজরা ছিল, তিনি প্রত্যহ সেই বজরা করিয়া বেড়াইতেন। আমরাও নৌকা করিয়া চন্দননগর হইতে চুঁচুড়ায় কলেজে পড়িতে যাইতাম। সেই সময় আমরা অনেক দিন মহর্ষিকে কখন-বা বজরার ভিতরে কখন-বা ছাদের উপর দেখিতে পাইতাম। সেই সময় একবার তাঁহার চুঁচুড়ার বাসাতে মাঘোৎসব হইয়াছিল, সেই উৎসবক্ষেত্রেও তাঁহাকে একদিন দেখিয়াছিলাম। তাহার পর কলেজ ছাড়িবার পর আমি যখন কলিকাতায় আসি তখন একদিন জোড়াসাঁকোর বাটীতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমি সে-সময় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতাম এবং আমার পাণ্ডুলিপিগুলি আদি ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন উপাচার্য্য এবং 'তত্ত্ববোধিনী'র সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে দিয়া আসিতাম। একবার পারসীকদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত হয়। সেই সময় এক দিন উপাচার্য্য মহাশয় আমাকে বলেন যে আমার ঐ সকল প্রবন্ধ মহর্ষির খুব ভাল লাগিয়াছে, সেই জন্য তিনি ঐ প্রবন্ধের লেখক কে, তাহা ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ঐ সংবাদ শ্রবণে আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। আমি মহর্ষিকে দেখিবার জন্য আগ্রহ

প্রকাশ করাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে মহর্ষির নিকট লইয়া গিয়া আমার পরিচয় দিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি লইয়া উপবেশন করিলাম, কিন্তু মহাষর সহিত কোন কথাবার্ত্তা হইল না, কারণ সে-সময় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ছিল না বলিলেই হয়। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে দুই-একটি কথায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার পর আমাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। সুতরাং মহর্ষিকে মাত্র "চোখের দেখা" দেখিয়াছি, তাঁহার সহিত কোন কথাবার্ত্তার সুযোগ আমি পাই নাই। এই 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'তে প্রবন্ধ লিখিবার সময়েই কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ঠাকুর-পরিবারের কয়েক জনের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। ইহার কিছু পরে, যখন আমি 'ভারতী' পত্রিকায় ছোটগল্প ও প্রবন্ধাদি লিখিতাম সেই সময় একদিন আমি চন্দননগর পুস্তকাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বালীগঞ্জে শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সরলা দেবীর সহিত তাহার পূর্ব্বেও আমার আলাপ পরিচয় ছিল। সেদিন আমি সরলা দেবীর জননী স্বর্গীয়া

স্বর্ণকুমারী দেবীর

পুস্তক সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলাম। আমি তখন একটা সওদাগরী আপিসে কেরাণীগিরি করিতাম। আপিস হইতে মধ্যাহ্নকালে বাহির হইয়া বালীগঞ্জে গিয়াছিলাম। আমি শ্রীমতী সরলা দেবীকে আমার আগমনের কারণ বলিলে তিনি উঠিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে আসিয়া বলিলেন, "আপনি বসুন, মা আসছেন।" সে-সময় 'ভারতী'তে সরলা দেবীর অনুদিত ওমর খৈয়ামের কবিতা প্রকাশিত হইতেছিল। সেই সকল কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময় স্বর্ণকুমারী দেবী সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া গিয়া প্রণাম করিলে তিনি অতি মধুর কণ্ঠে হাসিমুখে বলিলেন, "ব'স বাবা ব'স" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। আমিও উপবেশন করিলে তিনি আমার নাম, ধাম, বিষয় কার্য্য সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কথায় কথায় যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভগিনীপতি ৺ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় আমার প্রপিতামহর সহোদর, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র এটর্নী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার জ্ঞাতিভ্রাতা, তখন তিনি সস্নেহে বলিলেন, "ওঃ তুমি ত আমাদের ঘরের ছেলে।" এই বলিয়া তিনি আমাদের সাংসারিক অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি চন্দননগর হইতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে কখন কলিকাতায় আসি, সকালে কয়টার সময় আহার করিতে হয়, আপিসে কখন জলযোগ করি, বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় সন্ধ্যা হয় কিনা, আমার বাটীতে কে কে আছেন প্রভৃতি অনেক কথাই জানিয়া লইলেন। আমরা যে-সময় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, সেই সময় একবার সরলা দেবী দুই তিন মিনিটের জন্য কক্ষান্তরে গমন করিয়া পুনরায় আসিয়া আমাদের বাক্যালাপে যোগদান করিলেন। বেলা আড়াইটার সময় এক জন ভৃত্য কিছু ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া আমার সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া দিলে স্বর্ণকুমারী দেবী বলিলেন, "বাবা, মুখে হাতে জল দিয়ে একটু খাবার খাও।" আমি প্রথমে একটু আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন, "না বাবা, তোমার আপত্তি শুনিব না। রোজ আড়াইটার সময় তোমার জল খাওয়া অভ্যাস, না খাইলে পিত্ত পড়িয়া অসুখ হইবে।" আমি অগত্যা সেই সকল ফল ও মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমি আপিসে কখন জলযোগ করি এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, আড়াইটার সময়, তখন সরলা দেবীকে আমার অজ্ঞাতসারে ইঙ্গিত করিয়া দিলেন এবং সরলা দেবীও আমাদের নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া ভৃত্যকে ঠিক আড়াইটার সময় জলখাবার আনিতে আদেশ করিয়া আসিয়াছিলেন। লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক প্রার্থনা করিলে স্বর্ণকুমারী দেবী বলিলেন, "সব বই ত আমার কাছে নাই, যে কয়খানা আছে, দিব।" আমার উঠিবার কিছু পূর্ব্বে তিনি তাঁহার রচিত ছয়-সাত খানি পুস্তক আমাকে আনিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পুস্তক ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন বালীগঞ্জে তাঁহার মেজদাদা ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে থাকিতেন। আমি সেইখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। আমার নাম শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "আপনিই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিক কাগজে প্রবন্ধ গল্প লেখেন কি?" আমি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, "আপনি বেশ লেখেন। আপনার কথা আমি সরলার মুখে শুনিয়াছি।" আমি তাঁহাকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য বলিলে তিনি বলিলেন, "কোন পুস্তক ছাপাইতে আমার যে ব্যয় হয়, সেই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যত দিন সে টাকাটা আদায় না-হয়, তত দিন আমি সেই পুস্তক বিনামূল্যে দিই না। সুতরাং আপনাকে আমার সমস্ত পুস্তক দিব না। কয়েক খানা পাইবেন।" এই বলিয়া তিনি আমাকে তিন-চার খানা পুস্তক আনিয়া দিলেন এবং তাহার পর বোধ হয় এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে দুই-এক খানা পুস্তক ডাকযোগেও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তার সময় দেখিলাম যে তিনি অত্যন্ত মৃদুস্বরে কথা কহেন। দুই-একটি কথার পর তিনি নিজেই আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার হাঁপানি হইয়াছিল বলিয়া চিকিৎসকগণ তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে অথবা একাদিক্রমে অনেক ক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি সেদিন তাঁহার কাছে বোধ হয় পনর মিনিটের অধিক কাল ছিলাম না। আমার কোন বন্ধুর পুত্র শ্রীমান হৃদয়রঞ্জনের শ্বশুর বাল্যকালে জ্যোতি বাবুর শ্যালক-পুত্রের সহিত এক ক্লাসে পড়িতেন, উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই সূত্রে আমার বন্ধুর বৈবাহিকের সহিত ঠাকুর-পরিবারের একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীকে পিসিমা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমার বন্ধুপুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইবার পর আমার বন্ধুপুত্র, সত্যেন্দ্র বাবুর বাটীর প্রত্যেক কার্য্যে এমন কি মধ্যে মধ্যে বিনা কার্য্যেও নিমন্ত্রিত হইতেন। সত্যেন্দ্র বাবু বা জ্যোতি বাবু যখন রাঁচিতে থাকিতেন, তখনও রাঁচি হইতে আমার বন্ধুপুত্রকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করিয়া রাঁচিতে লইয়া গিয়া দশ-পনর দিন রাখিয়া দিতেন। জ্যোতি বাবুর সহিত আমার সাক্ষাতের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে আমার বন্ধুর পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কুড়ি-পঁচিশ বৎসর পরেও যখন তিনি বালীগঞ্জে বা রাঁচিতে যাইতেন, তখন জ্যোতি বাবু তাঁহার নিকট আমার সংবাদ লইতেন। হৃদয়রঞ্জনের বিবাহের পর জ্যোতি বাবু যখন শুনিলেন যে হৃদয়রঞ্জনের বাটী চন্দননগরে তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "চন্দননগরের যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়কে তুমি জান?" আমি হৃদয়রঞ্জনের পিতার বাল্য বন্ধু ও প্রতিবেশী এই কথা জ্যোতি বাবু শুনিবার পর হইতে তিনি হৃদয়রঞ্জনের নিকট সর্ব্বদাই আমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। ডাকযোগে আমার নিকট স্বরচিত পুস্তক প্রেরণ, এবং দীর্ঘকাল পরেও আমার সংবাদ জিজ্ঞাসা—অথচ আমার সঙ্গে তাঁহার একদিন মাত্র দশ মিনিটের জন্য আলাপ—ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে জ্যোতি বাবু কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন।

পাশের ঘর

শ্রীআশালতা দেবী (সিংহ)

"মা, মালীকে তুমি ব'কবে না বলে পণ করেছ না কি? আজ দু-দিন থেকে আমার ফুলদানিতে বাসি ফুল রয়েছে। একবার চেয়ে দেখে না, এত যে গোলাপ ফুটেছে একটা তোড়াও কোনদিন বেঁধে দেয় না। সপ্তদশবর্ষীয়া মালতী চঞ্চল চরণে মায়ের নিকটে আসিয়া অভিযোগ করিল। রাগে তাহার সুন্দর মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বেণী দুলিয়া উঠিতেছে, কর্ণাভরণ ঝিকিমিকি করিতেছে, হাতের চুড়িবালার রিনিঝিনি শব্দ উঠিতেছে। মা মেয়ের ক্রোধে উত্তেজিত অপরূপ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, "রাগিস নে মালু, গোয়ালাটা আজ দিনকতক হ'ল ছুটি নিয়েছে। মালীকে দিয়ে আমি গরুর জাব্‌না কাটাচ্ছি, ঘাস-জল দেওয়াচ্ছি। এই ক'দিন সে বেচারা বড় সময় পায় নি যে ফুলের তোড়ার তল্লাস করবে।"

মালতী কহিল, "ওই গুষ্টি গরুর পালের জন্যে তুমি খামকা মালীকে আটকে রাখবে? এদিকে বাবার এত সখের ফুলবাগান, তার দশা যাই হোক না কেন?"

"না রে, ফুলের বাগানের দশা কিছুই হবে না। মালী ছুটি পেলেই জল দেয়, আগাছা পরিষ্কার ক'রে রাখে। কিন্তু হ্যাঁ রে, তাও বলি, তোরা কি একটু বাগানের কাজ করতে পারিস নে? পড়িস্‌ নি শকুন্তলার কথা, আগেকার দিনে রাজার মেয়েরাও ঝারি-হাতে ফুলের গাছের গোড়ায় জল দিতেন।"

"বিকেলে যে আমার রাজ্যের কাজ, আমার কলেজের টাস্ক আছে, গা-ধোয়া, চুল-বাঁধা শেষ হ'তে-না-হ'তেই উর্ম্মিলারা দল বেঁধে আসবে ব্যাডমিণ্টন খেলতে। ভদ্রতা আর চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিষ রয়েছে। তাদের শুধু শুধু ফিরিয়ে দিই কেমন ক'রে। খেলতে খেলতে কতদিন সন্ধ্যে হয়ে যায়। আমার মিউজিকের লেসন্‌ নেবার সময় হয়ে আসে। কখন সময় পাই ব'লো?"

মালতীর কথা শেষ হইতে-না-হইতে পাশের ঘর হইতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং মিহি গলায় কে ডাকিল, "মালতী! মালতী!"

"ঐ দেখ মিলি আর উর্ম্মিলা এসেছে। চল্‌লুম। তুমি যেন কুমুদাকে দিয়ে পেয়ালা-চারেক চা আমার বসবার ঘরে পাঠিয়ে দিও। যত শীগ্‌গীর হয়।"

মালতী বেণী দুলাইয়া ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল।

মিলি উর্ম্মিলা আর লটি তত ক্ষণ উর্ম্মিলার ব্লাউজের অভিনব কাটছাঁট সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়া মিলি কহিল, "কি করছিলে ভাই এত ক্ষণ। আমরা সেই কোন্‌ কাল থেকে এসে ব'সে আছি। যদিও ভদ্রতা নয়, তবুও শেষে অনেক ক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থেকে থেকে তোমাকে ডাকলুম।"

মালতী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "সরি (sorry), আমার আজ একটু দেরি হয়ে গেছে।"

লটি হাসিয়া উর্ম্মিলার গায়ে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কার কথা ভাবছিলে ভাই? ভাবনায় এত অন্যমনস্ক যে আমাদের ডাক শুনতে পাও নি।"

"কার কথা আবার ভাবব! তোমরা একটা কিছু বানিয়ে না বললে সুখ পাও না।"

"আশা করি আমাদের বানিয়ে বলবার অবসর যেন আর বেশী দিন না থাকে। অচিরে সমস্তই সত্য হয়ে উঠুক।"

"আমরাও তাই আশা করি।"

মালতী উত্তর দিল না। গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

"ও কি, রাগ করলে না কি ভাই? আমরা কিন্তু মনে করেছিলুম মিঃ দের অধ্যবসায় এবারে সফল হয়ে আসছে। আমাদের বাড়ির পার্টিতে তোমার মা'ও সেদিন এই ধরণের কি-একটা চৌধুরী-মাসীকে বলছিলেন। আমি আড়ি পেতে শুনেছি।"

এইবারে মালতী কথা কহিল, "আমার মা যা খুশী

তা বলতে পারেন, তাঁর ইচ্ছামত। কিন্তু আমার মনে হয়—"

"তোর কি মনে হয় রে?"—উর্ম্মিলা মুখ টিপিয়া হাসিল।

"আমার মনে হয় মেয়েদের জীবনযাত্রায় পুরুষকে যে একান্ত প্রয়োজন এই মনোভাবটাই ভুল।"

"ওরে বাস্ রে, তুই যে মস্ত কথা বললি! জানি নে বাপু এসব কথার উত্তর। তোর মত আমরা আধ্যাত্মিক চিন্তাও অত করি নে আর সমাজতত্ত্ব কিংবা মনস্তত্ত্ব নিয়েও অত মাথা ঘামাই নে। কিন্তু দেরি কি, এবার চল ব্যাডমিণ্টন খেলবি নে?"

মালতী তাহার বন্ধুদের সহিত কথা কহিতেছিল এবং ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতেছিল। কুমুদার এত ক্ষণ চা আনিবার কথা। কিন্তু এখনও আসিল না। আঃ, আজ বিরক্তিতে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিয়াছে!

"আমি এখনই আসছি ভাই, তোমরা দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা কর।"

ভিতরে চায়ের তাগাদা দিতে আসিয়া দেখিল, বাবা সেই মাত্র কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটা সোফায় বসিয়া জিরাইয়া লইতেছেন। অদূরে ষ্টোভে চায়ের জল চড়ানো। মা চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া ধৌত করিতেছেন। কিন্তু দূরে বা নিকটে কোথাও দাসী কুমুদার চিহ্ন অবধি নাই।

মালতী বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, "কুমুদা কোথায় গেল? মা দেখছি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে ঝি-চাকরগুলোকে একেবারে মাটি ক'রে দেবে!"

তাহার মা মিনতি করিয়া কহিলেন, "রাগ করিস নে মা। কুমুদা আজকের মত ছুটি নিয়েছে। কালীঘাটে তার কি মানত আছে শোধ দিতে গেছে। তুই অনেক ক্ষণ চা চেয়ে গেছিস, আমি তখন থেকে ছটফট করছি। কিন্তু তোর বাবা এসে পড়লেন। মানুষটা তেতে-পুড়ে এল! জুতো-মোজা খুলে নিলুম, দু-দণ্ড হাওয়া করতে একটু ঠাণ্ডা হলেন। ঐ তো দেখি চায়ের জল ফুটছে, তা তুই এক কাজ কর না মা, তত ক্ষণ চা ভিজতে দে। ক' পেয়ালা তৈরি ক'রে নে। তোর বাবাকেও এক পেয়ালা দিস্। আমি তত ক্ষণ চট্ ক'রে ওঁর জন্যে ডিমের কচুরি ক'খানা ভেজে নিই।"

মালতী অনেক চেষ্টায় আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, "মা, তোমাদের ভদ্রতাবোধ কি একেবারে নেই? আমার বন্ধুদের বসিয়ে রেখে এখানে আমি ডিমের কচুরি আর চা করি। আর তারা হাঁ ক'রে কড়িকাঠ গুণতে থাক!"

মালতীর বাবা সহাস্যে কহিলেন, "বুড়ির মায়ের সঙ্গে দেখছি বুড়ীর এক দণ্ড বনে না। কেন তুমি ওকে রাগিয়ে দাও গো। যা যা বুড়ি, তোর বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগাছা কর গে। তোর মাকে দিয়ে চা তৈরি করিয়ে আমি দু-মিনিটের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাহারা রইলুম। একটুও দেরি হ'তে দেব না।"

মালতী রাগ করিয়া কহিল, "তোমার না থাকতে পারে কিন্তু আমার ভদ্রতাজ্ঞান যথেষ্ট রয়েছে। দাঁড়াও, আমি ওদের ব'লে আসছি, আর আমার ছবির এ্যালবামটা বার ক'রে দিয়ে আসছি। তত ক্ষণ সেইটে দেখতে দেখতে ওদের কাটবে। আমি এসে চা করছি। কিন্তু বাবা দেখো, আমি ব'লে দিলুম, ঝি-চাকরকে মা এত প্রশ্রয় দেয় যে শেষপর্য্যন্ত সবাইকে বিগ্‌ড়িয়ে না দিয়ে থাকতে পারবে না। কুমুদা গেল কালীঘাটে মানত শোধ করতে, কেন গেল? কেনই বা এসব কুসংস্কারকে আমল দেওয়া!"

মালতীর মা এবারে একটু ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন, "ছিঃ মা, অমন ক'রে বলতে নেই। কুমুদা দুঃখী মানুষ হ'লেও তারও তো জীবনে এমন অনেক বিশ্বাস থাকতে পারে যা তার কাছে কুসংস্কার নয়, পরম ধর্ম্ম।"

"তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।" মালতী চলিয়া গেল।

মালতীর বাবা সহাস্যে কহিলেন, "বুড়ির প্রকৃতিটা একটু অসহিষ্ণু। একটুতেই রেগে ওঠে। কিন্তু রাগলে ওকে চমৎকার দেখায়।"

কচুরি-ভাজা শেষ করিয়া একটা প্লেটে সাজাইতে সাজাইতে মালতীর মা কহিলেন, "মিছে নয়, তুমি হাসি-তামাশা করছ বটে, কিন্তু ভয়ে এক এক সময় আমার হাত-পা ওঠে না।"

"কেন ?"

"তোমার ঐ মেয়েটির কথা ভেবে। কি আদরই দিয়েছ ওকে, আর কেমন ক'রে মানুষ করলে। আমি শুধু ভাবি মাঝে মাঝে তোমার ঐ নাকতোলা মেয়ের বিয়ে হ'লে কেমন করেই বা সে সুখী হবে, আর কেমন করেই বা পাঁচ জনকে সুখী করবে।"

"তোমার এ-ভাবনা মিছে। বুড়ির মনটি আসলে খুব কোমল আর স্নেহশীল। আর দেখ আমার মনে চিরকালের একটা ক্ষোভ রয়েছে, বুড়ির বিষয়ে আমি আর কারও কথা শুনব না। ওকে আমার মনের মত ক'রে মানুষ করব। বিয়ের কথা পরে ভাবলেও চলবে।"

স্বামীর এ-কথায় গৃহিণীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল, স্বামী প্রথমে ওকালতি পাস করিয়া কলিকাতার হাইকোর্টে কিছুদিন ওকালতি করেন। আইন পাস করিবার চার-পাঁচ বছর আগেই তাঁহাদের প্রথমা কন্যা কমলার জন্ম হয়। কয়েক বছর আদালতে বাহির হইয়া কিছুই যখন সুবিধা হইল না তখন জ্যোতিষচন্দ্র সঙ্কল্প করিলেন বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসিবেন। স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনেক পরামর্শ অনেক কথা হইতে লাগিল কিন্তু আসলে তখনও তাঁহার বাবা জীবিত, তাঁহার মত কোনমতেই পাওয়া গেল না। তিনি আচারনিষ্ঠ সেকেলে ভাবাপন্ন ছিলেন। অত্যন্ত কড়া, রাশভারি লোক। কিন্তু জ্যোতিষ বাবার কাছে উৎসাহ না পাইয়া স্ত্রীর অলঙ্কার কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া কয়েক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাহায্যে এক রকম জোর করিয়াই ব্যারিষ্টরী পড়িতে গেলেন। সেই হইতে পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি। জ্যোতিষ ফিরিয়া আসিবার আগেই তাঁহার বাবা মারা গিয়াছিলেন। কিন্তু মারা যাইবার আগে তিনি জ্যোতিষের বড়মেয়ে কমলার অত্যন্ত অল্পবয়সে খুব কুলীনের ঘরে বিবাহ দিয়া দিলেন। প্রবাসী জ্যোতিষকে এ-সম্বন্ধে কোন কথা জানাইলেন না। তাঁহার মতামত নিলেন না। হয়ত এ তাঁর পুত্রের উপর এক প্রকার প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তিসঞ্জাত কাজই হইয়াছিল। অবশ্য নাৎনীর বিবাহে তিনি ধুমধাম খরচপত্র করিয়াছিলেন যথেষ্ট। কুলীন এবং সম্পন্ন বনিয়াদি বংশের ঘরে তাহাকে দিয়া-ছিলেন। কিন্তু যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা হইল না। ক্রমশঃ দেখা গেল সে-পরিবারে বাহিরের ঠাট-ঠমকের চেয়ে ঋণের বোঝা বেশী। যে ছেলেটির সহিত কমলার বিবাহ হয়, সে বিয়ের সময় আই-এ পড়িতেছিল, কিন্তু কিছুতেই পাস করিয়া উঠিতে পারিল না। কয়েক বার ফেল করিয়া বাড়িতে আসিয়া বসিল।

জ্যোতিষ ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত শুনিলেন এবং রক্তবর্ণ মুখে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে কহিলেন, "এত সামান্য কারণে যে বাবা আমার উপর এমন ক'রে প্রতিশোধ নেবেন, তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। যদি জানতুম, তাহ'লে কখন যেতাম না।"

সেই হইতে কমলার জীবন আর কমলার অদৃষ্ট পিতামাতার মনের উপর ভারের মত চাপিয়া রহিয়াছে। প্রতিকারহীন বেদনায় তাঁহাদের দিন রাত্রি নিঃশব্দে বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে। প্রতিকার করিবার তেমন কিছু ছিল না। কমলার শ্বশুর বিলাত-ফেরৎ বৈবাহিকের বাড়িতে বধূমাতাকে কখনও পাঠাইতেন না। ম্যালেরিয়ার সময়টাও নয়। ম্যালেরিয়ার সময়ে তাহার এক পাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া কমলা জ্বরে জ্বরে কঙ্কালসার হইয়া উঠিত, এমনি করিয়া ভুগিতে ভুগিতে তাহার দুই-তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে অত্যন্ত অকালে সংসার ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে একটি দিনের জন্যও পিতামাতার সস্নেহ আকুল আহ্বানে বাপের বাড়ি যাইতে বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পায় নাই। বছর দুই হইল তাহার শ্বশুর মারা গিয়াছেন। অতটা কড়াকড়ি শাসন আর নাই।

বড় মেয়ে অমন করিয়া দূরে চলিয়া গেল, চিরজীবনের জন্য অশেষ দুঃখ-দুর্ভাগ্যের মাঝে নিমজ্জিত হইয়া রহিল, এই কথা যত মনে পড়িয়া যায়, ছোট মেয়েটিকে তাহার বাবা ততই আকুল আগ্রহে বুকের মাঝে টানিয়া নেন। মালতীর তাই বাবার কাছে আদরের সীমা নাই। মা'ও আদর করেন। কিন্তু তাঁহার মনের মাঝে ভবিষ্যৎদর্শী শঙ্কাকুল মাতৃহৃদয় আছে! তিনি মনে জানেন, মা বাবার কাছে বাপের বাড়িতে যতই আদর-যত্ন হোক, মেয়েমানুষের ভাগ্যবিধাতা তাহার ভাগ্যে ঠিক কি যে লিখিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে! আর কমলার জন্য তার মায়েরও

মনে দুঃখ হয়। কিন্তু সে দুঃখের সঙ্গে দৈবের উপর বিশ্বাস বলিয়া একটা বস্তু জড়িত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে তত তীব্রতর করে না। তিনি এক-এক সময়ে ভাবেন, "কমলার অদৃষ্টই অমনি। কে জানে আমাদের হাত থাকলেও হয়ত জীবনে ওর অমনি কষ্টই হ'ত। অদৃষ্ট ছাড়া গতি নেই মেয়েমানুষের।"

জ্যোতিষ অমন করিয়া ভাবিতে পারেন না। তাঁহার বলিষ্ঠ পুরুষ-হৃদয় এই অন্যায়, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার সমস্ত জীবনের ব্যর্থতা তাঁহার নিদ্রাহীন রাত্রিকে তপ্ত, ব্যাকুল করিয়া তোলে। আর সেই আতপ্ত রোষ এবং ক্ষোভ হইতে যত মেঘ জমা হয় সে সকলই স্নেহধারা রূপে ছোট মেয়েটিকে অভিষিক্ত করিতে থাকে। হাজার বার তিনি আপন মনে বলেন, "একে আমি সুখী করব। আমার সমস্ত চেষ্টা দিয়ে একে সুখী, আনন্দময়ী ক'রে তুলব।"

* * *

পরের দিন—

মালতীর কলেজের 'বাস' বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সে প্রস্তুত হইয়া খাতা এবং বই হাতে লইয়া ড্রেসিং-টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া কেবল চুলে একটা সোনার ক্লীপ্ আট্কাইয়া লইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝরনাধারার মত তাহার গুনগুন্ গানের সুর উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল—

চাঁদিনী রাতে বল কে গো আসিলে······

পরক্ষণেই তাহার তীক্ষ্ণ তিরস্কারের স্বর শোনা গেল, "মা, মালী কি আজও বাগানের কাজ করে নি? আজ মণিকাদির জন্যে আমার দুটো ফুলের তোড়া নিয়ে যাবার কথা ছিল। তাকে আমি সকালেই সে-কথা বলেছি।··· নাঃ, তোমাদের ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা এত বিশৃঙ্খল···আর দেরি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কি অপ্রস্তুতেই না আমাকে আজ পড়তে হবে।"

মালী একপ্রকার দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রকাণ্ড দুইটা ফুলের তোড়া আনিয়া বাসে চড়াইয়া দিল। এত ক্ষণ সে প্রাণপণে তাড়াতাড়ি করিতেছিল, কিন্তু তবুও কপাল-গুণে খানিকটা দেরি হইয়া গেছে। দিদিমণির কাছে বকুনি খাওয়া তাহার কপালে অনিবার্য্য।

মালতীর বাবা খাইতে বসিয়াছেন, মা সামনে বসিয়া হাতপাখায় করিয়া মাছি তাড়াইতেছেন। পিয়ন আসিয়া হাকিল—চিঠ্‌টি!

বেয়ারা চিঠি লইয়া আসিল। জ্যোতিষ হাত মুখ ধুইয়া রুমালে মুছিতে মুছিতে খামখানা খুলিলেন, পত্রখানিতে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ছিল। সে সমস্ত সংশোধন করিয়া এইরূপ পড়িলেন :—

শ্রীহরি সহায়

১২ই আশ্বিন

সাং রসা। পলাশডাঙ্গা

অসংখ্য প্রণামান্তর নিবেদন

মা, আজ দুই বৎসর হইতে আমার বড় ছেলেটিকে লইয়া ভুগিতেছি। তাহার পেটে লিভার ও পীলে দুই প্রকাণ্ড হইয়াছে এখানে মহকুমা হইতে ডাক্তার আনিয়া অনেকবার দেখাইয়াছি। কোন ফল পাই নাই। তোমার জামাইও বহুদিন হইতে ভুগিতেছেন। আমার মনে বড় সাধ ছিল, কলিকাতায় তোমাদের ওখানে লইয়া গিয়া একবার বড় ডাক্তার দেখাই এবং হাওয়া পরিবর্ত্তন করি। কিন্তু জানই তো আমার শ্বশুর বাঁচিয়া থাকিতে একটা দিনের জন্যও ওখানে যাইবার উপায় ছিল না। তাঁর অবর্ত্তমানে যাবার উপায় হইয়াছে। ওঁর মত করাইয়াছি। এখন তোমরা একটি ভাল দিন দেখাইয়া লোক পাঠাইলেই আমার যাওয়া হয়। সে বাটীর কুশল সংবাদ অনেক দিন পাই নাই। তুমি ও পিতাঠাকুর মহাশয় আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করিবে। ইতি

সেবিকা কন্যা কমলা।

চিঠিপড়া শেষ হইয়া গেল। জ্যোতিষ কহিলেন, "আজই কমলাকে আনবার ব্যবস্থা করি।···কিন্তু কে যাবে? আচ্ছা এক কাজ করি, মনিঅর্ডার ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিই, আর জামাইকে লিখে দিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসুক। এই আশ্বিন মাসে, ওখানে ভর্ত্তি ম্যালেরিয়ার সময়। কালবিলম্ব না ক'রে যেন ওরা চলে আসে।"

ইহারই দিন তিন-চার পরে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস

ভাড়াগাড়ীর মাথায় গুটি-তিন-চার ষ্টীল ট্রাঙ্কের বাক্স, ছোটবড় গুটিকতক পুঁট্‌লি-পোঁটলা, এক নাগ্‌রি খেজুরগুড়, একটা বড় চাঙাড়িতে বড় বড় কদমা বাতাসা এবং আরও বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী সমেত কমলা তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া পৌছাইল। এ-বাড়িতে তাহাকে যেন বেমানান দেখায়। সে নিজেও বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। দীর্ঘ বারো বৎসর সে পিতৃগৃহে আসে নাই। রাশভারি শ্বশুরের বর্ত্তমানে পিতৃগৃহে যাইবার কল্পনামাত্র তাহার কাছে সুদুর স্বপ্নের মত ছিল। মালতী দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। এই তাহার দিদি! অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু গৌরবর্ণ অত্যন্ত পাণ্ডুর। কৃশ দেহরেখা। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখখানিতে একটি সলজ্জ দীনতার ভাব। পায়ে আলতা। লালপাড়ের একটি শাদা ফরাসডাঙা শাড়ি সাদাসিধা ধরণে পরা। এই বয়সের এমনি অনেক সুন্দরী মেয়েকে মালতী দেখিয়াছে জর্জ্জেট্‌ ক্রেপ সিল্ক পরা, উজ্জ্বলতায়, অজস্র হাসি-আমোদের বন্যায় ভাসমান কিন্তু সে সকলের চেয়ে অন্য রকম এই ম্লান দীননয়না তাহার প্রায় অপরিচিতা দিদির পানে একবার চাহিবামাত্র তাহার মনের ভিতর কি রকম করিয়া উঠিল।

সে নামিয়া আসিয়া দিদিকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া কমলার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "দিদি এস।"

মালতীর পাশের ঘরে তাহার দিদির থাকিবার স্থান হইয়াছে। বহুদিন পরে কমলা আপন পিতৃভবনে আসিয়াছে। তাহাকে তাহার মা-বাবা কত দিন নিজের কাছে পান নাই। তাহার বাবা তাহার প্রতি পিতৃকর্ত্তব্য পালন করিতে পান নাই, তিনি যখন সুদূর বিদেশে ছিলেন তখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার কোন অপাত্রে বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তাহার মা আপনার স্নেহবুভুক্ষিত অন্তরে কত দিন মেয়েকে টানিয়া লইতে পান নাই। তাই এত দিন পরে সে আসাতে সকলেই ব্যস্ত, সকলেই তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে উৎসুক। তেতালায় মস্ত খোলা ছাদ। স্নানের ঘর, পাশাপাশি দুইখানি শয়ন-কক্ষ এবং ঢাকা বারান্দা, তেতালার এই দুইখানি পাশাপাশি ঘরে কমলা ও মালতী থাকে। বারান্দার একাংশে ফুলের টব সাজান। সেইখানে বসিয়া মালতী কোন-কোন দিন জ্যোৎস্না-উদাস সন্ধ্যায় কোন নির্জ্জন অপরাহ্ণে এস্রাজ বাজায়। রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ, বনবাণী, মহুয়া পড়ে। বারান্দার অপরার্দ্ধ কিন্তু সবুজ স্ক্রীন দিয়া আড়াল করা। সেখানে কমলার গৃহস্থালী। রাত্রিবেলায় খুঁচিকে উঠাইয়া দিতে হয়, নয়ত প্রায়ই সে বিছানা নোংরা করিয়া ফেলে। স্বামী বিজয়নাথের আজ মাস ছয় হইতে শক্ত ম্যালেরিয়া হইয়াছে, কুইনাইন্‌ পেটে পড়িবামাত্র বমি আরম্ভ হয়। স্ক্রীন্‌-দেওয়া এই ঢাকা-বারান্দায় জলের বালতি, ঘটি গামছা তোয়ালে বেড্‌প্যান সমস্ত সরঞ্জামই রাখিতে হয়

*　　　*　　　*

রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। মালতী আপন মনে রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ হইতে পড়িতেছিল।

মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকী সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
হে মোর স্বপনবিহারী
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি'
পরম পুলকে:...

শরতের সুনীল আকাশে বহু দূর দিগন্ত অবধি মেঘের লেশ নাই, জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিতেছে। নির্জ্জন কক্ষের বাতায়নে বসিয়া তরুণী আপন মনের ঘনায়মান স্বপ্নের অঞ্জন মাখাইয়া পড়িতেছিল, "মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকী সব ধন স্বপনে, নিভৃত স্বপনে।"

তখন পাশের ঘরের একাংশে সংসারের সুখ-দুঃখ লইয়া যে আলোচনা হইতেছিল সেখানে স্বপ্নের ঘোর মাত্র ছিল না। কমলার স্বামী বিজয়নাথ বলিতেছিল, "কালকে মাসের পয়লা, অগস্ত্যযাত্রা যেতে নেই। তাঁর পরের দুটো দিন অশ্লেষা, মঘা, তা'ও বাদ গেল। তার পরে ৪ঠা কার্ত্তিক আমাকে যেতেই হবে।" কমলা নতমুখে কহিল, "কার্ত্তিক মাসে ওখানে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ায় পড়ে আছে সবাই। এ-সময়ে ওখানে নাই বা গেলে। তা ছাড়া মা বাবা যখন এত ক'রে বারণ করছেন।"

"তোমার মা বাবার কি বলো, সংসারে কোন অভাব নাই, অনটন নাই। পাখার হাওয়ার তলায় দিব্যি আছেন।

এদিকে আমাদের যে এখনও লাটের কিস্তি যায় নি। জমি-জমা যা ক্ষুদকুঁড়ো আছে, তাও কি শেষে নীলেম হয়ে যাবে। এখানে বসে থাকলেই পেট ভরবে?

কমলা কোন উত্তর করিতে পারিল না। এমন সময়ে তাহার ছোট ছেলে কানাই জাগিয়া উঠিল, "মা খিদে।" তাহার আজ সাত আট দিন হইতে খুব জ্বর হইয়াছে। উপবাসে আছে। পথ্যের মধ্যে জলবার্লি আর খইয়ের মণ্ড খাইয়াছে।

"মা আমি খাব।"

"তুই কি স্বপ্ন দেখছিস কানাই? এই মাঝরাত্রিতে খাবি কি রে, ঘুমো ঘুমো। ঐ শোন এখনই চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে। তোর কি ভয়ডর নেই রে প্রাণে। নে নে, ঘুমো।"

কানাই তত ক্ষণে সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। মিটিমিটি করিয়া বৈদ্যুতিক আলোটার পানে চাহিয়া বলিতেছে, "এখানে চৌকিদারের হাঁক কোথা পাবে। সে তো সেই পলাশডাঙায় হাঁকতো। দাও, দাও, আমাকে খাবার দাও, সেই তখন পট্‌লা সুজির রুটি খেলে, আমাকে কিছু দাও নি।"

কমলার রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত মৃদু সকরুণ সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল, "ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মী বাবা আমার। সোনা মাণিক আমার।···ঈস গা জ্বরে যেন আগুনের মত পুড়ে যাচ্ছে। আবোলতাবোল ব'কো না বাবা। চুপ ক'রে ঘুমাও।" কিন্তু অবোধ বালকের প্রলাপ তাহাতে লেশমাত্র কমে না।

কমলার স্বামী বিজয়নাথ রাগিয়া গিয়া কহিল, "এই হতভাগা ছেলেগুলোর জ্বালায় রাত্রিবেলায় পর্য্যন্ত একটু ঘুমবার জো নেই। মরণ হ'লে বাঁচি ওদের।"

"বালাই, ষাট! অমন ক'রে বলতে নেই।" কমলা সভয়ে মনে মনে সহস্রবার ঠাকুর-দেবতার নাম লইয়া রুগ্ন বালকের শিয়রে হাত রাখিল।

পাশের ঘরে মালতীর কবিতা-পড়া কখন থামিয়া গিয়াছে। কাল রবিবার, কলেজ যাইবার কিংবা পড়াশোনার তাড়া নাই। তাই সে ভাবিতেছিল, এস্রাজটা পাড়িয়া বসিবে কি না, কিন্তু পাশের ঘরের বিচিত্র কলরব তাহাকে আকৃষ্ট করিল। কমলা তখন অশান্ত জ্বরপীড়িত ছেলেকে শান্ত করিতেছে, "ছি বাবা কাঁদে না। বাবা যদি একটু বকে তাহ'লে কি কাঁদতে হয় ধন। আসলে উনি তোমাকে কত ভালবাসেন।"

মালতীর মনের উপর দিয়া তাহার দিদির ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। দিদি মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পায় না। সকাল হইতে উঠিয়া স্বামীর আর ছেলেদের পরিচর্য্যা, ছেলেদের নিত্য রোগ। স্বামী অর্দ্ধশিক্ষিত সঙ্কীর্ণমনা। কিন্তু তবুও তার মুখে কি পরিতৃপ্তির আভাস! সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত দিদি নিজের কথা বোধ হয় এক মিনিটের জন্যও ভাবে না। পাশের ঘরের কথোপকথন শুনিতে তার ভাল লাগে। মনে হয় তাহার সম্পূর্ণ অজানা এক জগতের যবনিকা যেন আস্তে আস্তে উঠিতেছে।

···কমলার স্বামী বিজয়নাথ জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ওকি আবার যাচ্ছ কোথায়? এই তো দু-ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে ছেলেটা ঘুমল, এইবার নিজে একটু ঘুমিয়ে নাও। কতক্ষণই বা ঘুমতে পাবে, এখনই আবার একটা-না-একটা কেউ উঠে পড়বে।"

"···এখনই আসছি। যাই দেখে আসি একটি বার গিয়ে কুমুদা কেমন আছে। তারও আবার তিন দিন থেকে জ্বর হয়েছিল কি না। আজই সবে ছেড়েছে। একটু সাবু আর খান দুই পটলভাজা ক'রে দিয়ে এসেছিলুম, দেখে আসি খেতে পেরেছে কি না।"

মালতীর মনে পড়িয়া গেল, বাড়ির দাসী এই কুমুদার যে আবার একটা অস্তিত্ব আছে এমন কথা সে কোনদিন মনেও করে নাই। এই কুমুদা একদিন মানত রাখিতে গিয়া সারাদিন উপবাস করিয়া কালীঘাট গিয়াছিল ছুটি লইয়া, সেজন্য মায়ের সঙ্গে সে কত কলহ করিয়াছিল। ঝি-চাকরের দুর্নীতি এবং কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতেছেন বলিয়া মাকে শুনাইয়াছিল সে লম্বা বক্তৃতা। মালতীর এস্রাজ বাজান আর হইল না। সে অন্যমনস্ক হইয়া আকাশের দূর তারার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, তার দিদি কমলা জীবনে কি পাইয়াছে যে এমন সহজে এত দুঃখ, এত অশান্তি এত খাটুনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে বহন করিয়া চলিতেছে। কোন অসন্তোষ নাই, মনে কোন ভার নাই।

নিজের কথা সে অহরহ ভাবে না, বরঞ্চ নিজের কথাটাকে অনেকের কথায় অনেকের কল্যাণে একেবারে চাপা দিতে পারিলেই যেন বাঁচে। তার দিদির জীবন হইতে প্রতিফলিত হইয়া একটা নূতন আলো যেন তার মনের উপর আসিয়া পড়িল। আসিয়া পড়িয়া অনেক গর্ব্ব অনেক ধারণাকে যেন আস্তে আস্তে গলাইয়া দিয়া ভাঙিয়া গড়িতে লাগিল।

পাশের ঘরে মৃদু গুঞ্জনে তখনও কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বিজয়নাথ আস্ফালন করিতেছে, "সৌরিশ সরকারকে আমি দেখাব মজা, বুঝলে কমলা। আমাদের বারিত্ পুকুরের সীমানা দিয়ে হেঁটে গেলে আমি তার পা ভাঙবো। পুকুরে সরা তো দূরের কথা। মনে নেই তোমার সাগর উঠোনের এক কাঠা জমি নিয়ে আমাকে কত কথাই না শুনিয়েছিল। বাছাধন টেরটি পাবেন এইবারে। দাঁড়াও বাইরে থেকে আসি মুখ হাত ধুয়ে একবার। এসে অমনি শুয়ে পড়ব।"—বিজয়নাথ দরজাটা খুলিল। পাশের ঘর—মালতীর কক্ষ হইতে তখন এস্রাজের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মালতী এইবারে এস্রাজটা টানিয়া লইয়াছে। বিজয়নাথ মুখ হাত ধুইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া খানিক ক্ষণ শুনিল। রুগ্ন সুপ্ত পুত্রের পাশে বসিয়া মুক্ত দ্বারপথে কমলা অনেক ক্ষণ সেই সুর শুনিল। ক্ষণকালের জন্য তাহাদের মন হইতে বারিত্ পুকুরের সীমানা, সৌরিশ সরকারের স্পর্দ্ধা, এক কাঠা জমি লইয়া মামলা করিবার প্রয়াস সমস্তই মুছিয়া গেল।

পথিক শিল্পী

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

বন্ধুবর নন্দলাল বসু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মাদ্রাজ-ভ্রমণের পথে হাওড়া ষ্টেশনে বসিয়া বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণের সঙ্গে এই রেখাচিত্রখানি পাঠাইয়াছিলেন।

যদিও ইহা ব্যক্তিগত, তবুও সাধারণের কাছে তুলিয়া ধরিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না, কারণ কবি ও শিল্পীর কল্পনা হইল সাধারণেরই।

তিনি প্রায়ই একটা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন যে, যানবাহনে আদর-আপ্যায়নে ত অনেক দেশই ঘোরা গেল কিন্তু নিরুদ্দেশ-যাত্রা আর হইল না!—যেখানে কেহ কাহারও খোঁজখবর আর রাখিবে না, দিনের পর দিন আমরা দুই জনে পথ ধরিয়াই কেবল চলিব—হাসপাতালে রোগশয্যার উপর সেই ইঙ্গিতের রেখাচিত্রখানি পাইয়া মনটা যেন একেবারে পথের সুরে ভরিয়া উঠিল।

> "গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ ;
> আমার মন ভোলায় রে!—"

পথে শিল্পীর যে পরিচয় পাইয়াছি, আজ সেই স্মৃতিই রোগশয্যায় লেখনী লইতে প্রেরণা জোগাইয়া আসিতেছে।

তিনি কোন কোন ছুটি উপলক্ষে সময় সময় সপরিবারে তাঁহার ছাত্রছাত্রীদের লইয়া বনভোজন করিতেন বা তাঁবু লইয়া দিনের পর দিন পথ ধরিয়া চলিতেন—তাঁহাকে বলা যাইতে পারে যেন একটা চলন্ত বিদ্যালয়। সেই সব দলে সময় সময় আমার যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছে। তখন লক্ষ্য করিয়াছি, পথেই যেন শিল্পীর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে,—যাহা শিক্ষিত সমাজের অনেক তত্ত্ব-কথা বিচারবিতর্কে সরগরম আসরে লক্ষ্য করি নাই ; সেই সব স্থানে সাধারণতঃ উদাসীন বা মৌনীই থাকিতে তাঁহাকে দেখা যায় ; কিন্তু সেই মৌনীই মুখর হইয়া উঠেন পথে।

এমন অনেক ছোটখাট জিনিষ, ঘটনা বা দৃশ্যাবলী আছে, যাহা আমাদের চোখে পড়ে নাই, আর পড়িলেও তাহা মনের উপর কোন ছাপ রাখে নাই, কিন্তু তাহাই দেখিয়াছি শিল্পীর চোখে কত বড় মধুর আকারে দেখা দিয়াছে, যাহাতে তাঁহার চলার গতিকে রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া সময় সময় বিরক্তি ধরিয়াছে, অনেক সময় অরসিকের মত ধাক্কা দিয়া তাঁহার চলার গতি

আনিয়াছি বলিয়া এখন মনে করিয়া লজ্জা বোধ হয়। কারণ কে জানে পথের পাশে ঘাসের উপর সকলের অলক্ষ্যে আপন পূর্ণতা লইয়া যে একটি ফুল ফুটিয়াছিল, সে শিল্পীর অপেক্ষায় পথপানে চাহিয়াছিল কি না? তাহার রং গড়নে মুগ্ধ হইয়া শিল্পীকে একেবারে বসিয়া পড়িতে দেখিয়াছি।

উন্মুক্ত প্রান্তরে গাছের ছায়ায় তিনি যখন তাঁহার ছাত্রছাত্রীদের লইয়া বসিতেন, গল্প-গুজবের ভিতর দিয়া চলিত তাঁহার শিক্ষা, এই দৃশ্যমান জগতের গড়ন, রেখাভঙ্গিমা, বর্ণ ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব—বর্ণনা করিতে করিতে সেই মৌনীই একেবারে মুখর হইয়া উঠিতেন—তাহা ছিল একটা মহা শিক্ষা ও উপভোগ্য বিষয়। এবং সেই সব উপলক্ষ্য করিয়া নানা জটিল সমস্যাকে সরল সহজ ভাবে সমাধান করিবার দেখিয়াছি তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। গ্রাম্য নরনারীদের ব্যবহার্য্য ও উপভোগ্য এমন অনেক শিল্পকলা ও আচার-ব্যবহার আছে, যাহা শিক্ষিত সমাজকে আদৌ আকৃষ্ট করে না, তাহাই দেখিয়াছি শিল্পীকে কি গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়া একেবারে তন্ময় করিয়া রাখে—যাহা অনেক বড় সাহিত্যিক বা শিল্পীর মধ্যে লক্ষ্য করি নাই, তাঁহারা কল্পনার সাহায্যেই গ্রাম্য রুচি চিত্র আঁকিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহা মর্ম্ম স্পর্শ করে না।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সথ।
[তৎকর্ত্তৃক পেন্সিলে লেখা ও আঁকা পোষ্টকার্ড]

এমন যে অসংগ্রহী স্বভাবের শিল্পী—যাঁহার পকেটে টাকা বা পয়সা থাকা পর্য্যন্ত তাহা উজাড় না করিয়া সোয়াস্তি পান না, শরীরে যেন ভার বোধ হয়—সেই অসংগ্রহীই ঘোর সংগ্রহী হইয়া উঠেন পথে, যত বাজে জিনিষে তাঁহার ঝোলাঝালি পূর্ণ, স্থান যখন আর সংকুলান হয় না তখন চাপাইতে থাকেন ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে, তখন তাঁহার যেন বিশ্বগ্রাসী রূপ।
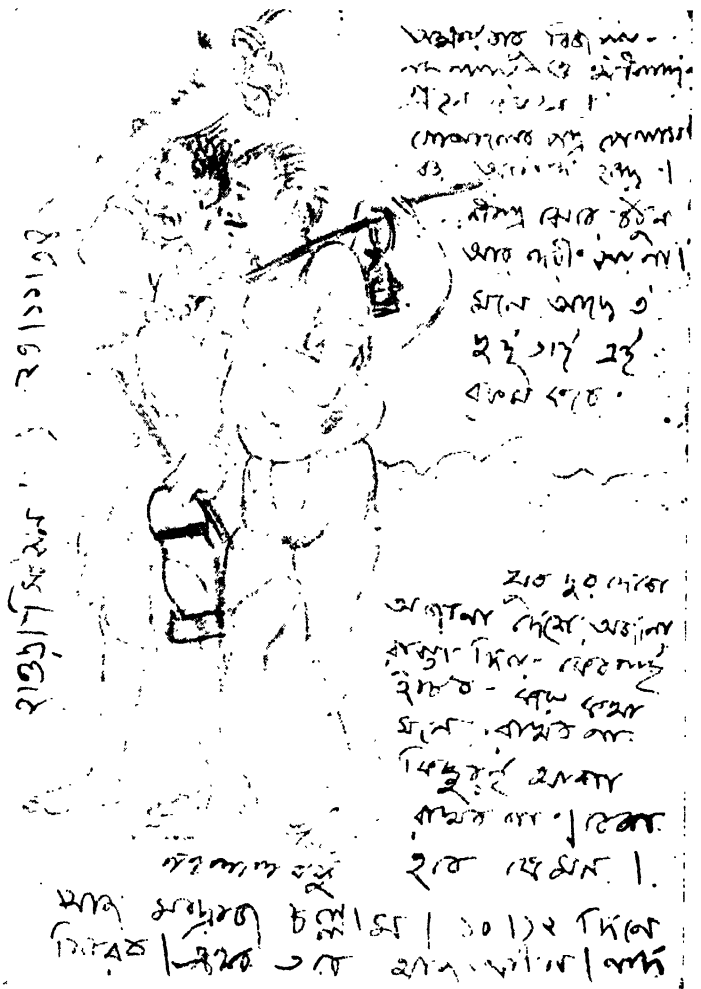
ধনীরা শিল্পকলাকে একটা আভিজাত্যের গণ্ডীর মধ্যে ঘিরিয়া কোন কোন দিকে তাহার উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকিলেও জনসাধারণের সহজসাধ্য শিল্পকলা সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষাই করিয়াছে, জনসাধারণ হইতে তাঁহারা যে স্বতন্ত্র, সুরুচিসম্পন্ন তাহা নানা আড়ম্বরের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার যে প্রয়াস চলিয়া আসিতেছে, তাহাই শিল্পীকে বিষম মর্ম্মপীড়া দিয়া থাকে।

স্তম্ভটি ও সৈন্যনিবাস তোসল নগরের পাদদেশের দ্বার-স্বরূপ ছিল এবং এই সৈন্যনিবাস হইতে একটি বিস্তৃত রাজপথ বরাবর খণ্ডগিরি এবং উদয়গিরির পাদদেশ হইতে দক্ষিণ দিকে জোগড় নগরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ঐ রাজবর্ত্মের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই স্তম্ভটির ৫০০ ফুট দূরে পরিখাবৃত বিস্তৃত গড় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই গড়টি শিশুপালগড় নামে জনসমাজে পরিচিত। গড়ের মধ্যে শিশুপাল নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম রহিয়াছে। গ্রামের মধ্যে মন্দির, গৃহ, বিদ্যালয় ইত্যাদি আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। এক্ষণে এই শিশুপালগড় নামক বিস্তৃত ভূখণ্ডটি পরীক্ষা করিলে ইহাই পুরাতন তোসলী নগর ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।

চীন ভাষায় লিখিত বুদ্ধভদ্র (৩৯৮-৪২১ খ্রীষ্টাব্দের পরে) গ্রন্থে দেখা যায় তোসলী নগরের উত্তরে সুরভি পর্ব্বত অবস্থিত ছিল।

তোসলস্য নগরস্যোত্তরে
দিগ্‌ভাগে সুরভম্ নামপর্ব্বতম্।

গন্ধর্ব্ব গ্রন্থ অনুসারে তোসলী নগরটি সুরভি পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে। ঐ পর্ব্বতের উচ্চ উপত্যকায় সুন্দর উদ্যান, তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, জলাশয় প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধভদ্র গ্রন্থঅনুযায়ী বর্ত্তমান উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিকে সুরভি পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ এই দুইটি পর্ব্বতে এখনও পর্য্যন্ত চন্দনবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়—সেই জন্যই বোধ হয় সুরভি পর্ব্বত নামকরণ হয়।

এই গড় বা শহরটি ডিম্বাকৃতি ও উর্ব্বর সমতলভূমি। ইহার চতুর্দ্দিক বিস্তৃত পরিখা দ্বারা আবৃত। এই পরিখাটি বর্ষাকালে জলপূর্ণ হইয়া থাকে। এই পরিখা হইতে সমতল উর্ব্বর ভূমিটি বার-তের ফুট উচ্চে অবস্থিত।

পঞ্চমে চ দানীং বসে নন্দরাজ—
তিবসসত—ওঘটিতং তনসুলীয় বাটা
পানাড়িং নগরং প্রবেসয়তি।"
—হস্তিগুম্ফা-প্রস্তরলিপি, ষষ্ঠ পংক্তি।

নন্দরাজ তনসুলিয়া নগরের জল সরবরাহ করিবার জন্য খাল কাটিয়াছিল এবং সেই খাল পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইত।

এই শহরটির চতুর্দ্দিক বিরাট ইটমাটির স্তূপ নির্ম্মিত বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত। এই স্তূপের বাঁধটি ২৫ ফুট উচ্চ এবং পরিসর ১০ ফুট। শহরের চতুর্দ্দিকে ইষ্টকস্তূপের বাঁধ ৫০০০ ফুট লম্বা। শহরটি প্রস্থে ৩৩০০ ফুট। শহরের মধ্যে প্রবেশের জন্য মধ্যে মধ্যে যাতায়াতের পথ গিরিবর্ত্মের ন্যায় অবস্থিত। পূর্ব্বকালে গড়-প্রবেশের জন্য চারিটি পথদ্বার ছিল। এক্ষণে প্রায় কুড়িটি প্রবেশদ্বার গ্রামবাসীরা বাঁধ কাটিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে। শিশুপালগড়ের মধ্যে গোচারণ-ভূমি, শস্যক্ষেত্র, গ্রামবাসীদের কুটীর, গ্রাম্য বিদ্যালয়, মন্দির ও জলাশয় বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই খনন করিলে প্রচুর পুরাতন ইষ্টকরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীরা গড়ের রাজাদের পুরাতন গৃহটি ভাস্করেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের অপর পারে গড়ের মধ্যে বিস্তৃত আম্র-উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেখানে কতকগুলি মাকড়া পাথরের স্তম্ভ বিদ্যমান আছে। এই কিম্বদন্তী রহিয়াছে যে এই স্থানে শিশুপাল রাজার ও থুরিয়া রাজার আবাসস্থল ছিল। ঐ স্থানের পূর্ব্বকালের রাজপ্রাসাদের পুরাতন ইষ্টক খনন করিয়া গ্রামবাসীরা আপনাপন কুটীরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছে। ইষ্টকগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহা দৈর্ঘ্যে ১′—৩″; প্রস্থে ৮″; উচ্চতায় ৪″: বুদ্ধগয়া ও সারনাথে এইরূপ পুরাতন উৎকৃষ্ট দগ্ধ ইষ্টক দৃষ্টিগোচর হয় এবং ইহা যে সুস্পষ্ট অশোক-যুগের নিদর্শন তাহা প্রমাণিত করে। মৃত্তিকার উৎকৃষ্ট দগ্ধ-প্রণালী-বিদ্যা অশোক-যুগের বিশেষত্ব। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় ভুবনেশ্বরের সর্ব্বত্রই, বর্ত্তমান ও অতীতে, প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহাদি দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ পাথর সহজলভ্য ও সুলভ।

অশোক-যুগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ এই নগরের মধ্যে প্রায় ২০টি ইষ্টক-নির্ম্মিত কূপ অদ্যাবধি দৃষ্টিগোচর হয় এবং ঐ কূপের জল অদ্যাপি গ্রামবাসীরা ব্যবহার করে। ভুবনেশ্বর ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলির মধ্যে কুত্রাপি ইষ্টকের কূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ভুবনেশ্বরে পাথর কাটিয়া কূপ, কুণ্ড ও সরোবর প্রতিষ্ঠিত করা চিরপ্রচলিত প্রথা। ইষ্টক-নির্ম্মিত কূপ এই নগরের বিশেষত্ব ও ঐতিহাসিকদিগের গবেষণার বিষয়। কূপগুলির উপরিভাগের চার-পাঁচ ফুট প্রস্তর-

নির্ম্মিত। নিম্নভাগটি সম্পূর্ণ ইষ্টকের। ইহা দ্বারা এই অনুমান হয় যে পুরাতন শহরটি চার-পাঁচ ফুট নিম্নে অবস্থিত এবং খননকার্য্য দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। উড়িষ্যা প্রদেশের বহু স্থান প্রবল বন্যা দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কারণ এই প্রদেশটি বহু পার্ব্বত্য নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমার মনে হয়, অতীতে দৈব-দুর্ব্বিপাকে প্রবল বন্যার দ্বারা এই পুরাতন শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই স্থানের উপরিস্থ পলিমাটি পরীক্ষা করিলে এই ধারণা দৃঢ়তর হয়। এই

দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত খেলনা

গড়ের পরিখাটি বরাবর খালের আকারে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃতি লাভ করিয়া দয়া-নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এবং অনতিদূরে ভার্গবী-নদী দয়া-নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ধৌলী বা ধবল-গিরি পর্ব্বতের সানুদেশ দিয়া দয়া-নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নগরের সহিত ধবল-গিরি পর্ব্বতের সংযোগ জলপথে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং নৌকা-যোগেই যাবতীয় আদান-প্রদান হইত। অর্থাৎ এই নগরটি খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি এবং ধবল-গিরি পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া জলপথ ও স্থলপথের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং যাবতীয় ব্যবসাবাণিজ্যাদির আবাস-ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল।

মাদারীপুরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ এস্ ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে গত বৎসর এই শহরটির স্থানে স্থানে খনন করিয়াছিলাম এবং পুরাতত্ত্বের কতিপয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সেই সমস্ত সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি :—

১। দগ্ধ মৃত্তিকার সুদৃশ্য নানাবিধ পুরাতন অলঙ্কার—মস্তকের, কর্ণের, নাসিকার, গলার ও হস্তের অলঙ্কারাদি।

২। মৃৎভাণ্ডের নানা প্রকার কলসী, হাড়ী, পেয়ালা, প্রদীপ, ঔষধ রাখিবার ও তৈয়ারী করিবার পাত্র ইত্যাদি।

৩। মূল্যবান পাথরের সুদৃশ্য কণ্ঠহার—প্রবাল, রক্ত প্রস্তর, রক্তমণি, নীলমণি ইত্যাদি। বিভিন্ন পাথরের খণ্ডগুলি সরু, লম্বা, চাপ্টা ও গোলাকৃতিরূপে কর্ত্তিত।

৪। চীনামাটির পেয়ালা ইত্যাদির খণ্ড খণ্ড অংশ সংগৃহীত।

৫। দুইটি দগ্ধ মৃত্তিকার হস্তী ও ষণ্ডের শীলমোহর।

৬। পান-আকৃতির তাম্রমুদ্রা,—দুই পার্শ্বের চিহ্ন ও লেখা লুপ্ত।

৭। ঔষধ বাটিবার জন্য পাথরের সুন্দর হামান-দিস্তা।

৮। ঔষধ চূর্ণ করিবার জন্য ছোট পাথরের জাঁতা।

৯। দগ্ধ-মৃত্তিকা নির্ম্মিত খেলনা।

১০। জনৈক গ্রামবাসী গৃহনির্ম্মাণের সময় অনেকগুলি উট ও হস্তী অঙ্কিত তাম্রমুদ্রা খননকার্য্যকালে হঠাৎ প্রাপ্ত হয়। সেইগুলি উক্ত নিরক্ষর গ্রামবাসী এক জন বাসন-বিক্রেতাকে বাসনের পরিবর্ত্তে প্রদান করে। সেই মুদ্রার দুই-একটি অংশ উদ্ধার করিবার জন্য আমি বালকাটীর কাঁসারীপাড়ায় বহু অনুসন্ধানে জানিতে পারি যে সেই পুরাতন মুদ্রাগুলি অগ্নিসংযোগে গালাইয়া বাসন তৈয়ারী করিয়াছে। আমার মনে হয় সেইগুলি মূর্ত্তি-অঙ্কিত অতি প্রাচীন মুদ্রা (Punchmarked Coins)।

এই প্রাচীন নগরের ক্ষুদ্র অংশ খনন করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণের নক্সা, পয়ঃপ্রণালী, বাহির ও অন্দর মহলের সংলগ্ন গৃহগুলি এবং আঙ্গিনার গঠনপ্রণালী ইত্যাদি

দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয় এবং সিন্ধুদেশের মহেন-জো-দাড়োর চিত্র মানসপটে উদ্ভাসিত হয়।

এই প্রদেশটি সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীন গৌরবময় জনপদরূপে পরিচিত ছিল। এই প্রদেশটির দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে পঞ্চ খরস্রোতা নদীমাতৃকা—যথা, মহানদী, দয়া, প্রাচী ও চন্দ্রভাগা—দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। উত্তর দিকে বিন্ধ্যাচলের শাখাপর্ব্বত-মালা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এক দিন এই প্রদেশটি শৌর্য্য-বীর্য্য, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিক্ষাদীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এখনও প্রাচী ও চন্দ্রভাগা নদীর তীরে অসংখ্য পুরাতন ভগ্নাবশেষ অতীত কালের গৌরবগাথার সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের পর এই মনোরম মহানগরীর যশোগাথা দেশ-বিদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল—চীন-পরিব্রাজকদিগের বর্ণনায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের এই নগরটি এত প্রিয় ছিল যে, তোসলী নগরে এক জন রাজকুমার তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ বসবাস করিতেন—তাহা ধৌলীর প্রস্তরলিপির অনুশাসন-পাঠে অবগত হওয়া যায়।

> দেবানং প্রিয়স বচনেন তোসলিয়াম্
> কুমারে মহামাতা চ বতবিয়ঃ
> – ধৌলীর দ্বিতীয় অনুশাসন-লিপি।

মহাকালের উত্থান-পতনে চক্রের সংঘর্ষণে এই সমৃদ্ধি-শালী নগরীর অস্তিত্ব আজ অজ্ঞাত ও অবিদিত। ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণুকণার উপাদান-সংগ্রহে তাহাই নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। আশা করি ভবিষ্যতে যোগ্যতর ব্যক্তি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সুন্দরভাবে গবেষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় এই শহরটির সুবন্দোবস্ত ভাবে খননকার্য্য পরিচালনা করিলে উড়িষ্যার ইতিহাসের অতীত অন্ধকার-যবনিকা অপসারিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগের উজ্জ্বল অধ্যায়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া জগতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিবে।

মণিপুরের কোম ও চিরু জাতি

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশে মণিপুর-রাজ্যে অনেক অসভ্য জাতির বাস। সে-সব জাতির মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই। শুধু পাশ্চাত্য সভ্যতাই নহে, বস্তুতঃ পক্ষে কোন প্রকার সভ্যতাই ইহাদের ভিতর লক্ষিত হয় না। এই সকল জাতি মণিপুরের "লোগ তাগ" হ্রদের চারি পাশে বনে জঙ্গলে ছোট ছোট দল বাঁধিয়া অতি সাধারণ ভাবে জীবন-যাপন করে। এই সকল জাতির জীবনযাপন-প্রণালী ও তাহাদের সাংসারিক ও সামাজিক রীতিনীতি লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি অতি প্রাচীন কালে মানব-সভ্যতার আদিতে মানুষের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল। মণিপুরে নাগা, কুকি প্রভৃতি অনেক আদিম জাতি বসবাস করে। এই সকল জাতির মধ্যে "কোম" ও 'চিরু" এই দুইটি প্রধান। মণিপুর-রাজ্যে বিষ্ণুপুর এলাকায় অনেক কোম ও চিরু জাতির বাস। কোম ও চিরু দুইটি ভিন্ন জাতি, উভয়ের শারীরিক গঠন এবং সামাজিক রীতিনীতি বিভিন্ন।

কোম জাতি।—আকৃতি ও গঠনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে কোম জাতি ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বিভিন্ন। অবশ্য বর্ণসঙ্কর হওয়ার দরুণ

এক জন কোম। ইনি কাইরাপ্ গ্রামের পুরোহিত

খোংনিং

সকল কোম লোকেরই শারীরিক গঠন ঠিক্ এক প্রকার নহে, তথাপি এই অঞ্চলের নাগা, কুকি ও অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা প্রথম-দৃষ্টিতেই লক্ষিত হয়। মোটের উপর কোমরা সাধারণ বাঙালী হইতে খানিকটা খর্ব্বাকৃতি, নাসিকা চ্যাপটা ও চওড়া, মুখমণ্ডল গোলাকৃতি, দাড়ি ও গোঁপ কিঞ্চিৎমাত্র (নাই বলিলেই হয়), মাথা চওড়া এবং চুল সাধারণতঃ সোজা ও শক্ত। ইহাদের গায়ের রং বিভিন্ন রকমের—একেবারে কালো হইতে সম্পূর্ণ হলদে রং। বিশেষতঃ মেয়েদের গায়ের রং ছেলেদের গায়ের রঙের চেয়ে অনেক ফরসা এবং 'মঙ্গোল' জাতির মত হলদে আভাযুক্ত। অনেক সময় মেয়েদের গায়ের রং লালচে দেখা যায়। আকৃতির দিক দিয়াও কোমদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য যথেষ্ট। কেহ কেহ ৫॥ ফুটের উপর দীর্ঘ, ফরসা রং, উচ্চ নাসিকা এবং সুন্দর ও কোঁকড়ান চুলবিশিষ্ট। ইহাদের দেখিলে মনে হয় যেন ওরা অন্যান্য কোম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির। ই সমস্ত ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখিয়া মনে হয় যে দীর্ঘকাল ভিন্ন জাতির সহিত বর্ণসাঙ্কর্য্যহেতু বর্ত্তমানে কোম জাতির কৃতি ও গঠন এই প্রকার দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ লে-মেয়েদের মধ্যে মঙ্গোল জাতীয় আকার সুস্পষ্ট, শেষতঃ মাথার চুলে, চ্যাপটা নাকে, হলদে গায়ের রঙে এবং চীনাদের মত টানা চোখে। আর যাহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ, মনে হয় তাহাদের মধ্যে প্রাচীন ককেশীয় জাতির রক্ত বর্ত্তমান। কোমদের অনেকের গায়ের রং রীতিমত কালো। সম্ভবতঃ ইহা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী প্রাক্-দ্রাবিড় জাতির সহিত সংমিশ্রণের ফল
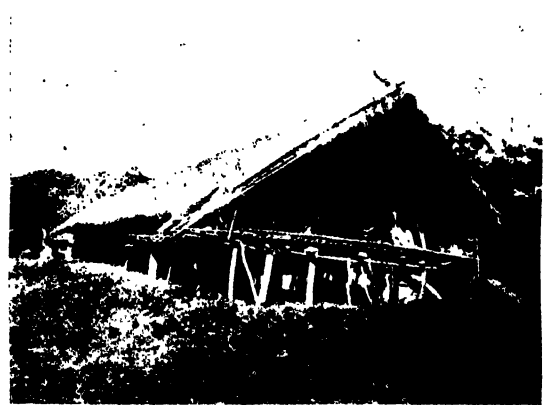
একটি চিরু-গ্রামের 'জলবুক'

কোমরা পাহাড়ের উপরে ত্রিশ-চল্লিশ ঘর একত্র হইয়া ছোট ছোট বস্তীতে বসবাস করে। এই সকল বস্তী দূর হইতে খুব সুন্দর দেখায়। চারিদিকে

আনা পাওয়া যায় তাহাতেই কোন রকমে দিনপাত হয়।

কোমদের মেয়েরা সাধারণতঃ ছেলেদের অপেক্ষা ঢের বেশী কর্ম্মঠ। ছেলেরা অনেক সময় মদ খাইয়া গল্প-গুজব করিয়া সময় কাটায়, কিন্তু মেয়েদের সারাদিন কোন-না-কোন কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কোম-দম্পতিদের মধ্যে কোন প্রকারের বিবাদ কলহ অথবা অসন্তুষ্টি বড়-একটা দেখা যায় না। মোটের উপরে কোম-মেয়েদিগকে দেখিলে মনে হয় যে শত পরিশ্রম করিয়াও ইহারা নিজেদের বেশ সুখী বলিয়া মনে করে। রান্নাবান্না, ঘরনিকানো, পাহাড়ের নীচের ঝরণা হইতে জল আনা এবং ছেলেপুলে লালন করা প্রভৃতি

এক জন চিরু

কোম-বালিকা তাঁত বুনিতেছে

উন্মুক্ত প্রকৃতি, তাহারই মাঝখানে একটি পাহাড়ের মাথায় খানকয়েক ঘর সারি সারি সাজান। ইহাদের বাড়িগুলি সুন্দরভাবে সাজান। বাংলা দেশের গ্রামের বাড়িগুলি শৃঙ্খলাহীনভাবে নির্ম্মিত কিন্তু কোমদের সে প্রকারের নহে। গ্রামের মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা এবং তাহার চারিদিকে বাড়িগুলি বৃত্তাকারে সাজান। প্রত্যেক ঘরে একটি মাত্র দরজা ও সাধারণতঃ ঐ দরজাটি গ্রামের ভিতর দিকে। একখানা মাত্র ঘর লইয়া একটি কোম-বাড়ি এবং সেই একখানা মাত্র ঘরে পিতামাতা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা এবং গ্রামের অন্য বাড়ির দু-চার জন যুবক একত্রে বসবাস করে। কোমদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন কৃষিকার্য্য। পাহাড়ের গায়ে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া ছোট ছোট ক্ষেতের মত তৈয়ারি করে, সেখানে কলা শশা কুমড়ো প্রভৃতি ফল জন্মায়, অনেক সময় ধানও জন্মায়। ঐ ধান এবং ফল প্রভৃতি নিকটস্থ বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহা দু-চার

কাজ করিয়াও ইহাদিগকে আবার তাঁত বুনিয়া কাপড় তৈরি করিতে হয়, এমন কি ক্ষেতে গিয়া চাষবাসের কাজে পুরুষ-দিগকে অনেক সাহায্য করিতে হয়। এত কাজ করিয়াও কোম-মেয়েরা স্বাস্থ্যে অটুট এবং আনন্দে ভরপুর।

বর-দান
শ্রীসে বি কুলকর্ণী,

দেখিলে মনে হয় না ইহাদের জীবনে কোথাও দুঃখের ছায়া পড়িয়াছে।

প্রত্যেক গ্রামে এক জন করিয়া মাতব্বর থাকে। গ্রামের লোকেরা সকল কাজেই ইহার উপদেশ বা আদেশ মানিয়া চলে। কাহারও চুরি হইলে সে তৎক্ষণাৎ মাতব্বরের বাড়ি গিয়া সকল কথা বলিলে মাতব্বর সেই লোকের বাড়িতে আসিয়া তত্ত্বাবধান করিয়া যান, এবং কি কি হারাইয়াছে তাহা বাড়ির লোকদের কাছ হইতে জানিয়া লন। ইহার পর মাতব্বর তাহার দু-এক জন বিশ্বস্ত লোককে চোর খুঁজিয়া বাহির করিতে আদেশ দেন। ইহারা গোপনে নানা অনুসন্ধান করিয়া যে-ব্যক্তি চুরি করিয়াছে তাহাকে মাতব্বরের নিকট ধরিয়া আনে। তখন মাতব্বর গ্রামের অন্যান্য লোকের সমক্ষে আসামীকে শাস্তি দেয়। গ্রামের সকল প্রকার বিচারের ভার এই মাতব্বরের উপরে। গ্রামে আর এক জন সহকারী মাতব্বর থাকে। মাতব্বর কখনও স্থানান্তরে গেলে বা অসুস্থ থাকিলে বিচারাদির কাজ সহকারী মাতব্বরের উপরে পড়ে। প্রত্যেক গ্রামে এক জন করিয়া সরকারী পেয়াদা থাকে। ইহার কাজ গ্রাম হইতে নানা প্রকারের খবর বহন করা। গ্রামে পূজা, বিবাহ বা অন্য কোন প্রকার উৎসব উপলক্ষ্যে এই পেয়াদাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। বাড়ি-বাড়ি কাঠ জোগাড় করা, উৎসবের জন্য রান্নাবান্না করা এবং গ্রামের অন্যান্য লোকদের পরিবেশন করা, এই সকলই সরকারী পেয়াদা ও তাহার স্ত্রীর কাজ। এই সকল কাজের পারিশ্রমিক-স্বরূপ সরকারী পেয়াদাকে ধান, চাল, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এবং কোন কোন সময় নগদ পয়সা গ্রামের লোকেরা চাঁদা করিয়া দিয়া থাকে।

এই সকল আদিম জাতির সামাজিক রীতিনীতি আমাদের কাছে অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের সামাজিক প্রথা অধুনা সকল সভ্য জাতি হইতে বিভিন্ন। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কোম-ছেলেরা দশ বৎসর বয়স্ক হইলেই রাত্রিতে নিজ বাড়িতে থাকিতে পায় না। কারণ ইহাদের ধারণা অনুসারে বয়স্থা ভ্রাতা ও ভগ্নী রাত্রিতে এক ঘরে শোয়া খুব খারাপ। তাই দশ বছর বয়স হইতেই ছেলেদিগকে বাড়ি হইতে অন্যত্র গিয়া শুইতে হয়। চিরুদের মধ্যেও এইরূপ ব্যবস্থা। প্রত্যেক চিরু-গ্রামে একটি ভিন্ন বাড়ি থাকে, তাহাকে জাতীয় ভাষায় "জলবুক" বলে। সন্ধ্যার সময় গ্রামের দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক অবিবাহিত ছেলেরা "জলবুকে" আসিয়া একত্র হয় এবং এইখানে রাত্রি যাপন করে। চিরুদের "জলবুক" সাধারণ বাড়ি হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। গ্রামের অবিবাহিত ছেলেরা এখানে একত্রে থাকে বলিয়া যে শুধু ইহাকে অন্যান্য বাড়ি অপেক্ষা ঢের বেশী বড় করিয়া তৈরি করা হয় তাহা নহে। ইহা মাটি হইতে দু-তিন হাত উর্দ্ধে মোটা কাঠের খুঁটির উপরে তৈরি করা হয়, কিন্তু চিরুদের সাধারণ বাড়ি মাটির উপরে। এমন কি অনেক সময় কোন প্রকারের পোস্তা (plinth) থাকে না। জলবুকের সামনে একটি প্রকাণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত নারী মূর্ত্তি রাখা হয়। ইহাকে "থোংনিং" (Mother Goddess) বলে। থোংনিং চিরুদের এক জন প্রধান দেবী। কোন নূতন বস্তীতে "জলবুক" করিবার পূর্ব্বে থোংনিংকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যথেষ্ট আয়োজন সহকারে পূজা করিতে হয়। এই পূজা উপলক্ষে অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা একত্র হইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকে। থোংনিং ছাড়া জলবুকের সামনে খোলা জায়গায় আর একটি বেদী বা পূজার স্থান আছে। ইহা একখানা বা কয়েকখানা বড় বড় পাথরের সমষ্টি। এইখানে নানা সময়ে—বিশেষ করিয়া গ্রামে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে—সকল লোকে একত্র হইয়া গ্রাম্যদেবতাকে পূজা দেয়। চিরুগ্রামের প্রবেশ ও বহির্দ্বারের নিকটেও এইরূপ দুইটি পূজার বেদী আছে। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চিরুদের মধ্যেও বয়স্থা ভাই-ভগ্নী রাত্রিতে এক বাড়িতে থাকিতে পারে না। বয়স্থা ভগ্নীরা পিতামাতার সঙ্গে একই ঘরে ভিন্ন বিছানায় শোয় এবং দশ বৎসরের বেশী বয়স্ক অবিবাহিত ভ্রাতারা সন্ধ্যার সময় জলবুকে চলিয়া যায়। চিরুদের নিয়মানুসারে বিবাহিতা কি অবিবাহিতা কোন স্ত্রীলোক কখনও কোন কারণে জলবুকে যাইতে পারে না। এমন কি জলবুকের খুঁটি কিংবা বেড়া পর্য্যন্ত মেয়েদের স্পর্শ করা নিষেধ। এই প্রকার সামাজিক নিয়মের দ্বারা জলবুকের পবিত্রতা রক্ষিত হয় বলিয়া চিরুদের ধারণা।

যাহা হউক, এইখানে আমরা দেখিতেছি যে আদিম অসভ্য জাতিরাও ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক সীমান্ত-রেখা টানিয়া একেকে অন্য হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে প্রয়াস পায়।

চিরু-মেয়েরা নিজ নিজ বাড়িতে বাপমায়ের সঙ্গে থাকে এবং ছেলেরা সন্ধ্যার পরে জলবুকে চলিয়া যায়। ইহা হইতে যদি কেহ ধারণা করিয়া লয় যে চিরু ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোন প্রকারের যৌন-সংমিলন ঘটে না তাহা হইলে উহা নিতান্ত ভুল হইবে। প্রথমতঃ চিরু ছেলেমেয়েরা নাগা কুকি প্রভৃতি অন্যান্য জাতি ও ছেলেমেয়েদের মত একত্রে জঙ্গলে কাঠ কুড়াইতে যায়, ক্ষেতে কাজ করে এবং অনেক সময় অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত নাচ-গান খেলাধূলা করিয়া থাকে। এইরূপ সময় বয়স্থ ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধে মেলামেশা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও চিরু ছেলেরা সন্ধ্যার সময় জলবুকে একত্র হইয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে অবস্থান করে না। সাধারণতঃ অবিবাহিত চিরু ছেলেরা তাহাদের মহিলা-বন্ধুদের সঙ্গে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটায়। অনেক ক্ষেত্রেই একটু রাত্রি হইলেই ছেলেরা নিজ নিজ মহিলা-বন্ধুর বাড়িতে চলিয়া যায় এবং তাহাদিগকে বাড়ির বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া আমোদ-প্রমোদ করে। এইরূপে অনেক সময় মহিলা-বন্ধুদের সহবাসে কাটাইয়া গভীর রাত্রিতে জলবুকে ফিরিয়া আসে।

কোমদের প্রথা চিরুদের প্রথা হইতে বিভিন্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোমদের মধ্যে বয়স্ক ভাই-ভগ্নীরা রাত্রিতে এক বাড়িতে অবস্থান করিতে পারে না। কিন্তু চিরুদের মত কোমরা অবিবাহিত ছেলেদের রাত্রি-যাপনের জন্য জলবুক তৈরি করে না। প্রত্যেক কোম-গৃহে ঘরের দুইটি অংশ থাকে। অবশ্য এই অংশ দুইটির মধ্যে দেওয়াল বা কোন প্রকারের আবরণ নাই। কিন্তু এই দুইটি অংশের একটিকে অপরটি হইতে পৃথক বলিয়া মনে করিয়া লওয়া হয়। এই দুই পৃথক ভাগের এক ভাগে বাপ-মা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এবং অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা থাকে। অন্য ভাগে গ্রামের অন্য বাড়ির (অনাত্মীয়) কয়েক জন যুবক আসিয়া রাত্রিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে-বাড়িতে কোন বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা নাই, সে-বাড়িতে গ্রামের কোন ছেলে শুইতে আসে না। অন্য পক্ষে যে-বাড়িতে এক জন অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা আছে, অনেক সময় সে-বাড়িতে চার-পাঁচ জন যুবক আসিয়া আশ্রয় লয়। যদিও অবিবাহিতা কন্যার জন্য বাপ-মায়ের অংশে একধারে শুইবার ব্যবস্থা থাকে তথাপি এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ যৌন-সংযোগ ঘটিয়া থাকে। এই প্রকারে গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতেই অন্য বাড়ির কয়েক জন যুবক রাত্রি-যাপন করে। এক জন যুবক সচরাচর একই বাড়িতে প্রতিদিন শুইতে যায় এবং সে-বাড়ির লোকেরা তাহাকে "সোম্পা" বলিয়া ডাকে ও এই অবিবাহিত যুবক সেই বাড়ির মেয়ে বা মেয়েদিগকে "সম্নু" বলিয়া ডাকে। সামাজিক প্রথানুযায়ী "সোম্পা" বা অবিবাহিত যুবকদিগের তত্ত্বাবধান করা "সম্নু" বা বাড়ির অবিবাহিতা মেয়েদের কর্ত্তব্য। সম্নুরা সোম্পাদের অনেক কাজ করিয়া থাকে। সকালবেলা উঠিয়া সোম্পাদের হাত মুখ ধুইবার জল দেওয়া, তাহাদিগকে তামাক সাজিয়া দেওয়া সম্নুদের কাজ এবং রাত্রিতেও সোম্পারা না-ঘুমান পর্য্যন্ত সম্নুদিগকে সোম্পাদিগের কাছে কাছে থাকিতে হয়। চিরু ও কোমদিগের মধ্যে এই প্রকারের আরও অনেক অদ্ভুত নিয়মকানুন বর্ত্তমান।

এই সকল বর্ব্বর জাতির বিবাহ-পদ্ধতিও যে-কোন সভ্য জাতির বিবাহ-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে আমাদের মত কোমদের মধ্যে কন্যার পিতা ও বরের পিতা একত্র হইয়া সম্বন্ধ স্থির করে। অবশ্য বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে পুত্রকন্যার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে পিতা-মাতার উপরে নির্ভর করে। তাঁহারা যে কন্যা বা বরের সঙ্গে বিবাহ ইচ্ছা করেন সেইখানেই বিবাহ হইয়া থাকে। অন্ততঃ পল্লীসমাজে কন্যা বা পুত্রের মতামতের বিশেষ কোন মূল্য দেওয়া হয় না। কিন্তু এ-বিষয়ে কোমদের কথা অনেকটা আধুনিক বলিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে কন্যা বা বরের মতামতই প্রধান। যদিও সম্বন্ধ স্থির করার ভার সাধারণতঃ কন্যা বা বরের পিতার উপর নির্ভর করে, তথাপি কন্যা বা পুত্র ইচ্ছা করিলে পিতার স্থিরীকৃত বর বা কনেকে বিবাহ নাও করিতে পারে। কোমদের পিতা-মাতা পুত্র বা কন্যার বিবাহ স্থির করিবার আগে ভাল করিয়া জানিয়া লন যে

তাহাদের পুত্র বা কন্যা গ্রামের কোন্ যুবতী বা যুবককে ভালবাসে এবং সেই অনুযায়ী তাঁহারা বিবাহের প্রস্তাব করেন। প্রথম প্রস্তাবের দিন বরের পিতা একটি শূকর ও এক বোতল "জু" লইয়া কন্যার পিতার বাড়িতে যান। তথায় কন্যার পিতাকে বরের পিতা আনীত শূকর ও "জু"র বোতল দেন। যদি কন্যার পিতা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি তাঁহার কন্যাকে উক্ত ব্যক্তির ছেলের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত। তখন উভয়ের মধ্যে কন্যাদানের যৌতুক সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে থাকে। কোমদের মধ্যে বিবাহের সময় বর বা বরের পিতা কন্যার পিতাকে দুইটি গরু, একটি মিথান ও চারি বোতল "জু" দিয়া থাকেন। অবশ্য এই কন্যাদানের যৌতুক সকলক্ষেত্রে সমান হয় না; তবে কন্যা সুন্দরী বা কুৎসিত সে হিসাবে যৌতুকের বিশেষ কোন পার্থক্য হয় না। প্রথম প্রস্তাবের দিন বরের পিতা কন্যার যৌতুক ও বিবাহের তারিখ ঠিক করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসেন। তাহার পর বিবাহের দিন বর তাহার পিতা মামা ও গ্রামের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগকে সঙ্গে করিয়া কন্যার বাড়িতে যায়। সেখানে কন্যার পিতা আগত অতিথিদিগের আহারাদির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। যদি তাঁহার অবস্থা ভাল হয় তাহা হইলে তিনি অন্ততঃ একটি মিথান ও দু-তিনটি শূকর মারিয়া থাকেন। বিবাহের আচারাদি খুব সাধারণ রকমের। গ্রামের সকল লোক কন্যার বাড়িতে আসিলে পর "মাকো" বা গ্রাম্য পুরোহিত সকলের সমক্ষে একটি মুরগী কাটিয়া থাকে। মরিবার সময় যদি মুরগীটির দুই পা একত্রে থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বর ও কন্যার সম্মিলন চিরস্থায়ী হইবে। তখন বর ও কন্যাকে একটি জু-পাত্র হইতে দুইটি নল দ্বারা জু টানিতে বলা হয় এবং এই একত্র জু-পানই বিবাহবন্ধনের মূল সূত্র। ইহার পরে সমাগত অতিথি ও গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও নাচগান করিয়া থাকে। অনেক সময় এইরূপ উৎসব দু-তিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত চলিয়া থাকে। যাহা হউক, উৎসব অন্তে গ্রামের লোকেরা ও অতিথিগণ নিজ নিজ বাড়ি চলিয়া যান, এবং নবদম্পতি তাহাদের নূতন বাড়িতে আলাদা সংসার পাতিয়া জীবনযাত্রা সুরু করে। বিবাহের পূর্ব্বে যে মুরগীটি মারা হয়, যদি মরিবার সময় পা দুইটা পৃথক হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বর ও কন্যার মিলন স্থায়ী হইবে না। এইরূপ স্থলে সচরাচর বিবাহ স্থগিত রাখা হয়। তখন অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

আহার্য্য সম্বন্ধে কোম ও চিরুদিগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। তাহারা আমাদেরই মত ভাত খায়, তবে তরকারী প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা নাই। ইহারা টাট্কা মাছ হইতে শুঁট্কি মাছ বেশী ভালবাসে। মাদক দ্রব্য ইহারা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। বলিতে গেলে ভাতের পরে ইহাদের প্রধান খাদ্য মদ। জু নামক এক প্রকার মদ কোম ও চিরু প্রভৃতি জাতিরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। তিন মাসের শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অবাধে জু খাইয়া থাকে। উৎসব প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও কোম ও চিরুরা প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ জু খাইয়া থাকে। অনেক সময় ভাত খাওয়ার পরে জলের পরিবর্ত্তে জু-ই খাইয়া থাকে। দেবদেবীর পূজাতেও যথেষ্ট পরিমাণ জুর সদ্ব্যবহার হয়। অধিক জু ব্যবহারের দরুণ সকল মণিপুরী জাতির মধ্যে স্বাস্থ্যহানির লক্ষণ দেখা যায় ইহা ছাড়া কোম বিশেষ করিয়া চিরু জাতিদের আর্থিক দুর্গতির একটি প্রধান কারণ অত্যধিক মাত্রায় মাদক দ্রব্য ব্যবহার। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় এক জন চিরু নিকটস্থ বাজারে কলা, কুমড়া ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া যে দু-চার আনা পয়সা রোজগার করে তাহার অধিকাংশ জু খাইতে ব্যয় করিয়া ফেলে এবং সন্ধ্যার সময় খালি-হাতে পাহাড়ের পথে অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় টলিতে টলিতে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

চিরু জাতি।—চিরুদের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে কতকটা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন শুধু তাহাদের আকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে কিছু বলিব। শারীরিক আকৃতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে চিরুরা কোমদিগের তুলনায় অনেক বেশী বর্ব্বর বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মুখের ভাব অনেকখানি রূঢ় এমন কি হিংস্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোমদের মত চিরুদের মধ্যে

অনেকটা ব্যক্তিগত প্রভেদ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে এক দল বেশ উঁচু লম্বা ও বলিষ্ঠদেহ। গায়ের রং সাধারণতঃ কালো বলিলেই হয়, যদিও দু-চার জনকে মঙ্গোলদের মত হলদে আভাযুক্ত দেখায়। তবে কোম অপেক্ষা চিরুদের মধ্যে কালোর সংখ্যা অনেক বেশী। ইহাদের নাসিকা চ্যাপ্‌টা ও চওড়া, মুখমণ্ডল গোলাকৃতি, দাড়ি ও গোঁফ সামান্য, মাথা চওড়া এবং চুল সোজা ও শক্ত। কোমদের মত ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট বর্ণসঙ্কর ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কারণ ইহাদের এক দল দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহ ও অপর দল খর্ব্বাকৃতি মঙ্গোল-ভাবাপন্ন। মুংসাই গ্রামের সহকারী মাতব্বর দীর্ঘকায় বলিষ্ঠদেহ এবং খুব কালো; কিন্তু তাহার ছেলে রীতিমত খর্ব্বাকৃতি, হলদে আভাযুক্ত গায়ের রং এবং নাকমুখ স্পষ্ট মঙ্গোল-ভাবাপন্ন। এই সকল দেখিয়া মনে হয় দীর্ঘকায় ককেশীয় জাতির সহিত খর্ব্বাকৃতি মঙ্গোল জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের উৎপত্তি। উপরন্তু ইহাদের মধ্যে প্রাক্‌দ্রাবিড় জাতির রক্তমিশ্রণও আছে বলিয়া মনে হয়।*

* আসামের কুকি, নাগা প্রভৃতি অসভ্য জাতির সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিৎ ডাঃ হাডন বলিয়াছেন—

"An analysis of the anthropological data of the Assam tribes seems to indicate that there are several constituent races which do not coincide with political groups and are lost sight of when one deals with averages. It may be tentatively suggested that there is an ancient dolichocephalic platyrrhine type (pre-Dravidian) which is strong among the Khasis, Kuki, Manipuri, etc. but is weaker among the Naga tribes."—A. C. Haddon : *Races of Man*, p. 116.

ইউরোপে ভারতীয় কুৎসা প্রচার

শ্রীসুশীলচন্দ্র রায়, জার্ম্মেনী

ইউরোপে যে কিরূপ তীক্ষ্ণভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করা হয় তাহা বোধ হয় আমাদের দেশের অনেকেই অবগত নহেন। ইউরোপ হইতে যে সকল লোক ভারতবর্ষে যান, তাঁহাদের অনেকেই এদেশে ফিরিয়া আসিয়া ভারতবাসীর আতিথ্যের প্রতিদান-স্বরূপ ভারতের কুৎসা রটাইয়া বেড়ান।

এই সমস্ত লোকের প্রচার-বাণীর মর্ম্ম এইরূপ :—ভারতবর্ষ একটি অসভ্য এবং বর্ব্বর দেশ, সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তুতে পরিপূর্ণ; ভারতবর্ষের লোকেরা অতি দীন এবং অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় থাকে, তাহাদের দেহ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়; সেখানে যাহা কিছু শিক্ষা বা সভ্যতা বর্ত্তমান তাহা কেবল ইংরেজ রাজত্বের কল্যাণেই সম্ভবপর হইয়াছে। তার পর ভারতবর্ষে তাঁহাদের বিক্রম বিষয়ে বর্ণনা করেন। কোন্ কোন্ রাজা মহারাজার বন্ধুত্ব লাভ এবং তাঁহাদের প্রাসাদে বাস করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ও সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে শিকারে গিয়াছেন, কয়টা বাঘ মারিয়াছেন ইত্যাদি। সেখানে কুলী সমেত (এই সব লোকেরই সাহায্যে ইউরোপবাসীদিগের শিকার সম্ভবপর হয়) ব্যাঘ্র বা অন্যান্য জন্তুর ফটোগ্রাফ বা ফিল্‌ম্ তুলিয়া এদেশে বক্তৃতা দেওয়া হয়। এই উপায়ে অনেকে টাকা রোজগার করেন। এ-সব দেশে অদ্ভুত কিছু দেখাইতে পারিলেই লোকেরা খুব উৎসাহের সহিত দেখে। অবশ্য যে-দেশে এই সমস্ত দেখান হয়, প্রারম্ভে সে-দেশের সভ্যতার উৎকর্ষ বিষয়ে কিছু বলিতে হয়।

ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা সম্বন্ধেই এই প্রকার ফটো বা ফিল্‌ম্ বেশী দেখান হয়। ইহার কারণ, বোধ হয়, এই দুই দেশ পরাধীন, এবং বহির্জ্জগতে এরূপ প্রচারকার্য্য-বিষয়ে ইহাদের বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সহায়তা। জাপান বা অপর

স্বাধীন দেশ সম্বন্ধে এরূপ প্রচারকার্য্য সম্ভবপর নহে। স্বাধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার ফটো বা ফিলম্ তুলিতে অনুমতি দিবেন না, অধিকন্তু এইরূপ প্রচেষ্টাকারীকে সে দেশ পরিত্যাগ করিতেও হইতে পারে।

এই সুসভ্য ইউরোপে মজুর ও বেকারদের বাসস্থান ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যদি ফটো বা ফিলম্ তুলিতে পারা যাইত, তবে এই প্রকার কুৎসা আমরাও প্রচার করিতে পারিতাম। এ-সব দেশের বেকারগণ সরকার হইতে সাহায্য পায়, তথাপি ইহাদের কদর্য্যতার সীমা নাই। আর আমাদের দেশে বেকারগণ সরকারের নিকট হইতে কোন সাহায্যই পায় না, ইহাতে যে তাহাদের দীনাবস্থা ঘটিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! এ-সব দেশের লোক আমাদের দেশে গিয়া রাজার হালে থাকে, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া সেই দেশেরই কুৎসা প্রচার করে, বেশ বাহবা নেয় এবং পয়সা রোজগার করে। এরূপ কার্য্য করিতে এদেরই প্রবৃত্তি হয়।

আমাদের রাজা-মহারাজারাও যে কেন এই শ্রেণীর লোকদিগকে তাঁহাদের প্রাসাদে স্থান দেন তাহাও বুঝা যায় না। তাঁহারা কি কোনদিনই নিজেদের দেশ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিবেন না? এ-সব লোক সাহায্য পাইয়া থাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও রাজা-মহারাজাদিগের নিকট হইতে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করেন নিজেদের স্বার্থের জন্য, আর রাজা-মহারাজগণ ইংরেজের ক্রীড়ার পুতুল। জাতীয় ভাব ইহাদের মধ্যে কোন দিন আসিবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ ইহারা নিজেদের স্বার্থটাই সর্ব্বাগ্রে দেখেন।

ইহা ছাড়া আবার আর এক দল আছে যাহারা অন্য ভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচার করে। ইহাদের আলোচ্য বিষয় সতীদাহ ও নরবলি। সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের জন্যই নাকি সতীদাহ-প্রথা ভারত হইতে লোপ পাইয়াছে, নতুবা এখনও আমরা সেরূপ বর্ব্বরভাবে সতীদাহ করিতাম। অথচ রাজা রামমোহন রায়ের নাম কোথাও উল্লেখ করা হয় না। যাহারা চক্ষু থাকিতেও কাণা তাহাদের আর কি বলা যায়। এমনি ভাবেই এরা সত্য কথার গোপন করে।

এই জাতীয় প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্য দুই প্রকার বলিয়া মনে হয়। প্রথম, বেশ দু-পয়সা রোজগার করা; দ্বিতীয়, শ্বেত জাতির প্রাধান্য প্রমাণিত করা। এখানে জগতের রাজনীতি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বোধ হয় বলা চলে। জাপান চায় এশিয়া শুধু এশিয়াবাসীদের জন্য এবং সেখানে শ্বেত-প্রাধান্যের পরিবর্ত্তে কেবল জাপান-প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাপান চীনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে এবং তাহার বহির্বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তৃতি করিতেছে। ইহাতে ইউরোপবাসীদের ভিতর আজকাল একটা ভীতিপূর্ণ চাঞ্চল্যের উদ্রেক হইয়াছে এবং ইউরোপের বড় বড় রাজনৈতিকদের ইচ্ছা যে সমস্ত ইউরোপীয় শক্তিসমূহ একত্র হইয়া এসিয়া ও আফ্রিকাতে শ্বেত-প্রাধান্য বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা করেন। সেদিন দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাটস্ তাঁহার একটি বক্তৃতায় এই বিষয় স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এই শ্বেত-প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য জগতের সম্মুখে পরাধীন জাতিসমূহের কুৎসা প্রচার করিয়া জানাইতে চায় যে এই সব অধীন দেশবাসীরা স্বয়ং নিজেদের দেশ শাসন করিতে অক্ষম এবং ইহাদের মঙ্গলের জন্যই শ্বেত-জাতিরা তাহাদের শাসন করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহাই শ্বেত-জাতির ভণ্ডামির চরম লক্ষণ।

সম্প্রতি, গত ১লা মার্চ হইতে ৭ই মার্চ, এই ড্রেসডেন শহরে Bengt Berg নামে এক সুইডেনবাসী ভদ্রলোক 'Tiger und Mensch' (ইংরেজী অর্থ, Tiger and Mankind; বাংলা অর্থ, ব্যাঘ্র ও মনুষ্য) আখ্যা দিয়া বায়স্কোপ দেখাইয়াছেন এবং দর্শকদিগকে বিষয়গুলি স্বয়ং বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই ফিল্মটি ড্রেসডেন শহরের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সিনেমা হাউস Universum-এ দেখান হইয়াছে। প্রদর্শিত ছবিগুলি হিমালয় পর্ব্বতের ও বাংলা দেশের বনজঙ্গলের, এবং অধিকাংশই তাঁহার শীকার সম্বন্ধীয়। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এইরূপ:—

ইতিহাসে যে ভারতবর্ষকে কল্পনার রাজ্য বলা হয় তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভারতবর্ষে গমন করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়। গান্ধীর নাম ইউরোপবাসী আমরা সকলেই শুনিয়াছি, কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক স্থানের

লোকেরা তাহা শুনে নাই। এখানে সব রকমেরই জন্তু-জানোয়ার বাস করে। ভারতবর্ষের সর্পবিষয়ে আমরা অনেক কিছুই শুনিতে পাই ও কল্পনা করি, কিন্তু আমার পাঁচ বৎসর ভারত-প্রবাসকালীন মাত্র ছয়বার সর্প দেখিয়াছি, একবার আমার বিছানাতেও ছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষকে ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুরা শাসন করে। ব্যাঘ্র, গো-মহিষ ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু হনন করে, কিন্তু ভারতীয়রা—যাহাদের অধিকাংশই হিন্দু—তৎপরিবর্ত্তে সেই ব্যাঘ্রকেই হাতজোড় করিয়া পূজা করে। এই প্রকার অদ্ভুত প্রকৃতির ভীরু জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। সত্যই এক জন ইংরেজ বলিয়াছেন যে ছয় কোটি বাঙালীকে ধ্বংস করিতে ছয়টা বাঘই যথেষ্ট।

ভারতের কৃষ্টির কথা অনেক শোনা যায়, কিন্তু আসলে কিছুই নয়। ভারতীয়রা তাহাদের সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা মোট বহন করায়। তৈলবর্ণ দেহবিশিষ্ট ভারতীয়রা ইংরেজের প্রস্তুত রাস্তায় ভ্রমণ করে। ইহাদের গা হইতে বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়, যাহা ইউরোপবাসীদিগের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নহে।

এই যে পার্ব্বত্য স্থান ও পথ দেখা যাইতেছে ইহা হিমালয়ের গাত্রে, এবং এই একমাত্র পথ ভারত ও তিব্বতকে সংযোজিত করিয়াছে। এই এক দল মিছিল আসিতেছে, ইহাদের সহিত কৈলাসাধিবাসী নৃত্যরত দেবতা। এইবার কিরূপ পশুবলি হইতেছে, এবং তাহার রক্ত পান করিয়া ইহাদের দেবতা কিরূপ তেজের সহিত নাচিতেছেন।

আমি ঢোলপুরের মহারাজার সঙ্গে অনেক বার শিকারে গিয়াছিলাম। আলোয়ারের মহারাজা এবং প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্‌ও আমার বন্ধু। ব্যাঘ্রশিকার ইউরোপবাসী বা ভারতবাসী উভয়ের পক্ষেই কঠিন, কারণ বাঘ অতি চতুর জন্তু। কিন্তু ভল্লুক তত চতুর নয়, এই জন্য ভল্লুক-শিকার বেশী শক্ত নয়। তবে ওদেশবাসীদের (অর্থাৎ ভারতবাসীদের) নিকট ভল্লুক-শিকারও কষ্টকর।

উপরে ভদ্রলোক Bengt Bergএর বক্তৃতার সারাংশ দিলাম। এইবার তাঁহার ভদ্রতার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

গত ২রা মার্চ তারিখে প্রাতঃকালে আমি তাঁহাকে টেলিফোন করি। তিনি 'সুপ্রভাত' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, আমিও তদনুরূপ প্রত্যুত্তর দিলাম। তার পর আমি বলিলাম যে আমি এক জন ভারতীয় এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে তিনি উদ্ধতভাবে বলিলেন যে তাঁহার সময় নাই এবং আমার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—আপনি আমাদের দেশে অতিথি হইয়াছিলেন, এদেশবাসীদের সম্মুখে ভারতকে এরূপভাবে মসীময় করিয়া আপনার লাভ কি? উত্তরে তিনি বলেন—তুমি যাহা করিতে পার কর।

এক্ষণে আমার প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে—সুইডেনের এমন কি সভ্যতা আছে যাহার জোরে তিনি ভারতকে এরূপ হীনভাবে লোকচক্ষে ধরিয়াছেন? সুইডেন ত আজ পর্য্যন্ত জগতকে বিশেষ কিছু দেয় নাই। সুইডেনের এক নোবেল (Nobel) ও ক্রয়গার (Kreuger) ব্যতীত আর ত কোন সুধী ব্যক্তির নাম বড়-একটা শোনা যায় না। সুইডেনেও অনেক লোক আছে যাহারা ভারতবাসীর চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকে। আমাদের দেশের মজুরগণ অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কাজ করে বটে, কিন্তু এদেশেও গ্রীষ্মকালে মজুরদিগকে রাস্তায় অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কাজ করিতে আমি নিজে দেখিয়াছি। আমাদের দেশে গরমটা প্রায় বার মাস থাকে বলিয়াই, তাছাড়া আমাদের দেশ দরিদ্র বলিয়াই, তথাকার লোকদিগকে ঐরূপ অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় থাকিতে হয়। আর পোষাকই বোধ হয় সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন নহে।

আজ আমরা পরাধীন বলিয়াই Bengt Berg-এর বচনের প্রতিবাদ করিতে কেহ নাই। এই অবমাননার প্রতিশোধ সেইদিন দিতে পারিব, যেদিন আমরা পরাধীনতার পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিব এবং এই জাতীয়-লোকেরা আর ভারতে পদার্পণ করিতে পারিবে না।

আবার Ludwig von Wohl নামে এক জন জার্ম্মান ভদ্রলোক 'Die Woche' নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ভারতবর্ষ বিষয়ে ধারাবাহিকরূপে একটি প্রবন্ধ বাহির করিতেছেন। প্রবন্ধটির নাম 'Verbrechen in Indien', বাংলা অর্থ—ভারতে অপকর্ম্ম। প্রবন্ধের নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে লেখক কি সদুদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধটি লিখিতেছেন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তিনি মহাত্মা

গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, এমন কি একদিন তিনি মহাত্মার সহিত মৌনদিবসে দেখা করিয়াছিলেন। মহাত্মাকে জার্ম্মেনী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে লিখিয়া দেন, "May God bless Germany,' অর্থ—ঈশ্বর জার্ম্মেনীর মঙ্গল করুন। বোধ হয় ইহারই প্রতিদানস্বরূপ তিনি এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন। প্রবন্ধের সারমর্ম্ম এইরূপ:—ভারতে এখনও কোথাও কোথাও নাকি নরবলি-প্রথা প্রচলিত আছে, নরবলি এবং সতীদাহ কবে এবং কিরূপে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় ভারত হইতে উঠিয়া গিয়াছে, কিরূপ বর্ব্বরভাবে নরবলি ও সতীদাহ সম্পন্ন করা হইত, তাহার সচিত্র বর্ণনা, কালী ঘাটের ছবি এবং এখনও আমরা কি-প্রকার অমানুষিক ভাবে পশুবলি দিয়া থাকি; ঠগীদের বর্ণনা, তাহাদের অত্যাচার কবে কোথায় ছিল এবং কিরূপে তাহা ক্রমে ক্রমে ইংরেজ-শাসনের গুণে লোপ পাইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ অনেক বিষয়েরই বর্ণনা তিনি দিতেছেন ও দিতে থাকিবেন যেহেতু প্রবন্ধটি ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, প্রত্যেক দেশেরই দোষগুণ আছে। কোন জাতি যতই সুসভ্য হউক না কেন, ইচ্ছা করিলে তাহার বহু কলঙ্ক জগতের সম্মুখে প্রচার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। শ্বেতজাতি যে কেন ভারতের কুৎসা প্রচার করিতেছে, তাহার কারণ সুস্পষ্ট। পরিতাপের বিষয়, এই সকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে আমরা এখনও যত্নবান হই না।

সন্ন্যাসযোগ

শ্রীসুধীরকুমার সেন

বিভূতির বয়স যখন তিন বৎসর তখন জলটুঙ্গি গ্রামে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। কামারপাড়ার এক বহুকালের প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে বাঘছাল পাতিয়া, ধুনি জ্বালাইয়া সন্ন্যাসী আস্তানা গাড়েন। সন্ন্যাসীর দীর্ঘ জটা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, মুখে সদা বম্ বম্ ধ্বনি; দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ পুরুষ, বয়স আন্দাজ করা যায় না। সন্ন্যাসী ফলমুল ছাড়া আর কিছু আহার করেন না, তাহাও একবার মাত্র, এবং নিদ্রা নাকি একেবারেই যান না, সমস্ত রাত্রি ধুনি জ্বালাইয়া জাগিয়া থাকেন এবং জপ-তপ করেন।

স্ত্রী মোক্ষদা প্রমুখাৎ সন্ন্যাসীর নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া শুনিয়া হরনাথের কান প্রায় পচিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সন্ন্যাসী-ফকিরে হরনাথের কোনদিনই বড় বিশ্বাস ছিল না। একবার তাহার ছেলেবেলায় তাহাদের বাড়িতে অকস্মাৎ এক সাধু উপস্থিত হইয়া সামনের অমাবস্যার বালক হরনাথের আকস্মিক মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ফাঁড়া কাটাইবার অছিলায় তাহার বাপের নিকট হইতে ঠকাইয়া টাকা লইয়া যায়। পরে শোনা যায়, ঐ সাধু পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক গৃহস্থকেও ঐভাবে ঠকাইয়া গিয়াছে। সেই হইতে গাঙ্গুলী-বাড়িতে সাধু-সন্ন্যাসী ঢুকিতে পাইত না।

হরনাথের যে সন্ন্যাসীর উপর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু ছেলে বিভূতিকে লইয়া সে কিছুদিন যাবৎ বিষম দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছিল। বিভূতির তিন বছর বয়স হইল, কিন্তু এখনও মুখে বোল ফুটে নাই। সকলেই বলিত, ছেলে বোবা হইবে। বৃদ্ধ নিশি গাঙ্গুলী বলিয়াছিলেন, 'এখন থেকে চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে সাধু-সন্ন্যাসী দেখাও, ভাল হ'লেও হ'তে পারে। দৈবে একটু বিশ্বাস রেখো ভাই, তোমাদের কব্‌রেজ-ডাক্তারের বাবারও সাধ্যি নেই যে বোবার মুখে বোল ফোটাতে পারে।' বলিয়া তিনি সন্ন্যাসীদের বোল ফুটাইবার অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ দেখা কয়েকটা কাহিনীও বিবৃত করিয়াছিলেন।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া হরনাথ বিভূতিকে লইয়া একদিন সেই সন্ন্যাসীর কাছেই গেল।

সন্ন্যাসীকে প্রথম দেখিয়াই হরনাথের মনে কেমন যেন ভক্তির উদয় হইয়াছিল। নিজে প্রণাম করিয়া ছেলেকে বলিল, 'প্রণাম কর।' তার পর এক পাশে বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী কোন কথা কহিলেন না। অনেক ক্ষণ পরে সমস্ত লোক উঠিয়া গেলে সন্ন্যাসী বিভূতির দিকে কিছু ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তার পর হরনাথের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'ছেলেটি আমায় দাও।'

হরনাথ বলিয়াছিল, 'বাবা, আমার এই একটি ছেলে, ওকে দিয়ে ঘরে থাকবো কি ক'রে? ওর মুখে এখনও কথা ফোটে নি, তুমি ওর মুখে কথা ফুটিয়ে দাও।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'বোবা হওয়ার কোনই ভয় নাই, কথা অবশ্যই ফুটিবে। কিন্তু, এই ছেলে কখনও ঘরে থাকিবে না। রাখিয়া কেন মিছামিছি মায়া বাড়াইতেছ? তার চেয়ে আমায় দাও।'

হরনাথ সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'ও যাতে ঘরে থাকে তুমি তাই ক'রে দাও বাবা।'

সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, 'উপায় নাই,' এবং কিছু ক্ষণ পরে ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া খানিকটা তুলোট কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে খস্‌খস্ করিয়া কি লিখিয়া কাগজটা মুড়িয়া হরনাথের হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি এই গ্রামে থাকিতে ইহা পড়িও না। কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথির পূর্ব্বে আমি এই গ্রাম পরিত্যাগ করিব, আমি এই গ্রাম ত্যাগ না-করা পর্য্যন্ত এই কাগজ পড়িও না বা কাহাকেও দেখাইও না।'

হরনাথ যাইবার পূর্ব্বে তবুও একবার শুধাইয়াছিল, 'কি লিখ্‌লে বাবা?'

সন্ন্যাসী চক্ষু বুজিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, 'কোনো প্রশ্ন করিও না। পড়িলেই বুঝিতে পারিবে, বিধিলিপি খণ্ডন হইবার উপায় নাই।'

এই পর্য্যন্তই।

দ্বাদশীর দিন সকালবেলা সন্ন্যাসীকে কেহ আর জলটুঙ্গি গ্রামে দেখিতে পাইল না। হরনাথ সেইদিন রাত্রে বাড়ির সকলে ঘুমাইলে সন্ন্যাসী-প্রদত্ত সেই কাগজের মোড়ক খুলিল। সামান্য কয়েক ছত্র লেখা। সন্ন্যাসী লিখিয়াছিলেন—

'তোমার পুত্রের ললাটে সন্ন্যাসযোগ দেখিতেছি। বয়স যেদিন পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইবে সেইদিন তোমার এই পুত্র গৃহত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। ইহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা দেখি না।'

হরনাথ মাথায় হাত দিয়া অনেক ক্ষণ বসিয়া ভাবিল, তার পর উঠিয়া কাগজের টুক্‌রাটুকু বাক্সের এক কোণে সঙ্গোপনে রাখিয়া দিল।

এই পত্রের কথা আর কেহই জানিল না।

সন্ন্যাসী মিথ্যা বলেন নাই, বৎসর ঘুরিতে-না-ঘুরিতে বিভূতি তোতাপাখীর মত অনেকগুলি কথা আওড়াইতে শিখিয়া গেল।

২

যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বৎসর অনেক আগাইয়া আসিয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের অন্তরালে হরনাথের সংসারে নিতান্ত কয়েকটা সাধারণ পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই ঘটিয়া উঠে নাই। বিভূতি বড় হইয়াছে এবং হরনাথ বুড়া হইয়াছে। বিভূতি যে-বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল হইল সেই বৎসর বিভূতির মা মারা গেল। মারা গেল অবশ্য বিভূতির ফেল করার দুঃখে নয়, রোগে ভুগিয়া। ঘুস্‌ঘুসে জ্বর আর কাশি মোক্ষদার দেহটা কঙ্কালসার করিয়া আনিয়াছিল, সে-বছরের শীতের প্রকোপ কঙ্কালের আর সহিল না, এক সন্ধ্যায় চক্ষু বুজিল। হরনাথ বয়সে বুড়া হইতেছিল বটে, কিন্তু দেহে তখনও বার্দ্ধক্য আসে নাই। পাড়ার পাঁচ জনে আসিয়া যুক্তি দিল, 'হরনাথ, বিয়ে কর, নইলে সংসারটা ভেসে যায়।' হরনাথ কাহাকেও হাসিয়া উড়াইয়া দিল, কাহাকেও রাগিয়া ভাগাইয়া দিল। নিশি গাঙ্গুলীর কথার উত্তরে বলিল, 'আর কি সে বয়স আছে দাদা?'

নিশি ছাড়িলেন না, বলিলেন, 'বয়সের কি কোনো মাপ আছে রে ভাই, মনেরই বয়স, নইলে আমি—'

তিন মাসও হয় নাই, গাঙ্গুলী তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে ঘরে আনিয়াছেন।

হরনাথ উঠিয়া গেল।

তাহার পর বৎসর বিভূতির বিবাহ দিয়া হরনাথ বউ ঘরে আনিল।

বউ বিন্দুমতীর চেহারা চলনসই হইলেও রং যে ফরসা নয় একথা গাঁসুদ্ধ লোক একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিল।

বাকী ছিলেন নিশি গাঙ্গুলী। তিনিও সেদিন বউ দেখিতে আসিয়া হরনাথের বাড়ি জলযোগ সারিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'একটু দেখে-শুনে আন্‌লেই ভাল হ'ত হরনাথ, আজকালকার ছেলে—যাক যা ক'রে ফেলেছ তার ত আর চারা নেই—'

হরনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'রং কালো হোক ক্ষতি নেই, মন কালো না হয়ত বাঁচি।'

গাঙ্গুলী ছাড়িলেন না, বলিলেন, 'তা বুঝতেও ঘষা-মাজা লাগে ভাই।'

বিভূতি তখন পুনরায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য তৈয়ারী হইতেছে।

বউ পছন্দ করিবার সময় হইয়া উঠে নাই। রং কালো তাহা নজরে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। ছোট বিন্দু তাহার সামনে ঘোমটা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা চোখে চোখে পড়ায় সলজ্জ হাসি হাসিয়া দৌড় দেয়, ইহাই তাহার ভাল লাগে। এই পৃথিবীতে ভাল-লাগার সীমা শুধু বর্ণ ও রূপের মধ্যেই সীমায়িত নহে। বিন্দুর জীবনযাত্রার যে ছন্দ, তাহাই বিভূতির চোখে অপূর্ব্ব। তাহার চলিবার ভঙ্গিটুকু, ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়ানো, সবই বিভূতির ভাল লাগে। মোট কথা, ঐ বারো বছরের শ্যামাঙ্গী মেয়েটি যেন তাহার জীবনে ভাল লাগার বান ডাকিয়া আনিয়া দু-কূল ভাসাইয়া দিল।

কিন্তু আরও যাহা ঘটিতেছিল তাহাই বলি। হরনাথ এতদিন প্রৌঢ়ত্বের কোঠা ছাড়াইয়া বার্দ্ধক্যে যেন কিছুতেই পা দিতেছিল না, এইবার সত্যই বুড়া হইতে চলিল। নিশি গাঙ্গুলীর চোখেই ব্যাপারটা সর্ব্বাগ্রে ধরা পড়িল। সেদিন হাটের পথে পাইয়া বলিলেন, 'বয়সটা যে শেষে দৌড়তে সুরু করল ভায়া!'

হরনাথ উত্তর দিল, 'বয়সের আর দোষ কি দাদা, এত দিন ধম্‌কে-ধাম্‌কে চেপে রেখেছি বইত নয়!'

গাঙ্গুলী দাঁতে হাসি চাপিয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রে হরনাথ বাক্সের ভিতর হইতে নিজের কীটদষ্ট কোষ্ঠীখানা বাহির করিয়া খুলিয়া দেখিতে বসিল। জীবনে এই তাহার নজর পড়িল, বয়স সত্যই কম হয় নাই। পঞ্চান্ন ছাড়াইয়া ছাপ্পান্ন চলিতেছে, চুলে পাক ধরিয়াছে, গায়ের চামড়া ঢিলা হইতে সুরু করিয়াছে। সেদিন রাত্রি যখন গভীর হইয়া আসিল হরনাথ কোষ্ঠীখানা তুলিয়া রাখিল বটে, কিন্তু মনে যে-দাগ ধরিয়া গেল তাহা আর কিছুতেই তুলিয়া ফেলিতে পারিল না।

পরদিন সকালবেলা বিভূতিকে ডাকিয়া হরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, 'পড়ছিস্ ভাল ক'রে?'

বিভূতি অবশ্য যথাশক্তি ভাল করিয়াই পড়িতেছিল, কাজেই 'হাঁ' বলিয়া মিথ্যা কথা বলিল না।

হরনাথ বলিল, 'যদি পাস করতে পারিস্ ত পড়, নইলে যা আছে বুঝে-শুনে এইবেলা কাজকর্ম্ম দেখে নে। মিছামিছি সময় নষ্ট না ক'রে যা হয় হিসেব ক'রে কর। আমার আর ক-দিন, বয়স ত আর কম হ'ল না।'

হরনাথের বয়সের সঠিক খবর বিভূতি রাখিত না, কিন্তু বুড়া হইতেছিল তাহা তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই। বাপের কথার উত্তরে কিছুই বলিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল।

বলা বাহুল্য, বিভূতি সে বছরও ফেল করিল। যেদিন খবর বাহির হইল, সেদিন রাত্রে বিন্দুমতী বিছানায় শুইয়া শুধাইয়াছিল, 'ফেল করলে কেন?'

বিভূতি উত্তর দিয়াছিল, 'পাস করতে পারলুম না ব'লে।' ইহার পর বিন্দু জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

হরনাথ বলিল, 'ফেল করলি ত?'

বিভূতি নীরব।

'তখন বলেছিলুম। যাক্, যা হবার হয়েছে, আর পড়ার দরকার নেই। যা আছে তাই এখন থেকে দেখে-শুনে চালাতে পারলেই খুব হবে। আমার সঙ্গে থেকে কাজকর্ম্ম দেখ্।'

বিভূতির পড়ার সখ মিটিয়া আসিয়াছিল। মিছামিছি ফি জমা দিয়া বছরের পর বছর ধরিয়া ফেল করিয়া কোনই লাভ নাই। বাপের সঙ্গে বাহির হইয়া কাজকর্ম্ম দেখার প্রস্তাবটা মন্দ নয়। বিন্দুর মুখে আজকাল দিনে-রাতে হাসি নাই বলিলেই চলে। বিভূতি আর দেরি করিল না। ভাল দিন দেখিয়া হরনাথের সঙ্গে বাহির হইয়া ক্ষেতে চাষের কাজ দেখিতে আরম্ভ করিল।

জলটুঙ্গি গ্রামের মধ্যে হরনাথ গাঙ্গুলী এক জন সম্পন্ন গৃহস্থ। গোলায় ধান আছে, গোয়ালে গরু আছে, একখানা চলতি মুদির দোকান আছে এবং প্রতিবেশীদের মতে সিন্দুকে অর্থ সঞ্চিত আছে। যাহাই থাকুক্ আর নাই থাকুক্, মোটের উপর হরনাথের সংসার ভালভাবেই চলিয়া যায়। বিভূতি প্রথম প্রথম ক্ষেতের কাজ দেখাশুনা আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু রৌদ্রে ঘোরা পোড়া শরীরে সহিল না বলিয়াই দোকানে বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামের মধ্যে এই একখানি মাত্র দোকান, কাজেই জিনিষপত্র মন্দ বিক্রি হয় না। আগে হরনাথ নিজেই দোকানে বসিত। মাঝখানে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দোকান দেখিবার জন্য মাহিনা করিয়া এক জন লোক রাখিয়াছিল। মাহিনা-করা লোকে সুবিধা হয় না বলিয়াই বিভূতি সেই কাজে বহাল হইয়াছে। বিভূতি সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই দোকানে যায়। সূর্য্য যখন মাথার উপরে ওঠে তখন বাড়ি আসে। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু ঘুমায়। তার পর আবার দোকান খোলে।

সন্ধ্যার পর, যখন ঘুটঘুটে আঁধার হয়, তখন দোকান বন্ধ করিয়া বাসায় ফেরে। তাহার পর খাইয়া ঘুমায়।

বিন্দুর মুখে ভাল করিয়া হাসি আর ফুটে নাই বটে, কিন্তু মুখভারও যে করিয়া থাকে না তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারে।

৩

হরনাথের শরীর ক্রমশই ভাঙিয়া আসিতেছিল, সেবার শীতের গোড়াগুড়ি বিছানা লইল। জ্বর আছে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, হাঁপানি জন্মিয়াছে। এতগুলা রোগ যে তাহার মধ্যে এত দিন নিঃশব্দে বাসা বাঁধিয়াছে, নিঃশব্দে বাড়িয়াছে, তাহা হরনাথ কখনও ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই। কিন্তু যেদিন জানিল সেদিন আর রেহাই পাইবার কোনো পথই খুঁজিয়া পাইল না। প্রথমে রোগকে আমল দেয় নাই, উঠিত, স্নান করিত, ভাত খাইত, সবই করিত। তাহার পর এমন একদিন আসিল যেদিন তাহার জীবনের সমস্ত অধিকার, সমস্ত শক্তি একমাত্র ঐ শয্যাপার্শ্বেই সঙ্কুচিত হইয়া মুখ লুকাইল।

ওদিকে বিন্দু অন্তঃসত্ত্বা। রোগীর সেবা পর্য্যন্ত হইয়া উঠে না। হরনাথ দিন-দিন কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে, পাশ ফিরিতেও কষ্ট হয়। বিভূতি পৃথিবীর মধ্যে অনেকগুলি কাজই করিতে পারিত না, রোগশয্যার পাশে বসিয়া সেবা করাও তাহার দ্বারা হইয়া উঠিল না। হরনাথের অবশ্য সেজন্য কোনো আপত্তি ছিল না, সে তখন মরিয়া হইয়াই শুইয়াছে, নির্ব্বিকারভাবে অন্তিম শয্যায় শুইয়া চক্ষু বুজিয়া বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দিল। নিশি গাঙ্গুলী শুধু সুখের দিনের বন্ধু ছিলেন না, সেদিন আসিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। বিভূতি পায়ের ধারে বসিয়া কোলের মধ্যে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতেছিল। গাঙ্গুলী বলিলেন, 'হরনাথ, খোকা আর তার বউ রয়েছে, চেয়ে দেখ।'

হরনাথ অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে একবার চাহিবার চেষ্টা করিল, একবার যেন আশীর্ব্বাদ করিতে হাতটা একটু তুলিলও, কিন্তু তার পর যে চক্ষু বুজিল, নিদারুণ অবসাদে তাহা আর মেলিল না।

মরার চেয়ে গাল নাই বটে, কিন্তু মরার চেয়েও বেশী দুঃখ বোধ হয় অর্দ্ধমৃত হইয়া বাঁচায়। হরনাথ মরিয়া বাঁচিল। বিভূতি কাঁদিল, দশ দিন হবিষ্য করিল, অশৌচান্তে বেপরোয়া হইয়া শ্রাদ্ধ করিল। সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহা লইয়াই মানুষের জীবন। বিভূতি আবার শোক ভুলিল।

হরনাথ মারা যাওয়ার মাস-তিনেক পরেই বিন্দুর ছেলে হইল। মায়ের মত মুখ, বাপের মত রং, মা ও বাপ দুই জনে মিলিয়া নাম রাখিল সোনা। তখন সোনা কোলে

কোলেই ঘোরে, হামাগুড়ি দিয়াও যাইতে পারে না। সেই সোনা বড় হইল, চলিতে শিখিল, বর্ণপরিচয়ের পাতার উপর চক্ষু বুলাইয়া বর্ণের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার মধ্যের ইতিহাসে আর নূতন কিছু ঘটিয়া উঠে নাই। নূতন কিছু যখন ঘটিয়া উঠিল তখন সোনার বয়স পাঁচ এবং বিভূতির দ্বিতীয় পুত্র শুভক্ষণে পৃথিবীর আলোতে আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

এই ছেলেটি আসিতে আসিতে যখন আসিয়া পৌছিল, তখন ইংরেজ-জার্ম্মানের যুদ্ধটা বেশ জমিয়া উঠিয়া পৃথিবীর খাদ্য-অখাদ্য সব জিনিষের দর চড়াইয়া আগুন করিয়া তুলিয়াছে। গ্রামের লোকেরা শহরবাসিগণের অপেক্ষা দয়ার্দ্র এবং অতিথিবৎসল, না খাইয়াও ভিক্ষা দিয়া বসে, তাই দুর্ভিক্ষ সহজে বলা যায় না, কিন্তু এবার সত্যই দুর্ভিক্ষ আসিল। বিভূতির সংসারে তখনও অনটনের সাড়া উঠে নাই, কিন্তু এ ছেলেটি যে অমঙ্গলের বাহন তাহা মা হইয়াও বিন্দু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল। আর-বছর ক্ষেতে ভাল ফসল হয় নাই; এ-বছর দোকানে ত এক রকম বিক্রি নাই বলিলেই হয়। মোট কথা, হরনাথের সঞ্চিত অর্থে এইবার হাত পড়িল। সঞ্চিত অর্থ বলিতে অবশ্য বিশেষ কিছু নয়, অন্ততঃ বাপ বাঁচিয়া থাকিতে বিভূতি যাহা ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল তাহাও নয়। বিভূতি হিসাব করিয়া দেখিল, হরনাথের সম্পন্ন বলিয়া গ্রামে যতখানি নামডাক ছিল, সে-অনুপাতে সঞ্চয় সে বিশেষ কিছুই করিয়া যাইতে পারে নাই। গোলাতে ধান কিছু মজুত ছিল সত্য, কিন্তু তাহা এমন কিছু নয়; একটা দুর্ভিক্ষ অথবা দুই-এক বছরের ইংরেজ-জার্ম্মানের লড়াই গোলাকে নিঃসন্দেহ ফতুর করিয়া দিতে পারে এবং তাহাই দিল। দোকানের অবস্থাও অচল হইয়া উঠিয়াছে। জলটুঙ্গি গ্রামে হীরু বিশ্বাস নামে এক জন লোক আর একখানা মুদির দোকান খুলিয়া বসিয়াছে এবং ধারে-নগদে দেদার মাল ছাড়িতেছে বলিয়া খরিদ্দারের দল সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বিভূতির দোকানে নেহাৎ যারা আসা বন্ধ করে নাই, তাহারাও ধার চায়। নগদ পয়সার কারবার গুটাইতে বসিয়াছে দেখিয়া বিভূতিও হাত গুটাইল। সেদিন সকাল হইতে দোকান আর খুলিল না।

বিন্দু এখন আর ঘোমটা-টানা কচি বৌটি নাই। বিশ বছর পার হইতে-না-হইতেই সে দুই ছেলের মা এবং একটা সংসারের গৃহিণী হইয়াছে। ঘোমটা নামিয়াছে, মেজাজ চড়িয়াছে। বিভূতি দোকান আর খুলিবে না শুনিয়া বলিল, 'দোকান তুলে দিলে ত খাবে কি?'

বিভূতি উত্তর দিল, 'জমিতে নিজে চাষ দেব।'

বিন্দু মুখ বাঁকাইয়া বলিল, 'তা হ'লেই হয়েছে, সাত-কুড়ের এক কুড়ে—ছিল দোকানখানা, তাও গোল্লায় দিলে—'

বিভূতি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দারিদ্র্যের এই একটা মস্ত বড় দোষ যে যখন আসে পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া আসে না। মানুষ যদি আগে হইতে তৈয়ারী হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে হয়ত খুব বড় দুর্ভাগ্যও তাহার নিকট সহজ হইয়া আসে।

বিভূতির সংসারে দারিদ্র্য আসিল। ক্ষেতের ফসল ভাল হয় নাই। হরনাথের সঞ্চিত যাহা-কিছু ছিল তাহা পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়াছে। ধার পাইবার জো নাই এবং করিবারও সাহস নাই। বিন্দু এই ক-মাসে আরও খিট-খিটে হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সে শ্রী আর নাই। রং কালো হইলেও বিন্দুর মুখশ্রী যে কুৎসিত ছিল না তাহা কেহই অস্বীকার করিত না, কিন্তু এই ক-মাসে সেই লাবণ্যের উপর যেন প্রৌঢ়তার ছাপ পড়িয়া গেল।

সংসারের দারিদ্র্য এবং বিভূতির কর্ম্মহীনতা বিন্দুর মুখের বাঁধ খুলিয়া দিয়াছে। সেদিন সকালে বলিল, 'জমিতে চাষ দিয়ে কি লাভটা হ'ল শুনি?'

বিভূতি কথাবার্ত্তা চিরদিনই কম কহিত। উত্তর দিল না।

কথার উত্তর না পাইয়া বিন্দুর রাগ আরও চড়িল, বলিল, 'ছেলে দুটোকে নিয়ে কি এখন উপোষ করতে বল নাকি?'

বিভূতি মুখ খুলিল, বলিল, 'উপায় যদি না থাকে ত করতে হবে বইকি!'

বিন্দু বলিল, 'উপায় সকলেরই থাকে, কিন্তু সে উপায় আমার নেই বলেই বাধ্য হয়ে আমায় এখানে পড়ে থাকতে হবে আর তোমাকেও বলতে হবে।'

বিভূতি বুঝিল দোষ তাহারই, তাই আর কোন কথা উঠিবার অবসর না দিয়াই সরিয়া পড়িল।

কিন্তু ঝগড়া-বিবাদ দিনরাতই একরকম লাগিয়া আছে। দারিদ্র্যের অন্তরঙ্গ সঙ্গী অশান্তি, উহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। অভাবের দিনে যদি মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা যায়, তাহা হইলে হয়ত একটু শান্তিও অন্ততঃ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই। বিভূতি কোন দিনই কোন বিষয় লইয়া বেশী ভাবিতে পারিত না, একটা কিছু হইলেই সে দিশাহারা হইয়া পড়িত, প্রাণ পালাই-পালাই করিত। এক-এক সময় তাহার মনে হয়, এসব ফেলিয়া ছাড়িয়া একদিকে চলিয়া যায়, যাহা হয় হইবেই, অন্ততঃ সে ত এই ভাবনা-চিন্তার হাত হইতে বাঁচে। কিন্তু, পরমুহূর্ত্তেই মনে হইত, সে ত না-হয় সংসারের দায় হইতে পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইল, কিন্তু বিন্দুর কি হইবে, সোনার, ঐ নিতান্ত কচি পিণ্টুটার।

নজের স্বার্থপর কল্পনায় বিভূতি শিহরিয়া উঠিত।

৪

হীরু বিশ্বাস দোকানের মালপত্র যাহা কিছু আছে কিনিয়া লইতে চাহিতেছে, কিন্তু পঞ্চাশ টাকার বেশী দিতে চায় না। নিশি গাঙ্গুলী কিছুদিন ধরিয়া বলিতেছেন, 'মহকুমা হইতে নৌকা করিয়া কয়লার চালান আনিয়া জলটুঙ্গি গ্রামে ঘর-ঘর জোগান দিলে মাসে বেশ কিছু থাকে, অবশ্য যদি বুদ্ধি এবং গতর খাটাইয়া চালান যায়।'

শেষ পর্য্যন্ত কয়লার ব্যবসাই আরম্ভ হইল।

নৌকা করিয়া বিভূতি কয়লার চালান আনে, নৌকা করিয়াই ঘোরে, সুবিধামত থামিয়া বাড়ি-বাড়ি জোগান দেয়, নৌকাভাড়া, জন খাটাইবার খরচ, কয়লার দাম, সব দিয়া কিছু কিছু থাকে। তবে খাটুনি আছে। খাটিতে বিভূতির অরুচি নাই। গাঙ্গুলী বলেন, 'শ্রমেই লক্ষ্মী। শ্রম বিনা ধনলাভ হয় না।'

কয়লার চালান আসে গিরিশপুরের হাট হইতে। পথ কম নয়, জলপথে প্রায় কুড়ি মাইল হইবে। নদী দিয়া বড় নৌকায় করিয়া মাল আনা হয়; খালের মুখে নৌকা মজুত থাকে, তাহাতে বোঝাই করিয়া বাড়ি-বাড়ি পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। বিভূতি প্রায় সব সময় নৌকাতেই থাকে। গাঙ্গুলী বলেন, পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই, এমন কি নিজের হাতের আঙুলকেও না। খালি 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' নয়, টাকা আসামাত্র ট্যাকস্থ করার মধ্যেও লক্ষ্মী বসতি করেন বটে।

কাজের সুবিধার জন্য বিভূতি খাওয়া-পরা আর মাসে-মাসে কিছু দিয়া অনুকূল বলিয়া একটি লোককে রাখিয়াছে। বিভূতি যদিও প্রায় সব সময়েই নৌকায় থাকে, তথাপি হিসাব-পত্র অনুকূলই রাখে। লোকটা বিশ্বাসী।

দেখিতে দেখিতে কারবার জাঁকিয়া উঠিল। মাসের মধ্যে দুই-একবার মুসলমান ব্যাপারীরা কয়লা-বোঝাই নৌকা খালে ঢুকায় বটে, কিন্তু তাহাদের আসা না-আসার, দরদামের কোনই স্থিরতা নাই। আশপাশের দুই-তিনখানা গ্রামের মধ্যে বিভূতিই কয়লার নিয়মিত কারবারি, চাহিদা আছে কিন্তু মাল দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারে না। চাহিদা-মত মাল জোগাইতে হইলে কারবার আরও বড় করিয়া বেশী কয়লা আমদানী করা দরকার। কিন্তু টাকা কোথায়? সংসার-খরচ চালাইয়া আর তাহা হইয়া উঠে না। বিভূতি ভাবে, একবার কিছু টাকা পাইলে হয়!

হঠাৎ, নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই, টাকা দিবার লোক জুটিয়া গেল। বর্ত্তমানে গ্রামের চালডালের দোকানের মালিক হীরু বিশ্বাসের তেজারতি কারবারও চলে। বিভূতির টাকার দরকার শুনিয়া নিশি গাঙ্গুলীর কাছে সে কথায়-কথায় বলিয়া বসিল, 'আমি টাকা দেব; কিন্তু সুদ চাই।'

গাঙ্গুলীর মুখে কথাটা শুনিয়া বিভূতি যেন হাতে চাঁদ পাইল। কিছু টাকা কারবারের পিছনে ঢালিতে পারিলে বন্যার জলের মত ঘরে টাকা আসিবে। সুদের জন্য ভয় কি? এক ভরা কয়লা আনিয়া কোনরকমে সরুইয়ের খালে ঢুকাইতে পারিলে সুদসুদ্ধ আসল শোধ করিতেও তাহার গায়ে বাধিবে না। বিভূতি বলিল, 'তার জন্য কি? সুদ দেব, দাও টাকা—'

টাকা আসিল, একটি দুইটি নহে, একশটি। একে-একে

গণিয়া দিয়া হীরু বিশ্বাস হাতচিঠা লিখাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

তাহার পরের মঙ্গলবারই গিরিশপুরের হাট। সোমবার রাত্রি থাকিতেই রওনা হইতে হইবে। এদিকে সোনার কয়দিন ধরিয়াই চাপিয়া জ্বর আসিতেছে। শুধু জ্বর নয়, অন্যান্য উপদ্রবও আছে। শিশু—সব কথা খুলিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু যতটুকু পারিল তাহাতেই অসুখ সোজা বলিয়া মনে হইল না। বিন্দু বলিল, 'রোগা ছেলেকে একলা নিয়ে আমি থাক্‌ব কি ক'রে?'

কিন্তু বিভূতির না গেলেই নয়। অনুকূল একা পারিবে না। তা ছাড়া এবার কয়লা আসিবে দু-ভরা। বর্ষাকাল, নানা রকম অসুবিধা। সাত-পাঁচ ভাবিয়া শেষপর্য্যন্ত বিভূতি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। যাওয়ার সময় বিন্দু বার-বার বলিয়া দিল, 'ঘরে রোগা ছেলে, অনর্থক দেরি ক'রো না যেন—'

কয়লা বোঝাই হইতে পুরা একবেলা লাগিল। দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বড়-বড় দুই নৌকা বোঝাই হইল কয়লায়। সন্ধ্যার একটু পরেই নৌকা ছাড়িল।

বর্ষাকাল। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। বিকালের দিকে পশ্চিম আকাশে কিছুক্ষণের জন্য রাঙা মেঘ দেখা দিয়াছিল। মাঝিরা বলিয়াছিল, 'আজকের রাতটা বাদ দিয়ে কাল ভোর থাকতেই নৌকা ছেড়ে দেব।' কিন্তু বিভূতি তাহাতে রাজি হয় নাই। নিজের শরীর তত ভাল নয়। তাহার উপর ঘরে রোগা ছেলে, বিন্দু তাহাকে একা আগ্‌লাইয়া আছে, বাড়িতে আর দ্বিতীয় মানুষ নাই। দেরি করা কোনমতেই উচিত নয়।

বিভূতির আগ্রহাতিশয্যে মাঝিরা বাধ্য হইয়াই নৌকা ছাড়িল, কয়লাবোঝাই দুইখানা নৌকা ঈষৎ আগুপাছু হইয়া চলিল নদী বাহিয়া। বিভূতি সেদিকে চায় আর আশায় আনন্দে তাহার বুকটা ফুলিয়া উঠে, একটু ওপাশেই অনুকূল মাথার কাছে হারিকেন জ্বালাইয়া হিসাবপত্র মিলাইতেছে আর মাঝে মাঝে তন্দ্রার ঘোরে ঢুলিতেছে। বালিশটা ভাল করিয়া মাথার তলায় গুঁজিয়া দিয়া বিভূতি শুইয়া পড়িল।

বর্ষার মধুমতী, দু কূল ছাপাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার উপর বিকাল হইতেই আকাশে ঝড়ের মেঘ দেখা দিয়াছে। রাত্রি যখন গোটা বারো তখন আকাশ ভাঙিয়া ঝড় উঠিল। বাতাসের শব্দ, জলের গর্জ্জন কানে যেন তালা লাগাইয়া দেয়। সে শান্ত নদী আর নাই। ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিয়া উন্মত্তের মত মধুমতী ছুটিয়াছে। অনুকূল ছইয়ের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ত্রস্তকণ্ঠে বলিল, 'তাড়াতাড়ি পারে ভিড়াও—'

পার কোথায়? সেই ক্ষুব্ধ নদীবক্ষ যেন সেই মুহূর্ত্তে দিগন্তপ্রসারিত হইয়া আকাশের রঙে আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছে, কূল দৃষ্টিসীমায় আসে না। শুধু জল—শুধু জল—

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিভূতির ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, বাহিরে মাঝিদের কোলাহল শুনিয়া ছইয়ের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শুধাইয়াছে, 'কি ব্যাপার মাঝি?'

শুধু শুধাইয়াছে মাত্র, আর উত্তর শুনিবার অবসর পাইল না। নৌকাটা যেন একবার টাল খাইল, একবার ভয়ার্ত্ত মাল্লাদের চীৎকার কানে আসিল, সামাল—সামাল—

তার পর তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল—চক্ষের সম্মুখে সেই মুহূর্ত্তে বিশ্বসংসার যেন অন্ধকার হইয়া গেল—

নৌকা ডুবিল।

সে রাত্রের ঝড়ে শুধু নৌকা ডুবিল না, ডুবিল তাহার সহিত বিভূতির আশা, ভরসা, উৎসাহ, সব, ডুবিল তাহার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের খরস্রোতে। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে যখন সে অবশ দেহে পারে আসিয়া পৌছিল, তখন ঝড়ের বেগ বুঝি কমিয়া আসিয়াছে, মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। নৌকার চিহ্নমাত্রও নাই, মাঝিমাল্লারা কে কোথায় গিয়াছে কে জানে। অনুকূল হয়ত ডুবিয়াছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি গায়ে তীক্ষ্ণাগ্র শরের মত বিঁধিতেছে। মাথা গুঁজিবার একটু জায়গাও নাই, ফাঁকা মাঠ, যতদূর চোখ যায় ধূ-ধূ করে মাঠ। চারিদিকে একবার দেখিয়া লইয়া বিভূতি হাঁটিতে লাগিল।

সে রাত্রিটা একটা গাছের তলায় বসিয়া সে কাটাইয়া দিল।

সেইখানে বসিয়া বসিয়াই বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন জাগিয়া উঠিল তখন সকাল হইয়াছে, আকাশ পরিষ্কার, প্রভাতের কাঁচা রৌদ্র আসিয়া মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উঠিয়া দাঁড়াইতে সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা বোধ হইল, সমস্ত দেহের উপর দিয়া কি যেন একটা চলিয়া গিয়াছে আর তাহারই তলায় পড়িয়া হাড়গুলি পিষিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

মাঠ ছাড়াইয়া বাঁদিকে গ্রামের পথ। মাঠ অতিক্রম করিয়া বিভূতি সেই পথ ধরিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল। পথের মধ্যে এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, গ্রামের নাম পলাশপুর, জলটুঙ্গি এখান হইতে হাঁটাপথে পুরা এক বেলার পথ। জলটুঙ্গির নাম মনে পড়িতেই তাহার বুকের মধ্য হইতে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। মনে পড়িয়া গেল বিন্দুর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, রুগ্ন সন্তান, হীরু বিশ্বাসের দেনা। কোথায় যাইবে? এই বিপুল বিশ্বে এই মুহূর্তে তাহার মাথা রাখিবার জায়গাটুকুও যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবুও উপায় নাই। জলটুঙ্গি ফিরিতেই হইবে। বিভূতি চলিতে লাগিল।

মধ্যাহ্নের রৌদ্র যখন প্রখর হইয়া উঠিল তখনও বিভূতি চলিতেছে। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, শ্রান্তি নাই। বেলা যখন পড়িয়া আসিল তখনও তাহার চলা শেষ হয় নাই। চোখের উপর সূর্য্য ডুবিল, ক্রমশঃ আকাশের রক্তাভাও ম্লান হইয়া আসিল, দিগন্তকে ঘিরিয়া নামিল অন্ধকার। সন্ধ্যা যখন হয়-হয় তখন বিভূতি গাঁয়ে আসিয়া পৌঁছিল। অন্ধকারে-অন্ধকারে চলিল বাড়ির দিকে। দরজার কাছে পৌঁছিয়া অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; তার পর দরজায় পা দিল।

রুগ্ন ছেলের শয্যাপার্শে বসিয়া বিন্দু বোধ হয় এত ক্ষণ কাঁদিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, বলিল, 'তুমি এসেছ? এ কি, তোমার এ রকম চেহারা কেন? জামা-কাপড় কি হ'ল?'

'সব গেছে।' বিভূতির আর কিছু বলিবার শক্তি ছিল না। মাটিতে ধুলার উপরই বসিয়া পড়িল।

বিন্দু শিহরিয়া উঠিল; ব্যাকুলভাবে বলিল, 'কি হয়েছে খুলে বল—'

বিভূতি উত্তর দিল, 'নদীতে কয়লার নৌকা ভ-ভরাই ডুবেছে—'

আর কিছুই জানিবার বিন্দুর প্রয়োজন ছিল না। মুমূর্ষু ছেলের শয্যাপার্শে সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই দিন গভীর রাত্রে, সমস্ত গ্রাম যখন অঘোরে ঘুমাইতেছে, বাপ যে ঘরে শুইত সেই ঘরে চৌকির উপর বিভূতি নিদ্রাহীন চক্ষে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

উঠানের পারে ও-ঘরে বিন্দু বুঝি এত ক্ষণ জাগিয়া এইমাত্র ঘুমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। মাঝে-মাঝে সোনা ঘুমের মধ্যে কাতড়াইয়া উঠিতেছে, সে কাতড়ানির শব্দ বিভূতির কানে আসিতেছে। কানে আসিতেছে আর বুকটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। ঘরে একটা পয়সা নাই, অথচ কাল সকালে ডাক্তার না আনিলেই চলিবে না। দুইটা টাকা ফি দিতেই হইবে, তাহার উপর ঔষধের জন্যও কিছু লাগিবে। বাপের প্রকাণ্ড হাতবাক্সটা, যেটার মধ্যে তাহার টাকা-পয়সা থাকিত, সেটা তাহার মৃত্যুর পর বিভূতি দুই-একবার খুলিয়াছিল, একবার ভাবিল সেইটা খুলিয়া ভাল করিয়া হাতড়াইয়া দেখিবে নাকি? দুইটা টাকাও কোণে কোণে পড়িয়া নাই! আশা-নিরাশায় দুলিয়া বিভূতি বাক্সটা খুলিয়া ফেলিল। কুঠুরি খুঁজিয়া জিনিষপত্র যাহা-কিছু হাতে ঠেকিল বাহির করিয়া চৌকির উপর রাখিতে লাগিল। কোন খোপে দুইটা তামার মাদুলী, কোথাও একটা কানখুসকি, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশি, তামাদি হাতচিঠা, আরও কত কি! টাকা নাই। মরিয়া হইয়া বিভূতি কাগজের তাড়া, টুকরা যেখানে যা পাইল খুলিয়া পড়িতে লাগিল, যদি কোন সন্ধান পাইয়া যায়, বাপের গুপ্তধনও থাকিতে পারে, অসম্ভব কি? একেবারে কোণের কুঠুরিতে ভাঁজ-করা একটু তুলোট কাগজ পাইল। তাহাই খুলিয়া আলোর সামনে ধরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়া শেষ হইলে বিভূতি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাতে লেখা ছিল, "তোমার পুত্রের ললাটে 'সন্ন্যাসযোগ' দেখিতেছি।

বয়স যেদিন পঁচিশ পূর্ণ হইবে সেইদিন তোমার এই পুত্র গৃহত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। ইহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা দেখি না।”

রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। বিভূতি সেইভাবেই বসিয়া আছে। ক্রমে তাহার চোখে সব পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে, অতীত, বর্ত্তমান, সব। পৃথিবী ত তাহাকে গৃহের সুখ হইতে চিরদিনই বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে শুধু জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে বইত নয়! একে-একে তাহার সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। ছেলেবেলায় মা হারাইয়া শোক দুঃখ কম পায় নাই। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা তাহার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিল। বিবাহে সে সুখী হয় নাই। জীবনে সে যাহা-কিছু করিতে গিয়াছে, যাহা-কিছু করিয়াছে, সবই ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ভাগ্যের লিখন মিথ্যা হইবার নয়, আজ এই কথাটাই বিভূতির বার-বার মনে পড়িতে লাগিল।

সেদিন শেষরাত্রে জলটুঙ্গি গ্রামের প্রান্তসীমা দিয়া এক জন পথিক পথ অতিক্রম করিতেছিল। অঙ্গে তাহার গৈরিক, বাহুতে কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা এবং আর-আর সন্ন্যাসের অনভ্যস্ত সজ্জা। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে এক অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত চোখ-মুখ, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তার মুক্তির আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। যেন সেই মুহূর্ত্তে তাহার আত্মা সকল-ভোলার আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাত্রা করিয়াছে কোন্ দুঃখ-বেদনার অতীত লোকে। গ্রামের প্রান্তে, পথ যেখানে বাঁকিয়া সোনারপুরের খালের তীর বাহিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে পৌঁছিয়া সে মুহূর্ত্তের জন্য জলটুঙ্গির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তার পর আবার চলিতে লাগিল।

বর্ত্তমান কৃষিসঙ্কট

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ, পি-এইচ ডি

ধনবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফরাসী পণ্ডিত কেনে (Quesnay) সাহেব ব'লেছিলেন, “চাষী গরিব, রাজ্য গরিব; রাজ্য গরিব, রাজা গরিব।” আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে একথা খুবই খাটে। সুতরাং আমাদের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সমস্যা হ'চ্ছে কৃষি-সমস্যা। শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, শ্রমশিল্পের অভাব, শিক্ষিত যুবকদের চাকুরীর অভাব,—সব বিষয়ে অভাবের ত আমাদের অন্ত নেই, তবু কৃষি-সমস্যার কথাটা বিশেষ ক'রে ব'লছি এই জন্যে যে, এই সমস্যার সমাধান হ'লে শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা সম্ভব হবে। শ্রমশিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারের চাহিদা দেশেই যথেষ্ট হবে, রণতরীর ভয় দেখিয়ে বিদেশে বিক্রয়ের প্রয়োজন হবে না। কৃষির উন্নতিতে, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত কারুরই কাজের অভাব হবে না।

এতই যদি হ'তে পারে তবে কিছুই হচ্ছে না কেন? তার কারণ, সমস্যাটি বড় জটিল। সরকারী অব্যবস্থার জন্যই হোক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্যই হোক, কিংবা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক অন্যান্য কারণ-পরম্পরাতেই হোক, আমাদের দেশের কৃষির এখন চরম দুর্গতি। মাথাপিছু জমার পরিমাণ এত কম, প্রত্যেক কৃষিজীবীর পোষ্য এত বেশী, জমা এমন শতধা বিচ্ছিন্ন, ঋণের ভার এরূপ দুর্ব্বহ যে, এত দিন ধ'রে কৃষকেরা যে বেঁচে আছে এই এক পরম আশ্চর্য্য!

এ-সব সমস্যার বহুবার বহু প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

যত দিন সে-সব আলোচনার সুফল না ফলে তত দিন পুনরালোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এখানে সে-সব সমস্যার কথা না ব'লে বর্ত্তমানে অর্থসঙ্কটের * ফলে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হ'য়েছে সেই সব বিষয়েই কিছু নিবেদন ক'রতে চাই।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু ফল সবাই দেখতে পাচ্ছেন। জিনিষপত্রের দাম অনেক ক'মে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বোধ হয় দরকার। সব জিনিষের দাম যদি সমান ভাবে কমে, তবে কারুর কিছু আসে যায় না। ধরুন, আমার মাহিনা অর্দ্ধেক হ'ল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি-ভাড়া অর্দ্ধেক হ'ল, চাল, ডাল, তেল, নুন, কাঠের দাম অর্দ্ধেক হ'ল, ট্যাক্স অর্দ্ধেক হ'ল, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের বেতন, তাদের মাষ্টার-মশায়ের বেতন অর্দ্ধেক হ'ল,—সব কিছুরই দাম অর্দ্ধেক হ'ল। এতে ক'রে আমার অর্থনৈতিক অবস্থার কোনই তারতম্য হবে না। কারণ যদিও দৃশ্যতঃ অল্পসংখ্যক টাকা পেলাম, সেই টাকা দিয়েই ঠিক আগেকার পরিমাণ জিনিষপত্র (goods and services) পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এতে ক'রে আমার আর ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?

কিন্তু বাস্তবিক কি তাই ঘটেছে? সব জিনিষপত্রের দাম কি সমান ভাবে কমেছে? চাষীর বিপদ ত এইখানেই। যে-সব জিনিষ সে বেচে সেগুলির দাম যত কমেছে, যেগুলি সে কেনে তা'র দাম তত কমে নি। পাটের দাম মণকরা দশ টাকা থেকে তিন টাকায় দাঁড়াল। শাড়ীর দামও জোড়া-পিছু পাঁচ টাকা থেকে তিন টাকা হ'ল।† আগে আধ মণ পাট বেচে এক জোড়া শাড়ী কেনা যেত। এখন কিন্তু এক মণ না বেচলে শাড়ীজোড়া পাওয়া যায় না। আধ মণ বেচে মাত্র একখানি শাড়ী পাওয়া যাচ্ছে। "পুরাতন ভৃত্য" "একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা" আনতে পারত, কিন্তু বর্ত্তমানে একখানা দিলে দুইখানা করার সঙ্কেত বঙ্গবধূরা জানেন না। সুতরাং তাঁদের দুঃখ মিটবে কেমন ক'রে?

আবার শুধু এই নয়। জিনিষ-কেনা ছাড়া টাকার অন্য অনেক প্রয়োজন আছে। টাকা দিয়ে খাজনা দিতে হয়, ঋণ শোধ দিতে হয়, ঋণের সুদ দিতে হয়, অন্যান্য বাজে খরচ করতে হয়। শস্য বেচে আগের তুলনায় তিন ভাগের এক ভাগ টাকা পাচ্ছি ব'লে খাজনা, ঋণের ভার, সুদের পরিমাণ যত দিন তিন ভাগের এক ভাগ না হচ্ছে তত দিন কষ্টের শেষ হবে কেমন ক'রে? জিনিষপত্র এত প্রচুর ও সস্তা ব'লেই চাষীর প্রাণান্ত ঘটার উপক্রম হয়েছে। ডান্‌কানের হত্যার পরে ম্যাক্‌বেথের প্রাসাদের দ্বারবান্ দরজায় করাঘাত শুনে বলেছিল, "প্রাচুর্য্য হবে এই ভেবে যে-চাষী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে সে-ই এই নরকপুরীতে আসছে।"‡ বাস্তবিক প্রাচুর্য্য এবং অভাব অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ হওয়া প্রহেলিকাময় ঠেকলেও নতুন মোটেই নয়।

এই আলোচনা থেকে কৃষিসঙ্কট সম্বন্ধে দুটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। একটি হচ্ছে এই যে, জিনিষপত্রের দাম ক'মে যাওয়াতে খাজনা, ঋণ বা সুদের দরুন অনেক বেশী পরিমাণে জিনিষ খরচ করতে হচ্ছে। এটি সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, শুধু চাষীদের সম্বন্ধে নয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ক'রতে চাই নে। অন্য তথ্যটা হচ্ছে এই যে, কৃষিজীবীর উৎপন্ন শস্যের দাম যে-পরিমাণে কমেছে অন্য জিনিষের দাম সেই অনুপাতে কমে নি। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সঙ্কটটাই হচ্ছে কৃষিসঙ্কট।

এ সঙ্কটটা কিন্তু জগদ্ব্যাপী। অত্যুৎপাদনের (over-production) ফলেই কি তবে এরূপ ঘটেছে? আগেকার চেয়ে বেশী উৎপাদন হলেই অত্যুৎপাদন বলা যায় না। মোটামুটি বলা যেতে পারে লোকসংখ্যার অনুপাতে বেশী

* অর্থসঙ্কট কথাটি এখানে economic crisisএর বদলে ব্যবহার করছি, monetary crisisএর পরিবর্ত্তে নয়। টাকার ন্যূনাধিক্য, বা প্রচলন-অপ্রচলনের প্রভাব-অস্বীকার করছি নে, কিন্তু টাকাই আমাদের অর্থনৈতিক জীবন সর্ব্বতোভাবে নিয়মিত ক'রছে, এটা মানতে রাজী নই!

† এটা মনগড়া উদাহরণ নয়। (Calcutta Index Number of Wholesale Prices Seriesএ) ১৯২৪ সালের পাট ও বস্ত্র সূচক-সংখ্যার (index number) সঙ্গে ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসের অনুযায়ী সংখ্যার তুলনা করেছি।

‡ ম্যাকবেথ, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য।

উৎপাদন হ'লেই অত্যুৎপাদন হয়েছে বুঝতে হবে।* ১৯০৫ সালে সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ১৯০ কোটী ছিল। ১৯২৯ সালে প্রায় ২০০ কোটীতে দাঁড়িয়েছিল।† অর্থাৎ অর্থসঙ্কটের অব্যবহিত আগে লোকসংখ্যা প্রতি-বৎসর শতকরা প্রায় দুই হিসাবে বেড়েছিল। ১৯২৪-২৬ সালের তুলনায় ১৯২৭-২৯ সালে চালের উৎপাদন মাত্র শতকরা দুই বেড়েছিল, পাটের উৎপাদন শতকরা তিন বেড়েছিল, সুতরাং এ দুটিতে অন্ততঃ অত্যুৎপাদন হয় নি। চায়ের উৎপাদন শতকরা বারো বেড়েছিল। তুলা ও শণের উৎপাদন প্রায় শতকরা পাঁচ কমেছিল। কেবল কফি, রবার ও চিনেবাদাম এই কয়টির উৎপাদন শতকরা ত্রিশ হিসাবে বেড়েছিল। কিন্তু এগুলিরও দাম শতকরা ত্রিশের চেয়ে বেশী অনুপাতে কমেছে।

অত্যুৎপাদন যদি না হ'য়ে থাকে, তবে চাহিদা বা টান কমার জন্যই দাম কমেছে। চাহিদাই বা কমল কেন? অর্থসঙ্কটের ফলে সকলেই ব্যয়সঙ্কোচের চেষ্টা করে। জিনিষপত্র কম কেনে। কাপড় কম কিনলেই তুলা কম লাগে। কিন্তু দুটোর দাম ঠিক এক ভাবে কমে না। কাপড় কম বিক্রী হচ্ছে, কাপড়ের কল অল্প সময় চালানো হ'ল, কতকগুলি কল এবং তাঁত বন্ধ রাখা হ'ল। কাপড়ের উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু যে তুলা চাষ করা হ'য়ে গিয়েছে তা কমান অসম্ভব। এমন কি পরের বৎসরের চাষ কমানও এত সহজ নয়। নানা দেশের নানা অবস্থার লোকে নানা ভাবে তুলা উৎপাদন করছে। তাদের একযোগে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। নৈসর্গিক কারণ বশতঃ কৃষিজাত দ্রব্যের বাড়া-কমার প্রতিবিধান করা মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

শিল্প ও কৃষির পার্থক্যটি বেশ ভাল ক'রে বোঝা যায় পাটের বিষয় দিয়ে। ১৯২৯ সালের প্রথমে বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট আরম্ভ হওয়ার প্রায় নয় মাস আগেই পাটের দাম কমা সুরু হয়েছিল।* তার কারণ এই, সব জিনিষের দাম কমতির মুখে দেখে ব্যবসায়ীরা জিনিষ বিক্রী না ক'রে জমা করছিলেন। আমদানী, রপ্তানী, দেশে ক্রয় বিক্রয় সবই কমার দরুন পাটের ব্যবহার কমছিল। কিন্তু পাটকলের মালিকেরা উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত ক'রে থলি ও চটের দাম তত কমতে দেন নি, যত পাটের দর কমেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বর্ত্তমান কৃষিসঙ্কট থেকে চাষীকে পরিত্রাণ করতে হ'লে তার শস্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত ক'রে বা শস্যের চাহিদা বাড়িয়ে দাম বাড়াতে হবে। এত বাড়াতে হবে যে-সব জিনিষ সে কেনে বা তা'কে যে খাজনা বা সুদ দিতে হয় তার দরুন আগের অনুপাতে খুব বেশী পরিমাণে শস্য না দিতে হয়। এর জন্যে নানা দেশে নানা রকমের প্রচেষ্টা চলেছে।

যে-সব দেশে শস্য আমদানী হয় তা'দের পদ্ধতি এক ভাবের। আর যে-সব দেশ থেকে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানী হয় তাদের প্রণালী আর এক রকমের। প্রথম শ্রেণীর দেশে নির্দ্দিষ্ট আমদানী-শুল্ক (fixed import duty) বসান ছাড়া নানা পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রান্সে অনেক বৎসর থেকেই আমদানী-শুল্কের হার বাড়ান-কমান হয়, অর্থাৎ আমদানী শস্যের দাম কমলে শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়ে দেশজ শস্যের দাম ঠিক রাখা হয়। সম্প্রতি জার্ম্মেনী, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশেও এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এতে ক'রে দেশের কৃষিজীবীরা এই ভরসাতে চাষ করতে পারে যে শস্যের দাম বরাবরই এক ভাবে থাকবে।

আর একটা উপায় হচ্ছে অদল-বদল (quota system), অর্থাৎ কি না আমাদের দেশ থেকে তোমরা এই পরিমাণ জিনিষ নাও, আমরাও তোমাদের দেশ থেকে এই পরিমাণ জিনিষ নেব। জাপানের কাপড়ের সঙ্গে আমাদের তুলার এই রকমের বন্দোবস্ত সম্প্রতি করা হয়েছে। কতখানি

* লোকসংখ্যা বাড়লেই কৃষিজাত দ্রব্য ঠিক সেই অনুপাতে বেশী দরকার হবে একথা অবশ্য বলছি না। লোকের হাতে পয়সা বেশী এলে লোকে মোটর গাড়ী কেনে, গ্রামোফোন কেনে, রেডিও কেনে, ভাত বেশী ক'রে খায় না। যন্ত্রের উন্নতির ফলে যদি কায়িক শ্রম ক'মে যায়, তা হ'লে খাদ্য কম লাগে। যুদ্ধের জন্য বা অন্য কারণে ছেলেপুলেদের সংখ্যা যদি অপেক্ষাকৃত কম হয়, তা হ'লেও খাদ্য কম খরচ হয়। অন্য অবস্থার পরিবর্ত্তন না হ'লে লোকসংখ্যার অনুপাতে শস্যের উৎপাদন নিয়মিত হওয়া উচিত একথা বলা যেতে পারে।

† League of Nations Memorandum on Production and Trade for 1929 and 1930.

* "Indian Prices During the Depression" in *Sankhyā : Indian Journal of Statistics, Vol I, Part I.*

শস্য বিদেশে কাটবে এটা জানা গেলে, কতখানি শস্য উৎপন্ন করা দরকার সেটা নির্ণয় করা কঠিন নয়, কারণ স্বদেশের চাহিদা মোটামুটি জানা আছে। সুতরাং যদি শস্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন হয় তবে এইরূপ অদল-বদলের বন্দোবস্ত সুবিধাজনক।

যুদ্ধের সময়ে অনেক শস্যের আমদানী গবর্ন্মেণ্ট থেকেই প্রায় দেশেই করা হ'ত। সেটা অবশ্য এই জন্যে হয়েছিল যাতে সবাই শস্য খেতে পায়। সুইৎজারল্যাণ্ডে কিন্তু এই নীতি অনেক দিন থেকেই চলেছিল। নরওয়ে, সুইডেন, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্থোনিয়া এ-সব দেশে এর রকমফের প্রচলিত আছে। এর সুবিধা এই যে, আমদানী-শুল্ক খুব চড়া হারে হ'লেও ঠিক সেই পরিমাণে দেশের শস্যের দাম বাড়ে না। ধরুন, যতখানি শস্য দেশে হয়, বিদেশ থেকেও ততখানিই আনা গেল। বিদেশী শস্য দেশী শস্যের তুলনায় সিকি সস্তা ছিল, অর্থাৎ ৮০ রকম দামের ছিল। যত দাম তত ট্যাক্স বসান হ'ল। তার ফলে বিদেশী শস্যের দাম দেশী শস্যের দেড়া হ'ল। যদি গবর্ন্মেণ্ট সবটা একচেটিয়া না করেন, তবে এই দেড়াদামেই দেশী ফসলও বিক্রীত হ'তে পারে।* কিন্তু যদি সরকার বাহাদুর সব ফসলের ভার নেন, তবে বিদেশী স্বদেশী সব শস্যই সিকি চড়া দামে বেচা যেতে পারে। শুল্ক বসিয়ে যত টাকা পাওয়া গেল তার কিয়দংশ দেশের চাষীদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া যেতে পারে।

এত সব হাঙ্গামা না ক'রে চাষী যত শস্য উৎপন্ন কর্‌লে বা রপ্তানী কর্‌লে সেই অনুসারে কিছু কিছু "পুরস্কার" (bounty) তা'কে দেওয়ার প্রথাও আছে। ইউরোপে বিট চিনির দৃষ্টান্ত সকলেই জানেন। অন্যান্য নানা ফসল সম্বন্ধে ও ইউরোপের নানা দেশে এই নীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আবার একটি রকমফের আছে। কোনও কোনও স্থলে সরাসরি "পুরস্কার" না দিয়ে একখানি "আমদানী পাট্টা" (Import bond) দেওয়া হয়। এতে ক'রে সব চেয়ে কম হারে শুল্ক দিয়ে বিদেশ থেকে পাট্টার লিখিত পরিমাণ জিনিষ আনা যেতে পারে। যদি চাষী নিজে কোনা জিনিষ আমদানী ক'রতে না চায়, ঐ পাট্টা অন্য লোককে বেচ্‌তে পারে।

সবচেয়ে পাকা বন্দোবস্ত হচ্ছে বিদেশী শস্যের আমদানী একেবারে রোক (embargo), এটির উদ্ভব হয়েছিল পশু ও শস্যের সংক্রামক ব্যাধি দেশে যাতে প্রবেশ ক'রতে না পারে সেই জন্য। বর্ত্তমানে রাশিয়াতে প্রায় সব শস্যের আমদানীই বন্ধ আছে।

যে-সব দেশে শস্য আমদানী হয় তাদের জন্যও যেমন নানা ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে-সব দেশ থেকে শস্য রপ্তানী হয় তাদের সম্বন্ধেও নানা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। ব্রেজিলে কফির মূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা সকলেই জানেন। চিনি, রবার, গম, তুলা এ সকলেরই দাম ঠিক রাখার জন্যে নানা চেষ্টা করা হয়েছে,—এমন কি আন্তর্জাতিক সম্মিলনীও বাদ যায় নি। কিন্তু ফলে যে বিশেষ কিছু হয়েছে এমন বলা যায় না।

এতক্ষণ নানা দেশের নানা কথা বলা হ'ল। এখন একটু দেশের কথা বলা যাক্‌। বিদেশ থেকে আমাদের দেশে যে গম বা আটা-ময়দা আসে ১৯৩১ সাল থেকে সেগুলির উপরে শুল্ক বসান হয়েছে। গমের চাষীরা কিছু পরিমাণে লাভবান হয়েছে। কিন্তু যে শুল্ক আদায় হচ্ছে বিলাতের মত আমাদের দেশে সেটা গমের চাষীদের মধ্যে বিতরিত হচ্ছে না।

রপ্তানীর জিনিষের উপরে শুল্ক খুব কম দেশেই আছে, আমাদের দেশে কিন্তু এই রকমের ট্যাক্স কয়েকটি আছে। চালের উপরে মণকরা তিন আনা শুল্ক ছিল। সম্প্রতি সেটি কমিয়ে ন-পয়সা করা হয়েছে। ব্রহ্মদেশ থেকেই চাল বেশী রপ্তানী হয়। ওটা ত ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই যাচ্ছে। সুতরাং ও-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ভেড়ার ও ছাগলের কাঁচা চামড়ার রপ্তানীর উপরে শুল্ক ব্রহ্মদেশে কম এবং ভারতবর্ষে তার চেয়ে কিছু বেশী হারে আছে। গবর্ন্মেণ্ট সেটি তুলে দিতে চান। আমাদের দেশের কাঁচা চামড়া থেকে পাকা চামড়া (tanned skin) তৈরি করার শিল্প এতে ক'রে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে

* প্রকৃত প্রস্তাবে সেটি আবশ্যক হয় না। কারণ দেশের সব চাষী একযোগে সমান ভাবে দাম বাড়াতে পারে না। আবার কোনও ফসলের দাম বেশী চ'ড়লে চাহিদা সমান থাকবে না, লোকে সেই ফসলের পরিবর্তে অন্য জিনিষ খাবে।

পারে এই আশঙ্কাতে বেসরকারী সদস্যেরা এই প্রস্তাবটি নাকচ করেছিলেন। কিন্তু বড়লাট সাহেবের নির্দ্দেশে গবর্ন্মেণ্টের প্রস্তাবানুসারে কাঁচা চামড়ার রপ্তানী-শুল্ক রহিত করা হয়েছে।

রপ্তানী-শুল্কের মধ্যে পাটের উপরে শুল্কের কথা সকলেই জানেন। যদি পাট আমাদের একচেটিয়া হয়, তবে আমরা যে দামই চাই না কেন বিদেশীদের তাই দিতে হবে, অর্থাৎ কিনা ট্যাক্সটি বিদেশীদের কাছ থেকেই আদায় হবে। বিদেশীদের চাহিদা কি রকমের তাই দেখে পাট একচেটিয়া কিনা নির্ণয় করা যায়। পাটের দাম বাড়ান হ'ল তবু চাহিদা সেই অনুপাতে কম্‌ল না; পাটের দাম কমান হ'ল তবু চাহিদা সেই পরিমাণে বাড়্‌ল না; এরকমটি যদি হয় তবেই পাট আমাদের একচেটিয়া বোঝা যাবে। সংখ্যাশাস্ত্রের (Statistics) সাহায্যে এই ভাবে পাট একচেটিয়া কিনা নির্ণয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে।*

কিন্তু এটা সহজেই বোঝা যায় যে পাটের দাম যদি নিকৃষ্ট তুলার চেয়ে বেশী হয়, তবে সকলে পাট না কিনে তুলা দিয়েই থলি তৈরি করবে। কাগজের থলি যদি বেশ টিকসই হয়, তবে লোকে পাট কিনবে কেন? আবার এমন উপায়ও অবলম্বিত হচ্ছে (elevator system) যে থলি মোটে লাগ্‌বেই না, গাড়ী থেকে নলের সাহায্যে একেবারে জাহাজের ভিতরে গম বোঝাই ক'রে রপ্তানী করা হ'চ্ছে এবং আমদানীর বন্দরে নলের সাহায্যেই সেই গম জাহাজ থেকে খালাস ক'রে গাড়ীতে বোঝাই দেওয়া হচ্ছে। এ-সব উপায়ে আমদানী-রপ্তানী সম্ভব হ'লে পাট একচেটিয়া থাকে কেমন ক'রে?

সুতরাং পাটের ট্যাক্স যে বিদেশীরাই দেয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না,—বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে পাটের দর এতই কমেছে যে দামের তুলনায় শুল্ক সামান্য নয়। পাটের চাষীরাই ট্যাক্সটি যোগাচ্ছে একথাই বরং বলা যায়। ঐ টাকাটা কিন্তু এতাবৎ কাল ভারত-গবর্ন্মেণ্টের নানা কাজে এবং নানা অকাজে ব্যয়িত হচ্ছিল। সম্প্রতি অর্দ্ধেক পরিমাণ বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু সেটিও পাটের চাষীদের কল্যাণকল্পে খরচ হবে কিনা জানা নেই।

এদিকে কিন্তু পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা চলেছে। বিদেশে যেখানে যে-ভাবেই চাষ কমানো হয়েছে,—আইনের বলে বাধ্য ক'রেই হোক কিংবা স্বেচ্ছা-প্রণোদনেই হোক,—সেখানেই চাষ কমানোর ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু "পুরস্কার" চাষীদের দেওয়া হয়েছে। বিদেশী শস্যের উপরে শুল্কের লভ্যাংশ থেকেই এই কটন প্রায় সব দেশেই চলেছে, একথা আগেই বলেছি। আমাদের দেশেও চিনির উপরে চড়া শুল্ক বসিয়ে চিনির দাম যথেষ্ট বাড়িয়েই আকের দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে সরকার বাহাদুর আকের কলওয়ালাদের কিছু টাকা পাইয়ে দিয়ে সেই টাকার কিয়দংশ আকের চাষীদের দিতে আদেশ করেছেন। এ আদেশের মানে বোঝা যায়; কিন্তু পাটের চাষীদের এ রকম কোনও "পুরস্কার" দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। তারা নিজেদের স্বার্থ নিজেরা বুঝে পাটের চাষ কমাবে এই ভরসা করা হচ্ছে। বর্ত্তমান ক্ষতির ক্ষোভ যত দিন তাদের মনে থাক্‌বে তত দিন চাষ কমানোর বিষয়ে তাদের আগ্রহ থাক্‌বে। কিন্তু এক বছর দাম বেশী হ'লেই পরের বছর কি হবে? এ ভাবে পাটের নিয়ন্ত্রণ কত দিন চলতে পারে?

কেউ অবশ্য বল্‌তে পারেন যদি চায়ের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় তবে পাটের নিয়ন্ত্রণই বা হবে না কেন? হবে না এই জন্য যে পাটের চাষীরা সংখ্যায় দশ লক্ষেরও বেশী। তারা মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ নয়; একযোগে কাজ করার বিষয়ে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা তাদের কিছুই নেই। আর একটি কারণ এই যে যাঁরা চায়ের স্বাদ একবার পেয়েছেন তাঁরা চা ছেড়ে কফি বা অন্য পানীয় সহজে ব্যবহার কর্‌তে চান না,—যদিই বা চায়ের দাম একটু বাড়েই এ-বিষয়ে আপনাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।

---

* শুধু এইটি দেখা গিয়েছে যে এ-বৎসরে পাটের চাষ বেশী হ'লে পরের বৎসর দাম কম হয়, অর্থাৎ উৎপাদন দ্বারা পরের বৎসরের মূল্য নিয়মিত হচ্ছে। কিন্তু তুলা, চিনেবাদাম এবং তিসির বেলায় এর বিপরীত দেখা যায়। অর্থাৎ এগুলির বেলায় এ-বৎসরের মূল্যের দ্বারা পরের বৎসরের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা *Sankhyā : Indian Journal of Statistics, Vol I, Parts II and III* এবং *Indian Economist, Vol IV, No 18* এই দুই জায়গায় করা হয়েছে। পাটের চাষীরা কত দুর্ব্বল ও অসহায় তা'র খানিক পরিচয় এ থেকে পাওয়া গিয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদন কমিয়ে দাম বাড়ানো চায়ের বেলায় যত সহজ, পাটের বেলায় তত নয়।

অন্য একটি অসুবিধাও আছে। পাটের এই এক মুস্কিল যে তার উৎপাদন ও চাহিদার সামঞ্জস্য খুব কম সময়েই হয়েছে। যখন উৎপাদন বেড়েছে তখন চাহিদা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয় নি। এর উল্টোটি বরং কয়েক বার করা হয়েছে, অর্থাৎ যখন চাহিদা বেড়েছে তখন উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চলেছে। স্বদেশী যুগে যখন পাটের দাম খুব বেড়েছিল, তখন ভারতীয় পাটকল সমিতির (Indian Jute Mills Association) উদ্যোগে সরকারী কৃষি-বিভাগ বিনামূল্যে উৎকৃষ্ট পাটের বীজ বিতরণ করেছিলেন। তার ফলে পাটের দাম কমে গিয়েছিল। যুদ্ধের শেষদিকে পাটের দাম আবার বেড়েছিল। ১৯২৫ সালে সবচেয়ে বেশী দাম হয়েছিল। তখন বীজ বিতরণ আর এক দফা হ'ল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পাটের দাম কমাবার জন্যেই যত চেষ্টা হয়েছে, বাড়ানোর জন্যে কোনও চেষ্টা এতাবৎ কাল হয় নি। যে কয় বৎসর পাটের দাম একটু চড়া ছিল, সে কয় বৎসরও এত দাম বাড়ে নি যতটা অন্যান্য জিনিষপত্রের বেড়েছিল। সুতরাং পাটের চাষী বরাবরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।* পাটের চাষ কমিয়ে চাষী যদি লাভবান হয়, তবে অবশ্য কারুর কিছু বলবার নেই। কিন্তু যদি তা'র ক্ষতি হয়, তবে সে ক্ষতিপূরণ কে করবে?

বাস্তবিক কারুর কিছু লোকসান হবে না আর পাটের চাষী ফাঁকতালে লাভবান্ হবে এটি বোঝা কঠিন। চাষীদের কিছু দিতে হ'লে টাকাটা কোথা থেকে আসবে সেটা দেখা দরকার। পাটের দাম কমার জন্য যাঁরা লাভবান্ হচ্ছেন, পাটের দাম কমার জন্য ক্ষতি তাঁদেরই বহন করা উচিত নয় কি? যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার সময়ের, অর্থাৎ ১৯১৪ সালের জুলাই মাসের শেষের তুলনায় পাটের দাম গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে অর্দ্ধেকেরও কম, প্রায় ।৶০ রকম ছিল। কিন্তু চট, থলি ইত্যাদির দাম প্রায় ৮০ রকম ছিল।† পাটকলের মালিকেরা ব'লবেন যে তাঁরা তাঁত বন্ধ রেখে অনেক ক্ষতি স্বীকার ক'রে এই ভাবে চট ও থলির দাম চড়িয়ে রেখেছেন। কিন্তু এটা কি সত্যি কথা নয় যে কাঁচা মাল কম দামে কিনতে পারছেন ব'লেই এটি করা সম্ভব হয়েছে? আমেরিকাতে তুলার চাষীদের এই ভাবেই সাহায্য করা হচ্ছে। যারা তুলা প্রথমে ব্যবহার ক'রবে সেই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তাদের ব্যবহৃত তুলার উপরে ট্যাক্স (processing tax) আদায় ক'রে সেটি তুলার চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হচ্ছে।* পাটের বেলায় এ রকম করা সম্ভব নয় কি?

এই উপায়ও কিন্তু চিরকালের জন্য হ'তে পারে না। কিন্তু তাই ব'লে যে এটি করা উচিত নয় একথা বলা যায় না। আমাদের দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য যে সংরক্ষণ নীতি (protection) অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সম্বন্ধেও এই নিয়ম আছে যে এই সাহায্য যেন চিরকাল না দিতে হয়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে পাটের চাষীদের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্যে শুধু এই ভাবে ট্যাক্স বসালে কিংবা পাটের চাষ কমাবার জন্যে আন্দোলন চালালেই চলবে না। পাটের চাহিদা বাড়ানোর চেষ্টাই হচ্ছে সব চেয়ে কাজের। এর জন্যে পাটের নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করতে হবে, রঞ্জনের এবং বয়নের অভিনব পন্থার সন্ধান করতে হবে। এই ব্যাপারে পাটের চাষীদের এবং চটকলের মালিকদের স্বার্থ অভিন্ন। এই সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি চেষ্টাও করা দরকার। পাটের চাষী যাতে তার উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়, ফড়িয়া, ব্যাপারী, আড়তদার, দালাল, জুয়াড়ী ইত্যাদি মিলে তার পাওনা টাকাতে ভাগ না

* *Capital* for August 15, 1929 এবং *Bengal Jute Inquiry Committee Report*, *Appendix*, pp. 33-34.

† সূচক সংখ্যা (Calcutta Wholesale Price Index Number) যথাক্রমে ৪৫ ও ৭৮ ছিল।

* এ বিষয়ে আইন এই:—"The processing tax shall be at such rate as equals the difference between the current average farm price for the commodity and the fair exchange value of the commodity....as will prevent...accumulation of surplus stocks and depression of the farm price of the community...

"...the fair exchange value of a commodity shall be the price therefor that will give the commodity the same purchasing power with respect to articles farmers buy, as such commodity had during the base period..."

বসায় এটাও দেখা দরকার। এ সকলই আয়াসসাধ্য। কিন্তু চাষীর প্রকৃত কল্যাণ সাধন করবার কোনও সহজ পথ নেই।

চাষীকে আমরা অনাত্মীয় মনে করি, এই জন্যেই তাদের দুঃখদৈন্যে আমাদের মন সাড়া দেয় না। দেশের লোক ব'লতে ভদ্রবেশধারী এবং ভদ্রবেশধারিণীদের মূর্ত্তিই আমাদের মনে আসে। যেখানে উৎপাদন হচ্ছে, সৃষ্টি চলেছে, সেখানে আমাদের মন যায় না। তাই বলি আমাদের মন ফিরলেই কৃষিসঙ্কট, কৃষিসমস্যা এ সবেরই সমাধান হবে। মৃত্তিকাই আমাদের মাতৃদেবী, মাটিই আমাদের মা-টি, একথা ভুললে চলবে না। কবি তাই লিখেছেন,—

> হে বসুধে! জীবস্রোত কত বারম্বার
> তোমারে মণ্ডিত করি' আপন জীবনে
> গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকাসনে
> মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
> কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
> ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন, তা'রি সনে
> আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
> তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
> সজীব বরণে; আমার সকল দিয়া
> সাজাব তোমারে। *

* কলিকাতা তালতলা সাহিত্য-সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে ধনবিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

৩

যামিনীর বিবাহ হইয়াছিল তাঁহার মায়ের মৃত্যুর মাসখানেক পরে। খুব ধুমধাম বা আমোদ-আহ্লাদ যে তাহাতে হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। সুরেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে বিবাহ করায় তাঁহার পরিবারেরও কেহ খুশী হয় নাই, কেহ যোগও দেয় নাই বিবাহে। সুতরাং বৌভাতও করা হয় নাই। ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশনও তেমন কিছু ঘটা করিয়া করা হয় নাই, কারণ যামিনীর উৎসব-কোলাহল ভাল লাগিত না, একলা অপটু হাতে বড় কাজ গুছাইয়া করাও শক্ত। সুরেশ্বরের ছোটভাই শিশির মায়ের মন রাখিয়া ঘোরতর সনাতন হিন্দু পরিবারের মেয়ে বিবাহ করিয়াছিল। তাহারা পারতপক্ষে তাঁহার বাড়ির ছায়া মাড়াইত না। সুতরাং এ বাড়িতে বড় উৎসব এত দিন পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। মমতা এবং সুজিতের জন্মদিনে আত্মীয়-স্বজন এবং ছেলেমেয়ের বন্ধু-বান্ধব দুই চারি জন আসিত, এই পর্য্যন্ত।

পাস করার পর এবার কিন্তু মমতা মাকে জোর করিয়া ধরিয়াছে, তাহার সকল বন্ধুবান্ধবকে খুব ঘটা করিয়া খাওয়াইতে হইবে। যামিনীও রাজীই হইয়াছেন, এমন কি তাঁহার যেন খানিকটা উৎসাহই বোধ হইতেছে। সুরেশ্বর উৎসবের কারণটাকে মোটেই আমল দিতেছেন না— মেয়ে পরীক্ষায় পাস করিয়াছে, তাহা লইয়া এত লাফালাফি কেন? তবে আমোদ-আহ্লাদ, লোকজন আসা, তাঁহার খুব ভালই লাগে, কাজেই ব্যাপারটাতে তিনি বাধা দেন নাই। সুজিত খুব সকরুণ অবজ্ঞা ভরে ব্যাপারটাকে দূর হইতে দেখিতেছে।

মমতার সঙ্গে যাহারা পরীক্ষা দিয়াছিল তাহাদের সকলের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। স্কুলের অন্য যে-সব মেয়ের সঙ্গে তাহার ভাব আছে, তাহাদের সে বাদ দেয় নাই। শিক্ষয়িত্রীরাও নিমন্ত্রিতা হইয়াছেন। আত্মীয়-বন্ধু যে যেখানে আছেন, সুরেশ্বর ও যামিনী মিলিয়া সকলকেই প্রায় নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছেন।

খাওয়া হইবে রাত্রে, কারণ গুমোট গরমের দিন, দুপুরবেলা এত খাটুনি খাটা বাড়ির লোকের অসাধ্য। ছাতের

উপর লাল শামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে, অবশ্য বৃষ্টির ভয়ে তাহার উপর তেরপল চাপাইতে হওয়ায় শামিয়ানার সৌন্দর্য্য বেশ খানিকটা কমিয়া গিয়াছে। দেবদারু-পাতা, ফুল, রঙীন লণ্ঠন দিয়া সমস্ত ছাত সাজান হইয়াছে। মমতা মায়ের সাহায্যে সারা ছাত জুড়িয়া আলপনা দিয়াছে, তাহার মাঝে মাঝে রঙীন কাঁচের এবং জয়পুরী মীনার কাজ-করা ফুলদানীতে শ্বেত ও রক্ত পদ্ম। ধূপের সুগন্ধে স্থানটি আমোদিত। নীচে বসিবার ঘরটিও গোলাপ ফুল ও নানা রকম ফার্ণ দিয়া খুব সুন্দর করিয়া সাজান। মমতা উদ্বিগ্ন হইয়া আছে, পাছে বৃষ্টি আসিয়া তাহার এত সাধের আয়োজন সব মাটি করিয়া দেয়। খাওয়াইবার জায়গার অবশ্য অভাব হইবে না, এত বড় বাড়িতে ঘর আছে অনেক। কিন্তু ছাদটি সাজাইতে তাহাকে ও তাহার মাকে পরিশ্রম অল্প করিতে হয় নাই, সেটা একেবারে ব্যর্থ হইলে মমতা বেচারীর মনে অত্যন্তই লাগিবে।

সমস্ত কাণ্ডটাই তাহার মনের মত করিয়া যামিনী করিতেছেন, মেয়ের আনন্দের উপর কোনো ছায়াপাত যাহাতে না হয় সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। মমতাকে তিনি মায়ের পক্ষেও যেন একটু অতিরিক্ত রকম ভালবাসিতেন। তাঁহার নিজের ব্যর্থ কৈশোর ও প্রথম যৌবনের যত সাধ, যত আকাঙ্ক্ষা এই কন্যাটির জীবনে সার্থক হইয়া উঠুক এই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা। সুজিত দিদিকে বিদ্রূপ করিতে আসিয়া এমন কড়া বকুনি খাইয়াছে যে রাগ করিয়া সে নিজের ঘরে খিল দিয়া বসিয়া আছে। অবশ্য শেষ অবধি সেখানে থাকিতে সে পারিবে না, একবার লোকজন আসিতে আরম্ভ হইলে হয়। সুজিত বোধ হয় মানুষের মুখ আর গল্পগাছা যতখানি ভালবাসে, এত আর জগতে কোনো জিনিষ ভাল-বাসে না। সুতরাং অতিথি-অভ্যাগতের দল দেখা দিতে আরম্ভ করিবামাত্রই যে সে বাহির হইয়া আসিবে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

কাজকর্ম্ম সারিয়া মমতা এখন মায়ের ঘরের বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সাজসজ্জা করিতেছে। পরীক্ষায় পাস করার জন্য মা তাহাকে নূতন সোনালী রঙের বেনারসী শাড়ী ও জামা কিনিয়া দিয়াছেন, বাবা দিয়াছেন এক জোড়া হীরার দুল। মেয়ে পরীক্ষা পাস করায় তাঁহার কোনো আনন্দ হয় নাই, অন্ততঃ মুখে তিনি তাহাই বলিতেছেন। কিন্তু মমতার আনন্দটা অত্যন্ত সংক্রামক জিনিষ, তাহা সারা বাড়ি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার হাস্যোজ্জ্বল কচি মুখখানির দিকে চাহিয়া সুরেশ্বরও আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। মেয়ে হয়ত তাঁহার চেয়ে মাকে ভালবাসে বেশী, এই একটা ধারণা থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাকে ঈর্ষান্বিত করিয়া তুলিত। তাই যামিনীর উপহারের পাঁচ গুণ দামী একটা উপহার মেয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি নিজের মনকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

মমতার নিজের গহনাগাঁটি খুব বেশী ছিল না। সুরেশ্বর থাকিয়া থাকিয়া প্রচণ্ড রকমের হিসাবী হইয়া উঠিতেন। মমতার গহনা গড়াইয়া টাকা নষ্ট করিতে তিনি রাজী ছিলেন না। বিবাহের সময় ত এক রাশ গহনা দিতেই হইবে, তখন বরপক্ষ কি রকম কি আব্দার ধরিবে, তাহা কিছুই বলা যায় না। শুধু শুধু এখন আর তাহা হইলে কেন টাকা খরচ করা? সুতরাং মমতার জন্য গহনা গড়ান হইল না। যামিনীর এ-সব দিকে ঝোঁক বেশী ছিল না, তিনিও ইহা লইয়া বিশেষ তর্কাতর্কি করিলেন না। মেয়ে ত সারাদিন স্কুলেই কাটায়, তাহার অত গহনা পরিবার অবসর কোথায়?

কিন্তু আজ মমতার ক্ষীণ তনুলতাটিকে বেষ্টন করিয়া হীরকের দ্যুতি জ্বলিতেছে। যামিনীর বিবাহের পর সুরেশ্বর প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া তাঁহাকে এক প্রস্ত হীরার অলঙ্কার কিনিয়া দেন। উহা বেশীর ভাগ সময় ব্যাঙ্কেই পড়িয়া থাকিত, যামিনী বধূজীবনের প্রথম বৎসর উহা বার-দুই অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার পর আর পরেন নাই। আজ সবগুলি আনাইয়া মনের মত করিয়া মেয়েকে সাজাইতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার নিজের স্বর্গগতা জননীর কথা মনে পড়িতেছে। যামিনীকে সাজাইবার কি আগ্রহই না তাঁহার ছিল! পুতুলখেলার মত তিনি যামিনীকে লইয়া খেলিতেন যেন। তাঁহার সাধ তিনি অনেকটাই মিটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই খেলার ফলভোগ করিতে রাখিয়া গিয়াছেন হতভাগিনী কন্যাকে।

যামিনীর বাহিরের ঐশ্বর্য্যের অভাব যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য জ্ঞানদা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছেন। কন্যার অন্তরের দারুণ রিক্ততা দেখিবার জন্য আছেন শুধু ভগবান। নিজের মেয়ের অলক্ষ্যে যামিনী একবার মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন।

যামিনীর দিকে চাহিয়া মমতা একবার জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা মা, তোমার কি শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে?"

যামিনী তাড়াতাড়ি মেয়ের মুখটা নিজের দিক হইতে ফিরাইয়া দিয়া তাহার খোঁপায় সোনার ফুল পরাইতে লাগিলেন, বলিলেন, "কই না ত? যা গরম, তাই মুখ শুক্‌নো দেখাচ্ছে বোধ হয়।"

মমতা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা মা, এত যে সাজিয়ে দিলে, ওরা আমায় অহঙ্কেরে মনে করবে না ত?"

যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "না মা, তা কেন ভাব্‌বে? আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপারে মানুষ ত সাজেই। পরিবেশন করবার সময় খুলে ফেলো'খন, তাহলেই হবে।"

সাজিতে অবশ্য মমতার খুবই ভাল লাগিতেছিল। আর কোন কারণে না হউক, অলকাটাকে খানিক তাক লাগাইয়া দেওয়ার জন্যই। তাহার দিনরাত রাজা-উজীর মারা শুনিতে শুনিতে মমতার ত দুই কান পচিয়া গিয়াছে। অন্য লোকের ঘরেও যে টাকা আছে তাহা সে একবার দেখুক, এবং টাকা থাকিলেই যে অমন অভদ্রের মত জাঁক করিতে নাই, তাহাও একটু সে শিখুক। অলকা এই প্রথম মমতাদের বাড়ি আসিতেছে।

যামিনী কি কাজে বাহির হইয়া গেলেন। মমতা খানিক ক্ষণ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমালোচকের দৃষ্টিতে নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিল। যেখানে যা ত্রুটি ছিল, তাহা সংশোধন করিয়া দিল, তাহার পর পাখা এবং বাতি বন্ধ করিয়া দিয়া বাবার ঘরের দিকে চলিল।

সুরেশ্বর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়িয়া ঘুমাইয়াছেন। যত গরম বাড়ে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে তাঁহার দিবানিদ্রার পরিমাণ। রাত্রের ঘুমের সময়ও ততই পিছাইতে থাকে। যামিনীর রাত জাগা সহ্য হয় না। তিনি মেয়েকে লইয়া সকাল-সকাল অন্য ঘরে ঘুমাইয়া পড়েন। সুরেশ্বরের শুইতে আসিতে প্রায়ই সাড়ে বারোটা কি একটা বাজিয়া যায়।

খাটে উঠিয়া বসিয়া তিনি নিজের খাস ভৃত্যটিকে হাঁক-ডাক করিতেছিলেন। চাকরবাকর আজ সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত, এক ডাকে কাহারও সাড়া পাওয়া যাইতেছিল না। বেশ চটিয়া একটা গর্জ্জন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মেয়েকে সামনে দেখিয়া সুরেশ্বর থামিয়া গেলেন। মমতার কাছে ধরা-পড়ার লজ্জাটা কেন জানি না তাঁহার অত্যন্ত বেশী ছিল। স্ত্রীর নীরব অবজ্ঞা বা সরব নিন্দা, কোনো কিছুকে তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করিতেন না, ও-সব তাঁহার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল। সুজিতকে ত তিনি মানুষের ভিতরেই এখনও গণ্য করিতেন না। কেবল মমতার মতামতকে কথায় না হোক কাজে তিনি যথেষ্ট মানিয়া চলিতেন। নিজের স্বভাবচরিত্রের যেগুলি বড় বড় ত্রুটি ছিল, তাহা যাহাতে কন্যার চোখে ধরা না পড়ে, সে দিকে তাঁহার যথেষ্ট সাবধানতা ছিল। মমতাকে লইয়া সকল দিক দিয়াই তাহার পিতামাতার ভিতর একটা রেষারেষির ভাব ছিল।

মমতা ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "দেখ বাবা, নূতন দুলটা পরেছি।"

সুরেশ্বর নিদ্রাবিহ্বল দুই চোখ ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন, "বাঃ, বেশ খাসা দেখাচ্ছে। একটা ছবি তুলে রাখ।"

মমতা বলিল, "কি যে তুমি বল বাবা, তার ঠিক নেই। সন্ধ্যেবেলা কখনও ছবি তোলা যায়? তুমি কিন্তু এখনও উঠ্‌লেও না, কাপড়ও ছাড়লে না, লোকজন এসে পড়লে অপ্রস্তুতে পড়বে।"

"এই যে যাই মা," বলিয়া সুরেশ্বর খাট ছাড়িয়া সোজা স্নানের ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। মমতা ফিরিয়া মায়ের ঘরে চলিল। সুজিতের রুদ্ধ দুয়ার খানিকটা ফাঁক হইয়াছে দেখিয়া আপন মনে একটু হাসিয়া গেল।

মায়ের ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, তিনি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিতেছেন। মমতা পিছন হইতে গিয়া দুই হাতে তাঁহার চুলের রাশ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কি সুন্দর এখনও তোমার চুল মা, আমার কেন এমন হ'ল না?"

যামিনী একটু হাসিয়া মেয়ের হাত হইতে চুলের গোছা টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমারও ত বেশ চুল মা; আরও বাড়বে এখন।"

"হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গেলাম, আবার নাকি বাড়ে?" বলিয়া মমতা একখানা চামড়ার গদী-আঁটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। পাশে আর একটি চৌকীর উপর যামিনী সন্ধ্যায় পরিবার কাপড়-জামা বাহির করিয়া রাখিয়াছেন, সেগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "বাবা, দুই আলমারি-ভর্ত্তি তোমার কাপড়, একটাও তবু পরবে না। সেদিন মামীমা ত ঠিক কথা বলেছিলেন।"

যামিনী চুলের বিনুনী শেষ করিতে করিতে বলিলেন, "কি আবার ঠিক কথা বললেন তোমার মামীমা?"

"ঐ যে সেদিন বল্লেন, তোমার বুঝি মনে নেই? নিশ্চয় মনে আছে। ঐ যে এর আগের রবিবারে।"

কথাটা এমন বিষম কিছুই নয়। যামিনীর ছোটভাই মিহিরের স্ত্রী একদিন বলিয়াছিল, "মাগো মা, কাপড়ের যেন দোকান! সব ক'খানাই ত নূতন দেখছি। দিদি, একদিনও বুঝি একখানা পাট ভেঙে পরো না? মেয়ের বিয়েতে তোমায় আর কাপড়চোপড় কিনতে হবে না।" এই কথাটাই মমতা কিছুতেই মায়ের সামনে বলিয়া উঠিতে পারিল না।

যামিনীর কথাটা মনে পড়িল। একটু হাসিয়া বলিলেন, "এসব ছেলেমানুষের ব্যাপারে আমি বেশী সাজগোজ করলে ভাল দেখাবে না। তাছাড়া আমায় ত সারাক্ষণ উপর, নীচ, ভাঁড়ার আর রান্নাঘরে ছুটোছুটি করতে হবে। তুমি এবার নীচে যাও, লোকজন আসবার সময় হ'ল। ড্রয়িংরুমের পাশের ঘরে আমি অনেকগুলি গোলাপ আর শ্বেতপদ্ম জলে ভিজিয়ে রেখেছি। নিত্যকে বলো গিয়ে, যে দুটো বর্ম্মার কাঠের ট্রে আছে, তাতে গুছিয়ে তুলতে, তোমার বন্ধুদের গোলাপ দিও হাতে হাতে। বড়দের পদ্ম দিও। আমি একবার রান্নাঘর তদারক করে আসি।

মমতা পাকা বুড়ীর মত বলিল, "তুমি যেয়ো না মা আগুনের আঁচে, তোমার মাথা ধরে যাবে। মামীমা ত আছেন সেখানে, বিন্দু-পিসীমাও আছেন।

যামিনী তবু রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। মমতা ফুল গুছাইবার জন্য নিত্য-ঝিকে ডাকিয়া লইয়া নীচে চলিয়া গেল।

ফুলে-ভরা ট্রে দুটি পাশে রাখিয়া মার্ব্বেল পাথরের সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইতে-না-দাঁড়াইতে সজোরে হর্ণ দিয়া একখানা গাড়ী তাহাদের গেটের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। মমতা অস্ফুটস্বরে বলিল, "এই রে অলকা ঝুটকিই সবার আগে হাজির।"

অলকা একলা আসে নাই, অনুগ্রহ করিয়া ছায়াকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সে না আসিলে ছায়ার হয়ত আসাই হইত না, কারণ এখানে সে থাকে পরের বাড়িতে, কে তাহাকে গরজ করিয়া এত দূর পৌছাইয়া দিতে আসিবে? সুতরাং মনে মনে অলকার প্রতি একটু কৃতজ্ঞ না হইয়াও মমতা থাকিতে পারিল না।

অলকা গাড়ী হইতে নামিয়াই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, কি চমৎকার মানিয়েছে ভাই তোকে! ঠিক যেন ইন্দ্রাণী। এত আছে, তবু কেন ভূত সেজে স্কুলে যাস্ বল্ ত।"

তাহার পিছন পিছন নামিল ছায়া। নিতান্ত সাদাসিদা পোষাক, ছিটের জামা আর কালপেড়ে একখানি পুরাতন মিলী শাড়ী। গহনার ছিটাফোঁটাও গায়ে নাই। হাতে খালি বাঁধানো দু-গাছি শাঁখা। মমতা আর অলকার মধ্যে পড়িয়া তাহাকে যেন একান্তই ম্লান আর হতশ্রী দেখাইতেছে। তবু তাহার মুখের হাসিটি মমতার চোখে বড়ই মিষ্টি লাগিল।

অলকার কথার উত্তরে মমতা বলিল, "আহা, কি কথাই বল্লে। এমনি ক'রে গেলে আমায় কেউ স্কুলে ঢুকতে দেবে?"

অলকা বলিল, "ঠিক এমনি করেই কি আর? তবে যেরকম যাও, তার চেয়ে কি আর একটু ভাল কাপড়, কি গহনা দুখানা বেশী পরা যায় না?"

ছায়ার সামনে এত কাপড়-গহনার গল্প করিতে মমতার লজ্জাই করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, "তোমরা দাঁড়াও না ভাই এখানে, আমার একলা-একলা এত লোককে রিসীভ্ করতে কেমন যে লজ্জা করে।"

অলকা তৎক্ষণাৎ রাজী। মমতা তাহার হাতে একটি আধফোটা লাল গোলাপ গুঁজিয়া দিতেই সে চট্ করিয়া তাহা নিজের ব্রোচে গাঁথিয়া লইয়া বলিল, "বেশ ত।

আমাকে একটা ট্রে দে, আর একটা তুই নে, ভাই। ছায়া কি করবে? ঘরে গিয়ে বসবে? অলকার ইচ্ছা নয় যে তাহাদের উজ্জ্বল সজ্জার সত্যই ছায়াপাত করিয়া ছায়া তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া থাকে। মমতা কিন্তু তাড়াতাড়ি বলিল, "ওমা, ও একলা গিয়ে ঘরে বসে থাকবে কেন? ও দাঁড়াক আমাদেরই সঙ্গে, লোকজন অনেক এসে গেলে তার পর ঘরে গিয়ে বসবে।"

ইহার পর একটি একটি করিয়া ক্রমাগত মানুষ আসিতে লাগিল। সুরেশ্বরও স্নান সারিয়া সুসজ্জিত হইয়া মেয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভদ্রলোকদের তিনি অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন, বসাইতে লাগিলেন। ভদ্রমহিলাদের অন্দরমহলে যামিনীর কাছে চালান করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। মমতার বন্ধুর দল তাহাকে ছাড়িয়া নড়িতে রাজী হইল না, তাহারই চারধারে রূপ ও রঙের তরঙ্গের মত দোল খাইতে লাগিল। সুজিতের দলের মানুষ খুব বেশী আসে নাই, তবু সেও কিছু পরে যথাসাধ্য সাজিয়া-গুজিয়া নামিয়া আসিল। দিদির বন্ধুদের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে লজ্জা করিতে লাগিল, তবু সেখান ছাড়িয়া নড়িতেও তাহার মন উঠিল না।

এদিকে খাওয়ার জায়গা করা হইয়া গিয়াছে। ঈশান-কোণে মেঘের কালিমা দেখা দিয়াছে, ঝড় হইলেও হইতে পারে। তাই যামিনী তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যাপারটা চুকাইয়া ফেলিতে চান।

ছাদ জুড়িয়াই খাওয়ার জায়গা, তবে মাঝে লেসের পরদা দিয়া মেয়েদের আর ছেলেদের দিক দুইটিকে আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা সুরেশ্বরদের বাড়ির নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রম হইবার জো নাই।

মমতা ছুটিয়া গিয়া বেনারসী ছাড়িয়া একখানি ঢাকাই শাড়ী পরিয়া আসিল, হীরার গহনাগুলিও খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গিনীরা তাহাকে টানাটানি করিতে লাগিল নিজেদের সঙ্গে বসাইবার জন্য। মমতার কিন্তু ভারি ইচ্ছা, সে পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়াইবে। যামিনীও সেই মত প্রকাশ করায় সে মহা উৎসাহ সহকারে ঝকঝকে পিতলের বালতি লইয়া পোলাও দিতে আরম্ভ করিল। যামিনী ও তাঁহার ভ্রাতৃবধূ প্রভা মেয়েদের দিকের খাওয়া তদারক করিতে লাগিলেন। ছেলেদের দিকে সুরেশ্বর দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন, কাজটা অন্য পাঁচ জনে করিয়া দিল।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার চুকিতে বেশ খানিক রাত হইয়া গেল। শেষ অভ্যাগতটিকে বিদায় করিয়া যামিনী যখন নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। মমতা ইহারই মধ্যে কখন আসিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মুখে তাহার স্পষ্ট ক্লান্তির চিহ্ন, এলোখোঁপা খসিয়া কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, যে-ঢাকাই শাড়ীখানা পরিয়া পরিবেশন করিয়াছিল সেখানাও ছাড়ে নাই, গহনাগাটিও সব খোলে নাই। আলুথালু ভাব যামিনী মোটেই দেখিতে পারিতেন না, একবার ভাবিলেন মমতাকে তুলিয়া দিবেন, যাহাতে সে কাপড় বদলাইয়া চুল বিনুনী করিয়া তবে আবার শোয়। কিন্তু মেয়ের ক্লান্তি যথেষ্ট হইয়াছে, আর তাহার ঘুম ভাঙাইয়া কাজ নাই, মনে করিয়া শেষপর্যন্ত আর তাহাকে জাগাইলেন না। মশারীটা ফেলিয়া, বাতি নিবাইয়া দিয়া, নিজের কাপড় ছাড়িবার ঘরে চলিয়া গেলেন।

দরজার কাছ হইতে বিন্দু-ঠাকুরঝি ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি ত কিছুই খেলে না বড়বৌ? তোমার জন্যে দই-মিষ্টি এনে দেব কি?"

যামিনী বলিলেন, "এত রাতে আমার আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, ঠাকুরঝি। তোমরা খাও গে, আমাকে নিত্যর হাতে এক গেলাস ঘোলের সরবৎ পাঠিয়ে দিও।" বিন্দু-ঠাকুরঝি চলিয়া গেলেন।

রাত বেশ অনেকখানি হইয়াছে, তবু অসহ্য গুমোট্ গরম। যামিনী জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, মেঘ কাটিয়া গিয়া মুক্ত আকাশে তারা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া লইলেন; মানুষের জীবনাকাশের মেঘ কোনদিনই বুঝি কাটে না। তবু ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা দেখা যায় বইকি? এই যে ছেলেমেয়ে দুটি ভগবান তাঁহার কোলে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহারা না আসিলে তিনি কাহাকে অবলম্বন করিয়া এতদিন বাঁচিয়া থাকিতেন? মমতাকে ভাল করিয়া মানুষ যদি করিতে পারেন, তাহার নারীত্বকে সকল দিক দিয়া

সার্থক হইতে যদি চোখে দেখিয়া যান, তাহা হইলে যামিনী সুখে মরিতে পারিবেন নাকি? হৃদয়ের যে নিদারুণ ব্যথা আজও তিনি ভাল করিয়া ভুলিতে পারেন নাই, তাহা তখন ভুলিবেন কি? সুজিতকে মানুষ করিবার ভার ত তিনি পাইলেন না, হয়ত মানুষ সে হইবেও না। যা তাহার বংশের ধারা, সেই মতেই সে চলিবে বোধ হয়। সন্তানের দুর্গতি দেখার যে বেদনা, তাহার জন্যও তাঁহাকে এখন হইতে প্রস্তুতই থাকিতে হইবে।

নিত্য আসিয়া শ্বেত পাথরের গেলাসে ঘোলের সরবৎ রাখিয়া গেল। যামিনী পাশের ঘরে গিয়া এত রাত্রে আর একবার গা ধুইয়া আসিলেন। কাপড়-জামা সব বদলাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর সরবৎটুকু পান করিয়া একটু যেন সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ এই ঘরে বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। লোহার সিন্দুকটা ঠিক বন্ধ আছে কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার পর বাহির হইয়া একবার সুজিতের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে অঘোরে ঘুমাইতেছে। চাকরকে হাজার বার বলা সত্ত্বেও সে এ-ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দেয় নাই, দেখা গেল। চারটি জানালার ভিতর তিনটিই বন্ধ। সুজিত এবং তাহার বাবার ধারণা বন্ধ ঘরে পূর্ণ বেগে পাখা চালাইলে তাহাতে কোনো ক্ষতি হয় না, তবে ঝড়-ঝাপ্‌টার দিনে সব দরজা-জান্‌লা বন্ধ না করিয়া দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। যামিনী বিরক্তিতে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া জানালাগুলি খুলিয়া দিলেন।

আর রাত করা চলে না, শ্রান্তিতে তাঁহার শরীর যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। একবার স্বামীর শয়নকক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার। সুরেশ্বর হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, নয় এখনও উপরে আসেন নাই। কোন্‌টা ঠিক তাহা জানিবার চেষ্টা না করিয়া যামিনী ফিরিয়া গিয়া মমতার পাশে শুইয়া পড়িলেন। এত যে শ্রান্তি, তবু ঘুম সহজে আসিতে চায় না। মনের উপর বেদনার পাষাণ-ভার দিনরাত যেন চাপিয়া বসিয়া আছে, ঘুমকেও সে ঠেকাইয়া রাখে।

ভোরবেলা অভ্যাসবশে ঘুম তাঁহার একবার ভাঙিল, কিন্তু শরীরের জড়তা তখনও এত বেশী যে, তাহার বাধা অতিক্রম করিয়া যামিনী উঠিতে পারিলেন না। আবার পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিলেন। অন্য দিন এই সময় হইতেই বাড়ির চাকর-বাকরের সাড়া পাওয়া যায়, আজ সারা বাড়ি নিঝুম। ঝি-চাকরেরা বোধ হয় তিন প্রহর রাত্রি পার হইয়া যাইবার মুখে শুইয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত কেহ আর চোখ মেলে নাই।

কিন্তু যামিনীর ঘুম আর ভাল করিয়া আসিল না। পূর্ব্বাকাশে আলোকচ্ছটা প্রথম দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা ত্যাগ করা তাঁহার চিরকালের অভ্যাস। আলো দেখিলে আর তিনি শুইয়া থাকিতে পারেন না। আজও উঠিয়া পড়িলেন। অন্য দিন নিত্য-ঝি আসিয়া তাঁহার মুখ ধুইবার সরঞ্জাম গুছাইয়া দেয়, চুল খুলিয়া দেয়, তাঁহার কাপড়-জামা সব লইয়া গিয়া স্নানের ঘরে ঠিক করিয়া রাখে। যামিনীর এ-সব ভাল লাগে না, কিন্তু জমিদারের গৃহিণী তিনি, সুরেশ্বরের এই সব বনিয়াদী চাল অত্যন্ত ভাল লাগে, ক্রমেই বেশী করিয়া ভাল লাগিতেছে। কাজেই বাধ্য হইয়া যামিনী এ-সব সহ্য করেন, খানিকটা উৎপাত সহ্য করার ভাবে। তবে সুবিধা পাইলেই নিত্যকে তিনি অন্য কোন কাজে লাগাইয়া দিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। আজ সে নিজেই আসিয়া পৌঁছায় নাই, দেখিয়া খুশী হইয়া যামিনী স্নানের ঘরে চলিয়া গেলেন। মমতা প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ওঠে, আজ কিন্তু সে এখনও গভীর ঘুমে অচেতন।

যামিনী স্নান সারিয়া আসিয়া চুল আঁচড়াইতেছেন, এমন সময় নিত্য পড়ি-কি-মরি গোছের ভাবে ছুটিতে ছুটিতে সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। যামিনীর স্নানটা তাহার বিনা-সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে একবার জিব বাহির করিয়া গালে হাত দিল, তবে যামিনীকে কিছু বলিতে ভরসা পাইল না। যামিনী চুলের জট ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন, "খুকীকে তুলে দে গিয়ে নিত্য, রোদ উঠে পড়ল ব'লে।"

নিত্য একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চুলের গোছাটা ভাল ক'রে মুছিয়ে দিয়ে যাব মা? বড় জল গড়াচ্ছে।"

যামিনী বলিলেন, "দরকার নেই, ও এখুনি ঝরে যাবে।

তোকে যা বলছি তাই কর্।” নিত্য অগত্যা চলিয়া গেল।

উপর তলায় পাঁচ-ছয় খানি বড় বড় ঘর। সামনের দিকে গাড়ী-বারান্দার ছাদ, ভিতরের দিকেও একটি চতুষ্কোণ বারান্দা। নীচে প্রকাণ্ড ডাইনিং-রুম থাকা সত্ত্বেও যামিনীর খাওয়া-দাওয়া বেশীর ভাগ এই বারান্দাটিতেই হয়। বর্ষাকালে ইহার সামনে ঝোলে সবুজ তেরপলের পরদা জলের ছাট আটকাইবার জন্য, আর ঘোর গ্রীষ্মে ঝুলিতে থাকে খশখশের পর্দ্দা। কালে-ভদ্রে নীচে তিনি খাইতে যান যদি অতিথি-অভ্যাগতের আবির্ভাব হয়, নয়ত কোন কারণ বশতঃ সুরেশ্বর যদি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। মমতা সর্ব্বদা মায়ের সঙ্গেই খায়, সুজিতের কিছু ঠিক নাই। সে মায়ের সঙ্গেও খায়, নিজের ঘরেও খায়, আবার নীচে বাবার সঙ্গেও খায়।

নিত্যর ডাকে মমতাও বার-দুই আলস্য ভাঙিয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িল। রোদ উঠিলে শুইয়া থাকিতে তাহারও ভাল লাগে না, তবে যামিনীর মত এ-বিষয়ে অতটা মতের দৃঢ়তা তাহার নাই। মাঝে মাঝে জাগিয়া বিছানায় শুইয়া আল্‌সেমি করিতে তাহার বেশ ভালই লাগে, তবে মায়ের ডাকাডাকির চোটে এ-সুখটা সে কোন দিনই পুরাপুরি উপভোগ করিতে পায় না। মায়ের স্নান করাও শেষ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে তখন নিত্য আর রেবতী-ঝি মিলিয়া শ্বেত-পাথরের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিতেছে। যামিনী আসিয়া বসিতে-না-বসিতেই তাঁহাদের প্রাতরাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। কালকের খাবার অনেক বাঁচিয়াছে, তাই আজ আর সকালে কিছু তৈয়ারি করা হয় নাই। লুচি, মাংস, সন্দেশ, পান্তুয়া, দরবেশ মিঠাই বোঝাই করিয়া মস্ত বড় একটা ট্রে বিন্দু-ঠাকুরঝি উপরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। লুচিগুলি ও মাংসটা বেশ করিয়া আবার গরম করিয়া লওয়া হইয়াছে।

যামিনী খাবারের পরিমাণ দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, “থাম্, থাম্, অতগুলো নামাস্ নে, কে অত খাবে? উনি আর খোকা উঠ্‌লে পর তাঁদের দিস্।”

নিত্য ট্রে-সুদ্ধ নামাইয়া রাখিয়া বলিল, “আর ও ত মেলা রয়েছে, পিসীমা আমাদের-সুদ্ধ রুটি গড়তে মানা ক'রে দিয়েছেন।”

যামিনী বলিলেন, “মেলা আছে বলেই কি ঐ দু-সের ময়দার লুচি আমি আর খুকি খেতে পারব? আমি যা দরকার তুলে নিচ্ছি, বাকি তুই ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে যা।” তিনি দুটি প্লেটে খান-চার করিয়া লুচি ও একহাতা করিয়া মাংস তুলিয়া লইলেন। মিষ্টি নিজের জন্য কিছুই লইলেন না, মমতার প্লেটে একটা সন্দেশ আর একটা পান্তুয়া তুলিয়া দিলেন। নিত্য আবার খাবার-বোঝাই ট্রে খানা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মমতা মুখ হাত ধুইয়া চুল আঁচড়াইয়া আসিয়া মায়ের সামনের চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল। বলিল, “মা, রাত্রেও কিছু খেলে না, এখনও কিছু খাচ্ছ না যে? বা রে, আমার পাসের খাওয়া তুমি কিছুই খাবে না নাকি?”

যামিনী বলিলেন, “এক গাদা বাসি জিনিষ খেলে অসুখ করবে যে গরমের দিনে? তবু রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল ব'লে মাংসটা এখনও খাওয়া যাচ্ছে, না হ'লে ত তাও যেত না। এখন খোকা না গণ্ডেপিণ্ডে গেলে তাহলেই হয়।”

মমতা খাইতে খাইতে বলিল, “খোকার আবার বাসি খাবার যা পছন্দ, ঠিক বাবার মত। কাকাও বাসি মাংসটাংস খুব ভালবাসেন, না মা?”

যামিনী বলিলেন, “তা ত ঠিক জানি না মা, হ'তে পারে।”

মমতা বলিল, “অনেক ত খাবার বেঁচেছে, ওঁদের কিছু পাঠিয়ে দাও না মা? মামাবাড়িতেও ত দিতে পার? লুসি আর বেটু খুব খুশী হবে।”

যামিনী বলিলেন, “মামার বাড়িতে ত দিতেই পারি। তবে তোমার কাকীমা আবার যা গোঁড়া হিন্দু এসব খাবেন কিনা কে জানে? মিষ্টি খানিকটা পাঠিয়ে দেব।”

তিনি রেবতীকে দিয়া বিন্দুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, “দেখ ঠাকুরঝি, মিহিরদের ওখানে কিছু লুচি মাংস আর মিষ্টি পাঠিয়ে দাও, আর ঠাকুরপোদের ওখানে মিষ্টি খানিকটা পাঠিয়ে দাও। হরি-ঠাকুরকে ব'লো ঠাকুরপোর ওখানে যেতে, নইলে আবার ছোঁয়া-ছুঁই নিয়ে গোলমাল বেধে যাবে।”

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই দেব কি ?"

যামিনী বলিলেন, "হাঁ, এখনই দাও, তাহলে সকালে খেতে পারবে, না হ'লে মাংসটা হয়ত খারাপ হয়ে যাবে।"

যামিনী আর মমতার খাওয়া শেষ হইতে বেশী ক্ষণ লাগিল না। মমতা টেবিল ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "বাবা বোধ হয় আজ বারোটার আগে উঠবেনই না। কাল কত রাত্রে তিনি শুয়েছিলেন মা ?"

যামিনী বলিলেন, "কি জানি মা ঠিক বলতে পারি না। বারোটা একটার আগে নয় নিশ্চয়ই।" স্বামীর বন্ধুর দলকে তিনি চিনিতেন, রাত্রি তিন প্রহর অতীত না হইলে তাঁহাদের উৎসব কখনও সাঙ্গ হয় না। কিন্তু ছেলেমেয়ের সামনে সে-সব কথা তিনি সহজে আলোচনা করেন না।

সুজিতও বোধ হয় বারোটা পর্য্যন্তই ঘুমাইত, কিন্তু মায়ের তাড়ায় তাহাকে সাড়ে নয়টার সময়ই উঠিয়া বসিতে হইল। স্নান না করিয়াই খাইতে বসিবার তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মা তাহাও করিতে দিলেন না। কাজেই সুজিতের দিনটা বিশেষ ভাল ভাবে আরম্ভ হইল না। তবে সুরেশ্বর উঠিলেন বেলা বারোটায় এবং স্নান করিয়া অল্প কিছু খাইয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন, তাঁহার শরীর ভাল নাই, এবং তিনি কোথাও বাহির হইবেন না। সুজিত বাবার গাড়ীখানা লইয়া কাকার বাড়ি বেড়াইতে চলিল, মাকে জানাইয়া গেল যে সন্ধ্যার আগে সে বাড়ি ফিরিবে না।

মমতারও আজ বড় আলস্যে ধরিয়াছিল, ভাত খাওয়ার পর একটু গড়াইয়া লইবার ইচ্ছায় শুইবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল। যামিনীর দিবানিদ্রা অভ্যাস ছিল না, দিনে ঘুমাইলে তাঁহার শরীর বড় অসুস্থ বোধ হইত।

খাওয়া-দাওয়ার পর খানিক ক্ষণ তিনি কতকগুলি নূতন বাংলা মাসিকপত্র নাড়াচাড়া করিয়া সময় কাটাইয়া দিলেন। তাহার পর সেলাই করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন লাগিল না। ছেলে বাহির হইয়া গিয়াছে, মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বামী বাড়ি আছেন বটে, কিন্তু সুরেশ্বরের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর সম্পর্ক ক্রমেই যেন কমিয়া আসিতেছে। এক জন না ডাকিলে আর এক জন বড় কাছে ঘেঁষেন না। ডাকটা বেশীর ভাগ সুরেশ্বরের দিক হইতেই আসে, কারণ পত্নীকে বাদ দিয়া এখনও তাঁহার দিন চলে না। যামিনীর জীবনে হয়ত স্বামীর কোনই প্রয়োজন নাই, অন্ততঃ তাঁহার বাহিরের ব্যবহারে তাহাই মনে হয়। আজ এখন পর্য্যন্ত সুরেশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। বাবুর খাস ভৃত্য নিতাই তাঁহাকে খবর দিয়া গিয়াছে যে বাবুর শরীর ভাল নাই, তিনি নীচে যাইবেন না, স্নান করিয়া উপরেই মাছের ঝোল ভাত খাইবেন। একবার খোঁজ নেওয়া দরকার কিনা, যামিনী তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সুরেশ্বর যদি খাইয়া-দাইয়া ঘুমাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনর্থক তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া লাভ নাই। বিনা প্রয়োজনেও যে-মনের টানে দুটি মানুষ সারাক্ষণ পরস্পরকে কাছে চায়, সে মনের টান এই দুটি মানুষের ভিতর নাই। সুরেশ্বরের অবশ্য নিজের দরকার হইলেই আসেন বা যামিনীকে ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু যামিনী সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে যাইবার আগে চুল চিরিয়া বিচার করিতে বসেন, তাঁহার যাইবার প্রয়োজন পুরাপুরি আছে কিনা।

কিছু ক্ষণ ভাবিয়া তিনি অবশেষে উঠিয়া পড়িলেন। গরমে পায়ের তলা জ্বালা করিতেছিল, চটিজোড়া ছাড়িয়া রাখিয়া খালি পায়েই স্বামীর ঘরের দিকে চলিলেন। ঘরের দরজা ভেজান, তবে ভিতর হইতে খিল বন্ধ নাই। পাখা চলার শব্দ বাহির হইতে শোনা যাইতেছে। গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইবামাত্র সুরেশ্বর চব্বিশটা ঘণ্টাই প্রায় পাখার তলায় কাটাইতে আরম্ভ করেন। মমতা বলে, "বাবা পারলে হাঁটা-চলার সময়ও একটা পাখা মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখেন।"

সুরেশ্বর বলেন, "বিজ্ঞানের আর একটু উন্নতি হোক, তখন এ দুঃখটাও আমার যাবে।"

যামিনী দরজাটা আস্তে আস্তে ঠেলিয়া একটু ফাঁক করিয়া দেখিলেন। সুরেশ্বর শুইয়া আছেন, তবে তাঁহার পিঠ দরজার দিকে, ঘুমাইতেছেন কিনা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যামিনী ধীর পদক্ষেপে খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুরেশ্বর ঘুমাইয়াই আছেন।

একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া যামিনী ঘরখানার চারি কোণে চোখ বুলাইয়া লইলেন। রোজ এখানে তিনি আসেন না, কাজেই চাকরবাকরা ফাঁকি দিবার বেশ সুবিধাই পায়। নানা স্থানে ঝুল জমিয়া আছে, কেহ তাহা ঝাড়ে নাই, জানালার ও দরজার পর্দাগুলিও বেশ হপ্তা কয়েক ধোপার মুখ দেখে নাই বোধ হয়। সুরেশ্বর নিজের পরিবার কাপড়টি ঠিক-মত কোঁচান হইলেই এবং খাওয়াটি মুখরোচক হইলেই সন্তুষ্ট, ঘরের পরিচ্ছন্নতা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান না। নিতাইকে ডাকিয়া ধমক দিতে হইবে। যামিনী যেমন নীরবে আসিয়াছিলেন, তেমনই নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

জাগরণী

শ্রীগোপাললাল দে, বি-এ

শীতের সে এক নিথর উদাস বেলা,
বহিল প্রথম কোন্ দখিনের হাওয়া,
শিথিল পাতারা জাগিল মর্ম্মরিয়া,
পলাশ চাহিল রক্তরঙীন চাওয়া,
অশোক হাসিল, কাননের কাঞ্চন
সোঁদালি তুলিল শাখায় আনত করি,
কবিকুঞ্জের কূটজ উঠিল ফুটি,
ধূলার পুলকে বকুল রহিল মরি,
এমন কালেতে কোকিল ডাকিল শাখে
আকাশে বাতাসে কি হ'ল কেহ না জানে,
সারাদেহ বাহি উষ্ণ শোণিত স্রোতে,
ছুটিয়া চলিল বক্ষসাগর পানে।
সহসা সে এক অভিনব আঁখি দিয়া,
হেরিনু ধরায় চলে লুকোচুরি খেলা,
মনের মানুষে খুঁজে ফিরে দরদিয়া,
গোপনে স্বপনে ধেয়ানে কাটায় বেলা,
তারকা-বিরল গোধূলি-আকাশখানি,
কখন উঠেছে দেখি ত্রয়োদশী-চাঁদ,
আকাশে সে থাকে তবু খুঁজে বারে বারে,
সরসীর কোণে ছুটি কার আঁখি-ফাঁদ,
অরুণ তখনও আসে নি উদয়াচলে,
কুমুদী-বন্ধু দাঁড়ায়ে পিছন টানে,
ত্বরা নাহি সহে ফুটি উঠে কমলিনী
আঁখি ছুটি রাখি উদয়াচলের পানে।
মাটির মানুষ, প্রতি নিশিদিন হেরি,
আকাশে বসুধা মিলেছে দিশার পারে,
গোধূলি উষায় গোপন মিলন খানি,
শব্দবিহীন পরিরম্ভন-ভারে;
পথের দু-ধারে বনতুলসীর ঝোপে,
ভ্রমর ভুলেছে কুসুমের মধুবাসে,
ঘুঘু-দম্পতি কপোত-মিথুন হেরি,
মজেছে কখন কি গোপন আশ্বাসে!
মেহেদি-বেড়ায় নিরালা পথের বাঁকে,
কক্ষে ধরিয়া পূর্ণ কলসখানি,
চাহিল তরুণী অপাঙ্গে কার চোখে
আমি তার আজ অর্থ কতক জানি।
মোরও মনে হ'ল তরুণ জীবন ভরি,
আমিও যেমন খুঁজিতে এসেছি কারে,
কাহার কেশের সৌরভ লভিয়াছি
অঞ্চল কার উড়িছে বনান্তরে।
পল্লীপথের সহজ শ্যামলতায়,
খুঁজেছি নদীর কাঁকন-কণিত ঘাটে,
পথে পথে তার পদপাত খুঁজিয়াছি,
ধূলায় ধূসর চরণাঙ্কিত বাটে;
চমকি চেয়েছি, শুনি কার রিণিঝিণি
ছল ছল করে গাগরীর মুখে জল?
নীল নবঘন সজল বসনতলে
অপূর্ণ হিয়া করিতেছে টলমল!
ছন্দে চলে সে অনুরাগী পদ-ঘাতে
ধূসর ধরার ধূলিরে সরস করি,
হৃদয়ে আমার দোলা লাগে আঁখিপাতে,
নয়নকুম্ভ ঘন ঘন উঠে ভরি।

আলোচনা

বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্র

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী

গত ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীসনৎকুমার সিংহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলাভাষা' ও বাংলা সাহিত্যের' প্রশ্ন করিতে হইলে, ইংরেজী ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়া তাহা বাংলা ভাষায় হওয়া উচিত, এই প্রশ্ন তুলিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "এমন বহু ছাত্র আছেন, যাঁহারা ইংরেজীতে দেওয়া প্রশ্ন অপেক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া প্রশ্নকে উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুচিন্তিত উত্তর প্রদান করিতে পারেন। ইংরেজী ভাষায় প্যাঁচ দেওয়া কঠিন শব্দে বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করিয়া এই সকল ছাত্রদের উপর কিরূপ অবিচার করা হয়, প্রশ্নকর্তারা বোধ হয় তাহা খেয়াল করেন না।" "বঙ্গভাষার এত বড় দৈন্য ঘটে নাই, যাহাতে প্রশ্নপত্র করিবার সময় শব্দের বা ভাবের অনটন পড়ে" এবং এ বিষয়ে ভাইস-চ্যান্সেলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে দেখা যায়, শ্রীবিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, মূল প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য বোধ হয় ঠিক ধরিতে না পারিয়া, উহার প্রতিবাদকল্পে যুক্তি দেখাইয়াছেন যে "ইংরেজী রাজভাষা, বর্ত্তমান কালের ভারতবর্ষের lingua franca. বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রশ্নই ইংরেজীতে হওয়া ঠিক বলিয়া মনে হয়।" ইহা কতদূর বিচারসহ সুধীগণ বিচার করিবেন।

সিংহ-মহাশয় 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের' প্রশ্নপত্র সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন। ইংরেজী ভাষার অনাদর ও অবহেলা করিতেছি না, কিন্তু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' প্রশ্নপত্র বঙ্গভাষাতেই হওয়া শোভন ও সঙ্গত নহে কি? এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী, তামিল, তেলুগু, উর্দ্দু ও অন্যান্য ভাষার সহিত অধীত হয়। এই সব পাঠ্যপুস্তক বাংলা প্রভৃতি নানা ভাষাতেই লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে। ইংরেজী, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ইংরেজীতে হইয়া থাকে, কারণ তাহা সকল ছাত্রেরই পাঠ্য, কিন্তু (ধরুন ম্যাট্রিক পরীক্ষায়) বাংলা, ইতিহাস, স্বাস্থ্যতত্ত্বের পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় লিখিত ও পঠিত হয়, এবং উত্তরও বাংলা ভাষায় লেখা চলে, এক্ষেত্রে শেষ দুইটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র বাংলা ভাষায় লিখিত হইলে, ইংরেজীতে দেওয়া প্রশ্ন অপেক্ষা ছাত্রগণের মাতৃভাষায় দেওয়া প্রশ্নকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুচিন্তিত উত্তর লিখিতে সহজ হয়। কিন্তু বহুতর ছাত্র এই দুই বিষয়ে ইংরেজীতেও উত্তর লিখিয়া থাকেন, সেক্ষেত্রে ইংরেজীতে প্রশ্নপত্র ছাপা হইলে পৃথক প্রশ্নপত্র করিতে হয় না, সেই দিক দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সুবিধা হয়, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নপত্রে বাংলাভাষাভাষী ভিন্ন অপর কেহ (উর্দ্দু, হিন্দী, আসামী, তামিল, তেলুগু প্রভৃতির পাঠ্য যাঁহারা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন) সংশ্লিষ্ট নয়, কাজেই বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্র বাংলাতে হওয়া সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। তবে যদি কেহ মনে করেন ভারতবর্ষের lingua franca অনুসরণ করা উচিত (ইংরেজী রাজভাষা হইলেও, যে দেশে শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর সেখানে lingua franca বলা যায় কি-না সন্দেহ, বরং হিন্দী সে স্থান অধিকার করে) অথবা মাতৃভাষায় প্রশ্ন অপেক্ষা ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রশ্ন সহজেই বোধগম্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, যে, বাঙালী জাতির cultural conquest দ্বারা বড়ই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষাকে সম্মানের আসন দিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী এমন কি জাপান প্রভৃতি স্বাধীন দেশে তাহাদের নিজের ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় সে-দেশের কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র লিখিত হয় না।

ভদ্র-লোক

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

বাঙ্গালার এক শ্রেণীর লোকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কাযুক্ত হইয়া 'প্রবাসী' পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। এই শ্রেণীকে স্বতন্ত্র উল্লেখ করিতে হইলে অবশ্য একটা স্বতন্ত্র নাম দিতে হয়। সুতরাং সংজ্ঞা শব্দরূপে রূঢ় অর্থে "ভদ্রলোক" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। শ্রদ্ধাভাজন 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সহ এই কথাটি নির্দ্দেশ করিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। গত সনের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসীতে' শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস মহাশয় (৭০২ পৃ.) এবং বর্ত্তমান সনের বৈশাখ মাসের 'প্রবাসীতে' শ্রীযুক্ত কাজী সেরাজুল হক সাহেব (৭২ পৃ.) আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই সকল প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

১। কাজী সেরাজুল হক সাহেবের আপত্তি "ভদ্রলোক" নামটি লইয়া। সুতরাং তাঁহার উত্তর প্রথমে দিব। তিনি লিখিয়াছেন, "চন্দ-মহাশয়ের মতে একমাত্র মুসলমান এবং অনাচরণীয় হিন্দুগণ ভদ্রলোক-বাচ্য নহেন"। রূঢ় অর্থে "ভদ্রলোক" শব্দ সরকারী কাগজ-পত্রে কিরূপে ব্যবহার হয় তাহা প্রবীণ 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়াছেন এবং "ভদ্রলোক" শব্দের যৌগিক অর্থ কি স্বয়ং কাজী সেরাজুল হক সাহেব লিখিয়াছেন; অবশ্যই আমার একটি অপরাধ হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী সম্বন্ধে "ভদ্রলোক" শব্দের আরবী প্রতিশব্দ রূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবী "শরিফ" শব্দের অর্থ ভদ্র; এই শব্দের বহুবচন "আশ্‌রাফ"। বাঙ্গালা "ভদ্রলোক" শব্দের মত আরবী "আশ্‌রাফ" শব্দটি রূঢ় অর্থে এক শ্রেণীর মুসলমানকে বুঝায়; এবং এই শ্রেণীর বহির্ভূত মুসলমানগণকে বলে "আত্‌রাফ" ("তরফ" শব্দের বহুবচন)। যখন কলিকাতা মাদ্রাসা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নিয়ম ছিল, "আশ্‌রাফ" শ্রেণীর ছাত্র ভিন্ন সেখানে কেহ পড়িতে পারিবে না। অনেক দিন হইল সেই নিয়ম রদ হইয়া গিয়াছে। সরকারী কাগজপত্রে এখন "আশ্‌রাফ" এবং "আতরাফ" ভেদ স্বীকৃত হয় না। এমত অবস্থায় কোন লেখক যদি মুসলমান সমাজকে "আশ্‌রাফ" এবং "আত্‌রাফ" এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়া উভয় শ্রেণীর জন্য পৃথক কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিতে যান তবে বোধ হয় তাহা কেহ পছন্দ করিবেন না। এই জন্যই আমি এই বিভাগের কথা উত্থাপন করি নাই। মুসলমান সম্প্রদায়ের মত সকল হিন্দু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এক পথের পথিক নহেন। বিভিন্ন পন্থী হিন্দুগণকে বিভিন্ন নামে নির্দ্দেশ না করিয়া উপায় নাই। "ভদ্রলোক" ছাড়া অন্য কোন নাম উদ্ভাবিত হইলে তাহা সানন্দে ব্যবহার করিব।

২। গত সনের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে (৭০৩ পৃ.) প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় আমার লেখার সারকথা ঠিকই ধরিয়াছেন এবং আমার অনুপস্থিতিকালে তাহা প্রকাশ করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মানুষের ভাগ্যচক্র অর্থের দ্বারা নিয়মিত। ঊনবিংশ শতাব্দে অনেক মহাপুরুষ মেয়েদের যৌবন-বিবাহ, উচ্চশিক্ষা, এবং স্বাধীনতা প্রবর্ত্তনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল লাভ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান শতাব্দে ইউরোপের মহাযুদ্ধের পরে আর্থিক অবস্থার বিপর্য্যয়ের ফলে, সেই সকল পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়াছে। যৌবন-বিবাহ দূরে থাকুক, অনেক মেয়ের এখন বিবাহই অসম্ভব হইয়াছে। আমার জানা-শুনা মেয়ের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের বিবাহ হইবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং ভবিষ্যতে যাহাতে অবিবাহিতা মেয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে এমন শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যুবকদিগকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া কঠিন; মেয়েদিগকে প্রকৃত স্বাধীনা হইতে শিক্ষা দেওয়া যে কত কঠিন তাহা বলাই বাহুল্য। আর্থিক অবস্থার বিপর্য্যয়ের ফলে যে-সকল জাতির মেয়েদের এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, সেই সকল জাতির লোকের এখন অনন্যকর্ম্মা হইয়া মেয়েদিগকে স্বাধীন জীবন যাপনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। যত দ্রুত সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তত দ্রুত তদুপযোগী শিক্ষাবিধানের চেষ্টা দেখা যায় না।

শতকরা ৫০ জন মেয়ের যদি বিবাহ না হয়, তবে কালে তদনুপাতে অনেক বংশ লোপ পাইবে। এই বংশগুলি রক্ষার জন্য চেষ্টা করা, অর্থাৎ যুবকদিগের বেকার-সমস্যার সমাধান করিবার জন্য আরও উঠিয়া-পড়িয়া লাগা উচিত। সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রবিধি-সংস্কার সমস্তই শেষকালে আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালী এক সময় রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে নেতৃত্ব করিয়াছে। এখন সেই নেতৃত্ব নাই কেন? এখন সেই নেতৃত্ব কোন্ প্রদেশের লোকের হাতে গিয়াছে? যাহাদের হাতে পয়সা বেশী তাহাদের হাতে গিয়াছে। বাঙ্গালার হাট-বাজার, দোকানপসার প্রায় সবই অবাঙ্গালীর হাতে। দেশের সম্পদের (natural resources) এখনও যাহা পরহস্তগত হয় নাই তাহা যদি বাঙ্গালীরা হাতে না রাখিতে পারে তবে প্রাদেশিক স্বরাজের কোন মূল্য থাকিবে না। এদেশের যে-শ্রেণীর লোকেরা এত কাল রাষ্ট্রবিধির সংস্কারের জন্য এত পরিশ্রম, এত ত্যাগস্বীকার করিয়াছে তাহারা যে বর্ত্তমানে কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা হিসাব করিলে কেহই তাহাদিগকে আত্মরক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিবেন না। আত্মরক্ষা করিতে হইলে এখন সকল চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের দিকে।

হিন্দু সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আমার মত সামাজিক ইতিহাস অনুযায়ী। ইতিহাসের ধারার পরিবর্ত্তন সহজ নহে এবং তাহার জন্য শক্তির ব্যয় অনেক সময় অপব্যয়। ঊনবিংশ শতাব্দে হিন্দুসমাজ-সংস্কারের অন্তরায় ছিল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিশ্বাস। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তখন কুলগুরু, কুলপুরোহিতের এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শাসনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান শতাব্দে শহরে কুলগুরু প্রভৃতির প্রভাব লুপ্ত হইয়াছে। ইঁহাদের স্থান অধিকার করিতেছেন, ঈশ্বরকল্প সাধু-সন্ন্যাসী গুরু। গৌতম বুদ্ধের এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মত এই সকল সাধুরা বর্ণাশ্রমকে বিশেষ গ্রাহ্য করেন না। সুতরাং ইঁহাদের প্রভাবে বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস ক্ষীণ হইতেছে। পৌর সভ্যতার (urban civilizationএর) এবং সকল শ্রেণীর আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস লুপ্ত হইবে এবং হিন্দু সমাজের আকার বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীগণের প্রচারিত ধর্ম্ম (mysticism) যুক্তিনিষ্ঠার (rationalism) বিরোধী। এই ধর্ম্ম পারত্রিক মুক্তির সহায়তা করিতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার যুগে ঐহিক মুক্তির সহায়তা করিবে কিনা সন্দেহ। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুবাদের এক পত্তন পরীক্ষা (experiment) হইয়া গিয়াছে! গুরুমুখী বৃত্তি পুনরায় গুরুই অনুসন্ধান করিবে।

নৃপতি-নির্ব্বাচন

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

বর্ত্তমান সনের বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে (৬৯ পৃ.) শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক অপ্রকাশিত ("অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে") পুস্তকের ভূমিকা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"অতএব দেখা যাইতেছে, চন্দ-মহাশয়ের উল্লিখিত কেবল মাত্র দুই জন নহে অনেক মহাজনই জনসাধারণের দ্বারা আহূত এবং নির্ব্বাচিত হইয়া রাজত্ব পাইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বৃহৎ বঙ্গের লোক। এ-বিষয়ে চন্দ-মহাশয়ের অভিমত জানিতে চাহি।"

যদিও মনোজ বাবু আমার অভিমত জানিতে চাহিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, তিনি যে উপকরণ দিয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন অভিমত দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। উদ্ধৃত বচনে ডাক্তার সেন মহাশয় প্রজাদের নিহত বা নির্ব্বাচিত অনেক রাজার নাম করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। প্রমাণ নিশ্চয়ই নিবদ্ধ হইয়াছে মূল গ্রন্থে। সেই সকল প্রমাণ না-দেখা পর্য্যন্ত অভিমত দেওয়া অসম্ভব। ত্রিপুরার রাজা কল্যাণের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এই ভূমিকাতেই ডাক্তার সেন মহাশয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রমাণ কয়েকটি পয়ার। এই সকল পয়ারে কথিত হইয়াছে, রাজা যশোমাণিক্যের রাজবংশীয় কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।

"সেনাপতি মন্ত্রিগণ চিন্তিয়া তখন।

* * *

এ সব চিন্তিয়া সেনা পাত্র মিত্রগণ।
কল্যাণ নাম সেনাপতি বসে সিংহাসন॥

এই পংক্তি কয়টি উদ্ধৃত করিয়া ডাক্তার সেন লিখিয়াছেন, "এই ব্যক্তিও পাল-বংশীয় গোপালের ন্যায়ই......প্রজাদের কর্ত্তৃক রাজপদে অধিষ্ঠিত (?) হইয়াছিলেন।" "সেনাপতি মন্ত্রিগণ" এবং সেনা পাত্র মিত্রগণ" কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন কোন প্রকারেই প্রজাদের কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন বলা যাইতে পারে না। উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাব হইলেই হিন্দুরাজ-দরবারে সেনাপতি মন্ত্রী পাত্রমিত্রগণের এবং মুসলমান রাজদরবারে আমীর-ওমরাহগণের রাজা নির্ব্বাচন করিতে হইত। এই প্রকার নির্ব্বাচন "প্রকৃতিভিঃ" প্রজাপুঞ্জ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন নয়। দিব্য নির্ব্বাচনের ইঙ্গিতও কোন শিলালিপিতে বা তাম্রশাসনে পাওয়া যায় না, সন্ধ্যাকর-নন্দীর 'রামচরিতে' পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর দিব্যর ঠিক সমসময়ের লোক না হইলেও নিকটবর্ত্তী সময়ের লোক; সমসময়ের লোকের মুখে দিব্যর কাহিনী শুনিবার তাঁহার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং দিব্যর পক্ষপাতের কোন কারণ ছিল না। ত্রিপুরার "রাজমালা"র এবং আসামের "বুরঞ্জি"তে যদি ঘটনার নিকটবর্ত্তী লোকের লিখিত নিরপেক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় তবে ইতিহাসের উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে।

"উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য"

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

গত বৈশাখ মাসে প্রকাশিত শ্রীকুমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের "উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য" নামে সারগর্ভ প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সন্ন্যাস লইবার পর মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রার সত্যতায় তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ গৌড়দেশ ও উড়িষ্যায় তখন যুদ্ধ চলিতেছিল ও সেই অবস্থায় শচীদেবী নীলাচল যাইতে অনুমতি দিবেন বোধ হয় না। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ উড়িষ্যা-গমনের প্রসঙ্গ হুবহু 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক হইতে টুকিয়াছেন। কবিকর্ণপুর উড়িষ্যায় ছিলেন ও প্রতাপরুদ্রকে শোনাইবার জন্য নাটক রচনা করিয়াছিলেন। প্রভুর সঙ্গে প্রথমবার না আসিলেও কবির পিতা শিবানন্দ সেনই নীলাচল-যাত্রীদের পাণ্ডা ছিলেন ("শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান"—মধ্য. ষোড়শ পরিচ্ছেদ), সুতরাং কবিকর্ণপুরের বর্ণনা সত্য বলিয়া মানা যাইতে পারে। সেন-মহাশয়ের মত নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে রত্নাকর প্রশ্ন করিতেছেন, "ইদানীং গৌড়াধিপতি যবন রাজের সহিত প্রতাপরুদ্রের বিরোধ থাকায় কাহারও গমনাগমন হয় না, তবে কিরূপে চারিটি পরিজনের সহিত ভগবান গমন করিলেন?" প্রশ্নের উত্তরও গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

শচীদেবীর পক্ষে, পুত্রের নির্বিঘ্নে ধর্মসাধনার জন্য হিন্দুরাজ্যে গিয়া বাস করিতে বলাই স্বাভাবিক মনে হয়: তার কিছু দিন পূর্ব্বেই অদ্বৈতাচার্য্যের গুরু মাধবেন্দ্র পুরী, শচীদেবীর পিতার সতীর্থ-পুত্র সপরিবারে নবদ্বীপ ছাড়িয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, (জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল) ও চৈতন্যদেবের সহিত পূর্ব্বপরিচিত গোপীনাথাচার্য্য পুরীতে গিয়াছিলেন।

সেন-মহাশয় 'শূন্যসংহিতা' হইতে জগন্নাথ বলরাম ইত্যাদি "পঞ্চ সখা" বৈষ্ণবদের নাম দিয়াছেন; ও "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" সংজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক তাঁরা কতকগুলি বৌদ্ধ মত পোষণ করিতেন। উড়িষ্যায় সুপরিচিত "প্রাচী" গ্রন্থমালার অধ্যাপক শ্রীআর্ত্তবল্লভ মহান্তী মহাশয়ও তাঁদের "বৌদ্ধ-বৈষ্ণব" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

'জগন্নাথ চরিতামৃতে' গৌড়ীয় ও 'উৎকলীয় বৈষ্ণবদের দলাদলির যে কাহিনীটি আছে, তাহাতে আংশিক সত্য নিহিত থাকিতে পারে। কিন্তু দিবাকর দাসকে সবটা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, "এ ন জানন্তি প্রেমতত্ত্ব।" বৃন্দাবনে গিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আস্ফালন, সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত বুঝা যায়।

সেন-মহাশয়ের মতে শুধু দেবকীনন্দন দাস জগন্নাথ ও বলরাম দাসের নাম করিয়াছেন। কিন্তু "বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনি" গ্রন্থে পাই, "উৎকলে জন্মিলা উড়া বলরাম দাস জগন্নাথ দাস আর তথাই প্রকাশ।" ভবিষ্যতে কুমুদবাবুর কাছে আরও অনেক কিছু জানিতে ও শিখিতে ইচ্ছা রহিল।

ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী ও বাঙালী প্রতিষ্ঠান

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

বেসিন নিম্ন-ব্রহ্মদেশের একটি বড় শহর। ব্রহ্মদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর বলিয়া বাণিজ্য-জগতে ইহার নামও বিশেষ পরিচিত। রেঙ্গুন হইতে ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর ষ্টীমারে চড়িয়া আসিবার পথে দুই তীরে ধানক্ষেত এবং গ্রামের দৃশ্য অতি মনোরম। রেঙ্গুন হইতে রেলপথেও আসা যায়। থারাওয়া (Tharrawa Shore) নামক স্থানে নদীর তীরে আসিয়া ট্রেন থামে, সেখানে একটি ফেরি ষ্টীমার যাত্রীদিগকে পার করিয়া হেনজাডা (Henzada Shore) নামক স্থানে নামাইয়া দেয়। সেখানে ট্রেন অপেক্ষা করে, সেই ট্রেনে বেসিন পৌঁছান যায়। মালপত্র লইয়া নামাওঠা ক্লেশকর বলিয়া অনেকে জলপথে যাতায়াতই সুবিধা মনে করে। রেঙ্গুন হইতে বেসিন জলপথে প্রায় আঠার ঘণ্টা এবং স্থলপথে প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টার রাস্তা।

শহরটির এক প্রান্ত দিয়া নদী (Bassein River) বহিয়া চলিয়াছে। নদীর দুই তীরেই বসতি আছে। এক পারে বড় বড় চালের কল, ছোট ছোট বস্তী, আর এক পারে শহর। চালের ব্যবসাই এখানকার প্রধান বাণিজ্য—বিদেশী বড় বড় মালের জাহাজ প্রায়ই আসিতে দেখা যায়। ইউরোপীয়, চীনদেশীয় এবং ব্রহ্মদেশীয় বড় বড় চালের কলের মালিকদের নামের সঙ্গে চট্টগ্রামবাসী এক জন ধনী বাঙালীর নামও বাণিজ্য-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মালাকর মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে এদেশে আসেন। সামান্য মূলধনে ছোটখাট ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়া

সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী

সম্রাট, প্রিন্সেস্ মেরী, লর্ড লাসেলস, সম্রাজ্ঞী আলেকজাণ্ড্রা, সম্রাজ্ঞী মেরী
প্রিন্সেস মেরীর বিবাহোৎসবে বাকিংহামরাজপ্রাসাদ
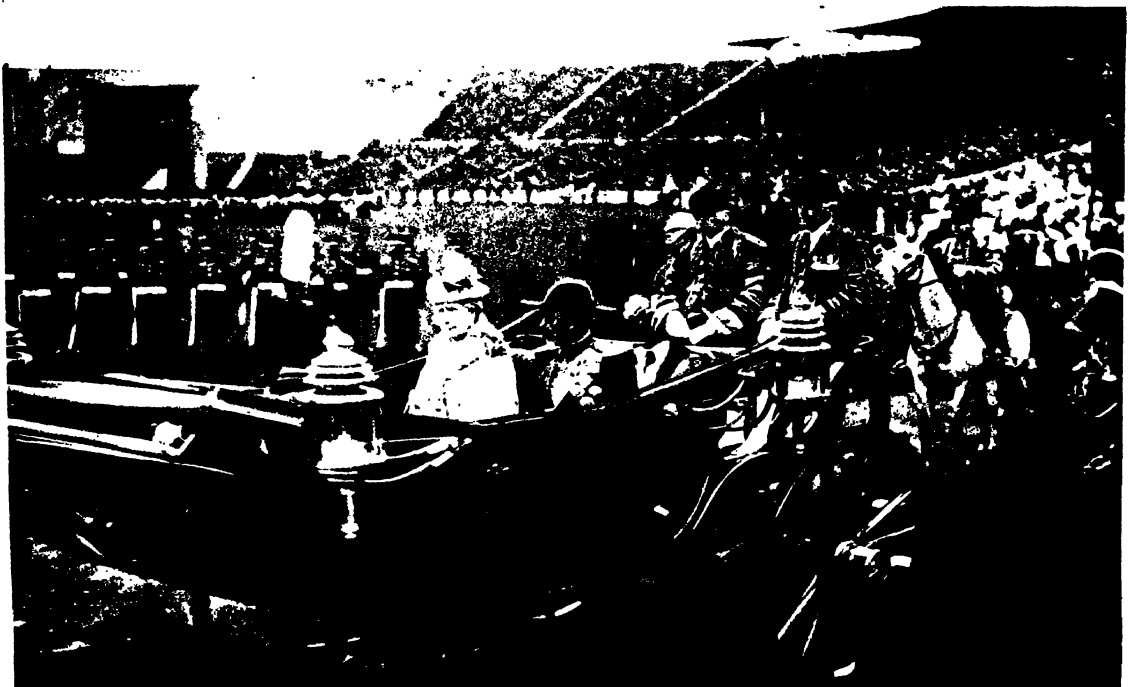
ওয়েম্বলী প্রদর্শনীর পথে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী

ক্সা চেষ্টার কাসেল্

প্রিন্সেস্ এলিজাবেথ, ইয়র্কের ডিউক ও ডচেস্ এবং মিঃ সি চাপেল স্মিথ
রিচমণ্ড 'রয়েল হর্স' শো' অভিমুখে

কেণ্টের ডিউক ও প্রিন্সেস মেরিনার বিবাহ

সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর পুত্রকন্যাগণ
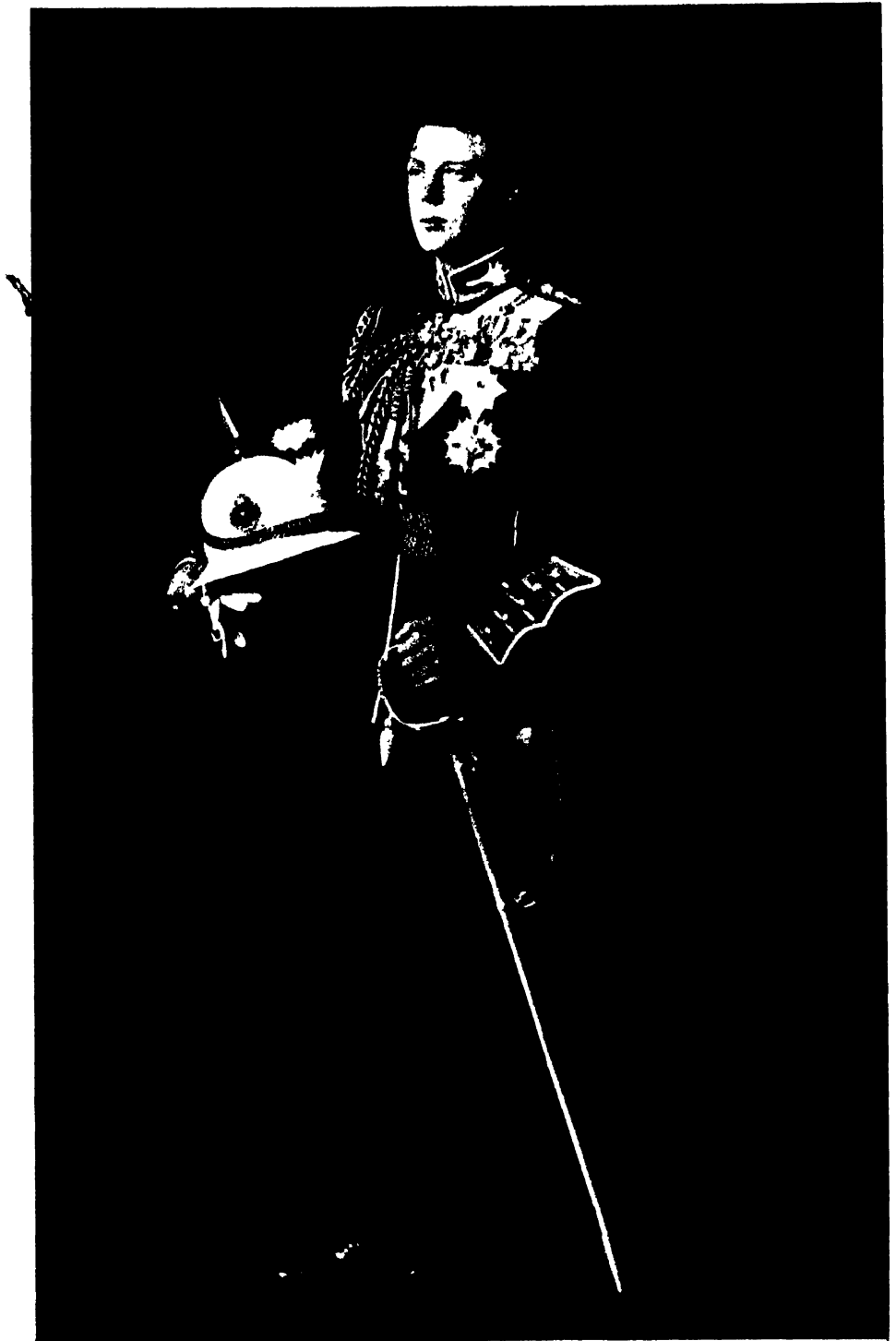
প্রিন্স অব ওয়েলস

(চিত্রগুলির দুইখানি ডব্লিউ এণ্ড ডি ডাউনি ও অন্যগুলি স্পোর্ট এণ্ড জেনেরল কোম্পানী কর্ত্তৃক গৃহীত।)

বেসিনের ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী-মহিলাদের প্রতিষ্ঠান—'বঙ্গলক্ষ্মী সমিতি'র সদস্যবৃন্দ

আজ লাখপতি হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চালের কলে এত ভাল ছাঁটাই কাজ হয় যে, (বি আই এস এন্ কোম্পানীর কর্ম্মচারী-বিশেষের নিকট শুনিয়াছি), বিদেশের জাহাজ যখন চাল লইতে এদেশে আসে তখন অর্ডারের মধ্যে মালাকরের কলের ছাঁটা চালের বিশেষ করিয়া উল্লেখ থাকে।

মালাকর মহাশয় লেখাপড়া অতি সামান্যই শিখিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যবসায় এবং চরিত্রের সততাগুণে এতখানি উন্নতিলাভ করিয়া দেশের গৌরবস্থল হইয়াছেন। গত বৎসর ব্রহ্মদেশের সরকার বাহাদুর তাঁহাকে স্থানীয় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। দরিদ্র অবস্থা হইতে এত বড় ধনী হইয়া, এত সম্মান লাভ করিয়াও তাঁহার সাদাসিদে জীবনযাত্রা একই ভাবে চলিয়াছে। বিলাস-আড়ম্বরহীন চাল-চলন, অমায়িক, সুমিষ্ট ব্যবহার দ্বারা তিনি সকল জাতীয় লোকের নিকট আদরণীয় হইয়াছেন।

পরলোকগত ডাক্তার রঘুনাথ সিংহ মহাশয় ১৯০০ সালে এ শহরে জেলের ডাক্তার হইয়া আসেন। ক্রমশঃ সরকারী কার্য্য করিতে ইস্তফা দিয়া স্বাধীন ভাবে ডাক্তারী ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনিও স্থানীয় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "বেসিন ফারমেসি" এখনও চলিতেছে। তাঁহার কতকগুলি পেটেণ্ট ঔষধের নাম এদেশে খুব পরিচিত।

পরলোকগত ব্যারিষ্টার রমাপ্রসাদ সেন মহাশয় ১৯০১ সালে এখানে আসেন। তখনকার দিনে তিনি আইন-ব্যবসায়ে খুব খ্যাতি ও অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। বাঙালীদের সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকিতেন। বাঙালী ও অবাঙালী সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

শ্রদ্ধেয় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত কেশবলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আনুমানিক ১৯০৭ সালে এখানে আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এক ভাগ্নীকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি বাঙালী সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধেয়। এখনও বাঙালীদের সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ রাখিয়া উৎসাহ দান করেন। তিনি কিছুদিন বেসিন বার-লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন।

পরলোকগত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় এক জন খ্যাতনামা আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন। এক সময়ে ধনে মানে খ্যাতিতে তিনি বাঙালীদের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করিয়া-

ছিলেন। তিনি উপর্য্যুপরি চার-পাঁচ বার স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং শহরের উন্নতিকল্পে আপন শক্তি ও অর্থ অকুণ্ঠিত-চিত্তে দান করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া বরফের একটি বিশাল কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই কারখানায় এত বরফ প্রস্তুত হইতে পারিত, যাহা সমস্ত নিম্ন-ব্রহ্মদেশের প্রয়োজন মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত হইত। চাহিদার তুলনায় উৎপত্তি বেশী হইলে যে ফল হয়, চৌধুরী মহাশয়েরও তাহাই হইল। এই ব্যবসায়ে এবং অপরাপর নানাবিধ ব্যবসায়ে তিনি বহু অর্থ লোকসান দেন এবং পরিণামে দেউলিয়া পরিগণিত হইয়া অত্যন্ত মনঃকষ্টে এবং দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহার শেষজীবনের অবসান হয়। ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হইলেও তাঁহার সঙ্কল্প সাধু ছিল। আইন-ব্যবসায়েও তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় আনুমানিক ১৯০৬ সালে এখানে আসেন ও স্থানীয় সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও নিজ উন্নতিকল্পে আইন অধ্যয়ন করেন এবং ১৯১৩ সাল হইতে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি এখন ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভার এক জন সভ্য। ব্রহ্মদেশের বাঙালীদের উন্নতি এবং সুবিধার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে।

এই কয়েক জন মাত্র বিশিষ্ট লোকের নাম উল্লেখ করিলেও আরও অনেক বাঙালী আছেন, যাঁহাদের ব্যক্তিগত পরিচয় প্রবন্ধের আকারে দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু অনেকে নানা কল্যাণকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

আইনজীবী বাঙালী সংখ্যায় বার জনের কম নয়। চিকিৎসা-ব্যবসায়েও জন চার-পাঁচ বাঙালী আছেন। এক জন স্থানীয় হাসপাতালের য়্যাসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জন্ এবং অন্য কয়েক জন স্বাধীন ব্যবসা করেন। স্থানীয় জেলের প্রধান 'জেলার'ও এক জন বাঙালী। মিউনিসিপ্যাল আপিসে, পি ডব্লিউ ডি আপিসে, সরকারী ইস্কুলে, পোষ্ট আপিসে, স্বাধীন ব্যবসাক্ষেত্রে, ঠিকাদারের কাজে ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে নানা কর্ম্ম লইয়া বাঙালী অনেক আছেন। দোকানদার, দুধওয়ালা, ধোপা, নাপিত, গৃহভৃত্য, সামপান্, লঞ্চ্ ও ষ্টীমার চালক, সকল কাজেই বাঙালীর সংখ্যা এখানে খুব বেশী দেখা যায়।

বাঙালী প্রতিষ্ঠানও কয়েকটি আছে। (১) বেঙ্গল সোশ্যাল্ ক্লাব, (২) বেসিন চট্টল সমিতি, (৩) বেঙ্গল ইউনিয়ন ক্লাব। এই তিনটিই বাঙালীদের প্রধান প্রতিষ্ঠান। ইহা ব্যতীত কালীবাড়ি, জগন্নাথবাড়ি, শিবমন্দিরও আছে। প্রতি-বৎসর দুর্গাপূজা-উপলক্ষে ক্লাবগুলির উদ্যোগে খুব ধুমধাম করিয়া পূজা, অভিনয়, যাত্রাগান এবং প্রীতিভোজন হয়। ষ্টীমলঞ্চ্ এবং প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া তাহার উপর প্রতিমা সাজাইয়া লইয়া অসংখ্য নরনারী কীর্ত্তন, গান প্রভৃতি করিতে করিতে নদীবক্ষে ঘুরিয়া বেড়ান এবং শেষে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেন, এ দৃশ্য অতি মনোহর।

আরও একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের সম্পর্কে বালক-বালিকাদিগের জন্য একটি বাল্য-সমিতি চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায় (স্থানীয় সরকারী স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক) এবং তাঁহার পত্নী সুহাসিনী দেবী প্রতি-রবিবার সকালে বালক-বালিকাদিগকে লইয়া গল্প, গান, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির দ্বারা সুশিক্ষা দেন। সুদূর ব্রহ্মদেশে যে-সকল বালক-বালিকার জন্ম হইয়াছে এবং এদেশেই যাহারা শিক্ষালাভ করিয়া বড় হইতেছে তাহারা বাংলা ভাষা ভাল করিয়া শিখিবার সুযোগ পায় না। বাংলা দেশের আবহাওয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা দেশীয় পৌরাণিকীর সুমিষ্ট গল্প, ইতিহাস ইত্যাদিতেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুহৃদবাবু এই অভাব নিজ সন্তানদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের শিক্ষার জন্য চিন্তিত হন। পরিশেষে স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া সকল বাঙালী সন্তানদের লইয়া এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া কাজটি চলিতেছে। বৎসরে দুই-তিনবার এই বালক-বালিকাদিগকে দিয়া গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি করাইয়া ক্লাবের সভ্যদিগকে আনন্দদান করেন।

সর্ব্বশেষে একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের কথা বলিব। প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর হইতে এ-শহরে শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীদের বাস। সকলেই প্রায় সপরিবারে বাস

করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় মহিলাদিগের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ছিল না।

আমরা ১৯৩৩ সালে মে মাসে এখানে আসি। বিদেশে একত্রে এতগুলি বাঙালীকে দেখিতে পাইলে কতখানি যে আনন্দ হয়, তাহা স্বদেশবাসীরা দেশে থাকিয়া হয়ত অনুভব করিতে পারিবেন না। সরকারী কাজে আমাদের নানা স্থানে ঘুরিতে হইয়াছে, বাঙালীবিরল স্থানেও বাস করিতে হইয়াছে। সেজন্য বাঙালীর সঙ্গলাভে বঞ্চিত হওয়ার যে কষ্ট, তাহাও অনুভব করিয়াছি।

এতগুলি বাঙালী যেখানে, সেখানে মহিলা-প্রতিষ্ঠান থাকা নিতান্তই প্রয়োজন হয়।

গত ১৯৩৪ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মহিলাদের একটি সভা আহ্বান করিয়া একটি মহিলা-সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতির নাম বঙ্গলক্ষ্মী সমিতি। সেই সময় সেই সভায় বিহার ভূমিকম্পের সাহায্যকল্পে মহিলারা কি করিতে পারেন, এই বিষয়েও আলোচনা হয়। কয়েক জন মহিলা স্বেচ্ছায় কাজের ভার গ্রহণ করেন এবং বাঙালী পঞ্জাবী গুজরাটী মান্দ্রাজী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসী মহিলাদের দ্বারে দ্বারে অর্থ ও পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত অর্থ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্কটত্রাণ-সমিতির নিকট প্রেরিত হয় এবং পুরাতন বস্ত্রগুলি স্থানীয় কমিশনারের ফণ্ডে দেওয়া হয়। এই সমিতির মাসে দুইটি করিয়া অধিবেশন হইয়া থাকে। মেলামেশার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপন, পুস্তকাদি এবং প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চ্চা, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিয়া আনন্দদান প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়া সমিতি গঠন করা হইয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মী সমিতি কলিকাতা সরোজনলিনী নারী-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। এ বৎসর সরোজনলিনী শিল্পপ্রদর্শনীতে সমিতির সভ্যগণ কয়েকটি শিল্পদ্রব্য পাঠাইয়া বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছেন।

গত অক্টোবর মাসে বঙ্গলক্ষ্মী সমিতির কয়েক জন সভ্য মিলিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করেন। সমস্ত বাঙালী মহিলাকে এই আনন্দ-উৎসবে আহ্বান করা হইয়াছিল। অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল। এদেশে এ ব্যাপার খুবই নূতন, সেজন্য সকলেই বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

গত ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৫, এই সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে একটি সান্ধ্য-সম্মিলন হয়। কেবল সমিতির সভ্যগণের স্বামী এবং পুত্রকন্যাদের নিমন্ত্রণ হয়। ব্রহ্মদেশে বাঙালী সমাজে এইরূপ স্ত্রী-পুরুষের একত্র সম্মিলন সম্পূর্ণ অভিনব। সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা—সমিতির সম্পাদিকার উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে সান্ধ্যসম্মিলনে যখন কুড়ি-বাইশটি বাঙালী পরিবার একত্র হইলেন, তখন সে দৃশ্যটিও অতি সুন্দর বোধ হইয়াছিল। সমিতির সভ্যগণ এবং বালক-বালিকারা সঙ্গীত, আবৃত্তি, রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান প্রভৃতির দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। স্থানীয় চীফ্ জেলার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'বিনি পয়সার ভোজ' অভিনয় করিয়া খুব হাস্য-রসের সৃষ্টি করেন।

নানারকম প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজনও ছিল। রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আনন্দোৎসবে এবং জলযোগে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

সভ্যাদিগের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যালোচনায় উৎসাহ দিবার জন্য বঙ্গলক্ষ্মী সমিতি একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ছোট ছোট শিশু-সন্তানদের জননীরাও এই প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। যিনি শীর্ষস্থান লাভ করেন তাঁহাকে সমিতি একটি দশ টাকা মূল্যের পুরস্কার দিয়াছেন। শিল্পের জন্যও একটি দশ টাকা মূল্যের পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় হাসপাতালেও সমিতি উৎসব উপলক্ষ্যে দশ টাকা দান করিয়াছেন।

বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সমিতির সভ্যগণের এবং যে-সকল বালক-বালিকা গান, আবৃত্তি ও অভিনয়াদি করিয়াছিল তাহাদের একখানি আলোকচিত্র তোলা হয়। তাহা এই প্রবন্ধের সহিত দেওয়া হইল।

বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের বাহিরে বাঙালীরা কি ভাবে জীবনযাপন করিতেছেন তাহার খবর জানিবার জন্য দেশবাসীর স্বাভাবিক ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের অবতারণা।

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরে

শ্রীনিরুপমা দেবী

আজিকার দিনের এই নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি, এই কন্যাবিদ্যাপীঠগুলি আমাদের মনে অনেক কথাই জাগাইয়া দেয়। এগুলি আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। অতীত যুগে আমাদের দেশে ঠিক্ এই বস্তুটির সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঋষি-বালিকারা আলবালে জল-সেচন, মৃগ, পক্ষী তরুলতার পরিচর্য্যা এবং অতিথিসেবা করিতেছেন, কিন্তু ঋষি-বালকদিগের মত তাঁহারাও আচার্য্যের নিকটে পাঠ লইতেছেন এমন দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ তাঁহারা যে অশিক্ষিতা থাকিতেন না তাহাও শাস্ত্রে এবং সাহিত্যে, কাব্যে, নাটকে যেখানেই তাঁহাদের দর্শন পাওয়া গিয়াছে সেখানেই অল্পবিস্তর অনুভূত হইয়াছে। তবে ইহা ঋষি-ভূমির কথা। যেখানে সর্ব্বদা তত্ত্বালোচনা হয় সেখানকার অধিবাসীদের যাহা সুলভ হইতে পারে জনসাধারণ তাহার ফলভাগী হইতে পারে না। সেই জন্য যে-কয়টি গরীয়সী নারী আমাদের আঁধার ঘরের মাণিক, যাঁহাদের নাম যখন-তখন উচ্চারণ করিয়া আমরা নিজেদের মান বাঁচাই, সেই বেদসূক্ত-রচয়িত্রী ঋষি-পদবাচ্য বাগাম্ভৃণী, বিশ্ববারা, ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী গার্গী, অমৃততত্ত্বানুসন্ধিনী মৈত্রেয়ী —ইঁহাদের কথাও এস্থলে তুলনীয় বলিয়া মনে হয় না। এই দৈবায়ত্ত প্রতিভাগুলি আমাদেরও দৈবায়ত্তপ্রাপ্ত বলিয়াই মনে হয়। কেননা, এই পরা বিদ্যা লাভের জন্যও নরের চিরকাল যেরূপ ব্যবস্থা ছিল এবং আছে নারীদের জন্য তাহা এদেশে কোন কালেই ছিল না। অপরা বিদ্যা শিক্ষার ত কথাই নাই। সে-যুগের রাজকন্যাগণ বা সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণের অন্তঃপুর-শিক্ষার কথাও এ হিসাবের মধ্যে গণ্য নয়, সেজন্য আমাদের সাবিত্রী-আদি দেশপূজ্যাগণের শিক্ষার বিষয়ও ধর্ত্তব্য হইবে না। মহাভারতীয় যুগেও দ্রৌপদী ব্যতীত (ইনি ত অগ্নিসম্ভবা, সর্ব্ববিদ্যায়ও হয়ত স্বয়ংসিদ্ধা) অন্যান্য রাজকন্যা এবং অন্তঃপুরিকাদিগের চতুঃষষ্ঠী কলাবিদ্যার মধ্যে নৃত্যগীত এবং চিত্রকলা শিক্ষার দিকের প্রমাণই বেশী পাওয়া যায়। কাব্য-যুগের নায়িকারা ইহাতে যথেষ্টভাবেই শিক্ষিতা হইতেন এবং তাঁহারা ছাড়াও আর এক দল নারী এই চতুঃষষ্ঠী কলাবিদ্যার সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতি, এমন কি ধর্ম্মতত্ত্বও কলা-হিসাবে লোকরঞ্জনার্থ শিক্ষা করিত, কিন্তু তাহাদের কথাও আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। সর্ব্বসাধারণ অর্থাৎ গৃহস্থ সমাজ ত সর্ব্ব-কালেই আছে, তাঁহাদের কন্যাগণের বিদ্যাশিক্ষার কি ব্যবস্থা তখন ছিল জানিতে ইচ্ছা হয়। যেন মনে হয় পিতা ভ্রাতা স্বামী আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে তাঁহারা যাহা কিছু বিদ্যালাভ করিতে পাইতেন অথবা পাইতেন না। লীলাবতী নামে গণিতশাস্ত্রখানিতে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার কন্যার নামটি মাত্র স্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কিংবা কন্যাকেই এই বিদ্যার অধিকারিণী করিয়াছিলেন কে বলিবে! এমনি বাংলার জ্যোতিষশাস্ত্রের কতকগুলি প্রবাদবচনও খনার নামে অভিহিত হয়! এই খনাও কাল্পনিক নারী কিনা তাহার প্রমাণ নাই! কিংবদন্তী ছাড়া খনার কাহিনীতে যদি কিছু থাকে তাহা হইলে এই সামুদ্রিক বিদ্যা যে তিনি আমাদের সমাজে লাভ করেন নাই একথাও মানিতে হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার এ বিদ্যার জন্য যে লোমহর্ষক শাস্তি পাইতে হইয়াছিল তাহাও স্মরণীয়। বৌদ্ধ যুগের কতকগুলি নারী সংঘবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মশিক্ষার কেন্দ্র গঠনে সাহায্য পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও মঠের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকায় অচিরেই বিলীন হইয়া গেল। একা সংঘমিত্রার দৃষ্টান্তে বিশেষ কোন ফল ফলে নাই। আমাদের বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী যুগে কয়েক জন গোস্বামিনীর উল্লেখও বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারাও পিতা স্বামী বা গুরু দ্বারা প্রভাবান্বিতা

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরের বাৎসরিক উৎসব-সভা

হইয়াই তথাকথিত বৈষ্ণবসমাজে আচার্য্যস্থানীয়া হইয়াছিলেন, সেজন্য সার্ব্বজনীন নারী-শিক্ষার হিসাবে ইহাও গণ্য হইতে পারে না।

অথচ আমাদের দেশের পূর্ব্বতন মনীষিগণ যে নারীজাতিকে হীন ভাবে দেখিতেন একথাও সত্য নয়। ভগবদ্‌শক্তিকে যাঁহারা স্ত্রীমূর্ত্তিতে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা বলিলে অসূয়া প্রকাশ করার মতই দাঁড়ায়। ইহা অপেক্ষা সম্মান কোন্ সমাজ নারীজাতিকে দিতে পারিয়াছে? কিন্তু এদেশের মেয়েদের ভাগ্যেরই বোধ হয় কিছু দোষ ছিল, কেননা ইহা সত্ত্বেও নারীজাতির হীনত্বপ্রতিপাদক প্রমাণ আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে নীতিশাস্ত্রে প্রচুরই মিলে। স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার সম্বন্ধীয় যে-সমস্ত সাধারণ বাক্যও শাস্ত্রকারেরা তাঁহাদের শাস্ত্রে প্রয়োগ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী যুগের পণ্ডিতমণ্ডলী সেগুলি ক্রমে কেবল নারীজাতির উপরই প্রয়োগ করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রকার মনু কন্যাদিগকে আদরে পালন এবং শিক্ষাদানের কথাও ত বলিয়াছিলেন কিন্তু জনসমাজ বেশী করিয়া মানিল কেবল তাহাদের পিতৃকুলে, পতিকুলে অদায়ভাগিত্বের কথা, অনধিকারের কথা। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যকামী শিষ্যমণ্ডলী এবং সাধনেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে উপদেশচ্ছলে যাহা বলিলেন তাহাতেও জনসাধারণ বুঝিলেন বা অন্ততঃ মুখে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন 'নারীই নরকের দ্বার'! একথা একবারও তাঁহাদের মনে আসিল না যে এই নারীরাও যদি আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মচর্য্য এবং মুক্তিকামী হইয়া উপদেশ যাচ্ঞা করিতে পাইত তাহা হইলে আচার্য্যের মুখে পুরুষেরা উল্টা কথাও শুনিতে পাইতেন। এই যে জীবপ্রকৃতিজাত স্বভাব বা গুণের উপর দোষারোপ, পরস্পরের উপর পরস্পরের এই

অসূয়া দৃষ্টি, ইহা যে একটি উদ্দেশ্য লইয়াই রচিত হইয়াছে তাহা তাঁহারা একবারও মনে করিলেন না। নারী-জাতির অসারত্ব প্রতিপাদ্য বহু শ্লোক বহু গ্লানি দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত এবং ব্যবহারিক শ্লোকে গ্রথিত হইতে লাগিল। এমন কি যে মহাভারত সতী সাবিত্রী দময়ন্তী গান্ধারী দ্রৌপদী প্রভৃতি অগণ্য স্ত্রীরত্নের সমাবেশে রচিত, সেই মহাভারতও এ দৃষ্টি হইতে সর্ব্বত্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। দেশের এই যুগটিই নারীদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকারময়।

আবার এই দেশেরই বৈষ্ণব সাধকগণ এই নারীত্বের কয়েকটি স্বভাব বা বৃত্তিকে তাঁহাদের সাধনপথে আদর্শ-রূপে ধরিয়া জগতকে এক অভিনব বস্তু দান করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন সেই পথে ভগবানের সঙ্গে যেমন একটি জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় এমন আর কোন পথেই নয়। সাধক-কবি এই নারী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবৎ উদ্দেশে এদেশে অনেক গান গাহিয়াছেন এবং এখনও গাহিতেছেন। এই ভাবে বহু গাথা রচিত হইয়াছে। শিল্পী, ভাস্কর মানবের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি-গুলিকে (যথা—দয়া স্নেহ প্রেম ভক্তি আশা প্রভৃতিকে) এই নারী-রূপ প্রদান করিয়া তাহাদের শিল্পকে জগতে অমর করিয়াছে, বহু ধর্ম্মাচার্য্যও নারীর এই তীব্র অনুভূতিময় অন্তরকে সাধনপথে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যে সাহিত্যে নারীদের অবিসংবাদী স্থানের ত কথাই নাই শুধু বাকী থাকিয়া গেল আসল মানুষগুলারই কথা! তাঁহাদেরও যে জ্ঞানের বুভুক্ষা, বিদ্যার পিপাসা, শিক্ষিত জীবনের প্রয়োজন থাকিতে পারে এই কথাগুলাই কেবল সমাজের চক্ষে বাদ পড়িয়া গেল।

এই যে শিক্ষা শব্দ অবশ্য 'পঠন পাঠন' অর্থাৎ ব্যবহারিক অধ্যয়ন-অধ্যাপনের উপরই বলা যাইতেছে, নতুবা প্রকৃত শিক্ষা যাহাকে বলে—যাহার ফলে সংযমে দৃঢ়তায় সুশীলতায় চরিত্র গঠিত হয়, সে শিক্ষা হইতে আমাদের দেশের নারীরা কখনই বঞ্চিত ছিল না, বরং ত্যাগে সংযমে এই পঠন-পাঠন বিদ্যা-হীনারা এমন স্থানে অধিষ্ঠিতা ছিল যাহার পক্ষে বেশী বলিলে আজ শ্লাঘার মতই শুনাইবে। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। যে সমাজ তাহাদের এই ব্যবহারিক বিদ্যা না শিখাইয়াও গৃহের উচ্চ স্থানেই তাহাদের প্রতিষ্ঠিতা রাখিয়াছিল এখন যুগধর্ম্মের প্রভাবে স্বভাবের বিপর্য্যয়ে সমাজ আর তাহাদের সেখানে স্থান দিতে পারিতেছে না। যেটুকু বা স্থান আছে তাহাতে আমাদের রুচিও নাই। দেশকালপাত্র বলিয়া আমাদের মধ্যে পরস্পর অপেক্ষক যে বস্তু আছে তাহার অস্তিত্ব এই রূপেই দেখা দেয়। তাই নারীদের এখন এই অপরা বিদ্যালাভের প্রচুর প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপ নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠারও তাই বিশেষ প্রয়োজন। এই সার্ব্বজনীন স্ত্রী-শিক্ষা যেভাবে ধীরে ধীরে আমাদের দেশে ও সমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে এবং করিতেছে তাহার ধীরপদক্ষেপ যেন আমাদের চোখের উপরেই ধরা রহিয়াছে। ইহার বয়স অতি অল্প। ইহার আয়তন যেমন বৃদ্ধি হইতেছে সমাজও ধীরে ধীরে তাহার বন্ধন শ্লথ করিতেছে।

এখন সমস্যা এই যে আধুনিক ধারার শিক্ষা আমাদের দেশের মেয়েদের উপযুক্ত কিনা। আমরা এ-বিষয়ে অনেক কথাই বলাবলি করি। যথা "পাশ্চাত্য দেশে ক্রমে যে শিক্ষায় 'ত্রাহি ত্রাহি' ভাব আসিয়াছে, সমাজ বলিয়া গৃহ বলিয়া বস্তু যে-শিক্ষায় আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, এ-শিক্ষায় আমাদের ঘরেরও ক্রমে সেই অবস্থা হইতেছে। আলোক আনিতে গিয়া কত আবর্জ্জনা যে ঘরে প্রবেশ করিল তাহা কি কেহ দেখিতে পাইতেছি না?" এ ছাড়া আরও ঢের কথা। "এই জীবনযুদ্ধের উপযোগী শিক্ষার চাপে ছেলেগুলার ত স্বাস্থ্য ও মনুষ্যত্ব গিয়াছে, মেয়েগুলারও এইবার গেল। ছেলেদের ব্যয় বহন করাই বাপ-মায়ের দিন-দিন অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে, মেয়েদের জন্য সেই ভার এখন দ্বিগুণ হইবে। ছেলেগুলাই দেশে উপার্জ্জনের পথ পায় না, খাইতে পায় না, মেয়েদেরও পরস্পরকে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন ফুরাইলে কিংবা ছেলেদের মত শিক্ষকেরও প্রাচুর্য্য ঘটিলে মেয়েদেরও এমনি দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে" ইত্যাদি বহু চিন্তাই আমরা করি এবং বাক্যেও বক্তৃতা দিই, আর কথাগুলার মধ্যে সত্যও যে আছে তাহাও স্বীকার্য্য; কিন্তু আমার মনে হয় প্রতিক্রিয়ার বন্যার জল এমনি ভাবেই আসে। সে-জলের সঙ্গে অনেক অবাঞ্ছিত বস্তুও ভাসিয়া আসে, কিন্তু তাহার পথ রোধ করার উপায় নাই। "অন্ধ

কাল তুরঙ্গম রাশ নাহি মানে, বেগে ধায় যুগধর্ম্ম চাকা।” ভবিষ্যতই ইহার একমাত্র বিচারক! এ-জল স্থির না হইলে ইহার উপকারিত্ব সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না; যাহা আমাদের মেয়েরা কখনও দলবদ্ধ হইয়া লাভ করে নাই সেই বিদ্যারসের স্বাদ সংঘবদ্ধ হইয়া আস্বাদে তাহারা এখন উতলা! বন্যার মতই এ-বস্তু তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। শিক্ষার নিয়মও এই যুগধর্ম্মের আবর্ত্তন-চক্রের বশেই চলিতেছে, আমরা ইহাকে সর্ব্ববিষয়ে অভিনন্দিত না করিলেও তত ক্ষণ সে নিজের বেগেই চলিবে যত ক্ষণ না নবযুগ বা কালধর্ম্ম আসিয়া তাহাকে প্রতিহত করে। ইহা সত্ত্বেও এই যুগে স্ত্রীশিক্ষার যে কতখানি প্রয়োজন তাহা ভুক্ত-ভোগীরাই জানেন। শুধু ইহা আলোক মাত্র নয়, জ্ঞানের বুভুক্ষা মিটাইয়াই ইহা ক্ষান্ত নয়, পরন্তু ইহা আজিকে নারীর শরীরধারণের অন্নপানীয় রূপেও পরিগণিত হইতেছে। দেশের কন্যাদের অস্থিমজ্জাগত ধর্ম্মের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে, নির্ভর আছে, অসার বিলাসচেষ্টা, উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা প্রভৃতির অপবাদ তাহারা হয়ত আর বেশী দিন সহ্য করিবে না।* এই শিক্ষার আবর্ত্তনে আমাদের দেশে অনেকগুলি মনস্বিনী মহিলার অভ্যুদয় হইয়াছে, হইতেছে এবং কালে আরও হইবে। ইহা ভিন্ন দেশের বহু হৃদয়বান্ মনীষী দেশের কন্যাদের নির্দ্দোষ সুশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য নিজেদের হৃদয়মন এবং কেহ কেহ বিপুল অর্থও নিয়োগ করিতেছেন (যেমন এই কন্যা-বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মহাশয়)। কোন্ পথে চলিলে আমাদের কন্যাদের দেশগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং গৃহ-গঠন প্রভৃতি অব্যাহত থাকিবে সে-বিষয়ে তাঁহারা যথেষ্ট চিন্তা করিতেছেন এবং করিবেন। কোন্ পথ দিয়া আলোক আসিলে আবর্জ্জনা অন্ততঃ কম আসিবে সে-পথ ক্রমেই আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি, এবং আশা করি আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার নীতিগুলি ক্রমে সর্ব্বঅপবাদ-শূন্য হইবে।

সর্ব্বশেষে আমার আর একটি কথা বলিবার আছে। মাত্র এইখানেই যেন আমরা না থামি। বিদ্যার এক দিকের নাম অপরা এবং তাহার আর এক দিক আছে যাহার নাম

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

পরা। ভারতের যদি কিছু থাকে এখনও এই পরা বিদ্যার মহিমা লইয়াই আছে। বহু দেশ এই অপরা বিদ্যার ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়াও কালের স্রোতে বিলীন হইয়াছে, বাঁচিয়া আছে কেবল তাহাদের অর্জ্জিত পরা বিদ্যা বলিয়া যাহা আখ্যাত তাহারই পরিচয়। আমরা ভারতের কন্যারা আমাদের দেশের এই বিশিষ্ট বস্তুটিকে যেন না ভুলি। আজ নরের সঙ্গে যখন সর্ব্ববিধ শিক্ষার সমান দাবী করিতেছি তখন এই পরাজ্ঞান হইতেই যেন আমরা দাবিশূন্য না হইয়া থাকি। সেই অধ্যয়নকেই যেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া জানি। আমাদের নির্ভীক সাধকবীর প্রহ্লাদের মত যুগধর্ম্ম দৈত্য-পিতার সাক্ষাতে “তন্মধ্যে ধীত মুত্তমম্” বলিয়া যেন সেই পরা শিক্ষাকেই প্রচার করি। যুগধর্ম্মের উপযোগী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াও আমাদের পুরাযুগের সত্যতত্ত্বান্বেষিণী নারীর মত যেন

* এখানে বলা উচিত, শিক্ষিতা মেয়েদের এই বিলাস-চেষ্টার কথা উল্লেখ করার এ উদ্দেশ্য নয় যে আমাদের ঘরের তথাকথিত অশিক্ষিত মেয়েরা ইহা হইতে অব্যাহত আছে আমরা ইহাই এখানে বুঝাইতে চাহিতেছি। একথা একেবারেই বলা চলে না, বরং সম্পন্ন ঘরে ইহার আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিলাস-বাসনটিও যুগধর্ম্মের আকারেই আমাদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। ধনী, গৃহস্থ, দীন কাহারও ঘর ইহা হইতে আজকাল বাদ পড়ে না। কিন্তু যাহারা যথার্থ শিক্ষিতা-পদবাচ্যা তাহাদের এ প্রভাব হইতে কিছু মুক্ত দেখিতে স্বভাবতই বাসনা আসে, একথা এখানে উল্লেখের ইহাই একমাত্র কারণ।

অমৃতের অনুসন্ধানও করিতে পারি। ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে যিনি বিচারে পরাভূত করিয়াছিলেন সেই ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবীর মত ব্রহ্মবাদিনী হই। শারীরিক বলে নারী অবলা, তাহাদের মস্তিষ্ক লঘুতর, সে জন্য তাহারা মস্তিষ্কের কার্য্যে অপটু, অদ্য পরিচালনার গুণে মস্তিষ্কের ত্রুটি হইতে তাহারা অনেকটাই মুক্ত হইয়াছে—ক্রমে যেন অধিকতর ভাবে এ-ত্রুটি মুক্ত হয়। আজিকার কালোচিত বিদ্যা যখন নারী একে একে সমস্তই আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে, তখন "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" দেশের সেই চিরগৌরবের পরা বিদ্যা লাভের স্থানেই কেন পিছাইয়া থাকিবে? এখানকার কন্যাগুলির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য নানা ব্যবস্থা দেখিয়া ও তাহাদের হস্তনির্ম্মিত শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার প্রাচুর্য্য দর্শনের সঙ্গে তাহাদের বালকণ্ঠ-নিঃসৃত বেদধ্বনি শুনিয়া আর একটি মহাকন্যা-প্রতিষ্ঠানের কথা মনে পড়িতেছে। সেখানে কয়েকটি গ্রাজুয়েট ছাত্রী বেদান্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির চর্চ্চা করিতেছেন, সেই কুমারী-কন্যাপীঠ শারদেশ্বরী আশ্রমের কথা বলিতেছি। এই দৃষ্টান্তে এ আশা করা আমার আজ দুরাশা বলিয়া মনে হয় না।

কেনই বা মনে হইবে? দৈহিক বলে নারীর ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু মানসিক বলে আত্মিক বলে সে ত্রুটি কেন থাকিবে? এই যে নরনারী-ভেদ এ ত আমাদের ব্যবহারিক জগতের পরিচয় মাত্র। যে ভূমিতে নরনারীর সংজ্ঞা একই, সেইখানকার পরিচয় দিতে সর্ব্ব দেশ-কালের পুঞ্জীভূত জ্ঞানস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় ভগবান বলিতেছেন

—অন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং
জীবভূতাং—যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

আমরা জীবরা সকলেই তাঁর সেই পরা প্রকৃতি। সেই পরিচয়ে আমাদের জাতি একই।

সেই তত্ত্বানুশীলনের পথ ও শিক্ষাও দেশে আমাদের জন্য বিস্তৃত হউক। নারীদের শেষ শিক্ষালাভ স্বরূপে ইহাই আমরা অদ্য কামনা করি।*

* গত ৭ই এপ্রেল চন্দননগরের কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরের বাৎসরিক উৎসবে সভানেত্রীর অভিভাষণ।

প্রবাসী বাঙালী ও স্বাস্থ্যরক্ষা

শ্রীপান্নালাল দাস, জয়পুর (রাজপুতানা)

আধুনিক বাংলার বাহিরের বাঙালীর ইতিহাস ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে গণনা করিলে দেখা যায় পূর্ব্বে প্রবাসী বাঙালীদ্বারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের—বিশেষতঃ বিহার-উড়িষ্যা, আগ্রা-অযোধ্যা, রাজপুতানা ও পঞ্জাবে—বাঙালীর গৌরবের যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা কেবল তাহাদের মানসিক উৎকর্ষ ও শিক্ষাগুণেই হয় নাই, তাহাদের শারীরিক বল এবং সৎসাহসও এই প্রতিষ্ঠালাভে সহায়তা করিয়াছিল। ইংরেজ-রাজ্যস্থাপনের প্রারম্ভে ও সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অনেক ঘটনা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমার এক নিকট-আত্মীয় আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে কার্য্যোপলক্ষে সপরিবারে বাস করিতেন; তাঁহার পুত্রেরা উপযুক্ত স্কুল-কলেজের অভাবে, শিক্ষাদীক্ষায় তাহাদের পিতার সমকক্ষ হইতে না-পারিলেও শারীরিক শক্তিতে ও নির্ভীকতায় তখনকার গুণ্ডা-উপদ্রবিত লক্ষ্ণৌ শহরে এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত লোকেরাও তাহাদিগকে ভয় ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এরূপ অনেক শহরেই তখন বলবান সাহসী প্রবাসী বাঙালী ছিলেন। পূর্ব্বে রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বাঙালী ছাত্রেরা মানসিক এবং শারীরিক শক্তির প্রতিযোগিতায় প্রবাসী বাঙালীর মানসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ইংরেজী ব্যায়াম-কৌশল অর্থাৎ সার্কাসের ক্রীড়া ভারতবর্ষে প্রথমে

বাঙালীরাই শিক্ষা করেন, এবং প্রবাসের বিভিন্ন প্রদেশে তাহা দেখাইয়া তদ্দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত বাঙালী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথমে ইংরেজ বিমানপোতারোহীদের মত বিমান-আরোহণ ও ছত্রসহযোগে ভূমিতলে অবতরণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। প্রাতঃস্মরণীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিরূপে মুষ্টিযুদ্ধে লণ্ডনে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছাত্রগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। সম্প্রতি বিখ্যাত অম্বু গুহের পৌত্র শ্রীযুক্ত গোবর (যতীন্দ্রচরণ) গুহ সুদূর বিদেশে তাঁহার শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়া বিশ্ববিজয়ী বীর গামার প্রায় সমকক্ষ হইয়া বাঙালী অন্য দেশীয় অপেক্ষা হীনবীর্য্য নহেন তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু এখন ভুবনবিখ্যাত ওলিম্পিক ক্রীড়ায় বাঙালীর অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। এখনকার মত তখন কেহ প্রবাসে বাঙালীকে "নাঙ্গা শির" "ভুখা বাংগালী" বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিত না। কি ধীশক্তি, কি শারীরিক শক্তিতে ও সাহসে সর্ব্ব বিষয়েই বাঙালী এককালে প্রাধান্য দেখাইয়া এখন যে পশ্চাৎপদ হইতেছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্বাস্থ্যহীনতা একটা কারণ বলিয়া নিরূপণ করা যায়। কেহ কেহ অযথা অন্য দেশীয়দের পরশ্রীকাতরতা, অকৃতজ্ঞতা এবং তাহাদের প্রাদেশিক সংকীর্ণতার উপর দোষারোপ করিয়া নিজেদের ত্রুটি নিবারণ সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। মানসিক উৎকর্ষের ভিত্তি শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং স্বাস্থ্যহীনতার সঙ্গে দরিদ্রতার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা স্বতঃসিদ্ধ। দারিদ্র্যদোষ যদি গুণরাশিনাশী হয়, তবে স্বাস্থ্যহীনতা কেবল গুণরাশি-নাশী নহে, সর্ব্বপ্রকার সুখসম্পদবিনাশী এবং দৌর্ব্বল্যের হেতু। মানুষ, কি যে-কোন প্রাণীই হউক, যদি দুর্ব্বল হয় তবে তাহার হিংসাদ্বেষ অলসতা দাম্ভিকতা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তির প্রাবল্য হয় তাহা নিশ্চয়। কি করিয়া আবার বাঙালীরা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নষ্টগৌরব উদ্ধার করিতে পারেন তাহা সকলেরই চিন্তার বিষয়।

সেকালের গৃহস্থ-পরিবারে 'প্রতিগ্রাসে মাছের মুড়া' খাওয়ার উপদেশ আছে, তাহাতেও সরল গ্রাম্য লোকদের বুদ্ধিমত্তা ও খাদ্যবিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। দুধ ভাত ও মাছের মুড়ো যে বাঙালীর আদর্শ খাদ্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আধুনিক সভ্যতাভিমানী বাঙালীরা যদি সেকালের পাটনী ও চাষাভুষার ধীশক্তি ও দূরদর্শিতার সহিত খাদ্যের ব্যবস্থা করেন তবে বাঙালীরা তাঁহাদের নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া সর্ব্ববিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন একথা বলা বাহুল্য।

বৈজ্ঞানিকেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উপযুক্ত খাদ্য খাইলে শরীর সুস্থ থাকে ও বলশালী হয়। খাদ্যের ভিতর ভিটামিন নামক জীবনীশক্তি-সঞ্চারক পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। খাদ্য হইতে ঐ জীবনীশক্তিপ্রদ পদার্থ নির্গত হইয়া গেলে বা নষ্ট হইলে সে খাদ্য সর্ব্বতোভাবে শরীররক্ষার উপযোগী হয় না এবং তাহা খাইলে বেরিবেরি রোগের উৎপত্তি হয়। বেরিবেরি রোগের প্রাদুর্ভাব বাঙালীর ভিতরই অধিক।

ইদানীং বাঙালীর খাদ্য ভিটামিনবিহীন হওয়াতেই বাঙালী নষ্টস্বাস্থ্য, দুর্ব্বল ও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন।

ভাত বাঙালীর প্রধান খাদ্য; ফেন ফেলিয়া দিলে চালের ভিটামিন নির্গত হইয়া যায়। তার পর মাছের মুড়া—পুঁটিমাছের পর্য্যন্তও—প্রতি গ্রাসে পাওয়া এবং দুধ, স্বপ্নেরও অগোচর হইতেছে। এখন শাকপাত, ফলমূল, নানাবিধ টাকট্যা তরিতরকারী ঘি ও দুধের পরিবর্ত্তে ফেনহীন ভাত, অল্পমাত্র ভাজা মুগের ডাল, শুষ্ক আলুর ঝোল ভেজাল সরিষার তৈলমাখা আলুভাত, একটু বড়ি বা বেসনের ভাজা বড়া এবং প্রস্তরচূর্ণমিশ্রিত সাদা ময়দার লুচি সাধারণ বাঙালীর উদর পূরণ করে। অধিক তাপে খাদ্যদ্রব্যের ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্য ঘৃতে বা তৈলে ভাজা জিনিষ মুখপ্রিয় হইলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী। ভেজাল সরিষার তৈল খাদ্যহিসাবে ভাল নয়, কেননা উহা বেরিবেরি রোগের উৎপাদনে সহায়তা করে। এইরূপ অখাদ্য-বর্জ্জন সহজেই করিতে পারা যায়, কিন্তু বাঙালীরা অভ্যাসদোষে ও অলসতাবশতঃ জানিয়া-শুনিয়াই আপাতঃ-মধুর খাদ্যের সমর্থন করেন এবং 'জানামি ধর্ম্ম নচ মে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্ম নচ মে নিবৃত্তি' এই বুলির

সার্থকতা দেখাইয়া ব্যাধিগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বন্ধুবর স্বর্গীয় ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয় বাঙালীর খাদ্যের উৎকর্ষ ও সুলভতা সম্পাদন জন্য যে 'ইক্‌মিক কুকার' উপহার দিয়া গিয়াছেন, যাহাতে রন্ধন করিলে ভাতের ফেন ফেলিতে হয় না এবং অন্যান্য খাদ্যের ভিটামিন নষ্ট হয় না, তাহার কদর কত জন করেন?

ভারতের নানা দেশবাসীর মধ্যে বাঙালীর খাদ্যেই ভাজাভুজির প্রচলন অত্যন্ত অধিক। ভাজিতে হইলে খাদ্যদ্রব্যকে ঘৃতে কি তৈলে পক্ব করিতে হয়। পক্ব তৈল বা ঘিয়ের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক, তিন শত হইতে চার শত ডিগ্রি, উহাতে খাদ্যের ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়। জলে সিদ্ধ হইলে এক শত ডিগ্রির অধিক তাপ উঠে না, ভিটামিন তত নষ্ট হয় না। কাজেই ভাজা অপেক্ষা সিদ্ধ জিনিষ ভাল এবং বাষ্পে (জলীয় বাষ্পে) পক্ব হইলে খাদ্যের ভিটামিন আদৌ নষ্ট হয় না এবং তাহা সহজপাচ্য ও উপাদেয়। যে খাদ্যদ্রব্য কাঁচা, অর্থাৎ যাহা রন্ধন করিয়া খাওয়া যায়, তাহা আরও ভাল। তাহাতে ভিটামিন অবিকৃত ও প্রচুর পরিমাণে থাকে ও সেই জন্য অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ। দরিদ্র হইলেও স্বাস্থ্যপ্রদ ভিটামিনযুক্ত খাদ্য-প্রাপ্তির কাহারও অভাব হয় না। অবাঙালীরা কোনও পল্লীতে বাঙালীর প্রতিবেশী হইয়া থাকিলেও বেরিবেরি রোগে প্রায়ই আক্রান্ত হন না। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে বাঙালীর খাদ্যের ত্রুটি হেতু এই রোগ দেখা যায়। অবাঙালীরা খাদ্যের ভিটামিন নষ্ট করেন না; বাঙালীরা তাহা নষ্ট করেন। ভেজাল ঘি, সরিষার তৈল, ফেনহীন ভাত, সাদা ময়দার লুচি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য যে অনিষ্টকর তাহা অবাঙালীরা বুঝেন, বাঙালীরা বুঝিলেও সম্পূর্ণ নিরুপায়, কেননা তাঁহাদের গৃহকর্ত্রীরা কিংবা পাচক ব্রাহ্মণেরা ভাতের ফেন রাখার হাঙ্গাম করিতে পারেন না। গৃহিণীরা ত নানান্ ঝঞ্ঝাটে সংসার দেখাশুনার হাল ছাড়িয়া দেওয়ায় তাঁহাদের অসহায় স্বামী পুত্র ভ্রাতারা নিরুপায় হইয়া হোটেল বা চায়ের ক্যাবিনের শরণাগত হন এবং নিকৃষ্ট টোষ্ট প্রভৃতি খাইয়া নিজ নিজ কর্ম্মে যাইতে বাধ্য হন। এরূপ করিলে অচিরেই যে ব্যাধি-গ্রস্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মৃত্যুর ও সমাজের দুঃখের হার বাড়াইতে হয় তাহা চিন্তা করেন না। জঘন্য চা টোষ্টের ক্যাবিনের পরিবর্ত্তে যদি আমাদের আসল বাঙালীর ভিটামিনযুক্ত খাদ্যের কিংবা এদেশের মত লাল ভুষিযুক্ত আটার রুটি ও ডালের দোকানের প্রচলন হয় তাহা বাঞ্ছনীয়। টাট্‌কা দুধ, ঘি, গুড়জল, সরবৎ, ডাবের জল প্রভৃতি ভিটামিন-পূর্ণ পানীয় সহজপ্রাপ্য হইলেও স্যাকারিন-মিষ্টতাযুক্ত সোডা, লেমনেড চা-ই বাঙালীর তৃপ্তিসাধন করে। ভিটামিনপূর্ণ সস্তা ফলমূল যাহা আমাদের দেশেই উৎপন্ন হয়—যাহা সুদূর কোয়েটা, কাবুল প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত নয়, এরূপ ফলমূলের অভাব নাই। এরূপ সস্তা ফল—কলা শশা মুলা গাজর প্রভৃতি কাঁচা মুগ, ছোলা, গুড়, নারিকেলের পরিবর্ত্তে, ময়রার দোকানের জলা (burnt) ঘিয়ে প্রস্তুত বা বাসী ছানায় তৈরি স্যাকারীনে সিক্ত মহার্ঘ সন্দেশ-রসগোল্লা খাইয়া পিত্তরক্ষা না করিয়া পিত্তধ্বংস করাই হয়।

কথায় আছে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে,' পশ্চিমারা বাংলা দেশে গেলেও তাদের স্ত্রীলোকেরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া জাঁতাতে গম ভাঙিতে ভাঙিতে মন খুলিয়া গান গাহিয়া ইহকাল ও পরকালের শুভানুষ্ঠান করে। তাহাদের জাঁতার ঘেরঘর্ঘর শব্দে ও উচ্চকণ্ঠের তানে পুরুষদিগকে এলার্ম-ধ্বনির মত সতর্ক করিয়া কার্য্যে মনোনিবেশ করায় এবং পরে এই সদ্যভাঙা আটার রুটি ও ডাল খাইয়া তাহারা সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া সুস্থ শরীরে থাকিয়া লক্ষ্মী লাভ করেন—তাদের সোডা লেমনেড চা খাইয়া টিফিন করিবার দরকার হয় না। আবার ঐ প্রবাদবাক্যের মতই বোধ হয় বাঙালীরা অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ প্রবাসে বাস করিলে সে দেশবাসীর গুণগ্রাম অনুকরণ করা আত্মমর্য্যাদার বিরুদ্ধ মনে করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করেন। তাহাদের স্ত্রী কন্যা ভগিনী প্রভৃতিরা গৃহকার্য্যে অনভ্যস্ত হইয়া ডাক্তার-বৈদ্যের হিসাবের বিল বাড়াইয়া খরচান্ত হইয়া জেরবার হইয়া পড়েন। নিজেদের অভ্যাসমত অর্থাৎ ফেনহীন ভাত প্রভৃতি খাদ্য খাইয়া বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। উদাহরণস্বরূপ দেখান যায় সম্প্রতি আগ্রা-অযোধ্যার

এক বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী ছাত্রাবাসে পঁচিশ জন ছাত্রের মধ্যে চৌদ্দ জন ছাত্র বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। অবাঙালী ছাত্রদের এ রোগ হয় নাই। অভ্যাসদোষে ও আলস্যবশে যদি উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ছাত্ররা এরূপে নষ্টস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন তবে প্রতিযোগিতায় ভারতের অন্য দেশীয়দের সমকক্ষ হওয়া দূরের কথা। প্রবাসে পাশা-পাশি বাস করিয়াও বাঙালীরা যে অবাঙালীদের গুণগ্রহণ করেন না তাহার আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সন্দেশ রসগোল্লা বাঙালীর আদর ও শ্লাঘার উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অবাঙালীরা উহা কেন তত পছন্দ করেন না এবং তৈরি করিতেও বাঙালীর সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করেন না, তাহার কারণ ভাবিবার বিষয়—ছানা করিলে দুধ কাটাইতে হয়—দুধে যে জীবনীশক্তি আছে তাহা নাশ করা হত্যার মত পাপ তাই তাঁহারা উহা করিতে চান না। বাঙালীরা ইহা ভুল বিশ্বাস বলিয়া একটু হাসিবেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের সুখাদ্য বিচারের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান আছে তাহা দেখেন না। দুধ কাটাইলে ছানার জল বাঙালীরা অকেজো মনে করিয়া ফেলিয়া দিয়া দুধের যথেষ্ট পরিমাণ সহজ-পাচ্য সারাংশ অপচয় করেন। অবাঙালীরা দুধ জমাইয়া দই হইতে ঘৃত বাহির করিয়া তাহার জলীয় ভাগ নানা প্রকারে খাদ্যরূপে ব্যবহার করেন, কিছু অপচয় হয় না। ছানার জল ও দইয়ের জল প্রায় একই জিনিষ যাহাকে 'ছাস' বলা হয়। ইহা অতি উপাদেয়, পুষ্টিকর পানীয়। এই ছাস দিয়া বাজরা যব বা গমের চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া এক উত্তম সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত হয়, যাহাকে রাবড়ি বলে। এই রাবড়ি ঠাণ্ডা হইলে খাইতে হয়। কৃষকেরা বা শ্রমজীবীরা দুখানি মোটা রুটি ও কিছু রাবড়ি লইয়া অতি প্রত্যুষে নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে যায় এবং সময়মত তাহাদ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য অটুট রাখে। এই ছাসের সহিত খুদ (ডালের খুদ) বা খুদের বেসন সিদ্ধ করিয়া সুস্বাদু স্নিগ্ধকর ও বলকারক এক প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় যাহাকে "কহ্‌ড়ী" বলে। ইহাতে তাহাদের গৃহিণীদের মিতব্যয়িতা ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় আছে তাহা জানা যায়।

স্বাস্থ্যরক্ষায় সুবিবেচিত খাদ্যের যেমন প্রয়োজন, সুনিয়মে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনাও তদ্রূপ। তাহা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, বিশুদ্ধ জল ও নির্ম্মল বাতাস। কিরূপে উপযুক্ত খাদ্য খাওয়া যায়, বিশুদ্ধ জল ও নির্ম্মল বাতাস কিরূপে পাওয়া যায়, সে-বিষয়ে শিক্ষার প্রতি শিশুকাল হইতে অভিভাবক ও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা উচিত। আধুনিক সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে যেমন সুখ-সুবিধা বাড়িতেছে তেমনি অভাব-অসুবিধাও বাড়িতেছে। মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক সোনায় দানায় লক্ষ্মীলাভ করিতেছেন বটে, কিন্তু আপামর সাধারণে দুঃখ-দারিদ্র্য মাথায় বহিয়া জীবন দুর্ব্বিষহ মনে করিতেছে। অনুসন্ধানে ইহার দু-একটি প্রধান কারণ পাওয়া যায়, তাহা অলসতা ও অজ্ঞতা। উপযুক্ত শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান প্রদান করে, এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সহজেই সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতা লাভ হয়। কার্য্যকরী শিক্ষার অভাবেই সভ্যতার সুফল লাভ হয় না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে হইলে কলিকাতা হইতে বেশী দূর যাইতে হইবে না, হুগলী নদীর তীরবর্ত্তী পাটকলের সাহেবদের ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদ, নন্দনকাননসদৃশ উপবন, এবং সুস্থ ও সবলকায় অধিবাসীর সহিত সমৃদ্ধিশালী কিন্তু স্বাস্থ্য-হীন পার্শ্ববর্ত্তী বাঙালী বড়লোকের তুলনা করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

জীবনপ্রদ সূর্য্যালোক, বিশুদ্ধ বায়ু, নির্ম্মল পানীয় ও উপযোগী খাদ্যে কি দরিদ্র কি ধনী সকলেরই সমান অধিকার।

আমেরিকার পানামা দেশ, ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশ, এমন কি নূতন তুরস্কের এঙ্গোরা রাজ্যের কতিপয় প্রদেশ যাহা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের জন্য মনুষ্যবাসের অযোগ্য ছিল, তাহা উদ্যোগী পুরুষসিংহদের চেষ্টায় ধনধান্যে, সুখে, স্বাস্থ্যে আদর্শ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ধীশক্তি-অভিমানী বাঙালীরা একনিষ্ঠ হইয়া চেষ্টা করিলে তাহাদের সোনার বাংলাকেও এরূপ ব্যাধি-বিবর্জ্জিত করিতে পারেন না কি?

বাঙালীদের দুরবস্থার সমস্যা উঠিলেই অনেকে তাহার কারণ অন্যের উপর, ভাগ্যের উপর এবং পরাধীনতার উপর আরোপ করিয়া নিজেকেই এক প্রকার প্রতারণা

করেন। আভ্যন্তরিক সামাজিক পরাধীনতা, বাহ্যিক পরাধীনতা অপেক্ষা বাঙালীকে অধিকতর নিপেষিত করিয়া অক্ষম ও দুর্ব্বল করিয়াছে, তাহা ভাবিয়াও ভাবেন না। কোন জীব ব্যাধিগ্রস্ত হইলে এবং তাহার প্রতিকার না করিতে পারিলে, জীবকে প্রথমে নিস্তেজ করে পরে জীবন নাশ করে, বাঙালীরা কি সেইরূপ নানা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যধিগ্রস্ত হইয়া, মৌখিক প্রলাপকে (অভাবপ্রবণতাকে) প্রশ্রয় দিয়া, নিস্তেজ ও ধ্বংসোন্মুখ হইতেছেন না ? সাময়িক উত্তেজনায়, লুপ্ত গৌরবের অক্ষম পৌরুষ ও সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পদে পদে পথ ভুলিতেছেন না ? পার্থিব প্রকৃতির নশ্বরতা দেখাইয়া সূক্ষ্মবাদে আসক্তি দেখাইয়া (অর্থাৎ spiritualistic হইয়া) ভারতের হাজার হাজার বৎসরের কৃষ্টির বৃথা জয়ঘোষণা করিয়া, মানুষ যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাহা ভুলিয়া তাঁহার দয়ার অপব্যবহার করিতেছেননা ? ইহা বড়ই দুরদৃষ্ট।

প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে মানুষের পূর্ণায়ু লাভ অসম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করাতেই বিধাতা কপালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইবে বলিয়া আমরা মৃত্যুর দিকে পা বাড়াইয়া থাকি। ভুল বিশ্বাস অজ্ঞতার পরিচায়ক। কে না জানে যথাযথ জ্ঞানলাভ হইলে সমস্ত ব্যাধিকেই দূরে রাখা যায় এবং মৃত্যুর হার পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা কম করা যায়। কারণ যে-দেশে সর্ব্বদা সর্ব্বমঙ্গলাকর, সর্ব্বরোগ-বীজহারী সূর্য্যরশ্মি অধিকতর বিকশিত, সে দেশ ত রোগশূন্য হওয়া উচিত। চতুর শাস্ত্রকারগণ নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিকের ভিতর সবিতাকে আবদ্ধ রাখিলেও অনেকেই সেই মঙ্গলময়কে রীতিমত "বয়কট" করিয়া নানা রোগের বশীভূত হইয়া পড়েন। বয়সানুসারে খাদ্যের পরিমাণ ও গুণের সামঞ্জস্য রাখিলে বিশুদ্ধ জলপান ও নির্ম্মল বায়ুসেবন করিলে, মানুষ অনায়াসে ১০০ বৎসর বা তাহারও অধিক বাঁচিতে পারে।

মানুষের শরীর অত্যন্ত জটিল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কলকব্জার সমষ্টি। কলকব্জা যদি নিয়মিত ভাবে চালিত ও পরিষ্কৃত হয় তাহা হইলে তাহাতে ময়লা বা মরিচা পড়ে না এবং সুন্দর ভাবে তাহা কার্য্যোপযোগী থাকে। মানুষ যদি তাহার শরীর কলকব্জা-চালনাদ্বারা কর্ম্মঠ এবং মলমূত্রত্যাগদ্বারা পরিষ্কৃত রাখে তবে নিশ্চয়ই সুস্থ ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে।

দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতা ছাড়িয়া দিলে, মানুষ সাধারণতঃ প্রয়োজন-অতিরিক্ত অধিক খাদ্য খাইয়া পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মানব-শরীরের পূর্ণ গঠনের জন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রায় ত্রিশ বৎসর সময় লাগে। এই সময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উপযোগিতা অনুযায়ী, দুই ভাগ পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এক ভাগ শরীররক্ষার জন্য (maintenance) ও এক ভাগ শরীর বৃদ্ধি বা গঠন জন্য (growth)। ত্রিশ বৎসর বয়সের পর অবয়ব সম্পূর্ণ গঠিত হইলে, দুই ভাগ খাদ্যের প্রয়োজন নাই। উত্থানের পর পতন নৈসর্গিক নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে, বিনা প্রয়োজনেও মানুষ প্রায়ই অপরিমিত এবং অনুপযোগী খাদ্য সম্ভোগ করিয়া অচিরে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হয়। শরীরের উপর অধিক খাওয়ার অত্যাচার দশ বৎসর অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কতক সহ্য হয়, তার পর তাহা চলে না। ভ্রম ও লালসা পদে পদে পথ ভুলাইয়া দেয়। অধিকতর পুষ্টিকর ও মহার্ঘ খাদ্য যাহা অনেকেরই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সহজসাধ্য ছিল না, এখন অবস্থা-পরিবর্ত্তনে শরীর সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট হইবে ভাবিয়া ও দুষ্ট ক্ষুধার বশে উদরসাৎ করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় প্রায়ই লোকের আর্থিক সচ্ছলতা ঘটে, সেই সময় গৃহিণী ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়ার অনুরোধে পুষ্টিকর মুখরোচক খাদ্যের মাত্রা অধিক হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া যায়। শরীর পুষ্ট হইয়া অধিক ভারগ্রস্ত হইয়া যখন হৃৎপিণ্ড, পাকাশয় প্রভৃতি যন্ত্রাদি "হালে পানি" না পাইয়া মানুষকে ব্যাধিকবলিত ও দুর্ব্বল করে, তখন অনুতাপগ্রস্ত হইতে হয়। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কলকব্জা বিষাক্ত দ্রব্যদ্বারা—যেমন অযথা চর্ব্বি ইউরিক এসিড প্রভৃতি ভর্ত্তি হইয়া, শারীরিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত করে। রেলওয়ে প্রভৃতি এঞ্জিনের ভার বহন শক্তির নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। ভার অতিরিক্ত হইলে এঞ্জিন অক্ষম হইয়া পড়ে, সেইরূপ শরীর-এঞ্জিন, হৃৎপিণ্ড, কার্য্যে অক্ষম হইয়া যায়, ফুসফুস যকৃৎ মূত্রযন্ত্রাদি বিকৃত হইয়া নানা

ব্যাধির সৃষ্টি করে। তাহাতে মানুষের স্বতঃই আর বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে না।

অতএব বিলক্ষণ বুঝা যায় ত্রিশ বৎসর বয়সের পর, অধিক পুষ্টিকর খাদ্যের পরিবর্ত্তে, মলমূত্রনিঃসারক পরিমিত খাদ্যদ্রব্যই হিতকর। তখন মৎস্য, মাংস, ঘি, ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি মুখরোচক, কিন্তু দুষ্পাচ্য খাদ্যের লোভ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়।

শরীররক্ষার অনুকূল খাদ্যের সহিত উপযুক্ত আবহাওয়া পাইলে মানুষ অনায়াসে সুস্থ শরীরে এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে।

স্বাস্থ্যরক্ষা-উপযোগী নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম পালন করিলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়।

১। প্রচুর নির্ম্মল উন্মুক্ত বায়ু সেবন।

২। সৃষ্টির কারণ ও জীবনীশক্তির আধার সূর্য্যালোক ভোগ।

৩। উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার।

৪। স্নানাদি ও মলমূত্র ত্যাগ দ্বারা শরীর ক্লেদশূন্য রাখা।

৫। শরীরের স্বাভাবিক তাপ রক্ষা করা অর্থাৎ উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও আচ্ছাদন দ্বারা শীত বর্ষা গ্রীষ্ম হইতে আত্মরক্ষা করা।

৬। নিত্য নিয়মের সহিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা ও বিশ্রাম করা।

৭। ব্যাধি উৎপাদনকারী বিষাক্ত দ্রব্য বা রোগবীজাণু হইতে সর্ব্বদা শরীর রক্ষা করা।

৮। এই সমস্ত পালনের উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তার।

কৃতজ্ঞতার বিড়ম্বনা

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

পরের শনিবার সুহৃৎ বাড়ি ফিরে এল। গৃহিণীর টুকিটাকি বরাতি জিনিষগুলি বুঝিয়ে দিয়ে আহারের সময় জিজ্ঞাসা করলে—আর কামারদের সেই কাণ্ডটার কি হ'ল বল ত? মিটে গেছে?

গৃহিণী চুমকুড়ি কেটে বললেন—মেটবার জ্বালা! দিনরাত্রি হৈ হৈ হচ্ছে। পঞ্চু কামার তো নালিশ ক'রে এসেছে।

—বল কি? পঞ্চু কামারের সাহস এত বেড়েছে?

—সাহস আর বাড়বে না কেন? মুখুয্যেদের ছোট তরফ যে তলে তলে উস্কে দিচ্ছে। নইলে…

সুহৃৎ ব্যাপারটা বুঝলে। মাথা নেড়ে বললে—হুঁ। তাই ত বলি, পঞ্চু কামার…

গৃহিণী ফিস্-ফিস্ ক'রে বললেন—টাকাও নাকি ছোট তরফই দিচ্ছে। আমার বাপু শোনা-কথা, সত্যি মিথ্যে জানি না। ও-সব কথায় আমি থাকিও না, থাকতে ভালও লাগে না। আমি বলে নিজের ঝঞ্চাট নিয়েই ব্যস্ত।

একটু থেমে সুহৃৎ বললে—বড় তরফকে তখনই বললাম, পঞ্চুকে কিছু দিয়ে মিটমাট ক'রে নিতে। কাজটা ত আর সত্যিই ভাল হয় নি। তবে রাগের মাথায় হ'য়ে গেছে এই যা। বলে, রাগ না চণ্ডাল।

গৃহিণী আবার ফিস্-ফিস্ ক'রে বললেন,—বড় তরফ ত মিটমাট করতে চেয়েছিল, ছোট তরফ দিলে কই! নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পেয়াদার সঙ্গে দিলে ডুলি ক'রে সদরে পাঠিয়ে।

সুহৃৎ মাথা নেড়ে বললে—সে-বারের দ'য়ের মাছ ধরার শোধ নিলে আর কি। ছোট তরফ তক্কে-তক্কেই ছিল কি না। তবে আর বলেছে কেন, ভায়াদ বড় শত্রু। আর কেউ হ'লে পারত?

—পঞ্চুকে একেবারে চোখে-চোখে রেখেছে। পাছে বড় তরফ টাকাকড়ি দিয়ে মিটিয়ে ফেলে। ব'লে বেড়াচ্ছে, বড়বাবুকে জেল দিয়ে তবে অন্য কাজ।

—কাকে কাকে আসামী করেছে?

—শুনছি তো বড়বাবুকে আর হারাধন পাইককে। সত্যি-মিথ্যে জানি নে বাপু।

সুহৃৎ চিন্তিত মুখে বললে—হুঁ।

গৃহিণী স্বামীর পাতে আর একটু মাছের তরকারী দিয়ে বললে—আবার বলছে তোমাকেও নাকি সাক্ষী মেনেছে।

এই আশঙ্কাই সুহৃৎ করছিল। ভাতের গ্রাস তার হাত থেকে প'ড়ে গেল। বিস্মিত ভাবে বললে—আমাকে?

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বললেন—বলছে তো তাই। মুখপোড়ারা সব পারে। তোমার বাপু ওখানে যাওয়ার দরকার কি ছিল?

সুহৃৎ খবরটা শুনে বিলক্ষণ দমে গেল। নিস্তেজভাবে বললে—ইচ্ছে ক'রে কি আর গিয়েছিলাম, আমি যে ওইখানেই ছিলাম। নিখিলের সঙ্গে যখন গল্প করছি তখনও কি জানি, পঞ্চুকে ধ'রে আনতে পাইক গেছে? নিখিলের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বটে, কেমন যেন অন্যমনস্ক। কিন্তু এত কাণ্ড হবে তা ভাবি নি। তা হ'লে ত তখনই মিটিয়ে দিতাম। আমি না থাকলে ত পঞ্চুর শেষই হয়ে গিয়েছিল। হারাধনটা তো কম দুষমন নয়।

—বেশ করেছিলে। এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে সদর আর ঘর কর।

ঢক্ ঢক্ ক'রে খানিকটা জল খেয়ে সুহৃৎ বললে—হ্যাঁ। সাক্ষী দেবার জন্যে আমি কাঁদছি কি না! নিখিলের বিরুদ্ধে আমি দোব সাক্ষী! ওদের কি মাথা খারাপ হয়েছে তাই আমাকে মেনেছে সাক্ষী? সাক্ষী দোব! আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই!

—তা ওরা যদি মানে? কোর্টে দাঁড়িয়ে তুমি মিথ্যে কথা বলবে?

উত্তেজিত ভাবে সুহৃৎ বললে—দরকার হ'লে তাও বলব, তবু নিখিলকে বিপদে ফেলতে পারব না। মনে নেই, ওর ভগ্নীপতি এই চাকরিটা না ক'রে দিলে আজ কোথায় দাঁড়াতাম? আজ জমি করেছি, জায়গা করেছি, পুকুর বাগান কিনেছি, গ্রামের পাঁচ জনের এক জন হয়েছি, কিন্তু সে-দিনের কথা মনে ক'রে দেখদিকি! সে ভদ্রলোক সাহায্য না করলে এমন চাকরি পেতাম? তখন আমি কলকাতার জানতামই বা কি, আর চিনতামই বা কি! আমার শরীরে কি মানুষের রক্ত নেই যে যাব নিখিলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে?

নিখিলের ভগ্নীপতির উপকারের কথা সুহৃৎ কিছুতে ভুলতে পারে না। সে অনেক দিনের কথা। সুহৃৎ তখন সবে এণ্ট্রান্স পাস করেছে। সেই বছরই তার বিয়ে হয়েছে। তার বাপের যা সাংসারিক অবস্থা তাতে মোটা ভাত-কাপড়টা কোন রকমে চ'লে যায়। কিন্তু সেই বারই হ'ল অজন্মা। জমির ধান বিক্রি ক'রে যাদের সংসারের সব খরচ চালাতে হয় তারা পড়ল বিপদে। এই বিপদে প'ড়ে সুহৃৎদের এমন অবস্থা হ'ল যে, দিন আর চলে না। তার বাপের শরীর নানা দুশ্চিন্তায় ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল। মেজাজ খিটখিটে হ'ল। কথায় কথায় সুহৃদের অপমানের আর সীমা থাকে না। এই প্রকার দুঃসময়ে বিধাতার বরের মত এলেন নিখিলের ভগ্নীপতি। কিন্তু বহুপ্রকারে তাঁর খোশামোদ ক'রেও সুহৃদের বাবা পাত্তা পেলেন না। তিনি সোজা জবাব দিলেন, চাকরি খালি নেই। অবশেষে সুহৃদের মা গিয়ে ধরলেন একসঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ীকে। তাঁদের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে অবশেষে তিনি সুহৃৎকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি হলেন। কিন্তু সুহৃদের তখন এমন অবস্থা যে ট্রেন-ভাড়াটি পর্য্যন্ত নেই। যাওয়া আর হয় না। শেষে ভদ্রলোক নিজেই ট্রেনভাড়া দিয়ে তাকে নিয়ে যান, এক মাস নিজের বাসায় রেখে এই চাকরিটি জুটিয়ে দেন। এই কথা সুহৃৎ কোন দিন ভোলে নি। নিখিল তার বন্ধুও নয়, সমবয়সীও নয়। কোন রকম আত্মীয়তাই নেই। তবু কলকাতা থেকে বাড়ি এসে একবার অন্তত তার ওখানে গিয়ে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই চাই। তাদের বাড়ির কারও অসুখ-বিসুখের খবর কাক-মুখে শুনলেও দুটো ফল নিয়ে আসে। দুটো কপি বাড়ি আনলে তার একটা ওদের বাড়ি দেয় পাঠিয়ে। তার কৃতজ্ঞতায় ওরা অবশ্যই খুশী হয়, এবং প্রজার কাছ থেকে যে-ভাবে নজর নেয় সেইভাবেই কৃতজ্ঞতার উপহারও

খুশী মনে গ্রহণ করে। দরকার পড়লে কখনও কখনও দু-চারটে জিনিষ ফরমাসও করে। দিতে গেলেও সুহৃৎ দাম নেয় না। হেসে বলে, বিলক্ষণ! তোমার কাছ থেকেও দাম নেব? খাচ্ছি কার?

এমনি ক'রে এক পক্ষের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও সুহৃৎ তার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার একটা যোগসূত্র রেখেই চলেছে। সে শুধু অবাক হ'ল এই ভেবে যে, নিখিলের বিরুদ্ধে সে সাক্ষ্য দিতে পারে এমন কথা লোকে ভাবলে কি ক'রে? নিখিলদের কাছে তার কৃতজ্ঞতার ঋণের কথা গ্রামের কোন্ লোকটা না জানে?

সুহৃৎ আপন মনেই হাসলে—হুঁঃ!

গৃহিণী বললেন—তুমি বাপু ওসবের মধ্যে থেক না। পরের নেঞ্জার নিয়ে চাকরি খোয়ালে তো চলবে না!

সুহৃৎ উঠ্‌তে উঠ্‌তে বললে—পাগল!

ব্যাপারটা এই প্রকার:

নিখিলের বড় মেয়েটি অনেক দিন পরে সম্প্রতি শ্বশুরালয় থেকে এসেছে। পাড়ার আর ক'টি সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে সে চলেছিল ওপাড়ায় এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে। পঞ্চু কামারের বাড়ির পেছন দিয়ে যে সরু পথ জঙ্গলের মাঝ দিয়ে গেছে মেয়েদের এপাড়া-ওপাড়া করার পক্ষে সেইটিই সুবিধাজনক। সেই রাস্তার ধারে পঞ্চুর পাঁচিল-লাগাও যে আমগাছটা, এবারে সেটায় অজস্র আম এসেছে। দেখে নিখিলের মেয়ের লোভ হয়। ঢিল ছুঁড়ে গোটাকতক আম সে পাড়ে। গাছটা কামারদের। ঢিল ছোঁড়ার শব্দ পেয়েই পঞ্চুর স্ত্রী নেপথ্য থেকেই তাদের কতকগুলি শ্রুতিকটু সম্বোধন করে। নিখিল এ গ্রামের দশ আনার জমিদার। তার মেয়ে ভাবে তার গলার সাড়া পেলে পঞ্চুর স্ত্রী নিশ্চয় থামবে। এই ভেবে সে বলে—আমি গো কামার-খুড়ী! তোমার গাছের একটা আম পাড়লাম।

কিন্তু কামার-খুড়ী সহজে বিগলিত হবার মত মেয়েই নয়। সে নেপথ্য থেকেই মুখ ভেংচে বলে, তবে আর কি। কামার-খুড়ী সগ্‌গে গেছে! মুখপুড়ীদের মরবার জায়গাও নেই!

নিখিলের মেয়ে স্নেহ-সম্ভাষণের উত্তরে এই কটূক্তি পেয়ে বিরক্ত হয়। বলে, আ মোলো। এ মাগী তো ভারি দজ্জাল দেখছি!

আর যাবে কোথায়! কামার-খুড়ী বেরিয়ে এসে এমন গালাগালি দিতে লাগল সে গাল কানে শোনা যায় না। এ গ্রামে সে একটা ডাকসাইটে মেয়ে। তিন দিন ধরে অনর্গল গাল দিয়ে যেতে পারে। দম নেবার জন্যেও এক মিনিট থামবে না। তার মুখের তোড়ে ওরা দাঁড়াতে পারে? ওরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে বাঁচল। আর কামার-খুড়ী দু-ঘণ্টা ধ'রে সেইখানে দাঁড়িয়ে ওদের ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষকে নরকের বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে পাঠাতে পাড়া মাথায় তুললে।

নিখিল কি একটা কর্ম্মোপলক্ষে বাইরে গিয়েছিল। রাত বারোটার সময় ফিরে এসে সমস্ত শুনে রাগে গুম হ'য়ে ব'সে রইল, মুখে কিছু বললে না। সকালে উঠেই হারাধনকে হুকুম দিলে, পঞ্চু কামারকে যেখানে পাস সেখান থেকে ধ'রে নিয়ে আয়।

হারাধনও তাই চায়। বিছানা থেকে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় পঞ্চুকে সে তুলে নিয়ে এসে কাছারীতে ফেললে। তার পর একটা থামে বেঁধে চাবুক দিয়ে প্রহার আরম্ভ করলে। সে প্রহার এমনই অমানুষিক যে, সুহৃৎ ঠিকই বলেছে, সে না থাকলে পঞ্চু খুন হ'য়ে যেত।

ভেবে দেখতে গেলে পঞ্চু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। জমিদারের মেয়েকে সে নিজে গালাগালি দেয় নি, স্ত্রীকেও গালাগালি দেওয়ার জন্যে উৎসাহিত করে নি। বস্তুত পক্ষে এ-ব্যাপারের কিছুই সে জানত না। সেও পেটের ধান্ধায় বাইরে কোথায় গিয়েছিল। রাত্রে ফিরে এসে দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে। তার স্ত্রীও ব্যাপারটাকে তার নিত্যকর্ম্মের ভগ্নাংশ হিসাবে মেনে নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় নি। স্বামীকেও জানানোর প্রয়োজন মনে করে নি। পঞ্চু যখন প্রহার-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করছে তখনও পর্য্যন্ত জানে না, কেন এ শাস্তি।

তা সে জানুক আর না জানুক, পৃথিবীতে এ রকম ঘটনা কিছু বিরল নয়। স্বামীর অপরাধে স্ত্রীর কিংবা স্ত্রীর অপরাধে স্বামীর, পিতার অপরাধে পুত্রের কিংবা পুত্রের

অপরাধে পিতার লাঞ্ছনা অহরহ দেখা যায়। বরং এইটিই প্রথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সে কথা যাক্।

আর পাঁচ জন দুর্ব্বল লোকের মত পঞ্চুও এ অপমান নীরবেই সহ্য করত। কিন্তু করতে দিলে না ছোট তরফের অখিল বাবু। উৎপীড়িতের প্রতি প্রীতিবশে নয়, কিছুকাল আগে দহের দখল নিয়ে নিখিলের কাছে যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছিল পঞ্চুকে অবলম্বন ক'রে সেই অপমানের সে প্রতিশোধ নিতে চায়। পঞ্চুকে দিয়ে অখিল মামলা দায়ের করালে। কিন্তু বিপদ হয়েছে একটাও তার সাক্ষী নেই। হারাধন পঞ্চুকে পিছনের জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসে। কেউ দেখেছে, কেউ দেখে নি। যারা দেখেছে নিখিলের ভয়ে হোক, খাতিরে হোক, তারা চুপ ক'রে আছে। একমাত্র লোক যার এই ঘটনা দেখা অস্বীকার করার উপায় নেই সে সুহৃৎ। অখিল অবশ্য কতকগুলো মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করেছে (পাড়াগাঁয়ে মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করা সবচেয়ে সহজ) কিন্তু তাদের ওপর ততখানি ভরসা করা যায় না। এরা পেশাদার ধুরন্ধর সাক্ষী হলেও ভাল উকিলের জেরার মুখে নাও টিকতে পারে। সেজন্যে অখিলের চোখ পড়েছে সুহৃদের ওপর। তাকে যদি পাওয়া যায় সে যত টাকা লাগে খরচা করতে প্রস্তুত।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে পঞ্চু সকালবেলায় সুহৃদের সঙ্গে দেখা করতে এল। ভক্তিভরে সুহৃদের পায়ের ধুলো নিয়ে লোকটা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। তার গায়ের ক্ষত স্থানে স্থানে মিলিয়ে আসছে। কয়েক জায়গায় তখনও দগ্‌দগ্‌ করছে। দেখে সুহৃদের দয়া হ'ল। বললে,—বোস্ পঞ্চু।

পঞ্চু বসলে বটে, কিন্তু কান্না থামালে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তাকে কি ব'লে সান্ত্বনা দেবে ভেবে না পেয়ে সুহৃৎ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে পঞ্চু বললে—আমি তো খুনই হয়েছিলাম দাদাঠাকুর। আপনি না থাকলে জীবনই যেত।

পঞ্চু কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলে।

সুহৃৎ শান্তকণ্ঠে বললে—সবই অদৃষ্ট পঞ্চু। যা হয়ে গিয়েছে, হয়ে গিয়েছে। ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি ক'রো না।

পঞ্চু তথাপি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সুহৃৎ আবার বললে—বরং কিছু টাকা নিয়ে মিটিয়ে ফেল। হাজার হোক, গ্রামের জমিদার। রাগের মাথায় যদি একটা অন্যায় ক'রেই থাকে, তাই ব'লে তার মুখ হাসাতে হবে?

পঞ্চু তথাপি চুপ ক'রে রইল।

সুহৃৎ বললে, সে না দেয়, আমি দোব। বুঝেছ পঞ্চু? গ্রামের জমিদার তো বটে! দোষ-ত্রুটি সবারই হয়। আবার কাল তুমি বিপদে পড়লে, ওই সব চেয়ে আগে ছুটে আসবে। বুঝলে না? মিটিয়ে ফেল।

পঞ্চুর মুখ দেখে মনে হ'ল, সে যেন একটু নরম হ'য়েছে। উৎসাহিত হয়ে সুহৃৎ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পঞ্চু করজোড়ে বললে—আজ্ঞে সে পথ আর নেই দাদাঠাকুর, ভেতরে ভেতরে অনেক কাণ্ড হয়েছে।

বাধা দিয়ে সুহৃৎ বললে—কিছু কাণ্ড হয় নি পঞ্চু। আমি বলছি, মিটিয়ে ফেললে তোমার ভালই হবে।

পঞ্চু কীর্ত্তনীয়ার ঢঙে একটা হাঁটু গেড়ে ব'সে বললে—আপনি বি-দ্যাশে থাকেন দাদাঠাকুর, খপর তো রাখেন না। এর মধ্যে অনেক গুড়-মধু আছে।

পঞ্চু টিপে টিপে হাসতে লাগল। সুহৃৎ বুঝলে, পঞ্চু মামলার রস পেয়েছে। ওকে ঘোরানো শক্ত। সুহৃৎ কিছু বিরক্ত এবং কিছু উৎসুক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

গলা খাটো ক'রে পঞ্চু বললে (যেন সুহৃৎকে অভয় দেবার জন্যে)—এর মধ্যে ছোটবাবু আছে দাদাঠাকুর। দু-হাতে টাকা খরচ করছে। আমার হাসপাতালের সব খরচ উনিই দিয়েছেন। এখান থেকে গাড়ী ক'রে গেলাম, এলাম, সব ওঁর খরচ।—পঞ্চু হেসে বললে, মায় একজোড়া চটিজুতো।

দেখা গেল পঞ্চু বেশ আছে। প্রহারের ক্ষত বাইরে এখনও শুকোয় নি বটে, কিন্তু ভেতরে তার চিহ্ন মাত্র নেই। গ্রামের সকল কথার কেন্দ্র এখন সে। যারা তার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলত না, তারাও এখন তাকে ডেকে বসিয়ে তামাক খাওয়ায়, পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করে। ঘন ঘন ছোটবাবুর সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে তার চাল পর্য্যন্ত বদলে গেছে।

সুহৃৎ একটু বিরক্ত ভাবেই বললে—তবে মর। ছোট-বাবুর চালে পড়েছ, কিন্তু কাল ওদের ভায়ে ভায়ে ভাব হয়ে যাবে। তখন মরতে মরবে তুমি।

পঞ্চু বুঝলে সে কথায় কথায় ভুল পথে চলেছে। সে চুপ ক'রে রইল। ধীরে ধীরে তার চোখে আবার জল জমতে লাগল। সে জল তার লোল গণ্ড বেয়ে টপ্ টপ্ ক'রে নীচে পড়তে লাগল। জলভরা চোখ তুলে বললে—আমি গরিব ব'লেই কি বাবু, আমাকে এত অত্যাচার সইতে হবে? কোন ভদ্রলোক সাহায্য করবে না? আপনি ত নিজের চোখেই সব দেখলেন দাদাঠাকুর?

কিন্তু এবারে আর ওর চোখের জলে সুহৃৎ গললো না। রুক্ষ কণ্ঠে বললে—আমি নিজের চোখে কিছুই দেখি নি পঞ্চু। আমাকে এর মধ্যে টানলে তোমার লাভ হবে না।

সুহৃৎ গট্ গট্ ক'রে বাড়ির ভেতর চ'লে গেল। ওর দিকে আর ফিরেও চাইল না।

একটু পরে নাপিত এল। রাখু পরামাণিক।

বাৎসরিক বন্দোবস্তের নাপিত। শনিবারে সুহৃৎ আসে। সেজন্যে রবিবার এসে কামিয়ে দিয়ে যায়। একথা-সেকথার পর রাখু বললে—গাঁয়ে ত হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে দাদাঠাকুর।

—কি রকম?

—পঞ্চু কামারকে নিয়ে। ভয় আমাদেরই দাদাঠাকুর। ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই লাগে নল-খাগড়ার প্রাণ যায়।

—তোমাদের আবার ভয় কি?

সুহৃদের দাড়িতে জল বুলোতে বুলোতে রাখু বললে—ভয় বইকি দাদাঠাকুর। এখনই ত বড়বাবু বলছেন, আগুন ছুটিয়ে ছাড়ব। খড়ের ঘরে বাস করি দাদাঠাকুর, রাত-বিরেতে কার ঘরে আগুন লাগবে আর তাদের জন্যে আমরাসুদ্ধ পুড়ে মরব।

সুহৃৎ উপেক্ষার সঙ্গে বললে—ও এমনি ভয় দেখাচ্ছে।

রাখু একটু থমকে কি ভেবে বললে—তা হবে।

তার পর একটু মুচকি হেসে বললে—আপনাকেও ত সাক্ষী মেনেছে শুনলাম।—ব'লে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে। কিন্তু সুহৃৎ নিরাসক্ত ভাবে শুধু বললে—হুঁ।

—আজ সকালে পঞ্চু এসেছিল বুঝি আপনার কাছে।

সুহৃৎ তেমনি ভাবে আবার বললে—হুঁ।

কিন্তু রাখু তথাপি দমলে না। বললে—আপনি দেবেন সাক্ষী? হুঃ! বড়বাবু সে দিন বলছিলেন, সুহৃৎ দেবে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী? সে খাচ্ছে কার? আমাদের দয়াতেই না সে মানুষের মত হয়েছে?

সুহৃৎ যেন চমকে উঠল। কিন্তু তখনই শান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—নিখিল নিজে বলছিল?

—বলবেন বইকি? তাঁর ভগ্নীপতির দৌলতেই আপনার কাজটা হয়েছে কি না, সেই কথা আর কি!

সুহৃৎ শুধু বললে—হুঁ।

রাখু আপন মনেই বলতে লাগল—আমি বললাম, বড়-বাবু, তিনি কখ্খনো আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন না। বাড়িতে দুটো কমলালেবু আনলে একটা আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তিনি তেমন লোকই নন্। বড়বাবুও বললেন—হাঁ, সে আমাদের খুব অনুগত।

সুহৃদের চোখের দৃষ্টি আর একবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু সে মুখে কিছু বললে না।

সুমুখ দিয়ে বড় তরফের গোমস্তা নকড়ি ঘোষ যাচ্ছিল। নকড়ি বেঁটে মোটা কালো। মাথায় একসঙ্গে টাক এবং টিকি। মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। গায়ে একটা আধময়লা লংক্লথের পিরাণ। গলায় সরু তুলসীর মালা। নাকে রসকলি। পায়ে তালতলার চটি। বগলে ছাতি।

সুহৃৎকে বৈঠকখানায় দেখে রাস্তা থেকেই দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নকড়ি প্রণাম জানালে। কাছে এগিয়ে এসে বললে—এই যে! কাল রাত্রে এসেছেন বুঝি? বড়-বাবু বলছিলেন…

সুহৃৎ মুখ না ফিরিয়েই বললে—ওটা নিখিল মিটিয়ে নিলেই পারত। মিছিমিছি খানিকটা কেলেঙ্কারী বাধানো।

নকড়ি একটা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উপরের সিঁড়িতে একটা পা রেখে বললে—আজ্ঞে প্রথম হ'লে মিট্তো। এখন দু-পক্ষেরই জেদ চেপে গিয়েছে। এস্পার-ওস্পার না হ'লে আর মিটবে না। আপনি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করেছেন তো?

প্রতিবার শনিবারে বাড়ি এসে রবিবার সকালেই সুহৃদের সর্ব্বপ্রথম নিখিলের ওখানে কিছু-না-কিছু নিয়ে যাওয়াই চাই। কিন্তু তার অর্থ যে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করা এমন কথা সে কোন দিন ভাবে নি। নিখিলকে সে চিরদিন, অর্থাৎ তার ভগ্নীপতির দৌলতে চাকরি পাওয়ার প'র থেকে, আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য ক'রে এসেছে। উপকৃত যে-ভাবে উপকারী বন্ধু বা আত্মীয়কে স্নেহ করে তার মনে তেমনি একটা ভাব ছিল। কিন্তু নিখিল যে আবার এই গ্রামের দশ আনার জমিদার, সে যে বড়বাবু, এ-কথা তার কোন দিন মনেই হয় নি। নকড়ি বড় বাবুর কর্ম্মচারী ব'লেই হোক, অথবা তার বড়বাবুর কাছে যাওয়াটা সে ওই চোখে দেখে ব'লেই হোক, তার মুখে দেখা করার কথাটা সুহৃদের কানে বিশ্রী ঠেকল।

সে একটু রূঢ়কণ্ঠে বললে—দেখি যদি সময় পাই। নিখিলকে ব'লো যদি দু-পাঁচ টাকা দিয়েও মিটমাট হয় সেই ভাল।

নকড়ি চলে যাচ্ছিল। সুহৃদের কথা শুনে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—বলেন কি মশাই, টাকা দিয়ে মিটমাট! আমার ত বোধ হয়, পঞ্চা যদি সদরের সমস্ত উঠোনটা নাকখৎ দিয়ে মাফ চায় তাহ'লেও বড়বাবু আর মেটাতে রাজী হবে না। একটা সামান্য প্রজা কোর্টে গিয়ে জমিদারের নামে ফৌজদারী ক'রে আসে এ কি সোজা ব্যাপার না কি? তার ওপরে আপনি বলেন টাকা দিয়ে মিটমাট করতে? বেশ!—ব'লে নকড়ি ঘোষ উপেক্ষার সঙ্গে হাসলে।

সে হাসি দেখে সুহৃদের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। বললে—তাহ'লে কি করতে চাও শুনি?

দু-পা এগিয়ে এসে বললে—শুনবেন? তাহ'লে প্রথম পর্ব্বটাই শুনুন। যারা যারা সাক্ষী আছে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া।

নকড়ি বড় বড় দাঁত বের ক'রে হা হা ক'রে হাসলে।

তার কথা শুনে সুহৃৎ ভিতরে-ভিতরে শিউরে উঠল। মুখে নীরস কণ্ঠে বললে—বল কি হে! আমিও ত শুনেছি সাক্ষী আছি। তাহ'লে আমার ঘর থেকেই বউনি হোক।

নকড়ি হা হা ক'রে হেসে বললে—হ্যাঁ, ভাল বটে।

কিন্তু তখনই গম্ভীর ভাবে বললে—কথাটা আপনি ঠাট্টা ক'রে বললেন বটে, কিন্তু এরই মধ্যে বেটারা বাবুর কাছে আপনার নামে সাতখানা ক'রে লাগাতেও ছাড়ে নি। তা বাবুর অবশ্য আপনার ওপর বিশ্বাস আছে। কারও কথা তিনি কানেও তোলেন না।

নকড়ি ঘোষের কথা-বলার ভঙ্গীতে সুহৃৎ অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সে কি ভাবে, সুহৃৎ তারই মত বাবুর কর্ম্মচারী যে তার ওপর বিশ্বাস আছে শুনে কৃতার্থ হয়ে যাবে? জমিদার হ'লেও নিখিল তার বয়ঃকনিষ্ঠ এবং স্বজাতি। তার পরম স্নেহভাজন। সেও কি সুহৃৎ সম্বন্ধে এইভাবে ভাবে না কি?

কিন্তু সুহৃদের মনের কথা নকড়ি টের পেল না। ছাতিটা বাঁ বগল থেকে ডান বগলে নিয়ে সে বলতে লাগল—এই কালই ত কথা হচ্ছিল। বাবু বললেন, যে যা বলে বলুক নকড়ি, সুহৃৎ সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আছে। সে আমার মোটা প্রজা। আর বড় অনুগত লোক। বাড়ি এলে আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যায় না। তাও দেখেছ, কোন দিন শুধু হাতে এল? সে কখনও আমার বিরুদ্ধে যেতে পারে? বলতে গেলে আমাদের খেয়েই মানুষ। না, না, নকড়ি, আর-বেটাদের বিশ্বাস নেই বটে, কিন্তু সুহৃৎ কখনও নিমকহারামী করবে না।

নকড়ির তাড়া ছিল। আর বসতে পারলে না। যাবার সময় ব'লে গেল—বাবুর সঙ্গে এখুনি একবার দেখা করতে যাবেন যেন নিশ্চয় ক'রে।

সুহৃদের কামানো হয়ে গিয়েছিল। সে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে নকড়ির দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

পরস্পরের মধ্যে যেখানে স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা নেই, যেখানে কৃতজ্ঞতাই একমাত্র বন্ধন, সেখানে চিরজীবন এক জনের আর এক জনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা যে কত বড় বিড়ম্বনার ব্যাপার সুহৃৎ সে-কথা আপন মনে ভাবতে লাগল। নিখিলের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্যও সে দিতে পারে না। কিন্তু কেন পারে না? নিখিলের ভগ্নীপতি তার

একটা চাকরি ক'রে দিয়েছেন। সেও কিছু স্নেহবশে নয়। সুহৃদের সঙ্গে তাঁর কোন আত্মীয়তা নেই, কিংবা কোন রকম স্নেহের সম্পর্কও নেই। বস্তুত পূর্ব্বে তিনি সুহৃৎকে চিনতেনই না। জামাইমানুষ, মাঝে মাঝে শ্বশুরালয় আসতেন। হয়ত তাকে দেখেনও নি। কিংবা দেখে থাকলেও সে নিতান্তই চোখের দেখা। তার বেশী নয়। সুহৃদের ক্ষেত্রে বলা চলতে পারে—যেমন আরও অনেক গরিব ভদ্রসন্তানের তিনি চাকরি ক'রে দিয়েছেন, তেমনি সুহৃদেরও দিয়েছেন। সে-কথা আজ হয়ত তাঁর মনেও নেই। মাঝে মাঝে যদি কখনও সুহৃদের সঙ্গে দেখা হয়, সুহৃৎ নমস্কার করে, তিনিও অন্যমনস্ক ভাবে সে নমস্কার ফিরিয়ে দেন। এই পর্য্যন্ত। এর জন্যে যদি কারও কাছে সুহৃৎ ঋণী, ত সে তাঁরই কাছে। বড়জোর নিখিলের স্বর্গীয় বাপ-মার কাছে। নিখিল তখন নিতান্ত ছোট এ ব্যাপারে তার কোন কৃতিত্ব নেই। কিন্তু সুহৃৎ তার পাড়াগেঁয়ে স্বভাবের গুণেই হোক, অথবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক ব্যাপারটিকে এমন ক'রে ভাবতে পারে না। অর্থের ঋণ যেমন পিতার কাছ থেকে পুত্রে অর্শায় এও তাই মনে করে।

তথাপি সুহৃৎ খুব দুঃখিত হ'ল, ব্যথিত হ'ল। নিখিল কোন স্নেহের সম্পর্ক স্বীকার করে না। কৃতজ্ঞতার শিকলে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চায়। সেই জোরে জোর খাটিয়ে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তার মনুষ্যত্বকে আঘাত দিতে চায়। তার কাছে সুহৃৎ শুধু মাত্র মোটা প্রজা এবং ঋণী। ক্রীতদাসের আত্মার ওপর মনিবের যেমন পুরুষ-পরম্পরা দখলী-স্বত্ব জন্মে, সুহৃদের উপরও তার তেমনই জন্মেছে। তার এই মনোভাব সুহৃদের বুকে বড় বেশী ক'রে বাজল। তবু চুপ ক'রে রইল। এ দুঃখের কথা ব'লে বোঝাবার নয়।

নকড়ি ফের ঘুরে এল। তার কাছে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলে—পঞ্চা হারামজাদা সকালে আপনার কাছে এসেছিল শুনলাম?

কার কাছে শুনেছে তা আর বললে না। সুহৃৎ তার দিকে ফিরে চাইলেও না। অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলে—হুঁ।

—কি বললে ব্যাটা?

তেমনি ভাবে সুহৃৎ জবাব দিলে—কিছুই বললে না।

—কিছুই বললে না? বলেন কি?

সুহৃৎ কিছুই জবাব দিলে না। চাকরটাকে ডেকে বৈঠকখানার বারান্দাটা ঝাঁট দিয়ে মাদুরটা পেতে দিতে বললে। নকড়ি পঞ্চুর বক্তব্য শোনবার জন্যে আরও কিছুক্ষণ বৃথা অপেক্ষা ক'রে আপন মনে কি ভেবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

সেও এদিক দিয়ে গেল, ওদিক দিয়ে এল অখিল। অখিল ছোটবাবু হ'লেও নিখিলের বড়। তার খুড়তুতো ভাই। সেই হিসেবে ছোট তরফ। অখিল সুহৃদের সমবয়সী, তার বাল্যসাথী। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে। এককালে দু-জনে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। তার পরে এক জন পেটের চিন্তায় কলকাতা গেল, আর এক জন দেশে থেকেই পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা করতে লাগল। সুহৃৎ মাঝে মাঝে যখন বাড়ি আসে তখন অখিল হয়ত নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, মাথা তুলে সাদর সম্ভাষণের সময়ও পায় না। ফলে, এখন আর সুহৃৎ ওদিকে যাওয়ার বড়-একটা প্রয়োজন বোধ করে না। এখন দু-জনে কচিৎ দেখা হয়।

অখিল এসে তার মাদুরের এক প্রান্তে ব'সে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে—কখন এলি? কালকে? খবর সবই রাখি। কেমন ছিলি? ভাল? বেশ ছোকরাটি সেজে আছিস কিন্তু। আমি ত বুড়ো হয়ে গেলাম। বাইরে থাকলে...

অখিল ছেলেবেলার মত সোল্লাসে তার পিঠে চাপড় দিলে। সুহৃৎ জানে ও কিজন্যে এসেছে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে মনে মনে তারই প্রতীক্ষা করতে করতে বাইরে শুধু একটু ফাঁকা হাসলে।

অখিল বললে—তোরা বেশ আছিস ভাই। দশটা-পাঁচটা আপিস করিস্ আর শনিবার-শনিবার বাড়ি আসিস্। খাসা আছিস্। কোন হাঙ্গাম নেই। গ্রামে থাকা, আর বাপের বিষয় বজায় রাখা যে কি ঝকমারি ভাবতেই পারিস্ না।

সুহৃৎ আবার একবার হাসলে।

অখিল বললে—মাঝে মাঝে মনে হয়, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে যেদিকে দুই চোখ যায় চলে যাই। এ ঝঞ্ঝাট আর পোয়াতে পারি না। কিন্তু বিষয়ের কীট আমরা, সাধ্যি কি চলে যাই!

অখিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললে—এই দেখ না, কোথাও কিছু নেই পঞ্চু কামারের একটা হাঙ্গাম ঘাড়ে এসে চেপেছে।

সুহৃৎ তাড়াতাড়ি ব্যগ্রভাবে বললে—কেন ভাই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া করিস্? মিটিয়ে ফেল। তুই ইচ্ছে করলেই মেটে।

বিষয়কর্ম্ম পরিচালনা ক'রে ক'রে বয়সে না হোক বুদ্ধিতে এবং মনে অখিল সত্যিই ঝুনো হয়েছে। মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললে—মেটে? বেশ আমি রাজী, তুই মিটিয়ে দে।

এত অবলীলাক্রমে অখিল কথাটা বললে যে, সুহৃৎ কি বলবে খুঁজে না-পেয়ে বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, পাশের পাঁচিলের আড়াল থেকে কে যেন একবার উঁকি দিয়েই মাথাটা সরিয়ে নিলে। কে ওটা?

কিন্তু পাঁচিলটা অখিলের পেছনে। সে টের পেলে না। তেমনি ভাবে হাসতে হাসতে বললে—এত সহজ নয় রে ভাই, এত সহজ নয়। চেষ্টার আমি ত্রুটি করি নি। নইলে ভাইকে কি আর সত্যিই আমি জেলে দিতে চাই?

অখিল উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। সুহৃৎ সে হাসির শব্দে একবার চমকে তার দিকে চেয়েই আবার পাঁচিলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। আবার সেই মাথা। সুহৃৎ স্পষ্ট দেখলে, নকড়ি ঘোষের মাথা। অখিল যে তার কাছে এসেছে এ খবর এরই মধ্যে নিখিলের কাছে পৌঁছে গেছে। তার পর হয় নিখিল নকড়ি ঘোষকে আড়ি পাততে পাঠিয়েছে, কিংবা সে নিজের ইচ্ছাতেই এসেছে। নিজের ইচ্ছায় নয়, এত সাহস তার হবে না। নিশ্চয়ই নিখিলই পাঠিয়েছে। সে দাঁতে ঠোঁট চেপে চুপ ক'রে রইল।

অখিল বলতে লাগল—আমাকে কি করতে বলিস তুই? পঞ্চু আমার প্রজা। গরিব। কি মার সে খেয়েছে তুই ত নিজের চোখেই দেখেছিস্। হ'লই-বা নিখিল ভাই। গরিব প্রজাকে যদি অন্যের উৎপীড়নের হাত থেকে না বাঁচাতে পারি, ত কিসের জমিদার আমি? আমার তাহ'লে বানপ্রস্থ নেওয়াই উচিত।

অখিল দেখলে সুহৃৎ খুব মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছে। গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল—তবু নিখিল যদি একবার আমাকে বলত, কিংবা তার নিজে এসে বলতে লজ্জা করে একজন লোক পাঠিয়েও জানাত যে, যা হ'য়ে গিয়েছে হ'য়ে গিয়েছে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি আমি তখনই মিটিয়ে দিতাম। সত্যি বলতে কি, আমি এমনও ভেবেছিলাম যে, নিখিল যদি দিতে রাজী না হয় আমি নিজের পকেট থেকেও পঞ্চুকে দু-দশ টাকা দিয়ে, দুটো ভাল কথা ব'লে বিদায় করতাম। তা নয়, উলটে আমাকেই শাসিয়ে বেড়াতে লাগল, হ্যান করেঙ্গে, ত্যান করেঙ্গে। দেখ দেখি কাণ্ড!

সুহৃৎ বেশ জানে অখিল যা বলছে তার এক বর্ণও সত্য নয়। তবু অখিলের চোখ মুখ দেখে, তার আবেগপূর্ণ কথা শুনে কিছুতে তাকে অবিশ্বাস করতে পারলে না। কেবল শেষ চেষ্টা ক'রে বললে—তোর দুটি হাতে ধরছি, ভাই, কোন উপায়ে যদি পারিস্ মিটিয়ে ফেল্। আমি বলছি, এতে সবাই তোর সুখ্যাতিই করবে।

সুহৃদের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অখিল বললে—এই বত্রিশ বন্ধনের মধ্যে ব'সে বলছি, তুমি মিটিয়ে দিতে পার আমি রাজী। মামলায় যে টাকা আমার গেছে তা যাক। তা চাই নে। তুমি তো নিখিলের অন্তরঙ্গ লোক, দেখ না একবার চেষ্টা ক'রে। কিন্তু যদি না পার? তাহ'লে?

তাহ'লে যে কি, তা সুহৃৎ জানে। অভিভূতের মত শুধু অখিলের কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে বললে—তাহ'লে?

—তাহ'লে তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে। একটি কথাও মিথ্যে বলতে হবে না। শুধু যা দেখেছ তাই। ব্যস্। রাজী?

সুহৃৎ জবাব দিতে পারলে না। শুধু পাঁচিলের দিকে একবার চাইলে। কাউকে দেখতে পেলে না। নকড়ি ঘোষ হয়ত চ'লে গেছে, কিংবা এখনও আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেই। কে জানে!

এমন সময়ে হারাধন পাইক লাঠি ঘাড়ে ক'রে এসে দাঁড়াল। ছোটবাবুকে দেখে হারাধন সসম্ভ্রমে প্রণাম

করলে। অখিল তার দিকে ফিরেও চাইলে না। সুহৃৎকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে—কি বলছিস্?

সুহৃৎ তথাপি জবাব দিতে পারলে না। হারাধনকে জিজ্ঞাসা করলে—কি খবর?

—আজ্ঞে বাবু একবার তলব দিয়েছেন।

—তলব? নিখিল নিজে আসতে পারে নি, পেয়াদা দিয়ে তলব পাঠিয়েছে? রাগে তার শরীর থর-থর ক'রে কেঁপে উঠল। মনে হ'ল, এই মুহূর্ত্তে তার ভগ্নীপতির দেওয়া চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই বিড়ম্বনার শিকল থেকে মুক্ত হ'তে পারলে সে বাঁচে।

কিন্তু অসীম তার সহ্যশক্তি। নিজেকে প্রাণপণে সংযত ক'রে শান্তকণ্ঠে বললে—এখন ত যেতে পারব না হারাধন। নিখিল কে বলগে, যদি সময় পাই সন্ধ্যের পর বরং যাব।

হারাধন মাটিতে লাঠি ঠুকে বললে—আজ্ঞে আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে বলেছেন।

হারাধন সুহৃৎকে ভয় দেখাইবার জন্য মাটিতে লাঠি ঠোকে নি, অভ্যাস বশে ঠুকেছে। কিন্তু সুহৃৎ আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলে না। লাফিয়ে উঠে বললে—হারামজাদা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি কি তোর বাবুর চাকর? যা বলগে যা বাবুকে আমি যেতে পারব না। তার দরকার থাকে সে এসে দেখা করতে পারে। আস্পর্দ্ধা!

তার রাগ দেখে হারাধন ভয়ে পালাল। অখিল তাড়াতাড়ি তার হাত ধ'রে বসাল। কিন্তু সুহৃদের রাগ যেন আর কিছুতে যায় না। কাঁপতে কাঁপতে বললে—সাক্ষী দেওয়ার কথা বলছিলে, দেব আমি সাক্ষী। তুমি নির্ভাবনায় থাক।

অখিল অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সন্দিগ্ধভাবে বললে—সত্যি বলছ ত ভাই?

সুহৃৎ বার-বার মাথা নেড়ে বলতে লাগল—হ্যাঁ, হ্যাঁ সত্যি। আমি যখন কথা দিলাম, তখন তার আর নড়চড় হবে না। কিছুতে না। আমার এক কথা।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে অখিল হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

ললিত ও লীলা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

১

ছোট সংসার—স্বামী আর স্ত্রী। চাকর-দাসী আছে কিন্তু আত্মীয় বল্‌তে কেউ নেই। তা না থাক, এতে ওরা ভালই আছে। এমন কি ছেলে-মেয়েদের অভাবও ওদের মনকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। সন্তান-স্নেহের বিলাসিতা যেমন নেই সন্তান-পালনের গুরু দায়িত্বও তেমনই নেই। ললিত ও লীলা পরস্পরকে পেয়েই সন্তুষ্ট। অন্য সুখের তাদের অবসর নেই, আকাঙ্ক্ষারও অভাব। ললিতের আয় খুব বেশী নয় কিন্তু ব্যয়ই বা তাদের এমন কি? আর্থিক অসচ্ছলতা তাদের কোনো কালেই কষ্ট দিতে পারে নি, বরং প্রায়ই কিছু কিছু সঞ্চয় হ'ত। প্রতিবাসীরা বল্‌ত, ওদের স্বামী-স্ত্রীর এতটা মিলের কারণ আসলে হচ্ছে এইটাই। অবশ্য এটা নিরপেক্ষ বিচার বলা চলে না, কারণ এরা সকলেই লীলা-ললিতের ঈর্ষা করত।

মধ্যে মধ্যে যেমন মান-অভিমান ও দাম্পত্যের কপট কলহ হয়ে থাকে সেদিনও তেমনই ললিত ও লীলার মধ্যে প্রবল তর্ক চলছিল—পরস্পরের মধ্যে কার ভালবাসা বেশী এই নিয়ে। তর্কের মীমাংসা চিরকাল যেমনভাবে হয়ে থাকে তেমনই ভাবে শেষ হ'ল। যুক্তি ক্রমশঃ রাগ, অভিমান এমন কি অশ্রুজলে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। অবশেষে সাব্যস্ত হ'ল এই যে দু-জনেই দু-জনকে খুব ভালবাসে। ললিত আপিস যাবার সময় বলে গেল—আমার ভালবাসার কিছু প্রমাণ ওবেলা আপিস থেকে এসে তোমায় দেব। লীলা কোন কথা বললে না, শুধু একটু হেসে তাকে বিদায় দিলে। ভাবলে—বো'ধ হয় নিত্যকারের বরাদ্দ আদরটা আজ মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

আসল কথা সে কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারে নি। কথাটা হচ্ছে এই—একটা পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় ললিত

কয়েকটা টাকা জিতেছে। কাল টাকার চেক পেয়েছে কিন্তু স্ত্রীর কাছে এখনও এ-সকল কথা কিছুই বলে নি। ইচ্ছাটা নগদ টাকা ও খবরটা একসঙ্গে দিয়ে লীলাকে একেবারে চমৎকৃত ক'রে দেবে। সামান্ত আনন্দও মানুষকে আত্মহারা ক'রে দিতে পারে যদি তা অপ্রত্যাশিত ভাবে আসে।

আপিসে পৌছতেই বন্ধুরা হৈ হৈ ক'রে উঠ্‌ল। হরেন এসে বল্‌লে, কি খাওয়াবে বল। ললিত বিস্ময়ের ভান ক'রে বল্‌লে—কি খাওয়াব, কিছুই নয়!

—তার মানে?

—মানে অতি সোজা। তোমাদের কিছু খাওয়ানোর কথা ছিল ব'লে ত আমার মনে পড়ছে না।

—কথা আবার থাক্‌বে কি, তোমারই কি পাঁচ-শ খানি টাকা পাওয়ার কথা ছিল?

—টাকা!—কিসের টাকা?

—আহা কিছুই জানেন না উনি, আপিসসুদ্ধ লোক জেনে গেল আর উনি—

পরেশ একখানা পুরনো ষ্টেট্‌সম্যানের পাতা ললিতের সামনে ফেলে দিয়ে বল্‌লে—মশাই লুকোবার চেষ্টা কর্‌লে কি হবে, এদিকে ছাপার কাগজে যে বার্ত্তা প্রচার হয়ে গিয়েছে। শনিবার খবর বেরিয়েছে আর আজ সোমবার, ইতিমধ্যে উনি কিছুই জানতে পারেন নি। ওরা ত কাগজে ওঠ্‌বার আগে জানিয়ে দেয়—এত দিনে হয়ত টাকাও পেয়ে গেছ।

ললিত আর চাপতে না পেরে হেসে বল্‌লে—না টাকা ঠিক পাই নি—তবে চেক পেয়েছি বটে; তা তোমরা যখন ছাড়বে না তখন দু-এক টাকা খরচা করা যাবে কাল। আজ কিন্তু তোমরা আমার কাজগুলো তুলে দিয়ে আমায় একটু সকাল-সকাল ছেড়ে দিও—চেকখানা ভাঙাতে হবে ত।

সকলে বলে উঠ্‌ল, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ললিতকে সেদিন আর বিশেষ কিছুই কর্‌তে হ'ল না। সে শুধু এর-তার সঙ্গে গল্প করেই সময় কাটাতে লাগল। হরেন প্রশ্ন করলে—গিন্নির জন্যে কি নিচ্ছ?

ললিত বললে—কি আবার নেব?

—বাঃ, তাঁর জন্যে কিছু একটা উপহার-টুপহার নিয়ে যাবে না?

—কি হবে পয়সা বাজে নষ্ট ক'রে?

—বেশ যা হোক। গিন্নির জন্যে খরচ করলে পয়সা নষ্ট হয়! যা বললে বললে, এ-কথা খবরদার আর কখনও মুখে এন না।—তাঁর কানে গেলে অনর্থপাত ক'রে ছাড়বেন। ছেলেমানুষ তোমরা আমার কথা শোন—একটা কিছু সোনার জিনিষ কিনে নিয়ে গিয়ে দাও। তাতে তিনিও খুশী হবেন, তোমারও অসময়ের সাহায্য হবে। নয়ত নগদ টাকাটা যদি সবই শ্রীহস্তে তুলে দাও তবে এটা ঠিক জেনে রেখে দিও তিনি নিশ্চয়ই ছিটের কাপড় আর এলুমিনিয়ামের হাঁড়ী কিনেই সমস্ত শেষ ক'রে দেবেন।

—তা বটে, তবে অসময়ে কাজে লাগার কথা যা বললে ওতে আমার বিশেষ ভরসা নেই। সোনার জিনিষ ওঁরা গায়ে একবার চড়ালে বিধবা হবার আগে আর সহজে নামান না। যদি বা নামান ত সেটা হয় ক্যাশবাক্সে ঢোকে নয় ত স্যাকরার বাড়ি যায় প্যাটার্ণ বদলাতে। ও জিনিষ হস্তগত করা তোমার আমার মত পুরুষের কর্ম্ম নয়।

আপিসের ঘড়ীতে ঢং ঢং ক'রে ছুটো বাজল। ললিত তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। সাহেবের কাছে ছুটি নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে জামার পকেটে রেখে ললিত সাবধানে পথ চলতে লাগল। যে-রকম পকেট-মারের ভয় পকেটের ভেতর একটা হাত রাখাই ভাল। নূতন নোটগুলা স্পর্শ করতেও বেশ লাগে।

হরেন মন্দ মতলব দেয় নি। তার কাছে স্বীকার না করলেও গহনা-কেনার যুক্তিটা ললিতের ভালই লেগেছে। ওতে আহার-ওষুধ দু-ই হবে। তাছাড়া গহনা পরলে লীলাকে ভারী সুন্দর দেখায়। সুন্দরী স্ত্রীলোকদের জন্যেই ত গহনার সৃষ্টি। কুৎসিতারা কেন যে গহনা প'রে তাদের কুরূপকে বাড়িয়ে তোলে, ললিত তা বুঝতে পারে না।

একটা জুয়েলারীর দোকানের সামনে শো-কেসের মধ্যে নানা রকম জিনিষ সাজান ছিল। ললিত সেই দিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাবতে লাগল ভিতরে ঢুকবে কিনা। একটু ইতস্ততঃ ক'রে অবশেষে সে ঢুকেই পড়ল।

অনেক জিনিষ বাছাবাছির পর একটা নেকলেস্ সে পছন্দ করলে। দামটা একটু বেশী, তা হোক্, লীলার মুখের হাসির দামও কম নয়।

বাসে ব'সে-ব'সে ললিত ভাবতে লাগল নেকলেসটায় লীলাকে কেমন মানাবে। শাঁখের মত শুভ্র গলায় সোনার হার, তাতে আবার নীলার মধ্যমণি। নকল নীলার মধ্যমণিটার দিকে তাকিয়ে লীলার আসল নীলার মত চোখ দুটা আনন্দে কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সে-কথা কল্পনা ক'রে ললিত বিভোর হয়ে গেল। কণ্ডাক্টার এসে টিকিট চাইলে কিন্তু তার তখন হুঁসই নেই। মন্থলি টিকিটের অধিকারী ভেবে সে বেচারী চ'লে গেল। ললিতও অন্যমনস্ক ভাবে হেদোর মোড়ে নেমে পড়ল।

বাড়ির দরজার কাছে এসে ললিত আর একবার মনে মনে মহলা দিয়ে নিলে কি ভাবে খবরটা খুব রঙীন ক'রে ভাঙা যাবে। তার ভালবাসার প্রমাণ,—হাঁ প্রমাণই ত তার সঙ্গেই আছে।

ভিতরে এসে নীচে স্ত্রীকে দেখতে পেলে না। একটু আশ্চর্য্য হ'ল, কারণ লীলা তার জলখাবার তৈরি করবার জন্য এসময় নীচেই থাকে। উপরে শোবার ঘরে গিয়ে দেখে লীলা একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। এমন অসময়ে ও শুয়ে কেন—রাগ হয় নি ত। নাঃ, রাগ হ'লে শুয়ে থাকবার মেয়েত ও নয়। তা যদি হ'ত ত ও এতক্ষণ অতিরিক্ত মনোযোগের সঙ্গে সংসারের কাজ আরম্ভ ক'রে দিত; উদাস গাম্ভীর্য্যের আবরণে ভিতরকার রাগকে এমন ক'রে ঢেকে ফেলত যে বাইরের লোক কিছুই বুঝতে পারত না। ললিত তাকে ভাল ক'রেই জানে—আদর পাবার জন্যে গোঁসার বিজ্ঞাপন ও কখনই দেবে না।

স্ত্রীর মুখের উপরকার চাদরখানা সরাতেই তার ঈষৎ আরক্ত ক্লান্ত মুখচ্ছবি দেখে সে বুঝতে পারলে লীলার অসুখ করেছে। দেহের উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে দেখলে জ্বর খুবই বেশী। লীলা তার স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠল কিন্তু চোখ চেয়ে থাকতে পারলে না। ললিত তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কখন জ্বর এল লীলা?

—তুমি আপিসে চ'লে যাবার পর।

—এখন কি বড্ড কষ্ট হচ্ছে?

—হাঁ।

—কি কষ্ট হচ্ছে?

লীলার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, সে মাথায় হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিলে সেখানে যন্ত্রণা হচ্ছে।

ললিত কাপড়-চোপড় না ছেড়েই স্ত্রীর শিয়রে ব'সে পড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তার মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। আজকের বিকালটাকে মধুময় করবার জন্য তিন দিন ধরে সে কত রকম জল্পনা-কল্পনা করেছে, কত মাথা ঘামিয়েছে। অবশেষে সবই কি মিথ্যা হয়ে গেল? এত কল্পনা এত আয়োজন সমস্ত মুহূর্ত্তের মধ্যেই ব্যর্থ হ'ল! যে মুখকে সে আনন্দের আতিশয্যে রাঙিয়ে তুলতে চেয়েছিল, রোগ-রক্তিম সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ললিত মানুষের অক্ষমতার কথা ভাবতে লাগল।

অনেক ক্ষণ পরে লীলা একবার চোখ মেলে তার দিকে চাইলে। ললিত এ সুযোগ উপেক্ষা করতে পারলে না—লীলা তোমার জন্যে কি এনেছি দেখবে না? ব'লে নেকলেসের বাকসটা তাড়াতাড়ি তার হাতে তুলে দিলে। কম্পিত দুর্ব্বল হাতে সেটা খুলে লীলা একবার মাত্র দেখেই আবার বন্ধ ক'রে নিজের বুকের কাছে রেখে ললিতের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। ক্লান্তিতে তার চোখ দুটা মুদে গেল। ললিত কিন্তু সে হাসি দেখে আপনাকে পুরস্কৃত মনে করতে পারলে না; সে হাসিতে উৎসাহ নেই, আনন্দ নেই, উত্তেজনা নেই—আছে বুঝি শুধু কৃতজ্ঞতা। লীলার অবসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে তার অসহায় অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে ললিতের অন্তর বেদনামথিত হয়ে উঠল।

২

ললিত ভেবেছিল লীলার অসুখ সামান্য, দু-দিনেই সেরে যাবে। কিন্তু দেখা গেল যতটা সোজা মনে হয়েছিল ততটা নয়। ঔষধ পথ্য অথবা সেবা কিছুরই অভাব হ'ল না তবু রোগ না ক'মে বরং বৃদ্ধির পথেই চলতে লাগল। আত্মীয়ের অভাব এই সময়ই বোঝা যায়। রোগীর সেবা করতে পারে বাড়িতে এমন কেউ নেই, কাজে কাজেই ললিতকে আপিসে ছুটি নিতে হ'ল। বুড়ী ঝিয়ের দ্বারা সংসারের প্রায় সব

কাজই চলে, কিন্তু সেবার ভার ললিত নিজেই সবটা নিয়েছে। লীলার জন্য তার দরদ দেখলে মনে মনে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। সময়ে স্নান নেই, আহার নেই, রাত্রে নিদ্রা নেই, পরিশ্রম ক্লান্তি নেই। দেহ কৃশ হয়ে গিয়েছে, রুক্ষ চুলের বোঝা কপালের উপর অযত্নবিন্যস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্ভাবনায় তার চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে। তবু তার সেবার বিরাম নেই। লীলা যখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করে তখন তাকে একটু শান্তি দেবার জন্যে ললিত অধীর হয়ে ওঠে, আবার সে যখন একটু স্থির হয়, তখনও সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না। নানা অশুভ চিন্তা তার মনকে মসীময় ক'রে তোলে। কখনও অনভিজ্ঞ হাতে নাড়ী পরীক্ষা করতে যায়, কখনও নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমত বইছে কি না। এক এক সময় কোনও কাল্পনিক কারণে হঠাৎ আতঙ্ক-চঞ্চল হয়ে রোগীর হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে বসে।

লীলা মাঝে মাঝে অনুযোগ ক'রে বলে—তুমি দিনরাত অমন ক'রে খাটলে শরীর টিক্‌বে কেন, সর্ব্বক্ষণ একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে না-থেকে এক-একবার বাইরে যেতে পার না? ললিত হেসে বলে—এইটুকুতেই আমার শরীর খারাপ হয় না লীলা, বিশেষতঃ তোমার জন্য পরিশ্রম করাটা আমার পরিশ্রমই মনে হয় না। তোমার শান্তির জন্য আমি এর চেয়ে অনেক বেশী সহ্য করতে পারি। জান নাকি লীলা তোমার সুখের জন্য আমি নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করতে পারি। লীলা বলে—তা কি আর আমি জানি না, কিন্তু আমার জন্য তোমার এত কষ্ট করবার দরকার কি, আমার তুচ্ছ জীবনের কিই বা দাম; তা ছাড়া মেয়েমানুষের প্রাণ ত সহজে যাবার নয়।

তা লীলা যাই বলুক ললিত তার কথা কানেই তোলে না, সে আরও নিবিড় উদ্যমে রোগীর পরিচর্য্যা করতে আসে।

একদিন লীলার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ল। দুর্ব্বলতা ত আছেই, তার উপর একটা নূতন উপসর্গ জুটে রোগীর অস্থিরতা অতিমাত্রায় বাড়িয়ে তুলেছে। হঠাৎ তার গালগলা ফুলে শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া পর্য্যন্ত অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বিকালে ডাক্তার এসে নূতন ব্যবস্থা ক'রে গেল, কিন্তু রাত বারোটার মধ্যেও রোগীর অবস্থার কোনো উন্নতি দেখা গেল না। ক্রমে যন্ত্রণা এমনি বেড়ে উঠ্‌ল যে ললিতের ভয় হ'তে লাগল বুঝিবা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে কখন কি হয়। ডাক্তারকে এখনই ডাকা দরকার, কিন্তু চাকরকে পাঠালে এত রাত্রে ডাক্তার আসবে কিনা সন্দেহ। অথচ এ-অবস্থায় রোগীর কাছ ছেড়ে যেতেও তার প্রাণ চাইছে না।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে তাই করতে হ'ল। ঝিকে লীলার কাছে বসিয়ে রেখে ললিত নিজেই ডাক্তারের বাড়ি ছুট্‌ল। সেখানে পৌঁছে কিন্তু শুন্‌লে ডাক্তার বাড়ি নেই, কল্‌কাতার বাইরে একটা 'কলে' গিয়েছেন। রাস্তা থেকে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে সে আবার হ্যারিসন রোডে ডাক্তার সেনের বাসায় এসে উপস্থিত হ'ল। ডাক্তার সেন বাসাতেই আছেন বটে কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমে তিনি বড় ক্লান্ত, এত রাত্রে বাইরে যেতে চান্ না। অবশেষে অনেক হাতে পায়ে ধ'রে, অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে তাঁকে রাজী করতে পারা গেল।

রাস্তায় অনেকটা দেরি হয়ে গেল। ট্যাক্সিতে আস্‌তে আস্‌তে নানা দুর্ভাবনায় ললিত অস্থির হয়ে উঠল। কে জানে বাড়ি গিয়ে লীলাকে কি অবস্থায় দেখবে। বাড়িতে ঢুক্‌তে তার ভয় করছিল। চারি দিক নিস্তব্ধ; তবু তার মনে হচ্ছিল যেন উপরতলা থেকে একটা মৃদু ক্রন্দনের স্বর আসছে। ঝি কাঁদছে না কি! ললিতের বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। অন্ধকার সিঁড়িতে দেশলাই জ্বেলে সে ডাক্তারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—তার হাত কেঁপে গিয়ে দেশলাই নিবে গেল। সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে দ্রুতপদে সে রোগীর ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ারে অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল।

ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। নিবিষ্ট মনে অনেক ক্ষণ দেখবার পর বাইরে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুলেন। ললিত পিছন-পিছন এসে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর অভিমত শোন্‌বার জন্য। বেশ ভাল ক'রে হাত ধুয়ে মুছে পকেট থেকে একটা শিশি বার ক'রে নিজের কাপড়-চোপড়ে কি একটা আরক ছিটিয়ে দিয়ে ডাক্তার ললিতের দিকে ফিরে চাইলেন।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বঙ্গে বর্ষা

শ্রীশৈলেশ রাহা

—ইনি আপনার স্ত্রী?

—আজ্ঞা হ্যাঁ।

—দেখুন অসুখটা সোজা নয়, সারিয়ে দিতে পারব এ-কথা জোর ক'রে কোনো ডাক্তার বলতে পারেন না। তবে ওঁর যন্ত্রণা উপশম করা এখনই দরকার এবং সেই চেষ্টাই আগে করা উচিত।

এ-কথা শুনে ললিত অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল, জিজ্ঞাসা করলে—তবে কি ওর সারবার আশা মোটেই নেই?

—সারবার আশা নেই এ-কথা কোন অবস্থাতেই বলা উচিত নয়। তবে এ ব্যায়রামে বড়-একটা লোকে বাঁচে না। যাই হোক্ আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না। দেখুন ওঁর যা হবার তা ত হবেই—ভগবান ছাড়া আর কেউ কিছু করতে পারবে না, কিন্তু আপনাদের জন্যই আমার বেশী ভাবনা হচ্ছে।

—আমাদের জন্য! কেন?

—ব্যায়রামটা অত্যন্ত সংক্রামক—প্লেগ। একটু অসাবধান হলেই আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। আর জানেনই ত ও-রোগ একবার হ'লে—। সুতরাং খুব সাবধানে থাকবেন। আমার সঙ্গে এক জন লোক দিন, দুটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। গুঁড়োটা তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন, আর শিশির ওষুধটা এখনই পাঁচ ফোটা খাইয়ে দেবেন। তা হ'লে যন্ত্রণাটা কিছু কমবে এখন। কিন্তু খুব সাবধান বেশী যেন না খাওয়ানো হয়। ওটা এমনি বিষ যে পাঁচ ফোটার জায়গায় দশ ফোঁটা খাওয়ালে আর কিছুতেই রোগীকে বাঁচানো যাবে না। আচ্ছা চললুম তা হ'লে—

'ফি'টা পকেটে ফেলে ললিতের চাকরকে সঙ্গে ক'রে ডাক্তার বিদায় হলেন। ললিত তাঁকে দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসে লীলার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল 'প্লেগ'—ডাক্তারের সাবধান-বাণী। নিজেও সে জানত প্লেগের মত ভীষণ সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধি আর নেই। একটা অননুভূতপূর্ব্ব ভয়ে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে লীলার ঘরে না-ঢুকে ফিরে এল।

ডাক্তার চ'লে যাবার পর বার ঘণ্টার মধ্যে ললিত লীলার ঘরে মাত্র একবার ঢুকেছিল ওষুধ খাওয়াতে। ওষুধটা খাওয়াবার পর থেকে লীলার অস্থিরতা একটু কমেছে, কিন্তু সে কেমন আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে! অনেক ডাকাডাকির পর তবে একটু হুঁস হয়, তখন একটু পথ্য তাকে কোনও রকমে গেলান যায়। এ সকল কাজ ঝিই করে—সে জানে না লীলার কি অসুখ। ললিত মাঝে মাঝে ঝিকে বাইরে ডাকিয়ে লীলার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু নিজে আর কিছুতেই তার ঘরে ঢুকতে ভরসা করে না। শেষ-রাত্রে যখন একবার ঢুকেছিল দু-মিনিটের বেশী সে-ঘরে সে কাটায় নি। তাড়াতাড়ি ওষুধটা খাইয়ে দিয়েই বাইরে এসে সাবান দিয়ে হাত-পা ধুয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলে। বাজার থেকে সংক্রামকতা নিবারণের নানা রকম ওষুধ কিনে এনে ঘরে-দোরে, নিজের কাপড়-জামায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঢেলেছে তবু তার ভয় ঘোচে নি। যতই বেলা প'ড়ে আসতে লাগল ততই তার আতঙ্ক বেড়ে যেতে লাগল। ক্রমে নিজের প্রাণের ভয় তার অন্তরকে এমন ক'রে অধিকার ক'রে ফেললে যে সেখানে আর লীলার ভাল-মন্দের চিন্তার স্থান রইল না।

সন্ধ্যার সময় ঝি এসে খবর দিল লীলার ঘুম ভেঙেছে, সে ললিতকে খুঁজছে। এ-কথা শুনে ললিত অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ল। লীলার ঘরে ঢোকবার তার মোটেই ইচ্ছা নেই, কিন্তু সে যে ভয় পেয়েছে এ-কথাও স্ত্রীকে জানতে দিতে চায় না। কি ওজর ক'রে এখন ওর কাছ থেকে দূরে থাকা যায় সে-কথা ভেবে না-পেয়ে ঝিকে বললে—আচ্ছা, তুমি যাও আমি যাচ্ছি।

কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল তবু সে স্ত্রীর ঘরের দিকে গেল না দেখে লীলা তাকে আবার ডেকে পাঠাল। এবার চুপ ক'রে বসে থাকা অসম্ভব। বরাতে যাই থাক এখনই লীলার কাছে না গেলে উপায় নেই। হঠাৎ লীলার ওপর তার অত্যন্ত রাগ হ'ল। ও ত বাঁচবেই না, তবে কেন মরতে দেরি ক'রে অনর্থক অপরের জীবন সংশয় করে। ও যদি তাড়াতাড়ি মারা যায় তবে ত ওকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয় না, তা ছাড়া রোগ সংক্রামিত হওয়ারও সময় থাকে না। ললিত আর ওকে বাঁচাবার মিথ্যে চেষ্টা করবে না,—তাতে ওর যন্ত্রণার মিয়াদ বাড়ানো ও আর সকলের জীবন বিপন্ন করা ছাড়া অন্য লাভ কিছুই হবে না। আশু মৃত্যুই এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

অতিকষ্টে খানিকটা মনের জোর সংগ্রহ ক'রে ললিত লীলার কাছে চলল। কিন্তু তার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত পৌছেই আবার তার সমস্ত সাহস অন্তর্ধান করল। ইচ্ছা হ'ল সেইখান থেকেই সে ফিরে আসে, কিন্তু লীলা তাকে তখন দেখে ফেলেছে। এ অবস্থায় ফিরে আসার উপায় নেই। বাধ্য হয়েই সে ঘরের মধ্যে ঢুকল। লীলা তার দিকে তাকিয়ে একটু ক্ষীণ হাসি হেসে বস্'তে বললে, কিন্তু ললিত যেন শুন্‌তেই পায় নি এমন ভাবে এসে লীলার মাথার দিককার জান্‌লাটা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লীলা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তোমার শরীরটা কি আজ ভাল নেই—বড্ডই শুক্‌নো-শুক্‌নো দেখাচ্ছে যেন?

—না, অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি বটে তবে ভাবনা-চিন্তা—

—শরীরের ওপরও কি অত্যাচার কম হচ্ছে? আমারই জন্যে তোমার এত কষ্ট দেখলে অন্য সময় আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতুম না। কিন্তু অসুখটা হয়ে আমার শরীর মন এমনই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে স্বার্থপরের মত কেবলই তোমায় দুঃখ দিচ্ছি। তুমি কাছে না থাকলে আমি এক দণ্ডও স্থির থাকতে পারি না। তুমি এখান থেকে কোথাও যেও না। ঝি-চাকরে সব কাজ করবে-এখন—তুমি এখানেই বিশ্রাম কর।

—বিশ্রাম করবার আমার মোটেই দরকার নেই, আমাকে এখনই একবার ডাক্তারের বাড়ি যেতে হবে—চাকরটা ত সব কথা বুঝিয়ে বলতে পার্‌বে না।

—না না, ও ঠিক পারবে। না-হয় একখানা চিঠি লিখে ওর হাতে দিয়ে দাও। তাছাড়া রাত্রে ত ডাক্তার নিজেই আস্‌বে। তুমি কোথাও যেও না লক্ষ্মীটি।

কি মুস্কিল! ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই সংক্রামিত ঘরে বসে থাকতে হবে? তার চেয়ে মৃত্যুর বিবরে মাথা গলানও ত নিরাপদ। ললিত অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ল, তার মুখ শুকিয়ে উঠল। হঠাৎ মনে হ'ল যেন গলার কাছটা ব্যথা কর্‌ছে। সেখানটায় একবার হাত বুলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলে ফুলেছে কি-না। কিন্তু তার উত্তেজিত বুদ্ধি দিয়ে সে বুঝতে পারলে না এ-সব তার কল্পনা না সত্য। এক-একবার ইচ্ছা হচ্ছিল এক ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে যায় কিন্তু তাও সে পার্‌লে না। কি কর্‌বে ভেবে না পেয়ে অসহায়ের মত কেবল এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর নানা রঙের ওষুধের শিশিগুলা যেখানে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানে। সেদিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই সে লীলাকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার কি এখন খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

লীলা বল্‌লে—যন্ত্রণা ত সব সময়ই আছে, তবে মাঝে মাঝে যে-রকম অসহ্য হয়ে ওঠে এখন তেমনটা নেই।

—যন্ত্রণা কমবার ওষুধটা এখন আর একবার খাও না, তা হ'লে ওটুকুও যাবে'খন।

—এখন থাক্, বিশেষ দরকার হয় পরে খাব। ওটার এমনি বিশ্রী ঝাঁঝ—

—না, না, এখনই একবার খাওয়া ভাল—ব'লে স্ত্রীর সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই ললিত ওষুধ ঢালতে আরম্ভ করলে। তার হাত এত কাঁপছিল যে ফোঁটাগুলো সে ঠিক ক'রে ঢালতে পার্‌লে না। পাঁচ ফোঁটার জায়গায় প্রায় পনরো ফোঁটা ওষুধ গ্লাসের মধ্যে পড়ল। কিন্তু সেদিকে সে নজর দিলে না, ডাক্তারের সতর্কতার বাণীও বোধ হয় তার মনে পড়ল না। গ্লাসটা সে লীলার দিকে এগিয়ে ধর্‌লে।

লীলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—বাস্তবিক তুমি আমার জন্যে এত ভাবো, এত ভালবাস যে আমিও তোমায় বোধ হয় অত ভালবাস্‌তে পারি নে। একথা আজ আমার স্বীকার করতে একটুও বাধছে না। আমায় একটু উঁচু ক'রে ধর্‌বে, তা হ'লে ওটা খেতে সুবিধে হবে।

এখন আর রোগের ভয়ে ললিত ইতস্ততঃ না ক'রে বাঁ-হাতটা স্ত্রীর পিঠের নীচে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে একটু তুললে, তার পর ওষুধের গ্লাস তার মুখে ধর্‌লে।

ওষুধ খেয়ে লীলা হাঁপিয়ে ওঠবার মত হয়ে মুখটাকে বিকৃত করলে। ললিত জিজ্ঞাসা করলে—ওটা খেতে কি তোমার বড্ডই কষ্ট হ'ল।

চেষ্টা ক'রে একটু হাসির ভাব টেনে এনে লীলা বললে—কষ্ট? না কষ্ট আর কি! এমন ক'রে তোমার কোলে শুয়ে তোমার হাতে বিষ খেতেও আমার কষ্ট হয় না।

শান্তিনিকেতন, দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১॥০ টাকা, বাঁধান ২৲ টাকা।

'শান্তিনিকেতন' পুস্তকখানির প্রথম খণ্ড প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক আকারের ৩০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। তাহার পর আরও ৩৫৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। প্রকাশক তাঁহার নিবেদনে জানাইয়াছেন, ১৩১৫ সালে 'শান্তিনিকেতন' প্রথম বাহির হয়। ১৩২১ সাল অবধি ইহা ১৭ খণ্ড পুস্তিকায় বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। তার পরের কুড়ি বৎসরের ধর্ম্মব্যাখ্যানগুলি নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ১৭ খানি 'শান্তিনিকেতন' পুস্তিকার অন্তর্গত ও নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান সমস্ত সংগৃহীত হইলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহা হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচন ও সংশোধন করেন। তাঁহার এই মনোনীত লেখাগুলি 'শান্তিনিকেতন' নাম দিয়া দুই খণ্ডে অধুনা প্রকাশিত হইল।

এই ব্যাখ্যানগুলি আত্মিক কল্যাণ ও আনন্দের উৎস। প্রাচীনের সহিত শ্রদ্ধার যোগ রাখিয়া, প্রাচীন উপনিষদাদির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, অথচ স্বীয় স্বাধীন মননের অধিকার ত্যাগ না করিয়া অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি এই সকল ব্যাখ্যান পাঠকদিগকে দান করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে কবি ঋষি হইতে পারিতেন, ঋষিও কবি হইতে পারিতেন, এবং উভয়েই দার্শনিক পদবাচ্য হইতে পারিতেন;—কেমন করিয়া, তাহা রবীন্দ্রনাথের বহু গদ্য রচনা ও কবিতা হইতে উপলব্ধি করা যায়।

শেষ সপ্তক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পুরু চিক্কণ কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা, প্রবাসীর মত পৃষ্ঠার ১৭০ পৃষ্ঠা। মনোজ্ঞ কাপড়ের প্রচ্ছদপট, তাহাতে কবির হস্তাঙ্কিত পুস্তকের নামচিত্র।

এই গ্রন্থে ছেচল্লিশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলির 'ছন্দ' মিত্রাক্ষর নহে, অমিত্রাক্ষরও নহে;—গদ্যের মত, কিন্তু পড়িতে জানিলে ইহার সঙ্গীত অনুভূত হয়। পুস্তকটি সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গে আরও কিছু লিখিত হইল।

র.

বালির বাঁধ—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত। আর. এইচ. শ্রীমানী এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, তাঁহার রচিত আরও কয়েকখানি উপন্যাস পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া পাঠকসমাজে আদৃত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি গ্রন্থকারের রচিত আর একখানি উপন্যাস। বর্ত্তমান যুগের কয়েকটি সমস্যা এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। নানা অভিনব আবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া বর্ত্তমান তরুণ-তরুণীগণ জীবনের পথে যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া থাকে, তাহাদের আলোচনা যথার্থ সাহিত্যিকের কার্য্য। উপন্যাসখানি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সুপাঠ্য। ভাষা বেশ মার্জ্জিত। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ সুন্দর।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

যুগাচার্য্য মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ—মাননীয় বিচারপতি স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সহ, শ্রীজ্যোৎস্নাময় বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

সাধু ভক্তের জীবনী আলোচনা সকলেরই কল্যাণকর। গ্রন্থখানি মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের ভক্তদিগেরই নিত্যপাঠ্যরূপে লিখিত হইলেও সকলেই তাঁহার জীবনী ও উপদেশ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

জ্ঞানপ্রবেশিকা—রায়-সাহেব শ্রীমহিমচন্দ্র বটব্যাল প্রণীত, ১ নং দয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় রোড, হাওড়া, দুর্গাবাটি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ মাত্র।

এই পুস্তকে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহাদির উৎপত্তি, উপাসনা ইত্যাদি বিষয়ে বেদান্তাদি শাস্ত্রের মত সংক্ষেপে নিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

দশের দাবী—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। রামেশ্বর এণ্ড কোং, চন্দননগর। দাম এক টাকা।

হরিজন-সমস্যা লইয়া ক্ষুদ্র অথচ সুলিখিত নাটক। আমাদের দেশসেবার বড় বড় নামের পিছনে অনেক সময়ে যে নিতান্তই ফাঁকা আড়ম্বর তাহা অবশ্য সকলেই জানেন; যাঁহাদের নিকটে দেশভক্তি শুধু "ফ্যাশান" বা সাময়িক চিত্তবিকার, লেখক প্রাচীন গ্রীক নাট্যসাহিত্যের স্থান-কালসম্পর্কিত বিধান সুকৌশলে পালন করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু দয়ালের মত যাঁহাদের আদর্শবাদ কার্য্যে পরিণতি লাভ না করিয়া তৃপ্ত হয় না, তাঁহাদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। গাছের গোড়ায় কুড়ুল মারিয়া আগায় জল ঢালিলে হইবে কি? যাহাদের সমান জায়গায় দাঁড়াইবার সাহস নাই, যাহাদিগকে নিজেদের স্থানে অর্থসামর্থ্যের দিক দিয়া টানিয়া উঠাইবার সাধ্য নাই, তাহাদিগের মধ্যে পাঠশালা খুলিলে, চরখা প্রচার করিলে কি হইবে? দুরবস্থা ত ঘুচিবে না—বরং অনর্থক আদর্শবিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়া বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইবে। "মানুষের ময়লা মানুষ কেন ফেলবেক্ হে! উয়াদের ময়লা তোদিগে ফেলতে হচ্ছে নাই, তোদেরটা উয়ারা কেন ফেলবেক্? বল্! জবাব দে!" লেখক সমস্যাটি সুন্দরভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, এবং মহিম প্রফুল্ল নিশানাথের চরিত্রে প্রভেদও সুকৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। নাট্যকারের ভাষা সহজ সঙ্গত ও সতেজ।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

ইছলামের ইতিবৃত্ত—খান বাহাদুর আহছান উল্লা, এম্‌-এ, আই-ই-এস। প্রকাশক—আহছান উল্লা বুক্‌ হাউস্‌, লিঃ, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ৩১৪, মূল্য ১৷৹

লেখক কোরাণ প্রভৃতির ভাষার কোন স্থানে অনুবাদ করিয়াছেন, কোন স্থানে বা করেন নাই। অনুবাদের এই স্বেচ্ছাচারিতায় ও "পারশু," "পারস্ত" প্রভৃতি বর্ণবিন্যাসের দোষে বইখানির ভাষা দুষ্ট হইয়াছে। কথ্য ভাল না হইলেও তথ্যের দিক দিয়া বইখানিতে অনেক জানিবার কথা আছে। বাঁধা ও ছাপা ভাল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

মানুষের গন্ধ পাই—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। সচিত্র। দাম এক টাকা।

ছেলেদের বই। আফ্রিকার জঙ্গলের নরখাদক সিংহ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী। দুটো মানুষ-খেকো সিংহ প্রতি রাত্রে তাঁবুর ভেতর থেকে কেমন ক'রে মানুষের পর মানুষ ধরে নিয়ে যেত তার কাহিনীটি বড়ই ভয়াবহ। বইখানি ইংরেজীর অনুবাদ। ভূত-প্রেতের আজগুবি গল্পের চেয়ে ছেলেমেয়েদের এই ধরণের গল্প শোনানর সার্থকতা আছে।

এলোমেলো—শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত। প্রকাশক—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৷৹

সচিত্র ছেলেদের বই। বইখানির পরিকল্পনা শিশু-মনের বেশ উপযোগী হয়েছে; গল্প-বলার ভঙ্গী অতি চমৎকার। ভাষা সরল ও মনোরম। ছেলেমেয়েরা এই বইখানি পড়ে খুব আমোদ পাবে।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

শরৎ-বন্দনা—শ্রীনরেন্দ্র দেব কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মদিবস উপলক্ষে স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ এই বইখানি শরৎ-বন্দনা সমিতির সাহিত্য-বিভাগের পক্ষ হইতে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৪ জন নানা শ্রেণীর লেখকের লেখায় বইখানি ২৪৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কতকগুলি শরৎচন্দ্রের লেখার সমালোচনা; কতকগুলি তাঁহার জীবনের টুকরা টুকরা ইতিহাস, কতকগুলি কাব্যার্ঘ্য। বলা বাহুল্য, সমালোচনাগুলি সবই অনুকূল, এ ধরণের পুস্তকে প্রতিকূল সমালোচনা দেওয়া চলিতই না।

বইখানি চমৎকার লাগিল, এবং বেশ স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে ইহা বাংলা-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। সম্পাদকের নিবেদনে বলা হইয়াছে এক মাসের মধ্যেই বইখানির রচনা সংগ্রহ, ছাপা, বাঁধাই—সবই করিতে হইয়াছে, এ সত্ত্বেও এর রচনা-সমৃদ্ধি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় শরৎ বাবু বাংলা দেশের মন কি ভাবে দখল করিয়া রহিয়াছেন।

বেইমান—শ্রীব্রজমোহন দাশ। কমলিনী সাহিত্য-মন্দির, ৫ সাউথ রোড, ইটালী। মূল্য ১৲।

উপন্যাস। সস্তা ভাবুকতায় ভরা। ঘটনায় ঘোরপ্যাঁচ আছে, তবে চরিত্রগুলি এমনই পুতুলের মত অজটিল যে ঘটনার পরিণাম পূর্ব্ব হইতেই চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে।

ছাপায় একটু-আধটু ভুল আছে। প্রচ্ছদপট, বাঁধাই, কাগজ ভাল।

আত্মারামের কাহিনী, ১ম খণ্ড—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্প্রতি আত্মজীবনীর সঙ্গে কল্পনা মিশান অনেকগুলি উপন্যাস বাংলা ভাষায় বাহির হইয়াছে। এ ধরণের উপন্যাসের একটা প্রকৃতি-গত সুবিধা এই যে ইহাতে প্রত্যক্ষ দর্শনের একটা স্পষ্টতা ও সজীবতা থাকে। ভাল লেখকের হাতে পড়িলে এরূপ পুস্তক যে কত সুন্দর হইতে পারে Dickens-এর David Copperfield তাহার উদাহরণ।

আলোচ্য বইখানি এইরূপ একটি আত্মচরিতমূলক উপন্যাস। লেখক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া নাট্য-সাহিত্যে, সুপরিচিত। বইখানি, ঐতিহাসিক তথ্যে (ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের) বিচিত্র চরিত্রে, বিচিত্র ঘটনায়, মিঠা, কটু নানান রসে পূর্ণ একখানি সাহিত্যের জাহাজ বলিলেও চলে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কারসাজি দেখিলাম, গোড়াপত্তন থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতা দেখিলাম, অনেক বাংলা ইডিয়মের জন্মকাহিনী শুনিলাম, আর এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে "আত্মারাম" যখন নীলা বাইজীর দোরগোড়া থেকে পিঠটান দিল, তখন নীতির কথা ভুলিয়া দুঃখিতই হইয়া পড়িয়াছিলাম; তবে সান্ত্বনা এইটুকু রহিল যে দ্বিতীয় খণ্ডে আবার তাহার মোলাকাৎ পাওয়া যাইবে।

গোলার আড্ডা কোর্ট উইলিয়ামের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গুলির আড্ডা "শ্যামবাজার কোর্ট" এক আজগুবি জিনিষ। বাংলা-সাহিত্যে এর জুড়ি কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

লেখার ভঙ্গি সাদামাটার উপরে বেশ জোয়াল। কথাবার্ত্তা বেশ সজীব, মনে হয় চরিত্রগুলি যেন সামনে আসিয়া চলা-ফেরা, ওঠা-বসা করিতেছে। এখানে লেখকের "নাটুকে" হাত বেশ কাজে আসিয়াছে।

বেশীর ভাগ চলতি কথাই আজকাল সাহিত্যের আসরে অভিজাত শব্দাবলির সঙ্গে কলিকা পাইতেছে। সে ক্ষেত্রে বড় বেশী বৈশেষিক চিহ্ন (inverted commas) দেওয়ার ছাপার দিক দিয়া বইখানি অযথা একটু জবরজঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, ছাপায় কিছু কিছু ভুলও থাকিয়া গিয়াছে। বাঁধাই প্রভৃতি চলনসই। মূল্য ২৲

মানুষ ও দেবতা—শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতী পাবলিশিং হাউস, ১৩ অদ্বৈত মল্লিক লেন। মূল্য ১৷৹

একটি অতিরিক্ত খামখেয়ালী নায়িকা সৃষ্টি করিতে গিয়া লেখক নিজেও যেন টাল সামলাইতে না পারিয়া খামখেয়ালী হইয়া গিয়াছেন, ফলে গল্পের মধ্যেও একটা বাঁধুনি আসে নাই, চরিত্রগুলির মধ্যেও সঙ্গতি প্রকাশ পায় নাই।

তবে লেখকের ভাষার উপর দখল আছে, সতর্কতা অবলম্বন করিলে তাঁহার নিকট ভাল জিনিষ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম—সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত। প্রকাশক, অমূল্যগোপাল মজুমদার, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৫৬।

গ্রন্থকার মূল পারস্য রুবেয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম হইতে এই অনুবাদ করেন নাই। তিনি ফিটজেরাল্ডের ইংরেজী ওমর খৈয়াম হইতে এই তর্জ্জমা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ফিটজেরাল্ড তাঁহার অনুবাদে মূল পারস্য ওমর খৈয়ামের হুবহু অনুবাদ করেন নাই। তিনি ওমর খৈয়ামের সমস্ত রুবাদগুলির ভিতরে একটি মিলন-সূত্র মনে মনে রচনা করিয়া, ওমর খৈয়ামের সবগুলি পদকে নিজের ইচ্ছামত চয়ন করিয়া, সেই সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহাতে অনেক আগের পদ পরে আসিয়াছে, পরের পদ আগে আসিয়াছে। কোন কোন মূল শ্লোককে তিনি বাদ দিয়াছেন। এইভাবে মাল্যরচনা করিয়া তিনি ইহাদিগকে ইংরেজী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছেন। তাই ফিটজেরাল্ডের ইংরেজী অনুবাদে যে রস পাওয়া যায় মূল পারস্য ওমর খৈয়ামে সে রস পাওয়া যায় না। ফিটজেরাল্ডের ইংরেজী ওমর খৈয়াম বর্ত্তমান নাস্তিক ইউরোপের ভাবধারার সহিত সমানে পা ফেলিয়া চলে। প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদেও তিনি মূলকে হুবহু গ্রহণ করেন নাই। এই জন্য যাঁহারা মূল পারস্য হইতে ওমর খৈয়ামকে হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহাদের অনুবাদ ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের মত ততটা লোকপ্রিয় হয় নাই।

সতীশবাবু ফিটজেরাল্ডের এই ইংরেজী তর্জ্জমা হইতে তাঁহার পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কান্তিবাবু ফিটজেরাল্ড হইতে এক বাংলা তর্জ্জমা পুস্তক প্রকাশ করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি অনুবাদে মাঝে মাঝে আরবী পারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া আগাগোড়া সমস্ত পুস্তকখানাতে পারস্যদেশীয় একটা পারি-পার্শ্বিকতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ-পুস্তক পড়িলে বসরাই গোলাপের সুগন্ধের সহিত বুলবুলের সুমিষ্ট সঙ্গীত আমরা শুনিতে পাই।

সতীশবাবুর অনুবাদে ওমর খৈয়াম বাঙালী হইয়া গিয়াছেন। বাংলার তুলসীমঞ্জরীর সুগন্ধের সহিত তিনি গোলাপফুলের গন্ধ মিলাইয়াছেন। এই অনুবাদের প্রথম দিকটা আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। ছন্দের সাবলীল গতি ও প্রকাশ-ভঙ্গীমায় সহজ প্রসাদগুণে শ্লোকগুলি আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। শেষের দিকের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদে লেখক আর একটু দৃষ্টি দিলে ভাল করিতেন।

জসীম উদ্‌দীন

প্রাচীন ধ্রুপদ স্বরলিপি—১ম ও ২য় ভাগ। শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

গ্রন্থকার প্রাচীন ধ্রুপদগুলির সহিত বর্ত্তমান যুগের গায়কগণের পরিচয় করাইয়া দিবার শুভ উদ্দেশ্য লইয়া পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন। ১ম ভাগের ভূমিকাতে অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, 'স্বরসাধনার কৃচ্ছ্রতার ভয়ে আজকাল অতি অল্প লোকেই ও পথে যাইয়া থাকেন, অথবা শতকরা একজনও যান কিনা সন্দেহ, হারমোনিয়মের স্কন্ধে ভর দিয়া স্বরবিষয়ে নিজের পঞ্চত্বগোপনে সকলেই শশব্যস্ত'' কথাগুলি অনেকাংশে সত্য। গ্রন্থকার এক জন প্রাচীনপন্থী প্রসিদ্ধ গায়ক; জীবনের অপরাহ্ণে তিনি যে তাঁহার জানা গানগুলি এই ভাবে স্বরলিপি করিয়া রাখিয়া গেলেন, তাহাতে মেধাবী ভাবী সঙ্গীত-শিক্ষার্থিগণ উপকৃত হইবে আশা করা যায়। স্বরলিপির প্রণালী ও তাল-আদি আরও সহজবোধগম্য করিয়া লিখিলে বেশী উপকার হওয়ার আশা করা যাইত। ধ্রুপদ গান ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, গ্রন্থকারের চেষ্টা কতটা ফলপ্রদ হইবে বলা যায় না।

শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

জলধর-কথা—সম্পাদক শ্রীব্রজমোহন দাশ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ২৲

"রায় বাহাদুর জলধর সেনের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মতিথিতে বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাগণের শ্রদ্ধা নিবেদন ও নানা প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দন"—পুস্তকের পরিচয়-স্বরূপ এই কথা বলা হইয়াছে। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ যে "কয়েক ছত্র অর্ঘ্যরূপে" পাঠাইয়াছেন তাহা স্থান পাইয়াছে। তার পর বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ও স্বল্প-পরিচিত বহু ব্যক্তির রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে অনেকে যে ভাবে শ্রীযুক্ত সেন-মহাশয়কে "সার্টিফিকেট" দিয়াছেন তাহা নিতান্ত অশোভন হইয়াছে। কেহবা আবার রসিকতার নামে ভাঁড়ামির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের জলধর-কথা (জীবনী ও লেখপঞ্জী) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত-মহাশয় হয়ত ইহাকে নির্ভুল বলিয়া দাবি করেন না। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় ১৩৪১ সনের আষাঢ় মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, পরিষদের উৎসাহী সভ্য পণ্ডিত-মহাশয় তাহার উল্লেখ করেন নাই। সওগাত, খোকাখুকু, মৌচাক ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত সেন-মহাশয়ের শিশুপাঠ্য কতিপয় রচনার উল্লেখও ইহাতে নাই।

সন্তরণ পরিচয়—শ্রীশান্তি পাল। কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ আনা।

সাঁতার কাটিতে শিক্ষা করা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। নদীবহুল বাংলা দেশে সন্তরণের বহুল প্রচার থাকিলেও ব্যায়াম-হিসাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কখনও ইহার অনুশীলন হয় নাই। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া এ-দিকে বাঙালীর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শান্তি পালের সন্তরণ-পরিচয়ের প্রকাশ সময়োপযোগী হইয়াছে। বাংলা ভাষায় সন্তরণ-সম্পর্কে ইহাই প্রথম গ্রন্থ। তিনি নানা চিত্র সহযোগে সহজ ও সরল ভাষায় কলিকাতায় সন্তরণ-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রফুল্লবাবুর কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ, এবং সন্তরণ-সম্পর্কে বলা-কৌশল বিবৃত করিয়াছেন। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

ছায়া—শ্রীশান্তি পাল। দি বুক এজেন্সী, ৩৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা। কাপড়ের বাঁধাই। পৃ. ৭০।

নানা ধরণের মোট ৬৬টি কবিতায় বইখানা সাজানো হইয়াছে। এই কবিতাগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। নবীন কবি ছন্দে দক্ষতা দেখাইয়াছেন এবং বিষয়বস্তুতেও বহু বৈচিত্র্য আছে। এই জন্য কোথাও একঘেয়েমি লাগে না। ইহার মধ্যে পল্লী-কবিতাগুলি সত্য সত্যই চমৎকার, পল্লীর প্রতি একটি অনির্ব্বচনীয় মধুর প্রীতি লেখকের অনেকগুলি কবিতাকে রসসিক্ত করিয়াছে।

'বর্ষা' 'শারদে' 'ভাদরে' প্রভৃতি কবিতায় পল্লীর নব নব প্রকার ছবি ফুটিয়াছে; পল্লীলক্ষ্মী যেন মূর্ত্তি ধরিয়া পাঠকের সামনে আসিয়া দাঁড়ান। লেখকের দেখিবার চোখ আছে, অন্তরে দরদ আছে, আমরা এই নবীন কবির রচনায় আশান্বিত হইলাম।

শ্রীমনোজ বসু

ক্ষণিকের অতিথি—শ্রীসীতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস, ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসগুলি পড়িতে নানাকারণে সব সময়ে সাহস পাই না। একটা কারণ, উপন্যাস সম্বন্ধে আমার মনে কতকগুলি ধারণা আছে সেগুলিতে আঘাত লাগিবে এই ভয়। আর সকল সময়েই সমস্যাপূর্ণ জটিল চরিত্রচিত্রবহুল উপন্যাস পড়িতে ইচ্ছাও করে না, অবসরও পাই না, দিনের কর্ম্মের অবসরে মাঝে মাঝে এমন একটি উপন্যাস চাই যাহা পড়িতে কোথাও বাধে না, যাহা এক নিঃশ্বাসে আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিতে পারা যায় এবং যাহার ঘটনার স্রোত বা চরিত্রের ধারা বুঝিতে বুদ্ধির খরচ করিতে হয় না। কিন্তু আজকাল দেখিতেছি মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় অনেক আধুনিক উপন্যাস ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। ফলে অনেক সময়ে সেগুলি না-হইতেছে উপন্যাস না-হইতেছে মনস্তত্ত্ব।

গল্পের প্রতি আদিম কাল হইতেই মানুষের লোভ আছে, তাই পৃথিবীর শৈশবেই রূপকথার সৃষ্টি। তাহাতে মানুষের সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নার কাহিনী রহিয়াছে। কি আদিম কালে কি আজিকার এই দিনে এই কাহিনী মানুষের মনকে চিরদিনই আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। তাই আজ বাংলা দেশে উপন্যাসে সাহিত্যের বাজার প্লাবিত। কিন্তু সেগুলির কয়টি সত্য সত্যই রূপকথার সেই সহজাত গুণটি রক্ষা করিতে পারে? কোথায় তাহাদের মধ্যে সাবলীল গতি, কথার ভিতর দিয়া ছবি ফুটাইয়া তোলার ক্ষমতা, কোথায় সেই সহজ প্রসাদগুণ যাহা অতি প্রাচীন রূপকথাকে অতি নবীনকালেও আদৃত করিয়া রাখিয়াছে?

'ক্ষণিকের অতিথি' উপন্যাসখানি কিন্তু একবারেই পড়িয়া ফেলিয়াছি, সে পড়াও আবার অধিকাংশ সময়ে ট্রামে বসিয়া পড়া; ফলে গন্তব্যস্থল পিছনে পড়িয়া আছে, একেবারে ডিপোয় গিয়া হাজির হইয়াছি। সব কথাগুলাই যে পড়িয়াছি একথা হলফ করিয়া বলিতে পারি না, কারণ গল্পের উপর লোভ ছিল, তাহারই ঝোঁকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু বাদ দিতে হইয়াছে। শেষ পাতাটা দেখার লোভ কষ্টে সংবরণ করিয়াছি।

সুতরাং 'ক্ষণিকের অতিথি' বইখানি ভাল লাগিয়াছে বলিতে পারি। ইহার কথাবস্তুর ধারা প্রসাদপূর্ণ সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, কোথাও বাধে নাই। ইহার গল্পাংশ এই:—ধনীপুত্র সত্যশরণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হঠাৎ একদিনে কপর্দ্দকহীন নিঃস্ব হইল। তখন সে বর্ম্মায় গেল ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টায়। সেখানে গিয়া প্রথম দিনেই তাহার সামান্য বিত্তের একটা মোটা রকম অংশ খরচ করিয়া একটি অন্ধ্রদেশীয়া মেয়েকে নারীবিক্রেতার হাত হইতে উদ্ধার করিল। (বর্ম্মায় আজও এসব চলে নাকি?) তাহারই চেষ্টায় কনকাম্মা (মেয়েটির নাম) এক পরিবারে আয়ারূপে আশ্রয় লাভ করিল। এই কনকাম্মাই সত্যশরণের জীবনে ক্ষণিকের অতিথি। ইহার পরে সত্যশরণের জীবনে আর একবার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল তখন কনকাম্মার অর্থ তাহাকে লইতে হয়। সে অর্থ কনকাম্মা নিজেকে বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করে, কিন্তু সত্যশরণ তাহা প্রথমে জানিতে পারে নাই; যখন জানিতে পারিল তখন আর কনকাম্মার সন্ধান পাওয়া গেল না। উপার্জ্জন করিয়া একদিন কনকাম্মার সন্ধান করিবে, তাহার ঋণশোধ করিবে এই সঙ্কল্প লইয়া সত্যশরণ দেশে ফিরিল।

দেশে এক চাকরি সে পাইল; তাহার গৃহকর্ত্তা পূর্ব্বপরিচিত কুটুম্ব। সেই গৃহে বাস করিতে করিতে গৃহের দুহিতা তপতীকে সে ভালবাসিল; তপতীও তাহাকে ভালবাসিল; নানা কুণ্ঠার ভিতর দিয়া তাহাদের ভালবাসা পরস্পরের নিকট আত্মপ্রকাশ করিল ও তাহাদের বিবাহ স্থির হইল। সত্যশরণ তপতীকে কনকাম্মার কথা বার-বার বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না।

এমন সময়ে আর একবার কনকাম্মা সত্যশরণের জীবনে দেখা দিল নিরাশ্রয় হইয়া, এক চক্ষু হারাইয়া। সেদিন সত্যশরণের জীবনে তাহার অভ্যর্থনা হইবার উপায় নাই—তাহা বুঝিয়াই আর একবার স্বেচ্ছায় সে সেখান হইতে বিদায় লইয়া গেল।

বইখানির সকল চরিত্রই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে; তপতী ও কনকাম্মাকে বিশেষ করিয়া ভাল লাগিয়াছে। তপতীর পিতার বিরূপতা একটু আকস্মিক মনে হইল। আরও দু-এক জায়গায় দেখিয়া মনে হইল বইটি কি একটু তাড়াতাড়িতে লেখা?

শ্রীঅনাথনাথ বসু

কল্যাণী

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

ওই তার বাড়ি,—
—ঐ যে ঘেরিয়া আছে রাংচিতার সারি
আঙিনার সীমা। এককোণে কয়েকটি
কলাগাছ। অন্যধারে শিম বরবটি
ছড়াইছে ডালপালা বাঁশের মাচায়।
সায়াহ্নের সুমন্থর বাতাসে নাচায়
তার তাজা ডগাগুলি। পরিপুষ্ট শ্যাম
সঘন পল্লব শোভা নয়নাভিরাম।
তারি পাশে খুঁটিবাঁধা দেখায় গাভীর
সুচিক্কণ শুভ্ররোম স্থূলকান্ত স্থির
ছবিখানি। মাতা সুখে খায় তৃণজল,
কাছে আছে দাঁড়াইয়া বৎসটি কোমল;
মাঝে মা এক-একবার অঙ্গ তার চাটে,
দুধ খেতে খেতে বৎস গুঁতো মারে বাঁটে।
পিতলের ঘটি এক কুয়োতলাপাড়ে,
বাল্‌তি দড়িতে বাঁধা, শুখাইছে আড়ে
বেলাশেষে ধুয়ে-দেওয়া শাড়িখানি কার,—
জল্‌ জল্‌ করে তার গাঢ় কালো পাড়।
উঠানের মাঝখানে এক মোড়া ধান,
পায়রা শালিখ করি তণ্ডুল সন্ধান
পায়ে পায়ে ঘোরে ফিরে গ্রীবা বাড়াইয়া;
গৃহদ্বারে পিঞ্জরেতে পোষমানা টিয়া।
খড়কুটো ঠোঁটে তুলি ব্যস্ত টুনটুনি
করে শুধু ঘর-বার। টিনের ছাউনি,
কাঁচা ভিৎ বাস্তু-ঘর। বাঁধানো সিঁড়িতে
সাজানো ফুলের টব, দুয়ার শোভিতে
লতার কেয়ারি-তোলা অর্দ্ধচন্দ্রাকার;
কানাচ করেছে আলো মল্লিকার ঝাড়।
প্রায়-ই থাকে পশ্চিমের জানালাটি খোলা,
ওই দিকে চলে গেছে রিক্ত পথভোলা
ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠ; দিগ্বলয়-সীমা
বহুদূরে ছুঁয়ে আছে পিয়াসী নীলিমা।
পায়ে-চলা পথখানি পড়িয়া অদূরে,
মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে মেঠো বাঁশিসুরে।
রক্তচ্ছায়া সন্ধ্যারবি ধীরে অস্ত যায়,
ব্যথাতুর আলোরেখা পড়ে জানালায়—
দেখা দেয় একখানি কম কচি মুখ,—
তারি মাঝে ভাসে সেথা একান্ত উৎসুক
টানা দুটি কালো চোখ নিমেষবিহীন,
দিনান্তেরি সাথে যেন হ'তে চায় লীন
চিরপরিসমাপ্তির নৈঃশব্দ-পাথারে।
গৃহকাজে টানে মন,—তবু বারেবারে
চায় ফিরে। শেষে উঠে দেয় ঘর ঝাঁট,—
শুকানো কাপড়গুলি ক'রে রাখে পাট।
গাছে ঢালে জল, নেয় গাভীটি গোয়ালে;
দু-চারিটি পত্রপুষ্প একখানি থালে
সাজাইয়া রাখে যত্নে বসিবার ঘরে,
জ্বালে সন্ধ্যাধূপদীপ, যায় তার পরে
পাকশালে, প্রবীণা গৃহিণী মার সাথে
অন্নসুধা আয়োজনে লাগে হাতে হাতে।
ক্রমে রাত্রি বেড়ে ওঠে, চোকে খাওয়া দাওয়া,
কাজে কাজে কাটে কাল; অন্ধকার-ছাওয়া
আঙিনাটি পার হয়ে শয়নমন্দিরে
যায়, শয্যায় আশ্রয় লয়; পাশ ফিরে
বৃদ্ধা পিসি গুঞ্জস্বরে জোড়ে আলাপন;—
ক্লান্তি নামে সারা দেহে, ঢোলে দু-নয়ন,—
কত কী মনের কথা জ'মে হয় ভারী,—
প্রদীপ নিভায়ে দিয়ে ঘুমায় কুমারী॥

স্বরলিপি

গান

হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়া তব
নীরবে জাগো একাকী শূন্য মন্দিরে
কোন্ সে নিরুদ্দেশ লাগি
আছ চাহিয়া।
স্বপনরূপিণী আলোক সুন্দরী
অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী
তাহার মূরতি রচিলে বেদনায়
হৃদয় মাঝারে ॥

—শাপমোচন—

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

[ধপা ক্ষপা]

|| পা -া মগা সা | পা -া না -া | না -র্সা র্সর্গা র্রা | র্সনা ধনা র্সর্রা র্সা |
|| হে ০ বি০ র | হী ০ হা য় | চ ন্ চ০ ল | হি০ য়া০ ০০ ত |

| না -া -া ধপা | পক্ষা ক্ষধা পধা পক্ষা | -া গা গরা গরা | গা -পা -া -া |
| ব ০ ০ ০০ | নী০ র০ বে০ জা০ | ০ গো এ০ কা০ | কী ০ ০ ০ |

| মা -া গরা গা | মগা মপা মা গরা | রগা গা রসা -া | সা সা গা মা |
| ০ ০ ০০ ০ | শূ০ ০০ ন্য ম০ | ন্০ দি রে০ ০ | কো ন্ সে নি |

| পা -া পনা না | না -র্সা ধনা -পা | নর্সা নর্সর্গা র্রা র্সনা | ধ না ধপা -া ||
| রু ০ দ্দে শ | লা ০ গি ০ | আ০ ০০০ ছ চা০ | ০ হি য়া০ ০ ||

| পক্ষা ধপা পা পনা | না না র্সনা -র্সর্গা | র্রা র্রা -র্সা র্সা | র্সা -র্সনা র্রর্সা -া |
| স্ব০ প০ ন রূ | ০ পি ণী০ ০০ | আ লো ০ ক | সু ন্দ০ রী ০ |

| পর্সা র্সা -া র্সা | র্সা র্সনা র্সর্বর্সর্রা র্সর্রর্সর্রা | র্সনা র্সনা ধপা পক্ষা | পনা ধা ধর্সা না |
| অ ল ০ ক্ষ্য | অ ল০ কা০০০ ০০০০ | পু০ রী০ ০০ নি০ | বা০ ০ সি০ নী |

| র্সা র্সর্গা র্গা র্গা | -া র্গর্মা র্গর্মর্পা র্মর্গা | র্গা র্গর্মর্পা র্পর্মা র্গর্রা | র্গর্মা র্গর্বা র্সা না |
| তা হা০ রি মূ | ০ র০ তি০০ ০০ | র চি০০ লে০ বে০ | ০০ দ০ না য় |

| র্সনা র্সর্গা র্রর্সা র্সনা | র্রা র্রর্সা না -পক্ষা ||||
| হৃ০ দ০ য়০ মা০ | ০ ঝা রে ০০ ||||
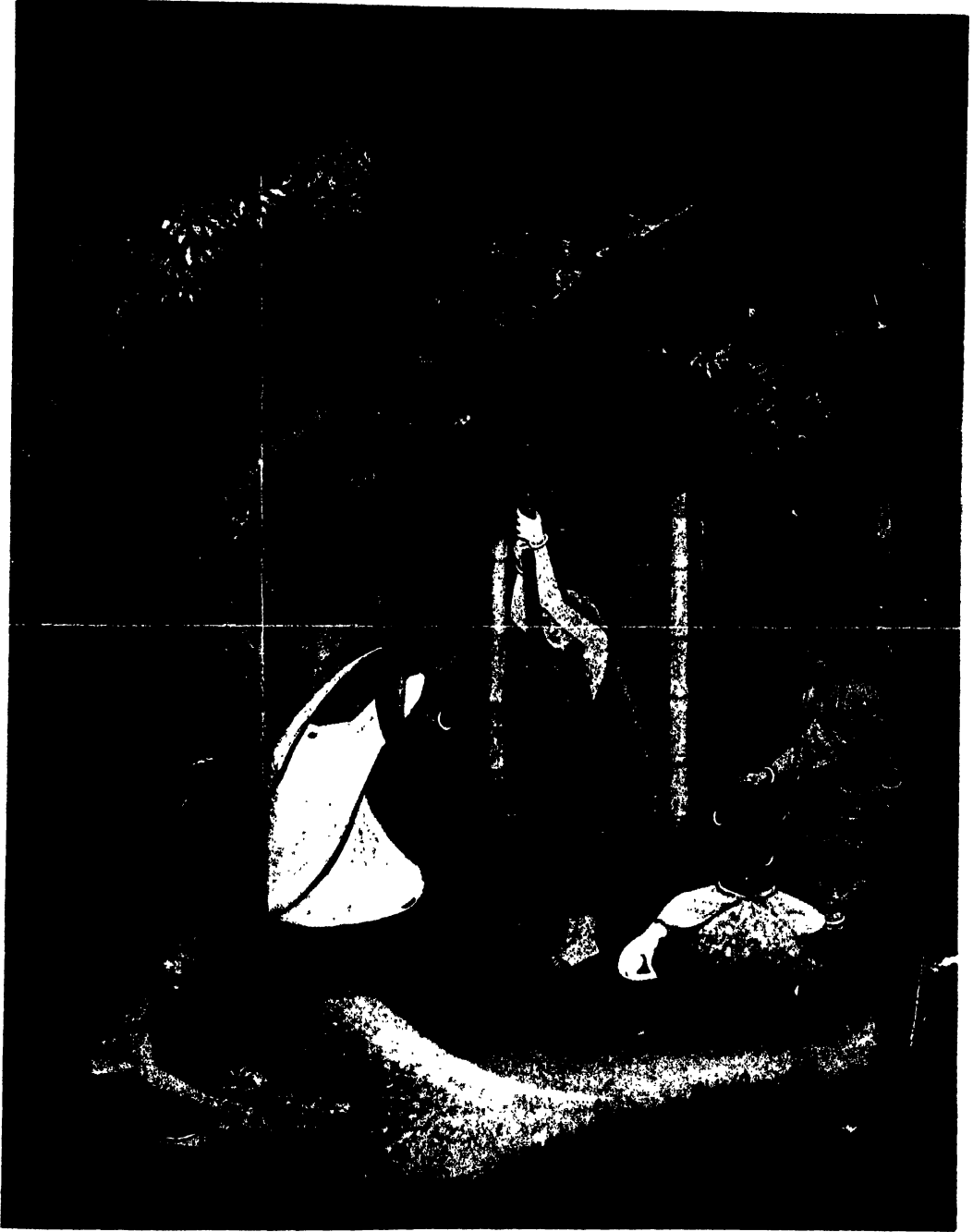
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পল্লীশ্রী

শ্রীশৈলেন্দ্রভূষণ দে

দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

দিনাজপুর জেলার প্রাচীন কীর্ত্তি—

দিনাজপুর জেলায় অনেক প্রাচীন স্তম্ভাদি পুরাকীর্ত্তি আছে। তাহার কয়েকটি বালুরঘাট উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের রজত রজতোৎসব উপলক্ষ্যে সভাপতিকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রে চিত্রিত হইয়াছে। চিত্রগুলি সহ সেগুলির কিছু বিবরণ নীচে দেওয়া হইল।

বাণগড়—বাণগড় বালুরঘাট মহকুমার গঙ্গারামপুর থানায় স্থিত। বিশাল ভগ্নস্তূপ। মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় দীঘি আছে। এক সময়ে গৌড়াধিপতিগণের রাজধানী ছিল; এই স্থানেই দিনাজপুর-স্তম্ভ পাওয়া যায়। (গৌড়-রাজমালা, পৃঃ ৩৬)। ইহার কোনও অংশ এখন পর্য্যন্ত খনন করা হয় নাই।

দিনাজপুর-স্তম্ভ—বাণগড় বা বাণ-নগরের বিশাল ভগ্নস্তূপ হইতে সংগৃহীত এবং দিনাজপুর রাজবাড়ির উদ্যানে পরিরক্ষিত 'কাম্বোজান্বয়জ' গৌড়পতির স্তম্ভ। ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ ইহার আবির্ভাব-কাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কাম্বোজান্বয়জ অর্থে কাম্বোজ দেশীয় বা জাতীয় লোকের বংশ-সম্ভূত। ফরাসী পণ্ডিত ফুস লিখিয়াছেন, প্রচলিত নেপালী কিম্বদন্তী অনুসারে তিব্বত দেশেরই নামান্তর কাম্বোজ দেশ। সুতরাং কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি তিব্বত বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া গৌড়াধিপতি দ্বিতীয় বিগ্রহপালকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বরিন্দ্রী বা গৌড়ের নামানুসারে গৌড়পতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল বরেন্দ্রের পুনরুদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। [গৌড়-রাজমালা (১৩১৯) ৩৫-৩৮ পৃঃ]

গরুড়-স্তম্ভ বা বাদাল-স্তম্ভ বা হরগৌরী-স্তম্ভ—বালুরঘাট মহকুমার হরগৌরী গ্রামে স্থিত। ধ্বংসাবশিষ্ট স্তম্ভ। স্তম্ভটি একটি "অখণ্ড মসৃণ ধূসর প্রস্তরে নির্ম্মিত"। তাহার সর্ব্বাঙ্গে "বজ্রলেপ" ছিল। তাহাতে গৌড়াধিপতি নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরব মিশ্রের প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে। "পালবংশীয় দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম নরপালের মন্ত্রী-বংশের পরিচয় ও তৎকাল সম্পাদিত বিবিধ বিজয় ব্যাপার" উল্লিখিত আছে। "এই প্রশস্তি সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ"। ইহা উক্ত গুরব মিশ্রের গৃহে প্রথম প্রোথিত হয় এবং এখনও সেই একই স্থানে আছে। [গৌড়-লেখমালা (১৩১৯), ৭০-৮৫ পৃঃ]। স্তম্ভের বেদী হরগৌরীর জমিদার দ্বারা পরে বাঁধান হইয়াছে।

জগদ্দল-বিহার—বালুরঘাট মহকুমামধ্যে ধামইর থানায় অবস্থিত। বিরাট স্তূপ। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মতে ইহাই বৌদ্ধগণের বিখ্যাত জগদ্দল-বিহার। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ইহাও এখন পর্য্যন্ত খনন করা হয় নাই। জগদ্দল-বিহার হইতে

বালুরঘাট উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের রজত রজতোৎসব উপলক্ষ্যে সভা।
মধ্যস্থলে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আনীত যে-সকল প্রস্তর ও মূর্ত্তি মহীসন্তোষের [illegible] মসজিদে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এবং অন্যান্য প্রা[illegible] এই বিহারটির স্থাননির্দ্দেশ হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া ছাত্রেরা [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

দিব্বোক-স্তম্ভ—গত ফাল্গুনের প্রবাসীতে সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গে এই স্তম্ভের বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া পুনরুল্লেখ করা হইল না। ইহা প্রজাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত নৃপতি দিব্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রথিত।

বালুরঘাট উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের রজত রজতোৎসব—

গত চৈত্র মাসে বালুরঘাট উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের যে "রজত

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় করকমলেষু!

হে মহাত্মন্,

আপনার বিদ্যা, বিনয় ও ধীশক্তি জনিত প্রতিষ্ঠা "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" এই মহাজন বাক্য সার্থক করিয়াছে।

"প্রবাসী" বাঙ্গালীর স্বদেশের প্রতীক, আর "মডার্ন রিভিউ" আপনার প্রতিভার দীপ্তিতে প্রবুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালীর সাংবাদিক সাধনাকে পৃথিবীর উভয় গোলার্দ্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

যে মনীষা বহুবৎসর ধরিয়া উচ্চ চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা দেশবাসীকে উপহার দিয়াছে, হে সুধীবর, সেই সংস্কৃতির পুণ্য উদ্দেশে আজ আমরা অর্ঘ্যদান করিতেছি; গ্রহণ করুন।

আপনার দেশাত্মবোধ জয়যুক্ত হউক, জীবনব্যাপী সাধনা সফল হউক, আর আপনার লেখনী সত্যের অমোঘ বাণী জনসাধারণকে দান করুক। আমরা যেন আপনার মহনীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারি।

তাং ২৪ চৈত্র ১৩৪১

গুণমুগ্ধ
বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ।

বালুরঘাট উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের রজত রজতোৎসব উপলক্ষ্যে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র। চারিপার্শ্বে দিনাজপুর জেলার প্রাচীন কীর্ত্তির কয়েকটি চিত্র।

বালুরঘাট উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের রজত রঙ্গনোৎসব উপলক্ষ্যে যষ্টিদ্বারা নির্ম্মিত তোরণ।
মধ্যস্থলে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতির বামপার্শ্বে শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রজতোৎসব” হইয়াছিল, তদুপলক্ষ্যে বালকগণ তাহাদের যষ্টিদ্বারা যে তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সভাপতি তাহার ভিতর দিয়া সভাস্থলে গিয়াছিলেন: ছাত্রবৃন্দ বৃদ্ধ সভাপতিকে ইহার দ্বারা আশ্রয় ও রক্ষার ইঙ্গিত দেওয়ায় তিনি ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলেন, যে, বৃদ্ধের আশ্রয় ও রক্ষার প্রয়োজন আছে বটে, যদিও আর বেশী দিনের জন্ম নহে। কিন্তু তিনি আশা করেন, বঙ্গের যুবক-শক্তি তাঁহাদিগকে (অর্থাৎ নারীবৃন্দকে) আজীবন প্রাণপণে রক্ষা করিবেন যাঁহাদিগকে রক্ষা না করিতে পারিলে তাঁহারা পুরুষনামের যোগ্য থাকিবেন না। সভাপতি নিরক্ষর ও শিক্ষিত উভয় শ্রেণীর মধ্যে বেকার-সমস্তার সমাধান আবশ্যক বলেন, এবং বলেন, যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপর ব্যাপকভাবে সকলরকম জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।

উৎসবের অঙ্গ-স্বরূপ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়ের সদ্য সদ্য রচিত

বালুরঘাট উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ড্রিল

"গড়মহীসন্তোষ" নামক অনুপ্রাণনাপূর্ণ যে নাটিকাটির অভিনয় হয়, তাহাতেও লেখক প্রসঙ্গক্রমে নিরক্ষতার বিরুদ্ধে অভিযানের প্রয়োজন ঘোষণা করেন।

বোড়াল গ্রামের মিলন-সঙ্ঘের তৃতীয় বার্ষিক সভা—

"৬ই বৈশাখ শুক্রবার, প্রথম দিবসের অধিবেশনে বোড়াল উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মণিমোহন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সঙ্ঘের যুবকবৃন্দ ও কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যায়ামবীরগণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকার ব্যায়াম-কৌশল, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি হয়। দ্বিতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগের মহিলা-পরিদর্শক শ্রীযুক্তা স্নেহবালা গুপ্তা সভানেত্রীর আসন পরিগ্রহণ করেন। এই দিবস বোড়ালের কৃতবিদ্য সন্তানদ্বয়ের পবিত্র স্মৃতিতে স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়টি 'রাজনারায়ণ বালিকা-বিদ্যালয়' ও বোড়াল পাবলিক লাইব্রেরী 'প্রিয়নাথ পাঠাগার' নামকরণের প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হয়। মিলন-সঙ্ঘ ও খেলোয়াড়-সঙ্ঘের বালিকাবৃন্দের বিবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়া, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি সভার উপভোগ্য হয়। সভানেত্রী মহোদয়ার অভিভাষণ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর মহান্ চরিত্র ও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রকৃষ্টপক্ষে স্মরণীয়। তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পৌরোহিত্যে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু ও স্বর্গীয় প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় ৺বসু মহাশয়ের পুণ্যজীবন কাহিনী সভাসমক্ষে বর্ণনা করেন। সাহিত্য, সমাজ, দেশভক্তি ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ বসুর অসামান্য প্রতিভাপূর্ণ চরিত্র-কথা সমবেত জনগণের কর্ণে সত্যই অমিয় বর্ষণ করিয়াছিল।"

কেন্দুয়াডিহি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়—

বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে কেন্দুয়াডিহি গ্রামে একটি ভদ্র পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানকার ও নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির বালকদের শিক্ষার জন্য একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার গৃহনির্ম্মাণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ অর্থসাহায্য চান। তাহা তাঁহাদের পাওয়া উচিত—বিশেষতঃ বাঁকুড়া শহরের এবং কেন্দুয়াডিহি ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহের লোকদের নিকট হইতে।

প্রবাসে বাঙালীর কৃতিত্ব—

ডক্টর এ. মালিক বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল হইতে এল্-এম্-এফ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভিয়েনায় গমন করেন। ভিয়েনা চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। তিনি সেখানে বৎসরাধিক কাল থাকিয়া চক্ষুচিকিৎসায় বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। চক্ষুর অস্ত্রোপচারে তিনি তাঁহার অধ্যাপক মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছেন, স্বয়ং বহু অস্ত্রোপচার করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ডক্টর মালিক শান্তিনিকেতনের এক জন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র।
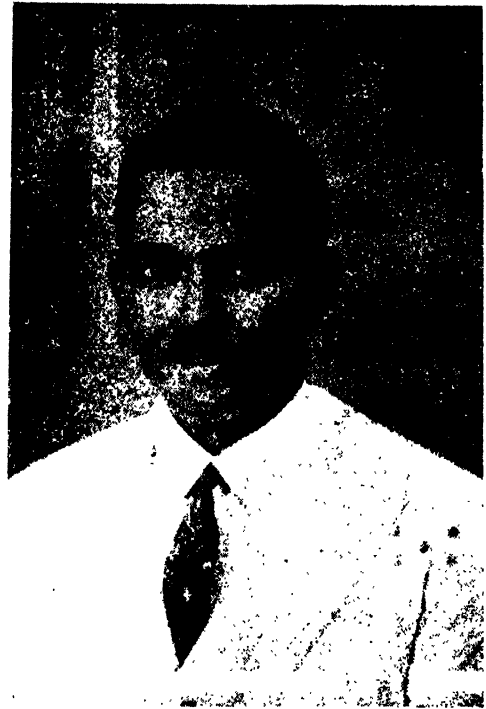
ডাঃ এ. মালিক

বাঙালীর সম্মান—

বিলাতে এ-বৎসর আন্তর্জ্জাতিক ভূমিবিজ্ঞান কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। ডক্টর আশুতোষ সেন ভারত-সরকারের পক্ষ হইতে

ডক্টর শ্রীআশুতোষ সেন

শ্রীমতী অমিতা সেন

অন্যতম প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন। বর্তমান মে মাসে তাঁহার বিলাত যাত্রা করিবার কথা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় সম্ভবতঃ জুন মাসে যাইবেন। সেন মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-বিজ্ঞান-গবেষক। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী অমিতা সেনও তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। শ্রীমতী অমিতা শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা।

সভানেত্রী ও সম্পাদিকা সহ শিবরামপুর আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ

'বেহুলা' অভিনয়ে শিবরামপুর আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ

শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ঘোষ

শিবরামপুর আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভা—

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত শিবরামপুর আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় মহিষাদল কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেটের সাব-ম্যানেজার শ্রীযুত শচীন্দ্রলাল রায়, এম-এ, মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; সভায় বহু মহিলা ও ভদ্র মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। কুমারী সান্ত্বনা মল্লিক দ্বারা উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইবার পর কুমারী মণিমালা পড়ুয়া ছাত্রীগণের পক্ষ হইতে অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা সুরবালা সামন্ত, শ্রীযুক্তা রোহিণী পড়ুয়া, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পড়ুয়া, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার তুঙ্গ, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ মাইতি স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা ও প্রচার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। সন্ধ্যায় ছাত্রীগণের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। তাহাদের 'বেহুলা' অভিনয় বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

বিদেশে বাঙালীর কৃতিত্ব—

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি-নিবাসী শ্রীযুত অমলেন্দু ঘোষ দুই বৎসর কাল জার্ম্মেনীতে বস্ত্রশিল্প শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। আই-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বিহার-গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি ১৯২৮ সালে বম্বে ভিক্টোরিয়া জুবিলী টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটে চারি বৎসরকাল বস্ত্রশিল্প অধ্যয়ন করেন। ১৯৩২ সালে তিনি এই বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করিয়া গুজরাটের অন্তর্গত ব্রোচ শহরে একটি মিলে এক বৎসরকাল বয়ন-সহকারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এ-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ঘোষ মহাশয় ১৯৩৩ সালে জার্ম্মেনী যান ও জার্ম্মেনীর প্রায় অধিকাংশ বিখ্যাত বস্ত্রশিল্পের কারখানায় যোগদান করেন। তিনি জার্ম্মেনীর অন্যান্য শহরের বিখ্যাত বস্ত্রশিল্পের কারখানাগুলিতেও কার্য্য করিয়াছেন। বয়নযন্ত্রাদি সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

বিধবা-বিবাহ—

"গত ১৩৩৪ সন হইতে ১৩৪১ সন পর্য্যন্ত মঙ্গলবাড়ী হিন্দু সভার প্রচারে ও সহায়তায় বিভিন্ন শ্রেণীতে নিম্নলিখিত বিধবা-বিবাহগুলি সম্পন্ন হইয়াছে:-

"নমঃশূদ্র ১৬, কর্ম্মকার ৪, মালাকর ৭, পাটুনী ৫, আচার্য্য ব্রাহ্মণ ১, মল্লবর্ম্মণ ১০, সূত্রধর ২, কায়স্থ ৩, শিকারী ২, ধোপা ৩, রুদ্রপাল ২, মোদক ৩, শঙ্খনিধি ১, সূত্রধার ২, মোট ৬২টি।

"নিজের ও জাতির কল্যাণের জন্য প্রতিদিন প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর চিন্তা করা কর্ত্তব্য যে, বাংলায় ১,১৬,৩৯,২৮৫ জন হিন্দু পুরুষের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ কন্যার অভাবে বিবাহ করিতে পারিতেছে না, অপর দিকে ১,০৫,৭২,৭৮৪ জন হিন্দু নারীর মধ্যে ২৩,৮৬,৫৫৭ জন বিধবা। সমাজের পবিত্রতা ও লোকস্থিতির জন্য সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্য ও কাপট্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে এই মারাত্মক সমস্যার আশু সমাধান করিয়া জাতিকে ধ্বংসের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে হইবে।"

ভারতবর্ষ

কানপুর বালিকা-বিদ্যালয়—

কানপুরের বালিকা-বিদ্যালয়টির কথা আগে অনেকবার শুনিয়াছিলাম। এবার হিন্দুমহাসভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে কানপুর গিয়া ইহা চাক্ষুষ দেখিলাম। এমন একটি বাড়ি, বিশেষ করিয়া এমন একটি হল, কোন বেসরকারী বালিকা-বিদ্যালয়ের দেখিবার আশা করি নাই। ইহা কোন সমৃদ্ধ 'সমাজ', 'সভা', বা 'সমিতি'র প্রতিষ্ঠান হইলে বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু ইহা তাহা নহে. অপর সমুদয় সহায়ক ও দাতাকে তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসা হইতে বঞ্চিত না করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, ইহা ইহার প্রতিষ্ঠাতা কানপুরের ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের আত্মোৎসর্গ, যত্ন ও পরিশ্রমে একটি শিশু-বিদ্যালয় হইতে বর্ত্তমানে ইণ্টারমীডিয়েট কলেজে উন্নীত হইয়াছে। যাঁহারা খবর রাখেন, তাঁহারা সেন মহাশয়কে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের কর্ণধার বলিয়া জানেন। এখন বিদ্যালয়টির ছাত্রীসংখ্যা প্রায় পাঁচ শত; সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত অনেক রকম গৃহকর্ম্ম, শিল্প ও কারুকার্য্য এখানে শিখান হয়। লেডী প্রিন্সিপাল শ্রীমতী শোভা বসু ও অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীগণ আন্তরিক অনুরাগের সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের একটি পত্রিকা আছে। তাহাতে ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলা প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হয়। মুদ্রণ পরিপাটী। বিদ্যালয়টি প্রশস্ত উদ্যান ও খেলিবার মাঠের মধ্যে স্থাপিত হইলে ইহার শোভা ও কার্য্যোপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু শুনিলাম, ইহার পাশের জমির মালিক সরকারী জলসেচ-বিভাগ। তাঁহারা খুব বেশী দাম চান। প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে ইহা পাইবার উপায় হয়ত হইতে পারে।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, কানপুর
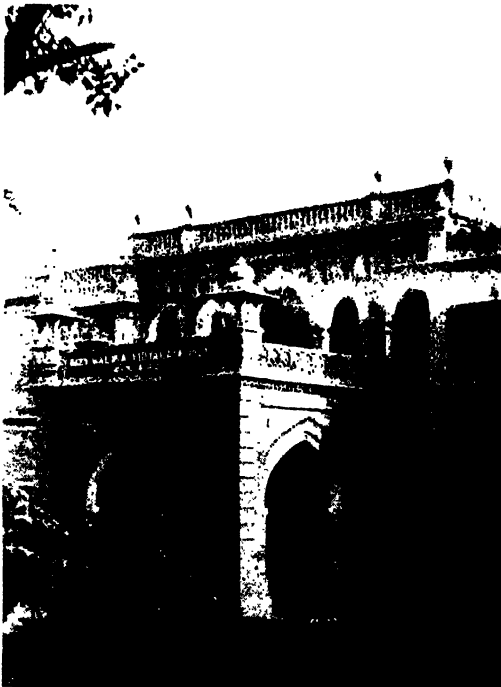
বালিকা-বিদ্যালয়, কানপুর

কলিকাতা লেক রোডে নবনির্ম্মিত বৌদ্ধ মন্দির

চিত্র-বিচিত্র

জাপানে ভূমিকম্পসহনক্ষম গৃহ—

পৃথিবীর যে-যে অঞ্চল দিয়া ভূকম্প-রেখা চলিয়া গিয়াছে, সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রায়ই ভীষণ দুরবস্থায় পড়িতে হয়। ঘর-বাড়ি ধ্বসিয়া মানুষ ও ইতর জন্তুর অহরহ প্রাণনাশ হইয়া থাকে। যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও আশ্রয়ের অভাবে ভীষণ কষ্টে পতিত হয়। জাপানে প্রায়ই ভূকম্পন হইয়া থাকে, সে-দিনও ফরমোসা দ্বীপে ভূমিকম্প হইয়া কি অনর্থেরই না সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯২৩ সনের ভূমিকম্পের পর হইতে জাপানে ভূমিকম্পসহনক্ষম ঘরবাড়ি নির্ম্মিত হইতেছে। এইরূপ ঘরবাড়ির কতকগুলি কাঠের ফ্রেমে ও কতকগুলি ইস্পাত-কংক্রিটের ফ্রেমে তৈরি। এই উভয় ধরণের বাড়ির কয়েকটি চিত্র এখানে দেওয়া হইল।
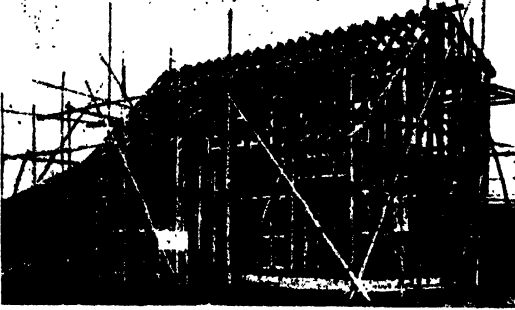
উপরে—ভূমিকম্পসহনক্ষম কাঠের ফ্রেমে তৈরি গৃহ
নীচে—কাঠের ফ্রেমে বাড়ি তৈরি হইতেছে।

কোবি কলেজ অব্ এঞ্জিনীয়ারিংএর বিজ্ঞান মিউজিয়মের ভিতরকার দৃশ্য। এ-গৃহটিও নূতন ধরণে কাঠের ফ্রেমে তৈরি।
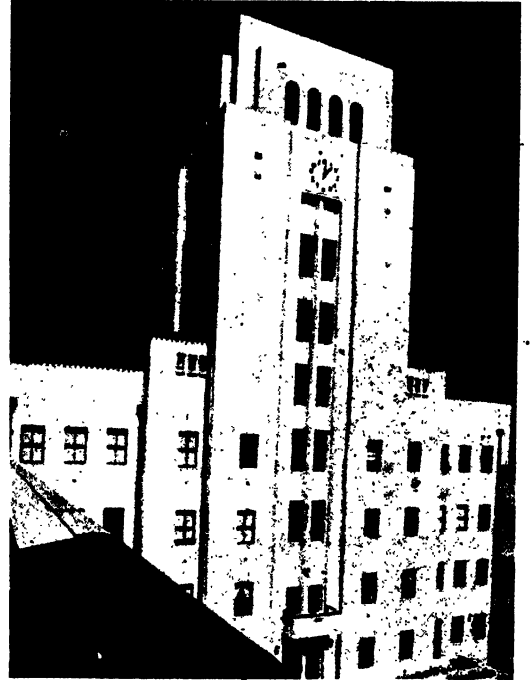
টোকিও ইউনিভার্সিটি অব্ এঞ্জিনীয়ারিংএর বাড়ি-ঘর। ইহা ইস্পাত-কংক্রিটে নির্ম্মিত। জাপানে অনুরূপ অনেক বাড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে।

বংশাইয়ের 'পকেট' সংস্করণ। দক্ষিণ দিকের গাছটি মাত্র আড়াই ইঞ্চি, অথচ ইহা একটি পূর্ণাবয়ব বৃক্ষের মতেই দেখা যাইতেছে। এই গাছটির বয়স ত্রিশ বৎসর ; ইহা বিশ বৎসর যাবৎ এই টবে রহিয়াছে।

"বংশাই" বা টবে পালিত ফুল ও অন্যবিধ গাছ—

জাপানীরা উদ্যান-রচনায় বিশেষ পটু। তাহাদের উদ্যান-রচনা-প্রণালী ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও অবলম্বিত হইতেছে। ছোট ছোট টবে কিরূপ ফুল ও অন্যবিধ গাছ জন্মানো ও রক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কতকগুলি গাছ টবে রাখিয়া একটি বনের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী ক্ষমা রাও বোম্বাই-নিবাসী পরলোকগত শঙ্কর পাণ্ডুরং পণ্ডিত মহাশয়ের কন্যা। শ্রীমতী ক্ষমা ইংরেজী ছোটগল্পের

শ্রীমতী ক্ষমা রাও

লেখিকা। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি দুইখানি সংস্কৃত পুস্তকের রচয়িতা—একখানি 'কথাপঞ্চকম্' নামে ছোটগল্পের সমষ্টি; অপরখানি 'সত্যাগ্রহ গীতা', মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন লইয়া রচিত। এই শেষোক্ত পুস্তকখানি বিদেশে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

ব্রহ্মদেশে লেৎপাদন মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি-পদে এবার এক জন মহিলা সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহার নাম দাও খা তুন। ইনি ব্রহ্মদেশীয় মুসলমান মহিলা। ইনি স্ত্রীজাতির মধ্যে শিল্পশিক্ষার জন্য একটি বয়ন কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। দরিদ্র-নারায়ণের সেবায়ও ইনি মুক্তহস্ত।

দাও খা তুন

শ্রীমতী বেণুতাই দত্তাত্রেয় চিৎলে

শ্রীমতী বেনুভাই দত্তাত্রেয় চিৎলে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সম্প্রতি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

তিনি বোম্বাই উইলসন কলেজের একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীগণ।
(বাম দিক্ হইতে) মনোরমা মেহ্‌তা, লেইলা ক্র্যাক, মনমোহিনী মুল্লা, লতিকা দাস, সবিতা-চৌধুরী,
গোহ্ কালে। (লেইলা ক্র্যাক বিবাহিতা। অন্যেরা কুমারী।)
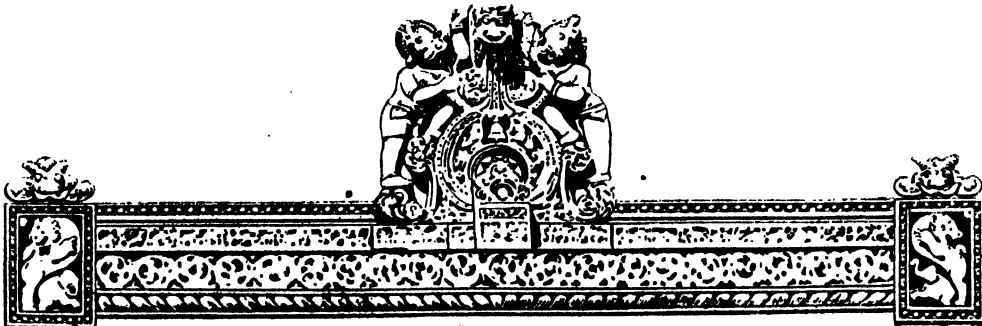
জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

গত বর্ষে প্রকাশিত অংশের চুম্বক—

অরুণ ও প্রতিমা দুই ভাইবোন। শৈশবে তাহারা পিতামাতাকে হারাইয়াছে। অরুণের বয়স পনর বৎসর, প্রতিমার তের। তাহারা কলিকাতার এক প্রাচীন ধনী বনিয়াদি বংশের ছেলেমেয়ে। তালপুকুরের ঘোষ-বংশের আর পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্য নাই; এখন এক পুরাতন তিন-মহল বাড়ি, বাগান পুকুর আছে। এই প্রাচীন প্রাসাদে বৃহৎ জীর্ণ উদ্যানের পরিবেষ্টনে অরুণ মানুষ হইয়া উঠিতেছে। সে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। প্রতিমাও এক মেয়েদের স্কুলে পড়ে। তবে পড়ায় তাহার মন নাই সে চমৎকার গান গাহিতে পারে, দেখিতে বড় রোগা।

অরুণের কাকা শিবপ্রসাদ ব্যারিষ্টার; অবিবাহিত, নানা ভাষাবিৎ। কাকা ও বিধবা ঠাকুরমার সহিত অরুণ ও প্রতিমা কলিকাতার প্রপিতামহের আমলের বাড়িতে থাকে। অরুণের অন্তর ভাবপ্রবণ ও করুণতায় ভরা।

স্কুলে অরুণের বড় বন্ধু। তাহার প্রধান বন্ধু অজয়। অজয় সুন্দর দেখিতে, তরুণ শালবৃক্ষের মত সুঠাম দৃঢ় দেহ, নানা ক্রীড়াপ্রিয়, কিশোর প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরা; অরুণের স্বপ্নময় উদাসতা তাহার নাই। অজয়ের পিতা হেমচন্দ্র রায় ভারত-গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানার এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা করাইতে কলিকাতায় ছুটি লইয়া আছেন। অরুণ অজয়কে মামাবাবু ও অজয়ের মাকে মামী বলে। অজয়ের মাতা স্বর্ণময়ী অরুণকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। অজয়ের তিন বোন। উমা অরুণের সমবয়সী, লীলার বয়স এগার বৎসর, আর চন্দ্রার বয়স ছয় বৎসর। সকলেই প্রতিমার স্কুলে পড়ে। সকলের সহিতই অরুণের ভাব। তবে উমার সহিত অরুণের মধুর সৌন্দর্য্য গড়িয়া উঠিতেছে।

জয়ন্ত চৌধুরী অরুণের এক সহপাঠী বন্ধু। ছেলেটি কবিতা লেখে, লম্বা চুল রাখে। তাহার পিতা কামাখ্যাচরণ সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। জয়ন্ত এখন তাহার ছোট ভাই মণ্টুকে লইয়া মেসোমশাই পীতাম্বর ও মাসীমা মৃন্ময়ীর নিকট আছে। কামাখ্যাচরণ ও পীতাম্বর দুই জনে মিলিয়া রাধাবাজারে এক ঘড়ির দোকান করিয়াছিলেন। এখন পীতাম্বর তাহার মালিক। পীতাম্বর বৈষ্ণব ও ভয়ানক কৃপণ। জয়ন্ত মাতৃহীন। মাসীমা তাহাকে যত্ন করেন। মাসীমার চার ছেলে চার মেয়ে। কৃপণ পীতাম্বর ছেলেমেয়েদের ভাল করিয়া খাইতে পরিতে দেয় না।

অরুণের আরও বন্ধু আছে—বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সুহাস সেন, যতীন দত্ত। বাণেশ্বর স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় যজ্ঞেশ্বর তর্কালঙ্কারের পুত্র। সে অত্যন্ত তর্কপ্রিয়, পিতার অযথা শাসন-পীড়নে সে মনে মনে গুমরিয়া মরে। সুহাস ক্লাসের আর্টিষ্ট, ব্যঙ্গচিত্র আঁকিতে ওস্তাদ। যতীন অতি গরিবের ছেলে, স্কুলে ফ্রি পড়ে; তীক্ষ্ণধী।

ইহা ছাড়া ক্লাসে বৃন্দাবন গুপ্ত, অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন মিত্র নানা সহপাঠীর সহিত অরুণের ভাব। বৃন্দাবন মোটা বলিয়া তাহাকে সবাই 'ভুজো' বলে। অরবিন্দ প্যাণ্ট কোট পরিয়া আসে বলিয়া তাহার নাম 'চালিয়াৎ চট্টো'।

ক্লাসের মাষ্টারদের মধ্যে ইংরেজী মাষ্টার মহাশয়ের খুব বড় নাক আছে বলিয়া তাঁহার নাম 'নাকু'। তিনি খুব রাশভারি লোক; কালো চোগাচাপকান পরিয়া আসেন।

ফাল্গুন মাসে উপন্যাসের আরম্ভ হইয়াছে। এই মাস অরুণ ও উমার জন্মমাস। চৈত্রের শেষে বৈশাখে স্কুল-জীবন একঘেয়ে চলিতেছে।

১০

কলেজ-জীবনের প্রথম দিন!

ভোরবেলা অরুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাতে ভাল ঘুম হয় নাই।

জীবনের এই দিনটি বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। অরুণ তাড়াতাড়ি ছাদে গেল নবোদিত সূর্য্যকে প্রণাম করিতে।

বর্ষার প্রভাত মেঘাচ্ছন্ন। সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়া চারি দিক সজল স্নিগ্ধ। তালপুকুরের ওপারে নারিকেল বৃক্ষগুলির আড়ালে সূর্য্যোদয় হইল। যেন নিকষমণির পেয়ালা হইতে গলিত স্বর্ণস্রোত চারি দিকে উপচাইয়া পড়িতেছে। উচ্ছ্বসিত আলোকতরঙ্গাঘাতে পেয়ালা খান্‌-খান্‌ হইয়া ভাঙিয়া গেল। অরুণ অন্তরে গভীর আনন্দ অনুভব করিল।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সে কৃতিত্বের সহিত পাস করিয়াছে; পনর টাকা বৃত্তি পাইয়াছে; ইতিহাসে বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। পরীক্ষার ফল এত ভাল হইবে, সে স্বপ্নেও আশা করে নাই।

ছাদে পড়িবার ঘরটি সে গোছাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের বইগুলি অনেক দিন হইল সরাইয়া ফেলিয়াছে, কতকগুলি বিলাইয়া দিয়াছে, কতকগুলি নীচে লাইব্রেরীর আলমারীর মাথায় রাখিয়াছে।

ছাদে পড়িবার ঘরটি ছোট। বইয়ের একটি আলমারী আনিতে হইবে। লিখিবার একটি ছোট ডেস্ক আনিতে পারিলে ভাল হয়। কলেজের বই কোথায় কি ভাবে রাখিতে হইবে, অরুণ তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

দেওয়ালে কয়েকটি ছবি টাঙাইতে হইবে। কীট্‌স্‌, শেলী, শেক্সপীয়ার, ইংরেজ কবিদের ছবি। বড় একটি পড়িবার ঘর পাইলে ভাল হয়। একতলার লাইব্রেরী-ঘরটি 'ষ্টাডি' করা যাইতে পারে, কিন্তু ঘরটি পুরাতন পুস্তক-ভরা বড় বড় আলমারীপূর্ণ, দেওয়ালে পিতৃপুরুষগণের অয়েল-পেন্টিংগুলি পুরাতন দিনের স্মৃতিভরা। তাঁহাদের পাশে শেলী, বায়রনের ছবি ঠিক মানাইবে না।

ছকু খানসামা আসিয়া জানাইল, সাহেব সেলাম দিয়াছেন।

অরুণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে, কাকা?

—হাঁ জী।

—কোথায়!

—ডাইনিং-রুমে।

দোতলার রেনোয়া-রসেটি-দেগার প্রভৃতি চিত্রাবলী-সজ্জিত খাবার ঘরে শিবপ্রসাদ ব্রেকফাষ্ট খাইতেছিলেন। অরুণ প্রবেশ করিতে শিবপ্রসাদ বলিলেন—খোকা আজ তোর কলেজ খুলছে?

—হাঁ, কাকা।

—তুই কি করবি, কিছু ভেবেছিস?

প্রশ্ন শুনিয়া অরুণ বিস্মিত হইয়া গেল। রসেটির "দান্তের স্বপ্ন" ছবিটির দিকে চাহিয়া বলিল—আমি কি করব? কেন—

—বস্ বস্ খোকা—খানসামা, খোকা-সাহেবকে একটা মুরগীর কাটলেট দেও।

—জী, হুজুর।

—দেখ্ এখন থেকে ঠিক করা দরকার, কি করবি।

—কেন, আমি ত এখন আই-এ পড়ব।

—সে ত জানি। আমি বল্‌ছি, জীবনে কি করতে চাস? তোর "এম্ অফ লাইফ" কি?

—বুঝেছি।

দেগার "নর্ত্তকী" জিজ্ঞাসুভাবে অরুণের দিকে চাহিয়া রহিল।

—দেখ্ এখন থেকে ভেবে ঠিক করা উচিত, জীবনে কি 'প্রফেসান' নিতে চাস।

—আচ্ছা, আমি ভাব্‌ব।

—আমার মত ব্যারিষ্টার হবার ইচ্ছে নেই আশা করি।

—আমি কিছু ঠিক করি নি।

—তোর যেরকম পড়ার সখ্ দেখি, প্রফেসার হ'লে মন্দ হবে না—কি বলিস, ইতিহাসের অধ্যাপক। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কাজ কর্‌বার আছে।

—না, প্রফেসার হ'তে আমার ইচ্ছে নেই।

অরুণ ভাবিল, যাহারা ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছে, পুরাতন সভ্যতা ভাঙিয়া নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছে, সে তাহাদের দলে থাকিতে চায়। সে পুরাতন ঘটনাবলীর কথক হইবে না।

হয়ত সে কবি হইবে। দেশের চিত্তের বেদনাকে বাণী দিবে, নবসৃষ্টির প্রেরণা দিবে। নবসভ্যতার অগ্রদূত হইবে।

সে ধীরে বলিল—আচ্ছা, আমি ভাব্‌ব।

—আজকাল কোন্ প্রফেসার প্রেসিডেন্সীতে আছেন?

অরুণ কাহারও নাম জানে না। কেবল, কবি মনোমোহন ঘোষের নাম শুনিয়াছিল।

—ইংরেজীতে মনোমোহন ঘোষ আছেন।

—কে? অরবিন্দ ঘোষের দাদা? অক্সফোর্ডে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমিও তখন ইংরেজী কবিতা লিখতুম। Oh, to be young, was heaven! দেখ্ খোকা, এদেশের কলেজ-জীবন বড় একঘেয়ে। দিনরাত পড়াশোনা করিস্ নে, ছেলেদের মধ্যে যাতে সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে তার চেষ্টা করবি।

—আমরা ত অনেক রকম প্ল্যান করছি, একটা ক্লাব করব।

—বেশ ভাল। তোর পড়ার ঘরটা বড় ছোট। নীচে লাইব্রেরী-ঘরটা তোর পড়ার ঘর করতে পারিস্। আর লাইব্রেরীর সব বই এবার তোর চার্জ্জে রইল।

শিবপ্রসাদ খানসামাকে ডাকিলেন। তাঁহার ঘর হইতে লাইব্রেরীর আলমারীগুলির চাবির থোলো আনিয়া অরুণকে দিতে বলিলেন।

—খোকা, আমি সরকার মহাশয়কে ব'লে দিয়েছি, তোকে এক-শ টাকা বই কিনতে দেবেন। কলেজের বই

কেনার টাকা ছাড়া এটা একস্ট্রা, কি বই কিনতে চাস্ একটা লিষ্ট ক'রে আমায় দেখাস্। আর তোর স্কলারশিপের টাকা তোর পকেট-মানি রইল। গভর্ণমেণ্ট তোকে স্কলারশিপ দিয়েছে, আর আমি তোকে এই ফাউণ্টেন্-পেন্ আর রিষ্ট-ওয়াচ দিচ্ছি। কেমন পছন্দ?

অরুণ বিস্মিত হইয়া শিবপ্রসাদের দিকে চাহিল। তার পর তাড়াতাড়ি নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।

—অলরাইট মাই বয়!

শিবপ্রসাদ মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। অরুণের মাতার কথা তাঁহার মনে পড়িল। আজ যদি দাদা ও বৌদিদি বাঁচিয়া থাকিতেন!

প্রতিমা চঞ্চলপদে গৃহে প্রবেশ করিল।

—দাদা, ঠাকুমা জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কখন ভাত চাই?

—দেখ্ টুলি, কেমন সুন্দর ফাউণ্টেন্-পেন্ আর ঘড়ি কাকা দিয়েছেন।

—বা কি সুন্দর ঘড়ি। দেখ কাকা, আমার হাতে ঠিক মানিয়েছে। বা, কাকা, আমার জন্যে কি—

—তুই ত হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় ফেল করেছিস।

—গানের পরীক্ষায় কে প্রথম হয়েছে?

—আচ্ছা, একটা জিনিষ পাবি, ফাউণ্টেন্-পেন না ঘড়ি? কি চাই?

—আমার কিছু চাই না।

—আমি বুঝেছি, একটা ভাল শাড়ী চাই।

—যাঃ!

—আচ্ছা, গ্রামোফন?

—ঠিক্ বলেছ, কাকা, ঠিক্। আমি যা ভাবছিলুম। অরুণ জিজ্ঞাসা করিল—কাকা, তোমার সবচেয়ে প্রিয় কবি কে?

—আমার প্রিয় কবি—ব্রাউনিং, ব্রাউনিং—Pippa Passes পড়েছিস্?

> The year's at the spring
> And day's at the morn;
> God's in his heaven—
> All's right with the world!

শিবপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। হাঁকিলেন—বয়!

অরুণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, স্কলারশিপের টাকা পাইলে কাকার জন্য একটি মরক্কোচামড়া-বাঁধান ব্রাউনিং ও টুলির জন্য একটি এম্বর-বর্ণের ফাউণ্টেন্-পেন কিনিয়া দিতে হইবে।

বয় আসিতে অরুণ বুঝিল, এবার কাকার মদের বোতলগুলি বাহির হইবে। প্রতিমাকে লইয়া সে খাবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

১১

প্রেসিডেন্সী কলেজে অরুণের পিতা, পিতৃব্য, মাতুল সকলে পড়িয়াছেন। অরুণ যে প্রেসিডেন্সীতে পড়িবে, ইহা যেন তাহার শিশুকাল হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছিল।

কলেজ ষ্ট্রীটের উপর পুরাতন কলেজের বৃহৎ বাড়িটি অরুণের নিকট রহস্যপুরী ছিল। শুধু জ্ঞানের সাধনা নয়, ওখানে মুক্তির আনন্দ আছে। অরুণ কত দিন দেখিয়াছে, কলেজের ছেলেরা যখন খুশী কলেজে যায়, যখন খুশী কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসে, গেটের বৃদ্ধ দরওয়ান কাহাকেও আটকায় না, সবাইকে সেলাম করে। অনেক ছেলের হাতে কোন বই থাকে না, একখানি খাতা, নোটবুক। ক্লাসে সব দিন না গেলেও চলে। কলেজের বারান্দায় দাঁড়াইয়া গল্প করা যায়, প্রফেসাররা কিছু বলেন না।

কলেজ সম্বন্ধে স্কুলের ছেলেদের ধারণা অলীক স্বর্গের মত।

আজ সেই অপূর্ব্ব কল্পলোকের আনন্দ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে।

কলেজে যাইবার জন্য অরুণ একটি জরপুরী নাগরা অনেক খুঁজিয়া কিনিয়া আনিয়াছিল, সিল্কের পাঞ্জাবীও করাইয়াছিল।

সিল্কের পাঞ্জাবী পরিল না। লংক্লথের পাঞ্জাবী পরিল, নাগরা পরিল, নূতন ফাউণ্টেন-পেনটি পাঞ্জাবীর পকেটে গুঁজিল, হাতে একটি বাঁধানো নোটবই লইল।

কলেজের গেট দিয়া ঢুকিয়া অরুণ দেখিল, দক্ষিণ দিকের করিডরে নবাগত ছাত্রদিগের জনতা। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্কুল হইতে নানা আকৃতি ও প্রকৃতির ছাত্রদল। ছেলেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত। প্রতিস্কুলের ছেলেরা নিজেদের

মধ্যে দল গঠন করিয়াছে। এক দল অপর দলের প্রতি উৎসুক ও বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চাহিতেছে। কোন্ ছেলেটি কোন্ বিষয়ে প্রথম হইয়াছে, কে কত টাকার স্কলারশিপ পাইয়াছে—নানা আলোচনা, তর্ক, হাস্য, ব্যঙ্গ, কৌতুক। কলিকাতাবাসী ছাত্ররা বাহিরের ছেলেদের বেশভূষা চাল-চলন সম্বন্ধে পরিহাসপূর্ণ মন্তব্য করিতেছে। সকলে উৎসুক, চঞ্চল, অনর্গল কথা কহিতে ব্যগ্র। বসন্ত-প্রভাতে পুষ্পোদ্যানে মৌমাছি-দলের মত উতলা। যেন তাহারা কোন্ বিচিত্র দেশ বিজয়ের অভিযানে বীরদর্পে সমাগত।

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় চকোলেট রঙের নূতন সুট পরিয়া ঘুরিতেছিল। তাহার চশমার কালো ফিতা আরও লম্বা ও চওড়া হইয়াছে। সকলের দিকে সে ব্যঙ্গদৃষ্টিতে চাহিতেছে। যেন সে কোন রাজ-মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী, কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছে।

—হ্যালো অরুণ! আমাদের স্কুলের কাউকে দেখতে পাচ্ছি নে।

—অজয়কে দেখ্‌ছ?

—না। তুমি আই-এ, না আই-এস্‌সি?

—আমি আই-এ; অজয় আই-এস্‌সি।

—যাক, এক জনকে দলে পাওয়া গেল। ও! কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্! তুমি আমাদের স্কুলের মান রেখেছ, আর দ্বিজেন মিত্তির। দ্বিজেন খুব, একেবারে কুড়ি টাকার স্কলারশিপ মেরেছে।

—আর যতীন দত্তের নামও বল। ও কুড়ি টাকার পেয়েছে।

—সে আমাদের কলেজে আসছে?

—না, আমাদের কলেজে ভর্ত্তি হয় নি। সে রিপন কি বঙ্গবাসীতে ভর্ত্তি হয়েছে। ওখানে ফ্রি পড়তে পারবে।

আমাদের কলেজ! কথাগুলি সকলে কি গর্ব্ব ও আনন্দের সহিত উচ্চারণ করিতেছে।

—তা, আমাদের পুরানো স্কুলের অনেকেই এখানে ভর্ত্তি হয়েছে।

—হাঁ, দ্বিজেন, জয়ন্ত, সুহাস, বৃন্দাবন, মোহিত, বিকাশ, হরিসাধন।

—আর বাণেশ্বরের খবর কি?

—সেও ত ভর্ত্তি হয়েছে শুনেছি কিন্তু সে কোথায় উধাও হয়েছে, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, কোন খোঁজ খবর নেই।

—ওই যে আমাদের কবি আসছে।

জয়ন্তের চুলগুলি আরও কুঞ্চিত ও দীর্ঘ হইয়াছে; পাঞ্জাবীটির বোতামগুলি পার্শ্বে; গলায় সাদা ধপধপে কোঁচানো চাঁদর। সে যে এক জন উদীয়মান কবি, বঙ্গভাষার ভবিষ্যতের আশা, এ-বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিবে না।

অরবিন্দ জয়ন্তের করমর্দ্দন করিয়া বলিল—গ্রেট ডে, গ্রেট ডে, কবি কলেজ-বন্দনা লেখ।

জয়ন্ত বলিল—অরুণ আমি ভেবে দেখলুম, সংস্কৃত তোমার নেওয়া উচিত। আমিও সংস্কৃত নিচ্ছি। চট্টো সাহেব কি কি নিলে?

—আমার আই-এস্‌সি পড়বার বড় ইচ্ছে ছিল। বাবা বললেন, আই-সি-এস্ পরীক্ষা দিতে হবে, ইংরেজীটা ভাল ক'রে জানা দরকার, আমি তোমাদের দলেই।

বৃন্দাবন গুপ্ত আসিয়া হাজির হইল। সে আর হাফ্-প্যান্ট পরিয়া নাই, লালপাড় কোঁচানো দেশী ধুতি পরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু পুরাতন কোটটি আছে, হাতে একগাদা বই।

—হ্যালো ফ্যাটি!

—দেখ, এখানে ফ্যাটি-ফ্যাটি বলবে না।

—আহা চটো কেন।

—অরুণ কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্, আমার ভাই এগার মার্কের জন্যে স্কলারশিপ্‌টা হ'ল না।

—তোর যা অসুখ গেল।

—আচ্ছা, আমাদের "মাকাল ফল" ত ফেল করেছে।

—এই তৃতীয়বার হ'ল। ও আর পড়ছে না। আমাদের হেড্-পণ্ডিত বলতেন না, বাবার আপিসে বেরুতে আরম্ভ কর, এবার তাই করবে।

—বাণেশ্বরের খবর কি?

—সে নাকি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছে।

—হা বাণেশ্বর হবে সন্ন্যাসী!

—ওই বোধ হয় ঘণ্টা পড়ল।

ক্লাসে অরুণের পার্শ্বে একটি অপরিচিত যুবক আসিয়া বসিল। মল্লযোদ্ধার ন্যায় বলিষ্ঠ দেহ, কিন্তু মুখখানি অত্যন্ত রুচি; চিকন শ্যামবর্ণ। যুবকটি কলিকাতায় নবাগত, লাজুক প্রকৃতির।

অরুণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোন্ স্কুল থেকে পাস করেছেন? যুবকটি চট্টগ্রাম শহরের এক স্কুলের নাম করিল।

চট্টগ্রাম! কর্ণফুলী নদী! অরুণের শৈশব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তখন তাহার পিতা পূর্ব্ববঙ্গের কোন শহরে ডেপুটি। এক ছুটিতে তাহারা কলিকাতায় না আসিয়া ষ্টীমার করিয়া চট্টগ্রাম হইতে রাঙামাটি গিয়াছিল। কর্ণফুলী নদী কি সুন্দর! দুই তীরে ছোট ছোট পাহাড়, ঝাউবন। মধ্যে কর্ণফুলী নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। অরুণের মাতা বলিয়াছিলেন, দেখ্ খোকা, কি সুন্দর দেশ! অরুণ বলিয়াছিল, ঠিক রূপকথার কেশবতী রাজকন্যার দেশের মত, নয় মা? আজ বার-বার তার মায়ের কথা মনে পড়িতেছে।

চট্টগ্রামের যুবকটিকে অরুণ বলিল—আমার নাম অরুণকুমার ঘোষ।

—ও, আপনি কি ইতিহাসে ঠিক আমার ওপর হয়েছেন?

—তা হবে।

—আমার নাম শিশিরকুমার সেন।

কয়েকটি কথা। কিন্তু শিশিরের সহিত অরুণের বড় ভাব হইয়া গেল। দুই ঘণ্টা পড়ার পর এক ঘণ্টা ছুটি। কলেজ-জীবন কি মজার!

অরুণ শিশিরকে লইয়া প্রথমে কমন্-রুমে গেল। কমন-রুমে গোলমাল, হৈচৈ চীৎকার।

শিশিরকে লইয়া সে লাইব্রেরীতে গেল।

ক্লাসের ঘরগুলি দেখিয়া অরুণ হতাশ হইয়াছিল। বেঞ্চিগুলি স্কুলের বেঞ্চির মত, বসিবার তেমন ভাল বন্দোবস্ত নাই। জানালা দিয়া পথের ট্রাম মোটরগাড়ীর শব্দ আসে। কিন্তু লাইব্রেরী দেখিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইল। এ যেন স্বপ্ন! এমন সুন্দর লাইব্রেরী সে কখনও দেখে নাই। আলমারীর পর আলমারী, নূতন পুরাতন কত বই-ভরা। বসিয়া পড়িবার জন্য ছোট ছোট টেবিল, চেয়ার। জানালা দিয়া নির্ম্মল নীলাকাশ, সবুজ মাঠ দেখা যায়; ঘরটি শুব্ধ, স্নিগ্ধ। সবাই নীরবে পড়িতেছে।

শিশিরকে লইয়া অরুণ সমস্ত লাইব্রেরী ঘুরিল। দুই জন পাশাপাশি দুই চেয়ারে বসিয়া ফিসফাস্ গল্প করিল। শিশিরও বই পড়িতে অত্যন্ত ভালবাসে। কে কোন বই পড়িয়াছে, কোন্ লেখক সম্বন্ধে কাহার কি মত, বহুক্ষণ আলাপ চলিল।

কলেজের শেষে অরুণ শিশিরকে বলিল—চল ভাই তোমার ঘর দেখে আসি।

—মোটেই ভাল ঘর নয়, বাতাস আসে না, আরও দু-জনের সঙ্গে থাকতে হবে। আমি একটা সিঙ্গল রুম পাবার চেষ্টা করছি। দুই জনে ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের দিকে চলিল।

১২

কলেজের প্রথম সপ্তাহ উৎসুক, উত্তেজনা, কৌতুক, নবীনতার আনন্দে কাটিয়া গেল।

নূতন বই কেনা, নূতন বই পড়া, নূতন প্রফেসারদিগের সঙ্গে পরিচয় করা, নূতন ছেলেদের সহিত ভাব করা, স্কুলের পুরাতন সহপাঠীদের সহিত নূতন করিয়া ভাব করা।

বাড়িতে বই লইবার জন্য লাইব্রেরীর কার্ড পাইয়া অরুণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা লইয়া কি কি বই পড়িবে তাহার এক তালিকা করিয়া ফেলিল। কলেজের টেনিস-ক্লাবে ভর্ত্তি হইল।

কলেজ ষ্ট্রীটের পুস্তকের দোকানগুলি ঘুরিতে অরুণের উৎসাহের অন্ত রহিল না। কেবল মাত্র কলেজপাঠ্য পুস্তক কেনা নয়, নূতন ইংরেজী-উপন্যাস কিনিতে, বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় লেখকদের বই কিনিতে তাহার পরম আনন্দ। কাকার-দেওয়া এক শত টাকা সে প্রথম সপ্তাহেই খরচ করিয়া ফেলিল। দোকানে-দোকানে ঘুরিয়া পুস্তক কিনিতে নূতন বন্ধু শিশির তাহার সঙ্গী হইল। সেও অনেক বই কিনিল। দু-জনে এক বই কিনিল না।

কলেজে ছুটির ঘণ্টাগুলি অরুণ লাইব্রেরীতে কাটাইত। মাঝে মাঝে জয়ন্ত তাহাকে কমন্‌-রুমে টানিয়া লইয়া যাইত। জয়ন্ত তাহার চারি দিকে একটি স্তাবক দল গড়িয়া তুলিয়াছে। সে তাহাদের বাংলা-কাব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিত; অরুণকে মাঝে মাঝে তাহার বক্তৃতা শুনিতে হইত।

তখন ইউরোপে মহাসমর চলিতেছে। লাইব্রেরীতে এক প্রকাণ্ড কাঠের বোর্ডের উপর ইউরোপের একটি ম্যাপ পিন্‌ দিয়া আঁটা থাকিত। ম্যাপে নানা বর্ণের পিন্‌-যুক্ত ক্ষুদ্র পতাকা যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পক্ষের জয়-পরাজয় নির্দ্দেশ করিত। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান, রুশ, নানা জাতির বিভিন্ন রঙের পতাকা। যুদ্ধভূমিতে এক পক্ষ কতদূর অগ্রসর হইল, হারিয়া কতদূরে পিছাইয়া পড়িয়াছে, কে কোন্‌ নগর ধ্বংস করিল, কোন্‌ দেশের কোন্‌ অংশ অধিকার করিল—যুদ্ধের প্রতিদিনের ইতিহাস ম্যাপের ওপর পতাকা-গুলি আঁটিয়া দেখান হইত।

অরুণ লাইব্রেরীতে গিয়া প্রথমেই ম্যাপটি দেখিত। এত দিন ইউরোপীয় সমর তাহার নিকট অবাস্তব ছিল, এখন সত্য জীবন্ত হইয়া উঠিল। প্রতিদিন সে নিয়মিত ভাবে খবরের কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিল।

কেন যুদ্ধ হইতেছে? কেন এক জাতি অপর জাতির সহিত যুদ্ধ করে?

ইতিহাসে সে নানা যুদ্ধের কথা পড়িয়াছে। সে যেন প্রাচীন কাহিনী, উপন্যাসের মত।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সভ্য জাতিদিগের মধ্যে যুদ্ধ! প্রতিদিন নূতন গ্রাম ধ্বংস হইতেছে, নূতন নগর দগ্ধ হইতেছে, বড় বড় জাহাজ ডুবিতেছে, শত শত মানুষ মরিতেছে।

মানুষ যেমন পরস্পরকে ভালবাসে তেমনই পরস্পরকে ঘৃণাও করে। ভালবাসা যেমন সত্য, হিংসা-দ্বেষ তেমনই সত্য। প্রেমের মিলন যেমন সত্য, মৃত্যুর সংগ্রাম তেমনই সত্য। আজ যখন সে কলিকাতার কলেজে বসিয়া বই পড়িতেছে, তর্ক করিতেছে, গল্প করিতেছে, তখন ফ্রান্সে যুদ্ধক্ষেত্র কামানের ধূমে অন্ধকার। ইংরেজের গুলিতে জার্ম্মান মরিতেছে, জার্ম্মানের গুলিতে কত ফরাসী যুবক প্রাণ হারাইতেছে।

কিন্তু, কেন এ যুদ্ধ?

অরুণ শিশিরের সহিত আলোচনা করিত। দুই বন্ধু নানা তর্ক করিত। মানব-ইতিহাসের কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাইত না।

এক মাসের মধ্যেই কলেজ-জীবনের কোনও অপূর্ব্বতা রহিল না। অরুণ হতাশ হইয়া পড়িল। সে দেখিল, কলেজ-জীবন স্কুল-জীবনেরই শোভন সংস্করণ। সে-মুক্তি, সে-স্বাধীনতা কোথায়?

স্কুলে সকল ছেলের মধ্যে সহজ যোগ ছিল। কলেজে সকলে ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত, ছাত্রদের মধ্যে সেরূপ সরল বন্ধুত্ব নাই।

প্রফেসারগণ ছাত্রদের সকলকে চেনেন না। তাঁহাদের সহিত কোনও সামাজিক যোগ নাই। ছাত্রদের অভিযোগ, ব্যথা কিছুই জানেন না।

কলেজেও স্কুলের মত সাপ্তাহিক, মাসিক নানা পরীক্ষা। ছেলেরা নিজেদের খুশীমত কিছু পড়িতে পারে না।

প্রথম মাসেই শিশিরের জ্বর হইল। বহু আবেদনের পর সে একটি আলাদা ঘর পাইয়াছিল। ঘরটি একতলায়, ছোট ও অন্ধকার, কাঠের দেওয়াল দিয়া বিভক্ত। স্বাস্থ্যকর চট্টগ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় এইরূপ বদ্ধ ঘরে বাস করিলে জ্বর ত হইবেই। প্রথম দিন জ্বরে শিশির সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। অরুণ অত্যন্ত চিন্তিত হইল। কলেজ কামাই করিয়া সমস্ত দিন শিশিরের শুশ্রূষা করিল। দ্বিতীয় দিন জ্বর কমিয়া গেল। শিশিরের বাড়িতে আর টেলিগ্রাম করিতে হইল না। রাত্রে শিশিরের শুশ্রূষার সব ব্যবস্থা করিল।

এক সপ্তাহের মধ্যে শিশির সারিয়া উঠিল। অরুণ নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু কলেজ-জীবনে তাহার আর কোনও আনন্দ রহিল না।

আর একটি ঘটনায় অরুণের মন অত্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বর্ষার রাত্রি। সমস্ত দিন অবিশ্রাম বৃষ্টি হইয়াছে। আকাশ মেঘাবৃত।

রাত্রে খাওয়ার পর অরুণ নীচে লাইব্রেরীতে বসিয়া শেলী পড়িতেছিল। দুঃখময় মানব-জীবন হইতে সে

কাব্যের কল্পলোকে শান্তির আশ্রয় খুঁজিতেছিল। শেলী তাহার প্রিয় কবি হইয়া উঠিয়াছে।

একটি ভৃত্য মামীমার পত্র লইয়া আসিল। মামীমা লিখিয়াছেন, হঠাৎ মামাবাবুর ভয়ানক অসুখ হইয়াছে, অরুণ কি আসিতে পারিবে? অরুণ তৎক্ষণাৎ হীরা সিংকে ডাকিয়া মোটর বাহির করিয়া চলিল।

অজয়দের বাড়ি পৌঁছিয়া অরুণ দেখিল ব্যাপার খুব গুরুতর নয়। বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠিয়া চলিতে গিয়া মামাবাবু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। এখন সংজ্ঞা আসিয়াছে তবে পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। ডাক্তার বন্ধু মামীমাকে বোঝাইতেছেন, ভয়ের কিছু নাই, রাত্রে থাকিবার জন্য এক জন ছোকরা ডাক্তারকে তিনি পাঠাইয়া দিবেন।

অরুণকে দেখিয়া মামীমা মনে বল পাইলেন। রাত্রে রোগীকে কি ঔষধ দিতে হইবে, কিরূপভাবে শুশ্রূষা করিতে হইবে, ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে অরুণ সব জানিয়া লইল। ঔষধ আনিতে অজয়কে মোটরগাড়ী করিয়া পাঠাইয়া দিল।

পাশের ঘরে চন্দ্রা চোখ লাল করিয়া ঢুলিতেছে, শীলা তখনও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। উমা প্রস্তরমূর্তির মত মামাবাবুর মাথার নিকট বসিয়া।

অরুণ উমাকে ধীরে বলিল—আমি মামাবাবুর কাছে বসছি, তুমি চন্দ্রা ও শীলাকে খাইয়ে এস। মামী, আমি আজ রাত্তে এখানে থাকব এখন। আমি খেয়ে এসেছি মামী, তুমি ওই চেয়ারটায় বস।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মামাবাবু সুস্থ হইয়া উঠিলেন। গভীর রাত্রি। বৃষ্টি থামিয়াছে। আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। হেমবাবু শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছেন। বাড়ির সকলে নিদ্রিত। অরুণ এক লম্বা ইজিচেয়ারে শুইয়াছিল। ধীরে সে উঠিয়া বারান্দার সম্মুখে খোলা ছাদে আসিল। ভিজা ছাদ; ফুলগাছের টবগুলি হইতে জল উপচাইয়া পড়িয়াছে। চারি দিক অন্ধকারে লেপা। অরুণ রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

আকাশ অন্ধকার। কালো মেঘের ফাঁক দিয়া একটি তারা জলজল করিয়া কাঁপিতেছে।

কে অরুণের পার্শ্বে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। অরুণ বুঝিল, সে উমা। ভিজা লোহার রেলিঙের উপর দুই হাত রাখিয়া উমা বলিল—তুমি ঘুমোও নি?

—না, ঘুম আসছে না। মামীমা ঘুমোচ্ছেন?

—হাঁ। মার আজ সারাদিন যা গেছে। ভাগ্যিস তুমি এলে।

—চিঠি পেয়ে আমি সত্যি বড় ভয় পেয়েছিলুম।

—এখন আর ভয়ের কিছু নেই, মনে হয়।

—হাঁ, আপাততঃ নেই।

দুই জনে চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল।

সজল বাতাসে চামেলীর মৃদু গন্ধ আসিতেছে। পশ্চিম দিকে চন্দ্রের উদয় হইল, বক্র তরবারির মত। বারিস্নাত অন্ধকার, ঘুমন্ত পৃথিবীর উপর ম্লান আলো বড় করুণ।

অরুণ ভাবিতেছিল মামাবাবু এ-যাত্রা রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। হঠাৎ কোন্ দিন তাঁর মৃত্যু হইবে। তার পর কি হইবে? এ পরিবারের কি হইবে? টাকা তিনি বিশেষ কিছুই জমান নাই। তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রায় সব খরচ হইয়া যাইতেছে। তিনি মরিয়া গেলে এদের অবস্থা কি হইবে?

আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিল। কৃষ্ণ মেঘস্তূপে চন্দ্র তারা সব লুপ্ত হইয়া গেল।

অরুণ অনুভব করিল, এই নীরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সে যে-কথা ভাবিতেছে, উমাও সেই কথা ভাবিতেছে।

ধীরে সে বলিল—উমা, যাও, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করগে।

কয়েক দিনের মধ্যে হেমবাবু বেশ সারিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি যে আর বেশী দিন বাঁচিবেন না, এই চিন্তা অরুণের মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

(ক্রমশঃ)

চীন সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল, এম-এ

চীন সাম্রাজ্যকে লইয়া গত কয়েক বৎসর হইতে পূর্ব্ব দিগন্তে যে রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে আজও তাহার অবসান হয় নাই। বার্লিনের এক জাতীয়তা-বাদী পত্রের সম্পাদক প্রিন্স কার্ল এণ্টন রোহন যথার্থই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিগন্তে প্রশান্ত মহাসাগরের উভয়-কূলে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ কর্ত্তৃক হঙকঙ্ অধিকারভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ প্রায় ৯২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে চীন একে-একে তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের কোন-না-কোন অংশ হারাইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া ও জীহোল অধিকৃত হওয়ায়, চীন এই দুইটী প্রদেশও হারাইয়াছে। মাঞ্চুসম্রাটগণ কর্ত্তৃক শাসিত চীন সাম্রাজ্যের ৪৫০০০০০ বর্গমাইলের মধ্য হইতে অধুনা ২৪০০০০০ বর্গমাইল বৈদেশীকগণ কর্ত্তৃক অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ফ্রান্স—ইন্দো-চীন; ইংরেজ—হংকং, উত্তর-বর্ম্মা, সিকিম ও তিব্বত; জাপান—কোরিয়া, ফরমোসা, পেস্কাডোরেস, মাঞ্চুরিয়া ও জীহোল এবং রুশিয়া—বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর আধিপত্য করিতেছে। জাপানের মাঞ্চুরিয়া-অধিকার অদূর ভবিষ্যতে এতদঞ্চলে এক নিগূঢ় রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের আভাষ দিতেছে, কেন না মাঞ্চুরিয়া (মাঞ্চুকুয়ো) চীনের অধিকার-বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, চীনের অধিকারভুক্ত অন্যান্য প্রদেশগুলির মধ্যে এক চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে; বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক চীনের অন্যান্য প্রদেশও যে এই প্রকারে অধিকৃত হইতে পারে ইহা তাহারই সূত্রপাত।*

চীনবাসীগণের এই ভয় অযথা বা অমূলক নহে; চীনের আঠারটি প্রদেশের প্রত্যেকেরই সীমা হইতে তাহার পরবর্ত্তী আভ্যন্তরীণ কিয়দংশ পর্য্যন্ত এক-একটি ভাগে বিভক্ত; তাহার পর আর একটি অংশ। সুতরাং 'বাহিরের' ও 'ভিতরের' দুই অংশ লইয়া সীমান্তে দুই স্তর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। 'বাহিরাংশ' (outer ring) গঠিত হইয়াছে মাঞ্চুরিয়া, বহির্মঙ্গোলিয়া, সিঙ্কিয়াঙ এবং তিব্বত লইয়া; ইহাদের মধ্যে সিঙ্কিয়াঙ ব্যতীত অন্য তিনটিই পররাষ্ট্রের অধীন। বর্ত্তমানে সিঙ্কিয়াঙ বা চীনা তুর্কীস্থান এক মহা বিপ্লবের মাঝে অবস্থান করিতেছে। 'ভিতরের অংশ' (inner ring) নিম্নলিখিত প্রদেশগুলি লইয়া গঠিত হইয়াছে:—উত্তরে, মঙ্গোলিয়ার ভিতরাংশ; পশ্চিমে, তিব্বতের ভিতরাংশ; জীহোল, ছাহার, সুইউয়ান এবং নিঙসিয়াং প্রদেশগুলি লইয়া আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া গঠিত। ইহার মধ্যে জাপান দলোনর শহরের নিকটবর্ত্তী জীহোল এবং ছাহার প্রদেশের পূর্ব্ব সীমান্ত অধিকার করিয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গিরিপথ দিয়া মঙ্গোলিয়ায় প্রবেশ করিতে হয়। তিব্বতের ভিতরাংশ চিংহাই ও সিকাঙ্ প্রদেশ লইয়া গঠিত। এই দুই প্রদেশের অনেকাংশ তিব্বতীয় সৈন্যদল জয় করিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে চীন তাহার সীমান্তে অবস্থিত প্রদেশগুলির বাহিরাংশের প্রায় সমস্তই হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভিতরের কিয়দংশ আংশিকভাবে বৈদেশিকগণের অধীনে গিয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ যে শীঘ্রই বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক হৃত হইতে পারে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

চীনের সীমান্ত-প্রদেশ

চীনের প্রাচীর-পরিবেষ্টিত মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সিঙ্কিয়াঙ্ এবং তিব্বত প্রভৃতি প্রদেশগুলি লইয়া যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই চীনের উত্তর এবং

* "For the loss of Manchuria has had an unsettling effect throughout the remaining outlying territories of China, and may be the prelude to a new era of territorial dismemberment." *Foreign Policy Report*

পশ্চিম সীমান্তরেখা নামে পরিচিত। এই অঞ্চলগুলি এবং বিশেষ করিয়া উত্তর দিক হইতে চীন সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ নগরগুলি একে একে বৈদেশিকগণের করকবলিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাঞ্চু অধিপতিগণ বৈদেশিক আক্রমণের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। পশ্চিমের রণ-নীতিকুশল বৈদেশিকগণ সমুদ্র-পথে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। আধুনিক নানা বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত বর্ত্তমান যুগের সমর-নীতি-বিশারদ প্রতীচীকে বাধা দিবার কোনও উপায় মাঞ্চুগণ তাঁহাদের অতীত অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করিতে পারেন নাই।* বৈদেশিকগণ চীনের স্থায়ী অধিবাসী নয় বলিয়া ইঁহারা তাহাদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়া আপনাদের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লইতে পারেন নাই। বিভিন্ন বৈদেশিক জাতিগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার প্রাচীন নীতি অনুসৃত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বিদেশীরা অতি অনায়াসেই এখানে জোত-জমি, উপনিবেশ প্রভৃতি বসাইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমেই আধুনিক কালের আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের যাবতীয় সাজসজ্জা, যথা—ঋণ দেওয়া, ইনডেমনিটি, রেল-প্রতিষ্ঠা, শুল্ক-সংরক্ষণ রীতি প্রভৃতি চীনের উপর প্রযুক্ত হইল। এমন কি তাহাকে এখানেই নৌ-বাহিনী ও সৈন্য-সামন্ত রাখিবার সুযোগ ও অধিকার বৈদেশিকগণকে দিতে বাধ্য করা হইল।

বিগত মহাযুদ্ধ অবসান হইবার পর চীনের জাতীয় অভ্যুত্থানের ফলে বৈদেশিক অত্যাচারের গতি কিয়ৎকালের জন্য অন্য পথে চালিত করিল। চীনের নিকট ১৯১৫ সালে জাপানের একুশটি দাবি বৈদেশিক অত্যাচারের চূড়ান্ত উদাহরণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯১৭ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত চীন এই প্রকার সামঞ্জস্যবিহীন সর্ত্তগুলির বিরুদ্ধে এক মহা অভিযান করিয়া আসিয়াছে। এই সময়েই উপর্য্যুপরি কয়েকটি ক্ষেত্রে জয়ী হইয়া চীনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। রবার্ট পোলার্ড বিরচিত "চীনের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ" (Pollard—*China's Foreign Relations, 1917-1931*) শীর্ষক গ্রন্থখানিতে এ-বিষয়েরই আলোচনা হইয়াছে। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের সেনা সন্নিবেশ হইবার পর হইতেই চীন রাজ্যমধ্যে বিদেশীয় প্রভাব বিস্তারের গতি অবরুদ্ধ করিয়া দিল। জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া ও জীহোল অধিকারভুক্ত হওয়ায় চীন বৈদেশিক নির্য্যাতনের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইল। এক ভাবে এইখানেই পাশ্চাত্য বৈর-নির্য্যাতনের শেষ হইল। মাঞ্চুকুয়ো-সাম্রাজ্যের নব-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই চীনে এক নূতনতর ইতিহাসের সূচনা হয়। কেননা, মাঞ্চুকুয়ো তথা জাপান, চীনের উত্তর সীমান্ত-প্রদেশ অধিকার করিয়া সতৃষ্ণভাবে এই আশায় বসিয়া রহিল যে, মঙ্গোলিয়ার পথে সে তাহার সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার নীতি বিস্তার করিবার সুযোগ পাইবে। ইহা ব্যতীত আরও দুইটি পাশ্চাত্য রাজ্য চীনের অন্য সীমান্ত-প্রদেশ অধিকার করিয়া আছে; রুশিয়া বহির্ম্মঙ্গোলিয়ায় এবং ইংরেজ তিব্বতে; দক্ষিণেও ইন্দো-চীনের মধ্য দিয়া য়ুনান প্রদেশে ফরাসী জাতিও তাহার প্রতিপত্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং এক সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী পূর্ব্ব-সীমান্ত ব্যতীত অন্যান্য সীমান্ত-রেখায় চীন গ্রাস করিবার জন্য বৈদেশিক শক্তিবর্গ লোলুপ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করিতেছে।

মঙ্গোলিয়ার ভিতরাংশ সিঙকিয়াং ও তিব্বতের ভিতরাংশ লইয়া বর্ত্তমানে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হইতেছে। এই প্রদেশগুলির প্রত্যেকেই এক বিদ্রোহের মধ্য দিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছে। আভ্যন্তরীণ বিপ্লব বা বৈদেশিক আক্রমণ কিংবা এই উভয়ের সংমিশ্রণই চীনের মনে এক ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। একই স্থান লইয়া দুই বা ততোধিক বৈদেশিক শক্তি এখন পরস্পরের স্বার্থ ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্যস্ত। আভ্যন্তরীন মঙ্গোলিয়াকে লইয়া জাপ ও রুশ, সিঙকিয়াংকে লইয়া ইংরেজ ও রুশ, এবং য়ুনানকে লইয়া ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে কলহের আভাষ দেখা দিয়াছে। চীন তাহার সীমান্ত-রক্ষায় কতদূর সমর্থ অদূর ভবিষ্যতে তাহা বুঝা যাইবে। ইহার ফলে 'সুদূর প্রাচ্যে' পরবর্ত্তীকালে বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের এক ভীষণ অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিবে।

চীন-সীমান্তে বিভিন্ন উপজাতি ও ধর্ম্ম

বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের সমাবেশে এক সংঘর্ষের সৃষ্টি

* Lattimore—*Manchuria : Cradle of Conflict*

হওয়ায় চীন-সীমান্তে এরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সম্ভবপর হইয়াছে। নানা ধর্ম ও নানা জাতির এখানে প্রচলন আছে। কেবলমাত্র মাঞ্চুরিয়ায় চীনার সংখ্যা অধিক। মাঞ্চুগণ এক্ষণে আর বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় না, ভাষা এবং আচার ব্যবহারে তাহারা সম্পূর্ণ চৈনিক।

মাঞ্চুরিয়া ব্যতীত অন্যান্য সীমান্ত-প্রদেশের বহির্ভাগ কিংবা আভ্যন্তরীণ অংশে চীনাগণের সংখ্যাধিক্য নাই। মঙ্গোল জাতির লোক সংখ্যা পাঁচ লক্ষ মাত্র, মঙ্গোলিয়া ছাড়া পশ্চিম-মাঞ্চুরিয়া, উত্তর-সিঙকিয়াং, চিঙ্‌হাই এবং তিব্বতেও মঙ্গোল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে এবং মাঞ্চুগণের ন্যায় চৈনিক ভাবে প্রভাবান্বিত হয় নাই। মঙ্গোল ও চীনায় কখনও বিবাহ-ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখা যায় না। যদি কখনও এরূপ সম্ভবপর হয়, তবে চীনারাই মঙ্গোল-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, ইহারই ফলস্বরূপ মঙ্গোলজাতি আজ জীবন্ত শক্তিসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

কানসু ও সিঙকিয়াং সীমান্ত-প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা অধিক। লাটুরেট সাহেব তাঁহার গ্রন্থে (Latourette —*The Chinese: their History and Culture*) লিখিয়াছেন যে, সর্ব্বসমেত প্রায় দশ লক্ষ মুসলমান এখানে আছে। আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতিতে তাহারা মুসলমান ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিলেও অন্যান্য বিষয়ে ভাবান্তর লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান অভ্যুদয়ের পথে কোনও বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষের ন্যায় মুসলমান স্বতন্ত্রী-করণের দাবি ও চেষ্টা চীনের পশ্চিম-সীমান্তে এক নবীনতর বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছে।

পশ্চিম-সীমান্তের 'লামা'-প্রদেশও চীনের মনে এক গভীর আশঙ্কার উদ্রেক করিয়াছে। নানা রীতি-নীতিবহুল বৌদ্ধ ধর্ম্মমত এখানে প্রচলিত। তিব্বতের অন্তর্গত পবিত্র লাসা শহরে এই ধর্ম্মমত উদ্ভূত হইলেও, ইহা মঙ্গোলজাতির মধ্যে বিশেষ প্রভাববিস্তার করিয়াছে। চীনের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের অধিকাংশেই এই ধর্ম্মমত অনুসৃত হইতে দেখা যায়; দালাই লামা ও পঞ্চান লামা এই ধর্ম্মমতের অনুশাসন করেন। পঞ্চান লামা বুদ্ধের অবতার বলিয়া পরিগণিত হওয়া স্বত্ত্বেও দালাই লামা অধুনা তিব্বতের শাসনভার পরিচালনা করিতেছেন। রাজনৈতিক কারণে পঞ্চান লামা ১৯২৪ সালে চীনে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।

১৯১২ সালে চীনে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে মাঞ্চুগণের এতদিনের সীমান্ত-নীতির পরাজয় ঘটিল। মাঞ্চু সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিবার ফলে মঙ্গোল এবং সীমান্ত-প্রদেশের অন্যান্য জাতি চীনের সহিত যে বন্ধনে এতদিন আবদ্ধ ছিল তাহা এক্ষণে ছিন্ন হইয়া গেল। তিব্বত এবং বহির্মঙ্গোলিয়া চীন সাধারণ-তন্ত্রের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। তদবধি ১৯১২ খ্রীঃ অঃ হইতে বহির্মঙ্গোলিয়া চারিটি বিভিন্ন প্রকারের রাজনৈতিক শাসনের অধীনস্থ ছিল। ১৯১২ হইতে ১৯১৮ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত জার-শাসিত রুশিয়া এখানে আধিপত্য করে। ১৯১৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ইহা চীনের এবং তৎপরে অতি অল্পদিনের জন্য রুশিয়ার ব্যারণ ফন্‌ ষ্টারণবের্গ (Sternberg)-এর অনুশাসনে আসে। ১৯১১ সালের ৬ই জুলাই ব্যারণ ষ্টারণবের্গ সোভিয়েট সৈন্যগণের নিকট পরাজিত হইলে পর উরগাতে মঙ্গোলগণের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট (Mongol Peoples Government) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহারা বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। চার বৎসর পরে ১৯২৪ সালের ৩১শে মে সন্ধির ফলে চীনের অধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়ায় বহির্মঙ্গোলিয়া হইতে সোভিয়েট সৈন্যদল অপসারিত করা হইল। তদবধি এখানে মঙ্গোলীয় জাতীয় দল শাসনভার পরিচালন করিতেছে এবং নিজেদের সুবিধার জন্য রুশীয় উপদেষ্টা রাখিয়াছে। বহির্মঙ্গোলিয়ার তরুণদল প্রকৃতপক্ষে রুশীয় রাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কেন না তাঁহারা মনে করেন বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া দেশ গঠন করিতে হইলে তাহার আবহমানকাল-প্রচলিত জর্জ্জরিত রীতি-নীতির আমূল সংস্কার করা উচিত। তদুদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে রুশিয়ার শাসন-প্রণালী বিশেষ ফলপ্রদ হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। এজন্য যুবকগণ "মঙ্গোলিয়ান পিপ্‌লস পার্টির' সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া দেশের অভিজাত সম্প্রদায়কে শক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা রুশীয় আদর্শে পরিচালিত এক নবীন বহির্মঙ্গোলিয়া

প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছেন। অধুনা এই রাজনৈতিক সম্প্রদায় যেরূপ শক্তিশালী হইয়া দেশ শাসন করিতেছেন তাহাতে মনে হয় বৈদেশিক আক্রমণ ব্যতীত ইহার পতন নাই।

মাঞ্চুবংশের পতনের পর আভ্যন্তরীন মঙ্গোলিয়ার বিভিন্ন রাজন্যবর্গ বহির্মঙ্গোলিয়ার সহযোগিতায় কয়েকবার আপন আপন স্বাধীনতা লাভের ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছে। রুশিয়া-ভীতি ও বহির্মঙ্গোলিয়ার রাজন্যবর্গের হিংসাপরায়ণতার দরুণই তাঁহারা এ-বিষয়ে ব্যর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের শক্তি-সামর্থে নিতান্ত আস্থাবান বলিয়া ধারণা করেন যে, সাধারণ-তন্ত্রী চীনের বিরুদ্ধতা করিবার শক্তি তাঁহাদের যথেষ্ট আছে। কিন্তু ইহা তাঁহাদের এক প্রকাণ্ড ভ্রম। কারণ দেখা গিয়াছে যুদ্ধকালে চীন সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়া আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। ১৯২৮ সালে যখন আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া জীহোল, ছাহার, সুইউয়ান ও নিঙ্‌সিয়া নামক চারিটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায় তখনই তাহার ধ্বংসের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়। এইরূপে পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের চীনের কবলে পতিত হইবার পথ পরিষ্কার হইল।

১৯৩১ সালে মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে এক নূতন বিপর্য্যয় ঘটিল। রুশিয়ার আদর্শানুযায়ী বহির্মঙ্গোলিয়ায় এক নূতন বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ হইতে উচ্চ ধরণের এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। অন্যদিকে মাঞ্চুরিয়া এবং আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ার রাজন্যবর্গ ধীরে ধীরে চীন কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়েই জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত হওয়ায় ঘটনা-পরিবর্তন হইয়া এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল। আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ার জীহোল প্রদেশ লইয়া জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুকুয়ো রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে তিনটি মঙ্গোলিয়ার সৃষ্টি হইল—একটি জাপানের, দ্বিতীয়টি চীনের এবং অপরটি সোভিয়েটের অধীন। কিন্তু জাপান চীন অথবা সোভিয়েট অপেক্ষা, অধিকসংখ্যক মঙ্গোলিয়ানগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

এই মাঞ্চুকুয়োর যে অংশে মঙ্গোলীয়গণের আধিক্য আছে তথায় জাপান সিংআঙ্‌ নামক প্রদেশ নূতন প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে একজন মঙ্গোলীয় শাসনকর্ত্তা অধিষ্ঠিত করিয়াছেন; মঙ্গোলজাতির দলবিশেষের অধিনেতাদের মধ্য হইতে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইতেছে। রাষ্ট্র-রক্ষাকল্পে তাহাদিগকে নিজেদের সৈন্যদল প্রস্তুত করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে এবং চীনা কৃষক ঔপনিবেশিকগণ যাহাতে এই অংশের কোনও ভূখণ্ড দখল করিতে না পারে, সে-বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবার ভারও তাহাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী চীনা প্রদেশের অধিবাসী মঙ্গোলগণ মাঞ্চুকুয়োবাসী মঙ্গোলগণের নিকট হইতে জাপানের স্বকৃত এই সীমারেখার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ১লা মার্চ্চ ১৯৩৪ সালে এই মাঞ্চুকুয়ো রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় মঙ্গোলরাজগণ জাপানের এই নবীন কীর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন। কেননা সম্রাট ক্যাঙ্‌টির অধীনে এই রাজগণ মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ জাতীয় ধরণে অচিরে যে এক নবীন মঙ্গোল-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিতে পারতেন তাহা এক্ষণে অসম্ভব হইল। সম্রাট আভ্যন্তরীন মঙ্গোলিয়ায় যে শুধু চীনাগণের গতি অবরুদ্ধ রাখিয়াছেন তাহা নহে, অধিকন্তু বহির্মঙ্গোলিয়ার বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদকে দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশিখরের ন্যায় প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এমত অবস্থায় চীন-পরিশাসিত আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় এক নবীন মঙ্গোলরাষ্ট্রের আবির্ভাব নিতান্ত অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই রাষ্ট্র-পরিকল্পনায় অধিনায়কত্ব করিতেছেন টি ওয়াঙ্‌। তাঁহার একমাত্র কাম্য চীন-শাসনের উচ্ছেদ সাধন করা। গত ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নানকিঙ্‌ সরকার উত্তর-চীনে মঙ্গোলগণের প্রার্থিত সর্ত্তগুলির বিষয় আলোচনার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। নানা বাগ্‌-বিতণ্ডার পর কোনও কোনও মঙ্গোল জেলায় স্বাধীন রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

মঙ্গোলগণ এক্ষণে রাজনীতিক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা চিন্তার বিষয়; সোভিয়েট রুশিয়ার সংস্পর্শ-জনিত বৈপ্লবিক স্বাদেশিকতা ও জাপানের সংঘাত-জনিত সনাতনপন্থীয় রক্ষণশীল জাতীয়তা তাঁহাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। মাঞ্চুকুয়ো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গোল রাজন্যবর্গ তাঁহাদের প্রাচীন কালের আচার-ব্যবহারের

অনুশীলন করিতে পারিবেন বলিয়া অভয় পাইয়াছেন। তাঁহারা সম্যক অবগত আছেন যে তাঁহারা বহির্মঙ্গোলিয়ার বৈপ্লবিক-পন্থী মঙ্গোলগণ অপেক্ষা দলে সংখ্যালঘিষ্ট। সুতরাং প্রাচীন-পন্থীর যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন তাঁহারা ইহাদের গতিরোধ করিতে পারিবেন, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আবহমানকাল প্রচলিত এক রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা মাঞ্চুকুয়ো সম্রাটের নিকট আনুগত্য স্বীকার না করিয়া এক সম্পূর্ণ স্বাধীন মঙ্গোল-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা এক ধ্বংসোন্মুখ নীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা পরস্পর মিলিত হওয়া দূরে যাক জাতীয়তার বিরুদ্ধগামী পরস্পরের স্বার্থপরতা লইয়া ব্যস্ত আছেন; অপর পক্ষে এক অভিনব শক্তিশালী যুবক মঙ্গোল দল আধুনিক আচার-ব্যবহারে সুসমৃদ্ধ হইয়া এই প্রাচীন দলের অভিযানকে ব্যর্থ করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইহাঁরা 'কমুউনিষ্ট' মতবাদী এবং প্রয়োজন হইলে বহির্মঙ্গোলিয়ার সাহায্যও লইবেন। এইরূপে রুশিয়ার সাহায্যে এক অপূর্ব্ব মঙ্গোল জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে দেশে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে মঙ্গোলগণকে কেন্দ্র করিয়া জাপান ও রুশিয়া মঙ্গোলিয়ায় সুসজ্জিতভাবে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন। যদি পুনরায় রুশ-জাপানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তবে মঙ্গোলিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড উভয় পক্ষকে বিশেষ সাহায্য দান করিবে। স্বায়ত্তশাসনশীল সিংজাং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া জাপান, চীন-শাসিত ছাহার ও সুই-উয়ান প্রদেশের অসন্তুষ্ট মঙ্গোল রাজন্যবর্গকে কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত চীন এই অঞ্চলগুলি দখল করিয়া থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত জাপান ও রুশের মধ্যে একটা শক্তির সমতা থাকিবে। সুতরাং কেহই এই অংশগুলি সহসা অধিকার করিবার প্রয়াস পাইবে না। ছাহার প্রদেশের দলোনর নামক স্থানে জাপান সৈন্যের সমাবেশ এই সমতা-ভঙ্গের আভাষ দিতেছে। এইরূপ অবস্থায় মঙ্গোলগণের কার্য্যাবলী এক মহাসমরের ইন্ধন যোগাইয়া নিজেদের সেই সুযোগে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারে।

আভ্যন্তরীণ তিব্বত

গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ মধ্য-এশিয়ায় তিব্বতকে লইয়া নানা বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। চীন, ইংরেজ ও রুশিয়ার মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মঙ্গোল, মিং ও মাঞ্চু সম্প্রদায়ও তিব্বতের উপর আধিপত্য করিয়াছে। ইংরেজ উত্তর-ভারত পর্য্যন্ত তাঁহাদের সীমারেখা বিস্তার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। গত শতাব্দীর শেষভাগে নেপাল, ভুটান ও সিকিম হইতে মাঞ্চু-তিব্বতীয় প্রভাব বিদূরিত হওয়ায় ইংরেজরা প্রত্যক্ষভাবে তিব্বতের সংস্পর্শে আসিয়াছে। ১৯০০ খ্রীঃ অঃ হইতে ব্রিটিশ, তিব্বতকে ভারতের সীমান্ত-প্রদেশের ঘাঁটিরূপে পরিগণিত করিতেছেন। উত্তর হইতে রুশিয়ার আক্রমণ ব্যর্থ করিবার পক্ষে এই কেন্দ্র সম্যক উপযোগী।

১৯০৪ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ভাগে কর্ণেল ইয়ংহাজবেণ্ড-এর অধিনায়কত্বে তিব্বতে পরিবর্দ্ধনশীল রুশিয়ার প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য এবং তিব্বত যে-ব্যবসানীতি সম্পূর্ণ অমান্য করিয়া আসিতেছে ইংরেজের সহিত সেই ব্যবসাসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য এতদঞ্চলে এক অভিযান দল পাঠান হইয়াছিল। তিব্বতীয়গণ এই দলকে আক্রমণ করিয়া ৩৭ জনকে নিহত করে, ও নিজেরাও ৭০ জন নিহত হয়। লাসায় ব্রিটিশ সৈন্য ৩রা আগষ্ট প্রবেশ করিলে দালাই লামা মঙ্গোলিয়ায় পলায়ন করেন এবং ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সালে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তাহারই ফলে দণ্ডস্বরূপ তিব্বত ইংরেজকে ৫০০০০০ পাউণ্ড প্রদান করিতে বাধ্য হয় এবং তিনটি শহরে ইংরেজকে ব্যবসা করিতে সুযোগ প্রদান করা হয়। এই সর্ত্তগুলি প্রতিপালন হইবার পরও চুম্বি উপত্যকা-প্রদেশে তিন বৎসরের জন্য ব্রিটিশ সেনা-শিবির সন্নিবিষ্ট করিতে দেওয়া হইল। তিব্বতও ইংরেজের অভিপ্রায় ও মতামত ব্যতীত অন্য কোনও বৈদেশিকগণকে এখানে জোত-জমি প্রতিষ্ঠা করিতে বা ব্যবসা-কেন্দ্র খুলিতে অনুমতি দিবে না, প্রতিশ্রুত হয়।

১৯০৮ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত মাঞ্চু-কার্য্যবিধি তিব্বতীয় ব্যাপারে ইংরেজের প্রতিপত্তি অনেকটা ক্ষুণ্ণ করিয়া দিল। ১৯০৮ সালে চীন তিব্বতের দণ্ডের অর্থ সমুদয় ইংরেজকে শোধ করিয়া দিল। তদবধি ইংরেজ সৈন্য চুম্বি উপত্যকা ত্যাগ করিল বটে কিন্তু ব্যবসা-কেন্দ্রে তাঁহাদের সৈন্য রক্ষিত হইল। ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দালাই লামা ফিরিয়া আসিলেন বটে কিন্তু ১৯১০ সালের প্রথম ভাগেই মাঞ্চুগণের ভয়ে পুনরায় ভারতবর্ষে পলায়ন করিলেন। এখানে ইংরেজগণ তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দন প্রদান করিয়া দার্জ্জিলিঙে তাঁহার আবাসস্থল নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহারা দুই বৎসর ধরিয়া দার্জ্জিলিঙে লামার অবস্থানের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। David Macdonald কৃত "Twenty years in Tibet" শীর্ষক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। ১৯১১ সালে চীনে বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাঞ্চুসৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল ও ফলে তিব্বত হইতে বিতাড়িত হইল। এইরূপে তিব্বত হইতে মাঞ্চু প্রভাব চির বিদায় গ্রহণ করিল। ১৯১২ সালে ইংরেজ দালাই লামাকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন এবং তাঁহারই আনুকুল্যে সেখানে অদ্যাবধি তাঁহারা প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছেন। ইউয়ান সি-কাই ১৯১২ সালে চীন সাধারণ-তন্ত্রের সৈন্যদল লইয়া তিব্বত আক্রমণ করেন কিন্তু ইংরেজের চেষ্টায় তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং তদবধি তিব্বতে চীনা সৈন্যগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে সিমলায় ইংরেজ, চীন, ও তিব্বতের প্রতিনিধিবর্গের এক বৈঠক বসে। তাহারই ফলে ব্রিটিশ ও তিব্বতের মিলিত চুক্তির বলে তিব্বতকে আভ্যন্তরীণ ও বাহির এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; প্রথমটি চীন কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হইবে এবং শেষোক্তটিকে চীনের সর্ব্বময় প্রভুত্বে এবং ইংরেজের রক্ষণাবেক্ষণে একটি স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। ইহাতে চীন প্রতিনিধিবর্গের সম্পূর্ণ মত থাকিলেও চীন গভর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলেন না। ইংরেজ ঘোষণা করিলেন চীনকে এই ইংরেজ-তিব্বতীয় চুক্তি মানিতেই হইবে এবং তাহা না-মানিলে যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বীকৃত না হইবেন, তত দিন পর্য্যন্ত চীন-তিব্বতীয় ব্যবসা-সূত্র ছিন্ন হইবে। চীন কিন্তু ইহাতে কখনও স্বীকৃত হয় নাই।

১৯১৪ সাল হইতে তিব্বতে ব্রিটিশ প্রভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। ভারতের সহিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তিব্বতে ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে। চীনের মধ্য দিয়া তিব্বতে প্রবেশ একরূপ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভারতের মধ্য দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিতে হইলে বৃটিশের অনুমতি দরকার। বৃটিশের আনুকূল্যে ও তিব্বত সরকারের অর্থে ১৯২৩ সালে লাসা পর্য্যন্ত ভারতীয় টেলিফোন লাইনটি বিস্তৃত হইয়াছে এবং এখানে ইংরেজ প্রতিনিধি যথারীতি রাখা হইয়াছে। বিলাত-প্রত্যাগত ইংরেজী-ধরণে শিক্ষিত তিব্বতীয় ছাত্র রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে এবং ভারত সরকারের অনুমতি অনুসারে তিব্বতীয় সৈন্যগণকে ইংরেজ ও ভারতীয় অফিসারগণের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সৈন্যদল অধুনা আভ্যন্তরীণ তিব্বতের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই কার্য্যের স্বপক্ষে তিব্বতীয় শাসকবর্গ বলেন যে ১৭২৭ সালে মাঞ্চুগণ কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই অঞ্চল তিব্বতেরই অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে এই স্থানে অংশত চীনের বসবাসের অধিকার ছিল; একথা এবং ইহা শাসনের ক্ষমতা যে চীনের আছে, তাহা ১৯১৪ সালের ইঙ্গ-তিব্বতীয় চুক্তিতে উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; এরিক টাইকম্যান নামক চীন-তিব্বত সীমান্তের এক ব্রিটিশ দূত এই সন্ধি করণের মূলে ছিলেন। বহুদিন যাবৎ চীন-তিব্বতের রক্তারক্তির ফলে অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে এক সর্ত্তানুযায়ী (১৯ আগষ্ট ১৯২৮) তিব্বত চিয়ামূডো নামক স্থান হস্তগত করে। ১৯২৮ সালে ন্যান্‌কিং গভর্ণমেণ্ট নিজেদের সুবিধার জন্য সিকাং ও চিংহাই প্রদেশগুলির সংস্কার সম্পন্ন করেন কিন্তু ১৯৩২ সালে তিব্বত ইহাদের অধিকাংশ করায়ত্ত করিয়া লয়। এই যুদ্ধে কোনও ইংরেজ সৈন্য সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত না-থাকায় ব্রিটিশ ইহার সর্ব্বদায়িত্ব অস্বীকার করিতেছেন। অপর পক্ষে, তিব্বত বলিতেছে যে তাহার ঐতিহাসিক যুগ হইতে অধিকারভুক্ত সীমানা-রেখা রক্ষা করিবার জন্যই সে ঐরূপ করিয়াছে; কোন অপরাধ করে নাই।

১৯৩৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর দালাই লামার মৃত্যু ঘটিলে তিব্বতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল। ১৯২৪ সালে পঞ্চান লামা তিব্বত হইতে বিতাড়িত হইলে তাহার পর হইতেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দালাই লামা একছত্র অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন; ইংরেজগণ কুড়ি বৎসর ধরিয়া ইঁহার সহিত গভীর সখ্যে আবদ্ধ ছিলেন। এই সময় পঞ্চান লামা মাঞ্চুরিয়া ও আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় বাস করিতেন এবং ন্যানকিং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ সাহায্য (শোনা যায় বৎসরে ৪০০,০০০ মেক্সিকান ডলার) পাইতেন। দালাই লামার মৃত্যু হওয়াতে পঞ্চান লামার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সুযোগ আসিয়াছে। দেশের অনেকেই দালাই ও তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলীর অতি আধুনিকতা-দোষদুষ্ট রীতি-নীতির মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না; ইহাতে তাঁহারা আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কেননা, পঞ্চান লামার অধিনায়কত্বে তাঁহারা তিব্বতের অবস্থার অনেক সংস্কার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে; যেহেতু লাসায় ইংরেজ পক্ষপাতী দল, ৩৪ সনের জানুয়ারীতে দালাইয়ের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং, অদূর ভবিষ্যতে পঞ্চান লামার তিব্বতে ফিরিবার কোন আশা নাই। নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে মিঃ গিলবার্ট এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন—লামার মৃত্যুর পর কে লামা হইবে তাহা নির্ণয় করিতে কয়েক বৎসর চলিয়া যায়; কেননা যে-মুহূর্ত্তে লামা মরিয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যে শিশু জন্মগ্রহণ করিবে, সে-ই লামা হইবে, ইহাই তিব্বতের সনাতন প্রথা। মৃতের আত্মা সেই নবজাত শিশুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সকলের ধারণা। সুতরাং এইরূপ একটি নবজাত শিশু খুঁজিয়া বাহির করিতে সাধারণতঃ কয়েক বৎসরও অতিবাহিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে সমুদয় সনাতন রীতির ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। পুরাতন লামার মৃত্যু হইতে না হইতেই অনতিবিলম্বে লাসার সন্নিকটবর্ত্তী একস্থানে এই অপরূপ ভাগ্যবান শিশুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহাকে লামা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে! অথচ বহুদূরবিস্তৃত লামা-শাসিত তিব্বতের কোনও অজ্ঞাত সুদূর সীমান্তে লামার আত্মা-অধ্যুষিত এই শিশুর জন্মগ্রহণ করা মোটেই বিচিত্র ছিল না!

সিঙ্‌কিয়াং প্রদেশে বিদ্রোহ

খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভ হইতে, হান বংশীয়গণের রাজত্বকালে দিগন্তবিস্তৃত চীনা-তুর্কীস্থানের কোনও না কোন বিষয়ে চীনের সহিত সংযোগ ছিল। ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৪ অব্দের বিখ্যাত মুসলমান-বিদ্রোহ দমন করিবার পর মাঞ্চু শাসকগণ তুর্কীস্থানের পুনঃসংস্কার করিয়া ইহাকে বিশাল চীন-সাম্রাজ্যের ঊনবিংশ প্রদেশ বলিয়া ঘোষিত করেন। তদবধি ইহা সিঙ্‌কিয়াং বা "নূতন সাম্রাজ্য" এই নামে বিভূষিত হইয়াছে। যদিও এই প্রদেশ তিব্বত ও বহির্মঙ্গোলিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী, তবুও ইহা যে চীনের একটি সুশাসিত অংশ ইহা নিরাপদে বলা যাইতে পারে। সিঙ্‌কিয়াং চীন সান পর্ব্বতমালা দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। দক্ষিণে খাসগড়—ভারত ও আফগানিস্থানের সহিত বণিকদলের ব্যবসা-পথের একটি বড় কেন্দ্র। উত্তরে যুঙ্গারিয়া যুদ্ধোপযোগী অবস্থিতির জন্য প্রসিদ্ধ। এখান হইতে চীন-রুশিয়ার বাণিজ্যপথ চলিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণে তুর্কীরা এবং উত্তরে তুঙ্গাং এবং কসাক লইয়া গঠিত বিশাল মুসলমান জনসংখ্যা বর্ত্তমান চীন-শাসনের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছে। ইহার অন্তর্বর্ত্তী কানসু প্রদেশেও একটি দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান উপজাতি আছে। রীতি-নীতি, কথা-বার্ত্তা ও আচার-ব্যবহারে এই মুসলমান সম্প্রদায়গুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চতুরতর নেতাদের মধ্যে চীনের পশ্চিম দিগন্তে সম্মিলিতভাবে এক সুবিশাল মুসলান সাম্রাজ্য-স্থাপনের পরিকল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছে। মুসলমানগণের এই চীন-বিদ্বেষ এতদঞ্চলে যথেষ্ট ভীতির সঞ্চার করিয়াছে, কেননা বৈদেশিকগণ এই সুযোগে মুসলমানগণের সহিত যোগদান করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। কোনও মুসলমান বিদ্রোহ ঘটিলে কানসুর পথে পরিচালিত হইয়া তাহা চীনের যথেষ্ট ক্ষতি করিতে পারে। যাহা হউক, চীনে সাধারণ-তন্ত্র প্রচলিত হইবার

পর হইতে কোনওরূপ মুসলমান বিদ্রোহের সম্ভাবনা ঘটে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানের এই সমস্যাবহুল কালে একবার কোন প্রকারে বিদ্রোহ-বহ্নি জাগরিত হইলে, চীন সাধারণ-তন্ত্র বিচলিত হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

১৯২৮ সাল হইতে সিঙ্কিয়াং অঞ্চলে চীন-শাসন সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। ১৯১১ হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত মিঃ ইয়াং সেঙ-সিন্ সুদক্ষ হস্তে ইহার শাসনভার পরিচালনা করিয়াছেন। ১৯২৫ সালের পর হইতে চীনের রাজনৈতিক অশান্তি নৌ-বাণিজ্যের পথে যথেষ্ট বিঘ্ন সঞ্চার করে; ঠিক সেই সময়েই সোভিয়েটগণের অর্থনৈতিক নীতি সিঙ্কিয়াং প্রদেশের অন্তর অধিকার করিয়া বসিল। ১৯২৮ সালে গভর্ণর ইয়াং সেঙ-সিনের হত্যা এক যুগান্তের অন্তরালে যবনিকা পাত করিল; মুসলমানগণের চীন-বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর কোনও সুনিপুণ নেতা রুক্ষহস্তে পরিচালন-দণ্ড গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে বসবাস করিয়া জনসংখ্যা শীঘ্রই বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে তুর্কী কৃষকগণকে উত্তরের অপেক্ষাকৃত বসতি বিরল যাযাবর দেশে বাস করিবার জন্য গমন করিতে হইয়াছে। ইহাতে চৈনিক শাসক-সম্প্রদায় সন্তুষ্ট ছিলেন বটে কিন্তু মঙ্গোল ও কসাকগণ নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। জনসাধারণও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এইরূপে গভর্ণর ইয়াং-এর রাজত্বকালে চৈনিক শাসন-নীতি দেশীয়গণের মনে এক বিদ্বেষ-বহ্নি জাগরিত করিল। বাহিরের প্রভাবের মধ্যে সোভিয়েটগণের প্রভাবই সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৯২৫ সালের পর সিঙকিয়াং-এ সোভিয়েট বাণিজ্য-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শীঘ্রই সিঙকিয়াং-এর সীমান্ত-রেখা ব্যাপিয়া 'তুর্ক সিব রেলওয়ে' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য অনায়াসে বিদেশে চালিত হইতে লাগিল। তদুপরি রুশিয়া "ফ্রী-ট্রেড" নীতির অনুসরণ করিয়া প্রাচ্যের নানা দেশে বাণিজ্য-বিস্তার করিতে সক্ষম হইল। এই সুযোগে রুশিয়া উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিঙকিয়াং-এর সহিত বন্ধুত্বভাব স্থাপন করিল। অবশেষে ১৯২৫ সালে চীন-সোভিয়েট সখ্য-নীতি স্বাক্ষরিত হওয়ায় উভয় দেশে পরস্পর প্রতিনিধি প্রেরণের অপূর্ব্ব সুযোগ আসিল। এইরূপে রুশিয়া এখানে তাহার বাণিজ্য-প্রসার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় চৈনিক শাসকবর্গের নানা অসুবিধা হইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন সিঙকিয়াং-এর আর্থিক ভাণ্ডারকে সোভিয়েট রাহু সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে! ফলে চীনের বাণিজ্য-শক্তি হ্রাস পাইল। ইহার পুনরুদ্ধারকল্পে চৈনিক শাসকগণ জনসাধারণের উপর অধিকতর শুল্ক স্থাপন করিলেন। ইহাতে সিঙকিয়াং-এর অধিবাসীবৃন্দ আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল।

এই সময়ে এখানে অনাহূতভাবে আর এক বৈদেশিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইল। ১৯২৯ সনে যখন চীনের বৈদেশিক-গণের নিকট হইতে অস্ত্র-আমদানি নীতি বন্ধ হইয়া গেল তখন সিঙ্কিয়াং ভারতের মধ্য দিয়া যুদ্ধাস্ত্র সঞ্চয় করিতে লাগিল। ইহাতে চীন সরকার আশঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ১৯৩০ সালের শেষ ভাগে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার মৃত্যুর পর চীন-কর্ত্তৃপক্ষ স্বাধীন হামি প্রদেশের উপর তাঁহাদের প্রত্যক্ষ শাসন-জাল বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইলেন; ইহাতে হামি তুর্কীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল ও অনায়াসে চীন সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া, মা চুং ইঙ্ নামক এক যুবক সেনাধ্যক্ষ-পরিচালিত, কানসু মুসলমান বাহিনীর সহিত সখ্যতা স্থাপন করিল। কারাসরের টর্গট মঙ্গোলগণের নিকট সাহায্য-ভিক্ষা করিয়া চীন সেনাবাহিনী বিফলমনোরথ হইল। অসন্তোষের ফলে সিঙ্কিয়াং-এ মঙ্গোলগণের দুর্দ্দান্ত অধিনায়ক গুপ্তভাবে নিহত হইল। ফলে এই প্রদেশের সমুদয় মঙ্গোল অধিবাসী চীনের প্রতি তাহাদের বশ্যতা অস্বীকার করিল। ১৯৩১-৩৩ সালের মুসলমান বিদ্রোহীগণ নানা দেশ দখল করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিপন্ন চৈনিক সরকার শ্বেত রুশীয়গণকে লইয়া এক বিরাট বাহিনী সৃষ্টি করিলেন। তাহাদের সাহায্যকল্পে মাঞ্চুরিয়ার চীনাগণকে লইয়া আর একটি দুর্দ্ধর্ষ দলেরও অভ্যুদয় হইল। এই বিশাল সম্মিলিত সেনাবাহিনী সাইবেরিয়ার সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৯৩৩ সালের মধ্যেই চীন কর্ত্তৃপক্ষ উত্তরের সিঙ্কিয়াঙের অধিকাংশ লুপ্ত রাজ্য আবার স্বাধিকারে

আনিলেন বটে কিন্তু শাসনব্যাপারে ও আর্থিক প্রসঙ্গে নানা অবনতি পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু সিঙকিয়াং-এর দক্ষিণদিকে চীনের অধিকার সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ হইল। খাসগড় অঞ্চলে বিভিন্ন মুসলমান দল পরস্পর পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে ব্যাপৃত হইল। ১৯৩৪ সালের প্রথম ভাগে খোটানের আমীর এখানে এক 'স্বাধীন' রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া খাসগড় তাঁহার রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সোভিয়েট-সম্প্রদায় এক অভিযোগ করিয়াছেন যে ইংরেজগণ এই "স্বাধীন" রাষ্ট্র-স্থাপন নীতির সহিত নাকি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। এতদিন ধরিয়া ইংরেজগণ সিঙকিয়াং-এ চীনের প্রতিপত্তি স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু সহসা এই ভূখণ্ডে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব ও অন্যদিকে চীনের দুর্ব্বলতা দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা এ-নীতির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যাহা হউক, কাশ্মীর কিংবা তিব্বতের মধ্য দিয়া খাসগড়ের সহিত কোনও যোগসূত্র রাখা সম্ভবপর ও অনায়াসসাধ্য নহে। খোটানের আমীরের পরিকল্পিত 'স্বাধীন' রাষ্ট্রস্থাপনের উদ্দেশ্যকে বলবতী করিবার যে প্রয়াস, সহানুভূতি ও সাহায্য, ইংরেজগণ পোষণ করিতে পারেন তাহা সাক্ষাৎভাবে করিতে পারিতেছেন না ও তাহা ভৌগোলিক কারণে ব্যাহত হইতেছে।

সিঙকিয়াংকে স্বাধিকারে রাখিবার জন্য ন্যানকিং সরকার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা মধ্য-এশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ আবিষ্কারক ডক্টর স্বেন হেডিনকে এই দুই রাজ্যের মধ্যে মটর যান গমনাগমনের নিমিত্ত উপযুক্ত রাস্তা নির্ম্মাণের পন্থা আবিষ্কারের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন।

ফরাসী য়ুনন

ইন্দো-চীনে ঘাঁটি ফেলিয়া ফরাসীগণ দক্ষিণ-চীনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। 'হেইফঙ—য়ুননফু রেলওয়ে' প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফরাসীগণ এই রাজ্যের সহিত যোগসূত্র রাখিয়াছে। এই রেলের সাহায্যে য়ুননে যে সব দ্রব্য আমদানি হয় তাহাদের উপর ফরাসী রাষ্ট্র এরূপ অধিক শুল্ক বসাইয়াছেন যে অ-ফরাসী কোনও দ্রব্য প্রতিযোগিতায় একেবারেই সমকক্ষতা করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত অন্য দেশ হইতে আগত পণ্য য়ুননে পৌছিতে ছয় মাস লাগে; এই দীর্ঘ সময়ে সাধারণতঃ নানা দ্রব্য অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে; কিন্তু ফরাসী দ্রব্য এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে আনীত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ফরাসীগণ এই অঞ্চলে অতি সুচারুরূপে ব্যবসা বিস্তার করিয়াছেন। য়ুননের রাষ্ট্রীয় অবস্থাও অনুরূপ। ফরাসীগণই এই রেলের সাহায্যে এখানে অনায়াসে তাঁহাদের যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করিতেছেন, স্থানীয় শাসনকর্ত্তাও ইন্দো-চীন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সমভাবে সখ্য বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ ফরাসী কৃষ্টির অনুসরণ করিতেছেন। প্রবাসী চৈনিক ছাত্রগণের অধিকাংশই ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করিয়া, ফরাসী রীতি-নীতিতে অভিজ্ঞ হইয়া দেশে ফিরিতেছেন। যাহা হউক বর্ত্তমানে ফরাসী সরকার প্রত্যক্ষ ভাবে এই অঞ্চলের শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। য়ুননের সীমান্ত-প্রদেশে নূতন কোনও শক্তির অভ্যুদয় হইলেই তাঁহারা এই ভার লইতে পারেন। চৈনিক বিরুদ্ধাচারণও বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ১৯০৭ সালের ১০ জুন হইতে পূর্ব্ব দিগন্তে অধিকার লইয়া ফরাসী সরকার জাপানের সহিত মিতালি করিয়া আসিয়াছেন। ইহার বলে ফরাসী ও জাপ সরকার এশিয়ায় তাঁহাদের স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং নিজেদের রাজত্ব রক্ষা করিতে গিয়া তৎসন্নিকটবর্ত্তী চীন রাজ্যের কোন কোন অংশেও শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত আছেন। ফরাসী-অধ্যুষিত এই প্রদেশে ইংরেজ আক্রমণও বোধ হয় সহসা সম্ভবপর নহে। তবুও য়ুননের উত্তর-সীমান্তে তিব্বতীয় বাহিনী অগ্রসর হইয়াছে এবং উত্তর বর্ম্মার মধ্য দিয়া ইংরেজগণ য়ুননের অন্য এক অংশে অনধিকার-প্রবেশ করিতেছেন। তৃতীয় কোনও শক্তির অভ্যুদয় না হইলে বা পূর্ব্ব দিগন্তে কোন তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত না হইলে এখানে ফরাসী প্রভাব সমভাবে অটুট রহিবে।

সিদ্ধান্ত

জাপান, রুশিয়া, ইংরেজ ও ফরাসী এই চারিটি বিশাল শক্তি চীনের সীমান্ত-রেখা লইয়া পরস্পরের সম্মুখীন। জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত হওয়ায় অন্যান্য তিন শক্তি পরস্পরের অধিকৃত অঞ্চলে নিজেদের সমস্ত শক্তি একত্র সঞ্চিত করিয়াছেন। সুতরাং যে-কোন অঞ্চলে

বহ্নি জলিয়া উঠিলে অপরাংশও প্রজ্জ্বলিত হইবে। এই সব বিষয়ের পশ্চাতে নিগূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার কোনটাই ক্ষণস্থায়ী সাময়িক চাঞ্চল্য নহে।*

একটি শক্তিশালী অবিচ্ছিন্ন চীন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা জাপানের মনে বিভীষিকার উদ্রেক করে। বিভিন্ন অংশে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিলে এশিয়ায় জাপানের রাজ্যস্থাপন-নীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই পথে মাঞ্চুরিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা জাপানের প্রথম কার্য্য। জাপানের দ্বিতীয় কার্য্য হইবে একটি 'মঙ্গোলকুয়া' রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। যাহা হউক, বহির্মঙ্গোলিয়ায় রুশিয়ার শক্তি পরীক্ষা না করিয়া জাপান এ-কার্য্যে কিছুতেই সহসা অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে পশ্চিম-চীন লইয়া জাপান সমগ্র ইংরেজ ও রুশিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হইতে পারিবে। সেই ভীষণ সংঘর্ষের ফলে, বিবাদমান কোন-না-কোন শক্তির একটিকে আশ্রয় করিয়া অদূর ভবিষ্যতে চীনের পশ্চিম সীমারেখায় এক অভিনব মুসলমান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইবেই হইবে।

ইহার ফলে চীন ধীরে ধীরে এক নগণ্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পর্য্যবসিত হইবে। তখন জাপান ও তাহার অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় শক্তি চীনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে।

বর্ত্তমানকালে চীনসম্পর্কিত আর একটি ব্যাপারে জাপানের সন্দেহসূচক কার্য্যকলাপ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি জাপান চীনকে বহু অর্থ ধারস্বরূপ দিতে সম্মত আছেন। চীনের আর্থিক ও অন্যান্য নানা ঐশ্বর্য্যের অধিকাংশই ছলে-বলে আত্মসাৎ করিয়া তাহার শক্তি অপহরণপূর্ব্বক তাহাকে আপনাদের আশ্রিত একটি রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্যই জাপান এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। ইংরেজের বহু অর্থ এখানে নানাভাবে গচ্ছিত আছে। সুতরাং চীনে তাঁহাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বহু পূর্ব্বে তাঁহাদেরই এই অর্থ ধার দেওয়া উচিত ছিল: তাহা হইলে তাঁহারা চীনের বন্ধুত্বলাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই, কেননা তাঁহাদের বোধ হয় চিন্তা হইয়াছিল যে তাঁহাদেরই প্রদত্ত ঋণে ছত্রভঙ্গ চীন সংস্কারমুক্ত ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ইংরেজ-শাসিত ভারতসাম্রাজ্যের সমূহ ক্ষতিসাধন করিতে পারে। এরূপ করিলে জাপানও অসন্তুষ্ট হইতে পারে, ইংরেজদের এই আশঙ্কাও ছিল। এই সব চিন্তা করিয়া তাঁহারা চীনকে যে ঋণ প্রদান করেন নাই, আজ জাপান তাহাতে সম্মত আছে। জাপানের এই প্রদত্ত অর্থে সমৃদ্ধ ও অধিকতর সুসজ্জিত চীন অতঃপর এশিয়ায় রাজ্য-সম্প্রসারণশীল যে-কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্রকে যে এক মহা বাধা প্রদান করিবে না তাহা কে বলিল? এই কারণেই কি বৃটেন, আমেরিকা ও জাপানের সহিত একত্র হইয়া চীনকে এই তিন শ্রেষ্ঠ শক্তির সম্মিলিত একটি ঋণ প্রদান করার প্রস্তাব করিয়াছেন? 'জাপান ক্রনিকল' লিখিতেছেন—

"Uneasy at the report of a possible financial aid by Japan to China...the British Government conceives the idea of broaching the question of a joint loan...... with a view to restraining Japan's independent action in the matter. It also desired to restrain the American Government in a similar way"

তাৎপর্য্য। চীনে জাপান ও আমেরিকার শক্তি হ্রাস করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অসহিষ্ণু হইয়া সম্মিলিত ঋণ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

জাপান যে চীনকে গ্রাস করিবার জন্য এই ঋণজাল বিস্তার করিতেছে, এই মতবাদ প্রচার করিয়া সম্মিলিত ঋণ-দানের সম্পর্কে আমেরিকার 'নিউ রিপাবলিক' লিখিয়াছে—

The proposal for a loan is not in any way concerned with the welfare of China. The loan would be part of a British-American offensive against Japan......

তাৎপর্য্য। এই ঋণ চীনের কোনও উন্নতিবিধায়ক কার্য্যের জন্য দেওয়া হইবে না, ইহা জাপানের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও আমেরিকার সম্মিলিত আক্রমণ-অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবে।

লণ্ডন নৌ-চুক্তিভঙ্গের অব্যবহিত পরে প্রশান্ত মহাসাগরে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে ইহা কি তাহার আয়োজন সূচিত করিতেছে?

* "They are maneuvres to feel out the strength of the opposition, episodes in a continental struggle over China's outlying territories." (F. P. Report, April 25, 1934)—Bisson
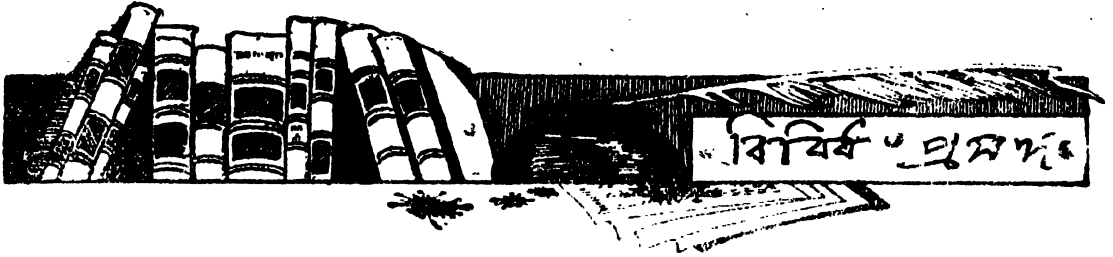
ব্রিটিশ জাতির রাজভক্তি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতি ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জের রাজত্বকালের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ-জাতীয় লোকেরা স্বদেশে এবং সাম্রাজ্যের অন্য সব অংশে নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ করিয়াছে, গ্রামনগরাদি আলোকমালায় সুসজ্জিত করিয়াছে, আতসবাজী দ্বারা দর্শকদের চমক লাগাইয়া দিয়াছে, সৈনিকদের কুচকাওয়াজ করাইয়াছে এবং আরও নানাপ্রকারে জাঁকজমকের সহিত "রজত-জয়ন্তী"র উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে। এই সকল বাহ্য আড়ম্বর যদি রাজভক্তির চিহ্ন হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ জাতিকে রাজভক্ত বলিতে কোন বাধা নাই।

কিন্তু ব্রিটিশ জাতিকে রাজভক্ত মনে করিবার অন্য কারণও আছে। রাজা পঞ্চম জর্জের রাজত্ব আরম্ভ হয় ১৯১০ সালে। ঐ বৎসর হইতে বর্তমান বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপের বহু দেশের শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোথাও সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে, কোথাও বা রাজ্যের পরিবর্ত্তে কোন-না-কোন রকমের সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। রাশিয়া সম্রাটের অধীন ছিল, সাধারণতন্ত্র হইয়াছে; তুরস্ক সুলতানের অধীন ছিল, সাধারণতন্ত্র হইয়াছে; জার্মেনী সম্রাটের অধীন ছিল, সাধারণতন্ত্র হইয়া এখন আবার হিটলারের একনায়কত্বের অধীন হইয়াছে; অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গরী এক সম্রাটের অধীন ছিল, উভয় দেশেই সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পর একাধিক বার বিপ্লব ঘটিয়াছে; স্পেনের রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন বা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন দুই-ই বলা চলে, এবং স্পেনে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে; ১৯১০ সালে পোর্টুগাল সাধারণতন্ত্র হইয়াছে; ইটালীর রাজার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐদেশ সাধারণতন্ত্র না হইয়া মুসোলিনির একনায়কত্বের অধীন হইয়াছে; এবং চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ অন্য কোন কোন দেশের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া সাধারণতন্ত্র হইয়াছে। এশিয়ার বৃহত্তম ও প্রাচীনতম সাম্রাজ্য চীন ১৯১২ সালে সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয় এবং তাহার পর হইতে এখনও সেই বৃহৎ দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ব্রিটেনে কিন্তু এখনও রাজার রাজত্ব বিদ্যমান। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে, যে, ব্রিটিশ জাতি রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী পছন্দ করে। কিন্তু এই টুকু বলিলেই সব কথা বলা হইবে না।

ব্রিটেনে রাজার ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ;—নামে রাজার ক্ষমতা অনেক রকম আছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই নাই। রাজা মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে চলিতে বাধ্য, এবং এক এক বারের পার্লেমেণ্ট-সভ্য-নির্ব্বাচনে যে-দল সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়, মন্ত্রীরা তাহার মধ্য হইতে মনোনীত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রিটেনে রাজার ক্ষমতা প্রজাদের অধিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বস্তুতঃ এরূপ বলিলে অপ্রকৃত কিছু বলা হয় না, যে, ব্রিটেন এরূপ একটি সাধারণতন্ত্র যাহার নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট নাই কিন্তু যাহার সিংহাসনাধিরূঢ় রাজা পুরুষানুক্রমে কতকটা প্রেসিডেণ্টের মত। ইংলণ্ডের লোকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কোন সাধারণতন্ত্রের লোকদের চেয়ে কম নয়।

সেই কারণে এবং আর একটি কারণে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সাধারণতন্ত্র স্থাপন আবশ্যক হয় নাই। দ্বিতীয় কারণটি ব্রিটিশ রাজনীতির একটি প্রচলিত কথার মধ্যে নিহিত। তাহা এই, যে, রাজা গর্হিত কিছু, অন্যায় কিছু, প্রজাদের অহিতকর কিছু করিতে পারেন না ("The King can do no wrong")। যিনি মন্দ কিছু করিতে পারেন না, তাঁহাকে সরাইবার আবশ্যক কি? সুতরাং ইউরোপের অন্য অনেক দেশে রাজতন্ত্র বা সম্রাটতন্ত্র বদলাইবার প্রয়োজন থাকায় পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলেও ব্রিটেনে সে রকম প্রয়োজনের অভাবে বিপ্লব হয় নাই।

কিন্তু ইংলণ্ডের রাজা যেমন মন্দ করিতে পারেন না, তেমনই মন্দ কিছুর প্রতিকারও ত করিতে পারেন না, মন্দ কিছু হওয়াতে বাধাও ত দিতে পারেন না, এবং ভাল কিছুও ত করিতে পারেন না—এটা কি ইংলণ্ডের লোকদের একটা অভিযোগ নহে বা হইতে পারে না? যদি মন্দের প্রতিকারের, মন্দ নিবারণের, এবং ভাল কিছু করাইবার কোন উপায় না থাকিত, তাহা হইলে ইহা একটা বড় রকমের অভিযোগ হইত বটে; কিন্তু ব্রিটেনে প্রজাদের যে রকম রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ক্ষমতা আছে, তাহাতে তাহারা সংবাদপত্র, সভাসমিতি, পার্লে মেণ্ট ও মন্ত্রীদের দ্বারা মন্দের প্রতিকার, মন্দ নিবারণ এবং হিতসাধন করাইতে পারে। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত রকম অভিযোগ তাহাদের নাই। মোটামুটি ব্রিটিশ জাতির অবস্থা এইরূপ। কিন্তু তাহাদের কোন দুঃখ নাই, তাহারা স্বর্গসুখে আছে, ইহাও ঠিক্‌ নহে। কিন্তু মানুষ যতটা নিজের ভাগ্যবিধাতা ও ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে পারে, ব্রিটিশ জাতি প্রায় ততটা বটে। এই জন্য তাহারা রাজাকে দোষ দেয় না, এবং রাজভক্ত হইবার তাহাদের কোন বাধা নাই।

—

ইংরেজরা কি অর্থে রাজভক্ত নহে

একটি অর্থে, আমরা মনে করি, ইংরেজরা রাজভক্ত নহে।

কেহ যদি কাহাকেও ভক্তি করে, তাহা হইলে সে তাঁহার সম্পর্কীয় ব্যাপারে এরূপ ব্যবহার করে, যাহাতে সেই ভক্তিভাজন লোকের সম্মান বাড়িতে পারে—অন্ততঃ এরূপ ব্যবহার করে না, যাহাতে তাঁহার অসম্মান হয়। ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সম্বন্ধের সহিত জড়িত দুই একটি বিষয়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষের অধীশ্বরী হইবার পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রভু ছিল। মহারাণী অধীশ্বরী হইয়া একটি ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন। তাহাতে এই অঙ্গীকার ছিল, যে, তিনি তাঁহার ভারতীয় প্রজাদের ও ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন, ধর্ম্ম, জাতি, বংশ প্রভৃতির জন্য কেহ কোন অধিকার বা সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না, ইত্যাদি। সকলেই জানেন, মহারাণীর ও তাঁহার পরবর্ত্তী দুই নৃপতির রাজত্বকালে তাঁহাদের মন্ত্রীরা ও ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তারা গুরুতর নানা ব্যাপারে এই অঙ্গীকার অনুসারে কাজ ত করেনই নাই, বরং তাহার বিপরীত কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি প্রকৃত রাজভক্ত হইতেন, যদি তাঁহারা রাণী ভিক্টোরিয়া, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও রাজা পঞ্চম জর্জকে ভক্তি করিতেন, তাহা হইলে যে ঘোষণাপত্র রাণী ভিক্টোরিয়া প্রচার করেন এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র সিংহাসন আরোহণের পর যাহার পুনরাবৃত্তি করেন, সেই ঘোষণা অনুসারে কাজ তাঁহারা নিশ্চয়ই করিতেন। ঘোষণাপত্রে কোন গর্হিত অঙ্গীকার করা হয় নাই। যদি রাণী ভিক্টোরিয়ার মন্ত্রীরা তাহা গর্হিত মনে করিতেন, তাহা হইলে ঘোষণা না করিবার পরামর্শ দিয়া তাহা বন্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু ঘোষণা করিতে দিয়া পরে তদনুসারে কাজ না করায় এই ধারণা জন্মান হইয়াছে যেন ঘোষণার অন্তর্গত রাজকীয় অঙ্গীকারের কোন মূল্য নাই। তাহাতে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও সম্রাট পঞ্চম জর্জের অঙ্গীকারের অসম্মান তাঁহারা করিয়াছেন।

শুধু যে ঘোষণা অনুসারে কাজ হয় নাই, তাহা নহে, উহাকে উড়াইয়া দিবার, উহার মূল্যহীনতা প্রমাণ করিবার, চেষ্টাও হইয়াছে। বিখ্যাত আইনজ্ঞ স্যর জেম্‌স্‌ ষ্টীফেন বলিয়াছেন, উহা (ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে) একটি সন্ধিপত্র (treaty) নহে, উহা একটা বাহ্য অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ দলিল ("a ceremonial document)। অর্থাৎ তদনুসারে কাজ করিতে কোন রাজপুরুষ বাধ্য নহে। ভারতের এক বড়লাট বলিয়াছেন, উহা ত পার্লে মেণ্টের একটা আইন নয়। অর্থাৎ রাজপুরুষেরা যেমন আইন মানিতে বাধ্য, উহা মানিতে সেরূপ বাধ্য নহে। উত্তরে বলা যাইতে পারে, ইংলণ্ডীয় প্রজাগণের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রধান যে সনন্দ ম্যাগ্না কার্টা রাজা জন্‌ দিয়াছিলেন, তাহাও ত পার্লে মেণ্টের আইন নয়; তবে সেই সনন্দকে সাত শতাব্দী ধরিয়া ইংলণ্ডের লোকেরা তাহাদের স্বাধীনতার ভিত্তীভূত বলিয়া কেন মূল্যবান মনে করিয়া আসিতেছে?

আমাদের ধারণা, ভারতবর্ষের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে ব্রিটিশ জাতির প্রকৃত রাজভক্তি নাই, স্বার্থভক্তি বা স্বার্থে

আসক্তি আছে। স্বার্থের অনুসরণ করিতে গিয়া যদি তাহাদের রাণী ও রাজাদের কথার অসম্মান করিতে হয়, তাহাতেও তাহারা স্বার্থসিদ্ধি হইতে বিরত হয় না।

—

সম্রাট পঞ্চম জর্জের কথার অসম্মান

সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র পুরাতন দলিল, এবং তজ্জন্য যদি কোন ইংরেজ তাহা তামাদি হইয়া গিয়াছে মনে করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জের কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারে, যে তাঁহার বিপরীত কাজ হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে যে ভারতশাসন আইন (Government of India Act of 1919) অনুসারে ভারতবর্ষের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা পার্লেমেণ্টে পাস হইবার পর রাজা পঞ্চম জর্জ একটি রাজকীয় ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তাহাতে তিনি বলেন :—

The Act, which has now become law, entrusts the elected representatives of the people with a definite share in the Government and points the way to full responsible Government hereafter......We have endeavoured to give to her (India's) people the many blessings which Providence has bestowed upon ourselves.

But there is one gift which yet remains and without which the progress of a country cannot be consummated—the right of her people to direct her affairs and safe-guard her interests.

তাৎপর্য্য। যে বিধি এক্ষণে আইনে পরিণত হইল তাহা ভারতের লোকদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের হাতে গবর্ণ্মেণ্টের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশের ভার অর্পণ করিতেছে, এবং ইহার পর যে পূর্ণ দায়িত্বমূলক গবর্ণ্মেণ্ট স্থাপিত হইবে তাহার সূচনা করিতেছে।... বিধাতার যে-সব কল্যাণকর দান আমরা (অর্থাৎ ইংরেজরা) পাইয়াছি, তাহা ভারতবর্ষের লোকদিগকে দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কিন্তু সেরূপ একটি জিনিষ এখনও দিতে বাকী আছে, যাহা ব্যতিরেকে কোন দেশের প্রগতি সম্পূর্ণ হইতে পারে না—তাহা তাহার অধিবাসীবর্গের স্বদেশের সমুদয় ব্যাপার পরিচালনা করিবার ও তাহার সমুদয় স্বার্থ রক্ষা করিবার অধিকার।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন প্রণীত হইবার পর পঞ্চম জর্জ যাহা দিতে বাকী আছে বলিয়াছিলেন, ষোল বৎসর পরে নূতন আইন প্রণয়নের সময় তাহা দেওয়া বা দিবার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ মন্ত্রীরা আইনটাকে যথাসাধ্য স্বশাসনের বিপরীত দিকে লইয়া যাইতেছেন। ইহার দ্বারা তাঁহাদের ও ব্রিটিশ জাতির রাজার অভিপ্রায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা বাঞ্জিত হইতেছে।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে যখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়, তখন তাহার উদ্বোধন করিবার জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁহার খুল্লতাত ডিউক অব্ কনটকে পাঠান। তিনি তদুপলক্ষে সম্রাটের পক্ষ হইতে ১৯২১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সম্রাটের জবানী বলেন :—

For years, it may be for generations, patriotic and loyal Indians have dreamed of Swaraj for their Motherland. Today you have the beginning of Swaraj and the widest scope and ample opportunity for progress to the liberty which my other dominions enjoy.

তাৎপর্য্য। অনেক বৎসর ধরিয়া, হয়ত বা অনেক পুরুষ ধরিয়া, স্বদেশপ্রেমিক ও রাজানুগত ভারতীয়েরা তাঁহাদের মাতৃভূমির জন্য স্বরাজের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। আজ আপনারা স্বরাজের আরম্ভ পাইতেছেন, এবং আমার অন্য ডোমীনিয়ন (রাজ্যাংশ)গুলি যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাহার দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত বিস্তৃততম অবকাশ ও প্রভূত সুবিধা পাইতেছেন।

স্বরাজের গোড়াপত্তন যদি ষোল বা চৌদ্দ বৎসর আগে হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান বৎসরের ভারতশাসন আইন দ্বারা তাহা উৎখাত হইতেছে, এবং ডোমীনিয়নগুলির মত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর যাহাতে ভারতীয়েরা হইতে না পারে এই আইনে তদুদ্দেশ্যে মানুষের উদ্ভাবনীবুদ্ধিগম্য সব উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। তাহা অবলম্বন করিয়া ব্রিটিশ জাতি ও মন্ত্রীরা তাঁহাদের রাজার বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন নাই।

ডিউক অব্ কনট তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা পঞ্চম জর্জের জবানী যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ইহাও বলা হয়, যে, "The principle of autocracy has all been abandoned," "অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্বের নীতি সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।" ১৯১৯ সালের আইনে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল কিনা তাহা এখন বিচার্য্য নহে ; কিন্তু যে আইন এই বৎসর প্রণীত হইতে যাইতেছে, তাহাতে গবর্ণর-জেনার্যালকে ও প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকে যেরূপ অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, এখন তাঁহাদের তাহা নাই, ব্রিটিশ নৃপতির তাহা নাই, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান ও

মুসলমান নৃপতিদের তাহা নাই। অতএব, পুনর্ব্বার বলিতে হইতেছে, বর্ত্তমান বৎসরের ভারতশাসন আইনের নানা ধারা দ্বারা রাজা পঞ্চম জর্জের অনেক কথার বিপরীত কাজ করা হইতেছে।

ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ মন্ত্রীদের যে সমালোচনা করিলাম, তাহা বিন্দুমাত্রও এরূপ কোন আশা হইতে নহে, যে, তাঁহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর নীতি অবলম্বন করিবেন। তাঁহারা আমাদের সমালোচনা করেন, আমরাও তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিলাম।

—

ইংরেজদের ও ভারতীয়দের রাজভক্তি

ইংরেজদের রাজভক্তি বা তাহার অভাব এবং ভারতীয়দের রাজভক্তি বা তাহার অভাব তুলনীয় নহে। কারণ, ব্রিটেনের ও ভারতবর্ষের এবং উভয় দেশের লোকদের রাজনৈতিক অবস্থা ও মর্য্যাদা একপর্য্যায়ভুক্ত নহে এবং ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, যে, ইংরেজরা যদি ভারতীয়দিগকে প্রশ্ন করে, "তোমরা কি রাজভক্ত?" তাহার উত্তর "হাঁ" হইলে প্রশ্নকর্ত্তারা বলিতে পারে, "তোমরা ভয়ে এরূপ কথা বলিতেছ।" আর যদি ভারতীয়েরা উত্তর দেয়, "না," তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তারা বলিতে পারে, "তবে ত এ বৎসরের ভারতশাসন আইন আরও কড়া করা উচিত ছিল!"

বস্তুতঃ এরূপ কোন নিরর্থক তুলনায় প্রবৃত্ত না হইয়া বলা যাইতে পারে, যে, ব্রিটেনে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে-সব অংশের লোকেরা স্বশাসক সেই সব দেশে রাজা পঞ্চম জর্জের জয়ন্তী উৎসবে বাহিরে যেমন দিনে ও রাত্রে কোথাও আঁধার ছিল না তেমনি মানুষগুলির অন্তরেও রাষ্ট্রনৈতিক নৈরাশ্যের অন্ধকার ছিল না। ভারতবর্ষের বাহির সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিতে পারিলেও অন্তর সম্বন্ধে ঠিক্ একথা বলা চলে না। রাজা পঞ্চম জর্জ দীর্ঘজীবী ও সুখী হউন স্বাধীনতাকামী ভারতীয়েরাও তাহা চান। তাঁহারা ইহাও জানেন, আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধিকারলাভে রাজা যেমন সম্মতি দিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধিকারলাভ কখনও ঘটিলে তাহাতেও তেমনি সম্মতি দিবেন। কিন্তু রজত-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁহারা কবির কথায় সায় দিয়া ইহা না বলিয়া থাকিতে পারেন না,

"পর দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

—

হিন্দীসাহিত্য-সম্মেলন

এবার হিন্দীসাহিত্য-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন ইন্দোরে হইয়া গিয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার মাতৃভাষা হিন্দী নহে, গুজরাটী। তাহাতে তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করায় কোন দোষ হয় নাই। একবার এক জন বাঙালীকেও হিন্দীসাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি করা হইয়াছিল। অবশ্য, ভাল হিন্দীর লেখক বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। মহাত্মা গান্ধীর সেরূপ কোন খ্যাতি নাই বটে, কিন্তু তিনি হিন্দীকে সমগ্র ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা এবং স্বরাজলাভের পর ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় এখন কংগ্রেসে হিন্দী বা উর্দ্দুতে বক্তৃতা করাই হইয়াছে নিয়ম; কেহ তাহার ব্যতিক্রম করিতে চাহিলে তাহাকে কৈফিয়ত দিতে হয় এবং সভাপতির অনুমতি লইয়া অন্য ভাষায় (সাধারণতঃ ইংরেজীতে) বক্তৃতা করিতে হয়। মহাত্মা গান্ধী হিন্দী-সাহিত্যিক নহেন, অতএব তাঁহাকে হিন্দীসাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি করা উচিত নয়, এই তর্ক কেহ কেহ তুলিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দীসাহিত্য-সম্মেলনের উদ্দেশ্য হিন্দীর প্রচারও বটে এবং এই প্রচারে মহাত্মা খুব সাহায্য করিয়াছেন, এই কারণে আপত্তি টেঁকে নাই।

মহাত্মাজী এই সর্ত্তে সভাপতি হইতে রাজী হন, যে, হিন্দী প্রচার-কার্য্যের সহায়তাকল্পে তাঁহার হাতে এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে। উদ্যোক্তারা তাহাতে রাজী হইলে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এই ভাষা ও সাহিত্য ভালবাসেন—বিশেষতঃ যাঁহারা হিন্দীর ভারতবিজয় আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের উৎসাহ ও বদান্যতা প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য। এক লক্ষ টাকা দেওয়া সোজা কথা নয়। ইতিপূর্ব্বেও হিন্দীভক্তদের অনুরাগের

প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মঙ্গলাপ্রসাদ-পুরস্কার নামে একটি ১২০০ টাকার পুরস্কার আছে যাহা বৎসরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিন্দী পুস্তকের লেখককে দেওয়া হয়। এ-বৎসর জালন্ধরের কন্যামহাবিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাসম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্ব বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দী পুস্তক লিখিয়া এই পুরস্কার পাইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য হিন্দী পুস্তক লিখাইবার নিমিত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার মাতৃভাষা হিন্দী নহে।

—

বাংলা ভাষার "প্রচার"

বাঙালীদের মধ্যে নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সমবেত ভাবে বৃহৎ ও অবিরাম চেষ্টা করিবার মত পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি, সংহতি ও উৎসাহ নাই। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের গত অধিবেশনের উদ্বোধন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন:—"আজ তো দেখতে পাই বাংলা দেশের ছোটোবড়ো খ্যাত অখ্যাত গুপ্ত প্রকাশ্য নানা কণ্ঠের তূণ থেকে শব্দভেদী রক্তপিপাসু বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল, এই অদ্ভুত আত্মশ্লাঘবকারী মহোৎসাহে বাঙালী আপন সাহিত্যকে খান্‌খান্‌ করে ফেলতে পারত, পরস্পরকে তারস্বরে দুয়ো দিতে দিতে সাহিত্যের মহাশ্মশানে ভূতের কীর্ত্তন করতে আর দেরী লাগত না—কিন্তু সাহিত্য যে-হেতু কো-অপারেটিভ্‌ বাণিজ্য নয়, জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী নয়, মুনিসিপাল কর্পোরেশন নয়, যে-হেতু সে নির্জ্জনচর একলা মানুষের, সেই জন্যে সকল প্রকার আঘাত এড়িয়েও সে বেঁচে গেছে। এই একটা জিনিষ ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালী সৃষ্টি করতে পেরেছে, কারণ সেটা বহুজনে মিলে করতে হয় নি।"

সাহিত্যসৃষ্টি অবশ্য মানুষ একলা-একলা করিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যসম্বন্ধীয় অনেক কাজ দল না বাঁধিলে করা যায় না, অনেক টাকা না হইলে করা যায় না—সেই অনেক টাকা কোনও এক জন দাতা দিতে পারেন বা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান হইতে তাহা সংগৃহীত হইতে পারে।

হিন্দী প্রচারের জন্য দক্ষিণ-ভারতে কয়েক বৎসর হইতে প্রভূত চেষ্টা হইতেছে। টাকা উঠিতেছে, শিক্ষক নিযুক্ত হইয়েছে এবং অনেক লোক, যাঁহাদের মাতৃভাষা তামিল বা তেলুগু, হিন্দী শিখিতেছেন ও নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন। যাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে, তাঁহাদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য এরূপ কোন চেষ্টা হইতেছে না। বরং যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা এরূপ বিস্তর প্রবাসী বাঙালী ছেলেমেয়ের বাংলা শিখিবার বাধা বাড়িতেছে।

আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রশ্ন শুনিতে হয়, যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা কেন করা হয় না। এই বিষয়টির আলোচনা আমরা করিব না। তাহার কারণ ইহা নহে, যে, আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অন্য কোন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করি।

আমরা একটি পাল্টা প্রশ্ন করিলে, আশা করি, কেহ অপরাধ লইবেন না। হিন্দীকে অন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য অনেক বৎসর ধরিয়া যত টাকা খরচ করা হইয়াছে এবং সম্প্রতি গান্ধীজীকে যে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার দশমাংশ কেহ বাংলা ভাষার প্রচারের জন্য স্বয়ং দিতে বা সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইতে পারেন কি?

আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রয়াসী নহি। আমরা অন্য দুই রকম চেষ্টা করিতে চাই।

(১) প্রবাসী বাঙালীদের ছেলেমেয়েদের বাংলা শিখিবার উপায় চিন্তা ও অবলম্বন করিতে ও করাইতে চাই। বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে বাঙালী ছেলেমেয়েদের বাংলা শিখিবার বিদ্যালয় নাই, তাহা স্থাপিত ও পরিচালিত হওয়াও সুকঠিন। কিন্তু তাহাদের বাংলা শিখিবার কিছু উপায় হওয়া উচিত। কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের গত অধিবেশন হওয়ার পর খবরের কাগজে এইরূপ অভিযোগ হইয়াছিল, যে, উড়িষ্যায় বিস্তর বাঙালী কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছেন যাঁহারা বাংলা ভুলিতে বসিয়াছেন বা ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন তাঁহাদিগকে বাংলা শিখাইবার কোন ব্যবস্থা বা চেষ্টা করেন নাই। আমরা যথাসাধ্য এই অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহারই অনুবৃত্তি-স্বরূপ একটা প্রশ্ন করিতে চাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য কম পরিশ্রম করেন নাই—অন্ততঃ মহাত্মা গান্ধী হিন্দীর জন্য যাহা করিয়াছেন

তাহা অপেক্ষা কম নহে। মনে করুন, ভবিষ্যতে কোন প্রবাসী বা বঙ্গাধিবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি হইতে অনুরোধ করিলে তিনি যদি বলেন, "বাংলা 'প্রচারের' জন্য আমি লাখ টাকা পাইলে সভাপতি হইতে রাজী আছি," তাহা হইলে উদ্যোক্তারা ঐ সর্ত্তে তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করিতে স্বীকৃত হইবেন কি?

(২) ইংরেজীতে প্রাপ্তবয়স্কদিগের ও অল্পবয়স্কদের জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, ইটালিয়ান ইত্যাদি ভাষা শিখিবার ও শিখাইবার অনেক বহি আছে। এইরূপ ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশের ভাষাতেও তত্তদ্দেশের ছাড়া অন্য অনেক ভাষা শিক্ষার বহি আছে। বহিগুলি কোন ভাষাটিকেই ইউরোপের রাষ্ট্রভাষা করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত নহে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে ভাব চিন্তা কৃষ্টির আদান-প্রদান ও বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য লিখিত। এইরূপ উদ্দেশ্যে অবাঙালীদিগের বাংলা শিখিবার জন্য কিছু পুস্তক প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কাজটির ভার লইতে পারেন কি? হয়ত পারেন। কিন্তু ব্যয়নির্ব্বাহ কে করিবে? আমরা উপরে রবীন্দ্রনাথকে কোনও কল্পিত ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হইবার কল্পিত অনুরোধ উপলক্ষ্যে তাঁহার যে কল্পিত সর্ত্তের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আপাততঃ ক্ষান্ত হইতেছি।

—

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের চুয়াত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া পঁচাত্তরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে ঐ দিন শান্তিনিকেতনস্থিত ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে তাঁহার জন্মোৎসব হয়। আশ্রমবাসী অধ্যাপকবর্গ, পুরন্ধ্রীগণ এবং আশ্রমের ছাত্রছাত্রীগণই প্রধানতঃ উৎসব করেন। বাহির হইতেও কেহ কেহ গিয়াছিলেন। প্রত্যুষে ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে গান গাহিতে গাহিতে আশ্রম পরিক্রম করিয়া সকলকে জাগান। সকলে আসিয়া আলিপনা ও ফুলপাতায় সজ্জিত আম্রকুঞ্জে সমবেত হন। কবির আসনের সম্মুখে শুভকর্ম্মসূচক নানাদ্রব্য রক্ষিত হইয়াছিল। শঙ্খধ্বনির

জন্মোৎসবে কবি দণ্ডায়মান।

জন্মোৎসবে কবি উপবিষ্ট।

দ্বারা তাঁহার আগমন সূচিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে উৎসব আরব্ধ হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করেন। কবিকে অতঃপর অর্ঘ্য দান করা হয়। অতঃপর কবি একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার দ্বারা

"শ্যামলী"তে অভ্যর্থনা
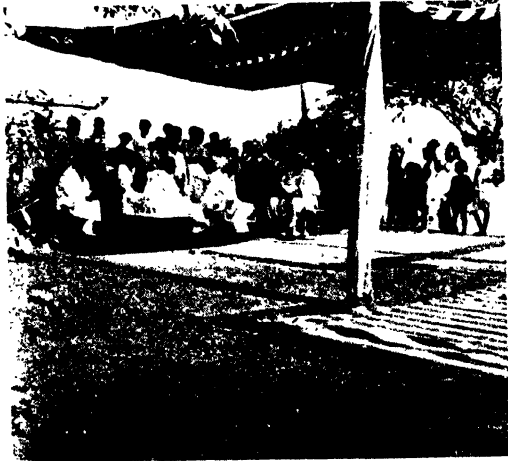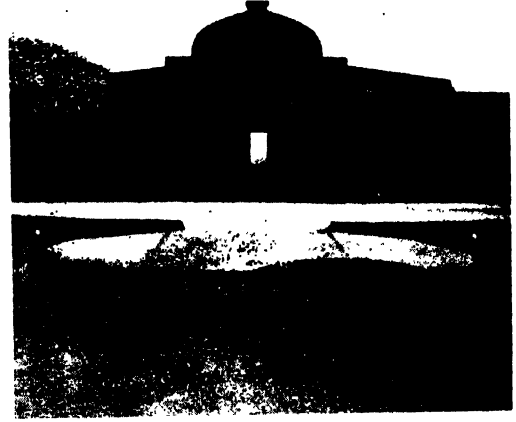
শান্তিনিকেতনে কবির জন্মোৎসব।

কবির জন্মোৎসবে আম্রকুঞ্জ।

সংশোধিত ইহার অনুলিপি পরে পাইলে আমরা প্রকাশ করিব। বাহ্য সম্মান অপেক্ষা আন্তরিক প্রীতি পাইতে তিনি অধিক অভিলাষী এই ভাবটি তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ পায়।

উৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর সভাস্থ অনেকে শ্রেণীবদ্ধভাবে তাঁহার জন্য নূতন নির্ম্মিত মৃৎকুটীর অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহার নাম তিনি রাখিয়াছেন "শ্যামলী"। এখন হইতে তিনি ঐ কুটীরে বাস করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। উহা এরূপ মাটিতে নির্ম্মিত যে বৃষ্টিপাতে তাহার বিশেষ বিকৃতি ও ক্ষতি হইবে না। এরূপ মাটির এরূপ গৃহ এখানে এই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছে। শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর নিজের পরিকল্পনা অনুসারে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং কতকগুলি মৃন্ময়

জন্মোৎসবে মাঙ্গল্য দ্রব্য।
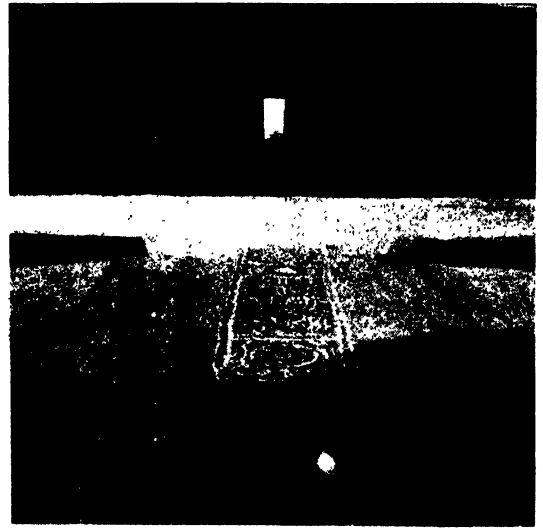
"শ্যামলী"র চিত্রিত প্রাঙ্গণ।

শান্তিনিকেতনে কবির জন্মোৎসব।

মূর্ত্তি ও কারুকার্য্যে ইহার বাহির ও ভিতর অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

এই কুটীরের সম্মুখে ভূষিত প্রাঙ্গণে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কবি শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের উদ্দেশে নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি পাঠ করেন :—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কল্যাণীয়েষু

ধরণী বিদায়বেলা আজ মোরে ডাক দিল পিছু,
কহিল "একটু থাম্, তোরে আমি দিতে চাই কিছু
আমার বক্ষের স্নেহ, রাখিব একান্ত কাছে ধ'রে
যে ক'দিন রয়েছিস্ হেথা, ঘিরিয়া রাখিব তোরে
স্পর্শ মোর করি মূর্ত্তিমান।"

হে সুরেন্দ্র, গুণী তুমি,
তোমারে আদেশ দিল, ধ্যানে তব, মোর মাতৃভূমি—
অপরূপ রূপ দিতে শ্যাম স্নিগ্ধ তাঁর মমতারে
অপূর্ব্ব নৈপুণ্যবলে। আজ্ঞা তাঁর মোর জন্মবারে
সম্পূর্ণ করেছ তুমি আজি। তাঁর বাহুর আহ্বান
নিঃশব্দ সৌন্দর্য্যে রচি' আমারে করিলে তুমি দান
ধরণীর দূত হয়ে। মাটির আসনখানি ভরি
রূপের যে প্রতিমারে সম্মুখে তুলিলে তুমি ধরি
আমি তার উপলক্ষ্য; ধরার সন্তান যারা আছে
ধরার মহিমা গান করিবে সে সকলের কাছে।
পঁচিশে বৈশাখে আমি এক দিন না রহিব যবে
মোর আমন্ত্রণখানি তোমার কীর্ত্তিতে বাঁধা র'বে,

তোমার বাণীতে পাবে বাণী। সে বাণীতে র'বে গাঁথা,
ধরারে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মোর মাতা

২০শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৪২। শান্তিনিকেতন।

সন্ধ্যাকালে বিশ্বভারতীর কর্ম্মীরা 'পরশুরাম' রচিত "বিরিঞ্চি বাবা" অভিনয় করেন। পরে ভোজ হয়।

এই জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ইংরেজী বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের নবপর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক কৃপালনী ইহার সম্পাদক। কবির আধুনিকতম কবিতার পুস্তক "শেষ সপ্তক"ও এই দিন প্রকাশিত হয়।

—

"শ্যামলী"র জন্মকথা

কবির জন্য শান্তিনিকেতনে যে মৃৎকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে, গৃহপ্রবেশের দিন তাহার মেজে ভিজা ছিল। এরূপ একটি কুটীর যে চাই, তা বোধ হয় কবিও বেশী দিন আগে ভাবেন নাই। তাঁহার "শেষ সপ্তক" পুস্তকের ছেচল্লিশটি কবিতার মধ্যে ৪৪তম কবিতাটিতে এই "শ্যামলী"র উদ্ভবের পূর্ব্বাভাস পাইতেছি। কবি তাহাতে লিখিয়াছেন :—

আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি
 বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
 তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
 সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
 মাটির কোলে মিশবে মাটি ;
 ভাঙা থামে নালিশ উঁচু ক'রে
 বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে।
 ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক'রে
 তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
 মৃতদিনের প্রেতের বাসা।
সেই মাটিতে গাঁথব
 আমার শেষ বাড়ির ভিৎ
 যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
 সব কলঙ্কের মার্জ্জনা,
 যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
 ঢেকে দেয় দূর্ব্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে ;
 যার মধ্যে শত শত শতাব্দীর
 রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ
 গেছে নিঃশব্দ হয়ে

কবিতাটিতে আরও এক্যার পংক্তি আছে।

—

কানপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন

কানপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের প্রধান বিশেষত্ব ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু উ উত্তমকে সভাপতি নির্ব্বাচন এবং চীন জাপান ব্রহ্মদেশ ও সিংহল হইতে বৌদ্ধ মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধিদের ইহাতে যোগদান। হিন্দু মহাসভার নিয়মাবলীতে "হিন্দু" কথাটির এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, যে, যে-কেহ ভারতবর্ষে উদ্ভূত কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন তিনি
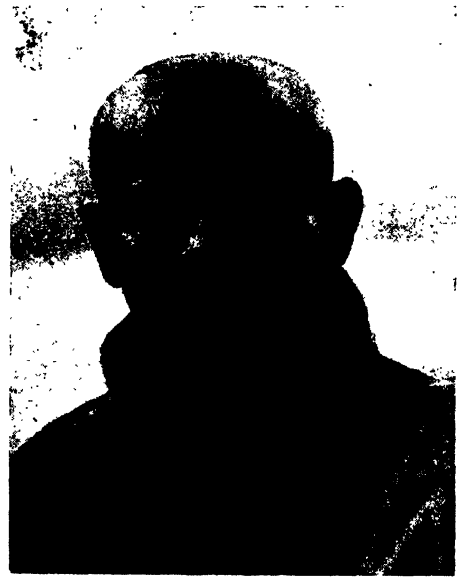
ভিক্ষু উত্তম

হিন্দু। তদনুসারে জৈন বৌদ্ধ শিখ ব্রাহ্ম আর্য্যসমাজী প্রভৃতি ভারতবর্ষজাত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগকে মহাসভা হিন্দু বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। নিয়মাবলী অনুসারে ইহা সম্ভব থাকিলেও, এক জন বৌদ্ধকে সভাপতি নির্ব্বাচন এই প্রথম করা হইল, এবং বৌদ্ধ প্রতিনিধিরাও মহাসভাতে এই প্রথম যোগ দিলেন। ভিক্ষু উত্তম তাঁহার অভিভাষণে ও তৎপরবর্ত্তী কোন কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব হিন্দু ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রকারভেদ এবং বৌদ্ধেরা এশিয়ার বহু দেশে ও দ্বীপে হিন্দুকৃষ্টির বিস্তারসাধন করেন।

মহাসভার অধিবেশন হইয়া যাইবার পর ভিক্ষু উত্তম হিন্দু সমাজকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ভারতের

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কানপুর অধিবেশনে চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশ হইতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। পঞ্জাবে তিনি অস্পৃশ্যতার ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে কিছু বলায় তত্রত্য "সনাতনী"রা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ইহাতে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। কেন না, "সনাতনী"রাই একমাত্র "হিন্দু" নহেন, এমন "হিন্দু" থাকিতে পারেন ও আছেন যাঁহারা জাতিভেদ মানেন না, অস্পৃশ্যতা মানেন না। "সনাতনী"দিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাঁহারা কি নিজেদের মত গোপন করিবেন?

—

শিক্ষিত শ্রমিক

যে কেহ কোন প্রকার পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, নিরক্ষরতা লিখনপঠনক্ষমতা নির্বিশেষে তাহাকে শ্রমিক মনে করা উচিত। কিন্তু কাহাকেও শ্রমিক বলিলেই সাধারণতঃ লোকে মনে করে মানুষটি দৈহিক শ্রমের দ্বারা রোজগার করে এবং নিরক্ষর। দৈহিক শ্রম দোষের বিষয় নহে, নিরক্ষরতাও নৈতিক অপরাধ নহে। কিন্তু যে কারণেই হউক, শিক্ষিত লোকেরা দৈহিক শ্রমকে অগৌরবজনক মনে করে। বলা বাহুল্য তাহা অগৌরবজনক নহে। পরানুগ্রহজীবী হওয়া অপেক্ষা দৈহিক-শ্রমজীবী হওয়া যে ভাল, এই বোধ যে আমাদের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে জন্মিতেছে, ইহা সন্তোষের বিষয়। কয়েক জন শিক্ষিত যুবক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি লাইব্রেরীর সমুদায় পুস্তক লাইব্রেরীর জন্য আশুতোষ বিল্ডিংএর নবনির্ম্মিত তলে দৈনিক বেতনে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা লেখাপড়া জানেন বলিয়া বহিগুলি শ্রেণীবিভাগ অনুসারে যথাস্থানে রাখিতে পারিতেছেন।

—

আলীগড়ের ছাত্রদের রাজনৈতিক মতি

সম্প্রতি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের য়ুনিয়নের এক অধিবেশনে সম্রাট পঞ্চম জর্জকে "রজত-জয়ন্তী" উপলক্ষ্যে

মৃত্যুর পরপারে

উপরে : অন্তিমশয়নে বিঠলভাই পটেল

নিম্নে : অন্তিম শয্যাপার্শ্বে—
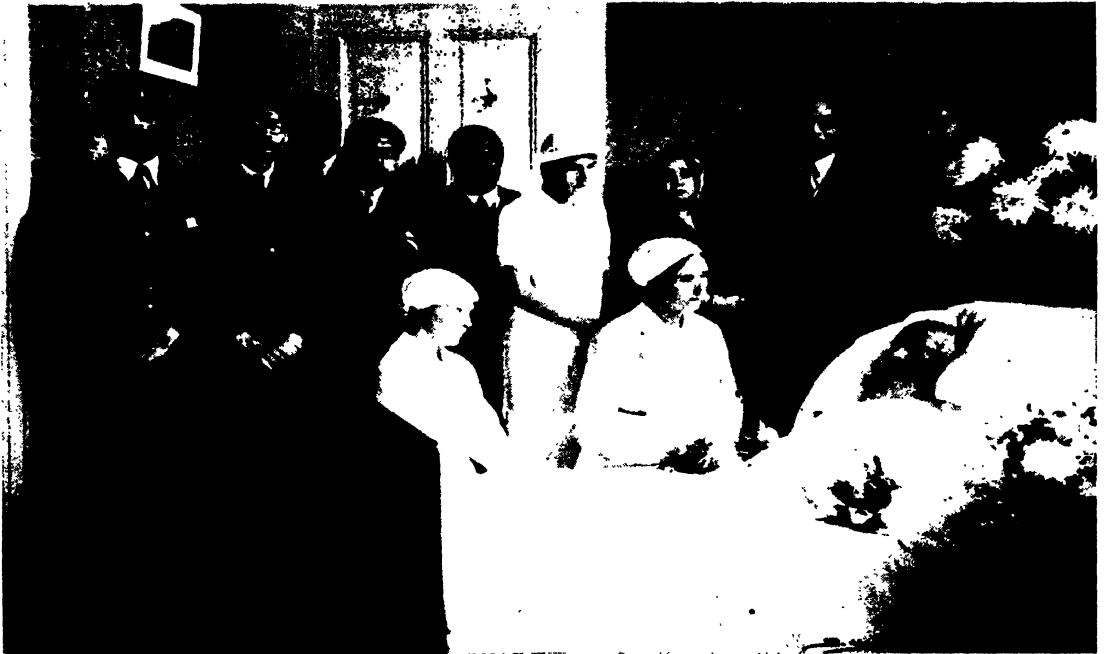
দণ্ডায়মান (বাম হইতে)—ডক্টর এস ঘোষ, মিঃ লোটওয়াল, মিঃ এ সি চাটার্জ্জী (অধুনা মৃত:), মিঃ ভোগীভাই, মিঃ এরুলকর, প্রধান নার্স, মিসেস্ এ সি চাটার্জ্জী, মিঃ নাপলাল, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু। নতজানু—সিস্টার হার্টা ও সিস্টার মেরিয়া।

ভ্রমণে বিঠলভাই পটেল,
ফ্রানৎসেনবাদ (চেকোস্লোভাকিয়া)

বিঠলভাই পটেল
(শেষ আলেখ্য। মিঃ অজিতকুমার সেন কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ, সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)

বিঠলভাই পটেল ও মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু,
ফ্রানৎসেনবাদ
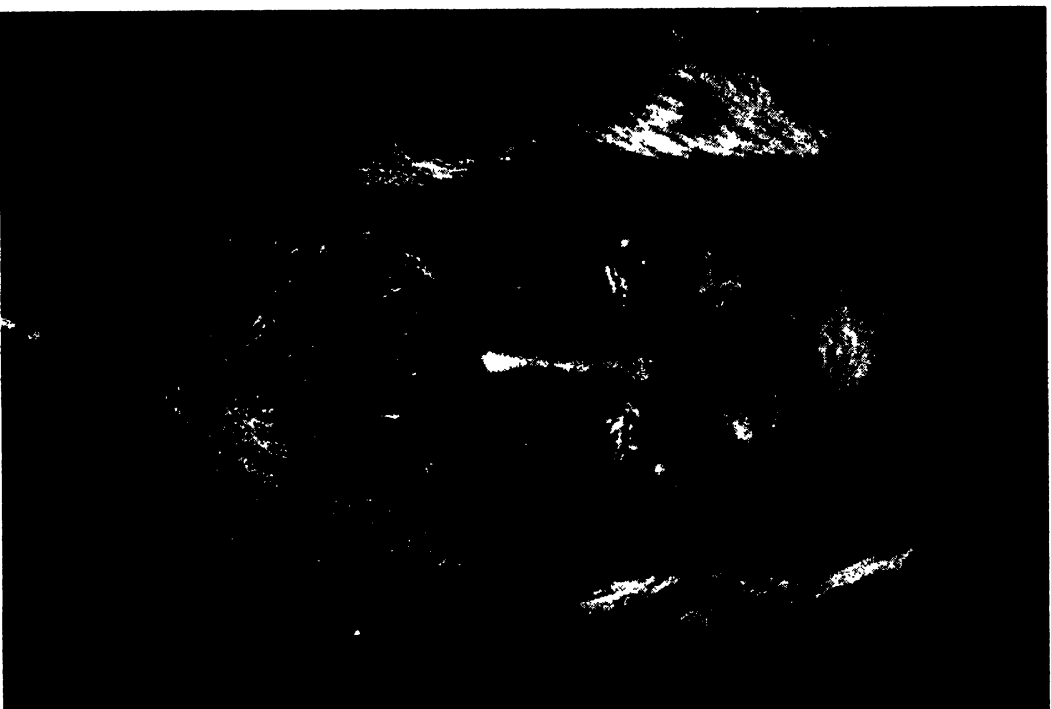
অভিনন্দন জানাইবার প্রস্তাব অত্যন্ত বেশী ভোটাধিক্যে বর্জ্জিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি?

"রজত-জয়ন্তী" উপলক্ষ্যে মসজিদগুলি ব্যবহারের বিরুদ্ধেও মুসলমান জনমত অনেক স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহারই বা কারণ কি?

—

বৈশাখী পূর্ণিমা

হিন্দু ও বৌদ্ধ সকলে বুদ্ধদেবকে ভক্তি করে। বৌদ্ধমতে বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁহার জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। হিন্দু মহাসভার গত অধিবেশনে গবর্ন্মেণ্টকে এই অনুরোধ জানান হয়, যে, বৈশাখী পূর্ণিমা যেন সরকারী সব প্রতিষ্ঠানের ছুটির দিন বলিয়া ঘোষিত হয়। ঐ দিন ছুটি হওয়া উচিত।

—

জেনিভায় বিঠলভাই পটেলের স্মারক ফলক

১৯৩৩ সালের ২২শে অক্টোবর জেনিভায় বিঠলভাই পটেল দেহত্যাগ করেন। তিনি রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইউরোপ গিয়াছিলেন। সুস্থ হইতেও পারিতেন, কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতা লাভ নিজের স্বাস্থ্যলাভ অপেক্ষা তিনি অধিক আবশ্যক মনে করায় আমেরিকায় ও ইউরোপে পীড়িত অবস্থাতেও তথাকার লোকদিগকে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা জানাইবার নিমিত্ত অনেক বক্তৃতাদি করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমেরিকার বিখ্যাত ভারতবন্ধু ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ড বলিয়াছেন, পটেল মহাশয় তিন মাসে আমেরিকার এক দিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পঁচাশীটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পটেল মহাশয় জেনিভার যে স্বাস্থ্যনিবাসে প্রাণত্যাগ করেন, তথায় তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি প্রস্তরফলক কক্ষগাত্রে গত ২২শে মার্চ ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্যোগে গ্রথিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানের সময় বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহ্‌তা, বঙ্গের শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

—

সুভাষচন্দ্র বসুর ক্রমিক স্বাস্থ্যোন্নতি

ভিয়েনায় অস্ত্রোপচারের পর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন জানিয়া প্রীত হইয়াছি। তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া আবার পূর্ণোদ্যমে দেশের সেবায়

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

নিযুক্ত হইতে পারিবেন, এইরূপ আশা হইতেছে। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি নানা প্রকারে দেশের কল্যাণ-চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

—

দমদমায় দুই বৈমানিকের অপমৃত্যু

দমদমার নিকটবর্ত্তী গৌরীপুর গ্রামের নিকট বৈমানিক দেবকুমার রায় ও বিনয়কুমার দাস এবং তাঁহাদের দু-জন যাত্রীর শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। প্রবাসীর পাঠকেরা অবগত আছেন, দেবকুমার বিমানযোগে ভূপ্রদক্ষিণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য অর্থসংগ্রহও হইতেছিল। বড় দুঃখের বিষয়, তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে তিনি কাজ করিয়া যাইতে পারিলেন না।

পৃথিবীতে বৈমানিকদের অপমৃত্যু অনেক হইয়াছে, এখনও হইতেছে। অতএব এই দুই জনের অপঘাত মৃত্যুতে অন্য বৈমানিকেরা নিরুৎসাহ হইবেন না। কিন্তু পরলোকগত এই দুই যুবকের আত্মীয় ও বন্ধুগণ, এরূপ অপমৃত্যু আরও হয় বলিয়া, শোকে সান্ত্বনা পাইবেন না। অন্য

সকলের সমবেদনা জানিয়া তাঁহারা হয়ত বি
হইতে পারেন।

যাঁহারা বীরের মত জীবন যাপন করেন, তাঁহারা দীর্ঘায়ু না হইলেও তাঁহাদের পৌরুষ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধেয় করিয়া রাখে।

দেবকুমার রায়

দেবকুমারের মাতা পুত্রের উদ্দেশে লিখিয়াছেন—

"তুমি সাহসে অজেয় বীর,
তাই তব জ্যোতি ছড়ায়ে পড়িছে
দিকে দিকে ধরণীর।"

—

স্বর্গীয় লালা দেবরাজ

পঞ্জাবের জালন্ধর শহরে কন্যামহাবিদ্যালয় যৌবনে স্থাপন করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আপনাকে উহার সেবায়

লালা দেবরাজ

নিযুক্ত রাখিয়া সম্প্রতি লালা দেবরাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আর্য্যসমাজের এক জন নেতা ছিলেন। পঞ্জাবের সমাজহিতকর বহু প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি তর্কবিতর্কে যোগ দিতেন না। বহু বিষয়ে তাঁহার বিস্তৃত অধ্যয়ন ও প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে গ্রাম্যলোকদে মত থাকিতেন বলিয়া সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না, যে তিনি আধুনিক বিদ্বানদের মত শিক্ষিত।

—

ঋষিবর মুখোপাধ্যায়

কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি ৮৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল ছিলেন। মেডিক্যাল এডুকেশ্যন সোসাইটীকে এবং বাঁকুড়া সম্মিলনীর মেডিক্যাল স্কুলকে তিনি অনেক সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। তিনি বাঁকুড়ায় নীলকরদের কুঠি, জমি, বাগান ও পুষ্করিণী

হরিহর মুখোপাধ্যায়

ক্রয় করেন। পরে প্রধান কুঠিটি ও কিছু জমি বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলকে দান করেন। ঐ দান না পাইলে বাঁকুড়া সম্মিলনী তাঁহাদের স্কুলটি স্থাপন করিয়া চালাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। পরে তিনি স্কুলটির জন্য সম্মিলনীকে আরও সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন।

—

গত ঈষ্টারের ছুটির সভাসমিতি

বহু বৎসর ধরিয়া খ্রীষ্টমাসের ছুটির সময় কংগ্রেসের অধিবেশন হইত, এবং আরও নানা সভাসমিতি ও প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন হইত। লাহোরে যে শেষ কংগ্রেস হয়, তাহার পর আর শীতকালে ঐ ছুটির সময় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় না, কিন্তু অন্য অনেক সভাসমিতি ও প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন ঐ সময়ে এখনও হইয়া থাকে। তখন বড় বড় দৈনিক কাগজও সবগুলির কার্য্যবিবরণ দেওয়া দুঃসাধ্য বলিয়া বুঝিতে পারেন—মাসিকপত্রের পক্ষে ত তাহা অসম্ভব। ঈষ্টারের ছুটিতেও এইরূপ বহু সভাসমিতি ও প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সেগুলিরও সামান্য সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তও দেওয়া কিংবা অন্ততঃ মন্তব্য প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। বড় বড় দৈনিক কাগজে সভাপতিদের বক্তৃতা এবং কিছু সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায়।

এই সকল সভাসমিতি হইতে বুঝা যায়, ভারতীয়েরা কত দিকে উন্নতির অভিলাষী হইয়াছে, কত অভাব অনুভব করিতেছে, কত অভিযোগ তাহাদের আছে।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

এবার দিনাজপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। দিনাজপুরের ও উত্তরবঙ্গের প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অভ্যর্থনা-সমিতির

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সভাপতি এবং অভিজ্ঞ কংগ্রেসনেতা ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

ইঁহাদের অভিভাষণে ও সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহে বহুবিষয়ে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক মত প্রতিধ্বনিত হয়। বাংলা দেশ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরোধী। মুসলমান বাঙালীরা উহার নিন্দা করিলেও উহা বর্জ্জনের

বিরোধী প্রায় সকলেই। অল্পসংখ্যক মুসলমান প্রায় সমুদয় হিন্দু উহার বর্জ্জনও চান।

ডাঃ শ্রীইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত

বিনা বিচারে বন্দীকৃত যাঁহারা তাঁহাদের মুক্তি বঙ্গদেশ চায়।

বাংলা দেশের জনমত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। গ্রাম্য শিল্পের পুনরুজ্জীবন দ্বারা, কৃষির উন্নতি দ্বারা, ও অন্যান্য উপায়ে বঙ্গের আর্থিক অবস্থার উন্নতির প্রয়োজনও সকলে অনুভব করিয়াছেন। দিনাজপুরে কৃষি ও শিল্পের প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যাহা বলেন, তাহাতেও বঙ্গের আর্থিক উন্নতির এই সব উপায় বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হয়।

—

শেঠ যুগলকিশোর বিড়লার দান

বিহারে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মন্দিরসমূহের পুনর্নির্ম্মাণার্থ শেঠ যুগলকিশোর বিড়লা এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

—

নিখিলবঙ্গ অধ্যাপক-সম্মেলন

ফেণীতে নিখিলবঙ্গ অধ্যাপক-সম্মেলনে অধ্যাপক ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন সভাপতির কার্য্য করেন। তিনি শিক্ষার বাহন, সহ-শিক্ষা, উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য না-থাকা প্রভৃতি নানা সমস্যার আলোচনা করেন। শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি বলেন

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সেন

উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে সমষ্টিগতভাবে জাতির শিক্ষায় অগ্রগতি ও শিক্ষার আদর্শ সিদ্ধি সম্ভব নহে। এই সামঞ্জস্যের অভাব আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম ত্রুটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও গবেষণা বিভাগের ছাত্রদের কৃতিত্ব বহু ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সামঞ্জস্যের অভাবে আশানুরূপ পরিস্ফুট হইতে পারে না। সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিক্রমে শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের অভাবে এই অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতের ন্যায় জনবহুল কৃষি ও খনিজ সম্পদ-সমৃদ্ধ দেশে আর্থিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। কার্য্যকরী শিক্ষার অভাবে এই বিপুল সম্ভাবনা অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনার নিমিত্ত আমাদের বরিশাল সম্মিলনে একটি কমিটি গঠিত হয়, কমিটি মাতৃভাষার সাহায্যে ছাত্রদের মধ্যে কার্য্যকরী শিক্ষা বিতরণ অনুমোদন করিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষার সম্বন্ধেও কিছু বলিতে চাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, ইণ্টারমীডিয়েট কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া এক দিকে যেরূপ নিজেদের দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন, অপর দিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব বৃদ্ধিতে বাধা জন্মাইতেছেন। স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া ছাত্র সকল বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিবে সকলেই ইহা মনে করেন। কিন্তু

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির গুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শিক্ষা পর্য্যন্ত পৌঁছিলেও ছাত্রের জ্ঞান সাধারণ বিষয়েও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শিক্ষণীয় বিষয়ের বাহুল্য বর্জ্জন না করা গেলে এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া শিক্ষাপদ্ধতি নিয়মিত না করা হইলে দেশ বা জাতির অগ্রগতি ও শিক্ষার উন্নতি সম্ভব হইবে না।

—

নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার-সম্মেলন

গত ২০শে এপ্রিল লক্ষ্ণৌ শহরে নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডক্টর এ সি উল্‌নার সভাপতির কার্য্য করেন এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ডক্টর রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির কাজ করেন। পরাঞ্জপ্যে মহাশয় প্রতিনিধিদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার পর,

মিঃ উল্‌নার

সভাপতি ডাঃ উল্‌নার তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, কোন কোন স্থানে গ্রন্থাগারকে বিত্তবান ব্যক্তিদিগের বিলাসের সামগ্রী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভাবর্দ্ধনের গতানুগতিক ব্যবস্থা বলিয়াই মনে করা হয়; তিনি আরও ভাল ভাল গ্রন্থাগার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের দাবি মিটানই শুধু কাজ নহে, দাবি বৃদ্ধি করিয়া সাধারণের পাঠাভ্যাস সৃষ্টি করাও কাজ। তিনি দেশে অধিকতর শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পাঠকবিহীন বড় বড় গ্রন্থাগার একটা স্মৃতিস্তম্ভের মত। তিনি আশা করেন যে এই সম্মেলন লাইব্রেরী-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন।—ইউনাইটেড প্রেস।

—

নিখিল-ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ান কংগ্রেস

নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের গত অধিবেশন কলিকাতায় হয়। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মিত্র ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার অভিভাষণের শেষে তিনি বলেন—
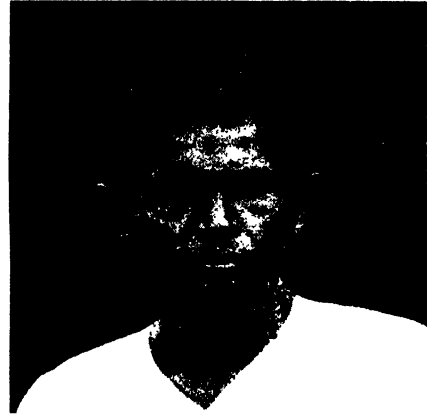
শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র

আলস্য ও ভয় পরিহার করিয়া কর্ম্মীদের আপন কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হওয়া উচিত। 'বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব নাই। ভারতীয় জাতীয় মহাসভা আপন গঠনতন্ত্রের দোষ এবং ভ্রান্তভাবে আপামর সাধারণের নিকট উপস্থিত হওয়ায় সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

সুখের বিষয় এই যে, ভারতীয় মহাসভার এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যুবক-সম্প্রদায় শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়া বিল তাড়াতাড়ি করিয়া পাস করাইবার উদ্দেশ্য হইতেছে দাসত্ববন্ধন আরও দৃঢ় করা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ধনিককুল এবং পরশ্রমজীবী জমিদার ও রাজন্যবর্গ ইণ্ডিয়া বিলের অগ্রগতি দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিতেছে। সর্ব্বোপরি ধ্বংসবাহী আর একটি পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সূচনা দেখা যাইতেছে। সুতরাং শ্রমিকদের আর বসিয়া থাকা উচিত নয়। ভাবী

সংগ্রামে যাহাতে আমরা সফল হইতে পারি তজ্জন্য সজ্ঘবদ্ধ হওয়া ও শক্তি সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত হরিহরনাথ শাস্ত্রী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং তাঁহার অভিভাষণে 'ধনিকদের অভিযান,' 'সরকারের দমননীতি,' 'চরমপন্থীদিগের সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা,'

পণ্ডিত হরিহরনাথ শর্ম্মা

প্রভৃতি নানা বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করেন। কংগ্রেস সম্বন্ধে এই শ্রমিক প্রচেষ্টার কি ভাব পোষণ ও কি কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় তদ্বিষয়ে তিনি বলেন—

বর্ত্তমান কংগ্রেসের পরিস্থিতি যে প্রগতি-বিরোধী তাহা আমি স্বীকার করি। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং কংগ্রেসকে চরমপন্থী করার প্রয়োজন। কিন্তু কংগ্রেসকে দূরে রাখিলে এবং এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে ভ্রান্তপথে চালিত হইতে দিলে আত্মঘাতী হইতে হইবে। কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে দেশের নির্যাতিত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে মিলন সংঘটন সম্ভবপর। এই প্রতিষ্ঠানকে অমান্য করিলে যে ভুল ১৯৩০ সালে একবার করা হইয়াছে তাহাই পুনরায় করা হইবে। তাহা দ্বারা শুধু বিত্তান্তগণ গণ-আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ভিতরে থাকিয়া কংগ্রেসের সংস্কৃতির যে চেষ্টা হইতেছে তাহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট দলই এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। এই চরমপন্থী কংগ্রেসীদের সহিত ভারতের বিভিন্ন শ্রমিক সঙ্ঘের যোগদান করা উচিত। বস্তুতঃ সে মিলন সংঘটিত হইতেছে। গত বৎসর কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট দলের সহিত নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক চুক্তি হইয়াছে। এই দলভুক্তগণ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ। শ্রমিকগণ জাতির মুক্তি আন্দোলনে, তথা প্রাত্যহিক অর্থনৈতিক সংগ্রামে, এই দলকে সহায়করূপে পাইবে বলিয়া আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে।

আগ্রা-অযোধ্যার উদারনৈতিকদের সভা

ঈষ্টারের ছুটিতে গোরখপুরে আগ্রা-অযোধ্যার উদারনৈতিকগণের কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। গোরখপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও তত্রত্য অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত আদ্যাপ্রসাদ এই কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনা-সমিতির

শ্রীযুক্ত আদ্যাপ্রসাদ

সভাপতিত্ব করেন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের অন্যতম উদারনৈতিক নেতা ও ভূতপূর্ব্ব অন্যতম মন্ত্রী এবং জমিদার রায় রাজেশ্বর বলী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। উভয়ের অভিভাষণে এবং কন্‌ফারেন্সের দুই প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং ভারতশাসন বিলের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

রায় রাজেশ্বর বলী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অমৃতবাজার পত্রিকার আদালত অবমাননার মোকদ্দমা

হাইকোর্টের অবমাননার অভিযোগে হাইকোর্টের বিচারে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের তিন মাস এবং তাঁহার মুদ্রক শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্তি বিশ্বাসের এক মাস অশ্রম কারাদণ্ড হয়। মুদ্রকের মিয়াদ অন্তে তিনি খালাস পাইয়াছেন, তুষারকান্তি বাবু এখনও জেলে। তাঁহারা প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু হাইকোর্ট দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন। আমাদের এই বিষয়ক আইনের জ্ঞান নাই। সুতরাং মানিয়া লইতেছি, যে, আইন অনুসারে এরূপ মোকদ্দমায় প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করিবার অনুমতি দিতে হাইকোর্ট অসমর্থ। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আইনটির পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। কারণ, এরূপ মোকদ্দমায় দেখা যায়, যে, অপমানিত হইয়াছেন হাইকোর্টের জজেরা, অভিযোক্তা হাইকোর্টের জজেরা, বিচারক হাইকোর্টের জজেরা, এবং জুরীও তাঁহারা। এরূপ স্থলে, হাইকোর্টের জজেরাও মানুষ বলিয়া এবং মনুষ্যসুলভ ভুলভ্রান্তির অতীত নহেন বলিয়া, আইনের দুই প্রকার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়—(১) যে হাইকোর্ট অবমানিত হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ হইবে, অভিযোগের বিচার সেই হাইকোর্ট না-করিয়া অন্য কোন হাইকোর্ট করিবেন; (২) বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপীল হইতে পারিবে।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মেলন

ঈষ্টারের ছুটিতে ঢাকায় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন এবং পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোনীত হন।

"যুবকদিগের শিক্ষকগণই সমাজকে গঠন করে। বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা না হইলে কলেজের শিক্ষায় কোনই ফল হয় না। শিক্ষানীতি গঠন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শিক্ষকদিগের বিশেষ অধিকার থাকা দরকার।" নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার উক্ত সম্মেলনের সভাপতি রূপে উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। ২৪টি জিলা হইতে অনুমান ১০০০ প্রতিনিধি উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত বহু দর্শকও উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার সভাপতি সন্তোষ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে, কেহ যদি শিক্ষকতাকে হতাশের শেষ আশ্রয় বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে কখনই ইহার সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে না। সমগ্র শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে শুধু অপচয় এবং অকার্য্যকরতার ভাবই প্রকট, বিশেষতঃ প্রাথমিক অবস্থায়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেরূপ অধিকসংখ্যক ছাত্র অকৃতকার্য্য হয়, তাহাতে মনে হয় প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমাইয়া দিয়া অনেককে শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা রোগের প্রতিকার নহে। বরং রোগ হইতে রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থাই অধিক উগ্র বলিয়া মনে হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও অধিক-সংখ্যক শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনই ইহার একমাত্র প্রতিকার। স্ত্রীপুরুষের শিক্ষার প্রয়োজনের অনুপাতে, শিক্ষার জন্য যাহা ব্যয় করা হয়, তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। এই ত্রুটি সংশোধন করা প্রয়োজন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার লাভ হইলে আজ যে শক্তির অপচয় হইতেছে তাহা বন্ধ হইয়া দেশের সমৃদ্ধি অশেষ বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষিতা মহিলা দেশের ঐশ্বর্য্য, কৃষি, ও কর্ম্মপ্রবণতা বৃদ্ধিই করিবে।

সভাপতির অভিভাষণের পূর্ব্বে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী একটি সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ ও অভ্যাগতদিগকে সাদরসম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।—ইউনাইটেড্ প্রেস।

শিক্ষকবর্গকে সম্বোধন করিয়া পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বলেন—

হে গুরুগণ, দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের হাতে। মহান্ এই ব্রত। লোকে যদি ভ্রমবশতঃ আপনাদের যথার্থ মূল্য নাও দেয়, তবু আপনারা মহৎ গুরু-পরম্পরার উত্তরাধিকারী। আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখাইয়া আপনাদের বাধ্য করিতে চাই না। ডি পি আই বলেন, "কলেজ শিক্ষায় যে মূল্য আপনারা দিয়াছেন, তার চেয়ে আপনাদের পিছে ব্যয় হইয়াছে বেশী। অতএব সমাজের কাছে আপনাদের ঋণ আছে।" আমি এই ঋণের তাগিদ আপনাদের উপর চাপাইতে চাই না।

গুরু আপনারা, গৌরব আপনাদের আছে, আপনাদের দায়িত্ব গভীর, তাই দাবি করিব। সকলকে দ্বিজত্ব দিবেন আপনারা, নিজেরা নবজন্মের সাধনা না করিলে চলিবে কেন? মঠের মোহান্ত, তীর্থের পাণ্ডারাও তো এক সময় এই দেশে লোকগুরু ছিলেন, আজ তাঁরা কোথায় নামিয়া গিয়াছেন। আপনারাও কি তাঁহাদেরই অনুসরণ করিবেন?

তাই আজ আপনাদের কাছে কঠিন দাবি করিব। দুঃখ দারিদ্র্য, অশ্রদ্ধা, বিরুদ্ধতা সব আছে, তবু আপনাদিগকে পদোচিত মহৎ হইতে হইবে এবং নিজ মাহাত্ম্যের প্রমাণ দিতে হইবে। এক দিন ব্রহ্মাবর্ত্তের জ্ঞানপীঠ জগৎকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের গুরুরা এমন একটি মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন যে জগতের সকলেই আসিয়া এখানে আপন আপন আচার ও আদর্শলাভ করিতে পারেন।"

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥ মনু ২।২০

হয়ত কেহ বলিতে পারেন, "সাধনা করিবে, তাহার জন্য এত বড় লোকসমাগম কেন? সাধনার ক্ষেত্রে চাই ব্যক্তিগত তপস্যা, তাহাতে এত হৈ চৈ কেন?"

চারিদিকে যে দুঃখদৈন্য, অশ্রদ্ধা, বিরুদ্ধতা। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তি পরিমিত। তাই চাই সম্মিলিত সাধনা। তাই আজ সকলে হইয়াছেন সম্মিলিত। মধ্যযুগের সাধকেরা ভারতে সকলেই মানিতেন ব্যক্তিগত তপস্যা, তবু কেন যে তাঁহারা "কুম্ভ," "পুষ্করী," "ফুলেরা" প্রভৃতি সাধু-মেলায় দলে দলে এক এক কাল-বিশেষে সম্মিলিত হইতেন, তাহার কৈফিয়ৎ তখনও কেহ কেহ চাহিতেন। যোগীরা যে ব্যক্তিগত তপস্যা করেন তাহা তো "যোগ"। মহাতীর্থে যে সকলের কালবিশেষে সমাগম, তাহাও "যোগ"। সে সবার যোগ, সাধনার যোগ, তপস্যার যোগ, শক্তির যোগ। তাই রজ্জবজী বলিলেন, "জলবিন্দুর প্রাণের মধ্যে যদি সিন্ধুর ডাক আসিয়া থাকে, তবে একলা একটি বিন্দুর প্রেম ব্যর্থতা মাত্র। তাই বিন্দু ডাকে বিন্দুকে, সকলে সংযুক্ত হইয়া সম্মিলিত সাধনার একটি ধারারূপে পরিণত হইলেই মিলে গতি। একলা একটি বিন্দু যাত্রা করিলেও পৌঁছিতে পারে না, পথের দূরত্বই তাহার প্রাণ ও শক্তিটুকু ফেলে শুকাইয়া, অথচ সবাই এক হইলে বাধা-স্বরূপ সেই ব্যবধানকেই ফেলিতে পারে প্লাবিত করিয়া। হে প্রভো, তখন তোমার দয়াতেই পাই তোমার দরশন।"

প্রীত অকেলা ব্যর্থ মহাসিন্ধু বিরহী দিল হোয়।
বুংদ পুকারে বুংদ-কো গতি মিলে সংজোয়॥
অকেল বুংদ পহুঁচৈ নহী সুখৈ পংথ জীব জোয়।
পংথ ভর ভরে এক হোয় দরস দয়া প্রভু তোয়॥

প্রত্যেকটি বিন্দু স্বতন্ত্র হইয়া চলিতে চাহিলে প্রত্যেকেই মরে শুকাইয়া। কিন্তু সকলে যদি একত্র হইতে পারে তবে পৌঁছিতে পারে সেই ভগবৎ-সাগরে। মানব-সাধনার ও জ্ঞানের এই চলিত ধারাই জীবন্ত গঙ্গা, এই সদাবহন্ত গঙ্গাতেই মিলে মুক্তি। এইখানে স্নান না করিয়া লোকে কিনা ডুব দিয়া মরে মৃত গঙ্গায়!

বুংদ বুংদ সাধন মিল হরিসাগর জাহি।
প্রাণ গংগ না পহুঁচা মুরদ গংগ সমাহি।

প্রার্থনা করি, আজ আমাদের সকলের সমবেত শক্তি গঙ্গার মত প্রবাহিত হউক। আজ যিনি আমাদের সুযোগ্য সভাপতি, তিনি এই ধারাকে আপন গন্তব্য লক্ষ্য অগ্রসর করিয়া লইয়া চলুন। সকলের এই সমবেত পবিত্র যোগে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

নিখিল-ভারত মূক-বধির শিক্ষক-সম্মেলন

ঈষ্টারের ছুটিতে কলিকাতায় একটি খুব প্রয়োজনীয় সম্মেলন হইয়াছিল। ইহা নিখিল-ভারত মূক-বধির শিক্ষক-সম্মেলন।

প্রাচীন কালে বোধ হয় সব দেশেই বিকলাঙ্গ, অন্ধ, পঙ্গু, বধির, মূক, অপরিণতমস্তিষ্ক শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা উপেক্ষার পাত্র ছিল। হয়ত তাহাদিগকে কেহ কেহ দয়া করিতেন, কিন্তু শিক্ষার দ্বারা তাহাদিগকে সমাজভুক্ত স্বাবলম্বী মানুষ করিয়া তুলিবার যে ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রসূত চেষ্টা, তাহা আধুনিক। তাহার প্রভাবে আমাদের দেশে অল্পসংখ্যক

অন্ধবিদ্যালয়, মূক-বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা একান্ত অযথেষ্ট। মূকবধির, অথবা ঠিক্ বলিতে গেলে বধির মূক, আমাদের দেশে আছে মোটামুটি দুই লক্ষ, কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষা পায় বোধ হয় হাজার দুই।

কলিকাতায় যে বধিরমূক শিক্ষকদের সম্মিলন হইয়া গেল অধ্যাপক ডক্টর আর্কাট তাঁহার সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মিলন প্রধানতঃ দুটি বিষয়ে লোকমত উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করেন। দেশের সার্ব্বজনিক শিক্ষার দাবি বিস্তারলাভ করিতেছে। এখন দুর্ভাগ্য বধিরমূক সমুদয় বালক-বালিকার শিক্ষার আয়োজনেরও চেষ্টা হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য বিকলাঙ্গদের মত বধিরমূকদিগেরও যে আইনগত দায়াধিকারশূন্যতা আছে, তাহা দূরীভূত হওয়া উচিত।

—

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে বা সহায়তায় আগে আগে একটি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন হইত। কি কারণে জানি না, কয়েক বৎসর তাহার অধিবেশন হয় নাই। হওয়া উচিত ও আবশ্যক।

তালতলা পাব্লিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত কয়েক বৎসর যে কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে, তাহার দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর কাজ কতকটা হইতেছে। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নহর মহাশয়ের ভবনে যে কুমার সিংহ হল আছে, তাঁহার সৌজন্যে সেই হলে এই কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের মত এই কলিকাতা সম্মিলনেরও এক জন মূল সভাপতি মনোনীত হন, এবং সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ললিতকলা আদি শাখার এক এক জন সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব আলোচ্য বিষয়ে বিদ্বান্। তাঁহাদের অভিভাষণগুলি এবং অন্য অনেক লেখকের প্রবন্ধ বেশ জ্ঞানগর্ভ হইয়া থাকে।

—

সূত্রধর জাতি

সূত্রধর জাতিকে গবর্মেণ্ট "তপসীলভুক্ত" করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা সরকারী মতে অধম জাতি বা নীচজাতি বা[লি]য়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে আ[পত্তি] করায় সরকার বাহাদুর তপসীল হইতে তাঁহাদের নাম বাদ দিয়াছেন। অন্য যে-সব জাতি প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তপসীল হইতে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

—

সিমলায় বাঙালীদের বিদ্যালয়

অনেক বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীদের উদ্যম ও অধ্যবসায়ে সিমলায় একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং পরে উহা বাট্‌লার স্কুল নামে পরিচিত হয়। প্রাদেশিক ঈর্ষা ও সংকীর্ণতা-গ্রস্ত কতকগুলি অবাঙালীর বিরুদ্ধাচরণে উহার সহিত বাঙালীদের সম্পর্ক রহিত হয়। গত ১লা মে বাঙালীরা অন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাহাতে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

—

বাঙালীদের মস্তিষ্কের অবনতি হয় নাই

কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙালী যুবকেরা ভারতীয় সিবিল সার্বিস ও অন্যান্য সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যথেষ্ট সংখ্যায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় বা উত্তীর্ণ হইলেও পারদর্শিতা অনুসারে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে না পারায় অনেকের এই ধারণা জন্মিয়াছে, যে, বাঙালীর মস্তিষ্কের অবনতি ঘটিয়াছে। আমরা এই ধারণা কখনও পোষণ করি নাই। পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করাটা যে খুব বেশী বুদ্ধি বা প্রতিভার প্রমাণ, তাহাও মনে করি না। বাঙালী ছেলেরা যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বেশী পাস হয় না বা উচ্চ স্থান অধিকার করে না, তাহার নানা কারণ থাকিতে পারে। অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছে, সুতরাং তাহারা বাঙালীদের সমকক্ষ হইতেছে; বাঙালী ছেলেদের চাকরির দিকে আগেকার মত ঝোঁক নাই; রাজনৈতিক কারণে বাঙালী বিস্তর যুবক বন্দী হওয়ায় তাহারও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ফল সব দিকে লক্ষিত হইতেছে; পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইতে হইলে পুস্তকক্রয়াদির জন্য অর্থব্যয় করিতে এখন বাঙালীদের চেয়ে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা অধিক সমর্থ; শিক্ষার জন্য বঙ্গে সরকারী ব্যয় অত্যন্ত কম হওয়ায় ও এখানে ট্রেনিং কলেজে শিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা কম হওয়ায় বঙ্গের উচ্চ বিদ্যালয়

ও কলেজগুলি অপেক্ষা অন্যত্র শিক্ষা ভাল দেওয়া হয়; বঙ্গে রাজনৈতিক হুজুক ও চিত্তবিক্ষেপের অন্যান্য কারণ বেশী; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করা বহু বৎসর অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া যাওয়ায় ও অন্যান্য কারণে বাঙালী ছেলেরা শ্রমবিমুখ হইয়াছে; সমগ্রভারতীয় পরীক্ষাগুলিতে পরীক্ষকদের মনেও বাঙালীদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাব থাকিতে পারে; মৌখিক পরীক্ষা এরূপ ভাবে গৃহীত হইতে পারে যাহাতে বিরাগভাজন পরীক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার হইতে পারে; ইত্যাদি নানা কারণে বাঙালী যুবকেরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসমূহে সফলতা দেখাইতে না-পারিয়া থাকিতে পারে।

অন্য দিকে, আমরা কয়েক বার দেখাইয়াছি, যে, জার্মেনীতে ভারতীয় ছাত্রদিগকে গুণানুসারে যে-সব বৃত্তি দেওয়া হয়, বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা তাহা কম পায় না, বরং বেশীই পায় এবং এই সব ভারতীয় ছাত্রের মধ্যে বাঙালী ছাত্রেরা কম কৃতিত্ব দেখায় না।

—

এ-বৎসর সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় বাঙালীর কৃতিত্ব

এ-বৎসর ভারতীয় সিবিল সার্বিস পরীক্ষার ফলে দু-জন হিন্দু ও দু-জন মুসলমান ছাত্র মনোনীত হইয়াছে। হিন্দু দুটি ছাত্রই বাঙালী; মুসলমান দুটি কোন্ প্রদেশের, নামের দ্বারা বুঝা যায় না। প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন ব্রহ্মদেব মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা উভয়েই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সুতরাং, বাঙালীদের ইহাতে সন্তোষের কারণ থাকিলেও বঙ্গের বাঙালীদের কিংবা কলিকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহাতে গৌরব করিবার কিছু নাই। ইহার আগেকার বৎসরও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ, প্রবাসী বাঙালীরা শিক্ষার জোরেই বঙ্গের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া ও শিক্ষা ব্যতিরেকে তাঁহারা টিকিয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া এবং বাঙালীরা (মহাত্মা গান্ধীর ভাষায়) "শিক্ষা-পাগল" বলিয়া, প্রবাসী বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা অনেক স্থলে বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বৎসরের পরীক্ষার ফল হইতে তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বেহার হেরাল্ড' লিখিয়াছেন, বি এ অনার্স পরীক্ষায় ইংরেজীতে ও অর্থনীতিতে দুটি বাঙালী ছাত্র তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে; ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর দুটি ছেলেই বাঙালী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম দু জন বাঙালী; পদার্থ-বিজ্ঞানে একটি মাত্র ছাত্র প্রথম শ্রেণীস্থ এবং সেটি বাঙালী; এবং রসায়নীবিদ্যায় একটি বাঙালী ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। আই-এ পরীক্ষায় একটি বাঙালী ছেলে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং আই এস্ সিতে নীলিমা মুখোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

বেহারের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতেও বাঙালী ছেলেরা ভাল পাস করিয়াছে। একটি বাঙালী ছেলে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং 'বেহার হেরাল্ড' বলেন, যে ৫৬টি পরীক্ষার্থী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহার মধ্যে ২২ জন বাঙালী, যদিও বিহারে মোটামুটি শতকরা ছয় জন মাত্র বাঙালী।

কিন্তু বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা বিহার-গবন্মেণ্টের নিকট হইতে গুণানুসারে বিদ্যার্জ্জনে উৎসাহ ও সাহায্য পায় না।

—

অধ্যাপক অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়

এলাহাবাদের অধ্যাপক অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ এক জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাভিজ্ঞ ব্যক্তির সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম্-এ পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সরকারী শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রাদেশিক প্রধান সরকারী কলেজ মিওর সেণ্ট্র্যাল কলেজের প্রধান ইংরেজী সাহিত্যাধ্যাপক হইয়াছিলেন। পরে তিনি সেকেণ্ডারী ও ইণ্টারমীডিয়েট এডুকেশন বোর্ডের সেক্রেটরী হইয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার ছাত্রদের কিরূপ কল্যাণকামী ছিলেন, বন্ধুদের সহিত তাঁহার কিরূপ হৃদ্যতা কর্ত্তব্যপরায়ণতাবশতঃ তিনি কিরূপ অতিরিক্ত করিতেন, এলাহাবাদের দৈনিক লীডারে তাহা কোন কোন হিন্দুস্থানী ছাত্র ও বন্ধু লিখিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে জলধর সেন মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা

গত ২৮শে বৈশাখ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা হয়। সভাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারা যাঁহারা সেন মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার স্বভাবের সেই দিকটির কথা উল্লেখ করিলেন যাহার বলে তাঁহার বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সহজেই তাঁহার আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই জন্য তাঁহাকে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এবং তিনিও ইহাতে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন :—

> সাহিত্যিক-বৎসল খাঁটি বাঙ্গালী তুমি। চরিত্রের মাধুর্য্যে ছোট বড় সকলের তুমি প্রিয়, ছোট বড় সকলেও তোমার প্রিয় ; কোন সাহিত্যিক তোমার অকপট স্নেহলাভে বঞ্চিত নয়। সাহিত্যিক মাত্রেরই তুমি পরমাত্মীয় ; তাই তুমি সকলের বড় আদরের 'দাদা'।"

—

নিখিলবঙ্গ "অনুন্নত জাতি" মহাসম্মেলন

আগামী ৫ই ও ৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ও সোমবার (ইং ১৯শে ও ২০শে মে) তারিখে যশোহর জেলার মহকুমা শহর ঝিনাইদহে এই মহাসম্মেলন হইবে। ইহাতে সমগ্র বাংলার অনুন্নত বলিয়া কথিত জাতিসমূহের (Scheduled castes) শিক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইবে এবং কি ভাবে কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণ করিলে সমগ্র "অনুন্নত জাতি" অচিরে সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া দেশকে উন্নত করিতে ও সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে তাহার সিদ্ধান্ত করা হইবে।

কার্য্যসূচী

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার সর্দ্দারগণের লাঠিখেলা, তার পর ৯টা হইতে যশোহর জেলার ও ফরিদপুর জেলার দুইটি শ্রেষ্ঠ দলের কবিগান।

...তে ১২টা পর্য্যন্ত "নিখিলবঙ্গ ...সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ...র হইবে। তার পর বিকাল ...তি মহাসম্মেলনের সামাজিক ...স্পৃশ্যতা, একতা, জাতিভেদ, ...মাজিক বিষয়ের আলোচনা

... হইতে রাজনৈতিক বিভাগের ... গবর্ণমেন্ট [illegible] জাতির জন্য কি করিয়াছেন ... নূতন শাসনসংস্কার, পুণা চুক্তি, সাম্প্রদায়িক [illegible] গবর্ণমেন্টের নীতি সম্বন্ধে প্রভৃতি বিষয়ের বিচার ও আলোচনা করিয়া [illegible] কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা হইবে।

৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক [illegible] সভা বসিবে। এই সভায় অনুন্নত জাতির শিক্ষায় অগ্রসর না [illegible] কারণ ও তাহার প্রতিকারের বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত, [illegible] সমস্যা, প্রজার দুঃখ ও তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা, জমিদার ও গবর্ণমেন্টের প্রজাস্বত্ব আইন, কোর্ট অব ওয়ার্ডস ও সার্টিফিকেট বিভাগের কার্য্যাবলী, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইবে।

প্রত্যহ সভারম্ভের পূর্ব্বে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সর্দ্দার ও খেলোয়াড়গণের লাঠি, ছোরা ও তলোয়ার খেলা হইবে এবং রাত্রি ৯টা হইতে বিভিন্ন জেলার সুপ্রসিদ্ধ কবিদারগণের যাত্রাছন্দে ও নূতন প্রণালীতে কবিগান হইবে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার অতিরিক্ত ভাবে প্রসিদ্ধ মল্লবীরগণের কুস্তী হইবে এবং শ্রীমতী সুধামুখী দেবী ও কলিকাতা হইতে আগত মেয়েদের লাঠি ছোরা ও যুযুৎসু খেলা হইবে। ঐ দিনেই রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্ব্বাচিত সর্দ্দারগণ, খেলোয়াড়গণ ও কবিদারগণকে মেডেল উপহার দেওয়া হইবে।

হিন্দুসমাজের "উন্নত" ও "অনুন্নত" জাতিসকলের অন্তর্ভূত যে-কেহ সমগ্র হিন্দুসমাজের এবং ভারতীয় মহাজাতির কল্যাণকামী, তাঁহারই অবসর ও সুবিধা থাকিলে এইরূপ সম্মেলনসকলে যোগ দিয়া সুচিন্তিত কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ইহা কেবল অনুন্নত জাতিদিগের কৃত্য নহে। এই সকল সম্মেলনের সুপথচালিত হওয়ার উপর জাতীয় কল্যাণ বহুপরিমাণে নির্ভর করে।

—

আসামে বিশ্ববিদ্যালয়

আসামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। যদি আসামে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং বাঙালীর প্রভাব নাশ বা হ্রাস এই প্রস্তাবের পরোক্ষ ফল বা উদ্দেশ্য না হয়, এবং যদি যথেষ্ট বেতন দিয়া ভাল ভাল অধ্যাপক নিযুক্ত

করিবার, যথেষ্ট ব্যয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি [illegible] পরীক্ষাগার পূর্ণ রাখিবার ও প্রয়োজনীয় [illegible] বিশ্বকোষাদি কিনিয়া লাইব্রেরীতে [illegible] আসামের গবর্ন্মেণ্ট ও [illegible] আসামের জন্ম আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] আপত্তি না হওয়া উচিত। কিন্তু কেবল [illegible] একটি পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন [illegible] দেখিতেছি না। আসামের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৪২ জন বাঙালী। তাহাদের ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির অনুশীলন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া হইতে পারে। আসামের অসমিয়া ভাষায় পরীক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে হইয়া থাকে। অসমিয়া যাঁহাদের মাতৃ-ভাষা তাঁহারা উদ্যোগী হইলেই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় না করিয়াও নিজেদের ভাষা সাহিত্য ও কৃষ্টির অনুশীলন করিতে পারেন। তাঁহাদের উদ্যোগিতা বাড়িতেছেও। আসামে যে-সব আদিম জাতির বাস তাঁহাদের মধ্যে খাসিয়াদের ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষা লইয়া থাকেন।

বঙ্গের বাহিরে যেখানেই বাঙালী আছেন, সেখানেই প্রভুত্ব করিবেন, আমাদের এরূপ কোন কু-অভিপ্রায় বা কু-আশা নাই। কিন্তু বাঙালী বলিয়াই বাঙালীকে কোথাও উপেক্ষিত বা লাঞ্ছিত হইতে হইবে, এরূপ অবস্থাও বরদাস্ত করা অনুচিত।

সামাজিক পবিত্রতা ও মুদ্রাযন্ত্র

সম্প্রতি আদালতে প্রধানতঃ একটা ও অপ্রধান ভাবে আরও দু-এক মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, এবং এখনও হইতেছে, যাহাতে সামাজিক ও পারিবারিক অপবিত্রতার কথা আলোচিত হইয়াছে। সামাজিক ও পারিবারিক অধোগতির কারণ বলিয়া যাহাদের নামে অভিযোগ হয়, তাহাদের বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাদের শাস্তিও হওয়া উচিত। কিন্তু এইরূপ মোকদ্দমার সাক্ষ্য ও প্রমাণাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট কাগজে বাহির করিলে সামাজিক কি কল্যাণ হয় [illegible] পারি না। কাগজের কাটতি বাড়ে সত্য, কিন্তু [illegible] বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠে অল্পবয়স্ক ও অধিকবয়স্ক সব [illegible] চিত্ত কলুষিত হয়। মোকদ্দমার ফলাফল [illegible]ট প্রকাশ করাই যথেষ্ট। এই প্রকার মোকদ্দমা [illegible] বেশী হয়। আমরা তথাকার দৈনিক কাগজ প্রায় [illegible] না, কিন্তু আমাদের এইরূপ একটা ধারণা আছে যে, তথাকার শ্রেষ্ঠ কাগজগুলিতে এরূপ মোকদ্দমার বিস্তারিত রিপোর্ট ছাপা হয় না। সে ধারণা যদি ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলেও পাশ্চাত্য দেশের মন্দটাব অনুকরণ না-করাই ভাল।

একটা মোকদ্দমা উপলক্ষ্য করিয়া রাশি রাশি জঘন্য পুস্তিকা প্রকাশিত ও বিক্রীত হইয়াছে। পুলিস জনকতককে ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহা অপেক্ষা কাহাকেও না ধরাই ছিল ভাল। যাহারা এই সব কলুষপূর্ণ পুস্তিকা লেখে, ছাপায় ও বিক্রী করে, তাহারা সমাজের শত্রু। কিন্তু যাহারা কেনে ও পড়ে—বিশেষতঃ যাহারা এই সব পচা জিনিষ অন্তঃপুরিকাদের ও ছেলেমেয়েদের হাতে পৌঁছিতে দেয়, তাহারাও কম নিন্দনীয় নহে।

বহু বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের নামে যে মোকদ্দমা হয়, তাহার রিপোর্ট কলিকাতার একখানা কাগজ সমুদয় অতি অশ্লীল অংশ সমেত ছাপিয়াছিল। আমাদের যতদূর মনে পড়ে তাহার পর এই দ্বিতীয় বার কুৎসিত রিপোর্ট বাহির হইল।

ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীর অদ্ভুত নিয়ম

খবরের কাগজে দেখিয়াছি এবং সাক্ষাৎভাবে জানেন এরূপ লোকের মুখে শুনিয়াছি, যে, কলিকাতার ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ এই নিয়ম করিয়াছেন, যে, ভারতীয় কোন ভাষায় লিখিত উপন্যাস ও গল্পের বহি লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িবার জন্য কিংবা বাড়িতে লইয়া গিয়া পড়িবার জন্য কাহাকেও দেওয়া হইবে না। শুনিলাম, যদিও ভারতীয় সব ভাষার নাম করা হইয়াছে, তথাপি নিয়মটার লক্ষ্য প্রধানতঃ বাংলা উপন্যাস ও গল্পের বহি। তাহা
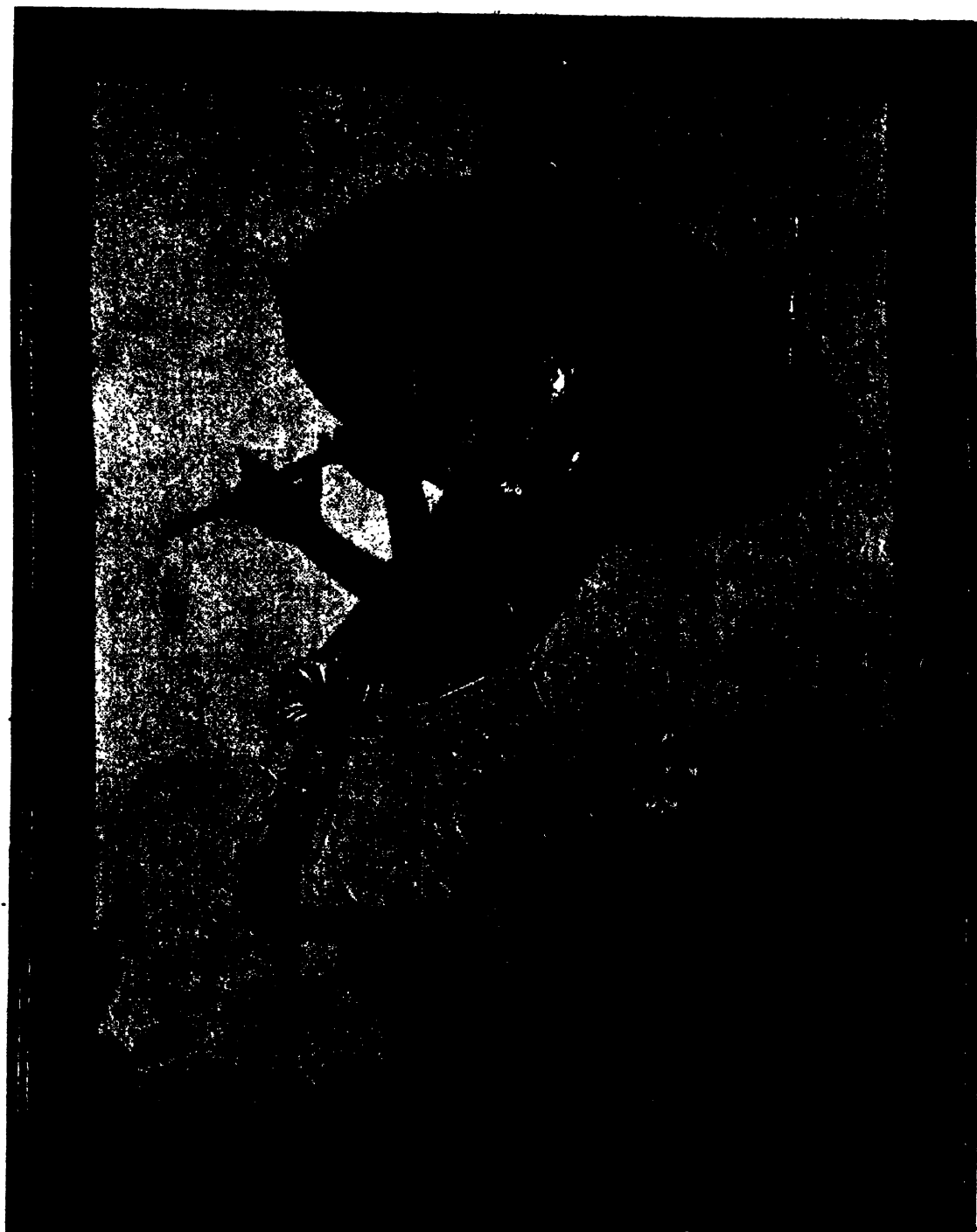
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গোধূলি-রাগিণী

শ্রী বি. বর্ম্মা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৪২

৩য় সংখ্যা

বুদ্ধদেব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলঙ্কার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল—যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করি নি?

তখনি আবার এই কথা মনে হ'ল যে, বর্ত্তমান কালের পরিধি অতি সংকীর্ণ, সদ্য উৎক্ষিপ্ত ঘটনার ধূলি আবর্ত্তে আবিল, এই অল্পপরিসর অস্বচ্ছ কালের মধ্যে মহামানবকে আমরা পরিপূর্ণ করে উপলব্ধি করতে পারি নে, ইতিহাসে বার-বার তার প্রমাণ হয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ক্ষুদ্র মনের কত ঈর্ষ্যা কত বিরোধ তাঁকে আঘাত করেছে, তাঁর মাহাত্ম্য খর্ব্ব করবার জন্যে কত মিথ্যা নিন্দার প্রচার হয়েছিল। কত শত লোক যারা ইন্দ্রিয়গত ভাবে তাঁকে কাছে দেখেছে, তারা অন্তরগত ভাবে নিজেদের থেকে তাঁর বিপুল দূরত্ব অনুভব করতে পারে নি, সাধারণ লোকালয়ের মাঝখানে থেকে তাঁর অলৌকিকত্ব তাদের মনে প্রতিভাত হবার অবকাশ পায় নি। তাই মনে করি সেদিনকার প্রত্যক্ষ ধাবমান ঘটনাবলীর অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁকে যে দেখি নি সে ভালই হয়েছে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা জন্মমুহূর্ত্তেই স্থান গ্রহণ করেন মহাযুগে, চলমান কালের অতীত কালেই তাঁরা বর্ত্তমান, দূরবিস্তীর্ণ ভাবী কালে তাঁরা বিরাজিত। একথা সেদিন বুঝেছিলুম সেই মন্দিরেই। দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে এক জন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হ'ল নির্জ্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে, সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল, আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন; আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তারই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপ-পরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল

প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম অন্তরতম, তাঁর জন্মদিন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ মুক্তিকামীর জীবনের মধ্যে। সেদিন সে আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার দীপ্তশিখায় সম্মুখে দেখতে পেয়েছে তাঁকে যিনি নরোত্তম। যে বর্ত্তমান কালে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেদিন যদি তিনি প্রতাপশালী রাজরূপে, দিগ্বিজয়ী বীররূপেই প্রকাশ পেতেন, তা হ'লে তিনি সেই বর্ত্তমান কালকে অভিভূত করে সহজে সম্মান লাভ করতে পারতেন; কিন্তু সেই প্রচুর সম্মান আপন ক্ষুদ্র কালসীমার মধ্যেই বিলুপ্ত হ'ত। প্রজা বড় করে জানত রাজাকে, নির্ধন জানত ধনীকে, দুর্ব্বল জানত প্রবলকে; কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতাকে সাধনা করছে যে মানুষ সেই স্বীকার করে সেই অভ্যর্থনা করে মহামানবকে। মানব কর্ত্তৃক মহামানবের স্বীকৃতি মহাযুগের ভূমিকায়। তাই আজ ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানব-মনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীত কালের মহৎপ্রকাশ বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিত্তবিকারে আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজও তাঁরই কাছে বলতে আসছে বুদ্ধের শরণ কামনা করি, এই সুদূর কালে প্রসারিত মানবচিত্তের ঘনিষ্ঠ উপলব্ধিতেই তাঁর যথার্থ আবির্ভাব।

আমরা সাধারণ লোক পরস্পরের যোগে আপনার পরিচয় দিয়ে থাকি, সে পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির; বিশেষ সমাজের। পৃথিবীতে এমন লোক অতি অল্পই জন্মেছেন যাঁরা আপনাতে স্বতই প্রকাশবান, যাঁদের আলোক প্রতিফলিত আলোক নয়, যাঁরা সম্পূর্ণ প্রকাশিত আপন মহিমায়, আপনার সত্যে। মানুষের খণ্ড প্রকাশ দেখে থাকি অনেক বড় লোকের মধ্যে, তাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা বিদ্বান, তাঁরা বীর, তাঁরা রাষ্ট্রনেতা, তাঁরা মানুষকে চালনা করেছেন আপন ইচ্ছামতো, তাঁরা ইতিহাসকে সংঘটন করেছেন আপন সঙ্কল্পের আদর্শে। কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয় নি রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।

মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছে:—আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। যিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে সত্যকে যিনি এমনি করে জেনেছেন তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানব-মহিমায় দেদীপ্যমান।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
চাত্মানং সর্ব্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।

মানুষের এই প্রকাশ জগতে আজ অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবৃত। কিছু কিছু দেখা যায়, অনেকখানি দেখা যায় না। পৃথিবীসৃষ্টির আদিযুগে ভূমণ্ডল ঘন বাষ্প-আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানে সেখানে উচ্চতম পর্ব্বতের চূড়া অবারিত আলোকের মধ্যে উঠতে পেরেছে। আজকের দিনে তেমনি অধিকাংশ মানুষ প্রচ্ছন্ন, আপন স্বার্থে, আপন অহঙ্কারে, অবরুদ্ধ চৈতন্যে। যে সত্যে আত্মার সর্ব্বত্র প্রবেশ সেই সত্যের বিকাশ তাদের মধ্যে অপরিণত।

মানুষের সৃষ্টি আজও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। এই অসমাপ্তির নিবিড় আবরণের মধ্যে থেকে মানুষের পরিচয় আমরা পেতুম কী করে যদি না মানব সহসা আমাদের কাছে আবির্ভূত না হ'ত কোন প্রকাশবান মহাপুরুষের মধ্যে? মানুষের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে, মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। ন ততো বিজুগুপ্সতে, আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, দেশকালের কোন্ সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে, কোন্ সদ্যপ্রয়োজনসিদ্ধির প্রলুব্ধতায়?

ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হ'ল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে ব্যাপ্ত হ'ল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ

তীর্থ হয়ে উঠল অর্থাৎ স্বীকৃত হ'ল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি এই জন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে ; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির কাছে। এলো চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এলো তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দুস্তর গিরি সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্ত্তার কাছে। দূর হ'তে দূরে মানুষ বলে উঠল মানুষের প্রকাশ হয়েছে—দেখেছি মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ। এই ঘোষণা-বাক্য অক্ষয় রূপ নিলো মরুপ্রান্তরে প্রস্তরমূর্ত্তিতে। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধবন্দনা, মূর্ত্তিতে চিত্রে স্তূপে। মানুষ বলেছে যিনি অলোকসামান্য, দুঃসাধ্য সাধন করেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব্ব শক্তির প্রেরণা এলো তাদের মনে ; নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তারা আঁকলো ছবি, দুর্ব্বহ প্রস্তরখণ্ডগুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্ম্মাণ করলে মন্দির, শিল্প-প্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্প-সম্পদ রচনা করলে, শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই মন্ত্র দান করে গেল, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম সুবৃহৎ স্তূপ পরিবেষ্টন করে শত শত মূর্ত্তি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতক-কথার বর্ণনায় ; তার প্রত্যেকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও লেশমাত্র আলস্য নেই, অনবধান নেই ; এ'কে বলে শিল্পের তপস্যা, একই সঙ্গে এই তপস্যা ভক্তির ; খ্যাতিলোভহীন নিষ্কাম কৃচ্ছ্রসাধনায় আপন শ্রেষ্ঠ শক্তিকে উৎসর্গ করা চিরবরণীয়ের চিরস্মরণীয়ের নামে। কঠিন দুঃখ স্বীকার করে মানুষ আপন ভক্তিকে চরিতার্থ করেছে ; তারা বলেছে, যে প্রতিভা নিত্যকালের সর্ব্বমানবের ভাষায় কথা বলে সেই অকৃপণ প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ না করতে পারলে কোন্ উপায়ে যথার্থ করে বলা হবে, তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে সকল কালের জন্যে ? তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা দুঃসাধ্য, যা চির-জাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্য্যবান পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তাঁর জয়ধ্বনি, শৈলশিখরে মরুপ্রান্তরে, নির্জ্জন গুহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এলো ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে।

এত বড় রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে ; সেই রাজাকে মাহাত্ম্য দান করেছেন যে গুরু তাঁকে আহ্বান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয় নি যেদিন তিনি জন্মেছিলেন এই ভারতে। বর্ণে বর্ণে জাতিতে জাতিতে অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্ম্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল ; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্ব্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষ-কলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন্ মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে। সকলের চেয়ে বড় দান যে শ্রদ্ধাদান তার থেকে কোনো মানুষকে তিনি বঞ্চিত করেন নি। যে দয়াকে যে দানকে তিনি ধর্ম্ম বলেছেন, সে কেবল দূরের থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে অর্থদান নয়, সে দান আপনাকে দান,—যে দান ধর্ম্মে বলে শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমান, পুণ্যাভিমান, ধনাভিমান প্রবেশ ক'রে দানকে অপমানকর অধর্ম্মে পরিণত করতে পারে এই ভয়ের কারণ আছে ; এই জন্যে উপনিষদ্ বলেন, ভিয়া দেয়ম্, ভয় করে দেবে। যে ধর্ম্মকর্ম্মের দ্বারা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার আশঙ্কা আছে তাকেই ভয় করতে হবে। আজ ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিধির প্রণালী-যোগে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধার পথ চারিদিকে প্রসারিত হয়েছে। এরই ভয়ানকত্ব কেবল আধ্যাত্মিক দিকে নয় রাষ্ট্রীয় মুক্তির দিকে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হয়েছে এ প্রত্যক্ষ দেখছি। এই সমস্যার কি কোনো দিন সমাধান হ'তে পারে রাষ্ট্র-নীতির পথে কোনো বাহ্য উপায়ের দ্বারা ?

ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সঙ্কল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল, কেউ ছিল

কি ম্লেচ্ছ কেউ ছিল কি আর্য্য? তিনি তাঁর সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্তে। তাঁর সেই তপস্তার মধ্যে ছিল নির্ব্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড় তপস্তা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?

জিজ্ঞাসা করি, মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দিয়ে আমরা কী পেয়েছি ঠেকাতে? ছিল আমাদের পরিপূর্ণ ধনের ভাণ্ডার, তার দ্বার, তার প্রাচীর, বাইরের আঘাতে ভেঙে পড়ে নি কি, কিছু কি তার অবশিষ্ট আছে? আজ প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলেছি মানুষের প্রতি আত্মীয়তাকে অবরুদ্ধ করে, আজ দেবতার মন্দিরের দ্বারে পাহারা বসিয়েছি দেবতার অধিকারকেও কৃপণের মতো ঠেকিয়ে রেখে। দানের দ্বারা ব্যয়ের দ্বারা যে ধনের অপচয় হয় তাকে বাঁচাতে পারলুম না, কেবল দানের দ্বারা যার ক্ষয় হয় না বৃদ্ধি হয় মানুষের প্রতি সেই শ্রদ্ধাকে সাম্প্রদায়িক সিন্দুকের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখলুম। পুণ্যের ভাণ্ডার বিধবীর ভাণ্ডারের মতোই আকার ধরল। একদিন যে ভারতবর্ষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপন মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করে তুলেছিল আজ সে আপন পরিচয়কে সঙ্কুচিত করে এনেছে, মানুষকে অশ্রদ্ধা করেই সে মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হ'ল। আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে কেননা মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এত সন্দেহ, এত আতঙ্ক, এত আক্রোশ। তাই আজ মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছে, তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। কিছুদিন পূর্ব্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হ'ল, সে জয় বাহুবলের। কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয় এই জন্তে মানুষের ইতিহাসে সে জয় নিষ্ফল হ'ল, সে জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরে নি। তাই মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে মানবের গুরু বলেছেন, ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্তের ক্রোধকে। এ না হ'লে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ। বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতিহিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না, ক্ষমাই আনে শান্তি, একথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে, রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন কিছুতে নিভ্‌বে না, জেলখানার দানবিক নিষ্ঠুরতায় এবং সৈন্তনিবাসের সশস্ত্র ভ্রূকুটিবিক্ষেপে পৃথিবীর মর্ম্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দুঃসহ হ'তে থাকবে, কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না। পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন অক্রোধেন জিনেৎ ক্রোধং—আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।" তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঞর্থক নয়, সদর্থক,—যে মুক্তি কর্ম্মত্যাগে নয় সাধুকর্ম্মের মধ্যে আত্মত্যাগে, যে মুক্তি রাগদ্বেষ-বর্জ্জনে নয় সর্ব্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্ম্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

[গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, কলিকাতায় শ্রীধর্ম্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসবে শ্রীমৎ আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করেন উপরে তাহা মুদ্রিত হইল। ইহা তিনি লিখিয়া দিয়াছেন।]

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

কল্যাণীয়েষু

শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে আমার একটা বক্তৃতার নিমন্ত্রণ ছিল। সেটা সমাধা করা গেছে। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল Ideals of the Ancient Civilization of India,* তাতে আমি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভেদটা কোন্‌খানে সেইটা দেখাবার চেষ্টা করেছিলুম। সেটা এদের ভালো লেগেছে। তার পরে এখানকার য়ুনিটেরিয়ানদের হলে The Problem of Evil† নামে একটা রচনা পাঠ করেছি এটাও প্রশংসা লাভ করেছে। ডাঃ লিউইস্‌ বলছিলেন তিনি যখন শুনছিলেন তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি যেন এমার্সনের বক্তৃতা শুনছেন। বোধ হয় তার কারণ, লেখাটাতে অনেক এপিগ্রাম ছিল।

শিকাগো থেকে কাল রচেষ্টারে এসেছি। এখানে উদারধর্ম্মমতীদের এক সম্মিলন সভা চলছে। কাল সন্ধ্যার সময় সভ্যরা আমাদের এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সেখানে অয়কেনের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। তিনি দুই হাতে আমার হাত ধরে আমাকে খুব সমাদর ক'রে গ্রহণ করলেন—বললেন ইণ্ডিয়া ও জর্ম্মানী আমরা এক রাস্তায় চলছি। এই বৃদ্ধকে দেখে আমার খুব আনন্দ বোধ হ'ল। কতকটা বড়দাদার ধরণের মানুষটি, খুব সরল এবং যেন জীবনোৎসাহে পূর্ণ। আমি মিসেস্‌ অয়কেন্‌-এর (Mrs. Eucken) পাশে বসেছিলুম, তিনিও খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বললেন, আমি যেন নিশ্চয়ই য়েনা য়ুনিভার্সিটিতে যাই—সেখানেই ওঁর স্বামী অধ্যাপনা করেন। ওঁরা নিয়ুইয়র্কে যাচ্ছেন—সেখানে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করলেন। এই অনুরোধটি রক্ষা করব মনে করছি। বিশেষতঃ সেখানে ঠিক এই সময়েই বার্গসোঁ (Bergson) আসছেন—এই শহরে য়ুরোপের দুই জ্যোতিষ্কের যোগ হবে। তাঁর সঙ্গেও এই সুযোগে আলাপ ক'রে নেবার চেষ্টা করা যাবে। আমার পক্ষে এই রকম ক'রে ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্তিকর—কিন্তু আমি জানি ফিরে গেলে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে কী দেখে এলে? তখন যদি কেবলমাত্র দুই-চার জন আর্ব্বানা নাগরিকের নাম কীর্ত্তন করেই ক্ষান্ত হই তা হ'লে তোমাদের অনুযোগভাজন হব। কিন্তু যতই এই দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় সভাসমিতি বক্তৃতা ও হাততালির মধ্যে আমাকে ঘোরাচ্ছে ততই আমি অন্তরের সঙ্গে অনুভব করছি যে আমি নির্জ্জনচর জীব—আমার মন আমার চারি দিকে প্রচুর পরিমাণে আপনাকে ছড়িয়ে রাখবার জায়গা চায়—নিজেকে বস্তাজাৎ ক'রে শহরের পণ্যশালা বোঝাই করা আমার পক্ষে মৃত্যুবৎ। কেউ বা হাটে বিক্রি হবার তুলো, তাকে খুব কষে ঠেসে ধরলে কোনো ক্ষতি হয় না—কেউবা শিমুল ফুল, তার কোনো প্রয়োজন কোনো মূল্য না থাক্ কিন্তু বেঁচে থাকা তার নিতান্তই দরকার—সে দাম চায় না, সূর্য্যের আলো চায়—তাকে চারি দিকে চাপ দিলেই তার যেটুকু প্রাণ আছে তা আর টেঁকে না—অতএব আমাকে গাছেই থাকতে হবে বাজারে আসা আমার একবারেই চলবে না, এ-কথা আমি এখানে প্রতিদিন বার-বার ক'রে অনুভব করছি। মনে মনে ভাবি ভাগ্যে আমি ভারতবর্ষের এক কোণে জন্মগ্রহণ করেছিলুম—আবার যেন সেইখানকারই নদীতীরে মাঠের ধারে জন্মলাভ করি—মনটা যেন খোলা মন হয়—নইলে একে কোণের মধ্যে বাসা তার পর যদি আবার মনের মধ্যেও ফাঁকা না থাকে তা হ'লে সে তো জীবিত কবর। সে দৃশ্য আমাদের দেশে অনেক দেখেছি। অন্তরে বাহিরে সঙ্কীর্ণতার মতো এমন অভিশাপ জগতে আর কী আছে? এ দেশেও মনের সঙ্কীর্ণতার অভাব নেই কিন্তু বিশ্বজোড়া কর্ম্মক্ষেত্রের উদারতা প্রত্যেক মানুষকে অন্তত একটা দিকে মুক্তিদান

* ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার আদর্শ।
† অমঙ্গল সমস্যা।

করেছে—সেদিকে তার শক্তি আপনিই প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে যারা ছোট মন ছোট মত ছোট হৃদয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তারা কোনো একটা মহাপাপে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছে। কর্ণ যেমন তার কবচ নিয়েই জন্মেছে—লোকাচারের ঘানিতে অহর্নিশি কেবল একই কক্ষে চিরজীবন পাক খেয়ে মরছে, শাস্ত্রের ঠুলি চোখে প'রে মনে করছে এই তাদের সদ্গতির পথে যাত্রা। ভারতবর্ষে যারা বাস করবে তাদের আর কোনো সম্পত্তি যদি না থাকে তবে মনটা নিতান্তই থাকা চাই—তা যদি থাকে তবে এমন পুণ্যস্থান আর নেই। তাই আমাদের প্রত্যেকের উপরে ভারতবর্ষের এই দাবী যে ভারতবাসীর মনকে জাগাও—প্রাণবান সর্ব্বত্রগামী আনন্দময় মনকে বিশ্বের অভিমুখে পূর্ণ বিকশিত ক'রে তোলো—কারখানা-ঘরে তাদের মজুরী যদি না জোটে হাটবাজারে তাদের মূল্য যদি না মেলে বিশ্বে তাদের চেতনা যেন সঙ্কীর্ণ না হয়। ভাগ্য তাদের চারি দিকেই বঞ্চনা করেছে এই জন্যে যাতে তারা নিজের অন্তরতম সহজ সম্পদকে নিজের ভিতর থেকে উদ্ধার করতে পারে এজন্যে তাদের শিশুকাল থেকে উদ্যোগী করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয় যেন সেই শুভ-চেষ্টার স্থান হয় এই কথা তোমাদের বার-বার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ওখানকার ছোট বড় প্রত্যেক কাজই যেন জীবনের কাজ হয় এই আমার ইচ্ছা। কল সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে—আমাদের ছেলেগুলিকে পিণ্ড পাকিয়ে সেই কলরাক্ষসের নৈবেদ্যরূপে যেন সাজিয়ে না দিই—তাদের বাঁচিয়ে তোল, বাঁচিয়ে রাখ—বিশ্বজগতকে তারা যেন নিজের জীবন দিয়ে গ্রহণ করে—জলে স্থলে আকাশে এবং বৃহৎ লোকালয়ে তারা যেন নিজের প্রাণের আলিঙ্গন বিস্তীর্ণ ক'রে দিতে পারে, তাদের অনুভূতির প্রবাহ কোথাও থেকে যেন প্রতিহত হয়ে ফিরে না আসে। তাদের পুড়িয়ে গলিয়ে পিটিয়ে ইস্কুলের ছাঁচে চেলে যেন কলের পুতুল ক'রে তুলো না। সে রকম পুতুল-তৈরির কারখানা অসংখ্য আছে—আমাদের বিদ্যালয় তা নয় ব'লেই যেন আমরা গৌরব করতে পারি। সভ্য-জগতে আজ এই মস্ত একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক দিকে সজীব মানুষ অন্য দিকে সভ্যতার কল এই দুইয়ের মধ্যে কার জিত হবে? এই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব কিছুতেই মিট্‌ছে না। কিন্তু এ-কথা তো ভুললে চল্‌বে না যে মানুষই কলকে চালাবে, কল তো মানুষকে চালাবে না। অতএব মানুষের শিক্ষা যদি কলের শিক্ষা হয় তা হ'লে মনুষ্যত্বের গোড়ায় কোপ মারা হয়। এই বিপদের কথা লোকে বুঝতে পারছে কিন্তু কী করলে এর কিনারা হ'তে পারে তা কেউ ভেবে পাচ্ছে না। আমরা এর একটা কিনারা করতে পেরেছি এই কথা আমরা যেন গর্ব্ব ক'রে বল্‌তে পারি। আমরা ভূমার বক্ষের মধ্যে ছেলেদের মানুষ ক'রে তোলবার আয়োজন করেছি এই কথাটা যেন সর্ব্বতোভাবে সত্য হয়—আমাদের তপোবন থেকে কলকে খেদাও, ওখানে প্রাণকে আন।

আজ অপরাহ্নে এখানকার সভায় Race Conflict* সম্বন্ধে আমার একটা বক্তৃতা আছে। বক্তা বিস্তর, কুড়ি মিনিটের বেশী কারও অধিকার নেই—অতএব অত্যন্ত সংক্ষেপে বক্তব্য সেরেছি। এ রকম নমোনমো ক'রে কাজ সারার কোনো প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি নে। তাই এখানে আসব না ঠিক করেছিলুম। কেবলমাত্র অয়কেনের আহ্বানে আমাকে টেনে এনেছে। কাল সন্ধ্যার সময় অয়কেন একটি বক্তৃতা করেছিলেন তার বিষয় ছিল Necessity of Idealism†—তাঁর জর্ম্মান উচ্চারণের ইংরেজী আমি প্রায় কিছুই বুঝতে পারি নি। এখানকার কাজ সেরে বষ্টনে যাব। সেখানে তোমার বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা হবে। ইতি ৩০শে জানুয়ারি ১৯১৩।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

508, W. High Street.
Urbana, Illinois. U. S. A.

কল্যাণীয়েষু

এখানে "Poetry" ("কাব্য") ব'লে একটা ম্যাগাজিন বেরিয়েছে। তাতে এজরা পাউণ্ড নামক একজন ইংলণ্ড-প্রবাসী আমেরিকান কবি আমার সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন—সেটা তোমাদের দেখবার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ইংলণ্ডে অনেকের

* জাতিসংঘর্ষ।

† আইডিয়্যালিজ্‌মের প্রয়োজন।

মধ্যেই একটা ধারণা হয়েছে যে বাংলা দেশে ভারি একটা আশ্চর্য্য সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়েছে। এ-কথাটা ঠিক কি না-ঠিক আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত—যেমন নিকটের থেকে অনেক জিনিষকে চেনা যায় না তেমনি দূরের থেকেও অনেক জিনিষকে বড় ক'রে দেখা অসম্ভব নয়। আমাদের জীবন-প্রবাহ চারি দিক থেকে প্রতিহত হয়েছে ব'লেই হয়ত বাঙালীর চিত্ত সমগ্রভাবে সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যে খুব একটা বেগ অনুভব করছে—আমাদের মনের চারি দিকে অত্যন্ত বেশী ঘেঁষাঘেঁষি নেই বলেই, বিরলে আমাদের আসন পড়েছে বলেই হয়ত আমাদের মানস দৃষ্টি অব্যাহত হ'তে পারবে। তা ছাড়া দুঃখের যে পরম শক্তি আছে। আমরা সংসারে নানা প্রকারে বঞ্চিত—সেই জন্যেই আমাদের প্রকৃতি নিজের অন্তরতম সম্পদকে যেমন ক'রে পারে আবিষ্কার করবেই—নইলে সে যে মারা পড়বে। আমাদের কাছে কেবল একটি দুয়ার খোলা আছে, সেটা আমাদের ভিতরের দুয়ার অথচ সেইটেই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনভাণ্ডারের পথ। সেখানে সকলের নীচের সিঁড়িতে নামতে হয়, সেখানে মাথা হেঁট ক'রে প্রবেশ করতে হয়, সেখানে লোকের ঠেলাঠেলি নেই, কাড়াকাড়ি নেই—সেই দিকটাতেই জগতের বড় বড় ধনী লোকের দৃষ্টি পড়ল না—কিন্তু যে গরীব সে সেখানেই জিৎবে—যিশু বলেছেন, যে গরীব সেই ধন্য, কেন না পৃথিবীর অধিকার তারই। সেই আমাদের গরীবের ধনের দিক থেকে যাতে আমাদের দৃষ্টি না ফেরে সে চেষ্টায় যেন আমরা কোনো দিন ক্ষান্ত না হই। আমাদের হরির লুঠ ধুলোয় এসে ছড়িয়ে পড়ছে—সেই ধুলো থেকেই আমরা কুড়িয়ে নেব—আমরা ভাগ্যকে নিন্দা করব না, নিন্দা যদি করতে হয়তো নিজেকে—আমরা কুড়োতে পারছি নে, আমরা ধনীর আস্তাকুঁড়ের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছি—একবার মুখটা ফেরালেই দেখতে পাই আমাদের আছে—অভাব নেই, কারও সাধ্য নেই আমাদের বঞ্চিত করে—আমাদের ধুলোর সিংহাসন কেউ কাড়তে পারবে না—সেইটেই যে পৃথিবীর রাজসিংহাসন। ইতি ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

508, High Street.
Urbana, Illinois U. S. A.

সবিনয় নমস্কার নিবেদন

ইলিনয়ে এসে আমরা বাসা বেঁধে বসেছি। বাড়িটি বেশ ছোটখাট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিভৃত নিরালা। এখানে দাসী চাকর পাওয়া যায় না—যারা ঘরের কাজ ক'রে দেয় তাদের help (হেল্প্) বলে। তারা ভৃত্য নয়—অনেক ভদ্র গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা এই ক'রে খরচ চালিয়ে দেয়। এখানকার গৃহিণীদের অধিকাংশকেই রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়—রাঁধাবাড়া, ঘর সাফ করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা ইত্যাদি। যে শ্রেণীর লোকদের এই রকম খাটতে হয় আমাদের দেশের সে শ্রেণীর মেয়েরা তার সিকি পরিমাণ কাজও করে না। এদের আবার আরও অনেক উপসর্গ আছে। কেবলমাত্র ঘরকরনার কাজ ক'রে এলোমেলো হয়ে অন্তঃপুরে প্রচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটালে এদের চলে না। তার উপরে পড়া-শুনা, বক্তৃতা আদি শোনা এবং করা, অতিথি-অভ্যাগতদের আদর-অভ্যর্থনা করা, এবং সর্ব্বদাই সুপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা। আবার ছেলেমেয়েদের পড়ানোও অনেকটা পরিমাণে নিজেরাই করে। এখানকার অধ্যাপক সীমুরের বাড়িতে এক জনও চাকর নেই। তাঁরা স্বামী স্ত্রী মিলে ঘরের সমস্ত ছোটখাট কাজ আদ্যোপান্ত নিজের হাতে করেন—তার উপরে মিসেস সীমুর বৌমাকে প্রত্যহ ইংরেজী শেখাবার ভার নিয়েছেন। যাঁকে অমন অশ্রান্ত খাটতে হয় তিনি যে কী ক'রে আবার এ রকম অনাবশ্যক দায়িত্ব কেবল মাত্র রথীর প্রতি স্নেহবশত গ্রহণ করতে পারেন আমি তো বুঝতে পারি নে। আমাদের ছোটখাট ঘরকরনার ভার বৌমাকে নিতে হয়েছে—আমরাও আজ পর্য্যন্ত help (হেল্প্) জোটাতে পারি নি। তাঁকে রাঁধতে, ঘর ঝাঁট দিতে, বিছানা তৈরি করতে হয়—অবকাশ-মতো রথীকেও এ সব কাজে যোগ দিতে হচ্ছে। বঙ্কিম ও সোমেন্দ্র আমাদের সঙ্গে আছেন।

এতদিনে তোমাদের স্কুল খুলেছে। সুরুলের বাড়ি কি কোনো কাজে লাগাতে পেরেছ? যে-সকল অধ্যাপক নূতন

নিযুক্ত হয়েছেন আমাদের আশ্রমের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের যোগসাধন হয়েছে ?

*Literary Digest** কতকগুলি পাঠাচ্ছি এবং ক্রমে পাঠাব—এর থেকে ছেলেদের দিয়ে তত্ত্ববোধিনীর সংকলন লেখাবার চেষ্টা ক'রো। এতে লেখাবার মতো অনেক জিনিষ আছে। কিছু কিছু তোমার কাজেও লাগতে পারে। ইতি ২৩ কার্ত্তিক ১৩১৯।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

508, High Street
Urbana,
Illinois. U. S. A.

কল্যাণীয়েষু

অজিত, আমার এ চিঠি যখন পাবে তখন তোমাদের বিদ্যালয় আবার খুলেছে—ছাত্রদের কলস্বরে তোমাদের শালবন আম্রবন আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে—আমলকির শাখা ফল-গুচ্ছে ভরে উঠছে, সকালবেলায় শিউলি গাছের তলা ফুলে ফুলে ছেয়ে যাচ্ছে, এবং উত্তুরে হাওয়ার তীব্র আঘাতে গাছে পাতাগুলো পাণ্ডুবর্ণ হয়ে থর থর ক'রে কাঁপছে। আমি যেখানে আছি এখানকার আকাশের চেহারা কতকটা বাংলা দেশেরই মতো—তেমনি আলো, তেমনি নির্ম্মল নীলিমা—এখানকার রাস্তায় লোকের কোলাহল নেই, কাজকর্ম্মের ভিড় অল্প, চারি দিক স্তব্ধ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিরোধ দৃষ্টিগোচর নয়। সেই জন্যে এখানে এসে খুব একটা শান্তি উপভোগ করছি। অনেক দিন পরে ক্ষুদ্র নিজের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে আবার যেন হৃদয়ের মধ্যে, ভূমার স্পর্শ উপলব্ধি করছি। যে জীবন সমস্ত বিশ্বের জীবন, যে জীবন জন্মমৃত্যুর অতীত, আনন্দ যার অন্ন, আনন্দ বিতরণ করাই যার কর্ম্ম, সেই জীবনের দ্বার খোলা পাবার জন্যে আমার মন আপনার প্রার্থনা নিবেদন করছে। নিজের সমস্ত অহমিকা তার কাছে কী মলিন, কী তুচ্ছ মনে হচ্ছে তা ব'লে শেষ করতে পারি নে। এই অহমিকা অহরহ নিজের চারি দিকে সরু মোটা নানা বস্তুর যে জাল কেবলই বিস্তার ক'রে নিজেকে আপাদমস্তক জড়িয়ে ফেলছে তার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে কিছুতে ভাল লাগছে না—"তিমির দুয়ার খোলো"—কোনো আচ্ছাদন আর সহ্য হয় না—সমস্ত সুখ-দুঃখ খ্যাতিনিন্দার খাঁচা ভেঙে ফেলে একবার কোনো রকমে আড়ষ্ট পাখা উধাও মেলে দিয়ে অমৃত আলোকে উড়তে পারলে হয়! গুটিপোকার বাইরের গুটির চেয়ে তার ভিতরের ছোট প্রাণীটি আসলে মহত্তর, কিন্তু তবু গুটি তাকে তার মুক্তির ক্ষেত্র থেকে আবৃত ক'রে রাখে—তেমনি স্পষ্ট অনুভব করি আমাদের অহংয়ের খোলসের চেয়ে ঢের বড় জিনিষ আমাদের ভিতরে রয়েছে, সে প্রাণবান এবং খোলসের ভিতরটাই তার চিরবাসস্থান নয়—আমার মধ্যে এমন আমি আছে, যে আমার চেয়ে ঢের বড়—আমার মধ্যে তাকে কুলবে কী ক'রে? একটু যখনই অবকাশ পাই তখনই তার পাখার ঝাপট শুনতে পাওয়া যায়—এখানে একটু নিরালা হয়েছে বলেই সেই আমার গোপন কামরা থেকে আওয়াজ আমার কানে পৌঁচচ্ছে।—আনন্দ-সঙ্গীতকে সম্পূর্ণ মুক্তিদান করবার পূর্ব্বে বেহালায় যখন সুর বাঁধতে হয় তখন তারের থেকে আর্ত্তধ্বনিই শোনা যায়—সেই ধ্বনিই ক্রমশ খাঁটি হয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে সঙ্গীতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই আনন্দসঙ্গীতকে বাধামুক্ত করবার গোড়ায় সুর-বেসুরের দ্বন্দ্ব যখন চলে তখন সে সুর কান্নার সুর অথচ সেইটেই সঙ্গীতের ভূমিকা। এই তারের মধ্যেই সেই সঙ্গীতের আহ্বান—আর কোথাও না—এই তারই আজ তাকে যেমন বেঁধে মারছে, এই তারই তাকে তেমনই মুক্তি দান করবে। ইতি ২৩শে কার্ত্তিক ১৩১৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* "লিটরেরি ডাইজেষ্ট"—আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ সংগ্রহ-সাপ্তাহিকপত্র।

"চণ্ডীদাস-চরিত"

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

১। ভূমিকা।

জয়ানন্দ-মিশ্র চৈতন্য-দেবের চেয়ে বিশ বৎসরের ছোট ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের চরিত লিখেছিলেন, গ্রন্থের নাম "চৈতন্যমঙ্গল"। তাতে আছে,

> জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
> শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥

এই তিন কবি কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গীত রচে'ছিলেন। চৈতন্য-দেব এঁদের রচিত গীত শুনতেন। ইনি এবং এঁর অনুবর্তী বৈষ্ণবেরা উক্ত তিন কবি-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ-লীলায় আধ্যাত্মিক সত্য অনুভব ক'রতেন। অপরে এত তত্ত্ব বুঝত না। তারা মানব-চরিত্র মনে ক'রত, আদিরসের গীতে মুগ্ধ হ'ত। আমাদের স্বভাব, আমরা আমাদের প্রিয় কবির কেবল নাম শুনে ও কাব্য পড়ে' তৃপ্ত হই না। তাঁর সঙ্গে মিশতে চাই, দুটা কথা কইতে চাই, দেখতে চাই, মানুষটি কেমন। উক্ত তিন কবিরও ভক্তগণ হয়ে থাকবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা কিছুই লিখে রাখে নি। কবিরাও আত্মচরিত লেখেন নাই। পরবর্তী কালের ভক্তেরা কবিদের কাব্য পড়ে' চরিত চিত্রিত ক'রলেন। হয়ত শ্রুতি-পরম্পরা ছিল। এঁদের কর্ম কঠিন হ'ল না। তিন কবিই আদিরসের উৎস খুলে গেছেন। ভক্তেরা দেখলে, এ ত বিনিয়ে বিনিয়ে বাছা বাছা শব্দ গেঁথে রচা পদ নয়, ঝুটা নয় সাচ্চা প্রেম-রস। নিশ্চয় অনুভূত রস। সখী কে?

চণ্ডীদাসের কথা বলি। "চণ্ডীদাসের পদাবলী"র চণ্ডীদাসের কথা নয়। তিনি এক জন কি দশ জন, কিছুই জানা নাই। তাঁদের নামধাম জানা নাই। চৈতন্য-দেবের পরে তাঁদের জন্ম হয়েছে। চণ্ডীদাস ব'ললে আদি চণ্ডীদাস বুঝায়। তিনি কে, তিনি কি পদ বেঁধেছিলেন, বিশ বৎসর পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। তাঁর পদের পুথী হঠাৎ পাওয়া গেছে। একটা মস্ত ভুলও হয়ে গেছে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা "কৃষ্ণকীর্তন" নাম হয়ে গেছে। সাহিত্য-পরিষৎ ছাপিয়েছেন। এঁর পদ হ'তে জানতে পারছি, ইনি এক রাজার প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত বাসলী দেবীর বড়ু ছিলেন। সংস্কৃত বটু শব্দ হ'তে বড়ু হয়েছে। বটু শব্দের দুইটা অর্থ আছে, (১) দ্বিজ-বালক বা যুবক, (২) ব্রহ্মচারী। বাসলী দেবীর বড়ু, দেবীর পূজার ও ভোগের যোগাড় ক'রতেন। হয়ত ভোগ রাঁধতেন। বাঁকুড়া শহর হ'তে চারি ক্রোশ পশ্চিম-উত্তরে ছাতনা নামে এক গ্রাম আছে। এককালে সেটা এক ছোট জাঙ্গল রাজ্যের রাজধানী ছিল। সে রাজ্যের নাম সামন্ত-ভূম। সেখানে বাসলীর প্রতিমা আছে, তাঁর নিত্য পূজা হ'চ্ছে। ছাতনার লোক বলে, চণ্ডীদাস এই বাসলীর বড়ু ছিলেন। সে যেন হ'ল। কিন্তু বড়ু পূজার যোগাড় করে' দিয়ে বাকি সময় কি ক'রতেন? ব্রহ্মচারী, বিবাহ হয় নি; তবু এত রস কি করে' এল? ছাতনার লোক বলে, রামী নামে এক রজক-কন্যা ধোবা-পুকুরে কাপড় কাচত, বড়ু ছিপ দিয়ে মাছ ধ'রবার ছলে ঘাটে যেয়ে ব'সতেন। ছাতনায় ধোবা-পুকুর আছে, রামীর কাপড়-কাচা পাথরের পাটটিও আছে।* এই বাসলীর নিত্য ভোগে মাছ চাই-ই চাই। কেহ বলে, চণ্ডীদাস রামীকে প্রকৃতি করে' সিদ্ধিলাভ করে'ছিলেন। রামীও তাঁর অনুগামী হয়েছিল। কিন্তু গাঁয়ের ব্রাহ্মণসজ্জনেরা এই সাধনমার্গ বুঝত না, চণ্ডীদাসকে পতিত ও উৎপীড়িত করে'ছিল। ইত্যাদি। ১৩৩৩ সালের বৈশাখ ও ফাল্গুন মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর সাহানা ছাতনায় প্রচলিত উপাখ্যান দিয়েছেন। ঐ সালের চৈত্রের "প্রবাসী"তে অন্যান্য অনেক বৃত্তান্ত দেওয়া গেছে। এই রকম উপাখ্যান আরও আছে। গীতের মধ্যে উপক্ষেপ আছে। পুরানা কাগজে পুরানা ভাষায় দুই এক পাতা লেখাও পাওয়া গেছে।

* আশ্চর্যের বিষয়, বীরভূমের নান্নুর গ্রামেও ধোবা-পুকুর আছে। রামীর জাতি-বংশ আছে।

কয়েক বৎসর হ'ল, "চণ্ডীদাস" নামে এক নাটক লেখা হয়েছে, কলিকাতায় থিয়েটারে অভিনয় হ'ত। পরে "টকি সিনেমা"তে ছায়াচিত্রে ও কলের কথায় অভিনয় হ'ত। হাজার হাজার লোক দেখতে ও শুনতে ছুটত। আমি নাটক পড়ি নি, সিনেমাও দেখি নি। কিন্তু শুনেছি, ভারি করুণ রস। সে নাটকে চণ্ডীদাস ও রামী সিদ্ধ ও সিদ্ধা। কিন্তু কেহ ভাবেন নি, দুই শত বৎসর পূর্বেও চণ্ডীদাস-চরিত লেখা হয়েছিল। তাতেও চণ্ডীদাস সিদ্ধ পুরুষ, রামী উত্তর-সাধিকা।

২। "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথী।

ছাতনার দুই ক্রোশ দক্ষিণে কেঞ্জেকুড়া নামে গ্রাম আছে। এই গ্রামের শ্রীযুত রামানুজ-কর বাঁকুড়ার বৃত্তান্ত-সংগ্রহে সর্বদা উৎসাহী। তিনি এই পুথীর সন্ধান পান। সাত-আট মাস হ'ল আমাকে পুথী এনে দিয়েছেন। কেঞ্জাকুড়ার এক ক্রোশ দক্ষিণে, এবং বাঁকুড়ার পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে লক্ষীশোল নামে এক গ্রাম আছে; সে গ্রামের শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ-সেনের বাড়ীতে পুথী ছিল। বর্তমানে এঁর বয়স পঞ্চান্ন বৎসর। এঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণপ্রসাদ-সেন এই পুথী লিখেছিলেন। কিন্তু দেশের এমনি দুর্ভাগ্য, পুথী খানি বৈদ্যবংশের হ'লেও আর এক গ্রামে গিরি-বাকতীর (বাগ্‌দী) ঘরে অন্যান্য পুথীর সঙ্গে এক সিন্দুকে পড়ে' ছিল। ধুঁআ লেগে সাদা কাগজ ও বার্ণিশ-করা পাটা কাল হয়ে গেছে। ঘর পুড়ে ছাই হয় নি, এই ভাগ্য। আমি পুথীর ১১ ও ১২এর পাতা বাদ প্রথম চুআল্লিশ পাতা পেয়েছিলাম। একটু পড়ে' বুঝলাম, আরও অনেক পাতা ছিল। শ্রীযুত রামানুজ-করের অধ্যবসায়ে এগার পাতা পেলাম। আবার অপেক্ষা ক'রলাম, বহু কষ্টে আরও পাতা পেলাম। এই রূপে দুখানা পাতা বাদে পুথীর প্রথম হ'তে ৮০ পাতা পর্যন্ত পেয়েছি। বোধ হয় আরও বিশ পাতা ছিল। শ্রীযুত রামানুজ নিশ্চেষ্ট হন নি। তাঁর যত্নে চণ্ডীদাস-ভক্তেরা এক অবিচ্ছিন্ন অপূর্ব কাহিনী পেলেন। শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ-সেন পুথীখানি দেখতে দিয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার ক'রলেন।

পুথীর প্রথম পাতার বাঁ পাশে লেখা আছে,

বাসুলী ও চণ্ডিদাস উদঅ সেনের চণ্ডিচরিত হইতে বিবিদ ছন্দে লিখিতং।

পুথীর মধ্যে এক স্থানে (পত্রাঙ্ক ৪৯, খ) লেখা আছে,

> সৎবৈদ্য উদঅ সেন নিলকণ্ঠ সুত।
> পরপিতামহপদে হইএে প্রণত।
> আশ্রঅ করিএা তার চণ্ডির চরিত
> রচিলা পআর ছন্দে কৃষ্ণ গাঁতাইত।

অতএব উদয়-সেন, কবি কৃষ্ণ-সেনের প্রপিতামহ। কৃষ্ণ-সেন এক শত বৎসর পূর্বে ছিলেন, মূল কবি উদয়-সেন আরও এক শত বৎসর পূর্বে চণ্ডী-চরিত লিখেছিলেন। উদয়-সেন সংস্কৃত শ্লোকে লিখেছিলেন, নিজে টীকাও করে'ছিলেন। হয়ত সে টীকা বাংলা। কৃষ্ণ-সেন এক স্থানে (পত্রাঙ্ক ৩০, খ) লিখেছেন,

এই স্থানে দুই শ্লোক পকা কাটা [পোকা-কাটা] হওাঅ পড়া জাঅ নাই। জাহা পড়া জাঅ তাহাতে অর্থবোধ না হইবাঅ ত্যাগ করিলাম।

অন্য স্থানে (পত্রাঙ্ক ৩২, খ) লিখেছেন,

উদঅ সেনের চণ্ডিচরিতের টিকাঅ এখানে লেখা আছে জে কালীসাধন করিএা জে সব সক্তি সঞ্চিত হঅ তাহা নিস্ফল জানিবাতে ও কেবল কৃষ্ণ অর্থ্যাত ব্রহ্মউপাসনা বড়ই দুকঠিন জানিবাঅ চণ্ডিদাস সকলি মায় পদে বিসর্জ্জন দিআ আত্মদান মতে তাঁহার নিকট রাধাকৃষ্ণমন্ত্রে দিক্ষিত হইলেন:

এই সংস্কৃত মূলের অনুসন্ধান চ'লছে।

এই দুই লিখন হ'তে অনুমান হয়, কৃষ্ণ-সেন সংস্কৃত চণ্ডী-চরিত বাঙ্গালা ছন্দে অনুবাদ করে'ছেন। এমন কি, "বাসুলী ও চণ্ডিদাস" এই নামও অনুবাদ। "চণ্ডীচরিত," চণ্ডীর বাসলীর, ও চণ্ডীর চণ্ডীদাসের চরিত। বাস্তবিক পুথীর বিষয়ও এই। কৃষ্ণ-সেন স্থানে স্থানে নিজের রচিত গীত দিয়াছেন, নূতন কিছু কিছু জুড়ে কবিত্ব করে'ছেন, কিন্তু বোধ হয় সংস্কৃত মূল হ'তে ঘটনার বৈলক্ষণ্য করেন নি। তিনি নানা ছন্দে পদ্য লিখেছেন, কোথাও কোথাও চমৎকার কবিত্বও দেখিয়েছেন। পুথী নানা বিষয়ে মূল্যবান, পরে প্রকাশ পাবে।

কৃষ্ণ-সেন ছাতনার রাজার গাঁতাইত ছিলেন। তাঁর রাজার নাম বলরাম দেও। (পত্রাঙ্ক ৭৭)। এঁর মনে প্রেম-রাগ জাগাতে কৃষ্ণ গাঁতাইত এই পুথী লিখেছিলেন। এই পদবী ওড়িয়ায় গন্তাইত। 'গন্তা', সংস্কৃত 'গ্রন্থ', কোশ। ওড়িষ্যার প্রত্যেক রাজার গন্তাইত আছেন, তিনি ভাণ্ডার-

অধিকারী। রাজ-ভাণ্ডার, গন্তা-ঘর। কৃষ্ণ-সেন গন্তাইত ছিলেন। আমি এত পুরু মসৃণ দেশী কাগজের পুথী আর দেখি নাই। পাতার দুই পিঠে ১২ ইঞ্চ × ৩।০ ইঞ্চ স্থানে লেখা। প্রতিপিঠে পনর-ষোল পংক্তিতে ২৪টা পয়ার শ্লোক। পয়ার ব্যতীত অন্য ছন্দ আছে।

চণ্ডীদাস-চরিতের পাতা

অক্ষর গোটা গোটা, ছাঁদ পুরানা। কিন্তু বর্ণাশুদ্ধির অন্ত নাই। বোধ হয় কবি নিজে লিপি করেন নাই। রাজার কোন মুন্সী (কেরাণী) লিখেছেন। মুন্সীদের লেখার ছাঁদ পুরানা হ'ত। দেখছি, লিপিকর ধ্বনিসম্বাদী বানান করে'ছেন। যুক্ত ব্যঞ্জন বিশেষে রেফ দিয়ে 'শুর্দ্ধ' করে'ছেন। ঐ ঔ য য় শ ষ নাই। য সর্বত্র জ, য় সর্বত্র অ, শ ষ সর্বত্র স। কিন্তু সু সর্বত্র যু। দুই এক স্থানে বা-স-লী আছে, কিন্তু বা-যু-লী সাধারণ। বুঝবার সুবিধার তরে আমি আবশ্যক স্থানে বানান শুদ্ধ ক'রলাম। আমি পুথীর নাম সংক্ষেপে চণ্ডীদাস-চরিত রাখলাম।

এই চরিত নানা ঘটনার বৈচিত্র্যে, অলৌকিক কর্মে, ভক্তি প্রেম শান্ত বিস্ময় প্রভৃতি রসের সমাবেশে এক অপূর্ব রোমাঞ্চ কাহিনী হয়েছে। কত জ্ঞানমার্গের যুক্তি, দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার, সকল ধর্মে সমদর্শিতা, পূর্বকালের সামাজিক শাসন, হিন্দুর প্রতি নবাবের মোল্লার উৎপীড়ন ইত্যাদির প্রসঙ্গে ও সমাধানে উদয়-সেন ও কৃষ্ণ-সেনের শাস্ত্রজ্ঞান ও উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। এ হেন গ্রন্থ সংক্ষেপ করা কঠিন। আমি বাদানুবাদ, যুক্তিতর্ক ত্যাগ করে' যথাসম্ভব পুথীর ভাষায় উপাখ্যানটি দিচ্ছি। পুথীর আরম্ভ এই :—

ওঁ সিবায় নমঃ।

বাযুলী বিস্তজননী। কালভয় নিবারিনি।
হামির উত্তর ভূপে। বাহ্মণের কন্যা রূপে।
অকস্মাত নিসিসেশে। দেখা দিলা সপ্নাবেসে।
বলেন রে নরপতি। আমি হয় হৈমবতী।
বারানসি পরিহরি। ভৈরবের সঙ্গে করি।
যুভদিন যুভখনে। এসেছী বর্হ্মস্তধামে।

৩। উপাখ্যান।

(১) ছত্রিনায়

এক দিন নিশিশেষে হৈমবতী ব্রাহ্মণ-কন্যা-রূপে রাজা হামীর-উত্তরকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। ব'ললেন, আমি বারাণসী হ'তে ভৈরবের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্যধামে এসেছি। শিলারূপ ধরে' বণিকের বলদের পিঠে ব্যাপারীর মাঠে আছি।

বণিক সে তত্ত্ব জানে না। তুমি ত্বরা বণিকের কাছে যাও, শিলাটি লও। আমি তোমার কুলদেবী হব, তুমি আমার নিত্য পূজা ক'রবে। আমার নাম বাসলী। আমার মন্দির বিরচন কর, রাজপুরে স্থাপন কর।[১]

নিদ্রাভঙ্গে নরপতি করপুটে স্তুতি করে' ব্যাপারীর মাঠে বণিকের নিকট হ'তে শিলাখান শিরে ধরে' নিজ পুরীতে নিয়ে এলেন। গঙ্গোদকে ধুলেন। নগরমধ্যে কোলাহল পড়ে' গেল, বিবিধ বাদ্য বাজতে লাগল। পরদিন শিলা-খণ্ডকে দুধে ধুয়ে এক কর্মকার মূর্তি বার ক'রলেন। দেবী রাত্রে রাজাকে পূজার পদ্ধতি বলে' দিলেন। 'আমি যেদিন এসেছি, সেদিন চৈত্র শুক্ল-সপ্তমী। বর্ষে বর্ষে সেদিন মহোৎসব ক'রবে। প্রত্যহ আট সের তণ্ডুলের ও মৎস্য কলাই (বীরির ডাল) ও দুধ ভোগ দিবে। নানা দেশ হ'তে যারা উৎসবে আসবে, তারা মুড়ি ও মিষ্টান্নের ভোগ দিবে। যে যা কামনা ক'রবে, তা সফল হবে। এখন কৌলিক পূজারী স্থির কর। নরপতি, তোমার মনে পড়ে কি, দেবীদাস ও চণ্ডীদাস ব্রহ্মণপুরে থাকত, তারা এখন তীর্থে বেড়াচ্ছে, কাল এখানে পৌছিবে। তুমি তাদিকে আমার পূজাকর্মে নিযুক্ত কর।' রাজা শুনে অবাক্।

একি কথা বল তারা তারা যে মা জাতিহারা
কেমনে করিবে তব পূজা।
রামী নামে রজকিনি চণ্ডির সর্ব্বস্ব তিনি
মন দুখে কহিলেন রাজা।
যথা চণ্ডি তথা রামা সচক্ষে দেখেছি আমি
শুন মাতা মুসুআর মাঠে[২]।
একত্রে সে একাসনে ছিল প্রেম-আলাপনে
মোরে দেখি পলাইল ছুটে।
দেখিতাম কভু যেঞে রজকিনি নিত্যালএ[৩]
সেবিছে চণ্ডির পদদ্বএ।
কভু দেখিতাম তথা আছে রামী নিদ্রাগতা
চণ্ডিবকে পদ ছড়াইএ।

* * *

একদিন চণ্ডিদাস লইঞে বড়সি।
মচ্ছ ধরিতেছিলা ধবাঘাটে[৪] বসি।
হেনকালে আইলা তথা রামী রজকিনী:
চণ্ডিদাস পানে চাঞি কহে মৃদু বানি।
ঘাটে বসি ধর মচ্ছ একি তব কাজ।
মেঞাছেলা আসে জায় নাঞি তব লাজ।
কলসি লইঞা কাখে দাঁড়াতে যে নারি।
কোথায় লইব জল বল ত্বরা করি।
চণ্ডি কহে এই ঘাটে নাম জদি জলে।
চারের জতেক মাছ পলাবে তাহলে।
ব্রাহ্মন বলিজা মোরে এই কর দয়া।
দক্ষিনের ঘাটে তুমি জল লহ গিঞা।
পাগল আমি যে রাই[৫] লাজ কোথায় পাব।
না নামিহ এই ঘাটে কিছু মচ্ছ দিব।
হাসি কহে রাইমনি মচ্ছ নাঞি খাই।
দাও জদি বলি তবে আমি জেবা চাঞি।

এইরূপ কথাবার্তা ও রামীর শপথের পর চণ্ডীদাস সম্মত হ'লেন।

এত কহি প্রেমমন্ত্র জপিতে জপিতে।
ধিরে ধিরে চলে চণ্ডি রামীর পশ্চাতে।
পাগল হইল হায় দ্বিজ চণ্ডিদাস।
জেই দেখে সেই বলে করি উপহাস।

রাজা॥ আর এক আশ্চর্য কথা বলি। রামীর কনিষ্ঠা ভগ্নী রোহিণীর সহিত ব্রাহ্মণ-সমাজপতি বিজয়-নারায়ণের পুত্র দয়ানন্দের বিবাহ হয়েছে। চণ্ডীদাস পুরুত ছিল। চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণের কি সর্বনাশই করে'ছে! মুসুআ গ্রামের নাম শুনলে বিদেশী পথ ভেঙ্গে চলে' যায়, কুটুম্বেরা সে গ্রামে অন্ন-জল খায় না। বিজয়নারায়ণ মনোদুখে বহুতর ব্রাহ্মণ সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এল। আমি দেখলাম,

রামী চণ্ডিদাস আর মুসুর আখ্যান।
জতদিন এ জগতে রবে বিদ্যমান।
ঘুচিবে না এ কলঙ্ক কহিলাম সার।

তাই বলি রামীকে গ্রাম হ'তে দূর করে' দাও, গ্রামের নাম যুবরাজপুর[৬] রাখ, চণ্ডীদাস প্রায়শ্চিত্ত করে' সম্প্রতি

---

১) তখন ছাতনার নাম ব্রহ্মণপুর ছিল। ব্রহ্মণপুরের বর্তমান নাম বামুনকুলী। দেবী বার্মণা হ'তে এসেছিলেন, কিন্তু শিলা কোথা হ'তে এসেছিল, ব্যাপারীরা কোন্ দেশী, তার উল্লেখ নাই।

২) মুসুআর মাঠ। পরে আছে, মুসুর গ্রাম, অন্য নাম নাম্মুর।

৩) নিত্যালয়ে, নিত্যা দেবীর আলয়ে। নিত্যা, শিব-বনিতা মনসা। ছাতনা অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে মনসা-দেবীর মেলা আছে। মনসা-পূজার এমন ঘটা আর কোথাও নাই। মেলা, একদিক-খোলা ঘর।

৪) ধবা-ঘাট, যে ঘাটে ধোবা কাপড় কাচত, ধোবা পুকুরের এক ঘাট। ছাতনার বাসলী দেবীর আদি 'থানে'র দক্ষিণ দিয়ে সড়ক গেছে। ধোব-পুকুর সড়কের দক্ষিণে।

৫) রামীর এক নাম রাসমণি ছিল! কোথাও তার নাম রাইমনি আছে। রামিণী, এই নামও আছে।

৬) নয় বৎসর পূর্বে আমরা ছাতনায় 'যুবর হাট' এই নাম পেয়েছিলাম। যুবরাজপুরের বর্তমান নাম যুবরাজপুর! গ্রাম ছোট, ব্রাহ্মণবহুল। ছাতনার রাজার বাড়ীর উত্তর গায়ে। ছত্রিনা হ'তে ছাতনা নাম। ছাতনা নামে কোন গ্রাম নাই। রাজ্যের নাম ছত্রিনা ছিল। সে হ'তে রাজধানীর নাম ছাতনা।

উঠুক। আমি এই দণ্ডে রাজ্যমধ্যে প্রচার ক'রব, কেহ মুহুর নাম ক'রবে না। আজি হ'তে রাজ্যের নাম ছত্রিনা রাখলাম। তারা রামীকে জোর করে' কাশী পাঠিয়ে দিলে। সকলে অহর্নিশি চণ্ডীকে বুঝাতে লাগল। কিন্তু

চোয়া না শুনএ কভু ধরমকাহিনী।
তবু কাঁদে চণ্ডিদাস বলি রামী রামী।
বহুমতে চণ্ডি তবে হইলা সুধীর।
তারপর প্রায়শ্চিত্ত দিন হইলা স্থির॥

মা গো, আরও শুন। আমি গুপ্তচর পাঠিয়ে জেনেছি। রামী বারাণসী যেয়ে চন্দ্রচূড় নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘরে রইল। তিনি রামীকে মা এবং রামী তাঁকে বাবা বলে। রামী রাঁধে, ব্রাহ্মণ খান। তার ভক্তি দেখে চন্দ্রচূড় তাঁর নিজের গুপ্তধন হাঁড়ী হাঁড়ী দেখিয়ে ব'ললেন, আমার মরণান্তে এই ধন তোর হবে। আমার এক ভগিনী ছিল, ব্রহ্মণ্যপুরে তার বিভা হয়েছিল। বেঁচে আছে কি নাই, জানি না। জামাইর নাম বিজয়নারায়ণ। এই ধন তোর হ'ল, তোর যা ইচ্ছা তুই ক'রবি। পরে চন্দ্রচূড় শুনলেন, রামী রজক-কন্যা। তিনি কেঁপে উঠলেন। 'তুই ব্রাহ্মণের জাতি নাশ ক'রলি?' রামী বলে, "সবে কয় গঙ্গাজলে না চলে বিচার।" 'যদি তোর এত বিশ্বাস থাকে, দেখি বিশ্বেশ্বরের পূজা কর।'

পরদিন রাই স্বর্ণঘট লয়ে পঞ্চগঙ্গাঘাটে নাইতে গেল। উঠতে যাচ্ছে দেখতে পেলে স্রোতে এক অপূর্ব পুষ্প ভেসে আসছে। সে পুষ্পটি ধরে' চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের পূজা ক'রতে গেল। পাণ্ডারা ঢুকতে দেবে না, পূজার অধিকারী তারা। কলহ হ'ল। এক সুচতুর পাণ্ডা রামীর সাহস দেখে তার পরিচয় জিজ্ঞাসলে।

রামী কহে আমি ছাড়া আর কিছু নই।
সত্য প্রাণ আমার না জানি সত্য বই॥
ব্রহ্মণ্যপুরেতে বাস জাতিতে রজক।
সনাতন নাম ধরে আমার জনক॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া ধরে নাম গুণময়ী মাতা।
চণ্ডিদাস হয় মোর আরাধ্য দেবতা॥

তখন পাণ্ডা হেসে ব'ললে, 'তা না হ'লে এত শক্তি তোর কি সম্ভবে? সনাতন—বিশ্বপতি জগতের মলা ধুয়ে থাকেন, রজকের কাজ এতে সন্দেহ নাই। তার বনিতা লক্ষ্মী, এও ত মিথ্যা নয়। কিন্তু চণ্ডীদাস কে?' রামী ব'ললে, পশ্চাতে ব'লব।

এত কহি পুরি মধ্যে পশিলা সত্বর।
দেখিলা শঙ্কর আছে পাতি দুই কর॥
বহিছে জটায় তার তরল তরঙ্গা।
ডমরুর সহ ভূমে পড়ি আছে সিঙ্গা॥
বাঘাম্বরে আঁটা কটি গলে হাড়মাল।
ধরণী চুম্বিয়া শিরে দুলে জটাজাল॥
সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ফণি ফঁস ফস করে।
অবাক হইয়া সবে থাকে জোড় করে॥
দুই করে রাসমণি ধরি ফুলডালা।
প্রেম গদ গদ স্বরে কহিতে লাগিলা॥

আসিয়াছি আমি রজকিনী রামী
পূজিতে চরণ তব।
হয়ে অনুকূল পদে ধর ফুল
নিজগুণে দেব দেব॥
তোঁহা বিনু আর কে আছে আমার
কর পার ভবসিন্ধু।
চরণে শরণ লইনু এখন
হে দীনজনার বন্ধু॥

এত কয়ে যেমন সে শঙ্করের চরণে ফুল দিতে গেল,

হাঁ হাঁ করি ভোলানাথ ধরি দুই করে।
কহিতে লাগিলা ভাসি প্রেমানন্দ নারে॥
এই ফুলে শুন রাই তীর্থরাজে বসি।
পূজিলা প্রভুর পদ অনেক সন্ন্যাসী॥
প্রভুর প্রসাদী ফুল দাও মোর করে।
তোর গুণে ধন্য হই ধরি শিরোপরে॥
যাহ তুমি রাসমণি লয়ে চণ্ডীদাসে।
প্রভুর সে গুণগান কর গিয়া দেশে॥
বিলাও সকলে দোঁহে রাধাকৃষ্ণ নাম।
আমার আদেশে পূর্ণ হবে মনস্কাম॥

এখানে দয়ানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করে' শুদ্ধ হ'ল, রোহিণী গুমরি গুমরি কাঁদে। চণ্ডীদাসও প্রায়শ্চিত্ত ক'রলে। ব্রাহ্মণ-সকলে পাতা পেতে ভোজনে ব'সলেন, পরিচারকেরা পাতে অন্ন দিতে লাগল, চণ্ডী অন্নথালা বয়ে দেয়।

পুনঃ বাহিরিল চণ্ডি অন্নথালা হাতে।
কোথা হতে আসি রামী কহিলা সাক্ষাতে॥
চণ্ডি চণ্ডি চণ্ডিদাস পুরুষ রতন।
প্রায়শ্চিত্ত কর তুমি একি বিড়ম্বন॥
জেতে জাত দিলে তুমি আমি যাব কোথা॥
কোন দিন চণ্ডি তুমি ভেবেছ সে কথা।
রমণীর জাতি গেলে জাতি নাহি পায়।
ভাসাইলি শেষে চণ্ডি অকূলে আমায়॥
আয় আয় করি তবে শেষ সম্ভাষণ।
বলি রামী চণ্ডিদাসে দিলা আলিঙ্গন॥
চণ্ডির দুহাতে ধরা ছিল অন্নথালা।
বার করি ভিন্ন হাত তারে আলিঙ্গিলা॥

নির্লজ্জ পামর চণ্ডী ব্রাহ্মণের জাতিকুল সব নষ্ট ক'রলে। দেবীদাস ব'ললে, তোরা চণ্ডীদাসকে চিনতে পারলি নি। একদিন এই অন্ন তোদিকে খেতে হবে। সে মাটির গর্তে পুতে রাখলে।

সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মণেরা সমাজ ক'রলেন। চণ্ডীর জীবনদণ্ড আর রামীর নির্বাসন আজ্ঞা হ'ল। পর দিন শোনা গেল সেই রাত্রেই দেবীদাস ও চণ্ডীদাস তাদের বৃদ্ধা মা বিন্ধ্যাকে নিয়ে কোথায় পালিয়েছে।

সেদিন রাত্রে লোকে ঘুমিয়েছে, কোথাও কিছু নাই, ঘুবরাজপুরে অকস্মাৎ আগুন লাগল। দেবীদাসের আর সনাতনের ঘর বাদে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কারও ঘরে কিছু নাই, আমি মাসাবধি আহার দিলাম, ভ*াড়ার ফুরিয়ে গেল, আমি ব্যাকুল। হেনকালে রাসমণি কোথা হ'তে এল, সকলকে টাকা দিলে। রামী রোহিণীকে অনেক ধনরত্ন দিলে, ব'ললে সে ব্রাহ্মণ-কন্যা। বিজয়-নারায়ণও এসেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মুখে শুনে-ছিলেন, রোহিণী দ্বিজকন্যা।

> চমকিআ উঠে বালা এই কথা শুনে।
> একদৃষ্টে চাহি থাকে তার মুখ পানে।

রামী বৃত্তান্ত ব'ললে। ভবানী ঝার্য্যাত[১] ব্রহ্মণ্যপুরে রাজা হয়েছিলেন। দুরন্ত সামন্তেরা এই নূতন রাজার আদেশ মানত না। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে দেশ হ'তে তাদিকে তাড়িয়ে দিলেন। সবাই পালিয়ে গেল, বার জন ছদ্মবেশে লুকিয়ে রইল। একদিন সুযোগ পেয়ে তারা 'খঞ্জরে'র (লম্বা ছোরা) আঘাতে রাজাকে সবংশে হত্যা করে। আমার পিতা ছুটে অন্দরে যান, রাণী তাঁর কন্যাটি পিতার হাতে স'পে' দিয়ে পালাতে বলেন। তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর, কন্যাটির এক বৎসর। আমার পিতামাতা আমাদিকে নিয়ে রাতারাতি মামাবাড়ী ঘাটশিলায় পালিয়ে গেলেন। তাঁরা সেখানে বার বৎসর থেকে এখানে ফিরে এসেছেন।

বাসলী ॥ রাজা, তুমি গুপ্তচরের মুখে শুনে চণ্ডীদাসকে ছুষছ। জেনে রাখ, যে রামী সেই আমি, শিবের অংশে চণ্ডীদাসের জন্ম। আমি প্রেমিক-প্রেমিকা দুটিকে রক্ষা ক'রতে ছুটে এসেছি।

> প্রেমের পাগল চণ্ডি না মানে সমাজগণ্ডি
> ততধিক রামী রজকিনী।
> প্রাণে প্রাণে মিশি যাএ কিন্তু কামগন্ধ নাঞি
> দোঁহে দোঁহাকার চিন্তামণি॥

ভ্রাতৃসঙ্গে চণ্ডীদাস কাশীতে পালিয়ে গেছল, দুদিন পরে এখানে আসবে। আর এক কথা। তোমার কুলাচার মতে ছাগমেষমহিষগণ্ডার বলি দিবে।

নগরপ্রান্তে দেবিদাস ও চণ্ডিদাস। জন্মভূমির প্রতি

> এবার জাগহ জনমভূমি।
> জাবে কি জনম কাঁদিএ!
> জাগ জাগ মা জনমভূমি॥
>
> চাদ জাগিছে নীল গগনে
> কুসুম হাসিছে কুঞ্জকাননে
> জাগাতে জগৎ মধুর তানে
> জাগেন জগৎ স্বামী।
> জাগ জাগ মা জনমভূমি॥

বাসলী ॥ তোরা কাকে মা বলে' ডাকছিস? তোরা কাশীতে আমার পূজা ক'রতিস, আমি যে শিলারূপা সেই তোদের মা বাসলী।

চণ্ডীদাস ॥

> মোরা যত দুঃখ পাই তাহে ক্ষতি নাই
> দুঃখ হয় দেখি দেশের দুর্গতি।

শুদ্ধভারতী ॥

> এইবার তুমি বল দেখি সখা সত্য মরম কথা।
> প্রাণের ভিতর পরাণ মাণিক খুজতে গেছলে কোথা॥....

বাসলী ॥

> রাধাকৃষ্ণ লীলা গীতি করিআ চয়ন।
> করহ এবার তুমি পাষণ্ডদলন॥
> উত্তরসাধিকা হবে রামী রজকিনী।
> জখন জা চাহ তোরে জোগাব সে আমি॥
> প্রাণপ্রিয় সহচরী মোর নিত্যা হয়।
> মাঝে মাঝে জাবে তুমি নিত্যার আলয়॥
> হতজ্ঞান ছিল চণ্ডি হইআ তন্ময়।
> চাপড় মারিআ পিঠে পুন দেবী কয়॥
> আমি কন্তা দেবিদাস তুমি মোর বাবা।
> করিহ আমার নিতা নৈমিত্তিক পূজা॥
> প্রসাদ না খাবে মোর কন্তা হেন জানে।
> করিবা আমার পূজা বংশ অনুক্রমে॥

---

১) ভবানী নামে ব্রাহ্মণ পঞ্চকোটের এক রাজার পূজার বারি-বাহক ছিলেন। রাজা তৎকালের সামন্ত রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভবানীকে রাজা করে' ছিলেন। পঞ্চকোট রাজ্যের পুরাতন নাম শিখর-ভূম। রাজধানীর নাম কাশীপুর। ছাতনা হ'তে বার ক্রোশ পশ্চিমে। ছত্রিনা রাজ্য শিখরভূমের অন্তর্গত ছিল। শিখরভূম মানভূম জেলায়।

দেবীদাস ॥ মা, আমি বুড়া হয়েছি, কে আমাকে কন্যা দিবে ?

বাসলী ॥ পরশু তোমার বিভা হবে।

দেবীদাস ও চণ্ডীদাস নিজেদের ঘরে এলেন। নকুলকে [৮] মায়ের কাশীপ্রাপ্তি শোনালেন। সে কাঁদতে লাগল। চণ্ডীদাস ঘরে এল, নগরে আনন্দধ্বনি উঠল। কেহ বলে দাদা, কেহ খুড়া, কেহ মামা বলে' দলে দলে দেখা ক'রতে এল। মায়ের কাশীপ্রাপ্তি ও নিজেদের তীর্থভ্রমণ দুই হেতু দেবীদাস ব্রাহ্মণভোজন করাবেন, সকলে তথাস্তু বলে। পরদিন এসে দেখে রোহিণী রাঁধছে! আবার কানাকানি দেখে চণ্ডীদাস রোহিণীর বৃত্তান্ত শোনালেন। কিন্তু এদিকে যে রামীও র'াধছে!

> রজকিনী বলি সবে চমকে থমকে।
> সমুখে দেখিল হাসে রজক বালিকে॥
> যেন শত সৌদামিনী একত্র হইআ।
> চমকে সর্ব্বত্র ধ'াদি থাকিআ থাকিআ॥

ব্রাহ্মণেরা উদ্দেশে প্রণাম ক'রলেন, কিন্তু জাতি দিবে কে? যদি বাসলী রামীর সিদ্ধ-অন্ন খান, তা হ'লে তাঁরা অবাধে খাবেন। রামী মৃত্তিকা খুঁড়ে অন্ন বার ক'রলে, কাঞ্চন থালায় বেড়ে, স্বর্ণ পীড়ি পেতে, ঘৃতের প্রদীপ জ্বেলে ঘরের কপাট ভেজিয়ে দিয়ে ধ্যানে ব'সল। ব্রাহ্মণেরা ছিদ্রপথে দেখলেন, বাসলী থাবা থাবা অন্ন খাচ্ছেন। তখন ভোজনে তাড়া-তাড়ি, হুড়া-হুড়ি প'ড়ল।

পরদিন বেশড়া গ্রাম [৯] নিবাসী বিষ্ণুশর্মা এক ষোড়শী কন্যা সঙ্গে নিয়ে ছত্রিনায় এলেন। তিনি নিত্যনিরঞ্জন শর্মার পুত্র দেবীদাসকে খুঁজছিলেন। তিনি তাঁর কন্যা দেবীদাসকে সম্প্রদান ক'রলেন।

অনন্তর চণ্ডীদাস মাতৃ-আজ্ঞা স্মরণ করে' শুশুনিয়া পাহাড়ে[১০] আনন্দ-আশ্রমে থাকলেন, রামীর সহিত দীক্ষিত হ'লেন। কিছু দিন পরে বিষহরি নিত্যার আলয়ে এলেন। নিত্যা সঙ্গীত শুনতে চাইলেন। তাঁরা শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ধ'রলেন। * সে গীত শুনে কেহ ধৈর্য বাঁধে নি। মানুষের কথা কি, পশুপক্ষীও কাঁদে।

> উথলিআ পড়ে পাড়ে তড়াগের জল।
> পবন শুনএ গীত হইআ নিশ্চল॥

আকাশবাণী।

> ধন্ত কবি চণ্ডিদাস ধন্ত তোর রামী।
> দোঁহমুখে শুনি গীত ধন্ত হইনু আমি।
> জতদিন রবে এই চন্দ্রসূর্য্যতারা।
> ততদিন সবার মস্তকে রবি তোরা॥

পরদিন উভয়ে ছত্রিনায় ফিরে এলেন, পর্ণের কুটীরে থাকলেন। এখানে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের উপাসনা ও গীত রচনা করেন।

(২) নান্নুরে

চণ্ডীর ও রামীর গীত শুনতে বহু দূর দেশের লোক আসতে লাগল। মিথিলায় বিদ্যাপতি গীতের খ্যাতি শুনলেন, "লোকমুখে ও কবিত্বের বিনিময়ে" পরিচয় পেলেন।

এক শঙ্খবণিক্ ছত্রিনায় শ'াখা বেচতে এসেছিল। তৃষ্ণায় কাতর, এক পুকুরে গেল। সেখানে এক অপূর্ব দ্বিজকন্যা স্নান ক'রছিল। কন্যা শ'াখা পরে' তার বাবার কাছে দাম নিতে পাঠিয়ে দিয়ে আর দেখা দিলে না। (ইনি বাসলী, বাবা দেবীদাস।) শ'াখারীর নিবাস বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুর, মল্লভূমের রাজধানী। সেখানে সে রামী চণ্ডীদাসের সুমধুর গানের কথা রটিয়ে দিলে। মল্লেশ্বর গোপালসিংহের কানে এল। তিনি ছত্রিনার সামন্তরাজের নিকটে আদেশপত্র পাঠালেন, দূতের সঙ্গে সে দুই গায়ককে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু সামন্তরাজ পাঠালেন না, এঁরা সবার সম্পূজ্য, হীনবৃত্তি ভিক্ষুক গায়ক নয়। দূত ব'ললে, যারা মূর্খ তারা মল্লেশ্বরের অসন্তোষ করে।

> ডিলিরাজ ফিরাজ খাঁ মহাগর্ব্ব করি।
> জেদিন ঘিরিল আসিমল্ল রাজপুরী॥
> কি দুর্গতি হইল তার সব জানি শুনি।
> নিজের বিপদ কেন আনিতেছ টানি॥
> পাণ্ডুরাজ সমগুণী জিনিআ ফিরাজে।
> গর্ব্ব করি আক্রমিলা জবে মল্লরাজে॥
> মরিল জবন সৈন্ত পিপীলিকাপ্রায়।
> অর্দ্ধমৃত হএ সেহ তার অন্ন খায়॥

৮) নকুলের পরিচয় কিম্বা বিশেষ কর্ম লেখা নাই। বোধ হয় চণ্ডীদাসের পিতৃব্যপুত্র। বিদ্যাবাসিনী তাকে মানুষ করে'ছিলেন।

৯) বেশড়া গ্রাম ছাতনার দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে।

১০) শুশুনিআ পাহাড় ছাতনার তিন ক্রোশ উত্তরে। এখানে এখন আনন্দ-আশ্রম নামে কোন আশ্রম নাই। এখান হ'তে চারি ক্রোশ পূর্বে সাল-তড়া। এই গ্রামের নিত্যা অদ্যাপি প্রসিদ্ধা আছেন। পুথীতে গ্রামের নাম নাই। মাপচিত্র পশ্য।

* গীত নাই। রাগ কামোদ সিন্ধুড়া তুড়ি নটনারায়ণ, এই নাম আছে।

গন্ত ভাস্রে পাণ্ডুআর ত্যজিল জীবন।
কি করিতে পার তাঁর তুমি হে রাজন।*

রাজা॥ সত্য, তিনি বীর অবতার। তাঁর অপূর্ব গুণ শুনেছি। উদরে কোথায় ভ্রূণ থাকে তিনি গর্ভবতীর পেট চিরে দেখেন, অপরাধীকে প্রাচীরে গেঁথে মারেন। তিনি ধর্মের অবতার।

মল্লরাজ দূতমুখে বার্তা শুনে ক্রোধে কম্পিত। 'সেনাপতি, তুমি সৈন্য নিয়ে এখনই ছত্রিনায় যাও, রাজাকে বধ করে' রামী ও চণ্ডীদাসকে বেঁধে আন। শাঁখারীকে সঙ্গে লও, সে দেখিয়ে দিবে। আমি মদন-মোহনকে নিয়ে পশ্চাৎ যাচ্ছি।

ছত্রিনায়।

ধীরে ধীরে গেল রবি অস্তাচলে চলি।
পরিআ ধূসরবাস আইলা গোধূলি॥
হাম্বারবে আসি গাভী পশিলা গোশালে।
পাঠাগার হতে শিষ্য চলে দলে দলে॥
পুষ্করে সারি দিঞা যত কুলনারী।
কলসী লইঞা কাঁখে আসে ধীরি ধীরি॥
নীলাকাশে নিরমল মাণিকের পারা।
একটি দুইটি করি উঠিতেছে তারা॥
বাজিল ঝাঁঝরি শঙ্খ ঘণ্টা দেবালএ।
বাহিরিলা বামাকুল দেউটি জ্বালাএ॥

ক্রমে রাত্রি এল, ছত্রিনাবাসী নিদ্রায় অচেতন। হেন-কালে মল্লরাজ বোল পুখুরের তটে[১১] ছাউনি পাতলেন। রামী-চণ্ডীদাসকে বেঁধে আনতে শাঁখারীর সঙ্গে শত সৈন্য পাঠালেন। বাম ভিতে দেখলেন, কে দুজন যায়, একটি পুরুষ, অন্যটি প্রকৃতি। 'আমি মল্লভূমের অধিপতি। তোমরা কে?' 'আমরা সংসারবিরাগী। আমি চণ্ডী-দাসের চেলা, ইনি রামীর দাসী।' 'তা হ'লে গীতবাদ্য শিখেছ। একটা গীত গাও, শুনি।'

গীতি। তোমার মদনমোহন বাঁকা মদনমোহন।
মধুপুর বরজিআ ব্রজপুর আওল
কঁহাওল শ্রীনন্দনন্দন॥...

রাজা গান শুনে প্রীত হ'লেন। 'তোমরা কেন এসেছ?' 'আমরা উদ্দেশ্যবিহীন, তোমার মঙ্গলহেতু এসেছি।'

রাজআভরণ তুলি যত দিন রবে।
জগতের কিছুমাত্র দেখিতে না পাবে॥
কানে তুলি লও রাজা খুল চক্ষু দুটি।
সমুখে অক্ষয় সত্য উঠিবেক ফুটি॥

রাজা॥ দেখছি, এই বয়সে নানা শাস্ত্র ঘেঁটেছ। বল দেখি, যে কাজে এসেছি, সে পূর্ণ হবে কি না।

পুরুষ॥ তোমার আশা পূর্ণ হবে, কিন্তু রণে জিততে পারবে না। তোমার শত সৈন্য বন্দীশালায় ধরণীতে লুটছে। যার মুখে গান শুনতে ইচ্ছিলি, সে আমি চণ্ডীদাস। (রামী-চণ্ডীদাস অন্তর্হিত।)

রাজা ক্ষিপ্তপ্রায় হ'লেন। এটা কি কামরূপ, না ভোজপুরী? শত সৈন্য আবার গেল। তারা যেমন যায়, তেমন মিলা'য় যায়। রাজা সমুখে আলোকচ্ছটা দেখলেন। এক ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্তি, দীর্ঘলদেহা, বিকট-দশনা শ্যামা। জিহ্বা লক্‌-লক্‌ ক'রছে, যেন ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস ক'রবে।

এক হাতে তরুআল এক হাতে ঢাল।
মুহুর্মুহু গর্জে বামা যেন মহাকাল॥

রাজা আবার গান শুনতে পেলেন,

হেদেরে নিঠুর কান।
সে দেশে জ্বালাএ এ দেশে আইলি
বধিতে রাধার প্রাণ॥
তোর কপট মধুর হাসি কপট মধুর বাণী
তোর কপট পীরিত মধুর মুরতি
নিঠুর মধুর নাম॥ *...

রাজা এমন মধুর কণ্ঠ কখনও শুনেন নি। তিনি নিকটে গেলেন।

ইচ্ছা যদি হয় রাজা করহ বরণ।

রাজা॥ তোমাদের দেব আচরণ দেখছি। আমার মনোরথ পূরণ হয়েছে। তোমার বয়স অল্প দেখছি, এখনও আঠার পার হয় নি। এই অল্প বয়সে কেমনে অপার শাস্ত্রজ্ঞান ল'ভলে?

---

* এখানে ইতবৃত্তির ঘটনার উল্লেখ আছে। পরে ১২এর টিপ্পনী পড়।

১১) বিষ্ণুপুর হ'তে ১৪ ক্রোশ পশ্চিম-উত্তরে ছত্রিনা। মল্লসৈন্য সকালে বেরিয়ে সে দিন রাত্রিশেষে ছাতনায় এসেছিল। তাবে বুঝা যায়, তখন আশ্বিন মাস। বোল পুখুর সড়কের বাঁ দিকে। কবি লিখেছেন, তিন দিকে নিবিড় বন ছিল। এখনও প্রায় তাই। কেবল সড়কের দিকে ফাঁক। এই পুখুরে কি এক ভয়ানক ঘটনা ছিল। পুখুর বড়, জল নির্মল। কিন্তু কেহ সে জল ছোঁয় না, সে জল গো-মহিষকেও খেতে দেয় না। এখান হ'তে ছাতনা আধ ক্রোশ উত্তরে।

* ছাতনায় মদনমোহন এসেছেন। তাঁর উদ্দেশে দুইটি গীত।

এফি কথা কহ রাজা চণ্ডীদাস বলে।
আমার বয়স প্রায় তেত্রিশের কোলে।
জেই দিন মহামুদি ঘোর অত্যাচারী।
বসিলেন সিংহাসনে পিতৃহত্যা করি॥
তার পূর্ব্বদিন মোর জন্ম মধুমাসে।
তুমি কি না বল মোরে বালক বয়সে॥
কহিতেন এই কথা প্রায় মোর পিতা।
জখনই উঠিত তার দৌরাত্ম্যের কথা॥ ১২

(পত্রাঙ্ক ২১)

রাজা॥ তপঃসিদ্ধদের বয়সনির্ণয় হয় না। দয়া করে' বল, রামী তোমার কে?

হাসিঞা কহিল চণ্ডি কি কব রাজন।
কারণ ব্যতীত কার্য্য নহে কদাচন॥
একই সম্বন্ধ মোর রামিণী সহিতে।
জে সম্বন্ধ হয় তার জগতের সাথে॥

প্রচণ্ডা বাসলী রণক্ষেত্রে মদনমোহনের সহিত যুদ্ধ ক'রলেন। পরে সন্ধি হ'ল, মল্লরাজ ও সামন্তরাজ মিত্র হ'লেন। চণ্ডীদাস রাসে ও দোলে বিষ্ণুপুরে গাইতে যাবেন।

এদিকে রোহিণী হামীর-উত্তরকে পিতৃ-হন্তা বুঝে গভীর রাত্রে রাজাকে কাটতে যেত। একদিন চণ্ডীদাস জানতে পেরে পেছু পেছু গেছলেন। হামীর-উত্তর বুঝিয়ে দেন, তিনি ভবানী খাঁয়াতকে বধ করেন নি, দ্বাদশ সামন্ত বধ করে'ছিল। দ্বাদশ সামন্তেরা এক এক মাসে এক এক রাজা হ'ত। এতে রাজ্যের সুসার হ'ত না। তারা হামীর-উত্তরকে কন্যা ও রাজ্য দান করে। তিনি পশ্চিমা ছত্রি। (সে হ'তে নগরের নাম ছত্রিনা।)

রাসপূর্ণিমা এসে প'ড়ল। চণ্ডীদাস ও রামী বিষ্ণুপুর গেলেন, পুরের বাহিরে এক আশ্রম থাকলেন। রাজা ও রাণীর মুখে 'প্রভু' ভিন্ন কথা নাই। রাজসভার উপাধ্যায়, সরস্বতী, শিরোমণি প্রথমে চটে' উঠেছিলেন, চণ্ডীদাসকে পরীক্ষা করে' তাঁরাও 'প্রভু চণ্ডীদাসে'র পূজা ক'রলেন। কাঁকল্যা গ্রামের * রুদ্রমালী কায়স্থ নিজে গীতবাদ্য জানতেন, চণ্ডীদাসের পরম ভক্ত হ'লেন। কিছু দিন যায়, রুদ্রমালী রাজাকে জানালে, পাণ্ডুআ নগরের সিকন্দর-সাহ সেখানে চণ্ডীদাসকে নিয়ে যেতে জবনসৈন্য পাঠিয়েছেন, সেনানী আবদুর-রহমন অপেক্ষা ক'রছে। রাজা অসম্মত। চণ্ডীদাস বলেন, তিনি তাঁর জন্যে রক্তপাত হ'তে দিবেন না, তিনি শত সিকন্দরকেও ডরান না। রহমন "সর্ব্বধর্ম্মে সমরুচি পণ্ডিত জবন।" তিনি রামীকে যেতে নিষেধ ক'রলেন। রামী বলে, তোমার মতন সহায় থাকতে তার চিন্তা নাই। দুনিয়ার রক্ষাকর্ত্তা তাকে রক্ষা ক'রবে। রহমন বলে, মা, তোমার যদি এত বিশ্বাস থাকে, চল।

পরদিন চণ্ডীদাস ও রামী চৌদোলে, সৈনিকেরা অশ্বে যাত্রা ক'রলেন। রুদ্রমালী প্রভুর সঙ্গ ছাড়ল না। গহন বনের ভিতর দিয়ে পথ। বেলা দ্বিতীয় প্রহর, সৈন্যেরা পথ হারালে। দেখলে দূরে সমতল ও ভগ্ন অট্টালিকা। বন ঝোপ কেটে কেটে সেদিকে চ'লল। এক সরোবরে

---

১২) এখানে দিল্লীর ও পাণ্ডুআর সুলতানদের ইতিবৃত্ত স্মরণ ক'রতে হ'চ্ছে। ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দে ঘিয়াসুদ্দিন-তুঘলক দিল্লীর বাদসাহ হন। তাঁর পুত্র জুনা-খাঁ হাতী চালিয়ে মণ্ডপ ফেলিয়ে পিতাকে হত্যা করেন, এবং ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ নাম নিয়ে বাদসাহ হন। এই পিতৃহন্তা অতিশয় নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন, ২৬ বৎসর ভারতকে জ্বালিয়েছিলেন। তদনন্তর ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ-সাহ দিল্লীর সুলতান হন। বঙ্গে দেখি। পাণ্ডুআ নগর মালদহের নিকট। ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে শমসুদ্দিন-ইলিয়াস-সাহ পাণ্ডুআর রাজা হন। ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর ফিরোজ-সাহ বঙ্গদেশ আক্রমণ করে' শোণিতস্রোত বহিয়েছিলেন, কিন্তু জয়ী হ'তে পারেন নি। ১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দে শমসুদ্দিন মারা যান, এবং তৎপুত্র সিকন্দর-সাহ পাণ্ডুআর রাজা হন। ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ-সাহ পাণ্ডুআ দ্বিতীয় বার আক্রমণ করে' সিকন্দর-সাহের সহিত সন্ধি করেন। সে বৎসর ওড়িষ্যা জয় ক'রতে এসে ১৩৬১ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে ফিরবার সময় মল্লভূমে এসে থাকবেন। শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই অনুমান করেন। (Coins and chronology of the early independent Sultans of Bengal.) কিন্তু পুথীর সহিত মিলছে না।

প্রথমে চণ্ডীদাসের জন্ম-বৎসর দেখি। শ্রীযুত ভট্টশালী জানিয়েছেন ৭২৫ হিজরার রবি-অল-আওল মাসে ঘিয়াসুদ্দিন-তুঘলক মারা পড়েন। দেখছি, এটি ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই ফেবরুআরি হ'তে ১৭ই মার্চ। সে বৎসর শক ১২৪৬। ২৪শে ফেবরুআরি হ'তে চৈত্র বা মধুমাস হয়েছিল। চণ্ডীদাসের জন্ম শক ও মাস পাওয়া গেল। ৭৫৮ হিজরার জুলহিজ্জা মাসে শমসুদ্দিন মারা যান। এটি ১৩৫৭ খিষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর হ'তে ১৪ই ডিসেম্বর। ১২৭৯ শকের পৌষ মাস। পুথীতে আছে, সে বৎসর ভাদ্র মাসে শমসুদ্দিন মারা গেছেন। মাসকয়েকের তফাৎ হ'চ্ছে। এই বৎসরের আশ্বিন মাসে মল্লেশ্বর ছাতনায় এসে থাকবেন। চণ্ডীদাস ব'লছেন, তাঁর বয়স তেত্রিশের কোলে। শক ১২৪৬ হ'তে ১২৭৯, ঠিক তত বৎসর। পুথীতে আছে, ১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ফিরোজ-সাহ মল্লভূমে এসেছিলেন। কবিকে বিশ্বাস ক'রলে ১৩৫৪ খিষ্টাব্দে ফিরোজ-সাহ মল্লভূমের পথে এসেছিলেন। অথবা কবি পরের ঘটনা পূর্বে এনে ফেলেছেন।

* এই গ্রামেই কৃষ্ণকীর্তনের পুথী পাওয়া গেছে। এই ঐক্য আকস্মিক।

পদ্ম ফুটে রয়েছে, গাছে আম কাঁঠাল ধরে'ছে।[১৩] অপরাহ্ণ হ'ল, সৈনিকেরা ন'ড়তে চায় না। রহমন বলে, গ্রামে গেলে খেতে পাবে, বনে বাঘের ভয় আছে।

চণ্ডীদাস॥ রাধাশ্যাম থাকতে ভয় নাই।

রহমন॥ যাঁর জন্ম মৃত্যু জরা শোক ছিল, তিনি কেমনে দুনিয়ার কর্তা হবেন? আমার যে আল্লা, তোমার সেই ব্রহ্ম। উভয়ের শাস্ত্রে এই সমন্বয়। কেমনে মানুষ ব্রহ্ম হয়?

চণ্ডীদাস॥

সকলি মানুষ শুনহে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥
সকলের জন্ম সাক্ষাৎ ব্রহ্মেতে বিলয়।
সেই মত কর্ম্ম নয় করিবা নিশ্চয়॥
কিন্তু কর্ম্ম হয় মাত্র প্রকৃতিতে বদ্ধ।
ব্রহ্মের সহিত নাহি কর্ম্মের সম্বন্ধ।
প্রকৃতি ছাড়িএা তুমি ব্রহ্মপ্রাপ্তি আশে।
জেই কর্ম্ম কর সেটা ব্যর্থ হয় শেষে॥
* * *
পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মোর শ্রীরাধা প্রকৃতি।

রহমন বুঝলে, রাধাকৃষ্ণ নামের ভক্ত হ'ল। সৈনিকেরা ক্ষুধায় কাতর। রামী কা-কে ডাকলে। এক বালক বিষ্ণুপুর হ'তে এসে তাদিকে অন্নপানে তৃপ্ত ক'রলেন। (ইনি বিষ্ণুপুরের মদনমোহন, চণ্ডীদাস বুঝলেন।)

সন্ধ্যা হয়েছে, এক সৈনিক এসে ব'ললে, নির্জন কাননে এক রমণীর ক্রন্দন শুনে জন কয়েক দেখতে গেছল। তারা ফিরে এসেছে, কিন্তু বাকশক্তিহীন। চণ্ডীদাস বলেন, বোধ হয় কোন কাপালিক তন্ত্রমতে সাধনা ক'রছে। এর প্রতিকার কর্তব্য। জন কয়েক গাছের আড়ালে থেকে দেখে এস। তারা গিয়ে দেখলে, এক দীর্ঘতনু গৌরবর্ণ যুবক, হাতে বিল্বপত্র জবাফুল, দীর্ঘকেশ উভ ঝুঁটি বাঁধা, কটিতে রক্তবর্ণ পট্টবাস, কপালে চন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা, গলে রুদ্রাক্ষমালা, চক্ষু হ'তে অগ্নি উদ্গীর্ণ হ'চ্ছে। পাশে এক ষোড়শী রূপসী কদলীপত্রসম কাঁপছে, সম্মুখে পাষাণের কালিকামূর্ত্তি।

যুবক॥ এবার জোর করে' তোর মুণ্ড কাটব।

ষোড়শী॥ একে নরহত্যা, তায় নারী। এই তোর ধর্ম? যে মায়ের পূজা ক'রছিস, সে আমি নই কি?

যুবক॥ তোর মুখে শাস্ত্র শুনতে চাই না। "তন্ত্র মিথ্যা আমি মিথ্যা দেবী মিথ্যা হয়?"[১৪]

কাপুরুষ হয় জেই অলস অজ্ঞান।
নন্দের নন্দন হয় তারি ভগবান॥
জত দিন ছিল না এদেশে কৃষ্ণভজা।
সবাই স্বাধীন ছিল এদেশের রাজা॥
জখনি সে জয়দেব কৃষ্ণনাম ধরে।
তখনি জবন আসি ঢুকে তোর ঘরে॥

এই বার্তা পেয়ে চণ্ডীদাস ও রহমন সেখানে ছুটে গেলেন। যুবতীকে যূপকাষ্ঠে বেঁধে যুবক খড়্গ তু'লছে, চণ্ডীদাস বিদ্যুৎবেগে তার হাত ধরে' ফেললেন।

চণ্ডীদাস॥

নামটি আমার পাগল চণ্ডিদাস।
এই পাগলী মাএর ছেলে আমি কাঙ্গাল কৃষ্ণদাস॥
আমি খাওাই মাকে মনের মধু শুআই মনের কোলে।
আমি কেঁদে কেঁদে কাঁদাই মাকে এমনি অবোধ ছেলে॥
আমি ভোলা মাকে ভুলিএ ভুলিএ সব নিএছি কেড়ে।
এখন থাকতে নারে পাগলী বেটী কোথাও আমায় ছেড়ে॥

আমি এত রতন কোথায় রাখি? কেন ভূতের বোঝা বয়ে মরি? আমি আত্ম-বলি-দান করে' মাকে সব ফিরিয়ে দিয়েছি। "কেবল আমায় দে মা শ্যামা রাধাকৃষ্ণ নাম।"

চণ্ডীদাস তান্ত্রিককে রাধকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রলেন। সে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, তার নাম রূপচাঁদ, নিবাস চন্দননগরে। কন্যার নাম রমাবতী, ফুলিয়ার বন্দ্যবংশজাত কুলীন। পিতার নাম ব'ললে না, দেশেও ফিরবে না। চণ্ডীদাস রূপের সহিত রমার বিবাহ দিলেন। রামী মেয়ে জামাইকে সাজালে। পেটরা খুলে পাটের জোড় ও শাড়ী, ও নানা অলঙ্কার বার ক'রলে। চণ্ডীদাস দেখলেন, বুঝলেন, শক্তি ক্ষয় ক'রতে রামীকে নিষেধ ক'রলেন।

ভোর হয়ে গেল। আবার সকলে যাত্রা ক'রলেন, রূপ ও রমা সঙ্গে চ'লল। পাণ্ডুআ নগর বহু দূরে, তিন নদ তিন নদী পেরিয়ে যেতে হবে।[১৫] স্নানের সময় "দামুদর"

---

১৩) চণ্ডীদাস পঙ্গদিন বর্দ্ধমান জেলায় মানকরে। (মাপচিত্র পশ্য) বিষ্ণুপুর হ'তে সেদিকে যেতে হ'লে ৮ ক্রোশ দূরে গহন বনের ভিতরে কোড়াগ্রাম (কোটেশ্বর) গড়ে এসেছিলেন। দুই শত বৎসর পূর্বে ভগ্ন অট্টালিকা ও কালীমন্দির থাকা আশ্চর্য্য নয়। এখন গড়ের ভগ্ন স্তূপ আর বন। বর্ণসা হ'তে বোধ হয় চণ্ডীদাস চৈত্র মাসে পাণ্ডুআ-যাত্রা করে'ছিলেন। এক দিন পথে সন্ধ্যায় সময় কালবৈশাখীতে পড়ে'ছিলেন।

১৪) ষাট সত্তর বৎসর পূর্বেও বিষ্ণুপুরে তান্ত্রিক সাধনা চ'লত। নরবলি চ'লত কি না সন্দেহ, কিন্তু শবসাধনা ছিল। শৈশবকালে আমি একজন দেখেছিলাম।

১৫) দ্বারকেশ্বর, দামুদর, অজয়, তিন নদ। মোর (ময়ূরেশ্বরী), ভাগীরথী, মহানন্দা, তিন নদী।

পার হ'লেন, জবন-সৈন্য দেখে নরনারী ছুটে পালাতে লাগল। তের দণ্ড বেলার সময় জবন-সৈন্য মানকরে পঁহুছিল,[১৬] এক বাগান-ঘেরা সরোবরের তীরে থাকল। রূপ ও রমাকে দেশে পাঠাবার জন্য চণ্ডীদাস বার জন বাহকের অন্বেষণে বেরুলেন। মানকরে জয়াকর নামে এক ধনাঢ্য বৈদ্য কবিরাজ ছিলেন, চণ্ডীদাস তাঁর কাছে গেলেন। কবিরাজ অতি কৃপণ। চণ্ডীদাসকে ভিক্ষুক মনে করে' চটে' আগুন। 'দেখ না, শরীর কেমন, সাতটা বাঘের পেট পুরবে। খেটে খাবে না, ভিক্ষায় বেরিয়েছে! এদের বাড়াবাড়ি না হ'লে "পারিত জবন দেশ লইতে কি কাড়ি।" "নিশ্চয় কতেক সাধু আছে জানি বটে। এখনো আকাশে তেঁই চন্দ্র-সূর্য্য উঠে।" ছত্রিনায় এক ভক্তচূড়ামণি আছেন, নাম চণ্ডীদাস। তাঁকে মারলেও তিনি মরেন না। বিষ্ণুপুরেও তিনি অনেক অলৌকিক কর্ম্ম করে'ছেন।

চণ্ডীদাস॥ যদি অলৌকিক কর্ম দ্বারা সাধুর প্রমাণ হয়, তা হ'লে বাজিকরও সাধু। বীজ পুঁতে তখনই পাকা আম ফলায়, ধ্যানমগ্ন হয়ে শূন্যে বসে' থাকে, গলায় রশি বেঁধে শূন্যে ঝুলতে থাকে, মানুষকে মেরে তখনই জীআয়। অগস্ত্যের সিন্ধুপান, অহল্যার পাষাণদেহ, এ সব সাধুর লক্ষণ? এই কথা ব'লতে ব'লতে চণ্ডীদাস বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অচেতন হ'লেন। রুদ্রমালী প্রভুকে খুঁজছিল, দেখে যেয়ে রামীকে ব'ললে। রামী এসে গান ধ'রলে,—

অন্ধনয়ন-আলোক আইস অন্তর্যামী।
অন্তরতম সুন্দর এস এসহে জীবনস্বামী।...

চণ্ডীদাস প্রকৃতিস্থ হ'লেন। জয়াকরের জ্ঞান হ'ল। তাঁর কাছে রূপ ও রমাকে রেখে সেনাসঙ্গে চণ্ডীদাস অজয়ের দিকে চ'ললেন। কেন্দুলী বাঁ দিকে থাকল। অজয়তীরে সন্ধ্যা হ'ল। সেখানে সেন-রাজাদের নাম শুনে জয়দেবকে স্মরণ হ'ল।

ধন্য মা গো পদ্মাবতী পতিরূপে তোর।
তোমি করে খান অন্ন শ্রীনন্দকিশোর॥
* * *
করিল তোর পতির সে কবিতা পূরণ।
নিজ করে দেহি পদপল্লব মুদারম॥

চণ্ডীদাসের দেহ কণ্টকিত হ'ল। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে শ্যামা মাকে অন্তরে বাহিরে দেখতে পেলেন। তিনি আকাশবাণী শুনলেন,

ব্রহ্মণ্যপুরের মাঝে শুন্ন ব্রবাসিনী।
বাসলী জে বিশালাক্ষী সেই হই আমি॥
হেথায় নান্নুর গ্রামে হই জে পূজিতা।
চল বৎস গ্রামে মোর আমি তোর মাতা॥

চণ্ডীদাস অজয় পার হয়ে বোলপুরে, সেখান হ'তে ছয় ক্রোশ দূরে নান্নুর গ্রামে এলেন। তখন প্রহরেক রাত্রি।[১৭] "কোথাও না জ্বলে দীপ ঘোর অন্ধকার। মানুষের সাড়া নাই রুদ্ধ সব দ্বার।" সৈনিকেরা চক্‌মকি ঠুকে মশাল জ্বাললে। দেখলে সেটা মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কুকুরের অবিশ্রান্ত ঘেও ঘেও রবে, এক বৃদ্ধের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে দেখলে, নানা স্থানে মশাল জ্বলছে। সবার হাতে ঝক্‌ঝকে অসি, মুখে চাপ দাড়ি, মাথায় টুপী বা পাগড়ী। ভাবলে, নবাবের সেনা দেবীমূর্ত্তিসহ মন্দির ভাঙ্গতে এসেছে। দেবনাথ, বিশালাক্ষীর পূজারী। বৃদ্ধ তাকে খবর দিলে। সকলীপুরের লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে জুটল। পরামর্শ হ'ল, সৈন্যরা ঘুমিয়েছে, চোরাঘাতে মেরে ফেল। চণ্ডীদাস মন্দিরের দ্বারে ধ্যানমগ্ন। লোকে তাঁকে জবন মনে করে' বাণ ছুড়তে লাগল। তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ 'শ্রীমধুসূদন জগদ্ধাত্রী উমা,' এই নাম স্ফুরণ হ'ল। হড়-হড় রবে মন্দিরের দ্বার খুলে গেল, তিনি ভিতরে ঢুকতেই হড়-হড় রবে দ্বার রুদ্ধ হ'ল। নিমেষের মধ্যে কি হয়ে গেল, কেহ বুঝতে পারলে না। সৈন্যেরা জেগে উঠল, চণ্ডীদাসকে দেখতে পেলে না। রহমান বলে, লোকগুলাকে বেঁধে ফেল্, চণ্ডীদাসকে বার করে' না দিলে কেটে ফেল্। দেবনাথ বলে, "কাটিআ ফেলিতে সবে বলিলে ত বেশ। মোরাও মানুষ বটি নহি ছাগ মেষ।" চণ্ডীদাসকে পাওয়া গেল না। সকলেই বুঝলে, শরাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সকলিপুরের লোকদের খেদের সীমা রইল না। কিন্তু শবও পাওয়া গেল না। রহমন বলে, সাধকপ্রবর দেহত্যাগ করে'ছেন, সে দেহ কে দেখতে পাবে? সৈন্যগণ, তোমরা পাণ্ডুআয় যাও, রুদ্রমালী তুমি নিজ স্থানে যাও, মা রাসমণি

[১৬] কোটেশ্বর হ'তে মানকর ৮ ক্রোশ।

[১৭] মানকর হ'তে বোলপুর দশ ক্রোশ, বোলপুর হ'তে নান্নুর ছয় ক্রোশ। সকলীপুরের বর্ত্তমান নাম সাকুলীপুর। উত্তরে নান্নুর। রহমন সত্বর যাচ্ছিল। কিন্তু একদিনে চৌদোলে ১৬ ক্রোশ পথ যাওয়া কঠিন।

যথা ইচ্ছা তথা যাও। "প্রভুর জীবনলীলা হইল অবসান।"

> চণ্ডির চরিত্র আর কি লিখিবি ভাই।
> বলরে প্রাণের বন্ধু তুমারে সুধাই॥
> বিধাতা তুমার পুথি মিলাইল বেশ।
> নানুরে আরম্ভ করি নানুরেতে শেষ॥

রামীর বিশ্বাস হ'ল না, প্রভুকে না নিয়ে সে ন'ড়বে না। পূর্ব দিকে রবির উদয় হ'ল। মন্দিরের দ্বার খোলা হ'ল, চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর পদতলে পূজা ক'রছেন! কি আশ্চর্য, নিক্ষিপ্ত বাণ দশটি দেবীর দেহে বিদ্ধ হয়েছে, রুধির নির্গত হ'চ্ছে। চণ্ডীদাস কারও দোষ দেখতে পেলেন না।

দেবনাথ নানুরে চণ্ডীদাসের আগমনে ব্রাহ্মণ ও গ্রামস্থ সকলকে ভোজন করাবেন। ভোজনকালে গণ্ডগোল উপস্থিত হ'ল। জবন-সৈন্যেরা অতিথি, প্রথমে তাদের ভোজন কর্তব্য। চণ্ডীদাস এই ব্যবস্থা দিলেন। ব্রাহ্মণেরা ক্ষেপে উঠলেন, তাঁরা জবনের উচ্ছিষ্ট খাবেন না। অনেক কাণ্ড হ'ল। শ্রীকান্ত নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ও গৃহত্যাগী হ'লেন, তাঁর পুত্র পার্বতীচরণ চণ্ডীদাসের ভক্ত ও অনুগামী হ'ল।

(৩) পাণ্ডুআয়

নানুর হ'তে পাণ্ডুআর দিকে আবার যাত্রা আরম্ভ হ'ল। চণ্ডীদাস ও তাঁর সঙ্গীরা গাড়ীতে ("রথে"), সৈনিকেরা অশ্বে। কত গ্রাম কত মাঠ পেরুতে লাগলেন। পথে চণ্ডীদাসের সহিত রহমনের তত্ত্বকথা চ'লল। চণ্ডীদাস এক দৃষ্টান্ত দিলেন,

> ভারত করিল গ্রাস প্রায় তব জাতি।
> তথাপি স্বাধীন হের মল্ল নরপতি॥

রহমন বলে, সে কথা যথার্থ। তাঁর সৈন্যবল নাই, তেমন সেনাপতিও নাই। তথাপি দিল্লীরাজ পরাস্ত হয়েছে। আমি তাঁর সহিত রণে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে বিষ্ণুপুরে গেছলাম। আপনার কৃপাগুণে রণ বাধে নি। মল্লেশ্বরের শক্তির মূল কি? চণ্ডীদাস মল্লবংশের উৎপত্তি ও মদনমোহনের আবির্ভাব ব'ললেন। মদনমোহনই মল্লেশ্বরের মন্ত্রী ও সেনাপতি। দলমাদল কামান তাঁরই।

পরদিন সুরপুর গ্রামে[১৮] পঁহুছিলেন। দেখলেন পাঁচ মোল্লা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রহার ক'রছে, আর ব'লছে, 'দেখ্, কাফের, তোর রাধাকৃষ্ণ কি ক'রতে পারে।' রহমন অশ্ব হ'তে নেমে তাদের কাছে প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসলে। তারা বলে, 'আমরা নবাবের মোল্লা, ইসলাম বিস্তার ক'রতে এসেছি। এই নির্বোধ বাধা দিচ্ছিল।' রহমন কোরাণের তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিলে, অনিচ্ছুককে জোর করে' ধর্মশিক্ষাদানের বিধি নাই। চণ্ডীদাসের ব্যবহার দেখে মোল্লারা তাঁকে সাধু স্বীকার ক'রলে। তিনি তাদিকে বুকে জড়িয়ে ধ'রলেন।

পাণ্ডুআ নগরে প্রাতে।

> বার দিঞা বসিলেন সিকেন্দর সাহ।
> সমুখে উজীর পীর কাজী ওমরাহ॥

ইত্তালা হ'ল রহমন সহ চণ্ডীদাস-বাহগির দুআরে হাজীর। বাদসাহ উজীরকে সাথে লয়ে দেখতে গেলেন।

সিকন্দর॥ রহমন, সাধুর সঙ্গে নারীটি কে?

রহমন॥ ইনি যে-সে নারী নহেন, ইনি শক্তিস্বরূপিণী।

সিকন্দর॥ মুসলমান হয়ে এই জ্ঞান? (চণ্ডীদাসকে) কহ সাধু কে এই রমণী?

চণ্ডীদাস॥ এঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

সিকন্দর॥ (রামীকে) তুমি পাণ্ডুআ নগরে কেন এসেছ? সাধুর সঙ্গে তোমার সুবাদ কি?

রামী॥ (সহাস্যে)

> শুন রাজা মহাশয়
> সুধার স্বরগে উরগের মেলা ঘন ঘন গরজয়।
> রাজা ইথে কার কিবা হয়।
> বল বল মহাবল ইথে কি ফলিবে ফল
> ভাবের তরঙ্গে উঠিআছে ফুটি স্বভাবের শতদল
> সখা কেমনে তুলিবে বল॥
> শুনহে সুধার বাঁধ ধরিতে গগন চাঁদ
> বসিআছ পাতি দিবসরজনী ধরণীর বুকে ফাঁদ।
> বলিহারি খোদা বান্দ।
> মৃগ জায় নাচে নাচে কেসরী চলেছে এঁচে
> ধরি শরাসন কিরাতের দল ছুটি চলে তার পিছে।
> দেখি কেবা মরে কেবা বাঁচে।
> আমি কে জে জন জানে আমি কে সে জন জানে
> তুমিও সে জন আমিও সে জন কত কব জনে জনে।
> রাজা ভাবি দেখ মনে মনে।
> চণ্ডিদাস মোর জেই তুমিও আমার সেই
> তুমি তিনি আমি একেরি প্রকাশ কর্ম্মেরি ফের জেই।
> সখা ভেদমাত্র কিছু নাই।

---

১৮) বর্তমান সেরপুর। নানুর হ'তে ৮ ক্রোশ। এখান হ'তে পাণ্ডুআ ৬০ ক্রোশ। অন্ততঃ ছদিনের পথ। এই পথের বর্ণনা নাই। মুর্শীদাবাদ সেরপুরের নিকটে। বোধ হয় কবি মুর্শীদাবাদ যাতায়াত করে' পথটি চিনেছিলেন, পাণ্ডুআ যান নাই।

সিকন্দর ॥ (মনে মনে) রূপসম কণ্ঠস্বর অতি মনোরম। কি সুন্দর অঙ্গজ্যোতিঃ! বয়সে ষোড়শী। বেগমের যোগ্যা বটে। (প্রকাশ্যে) তুমি অন্দরে যাও।

রামী ॥ আমরা কারো ঘরে থাকি না।

সিকন্দর ॥ তবে বাগিচার মধ্যে অট্টালিকায় থাক।

রামী ॥ আমি একা থাকব না, চণ্ডীদাস ও ভক্তেরা থাকবেন।

সিকন্দর ॥ বাঙ্গালীর পর্দা নাই, এই বড় দুঃখ।

রামী ॥ স্বভাবতঃ বাঙ্গালী সুশীল।

তাঁদিকে এক বাগানবাড়ী দেওয়া হ'ল, নাদীর সাহ তার রক্ষক। তাঁরা সেখানে গেলেন। চণ্ডীদাস সাবধানে থাকলেন।

সিকন্দর ॥ উজীর, "ধর্ম্মপথে কণ্টক যে জন। তাহারে নাশিলে হয় ধর্ম্মের রক্ষণ ॥ * * পূজার সামগ্রী জার মৃত্তিকা পাথর। ধ্যানধারণার বস্তু হয় জার নর ॥" তাকে বধ ক'রলে পুণ্য হয়।

উজীর সায় দিলেন না, রহমনকে তলব হ'ল।

সিকন্দর ॥

এই জে ভারত মোরা কৈনু অধিকার।
এদেশের নানা ধর্ম্ম হেতুমাত্র তার ॥

যদি হিন্দুদিকে ইসলামী ক'রতে পারি, তা হ'লে এই সোনার ভারত চিরদিন আমার থাকবে। আমি নানা স্থানে মোওলানা পাঠিয়ে ধর্মপ্রচার করাচ্ছি। শুনলাম দক্ষিণ-পশ্চিমে নানুরে এক চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ নাম করে' বাধা দিচ্ছে। তাকে হত্যা করা বিনা উপায় নাই।

রহমন ॥ তা হ'লে, মোগল পাঠানে যুদ্ধ কেন হয়? জুনা খাঁ[১৯] কেন পিতৃহত্যা ক'রলে? সেখ সৈয়দ মোগল পাঠান পরস্পর কেন হিংসা করে?

বাদসাহ ॥ (সক্রোধে) নিমকহারাম! আমার হুকুম, চণ্ডীদাসের মাথা কেটে আন্।

রহমন ॥ আমি চণ্ডীদাসকে এনে দিচ্ছি, আপনি স্বহস্তে মুণ্ড ছেদন করুন। (সিকন্দর কুপিত, রহমনকে কাটতে উদ্যত। সেনাপতি ওসমান সেনাসহ প্রবেশ ক'রলে। এক ভীমা ভৈরবীর সঙ্গে সেনার যুদ্ধ ও পরাজয়, ভৈরবীর অন্তর্ধান।)

সিকন্দর ॥ দেখছি, লোকটা জাদু জানে।

পরদিন সিকন্দর-সাহ সাহিজাদা (বাদসাহ-পুত্র) ও এক ঘাতককে ডেকে চণ্ডীদাসের বধের আজ্ঞা ক'রলেন। তারা চণ্ডীদাসের মুণ্ড কেটে এনে বাদসাহকে দেখাবে। তারা গভীর রাত্রে বাগানবাড়ীতে গেল, চণ্ডীদাস ধ্যানমগ্ন। তারা তাঁকে এক শ্মশানে বয়ে নিয়ে গেল। চণ্ডীদাসের চৈতন্য ফিরে এল। 'আমাকে বধ ক'রবি, কি? আমি অমর। "চিরস্থির আমি মোর কর্ম্মের ভিতর।" তাঁর কথা শুনে সাহিজাদা পাগলের মত ছুটে পালাল।

এদিকে বাদসাহ পুত্রকে ধন্য ধন্য ব'লছেন। বেগম কারণ শুনে, 'হা ধিক্ হা ধিক্! প্রভু চণ্ডীদাসকে সংহার করে'ছে!' (বিষাদে ও রোষে পাগলিনীপ্রায়)।

সিকন্দর ॥ (মনে মনে) "কেবল ধর্ম্মের পথে রমণী কণ্টক।" (বেগমের অনুসরণ)

সিকন্দর পাত্রমিত্র নিয়ে বসে'ছেন।

রহমন ॥ যার জন্যে পাণ্ডুআ নগর কাঁদছে, তুমি দুরন্ত সয়তান, চোরাঘাতে বধ করালে? (অসি তুলে সিকন্দরকে বধোদ্যত।)

চণ্ডীদাস বিদ্যুৎ বেগে রহমনের হাত ধরে' ফেললেন। রাণী উন্মাদিনী। "পাপিনী পাপিনী আমি বড়ই দুঃশীল।" রহমন, আমাকে আগে বধ কর।

চণ্ডীদাস ॥

কেন মাতা হও ব্যগ্র এত।
আমিই সেই চণ্ডীদাস তোমার আশ্রিত।
স্বধর্ম্মে মরণ পণ করিআ নৃমণি।
তার চেয়ে কেবা আছে প্রকৃত ইসলামী ॥
জবে মাতা মিলে দুটি প্রবাহ আসার।
ঝাঁকাঝাঁকি করে আগে পরে একাকার।

রাজা ॥ আমি কে বা, তুমি কেমন! "ধর কি পাপিষ্ঠে টানি চুম্বকের মত।"

(নেপথ্যে)

কিবা এ মিলন ঘটা।
গভীর কূপের অন্তরতমে রবির কিরণ-ছটা ॥
অমার তমসে পূর্ণমাসী শশী হাসি সুধারাশি ঢালিছে।...

রাজার অনুতাপ। রাজা ও রাণীর মিত্রতা। পুত্র পিতৃ-দ্রোহী[২১]। পাণ্ডুআয় অনেক কাণ্ড হ'য়েছিল।

---

১৯) দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ। ১২এর টিপ্পনী পশ্য।

২১) এটি ইতিবৃত্তির সত্য।

(৪) প্রত্যাবর্ত্তন

চণ্ডীদাস দেশে ফিরবার অনুমতি চাইলেন। মানকরে তাঁর জামাই ও কন্যাকে মেলানি দিতে হবে। সিকন্দর চণ্ডীদাসের অনুগত ভক্ত, ছাড়তে চান না। রূপ ও রমাকে আনালেন। চণ্ডীদাস শম্ভুনাথকে* নান্নুরে পাঠালেন।

বলেছেন বিশালাক্ষী জননী আমার।
তোর বংশে মোর জন্ম হইবা আবার॥
প্রেমের পাগল চণ্ডি না চাহে নির্ব্বাণ।
জন্মে জন্মে গাইবে সে রাধাকৃষ্ণ নাম॥
জানে জেন এই কথা তোর বংশাবলি।
রইবা জার বাম করে ছয়টি অঙ্গুলি॥
সেই আমি বলি তারে পাইবা আভাস।

তার নাম পুনঃ চণ্ডীদাস হবে।

চণ্ডীদাস শুনলেন, রমার পিতার নাম পুরন্দর। গঙ্গার নিকটে রঙ্গনাথপুরে নিবাস। রমা গঙ্গাস্নানে যেত, তান্ত্রিক তাকে ধরে' নিয়ে যায়। পাণ্ডুআয় এক মাস থাকবার কথা ছিল, প্রায় এক বৎসর হয়ে গেল। সিকন্দর চণ্ডীদাসকে বিদায় দিলেন, পাণ্ডুআনগরবাসী চণ্ডীদাসের জয়গান করে। তিনি পৌষ মাসের শুক্ল-পঞ্চমীর দিন যাত্রা ক'রলেন।

রঙ্গনাথপুর গঙ্গার পূর্ব পারে। চণ্ডীদাস রঙ্গনাথপুরে[২২] এলেন। পুরন্দরের সন্ধান পেলেন। রমাকে ও তার পিতাকে সমাজপীড়ন হ'তে রক্ষার উপায় দেখতে লাগলেন। দেশে প্রচার হয়েছে রমা কুলত্যাগ করে'ছে। তার বিবাহ? কে কন্যা দান ক'রলে? চণ্ডীদাস গাঁয়ের ব্রাহ্মণদিকে ক্ষান্ত ক'রলেন। এখানে তিনি একদিন স্নানান্তে শিবাষ্টক[২৩] রচনা করেন।

* এখানে নামটি ভুল হয়েছে। পার্ব্বতীচরণ হবে। কিম্বা পার্বতী চরণের অপর নাম শম্ভু ছিল।

২২) রঙ্গনাথপুর গঙ্গাকূলে। মুর্শিদাবাদ জেলায়। পলাশীর কিছু উত্তরে।

২৩) এখানে কৃষ্ণ-সেন,—"উদয় সেন লিখিআছেন এই সিবাষ্টক মহাপ্রভু চণ্ডিদাসের স্বরচিত। বহু স্থানে অর্থবোধ না হইবাও অবিকল স্তবটি লিখিত করিলাম।" বাঁকুড়া কলেজের সংস্কৃতের প্রোফেসর শ্রীযুত রামশরণ-ঘোষ এই মন্তব্য করে'ছেন।

অষ্টক স্তব সাধারণতঃ এক ছন্দেই লিখিত হইয়া থাকে। এই অষ্টকের ১, ২, ৬ শ্লোক শিখরিণী ছন্দে, ৩, ৫, ৭ শ্লোক বসন্ততিলকে এবং ৪, ৮ শ্লোক শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লিখিত। মনে হয় স্তবটি এক কবির নহে, এটি সংগ্রহ। ২য় শ্লোকটি বিপর্য্যস্ত ভাবে পড়িলে অর্থাৎ উত্তরার্দ্ধ প্রথমে পড়িয়া পূর্ব্বার্দ্ধ পরে পড়িলে বৈরাগ্যশতকের

এদিকে যে বনে রূপচাঁদ রমাকে ধরে নিয়েছিল, সে বনের ভগ্ন অট্টালিকার চত্বরে দুই বিদেশী। এক জন রূপনারায়ণ, অপর নাম কন্দর্প; অপর বিদ্যাপতি। বহু দূর দেশ হ'তে এসেছেন, ক্ষুধাতুর, বনে পশুর গর্জ্জন।

রূপনারায়ণ অগতির গতিকে স্মরণ কর'তে লাগলেন। এক ব্যাধবালক এসে তাঁদিকে ফলমূল খেতে দিলে। বিদেশীদ্বয় পাণ্ডুআ যাবেন, বালকটি ব'ললে, ততদূর যেতে হবে না, পথেই দেখা হবে। সে সঙ্গে চ'লল। (বালকটি মদনমোহন)

চণ্ডীদাস রঙ্গনাথপুর হ'তে দক্ষিণে আসতে লাগলেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন লোকে গঙ্গাস্নান ক'রছে। তিনিও লোকাচার মতে গঙ্গাস্নান ক'রলেন। দেখলেন অপর পারে কে তিন জন আসছে; বুঝলেন প্রিয়দরশন হবে। তিনি গঙ্গা পেরিয়ে এসে বিদ্যাপতিকে দেখে ধ্যানমগ্ন হ'লেন। ধ্যানভঙ্গে তাঁকে আলিঙ্গন ক'রলেন।

বিদ্যাপতি কহে সখাহে তুমার বাজিত যখন বাঁশরী।
প্রেমরসে ডুবি আনন্দে মাতিআ নাচিত মিথিলা নগরী॥
কল্পনায় গড়ি মুরতি তুমার স্থাপিতাম পুষি হৃদয়ে।
শিবসিংহ এই রূপ নারায়ণ সহ দেখিতাম চাহিএ॥
নিত্য সুললিত বাঁশরীর স্বর শুনিতাম সদা শ্রবণে।
মানসের গড়া মোহন মুরতি দেখিতাম চেএে নয়নে॥
আর কেনে সখা বাজে না সে বাঁশী নব নব রাগে মাতিআ।
আর কেনে সখা না পিআও মোরে নূতন চাঁদের অমিআ॥
কোথা কার কাছে শিখেছ হে বঁধু বাজাতে এহেন বাঁশরী।
কোন মন্ত্রবলে পাইলে তার দেখা গেলে সে গুপত নগরী॥

এরপর তাঁরা কেঁদুলী আসেন। (পুথীর আর পাতা পাওয়া যায় নাই।)

৪। পর্য্যালোচন।

ছাতনায় "বাসলী-মাহাত্ম্য" নামক এক খানা ৬।৭ পাতার পুথী পাওয়া গেছে। ১৩৮৭ শকে পদ্মলোচন শর্ম্মা

৮৭ শ্লোকের সহিত অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। এই শ্লোকটি সাহিত্য-দর্পণে শান্ত রসের উদাহরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ শ্লোকটি কাব্যপ্রকাশের শান্তরসের উদাহরণ। ১, ৩, ৭, ৮ শ্লোক অত্যন্ত বিকৃত হওয়ায় পাঠোদ্ধার হইল না। ৪ ও ৫ শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৪। বাচস্চাটুষু লোচনে পরবধূবক্ত্রেষু চিত্তং ধনা-
শায়াং সাধুজনাপবাদকথনে চাস্মাভি রায়াসিতম্।
ন ধ্যাতোঽসি ন কর্মতোঽসি ন মনাক্ দৃষ্টোঽসি নার্কর্ণিতঃ
কিং ক্রমো জগদীশ শঙ্কর পরিহারে পি লজ্জামহে॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ করুণাময় শূলপাণে
শম্ভো গিরীশ শিব শঙ্কর চন্দ্রমৌলে।
শ্রীনীলকণ্ঠ মদনান্তক বিশ্বরূপ
গৌরীপতে ময়ি বিধেহি কৃপা কটাক্ষম্॥

আদি বাসলীস্থানের পশ্চাৎ দ্বার
বাসলী বা শাঁখাপুখরের ঘাটের নিকট

সংস্কৃত শ্লোকে রচে'ছিলেন। ১৩৩৩ সালের ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে (৬২৯ পৃঃ) শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হয়েছে। এইটি চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে প্রাচীনতম পুথী, চৈতন্যদেবের জন্মের বিশ বৎসর পূর্বে রচিত। তাতে আছে, চণ্ডীদাসের পিতার নাম নিত্যনিরঞ্জন, মাতার নাম বিন্ধ্যবাসিনী, অগ্রজের নাম দেবীদাস। দেবীদাস ও চণ্ডীদাস তীর্থ করে' ফিরলে ছাতনার রাজা হামীর-উত্তর তাঁদিকে সদ্যঃপ্রাপ্ত বাসলী-প্রতিমার পূজারী নিযুক্ত করে'ছিলেন। দেবীদাস গৃহস্থ হয়েছিলেন। একদা ছাতনা দস্যু-সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল, বাসলী স্বয়ং রণক্ষেত্রে নেমে রাজাকে সঙ্কট হ'তে মুক্ত করে'ছিলেন। আর এক বার এক ম্লেচ্ছ নৃপতি রাজাকে বেঁধে নিয়ে গেছলেন, দেবীদাস সঙ্গে ছিলেন। এ বারেও বাসলী রাজাকে পাশ-মুক্ত করে'ছিলেন। এতদিন আমরা দুই এই ঘটনার কিছুই বুঝতে পারি নি। উদয়-সেনের চণ্ডী-চরিত হ'তে ঘটনা বুঝতে পারছি। ইনি দুই শত বৎসর পূর্বে, ধরি ১৬৫০ শকে, তৎকালে শ্রুত ঐতিহ্য ধরে' চণ্ডী-চরিত লিখেছিলেন। দেখছি, চণ্ডীদাসের পিতা মাতা ভ্রাতার নামে ঐক্য আছে। দেবীদাস ও চণ্ডীদাস তীর্থ হ'তে ফিরে বাসলীর পূজারী হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা দস্যু-সৈন্য দ্বারা ছাতনা অবরোধ করে'ছিলেন। উদয়-সেন শুনেছিলেন সিকন্দর-সাহ চণ্ডীদাসকে ধরে' নিয়ে গেছলেন, ছাতনা আক্রমণ করেন নি। এই অনৈক্য হ'তে বুঝছি, উদয়-সেন পদ্মলোচন শর্মার পুথী পড়ে' লেখেন নি। দুই জনই দেবীর শাঁখা-পরা গল্পটি দিয়েছেন, কিন্তু উদয়-সেন অপুত্রক তন্তুবায়ের পুত্রলাভ শুনেন নি।

পদ্মলোচন দেবীদাস কিম্বা চণ্ডীদাসের জন্মশক দেন নাই। তিনি দেবীদাসকে পিতা বলে'ছিলেন। কিন্তু এক পুরুষ-কালে, পঁচিশ ত্রিশ বৎসরে, বাসলীর নানা মাহাত্ম্য, ও

চণ্ডীদাসের কবিত্ব-খ্যাতি তৎকালের পক্ষে অসাধারণ মনে হয়। যেমন তেমন কথা নয়, বাসলী ভৈরবী সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং যুদ্ধ করে'ছিলেন। দেবীদাসের বর্তমান বংশধরেরা বলেন, পদ্মলোচন দেবীদাসের পৌত্র। ইহা অসম্ভব নয়, পিতৃ শব্দে পিতামহ-প্রপিতামহ ইত্যাদি বুঝাতে পারে। বেশী বয়সে দেবীদাসের বিবাহ হয়েছিল, বেশী বয়সে পদ্মলোচনের বাসলীভক্তি জেগেছিল। মুখোপাধ্যায় হয়েও দেবীদাস বিবাহের কন্যা পান নি। কুলে কোন দোষ ঘটে'ছিল। সে দোষে দেবীদাসের পুত্রেরও বিবাহ দেরিতে হয়েছিল। অতএব ১৩৮৭— (৪০+৪০+৬০=) ১৪০=১২৪৭ শকে দেবীদাসের জন্ম হ'য়ে থাকতে পারে। (২) দেবীদাসের বর্তমান বংশধরেরা পুরুষ গণে' আসছেন। তাঁরা বলেন, দেবীদাস হ'তে ২৩ পুরুষ গত হয়েছে। বেশী বয়সে বিবাহ স্মরণ ক'রলে ৬০০ বৎসর বেশী ধরা হবে না। এই রূপে প্রায় ১২৫৭ শকে পঁহুছিতেছি। দেবীদাসকে ধরে' ১২১৭ শকে। (৩) উদয়-সেন শক দেন নি, কিন্তু এক ঘটনার উল্লেখ করে'ছেন। সে ঘটনা স্মরণীয় হয়েছিল। তা হ'তে পাচ্ছি, চণ্ডীদাস ১২৪৬ শকের চৈত্র মাসে (ইং ১৩২৫ সালে) জন্ম-গ্রহণ করে'ছিলেন। এতে অবিশ্বাসের কারণ পাচ্ছি না। একটি মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া গেল।

আরও দেখা যাচ্ছে, ১২৭৯ শকে আশ্বিন কি কার্তিক মাসে এক মল্লেশ্বর ছাতনা অবরোধ করে'ছিলেন। বোধ হয় বোলপুখুরের কাছে যুদ্ধ হয়েছিল, সে যুদ্ধে বহুতর সৈন্য সে পুখুরে প্রাণত্যাগ করে'ছিল। পর বৎসর ১২৮০ শকে পৌষ কিম্বা মাঘ মাসে দিল্লীশ্বর ফিরোজ-সাহ ওড়িষ্যা হ'তে ফিরবার সময় মল্লরাজধানী আক্রমণ করে'ছিলেন। সে আক্রমণ ব্যর্থ হ'লেও তিনি ছাতনার রাজাকে (হামীর-উত্তরকে) বেঁধে নিয়ে গেছলেন। দেবীদাস সঙ্গে ছিলেন। পদ্মলোচন লিখেছেন, দেবীদাস দুধ খেয়ে বেঁচেছিলেন, বাসলীর কৃপায় রাজাও পাশ-মুক্ত হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র-মজুমদার জানিয়েছেন, ফিরোজ-সাহ বীরভূম আক্রমণ ও বীরভূমের রাজাকে পরাজিত করে'ছিলেন, রাজা সন্ধি করেন। ফিরোজ-সাহ হামীর-উত্তরকে বীরভূম পর্যন্ত নিয়ে গেছলেন কিনা, জানা নাই। তখন চণ্ডীদাস কোথায় ছিলেন ? উদয়-সেনের মতে ১২৮০ শকে চণ্ডীদাস পাণ্ডুআয় ছিলেন। ইহাও অসম্ভব নয়। ছাতনায় থাকলে পদ্মলোচন চণ্ডীদাসেরও নাম ক'রতেন। উদয়-সেন তাঁর চারি শত বৎসর পূর্বের ইতবৃত্তির ঘটনা কোথায় জেনে-ছিলেন, কে জানে।

এখন চণ্ডীদাস-চরিত দেখি। প্রাচীন ব্রহ্মণ্যপুরের বর্তমান ছাতনার রাজার আবাসের উত্তর গায়ে মুমুর গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়েছিল। গ্রামটা অভিশপ্ত হয়েছিল, রাজ-আজ্ঞায় সে গ্রামের নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ হয়েছিল। তার নূতন নাম যুবরাজপুর রাখা হয়েছিল। বোধ হয় রামীর প্রকৃত নাম রামা। লোকে তাকে রাসমণিও ব'লত। তার নিবাস ছাতনায়। বোধ হয় বালবিধবা, সে মাছ খেত না। সে সতর আঠার বৎসর বয়সে চণ্ডীদাসকে প্রেমময়ে ভজিয়েছিল। তখন চণ্ডীদাসের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর হয়ে থাকবে।

পুথীতে আছে, বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ ছাতনা আক্রমণ করে'ছিলেন। মদনমোহন তাঁর সহায় ছিলেন, দলমাদল কামানটি মদনমোহনের। এই তিন উক্তিতে সন্দেহ হ'চ্ছে। মল্ল-বংশে এক গোপালসিংহের নাম পাই। ইনি ইং ১৭১২ সালে =১৬৩৪ শকে রাজা হয়েছিলেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর আজ্ঞায় বিষ্ণুপুরে সকল নর-নারীকে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা হরিনাম ক'রতে হ'ত। লোকে ব'লত, গোপালসিংহের বেগার। উদয়-সেন তাঁর সমকালিক গোপালসিংহের বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগ শুনেন নি, এ হ'তে পারে না। কবির গোপালসিংহ নিষ্ঠুর ক্রূর ছিলেন। প্রাচীন মল্লরাজাদের নৃশংসতার অপবাদ এখনও আছে। মল্ল-বংশের প্রাচীন রাজাদের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সব সত্য কি না, সন্দেহ। চণ্ডীদাসের সহিত মল্লভূপের সাক্ষাৎ কালে কানুমল্ল ছিলেন। কানু, কৃষ্ণ ; কৃষ্ণ হ'তে গোপাল হওয়া অসম্ভব নয়। দ্বিতীয় উক্তি, মদনমোহন। লোকে বলে, রাজা বীর-হাম্বীর মদনমোহনের বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত করে'ছিলেন। ইং ১৫৮৭ সালে =১৫০৯ শকে ইনি রাজা হন। আমরা চাই ইং ১৩৫৭ সাল =১২৮০ শক। হয় কিম্বদন্তির ভুল, নয় কবির ভুল। কবি ইচ্ছা করে'ও

মদনমোহনকে এনে থাকতে পারেন। এই কবি কৃষ্ণ-সেন মনে হয়। তিনি ভুলে'ছেন দলমর্দন বা দলমাদল কামান এত পুরানা হ'তে পারে না। এই কামানের নির্মাণ-কাল জানা নাই।

এখন নান্নুরে যাই। দুই শত বৎসর পূর্বে সেখানে বিশালাক্ষীর বিগ্রহ ছিল। তখন নান্নুরে বসতি ছিল না, সকলীপুরের লোকেরা দেবীর পূজা ক'রত। কবি তাঁকে একবারও বাসলী বলেন নি। যেখানে যত চণ্ডী আছেন, কবির মতে সেখানে বাসলীও আছেন। কিন্তু সেটা পরমার্থতঃ, লোকতঃ নয়। নান্নুরের বিশালাক্ষী অপহৃত কিম্বা

চণ্ডীদাসের দেশ

মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়ে থাকবেন। এখন যে প্রতিমা আছে, সেটি চতুর্ভুজা সরস্বতীর। কেহ কেহ বলে, বিশালাক্ষীর মন্দির ভেঙ্গে পড়ে'ছিল। কথাটা সত্য মনে হয়। মাটির ঢিবি আছে, খুঁড়লে হয়ত নান্নুরের বিশালাক্ষী পাওয়া যাবে। একটা গল্প আছে, মন্দির চাপায় চণ্ডীদাসেরও অপঘাত হয়েছিল। কবিও আভাসে জানিয়েছেন। "নান্নুরে আরম্ভ করি নান্নুরেতে শেষ।" এখানে নান্নুর অবশ্য ছাতনার নুন্নুর, এবং নান্নুর বীরভূমের নান্নুর। কবি ঘটনাটি আরও শোকাবহ করে'ছেন। সকলীপুরের লোকে চিনতে না পেরে চণ্ডীদাসকে বাণবিদ্ধ করে'ছিল। বোধ হয় কৃষ্ণ-সেন শুনেছিলেন, নান্নুরে চণ্ডীদাসের দেহাবসান হয়েছিল। "চণ্ডির চরিত্র ভাই কি লিখিবি আর।" এই উক্তি তাঁরই মনে হয়। উদয়-সেন শুনেন নি, চণ্ডীদাসকে পাণ্ডুআয় নিয়ে গেছেন। অতএব বোধ হয়, ১৬৫০ হ'তে ১৭৫০ শকের মধ্যে মন্দির ধ্বংস হয়েছিল।

আর এক গল্প আছে, এক নবাব চণ্ডীদাসকে ধরে' নিয়ে গেছলেন। বেগম চণ্ডীদাসের গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নবাব টের পেয়ে চণ্ডীদাসকে হাতীর পায়ে পিষে মারতে হুকুম দিয়েছিলেন। উদয়-সেন এ কথা শুনেন নি। সিকন্দর-সাহ চণ্ডীদাসকে ধরে' নিয়ে গেছলেন, বধেরও হুকুম দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্য কারণে। এখানেও বেগম চণ্ডীদাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস সিকন্দরকে তাঁর অনুরক্ত করে'ছিলেন।

বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিলন নিয়ে কেহ কেহ বৃথা জল্পনা করে'ছেন। অন্ততঃ শত বৎসর পূর্বেও সে মিলন সত্য বিবেচিত হ'ত।

এই পুথী হ'তে আর একটা মূল্যবান তথ্য পাচ্ছি। দুই শত বৎসর পূর্বে লোকে জানত, বীরভূম নান্নুরে চণ্ডীদাস-পথগামী, চণ্ডীদাস-নামধারী এক কবি ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন কিন্তু বিশালাক্ষীর পূজা ক'রতেন। এঁরও অনুকারক জন্মে'ছিলেন। তাঁরা চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এঁর প্রকৃত নাম কি, তাহা জানা নাই। কবে ছিলেন, তাও অজ্ঞাত।

কুতূহলী ভক্তেরা গীত রচে' চণ্ডীদাসের চরিত স্মরণ করে'ছেন। উদয়-সেনের চণ্ডী-চরিতে সে সব গীতের আশ্রয় পাচ্ছি। ভক্তদের গীতের ভাষা পুরানা নয়। তাঁরা নুন্নুর আর নান্নুর বা নান্নুর মিশিয়ে ফেলেছেন। কৃষ্ণ-সেনও নুন্নুর নাম দুবার নান্নুর করে'ছেন। যখন সিকন্দর-সাহ ব'লছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম দেশে নান্নুরে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়ে ইসলাম বিস্তারে বাধা দিচ্ছে, তখন সে নান্নুর ছাতনার। কবি লিখেছেন, "নান্নুরে আরম্ভ করি নান্নুরেতে শেষ", নান্নুর নিশ্চয় ছাতনার। নান্নুর পেতে হ'লে নিত্যার আলয় সালতড়া গ্রাম চাই। সে গ্রাম ছাতনা হ'তে পাঁচ ক্রোশ দূরে। ছাতনায় নুন্নুর নামে এক গ্রাম ছিল, পার্শ্ববর্তী গ্রামের কোন কোন লোক এখনও জানে। আমরা 'নুন্নুর হাট' এই নাম পেয়েছিলাম। ইং ১৯২৬ সালে নবেম্বর মাসে শ্রীযুত রাজশেখর-বসু বাঁকুড়া এসে ছাতনা

দেখতে গেছলেন। যে পথিক মুমুর নাম বলে'ছিল, তিনি তার নামধাম টুকে নিয়েছিলেন।

রামী নামে এক রজক-কন্যা না থাকলে যাবতীয় শ্রুতি-পরম্পরা নিরাধার হয়ে পড়ে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" রামীর নাম নাই। থাকতেই হবে, এমন অবশ্যম্ভাবিতাও নাই। "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে" মুমুর গ্রামের নামও নাই। চণ্ডীদাস আত্মচরিত লেখেন নাই। যে যে পদে নান্নুর বা নান্নুর, নিত্যা, প্রভৃতির নাম আছে, সে সব পদ পরবর্ত্তী কালের ভক্তদের রচিত।

চণ্ডীদাস বাসলীর বরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করে'-ছিলেন। তিনি পাষণ্ডদলন ক'রতে আসেন নি। তিনি বলেন নি, "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" "কৃষ্ণকীর্ত্তন" হ'তে এইটুকু পাই, তিনি শাক্ত-বৈষ্ণব ছিলেন। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রাচীন। চণ্ডীদাসের কালে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ছিল না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখি, লোকে হরিনাম ক'রছে, দেবীপূজায় পশুবলি, এমন কি, নর-বলিও দিচ্ছে। চণ্ডীদাস-চরিতের কবি প্রাণীহিংসাসমর্থন করে'ছেন। বাসলী হাম্বীর-উত্তরকে পশুবলি দিতে ব'লছেন। এতে হিংসা পাপ হয় না।

কেন রাজা কি কারণে নাশে অজ ভুজঙ্গমে
পুণ্যতম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে।
কি কারণে ম্লেচ্ছ দেশে জনগণ জীব নাশে
অন্ন খায় মৃগয়ায় বনে।
নরমেধে অশ্বমেধে কেন সে পুরাণে বেদে
লিখে রাজা সাধুসিদ্ধ জনে।
জান তুমি নররায় তারা কি নরকে যায়
এ কি তব ধর্ম্ম আচরণ।
গোম অতিথিয়ে কয় চর্ম্মণ্বতী কেন বয়
জান সে ত হাম্বীর রাজন।

বাসলীমাহাত্ম্যে, ১৪০০ শকে, চণ্ডীদাস কবি, বাসলী-ভক্ত, ও ধার্মিক। ১৬৫০ শকে তিনি সিদ্ধপুরুষ। তিনি শ্যামা কিম্বা শ্যামের নাম শুনলে, তাঁদের লীলা স্মরণ হ'লে, পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের ন্যায়, সমাধিস্থ হ'তেন। ১৪০০ হ'তে ১৬৫০ শকের মধ্যে চণ্ডীদাসের এই রূপান্তর হয়েছিল। মানুষ তার আরাধ্য দেবতাকে তার নিজের মনের মতন করে' গড়ে, নাম একটা উপলক্ষ মাত্র।

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

৫

দারুণ গরমে বাড়িসুদ্ধ সকলে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সুরেশ্বরও দশটা বাজিবার আগে ঘরে খিল দেন, এবং সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধব আসিয়া জুটিলে পর তবে দরজা খুলিয়া নীচে যান। রাত্রিটাকেই দিন করিবার চেষ্টায় আছেন যেন মনে হয়। ফলে দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় না। ক্রমেই যেন বাড়াইতেছেন। যামিনীর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। একেই তিনি স্বল্পভাষিণী, এখন কথাবার্ত্তা বলা একেবারেই প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। মমতার ইহাতে ভারি অস্বস্তি লাগে; মা আর কারও সঙ্গে কথা বলুন বা নাই বলুন, তাহার সঙ্গে ত সর্ব্বদাই বলিতেন? হঠাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন কেন?

শেষে থাকিতে না পারিয়া বলিল, "মা, তুমি কি মৌনব্রত নিয়েছ নাকি, গান্ধী-মহারাজের মত? আমার সঙ্গেও যে আড়ি ক'রে দিয়েছ দেখছি।"

যামিনী একটুখানি ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "না, মা, মৌনব্রত আর নেব কি করতে? যা গরম, শরীর মন কিছুই ভাল নেই, কথাবার্ত্তা বলতেও ইচ্ছা করে না।"

মমতা বলিল, "বাবা ত সারাদিন দরজা এঁটে ঘুমবেন, আর তুমি থাকবে চুপ ক'রে। খোকাটা ত কোথায় যে

ঘোরে, তার ঠিকানাই নেই। বাবাঃ, কলেজটা আমার খুললে বাঁচি, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে একেবারে।"

যামিনী বলিলেন, "তোর মামীমা সেদিন এত ক'রে যেতে ব'লে গেল, যা না দিন-দুই-চার থেকে আয়। সে এত কথা বল্‌বে যে তুই উত্তর দেবারও অবসর পাবি না।"

মমতা বলিল, "বা'রে, আমাকে একলা যেতে ত আর মামীমা বলেন নি? তুমি, খোকা, আমি, সবাই মিলে যাই চল।"

যামিনীর বাপের বাড়ি যাইতে মন কিছুতেই ওঠে না। বাবা যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন মনের এই বাধাকে জোর করিয়া কাটাইয়াই তাঁহাকে যাইতে হইত। না হইলে বৃদ্ধ মনে করিবেন কি? বাস্তবিক পত্নীর মৃত্যুর পর যামিনীর পিতা নৃপেন্দ্র বাবু একেবারে অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। দীর্ঘকালের অভ্যাস নিজের জন্য কোন কিছু একেবারে না করাটা তাঁহার দিব্য আয়ত্ত হইয়াছিল। সাংসারিক কোনো ব্যাপারে পত্নী জ্ঞানদা তাঁহাকে কোনোদিনই হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। নিজের পরিবার ও সংসারের মধ্যে জ্ঞানদার একাধিপত্য প্রায় মুসোলিনীর কাছাকাছি ছিল। নৃপেন্দ্রনাথ ইহাতে শান্তি নিশ্চয়ই পাইতেন না, আত্মমর্য্যাদাও তাঁহার সময় সময় ক্ষুণ্ণ হইত, কিন্তু আরামে থাকার মূল্যস্বরূপ এগুলিকে তিনি বিসর্জ্জনই দিয়াছিলেন। তিনি নিজে কি খাইবেন, কি পরিবেন, কখন ঘুমাইবেন, কখন কোথায় যাইবেন, তাহা ভাবাও বহুদিন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। জ্ঞানদাই এ সবেরও ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আবার নূতন করিয়া এ সব ভাবনা ভাবিতে গিয়া নৃপেন্দ্র বাবু বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সংসারে বিশৃঙ্খলার একশেষ হইতে লাগিল। যামিনীর সবে তখন বিবাহ হইয়াছে, সুরেশ্বর দুই দণ্ড তাঁহাকে চোখের আড়াল করিতে চান না। তবু মাঝে মাঝে জেদ করিয়া তিনি আসিতেন। ভ্রাতা মিহিরের সাক্ষাৎ কালেভদ্রে মিলিত। মা থাকিতে সে একেবারেই ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করিতে পারে নাই, এখন তাহার শোধ তুলিতেছিল, কোনো সময়েই ঘরে থাকিত না। স্কুলে যাইবার নাম করিয়া বাহির হইত, রাত আটটা-নটার আগে কোনোদিন বাড়ি ফিরিত না। নৃপেন্দ্র বাবু সে-সব লক্ষ্যই করিতেন না।

যামিনী আসিয়া চুপ করিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিতেন। কেহ কাহাকেও সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেন না। মৃত্যুশোক যে না-পাইয়াছে, তাহার মুখে সান্ত্বনার বাণী হাস্যকর শুনায়; যে পাইয়াছে সে জানে ইহার কোনো সান্ত্বনা জগতে নাই, কথা বলিতে যাওয়াই বৃথা। তাই পিতা-পুত্রী দু-জনে নীরবই থাকিতেন, পরস্পরকে কিছু তাঁহাদের বলিবার ছিল না। সাধারণ কুশলপ্রশ্ন প্রভৃতি দু-একটি কথামাত্র তাঁহারা বলিতেন, তাহার পর সুরেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইতেন যামিনীকে লইয়া যাইবার জন্য। স্মৃতির শ্মশানের মত এ গৃহ যামিনীর বড় অসহনীয় ছিল। এখানকার সর্ব্বত্র তিনি যেন অশরীরী জ্ঞানদার ছায়া দেখিতেন। আর এক জন, যে জগতে থাকিয়াই তাঁহার কাছে মৃত, সেই প্রতাপকেও যেন বড় বেশী করিয়া এখানে মনে পড়িত, এখানকার ধূলিকণাটুকুর সঙ্গেও যে তাহার স্মৃতি জড়িত? প্রতাপের প্রতি নিজের নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে হইলে তাঁহার বুকের ভিতর যেন চিতার আগুন জ্বলিতে থাকিত, দুই চোখ বুজিয়া এখান হইতে তিনি পলাইয়া বাঁচিতেন।

তাহার পর দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া আসিল। মমতা আসিয়া যামিনীর কোল জুড়িয়া বসিল, হৃদয়ের দারুণ ক্ষতে সে সুধাময় প্রলেপ মাখাইয়া দিল। তাহাকে নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার কুসুম-কোমল গণ্ডে চুম্বন দিয়া, যামিনী জগতের আর সব কিছুই যেন হঠাৎ ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারও মুখে হাসি ফুটিল, সংসারে এত দিন তিনি অতিথির মত ছিলেন, আজ মমতার জননীরূপে ইহাকে নিজের গৃহ বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন।

নৃপেন্দ্রের সংসারেও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। তাঁহার নিজের শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, পুরা পেন্সন লাভের আশা ত্যাগ করিয়া তিনি আগেভাগেই কাজ ছাড়িয়া দিলেন। অল্প যা পেন্সন পাইলেন, তাহাতে সংসার চলে না, অন্ততঃ এতকাল যে ভাবে চলিতেছিল তাহা চলে না। বাড়িটাকে ভাড়া দিয়া ছোট বাড়িতে উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব

গরিব ভাই-ভাজকে ত ভুলেই গেছ। কিন্তু খোকা কই? বেটু ত তার জন্যে মহা ব্যস্ত।"

মমতা আসিয়াই কাপড়ের পুঁটলি নামাইয়া রাখিয়া ছাদে ছুটিয়াছিল লুসি আর বেটুর খোঁজে। যামিনী বলিলেন, "তাকে আর আনলাম না, বড় অমনোযোগী আর দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে। দিনকতক ধরে বেঁধে ভাল ক'রে পড়াতে হবে।"

প্রভা বলিল, "ওমা, তা দু-এক দিন থেকে গেলে আর কি হ'ত? এখনও ত এক মাস ছুটি বাকি। ঠাকুরজামাই আসতে দিলেন না তাই বল, মানের হানি হবে।"

যামিনী বলিলেন, "তোমার ঠাকুরজামাই ছেলের জন্যে অত ভাবনা ভাবলে ত আমি বর্ত্তে যেতাম গরম প'ড়ে অবধি সমস্ত দিনরাত ঘরে দোর দিয়ে ঘুমনো ছাড়া আর কোনো কাজ তাঁর নেই। ছেলে মামাবাড়ি ছেড়ে বিলেত চলে গেলেও তাঁর নজরে পড়ত না।"

প্রভা রসিকতা করিয়া বলিল, "তাই বুঝি তোমার এখন ছুটি মিলেছে, নইলে ত রাণীকে চোখের আড়ালও করতে পারেন না।"

যামিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তা ভাবলে যদি খুশী হও ত তাই। আমি কিন্তু ভাই রাত্রে চলে যাব, মমতা এখন দিনকয়েক থাকবে।"

প্রভা বলিল, "তাই ত বলি, আমাদের কি আর এত ভাগ্যি হবে? খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। আমি সকলেরই রান্না করেছিলাম, সব ফেলা গেলে চলবে না।"

রাত্রে যামিনী বশেষ কিছুই খান না; কিন্তু না খাইলে আবার একরাশ কথা শুনিতে হইবে, তাহার চেয়ে খাইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

মিহির খানিক পরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভা রান্নাঘর তদারক করিতে গেল, যামিনী বসিয়া ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন।

খাওয়াদাওয়া সারিতে খানিকটা রাত হইয়া গেল। তাহার পর মেয়েকে রাখিয়া যামিনী ফিরিয়া চলিলেন।

(৬)

শুক্লপক্ষের রাত, আকাশে কোথাও মেঘের টুক্‌রাটিও নাই। থাকিয়া থাকিয়া দমকা বাতাস আসিতেছে, আবার খানিক ক্ষণের মত সব স্থির। কলিকাতার কলকোলাহল রাত একটার আগে কখনও মন্দা পড়ে না, গাড়ী ঘোড়া মোটর সমানে চলিয়াছে, তবে গতির বেগ কিছু কমিয়াছে, প্রাণ হাতে করিয়া সকলকে চলিতে হইতেছে না। হাওয়ার লোভে সকলেই বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, হিন্দুকুলবধূ ছাড়া। গরিব যে সে ফুটপাথে বসিয়া হাওয়া খাইতেছে, বড়মানুষ গাড়ী চড়িয়া গড়ের মাঠে চলিয়াছে।

যামিনী একলা গাড়ীতে আসিতে আসিতে ইহাই চাহিয়া দেখিতেছিলেন। অধিকাংশ মানুষের জীবনে শুধু অভাব, শুধু সংগ্রাম। অথচ এই জীবনের প্রতিই মানুষের কি নিদারুণ আসক্তি উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজিবার আশ্রয় নাই। রোগে ও অভাবে তাহারা জীর্ণশীর্ণ। কিন্তু ইহারই ভিতর সংসার পাতিয়াছে, নিজেরা যেভাবে না খাইয়া, না পরিয়া পৃথিবীর কয়টা দিন শেষ করিয়া গেল, সেইভাবেই বাঁচিয়া মরিতে আর কতকগুলি জীবকে রাখিয়া গেল। তবু ইহাদেরই জীবনে যে কোন আনন্দ নাই বা শান্তি নাই, তাহাই কি কেহ বলিতে পারে? ঐ যে কুলিরমণী শিশু কোলে লইয়া শ্রান্ত পতির পাশে রাস্তার উপরেই বসিয়া আছে, সে কি সত্যই যামিনীর চেয়ে অসুখী? তাঁহার রত্নালঙ্কার আছে, মোটর আছে, প্রাসাদতুল্য বাড়ি আছে, কিন্তু আনন্দ কোথায়, শান্তি কোথায়? এক মমতার মুখখানি মনে যখন জাগে, তখনই প্রাণের ভিতর তাঁহার সুধা সিঞ্চিত হয়, আর কে বা কি তাঁহার আছে যাহা বিন্দুমাত্র আনন্দ বা শান্তি তাঁহাকে দিতে পারে? সুজিতও তাঁহার সন্তান। কিন্তু তাহার চিন্তায় এখনই তাঁহার মনে বেদনার সঞ্চার হয়; এ ছেলে বড় হইয়া কেমন যে দাঁড়াইবে, তাহারই ভয় তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। স্বামীর চিন্তা তিনি যথাসাধ্য মন হইতে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখেন। সুরেশ্বরকে বিবাহ তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর স্বামীকে যাহা দেয়, তাহা তাঁহাকে যামিনী দিতে পারিলেন কই? সুরেশ্বরের নিকট হইতেও তিনি যদি পত্নীর প্রাপ্য যাহা কিছু তাহা না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে দোষ দিবেন কাহাকে? যে বিবাহের মূলে উভয় পক্ষেই ছিল শুধু লোভ,

তাহার ফল ইহার চেয়ে ভাল আর কি হইবে? কিন্তু এ-সব এক রকম তাঁহার সহিয়া গিয়াছে, দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে। পত্নীরূপে তাঁহার নারীজীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থই হইয়াছে, জননীরূপে অল্পমাত্রও সার্থকতা লাভ যদি তাঁহার ভাগ্যে থাকে, সেই আশাতেই তিনি বুক বাঁধিয়া আছেন। সন্তানদিগের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের যেন ত্রুটি না হয়, তাহারা যেন মানব-জীবনে যাহা-কিছু পাইবার তাহা পায়, বঞ্চিত না হয়, এবং অন্যকে বঞ্চিত বা প্রতারিত না করে। এ-ক্ষেত্রেও স্বামী তাঁহার প্রতিবন্ধক, নিতান্ত ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাকে যদি সুমতি দেন তবেই।

বাড়ি আসিয়া পৌঁছিতে তাঁহার প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। নীচে সব চুপচাপ দেখিয়া তিনি একটু অবাক হইয়া গেলেন। সুরেশ্বরের অসুখবিসুখ কিছু ঘটিল নাকি? রাত একটার আগে ত তাঁহার সান্ধ্য উৎসব শেষ হয় না?

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে একটা চাকরের সঙ্গে দেখা হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু কি উপরে?"

সে জানাইল, বাবু উপরেই আছেন। তাঁহার শরীর ভাল না থাকায় তিনি আজ নীচে নামেন নাই।

যামিনী একটু উদ্বিগ্নভাবে উপরে উঠিয়া গেলেন। স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য এখন মধ্যে-মধ্যে তাঁহার আশঙ্কা হইত। স্বাস্থ্যের কোন নিয়মই প্রায় সুরেশ্বর মানিয়া চলেন না, সুতরাং অসুস্থ হইয়া পড়া তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।

সুরেশ্বরের ঘরে তখনও বাতি জ্বলিতেছে। যামিনী পর্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া বলিলেন, "তোমার শরীর ভাল নেই নাকি?"

সুরেশ্বর শুইয়া শুইয়া নভেল পড়িতেছিলেন, ইহাও তাঁহার সদভ্যাসের একটি। বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'হুঁ; এত রাত হ'ল কেন?"

যামিনী একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, প্রভা খাওয়াবার জন্যে জেদ করতে লাগল, তাই দেরি হ'ল।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "মমতা ঘুমিয়ে পড়েনি ত? যা ঘুম-কাতুরে সে।"

যামিনী বলিলেন, "সে ত আসে নি, দিন-দুই মামীর কাছেই রইল।"

সুরেশ্বর বিরক্তভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এই মাটি করেছে।"

যামিনী বলিলেন, "কেন? দিন-দুই ঘুরে আসুক না? বাড়িতে ব'সে ব'সে ছেলেমানুষের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, একটা ত সঙ্গীও নেই?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "আর ক'দিন আগে গেলেই পারত, তখন দু-দিন ছেড়ে দশ দিন থাকলেও ক্ষতি ছিল না। এখন আমি তাদের কথা দিয়ে দিয়েছি যে, পরশু তারা আসবে।"

যামিনী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কাকে তুমি আবার কথা দিতে গেলে, তোমার জ্বালায় ত আর পারি নে। কি কথা?"

সুরেশ্বর মাথার বালিশটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "তোমার ত সব তাতেই জ্বালা। কি হ'লে যে তোমার সুবিধে হয়, তা ত এই এতকালের মধ্যে আমার মাথায় ঢুকল না। মেয়ে ত সতের-আঠার বছরের হ'তে চলল, সত্যিই কি তুমি তার বিয়ে দিতে দেবে না নাকি? তোমার মা যে ব্রাহ্মসমাজের মানুষ ছিলেন, তিনিও ত এ বয়স থেকে তোমার বিয়ের ভাবনা ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। তুমি যে তাঁকেও ছাড়াতে চললে দেখছি।"

যামিনী বলিলেন, "খালি মায়ের তুলনা দেওয়া তোমার এক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমিই কি ঠিক তোমার বাবার মত সব তাতে চলেছ? সে কথা এখন থাক্, ও আলোচনার এ জীবনে ত কখনও মীমাংসা হবে না। কাকে কি কথা দিলে তাই বল।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "একটি ভাল ছেলের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই ভাবছি কথাবার্ত্তা একটু কয়ে দেখি।"

যামিনী বলিলেন, "ভাল ছেলের সন্ধান ত এখন পর্য্যন্ত ঢের পাওয়া গেল। মেয়ে এখনও অত্যন্ত ছেলেমানুষ, বিয়ে দেবার মত মোটেই নয়। এত তাড়াহুড়োর দরকার কি? পড়ুক না আর কিছু দিন? এ-সব শুনলে সে এখন কেঁদে অনর্থ করবে। আই-এ-তে কি কি নেবে তারই ভাবনা ভাবছে বেচারী, আর তুমি এই সব উৎপাত জোটাচ্ছ?"

সুরেশ্বর বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ঢের পড়বার সময় পাবে

তোমার মেয়ে, ভাবনা নেই। ওরা ছেলেকে এখন বিলেত পাঠাচ্ছে আই-সি-এস এর চেষ্টায়। সেখান থেকে ফিরে আসতেও ত ঢের দিন। তোমার মেয়েকে তখন পছন্দ করলে হয়।"

যামিনী বলিলেন, "না করলেও আমার মেয়ে বানের জলে ভেসে যাবে না। কিন্তু ছেলে কে, তাই না-হয় একটু শুনি? এত আগে মেয়ে দেখবার তাদেরই বা কি দরকার, বিয়ে যখন এখন হবেই না?

সুরেশ্বর বলিলেন, "ওর ভিতর একটু কথা আছে। ছেলের বাপের অবস্থা ভাল নয়, বিলেত পাঠাবার জন্তে তাঁকে অনেক টাকা ধার করতে হবে। আমি টাকাটা ধার দেব বলেছি; ছেলে অবশ্য যদি পাস ক'রে এসে মমতাকে বিয়ে করে, তাহলে আর তাঁদের শোধ করতে হবে না টাকা।"

যামিনী বলিলেন, "আর না যদি করে? সেটার সম্ভাবনাই বেশী।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "হ্যা, এখন থেকে কুডাক ডাক, তাহলে তাই ঘটবে শেষ পর্য্যন্ত। না যদি বিয়ে হয়, তাহলে বুড়োর কাছ থেকে সুদে আসলে সব আদায় করব। বিনা লেখাপড়ায়ই কি তাকে টাকা ধরে দিচ্ছি নাকি?"

যামিনী বলিলেন, "মানুষটা কে, তাই ত এখন অবধি শুনলাম না। শুধু আই-সি-এস্ হলেই ত হবে না, ছেলের স্বভাবচরিত্র, স্বাস্থ্য সব দেখতে হবে, পরিবার দেখতে হবে।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "অত দেখতে গেলে মেয়ের বিয়ে এ জন্মে হবে না। ছেলের বিয়েতেই লোকে অত দেখে না, তা মেয়ের বিয়েতে।"

যামিনী তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে না হোক, তাতে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ নেই, কিন্তু অপাত্রে যেন না পড়ে।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তোমার মতে ত পুরুষমানুষ মাত্রেই অপাত্র। আমি অপাত্র, আমার ভাই অপাত্র, আমার বন্ধু-বান্ধব যে যেখানে আছে সবাই অপাত্র। তাহলে ব'লে দাও না কেন সোজা যে মমতার বিয়ে তুমি দিতে দেবে না?"

যামিনী বলিলেন, "এ নিয়ে এত হৈ চৈ করবার ত আমি কোনো কারণ দেখছি না। যথাসাধ্য ভাল ছেলে বেছে আমি দিতে চাই, তাতে চট্‌বার কি আছে? মেয়ে সুখী হ'লে ত তোমার কোনো লোকসান নেই?"

সুরেশ্বরের মেজাজ যথেষ্টই গরম হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন "না তা নেই, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, তুমি যদি এ রকম ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় কর, তাহলে মমতার বিয়ে হবে না। মানুষ ত দোষক্রটিহীন হয় না, বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে। ওরই মধ্যে একটু দেখে-শুনে নিতে হয়, নিতান্ত ক্ষীণজীবী কি রুগ্ন না হয়, দুটো খেতে পরতে দিতে পারে।"

স্বামীর আদর্শ পুরুষের নমুনা পাইয়া যামিনী আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন। বুঝিতে পারিলেন, আবার একটা সংগ্রাম ঘনাইয়া আসিতেছে। মেয়ের সুখের জন্ত আবার কিছু দিন তাঁহাকে দিনরাত্রিব্যাপী অশান্তি বরণ করিয়া লইতে হইবে। হয় হইবে। কিন্তু তাহার তরুণ জীবনকে সামাজিক হাড়কাঠে ফেলিয়া বলি দিতে তিনি কিছুতেই দিবেন না।

সুরেশ্বর স্ত্রীর মুখের ভাব দেখিয়া কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর কি মনে করিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া, যামিনীর একখানা হাত ধরিয়া বলিলেন, "এখন থেকে এই নিয়ে রাগারাগি করবার দরকার কি? বিয়ে হলেও তিন-চার বছরের আগে হচ্ছে না? ওরা দেখুক না মেয়ে, আমরাও ছেলেটিকে দেখি। মোট কথা, বুড়ো গোপেশ চৌধুরী পরশু আসছে, খুকীকে দেখতে। তাকে আনিয়ে রেখো, এবং কিছু জলখাবারের যোগাড় ক'রো।"

যামিনী হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তা বেশ, তাই করা যাবে। এখন তুমি আছ কেমন, তাই বল দেখি? কেষ্টো বললে তোমার শরীর ভাল নেই, নীচে যাও নি, কি হয়েছে? খেয়েছ কিছু, না, তাও খাও নি?"

যামিনী হাত সরাইয়া লওয়াতে সুরেশ্বর আবার চটিয়া গিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের এ ধরণের দেমাক তাঁহার ভাল লাগিত না। এত জাঁক আবার কিসের? এ যেন স্ত্রী না আরও কিছু। স্বামীর মেজাজ বুঝিয়া এবং তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতে স্ত্রী বাধ্য, কিন্তু পুরুষের দিকেও এমন বাধ্য-বাধকতা কেন থাকিবে? বলিলেন, "থাক, থাক, তোমার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা　　সন্ধ্যাগমে　　শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

আর অত আত্তি দেখাতে হবে না। মায়া-মমতা যা সব আমার জানা আছে। যাও নিজে এখন ঘুমোও গিয়ে।"

যামিনী চুপ করিয়া রহিলেন। এই সব অনুযোগ-অভিযোগ ত বহু বৎসরই চলিতেছে, ইহা আর তাঁহার কাছে নূতন ছিল না। এ সবের নূতন করিয়া উত্তর দিবারও কিছু ছিল না। মায়া বা ভালবাসা কোনো পক্ষেই নাই, তবু তাঁহারা যখন সন্তানের জনক-জননী, একত্রে সংসারও করিতেছেন, তখন পরস্পরের মঙ্গল-অমঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও ত চলে না? যামিনীর স্বামীর কাছে নিজের জন্ত কোন দাবিই ছিল না, শুধু সামাজিক মানমর্য্যাদার হানি না ঘটিলেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু সুরেশ্বরের সকল বিষয়েই সংযম ক্রমেই যেন কমিয়া আসিতেছিল; লোক-সমাজেও বেশী দিন তাঁহার সুনাম অক্ষুন্ন থাকিবে না, এ ভয় যামিনীর জাগিয়া উঠিতেছিল।

সুরেশ্বরের মনোভাবটা ছিল একটু অদ্ভুত রকমের। স্ত্রীকে তিনি ভালবাসিতেন না, শ্রদ্ধাও করিতেন না, কিন্তু যামিনী যে ইহা লইয়া দিনরাত মাথা কোটেন না, হা-হুতাশ করেন না, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি যখনই স্ত্রীকে কাছে ডাকিবেন, সে যে বর্ত্তিয়া গিয়া তখনই আসিয়া জুটিবে না, ইহাও তাঁহার অসহ্য ছিল। তাঁহাদের বনিয়াদী জমিদার-বংশ, এ বংশে স্ত্রীর মূল্য কোনদিনই ছিল না, কিন্তু স্ত্রীদের কাছে স্বামীদের মূল্য ছিল যথেষ্ট। যামিনী এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানোতে সুরেশ্বর কিছুমাত্র খুশী হইতে পারেন নাই। কিন্তু স্ত্রীর উপর জোর খাটাইবার ভরসা তাঁহার ছিল না। যামিনীর সম্বন্ধে আর কোনো মনোভাব তাঁহার থাক বা না-থাক, ভয় খানিকটা ছিল। সুতরাং কথা দিয়া বিঁধিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনও শাস্তি স্ত্রীকে তিনি দিতে পারিতেন না।

যামিনী মিনিট-পাঁচ বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দুধ-টুধ একটু কিছু খেলে হ'ত না? একেবারে সারাটা রাত না-খেয়ে থাকবে?"

সুরেশ্বরের রাগ ইহারই মধ্যে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি আবার বালিশ টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িলেন। উদাসীন ভাবে বলিলেন, "তাই দাও গে পাঠিয়ে। একেবারে ঠাণ্ডা জলের মত যেন নিয়ে না আসে।"

যামিনী উঠিয়া গেলেন। বিন্দুকে ডাকিয়া সুরেশ্বরের জন্ত দুধ গরম করিয়া পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। তাহার পর নিজের শয়নকক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন। রাত ঢের হইয়াছে, এখন শুইয়া পড়িলেই হয়। সুরেশ্বর যদি বেশী অসুস্থ হইয়া পড়েন, এই একটা আশঙ্কা তাঁহার হইতে লাগিল। তাঁহার ঘরে গিয়া থাকিবেন কিনা, যামিনী একবার ভাবিয়া দেখিলেন। কিন্তু পাছে আবার তর্কাতর্কি বাধিয়া গিয়া তাঁহার অসুস্থতা বাড়িয়া ওঠে, সে ভয়ও ছিল। একটা চাকরকে ডাকিয়া সিঁড়ির মুখে শুইতে বলিয়া, যামিনী নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

রাত্রে ঘুম হোক বা নাই হোক, সকালে তিনি উঠিতেনই। আজ উঠিয়া একেবারে বাগানে চলিয়া গেলেন। নিত্য-ঝিকে বলিয়া গেলেন, আজ চা খাইতে তাঁহার বিলম্ব হইবে, সুতরাং এখনই গিয়া যেন হাঁকডাক না বাধায়। সুরেশ্বর যদি জাগেন, তাহা হইলে যেন যামিনীকে খবর দেওয়া হয়। সুজিতের ঘরের দরজা খোলা। উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সেখানে তখনও মাঝরাত্রি।

বাগানটি প্রকাণ্ড বড়। মমতার বাগানটির প্রতি বড় টান। বাবাকে বলিয়া সে প্রায়ই নূতন গাছ আনায়, গাছ লাগায়, বাগানের যথারীতি যত্ন না হইলে মালীদের যথাসাধ্য বকুনি দেয়। এখানটি অত্যন্ত নিরিবিলি বলিয়া যামিনী স্থানটিকে খুবই পছন্দ করেন, তবে অতটা টান নাই। আজ চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক দিনও হয় নাই, মমতা একটু চোখের আড়াল হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহার কেমন যেন বুকের ভিতরটা খালি খালি বোধ হইতেছে। এই মেয়েকে চিরদিনের জন্ত সুরেশ্বর এখনই বিদায় করিয়া দিতে চান? যামিনী তাহা হইলে আর কি এ সংসারে টিকিতে পারিবেন? কিন্তু অন্ত কোথাও তাঁহার স্থান ত নাই? এই ভাবে এইখানেই পড়িয়া থাকা ছাড়া তাঁহার আর গতি আছে কি?

কিন্তু আজই না-হয় শুধু সুরেশ্বর মমতার বিবাহ দিতে চাহিতেছেন বলিয়া তিনি জোর করিয়া বাধা দিতেছেন। হয়ত এ বিবাহ তিনি বন্ধও করিতে পারিবেন। কিন্তু

মমতা নিজে যখন কাহাকেও বরণ করিবে, তখনও কি যামিনী তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন? তাহাই কি তিনি চাহিবেন? না, না, কন্যার বিচ্ছেদে তাঁহার হৃদয় শতধা ভাঙিয়া গেলেও তিনি মমতার সুখের পথে দাঁড়াইবেন না। সে যদি নারীজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হয়, তাহা হইলে যামিনীর নিজের রিক্ত জীবনের লজ্জাও যেন অনেকটা ঢাকিয়া যাইবে। কিন্তু মমতাকে তিনি আর কাহারও আভিজাত্যের অভিমানের খাতিরে ভাসাইয়া দিতে পারিবেন না। সে দরিদ্রের গৃহে যদি ভালবাসিয়া যাইতে চায়, তাহাতে যামিনীর আপত্তি নাই, কিন্তু প্রেমহীন স্বর্ণ-শৃঙ্খল যেন তাহার গলায় কেহ না পরাইয়া দেয়।

কাল যে মানুষগুলির আগমন ঘটিবে, না-জানি তাহারা কেমন? বেশী আশা যামিনীর ছিল না, তবু চোখেও না দেখিয়া একেবারে একটা মত গড়িয়া তুলিতে তিনি চাহিলেন না। দেখাই যাক। ছেলে সঙ্গে আসিবে কি না কে জানে? ছেলের বাপকে দেখিয়া ত বুঝা যাইবে না ছেলেটি কেমন?

যাহা হউক, আজই সন্ধ্যার পর চিঠি লিখিয়া মমতাকে তাহার মামার বাড়ি হইতে আনাইয়া লইতে হইবে। প্রভা হয়ত ঠাট্টা করিবে, কিন্তু উপায় ত নাই? এখনও অন্ততঃ বছর-তিনের ভিতর বিবাহের কোনো সম্ভাবনা নাই, জানিলে মমতা বেশী বাঁকিয়া বসিবে না। সুরেশ্বরকে বেশী চটাইতে এখন যামিনীর সাহস হইতেছিল না। ডাক্তারে তাঁহার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে নানা রকম আশঙ্কা করিতেছিল, এখন তাঁহাকে অধিক উত্তেজিত না করাই ভাল।

এমন সময় নিত্য আসিয়া খবর দিল যে বাবু উঠিয়া গৃহিণীর খোঁজ করিতেছেন।

যামিনী ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিলেন।

(ক্রমশঃ)

তথাগতের সাধনার একটি দিক

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী

শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্ম ও সাধন প্রণালী এখন সভ্যজগতের গবেষণার একটি প্রধান বিষয়। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বোধিদ্রুমতলে তিনি যে-আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া যে-আদর্শ তিনি সাধন ও প্রচার করিয়াছিলেন তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত মর্ম্মকথা জানিবার চেষ্টা নানাভাবে করা হইতেছে। দুঃখবাদে তাঁহার ধর্ম্মের আরম্ভ, নির্ব্বাণে তাঁহার পরিণতি—এই ভাবেই স্থূলতঃ বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা সাধারণতঃ দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার দুঃখবাদ বা নির্ব্বাণ ইহার কোনটির অর্থই যে নিশ্চিত ভাবে কেহ এখনও স্থির করিতে পারিয়াছেন তাহা মনে হয় না। তিনি নিজে যে-সত্য প্রচার করিয়াছিলেন যদি কেবল তাহাই সুনিশ্চিত জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলেও অন্ততঃ তাঁহার আদর্শ ও সাধনার বিষয়ে আমরা অনেকটা সন্দেহশূন্য হইতে পারিতাম, কিন্তু তাঁহার সাধনপন্থা ও আবিষ্কৃত সত্যগুলির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য ও পরবর্ত্তী অনুচরদিগের বহু শতাব্দী বিস্তৃত দার্শনিক টীকা ও জল্পনা-কল্পনা তাঁহার প্রকৃত শিক্ষাকে এত অধিক পরিমাণে জটিল করিয়াছে যে তাঁহার ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে পারা এখন একটি মহা সমস্যার বিষয়। অদ্ভুত মেধাসম্পন্ন মনস্বী শাক্যসিংহ যে সাধনের বস্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রচার করিয়া গেলেন, তাঁহার শিষ্যদের পাণ্ডিত্যের ঊর্ণনাভরূপ তর্কজালে লোপ পাইয়া তাহা পুনরায় কর্ম্মকাণ্ডে পর্য্যবসিত হইল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যে ত্রুটি দূর করিবার জন্য প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টা ছিল, সেই বহিরঙ্গ ক্রিয়াকলাপই নূতন ভাবে আসিয়া তাঁহার পুরুষকারের ধর্ম্মকে জড়ত্বভাব করিয়া দিল।

গৌতমের শিক্ষা ও সাধনা অবলম্বন করিয়া যে বিস্তৃত বৌদ্ধ-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দেখিলে একটি কথা সুস্পষ্ট হয় যে তাঁহার সাধনা বিশাল ও নানামুখী ছিল এবং সেই জন্য নানাদিক দিয়া ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। গভীর আত্মদৃষ্টি, আত্মবিশ্লেষণ ও দর্শনের ফলে তিনি যে মহান্ সত্য লাভ করিয়াছিলেন, আধুনিক পণ্ডিত-সমাজ তাহার গূঢ়মর্ম্ম কত দিনে আয়ত্ত করিতে পারিবেন তাহা বলা কঠিন। জগৎ, জীব, মানব, কর্ম্মফল, জন্মান্তরবাদ, মানবাত্মা, পরমাত্মা, ইত্যাদির সত্তা ও পরস্পরসম্পর্ক বিচার—সমস্তই সিদ্ধার্থের দৃষ্টিচক্রবালের অন্তর্গত এবং পণ্ডিতরাই ইহার প্রকৃত অধিকারী, কিন্তু যে ধর্ম্ম ও আদর্শ জনসাধারণের উপযোগী বলিয়া তিনি মনে করিলেন এবং সেই জন্য তাহাদের মধ্যে চিরজীবন প্রচার করিয়া গেলেন তাহা সেই জনসাধারণের দিক দিয়া দেখা অসঙ্গত হইতে পারে না।

জগতে যত প্রকার "ধর্ম্ম" দেখা যায় তাহার প্রায় সকলগুলিই আপ্তবাক্য বা সাক্ষাৎ অনুভূতি—Revelation বা Inspiration এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাই ধর্ম্মের সর্ব্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা। মানুষ ভগবানের নিকট হইতে সত্য লাভ করে, স্বর্গ হইতে বাণী অবতীর্ণ হয়, ভগবান আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রেরণ করেন এবং সেই সকল সত্য, বাণী ও অনুভূতির উপর "ধর্ম্ম" প্রতিষ্ঠিত হয়। বেদ মানব-রচিত নহে, আপ্তবাক্য; অনন্তজ্ঞানস্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার নিকট হইতে ঋষিরা বেদের বাণী লাভ করিয়াছিলেন, উপনিষদের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং তাহারই উপর হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। মুষা ভগবানের বাণী শ্রবণ করিলেন। তাঁহাকে অগ্নিময় সত্তারূপে দর্শন করিলেন এবং সিনাই পর্ব্বতশিখরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, জিহোবার নিকট হইতে "দশাজ্ঞা" প্রাপ্ত হইলেন। ঈশা যখন আধ্যাত্মিক অভিষেক লাভ করিলেন তখন আকাশ উন্মুক্ত হইল এবং সেখান হইতে বাণী অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। মুহম্মদ ভগবানের নিকট হইতে বারংবার যে বাণী ও আদেশ লাভ করিলেন তাহাতে কোরাণের জন্ম হইল। তর্কচূড়ামণি বিশ্বম্ভর যখন ভক্তচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রূপান্তরিত হইলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও বাণী অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাতে এই রূপান্তর সম্ভব করিল। সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে "ধর্ম্ম" আধিদৈবিক—মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির অতীত কোনও এক স্থান হইতে ইহা অবতরণ করে বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

সিদ্ধার্থও মানবদুঃখনিরাকরণের চেষ্টায় প্রথমে এই আধিদৈবিক ধর্ম্মের সাধনাতেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অভীষ্ট সাধনে বিফলমনোরথ হইয়া এ-পথ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রত্যক্ষবাদীর নিকট আপ্তবাক্যের কোন মূল্য হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়, কেন না আপ্তবাক্য বা অনুভূতি—Revelation বা Inspiration—সত্যাসত্য প্রমাণের বহির্ভূত, অতএব প্রত্যক্ষবাদীর পক্ষে নির্ভরযোগ্য নয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি-তান্ত্রিক বা subjective, ইহা লইয়া তর্ক চলে না, অথচ আপ্তবাক্যলব্ধ অনুভূতিগুলি পরস্পরবিরোধী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেখানে তাহারা পরস্পরবিরোধী সেখানে কোন্‌টি সত্য বা কোন্‌টি মিথ্যা কে প্রমাণ করিবে? সুতরাং গৌতম দেখিলেন যে আপ্তবাক্য দুঃখনিরাকরণপন্থার বা "ধর্ম্মের" মূলভিত্তি হইতে পারে না। তবে আমাদের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির মধ্যে কোন্ বস্তু নিশ্চিত, প্রত্যক্ষ ও আয়ত্তাধীন? আমাদের আত্মন্ বা self-ই কি সেই বস্তু নয়? আমাদের নিজ নিজ self বা আত্মনের প্রকৃতি আমরা সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ ভাবে জানিতে পারি, তাহার "স্ব-রূপ" বিচার করিতে পারি, তাহার ভিতরে যাহা ঘটিতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিতে পারি, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট সত্য, নিশ্চিত ও কল্পনাবিরহিত। সুতরাং তাঁহার মতে, 'ধর্ম্ম' সত্য হইতে হইলে তাহাকে মানুষের self বা আত্মন্ অথবা মানবপ্রকৃতির ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, মানবচিত্তবৃত্তিকে (human nature) ধর্ম্মের মূলভূমি ধরিতে হইবে। সুখ-দুঃখের বীজ মানব-অন্তরে নিহিত, সুখ-দুঃখ তাহার চিত্তবৃত্তিসমূহ হইতে উদ্ভূত, সুতরাং "ধর্ম্ম" যদি দুঃখনিরাকরণের ও সুখ লাভের পথ হয়, তবে তাহাও সেই একই স্থান হইতে উদ্ভূত হওয়া উচিত।

কিন্তু 'মানবপ্রকৃতি' কি? ইহার সংজ্ঞা, স্বরূপ, অন্তরস্থিত বস্তু কি? এই স্থানেই মানবপ্রকৃতির বিশ্লেষণ

বা মনোবিজ্ঞানের (psychology) আরম্ভ ও প্রয়োজনীয়তা। মানবচিত্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া যে-যে বস্তু পাওয়া যায় সেগুলির সহিত মানবচিত্ত-বহির্ভূত জাগতিক যাহা-কিছু আছে তাহাদের সম্পর্ক ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করাই সিদ্ধার্থের সাধন-প্রণালীর প্রধান বিশেষত্ব এবং তাঁহার নূতন সাধন ও আদর্শ এই মানবপ্রকৃতির বিশ্লেষণের উপরই স্থাপিত।

এই মূলসূত্রে উপস্থিত হইয়া সিদ্ধার্থ দেখিলেন যে মানুষের "আত্মন্" (Self) নানা প্রকার চিত্তবৃত্তির ক্রীড়া-স্থল—কোনটি তাহাকে উচ্চতর অবস্থায় লইয়া যায়, অর্থাৎ প্রকৃত সুখ বা আনন্দদায়ক হয়, কোনটি বা তাহাকে নিম্নগামী করে, অর্থাৎ দুঃখ আনয়ন করে। সুতরাং প্রথমেই এই চিত্তবৃত্তিগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। মনোবিশ্লেষণের ফলে কতকগুলিকে "সুপ্রবৃত্তি" এবং অন্যগুলিকে "কুপ্রবৃত্তি" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তিনি দেখিলেন যে যেমন কুপ্রবৃত্তিগুলির দমন ও উচ্ছেদসাধন প্রয়োজন, তেমনই সুপ্রবৃত্তিগুলির পূর্ণ উৎকর্ষ প্রয়োজন। সাধনে ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক—positive এবং negative—দুই পথেরই স্থান আছে। Thou shalt not—"ইহা করিবে না, উহা অন্যায়" এই ভাবের বাক্যগুলি এক শ্রেণীর সাধন-সহায়, ইহাদের অভাবাত্মক বলা যায়। সকল ধর্ম্মেই অভাবাত্মক সাধনের ব্যবস্থা আছে, কেবল কোন কোন ধর্ম্মে ইহার মাত্রা কিছু অধিক। কিন্তু ভাবাত্মক বা positive সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য মানব-চরিত্রে যাহা-কিছু সু ও সুন্দর আছে তাহার পূর্ণবিকাশ বা উৎকর্ষ। বিশ্লেষণের সাহায্যে শাক্যসিংহ এই সুপ্রবৃত্তি-গুলিকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের চরম উৎকর্ষ সাধনকে "পারমিতা," এবং তদনুযায়ী সাধনমার্গকে "দশ পারমিতা" নামে প্রচার করিলেন। যে দশ ভাগে সুপ্রবৃত্তি-গুলিকে ভাগ করা হইল তাহা এই :—

দান, শীল, নিষ্ক্রমণ, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষমা, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা।

এই স্থলে বৌদ্ধশাস্ত্রের "জাতকার্থবর্ণনা" গ্রন্থের প্রারম্ভিক বিবরণে "দূরনিদান" অধ্যায়ে সুমেধপণ্ডিত নামে বুদ্ধপূর্ব্ব এক জন বোধিসত্ত্বের "দশপারমিতাতত্ত্ব" লাভের বিবরণ উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কেন-না ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে শাক্যসিংহের এই মনোবিশ্লেষণ গভীর আত্মদৃষ্টি বা আত্মানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ বর্ণনা এইভাবে পাওয়া যায় :—

"[সুমেধপণ্ডিত] 'নিশ্চয়ই আমি বুদ্ধ হইব' এই প্রকার কৃতসঙ্কল্প হইয়া বুদ্ধগণের করণীয় ধর্ম্ম জ্ঞাতার্থে, 'বুদ্ধগণের করণীয় ধর্ম্ম কোথায়, উর্দ্ধে না অধোতে, কোন্ দিগ্‌বিদিকে ?' ইত্যাদি সকল ধর্ম্মধাতু বিচার করিতে করিতে, পূর্ব্ববোধি-সত্ত্বগণ দ্বারা গৃহীত ও সাধিত "পারমিতা সকল লাভ করিলেন।" [সকল পারমিতা লাভের পর]… অনন্তর তিনি চিন্তা করিলেন, 'এই লোকে বোধিসত্ত্বগণ দ্বারা পালনীয় বুদ্ধত্বলাভের সহায়কারী, বুদ্ধগণের করণীয় ধর্ম্ম এই কয়েকটিই মাত্র, এই দশপারমিতা ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই ; এই দশপারমিতা উর্দ্ধে আকাশেও নাই, নিম্নে পৃথিবী বা দশ দিকের মধ্যেও নাই, আমারই হৃদয়মাংসেতে (হৃদয়ে) এইগুলি প্রতিষ্ঠিত।' এইরূপে পারমিতাগুলি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, সমস্তগুলি দৃঢ়ভাবে (স্পষ্টভাবে) ধারণা করিয়া…" ইত্যাদি।

ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে এখানে আত্মবিশ্লেষণের সাহায্যে মানবহৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া পূর্ণতা-লাভের পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উপদেশদানকালে কেবল যে এই দশটি বিষয়ে উৎকর্ষ বা পূর্ণতা লাভ করিবার উপদেশ দিয়া বুদ্ধদেব ক্ষান্ত হইতেন তাহা নয় ; মনে হয় তিনি প্রত্যেকটির বিশদ ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাঁহার শ্রোতাদের মনে এই পারমিতা-গুলির বিশেষত্ব ও মহিমা মুদ্রিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন এবং নানাভাবে তাহাদের বুঝাইয়া দিতেন যে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে হৃদয়ের প্রত্যেক সু-প্রবৃত্তির পৃথক সাধন ও উৎকর্ষ প্রয়োজন, তাহা না হইলে সমগ্র মানবপ্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

এখন এই দশটি পারমিতার অর্থ ও উদ্দেশ্য বিচার করা যাইতে পারে। শ্রীবুদ্ধ-প্রদর্শিত উৎকর্ষসাধনপ্রণালীর প্রথম স্তরে "দান"। দানের অর্থ ত্যাগ; আমাদের দেশের সনাতন ধর্ম্ম। ত্যাগ অভ্যাস না করিলে ধর্ম্মসাধন অসম্ভব। কিন্তু এ ত্যাগ কি প্রকারের হওয়া উচিত ? "যেমন অধোমুখী-

কৃত জলকুম্ভ নিঃশেষে জল বমন করে, কিছুই লুক্কায়িত রাখে না, সেই প্রকারে ধন যশ স্ত্রীপুত্র বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্বীয় দেহ, কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া উপযাচকদিগের প্রার্থিত সমস্ত বস্তু নিঃশেষ করিয়া" দান করিতে হইবে। আপনার বলিয়া, স্বীয় বা নিজ বলিয়া কিছুই থাকিবে না, একেবারে নিঃস্ব হইতে হইবে, এই ভাবে "দান পারমিতা," অর্থাৎ দানবিষয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে হইবে।

ইহার পর "শীল"। শীল কথাটি বৌদ্ধশাস্ত্রের একটি প্রধান ও ব্যাপক সংজ্ঞাযুক্ত পদ—ইহাতে ইংরেজী character, virtue, purity, ইত্যাদিতে আমরা যাহা বুঝি সে-সমস্তই বুঝায়। শীল সযত্নে রক্ষা করা ধর্ম্মজীবনের একটি প্রধান সাধন, সুতরাং ইহাতে পূর্ণতা লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। "চামরমৃগ যেমন প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া নিজের পুচ্ছ সাবধানে রক্ষা করে, সেই ভাবে প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা শীলকে রক্ষা করিতে হইবে।" এই ভাবে সাধন করিলে "শীল-পারমিতা," শীল বিষয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করা যায়।

তার পর, "নিষ্ক্রমণ," অর্থাৎ সংসারবন্ধনমুক্ত্যাভিলাষী হইবার সাধনা। সংসারে থাকিতে হইবে, সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, কিন্তু মন থাকিবে বন্ধনমুক্ত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব। "যেমন দীর্ঘকাল বন্ধনাগারবাসী পুরুষও বন্ধনাগারকে ভালবাসে না, বরং মুক্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়ে, সে-স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করে না, সেই রূপে সমস্ত সংসারকে বন্ধনাগার সদৃশ মনে করিয়া সমস্ত সংসার ত্যাগ করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া এবং ত্যাগকামী হইয়া নিষ্ক্রমণপ্রয়াসী" হইতে হইবে। এ-বিষয়ে পূর্ণতা লাভ না করিলে "নিষ্ক্রমণ পারমিতা" সাধন করা যায় না।

চতুর্থ সাধন "প্রজ্ঞাপারমিতা"। প্রজ্ঞা বা জ্ঞান মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান; আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, সমস্তই আমাদের জ্ঞানসঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। যে জ্ঞানহীন তাহার পক্ষে কোন সাধনাই সম্ভব নয়। মানুষ শূন্য ভাণ্ডার লইয়া জীবন আরম্ভ করে, অতএব সে যদি সযত্নে জ্ঞানরত্ন সঞ্চয় করিতে না থাকে তবে তাহার জীবন বৃথা ও অর্থশূন্য হইয়া যায়। সুতরাং "হীন মধ্য ও উৎকৃষ্ট কিছুই বর্জ্জন না করিয়া, সকল পণ্ডিতের নিকটে গিয়া প্রশ্ন-সমাধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভিক্ষাব্রতধারী ভিক্ষু যেমন হীনাদিকুলনির্ব্বিচারে কিছু বর্জ্জন না করিয়া, সকল স্থানে ভিক্ষান্ন গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র তাহার নিয়মিত অন্ন সংগ্রহ করে, তেমনই সকলের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্নসকল জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।" ভিক্ষান্নজীবীর ন্যায় নিরভিমানী হইয়া, অনলস হইয়া, সকলের নিকট জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে, কেন-না জ্ঞানে চরম উৎকর্ষ লাভ না হইলে "প্রজ্ঞাপারমিতা" সাধিত হইতে পারে না।

পঞ্চম বীর্য্যপারমিতা। সাহস না থাকিলে জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না, কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। যাহার সাহস নাই সে ধর্ম্মসাধন করিবে কিরূপে? এ-পথে কত বাধা আছে, বিঘ্ন আছে, লোকের বিরোধিতা আছে, বিদ্রূপ অপমান নির্যাতন আছে, সুতরাং বীরের ন্যায় এ-সকলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলে কে চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইতে পারে? "মৃগরাজ সিংহ যেমন সকল অবস্থায় দৃঢ়বীর্য্য হয়, সেইরূপ জগতে সকল অবস্থায় দৃঢ়বীর্য্য ও জাগ্রত বীর্য্য হইয়া" সচেষ্ট থাকিতে হইবে। সাহসের অভাবে কত লোক সত্যের পথে অগ্রসর হইতে পারে না, আদর্শভ্রষ্ট হয়, কত পুণ্যকার্য্য অকৃত থাকে এবং কত পাপ ও অন্যায় কৃত হয়, সুতরাং "বীর্য্যপারমিতা"র উৎকর্ষ পূর্ণভাবে সাধন না করিলে ধর্ম্ম সম্ভব হয় না।

ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্রে আমরা উপস্থিত হই। মানবহৃদয়ে যত কিছু সদ্‌বৃত্তি আছে তাহার মধ্যে ক্ষমা একটি মহান্ বৃত্তি। প্রতি পদে আমরা ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এবং যাহার এ গুণ নাই সে পরকে যেমন অসুখী করে, নিজে তাহাপেক্ষা কিছু কম অসুখী হয় না। সেই জন্য এই বৃত্তির চরম উৎকর্ষ প্রয়োজন এবং যাহার এই "ক্ষমাপারমিতা" সাধন করা হয় নাই তাহার পক্ষে ধর্ম্মসাধনের চেষ্টা একটা বাহ্য আড়ম্বর মাত্র। প্রত্যেক সাধককে "সম্মানে ও অপমানে ক্ষমাশীল হইতে হইবে। যেমন শুচি ও অশুচি যাহাই তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হউক না কেন, পৃথিবী কাহারও প্রতি প্রেম বা শত্রুতা প্রকাশ করে না, সমস্ত ক্ষমা করে, সহ্য করে ও শান্ত থাকে, তেমনই

সম্মানে ও অপমানে ক্ষমাশীল ও শান্ত হইতে হইবে।" এই-রূপে "ক্ষমাপারমিতা" পূর্ণভাবে সাধন করিতে হইবে।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। মানুষ যত ক্ষণ সত্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন না করে, সত্যকে আশ্রয় না করে, সত্যতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তত ক্ষণ সাধন-পথে সে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারে না, সেই জন্য "সত্যপারমিতার" প্রয়োজন। সত্যকে একমাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে, মিথ্যা বর্জ্জন করিতে হইবে, "অশনিও যদি মস্তকে পতিত হয় তথাপি ধনাদির লোভে কিংবা তাহার বশবর্ত্তী হইয়া জ্ঞাতসারে কখন মিথ্যা বলা হইবে না। যেমন ওষধিতারকা সর্ব্বঋতুতে নিজের নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে ভ্রমণ করে না, নিজ পথেই চলে, সেই প্রকারে সত্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মিথ্যাবাদী না হইয়া," সত্যাভিমুখী, সত্যকামী, সত্যপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। এই ভাবে একান্তচিত্তে "সত্যপারমিতা" সাধন না করিলে ধর্ম্মসাধন হইতে পারে না।

আবার আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যায়, উন্নতির সকল আয়াস পণ্ড হইয়া যায় যদি আমাদের হৃদয়ে প্রতিজ্ঞার বল না থাকে। ধর্ম্মসাধনের মূলমন্ত্র স্থিরপ্রতিজ্ঞা, কেন-না অনেক সময়ে "ধর্ম্ম কি তাহা আমরা জানি, কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্তি আসে না," সে ধর্ম্ম আচরণ করিবার উপযুক্ত বল মনে থাকে না, সহজেই পথভ্রষ্ট হই। ইহার একমাত্র প্রতিকার "অধিষ্ঠান-পারমিতা" বা দৃঢ়সঙ্কল্প বিষয়ে পূর্ণতাসাধন। যখন জানিতে পারা গেল সত্য কি, ধর্ম্ম কি, "কোন্ বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইবে, তখন সেই বস্তুতে অবিচলিত হইতে হইবে।" "পর্ব্বত যেমন সর্ব্বদিক হইতে বায়ুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও কম্পিত বা বিচলিত হয় না, নিজ স্থানেই স্থিতি করে, সেইরূপ নিজের সাধনা বিষয়ে অবিচলিত থাকিতে হইবে।" স্থিরপ্রতিজ্ঞা ধর্ম্মপথের একটি প্রকৃষ্ট সাধন এবং এইভাবে তাহাতে উৎকর্ষ লাভ না করিলে সফল-উদ্দেশ্য হওয়া যায় না।

পূর্ব্বে ক্ষমার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমাই ধর্ম্ম-সাধনের শেষ কথা নয়, "ইহবাহ্য," আরও অগ্রসর হইতে হইবে। ক্ষমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন "মৈত্রী" বা প্রেম। ক্ষমা অহঙ্কার-সম্ভূত বা করুণা-প্রসূত হইতে পারে, প্রেম তাহাতে যথেষ্ট না থাকিতে পারে, সেই জন্য "মৈত্রী পারমিতা" বা প্রেমসাধনে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে, "হিত এবং অহিত দুইয়েরই প্রতি সমভাবাপন্ন হইতে হইবে। জল যেমন পাপী ও পুণ্যবান সকলকেই সমভাবে শীতলতা দান করিয়া স্নিগ্ধ করে, সেইরূপে সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ভাবে সমভাবাপন্ন হইলে" এই সাধন পূর্ণ হয়। ইহাতে সিদ্ধিলাভ না হইলে ধর্ম্মপথের পূর্ণতায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়।

শেষে "উপেক্ষা-পারমিতা"। জীবনের নানা অবস্থায়, সংসারের নানা ক্ষেত্রে; লাভ-ক্ষতি, আশা-নিরাশা, সফলতা-বিফলতা, সম্মান-অপমান, উন্নতি-অবনতি প্রভৃতি, আমাদের চিত্তবিকার উপস্থিত করে এবং তাহা হইতেই আমাদের সুখ-দুঃখ জন্মে; কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হই, কখনও বা বিষাদে অবসন্ন হই, শান্তিলাভ করিতে পারি না। অতএব যে শান্তি চায়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ চায়, তাহাকে এ-সকল অবস্থাবৈচিত্র্যের অতীত হইতে হইবে এবং তাহার জন্য "উপেক্ষা-পারমিতা" সাধন করিতে হইবে। "সুখে ও দুঃখে নির্ব্বিকারচিত্ত হইতে হইবে; যেমন পৃথিবী, শুচি বা অশুচি যাহাই তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হউক না কেন, নির্ব্বিকারচিত্ত থাকে, সেই ভাবে সুখে দুঃখে চিত্তবিকারহীন হইলে" সাধনের শ্রেষ্ঠ অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।

এখন বিচার করা যাইতে পারে যে দশপারমিতা তত্ত্বের সার কথা কি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহা এই যে, মানব-জীবনের সার্থকতা বা উদ্দেশ্য হৃদয়ের সৎ প্রবৃত্তিগুলির চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া পূর্ণচরিত্র লাভ—ইহাই মানুষের সাধনা, ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিণতি, ইহাই তাহার 'ধর্ম্ম', ইহাই প্রকৃত 'নির্ব্বাণ'। এই সাধন-প্রণালীকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা যাইতে পারে :—

সুপ্রবৃত্তি—উৎকর্ষসাধন
শরীর + মন = আত্মন্ < (পূর্ণতা বা পারমিতা) > চরিত্রের = নির্ব্বাণ
(Self) কুপ্রবৃত্তি—দমন পূর্ণতা
(নাশ)

এভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে নির্ব্বাণ একটি "শূন্য" অবস্থা নয়, "নিবিয়া" যাওয়া নয়, বরং ইহা মানব-চরিত্রের

পূর্ণবিকাশের অবস্থা—কোনো negative কল্পনা নয়, কিন্তু একটি নিবিড়ভাবে positive বস্তু।

এ-পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে শাক্যসিংহ 'ধর্ম্ম'কে আপ্তবাক্য বা আত্মানুভূতি Revelation বা Inspirationএর উপর স্থাপিত না করিয়া মানবচিত্তবৃত্তি (human nature)এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে মনোবিশ্লেষণ বা psychological analysisএর সাহায্যে আমাদের চিত্তস্থিত বৃত্তিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া কোন্‌গুলির চরম উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন, অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানকেই 'ধর্ম্মে'র মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিলেন। এস্থলে একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে তাঁহার মনোবিশ্লেষণ নির্ভুল বা ত্রুটিহীন নয়, ইহা crude বা imperfect psychology এবং ইহাতে নানা ভ্রম-প্রমাদ আছে। কিন্তু এ-অভিযোগ সত্য হইলেও তিনি যে-কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে কোন ভ্রম আসে না, কেন-না তাঁহার মূল কথা এই যে মানবচিত্ত-বিশ্লেষণের উপর—অন্য কিছুর উপর নয়—ধর্ম্মকে স্থাপিত করিতে হইবে, যেহেতু আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলিই প্রমাণসম্ভব সত্য, এখানে কল্পনা বা ভাবুকতার স্থান নাই, বৃথা আড়ম্বর বা জঞ্জাল নাই। যে-সকল বিষয় মানুষের সাক্ষাৎভাবে জানা সম্ভব নয়, যেগুলি merely speculative, শাক্যসিংহ সে-জাতীয় বিষয় লইয়া তর্ক বা আলোচনার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত সাধারণ ধারণা ছিল যে ধর্ম্ম স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করে, কিন্তু সিদ্ধার্থ প্রচার করিলেন যে মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে আরোহণ করা, পূর্ণতার আদর্শের পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়াই 'ধর্ম্ম'; হৃদয়বৃত্তিগুলির চরমবিকাশ, অর্থাৎ self-cultureই 'ধর্ম্ম' বা পূর্ণচরিত্র-লাভের একমাত্র উপায় এবং পূর্ণচরিত্রলাভ ভিন্ন মানব-জীবনের চরম পরিণতি, মোক্ষ বা 'নির্ব্বাণ' লাভের অন্য কোনও পন্থা নাই। ভারতের ইতিহাসে শ্রীবুদ্ধের পূর্ব্বে কেহ self-cultureএর বার্ত্তা এমন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন নাই এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে জগতের এক জন first apostle of self-culture অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষবাদের প্রথম পুরোহিত বা হোতা বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধার্থের এই সাধনপন্থা কেবল পণ্ডিত, জ্ঞানী বা ধার্ম্মিকের জন্য নয়; ইহা সকলের জন্য, সর্ব্বসাধারণের জন্য এবং তিনি যে তাঁহার সকল শ্রোতাকেই এই পূর্ণচরিত্র লাভের আদর্শ দেখাইয়া উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করিতেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই self-cultureএর বাণী ঘোষিত হইলেও এখনও ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক, কেন-না আধুনিক জগৎও এই self-cultureকে ধর্ম্মসাধনে প্রধান স্থান দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এখনকার মনস্বিগণও ক্রমে ইহাকেই প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। শাক্যসিংহ আরও বলিলেন যে পূর্ণচরিত্র-সাধন প্রত্যেক ব্যক্তিরই লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং দেখাইলেন যে তাঁহার প্রদর্শিত 'ধর্ম্ম' বা সাধন-পন্থা পুরুষকারের ধর্ম্ম, কেন-না কেহ কখনও অন্যের নিকট হইতে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, শাস্ত্র বা গুরুর নিকট হইতে কেহ ইহা লাভ করিতে পারে না; প্রত্যেককে নিজের সাধন ও চেষ্টা দ্বারা ইহা অর্জ্জন করিতে হইবে, ইহা স্বোপার্জ্জিত বস্তু। তাঁহার মতে পূর্ণচরিত্র, বুদ্ধত্ব, সকলেরই অর্জ্জনীয়; তিনি এ-বিষয়ে কোনও বিশেষত্বের দাবি করেন নাই, বরং নিজেকে পূর্ব্ব বুদ্ধগণের অনুবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং পরে আরও বুদ্ধগণ আসিবেন তাহাও বলিয়াছেন। Self-cultureএর পথে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ, গুরু নয়; পথপ্রদর্শক মাত্র, লক্ষ্য বা উপাস্য নয়, এবং সেই জন্য শেষপর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিয়া গেলেন—"তোমরা আত্মদীপ হইয়া বিহার কর, আত্মশরণ হও, অনন্যশরণ হও; ধর্ম্মদীপ হও, ধর্ম্মশরণ হও, অনন্যশরণ হও।"

কিন্তু তাঁহার পারমিতা-তত্ত্ব—পূর্ণচরিত্রলাভ, আত্মোৎকর্ষ বা self-cultureএর এই বাণী, যাহা পণ্ডিত-অপণ্ডিত, ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য, তাহা ক্রমে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তির সূক্ষ্ম ও কূটবিচারে আচ্ছন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া লোপ পাইল এবং যে-আদর্শ দিতে তিনি জগতে আসিয়াছিলেন, যে বস্তু তাঁহার আদর্শের সার ছিল, অর্থাৎ পূর্ণচরিত্র-লাভ, তাহা অন্তর্হিত হইল। বলা বাহুল্য যে, যদি বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোনও তত্ত্ব আমরা আধুনিক সময়ে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকি, তবে তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ববিচার নয়, তাহা এই পারমিতা-তত্ত্ব, মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণবিকাশের তত্ত্ব।

"প্রিয়া যদি হ'ত রক্তগোলাপ যেন"

শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য

[সুইনবার্নের "If Love were as the rose is" কবিতার অনুবাদ]

১

প্রিয়া যদি হ'ত রক্তগোলাপ যেন,
আর—আমি হইতেম হরিৎ-চিকন্ পাতা ;—
শ্যামল হর্ষে, ধূসর বেদনে,
হিমপ্রান্তরে, ফুলভরা বনে,
দুখবরষায়, ফাল্গুনগগনে,
আমাদের দুটি জীবন রহিত একটি সূতায় গাঁথা।—
প্রিয়া যদি হ'ত রক্তগোলাপ যেন,
আর—আমি হইতেম হরিৎ-চিকন্ পাতা ॥

২

যদি হইতেম আমি গানের মধুর বুলি,
আর—প্রিয়া যদি হ'ত তার সাথে বাঁধা সুর ;—
রব—সুষমায় আহ্লাদভরে—
ফুল্ল অধর মিলিত অধরে ;—
চঞ্চুটি রাখি চঞ্চুর 'পরে
কপোতমিথুন বাদলবেলায় ভেজে যেন সুখাতুর।—
যদি—আমি হইতেম গানের মধুর বুলি,
আর—প্রিয়া যদি হ'ত তার সাথে বাঁধা সুর ॥

৩

তুমি যদি হ'তে জীবন, হে মোর প্রিয়া,
আর—আমি হইতেম মরণ, তোমার সাথী ;—
আলোক বিকশি, তুহিন ছড়ায়ে,
কুহেলি-কুসুম আলোকে জড়ায়ে
পালাতেম হিম- পতাকা উড়ায়ে,
যূথী-ভরা ঋতু আনিত যখন তারা-ছাওয়া মধুরাতি।—
তুমি যদি হ'তে জীবন, হে-মোর প্রিয়া,
আর—আমি হইতেম মরণ, তোমার সাথী ॥

৪

যদি—হইতেম আমি সুখের কিশোর দাস,
আর—তুমি যদি হ'তে ব্যথার সেবিকা প্রিয়া ;—
নিষেধ টুটিয়া যেতেম খেলায়ে
দীর্ঘ বরষে, ঋতুপর্য্যায়ে,
পিরীতি আসিত দিঠিতে ঘনায়ে,
দিনে হাসিরাশি, রাতে আঁখিজল উঠিত গো উছলিয়া
যদি—হইতেম আমি সুখের কিশোর দাস,
আর—তুমি যদি হ'তে ব্যথার সেবিকা প্রিয়া ॥

৫

তুমি যদি হ'তে ফাল্গুন বনরাণী,
আর—আমি হইতেম চৈত্রের ফুলরাজ ;—
রাত্রির বুকে ফুল ছড়াইয়া,
ফুলেল আলোতে আঁধর ছাইয়া,
দীর্ঘ দিনেতে পাতা উড়াইয়া
দিবসেরে সখি পরায়ে দিতেম ঘন রজনীর সাজ।—
তুমি যদি হ'তে ফাল্গুন বনরাণী,
আর—আমি হইতেম চৈত্রের ফুলরাজ ॥

৬

তুমি যদি হ'তে আহ্লাদ-রাজবালা,
আর—আমি হইতেম দুঃখের অধিপতি ;—
মনসিজে ধরি কত খেলাছলে,
পক্ষ তাহার বাঁধিতেম বলে,
উদ্দাম তার চরণের তলে
নৃত্যছন্দ-বাঁধন পরায়ে রুধিতেম তার গতি।—
তুমি যদি হ'তে আহ্লাদ-রাজবালা
আর—আমি হইতেম দুঃখের অধিপতি ॥

আকাশের দেশে

বৈমানিক শ্রীবীরেন রায়

ধরণীর শ্যামল বুকের উপর ব'সে থেকে মানুষের খেয়াল হ'ল মাটির উপরকার অনন্তের দেশে ছুটে যাবার। এ প্রচেষ্টা অতি আদিম যুগ থেকে চলে আসছে। প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক পুরাণে এরূপ উড়ো খেয়ালের অনেক নজীর আছে। ডীডালেসের গ্রীক আখ্যায়িকায় শোনা যায় যে এই তরুণবয়স্ক বীর ঈজিয়ান সমুদ্র উড়ে পার হয়ে সিসিলী-দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। আর ভারতীয় পুষ্পক-

ভবিষ্যতের রকেট-প্লেন

হের ক্রোনফেল্ড-এর এঞ্জিনহীন গ্লাইডার

রথের কথা কালিদাসের কাব্যেও আছে। মানুষ শুধু স্বপ্নের মায়াজালেই নিবদ্ধ থাকে না,—সে কল্পনার কুহেলিকা ভেদ ক'রে চিরকাল ছুটে চলেছে বাস্তবের সন্ধানে। তার কাছে কোন বাধাই দাঁড়াতে পারে না। গত অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাবতেও পারেন নি যে একদিন ভোরবেলা কলকাতা থেকে চট ক'রে পুরীতে গিয়ে সমুদ্রস্নান সেরে এসে দশটায় আবার আফিস করা যেতে পারে, বা এক মাসেরও কম সময়ে সারা পৃথিবীটায় একবার চক্র বা পরিক্রমা করা যেতে পারে। এ-বিষয়ে শুধু মহাকবি শেক্স্পীয়রের পরিকল্পিত হ্যামলেটের উক্তি মনে পড়ে—

"What a piece of work is man ! how noble in reason ! how infinite in falculties ! in form and moving how express and admirable ! in action how like an angel ! in apprehension

how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals!"—এই উক্তিটির শেষ কথা হচ্ছে—তবুও মানুষ ধূলার অধম। সেটা মানুষের মরণশীলতা,—তবে বিজ্ঞান যে রকম অদ্ভুত উন্নতিসাধন ক'রে চলেছে, তাতে মনে হয় ঈলিক্সার্ ভাইটী বা সঞ্জীবনী-সুধাও ভাবীকালের বৈজ্ঞানিকেরা একদিন আবিষ্কার ক'রে ফেলবেন। আমরা তার ফলভোগী হব না, এই যা দুঃখ।

সুদীর্ঘ সাধনা ও চেষ্টার ফলে আজ কি দাঁড়িয়েছে দেখা যাক। আজ মানুষ উড়ো জাহাজে ঘণ্টায় ৫০০ মাইলের উপর উড়তে পারে (ফ্লাইং অফিসার আগেলোর কৃতিত্ব দাঁড়িয়েছিল ঘণ্টায় ৪২৩ মাইল)। সে এঞ্জিন না নিয়ে শুধু হাওয়ার উপর পাখনার ভরে ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে যেতে পারে (নব-জার্মেনীর গ্লাইডিং ওস্তাদের রেকর্ড)। আজ সে এ-মাঠ হ'তে ও-মাঠ, সেখান থেকে কোন বাড়ির ছাতের উপর তার প্রিয় সখীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে পারে, অটোজাইরো চ'ড়ে উড়ো ব্যাঙের মত লাফিয়ে। তার অতীতের যা-কিছু স্বপ্ন, আজ সব সার্থক হয়েছে।
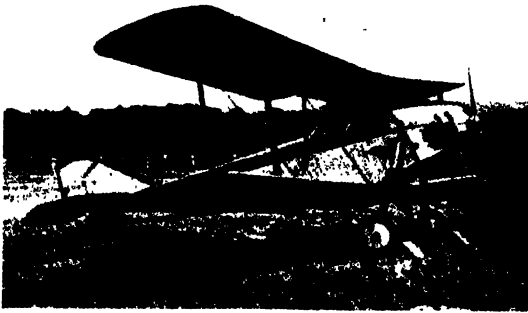
হাল্‌কা এয়ারোপ্লেন

ইতিহাসের পুরনো পাতায় বিখ্যাত ইটালীয়ান শিল্পী লেওনার্ডো ডা ভীঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) এক উড়ো পাখার খেলনা করেছিলেন এবং পাখনা মেলে উড়ে যাবারও চেষ্টা করেছিলেন। তার পর ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যর জর্জ কেলী (১৮০৯) মাটি থেকে জোরে ছেড়ে দিলে উড়ে যায়, এমনতর এক খেলনা বানিয়েছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অটো লীল্‌য়েন্টাল্‌ নামক এক জন জার্মান মানুষের ওড়ার কল্পনাকে সফল ক'রে সম্পূর্ণ পাখীর প্রতিচ্ছবির মত একটা উড়ো কল তৈরি করেন। এর দ্বারা তিনি মাটি থেকে হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছিলেন। এই গ্লাইডারকে (হাওয়ার ভরে উড়ো কল) তিনি এঞ্জিনে চালাতে গিয়ে মারা যান। উড়ো জাহাজের পথ-প্রদর্শক হিসাবে ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। তাঁরই কাজকর্ম্ম ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে বিলাতে পিলকর্, ফ্রান্সে ফার্ম্যান্ ও ভোআসিন্, এবং আমেরিকাতে ক্যানিউট্‌ ও রাইট ভ্রাতৃযুগল এ-বিষয়ে খুব গবেষণা চালাতে থাকেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এঁরা গ্লাইডারে মোটর লাগিয়ে এয়ারোপ্লেন বা আজকালকার উড়ো জাহাজ তৈরি করেন। বিমানপোত চালাবার ইহাই নবযুগ। আমেরিকায় নর্থ কারোলিনায় কিটি-হক নামক স্থানে উইলবার রাইট ও অর্ভিল রাইট দ্বাদশ ঘোড়ার জোরবিশিষ্ট মোটর চালিত একখানি বাইপ্লেনে দু-বার ওড়েন। প্রথম বার ওড়া হয় ১২ সেকেণ্ড ও দ্বিতীয় বার ৫৮ সেকেণ্ড। তিন বছর পরেই এঁরা এক বার ওড়েন ৩৮ মিনিট এবং না-নেমে একসঙ্গে ২৫ মাইল উড়ো পথে বিচরণ করেন।

এইবার এল পাখনা ছেড়ে মোটরের সাহায্যে শূন্যে সঞ্চরণ। পাখী যখন আকাশে উড়ে, তখন তার শারীরিক আনন্দ হয় প্রচুর, তাই কবির ভাষায় "হংস যেমন মানস-যাত্রী।" কিন্তু সে যন্ত্র-চালাবার একটা অবর্ণনীয় সুখ পায় না। মানুষ এইবার সেই সুখ উপভোগ করবার সুবিধা পেলে। অসীম বাতাসের সমুদ্রে মানুষ এইবার মাছের মত অবাধে সঞ্চরণ করবার শক্তি অর্জ্জন করলে। এঞ্জিন প্রয়োগ ও চালনা না করেও মানুষ সম্প্রতি আবার পাখীর মত উড়তে আরম্ভ করেছে জার্মেনীতে। অস্কার উর্সিমুস্ নামক এক জন জার্মেনের নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এঞ্জিনহীন বিমানপোত চালাবার আন্দোলন করেন। ভার্সাই সন্ধিসূত্রে যখন বিধ্বস্ত জার্মেনীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হ'ল ও জার্মেনী যখন বিমানপোত বৃদ্ধির কোনই সুবিধা পেলে না, তখন এই বিজ্ঞানবীর এঞ্জিনহীন বিমানপোত

চালাবার চেষ্টা ক'রে সন্ধির আইনে ফাঁক সৃষ্টি করিলেন। গ্লাইডারের কথা পরে বলব।

কুড়ি বছর পূর্ব্বে এয়ারোপ্লেন চলত সাধারণতঃ ঘণ্টায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল বেগে। আর আজ সে চলে সাধারণতঃ এক-শ দেড়-শ মাইল বেগে। আপাত দেখতে গেলে কুড়ি বছরে গতি-হিসাবে এয়ারোপ্লেনের খুব বেশী উন্নতি হয় নি। তবে উন্নতি হয়েছে অন্য দিকে প্রচুর। আগে বিমানপোত চালনা করা এক অসমসাহসিকতার কাজ ছিল, কারণ যন্ত্র বিগড়ে যাবার সম্ভাবনা ও প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা খুবই ছিল। অন্য ত্রুটিও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজ?—আজ দক্ষ চালকের হাতে পড়লে এয়ারোপ্লেনটি যে নিরাপদে চলবেই তাহার সম্ভাবনা শতকরা নব্বুই ভাগ। যে দশ ভাগ বাদ দেওয়া হ'ল, সেটাকে এই ভাবে ভাগ করা যেতে পারে—দশ ভাগের চার ভাগ নির্ভর করে চালকের সতর্কতা ও সাহসের উপর, চার ভাগ নির্ভর করে আকাশের অবস্থার উপর ও বাকী দু-ভাগ নির্ভর করে দেশের প্রাকৃতিক সংস্থান ও নামা-ওঠার সুবিধার উপর। তা ছাড়া আধুনিক যুগের এয়ারোপ্লেনকে বিজ্ঞানের দিক থেকে একেবারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা যেতে পারে। দুটি বিষয়ে এখনও বহু উন্নতি করবার আছে,—তা হচ্ছে জোরে চলা ও চট্ ক'রে ওঠা-নামার ব্যবস্থা করা। জোরে চলার উন্নতি সাধনের জন্য ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার যন্ত্রের পরীক্ষা চলেছে; এই যন্ত্র ৫০০ থেকে ১০০০ মাইল জোরে ঘণ্টায় যেতে পারে। ওঠানামার উন্নতি নির্ভর করছে সাইক্লোজাইরো এবং অটোজাইরোর উৎকর্ষবিধানের উপর। ঘণ্টায় দেড়-শ থেকে দু-শ মাইল বেগে আমেরিকার কোন কোন বিমানপথে (air-line) এবং জার্ম্মেনীর লুফ্‌ট্ হান্‌সা (এটি এক বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মান উড়ো জাহাজ কোম্পানীর নাম, অর্থ—উড়োপাখী) লাইনের কোন কোন বিভাগে ইতিমধ্যেই প্রচলিত হয়েছে। ঘণ্টায় দু-শ থেকে আড়াই-শ মাইলের উপর উড়তে পারে এমন উড়ো জাহাজ যুদ্ধ-বিভাগের জন্য সব দেশেই আজকাল ব্যবহার হচ্ছে। এই বেগ ও গতি সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য উড়ো জাহাজে আমদানী করবার দ্রুত চেষ্টা চলেছে এবং আশা করা যায় যে অদূর-ভবিষ্যতে, অর্থাৎ পরবর্ত্তী পাঁচ বছরের মধ্যেই, এই চেষ্টা সফল হবে। তখন সাধারণ গতিবেগ হবে মিনিটে চার মাইল, অর্থাৎ ঘণ্টায় আড়াই-শ মাইলের কিছু কম।

এই গতিবেগ বাড়াবার জন্য দেশ-বিদেশে যা চেষ্টা চলেছে, তা অদ্ভুত। উড়ো জাহাজের চালকের অসীম সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। তাকে দক্ষতাজ্ঞাপক মানপত্র দেবার পূর্ব্বে যে পরীক্ষায় ফেলা হয়, তা-ও অদ্ভুত। কিন্তু তার মধ্যে মারাত্মক বা কঠিন কিছুই নেই। ছয় বছর পূর্ব্বে যখন এক বিশিষ্ট প্রফেসর বন্ধুর সঙ্গে দমদমে প্রথমে একটি ছোট

গ্রাফ্ জেপেলিন
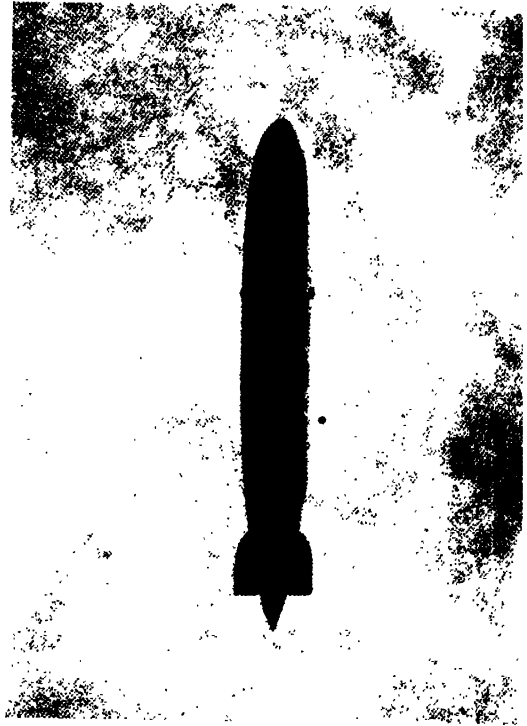
প্লেনে সখের খেয়ালে চড়ি, তখন আমাদের ডাচ্-চালকটিকে দেখে মনে হয়েছিল—এ বুঝি ইন্দ্রের পুষ্পক-রথ-চালক। আর আজ মনে হয় যে ব্যাপারটি ডাঙার উপর মোটরগাড়ী চালানর চেয়েও সোজা। কারণ ডাঙায় আছে সহস্র বাধা, ট্রাফিক পুলিস ও চাপা দেওয়ার ভয়। কিন্তু বিপুল বিহায়স্-প্রাঙ্গণের হাওয়া ও অবাধ মুক্তি প্রাণে এনে দেয় অসীম তৃপ্তি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে আজ মনে হয় যে বিমান-বীরদের

মত শান্ত ও স্থিতধী পুরুষ বোধ হয় অধ্যাত্ম-চর্চ্চারত ঋষি ব্যতীত দুনিয়ায় আর কেউ নেই।

উড়ো জাহাজ ছাড়া আকাশপথ জয় করবার আর এক উপায় হচ্ছে—আজকালকার বেলুনে এঞ্জিন দেওয়া সংস্করণ জেপেলিন্। ইহার আবিষ্কর্ত্তা গ্রাভ্ ফন্ জেপেলিন (গ্রাভের অর্থ কৌণ্ট্)। ইনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মোটা সিগারের মত আকৃতি দিয়ে তলায় ও সামনে প্রোপেলর ও এঞ্জিন দিয়ে এক বৃহদাকার বিমানপোত তৈরি করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার আধুনিক মূর্ত্তি রচিত হয়। প্রথমে লোকে এই বুড়ো সৈন্যকে পাগল সাব্যস্ত করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এই যন্ত্রের অনেক উন্নতি হয়। গত মহাযুদ্ধের সময়

টেল্-লেস্ মেশিন

এইরূপ জেপেলিনগুলা ইংলণ্ডের উপর বোমা নিক্ষেপ করে ও আরও অনেক অতিমানুষিক কাজ করে। ইহার কতকটা পরিচয় 'হেলস্ এঞ্জেলস্' নামক চলচ্চিত্রে পাওয়া যায়। একেই যথার্থ উড়ো জাহাজ বলা যেতে পারে।

জেপেলিনের উপরের অংশ আলুমিনিয়ম ধাতুতে নির্ম্মিত ও কয়েকটি বড় বড় গ্যাস্-ব্যাগে বিভক্ত। জার্ম্মান্ সেনা-বিভাগের *L 33* নামক জেপেলিন্খানি ইংরেজরা যুদ্ধের সময় দখল ক'রে তার কলকৌশল সব বুঝে নেয় ও দু-খানা রিজিড্ বিমানপোত তৈরি করে। তাদের নাম *R 33* ও *R 34*। জার্ম্মেনীর গ্রাভ্ জেপেলিন *L. Z. 127* (ডক্টর একনের-চালিত) একুশ দিনে একুশ হাজার মাইল ভ্রমণ ক'রে পৃথিবী পর্য্যটন করেছে। যাত্রার পথে এই উড়ো জাহাজখানি মাত্র তিন জায়গায় থেমেছিল—লোস্ এ্যাংগেলেস, নিউ ইয়র্ক, ও টোকিও। আবার টোকিও থেকে জার্ম্মেনীতে যাবার সাড়ে সাত হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছিল পুরা এক-শ ঘণ্টায় একবারও না থেমে। এই উড়ো জাহাজখানি এখন প্রায় আড়াই বছর যাবৎ নিয়মিত ভাবে জার্ম্মেনী থেকে দক্ষিণ-আমেরিকায় বুয়েনস্-আয়ার্সে ডাক ও আরোহী নিয়ে না থেমে অবলীলাক্রমে পাঁচ-ছয় হাজার মাইল যাতায়াত করছে। ইহা এখন অতি সামান্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ড ইহাকে অনুকরণ ও অতিক্রম করতে গিয়ে জার্ম্মান ওস্তাদদের কাছে হার মেনেছে ও প্রত্যেক যন্ত্রটি ভেঙেছে। কার্য্যকরী করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। জার্ম্মেনী আর একখানি *L. Z. 129* তৈরি করছে এবং শীঘ্রই সেটি সাধারণের কাজে লাগবে। এই জেপেলিন থেকে গ্লাইডারের (যার নব-পর্য্যায় জার্ম্মেনীতে আবার আরম্ভ হয়েছে) দ্বারা গ্রামে গ্রামে ডাক ও আরোহী ফেলে দিয়ে আসল উড়ো জাহাজখানি একবারও না থামিয়ে চলে যাবার নূতন ব্যবস্থা হচ্ছে এবং শীঘ্রই ইহা সম্পূর্ণ সফল হবে। অতিকায় জেপেলিনের পাল্লায় জার্ম্মেনী অতিকায় উড়ো প্লেন ও তারই সমুদ্রে নামবার সংস্করণ সীপ্লেন্ আবিষ্কার করেছে। জার্ম্মেনীর ডোর্নে্যা কোম্পানী নির্ম্মিত *D. O. X.* ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম তৈরি হয়। এই সীপ্লেনটি পৃথিবীর মধ্যে অতি অদ্ভুত উড়ো জাহাজ। ইহাতে বারো-খানা জোরালো এঞ্জিন আছে পাশাপাশি এবং প্রথম পরীক্ষার সময় ১৬৯ জন আরোহী নিয়ে একটি হ্রদ থেকে মাত্র আটখানি এঞ্জিন চালিয়ে স্বচ্ছন্দে উড়তে পেরেছিল ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগে। এই উড়ো জাহাজখানি দারুণ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়েছে, মাঝে মাঝে সমুদ্রেও নেমেছে, অথচ একটুও ক্ষতি হয় নি। এতে প্রকাণ্ড হল্ ও প্রমোদ-পথ (promenade) আছে, নাচগানের বিরাট বৈঠকখানা আছে, প্রকাণ্ড হোটেল আছে ও সভ্য মানুষের সুখসুবিধার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন সবই আছে। এই উড়ো জাহাজখানি দেখতে ঠিক জেপেলিনের মত। প্রতিদিন সকালে এই উড়ো জাহাজের

উপরই খবরের কাগজ ছাপা হয়ে আরোহীদের সরবরাহ করা হয়। যাত্রাকালে বেতার দিয়ে দুনিয়ার সব খবর সংগ্রহ করা হয়। এটি দেড়-শ ফুট লম্বা (যদিও সাধারণতঃ জেপেলিন লম্বা হয় ছ-শ থেকে সাত-শ ফুট)। এতে ৭০টি সুন্দর খাটিয়া বা বিছানা আছে। যাত্রীগ্রহণকারী সাধারণ এয়ারোপ্লেন আঠারো থেকে কুড়ি জন মাত্র আরোহী নেয়। এতেই জার্ম্মেনীর এই উড়ো জাহাজখানির অতিকায়ত্ব প্রমাণ হচ্ছে। জার্ম্মেনী সম্প্রতি এই রকম একখানি উড়ো জাহাজ ইটালীকে তৈরি করে দিয়েছে, *D. O. X*এর অনুকরণে।

বারো এঞ্জিনযুক্ত ডোর্ন্সে ডি. ও. এক্‌স্ ফ্লায়িং-বোট

বিমানপোতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সীপ্লেনও ও জেপেলিনের দ্বন্দ্ব চলবে। ইহাদের সঙ্গে স্থলে যোগাযোগ করবার জন্য ইয়ুঙ্কার (Junker) কোম্পানী *G. 38*-ধাঁজের অতিকায় এয়ারোপ্লেন তৈরি করেছে। এগুলি না থেমে একেবারে হাজার মাইল যায়, ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগে। তবে জেপেলিনের ভবিষ্যতে শত্রু হয়ে দাঁড়াবে *D. O. X.*-ধাঁজের সমুদ্র-বিমানপোত ও *G. 38*-ধাঁজের উড়ো জাহাজ। তার কারণ এই যে এয়ারোপ্লেনের গতিবেগ জেপেলিনের চেয়ে ঢের বেশী; তবে জেপেলিনেরও সুবিধা এই যে একটুও না-থেমে এরা স্বচ্ছন্দে ছ-সাত হাজার মাইল যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ এয়ারোপ্লেনের পক্ষে এক হাজার মাইল একাদিক্রমে উড়ে থামা নিশ্চয়ই দরকার এবং আকারে একটু বড় হলেই বেশী দূরে যাওয়া এদের কাছে অসম্ভব।

জার্ম্মেনীর *G. 38*-এর মত ও আকারে সামুদ্রিক উড়ো জাহাজ ডোর্নে'র *D. O. X*-এর মত সোভিয়েট রাশিয়া ম্যাক্সিম্ গর্কি নামক এক প্রকার উড়ো জাহাজ নির্ম্মাণ করেছে।* পঞ্চাশ জন যাত্রী নিয়ে এই এয়ারোপ্লেন উড়তে পারে। রুশেরা এই উড়ো জাহাজের পথ বিস্তার ক'রে আকাশপথে রেলগাড়ী চালাবার ব্যবস্থা করছে। এদের পিছনে এঞ্জিন-বিহীন অথচ চালকযুক্ত তিন-চারখানি ক'রে গ্লাইডার্ থাকে। এয়ারোপ্লেন চলন্ত অবস্থায় ইচ্ছামত এক-একখানি গ্লাইডার্ খুলে দেয় ও গ্লাইডারগুলি হাওয়ার ভরে চালকসহ এক-একখানি ক'রে যথাগন্তব্য পথে নেমে পড়ে এবং ডাক ও আরোহী নামিয়ে দেয়। কোনই বিপদ হয় না এবং আসল উড়ো জাহাজখানিকে থামতেও হয় না। এ-বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়া বিমানপোতের ইতিহাসে নবযুগ রচনা করছে।
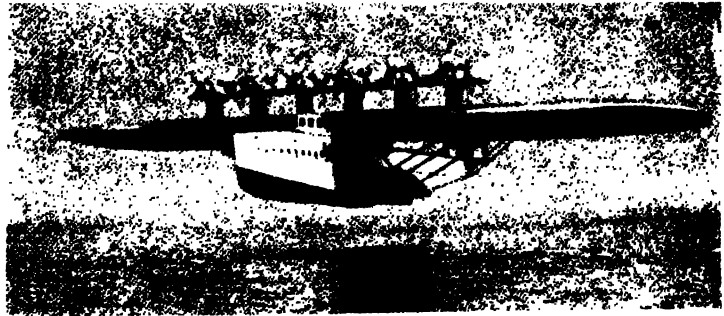
বিমানপোত-বিজ্ঞানের এই যে দ্রুত উন্নতি, গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধই ইহার জন্য দায়ী। শান্তির সময়ে মানুষের মনে প্রেরণা আসে না এবং কোনরূপ প্রচেষ্টাও অসম্ভব। যুদ্ধের সময়ে মানুষের ধন-প্রাণ রক্ষার চেষ্টা উগ্র হয়ে উঠে ও সে নানা উপায় উদ্ভাবন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। যুদ্ধের পর আজ জার্ম্মেনীতে আর এক প্রচেষ্টা চলেছে—তাহা এঞ্জিন-বিহীন গ্লাইডার্সে'র প্রচলন। এইগুলি হাওয়ার ভরেই ছোটে ও হাওয়ার ভরে ওঠা-নামা করে। আজ জার্ম্মেনীর প্রত্যেক স্কুল-কলেজে এঞ্জিনশূন্য গ্লাইডারে নিজের অঙ্গচালনা এবং আকাশের অবস্থার খুঁটিনাটি লক্ষ্য ক'রে প্রত্যেক ছেলের মনে নব প্রেরণা জাগিয়ে দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য হয়েছে। এই এঞ্জিনহীন গ্লাইডারের উন্নতি সোভিয়েট রাশিয়াতে কতখানি হয়েছে তা আগেই বলেছি। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে ১৯২৩-২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সাধারণের মনে উড্ডীয়ন-লিপ্সা ও কৌতূহল জাগিয়ে তোলবার জন্যে অনেক হাল্‌কা

* ইহা সম্প্রতি বিনাশ পাইয়াছে।

উপর হইতে কলোন শহর ও গীর্জ্জার দৃশ্য

ওড়বার দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি এখানে। ফ্রান্সের কোডস্ ও রসি দু-বার আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়েছেন ও না-থেমে ৫,৫৯৭ মাইল উড়ে গেছেন। জার্ম্মেনীর কুমারী বেইনহর্ন্ (১৯৩১-৩২) এই সেদিন সমস্ত পৃথিবীটা চক্র দিয়ে এলেন; ইনি পথের মাঝে কলকাতাতেও নেমেছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী য়্যামীলিয়া ইয়্যারহার্ট একা আটলান্টিক মহাসাগর পার হ'লেন। কুমারী জীনব্যাটেন্ নামক এক জন

এয়ারোপ্লেন ক্লাব স্থাপিত হয়েছে। এদের প্রচুর সরকারী সাহায্যও দেওয়া হয়। ফ্রান্সে এয়ারোপ্লেন-ক্রেতাকে সরকার সমস্ত সুবিধা দেন সেই উড়োজাহাজ-নির্ম্মাতা কোম্পানীকে অর্থ জুগিয়ে। এতে লোকের মনে ওড়বার প্রবৃত্তি ও তাড়না বেড়েই চলেছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে জনকয়েক বৈমানিক ছাড়া এ-বিষয়ে কেহই অনুসন্ধিৎসু নন এবং ব্যাপারটি নিয়ে রাষ্ট্র-সভায় কোন আলোচনাও হয় না। যে-সব আলোচনা হয়েছে, তা-ও ভ্রমপ্রমাদসঙ্কুল। এতেই মনে হয় আমাদের "সমুখে রয়েছে ঘোর সুচির শর্ব্বরী।"

নিউজিল্যাণ্ডের মেয়ে বার-তিনেক পড়ে গিয়ে ও আঘাত পেয়েও পক্ষাহের মধ্যে লণ্ডন থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় উড়ে গেলেন। আমেরিকার ওয়াইলী পোষ্ট্ ও হ্যারল্ড গ্যাটি মাত্র আট দিনে ভূপ্রদক্ষিণ করলেন এবং পরে হ্যারল্ড গ্যাটি এক সপ্তাহে ভূপর্য্যটন করলেন। এই ঝোঁকে ডেল জ্যাক্সন ও ফরেষ্ট্ ওব্রায়েন্ একটি এয়ারোপ্লেনে আটাশ দিন ধরে শূন্যমার্গে পড়ে রইলেন। এঁরা সমস্ত সময়টা উপরেই খাওয়া-দাওয়া সেরেছেন ও শূন্যেই নীচু থেকে পেট্রল নিয়েছেন। একেই বলে অদম্য উৎসাহ ও সাহস।

পৃথিবীর ভীষণতম বিষধর অহিরাজ শঙ্খচূড়

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু, বি-এ

বিষধর সর্পের মধ্যে এদেশের শঙ্খচূড় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর সর্প। আকার, তেজ ও বিষের উগ্রতায় ইহারা পৃথিবীর সকল বিষধর সর্পকে অতিক্রম করিয়াছে। ভারতবর্ষের গোক্ষুর, কালাচ চন্দ্রবোড়া; আফ্রিকার মাম্বা, পফ্‌অ্যাডার্, গেবুন ভাইপার্, থুৎকারী গোক্ষুর; আমেরিকার ঝুমঝুমি সর্প, কোরাল স্নেক্, কপার হেড্ ও মোকাসিন্ সর্প; দক্ষিণ-আমেরিকার লান্স্‌হেডেড্ ভাইপার্ বা সড়্‌কিমুখো বোড়া ও 'বুশ্ মাষ্টার' এবং অষ্ট্রেলিয়ার বৃহৎ ব্রাউন্ স্নেক্, ডেথ্-অ্যাডার্, বাঘা সাপ (টাইগার্ স্নেক্) প্রভৃতি হইতেও এদেশের শঙ্খচূড় অতি প্রবল ও ভয়ঙ্কর বিষধর। অত্যন্ত তীব্র বিষ, ভীষণ তেজ ও দেহের সুদীর্ঘ আকারের নিমিত্ত ইহারা উড়িষ্যা দেশে অহিরাজ নামে পরিচিত হইয়াছে। বিষাক্ত সর্পের মধ্যে আফ্রিকার কৃষ্ণ 'মাম্বা' সর্প প্রায় ১২ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের দেহ আদৌ স্থূল নহে এবং মস্তকে ফণাও থাকেনা। মাম্বারা অত্যন্ত বিষাক্ত সর্প হইলেও শঙ্খচূড়দের মত তাহাদের আকৃতি আদৌ ভীতিপ্রদ নহে। উত্তর-অষ্ট্রেলিয়ার বিষাক্ত ব্রাউন সর্পেরা খুব বৃহৎ হইলেও কিঞ্চিদধিক দশ ফুটের উপর দীর্ঘ হয় না। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বুশ মাষ্টারও প্রায় বার ফুট অবধি লম্বা হয়। ইহাদের বিষ অন্য বিষাক্ত সর্পের বিষের তুলনায় সেরূপ উগ্র নয়। কিন্তু বিষদন্ত বৃহৎ হওয়ায় ও দংশনে অত্যধিক বিষ নিঃসৃত হওয়ায় ইহাদের দংশন বিশেষ মারাত্মক। সেই কারণে ইহাকে আমেরিকার শঙ্খচূড় বলা যাইতে পারে। কিন্তু দেহায়তনে ও অত্যুগ্র মারাত্মক বিষের জন্য শঙ্খচূড়েরাই পৃথিবীর সকল বিষধর সর্পের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

শঙ্খচূড়ের বৈজ্ঞানিক নাম নায়া হান্না (Naia hanna) এবং ইংরেজী নাম কিং কোব্রা বা "হামাড্রায়াড্"। সর্প ধরিয়া আহার করে বলিয়া ইহাদের অন্য নাম "ওফিওফেগাস্ ইলাপ্স," "ওফিওফেগাস্ বঙ্গেরাস্," স্নেক্-ইটিং কোব্রা বা সর্পভুক্ গোক্ষুর। এই নাম হইতেই বুঝা যায় যে ইহারা

শঙ্খচূড়ের ফণা
মূকবধির শ্রীমণীন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক অঙ্কিত

গোক্ষুর-জাতীয় সর্প এবং নানা জাতীয় ভুজঙ্গই ইহাদের সাধারণ আহার। এদেশের যে-সকল স্থানে গোক্ষুরের বাস, প্রায় সেই সকল স্থানেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর, পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতে ইহাদিগকে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ, শ্যামরাজ্য, ইন্দোচীন, মালয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-

চীনরাজ্য শঙ্খচূড়ের প্রধান বাসস্থান। চীনরাজ্যে ক্যানটন ও ফুচাউ-এর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশ ও শ্যামরাজ্যের গভীর জঙ্গলে ইহারা প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে ইহার নাম mwe-houk-gyi। ফিলিপাইন্‌ দ্বীপপুঞ্জের নিবিড় বনে অতি বৃহদাকার শঙ্খচূড় থাকিতে দেখা যায়।

গোক্ষুর-জাতীয় সর্প হইলেও সাধারণ গোক্ষুর হইতে ইহাদের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। গোক্ষুররা সাধারণতঃ চার, পাঁচ বা ছয় ফুট অবধি লম্বা হইয়া থাকে; শঙ্খচূড়রা চৌদ্দ-পনর ফুট অবধি লম্বা হয়। শঙ্খচূড় বার ফুট

উত্তেজিত শঙ্খচূড়
মূকবধির শ্রীমণীন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক অঙ্কিত

অবধি দীর্ঘ হয় বলিয়াই সাধারণতঃ শুনা যায়, কিন্তু ষোল এবং আঠার ফুট লম্বা শঙ্খচূড়ের বিবরণও পাওয়া গিয়াছে। উত্তেজিত হইলে গোক্ষুরদের ফণা বেশ প্রসারিত হয়; শঙ্খচূড়দের ফণা আদৌ প্রসারিত হয় না। দেহের অনুপাতে ইহাদের ফণা অতি ক্ষুদ্র ও অসম্প্রসারিত। ফণার আকার দেখিলে মনে হয় শঙ্খচূড় বিশেষ ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হয় নাই। নিম্নে শঙ্খচূড়ের ফণার চিত্র অর্পিত হইল। ক্রুদ্ধ ও দংশনোন্মুখ শঙ্খচূড়ের ফণা ইহার অধিক প্রসারিত হয় না। গোক্ষুর কেউটিয়ার বিস্তৃত ফণার উপর যথাক্রমে গোষ্পদ বা গোলাকার চিহ্ন অঙ্কিত থাকে; শঙ্খচূড়দের ফণার উপর কোণাকৃতি (∧) একটি মোটা দাগ অঙ্কিত থাকিতে দেখা যায়। গোক্ষুরেরা লোকালয়ে বা জনপদের সন্নিকটে ছোটখাট বনজঙ্গলে বাস করে এবং ইন্দুর ও ভেক প্রভৃতির অন্বেষণে লোকালয়ে প্রবেশ করে, কিন্তু শঙ্খচূড়কে এরূপ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। গভীর বনজঙ্গলই ইহাদের বাসস্থান। এদেশে বাংলার উত্তরে হিমালয়ের নিবিড় অরণ্যে, সুন্দরবনে এবং আসামের জঙ্গলে মধ্যে মধ্যে শঙ্খচূড় দেখিতে পাওয়া যায়। গোক্ষুর শুধু স্থলেই অবস্থান করে; শঙ্খচূড়েরা জলে, স্থলে এবং বৃক্ষেও অবস্থান করিয়া থাকে। অনেক সময়ে বৃক্ষের শাখার উপর ইহাদিগকে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখা যায় বলিয়া ইহাদিগকে tree cobra বা "গেছো গোক্ষুর"ও বলা হয়। জলের মধ্যে ইহারা সুন্দর সন্তরণ দিতে পারে। সন্তরণ দিবার সময় ইহারা মস্তকটিকে জলের উপর অনেকখানি বাহির করিয়া রাখে। জলের মধ্যে সমুন্নত মস্তক দেখিয়াই ইহাদের চিনিতে পারা যায়। গোক্ষুরের প্রকৃতি অনেকটা শান্ত ভাবের, শঙ্খচূড়ের প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র। গোক্ষুরের ভাব দেখিলে উহাকে ভীরু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু শঙ্খচূড়কে কখনও ভীত হইতে দেখা যায় না। লোক দেখিলেই বা সামান্য পদশব্দ পাইলেই ইহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া বেগে আক্রমণ করে। গোক্ষুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও ইহাদের কবল হইতে নিস্তার পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। বিশেষতঃ প্রজনন-কালে ইহাদের সম্মুখে পড়িলে আর রক্ষা থাকে না।

শঙ্খচূড়কে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ আমি বহুবার লাভ করিয়াছি। প্রায় ষোল বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুরে বাংলার দক্ষিণাঞ্চল নিবাসী কতকগুলি সাপুড়িয়ার নিকট যেরূপ বৃহৎ শঙ্খচূড় দেখিয়াছিলাম, সেরূপ প্রকাণ্ড সর্প আর কখনও দেখিতে পাই নাই। সাপুড়িয়াদের একটি দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক বালক সর্পের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল, সর্পটিও ফণা উন্নত করিয়া বালকটির প্রায় মস্তক অবধি উচ্চ হইয়াছিল। মাস-কয়েক

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পাণ্ডব-মন্ত্রণাসভায় দ্রৌপদী

শ্রীচিন্তামণি কর

পূর্ব্বে আলিপুরে জিরাট পোলের নিকট কতকগুলি মুসলমান সাপুড়িয়ার নিকট বেশ বৃহদাকার ও তেজী শঙ্খচূড়কে দেখিয়াছিলাম। সর্পটি তখন প্রায় দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইয়া অবস্থান করিতেছিল। লোক জমিতে দেখিয়া সাপুড়িয়ারা ভয়ে তাহাকে তাড়াতাড়ি ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফেলিয়াছিল। আলিপুর পশুশালায় প্রায়ই একটি দুইটি করিয়া শঙ্খচূড় রক্ষিত হইতে দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে আলিপুর জীবনিবাসে দুইটি শঙ্খচূড় রক্ষিত হইয়াছে। দুইটির বর্ণ কিন্তু বিভিন্ন। সাধারণতঃ ইহাদের বর্ণ ফিকা সবুজ ও ফিকা হরিদ্রায় মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং তাহার উপর তিন-চার অঙ্গুলি অন্তর কাল-বর্ণের একটি করিয়া মোটা ডোরা অঙ্কিত থাকায় ইহাদের আকৃতিও বেশ সুন্দর দেখাইয়া থাকে। ইহাদের পুচ্ছের শেষাংশের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। কলিকাতার যাদুঘরেও দুইটি বৃহৎ শঙ্খচূড়ের মৃতদেহ ও একটি বৃহৎ শঙ্খচূড়ের সম্পূর্ণ কঙ্কাল রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি শঙ্খচূড় দৈর্ঘ্যে ১৩ ফুট ৫ ইঞ্চি। দেহের দীর্ঘতা অনুযায়ী ইহাদের দেহের ওজনও নির্ণীত হইয়াছে। ১৩, ১৪, এবং ১৫ ফুট দীর্ঘ শঙ্খচূড়ের ওজন যথাক্রমে ১৩, ১৪ এবং ১৬ পাউণ্ড অবধি হইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার যাদুঘরে শঙ্খচূড়ের ছিন্ন মস্তকও আরকের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। এই মুণ্ডটির মধ্যে ইহাদের বিষ-গ্রন্থিটি বাহির করিয়া দেখান হইয়াছে।

গভীর জঙ্গলের জীব হইলেও কলিকাতার উপকণ্ঠে শিবপুর বনোদ্যানে একবার একটি শঙ্খচূড়কে বধ করা হইয়াছিল। সর্পটি মাত্র ৮ ফুট ৩½ ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল। ইহার পর কলিকাতার সন্নিকটে শঙ্খচূড়ের আবির্ভাবের কথা আর বড় শুনা যায় নাই। সর্পদের মধ্যে সর্পীরা সাধারণতঃ আকারে বৃহৎ হইয়া থাকে। শঙ্খচূড়দের মধ্যে এ রীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাদের মধ্যে সর্পী অপেক্ষা সর্পের বর্ণই অধিক উজ্জ্বল ও সুন্দর হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সর্প ও সর্পীর বর্ণ এরূপ বিভিন্ন হয় যে উহাদিগকে বিভিন্ন জাতীয় বিষধর বলিয়াই বোধ হয়।

গোক্ষুর-প্রধান স্থলে বাস হইলেও ইহাদের সংখ্যা গোক্ষুরদের মত আদৌ বিস্তৃত নহে। গভীর বনজঙ্গল ব্যতীত ইহাদের দর্শনের প্রত্যাশা করা যায় না এবং সে-সকল স্থলেও ইহাদের সংখ্যা অল্প বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে। গভীর বনজঙ্গলে বাস না হইলে এবং সংখ্যায় অল্প না থাকিলে শঙ্খচূড়ের ভয়ে নর ও পশুকে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হইতে হইত। উত্তর-শ্যাম রাজ্যের শালবনে ইহাদের অত্যাচারের কথা শুনা গিয়াছে। এই গভীর জঙ্গল হইতে কর্ত্তিত শালবৃক্ষ-সকল টানিয়া বাহির করিবার জন্য শালব্যবসায়ীরা কতকগুলি শিক্ষিত হস্তী নিযুক্ত করিয়া থাকে। জঙ্গলের মধ্যে শঙ্খচূড়রা মধ্যে মধ্যে এই সকল হস্তীকে দংশন করিয়া কাষ্ঠব্যবসায়ীদের বিশেষ ক্ষতি করে। এই সকল শালের জঙ্গলে প্রতি বৎসর শঙ্খচূড়ের দংশনে দুই-তিনটি করিয়া শিক্ষিত হস্তী প্রাণ হারাইয়া থাকে। হস্তীর গাত্রচর্ম্ম বিশেষ স্থূল বলিয়া প্রথমে সর্পদংশনের ফলে মৃত্যু হওয়ার বিষয় অনেকে বিশ্বাস করেন নাই। হস্তীর শুণ্ডাগ্রে অথবা পদনখরের মধ্যবর্ত্তী কোমল মাংসে শঙ্খচূড়েরা দংশন করিয়া উহাদের প্রাণনাশ করে। পূর্ব্বোক্ত হস্তীদের নখরের মধ্যবর্ত্তী কোমল মাংসে শঙ্খচূড় দংশন করিয়াছিল এবং তাহার ফলে তিন ঘণ্টার মধ্যেই উহাদের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছিল।

দেহের আকারানুযায়ী ইহাদের মুখের মধ্যে বিষদন্ত ও বিষগ্রন্থীর আকারও বিশেষ বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। কলিকাতার যাদুঘরে শঙ্খচূড়ের যে কর্ত্তিত মুণ্ড রক্ষিত হইয়াছে তাহার পার্শ্বের ত্বক উঠাইয়া সম্পূর্ণ বিষগ্রন্থিটি রক্ত-বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে। সাধারণ গোক্ষুর ও অন্যান্য বিষাক্ত সর্পের বিষগ্রন্থিও এই ভাবে উন্মুক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহাদের বিষদন্ত যে কিরূপ বৃহৎ তাহা যাদুঘরে রক্ষিত শঙ্খচূড়ের কঙ্কালস্থিত মুণ্ডটি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। উত্তেজিত হইলে ইহারা ভূমির উপর হইতে প্রায় চার-পাঁচ ফুট দাঁড়াইয়া উঠে এবং যষ্টির মত সোজা হইয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। এই সময়ে ইহাদের চোখের ভাব দেখিলেও ভয় হয়। ফণা প্রসারণের সহিত গোক্ষুরেরা যেমন গ্রীবা বক্র করিয়া দুলিয়া থাকে শঙ্খচূড়দের মধ্যে সে-রীতি আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। ঈষৎ ফণা প্রসারণের সহিত ইহারা একেবারে ঋজু ভাবে দাঁড়াইয়া উঠে ও কিছু ক্ষণ নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। একটি উত্তেজিত শঙ্খচূড়ের চিত্র প্রদত্ত হইল।

দংশনের সময় ইহারা ইহাদের বৃহৎ বিষদন্ত জীবজন্তুর দেহে মোক্ষম ভাবে বসাইয়া দেয় এবং দষ্টস্থান কামড়াইয়া ধরিয়া চর্ব্বণ করিবার রীতিতে প্রথম দষ্টস্থানের পার্শ্বে আরও কয়েক বার বিষদন্ত প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়, ইহার ফলে দষ্ট ব্যক্তির দেহে অত্যধিক মাত্রায় বিষ প্রবেশ করে। সাধারণ গোক্ষুরের দংশনে যে-পরিমাণ বিষ প্রবিষ্ট হয় শঙ্খচূড়ের দংশনে তাহার পঞ্চগুণ বিষ নির্গত হইয়া থাকে। গোক্ষুর দংশন করিলে সাধারণতঃ প্রায় ২১ মিলিগ্রাম বিষ বিষগ্রন্থি হইতে বাহির হইয়া পড়ে; শঙ্খচূড়ের এই প্রকার দংশনে প্রায় এক শত মিলিগ্রাম বিষ নিঃসারিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষের আধিক্যে ও উগ্রতায় দষ্ট প্রাণীর অচিরে প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে। ইহাদের বিষের ক্রিয়া যে কিরূপ ভীষণ তাহা চিন্তা করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। শঙ্খচূড়ের বিষে শরীরের সমস্ত রক্ত শিরার মধ্যে একেবারে জমিয়া যায়। ইহাদের সামান্ত বিষ লইয়া একবার একটি মোরগের পায়ে সূচিকা দ্বারা প্রবিষ্ট করান হইয়াছিল। ইহার ফলে মোরগের দেহের সমস্ত রক্ত জমাট বাঁধিয়া তিন ঘণ্টার মধ্যে উহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ইহাদের বিষ উজ্জ্বল গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের হইয়া থাকে। বিষদন্ত ভাঙিয়া দিবার পরেও ইহাদের বিষগ্রন্থিতে চাপ দিলে বিষ বাহির হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর গড়ে বিশ হাজার মানুষ ও প্রায় পঞ্চাশ হাজার গবাদি সর্পদংশনে মারা যায়। শঙ্খচূড়ের সংখ্যা অল্প না হইলে এই মৃত্যুর হার যে কিরূপ ভীষণ হইত তাহা ভাবিলেও শঙ্কা আসে। গভীর জঙ্গলে বাস করে বলিয়া শঙ্খচূড়ের দংশনের কথা প্রায়ই শুনা যায় না।

এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যেই গোক্ষুর-জাতীয় সর্পেরা অণ্ড প্রসব করে এবং মে হইতে জুন মাসের মধ্যে ইহাদের অণ্ড হইতে শাবক নির্গত হইয়া থাকে। শঙ্খচূড়েরাও এই সময়ের মধ্যে অণ্ড প্রসব করে। অণ্ড প্রসব করিবার পূর্ব্বে ইহারা প্রসূত ডিম্বগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য তৃণ ও শুষ্ক পত্রাদির দ্বারা এক প্রকার নীড় রচনা করে। এই নীড়ের মধ্যে অণ্ডগুলিকে রক্ষা করিয়া ইহারা অঙ্গতাপ প্রদান করে। ইহাদের এই নীড়কে কেহ যেন পক্ষিনীড়ের মত সুগঠিত বলিয়া ধারণা না করেন। বনের মধ্যে শাখা-বিগলিত শুষ্ক পত্রাদির স্তূপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ও সেগুলিকে অঙ্গ বেষ্টনে একত্র পুঞ্জীভূত করিয়া ইহারা তন্মধ্যে ডিম্ব প্রসব করে।

সাধারণ সর্পদের মধ্যে অপত্য-স্নেহের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কেবল ময়ালেরা প্রসূত অণ্ডকে অঙ্গবেষ্টনের মধ্যে রক্ষা করিয়া দেহতাপ প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং শাবক নিষ্ক্রান্ত না-হওয়া অবধি অণ্ডগুলিকে পরিত্যাগ করে না। শঙ্খচূড়েরাও এই রীতিতে অণ্ড রক্ষা করিয়া থাকে। ইহাদের দেহতাপ ও বিগলিত পত্র ও তৃণাদির তাপে ইহাদের অণ্ডগুলি পরিপুষ্টি লাভ করে। ময়াল-সর্পীর মত ইহারা অণ্ড লইয়া নিশ্চল ভাবে পড়িয়া থাকে না। সে সময় নীড়ের নিকট কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলে একেবারে উত্তেজিত হইয়া তাহাকে তাড়া করে। ইহাদের আচরণে বোধ হয় অঙ্গতাপ প্রয়োগ করা অপেক্ষা অণ্ডগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই সর্পী উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া পড়িয়া থাকে। এই সময় উহারা কোনও প্রকার আহারও গ্রহণ করে না। অণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর শাবকগুলিকে শঙ্খচূড়ের শাবক বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। তখন শিশু-শঙ্খচূড়ের দেহের বর্ণ একেবারে কৃষ্ণ হইয়া থাকে এবং তাহার উপর শ্বেত-বর্ণের সরু সরু ডোরা থাকিতে দেখা যায়। এই সময়ে ইহাদিগকে দেখিলে অন্য সর্পের শাবক বলিয়া বোধ হয়। বয়সের সহিত শৈশবের এই বর্ণ-সম্পদ ধীরে ধীরে মলিন হইয়া যায়।

অরণ্যের নানা জাতীয় ক্ষুদ্র ও মধ্যমাকারের সর্পই শঙ্খচূড়দের প্রধান আহার। এই সকল সর্পভক্ষণে ইহাদের কতকটা বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা নির্ব্বিষ সর্প সুন্দর রূপে চিনিতে পারে। আহারার্থ বিষাক্ত সর্পকে পরিত্যাগ করিয়া ইহারা নির্ব্বিষ সর্পগুলিকেই ধরিয়া উদরস্থ করে। বহুদিন উপবাসী থাকিলেও ইহারা বিষাক্ত সর্প ধরিতে অগ্রসর হয় না। সে সময়ে ইহাদের বাক্সের মধ্যে বিষাক্ত সর্প ফেলিয়া দিলে উহাকে ধরিবার আগ্রহ না দেখাইয়া বরং সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। জীব-নিবাসে রক্ষিত শঙ্খচূড়কে সর্প ব্যতীত অন্য কোনও

ক্ষুদ্র জীব আহার করান যায় না। তবে সর্প না মিলিলে যে ইহারা একেবারেই দীর্ঘকাল অনশনে পড়িয়া থাকে তাহা বোধ হয় না। ফেরার সাহেব বলেন যে সর্প না-পাইলে শঙ্খচূড়েরা ক্ষুদ্র পক্ষী, ইন্দুর, ভেক প্রভৃতি ধরিয়া আহার করে। তবে সর্পই প্রিয় ভক্ষ্য বলিয়া প্রথমে অন্য আহারে ইহাদের রুচি আসে না।

শঙ্খচূড় সর্পাহার দ্বারা আমাদের উপকারসাধন করে বটে, কিন্তু এ-বিষয়ে আমেরিকার কতকগুলি বিষাক্ত সর্প সে-দেশের নানা জাতীয় বিষধর ভুজঙ্গকে উদরস্থ করিয়া আমেরিকাবাসীদের বিশেষ কল্যাণসাধন করে। এই সকল সর্পের মধ্যে ফ্লোরিডা, মেক্সিকো ও মধ্য- আমেরিকার কিংস্নেক্; মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার 'মসুরাণা' দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের কোরাল স্নেক্ এবং মধ্য-আমেরিকার রোড গার্ডার বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি সর্প বিষাক্ত এবং শেষোক্ত সর্পটির বিষ অনুগ্র। আমাদের এদেশের কালাচ সাপেরাও সময়ে-সময়ে সর্প ভক্ষণ করিয়া অদ্ভুত রুচির পরিচয় দিয়া থাকে।

আলিপুর পশুশালায় আমি একবার শঙ্খচূড়ের সর্প-ভক্ষণ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। শঙ্খচূড়কে তখন একটি মধ্যমাকারের ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া) সর্প খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। সর্পটিকে শঙ্খচূড়ের বাক্সের মধ্যে ফেলিবার জন্য ডালাটি তুলিতেই শঙ্খচূড় সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সর্পটিকে বাক্সের মধ্যে নিক্ষেপ করা মাত্রই শঙ্খচূড় প্রায় দেড় হাত পরিমাণ দাঁড়াইয়া উঠিয়া একেবারে উহার গলদেশে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। শ্যেন বা ঈগল যে-ভাবে সর্প ভক্ষণ করে শঙ্খচূড়ও সেইভাবে বোধ হয় পনর মিনিটের মধ্যে সমস্ত সপটিকে উদরস্থ করিয়াছিল। পশুশালায় শঙ্খচূড়ের বাক্সের মধ্যে উহার আহারার্থ সর্প প্রবিষ্ট করাইয়া দিবার সময় শঙ্খচূড়কে বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত ফণা প্রসারিত করিয়া উঠিতে দেখা যায়। সর্পের মুখ ইহাদের বাক্সের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র নিমেষমধ্যে ইহারা উহার গলদেশে কামড়াইয়া ধরে। এই সময়ে উত্তেজনাবশতঃ ইহাদের মুখ হইতে প্রায়ই উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের বিষ নির্গত হইয়া থাকে। এই বিষ ইহাদের পক্ষে পাচক রসের কার্য্য করে।

জীবনিবাসে এক সপ্তাহ অন্তর আহার করিতে দিলেও শঙ্খচূড়ের পরিপাক-শক্তি ও ক্ষুধা সাধারণ সর্প অপেক্ষা প্রবল। সর্পভুক্ সর্পেরা মুষিকভোজী সর্প অপেক্ষা ভুক্ত আহারকে শীঘ্র পরিপাক করিয়া থাকে এবং শেষোক্ত সর্প অপেক্ষা আরও শীঘ্র পুনরায় আহার করে। ইহাদের পাকস্থলীর পাচক-রসের এরূপ শক্তি যে উহাতে গলাধঃকৃত জীবের অস্থি ও দন্তাদিও বিগলিত হইয়া পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র ভুক্ত প্রাণীর রোমাবলী উহাতে জীর্ণ হয় না এবং রোমের বর্ণেরও কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না।

নিউইয়র্ক শহরের জীবনিবাসে কতকগুলি সুবৃহৎ শঙ্খচূড় রক্ষিত হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের সর্পব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এই সকল সর্প তথায় আনীত হইয়াছিল। এই সর্পগুলিকে সপ্তাহে একবার মাত্র চার-পাঁচ ফুট লম্বা সর্প খাইতে দেওয়া হয়। বহুদিবস অনাহারে থাকিলেও শঙ্খচূড়ের তেজের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। সিঙ্গাপুর হইতে নিউইয়র্কে প্রেরিত হইবার সময় পূর্ব্বোক্ত শঙ্খচূড়-গুলিকে জাহাজের মধ্যে প্রায় দেড় মাস কাল অভুক্ত অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে জল ব্যতীত আর কিছুই উহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয় নাই। বাক্সের উপর হইতে জল ঢালিয়া দিলেই সর্পগুলি দাঁড়াইয়া জল পান করিত। এই অবস্থায় দেড় মাস কাল পরে জীবনিবাসে উপস্থিত হইলে উহাদের বাক্সের ডালা উন্মুক্ত করা মাত্রই উহারা সদ্যধৃত শঙ্খচূড়ের মতই সতেজে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল। দেড় মাসের অনাহারেও উহাদের স্বভাব সিদ্ধ তেজের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। জাহাজে প্রেরিত হইবার কালে শঙ্খচূড়দের নির্ম্মোক (খোলস) ত্যাগ করিতে বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। দেহের অন্য স্থানের নির্ম্মোক পরিত্যক্ত হইলেও তৎকালে চক্ষের উপরকার পর্দ্দাটি সহজে খসিয়া যায় না। এই কারণে সে সময়ে ইহাদের দৃষ্টিশক্তি একেবারে খর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং ইহারা আহারগ্রহণেও বিমুখ থাকে।

সর্পের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির কোনও নিদর্শন পাওয়া না গেলেও গোক্ষুর ও শঙ্খচূড়ের মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ শঙ্খচূড়ের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ আরও স্পষ্ট

ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাক্সের মধ্যে বন্দী করিলে প্রথম দুই-তিন দিন ইহারা কাচের গায়ে কেবল ছোবল মারিতে থাকে, পরে কাচের কাঠিন্য অনুভব করিয়া এই কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাদের বাক্সের সমক্ষে দর্শকের ভিড় হইলে অনেক সময়েই ইহারা উত্তেজিত হইয়া উঠে, কিন্তু সর্প-গৃহের পরিচারককর্ম্ম বা ইহাদের আহার-প্রদানকারী ভৃত্যেরা ইহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে ইহারা কোন প্রকার উত্তেজনা প্রদর্শন করে না। সর্প-গৃহের যে সকল লোক ইহাদের বাক্সের মধ্যে আহার প্রদান করে ইহারা তাহাদের চিনিতে পারে এবং তাহারা বাক্সের নিকট উপস্থিত হইলেই ইহারা মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠে। আহার প্রদানের সময়ও ইহারা অনেকটা বুঝিতে পারে। সে সময়ে ইহারা বাক্সের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিশেষ চঞ্চলতা প্রদর্শন করে এবং বাক্সের যে স্থান দিয়া সর্পাদি প্রদান করা হয় তদভিমুখে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকে। পানার্থ জল প্রদান করিবার কালে ইহারা মুখ তুলিয়া ধরে। বাক্সের মধ্যে ইহারা এক-একটি স্থান পছন্দ করিয়া লয়। অন্য দিকে স্থানান্তরিত করিলেও ইহারা পূর্ব্বেকার মনোমত স্থানে পুনরায় আসিয়া অবস্থান করে। এই সকল দৃষ্টান্ত ব্যতীত ইহাদের অপত্যস্নেহের মধ্যেও ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তির আরও পরিচয় পাওয়া যায়।

আলাপ

শ্রীসুনীল সরকার, এম এ

আফিং খাই না, কিন্তু আমার আইবুড়ো-গুহায় ব'সে ঝিমচ্ছি ঠিক আফিংখোরের মত।

ইংরেজী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হোক্, নইলে আমার দুনিয়ার বহির্ভূত এই ঘরটির এক কথায় কি-ই বা বর্ণনা দিতুম বলুন ত? এক সময় আমি আশা পোষণ করতুম যে এই ঘরটিকে বলতে পারব 'আমার ষ্টুডিও'। লোকের কাছে কথায় কথায়, শুধু তাই বা কেন, এই রচনা লেখবার সময়ই তাহ'লে আরম্ভ করতে পারতুম—'এক দিন আমার ষ্টুডিওতে ব'সে আছি, আমায় ঘিরে আছে এক অলিখিত উপন্যাস'—কিন্তু হায়, আমার ঘরটা যদি একবার স্বচক্ষে দেখতেন, তাহ'লে বুঝতেন যে বরং গর্দ্দভকে নিখিল বিশ্ব সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় কনসোলেশন্ প্রাইজ দেওয়া যায়, কিন্তু আমার এ ঘরকে কিছুতেই গুহার চেয়ে মোলায়েম কোন নাম দেওয়া যায় না। উঃ! কি বিচ্ছিরি!—যাক—ঝোঁকের মাথায় ঘরের কথা বাইরের লোকের কাছে ব'লে ফেলাটা কিছু নয়।

গুহা নামটার একটা সার্থকতাও আছে। আমি অবিবাহিত যুবক; কোথায় পদভরে মেদিনী কম্পিত ক'রে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াব সুন্দরতম দুর্লভতম শিকারের খোঁজে, তা নয়, এমন গোঁফ-দাড়ি-গজান এলোমেলো জংলি অবস্থায় ইজিচেয়ার আশ্রয় ক'রে ঝিমাবার মানে কি? এ কি ডি-কুইনসির স্বপ্ন-খেয়ালের অভিসার, না কোল্‌রিজের অতি-প্রাকৃতের রাজ্যে দিগ্বিজয়যাত্রা? কিছুই নয়, আমার নিজের কথাই ত আমি ভালভাবেই জানি, ওসব কিছু নয়। এ হচ্ছে বনে বনে শিকারের আশায় হতাশ হয়ে ক্ষুধিত সিংহের গুহায় প্রবেশ। আমি যুবক এবং নবীন, কিন্তু সত্যি বলছি, গুহাশ্রিত হয়ে থাকতে হচ্ছে—কারণ, এই বিশাল ধরায় আমার শিকার মিললো না। শিকার অবশ্য অনেক আছে, নইলে কলকাতায় কেবল ঐ সম্প্রদায়ের স্কুল এবং কলেজের সংখ্যা বাড়ছে কেন! এমন শিকারের গল্পও ত শুনি কত—কিন্তু এমন আমার ভাগ্য যে আমার বেলায় কেউ আর শিকার হ'তে চায় না। এর কারণ বুঝিনি এমন বোকা আমায় পান নি—আমি ভয়ানক খারাপ দেখতে কিনা তাই। ওদের দোষ দেব কি, আয়নায়

মূর্তিটি দেখলে আমি নিজেই মুখ ভেঙচে ছুটো খারাপ কথা ব'লে ফেলি, তা ওরা!

যেদিনকার কথা বলছি, সেদিন বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। বেশী ভার পিঠে চাপলে গাধা যেমন একগুঁয়ে ভাবে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমার টেবিলটা রাশীকৃত বই-খাতার বোঝা পিঠে নিয়ে তেমনই নির্ব্বোধ অপ্রসন্নভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিছানাটা নিষ্কলঙ্কই ছিল, কিন্তু এই খানিক ক্ষণ আগে দোয়াত-দুর্ঘটনায় তার কপালে হ'ল দুরপনেয় কালিমা-চিহ্ন। ওধারের দেওয়ালের পেগে ঝোলান ময়লা কাপড়-জামার রাশ—ক'দিন আজ ধোপা আসে নি—সেদিকে চোখ পড়লেই মনে মনে একান্তভাবে ইতালীয় নগ্নতা-আন্দোলনের পক্ষপাতী হয়ে উঠছি। এমন সময়—

গল্পের মধ্যে "এমন সময়" কি রোমাঞ্চকর, কি নাটকীয়! কিন্তু হায়, আমার জীবনে কখনও এমন হ'ল না যে শুধু নীরসভাবে বেঁচে যেতে যেতে হঠাৎ—এমন সময়—একটা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটল। আমার ঘরে সেদিন সেই সময় যিনি এসে উপস্থিত হলেন, তিনি—কি আর বলবো—আমার দিদি। তিনি কত কি হ'তে পারতেন, এমন কি কেউ না হ'লেও পারতেন, কিন্তু বলেই ফেলা যাক—তিনি আমার কটুভাষিণী, সাতাশ বৎসর বয়সে বেথুনে বি-এ পাঠ-কারিণী দিদি। নিশ্চয় তার কোনও টিউটোরিয়্যাল আমায় লিখে দিতে হবে। কেউ যদি ভাবেন সিগারেটটা নিবিয়ে কিংবা লুকিয়ে ফেললুম এই সাড়ে তিন বছরের বড়দিদিকে দেখে, তা হ'লে ভুল করলেন। কিছুই করলুম না, শুধু ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, আহত ভাবে চোখদু'টি নামিয়ে নিলুম। যদি পারে, এই থেকে বুঝে নিক আমার মনের অবস্থা। বুঝে নিক্, এর এই ভগ্ন, ক্ষত-বিক্ষত জীবনে আর 'দিদি' সইবে না। কিছু দিন—আর যে-ক'টা দিন আছে একে দিদি-হীন অবস্থায় বাঁচতে দেওয়া যাক্। কিন্তু বৃথা আশা! মেয়েরা যে দয়া হীন, হিংস্র এবং সেই কথাটা যা উচ্চারণ করতেও ভয় পাই—প্র্যাকটিক্যাল, সে কথা ব'লে ব'লে তো বুড়ো বার্ণার্ড-শ হার মেনে গেলেন। অতএব দিদি তাঁর স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুরু করলেন—

রোজ আপনি তাড়াহুড়ো ক'রে আপিসের কোটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যান্—মনে মনে নিশ্চিন্ত আছেন, তার পকেটে পাওয়া যাবে একটা মান্থলি টিকিট, আপনার মণি-ব্যাগ, দেশলাই, বিড়ি, কিছু মশলা পড়ে আছে; হয়ত বা এক গোছা চাবি, দু-একখানা দরকারী কাগজপত্র, বহু দিন আগে কোন্ শিশুর জন্যে কেনা লজেঞ্চুসের চটচটে একটুখানি ভগ্নাংশ এবং খুব রোমান্টীক যদি বা কিছু থাকে, হয়ত কার কাছ থেকে আসা নীল লেফাফায় মোড়া একখানা চিঠি। এর মধ্যে এক দিন পথে বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ বিড়ির জন্যে সেই চির-পরিচিত পকেটে হাত গলাতেই যদি উঠে আসে কয়েকখানা খড় খড়ে এক-শ টাকার নোট—আপনার মনের অবস্থা কেমন হবে ভাবুন। তবেই বুঝতে পারবেন আমার মনের অবস্থাটা, যখন আমার লাঞ্ছিতা, চির-উপেক্ষিতা দিদি বললেন, 'এই একটি মেয়ে তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।'

এই কথাই আমি অবাক্ হয়ে ভাবি যে আমার এই দিদির মধ্যে যে কত অসম্ভব সদ্‌গুণরাশি এত দিন ধ'রে বিরাজ ক'রে এল, আমি তা একবার জানতেও পারি নি; দুর্লভ কথা, কতখানি জ্ঞান্ থাকলে তবে অমন কথা উচ্চারণ করা যায়—'একটি মেয়ে তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।' 'ব্রেভ ওয়ার্ডস্, রেয়ার ওয়ার্ডস্'—ফলষ্টাফ থাকলে বলতো। একবার শুনলে আবার শুনতে ইচ্ছে হয়। না বলেই থাক্‌তে পারলুম না—'দিদি, আর একবার বল।'

'এখন তোমার সঙ্গে আমি ইয়ার্কি দিতে আসি নি; মেয়েটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, কি করবি বল্।'—দিদি চিরকাল টু দি পয়েণ্ট কথা বলবার জন্যে প্রসিদ্ধ।

নারীজাতিকে কখনও কোনও উৎসাহ দিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি। কিন্তু আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা আমার দিদির সেই রোষ-রক্তিম মুখখানির দিকে চাইলুম এবং তখনই বুঝতে পারলুম আমার ভুল ও আমার চির-উপেক্ষিতা দিদির গভীর মনোবেদনা। এ-জীবনে কিই বা ও আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিল? বড়জোর ওর হয়ে দু-একটা টিউটোরিয়্যাল লিখে দেওয়া। আমার দিক থেকে স্নেহের অভাবেই হয়ত আজ ও এমন রুক্ষ হয়ে উঠেছে, কে বলতে পারে! সিগারেটটা নিবিয়ে ফেললুম, হাজার হোক্ বড় দিদি ত। গলাটা মোলায়েম ক'রে বললুম—চিরকালটা আমার তুমি হৃদয়হীন ভেবে ভয়ই ক'রে এলে

দিদি। কিন্তু এবার থেকে আমার নতুন আলোয় দেখবে। যাও আর দেরি ক'রো না—বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছেন ডেকে নিয়ে এস।

'কি, তোকে ভয় করি আমি ?'—সেই পুরনো ষ্টাইলে চোখ চক্‌চক্‌ ক'রে উঠল।

'না দিদি, না'—তাড়াতাড়ি বললুম—'বরং আমিই তোমায় ভয় করি। কিন্তু এটা কি অভদ্রতা হচ্ছে না যে এক জনকে বাইরে—'

'তুই আর আমায় ভদ্রতা শেখাতে আসিস্‌ নি। ঘরখানা করে রেখেছে দেখেছ, জংলী কোথাকার'—বলতে বলতে বাইরে গেল।

দিদির গলার ঝাঁঝটা মোটেই সুখশ্রাব্য নয় এবং আমার ঘরের সমালোচনা করবার অধিকারই বা ও কোত্থেকে পেলে; আমার সম্পত্তিতে দূরতম অধিকারও ওর নেই, হিন্দু ল' খুলে দেখিয়ে দিতে পারি – কিন্তু বাস্তবিক মেয়েছেলে কিনা, ঠিক্‌ ধরেছে। আমি নিশ্চয়ই জানি ঐ অল্প সময়ের মধ্যে টেবিলের অবস্থা, বিছানায় কালির দাগ, পেগে বস্ত্র-বিভ্রাট—সমস্তই ওর চোখে পড়েছে। হয়ত আরও কত কি ছোটখাট নোংরামি লক্ষ্য ক'রে গিয়েছে যা এখনও আমার চোখে পড়ছে না। অবশ্য অন্য সময় হ'লে মেয়েদের সম্বন্ধে মনু-সংহিতার বচন আউড়েই নিশ্চিন্ত থাকতে পারতুম, কিন্তু এর মধ্যে এক তৃতীয় ব্যক্তি আসছে যে—তিনি আবার আমার দিদির জাতি-ভগ্নী। বিপদ; মুস্কিল; মহাসঙ্কট! দেখুন কোন কথাতেই শানাচ্ছে না যতক্ষণ না ইংরেজীতে ব'লে ফেলছি—ক্যাটাষ্ট্রফি!

লীরিক্‌ উত্তেজনায় আমার স্নায়ু-তন্ত্রী কম্পিত হ'তে লাগল। এ যে একেবারে সেই 'কোথায় আলো, কোথায় মাল্য, কোথায় আয়োজন; রাজা আমার দেশে এল কোথায় সিংহাসন' গোছের অবস্থা! 'হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা'—প্রায় আর্ত্তনাদের সুরে বললুম—'কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা!' এবং বিছানাটাকে প্রাণপণে পরিষ্কার করতে করতে যখন বলছি—'ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা'—তখন দিদির সঙ্গে প্রবেশ করলেন আমার তরুণী অতিথি। এক হাতে এক গাদা বই, আর এক হাত দেয়াল-বেয়ে-পড়া দোলন-লাগা ঝুমকো লতার মত, মাথায় আছে বেণী এবং মুখে—বললে বিশ্বাস করবেন না—হাসি! আমার কবিতা শুনে ফেলেছে। নিশ্চয় মনে মনে ভাবছে, ওই হ'ল আমার 'দুঃখ রাতের রাজা,' কিন্তু তাতে যে লিঙ্গ-বিপর্য্যয় হয়, তা কি ও একবারও ভাবছে!

'বোস্‌ তুমি এইখানে—মাগো, এ ঘরে মানুষ থাকতে পারে—আমি চললুম ওপরে—তোর কাজ হয়ে গেলে ওপরে আসিস্‌—'

'আপনি বলুন নীরুদি'—মেয়েটি উৎকণ্ঠিত ভাবে বলে উঠল।'

'কেন, তুই বলতে পারিস্‌ না!...এই মেয়েটি আমাদের কলেজে আই-এ পড়ে—এবারে এগজামিন্‌ দেবে। ওকে একটু পড়িয়ে দিতে হবে। তোর সময় হবে ?'

উঃ, কি নীরস, বিশ্রী কথা-বলার ভঙ্গী! যেন সেই খোট্টানী ফেরিওয়ালীটা যার কাছে য়্যালুমিনিয়মের বাসন বিক্রী করতে এসেছে। মনের রাগ যথাসম্ভব মনেই চেপে বললুম—'কি বিষয়, কি বৃত্তান্ত, আগে জানা যাক্‌—সময়ের খুব কড়াকড়ি নেই।'

'বেশ—'যেন একটা ছোটখাট পট্‌কার আওয়াজ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দিদির অন্তর্ধান।

তার পরেই ভেবে দেখুন সেই গুহায় সর্ব্বদ্রষ্টা সূর্য্যদেবেরও অগোচরে পরস্পরের সম্মুখীন এক লোভনীয় শিকার ও এক ক্ষুধা-জর্জ্জরিত বিশ্রী, বিকট সিংহ। আচ্ছা, সিংহ কি কখনও নার্ভাস্‌ হয়? সিংহের গলা কাঁপে, কান লাল হয়ে কপালের দু-পাশে বিন্দু বিন্দু স্বেদজল নির্গত হয়? জু-লজি পড়া না থাকায় এ সব কথা তেমন শিখি নি, তবে আমার যে তখন ঐ রকম অবস্থা হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

জানি, অনেকেই ব'লে উঠবেন, শেষকালে তোমার মত লোক, আর কেউ নয়—সুনীল মিত্তির—যাকে দেখলে মেয়েদের হয় হৃৎকম্প এমন জনশ্রুতি আছে—সেই তুমি শেষে নার্ভাস্‌? তাঁরা জানেন না যে এ কলেজী ছেলের সস্তা নার্ভাস্‌নেস্‌ নয়—এর ভেতর ছিল প্রচণ্ড অন্তঃস্রোত—এটা যার সামান্য বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কথাটা ঘোরালো হয়ে উঠছে—অনেকেই বুঝবেন না—সত্যি কথা বলতে কি, বাংলা দেশে আমার বোঝে অল্প লোকেই—কিন্তু তাই ব'লে আমি ত আর অভিমান ক'রে ব'সে থাকতে পারি

না; বলছি, বলছি—ক্রমশঃই ব্যাপারটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেব।

প্রথমতঃ বলা দরকার, সেদিন মেয়েটির সঙ্গে আমার কি কি কথা হ'ল। কথা ছাড়া আর কিই বা হবে। যাঁরা সরসতর কিছু আশা ক'রে আছেন, তাঁরা আমার দোষ দেবেন না। এই বিরক্তিকর, কথাসর্ব্বস্ব বাংলা দেশে কথা ছাড়া আর আছে কি? এখানে উপাসনা মানে বক্তৃতা, দেশাত্মবোধ মানে তর্ক, প্রেম মানে প্রগল্‌ভতা। একথা জানি ব'লেই আমি মনে মনে সেই নির্ঘাত কথাগুলো আহরণ করবার চেষ্টা করছিলুম, যেগুলো বললে অনেকটা পড়াশুনোর কথার মত শোনাবে, অথচ যার মধ্যে অন্তর্লীন থাকবে প্রেমের গোপন কটাক্ষ। সময়ও অল্প, তার মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে নিতে হবে। উৎকণ্ঠায় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—মেয়েটি যদি হঠাৎ উঠে পালায়—ছেলেবেলা থেকেই ত দেখে আসছি যে বিনা-নোটিশে পালানো বিদ্যায় ওরা স্পেশালিষ্ট্!—কিংবা—কিংবা যদি দিদি এসে পড়ে।

কথা-সমুদ্রমন্থনের গলদ্‌ঘর্ম্ম অধ্যবসায়, সময় সম্বন্ধে একটা তীব্র শেলিয়ান দুর্ব্বলতা এবং পেয়ে হারাবার আশঙ্কা—এই তিন ব্যাপার একসঙ্গে যোগ দিন—যোগফল সুশীল মিত্তিরের নার্ভাস্‌নেস্।

সময় যেতে লাগলো—

ক্রমশঃ আরও সময়—! অর্থাৎ মেয়েটি আসার পর পুরো চার মিনিট—এবং দিদির প্রস্থানের পর প্রায় সাড়ে তিন মিনিট, কেটে গেল। এখনও আমি কিছুই ব'লে উঠতে পারি নি। মুখ ঘেমে স্পঞ্জ রসগোল্লা হয়ে উঠেছে। ভাগ্যিস্ আমি ঘরেও একটা হাত-কাটা শার্ট গায় দিয়ে থাকি—এই রক্ষে। কিন্তু পকেট থেকে রুমাল বার করবার উপায় নেই, কারণ আমি জানি ত সে রুমাল দেখলেই কয়লার খনি অথবা বাঙালী গৃহ-লক্ষ্মীর হেঁসেলের কথা মনে উদিত হয়।

আরও এক মিনিট। কিন্তু তখনও পেটের মধ্যে সব কথা একেবারে 'অনুপস্থিত মহাশয়'। ঘড়ি দেখলুম—পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ! মুখের ওপর থেকে সমস্ত ভিজে কোঁকড়ানো ইমোশন ইস্ত্রি ক'রে দিয়ে বললুম্—'আচ্ছা, আপনি—ইয়ে—মানে—পাঁজি পড়েছেন?'

মেয়েটির এতে আর ভয় পাবার কি ছিল? কিন্তু দেখি কানের দুলের গোল্ডলীফ্ ইলেক্ট্রোস্কোপ্ ঘন ঘন দোদুল্যমান। কিন্তু আমি ছাড়বার পাত্র নই। আবার জিজ্ঞাসা করলুম—'পড়েছেন?'

'না, আমি ত কখনও—আমাদের কলেজে ত ও নামের কোনও বই পড়তে বলে নি। কার লেখা?

'কার লেখা? না, না, সে কারুর লেখা-টেখা নয়। ভাঁড়ার-ঘরের কুলুঙ্গিতে যে পাঁজি তোলা থাকে, সেই পাঁজি। যাত্রা করবার পাঁজি, অন্নপ্রাশনের পাঁজি, অলাবু-ভক্ষণের পাঁজি—গলাটার ষ্টীয়ারিং হুইল হঠাৎ যেন আল্‌গা হয়ে গেল, তবু চোখ-কান বুজে মোটরের চাকায় নধর পাঁঠাটিকে চাপা দেবার মত ক'রে ব'লে ফেললুম—শুভবিবাহের পাঁজি।

'নীরুদি বোধ হয় ডাকছেন।'—মেয়েটির মুখ দিয়ে হঠাৎ এই কথা বেরিয়ে গেল। জাল-করা অচল টাকার মত। মোটে বাজলো না। আসল কথা—পালাচ্ছে। প্রেম নয়, চুম্বন নয়—শুধু পাঁজির কথা বলেছি—আর পালাচ্ছে! দেখুন, অনেক দেখে-শুনে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে এই—যে এক জন মেয়েকে আপনি যাই বলুন না কেন—পালাবেই। পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। আমি একবার এক মেয়েদের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলুম, জানেন মশায়। ওদেরই হয়ে যথাসাধ্য বললুম, জানেন মশায়, সে দেবীটেবী ব'লে ওদের একেবারে যাচ্ছেতাই প্রশংসা সুরু ক'রে দিলুম; কিন্তু খুশী হওয়া দূরে থাক্ হেসে আর টিট্‌কিরি দিয়ে ওরা আমায় ঘরের বার ক'রে ছাড়লে। কিছুই নয়—আমি ওদের স্বভাব-নিপুণতা প্রমাণ করবার জন্য শুধু বলেছিলুম—ভদ্রমহিলাগণ, একটি অতি তুচ্ছ উদাহরণ দিয়া আজ আমি প্রমাণ করিব আপনারা কি অসম্ভব বুদ্ধিমান্—জাতিগতভাবে আপনারা কি ভারনা—ইয়ে—চতুর—আই মীন—ক্লেভর—আপনারাও ত আজকাল পথেঘাটে (হেদুয়া পার্ককে যদি ঘাট বলিতে বাধা না থাকে) মাঠে ও সিনেমায় বাহির হইতেছেন। অর্থ প্রভৃতি বহু মূল্যবান জিনিষ লইয়াই আপনাদের চলাফেরা করিতে হয়। ইহা ভারতের সর্ব্বত্র বিদিত আছে যে আপনারা নিষ্পকেটা অর্থাৎ 'পকেট' ব্যবহার করেন না। অথচ কোথায় যে আপনারা উপরি লিখিত ব্যাগ, চিঠিপত্র,

রুমালাদি লুকাইয়া ফেলেন, তাহা পকেট বা ট্যাঁক কাটাদের ধরিবার সাধ্য নাই। অদ্ভুত আপনাদের কৃতিত্ব—যে অনায়াসে অবলীলাক্রমে সমস্ত জিনিষ আপনারা ট্যাকে গুঁজিয়া ফেলেন, অথচ বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। এই ত এখানে এত জন ভদ্রমহিলা উপস্থিতও আছেন—কিন্তু কই, কাহার ট্যাঁকেরও কাছে ত উঁচু নাই। এমন কি তীক্ষ্ণতম চোখও—

এই পর্য্যন্ত বলতেই—বললে বিশ্বাস করবেন না—সে কি হাসি! অর্দ্ধেক মেয়ে উঠে বেরিয়ে গেল। সভানেত্রী আমার কাছে এসে বলেন কি জানেন—'চুপ করুন মশায়, আপনার আর বক্তৃতা দেবার দরকার নেই।'

কিন্তু এক্ষেত্রে ত আর ওভাবে কেউ থামাতে পারবে না। অবশ্য যদি দিদি না এসে পড়ে, তাড়াতাড়ি বললুম—'আচ্ছা, আচ্ছা, স্বীকার করছি পাঁজির কথাটা তোলা আমার ঠিক হয় নি, স্বীকার করছি পাঁজি খুব গ্রাম্য, মেনে নিলুম যে বাংলা দেশের সমুদয় পাঁজি পুড়িয়ে ফেলা উচিত—আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, আজই সদাশয় গভর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করব যেন এই গ্রাম্য এবং রাজদ্রোহপূর্ণ পাঁজির পাজা নির্ম্মূল করেন—কিন্তু আপনি বসুন।'

উঃ, বাঁচা গেল। বসেছে! বললুম, 'অবশ্য পাঁজিটার কথা তোলবার সামান্য একটু কারণও ছিল। দিন ক্ষণ মানেন্ না বোধ হয়! লগ্ন? অন্য কিছুর নয়—ভয় পাবেন না—এই ধরুন, পাঠারম্ভেরও তঃএকটা শুভ মুহূর্ত্ত চাই। এই মনে করুন, আপনি যখন এলেন তখন বেজেছিল সাড়ে পাঁচটা, তখন হয়ত ছিল বৃশ্চিক রাশির শেষ কলা, দশ মিনিট না যেতেই রাশিচক্র ধাঁ ক'রে ঘুরে গেল—হয়ে গেল ধনুলগ্ন। বৃহস্পতি আবার এখন স্বগৃহেই বাস করছেন—ঐ ধনুরাশিতেই। কি যোগাযোগ দেখুন। একবার মনে মনে শুধু ভাবুন, আকাশ থেকে দেবগুরু আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন। লগ্নের এক-একটা ক'রে দ্রেক্কাণ কাটছে আর আমাদের শরীর মনের মধ্যে কত কি পরিবর্ত্তন ঘটে যাচ্ছে। এই এখন ত আপনি মুখ গম্ভীর ক'রে ব'সে আছেন, সত্যি বলছি, এমন হ'তেই পারে যে পনের মিনিট বাদেই হয়ত আপনি—যাক্, যাক্—যখন আপনি মানেন না—সে কথা যাক্। আচ্ছা, আচ্ছা, সংস্কৃত পড়তে হবে, না? তাতে কি, তাতে কি, সব ঠিক ক'রে দেব, ভয় পাবেন না। ঐ বইখানা একবার দিন ত—বেশ, বেশ, বইখানা কি? কুমারসম্ভব! মানে কি বলুন ত? কুমার কি ক'রে সম্-পূর্ব্বক ভূ ধাতু অল্—অর্থাৎ সম্ভব হ'ল? ওকি, উঠছেন না কি? এর মধ্যে? দেখুন একদিনে মোটে এইটুকু প্রোগ্রেস্ হ'লে লোকে বলবে কি? ঘরে গিয়ে কোন্‌মুখে আপনার মাকে বলবেন—মা, আজ সুশীলবাবুর কাছে সংস্কৃত বইয়ের মলাটখানা পড়ে এলুম, হা-হা-হা—! আচ্ছা, সংস্কৃত ভাল না-লাগে ত ইংরেজী?'

'না, আজ মাথাটা খুব ধরেছে, আজ আসি—'

'সর্ব্বনাশ, মাথা ধরেছে, আমারই দোষ! খালি কতকগুলো বকর-বকর ক'রে লোকের মাথা ধরিয়ে দেওয়াই আমার পেশা। ছেলেবেলা থেকে তাই-ই ক'রে আসছি। আপনার মাথা ধরবে, এ আর আশ্চর্য্য কি; বরং এই ভেবে অবাক হচ্ছি যে আপনি এখনও ফেণ্ট্ হয়ে পড়েন নি। আচ্ছা দেখুন, আমি যদি আর একটিও কথা না কই? একেবারে ঠোঁটে গালামোহর ক'রে ঐ ডেক-চেয়ারটায় ব'সে থাকি? তাহ'লে আপনি আর একটু বসবেন?—আমার আর কি বলুন, কিছুই নয়, কিন্তু ভেবে দেখুন—দু-দিন বাদে আপনার এগজামিন্। সোর্ড্ অব ডামোক্লিস্ মাথার ওপর ঝুলছে।'

বরাবরই আমি এই কথা ব'লে আসছি যে, ভগবান্, আমায় শুধু সময় দাও। আমি বিশ্রী হ'তে পারি, বিকট হ'তে পারি। জানি আমার নাকের ঠিক ডগায় একটা দুর্দ্দান্ত আঁচিল আছে। কিন্তু সময় যদি পাই তাহ'লে ও অসাধ্য-ফসাধ্য সব আমি সাধন করে দিতে পারি। মেয়েটি এসেছে যখন, তখন পাঁচটা পঁয়ত্রিশ—আর এখন হচ্ছে সবে পাঁচটা পঞ্চাশ—এরই মধ্যে কি ব্যাপার! চোখ দুটি দুষ্টু দুষ্টু ক'রে বলে 'দু-জনেই চুপচাপ ব'সে থাকলে এগজামিনের বিশেষ সুবিধে হবে কি?' বলেই—সত্যি বলছি—হাস্য।

'হেসেছেন'—'সুপ্ত-সিংহ-যেন-জাগ্রত-হইল' গোছের একটা চীৎকার দিলুম—'ঐ ত হেসেছেন!—তবে?' ব'লে মেয়েটির দিকে একটু এগোলুম।

রাজপুতানার মাঠে হঠাৎ দেখলেন একদল হরিণ—ধাঁ

ক'রে বন্দুকটা তুলে ছোঁড়বার পর—আপনি যেমন ক্যাব্‌লা—ও হরি, টোটাই ভরা হয় নি এবং ততক্ষণে হরিণ-দল দিগন্তসীমায় বিলীয়মান। কেমন বোধ হয়? ঠিক তেমন অবস্থা আমার। যত ক্ষণে চেঁচিয়ে উঠেছি—'ঐ ত হেসেছেন,' তত ক্ষণে শ্রীমতী হরিণী লম্বা বেণী দুলিয়ে একেবারে দোতলায়। ইনি আবার বনের হরিণী নন্—মনের হরিণী—তাই গতিটা বুঝি বা দ্রুততর।

কত গ্যালন উৎসাহ নিয়ে মেয়েটির দিকে যাত্রা করেছিলুম তার অবশ্য ঠিক নির্ভুল হিসেব দিতে পারব না—কিন্তু তখনও সেই প্রাথমিক মোমেণ্টম্ নিঃশেষ হয় নি। গেয়ে উঠলুম। কোথায় যাবে ও? বড়জোর দোতলায়। আরও জোর তেতলায়। আর বৃহত্তম জোর ছাদে! যেখানেই থাকুক্, আমায় এড়ানো যাবে না। সশরীরে না যাই শব্দভেদী আছে। পাশের বাড়ির পাঁচ বছরের ছেলেটা ভয়ানক কান্নাকাটি করে, তাই দয়া ক'রে গান গাই না। নইলে ঠেসে একবার গান ধরলে আর বড়-একটা চালাকি করবার জো নেই। যেখানে শুনবেন, সেখানেই ব'সে পড়তে হবে।

"সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে—"

হঠাৎ থেমে যেতে হ'ল। সর্ব্বনাশ, দিদির সঙ্গে সুমি নেমে আসছে। 'আবার চেঁচাতে সুরু করেছিস?' ব'লে এক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে সুমিকে নিয়ে দিদির প্রস্থান।

আর কেউ সাক্ষী নেই, কিন্তু হে আমার আইবুড়ো-গুহা, তুমি ত সবই দেখলে! কিছুই ত তোমার অবিদিত নেই। তুমি দেখলে, একটি সরলপ্রাণ যুবক তার যথাসাধ্য করলে। তুমি ত জান, যখন তোমার ঐ চৌকাঠ পেরিয়ে একটি আসল তরুণী এসে দাঁড়াল, তখন যুবকটির মনে সে কি এক হাজার অশ্বশক্তির আন্দোলন সুরু হয়েছিল! তুমি জান সেই অতুলনীয় যুবক কি বীরবিক্রমে সেই হাজার অশ্বের বল্‌গা ধারণ করেছিল? একবারও সে ভয়ানক চেঁচিয়ে ফেলে নি, উস্‌খুস্ করে নি, হাত-পা ছোঁড়ে নি, মাথা চুলকোয় নি, গোঁফে তা দেয় নি, তা তুমি জান। একলা ঘরে ঐ মেয়েটাকে পেয়ে সে কি না ব'লে বসতে পারত। কিন্তু বাক্-সংযমী যুবা বললে শুধু পাঞ্জির কথা। (বাঃ কুমারসম্ভব-সম্বন্ধে তাকে দোষ দিলে চলবে কেন, সেটা ত ওদের পড়বার বই।) ঐ একলা ঘরে হঠাৎ হাতটা ওর হাতে লাগিয়ে দিতে পারত কিন্তু মহাপ্রাণ যুবক, ত্যাগশীল যুবক—সে এ-সব কিছুই করলে না। শুধু একটু এগিয়েছে, 'ঐ ত হেসেছেন' ব'লে খুব একটু চেঁচিয়েছে, আর চেঁচিয়ে নয় গলাটা তুলে রবিবাবুর একটা গানের এক লাইন গেয়েছে। এই তার দোষ। তোমার কি মনে হয়, এই সামান্য দোষে এক জন মেয়ের তোমাকে এবং আমাকে উপেক্ষা ক'রে পালান উচিত হয়েছে?

আমার আইবুড়ো গুহা নীরব। অবশ্য আমি জানতুমই যে ওর কাছে উত্তর আশা করা ভুল, কিন্তু ঝোঁকের মাথায় ওকে মনের কথা ব'লে ফেললুম। কিন্তু দিদি! উঃ, মুখ দিয়ে যা বেরোয় যেন এক-একখানি বৃশ্চিক!—'আবার চেঁচাতে সুরু করেছিস্'! কথাগুলোকে ভেঙে ভেঙে নেওয়া যাক—বিশ্লেষণের সুবিধে হবে।

'আবার'—অর্থাৎ আমি যে প্রায়ই এমনটা ক'রে থাকি, তা ঐ সুমি মেয়েটিকে জানান হ'ল।

'চেঁচাতে'—গানকে বলা হচ্ছে চেঁচানো। ভুল। চেঁচা ধাতু থেকে হয়েছে চেঁচানো। লোকে যখন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে, তখন গলায় যে ভাঙা-ভাঙা আওয়াজ হয় সেই হচ্ছে চেঁচা ধাতু। আমার গলা কেউ কখনও ভাঙতে শুনেছে?

'সুরু'—অর্থাৎ যেন অনেককাল ধ'রে এই চীৎকার আমি চালাবই।

'করেছিস্'—কথাটায় কোনও অর্থগত বা ব্যাকরণগত ভুল নেই। কিন্তু ঐ 'ছিস্'-এর 'ছ' আর 'স' টা এমনভাবে উচ্চারণ করলে যেন কে শুক্‌নো ঝাঁটা দিয়ে শানের মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে।

—মোট কথা নিদারুণ অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের ভাব। কেন ও ঐ মেয়েটিকে আট্‌কে রাখতে পারত না? বলতে পারত না—"ওর কাছে তুই পড়—তোর ভাল হবে। ওর রকম-সকম দেখে ভয় পাস নি, আসলে ও অতি উঁচু

ঘরের ছেলে। এই দেখ্ না—আমি ত বি-এ পড়ি, ওর কাছ থেকে টিউটোরিয়াল লিখে না নিলে আমাকে কলেজে যাওয়া ছাড়তে হ'ত?" অকৃতজ্ঞ, বর্ব্বর! হে ভগবান্, আর কত কাল? পাঁচ জনে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যারে সুশীল, তোর কি অসুখ হয়েছে। মুখ-চোখ ওরকম শুক্‌নো-শুক্‌নো দেখায় কেন? কিছু বলি না—কারণ ভাল শোনায় না। বলতে গেলে বলতে হয়—অন্য কোনও অসুখ নয়—আমার 'দিদি' হয়েছে, ছেলেবেলা থেকে 'দিদিতে' ভুগছি—

'সুমিকে তোর কেমন লাগলো?'

চম্‌কে চেয়ে দেখি দিদি। কিন্তু এ কি প্রশ্ন? ঢোক গিলে বললুম, 'মন্দ কি! ও আর পড়বে না?'

'না।'

'তবে এ-রকম ক'রে আমায় অপমান করবার—'

'অপমান কিসের? ও এখানে পড়তে এসেছিল না কি? সংস্কৃত ওই তোকে কান ধ'রে পড়াতে পারবে। ওর মার ইচ্ছে তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দেন। সুমিকে এমনি বললে ত আসতে চাইবে না। আজ আমাকে ইংরেজী একটা কবিতার মানে জিজ্ঞাসা করলে—আমি বললুম, চল্, আমাদের বাড়ি, আমার ভাইয়ের কাছে বুঝিয়ে নিবি এখন। এখন বল্—আমাকে, তাহ'লে মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে ওদের খবর পাঠাই।'

—'তুমি আর আমায় হাসিও না। আমায় সংস্কৃত শেখাতে পারে, হুঁঃ; আর মেয়ের কি চলন-বলন আর কিই বা ছিরিছাঁদ! নাকটা সমান করে চেঁচে নিতে বোলো—'

'আর তোমারই বা কি কার্ত্তিকের মত শ্রী'

'দেখো দিদি—'

'তোর অত ভীষণ মেজাজ কেন বল্ ত। ঠাট্টা করলে বুঝতে পারিস্ না? অমত করিস্ নি, লক্ষীটি। সুমি চমৎকার মেয়ে। আর ওর মা আমায় এমন ক'রে ধরেছেন! আমিও অনেকটা আশ্বাস দিয়ে ফেলেছি। এ বিয়ে না হ'লে ওদের কাছে আর আমি মুখ দেখাতে পারবো না।'

'আমার কোনই আগ্রহই নেই। তবে ব্যাপার যদি এমনই দাঁড়িয়ে থাকে, তাহ'লে তোমাকে আর বিপদে ফেলব না। তবে একটা কথা। দোতলায় গিয়ে মেয়েটি তোমায় কিছু বলে নি?'

'হাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কিরে ভাইটি কেমন; বললে পাগল!'

'হাঁ, পাগল! পাগল বলেছে! তবুও তুমি আমাকে—'

'তোকে আর তাই শুনে ক্ষেপে উঠতে হবে না—পছন্দ হ'লে মেয়েরা অমন কিছুই একটা ব'লে থাকে।'

'তাহ'লে ও জানতো যে বিয়ের কথা হচ্ছে!'

মুখ টিপে হাসতে হাসতে দিদির প্রস্থান।

তা এক রকম মধুরেণ-গোছের সমাপনটা। কি বলুন? কিন্তু আলাপ? অবিবাহিত যুবক-যুবতীর রোম্যান্টিক আলাপ, সে কোথায়? সে কি এই বাংলা দেশে নেই! এখানে হয় 'কি, কেমন-আছেন, গোছের নমস্কার-ঠোকা পরিচয়—নয় একেবারে শরণং গচ্ছামি,—অর্থাৎ বিয়ে!'

হাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল। বন্ধু শৈলেন ঘোষ কি মণি মজুমদার—কেউই কাছে নেই। কার সঙ্গে পরামর্শ করি! বাস্তবিক, কি করা যায় বলুন ত! সাড়ে তিন বছরের বড় দিদিকে খুব অবহেলাভরে একটা প্রণাম করলে তাতে পৌরুষ-টৌরুষ প্রভৃতির কোনও রকম হানি গ্লানি হয় না ত? নিখিলবঙ্গ ছাত্রসঙ্ঘ কি বলেন?

কল্পলতা—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু লিখিত ছোট গল্পের বই : মূল্য পাঁচ সিকা। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

কথা-সাহিত্যে মণীন্দ্র বাবু অতি-আধুনিকদের বহু পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার রচনায় আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট হইলেও, অতি-আধুনিকতার আবর্জ্জনার সহিত তাহার সংস্রব নাই। কল্পলতায় যে আটটি গল্প আছে তাহার সবগুলিই আধুনিক জগতের মানুষ লইয়া রচিত। একটি গল্প (হোটেলওয়ালা) ত পুরাপুরি ইউরোপীয় মানুষদেরই গল্প; বাকিগুলি সব নব্য বঙ্গের আধুনিক তন্ত্রের নায়ক-নায়িকাদেরই কাহিনী। ইহারা ড্রয়িং-রুমে ব'সে ওটমিল পরিজ খায়, মোটরে চড়ে কিন্তু তবু সনাতনপন্থী বাঙালীর মতই স্ত্রী স্বামী পুত্রকন্যা মিলিয়া সংসার করে, সন্তানপালন করে, আত্মীয়-স্বজনের সেবা করে, দিনান্তে ঘরে আসে ও ঘরের কথাই ভাবে। যে কল্পিত অতি-আধুনিক জগৎ বাংলা-সাহিত্যে কিছুদিন দেখা দিয়াছে তাহা যে কত বড় মিথ্যা তাহা মণীন্দ্র বাবুর খাঁটি আধুনিক গল্পগুলি পড়িলে বুঝা যায়।

কল্পলতার 'হোটেলওয়ালা' গল্পের করুণ রস পাঠকের মনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত করে: আধুনিক ইউরোপের এই জার্ম্মান হোটেলওয়ালা মহাযুদ্ধের সময় বিবাহবিচ্ছেদের ফলে ইংরেজ স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাসন্তানকে হারাইয়া অন্তরের নিগূঢ় ব্যথাকে নাচগান ও হাসির উচ্ছ্বাসে ভুলিবার চেষ্টা করিত। এই সন্তানবিরহী পিতার একমাত্র সম্বল কন্যার নানা বয়সের ফটোগ্রাফে ভরা একটি এলবাম। জার্ম্মান পিতা ও ইংরেজ মাতার বিচ্ছেদের ফলে সে মাতার কাছেই থাকিয়া গেল, এই নির্ব্বাসিতা কন্যার বিরহে পিতার দিন কি করিয়া কাটিয়াছিল এবং হাসপাতালে দশ বৎসর পরে পিতামাতার চক্ষুর অগোচরে তাহার মৃত্যুতেই বা পিতার জীবন কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইল পড়িতে পড়িলে সেই বিদেশী পিতার হৃদয়-ব্যথায় বাঙালী পিতামাতার চক্ষেও জল আসিয়া যায়। মণীন্দ্র বাবুর অন্যান্য গল্পে কল্পলোক বস্তুলোক হইতে বড়, কিন্তু এখানে মাটির পৃথিবী তাহার হাসি কান্না লইয়া একেবারে বাস্তবরূপে দেখা দিয়াছে।

সব গল্পেই মণীন্দ্র বাবুর ভাষার সৌষ্ঠব, পদলালিত্য ও উপমার সৌন্দর্য্য পূর্ব্ব রীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ফাঁকি গল্পটি ছোট কিন্তু কালব্যাধিপীড়িতা নারীর মর্ম্মব্যথায় সকরুণ। ইন্দ্রা গল্পটিও সুন্দর। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

সোনার কাঠি—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু লিখিত। সরস্বতী লাইব্রেরী। দাম এক টাকা।

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত দশটি সুন্দর গল্পের সমষ্টি। দেশী ও বিদেশী দুই রকম গল্পই আছে। বিদেশী গল্পগুলিও স্বদেশী শিশুদের মন ভুলাইবার মত করিয়া গড়া। শিশুরা সন্দেশের ভক্ত, তাই আর সব গল্পের অপেক্ষা 'সন্দেশের দেশ'টাই তাহাদের বেশী পছন্দ হইবে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

আমাদের দেশে সুলেখকেরা শিশুসাহিত্যের দিকে যতখানি মন দিলে শিশুদের আনন্দ ও শিক্ষা দু-ই যথাযথ হইত ততখানি মন তাঁহারা এতদিন এদিকে দেন নাই। মণীন্দ্র বাবু ও অন্যান্য সুলেখকেরা যদি এদিকে একটু বেশী নজর দেন, তবে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র বাজে লেখা পড়িয়া পড়িয়া শিশুদের এবং ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকদের বাংলা ভাষাকে গলা টিপিয়া মারিবার সদিচ্ছাটা একটু কমিতে পারে।

বইটির বহিরাবরণ শিশুদের চিত্তাকর্ষণ করিবে দেখিলেই বুঝা যায়।

শ্রীশান্তা দেবী

পয়ারে সাংখ্যদর্শন—শ্রীনক্ষত্রকুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মনোহরপুর, কুমিল্লা। মূল্য দশ আনা মাত্র।

বাঙ্গালা পদ্যের মধ্য দিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনসাধারণের ভিতর দর্শনাদি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় তত্ত্বের নিক্ষর প্রচার করিবার প্রথা পুরান বাংলা-সাহিত্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়। এই জাতীয় সাহিত্যের আভাস 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৩৯শে খণ্ডে দিয়াছি। বর্ত্তমানে কাব্য ব্যতীত অন্যত্র পদ্যের আদর নাই, প্রাচীন যুগেও পুরাণ ব্যতীত অন্য কোনও বিভাগ বিষয়ে এই জাতীয় সাহিত্য তেমন আদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তথাপি গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে সরল পয়ারে সাংখ্যের মুখ্য তত্ত্বগুলির বর্ণনা করিয়া সেই প্রাচীন রীতির অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। সরল ও সুবোধ্য ভাবেই বিষয়গুলি বুঝাইবার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই সত্য, তবে বিষয়ের গুরুত্ববশতঃ ভাষা স্থানে স্থানে জটিল হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় সাংখ্য ও বেদান্তাদি দর্শনের মূলতঃ ঐক্য প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থান্তে পরিশিষ্টাকারে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার সংস্কৃত মূল, ও বেদাদি সংস্কৃত গ্রন্থে সাংখ্যমত-পরিপোষক যে-সকল কথা পাওয়া যায় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সাংখ্য-সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

জামাই-ই-চোর—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭৮ কাশীপুর রোড, বরাহনগর। মূল্য ছয় আনা।

ইহা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত একখানি গল্পের বই। পুস্তকে পাঁচটি গল্প আছে—বজ্জুত, দৈত্যপুরী, জামাই-ই-চোর, ভৌতিক ব্যাপার, মণ্টু বাবু। সহজ সরল ভাষায় লেখক ছেলেদের জন্য এই কয়টি মনোরম গল্প লিখিয়াছেন, সব কয়টিই সরস ও কৌতুকপ্রদ। ইহাদিগের মধ্যে জামাই-ই-চোর নামক গল্পটি অতি সুন্দর জমিয়াছে, পেটুক জামাইয়ের বর্ণনা বেশ মনোজ্ঞ। বজ্জুত গল্পটির ভাষা আর একটু সরল হইলে ভাল হইত বলিয়া মনে হয়। মোটের উপর এই পুস্তকখানি যাহাদের জন্য রচিত, তাহাদের ভালই লাগিবে। রচনার ভঙ্গী চমৎকার। কাগজ, বাঁধাই, ছাপা সকলই ভাল।

কালো মেয়ে—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বি-এ, বিদ্যাভূষণ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ৩৬।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ইহা একখানি উপন্যাস। একটি পিতৃহীন কালো মেয়ের জীবন কিরূপ দুঃখকষ্ট ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাই এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ। কালো মেয়ে সুবালা জেঠা-মহাশয়ের সংসারে প্রতিপালিত হইয়া জ্যেঠিমার নিকট সকল সময়ে তিরস্কার ও লাঞ্ছনা পাইত। ক্রমশঃ তাহা অসহ্য হইয়া উঠিলে, একদিন রাত্রিতে প্রতিবেশী শৈশব-সহচর বিনোদের নিকট পলাইয়া আসিল। তার পর বিনোদ সুবালার জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও মাতার সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিয়া গৃহত্যাগ করিল এবং সুবালাকে লইয়া দেওঘরে বাস করিতে লাগিল। তথায় একদিন ক্রোধবশে বিনোদ সুবালাকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিল, ইহাতে সুবালা বিনোদের নিকট বিদায় লইয়া এক পরিচিতা ভৈরবীর সঙ্গ লইল। ইহাই উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়। গ্রন্থের প্রধান নায়িকা সুবালার চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে, যদিও স্থানে স্থানে অযথা ভাবোচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অনাবশ্যক বর্ণনায় গ্রন্থখানির কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। পুরুষ চরিত্রগুলি আদৌ জমে নাই, অনিলের চরিত্রচিত্রণ একেবারে খাপছাড়া হইয়াছে। বিনোদের চরিত্রে আর একটু তেজস্বিতা থাকিলে ভাল হইত, অনেক স্থানে উহা প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল ত্রুটিসত্ত্বেও লেখকের লেখায় মাধুর্য্য আছে। তাঁহার ভাষা সরল, অনাড়ম্বর, লিখিবার ভঙ্গীও ভাল। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ সুন্দর।

কমলাসাগর—শ্রীঅধরচন্দ্র দাস খাসনবিশ। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ইহা একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ত্রিপুরা-রাজ্যের ইতিহাসের এক অংশ অবলম্বনে এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে, এবং উহা ত্রিপুরা-রাজকুলতিলক মহারাজ ধন্যমাণিক্যের রাজত্বকালের শেষ ভাগের ইতিহাস। মহারাজ ধন্যমাণিক্য যে সময়ে ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে বাংলার তক্তে সুলতান হুসেন শাহ বিরাজিত। ঘটনাচক্রে বঙ্গাধিপ সুলতান হুসেন শাহের সহিত ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্যের বিরোধ হয়। ত্রিপুর-সেনাপতি রায় চয়চাগের কৌশলে ত্রিপুরাধিপতি জয়ী হইলেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্য তাঁহার পাটেশ্বরী মহারাজ্ঞী মহাদেবী কমলাবতীর অনুরোধে ত্রিপুরার তদানীন্তন রাজধানী কৈলারগড়ে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া উহার নাম কমলাসাগর রাখেন। উল্লিখিত ঘটনাসমূহ অবলম্বনে এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে।

ত্রিপুরার এই বিশ্ববিশ্রুত রাজবংশের ইতিহাস অতি বিচিত্র। ইহার বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও সেই ইতিহাস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া উপন্যাস ও নাটক রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে যে-সকল রাশি রাশি উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা খুবই অল্প। লেখক সেই প্রাচীন পথ অবলম্বন করিয়া ত্রিপুরা-রাজ্যের ইতিহাসের এক চিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। চরিত্রগুলি বেশ ফুটিয়াছে, বিশেষতঃ সেনাপতি চয়চাগ, তাপসী কাত্যায়নী, পুরোহিত চণ্ডাই, দাসী লক্ষ্মী ও দাসীপতি নরোত্তম—ইহাদিগের চরিত্রগুলি বেশ জীবন্ত হইয়াছে। লেখকের ভাষা একটু সংস্কৃতবহুল হইলেও গ্রন্থে খাপছাড়া হয় নাই। পুস্তকের কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ভাল।

কাণাকড়ির খাতা—শ্রীহরিনির্ম্মল বসু ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, হইতে এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তকখানি অল্পবয়স্ক বালকদের জন্য লিখিত একখানি গল্পের বই। সাধারণতঃ যেরূপ শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে, ইহা ঠিক সেরূপ নহে; ইহা কতকটা স্বতন্ত্র ধরণের। কাণাকড়ি নামক একটি বালকের কবিত্বের ইতিহাস ইহাতে বেশ সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাণাকড়ি স্বভাবকবি; সুতরাং যে বস্তু বা যে প্রাণী তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে তাহার উপরই কাণাকড়ি কবিতা লিখিয়া ফেলিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণে রচিত তাহার কাঠ-বিড়ালী-বধকাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বোন নেড়ীকে কামড়াইয়া পলায়নোন্মুখ বিছার প্রতি তাহার কবিতা-বাণবর্ষণ, অথবা পুরুত-ঠাকুরের টিকির অন্তর্ধানে তাহার কবিতায় দুঃখপ্রকাশ, অথবা নেড়ীর শ্বশুরের উদ্দেশ্যে তাহার কবিতা প্রয়োগ—সকলই একটা বিমল হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া পাঠককে আমোদ ও আনন্দ দান করিয়াছে। পুস্তকে কবিতার ভাবের উপযোগী নানা চিত্রের সমাবেশ হইয়াছে, ইহাতে উহা আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ভাষা বেশ সরল ও ঝরঝরে। সকল দিক দিয়া এই পুস্তকখানি শিশুদের ও অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জন করিবে। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ বেশ সুন্দর।

পিণ্টুর বিলাতযাত্রা—ছোটদের গল্পসিরিজ প্রথম সংখ্যা, শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত; প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; দাম চারি আনা মাত্র।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা। একটি দুষ্ট অথচ মেধাবী বালক ভূতের সাহায্যে নানা অদ্ভুত কার্য্য করিয়া অবশেষে বিলাত পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিয়াছিল, তাহারই কৌতুকপূর্ণ কাহিনী। বর্ণনা সরল, ভাষাও সহজ। তবে আখ্যানবস্তুটি তেমন জমে নাই, ছাপায়ও দুই-চারিটি ভুল আছে। কাগজ, বাঁধাই ভাল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

স্মৃতির মূল্য—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

খুব সংযত ভাষায় গুছাইয়া লেখা এই বইখানি চমৎকার লাগিল। মনোবিশ্লেষণের যুগে প্রেম সাহিত্যে নানা ভাবেই দেখা দিতেছে। যেখানে বাস্তবিকতার জয়জয়কার সেখানে অনেক ক্ষেত্রে আর্টের দিক দিয়া আনন্দ পাওয়া গেলেও সব সময় মনের বেশ একটি নিষ্কলুষ রসতৃপ্তি ঘটে না। অপর পক্ষে যেখানে আদর্শ খুব উচ্চ করিয়া ধরা হয় সেখানে প্রায়ই আর্টের অভাব থাকায় মনে—বিশেষ করিয়া এ যুগের পাঠকের মনে, কোন ছাপই দিতে পারে না। আর্ট ও আদর্শের সামঞ্জস্যে আলোচ্য বইখানির শ্রেষ্ঠতা। বইখানির দ্বিতীয় গুণ এই যে লেখক খুব দক্ষতার সহিত ব্রাহ্ম ও সনাতনী হিন্দুর মনের ভাব লইয়া এমন সুন্দর ভাবে একটি মহৎ পরিসমাপ্তিতে আসিয়া পহুঁছিয়াছেন যে প্রশংসা না-করিয়া থাকা যায় না। প্লটটা এক হিসাবে সাধারণ হইলেও এর ভিতরের এই সূক্ষ্মতাটুকু মৌলিক।

মনস্তত্ত্বমূলক নভেল না হইলেও মাঝে মাঝে দু-একটি ঘটনার মধ্যে মনের জটিল গতি লেখকের হাতে বেশ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে।

ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে নরেন্দ্রের, সিনেমার সদ্য সদ্য নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়ায় আর আসানসোলে রেলগাড়ীতে

মাড়োয়ারির কথায় পরই দুই জন ফিরিঙ্গী উঠিয়া পুষ্পিতাকে অপমানিত করিতে যাওয়ায় একটু যেন ফরমাসী ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। ছাপার ভুল অল্পস্বল্প আছে এবং হেদুয়ার দক্ষিণে "সিটি কলেজ" দেখানও নিশ্চয় এই পর্য্যায়ে পড়ে।

বইখানি প্রকৃতই ভাল বলিয়া এই দোষ দুটি একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কাগজ বাঁধাই প্রভৃতি ভাল। মূল্য ২৲

দান—শ্রীচরণদাস ঘোষ। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপন্যাস। লক্ষপতি "দাদু"র নাতি সৌরেশ গোড়ায় একটি অতি রুক্ষ প্রকৃতি, আত্মম্ভরী যুবা ছিল; কিন্তু পাচিকা-কন্যা মলিনার সহিত ব্যর্থ-প্রেমের অনলে পুড়িয়া তাহার জীবনের শুদ্ধি আরম্ভ হইল। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু সাহিত্যে যেমন মন্দের অতিরঞ্জন আছে, তেমনই ভালর অতিরঞ্জনও সম্ভব। এই শেষের দোষে বইটি দুষ্ট। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন সব লোকের ভাল হইবার "খুন চাপিয়া" গিয়াছে।

ভাষা ভাল, মাঝে মাঝে সূক্ষ্মদৃষ্টিরও পরিচয় আছে। ভবিষ্যতে লেখকের নিকট ভাল জিনিষ আশা করা অসঙ্গত নয়।

কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি ভাল। মূল্য ২৲

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শেষের দাবী—শ্রীনিত্যহরি ভট্টাচার্য্য। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে প্লটের নূতনত্ব নাই। এই ধরণের প্লট অবলম্বন করিয়া বাংলা দেশে গত কয়েক বৎসরে বহু উপন্যাস রচিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা ভাল, কিন্তু প্রত্যেক পাতাতেই যেন সেন্টিমেন্টালিটির কিছু বাড়াবাড়ি। আরও সংযম দেখাইলে গল্পটি ফুটিত ভাল। মীরা নিতান্তই অস্পষ্ট, সবিতার চরিত্রই গল্পটিকে খেলো হওয়ার বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

ননদিনী—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ পালিত। প্রকাশক—শ্রীবনবিহারী নাথ, ৩।১ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একখানি উপন্যাস। কাঁচা হাতের রচনা। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহজ সাঁওতালী ভাষাশিক্ষা—শ্রীহরিপ্রসাদ নাথ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমাখনলাল নাথ, কে: শ্রীহরিপ্রসাদ নাথ, স্যানিটারী ইনস্পেক্টর, পোঃ লাহিড়ী, দিনাজপুর। মূল্য ১৲। পৃঃ ৮০+১৬১।

সাঁওতালী ভাষা শিক্ষার বই। বাংলায় অর্থ এবং ইংরেজীতে উচ্চারণ দেওয়া হইয়াছে। ব্যাকরণের অংশ আরও পরিপূর্ণ হইলে ভাল হইত। তাহা হইলেও সাধারণ পাঠকের পক্ষে সাঁওতালী ভাষা শিক্ষার জন্য উপযোগী বই হইয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ধ্যানযোগ—শ্রীশ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ, ভাগবতরত্ন, বি-এ প্রণীত। মূল্য কাপড়ে বাঁধান ১৲ টাকা, কাগজের কভার ৮০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান, ১২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখক মহাশয় সুপণ্ডিত, ভাবুক এবং ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও সাধক। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের সাধনার ফল এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশে ধ্যানের তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণসহ আলোচিত হওয়াতে তাহা ধ্যানশিক্ষার্থী মাত্রেরই আদরণীয় হইবে। দ্বিতীয়াংশে রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্মনেতা, অন্যান্য ব্রাহ্ম আচার্য্যের ধ্যান-বিষয়ক মত ও অভিজ্ঞতা বর্ণিত হওয়াতে তাহা ধ্যানরসিক মাত্রেরই আনন্দবিধান করিবে।

লেখক মহাশয় ভেদাভেদবাদী, তাঁহার মতে ধ্যানের চরমাবস্থায় ও ধ্যাতৃধ্যেয়ভেদ অংশতঃ বর্ত্তমান থাকে; এই মতের সমর্থনে তিনি গরুড়-পুরাণের একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন (১০ পৃ.) "ধ্যেয়মেব হি সর্ব্বত্র ধ্যাতা তল্লবতাং গতঃ"। কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত এই শ্লোকে "তল্লবতাং" এর পরিবর্ত্তে "তন্ময়তাং" এবং বঙ্গবাসী-প্রকাশিত গরুড়-পুরাণে "তন্ময়তাং" এইরূপ পাঠ আছে; শ্লোকের ভাবানুসারে শেষোক্ত পাঠই সঙ্গত মনে হয়। এই বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

অজাতশত্রু—শ্রীমৎ শীলালঙ্কার স্থবির কর্ত্তৃক প্রণীত। বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন।

অজাতশত্রুর জীবনকাহিনী মূল পালি হইতে সংগৃহীত হইয়া ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ঠিক ইতিহাস না হইলেও বইখানা শিক্ষাপ্রদ এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। তবে, ভাষাটা একটু যেন মধ্যযুগীয় হইয়াছে, কারণ, 'প্রাণেশ্বর', 'প্রিয়তমে' প্রভৃতি সম্বোধন স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্ত্তায় আজকাল নাটকে উপন্যাসেও বড়-একটা দেখা যায় না।

গ্রন্থকারের ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করা উচিত হইবে না। কিন্তু "দেবদত্ত কল্পকাল যাবৎ অবীচি-নরকে অসহ্য দুঃখভোগ করিয়া কল্পান্তে তথা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। অন্তিম সময়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হওয়ার ফলে, এই হইতে শত সহস্র কল্পের পর তিনি 'অটবীশ্বর' নামক 'পচ্চেক' বুদ্ধ হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন"; (১৭৩ পৃ.); আর, অজাতশত্রু অদ্যাবধি লৌহকুম্ভী নরকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন এবং 'ষাট হাজার বৎসর পরে তিনি লৌহকুম্ভী হইতে মুক্তি পাইবেন। পরে তিনি 'বিদিত বিশেষ' নামক প্রত্যেক বুদ্ধ হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।" ২৬১ পৃ।—ইত্যাদি কথা শুনিলে আজকাল অতি 'নিম্ন মানের' ছেলেরাও সন্দেহের হাসি হাসিবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞানের পরিভাষা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা হইতেছে অনেক দিন হইতেই। কিন্তু গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে ইহা আশ্চর্য্যরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে কেবল মাত্র বিজ্ঞান আলোচনার জন্যই একাধিক বাঙ্গালা পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে এবং সাধারণ পত্রিকাগুলিতেও জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশ করা প্রায় ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে বাঙ্গালা ভাষায় বহু বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত, সম্প্রতি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত সকল শিক্ষণীয় বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং বিজ্ঞান এই সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত হওয়াতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ইত্যাদি রচনার জন্য কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই সময়ে পরিভাষা-রচনা-সম্পর্কে সম্যক আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে।

পরিভাষা নির্ভুল, সরল এবং যতদূর সম্ভব সুপ্রচলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক কিন্তু এ-বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। পারিভাষিক শব্দের নির্দ্দোষ এবং যথার্থ অর্থ-দ্যোতক হওয়ার উপরে বিজ্ঞান-সাহিত্যের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। Calculas-উদ্ভাবক প্রতিভাশালী গণিতবিৎ লাইবনিৎজ্ এ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। দুরূহ গাণিতিক সমস্যার সমাধানে calculus-এর অসামান্য সাফল্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লাইবনিৎজ্ বলিয়াছেন—"The terminological expressions in mathematics are most helpful—*when they express the inmost nature of the matter shortly,—and as it were—give a picture of it.*…In this way the labour of thought is reduced to a wonderful manner." —"গণিত-বিজ্ঞানে, পরিভাষা যদি যথাযথ হয়, অর্থাৎ শব্দগুলি বিষয়-বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব সংক্ষেপে প্রকাশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটি চিত্র চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করে, তাহা হইলে ইহারা অতিশয় কার্য্যকরী হয়।…এইরূপে ইহাদের সাহায্যে মানসিক পরিশ্রম অভাবনীয়রূপে লঘু হইয়া পড়ে।" এই কথা বিজ্ঞানের সকল শাখা সম্বন্ধেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

লাইবনিৎজের এই বাক্য যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা সহজেই দেখিতে পাই। তড়িৎ-বিজ্ঞানের "পরিভাষা-সম্পর্কে জনৈক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার লেখককে বলিয়াছিলেন, যে, কেবল মাত্র পরিভাষার তালিকাটি পাঠ করিয়াই তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার অনেক অস্পষ্ট ধারণা পরিষ্কার হইয়াছে।

পরিভাষা-সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির উপর বারংবার জোর দিবার কারণ আছে। প্রকৃত পারিভাষিক শব্দের এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেকটা ঔদাসীন্য লক্ষিত হয়। শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের রচনাতেও যখন যথার্থ পরিভাষার অভাব দেখিতে পাই, তখন বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী পাঠকের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া দুঃখ হয়।

পারিভাষিক শব্দের এই অন্তর্নিহিত শক্তি একটি দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করিলে স্পষ্ট হইবে। দৃষ্টান্তটি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম-সম্বলিত একটি নিবন্ধ হইতে গৃহীত (প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৪১)। রেডিয়াম-আবিষ্কারক মাদাম কুরির জীবনী-প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে radio-activityর তর্জ্জমা করা হইয়াছে—"স্বতঃ-জ্যোতির্ম্ময়"। রেডিয়ম ও অপর সকল radio-active বস্তু হইতে সর্ব্বদাই radiant-energy বিকীর্ণ হইতেছে সত্য; কিন্তু এই শক্তি দৃশ্যমান নহে। এ কথা উল্লিখিত প্রবন্ধেও কয়েক লাইন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাংলা ভাষায় 'জ্যোতিঃ' শব্দটি দৃশ্যমান উজ্জ্বল আলোক (visible radiant energy) অর্থে ব্যবহৃত হয়; ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাহাই। তৎসত্ত্বেও radio-activityর বাংলা স্বতঃ-জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে! কিন্তু

'তেজ' শব্দটি দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় প্রকার radiant energy সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়, যথা আলোর তেজ, উত্তাপের তেজ, ইত্যাদি। Radio-active শব্দটির সহিত তুলনা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে—ইহার যথার্থ প্রতিশব্দ "তেজ-বিকীরক", "স্বতঃ-জ্যোতির্ম্ময়" নয়; এবং radio-active শব্দটি যেরূপ radium প্রভৃতির অন্তর্প্রকৃতি সহজেই নির্দ্দেশ করিতেছে, "তেজবিকীরক" শব্দটিও তাহাই করিতেছে। বাঙ্গালা শব্দের যথার্থ অর্থ সম্বন্ধে এই প্রকার ঔদাসীন্য মাতৃভাষার প্রতি অনাদর সূচিত করে।

অনেক স্থলে বিদেশী শব্দের অনুবাদে পল্লবগ্রাহিতা ও অহৈতুক অনুকরণপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। যথা Pole—ধ্রুব (চলন্তিকা, পরিশিষ্ট ঞ)। Polar Star 'ধ্রুব-তারা' সুতরাং pole নিশ্চয়ই ধ্রুব; এবং অনুরূপ যুক্তি হইতে নিষ্পন্ন anode (positive pole) ধন-ধ্রুব। ইহা অপেক্ষা চমৎকার পারম্পর্য্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু পদার্থশাস্ত্রবিৎ জানেন polar star মোটামুটি ভাবে 'ধ্রুব' (স্থির, নিশ্চল, অপরিবর্ত্তনীয়) তারা হইলেও পৃথিবীর মেরু* (end of the axis) বা চুম্বকের মেরুকে ধ্রুব মনে করিবার বিশেষ কোনও হেতু নাই। এইরূপ আর একটি অনুকৃতি electron শব্দটির অনুবাদের ভিতর পাইতেছি। Electron—'বিদ্যুতিন' (প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৪১) বা 'বিদ্যুতন' (বিজলী—ভাদ্র, ১৩৪১)। Electrolysis শব্দটির অর্থ বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ বটে; কিন্তু, 'electro' শব্দাংশটির অর্থ 'বিদ্যুত' নহে। অর্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র ধ্বনিসাম্যের জন্য electronএর অনুকরণে 'বিদ্যুতন' লেখা, Hair-lineএর অনুকরণে কুন্তলীন-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইহা লাভজনক হইলেও, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনায় এই-প্রকার প্রচেষ্টা হাস্যকর। এই সকল লেখক proton, photon, magneton, neutron, positron প্রভৃতি শব্দের প্রতিশব্দ কিরূপ করিতে চাহেন জানিতে কৌতূহল হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা যাইতে পারে, পাশ্চাত্য জগতে পদার্থবিজ্ঞানের চর্চ্চা অপেক্ষাকৃত অধিক দিনের বলিয়া প্রাচীন, কিন্তু ভ্রমাত্মক অনেক পরিভাষা উহাতে চলিয়া আসিয়াছে এবং পরে নির্দ্দিষ্ট অর্থে সুপ্রচলিত হইয়া যাওয়াতে উহা আর সংশোধিত করিয়া লইবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। কিন্তু আমাদের পক্ষে এই সকল শব্দের ভ্রান্ত শাব্দিক অনুবাদ করিবার আবশ্যক নাই। Electricity শব্দটিই এই প্রকার ভুল পরিভাষার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। গ্রীক electron শব্দটির প্রকৃত অর্থ তৈলস্ফটিক বা অ্যাম্বার। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক থেলস্ প্রথম লক্ষ্য করেন যে তৈলস্ফটিক রেশম দিয়া ঘর্ষণ করিলে উহা লঘু বস্তুকে আকর্ষণ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে রাণী এলিজা-বেথের চিকিৎসক ও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গিলবার্ট দেখিয়া-ছিলেন যে, শুধু তৈলস্ফটিক নয়, কাচ প্রভৃতি আরও প্রায় কুড়িটি বস্তু এইরূপে ঘর্ষিত হইলে লঘু বস্তুকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা লাভ করে। অতএব তিনি বস্তুগুলির এই বিচিত্র ধর্ম্মকে electricity বা তৈলস্ফটিকত্ব (তৈলস্ফটিকের ধর্ম্ম) বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার অনেক পরে মানুষ জানিতে পারিয়াছে যে, electricity ও lightning বা বিদ্যুৎ বাস্তবিক পক্ষে অভিন্ন। কিন্তু তখন নামটি আর পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

Wave-length শব্দটি এইরূপ ভুল পরিভাষার আর একটি চমৎকার উদাহরণ। সকলেই জানেন, এই শব্দটির দ্বারা বাস্তবিক তরঙ্গের 'দৈর্ঘ্য' নির্দ্দেশ করা হয় না। ইহা আসলে তরঙ্গের বিস্তার (অথবা পাশাপাশি দুইটি তরঙ্গের ব্যবধান) বুঝাইতেই ব্যবহৃত হয়। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদ ঠিক "তরঙ্গের দৈর্ঘ্য"ই করা হয়। বেতারের ঢেউ কত লম্বা তাহারও পরিমাপ দেওয়া হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা হইতে উদ্ধার করিতেছি:—

"একটা ঢেউ কত লম্বা তা ধর জানি। সেই মাপটা (চুড়ো থেকে চুড়ো) তার দ্রাঘিমা (wave-length)। এখন এক সেন্টিমিটারে সেই দ্রাঘিমাটি কতবার ভাগ খায়, জানলে জানা গেল সেই উর্ম্মির উর্ম্মি-সংখ্যা (wavo number)।" (ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৪১)।

Wave-length যে এক তরঙ্গ-শীর্ষ হইতে অপর তরঙ্গ-শীর্ষের ব্যবধান তাহা স্বীকার করিয়াও "ঢেউ কতটা লম্বা" জানিয়া ইহার পরিমাপ করা এবং দীর্ঘ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন "দ্রাঘিমা" শব্দের দ্বারা ইহার তর্জ্জমা করা কি যুক্তি-যুক্ত হইয়াছে? (মনে রাখিতে হইবে ভূগোলে দ্রাঘিমা—

* পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর অবস্থানের পরিবর্ত্তন হয়।

যে কাল্পনিক রেখাগুলি পৃথিবীকে longitudinal sectionsএ বিভক্ত করে—তাহাদেরই মাত্র বলা হয়।) চলন্তিকায় wave-length শব্দটির যথার্থ প্রতিশব্দ পাইতেছি—'তরঙ্গান্তর'। ইহা হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত আধুনিক পদার্থশাস্ত্রে force শব্দটি এবং ইহার সংযোগে সৃষ্ট অপর অনেক শব্দ—যথা lines of force, gravitational force প্রভৃতি শব্দের সম্বন্ধেও বিবেচনা করিবার প্রয়োজন ঘটিতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক force বা বলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান; সুতরাং এই শব্দগুলির আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া যথা-সম্ভব মর্ম্মানুবাদ করা উচিত।

চলন্তিকায় দেখিতেছি রাজশেখর বসু মহাশয় dynamics-এর অনুবাদ করিয়াছেন 'বল-গণিত,' এবং হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ ইহাকে 'গতি-বিদ্যা' করিয়াছেন। Dynamicsএর অনুবাদ 'বল-গণিত' না করাই ভাল। গ্রীক dunamis শব্দটির অর্থ 'বল' বটে; কিন্তু statics এবং dynamics এই উভয় শাস্ত্রই action of force-সম্পর্কিত গণিত। Dynamicsকে বিশেষ করিয়া 'বল-গণিত' বলিবার কোনও বৈজ্ঞানিক হেতু নাই। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত কারণেও 'বল-গণিত' শব্দটি অবাঞ্ছনীয়। 'গতি-বিদ্যা' কম আপত্তি-কর হইলেও, বিদ্যা, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শব্দ তিনটির পৃথক ও নির্দ্দিষ্ট প্রয়োগ স্মরণ রাখা উচিত। সাধারণত বাঙ্গালা ভাষায় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান pure science এবং বিদ্যা applied science অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'অর্থশাস্ত্র' 'ব্যবহারশাস্ত্র', 'জ্যোতির্বিজ্ঞান' 'পদার্থ-বিজ্ঞান' পূর্ত্ত-বিদ্যা','ডাক্তারি বিদ্যা', প্রভৃতি শব্দগুলি বিচার করিলেই ইহা স্পষ্ট হইবে। অতএব dynamicsএর প্রকৃত প্রতিশব্দ দাঁড়াইতেছে—'গতি-বিজ্ঞান'।

প্রাচীন ভারতীয় পদার্থশাস্ত্র গণিত রসায়ন বা জ্যোতিষ বিদ্যার ন্যায় ব্যাপক না হওয়াতে, আধুনিক পদার্থ-শাস্ত্রের পরিভাষা রচনায় আমাদের অনেকটা স্বাধীনতা রহিয়াছে।

এই সকল আলোচনা হইতে দেখিতে পাইতেছি, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনায় যতখানি মনোযোগ ও সাবধানতা প্রয়োজন তাহা অনেক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান নাই। প্রত্যেকটি পারিভাষিক শব্দ বিশেষরূপে সকল দিক বিচার করিয়া গৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কোনরূপে একটা প্রতিশব্দ তর্জ্জমা করিয়া দিলে বাঙ্গালা অনুবাদ হয়ত হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ পরিভাষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

ইহা ব্যতীত আর একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পরিভাষা রচনাকারীর মনে রাখা দরকার: যে-ভাষায় পরিভাষা রচনা করা হইতেছে তাহা বাঙ্গালা ভাষা। বাঙ্গালা সংস্কৃতের কন্যা কিনা ভাষা-তত্ত্ববিৎ তাহা বিচার করিবেন। তাহা হইলেও এ কথা সত্য যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জননীর রূপ দুহিতার স্বকীয়তার দ্বারা ভিন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছে। অনেক সংস্কৃত শব্দ কিছুমাত্র রূপ-পরিবর্ত্তন না করিয়াও বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থসূচক হইয়া পড়িয়াছে। স্নায়ু শব্দটি ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অর্থ nerve, কিন্তু সংস্কৃত স্নায়ু শব্দের অর্থ tendon। চলন্তিকায় দেখিতেছি—balance শব্দের তর্জ্জমা করা হইয়াছে 'তুলা'। ইহা নির্ভুল সন্দেহ নাই, কিন্তু বেহারাকে 'ষ্টোর' হইতে তুলা লইয়া আসিতে বলিলে সে কি আনিবে তাহা গবেষণার বিষয়। অথচ এই বহুব্যবহৃত জিনিষটির বাঙ্গালা নাম আছে। 'পঞ্চভূত' শব্দে সংস্কৃত 'ভূত' শব্দটি element এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু জলা-ভূমির উপর সঞ্চরণশীল আলেয়ার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি বৈজ্ঞানিক বলেন—উহা ভৌতিক ব্যাপার (physical phenomenon—চলন্তিকা,—গিরীন্দ্রশেখর বসু) অথবা অধ্যাপক ব্যোমযানের ইতিহাস প্রসঙ্গে ছাত্রমণ্ডলীকে বলেন—"ভূতবিদ্যার (যোগেশচন্দ্র রায়, প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৪১) প্রভাবে কোনও কোনও মানুষ প্রাচীন কালে শূন্যে উড়িয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন," তাহা হইলে শ্রোতার মনোভাব কিরূপ হইবে তাহা অনুমেয়! ভীরু বাঙালীকে এতটা ভূতের ভয় দেখান সমীচীন নহে। এক স্থলে দেখিতেছি nucleus-এর তর্জ্জমা 'ভূত-বীজ' (প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়—ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪১); ইহা শুধু ভীতিপ্রদ নয়, নির্দ্দোষও হয় নাই। Atomic physicsএ nucleus দ্বারা যে (জ্যামিতিক) কেন্দ্রীয়

সংস্থান বুঝান হয়, তর্জ্জমায় তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যাইতেছে না।

বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় পরিভাষা রচনা করা সহজ ব্যাপার নহে; এজন্য বহু বিদেশী ভাষার শব্দের সাহায্য লইতে হইবে এবং প্রধানতঃ সংস্কৃত শব্দ-সমুদ্রের উপর নির্ভর করিতেই হইবে—এ কথা সত্য। কিন্তু বাঙ্গালা পরিভাষা বাঙ্গালাই হওয়া উচিত। বাঙ্গালী পাঠক ইহার শ্রেষ্ঠ বিচারক; তাঁহাদেরও এ-বিষয়ে দায়িত্ব আছে। ভাষা সার্ব্বজনীন; পরিভাষাও এক জনের নহে। লেখক ও পাঠক উভয়ের কার্য্যের দ্বারাই ইহা যথাযথ ভাবে গঠিত হইতে পারে।

পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকা দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে দেওয়া হইল। ইহাতে প্রধানতঃ তড়িৎ-বিজ্ঞান ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপর বিজ্ঞানের পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঠকগণকে ইহা বিচার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

Machine—যন্ত্র
Tool—হাতিয়ার
Apparatus—পরীক্ষা-যন্ত্র; তৈজস
Mechanics—যন্ত্র-বিদ্যা
Dynamics—গতি-বিজ্ঞান
Statics—স্থিতি-বিজ্ঞান
Physical—জড়, জাগতিক, পার্থিব
Physics—পদার্থ-বিজ্ঞান
Science—বিজ্ঞান, শাস্ত্র
Applied Science—বিদ্যা; ব্যবহারিক বিজ্ঞান
Weight—ওজন (বলের পরিমাপ); পরিমাণ
Balance—পাল্লা; নিক্তি
Kinetic Energy—বেগ-শক্তি
Latent Energy—সুপ্ত-শক্তি
Potential Energy—প্রচ্ছন্ন-শক্তি; সঞ্চিত-শক্তি
Mechanical Energy—যান্ত্রিক-শক্তি
Foot-pound—ফুট-পাউণ্ড
Erg—আর্গ (বলের পরিমাপ)
Radio-meter—তেজ-দর্শক
Radiant Energy—তেজ-শক্তি
Quantum—শক্তি পরিমাণ; (সংক্ষেপে 'পরিমাণ')
Cosmic rays—সৃজন-রশ্মি
Fluorescence—স্বতঃ-জ্যোতি
Flurescent—স্বতঃ-দীপক
Homogeneous—সমাকার; সমব্যাপ্ত
Amplitude—সীমা; বিস্তৃতি
Inert—নিষ্ক্রিয়
Active—সক্রিয়
Affinity—আত্মীয়তা; টান
Configuration—পরিস্থিতি
Existence—সত্তা
Velocity—বেগ
Acceleration—বেগ-বৃদ্ধি
Motion—গতি
Thickness—বেধ
Film—পর্দ্দা
Crystal—স্ফটিক
Crystalline—দানাদার
Diffusion—পরিব্যাপ্তি
Gaseous—বায়বীয়
Emulsion—ঘোল
Chemical Equivalent—রাসায়নিক-সমশক্তি
Mean Free Path—স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণ-পথ (বা সীমা)
Electrical Discharge—বিদ্যুৎ-স্ফুরণ
Spark—স্ফুলিঙ্গ
Arc—বিদ্যুৎ-শিখা
Arcing—বিদ্যুৎ-জ্বলন
Flash—চমক; দ্যুতি
Fact—তথ্য
Lightning—বিজলী; সৌদামিনী
Insulation—প্রতিরোধ, অবরোধ
Transmitter—প্রেরক
Receiver—গ্রাহক
Ray—রশ্মি
Unit—একক, পরিমাপ, মাপকাঠি
Electrical Energy—বিদ্যুৎ-শক্তি
Watt-hour—ওয়াট-ঘণ্টা
Principle—মূল-সূত্র; মত, তত্ত্ব
Form—রূপ
Molecular movement—আণবিক স্পন্দন
Molecular agitation—পরিস্পন্দ (বৈশেষিক ন্যায়)
Wave—তরঙ্গ
Wave-length—তরঙ্গান্তর
Frequency—দ্রুততা
Pitch—গ্রাম
Intensity—তীব্রতা
Particle—বস্তুকণা; কণা
Corpuscle—কণিকা
Interference—ব্যতিকরণ
Ellipse—বৃত্তাভাস; দীর্ঘবৃত্ত
Orbit—কক্ষ
Axis—অক্ষ
Constellation—নক্ষত্র-মণ্ডল; রাশি
Nebula—নীহারিকা
Light-year—আলোক-বৎসর
Gravitation—মাধ্যাকর্ষণ
Heavenly body—জ্যোতিষ্ক

Aurora— মেরুজ্যোতি
Electrical fire— বিদ্যুদগ্নি
Valve—ভাল্‌ভ্
Amber— তৈলস্ফটিক ; অ্যাম্বার
Broad-cast— বার্তা-প্রচার ; 'কথা ছাড়া'
Excitation— উদ্দীপনা ; উত্তেজন
Ion— ভ্রাম্যমাণ অণু ; তড়িন্ময় অণু
Ionised— তড়িন্ময়
Radio Activity— তেজ-বিকীরণ
Transmuted —(অপর পরমাণুতে) রূপান্তরিত
Disintegration— ভাঙন
Mineral — খনিজ ; আকরিক
Calorimeter—ক্যালরি-মান
Induce—সঞ্চারিত করা ; চালা
Induction—সঞ্চারণ
Alpha-ray— ক-রশ্মি
Beta-ray—খ-রশ্মি
Gamma-ray— গ-রশ্মি
Direct proportion—সরল অনুপাত ; অনুপাত
Inverse proportion—বিপরীত অনুপাত
Exact multiple— পূর্ণ গুণিতক
Proto-Atom— আদিম পরমাণু
Alcohol— সুরাসার
Ether (chemical)—ইথার
Absolute temperature—চরম তাপমাত্রা
Absolute zero— চরম-শূন্য
Degree—ডিগ্রি ; মাত্রা
Activity— সক্রিয়তা
Phosphorescent —স্বতঃ-উদ্ভাসিত
Phosphorescence— উদ্ভাসন
Porous membrane— সচ্ছিদ্র পর্দা
Osmotic pressure— দ্রাবণ-চাপ
Manometer— চাপমান
Concentration— ঘনতা
Equation— সমীকরণ
Perfect gas— আদর্শ বায়ু
Experiment—পরীক্ষা
Soluble —দ্রবণীয়
Source of supply—বিদ্যুৎ-উৎস
Intervening Medium— অন্তবর্তী মধ্যস্থ
Rare—বিরল
Rarified—বিরলীকৃত ; বিরল
Bright—উজ্জ্বল
Glowing—প্রভাময়
Cathode ray—ঋণ-রশ্মি
Lenard ray—লেনার্ড-রশ্মি
Flexible—নমনীয়
Material particle—জড়-কণা
Diffuse—বিচ্ছুরিত করা
Emit—বিকীর্ণ করা
Project—নিক্ষেপ করা
Crookes Tube—ক্রুকসের নল
Constituent—উপাদান
Anode— সংযোগীপ্রান্ত
Cathode—বিয়োগী প্রান্ত
Anticathode—প্রতি-বিয়োগী প্রান্ত
Positive ray—ধন-রশ্মি
Collision—সংঘাত
Discharge Tube—স্ফুরণ-নল
Photograph—আলোক-চিত্র ("ছায়াচিত্র" নয়)
Expose—আলোকসম্পাত করা
Exposed— আলোকাক্রান্ত
Develope— পরিস্ফুট করা
Contact— সংস্পর্শ, জোড়
X-Ray—এক্স-রে ; অদৃশ্য-আলো
Rontgen Ray—রোণ্টগেন-রশ্মি
Opaque— অস্বচ্ছ
Excite—উদ্দীপ্ত করা ; 'চড়ানো'
Area—ক্ষেত্রফল ; আয়তন
Volume—ঘনফল ; আয়তন
Expansion—বিস্তার
Molecular weight—আণবিক ওজন
Gramme molecule— আণবিক গ্রাম
N (Avogadro's number)—'অ' (এক আণবিক-গ্রাম বায়ুতে অণু-সংখ্যা)
R (Gas constant)—'স'
Brownian movement—ব্রাউনীয় স্পন্দন
Viscous— আঠালো ; গাঢ়
Viscosity— আঠালো ভাব ; গাঢ়তা
Quartz—স্ফটিক, কাচমণি
Spontaneous—স্বতঃ-স্ফূর্ত
Suspended— বিলম্বিত
Symbol— প্রতীক
Vertical— খাড়া, লম্বমান
Horizontal—সমতল
Absolute—চরম ; নিরপেক্ষ
Relative—আপেক্ষিক
Relativity—আপেক্ষিকতা
Dimension—আয়তন
Event— ঘটন
Phenomenon—ব্যাপার
Phenomena—লীলা
Action— ক্রিয়া
Reaction—প্রতিক্রিয়া
Space—দেশ, স্থান, আকাশ
Interval—অবকাশ
Infinite—অসীম
Infinity—অসংখ্য
Infinitesimal—অণীয়ান ; অণিম
Logic—যুক্তিশাস্ত্র

Logical—ন্যায়সিদ্ধ
Subjective—আত্মগত
Objective—বিষয়গত ; বস্তুগত
Perception—অনুভূতি
Conception—উপলব্ধি
Accidental—আকস্মিক
Laboratory—পরীক্ষাগার
Anomaly—অনুপপত্তি
Exception—ব্যতিক্রম
Solution—সমাধান
Scheme, Design—পরিকল্পনা
Unification—একীকরণ
Analogy—উপমান, সমানুভূতি
Imagination—কল্পনা
Observer—দর্শক
Structure—কাঠামো
Supplementary—পরিপূরক
Peribilion—স্ফুট-বিন্দু
Geodesic—বত্ম´
Law of motion—গতিসূত্র
Reciprocally relative—অন্যোন্য-সাপেক্ষ
Standard—নিরিখ ; নির্দ্দিষ্ট মান
Probability—সাম্ভাব্যতা
Eliminated—নিরাকৃত ; নিষ্কাশিত
Eliminate—নিরাকরণ করা

দেশের মেয়ে

শ্রীসাধনা কর

আর কিছুক্ষণ দাঁড়াও—মাঝি ; ব্যস্ত দেখছি ভারি
ফিরে যেতে আপন গাঁয়ে। হ'ল বছর চারি
পার ক'রে সেই দিয়ে গেলে কবে শ্বশুর-ঘরে
খোঁজ নিলে না দেশের মেয়ের মন যে কেমন করে!
এইবারে ঐ পাশের বাড়ি ভাগ্যি ছিল বিয়ে
আসতে হ'ল কুটুম নিয়ে ; যেতে এ-পথ দিয়ে
ভাবলে বুঝি দেশে ফিরলে শুধায় যদি কেহ—
"হাঁসখালি তো গিয়েছিলে, কেমন আছে স্নেহ?"
তাই বুঝি এই খবর নেওয়া! যেমন হ'ল দেখা
অমনি ফিরে চললে—যা হোক্ ঘুচেছে দায় ঠেকা!
বাড়ির পাশে বাড়ি তোমার,—আসবে আবার কবে,
দু-চার-কথা শুনব,—তাতে কী আর দেরী হবে?
বিল্ পেরিয়ে খাল ছাড়িয়ে ধরবে গাঙে পাড়ি,
দু-দণ্ড রাত ; তার পরেই তো পৌঁছে যাবে বাড়ি।
জ্যোৎস্না রাতি, জোয়ার আসতে অনেক আছে দেরী
পথে যেতেও সঙ্গ দেখো মিলবে অনেকেরই।
একটি দিনেই এমন ত্বরা? আমি যে দিন গুনি,
আমায় কবে আসবে নিতে ; বল তো সব শুনি,—
কেমন আছে ছোট ভাইটি? কে লয় তারে কোলে?
এক বছরের রেখে তারে সেই যে এলেম চ'লে,
আর কি আমায় মনে আছে? আচ্ছা, এবার ঝড়ে
অনেক ক্ষতিই হ'ল বুঝি? শুনছি কাদের ঘরে
বাজ প'ড়ে কে পুড়ে গেছে? চৌধুরীদের নীতু
চাকরি ছেড়ে ফিরলো দেশে? কি যে বিদেশ-ভীতু!
বিনুদাদার বিয়ে খেলে, বউ নাকি তার কালো?
মাঝিখুড়ো, ঘরে তোমার আছে তো সব ভালো?
গামছাটাতে বাঁধা রইল অল্প কিছু চিঁড়ে,
আর ক'খানা পাটালীগুড়, ; নাও ভিড়িয়ে তীরে
খেয়ে নিয়ো ; বুঝি তোমার শুক্‌নো মুখের ভাবে
লগি বাইতে পথে পথে বেজায় খিদে পাবে।
কী-ই বা খেলে!—ভাল কথা, ব'লো কিন্তু মা-কে
এ-আশ্বিনে পূজোর আগে কোনো একটি ফাঁকে,—
ভাল ক'রে তত্ত্ব দিয়ে লোক পাঠানো চাই,—
দেওয়া-থোওয়া হয় না তেমন শুনছি হেতায় তাই।
জ্যৈষ্ঠে তবে এসেছিল খুড়তুতো বোন চিনু!
এবার কি সে দুমাস ছিল?—কী সব শুনেছিনু
ছোটকাকার বড় ছেলে—গেলই জ্বরে মারা?
সব চেপে রই মাঝি কাকা যায় না যে আর পারা।
যেতে এরা দেয় না আমায় নিতেই আসে-বা কে
মানুষ ফেলে মানুষ এখন টাকার খোঁজই রাখে।
যাহোক তা হোক্ সন্ধ্যে লাগে—এবার তবে যাও ;—
স্মরণ রেখো, এসো খুড়ো নিয়ে তোমার নাও।
বাবা যেন আসেন নিজে দাদা আসেন সাথে
এস কিন্তু—পত্র দিতেম,—নেই সে-সময় হাতে।

পাথার-পুরী

শ্রীশান্তা দেবী

গ্রীষ্মের দিনে সমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে অকস্মাৎ কচ্ছপের প্রকাণ্ড কালো পিঠের খোলা দেখিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। কোন্ অজানা অতল হইতে এক নিমেষে যে সে আবির্ভূত হইল, বুঝা যায় না। চেপ্টা পাহাড়ের মত এই জীবটির অদ্ভুত ও মন্থর গতির তুলনা হয় না। কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সলজ্জ ধীর গতিতে সে সমুদ্রের দিকে বিশেষ যেন কি এক উদ্দেশ্যে চলিয়াছে। তাহার গতি-ভঙ্গী দেখিয়া মানুষের লোভ হয় আপনার আয়তন ভুলিয়া কচ্ছপের পিঠে চড়িয়া সমুদ্রের রহস্যময় অতল গর্ভে পাড়ি দিতে।

জাপানী জেলেরা যদি কেহ সমুদ্রতীরে কচ্ছপ দেখিতে পায়, তাহা হইলে অমনি চীৎকার করিয়া উঠে, "কে কোথায় আছ হে এস, আজ জালে অনেক মাছ পড়িবে, শুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে।" জেলের দল সকলে ছুটিয়া আসিয়া সৌভাগ্যের দূতটিকে ধরিয়া চিরাচরিত প্রথা-মত ধেনো মদে স্নান করাইয়া আবার মুক্তি দিয়া দেয়।

বহুকাল পূর্ব্বে এক জাপানী যুবক জেলে উরশিমা তারো এক বৃহৎ কচ্ছপের পিঠে চড়িয়া সমুদ্রের অতল জলতলে পাড়ি দিয়াছিল। কিন্তু সে-কালে বোধ হয় মদ্য অর্ঘ্য দিবার এ রীতি ছিল না, অথবা উরশিমা বোধ হয় এতটা শান্তি-প্রিয় ছিল, যে, কচ্ছপ দেখিয়াই "কে কোথায় আছ" বলিয়া চীৎকার করে নাই।

কচ্ছপটা উরশিমার কানে কানে বলিল, "আমি জানি জানি, তোমার নাম যে উরশিমা তা আমি জানি। আমি যখন ছোট্ট বাচ্চা ছিলাম, তখন এই পাড়ার এক দল ছেলের হাতে এক বার ধরা পড়েছিলাম। তারা আমার উপর অত্যাচার করতে যাচ্ছিল, এমন সময় তুমি আমায় দেখ্‌তে পেয়ে ছেলেদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আমায় মুক্তি দিয়েছিলে। তুমি আমাকে জলে ছেড়ে দিতে দিতে বলেছিলে,—তুমি বড় কচি, বড় ছোট্ট, এখনও ডাঙায় উঠে একলা একলা ঘুরে বেড়াবার তোমার বয়স হয় নি।"

পাথার-পুরীর রাজকন্যা অতোহিমে আমাদের সম্রাজ্ঞী। তিনি তোমার এই দয়ার কাহিনী শুনে বড়ই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এক বার তোমায় দেখ্‌তে চেয়েছেন, তাই আমি তোমায় নিতে এসেছি। রাজকন্যা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী, তাঁর মাধুর্য্যের আর গুণের তুলনা হয় না। সেই দিন থেকেই তোমাকে আমি কত খুঁজে বেড়িয়েছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এক দিনও দ্বিতীয় বার তোমায় দেখা পাওয়ার ভাগ্য আমার হয় নি। কাজেই তোমাকে পাথার-পুরীর পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি নি। আজ তোমায় পেয়েছি, এস দয়া ক'রে আমার পিঠের উপর চ'ড়ে ব'স। তোমাকে এখনই সেখানে নিয়ে যাই।"

কাছিমের পিঠে উরশিমা তারোর পাথার-পুরী যাত্রা

কচ্ছপের কথা শুনিয়া মনে হইতেছিল আগ্রহে ও আন্তরিক আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতেছে। এই

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পাথার-পুরীর রাজকন্যা

বিরাটপৃষ্ঠ কূর্ম্মকে সেই শিশুশাবক বলিয়া চেনা উরশিমার পক্ষে সহজ ছিল না। এখন তাহার প্রকাণ্ড পিঠ শুধু যে আয়তনে বাড়িয়াছে তাহা নয়, শক্ত খোলা গজাইয়া এবং তাহার উপর সামুদ্রিক শ্যাওলা ও গুল্ম জন্মিয়া দেখিতে একেবারে অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। কচ্ছপ আবার বলিতে লাগিল, "এস, দয়া ক'রে আমার পিঠে চ'ড়ে ব'স। আমার দেহের আয়তন ত দেখ্‌ছ, তোমাকে পাথার-পুরীতে নিয়ে যেতে আমার কোন কষ্টই হবে না। রাজপ্রাসাদের তিনটি সিংহ-দরজা; সিংহ-দরজার ভিতর কত বিরাট প্রাসাদ, বিশাল কক্ষ সোনায় রূপায় মুক্তায় ও প্রবালে খচিত। রাজকন্যার সহস্র সুন্দরী দাসী। সে পাথার-পুরী ত নয়, যেন স্বর্গ-পুরী।"

পাথারা-পুরী যাহারা স্বচক্ষে দেখে নাই, তাহারা তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য কল্পনা করিতে পারিবে না। তাহাদের এইটুকু বলিলেই চলিবে, যে, কূর্ম্ম সে-পুরীর যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল, উরশিমা সেখানে গিয়া দেখিল, পুরীর রূপ-গরিমা তাহার চেয়ে এক তিলও কম নয়।

পাথার-পুরীতে বরুণলোকের সকল অধিবাসীরই ভিন্ন ভিন্ন কাজ আছে। অতিকায়দেহ তিমি রাজপ্রাসাদের সিংহ-দ্বার তদারক করিতেছে। মকর কুম্ভীররা সব প্রহরী, ঝাঁকে ঝাঁকে সোনালি রূপালি ছোট মাছেরা চরের ও দূতের কাজ করিয়া ফিরিতেছে।

কূর্ম্মের পিঠে চড়িয়া উরশিমা কেবলই ডুবিতে ডুবিতে পাঁচ শত তলা জলে স্রোতের তলায় নামিয়া তবে সমুদ্র-গর্ভে গিয়া পৌঁছিল। সেখানে পাল পাল মৌরলা, চাঁদা সকলে তিন হাজার ক্রোশ দূরের প্রাসাদ হইতে ছুটিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল।

উরশিমা তাহাদের সঙ্গে রাজ-প্রাসাদে গিয়া পৌঁছিতেই সুন্দরী রাজকন্যা তরুণ অতিথিকে মহানন্দে সম্বর্দ্ধনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু লজ্জারুণ মুখে বাক্য বেশী ফুটিল না; লজ্জায় তিনি তাঁহার আরক্তিম মুখমণ্ডল অঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলিলেন। রাজকন্যা মুখ ঢাকিয়াই উরশিমার হাত ধরিয়া তাঁহাকে আর একটি কক্ষে লইয়া গেলেন। সেই নাট্যশালায় অসংখ্য লাবণ্যময়ী নর্ত্তকী ও গায়িকার নাচে ও গানে উরশিমা সুরলোকের স্বপ্নে ডুবিয়া গেল।

তার পর দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া কি অকল্পিত স্বর্গ-সুখে উরশিমা ও অতোহিমের দিন লঘুপক্ষে উড়িয়া চলিয়া গেল, কথকেরা সে কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া বর্ণনা করেন নাই। সম্ভবতঃ এ আনন্দ-স্রোত বর্ণনা করার ভাষা তাঁহাদের ছিল না বলিয়াই সে চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। যাই হোক, এ কথা আমরা শুনিয়াছি, যে, তিন বৎসরের পর উরশিমার মনে অবসাদ দেখা দিল। এ অলস জীবন আর তাহার ভাল লাগিত না, কেবলই আপনার ঘর-বাড়ি ও গ্রামের কথা মনে পড়িত। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সে রাজকুমারীকে বলিল, "তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি এবার দেশে ফিরতে চাই।"

এ কথায় রাজকন্যার বুক ভাঙিয়া পড়িল, চোখের জল উছলিয়া উঠিল, কিন্তু অবশেষে তিনি মনকে বুঝাইলেন, যে, উরশিমাকে তাঁহার ছাড়িয়া দিতেই হইবে। রাজকন্যা মিনতি করিয়া বলিলেন, "উরশিমা, আমাকে তুমি ভুলিও না।" তার পর বিদায়-মুহূর্ত্তে স্মৃতি-চিহ্নরূপে ছোট একটি রত্নখচিত কৌটা উরশিমার হাতে তুলিয়া দিয়া বার-বার করিয়া বলিয়া দিলেন, "এ কৌটা যেন সে কোন দিন না খোলে।"

যত সুন্দরী দাসী, সখী ও প্রিয়দর্শন সান্ত্রী প্রহরীদের সম্মুখে উরশিমা পাথার-পুরী হইতে চিরবিদায় লইয়া চলিয়া গেল। আবার সেই বিরাট কূর্ম্মের পিঠে চড়িয়া পাঁচ শত তলা জলস্রোত ফুঁড়িয়া উরশিমা নিজ গ্রামের সমুদ্র-তীরে আসিয়া দেখা দিল। সেই সমুদ্র, সেই উর্ম্মিমালা, সেদিন যেমন ছিল তিন বৎসর পরে আজও তেমনই আছে; কিন্তু সেই পুরাতন গ্রামের গৃহগুলি, সেই পরিচিত বনভূমি কোথায় যেন মিলাইয়া গিয়াছে; উরশিমা আপনার বলিয়া চিনিতে পারে এমন একটা কিছু কোথাও নাই। উরশিমা ডাঙায় উঠিল, চারি ধারে কেবল অজানা গৃহ, আর অচেনা মুখ। সে নিজে সত্যই উরশিমা কি আর কেহ এ বিষয়েও তাহার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল। মনের সন্দেহ চাপিয়া সে এক জন পথিককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে পথিক, উরশিমা তারো বলিয় কাহাকেও চেন?" পথিক হাসিল, হাসিয়া বলিল,

"উরশিমা ত কত শত বৎসর আগে এই দেশ হইতেই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে !"

উরশিমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিয়া গেল; রাজকন্যার নিকট ফিরিয়া যাইতে তাহার মন কাঁদিয়া উঠিল। হতাশ হইয়া উরশিমা রত্নখচিত কৌটাটি খুলিয়া ফেলিল।

উরশিমা যেমন ভাবিয়াছিল, কৌটার ভিতর তেমন কিছুই নাই। কৌটা খুলিতেই তাহার তলা হইতে হাওয়ায় ভাসিয়া খানিকটা শুভ্র ধোঁয়া উঠিয়া উরশিমাকে বেড়িয়া ধরিল। এক মুহূর্ত্তে তরুণ যুবক উরশিমা অতি বৃদ্ধ জেলে হইয়া গেল। তাহার তরুণ মুখমণ্ডল ও মসৃণ

উরশিমা তাম্রো জরাগ্রস্ত হইল

চর্ম্ম নিমেষে মিলাইয়া গেল, কুশ্রী বলিরেখায় মুখ ভরিয়া গেল। তাহার দীর্ঘ দেহ অর্দ্ধেক ছোট হইয়া গেল, পিঠ জরাভারে নুইয়া পড়িল, সুকঠিন দুই পা এমনই কাঁপিতে লাগিল, যে, তাহার দাঁড়াইয়া থাকাই দায় হইল। তবু সর্ব্বহারা বৃদ্ধ এক হাতে কৌটার ঢাকনা ও অপর হাতে শূন্যগর্ভ কৌটাটি লইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

জাপানী "নিপ্পন" পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্পটি পড়িয়া মনে হইল,—সমুদ্রতীরবাসীদের মধ্যে রহস্যময় সাগরের মায়ার এইরূপ গল্প বোধ হয় নানা দেশেই প্রচলিত আছে। কেহ অতল সমুদ্রগর্ভে সেই কল্পলোকের সৃজন করে, কেহ অন্তহীন সমুদ্রের পারে সেই মায়ালোকের কল্পনা করে।

বিখ্যাত আইরিশ বীর ফীনের পুত্র ওশিনের নামে এইরূপ গল্প আছে, যে, চিরযৌবনের দেশের অনন্ত-যৌবনা রাজকন্যা নায়াম ওশিনের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার ফেন-শুভ্র অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সাগরের পর সাগর পার হইয়া নিজ দেশে লইয়া যান।

সেখানে সমুদ্রতীরে নীল পাহাড়ের ধারে নির্ঝরিণীর কোলে সোনায়-মোড়া রত্নখচিত প্রাসাদে দশদিনব্যাপী উৎসবের পর অনন্তযৌবনা সুবর্ণ-কেশী নায়ামের সহিত ওশিনের বিবাহ হইল।

চির-বসন্তের ফুল-ফলের সমা-রোহের ভিতর রাজসমারোহে, সঙ্গীতে উৎসবে, বাদ্যে, শত অনুচরের সেবায় ওশিনের তিন শত বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার মনে হইল, মাত্র তিনটি বৎসর বুঝি অতীত হইয়াছে।

তখন মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল দেশ, পিতামাতা ও বন্ধুদের জন্য। নায়ামকে চোখের জলে ভাসাইয়া তাহার নিকট বিদায় লইয়া ওশিন দেশে ফিরিয়া চলিলেন। যে ফেন-শুভ্র অশ্বের পিঠে ওশিন এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারই পিঠে চড়িয়া নায়াম তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে বলিলেন। কিন্তু বার-বার তিন বার করিয়া নায়াম বলিয়া দিলেন, 'এ অশ্বের পিঠ হইতে তুমি নামিও না, তাহা হইলে তুমি আর এ-লোকে ফিরিতে পারিবে না।'

স্বদেশে ফিরিয়া ওশিন পিতা কি বন্ধু কাহারও কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলেন না। যাহাদের ফিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা সকলেই বলিলেন, "শত শত বৎসর আগে তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন, তাঁহার পুত্র ওশিন
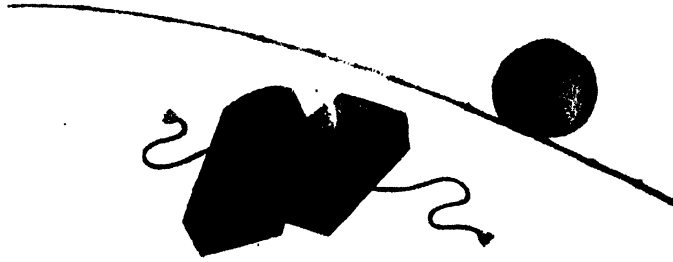
কোন দেবকন্যার সহিত চিরযৌবনের দেশে চলিয়া গিয়াছেন।"

ওশিন বৃথা সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরিয়া এক জায়গায় কয়েক জন লোককে পাথর তুলিতে সাহায্য করিতে গিয়া ছিটকাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়েন। অমনই নায়ামের অশ্ব তীরবেগে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, ওশিনের বলিষ্ঠ দেহ, অনন্ত যৌবন, খরদৃষ্টি সকলই অন্তর্হিত হইল। ক্ষীণবল হতদৃষ্টি বৃদ্ধ ওশিন ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন!

সাধারণ গ্রন্থাগার, সৎসাহিত্য ও গবেষণা

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়, রাঁচি

১

রোমান পণ্ডিত সিসিরো বলিয়াছিলেন, "পুস্তক-শূন্য গৃহ আত্মাশূন্য শরীরের অনুরূপ।" "A room without books is a body without soul." আমাদের অনেকের নিকট ইহা অত্যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও, আমার মনে হয়, অন্ততঃ গ্রন্থাগারশূন্য শহরকে আত্মাশূন্য শরীরের সঙ্গে তুলনা করিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। মনীষী কার্লাইল গ্রন্থাগারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্যমূল্য বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "A collection of books is a real university." বস্তুতঃ, নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির পুঁথিসংগ্রহ তাহাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

জ্ঞানবিতরণ ও শিক্ষাদান হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ পুণ্যকার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বহুপ্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার সমধিক সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিয়াছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দী হইতেই হস্তলিখিত পুঁথি প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই পুঁথিলিখন প্রথমে বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে সীমাবদ্ধ ছিল; ও পরে জ্যোতিষ, ন্যায়, ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি, এবং পুরাণ ইতিহাস ও কাব্যাদিতেও প্রসারিত হইয়াছিল। প্রথমে অনেক পুঁথি দেবমন্দিরে রক্ষিত হইত ও পরে মন্দিরের সংলগ্ন গৃহে দেবোচিত সম্মানে রক্ষিত হইত এবং ঐ গৃহও দেবালয়ের মধ্যে পরিগণিত হইত; কোন-কোন স্থলে ঐরূপ গ্রন্থাগারকে "সরস্বতী-ভাণ্ডার" বলা হইত। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালেও বিদ্যার্থী ও পণ্ডিতদের জন্য ধর্ম্মগ্রন্থ নকল ও সংগ্রহ করা ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। জিনদের মন্দিরে ও উপাশ্রয়ে, বৌদ্ধদের বিহারে ও সঙ্ঘারামে, হিন্দুদের মঠ ও মন্দিরে প্রচুর পরিমাণে হস্তলিখিত পুঁথি রক্ষিত হইত। কোন-কোন রাজপ্রাসাদেও এইরূপ গ্রন্থাগার ছিল। নালন্দা, বিক্রমশিলা, উদ্দণ্ডপুরি ও তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশ্রুতনামা গ্রন্থাগারে সুদূর চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে শিক্ষার্থী ও পণ্ডিতেরা আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন ও পুঁথি নকল করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেন। সম্প্রতি মধ্য-এশিয়ায় ও পূর্ব্ব-এশিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে ভারতবর্ষ হইতে এশিয়ায় বিভিন্ন দেশের যাতায়াতের প্রধান পথগুলির পার্শ্বে ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকেরা মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের আনীত পুঁথিগুলি ঐ সব দেশের শিক্ষার্থীদের দ্বারা নকল করাইতেন, শিক্ষা দিতেন ও গ্রন্থাগার স্থাপন করিতেন। এইরূপে তাঁহারা ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কৃষ্টিও ভারতের বাহিরে বিস্তার করিতেন। বৌদ্ধ যুগের পরেও হিন্দুরাজগণ গ্রন্থাগার-স্থাপন, সুপণ্ডিত ও প্রতিভাশালী লেখকদিগকে আনুকূল্য ও উৎসাহ প্রদান প্রভৃতিতে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। এ বিষয়ে মধ্যভারতে ধার-নগরীর ভোজরাজা, দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজা, অনহিলবাদপট্টনের বিশালদেব ও রাজমান্ত্রির রাজারাজ, বিজয়নগরের প্রতাপদেব রায়, বঙ্গদেশের পাল-রাজবংশের প্রথম ও দ্বিতীয় গোপাল দেব, এবং উত্তর-ভারতে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন, গুপ্ত-রাজবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হিন্দু মঠ-মন্দিরে হস্তলিখিত

বহুসংখ্যক পুঁথির সংগ্রহ থাকিত এবং এখনও কোন-কোন স্থানে আছে। মুসলমানের ভারত-বিজয়ের পর ভারতের অনেক মঠ ও মন্দির ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগার বিনষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি নিজামের রাজ্যে ওয়াডির নিকট নাগই গ্রামে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর দুই খানা শিলালিপি উদ্ধার হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে সেখানে একটি ঘটিকাশালা বা বিদ্যালয় ('কলেজ') ছিল এবং তৎসংলগ্ন যে গ্রন্থাগারটি ছিল তাহা এত প্রকাণ্ড যে তার জন্য ছয় জন গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিল। আর এই গ্রন্থাগারকে ঐ শিলালিপিতে "সরস্বতী-ভাণ্ডার" ও উহার অধ্যক্ষদিগকে "সরস্বতী-ভাণ্ডারিকা" বলা হইয়াছে। রাজপুতানার জয়সল্‌মীর, ভাটনের প্রভৃতি স্থানে, ও গুজরাটের আহমেদাবাদ, সুরাট, কাম্বে প্রভৃতি স্থানের বর্ত্তমান জৈন-উপাশ্রয়গুলির সংলগ্ন যে পুস্তকাগার আছে তাহাদিগকে "ভারতী-ভাণ্ডার" নাম দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে কোন-কোন ভারতী-ভাণ্ডারে দশ হাজারেরও অধিক পুঁথি আছে। কেবল প্রাচীন ভারতে নয়, প্রাচীন আসিরিয়া, বাবিলোনিয়া, মিশর (ইজিপ্ট) প্রভৃতি দেশের পুরাযুগের গ্রন্থাগারগুলি অধিকাংশই ধর্ম্ম-মন্দিরের অঙ্গীভূত বা সংশ্লিষ্ট ছিল। তবে ভারতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ এতই পবিত্র গণ্য হইত যে এদেশে মিশরদেশের প্যাপিরাস তৃণের ন্যায়, ভূর্জ্জপত্র বা তালপত্র এবং পরে তুলা-নির্ম্মিত তুলট কাগজ পুঁথির জন্য ব্যবহৃত হইত। গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় চর্ম্মে প্রস্তুত কাগজ, বা পার্চ্চমেণ্ট বা ভেল্লম (velium) প্রভৃতির প্রচলন ছিল না। সাধারণ পশু-চর্ম্ম ধর্ম্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অশুচিজ্ঞানে হিন্দুর পক্ষে পরিত্যাজ্য ছিল ও এখনও আছে।

যদিও চীনদেশে হান-বংশীয় রাজাদের সময়, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০২ সন হইতে খ্রীষ্টাব্দ ২২১এর মধ্যে কাঠের পাটায় ছাপিবার (block printing এর) প্রথা উদ্ভাবিত হয় এবং তিব্বত দেশেও তাহা প্রচলিত হয়, ভারতবর্ষে ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে পুস্তক-মুদ্রণ আরম্ভ হয় নাই। পোর্ত্তুগীজেরা গোয়া-নগরীতে ভারতের প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত করে।

কিন্তু ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা অক্ষরে সর্ব্বপ্রথম পুস্তক হুগলীতে (চুঁচুড়ায়) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তক ইংরেজ গ্রন্থকার নাথেনিয়েল ব্রাসে হালহেডের "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" (Grammar of the Bengali Language)। কিন্তু তারও অনেক পর পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় হস্তাক্ষরে অনেক পুঁথি লিখিত হইত। এখনও হস্ত-লিখিত পুঁথি প্রস্তুত করা একেবারে স্থগিত হয় নাই।

প্রাচীন ভারতে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন সকলই ধর্ম্মের পরিধানে সজ্জিত হইত, সর্ব্ববিধ জ্ঞান ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল। কেবল, যে-জ্ঞান ক্ষণিকের উত্তেজনা বা কৌতূহল চরিতার্থ করে, হিন্দু ঋষিগণ তাহার কোন মূল্য দিতেন না। বস্তুতঃ গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ বা জলাশয় প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা কোনও অংশে কম পুণ্য কর্ম্ম নয়। জলাশয় কিংবা ফলবান বৃক্ষ আমাদের শারীরিক ক্ষুৎ-পিপাসা মোচন করে ও বৃক্ষচ্ছায়া ক্লান্ত দেহের শ্রান্তি দূর করে। কিন্তু গ্রন্থাগার দেবালয়ের ন্যায় আমাদের হৃদয়ের ও আত্মার ক্ষুৎ-পিপাসা মোচনে সাহায্য করে ও শোকতাপান্বিত হৃদয়ে সান্ত্বনা আনয়ন করে! সাহিত্যচর্চ্চা যে নীরস জীবনকে সরস করে এ-কথার যাথার্থ্য অবশ্য অনেকেই স্ব-স্ব জীবনে অনুভব করিয়াছেন।

ইংরেজ সাহিত্যিক ফ্রেডারিক হ্যারিসন যথার্থ কথাই বলিয়াছেন যে সাহিত্যের ভিতর যে কবিত্ব ও ভাবরসের অংশ আছে তাহা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিত্য ব্যবহারের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। "I put the poetic and emotional side of literature as the most needed for daily use."

বাঙালীর গৌরবস্থল কবিশিরোমণি মাইকেল মধুসূদনও বলিয়াছেন,—

> "এ ধরার কর্ম্মভার মন-বেদনিলে,
> কার করপদ্মস্পর্শে ঘুচে সে বেদনা
> বরদার দয়া সম?
> হাত বুলাইলে জননী, ব্যথিত দেহে
> ব্যথা কোথা থাকে?"

এ কেবল দার্শনিক, সাহিত্যিক বা কবির উক্তি নয়। এই মর্ম্মে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্যর জন্ হারসেলও বলিয়াছেন,—

"If I were to pray for a taste which should stand me in stead under every variety of circumstances, and be a source of happiness and cheerfulness to me through life, and a shield against its ills, however things might go amiss and frown upon me, it would be a taste for reading......Give a man this taste, and the means of gratifying it, and you can hardly fail of making a happy man, unless, indeed, you put into his hands a most perverse selection of books."

অর্থাৎ, "বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে মনকে অটল রাখিতে, হৃদয়ে আজীবন আনন্দ ও প্রফুল্লতা দান করিতে, এবং ভাগ্যদেবীর ভ্রুকুটি ব্যর্থ করিয়া ঘোর বিপত্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ কোন প্রবৃত্তি যদি ভগবানের নিকট ভিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে আমি পুস্তক-অধ্যয়নে রতি ভিক্ষা করিব। যদি তুমি কাহারও মনে পুস্তকপাঠে আসক্তি জন্মাইতে পার', তাহা হইলে সে ব্যক্তি জীবনে সুখী না হইয়া যাইতে পারে না, যদি না সম্পূর্ণ অর্ব্বাচীন ভাবে নির্ব্বাচিত অযোগ্য পুস্তকাবলী তাহার হস্তে প্রদান কর।"

২

সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক-নির্ব্বাচন সাধারণতঃ তিনটি উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। তাহার দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য ও একটি গৌণ উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য প্রথমতঃ, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার; ও দ্বিতীয়তঃ, উপযোগী সাহিত্য জোগাইয়া পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয়ে ভাবের পরিপুষ্টি, পরিমার্জ্জন ও উৎকর্ষসাধন। আর গৌণ উদ্দেশ্য, জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধিত করিয়া বিশেষ বিশেষ উপযুক্ত পাঠক-পাঠিকার মনে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য আগ্রহ উৎপাদন করা এবং তাঁহাদের গবেষণার সহায়তা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার যথাসম্ভব পরিপুষ্ট করা। কোন স্থানের সাধারণ গ্রন্থাগারে এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণেও সাধিত হইলে কেবল যে সেই স্থানের গৌরব বৃদ্ধি করিবে তাহা নয়, আদর্শ গ্রন্থালয় রূপে সমস্ত দেশের গৌরবস্থল হইবে।

গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় মুখ্য উদ্দেশ্য—উপযোগী সাহিত্য নির্ব্বাচনের দ্বারা পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে ভাবের পরিপুষ্টিসাধন ও পরিমার্জ্জন।

আজকাল দেশ-বিদেশে অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে; তাহার মধ্যে সৎ গ্রন্থের সংখ্যাও অল্প নয়। কিন্তু জনসাধারণের পুস্তকপাঠের সময় অল্প এবং সাধারণ গ্রন্থাগারেরও পুস্তক ক্রয় করিবার অর্থ অপরিমেয় নয়। এ জন্য লোকশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পুস্তক নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন এ-কথা বলা বাহুল্য।

পুস্তক-নির্ব্বাচন কেবল যে সব সময়ে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের রুচি অনুযায়ীই করিতে হইবে তাহা নয়। উপযুক্ত পুস্তক-নির্ব্বাচন দ্বারা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের রুচি যথাযোগ্য পথে চালিত করা গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষদের একটি প্রধান দায়িত্ব বলিয়াই আমার মনে হয়। দুঃখের বিষয়, অনেক সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ কথা সব সময়ে মনে রাখেন না।

সচরাচর দেখা যায় যে সাধারণ পুস্তকাগারে উপন্যাস-শ্রেণীর গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; সুতরাং উপন্যাসের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। সাধারণ (public) গ্রন্থাগারে যথার্থ ভাল উপন্যাস যথাসম্ভব প্রচুর পরিমাণে রাখা নিশ্চয়ই আবশ্যক।

কবিতার ন্যায় উপন্যাসও রস-সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু যে-কোন রকমের রসবোধ ও রসসৃষ্টি সৎসাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। যে বিশুদ্ধ রস ও ভাব উচ্চ আদর্শের মধ্য দিয়া অসম্পূর্ণ মানুষকে পূর্ণত্বের দিকে—যথার্থ মনুষ্যত্ব বা দেবত্বের দিকে লইয়া যায়, তাহা দ্বারাই প্রকৃত ঔপন্যাসিক, মানবের মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক জীবনের সম্যক জ্ঞানের সাহায্যে, ঘটনার সামঞ্জস্যে, চরিত্রের সুনিপুণ অঙ্কনে ও কলানৈপুণ্যে একটি নির্ম্মল ভাব রস ভোগের নিত্যজগৎ সৃষ্টি করেন। এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য ও প্রত্যক্ষ সার্থকতা পাঠক-পাঠিকার মনে সাহিত্য-রস-ভোগের বিমল আনন্দ প্রদান করা। আর উহা পরোক্ষ ভাবে উচ্চ আদর্শের চিত্রদ্বারা পাঠক-পাঠিকার মগ্ন চৈতন্য বা সুপ্ত চৈতন্যের (unconscious mindএর) উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে।

পরিতাপের বিষয়, সম্প্রতি বাস্তবিকতার (realismএর) দোহাই দিয়া, বিজাতীয় বিকৃত মনোবৃত্তিপোষক এক শ্রেণীর উপন্যাস বাংলা ভাষায় দেখা দিতেছে। আরও অধিকতর পরিতাপের বিষয় এই যে, কয়েকটি কৃতবিদ্য মনীষী বাঙালী লেখক এই

শ্রেণীর উপন্যাস প্রণয়নে মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও প্রতিভা আছে, উচ্চ অঙ্গের রসবোধ আছে, কবিত্ব আছে, মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ-শক্তি ও অঙ্কন-কৌশল আছে ও ভাষার প্রাঞ্জলতা আছে; কিন্তু ক্ষোভের বিষয় তাঁহাদের প্রণীত অধিকাংশ উপন্যাস নূতন সম্ভোগ-ধর্ম্মের পরিপোষক।

অত্যধিক বস্তুতান্ত্রিকতার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে যে-সব গ্লানি উৎপন্ন হইয়াছে, অধুনা সে সমাজের কোন-কোন চিন্তাশীল নেতা তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার নিরাকরণের উপায় চিন্তা করিতেছেন। আর আমরা কি সেই গ্লানিজনক বিদেশী ভাব ও আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমাদের সমাজের অমঙ্গলের পথ আরও উন্মুক্ত করিব? বিদেশীয় সভ্যতার সংস্পর্শে অনুকরণযোগ্য কোনও নূতন আদর্শ বা ভাবের সমাহরণ ও সমীকরণের দ্বারা আমাদের সমাজের আদর্শ ও ভাবসম্পদের শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইতে পারে বটে, কিন্তু যে-সব নূতন আদর্শ ও ভাবধারা আমাদের সমাজের মৌলিক (fundamental) উচ্চ আদর্শ ও ভাবধারার অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হয়, সেরূপ আদর্শের আমদানিতে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ অমঙ্গলই সাধিত হইবে—ইহা নিশ্চিত। কোন-কোন বিষয়ে হিন্দু সমাজ বহু যুগের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনায় পঙ্কিল হইয়াছে সত্য, এবং ঐ সমস্ত সঞ্চিত গলদ দূর করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হওয়া হিন্দু সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মূলতঃ হিন্দু সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ যে পাশ্চাত্য সমাজের বস্তুতান্ত্রিক ও ভোগমূলক আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর ও কল্যাণকর ইহা চিন্তাশীল পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে কেহ কেহ এখন উপলব্ধি করিতেছেন, এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে অনেকেই করিবেন।

আমি একথা বলি না যে ঔপন্যাসিক কেবল ত্যাগ-ধর্ম্মের চিত্র—মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শের চিত্রই আঁকিবেন। বস্তুতঃ পূর্ণ আদর্শ এ-সংসারে সচরাচর আয়ত্ত হয় না। কৌলিক সভ্যতা ও সংস্কার, শিক্ষা ও আবেষ্টনের প্রভাবে প্রত্যেকেরই জীবনের আদর্শ গড়িয়া উঠে। প্রতিকূল আবেষ্টনের সংঘর্ষে অনেকেরই জীবনস্রোতে অল্পবিস্তর তরঙ্গ উঠে এবং কোন-কোন স্থলে সেই তরঙ্গ উত্তাল হইয়া উঠিয়া নৌকাডুবিও হয়। বিভিন্ন অবস্থায় জীবনের আদর্শও বিভিন্ন আকার ধারণ করে ও সেই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে গিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন সমস্যা উপস্থিত হয়; এবং সেই সমস্যার সমাধান অবস্থাভেদে বিভিন্ন উপায়ে সাধিত হইতে পারে। ঔপন্যাসিক এই সমস্ত নিয়মের ক্রিয়া আপন প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তা এবং কল্পনাশক্তির সাহায্যে উপলব্ধি করিয়া যথাযথ ঘটনা-সমাবেশ ও চরিত্র অঙ্কনের দ্বারা বাস্তব জীবনের প্রকৃত ছবি কলা-কৌশলে অঙ্কিত করেন। কিন্তু সেই ছবি সংযত ও সুরুচিসম্পন্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

সংসারে ভাল মন্দ দুই-ই আছে। বাস্তব জীবনে সকলেই উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করে না সত্য; কিন্তু সে জন্য নীচ আদর্শের ও পশুভাবের অনাবৃত চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা সৎসাহিত্যের অনুপযোগী। কোন গৃহের চিত্রাঙ্কণে কলাকুশলী চিত্রশিল্পী গৃহের বাহিরের ও ভিতরের সৌন্দর্য্য যথাশক্তি পরিস্ফুট করেন, কিন্তু শৌচাগার ও পয়োনালা প্রত্যেক আবাস-গৃহের একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ হইলেও তাহা সৎ শিল্পীর চিত্রে বিশেষ স্থান পায় না; আর সেই জন্য চিত্রের বাস্তবতারও কোনও ব্যত্যয় হয় না। বাস্তব জীবনেও পয়োনালা ও শৌচাগার প্রাচীর বা আবরণী দ্বারা দৃষ্টির অন্তরালে রাখা হয়। সেইরূপ উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে জীবনের নিকৃষ্ট দিক্ দেখাইবার প্রয়োজন হইলে তাহার নগ্নতা যথাসম্ভব অন্তরালে রাখিয়া এরূপ ভাবে দেখাইতে হইবে যাহাতে তাহার হীনতা ও উচ্চতর আদর্শের সঙ্গে বৈষম্যের বোধে উচ্চ আদর্শের সৌন্দর্য্যকে আরও উজ্জ্বলতর ভাবে, প্রতিভাত করে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক বাস্তবপন্থী ঔপন্যাসিকেরা এ সম্বন্ধে অন্ততঃ উদাসীন।

উপন্যাস-সাহিত্যের গৌণ উদ্দেশ্য, যে আদর্শ জীবনের প্রতি পাঠক-পাঠিকার হৃদয় আকৃষ্ট করা,—সে জীবন প্রকৃত মনুষ্য জীবন—যে-জীবন মানুষকে পশু হইতে উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত করে। সে জীবন ইন্দ্রিয়চরিতার্থজনিত ক্ষণিক সুখের অপ্রকৃত অনিত্য জীবন নহে; হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলির

অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির প্রকৃত জীবন—নিত্যজীবন। ঔপন্যাসিক নায়ক-নায়িকার যে চরিত্র সৃষ্টি করেন, পাঠক-পাঠিকা পাঠকালীন সেই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যান এবং সেই ক্ষণিক তদাত্মতা উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্র অনুসারে অলক্ষ্যে পাঠক-পাঠিকার চরিত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষের সাহায্য করে।

যে শ্রেণীর উপন্যাসে আধুনিকতার ও বাস্তবিকতার (realismএর) দোহাই দিয়া মনুষ্য-জীবনের আঁস্তাকুড় নর্দামা প্রভৃতির চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয় তাহা হিন্দুর আধ্যাত্মিক আদর্শের বিরোধী। উহা বিশেষতঃ আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয় কৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, ও ভারতীয় সাধনার পরিপন্থী।

আমার বিবেচনায় এই শ্রেণীর উপন্যাস বা অন্য কোন রচনা অন্ততঃ অপরিণতবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়; এবং অন্ততঃ এই জন্যও সেগুলি সাধারণ পাঠাগারে স্থান পাইবার অযোগ্য।

পণ্ডিতেরা বলেন, "সাহিত্য" (সহিত+ষ্য) শব্দের মৌলিক অর্থ সম্মিলন বা যোগ। এবিশ্বে যা-কিছু নিত্য সুন্দর ও মঙ্গলময় তাহারই সঙ্গে কল্পনাশক্তিবলে আনন্দের চিরন্তন যোগ অনুভব ও স্থাপন করিয়া সাহিত্যিক প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করেন; অনিত্য বাহ্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কেবল ইন্দ্রিয়বোধের ক্ষণিক মিলনের দ্বারা নয়। মানস জগতে—ভাবের নিত্য জগতে প্রকৃত সাহিত্যিক ও কবি যে আদর্শ প্রেমানন্দ অনুভব ও প্রকাশ করেন তাহা কবির ভাষায় বলিতে গেলে "প্রীতি, শুদ্ধপ্রীতি, কামগন্ধ নাহি তায়"।

যে উচ্চ অঙ্গের উপন্যাস, নাটক, কথাসাহিত্য, কবিতা-পুস্তক ও কবিত্বপূর্ণ বা ওজস্বী গদ্যরচনা প্রভৃতি নিত্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি দ্বারা পাঠক-হৃদয়ে আনন্দের উৎস প্রবাহিত করে ও ভাবের পরিপুষ্টি ও পরিমার্জ্জন করে এবং পরোক্ষে চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের সহায়ক হয়, সাধারণ গ্রন্থাগারে তাহা যথাশক্তি প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা নিশ্চয়ই আবশ্যক। খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সুরুচিপূর্ণ গ্রন্থাবলী, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, আদর্শ নরনারীর জীবনী, ধর্ম্মগ্রন্থ, মহাকাব্য, (রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডিসি প্রভৃতি) ও খণ্ডকাব্য, বিভিন্ন দেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত, লোক-সাহিত্য (folklore) প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থও যথাসম্ভব সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। আর ব্যবহারিক জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, কারিগরি (manufacture) প্রভৃতি যে-সমস্ত বিভিন্ন ক্রিয়াত্মক (practical) বিষয়ে অভিজ্ঞতা অনেকের প্রয়োজন হয় সেই সব তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কিছু গ্রন্থ এবং বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া জাতীয় গ্রন্থও রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়া মনোবিজ্ঞান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান (Zoology) ও জীববিজ্ঞান (Biology), ভূ-বিজ্ঞান, খনিজ-বিদ্যা, এমন কি পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন সম্বন্ধেও সহজবোধ্য সুপাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া সাধারণ গ্রন্থাগারে রাখিলে জ্ঞানবিস্তারের প্রভূত সাহায্য হইতে পারে। আজকাল এ সব বিষয়ের সহজ অথচ তথ্যপূর্ণ বিবিধ পুস্তকাবলী সুলভ মূল্যে প্রকাশিত হইতেছে। এ ছাড়া ভারতীয় ও প্রাদেশিক সরকারী প্রয়োজনীয় রিপোর্টগুলি,—যেমন আদমসুমারীর রিপোর্ট, বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ার, Imperial Gazeteer of India, Linguistic Survey Reports of India, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ও ভূতত্ত্ব-বিভাগের রিপোর্ট প্রভৃতি (Archaeological ও Geological Reports) আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলিতে সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক-পাঠিকার অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে স্বভাবসিদ্ধ রুচি থাকিলেও কেবল উদ্দীপনার অভাবে তাহা অপরিস্ফুট থাকে; এমন কি তাঁহাদের নিজেদের কাছেও অজ্ঞাত থাকে। দৈবক্রমে অন্তর্নিহিত রুচির উদ্দীপক পুস্তক হস্তগত হইলে বা তাহার আলোচনা শুনিলে সেই সেই বিষয় অনুশীলনের দিকে তাঁহাদের মন স্বতঃই আকৃষ্ট হয় এবং পরিণামে হয়ত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপন অভিপ্রেত বিষয়ে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারেন। এইরূপে উপযুক্ত ব্যক্তিবিশেষকে মৌলিক গবেষণার পথে চালিত করা ও তত্ত্বানুসন্ধানের সুযোগ প্রদান করা আমার বিবেচনায় এই প্রকার গ্রন্থাগারের গৌণ উদ্দেশ্য থাকা

উচিত। পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষেরা এ-সম্বন্ধে সবিশেষ সজাগ ও সচেষ্ট আছেন।

কি উপায়ে দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সাহায্যে জাতীয় শিক্ষা এবং বিষয়-বিশেষের প্রগাঢ় চর্চ্চা বা গবেষণার সৌকর্য্য সাধিত হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ইংলণ্ডে গত ১৯২৪ সালে সরকারী শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রণা-সভা একটা বিশেষ সমিতি নিযুক্ত করেন ও ১৯২৭ সালের জুন মাসে ঐ কমিটির কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হয়। ঐ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ইংলণ্ড ও ওয়েলসের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এক কার্য্যোপযোগী শৃঙ্খলে পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান নগরে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক গ্রামের ও শহরের গ্রন্থাগারগুলি সেই প্রদেশের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। লণ্ডন ও তাহার উপকণ্ঠের গ্রন্থাগারগুলিও এইরূপে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। সকলের উপর একটি জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা দেশের সমস্ত গ্রন্থাগার এক শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইয়াছে। এখন ইংলণ্ডের ও ওয়েলসের প্রত্যেক ব্যক্তিরই হাতের কাছে সাধারণ গ্রন্থাগার আছে এবং যদি কেহ তাঁহার প্রয়োজনীয় গ্রন্থ স্থানীয় গ্রন্থাগারে না পান তাহা হইলে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে লিখিলে সেখানকার গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ সেই প্রদেশের যে-কোন গ্রন্থাগারে ঐ পুস্তক থাকে সেখান হইতে আনাইয়া দেন এবং কোথাও না থাকিলে জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে লিখিলে তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ দেশের কোন গ্রন্থাগারে সে পুস্তক থাকিলে সেখান হইতে আনাইয়া দেন; আর না পাওয়া গেলে ক্রয় করিয়া সরবরাহ করেন। অবশ্য এজন্য প্রত্যেক স্থানীয় গ্রন্থাগারের পুস্তকের তালিকা প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রাখা প্রয়োজন এবং প্রত্যেক প্রদেশের ও প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলিরও সংগৃহীত গ্রন্থের তালিকা জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের রাখা প্রয়োজন; সুতরাং তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উপায়ে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের সাধারণ গ্রন্থাগারের সাহায্যে গবেষণার পথ সহজ ও সুগম হইয়াছে। টাইম্‌স্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্টের বিগত ২৮শে মার্চ্চ তারিখের সংখ্যায় ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির এইরূপ ব্যবস্থার উপকারিতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে জাতীয় শিক্ষা, পাণ্ডিত্য ও গবেষণার উন্নতি কল্পে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে এইরূপ জাতীয় গ্রন্থাগারের স্থাপন অপেক্ষা অন্য কোন সুলভ উপায় কল্পনা করা যায় না।

"It is difficult to think of any contribution to national scholarship, research, and general education, which would be so effective at so low a cost as the establishment of the National Central Library, and all that it represents on a sound and permanent basis."

এই জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নির্ম্মাণের ব্যয়ের অধিকাংশ কার্নেগী ট্রাষ্ট ফণ্ডের দান। পুস্তক-ক্রয় প্রভৃতি অন্যান্য ব্যয়ের জন্য ঐ ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে বাৎসরিক চার হাজার পাউণ্ড প্রদত্ত হইত কিন্তু সম্প্রতি তাহাও বন্ধ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কেবল পুস্তকের তালিকা প্রস্তুতের জন্য বাৎসরিক তিন হাজার পাউণ্ড সাহায্য দান করেন। অন্যান্য সমস্ত ব্যয় এবং স্থানীয় ও প্রাদেশিক গ্রন্থাগারগুলির ব্যয়ভার দেশের লোকে বহন করে। এদেশেও জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের এরূপ ব্যবস্থাই সহজ, সুলভ ও কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয়। দেশের নেতৃবর্গের দৃষ্টি এদিকে সানুনয়ে আকর্ষণ করিতেছি। এ-সম্বন্ধে যদি তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে। আর আপাততঃ চেষ্টা করিলে অন্ততঃ কয়েকটা নিকটবর্ত্তী জেলা মিলিয়া এইরূপ এক একটি সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের বন্দোবস্ত করা আয়াসসাধ্য হওয়া অসম্ভব নয়। এরূপ সম্মিলিত গ্রন্থাগারগুলির সাহায্যে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে গবেষণার দ্বারা দেশের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে পারেন। আর যদিও ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতে প্রত্যেক গ্রামে গ্রন্থাগারস্থাপন সময়-সাপেক্ষ, এবং আপাততঃ প্রত্যেক জেলার প্রধান স্থানের সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় যথেষ্ট শাখা-গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা আয়াসসাধ্য না হইলেও,

ভ্রাম্যমান (travelling) গ্রন্থাগারের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে জ্ঞান-বিস্তার ও সৎ-সাহিত্য প্রচার করা বিশেষ কঠিন হইবে বলিয়া মনে হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি বড়োদা-রাজ্যে ভ্রমণকালে সেখানে এইরূপ ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সন্তোষজনক কার্য্য করিতেছে দেখিয়াছি।

৪

গবেষণা সাধারণতঃ দুই প্রকারের,—গ্রন্থাগারের গবেষণা (Library research) ও ক্ষেত্রের গবেষণা (Field research)। গ্রন্থাগারে গবেষণাদ্বারা আমরা কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী অনুসন্ধানকারীদের সংগৃহীত তথ্য ও সে-সম্বন্ধে অন্যান্য লেখকদের গ্রন্থ, প্রবন্ধ, বিবরণী, সমালোচনা প্রভৃতি একত্র করিয়া ও সমাহৃত তথ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাদের বিশ্লেষণ ও শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি এবং হয়ত কোন নূতন তত্ত্বও উদ্‌ঘাটন করিতে পারি। যেমন, বেদ বেদান্ত পুরাণ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের আদিম স্বরূপ ও পরবর্ত্তী ক্রমিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে এবং পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ও অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থ, যেমন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বৌদ্ধ জাতক, গ্রীক্-লেখকদের ও চীন-পরিব্রাজকদিগের সমসাময়িক বিবরণ প্রভৃতি যথাযথ আলোচনা ও বিচার করিয়া পুরাকালের হিন্দুসমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু পুস্তকাগারে গবেষণার অসম্পূর্ণতা পূরণ করিবার জন্যও ক্ষেত্রের গবেষণার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। যেমন ক্ষেত্রে অনুসন্ধান দ্বারা প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তরলিপি, তাম্র-লিপি প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা সমসাময়িক বিবরণ প্রভৃতির শূন্যস্থানগুলি যথাসম্ভব পূর্ণ করিতে হয় তেমনি ক্ষেত্রে গবেষণার জন্যও গ্রন্থাগারের সাহায্যের প্রয়োজন হয়; কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী অনুসন্ধানকারীরা তত্ত্বানুসন্ধানের কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন ও কোন্ কোন্ তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ দফায় জ্ঞানের অভাব আছে, এ-সব জানিয়া ক্ষেত্রে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে সম্যক সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গবেষণার সাহায্যেই প্রকৃতির গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতেরা জড়বিজ্ঞানের অনেক রহস্যপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং তাহারই বলে তড়িৎ, রেডিও শক্তি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি আয়ত্তাধীন করিয়া কল-কারখানা দ্বারা জীবনযাত্রার ও শারীরিক সুখসম্ভোগের এবং রোগ-নিরাকরণের অভূত-পূর্ব্ব সৌকর্য্য সাধন করিতেছেন। গবেষণার সাহায্যেই মনোবিজ্ঞানের জটিল নিগূঢ় তত্ত্বগুলি কতক পরিমাণে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন ও সেই তত্ত্বের সাহায্যে শিশুর মনস্তত্ত্ব অনুশীলন করিয়া শিক্ষার সৌকর্য্য সাধন ও বাতুলের চিত্ত-বিক্ষিপ্ততার ও মগ্ন চৈতন্যের গুপ্ত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদের রোগ নিরাকরণের পন্থাও উদ্ভাবন করিতেছেন এবং গবেষণার সাহায্যে মানবের দেহের ও মনের অভিব্যক্তির এবং সভ্যতার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক সাধকের একান্ত ভক্তি ও সেবায় প্রসন্ন হইয়া স্তব্ধ অতীত তাঁহার কাছে তাঁহার যুগযুগান্তরের গোপন রহস্য প্রকাশ না করিয়া পারেন না। এই পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ-যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত ধরিত্রীর স্তরে স্তরে কত জীবনের কত ধারা চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; অক্লান্ত পরিশ্রমী প্রাগৈতিহাসিক গবেষণা রূপ সাধনা দ্বারা, সেই মৌন ইতিহাস ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত করিতে সমর্থ হইতেছেন। ধরিত্রীর ভিন্ন ভিন্ন স্তর উদ্‌ঘাটন ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা কোন ভূস্তরে অর্থাৎ কোন্ যুগে ও অন্তর্যুগে কোন শ্রেণীর প্রত্নজীব (ancient life) ও প্রাগৈতিহাসিক মানব উদ্ভূত হইয়াছিল এবং কোন্ যুগে ও অন্তর্যুগে মানবের অস্ত্র-শস্ত্র, পরিচ্ছদ, আবাসবাটী ও অন্যান্য দ্রব্য-সম্ভারের উপাদান, ও গঠন-প্রণালী ও আকার কিরূপ ছিল তাহা যথাসম্ভব নিরূপণ করিয়া মোটামুটি একটী ধারাবাহিক বৃত্তান্ত উদ্ধার করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের কার্য্য সুগম করিয়া দিতেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বাস্তব তত্ত্ব উৎঘাটন করিতে হইলে ক্ষেত্রে গবেষণা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নাই। পৌরাণিক ঋষিরা যোগবলে তাহা পারিতেন কি না জানি না! কেহ কেহ বলেন হিন্দু ঋষিদের উল্লিখিত মৎস্য-অবতার, কূর্ম্ম-অবতার, বরাহ-অবতার, বামন-অবতার,

ও নৃসিংহ-অবতার প্রত্নজীবতত্ত্বের (palæontologyর) Age of Fishes, Age of Amphibians and Reptiles, Age of Mammals, Age of Proto-man এবং Age of Recent Manকেই নির্দ্দেশ করে। এ অনুমান কত দূর প্রামাণ্য তাহা জানি না। তবে বর্ত্তমান যুগে ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যতীত প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ধারের দ্বিতীয় উপায় সাধারণ মানবের আয়ত্তাধীন নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ক্ষেত্রে গবেষণা ও গ্রন্থাগারে গবেষণা দুই-ই পরস্পরের সহায়ক ও পূরণাত্মক (complementary), সেই জন্য আমার বিবেচনায় গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষ যেমন উপযুক্ত গ্রন্থ যোগাইয়া উপযুক্ত পাঠক-পাঠিকাকে মৌলিক গবেষণায় সহায়তা ও অন্যান্য উপায়ে উৎসাহ প্রদান করিবেন তেমনই গবেষণাব্যপদেশে সংগৃহীত দ্রব্যজাত গ্রন্থাগারের এক বা একাধিক প্রকোষ্ঠে বা সংলগ্ন-গৃহে বিষয়ানুযায়ী যথাযথ সজ্জিত করিয়া রক্ষা করিবেন। এই প্রণালীতে প্রত্যেক জেলার প্রধান পুস্তকাগারের সঙ্গে সেই জেলার প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিক কালের বিশেষ বিশেষ নিদর্শন, বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন জাতির অস্ত্র-শস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি, গৃহস্থালীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, পূজার উপাদানাদি, প্রস্তরাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রভৃতি, প্রাচীন মুদ্রা, পুরাতন পুঁথি, পুরাতন চিত্র (বা তাহার প্রতিরূপ), জেলার আধুনিক বিভিন্ন জাতির বিশেষত্ব-দ্যোতক হস্ত-শিল্পজাত দ্রব্যাদি, সংক্ষিপ্ত বিবরণী-সংযুক্ত লেপ-পত্র (label) সংযুক্ত করিয়া রক্ষা করিলে কেবল যে গ্রন্থাগারের বৈভব ও গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহা নয়, লোকশিক্ষার সাহায্য হয় এবং দেশের সাধারণ জ্ঞানসম্পদ বৃদ্ধিরও সহায়তা হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এ-সম্বন্ধে যে-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক জেলার সাধারণ পুস্তকাগার ও সাহিত্য-মন্দিরে অনুসৃত হইলে সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চ্চায় সহায়তা হইবে।

মানভূম জেলায় কয়েকটি প্রাচীন জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গিয়া বাউরী প্রভৃতি গ্রামবাসীদের নিকট শুনিলাম যে অনেকগুলি প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি অনেক মাড়োয়ারী, 'সাহেব' প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে আসিয়া গো-শকট পূর্ণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এখনও কয়েকটি পুরাতন মূর্ত্তি ও ভাস্কর্য্যের অন্যান্য সুন্দর নিদর্শন ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত আছে দেখিলাম। এই সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান জেলাস্থ প্রধান গ্রন্থাগারে বা তৎসংলগ্ন গৃহে রক্ষা করা অতীব প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। আর জেলার যে-সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান প্রাদেশিক বা ভারতীয় যাদুঘরে স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহার plaster-cast বা অন্য কোনও প্রতিরূপ (model) বা অন্ততঃ আলোক-চিত্র (photo-graph) স্থানীয় গ্রন্থাগারে রক্ষা করিলে গ্রন্থাগারের উপকারিতা বৃদ্ধি হয়। এইরূপে প্রত্যেক জেলায় প্রধান সাধারণ গ্রন্থাগারের সংলগ্ন একটি স্থানীয় ক্ষুদ্রায়তনের প্রদর্শনী বা যাদুঘর (মিউজিয়ম) স্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রত্যেক জেলার নেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে লোকশিক্ষা বিস্তারের সহায়তা হইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রত্নতত্ত্বের, নৃতত্ত্বের, জাতিতত্ত্বের, বা ইতিহাসের গবেষণা করিবার সুযোগ ও অবসর অনেকের ভাগ্যে ঘটে না, এবং স্পৃহাও সকলের উদ্রিক্ত হয় না। কিন্তু গবেষণা কেবল ঐ সব বিষয়ের জটিল তত্ত্ব ও সমস্যা উদ্ঘাটন ও সমাধানেই আবদ্ধ নয়। জীবনসংগ্রামে ব্যাপৃত সাধারণ শিক্ষিত লোকেরও আয়াসসাধ্য প্রীতিকর গবেষণার বিষয়েরও অভাব নাই; অবসর-মত সে-সমস্ত লঘু এবং মনোজ্ঞ লোক-সাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা যাইতে পারে।

স্ব-স্ব জেলার বিভিন্ন জাতির পল্লীসঙ্গীত, লোকনৃত্য-পদ্ধতি, জনশ্রুতি বা কিম্বদন্তী, ব্রতকথা, উপকথা, প্রবাদবাক্য, হেঁয়ালী প্রভৃতির সংগ্রহও গবেষণার মধ্যে গণ্য করা যায়। এই সমস্ত চর্চ্চা করা যেমন অনেকের পক্ষেই রুচিকর, প্রীতিকর ও আয়াসসাধ্য, তেমনই এই সমস্ত লোক-সাহিত্যের উপাদান সঙ্কলন দ্বারা সেগুলি প্রবন্ধ বা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

এই সমস্ত জন-সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিভিন্ন জাতির বা সমাজের যথার্থ পরিচয়—অন্তরের পরিচয়—পাওয়া যায়। আর সেই পরিচয়ের দ্বারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইয়া মিলনের পথ সহজ ও সুগম হইতে পারে।

এইরূপ সহজসাধ্য ও আনন্দদায়ক গবেষণা দ্বারা সাহিত্য ও জাতীয়তা উভয়েরই পরিপুষ্টিসাধন হইতে পারে।

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কোন কোন পাঠক-পাঠিকার অন্তরে উপন্যাস, ছোটগল্প এবং গীতি-কাব্য রচনা করিবার আগ্রহ ও প্রয়াস দৃষ্ট হয়। এক্ষেত্রে আজকাল অনেকেই হস্তক্ষেপ করিতেছেন, কিন্তু কৃতিত্ব বা সফলতা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তবে অ-কর্ষিত বা অল্প-কর্ষিত নূতন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিবার অধিকতর সম্ভাবনা আশা করা যাইতে পারে। যাহাদিগকে সাধারণতঃ নীচ জাতি ও অসভ্য জাতি বলা যায় তাহাদের জীবন, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম্মমত ও পূজাপ্রণালী প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের জীবনের সহিত সম্যক পরিচিত হইলে, তাহাদের জীবনে উপন্যাস-সাহিত্যের, কথা-সাহিত্যের ও গীতি-কবিতার অভিনব উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ, স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-ভক্তি, বাৎসল্য, শৌর্য্য-বীর্য্য, সত্যপ্রিয়তা, সৎ-সাহস, ধর্ম্মানুরাগ, সৌন্দর্য্য-স্পৃহা ও রস-রূপের বোধ প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি-গুলিতে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রতিভাত হয় সেগুলি অসভ্য ও অর্দ্ধ-সভ্য জাতিদের মধ্যেও অল্পবিস্তর প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সাহিত্যের প্রধান উপাদান যে সুন্দরের রূপ, তাহার বিকাশ অসভ্য ও অর্দ্ধ-সভ্য জাতিদের মধ্যেও বর্ত্তমান। সেই রূপটি ধরিতে পারা ও কলাকৌশলে তাহা যথাযথ প্রকাশ করিতে পারাই সাহিত্যশিল্পীর সার্থকতা।

গ্রন্থাগারে এই সব জাতি সম্বন্ধে প্রকাশিত বিবরণাদি পাঠে এবং বিশেষতঃ তাহাদের প্রকৃত জীবনধারার সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ে ইহাদের জীবনেও সুন্দরের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে এখনও কর্ম্মীর সমূহ অভাব। সাহিত্যিক-যশাভিলাষী কোন কোন ব্যক্তি যদি এক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে সম্ভবতঃ কেহ কেহ তাহাদের মধ্যে সেই সুন্দরের রূপ উপলব্ধি করিয়া ভাষা দিয়া সেই সুন্দরের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বাংলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

আমাদের কবিসার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গৃহ-নির্ম্মাণের মজুরদের মধ্যে একটি কিশোরী সাঁওতাল

সাঁওতাল মেয়ে
শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত
[বিশ্বভারতীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা হইতে গৃহীত

মেয়েকে দেখিয়া কল্পনানেত্রে এই সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছিলেন; এবং সুন্দর কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন কিরূপে—

"মাথায় মাটিতে ভরা ঝুড়ি সাঁওতাল মেয়ে,
* * *
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে,
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদন পরা
শুশ্রূষায় স্নিগ্ধ সুধাভরা—।" *

---

* বিগত ১৮ই মে পুরুলিয়ায় হরিপদ-সাহিত্য-মন্দিরের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণের এক অংশ; অবশিষ্ট অংশ, "মানভূম জেলায় সাহিত্যচর্চ্চার উপাদান" আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

আমার দেখা লোক

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতি বাবুর মেজদাদা

৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়কেও আমি মাত্র এক দিন দেখিয়াছিলাম। সত্যেন্দ্র বাবু বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ান ছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সত্যেন্দ্রবাবু পেন্সন লইয়া বালীগঞ্জে বাস করিতেছিলেন, বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু মহাশয় তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। আমাদের বন্ধু শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদিন্দু রায় অধ্যাপক বসুর ল্যাবেরেটারি এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। প্রাতে কলিকাতায় আসিবার সময় আমরা জগদিন্দুবাবুর সহিত একই ট্রেনে আসিতাম। এক দিন জগদিন্দুবাবু বলিলেন "আমাদের কলেজে এক্সরে বা অদৃশ্য আলোক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। আজ বেলা ৩টার সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা দেখিতে আসিবেন; যদি আপনারা তিনটার সময় যাইতে পারেন, তবে আপনাদিগকেও দেখাইব।" তিনটার সময় এক জন বন্ধুর সহিত প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়া জগদিন্দুবাবুর নিকট শুনিলাম যে, পার্শ্বের কক্ষে সত্যেন্দ্রবাবু ও ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জ্জি নামক তাঁহার এক আই-এম-এস বন্ধু আসিয়াছেন, ডাক্তার বসু তাঁহাদিগকে অদৃশ্য আলোক দেখাইতেছেন, তাঁহারা চলিয়া গেলেই তিনি আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। আমি জগদিন্দুবাবুকে বলিলাম যে, বাল্যকালে যখন স্কুলে পড়িতাম তখন, জিমন্যাষ্টিক করিবার সময় পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়াছিলাম. সেই স্থানটার হাড় এখনও একটু বাঁকা আছে, আমি সেই হাড়টা অদৃশ্য আলোকে দেখিব। এই কথা শুনিয়া জগদিন্দুবাবু পার্শ্বের কক্ষে গমন করিলেন এবং তখনই ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন "আমি ডাক্তারকে আপনার ভাঙ্গা হাতের কথা বলাতে তিনি আপনাকে লইয়া যাইতে বলিলেন।" আমি ও আমার বন্ধু জগদিন্দু বাবুর সঙ্গে সেই কক্ষে গমন করিলে অধ্যাপক বসু, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি এবং সত্যেন্দ্রবাবু তিন জনেই বিশেষ আগ্রহসহকারে আমার হাতের ভগ্ন অস্থি দেখিলেন। সত্যেন্দ্র বাবু ইংরজীতে তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "কলিকাতায় এক্সরে সাহায্যে ভগ্ন অস্থি দর্শন বোধ হয় এই প্রথম। ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি হাসিয়া বলিলেন, "আমার অভিজ্ঞতাতে প্রথম বটে।" তখন কলিকাতায় আর কোথাও এক্সরে যন্ত্র আসে নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই যন্ত্র ডাক্তার বসুর নির্দ্দেশক্রমে কলেজের গবেষণাগারে জগদিন্দুবাবু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রবাবু ও জ্যোতিবাবুর মত তাঁহাদের অগ্রজ বাবু

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়কেও আমার একদিন মাত্র দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের পর দিন সন্ধ্যার সময় "হিতবাদী"র তদানীন্তন সম্পাদক সখারাম গণেশ দেউস্কর আমাকে বলিলেন, "দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে স্নেহ করেন; তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, আপনি যাইবেন?" তাঁহার প্রস্তাবে আমিও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দ্বিতলে, দক্ষিণ দিকের বড় হলের এক পার্শ্বে একখানা সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় দ্বিজেন্দ্রবাবুকে দেখিতে পাইলাম। গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, পক্ককেশ, পক্ক শ্মশ্রু বৃদ্ধ বসিয়া আর দুইজন প্রবীণ ভদ্র লোকের সহিত মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিলেন। আমরা প্রবেশ করিবামাত্র সেই দুইজন ভদ্রলোক গাত্রোত্থান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমরা কক্ষ মধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইলে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন—"কে?" সখারামবাবু আত্মপরিচয় প্রদান করিলে তিনি বলিলেন "সখারাম এসেছ? এস। আমার বড়ই বিপদ; এতদিন কিছুই জানিতাম না, এখন কি যে করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এতদিন আমি পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম, এখন যেন বড়ই অসহায় বলিয়া নিজেকে মনে করিতেছি।"

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সখারাম বাবু বলিলেন, "আমার বন্ধু, 'হিতবাদী'র সহকারী সম্পাদক।" আমি বলিলাম "আমার আর একটু পরিচয় আছে, আপনাদের বাটীর দৌহিত্র সন্তান এটর্নী অমরেন্দ্রবাবু আমার জ্ঞাতি-ভ্রাতা। তাহার প্রপিতামহ এবং আমার প্রপিতামহ সহোদর।" এই কথা শুনিবা মাত্র তিনি ঠিক স্বর্ণকুমারী দেবীর কথাই যেন পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "ওঃ তবে ত তুমি আমাদের ঘরের ছেলে গো।" দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর যখন মহর্ষির সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় উল্লেখ করিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন "আমাদের বিষয় সম্পত্তি নাশ অবধারিত জানিয়া বাবা আমাকে একটি ছোট ডেস্ক কিনিয়া দিয়া ভাল করিয়া হাতের লেখা পাকাইতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি হাতের লেখাটা ভাল হয়, তাহা হইলে কোন সাহেব-সুবাকে ধরিয়া একটা কেরাণীগিরি করিয়া দিতে পারিব, হাতের লেখা ভাল না হইলে তাহাও জুটিবে না।' বাবার আদেশে আমি হাত পাকাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।" রাত্রি প্রায় সাড়ে

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আটটার সময় আমরা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইহার পর দুই চারি বার মাঘোৎসবের সময় আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন কথা হয় নাই। সেদিন

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সত্তর বা তাহারও অধিক বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে পিতৃশোকে কাতর দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি এমন ভাবে কথাগুলি বলিলেন, যেন কোন নাবালক সহসা পিতৃহীন হইয়া অকূল সাগরে পড়িয়াছেন। বুঝিলাম যে, পিতা বা মাতা জীবিত থাকিলে পুত্রের যতই বয়স হউক না কেন, তাহার বালকত্ব অন্ততঃ পিতা মাতার কাছে বিদ্যমান থাকে। মহর্ষির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা কালে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এক সময় বাবা যে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন খ্রীষ্টানী ভাবের বন্যায় হিন্দু সমাজ ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন বাবা রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই খ্রীষ্টানী ভাবের একটা বড় ঢেউকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি না থাকলে আজ বাঙ্গালার ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে খ্রীষ্টানের সংখ্যা অনেক বেশী হ'ত।" কথাটা যে খুবই সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সখারাম বাবুর সহিত না গেলে হয় ত তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিবার সৌভাগ্য কখন হইত না। এই প্রসঙ্গে বাবু

রাজনারায়ণ বসু

মহাশয়ের কথাও বলিব। রাজনারায়ণ বাবু যখন মেদিনীপুর স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, তখন আমার পিতা বোধ হয় দুই বৎসর কাল ঐ স্কুলে পড়িয়াছিলেন। বহুকাল পরে আমার পিতা পেন্সন লইয়া কয়েক মাস দেওঘরে বাস করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুও দেওঘরে থাকিতেন। আমার পিতা সেই সময় প্রায় প্রত্যহই তাঁহার নিকট বেড়াইতে যাইতেন। দেওঘর হইতে বাবা ফিরিয়া আসিয়া আমাদের নিকটে রাজনারায়ণ বাবুর সম্বন্ধে গল্প করিতেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি কিছুদিনের জন্য সেই সময় মধুপুরে আমার এক বন্ধুর নিকটে গিয়াছিলাম। একদিন

রাজনারায়ণ বসু

আমাদের পরামর্শ হইল যে, রাজনারায়ণ বাবুকে দেখিতে যাইব। আমি বাবাকে পত্র দ্বারা আমাদের সঙ্কল্পের কথা জানাইলে তিনি পত্রোত্তরে আমাদিগকে লিখিলেন যে, তিনি আমাদের কথা রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছেন। বাবার পত্রের মধ্যে আমাদের একখানি পরিচয় পত্র ছিল। বাবার পত্র পাইয়া আমরা তৎপর দিনই দেওঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা যখন রাজনারায়ণ বাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন বোধ হয় বেলা আড়াইটা। তিনি বাহিরের ঘরে ছিলেন না। আমি একজন ভৃত্যের দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ দিলে তিনি সহাস্য বদনে আসিয়া বলিলেন—"ইন্দ্রকুমারের পত্র পাইয়াছি, তোমাদের মধ্যে ইন্দ্রকুমারের ছেলে কে?" আমি আপন পরিচয় প্রদান করিলে তিনি আমাদের দুই জনকেই সমান স্নেহভরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন, "আমার ছাত্রের ছেলে, আমার নাতি। কেমন তাই নয় কি?" এই বলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। দেখিলাম, তিনি সকল কথাতেই খুব প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিতেন। তাঁহার মত প্রাণখোলা উচ্চ হাসি আজকাল বড় দেখিতে পাই না। আমরা তাঁহার কাছে প্রায় অপরাহ্ণ পাঁচটা পর্য্যন্ত ছিলাম। আসিবার পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে জলযোগ করাইয়া বিদায় দিলেন। রাজনারায়ণ বাবু ভূদেব বাবু ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের সতীর্থ ছিলেন। মাইকেলকে আমি দেখি নাই, কিন্তু রাজনারায়ণ বাবুর সহিত ভূদেব বাবুর তুলনা করিলে একটা পার্থক্য সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িত। ভূদেব বাবু যেমন রাশভারি, অল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, রাজনারায়ণ বাবু সেরূপ ছিলেন না। তিনি সদানন্দ রঙ্গপ্রিয় লোক ছিলেন। আমরা যতক্ষণ তাঁহার নিকট ছিলাম, ততক্ষণের মধ্যে তিনি যে কতবার আমাদিগকে "নাতি" সম্বন্ধ ধরিয়া আমোদ করিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার মধ্যেই আমরা কতদূর পড়াশুনা করিয়াছি, কি কাজ করি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেকালের আর এক জন সুরসিক অথচ সুপণ্ডিত লোক ছিলেন বাবু

গঙ্গাচরণ সরকার

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার গঙ্গাচরণ বাবুর একমাত্র পুত্র। গঙ্গাচরণ বাবুর বাটি চুঁচুড়ার কদমতলা, আমাদের বাটি হইতে বোধ হয় এক ক্রোশ হইবে। আমার

এক জ্ঞাতি ভ্রাতা অক্ষয় বাবুর সতীর্থ ও বন্ধু ছিলেন, তিনি অক্ষয় বাবুর প্রতিবেশী, তাঁহার বাটীতে আমি সর্ব্বদাই যাইতাম, সেই সূত্রে অক্ষয় বাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। বাঙ্গালা লেখার প্রতি আমার বাল্য কাল হইতে ঝোঁক ছিল বলিয়া অক্ষয় বাবু আমাকে স্নেহ করিতেন। আমিও আমার সেই জ্ঞাতি ভ্রাতার বাটীতে গেলেই অক্ষয় বাবুর বাটীতে যাইতাম। সেই সময় আমি প্রায় গঙ্গাচরণ বাবুকে দেখিতে পাইতাম। গঙ্গাচরণ বাবু সবজজ ছিলেন; আমি যখন তাঁহার বাটীতে যাইতাম, তখন তিনি পেন্সন লইয়া বাটীতে বসিয়া ছিলেন। গঙ্গাচরণ বাবুর দেহের বর্ণ খুব কাল ছিল আর ধবধপে সাদা খুব বড় গোঁফ ছিল। বন্ধুমহলে গঙ্গাচরণ বাবু খুব সুরসিক, উপস্থিত বক্তা ও আমুদে বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রসিকতা সম্বন্ধে চুঁচুড়ার প্রাচীনগণের মুখে এখনও অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। দুই একটি গল্পের কথা বলিলে পাঠকগণ তাঁহার স্বভাবচরিত্র-সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাইবেন। এক দিন কলিকাতা হইতে এক ভদ্রলোক অক্ষয় বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চুঁচুড়ায় গিয়াছিলেন। তিনি অক্ষয় বাবুর বাটী চিনিতেন না, জিজ্ঞাসা করিয়া কদমতলায় উপস্থিত হইলেন এবং একটা বাটীর বাহিরের রোয়াকে একজন কৃষ্ণকায় পক্বগুম্ফ ভদ্রলোককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাড়ি কোথায়?" সেই বৃদ্ধ বলিলেন—"কই এখানে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কোন বাড়ি আছে বলিয়া ত জানি না।" আগন্তুক তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমাকে এক জন ভদ্রলোক বলিলেন যে, এই গলির ভিতর পুকুরের পূর্ব্ব পাড়ে রোয়াক-ওয়ালা বাড়ি। এইটাই ত পুকুর-পাড়ে সেই রোয়াকওয়ালা বাড়ি—তবে তিনি কি ভুল বলিলেন?" বৃদ্ধ বলিলেন, "এ বাড়ি ত আমার। আপনি সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন দেখি, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাড়ি এইটা কি না?" বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আগন্তুক পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকের নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনি যে বাড়ির কথা বলিলেন, সেই বাড়িতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন সেই বাড়ি তাঁহার, অক্ষয় বাবুর বাড়ি কোথায়, তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না" এই কথা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—"তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, সেটা তাঁহারই বাড়ি, তিনি অক্ষয় বাবুর পিতা গঙ্গাচরণ বাবু। আপনি গিয়া গঙ্গাচরণ বাবুর বাড়ির সন্ধান জিজ্ঞাসা করুন।" আগন্তুক তখন পুনরায় সেই বৃদ্ধের নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহাশয় গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের কি এই বাড়ি? আমি তাঁহার পুত্র অক্ষয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা হইতে আসিতেছি।" এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধ সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থিত করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন এবং একজন ভৃত্যকে অক্ষয় বাবুকে সংবাদ দিতে বলিলেন। অক্ষয় বাবু আসিলে বৃদ্ধ বলিলেন, "অক্ষয়, এই ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাড়ি কোথা? এ পাড়ায় তোমার যে কোন বাড়ি আছে, তা ত জানি না, তাই বলিলাম আমি জানি না।" পরে সেই আগন্তুককে বলিলেন—"যত দিন আমি বাঁচিয়া আছি, তত

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

দিন এ বাড়ি আমার, মৃত্যুর পর এই বাড়ি অক্ষয়ের হইবে।" একদিন গঙ্গাচরণ বাবুর এক পুরাতন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে

দেখা করিতে আসিয়া কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্ষয়ের সন্তানাদি কি ?" শুনিয়া গঙ্গাচরণ বাবু বলিলেন—"একটু পরে বলিব।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু সবিস্ময়ে বলিলেন, "একটু পরে বলিবে ? তার মানে ?" গঙ্গাচরণ বাবু বলিলেন, "বউমার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, শীঘ্রই সন্তান হইবে। হইলে বলিব কয়টি পুত্র, কয়টি কন্যা। এখনই বলিলে আবার পনর কুড়ি মিনিট পরে নূতন করিয়া সংবাদ দিতে হইবে। তার চেয়ে একটু অপেক্ষা করিয়া দেখিয়া বলা ভাল।" বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়াছি, গঙ্গাচরণ বাবু আর একবার বড় রঙ্গ করিয়াছিলেন। একদিন চুঁচুড়ার বাজারে গিয়া দেখিলেন এক জায়গায় লটারি বা ধুক্তি খেলা হইতেছে। আমরা বাল্য-

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কালে দেখিয়াছি, চন্দননগর, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে শীত কালে প্রায়ই খেজুরে গুড়ের কলসী লটারি হইত, একজন দোকানদার দশ আনা, বার আনা, দিয়া এক কলসী গুড় কিনিয়া তাহার উপর একটা ঝুনা নারিকেল রাখিয়া সেই গুড় ও নারিকেল লটারি করিত। টিকিটের মূল্য দুই পয়সা বা এক আনা। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে এক টাকা বা দেড় টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়া যাইত। তাহার পর লটারি আরম্ভ হইত। একটি ছোট বালক একটা হাঁড়ির ভিতর হইতে টিকিট এক এক খানি করিয়া টানিয়া বাহির করিত। টিকিট ক্রয়কারীদের নাম একজন লোক চীৎকার করিয়া বলিয়া যাইত, আর বালক যে টিকিট বাহির করিত, তাহা সাদা হইলে সমবেত জনতা উচ্চৈঃস্বরে "ফরসা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। বাজারে গুড়ের লটারি হইতেছে দেখিয়া গঙ্গাচরণ বাবু এক আনা দিয়া এক খানা টিকিট কিনিয়া সেই খানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে লটারি আরম্ভ হইল। এক একটা নাম ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বালক টিকিট বাহির করিতে লাগিল, আর সকলে "ফরসা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। গঙ্গাচরণ বাবুর নাম ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই বালকটি একখানা সাদা টিকিট বাহির করিল। তাহা দেখিয়া সকলে চীৎকার করিয়া বলিল, "ফরসা" তাহা শুনিয়াই গঙ্গাচরণ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "আমার একআনা পয়সা বৃথা নষ্ট হয় নাই। চিরকাল লোকে আমাকে কালো বলিয়া আসিয়াছে, আজ বাজারশুদ্ধ লোক একবাক্যে বলিয়াছে—'গঙ্গাচরণ ফরসা।" গঙ্গাচরণ বাবুর একমাত্র পুত্র, সাহিত্যাচার্য্য বাবু

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

মহাশয়ের নাম বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি চুঁচুড়ায় আমার জ্যাঠতুত দাদার বাড়িতে গেলেই প্রায়ই অক্ষয় বাবুর বাড়িতে যাইতাম। আমার যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যে কতবার অক্ষয় বাবুর কাছে গিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে দুই-চারি কথায় কিছু বলা অসম্ভব। আমি বাল্যকাল হইতে সাহিত্য-চর্চ্চা করিতাম, লিখিতাম, সেই জন্য তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। "হিতবাদীতে" যখন আমি "বৃদ্ধের বচন" লিখিতাম, তখন তিনি আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেন যে "হিতবাদী হাতে পাইলেই আগে দেখি যে তোমার 'বৃদ্ধের বচন' আছে কিনা ?" পত্নীর চিকিৎসার জন্য তিনি কিছু দিন কলিকাতায় মৃজাপুর ষ্ট্রীটে একটা বাড়ি ভাড়া লইয়া বাস করিয়াছিলেন। এখন সেই বাড়িটা

নাই, তাহার উপর দিয়া হ্যারিসন রোড নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান হ্যারিসন রোড ও মৃজাপুরের সংযোগ স্থলে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ঈশান কোণে সেই বাড়ি ছিল। তখন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের নাম ছিল "ছোট গোলদীঘি"। অক্ষয় বাবুর বাটীর ঠিক পূর্ব্ব দিকে রিপন কলেজ ছিল। আমি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া একবার তিন-চারি দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া অক্ষয় বাবুর সেই বাসাতে ছিলাম। অক্ষয় বাবু পরে যখন দেওঘরে থাকিতেন, তখন আমিও কিছু দিন দেওঘরে গিয়া বাস করিয়াছিলাম। দেওঘরে আমি অক্ষয় বাবুর বাটীতে থাকিতাম না, আমার বাসা তাঁহার বাটীর কাছেই ছিল, সুতরাং সেই অপরিচিত দেশে আমি যে প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাইতাম, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কলিকাতায় যে সময় আমি অক্ষয় বাবুর বাসাতে ছিলাম, সেই সময় এক দিন এক প্রৌঢ় ভদ্র লোক অক্ষয় বাবুর বাসাতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় কানে কম শুনিতেন। উভয়ে বোধ হয় সমবয়স্ক ছিলেন, অক্ষয় বাবু তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবার সময় বেশ উচ্চ কণ্ঠে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতেই আমি মনে করিলাম যে আগন্তুক বধির। আমি খুব নিম্নস্বরে অক্ষয় বাবুকে সেই ভদ্রলোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে অক্ষয় বাবু তেমনি মৃদুস্বরে বলিলেন বাবু

রজনীকান্ত গুপ্ত

আমি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সেই আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে, মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" আমাদের পাঠ্য ছিল, আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যিনি বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষক ছিলেন, তিনিই এই রজনীকান্ত গুপ্ত। আমার মনে হয়, রজনী বাবুর মুখে গালের কাছে একটা আঁচিল ছিল। চুঁচুড়ায় অক্ষয় বাবুর বাড়িতে আর এক জন বৃদ্ধ ভদ্র লোককে দেখিতে পাইতাম। তিনি বোধ হয় অক্ষয় বাবুর অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন। সেকালে তিনি এক জন অসাধারণ পরিহাস-রসিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার নাম বাবু

দীননাথ ধর

দীন বাবু এক সময়ে ঢাকাতে গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন। পরে অবসর গ্রহণ করিয়া বাটীতে বসিয়াছিলেন। আমার পিতার সঙ্গেও তাঁহার বেশ হৃদ্যতা ছিল। অক্ষয় বাবুর বাটীতে তিনি আমার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ইন্দ্রকুমারের ছেলে? আমি বলি বুঝি অক্ষয়ের কেউ হবে।" আমি যখন "হিতবাদী"তে কার্য্য করিতাম, তখনও তিনি মধ্যে মধ্যে "হিতবাদী" আপিসে যাইতেন। পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তখন "হিতবাদী"র সম্পাদক। দীন বাবু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "যোগিন এখানে যে?" বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন, "যোগিন বাবুই "হিতবাদী"র সম্পাদক, আমি ত নামে।" শুনিয়াই দীন বাবু
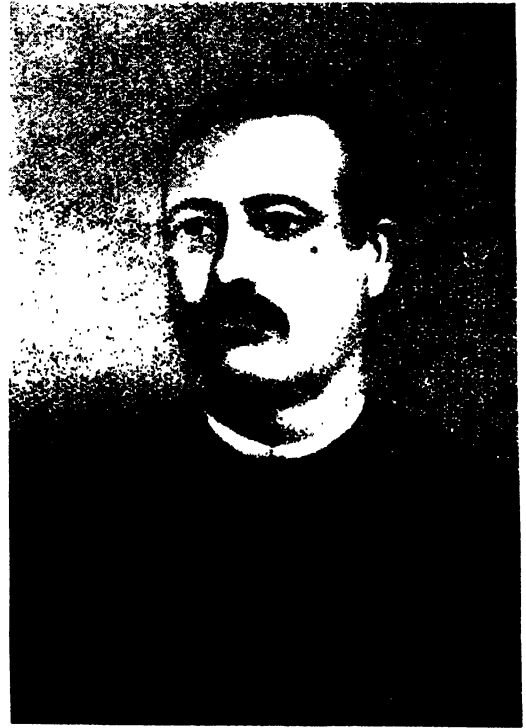
রজনীকান্ত গুপ্ত

বলিলেন, "বেশ, বেশ, শুনে বড় আনন্দ হ'ল যে আমাদের ঘরের ছেলে কলিকাতায় খবরের কাগজমহলে নাম কিনেছে।" দীন বাবুর গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আর একদিন তিনি আমাদের আপিসে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময় এক জন লোকের

ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কথা উঠিল, সেই প্রসঙ্গে দীন বাবু বলিলেন, "আমি যখন ঢাকাতে ওকালতি করি, তখন একদিন বড় মজা হয়েছিল। ঢাকাতে মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী নামে একটা লোক পৈতে ফেলে ব্রাহ্ম হয়েছিল। তার পর শুনিলাম, সে ক্রিশ্চান হয়েছে। আবার কিছুদিন পরে শুনিতে পাইলাম যে মুসলমান হইয়া সে দীন মহম্মদ নাম লইয়াছে। একবার সে তাহার একটা মামলা করিবার জন্য আমাকে আসিয়া ধরিল। আমি তাহার পরিচয় লইয়া বলিলাম—"আমি তোমার মোকদ্দমা লইতে পারি, যদি তুমি ইব্রাহিম নামে মোকদ্দমা কর। সে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম ইশুর (যিশুর) 'ই' ব্রাহ্মর 'ব্রা' হিন্দুর 'হি' এবং মহম্মদের "ম"। তোমার নাম দীন মহম্মদ না হইয়া ইব্রাহিম হওয়া উচিত।" এই দীন মহম্মদ গাঙ্গুলী সাহেবও কয়েকবার হিতবাদী আপিসে আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে "গাঙ্গুলী সাহাব" বলিয়া সেলাম করিতাম। তিনি ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না, দীন বাবুর মুখেই তাহা শুনিলাম। দীন বাবু "হিতবাদী" আপিসে আসিলে প্রায়ই ঐরূপ গল্প করিতেন। তিনি নিজে সুবর্ণবণিক ছিলেন অথচ সুবর্ণবণিকদিগের জাতিগত দুর্ব্বলতা লইয়াই হাস্য পরিহাস করিতেন। আমাদের আপিসে বসিয়া তিনি যে-সকল সরস গল্প করিতেন তাহার অধিকাংশই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের আদেশে "দীন বাবুর দান" নামে "হিতবাদী"তে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

আমাদের সেকালে আর এক জন সুবিখ্যাত পরিহাস-রসিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বাবু

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়। ইন্দ্রনাথ বাবুর অধিকাংশ লেখা সেকালের "বঙ্গবাসীতে" প্রকাশিত হইত—কিন্তু তাঁহার নিজের নামে নহে "পঞ্চানন্দ" এই ছদ্মনামে। ইন্দ্রনাথ বাবু বর্দ্ধমানে ওকালতি করিতেন। আমার পিতা বর্দ্ধমানে প্রথমে নর্ম্মাল স্কুলের হেডমাষ্টার, পরে সব-ইন্সপেক্টর ও শেষে ডেপুটি-ইন্সপেক্টর পদে শিক্ষা-বিভাগে প্রায় বিশ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। আমাদের বাসা ইন্দ্রনাথ বাবুর বাটীর কাছেই ছিল। বাবার নামের সহিত ইন্দ্রনাথ বাবুর নাম-সাদৃশ্যে অনেক সময় চিঠিপত্রের গোলমাল হইত, বাবার চিঠি তাঁহার বাটীতে এবং তাঁহার চিঠি বাবার কাছে আসিত; অনেক সময় হয়ত কোন মক্কেল বাবার কাছে আসিয়া হাজির হইত। আমরা যখন বালক, ইন্দ্রনাথ বাবু তখন যৌবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। যৌবনে তিনি বেশ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বর্ণও বেশ উজ্জ্বল গৌর ছিল। বর্দ্ধমানের নর্ম্মাল স্কুল উঠিয়া গেলে বাবা স্কুলের সব-ইন্সপেক্টর হইলেন, আমরা বর্দ্ধমান হইতে চন্দননগরে চলিয়া আসিলাম, বাবা বর্দ্ধমানে একাকী বাসা করিয়া থাকিলেন। সেটা বোধ হয় ১৮৭৭ কিংবা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। বর্দ্ধমান ছাড়িয়া আসিবার পর বোধ হয় চল্লিশ বৎসর পরে ইন্দ্রনাথ বাবুর আর একদিন সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, "হিতবাদী" আপিসে। "হিতবাদী" আপিসে তিনি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কাছে আসিয়া-ছিলেন। আমি তাঁহাকে একেবারেই চিনিতে পারি নাই। সেই বাল্যকালে দৃষ্ট সুন্দর সুশ্রী ইন্দ্রনাথ আর এই বৃদ্ধ ইন্দ্রনাথ! প্রায় চল্লিশ বৎসর কি পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে দেখা। বলা বাহুল্য যে, তিনিও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমাকে বলিলেন, "যোগেন বাবু ইঁহাকে চেনেন? ইনিই বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে পঞ্চানন্দ।" এই বলিয়াই তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি যেমন বঙ্গবাসীর পঞ্চানন্দ, ইনিও তেমনি আমাদের শ্রীবৃদ্ধ।" ইন্দ্রনাথ বাবুর নাম শুনিবামাত্র আমি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে তিনি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবা মাত্র আমি বলিলাম, "আমার বাবার নাম ৺ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানে আমরা আপনার বাড়ির কাছেই থাকিতাম।" এই কথা শুনিবামাত্র তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি সেই যোগিন? তোমাকে দেখিয়াছি ত ছেলেমানুষ, তখন তোমার বয়স বোধ হয় আট-দশ বৎসর। তোমাকে চিনিব কি করিয়া? বেশ বাবা বেশ, তোমাকে দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। তোমার বাবা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। যাহা হউক, আমার বড় আনন্দ হ'ল যে "বৃদ্ধের বচন" তোমারই লেখা শুনে। আমরা মনে

করিতাম যে আমি, অক্ষয় সরকার প্রমুখ কয়েক জন বুড়া মরিলেই বাংলা-সাহিত্যের রস শুকাইয়া যাইবে। তোমার বৃদ্ধের বচনগুলি পড়ে মনে হ'ত বাংলা-সাহিত্যের রস এত শীঘ্র শুকাইবে না, রসধারা আরও কিছুদিন বাংলা-সাহিত্যকে সরস করিয়া রাখিবে।" এক দিন অক্ষয় সরকার কি ইন্দ্রনাথ বাবু আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আমারও ঠিক সেই কথাই বারংবার মনে হয়। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ('পরশুরাম') প্রমুখ কয় জন বৃদ্ধের লেখনী বন্ধ হইলে হয়ত বাংলা-সাহিত্য একেবারে রসহীন হইয়া পড়িবে। অনেকটা আশা ছিল উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর—কিন্তু উপেন্দ্রনাথও তাঁহার লেখা বন্ধ করিয়াছেন। আজকাল তাঁহার সরস লেখা বড় চোখে পড়ে না। আমাদের সেকালের সাহিত্যের একছত্র সম্রাট বাবু

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়কে আমি অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু একবার ব্যতীত তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার সুবিধা হয় নাই। বাল্যকালে তাঁহাকে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চুঁচুড়ার বাড়িতে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু তখন তাঁহার কাছে বড় যাইতাম না। তখন তাঁহার গোঁপ ছিল। তার পর বহুকাল পরে একবার তাঁহাকে দেখি জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে (এখন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) একটা সভাতে সভাপতিরূপে। সেই সভা বোধ হয় ১৮৯৩ কি ৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে হইয়াছিল। সেই সভাতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোধ হয় "ইংরাজ ও ভারতবাসী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। আর একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর ঐ স্থানেই রবীন্দ্র বাবু বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেবারে স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবুকে যখন সভাপতি রূপে দেখিয়াছিলাম, তখন আমি কলিকাতায় বহুবাজারে একটা মেসে থাকিতাম। সেই মেসে আমার চারি-পাঁচ জন সতীর্থও থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা মেডিকেল কলেজে পড়িতেন, কেহ বা আইন পড়িতেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়ার সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার ৺সত্যশরণ মিত্র আমার বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ ছিলেন, তাঁহারও বাটী চন্দননগরে ছিল, তিনি আমাদের মেসেই থাকিতেন। একদিন আমরা কয় জন বন্ধুতে মিলিয়া বঙ্কিম বাবুকে দেখিতে গেলাম। তিনি তখন মেডিকেল কলেজের পূর্ব্বদিকে প্রতাপ চাটুয্যের লেনে বাস করিতেন। আমরা পাঁচ-ছয় জন মিলিয়া একদিন সকালবেলা ৯টার সময় তাঁহার বাসাতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি অনাবৃত শরীরে বসিয়া একখানা ইংরেজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন এবং আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন। আমরা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যশরণ বলিল, "আমরা আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি।"

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তিনি আমাদিগকে বসিতে বলিলে আমরা উপবেশন করিলাম। আমাদের সকলেরই বাড়ি চন্দননগরে শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা সকলেই ত আমার প্রতিবেশী দেখছি।" তিনি প্রতিবেশী বলিলেন, কারণ তাঁহার নিবাস কাঁটালপাড়া চুঁচুড়ার ঠিক পরপারে আর চন্দননগর চুঁচুড়ার সংলগ্ন ঠিক দক্ষিণে। চন্দননগরের উত্তরাংশের গঙ্গার ঘাট হইতে কাঁটালপাড়ার গঙ্গার ঘাট বোধ হয় এক ক্রোশের অধিক হইবে না। আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিয়া আমাকে বলিলেন, "ও, তুমি ইন্দ্রকুমার বাবুর ছেলে? তুমি কি কর?" আমি তখন দালালি করিতাম, সে কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "অনেকের ধারণা আছে যে, ওকালতি বা দালালিতে মিথ্যা কথা না বলিলে চলে না। একথা আমি বিশ্বাস করি না। সর্ব্বদা মনে রাখিও—Honesty is the best policy।" আমার সঙ্গীরা সকলেই তখন ছাত্র—অধিকাংশই মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বোধ হয় দুই-এক জন আইন-ক্লাসের ছাত্রও ছিলেন। বঙ্কিম বাবু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমার কাছে উপদেশ লইতে আসিয়াছ? এক কথায় আমার উপদেশ—Do your duty, তোমাদের বর্ত্তমান duty লেখাপড়া করা। ছাত্রানামধ্যয়নস্তপঃ। পড়াশুনাই তোমাদের তপস্যা, এখন তোমাদের অন্য কোন duty নাই।" এই বলিয়া নীরব হইলে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। বঙ্কিম বাবুর অগ্রজ বাবু

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়কেও আমি বাল্যকালে অনেক বার দেখিয়াছি। আমার পিতা যখন বর্দ্ধমান নর্ম্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সে-সময় সঞ্জীব বাবু বর্দ্ধমানের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বর্দ্ধমানে তাঁহাকে অনেক বার দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সহিত কখনও কথা বলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।*

* বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথের চিত্র ছাড়া, বাকী চিত্রগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত তৈলচিত্রের প্রতিলিপি।

আলোচনা

ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীর অদ্ভুত নিয়ম

বসুধা চক্রবর্ত্তী

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে "ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর অদ্ভুত নিয়ম" শীর্ষক যে মন্তব্য বাহির হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিতে চাই।

প্রথমতঃ, ইহা সত্য নহে যে বাংলা উপন্যাস ও গল্পের বহি কাহাকেও পড়িতে দেওয়া হইবে না বলিয়া নিয়ম করা হইয়াছে। লাইব্রেরীয়ানের অথবা পাঠাগারের সুপারিন্টেনডেন্টের অনুমতি লইয়া যে-কেহ বই পড়িতে বা বাড়িতে লইয়া যাইতে পারেন, এবং এই প্রকার অনুমতি দিতে তাঁহারা কার্পণ্য করেন না। যথেচ্ছভাবে গল্প উপন্যাস লইতে দিলে সে সুযোগের অপব্যবহারের ফলে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর আসল উদ্দেশ্য যে যথার্থ পাঠেচ্ছু দিগকে গবেষণার ও নিয়মিত অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া, তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ আছে: গল্প উপন্যাস সকলকেই পাঠাগারে বসিয়া পড়িতে দিলে সেখানে স্থান-সঙ্কুলান কঠিন হইবে এবং বাড়ি লইয়া যাইতে দিলে সে-সব বই নানা প্রকারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, অতীত অভিজ্ঞতা হইতে এইরূপ দেখা গিয়াছে। এমন অনেক বই বা এমন সংস্করণের বই আছে যাহা একবার হারাইলে বা কোনো ভাবে নষ্ট হইলে আর পাইবার উপায় থাকে না, অথচ সেই সব বই বহুদিন পরেও লোকের বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে পারে। ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে বাংলা বই অনেক আছে, দিন দিন তাহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং বর্ত্তমানের বা ভবিষ্যতের যথার্থ পাঠকদের পক্ষে সে-সব বই পড়িতে পাইতে কোনো বাধা ঘটিবার কারণ নাই।

আলোচ্য নিয়মটি পূর্ব্বেও অলিখিতভাবে ছিল, সম্প্রতি প্রয়োজন-বোধে লিখিতরূপে করা হইয়াছে মাত্র। অন্যান্য লাইব্রেরীর সঙ্গে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য ও দায়িত্বগত পার্থক্যের কথা চিন্তা করিলে ঐরূপ একটি নিয়মের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হইবে বলিয়াই মনে হয়।

ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীতে বাংলা উপন্যাস পাঠ নিষেধ

উক্ত বিষয়ক সম্পাদকীয় মন্তব্যের সম্বন্ধে অন্যান্য কথার মধ্যে শ্রীহট্ট জেলার দুয়ারাবাজার গ্রামের শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখিয়াছেন, যে, ঐরূপ নিষেধ চ্যাপম্যান সাহেবের আমলেও ছিল।

ইহা সত্য কিনা, ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর তখনকার ও এখনকার উভয় সময়েরই পাঠকেরা বলিতে পারিবেন।

কল্যাণমাণিক্যের নির্ব্বাচন ও ত্রিপুরার রাজমালা

"প্রত্নকম্র"

শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ২১৫ পৃ.) ঠিকই লিখিয়াছেন, কল্যাণমাণিক্যের নির্ব্বাচন কোন প্রকারেই প্রজাদের কর্তৃক নির্ব্বাচন বলা যাইতে পারে না।" ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উক্তি এ-বিষয়ে বিচারসহ নহে। কল্যাণমাণিক্যের রাজ্য-প্রাপ্তির বিবরণ মূলগ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

বিখ্যাত ত্রিপুর-রাজ অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৫৭৭-৮৬ খ্রীঃ) দুই রাজার জন্ম হয়:—"অমরমাণিক; রাজা দুই রাজার জন্ম। জসোমাণিক্য আর কল্যাণমাণিক্য সম্য॥" (প্রাচীন রাজমালা, হস্তলিখিত) ১৫০১ শকের মাঘ মাসে অমরমাণিক্যের পৌত্র এবং রাজধরমাণিক্যের পুত্র যশোমাণিক্যের এবং ১৫০২ শকের ভাদ্র মাসে কল্যাণমাণিক্যের জন্ম হয়। কল্যাণের মাতামহ—"জন্মপত্রী লিখাইয়া দেখিল শোভন। দৈবজ্ঞে নিষেধে তাকে বলিতে কথন॥" (মুদ্রিত রাজমালা, ১৭৭ পৃ.) কারণ তাঁহার 'রাজযোগ' ছিল এবং দৈবজ্ঞ ভবিষ্যদুক্তি করিয়াছিল—"সাতচল্লিশ বৎসরেত রাজা হৈব পাছে।" (প্রাচীন রাজমালা)। অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধরমাণিক্যের (১৫৮৬-১৬০০ খ্রীঃ) মৃত্যুর পর—'রাজাহীন রাজ্য প্রজা রহিবে কেমনে। রাজা বিনে রাজ্য স্থির না হয় কখনে। মন্ত্রী লৈয়া রাজসৈন্য করয়ে মন্ত্রণা। কতদিনে রাজা হবে করয়ে গণনা॥ নৃপতির পুত্র যশোধর-নারায়ণ। মন্ত্রী কহে তাকে রাজা করিব এখন॥ (মুদ্রিত রাজমালা ২৪১ পৃ.) সুতরাং দেখা যাইতেছে রাজবংশের প্রকৃষ্টতম উত্তরাধিকারী হইয়াও যশোমাণিক্য (১৬০০-২৩ খ্রীঃ) মন্ত্রী ও সেনাপতি দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কল্যাণমাণিক্যের (১৬২৫-৬০ খ্রীঃ) নির্ব্বাচনও সেই ভাবেই ঘটিয়াছিল, কেবল তিনি রাজবংশের নিকট উত্তরাধিকারী না হইয়া দূরবর্ত্তী মহামাণিক্যের বংশধর ছিলেন। কল্যাণমাণিক্যের নির্ব্বাচনপ্রণালী বিষয়ে সংস্কৃত রাজমালায় এক কৌতুককর কাহিনী লিখিত আছে। প্রায় দুই বৎসর কাল (১৬২৩-২৫ খ্রীঃ) ত্রিপুরা-রাজ্য মোগলদের অধিকারে ছিল। তাহারা চলিয়া গেলে মন্ত্রিগণ বারাণসীতে রাজ্যভ্রষ্ট যশোমাণিক্যের নিকট দূত প্রেরণ করেন। তিনি পুনরায় রাজ্য হইতে অস্বীকৃত হইয়া দূতের সঙ্গেই চারি বর্ণের চারিখানা বস্ত্র—পীত, শ্বেত, শ্যাম এবং নীল বর্ণ—প্রেরণ করিয়া বলেন—"চারি জন সেনাপতির জন্য এই চারি বস্ত্র। কে কোন্‌টা পছন্দ করিয়া পরিধান করে আমাকে জানাও।" অন্যতম সেনাপতি কল্যাণকা শ্বেতবস্ত্রখানি বাছিয়া লন এবং যশোমাণিক্য তাঁহাকেই রাজযোগ্য বলিয়া রাজা করিতে পত্র দেন। ["কল্যাণকাঃ শ্বেতবস্ত্রং ধীরঃ পরিদধৌ তদা।. এতদ্বৃত্ত-সমাযুক্তাং লিপিং প্রাপ্য সভূমিপঃ। কল্যাণকাং রাজযোগ্যং নৃপং কর্ত্তুং লিপিং দদৌ॥ হস্তলিখিত সংস্কৃত রাজমালা]

শ্রীযুত মনোজ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৫, ৬৯ পৃ.) "রাজমালার প্রাচীন ও জরাজীর্ণ বহু পুঁথি রাজপাঠাগারে রক্ষিত আছে, উহা তাম্রশাসনাদি অপেক্ষা কম বিশ্বসনীয় নহে।" বহু বৎসর যাবৎ বাঙ্গালার বিদ্বৎসমাজে এইরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। তাহার কারণ, ত্রিপুরার দুর্ভেদ্য রাজগ্রন্থাগারে অতি কম লোকেরই প্রবেশাধিকার ঘটে এবং ইদানীং যে কতিপয় ঐতিহাসিক রাজমালার পুঁথি আলোচনার সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অপ্রীতিকর তত্ত্ব প্রচার করিতে বিরত রহিয়াছেন। শুক্রেশ্বর এবং বাণেশ্বর খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীতে যে রাজমালা রচনা করেন তাহা গোবিন্দমাণিক্যের (১৬৬০-৭৩ খ্রীঃ) সময়েই

বিলুপ্তপ্রায় হইযাছিল। "শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি, দৈবযোগে আপনে পাইলো সেই পুথি। শ্রীধর্ম্মমাণিক্য হনে যত রাজা হৈল, দৈত্য খণ্ড পুস্তকেত নাম গাথা হৈল॥" (প্রাচীন রাজমালা) ১৫৯১ শকে গোবিন্দমাণিক্য রাজমালা পরিবর্দ্ধিত করেন এবং কৃষ্ণমাণিক্যের (১৭৬০-৮৩ খ্রীঃ) সময়ে তাহা পুনঃপরিবর্দ্ধিত হয়। এই শেষোক্ত গ্রন্থের একখানি মাত্র পুঁথি রাজগ্রন্থাগারে ছিল, তাহাও ইদানীং অদৃশ্য হইয়াছে—একটি আধুনিক প্রতিলিপি মাত্র বিদ্যমান। ১২৯৮ ত্রিপুরাব্দে বিখ্যাত উজীর দুর্গামণি অজ্ঞাতসারে প্রাচীন রাজমালার আমূল সংশোধন করিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থেরই কতিপয় প্রতিলিপি গ্রন্থাগারের সম্পত্তি। দুর্গামণির ইতিহাসজ্ঞান কম ছিল, তাঁহার সংশোধিত গ্রন্থে বহুস্থলে তিনি মারাত্মক ভুল করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ত্রিপুরার সমর্থ রাজপরিষদ বহুসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া দুর্গামণির রাজমালাই মুদ্রিত করিতেছেন, যাহার ঐতিহাসিক মূল্য কৃষ্ণমাণিক্যের পূর্ব্ববর্তী রাজগণের বিষয়ে অতি কম। তাহাও যদি মূলগ্রন্থ টীকা টিপ্পনী ব্যতীতই সত্বর মুদ্রিত হইত! বিগত চল্লিশ বৎসর মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজগণ রাজমালা প্রকাশের জন্য অকাতরে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন—তাঁহাদের শুভেচ্ছার পরিণতি দেখিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে, যে-কয়খানি মূল্যবান্ গ্রন্থ এখনও গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে তাহাও শীঘ্রই অমুদ্রিতাবস্থায় বিলুপ্ত হইবে। অথচ অতি সামান্য ব্যয়ে গ্রন্থ কয়খানি (প্রাচীন রাজমালা, কৃষ্ণমালা এবং চম্পকবিজয়) মুদ্রিত হইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন এবং ইতিহাস-সঙ্কলন সম্পূর্ণ বিভিন্ন কার্য্য। ত্রিপুরার প্রকৃত ইতিহাস রচনা নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞের কার্য্য, রাজকর্ম্মচারী এবং রাজানুগৃহীত ব্যক্তি দ্বারা তাহা অসম্ভব।

বালুরঘাট উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়

আমীর উদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরী

আপনার বৈশাখ মাসের প্রবাসীর সম্পাদকীয় মন্তব্যে আপনি লিখিয়াছেন :—

"ইহার অধিবাসীদিগের সার্ব্বজনিক লোকহিতকর কার্য্যে উৎসাহ প্রশংসনীয়। এখানে তাঁহারা একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় চালাইয়া আসিতেছেন। গত মাসে তাহার ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাহার 'রজত-রঙ্গোৎসব' করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ বেসরকারী। ইহার পাকা ঘরবাড়ি স্থানীয় ভদ্রলোকেরা চাঁদা দিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। চলতি খরচের জন্যও তাঁহারা সরকারী কোন সাহায্য গ্রহণ করেন না, প্রার্থনাও করেন না। তাহা সত্ত্বেও বিদ্যালয়টি সুপরিচালিত।"

বাস্তব পক্ষে এই স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন বালুরঘাটের ১ম সাবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়। তিনি মফস্বলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পল্লীবাসী ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই স্কুলের ঘরবাড়ি নির্ম্মাণ করেন; তিনি এই মহকুমার মফস্বলের প্রতিগ্রামের কৃষকশ্রেণীর লোকের নিকট হইতেও লাঙ্গল-প্রতি ১০৲ টাকা হিসাবে চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন। বলা আবশ্যক মনে করি, যে, এই স্কুলের সমস্ত টাকা অতুল বাবু কর্ত্তৃক মফস্বলের নিকট হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। বালুরঘাট শহরের দুই জমিদার ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে তিনি স্কুলের জন্য চাঁদা আদায় করিয়াছেন এরূপ কথা আমরা শুনি নাই। বেসরকারী কোন ভদ্রলোক বা কোন লোক এই স্কুলের জন্য কোন চাঁদা আদায় করেন নাই।

এই স্কুলের প্রধান বিল্ডিংগুলি অতুল বাবু ও অন্য বিল্ডিং বালুরঘাটের অন্যতম সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার আবুল মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফার সাহেব নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। স্কুলের বোর্ডিং দুটির গায়ে এখনও "মোজাফ্‌ফার মোসলেম হোষ্টেল ও মোজাফ্‌ফার হিন্দু হোষ্টেল" লিখিত রহিয়াছে। সুতরাং এই দুইটির সম্বন্ধে বোধ হয় আর কিছু না বলিলেও চলিতে পারে।

এই স্কুল গবর্ণমেণ্ট-স্কুল না হইলেও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক সাহায্য ও বিল্ডিং-গ্র্যাণ্ট বাবত সাহায্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল এবং স্থানীয় সাব্‌ডিভিসনাল অফিসারই ইহার Ex-officio প্রেসিডেণ্ট (প্রথম হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত) ছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন-অমান্য-আন্দোলনে এই স্কুলের বহুসংখ্যক ছাত্র—বিশেষতঃ সেক্রেটারী, জেলে যাওয়ায় তখন হইতে এই স্কুলের গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর হইতে স্কুলটি কংগ্রেস-পক্ষ পরিচালনা করিতেছেন।

স্কুল সুপরিচালিত কি না কেমন করিয়া বলিব? এই কর্ত্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন থাকাকালে স্কুলের জনৈক শিক্ষক বহু টাকা তহ্‌রুপাত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। অথচ যত ক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা স্কুলের এক জন শিক্ষক ধরাইয়া না-দিয়াছিলেন তত ক্ষণ স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ ধরিতে বা বুঝিতে পারেন নাই।

সম্পাদকের মন্তব্য

বালুরঘাট উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমরা বৈশাখের প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার প্রতিবাদ করিয়া লেখক একটি অতিদীর্ঘ পত্র পাঠান। তাহাতে আমাদের মন্তব্যের প্রতিবাদ ছাড়া অবান্তর অনেক কথা থাকায় ও তাহা অত্যন্ত লম্বা বলিয়া আমরা তাঁহাকে তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঠাইতে লিখি। এবার তিনি যাহা পাঠাইয়াছেন, তাহাও লম্বা এবং তাহাতেও এমন অনেক কথা ছিল যে-বিষয়ে আমরা কিছু বলি নাই। সুতরাং আমাদের মন্তব্যের প্রতিবাদসূচক কথাগুলিই ছাপিলাম।

আমরা স্কুলটির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধেই কিছু লিখিয়াছিলাম, অতীত সম্বন্ধে কিছু লেখা আমাদের অভিপ্রেত ছিল না।

আমরা লিখিয়াছিলাম, স্কুলটি স্থানীয় ভদ্রলোকেরা চাঁদা দিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। লেখক বলিতেছেন, বালুরঘাট শহরের দু-জন জমিদার ছাড়া আর কেহ চাঁদা দেন নাই, বাকী চাঁদা পল্লীবাসী ধনী-নির্ধন সবাই দিয়াছিল। ইহা সত্য কিনা জানি না। যাহা হউক, আমরা চাঁদা-দাতাদের বাসভূমির চৌহদ্দি লিখি নাই, সুতরাং "স্থানীয়" বলিতে মফস্বলের লোকদিগকে বুঝাইতে পারেই না বলা যায় না।

লেখকের মতে স্কুলটি সুপরিচালিত নহে, যেহেতু একবার টাকা তহরূপ হইয়াছিল, এবং তাহা কর্ত্তৃপক্ষ ধরিতে পারেন নাই, এক জন শিক্ষক ধরাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে, ইহাও অতীত কালের দুঃখের কথা। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অধীনে অনেক সরকারী টাকা নানা স্থানে তহরূপ হয়, এবং সেই সব চুরি বড়লাট ছোটলাট কমিশনার প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষ ধরেন না। অতএব গবর্মেণ্ট সুপরিচালিত কিনা, লেখক বলিতে পারিবেন।

পলাতক

শ্রীসরোজকুমার মজুমদার

কিছু দিন হইতেই বাজার অত্যন্ত খারাপ পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া, এই শ্রাবণ মাস হইতে নটবর এক পয়সাও কামাইতে পারে নাই।

রাস্তায় কিন্তু রকমারি পোষাকে সাজগোজ-করা মানুষের চলার অন্ত নাই। শহরের বায়স্কোপ-ঘরগুলির সম্মুখ দিয়া নটবর এক বার নয় শত বার ঘুরিয়া আসিয়াছে। সেখানেও অগণিত নর-নারীর ভীড়—তেমনই আবার খেলার মাঠেও। কিন্তু নটবর তাহাতে বিন্দুমাত্রও লাভবান হয় নাই। আজকালকার বাবুরা সবাই যেন একটু অতিমাত্রায় চালাক হইয়া গিয়াছে।

দিনে দিনে এ হইল কি? নটবর অবাক হইয়া যায়।

এদিকে কিন্তু ছেলেটার বলিতে গেলে সাত দিন হইতে পেটে কিছুই পড়ে নাই। মনের দুঃখে নটবর লোহালক্কড়ের দোকানে তাহার কাঁচি দুইটা বেচিয়া দিয়াছে। ছয় পয়সায় তাহাদের দু-জনের দুই দিন বেশ চলিয়া যাইবে।

হঠাৎ আবার যে ছেলেটার কেন জ্বর হইল!

নটবর ছেলেকে লইয়া হাসপাতালে দেখাইতে গেল। পেট টিপিয়া, জিব দেখিয়া ডাক্তার একটা শিশিতে করিয়া ওষুধ দিলেন। বলিলেন—দু-বেলা দুধ খেতে দিস্। আর ডালিম, বেদানা, কমলা,—বুঝলি?

কুণ্ঠিত ভাবে নটবর প্রশ্ন করে,—আজ্ঞে, দুধ কি হাসপাতালে দেয় না?

ডাক্তার দাঁত মুখ খিঁচাইয়া উঠেন,—হ্যা! দুধ দেবে না হাসপাতাল থেকে? তোমার বাবার হাসপাতাল কি না!

শুধু ঔষধ লইয়াই ছেলেকে কাঁধের উপর ফেলিয়া নটবর বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

আজ তাহাকে কিছু রোজগার করিতেই হইবে—তা সে যে করিয়াই হউক। খোকার পথ্য চাই-ই।

সন্ধ্যা হইতেই নটবর বাহির হইয়া পড়িল। সোজা হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটি সৌখীন বাবু আসিতেছে। নটবর তাহার দিকে আগাইয়া চলিল। বাবুটির কাছাকাছি আসিতেই চুপি-চুপি তাঁহাকে বলিল,—একটা জিনিষ নেবেন বাবু? খুব সস্তায় দেবো।

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—দেখি, কি জিনিষ?

নটবর খুব আস্তে বলিল,—তা হ'লে একটু এদিকে আসুন!

একটা বড় থামের আড়ালে গিয়া নটবর তাহার ট্যাঁক হইতে চক্‌চকে গোলাকার একটি জিনিষ বাহির করিয়া বলিল,—সোনা বাবু, আসল গিনিসোনা! বৌ-বেটী ত কবে ম'রে সাফ হয়ে গেছে। মাগী যে ছেলেটাকে রেখে গেছে বাবু, তার জন্যেই ত যত মুস্কিল কি না! তা ছেলেটার আবার ক'দিন থেকেই ভারি অসুখ। দু-শ টাকার জিনিষ পঞ্চাশেই ছেড়ে দিই যদি বাবু মেহেরবাণী ক'রে—

নটবর আর তাহার কাহিনী ও আবেদন শেষ করিবার অবকাশ পাইল না। ঠাস্ করিয়া গালের উপরে এক প্রচণ্ড চড় খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িল।

—তোমায় আমি পুলিসে দেবো, জান? সোনা! সোনা আমি চিনি না, না? কচি খোকা পেয়েছ? পেতল ঝালাই ক'রে তুমি ডাকাতি ক'রতে এসেছ আমার কাছে?

আঘাতের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই নটবরকে ভীড়ের মধ্যে গলিয়া যাইতে হইল। ভাবিল, তবু যা হোক্ খুব বাঁচিয়া গিয়াছে! আর একটু হইলে পুলিসের খপ্পরে পড়িয়াছিল আর কি! লাভের মধ্যে তাহার মালটিও খোয়া যাইত। সরকার-খুড়া ঐটা ঝালাইয়া দিতে তাহার কাছ হইতে লইয়াছে নগদ বার আনা পয়সা।

খালি হাতেই নটবর বাড়ির পথে হাঁটিতে থাকে।

বড়বাজারে ইয়াসিন মিঞার মেওয়ার দোকানের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইয়াসিন মুচকি হাসিয়া শুধাইল,—কি রে নটু কিছু কামালি ?

হাল্‌কা হাসিয়া নটবর উত্তর দিল—কই আর হচ্ছে দাদা ? শা—বাবুরা আজকাল বড্ড ধড়িবাজ হয়েছে! ব্যাটারা টাকা-পয়সাগুলো যে কোথায় রাখে তার স্রেফ পাত্তাই পাওয়া যায় না।

একটু পরেই আবার সলজ্জভাবে ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—আর সেই দুঃখেই ত আসা দাদা। ইয়াসিন-চাচা, গোটা-দুই কমলা আর কিছু আঙুর যদি দিতিস্ তো ভারি উপকার হ'ত। দু-দিন থেকে ছোঁড়াটার ভারি অসুখ চলছে।

মৃদু হাসিয়া ইয়াসিন জিনিষগুলি উহার হাতে দিয়া বলিল,—নে, নিয়ে যা। কিন্তু আর এক দিন আবার ঐ চণ্ডু বানিয়ে খাওয়াতে হবে, বুঝলি ?

ফলগুলি হাতে পাইয়া নটবর খুশীতে উপ্‌চাইয়া উঠিল,—আসিস। এই মাল—বারে, তুই দু-ভরি আফিম নিয়ে আসিস। আমি চোস্ত ক'রে বানিয়ে দেবো এখন।

ঘরে ঢুকিয়া হাতড়াইয়া নটবর কুপি ও দিয়াশলাই জোগাড় করিল। একবার ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিল,—কি রে, কেমন আছিস এখন ?

কোন উত্তর নাই। ঘুমাইয়া পড়িয়াছে হয়ত।

নটবর বাতি জ্বালাইতেই দেখে জলের ঘড়ার পাশেই ছেলে তাহার উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। কপালে ঈষৎ আঘাত লাগিয়া কাটিয়া গিয়াছে। রক্ত পড়িয়া সারামুখে জমিয়া আছে। গোটা মেঝে বমিতে থৈ-থৈ করিতেছে।

পিপাসার তাড়নায় ছেলেটি তক্তাপোষ হইতে নামিয়া নিজেই জল গড়াইয়া লইতে গিয়াছিল হয়ত। ঘড়ার কাছে আসিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়াতেই বুঝি কপালের খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কখন যে সে বমি করিয়া ফেলিয়াছে তাহা বোধ হয় সে নিজেই জানে না!

পরদিন সকালেই নটবর বাবা বিশ্বম্ভরের নাম লইয়া যাত্রা করিল। আজ তাহাকে অবশ্যই কিছু রোজগার করিতে হইবে। খোকাকে আজ দুধ না দিলে আর বাঁচান যাইবে না। পরের কাছে হাত পাতিলে হয়ত তাহার সমধর্ম্মীদের মধ্যে কেহ-কেহ সাহায্য করিবে। কিন্তু নটবরের আত্মসম্মানজ্ঞান প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিল। ধার চাহিবার মত নগ্ন-দীনতার কল্পনা নটবর করিতে পারে না।

আজ আর হাওড়ার দিকে নয়। খুব শিক্ষা হইয়াছে। নটবর চলিল দক্ষিণেশ্বরের পথে। সেখানে আজ কি-একটা উৎসব আছে। বহু লোক আসিবে। মা কালী করিলে মোটারকমই কিছু হাতাইতে পারে।

অসংখ্য যাত্রীর ভীড়। নটবরও দলের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। এক জন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোকের পাশ দিয়া ধীরে চলিতে চলিতে নটবর ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, ওই যে, ওই সাধুরা ও-দিকে ব'সে আছেন,—ওরা সবাই খুব সিদ্ধপুরুষ, না ?

ভদ্রলোক সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই নটবর তাঁহার বাম-পকেট হইতে মনি-ব্যাগটি চট্ করিয়া তুলিয়া লইয়া জনতার মধ্যে গা-ঢাকা দিল।

কিছু দাঁও মারিয়াছে যাহোক্। প্রফুল্লচিত্তে নটবর একটি অপেক্ষাকৃত জনবিরল স্থানে গিয়া গভীর ঔৎসুক্যে ব্যাগটি খুলিল। একটি আনি, তিনটি পয়সা ও কাঁচি-মার্কা সিগারেটের একটি সযত্ন-রক্ষিত কুপন! নটবর ভাবিল,—হায় রে!

কিন্তু ব্যর্থতার আপশোষ আর বেশী ক্ষণ থাকিল না। কোন পল্লীগ্রাম অঞ্চল হইতে আগত এক তীর্থযাত্রীর কাছে নটবর তাহার দু-শ টাকা দামের 'মাল'-টি বেচিয়া নগদ তের টাকা পাইয়া গেল।

লোকটি প্রথমে কিছুতেই লইবে না। দু-শ টাকা দামের যে-জিনিষ পঞ্চাশ টাকায় পাওয়া যায় তাহার নিষ্কলুষতা সম্বন্ধে সন্দেহ সবারই হয়। নটবর বলিয়াছিল যে সে এই ভীড়ের মধ্যেই সোনাটি কুড়াইয়া পাইয়াছে। ওজনে আধপোয়া ত হইবেই! বিক্রী করিলেই দু-তিন-শ টাকা আসিয়া যায়। কিন্তু—গভীর দুঃখের সহিতেই নটবর বলিল—কিন্তু তাহাদের গরিবদের বিপদ পদে পদে।

হুরীর দোকানে বিক্রয় করিতে গেলে সবাই ভাবিবে সে রি করিয়াছে।

লোকটি চশ্‌মা পরিষ্কার করিয়া সোনাটি এপিঠ-ওপিঠ াল করিয়া দেখিল। অনেক গবেষণার পর এই মীমাংসা রিল যে দু-শ টাকার সোনায় যদিই-বা এক-শ টাকার াদ থাকে, তবুও ত এক-শ টাকার সোনা নিশ্চয়ই াছে। সুতরাং অনেক দরকষাকষির পরে নটবরের তের াকা রোজগার হইয়া গেল।

ছেলেটি দুই দিন হইল ভাত খাইয়াছে। নটবর তাহাকে ঙ্গে লইয়া বাহির হইল। খোকার হাত ধরিয়া সে চলিল হরের অন্তরের দিকে—সহস্র লোকের কোলাহল-মুখরিত ংশে!

বড় রাস্তার ধারে একটি লোক হিন্দী, উর্দ্দু, ইংরেজী ও াংলা ভাষার অদ্ভুত মিশ্রণে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিতেছে বং কি-কি সব রকমারী যাদুবিদ্যা দেখাইতেছে আর াহাকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকাররূপে ঘিরিয়া রহিয়াছে অসংখ্য ৎসুক প্রাণী।

নটবর ভীড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ছেলের ানের কাছে চুপি-চুপি কি-যেন বলিয়া শেষে বলিল,—আর মি যদি তোকে এক-আধটু মারিও তবুও কিন্তু কিছু নে করিস না তুই। খালি খুব ক'রে কাঁদিস— বুঝলি?

জনতার মধ্যে যে-ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিতে নটবর ছেলের ৃষ্টি আকর্ষণ করিল সে এক জন সুশ্রী তরুণ। তাহার সাজ-গোজের মধ্যে বেশ একটা পারিপাট্য দেখা যায়। লোকটি মালে মুখ ঘষিতে ঘষিতে শ্যেন-দৃষ্টিতে বাজীকরকে লক্ষ্য করিতেছিল।

খোকা লঘুগতিতে ভীড়ের মধ্যে লোকটির ঠিক পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথাটি এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে সে-ও যেন বাজীকরকেই দেখিতে চায়। ভীরু-কম্পিত দৃষ্টিতে একবার পিছনে চাহিল। নটবর দূর হইতেই চোক টিপিয়া তাহাকে ভরসা দিল।

পাঞ্জাবীর তলেই ফতুয়া। ছেলেটি বাজীকরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই একবার অতি ধীরে তাহার হাত বাড়াইল। পরেই দারুণ শঙ্কা ও দ্বিধায় কচি হাতটি টানিয়া নিল একেবারে নিজের বুকের নিকটে। লোকটির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। না, সে তাহার আচরণ মোটেই লক্ষ্য করে নাই।

আস্তে আস্তে বাহিরে আসিল।

নটবর হাসিতে হাসিতে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল,—কই দেখি! কি নিলি?

খোকা লজ্জিত ভাবে বলিল,—কিছু নিই নি। আমার ভয় করছে বাবা!

নটবর ভয়ানক রাগিয়া উঠিল। মুখ বিকৃত করিয়া ছেলের স্বরের অনুকরণে বলিল,—ভয় করছে বাবা! কেন? আমি রয়েছি কি করতে?

পরেই আবার ছেলের কাঁধে স্নেহের সহিত মৃদু ঝাঁকুনি দিয়া এবং গলার স্বর যথাসাধ্য কোমল করিয়া বলিল,—যা বাবা! তোর কিচ্ছু ভয় নেই। আমিই ত আছি—এই এখানেই। জ্বর থেকে উঠ্‌লি, এখন ত আর তোর উপোস একবেলাও সইবে না।

খোকা আবার গিয়া দাঁড়াইল তাহার পূর্ব্বের সেই জায়গাটিতেই। তাহার সারা মুখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে। পা-দুটিকে সে কোন রকমেই সোজা করিয়া শাসনে আনিতে পারিতেছে না। অলক্ষ্যে থাকিয়া কে-যেন তাহার জিবুটিকে টানিয়া রহিয়াছে।

অবশেষে সে লোকটির জামার তলায় ধীরে তাহার হাত প্রবেশ করাইয়া অসীম ক্ষিপ্রতার সহিত ফতুয়ার পকেট হইতে নিঃশব্দে মনি-ব্যাগটি অপসারিত করিয়া লইল।

পাশ হইতে কে এক জন চেঁচাইয়া উঠিল,—আরে, রে! চুরি ক'রলে যে!

আর যায় কোথায়! ছেলেটিকে সকলে ঘিরিয়া ধরিল। কিল চড়ও সমানে চলিতে লাগিল। কয়েক জন গেল পুলিস ডাকিতে। কোথা হইতে একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া ছেলেটিকে দারুণভাবে মারিতে সুরু করিল উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া,—এই শা—আমারও সে-দিন পকেট মেরে-ছিল! সে-দিন ছেড়ে দিয়েছিলাম। আবার ব্যাটা এসেছিস্ এই কাজ করতে? না, না! পুলিসে দেবেন কেন? এ-সব ছেলেকে পুলিসে দিলে কিস্যু হবে না।

মারুন, মারুন সবাই মিলে। মেরে আমি ওকে ঠাণ্ডা করছি—দেখুন না। এই নিন্ত আপনার টাকা! হ্যা গুনে নিন্। আর করবি শা— এ-কাজ কখনও, অ্যাঁ?

লোকটি ছেলেটিকে মারিতে মারিতেই জনতার বাহিরে লইয়া আসিল।

ছেলেকে লইয়া যখন নটবর তাহার গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন খোকার গা ভরিয়া পরিষ্কার জ্বর দেখা দিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের নিষ্ঠুর সুস্পষ্ট চিহ্ন! বাঁ-গালের উপর যে দুইটি আঙ্গুল লাল হইয়া দেখা যাইতেছে, নটবর বুঝিতে পারে সে দুইটি তাহারই!

নটবর তক্তাপোষের উপরে ধীরে ছেলেটিকে শোয়াইয়া দিল। খোকা পিতার মুখের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। লাল চোখ দুইটি যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

খোকার মুখের কাছে মুখ লইয়া মৃদুস্বরে নটবর প্রশ্ন করিল,—খুব লেগেছে কি রে বাবা?

খোকা কোন কথা বলিল না। অসহায় দুই চোখ হইতে ঝর-ঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া মেঝেয় পড়িল।

নটবর নিজেই বলিতে লাগিল,—নইলে যে তোকে আজ ওরা জেলে নিয়ে যেত। এ-ছাড়া ত আর তোকে ফিরিয়ে আনবার অন্য উপায় ছিল না বাবা!

নটবর ছেলের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল।

সেদিন কোন রকমে কাটিয়া গেল। পরদিন সকাল হইতেই খোকার জ্ঞান নাই। কি করিবে, কি হইবে— নটবর কিছুই ভাবিতে পারে না।

চিকিৎসার প্রয়োজন। তা বলিয়া ডাক্তার ত আর বিনা-পয়সায় আসিয়া দেখিয়া যাইবে না।

ঘরের চারি দিকে চাহিয়া নটবর এমন কিছুই দেখিতে পাইল না যাহার পরিবর্ত্তে সে কাহারও নিকট হইতে অর্থ পাইতে পারে। অকস্মাৎ খোকার হাতের সোনার মাদুলীটির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কিছুমাত্র না ভাবিয়া নটবর ছেলের হাত হইতে মাদুলীটি খুলিয়া লইল। অচেতন ছেলের উদ্দেশেই বলিল,—তোকে বাচাবার জন্যই এই মাদুলী করেছিলাম। দেখি, আজ এই মাদুলী দিয়েই তোকে রক্ষা করতে পারি কি না।

নটবর বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিলেন। অসংখ্য উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়া ইহাও জানাইয়া দিলেন যে অবস্থা এতই আশঙ্কাজনক যে দুই বেলাই চিকিৎসক দেখানো প্রয়োজন। এই প্যাকাটির মত ছেলে,—খাঁ করিয়া মরিয়া যাইতে কত ক্ষণ? খাইতে দিতে হয়।

ফি লইয়া ডাক্তার বিদায় লইলেন।

নটবর দুইটা কমলালেবু আনিয়াছিল। রস করিয়া ছেলের মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল। তার পর বাহির হইল অর্থের সন্ধানে।

টাকার প্রয়োজন। যেমন করিয়াই হউক,—চুরি, ডাকাতি, ভিক্ষা,—যে করিয়াই হউক টাকা চাই-ই, চিকিৎসার দরকার। পথ্যের দরকার।

কিন্তু চুরি করিতে আর নটবরের সাহস হয় না। যদি ধরা পড়িয়া থানায় যাইতে হয়? তবে ত আর খোকাকে দেখিতে পাইবে না! বিনা-চিকিৎসায়, বিনা-পথ্যে তাহার জেল হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই হয়ত খোকা—। নটবর আর ভাবিতে পারিল না যে খোকার তাহা হইলে কি হইবে।

অলস-মন্থর গতিতে অনির্দ্দিষ্টভাবে চারি দিকে ঘুরিতে ঘুরিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মানসম্ভ্রমের কথা নটবর ভুলিয়া গেল। পুরানো এক দোস্তের নিকটে কয়েকটি টাকা ধার চাহিতেই পাইয়া গেল।

দুই হাত ভরিয়া নানা ফলমূল কিনিয়া ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তারের হাতে অগ্রিম ফি-এর টাকা দিয়া বলিল— এখনই একবার আবার যাইতে হইবে।

ডাক্তার বলিলেন,—তুমি এগোও, আমি এই এলুম ব'লে।

নটবরের বুকটা অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। উৎফুল্ল চিত্তে সে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিল। চারি দিকে উৎকট তমসা! নটবর আস্তে কপাটটি খুলিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রদীপটি এখানেই আছে—এই ত! প্রদীপটি জ্বালিয়া দিল। একরাশি আলো আসিয়া তাহার চোখের সম্মুখে কালো অন্ধকারের একটি পর্দ্দা উন্মোচন করিয়া দিল।

খোকার শীতল-শক্ত দেহ দুই সবল বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া নটবর চীৎকার করিয়া একবার কাঁদিতে চাহিল। কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে কোন স্বরই নির্গত হইল না।

নটবর পরমস্নেহে ছেলের সর্ব্বাঙ্গে একবার হাত বুলাইয়া দিল। কাঁথাটি তুলিয়া তাহা দিয়া বেশ করিয়া খোকাকে ঢাকিয়া দিল। পরে তাহার শুষ্ক-বেপথু ওষ্ঠদ্বয় দিয়া খোকার মলিন ও মৃত অধর একবার মৃদু স্পর্শ করিল।

বাহিরে আসিয়া নটবর আস্তে কপাটটি টানিয়া দিল। খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে নটবর কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল কে জানে!

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(১৩)

অরুণ পড়িবার একটি নূতন ঘর পাইয়াছে। ঘরটি দোতলায় পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে, অরুণের শয়ন-গৃহের পার্শে। শিবপ্রসাদ এ-ঘর চিঠি-পত্তর লিখিবার জন্য ব্যবহার করিতেন।

ঘরটি অরুণ নূতন করিয়া সাজাইল। দেওয়ালে শেক্সপীয়র, শেলী ও রবীন্দ্রনাথের ছবি টাঙাইল। পুরাতন ছবিগুলির মধ্যে ওয়াট্‌সের "আশা" চিত্রখানি রাখিল। অন্ধ আশা পৃথিবীর গোলকের উপর বসিয়া কোন্ মায়াময় রাগিণীতে কোন সোনার স্বপ্ন রচনা করিতেছে।

পূজার ছুটির আর বেশী দেরি নাই। শরতের প্রভাত। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পড়িবার ঘরে ইজিচেয়ারে বসিয়া অরুণ জানালা দিয়া বৃষ্টিধোয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। হট-হাউসের ভাঙা কাচগুলির ওপর সূর্য্যালোক ঝিকিমিকি করিতেছে, কদম্ববৃক্ষের ঘন সবুজ দীর্ঘপত্রগুলি বাতাসে কাঁপিতেছে, দূরে কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের উপর শুভ্র মেঘস্তূপ সমুদ্রগামী বলাকাশ্রেণীর মত।

এ সুন্দর প্রভাত অরুণের মন উদাস করিয়া তুলিতেছিল। তাহার অন্তরে স্তরে স্তরে কোন বিষাদের অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাহাকে শান্তি দেয় না।

বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিনের এক ঘটনায় অরুণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল।

হিন্দু হোষ্টেলে শিশির সেনের অন্ধকার ছোট ঘরে প্রায়ই তাহাদের আড্ডা বসিত। চা-পান ও সিগারেটের ধূম-কুণ্ডলীর মধ্যে সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, জীবনের উদ্দেশ্য, সভ্যতার ভবিষ্যৎ, প্রফেসারগণের পড়ান, 'সবুজপত্রে' 'ঘরে বাহিরে,' নানা বিষয়ে তর্ক, আলোচনা, বক্তৃতা হইত। অরুণ ও শিশির এই দুই জনই আলোচনা-সভার নিয়মিত সভ্য। বৃন্দাবন, দ্বিজেন বা অরবিন্দ আসিয়া আড্ডায় মাঝে মাঝে যোগ দিত। যখন কেবলমাত্র অরুণ থাকিত তখন শিশির দীর্ঘ বক্তৃতা জুড়িয়া দিত। নীরব শ্রোতা রূপে অরুণকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে। শিশির অরুণের অপেক্ষা অধিক বই পড়িয়াছে, তাহার স্মৃতিশক্তিও প্রখর, পঠিত পুস্তকগুলি হইতে নানা অদ্ভুত মতবাদ উদ্গারণ করিয়া সে নূতন বন্ধুকে তাক লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। বৃন্দাবন, অরবিন্দ, অথবা জয়ন্ত থাকিলেই মুস্কিল হইত। তাহারা তর্ক করিত, ব্যঙ্গ করিত, অরুণ স্বাধীন চিন্তার জয় ঘোষণা করিত। শিশির সহজেই রাগিয়া উঠে, পরিহাস বুঝিতে পারে না; ব্যঙ্গ করিতেও জানে না। তর্ক অনেক সময় ঝগড়া হইয়া দাঁড়াইত।

শিশিরকে লইয়া ক্লাসে অরুণের মুস্কিল হইত। ছেলেরা যখন জানিল শিশির সহজেই রাগিয়া ওঠে তখন তাহাকে

রাগাইবার, অপদস্থ করিবার নিত্যনূতন ফন্দী বাহির করিত। ঝগড়া হইলে অরুণকে মধ্যস্থ হইয়া মিটমাট করিয়া দিতে হইত।

জয়ন্তের সহিত অরুণের যোগ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। জয়ন্ত কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার সহজ ভাব, সরল বেশভূষা নাই। তাহার অত্যুগ্র কবিয়ানা অরুণের ভাল লাগিত না।

জয়ন্তের কয়েকটি কবিতা একটি খ্যাতনামা মাসিক পত্রিকায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া এক অখ্যাতনামা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জয়ন্ত যেমন ক্ষুব্ধ তেমনই গর্ব্বিত। সে বাস্তবের কবি, ভবিষ্যৎ যুগের অগ্রদূত, সেজন্য আজ সে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। অরুণ বলিয়াছিল, তোমার কবিতায় বাস্তব কোথায়? তুমি যত খুশী কবিতা লেখ, কিন্তু এখন ছাপিও না। অরুণের মত শুনিয়া জয়ন্ত শিশিরের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল শিশির সেনের সহিত মিশিয়াই অরুণের এরূপ ভাবান্তর হইয়াছে; অরুণের মত শিশিরের মতেরই প্রতিধ্বনি।

জয়ন্তের কবিতাগুলি অধিকাংশই নারী-প্রেমের কবিতা; তরুণ প্রেমিক-অন্তরের তপ্তবাষ্পভরা বুদ্বুদরাশি, তাহাতে আবেগের ফেনিলতা ও অলস কল্পনার প্রাধান্য আছে কিন্তু রসাত্মক সৌন্দর্য্য-রূপ নাই। মধ্যে মধ্যে নারীদেহের রূপবর্ণনা আছে। জয়ন্তের ধারণা, এই দৈহিক সৌন্দর্য্য বর্ণনাই বাস্তব, আধুনিক।

জয়ন্তের ইচ্ছা, অরুণ কবিতাগুলির প্রশংসা করিয়া তাহার কবি-যশ চারিদিকে প্রচার করে।

শিশিরের ঘরে অরুণ 'সবুজপত্র' হইতে 'ঘরে বাহিরে' পড়িতেছিল, কতকগুলি মাসিক পত্রিকা ও একটি মোটা খাতা হাতে করিয়া জয়ন্ত আসিল, যেন যোদ্ধার বেশ।

উচ্চস্বরে সে বলিল—অরুণ, আমার নতুন কবিতাগুলো পড়েছিস, সবাই খুব প্রশংসা করছে। দেখ্ ওই ফুলের চাষ, ভাবের রঙীন ফানুস-ওড়ান আর চলবে না; এটা বস্তুতন্ত্রের যুগ, সন্দীপ হচ্ছে এ যুগের হোতা। শিশির, তোমার কি মনে হয়?

শিশির গম্ভীর ভাবে বলিল—তোমার কবিতা আমি ভাল ক'রে পড়েছি। আমার মনে হয় ও বাস্তব বা নবযুগের কবিতা নয়। তুমি রোমান্টিক ডেকাডেণ্ট্। হৃদয়ের তাপ ও আক্ষেপের সঙ্গে নারীর দেহরূপ বর্ণনা করলেই বাস্তব হয় না।

—আমি ডেকাডেণ্ট্! হাসালে। আমার প্রতি কবিতা বাস্তব জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা হ'তে—

অরুণ মৃদুস্বরে বলিল—অভিজ্ঞতা নয়, বল কাল্পনিক অনুভূতি। আমি জানি, নারী ও প্রেম সম্বন্ধে তোমার কি অভিজ্ঞতা আছে।

জয়ন্ত রাগিয়া উঠিল। অরুণ তাহাকে পরিহাস করিতেছে! ব্যঙ্গস্বরে সে বলিল—না, তুমি ভাব শুধু, তোমারই আছে—অজয়ের বোনের সঙ্গে প্লেটোনিক প্রেম ক'রে, যদি ভাব—

অরুণের মূর্ত্তি দেখিয়া জয়ন্ত চুপ করিল। লজ্জায় অরুণের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে সে দাঁড়াইয়া উঠিল। সজোরে জয়ন্তের গণ্ডে করাঘাত করিতে ইচ্ছা হইল। আপনাকে দমন করিয়া অরুণ স্থির হইয়া বসিল, তিক্ত স্বরে বলিল—দেখ জয়ন্ত, তোমার ওই রাবিশ কবিতার আলোচনা কর্‌বার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই; তুমি তোমার স্তাবক-দলের নিকট যাও।

একটি সিগারেট ধরাইয়া অরুণ জোরে টানিতে লাগিল।

—রাবিশ কবিতা! ঐ শিশির সেন তোমার মাথা খেয়েছে। আচ্ছা!

কবিতার খাতা ও পত্রিকাগুলি বগলে পুরিয়া জয়ন্ত হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে জয়ন্ত অরুণের বাড়িতে আসিয়াছিল। ব্যথিত স্বরে তাহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছে, তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। দুই বন্ধুর আবার মিলন হইয়াছে।

শরৎ-প্রভাতের দিকে চাহিয়া অরুণ গত সন্ধ্যার ঘটনাটি ভাবিতেছিল। বন্ধুত্বের সূত্র অতি সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া রচিত, একবার কোথাও ছিঁড়িয়া গেলে, তাহাকে মোটা তালি দিয়া জোড়া যায় না।

জয়ন্তের সহিত হয়ত সে আর পূর্ব্বের মত সহজ সরল

ভাবে মিশিতে পারিবে না। হয়ত মিথ্যা বানাইয়া তাহার কবিতার প্রশংসাও করিবে। বন্ধুত্বের অভিনয় করিতে হইবে। জীবন বড় জটিলতাময়। এই চিন্তাগুলির ভারে তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল; কলেজ যাইতে ইচ্ছা করিল না।

প্রতিমা আসিল চঞ্চল পদে।

—দাদা, অ দাদা, বা বেশ ইজিচেয়ারে শুয়ে আছ—আজ কলেজ যেতে হবে না?

—না।

—আজ কিসের ছুটি?

—ছুটি নয়, আমি যাব না।

—বেশ আছ দাদা, কলেজে পড়ার ওই মজা, নয়? যেদিন খুশী গেলুম, যেদিন খুশী গেলুম না। ও, তোমার মুখ কি ফ্যাকাসে, অসুখ করেনি ত?

—না, বেশ ভাল আছি। হাঁ রে টুলি, তোর স্কুল নেই?

—বা, আজ শনিবার যে, তোমার কিছু মনে থাকে না, কি হয়েছে আজ?

—তোর খাওয়া হয়েছে?

—এখনও ঠাকুমার বড়ার অম্বল হয় নি, খাব কি!

—শোন্, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, চল কোথাও বেড়িয়ে আসি।

—বেশ সুন্দর দিন।

—মোটরকার এসেছে?

—ওই ত হর্ণ শোনা যাচ্ছে।

—হীরা সিংকে বল, গাড়ী যেন বাইরে রাখে।

—কোথায় বেড়াতে যাবে?

—ও, আজ একটা লম্বা ড্রাইভ।

কিছুক্ষণ পরে প্রতিমা হিল্-তোলা জুতার খট-খট শব্দ করিতে করিতে আসিল; পরনে সবুজ-পাড়-ওয়ালা ধপ-ধপে সাদা শাড়ী।

—চল দাদা।

—এ কি, একটা রঙীন শাড়ী পর।

—না দাদা, এই বেশ, চল শীগ্‌গীর।

সাদা শাড়ী পরার এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য আছে, শরতের শুভ্র আলোকে হিল্লোলিত কাশগুচ্ছের অনুপম লাবণ্যের মত।

অরুণ বসিল সম্মুখে ষ্টিয়ারিং-হুইলে, তাহার পার্শ্বে প্রতিমা। হীরা সিং বসিল পিছনে, গাড়ীর ভিতর।

গলি পার হইয়া তাহারা বড় রাস্তায় পৌঁছিল।

প্রতিমা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—দাদা, চল উমা-দিকে নিয়ে যাই।

অরুণ গম্ভীর ভাবে বলিল—না।

—বা, না, কেন, আজকাল উমা-দির নাম করলে তুমি এত গম্ভীর হয়ে যাও কেন?

—বেশী বাজে বকিস্ না।

—দাদা, আস্তে চালাও, আর একটু হ'লে এই গরুর গাড়ীতে ধাক্কা লাগত।

—তুই যা বক্ বক্ করছিস্।

—ওই, ওই তোমার বন্ধু যাচ্ছেন।

সম্মুখের ফুটপাথে অজয় যাইতেছিল, হাতে একখানি নোটবুক।

অরুণ গাড়ী থামাইয়া ডাকিল—অজয়, অজয়!

—হ্যালো, কোথায় চলেছিস্? কলেজ?

—না, একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।

—মার্কেটিং?

—না। তুই আয় আমাদের সঙ্গে।

—আমি? আমার কেমিষ্ট্রির ক্লাস।

প্রতিমা হাসিয়া বলিল—রোজ যদি কলেজে যেতে হয় তবে আর কলেজে পড়ার মজা কি?

—টুলি ভাবে আমাদের কলেজ-জীবন খুব মজার।

—মজাই বা কি।

—আয়, শীগ্‌গীর, ওদিকের দরজা খুলে উঠে আয়।

—আসুন চলে। ওই ট্রামটা সামনে আসছে।

প্রতিমার কালো চোখের চাউনিতে কোন্ সুদূরের ইসারা। প্রতিমার কথা-বলার ভঙ্গীতে কোন্ সুর-সমুদ্রের আহ্বান। প্রতি-কথার শেষে প্রতিমা একটি ছোট টান দেয়, সুরের রেশের মত, কথা শেষ হইয়া যায় কিন্তু তাহার ঝঙ্কার বহু ক্ষণ কানে বাজে।

অজয় দ্বিধা করিল না, প্রতিমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। অরুণ বেগে গাড়ী ছোটাইল।

অজয় জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ দিকে যাবে?

অরুণ হাসিয়া কবিতার সুরে বলিল—কিছু ঠিক নাই, চলিয়াছি ভাই অজানার সন্ধানে।

—চল যশোর-রোড্ দিয়ে।

কলিকাতা, শহরতলী পার হইয়া গ্রাম্য পথে পড়িতে মোটরগাড়ী যেন নাচিতে লাগিল। গরুর গাড়ীর চাকায় বিক্ষত পথ, কোথাও বর্ষার জলে ভাঙিয়া গিয়াছে, কোথাও গর্ত্ত। অরুণ গাড়ীর বেগ কমাইল।

পথের দুই ধারে অপূর্ব্ব শারদশ্রী। শস্যপূর্ণ দিগন্ত-প্রসারিত ক্ষেত্র বাতাসে হিল্লোলিত, আলোকে ঝলমল। মাঝে মাঝে কদলী নারিকেল নানা তরু-ছায়া-প্রচ্ছন্ন ছোট ছোট গ্রাম।

প্রতিমা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—দাদা, কি সুন্দর!

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অজয়ের অনুভূতি সূক্ষ্ম নয়। মাঠ দেখিলেই তাহার মনে হয়, ইহাতে কয়টা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার মাঠ হইতে পারে। কিন্তু আজ তাহার চোখে কে সৌন্দর্য্যের অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে।

কোন্ পথ দিয়া কোন্ দিকে কত দূর যে তাহারা চলিল, তাহার আর হিসাব রহিল না। শরৎ-মধ্যাহ্নের সোনালী আলোক ফেনিল মদের মত তাহাদের অন্তর-পেয়ালা ভরিয়া তুলিয়াছে। উন্মুক্ত আকাশের তলে শস্য-শ্যামল সুবিস্তৃত মাঠগুলি, ছায়াচ্ছন্ন স্বপ্নময় গ্রামগুলি মোটরগাড়ীর দুই ধারে সুন্দর ছবির অফুরন্ত ঝর্ণাধারার মত বেগে বহিয়া গেল।

অপরাহ্নে তাহারা এক বড় গ্রামের নিকট আসিয়া পৌঁছাইল। সম্মুখে বড় দীঘি।

—দাদা, এখানে মোটর থামাও, চল ওই গ্রামে যাওয়া যাক্।

—আরে অরুণ, গাড়ী থামা ত। বাণেশ্বরের মত কে ব'সে রয়েছে ওই দীঘির ধারে।

—বাণেশ্বর! এখানে? সে ত সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছে।

গ্রামে যাইবার মেঠো পথে গাড়ী চালান শক্ত।

হীরা সিংহের জিম্মায় গাড়ী রাখিয়া সকলে গাড়ী হইতে নামিল।

অজয় দীঘির দিকে অগ্রসর হইল। কেয়া-বনের পাশে কে এক জন দীঘিতে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। তাহার পাশে এক ছোট বালিকা মাছের টোপ তৈরি করিতেছে।

অজয় চীৎকার করিয়া উঠিল—আরে বাণেশ্বর! বাবা, এই তোমার সন্ন্যাসিগিরি হচ্ছে!

বাণেশ্বর ছিপ তুলিয়া অবাক হইয়া দেখিল—তাহার সম্মুখে অজয়, অরুণ ও তাহার বোন প্রতিমা।

—এ কি তোমরা? তোমরা এখানে!

—কলেজে আসার নাম নেই, গাঁয়ে ব'সে মাছ ধরা!

—মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।

—যা বলেছিস্ ভাই। গাঁয়ে খাবার সুখ আছে। এই গাঁয়ে আমার মাসীর বাড়ি।

—চল, গাঁয়ের ভেতর; বড় জলতেষ্টা পেয়েছে।

—কচি ডাব কেটে দেব, যেন অমৃত।

—খিদেও পেয়েছে মন্দ নয়।

—চল, মাসীমার ভাণ্ডারে অনেক রকম খাবার মজুত আছে।

—ভাই, মুড়ি আর নারকেল খাব, বেশ গেঁয়ো খাবার সব খাওয়ান চাই।

হৈ-চৈ করিয়া সকলে গ্রামে ঢুকিল। ঘুমন্ত গ্রাম সচকিত হইয়া উঠিল।

বাণেশ্বরের মাসীমার ভাণ্ডার হইতে মুড়ি, মোয়া, পাটালি গুড়, রসকরা নানা খাদ্য বাহির হইল। কিন্তু ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, লুচি ভাজিতে বসিলেন।

গ্রাম দেখিতে প্রতিমার বড় মজা লাগিল। আঁকা-বাঁকা সরু পথ, প্রাচীন বটগাছ, চণ্ডীমণ্ডপ, পানা-ভরা পুকুর, পুকুরের ছোট ছোট ঘাট, খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল, গোবর-লেপা পরিষ্কার আঙিনা, ধানের গোলা, পানের বরজ, কড়াইশুটির ক্ষেত—এ যেন আর এক দেশ, স্বপ্নের রাজ্য।

যাইবার সময় বাণেশ্বরের মাসীমা পুকুরের মাছ, ক্ষেতের শাকসব্জী ও হাড়ি-গুড় সঙ্গে দিলেন। অরুণরা তাঁহাকে জানাইয়া আসে নাই, বলিয়া বার-বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর তাহারা কখনও এ গ্রামে আসিবে?

অরুণ বলিল—চল্ বাণেশ্বর আমাদের সঙ্গে, কি পাগলামি করছিস্, কলেজে ভর্তি হয়ে আসার নাম নেই।

বাণেশ্বর হাসিয়া বলিল—নিশ্চিন্ত হও। আসছে সোমবার থেকে যাচ্ছি। পরশু মা এসেছেন এখানে। বড় কান্নাকাটি করছেন। পিতার আদেশ অমান্য করা যায়, কিন্তু মাতার অশ্রুজল, বুঝতে পারছিস ত বাঙালী ছেলের পক্ষে—

হীরা সিংকে ফিরিবার পথের নির্দেশ দিয়া বাণেশ্বর বিদায় লইল।

সে রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে প্রতিমা পথধূলিপূর্ণ চুলগুলি বহু ক্ষণ ধরিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া আঁচড়াইল। হাস্য-কৌতুকপূর্ণ আনন্দাবেগময় আজিকার দিনটি তাহার হৃদয়ের কোন্ রুদ্ধ গোপন দ্বারে আঘাত করিয়াছে। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল, সে বেশ সুন্দরী।

ধীরে সে অরুণের পড়িবার ঘরে গেল।

—দাদা, কি পড়ছ, ছাই, চল, ছাদে একটু বেড়াইগে।

—যা, এখনও ঘুমোস্ নি। সারাদিন টো-টো ক'রে ক্লান্তি নেই।

—ঘুম যে আস্‌ছে না।

—আচ্ছা, চল্ ছাদে।

—তোমার বেহালাটা নাও।

—গান গাইবি?

—না বাপু, এখন গাইতে পারব না। তুমি বাজাবে, আমি শুনব।

—কি আবদার!

শরৎ-নিশীথের নিস্তব্ধ স্বপ্নময় শুভ্রতায়, নক্ষত্রলোকের অসীমতায়, কোন কণ্ঠ-সঙ্গীত নয়; এ অনির্ব্বচনীয় রাত্রে বেহালার সুদূর-প্রসারী সুর-তরঙ্গে ব্যাকুল অন্তরকে অজানা রহস্যময় পথে ভাসাইয়া দেওয়া।

(১৪)

কিশোরীর চিত্তকে রূপকথার রাজকন্যার ঘুমন্ত রাজপুরীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এ যেন অপরূপ রাজপ্রাসাদ; তাহার কক্ষে কক্ষে কত মণি-মাণিক্য, বিবিধ বর্ণের রত্ন, কত বিচিত্র চিত্র, কারু-মূর্ত্তি; কত অপূর্ব্ব পশুপক্ষী, সুসজ্জিত সভাসদ, সালঙ্কৃত দাসদাসী, সুকণ্ঠ গায়কবৃন্দ; তাহার দ্বারে দ্বারে বর্ম্মপরিহিত সৈনিকগণ মুক্ত তরবারি হস্তে। কিন্তু সকলেই সুষুপ্ত। প্রাসাদের গর্ভগৃহে মণিময় মন্দিরে হেমপ্রদীপ অন্ধকারে রহিয়াছে। রাজপুত্র আসিয়া যখন সেই প্রেমের প্রদীপ জ্বালাইবে, জাগিয়া উঠিবে রাজকন্যা, জাগিয়া উঠিবে রাজপুরী, চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল, জীবনকল্লোলধ্বনি জাগিবে।

তরুণ যুবকের অন্তর-লোক এই অপরূপ রাজপ্রাসাদ নয়। এ যেন পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক যুগের শ্যামল ছায়াঘন অরণ্য। এখনও চারিদিকে জল ও স্থলের বিভাগ স্থির হয় নাই। ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতে কোথাও পর্ব্বত ভাঙিয়া সমুদ্রের সৃষ্টি হয়, কোথাও সমুদ্রতল হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। অন্তর্নিহিত তপ্ত বাষ্পের আলোড়নে কত অচিন্তনীয় তাণ্ডব-নৃত্য! চারিদিকে অবাস্তব ছায়া, অলীক মায়া। অদ্ভুত বৃহদাকার জন্তুগুলি উদাসীন ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা কে পক্ষী হইবে, কে স্থলচর অথবা সামুদ্রিক হইবে তাহা নির্দ্ধারিত হইতেছে না। অসম্ভব আশার মত বৃহৎ পক্ষ বিস্তার করিয়া সকল জন্তুই আকাশে উড়িতে চায়।

এই ছায়াঘন পথহীন অরণ্যে যদি একটি মন্দিরে একটি প্রেমের প্রদীপ জ্বলিত, তাহা হইলে হয়ত মঙ্গল হইত। কিন্তু এখানে নানা শক্তির সংগ্রাম, নানা হৃদয়াবেগের সংঘাত, নানা ভাবুকতার অসম্ভব জটিল জালরচনা।

তরুণ যুবক ত কেবলমাত্র প্রেমিক নয়, সে যে বীর যোদ্ধা। সে বাহির হইয়াছে সত্যের সন্ধানে, সে করিতেছে শক্তির সাধনা, স্বাধীনতার জয়পতাকার সে রক্ষক। পুরাতন পৃথিবী ভাঙিয়া সে গড়িবে নূতন পৃথিবী, নব সভ্যতা। কেবলমাত্র প্রেম নয়, আরও জ্ঞান, আরও শক্তি, আরও যশ, আরও মানবকল্যাণ চাই, তবেই ত তাহার নারী-প্রেম সার্থক হইবে।

(১৫)

পূজার ছুটি আরম্ভ হইতেই অরুণ ছুটিতে পড়িবার

পুস্তকগুলির দীর্ঘ তালিকা করিল। প্রায় পঁচিশখানি বই। অধিকাংশই ইতিহাসের বই। উপন্যাসের মধ্যে লইল, টলষ্টয়ের 'রিসারেকশন্'। একটি রুটিন করিয়া ফেলিল। আর হেলাফেলা নয়।

বস্তুতঃ তাহার অশান্ত হৃদয়াবেগকে দমন করিবার জন্যই এই জ্ঞানের সাধনা।

ছুটিতে সে একা, বন্ধুহীন। শিশির চট্টগ্রামে চলিয়া গিয়াছে। জয়ন্তের সহিত আর সহজ সৌহার্দ্দ্য নাই; অধিক ক্ষণ তাহার সহিত কথা কহিলে সে যেন হাঁপাইয়া উঠে। বাণেশ্বর তাহার মাসীর বাড়ি, মৎস্যভক্ষণের লোভে। অজয়কে বাড়িতে বড় দেখা যায় না, তাহার নূতন কয়েক জন বন্ধু হইয়াছে, তাহাদের সহিত সমস্ত দিন খেলা ও খেলার গল্প।

অরুণ এই নিঃসঙ্গ জীবনই চাহিতেছিল। তাহার মন অত্যন্ত বেদনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে।

ভাল না লাগিলেও প্রতিদিন অজয়দের বাড়ি একবার যাইতে হয়। হেমবাবুর মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে; বাড়ির সকলে কেমন গম্ভীর, বিষণ্ণ। চন্দ্রাও যেন হাসিতে লাফাইতে ভুলিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ির আবহাওয়ায় চাপা গুমোট ভাব। কবে যে হেমবাবু সারিয়া উঠিবেন, তিনি সারিবেন কিনা, কিছুই বোঝা যায় না। ডাক্তারদের আশ্বাসবাণী আর কেহ বিশ্বাস করে না। তাহার উপর অর্থাভাব।

অজয়দের বাড়িতে ঢুকিলেই অরুণ যেন শুনিতে পায়, ঘরের কোণে কোণে কাহারা যেন কাণাকাণি করিতেছে,—টাকা নাই। ছাদের ফুলের টবে শুষ্ক গাছগুলি দোলাইয়া মলিন পর্দ্দা কাঁপাইয়া বাতাস বহিয়া যায়—টাকা নাই। মামীমার স্থির পাণ্ডুর মুখে, উমার দীর্ঘ কৃষ্ণ নয়নপল্লব-ছায়ায় উদাস ক্লান্ত সুর বাজে—টাকা নাই। কেহ মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না। নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করে না। গত মূর্চ্ছার পর হেমবাবুর জন্য একটি নার্স রাখা হইয়াছিল, তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, উমা স্কুলে আর যায় না, পিতার শুশ্রূষার ভার লইয়াছে। একটি চাকর কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যায় বাড়িতে প্রবেশ করিলে অরুণ চমকিয়া ওঠে, নীচের ঘরগুলি অন্ধকার, উপরের ঘরগুলির আলোক ম্লান, যেন একটা চাপা আর্ত্তনাদ গুমরিয়া উঠে—টাকা নাই।

অরুণের ইচ্ছা করে, তাহার স্কলারশিপের টাকা মামীমার হাতে দেয়। কিন্তু সত্যই অর্থাভাব কি না, সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

অত্যধিক পাঠ ও নিঃসঙ্গ জীবনে বিষণ্ণতার ভারে অরুণের মন হয়ত অসুস্থ হইয়া উঠিত, প্রতিদিন নিয়মিত টেনিস খেলিয়া সে বাঁচিয়া গেল। বহু ক্ষণ টেনিস খেলিয়া ঘর্ম্মাক্ত শ্রান্ত হইয়া যখন সে বাড়ি ফিরিত, মনের মধ্যে শান্তি অনুভব করিত।

সন্ধ্যায় প্রায়ই ছাদে বেহালা লইয়া বসিত। স্কলারশিপের টাকা জমাইয়া বেহালাটি কিনিয়াছিল; সঙ্গীত-চর্চ্চার জন্য নয়, অলস ক্ষণে সুর লইয়া আপন মনে খেলা করা। শিবপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, এক জন ভাল ফরাসী বেহালা-বাদক শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিতে চান। অরুণ রাজী হয় নাই। নিজের সাধনায় নিজের খুশীমত সে বেহালা শিখিবে।

ছুটির মাঝামাঝি অরুণ অত্যন্ত মানসিক শ্রান্তি অনুভব করিল। বৃথা এ গ্রন্থ পাঠ। সব পড়া-শোনা সে ছাড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে কবিতার বই লইয়া পড়িত। ইজিচেয়ারে শুইয়া শরতের আলো-ছায়ার দিকে চাহিয়া অবকাশপূর্ণ দিনগুলি নীলাকাশ-সমুদ্রের আলো-অন্ধকারে মাঝি-হীন তরীর মত আনমনা ভাসাইয়া দিত। তাহার চারি দিকে প্রকৃতি ও মানব-জীবন যেন কোন্ গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন।

এই সময় এক দিন অরুণের এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হইল, তাহার জীবন ওলট-পালট হইয়া গেল।

সমস্ত দিবস প্রখর সূর্য্যতাপের পর অপরাহ্নে আকাশ অন্ধকার হইয়া আসিল। ঝড় উঠিল। রুদ্রের তৃতীয় নেত্রের ধক্-ধক্ কম্পনের মত দিকে দিকে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামিল। উন্মুক্ত বাতাস।

ঝড়ের শোভা দেখিতে অরুণ ছাদের ছোট ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। বৃষ্টি বেশী ক্ষণ হইল না। পূর্ব্বাকাশে কতকগুলি কালো মেঘ জমিয়া রহিল। পশ্চিমাকাশের জলধৌত

নীলিমায় সূর্য্যালোক নির্ম্মল, উজ্জ্বল। মায়াময় আলো। বারিস্নাত বৃক্ষগুলির পাতায় পাতায় উচ্চ নীচ লাল হলদে সাদা বাড়িগুলির দেওয়ালে ছাদের শ্রেণীতে স্তরে স্তরে যেন সৌন্দর্য্যের আগুন লাগিয়া গেল। চারি দিক ঝলমল, ঝিকিমিকি করিতেছে। পূর্ব্ব-উত্তর কোণে স্নিগ্ধ সজল মেঘস্তূপের পার্শ্বে পুষ্করিণীর তাল নারিকেল শ্রেণীর মাথায় রামধেনু উঠিল, অর্দ্ধেক আকাশ জুড়িয়া।

প্রাত্যহিক পৃথিবীর উপর হইতে বিষাদের কালো যবনিকা উঠিয়া গিয়া, অরুণের চক্ষুর সম্মুখে বিশ্বসংসারের কোন্ জ্যোতির্ম্ময় আনন্দরূপ প্রকাশিত হইল। সে বিমুগ্ধ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এ কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-দীপ্তি, আনন্দ-জ্যোতিঃ চারিদিকে বিচ্ছুরিত।

রাত্রির নিকষকৃষ্ণ পেয়ালা শত খণ্ডে ভাঙিয়া যেমন প্রভাত-সূর্য্যের রক্তিম আলোক-ধারা মত্ত বেগে চারি দিকে উপছাইয়া পড়ে তেমনই অরুণের অন্তরে এত দিন যে বিষাদ ও বেদনা স্তরে স্তরে জমিয়াছে, সেই অন্ধকার অন্তর-গুহা বিদীর্ণ করিয়া আনন্দ-প্লাবন প্রবাহিত হইল।

এ অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার অর্থ বুঝিবার মত পরিণত বুদ্ধি অরুণের ছিল না। সে শুধু অনুভব করিল, ক্ষান্তবর্ষণ আকাশ-নীলিমার নির্নিমেষতায়, জলসিক্ত তরুপুঞ্জের শ্যামলিমায় এ কি অপরূপ আলো, এ কি জ্যোতির্ম্ময় সৌন্দর্য্য!

সে আর ছাদে থাকিতে পারিল না, পথে বাহির হইল। প্রাসাদশ্রেণী, জনস্রোত, ট্রামের যাত্রী, মোটর-গাড়ীর প্রবাহ, সকল বস্তু রূপ শব্দ সে নূতন আনন্দে অনুভব করিল। চারি দিকে এ কি অপরূপ আলো।

উন্মত্তের মত সে রাস্তা দিয়া চলিল। পথের কোন নির্দ্দেশ রহিল না। এ কি সৌন্দর্য্য! তাহার ইচ্ছা হইল, পথের ঐ মুটেকে সে আলিঙ্গন করে, ঐ ভিখারীকে সে সর্ব্বস্ব দান করিয়া দেয়; ঐ মেয়েটির কি সুন্দর মুখশ্রী।

অরুণ নূতন নূতন অপরিচিত রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিল। ধীরে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পথে গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিল। চলিতে চলিতে অরুণ কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে বালীগঞ্জের এক বৃহৎ মাঠের সম্মুখে আসিয়া পৌছাইল।

সুবিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর, জনহীন, উদাস, প্রদোষান্ধকার-ময়। মধ্যে একটি প্রাচীন বৃক্ষ। অরুণ বৃক্ষটির নীচে ভিজা ঘাসের উপর বসিল। আনন্দময় সৌন্দর্য্যানুভূতির তীব্রতা আর নাই, চারি দিকে স্নিগ্ধ মাধুর্য্য।

মাঠ-ভরা তরল অন্ধকার। দেবদারু-ছায়াচ্ছন্ন রক্তিম পথের ওধারে ধনীদিগের প্রাসাদ ও উদ্যান স্তব্ধ। দূরে তরুশ্রেণীতে ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ। পূর্ব্বদিকচক্রবালে নারিকেল বৃক্ষগুলির অন্তরালে কয়েকটি বাড়ি হইতে আলো জ্বলিয়া উঠিল।

শূন্য অন্ধকার মাঠে অরুণ নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সে বড় একা, বড় অসহায়। তারার আলোকে এক পথহারা শিশু যেন অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া মাতৃহস্তের স্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আকাশ তারায় তারায় ছাইয়া গেল। অরুণ অনুভব করিল অসীম ব্যোম ভরিয়া অগণিত নক্ষত্রে যে প্রাণশিখা জ্বলিতেছে তাহারও জীবনে সেই প্রাণ স্পন্দিত। মাটির তৃণ হইতে আকাশের তারা এক গভীর আনন্দময় প্রাণসূত্রে বদ্ধ। সে আর একা নয়। বিশ্বজগতের যিনি দেবতা, তিনি তাহার সঙ্গী, তাহার বন্ধু হইলেন। সমস্ত চৈতন্য দিয়া সে কোন্ অতল স্পর্শ প্রাণ-সমুদ্রের শান্ত গভীরতায় নিমগ্ন হইয়া গেল।

ছুটির পর কলেজ খুলিল। শরৎ-সন্ধ্যায় কনক মহিমা ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সৌন্দর্য্যস্মৃতির আভায় চারি দিক রঙীন। দিনগুলি যেন কোন আনন্দ-পদ্মের এক-একটি পাপড়ি। জয়ন্ত, শিশির, বাণেশ্বর, অরবিন্দ, সকলেই তাহার ভাল লাগে। সকলের সহিত সে হৈ-চৈ করিয়া গল্প করে, উচ্ছ্বসিত হাস্য করে; সকলে মিলিয়া একটি ক্লাব করিবে, এক সাহিত্যিক পত্রিকা বাহির করিবে, নানা জল্পনা করে।

(১৬)

অরুণ বাড়িটির নাম দিয়াছিল, "সোনার স্বপ্ন"। পরবর্ত্তী জীবনে এই বাড়ির কথা যখন সে বন্ধুদের বলিয়াছে, তাহারা হাসিয়া উঠিয়াছে, "সোনার স্বপ্ন নয়, ওটা তোমার দিবাস্বপ্ন।"

অরুণের অনেক সময় সন্দেহ হইয়াছে, হয়ত সে সত্যই স্বপ্ন দেখিয়াছিল। শীত-অপরাহ্ণের সোনালী আলোয় তাহার মগ্নচৈতন্য কোন মায়াজাল বুনিয়াছে, হয়ত এ-বাড়িটি তাহার নিঃসঙ্গ মনের মরীচিকা।

সমস্ত কলেজ-জীবনে এই বাড়ি সে কতবার খুঁজিয়াছে, আর কখনও দেখিতে পায় নাই। যেন আলাদীনের প্রদীপ-দৈত্য কোন রূপকথা-পুরী হইতে এক দিনের জন্ম এই অপূর্ব্ব বাড়ি তুলিয়া আনিয়া বালীগঞ্জের নির্জ্জন শ্যামল উদ্যানপথে স্থাপিত করিয়াছিল, তার পর রাতারাতি কোথায় তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

ঘটনাটি এইরূপ—

মাঘ মাস। শীত শেষ হয় নাই। সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে বসন্তের বাতাস বয়।

ছুটির দিনে অপরাহ্ণে অরুণ প্রায়ই কলিকাতার পথে বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়ে। কোন সহপাঠী বন্ধু সঙ্গে থাকে না। এখন সে একা নয়, সৌন্দর্য্যময়ী কল্পনা তাহার সঙ্গিনী।

ঘুরিতে ঘুরিতে অরুণ বালীগঞ্জের দক্ষিণপ্রান্তে আসিয়া পড়িল। সর্পিল জনহীন পথ, তরুচ্ছায়াবৃত; মাঝে মাঝে বস্তি; কোথাও পানাপুকুর, বাঁশঝাড়; ধনীদিগের প্রমোদ-উদ্যান। শীত-অপরাহ্ণের আলো অতিসূক্ষ্ম মসলিনের অবগুণ্ঠনের মত জল স্থল আকাশ আবৃত করিয়াছে,— অজানা, অস্পষ্ট, রহস্যময়।

অরুণ এক খোলা মাঠের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছাইল। অদূরে এক দোতলা বাগান-বাড়ি, উঁচু দেওয়ালে ঘেরা। পুরাতন হলদে দেওয়াল কাঁচা সোনার মত আলোয় ঝকমক করিতেছে। সোনার দেওয়াল ভরিয়া মাধবীলতা, অপরাজিতা-লতা পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

ছোট একটি কাঠের দরজা, সবুজ রঙের, বন্ধ। দীর্ঘ প্রশস্ত দেওয়ালে এই ছোট দরজা দেখিলে মনে হয়, যেন কোন গুপ্তদ্বার।

মন্ত্রচালিতের মত অরুণ দরজায় আঘাত করিল, দরজা খুলিয়া গেল; মরচে-পড়া কব্জার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল।

সম্মুখে মরকতশ্যাম তৃণাস্তরণ; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রক্তিম *পথ সোনার পুরীর অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে;* পথের দুই পার্শ্বে মনোহর ক্রীড়াশৈল, পুষ্পিত লতাবিতান, স্তব্ধ নিকুঞ্জ। শ্যামল তৃণভূমিতে নানা অপরূপ বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত, ক্রিস্তান্‌থেমাম্, মার্সেল নীল, ম্যামারেন্‌থাস্, কত অজানা বিদেশী ফুল।

দুইটি বালিকা ছুটিয়া আসিল হাস্যচঞ্চল চরণভঙ্গীতে, গ্রীষ্মের গুমোট সন্ধ্যায় অকস্মাৎ দক্ষিণ-বাতাসের মত। যেন মাটি হইতে দুটি ফুল ফুটিয়া উঠিল অরুণকে অভ্যর্থনা করিতে। তাহাদের বয়স সাত কি দশ হইবে। অরুণের মনে নাই, তাহারা শাড়ী পরিয়াছিল, না ফ্রক পরিয়াছিল। তাহার শুধু মনে পড়ে, এক জনের বসন ছিল চাঁপাফুলের রঙের, আর এক জনের ছিল রক্তকরবীর মত।

কেশে গোঁজা প্যান্সি ফুল দুলাইয়া একটি বালিকা বলিল—কাকে চাও তুমি?

অরুণ নীরব, বিমুগ্ধ হইয়া রহিল।

অপর বালিকাটি হাতের স্কিপিং-দড়ি ঘুরাইয়া বলিল— ও বুঝেছি, তুমি দাদাকে চাও।

অরুণ হাসিয়া বলিল—আমি কাউকে চাই না, আমি এসেছি তোমাদের বাগানে বেড়াতে।

—চিনেছি, তুমি ত দাদার বন্ধু, এস, এস।

—দাদা ত বাড়ি নেই।

—বা, তাতে কি, আমরা আছি। এস, এস।

মেয়ে দুইটির কচিগলার স্বর মধুর সুরে ভরা। দুইটি বয়্‌জয়ি কুকুর তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল,— লম্বা, ছিপ্‌ছিপে শাণিত বর্শার ফলকের মত।

বালিকারা অরুণকে বাড়ির ভিতর লইয়া চলিল। পিছনে চলিল দুইটি কুকুর।

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম; রঙীন মার্ব্বেলের মেঝের উপর চিত্রিত পারস্য কার্পেট পাতা; নানা অদ্ভুত আসবাবপত্র; দেওয়ালে নানা বিচিত্র ছবি, দীপ্ত রঙের বড় বড় ছোপ; বহু বর্ণের পর্দা; স্তিমিত আলোকে চারিদিক আব্‌ছায়াময়।

কোণের চামড়া-মোড়া সোফায় এক প্রৌঢ়া মহিলা মরক্কো-চামড়া বাঁধান এক বৃহৎ গ্রন্থ নীরবে পাঠ করিতেছেন। মাতৃস্নেহমণ্ডিত মুখে কি শান্ত ভাব!

—মা দেখ, দাদার এক বন্ধুকে ধ'রে এনেছি।

—কিছুতেই আসতে চায় না।

—বা, বেশ, ব'স তুমি। তোরা ওর সঙ্গে খেলা কর।

—কি খেলা জান তুমি?

—আমি কোন খেলা জানি না। আমি শুধু বই পড়তে জানি; শুধু বই পড়ি।

—আমরা বই পড়ি না; মা পড়েন, আমরা গল্প শুনি।

—আমাদের অনেক ছবির বই আছে, দেখবে?

বালিকারা অরুণের সম্মুখে তাহাদের ছবির বই, তাহাদের নানা খেলনা, তাহাদের নানা জন্মদিনের উপহার-দ্রব্য সকল স্তূপীকৃত করিল।

অরুণ তাহাদের সহিত কত অদ্ভুত সুন্দর ছবির বই দেখিল, কত নাম-না-জানা খেলা খেলিল। খেলার নামগুলি তাহার মনে পড়ে না। তবে বালকবালিকা-সমাজ-প্রচলিত লুডো, ক্যারম, বাঘ-বন্দী ইত্যাদি সাধারণ খেলা নয়। খেলার শেষে খাবার আসিল। অতি তৃপ্তিকর পানীয়। খাবারগুলিও বৈদেশিক। নানা রঙের কেক, চকোলেট, আরও নানা অজানা খাবার। অরুণ কোন খাবারের নাম বলিতে পারে না, মেয়ে দুইটি হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে।

চাঁপাফুলের রঙের কাপড়-পরা মেয়েটি বলিল—তোমার নাম কি বল?

সচিত্র "কিং আর্থার" উপাখ্যান-গ্রন্থ হাতে করিয়া অরুণ বলিল—আমার নাম স্যার ল্যান্সলট।

রক্তকরবী ফুলের রঙের বেশ-পরা মেয়েটি বলিল—না, তোমার নাম ল্যান্সলট নয়; আমি জানি তোমার নাম, তুমি হচ্ছ অজিত সিং, তুমি বেরিয়েছ দৈত্য বধ করতে।

কোন উপকথায় সে পড়িয়াছিল, ভীষণ দৈত্য বধ করিয়া অজিত সিং এক দেশকে কিরূপে রক্ষা করে।

অরুণ গম্ভীর হইয়া বলিল—তুমি ঠিক বলেছ।

—দৈত্য বধ করতে তুমি পারবে? সে বড় ভয়ঙ্কর দৈত্য।

—নিশ্চয় পারব।

—চল তবে; আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে পাঁচিলের ওপারে সে বাস করে। মাঝে মাঝে তার গর্জ্জন শুনে আমরা চমকে উঠি। তখন বড় ভয় করে। রাতে ঘুম হয় না।

—চল, আমি বধ করব সে দৈত্যকে।

বালিকা দুইটির সহিত সে ঘর হইতে বাহির হইল। বালিকা দুইটি তাহাকে পথ দেখাইয়া চলিল, কুকুর দুইটি চলিল অগ্রে।

পুষ্পশোভিত সুন্দর উন্মুক্ত পথ নয়। এ ঘনবন, সঙ্কীর্ণ বক্র বীথিকা, দুই পার্শ্বে অতি প্রাচীন ঝুরি-নামা বট-অশ্বত্থ বৃক্ষগুলির ভীষণ অন্ধকার।

উচ্চ দেওয়ালে সংলগ্ন বৃহৎ কৃষ্ণ লৌহ কবাটের সম্মুখে তাহারা উপস্থিত হইল। কবাট অর্গলবদ্ধ।

—কবাট খুলতে পারবে?

বালিকা দুইটির মুখ আশঙ্কায় পাণ্ডুর, চক্ষুগুলি বাথায় করুণ। কুকুর দুইটি চঞ্চল হইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে।

অরুণ সশব্দে অর্গল সরাইয়া দ্বার খুলিল। সম্মুখে সঘন অন্ধকার।

পিছন হইতে বালিকা দুইটি বলিল—এগিয়ে যাও।

অজানা অন্ধকারপথে দৈত্যের সন্ধানে অরুণ অগ্রসর হইল।

পিছনে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

দৈত্যের এ কি অবয়বহীন অন্ধকার রূপ!

যেন স্বপ্নের ঘোর হইতে জাগিয়া চমকিয়া অরুণ চাহিয়া দেখিল, বালীগঞ্জের এক অজানা পথে শীত-সন্ধ্যার অন্ধকারে দিশাহারা দাঁড়াইয়া।

কোথায় সেই সোনার প্রাসাদ? স্বপ্নের মত রাত্রির গগন-তিমিরে মিলাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর বহুদিন সে বালীগঞ্জে ঘুরিয়াছে, সে "সোনার স্বপ্ন" আর খুঁজিয়া পায় নাই।

(ক্রমশঃ)

অতৃপ্ত

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

তোমার অম্বরতলে সুন্দর ভুবনে
এত অল্প লয়ে দিন কাটাব কেমনে!
অনন্ত সমুদ্র মাঝে কি আঁকড়ি ধরি
আনন্দে ভাসায়ে দেব ক্ষুদ্র এই তরী?
ফুটন্ত নিকুঞ্জ হ'তে নব মালতীর
সুগন্ধ বহিয়া আনে সুমন্দ সমীর—
এতটুকু হাসি, আর এতটুকু আশা,
এতটুকু ছায়াময় মৃদু ভালবাসা
এই লয়ে গৃহকোণে অলস মায়ায়
সমস্ত জীবনখানি মেলেছি ছায়ায়।
অবিচ্ছিন্ন শান্তি নিয়ে এ সঙ্কীর্ণ সুখে
দীর্ঘ দিন কাটে যদি অনুদ্বিগ্ন বুকে,
তবু কেন রুদ্ধ কক্ষে মাঝে মাঝে আসে
মুক্ত অন্তরীক্ষ দিয়ে বাতাসে বাতাসে
অজস্র সহস্র প্রশ্ন, লুপ্ত হয় দিশা
কম্পমান বক্ষে জাগে অনন্ত পিপাসা?
এই মুকুলের গন্ধ বকুলের মালা—
অবরুদ্ধ কক্ষতল স্নিগ্ধ ছায়া ঢালা
শুধু এই নিয়ে বসে এতটুকু ঘরে
অফুরন্ত প্রাণখানি কিছুতে না ধরে।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য আছে পূর্ণ বিশ্বময়
এত ক্ষুদ্র তার মাঝে আমার সঞ্চয়!
উদ্বেলিত চিত্ত দিয়ে এতটুকু চাওয়া
অফুরন্ত বিত্ত হ'তে এতটুকু পাওয়া।

এ নিয়ে মেটে না ক্ষুধা! যেখানে বিশ্বের
ঐশ্বর্য্য লুকান আছে, যেখানে নিঃস্বের
নিঃশেষে ভরিবে পাত্র, পূর্ণ হবে প্রাণ
আমি কি পাব না কভু তাহার সন্ধান?
শুধু ফাল্গুনের সুর মধুগন্ধ-মিশা,
শুধু পূর্ণিমার হাসি শুক্ল-চৈত্রনিশা,
শুধু এই নহে বন্ধু, শুধু নহে সুখ,
আমার হৃদয়ে আছে বিকাশ-উন্মুখ
আশার মায়ায় ঢাকা ক্ষুদ্র এক কুঁড়ি
উন্মুক্ত অম্বরতলে অন্তলোক ফুঁড়ি
চাহে নিত্য প্রকাশিতে সর্ব্ব দুঃখে সুখে
আঁধারে আলোতে কভু ঝঞ্ঝার সম্মুখে।
শুধু লাভ নহে বন্ধু, শুধু ক্ষতি নয়,
সর্ব্ব স্পর্শ পেতে হবে সমস্ত সঞ্চয়
গাঢ় অনুভূতি দিয়ে মত্ত চিত্ত-স্রোতে
অজস্র সহস্ররূপে এ নিখিল হ'তে
ভরে নেব নাকি বুক? বিকশিয়া সব
ক্ষুদ্র প্রাণে রুদ্ধ আছে যে মহা গৌরব!
আপনার অন্তরের ঐশ্বর্য্যের সাথে
সমস্ত নিখিল কবে পারিব মিলাতে?
বসুধার পাত্র হ'তে নিত্য নব দান
পূর্ণ ক'রে দেবে নাকি এ অতৃপ্ত প্রাণ?
এতটুকু চাওয়া পাওয়া—এ নয় এ নয়!
বিশ্বের ভাণ্ডারে রবে আমার সঞ্চয়।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রসাধন

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

কোরিয়ান নৃত্য

জাপানের কলা-রসিকেরা ভারতের উদয়শঙ্কর, পেরুর হেল্‌বা হুয়ারা, আর্জ্জেন্টীনা এবং এস্কুডেরো (স্পেন) প্রভৃতির নৃত্যকলায় আশ্চর্য্য সফলতার ইতিহাস আগ্রহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। বিদেশীয় নৃত্যকলাভিজ্ঞদের তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইয়া জাপানের "নিপ্পন" পত্র কোরিয়ার সাই-শো-কির নৃত্যের একটি সুন্দর সচিত্র বিবরণ দিয়াছেন। সাই-শো-কির নৃত্যলীলায় যে শক্তি ও দীপ্তির প্রকাশ দেখা যায় তাহাতে কোরিয়ান নৃত্য বিষয়ে আমাদের প্রাচীন ধারণা আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। পূর্ব্বকালে কোরিয়ান নৃত্য মনকে শোকভারাক্রান্ত ও স্বজনবিরহ-কাতর করিয়া তুলিত বলিয়াই লোকে মনে করিত। বিগত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া কোরিয়ানেরা ভ্রান্ত রাজনীতির ফল ভোগ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কোরিয়ানরা এমন নির্জ্জীব থাকা দূরে থাকুক নৃত্যগীত ও চিত্রকলায় সর্ব্বদাই সগর্ব্বে আপনাদের শ্রেষ্ঠতার দাবি ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে। শুধু ঐতিহাসিকের সাক্ষ্যের সাহায্যেই তাহাদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয় না, তিন হাজার বৎসর ধরিয়া তাহারা যে-সকল চিত্র, মৃৎশিল্প ইত্যাদির অপূর্ব্ব নিদর্শন সঞ্চিত করিয়া আসিতেছে তাহাতেই তাহাদের নৈপুণ্য প্রকাশ পায়।

কোরিয়ানেরা নৃত্য ও গীতের একান্ত ভক্ত। স্বজাতীয় নৃত্যে যোগ দিবার জন্য সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরাও স্বচ্ছন্দে সাধারণ লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। কিন্তু গত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া নৃত্যকে লোকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখাতে ইহা কেবল পেশাদার নর্ত্তকীদের হাতে পড়িয়া হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কাজেই ইহার উন্নতির পথ বহু কাল রুদ্ধ ছিল; কিন্তু তবুও আজ পর্য্যন্ত কোরিয়ান নৃত্যকলা তাহার বহু শতাব্দী অর্জ্জিত বিশিষ্টতা হারায় নাই।

কোরিয়ান নৃত্যকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়। (প্রথম) রাজদরবারের নৃত্য; (দ্বিতীয়) রঙ্গমঞ্চের ও ভ্রাম্যমাণ নর্ত্তক-সম্প্রদায়ের (সা-তাং-পে) নৃত্য; (তৃতীয়) চাষা, জেলে প্রভৃতির গ্রাম্য নৃত্য; (চতুর্থ) দেবমন্দিরের নৃত্যপূজা। ইহার ভিতর প্রথম শ্রেণীর দরবারী নৃত্য আয়ত্ত করিতে হইলে প্রাচীন লি-রাজবংশের প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত-বিভাগের শিক্ষাধীনে বহু কাল সাধনা করিতে হয়। কিন্তু
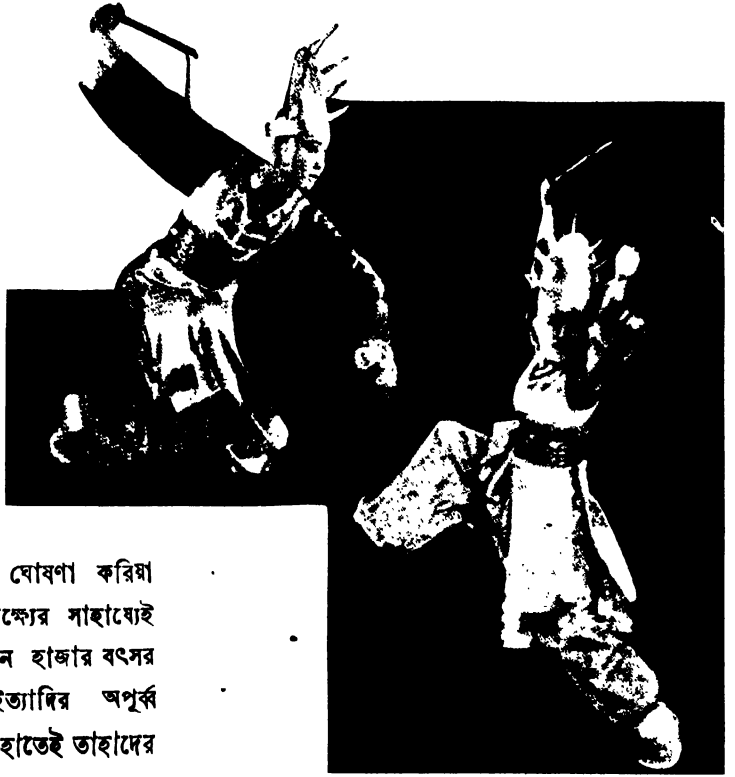
কোরিয়ান নৃত্য

কোরিয়ান নৃত্য

এই সকল উচ্চ অঙ্গের নৃত্য ও গীত কেবল রাজদরবারের লোকেই উপভোগ করিতে পায়।

গুইফু (Guifu) নাম্নী পেশাদার নর্ত্তকীরা গৃহস্থ-পরিবারে অতিথি-অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনার জন্য নিমন্ত্রিত হয়। এই সকল বালিকার কেবল যে নৃত্যকলায় প্রতিভা আছে তাহা নয়, ইহাদের রীতিমত মার্জ্জিত শিক্ষাও আছে; শিশুকাল হইতেই ইহাদিগকে নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, শিষ্টাচার প্রভৃতি সযত্নে শিক্ষা দেওয়া হয়।

গত শরৎকালে টোকিও শহরে বিখ্যাত কলাবিৎ সাই-শো-কির যে নৃত্য-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহারই দুইটি চিত্র এখানে দেওয়া হইল। বাঁশী ও মৃদঙ্গের সঙ্গতে কোরিয়ান লোকনৃত্য যে কি অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করিতে পারে, এই ছবিগুলির সাহায্যে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

অসি-নৃত্যে চার হইতে আট জন নর্ত্তকের প্রয়োজন। ছোট ছোট তলোয়ার এবং যোদ্ধজনোচিত বেশভূষা এই নাচের বিশেষ উপযোগী।

পুরোহিতদিগের পৌরাণিক নৃত্য বৌদ্ধ ও কনফুশিয়ান দুই প্রকারই আছে। তাহাদের সংঘাতের ইতিহাসও কোন কোন নৃত্যের বিষয়। একটি বিখ্যাত নৃত্যের বিষয়বস্তু প্রধান মন্ত্রী কোশির অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যাকে লইয়া রচিত হয়। এক জন বৌদ্ধ পুরোহিত এই কনফুশিয়ান বালিকার রূপে প্রলুব্ধ হইয়া কি করেন, তাহাই নৃত্যের বিষয়বস্তু। নৃত্যের বিষয়নির্ব্বাচন, নৃত্যভঙ্গী, ছন্দ, পরিচ্ছদ ও প্রসাধন প্রভৃতির অসংখ্য বৈচিত্র্য, এবং নর্ত্তকীদের উচ্চাঙ্গের প্রকাশভঙ্গিমা ও নৈপুণ্য কোরিয়ান নৃত্যকে নৃত্যকলায় উচ্চ আসন অধিকার করিতে সমর্থ করিয়াছে।

ব্রহ্মদেশে "তাগুলা" উৎসব বা জলখেলা

শ্রীঅজেন পুরকায়স্থ

ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতায় প্রভাবান্বিত ব্রহ্মদেশে অনুষ্ঠিত উৎসবাদি বহুলাংশে এতদ্দেশীয় উৎসবাদির সমজাতীয় এবং অনুরূপ। কেবল এদেশে অনুষ্ঠিত উৎসবগুলি দিন দিন প্রাণহীন বা ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে। ব্রহ্মদেশীয়দের জীবন হইতে আনন্দোৎসব বাদ পড়ে নাই।

ব্রহ্মদেশে প্রচলিত উৎসবগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়; বৌদ্ধধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নানারূপ ধর্ম্মোৎসব এবং বিভিন্ন ঋতুতে ঋতু-উৎসব। এদেশের মত ব্রহ্মদেশেও ঋতু-উৎসবগুলিতে কালক্রমে কিছু কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংস্পর্শ ঘটিয়াছে।

ঋতু-উৎসবগুলির মধ্যে 'তাগুলা' উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাজসজ্জা ও সৌখীন পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত

সাজসজ্জা, সৌখীন পোষাক এবং গীতাদির জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত
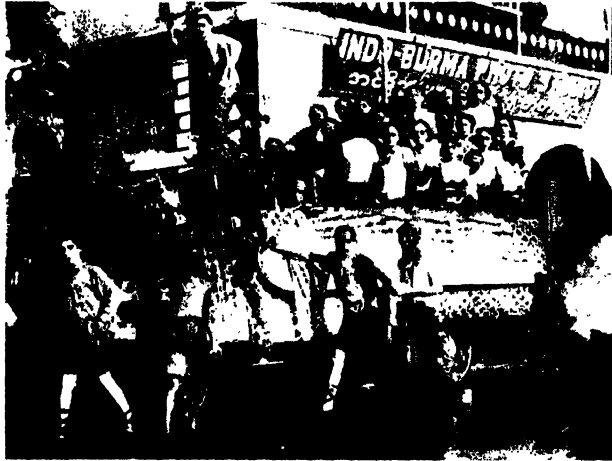
সাজসজ্জা ও নৃত্যের জন্য তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

জনপ্রিয়। ইহা নববর্ষ ও বর্ষাগমের উৎসব, বর্ষাদেবতা "থায়ামিন" এই উৎসবের দেবতা।

কৃষিজীবী ব্রহ্মদেশ নববর্ষের প্রথম প্রভাতে ভগবান বুদ্ধের চরণে জল-অঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রার্থনা জানায়, হে দেব! আমাদের শান্তি দাও, অন্ন দাও। কুমারী কন্যাগণ মন্দির-প্রত্যাগত পথিকদের দেহে জলসিঞ্চন করিয়া পাপ-তাপশ্রান্তি-ক্লান্তিহারী দেবতার চরণে প্রার্থনা জানায়, হে দেব! আমাদের পবিত্র কর, শান্তি দাও। ধনী-দরিদ্র, স্ত্রীপুরুষ, শিশুবৃদ্ধ আপামর জনসাধারণ বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া নব বৎসরের প্রথম তিন দিবস ভগবান বুদ্ধের মন্দিরে পূজা নিবেদন করে এবং কতকটা এদেশের হোলি-উৎসবের ধরণে, রঙের বদলে পরস্পরের দেহে জল-সিঞ্চন করিয়া কৃষি-দেবতা থায়ামিনকে বরণ করে। ইহাই 'তাগুলা' উৎসব।

পরিবর্ত্তনশীল জাগতিক নিয়মে ব্রহ্মদেশের এই উৎসবের আজ অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মন্দির-চত্বর আর উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে বহু প্রাচীন কৃষি-উৎসব আজ আর পূর্ব্বের মত সরল এবং অনাড়ম্বর নাই। বিদেশীয় "কার্নিভাল" উৎসবের অনুকরণে পথে পথে নানা বিচিত্র ছদ্মবেশধারী জনতা এবং নানারূপ ছদ্ম-আবরণে সজ্জিত গাড়ী ও মোটরের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়।

সমগ্র ব্রহ্মদেশের ভিতর মৌলমিনের অনুষ্ঠিত তাগুলা উৎসবেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সমারোহ দেখা যায়। উৎসব-মুখর হাস্যময়ী নগরীর শোভা দেখিতে বহু দূরদেশ হইতে এখানে লোকসমাগম হইয়া থাকে। "মপুণ" হইতে "ডানকুইনেব" পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ মাইল বিস্তৃত প্রশস্ত রাজপথ উৎসবের তিন দিন যে কি অপরূপ রূপ ধারণ করে, তাহা না দেখিলে ধারণা করিতে পারা যায় না। পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিবিধ ভূষণে সজ্জিত জনতা পথে প্রাচীন কালের ময়ূরপঙ্খীর সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক এরোপ্লেন ড্রেডনটের অনুকরণে সজ্জিত গাড়ী মোটরের ভিড়, নৃত্যগীতবাদ্য। এই সব বিচিত্র যানারূঢ় নানা বিচিত্রবেশী যুবক-যুবতী জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত পথিকদের দেহে বারি সিঞ্চন করিতে
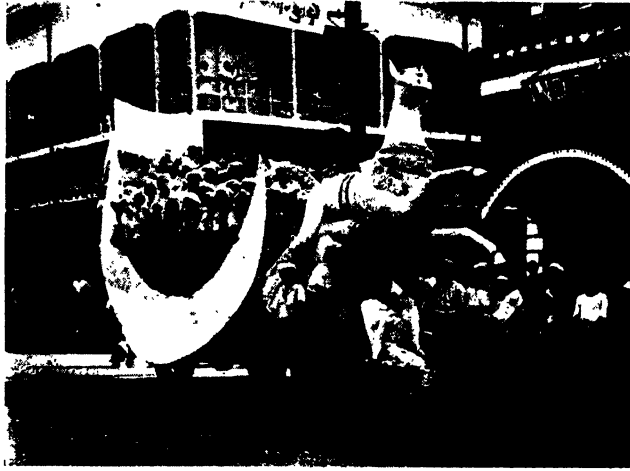
সাজসজ্জা, সৌখীন পোষাক, নৃত্য ও গীতের জন্য চতুর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত

করিতে চলিয়া যায়। সমস্ত মিলিয়া যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তাহা দেখিলে মনে হয়, শ্রান্তি ও অবসাদ এদেশের মানুষের জন্য নয়। দুঃখ-দুর্ভাগ্য ইহাদেরও জীবনে কম নাই, কিন্তু উৎসবের দিনে সে-সমস্তকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে ইহাদের বাধা হয় না।*

* এই প্রবন্ধে মুদ্রিত চিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত।

আটাশ ঘণ্টার জন্য

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

তারপাশায় নামিয়া দেখিলাম চারটা বাজিয়াছে। ষ্টীমার তখনও ঘাট ছাড়ে নাই; মাল বোঝাই হইতেছে। চুঙীটা দিয়া অনবরত কালো ধোঁয়া বাহির হইয়া সমস্ত জায়গাটা ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে হইয়াছে। বোটের দোতালার উপর অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া যাত্রীদের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছে।

এখানে বোটের উপরেই ষ্টেশন। কোন বছরই ষ্টেশনের জায়গার কোন ঠিক থাকে না। এ-বছর যেখানে ষ্টেশন আছে, ও-বছর হয়ত তার কোন অস্তিত্বই পাওয়া গেল না—ভাঙিয়া-চুরিয়া যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবারও জো নাই। কাজেই টিকিটঘর, গুডস্-আপিস, গুদামঘর সবই বোটের উপর। বোট্‌খানাকে যেখানেই রাখা হয়, সেখানেই ষ্টেশন।

অল্প খানিকটা জায়গা হাঁটিয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত একখানি ছোট ষ্টীমারে উঠিতে হইল। প্রথম ষ্টেশন বলিয়া লোকজনের তেমন ভিড় ছিল না। কম্বল বা সতরঞ্চি বিছাইয়া যাত্রীরা দিব্যি গড়াগড়ি করিতেছে। লোহার জালের রেলিঙের কাছে অনেক জায়গা খালি পড়িয়াছিল, তাহারই এক জায়গায় ভাল করিয়া বিছানা পাতিলাম। সঙ্গে তোষক, বালিশ, চাদর সবই ছিল, কাজেই বিছানা করিতে কোন বেগ পাইতে হইল না। পিছনেই ইণ্টার-ক্লাসের কামরা, প্যাসেঞ্জার একটিও নাই। কিন্তু মেয়েদের

ইণ্টার-ক্লাসের কামরায় বেশ যাত্রী ছিল। সেখানে আবার অনেক সুবিধাও আছে, তার মধ্যে একটি হইল, ষ্টীমার-ক্লার্ক ওখানে টিকিট্ চেক্ করিতে যায় না।

চুঙ্গীটার বাস কিন্তু কম নয়, অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া ছিল। খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিলেই ষ্টীমারের সেই পেটেণ্ট দোকান। এখানের জিনিষপত্রের সব একদর। এক কাপ চা চার পয়সা—চাও খারাপ নয়, লিপ্টনের পয়সা-প্যাকেটচা। সন্দেশ-রসগোল্লাও আছে—সে সবও একদর, দেড় টাকা সের। দোকানের পরই থার্ড-ক্লাসের সীমানার বেড়া, ওধারে ফাষ্ট এণ্ড সেকেণ্ড ক্লাস। সিঁড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া ডেক্ ও কামরা পর্য্যন্ত সমস্তই একেবারে ফিটফাট। ঐশ্বর্য্যের আর সীমা নাই—গদির বিছানা, ড্রেসিংএর সরঞ্জাম, ধবধবে শাদা বেসিন, সবই আছে।

পাশের ভদ্রলোককে বিছানাটার উপর নজর রাখিতে অনুরোধ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। ষ্টীমার ছাড়িবার আর বেশী বিলম্ব নাই। ওয়ার্ণিং হুইসেল দেওয়া হইয়াছে, যাহারা এখনও ডাঙায় আছে, তাহারা আসিয়া পড়িল বলিয়া। মোটা মোটা লৌহযন্ত্রগুলি সব চুপ চাপ যে যার জায়গায় স্থির হইয়া আছে। বাষ্পগুলি যেখানে গিয়া জমা হইতেছে, সেখান হইতে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কতক বাষ্প বাহির হইতেছে—অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভিতরের বাষ্পসমূহ যন্ত্রাধার ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া সব একাকার করিয়া দিবার জন্য উতলা হইয়াছে। উহারই পিছনে লোহার পাতের প্ল্যাটফর্মের উপর ড্রাইভার দণ্ডায়মান; তাহার সহকারীদ্বয় বিভিন্ন কলকব্জার মধ্যে তেল ঢালিতেছে। একটা খালাসীর কি অসীম সাহস, কলকব্জাগুলির একেবারে নীচে গিয়া হাতুড়ি লইয়া ঠুংঠাং করিতেছে। দৈবক্রমে যদি ষ্টীমার ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে ওর অবস্থার কথা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে।

খানিক ক্ষণ পর ষ্টীমার ছাড়িল।

আমরা পাড়ের কাছ দিয়া চলিয়াছিলাম। স্থানে স্থানে ফাটল-ধরা বড় বড় মাটির চাকা পড়-পড় হইয়াও পড়িতেছে না। কোন জায়গায় হয়ত একটি গাছের মাথা জলের উপর ভাসিয়া আছে, মাটিগুলি সব তলাইয়া গিয়াছে। নদী-ভাঙার দরুণ কত গৃহস্থ পাড় ছাড়িয়া গাঁয়ের ভিতরে গিয়াছে—খানিক পর-পরই পরিত্যক্ত ভিটাগুলি দেখিয়া তাহাদের কথা মনে পড়ে। পুরুষানুক্রমে কত কাল ধরিয়া যে-জায়গায় বসবাস করিতেছিল, সে-জায়গা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। মায়ামমতাহীন নিষ্ঠুরা নদী একবার ভুলক্রমেও মানুষের দুঃখের কথা ভাবে নাই। কত যুগের, কত পরিশ্রমের, কত গৌরবের কীর্ত্তি মুহূর্ত্তে বিনাশ করিয়াছে। কেবল 'ঝপ্ ঝপ্ ঝপাৎ' একটি শব্দ, তার পর কেবল জল আর জল।

উপরে আসিয়া বিছানায় বসিবামাত্র পাশের ভদ্রলোকটি নামধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দিবার পর তিনি বলিলেন—আপনি ব্রাহ্মণ? প্রণাম; তা ভালই হ'ল, আমিও খুলনা যাচ্ছি—খুলনায় বুঝি আপনার কোন কাজ আছে?

—না।

—তাহ'লে এমনি বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি?

—হু।

—খুলনা ত আজকাল আমাদের বাড়ির মত হয়ে গেছে—বছরের মধ্যে দু-চার বার যাওয়া চাই-ই। লোক-জনের সঙ্গেও খুব জানাশুনা, আমাকে পেলে যে তাঁরা কত খুশী হন তা আর কি বলব। আপনি কি এই প্রথম যাচ্ছেন?

—না।

—আরও অনেক বার গেছেন বুঝি?

—হাঁ।

—ছোটর মধ্যে বেশ শহর কিন্তু মশাই, না?

—হুঁ।

—ট্রেড্-ইম্পরটেন্স কিন্তু এ জায়গাটার খুব বেশী, বরিশাল ও যশোরের জিনিষপত্তর সব এখান দিয়েই কলকাতায় চালান হয়। আমাদের ব্রজকিশোরবাবু এই চালানের ব্যবসা ক'রে খুলনায় চারখানা বাড়ি করেছেন। তার কথা শুনলে—

—আচ্ছা, আমি একটু আসছি এই বলিয়া উঠিয়া

আসিতে বাধ্য হইলাম। একটু দূরে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম। ঠিক করিলাম, ভদ্রলোক না ঘুমাইলে আর বিছানার কাছে যাইব না।

হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম অল্পবয়সী তিন জন ভদ্রলোক আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া কি যেন বলাবলি করিতেছেন। খানিক ক্ষণ পর তাঁহাদের মধ্যে এক জন সরাসরি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন—আসুন না, একসঙ্গে খানিকটা সময় কাটাই, আমরা তিন জন ত আছি-ই, আপনি এলেই আরম্ভ করতে পারি।

অন্য দুই জন তত ক্ষণ তাস বাহির করিয়া জায়গা নির্ব্বাচন করিয়া ফেলিয়াছেন। বুঝিলাম কেবল আমার অপেক্ষায়-ই আরম্ভ হইতেছে না। কিন্তু আমি যে আবার এ রসে বঞ্চিত, স্পষ্টই কহিলাম—আমি যে খেলা জানি নে।

—যা জানেন তাতেই হবে, আমরা ত আর এখানে স্টেকে খেল্‌তে যাচ্ছি নে।

—সিন্সিয়ারলি বল্‌ছি, আমি একেবারেই খেলা জানি নে।

—বুঝেছি, আপনার খেলার দিকে তেমন ঝোঁক নেই এখন। আচ্ছা বেশ দুটো রাবার হয়ে গেলেই বন্ধ ক'রে দেব।—আবার চিন্তে করছেন কি? এসে পড়ুন। বেলাটাও একেবারে পড়ে এল, কত ক্ষণই বা খেলা হবে?

কি মুস্কিল, ভদ্রলোক ধারণাই করিতে পারেন নাই যে আমি বাস্তবিক তাসের কোন খেলাই জানি না। বলিলেও বিশ্বাস করিবেন না, একেবারে আনাড়ীর মত খেলিলেও মনে করিবেন, তামাশা করিতেছি। নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষটায় অনেক ক্ষণ পীড়াপীড়ির পরও যখন এক পা-ও নড়িলাম না, তখন ভদ্রলোক রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, তাঁহাদের মধ্যে এক জন বলিতেছেন—আজকালের ফ্যাশনই হচ্ছে এটা—সকলের মধ্যেই কাব্যভাব ঢুকেছে কিনা, তাই কেউ কারু সঙ্গে মিশ্‌তে চায় না। তা যাক্‌। চল আমরা তিন জনেই খেলি।

তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। মেঘনার ঢেউগুলি ম্লান সূর্য্যকিরণে চিক্‌মিক্‌ করিতেছিল। বাতাসের জোর না থাকায় নদীটা তেমন চঞ্চল ছিল না। একটা সোঁ-সোঁ শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল—মেঘনার বৈশিষ্ট্যই হইল এই গান। মনে হইতেছিল, গানের তালে তালে ছোট ছোট ঢেউগুলি হুড়াহুড়ি করিয়া এক আকর্ষণী শক্তির পিছনে ছুটিতেছিল। আশপাশে দুই চারিখানি নৌকা দেখা যাইতেছিল—কোনটা পাড়ি দিতেছে, কোনটা বরাবর স্রোতের মুখে চলিয়াছে, কোনটা বা পাল খাটাইয়া উজান ঠেলিয়া যাইতেছে। ছোট একটা বালুচরের কাছে জেলেদের লম্বা নৌকাগুলি সারিবাঁধা ছিল। অদূরে মাইল মাইল দূর পর্য্যন্ত প্রলম্বিত জালের বাঁশগুলি জলের উপর ভাসমান ছিল। নৌকাগুলি যথাসময়ে জাল গুটাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। নারিকেল-বোঝাই একখানি নৌকা অল্প দূর দিয়া যাইতেছিল। ছাউনীর উপরের চারিদিকটা বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা, তাহার উপরে প্রায় পাঁচ-ছ হাত উঁচু পর্য্যন্ত নারিকেল বোঝাই হইয়াছে; মনে হয় ছোট একটি নারিকেলের টিলা জলের উপর দিয়া চলিয়াছে।

সন্ধ্যার পর মহা ফ্যাসাদে পড়িলাম। এ-ষ্টীমারটায় বিজলী বাতি নাই। ঝুলপড়া কয়েকটা কেরোসিনের লণ্ঠন এখানে-ওখানে ঝুলিতেছে। তাহাতে আলো কিছুই হইতেছে না, বরং অসুবিধা হইতেছে! যে-জায়গায় লণ্ঠনের আলো পৌঁছে নাই, সে-জায়গার অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়াছে। মেয়ে-কামরার লণ্ঠন হইতে কেরোসিনের শীষ কেবলই বাহির হইতেছিল। সারারাত্রি ঐ আলোটা জ্বালা থাকিলে কেরোসিনের গ্যাস্‌ হজম করার দরুণ মহিলাদের লইয়া ভোরবেলা টানাটানি করিতে হইবে না ত?

মেয়েরা কাম্‌রাটিকে সম্পূর্ণরূপে বাড়িঘরের মত করিয়া তুলিয়াছেন। জলের ঘটি, টিফিন-কেরিয়ার, বাক্স-তোরঙ্গ, তোষকবালিশ, কাপড়চোপড় সব একাকার হইয়াছে। একদিকে জল ফেলিতে ফেলিতে ডেক্‌টাকে পর্য্যন্ত কাদা করিয়াছেন। কাহারও শিশু ঘুমাইয়াছে, কাহারও শিশু কাঁদিতেছে। স্বামীদের এদিকে একবার লক্ষ্য করিবার অবসরও নাই, বিছানায় বসিয়া বা শুইয়া দিব্য আরাম করিতেছেন। এক জন মুসলমান মহিলার অসুবিধা হইতেছিল বেশী। আপাদমস্তক বোর্‌খা দিয়া ঢাকা অবস্থায় তিনি এককোণে বসিয়া ছিলেন। কাহারও সঙ্গে কথাও কহিতে পারেন না, মুখ তুলিয়া বোর্‌খার ফাঁকে একবার এদিক-ওদিক চাহিতেও পারেন না। তাঁহার স্বামীটিও খুব

কাছেই ছিলেন, এবং যেভাবে ঘন ঘন স্ত্রীর দিকে তাকাইতেছিলেন, তাহাতে মনে হয়, পাহারাওয়ালার কাজটা নিজেই করিবার জন্য অত কাছাকাছি জায়গা ঠিক করিয়াছেন।

আর এক জায়গায় তিন-চার জন মুসলমান নমাজ পড়িয়া কিছু জলযোগান্তে ধূমপানের আয়োজন করিতেছিল। হুঁকো কল্‌কে সবই আছে, কেবল নীচের রান্নার কেবিন হইতে একটু আগুন আনিলেই হয়। তাহাদের সঙ্গে একটা পোর্টেবেল গ্রামোফোন মেশিন ছিল। রঙ্‌চঙে লুঙ্গি-পরা অল্পবয়সী মুসলমানটি মেশিনের ডালা তুলিয়া ভিতর হইতে চাবি বাহির করিয়া দম্ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল; আর এক জন রেকর্ডের বাক্স হইতে একখানি রেকর্ড লইয়া মেশিনের উপরকার থালাটার উপর রাখিল। দম্ দেওয়া হইল, সাউণ্ড-বক্সে পিন্ লাগাইয়া রেকর্ডের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কই তবু ত কোন শব্দ হইতেছে না! মিঞা সাহেব মেশিনটাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া নীচে উপরে খুব জোরে জোরে কয়েকটা ফুঁ দিয়া হয়ত ভাবিল, কোথাও ধূলি আটকাইয়া গিয়াছে, ফুঁ দিয়া সেগুলি উড়াইয়া দিলেই গ্রামোফোন বাজিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। এইবার এক জন ভাল পরামর্শ দিল। গামছা ভিজাইয়া মেশিনটার ভিতর ও বাহির ভাল করিয়া মুছিয়া লইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। পরামর্শটি কার্য্যে পরিণত হইবার পরও দেখা গেল, মেসিনটি বোবাই আছে। তখন তাহারা ভাবিল, শহরের দোকানদার তাহাদিগকে সাদাসিধা লোক ভাবিয়া নিশ্চয়ই ঠকাইয়াছে। যে-মেশিন তাহাদের সম্মুখে বাজান হইয়াছিল, সেই মেশিন সরাইয়া রাখিয়া অন্য আর একটি খারাপ মেশিন তাহাদের নিকট গছাইয়াছে। অবশেষে এক জন আমাকে ডাকিয়া বলিল, "বাবু, আমাগ' এই কলডা একবার দ্যাহেন চাই, এ'ডা শব্দ করে না কিয়া (কন)?"

মেকানিক না হইলেও কল্‌টা একবার নাড়াচাড়া করিতে দোষ কি। মাদুরের উপর বসিয়া মেশিনটাকে সামনে টানিয়া দেখিলাম, উপরকার হুকটা না ঠেলিয়াই সাউণ্ড-বক্সকে রেকর্ডের উপর রাখিয়াছে, ফলে রেকর্ডের তলার থালাটিও ঘুরিতেছে না। রেকর্ডও ঘুরিতেছে না, কোন শব্দও হইতেছে না। কাজেই শুধু বুড়ো আঙুলের সামান্য একটু ঠেলাই যাদুমন্ত্রের মত কাজ করিল। গানটি দিব্যি পরিষ্কার শুনা গেল, 'রমজানের ঐ রোজার শেষে।' মিঞা সাহেবরা সকলেই ইহাতে খুব চমৎকৃত হইল। অল্পবয়সী মুসলমানটি আমি চলিয়া আসিলে বলিল, 'ওডার কথা আমিও জানতাম, তবে এড্ডাহানি তামাশা করবার লেইগ্যা ওহানে একবারও হাত দেই নয়।'

নদীটার চারি দিকে ভীষণ অন্ধকার। কেবল মাঝে মাঝে ছোট ছোট ডিঙি-নৌকার বাতিগুলি তারার মত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে নদীবক্ষে ষ্টীমারের পাখার ঝাপ্‌টার আওয়াজ স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। ষ্টীমারটিও সপ্‌-সপ সপ্‌-সপ্ শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিয়াছিল। এক জন খালাসী রেলিঙের উপর বসিয়া মাথাটি পিছনে হেলাইয়া আপন মনে গলা ছাড়িয়া গাহিতেছে, 'আন্ধার ঘরে তুই যে আমার সোনার মাণিক রে-এ-এ-এ।' গ্যাসের সার্চ্চ-লাইট্‌টাকে পাড়ের দিকে মুখ করিয়া রাখায়, পাড়ের উপরের গাছপালা ও ঘর-বাড়ি-গুলিকে মায়াপুরীর রাজ্য বলিয়া মনে হইতেছিল। কেবল নীল, নীল, নীল,—একটা মাত্র আলোর প্রভাবে কি চমৎকার একটা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

বিছানার কাছে ফিরিয়া দেখি ভদ্রলোক আমার জন্য ঠিক অপেক্ষা করিতেছেন।

—দেখুন, রাত্তির বেলা জায়গা ছেড়ে ঘোরা-ফেরা করবেন না, এ লাইনের ষ্টীমারে কিন্তু অনেক কাণ্ড ঘটে থাকে।

—তাই না কি?

—সত্যি তাই। আপনার সঙ্গে যখন পরিচয় হ'ল—ভাল কথা, আমার পরিচয় ত দেওয়া হয় নি। আমার নাম শরদিন্দু সোম, নিবাস পাটগ্রাম, জিলা নদীয়া। আই-এ'র পর এল-টি পাস ক'রে নানা জায়গায় স্কুল-মাষ্টারী ক'রে বেড়াচ্ছি। ইনস্পেক্টার চন্দ্র সাহেব আমাকে একখানা সার্টিফিকেট দিয়েছেন—বেশ ভাল সার্টিফিকেট্ কিন্তু। —আঃ অত দূরে স'রে বসেছেন কেন? এদিকে আসুন না, এইখানটায় বসুন। মুখোমুখি না হ'লে কি আলাপ ক'রে সুখ আছে? হাঁ, এই ত বেশ হয়েছে এখন। তার পর

কি জানি বলছিলাম? অ' চন্দ-সাহেবের সার্টিফিকেটের কথা—সে যে কত প্রশংসা ক'রে লিখেছেন, তা আর কি বল্‌ব। সার্টিফিকেটখানা হয়ত ট্রাঙ্কেই আছে, দেখি, আপনাকে এনে দেখাতে পারি কিনা।

শরদিন্দু বাবু মেয়ে-কামরার দরজায় গিয়া বলিলেন,—ঘুমুচ্ছ নাকি! একবার শুন দিকিন এদিকে।

এক জন বর্ষীয়সী স্থূলাঙ্গী মহিলা চোখ মুছিতে মুছিতে রাগত ভাবে দোর-গোড়ায় আসিলেন।

—ট্রাঙ্কটা খুলে আমার সার্টিফিকেটখানা বার ক'রে দিতে পারবে?

—কি জানি, তোমার ছাট্‌কাট্‌ কোথা আছে আমি কি ক'রে জানব। ইংরেজী বলবার বুঝি আর জায়গা পাও না? এটা বাড়ি-ঘর নয়, ষ্টীমার, চুপ ক'রে শুয়ে থাক গে, আর জ্বালিও না।

—এক জন ভদ্রলোককে দেখাতে হবে যে, দাও না ওটা খুলে।

- কি জ্বালাতন, এখন ওসব খোলা যায় নাকি? ইচ্ছে হয়, তুমি ভেতরে এসে খুঁজে নাও।

—তা কি ক'রে হয়?

—তবে না হয়ত মর গে যাও, আমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারব না।

এবার শরদিন্দু বাবুর জন্য সত্য সত্যই একটু মায়া হইল।

বিব্রতা ঢাকিবার জন্য শরদিন্দু বাবু জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন—এক্সকিউজ্‌ মি টু-ডে, কাল সকালে আপনাকে ওটা দেখাব। ট্রাঙ্কের তলা থেকে এখন ওটা বার করা আর এক হাঙ্গাম-বিশেষ।

—কেন আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন? আপনার কাছ থেকে ত সবই শুনলাম, আবার দেখে কি হবে?

—না, না, বলেছি যখন দেখাবই। আচ্ছা, আপনারাও কুলীন, কেমন?

—হাঁ।

—এই কুলিন বামুনের মেয়ে নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখেছিলুম। কবিতাটা বেশ হয়েছিল, কিন্তু কোন সম্পাদকই ছাপলেন না। প্রত্যেক কাগজে পাঠিয়েছিলুম। অথচ একটা উত্তর পর্য্যন্ত পাই নি। অবিশ্যি আমরা ত আর প্রতিভাবান কবি নই, যে, যা লিখব তাই-ই উৎকৃষ্ট কাব্য হবে, কিন্তু তবু আমাদের পরিশ্রমের ত কিছু মূল্য দেওয়া উচিত।

—তা ত নিশ্চয়ই—

এই ত আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন। আচ্ছা দেখুন, আপনার কাছে একটা পরামর্শ জিজ্ঞেস্‌ করি। ঐ কবিতাটা আর নূতন কয়েকটা কবিতা লিখে ছোটখাট একখানা বই ছাপান কি ভাল?

—মন্দ কি।

—আচ্ছা বেশ আপনাকে কিন্তু সাহায্য করতে হবে। আপনারা উচ্চশিক্ষিত, বইখানার উপর প্রয়োজনবোধে যদি একটু-আধটু রিটাচ্‌ ক'রে দেন, তাহলেই বাজারে চলে যাবে।

—আপনি কিন্তু ভুল কচ্ছেন, আমি কবিতা লিখ্‌তে জানা ত দূরের কথা, বুঝতেও পারি না।

—ও ব'লে আমায় ঠকাতে পারবেন না, আপনার মত যাঁর দুটো চোখ আছে, তিনি কবি না হয়েই পারেন না। হাঁ, চোখ ছিল আমার জেঠামশায়ের—ওরকম দ্বিতীয় একজোড়া চোখ আমি আর দেখি নি। তাঁর চোখের দিকে একবার চাইলে, কার সাধ্য ছিল মাথা নামায়। বাস্তবিক তিনি এক জন মহাপুরুষ।

আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া কনুইয়ের উপর ভর করিয়া হেলান দিলাম। শরদিন্দু বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

ওরকম চরিত্র আজকাল দেখা যায় না। অল্পবয়সে তিনি সহজেই খারাপ হ'তে পারতেন। তিনি বলতেন, তাঁর সমস্ত যৌবনটা কেবল প্রলোভনের ভেতর দিয়ে কেটেছে। প্রলোভন মানুষের কি সর্ব্বনাশটাই না করতে পারে? চোখের 'পরে আমার নিজের বন্ধুকেই রাজার দুলাল থেকে পথের ভিখিরী হ'তে দেখলাম। আপ্‌নি একেবারে শুয়ে পড়লেন যে, উঠে বসুন; এখন পর্য্যন্ত বর্‌শাও ত ছাড়ায় নি। মাদারীপুর পর্য্যন্ত চলুন জেগেই যাই, তার পর সেখান থেকে কিছু মিষ্টি খেয়ে ঘুম দেওয়া যাবে।

—আমার শরীরটা খারাপ লাগছে, আপনি বলতে থাকুন, আমি শুনছি।

—ষ্টীমার রেলে আমার শরীর ভাল থাকে না—কেমন কেমন যেন লাগে। তবু ষ্টীমারটা অনেক ভাল, খাওয়াটা পেলে এখানে আর বিশেষ কোন কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা নেই। আচ্ছা, এরোপ্লেনের জার্নি কি রকম লাগে জানেন? আমি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এরোপ্লেন চড়ি নি। সত্যি বল্‌তে কি, আমার ত ভীষণ ভয়ই করে। আমার মনে পড়ে, অনেক বছর আগে, ঢাকাতে এক মেম্ বেলুনে উঠেছিল। অনেক উঁচুতে ওঠার পর হঠাৎ কি একটা গোলমাল হওয়াতে মেমসাহেব বেলুনসুদ্ধ রমনার একটা গাছের উপর পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। আর যাই বলেন, ওদের মেয়েপুরুষ সবাই খুব ডেয়ারিং—

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, মনে নাই; জাগিয়া দেখি ভোর হইয়াছে। শরদিন্দু বাবু যোগাসনে বসিয়া সুর করিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। উঠিয়া বসিলাম।

—ঘুম ভাঙল আপনার?

—আগের দিনটা অনিদ্রায় কাটায় কাল বেশ ভাল ঘুম হয়েছে।

তাহ'লে এখন যান, নীচে থেকে হাতমুখ ধুয়ে আসুন গে। এই ঘটীটা নিয়ে যান। আমি ত একেবারে চান্ ক'রে এসেছি, ঐ দেখুন না রেলিঙের গায়ে ভিজে কাপড় শুকোতে দিয়েছি। আপনি চান করবেন? তাহ'লে আমি গামছা-কাপড়ের বন্দোবস্ত করছি না হয়।

—আমার আবার ঠাণ্ডা সয় না, চান্ করলে ঠিক সর্দ্দি লেগে যাবে। তবে হাত-মুখটা একবার ধুয়ে আস্‌তেই হবে। একি আমার জুতোজোড়া কোথা? এখানে ত দেখছি না।

শরদিন্দু বাবু হেসে বললেন—বুঝেছি, ও আর বৃথা খুঁজে লাভ কি? এখানে এলে ঘুমের দক্ষিণাস্বরূপ ওটা দান করতে হয়।

ভদ্রলোকের উপর একটু বিরক্ত হইলাম, কিন্তু নিরুত্তর থাকায় তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—এ ত খুব সোজা কাজ। জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে যে-কোন লোক যে-কোন ষ্টেশনে নামতে পারে। তাতে লাভও মন্দ হয় না, টিকেটের দাম হয়ত আট আনা দশ আনা লেগেছে কিন্তু তার বদলে টাকা-তিনেকের জিনিষ পাওয়া গেল।

—এর কি কোন ব্যবস্থা হবে না? ষ্টীমারের লোক এ-সব দিকে নজর রাখে না কেন? নিজেই ভেবে দেখুন ত একি যাচ্ছে-তাই কাণ্ড।

—এ ত আর নূতন কিছু নয়, হামেসাই হচ্ছে। এ নিয়ে খবরের কাগজে কত লেখালেখি হ'ল। ষ্টীমার কোম্পানী ভ্রূক্ষেপও করে না, দরকারও নেই, কেবল বুকিং-আপিসের বাক্সটা ভর্ত্তি থাকলেই হ'ল, যাত্রীদের কি হ'ল না হ'ল তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে যাবেন কেন? ভাল আলোর বন্দোবস্ত না থাকলে এসব হবেই, কালকেই ত আপনাকে সাবধান হ'তে বলেছিলাম।

নূতন জুতোজোড়া হারাইয়া মনটা বাস্তবিক একটু দমিয়া গেল। যাক্, কি আর করা যায়, সুটকেস্ খুলিয়া স্যাণ্ডেল-জোড়া বাহির করিয়া নীচে নামিয়া গেলাম।

ষ্টীমার তখন সিদ্ধিরগঞ্জ ষ্টেশনে থামিয়াছিল। বেশ বড় ষ্টেশন। অনেক লোক উঠিল। ষ্টীমারটা এবার লোকে একেবারে ভর্ত্তি হইয়া যাইবে। এখান হইতে জেলেরা অনেক মাছ কলকাতায় চালান দেয়। অসংখ্য বাক্সভর্ত্তি মাছ ষ্টীমারে উঠান হইতেছিল। পাড়ের লোকেরা দুধ, কলা, রসগোল্লা ইত্যাদি খাবার লইয়া ষ্টীমারের উপর উঠিয়া ষ্টীমারের দোকানদারের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছিল।

রাত্রিবেলা কখন যে কাটা-নদীতে পড়িয়াছিলাম সে খেয়ালই আমার ছিল না। কাটা-নদী হইলেও স্রোত খুব বেশী, জলও অনেক। ডিঙিগুলি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া উজান ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; কিন্তু ঢেউ নাই মোটেই। অদূরে একখানি মাটি-কাটা ষ্টীমার ছিল। ষ্টীমারের সামনে মাটি কাটিবার কলের কোদালীগুলি দেখা যাইতেছিল। ঐগুলির পিছনে অসংখ্য যন্ত্রপাতি। ষ্টীমারের মাঝখান হইতে প্রকাণ্ড একটা মোটা চুঙী লম্বমান হইয়া পাড়ের উপরে ঝুলিয়া রহিয়াছে। এই চুঙী দিয়াই কাটা মাটিগুলি জলসমেত ভীষণ শব্দ করিতে করিতে মাঠের উপর পড়ে। মাঠের পাশ দিয়া জলনিকাশের ব্যবস্থা

আছে, কাজেই মাটিগুলি ওখানে পড়িয়া ক্রমে শুকাইয়া গিয়া মাঠের সহিত মিশিয়া যায়।

ষ্টীমার ছাড়িয়া দিলে হাত মুখ ধুইয়া উপরে আসিলাম। শরদিন্দু বাবু এদিকে সমস্ত সাজাইয়া-গুছাইয়া আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, এই যে আসুন, অল্প কিছু জলযোগ করা যাক্।

—সে কি আপনি যে একেবারে নেমন্তন্নের জিনিষপত্র জুটিয়ে ফেলেছেন—দুধ, কলা, খৈ, সবই ত আছে দেখছি।

জলযোগ শেষ হইয়া গেলে মেয়ে-কামরার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একটি পাঁচ-ছ বছরের মেয়ে শরদিন্দু বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—বাবা, একবার এস, মা ডাকছেন।

—আয় না কল্পনা, এঁর সঙ্গে আলাপ কর, ইনি তোর কাকা হন। তোর মাকে বল্ আমি নীচের থেকে জল নিয়ে আসছি।

কল্পনা লজ্জায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেল, এক দৌড়ে মা'র পিছনে গিয়া আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিল।

শরদিন্দু বাবু উপরে আসিলে সেই স্থূলাঙ্গী মহিলাটি বলিলেন,—সমস্ত রাত্তিরটা এখানে থেকে একেবারে সেদ্ধ হয়ে গেছি। এতটুকু জায়গার মধ্যে এতগুলো ছেলেপেলে নিয়ে এই গরমে টেকা যায়? তুমি ত দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছ, মরে রইলাম না জ্যান্ত রইলাম তাও ত একবার খোঁজ কর নি। তখন বলেছিলাম, বাইরে একটা বড় বিছানা কর, সবাই একসঙ্গে থাক্‌ব, সেটা ভাল লাগল না। বড় মানী লোক কি না, তাই বুঝি আমাদের নিয়ে বাইরে বসতে লজ্জা করে? যাক্। আমায় একটু বাইরে নিয়ে চল, নীচে গেলে একটু হাওয়া-টাওয়া গায়ে লাগবে।

—এখন না, আর একটু পরে।

—না, না, এখ্খুনি।

—তুমি কি লোকজন দেখ না? এক ভদ্রলোক আমার জন্ত অপেক্ষা করছেন। তিনি ভাববেন কি?

—ভাববেন তোমার মুণ্ডু। ভদ্রলোক বুঝি আর স্ত্রী নিয়ে বাইরে বের হন না?

—আচ্ছা চল, তবে তাড়াতাড়ি আসতে হবে কিন্তু।

শরদিন্দু বাবু কল্পনা ও মহিলাটিকে লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

অল্পপরিসর সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করিতে ভদ্র-মহিলাটিকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে সন্দেহ নাই। আমি আর কি করিব, সঙ্গে একখানি হিবার্ট জার্নাল ছিল, তাই খুলিয়া একটা সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রবন্ধে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম।

আধ ঘণ্টা পরে শরদিন্দু বাবু বিছানায় আসিয়া বসিলেন। রৌদ্রের প্রখরতা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছিল। এপার-ওপারের ব্যবধান খুব পরিমিত থাকায় ষ্টীমারটি খুব সাবধানে অগ্রসর হইতেছিল। গাঙ্‌শালিকের দল মাঠের উপর দিয়া উড়িয়া উড়িয়া ষ্টীমারটার সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। পূর্ণকুম্ভকক্ষা বধূর দল মাথায় কাপড় টানিয়া ষ্টীমারের দিকে চাহিয়া ছিল। একটা নেংটা ছেলে ষ্টীমারের লোকদিগকে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী-সহকারে মুখ ভেঙ্‌চাইয়া মহা আনন্দ পাইতেছে।

শরদিন্দু বাবু বলিতেছিলেন, আপনাদের জীবনটা বাস্তবিক সুখের, এখনও তেমন বয়স হয় নি, পড়াশুনো করবার ইচ্ছেটাও আছে। আমরা সংসার নিয়েই আছি। এক জন কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছেন, তার জন্যে প্রতি মাসেই টাকা গুণতে হচ্ছে, কিন্তু তিন-তিন বারের প্রবেশিকা পরীক্ষায়ই অন্ততঃ একটা করে হংসডিম্ব সে পেয়েছেই। আমার ভাই যে এমন হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমার তিন-তিন্‌টে লেটার ছিল। হেড-মাষ্টার মশায় বলতেন, আমার মত একটা ছেলে সচরাচর নাকি দেখা যায় না। আর আজকালের ছেলেগুলি হয়েছে কি! আমারই এক ছাত্র আজ পর্য্যন্ত ইংরেজীতে পাঁচের বেশী নম্বর তুল্‌তে পারেনি।

ভদ্রলোক ভাগ্যিস্ চন্দ্র-সাহেবের সার্টিফিকেটের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, নইলে এখনই আবার সেটা বাহির করিয়া আর এক পর্ব্ব আরম্ভ করিতেন নিশ্চয়।

মেয়ে-কামরার ভিতরে হঠাৎ একটা সোরগোল পড়িল। শরদিন্দু বাবুর স্ত্রীর গলাও শুনা যাইতেছিল, কাজেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সেখানে যাইতে হইল, আমিও সঙ্গে গেলাম।

—তুমি আমায় এখখুনি যদি বাইরে না নিয়ে রাখবে, তাহলে আমি নিশ্চয় বলছি, নদীতে ঝাঁপিয়ে মরব। এখানে আমি আর এক মুহূর্তও থাকব না।—এই বলিয়া তিনি কল্পনার হাত ধরিয়া কামরার বাহিরে চলিয়া আসিলেন, বলিলেন—মাগীর আক্কেল দেখ—এ'টা কি হাসপাতাল? যক্ষাকাশ নিয়ে কোন্ সাহসে তুই কামরায় ঢুকলি?

কামরার অন্যান্য মেয়েরাও অমনি বলিয়া উঠিল—ওমা, সে কি গো, এর আবার যক্ষা নাকি গো। শুনচ, শীগ্‌গীর এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নয়ত তোমার মিন্‌সেকে একবার ডাক না, দুটো কথা শুনিয়ে দি। দেখি কেমন তার আক্কেল!

শরদিন্দু বাবুর স্ত্রী বলিলেন—এতক্ষণ কিছুই বুঝতে পারি নি, হঠাৎ চেয়ে দেখি, মাগী কেবল খক্ খক্ করছে আর থুথু ফেলছে।

যাহা হউক, গোলমালটা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। মহিলাটির স্বামী আসিয়া তাঁহাকে নীচে লইয়া গেলেন। সারেঙকে বলিয়া ফিনাইল আনিয়া থুথু-ফেলার জায়গাটা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু শরদিন্দু বাবুর স্ত্রী তবু সেই কামরায় আর ঢুকিবেন না। অগত্যা তাঁহাকে নিজের বিছানায়ই জায়গা দিতে হইল।

আমি ওখানে গিয়া বসিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম, কিন্তু শরদিন্দু বাবু বলিলেন—ওকি আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? এখানে এসে বসুন, এতে লজ্জা কি?

শরদিন্দু বাবুর স্ত্রী মাথার কাপড় টানিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলেন, আর শরদিন্দু বাবু নিজে আসিয়া আমার বিছানায় বসিলেন।

আমি বিছানায় আসিলে, শরদিন্দু বাবু তাঁহার কথা আরম্ভ করিলেন—বুঝলেন কিনা, সাবধান হয়ে চলাটা ওঁর স্বভাব। (খুব আস্তে) মেজাজটা একটু কড়া, তা নইলে আর-সবই ভাল। রান্না-বান্না ত এক্‌সেলেণ্ট করেন, একবার খেলে হাতে লেগে থাকবে। তবে আজকাল বেশী মোটা হয়ে পড়ায় কাজ-কর্ম্ম করতে একটু কষ্ট বোধ করেন। আগে কিন্তু উনি এরকম ছিলেন না। কি আর বলব, মশায়, প্রায় বুড়ো হ'তে চলেছি, না বলেও পারি নে, গোয়ন্ত বয়সে এঁর মত সুন্দরী এঁদের গাঁয়ে আর একটিও ছিল না, কিন্তু গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে অমন মোটা হয়ে গেল।

বাস্তবিক আমি অত্যন্ত লজ্জা পাইতেছিলাম, কহিলাম—আপনি বসুন, আমি একটু হাওয়া খেয়ে আসি। সামান্য একটু দূরে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আমরা গোপালগঞ্জের সীমানার মধ্যে আসিয়াছিলাম। ষ্টীমার কাটা-নদী ছাড়াইয়া মধুমতীতে পড়িয়াছে। নদীর পাড়ে ছোট ছোট কয়েকটি বাংলো—বেশ দেখা যায়। কিছু দূর অগ্রসর হইলে দেখা গেল স্কুল-ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছেলেরা আমাদের দেখাইয়া কি যেন বলাবলি করিতেছে। কাছারীগুলিও সব নদীর পাড়ে। তখনও এগারটা বাজে নাই, কাজেই উকিল-মোক্তারের দল মহাফেজখানায় ঘোরাফেরা করিতেছে। কেহ কেহ বা ষ্টীমারের দিকে চাহিয়া আছে—বোধ হয় মক্কেল আসিবার কথা। ওদিকে শরদিন্দু বাবুদের কথাবার্ত্তাও শুনিতেছিলাম।

তাঁর স্ত্রী বলিতেছিলেন—হ্যাগা, ভদ্রলোকের কাছে ফিস্ ফিস্ ক'রে আমার নামে কি বললে?

—কই না, তোমার বিরুদ্ধে ত কিছু বলিনি।

বল নি বইকি, আমি ত আর কানে খাটো নই—সব শুনেছি। কতদিন তোমায় কত ক'রে বল্‌লাম, তবু কি তোমার লজ্জা হয় না? এক জন অপরিচিত লোকের কাছে স্ত্রী-নিন্দে করা বুঝি খুব বাহাদুরি, না? তোমাকে নিয়ে আমি কি করব বল ত? মান-সম্ভ্রম কিছু রাখলে না।

—তুমি মিছিমিছি আমায় বকছ। আমি কিছু বলি নি, বিশ্বেস না-হয় ভদ্রলোককে ডেকে জিজ্ঞেস কর।

—হাঁ, তা হ'লেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্তটা হয় আর কি। কিছু তলিয়ে দেখবার ত মস্তিষ্ক নেই, কেবল জান বক্-বক্ করতে। ফের তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি, যদি ঘুণাক্ষরেও আমি এসব আর জানতে পারি বা শুনতে পাই তাহলে একটা অঘটন না ঘটাই ত আমার নামে কুকুর পুষো।

ষ্টেশনে ভিড়িবার জন্য ষ্টীমারটি তখন ঘুরিতেছিল। এসব ষ্টেশনে উঠা-নামার কাজটা ভারি হাঙ্গামের ব্যাপার।

একখানি মাত্র সিঁড়ি ফেলিয়া দুই প্রান্তে দুই জন খালাসী একটি বাঁশ ধরিয়া রাখে—যাত্রীরা বাঁশের ওপর হাত ভর করিয়া সিঁড়ি দিয়া ষ্টীমারে ওঠে। কোনমতে একবার পা এদিক-ওদিক হইলেই একেবারে পপাত সলিল-তলে।

খুলনা পৌঁছিতে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। শরদিন্দু বাবু আমার টিকিটখানা চাহিয়া তাঁহার নিকট রাখিলেন—ইহাতে ষ্টীমার কোম্পানীকে অতিরিক্ত মালের ভাড়া দিবার আর কোন আশঙ্কা রহিল না।

আমাদের ষ্টীমারখানি ষ্টেশনে দাঁড়ান আর একখানি ষ্টীমারের গায়ে ভিড়িলে। মিনিটখানেক পর প্রায় শতখানেক কুলি যুদ্ধের ফৌজের মত দৌড়াদৌড়ি করিয়া নীচে উপরে সমস্ত মাল আগলাইয়া দাঁড়াইল।

আমি কহিলাম,—চলুন শরদিন্দু বাবু, এবার নামা যাক্।

—কাইগুলি একটু দাঁড়ান মশাই, ভিড়টা কম্‌তে দিন। আস্তে আস্তে না গেলে, শেষটায় গিন্নি পড়ে-টড়ে গেলে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হবে।

শরদিন্দুবাবুর স্ত্রী এই কথা শুনিয়া কতখানি রাগিলেন জানি কিন্তু আমি কাছে থাকায় চোখরাঙানি ছাড়া মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না। কহিলাম—আপনি ওঁকে নিয়ে আগে চলুন, আমি কল্পনাকে নিয়ে পেছনে আস্‌ছি, আর কুলি-দুটো মাঝখানটায় থাক।

অবতরণ-পর্ব্ব শেষ হইলে শরদিন্দু বাবু বলিলেন,— আজ আর আপনার অন্য কোথাও যাওয়া হ'তে পারে না। চলুন আমাদের সঙ্গেই। ওঁর রান্না না খাইয়ে আপনাকে ছাড়ছি না। (কানের কাছে মুখ আনিয়া) মাঝে মাঝে রাগ করিলেও, আমার জন্যে ওঁর ভারি দরদ। তাহ'লে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, গাড়ী ডাকা যাক।

আমি দুই-এক বার অসম্মতি জানাইয়া পরে শরদিন্দু বাবুর কথাতেই রাজী হইলাম।

বাঙালীর চরিত্র

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

বাংলা দেশে যাহারা চাষবাস করে, গ্রামে থাকিয়া কামার, কুমোর বা ছুতারের কাজ করে, তাহাদের সম্বন্ধে এ প্রবন্ধ নয়। এই সকল গ্রামবাসীর জাত আছে, সমাজ আছে, গ্রামের শাসন—ভালই হউক অথবা মন্দই হউক, তাহারা তাহা মানিয়া চলে। কিন্তু তাহাদের ছাড়া বাংলায় ইংরেজ-শাসনের পরে যে নূতন বাঙালী জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা অন্নের জন্য ইংরেজের কাছে চাকরি করে, যাহাদের সমাজ নাই, যাহারা একটি পঙ্গু ব্যক্তিত্ববাদের উপাসনা করে, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আজ যে-সকল বাঙালী শহরে বাস করিতেছে, তিন-চার পুরুষ পূর্ব্বে তাহারা গ্রামেই জীবনযাপন করিত। তাহাদের চাষবাস ছিল, শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, আনন্দ-উৎসব সবই ছিল। তাহার পর ইংরেজ বণিকের হাতে যখন দেশের শাসনভার চলিয়া গেল, তখন হইতে ক্রমে ক্রমে দেশের বিভিন্ন শিল্প নষ্ট হইতে লাগিল। তাঁতির কাপড়ের ব্যবসায় গেল, এবং বাংলার বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য যে-সকল শিল্পও ছিল, সেগুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে লাগিল। এমন অবস্থায় গ্রামের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান ছিল তাহারা শহরে আসিয়া ইংরেজ বণিকের জন্য মাল কেনাবেচা করিতে লাগিল। যাহারা তাহা পারিল না, তাহারা গ্রামে থাকিয়া নিজেদের জাতিব্যবসায়ের পরিবর্ত্তে চাষবাসে মন দিল। চাষী-মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং জমিদারেরা সুবিধা বুঝিয়া মজুরির হার কমাইয়া দিতে লাগিলেন। ভাগে চাষ করিবার বহু লোক জুটিল এবং জমিদারেরা বৎসরের পর বৎসর বিভিন্ন চাষীকে ভাগে জমি চাষ করিবার জন্য নিয়োগ করিতে লাগিলেন।

যে-জমিতে মজুর বেশী দিন একটানা থাকিতে পাইবে না, পরের মর্জির উপর যেখানে থাকা-না-থাকা নির্ভর করে, সেই জমিতে খাটিয়া-খুটিয়া সার দিয়া দুইটির জায়গায় তিনটি ফসল করা মজুরের গরজ নয়। সেই জন্য দেশের চাষের অবস্থাও ক্রমে ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল।

বাঙালীর গ্রাম্য আর্থিক জীবনে গত শতাব্দী ধরিয়া এইরূপে একটানা ভাঙন চলিতেছে। তাহার ফলে গ্রামের চাষী এবং কামার, কুমোর, ছুতার ও পটুয়া, কাঁসারী অথবা স্যাকরার মধ্যে যে অন্নের বন্ধন ছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মুচি চাষ করিতেছে, নাপিতের ছেলে কলিকাতায় পাটের দালালী করিতেছে, কায়স্থ হয় চাকরি করিতেছে নয়ত মোটর হাঁকাইতেছে। এক কথায় পূর্ব্বে যে বর্ণ-বিভাগকে আশ্রয় করিয়া লোকের অন্ন জুটিত, আজ তাহার স্থানে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, কেননা জাতীয় বৃত্তির দ্বারা আর আহার জুটিতেছে না।

গ্রামের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেমন একটি অন্নের বন্ধন ছিল, তেমনই তাহার ফলে একটি প্রীতিরও বন্ধন বর্ত্তমান ছিল। সেই অবস্থা হইতে হঠাৎ যখন বাঙালীকে শহরে ইংরেজ বণিকের আপিসে চাকরির সন্ধানে ছুটিতে হইল, তখন তাহার অন্নের বন্ধন পর-ভাষাভাষী, দূরদেশবাসী জাতির সহিত স্থাপিত হইল। ইংরেজ বণিক ও বাঙালী সহকারীর চেষ্টায় যে নূতন কারবার গড়িয়া উঠিল, তাহা ভারতের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় নাই; বরং ভারতবর্ষ হইতে বহু দূরে অবস্থিত ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্যই প্রধানতঃ গঠিত হইয়াছিল। সেই ইংরেজের আপিসে এবং রাজ-দরবারে চাকরি করিবার জন্য গ্রাম হইতে তাঁতি আসিল, সুবর্ণবণিক আসিল, সদ্‌গোপ আসিল, কায়স্থ ব্রাহ্মণ ত আসিলই। ইংরেজের দরজায় আসিয়া তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া গেল এবং তাহার মধ্যে যে বেশী কর্ম্মঠ, বেশী চতুর, সে-ই নিজের সংসার গুছাইয়া লইল। যাহারা পূর্ব্বে একটি সমাজ-দেহের হাত, পা, মুখ বা মাথা ছিল, আজ রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনের ফলে তাহারা সবাই নূতন একটি আর্থিক সংগঠনের বাহক বা দাস মাত্র হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দাসত্বের মাহিনা বাড়াইবার জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া গেল। গ্রাম্য সমাজ-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া টুকরা টুকরা মানুষগুলি শহরে পাশাপাশি বাস করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে নূতন কোনও সমাজ গড়িয়া উঠিল না। আজ তাহারা পরস্পরের সহযোগিতায় অন্ন-সংস্থান করে না, বরং অন্ন-সংস্থানের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করিয়া থাকে।

ইহার ফলে বাঙালী গত শতাব্দী ধরিয়া সামাজিকতার পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর ব্যক্তিত্ববাদের ঘোর উপাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে নবপ্রবর্ত্তিত আর্থিক ব্যবস্থার ফলে বাংলা দেশের যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অন্য কোনও প্রদেশে তত হয় নাই। অন্যান্য প্রদেশে কামার, কুমোর, বণিক, স্যাকরা, মুচি এবং চাষী সবই স্থানীয় লোক পাওয়া যায়। তাহারা পরস্পরের সাহায্যে এখনও বাঁচিয়া আছে; সেখানে এখনও পুরাপুরি গ্রাম্য আর্থিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া যায় নাই। কিন্তু বাংলা দেশে ভাঙন এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে বাংলার গ্রামে কামার, ছুতার, অথবা চাষী মজুর পর্য্যন্ত বিহার বা সাঁওতাল পরগণা হইতে আনিতে হয়; এবং বাংলায় যত কামার, কুমোর, এমন কি "হরিজন" পর্য্যন্ত ছিল তাহারা সবাই লেখা-পড়া শিখিয়া "ভদ্রলোক" হইয়া শহরে চাকরির সন্ধানে ঘুরিতেছে। গ্রামের সমাজে এখন আর প্রাণ নাই এবং শহরের মধ্যে ত কোন সমাজ এখন পর্য্যন্ত গড়িয়াও উঠে নাই। ইহার ফলে বাঙালীর চরিত্রে সামাজিক বৃত্তিগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া বাঙালী একচ্ছত্র ব্যক্তিত্ববাদের উপাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সকল ঐতিহাসিক কারণের বশে, ব্যক্তিত্বের অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে, আজ বাংলা দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া নূতন কোনও প্রতিষ্ঠান, কোনও মহৎ কার্য্য করিতে পারিতেছে না। আধুনিক বাংলায় যে বড় লোক নাই, তাহা নহে। যাঁহারা আমাদের দেশে বড়, তাঁহারা যে-কোনও দেশে, যে-কোনও কালে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা একাই বড়। একাই তাঁহারা বড় বড় কাজ করিয়াছেন। কিন্তু গত শতাব্দীর মধ্যে দশ জন বাঙালী মিলিয়া, দশ জনের সম্মিলিত মতে কোথাও একটা বড় কাজ করিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না।

বাঙালীর গড়া তিনটি প্রতিষ্ঠান লওয়া যাক। কাহারও নিন্দা করিবার জন্য এ আলোচনা করিতেছি না, বাঙালী-চরিত্রের পরিণতি বুঝিবার জন্যই আমাদের এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। বাঙালীর গড়া নামকরা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় এবং কংগ্রেসী করপোরেশন ও বোলপুরের শান্তিনিকেতন ধরা যাইতে পারে। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এ তিনটির মধ্যে ব্যক্তিত্ববাদী, অসামাজিক, বাঙালীর হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ই হউক আর কর-পোরেশনই হউক, তাহা মোটামুটি এক-এক জন মহা শক্তিশালী বাঙালীর কীর্ত্তি। আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন অথবা রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই চরম ব্যক্তিত্ববাদের উপাসক। তাঁহারা যে-সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা অসংখ্য লোকের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রকাশ নয়। অর্থাৎ তাহা কোনও সমাজের দ্বারা গড়া জিনিষ নয়। যে তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম করা হইয়াছে, তাহারা একান্ত ভাবে ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি। অন্য যাঁহারা আশুতোষ চিত্তরঞ্জন বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপ বাদ দিয়া কাজ করিয়াছেন। নয়ত প্রতিষ্ঠান-চালনায় এই সকল মহাপুরুষের পাশে বেশী দিন তাঁহাদের স্থান হয় নাই। ফলতঃ প্রতিষ্ঠানগুলি একান্ত ভাবে আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছবি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এই তিন জন মহাপুরুষই মজ্জায় মজ্জায় ইংরেজী আমলের ব্যক্তিত্ববাদী বাঙালী।

গ্রামের মধ্যে একবার একটি সভায় দেখিয়াছিলাম যে, যাহারা কার্য্যারম্ভের পরে আসে তাহারা সমস্ত সভার একটা সম্মিলিত সত্তাকে স্বীকার করিয়া লয়। দেরি করিয়া আসিলে তাহারা সভাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পরে তাহার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। কিন্তু শহরে বাঙালীর সভায় দেখিয়াছি যে যাঁহারা দেরিতে আসেন, এমন কি যাঁহারা সভার মধ্যেও আছেন, তাঁহারা সভার কোন স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলিয়া মানেন না। বাহিরে যে যদু, মধু অথবা রামের সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ ছিল, সভার মধ্যে তাহারা যে আর যদু মধু রাম নাই, বরং একটি বৃহৎ সমাজের আদি স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন, এ-কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। সভার মধ্যে থাকিয়াও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা পরস্পরের সুখ-দুঃখ লইয়া আলোচনা করেন। অথচ এমন হইবার কোনও কারণ নাই। সভাস্থ আমি এবং বাহিরের আমির মধ্যে যে আকাশপাতাল প্রভেদ আছে ইহা স্বীকার করাই সমাজ-জীবনের মূলকথা।

বোম্বাইয়ে একদিন ট্রামে যাইতেছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া অপর এক জনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। ট্রামের কণ্ডাক্টার তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিয়া গেল, "বাবু, এটি আপনার বাড়ি নয়, আরও দশ জন আছেন।" অথচ এরূপ ঘটনা বর্ত্তমান কলিকাতা শহরে কল্পনা করাও বোধ হয় কঠিন। ট্রামে, বাসে, রেলগাড়ীতে যে মুহূর্ত্তে আমি উঠিলাম সেই মুহূর্ত্তেই যে আমি আর আমি নই, বরং একটি ক্ষুদ্র সমাজের সভ্য, এ-কথা সর্ব্বদা ভুলিয়া আমরা অন্দরমহলের আমির মত আচরণ করি। বাঙালীর ব্যক্তিত্ববাদ-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই অন্দরমহলের জীবনই বড় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর কংগ্রেসে, করপোরেশনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বত্রই আসল কাজকর্ম্ম অন্দরমহলে ঘটিয়া থাকে। ইংরেজের অনুকরণে যে-সকল মিটিং করা হয়, সেখানে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। অন্দরমহলে যে সমাধান আগে হইতে ঠিক হইয়া আছে, তাহাই মিটিঙে পাস করাইয়া লওয়া হয়। তাহাতে অন্ততঃ বাহিরের জগতের কাছে আমাদের সামাজিক ঠাট বজায় থাকে।

রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ অথবা চিত্তরঞ্জনের হাতে পড়িয়া এরূপ অন্দর-মহলী অভ্যাসের দ্বারা হয়ত বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের পরে, তাঁহাদের অপেক্ষা নীরেস লোকের হাতে পড়িলে যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? তিন জনেই সমাজ নামক কোনও অশরীরী বস্তুকে সম্মান করেন নাই। তাঁহারা যে দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছেন এ-কথা সত্য, কিন্তু বাঙালীকে নূতন সমাজ বাঁধিতে হইলে যে-সকল সামাজিক গুণ আয়ত্ত করিতে হইবে, যেগুলি ইংরেজ শাসনের পূর্ব্বে ছিল অথচ এখন লোপ পাইয়াছে, যেগুলি ইংরেজের নিজের মধ্যে আছে এবং ইংরেজ-জাতিকে প্রভূত শক্তিদান করিতেছে,

সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এ তিন জন শক্তিমান পুরুষ কোনও শিক্ষা দেন নাই। তাঁহারা তিন জনেই ব্যক্তিত্ববাদী এবং স্বীয় উদাহরণের দ্বারা দেশে ব্যক্তিত্ববাদকে এবং অসামাজিকতাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইহাই হইল বাঙালীর বর্ত্তমান চরিত্র এবং তাহার উৎপত্তির মূলগত কারণ। বাঙালীকে আজ যদি আবার নিজের চরিত্রের সামাজিকতার বোধ আনিতে হয়, তবে নিজেদের মধ্যে পুনরায় তাহাকে একটি অন্নের বন্ধন স্থাপন করিতে হইবে। ইংরেজ বণিকের আপিসে অথবা রাজসরকারের চাকরি করিবার জন্য বাঙালী এতদিন বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রাম (struggle for existence-এর) নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে; এবার তাহাকে নূতন একটি জীবন গঠন করিবার জন্য পারস্পরিক সাহায্যের (mutual aid-এর) শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

নিজেদের মধ্যে অন্নসূত্রের বন্ধন স্থাপন করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন। ইহাই হইল মূলকথা। ব্যক্তিত্ববাদ আর যাহাই সাধন করুক না কেন, তাহার এ ক্ষমতা নাই যে সে আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে মোচন করে। স্বাধীনতার স্পৃহা আজ দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিতেছে এবং তাহারই সাধনায় আজ দেখা যাইতেছে যে যে-ব্যক্তিত্ববাদ চাকুরে বাঙালীকে অন্নসংস্থানের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, আজ তাহাই স্বাধীনতা-অর্জ্জনের যত্নে পদে পদে বাধা দান করিতেছে। সেই স্বাধীনতার জন্যই চাকুরে বাঙালীকে আজ তাহার ব্যক্তিত্ববাদ খর্ব্ব করিয়া সামাজিকতাবোধের অভ্যাস করিতে হইবে।

মধুসূদনের "বঙ্গ-ভাষা"

শ্রীদীননাথ সান্যাল

কবিবর মধুসূদনের কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ কাব্যগুলির মধ্যে কেবল "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" হইতেই অনেক বিষয়ে সুস্পষ্ট-ভাবে তাঁহার মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় পরিচয় পাওয়া যায়। তাৎকালিক হিন্দু-কলেজের শিক্ষা-দীক্ষা-প্রসূত পাশ্চাত্য-মোহের প্রভাবে অত্যধিক মাত্রায় প্রভাবিত মধুসূদনের বাহ্য আচরণ ও হাব-ভাবের ভিতরে তাঁহার মনটি কিরূপ ছিল, তাহা ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে বেশ পরিস্ফুট-ভাবেই আছে। এখানে আমি সে-কথার বিস্তার করিব না। এখানে কেবল ঐ কবিতাবলীর প্রথম কবিতা—"বঙ্গ-ভাষা" সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। "উপক্রম"-শীর্ষক প্রথম দুইটি কবিতা ঐ গ্রন্থখানির ভূমিকা মাত্র। তৃতীয় কবিতা "বঙ্গ-ভাষা"ই ঐ পুস্তকের এক শত কবিতাবলীর প্রথম কবিতা এবং বিষয়-গুণে ঐ কবিতাটিই প্রথম স্থানের যোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ কবিতাটির দুর্ব্যাখ্যাই অনেক স্থলে সুপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

কবি তাঁহার "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" ফ্রান্স্ দেশের ভার্সাই-নগরে প্রবাস-কালে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এ-দেশে থাকিতেই তাঁহার ঐরূপ কবিতাবলী লিখিবার ইচ্ছা হয়; "মেঘনাদ-বধ" শেষ করিয়াই, তিনি "কবি-মাতৃ-ভাষা"-শীর্ষক একটিমাত্র চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়া, বন্ধু রাজনারায়ণকে পাঠাইয়া দেন। ঐ কবিতাটি অনেকের জানা না থাকিবার সম্ভাবনায় "মধু-স্মৃতি" হইতে সেটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম:—

> "নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
> অগণ্য; তা' সবে আমি অবহেলা করি,
> অর্থ-লোভে দেশে-দেশে করিনু ভ্রমণ,
> বন্দরে-বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
> কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
> এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
> অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
> তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায়-মন।
> বঙ্গ-কুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
> কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
> সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
> নিজ গৃহে ধন তব; তবে কি কারণে
> ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি?
> কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?"

অলঙ্কার-মণ্ডিত এই ক্ষুদ্র কবিতাটির মধ্যে যে ভাবটি

লাভাদি দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন করিয়া তাহাতে ভাল ভাল কিছু বহি, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র রাখিতে হইবে এবং ভাল নূতন বহি কিছু বাহির হইলে তাহা আনাইতে হইবে। অনেক গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল নয়, রাস্তাঘাট ভাল নয়। এই এই বিষয়ে সরকারী বেসরকারী যত প্রকার সুবিধা পাওয়া যায় তাহা লইতে হইবে, সুবিধা না-থাকিলে স্বাবলম্বন দ্বারা যথাসাধ্য করিয়া লইতে হইবে। অনেক গ্রামে—অধিকাংশ গ্রামে বলিলেই ঠিক্ হয়—রোগ চিকিৎসার বন্দোবস্ত নাই বলিলেই হয়। প্রত্যেক গ্রামে না-হউক, কয়েকটি পরস্পর-নিকটবর্ত্তী গ্রাম মিলিত হইয়া, এক জন করিয়া চিকিৎসক রাখিবার ও একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

গ্রামে বাস আরও কোন কোন কারণে—বিশেষতঃ কয়েকটি জেলায়—দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। চুরি ডাকাইতি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ, এবং নারীহরণ তন্মধ্যে প্রধান। ইহার প্রতিকারার্থ গবর্ন্মেণ্টের যাহা করণীয়, তাহা করা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে কি না বলিতে পারি না। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন ও রক্ষণ, এবং সকলের সম্মিলিত পৌরুষ দ্বারা প্রতিকার হইলে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা কখন হইবে, তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলেও ত চলিবে না। প্রত্যেক পরিবারের এবং সমর্থ বয়সের প্রত্যেক সক্ষম পুরুষ ও স্ত্রীলোকের, বালক-বালিকাদেরও, সাহস ও শৌর্য্য একান্ত আবশ্যক।

—

ঝিনাইদহে বঙ্গের "তপশীলভুক্ত" জাতিদের কন্‌ফারেন্স্

ঝিনাইদহ কোন জেলার সদর শহর নহে, একটি মহকুমার প্রধান শহর মাত্র। কিন্তু তথায় গত মাসে "তপশীলভুক্ত" জাতিদের যে কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল, তাহাতে প্রতিনিধির সংখ্যা ও শ্রোতাদের সংখ্যা যেরূপ হইয়াছিল, তাহা প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের পক্ষেও অগৌরবের কারণ হইত না। আর একটি প্রশংসার বিষয় এই, যে, "অনুন্নত" জাতিদের যে-সকল নেতা এই কন্‌ফারেন্সের আয়োজন

ঝিনাইদহ অনুন্নত সমাজ সম্মিলনে হিন্দুমিশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজীর সহিত সমাগত ঘোড়াল মিলন-সংঘের বালিকা স্বেচ্ছাসেবিকাগণ। ইহারা সেখানে লাঠি ছোরা ও অন্যবিধ খেলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস

করেন, জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণাতে কোন একদেশদর্শিতা ছিল না। দৈহিক স্বাস্থ্য বল ও সাহসের দিকে তাঁহাদের যেমন দৃষ্টি ছিল, অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ প্রভৃতি দূর করিয়া সামাজিক উন্নতি সাধন ও একতা লাভের দিকেও তাঁহাদের তেমনই দৃষ্টি ছিল। বাল্যবিবাহ দূরীকরণ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন তাঁহাদের লক্ষীভূত ছিল। রাজনৈতিক বিভাগের অধিবেশনে তাঁহারা নূতন ভারতশাসন বিল, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, পুণা-চুক্তি প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছিলেন।

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বিভাগে তাঁহারা "তপশীলভুক্ত" জাতিদের শিক্ষাবিষয়ক ও আর্থিক উন্নতির নানা উপায় আলোচনা করিয়াছিলেন।

প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা যেমন লাঠি ও তলোয়ার খেলা দেখাইয়াছিল, তেমনই বোড়াল গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও লাঠিখেলা জিউজিৎসু প্রভৃতি দেখাইয়াছিল।

এই কন্‌ফারেন্সটির সাফল্যের জন্য ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস, ইহার রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের সভাপতি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস, বি-এল, ও অন্যান্য নেতারা এবং ঝিনাইদহের স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ধন্যবাদভাজন। বাহির হইতে ইহাতে ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, স্বামী সত্যানন্দ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, ডাঃ জীবনরতন ধর, ডাঃ মোহিনীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যোগ দিয়াছিলেন।

সামাজিক বিভাগে সভাপতি-রূপে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে অনেক সারগর্ভ কথা ছিল। তাঁহার শেষ কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

সমাজই রাষ্ট্র গঠন করে এবং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে। সমাজ নিজ কল্যাণ-কামনায় রাষ্ট্রগঠনে নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং রাষ্ট্রের আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত থাকে। রাষ্ট্রও সমাজের হিতসাধনে যত্নবান হয়। সংক্ষেপতঃ এই ত রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক। সুতরাং যে-দেশে রাষ্ট্রনীতি সমাজের হিতসাধনের জন্য প্রণীত হয়, সে-দেশে সমাজ রাষ্ট্রের সাহায্যে ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করে। কিন্তু যে-দেশে রাষ্ট্র নিজ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে এবং সমাজের স্বার্থ উপেক্ষা করে, সে-দেশে উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাধে। আমাদের রাষ্ট্রের উপর সমাজের দাবি নাই, সুতরাং রাষ্ট্র হইতে সমাজ প্রকৃতপ্রস্তাবে কিছুই পায় নাই। তাহার ফল এই পর্য্যন্ত ভাল হয় নাই। ভবিষ্যতেও হইবে না। রাষ্ট্র আমাদের হাতে লিখিয়া, আমাদের উন্নতি অসম্ভব।

...টি অনেকের

যাঁহারা মনে করেন, আগে সমাজসংস্ক... হইতে সেটি এ উন্নতি হউক, তাহার পর রাষ্ট্রীয় স্বরাজ, তাঁহারা রজনীকান্ত বাবুর শেষ বাক্যটি ... করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বাঙ্গা... বৈদ্য কায়স্থ ছাড়া অন্য জাতির লোকেরা যে-সব ...গে। করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন। তি... প্রকার কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন... ভারতের

রাজনৈতিক শাখায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্র... নীচে মুদ্রিত হইল।

(১) "যেহেতু নূতন শাসন-সংস্কার আইন, যাহা অধুনা বৃটিশ পার্লেমেণ্টে রচিত হইতেছে, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী, যেহেতু ইহা দ্বারা বৈদেশিক শাসন ও শোষণ পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত রাখিবার ও চিরস্থায়ী করিবার বাঞ্ছা হইতেছে; যেহেতু ইহা বর্ত্তমান

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস

শাসনব্যবস্থা ও হোয়াইট পেপার অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকারক, অপমানজনক ও অত্যন্ত ব্যয়সঙ্কুল এবং যেহেতু ইহা ভারতে সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে নিন্দিত হইয়াছে, সেই হেতু এই সম্মিলনী এই শাসন-সংস্কার সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিতেছে। ইহা বর্জ্জন করিবার জন্য দেশবাসীকে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রবল আন্দোলন চালাইবার অনুরোধও এই সম্মেলন জ্ঞাপন করিতেছে।''

(২) এই সম্মেলন বিবেচনা করে, বৃটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত জাতীয়তা ও গণতন্ত্র বিরোধী এবং জাতির পক্ষে অকল্যাণকর। ইহার ভবিষ্যৎ ফল অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং ইহা সমগ্র জাতিকে বহুধা বিভক্ত করিয়া সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে; এই জন্য এই সম্মেলন সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতেছে। এই অকল্যাণকর বলী"তে সুস্পষ্টস্গৃহিত করিবার জন্য ভারতের সর্ব্বত্র আন্দোলন করিতে হইতেছিলেন বলিয়াই রোধ করিতেছে। এই সম্মিলনী বিশ্বাস করে যে, ং পূর্ণবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রথা ভিত্তি করিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে ব্যতীত আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ

রর.গৌরদাসের ক'

হেতু পুণা-চুক্তিতে অনুন্নত হিন্দুদের নির্ব্বাচন দুই দফায় রিতে এবং . তিনি র দরিদ্র অনুন্নত নির্ব্বাচনপ্রার্থী ও ভোটারদের ব্যয়-ঙ্গালায় লিখিতে ,ব, সেইহেতু এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, পুণা-চুক্তি হইয়াছিলেন। ত না করিয়া উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কমিটি গঠিত হউক এবং তাঁহাদের মতি স্বল্প-কাল মধ্যোস মধ্যে প্রকাশ করুন এবং তাহা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের তাৎকালিক সুধীমণ্ডত করুন।

কথা এখানে না -রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, (২) অখিলচন্দ্র দত্ত, (৩) শ্রে সি (৪) রজনীকান্ত দাস, (৫) ডাঃ মোহিনীমোহন দাস, লখিকে (৬) চৈতন্যকৃষ্ণ মণ্ডল, (৭) রসিকলাল বিশ্বাস, (৮) ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (৯) ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত।

ঝিনাইদহে "তপশীলভুক্ত" জাতিদের কন্‌ফারেন্সের অঙ্গস্বরূপ বঙ্গের নমশূদ্র জাতির একটি সম্মেলন হয়। তাহার সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ মণ্ডল নমশূদ্রদিগে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নানা পন্থা নির্দ্দেশ করেন।

—

নারীহরণ, ও বঙ্গের ছেলেমেয়েদের ব্যায়ামপটু

খবরের কাগজে এবং কোন কোন বক্তৃতায় মধ্যে মা এইরূপ ধিক্কারসূচক উক্তি দেখিতে ও শুনিতে পাও যায়, যে, বঙ্গের অনেক যুবক ও বালক এবং অনে মেয়েও দৈহিকবলসাপেক্ষ অনেক ব্যায়াম খেলায় কৃতিত্ব দেখান; তাহাতে তাঁহাদের সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়; অথচ তাঁহাদের দ্বা নারীহরণাদি নারীনির্য্যাতন নিবারিত হয় না। এরূপ ক বলিলে এই সব বলিষ্ঠ ব্যায়ামপটু ক্রীড়ানিপুণ তরুণবয় ব্যক্তিদের প্রতি ঠিক ন্যায্য ব্যবহার হয় না। অনেক স্থলে এই সব ছেলেমেয়ে শহরে থাকে, কিন্তু নারীহরণাদি গ্রামে বেশী হয়, যদিও শহরে একবারেই হয় না এমন নয় যদি কেহ ঘটনাস্থলে বা ঘটনাকালে উপস্থিত থাকিয়া ব নিকটে থাকিয়াও কিছু না করে, তাহা হইলে তাহা নিন্দা নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত। ঘটনার পরেও নিরুদ্দে নির্য্যাতিতা নারীর সন্ধানে সমর্থ বয়সের সব প্রতিবেশী যোগ দেওয়া বা সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

ইহা পরিতাপের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে, যে ঘরে বাহিরে নারীনির্য্যাতন নিবারণের জন্য আমরা সাধ্য চেষ্টাই এ-পর্য্যন্ত করিয়াছি। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত কিছু করা হয় নাই বলিয়াই নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া অধিকতর উদ্যোগী হইতে হইবে।

—

বঙ্গে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা

এইরূপ অনুমান, যে, ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি বিলাতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল।

দেশ।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্	১,৯২,৮০,০০০	২,০৯,২১,০০০
স্কটল্যাণ্ড	২৩,৪৮,০০০	২৫,৩৫,০০০

দেখা যাইতেছে, বিলাতে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক বেশী। অনেক স্ত্রীলোক অবিবাহিত থাকে। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু তথাকার সমাজপতিরা এই যুক্তি প্রয়োগ

[illegible] নাই, যে, কুমারীদেরই যখন অনেকের বিবাহ হয় না, তখন বিধবাদের কাহারও বিবাহ হওয়া উচিত নয়।

বঙ্গে ১৯৩১ সালে পুরুষ ছিল ২,৬৫,৫৭,৮৬০ এবং স্ত্রীলোক ছিল ২,৪৫,২৯,৪৭৮ জন। বঙ্গে কেবল যে পুরুষদের মোট সংখ্যা স্ত্রীলোকদের মোট সংখ্যার চেয়ে বেশী, তাহা নহে; হিন্দু বাঙালীদের দুই-একটি জা'ত ছাড়া প্রত্যেক জা'তেরই স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশী। সেন্সস রিপোর্টে ইহাও দেখা যায়, যে, অধিকাংশ জা'তেরই বিবাহের বয়সের পুরুষের সংখ্যা বিবাহের বয়সের নারীর সংখ্যার চেয়ে বেশী। অতএব বঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ খুব উৎসাহের সহিত চালান একান্ত কর্ত্তব্য। নির্য্যাতিতা কুমারী ও বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত। তা ছাড়া বরপণ ও কন্যাপণের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিয়া সকল অবস্থার লোকের পক্ষেই বিবাহ সহজসাধ্য করা উচিত। হিন্দুসমাজে, এক জা'তের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে এবং ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে বিবাহ চালান উচিত। কোন স্থলে বাঙালী সমাজে বিবাহযোগ্যা কন্যা না মিলিলে বাঙালী পাত্রের অন্যপ্রদেশীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করা উচিত। এ বিষয়ে সিন্ধী ও পঞ্জাবীরা তৎপর। বাঙালী হিন্দু পাত্র অন্য সম্প্রদায়ে জাতা কন্যাকে স্বধর্ম্মে আনিয়া বিবাহ করিতে পারেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা ইহা করিয়া থাকেন।

এই প্রকার নানা বৈধ উপায়ে হিন্দু বাঙালীদিগকে পরিবারী গৃহস্থ হইতে হইবে। নতুবা হিন্দুসমাজের আপাততঃ আপেক্ষিক ক্ষয় এবং অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবিক লোকসংখ্যা হ্রাস অনিবার্য্য।

বলা বাহুল্য, নির্য্যাতিতা সধবা নারীদের সমাজভুক্ত [illegible]ায় কোন বাধাই থাকা উচিত নয়। সমুদয় সামাজিক প্রথা ব্যবস্থা ও নিয়ম এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে কোন নারী পণ্যস্ত্রী না-হয় বা হইতে বাধ্য না-হয়।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যত লোক আছে তাহারাই ত খাইতে পায় না, সকল হিন্দু পুরুষ ও নারী বিবাহ করিয়া গৃহী ও পরিবারী হইলে অন্নকষ্ট আরও বাড়িবে। ইহা ভুল। মনুষ্যত্ব থাকিলে অন্নকষ্ট দূর করিবার পন্থা উদ্ভাবিত হইবে। বাংলা দেশ খুব ঘনবসতি বটে; কিন্তু এখানেও বিস্তর চাষযোগ্য জমী পড়িয়া আছে ও পাকে এবং বহু লক্ষ অবাঙালী নিঃস্ব অবস্থায় বঙ্গে আসিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, অনেকে ধনীও হয়।

দেখা গিয়াছে, বাঙালীর ছেলেরা কোন-না-কোন উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করিতে, দুঃখ বরণ করিতে, প্রাণপণ করিতে পারেন। সমাজকে বাঁচাইয়া রাখা মহৎ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সমুদয় মানসিক ও দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করুন।

—

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা ও আত্মহত্যা

ইহা সাতিশয় পরিতাপের বিষয়, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না-হওয়ায় কোন কোন ছাত্র আত্মহত্যা করে। পাস করিলেও ত অনেকের কাজ জুটে না, এবং, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বার-বার নাম করিয়া দেখাইয়াছেন, বঙ্গের অনেক বিখ্যাত কৃতী লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। মনকে খুব দৃঢ় করিয়া টিকিয়া থাকিবার অশেষ নানা উপায় পরীক্ষা করা যুবকদের কর্ত্তব্য।

—

কংগ্রেসের জুবিলি

কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসর বয়স হওয়ায় তাহার জুবিলি হইবে। আশা করি উদ্যোক্তারা মনে রাখিবেন, এই পঞ্চাশ বৎসরের অধিকতর সময় কংগ্রেস অসহযোগী ছিলেন না। সুতরাং অসহযোগিতার আমলের আগেকার কংগ্রেসওয়ালাদিগকে বাদ দিয়া যেন জুবিলি করা না-হয়। অবশ্য নিমন্ত্রিত হইয়াও যদি আগেকার আমলের কোন কংগ্রেসওয়ালা উৎসবে যোগ না-দেন, তাহা হইলে সেই অসহযোগের জন্য তিনিই দায়ী হইবেন, উদ্যোক্তারা নহেন।

—

আধুনিক ভারতেতিহাস কন্‌ফারেন্স

পুণাতে সম্প্রতি আধুনিক ভারতেতিহাস সম্বন্ধে একটি কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের আধুনিক যুগের আরম্ভ কখন তাহা ঠিক্ নির্দ্ধারিত না হইলেও ইংরেজ-রাজত্ব যে এই যুগের মধ্যে পড়ে তা[illegible] সন্দেহ নাই। অতএব, ইংরেজ-রাজত্বেরও [illegible]তে সেটি [illegible] সত্যবাদিতার সহিত লিখিবার ও লিখাই[illegible] করিবার ও করাইবার ব্যবস্থা এই কন্‌ফারে[illegible] করিয়াছেন বা করিতে পারিবেন কি না, জা[illegible] হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ইতিহাস যে কেবল [illegible] শাসনকর্ত্তাদের শাসনকালের যুদ্ধাদি ঘটনার তারিখ নহে, ইহা এখন ইস্কুলের ছেলেমেয়েরাও [illegible] জনসমাজের নানা অবস্থা, সভ্যতা ও কৃষ্টির নানা[illegible]নে। বর্ণনা ও ক্রমবিকাশ ইত্যাদিও ইতিহাসে থা[illegible] ইহাও এখন মামুলি [illegible]। কি[illegible] আধুনিক যুগের ভারতের ইতিহাস যিনি লিখিবেন, তাঁহাকে তাহা[illegible] সত্যবাদী, সাহসী ও নিরপেক্ষ হইতে হইবে।

আধুনিক ভারতেতিহাসের অনেক উপকরণ ভারতবর্ষে সরকারী কোন কোন দপ্তরে আছে; তার চেয়ে বেশী আছে বিলাতে। সবগুলি উপকরণ ঐতিহাসিকের অধিগম্য ও অধীত হওয়া আবশ্য[illegible]

বিদ্যমান তাহাই কবিবরের জীবনের মহত্তম ঘটনা। সর্ব্বাংশে পাশ্চাত্য-মুখ যে মধুসূদন, তাঁহার মাতৃ-ভাষাকে একান্ত তুচ্ছ ভাবিয়া ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই ;—পরে, প্রতিভাগ্নির উত্তেজনায় যিনি এ-দেশে থাকিতেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা ভাষার, নানা সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত হইবার নিমিত্ত কোন কষ্টকেই কষ্ট জ্ঞান করেন নাই ;—এবং তৎপরে এই দেশেই যাঁহার সারস্বত-প্রতিভা ইংরেজী-ভাষার বাহনেই স্বপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং করিতে থাকিত, যদি না ঘটনা-চক্রের মধ্য দিয়া বঙ্গমাতা তাঁহার এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, অথচ পূর্ণমাত্রায় পথভ্রষ্ট সন্তানটিকে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া না লইতেন।

যাহা হউক, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিল ;—মধুসূদন বাঙ্গলা-সাহিত্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইহাই মধুসূদনের জীবনের মহত্তম ঘটনা। তিনি যে শুধু কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত পড়িয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে ; জয়দেবের "গীতগোবিন্দ," বিদ্যাপতি প্রমুখ 'বৈষ্ণব পদাবলী," কবিকঙ্কনের "চণ্ডী," ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল" ইত্যাদি তাৎকালিক বাঙ্গলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি রস-লোলুপ চিত্তে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ; তাহার প্রমাণ তাঁহার কাব্যাদিতে, বিশেষতঃ "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"তে সুস্পষ্ট-ভাবে পাওয়া যায়। এইরূপে প্রস্তুত হইতেছিলেন বলিয়াই তিনি পাইকপাড়ার রাজ-নিকেতনে নব-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে "রত্নাবলী" নাটিকার অভিনয় উপলক্ষে বাবু গৌরদাসের কাছে ঐ পুস্তকখানির অপ্রশংসা প্রকাশ করিতে এবং তিনি নিজেই উহা অপেক্ষা ভাল নাটক বাঙ্গালায় লিখিতে পারেন, এরূপ গর্ব্বোক্তি করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভা অতি স্বল্প-কাল মধ্যেই কেমন সমুজ্জ্বল ভাবে স্ব-প্রকাশ করিয়া তাৎকালিক সুধীমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল, সে-কথা এখানে না বলিলেও চলে। "মেঘনাদ-বধ" লিখিতে লিখিতে অমৃতের অভিলাষী মধুসূদন সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ কাব্যখানিই তাঁহাকে অমর করিবে। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, বঙ্গ-সরস্বতীর পদাম্বুজে শরণ লওয়াতে তাহার কৃপাই উহার একমাত্র কারণ। তখন তিনি হর্ষোদ্বেল চিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার মনোভাবের এই শুভ পরিবর্ত্তনটি সুন্দর অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া বঙ্গ-সরস্বতীর শ্রীচরণে নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উপরি উক্ত চতুর্দ্দশপদী কবিতাটিই ঐ নিবেদন এবং উহাই তাঁহার রচিত প্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

ইহার পরে, সঙ্কল্পিত কাব্যাদির মধ্যে কয়েকখানি লিখিয়া এবং অন্যান্যগুলি না লিখিয়াই অতি ব্যস্তে তিনি ইউরোপ-যাত্রা করেন, সেখানে প্রবাসকালে তিনি সঙ্কলিত "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" লিখিয়া তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত কবি-জীবন 'সমাপ্ত' করেন। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ চারি বৎসরের জীবনই তাঁহাকে অমর করিয়াছে। ইহার মূল কিন্তু পরিত্যক্ত বঙ্গ-সরস্বতীর ক্রোড়ে তাঁহার পুনরাগমন। তাই বলিয়াছি, ঐ ঘটনাটিই তাঁহার কবি-জীবনের মহত্তম ঘটনা। "মেঘনাদ-বধ" রচনার সময়ে তিনি উহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই ঐ মহাকাব্যখানি শেষ করিয়াই তিনি কবি-মাতৃ-ভাষা লিখিয়া মনের আবেগ মিটাইয়াছিলেন। পরে উহাই পরিমার্জ্জিত-রূপে তাঁহার শেষ কাব্যে প্রথম স্থান পাইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, অলঙ্কারমণ্ডিত ঐ কবিতাটির অলঙ্কার উন্মোচন না করিয়া শুধু কাব্যার্থ গ্রহণ করাতেই অনেকের কাছে উহার দুর্ব্যাখ্যার সৃষ্টি। উহার কাব্যার্থ গ্রহণে আদ্যন্ত-সঙ্গত অর্থ ত হয়ই না ; বরং এই ধারণাই হয় যে—কবি বাঙ্গালা-ভাষাকে তুচ্ছজ্ঞানে নানা পর-ভাষা শিক্ষার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করেন ; পরে বঙ্গ-কুল-লক্ষ্মী স্বপ্নে তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিতে এবং স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্য আলোচনা করিতে, আদেশ করিলে, তিনি সেই আদেশ পালন করেন এবং দেখেন যে, বঙ্গ-ভাষার সাহিত্য-ভাণ্ডার মহামূল্য রত্নাদিতে পূর্ণ।

বলাই বাহুল্য, ঘটনার বিরোধী এই ব্যাখ্যা একান্তই কু-ব্যাখ্যা। এই কু-ব্যাখ্যার ভ্রমেই অনেক শিক্ষিত প্রবীণ ব্যক্তির মুখেও প্রশ্ন শুনিতে হয়,—"মধুসূদন কি বিলাত থেকে ফিরে এসে মেঘনাদ-বধাদি কাব্য রচনা করেন ?" বড়-বড় দুইখানি জীবন-চরিত প্রচলিত থাকিতেও আমাদের

শিক্ষাভিমানী অনেক ব্যক্তির এই দশা। সাধে কি, মধুসূদনের মনোভাবের এই মহাপরিবর্ত্তনের পরে, তিনি মাতৃ-ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য যথোচিত তীব্র ভাষায় ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই?

"If there be any one among us to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. European scholarship is good, inasmuch as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe. But when *we* speak to the world, let us speak in our own language. Let those who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue. Here is a bit of 'lecture' for you and the gents who fancy that they are Swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays; I assure you, they are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be called 'educated,' who is not master of his own language." (গৌরদাসকে লিখিত পত্র হইতে)

দুঃখের বিষয়, এতকাল পরেও এ 'লেক্চার' শুনিবার সময় অতীত হয় নাই। এখনও আমরা অনেকেই মোহ-নিদ্রাভিভূত হইয়া পাশ্চাত্যের স্বপ্ন দেখিতেছি এবং স্বপ্নের হাসি হাসিতেছি! কবে এ মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিবে?

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী রমা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি দু হাজার চারি শত টাকা পরিমিত একটি বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। এই বৃত্তির সাহায্যে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ১লা জুলাই হইতে এক বৎসর যাবৎ দর্শন শাস্ত্রে গবেষণা করিবেন। কিছু কাল পূর্ব্বে রায় বাহাদুর বিহারীলাল মিত্র বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কল্পে যে অর্থ দান করিয়াছিলেন তাহা হইতে এই বৃত্তিটি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমতী রমা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মেধাবী ছাত্রী। তিনি বি-এ অনার্স পরীক্ষায় ও এম্-এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে কিছুকাল গবেষণাও করিয়াছেন। শ্রীমতী রমা স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পৌত্রী।

শ্রীমতী রমা বসু

বিরহ-কাব্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

মমতাজ নাই, তাজ আছে ;—তাই
মমতাজে মোরা চিনি,
রূপাতীত রূপে ব্যথিতের বেদনায় ;
একের চক্ষে একান্ত হয়ে
ছিল যে বা একাকিনী,
বিশ্বে সে আজি শাশ্বত সেবা পায় !
রূপ ক্ষণিকের আঁখির স্বপ্ন,
জোয়ারের জলরাশি—
নিমেষে মিশায় কালস্রোতের মুখে,
সাধনার বলে অদেহ দেবতা
অপরূপে উদ্ভাসি'
অমর হইয়া উঠে মানবের বুকে।

কবে কালিদাস লিখিল কাব্য
কাগজের সাদা পাতে,
বিরহ-মসীতে ডুবায়ে প্রাণের তুলি ;
বিশ্বজগৎ লিখি' দাসখৎ
দিল তারি বেদনাতে
প্রতিদিনকার গৃহসংসার ভুলি' !
সাদার বক্ষে কালোর দুঃখ—
আঁখিপটে আঁখিতারা,
তাহারি আলোক পড়ি' প্রেমিকের চোখে,
দেখায়ে অপার প্রেম-পারাবার
করি' দেয় দিশাহারা,—
মেঘদূত হ'য়ে ফিরে তাই লোকে লোকে !

কবি সাজাহান রচিল তেমনি
শ্যাম ধরণীর বুকে,
সাদার আখরে যে শোক-আলিম্পনা,
শুভ্র পাথরে গাঁথা সেই ব্যথা
নেহারি' ঊর্দ্ধমুখে
আজও করে ধরা আঁখি-সংমার্জনা !
কালের বক্ষে সে শ্লোকের শোক
চিরবিরহের রূপে
বৈধব্যের শ্বেত বাস সম রাজে
বিশ্বভুবন বিস্ময়ে হেরি'
নিঃশ্বসে চুপে চুপে—
কবেকার ব্যথা—বুঝিতে পারে না তা যে !

মন খোঁজে মন—হোক বন্ধন !
দেহ খুঁজে মরে দেহ,—
প্রেমের ধর্ম্ম ভাল জানে মানে তার ;
দু-দিনের যাহা, দু-দিনে ফুরায়,
তাই বুঝি সন্দেহ—
মরণে গাঁথিয়া পরে সে গলার হার !
মনে ভাবে বুঝি—আমি যাই,—তায়
নাহি ক্ষোভ, নাহি ক্ষতি,
ব্যথা বেঁচে থাক্ সন্তানরূপ ধরি',
প্রিয়-বিরহের স্মৃতিতে লভে সে
অমরার সদ্‌গতি,
কালের কালিতে সকলের কোল ভরি' !

হোক্ সব মিছে, প্রেমের সত্য—
সে বুঝি মিথ্যা নয়,
নহে সে ক্ষণিক ঐশ্বর্য্যের মত ;
রাজ্য ও রাজা বিজয়ীর হাতে—
সেও লভে পরাজয়,
আজ যাহা আছে, কাল তাই অপগত !
দুঃখ অমর—নাহি তার ঘর,
আগুনে হয় যা দাহ,
বুক হ'তে বুকে বাঁধে শুধু তার বাসা ;
চিরমানবের বুকে যা গোপনে
বহে তার পরিবাহ,
কালোর কিনারে এই কি আলোর আশা !

হয়ত বা কোন্ সুদূর দিনের
অলঙ্ঘ্য অভিঘাতে
পাষাণ-হর্ম্ম্য—এও ধূলি হয়ে যাবে ;
মর্ম্মরময়ী যে রূপ-কীর্ত্তি
গড়া মানুষের হাতে,—
মানুষের চোখে নির্ব্বাণ তার পাবে !
হাসি' মহাকাল ভরি' জটাজাল
মাখিবে না শুধু ছাই,
গঙ্গার মত বহিবে তাহার প্রীতি ;
ভারত যেমন মরিয়া করেছে
মহাভারতের ঠাঁই,—
চোখ হ'তে বুকে জমায়ে শোকের স্মৃতি।

ভারতবর্ষ

লক্ষ্ণৌ বৈশাখী সম্মিলনী—
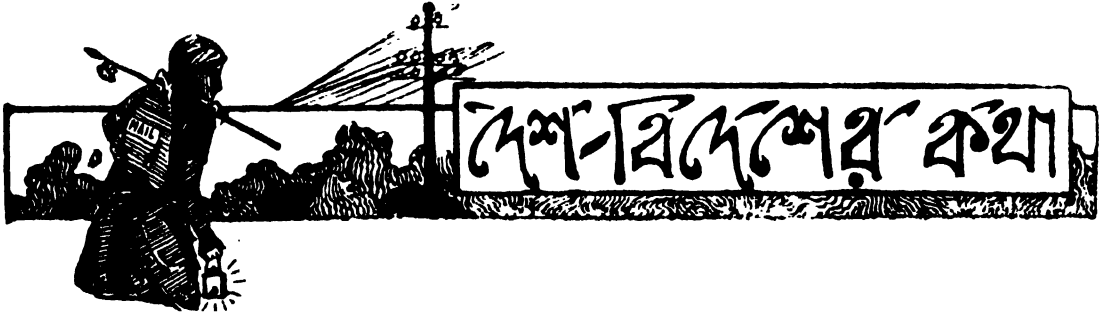
শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ-ডি, লক্ষ্ণৌ হইতে লিখিতেছেন—

গত ৭ই ও ৮ই বৈশাখ লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বাঙালী তরুণদের উদ্যোগে "বৈশাখী সম্মিলনী"র চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন সমারোহ-সহকারে সম্পন্ন হইয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ের এই অনুষ্ঠানটি চারি বৎসর পূর্ব্বে কবি ৺অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীসরল ভট্টাচার্য্যের নটরাজ

সম্মিলনীর উদ্বোধন-উৎসব প্রথম দিবস লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ জাতীয় গীত, "জন-গণ-মন

শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাপুড়ে নৃত্য

অধিনায়ক গীত হইলে কর্ম্মসচিব শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নাতিদীর্ঘ একটি বিবৃতিতে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তার পর সভাপতি মহাশয় একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সরস বক্তৃতা করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। তাঁহার অভিভাষণের বিষয় ছিল 'তরুণের কর্ত্তব্য'।

ইহার পর যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত রঙ্গকৌতুক ও ভারতীয় নৃত্য প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ ও বাংলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠানের সভাপতি হইয়াছিলেন লক্ষ্ণৌ "শিয়া কলেজের" অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্রীশ সেন মহাশয়। ৺অতুলপ্রসাদের জনপ্রিয় "উঠগো ভারতলক্ষ্মী" গানটি উদ্বোধনস্বরূপ গীত হইয়াছিল।

শ্রীবিমলকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের গন্ধর্ব্ব নৃত্য

তার পর সভাপতি মহাশয় আধুনিক যুব-আন্দোলন সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন।

সভাপতির অভিভাষণের পর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইহাতে অনেক ছোট বড় ছেলেমেয়েরা যোগ দিয়াছিলেন। অতঃপর অধ্যাপক শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নবরচিত একটি গল্প পাঠ করেন। গল্প পাঠের পর গান গাহিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সুধাংশু বাবু। তার পর লক্ষ্ণৌয়ের জনকয়েক ব্যায়াম-শিল্পী শ্রীঅশোককুমার মিত্র, শ্রীঅমরেন্দ্র রায়, শ্রীগঙ্গা কর্ম্মকার দুরূহ ব্যায়াম ও পেশীসংযমন প্রদর্শন করিয়া অবিমিশ্র আনন্দ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সম্মিলনীর সহিত ছোট একটি কারুশিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাতে গুটিকয়েক উচ্চ শ্রেণীর সুচীশিল্পের কাজ পাওয়া যায়। শ্রীসরল ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী স্বর্ণলতা দত্ত ও শ্রীমতী হেমলতা দত্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত সুচীশিল্প প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। প্রদর্শনীর বস্তুগুলির গুণ বিচার করিয়াছিলেন মিসেস্ এন্. কে. সিদ্ধান্ত ও মিসেস্ এস্. এন্. রায়। মিসেস্ সিদ্ধান্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক দুইটি অতিরিক্ত পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন।

সর্ব্বশেষে তরুণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী শ্রীকিরণ ধরের সুযোগ্য প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" অভিনীত হয়। কর্ম্মীরা পূর্ব্বিকার মত এবারও রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া সাহস ও রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। অভিনয় সব দিক দিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

সম্মিলনীর একটি উদ্দেশ্য ছোটদের সাহিত্যচর্চ্চা ব্যাপারে উৎসাহিত করা। এইজন্য অন্য বৎসরের মত এবারও রচনার জন্য অনেকগুলি পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা হয়। "কাব্য সাহিত্যে অতুলপ্রসাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বসু ও শ্রীমোহিতকুমার রায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হন। "প্রবাসী বাঙালীর আর্থিক সমস্যা ও তাহার প্রতিকার" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী ও শ্রী"প্রভাত" পুরস্কার পাইয়াছিলেন। "অতুল-প্রসাদ" শীর্ষক কবিতার জন্য শ্রীভূপেন্দ্র দত্ত, শ্রীসরল ভট্টাচার্য্য ও "জাগরণ" শীর্ষক কবিতার জন্য শ্রীরঞ্জন রায় ও শ্রীভূপেন্দ্র দত্ত পারিতোষিক পাইবার যোগ্য বিবেচিত হন। এরূপ রচনা প্রতি-যোগিতা দ্বারা লক্ষ্ণৌয়ের বাঙালী ছেলেদের মধ্যে যে সাহিত্য প্রীতি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা জানিয়া আনন্দ হয়।

নৃত্যরতা শ্রীমতী ডলি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—

কানপুর হইতে শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিতেছেন—

"প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন আগামী ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের অবকাশে কাশীতে হইবে।"

লক্ষ্ণৌ বৈশাখী সম্মিলনীর—সভাপতিদ্বয় ও কর্ম্মীবৃন্দ

চেয়ারে উপবিষ্ট বামদিক হইতে :—শ্রীবিমলকান্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্ম্মসচিব), অধ্যাপক শ্রীশ সেন (সভাপতি), ডক্টর নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (সভাপতি), ডক্টর নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ), শ্রীকিরণ দর (সহঃ কর্ম্মসচিব), শ্রীশৈলেন দত্ত।

মধুচক্র বার্ষিকী—

রাঁচির সহরতলী হিন্দু পল্লীতে স্থানীয় রবীন্দ্রসাহিত্য সেবা প্রতিষ্ঠান "মধুচক্রের" চতুর্থ বার্ষিক উৎসব গত ২৩শে বৈশাখ সোমবার শ্রীযুক্ত সুধাকান্তি রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। সভাপতিবরণ ও উদ্বোধন সঙ্গীতের পর মধুচক্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবনীশ্বর দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। তারপর তিনি সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিয়া ও বিগত বর্ষের কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। মধুচক্রের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী এই উপলক্ষ্যে "রবীন্দ্র সাহিত্যে শিশু ও বাৎসল্য" শীর্ষক একটি হৃদয়-গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত প্রজ্ঞারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে মোহিত করেন। তৎপর সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন "রবীন্দ্র সাহিত্যে জীবন ও মৃত্যু" শীর্ষক একটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও নানা তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণটি সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। তৎপর শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত সুভ্রাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন সুমধুর সঙ্গীত দ্বারা সকলের পরিতৃপ্তি বিধান করিয়াছিলেন। অভ্যাগত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন বক্তৃতাপ্রদান করেন।

পরলোকে জিতেন্দ্রকুমার নাগ—

ব্রহ্মদেশে গিয়া যে সকল বাঙালী লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার নাগ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ইনি বারদির বিখ্যাত নাগ-পরিবারের সন্তান। অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়া, নিজের ভাগ্য তাঁহাকে নিজেই গড়িয়া লইতে হইয়াছিল। তিনি প্রথম য়্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারল আপিসে সামান্য কর্ম্ম আরম্ভ করেন, পরে সেখান হইতে রেঙ্গুন ডেভেলপমেণ্ট ট্রাষ্টের আপিসে স্থানান্তরিত হন। এইখানেই ডেপুটি চিফ্ য়্যাকাউণ্টাণ্টরূপে তিনি শেষ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছিলেন। কয়েকবার অস্থায়ী ভাবে সেক্রেটারী ও চিফ্ য়্যাকাউণ্টাণ্টের কাজও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রেঙ্গুনে তাঁহার যে প্রতিপত্তি তাহা শুধু বড় চাকুরের প্রতিপত্তি ছিল না। মানুষ হিসাবে তিনি এই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রেঙ্গুনের বাঙ্গালীদের ভিতরেও তাঁহার শত্রু ছিল না, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। স্বভাবের ঔদার্য্য এবং পরদুঃখকাতরতা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। অর্থ উপার্জ্জন তিনি প্রচুর পরিমাণে করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের পরিবারের জন্য বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আত্মীয় স্বজনের ভিতর এমন কেহই নাই বোধ হয় যিনি তাঁহার সাহায্য চাহিয়া পান

জিতেন্দ্রকুমার নাগ

নাই বা অযাচিত ভাবেই পান নাই। রেঙ্গুনে বেশী এমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহাতে তাঁহার যোগ না ছিল, এবং যাহার জন্ম তিনি অর্থ সাহায্য করেন নাই। বিলাসিতা ও আরাম-প্রিয়তা তাঁহার স্বভাবে একেবারেই ছিল না। নিজে সর্ব্বদা সাদাসিদা ভাবেই জীবন কাটাইয়াছেন, এবং সন্তানদিগকেও সেই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মত বন্ধুবৎসল মানুষ বাঙালী-সমাজে বিরল। কোনো কোনো বন্ধুর জন্ম তাঁহাকে অনেক সময় প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, অথচ ইহার জন্ম তাঁহার বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটিতে দেখা যায় নাই। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসরের অধিক হয় নাই। এই অকাল মৃত্যু শুধু যে তাঁহার পরিবারকে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত করিল তাহা নহে, রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙালী-সমাজকেও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিল। তাঁহার সাতটি পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান। আশা করি পিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চিরদিন তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। "বড় মানুষ" হইয়াও যে বড় মানুষ থাকা যায়, জিতেন্দ্রকুমার তাহারই দৃষ্টান্ত নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন।

বালুচীস্থানে ভূমিকম্প—

বিহারে (ও নেপালে) যত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ভূমিকম্প হইয়াছিল, বালুচীস্থানের অন্তর্গত কোয়েটা শহরে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামে যে ভূমিকম্প সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাহা সেরূপ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে হয় নাই। কিন্তু কম্প বিহার অপেক্ষা বালুচীস্থানে খুব প্রচণ্ড ও ভীষণ হইয়াছে, এবং এখানে মানুষ মরিয়াছে ও আহত হইয়াছে অনেকগুণ বেশী, সম্পত্তিনাশও হইয়াছে বেশী। যাহাদের মৃত্যু হয়

ভূমিকম্প কালের দৃশ্য, কোয়েটা। (অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত কোয়েটা শহর। অধিবাসীরা উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে তাঁবুতে আশ্রয় লইয়াছে। (অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

ভূমিকম্পের পর কোয়েটা রেল ষ্টেশনের।
(অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)
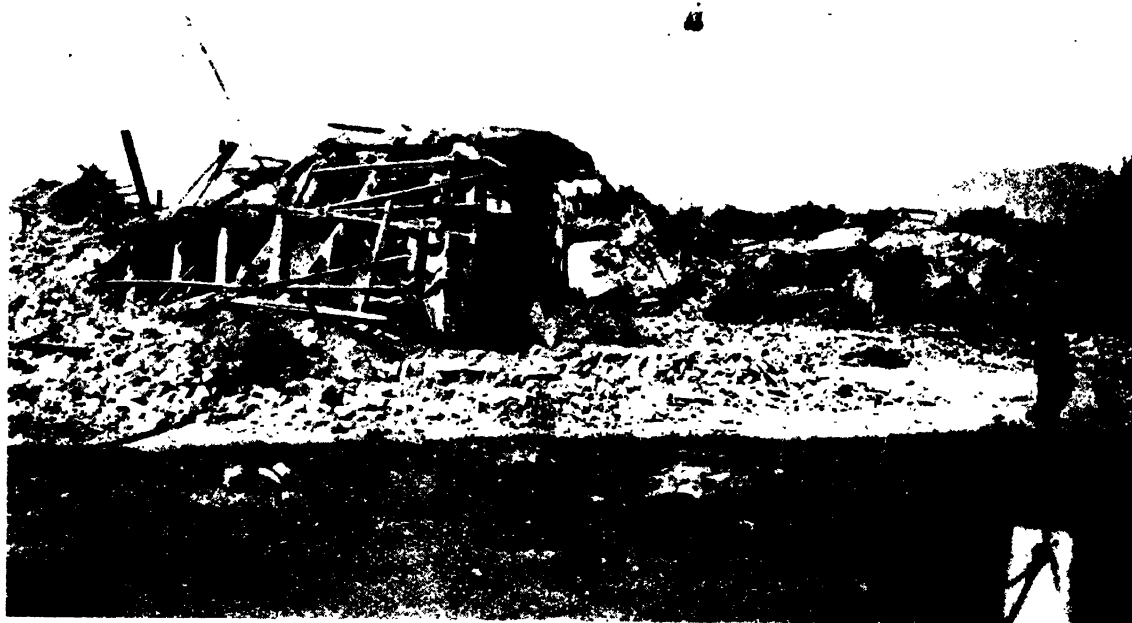
ভূমিকম্প বিধ্বস্ত কোয়েটা শহর। (অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল গোস্বামী

নাই এবং আহত হইলেও পলাইবার শক্তি আছে. এরূপ শত শত অসহায় মানুষ সিন্ধু ও পঞ্জাবে পলাইয়া আসিতেছে।

সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় প্রথমস্থানীয় বাঙালী—

আমরা গত মাসে লিখিয়াছিলাম, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষে গৃহীত সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই পরীক্ষা দিল্লীতে গৃহীত হয়। ইহা খাস ভারতবর্ষের জন্য। কেবল ব্রহ্মদেশের জন্য ব্রহ্মদেশীয় পদপ্রার্থীদের পরীক্ষা হয় রেঙ্গুনে। এই পরীক্ষায় পেগুনিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল গোস্বামী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে ইঁহার জন্ম, এবং গবন্মেণ্ট ইঁহাকে ব্রহ্মদেশের স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী ছাত্র। ইঁহার ব্রহ্মদেশীয় নাম মং পান গ্যাও।

—

বাংলা

আড়িয়লের শ্যামাকান্ত স্মৃতিমন্দির—

ঢাকা জেলার আড়িয়ল গ্রাম বাংলা দেশের অনেক শহরের চেয়ে অধিক উদ্যোগী। এই গ্রামের যে সমিতি আছে, তাহার ব্যায়াম-

"সোহম্‌স্বামী"

বিভাগ, পাঠাগারবিভাগ ও সেবা-বিভাগ আছে। অধিকন্তু এই গ্রামে একটি মিউজিয়ম আছে। তাহার বৃত্তান্ত প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে চিত্রসহ বাহির হইয়াছিল। প্রাচীন মূর্ত্তি আদির মিউজিয়ম বাংলা দেশে কলিকাতা, ঢাকা ও রাজসাহী ভিন্ন অন্য কোন শহরেও নাই, গ্রাম ত দূরের কথা। সুতরাং আড়িয়লকে এ বিষয়ে গ্রামগুলির মধ্যে অগ্রণী বলিতে হইবে। আর একটি বিষয়ে আড়িয়ল নিজের কর্ত্তব্য করিয়াছেন। তাহা ইঁহার "শ্যামাকান্ত স্মৃতিমন্দির" স্থাপন, এবং সম্প্রতি তাহাতে তাঁহার চিত্রপ্রতিষ্ঠা। বীর শ্যামাকান্ত দৈহিক শক্তি ও সাহসের জন্য, সদ্যধৃত বন্য ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরে তিনি সাধনা ও তপস্যার দ্বারা অভীষ্ট লাভ করেন, "সোহম্‌স্বামী" নামে পরিচিত হন, এবং নিজের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন। আড়িয়ল গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ—

কবিরাজ শিরোমণি শ্যামদাস বাচস্পতি মহাশয় আয়ুর্বেদ শিখাইবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যশাস্ত্রপীঠপরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি ইংরেজী রিপোর্টে ইহার বৃত্তান্ত ও অনেকের ইহার প্রশংসা দেখিলাম। কলিকাতা কর্পোরেশন ইহাকে দুই বিঘা জমী দিয়াছেন। তাহার উপর বৃহৎ হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ভিন্ন তাহা হইতে পারিবে না। এইজন্য কবিরাজশিরোমণি মহাশয়ের পুত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ সকলের নিকট সাহায্য চাহিতেছেন। তাঁহার পিতা ইহার জন্য যথাসাধ্য অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তিনিও করিতেছেন। দেশে চিকিৎসাশিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দের সম্মান—

কলিকাতা গবন্মেণ্ট স্কুল অব আর্টসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে বিলাতের রয়্যাল সোসাইটী অব্ আর্টসের ফেলো মনোনীত হইয়াছেন, এই সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। শিল্পীদের পক্ষে ইহা উচ্চ সম্মান। কিছু দিন হইল, লক্ষ্ণৌ গবন্মেণ্ট স্কুল অব আর্টসের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার এই সম্মান লাভ করেন।

উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নানা শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মাণিকতলা মিউনিসিপালিটির (যাহা এখন কলিকাতা করপোরেশনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে) একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তিনি নারিকেলডাঙ্গা জর্জ্জ হাই স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউটেরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

পিত্তলফলকে খোদিত চিত্র -

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পিত্তলফলকে খোদিত বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূর্ত্তি ও অন্যবিধ চিত্র আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। খোদিত চিত্রগুলি এনামেল বা মীনা করা। জিনিষগুলি দেখিতে পরিপাটী এবং পড়িবার টেবিলে বা অন্যত্র গৃহসজ্জা রূপে রাখিবার যোগ্য। লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার তাঁহাকে এই নূতন রকম কাজে উৎসাহ ও পরামর্শ দেন, এবং তাঁহার খোদিত রামমোহন রায়ের একটি আলেখ্য কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরীকে

উপহার দেন। ঐ লাইব্রেরীর সেক্রেটরী অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই শিল্পদ্রব্যটির প্রশংসা করিয়া প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, যে, উহা লাইব্রেরীতে রক্ষিত হইবে। শিল্পীর ঠিকানা গবর্মেণ্ট স্কুল অব আর্টস, লক্ষ্ণৌ।

রাজা হৃষীকেশ লাহা—

তিরাশি বৎসর বয়সে রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয়ের মৃত্যুতে কলিকাতার ও বঙ্গের একজন প্রাচীন কৃতী পুরুষের তিরোভাব হইল। তিনি বিখ্যাত ধনী মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার দ্বিতীয় পুত্র হইলেও, তাঁহার প্রভূত সম্পত্তি কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নহে। তাঁহার নিজের ব্যবসা বুদ্ধি পরিশ্রম, নিয়মনিষ্ঠা

রাজা হৃষীকেশ লাহা

প্রভৃতিও তাঁহার কৃতিত্বের কারণ। ধন উপার্জ্জনই তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব নহে। তিনি বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের সহিত নেতা বা অন্যতম কর্ম্মী রূপে সংসৃষ্ট ছিলেন, দানও অনেক সৎকার্য্যে প্রভূত পরিমাণে করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। যখন বার্দ্ধক্য বশতঃ স্বয়ং আর পড়িতে পারিতেন না, তখন তাঁহাকে প্রত্যহ পড়িয়া শুনাইবার লোক নিযুক্ত ছিল। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট তাঁহার অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীটি দেখিবার জিনিষ। লাহা বংশের কয়েকটি শাখা বিদ্যানুশীলনের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্র ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা কয়েকটি উৎকৃষ্ট গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের লেখক, এবং ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার একটি ইংরেজী ত্রৈমাসিক পত্রিকা তিনি চালান। তাঁহার লাইব্রেরী নানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থে পূর্ণ। লাহা পরিবারের অন্য দুটি শাখার ডক্টর সত্যচরণ লাহা পক্ষিতত্ত্বের জ্ঞানে ভারতে অদ্বিতীয়, এবং ডক্টর বিমলাচরণ লাহা প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ যুগ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের লাইব্রেরী দুটিও উৎকৃষ্ট। লাহা বংশের এই বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের গুরুজনদের নিকট হইতে বাধা পাওয়া দূরে থাক্ উৎসাহই পাইয়াছেন।
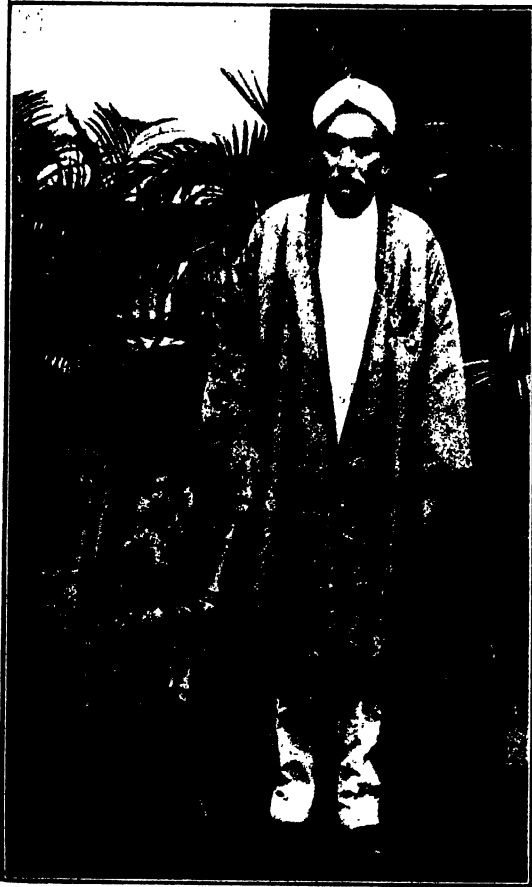
শরৎকুমার রায়—

বুদ্ধদেব, শিবাজী ও মরাঠা জাতি, শিখ ধর্ম্ম ও তাহার গুরুগণ রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি সদ্‌গ্রন্থের লেখক এবং শান্তিনিকেতনে স্থিত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শরৎকুমার রায় মহাশয়ের ৫৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের

শরৎকুমার রায়

সেবা ও সমাজসেবা তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ ছিল। তিনি বিবাহ করেন নাই। তিনি তাঁহার ছাত্রদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জন্য ছাত্রদের উপর তাঁহার সুপ্রভাব ছিল।

কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—

ছিয়াশী বৎসর বয়সে রাজশাহী ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি

কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবিরাজদের মত সাধারণ আয়ুর্বেদ অনুযায়ী সমুদয় চিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন। অধিকন্তু তিনি অস্ত্রোপচারেও দক্ষ ছিলেন, ইহা তাঁহার বিশেষত্ব। সংস্কৃত চিকিৎসা-বিষয়ক নানা গ্রন্থ ছাড়া অন্য নানা গ্রন্থ ও শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান বিস্তৃত ও গভীর ছিল। তিনি "সুশ্রুতার্থ-সন্দীপনা" নামক একটি সুবৃহৎ ভাষ্যের লেখক ও প্রকাশক এই ভাষ্য বঙ্গের বহু আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে এবং বোম্বাই, রাজপুতানা ও দক্ষিণভারতের নানা আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে পড়ান হইয়া থাকে। তিনি বহু লক্ষ টাকার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাবান, পরদুঃখকাতর, আশ্রিতবৎসল ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন।

পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী—

পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বহুশাস্ত্রবিৎ তেজস্বী স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। "জালিয়াৎ ক্লাইব", "ছত্রপতি শিবাজী", 'প্রতাপাদিত্য" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিব্বত, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি নানা দেশে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্যামদেশে তিনি হিন্দু সভ্যতার বহু নিদর্শন নিরীক্ষণ করেন।

গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল—

এই কলেজ ও হাসপাতাল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় ও কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের নিকট ইহার অস্তিত্বের জন্য ঋণী। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে ইহা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারিত না। ইহা অবৈতনিক। ইহার অবৈতনিকত্ব রক্ষার জন্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য তিনি করিয়াছেন ও করিতেছেন। দেশে চিকিৎসা শিক্ষা যত বাড়ে ততই ভাল।

দুর্গাপুর সপ্তম বার্ষিক সঙ্গীত সম্মিলন—

গত ৬ই ও ৭ই মে দুর্গাপুরে সপ্তম বার্ষিক সঙ্গীত সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন শ্রীযুক্ত নীরদবরণ রায়। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর সুললিত সঙ্গীত দ্বারা প্রায় তিন সহস্র শ্রোতাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার ঘোষ অতি চমৎকার তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন। স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সীতারাম মিশ্র, গোপেন্দ্রলাল সিংহ, অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ তেওয়ারী, মদন মুখোপাধ্যায়, ও বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

দুর্গাপুর সঙ্গীত সম্মেলন। মধ্যস্থলে সভাপতি শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
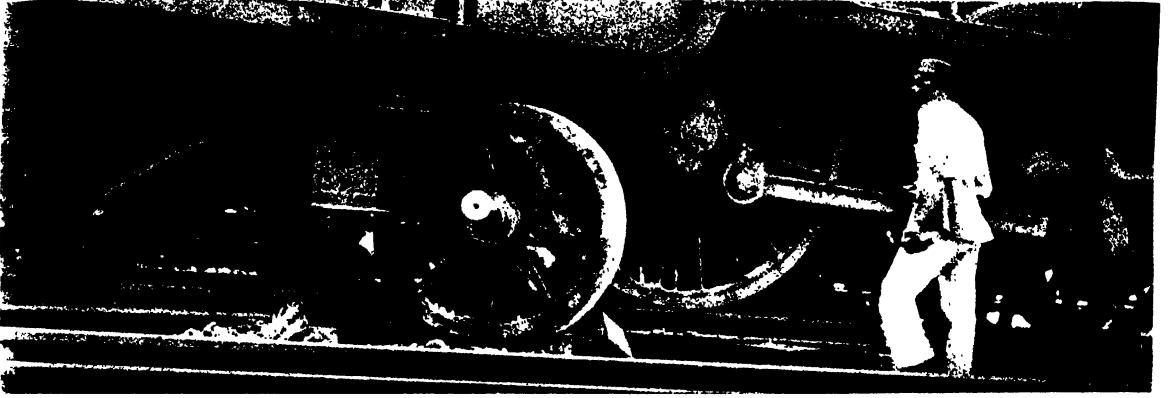
পলতা-বারাকপুর ষ্টেশনের মধ্যস্থলে ট্রেন-সংঘর্ষ

পলতা—বারাকপুর ষ্টেশনের মধ্যস্থলে ট্রেন-সংঘর্ষের একটি দৃশ্য

পলতা-বারাকপুর ষ্টেশনের মধ্যস্থলে ট্রেন-সংঘর্ষ—

গত ১৫ই মে পলতা ও বারাকপুর ষ্টেশনের মধ্যস্থলে ৩৮ ডাউন পার্শেল এক্সপ্রেস ও ৬০০ ডাউন গুডস্ ট্রেনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। ইহার দুইখানি চিত্র এখানে দিলাম।

বিপিনচন্দ্র পালের তৈলচিত্র—

কৃতী মানুষদের স্মৃতি রক্ষিত হয় তাঁহাদের কাজের দ্বারা। তথাপি, তাঁহাদিগকে মনে পড়ে, এরূপ চিত্র, মূর্ত্তি, স্মৃতিমন্দির প্রভৃতি আবশ্যক তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবার জন্য, এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে লোকদের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা বক্তৃতার দ্বারা, এবং সংবাদপত্রে ও গ্রন্থে তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা লেখা দ্বারা রাষ্ট্র-নীতি, সমাজ সংস্কার, ধর্ম্ম সংস্কার, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে দেশের মধ্যে চিন্তার উন্মেষে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা দেশের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন কিছু থাকা আবশ্যক ছিল; কলিকাতার ইণ্ডিয়ান জার্নেলিষ্টস্ এসোসিয়েশ্যনের সহকারী সভাপতি . ল মহাশয়ের একটি তৈল চিত্র

বিপিনচন্দ্র পাল

ও তাহা আলবার্ট হলে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া এই আবশ্যক কাজটি নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। কলিকাতার মেয়র এই চিত্রটির আবরণ উন্মোচন করেন। আমরা ঐ চিত্রের ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম।

—

বিদেশ

শ্রীযুক্ত হৃষিকেশব ঘোষের ইউরোপ যাত্রা—

এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় চিন্তামণি ঘোষ বাংলার বাহিরে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ ও খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হৃষিকেশব ঘোষ চিন্তামণিবাবুর মধ্যম পুত্র। পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনি অপর ভ্রাতাদের সহযোগিতায় জেনারেল ম্যানেজাররূপে ইণ্ডিয়ান প্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার ব্যবসায়নৈপুণ্য ও কর্ম্মকুশলতা গুণে ভারতবর্ষের নানা প্রসিদ্ধ স্থানে ইণ্ডিয়ান প্রেসের শাখা স্থাপিত হইয়া ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বিহারে সারণ জেলার একমাত্র বাঙালীর মূলধনে প্রতিষ্ঠিত শীতলপুর চিনির কারখানায় ইনি একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টার। শীতলপুর গত বৎসর অংশীদারগণকে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। বিগত ২৮শে মে হৃষিকেশববাবু ইউরোপ গমন করিয়াছেন। তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইতেছে, তথাকার প্রধান প্রধান কলকারখানা,

শ্রীযুক্ত হৃষিকেশব ঘোষ

ছাপাখানা, বাণিজ্যকেন্দ্র ইত্যাদি দর্শন করিবেন এবং বিশেষভাবে মুদ্রাযন্ত্রের নানাবিভাগের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুস্তক মুদ্রণ, পুস্তকপ্রকাশ ও প্রচারের জন্য কি ভাবে পাশ্চত্যদেশে কার্য্য করা হয়, এবং আমাদের দেশেও তাহার প্রচলন সম্ভবপর কি-না সে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন। ইউরোপের কাগজের কল, চিনির কারখানাগুলিও তিনি এই যাত্রায় দেখিয়া আসিবেন। হৃষিকেশববাবুর এই যাত্রা সফল হইবে আশা করি।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর ক্রমিক স্বাস্থ্যোন্নতি

ভিয়েনায় অস্ত্রোপচারের পর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সুস্থ হইতেছেন ও বল পাইতেছেন। আমরা অস্ত্রোপচারের এক দিন ও সাত দিন পরে গৃহীত তাঁহার দুটি ফোটোগ্রাফ ছাপিতেছি। ভিয়েনার বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ ডেমেল অস্ত্র করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন।

যে ডাঃ পি. ডি. কাত্যার (Dr. P. D. Katyar) সুভাষবাবুর সম্বন্ধে সংবাদপত্রে খবর পাঠাইয়া থাকেন, তিনি ভারতবর্ষের লোক। এই বৎসর ভিয়েনায় এম ডি ডিগ্রী পাইয়াছেন, এবং দেহের আভ্যন্তরীন রোগসমূহের বিশেষজ্ঞ হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

হাঙ্গেরীতে ভারতীয় হকী শিক্ষক—

ভারতবর্ষের হকী-ক্রীড়ক দল দুই দুই বার ওলিম্পিক ক্রীড়ায় জয়ী হইয়াছেন। ভারতীয় এক দল সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ায় তথাকার খেলোয়াড়দিগকে অনেক বার পরাজিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের হকী-খেলোয়াড়রা যে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। সেই জন্য বার্লিনে আগামী ওলিম্পিক

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও অধ্যাপক ডেমেল

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

ডাঃ পি ডি কাত্যার

শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দয়াল মাথুর

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহ্‌তা

ক্রীড়ায় হাঙ্গেরীর যে খেলোয়াড়রা হকী খেলিবে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ম ভারতীয় একজন খেলোয়াড়কে হাঙ্গেরী লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দয়াল মাথুর।

জেনিভায় বিঠলভাই পটেল স্মৃতিফলক—

জেনিভায় যে স্বাস্থ্য নিবাসে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেলের মৃত্যু হয়, সেখানে ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দিগের উদ্যোগে তাঁহার স্মারক একটি প্রস্তর ফলক গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে-দিন ইহার প্রতিষ্ঠা হয়, সে-দিন ইহা পুষ্পভূষিত হয়। চিত্রে এক পাশে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যদিকে বোম্বাইয়ের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহ্‌তাকে দেখা যাইতেছে।

ভ্রম-সংশোধন :—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ২১৭ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ, ৫ম পংক্তি : "পরলোকগত ব্যারিষ্টার রমাপ্রসাদ সেন" স্থলে "পরলোকগত ব্যারিষ্টার রাধিকাপ্রসাদ সেন" পড়িতে হইবে।

বিলাতে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন

বিলাতে গত কয়েক বৎসর যে গবর্মেণ্ট রাষ্ট্রীয় কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন, তাহাকে ন্যাশন্যাল অর্থাৎ জাতীয় গবর্মেণ্ট বলা হইয়া আসিতেছে; অর্থাৎ এইরূপ ভান করিয়া আসা হইতেছে, যে, ইহা কোন একটা মাত্র রাজনৈতিক দলের গবর্মেণ্ট নহে কিন্তু রক্ষণশীল বা টোরি, উদারনৈতিক বা লিবার‍্যাল এবং শ্রমিক বা লেবার তিন দলেরই লোক লইয়া ইহার মন্ত্রিসভা গঠিত। বস্তুতঃ কিন্তু ইহা প্রধানতঃ টোরি দলেরই মন্ত্রিসভা ও গবর্মেণ্ট ছিল। ইহার প্রধান মন্ত্রী মিঃ জেমস্ র‍্যামজি ম্যাকডোন্যাল্ড এক সময়ে শ্রমিক দলের নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, কি অন্য নানা বিষয় সম্বন্ধে, নিজের পূর্ব্বেকার নীতি ও মত বেমালুম গিলিয়া ও হজম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি কার্য্যতঃ টোরি হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন শ্রমিক সঙ্গীরা তাঁহাকে নিজেদের দলের লোক বলিয়া গণ্য করিত না, আবার টোরিরাও তাঁহার পুরাতন মত ও দলের দোষে তাঁহাকে আত্মীয় মনে করিতে পারিত না, বরং তাঁহার বিরোধিতাই করিত। তা ছাড়া তাঁহার স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়াছিল। এই সব কারণে তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়াছেন বা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। টোরি বা রক্ষণশীলদের নেতা মিঃ বল্‌ডুইন তাঁহার জায়গায় প্রধান মন্ত্রী হইলেন। যে গবর্মেণ্ট বস্তুতঃ টোরি, এক জন টোরি নেতার তাহার প্রধান মন্ত্রী হওয়া ঠিকই হইয়াছে।

স্যর জন সাইমন ছিলেন পররাষ্ট্রসচিব। সে কাজে তিনি বিশেষ সিদ্ধি বা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে দেওয়া হইল স্বরাষ্ট্রসচিবের কাজের ভার। পররাষ্ট্রসচিব হইলেন স্যর সামুয়েল হোর যিনি ছিলেন ভারতসচিব; এবং তাঁহার জায়গায় লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড ভারতসচিব হইলেন। লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড আগে মন্ত্রিসভায় কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহার নিয়োগ নূতন। এইরূপ অমন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব আরও কয়েক জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তাঁহাদের বিষয় আমাদের আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের নিয়োগ সম্বন্ধেই কিছু বলা আবশ্যক। তাহা পরে বলিতেছি।

স্যর সামুয়েল হোরকে যে ভারতসচিবের পদ হইতে সরান হইল তাহা তাঁহার অকৃতিত্বের জন্য নহে। বর্ত্তমান ভারতশাসন বিল ও ভবিষ্যৎ ভারতশাসন আইন ভারতবর্ষের পক্ষে যত অনিষ্টকর ও অপমানজনকই হউক না, উহার দ্বারা ইংরেজদের বাণিজ্য, বড় চাকরি ও প্রভুত্ব বজায় রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে এবং হাউস্ অব্ লর্ডসে উহা যখন আলোচিত হইবে তখন এই চেষ্টা আরও করা হইবে। হাউস্ অব্ কমন্সে যত চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে স্যর সামুয়েল হোর বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান এবং তর্কবিতর্কে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এরূপ মানুষকে ভারতসচিবের কাজ হইতে সরাইয়া যে অন্য কাজ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার অসম্মান হয় নাই, এক প্রকার পদোন্নতিই হইল। কেন তাঁহার জায়গায় এখন অন্য লোককে নিয়োগ করা হইল, সেই বিষয়ে আমাদের যাহা অনুমান তাহা অংশতঃ বলিব।

—

লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের ভারতসচিবের পদে নিয়োগ

যে ভারতশাসন বিলটি হাউস্ অব্ কমন্সে পাস হইয়া গিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অনুমোদিত এবং তাহা আইনে পরিণত হইবেই। তাহার বিরুদ্ধে, তাহার কোন কোন ধারার বিরুদ্ধে, যুক্তি প্রবল থাকিলেও এবং তৎসমুদয়ের সমর্থক যুক্তি সারবান না হইলেও হাউস অব কমন্সে বিরুদ্ধবাদীরা বার-বার হারিয়া গিয়াছে।

হাউস্ অব্ লর্ডসে যখন আলোচনা হইবে, তখন তাহার বিরুদ্ধে তর্কবিতর্কের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইবে, এবং বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি যেমনই হউক, মোটের উপর তাহারা হারিয়া যাইবে। তথাপি সেই সব যুক্তির উত্তর দিবার লোক ত চাই। হাউস্ অব্ কমন্সে উত্তর দিয়াছিলেন প্রধানতঃ স্তর সামুয়েল হোর ও তাঁহার সহকারী মিঃ বাট্লার। কিন্তু তাঁহারা লর্ড নহেন বলিয়া লর্ডসে যাইতে পারেন না। সেই জন্য সেখানে এমন এক জন লোক চাই যিনি লর্ড, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁহার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া যিনি তর্কবিতর্ক করিতে পারিবেন, এবং ইংরেজরা ও অন্য বিদেশীরা এই অভিজ্ঞতার মোহে পড়িয়া মনে করিতে পারিবে, যে, এমন লোক যাহার সমর্থন করিতেছে তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে ভাল। লর্ড জেট্ল্যাণ্ড এই রকম মানুষ।

অবশ্য ভূতপূর্ব্ব লর্ড আরুইন ও বর্ত্তমান লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, এবং তিনি ভারতে লর্ড জেট্ল্যাণ্ডের চেয়ে উচ্চতর পদে, বড়লাটের পদে, অধিষ্ঠিত ছিলেন। লর্ড জেট্ল্যাণ্ড (ভূতপূর্ব্ব লর্ড রোনাল্ড্শে) বঙ্গের গবর্ণর মাত্র ছিলেন। যাহা হউক, যে-কারণেই হউক, লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ সমরসচিবের পদ প্রদত্ত হওয়ায় তাঁহাকে ভারতসচিব করা চলিল না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, লর্ড জেট্ল্যাণ্ড্কে ভারতসচিব করিবার নিগূঢ় কারণ আছে।

সকলেই জানেন, লর্ড জেট্ল্যাণ্ড টোরি, লর্ড কার্জ্জনের চেলা এবং তাঁহার চরিতাখ্যায়ক হইলেও, "হার্ট অব্ আর্য্যাবর্ত্ত" প্রভৃতি লিখিয়া এবং বঙ্গের গবর্ণর রূপে ভারতীয় চিত্রকলার উৎসাহদাতা হইয়া হিন্দু সভ্যতা, দর্শন ও কৃষ্টির গুণগ্রাহিতা দেখাইয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ভারতশাসন বিলে হিন্দুদের, বিশেষ করিয়া বঙ্গীয় হিন্দুদের ও "উচ্চ" বর্ণের হিন্দুদের, প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং এমন লোকের দ্বারা লর্ডসে যদি ভারতশাসন বিলটার পক্ষে ওকালতি করান যায়, তাহা হইলে লোকদের মনে এই ধারণা জন্মাইবার সুবিধা হইবে, যে, যখন এক জন হিন্দু সভ্যতা ও কৃষ্টির গুণগ্রাহী এবং হিন্দুদের বন্ধু বিলটার সমর্থক, তখন সেটা মন্দ জিনিষ নয়, এবং হিন্দুদের প্রভাব নষ্ট করিবার জন্যও উহা প্রণীত হয় নাই।

ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের রীতি এই, যে, তাঁহারা ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অল্পস্বল্প সংশোধনের চেষ্টা করিলেও, যদি সফলকাম না হন, তাহা হইলে মূল ব্রিটিশ নীতির বিরোধী হন না। লর্ড জেট্ল্যাণ্ডের হিন্দুদের সম্বন্ধে ন্যায্য ব্যবস্থা করাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর, তিনি বিলটার সমর্থনই করিয়াছেন;—এমন কি এরূপ কথাও বলিয়াছেন, যে, তিনি ভারতীয় রাজনৈতিকদের বিশ্বাস করেন না, তাহারা বলিতেছে বটে তাহারা এরূপ আইন চায় না কিন্তু আইন পাস হইয়া গেলে তাহারা উহা ওয়ার্ক করিবে অর্থাৎ উহার অনুবর্ত্তী হইয়া উহা কাজে লাগাইবে। সুতরাং তিনি লর্ড বলিয়া হাউস অব লর্ডসে বিলটার সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগ তাঁহার থাকিলেও তিনি তথায় হিন্দুদের সম্বন্ধে ন্যায্য ব্যবস্থা করাইবার চেষ্টা করিবেন, এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না—অন্ততঃ খুব কমই ছিল। তথাপি, যদি কোন কারণে সেরূপ কিছু করিয়া বসেন, তাঁহাকে ভারতসচিব করিয়া মন্ত্রিসভারই এক জন সদস্য করিয়া দেওয়ায় সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। কারণ, গবর্ন্মেণ্টপক্ষীয় কোন লোক গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে, মন্ত্রিসভার এক জন মন্ত্রী মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে, কিছু করিতে পারেন না।

তিনি যে পুরাপুরি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ভারতীয় নীতি অনুসারে চলিবেন এবং স্তর সামুয়েল হোরের সহিত যে তাঁহার মনের, মতের ও নীতির মিল আছে, তাহা তিনি ভারতসচিব হইবার পরই সংবাদপত্রে প্রেরিত একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইয়া দিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

I realize, of course, that the future constitution of India is already in shape and that the task which falls to my lot is not to draft or re-draft the measure but rather to aid in piloting the existing Bill through its final stages to the Statute Book and after that to join with Lord Willingdon in bringing the new form of Government into operation. The credit for the Bill will remain for all times on Sir Samuel Hoare.

Perhaps I should add that it has always been my view that a reasonable continuity of policy is essential in the relations between Britain and India. In this case continuity of policy will be easy and natural, for my views and those of Sir Samuel Hoare on the

question of the Indian constitution have been framed in almost complete sympathy with one another during the long process of investigation at the Round Table Conferences and by the Joint Select Committee in which he and I had taken part.

তাৎপর্য্য। আমি অবশ্য উপলব্ধি করিতেছি, যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ মূল শাসনবিধিকে ইতিমধ্যেই রূপ দেওয়া হইয়াছে, এবং আমার উপর যে কাজের ভার পড়িয়াছে, তাহা উহার পাণ্ডুলিপি মুসাবিদা বা পুনর্মুসাবিদা করা নহে কিন্তু উহাকে আইনে পরিণত করিবার আগে যাহা যাহা করা দরকার তাহা করিয়া উহাকে আইনে পরিণত করা এবং তদনন্তর ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সহযোগে তদনুসারে কাজ করা ও করান। বিলটির জন্য প্রাপ্য প্রশংসা চিরকালের জন্য স্তর সামুয়েল হোরেরই থাকিবে।

হয়ত ইহাও আমার বলা উচিত, ইহা বরাবরই আমার মত ছিল ও আছে, যে, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক বিষয়ে নীতির যুক্তিসঙ্গত পূর্ব্বাপর ধারাবাহিক অবিচ্ছেদ একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নীতির এই ধারাবাহিক অবিচ্ছেদ সহজ ও স্বাভাবিক হইবে; কারণ গোলটেবিল বৈঠক-সমূহের ও জয়েন্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটীর দীর্ঘকাল-ব্যাপী অনুসন্ধানে স্তর সামুয়েল ও আমি উভয়েই ব্যাপৃত ছিলাম, এবং তৎকালে ভারত-শাসনবিধি সম্বন্ধে আমাদের মত পরস্পরের সহিত প্রায় সম্পূর্ণ-সহানুভূতি সহকারে গঠিত হইয়াছিল।

অর্থাৎ কি না, যাত্রার দলের কোন এক জন রাম ও অন্য এক জন রাবণ কিছু কালের জন্য সাজিলেও, আসলে তাহারা বন্ধু এবং একই অধিকারীর দলের ছোকরা।

লর্ড জেটল্যাণ্ড না বলিলেও আমরা জানিতাম, তিনি ভারতসচিব রূপে বিলটার কোন অংশের এমন কোন পুনর্মুসাবিদা বা সংশোধন করিবেন না যাহাতে ভারতবর্ষের কোন সুবিধা হয়।

তিনি বলিয়াছেন, বিলটির জন্য প্রাপ্য প্রশংসা চির-কাল স্তর সামুয়েল হোরেরই থাকিবে। প্রশংসার মানে ব্রিটিশ জাতির প্রশংসা, ভারতীয় প্রশংসা নহে। স্বরাজ্য-কামী কোন ভারতীয় বিলটার বা তজ্জন্য স্তর সামুয়েলের প্রশংসা করে নাই, করিবে না।

ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের পরস্পর সম্পর্ক ব্রিটিশ মতে যাহা হওয়া উচিত, ব্রিটিশ রাজনীতি এ পর্য্যন্ত কখনও তাহার বিরুদ্ধে যায় নাই। বর্ত্তমান ভারতশাসন বিলটির নীতি এই, যে, ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ভারতীয়-দিগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূলীভূত কোনদিকে ও কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইবে না, এবং চাকরি, কলকারখানা, ব্যবসা প্রভৃতি সূত্রে ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজ জাতির আয় একটুও কমিতে দেওয়া হইবে না, বরং যথাসম্ভব বাড়াইয়া চলিতে হইবে—তাহাতে ভারতবর্ষের দশা যাহাই হউক। লর্ড জেটল্যাণ্ডের মতে ব্রিটিশ জাতির ভারতীয় নীতি যদি বরাবর ইহাই থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি উহার যে পূর্ব্বাপর ধারাবাহিকতা ও অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা একান্ত আবশ্যক মনে করেন, তাহা রক্ষিত হইয়াছে।

"শান্তি, স্বাধীনতা ও ন্যায়"

ভারতশাসন বিল সম্পর্কে পার্লেমেণ্টে তাহার সমর্থক যত বক্তৃতা হইয়াছে, তাহার অতি অল্প অংশই সংক্ষিপ্ত আকারে এদেশে দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। যতটুকু বাহির হইয়াছে, তাহাই পড়িয়া ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন। সেগুলার মধ্যে যত মিথ্যা কথা আছে, ব্রিটিশ জাতির ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া উচিত বটে; কিন্তু কাহাকে দেখান হইবে? ভারতীয়দের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত কাগজ ইংলণ্ডে ক'খানা যায়, কয় জন ইংরেজই বা পড়ে? এত মিথ্যা ও অজ্ঞতা দেখাইয়া দিবার মত জায়গাই বা আমাদের কাগজ-গুলিতে কোথায় আছে? বক্তৃতাগুলার মধ্যে যে-সব কুযুক্তি ও অসার যুক্তি আছে, তাহাও দেখাইয়া দেওয়া উচিত বটে; কিন্তু দেখাইয়া দিলেও ব্রিটিশ-পক্ষীয় কে পড়িবে? এরূপ কাজ করিবার মত উদ্বৃত্ত সময়, এরূপ সমালোচনা ছাপিবার মত উদ্বৃত্ত জায়গা, সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে কতটুকু আছে?

কেবল নমুনা-স্বরূপ কোন কোন বক্তৃতার দু-একটা কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন, হাউস্ অব কমন্সের মহিলা-সভ্য ডচেস্ অব্ আঠল তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, সুদখোরের কাজটা হিন্দুরাই করে।

স্তর সামুয়েল হোর ভারতশাসন বিলের হাউস্ অব কমন্সে আলোচনার শেষদিকে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,

"The Federation is a great conception, and we shall have shown to the world that we succeeded in a time of crisis in establishing in Asia a great territory of indigenous peace, liberty and justice."

স্তর সামুয়েল হোর অরসিক নহেন। তিনি জ্ঞাতসারে বা অনভিপ্রেত ভাবে পরিহাস, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপও করিতে পারেন।

আর্ডিন্যান্স, অর্ডিন্যান্স-বৎ আইন, এবং সামরিক আইনের

মত আইন এবং তৎসমুদয়ের সহায়ক লাঠির সাহায্যে ভারতবর্ষে যেখানে যখন দরকার সেখানে তখন "শান্তি" স্থাপিত বা রক্ষিত হয় বটে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু ডাকাইতি প্রতি মাসে ও সপ্তাহে অনেক হয় এবং তাহাতে গ্রামের লোকেদের শান্তি নষ্ট হয়, "সাম্প্রদায়িক" দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনেক হয় ও তাহাতে মানুষ হত ও আহত হয়, অশান্তি ঘটে, এবং নারীহরণ ও নারীর উপর অত্যাচার অনেক হয় ও তদুপলক্ষ্যে খুন-জখমও অনেক হয়—ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। অশান্তির এই সব কারণ বাড়িতেছে বলিয়া আমাদের ধারণা, কিন্তু সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের সাহায্যে এই ধারণার সত্যতা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যকে শান্তি বলা যায় না। মহামারী ও নানাবিধ সংক্রামক রোগে লক্ষ লক্ষ লোক কষ্ট পায় ও মরে। ইহাকেও "শান্তি" বলা যায় না। কেবল মাত্র যুদ্ধকেই শান্তির বিপরীত অবস্থা মনে করা ভুল। যুদ্ধকে শান্তির বিপরীত অবস্থা মনে করিবার কারণ প্রধানতঃ এই, যে, ইহাতে মানুষ হত ও আহত, ইহাতে সম্পত্তি বিনষ্ট ও লুণ্ঠিত হয়, মানুষ তাহার ধনপ্রাণ নিরাপদ মনে করিতে পারে না, এবং যুদ্ধের অবস্থায় নারীদের উপর অত্যাচার হয়। ভারতবর্ষে শান্তির সময়ে দশ বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ বৎসরে দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাবে, মহামারীতে, ডাকাইতিতে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায়, এবং নারীদের উপর নানা অত্যাচারে শোচনীয় যাহা-কিছু ঘটিয়াছে, তাহা অন্যান্য দেশে ঐ রূপ দীর্ঘকালে যুদ্ধের সময়ের শোচনীয় ব্যাপার-সমূহের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইবে, ভারতবর্ষে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অভাব আছে বটে, কিন্তু যুদ্ধজনিত অশান্তি অপেক্ষা এদেশে অশান্তি কম কিনা তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

এদেশে যুদ্ধাভাব আছে অতএব অশান্তি নাই শান্তি আছে, ইহা না-হয় মানিয়া লইলাম। কিন্তু ভারতশাসন বিল দ্বারা লিবার্টি অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এই পরিহাস, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপে অব্রিটিশ মানুষদের হাসা উচিত, কাঁদা উচিত, না ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত? কিন্তু ইহা একটি অর্থে সত্য কথা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। স্যর সামুয়েল হোর বলেন নাই, বিলটার দ্বারা কাহার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং যে-কোন লোক বা লোকসমষ্টির স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হইলেই বলা যাইতে পারে, যে, ইহার দ্বারা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অতএব, ভারতবর্ষের লোকেরা ইহার অনুগ্রহে কতটুকু স্বাধীনতা পাইবে, তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণার্থ অত্যুৎকৃষ্ট রাসায়নিক নিক্তি আমদানী না করিয়া বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনার‍্যাল বাহাদুরকে ইহা পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছে। সামরিক, বৈদেশিক প্রভৃতি কতকগুলি রাষ্ট্রীয় বিভাগ "রক্ষিত" (reserved) হিসাবে সম্পূর্ণ তাঁহার অধীন থাকিবে। বাকীগুলি নামে "হস্তান্তরিত" (transferred) হইলেও তিনি সেগুলির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন এবং তাঁহার ইচ্ছা ও মর্জ্জি অনুসারে তিনি ভারতশাসন আইনের কোন অংশ বা সমুদয় অংশ স্থগিত রাখিতে পারিবেন। অধিকন্তু তিনি স্বয়ং, ব্যবস্থাপক সভার সাহায্য ব্যতিরেকে, শুধু অল্প কালস্থায়ী অর্ডিন্যান্স নহে, চিরস্থায়ী বা দীর্ঘকাল-স্থায়ী আইন করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ গবর্ণর-জেনার‍্যালকে যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, সেরূপ ক্ষমতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতির বা অন্য কোন সভ্য দেশের নৃপতির নাই, এবং তাহা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান, বা মুসলমানদের শাস্ত্রে তাহাদের নৃপতিদিগকে দেওয়া হয় নাই। শাসনটা চলিবে অব্রিটিশ কালা আদমীদের উপর; সুতরাং ব্রিটিশ জাতি বিনা চিন্তায় অবিচারিত ভাবে মানিয়া লইয়াছে, যে, ব্রিটিশ দ্বীপে এরূপ শক্তিমান্ লোক সব সময়েই পাওয়া যাইবে যাহারা গবর্ণর-জেনার‍্যাল রূপে ঐ পদের অতিমানব কার্য্যভার বহন করিতে পারিবে। যদি ব্রিটিশ মনুষ্যদিগকে শাসন করিবার কথা হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ জাতি কখনই এরূপ ও এত ক্ষমতা অতিবুদ্ধিমান অতিঅভিজ্ঞ অতিশক্তিমান্ কোন মানুষকেও দিতে রাজী হইত না।

সমুদয় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গবর্ণর-জেনার‍্যালকে যেমন স্বাধীন করা হইয়াছে, এক একটি প্রদেশ সম্বন্ধে, গবর্ণর-জেনার‍্যালের অধীনে, প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দিয়া স্বাধীন করা হইয়াছে। সিবিল সার্বিস, পুলিস সার্বিস প্রভৃতিতে লোক নিযুক্ত করিবেন এবং তাহাদের বেতন পেন্সন পদোন্নতি অবনতি ছুটি ইত্যাদির

ব্যবস্থা করিবেন ভারতসচিব। আত্মসম্মানহীন নিস্তেজ ধনলোলুপ পদলিপ্সু খেতাবপ্রার্থী যে-সব হতভাগ্য ভারতীয় মন্ত্রী হইয়া ঐ সব চাকরোর উপরওয়ালা হইবে, তাহারা নামে মাত্র উপরওয়ালা হইবে; "অধস্তন" এই সকল চাকরোর উপর তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। এই সব চাকরোদের স্বাধীনতা বড় কম হইবে না। এমন কি, যে-সব স্থলে যে-রকম অবস্থায় বেসরকারী লোকদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা চলে, এই সকল চাকরোদের বিরুদ্ধে সে-সব স্থলে সে-রকম অবস্থায় মোকদ্দমা করিতে হইলে গবর্ন্মেণ্টের অনুমতি আবশ্যক হইবে।

অতঃপর ভারতপ্রবাসী বেসরকারী অন্য ইংরেজ ও ইউরোপীয়দের কথা। তাহারা নিজেদের দেশে রাষ্ট্র-নৈতিক যে স্বাধীনতা ভোগ করে এবং নানা প্রকার কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, স্ব-স্ব দেশে তাহা ত বজায় থাকিবেই, অধিকন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ হইলে ভারতীয়েরা এখানে যত রকম সুবিধা ভোগ করিত তাহা এই বৈদেশিকেরা ভোগ করিবে—তাহারা বিদেশী বিবেচিত হইবে না। কার্য্যতঃ ভারতীয়েরাই, বিদেশে গেলে যেমন বিদেশী বিবেচিত হয়, স্বদেশেও তেমনই রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ব্যাপারে বিদেশী হওয়ার অসুবিধাটা ভোগ করিবে! ভারতীয়েরা নগণ্য; তাহারা স্বাধীনতা নাই পাইল! তাহাতে কি আসে যায়? অন্য যাঁহাদের উল্লেখ করিলাম তাঁহারা মান্যগণ্য। সুতরাং প্রমাণিত হইল, যে, তাঁহাদের স্বাধীনতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ায় ভারতশাসন বিল স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

বাকী থাকে ন্যায়।

এই বিলটির প্রধান প্রধান সব ব্যবস্থা এরূপ ন্যায়সঙ্গত, যে, ইহার মুসাবিদার জন্য যিনি প্রধানতঃ প্রশংসার দাবি করিতে পারেন, তাঁহাকে ধর্ম্মাবতার বলা উচিত।

এক নম্বর ন্যায্য ব্যবস্থা ও সর্ব্বোত্তম ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, যদিও অন্য যত সভ্য দেশে ব্যবস্থাপক সভা আছে তথায় সকল ধর্ম্মের ও শ্রেণীর লোকদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এক বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর লোকদের জন্য আলাদা আলাদা নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা আলাদা আলাদা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় নাই, তথাপি ভারতবর্ষেও সকলের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এক হইলেও এখানে আলাদা আলাদা নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা আলাদা আলাদা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নিয়ম করিয়া ভারতবর্ষে পূর্ণমাত্রায় মহাজাতি গঠনে বাধা জন্মান হইয়াছে এবং মহাজাতি যতটুকু গঠিত হইয়াছিল তাহাকেও খণ্ড খণ্ড করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য, যাহাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভের জন্য সম্মিলিত চেষ্টা করিতে না পারে।

ভারতবর্ষ দুটা বড় ভাগে বিভক্ত। যদিও সমগ্র ভারতেরই প্রভু ব্রিটিশ জাতি, তথাপি একটা ভাগকে বলা হয়, ব্রিটিশ ভারত, আর একটাকে বলা হয় ভারতীয় বা দেশী ভারতবর্ষ বা দেশী রাজ্যসকলের সমষ্টি। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই দুই ভাগেরই প্রতিনিধি থাকিবে। এই প্রতিনিধিরা অবশ্য মনুষ্যজাতীয় হইবেন, এবং মানুষদেরই প্রতিনিধিত্ব করিবেন—গাছ পাথর মাটি জমি মরুভূমি বন জঙ্গল গৃহপালিত পশুপক্ষী বা বন্য প্রাণিসমূহের নহে। সুতরাং কোন্ ভূখণ্ডের লোকেরা কত প্রতিনিধি পাইতে পারেন, তাহা লোকসংখ্যা অনুসারে নির্দ্ধারিত হওয়া ন্যায়সঙ্গত। সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৩৫ কোটির উপর, দেশীরাজ্যগুলির লোকসংখ্যা প্রায় ৮ কোটি। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার মোট প্রতিনিধি-সংখ্যার সিকির কমসংখ্যক প্রতিনিধি দেশী রাজ্যগুলি পাইতে পারে। কিন্তু তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে মোটসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ-সংখ্যক প্রতিনিধি। ইহা ধর্ম্মাবতারের দুই নম্বর ন্যায্য ব্যবস্থা।

তিন নম্বর ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, দেশীরাজ্যগুলির লোকেরা তথাকার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না, প্রতিনিধি মনোনীত করিবে তথাকার নরেশরা।

চার নম্বর ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, দেশীরাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ব্রিটিশ-ভারতের প্রতিনিধিদের থাকিবে না, কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতের জন্য আইনাদি প্রণয়ন প্রভৃতিতে দেশী-রাজ্যের নরেশদের মনোনীত প্রতিনিধিরা তর্কবিতর্ক, ভোটদান ইত্যাদি করিতে পারিবে।

পাঁচ নম্বর ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, যদিও হিন্দুরা

ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে সংখ্যাবহুল সম্প্রদায় এবং ধন বিদ্যাবুদ্ধি জনহিতৈষিণা সার্ব্বজনিক কাজে উৎসাহ দেশসেবার জন্য স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ প্রভৃতিতে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, তথাপি তাহাদিগকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের সংখ্যানুযায়ী প্রতিনিধি না দিয়া তাহাদিগকে কার্য্যতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইয়াছে।

ছয় নম্বর ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, যদিও অধিকাংশ ইউরোপীয় ভারতবর্ষজাত নহে, ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দাও নহে, তথাপি তাহাদিগকে ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

সাত নম্বর ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, যদিও তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম, তথাপি তাহাদিগকে উভয়বিধ ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে।

আট নম্বর ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, যদিও মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ-ভারতের লোকসমষ্টির পুরা সিকি অংশও নহে, তথাপি তাহাদিগকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রতিনিধিসমূহের এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে।

নয় নম্বর ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, যদিও প্রদেশগুলির মধ্যে বঙ্গের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী, তথাপি বাংলা দেশকে অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী কিংবা তাহার লোকসংখ্যার অনুযায়ী প্রতিনিধি দেওয়া হয় নাই, পরন্তু কয়েকটি প্রদেশকে লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য সংখ্যা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি দিবার নিমিত্ত বাংলাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ন্যায্য-সংখ্যক প্রতিনিধি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, এবং অন্যান্য কোন কোন প্রদেশকেও বঞ্চিত করা হইয়াছে।

দশ নম্বর ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, আগ্রা-অযোধ্যা, মান্দ্রাজ, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ-বেরার, আসাম ও উড়িষ্যায় মুসলমানেরা সংখ্যালঘু বলিয়া তাহাদিগকে তাহাদের সংখ্যানুসারে প্রাপ্য প্রতিনিধি অপেক্ষা অনেক বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গে ও পঞ্জাবে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হইলেও, তাহাদিগকে অতিরিক্ত প্রতিনিধি দেওয়া দূরে থাক, তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে যত জন প্রতিনিধি প্রাপ্য হয়, তাহা অপেক্ষাও কম দেওয়া হইয়াছে।

এগার নম্বর ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, দেশীয় ও ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ানদিগকে যে-যে প্রদেশে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, তথায় তাহাদের সংখ্যা অনুসারে যত প্রাপ্য হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী দেওয়া হইয়াছে।

আরও বিস্তর সুব্যবস্থা বিলটিতে আছে। কিন্তু সকলগুলির উল্লেখ করিবার সময় নাই, স্থানও নাই। যাহা লিখিয়াছি, তাহাদ্বারাই উহার সৃষ্টিকর্ত্তার বা সৃষ্টিকর্ত্তাদের নিখুঁত ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হইবে।

ধন্য ব্রিটিশ স্বার্থত্যাগ!

গত ৪ঠা জুন স্যর সামুয়েল হোর সাড়ে সাত বৎসর পূর্ব্বে যে সাইমন কমিশনের কাজ আরম্ভ হয় তাহার উল্লেখ করিয়া পার্লেমেণ্টে বলেন :—

"Since then there had been no halt and no remission in our labours. Twenty-five thousand pages of report, 4,000 pages of Hansard, 600 speeches by Mr. Butler and myself, 15,50,000 words publicly spoken, written and reported bear witness to the toil and trouble behind today's debate."

তাৎপর্য্য। সাইমন কমিশনের সময় হইতে আমরা থামি নাই, আমাদের পরিশ্রমে কোন বিরাম হয় নাই। ২৫,০০০ পৃষ্ঠা পরিমিত রিপোর্ট, হান্সার্ডের ৪,০০০ পৃষ্ঠা পার্লেমেণ্টের রিপোর্ট, মিঃ বাটলারের ও আমার ছয় শত বক্তৃতা, এবং সাড়ে পনর লক্ষ প্রকাশ্যভাবে কথিত, লিখিত ও প্রতিবেদিত শব্দ অদ্যকার তর্কবিতর্কের পশ্চাদ্বর্ত্তী পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকারের সাক্ষ্য দিতেছে।

তিনি নিজেদের পরিশ্রমের এইরূপ একটা আত্মশ্লাঘাপূর্ণ বর্ণনা দিয়া তাহার পর পার্লেমেণ্টে বিলটার বিরোধীদিগকে তাঁহাদের ধৈর্য্যাদি গুণের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। তদনন্তর বলেন :—

"I hope our Indian friends will note the devotion of the Imperial Parliament to Indian affairs—particularly the self-sacrifice of many British public men of all parties who, following the example of Sir John Simon and his colleagues seven and a half years ago, sacrificed private avocations, convenience and time in this Herculean task of building a constitution for India."

তাৎপর্য্য। আমি আশা করি আমাদের ভারতবর্ষীয় বন্ধুরা ভারতবর্ষীয় ব্যাপারসমূহে সাম্রাজ্যিক পার্লেমেণ্টের আত্মনিয়োগ লক্ষ্য করিবেন, বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবেন সার্ব্বজনিক কার্য্যে ব্যাপৃত সকল দলের সেই সব ব্রিটিশ লোকদের স্বার্থত্যাগ যাঁহারা স্যর জন

সাইমনের ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের সাড়ে সাত বৎসর আগেকার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিগত কাজ, সুবিধা ও অবসর ভারতবর্ষের নিমিত্ত কন্সটিটিউশ্যন গঠনরূপ বিরাট অবদানের জন্য বলি দিয়াছেন।

এই ব্রিটিশ মনুষ্যগুলি স্বজাতির জন্য করণীয় কার্য্যে যতটুকু আত্মনিয়োগ ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু স্যর সামুয়েল হোরের "ভারতীয় বন্ধু"দিগকে ইহা লক্ষ্য করিতে বলিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য কি এই, যে, ভারতীয়েরা মনে করিবে, এই মনুষ্যগুলি ভারতবর্ষের জন্য স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়াছে, অতএব তাহাদের প্রতি ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত? এরূপ অদ্ভুত ও অসঙ্গত আশা ভণ্ড বা আত্ম-প্রতারিত লোকেরাই সাধারণতঃ করিয়া থাকে। ব্রিটিশ জাতির জমিদারী ভারতবর্ষে তাহাদের অধিকার ও প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য, ভারতবর্ষের লোকদিগকে অধীন রাখিয়া তাহাদের কাছে পণ্যদ্রব্য বেচিয়া ধন আহরণ করিবার জন্য, এবং ভারতবর্ষের প্রভূত জনসমষ্টি ও প্রাকৃতিক সর্ব্ববিধ সম্পদ ব্রিটিশ জাতির কাজে অবাধে লাগাইবার জন্য কতকগুলি ব্রিটিশ মনুষ্য কিছু স্বার্থ-ত্যাগ যদি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা ব্রিটিশ জাতিরই কাছে বাহবা ও কৃতজ্ঞতা পাইবার অধিকারী। আমরা অন্য জাতিদের মত স্বাধীনতা পাইব না, পরাধীন জাতি বলিয়া চিরকাল পরিগণিত হইতে থাকিব; আমরা স্বাধীন জাতিদের মত সর্ব্ববিধ ন্যায্য উপায় অবলম্বন করিয়া জ্ঞানী হইতে এবং স্বদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া তাহাদের মত সুস্থ সবল ধনী শক্তিশালী হইতে পারিব না;—এরূপ ব্যবস্থা যে বিলে হইয়াছে তাহার প্রণেতাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ হইব, এরূপ ঘোরতর অপমানকর ও হাস্যকর দাবি করিতে যে-কোন বুদ্ধিমান্ লোকের লজ্জিত হওয়া উচিত।

স্যর সামুয়েল হোর যাহাদের কাছে আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে বলিয়াছেন, তাহারা স্বজাতীয় লোকদের স্বার্থ রক্ষা করিয়াছে, সুতরাং স্বজাতীয়দের কৃতজ্ঞতা তাহারা পাইতে পারে—আমাদের নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের যে-সব লোক ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের আহ্বানে সাইমন কমিশনের সহকারী কমিটি-সমূহে, তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক-সমূহে এবং জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির সংস্রবে ভূতের বেগার খাটিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্যর সামুয়েলের মনে পড়িল না কেন? তাঁহারা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে ব্রিটিশ জাতিরই স্বার্থসিদ্ধির সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের অতি নরম অতি সামান্য দাবিও (দাবি বলা ভুল—আবদার বলিলে ঠিক হইবে কি?) ত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা গ্রাহ্য করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের খাতিরে ব্রিটিশ জাতিকে কোন ক্ষমতা ও স্বার্থ ছাড়িয়া দিয়া ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করিতে হয় নাই। অধিকন্তু তাঁহারা ব্রিটিশ জাতির এই উপকার করিয়াছেন, যে, ঐ জাতি জগতের কাছে বলিতে পারিবে, "আমরা ভারতীয় লোকদের প্রতিনিধিদের সব কথা শুনিয়া তাহার পর আইন করিয়াছি" (যদিও ঐ ভারতীয় লোকগুলিকে ভারতীয়েরা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে নাই, তাঁহারা ব্রিটিশ-গবর্ন্মেণ্টেরই মনোনীত লোক)।

এ হেন উপকারী ভারতীয় কালা আদমীদিগকে স্যর সামুয়েল হোর ব্রিটিশ জাতির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলে ঠিক্ হইত। তাহা না করিয়া তিনি করিয়াছেন কি, না, যাহারা ভারতীয়দের পায়ের বেড়ী দৃঢ়তর করিয়াছে তাহাদের পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতার দাবি করিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্?

—

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও আরব্য উপন্যাস

আমরা বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন আরব্য উপন্যাসের বটতলার সংস্করণ সংশোধন করিয়া ও ছবি দিয়া এলাহাবাদ হইতে উহা প্রকাশ করি, তখন তাহা স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দি। তখন তিনি অধ্যাপক। সেই উপলক্ষ্যে তিনি আমাদিগকে যে চিঠি লেখেন, তাহা হইতে জানিতে পারি, যে, তিনি তাহার আগে ইংরেজী বা বাংলা কোন ভাষাতেই আরব্য উপন্যাস পড়েন নাই। বালক ও যুবকেরাও যাহা নির্ব্বিঘ্নে পড়িতে পারে, ত্রিবেদী মহাশয়ের বাল্য ও যৌবনকালে আরব্য উপন্যাসের এরূপ সংস্করণ ছিল না বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার গুরুজন তাঁহাকে আরব্য উপন্যাস কিনিয়া দেন নাই, তিনিও গোপনে তাহা পড়েন নাই। অথচ উত্তরকালে তিনি সাহিত্যরসিক হন নাই, বলা যায় না। ইহা হইতে

বালক যুবক শিক্ষক অভিভাবক সকলেরই সাহিত্যনামধেয় নানা আবর্জ্জনার প্লাবনে পীড়িত বর্ত্তমান বাংলা দেশে কিছু শিখিবার আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে ত্রিবেদী মহাশয়ের গত বার্ষিক স্মৃতিসভায় আমরা এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলাম।

—

ভারতশাসন বিলের বৈকল্পিক কিছুর দাবি !

ভারতশাসন বিল এখন হাউস অব কমন্সে অনুমোদিত হইয়া হাউস অব লর্ডসে আলোচিত হইতেছে। কমন্সে আলোচনার শেষ পর্ব্বে তখনকার ভারতসচিব ও ভারত-শাসনসংস্কার-নাটকের নটরাজ স্তর সামুয়েল হোর বলেন:—

"I ask the critics both here and in India what practical alternative they have to offer. If they have no alternative, do they agree that there should be no legislation ?"

তাৎপর্য্য। "ভারতবর্ষ ও ব্রিটেন উভয় দেশেরই সমালোচকদিগকে আমি সুধাই, ভারতশাসন বিলের বিকল্পে তাঁহারা অন্য কোন শাসনবিধি কি উপস্থিত করিতে পারেন। যদি ইহার বিকল্পে দিবার মত তাঁহাদের কিছু না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কি ভারতশাসন বিষয়ে কোন নূতন আইন প্রণীত না হউক, ইহাই চান ?"

পার্লেমেণ্টে যে বিলটার আলোচনা চলিতেছে, এটা আমরা চাই না, এরকম নূতন কোন আইনপ্রণয়ন চাই না, পুরাতন যেটা আছে তাই বরং ভাল—একথা ত ভারতবর্ষের কংগ্রেসনেতা, উদারনৈতিক নেতা ও অন্য অনেক নেতা বার-বার বলিয়াছেন; নূতন করিয়া প্রশ্ন করিবার কি আবশ্যক ছিল ?

স্তর সামুয়েল ধরিয়া লইয়াছেন, যে, তাঁহারা যে বিলটা জবরদস্তী সহকারে ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে আইনে পরিণত করা চলিত, এমন কোন বিল বা তদ্রূপ কিছু আগে কেহ মুসাবিদা করে নাই। ইহা সত্য নহে, দেখাইতেছি। কিন্তু বৈকল্পিক কিছু আছে বা ছিল কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিবার সময়ও ত এটা নয়। বিলটা ত প্রায় আইনে পরিণত হইয়াই গিয়াছে। টোরি-দলের প্রিয় এমন জিনিষটি পুরুষানুক্রমে টোরিদের আড্ডা হাউস অব লর্ডসে না-মঞ্জুর হইয়া যাইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। এহেন সময়ে সুধান, "অন্য রকম কার কি আছে ?" প্রহসন মাত্র।

ভারতবর্ষ যাহাতে কতকটা স্বাধীনতা পাইতে পারিত, মোটামুটি এরূপ একটা আইনের খসড়া নেহরু রিপোর্টে ছিল। মিসেস বেসাণ্টও এরূপ একটি বিল রচনা করিয়া বা করাইয়া পার্লেমেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন। এগুলিকে যদি পুরাতন ইতিহাস বলা হয়, তাহা হইলে আধুনিক বিকল্পেরও অভাব ছিল না। তথাকথিত গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনা-প্রসূত অনেক সিদ্ধান্ত এরূপ ছিল, যে, তাহাকে ভিত্তি করিয়া বিলটি মুসবিদা করিলে তাহা বর্ত্তমান বিল অপেক্ষা ভাল হইত। মেজর য়্যাটলী জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমীটির সভ্যরূপে উহার সংখ্যালঘু দলের পক্ষ হইতে একটি আলাদা রিপোর্ট লেখেন। তাহা কমীটির অধিকাংশের রিপোর্টের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে ভাল ছিল। সংখ্যালঘুদের এই রিপোর্ট অনুসারে ভারতশাসন বিল রচিত হইতে পারিত। ভারতবর্ষের তথাকথিত "প্রতিনিধি" রূপে গবন্মেণ্ট আগা খাঁ-প্রমুখ যে লোকগুলিকে জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমীটির নিকট হাজির করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অতি মডারেট বা মৃদু রকমের কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার একটিও ব্রিটিশ সরকার বাহাদুর গ্রহণ করেন নাই। ভারতবর্ষের লোকেরা যাহাতে অল্প কিছু চূড়ান্ত ক্ষমতাও পায়, এরূপ কোন প্রস্তাবই কর্ত্তারা কখনও গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। সুতরাং বৈকল্পিক কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক তামাসা মাত্র।

—

মাঞ্চুরিয়ার তেল জাপানের একচেটিয়া

মাঞ্চুরিয়া আগে চীন সাম্রাজ্যের ও পরে চীন সাধারণ-তন্ত্রের অন্তর্গত ছিল। চীন সাম্রাজ্য সাধারণতন্ত্র হইবার সময় যে শিশুটি সম্রাট ছিলেন, তিনি মাঞ্চু-বংশীয়। জাপান বাহুবলে মাঞ্চুরিয়াকে চীন হইতে পৃথক্ ও "স্বাধীন" করিয়া দিয়া তাহার সিংহাসনে ঐ মাঞ্চু-বংশীয় লোকটিকে বসাইয়া তাঁহাকে উহার সম্রাট ঘোষণা করে। বস্তুতঃ কিন্তু এই সম্রাটটি জাপানের হাতের পুতুল মাত্র, ও মাঞ্চুরিয়া (জাপানী নাম 'মাঞ্চুকুয়ো') জাপানীদের জমিদারী। সেখানে জাপানীরা নিজেদের সৈন্যদল রাখিয়াছে, জাপানী লোক বসাইতেছে এবং তাহার সর্ব্ববিধ প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে নিজেরা ধনী হইতেছে। মাঞ্চুরিয়ার খনিজ কেরোসীন ও অন্যান্য তৈল

আগে নানা পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা কেনাবেচা করিত। এখন জাপান উহা একচেটিয়া করিয়া লইল। আগেকার দিন হইলে, পাশ্চাত্য জাতিরা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত। কিন্তু এখন জাপান জলে-স্থলে-আকাশে, সর্ব্বত্র, শক্তিশালী। এখন কেবল কাগজে কলমে তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রসচিব বলিতেছেন, জাপানের এই একচেটিয়া ব্যবসাটি চীনের সঙ্গে বিদেশী শক্তিদের অনেক সন্ধির সর্ত্তের বিপরীত, জাপানী গবন্মে'ণ্ট যে বার-বার কথা দিয়াছিলেন তাহার বিপরীত, এবং ওয়াশিংটনে যে নয়টি জাতির মধ্যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার তৃতীয় ধারা ইহার বিরুদ্ধ। এ সব কথাই সত্য হইতে পারে। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নাই এমন কোন শক্তিশালী জাতি আছে কি? ব্রিটেন কি এ-বিষয়ে নিষ্পাপ? একটা দৃষ্টান্ত দিই।

১৮৮৬ সালে ব্রিটিশ গবন্মে'ণ্টের সহিত জাঞ্জিবরের সুলতানের একটি সন্ধি হয়। তাহাতে লেখা আছে, যে, সুলতান তাঁহার রাজ্যে কোন গবন্মে'ণ্ট, সমিতি, বা ব্যক্তিকে কোন রকম একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন করিতে দিবেন না। তাহাতে আরও লিখিত আছে, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজারা জাঞ্জিবার রাজ্যে সর্ব্ববিধ আইনসঙ্গত উপায়ে জমী, ঘরবাড়ি এবং অন্য রকম সব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইতে ও থাকিতে পারিবে ও তাহা দান বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, সুলতান নামে মাত্র স্বাধীন, তাঁহাকে ব্রিটিশ গবন্মে'ণ্টের হুকুম তামিল করিতে হয়। জাঞ্জিবারের একটা ডিক্রী অনুসারে সেখানে ভারতীয়দের জমীর মালিক থাকিবার অধিকার লুপ্ত হইয়াছে, এবং লবঙ্গের ব্যবসা একটা ইউরোপীয় কোম্পানীর একচেটিয়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয়রা আর সে ব্যবসা করিতে পারিবে না। সুলতানের সঙ্গে ব্রিটেনের সন্ধির এই যে দুই সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা ব্রিটিশ আদেশে বা প্রভাবে হইয়াছে।

—

ব্রিটেনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ

ইউরোপের অন্য অনেক দেশের মত বিলাতে আগে কোন কোন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা, যে যখন রাজশক্তির অধিকারী হইত, অপর সম্প্রদায়ের লোকদিগকে খোঁটায় বাঁধিয়া পুড়াইয়া মারিত। আধুনিক যুগে এই বর্ব্বরতা লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডে রোমান কাথলিক, ইহুদী ও ননকনফর্মিষ্টরা উনবিংশ শতাব্দীরও বহু বৎসর পর্য্যন্ত নানা দিকে নানা সাধারণ অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। এই বিংশ শতাব্দীতেও বিলাতে ইহুদী ও রোমান কাথলিকদের বিরুদ্ধে অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এখনও সেখানে মরে নাই। গত ১০ই জুন যখন মিঃ র‍্যামজি ম্যাকডন্যাল্ডের জন্মভূমি স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরায় অশার হলে (Ussher Hallএ) অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ লায়ন্সকে এক প্রকার মানপত্র দেওয়া হইতেছিল, তখন তিনি রোমান কাথলিক বলিয়া তুমুল কোলাহলপূর্ণ প্রতিবাদ হয়, হলের বাহিরে জনতা একত্র হইয়া "চাই না পোপগিরি ("no popery") বলিয়া চেঁচাইতে থাকে, এবং ভিতরে প্রটেষ্টাণ্ট ম্যাকগ্মন সোসাইটীর পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় 'সভ্য'গণ হলের ভিতর নানা বাধা উপস্থিত করিতে থাকে। দু-বার পুলিস ডাকিয়া হাঙ্গামাকারীদিগকে বাহির করাইয়া দিতে হয়। ইত্যাদি।

অবশ্য, যখন বিলাতে পরস্পরকে পুড়াইয়া মারা ধর্ম্মসঙ্গত ছিল, তখন, পরে যখন ইহুদী, রোমান কাথলিক ও নন-কনফর্মিষ্টদের অনেক রকম অধিকার ছিল না, তখন, এবং আধুনিক বিংশ শতাব্দীতে—কোন সময়েই কোন প্রধান মন্ত্রী স্বদেশ বিলাতকে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা রূপ স্বর্গীয় জিনিষটি উপহার দেন নাই, পরার্থপর ব্রিটিশ জাতি তাহাদের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজি ম্যাকডন্যাল্ডের মারফৎ ভারতীয়-দিগকেই এই পরমকল্যাণকর বস্তুটি উপহার দিয়াছেন।

—

"বসন্ত কৃষি প্রতিষ্ঠান"

দীঘাপাতিয়ার পরলোকগত কুমার বসন্তকুমার রায় রাজশাহীতে একটি কৃষিশিক্ষালয় স্থাপনার্থ অনেক টাকা দান করিয়া যান। শিক্ষালয়টি স্থাপন করিবার ভার ছিল

গবর্মেণ্টের উপর। এতদিন পরে সরকারের দয়া হইয়াছে। টাকা জমিয়া সুদে আসলে ৪,৩৪,১০০ হইয়াছে। আছিগণ তাহা রাজশাহীর ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটি রাজশাহী কলেজের শাখাস্বরূপ উহার সহিত সংযুক্ত থাকিবে ও আগামী অক্টোবর মাসে খোলা হইবে। উহাতে সাধারণ কৃষি, বাগানে ফলফুল প্রভৃতির চাষ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ব্যবসায়, এবং ডিম্ব ও মাংসের জন্য পক্ষিপালন শিক্ষা দেওয়া হইবে।

—

কোয়েটায় ভূমিকম্প

কোয়েটা ও তাহার নিকটবর্ত্তী যে-সকল স্থান জুড়িয়া ভূমিকম্প হইয়াছে, বালুচীস্থানের সেই অংশ, বিহারের যে ভূখণ্ডে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহার মত বৃহদায়তন নহে। কিন্তু কম্প প্রবলতর হওয়ায় বিহার অপেক্ষা অনেক বেশী লোক হত ও আহত হইয়াছে। তাহার আর একটি কারণ, বিহারে ভূমিকম্প হয় দিনের বেলায়। তখন অনেক লোক বাড়ির বাহিরে রাস্তায় মাঠে ঘাটে ও অন্য স্থানে ছিল, সুতরাং ঘরবাড়ি ভাঙিয়া পড়িলেও তাহারা চাপা পড়ে নাই। যাহারা ঘরের মধ্যে ছিল, তাহারাও জাগিয়া ছিল; সুতরাং অনেকে পলাইতে পারিয়াছিল। বালুচীস্থানে ভূমিকম্প হয় রাত্রে যখন লোকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। এই জন্য বিস্তর পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্পের পর কোথাও আগুন লাগিয়া কোথাও বা ভূগর্ভ হইতে উত্থিত জলের প্লাবনে অনেকের প্রাণ গিয়াছে। নষ্ট সম্পত্তির ইয়ত্তা নাই। কোয়েটা শহরটি বর্ত্তমান শহর হইতে একটু দূরে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

যাহারা বাড়ি চাপা পড়িয়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় জীবিত ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেক লোককে খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। প্রোথিত মৃত ব্যক্তিদের শব পচিয়া এরূপ দুর্গন্ধ হয়, যে, নাকমুখে কাপড় বাঁধিয়া বা যুদ্ধের সময়কার গ্যাস-মুখোস পরিয়াও খননানন্তর মানুষ ও সম্পত্তি উদ্ধার কার্য্য বন্ধ করিতে হয়। গবর্মেণ্ট যদি বাহিরের সব লোকের কোয়েটা যাওয়া বন্ধ না-করিয়া দিয়া প্রকৃত জনসেবকদিগকে তথায় গিয়া উদ্ধারকার্য্য করিতে দিতেন, এবং শব পচিয়া দুর্গন্ধ হইবার পূর্ব্বেই উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত সৈনিক ও বেসরকারী যথেষ্টসংখ্যক লোক খননকার্য্যে নিযুক্ত হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এমন কোন কোন লোকের প্রাণ রক্ষা হইত প্রোথিত অবস্থায় কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকিবার পর যাহাদের প্রাণ গিয়াছে। বিহারে ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের কেহ কেহ খবরের কাগজে লিখিয়াছেন, যে, প্রোথিত অবস্থায় ৪।৫ দিন বা তার চেয়েও দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিল সেখানে এরূপ কোন কোন লোকেরও উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল।

প্রথম হইতেই কংগ্রেস-নেতারা ঘটনাস্থলে গিয়া নানা প্রকারে বিপন্ন লোকদের সেবা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গবর্মেণ্ট কারণ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে অনুমতি দেন নাই। অন্য কোন বে-সরকারী সভাসমিতিকেও অনুমতি দেন নাই। গবর্মেণ্ট মনে করেন, যাহা কিছু করিবার প্রয়োজন তাহা করিবার মত লোকজন অর্থ ও সামগ্রী তাঁহাদের আছে। গবর্মেণ্টের ক্ষমতা যথেষ্ট আছে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন প্রভৃতিতে বহুলোক বিপন্ন হইলে দেখা যায়, যে, যে-কারণেই হউক, গবর্মেণ্টের ধনবল ও জনবল এবং হিতৈষণা থাকা সত্ত্বেও, সব বিপন্ন লোকেরা যথাসময়ে সাহায্য পায় না; বেসরকারী হিতৈষীদের কার্য্যক্ষেত্র সব সময়েই থাকে, এবং বেসরকারী লোকেরা কাজে নামেন বলিয়া এমন অনেক দুঃখ দূর বা উপশমিত হয়, কেবল সরকারী চেষ্টায় যাহা হইত না। বালুচীস্থানের ভূমিকম্প সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা সেইরূপ। গবর্মেণ্ট নানা সমস্যাসঙ্কুল বাধাবিঘ্নপূর্ণ বহুব্যয়সাপেক্ষ কাজ করিতেছেন স্বীকার্য্য; কিন্তু বেসরকারী বাছাই-করা লোকদিগকেও কাজ করিতে দিলে ভাল হইত।

যাহা হউক, গবর্মেণ্ট কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে জানাইয়াছেন, যে, যে-সব আত্মীয়স্বজন-হীন, সর্ব্বস্বান্ত, আহত, বা ভয়ত্রস্ত লোক বালুচীস্থান ছাড়িয়া সিন্ধু ও পঞ্জাবে পলাইয়া আসিতেছে, বা যাহাদিগকে গবর্মেণ্ট ট্রেনে করিয়া পাঠাইতেছেন, সিন্ধু ও পঞ্জাবের নানা স্থানে তাহাদের সাহায্য করা আবশ্যক, এবং কংগ্রেস তাহা করিতে পারেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

তাহাই করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন ও সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সর্ব্ববিধ সাহায্য চাহিয়াছেন। ভবিষ্যতে যদি গবন্মেণ্ট কংগ্রেসকে বালুচীস্থানে গিয়া সেবার কাজ করিতে দেন, তখন সে কাজের বন্দোবস্তও তিনি করিবেন। নানা স্থানে অনেক নেতা, যেমন কলিকাতায় আমাদের মেয়র মৌলবী ফজলল হক সাহেব, বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহারাও কংগ্রেসের মত কাজ করিতে পারিবেন। এরূপ কাজে সকলেরই সাধ্যমত সাহায্য করা উচিত।

কোয়েটা ও বালুচীস্থানের অন্যান্য বিধ্বস্ত স্থানে বি-প্রদেশী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ সিন্ধী, পঞ্জাবী, ও বোম্বাই অঞ্চলের পারসী। অন্যান্যপ্রদেশবাসী লোকও তথায় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ছিলেন। ১২ই জুন পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে কোয়েটায় বাঙালী পরিবার ছিলেন এগারটি। ইঁহাদের মধ্যে দুটি পরিবার ভূমিকম্পের সময় শহরে ছিলেন না। বাকী নয়টি পরিবারের বাইশ জন পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকার প্রাণ গিয়াছে।

আমরা মৃত, শোকসন্তপ্ত, আহত, ও ক্ষতিগ্রস্ত সকলের জন্য ব্যথিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শিক্ষা

যদিও বাংলা দেশ লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষের অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বড় এবং এখান হইতে মোট রাজস্ব আদায়ও অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বেশী হয়, তথাপি শিক্ষকতা শিখাইবার কলেজ ও বিদ্যালয় অন্য কোন কোন প্রদেশে বঙ্গের চেয়ে বেশী আছে। ফলে বঙ্গে শিক্ষকতাশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক শতকরা অন্য কোন কোন প্রদেশের চেয়ে কম। বঙ্গে বিদ্যালয়সমূহে বালক-বালিকাদের শিক্ষা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট না হইবার ইহা একটি কারণ। আর একটি কারণ, বঙ্গে অর্দ্ধেকের উপর স্কুলপরিদর্শক কর্ম্মচারী মুসলমান হওয়া চাই—যোগ্যতম হওয়া চাই এরূপ নহে। সরকারী বিদ্যালয়-সকলেও যোগ্যতম লোকই নিযুক্ত হওয়া চাই, নিয়ম এরূপ নহে; কিন্তু নিয়ম এই, যে, যোগ্যতম হউন বা না-হউন, অর্দ্ধেকের উপর শিক্ষক মুসলমান সম্প্রদায় হইতে লইতে হইবে।

যোগ্যতা-অযোগ্যতা-নির্ব্বিশেষে কেবল একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতে অর্দ্ধেকের উপর সরকারী পরিদর্শক কর্ম্মচারী ও শিক্ষক লইবার যে নিয়মের জন্য শিক্ষার যে অবনতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার উপর আমাদের হাত নাই। কিন্তু অধিকসংখ্যক ট্রেনিং কলেজ হইলে অন্ততঃ শিক্ষকতা-শিক্ষাপ্রাপ্ত বেশী শিক্ষক পাওয়ায় হয়ত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার কিছু উন্নতি হইতে পারে। সেই জন্য ভবানীপুরের আশুতোষ কলেজ শিক্ষকতাশিক্ষাদান-বিভাগ খুলিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গীয় সরকারী শিক্ষা-বিভাগের বা শিক্ষামন্ত্রীর (কাহার জানি না) এরূপ উদ্যোগিতা পছন্দ না-হওয়ায় আশুতোষ কলেজ সরকারী মঞ্জুরী পান নাই। এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং শিক্ষকতা শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সঙ্কল্প প্রশংসনীয়। দেখা যাক্, এখন সরকারী শিক্ষামুরুব্বিরা কোন প্রকার বাধা জন্মান কি না।

ভারতবর্ষে চৈনিক ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষা

কলিকাতার একটি ইংরেজী কাগজে দেখিলাম,

"From the beginning of the next academic year the Calcutta University will be able to claim the unique distinction of being the only University in India to make regular arrangements for Chinese and Tibetan studies in the Department of its Post-Graduate Teaching in Arts."

তাৎপর্য্য। "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী বৎসরের গোড়া হইতে ইহা এই বিশেষ বরেণ্যতা দাবি করিতে পারিবে, যে, ভারতবর্ষে ইহাই চৈনিক ও তিব্বতী অধ্যয়নের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইবে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঐ দুটি ভাষা ও সাহিত্য পড়ান হইবে, ইহা সুসংবাদ। কিন্তু ইহা বলিয়া দিলে ভাল হইত, যে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে বহু বৎসর আগে হইতে এই দুটি ভাষা শিখান আরম্ভ হয়, এবং প্রধানতঃ যে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়কে পাওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজে নামিতেছেন, তিনি বিশ্বভারতীতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে এই দুই ভাষা শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

আগামী জুলাই মাসে বা তাহার পরেও ভারতের মধ্যে কেবল যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই চৈনিক কৃষ্টির আলোচনা হইবে, এমন ত মনে হয় না। দৈনিক কাগজে আগেই বাহির হইয়াছিল, এবং জুন মাসের মাসিক

"বিশ্বভারতী নিউস্‌" কাগজে দেখিলাম, যে, কয়েক মাস পূর্ব্বে যে চীন-ভারতীয় কৃষ্টি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার কল্যাণে শান্তিনিকেতনে একটি চৈনিক ভবন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য ও চৈনিক পুস্তক ক্রয় করিবার নিমিত্ত চীনে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর দান সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া চৈনিক অধ্যাপক তান্‌ য়ুন্‌ শান্‌ লিখিয়াছেন। অধিকন্তু, চীনের ন্যাশন্যাল গবর্ন্মেণ্টের পরীক্ষা-সমিতির সভাপতি (President of the Examination Yuan) মিঃ তাই চি-তাও মহাশয়ের উইল অনুসারে দশ হাজার টাকার কিছু বেশী চীন-ভারতীয় কৃষ্টি সমিতি পাইয়াছে। অনেক চৈনিক গ্রন্থ আগে হইতেই বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে ছিল। সম্প্রতি আরও অনেক গ্রন্থ আসিয়াছে।

চীন-ভারতীয় মৈত্রীর চীনদেশীয় উৎসাহদাতারা যে এত টাকা দিয়া শান্তিনিকেতনে চৈনিক ভবন ও চৈনিক গ্রন্থাগার নির্ম্মাণ করাইতেছেন, এবং চৈনিক গ্রন্থও পাঠাইতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য বোধ হয় চৈনিক ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির অনুশীলন—চৈনিক গ্রন্থাবলীর তাজমহল নির্ম্মাণ সম্ভবতঃ তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে।

সুখের বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চীন ও তিব্বতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্য এক ব্যক্তি আগে ঐ দুটি দেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং হয়ত ভবিষ্যতেও করিবেন।

—

পুনা চুক্তির সংশোধনের সম্ভাব্যতা

গত ৩১শে মার্চ্চ আহমদাবাদের "হরিজন" আশ্রমে (ভূতপূর্ব্ব সত্যাগ্রহ আশ্রমে) মহাত্মা গান্ধী "হরিজন"দের নেতা শ্রীযুক্ত কীকাভাইয়ের একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "পুনা চুক্তি আইন-ভুক্ত হইবার পর তবে বলবৎ হইবে অর্থাৎ কাজে লাগান যাইবে, এবং যদি ইহার সব স্বাক্ষরকারীরা একত্র মিলিত হন তবে ইহা সংশোধিত হইতে পারে।" কে তাঁহাদিগকে এক জায়গায় কিসের জোরে আনিবেন? মহাত্মাজী এখন যদি আবার উপবাস করেন, তাহা হইলেও সকল স্বাক্ষরকারীরা মিলিত হইবেন কি না সন্দেহ।

—

বঙ্গের গ্রন্থাগারসমূহ

গত মে মাসে মাড্রিড শহরে যে পৃথিবীর লাইব্রেরিয়ানদের অন্তর্জাতিক কংগ্রেস হইয়া গিয়াছে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও লাইব্রেরী-প্রচেষ্টার বঙ্গীয় প্রধান উদ্যোগী কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় তাহাতে ভারতীয় প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছেন। তিনি এক জন সংবাদদাতাকে লণ্ডনে ভারতবর্ষের লাইব্রেরীসমূহের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। যথা—বঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কলিকাতার ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীটি বড়। ইহাতে তিন লক্ষ বহি আছে। বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট ইহাকে বৎসরে ১৬,০০০ টাকা দেন। এই গবর্ন্মেণ্ট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদকেও সাহায্য করেন। এশিয়াটিক সোসাইটিকেও টাকা দেন। কলিকাতায় প্রায় ২৫০টি অন্য লাইব্রেরী আছে; তাহার মধ্যে ১৭৩টিতে মোট ৫৫০৯৩৫ খানি বহি আছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির নিকট হইতে তাহারা বার্ষিক মোট ৪৮৯৬০ টাকা সাহায্য পায়। বঙ্গের মফঃস্বল শহরের উত্তরপাড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরীগুলি উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গের গ্রামসমূহে প্রায় এক হাজার লাইব্রেরী আছে। শিক্ষিত যুবকেরা চাঁদা তুলিয়া এগুলি স্থাপন করিয়াছে ও চালাইতেছে। আগে স্থানীয় লোক্যাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি আইন অনুসারে লাইব্রেরীর সাহায্য করিতে পারিত না; কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের চেষ্টায় আইন সংশোধিত হওয়ায় এখন পারে। কিন্তু হুগলী জেলা ব্যতীত আর কোথাও এই সংশোধনের সুবিধা লওয়া বা দেওয়া হয় নাই। মফঃস্বলের গ্রামগুলির গ্রন্থাগারসমূহের কর্ত্তৃপক্ষের স্থানীয় বোর্ডগুলি হইতে টাকা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় গ্রামগুলির যে ১০০০ লাইব্রেরীর কথা বলিয়াছেন, তাহা কোন্‌ কোন্‌ জেলার কোন্‌ কোন্‌ গ্রামে অবস্থিত, তাহার বোধ হয় কোন তালিকা নাই। একটি তালিকা প্রস্তুত হওয়া উচিত। তাহা হইলে বুঝা যাইবে, কোন্‌ জেলা এ বিষয়ে কত দূর অগ্রসর বা অনগ্রসর। এই তালিকায় গ্রামের ও জেলার নাম, লাইব্রেরীটিতে কত বহি আছে এবং কি কি মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজ যায়, তাহার উল্লেখ থাকা

আবশ্যক। এরূপ তালিকা থাকিলে আমরা বুঝিতে পারিতাম এই ১৩৪২ সালে বঙ্গে এমন কোনও গ্রামের লাইব্রেরী আছে কি না যাহার পাঠকেরা 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসী' দেখিতে পান না।

—

ইউরোপীয়ের গোপনে রিভলভার আমদানী

গত মাসে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এক জন ইউরোপীয়ের এই অপরাধে তিন শত টাকা জরিমানা করিয়াছেন বা তাহা না দিলে চারি মাস কারাবাস শাস্তির হুকুম করিয়াছেন, যে, সে ব্যক্তি গোপনে দুটা রিভলভার আমদানী করিয়া বিনা লাইসেন্সে একটা নিজের কাছে রাখিয়াছিল ও অন্যটা অপর এক জন ইউরোপীয়কে বিক্রী করিয়াছিল। কোন বাঙালী যুবক তাহা করিলে তাহার চার-পাঁচ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড হইত। ইউরোপীয় বলিয়া অপরাধীর কম শাস্তি হইবার কোন কারণ নাই। বিভীষিকাপন্থী ও রাজনৈতিক বা সাধারণ ডাকাইতরা যে রিভলভার বন্দুক আদি ব্যবহার করে, তাহার কতকগুলা যে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীরা গোপনে আমদানী ও বিক্রী করে নাই, এরূপ মনে না করিবার কি কারণ আছে? যাহারা এই প্রকারে বিভীষিকা-পন্থীদের সাহায্য করে, তাহাদের কাহারও ইউরোপীয় বলিয়া লঘু দণ্ড হইলে অবিচার ত হয়ই, অধিকন্তু তাহারা ও তদ্বিধ অন্য লোকেরা প্রশ্রয় পায়।

বঙ্গের পল্লীগ্রাম ও কুটীরশিল্প

মহাত্মা গান্ধী পল্লীগ্রামের শিল্পসকলের পুনরুজ্জীবন, সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধনের জন্য সমিতি গঠন করায় সাক্ষাৎভাবে কিছু ফল ত হইতেছেই ও হইবেই, পরোক্ষ ফল এই হইয়াছে, যে, গবন্মেণ্টও এইরূপ কাজের জন্য টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকার সদ্ব্যয় হওয়া আবশ্যক। ভারত-গবন্মেণ্ট সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের জন্য যে এক কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাংলাকে দেওয়া হইয়াছে উনিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। এই টাকার অধিকাংশ বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু অংশের অর্থাৎ পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু জেলাগুলির গ্রামসমূহের জন্য ব্যয়িত হইলে ভাল হয়।

বাংলা-গবন্মেণ্ট কি ভাবে কাজ করিবেন তাহার একটা কার্য্যপদ্ধতি শীঘ্র স্থির করিয়া প্রকাশ করুন এবং বেসরকারী বিশেষজ্ঞদেরও সমালোচনা ও পরামর্শ চাউন। সরকার বাহাদুর কোন্ কোন্ কুটীরশিল্পের উন্নতি চান, তাহা জানা আবশ্যক। উনিশ-কুড়ি লক্ষ টাকা বঙ্গের মত গ্রামবহুল দেশের পক্ষে বেশী নয়। সুতরাং অল্পসংখ্যক প্রধান কয়েকটি কুটীরশিল্পে হাত দেওয়াই ভাল।

অবশ্য কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবন, সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধন ছাড়া (এবং তৎসমুদয়ের জন্যও) পল্লীগ্রামসকলের উন্নতি সাধনের জন্য অন্য অনেক কাজ করিতে হইবে। যথা, বিদ্যালয় স্থাপন, পানস্নানের জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য বন্দোবস্ত, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। মানুষেরা চিন্তা করিয়া আত্মোন্নতির প্রয়োজন বুঝিলে ও নিজেরাই তাহার উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিলে তবেই প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি হয়। মনুষ্যগণকে এইরূপ চিন্তায় সমর্থ করিতে হইলে তাহাদের মনকে জাগান দরকার। শিক্ষাদান ও জ্ঞানদান ব্যতিরেকে মানুষের মনকে জাগান যায় না। এই জন্য বিদ্যালয়ের একান্ত আবশ্যক, এবং বিদ্যালয় যথেষ্টসংখ্যক না থাকিলেও মানুষকে লিখনপঠনক্ষম করিয়া তুলা আবশ্যক। এই কাজটিতে নগর ও গ্রামের প্রত্যেক লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির মন দেওয়া উচিত।

কুটীরশিল্পের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই বাঙালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় ভাতকাপড়ের কথাটি আগে মনে পড়ে। আগে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে যে ঢেঁকি চলিত, তাহাকে শিল্পযন্ত্র বলুন আর নাই বলুন, তাহার চাল স্বাস্থ্যকর ছিল এবং ঢেঁকি দ্বারা বহুলোক প্রতিপালিত হইত। ঢেঁকি আগেকার মত খুব বেশী করিয়া চালান যায় না কি?

বাংলা দেশে কত জায়গায় তাঁত চলিত, তথাকার তাঁতীরা এখন নিরন্ন। তাহাদিগকে উন্নত ধরণের তাঁত জোগাইয়া, দেশী কতকটা মিহি সুতা জোগাইয়া তাহাদের অন্নের ব্যবস্থা করা যায় কি? ভাল কাপড় বোনা বঙ্গের একটি প্রধান শিল্প ছিল।

অন্য প্রদেশের চিনির পরিবর্ত্তে বঙ্গের গুড় বেশী পরিমাণে চালান যায় কি? ধাগড়া ও বাঁকুড়ার

বাসন, ঢাকার শাঁখা, রংপুরের সতরঞ্চ, মেদিনীপুরের মাদুর, শ্রীহট্টের শীতলপাটি, ত্রিপুরা জেলার বাঁশ ও বেতের কাজ, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের রেশমী কাপড় ও গোপীনাথপুরের ছিট তসরের কাপড় ও বাফ্‌তা— এইরূপ কত জিনিষ ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। বাংলা দেশের বাঙালী মুচি চামড়া কষ-করা ও জুতা তৈরি করার কাজ হইতে তাড়িত হইতেছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় ট্যাংরায় উন্নত অথচ অল্পমূলধনসাধ্য উপায়ে যে চামড়া কষ-করার কাজ শিখাইতেছেন, তাহা তাঁহার অন্য অনেক কাজের মত অতীব প্রশংসনীয়।

এক একটি করিয়া বঙ্গের নানা শিল্পের উল্লেখ ও বর্ণনা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধেও করা কঠিন, "বিবিধ প্রসঙ্গে" ত হইতেই পারে না। সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধীর সমিতির বঙ্গীয় শাখার ভারপ্রাপ্ত ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন।

ভারতবর্ষে ও বঙ্গে এখনও কুটীরশিল্পজাত যত সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহার অনেকগুলির বিদেশে কাটতি আছে ও হইতে পারে।

আমেরিকার শিকাগো শহরে ভারতীয় গন্ধদ্রব্য ও ধূপধুনা ব্যবসায়ী ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ কিছু দিনের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকা ফিরিয়া যাইবার আগে দেখা করিতে আসিয়া বলিতেছিলেন, কতকগুলি ধুনুচি লইয়া যাইতে চান, ফরমাইস দিয়াছেন, যথাসময়ে পাইবেন কিনা বুঝিতে পারিতেছেন না। বিদেশে যে-সব জিনিষের কাটতি হয় বা হইতে পারে, তাহার বাজারের সন্ধান লওয়া ও দেওয়া গবন্মেণ্টের কর্ত্তব্য, আমাদের বণিক- সমিতিগুলির কর্ত্তব্য, এবং রপ্তানিব্যবসায়ীদেরও কর্ত্তব্য।

বিহার-উড়িষ্যার গবন্মেণ্ট ঐ প্রদেশের শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ বাহিরে বিক্রীর জন্য ছাব্বিশ জন দক্ষ এজেণ্ট নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় তথাকার লক্ষাধিক টাকার জিনিষ ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ায় বিক্রী হইয়াছে। বাংলা-গবন্মেণ্ট কি করিতেছেন?

ডক্টর নীলরতন ধরের গবেষণা

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নীলরতন ধর গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, গো-শালার সার প্রয়োগ দ্বারা বা এমোনিয়াম সলফেট (এক প্রকার নিশাদল) প্রয়োগ দ্বারা যে-সব জমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করা হয়, তাহাতে গুড় প্রয়োগ করিলে উর্ব্বরতা হ্রাস পায় না, লুপ্ত হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়। কেন এরূপ হয়, তাহার রাসায়নিক কারণও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই বিষয়ে আরও গবেষণা করিবার জন্য অধ্যাপক ধরকে পাঁচ বৎসরের জন্য ছত্রিশ হাজার টাকা দিতে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের গবন্মেণ্ট ইম্পীরিয়াল কৌন্সিল অব্ এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চকে অনুরোধ করিয়াছেন। ডক্টর ধর প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।

বঙ্গেও দু-এক জন রাসায়নিক গবেষক কাজ করিতেছেন। বাংলা-গবন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে স্বয়ং কি উৎসাহ দেন, এবং কৃষিগবেষণার ইম্পীরিয়াল কৌন্সিল হইতেই বা কত টাকা সাহায্য আদায় করিয়া দেন বা তজ্জন্য সুপারিশ করেন?

অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাংলা-সরকারের শিখিবার বিষয়

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রুকে সভাপতি করিয়া একটি কমীটি তথাকার গবন্মেণ্ট নিযুক্ত করেন। কমীটির সাক্ষ্যগ্রহণ ও অন্য অনুসন্ধান শেষ হইয়াছে। স্যর তেজ বাহাদুর অন্য কাজে বিলাত গিয়া সেখান হইতেও বেকার-সমস্যা সমাধানের হদিস সংগ্রহ করিতেছেন।

বঙ্গে এরূপ কিছু হয় নাই।

মধ্যপ্রদেশের গবন্মেণ্ট মদ্য বিক্রয় ক্রমে ক্রমে কমাইবার জন্য উপায় নির্দ্ধারণার্থ সরকারী ও বেসরকারী সভ্য লইয়া একটি কমীটি নিযুক্ত করেন। এখন তথাকার গবন্মেণ্ট

কমীটির ও নিজের মত অনুসারে মদ্যবিক্রয় ক্রমে ক্রমে কমাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

বঙ্গেও এরূপ কিছু করা দরকার, কিন্তু করা হয় নাই।

পঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর ডগলাস ইয়াং, অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত জীয়ালাল, হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশ্যনের প্রেসিডেণ্ট, হাইকোর্টের এক জন য়াডভোকেট, এবং জেলা-কোর্টের বার এসোসিয়েশ্যনের দুই জন প্রতিনিধিকে লইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত হইতেছে। উহার উদ্দেশ্য আদালতের আমলা প্রভৃতির উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি ও অন্যান্য দুর্নীতি নিবারণ।

বঙ্গেও এইরূপ কমিশন আবশ্যক।

—

সিন্ধুর মিষ্টান্ন বিদেশে প্রেরণ

বাঙালীরা মনে করেন তাঁহাদের সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতির সমান মিষ্টান্ন আর কোথাও নাই। তাহা সত্য কিনা, তাহার বিচারক আমরা নই। কিন্তু বাঙালী যে মিষ্টদ্রব্যভোজনপরায়ণ তাহার প্রমাণ, এক জন মিষ্টান্ন-বিক্রেতা বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, যে, গত বৎসর তিনি নয় লক্ষ টাকার সন্দেশ বিক্রী করিয়াছেন। বাঙালী যদি এতই সন্দেশপ্রিয় হন, তাহা হইলে কেবল নিজেই খাইবেন কি ? বিদেশেও এমন করিয়া নানা মিষ্টদ্রব্য পাঠান, যাহাতে তাহা তথায় তাজা অবস্থায় পৌছিয়া বিক্রী হইতে পারে। তাহাতে অর্থাগম হইবে এবং এ ধারণাও বিদেশীদের হইতে পারে, যে, বাঙালীরা কেবল বোমা ও রিভলভারের গুলি এবং খবরের কাগজের অত্যন্ত তিক্ত তীব্র বা ঝাঁঝাল মন্তব্যের জন্যই বিখ্যাত নয়, মানুষকে 'মিষ্টমুখ' করাইতেও জানে।'

সিন্ধুদেশের লোকেরা খুব উদ্যমশীল বণিক। পৃথিবীর এমন কোন বড় বন্দর নাই, যেখানে সিন্ধী বণিক দেখা যায় না। সিন্ধুদেশের শিকারপুরে যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, সিন্ধী বণিকেরা তাহা টাট্‌কা অবস্থায় বিদেশে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।

—

চট্টগ্রামে লাল বৈপ্লবিক বিজ্ঞাপন

চট্টগ্রামে আবার লাল বৈপ্লবিক বিজ্ঞাপন ধৃত হইয়াছে। ইহা বাস্তবিক বৈপ্লবিকদের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বিভীষিকাপন্থীরা কি এখনও আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারে না ? আমরা শুনিয়াছি, গোয়েন্দাদের দ্বারা সরকারকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত পুস্তক-পুস্তিকাদি ছাত্র ও অন্যান্য অল্পবয়স্ক লোকদের মধ্যে বিতরিত হয়। ইহা সত্য হইলে, বৈপ্লবিক লাল ইস্তাহার-বিতরণও কি এই প্রকার লোকদের কুকার্য্য হইতে পারে না ?

যাহাই হউক, আমরা ছাত্র ছাত্রী ও অন্য অল্পবয়স্ক লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাহারা যেন কাহারও প্রদত্ত নিষিদ্ধ পুস্তক-পুস্তিকা গ্রহণ না-করে ও না-রাখে। তাহাদের সর্ব্বদাই ইহা জানা, অন্ততঃ সন্দেহ করা, উচিত যে, এই প্রকার জিনিষ গোয়েন্দাদের দ্বারা বা তাহাদের জ্ঞাতসারে বিতরিত হইতেছে।

—

বাংলা দেশ ও জার্মেনী

জার্মেনীতে এইরূপ একটি আইন হইতেছে বা হয়ত এখন হইয়া গিয়াছে, যে, কেহ যদি হের্ হিটলারের প্রাণবধ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না-ও হয়, তাহা হইলেও তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। এই প্রকার দণ্ডের বিধান কিন্তু বাংলা দেশে আগেই হইয়া গিয়াছে, এবং দণ্ডও কাহারও কাহারও হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ, এ-বিষয়ে বঙ্গের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইবে। কেন-না, জার্মেনীতে কেবল হিটলারের প্রাণ লইবার চেষ্টা দণ্ডনীয়, বঙ্গে অন্যদেরও —যদি হত্যার চেষ্টাটা "রাজনৈতিক" কারণে বা উদ্দেশ্যে হয়।

এই দিকে যেমন অনগ্রসর বাংলা অগ্রসর জার্মেনীকে পরাস্ত করিয়াছে, অন্য আর এক দিকে কিন্তু অবস্থা বিপরীত। জার্মেনীতে আইন হইতেছে বা হইয়াছে, যে, কেহ জার্মেনীর কোন জাতীয় প্রতীকের ("national symbol"এর) অসম্মান বা অপমান করিলে তাহার শাস্তি হইবে। ভারতবর্ষে (এবং অবশ্য বঙ্গেও) কিন্তু জাতীয়

প্রতীক 'জাতীয় পতাকা" বহন ও তাহাকে সম্মান প্রদর্শনের অপরাধে বিস্তর লোকের কারাদণ্ড হইয়াছে। ভারতবর্ষকে সম্মানপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে "বন্দেমাতরম্" বলায় অনেকে দণ্ডিত হইয়াছে, এবং জাতীয় নেতা গান্ধীজীর ছবি রক্ষা প্রভৃতি কার্য্যও অপরাধের বা প্রায় অপরাধেরই সামিল গণিত হইয়াছে।

—

"অন্তরীণ"দের বন্দিদশার রূপান্তর

বঙ্গের কোন কোন স্থানের "অন্তরীণ"দিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইতেছে, এই যে ধারণা কাহারও কাহারও হইয়াছিল, তাহা ভ্রান্ত। তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। কাহাকেও অভিভাবকের কাছে মুচলেকা ও জামীন লইয়া, কাহাকেও বা সরকারের অনুমোদিত গ্রামের মাতব্বরদের সমিতির তত্ত্বাবধানে নিজের বাড়িতে থাকিতে দেওয়া হইতেছে। ইহাতে বোধ হয় সরকারের কিঞ্চিৎ লাভও আছে—ঐ "অন্তরীণদের" ভাতাটা বাঁচিয়া যাইবে।

—

অন্তর্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সে বর্ণাপরাধ

জেনিভায় লীগ্ অব্ নেশ্যন্সের যে অন্তর্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্স হইতেছে, তাহাতে ভারতের শ্রমিকদের প্রতিনিধি এক জন, শ্রমিকদের মজুরীদাতাদের প্রতিনিধি এক জন, এবং ভারত-গবর্মেন্টের প্রতিনিধি এক জন যোগ দিতে গিয়াছেন। যে-সকল শ্রমিক এক দেশ হইতে অন্য দেশে মজুরী করিবার নিমিত্ত আনীত হয় বা যায়, শেষোক্ত দেশে তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। ভারতীয় বেসরকারী প্রতিনিধি দু-জন এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন, যে, ভারতীয় শ্রমিকরা বিদেশে গেলে সেখানে বসবাস করিয়া ভূসম্পত্তি ও অন্য সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে, কোন মোকদ্দমায় তাহারা জড়িত হইলে তাহারা তদ্দেশীয় আসামী ফরিয়াদী বাদী প্রতিবাদীদের বিচার-সম্পর্কীয় সব অধিকার সমানভাবে পাইবে, এবং সেই দেশের ব্যবস্থাপক সভাদির নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার পাইবে। এই প্রস্তাবের প্রথম দুটি সর্ত্ত ভারত-গবর্মেন্টের প্রতিনিধি স্যর জোসেফ ভোরও অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রতিনিধিরা তিনটি সর্ত্তের কোনটিতেই রাজী হন নাই। তাহা হইলে তাঁহারা চান, যে, ভারতবর্ষের শ্রমিকরা বিদেশে খাটিলে, খাটিবে পশুর মত, মানুষের মত নহে।

ইহা স্বাভাবিক, যে, ভারতীয় বেসরকারী প্রতিনিধিদ্বয় শ্রমিকঘটিত এই প্রকার প্রশ্নের আলোচনার সময় উক্ত কন্‌ফারেন্সে আর যোগ দিবেন না স্থির করিয়াছেন।

—

গণিত-গবেষক শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল আধুনিক উচ্চাঙ্গের গণিতের একটি বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার গবেষণা গণিতে বিশেষজ্ঞ অনেকের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে। তিনি এখন বেলগাছিয়াস্থিত পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কিছু বৃত্তি পান। তাহা যে স্থায়ী, এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি নাই। বর্ত্তমানে তাঁহার চক্ষুরোগ হওয়ায় তাঁহার অধিকতর অর্থের প্রয়োজনও আছে। এখন কোন বিদ্যোৎসাহী সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি বা কোন বিদ্বৎ-সভা তাঁহার যথোচিত সাহায্য করিলে বিদ্যার সম্মান করা হইবে এবং তিনি কৃতজ্ঞ হইবেন। তাঁহার ঠিকানা, "পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির," ৫ সী, ওলাইচণ্ডী রোড্, কলিকাতা।

—

"গ্রামে ফিরিয়া যাও"

"গ্রামে ফিরিয়া যাও," বা "ভূমিতে ফিরিয়া যাও," এইরূপ পরামর্শ, কেবল আমাদের দেশে নয়, অন্য অনেক দেশেও দেওয়া হইতেছে। আমরা কেবল বাংলা দেশের কথাই অল্প কিছু জানি ও ভাবিতে পারি।

বঙ্গে গ্রামে থাকা অবশ্যই উচিত, কিন্তু তথায় ফিরিয়া যাইবার ও থাকিবার অনেক বাধা আছে। সেগুলি অতিক্রান্ত হওয়া চাই। গ্রাম্য জীবন একঘেয়ে। শহরের হুজুক ও চিত্তবিক্ষেপের সব কারণ গ্রামে আমদানী করিতে হইবে বলিতেছি না, কিন্তু নির্দ্দোষ রকমের সরস এমন কিছু চাই, যাহাতে জীবন একঘেয়ে না-হয়। গ্রামে উপার্জ্জনের উপায় বেশী রকম নাই। উপার্জ্জনের বহু উপায়ের উদ্ভাবনও তথায় করিতে হইবে। গ্রামে জ্ঞান-

রামচন্দ্র ও গুহক

শিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪২

৪র্থ সংখ্যা

অবর্জ্জিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কল্যাণীয়েষু–

আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু
চিরকাল মনে রাখিবে, এমন কিছু,
মূঢ়তা করা তা নিয়ে মিথ্যে ভেবে।

ধূলোর খাজনা শোধ করে নেবে ধূলো
চুকে গিয়ে তবু বাকি রবে যতগুলো
গরজ যাদের তারাই তা খুঁজে নেবে।

আমি শুধু ভাবি, নিজেরে কেমনে ক্ষমি,
পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি উঠেছে জমি',
কোন্ সৎকারে করি তার সদ্‌গতি!

কবির গর্ব্ব নেই মোর হেন নয়,
কবির লজ্জা পাশাপাশি তারি রয়,
ভারতীর আছে এই দয়া মোর প্রতি।

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে
সময় রাখি নি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্ত্তি এবং কুকীর্ত্তি গেছে মিশে।

ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্যে যে জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে !

বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা,
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা ;—
আবর্জ্জনারে বর্জ্জন করি যদি

চারিদিক হ'তে গর্জ্জন করি উঠে,
"ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে,
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।"

ইতিহাস বুড়ো, বেড়া জাল তার পাতা,
সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা,
ধরা যাহা পড়ে ফর্দ্দে সকলি আছে।

হয় আর নয়, খোঁজ রাখে শুধু এই,
ভালোমন্দর দরদ কিছুই নেই,
মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে।

বিধাতাপুরুষ ঐতিহাসিক হ'লে
চেহারা লইয়া ঋতুরা পড়িত গোলে,
অঘ্রাণ তবে ফাগুন রহিত ব্যেপে,

পুরানো পাতারা ঝরিতে যাইত ভুলে,
কচি পাতাদের আঁকড়ি রহিত ঝুলে,
পুরাণ ধরিত কাব্যের টুঁটি চেপে।

জোড়হাত ক'রে আমি বলি, শোনো কথা,
সৃষ্টির কাজে প্রকাশেরি ব্যগ্রতা,
ইতিহাসটারে গোপন করে সে রাখে,

জীবনলক্ষ্মী মেলিয়া রঙের রেখা
ধরার অঙ্গে আঁকিছে পত্রলেখা,
ভূ-তত্ত্ব তার কঙ্কালে ঢাকা থাকে।

বিশ্বকবির লেখা যত হয় ছাপা,
প্রুফশিটে তার দশগুণ পড়ে চাপা,
সংস্করণে নূতন করিয়া তুলে।

দাগী যাহা, যাহে বিকার, যাহাতে ক্ষতি
মমতামাত্র নাহি তো তাহার প্রতি,
বাঁধা নাহি থাকে ভুলে আর নির্ভুলে।

সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা

জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণপাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা ?

যাহা কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবি,
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনো কবি,
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক ;

কিন্তু হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ ?

ভাবী কালে মোর কী দান শ্রদ্ধা পাবে,
খ্যাতিধারা মোর কতদূর চলে যাবে,
সে লাগি চিন্তা করার অর্থ নাহি।

বর্ত্তমানের ভরি অর্ঘ্যের ডালি
অদেয় যা দিনু মাখায়ে ছাপার কালি
তাহারি লাগিয়া মার্জ্জনা আমি চাহি॥

৫ জুন ১৯৩৫
চন্দননগর

আমার দেখা লোক

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

সেকালের শিক্ষা-বিভাগের শীর্ষস্থানীয়, সর্ব্বজন-পরিচিত

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহাশয় আমার পিতার শিক্ষাগুরু এবং পরে দীক্ষাগুরুও হইয়াছিলেন। আমার পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি যে,

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় ভূদেব বাবু হুগলীতে একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিতে আসিয়াছেন এবং যে-সকল ছাত্র নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন করিবে, তাহারা মাসিক চারি-পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবে, এই সংবাদ পাইয়া আমার পিতা ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য ভূদেব বাবুর নিকট গমন করিলে ভূদেব বাবু বলেন যে, কয়েক দিন পরে একটা পরীক্ষার দ্বারা ছাত্র নির্ব্বাচন করা হইবে। আমার পিতা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করাতে ভূদেব বাবু তাঁহাকে নর্ম্মাল স্কুলে ছাত্ররূপে গ্রহণ করেন। নব-প্রতিষ্ঠিত নর্ম্মাল স্কুলের প্রথম রেজিষ্টারি বা হাজিরা বহিতে বাবার নাম লিখিবার সময় ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন, "ইন্দ্রকুমার, তোমার নামে এই স্কুলের 'বউনি' হইল, যদি স্কুলের উন্নতি হয়, তাহা হইলে আমিও তোমার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" ভূদেব বাবুর সহিত আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতার ইহাই সূত্রপাত। সে আজ আশী বৎসরেরও অধিক কালের কথা, কিন্তু সেই সময় হইতে এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণই আছে। আমার পিতা ভূদেব বাবুর পত্নীকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন, সেই মহীয়সী মহিলাও আমার জননীকে পুত্রবধূ বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি অনেক সময় আমার মাকে চুঁচুড়ার বাটীতে লইয়া গিয়া দশ-পনর দিন—এমন কি এক মাস দেড় মাসও রাখিয়া দিতেন। আমার মাতামহী মাকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলে "আমার ছেলের বৌকে আমি যদি না পাঠাই, বেয়ানের কিছু জোর আছে কি?" এই বলিয়া সেই লোককে ফিরাইয়া দিতেন।

আমিও বাল্যকালে বহুবার আমার জননীর সহিত চুঁচুড়ায় গিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছি, কিন্তু ভূদেব বাবুর পত্নীকে আমার মনে নাই, কারণ তাঁহার স্বর্গারোহণের সময় আমার বয়স দুই বৎসর বা আড়াই বৎসর মাত্র। সুতরাং ভূদেব বাবুর পত্নীকে আমি না দেখিলেও ভূদেব বাবুকে বাল্যকাল হইতে বহু বার দেখিয়াছি। বাটীতে সামান্য ক্রিয়াকর্ম্ম হইলেও "ফরাসডাঙ্গার বৌমাকে" (আমার জননীকে) লইয়া যাইবার জন্য তিনি লোক পাঠাইতেন। ভূদেব বাবু আমাদিগকে পৌত্র সম্বন্ধ ধরিয়া নানা প্রকার আমোদ করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে আমার বড় ভয় হইত। সেই সাহেবের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, পাকা গোঁফ এবং উজ্জ্বল চক্ষু, গম্ভীর প্রকৃতি বৃদ্ধের নিকট

আমি সহজে যাইতাম না, তাঁহার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতাম। আমার মনে আছে, একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ (গোবিন্দ বাবুর পত্নী। গোবিন্দ বাবু ভূদেব বাবুর মধ্যম পুত্র ছিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রদেবের বাল্য-কালেই মৃত্যু হইয়াছিল, সেই জন্য গোবিন্দ বাবুর পত্নীকেই জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ বলিলাম) আমাদের তিন সহোদরকে একখানা থালাতে করিয়া জলখাবার দিলে ভূদেব বাবু এক গাছা লাঠি লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "শালারা যদি খাবার নিয়ে কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করিস, তাহ'লে লাঠি-পেটা করব।" আমার বয়স তখন সাত বৎসর কি আট বৎসর হইবে। একে ত তাঁহাকে দেখিলেই আমার ভয় হইত, তাহার উপর "লাঠিপেটার" ভয়ে আর তাঁহার ত্রিসীমানায় যাইতাম না।

ইহার অনেক দিন পরে, যখন ভূদেব বাবু পেন্সন লইয়া চুঁচুড়ায় বাস করিতেন, তখন আমি হুগলী কলেজে পড়িতাম। সেই সময় আমি সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে যাইতাম। তিনি কখনও বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার পরিবারভুক্ত সকলের জন্যই, ঢাকা, শান্তি-পুর বা চন্দননগরের কাপড় ক্রয় করা হইত। চন্দননগর বা ফরাসডাঙ্গার কাপড় আবশ্যক হইলে আমাকে বলিতেন। আমি সংবাদ পাইলেই, আমাদের প্রতিবেশী হরিশ ভড়কে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতাম। হরিশ ভড়ই তাঁহার বাটীতে ফরাসডাঙ্গার কাপড় জোগাইত। ভূদেব বাবু কখনও সাদা ধুতি বা সরু পাড়ের কাপড় পরিতেন না, তিন আঙ্গুল চারি আঙ্গুল চওড়া কালা রেল-পাড়, মতি-পাড় বা কাশী-পাড় শাড়ী পরিতেন। তিনি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন, সাধারণতঃ আটচল্লিশ ইঞ্চ চওড়া বস্ত্র ব্যবহার করিতেন; কিন্তু অত অধিক বহরের শাড়ী সহজে পাওয়া যাইত না, তাই হরিশ ভড় তাঁহার আদেশমত কাপড় বুনিয়া দিত।

ভূদেব বাবু আহারকালে কাঁটা ও চামচ ব্যবহার করিতেন। আসনে বসিয়া থালাতে খাইতেন, কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতেন বলিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিলে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া খাইতেন না। ধূমপানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, আলবোলার নল সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। অত্যধিক ধূমপান করিতেন বলিয়া তাঁহার শুভ্রগুম্ফ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার শ্মশ্রু ছিল না, বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া তিনি শ্মশ্রু রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকের কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কিন্তু গুম্ফ ও শ্মশ্রু সম্পূর্ণ শ্বেত ছিল। আমার বাল্যকাল হইতে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত যাঁহাকে বহুবার দেখিয়াছি, যাঁহার উপদেশ শ্রবণে ধন্য হইয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে দুই-চারি কথায় কিছু লেখা অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না লিখিয়া তাঁহারই সামসময়িক আর এক মহাপুরুষের কথা বলিব। ইনি

ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষজীবনে, বোধ হয় বৎসরাধিক কাল চিকিৎসকগণের পরামর্শে চন্দননগরে গঙ্গার তীরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। চন্দননগরে ষ্ট্র্যাণ্ডের দক্ষিণ-প্রান্তের গঙ্গাগর্ভে যে বাটী আছে, তিনি সেই বাটী এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণে আর একটি বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত বাটীটি তাঁহার অন্তঃপুর ও শেষোক্ত বাটীটি তাঁহার সদরবাটী বা বৈঠকখানা-রূপে ব্যবহৃত হইত। চন্দননগরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইহা দ্বিতীয় বার বা শেষ বারের অবস্থান। আমার পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, আমার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার কয়েক মাসের জন্য চন্দননগরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় আমার পিতা তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়া-ছিলেন। শেষবার বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন চন্দননগরে যান, আমার পিতা তখন বর্দ্ধমানে কার্য্য করিতেন, প্রতি শনিবারে বাটীতে আসিতেন। সেই সময় একদিন বাবা বলিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় এখানে আসিয়াছেন, আজ বৈকালে তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইব।" স্কুলে যাঁহার "বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ" হইতে "সীতার বনবাস" পর্য্যন্ত এবং "উপক্রমণিকা" হইতে "ঋজুপাঠ তৃতীয় ভাগ" পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম, যাঁহার অসাধারণ দয়া ও দানের কথা ভারত-বিদিত, যিনি বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তক, বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের জনক, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে যাইব শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম। বৈকালে বাবার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাসে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এক জন খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণ, অনাবৃত শরীরে একটা হুঁকা লইয়া বাগানের ভিতর দিয়া গঙ্গার ধারের দিকে যাইতেছেন। বাবা মৃদুস্বরে বলিলেন, "উনিই বিদ্যাসাগর।"

আমরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম ও পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি সহাস্যে বলিলেন, "ইন্দ্রকুমার এসেছ? এটি কে?" বাবা বলিলেন, "আমার ছেলে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন—"তোর নাম কি?" আমি তাঁহার মুখে "তুই" সম্বোধন শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। আমি তখন কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতায় অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, লোকে আমাকে "যোগিন বাবু" বলিয়া সম্বোধন করে, আর এই বৃদ্ধ প্রথম-দর্শনেই আমাকে "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিলেন! তখন বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি আমাকে "তুই" বলিয়া একেবারে ঘরের ছেলে করিয়া লইয়াছিলেন।

এই প্রথম-পরিচয়ের পর হইতেই আমি সর্ব্বদা তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতাম। বাবা সপ্তাহে একদিন, রবিবারে তাঁহার কাছে যাইতেন, কিন্তু আমি প্রায় প্রত্যহই যাইতাম। সে-বৎসর আমার ম্যালেরিয়া হওয়াতে কয়েক মাসের জন্য বাটীতেই বসিয়াছিলাম, কলিকাতায় যাইতাম না। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রত্যহ যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর বাসের জন্য নির্ম্মিত নহে, সাহেবদিগের জন্য নির্ম্মিত। সেই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ ব্যয়ে কিছু পরিবর্ত্তন ও একটি নূতন পাইখানা প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। এজন্য রাজমিস্ত্রি ও ছুতারমিস্ত্রি প্রয়োজন হওয়াতে তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, "যোগিন, ভাল রাজমিস্ত্রি দিতে পারিস?" আমাদের বাটীতে সেই সময় রাজের কাজ হইতেছিল, আমি মিস্ত্রিকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলাম। তাহার পর ছুতারমিস্ত্রি, ইট, চুণ, সুরকি, বালি, কাঠ প্রভৃতি আবশ্যক হইলেই আমাকে বলিতেন, আমিও আনাইয়া দিতাম। সেই জন্য তিনি আমার নাম রাখিয়াছিলেন—"মুরুব্বি"। তিনি বলিতেন, "তোকে মুরুব্বি না পেলে আমার যে কি দশা হ'ত তা জানি না।"

তাঁহার কাছে গেলে তিনি জলযোগ না করাইয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার শয়নকক্ষে খাটের নীচে একটা হাঁড়িতে মিষ্টান্ন থাকিত, পাঁচ সাতখানা রেকাবী ও গ্লাস থাকিত। তিনি স্বহস্তে রেকাবীতে খাবার সাজাইয়া হাতে দিতেন, কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া দিতেন এবং স্বহস্তে পান সাজিয়া দিতেন। একদিন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি নিজে পান সাজেন কেন?" তিনি বলিলেন "আমি যে উড়ে রে। মেদিনীপুরের উড়ে। দেখিস নি, উড়েরা নিজের হাতে পান সেজে খায়।" তিনি একদিন আমাদের বাটীতে আসিয়া প্রায় তিন চারি ঘণ্টা বসিয়াছিলেন। সে দিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের বাড়িতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। তিনি খুব 'মজলিসি' লোক ছিলেন। নানা প্রকার গল্প করিয়া খুব হাসাইতে পারিতেন। তাঁহার গল্প শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিত, কিন্তু তিনি হাসিতেন না।

স্বর্গীয় ভূদেব বাবুর সহিত অনেক বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেমন মিল ছিল, তেমনই আবার অনেক বিষয়ে পার্থক্যও ছিল। উভয়েই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান, হিন্দুর আচার-ব্যবহারে নিষ্ঠাবান, অগাধ পণ্ডিত এবং অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন, উভয়েই শিক্ষা-বিভাগে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বাহ্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। ভূদেব বাবু ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, শুভ্র-শ্মশ্রু ও গুম্ফধারী দেখিলে সহসা বৃদ্ধ ইহুদী বলিয়া মনে হইত, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন শ্যামবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, শ্মশ্রু-গুম্ফ এবং মস্তকের চারিদিক মুণ্ডিত, সেকালের সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতই বেশভূষা ও আকৃতি। ভূদেব বাবু ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি এবং অল্পভাষী— এক কথায় "রাশভারী" লোক, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন খুব মজলিসি, আমুদে, সর্ব্বদাই নানা প্রকার গল্প করিতেন, সকলকেই একেবারে ঘরের ছেলে করিয়া লইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে কেহ অনাবশ্যক অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। যেদিন আমি বাবার সঙ্গে প্রথমে তাঁহার কাছে যাই, সেদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় ধূমপান করিয়া বাবার হাতে হুঁকা দিলেন। বাবা হুঁকাটি লইয়া রাখিয়া দিলে তিনি বলিলেন, "সে কি? তুমি তামাক খাও না?" বাবা ধূমপান করিতেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মুখে ধূমপান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাবাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, তুমি তামাক খাও। আমাকে দেখে 'সমীহ' করা হচ্ছে? আমি ও-সব জ্যাঠামী ভালবাসি না। তামাক খাওয়া যদি অন্যায় মনে কর, তবে খাও কেন? যদি অন্যায় ব'লে মনে না-কর, তবে আমার সাম্‌নে খাবে না কেন?" এই বলিয়া বাবার হাতে হুঁকা তুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে ধূমপান করাইলেন।

প্রায় এক বৎসর কাল যে মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাঁহার সম্বন্ধে দুই-এক কথায় কি বলিব? সেকালের আর এক জন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিককেও আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি। তাঁহার নাম বাবু

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু তাঁহাকে আমার শৈশবে দেখিয়াছি, সেই জন্য তাঁহার আকৃতি আমার বেশ সুস্পষ্ট মনে নাই। আমার পিতা যখন কটক নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন রাজকৃষ্ণ বাবু কটকে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। তখন কটকে 'কলেজ' ছিল না। এখন যাহা 'র‍্যাভেন্সা কলেজ' নামে পরিচিত, তখন তাহার নাম ছিল 'কটক হাই-স্কুল'। ঐ হাই-স্কুলে এল. এ (এখনকার ইণ্টারমিডিয়েট) পর্য্যন্ত পড়ান হইত। বোধ হয় হাই-স্কুলেই আইন পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। আমরা যখন কটকে ছিলাম, তখন র‍্যাভেন্সা সাহেব উড়িষ্যা-বিভাগের কমিশনার ছিলেন। পরে তাঁহার নামানুসারে হাই-স্কুলকে র‍্যাভেন্সা কলেজ করা হয়। শুনিয়াছি, পরে রাজকৃষ্ণবাবু বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের হেড ট্রান্সলেটার হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু কবি ও সুরসিক ছিলেন। নর্ম্মাল স্কুলের তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

সখারাম গণেশ দেউস্কর

দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীকে তিনি একবার নিমন্ত্রণ করিবার সময় নিমন্ত্রণ-পত্রে লিখিয়াছিলেন

> "সবিনয় নিবেদন, আপনি সামান্য নন
> লোকে বলে সুপরি তিনটে।"

শুনিয়াছিলাম যে, কটকে রাজকৃষ্ণ বাবুর পত্নীর সহিত যখন দ্বারকা বাবুর পত্নীর প্রথম পরিচয় হয়, তখন নাকি দ্বারকা বাবুর স্ত্রী স্বামীর পরিচয় প্রদান কালে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী নর্ম্মাল স্কুলের সুপুরিটিণ্টেণ্ট। দ্বারকা বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। মোহিনী বাবু অনেকগুলি ভাষা জানিতেন। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াই তিনি লোকান্তরে প্রস্থান করেন। সেকালের আর এক জন কবি বাবু

রাজকৃষ্ণ রায়

আমাদের যৌবন কালে খুব বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার "প্রহ্লাদ-চরিত্র" "প্রভাস" "লয়লা মজনু" প্রভৃতি নাটক ও গীতিনাট্য এক সময় বেঙ্গল থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার প্রভৃতি থিয়েটারে

অভিনীত হইত। রাজকৃষ্ণ রায় স্বয়ং মেছোবাজার স্ট্রীটে "বীণা থিয়েটার" নামে একটি থিয়েটার করিয়াছিলেন। সেই থিয়েটারে কোন অভিনেত্রী ছিল না, পুরুষেরাই স্ত্রীলোকের ভূমিকার গ্রহণ করিতেন। চন্দননগরে ৺দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সময় তাঁহার বাটীতে বীণা থিয়াটারে "প্রহ্লাদ-চরিত্রের" অভিনয় হইয়াছিল—তাহাতে রাজকৃষ্ণ বাবু হিরণ্যকশিপু সাজিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুকে সেই সময় দেখিয়াছিলাম।

"হিতবাদীর" সম্পাদক

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

মহাশয়ের সময়েই আমি "হিতবাদীর" সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করি। আমার নিয়োগের বোধ হয় আড়াই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। হিতবাদীর সেবায় নিযুক্ত থাকিবার সময়, আমি বহু বার, তাঁহার মৃত্যু তারিখে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। সুতরাং এখন আর সেই সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। তাঁহার সম্বন্ধে আমি এক কথায় এই বলিতে পারি যে, তাঁহাকে দেখিলে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি বলিয়া মনে হইত। তাঁহার মত তেজস্বী পুরুষ অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতে গেলে আমাকে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। তাঁহার সম্বন্ধে একটা কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত নৌ-সেনাপতি নেলসনের ন্যায় কাব্যবিশারদ মহাশয়ও was as brave as a lion and as tame as a lamb. "হিতবাদীতে" তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ

পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর

মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয় চন্দননগরে আমার বাল্যবন্ধু ও প্রতিবেশী বাবু চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে। একদিন চারু বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর আমার বাটীতে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমাদের বাটীতে সখারাম বাবু এসেছেন, দাদা বাড়িতে নাই, তিনি একলা ব'সে আছেন। আপনি আমাদের বাড়িতে আসুন।" সখারাম বাবুর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় ছিল না। "সাহিত্য" কাগজে তিনিও লিখিতেন, আমিও লিখিতাম পরস্পরের পরিচয় ঐ পর্য্যন্ত ছিল। আমি তাঁহার নাম জানিতাম, তিনিও আমার নাম জানিতেন। চারু বাবুর বৈঠকখানাতে প্রবেশ করিবামাত্র সখারাম বাবু আমাকে নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আমি বর্গী। চারু বাবু পলাইয়া থাকিলেও নিস্তার পাইবেন না, আমি তাঁহার আতিথ্যের উপর অত্যাচার না করিয়া উঠিব না।" সখারাম বাবুর সহিত সেই আমার প্রথম বাক্যালাপ। আমি তখন কলিকাতায় একটা আপিসে কেরাণীগিরি করিতাম। তাহার পর যখন কেরাণীগিরি ছাড়িয়া "হিতবাদী"তে যাই, তখন তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। এই ঘনিষ্ঠতা পরে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। সখারাম বাবু আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। যাঁহার সহিত এক টেবিলে বসিয়া ছয়-সাত বৎসর প্রত্যহ কাজ করিয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করা অসম্ভব। তাঁহার স্বদেশানুরাগ তাঁহার "দেশের কথাতে"ই প্রকাশ। "দেশের কথা"র ন্যায় পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। সকলেই অবগত আছেন যে, গবর্ণমেণ্টের আদেশে ঐ পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। "দেশের কথা" ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে "ঝান্সির রাজকুমার" নামক পুস্তকখানিও বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত হইয়াছে। সখারাম বাবু গম্ভীর প্রকৃতি, রাশভারী লোক ছিলেন, কিন্তু হাস্য-কৌতুকে যোগ দিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন। বন্ধু-বান্ধবের সহিত রসিকতা করিতে তিনি অপটু ছিলেন না। আমাদের নিকট মধ্যে মধ্যে এমন দুই-একটা সংস্কৃত কবিতা বলিতেন, যাহা ভারতচন্দ্র-যুগেই ভদ্রসমাজে শোভন, বর্ত্তমান যুগে একেবারে অচল। একদিন আমি চারু বাবুর অনুরোধে তাঁহার পত্নীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিয়া বাহির-সিমলায় তাঁহার শ্বশুর-মহাশয়ের বাসাতে পঁহুছিয়া দিয়া আপিসে যাই, সুতরাং সেদিন আমার আপিসে যাইতে একটু বেলা হইল। বেলা হইবার কারণ শুনিয়া সখারাম বাবু বলিলেন, "আপনার কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। আমি হইলে

চারু বাবুর স্ত্রীকে লইয়া একেবারে শিয়ালদহের কুলি-ডিপোতে লইয়া যাইতাম। কিছু নগদ বিদায়ও পাইতাম আর বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যপালনও হইত। এমন সুযোগ ছাড়িতে আছে?" এইরূপ কথা সখারাম বাবু অনেক সময়েই বলিতেন। সখারাম বাবু অনেক বার আমাদের বাড়িতে গিয়াছিলেন এবং আহারও করিয়াছিলেন। তাঁহার আহার সম্বন্ধে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। সে বৈশিষ্ট্য তাঁহার ব্যক্তিগত নহে, সমাজগত। সখারাম বাবু নিরামিষভোজী মারাঠা ব্রাহ্মণ, আমি মৎস্য-মাংসভোজী বাঙালী ব্রাহ্মণ, সুতরাং তিনি আমাদের বাটীতে যে আমিষ "হেঁশেলে"র ব্যঞ্জনাদি খাইবেন না, তাহা জানিতাম; অন্নভোজনও করিবেন না, সুতরাং লুচির ব্যবস্থা করিলাম। সখারাম বাবু বলিলেন, "আপনাদের বাঙ্গালায় চাউল যত ক্ষণ সিদ্ধ না হয়, তত ক্ষণ উহা 'সকড়ি' বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু আমাদের সমাজে চাউল বা ময়দায় জল লাগিলেই উহা "সকড়ি" হয়। সশ্রেণী ব্যতীত অন্য শ্রেণীর বাটীতে আমরা 'সকড়ি' খাই না। সুতরাং আপনারা যেরূপ জল দিয়া ময়দা মাখিয়া লুচি ভাজেন, সেরূপ না করিয়া যদি দুধ দিয়া ময়দা মাখিয়া লুচি ভাজেন, তাহা খাইতে আমার আপত্তি নাই। মারাঠা দেশে ময়রার দোকানে লুচি পুরী প্রভৃতি দুধেমাখা ময়দায় প্রস্তুত হয়।" আমি সখারাম বাবুর কথায় দুধে ময়দা মাখিয়াই লুচি ভাজিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তিনি যতবার আমাদের বাটীতে গিয়াছেন, ততবারই দুধে ময়দা মাখিয়া লুচি হইত। মারাঠা ব্রাহ্মণগণ নিরামিষাশী, কিন্তু পেঁয়াজ খাইতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। সখারাম বাবু আমাদের বাটীতে পেঁয়াজের তরকারি খাইতেন, একবার আমার এক পুত্রের উপনয়নের পর, আপিসে বন্ধুদের জন্য "আনন্দ-নাড়ু" লইয়া গিয়াছিলাম। সখারাম বাবু প্রথমে খাইতে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন শুনিলেন যে, উহাতে চাউলের গুঁড়া, নারিকেল, তিল ও গুড় ছাড়া আর কিছু নাই, চাউলের গুঁড়াতে জল দেওয়া হয় না, গুড় দিয়াই মাখা হয়, তখন বিনা আপত্তিতে ভোজন করিলেন। তিনি একদিন আমাদিগকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, যেন সম্পূর্ণ মারাঠা প্রণালীতে আমাদিগকে খাওয়ান হয়। ভোজনের সময় ভোজনগৃহে গিয়া দেখিলাম, আমাদের প্রত্যেকের বসিবার জন্য একখানি করিয়া কাঠের "পিঁড়া" পাতা হইয়াছে। পিঁড়ার সম্মুখে কলাপাতা। আমরা চওড়া কলাপাতা চিরিয়া দুই ভাগ করিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া লই, এবং পাতার ডগার দিকটা অখণ্ড ত্রিভুজাকার থাকে, সখারাম বাবুর বাটীতে দেখিলাম আমাদের প্রত্যেকের পাতাই সেইরূপ ত্রিভুজাকৃতি, কাহারও পাতা চেরা ও চৌকা নহে। ত্রিভুজাকৃতি পাতাতে খাইবার সময় আমরা সাধারণতঃ উহার সূক্ষ্ম কোণটা আমাদের বামদিকে রাখি, সেই দিকে অন্ন বা লুচি থাকে, আর দক্ষিণ দিকে ব্যঞ্জনাদি থাকে। মারাঠা-প্রথা দেখিলাম যে, ত্রিভুজ পাতার baseটা অর্থাৎ ত্রিভুজের যে বাহুটা আমরা দক্ষিণ দিকে রাখি, সেই দিকটা আমাদের আসনের দিকে আর তাহার বিপরীত কোণ—অর্থাৎ যে-কোণে পাতার শেষ, সেই কোণটা পিঁড়া হইতে দূরে আছে। পাতার তিন দিকে ঘরের মেঝেতে "আলিপনা" দেওয়া। তার পর ভোজ্যের কথা। খিচুড়ি বা পোলাওর মত একটা পদার্থ—সেইটাই ভাত বা লুচির ন্যায় প্রধান ভোজ্য—সখারাম বাবু বলিলেন, "উহার নাম "ডালতাঁদুড়", উহা ডাল ও তণ্ডুল শব্দের অপভ্রংশ, বুঝিলাম আমরা যাহাকে খিচুড়ি বলি। ব্যঞ্জনাদি সমস্তই আমাদের অপরিচিত। সাগুদানার মিঠাই ও ছোট ছোট জিলাপী, জিলাপীটা সাগুদানার কি এরারুটের তাহা মনে নাই—ইহাই আমরা ভোজন করিলাম। সমস্তই সখারাম বাবুর পত্নী স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন। মারাঠা দেশে স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথা নাই, কিন্তু সখারাম বাবুর স্ত্রী কখনও আমাদের সম্মুখে বাহির হইতেন না, তবে তাঁহাকে আমি দুই-এক বার দেখিয়াছি। সখারাম বাবু কাশীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী অনেক সময় একাকিনী কলিকাতা হইতে কাশীতে যাইতেন বা কাশী হইতে আসিতেন। সখারাম বাবু হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া শ্বশুরবাটীতে টেলিগ্রাম করিতেন, সেখানে কেহ ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেন, কাশী হইতে আসিবার সময়ও এইরূপ ব্যবস্থা হইত। ট্রেনে একাকিনী যাতায়াত করিবার সময় তাঁহার পত্নী একখানা বড় ছোরা কোমরে বাঁধিয়া রাখিতেন।

সখারাম বাবু মহামতি রাণাডে ও লোকমান্য তিলকের একান্ত ভক্ত ছিলেন। সুরাটের কংগ্রেস লণ্ডভণ্ড পরিণত হইলে সুরেন্দ্রবাবু প্রমুখ মধ্যপন্থীরা বলেন যে, লোকমান্য তিলকের অনুচরদের গুণ্ডামির জন্যই কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন পণ্ড হইয়াছে, সুতরাং তিলককে নিন্দা করিয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতে হইবে। কবিরাজ ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন ও ৺উপেন্দ্রনাথ সেন সুরেন্দ্রবাবুর মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা "হিতবাদী"তে তিলকের নিন্দাসূচক প্রবন্ধ লিখিবার জন্য সখারাম বাবুকে আদেশ করিলে সখারাম বাবু হিতবাদীর সংস্রব ত্যাগ করেন। হিতবাদী ত্যাগের পর, তদানীন্তন ন্যাশনাল কলেজ বা জাতীয় বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও ইতিহাসের অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র—পঞ্চমবর্ষীয় শিশু বালাজী কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। পুত্রবিয়োগের বোধ হয় দুই বৎসর কি আড়াই বৎসরের মধ্যেই সখারাম বাবুর পত্নীবিয়োগ হয়। শেষজীবনে সখারামবাবু বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিলেন। পুত্রশোক ও পত্নীশোক, নিজের দীর্ঘকালব্যাপী পীড়া, অর্থকষ্ট প্রভৃতি তাঁহাকে একেবারে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার শেষ-জীবনের কথা মনে হইলে বড়ই কষ্ট হয়।

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বোম্বাইয়ের পথে—বোম্বাই

ইঞ্জিনের বাঁশী বাজল, বন্ধুদের বিদায়-কলরবের মধ্যে ট্রেন ছাড়ল। স্ত্রী আর পুত্র-কন্যারা গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছিল; লোকজন হৈ-চৈ দেখে এরা সকলেই একটু ভ'ড়কে গিয়েছে, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা বাবার গলার ফুলের মালা পেয়ে মহা খুশী, তারা তাদের মায়ের পাশে নানা আত্মীয়-বন্ধু আর চেনা-অচেনা লোকের গাড়ীর কাছেই প্লাটফর্মের মধ্যে এক ধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে; প্রণামের পালা একটু আগেই শেষ হ'য়েছে। ভীড়ের মধ্যে বহু হাতে রুমাল নাড়া, কারু মুখ আর চেনা যায় না, আধ সেকেণ্ডের মধ্যেই, তবু ষ্টেশনের তীব্র আলোর মধ্যে বিস্তর রুমাল ন'ড়ছে—শেষ মুহূর্ত্তটুকু পর্য্যন্ত প্রিয়জনকে ছুঁয়ে থাকবার কি অব্যক্ত আকুলি-বিকুলি থেকে বিদায়কালে এই রুমাল-নাড়ার রীতির উদ্ভব! ষ্টেশনের বিরাট লোহার আলোকিত গহ্বর থেকে বাইরের খোলা মাঠের মধ্যে ট্রেন-অজগর ফোঁস-ফোঁস্ ক'রতে ক'রতে গজরাতে-গজরাতে বেরিয়ে প'ড়ল; এখনও খানিকটা পথ বিজলীর আলোয় উজ্জ্বল,—ষ্টেশনের ভিতরকার আলোক-কুণ্ড থেকে যেন কতকগুলো আলোর ফিন্‌কি ছিটকে বেরিয়ে এসে আলোক-স্তম্ভগুলির মাথায় মাথায় জ্বলছে।

তের বচ্ছর পরে আবার পশ্চিম-যাত্রা। তখন যে আশা-আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ নিয়ে গিয়েছিলুম, এখনও তার অনেকটা আছে, কিন্তু জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে, দৃষ্টি-কোণও কোনও কোনও বিষয়ে কতকটা বদলে গিয়েছে। ইউরোপে নানা রকমের উপদ্রব ওলট-পালট চ'লেছে, তার দু-একটা জনশ্রুতি খবরের কাগজে আমাদের কাছে পৌঁছায়। সত্য সত্য কি ঘ'টছে তা সেখানে থেকে না দেখলে বুঝতে পারা যাবে না; কিন্তু সব তলিয়ে বোঝবার জন্য সময় আমার কোথায়? আমার প্রধান উদ্দেশ্য, আবার এক যুগ পরে ইউরোপের জ্ঞান-তপস্বীদের সংস্পর্শে আর একটু আসি, তাঁদের অনুপ্রাণনায় নবীন উৎসাহে নিজের কাজে আবার লেগে যাই; আর সঙ্গে সঙ্গে যে বিচিত্র আর অপ্রতিহত ভাবে মানুষ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে

আর ক'রছে তার সামান্য কিছু পরিচয় সংগ্রহ ক'রে আসি। রসিক আর পণ্ডিতদের সভা আর সাহচর্য্য; মিউজিয়ম, আর্ট-গ্যালারি প্রভৃতি সংগ্রহ-শালা; আর বাইরের প্রবহমান জীবনস্রোত—এই তিনেরই টান আগেকার মত এবারও আমায় বাইরে টেনেছে। সুখী জীবন, সুস্থ জীবন, সুন্দর জীবন, শান্তিময় জীবন পাবার জন্য পশ্চিম কি ক'রছে, তার করার মধ্যে কতটুকু বা সার্থকতা এসেছে, এই চার-পাঁচ মাস ধ'রে পশ্চিমের জীবনে অবগাহন ক'রে তার একটা পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চ'লেছি; আমাদের অবস্থার সব দিক বিচার ক'রে, ইউরোপের এই চেষ্টার ভিতর আমাদের জন্যও কোনও বাণী, কোনও আশার কথা আছে কি না সে-বিষয়েও অবধান ক'রে দেখ্‌বারও ইচ্ছা আছে। সমগ্র মানব জাতির উদ্ধারের জন্য ইউরোপের কোথাও কোথাও চেষ্টা হ'চ্ছে, এই রকমটা শোনা যাচ্ছে; এইরূপ বিশ্বহিতৈষণা ইউরোপে কতটা আছে, সেটা দেখ্‌তেও ইচ্ছা হয়। যাক্, পাঁচ মাস পরে ঘরে ফিরবার সময়ে এ-সব বিচার করবার অবকাশ মিলবে।

বী-এন্-আর;—নাগপুর হ'য়ে বোম্বাই মেল। ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২০শে মে তারিখে আমার যাত্রা সুরু হ'ল। বোম্বাইয়ে গিয়ে জাহাজ ধ'রবো, ১৯৩৫ সাল ২৩শে মে তারিখে। গাড়ীতে ভীড় নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনটি নীচের বেঞ্চে আমরা তিন জন যাত্রী। আর এক জন খড়্গপুরে নেমে গেল—এক মাদ্রাজী দামী ইংরেজী পোষাকের বহরে আর ইংরেজী কেতার অনুকারী মার্জ্জিত ধরণের কথাবার্ত্তায় সে যে বড় চাকুরে', সম্ভবতঃ বিলেত-ফেরত—তার পরিচয় একটু দিয়ে গেল। বোম্বাই-যাত্রী আমাদের তিন জনের মধ্যে এক জন ছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-মন্দিরের রসায়ন-বিভাগের গবেষক-পদাধিরূঢ় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন; দ্বিতীয়টি (পরে আলাপে এর পরিচয় জেনে নিলুম), তাতা-লোহা-কোম্পানীর এক জন কর্ম্মচারী, দক্ষিণ-ভারত পালঘাট অঞ্চলে বাড়ি একটি তামিল ব্রাহ্মণ ছোক্‌রা—আয়েঙ্গার—নিজের আপিসের কাজে বোম্বাই চ'লেছে। আর তৃতীয় জন আমি।

সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের গাড়ী ছাড়ে। রাত একটার দিকে কি একটা ষ্টেশনে অন্য কামরায় জায়গা না পেয়ে একটি বাঙালী-পরিবার আমাদের কামরায় উঠ্‌লেন—ছেলে-পুলে মেয়ে-পুরুষে আট-নয় জন হবে, আর সঙ্গে পাহাড়-পরিমাণ লগেজ। ভোর চারটায় ঝারসুগুডা ষ্টেশনে এঁরা নেমে গেলেন। রাত্রে যেমন ঘুমের ব্যাঘাত একটু হ'য়েছিল, ভোরে বিহার উড়িষ্যা আর মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলের শালের বন দেখে মনটা তেমনি খুশী হ'য়ে গেল। অসমতল জমী, মাঝে মাঝে ঢিবি আর ক্রমাগত শালগাছ, বিরাট সুউচ্চ প্রৌঢ় বনস্পতি থেকে ছোট ছোট ঝোপ,—সব অবস্থার শালগাছ। বোধ হয়, এই খানটা সরকারী তরফ থেকে শালগাছ পুতে বন ক'রে রাখা হয়। অনাদিকালের অরণ্য ব'লে এ অঞ্চলটাকে মনে হ'ল না। মাঝে মাঝে কোলজাতীয় ছেলেরা লেংটী প'রে গোরু মোষ নিয়ে বেরিয়েছে। দু-একটা পাহাড়ে' নদী চ'লেছে ঝির-ঝির ক'রে, তাতে জায়গাটা আরও মনোরম হ'য়েছে। সকাল-বেলায় সোনালী রোদ্দুর উঠ্‌ল, ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের জগৎটা যেন আজকালকার শহুরে সভ্যতা যখন জন্মায় নি তখনকার দিনের সেই তরুণ জগৎ ব'লে বোধ হ'তে লাগল। বিশেষ ক'রে কোল জাতের এই সব অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলে-পুলেরা থাকায় চিত্রটাকে যেন আদিম যুগের ক'রে তুলেছিল। রায়গড় ষ্টেশন এল, ষ্টেশনে গাড়ী অল্প খানিকক্ষণ দাঁড়াল, ষ্টেশনে লোকজন বেশী নেই, তবে খোলা প্লাটফর্মের বাইরে, একটি কুয়োর ধারে দেখা গেল, গায়ে ময়লা কালো ছিটের কোট, মাথায় কালো ফেল্টের টুপী, আর পরণে ময়লা সাদা ঢিলে ইজের, খোঁচা খোঁচা দাড়ী একমুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পশ্চিমা, খুব সম্ভব রেলের ঠিকেদার কি ঠিকেদারের লোক হবে; আর তার পাশে র'য়েছে এক জন কোল যুবক। এই যুবকটিকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল,—তার চেহারায় এমন সুন্দর একটি চিত্রের সৃষ্টি করেছিল, যে কি আর ব'লবো! চমৎকার সুঠাম চেহারা, যেন কালো পাথরে কোঁদা; কোমরে লাল রঙের একখানা কাপড়, হাঁটুর অনেকখানি উপরে কাপড়ের শেষ;—অজন্টার রাজপুত্রের রাজার কোমরে যে কাপড় আঁকা আছে, তারই মত বহরের; কোল গাঁয়ের তাঁতে হিন্দু তাঁতী বা মুসলমান জোলা (অথবা কোনও কোল মেয়ে) পাঁয়ে-বোনা সুতোর এই মোটা খাদি

কাপড় বুনেছে। সুগঠিত পায়ের পেশী, পায়ের দাবনার পেশীগুলিও সুপুষ্ট, সুপরিস্ফুট; দুই কালো রঙের পায়ের মাঝ দিয়ে কোমরের লাল কাপড়ের একটা ভাগ একটু কোঁচার মতন ঝুলছে, হাঁটু পর্য্যন্ত; মাথা উঁচু ক'রে যুবক দাঁড়িয়ে; দুই হাতে দুই কাঁসার বালা, তাতে তার গায়ের চমৎকার কালো রং আরও ফুটে উঠেছে; ডান হাতে একটা লাঠি, গলায় কতকগুলা রঙীন পুঁতির মালা, কাঁধে একখানা কালো হ'লদে আর অন্য রঙে রঙীন চাদর বা গামছার মত; মুখের ভাব সরলতা-মাখানো, মাথার বাবরী চুল কাঁধ পর্য্যন্ত এসে নেমেছে—একটা কাঁসা কি পিতলের চক্চকে ফিতার আকারের আঙটা মাথার চারদিক বেড় দিয়ে তার ঝাঁকড়া কালো চুলকে আটকে ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছে। এই সরল সুন্দর বেশে কোল যুবকটিকে পশ্চিমে ঠিকেদারের পাশে কত না সুন্দর দেখাচ্ছিল! ছোকরা যেন একেবারে সেই আর্য্যপূর্ব্ব যুগ থেকে সরাসরি এই ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নেমে এসেছে, তার আদিযুগের সমস্ত রোমান্স, সমস্ত সরল ঋজু সহজ সুন্দর মানবিকতার আবহাওয়া নিয়ে—আর্য্য আর দ্রাবিড়দের ভারতে পদার্পণ করবার আগে যে কোল জাতির দ্বারা ভারতীয় জীবনযাত্রা-পদ্ধতি আর ভারতীয় সভ্যতার পত্তন হ'য়েছিল সেই কোল জাতির আদিম যুগের মূর্ত্তিমান প্রতীক-স্বরূপ ঐ কোল-যুবকটিকে আমার মনে হ'তে লাগল। বাস্তবিক, যুবকটিকে দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। মিনিট কতকের মধ্যে গাড়ী আবার রওনা হ'ল, আর প্রাচীন যুগের এই চিত্র আমার চোখের সামনে থেকে চিরতরে অন্তর্হিত হ'ল। প্রাচীন জগৎ, প্রাচীন জীবন-যাত্রার পদ্ধতি চিরকালের জন্য চ'লে গিয়েছে, তার জন্য দুঃখ ক'রে লাভ নেই—যেটুকু দুঃখ বা আক্ষেপ করা যায় সেটুকু এই জন্য যে একটা সুন্দর জিনিষ চ'লে গেল ব'লে; কিন্তু তা ব'লে অতীতের রোমান্স-এর জন্য আধুনিকের জ্ঞান-বিজ্ঞানময় জগৎকে ছাড়তে আমি প্রস্তুত নই; অতীতের জীবনের রসবত্তাকে সারল্যকে যদি আধুনিক জীবনের নীরসতার মধ্যে, কপটতার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারি, তবেই অতীতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সার্থক হবে।

যত দিন বেড়ে চ'ল্ল, সূর্য্যদেবের প্রকোপ ও তাত বৃদ্ধি পেতে লাগল। বর্দ্ধন-মহাশয় আর আমি উভয়ে পূর্ব্বে পরিচিত ছিলুম না, ট্রেনে প্রথম পরিচয়, আমরা উভয়ে এক যাত্রার যাত্রী; একই জাহাজে আমাদের গতি। তিনি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী সন্তান; বিজ্ঞানে এখানকার ডী-এস্-সি, আর পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েরও ডী-এস্-সি মর্য্যাদা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন। কিন্তু এখনও পাকা চাকরী কোথাও হয় নি। এবার রসায়নের একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণা করবার জন্য ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাসবিহারী ঘোষ বৃত্তি নিয়ে এক বছরের মতন লণ্ডনে চলেছেন। তিনি একটু গম্ভীর-গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সাঁয়ত্রিশ-আটত্রিশ বৎসর বয়স' অকৃতদার, একটু অতি মাত্রায় অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী—আজকাল আত্মবিস্মৃত আত্মবিক্রীত বাঙালী হিন্দু সমাজে "Oriental Oriental" লব্জ আউড়ে ইউরোপের মুখে ঝাল খেয়ে সাবেক সেকেলে ঢঙের দিশী জিনিষের ভিতরের আর্ট-এর কদর করবার যে একটা হিড়িক উঠেছে, যেটা অনেক সময়ে একটা অসহ্য ন্যাকামি ভিন্ন আর কিছু নয়, আর যেটাকে "প্রাচ্যামি" আখ্যা আমার এক বন্ধু দিয়েছেন, সেই "প্রাচ্যামি"র কোনও ধার বর্দ্ধন-মহাশয় ধারেন না, অথচ তাঁর সরল সাদাসিধে ধরণ-ধারণ দেশী চালচলনের দিকে তাঁর সহজ পক্ষপাতিত্ব আমার বেশ লাগল। ইউরোপে যাচ্ছি, ট্রেনে আবার এই গরমে বিলিতি খানা খেয়ে অর্থনষ্ট ক'রে মরি কেন? স্থির করলুম আমরা ঝাড়সুগুড়া ষ্টেশনে যে হিন্দু ভোজনাগার আছে সেখানে নিরামিষ ভাত ডাল তরকারী খাবো। ট্রেনে বিলাতযাত্রী আর এক জন বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে পরে দেখা, তিনি ভীত হয়ে বল্লেন, "মশাই, যাচ্ছেন বিদেশে, এসব দিশী হোটেলের খাওয়া খেলে কলেরা হয়ে মারা যাবেন।" আমাদের এই বন্ধুটির কোনও অপরাধ নাই; আমরা সাধারণতঃ একটু শিক্ষিতাভিমানী, একটু আলোকপ্রাপ্ত আর তার উপর একটু বিদেশাগত ভাগ্যবান হ'লে, স্বজাতির রীতিনীতির থেকে এবং সম্ভব হ'লে বহুক্ষেত্রে স্বজাতীয় লোকেদের থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। বিশেষ একটু আত্ম-কেন্দ্রী ভাবও মনের মধ্যে আসে; তাই অনেক সময়ে যখন ক'লকাতা থেকে

স্বদেশের পল্লীগ্রামে যাই, তখন ম্যালেরিয়ার ভয়ে সঙ্গে নিয়ে যাই হয় সোডা, নয় ডাব ; অথচ ভুলে যাই যে সেখানেও সেখানকারই জল খেয়ে স্বাস্থ্য বজায় রেখে আরও পাঁচ জন ভদ্রসন্তান বাস ক'রছে। যাক্, বিলাসপুরে বেশ তড়বড়ে বাঙলা বলে এমন এক জন অ-বাঙালী ছেলে, পশ্চিমা হ'তে পারে, মারহাটি হ'তে পারে, দু'জনের জন্য নিরামিষ খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল। ডুঙ্গারগড়ে চাকরে থালায় ক'রে খাবার দিয়ে গেল—পরিষ্কার সুরভি আতপ চালের ভাত, খান-চারেক লাল আটার রুটী আর আট-নয়টা আলুমিনিয়মের বাটী ক'রে ঘী, ডাল, টক, আচার, তিন-চার রকমের ভাজী, তরকারী, দই, চিনি, পায়েস, আর পাঁপর দিয়ে গেল। এক টাকা ক'রে নিলে, আমরা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সমাধা ক'রলাম।

"ভুক্তা রাজবদাচরেৎ"—ভীষণ গরম, সব কাঠের জানালা-গুলি ফেলে দিয়ে গাড়ীর কামরা অন্ধকার ক'রে মনে ক'রলুম একটু ঘুমিয়ে গ্রীষ্মকালের দিন-চর্য্যা ক'রবো, কিন্তু অগ্নি-সখা পবনদেব এখন সূর্য্য-সখা হ'য়ে দেখা দিলেন। কি ভীষণ তপ্ত হাওয়া জানালার পাখী ভেদ ক'রে চ'লতে লাগ্‌ল,—যেন আগুনের হল্‌কা বইছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ধুলো। ঘুম দূরে থাক, প্রাণ যেন আই-ঢাই ক'রতে লাগল। সারা দুপুর আর বিকাল ধরে এই লু চ'ল্‌ল। বিছানাপত্র এমন তেতে উঠ্‌ল যে অনেক রাত পর্য্যন্ত গরম ছিল।

বিকালে ওয়ার্দ্ধা ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াল। আমাদের কামরায় ইতিমধ্যে দু-জন ইংরেজ বা আঙ্গলোইণ্ডিয়ান ইঞ্জিন-চালক উঠেছে, এক জন আধবুড়ো, লম্বা-চওড়া জবরদস্ত চেহারার লোক, অন্য জন ছোকরা, রোগা পাতলা। আধ-বুড়ো লোকটি বর্দ্ধন-মহাশয়ের সঙ্গে ভাব ক'রে নিলে—মুখপাতে বাঙালী জাতির সুখ্যাতি ক'রে—সাহেব কবে বছর-খানেক ক'লকাতায় ছিল, তখন দেখেছে যে ভারতবর্ষের সব জাতের চেয়ে বাঙালীরাই educated, clever, acute. ওয়ার্দ্ধা থেকে গাড়ী ছেড়ে দিতে এই ইঞ্জিনওয়ালা সাহেবটি আমাদের ব'ল্‌লে, "মিষ্টার গ্যাণ্ডী এই গাড়ীতে চ'লেছেন, ইঞ্জিনের পিছনেই যে থার্ড ক্লাস গাড়ী খানা আছে, সদলে তাতে উঠেছেন।" গাঁধীজীর সঙ্গে আমরা এক ট্রেনে সহযাত্রী! তাঁর দর্শন তো একবার পাওয়া চাই! সাহেব ব'ললে—"আমিও আগের ষ্টেশনে গাড়ী থামলে তাঁকে দেখ্‌তে যাব।"

খাকীর হাফপ্যাণ্ট আর কামিজ প'রে ট্রেনে উঠেছিলুম, রাত্রে ঘুমাবার জন্য লুঙ্গী পরি, তার পর গরমের তাড়ায় আর লুঙ্গি ছেড়ে হাফপ্যাণ্ট পরতে প্রাণ চায় নি। লুঙ্গী বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশ হ'ল, বর্ম্মা আর মালয় দেশ থেকে বাঙালী মুসলমান খালাসী আর বর্ম্মা-প্রবাসী অন্য শ্রেণীর লোকেদের অবলম্বন ক'রে বাঙলা দেশে ঢুকেছে। লুঙ্গী সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সাধারণ পোষাক, আমার মনে হয়, ক্রমে লুঙ্গী ভারতবর্ষের পোষাক হ'য়ে দাঁড়াবে—অন্ততঃ ঘরোয়া পোষাক হ'য়ে, তবে তার কিছু দেরী আছে। যাক্, এখনও লুঙ্গী বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের সামাজিক পোষাক হয় নি। মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা ক'রবো, বড় বাক্‌স থেকে ধুতী বা'র করবার সুবিধা নেই, অগত্যা লুঙ্গী ছেড়ে ফেলে খাকীর হাফপ্যাণ্ট আর শর্ট প'রে নিলুম। তাঁর সঙ্গে একটু কথা কইবারও ছিল। আমি ভারতবর্ষে রোমান অক্ষর চালানোর পক্ষে, তবে আমার মনে হয় উপস্থিত দেশের লোকে রোমান অক্ষর চট্ ক'রে নিতে চাইবে না। দেশের লোকের সামনে বিষয়টার অবতারণা একটুখানি ক'রে রাখতে চাই ব'লে হালে আমি একটা বাঙলা প্রবন্ধ লিখি, "আনন্দবাজার পত্রিকা" গত বৎসরের পূজার সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়, আর ক'লকাতায় গত ডিসেম্বর মাসে যে প্রবাসী-বাঙালী-সাহিত্য-সম্মেলন হয় তার সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি সেই প্রবন্ধটি আকর্ষণ করে, তিনি তাঁর অভিভাষণে ভারতে রোমান-লিপি প্রচলনের পক্ষে কিছু বলেন। তার পরে আমি ইংরেজীতে এই বিষয়ে একটি বড় প্রবন্ধ লিখেছি। রোমান অক্ষর ভারতবর্ষের ভাষার জন্য চলা উচিত কিনা সে-বিষয়ে প্রশ্ন গাঁধীজীর কাছেও কেউ কেউ তুলেছিলেন। কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে খোলাখুলি মত এখনও দেন নি। এ দিকে ইন্দোরে গত এপ্রিল মাসে গাঁধীজীর সভাপতিত্বে যে নিখিল-ভারত-হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন হয় তাতে নাগরী অক্ষরের সংস্কার করবার জন্য একটা সমিতি গঠিত হয়, আমাকেও সেই সমিতির অন্যতম সদস্য ক'রেছে। সে-বিষয়ে ক'লকাতায় ইতিমধ্যে আমাদের

দুটো অধিবেশনও আমার বাড়িতে হ'য়ে গিয়েছে। রোমান বর্ণমালা চালাতে না পারলে, দেবনাগরী গ্রহণ করার পক্ষেও আমার পূরো মত আছে। মোট কথা সংযুক্ত রাষ্ট্রময় ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য এক বর্ণমালা হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং সেজন্য আলোচনা বিচার বিবেচনা করবার সময় এখন এসেছে। নাগরী-লিপি-সুধার-সমিতির সভ্য হিসাবে আর সব সদস্যদের কাছে তার প্রধান সভাপতি বিধায় গাঁধীজীর কাছে আমার রোমান-লিপি-বিষয়ক ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। তবুও স্বয়ং মহাত্মাজীর হাতে ঐ প্রবন্ধ একখণ্ড দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। গত বার হরিজনসেবার জন্য টাকা তুলতে যখন মহাত্মাজী কলকাতায় আসেন, তখন তিনি দেশবন্ধুর কন্যা শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী পরিচালিত ব্রজমাধুরী সংঘের বাঙলা কীর্ত্তন শুনতে দেশবন্ধুর জামাতা শ্রীযুক্ত সুধীর রায় মহাশয়ের বাড়িতে আসেন। বাঙলা কীর্ত্তনের কথা আর অর্থ দু-ই গানের সময়ে বুঝতে সুবিধা হবে ব'লে আমি নাগরী অক্ষরে বাঙলা গানগুলি লিখে দিই, আর তার পাশে হিন্দী অনুবাদ একটা ক'রে দিই, তাতে মহাত্মাজীর পক্ষে কীর্ত্তনের রসগ্রহণে সাহায্য হ'য়েছিল। রোমান-লিপি নিয়ে গাড়ীতে মহাত্মাজীর সঙ্গে কোনও আলাপ-আলোচনার সুবিধা যদি হয়, সেটাও একটা লোভনীয় বিষয় ছিল। যাক্, পরের ছোট একটা ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তে আমি মহাত্মাজীর গাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লুম। থার্ড ক্লাস গাড়ীর একটি কোণে মহাত্মাজী ব'সে নিবিষ্টচিত্তে সুতো কাটছেন। তাঁর সামনের বেঞ্চে পত্নী কস্তুরী বাঈ ব'সে পাখা করছেন, আর তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথা কইছেন। বাইরে প্লাটফর্মে আর গাড়ীর ভিতরে কোথা থেকে খুব ভীড় হ'য়ে গিয়েছে। মহাত্মাজী সুতো কাট্‌তে কাট্‌তে মাথা না তুলে একটু জোর গলায় মাঝে মাঝে ব'লছেন—"হরিজনোঁকে লিয়ে জো কুছ হো, দে দেনা, এক পৈসা দো পৈসে জৈসী শক্তি হো দেনা চাহিয়ে।" মহাত্মাজীর দবীরখাস বা সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই, আর অন্য কতকগুলি অনুচর আর সাথী র'য়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক জন সুইট্‌সারলাণ্ডবাসী, প্রৌঢ়, আর একটি মার্কিন যুবক। আমি মহাত্মাজীকে নিবিষ্টচিত্তে সুতা কাটতে দেখে কাছে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রলুম। এর মধ্যে গাড়ী ছেড়ে দিলে। তার পর দেশাই মহাশয়কে আহ্বান ক'রে, গান্ধীজীকে দেবার জন্য প্রবন্ধখানি তাঁকে দিলুম। ইতিমধ্যে গাঁধীজী আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে আমি হিন্দীতে তাঁকে বিনীত নমস্কার জানিয়ে ইন্দোর হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে গঠিত নাগরী-লিপি-সুধার-সমিতির কথা বললুম আর সময়মত রোমান-লিপি-বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করলুম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহশালা প্রদর্শনকালে বহুকাল পূর্ব্বে, আর ব্রজমাধুরী সংঘের কীর্ত্তনের পদ আর তার হিন্দী অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে পূর্ব্বে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল, সেকথা জানালুম। কীর্ত্তনের অনুবাদের কথা তাঁর স্মরণে ছিল, তিনি সে-বিষয়ে উল্লেখ ক'রলেন, শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। আমার ইউরোপ-যাত্রার কারণ তাঁকে ব'ললুম, আমি লণ্ডনে ধ্বনিতত্ত্ব-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে আর রোমে প্রাচ্যবিদ্যা-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যাচ্ছি, আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মাতৃভাষা-শিক্ষা ও ভাষাগত বিরোধ সমীক্ষা করবারও ইচ্ছা যে আছে সে-কথাও তাঁকে বললুম। তিনি শিষ্টতার সঙ্গে আমার উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা ক'রলেন। অন্য অন্য জায়গার মধ্যে ভিয়েনা যাবার ইচ্ছে আছে শুনে ব'ললেন, "যদি সুভাষ সে সাক্ষাৎ হোয়, তো উসে কহ দেনা কি উসকী চিট্‌ঠী কা জওয়াব হম্ দে চুকে। ওর জল্‌দ্ আরাম হো জানা, ঐসা রহনে সে চলেগা নহীঁ।" রোমান-লিপি সম্বন্ধে তিনি বললেন যে আমার বিচার ও সিদ্ধান্ত তিনি মন দিয়ে প'ড়ে দেখবেন, আর আমার প্রবন্ধের আরও কতকগুলির প্রতি দেশাই মহাশয়ের নিকটে জমা দিতে ব'লে দিলেন।

তার পর যতটা সুতো কাটা হয়েছিল সেটুকু জড়িয়ে রাখবার জন্য দেশাইয়ের হাতে দিয়ে আমার প্রবন্ধটা নিয়ে দেখতে লাগলেন। তার পরে সেটা রেখে দিয়ে আবার টেকো নিয়ে সুতো কাটতে লেগে গেলেন। মহাত্মাজীর সঙ্গের সুইস ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি

ইংরেজী বলেন, তবে ফরাসী তাঁর মাতৃভাষা—বহুদিন পরে জাত ফরাসী-বলিয়ে পেয়ে, এই ভাষাটা একটু ঝালিয়ে নেবার লোভ ছাড়তে পারলুম না। মহাত্মাজীর এক জন ভক্ত এই লোকটি, তাঁরই কাজে যোগ দিয়েছেন, বিহারে কিছু কাল কাটিয়ে এসেছেন। ইনি ইউরোপ ফিরছেন, আমাদের সঙ্গে Conte Rosso "কন্তে রস্সো" ব'লে ইটালীয় জাহাজেই যাবেন। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামলে মহাত্মাজীকে প্রণাম করে চ'লে এলুম। তার পরে একটু রাতে রাত নটা আন্দাজ আর একটা ষ্টেশনে গাঁধীজীর খোঁজ নিতে যাই, তখন দেখি, যদিও তাঁর খোলা জানালার ধারে প্লাটফর্মের উপরে খুব ভীড় জমেছে, তিনি তাঁর কোণটিতে কাঠের পাটাতনের উপর কুঁকড়ে-সুঁকড়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন, ভীড়ের হৈ-চৈতে তাঁর কোনো অসুবিধা হচ্চে ব'লে মনে হ'ল না;—আর সবাই ব'সে ব'সে ঢুলছে।

রাতটা কেটে গেল। ভোরের দিকে পশ্চিম-ঘাটের সহ্যাদ্রির পাহাড়-অঞ্চল দিয়ে ট্রেন যাবার সময়ে গরমটা অনেক কম বোধ হ'ল।

বোম্বাইয়ে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মালিক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উঠলুম—তাঁর ছোট ভাই প্রবোধ বাবু আমায় নিতে এসেছিলেন।

১৯২২ সালে বিলেত থেকে ফিরবার সময় শেষ বোম্বাই দেখা। এবার বোম্বাই বেশ চমৎকার লাগল। বাড়িগুলো ক'লকাতার বাড়ির তুলনায় যেন 'ফঙ্গবেনে' লাগছিল, কিন্তু গাছের, বিশেষতঃ সমুদ্রের ধারে নারকল গাছের, আর বাগানে আর রাস্তার ধারে নানা রকমের ফুলের গাছের প্রাচুর্য্যে শহরটা বড়ই সুন্দর বোধ হ'ল।

বোম্বাইয়ের প্রিন্স-অব্-ওয়েল্‌স্ মিউজিয়ম দেখা হয় নি, এবার সেটা ভাল ক'রে দেখে এলুম। জাপানী আর অন্য অন্য শিল্প-সংগ্রহ নিয়েই মিউজিয়মের কদর। জামশেদ-পুরের তাতা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্তর জামশেদজী তাতার পুত্র স্তর রতন তাতার সংগ্রহকে আধার ক'রে এই মিউজিয়ম। খানকতক সুন্দর সুন্দর ইউরোপীয় চিত্র এই সংগ্রহে আছে, প্রাচীন ও আধুনিক এবং মূল্যবান। গুটিকতক আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যও আছে। জাপানী lacquer বা কাঠের উপর গালার রঙের কাজের কতকগুলি সুন্দর নিদর্শন আছে। জাপানী হাতীর দাঁতের কাজের মধ্যে একটি জিনিস আমার চমৎকার লাগল। খুব বড় এক টুকরো হাতীর দাঁত কেটে এক খণ্ডেই দুটি মূর্ত্তি করা হয়েছে; একটি পুরুষ, যুবক যোদ্ধা, বীরদর্পে হাতে বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে, সামনে যেন শত্রু আক্রমণ করতে আসছে, তাকে রুখবে, নয় প্রাণ দেবে; তার সামনে গা ঘেঁসে একটি তরুণী, বোধ হয় যুবকের স্ত্রী বা প্রেমাস্পদ—আসন্ন বিপদে বীরাঙ্গনা প্রিয়তমের পাশে এসে নিজের যোগ্য স্থান নিয়েছে; স্ত্রীলোকটির মূর্ত্তি কাটা হয়েছে হাটু পেতে বসিয়ে যোদ্ধার সামনে, ডান হাতে খাপসুদ্ধ তলোয়ার ধ'রে র'য়েছে। এই মূর্ত্তি আমার চমৎকার লাগল। মিশরের আর আসিরিয়ার প্রাচীন ভাস্কর্য্যের অল্প কতকগুলি নিদর্শন আছে। আর প্রাচীন জিনিষের মধ্যে আছে দক্ষিণ-আরবের অধুনালুপ্ত হিম্‌য়ারী জাতির শিলালেখ কতকগুলি। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের খুব লক্ষণীয় নিদর্শন বড় নেই, তবে উল্লেখযোগ্য—সিন্ধু প্রদেশে প্রাপ্ত কতকগুলি পোড়া মাটীর বৌদ্ধমূর্ত্তি, আর অন্য জায়গায় পাওয়া গুপ্ত-যুগের সশক্তিক বরুণ-দেবের খোদিত-চিত্র মূর্ত্তি একটি। সবচেয়ে লক্ষণীয় বাদামী গুহা থেকে আনা চার খানি বেশ বড় আকারের খোদিত চিত্র,—দুটি কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থিত গণ, ঋষি ও অপ্সরা-বেষ্টিত নন্দিসহ হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি, একটি নারায়ণের অনন্তশয়ন মূর্ত্তি, আর একটি চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি। মিউজিয়মের আর একটি মূল্যবান সংগ্রহ—প্রাচীন অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রের নিদর্শন। রাজপুত মোগল ছবি তো আছে, তা ছাড়া আর কোথাও বা পাওয়া যাবে না, দক্ষিণী মুসলমানী চিত্র, মারাঠাদের আমলে আঁকা চিত্র আর নক্শা। এই মিউজিয়মের বিজ্ঞান-বিভাগের সংগ্রহ ততটা বড় নয়—তবে জীবতত্ত্ব-বিষয়ক সংগ্রহগুলি চিত্তাকর্ষক। মোটের উপর, মিউজিয়ম দেখে ঘণ্টা দেড়েক বেশ কাটানো গেল। বিজাপুরের মুসলমান বাস্তুরীতিতে তৈরী মিউজিয়মের বাড়িটি বড়ই সুন্দর।

বোম্বাই শহর ভারতবর্ষে এক বিষয়ে অদ্বিতীয়—এটির মত "আন্তর্জাতিক" শহর আর আমাদের দেশে নাই। ভারতের সব জাতি তো আছেই—যদিও স্থানটা মহারাষ্ট্রের

অন্তর্গত, তবুও এখানে গুজরাটীর রাজত্ব ব'ললেই চলে, ভাটিয়া আর পারসীদের প্রভাব এর কারণ। পাহারাওয়ালারা মারহাট্টা, এখানে ক'লকাতার মত বাইরের প্রদেশ থেকে পাহারাওয়ালা আনতে হয় নি; কালো, বেঁটে-খাটো কিন্তু বেশ মজবুত চেহারার মারহাট্টী পাহারাওয়ালা, মাথায় হ'লদে রঙের ছোট ছোট বাঁধা-পাগড়ীর মতন টুপি, গায়ে কালো পোষাক, হাঁটু পর্য্যন্ত পাজামা, পায়ে চামড়ার চপ্পল, দেখে মনে খুব শ্রদ্ধা লাগে না। কুলী আর "কামগার" লোকেরাও বেশীর ভাগ মারহাট্টা, কিন্তু উত্তর-ভারতের "ভৈয়া" বা হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবীও কম নয়। বাঙালী হাজার তিনেক আছে শুনলুম, কিছু ব্যবসার কাজে, কিছু ছোটোবড়ো চাকরীতে, কিছু সোনা-রূপোর কাজে। শেষোক্ত শিল্পে বাঙালী কারিগরের নাম-যশ এখানে খুব। ভারতীয় সব জাত ছাড়া ভারতের বাইরের এত জাত বুঝি বা ক'লকাতায়ও নেই—আর সংখ্যায়ও এরা অনেক। আরব, ইরাণী, ইহুদী আর্মানী তো যেখানে-সেখানে।

বোম্বাইয়ে বোধ হয় হোটেলের (রেস্তোরাঁর) সংখ্যা ক'লকাতার চেয়ে ঢের বেশী। হিন্দুদের "উপহার-গৃহ"র অন্ত নেই। এই সব উপহার-গৃহে তেলে-ভাজা বা ঘীয়ে ভাজা পকোড়ী, সেমুই, বেগুনী ফুলুরী, পাউরুটি, বিস্কুট চা বিক্রী হয়—সাধারণ বহু লোক এই সব জায়গায় দিনের একটা বড় খাওয়া সারে। রেস্তোরাঁর আধিক্য আর তার ব্যবস্থা থেকে শহরের সমাজের একটা পরিস্থিতি টের পাওয়া যায়। আমার মনে হয় যে হোটেলে গিয়ে ভাত খেয়ে আসে এমন লোকের সংখ্যা বোম্বাইয়ে বেড়ে গিয়েছে। বারো বছর আগে যখন বোম্বাই দেখি, তখন যতদূর স্মরণ হ'চ্ছে এই সব হিন্দু "উপহার-গৃহ" কেবল চা আর জলখাবারই দিত, ভাত-তরকারীর ব্যবস্থা এ-সব হোটেলে ছিল না। এবার দেখলুম, প্রায় আধাআধি "উপহার-গৃহ"র উপরে বড় বড় গুজরাটী বা নাগরী হরফে লেখা—"রাইস-প্লেট," অর্থাৎ একথাল ভাত তরকারীও মিল্‌বে। বোম্বাইয়ে কলকাতার মতন মেয়ের চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশী—ঘরবাসীর চেয়ে পরবাসী লোকই বেশী, সুতরাং হোটেলের আবশ্যকতা বেড়ে যাচ্ছে। মারহাট্টী গুজরাটী সমাজে হোটেলের প্রভাব কতটা, তা লক্ষ্য ক'রে দেখবার সময় ও সুযোগ আমার হয় নি। তবে আমাদের বাঙালী জীবনে এর প্রভাব আসছে, তা নিঃসন্দেহ। জাত-পাঁত ছোঁওয়া-লেপা, সকড়ী-এঁটোর বিচার হোটেলের প্রসাদে উঠে যাচ্ছে। খাওয়ায় আর জাত নেই, এ বোধ এখন শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর মজ্জাগত হ'য়ে গিয়েছে, এই বছর পঁচিশ তিরিশের মধ্যেই। ক'লকাতায় হোটেল রেস্তোরাঁর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আবহাওয়াও বদলে যাচ্ছে দেখা যায়, পাড়াগাঁ থেকে দেশের সামাজিক পারিপার্শ্বিক ছেড়ে যারা সপরিবারে ক'লকাতায় বাস ক'রছে তাদের জীবনেই হোটেলের প্রভাবটা বেশী। আগে ভদ্র বাঙালী হিন্দু-বাড়ির মেয়েরা বাইরের লোকের সামনে খাওয়াটাকে অশিষ্টতা মনে ক'রতেন, ঘরে নিজেদের মধ্যে না হ'লে খেতে চাইতেন না; এখন কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে, মা-লক্ষ্মীরা (এরা নিতান্ত গেরস্থ ঘরেরই মেয়ে, ফার্পো বা চীনা হোটেলে যেতে অভ্যস্ত উচ্চশিক্ষিত "ভাগ্যবান" "অভিজাত" সম্প্রদায়ের নন) স্বামী বা ভাই বা cousinএর সঙ্গে চপ্-কাট্‌লেটের দোকানে খেতে ঢুকছেন, টেবিল সব ভর্‌তি, সদলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রছেন, লোক উঠে গেলেই খালি টেবিল দখল ক'রবেন। এক জন ভোজন-রসিক ব'লেছিলেন, "মুসলমানী খানা, সদ্‌ব্রাহ্মণে পাকাবে, আর ভাল ক'রে টেবিলে সাজিয়ে খাওয়া যাবে—এই হ'চ্ছে ভোজন-সুখের চরম।" টেবিলে খাওয়াটা কিছু খারাপ নয়, কিন্তু তার জন্য পাঁয়তারা করতে হয় অনেক, আর খরচাও অনেক। সস্তায় সারতে গেলে, গোবর-নিকানো মেঝেয় খাওয়ার চেয়ে বড় পরিষ্কার হয় না। হোটেলের টেবিল এখন ক'লকাতায় বাঙালী হিন্দুর সামাজিক ভোজেও ঢুকেছে—জাপানী কাগজের বিক্রীও এতে বেড়ে গিয়েছে, টেবিল-ক্লথের বদলে এই-ই সুবিধার।

বাঙলা দেশের যে অল্প কয়টি সুসন্তান ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে নিজেদের একটা স্থান ক'রে নিয়ে সমগ্র বাঙালী জাতির সামনে উজ্জ্বল আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন, বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। ক'লকাতায় ইনি বালীগঞ্জে আমাদের হিন্দুস্থান পল্লীতে বাড়ী কিনেছেন, প্রতিবেশী-বিধায়

বোম্বাইয়ে এঁর এখানেই উঠি। এঁদের বাড়ী হুগলী জেলায়। বোম্বাই হেন শহরে, আর পশ্চিম-ভারতে সর্ব্বত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে ইনি একচ্ছত্রতা অর্জ্জন ক'রেছেন। নর্ম্মদা নদীর উপর দিয়ে সম্প্রতি সাঁকো তৈরী হ'ল, তা এঁরই হাত দিয়ে। এটা একটা বিরাট কাজ, আরও কত বড় বড় কাজ হাতে নিয়েছেন। এঁর যেমন উপার্জ্জন, সৎকাজে আর দুঃখমোচনে এঁর তেমনি দানও আছে। এঁর জীবনের কথা আলসে-ধরা বাঙালী ছেলেদের প্রাণে নূতন শক্তি নব অনুপ্রেরণা আনতে পারে। ক'লকাতায় গঙ্গার উপর দিয়ে যে নতুন সাঁকো হবে, ইনি ক'লকাতার শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলির সঙ্গে একজোট হ'য়ে সেই কাজটি হাতে নেবার চেষ্টা ক'রছেন। এ-বিষয়ে তাঁর সাফল্য আর কৃতিত্ব লাভ প্রত্যেক বাঙালীর পক্ষে কাম্য আর প্রার্থনীয় হবে।

পুত্রেষ্টি

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১

রামচন্দ্রপুরের উত্তর পাড়ার বাড়ুজ্যে-বাড়ির মেজকর্ত্তা বৈঠকখানায় একা বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। অকস্মাৎ কি তাঁহার খেয়াল হইল—পট্ করিয়া একগাছা গোঁফ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বলিলেন—দুধের সর খাবে—বেটা—তুমি দুধের সর খাবে! বলিয়া আবার একগাছা—আবার একগাছা—আবার একগাছা। এইবার কিন্তু তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইল, গোঁফ জোড়াটির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—উঃ! তার পর একটু চিন্তা করিয়া আপনাকেই বোধ করি প্রশ্ন করিলেন—মাথায় টাক পড়ে—গোঁফে পড়ে না কেন? এমন সময় দরজার গোড়ায় খুট্ খুট্ শব্দ উঠিল। দীর্ঘ শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ দরজার মুখেই ভারী এক জোড়া চটীজুতা খুলিয়া, প্রকাণ্ড একটা হুঁকা হাতে ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটির চোখে অতিরিক্ত রকমের পুরু কাঁচের এক জোড়া চশমা। চশমার পাশ্নে দুইটি আবার নাই—তাহার স্থলে দুই প্রান্ত দড়ির বেড় দিয়া মাথার পিছনে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। ঘরে প্রবেশ করিয়াই বৃদ্ধ ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিদের মত ঘাড় তুলিয়া সমস্ত ঘরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। বোধ করি মেজকর্ত্তাকে ঠাওর করিয়া লইয়া—হেঁট হইয়া একটি প্রণাম করিয়া কহিল—পেনাম! তামাক খান। সঙ্গে সঙ্গে সসম্ভ্রমে মেজকর্ত্তার সম্মুখে হুঁকাটি বাড়াইয়া ধরিল। হুঁকাটায় গোটা-দুই টান দিয়া মেজকর্ত্তা বলিলেন —আচ্ছা—এ—কি করা যায় বল দেখি, রায়?

রায় উত্তর দিল—আজ্ঞে, বাজারের খরচ দেন।

রায় এ বাড়ির বহুকালের পুরাতন ভৃত্য। পায়ে এক জোড়া ছেঁড়া চটি—চোখে চশমা-পরা রায় এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত। মেজকর্ত্তা বলিলেন—হুঁ —তা দেখে-শুনে নিয়ে এস। এদিক-ওদিক দেখিতে দেখিতে রায় অভ্যাস-মত ধীরে ধীরে বলিল—গাছের দরিব্য নয় যে পেড়ে আনব, মাঠে পড়ে নাই যে কুড়িয়ে আনব—দোকানে দাম লিবে যে!

উপরের ঠোঁটটা ফুলাইয়া নিম্নদৃষ্টিতে গোঁফগুলি দেখিতেই মেজকর্ত্তা ভোর হইয়া রহিলেন—কোন উত্তর দিলেন না। রায় বলিল—আজ্ঞে খরচ দেন!

মেজকর্ত্তা চটিয়া উঠিলেন—হুঁকাটা সশব্দে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—খরচ—খরচ কিসের হে বাপু?

রায় কিন্তু দমিল না—সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল—আজ্ঞে বাজারের।

অপ্রসন্ন মুখে কর্ত্তা বলিলেন—কত?

রায়ও জবাব দিল—সে ত আদ্যিকাল থেকে হিসেব করাই আছে আট আনা। ন-আনা ছিল আট আনা করেছেন—সেই তাই দেন। মেজকর্ত্তা ট্যাঁক হইতে খুলিয়া ছয় আনা পয়সা রায়ের হাতে দিয়া বলিলেন—এ্যা—এই নাও।

পয়সা কয় আনা চশমার কাছে ধরিয়া দেখিয়া শুনিয়া রায় বলিল—তা কি ক'রে হয়—হিসেবের আঁক ত কমবার নয়—ই—ছ-আনাতে কি ক'রে হবে?

মেজকর্ত্তা বলিলেন—ওতেই হবে হে বাপু, দেখে-শুনে করতে পারলে ওতেই হবে।

পয়সা ছয় আনা রায় তক্তাপোষে নামাইয়া দিল; কহিল—তা হ'লে আমি পারব না আজ্ঞে, যে পারবে তাকেই পাঠান আপনি। আমি বৌমাকে গিয়ে ব'লে থালাস।

সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরিল। মেজকর্ত্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন—বলি শোন হে শোন—এই নাও।—বলিয়া এবার কোঁচার খুঁট হইতে একটি আনি বাহির করিলেন। রায়কে বলিলেন—ছেলে নাই—পিলে নাই—এত খরচ কেন হে বাপু? এই সাত আনাতেই সেরে এস যাও। আর জ্বালিয়ো না আমাকে।

রায় তবুও পয়সা লইল না; সে আরম্ভ করিল—আমারই হয়েছে এক মরণ মেজবাবু—কি ক'রে কি করি আমি! আপনি খরচ দেবেন না—ওদিকে জিনিষ কম হ'লে বৌমা আমার ওপরেই রাগবে। কোন্ জিনিষ কম করব আপনিই বলেন দেখি?

মেজকর্ত্তা বলিলেন—তুমি বড় বক, রায়জী। এই নাও। এবার কোঁচার আর এক খুঁট হইতে চারিটি পয়সা বাহির করিয়া তাহার তিনটি রায়ের হাতে দিয়া বলিলেন—আর আমার নাই—আর আমি দিতে পারব না। বলিয়া রায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিলেন।

রায় আর প্রতিবাদ করিল না; পৌনে আট আনা লইয়াই আবার একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। বাহিরে রায়ের চটিজুতার মন্থর শব্দ মিলাইয়া যাইতেই মেজকর্ত্তা উদ্বৃত্ত পয়সাটা মুঠার মধ্যে অতি দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ পয়সাটা আমি কাউকে দোব না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়ির ভিতরে চলিলেন এই তাম্রখণ্ডটি তাঁহার সঞ্চয়ের ভাণ্ডারের মধ্যে রাখিবার জন্য। এটি তাঁহার স্বভাব। আজ বার বৎসর ধরিয়া তিনি মধুমক্ষিকার মত শুধু সঞ্চয়ের মোহে ডুবিয়া আছেন। নৈমিত্তিক খরচ হইতে তাঁহার এক কণাও সঞ্চয় করা চাই—সে সঞ্চয় আর তিনি খরচ করেন না। এবং এই তিল-সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার একটি পৃথক ভাণ্ডার আছে। তিল জমিয়া জমিয়া আজ পাহাড় না হইলেও স্তূপ হইয়াছে—লোকে বলে 'বাড়ুজ্যেদের আঁটকুড়ো কর্ত্তার ছাতাধরা টাকা।' মধ্যে মধ্যে এ-কথা মেজকর্ত্তার কানে আসে—তিনি স্তব্ধ হইয়া থাকেন।

বৈঠকখানার পরই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে খামার-বাড়ি, অপর অংশটায় দেবালয় ও নাটমন্দির, তাহার পরই সে-আমলের পাকা বাড়ি। নাটমন্দির পার হইয়া মেজকর্ত্তা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন। বাড়িটা এখন তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর দিকের অংশটা মধ্যম তরফের ভাগে পড়িয়াছে। দোতালায় শয়ন-ঘরে খাটের শিয়রে সিন্দুরের মাঙ্গলিক চিহ্ন শোভিত লোহার সিন্ধুক। সিন্ধুকটা খুলিয়া মেজকর্ত্তা চটের একটা প্রকাণ্ড থলিয়ার মধ্যে পয়সাটি রাখিয়া দিলেন। একদিকে কাঠের দুইটা হাত-বাক্স রহিয়াছে—তাহার একটায় মহলের আমদানীর টাকা থাকে—অপরটায় থাকে বন্ধকী কারবারের সোনা-রুপার অলঙ্কারপত্র। সম্পদসম্ভারগুলির দিকে চাহিয়া তাঁহার অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল। একবার তিনি চটের থলিয়াটা তুলিয়া ধরিয়া ওজন অনুমানের চেষ্টা করিলেন। থলিয়াটার ওজনের গুরুত্বে খুশী হইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন পঁচিশ সের কি ত্রিশ সের, কোন্ ওজনটা ঠিক! কিন্তু বাধা পড়িল, পিছন হইতে মেজগিন্নী বলিলেন—ও হচ্ছে কি?

তাঁহার কোলে একটি শীর্ণকায় শিশু।

থলিয়াটা রাখিয়া দিয়া মেজকর্ত্তা তাড়াতাড়ি সিন্ধুকের ডালাটা বন্ধ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মেজগিন্নী হাসিয়া বলিলেন—ভয় নেই টাকাকড়ি চাইতে আসি নি আমি—তুমি ধীরে-সুস্থে সিন্ধুক বন্ধ কর।

মেজকর্ত্তা অপ্রস্তুতের মত কহিলেন—তা,—তা নাও না কেন তুমি—ইয়েকে ব'লে কি চাই নাও না কেন।

—না, টাকা তোমার আমি চাই না। তুমি অনুমতি দাও এই ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র নিই। বড় সুন্দর ছেলে গো দেখ একবার।

মেজকর্ত্তা স্থিরদৃষ্টিতে মেজগিন্নীর মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন, শিশুর দিকে চাহিলেন না বা কোন উত্তরও দিলেন না। মেজগিন্নী বলিলেন—ছেলের জন্যে তোমার মনের কষ্ট আমি জানি। আমাকে লুকুলে কি হবে—আমার ত চোখ আছে, কি মানুষ কি হয়ে গেলে! কতবার বললাম আবার তুমি বিয়ে কর—সেও করলে না।

মেজকর্ত্তার চিত্ত বোধ করি অস্থির হইয়া উঠিতেছিল—তাঁহার অঙ্গভঙ্গীর চাঞ্চল্যে সে অস্থিরতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি কি বলিতে গেলেন—কিন্তু বাধা দিয়া মেজগিন্নী বলিলেন—স্থির হয়ে ব'স দেখি—আমার কাছেও তুমি পাগল সেজে থাকবে?

সমস্ত শরীরটা দুই হাতে চুলকাইতে চুলকাইতে মেজকর্ত্তা বলিলেন—যে গরম—শরীর গুড়গুড় করছে—উঃ।

বিছানার উপর হইতে পাখা তুলিয়া লইয়া মেজগিন্নী বলিলেন—ব'স আমি বাতাস করি।

বার-দুই শুষ্ক কাশি কাশিয়া মেজকর্ত্তা বলিলেন—উ-হু, গরুগুলো কি করছে—মানে খেতে-টেতে পেলে কি না—ছাড় পথ ছাড়।

দরজার মুখ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া মেজগিন্নী বলিলেন—আমার কথা শেষ হোক তবে যাবে। শোন, এই ছেলেটিকে আমি পুষ্যি নোব। চাটুজ্যেদের ভাগ্নে—মা নেই, বাপ নেই; কেউ নেই। মামা-মামীও বিদেয় করতে পারলে বাঁচে—সামান্য কিছু দিলেই দিতে চায়।

অস্থির চঞ্চল ভাবে মেজকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—না-না-না; ও হবে না, ও হবে না, ওসব কলুষে চারায় কাজ নাই আমার। কি বংশ না কি বংশ—, ছাড় ছাড়—পথ ছাড়।

মেজগিন্নী দৃঢ়ভাবে বলিলেন—না।

মেজকর্ত্তা তখনও বলিতেছিলেন—চোর না ছ্যাঁচড় না ভিখিরী ঘরের ছেলে—ও সব হবে না। মরে যাবে—মরে যাবে—চেহারা দেখছ না!

মেজগিন্নীর চোখে জল দেখা দিল, সজল চক্ষে তিনি বলিলেন—ওগো দু-বেলা ভাত মুড়ি পেট ভরে খেতে পায় না, দুধ ত দূরের কথা। ওদের বাড়িতে থাকলেই ছেলেটা মরে যাবে।

অকারণে খাটের চাদরখানা টানিতে টানিতে মেজকর্ত্তা বলিলেন—যাক-যাক—মরে গেলে ফেলে দেবে ওরা।

মেজগিন্নী বলিলেন—ছি—অবোধ শিশু তোমার কি দোষ করলে বল ত?

মেজকর্ত্তা আপন মনেই বলিতেছিলেন—পরের ছেলে—পরের ছেলে—হবে না—হবে না। ফিরিয়ে দাও—চার আনা পয়সা বরং—।

মেজগিন্নী ততক্ষণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। সম্মুখের লম্বা বারান্দাটার দূরতম প্রান্তে ক্ষীণ পদধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে সিঁড়ির বুকের মধ্যে নিঃশেষে বিলীন হইয়া গেল। মুখের কথাটা অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া মেজকর্ত্তা এতক্ষণ স্তব্ধ ভাবেই দাঁড়াইয়া-ছিলেন। স্ত্রীর অস্তিত্বের সমস্তটুকু মিলাইয়া যাইতে এতক্ষণে তিনি স্ত্রীর গমনপথকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা—আমার ছেলে নাই ত তোমার কি বাপু? তার পর আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—যুধিষ্ঠির—নির্ব্বংশ—ভীম নির্ব্বংশ—রাবণ নির্ব্বংশ—কেষ্টঠাকুর নির্ব্বংশ—আমিও নির্ব্বংশ—বংশ নাই ত নাই—হবে কি? বলিতে বলিতেই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া বৈঠকখানার দিকে চলিলেন। চাষ-বাড়ির প্রান্তে প্রাচীরের গায়ে সারি সারি পেয়ারার গাছ। মেজকর্ত্তা লক্ষ্য করিলেন বিনা-বাতাসেই গাছগুলি বেশ আন্দোলিত হইতেছে—বুঝিলেন গাছে বাঁদর লাগিয়াছে। তিনি হাঁকিলেন—নিতাই—ও—নিতাই, পেয়ারা-গাছে বাঁদর লেগেছে—তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে। সঙ্গে সঙ্গে গাছ হইতে ঝুপ্‌ ঝাপ করিয়া দশ-বারোটি ছেলে লাফ দিয়া মাটিতে পড়িল। মেজকর্ত্তা যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। ছেলেরা উপদ্রব করিলে তিনি জ্বলিয়া যান। আজও তিনি ঠিক বালকের মত ছুটিয়া ছেলের দলকে তাড়া দিলেন। কিন্তু কাহাকেও পাইলেন না, বাড়ির বহিঃসীমা হইতে শিশুকণ্ঠের কলহাস্যে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। বিফলতার জন্য মেজকর্ত্তার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। বিপুল আক্রোশে

কয়টা ঢেলা কুড়াইয়া লইয়া তিনি পেয়ারা-গাছের উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার মনেই বলিলেন, পেয়ারারই বুনেদ মারব আজ। কিন্তু নিরস্ত হইতে হইল, পিছনের পোয়াল-গাদার আড়াল হইতে কে কাঁদিয়া উঠিল। ফিরিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন দুইটি পোয়াল-গাদার মধ্যবর্ত্তী গলির মত স্থানটির মধ্যে বৎসর-চারেকের একটি সুন্দর শিশু ভয়ে কাঁদিতেছে। মেজকর্ত্তাকে দেখিয়া বর্দ্ধিততর ভয়ে তাহার কান্না বন্ধ হইয়া গেল। মেজকর্ত্তা ছেলেটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন—অতি সুন্দর ছেলেটি! অকস্মাৎ তিনি একান্ত লুব্ধ আগ্রহে যেন ছোঁ মারিয়া শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া বার-বার চুমা খাইয়া পরমাদরে কহিলেন—ভয় কি, তোমার ভয় কি? পর মুহূর্ত্তেই কিন্তু চকিত হইয়া উঠিলেন, চারি দিক চাহিয়া দেখিয়া ছেলেটিকে একরূপ ফেলিয়া দিয়া অতি দ্রুতপদে যেন পলাইয়া আসিলেন। বৈঠকখানায় কেহ ছিল না, নির্জ্জন ঘরে আধ আলো-ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি হাঁপাইতেছিলেন। চোখের দৃষ্টি কেমন অস্বাভাবিক রূপে প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। হুঁকার মাথায় কল্কেটা হইতে তখনও ক্ষীণ রেখায় আঁকিয়া-বাঁকিয়া ধোঁয়া উঠিতেছিল। মেজকর্ত্তা ধীরে ধীরে হুঁকাটাকে তুলিয়া লইয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িলেন। হুঁকাটা তিনি টানিলেন না, নীরবে নত দৃষ্টিতে শুধু হুঁকাটা ধরিয়াই বসিয়া রহিলেন। বাহিরে জুতার শব্দ হইল, কিন্তু সে শব্দ তাঁহার কানে গেল না। যে আসিল সে বড়কর্ত্তার পুত্র—মেজকর্ত্তার ভ্রাতুষ্পুত্র মণি। মণি ডাকিল—কাকা!

মেজকর্ত্তা অদ্ভুত দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন—আসুন আসুন আসুন। ভাল ছিলেন? নেন নেন তামাক খান। বলিয়া হুঁকাটা মণির দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন। মণি অপ্রস্তুত হইয়া কয় পদ পিছাইয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল—আমি মণি। একটা কথা—। কথা তাহার আর শেষ হইল না, মেজকর্ত্তা হুঁকাটা সেইখানেই নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে বৈঠকখানা ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। মণি বিরক্ত হইয়া বলিল—সাধে লোকে বলে ক্ষ্যাপা গণেশ!

২

বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন মেজকর্ত্তার নবীন বয়স, বাঁড়ুজ্যেদের তিন তরফ তখন একান্নবর্ত্তী ছিল। সে আমলে মেজকর্ত্তা কিন্তু এমন ছিলেন না, লোকে তখন তাঁহার নাম দিয়াছিল বাবু গণেশ। তখন নিত্য সন্ধ্যায় মেজকর্ত্তার আড্ডায় গান-বাজনার মজলিস বসিত। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত সেতারী আলি নেওয়াজ খাঁ নিয়মিত মাসে একবার করিয়া মেজকর্ত্তার ওখানে আসিতেন। মেজকর্ত্তা খাঁ-সাহেবের নিকট সেতার শিখিতেন। আচারে-ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায়, আদব-কায়দায় মেজকর্ত্তা উঁচুদরের লোক ছিলেন। খরচ-খরচায় তিনি তখন মুক্তহস্ত। বন্ধু-বান্ধব লইয়া প্রীতিভোজনের বিরাম ছিল না। বড় ভাই দেখিতেন জমিদারী, ছোট ভাই দেখিতেন মামলা-মোকদ্দমা, মেজকর্ত্তার উপরে ছিল জোত জমা, পুকুর বাগান তদারকের ভার।

গ্রামের প্রান্তে চাষ-বাড়িতে মেজকর্ত্তার মজলিস বসিত। নিস্তব্ধ রাত্রে বিপুল হাস্যধ্বনিতে সুষুপ্ত গ্রামবাসী চকিত হইয়া উঠিয়া বসিত কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিত—বুঝিতে পারিত মেজকর্ত্তা হাসিতেছেন।

এমনি করিয়া দশ-বার বৎসর কাটিয়া গেল, তখন মেজকর্ত্তার বয়স ত্রিশ, মেজগিন্নী পঁচিশ অতিক্রম করিয়াছেন। সেদিন সকালে স্নান-আহ্নিক সারিয়া মেজকর্ত্তা ছোট ভাই কার্ত্তিকের মেজখোকাকে কোলে লইয়া জল খাইতেছিলেন। বাড়ির পাঁচটি ছেলের মধ্যে এই শিশুটিই নিঃসন্তান মেজকর্ত্তার বড় প্রিয়। নিজে খাইতে খাইতে খোকার মুখে একটু করিয়া তুলিয়া দিতেছিলেন।

মেজগিন্নী সেদিন বিনা ভূমিকায় বলিলেন—দেখ, আমি বদ্যিনাথে যাব। তোমাকেও যেতে হবে।

মেজকর্ত্তা ভাইপোকে লইয়া মাতিয়াছিলেন, অন্যমনস্ক ভাবেই প্রশ্ন করিলেন—কেন?

—ধর্ণা দোব বাবার কাছে।

মেজকর্ত্তা এবার যেন সজাগ হইয়া উঠিলেন। মেজগিন্নীর কণ্ঠবিলম্বিত মাদুলী ও কবচগুলির দিকে চাহিয়া বলিলেন—অনেক ত করলে আর কেন?

মেজগিন্নীর চোখে জল দেখা দিল, কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, বলিলেন—তুমি এই কথা বলছ!

মেজকর্ত্তা খোলা জানালা দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

মেজগিন্নী আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন—বাবাকে ধ'রে একবার দেখব। কত লোকের ত বংশ হচ্ছে বাবার কৃপায়।

মেজকর্ত্তা নীরবেই বসিয়া রহিলেন—কোন উত্তর দিলেন না। মেজগিন্নীও নীরবে উত্তরের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। আহারলুব্ধ খোকা জ্যেঠামহাশয়ের দাড়ীতে টান দিয়া কহিল—হাম্। খোকার হাতটা সরাইয়া দিয়া তিনি বিরক্তিভরে বলিলেন—আঃ। উত্তর না পাইয়া মেজগিন্নী আবার বলিলেন—তুমি না পাঠাও' আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও—সেখান থেকে আমি যাব। ওদিকে কোলের মধ্যে খোকার চাঞ্চল্যের শেষ ছিল না, জ্যেঠার নাকে এবার সে একটা ছোবল মারিয়া বলিল—দে—হাম্। বিরক্ত হইয়া মেজকর্ত্তা খোকাকে মেজগিন্নীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—দিয়ে এস ওকে, ওর মা'র কাছে। মেজগিন্নী খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া উত্তরের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

কিছুক্ষণ পর মেজকর্ত্তা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—খোকাকেই তুমি নাও না কেন?

মেজগিন্নী দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—না। এক গাছের বাকল অন্য গাছে কখনও জোড়া লাগে না।

মেজকর্ত্তা বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিলেন—চল—তাই চল।

*　　　*　　　*

মেজগিন্নীর দেওঘর-যাত্রার উদ্যোগ হইতেছিল। যাত্রার নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বদিন দ্বিপ্রহরে প্রতিবেশিনীরা অনেকে আসিয়াছিল, ছোটগিন্নী বড়গিন্নীও ছিলেন। এক জন বলিল—বাবার দয়ার শেষ নাই, ওখানে গেলে বাবার দয়া হবেই।

অন্য এক জন বলিল—কপাল ভাই কপাল; কপালে না থাকলে বাবার হাত নাই। এই আমার—

সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বাধা দিয়া ক্ষেমা-ঠাকরুণ বলিয়া উঠিল—উ—ব'ল না মা; বাবার অসাধ্যি কিছু নাই। কার নিয়ে যে কাকে দেন বাবার ছলনা কি কেউ বুঝতে পারে? ওই যে মুখুজ্যে-বাবুদের মণি-বৌ, ওর যে ওই দশটা ছেলে ম'রে তিনকড়ি; ও কে জান?

এক মুহূর্ত্তে মজলিসটা জমিয়া উঠিল। ক্ষেমা-ঠাকরুণ বাবাকে প্রণাম করিয়া আরম্ভ করিল—ও-পাড়ার মুকী দিদি—মোক্ষদা ঠাকরুণ গো, ওই ওরই ভাইপো ম'রে মণি-বৌর ওই তিনকড়ি। জান ত মুকী-ঠাকরুণ মণি-বৌর বাড়িতেই থাকত—খাওয়া-পরা সব ছিল মণি-বৌর বাড়িতে—দু-জনে গলাগলি ভাব। দশটা ছেলে যখন ম'ল মুকী-ঠাকরুণ বদ্যিনাথ গেল মণি-বৌর হয়ে ছেলের জন্যে ধন্না দিতে। তিন দিনের দিন স্বপ্ন হ'ল—উঠে যা তুই, ওর ছেলে নাই, হবে না। মুকী সে না-ছোড়বন্দা; বলে—না বাবা দিতেই হবে, না-দিলে আমি উঠব না। দ্বিতীয় দিনেও ঐ স্বপ্ন! মুকী উঠল না; বলে—মরব বাবা এইখানে। তখন তিন দিনের দিন স্বপ্ন হ'ল—এই দেখ ভাই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

সত্যই ক্ষেমা-ঠাকরুণের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রোত্রীরা সকলে স্তব্ধ-নির্ব্বাক। ক্ষেমা-ঠাকরুণ আবার আরম্ভ করিল—তিন দিনের দিন স্বপ্ন হ'ল—ওর নাই—তবে কেউ যদি ওকে আপনার নিয়ে দেয় তবে হবে। তুই দিবি? মুকী বললে—হ্যাঁ বাবা দোব। বাবা বললেন—বেশ তবে ওর ছেলে হবে। মুকীর ত আর ছেলে-পিলে ছিল না, ছিল একমাত্র ভাইপো, মুকী তাকে মানুষ করেছিল। পনের-ষোল বছরের সুস্থ সবল ছেলে, ছেলের ছাতি কি! সেই ছেলে ভাই তারই আট দিনের দিন ধড়ফড়িয়ে মরে গেল। তখন মুকী বুক চাপড়ে বলে—হায় আমি কল্লাম কি গো, এ আমি কল্লাম কি? সেই ছেলে ম'রে সেই বছরই মণি-বৌর ওই তিনকড়ি হ'ল।

সকলে স্তব্ধ অভিভূত হইয়া বসিয়াছিলেন। সহসা বড়-গিন্নী বলিয়া উঠিলেন—কি হল রে মেজ,এমন করছিস কেন?

কম্পিত হস্তে মেঝের বুক চাপিয়া ধরিয়া মেজগিন্নী বলিলেন—দোক্তা খেয়ে মাথা ঘুরছে।

রাত্রে তিনি স্বামীকে বলিলেন—দেখ, কপালে যদি থাকে তবে এমনি বংশ হবে। বদ্যিনাথ থাক।

মেজকর্ত্তা বিস্মিত হইয়া গেলেন, বলিলেন—আবার কি হ'ল ?

মেজগিন্নী সে-কথা স্বামীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিলেন না—সকরুণ নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে শুধু চাহিয়া রহিলেন। মেজকর্ত্তা আদর করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—ছি—এমন দোমনা হওয়া ভাল নয়।

* * *

বাবা বৈদ্যনাথ যে কি স্বপ্নাদেশ দিলেন সে-কথা মেজকর্ত্তা এবং মেজগিন্নী জানেন—তৃতীয় ব্যক্তির নিকট সে-কথা তাঁহারা প্রকাশ করিলেন না। প্রত্যাবর্ত্তনের কয়দিন পরে মেজকর্ত্তা বড়ভাইকে গিয়া বলিলেন—আমার একটি কথা ছিল দাদা। বড়কর্ত্তা কি একটা দলিল পড়িতেছিলেন, দলিলখানা রাখিয়া দিয়া তিনি বলিলেন—কি বলবে বল।

একটু ইতস্তত করিয়া মেজকর্ত্তা বলিলেন—আমি মনে করছি পোষ্যপুত্র নোব।

বড়কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন—বাবার দয়া হ'ল না।

মেজকর্ত্তা বলিলেন—সে-কথা থাক। এখন আমার ইচ্ছে—মেজবৌরও ইচ্ছে যে কার্ত্তিকের মেজখোকাকে—।

বড়কর্ত্তা বলিলেন—সে কথা কার্ত্তিককে বল—ছোট-বৌমারও মত চাই—তাঁকেও বলা দরকার।

মেজকর্ত্তা বলিলেন—সে আমি তোমারই ওপর ভার দিচ্ছি।

বড়কর্ত্তা বলিলেন—বেশ, আমি বলছি কার্ত্তিককে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার বড়বাবু বলিলেন—এ তোমার সাধু সঙ্কল্প গণেশ—ঘরের সম্পত্তি ঘরে থাকবে—একই বংশ—খুব ভাল কথা।

মেজকর্ত্তা হাসি-মুখে চাষ-বাড়ি চলিয়া গেলেন। সেখানে সেদিন পোষ্যপুত্র গ্রহণোপলক্ষ্যে যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণ-ভোজন উৎসব-আয়োজনের ফর্দ্দও হইয়া গেল। গোল বাধিল উৎসবের ফর্দ্দের সময়। বন্ধুদের এক দল বলিল—যাত্রা গান হোক—কলকাতার যাত্রা। আর এক দল বলিল—তার চেয়ে ভেড়ার গোয়ালে আগুন ধরিয়ে দাও। করাতে হ'লে খেমটা-নাচ করাতে হবে।

মেজকর্ত্তা বলিলেন—কুচ পরোয়া নাই—ও দুই-ই হবে। আর একদিন হোক বৈঠকী মজলিস। খাঁসাহেবকে লেখা যাক, উনিই সব ওস্তাদ, যন্ত্রী নিয়ে আসবেন।

দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া বাড়ির ফটকে ঢুকিয়াই মেজকর্ত্তা দেখিলেন কার্ত্তিক মেজখোকাকে কোলে লইয়া বৈঠকখানা হইতে বাড়ির ভিতর চলিয়াছে। বুঝিলেন কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গিয়াছে। সানন্দে দ্রুতপদে তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া খোকাকে ডাকিলেন—বাপ্‌ধন!

কথার সাড়ায় ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কার্ত্তিক রুষ্ট স্বরে বলিল—না। তার পর মেজভাইয়ের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—এত বড় চণ্ডাল হিংসুটে তুমি—তা আমি জানতাম না।

মেজকর্ত্তা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কোন উত্তর না পাইয়া কার্ত্তিক আবার বলিল—এই শিশুকে বধ ক'রে তুমি বংশ রাখতে চাও!—ছি—ছি!

চারিদিক যেন দুলিয়া উঠিল—মেজকর্ত্তা আর্ত্তস্বরে বলিলেন—কার্ত্তিক!

কার্ত্তিকও তখন ক্রোধে জ্ঞানশূন্য; সে বলিল—তুমি লুকুলে কি হবে—সত্যি কথা কখনও ঢাকা থাকে না, বুঝেছ! আমরা বাবার স্বপ্নের কথা শুনেছি। চণ্ডাল—তুমি চণ্ডাল!

মেজকর্ত্তা অকস্মাৎ মাটিতে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাটির বুক আঁকড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ভূমিকম্প—ভূমিকম্প! পরমুহূর্ত্তে তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অজ্ঞান।

* * *

সেই দ্বিপ্রহরে গিয়া মেজকর্ত্তা আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বাহির হইলেন পূর্ণ দুই মাস পর। সেদিন বরাবর তিনি বড়কর্ত্তার নিকট গিয়া বলিলেন—আমার সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিতে হবে।

বড়কর্ত্তা চমকিয়া উঠিলেন—কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—ব'স।

ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পদচারণা করিতে করিতে মেজকর্ত্তা একস্থানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, দেওয়ালের গায়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্টচিত্তে কি দেখিতে দেখিতে বলিয়া

উঠিলেন—বাপ রে—বাপ রে—বেটা পিঁপড়ের বংশবৃদ্ধি দেখ দেখি; উঃ সবারই মুখে একটা ক'রে ডিম! বলিতে বলিতেই তিনি দুই হাত দিয়া পিপীলিকাশ্রেণীকে দলিয়া পিষিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। বড়কর্ত্তা উঠিয়া আসিয়াছিলেন, মেজভাইয়ের পিঠে হাত দিয়া তিনি ডাকিলেন—গণেশ! একান্ত লজ্জিত ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মেজকর্ত্তা ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পলাইয়া গেলেন। বড়কর্ত্তা কবিরাজ আনাইলেন, কিন্তু মেজকর্ত্তা ফিরাইয়া দিলেন। ঘর হইতেই বলিয়া পাঠাইলেন—বিষয় ভাগ ক'রে দেওয়া হোক আমার, এর ওর ছেলের পালের দুধের দাম দেবার আমার কথা নয়।

তার পর বিছানার উপরে সজোরে একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—মারি বেটা বদ্যিনাথের মাথায় রাবণের মত এক কিল—যাক বেটা মাটিতে ব'সে। কচু—কচু—দেবতা না কচু!

কিছু দিনের মধ্যেই সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেল। সে আজ বার বৎসরের কথা। তার পর হইতেই মেজকর্ত্তা এমনি ধারায় চলিয়াছেন। আরও একটি পরিবর্ত্তন তাঁহার আসিয়াছিল—জপে তপে ধর্ম্মে কর্ম্মে তাঁহার গভীর অনুরাগ দেখা দিল। দারুণ শীতে গভীর রাত্রে যখন লোকে লেপের মধ্যেও শীতে কাঁপিতেছে তখন মেজকর্ত্তা খালি গায়ে হাত দুইটি বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজিয়া গ্রামপ্রান্তের দেবীমন্দির হইতে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে অ-পথ ধরিয়া বাড়ি ফেরেন। যে পথে সাধারণে চলে সে পথ ধরিয়া তিনি চলেন না—পথচিহ্নহীন নির্জ্জন প্রান্তরে মেজকর্ত্তার পদচিহ্ন নিত্য নব পথরেখার প্রথম চিহ্ন আঁকিয়া দেয়।

৩

ঐ ঘটনার পর হইতে আজও পর্য্যন্ত কখনও আর মেজকর্ত্তা পোষ্যপুত্র লওয়ার নাম করেন নাই, কি সন্তান-কামনার কথা মুখে আনেন নাই। অর্থ ও পরমার্থের মোহের মধ্যে বংশকামনা ডুবাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মেজগিন্নী ভুলিতে পারেন নাই—তিনি স্বামীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, পোষ্যপুত্র লওয়ার কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। মেজকর্ত্তার মাথার গোলমাল বাড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সময়েই তাঁহার অর্থসঞ্চয়ের পিপাসা বাড়িয়া যাইত—আপন শয়নকক্ষে ঐ সিন্ধুকটির পাশেই তখন তিনি অবিরাম ঘুরিতেন—বার-বার সেটা খুলিয়া দেখিতেন। কখনও কখনও ধর্ম্মে কর্ম্মে অনুরাগ বাড়িত—কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি তীর্থদর্শনে বাহির হইয়া পড়িতেন। দেখিয়া শুনিয়া মেজগিন্নী নিরস্ত হইয়াছিলেন—বহুদিন আর ও কথা তোলেন নাই। আজ চার মাসের পর সহসা চাটুজ্যেদের ভাগিনেয়—ওই অনাথ শিশুটিকে দেখিয়া কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই, স্বামীর নিকট অনুরোধ জানাইতে আসিয়াছিলেন। ছেলেটির মামী নীচে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—ছেলেটিকে দিয়া কিছু অর্থ প্রত্যাশা তাহাদের ছিল। মেজগিন্নী নীচে আসিয়া নীরবে ছেলেটিকে তাহার কোলে তুলিয়া দিলেন।

চাটুজ্যে-বৌ প্রশ্ন করিল—কি হ'ল?

মেজগিন্নী সে-কথার উত্তর দিতে পারিলেন না, বুকের ভিতর কান্না মুহুর্মুহু ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। চাটুজ্যে-বৌ বিস্মিত হইয়া আবার প্রশ্ন করিল—হ'ল না?

ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে মেজগিন্নী জানাইলেন—না। আর তিনি সেখানে দাঁড়াইলেন না, পিছন ফিরিয়া একটা ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধ রায় ঠুক ঠুক করিয়া আসিয়া চশমা দিয়া চারিদিক দেখিয়া মেজগিন্নীকে ঠাওর করিয়া লইয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল—বৌমা!

মেজগিন্নী শুইয়াছিলেন—উঠিয়া বসিলেন। মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া ক্লান্ত মৃদুস্বরে বলিলেন—চল যাই। বাবু এসেছেন?

ঘাড় নাড়িয়া রায় বলিল—মা, ক্ষেপার মন—বিন্দাবন, কি বলব বল! এগারটার টেনে বলে আমি গঙ্গাচানে চললাম। আমি ওই ওই করতে করতে আর নাই—চলে গিয়েছে।

মেজগিন্নী বলিলেন—তা হ'লে তোমরা খেয়ে নাও গে, ঠাকুরকে রান্নাবান্না সামলে দিতে বল।

রায় বলিল—তুমি এস মা, দুটো মুখে দেবে চল।

সস্নেহ হাসি হাসিয়া মেজগিন্নী বলিলেন—আমি খাব না বাবা, আমার মাথাটা বড় ধরেছে।

রায় আর একটি প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ফিরিল। চটি জোড়াটি পায়ে দিয়া কিন্তু আবার খুলিয়া ফেলিল; বলিল—না গো বৌমা—ই তোমাদের ভাল নয় বাপু। ই—আমার ভাল লাগছে না। ছুটো খাও বাপু তুমি। ক্ষেপার সঙ্গে তুমি-সুদ্ধ ক্ষেপলে কি চলে!

ধীরে অথচ দৃঢ়স্বরে মেজগিন্নী আদেশ করিলেন—যা বললাম তাই কর গে রায়জী।

রায় আর কথা কহিল না, চটি জোড়াটি পায়ে দিয়া ঠুক ঠুক করিতে করিতে সে চলিয়া গেল।

* * * *

বহুকাল পর মেজকর্ত্তা আজ কেমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। অস্থির চাঞ্চল্যে মণিকে পর্য্যন্ত চিনিতে পারেন নাই—হুঁকা বাড়াইয়া দিতে গিয়াছিলেন। সেটুকু খেয়াল হইতেই লজ্জায় পলাইয়া আসিয়া আপন শয়নঘরের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করিলেন। অবিরাম ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যে মধ্যে তিনি. বলিয়া উঠিতেছিলেন—দুর-দুর! একবার ছোট তরফের বাড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—খট-খট লবডঙ্কা।

পরমুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিলেন—দুর দুর।

আবার কয় বার পদচারণা করিয়া তিনি বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেও ভাল লাগিল না। বিছানা হইতে উঠিয়া আবার তিনি অস্থির পদে ঘরের মধ্যে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে চট করিয়া আলনা হইতে কাপড় ও গামছা টানিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—ধুয়ে ফেলে আসি—ধুয়ে ফেলে আসি। শতেক যোজনে থাকি, যদি গঙ্গা বলে ডাকি—। বাহিরের হাত-বাক্স হইতে খরচ বাহির করিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ির ফটকের মুখেই রায়ের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল—বৃদ্ধ রায় কি একটা হাতে লইয়া ফিরিতেছিল। পাশ কাটাইয়া যাইতে যাইতে মেজকর্ত্তা বলিলেন—গঙ্গাস্নানে চললাম—গঙ্গাস্নানে চললাম—ব'লে দিয়ো—ব'লে দিয়ো!

রায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল—দাঁড়ান দাঁড়ান!

কেহ কোন উত্তর দিল না, রায় উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—মেজকর্ত্তা! বলি শুনচেন গো! অই-অ—মেজকর্ত্তা! সে আহ্বানেরও উত্তর কেহ দিল না, রায় ঘাড় তুলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে চাহিয়া দেখিল যত দূর তাহার দৃষ্টি চলে কেহ কোথাও নাই।

ষ্টেশনে নামিয়া মেজকর্ত্তা একেবারে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উঠিলেন। ঘাটে স্নানার্থী-স্নানার্থিনীর আসা-যাওয়ার বিরাম নাই, ঘাটের উপরেই ছোট বাজারটিতে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় জমিয়া আছে। মেজকর্ত্তা ঘাটের একপাশে বসিয়া ওপারে ধু-ধু-করা বালুচরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রৌদ্রচ্ছটায় বালুচর ঝিকমিক্ করিতেছে। বহুদূরে চরের উপর সবুজের রেশ। ঘাটে নানা কলরবের মধ্য হইতে নানা কথা তাঁহার কানে আসিতেছিল। অতিনিকটেই কাহারা আলোচনা করিতেছিল—আশ্চর্য্য সাধু ভাই! যে যাচ্ছে তারই নাম ধরে ডাকছে—কোথা আমাদের বাড়ি বল দেখি—ঠিক ব'লে দিলে!

আর এক জন অতি মৃদুস্বরে বলিল—শ্মশানের ঘাটোয়াল বলছিল কি জান—বলছিল বাবা মড়া খায়।

মেজকর্ত্তা আগ্রহভরে প্রশ্ন করিলেন—কোথা হে কোথা?

এক জন উত্তর দিল—সাধু কি লোকালয়ে থাকে হে বাপু, সাধু যে সে থাকবে শ্মশানে।

মেজকর্ত্তা উঠিয়া পড়িলেন। গঙ্গার তটভূমির উপর ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ এক ফালি পথ চলিয়া গিয়াছে—সেই পথটা ধরিয়া শ্মশানের 'টিনের চালাটায় আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। অনতিদূরে গঙ্গাগর্ভের নিকট বালুচরের উপর বেশ একটি জনতা মধুচক্রে মধু-মক্ষিকার মত জমিয়া আছে। তিনি বুঝিলেন সন্ন্যাসী ওইখানেই অবস্থান করিতেছেন। তিনিও অগ্রসর হইয়া জনতার মধ্যে মিশিয়া গেলেন। জনতার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একটা ধুনির সম্মুখে ভীমকায় উগ্রদর্শন এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। নানা জনকে তিনি নানা কথা বলিতেছিলেন।

মধ্যে মধ্যে অপরিচিত জনতার মধ্য হইতে এক-এক জনের নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন। থাকিতে থাকিতে এক সময় মেজকর্ত্তার দৃষ্টির সহিত সন্ন্যাসীর দৃষ্টি মিলিত হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—এস বাবা গণেশ বাঁড়ুজ্যে, রামচন্দ্রপুরের বাড়ুজ্যে-বাড়ির মেজকর্ত্তা এস। মেজকর্ত্তা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পরমুহূর্ত্তে বিপুল ভয়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী যদি অন্তরের আরও কোন কথা এই জনতার সমক্ষে বলিয়া দেয়! তিনি ত্বরিত পদে সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া আবার গঙ্গার ঘাটের উপর বসিলেন। কতক্ষণ বসিয়াছিলেন তাঁহার নিজেরই ঠিক ছিল না। অবশেষে তাঁহার চমক ভাঙিল কাহার কথায়। ঘাটের উপরের বাজারের এক জন পরিচিত দোকানদার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল—ওই—মেজকর্ত্তা যে! প্রণাম, ভাল আছেন?

মেজকর্ত্তা একটু অর্থহীন হাসি হাসিয়া কহিলেন—ভাল ত?

দোকানী বলিল—আজ্ঞে হ্যা—আপনাদের আশীর্ব্বাদ। তার পর চান-টান করুন। পাকশাকের জোগাড় ক'রে দি—সেবা করবেন চলুন। বেলা যে আর নাই।

মেজকর্ত্তা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই বেলা আর বেশী নাই—সূর্য্যমণ্ডলে ক্লান্তির রক্তাভা দেখা দিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন—তাই ত—তা ইয়ে—মানে ফিরবার ট্রেনটা—।

হাসিয়া দোকানী বলিল—সে ত সেই কাল সকাল ন'টায়। তিনটের গাড়ী ত অনেক ক্ষণ চলে গিয়েছে।

মেজকর্ত্তা ধীরে ধীরে চিন্তান্বিত ভাবে ঘাটের ধাপে ধাপে গঙ্গার জলে গিয়া নামিলেন।

* * *

গভীর রাত্রি। দোকানের বারান্দায় মেজকর্ত্তা জাগ্রতচক্ষে শুইয়াছিলেন। ঘুম আসে নাই। বার-বার তিনি উঠিয়া বসিতেছিলেন—আবার শুইতেছিলেন। এবার তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিস্তব্ধ পল্লী—শুধু গঙ্গাতটের বনভূমিতে ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত চীৎকার ধ্বনিত হইতেছে। মেজকর্ত্তা শ্মশানের দিকে চলিলেন। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া প্রবলবেগে স্পন্দিত হইতেছিল। শ্মশানের বুকে নামিয়া দেখিলেন জনশূন্য শ্মশানে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে সন্ন্যাসী গঙ্গার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন।

অল্প দূরে দাঁড়াইয়া করজোড়ে মেজকর্ত্তা ডাকিলেন—বাবা! সন্ন্যাসী মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিলেন—এস—ব'স। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া মেজকর্ত্তা উপবেশন করিলেন। নরকপালের পাত্রে কি একটা পানীয় পান করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—কামনা নিয়ে এসেছ বাবা?

মেজকর্ত্তার কণ্ঠ যেন নিরুদ্ধ হইয়া গেছে—স্বর তাঁহার বাহির হইল না।

সন্ন্যাসী আবার বলিলেন—কি কামনা বল বাবা।

বহুকষ্টে মেজকর্ত্তা এবার উত্তর দিলেন—বাবা অন্তর্য্যামী—

হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—কিন্তু তোমার কামনার কথা তোমাকেই যে মুখ ফুটে চাইতে হবে বাবা। না চাইলে কি এ সংসারে পাওয়া যায়—তুমি দাও?

সেই অঙ্গারলিপ্ত তটভূমির উপরেই লুটাইয়া পড়িয়া মেজকর্ত্তা বলিলেন—সন্তান—বংশ! বাবা বৈদ্যনাথ আমাকে নিরাশ ক'রেছেন, তুমি দয়া কর বাবা!

সন্ন্যাসী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, মেজকর্ত্তাও উঠিলেন না সেই ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় সন্ন্যাসীর পাদমূলে পড়িয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ পর সন্ন্যাসী বলিলেন—ওঠ্—উঠে ব'স্। বলিয়া ঝুলি হইতে একটা মাটির পাত্র বাহির করিয়া খানিকটা পানীয় তাহাতে দিয়া বলিলেন—মায়ের প্রসাদ—পান কর। মেজকর্ত্তা শাক্ত ব্রাহ্মণবংশের সন্তান, বিনা দ্বিধায় তিনি সেটুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

সন্ন্যাসী নিজেও পানীয় পান করিয়া বলিলেন—শিববাক্য লঙ্ঘন করা যায় না। যায়?

মেজকর্ত্তা হতাশভাবে বলিলেন—না বাবা যায় না।

হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—যায়—পারে—এক জন পারে। কে জানিস?

মেজকর্ত্তা বলিলেন—না বাবা।

খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—বাবার

কথা রদ্ করতে পারে—মা রে, বেটা মা, আমার কালী-মা—যে শিবের বুকে চ'ড়ে নাচে!

আবার সেই খিল্ খিল্ হাসি।

সে হাসির তীক্ষ্ণতায় বনভূমির অন্ধকারও যেন শিহরিয়া উঠিল, উপরে টিনের চালায় সে হাসির প্রতিধ্বনি অট্টহাস্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া তখনও বাজিতেছিল।

মেজকর্তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী আবার একপাত্র পানীয় মেজকর্তার পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। নিজেও পান করিয়া বলিলেন—মাকে আমার তুষ্ট করতে পারবি?

করজোড়ে মেজকর্তা বলিলেন—কি করতে হবে বাবা?

মেজকর্তার মুখের নিকট ঝুঁকিয়া পড়িয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—বলি দিতে পারবি? তন্ত্রমতে আমি তোর জন্যে মায়ের কাছে পুত্রেষ্টি যাগ করব।

মেজকর্তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—বলিলেন—হ্যাঁ বাবা—

সন্ন্যাসী বলিলেন—কিন্তু নরবলি—পারবি দিতে পারবি?

মেজকর্তা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একপাত্র পানীয় তাঁহার মুখের কাছে ধরিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—ভয় কি? অমাবস্যার অন্ধকার—কেউ জানবে না—মানুষের দৃষ্টি সেদিন ঢাকা থাকে। গভীর রাত্রে—দূর শ্মশানে—কেউ জানবে না। মাথার মধ্যে সুরার নেশা আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছিল—চোখও জ্বলিতেছিল অঙ্গারখণ্ডের মত—

মেজকর্তা বলিয়া উঠিলেন—পারব—বাবা—পারব!

৪

পরদিনই মেজকর্তা বাড়ি ফিরিলেন। অকারণে খানিকটা অত্যন্ত কৃত্রিম হাসি হাসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলাম।

মেজগিন্নী বলিলেন—বেশ ক'রেছিলে।

বোধ করি এ কথার উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া মেজকর্তা আরও খানিকটা হাসিয়া বলিলেন—তাই বলছিলাম।

মেজগিন্নী ঠাকুরকে বলিলেন—সকাল-সকাল রান্না কর ঠাকুর, কাল থেকে বাবু খান নাই।

অস্থির ভাবে কয় বার ঘুরিয়া ফিরিয়া মেজকর্তা বলিলেন—সেই ছেলেটা সেই—।

শঙ্কিতভাবে মেজগিন্নী বলিলেন—সে তখনই তারা নিয়ে গিয়েছে।

মেজকর্তা আরও কয়বার ঘুরিয়া—অবশেষে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। আবার কিছুক্ষণ পর আসিয়া বিনা-ভূমিকায় বলিলেন—তা, তাকে রাখলেই হ'ত—।

মেজগিন্নী স্বামীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—কাকে?

মেজগিন্নীর দিকে পিছন ফিরিয়া রান্নাঘরের চালের একগোছা খড় টান মারিয়া মেজকর্তা বলিলেন—সেই ছেলেটাকে—সেই—।

মেজগিন্নী কোন উত্তর দিলেন না। মেজকর্তা আরও একাগাছা খড় টান মারিয়া খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন—পুষ্যিপুত্তুর নাই হ'ল—খেত-দেত থাকত।

বাধা দিয়া মেজগিন্নী বলিলেন—চালের খড়গুলো কেন টানছ বল ত? যা বলবে সুস্থ হয়ে ব'সেই বল না বাপু।

মেজকর্তা আর দাঁড়াইলেন না, হন হন করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। বৈঠকখানায় গিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। অপরিসীম উদ্বেগে তাঁহার বুকের ভিতরটা যেন পীড়িত হইতেছিল। দরজার গোড়ায় রায়ের চটির মন্থর শব্দ উঠিল। রায় আসিয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল—বৌমা একবার ডাকছেন গো!

মেজকর্তা চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—এ্যাঁ।

রায় বলিল—দিনরাত এত ভাববেন না মেজবাবু। বলছি—বৌমা একবার ডাকছেন আপনাকে।

মেজকর্তা উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—আমি চণ্ডীতলা চললাম।

রায় শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—অই—অই। ই—করে কি হায়—বলি শুনছেন গো—অ—।

মেজকর্তা তখন চলিয়া গিয়াছেন।

দ্বিপ্রহরে খাইতে বসিলে মেজগিন্নী অভ্যাসমত পাখা

লইয়া বাতাস করিতেছিলেন। মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন—তা হ'লে চাটুজ্যেদের ছেলেটিকে—।

মেজকর্ত্তা বলিলেন—হ্যাঁ খাবে-দাবে থাকবে—মানুষ হবে—তা' থাক না—থাক না। খাবে-দাবে—মানে—।

উঠানে বাঁড়ুজ্যে-বাড়ির উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরীটা বসিয়াছিল—সেটা সহসা আকাশের দিকে মুখ করিয়া তারস্বরে দীর্ঘ চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠাকুর তাহাকে তাড়া দিল—দূর—দূর।

মেজগিন্নী বলিলেন—থাক থাক ঠাকুর—ও বাচ্চার জন্যে কাঁদছে—কাল রাত্রে বাচ্চাটাকে শেয়ালে নিয়ে গিয়েছে। ওই—ওই—ওকি কিছুই যে খেলে না।

তখন মেজকর্ত্তা আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন।

অপরাহ্ণে ঘুম হইতে উঠিয়া মেজকর্ত্তা জলের গ্লাসটি লইয়া বাহিরে বারান্দায় আসিতেই দেখিলেন, হাসি-মুখে মেজগিন্নী ছেলেটিকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামীকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন—কতবার এলাম, তোমার ঘুম আর ভাঙে না। ভারী সুবোধ ছেলে বাপু—কান্নার নামটি নাই। একবার নাও না কোলে—।

মেজকর্ত্তার আর মুখ খোয়া হইল না; অভ্যাস-মত দ্রুতপদে তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। মেজগিন্নী একটু ম্লান হাসি হাসিলেন—কিন্তু দুঃখ বা অভিমান তিনি করিলেন না।

রাত্রে মেজকর্ত্তা বলিলেন—ওকে ঝিকে দিয়ো মানুষ করবে। মেজগিন্নী বলিলেন—তাই দোব।

শয্যায় শুইয়াও মেজকর্ত্তার ঘুম আসিল না—অসম্ভব অবাস্তব কল্পনায় তাঁহার মস্তিষ্ক পীড়িত হইতেছিল। তবুও তিনি নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন পাছে মেজগিন্নী জানিতে পারেন। তিনি কল্পনা করিতে-ছিলেন আগামী অমাবস্যা-রাত্রির কথা। ভীমদর্শন সন্ন্যাসী—সম্মুখে যজ্ঞকুণ্ড—ছেলেটা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সব দেখিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের দৃশ্য ভাসিয়া উঠে—মেজগিন্নী খোকার জন্য ধুলায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে। অকস্মাৎ মনে হয় ওই ছেলেটার পরলোকগতা মায়ের কথা—তার আত্মা যদি আসিয়া বলে—দাও দাও ওগো আমার সন্তান ফিরাইয়া দাও! সঙ্গে সঙ্গে তিনি বালিশের মধ্যে সজোরে মুখ গুঁজিয়া দেন। বাহিরে তারস্বরে কুকুরীটা কাঁদিতেছিল। তিনি শিহরিয়া উঠেন—উঃ! আবার ধীরে ধীরে মেজকর্ত্তা মনকে দৃঢ় করেন।

প্রভাতে উঠিয়া মেজকর্ত্তা দেখিলেন মেজগিন্নী কখন উঠিয়া গিয়াছেন—ওদিকের খাট শূন্য। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিতেন সে-শয্যা কেহ স্পর্শও করে নাই।

* * *

দিন-দশেক পর।

সেদিন অমাবস্যা, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা খুব কম। মেজকর্ত্তা অমাবস্যার উপবাস করেন, রায়জী করে নিশিপালন। মেজকর্ত্তা বাড়িতেও নাই। আজ কয়দিন হইতেই এক সন্ন্যাসী লইয়া মাতিয়া আছেন। সকালেই বাড়ি হইতে চলিয়া যান, ফেরেন দ্বিপ্রহরে—আবার খাওয়া-দাওয়ার পর বাহির হন—গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসেন, তাও বড় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। মেজকর্ত্তার সন্ন্যাসী-সেবা এমন অসাধারণ কিছু নয়—তন্ত্রমতে জপে তপে সুরাপানও তিনি করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া এখন স্বামীর অনুপস্থিতি মেজগিন্নীরও মন্দ লাগে না—খোকাকে লইয়া স্বেচ্ছামত খেলা খেলিতে বাধা পড়ে না।

সেদিন সন্ধ্যার পর দোতালার বারান্দায় উজ্জ্বল হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়া মেজগিন্নী খোকাকে কোলে লইয়া দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে ছড়া গাহিতেছিলেন—

"তুমি পথে ব'সে ব'সে কাঁদছিলে—
মা-মা ব'লে ডাকছিলে—।"

চিরঅনাদৃত অনাথ শিশু শান্ত মুগ্ধ নেত্রে মেজগিন্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কি মোহ সে মুখে ছিল সে-ই জানে।

মৃদু মন্থর জুতার শব্দ করিয়া রায় আসিয়া দাঁড়াইল, মেজগিন্নী মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিলেন। হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া রায় বলিল—পেনাম বৌমা।

মেজগিন্নী বলিলেন—কিছু বলছ রায়জী?

রায়জী ধীরে ধীরে বলিল—ই বেটা সাধু ত ভাল নয় মা, বাবুকে যে পাগল ক'রে দিলে গো! দিন-রাত মদ-মদ আর মদ। আজ আবার ব'লে পাঠিয়েছেন ফিরতে রাত হবে—দোর সব যেন খোলা থাকে। তা বলি বলে যাই বৌমাকে। আর কল্কেটা সেজে রেখে যাই, তখন আবার

ধর্ ধরবে না। একটু ইতস্তত করিয়া আবার সে বলিল— তুমি এত লাগাম ঢিল দিয়ো না মা। ছেলে নিয়ে তুমিও যে কেমন হয়ে গেলে—একটুকু শাসন-টাসন ক'রো।

মৃদু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মেজগিন্নী অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিলেন।

* * *

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। মেজকর্তা অতি সতর্ক নিঃশব্দ পদক্ষেপে বাড়ির ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিরন্ধ্র গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবী যেন বিলুপ্ত হইয়া গেছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড সুষুপ্ত বাড়িখানা গাঢ়তর অন্ধকারের মত দাঁড়াইয়া আছে। শুধু দুই-তিনটা খোলা জানালা দিয়া গৃহমধ্যের আলোক-রশ্মি শূন্যের অন্ধকারের মধ্যে নিতান্ত অসহায় প্রেত-দেহের মত ভাসিয়া রহিয়াছে। অতি সতর্কতা সত্বেও মেজকর্তার পা টলিতেছিল। ধীরে ধীরে তিনি অন্দরের দিকে চলিলেন। মৃদু কাতর স্বরে কে কাঁদিয়া উঠিল। মেজকর্তা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ শুনিয়া বুঝিলেন কুকুরটা এখনও শোক ভুলে নাই। আবার তিনি অগ্রসর হইলেন। আজ শ্মশানে তাঁহার পুত্রেষ্টি যাগ হইতেছে। তিনি বলি-সংগ্রহে আসিয়াছেন। বলির সময় সমাগতপ্রায়। সমস্ত দরজা খোলা রহিয়াছে— সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া তিনি দোতালায় উঠিলেন। ধীরে ধীরে ঝিয়ের ঘরে ঢুকিলেন। অন্ধকার ঘর—অতি সতর্কতার সহিত দেশলাই জ্বালিয়া দেখিলেন বুড়ী ঝি অকাতরে ঘুমাইতেছে, কিন্তু শিশু ত সেখানে নাই। বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন—কোথায় তবে? বিদ্যুৎ-রেখার মত একটা কথা মাথার মধ্যে খেলিয়া গেল। আবার তিনি অগ্রসর হইলেন। এ-পাশের আলোকিত বারান্দায় দ্বারপথে দাঁড়াইয়া মেজকর্তা দেখিলেন তাঁহার অনুমান সত্য—মেজগিন্নীর কোলের কাছে শিশুটি শুইয়া আছে।

ধীরে ধীরে তিনি শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন মেজগিন্নীর বক্ষদেশ সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত মুক্ত। তাঁহার বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শিশুটি দুই হাতে মেজ-গিন্নীকে জড়াইয়া ধরিয়া একটি স্তন মুখে পুরিয়া অগাধ নিশ্চিন্ত ঘুমে মগ্ন। মাঝে মাঝে স্বপ্নঘোরে মৃদু হাস্যরেখা তাহার অধরে ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। মেজগিন্নীর মুখে অতি তৃপ্তির হাস্যরেখা যেন তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে। মেজকর্তার সুরা-প্রভাবিত মস্তিষ্কের মধ্যে সব যেন ওলট-পালট হইয়া যাইতেছিল। হাত-পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তবুও তিনি প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া শিশুকে তুলিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ির বাহিরে প্রান্তরের মধ্যে পড়িয়া গতি আরও দ্রুত করিবার চেষ্টা করিলেন।

অকস্মাৎ অমাবস্যার অন্ধকার দীর্ণ করিয়া কে কাঁদিয়া উঠিল। মেজবৌ! মেজকর্তা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। আবার সেই মর্ম্মভেদী চীৎকার। বিশ্বের বেদনা যেন সে-চীৎকারের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। মেজকর্তার বুকের ভিতর যেন ঝড় বহিয়া গেল, তবুও আর একবার চেষ্টা তিনি করিলেন। কিন্তু সম্মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াই তিনি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। শ্বেতবর্ণ অশরীরী মূর্ত্তির মত কে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সেটা একটা ছোট তালগাছের শুক্‌না পাতা, শিথিল দীর্ঘ বৃন্ত সমেত সেটা ঝুলিতেছিল—অপর কিছু নয়। কিন্তু মেজকর্তার মনে হইল এই শিশুর অশরীরী মাতা যেন দীন ভাবে সন্তান-ভিক্ষা চাহিতেছে। ওদিকে পিছনে বাড়ির মধ্য হইতে আবার সেই মর্ম্মভেদী চীৎকার! সে চীৎকারে তাঁহার মর্ম্মস্থল সমবেদনায় অধীর হইয়া উঠিল—সমস্ত বাসনা এক মুহূর্ত্তে তুচ্ছ হইয়া গেল। তিনি ফিরিলেন—উন্মত্তের মত ফিরিলেন—যাই—যাই—মেজবৌ!

ঠিক এই সময়ে দূরে চৌকীদার হাঁক দিতেছিল— ও—ওই! মেজকর্তার মনে হইল এ রুদ্রকণ্ঠে রুষ্ট তান্ত্রিকের আহ্বান। তিনি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন— মেজবৌ! মেজবৌ!

মেজবৌয়ের নিশ্চিন্ত অঞ্চলতল আশ্রয়ের জন্য প্রাণ-পণে ছুটিয়া বাড়ির ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মেজকর্তার কণ্ঠস্বর পাইয়া কুকুরী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুক্রন্দনে আপনার বেদনা নিবেদন করিল।

মেজকর্তা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন— তোর ত আমি নিই নি মা—তোর ছেলে আমি নিই নি।

স্বরলিপি

গান

বারতা পেয়েছি মনে মনে
গগনে গগনে তব নিশ্বাস পরশনে
এসেছ অদেখা বন্ধু দক্ষিণ সমীরণে।
কেন বঞ্চনা কর মোরে
কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে
দেখা দাও দেখ মন ভরে
মম নিকুঞ্জবনে ॥
দেখা দাও চম্পকে রঙ্গণে
দেখা দাও কিংশুকে কাঞ্চনে।
কেন শুধু বাঁশরীর সুরে
ভুলায়ে লয়ে যাও দূরে
যৌবন উৎসবে ধরা দাও
বন্ধনে ॥

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার।

পা পধা || ক্ষপা -মা মা মগা | গা -া গা গা গা -রা গা -মা -া -া -া -গা
বা র০ || তা০ ০ পে য়ে০ | ছি ০ ম নে ম ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

গপা পা পা পা | পা পা পক্ষা পক্ষা পক্ষা -না না ধা পা পা মা গা
নে গ | গ নে ত০ ব০ নি০ ০ শ্বা স প র শ নে

সা সা গা মা | পা পা পা -না না -া -া -র্সা র্সা -া র্সর্গা র্রা
এ সে ছ অ | দে খা ব ন্ ধু ০ ০ ০ দ ০ ক্ষি ণ

র্সনা ধা -র্সা না | ধপা -া পা পধা
স০ মী ০ র | ণে০ ০ "বা র০"

-া -া ||{ র্সা র্সর্গা.গা -র্রা | র্রা র্রা র্রা র্রর্সা | র্সা -া র্সা র্সনা .ধা -না ধা -না
০ ০ ||{ কে ন ব ন্ | চ না ক র | মো ০ রে কে ন ০ বাঁ ০

| ধা -র্সা -া নধা | ধা না -া র্সনা | ধনর্সা ধনা ধপা -া | -া -া -(া -া) } |
| ধ -০ ০ ০০ | অ দৃ ০ শ্য০ | ডো০০ ০০ রে০ ০ | ০ ০ ০ ০ } |

পা পা পা -র্সা ণা ধা | পা ধপা মা মা গা -া -া -া | -া -া -া -া
দে খা দা ও দে খা | দা ও০ দে খা দা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ও

সা সা গা মা পা পা না না না না -র্সা র্সনা | ধনা নধা পা পধা
দে হ ম ন ভ রে ম ম নি কু ন্ জ০ | ব নে০ "বা র"

সা সপা || পা -া -া -া -া -া -া -া পা -া পা পধা | মপা -া মা গা
দে খা || দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও চ ম্ প কে০ | র০ ঙ্ গ নে

-া -া গা গা | গা -া -া -মা -া -া -া -া মা -া মা গা
০ ০ দে খা | দা ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ কি ঙ্ শু কে

রগা -া রা সা | -া -া -া -া
কা ন্ চ নে | ০ ০ ০ ০

র্সা র্সর্গা র্গা র্গা | র্রা র্রা র্রা র্রর্সা র্সা -া র্সা র্সনা নধা -না -না না
কে ন শু ধু | বা শ রী র সু ০ রে ভু লা ০ রে ন

না -া -া -ধা ধা -র্সা -া নধা ধনর্সা ধনা ধপা -া -া -া -া -া
রে ০ ০ ০ যা ০ ০ ও০ দূ০০ ০০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

পা -র্সা ণা ধা পা -ধা পা মা | গা -া গা গা | গা -া গা গা
যৌ ০ ব ন | উ ০ ৎ স | বে ০ ধ রা | দা ও ধ রা

গা -া গা গরা | গা -মা -া -া গা -মা পা মা রগা -া রা সা
দা ও ধ রা | দা ও ০ ০ দৃ ষ্ টি র ব ন্ ধ নে

"এসেছ অদেখা বন্ধু দক্ষিণ সমীরণে" পূর্ব্বের ন্যায়

কবিগুরু এই গানটির দুইটি সুর দিয়াছিলেন, তার মধ্যে এই একটি। অপরটি গত ১৩৪১ সনের মাঘের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাথেয়

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মনের নিরালা আঁকা-বাঁকা পথে একেলা সঙ্গীহীন,
চলেছি, চলেছি অবিশ্রান্ত, চলেছি রাত্রিদিন।
গহন, গোপন, দুর্গম অতি, অনাবিষ্কৃত দেশ,
দীর্ঘ, জটিল, অন্ত-বিহীন পন্থ নিরুদ্দেশ।

ভাল ক'রে দূর দিগন্ত-ভালে ফোটে নি অরুণ-আলো,
সকল কাকলি ছাপায়ে তখনও ডাকে নি কোকিল কালো,
ঈষৎ-উতল কিশলয়-ছোঁয়া বায়ু বহে ঝুরু ঝুরু,
রাত্রি-দিবার সন্ধিক্ষণে যাত্রা হয়েছে সুরু।

ঝরা কুসুমের কেশরে পরাগে সুবর্ণ হ'ল রেণু,
দূরে, বহু দূরে অশান্ত সুরে বাজে কার বনবেণু।
চলার ছন্দে আনন্দ মোর শোণিতে উছলি ওঠে,
চিত্ত-সায়রে কম কামনার রক্ত-কমল ফোটে।

কে যেন এ পথে চলে গেছে, তার অঙ্গ-সুরভিখানি,
বকুল-বনের পবনে কেমনে বন্দী হ'ল না-জানি!
কোমল করের মৃদুল পরশে মুকুল উঠেছে জেগে।
অপরাজিতা কি ফুটে ওঠে তার চোখের দৃষ্টি লেগে!

কে যেন এ পথে চলে গেছে, আজও পায়ের চিহ্নে তার
ভুলে-যাওয়া কোন্ গানের পদের বেজে ওঠে ঝঙ্কার!
পাতার আড়ালে উড়ে পড়ে কার আকুল অলক-দাম,
মনে পড়ে, তবু মনে পড়ে নাকো কোনমতে তার নাম।

পাখীর কূজনে, ফুলের ভাষায় স্তব্ধ আকাশতলে,
বসুন্ধরার রুদ্ধ হৃদয়ে, বাতাসে জলে স্থলে,
যে গানের সুর চলে অবিরাম, চলে চিরদিন ধরি,
সে সুর শিখিনু, সে গান আমার কণ্ঠে নিলাম ভরি।

একা চলি, তবু মনে হয় যেন সঙ্গী কোথায় আছে।
আমার তরে কি প্রতীক্ষা করে? সে কি দূরে,
সে কি কাছে?
ধানের শীর্ষ দুলে দুলে ওঠে আশা-শিহরিত সুখে,
কনক-আলোকে ঝরে লাবণ্য শ্যামা ধরণীর বুকে।

একা গান গাই, আমার সঙ্গে গেয়ে ওঠে বনভূমি।
ঊর্দ্ধ আকাশে রবি উঠে আসে; এখনও এলে না তুমি?
কি হবে—যদি না পথের প্রান্তে দেখা পাওয়া যায় তার!
গানের কলির মাঝখানে সুর ক'রে ওঠে হাহাকার।

খর হয়ে ওঠে সূর্য্যের কর; পত্রের মর্ম্মরে
আর্ত্ত তরুর মর্ম্ম-বেদনা বৃথা গুমরিয়া মরে।
পথের ধূলায় বাতাস বুলায় রক্ত-ধূসর-তুলি
আকাশের বুকে অসহ্য মূক যন্ত্রণা ওঠে দুলি।

নাই আশ্রয়, নাই আবরণ, নাই তৃণবীথি তরু,
তৃষা নিদারুণ, তরল আগুন, দূর-বিস্তার মরু।
ভ্রান্তি-দীপিকা জাগে মরীচিকা; তপ্ত তপন-ভাতি;
এল না, এল না, আজও সে এল না আমার স্বপ্ন-সাথী।

সে যদি না আসে কেন এ প্রয়াস? কেন প্রাণপণ করি
সুদীর্ঘ পথ অতিবাহি চলি সুদীর্ঘ দিন ধরি?
আহত আত্মা বিশ্রাম মাগে; ক্লান্ত, ক্লান্ত অতি;
যদি শুয়ে পড়ি তপ্ত শয়নে, কারও কিছু নাই ক্ষতি।

স্বপ্নে জাগিনু সুধা-সুরভিত অস্ফুট নিঃশ্বাসে,
কার আনমিত মুখখানি মোর মুখ'পরে নেমে আসে?
আকাশের চাঁদ অবনতমুখী—মুগ্ধ সাগরে চুমে,
আনন্দময় জাগরণ যেন মেলে অনন্ত ঘুমে।

স্পর্শ-আতুর শিরার রুধিরে মধুর দহন জাগে,
বটের শাখায় গুটানো-পাখায় পাখীর শিহর লাগে।
প্রহরের গতি স্তব্ধ; একটি অনুভূতি কেঁপে মরে।
রৌদ্র-মদির মুহূর্ত্তগুলি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

দীঘল কোমল আঁখি দুটি কেন রাখিলে আঁখির 'পরে
নিমেষের লাগি এসে যদি যাবে চির দিবসের তরে?
সময়ের স্রোত দুর্দ্দাম। তোর চোখে জল টলমল?
এ পাথেয়টুকু আমার পথের রয়ে গেল সম্বল।

জাপানে কয়েক দিন

শ্রীপারুল দেবী

আমি, আমার বাবা, আমার স্বামী ও আমার মেয়ে, এই কয় জনে কলিকাতা থেকে 'সির্দ্ধানা' জাহাজে ১৪ই মার্চ্চ জাপানের জন্য ছাড়লাম। বি, আই, এস, এন কোম্পানীর ছোট জাহাজ; তার কেবিনের মাপ দেখেই প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ল যে কি ক'রে ঐটুকুর মধ্যে বাস করা যাবে। কিন্তু অভ্যাস এমনই জিনিব যে ১৬ দিন পরে হংকঙে যখন আমরা সে জাহাজ থেকে পি-এণ্ড-ও কোম্পানীর 'রাঁচি' বলে মস্ত জাহাজে উঠ্‌লাম তখন মনে হ'তে লাগল ঐটুকু জায়গাই মানুষের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রাঁচি জাহাজের লম্বা ও প্রশস্ত ডেকের পাশে পাশে বসবার ঘর, খেলবার ঘর, ধূমপানের ঘর, চিঠি লেখবার ঘর ইত্যাদি নানা-প্রকার ঘরের ভিড়ে প্রথম কয়েক দিন আমি তো কেবলই হারিয়ে যেতাম।

যাহোক, আমরা কলিকাতা ছেড়ে রেঙ্গুন, পিনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং শাংঘাইয়ে থামতে থামতে ১২ই এপ্রিল জাপানের প্রথম বন্দর কোবেতে এসে পৌছলাম। প্রায় এক মাস জাহাজে থেকে, ক্রমাগত সমুদ্র দেখে দেখে, আমরা ডাঙ্গার জীব, ডাঙ্গায় নামবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, তাই প্রথম দিন জাহাজ আসতেই আমরা নেমে হোটেলে চলে গেলাম। শ্রীযুক্ত দাস কোবের এক জন পুরাতন বাসিন্দা, তিনি আমাদের আসবার সংবাদ পেয়ে বন্দরে আমাদের নিতে এসেছিলেন। তিনিই অনুগ্রহ ক'রে আমাদের হোটেলে পৌছে দিলেন, এবং যে কয় দিন কোবেতে ছিলাম, যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আগে শুনেছিলাম জাপানে অনেকেই ইংরেজী বোঝে, কিন্তু দেখলাম সেটা সত্য নয়। সাধারণ লোকে ইংরেজী বোঝেও না এবং বোঝা যে দরকার তা-ও মনে করে না। ভাষা নিয়ে তাই জাপানে আমাদের এত গোলমালে পড়তে হয়েছিল যে ইউরোপের ফ্রান্স বা জার্ম্মানী কোনখানে এ রকম হয় নি। আমরা কোবেতে ইয়ামাতো হোটেলে গিয়ে নামতেই জাপানী মেয়েরা ছুটতে ছুটতে এসে জাপানী প্রথায় নত হয়ে অভিবাদন ক'রে আমাদের জিনিষপত্র ভিতরে

জাপানী মহিলা

নিয়ে গেল ও তখনই ফিরে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম-কক্ষে বসিয়ে হলদে রঙের এক রকম জাপানী

কুমারী শিমিজু

সরবৎ ছোট ছোট গেলাসে ঢেলে খেতে দিলে। এখানকার মেয়েদের কার্য্যক্ষমতা দেখে সত্যই বিস্মিত হ'তে হয়। আমাদের দেশের চার জনের কাজ ওরা এক জনে অত্যন্ত সহজে করে এবং সর্ব্বদাই হাসিমুখে করে। জাপানে গিয়ে প্রায় সকল হোটেলেই মেয়েদের কাজ করতে দেখলাম; পুরুষ-চাকর খুবই কম। হোটেল বা রেস্তোরাঁতে টেবিলে খাওয়ান, ঘর পরিষ্কার করা, দোকানে জিনিষপত্র বিক্রি, বাস্ কনডাক্‌টারগিরি, এ সকল কাজ সর্ব্বদা মেয়েরাই ক'রে থাকে। দেশের বেশীর ভাগ কাজই পুরুষ এবং মেয়ে ভাগ ক'রে করছে, তাই সকলেই ব্যস্ত, সকলেই যেন ছুটে চলেছে। ট্রেন, ইলেকট্রিক ট্রাম, বাস ট্যাক্সিতে দেশ ছেয়ে গেছে—প্রতি দশ-পনর মিনিট অন্তর ট্রেন চলেছে, পাঁচ মিনিট অন্তর ট্রাম ছাড়ছে, তবু প্রতি গাড়ীতে লোক ধরে না এত ভিড়। আমরা যে সময়টাতে জাপানে গেলাম সে সময়ে ওদের চেরীফুলের মাস চলেছে। সেটা হ'ল ওদের বসন্ত উৎসবের কাল; নাচগান আমোদপ্রমোদ নিয়ে দেশে একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে, তাই আমরা যেখানে গিয়েছি, আরও এত ভিড় পেয়েছি। ওরা ছুটির দিনে কখনও বিছানায় শুয়ে বসে বিশ্রাম নেয় না—বিশ্রাম যেন ওদের আনন্দই নয়; ওরা বাইরে বেরিয়ে পড়ে আনন্দ করতে। নদীর ধারে, ঝরণার পাশে, পাহাড়ের উপর, চেরীগাছের তলায়, বাগানে ওরা দল বেঁধে ব'সে গানবাজনা করে, খাওয়া-দাওয়া করে, আনন্দ ক'রে অবসর-কাল কাটায়। ইংরেজীতে যাকে ব'লে *holiday-making spirit*, সেটা ওদের মধ্যে এত বেশী দেখলাম যে ইউরোপের সকল জায়গাতেও বোধ হয় এতটা দেখি নাই।

আমরা কোবেতে চার দিন ছিলাম, তার মধ্যে জাপানের বাণিজ্য-কেন্দ্র মস্ত শহর ওসাকা একদিন দেখে এলাম। সমস্ত শহরটা কারখানা ও কলের চিমনীতে ভরা। পুরাতন প্রাসাদ এখন যাদুঘর রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ওসাকায় সে-সময়ে ওদের জাতীয় প্রদর্শনী হচ্ছিল—সেখানে ওদেশে যা কিছু তৈরি হয়, সকল জিনিষ দেখান হচ্ছিল। কলকারখানা, জাহাজ, এরোপ্লেন, অস্ত্রশস্ত্র, কাপড়চোপড়, ঘরের আসবাব, ছবি, খাবার জিনিষ—কোনও কিছু বাকী নেই—নিজেদের দেশের সকল অভাব নিজেরাই পূরণ করেছে। জাপানে গিয়ে যা-কিছু দেখেছি, সকল সময়ে বারে বারে নিজেদের কথাই মনে পড়েছে এবং আমাদের দেশের তুলনায় ঐ একটা শহরের মত ক্ষুদ্র দেশের শক্তি,
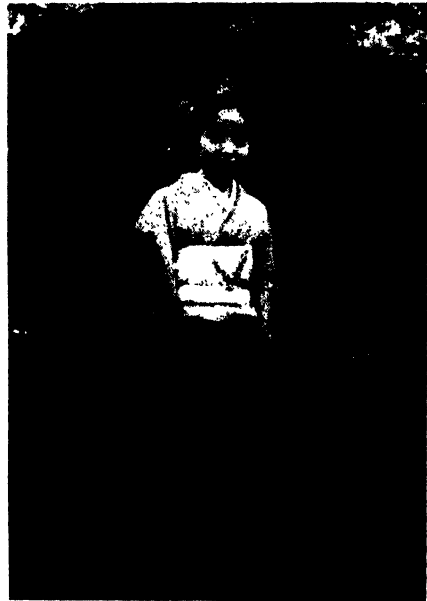
শ্রীমতী শিমিজু

কার্য্যপটুতা ও সাফল্য দেখে বার-বার মনে হয়েছে যে এতটুকু জাপান যদি এত করতে পেরে থাকে তো এত বড় ভারতবর্ষের কতই না করা সম্ভব।

ফুজি পাহাড়ের দৃশ্য

ওসাকায় আমরা জাপানের বিখ্যাত চেরী-নাচ দেখলাম। দেখতে গিয়ে ভারী মজা হয়েছিল তাই সেই কথাটা একটু ব'লতে চাই। অনেক কষ্টে টিকিট কিনে তো আমরা ভিতরে গেলাম। একটি মেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, সে হাত দিয়ে ইসারা ক'রে সকলকে নীচের সিঁড়ি দেখিয়ে দিচ্ছে আর কি ব'লে দিচ্ছে। আমরা টিকিট নিয়েছি উপরের, নীচে কেন নামতে ব'লে কিছু বুঝতে না পেরে বার-বার মেয়েটিকে টিকিট দেখিয়ে বলছি যে আমরা উপরে বসবার জায়গায় যেতে চাই, কিন্তু সে কেবলই হাসে আর আমাদের পায়ের দিকে দেখায়। তখন বুদ্ধিবলে বুঝলাম যে জুতা নিয়ে কিছু গোল আছে। নীচে নেমে যেতেই একটি মেয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে আমাদের সকলের জুতা খুলে নিয়ে কালো কাপড়ের এক রকম জুতা পরিয়ে দিলে এবং উপরে যাবার অন্য একটা রাস্তা দেখিয়ে দিলে। পুরু মাদুরে ঢাকা রাস্তা, এবং সিঁড়ি, আর তারই দু-পাশে কাগজের চেরীফুলের ও আলোর বাহারে ভিতরটা ঝক্‌মক্ করছে। দলে দলে জাপানী মেয়েরা নাচ দেখতে গেছে। তাদের কিমোনোর বিচিত্র রঙের সমাবেশ, মাথায় মস্ত উঁচু খোঁপায় কারও চেরীফুল কারও অন্য কিছু বাহার। কিমোনোর উপর যে নানা রঙে চিত্রিত 'ওবি' বা কোমরবন্ধ ওরা বাঁধে তারই গাঁট বাঁধবার জায়গাটি পিঠে ঠিক প্রজাপতির ডানার মত মেলে দিয়েছে। সবশুদ্ধ ওদের শুভ্র গায়ের রঙে, পোষাকের লাল নীল কালো হলদের অপূর্ব্ব বর্ণসমাবেশে আলোয় ফুলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। ভিতরে গিয়ে একটা জায়গায় অনেকে বসছে দেখে সেইখানে গিয়ে বসলাম—সামনেই অত্যন্ত ক্ষুদ্র ষ্টেজ। ষ্টেজের উপর একটি ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভ জ্বলছিল তারই পাশ দিয়ে ভিতর দিকে যাবার একটি ক্ষুদ্র দরজা। অত বড় নাচঘরের ঐ ছোট্ট ষ্টেজ দেখে আমরা তো আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। যাহোক বসে আছি, ভাবছি হয়ত ঐ টুকুর মধ্যেই জাপানের বিখ্যাত চেরী-নাচ হয়ে থাকে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে আশা করছি যে এইবার হয়ত একটি মেয়ে চেরীফুলের গোছা হাতে ক'রে নাচতে নাচতে বেরোবে, এমন সময়ে অত্যন্ত ধীর-মন্থর গতিতে শ্বেতপাথরের মত সাদা রং মাখা ও বিচিত্র রঙের ভূলুণ্ঠিত কিমোনো-পরা একটি মেয়ে ষ্টেজে এসে জানু পেতে বসে জাপানী প্রথায় সকলকে তিন বার অভিবাদন করলে। তার পর আবার তেমনই ধীর ভাবে উঠে সেই ষ্টোভের সামনে বসল। তখন আর একটি মেয়ে হাতে একটি ট্রেতে কয়েকটি পাত্র ইত্যাদি নিয়ে ঢুকে অভিবাদন ক'রে সেই ট্রেটি প্রথম মেয়েটির কাছে রাখলে। সে মেয়েটি ব'সে ব'সে ধীর সুন্দর ভঙ্গীতে ষ্টোভে কি রান্না করতে লাগল। আমরা তো অবাক হয়ে ভাবছি এ আবার কি ধরণের নাচ। যাহোক দশ মিনিট পরে ষ্টোভের উপর থেকে পাত্রটি নামিয়ে মেয়েটি বাটিতে বাটিতে হাতা করে চা ঢেলে দিতে লাগল এবং দলে দলে ছোট ছোট

চেরী ফুল

বদলে হয়ত বা সেদিকে ঝাল চা রান্না হচ্ছে ভেবে না জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে আর ঢুকতে সাহস হ'ল না, কিন্তু কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি। অনেক খুঁজে একটি সামান্য ইংরেজী-জানা ভদ্রলোককে ধরে জানতে পারলাম যে ঝাল চা নয়, সেই দিকেই আসল নাচ হচ্ছে, এ চা-খাওয়ার ব্যাপারটা শুধু এদের অভ্যর্থনা, এটা নাচের অঙ্গ নয়। কিন্তু আমরা আসতে দেরি করেছি ব'লে সমস্ত জায়গা ভরে গেছে; আধ ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে থাকলে এ নাচটা শেষ হবার পর ঐ দল যখন
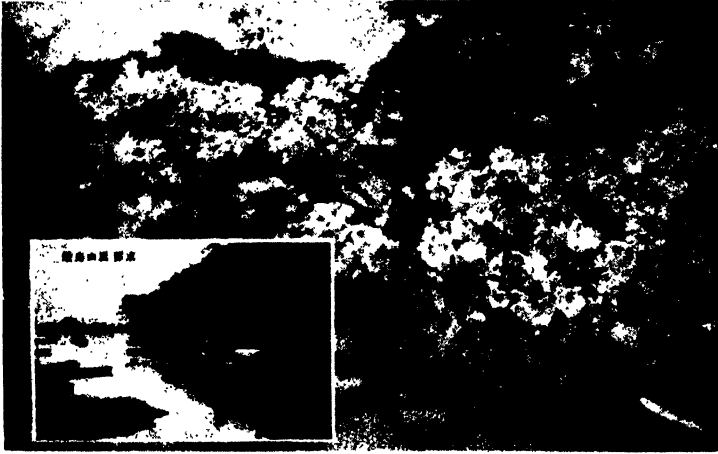
মেয়ে বেরিয়ে সেই বাটিগুলি দর্শকদের সকলকে পরিবেশন করতে লাগল। মেয়েগুলির পরিবেশন করবার ভঙ্গী দেখতে ভারী ভাল লাগে। বাটিটি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে হাসি-মুখে মাথা নীচু ক'রে প্রথমে অভিবাদন করে, তার পর দুই হাতে বাটি ধরে অত্যন্ত আস্তে সম্মুখে রেখে দেয় ঠিক যেন অঞ্জলি দিচ্ছে। তার পর আবার অভিবাদন ক'রে আস্তে আস্তে পিছিয়ে সরে যায়। পাশের লোকেরা দেখলাম হাসিমুখে "আরিগা তো" (ধন্যবাদ) বলছে এবং বাটির তরল সবুজ রঙের পানীয়টুকু নিঃশেষে পান করছে। যস্মিন দেশে যদাচারঃ ভেবে আমরাও সেই সবুজ পদার্থটি মুখে নিয়ে দেখি যে সে বিষম তেতো। শুনলাম সে হ'ল জাপানী চা, ওরা বলে 'ও চা'; সে না-কি ও-দেশের উত্তম পানীয়। যাহোক চায়ের ব্যাপার শেষ ক'রে দেখলাম দলে দলে লোক উঠে গেল। আমরা তো বুঝতেই পারি না ব্যাপারটা কি। এসেছিলাম নাচ দেখতে কিন্তু নাচটা অন্তরালেই রইল, শেষ অবধি চা খেয়েই বুঝি বাড়ি ফিরতে হয়। যাহোক্ তবু অপেক্ষা করছি, এমন সময়ে পুরাণ দর্শকের দল বেরিয়ে যেতেই হুড়মুড় ক'রে নূতন দল ঢুকল এবং সে মেয়েটি আবার ঠিক তেমনি ভাবে নূতন ক'রে চা-তৈরি আরম্ভ ক'রে দিলে। অতঃপর সেই ব্যাপারেরই পুনরাবৃত্তি হবে বুঝে আমরা নিরাশ হয়ে উঠে এলাম। এসে দেখি অন্য এক দিকে অনেক লোক ঢুকছে। ভেতোর

বেরিয়ে যাবে তখন জায়গা পাওয়া যাবে। কি করি বসেই রইলাম। আধ ঘণ্টা পরে প্রায় হাজার লোক দলে দলে বেরোতে লাগল। তারা বেরিয়ে গেলে পরে একটি মেয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসিয়ে দিলে। ভিতরে ঢুকে তখন দেখি যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার। তার পর যখন সীন উঠল প্রজাপতির মত রং-চঙে কাপড়-পরা মেয়েরা পাখা হাতে নিয়ে নানা ভঙ্গীতে নাচলে তখন যে কি সুন্দর লাগল তা বলতে পারি না। ষ্টেজের দুই পাশে চেরী ফুলের পর্দা দেওয়া দুইটি বড় বড় বেদীর মত জায়গা আছে; সেইখানে এক-এক পাশে আট জন ক'রে মেয়ে নানা রকম বাজনা নিয়ে বসে আর গান করে আর ষ্টেজে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন মেয়ে এক রকম পোষাক প'রে একসঙ্গে নাচে। জাপানের ষ্টেজে ঝরণা নদী পাহাড়ের যে সব সুন্দর দৃশ্য দেখলাম সে যেন সত্য ব'লে ভ্রম হয়। যাহোক অনেক কষ্টের পর শেষ-অবধি ওদের নাচটা দেখে সেদিন সব কষ্ট সার্থক ব'লে মনে হয়েছিল। তার পরে কিয়োটো ও টোকিওতেও এ নাচ দেখেছি, কিন্তু প্রথম দিনের মত ভাল আর কোনও দিন লাগে নি।

আমরা কোবেতে থাকতে 'রোকো' ব'লে পাহাড়ে এক দিন গিয়েছিলাম। মস্ত উঁচু পাহাড়। ফিউনিকুলার ক'রে কতকটা ওঠবার পরেও আবার রোপওয়েতে ক'রে আধ ঘণ্টা যেতে হ'ল। টেলিগ্রাফের তারের মত তার

উপরে উঠে গেছে তাইতে একটি ছোট্ট গাড়ী ক'রে ঝুলতে ঝুলতে যখন উপরে উঠ্‌তে লাগলাম এবং পায়ের নীচে পৃথিবী ক্রমেই আরও নীচে সরে যেতে লাগল, তখন যে মনটা খুব নিশ্চিন্ত ছিল তা ঠিক বলতে পারি না। সেদিন কুয়াসা ছিল, অত উঁচুতে উঠেও নীচের দৃশ্য ভাল ক'রে দেখতে পাওয়া গেল না।

কোবে থেকে আমরা জাপানের পুরাতন রাজধানী কিয়োটোয় এসে তিন দিন ছিলাম। ওখানে হোজু নদী, বিওয়া লেক, বুদ্ধ-মন্দির, মন্দির-সংলগ্ন জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘণ্টা ইত্যাদি দেখলাম। কিয়োটো থেকে কিছু দূরে 'নারা' ব'লে জায়গাটি দেখে আমাদের খুব ভাল লেগেছে। সেখানে প্রকাণ্ড বাগানে আট শত হরিণ ছাড়া আছে, তারা ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে চরে বেড়ায়, মানুষ দেখে একটুও ভয় করে না। বাগানের মধ্যেই বড় দুটি মন্দির; একটি হ'ল বুদ্ধদেবের—অত বড় বুদ্ধমূর্ত্তি নাকি আর কোনখানে নেই। আর একটি হ'ল শিন্‌টো—যেখানে জাপানীরা পূর্ব্বপুরুষদের ও মহাত্মাদের স্মরণ ক'রে তাঁদের পূজা করে। শিনটোতে কোনো মূর্ত্তি নেই—একটি বেদীর উপর অনেক ফুল, মোমবাতি, ধূপ ও পূজার উপকরণ সাজান, ও মাঝে মাঝে একটি আরসি রাখা। ওরা বলে নিজেদের মুখ সেই আরসিতে দেখে ওরা পূজা করে। তার মানে বোধ হয় সকল মানুষের মধ্যে যে শাশ্বত ভগবান বাস করেন তাঁরই পূজা।

তার পর আমরা মিয়োনোসিতায় গেলাম, সেখান থেকে বরফে-ঢাকা ফুজি পাহাড়ের চমৎকার দৃশ্য পাওয়া যায়। ফুজি পাহাড়ের নীচেকার অর্দ্ধেক অংশ কালো, সেখানে এতটুকুও বরফ নেই—তার পর হঠাৎ একেবারে সাদা বরফ সুরু হয়েছে; চূড়ার উপরিভাগ পর্য্যন্ত একেবারে দুধে-ধোওয়া সাদা। আশা করি ছবি দেখে কিছু বোঝা যাবে। আমরা টোকিওতে থাকতে জাপানের বিখ্যাত নিক্‌কো পাহাড় দেখতে গিয়েছিলাম। জাপানে একটা কথা আছে যে জাপানে এসে যে নিক্‌কো দেখে নি সে কিছুই দেখে নি—কিন্তু সত্য বলতে কি, আমার তো নিক্‌কো অপেক্ষা ফুজি পাহাড়ের দৃশ্যই বেশী ভাল লেগেছে। তবে আমরা যে-সময়ে নিক্‌কো গিয়েছিলাম সে-সময়ে
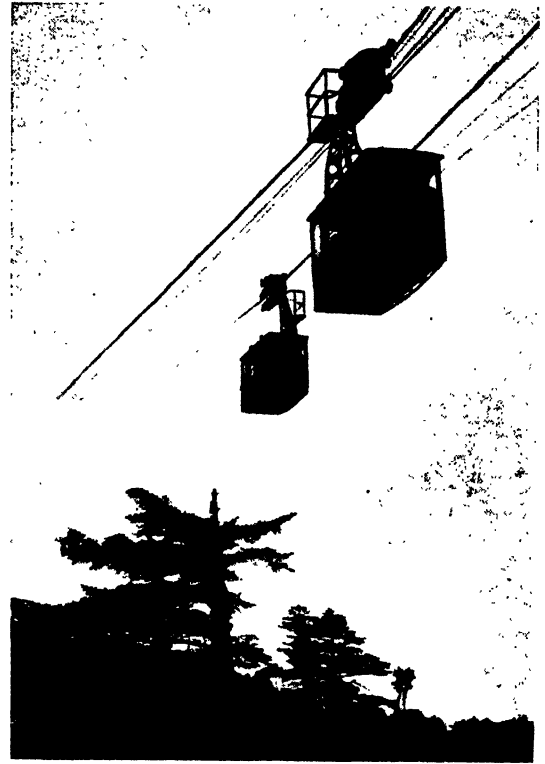
'রোপওয়ে'

বেশী ঠাণ্ডা থাকাতে চার দিকে বরফ জমে ছিল, ঝরণার মুখ তখনও খোলে নি—শুনেছি সেই ঝরণাই হ'ল নিক্‌কোর গৌরব।

মিয়োনোসিতা থেকে আমরা জাপানের বর্ত্তমান রাজধানী টোকিওতে যাই। টোকিও এখন শুনছি পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান নগর হয়ে উঠেছে। তার বড় বড় রাস্তার দু-পাশে সাজান দোকানের সারি, তার ট্রাম, বাস, ট্যাক্সির ভিড়, তার জনসাধারণের ব্যস্ততার পরিমাণ ইউরোপের বড় বড় শহরের সমতুল্য। জাপানের বর্ত্তমান রাজধানীকে ওরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শহর ক'রে তুলবে, এই ইচ্ছায় ওদের খরচ এবং চেষ্টার অন্ত নেই। পৃথিবীর সকল দেশেই কোন-না-কোন সময়ে উন্নতির যুগ আসে—জাপানের এখন সেই যুগ। ওরা এখন ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের সামান্য জাপান আজ নিজের উন্নতির পরিমাণে জগতকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছে। কেমন

কুমারী এম. শিল্পে লেস্ এন্‌জিলিজে অলিম্পিক ক্রীড়ায় বর্শা-ছোড়া প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন

ক'রে এত অল্প সময়ে এত উন্নতি সম্ভব হ'ল, তাই জানবার জন্যই জাপানে আসবার আগ্রহ আরও বেশী ছিল—কিন্তু সময় এত অল্প যে তার মধ্যে ওদের স্কুল-কলেজ, মন্দির, দোকান ইত্যাদি দেখাও সব হয়ে উঠল না। তবে টোকিওতে শ্রীমতী লীলা মজুমদার নিজে আমাদের সঙ্গে ক'রে জাপানী ভদ্র পরিবারের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, জাপানী রেস্তোঁরাতে খাইয়েছিলেন, জাপানের মস্ত ইণ্টারন্যাশনাল লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাই অত অল্প সময়ের মধ্যে যতটা দেখা সম্ভব তা আমরা দেখতে পেয়েছি। শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী মজুমদার প্রায় পঁচিশ বৎসর জাপানে আছেন—জাপানী ভাষা তাঁদের মাতৃভাষার সামিল হয়ে গেছে। আমরা ত না ভাষা বুঝি, না সেখানকার কোনো জায়গা চিনি—শ্রীমতী মজুমদারের সাহায্য না পেলে আমরা টোকিওতে যা-যা দেখিছি, তার অনেক কিছুই দেখা সম্ভব হ'ত না। কোনও একটি জাপানী পরিবারের সঙ্গে আলাপ করবার আমার বড় ইচ্ছা দেখে তিনি স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবার শ্রীযুক্ত শিমিজুর বাড়ি আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। গৃহস্বামী তখন অনুপস্থিত ছিলেন; গৃহকর্ত্রী ও তাঁর বালিকা-কন্যা আমাদের বারবার অভিবাদন ক'রে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। জাপানী গৃহে সর্ব্বদাই জুতা খুলে ঢুকতে হয়। ওদের মাদুর-মোড়া ঘরের মেজেতে কোনখানে একবিন্দু ধুলা যাতে না যায়, তার জন্য ওদের সাবধানতার অন্ত নেই। বাড়ির ভিতরটা এত আশ্চর্য্য পরিষ্কার যে সেখানে বসে ভারী তৃপ্তি বোধ হয়। মেজের উপর বড় বড় তাকিয়ার আসন বিছিয়ে আমাদের জন্য বসবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা ছিল—তারই মধ্যে সব চেয়ে ভাল আসনটি গৃহস্বামিনী আমার বাবার জন্য রেখেছেন বললেন। জাপানেও আমাদের দেশের মত বয়সের সম্মান অত্যন্ত বেশী—এটা দেখে এশিয়ার লোক আমরা, ওদের সঙ্গে নিজেদের একত্ব অনুভব করলাম। অতিথিকে দেবতা জ্ঞান করা আমাদের দেশেরও ধর্ম্ম, তবে বাহ্যিক আড়ম্বরটা জাপানে অত্যন্ত অধিক, তাই সেটা বেশী চোখে পড়ে। জাপানে অতিথিকে অভিবাদন করবার, সম্মান প্রদর্শন

কুমারী মিহাতা অলিম্পিক সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন

করবার যে প্রথা, সে-সকল নিয়ম প্রতি-জাপানী মেয়ে, শিশুকাল থেকে যেমন ক'রে লিখতে-পড়তে শেখে ঠিক তেমনি ক'রে শেখে। জাপানে মেয়েদের স্কুলে একটি বিভাগ আছে, তার নাম হ'ল Laboratory of Manners। কেমন ক'রে অতিথির উপস্থিতি কালে ঘরের দরজা যতবার খুলবে হাঁটু পেতে ব'সে তবে খুলতে হবে, তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে গিয়ে আবার তেমনি ভাবে বসে তবে দরজাটি আবার বন্ধ করবে, কেমন ক'রে দুই হাতে সুন্দর ভঙ্গীতে খাবারের পাত্রটি ধরে অতিথির সম্মুখে রেখে সরে এসে হাঁটুতে হাত দিয়ে মাথা নীচু ক'রে সম্মান দেখাতে হবে—এ সকল প্রথা ওদের প্রতি-মেয়ের শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

উতামারো-অঙ্কিত জাপানী জেলেনী

আতিথেয়তার কথা বলতে গিয়ে আমাদের ভারতবর্ষের আতিথ্যের যে নমুনা বিদেশে এবারে দেখেছি, সেই কথাটি

জাপানে ঝাঁট দিবার রীতি

জাপানের পূজার্থিনী

সকালবেলা শ্রীযুক্ত দেব নিজের মোটর এনে আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে সমস্ত হংকং পাহাড় ও কাউলুন ব'লে আর একটি জায়গা প্রায় দেড় শত মাইল ঘুরিয়ে যা কিছু দর্শনীয় সব দেখালেন। আমাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন জেনে তিনি পূর্ব্বে হ'তেই সেদিনটা ছুটি নিয়েছিলেন। শ্রীমতী দেব সকাল এবং রাত্রি দুই বেলাই আমাদের জন্য অনেক রকম দেশী তরকারী নিজে রান্না করেছিলেন; আমরা দুই বেলাই তাঁর কাছে খেলাম। আমার বাবা সাধারণতঃ কোনও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে চা'ন না, কিন্তু শ্রীমতী দেবের অনুরোধ তিনিও এড়াতে পারেন নি। তার পরদিন ভোরবেলা শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী দেব দুই জনেই আমাদের জাহাজে এসে যতক্ষণ না জাহাজ ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল ততক্ষণ ছিলেন, এবং এত করার পরেও যাবার সময়ে স্বামী স্ত্রী দু-জনেই বার-বার বলতে লাগলেন যে সময় অল্প তাই কিছুই করতে পারেন নি, যেন অপরাধ না নিই। যতক্ষণ না জাহাজ দৃষ্টিপথের বাইরে চলে এল, ততক্ষণ তাঁরা সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে জেটিতে দু-জনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেশের এই অনাড়ম্বর ও আন্তরিক আতিথ্যের দৃষ্টান্ত যে কেবল এই একটিমাত্রই দেখেছি, তাও নয়—সিঙ্গাপুরে, কোবেতে টোকিওতে যেখানেই আমাদের ভারতবর্ষীয় কোনও লোক সন্ধান পেয়েছেন যে আমরা গিয়েছি সকলেই অযাচিত ভাবে এসে সর্ব্বরকমে সাহায্য করেছেন। এই থেকে বোঝা এখানে না ব'লে থাকতে পারলাম না। কোন জিনিষের মধ্যে থেকে সে জিনিষকে বিচার করা বড় শক্ত—আমরা দেশের মধ্যে দেশেরই এক জন হয়ে থাকি; দেশকে দেশবাসীকে আলাদা ক'রে দেখতে পারি না। এবার বিদেশী আবহাওয়ায়, বিদেশী লোকের মাঝে নিজের দেশের লোককে যথার্থভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। তার মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়েছে ভারতবাসীদের একান্ত অতিথিবৎসলতা। হংকং-নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবের সঙ্গে আমাদের কোনদিন জানাশোনা ছিল না—আমরা তাঁর স্বদেশবাসী—জাহাজে যাচ্ছি সংবাদ পেয়ে তিনি ও তাঁর স্ত্রী রাত্রে জাহাজে এসে আলাপ করলেন। তার পর
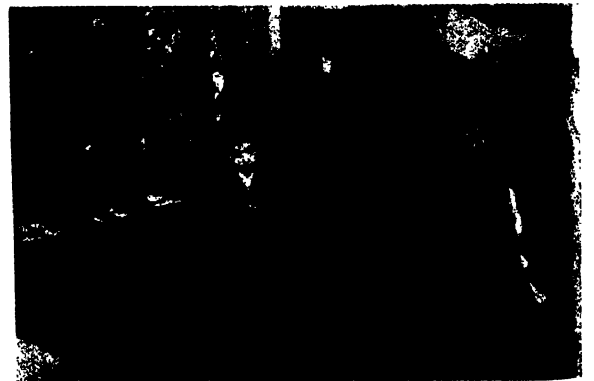
জাপানী মহিলা অতিথিকে অভিবাদন করিতেছেন

যায় যে আমাদের মধ্যেও স্বজনপ্রীতি ও ভারতবর্ষের সেই অতি প্রাচীন অতিথি-মর্য্যাদাজ্ঞান আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

এবার যা বলছিলাম তাই বলি। আমরা বসবার পরে কুমারী শিমিজুই জননীর নির্দ্দেশমত প্রথমে আমার বাবাকে, তার পর আমার স্বামীকে, তার পর ক্রমে আমাকে, শ্রীমতী মজুমদারকে ও আমার মেয়েকে খাবারের পাত্র ধ'রে ধ'রে দিতে লাগলেন। গৃহকর্ত্রী ইংরেজী জানেন না, তাই শ্রীমতী মজুমদার আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, পাত্রে যে সুন্দর ছাঁচে-তোলা ছোট ছোট মিষ্টান্ন রয়েছে, সেইগুলি আমাদের খেতে দিয়ে শ্রীমতী শিমিজু আমাদের শুভযাত্রা জ্ঞাপন করছেন। সাদা, নীল, গোলাপী নানা রঙের চিনির তৈয়ারী সুন্দর সুন্দর খেলনার মত জিনিষ পাত্রে রয়েছে দেখলাম—তার কোনটি শুভযাত্রা, কোনওটি স্বাস্থ্য, কোনটি সুখসমৃদ্ধি কামনার চিহ্ন। গৃহস্বামিনী আমাদের জন্য বিশেষ ক'রে সেগুলি আনিয়েছেন জানালেন। তার পরে আবার সেই সবুজ রঙের চা এল এবং তার পরে "আকাগুহান" ব'লে এক রকম লাল চালের পোলাও সুন্দর কাগজের বাক্সে ক'রে আমাদের সামনে রাখা হ'ল—সেটা নাকি বিশেষ সম্মানার্হ অতিথিদের ওঁরা দিয়ে থাকেন। আমরা তো কিছুই খেতে পারলাম না—তবে শ্রীমতী মজুমদার বললেন যে তাঁরা এত ক'রে আয়োজন করেছেন, না গ্রহণ করলে দুঃখিত হবেন, তাই আমি সেই সব খাদ্যসামগ্রী কবির "খেয়ে যায় নিয়ে যায়, আর যায় চেয়ে" কথাটির সত্যতা সপ্রমাণ ক'রে, বেঁধে-ছেঁদে বয়ে বয়ে হোটেলে নিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত শিমিজু কর্ম্মস্থান থেকে ফিরে অতিথিসৎকারে যোগদান করেছিলেন। সকলে মিলে ফটকের বাহিরে কতকটা পথ আমাদের সঙ্গে এলেন, এবং বার-বার জানালেন যে আমরা এবং বিশেষ ক'রে আমার পিতা যাওয়াতে তাঁরা যে কত আনন্দিত হয়েছেন তা ভাষা জানেন না ব'লে সম্যকরূপে জানাতে পারলেন না এই ক্ষোভ রয়ে গেল। বিদায়ের পূর্ব্বে আমার মেয়ে তাঁদের ছবি তুলতে চাওয়াতে, তাঁরা মা ও মেয়ে তখনই হাসিমুখে সম্মত হলেন।

জাপানের দুইটি জিনিষ আমাদের মুগ্ধ করেছে—তার সৌজন্য এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞান। জাপানীদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান বলতে কিন্তু রাস্তাঘরবাড়ির সৌন্দর্য্য ঠিক বোঝায় না—কেন না জাপানের রাস্তাঘাট, বাড়ির গঠন ইত্যাদি যে খুব সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচায়ক তা নয়: বরং সে-সব দেখলে অনেক সময় বিপরীত ধারণাই হয়ে থাকে। কবিরা যে ব'লে থাকেন নারীই জগতের সৌন্দর্য্যের আধার, জাপান সেই কথাটির সম্মান বজায় রেখেছে। জাপানী মেয়েদের উজ্জ্বল হাসিমুখ, তাদের নয়নমুগ্ধকর পোষাক, তাদের নম্রতা তাদের নারীসুলভ বিনয় জাপানকে যে সৌন্দর্য্য দান করেছে জাপানের আর কোনও জিনিষই তা পারে নি। জাপানী মেয়েরা সুন্দর ভঙ্গীতে দাঁড়ায়, সুন্দর ভঙ্গীতে কাজ করে—সুন্দর ভাবে কথা বলে—ইংরেজীতে যাকে বলে গ্রেস্, জাপানী মেয়েরা সে জিনিষটা এমন ভাবে আয়ত্ত করেছে যে নাক্ মুখ চোখের সৌন্দর্য্য যার যেমনই থাক্, গ্রেস্ তাদের সকলেরই সমান আছে।

জাপানী সৌজন্য আমাদের অনেকের চোখে হয়ত একটু অতিরিক্ত ঠেকলেও আমার নিজের ভারী সুন্দর লেগেছে। জাপানী ঝি-চাকরের কাছে কোন জিনিষ চাইলে তারা জিনিষটি নিয়ে যে কথাটি ব'লে কাছে এসে দাঁড়ায়, তার মানে হ'ল "আপনি যদি অনুগ্রহ করেন।" ট্যাক্সি, কি বাস, কি ট্রাম থেকে যাত্রীরা নামলেই হয় চালক, নয় কনডাক্টার সকলকে বলতে থাকে "ধন্যবাদ, আপনাদের অশেষ অনুগ্রহ।" রাস্তায় ঘাটে ওদের পরস্পরের কাছে বিদায় নেওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ। বিদায়কালে জানুতে হাত দিয়ে নত হয়ে এক জন অপরকে প্রথমে অভিবাদন করে, অন্য জন তখনই তেমনি ভাবে প্রত্যভিবাদন করে, আবার প্রথম ব্যক্তি তখনই সেই অভিবাদনের উত্তর দেয়, এবং দ্বিতীয় জনও আবার তার উত্তর না দিয়ে থাকতে পারে না—এমনি ক'রে কে যে প্রথমে থামবে তা ঠিক করতে না পেরে ওদের বিদায়ের পালা আর শীঘ্র শেষ হ'তে চায় না। আমার মেয়ে কেবলই বলত "ওদের ভদ্রতা দেখে প্রাণ হাঁপাচ্ছে মা, কত সময়ই লেগে যাচ্ছে একটা কাজ করতে; They are slave to their politeness"। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় ভাল মনিবের দাস হওয়াও ভাল।

টোকিও থেকে আমরা ইয়োকোহামায় এসে বোট ধরলাম। শ্রীমতী মজুমদার অতটা রাস্তা আমাদের

সঙ্গে এসেছিলেন জাহাজে আমাদের তুলে দিতে। বোট ছাড়বার দেরি ছিল ব'লে আমরা ওখানে ভূমিকম্পের মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। ১৯২৩ সালে জাপানে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয় তারই নানা রকম ছবি, ভাঙা পোড়া জিনিষপত্র, সে সময়কার দেশের ভীষণ অবস্থার বিবরণ, সব রয়েছে। ইয়োকোহামা ও টোকিও একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল, কত লক্ষ লক্ষ প্রাণ যে নষ্ট হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। নিজেদের সেই ভীষণ ভাগ্যপরীক্ষায় ওরা কত সহজে উত্তীর্ণ হয়েছিল শুধু এইটুকু থেকেই বোঝা যাবে যে ওদের সমস্ত বিনষ্ট হয়ে যাবার পর ভূমিকম্পের দিন থেকে ঠিক এক মাস পরে, খোলা জায়গায় ছাত্রছাত্রীদের মাটিতে বসিয়ে ওদের প্রাথমিক শিক্ষার যে স্কুল, তা আরম্ভ হয়ে যায়। জাপানে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা দেখে সত্যই মুগ্ধ হ'তে হয়। সকালবেলা টোকিওতে দেখতাম দলে দলে হাজার হাজার দরিদ্র বালক-বালিকা স্কুলের পোষাক প'রে চলেছে—কোন দলকে পাহাড়ের উপর বনভোজনে নিয়ে যাওয়া হ'ল, কোনও দলকে হয়ত কোন দেশহিতকরী বক্তৃতা ও লণ্ঠন-চিত্র হবে সেইখানে বসিয়ে দেওয়া হ'ল, কোন দলকে বা টোকিওতে যে বিখ্যাত যুদ্ধের মিউজিয়াম আছে তাইতে বিনা টিকিটে দুই-তিন জন শিক্ষক নিজেরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। গত রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে যে যে যোদ্ধা স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, মিউজিয়ামে তাঁদের রক্তের দাগ চিহ্নিত ছিন্ন পোষাক দেখিয়ে তাঁদের সাহস, তাঁদের স্বদেশপ্রেম, তাঁদের মৃত্যুগৌরবের কথা ব'লে ব'লে ছোট ছেলেমেয়েদের মনে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে স্কুলের শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সকল জিনিষ দেখিয়ে বেড়াচ্চেন। প্রতি ছেলেমেয়ের ৬ বৎসর থেকে ১২ বৎসর অবধি আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তার পরে অবশ্য নিজের ইচ্ছা এবং সাধ্যমত। বিলাতের মত জাপানেও দেশের সাধারণ সকলেই সংবাদপত্র পড়ে ও সকল দেশের সংবাদ রাখে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ওখানে খবরের কাগজের দাম অত্যন্ত কম করা হয়েছে, কিন্তু যারা তাও কিনতে অসমর্থ, তাদের জন্য বড় বড় রাস্তার ফুটপাথে কাঠের দেওয়ালের উপর চার-পাঁচটা খবরের কাগজ প্রতিদিন টাঙিয়ে দেওয়া হয়, সেইখানে দাঁড়িয়ে দরিদ্র লোকেরা দেশের প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ জেনে নেয়। সেখানে সকল সময়ই দেখেছি লোকের ভিড় থাকে—সকল দেশের সংবাদ জানবার জন্য যে সাধারণের কত আগ্রহ তাই থেকেই বোঝা যায়।

বেলা বারটায় আমাদের জাহাজ ছেড়ে দিলে। শ্রীমতী মজুমদার ও তাঁর পুত্র আমাদের কাছে বিদায় গ্রহণ ক'রে যখন জাহাজ থেকে নেমে গেলেন তখন সত্যই মনে হচ্ছিল কোনও আত্মীয়কে ছেড়ে যাচ্ছি। জাহাজ ছেড়ে যাবার পর যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ তাঁরা জেটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

প্রতি মানুষের, প্রতি জিনিষের, প্রতি দেশের ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। জাপানে অতি অল্প দিন ছিলাম, তার মধ্যে ভাল জিনিষ অনেক দেখেছি, এবং মন্দ কিছুই দেখি নি যদি বলি ত ভুল বলা হবে। ভাল-মন্দ সকল দিক না দেখলে একটি জিনিষকে ঠিক এবং সম্পূর্ণভাবে হয়ত জানা যায় না; কিন্তু আমার মনে হয় যে দেশের মধ্যে থাকতে পাচ্ছি না, যাদের সঙ্গে ঘর করবার সম্পর্ক নয়, সে দেশকে দোষে গুণে সম্পূর্ণভাবে যদি নাও জানি তো আমার পক্ষে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। আমরা দু-দিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম। যে-জায়গায় যে-জিনিষটি ভাল দেখেছি, কিনে নিয়ে এসেছি, দেশে নিজের বাড়িতে রাখব ব'লে। তাদের দেশে তারা যে জিনিষটি খারাপ ভাবে তৈরি করে, সে জিনিষটি তো আনি নি। তেমনি তাদের দেশের গুণ, তাদের ভাল প্রথা, তাদের সুনীতি, সেইগুলিই শুধু যদি দেখে আসতে পারি, জেনে আসতে পারি, শিখে আসতে পারি, তাহলেই আমার মনে হয় আমার প্রয়োজন সাধন হ'ল। খারাপ যা-কিছু তা আমাদের দেশে বয়ে নিয়ে আসবার তো কোন দরকার নেই। তাই আমার চোখে জাপান তার সৌজন্য, তার সৌন্দর্য্য, তার স্বাদেশিকতা নিয়ে যদি কিছু অযথারূপেও উজ্জ্বল প্রতিভাত হয়ে থাকে তো আমি সেইটিই আমার লাভ ব'লে মনে করব।

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

(৭)

মামার বাড়ি আসিয়া গুছাইয়া বসিবার আগেই মা তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়া হাজির হওয়ায় মমতা অত্যন্ত চটিয়া গেল। বাড়িতে ত টেকা দায়, একটা কথা বলিবার মানুষ-সুদ্ধ সেখানে নাই। আবার বাড়ি হইতে বাহির হইলেও কাহারও সয় না, এ এক আচ্ছা জ্বালা!

সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "আজকেই যাব কেন? এই ত সবে এলাম। বাবার আমায় কি দরকার শুনি?"

শুধু চিঠি লিখিয়া পাঠাইলে, বা অন্য কাহাকেও পাঠাইলে মমতা পাছে না-আসে বা বেশী রকম রাগারাগি করে, এই ভয়ে যামিনী চা খাওয়া হইয়া যাইবার পর, নিজেই তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

মমতার কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, "বিশেষ দরকার না থাকলে শুধু শুধু তোমাকে বিরক্ত করবার জন্যেই কি আর নিতে এসেছি মা? তুমি না গেলে তোমার বাবা বড় বিরক্ত হবেন। আজ চল, আবার না হয়, দু-চার দিন পরে এস।"

মমতা আর কিছু না বলিয়া কাপড়-চোপড় গুছাইতে চলিয়া গেল। প্রভা যামিনীকে খাতির করিয়া বসাইয়া বলিল, "ব্যাপার কি ঠাকুরঝি? ছেলেমানুষ এসেছে, অমনি তাকে তাড়া-তাড়াতাড়ি হিঁচড়ে নিয়ে চল্‌লে কেন?"

যামিনী বলিলেন, "মেয়ের বাপের খেয়াল, আমি কি করব বল?"

প্রভা ব্যাপারখানা ঠিক আন্দাজ করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখতে আসবে বুঝি কেউ?"

যামিনী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন তাহাই বটে। এ-বিষয়ে বেশী কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার না থাকিলেই বা কি আসিয়া যায়? প্রভার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। সে ব্যগ্রভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "নিশ্চয়ই রাজা কি জমিদার? নইলে ঠাকুরজামাই এত ব্যস্ত কি আর সাধে হয়েছেন?"

যামিনী বলিলেন, "আমার এইটুকু মেয়ের বিয়ে দেবার মোটেই ইচ্ছে নেই। নিতান্ত ওঁর জেদে মেয়ে দেখান হচ্ছে। রাজা কি জমিদার সে-সবের খোঁজও করি নি কিছু। বেশী টাকাকড়ি নেই বোধ হ'ল ওঁর কথা থেকে।"

প্রভা বিজ্ঞভাবে বলিল, "হ্যা, টাকা না থাকলে আর তোমার কর্ত্তাটি এগোতেন কি না? কিন্তু তুমি মেয়ের বিয়ে দিতে চাও না কেন এখন? ছেলেবেলা দিয়ে দেওয়া ভাল ভাই, তখন মেয়েদের অত স্বাধীনতা বাড়ে না। তার পরে কে কাকে পছন্দ ক'রে বসবে তার ঠিক কি?"

যামিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "নিজে ত স্বাধীন ভাবেই বিয়ে করেছ, তাতে খুব ঠকেছ বলেও মনে হয় না। তবে নিজে বিয়ে করার উপর অত চটা কেন?"

প্রভা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আমি ঠকি নি ব'লে কি আর কেউ ঠকে নি? হাজারটা দৃষ্টান্ত রয়েছে।"

যামিনী বলিলেন, "দৃষ্টান্ত আর কিসের নেই বল? মা বাপে বিয়ে দিয়েছে, এমনও লাখ মেয়ে অসুখী হয়েছে, তারও কি দৃষ্টান্ত নেই? তবু আমি নিজের কপাল নিজে বেছে নেওয়ারই পক্ষপাতী।"

এমন সময় মমতা আর লুসি আসিয়া পড়ায়, আলোচনাটা থামিয়া গেল। মমতাকে যখন এ-বাড়িতে থাকিতেই দেওয়া হইবে না, তখন সে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ লুসিকে লইয়া যাওয়া স্থির করিয়াছে। একটা কথা বলিবার লোক তাহার থাকা চাই ত?

যামিনীকে বলিল, "মা আমি কিন্তু লুসিকে নিয়ে যাচ্ছি।"

যামিনী বলিলেন, "আমার আর তাতে কি আপত্তি? তোমার মামীমাকে বলেছ?"

মামীমাকে তখন অবধি বলা হয় নাই। লুসি নিজেই

চীৎকার করিয়া বলিল, "মা আমি যাচ্ছি কিন্তু। তুমি যে বলেছিলে আমার সাত দিন পিসীমার বাড়ি গিয়ে থাকতে দেবে।"

প্রভা বলিল, "তা পোঁটলা-পুঁটলি যখন গুছিয়েই নিয়েছ, তখন মা আর না বলে কি ক'রে? দেখ পিসীমাকে যেন হুড়োহুড়ি ক'রে জ্বালিয়ে তুলো না।"

যামিনী বলিলেন, "হ্যাঁ ওরা আবার আমাকে জ্বালাবে। একটু হুড়োহুড়ি কেউ করলেই আমি বাঁচি। বাড়িটাতে একটা টুঁ শব্দসুদ্ধ কেউ করে না।"

প্রভা বলিল, "তাই নাকি? হুড়োহুড়ির খুব দরকার বুঝি? ছুটোই বড় হয়ে গেছে যে, না?"

যামিনী একটু হাসিয়া বলিলেন, "বড় হওয়ার জন্যে নয়। বড় ছেলেমেয়েতেও কি আর হুড়োহুড়ি করে না? তা খোকার ত বাড়িতে মনই টেকে না, আর মমতা সঙ্গীর অভাবে কি করবে ভেবেই পায় না।"

এমন সময় লুসির ছোট ভাই বেটু আসিয়া উপস্থিত হইল। মমতা এবং লুসি দু-জনেই কাপড়-চোপড় লইয়া যাইতে প্রস্তুত দেখিয়া বলিল, "কোথায় সব যাওয়া হচ্ছে।"

লুসি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমি পিসীমার বাড়ি যাচ্ছি, সাত দিন পরে আসব।"

যামিনী বলিলেন, "তুমিও চল না বেটু, অনেক দিন ত পিসীমার বাড়ি যাও নি?"

বেটু ঠোঁটটা উল্টাইয়া বলিল, "গিয়ে কি করব? খোকাদা ত সারাদিন চাল মারবে, আর দিদিরা যত স্কুলের টীচারের গল্প করবে।"

ছেলের যশ এতদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়াছে দেখিয়া যামিনী গম্ভীর হইয়া গেলেন। প্রভা ছেলেকে তাড়া দিয়া বলিল, "আহা, কিবা কথার ছিরি! ধেড়ে ছেলে হ'ল, এখনও কার সামনে কি বলতে হয়, না-হয়, সে আক্কেলটা হ'ল না।"

যামিনী বলিলেন, "আমার সামনে বলেছে তাতে আর কি হয়েছে? আমি ত নিতান্ত পর নই? সত্যি সুজিতকে উনি কি যে শিক্ষা দিচ্ছেন, তা উনিই জানেন। দিনের দিন বেয়াড়া হয়ে উঠ্‌ছে।"

আর অপেক্ষা করিবার বিশেষ কোনো কারণ ছিল না। মমতা আর লুসিকে লইয়া যামিনী গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। লুসি আর মমতা কি একটা বিষয়ে এমন গভীর আলোচনা জুড়িয়া দিল, যে, অতখানি পথ কোথা দিয়া যে পার হইয়া গেল, তাহার ঠিকানাই রহিল না।

মেয়ে পাছে আসিতে রাজী না হয়, সে-ভয়টা সুরেশ্বরের একটু ছিল বোধ হয়। দেখা গেল, ইহারই মধ্যে তিনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন এবং স্নানের জলের জন্য চাকরকে হাঁকডাক করিতেছেন।

লুসি বলিল, "ও কি পিসেমশাই, এত গরমেও তুমি গরম জলে চান কর নাকি?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তোদের সব তাজা রক্ত, গরম জলটলের দরকার হয় না। আমাদের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে কিনা, সারাক্ষণই বাইরে থেকে তাতে তাপ জোগাতে হয়। তা তুই এসেছিস্ বেশ হয়েছে", বলিয়া তিনি স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

মমতা লুসিকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া হাজির করিল। শোয় সে মায়েরই সঙ্গে বটে, তাই বলিয়া তাহার নিজের একটা ঘরের অভাব নাই। এ-ঘরে তাহার জিনিষপত্র, পড়ার বই ইত্যাদি সব থাকে। আলনাতে লুসির কাপড়-চোপড় রাখিয়া সে বলিল, "এখনও ত বেশী রোদ হয় নি, বেশ মেঘলা ক'রে আছে। চল্ না বাগানে একটু ঘুরে আসি।"

দু-জনে বাগানে ঘুরিতে চলিল। যামিনী উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে দুটো ছাতা নিয়ে যা। আবার রোদ লাগিয়ে অসুখ-বিসুখ করিস না।"

মমতা বলিল, "না মা, একটু রোদ উঠেছে দেখ্‌লেই আমরা পালিয়ে আসব। ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরতে আমার ভাল লাগে না।"

যামিনী নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন। বিকালের জলখাবারের সব আয়োজন ঠিক হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য নিত্যকে দিয়া বিন্দু-ঠাকুরঝিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

দু-জনে কথা হইতেছে এমন সময় তোয়ালে দিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে সুরেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যামিনী মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "কি, তুমি এমন সময়ে কি মনে ক'রে?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "কেন আমার আসায় অপরাধ হ'ল

কি? জোগাড়-জাগাড় কি করেছ তাই দেখতে এলাম। শেষ মুহূর্ত্তে আবার একটা গণ্ডগোল না বাধে।"

যামিনী একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "এমন কি রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার যে একলা আমি সামলাতে পারব না?"

কাহাকেও বিরক্ত হইতে দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার দশগুণ বিরক্ত হইয়া উঠাই ছিল সুরেশ্বরের স্বভাব। তিনি অনেকখানি গলা চড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাই যদি পারবে, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? বলি, আইসক্রীমে ডিম যেন না দেয় সেটা ব'লে দিয়েছ কি? না শেষ মুহূর্ত্তে সব পণ্ড হবে? তার পর তোমার আর কি? বল্‌লেই হ'ল আমার মনে ছিল না।"

যামিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সুরেশ্বরের কথায় এতদিন পরেও তাঁহার যে মনে লাগিত ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু সত্যই, বহুদিনের অভ্যাসেও অনেক জিনিষ তাঁহার সহিয়া যায় নাই। কিন্তু জানিতেন এখন কথা বলিলে সুরেশ্বর আরও উত্তেজিত হইবেন এবং আরও চীৎকার করিবেন। সুতরাং উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বিন্দু তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ্বরের আরও কিছু বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যামিনীকে খুব বেশী চটাইতে তাঁহার ভরসা হইল না। কি জানি, যামিনী যদি রাগিয়া এমন কিছু করিয়া বসেন, যাহাতে সব কাজ সত্যই পণ্ড হইয়া যায়? মেয়েও যে-রকম মায়ের হাত ধরা। হয়ত ঠিক্ সময়ে বলিয়া বসিবে আমার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে আমি যাইতে পারিব না। না-হয় চুল না বাঁধিয়া, সাজ-সজ্জা কিছুই না করিয়া গিয়া হাজির হইতেও পারে। যাহারা আসিতেছে, তাহারা অবশ্য সুরেশ্বরের রূপার আকর্ষণেই আসিতেছে, মমতার রূপের আকর্ষণে নয়, তাহা হইলেও সুরেশ্বর যখন বলিয়াছেন, তাঁহার মেয়ে খুব সুন্দরী, তখন তাঁহার কথার মর্য্যাদারক্ষা যাহাতে হয়, সে চেষ্টাও করা কর্ত্তব্য।

অতএব স্ত্রীকে আর খোঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া তিনি মাথা মুছিতে মুছিতেই বাহির হইয়া চলিলেন। দরজার ওপার হইতে বলিলেন, "ওবেলা মমতার চুলটুলগুলো নিজে বেঁধে দিও, যেন ভূত সেজে গিয়ে হাজির না হয়। নিজে ত এখনও কিছুই ঠিক ক'রে করতে পারে না।"

যামিনী এবারেও তাঁহার কথার উত্তর দিলেন না। আইসক্রীমে যে ডিম দিতে বারণ করিতে হইবে, এ-কথা বলিতে সত্যই তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গোপেশবাবু নাকি অতি ভয়ানক সনাতনপন্থী। ডিম তাঁহাদের রান্নাঘরের চৌকাঠ পার হইতে পারে না। পেঁয়াজ খাইতেও তাঁহার মাঝে মাঝে আপত্তি হয়, তবে সব সময় নয়। কাজেই রান্নাবান্না খুব সাবধান হইয়া করিতে হইবে। ছেলেকে যদিও বড় চাকরি জুটিবার আশায় তিনি বিলাতে পাঠাইতেছেন, তবু সে একেবারে বেহাত না হইয়া যায়, সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বিবাহ করিয়া যাইতেই বলিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলে তাহাতে কিছুতেই রাজী হইল না। তবে বিবাহ তিনি বিশুদ্ধ হিন্দু-পরিবারে স্থির করিয়া রাখিবেন, এবং ছেলে যাহাতে ফিরিয়া আসিয়া এ স্থানেই বিবাহ করে, তাহারও ব্যবস্থা করিবেন। সুরেশ্বরের হিন্দুত্বে একটুখানি যে খুঁৎ আছে, তাহা দশ হাজার টাকার গুণে তিনি ভুলিয়া যাইতে সম্মত হইয়াছেন। মেয়েটি যদি সত্যই খুব সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা হয়, তাহা হইলে ছেলেকে প্রতিজ্ঞাপালন করান খুব কঠিন হইবে না, এ আশাও তাঁহার আছে। প্রথম দিন অবশ্য ছেলে আসিবে না, তিনিই সনাতন প্রথামত দু-চার জন আত্মীয়বন্ধু লইয়া কন্যা দেখিয়া যাইবেন। দুই-চার দিন পরে সুরেশ্বর দেবেশকে নব্যপ্রথামত চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিবেন। তাহার পর কথাবার্ত্তা সব পাকাপাকি হইয়া গেলে, একবার ঘটা করিয়া আশীর্ব্বাদ করা হইবে, ইহাই এখন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া আছে। লুসি আর মমতা বাগানে গিয়া, ফুল কুড়াইয়া, ফল পাড়িয়া খাইয়া, গাছে ঝোলান দোলনায় দুলিয়া যথারীতি ফুর্ত্তি করিতে লাগিয়া গেল। লুসি ত প্রায় বনের হরিণের মত উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহাদের যে পাড়ায় বাড়ি, তাহাতে এখন আর এক ইঞ্চি খোলা জমি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের নিজের বাড়ির সঙ্গে সেকালে একটুখানি খোলা জায়গা ছিল, লুসির বাবা মিহির তাহাও বহুকাল হইল টাকার লোভে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। এখন তাহাদের বাড়ির দুই পাশে দুখানি অভ্রভেদী বাড়ি, ছাদে না উঠিলে নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভাল করিয়া লওয়া যায় না। একটা

সবুজ পাতা বা একটা ফুল কোনদিন তাহাদের চোখে পড়ে না।

মমতাদের বাগানটি ভারি সুন্দর। মালী আছে বটে, কিন্তু কাজে খুব বেশী উৎসাহ তাহার নাই। কাজেই বাগানটি দেখিলে কারখানায় গড়া সুরকি, কাঁচ ও কাঠের বাগান মনে হয় না। প্রাকৃতিক সহজ শ্রী ইহার ভিতর এখন অনেকখানি ছড়ান আছে। গাছের তলায় ফুল ঝরিয়া পড়িলে, তখনই কেহ তাহাদিগকে ঝাঁট দিয়া বিদায় করে না, দূর্ব্বাঘাস আপন ইচ্ছামত এদিক-ওদিকে শ্যামল অঞ্চল বিছাইয়া দেয়, কয়েক দিন অন্ততঃ 'রোলার' লইয়া কেহ তাহাকে নির্ম্মূল করিতে ছুটিয়া আসে না। গাছের ফুল মুকুল হইতে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পরূপে গাছেই থাকিয়া যায়, মূর্ত্তিমান যমের মত উড়ে মালী রোজ সকাল-বিকাল তাহাকে নির্ম্মম হাতে উপড়াইয়া লইয়া যায় না।

একটি বলরামচূড়া গাছে যেন ফুলের আগুন লাগিয়া গিয়াছে। মমতা আর লুসি তাহার তলায় আসিয়া ঝরা-ফুলের রাশির উপর বসিয়া পড়িল। লুসি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "দিদি-ভাই, তোমাকে ঠিক ছবির মত সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি ছবি আঁকতে জানলে তোমার ঠিক এই রকম একখানি ছবি এঁকে রাখতাম। মানুষ যখন সেজেগুজে ছবি তোলাতে বসে, তখন এমন কাঠপানা হয়ে যায় যে তাদের একটুও ভাল দেখায় না।"

মমতা লজ্জিত হইয়া বলিল, "যা, যা, তোকে অত কবিত্ব করতে হবে না। চিত্রকর না হোস্, কবি তুই হবিই।"

লুসি বয়সে মমতার চেয়ে মাত্র এক বৎসরের কি দেড় বৎসরের ছোট হইবে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় ঢের পাকা। সে বলিল, "তোমাকে দেখ্‌লে ভাই অকবিও কবি হয়ে যায়, আমি ত তবু একটু ভাবুক আছিই।"

মমতা তাহার পিঠে এক চড় মারিয়া বলিল, "যা, ভারি বাক্যবাগীশ হয়েছিস্।"

লুসি বলিল, "দিদি-ভাই, একটা কথা কিন্তু আমি লুকিয়ে শুনে ফেলেছি। তুমি যখন কাপড় গুছোচ্ছিলে, তখন মা'তে আর পিসীমাতে কি কথা হচ্ছিল জান?"

মমতা চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কি কথা রে?"

লুসি বলিল, "পিসীমা তোমাকে সাত-তাড়াতাড়ি কেন টেনে আনলেন জান?"

মমতা বলিল, "না ত। কেন?" লুসি ঘাড় দুলাইয়া দুলাইয়া বলিতে লাগিল, "দিদির বর আসবে যক্ষুনি, দিদিকে নিয়ে যাবে তক্ষুনি। তোমায় দেখতে আসছে গো।"

মমতা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কক্ষনো না, মা বুঝি আমাকে এখনই বিয়ে দেবেন।"

লুসি বলিল, "আহা বিয়ে ত দেখবা মাত্র হয়ে যাচ্ছে না? তার দেরি আছে।"

মমতার উত্তেজনা কাটিয়া গিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "কক্ষনো আমি এখন বিয়ে করব না। আমি কলেজে পড়ব, এম্-এ পর্য্যন্ত। মা আমাকে কথা দিয়েছেন।"

লুসি বলিল, "তা পিসেমশাই যদি জোর করেন, তাহলে পিসীমা কি করবেন বল?"

মমতা বলিল, "আমি বিয়ে করবই না। বাবা ত আর আমার হাত-পা বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিতে পারবেন না।"

(৮)

আকাশ অন্ধকার করিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ কাল মেঘের রাশ ফুলিয়া ফুলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। যামিনী ঘরে বসিয়া কি একটা লিখিতেছিলেন, এমন সময় দিনের আলো ম্লান হইয়া আসায় মুখ তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আকাশের অবস্থা দেখিয়া লেখা রাখিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন, নিত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে ছুটে যা বাগানে, বিষ্টি এসে পড়ল ব'লে। মেয়ে দুটো একেবারে চুপ্‌চুপে হয়ে ভিজে যাবে, ওদের ডেকে নিয়ে আয়।"

নিত্য আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে লাগিল, "দিদিমণি গো, শিগ্‌গীর চলে এস, ভয়ানক বিষ্টি নামছে।"

তাহার কাংস্যকণ্ঠস্বর ঠিক গিয়া পৌঁছিল মমতা আর লুসির কানে। গল্পে এবং তর্কে দুই জনেই এমন মাতিয়া ছিল যে আসন্ন বৃষ্টির সূচনাগুলি তাহারা লক্ষ্যই করিতে পারে নাই। নিত্যর চীৎকারে চকিত হইয়া দুই জনেই

উঠিয়া পড়িল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল নিকষ কালো মেঘের রাশ একেবারে মাথার উপর ঘনাইয়া নামিয়া আসিতেছে। কড়্‌কড়্‌ শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া বজ্রধ্বনি হইল, বিদ্যুতের তীব্র চমক তাহাদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া মিলাইয়া গেল।

"ও ভাই ছুটে চল", বলিয়া মমতা উঠিয়া প্রাণপণে দৌড় দিল, লুসিও তাহার পিছন পিছন ছুটিল।

কিন্তু বৃষ্টিকে হার মানাইতে পারিল না। বাড়ি তখনও বেশ খানিকটা দূর, তখনই ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে বর্ষারম্ভের বৃষ্টি তাহাদের মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িল।

মমতা এবং লুসির দেহ মনে পুলকের শিহরণ খেলিয়া গেল। আঃ, কি সুন্দর, কি ঠাণ্ডা! আরও প্রাণ ভরিয়া ভিজিতে পাইলে তাহাদের গা জুড়াইয়া যায়। কিন্তু বাপ-মায়ের উৎপাতে যাহা ভাল লাগে তাহা করিবার জো কি? কাজেই রঙীন আঁচল উড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে ভিজিতে ভিজিতে দুই জনে প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। মমতা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "বাবার সামনে পড়লেই গিয়েছি আর কি? ব'কে ভূত ঝাড়িয়ে দেবেন।"

লুসিও দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতে লাগিল, "তোমাদের বাপু সব অনাসৃষ্টি। এক ফোঁটা জল গায়ে পড়লে কি তোমরা গলে যাবে? আমরা সে-বার মামাবাড়ির গাঁয়ে গিয়ে এমন ভেজা ভিজেছিলাম যে কি বলব। কিন্তু কই মরি নি ত?"

যামিনী উদ্বিগ্ন ভাবে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। মেয়ে এবং ভাইঝির অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "শীগ্‌গীর উঠে আয়। একেবারে চান ক'রে কাপড়চোপড় বদলে ফেল। তার পর গরম দুধটুধ কিছু একটু খা।"

মেয়েরা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। সুরেশ্বর যে তাহাদের দেখিতে পান নাই, ইহাতে শুধু অপরাধিনী-দ্বয় নয়, যামিনীও খানিকটা আরাম বোধ করিলেন। সুরেশ্বরের মেজাজ কোনকালেই ভাল ছিল না, এখন ত সারাক্ষণ সপ্তমে বাঁধা হইয়া আছে। পান হইতে চূণ খসিলেই তিনি হাউমাউ করিয়া চেঁচাইয়া সারাবাড়ি মাথায় করিয়া তোলেন। যামিনী এই জিনিষটি একেবারে সহ্য করিতে পারেন না, কাজেই চীৎকারের কারণ যাহাতে না ঘটে, তাহার প্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়া চলেন।

মেয়েরা স্নান সারিয়া আসিতেই তিনি নিজে স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। মমতা লুসিকে লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া একটা শেলাইয়ের প্যাটার্ন শিখিতে বসিয়া গেল।

সুরেশ্বরের আজ মনে শান্তি ছিল না। যতক্ষণ না মেয়ে-দেখান ভালয় ভালয় উৎরাইয়া যায়, ততক্ষণ তাঁহার ছট্‌ফটানি যাইবে না। স্ত্রী যে তাঁহাকে সাহায্য করার বদলে তাঁহার কাজে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিঘ্নই ঘটাইবেন, এ ধারণাও কিছুতেই তাঁহার মন হইতে যাইতে চায় না। আবার যামিনীকে নিজের এই অবিশ্বাস পুরাপুরি জানিতে দিতেও তাঁহার ভয় করে। খানিক নিজের ঘরে গিয়া বসেন, আবার যামিনীর ঘরের দিকে আসিয়া হাজির হন।

মমতাদের আলোচনায় বাধা দিয়া, তিনি হট্‌ করিয়া একবার ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার? তোর মা কোথায় রে?"

মমতা মুখ তুলিয়া না চাহিয়াই গম্ভীরভাবে বলিল, "মা চান করতে গেছেন।"

মমতার মুখের ভাব দেখিয়াই সুরেশ্বর বুঝিলেন মমতা আজকার ব্যাপারের বিষয় সব শুনিয়াছে, এবং তাহার খবরটা ভাল লাগে নাই। চীৎকার করিয়া খানিকটা বকাবকি করিতে পাইলে তিনি খুশী হইতেন, কিন্তু কাহাকে বকিবেন? যামিনী ত নিশ্চিন্ত মনে স্নানের ঘরে খিল দিয়া আছেন। মমতাকে বকা সুরেশ্বরের সাধ্যে কুলায় না। কন্যাকে যেমন তিনি ভালওবাসেন অতিরিক্ত রকম, তেমনই ভয়ও খানিকটা করেন। তাহার চোখে নীচু হইতে সুরেশ্বরের একান্ত আপত্তি। সুজিত কাছে নাই, না হইলে তাহাকে বকিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না।

শুধু বলিলেন, "খেয়ে-দেয়ে যেন সারা দুপুর হৈ-রৈ ক'রে ঘুরে বেড়িও না, শরীর খারাপ হবে। খাওয়ার পর খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করা বিশেষ দরকার।"

সুরেশ্বর চলিয়া যাইতেই লুসি বলিল, "দিদি, পিসে-মশায়ের ভয় হয়েছে, পাছে তোকে খুব সুন্দর না দেখায়।"

মমতা মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিল, "সুন্দর না দেখালেই

আমি বাঁচি। আমাকে পছন্দ না ক'রে ফিরে যায় ত বেশ হয়।"

মমতার রূপের মহাভক্ত লুসি। নিজের চেহারায় তাহার বিশেষ রূপের বালাই নাই, তাই সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার লোভও যেমন শ্রদ্ধাও তেমন। তাহার কাছে সুন্দর হইলে মানুষের সাত খুন মাপ। মমতার কথা শুনিয়া সে বলিল, "ইস্, তোমাকে আবার পছন্দ না ক'রে ফিরে যাবে। হাঁড়ির কালি মেখে চটের কাপড় প'রে গেলেও না। বাংলা দেশে তোমার মত চেহারা অলিতে-গলিতে গড়াচ্ছে কি না?"

নিজের রূপের এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মমতা যে একেবারেই খুশী হইল না, তাহা নহে। তবে মুখে সেটা ত আর প্রকাশ করা যায় না? কাজেই গম্ভীর ভাবেই বলিল, "আহা, রূপ ত কত!"

লুসি হঠাৎ অন্য কথা পাড়িল। বলিল, "আচ্ছা দিদি-ভাই, সত্যি ক'রে বল্ ত, তোর বিয়ে করতে একেবারেই ইচ্ছে করে না? না ও-সব ঢং? বলতে হয় ব'লে বলিস্?"

মমতা মুখ লাল করিয়া চুপ করিয়া খানিক বসিয়া রহিল। একেবারে সত্য কথা কি বলা যায়? আর নিজের মন নিজেই কি সে ভাল করিয়া জানে? কখনও মনে হয় এক রকম, কখনও মনে হয় আর এক রকম। বিবাহ একেবারেই করিতে সে চায় না, ইহা একেবারেই ঠিক নয়। ষোল-সতের বৎসরের এমন মেয়ে বাংলা দেশে কোথায়, যে মনে মনে এই রঙীন স্বপ্নটি দেখে না? তাহার হৃদয়ের গোপন ঘরে সেই চিরকালের রাজকন্যা বসিয়া, বিনি-সুতার মালা কি গাঁথিতেছে না? সে মালা কাহার গলায় পড়িবে, তাহা ত সে জানে না এখনও। কত বার সেই চিরকালের রাজপুত্রের মুখ কত রকম রূপে সে দেখিয়াছে। কিন্তু আজও দিনের আলোয় স্পষ্ট করিয়া সে তাহাকে চেনে না।

লুসি বলিল, "কেমন, এখন চুপ মেরে যেতে হ'ল ত? হুঁ বাবা, পথে এস। অমন বক-ধার্ম্মিক সবাই সাজে।"

মমতা বলিল, "মোটেই আমি বক-ধার্ম্মিক নই। একেবারে বিয়ে করব না, এমন কথা ত আমি কোন দিন বলি নি? তাই ব'লে এখন করব কেন? লেখা-পড়া শিখলাম না, মানুষ হ'লাম না, এখনই বোকার মত বিয়ে ক'রে বসি। তার পর চিরজীবন ধ'রে খালি দাঁত-খিঁচুনি খাই।"

লুসি বলিল, "কেন, ছোট বয়সে বিয়ে করলেই বুঝি দাঁত-খিঁচুনি খেতে হয়? এই ত আমার দিদিমার বিয়ে হয়েছিল এগার বছরে, তিনিই ত সারাক্ষণ দাদুকে বকুনি দেন।"

মমতা লুসিকে থামাইবার আর উপায় না দেখিয়া উল্টা আক্রমণ করিল। বলিল, "ও তোমার বুঝি ভারি বিয়ের সখ, তাই আমাকে এত ক'রে ভজাচ্ছ? তা বেশ ত চল না, আজ তোমাকেই দেখিয়ে দেওয়া যাক। পছন্দ করে ত বেশ, তোমাকেই ওদের ঘরে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে।"

লুসি বলিল, "তা আর না? আমি অমনি গেলাম আর কি তাদের সামনে? আমাকে তারা পছন্দ করবেই বা কেন? যা না কেলে মূর্ত্তি? তা ছাড়া আমি ত ব্রাহ্ম-সমাজের মেয়ে।"

মমতা বলিল, "তাতে কি? মাও ত ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে?"

লুসি বলিল, "পিসীমার মত চেহারা থাকলে আর ভাবনা ছিল কি? সমাজ-টমাজ ভুলে মানুষ লেজ তুলে দৌড়ে আসত। পিসেমশাই যা ক'রে পিসীমাকে বিয়ে করেছিলেন, তা বুঝি জান না?"

মায়ের বিবাহের অত ইতিহাস মমতার জানা ছিল না। লুসি তাহার মায়ের কাছে অনেক কথাই শুনিয়াছে। মমতাকে শুনাইতে তাহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু এই সময় যামিনী স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসায় তাহাকে, থামিয়া যাইতে হইল।

আজ খাওয়া-দাওয়া সকাল-সকাল সারিয়া, চাকর-বাকরকে সময়-মত ছাড়িয়া দিতে হইবে। না হইলে, তাহারা বিকালের জলযোগের আয়োজনে যথাকালে লাগিতে পারিবে না। কাজেই স্নানের পরে সকলে একসঙ্গেই খাইতে বসিয়া গেলেন। সুরেশ্বরও সুজিতকে লইয়া এই সঙ্গেই বসিয়া গেলেন। নিজে অবশ্য মাছের ঝোল ভাত ভিন্ন আর কিছু খাইলেন না। সুজিত লুসিকে দেখিয়া ভদ্রতার খাতিরে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "বেটু এল না কেন?"

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ইরাণী

শ্রীপুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

লুসি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "কে জানে!"

খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়েদের শুইয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া সুরেশ্বর নিজের ঘরে শুইতে চলিয়া গেলেন। যামিনী বিন্দুকে ডাকিয়া কি কি করিতে হইবে, কেমন ভাবে করিতে হইবে তাহা আরও একবার বলিয়া দিলেন। নীচের বড় ড্রইং-রুম্‌টা চাকর ভালভাবে পরিষ্কার করিয়াছে কিনা, তাহা নিজে একবার গিয়া দেখিয়া আসিলেন। মালীকে তিনটার সময় ফুল আনিতে বলিয়া দিয়া, বিশ্রাম করিতে আবার উপরে উঠিয়া আসিলেন।

দিনের বেলা তিনি কোনদিনই ঘুমাইতেন না, আজও ঘুমাইলেন না। সুরেশ্বর বলিয়াছেন মমতাকে খুব ভাল করিয়া সাজাইয়া দিতে। কি ভাবে সাজাইবেন তাহাই যামিনী ভাবিতে লাগিলেন। সুরেশ্বর অবশ্য চান যে মেয়েকে হীরা-মুক্তা-কিংখাবে একেবারে মুড়িয়া ফেলা হয়। তাহাতে মেয়ের বাপের টাকা অনেক আছে তাহা বুঝা যাইবে বটে, কিন্তু মমতা বেচারীকে ত দেখাই যাইবে না। যামিনীর পছন্দ-মত সাজাইলে মেয়েকে দেখাইবে ভাল বটে, তবে সুরেশ্বর চটিয়া যাইবেন। মমতারও ত একটা মতামত আছে? তাহাকেই না-হয় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা যাক? সে নিজের ইচ্ছা-মত সাজিলে, সুরেশ্বর বেশী কিছু বলিবার সুবিধা করিতে পারিবেন না।

পিতার আজ্ঞামত মমতা শুইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘুমায় নাই যে তাহা বলাই বাহুল্য। খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বিকালে কোন্ শাড়ীখানা পরবি রে?"

মমতা কিছু বলিবার আগেই লুসি লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "সেই ওর পাসের খাওয়ার দিন যে শাড়ী আর যে গহনাগুলো পরেছিল, তাই পরিও পিসীমা। অত সুন্দর আর ওকে কোনো পোষাকেই দেখায় না।"

বিবাহ করিতে যত অমতই থাক, সাজিতে মমতার বিশেষ কিছু অমত ছিল না। সে বলিয়া উঠিল, "না মা, তোমার বৌভাতের সেই বেগুনী জংলা শাড়ীটা পরব, ওটা আমার একবারও পরা হয় নি। আর সেই বড় বড় মুক্তোর মালাটা।"

তাহাই হইল। মমতার সামনে যামিনী নিজের কাপড়ের আল্‌মারী ও গহনার বাক্স খুলিয়া দিলেন। সে যাহা খুশী তাহা বাছিয়া লইল। মোটের উপর দেখা গেল, চুল বাঁধিতে জানুক বা নাই জানুক, নিজের সুন্দর রূপকে সুন্দরতর করিতে কি কি প্রয়োজন তাহা মমতার বেশ জানা আছে।

তাহার পর গা ধুইয়া আসিয়া মমতা মায়ের কাছে চুল বাঁধিতে বসিল। লুসি যামিনীকে সাহায্য করিতে লাগিল। গহনা মমতা খুব বেশী পরিল না, কিন্তু যাহা পরিল তাহা একেবারে বাছাই-করা জিনিষ, সুরেশ্বরের পিতামহীর আমলের জড়োয়া গহনা। মেয়ের কপালে ছোট একটি কুঙ্কুমের টীপ পরাইয়া দিয়া যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুধু-পায়ে যাবি, না নাগরা জুতো পরবি? শুধু-পায়ে যাস্ ত নিত্যকে বলি আল্‌তা পরিয়ে দিতে।"

মমতা আল্‌তা পরিতেই চায়। লুসি বলিল, "দিদিকে দেখাচ্ছে যেন ঠিক রূপকথার রাজকন্যা।"

যামিনী ভাইঝির উচ্ছ্বাসে একটু হাসিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

লুসি মমতার মুখখানা একবার ডান-পাশে একবার বাঁ-পাশে ঘুরাইয়া দেখিয়া বলিল, "তোমার কাছে কি লিপ্‌ষ্টিক্ আছে পিসীমা, একটু দিয়ে দিলে হ'ত দিদির ঠোঁটে, বড় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।"

যামিনী বলিলেন, "রূপকথার রাজকন্যাতে কি 'লিপ্‌ষ্টিক্' লাগায় রে? ওসব পাট আমার নেই।"

লুসি লজ্জিত হইয়া আর কিছু বলিল না। আজকাল ঘরে-ঘরেই ত 'লিপ্‌ষ্টিক্' ও 'রুজের' চলন, ইহাতে আপত্তি যে কেন পিসীমার তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

সাজগোজ সারিয়া মমতা চুপ করিয়া পাখার তলে বসিয়া রহিল, ঘোরাফেরা করিতে গিয়া পাছে ঘামিয়া উঠে। লুসি তাহার পাশে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। যামিনী উঠিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা গড়াইয়া গেল। মেঘলা দিন, একেবারে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। মমতা একবার লুসিকে বলিল, "তুই চুল বেঁধে, কাপড় ছেড়ে নে না ভাই, তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পারবি। একলা যেতে আমার ভয়ানক লজ্জা করবে।"

লুসি বলিল, "তা আর না? আমি গেলাম আর কি? একেই ত এই চেহারা, তার উপর তোমার ঐ ইন্দ্রাণীর মত মূর্ত্তির পাশে আমাকে যা দেখাবে তা আর ব'লে কাজ নেই।"

অগত্যা যথাকালে মমতাকে একলাই যাইতে হইল। অবশ্য সুজিত তাহাকে ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়া আসিল। তাহার হাতে রূপার ডিবায় পান। পান না লইয়া কোন কনেকেই দেখা দিতে যাইতে নাই, অতএব মমতাও একটা পানের ডিবা হাতে করিয়া আসিয়াছে।

তাহার সামনেই একখানা বড় চেয়ার সম্পূর্ণ ভরিয়া একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। মাথায় মস্ত বড় টাক, কিন্তু সুপুষ্ট গোঁফজোড়া অনেকটা মাথার কেশের অভাব পোষাইয়া লইয়াছে। পাশের সোফায় আরও দুইটি ভদ্রলোক বসিয়া, ইঁহাদের বয়স কিছু কম। আর একটা চেয়ারে সুরেশ্বর। ঘরে এই চারিটি মানুষ। সকলে যে অতি উত্তমরূপে জলযোগ করিয়াছেন, তাহার চিহ্ন এখনও এদিকে-ওদিকে বর্ত্তমান।

মমতা ঢুকিতেই সুরেশ্বর বলিলেন, "পান ঐ টেবিলের উপর রাখ মা। গোপেশ বাবু, এইটিই আমার মা-লক্ষ্মী।"

গোপেশ বাবু পরম আপ্যায়নের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বোসো মা, বোসো। রাজ-নন্দিনী ত রাজনন্দিনীই বটে। তোমার নামটি কি মা?"

মমতা নাম বলিল। তাহাকে এমন একটা 'সিলি' ব্যাপারের ভিতর আনিয়া ফেলায় সে বাপের উপর আবার চটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৃদ্ধ নিশ্চয়ই তাহার নাম জানেন, শুধু শুধু জিজ্ঞাসা করিবার কি প্রয়োজন? সমস্ত ব্যাপারটাই যে শুধু শুধু, তাহা বেচারী মমতা জানিত না। সুরেশ্বরের টাকার থলিটা দেখামাত্র গোপেশ বাবুর শুধু প্রয়োজন ছিল।

আবার প্রশ্ন হইল, "কতদূর পড়াশুনো করা হয়েছে মা-লক্ষ্মীর?"

মমতা বলিল, "এইবার ম্যাট্রিক পাস করেছি।"

গোপেশ বাবু পাশের এক ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ আমাদের ঢের, কি বল হে দক্ষিণা? একেবারে মেমসাহেব হ'লে আবার বাঙালী ঘরে চলে না।"

মমতা মনে মনে বলিল, "আহা কিবা তোমার বুদ্ধি! ম্যাট্রিকের বেশী পড়লেই বুঝি মেমসাহেব হয়ে যায়।"

মমতা গান জানে কিনা সে খোঁজও হইল। তাহার পর তাহার ছুটি। সুজিত আসিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। উপরে আসিতেই লুসি ছুটিয়া আসিয়া তাহার গায়ে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। মমতা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যা, অত হাস্‌ছিস্ কেন?"

লুসি বলিল, "বাপ রে, বরের বাপটি ত ঠিক সিন্ধু-ঘোটকের মত দেখতে। বরটিও ঐ রকম হলেই হয়েছে।"

ক্রমশঃ

সংবাদপত্রে সেকালের কথা—তৃতীয় খণ্ড। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাবলী—৮২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৪২।

ইতিপূর্ব্বে এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমরা 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী'তে সমালোচনা করিয়াছি। উক্ত সমালোচনায় এই বহু শ্রমসাধ্য ও বহুমূল্য সঙ্কলনের প্রয়োজন, উপকারিতা ও সম্পাদন-রীতি সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, আলোচ্য তৃতীয় খণ্ডে তাহার ধারা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

কারণ এই তৃতীয় খণ্ডটি প্রকৃতপক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার পুরাতন ফাইলে যে প্রচুর ও বিচিত্র সাময়িক ঐতিহাসিক উপাদান বিক্ষিপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল, তাহা প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে বিন্যস্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান খণ্ডের প্রথম (পৃ. ১—১৯০) ও দ্বিতীয় অংশে (১৯০—৪১৯), প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে যে-সকল তথ্য বাদ পড়িয়াছিল, তাহা পরিশিষ্ট-হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামক পত্রিকার কতকগুলি সংখ্যা হইতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থের শেষে (পৃ. ৪২০—৩২) স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত কোনও ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত তৎকালীন বাঙ্গালা জীবনের নয়টি দুষ্প্রাপ্য চিত্র পুনর্মুদ্রিত হইয়া এই সারবান্‌ গ্রন্থের মূল্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। ৩৬ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ সূচীপত্রে গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তি ও বিষয়ের তালিকা এই সুবৃহৎ সঙ্কলন পাঠে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মত ইহাতেও শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও বিবিধ এই কয়টি বিভাগে সঙ্কলিত তথ্যগুলি সুবিন্যস্ত হইয়াছে।

বিষয়-বস্তুর প্রাচুর্য্যে ও বৈচিত্র্যে বর্ত্তমান খণ্ড অন্যান্য খণ্ডগুলির মত চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান্‌ হইয়াছে। সেকালের সংবাদপত্র হইতেই সম্পাদক সেকালের কথা শুনাইয়াছেন—ইহাতে তাঁহার নিজের মতবাদ বা কল্পনার কোনও অবসর নাই। ঐতিহাসিক উপাদান ও প্রমাণপঞ্জী হিসাবে এই গ্রন্থের তিনটি সুবৃহৎ খণ্ড অধুনা-দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে যে-উপকরণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে বিস্মৃতপ্রায় গত শতাব্দীর প্রামাণ্য ইতিহাস-রচনার পথ সুগম করিয়া দিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে উক্ত শতাব্দীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যাইবে না, কিন্তু সেই যুগের বহু অজ্ঞাত কিন্তু জ্ঞাতব্য তথ্য ও ঘটনা সম্পাদকের অনন্যসাধারণ পরিশ্রমে ও নিপুণ বিন্যাস-কৌশলে, ইহার সুখ দুঃখ গৌরব ও অগৌরবের একটি নির্ব্বিকার প্রামাণ্য চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সুতরাং কেবল প্রমাণপঞ্জী বা উপাদান সংগ্রহ হিসাবে নহে, সেই যুগের কৃতিত্বের একটি সরস চিত্র হিসাবেও এই গ্রন্থ ঐতিহাসিকের এবং সাধারণ পাঠকেরও আদরণীয় হইবে।

এই ধরণের পুস্তক প্রকাশ করিয়া লাভবান হইবার প্রত্যাশা না থাকিলেও, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ এই সৎকার্য্যের জন্য শুধু ঐতিহাসিকের নহে, শিক্ষিত পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। গ্রন্থকর্ত্তা এই গ্রন্থের তিন খণ্ডের সর্ব্বস্বত্ব পরিষদকে প্রদান করিয়া এবং পারিশ্রমিক ও খরচ বাবদ তাঁহার সমস্ত প্রাপ্য হইতে পরিষদকে অব্যাহতি দিয়া, পরিষদের অর্থ-কৃচ্ছ্রতার সময় যে অনুরাগ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধকের উপযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী—১ম খণ্ড। অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৫; পৃ. ডবল ক্রাউন আট পেজী ৩৮০+৩২৬

বাংলা ১৩২৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বড়ু চণ্ডীদাস রচিত কতকগুলি পদ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে প্রকাশিত হইবার পরে নিম্নলিখিত দুই প্রধান সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে:—(১) চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একই ব্যক্তির রচিত কি না, এবং (২) দুই গ্রন্থের লেখক বিভিন্ন প্রমাণিত হইলে কোন্‌ ব্যক্তির লেখা চৈতন্য মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই দুই সমস্যা লইয়া বিস্তর মসীযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এত উৎসাহপূর্ণ আলোচনা সত্ত্বেও বহু ব্যক্তির মনে এখনও এই দুই সমস্যা অমীমাংসিত ভাবে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ইহাদের কোন সুমীমাংসা হইবার পূর্ব্বে এই সম্পর্কে আর এক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদের কতকগুলিতে 'দীন' এবং কতকগুলিতে 'দ্বিজ' এই বিশেষণযুক্ত চণ্ডীদাস-ভণিতা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে দুই পদকর্ত্তা বিদ্যমান ছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে চণ্ডীদাস-সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় চণ্ডীদাস-সমস্যার মীমাংসাকল্পে অনেক প্রয়োজনীয় মালমশলা উপস্থিত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে তাঁহার দীর্ঘকালের গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই হেতু তিনি পণ্ডিত-মণ্ডলীর আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। উল্লিখিত ভূমিকায় তিনি যে দুইটি অভিনব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আমাদের প্রচলিত সংস্কারকে আঘাত করে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই প্রসঙ্গে মণীন্দ্র বাবুর যুক্তি-পরম্পরা বিশেষ ধীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "চণ্ডীদাস নামে দুই জন কবি বর্ত্তমান ছিলেন। এক জন চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল বড়ু, অন্য জন চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল দীন।" (পৃঃ ১৮/০) "একমাত্র দীন চণ্ডীদাসই প্রচলিত পদাবলীর রচয়িতা। তিনি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক এক বৃহৎ

কাব্য রচনা করিয়াছিলেন,” (পৃঃ ৩৲ ৩/০) এবং “চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত পদাবলী এই বৃহৎ কাব্যের অংশ মাত্র” (পৃ. ৩৲)। দ্বিজ ও দীন চণ্ডীদাসের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তিনি বলেন, “দ্বিজ ভণিতা পরবর্ত্তী আরোপ মাত্র, কবি কখনও নিজেকে দ্বিজ ভণিতায় প্রচার করেন নাই” (পৃ. ৩৲)

উল্লিখিত সকল সিদ্ধান্তই মণীন্দ্র বাবু যথাযোগ্য যুক্তি-তর্ক সহকারে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমাদের মনে হয় যে নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রই তাঁহার সিদ্ধান্তনিচয় সম্বন্ধে অনুকূল ভাব পোষণ করিবেন। স্থানাভাবে এস্থলে তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তি-তর্কের কোন সংক্ষিপ্ত উল্লেখও সম্ভবপর নহে, তবে এ-কথা নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, তিনি এই প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি-তর্কের প্রধান আধার প্রাচীন পুঁথি এবং প্রকাশিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যাদি। পুঁথির প্রমাণ সর্ব্বত্র দিতে না পারিলেও বহু স্থলে তাহা তাঁহার সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ভাবে স্থাপনায় সাহায্য করিয়াছে এবং যে-যে স্থলে এতজ্জাতীয় প্রমাণ অপ্রাপ্য সেই-সেই স্থলে তিনি উচ্চাঙ্গের সমালোচনা-পদ্ধতির শরণ লইয়াছেন এবং নিপুণতার সহিত সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত পুস্তকখানির প্রশংসাবাদ। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি যে আবিষ্কার করা না-যায় এমন নহে। যথা, সম্পাদক বৃহৎ কাব্য অর্থে ‘মহাকাব্য’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ ‘মহাকাব্যে’র একটি পারিভাষিক অর্থ আছে, এবং সেই অর্থে কৃষ্ণলীলাত্মক পদাবলীকে মহাকাব্য বলা যায় না। কিন্তু ইহা গ্রন্থ-সম্পাদকের অসাবধানতা মাত্র। আর দানলীলা নৌকালীলা যে চণ্ডীদাস-পরবর্ত্তী সাহিত্যে কেমন ধারাবাহিকভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে তাহার নিদর্শন দিতে গিয়া তিনি ভ্রমক্রমে একটি সুবিদিত গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গলে দানলীলা ও নৌকালীলা বর্ণিত হইয়াছে। (বঙ্গবাসী সংস্করণের ৭০ ও ৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) মাধবাচার্য্যকে কেহ কেহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মনে করেন। যাক্, এই জাতীয় ত্রুটিতে ‘দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী’র মত গ্রন্থের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আমরা উৎসুকভাবে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিব।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

যূথপতি—লেখক শ্রীধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, অনুবাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ১৷০

জীবজন্তুকে অবলম্বন করিয়া গল্প রচনা করিবার রীতি এদেশে জাতক পঞ্চতন্ত্রের আমল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; সুতরাং তাহা অতি প্রাচীন বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে কিছু পরিমাণ সাহিত্যরস থাকিলেও সেগুলিকে ঠিক সাহিত্য বলা চলে না। ‘কথামালা’ শিশুচিত্তে আনন্দ জাগাইলেও তাহা পাঠ্যপুস্তকই হইয়া থাকে। যে-দেশে জীবজন্তুর কাহিনী এতদিনের পুরাতন আশ্চর্য্যের বিষয় সেদেশে কিপ্‌লিং-এর *Jungle Book*-এর মত সাহিত্য এতদিন রচিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিয়া ইংরেজী সাহিত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা কিপ্‌লিং-এর রচনা হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। তাহাতে ধনগোপাল বাবুর ভারতীয় দৃষ্টি ও দরদের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে, সুতরাং ভারতীয় পাঠক সেগুলি পাঠ করিয়া অধিকতর আনন্দলাভ করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ধনগোপাল বাবুর বইগুলি ইংরেজীতে লিখিত বলিয়া সাধারণ বাঙালী বালক-পাঠকমণ্ডলীর পক্ষে দুরধিগম্য। সৌভাগ্যের বিষয়, সম্প্রতি তাঁহার গ্রন্থগুলির বাংলায় অনুবাদ হইতেছে। বাংলার বালক-পাঠ্যগ্রন্থের একান্তই অভাব; এই অনুবাদগুলি সেই অভাব কিছু পরিমাণে দূর করিবে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য গ্রন্থখানি *Lord of the Herd* নামক গ্রন্থের অনুবাদ। এদেশের একটি হাতীর দলের সর্দ্দারের কাহিনী অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। সর্দ্দারের বিচিত্র জীবনের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক জীবজন্তুর জীবন সম্বন্ধে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দরদের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বইটি পড়িতে পড়িতে ছেলেমেয়েরা প্রচুর আনন্দ অনুভব করিবে।

সুরেশ বাবুর অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার ভাষা সরল, সজীব ও স্বাভাবিক, পড়িতে বাধে না। বইখানি পড়িয়া ভাল লাগিল। দু-এক জায়গায় স্থানীয় কথ্যভাষার প্রয়োগ কানে বাজিয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, কিন্তু ছবিগুলির কয়েকটি ভাল ফোটে নাই।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

ত্রিপিটক গ্রন্থমালা—৩, ৪। (১) বুদ্ধবংশ (বাংলা অনুবাদ সমেত) শ্রীধর্ম্মতিলক স্থবির কর্ত্তৃক অনূদিত। (২) ধর্ম্মপদার্থকথা—যমকবর্গ (বাংলা অনুবাদ সমেত) শ্রীশীলালঙ্কার স্থবির কর্ত্তৃক অনুবাদিত; বৌদ্ধ মিশন, ১৫৮ নং অপার ফেয়ার ষ্ট্রীট, কান্দগ্রে, রেঙ্গুন।

বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া বৌদ্ধ সাহিত্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের তত্ত্বকথা প্রচারের শুভ উদ্দেশ্য লইয়া সুদূর রেঙ্গুনে বৌদ্ধ মিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ ত্রিপিটক গ্রন্থমালা নাম দিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রচারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। টীকা-টীপ্পনী-সংবলিত বিশাল ত্রিপিটক সাহিত্য ও তাহার অনুবাদ সম্পাদন ও প্রকাশের কার্য্যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। মিশন কর্ত্তৃক এখন পর্য্যন্ত অর্থসংগ্রহের কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে প্রথমখানি মহাভিক্ষু সমাগমের উদ্‌বৃত্ত অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে; শ্রীযুক্ত বরদাচরণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চৌধুরী নামক চট্টগ্রামের দুই জন বদান্য ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে দ্বিতীয়খানি মুদ্রিত হইয়াছে। আশা করা যায়, বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি ও বাঙ্গালীর জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবার জন্য বৌদ্ধ মিশনের এই সাধু প্রচেষ্টা ক্রমে সাহিত্যানুরাগী অন্যান্য বদান্য ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে এবং কার্য্য সুসম্পাদনের পথ সুগম হইবে।

গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে বুদ্ধবংশে অতীত বুদ্ধগণের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির ভূমিকায় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন।

ধর্ম্মপদার্থকথা সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপদ নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা বিবরণ গ্রন্থ। ধর্ম্মপদের গাথাগুলি যে সকল বিশিষ্ট ঘটনা উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে তাহাদের বিবরণপূর্ণ বিভিন্ন উপাখ্যান এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ‘গ্রন্থপরিচয়ে’ শ্রীযুক্ত প্রজ্ঞালোক স্থবির মহাশয় প্রসঙ্গতঃ বৌদ্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা-গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বে ভারতীয় অক্ষরে এই দুই গ্রন্থের মূল মুদ্রিত হয় নাই এবং ভারতীয় কোনও ভাষায় ইহাদের অনুবাদও প্রকাশিত হয় নাই। বৌদ্ধ মিশনের চেষ্টায় সেই অভাব দূরীভূত হইল। তবে অনুবাদের ভাষা আর একটু সরল ও মার্জ্জিত হইলে ভাল হইত। গ্রন্থমধ্যে

ব্যবহৃত সকল বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের অর্থ সহিত একটি সূচী পতি-গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হইলে গ্রন্থের অনেক দুর্বোধ্য অংশ বুঝিবার সুবিধা হইত।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বীণাপাণি সংকলন—আর্য্য-শিল্প-ভাণ্ডার কর্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকে কণ্ঠ ও যন্ত্রসাধন প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

নর্দ্দ বিদ্যা ও নন্দ বিদ্যা সংকলন—শ্রীহরেন্দ্রলাল দাস প্রণীত।

গ্রন্থ দুইটিতে গ্রন্থকার সঙ্গীত ও স্বর-সাধন-সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার লিখিবার প্রণালীর জটিলতার সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা কতদূর কাজে লাগিবে বলিতে পারিলাম না। নন্দ বিদ্যা প্রথম ভাগের ভূমিকাটি সুলিখিত, এবং ভূমিকাটি সঙ্গীতবিদ্যানুরাগী সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত। ইহাতে অনেক খাঁটি কথা পাওয়া যাইবে।

শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

ব্যোমকেশের কাহিনী—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পি. সি. সরকার এণ্ড কোং দ্বারা কলেজ স্কোয়ার নর্থ (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি গ্রন্থকার-প্রণীত "ব্যোমকেশের ডায়েরী"র দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতে 'চোরাবালি' ও 'অর্থমনর্থম্' নামক দুইটি আখ্যায়িকা স্থান পাইয়াছে। 'ব্যোমকেশের ডায়েরী' পড়িয়া যাঁহারা আনন্দ লাভ করিয়াছেন, উহার দ্বিতীয় খণ্ড পড়িয়া তাঁহারা আরও মুগ্ধ হইবেন। অভিনব ঘটনা-সৃষ্টির দ্বারা রহস্যজালের উদ্‌ঘাটনে লেখক সিদ্ধহস্ত, তাঁহার কলা-কুশলী হস্তে চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। চোরাবালির রহস্য-সমাধানে অথবা ধনী করালীবাবুর মৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারণে যে অদ্ভুত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা গ্রন্থকার লিপিচাতুর্য্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে। উচ্চাঙ্গের ডিটেকটিভ গল্প বাংলা ভাষায় নিতান্ত বিরল; গ্রন্থকারের এই শ্রেণীর আখ্যায়িকা সেই অভাব পূর্ণ করিবে। তাঁহার ভাষা সরল ও সতেজ এবং বর্ণনাভঙ্গী মনোজ্ঞ। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ সুন্দর।

চিন্তারেখা—শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত; রঞ্জন কার্য্যালয়, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে লেখকের রচিত পাঁচটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, (১) শিক্ষা ও সুখ, (২) বেঙ্গল ক্লাব, (৩) পরপারের ছবি, (৪) মনের খেয়াল, (৫) মানবপূজা (মহাত্মা গান্ধী)। প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনটি বিশেষ বিশেষ সময়ে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কোন-না-কোন সম্মেলনে পঠিত হইয়াছিল। এই কয়টি প্রবন্ধের মধ্যে 'শিক্ষা ও সুখ' ও 'মানবপূজা' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। প্রথমটিতে লেখক প্রকৃত শিক্ষা ও মানবের প্রকৃত সুখ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-গুণের পরীক্ষা করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভূমির আদর্শ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে শিক্ষার ভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র জীবনের ঘটনা-পরম্পরার বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখকের বলিবার ও বুঝাইবার শক্তি আছে এবং তাঁহার রচনায় যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা প্রবন্ধের বিষয় ও ভাবের উপযোগী। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই বেশ সুন্দর।

পাষাণ-পুরী—শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

ইহা একখানি উপন্যাস গ্রন্থ। লেখক বিষয়টি মনোরম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উপন্যাসের আখ্যানভাগ একেবারে মামুলী; দুই বন্ধু প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী, এক জনের জয় এবং অপরের পরাজয় ও অধঃপতন, নববিবাহিতা দম্পতির মনোমালিন্য ও পুনর্মিলন প্রভৃতি। ঘটনা-বৈচিত্র্যের সমাবেশ থাকিলেও উপন্যাসটি ভাল জমে নাই। অনাবশ্যক ভাবের উচ্ছ্বাসে এবং অনর্থক শব্দাড়ম্বরে আখ্যানভাগ ভারাক্রান্ত। এমন কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ আছে, যাহা বাংলা ভাষায় কটুপ্রয়োগ বা স্বল্পপ্রয়োগ দোষে দুষ্ট। লিপি-প্রমাদ যথেষ্ট রহিয়াছে। পুস্তকের বাঁধাই, ছাপা ও কাগজ ভাল।

মানসী—শ্রীমতী আশালতা দেবী (সিংহ) প্রণীত। পি. সি. সরকার এণ্ড কোং কর্তৃক ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি একখানি উপন্যাস। একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক ও এক জন উচ্চশিক্ষিতা যুবতী পরস্পরকে ভালবাসিয়া উভয়ের মাতা-পিতার অসম্মতি সত্ত্বেও বিবাহ করিয়া বিশেষ অর্থকষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উভয়েই ধনীর সন্তান, সুতরাং কষ্ট তাহাদের যথেষ্টই হইয়াছিল, কিন্তু তখন তাহাদের মিলন বেশ মধুর ও শান্তিময় ছিল; পরে যুবক পিতার মৃত্যুর পর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলে তাহারা বিশেষ সচ্ছলতার ভিতর বাস করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মনে আর পূর্ব্বের আনন্দ ও শান্তি বজায় রহিল না, যেন স্বামী ও স্ত্রী মনে মনে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, শেষে স্ত্রী নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া মনের সকল গ্লানি দূর করিয়া দিল। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সুখপাঠ্য, শেষের অংশটি অতি সুন্দর জমিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর ও সতেজ। কোথাও বৃথা উচ্ছ্বাস নাই, অথচ রচনা আবেগময়ী। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ বেশ ভাল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

নয়া ভারতের ভিত্তি—শ্রীরেজাউল করীম, এম-এ, প্রণীত। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গ্রন্থকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানা রাজনৈতিক ঘটনার সম্পর্কে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলি একত্র করিয়াছেন। তিনি জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহার ধারণা জাতীয় ঐক্য ভিন্ন স্বরাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার ভাব পোষণ করেন, তাহারা সত্যই সম্প্রদায়-বিশেষের অমঙ্গল করেন কারণ জাতির মঙ্গলেই প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মঙ্গল নিহিত আছে।

গ্রন্থকারের সত্যপ্রিয়তা, নির্ভীকতা ও নিপীড়িত অনশনক্লিষ্ট জনগণের প্রতি প্রেম সকলের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিবে।

তুষারতীর্থ অমরনাথ—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পৃঃ ৷/০+২৬২+৩৮ খানি ছোট বড় ছবি। মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

বিশেষত্ব-বিহীন ভ্রমণ-কাহিনী। লেখার মধ্যে কোথাও কোথাও

রোমান্টিসিজম ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু পথের খুঁটিনাটি বর্ণনার আতিশয্যে তাহাও চাপা পড়িয়া জমে নাই।

দেবস্থান—ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, পোঃ মাধবপুর, রাজশাহী। দাম বারো আনা। পৃঃ ৷০+১৯৩

অনেকের ধারণা যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মানে পথে পথিকেরা যে সকল কষ্ট ভোগ করিয়াছেন তাহার বর্ণনা। বাংলা দেশের অনেকগুলি ভ্রমণবৃত্তান্ত এই দোষে দুষ্ট। ভ্রমণকারিগণ নিজেদের লইয়া এত বিব্রত থাকেন যে, যে-দেশ দিয়া তাঁহারা যান তাহা ভাল করিয়া দেখিবার অবসর প্রায়ই পান না, স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ ত একেবারেই পান না। ধনী যাত্রীরা ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড কিনিয়া এই অভাব কতকাংশে পূরণ করেন, অপরে তাহাও পারেন না। নিজে দেখিবার, নিজে উপভোগ করিবার মত অবসর প্রায় কাহারও হয় না; শিক্ষা ত অনেকের কিছুই নাই।

আলোচ্য পুস্তকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনাই প্রধান মানুষ সেখানে গৌণ স্থান লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ভাষায় লালিত্য আছে; কিন্তু তাঁহার বর্ণনার মধ্যে বস্তু কম এবং বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা কতকটা একঘেয়ে ধরণের; তাহা সত্ত্বেও "দেবস্থান" বইখানি এক দিক দিয়া উপভোগ্য হইয়াছে। নিজের কষ্ট বর্ণনায় লেখকের সংযম আছে, এবং তাঁহার মধ্যে কোনও ধর্ম্মের মিথ্যা আড়ম্বর নাই। দেবমন্দিরে যেখানেই তিনি অনাচার দেখিয়াছেন সেখানেই তাঁহার সত্যপ্রিয় মন আহত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনকালে সত্য সত্যই আত্মহারা হইয়া পড়েন, এবং ভাষার গুণে পাঠকের হৃদয়কেও আবিষ্ট করিয়া ফেলেন।

এই জন্য উঁচুদরের লেখা না হইলেও বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সরলতা এবং আন্তরিকতা গুণে সুখপাঠ্য হইয়াছে বলিতে হইবে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

শব্দগত স্পর্শদোষ

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

['Contamination of words'—Contaminationএর বাংলা কি হবে এ নিয়ে কথা উঠেছিল। আমার প্রথমে মনে হয় যে সম্—√কৃ দিয়েই কাজ চলবে। তাই 'Contamination of words' এই শব্দসমষ্টির প্রতিশব্দ দিতে চেয়েছিলুম 'শব্দসাঙ্কর্য্য'। সঙ্কর শব্দটা যেমন সাধারণ অর্থে confusion বোঝায় তেমনি এর একটা বিশেষ অর্থও আছে। সেটা হচ্ছে দুই বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর মিলনে উৎপন্ন তৃতীয় এক জাতি। শব্দের ক্ষেত্রেও সঙ্কর শব্দের এই রকম একটা সুনির্দ্দিষ্ট বিশেষ অর্থ এসে যেতে পারে। তখন সাঙ্কর্য্যের মানে দাঁড়াতে পারে দুই ভিন্ন ভাষার শব্দের একত্রীভবন। 'স্কুলপাঠ্য', 'গ্যাসালোক' প্রভৃতি শব্দকে সঙ্কর শব্দ বলা যেতে পারে। 'Contamination' ব'লতে যতটা বোঝাবে, 'শব্দসাঙ্কর্য্য' ব'ললে হয়ত ঠিক ততটা প্রকাশ পাবে না। এই জন্য পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসু হই। 'স্পর্শদোষ' শব্দটি তাঁরই দেওয়া। ভাষাতত্ত্বের 'Contamination' শব্দের অর্থও যেমন ব্যাপক 'স্পর্শদোষে'র অর্থও তেমনি।]

অক্সফোর্ডের স্পুনার সাহেবের সম্বন্ধে গল্প শোনা যায় যে তিনি নাকি কথা ব'লতে গেলেই শব্দে শব্দে গুলিয়ে ফেলতেন। তাঁর জিহ্বাটা ছিল একটু অবাধ্য রকমের। তাঁর এই অবাধ্য জিহ্বা কোন-কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে এমনতর এক-একটা কাণ্ড ক'রে বসেছে যে আজকের দিনে সে-রকম একটা কিছু ঘটলে বড় সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত না। কোন ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হ'য়ে ভদ্রলোক একটি কুমারীকে অকস্মাৎ অনুরোধ ক'রে ব'সলেন, "Miss, will you kindly *take me*?" "take me" বলাটা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি ব'লতে চেয়েছিলেন, "Miss, will you kindly make tea?" তা তাঁর মনে যাই থাক না কেন প্রকাশ ক'রে যা ব'লেছিলেন তার উত্তর পেয়েছিলেন এবং সে উত্তরটি তাঁর পক্ষে দুঃখের কারণ হয় নি।

শব্দের উচ্চারণক্ষেত্রে এই ধরণের ভুল আমরাও কম করি না। পাশা-পাশি দুই শব্দ তাড়াতাড়ি উচ্চারণ ক'রতে গিয়ে উদোরপিণ্ডি অনেক সময়ই বুধোর ঘাড়ে চড়িয়ে দিই—কখনও বা স্বেচ্ছায়, কখনও বা অজ্ঞাতসারে। কিন্তু এ ধরণের জিনিষ ভাষায় কখনও স্থায়ী আসন পেতে পারে না, এক কৌতুক প্রসঙ্গ ছাড়া। খুব খানিকটা ঘুরে ফিরে এসে 'মুখখানি যার মুকিয়ে যায়' সে অনেক সময় 'এক চাপ্ কা' খেয়ে শ্রান্তি দূর ক'রতে পারে। কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে কারবার যাদের তাদের প্রয়োজন বেশী এক কাপ চায়েরই। হাস্য-রসের অবতারণায় এ-সব

কখনও কখনও আবশ্যক হয়, তা না হ'লে বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের সহপাঠীরা তাঁকে "কশুরে জৈ" ব'লে জ্বালাতন করবেন কেন? বাংলায় এ-ধরণের শব্দদুষ্টি প্রায়ই দেখা যায়। ইংরেজীতে স্পূনার সাহেবের নামানুসারে একে স্পূনারিজ্‌ম্‌ বলা হয়।

এ-ধরণের অবাধ্যতা প্রায় সকলের জিহ্বাই কখনও-না-কখনও ক'রে থাকে কিন্তু কারও কারও জিহ্বা এত অসংযত যে প্রায়ই সীমা লঙ্ঘন করে। আমার এক বন্ধু কাপড় কদাচিৎ পরেন কারণ, 'কাপর পরাই' তাঁর স্বভাস। তাঁর বৈকালিক জলখাবারের মধ্যে 'সিঙারা কচুড়ি' থাকা চাই-ই।

শব্দের এমন রূপ-বিকৃতি ঘটে কেন? তার কারণ আমাদের বাগ্‌যন্ত্রটাও একটা যন্ত্র। স্প্রিঙে-চলা ঘড়ির বড় কাঁটা ও ছোট কাঁটা যেমন মধ্যে মধ্যে জড়িয়ে যায়, মনে চলা আমাদের এই বাগ্‌যন্ত্রেরও অবস্থা হয় কখনও কখনও সেই রকম। একাধিক কথা বা ভাব মনের মধ্যে জমবার অবসর পেলেই সেগুলো বেরোবার সময় ছুটোপাটি করবেই, ছুটির ঘণ্টা পড়লে স্কুলের একটি মাত্র দরজা দিয়ে বেরোবার সময় ছেলেরা যেমনতর করে। বাড়ি যাবার তাড়ায় রামের ধারাপাত যায় শ্যামের বাড়ি কিন্তু শ্যামের দ্বিতীয় ভাগখানা রামের বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। এক জনের চিঠি অপরের খামের মধ্যে প্রবেশ লাভ ক'রে কত লোকের কত অনর্থ যে ঘটিয়েছে তার হিসেব কে রাখে? এ আর কিছুই নয়, এক ধরণের অন্যমনস্কতা, দুটো ভাবের গোলমালে এই অন্যমনস্কতার সৃষ্টি। আজ যা আকস্মিক তাই আবার এক দিন নিত্য হ'য়েও দাঁড়াতে পারে। স্পর্শদুষ্ট শব্দও তেমনি কখনও কখনও ভাষায় স্থান পেয়ে যায়।

মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের যে অচ্ছেদ্য যোগ আছে, আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা সে-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ক'রেছেন। পলের (Paul) নাম এঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বলেন,—

"We call the process 'contamination' when two synonymous or similar sounding forms or constructions force themselves simultaneously or at least in the very closest succession, into our consciousness, so that one part of the one replaces, or it may be, ousts a corresponding part of the other; the result being that a new form arises in which some elements of the one are confused with some elements of the other."

এর তাৎপর্য্য এই,—"যখন একার্থবোধক বা অনুরূপ ধ্বনিবিশিষ্ট দুটি শব্দ বা বাক্য যুগপৎ বা উপর্য্যুপরি আমাদের চৈতন্যকে অধিকার করবার জন্য উদ্যত হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একটির অংশ-বিশেষ অপরের অনুরূপ অংশের সঙ্গে স্থান বিনিময় করে বা ঐ অংশকে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত করে। এই দ্বন্দ্বের ফলে উভয়ের কিয়দংশকে বিপর্য্যস্ত ক'রে একটি অভিনব শব্দ বা বাক্যের উদ্ভব হয়। এই বিকৃতির প্রণালীকেই স্পর্শ-দোষ বলা যায়।" আমরা এখানে শুধু স্পর্শদুষ্ট শব্দের কথাই আলোচনা করব।

স্পর্শদুষ্ট শব্দের জাতি হিসাব করতে গেলে স্বয়ং মনুকেও হার মানতে হবে। আমরা মোটামুটি কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ ক'রে সংক্ষেপে তাদের কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি, ইংরেজীতে যাকে বলে স্পূনারিজ্‌ম্‌। স্বনামধন্য স্পূনার সাহেবের নামেই এই শ্রেণীর নামকরণ। 'কশুরে জৈ', 'সিঙারা কচুড়ি' প্রভৃতি বাংলার স্পূনারিজ্‌ম্‌।

দ্বিতীয় শ্রেণীর স্পর্শদুষ্ট শব্দের উদাহরণ হবে মনোরথ। মনোরথ শব্দটা বাংলায় ত চলবেই কেন-না সংস্কৃতেও ওটা চলে। এর স্পর্শদোষটা ঘটেছে সংস্কৃত থেকেই, বাংলায় এসে নয়। আসল শব্দটা ছিল 'মনোঽর্থ'। অপরিচয়ের ফলে শব্দটা আমাদের নূতন ঠেকবে হয়ত। মনোঽর্থ (মনঃ+অর্থ) মনের উদ্দেশ্য বা অভিলাষ। একদা মনোরথ অধিকার ক'রে বসল মনোঽর্থের স্থান। তাই মনোরথ সিদ্ধ হোক্ প্রভৃতি প্রয়োগ ভাষায় চলে গেলেও বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে গেলে গোলমাল ঠেকে। সেই জন্যই কারও কারও 'মনোরথ' সিদ্ধ না হ'য়ে পূর্ণ হয়।*

* কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি যে মনোরথ শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস প্রথম শুনি পরম শ্রদ্ধাস্পদ মদীয় অধ্যাপক পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে। ইতিপূর্ব্বে ঐ শব্দটির প্রতি আর কোন ভাষাতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে কি না জানি না।

এ-রকম স্পর্শদুষ্টি ঘটে কেন? কারণ, পদ বা পদাংশ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে কখনও কখনও নব নব রূপ ধারণ করে, যদি পূর্ব্ব ও পরিবর্ত্তিত শব্দের মধ্যে বেশ একটা ধ্বনিগত সাম্য থাকে। কিন্তু শুধু ধ্বনির মিল নয়, অর্থেরও মিল কিছু থাকা চাই। এখানে মনোরথ অর্থের দিক্ দিয়ে মনোহর্থের কাজ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিচ্ছে, অন্ততঃ তার অযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ওঠে নি। আর এদিকে উচ্চারণের মিল ত আছেই। স্পর্শদুষ্ট হ'লেও ভাষার ক্ষেত্রে এঁরা একেবারে অনাচরণীয় নন।

ধ্বনিসাম্যের ফলে আর এক রকম স্পর্শদোষের উদ্ভব হয়, কিন্তু এগুলি কৌতুক প্রসঙ্গ ছাড়া ভাষায় অল্পই ব্যবহৃত হয়। ছোট ছেলেরা কখনও কখনও এ-ধরণের শব্দ ব্যবহার ক'রে বসে কিন্তু তার জন্য শাস্তিও পেতে হয়। 'Protractor' ব্যতীত 'protector' দিয়ে যে জ্যামিতির চিত্র আঁকা যায় না mathematicএর শিক্ষক মহাশয়ের বেত্রদণ্ড তা বারংবার বুঝিয়ে দেয়। আমরা ঠাট্টার ছলে মাতালের নামানুসারে চা-খোরকে 'চাতাল' বলি। জনৈক অভিভাবক সেদিন কোন অধ্যাপককে ব'লছিলেন যে তাঁর পুত্র ইংরেজীতে একটু deficit, ছেলেবেলা থেকে নিজে ত পড়ানোর সময় পান নি কিনা! কাঠের ও টিনের মিস্ত্রিরা রিপিট (rivet) ক'রে কাঠ বা টিন জুড়ে। মিস্ত্রি-সমাজে 'রিপিট' কথাটা খুব চ'লে গেছে। ডায়মন (diamond) কাটা বাজু ও পায়নাফুলি (pine-apple) সাড়ি স্কুল-কলেজে-পড়া মেয়েরাও মাঝে মাঝে প'রে থাকেন। নবোদ্ভাবিত পিটুনি পুলিস খবরের কাগজ মারফৎ দেখছি বাংলার পল্লীগ্রামেও বাসা বাঁধল। মালসি (M. L. C.) ও তাই। এটা বোধ হয় এম্-এল্-সি ও মালসা এই দুটো শব্দের ধ্বনিসহযোগে গঠিত।

অজ্ঞতা উপেক্ষা বা অনবধানতা হেতু ব্যাকরণের নিয়ম উল্লঙ্ঘন শব্দবিপর্য্যয়ের আর একটি কারণ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের রচনাতেও এই ধরণের বিপর্য্যস্ত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। স্বাধীনচেতা মধুসূদন কেবল শ্রুতিমধুর হবে ব'লে বরুণানী না লিখে বারুণী লিখেছিলেন। মনে মনে আশঙ্কা নিশ্চয় ছিল চলবে কি না। চিঠিতে কোন বন্ধুকে লিখেছিলেন যে এ-রকম প্রয়োগ কেন ক'রেছেন। বারুণী শব্দটার সঙ্গে পূর্ব্বপরিচয়ই এখানে স্পর্শদোষ সংঘটন করেছে, এই রকম অনুমান হয়। শরৎচন্দ্র 'লইয়াছি'র স্থানে 'নিয়াছি' লেখেন, 'দিয়াছি'র প্রভাবে সম্ভবত। এটাকে analogyর উদাহরণ বলা চলতে পারে। ভাষার নিয়মানুমোদিত না হ'লেও নিয়াছি-টা চলে গেছে। কিন্তু নবগান 'গেতে' শুনলেই কানে তুলো দিতে ইচ্ছে করে।

একার্থবোধক শব্দ ও প্রত্যয়াদির যোগে প্রায়ই পুনরুক্তির সৃষ্টি হয়, কারণ উক্ত যা-তাও অনেক সময় অনুক্ত ব'লেই প্রতিভাত হয়। 'অদ্যাপিও' (অদ্য+অপি +ও)র 'অপি' এবং 'ও' এই দুইটি অব্যয়ই একার্থবাচক, কিন্তু 'অদ্যাপিও' ব্যবহার করেন যাঁরা, তাঁদের মন 'অদ্যাপি'র অর্থ 'অদ্য'র চেয়ে কিছু বেশী ব'লে গ্রহণ করে না। ধরে দিলে ব'লবেন—ও তাই ত! 'আয়ত্তাধীন' 'কিয়ৎপরিমাণ' 'কেবল মাত্র' প্রভৃতি শব্দও এই শ্রেণীতে পড়ে। 'উদ্বেলিত', 'অধীনস্থ', 'সশঙ্কিত', 'নিঃশেষিত' প্রভৃতি শব্দকেও এই শ্রেণীরই অন্তর্গত করা যায়। উপরের শব্দগুলিতে যে প্রত্যয়গুলি যোগ করা হ'য়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ 'অনাবশ্যকীয়'। 'অধীনস্থ' শব্দটি fallen vacant under your kind disposal স্মরণ করিয়ে দেয়। এ-রকম ভুল বাঙালীর মুখে ও হাতে প্রায়ই বেরোয়। আমরা যখন যার 'underএ' কাজ করি তখন তার। আবার তার কাছ থেকে চ'লে গেলে তারই 'againstএ' জটলা পাকাই। ইংরেজী prepositionএর গায়ে বাংলা post-positionএর হরিহর রূপ। ব্যাকরণের ধর্ম্মাধিকরণে এই অপরাধ দণ্ডবিধির আমলে আসতে পারে। কিন্তু সৌজন্যতা-বোধে এ-সবও উপেক্ষা করা হ'য়ে থাকে। দেখা যায় 'নিরপরাধী' ও নির্ব্বিরোধী লোকই বেশীর ভাগ ধরা পড়ে। 'অংশীদার' 'ভাগীদার' প্রভৃতি 'সাবধানী' লোককেও সদাসর্ব্বদা ফাঁকি দেয়। অত্যন্ত গুরুতর কথার সময়ও আমরা গাম্ভীর্য্য রক্ষা করতে পারি না। শ্রেষ্ঠকেই যখন মর্য্যাদা দিই তখন 'শ্রেষ্ঠতম'কে অবজ্ঞা করি কেমন ক'রে? ইংরেজীতেও innermost প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়।

বিদেশী শব্দ বাংলায় এসে যখন জাত হারায় তখন

তার যে রূপ হয় সেটি ভারি মজার। সে-রকম স্পর্শদুষ্ট শব্দের কয়েকটি উদাহরণ আগে দিয়েছি, এখানে আরও কয়েকটি দিচ্ছি। 'নাবালক' কথাটি ফার্সি নবালিগ্ শব্দের বাংলা-রূপান্তর। বালিগ্ শব্দটা একে অপরিচিত, তাতে আবার বালক শব্দের সঙ্গে ধ্বনির মিল আছে। সুতরাং ন-বালিগ্ দাঁড়াল 'নাবালক' হ'য়ে, যদিও শব্দের আকৃতি ও অর্থ হ'য়ে গেল পরস্পর-বিরুদ্ধ। অবশ্য 'অমন্দ'র খাতিরে 'না' স্বার্থে প্রযুক্ত বলতে পারি। 'নাবালকের' দেখাদেখি 'সাবালক'। এই প্রসঙ্গে 'লালটিন' কথাটা উল্লেখযোগ্য। লণ্ঠন (lantern)কে পশ্চিম-বঙ্গের কোন কোন জেলায় এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে 'লালটিন' বলে। লণ্ঠনটা তৈরি হয় সাধারণত টিনে তাই (টান্ (tern)>) ঠন টার স্থান সহজেই অধিকৃত হ'ল 'টিন' দ্বারা এবং নিরর্থক লন শব্দটার জায়গায় এসে ব'সল লাল। লাল শব্দটার সার্থকতাও হয়ত কিছু ছিল। এদেশে যখন হারিকেন লণ্ঠন প্রথম আমদানি হয় তখন টিন ও পিতল উভয় ধাতুরই লণ্ঠন আসত। আজকাল পিতলের লণ্ঠন খুব কম দেখা যায়। পিতলের রংটার সঙ্গে লাল শব্দটার যোগ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু মজা হ'চ্ছে এই যে একই লণ্ঠন 'লাল' এবং 'টিন' দুই-ই হ'তে পারে না। 'লালটিন' শব্দটি স্পর্শদোষের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

আর এক রকম শব্দের কথা ব'লে এই প্রবন্ধ শেষ করব। ইংরেজীতে এই ধরণের স্পর্শদুষ্ট শব্দকে বলে Portmanteau words। উদাহরণ দিলে এটা সহজে বোঝা যাবে। প্রথমে একটা ইংরেজী শব্দই বলি। potatomato শব্দটি নূতন বেরিয়েছে। ওদেশের কোন উদ্ভিদ্‌তাত্ত্বিক আলু ও বিলাতিবেগুন মিলিয়ে এক অভিনব ফল তৈরি করেছেন। তারই নাম দিয়েছেন potatomato। বাংলা রূপকথাটি সম্ভবত এই রকমের রূপক ও কথা এই দুইটি শব্দ সহযোগে গঠিত। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিকে 'উত্তরান্তি' ব'লতেও শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে ওড়িয়া 'প্রাকর্ম' শব্দটির কথা মনে পড়ে। প্রাচীন ওড়িয়ায় পরাক্রম শব্দটি বানান ভুল ক'রে 'প্রাকর্ম' লেখা হ'ত। বানানের সঙ্গে মানেও গেল ব'দলে। নূতন শব্দের নূতন মানে হ'ল অদৃষ্ট। এই শব্দটি দেখলে মনে হয় স্পর্শদোষ ঘটেছে প্রাক্তন ও কর্ম এই দুই শব্দের মধ্যে। লক্ষ্য ক'রলে এ-রকম অনেক কথাই নজরে পড়ে।

বন্ধু

শ্রীরসময় দাশ

সে তো একদিন নয়; কতবার এ জীবন 'পরে
দুঃখের শ্রাবণ-ধারা নিঃশেষে গিয়েছে যবে ঝরে,
অশ্রুধৌত হৃদয়ের বহুদূর স্নিগ্ধ নীলাকাশে—
দেখেছি তোমার হাসি শরতের মেঘসম ভাসে।
অমনি ভুবনে মোর—পল্লীপ্রান্তে নদী-তীরে-তীরে
দুলিয়াছে কাশবন শুভ্র হাস্তে—সুমন্দ সমীরে।
অস্ত-আলো ঝলমল পশ্চিমের দিগন্ত সীমায়
হংস-বলাকার দল উড়ে গেছে চঞ্চল পাখায়।
তার পর নামিয়াছে বিষাদ-কুহেলি অন্ধকার,—
শেফালী ঝরিয়া গেছে, নিবে গেছে দীপ্তি জোছনার।
শিশির বিষণ্ণ প্রাতে ঝরা পাতা দলি পদতলে,
দূরের পথিক-বন্ধু, বার-বার গেছ তুমি চলে।
আসন্ন বিরহ-তলে চিররাত্রি একাকিনী জাগি
আশার প্রদীপখানি জ্বালায়ে রেখেছি তোমা লাগি।
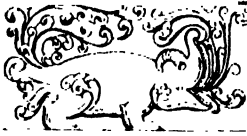
আলোচনা

শেখ বক্সুই কি রাজারাম?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের "প্রবাসী"র অগ্রহায়ণ ও চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রামমোহন রায় ও রাজারাম" শীর্ষক প্রবন্ধে ও প্রত্যুত্তরে নানা যুক্তি প্রমাণের দ্বারা শেখ বক্সুই রাজারাম প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রবাসীর সম্পাদকও এই আলোচনা সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্র বাবু যে সব যুক্তি দ্বারা শেখ বক্সু ও রাজারামকে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে আমার মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছে তাহারই উল্লেখ করিব।

ব্রজেন্দ্র বাবু সরকারী কাগজ-পত্র ও তদানীন্তন সংবাদপত্রের মতের উপর তাঁহার প্রথম যুক্তিটি বিশেষ ভাবে স্থাপন করিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপে এই:—"রামমোহনের সকল জীবনচরিতেই"—"পালিত পুত্র বালক রাজারাম, পাচক রামরত্ন মুখোপাধ্যায় এবং ভৃত্য রামহরি দাস"—রামমোহনের বিলাতযাত্রার সঙ্গী হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

ভারত-সরকারের দপ্তরখানা হইতে রামমোহনের সঙ্গীদের জাহাজ-যাত্রী হইবার জন্য প্রদত্ত যে অনুমতিপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে রামরতন মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস ও শেখ বক্সুর নাম পাওয়া যাইতেছে। "এমন কি বিলাতে রামমোহনের সমাধিকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি তালিকার প্রতিলিপিতেও" রাজারাম রায়, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাসের নাম পাওয়া গিয়াছে।

এই গরমিলের কারণ কি? রামহরি দাস ও রাজারামের পরিবর্ত্তে হরিচরণ দাস ও শেখ বক্সুর নাম কেমন করিয়া আসিল? ব্রজেন্দ্র বাবু এই আপাতঃ বৈষম্যের মীমাংসা করিয়াছেন:—

[১] নিজ নামের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া রামমোহন হরিচরণ দাসের নাম রামহরি দাসে পরিবর্ত্তিত করেন,—"নিজ নাম 'রাম'এর উপর রামমোহনের—হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিলক্ষণ মোহ ছিল।" পৃঃ ২২১

[২] বাকী রহিলেন রাজারাম ও শেখ বক্সু; রামমোহনের সঙ্গে বিলাতে যদি তিন জন সঙ্গীই গিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই দুই ব্যক্তি এক না হইয়া যান না, অতএব রাজারাম ও শেখ বক্সু অভিন্ন।

ব্রজেন্দ্র বাবুর এই যুক্তিতে ভুল ধরিবার কিছুই নাই। তবু এইরূপ নিখুঁত যুক্তিতেও কেন আমার সন্দেহের উদ্রেক হইল তাহাই এখন সংক্ষেপে নিবেদন করিব।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে রামমোহন এলবিয়ন জাহাজে বিলাত যাত্রা করেন। ঐ তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' এলবিয়ন জাহাজে যাঁহারা বিলাত যাইতেছিলেন, তাঁহাদের নামের একটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সেই তালিকার অংশ-বিশেষ ব্রজেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধের পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই—"India Gazette: 15 Nov. 1830: Shipping Intelligence: Departure of Passengers: Per ship Albion:—Baboo Rammohun Roy and Servants." কিন্তু এই সংবাদ তিনি অন্যত্র (৮৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায়) একটু পরিবর্ত্তিত আকারে উল্লেখ করিতেছেন, তাহা এই—"Departure of Passengers Albion: Baboo Rammohun Roy, son and servants" The Government Gazette, 15 Nov. 1830. একই সংবাদ দুই যায়গায় দুই ভাবে উল্লেখ করার কারণ কি?

ঐতিহাসিকেরা স্বমতের সমর্থনের অনেক স্থলে অপরের মত বা রচনা উদ্ধৃত করেন; সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ রচনা বা মত উদ্ধৃত করিতে হইবে এমন কোন বিধান নাই। কিন্তু যেখানে মাত্র দুই পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা এক স্থলে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র নাম দিয়া এক রকম ও অন্যত্র 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে'র নাম দিয়া অন্য প্রকারের, এই পাঠভেদই আমার সন্দেহ উদ্রেকের মূল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' ও 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে' যাহা পাইতেছি তাহা কিন্তু ব্রজেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত অংশদ্বয়ের কোনটির সঙ্গেই মিলে না। তাহা এই—"Departure of passengers per ship Albion:—Baboo Rammohun Roy and son, and 4 servants."

পাঠকেরা এই স্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন, মূল প্রবন্ধের যেখানে শেখ বক্সু ও রাজারামকে অভিন্ন প্রমাণের জন্য লেখক বদ্ধপরিকর সেখানে "Baboo Rammohun Roy and servants" কেবল এই টুকুই উদ্ধৃত হইতেছে। পরে রাজারামকে যখন রামমোহনের পুত্র প্রমাণ করিতে যাইতেছেন তখন Baboo Rammohun Roy, son and servants" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।* অধিকন্তু পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য "son" শব্দটি (ইটালিক্সে) মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্র ৪ (চারি) সংখ্যাটি বাদ যাইতেছে। রামমোহনের সঙ্গে তাঁহার পুত্র ও ৪ (চারি) জন ভৃত্য বিলাত গিয়া থাকিলে রাজারাম ও শেখ বক্সু এক না হইলেও চলিতে পারে, শুধু এই কারণেই কি ৪ (চারি) অঙ্কটি আলোচনায় সর্ব্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে?

রামমোহনের সঙ্গে তাঁহার পুত্র ও ৪ জন ভৃত্য গিয়াছিলেন বলিয়া

---

* "রাজারাম ওরফে শেখ বক্সু যে রামমোহনের পুত্র তাহার সপক্ষে প্রমাণ আমি গভর্ণমেণ্ট গেজেটে পাইয়াছি।

জাহাজ ছাড়িবার দিন, ১৮৩০, ১৫ই নভেম্বর, তারিখের গেজেটে 'অ্যালবিয়ন' জাহাজে বিদেশযাত্রীর তালিকায় 'রামমোহন, তাঁহার পুত্র ও ভৃত্য সমভিব্যাহারে বিলাতযাত্রা করিতেছেন' বলা হইয়াছে। রামমোহনের সঙ্গে রামরতন ও হরিচরণ ভৃত্যরূপে গিয়াছিলেন,—বাকি রহিল শেখ বক্সু (এই নাম পাসপোর্টে আছে) সুতরাং ইনি ছাড়া আর কেহই রামমোহনের পুত্র হইতে পারেন না।" পৃ. ৮৪৬

ইণ্ডিয়া গেজেট' ও 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' ব্যতীত আরও কয়েক জায়গায় উল্লেখ আছে, যথা—

(i) ***The John Bull***, Calcutta, Saturday. November 13, 1830..."Baboo Rammohun Roy and son, 4 servants"

(ii) ***Calcutta Magazine***, 1830..."Baboo Rammohun Roy and son, and four servants."

(iii) সমাচার দর্পণ, ২০ নবেম্বর ১৮৩০, ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭— শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারিজন পরিচারক সমভিব্যাহৃত হইয়া আলবিয়ন নামক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক বিলায়তে গমন করিয়াছেন।" ['সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৪, ১৩৪০ বাং মুদ্রিত।]

পুত্র ও ৪ (চারি) জন ভৃত্য সহ রামমোহন বিলাতযাত্রা করেন এই সংবাদ ব্রজেন্দ্র বাবু জানিতেন, অন্ততঃ 'ইণ্ডিয়া গেজেট' ও 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট'র মত তাঁহার মূল প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখিবার সময় জানা ছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। যদি ৪ জন ভৃত্য সহ রামমোহন বিলাতযাত্রা করেন নাই বলিয়া ব্রজেন্দ্র বাবু মনে করেন, তাহা হইলে ইহা উল্লেখ করিয়া ভুল প্রমাণ করিলেই চলিত।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, যিনি বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে 'রাজারাম' বলিয়া পরিচিত এবং বিলাত গিয়াও যিনি ঐ নামেই সর্ব্বত্র আদৃত, হঠাৎ বিলাত যাওয়ার সময় তাঁহার এই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শেখ বক্স্ নামে পাসপোর্ট নেওয়ার কি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? ব্রজেন্দ্র বাবু এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়াই নিম্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—"যে প্রমাণের উপর আমার প্রথম সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া এইটুকু বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে, রামমোহনের বিলাতযাত্রার সঙ্গীগণের পাসপোর্ট হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়—রাজারামের প্রকৃত নাম শেখ বক্স্ এবং এই নাম হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে সে মুসলমান।" পৃঃ ৮৪৫

এলবিয়ন জাহাজের বিলাতযাত্রীদের নামের তালিকাতে রামমোহনের সঙ্গে চারি জন ভৃত্য গিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও যদি ব্রজেন্দ্র বাবু পাসপোর্টের নামত্রয়ই নির্ভুল বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে ইহাই বলিব যে গবর্ণমেণ্ট রেকর্ডস্ বর্ত্তমানে যে আকারে পাইতেছি তাহা সম্পূর্ণ নহে। এলবিয়ন জাহাজে যাঁহারা বিলাত গিয়াছেন বলিয়া ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে উল্লেখ আছে এবং উক্ত জাহাজ বিলাত পৌঁছিলে পর যাঁহাদের নাম বিলাতের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সকলের নাম পাসপোর্টে পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন্‌টি বিশ্বাস করিব?

সম্পাদকের মন্তব্য। লেখকের দুটি বাক্য এবং দুটি প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়াছি। তাঁহার যুক্তির কোন পরিবর্ত্তন করি নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যুত্তর

রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, রামহরি দাস ও রাজারাম—এই তিন জনকে রামমোহন বিলাতযাত্রার সঙ্গী করেন বলিয়া সর্ব্বত্র উল্লিখিত আছে। আমি সরকারী দপ্তরখানায় গবন্মেণ্টের যে নির্দ্দেশ আবিষ্কার করি তাহাতেও তিন জন ব্যক্তিকেই রামমোহনের সঙ্গী হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহাদের নাম দেওয়া আছে—রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস ও শেখ বক্স্। আমি আলোচনা করিয়া দেখাই যে রামহরি দাস এবং হরিচরণ দাস একই ব্যক্তি; সুতরাং 'শেখ বক্স্'ও রাজারামেরই নামান্তর মাত্র (কি কারণে এইরূপ নামান্তর হয় তাহার আলোচনা এখানে করিবার স্থান নাই)। যতীন্দ্র বাবু আমার এই সিদ্ধান্ত মানেন না। তিনি বলেন—শেখ বক্স্ এবং রাজারাম অভিন্ন নাও হইতে পারে, কারণ রামমোহনের সঙ্গে এই তিন জন ব্যতীত আরও দুই জন লোক যে বিলাত গিয়াছিল সমসাময়িক সংবাদপত্রে "চারি জন" ভৃত্যের উল্লেখ হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, নাম ও সংখ্যা যুক্ত সরকারী অনুমতির সংবাদ বেশী বিশ্বাসযোগ্য, না সংবাদপত্রে শুধু যে-সংখ্যার উল্লেখ পাইতেছি তাহা বেশী বিশ্বাস-যোগ্য। কি কি কারণে আমি সরকারী কাগজপত্রের তথ্যকেই নির্ভর-যোগ্য এবং সংবাদপত্রের সংবাদকে অবিশ্বাস্ত বলিয়া মনে করি তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

(১) ডাঃ কার্পেণ্টার রামমোহনের এক জন বিশিষ্ট বন্ধু; রামমোহনের মৃত্যুকালেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার লেখা হইতে জানা যায় যে, এদেশ হইতে যাত্রা করিয়া রামমোহন যখন সর্ব্ব-প্রথম লিভারপুলে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত তিন জন সঙ্গী ছিল। তিনি লিখিয়াছেন:—

> "On the 8th of April, 1831, the Rajah arrived at Liverpool, accompanied by his youngest son, Rajah Ram Roy, and two native servants, one of them a Brahmin;..." (Mary Carpenter's *Last Days*, etc., p. 68.)

রামমোহনের সহিত যদি ইহার অপেক্ষা অধিক পরিচারক গিয়া থাকে, ডাঃ কার্পেণ্টার তাহাদের উল্লেখ করিলেন না কেন? আমরা দেখিতেছি তিনি পরিচারকদের জাতি পর্য্যন্ত নির্ভুল ভাবে উল্লেখ করিতেছেন।

(২) ব্রিষ্টলে রামমোহনের সমাধিকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি তালিকার প্রতিলিপিতেও আমরা রামমোহনের তিন জন সঙ্গীরই—রামরত্ন, রামহরি ও রাজারামের নাম পাই। (*Ibid.*, p. 130.) যতীন্দ্র বাবু যে-অতিরিক্ত দুই জন পরিচারকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, এই ঘটনার সময়ে তাহারা কি অনুপস্থিত ছিল, না ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল?

(৩) সরকারী পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র ব্যতীত জাহাজে বিদেশে যাইবার এখন যেমন উপায় নাই, তখনও তেমনই ছিল না। এই ছাড়পত্রে রামমোহনের তিন জন সঙ্গীর বিলাত যাইবার অনুমতি আছে। তাহা হইলে আরও দুই জন লোক অনুমতি ব্যতীত বিলাত গেল কি করিয়া?

(৪) যতীন্দ্র বাবু যে-সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছেন, অর্থাৎ পুত্র ও চারি জন পরিচারক সমভিব্যাহারে রামমোহন বিলাত যাইতেছেন—তাহা ঠিক একই আকারে এদেশের একাধিক সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একই জায়গা হইতেই সংবাদটি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রেরিত হইয়াছিল; অথবা একখানি কাগজে সংবাদটি প্রথমে প্রকাশিত হয়, তাহার পর অন্য কাগজগুলি সেই সংবাদের পুনরাবৃত্তি করে।* কেহ যেন মনে না

* যতীন্দ্র বাবু 'সমাচার দর্পণ' হইতে যে-জাহাজী সংবাদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও 'সমাচার দর্পণে'র নিজস্ব নহে, অন্য ইংরেজী সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৪ দ্রষ্টব্য।

করেন, সব কাগজই স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া রামমোহনের পরিচারকদের সংখ্যাটি ছাপিয়াছে? সংবাদটি কোন কাগজে ১৩ই নভেম্বর, কোন কাগজে বা ১৫ই নভেম্বর প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা হইলে সংবাদটি যে মুদ্রণের জন্য ১৩ই নভেম্বরের এবং রামমোহনের যাত্রার দুই-তিন দিন পূর্ব্বেই সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে পৌঁছিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু রামমোহন তাঁহার তিন জন সঙ্গীর পাসপোর্ট লন যাত্রার দিনই—১৫ই নভেম্বর। সুতরাং এই ছাড়পত্র বাতিল করিয়া পুনরায় যে তিনি পুত্র ও চারি জন পরিচারকের জন্য নূতন ছাড়পত্র লইয়াছিলেন—এরূপ অনুমানের অবকাশ নাই। এই কারণে মনে হয়, সংবাদপত্রে ২ স্থলে ৪ জন পরিচারক ছাপা হইয়াছে (ইংরেজী হাতের লেখায় "২"কে "৪" বলিয়া ভুল করা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়) এবং এই ভুল অন্যান্য কাগজেও সঞ্চারিত হইয়াছে, অথবা গোড়ায় হয়ত চারি জন পরিচারকের যাইবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত ঠিক ঐ সংখ্যক পরিচারকের যাওয়া হয় নাই।

যতীন্দ্র বাবু দু-চারিটি সমসাময়িক সংবাদপত্রে চারি জন ভৃত্যের উল্লেখ পাইয়া এই তথ্য ও যুক্তিগুলি প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই। তাহা ছাড়া পাসপোর্টের প্রসঙ্গে গবর্ন্মেণ্ট রেকর্ডস্ সম্পূর্ণ নয় বলিয়া তিনি যে-মন্তব্য করিয়াছেন তাহার অর্থও বুঝিতে পারিলাম না। তিনি কি বলিতে চান যে, আমি যে-অনুমতিপত্র দেখিয়াছি তাহা ছাড়া রামমোহনের যাত্রা-সংক্রান্ত অন্য অনুমতিও লওয়া হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে তাহার চিহ্ন সরকারী দপ্তর হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? একই যাত্রার সঙ্গীদের মধ্যে তিন জনের জন্য অনুমতি এক তারিখে লইয়া অপর দুই জনের জন্য অনুমতি অন্য সময়ে লওয়া হইয়াছিল, বা সরকারী দপ্তরে তারিখ-অনুযায়ী সাজান ও বাঁধাই করা সম্পূর্ণ "Body Sheet" হইতে কেবল রাজারাম ও আর এক জন ব্যক্তির বিলাত যাইবার অনুমতির চিহ্ন লোপ পাইয়া গিয়াছে, ইহা সাধারণ বুদ্ধিতে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তবে যাঁহারা রাজারাম ও শেখ বক্সু ভিন্ন ব্যক্তি প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

এই গেল আসল প্রশ্নের কথা। ইহা ছাড়া যতীন্দ্র বাবুর আলোচনায় এরূপ একটা ইঙ্গিত আছে যে আমি চারি জন ভৃত্যের কথা জানিয়াও রাজারাম-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করি নাই। ইহার উত্তরে জানাইয়া রাখি যে, যে-কাগজে রাজারাম সম্বন্ধে বাদানুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই 'প্রবাসী' পত্রেই, যতীন্দ্র বাবুর আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বেই, ১৩৩৮ সালের আষাঢ় সংখ্যায় "সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের কথা" প্রবন্ধে "চারি জন" পরিচারক সমভিব্যাহারে রামমোহন ও তাঁহার পুত্রের বিলাতযাত্রার সংবাদ আমিই প্রকাশ করি। এই প্রবন্ধের ইংরেজী অংশ আবার ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রে (১৯৩০, ৬ই ডিসেম্বর) প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়া আমার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১৩৪০ সাল) পুস্তকের ২য় খণ্ডেও সংবাদপত্র হইতে এই সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যতীন্দ্র বাবু এই জাহাজী সংবাদটি তাঁহার আলোচনায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রাজারাম-সম্পর্কিত প্রবন্ধে এই "চারি জন" পরিচারকের ভুল সংবাদ উদ্ধৃত করিলে উহা কেন ভুল তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমায় দীর্ঘ প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘতর করিতে হইত—ইহাই সেই প্রবন্ধে এই মহামূল্যবান তথ্যটিকে "গোপন" করিবার একমাত্র কারণ।

"উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য"

শ্রীহিরণ্ময় মুন্সী

গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে শ্রীকুমুদবন্ধু সেন মহাশয় 'উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য' প্রবন্ধে সন্ন্যাস লইবার পর মহাপ্রভুর নীলাচলযাত্রার সত্যতায় যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভঞ্জনার্থে গত জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র আলোচনা-বিভাগে শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবিকর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের কড়চার কাহিনীই অধিক সত্য বলিয়া মনে করি। প্রভাত বাবু এ-সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই কেন বুঝিলাম না। গোবিন্দদাস স্পষ্টই বলিয়াছেন—সন্ন্যাস লইবার পর—

> শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু মাতার চরণে।
> প্রণাম করিয়া কথা কন্ সন্তর্পণে॥
> দুই চারি বাত্ কহি মায়া কাটাইয়া।
> দক্ষিণে করিলা যাত্রা সকলে ছাড়িয়া॥
> ঈশান, প্রতাপ, গঙ্গাদাস, গদাধর।
> প্রভুর সহিত চলে আর বাণেশ্বর॥

ইহার পরে মেদিনীপুরের পথে মহাপ্রভু ধীরে ধীরে নীলাচলে চলিয়াছেন। পথে নারায়ণগড়ে ধলেশ্বর শিব দর্শন করিয়া সুবর্ণরেখার ধারে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে হরিহরপুর, বালেশ্বর, নীলগড় হইয়া বৈতরণী, মহানদা প্রভৃতি অতিক্রম পূর্ব্বক সাক্ষীগোপালে গোপাল দর্শন করিলেন। অবশেষে আঠারনালায় পৌঁছিয়া পুরীর শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দেখিয়া ভাবাবেশে ধূলায় লুটাইলেন। সুতরাং গোবিন্দের কড়চার সত্যতা স্বীকার করিলে এ-সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না; কারণ গোবিন্দ সন্ন্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতেই প্রভুর সঙ্গে ছিলেন এবং দক্ষিণ-ভ্রমণে তিনিই প্রভুর একমাত্র সঙ্গী।

"বিজ্ঞানের পরিভাষা"

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী

আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় Apparatus, Inert, Emulsion, Frequency, Aurora, Röntgen-rays, Observer, Eliminated ও Logic-এর প্রতিশব্দ দিতে গিয়া, যথাক্রমে 'পরীক্ষা-যন্ত্র,' 'নিষ্ক্রিয়,' 'ঘোল', 'দ্রুততা,' 'মেরুজ্যোতি,' 'রাণ্টগেন-রশ্মি',* 'দর্শক,' 'নিরাকৃত' ও 'যুক্তিশাস্ত্র' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'যন্ত্রপাতি,' 'জড়,' 'ইমালশন,' 'পৌনঃপুন্য,' 'মেরুপ্রভা,' 'রাণ্টগেন-রশ্মি,' 'পর্য্যবেক্ষক,' 'অপসারিত' ও 'ন্যায়শাস্ত্র' শব্দ ব্যবহার করিলে কেমন হয়?

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় Phenomenon শব্দের প্রতিশব্দ 'ব্যাপার' এবং Phenomena শব্দের প্রতিশব্দ 'লীলা' করিয়াছেন। Phenomenon শব্দের অর্থ 'ব্যাপার' হইলে Phenomena শব্দের অর্থ কেন 'লীলা' হইবে, তাহা বোধগম্য হইল না।

*Röntgen নামের প্রকৃত উচ্চারণ 'রাণ্টগেন'। বাংলায় এই উচ্চারণ পরিবর্ত্তন করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। —লেখক।

"বাঙ্গালার চরিত্র"

শ্রীসত্যাশ্রয়ী

"প্রবাসী"র গত আষাঢ় সংখ্যায় বাঙ্গালীর চরিত্র নামক প্রবন্ধটি পড়িলাম। লেখকের মতে, "ব্যক্তিত্বের অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে আজ বাংলা দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া নূতন কোন প্রতিষ্ঠান, কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না।"

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বাঙ্গালীর গড়া তিনটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন;—কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ও কংগ্রেসী 'করপোরেশন' এবং বোলপুরের শান্তিনিকেতন। তাঁহার মতে, "ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এই তিনটির মধ্যে ব্যক্তিত্ববাদী অসামাজিক বাঙ্গালীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠান কয়েকটি অসংখ্য লোকের বহুমুখী সম্মিলিত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নহে।"

যে তিনটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান লেখক কর্ত্তৃক এক সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে করপোরেশন আদৌ চিত্তরঞ্জনের সৃষ্টি নহে। তিনি ইংরেজের আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত একটি গড়া জিনিষ হাতে পাইয়াছিলেন মাত্র। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূলতঃ ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং ইহার গঠনের নিন্দা ও প্রশংসা সুরেন্দ্রনাথের প্রাপ্য। তবে বর্ত্তমান কংগ্রেসী দলের হাতে ইহা আসার মূলে দেশবন্ধু ছিলেন বটে। ইহার আধুনিক আদর্শ ও কার্য্যপদ্ধতির প্রশংসানিন্দাও অংশতঃ তাঁহার প্রাপ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ইহাকে কোনও মতেই 'মহাশক্তিশালী বাঙ্গালীর একটি কীর্ত্তি' বলা চলে না। ইহার কোন-কোন অংশ বাঙ্গালীর কীর্ত্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু এখানেও 'মহাশক্তিশালী বাঙ্গালীর' কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অবলম্বিত রাষ্ট্রনীতি লঙ্ঘন করিয়া চলিবার শক্তি ছিল না ও নাই।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত বোলপুরের শান্তিনিকেতন। প্রতিষ্ঠানটি প্রকৃত পক্ষে 'মহাশক্তিশালী বাঙ্গালীর কীর্ত্তি' ও মূলতঃ রবীন্দ্রনাথেরই "প্রাতচ্ছবি"। কিন্তু ইহার মধ্যে 'ব্যক্তিত্ববাদী অসামাজিক' বাঙ্গালীর হাতের পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, তাহাই বিবেচ্য। করপোরেশনে চিত্তরঞ্জনের বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের সহিত একযোগে কর্ম্ম করার সুযোগ আমার ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আমার অধিকার নাই।

বোলপুরের শান্তিনিকেতনের কার্য্যপ্রণালী দীর্ঘ কাল ধরিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিবার সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম। অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, যে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখকের এই অভিযোগ একান্তই অমূলক। রবীন্দ্রনাথ একচ্ছত্র ব্যক্তিত্ববাদের উপাসক হইতে পারেন, কিন্তু শান্তিনিকেতনের সৃষ্টির ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের স্বল্প মাত্র পরিচয়ও ঘটিয়াছে, তাঁহারা জানেন, এই প্রতিষ্ঠানটির মূলে রবীন্দ্রনাথের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা লেখকবর্ণিত ব্যক্তিত্ববাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণ বিদ্যালয়ের সমুদয় কার্য্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যাহাতে নিজেরাই চালাইতে পারে, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান উদ্দেশ্য। আশ্রমের পরিচ্ছন্নতা, তাহার সৌন্দর্য্যসাধন, অতিথিসেবা, আহারের ব্যবস্থা—এই সমুদয়ই ছাত্রসঙ্ঘের উপর ন্যস্ত ছিল। অধিকন্তু ছাত্রদের পরিচালনা, ত্রুটি-বিচ্যুতির দণ্ডবিধান,—যাহা তৎপূর্ব্বে আর কোন দেশে কোন বিদ্যালয়ে কখনও পরীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি, এমন সমস্ত বিষয়েও ছাত্রসঙ্ঘের উপরেই ভার ন্যস্ত ছিল, এবং আছে। শিক্ষা-বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক—আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতির শিক্ষকগণও, রবীন্দ্রনাথের এই নীতির প্রশংসা করিয়াছেন। কেহ কেহ এ-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশও করিয়াছেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হন নাই।

বাংলা দেশে সমুদয় বিদ্যালয়ের নীতি ছিল শৃঙ্খলার বলে কঠোর শাসন (strict discipline)। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে একটি বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ছেলেরাই সভা করিয়া নিয়ম প্রণয়ন করিত, নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করিত, নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে তাহারা দণ্ড বিধান করিত এবং এখনও করে, তাহারা আহার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করিত। পাকশালার বন্দোবস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিত। শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিত। এই সকল বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কিংবা তাঁহার সহযোগী শিক্ষকদের কর্ত্তৃত্বের কোনরূপ অবকাশ ছিল না।

শুধু ছাত্রদের নিজেদের বিষয় লইয়াই নহে, তাহাদের পারিপার্শ্বিক সমস্ত সামাজিক জীবনে তাহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা যাহাতে প্রস্ফুটিত হয়, ছাত্রেরা যাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে অভ্যাস করে, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ছাত্রগণ সম্মিলিত হইয়া দরিদ্রভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল, এবং ছাত্রগণই নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া আসিয়াছে।

বিদ্যার্থীদিগের সৃষ্ট এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান আজও বর্ত্তমান আছে।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল যে, ছেলেরা তাহাদের প্রয়োজনের নিমিত্ত ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবে, ছেলেরাই সেই ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিবে; এবং আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধির জন্য মিউনিসিপ্যালিটির ন্যায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবে। এই রূপে তাঁহার কল্পনা বিভিন্ন দিকে কত প্রচেষ্টার সৃষ্টি করিয়াছে। অনেক সময় তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা তাঁহার অনিচ্ছা বা অবহেলা প্রযুক্ত নহে। এই সকল চেষ্টার মূলে ছিল ছাত্রগণ যাহাতে সম্মিলিত হইয়া সামাজিক জীবন বিকাশে সমর্থ হয়, সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা! ইহাকে কি একটিমাত্র মানুষের ব্যক্তিত্বের উপাসনা বলে? শান্তিনিকেতনে একটি কোঅপারেটিভ ষ্টোরস্ বর্ত্তমান আছে। ইহার প্রথম সম্পাদক ছিল এক জন ছাত্র। ডিরেক্টরগণের মধ্যে দুই জন ছাত্র রাখা নিয়ম ছিল। অনেক দিন পরে কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তিতে এই নিয়ম পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু গোড়ার কথা ছিল ছাত্রগণ যাহাতে সমবায়-নীতিতে অভ্যস্ত হয়। অধ্যাপকবর্গসমেত সমগ্র আশ্রমের অন্নবস্ত্র আদি আবশ্যক সামগ্রী সকলের সমবেত চেষ্টায় উৎপন্ন হইবে, এই প্রস্তাব এবং চেষ্টাও রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন। চেষ্টা ফলবতী না হইবার কারণ তিনি নহেন।

বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে যে পর্য্যন্ত না রবীন্দ্রনাথ রেজিষ্টরী করিয়া সম্পত্তির সহিত বিদ্যালয়টি সাধারণের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, তত দিন পর্য্যন্ত ইহার পরিচালনার জন্য সমস্ত অধ্যাপক লইয়া একটি সমিতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে উপস্থিত থাকার সময়ে অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে তিনি অনেক আবশ্যক কার্য্যও ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু আশ্রমে উপস্থিত থাকিতে অধ্যাপক-সভায় উপস্থিত হন নাই ইহা কখনও দেখি নাই। আশ্রমসংক্রান্ত প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়, প্রত্যেক বিদ্যার্থীর স্বাস্থ্য, পাঠোন্নতি, চরিত্র প্রভৃতির আলোচনা এই সমিতিতে হইত। এই সময় দীনতম অধ্যাপকও অসঙ্কোচে তাঁহার মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কি অসীম ধৈর্য্যের সহিত রবীন্দ্রনাথ যে এই খুঁটিনাটি আলোচনায়

যোগ দিতেন, তাহা ভাবিলে আমি বিস্মিত হইয়া যাই। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ কখনও আপন মত প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হন নাই; পক্ষান্তরে কত সময় দেখিয়াছি, অধ্যাপকগণেরই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই অধ্যাপকগণের মধ্যে কাহারও কোন বিশেষত্ব দেখিলে তাহার উন্মেষ পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন না। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়, ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ৺জগদানন্দ রায় প্রভৃতির প্রত্যেককে রবীন্দ্রনাথ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন প্রচেষ্টার মূল কথা কি? "সমাজ গড়িতে হইলে যে-সকল সামাজিক গুণ আয়ত্ত করিতে হইবে, যেগুলি ইংরেজ-শাসনের পূর্ব্বে ছিল অথচ এখন লোপ পাইয়াছে," সেইগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই তিনি যে বিপুল আয়োজন ও চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা আজও সর্ব্বসাধারণের সুবিদিত না হইয়া থাকিলে তাহা দুঃখের বিষয়। শ্রীনিকেতনের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সমবায়-নীতিতে তাহাদের যে-সমস্ত স্বাস্থ্যসমিতি তিনি স্থাপন করাইয়াছেন, এবং সাঁওতালদিগের বিদ্যালয়, তাহাদিগের কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ স্থাপন করাইয়াছেন, এই প্রকার সকল বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিলে তাহা পরিতাপের বিষয়।

শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের গঠনমূলক প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আমাদিগের সাবেক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ব্যর্থতা আমাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। পাবনা কন্‌ফারেন্সের পূর্ব্ব হইতেই তিনিই প্রথম স্বাবলম্বনের সার্থকতা তাঁহার জীবন্ত জ্বলন্ত ভাষায় সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করেন। ভিক্ষায়াম্ নৈবচ নৈবচ, তাঁহারই দেওয়া মন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ, তদনুযায়ী কার্য্যপদ্ধতি রচনা ও তাহাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা দেশবন্ধুর গঠনমূলক পদ্ধতির এবং কংগ্রেসের ও মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক পদ্ধতির অনেক আগেকার কথা। তাঁহার কোন কোন স্থানের ও দিকের চেষ্টা ও আয়োজন কেন অন্যদের দোষে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বলিবার সময় ও স্থান ইহা নয়। সমাজ নামক কোন অশরীরী বস্তুতে তিনিই প্রথম বিদেশী আমলাতন্ত্রের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। শুধু বক্তৃতায় নহে, শুধু লেখায় নহে, তাঁহার সমস্ত চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহা ভবিষ্যৎ বংশ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইবে।

বাংলার লবণ-শিল্প

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

বাংলা দেশে এক সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত। ইহা ইতিহাস হইলেও, বাংলার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ভুলিলে চলিবে না। ভিক্টোরিয়ার যুগের বহু বিদেশী গ্রন্থ হইতেও আমাদের দেশের তদানীন্তন লবণ-শিল্পের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমান-আমলে বহু দিন হইতে নিম্নবঙ্গে, বিশেষতঃ হিজলী প্রদেশে, বিস্তৃত ভাবে লবণ প্রস্তুত হইত। সমুদ্র-তীরবাসীদের মধ্যে ইহা একটি কুটীরশিল্প হিসাবে সেদিনও পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিল। মেদিনীপুর ও সুন্দরবন ছিল লবণ-ব্যবসায়ের প্রধান আড্ডা। তাহা ছাড়া ব্যাপক ভাবে বণিক-সম্প্রদায় এই প্রদেশে লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকিতেন। খালাড়ি হইতে অতি সহজে লবণ লইয়া যাইবার জন্য বন্দরওলাচরের সম্মুখ ভাগ হইতে সাক্রাইলের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র খাল কাটা হইয়াছিল। লবণ-বাণিজ্যের অস্তিত্বে এই খালকে তখনকার লোকে বলিত নিমকির খাল। হিজলীতে যে-সমস্ত স্থানে লবণ-কারবার ছিল সেই স্থানকে নিমক্-মহাল বলা হইত। বাংলার শাসনকর্ত্তা সুলতান সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে এই নিমক্-মহালের উল্লেখ পাওয়া যায়। নবাবী আমলে হিজলীর কারবার পরিচালনা করিতেন নবাব-সরকারের অধীন কয়েক জন জমিদার।* এই লবণ ছিল নবাব-সরকারের অন্যতম প্রধান আয়ের বস্তু কারণ লবণের উপর শুল্ক বসান হইয়াছিল, যদিও অধুনা ইংরেজ-শাসকের লবণ-শুল্কের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। যাহা হউক, বাংলার এই ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যবসায়ে হিজলী প্রদেশে কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, মুলতানী, ভাটিয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক সওদাগরগণ এখান হইতে লবণ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন।

* 5th Report on East India Affairs, Vol. II, Firminger.

সাধারণতঃ ভিজা মাটির দেশ বলিয়া কার্ত্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুত হইত। বর্ষাকালে যে-সমস্ত জমি সমুদ্রের জোয়ারে ধুইয়া যাইত সেই সমস্ত লবণাক্ত ভূমি বা 'চর' হইতে লবণ প্রস্তুত হইত। এই চরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্ত অংশগুলিকে বলিত খালাড়ি। কথিত আছে, নবাবী আমলে সুদ্ধ মেদিনীপুর জেলাতেই প্রায় চল্লিশ হাজার খালাড়ি ছিল। প্রতি খালাড়িতে সাত জন করিয়া শ্রমিক নিযুক্ত হইত। তাহারা গড়ে প্রায় আড়াই-শ মণ লবণ প্রস্তুত করিত। এই শ্রমিকগুলিকে তখনকার লোকে বলিত মলঙ্গী।* শুনা যায় এক কালে প্রায় ৫৩ হাজার মলঙ্গী শ্রমিক বাংলা ও উড়িয়্যার সমুদ্র-কূলে লবণ প্রস্তুত করিত। কথিত আছে, হিন্দু রাজত্ব-কালেও এই লবণ-বাণিজ্য বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

মলঙ্গীরা উপরিউক্ত লবণাক্ত মাটি হইতে লবণাংশকে পরিস্রুত করিয়া আগুনে ফুটাইয়া লবণ বাহির করিত। আগুনের জন্য নিকটস্থ বন হইতে কাঠ সংগ্রহ করা হইত এবং চুল্লীর কাঠের জন্য ঐ সমস্ত বনজঙ্গলকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করা হইত। তৎকালীন লোকেরা এই বনকে বলিত 'জলপাই' অর্থাৎ জল বা জলন—জ্বালানী কাঠ (উড়িয়া ভাষায়)+পাই—পাইবার স্থান। নবাব-সরকার হইতে ঐ সমস্ত মলঙ্গীদিগের এক শত মণে বাইশ টাকা পারিশ্রমিক ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে-সমস্ত জমিদারের অধীনে ইহারা কার্য্য করিত, তাঁহারা যে-ছয় মাস লবণ প্রস্তুত হইত সেই ছয় মাস পারিশ্রমিক দিতেন আর বাকী ছয় মাস চাষবাস করিয়া অন্ন-সংস্থান করিবার জন্য তাহাদের জমি দিতেন। এই জমিদারগণ ব্যবসায়ীদিগের নিকট ৬০৲ পর্য্যন্ত দরে এক শত মণ লবণ বিক্রয় করিতেন। যে-সমস্ত বণিক লবণ লইয়া বাণিজ্য করিতেন তাঁহারা অনেক স্থলে নবাব-দরবারে গৌরবান্বিত হইতেন। কয়েকটি বণিক বকর-উল-তজ্জব বা মালিক-উল-তজ্জব প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।†

* দেশাবলী বিবৃতি—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

† Statistical Account of Bengal by Hunter—Vol. III, Midnapore.

পলাশী-যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে অর্থাৎ ইংরেজ এদেশের কর্ত্তা হইবার পর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার তদানীন্তন নামমাত্র নাজিমকে এদেশের লবণ, সুপারি ও তামাকুর বাণিজ্যের উপর এক কঠোর আইন জারি করিতে বাধ্য করেন। বোল্ট (Bolt) এ-বিষয়ে তাঁহার *Consideration of Indian Affairs*এ যথেষ্ট নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। এই আইন এতই বাধ্যতামূলক এবং কঠোর হইয়াছিল যে তাহার ফলে বাংলার লবণ-শিল্প ধ্বংসোন্মুখী হইল। এই আইনের কথা বিলাতে পৌছাইতে দেরি হইল না। সেখানে কোর্ট-অব-ডিরেক্টরস' কোম্পানীর এই একচেটিয়া রীতি (salt monopoly) মঞ্জুর না করিয়া, তাহা তুলিয়া দিবার জন্য কড়া হুকুম জারি করিলেন। কিন্তু অত দূর হইতে তাঁহারা কি করিবেন, ক্লাইভ্ ও কলিকাতা-কাউন্সিলের সভ্যগণ ইহা সত্ত্বেও ট্রেডিং এসোসিয়েশুন বা একটি বণিক-সভা স্থাপন করিলেন। তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে প্রতি লবণ কারখানার মালিককে এই এসোসিয়েশনের নিকট সর্ব্বপ্রথম শত মণ পিছু ৭৫৲ টাকায় বিক্রয় করিতে হইবে, এবং এসোসিয়েশন সেই লবণ দেশীয় মহাজনদের পাঁচ শত টাকায় শতকরা মণ বিক্রয় করিবেন অর্থাৎ মহাজনরা এই জমিদারগণের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে লবণ কিনিতে পাইবে না।‡ এই কঠিন আইনের মর্ম্মে যে সমস্ত পরোয়ানা জমিদারবর্গের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তাহার একটি তুলিয়া দিলাম—

"Be it undersood that a request has been made by the Government and the gentlemen of the Committee and Council to this purpose that until the contracts for salt of the said gentleman unsettled, *no salt shall be made* or got ready in any District; that a gomasta be sent to attend on the said gentleman and having given a bond, he may then proceed to his business and make salt but till the bond be given to the Governor.........Without delay give your bond and settle your business and then proceed to the making of salt. In case of delay it will be for your good.

এই কঠিন চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

‡ নন্দকুমার—চণ্ডীচরণ সেন

কোম্পানী দেশীয় জমিদারগণকে হীনবল করিয়া তুলিল। এইরূপ অযথা চুক্তিতে কেহই লবণ প্রস্তুত করিতে সাহস করিলেন না এবং এইরূপ অসম্ভব দরে লবণ ক্রয় করিয়া বাণিজ্যে লাভ করা মহাজনদেরও সম্পূর্ণ দুষ্কর হইয়া উঠিল। ইহার ফল হইল যে এদেশীয় বহুসংখ্যক বণিক তাঁহাদের লবণ-বাণিজ্য ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিলেন এবং জমিদারগণও লবণ প্রস্তুত করিবার ভার ছাড়িয়া দিলেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রমশঃ নিজে একচেটিয়া ভাবে এই ব্যবসায় গ্রহণ করিলেন। কোম্পানীর নূতন পরিচালনায় বহু বাঙালী কাজ করিয়া ও দালালী করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোম্পানীর এই নিষ্পেষণে কি অমূল্য সম্পদ যে তাঁহারা হারাইয়াছিলেন তাহা আজ বুঝিতে পারিতেছি।

ইহার পর দেশীয় জমিদারগণ ও মহাজনগণ লবণ প্রস্তুত করা ও লবণের বাণিজ্য এক প্রকার ছাড়িয়া দিলে এবং সমগ্র লবণ-খালাড়ি কোম্পানীর আয়ত্তে আসায় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী একটি লবণ-বিভাগ খুলিলেন। জমিদারগণ তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট মালিকানা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কোম্পানীকে লবণ-প্রস্তুতি বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে এইরূপ এক সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয়। অবশ্য তাহার জন্য কোম্পানী তাঁহাদের কিছু মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত লবণ-বিভাগের অধীনে লবণ প্রস্তুত করিবার স্থানে স্থানে একটি লবণ-প্রতিনিধি বা এজেণ্ট থাকিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের মত তাঁহাদের অনেকটা ক্ষমতা দেওয়া ছিল। এই লবণ-বিভাগে বহু ইংরেজ ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ম্ম করিতেন। কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারের, ৺লালমোহন, রাধামোহন, দ্বারকনাথ ঠাকুর এই বিভাগের দপ্তরে কর্ম্ম করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এইরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার লবণ-শিল্প একপ্রকার কোম্পানীর সম্পূর্ণ করতলগত হইয়া আসিল। ১৭৯৪ সালে একটি নাম মাত্র বাৎসরিক জমা ধার্য্য করিয়া কোম্পানী লবণ প্রস্তুত করিবার স্বদেশীয় সমস্ত খালাড়ি অধিকার করিয়া লয়।

এই সমস্ত কঠিন নিয়মের চাপে স্বদেশী লবণের দর ভীষণ চড়িয়া উঠিল। কোম্পানী নিজেও তাহাদের একচেটিয়া লবণ-বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার উপর বাজারে এই লবণ আমদানী করিবার পূর্ব্বে প্রতি মণে প্রায় তিন সাড়ে-তিন টাকা শুল্ক দিতে হইত। অগ্নিমূল্যে লবণ ক্রয় করা দরিদ্র বঙ্গবাসীর পক্ষে একপ্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কোম্পানীর ত একেই লবণ হইতে নাম মাত্র আয় হইত তাহার উপর এই সঙ্গীন অবস্থায় তাহারা কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। এই সময়ে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে সুলভে রৌদ্রতেজ-সাহায্যে লবণ প্রস্তুত হইত এবং তাহার উপর শুল্কও তুলনায় অনেক কম ছিল বলিয়া দিন-কয়েক কোম্পানী বাংলার লবণ ছাড়িয়া অল্পদামে এই লবণ বেচিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এদিকে কোম্পানীর স্বজাতি ও স্বদেশীয় ইংরেজ বণিকগণ বহুদিন ধরিয়া বাংলার লবণের বাজারের প্রতি ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিলেন। ১৮৩৫ সাল হইতেই চেশায়ারের লবণ বাজারে আমদানী হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম অবশ্য ইংলণ্ডের লবণের উপর, বাংলার নিজস্ব লবণেরই ন্যায় সমান শুল্ক বসান হইয়াছিল, কিন্তু বিলাতী লবণ ক্রমশঃ কম দামে বিক্রয় হওয়াতে স্বদেশী লবণ প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিল না—লোকে প্রচুর পরিমাণে বিলাতী লবণ ব্যবহার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কোম্পানী ও তাঁহাদের স্বদেশী বণিকভ্রাতারা বিলাতী লবণে সমগ্র বাংলার বাজারকে গ্রাস করিতে সচেষ্ট হইলেন। কোম্পানীও বুঝিলেন যে তাঁহাদের নিজস্ব সঙ্কীর্ণ স্বার্থ অপেক্ষা ইংলণ্ডের এত বড় একটা বাজার সৃষ্টি করিলে মন্দ হইবে না। এই মতলব সফল করিতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার অজুহাতে লবণ প্রস্তুত করিবার খরচের ঘাড়ে রাজস্ব-আদায়ের খরচা-সুদ্ধ অযথারূপে চাপাইয়া এদেশজাত লবণের বর্দ্ধিত মূল্যকে অসম্ভব মূল্যে পরিণত করিলেন। ইহাতে ব্রিটিশ বণিকের কি দারুণ সুবিধা হইল তাহা আশা করি পাঠককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এই স্থলে স্বর্গীয় রমেশ দত্ত মহাশয়ের নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

"But in working out the principle, the Company went too far, and gave an undue advantage to the British manufacturer. For they included the expenses of securing and protecting revenues in the "cost price" and added to the selling price of the Bengal salt. The British manufacturer obtained the full advantage of this blunder, and the sale of British salt went up by leaps and bounds." (India in the Victorian Age, p. 145.)

এতদিন পর্য্যন্ত ইহা কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায় হইলেও বাঙালী নিজের ঘরে লবণ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছিল ; কিন্তু এইবার তাহা বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। ধ্বংসের পথে আসিয়া এই শিল্পের এবং এবং শিল্পাশ্রয়ী ব্যক্তিগণের এরূপ দুর্গতি হইল যে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী বঙ্গদেশে দেশীয় লোকের দ্বারা লবণ প্রস্তুত করা আইনের সাহায্যে বন্ধ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের জন্য বিলাতে হাউস-অব-কমন্স্ কতকটা দায়ী হইলেও তাঁহারা এতটা পেষণের ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা বিলাতী লবণ ও বঙ্গদেশজাত লবণ উভয়কেই সমানভাবে বাজারে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি অতদূর হইতে তাঁহাদের নির্দ্দেশ কখনই কার্য্যে পরিণত হইত না।

কোম্পানীর এই অযথা ও নির্দ্দয় কার্য্যে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী লিখিয়াছেন—

"The Government, in my opinion, should be far less ashamed of confessing that it has committed a blunder than of showing reluctance to remedy an injustice lest it should at the same time be convicted of having previously blundered."

তাঁহার মত অনুযায়ী ভারতীয় লবণকে বিলাতী লবণের সহিত ভালভাবে প্রতিযোগিতা করিবার সুযোগ দিবার জন্য কোর্ট-অব-ডিরেক্টরসে একটি রেফারেন্স হয়। কিন্তু চতুর ইংরেজ বণিক ও লবণ-প্রস্তুতকারকগণ একজোট হইয়া এক বিরাট আন্দোলন সুরু করিয়া দিল। তাহারা সমগ্র ভারতবর্ষকে তাহাদের প্রস্তুত লবণ জোগাইবার প্রার্থনা চাহিয়া বসিল এবং তাহাদের আমদানী লবণের উপর কোম্পানীর আমদানী-শুল্ক পর্য্যন্তও তুলিয়া দিবার জন্য কোর্ট-অব-ডিরেক্টরসে এক আবেদন করিয়া দিল। বুদ্ধিমান সহৃদয় ভারতবন্ধু এই বণিক-সম্প্রদায় অনুকম্পার স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমাদের সুন্দর পরিষ্কার লবণ ভারতবাসীকে ব্যবহার করিতে না দিলে উহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে, অতএব যে বর একবার প্রদান করা হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া ভাল হইবে না।"

দেশীয় লবণের উপর অযথা দর চাপাইয়া রাখিতে বিলাতের বণিকগণ যেমন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, আমাদের বাংলা দেশেও তেমনই আবার ইহার বিরুদ্ধে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশ তখন সম্পূর্ণ পরাধীন, তাহার উপর মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনে তাহার কণ্ঠস্বর এতই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল যে তাহাদের সেই চীৎকার বিলাতে কর্ত্তাদের কানে পৌঁছাইলেও কোন কাজ হয় নাই। সকলেরই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া লবণ-কর রহিয়া গেল। বিলাতী লবণ এই কর দিয়াও সুলভ মূল্যে বাজারে বিক্রীত হইয়া এদেশজাত লবণকে একেবারে কোণঠাসা করিয়া দিল।

স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব ও অন্যান্য দেশহিতৈষিগণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হইতে এই অন্যায় শুল্ক তুলিয়া দিবার জন্য এক আবেদন করেন।

"...But as salt is the necessary of life, the duty on salt should be entirely taken off as soon as possible."*

অতএব দেখা যাইতেছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোম্পানীর অনুচিত লবণ-শুল্ক-দ্বারা সারা ভারতবর্ষের সহিত বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন কালের অমূল্য সম্পদ লবণ-শিল্প প্রায় এক শত বৎসরের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। বিলাতী চা, বস্ত্র, রেশম, পশম, কলকব্জা প্রভৃতির সহিত বিলাতের লবণও ক্রমে ক্রমে ভারতের সমগ্র বাজার গ্রাস করিয়া লইল। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা বুঝা যায়।†

* Common's First Report, 1853.

† *India in the Victorian Age*, p. 145.

কলিকাতার বাজারে বিলাতী লবণ (মণ-হিসাবে)

১৮৪৫-৪৬	১৮৪৬-৪৭	১৮৪৭-৪৮	১৮৪৮-৪৯	১৮৪৯-৫০	১৮৫০-৫১	১৮৫১-৫২
৫০২,৬১৬	৩১২,৮৩৫	৭৫২,৯৯৮	৪৫৯,৮০৩	৬৯৪,৪৪৭	১,০৯২,৬৯৮	১,৮৫০,৭৬২

লবণের উপর সাধারণ ভাবে যে শুল্ক বসান হইয়াছিল তাহা প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র বাঙালীর উপর পেষণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে। এই সমস্ত কর সম্বন্ধে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী বলিয়াছিলেন—

"...What a humiliating confession to say that after the lengths of the British rule the people of India are in such wretched plight, that they have nothing that the Government can tax and that Government must therefore tax an absolute necessity of life to an inordinate extent......"—*Poverty and un-British rule in India*, p. 215.

বাংলার সমুদ্রকূলে লবণ প্রস্তুত করিয়া বঙ্গবাসী অতি অল্প ব্যয়ে লবণ ব্যবহার করিতে পারিত, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে চতুর্গুণ শুল্ক দিয়া বাজারে মহামূল্য পদার্থ হিসাবে নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় এই লবণ বঙ্গবাসীকে ক্রয় করিয়া খাইতে হইল। স্বদেশের হাত হইতে এই বাণিজ্য কোম্পানীর অধিকারে গিয়া বাংলার লবণ-শিল্পের সর্ব্বনাশ হইল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নূতন চার্টার অনুযায়ী কোম্পানীর একচেটিয়া লবণ-ব্যবসায় উঠিয়া গেল। কোম্পানী ইচ্ছা করিলে তাহাদের এই একচেটিয়া লবণ-ব্যবসায় বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেন যদি-না অযথাভাবে এদেশজাত লবণের দর অত বাড়াইয়া দিতেন। ৩৷৹ টাকা লবণ-কর দিয়া বিলাতী লবণ বাজার ছাইয়া ফেলিল, কিন্তু এদেশের লবণ-কর দিয়া বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিল না।

এই জন্য লবণ-কর উঠাইয়া দিবার জন্য দেশের লোক যথেষ্ট অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানী তাহাদের স্বার্থ পরিত্যাগ করিবে কেন? লবণের উপর শুল্ক বসাইয়া তাহাদের আয় বিশেষ রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। এই লবণ হইতেই কোম্পানীর রাজস্ব ১৭৯৩ সালে আট হাজার পাউণ্ড হইতে ১৮৪৪ সালে তের লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়ায়। ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা ৭৩,৬১০,২২৩ পাউণ্ড হইয়া উঠে। ক্রমশঃ লবণের চাহিদা এত বাড়িয়া উঠে যে ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের লবণ হইতে এক বৎসরের আয় একষট্টি লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়।

এইরূপে লবণ-শুল্ক আজও প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের পর কোম্পানীর হাত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে রাজত্ব আসিলেও দরিদ্র ভারতবাসীর উপর হইতে এই জগদ্দল পাথর অপসৃত হইল না। বরঞ্চ ইংলণ্ডের অধীনে আসিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই সকল দ্রব্যেরই উপর কর বাড়িয়া গেল। তাহাদের সহিত লবণ-শুল্কও পূর্ব্বের অপেক্ষা শতকরা ৫০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। বহুকাল ধরিয়া লবণ-শুল্ক এই বর্দ্ধিত সংখ্যায় ছিল, তাহার পর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপন লবণ-শুল্ক হ্রাস করিয়া মণ-করা ২৲ টাকা ধার্য্য করিয়া দেন। কিন্তু পুনরায় ১৮৮৮ সালে গবর্ণমেণ্ট এই শুল্ক ২৲ টাকা হইতে ২৷৹ টাকা করিয়া দেন। ১৯০৩ সালে, অর্থাৎ পনর বৎসর পরে, গবর্ণমেণ্ট এই লবণ-শুল্ক ২৷৹ টাকা হইতে ২৲ টাকায় আবার ধার্য্য করেন।

ইহার ভিতর বাংলায় লবণ মোটেই প্রস্তুত হইত না। বিলাতী লবণের সহিত ভারতে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও করদ-রাজ্যগুলির ভিতরই যা-কিছু লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকিত। মহারাণীর রাজত্বের গোড়ার দিকে কয়েকটি মলঙ্গী গবর্ণমেণ্টের খালাড়িগুলিতে সামান্য লবণ প্রস্তুত করিতেছিল, কিন্তু ১৮৬১ সালে লর্ড বীডনের সময়ে এই নামমাত্র লবণ-শিল্পের ছায়াটিকেও আইনের দ্বারা নষ্ট করা হইল। ১৮৬৩ সালেই প্রকৃতপক্ষে বাংলার লবণশিল্প সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়। তাহার ফলে মলঙ্গীরা কর্ম্মহীন হইয়া শোচনীয় অবস্থায় পড়িল, তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করা দুঃসাধ্য হইল। বাংলা ও উড়িষ্যায় ১৮৬৩

সালে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহার অন্যতম কারণ ছিল লবণ-প্রস্তুতি আইনের দ্বারা বন্ধ করা।

১৮৩৩ সালে চেশায়ারের বিলাতী লবণ সূচের ন্যায় এই দেশে প্রবেশ করিয়া প্রায় ১৯১০ পর্য্যন্ত একচ্ছত্র ভাবে বাংলার বাজারে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই ভারতীয় লবণ ভিন্ন হামবুর্গ, সালিব, এডেন প্রভৃতি স্থানের লবণ ক্রমে ক্রমে কলিকাতার বাজারে প্রবেশ-লাভ করে এবং বিশেষতঃ এডেন বিশ বৎসরের মধ্যেই বিলাতী লবণকে প্রতিযোগিতায় হারাইতে সমর্থ হয়। নিম্নলিখিত তালিকা* হইতে পাঠকবর্গ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতার বাজারে আমদানী লবণ

	১৯০৪-০৫	১৯০৮-০৯	১৯১২-১৩			
	মণ	মণ	মণ	মণ	মণ	মণ
বিলাতী	৫৫,৫৯,৮৪৯	৪৬,৩৭,৪৬৮	৩৮,৮৫,১১৪	৩,১৬,৪৭৫	১৫,৬০,৮৮৩	২০,৭৩,৫৭১
হামবুর্গ	১২,৫৮,১৮৩	৭,৬১,০৩৬	৮,৪৩,৪৮৩		১০,৮৯,৩৪১	১১,৭৫,২০৫
সেলিফ	১৫,৪৬,৯৯৫	২৪,৮৮,২৭০	৮,৯৭,৫৮২			
এডেন	১৪,৫৮,৭৮৮	১৬,২৩,৩৬১	১৬,৬০,০৭৯	২৫,২০,৫৯৮	৩৪,৭৩,৭৪৫	৩৪,০৯,৯৬১
স্পেন		৩০,২৭,৮১৯	১৫,৯০,৫০৫	৬,৬৫,৮৫১	১১,২৯,৯৫০	১৫,৩৮,৯০২

অতএব দেখা যাইতেছে ব্রিটিশ বেনিয়ার একচেটিয়া ব্যবসায় নষ্ট করিয়া মার স্পেন, পোর্ট সৈয়দ, রুমেনিয়া পর্য্যন্ত ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ভিতর ইউরোপের মহাযুদ্ধ আসিয়া পড়ায় বিলাতী লবণের বাজারের অবস্থা একেবারে মন্দা হইয়া দাঁড়াইল। একেই ত ইণ্ডো-এডেন লবণের সমকক্ষতায় ১০০ মণের দাম ৮০ হইতে ৪০ টাকায় নামাইতে হয়, তাহার উপর যুদ্ধারম্ভকাল হইতে লিভারপুল ভারতকে ঠিক-মত লবণ জোগাইতে পারিল না। ফলে এডেন ও অন্যান্য লবণের দর অসম্ভব রূপে চড়িয়া গেল। এই সময়ে ভারত-গবর্ণমেণ্ট নূতন করিয়া বুঝিলেন যে লবণ এই দেশে প্রস্তুত করিলে কিরূপ হয়। বহুদিন পরে ১৯১৮ সালে গবর্ণমেণ্ট পুনরায় বাংলাকে স্বত্বর লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিলেন এবং তাহার জন্য লাইসেন্স দিবারও বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু এই সুযোগে দেশের লোকের পরিবর্ত্তে নামমাত্র একটি বিদেশী কোম্পানী—এণ্ড্রু ইউল, কাঁথির সাগরতীরে কিছুকাল কারখানা স্থাপন করিয়া লবণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। লবণ তাঁহাদের ভালই হইয়াছিল, তবে কোন কারণ বশতঃ তাহা উঠিয়া যায়। দীর্ঘ শত বৎসরের অনভ্যাসে বাঙালী কি করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল; মলঙ্গীদিগের বংশধরগণ হয়ত অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে, তাই চট করিয়া এই হৃতশিল্পের পূর্ণ উদ্ভব সম্ভব হইল না। তাহার উপর বঙ্গবাসীর মস্তিষ্কে এই ভ্রান্ত ধারণা মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে বাংলা দেশে লবণ হয় না, কারণ সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া স্বার্থান্ধ বিদেশীয় বণিকগণ পর্য্যন্ত বলিয়া দিয়াছেন যে বাংলার ভিজা মাটিতে লবণ প্রস্তুত অসম্ভব, তাঁহারা যেন আমাদের রত্নপ্রসূ বাংলার ইতিহাস হাটকাইয়া দেখিয়াছেন।

সুখের বিষয়, যুদ্ধের পর লবণের শুল্ক কমিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু লর্ড রেডিং-এর শাসনে ১৯২৫ সালে এক টাকা চার আনা হইতে পুনরায় লবণের শুল্ক আড়াই টাকায় পরিণত হয়। ইহাতে ভারতবাসীর দুঃখের সীমা থাকে না, একেই ত মহাযুদ্ধের ফলে ভারতের অর্থরাশি ব্রিটিশ তাহার দেনা শোধ করিতে লইয়া যাইতেছে তাহার উপর এই সমস্ত অযথা শুল্কের চাপে দরিদ্র দেশবাসীর অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা পাঠকেরা জানেন।

যাহা হউক, এই সময় এডেন-লবণের কষ্ট প্রাইস্ (cost price) অর্থাৎ শুল্ক-বাদ দাম প্রতিযোগিতার জন্য অনেক

* Tariff Board's Report on Salt Industry.

কমিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের পর চেশায়ারের লবণ এই অবস্থায় দাঁড়াইতে পারিবে কেন? অতএব চতুর ব্রিটিশ বণিক ১৯২৭ সালে সমস্ত লবণ-ব্যবসায়ীদিগের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক চুক্তি অনুযায়ী একটি 'কমবাইণ্ড্ প্রাইস্' নির্দ্ধারিত করিয়া দিল। ইহাতে সকল দেশের সকল প্রকার লবণকে একই দরে বিক্রীত হইতে হইল। কিন্তু এই দর ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়া যেদিন একেবারে ১০০ মণে আটাশ টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়ায় সেই দিন হইতে সঙ্ঘের চুক্তি ভাঙিয়া যায়। এই কম্বাইণ্ড প্রাইসে ১৯২৭-২৯ সাল পর্য্যন্ত মাত্র তিন বৎসর লবণের যথার্থ মূল্যবাদে প্রায় দেড় কোটি টাকার উপর বিলাতী বণিকগণ লাভ করিয়াছিল। ইহা ১৯২৯ সালের কথা, ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের বুদ্ধিমান এডেন-লবণ-ব্যবসায়িগণ বিলাতী লবণকে কোণঠাসা করিবার জন্য ১৯৩১ সালে অতিরিক্ত-লবণ-আমদানী-শুল্ক (Additional Salt Import Duty) পাস করিয়া লইলেন। ইহাতে লিভারপুল, হ্যামবুর্গ, রুমেনিয়া, স্পেন প্রভৃতি বিলাতী লবণের উপর প্রথম চার আনা এবং পরে দশ পয়সা করিয়া অতিরিক্ত শুল্ক বসান হইল। কাজে কাজেই বিদেশীয় লবণের দর বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমদানীও কমিয়া গেল। এই সুযোগে করাচী, এডেন, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের লবণ বাংলার বাজার ছাইয়া ফেলিল। যে-বাংলাকে লইয়া প্রাদেশিক ও বৈদেশিক লবণ-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে এতদিন টেকাটেকী চলিল সেই বাংলার লোকের কিন্তু সেদিনও পর্য্যন্ত হুঁস হয় নাই। অথচ বৎসরে প্রায় দেড় কোটি মণের উপর লবণ বাংলার বাজারে আসে। বহুকাল পরে ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন-চুক্তির ফলে মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের সমুদ্রতীরবাসিগণ তাহাদের প্রয়োজনমত লবণ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছে। ইহাদের শুল্ক দিতে হয় না।

সুখের বিষয়, স্বদেশপ্রাণ কয়েক জন বাঙালী ভদ্র-মহোদয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলার এই হৃতশিল্পের পুনরুদ্ধারের আয়োজন চলিতেছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে অনূন বার-তেরটি কোম্পানী লবণ প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স লইয়াছেন। ভারত-সরকারও অতিরিক্ত-লবণ-আমদানী শুল্কের আয় এই শিল্পের জন্য ব্যয় করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ আছেন, এবং তাঁহাদের আদেশানুযায়ী বাংলা-সরকারও এই প্রদেশে যাহাতে লবণ ভালরূপে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। আশা করা যায় মিঃ পিট আয়েঙ্গার এবং বর্ম্মা ও সিন্ধু-প্রদেশীয় লবণকুশলীগণের মত লইয়া বাংলা-সরকার শীঘ্রই উপরিউক্ত শুল্কের আয় হইতে বাংলার প্রাপ্য অর্থ লইয়া, লবণের বৃহৎ বৃহৎ কারখানা খুলিয়া দেশের ও বেকারের দুরবস্থা ঘুচাইবেন। বাংলার অর্থ বাংলায় থাকুক, বাঙ্গালী নিজের ঘরে আবার লবণ প্রস্তুত করুক ইহাই প্রার্থনা। এমন দিন যেন আসে যেদিন ইতিহাসে লবণ-শিল্পের শতবর্ষ-ব্যাপী কলঙ্ক বাংলার উন্নতির মাঝে ঢাকিয়া যায়। বাঙ্গালীর এই সৎপ্রচেষ্টায় সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারর্স এসোসিয়েশন ও এই সমিতির সম্পাদক শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টার কথা উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই সমিতির সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। এই সমিতিই প্রথম ভারত-আইন-পরিষদে বাংলার দাবি জানায় এবং তাঁহাদেরই পরিশ্রমের ফলে আজ বাংলা-সরকার এই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর এই চেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

জীবন-চরিত

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কালের কষ্টিপাথরে নামের একটু চিহ্ন আঁকিয়া রাখিবার অল্প-বিস্তর দুর্ব্বলতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। যে-নামের সম্মুখে ও পশ্চাতে আসন্ন অন্ধকারের বিভীষিকা—ব্যাকুল দুটি বাহুতে ক্ষীণতম আলোক-চিহ্ন ধরিবার আগ্রহ তার কতই না তীব্র, বহুদিনকার বিস্মৃত-প্রায় একটি ঘটনায় সে-কথা আজ বার-বার মনে হইতেছে।

পাড়ার কোন প্রতিষ্ঠাবান প্রতিবেশী একদিন বিশেষ করিয়া ধরিলেন,—তাঁর এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের জীবনী লিখিয়া দিতে হইবে। আত্মীয়টি ধনী, সুতরাং জীবনী প্রকাশ করিবার অধিকার তাঁর যথেষ্টই। তিনি থাকেন পশ্চিমের কোন একটা বড় শহরে; দীর্ঘদিন বাংলা ছাড়া। স্বাস্থ্যের অজুহাতে, কি মনুনীতির অনুসরণে সে-কথা আমার প্রতিবেশী বলিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সংসার-সাগরের ঢেউ খাইয়া অনর্থক নাকাল হইবেন না। এইবেলা সময় থাকিতে তীরলগ্ন তরীখানিতে উঠিয়া বসিয়া যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিবেন। গিয়াছেন দেবদেবীবহুল তীর্থস্থানে, সৌধের পাদদেশে সুরধুনী; নিত্যস্নান, পূজাপাঠ ও দেবদেবী-দর্শনে খেয়া-পারের আয়োজন ভালভাবেই চলিতেছে। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে এ-পারের যাত্রীদের কিছু না দিলে চিত্তে তাঁহার শান্তি জন্মিতেছে না। আত্মপরায়ণ সাধুর মত পৃথিবীকে বঞ্চিত করিয়া নিজের দুঃসাধনার দ্বারা ব্রহ্মের সামীপ্যলাভকে তিনি পরম স্বার্থপরের কাজ মনে করেন, তাই এ-পারের অধিবাসীদের উপহার দিবার জন্য আত্মজীবনীর প্রয়োজন।

অর্থ তাঁর যথেষ্টই আছে, নাই লিপি-কুশলতা। তাহাতেও কিছু যায় আসে না। এমন বহু দৃষ্টান্ত তাঁহার সম্মুখে আছে—সামান্য পত্রের দুটি ছত্র লিখিতে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর ধনী-দুলালও সুলেখক বলিয়া সাহিত্য-জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। দরিদ্র লেখকের সন্ধানে তাই আত্মীয়কে লিখিয়াছেন, সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য নামের মোহ যে অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারে!

আত্মীয়টি বুদ্ধিমান। কবে এক সময়ে বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া তাঁর কোন এক কন্যার বিবাহে কয়েকটি পদ্য লিখিয়া দিয়াছিলাম—সে-কথা তিনি ভোলেন নাই। হাতের কাছে অনুগৃহীত লেখক, দরিদ্র, অতএব নামেই বা তার প্রয়োজন কি? কিছু অর্থ ব্যয় করিলেই...... সুতরাং তিনি আসিয়াছেন।

বলিলেন—দেখুন চিঠি, এখন উদ্ধার করুন আমায়। চিঠি পড়িলাম। যাঁহার জীবনী লিখিব তিনি লেখেন নাই, লিখিয়াছেন তাঁহার স্ত্রী। লিখিয়াছেন:—

"বাবা, এই ত শরীর, কবে আছি—কবে নাই; উনিও দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছেন। এত-কটি চালের ভাত··· ইত্যাদি—(আহার-তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া আসল কথা পাড়িয়াছেন) আমার ইচ্ছা ওঁর জীবনী একটা ছাপাই। লেখা হবে পয়ার ছন্দে (অর্থাৎ পদ্যে)। যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীরাম দাসের মহাভারত আছে অতখানি বড় করিতে পারিলেই ভাল হয়। খরচ অবশ্য যা পারি পাঠাইব; তুমি যদি একটু চেষ্টা করত····"

অতঃপর কুশল প্রশ্ন ও আশীর্ব্বাদে সুদীর্ঘ পত্রের সমাপ্তি। পড়া শেষ হইলে তিনি বলিলেন—পড়লেন ত? কিছু 'ইয়ে'ও দেবেন বলেছেন। দেখুন না চেষ্টা ক'রে যদি লেগে যায় ত মন্দ কি!

আমার সাংসারিক অভাবের এই ইঙ্গিতটুকু অবশ্য গায়ে মাখিলাম না।

একটু ভাবিয়া বলিলাম—লেখা যায়, কিন্তু, খাটতে হবে অনেক। মানে অনেক কিছু সংগ্রহ ক'রতে হবে। তাঁর জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত যত-কিছু ছোট-বড় ঘটনা কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলবে না।

তিনি বলিলেন—তা ত বটেই। কিন্তু আমি ত কিছুই জানি না।

খানিক কি ভাবিয়া বলিলেন—সে না-হয় চিঠি লিখে সংগ্রহ করলেই হবে। কেমন রাজি ত? রাজি না হইয়া উপায় কি? এই ভাঙা জীর্ণ স্যাঁতসেঁতে ঘরে বসিয়া ও-ঘরের বহুকণ্ঠোত্থিত কলরব যে স্পষ্টই শুনিতেছি!

* * *

দিন-সাতেক পরে আবার তিনি আসিলেন। আসিয়াই আমার জীর্ণ তক্তাপোষের উপর বসিয়া হাসিমুখে বলিলেন—এই নিন চিঠি, আশা করি এইবার লিখতে সুরু করবেন।

পত্রখানি দীর্ঘ বটে। এত দীর্ঘ পত্র পড়িবার ধৈর্য্য এক তথ্যানুসন্ধানী লেখক ছাড়া আর কাহারও থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্ণনাগুলি কি অদ্ভুত! এই যে রাত্রিদিন অভাবগ্রস্ত সংসারের জন্য মুখে রক্ত তুলিয়া খাটিয়া মরিতেছি, এ শ্রমের মর্য্যাদাবোধ আজও আমাদের কেন যে জন্মিল না! অথচ তিনি একদিন সংসারের কি একটা তুচ্ছতম কাজে লাগিয়া সকলকে চমৎকৃত ও ধন্য করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণে পত্রের আটখানি পৃষ্ঠা ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মত জীবনী লিখিবার উপকরণ এতগুলি পৃষ্ঠার মধ্যেও খুঁজিয়া পাইলাম না।

প্রথমতঃ, তিনি জন্মিয়াছেন এক ধনীর গৃহে। জন্মোৎসবের অত্যুক্তিপূর্ণ বিবরণ ত আছেই, কিন্তু ধনীর সৌধ বর্ণনা, গৃহবাসিনীদের অলঙ্কারের আনুমানিক মূল্য, আসবাব, মোটর, কর্ত্তাদের বাবুয়ানী ইত্যাদি বর্ণনাবাহুল্যে জন্মোৎসবও চাপা পড়িয়াছে। এক বৎসরের শিশু যেদিন আধ-আধ ভাবে 'মা' বলিয়া ডাকিল সেদিন এই শিশুর মধ্যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া কে বা কাহারা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন সে-সকল বিবরণও যথেষ্ট। সেই প্রতিভার ক্রমবিকাশে শিশু বালক হইয়াছে, পাঠশালায় পড়িয়াছে, তথা হইতে স্কুলে এবং সেখানেও স্থায়ী ভাবে বাস করিবার লক্ষণ না দেখাইয়া মাতামহের সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর তত্ত্বাবধানে মনোনিবেশ করিয়াছে। এই জমিদারী-পরিচালনার সময়ে তিনি বিলের ধারে বন্দুক ধরিয়া কয়েকটি চকাচকি নাকি শিকার করিয়াছিলেন, নৌকায় করিয়া 'বাচ'-খেলা, সাঁতার দিয়া পদ্মফুল তুলিয়া আনা, কাপড়ের ছাঁকনিতে পুঁটি বা চেলা মাছ ধরা, পাখীর বাসা হইতে ডিম সংগ্রহ, চু-কপাটী খেলা, জামগাছ হইতে পড়িয়া গিয়া মাথা ফাটানো ইত্যাদি বহু দুঃসাহসিক কাজও তিনি করিয়াছেন। বুদ্ধি তাঁর অসাধারণ। দাদামহাশয় সেই বুদ্ধির তারিফ করিয়া আপন ছেলেদের বঞ্চিত করিয়া বীরগঞ্জের মহলটাই এই গুণবান দৌহিত্রকে দান করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনি জমিদার। এত বড় যে জমিদার—তিনিও একদিন নিজের হাতে রাঁধিয়া জনকয়েক দুঃস্থকে ভোজন করাইয়াছিলেন। এক দিন এক ভিখারী কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছিল, বাড়ির সকলে কাজে ব্যস্ত থাকায় সে-প্রার্থনা শুনিতে পায় নাই; কর্ত্তা তখন উপরে দিবানিদ্রার আয়োজনে পালঙ্কে দেহ বিছাইয়াছেন, ছুটিয়া নীচে নামিয়া স্বহস্তে ভিক্ষার চাল দিয়াছিলেন! ইত্যাদি—ইত্যাদি।

দম বন্ধ করিয়া এই কৌতূহলপূর্ণ কাহিনী পড়িতেছিলাম। পাঠশেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস একটু জোরেই পড়িল।

মুরলীবাবু (আমার ধনী প্রতিবেশী) ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিলেন—নিঃশ্বাস ফেললেন যে অমন ক'রে?

বলিলাম—তাঁর জীবনে বৈচিত্র্য আছে। কিছু লেখাও যেতে পারে, নাই বা হ'ল রামায়ণ মহাভারতের মত অতটা বড়।

তিনি মাথা নাড়িলেন—উঁহু,—ওটা চাই। পয়ার ছন্দ, আর কমসে-কম এক হাজার পাতা।

পরে উচ্চহাস্যে বলিলেন—আরে, তাতে আর ভাবনা কি? দিব্যি উপমা দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে লেখা যায় না?

বলিলাম—ছন্দটা যে পয়ার—

মুরলীবাবু তেমনই হাসিয়া বলিলেন—আপনারই সুবিধে। এক বনের বর্ণনাতেই ত বিশ পাতা ভরে যাবে, ধরুন না, কত রকমের গাছ, কত রকমের জানোয়ার—

বলিলাম—শুধু গাছ আর জানোয়ার দিয়ে পাতা ভরালে ত চলবে না, আসল মানুষটিকেও দেখানো চাই। উনি যা পাঠিয়েছেন—তা অল্প। চিঠিতে অত খুঁটিনাটি লেখাও চলে না। একবার মুখোমুখী দেখা হ'লে—

মুরলী বাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—বেশ, ভাল কথা। আজই আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, আপনি সেখানে চলে

যান। গিয়ে তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনে আসুন। সেই সঙ্গে টাকাটারও অর্থাৎ যা আপনার দরকার জানিয়ে আসবেন।

আরও দিন-কয়েক পরে তিনি পুনরায় দর্শন দিলেন। মুখে হাসি, প্রসারিত হাতে দুখানি নোট। বলিলেন—আর কেন? দুর্গা শ্রীহরি ব'লে বেরিয়ে পড়ুন। আজ রাত্তিরের ট্রেনে। আমি চিঠি লিখে দিয়েছি।

বলিলাম—কাল যাব। আমি যেখানে কাজ করি, তাদের জানিয়ে দিন-তিনেকের ছুটি নিতে হবে।

* * *

এই দূর দেশ যাত্রার মধ্যে মাদকতা ছিল নিশ্চয়ই, নতুবা অতি উল্লাসে মধ্যম-শ্রেণীর টিকেট কিনিতে যাইব কেন? ষ্টেশনে আসিয়া দেখি যে স্বল্পসংখ্যক মধ্যম-শ্রেণীর গাড়ী আছে তাহার কোনটাতেই আরাম করিয়া বসিবার জায়গা নাই। কি করি, উহারই একখানিতে উঠিয়া পড়িলাম। প্রথমতঃ, লোকগুলি ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। এখানে মোটেই জায়গা নাই—অন্য জায়গায় দেখুন, আপনারই বিশেষ অসুবিধা—ইত্যাদি। ইঁহাদের সাধু উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া কক্ষমধ্যে চাহিলাম। দুখানি বেঞ্চ লোকে ভর্ত্তি, কিন্তু তৃতীয়খানিতে দিব্য বিছানা বিছাইয়া এক বিরাট পুরুষ নিদ্রা দিতেছেন। নিদ্রার নামে স্থান-দখলের এই দুষ্টামিটুকু বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। কিন্তু উপায় কি। উঁহাকে টানিয়া তুলিতে গেলে কোলাহল অনিবার্য্য। স্থান হয়ত মিলিতে পারে, সারা পথের শান্তিটুকু অক্ষুন্ন রহিবে না। কি করি, উপর দিকে চাহিলাম। দুটি বাঙ্কেই প্রচুর দ্রব্যসম্ভার উছলিয়া পড়িতেছে; ওদিকে চাওয়া মিথ্যা বুঝিয়া এতটুকু স্থান সংগ্রহের আশায় পুনরায় দৃষ্টি নামাইলাম। হাঁ, স্থান একটু আছে বটে। বিরাট পুরুষের পদপ্রান্তে আঙুল-কয়েক জমি—ঐ ভদ্রলোকটির প্রসারিত পা দুখানির ব্যবধানে পড়িয়া আছে। বিছানাটা আর না গুটাইয়া কোন প্রকারে সেইটুকুতেই বসিয়া পড়িলাম। বসিয়া পড়িতেই ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল, বাঁশী দিয়া গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট পুরুষ জাগিয়া উঠিলেন। জাগিয়া উঠিয়াই আমার দিকে রোষকষায়িত এক তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন—আর কোথাও বসবার জায়গা পেলে না? বেশ লোক ত, একেবারে বিছানায়।

এই অভদ্র সম্বোধনে রাগ হইবারই কথা।

উষ্ণস্বরে বলিলাম—এটা ত আপনার রিজার্ভ করা নয়, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট করেন নি কেন?

ভদ্রলোকের দৃষ্টি তীব্রতর হইল, কণ্ঠও চড়িল—মানে? কে আমার সাতপুরুষের কুটুম, আমারই বিছানায় ব'সে চোখ রাঙানি? জান, আমি ইচ্ছা করলে—

শান্তভাবে বলিলাম—বিছানাটা গুটিয়ে নিতে পারেন। তাতে আমারও বসবার সুবিধা হবে।

উত্তর শুনিয়া গাড়ীসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিস্ফল আক্রোশে ভদ্রলোকের মুখে চোখে যে উগ্র ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি পৃথিবীতে এমন কুৎসিত কিছু নাই। শুধু ডারুউইন সাহেবের সিদ্ধান্তকে মনে মনে নতি জানাইয়া বলিলাম, হাঁ অভিজ্ঞতা বটে! নিশ্চয়ই তিনি একদিন সুদূর যাত্রার পথে এমনই এক সঙ্গী লাভ করিয়াছিলেন এবং স্থানাভাব বশতঃ বাক্‌-বিতণ্ডায় সেই অতিকায় সঙ্গীর মুখে কুৎসিত কয়েকটা রেখার বিন্যাস তাঁহাকে ঐরূপ তত্ত্বানুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য! রাগিয়া এই বিরাট পুরুষ আমার সুবিধাই করিয়া দিলেন, অর্থাৎ তাঁহার বিছানার খানিকটা গুটাইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। আমি সে সুযোগের অসদ্ব্যবহার করিলাম না, ভাল করিয়া বসিলাম।

সেই যে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন আর তিনি চাহিলেন না। বাহিরের অন্ধকার-মাখা ধরিত্রীর পানে চাহিয়া বুঝি আপন মনের প্রতিচ্ছবিই দেখিতে লাগিলেন। সূচীভেদ্য অন্ধকার, কল্লোলহীন সমুদ্রের মত গম্ভীর নিষ্ক্রিয়। মাঝে মাঝে দূরে যে-সব আলো চকিতে ফুটিয়া চকিতে মিলাইয়া যাইতেছে সেগুলি উর্ম্মি-সংঘাতে যে ক্ষণস্থায়ী জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠে তাহারই মত নয়নাভিরাম। কিছুক্ষণ দেখিতে মন্দ লাগে না।

ট্রেনের গতি মন্থর হইয়া আসিতেই লোকটি চীৎকার করিতে লাগিলেন—তেওয়ারি, তেওয়ারি।

ট্রেন থামিলে ক্ষীণকায় এক ভৃত্য আসিয়া 'হুজুর' বলিয়া করজোড়ে দাঁড়াইল।

ভদ্রলোক বলিলেন—তামকুল হ্যায় ?

—জী হাঁ।

পাশেই দেখিলাম, প্রকাণ্ড এক গড়গড়া, তাওয়া-বসানো তেমনই প্রকাণ্ড এক কলিকা।

তেওয়ারি গাড়ীতে উঠিয়া তামাক সাজিতে বসিল। ঠিকুরা বদলাইয়া তামাক টিকা সাজাইয়া আগুন ধরাইবে এমন সময়ে ঘণ্টা বাজিল।

ভদ্রলোক ভৃত্যকে অভয় দিয়া আমাদের শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—ঘণ্টা বাজলো—বাজলোই। ওঠে চেকার না-হয় এক্‌সেস আদায় করবে, তা ব'লে তামাক খাব না ? ইঃ,—ভারি আমার—

হাঁ, মেজাজ বটে। চলিয়াছেন মধ্যম-শ্রেণীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত সুবিধা আদায় করিতে করিতে।

গড়গড়ায় টান দিতেই একমুখ ধোঁয়া বাহির হইল এবং সেই ধোঁয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের ধোঁয়াও বুঝি বাহির হইয়া গেল!

সম্মুখের বেঞ্চের এক ভদ্রলোককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—সেবারও দুটো চাকর নিয়ে উঠেছিলাম সেকেণ্ড ক্লাসে। মাঝপথে উঠলো এক ব্যাটা চেকার। উঠলো ত উঠলোই! আমি আপন মনে গড়গড়ায় দিচ্ছি টান, একটা চাকর টিপছে পা। আর একটা চাকর কাচের গ্লাস আর সোডা নিয়ে তৈরি করছে। আমি হুইস্কীটাই পছন্দ করি কি না! ট্রেন-জার্ণিতে এক-আধ গ্লাস বুঝলেন না? শরীর, মন দুয়েরই বেশ স্ফূর্তি পাওয়া যায়। চেকার টিকিট চাইবে কি, কাচের গ্লাসের পানে জুল্ জুল্ ক'রে চেয়ে আছে নিশ্বেস অবধি পড়ছে না। ব্যথার ব্যথী ত, গ্লাসটি এগিয়ে দিয়ে বললুম, চলবে? 'থ্যাঙ্কস' দিয়ে গ্লাসটি নিয়েই চোঁ-চোঁ চুমুক। যেন গ্রীষ্মকালের আধফাটা শুকনো মাটির ওপর এক কলসী জল ঢেলে দেওয়া হ'ল! তার পরেই জমজমাট। সারা পথটা চাকর দুটো সঙ্গে চ'ললো। আমি যদি বলি, ওরা নামুক—চেকার বলে, 'না' দিব্যি চলছে—চলুক না।—বলিয়া হো-হো করিয়া খানিক হাসিলেন ও তেওয়ারিকে কি ইঙ্গিত করিলেন।

ছোট এটাচি কেস খুলিয়া তেওয়ারি যাহা বাহির করিল তাহা এতখানি ভূমিকারই বিষয়বস্তু।

গ্লাসে তরল পদার্থ টল টল করিয়া উঠিল। লোকটি হাসিমুখে সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—এ বাবা জগন্নাথ-ক্ষেত্র, জাতবিচার নেই। আমি জমিদার আছি—আছিই; কিন্তু ট্রেনে প্যাসেঞ্জার, আপনারাও যা—আমিও তাই। আসুন।

কেহ হাত বাড়াইল না দেখিয়া নিজেই সেই গ্লাসটি উদরস্থ করিয়া হুকুম দিলেন—দুসরা।

অতঃপর তেমনই হাসিয়া বলিলেন—ঘাবড়াচ্ছেন, কেন ? আমি মহালে যখন পা দিই তখন বাঘ, এখন কেঁচো। কত লোক এই চোখরাঙানিতে মুচ্ছো গেছে। মাথা ফাটাতে, ঘর জ্বালাতে, গ্রীষ্মের দুপুরবেলায় খালি মাথায় খালি পায়ে উঠোনে তপ্ত বালির ওপর দাঁড় করিয়ে রাখতে, বেত চালাতে কত হুকুমই না দিয়েছি। বজ্জাত প্রজা শাসন করতে যে কত ফন্দীই ক'রতে হয়—হা-হা-হা।

সে গ্লাসটি শেষ করিয়া হুকুম দিলেন—ফিন্।

গ্লাসের পর গ্লাস যতই চলিতে লাগিল, বক্তার মেজাজ ততই 'খোস' হইতে লাগিল।

আমি ত এদিকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম।

ওপাশের শ্রোতাগুলি দিব্য জমিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ উপভোগ করিতেছেন।

হঠাৎ গাড়ীর গতি মন্থর হইল, দূরের আলো নিকটে আসিল।

লোকটি গল্প থামাইয়া তেওয়ারিকে হুঙ্কার দিয়া ডাকিলেন। সে বেচারী তটস্থ হইতেই হুকুম হইল—উ জেনানা কামরামে যো হ্যায়, উহি কো হিঁয়া লে আও।

তেওয়ারি খেয়ালী প্রভুর হুকুমের ক্ষীণ প্রতিবাদ স্বরূপ বলিল—এহি কামরেমে? হুজুর, গাড়ী যব নেহি ঠারেগা—

প্রভু হুঙ্কার দিলেন—আলবৎ ঠারেগা—আধা ঘণ্টা জরুর। বহুৎ আচ্ছা, সামান সব হুঁশ্ রাখকে—লেকেন ওহি কো—

কি আর করে—সে বেচারী নামিয়া গেল।

ভদ্রলোক ছোট একটি রূপার কৌটা খুলিয়া গোটা-কয়েক এলাচ মুখে পুরিয়া সোজা হইয়া বসিলেন।

ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে তেওয়ারি একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোকের সঙ্গে এই গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। ভদ্রলোক বিছানাটা না গুটাইয়াই বলিলেন—বোস।

মহিলাটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রং ময়লা, মুখশ্রী বা গঠনে তেমন বিশেষত্ব নাই। চোখ দেখিলে মনে হয়, সম্প্রতি কোন সমস্যায় পড়িয়া বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ঠিক ক'রলে?

এইবার মহিলাটি কথা কহিল—ভেবে ত কিছুই থই পাচ্ছি না, বাবা। যাই, বাবা বিশ্বনাথের পায়ে ফুলজল ঢেলে যদি শান্তি পাই। মনে করেছি, দেশে আর ফিরব না।

ভদ্রলোক বলিলেন—সে ভাল কথা। কথায় বলে সৎসঙ্গে কাশীবাস।

মনে মনে বলিলাম, এমন সঙ্গ দুর্লভ বটে!

মহিলাটি বলিলেন—আর বাবা, জানই ত সব। এতকাল নিজের ছেলের মত মানুষমুনুষ করলাম, এখন হ'লাম সৎ-মা! বলে—যতদিন আছ, রাজার হালে থাক। তীথি-ধম্ম—পুজো আচ্চা—

ভদ্রলোক হাসিলেন—ও সব ভুজুং-ভাজাং না দিলে যে বিষয় হাত করা যায় না! সে-বার আমি—জানেন মশাই—

সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—এই আমাদের এক প্রতিবেশী ঐ রকম তীর্থ-ধর্ম্মের নাম ক'রে তার দূরসম্পর্কের এক বোনকে নিয়ে এল বাড়িতে। এসেই আজ অন্নপূন্নো-পুজো, কাল কালী-পুজো, কোথায় দ্বারকা, রামেশ্বর বাকী আর কিছুই রাখলে না। বোনটা খুশী হ'য়ে দিলে সব বিষয় লেখাপড়া ক'রে। বললে—দাদা, এ বোঝা আর বইতে পারি নে, তুমি নাও। নিয়ে এমনি হাত-খরচা যা দেবে তাই আমার যথেষ্ট। ব্যস, যেমন লেখাপড়া হওয়া, অমনি দিন-কতক পরে একটা দুর্নাম দিয়ে—বলিয়া কথাটা শেষ না করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মহিলাটি সত্রাসে বলিলেন—না, বাবা, হাতে আমি কারও যাব না। যা দু-চার হাজার আছে মরবার সময় যে সেবা ক'রবে তারই হাতে দিয়ে যাব।

ভদ্রলোক বলিলেন—দু-চার-হাজার মানে ত জানি, কম-সে-কম দশটি হাজার। সে যেন ব্যবস্থা হ'ল। কাশীতে গিয়েই তোমার নামে কোম্পানীর কাগজ কিনে দেব, মাস-মাস যা সুদ পাবে, তাতে রাজার হালে চ'লবে। কিন্তু জমি-জমার কি বিলি ব্যবস্থা হবে?

মহিলাটি বলিলেন—কি আর হবে,—যাদের জমি তারাই ভোগ করুক। আমার একটা পেট—

—আহা—হা—বুঝলে না কথাটা। পেট একটা ত বটেই, কিন্তু বাঁচতে হয় যদি অনেক দিন, বুঝলে না, টাকা অনেক রকমে নষ্ট হ'তে পারে, জমির ত ক্ষয় নেই। আমি বলি কি—

অনেক লোকের সামনে বলাটা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়াই সে-কথা চাপিয়া গিয়া বলিলেন—কাশীতেই থাক। টাকার ব্যবস্থা বল, জমির ব্যবস্থা বল—সব ভার আমার। চুল চিরে ভাগ ক'রে নেব। মেয়েমানুষকে ঠকাবার আর জায়গা পায় নি?—বলিয়া রোষ-রক্তিম চক্ষে কামরার প্রত্যেক ব্যক্তির পানে চাহিলেন।

মহিলাটি ঈষৎ কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিলেন—সবাই ব'লছিল আর দিন-কতক দেখে যা হয় একটা ক'রো। সৎ-ছেলে হ'লেও কেউ ত খারাপ ব্যবহার করে নি।

ভদ্রলোক রক্তচক্ষু তেমনই মেলিয়া বলিলেন—সবাই মানে? ওই মেয়ে-গাড়ীর জ্যেঠা মেয়েগুলো ত? বোঝে ত কচু। বলে এই ক'রে চুল পাকালুম। ও মিষ্টি কথাই বল, আর চড়া কথাই বল, সুরটি ধরতে আমার দেরি হয় না। জান, সংসারে কাকেও বিশ্বাস নেই। পরে তেওয়ারিকে হুকুম দিলেন, গাড়ী থামিলে জিনিষপত্র সব থার্ড-ক্লাসে রাখিয়া মা-জীর বিছানাটা যেন সে এইখানে পাঠাইয়া দেয়।

মহিলাটি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—কেন বাবা, ও গাড়ীতে ত বেশ ছিলাম।

ভদ্রলোক বলিলেন—বুঝছো না, আরও অনেক পরামর্শ আছে। টাকা-কড়ি সব সঙ্গে আছে ত? রাত্রিকাল, একা মেয়েমানুষ কেউ গলা টিপে কেড়ে নিতে কত ক্ষণ!

মহিলাটি এই কথায় ঈষৎ চমকিত হইয়া কোমরের কাছে কাপড়টা একবার চাপিয়া ধরিলেন, পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তবে থাক।

ভদ্রলোক ট্রেনের সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—আমার কে? কেউ নয়। তবে পরের দুঃখ দেখলে মন কেমন ক'রে ওঠে, তাই। মার মামী, আমারই জমিদারীতে বাস। মহাল দেখতে গিয়ে শুনলুম অবস্থা এই, অমনি প্রাণটা কেঁদে উঠল। উনি নেহাতই ভালমানুষ। মুখের আদরযত্নে ত ভুলেই গিছলেন, সর্ব্বনাশের দেরি ত ছিল না, ভগবান আছেন, তাই আমি গিয়ে পড়লুম। বলিয়া যুক্তকরে সেই অজানাকে উদ্দেশ করিয়া একটি প্রণাম জানাইলেন। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে মহিলাটির বিছানা আসিল ও চাকরটা সেটা মেঝের উপর পাতিয়া দিল। ভদ্রলোক বলিলেন—জলটল খেয়ে শুয়ে পড়। মহিলাটি কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—না বাবা, ট্রেনে সব ছোঁয়ানেপা, কাশীতে গিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন ক'রে জল মুখে দেব। তুমি কিছু মুখে দাও।

উচ্চ হাসিয়া তিনি বলিলেন—আমি! আমারও ঐ এক গোত্র। ট্রেনের মধ্যে ব'সে কেমন যেন সব ঘিন্ ঘিন্ করে, কিছু খেতেও প্রবৃত্তি হয় না। তবে বামুনের বিধবা নই ব'লে যা-হয় কিছু মুখে দিয়ে পিত্তিরক্ষে করি। এই যে পায়খানাটা সেরে আসি। বলিয়া ছোট এটাচি কেসটি হাতে লইলেন। যাহা হউক, পিত্ত রক্ষা করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন গাড়ীর দোদুল্যমান অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিলেন, আগে গাড়ীগুলো কেমন ভাল দিত; এখন সব ফাঁকি, দেখেছ একবার দুলুনিটা। মানুষে কি পা ঠিক রাখতে পারে?

সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খাইয়া আমারই উপরে পড়িয়া গেলেন। দু-হাত দিয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে রুষ্ট স্বরে বলিলাম—ননসেন্স।

—কী—বলিয়া সোজা হইয়াই হঠাৎ থামিয়া গিয়া শান্ত ছেলেটির মত নিজের জায়গায় গিয়া বসিলেন। কলহ করিলে অনেক কিছু ক্লেদ বাহির হইতে পারে ভাবিয়াই হয়ত এই আত্ম-সংযম। সংযমী পুরুষ বটে!

কয়েকটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল ও ছাড়িয়া গেল। ভদ্রলোক আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। আপন মনে চক্ষু মুদিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। মেঝের পাতা বিছানায় মহিলাটি বহুক্ষণ হইল শুইয়া পড়িয়াছেন; বোধ হয় ঘুমাইতেছেন। ভদ্রলোকেরও দিব্য নিরুদ্বিগ্ন ভাব। হঠাৎ গাড়ীর গতি মন্থর হইয়া আসিল এবং কাছে দূরে অনেক আলো দেখা গেল। কোন বড় ষ্টেশন আসিতেছে নিশ্চয়।

ভদ্রলোকের তন্দ্রা টুটিয়া গেল, এবং চকিতে চঞ্চল হইয়া এ-ধার ও-ধার চাহিয়া এটাচি কেসটি খুলিয়া একটি বোতল বাহির করিলেন। কিন্তু সেটি নেপথ্যেই শূন্যগর্ভ হইয়া গিয়াছিল। 'দুত্তোরি' বলিয়া জানালা গলাইয়া সেটি ফেলিয়া দিয়া আর একটি আধখালি বোতল তুলিয়া লইলেন। ছিপি খুলিয়াই মুখের মধ্যে হড় হড় করিয়া সবটা ঢালিয়া মত্ত কণ্ঠে হাকিলেন—তেওয়ারি!

গাড়ী থামিল, তেওয়ারি আসিল।

আসিয়াই সেলাম জানাইয়া সংবাদ দিল—'পরজা' লোক সব 'টিশনের' বাহিরে হুজুরের দর্শন মাগিতেছে।

হুজুর প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন—কুছ্ পরোয়া নেহি চলো।

গাড়ী এখানে মিনিট-পনর থামিবে, ব্যাপার কি হয় জানিবার জন্য কৌতূহল হইল। নামিয়া উহাদের পিছনে চলিলাম।

লোহার রেলিঙের ওপারে পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক ট্রেনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ষ্টেশনের উজ্জ্বল আলো তত দূরের অন্ধকারকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, লোকগুলি শীর্ণকায় না হইলেও পরিধেয়ে তাহাদের দুর্দ্দশার কাহিনী লেখা আছে। ঘোমটা টানিয়া যে-কয়টি স্ত্রী-মূর্ত্তি পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারাও অশ্রুমুখী। এই ষ্টেশন হইতে মাইল-দশেক দূরের প্রজা তাহারা; সংবাদ পাইয়াছে আজ এই ট্রেনে তাহাদের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা আসিতেছেন, তাই দ্বিপ্রহর হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে। তাঁহার দর্শন পাইলে নিজেদের অভাব-অভিযোগের করুণ কাহিনী নিবেদন করিয়া যদি কিছু ফলোদয় হয়। জমিদার বাবুকে দেখিয়া সেই জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

পুলকিত জমিদার আশেপাশে চাহিয়া সগর্ব্বে কহিলেন—আমার প্রজা।

জমিদার ঘুরিয়া বেড়ার ও-ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন, ভূমি প্রণামের ধুম পড়িয়া গেল।

আমরা ও-ধারে দাঁড়াইয়া ব্যাপার কি হয় দেখিতে লাগিলাম।

তার পর প্রজাকণ্ঠে আরম্ভ হইল—সেই সনাতন অভাব-অভিযোগের কথা,—ফসল অপ্রচুর, নায়েব হৃদয়হীন, দয়া না করিলে ইত্যাদি।

জমিদার রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন—নায়েব বজ্জাত, না তোরা বেইমান? শুনলাম ফসল যা হয়েছে অনায়াসে খাজনা দেওয়া চলে। তোরা মিটিং ক'রে একজোট হয়েছিস—খাজনা দিবি না। আচ্ছা দেখ্ লেঙ্গে। লেঠেল দিয়ে ও-গর্ব্ব যদি না ভাঙি ত আমার নামই নয়!

একটু থামিয়া বলিলেন—এখানে নামবার ইচ্ছে ছিল, তাই তোদের আসতে লিখেছিলাম। কিন্তু বিশেষ জরুরি কাজে নামা হ'ল না। ফিরে বার এসে দেখে যাব—ফসল হয়েছে কি না!

প্রজারা কাঁদিয়া বলিল,—এবারের অবস্থাটা দেখে যান দয়া ক'রে।

জমিদার ধমক দিলেন—চোপ রও। আমি বলছি—ফিরে বার এসে দেখে যাব। যখন বলেছি, তখন পূবের সূর্যি পশ্চিমে উঠলেও আসবো। এসে যদি দেখি তোদের কথা মিথ্যে ত সব একধার থেকে—, কি করিবেন অবশ্য না বলিয়াই পিছন ফিরিলেন।

অমনই লোকগুলি হুজুরের পায়ের তলায় শুইয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল—দোহাই হুজুরের, জানে মারবেন না। বিচার করুন, একবার আমাদের অবস্থাটা দেখে যান।

জমিদার রুক্ষ কণ্ঠে কহিলেন,—এইও তফাৎ যাও। বলিয়াই পটাপট লাথি কসাইয়া সেই জনতাকে বিদলিত করিয়া প্ল্যাটফর্মে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলেন।

হাঁফ ছাড়িয়াই হাঁকিলেন—তেওয়ারি, হামারা এটাচি কেস।

কে এক জন পিছন হইতে বলিল—জমিদার, না কসাই?

বক্তাকে দেখা গেল না, কিন্তু জনতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রভু বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—কসাই কে নয়, বাবা? যেখানে লেন-দেন সেইখানেই কসাইগিরি! জমিদারী ত দানছত্র নয়, চাঁদ! থাকতো জমিজমা ত বুঝতে, হুঁ। প্রজার কাছে রাজা মন্দ চিরকাল, কেন না, রাজা খাজনা নেয়। রোগীর কাছে ডাক্তার ব্যাটা কসাই, দাম ত নেয়ই ওষুধও তেতো। দেনদারেরা টাকা দেবার সময়ই মহাজনের বদনাম রটায়। এমনি খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, বাবা। এই যে টিকেট-চেকার গাড়ীতে উঠেছে—ওকে কে বাবা শুভদৃষ্টিতে দেখছ? বল হক কথা—

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেই বক্তৃতা অসমাপ্ত রাখিয়া তেওয়ারির হাত ধরিয়া টলিতে টলিতে প্রভু যথাস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রিটা শান্তিতেই কাটিয়া গেল।

* * *

পরদিন সকালে নামিবার সময় আবার হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ষ্টেশনে লোক আসিয়াছে, গাড়ী আসিয়াছে, সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে দারোয়ান লোকজন দাঁড়াইয়া আছে। মনের বিরাগবশতঃ ও-দিকে আর লক্ষ্য করিলাম না, ছোট বিছানাটি বগলে পুরিয়া বেতের স্যুট-কেসটি হাতে ঝুলাইয়া ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। এক্কা ও টাঙ্গা গোধুলিয়ার শেয়ার হাকিতেছে, সস্তা বলিয়া এক্কায় চাপিলাম।

ঠিক করিলাম, এ-বেলা এক ধর্ম্মশালায় উঠিয়া স্নানাহার ও বিশ্রামান্তে বৈকালে ধনীগৃহে গমন করিব। ধনীদের সম্বন্ধে এখনও একটা দুর্ব্বল ধারণা মনে পোষণ করিতেছি, আহারের সময়ে তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। জানি, আমার এ ধারণা অমূলক, ধনীলোক মাত্রেই অতিথির অসম্মান করেন না, তথাপি অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে কোন নির্জ্জন পল্লীপথে চলিবার কালে যেমন অহেতুক একটা ভয় সারাদেহে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে, সহস্র যুক্তিতেও হৃদয়কে বশে আনিতে পারা যায় না, ইহাও অনেকটা সেইরূপ।

ঠিকানাটা জানাই ছিল, বিশ্রামান্তে ভয় কাটাইয়া বৈকালেই তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলাম।

গঙ্গার উপরেই বহু পুরাতন প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আধুনিকতার লেশমাত্র কোথাও নাই। আভিজাত্যের

গৌরবশ্রী মলিন করিতে ইহার গৃহস্বামী যে অত্যন্ত কুণ্ঠিত সে-কথা কার্ণিশে শোভমান বট-অশ্বত্থ-শিশুর পানে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায়। গঙ্গার দিকের খালি বারান্দায় বহু পারাবত বাসা বাঁধিয়া বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন ; তাহাদের পালকে ও পুরীষে রেলিঙ প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে। একটা ময়না পাখীও খাঁচার মধ্যে ঢুলিতেছে। ঘরগুলির দুয়ারে চিক্ ফেলা। ফটকে দারোয়ান টুলের উপর বসিয়া খৈনি টিপিতেছে। বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রথমটা সে গ্রাহ্যই করিল না, পরে কলিকাতার নাম করিতেই মহাব্যস্ত হইয়া বৈঠকখানার দুয়ার খুলিয়া আমাকে সমাদর করিয়া বসাইল। বুঝিলাম, জীবনী-লেখকের আগমন-সংবাদ এখানে যথাসময়ে পৌছিয়াছে।

বসিয়া আছি ত বসিয়াই আছি। দুয়ারে একখানা ভাল ফিটন আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে দামী ক'খানা অয়েল-পেণ্টিং বহুক্ষণ দেখা শেষ হইয়া গিয়াছে, ক্লক ঘড়িটার পেণ্ডুলামের শব্দ একঘেয়ে লাগিতেছে। বড় একটা টিক্‌টিকি উড্ডীয়মান একটা পতঙ্গের পানে বহুক্ষণ ধরিয়া লোলুপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ; পতঙ্গটি কিছু চঞ্চল, কয়েক সেকেণ্ড মাত্র একস্থানে বসিয়াই আবার উড়িতেছে। টিক্‌টিকির উজ্জ্বল চোখে আশার আলো তখনও প্রখর ; সে জানে তার শিকারের শ্রান্তির সুযোগে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফল মিলিবে। রবার্ট ব্রুস্ মাকড়সার উদ্যমে মোহিত হইয়া ভগ্ন-মনে বলসঞ্চার করিয়াছিলেন, আমিও টিক্‌টিকির ধৈর্য্যে কিছু শিক্ষালাভ করিয়া প্রতীক্ষার মুহূর্ত্ত গুণিতেছি। পতঙ্গটার শ্রান্তি আসিতে-না-আসিতেই আমার প্রতীক্ষা সফল হইল।

সম্মুখে যাঁহাকে দেখিলাম, তিনি জীবনী-লেখকের তপস্যার বস্তু বটে। পরণে গরদের ধুতি ; গায়ে কলির মুক্তি-মন্ত্র-সম্বলিত গরদের নামাবলী, গলায় সোনা দিয়া বাঁধানো তুলসীর মালা, নাসিকায় তিলক, কিন্তু আর বেশী ক্ষণ আমায় এ সব দেখিতে হইল না। স্পষ্ট দিবালোকে জাগিয়া যে লোকে এমন দুঃস্বপ্ন দেখিতে পারে এ কথা কাহাকে বলিব ?

আমার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখিয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন। হাসিটি বৈষ্ণবজনোচিত এবং আশ্চর্য্য, কঠোর কোমলতাও যে কোন মিষ্ট সুরকে আয়ত্ত করিতে পারে। তেমনই মিষ্ট স্বরে বলিলেন, বড় আশ্চর্য্য হয়েছেন, নয় ? একটা গল্প শুনুন। নারদ ঋষি একদিন পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন হরিনাম গান করতে-করতে। যেতে যেতে দেখলেন, পথের পাশে একটা গোখ্‌রো সাপ ফণা দুলিয়ে ফোঁস-ফোঁস করছে। সাপের হিংসা-প্রবৃত্তি দেখে তিনি বড় ব্যথা পেলেন। বললেন—ওরে অবোধ, তুই শুধু শুধু লোকের হিংসা ক'রে মরিস কেন ? হিংসে ছাড়্—সুখে শান্তিতে থাকবি। মুনির কথা শুনে সাপ ফণা নামালে এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রলে আর কাউকে কামড়াবে না···বছর-খানেক পরে আবার নারদ মুনি সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, সেইখানে রুগ্ন অথর্ব্ব সাপটা পড়ে পড়ে ধুঁকছে। মুনির দয়া হ'ল। জিজ্ঞাসা করলেন তোর এ দশা কেন ? সাপ কেঁদে বললে—আর ঠাকুর তোমার কথা শুনে হিংসে ছেড়েই আমার এই দুর্গতি। ওই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-গুলো পর্য্যন্ত ঢিল মেরে মেরে আমার এমন দশা করেছে। মুনি হেসে ব'ললেন—দূর বোকা। আমি তোকে কামড়াতেই নিষেধ করেছি, কিন্তু ফোঁস্-ফোঁস্ ক'রতে কি বারণ করেছি ? কেউ কাছে এলেই ফোঁস্-ফোঁস্ করবি। মুনির উপদেশ শুনে সাপটা বেঁচে গেল। বলিয়া একটু হাসিলেন।

পরে আমায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন—কিছু মনে করবেন না। ট্রেনে জমিদারী চাল না দেখালে দেখলেন ত বজ্জাত প্রজা, ওদের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি। রাজ্য-শাসনে যেমন সব গুণ দরকার, তেমনই মনটাকে শুধু ভগবানের চরণে ফেলে রাখলে চলে না, রাজসিকতার প্রয়োজন। ওই দেখুন, বিবেকানন্দ ব'লে গেছেন—বলিয়া এক মিনিট চিন্তা করিয়া সেই সুবিধাজনক বাণীটি স্মরণ করিতে না পারিয়াই সদুঃখে বলিলেন—বয়েস হয়েছে, স্মৃতিও দুর্ব্বল। আচ্ছা, আপনারা যাঁরা কবি,—তাঁরা কবিতার বেলায় কত দরদই না ঢেলে দেন। কত লোক-হিতৈষণা—কত ভ্রাতৃপ্রেম—কত সার্ব্বজনীনতার মহোৎসব, কিন্তু সত্যি ক'রে বলুন ত, মহল দেখতে গিয়ে কবিতার ছন্দ মিলিয়ে সেগুলি ছত্রে ছত্রে অনুসরণ করেন কি ?

উত্তর না পাইয়া হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—যাই বলুন, এ আপনার ভারী অন্যায়! আমি থাকতে উঠলেন কি না

ধর্ম্মশালায়। এখনই চাকরটাকে দিয়ে আপনার বিছানা-পত্র আনিয়ে নিচ্ছি। তার পর, মাসখানেক আপনাকে আর ছাড়ছি না। আমার জীবনের সব ঘটনা খুঁটিয়ে শুনতে এক মাসের ওপর সময় লাগবে।

হঠাৎ বাহিরে চাহিয়া হাঁকিলেন—পাঁড়েজী গাড়ী আয়া?

উত্তর আসিল—জী, হাঁ।

ফিরিয়া বলিলেন—আসুন, উঠে আসুন।—বলিয়া আমায় জোর করিয়া উঠাইয়া দ্বারপ্রান্তে আনিলেন। দেখিলাম, বার বছরের একটি ছেলের সঙ্গে ট্রেনের সেই বিধবা মহিলাটি গরদের ধুতি পরিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। মুখখানিতে দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নাই। ভদ্রলোক আমার পানে চাহিয়া হাসিলেন।

ভিতরে আসিয়া বসিতেই বলিলেন—আবার মাপ চাইছি, ট্রেনের কথা ভুলে যান, নারদ ঋষির উপদেশ মনে করুন। বুঝলেন না? বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মিনিট-কয়েক হাসিবার পর বলিলেন—আচ্ছা,—জীবনীতে ক'খানা ফটোর দরকার? আমার ছেলে বয়েস থেকে আজ পর্য্যন্ত ফটোই আছে পঞ্চাশ-ষাট্‌খানা। অতগুলো লাগবে

বলিলাম—সে পরে চেয়ে নেব।

—আচ্ছা, জীবন-কাহিনী কি আজ থেকে—এখনই সুরু ক'রবো? আপনার কষ্ট হবে না তো?

—আজ থাক। সামান্য একটু কাজ সেরে কাল থেকে শুনবো।

মনে মনে হিসাব করিলাম, কাশীর জরদা কিছু কিনিতে হইবে, দু-একটা সিঁদুরকৌটা, ছালটের শাড়ী একখানা, ছেলেদের কিছু কাঠের খেলানা, রামনগরের বেগুন, কপি, কালাকাঁদ খাবার, সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের আরতি-দর্শন; আর রিটার্ণ টিকেট ত কাটাই আছে। জীবনী ট্রেনের মধ্যেই লেখা হইয়া গিয়াছে, ফটোরই বা প্রয়োজন কিসের? বাহিরের ফটো দু-দিনে ম্লান হইতে পারে, কিন্তু মনের ফটো?

আমাকে মৌন দেখিয়া তিনি হাঁকিলেন—তেওয়ারি, ও কি উঠছেন যে! একটু জল খেয়ে যান।

হাতজোড় করিয়া কহিলাম—মাপ করবেন।

হতভম্বের মত ভদ্রলোক বলিলেন—তা'হলে!

হাসিয়া বলিলাম—নমস্কার।

কলিকাতায় ফিরিলে মুরলী বাবু দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন—কি মশায়, সব মাল-মশলা সংগ্রহ হ'ল? এত অল্প সময়েই যে···তা কবে বেরুবে জীবনীখানা?

বলিলাম—জীবন থাকতে জীবনী-লেখার বড় সুবিধে হয় না। লেখা উচিত নয়। সামনে যে জিনিষকে অত্যন্ত কাঁচা ব'লে মনে হয়, স্মরণে সেই জিনিষটা হ'য়ে ওঠে অপরূপ। আপনি শোক-সভায় গেছেন ত? দেখেছেন ত—যে-গুণ ঐ মৃত ব্যক্তির ছিল না, যা তিনি কল্পনাতেও আনেন নি, সেই সব বড় বড় কথাকে মহত্ত্ব-মণ্ডিত ক'রে আমরা শোকপ্রকাশের নামে কতকগুলি নির্জ্জলা মিথ্যা দিয়ে স্তবগান ক'রে থাকি। তাঁকে জানাবেন, ফটো এবং জীবন-বৃত্তান্ত দুই-ই আমার সংগ্রহ হয়েছে, বাকী সুযোগের অপেক্ষা করছি।

ভদ্রলোক উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—আচ্ছা রসিক লোক আপনি। সাহিত্যিক কি না!

মধুস্মৃতি

শ্রীমানকুমারী বসু

১

সজল জলদে ভরা সেই
আষাঢ়ের ধূমল গগন,
হেন দিনে নিলা বিধি, মায়ের অঞ্চল নিধি
"ভূতলে অতুল মণি" শ্রীমধুসূদন !

২

যুগ-যুগান্তর যায় চলি
তুমি দেব ! রয়েছ ঘুমিয়া,
পার্শ্বে পতিব্রতা সতী, নিদ্রালস ছায়াপতী
জগতের পানে আর দেখ না চাহিয়া।

৩

তবু তব শেষের আদেশে,
বঙ্গবাসী "এ সমাধিস্থলে"
বেদনা-পূরিত হর্ষে, করে পূজা প্রতিবর্ষে,
মরম-মথিত তপ্ত ভক্তি-অশ্রু-জলে।

৪

তোমার সে প্রিয় জন্মভূমি,
স্মরে মধু গৌরবের ধন,
তার সেই রবি শশী, নিত্য নীলাকাশে বসি,
ছড়ায় তোমারে স্মরি সোনার কিরণ।

৫

তার সেই সমীরণে ভরা
তোমারি সে মধুর মাধুরী.
তোমারি রসাল শাখে, মধুরবে পাখী ডাকে,
কপোতাক্ষী বহে তব নাম করি।

৬

তোমার সে অমর সন্তান—
মেঘনাদ, বীরাঙ্গনাগণ,
সে শর্ম্মিষ্ঠা পদ্মাবতী, কৃষ্ণা, চতুর্দ্দশপদী,
তিলোত্তমা, ব্রজবালা—সজল নয়ন,
জাগায়ে তোমারি স্মৃতি, অমৃত বিতরে নিতি,
চির অমরতা-মাখা তাদেরি আনন,
মানস কুসুম তব নন্দিনী নন্দন !

৭

দিয়ে গেছ বঙ্গভারতীরে,
অপরূপ রত্ন-অলঙ্কার,
বিশ্ব রবে যতদিন, হবে না সে আভাহীন,
অতুল অমূল্য রত্ন দীন বাঙ্গালার !

৮

থাক দেব ! ঘুমাও আরামে,
বঙ্গ-কবি রাজ-রাজেশ্বর !
দেখ কত অনুরক্ত, শ্রীমধুসূদন-ভক্ত
দান করে পুষ্পাঞ্জলি শত পূত কর !
যেথানে যে লোকে তাতঃ ! কর নিবসতি
লহ তব দুহিতার সহস্র প্রণতি।*

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিসভায় পঠিত।

মানভূম জেলায় সাহিত্য-সেবা ও গবেষণার উপাদান

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়, রাঁচী

ছোটনাগপুরের অন্যান্য জেলার ন্যায় মানভূম জেলাতেও প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, লোকসাহিত্য (folklore) প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণার প্রচুর উপাদান সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে। কেবল আহরণকারীর অভাবে তাহার অধিকাংশ অনাদৃত ও অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া আছে, এবং কতক কতক লয়প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। এ-যাবৎ আহরণের যাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই সরকারী ও বেসরকারী অনুসন্ধিৎসু বিদেশীয় পণ্ডিতদের প্রসাদে। এটা আমাদের পক্ষে নিতান্তই লজ্জার কথা। আর বিদেশী পণ্ডিতদের দ্বারাও সেটুকু তথ্য এ-পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে তাহারও পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর।

এ-পর্য্যন্ত কতটুকু তথ্য আহৃত হইয়াছে তাহার এবং কত-শত গুণ বেশী তথ্য সংগ্রহ করিতে বাকী আছে, এই অভিভাষণে এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

প্রথমে, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের কথা। বয়ঃক্রম-হিসাবে ছোটনাগপুর ভারতের মধ্যে একটি প্রাচীনতম প্রদেশ। সুতরাং এখানে পুরাতন প্রস্তর-যুগ হইতে মানুষের বসবাস ছিল এরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত। শুধু অনুমান নয়, ইহার যৎসামান্য প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। আক্ষেপের বিষয়, এ-সম্বন্ধে এখানে এখনও কোনও অনুসন্ধান হয় নাই। মানব-সভ্যতার প্রস্তর-যুগের ও তাম্র-যুগের যাহা কিছু সামান্য নিদর্শন এ জেলায় পাওয়া গিয়াছে তাহা দেব-প্রসাদাৎ এবং তাহাও বিদেশীয় পণ্ডিতদেরই মারফৎ ঘটিয়াছে।

ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ভ্যালেণ্টাইন বল্ সাহেব ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই জেলায় ভ্রমণকালে গোবিন্দপুরের এগার মাইল দূরে কুনকুনে গ্রামে পুরাতন প্রস্তর-যুগের একখানা ঈষৎ সবুজ রঙের আভাযুক্ত Quartzite প্রস্তরের কুঠার-ফলক পাইয়াছিলেন। ঐ সনের এশিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণীর ১২৭-১২৮ পৃষ্ঠায় উহার ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল। বল্ সাহেব তাঁহার *Jungle Life of India* নামক গ্রন্থের পঞ্চম প্লেটেও ঐ ছবি দিয়াছেন। পরে তিনি এই জেলার গোপীনাথপুরে আর একখানা নূতন প্রস্তর-যুগের অস্ত্র পান। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণীর ১৬৩ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ আছে। ডেভেরিয়া (J. Deveria) সাহেব এই জেলার বরাভূম পরগণার ধাদকার নিকট দেওবা গ্রামে নূতন প্রস্তর-যুগের লাইমষ্টোন পাথরের একখানা অস্ত্র পাইয়াছিলেন। সেটি এখন কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রাখা আছে। কগীন ব্রাউন (Coggin Brown) সাহেবের প্রণীত *Catalogue of Pre-historic Antiquities in the Indian Museum* নামক পুস্তকের সপ্তম প্লেটে উহার চিত্র দেওয়া হইয়াছে। এই জেলায় প্রাপ্ত প্রস্তরযুগের অস্ত্র সম্বন্ধে ছাপা গ্রন্থে আর কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আমার বিশ্বাস, গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিলে কোন-কোন চাষীর ঘরে এরূপ অস্ত্র কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে। ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে, বা বৃষ্টিতে মাটি ধুইয়া গিয়া কখনও কখনও প্রস্তর-যুগের এক-আধখানা অস্ত্র দৈবাৎ দৃষ্টিগোচর হয়; এবং ক্ষেত্রস্বামী বা অপর কেহ ঐরূপ প্রস্তরকে "বজ্র-প্রস্তর" মনে করিয়া যত্নে রক্ষা করে এবং মাথাধরা, বাত প্রভৃতি পীড়ায় আরোগ্যলাভের আশায় ঐ পাথর জলে ঘসিয়া তাহার প্রলেপ দেয়। এইরূপে প্রাপ্ত প্রস্তরাস্ত্রের সূত্র অবলম্বন করিয়া যদি কেহ উহার প্রাপ্তিস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানে যথারীতি খননাদি দ্বারা অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে হয়ত ভাগ্যক্রমে অনেক প্রস্তরাস্ত্র উদ্ধার করিতে পারেন। আমি এইরূপ সূত্র ধরিয়া রাঁচী জেলায় প্রস্তর-যুগের অনেক অস্ত্র পাইয়াছি। এরূপ দুই শত অস্ত্র পাটনার যাদুঘরে দিয়াছি। ইহা ছাড়া রাঁচী জেলায় তাম্র-যুগের অস্ত্রাদিও কিছু উদ্ধার করিতে পারিয়াছি।

মানভূম জেলায় দৈবযোগে কয়েক খানা প্রাগৈতিহাসিক যুগের তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রও পাওয়া গিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী আগে এই জেলার বিসুয়াড়ি গ্রামের সাঁওতাল মাঝি একখানা তাম্রের কুঠার-ফলক জঙ্গলের মধ্যে দেখিতে পাইয়া পোখুরিয়ার তৎকালীন খ্রীষ্টান পাদরী ক্যাম্পবেল সাহেবকে জানায়। ঐ অদ্ভুত বস্তুকে ভৌতিক দ্রব্য বিবেচনা করিয়া গ্রামস্থ বা নিকটস্থ কেহ উহার নিকটে যাইতে সাহস করে নাই; তখন ডাক্তার ক্যাম্পবেল তাঁহার মিশনের একটি খ্রীষ্টান যুবককে পাঠাইয়া সেটি সংগ্রহ করেন। উহা কি বস্তু তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া মানভূমের তখনকার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার স্বর্গীয় রায়-বাহাদুর নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়কে দেখান; তিনি অনুমান করেন যে, উহা দেবীপ্রতিমার কলগা (halo); পরে ক্রমে ক্রমে ঐরূপ ছোট-বড় ২৭ খানা তাম্র-কুঠার-ফলক আশপাশ হইতে ক্যাম্পবেল সাহেবের হস্তগত হয়; কিন্তু তখনও ঐগুলি কি জিনিষ তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচী জেলায় আমি তৎপূর্ব্বে যে কয়েকখানা তাম্র কুঠার ফলক পাইয়াছিলাম তাহার বিবরণ ঐ সনের বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকায় লিখি। তাহা পাঠ করিয়া, ক্যাম্পবেল সাহেব স্যর এডওয়ার্ড গেটকে এবং আমাকে তাঁহার প্রাপ্ত তাম্রের ঐ জিনিষের কথা বলেন; এবং সেগুলির বিবরণ শুনিয়া, তাম্র-যুগের অস্ত্রভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, আমরা এইরূপ বলায় তিনি উহার কয়েকখানা পাটনার যাদুঘরে দান করেন, ও স্যর এডওয়ার্ড গেটকে একখানা এবং আমাকে একখানা উপহার দেন। বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে ডাক্তার ক্যাম্পবেল ঐগুলির প্রাপ্তির বিবরণ প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয়তঃ, জাতি-তত্ত্বের কথা। প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ঐতিহাসিক যুগে ধারাবাহিক ভাবে এ-জেলায় কোন্ কোন্ জাতি আসিয়াছিল তাহার ইতিহাস সবিশেষ এখনও অজ্ঞাত। এ-সম্বন্ধেও এ-পর্য্যন্ত যে কিছু সামান্য তথ্যানুসন্ধান হইয়াছে তাহার জন্যও আমরা প্রধানতঃ বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট ঋণী।

নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে পাঁচটি প্রধান জাতি (race) পর-পর ভারতে বসবাস করে। সর্ব্বপ্রথমে সম্ভবতঃ বর্ত্তমান আণ্ডামানবাসীদের ন্যায় একটি কালো, বেঁটে মৃগয়াজীবী জাতি ভারতে বাস করিত। সে জাতি বহুকাল পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইলেও দক্ষিণ-ভারতের আধুনিক কাডার, উরুলা প্রভৃতি জাতির মধ্যে তাহাদের রক্ত কিছু মিশ্রিত আছে, এইরূপ অনুমিত হয়। তার পর আসে বর্ত্তমান সাঁওতাল, খাড়িয়া, ভূমিজ, মুণ্ডা, শবর, জুয়াঙ, বীরহোড়, কোড়োয়া, কোড়কু, গদব প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা। ভারতের উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে সুদূর অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত এই "কোল" জাতির ভাষার চিহ্ন পাওয়া যায়। সে-জন্য ভাষা-হিসাবে আজকাল ইহাদিগকে "অষ্ট্রীক্" জাতি বলা হয়। ইহাদের একটি শাখার নাম "শবর", এবং পুরাণ প্রভৃতিতে "শবর", "পুলিন্দ" প্রভৃতি যে-সব নাম দেখা যায় তাহা হইতে অনুমান হয় যে ভারতের সমস্ত "অষ্ট্রীক্" বা "মুণ্ডা"-ভাষী জাতিদের সম্বন্ধেই ঐ "শবর" নাম প্রয়োগ করা হইত। রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে যে "বানর," "নিষাদ" প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সে নামগুলিও সম্ভবতঃ এই 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' জাতিদের কোন-কোন শাখা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত।

ইহাদের পরে ভূমধ্যসাগরমাতৃক-দেশের মেডিটারেনিয়ান জাতির একাধিক শাখা উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম দিয়া ভারতে প্রবেশ করে। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, ও মহাভারত প্রভৃতিতে বর্ণিত প্রাচীন "অসুর" বা "দানব" এবং "রাক্ষস" প্রভৃতি এই জাতির শাখা। আধুনিক দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী তামিল, তেলুগু প্রভৃতি জাতিগুলি এই জাতিভুক্ত।

ইহাদের আরও অনেক পরে মধ্য-এশিয়ার অত্যুচ্চ পার্ব্বত্য অধিত্যকা হইতে পামীর-গিরিবর্ত্ম হইয়া "আল্পাইন" জাতির এক বা একাধিক শাখা ভারতে প্রবেশ করে। ইহারা "ককেসীয়" শ্রেণীর গোষ্ঠী-বিশেষ। বর্ত্তমান বাঙালী, গুজরাটী, মারহাটি, কুর্গী প্রভৃতি এই আল্পাইন জাতির মিশ্র-বংশধর বলিয়া অনুমিত হয়।

তার পর সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম হইয়া ককেসিক্ আর্য্যজাতি ভারতে প্রবেশ করে, এবং অপর প্রান্তে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব পথে, মঙ্গোলিয়ান জাতির

ভোট-চীন (Tibeto-Chinese) শাখা ভারতে আসে।

ভারতের মূল অধিবাসী এই পাঁচটি প্রধান জাতির মধ্যে মানভূম জেলা এবং ছোটনাগপুরের অন্যান্য জেলায় নেগ্রিটো এবং মঙ্গোলিয়ান জাতির আগমন বা অবস্থানের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। "অষ্ট্রীক্" কোল বা "মুণ্ডা" জাতীয় ভূমিজ, সাঁওতাল, খাড়িয়া, পহিড়া প্রভৃতি কয়েকটি জাতি মানভূম জেলার আদিম-নিবাসী বলিয়া পরিগণিত হয়। এখানকার অবশিষ্ট প্রধান জাতিগুলির মধ্যে দ্রাবিড়ী বা "মেডিটারেনিয়ান" ও আল্পাইন, এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কিছু "মুণ্ডা"-শোণিত ও উচ্চশ্রেণীর জাতিদের মধ্যে সামান্য আর্য্য-শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অষ্ট্রীক্-ভাষা-ভাষী 'কোল' জাতিগুলি ছাড়া এ-জেলার অন্যান্য প্রধান জাতিগুলির মধ্যে কোন্গুলি "মেডিটারেনিয়ান" বা দ্রাবিড়ী বংশসম্ভূত ও কোন্গুলি "আল্পাইন" তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপযোগী যথেষ্ট উপাদান এ-পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। ভূমিজ (জনসংখ্যা ১,০৩,৯০১), সাঁওতাল (২,৮২,৩১৫) প্রভৃতি আদি নিবাসী ছাড়া ও ব্রাহ্মণ ছাড়া, এ-জেলার সংখ্যা হিসাবে প্রধান অধিবাসী কুর্ম্মি (৩,২৩,০৬৮), বাউরি (১,২১,৩২১), কুমার (৫৬,৯৬৮), তেলী বা কলু (৪৮,৪৫৭), গোয়ালা (৪০,৯৯৬), কামার (৩৫,২৭৯) ও ভুঁইয়া (৩৩,৭৪৩)।

মানভূমের তেলকুপি গ্রামে একটি ভগ্ন-দেউল

মানভূমের তেলকুপি গ্রামে একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দির

ইহা ছাড়া মাল বা মল্লিক এবং সরাক এই দুই জাতি সংখ্যায় কম হইলেও ঐতিহাসিক গুরুত্বে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত গবেষণার অভাবে ইহাদের কোন্ জাতির মধ্যে আল্পাইন-জাতীয় উপকরণ বর্ত্তমান, কোন্ জাতিতে দ্রাবিড়ী শোণিতের আধিক্য আছে, এবং কোন্ জাতির মধ্যে 'কোল'-শোণিতের সংমিশ্রণ আছে, নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না এবং সাঁওতাল প্রভৃতি 'কোল' জাতি ছাড়া কোন্ জাতির পর কোন্ জাতি এ-জেলায় আসিয়াছিল সে-সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান এ-পর্য্যন্ত হয় নাই।

তেলকুপি গ্রাম

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক্ ঐতিহাসিক প্লিনি তাঁহার *Natural History* (vol. vi. p. 83) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "পালিবোথরার বা পাটলিপুত্রের পশ্চাতে গঙ্গা-উপকূল হইতে দূরে মোনেডি ও শূয়ারি এবং 'মল্লি' বা 'মল্ল'দের দেশ এবং তাহাদের দেশে Mount Mallus বা মল্লপর্ব্বত অবস্থিত।" প্লিনির এই মোনেডি বা মোণ্ডেই এবং "শূয়ারি" ও "মল্লি" যথাক্রমে "মুণ্ডা," "শবর," ও "মাল" জাতিকে নির্দ্দেশ করে ; ক্যানিংহাম, ওল্ডহাম, রিজ্‌লি প্রমুখ পণ্ডিতেরা এইরূপ অনুমান করেন ; এবং এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। দ্রাবিড়ী ভাষায় পাহাড়কে "মালে" বলে ; হয়ত প্লিনির সংবাদ-দাতা স্থানীয় লোককে 'এই পাহাড়ের নাম কি' জিজ্ঞাসা করায় সে তাঁহাকে কেবল বলিয়াছিল যে ইহা "মালে," অর্থাৎ পাহাড়, অথবা "মালদের" পাহাড় ; তাই তিনি উহার নাম "Mons Mallus" স্থির করিয়াছিলেন। "শবর"-সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে "শবর" নামক মুণ্ডা-ভাষা-ভাষী একটি জাতি যদিও এখন উড়িষ্যায় বাস করে, তবু পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে মুণ্ডা-ভাষা-ভাষী জাতিদের সাধারণ নাম "শবর" বলা হইয়াছে। আর আমি মানভূমের দলমা-পাহাড়ের জঙ্গল খাড়িয়াদের নিকট শুনিয়াছি যে তাহাদের আদি পুরুষের নাম ছিল "শবর বুড়া" ও তাহার স্ত্রীর নাম ছিল "শবর বুড়ী।" সে যাহাই হউক, মাল জাতি যে অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই জেলায় বাস করিত এবং এখানকার একটি প্রধান জাতি ছিল, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ ঐ "মাল" জাতির নাম হইতেই এই জেলার নাম "মানভূম" হইয়াছে ; এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে "মানভূম" —"মল্লভূমি" বা "মল্লযুদ্ধ-নিপুণ জাতির দেশ।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "মল্লভূমি" বিষ্ণুপুরের পুরাতন রাজাদের রাজ্যের নাম ছিল এবং এখনও বিষ্ণুপুর অঞ্চল "মল্লভূমি" নামে অভিহিত হয়। এখনও দেবীর সম্বন্ধে "মল্লে রা শিখরে পা ; সাক্ষাতে দেখ্‌বি তো শান্তিপুরে যা" এই প্রবচনে বিষ্ণুপুরকেই "মল্ল"ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। বর্ত্তমান "মানভূম" জেলা বিষ্ণুপুরের রাজাদের রাজ্যভুক্ত ছিল এরূপ কোনও প্রমাণ বা কিম্বদন্তীও আমার জানা

বোড়ামে চতুর্ভুজ দেবীমূর্ত্তি, পার্শ্বে গণেশ ও কার্ত্তিক

পাকবিড়রায় মন্দিরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ও জৈন মূর্ত্তি

নাই। বস্তুতঃ মানভূম জেলার মানবাজারের রাজাদিগকে মানভূমের রাজা বলা হয় (*District Gazetteer of Manbhum*, p. 275)। তবে বিবাহসূত্রে মানবাজারের রাজা বা জমিদার-বংশ বিষ্ণুপুরের মল্ল-রাজবংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল (ঐ, ২৭৬ পৃ.)। অতএব, উভয় বংশই "মাল"জাতিসম্ভূত এরূপ অনুমান করা যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া মনে হয় না। বাঁকুড়া ও মানভূম জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমান্ত-রেখায় তিলুড়ী গ্রামে একটি প্রাচীন শিলালিপিতে "মানস্য বীর স্তম্ভমিদং" এই কথাগুলি হইতে এবং ঐ স্থানের ধ্বংসাবশেষগুলি মান-বংশীয় কোন রাজার আবাসস্থল ছিল এইরূপ কিম্বদন্তী হইতে বর্ত্তমান মানভূম জেলায় মানরাজাদের এক সময় আধিপত্য ছিল এই অনুমান সমর্থিত হয় (প্রবাসী, ১৩৪০, চৈত্র, ৮১০-৮১৩)। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাসে" লিখিয়াছেন যে বর্ত্তমান হাজারিবাগ জেলায় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দে একটি 'মান'-রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। বর্দ্ধমান, অজিতমান, শ্রীধৌতমান প্রভৃতি ঐ বংশের রাজা ছিলেন। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে 'মান-জাতি' এককালে একটি পরাক্রান্ত জাতি ছিল এবং বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল, এবং সম্ভবতঃ এই পুরাতন 'মান' ও বর্ত্তমান 'মাল' জাতি অভিন্ন।

মানভূমের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার কুপলাণ্ড সাহেব *Manbhum District Gazetteer*এ লিখিয়াছেন (২৭৬ পৃ.) যে যদিও মানবাজারের জমিদার-বংশ এখন আপনাদিগকে "রাজপুত" বলিয়া পরিচয় দেন, তবুও খুব সম্ভব উঁহারা বাউরি-বংশ-সম্ভূত। যদিও এই অনুমানের কোন কারণ তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই, তবুও 'মাল' জাতি ও 'বাউরি' জাতি অভিন্ন না হইলেও পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত থাকা সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। বাউরি জাতির মধ্যে "মল্লভূমিয়া" "মলুয়া" "মুলো" প্রভৃতি উপ-জাতি (sub-caste) আছে; এই "মল্লভূমিয়া" নাম হইতে জানা যায় যে "মাল" জাতি হইতে "বাউরি"রা পৃথক জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় এবং হইত। "বাগদী" জাতির সঙ্গেও মূল "মাল" জাতির জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক থাকা সম্ভব। "বাগদী" জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কিম্বদন্তী আছে যে বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীর-মল্লের শাস্ত্র,
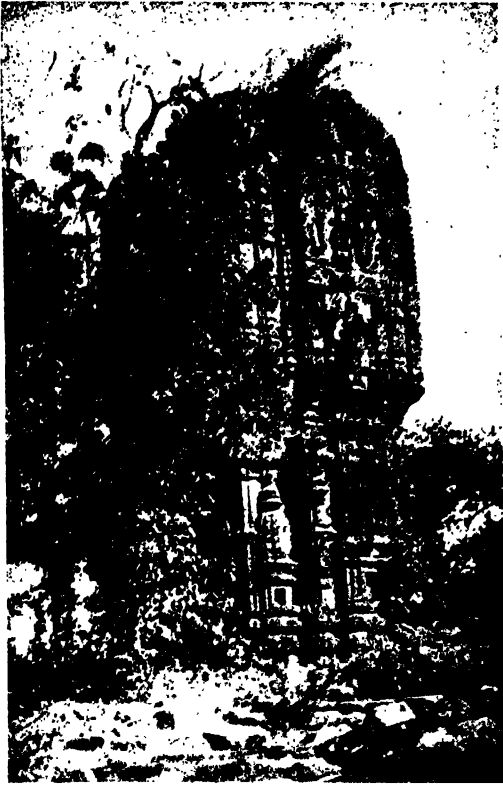
ছড়রার নিকটে জিনগণের মূর্ত্তি অঙ্কিত পাথরের খণ্ড

ঘোড়াম-গ্রামে ইটে তৈয়ারী দেউল

নেমু, মন্ত ও কেতু নাম্নী চারি কন্যা হইতে বাগ্দী জাতির চারিটি শাখা—তেঁতুলে বাগ্দী, দুলে বাগ্দী, কুশমোতিয়া বাগ্দী ও মাতিয়া বাগ্দী যথাক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে। স্যর উইলিয়াম হাণ্টার তাঁহার *Annals of Rural Bengal* পুস্তকে এইরূপ একটি কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—একটি কুশমোতিয়া বাগ্দী জঙ্গলে একটি শিশু কুড়াইয়া পায় ও তাহাকে পালন করে। সেই পালিত শিশুই সেই দেশের তৎকালীন রাজার মৃত্যুর পর রাজহস্তীর দ্বারা আনীত হইয়া বিষ্ণুপুরের রাজগদীতে স্থাপিত হয়। বাগ্দীদের মধ্যেও 'মল্লিক'-উপাধির প্রচলন আছে।

'মাল', 'বাগ্দী' ও 'বাউরি' এই তিন জাতির মধ্যেই 'দ্রাবিড়ী' জাতির বিশেষত্ব-দ্যোতক সর্পপূজার বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহারাই বাঙ্গালা দেশের মনসা-পূজার প্রবর্ত্তক। তবে মস্তিষ্ক-করোটির গঠন পর্য্যালোচনা করিলে ইহাদের মধ্যে 'আলপাইন' জাতির নিদর্শনের আধিক্য দৃষ্ট হয়। বাউরিদের মস্তিষ্কের পরিমাপ হইতে দেখা গিয়াছে যে শতকরা ৭৫টি মাথা গোল-ধরণের (brachy-cephalic, 76-85 c. i.) এবং সাড়ে বারটি লম্বাটে (dolicho-cephalic, c. i. 66-70) এবং সাড়ে বারটি মাঝারি ধরণের (meso-cephalic, c. i. 71-75)। বাঙ্গালী কায়স্থের মধ্যেও শতকরা ৬৭টি গোল মাথা, এবং ৩৩টি মাঝারি মাথা। আলপাইন-জাতিরই মাথা গোল-ধরণের। (*Man in India*—July-Dec., 1934.)

দ্রাবিড়ী জাতির মস্তিষ্ক-করোটি লম্বাটে ও মাঝারি (meso-cephalic) ধরণের কিন্তু 'কোল' (Austric-speaking) জাতির মস্তিষ্ক-করোটি বিশেষভাবে লম্বাটে (dolicho-cephalic)। নাসিকার পরিমাপেও বাউরিদের
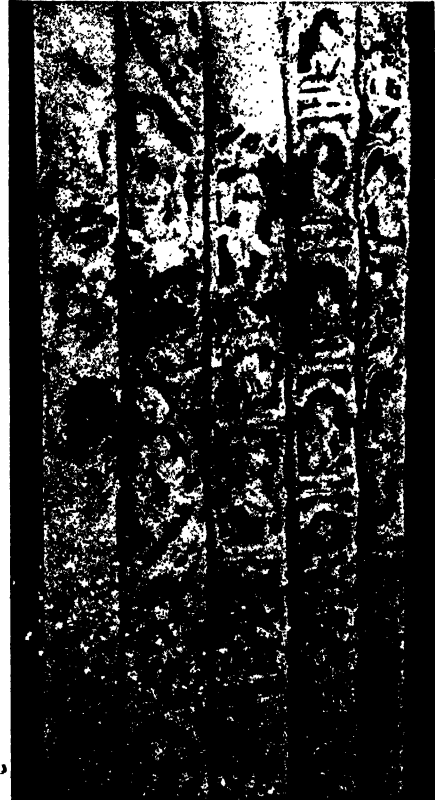
তেলকুপির মন্দির-গাত্রে মনুষ্যকৌতুকী ও অন্যান্য মূর্ত্তি

মানভূম জেলার একটি শিক্ষিত কুড়মি-পরিবার

মানভূম জেলার সাঁওতাল (কাড়ামারা গ্রাম)

মধ্যে শতকরা ৮৬ জনের মাঝারি ধরণের (mesorrhine) নাক (nasal index, ৭৬ হইতে ৮০) দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বাঙ্গালী কায়স্থদের শতকরা ৭৫ জনের ঐরূপ নাক দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া মনে হইতে পারে যে বাঙ্গালী কায়স্থ জাতি যদি ভারতীয় আলপাইন জাতির মধ্যে উচ্চতম শ্রেণীর অন্তর্গত স্বিরীকৃত হয়, তাহা হইলে 'মাল', 'বাগ্দী', 'বাউরি' প্রভৃতি জাতিগুলি ঐ "আলপাইন" জাতির নিম্নতম স্তর-ভুক্ত থাকা অসম্ভব নয়। যেমন বাঙ্গালী কায়স্থ জাতির মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে আর্য্য-শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে, সেইরূপ বাউরি প্রভৃতি জাতির মধ্যে দ্রাবিড়ী ও মুণ্ডা-শোণিত যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। তবে এ-সব সম্বন্ধে যথোপযুক্ত গবেষণার অভাবে এখনও নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না। সম্প্রতি কুড়মি ও মাল-জাতির মধ্যে কেহ কেহ "কূর্ম্ম-ক্ষত্রিয়" ও "মল্ল-ক্ষত্রিয়" বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

এ জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কুড়মি জাতির কুলজী বা বংশ-বৃত্তান্ত ও তাহাদের এ অঞ্চলে আগমনের কাল সম্বন্ধেও আজ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে গবেষণার অভাব। এ সম্বন্ধে ডাল্টন, রিজ্‌লী ওডোনেল, কুক প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতেরা যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে তিন প্রকার আনুমানিক মত দৃষ্ট হয়।

প্রথম অনুমান এই যে, ছোটনাগপুর, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কুড়মিরা সকলেই মূলতঃ দ্রাবিড়ী

তেলকুপিতে রেখ-দেউল
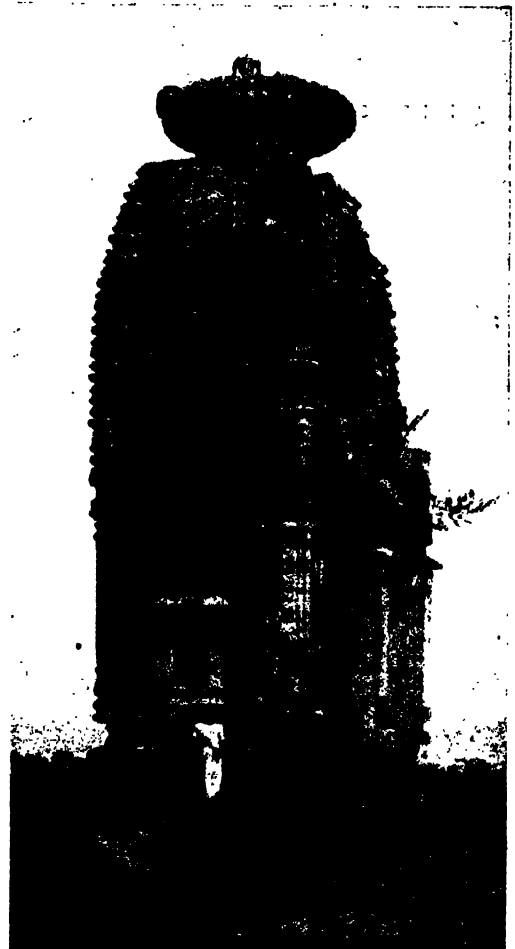
মানভূম জেলার সাঁওতাল (কাড়ামারা গ্রাম) মানভূম জেলার ভূমিজ-দম্পতী মানভূম জেলার বাউরি জাতি

জাতি ছিল; তবে পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি যে সব অঞ্চল আর্য্যদের অভিযানের পথে পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থানের কুড়মিদের মধ্যে অল্প-বিস্তর আর্য্য শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অনুমান এই যে, সমস্ত কুড়মি জাতি মূলতঃ আর্য্য-বংশসম্ভূত। কিন্তু আবাসস্থান ও বৃত্তি বা পেশাভেদে এবং 'দ্রাবিড়ী' কিংবা 'মুণ্ডা' জাতিদের সংমিশ্রণে ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কুড়মিদের জাতীয় অপকর্ষতা ঘটিয়াছে।

তৃতীয় অনুমান এই যে, নাম এক হইলেও কুড়মি নামধারী জাতির উৎপত্তি দ্বিবিধ। ছোটনাগপুরের কুড়মিরা 'কোল'-বংশ-সম্ভূত, আর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ও বিহারের কুড়মিরা আর্য্য-বংশ-সম্ভূত।

এই তিনটি মত ছাড়া একটি চতুর্থ অনুমানও অযৌক্তিক নয়, আমার এইরূপ মনে হয়। আমার অনুমান এই যে, হয়ত কুড়মি জাতি মূলতঃ আলপাইন-বংশ-সম্ভূত হইতে পারে। এই অনুমানের সপক্ষে এইরূপ কয়েকটি যুক্তি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(১) কৃষিকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য মহারাষ্ট্র দেশের কুনবি জাতি ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের, বিহারের ও ছোটনাগপুরের কুড়মি জাতি প্রসিদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কুড়মি জাতির কৃষিকার্য্যে আসক্তি ও শ্রমশীলতা সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে :

"ভালি জাত কুড়মিন, খুরপি হাথ।
খেত নিরাওএ আপন পিকে সাথ॥"
"এক পান যে বর্ষে স্বাতী।
কুড়মিন পহিরে সোনে কি পাতি॥"

(২) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কুড়মিদিগের মধ্যে 'কুনবি' নামেরও প্রচলন আছে। মহারাষ্ট্র প্রদেশের কুনবি জাতি যে অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয়দের ন্যায় আলপাইন-বংশ-সম্ভূত ইহা অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মত।

বস্তুতঃ বিহারের আউধিয়া কুড়মি এবং যুক্তপ্রদেশের কনৌজিয়া কুড়মিরা মারহাট্টা ভোঁসলা রাজাদের ও সিন্ধিয়া-রাজবংশের এবং শিবাজীর সঙ্গে সমজাতিত্ব দাবি করে।

(৩) উত্তর-পশ্চিম বা যুক্তপ্রদেশের আজমগড় জেলায় কুড়মি জাতির একটি শাখা 'মাল' নামে অভিহিত হয়। 'মাল'-জাতি যদি আল্পাইন-বংশ-সম্ভূত হয়, তাহা হইলে কুড়মি জাতিও ঐ বংশ-সম্ভূত হওয়া সম্ভবপর। আজমগড় জেলার মালেরা গোরক্ষপুর জেলার সাঁইথোয়ার কুড়মিদের সঙ্গে কন্যা আদান-প্রদান করে। ঐ সাঁইথোয়ার কুড়মিরা "নাগ-বংশী" নামে আপনাদের পরিচয় দেয়।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কুড়মি জাতিকে বাঙালী

মানভূম জেলার সাঁওতাল　　মানভূম জেলার একটি শিক্ষিত কুড়মি ভদ্রলোক　　মানভূম জেলার ভূমিজ

ও মহারাষ্ট্রীয় জাতিদের ন্যায় ককেসীয় আলপাইন জাতির অন্তর্গত মনে করা অসঙ্গত না হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে কুড়মি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ও দৈহিক পরিমাপ (anthropometry) এবং কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের রীতিমত গবেষণা ব্যতিরেকে কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

তার পর মাল-জাতির কথা। 'মাল' জাতি এখন মানভূমের বাহিরে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া, খুলনা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, রাজশাহী, মালদহ, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বাস করিতেছে। উড়িষ্যার কয়েকটি করদ-রাজ্যেও "মাল" জাতির বসতি আছে। সাঁওতাল পরগণায় 'মাল' জাতির সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র। সেখানে কিম্বদন্তী আছে যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল-বিদ্রোহের অনতিপূর্ব্বেই মানভূমের গোবিন্দপুর অঞ্চল হইতে ঐ মালেরা সেখানে যায়। কিন্তু বঙ্গের অন্যান্য জেলায় বহু পূর্ব্বকাল হইতেই 'মাল', 'বাগ্দী', ও 'বাউরি' জাতি গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; এবং পরে কোনও অজ্ঞাত কারণে, সম্ভবতঃ অন্যান্য জাতির আগমনে, মানভূমের মালেরাও অনেকে পূর্ব্বাভিমুখে বঙ্গদেশে গমন করে। 'মালদহ' জেলার নাম সম্ভবতঃ 'মাল'-জাতি হইতেই উৎপন্ন। মাল-জাতির জনসংখ্যা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে ছিল এক লক্ষ আট হাজার এবং বিহার ও উড়িষ্যায় মাত্র চব্বিশ হাজার। ঐ সনে 'বাগ্দী' বাংলা দেশে ছিল এক লক্ষ ষোল হাজার এবং বিহার ও উড়িষ্যায় কেবল মাত্র আঠার হাজার, ও বাউরি বাংলা দেশে তিন লক্ষ চৌদ্দ হাজার এবং বিহার ও উড়িষ্যায় দুই লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীতে বাগ্দী ও বাউরির জনসংখ্যা একত্রে বাংলা দেশে তের লক্ষ আঠার হাজার আট শত আট ত্রিশ ছিল। কিন্তু বিহার ও উড়িষ্যায় কেবল তিন লক্ষ পনর হাজার আট ত্রিশ জন। সম্ভবতঃ মাল-জাতি বাগ্দী ও বাউরি জাতি অপেক্ষা সভ্যতায় কিছু অধিকতর উন্নত থাকায় তাহাদের অধিকাংশ বাঙালী শূদ্র নবশাখ জাতির মধ্যে লীন হইয়াছে; বাগ্দী ও বাউরিরা অধিকাংশই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বাঙালী জাতির অতি নিম্ন স্তরে স্থান পাইয়াছে।

রিজ্‌লী সাহেব এই 'মাল' জাতিকে যে বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার 'মালে'র বা 'সৌরিয়া-পাহাড়িয়া'দের

মানভূম জেলার দেশোয়ালি-মাঝি, ইহারা এক শ্রেণীর সাঁওতাল।

বুধপুরে মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি পাথরের 'ভাঙ্গি' (নরমুণ্ড)। ইহার সাহায্যে পুরাকালে বীরেরা মুগুরের মত ব্যায়াম করিত।

পাকবিড়রার দুইটি জিন-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ-পার্শ্বে গ্রামের ভূমিজ-সর্দ্দার।

সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন (*Tribes and Castes of Bengal*, Vol. II, pp. 46-47), এ-সিদ্ধান্ত কত দূর সত্য বলা যায় না। এমন কি 'কুমারভাগ' প্রভৃতি 'মালপাহাড়িয়া'রাও 'সৌরিয়া-পাহাড়ী'দের সহিত অভিন্ন এ-কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। যদি 'মালপাহাড়িয়া' ও 'সৌরিয়া-পাহাড়ী'দের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ না থাকে, তবে মানভূমের মাল জাতি সাঁওতাল পরগণার 'মালপাহাড়িয়া'দের স্বগোষ্ঠী এরূপ অনুমান করা অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়। সৌরিয়া-পাহাড়িয়ারা দ্রাবিড়ীভাষা-ভাষী হইলেও, জাতি হিসাবে "দ্রাবিড়-পূর্ব্ব" (Pre-Dravidian) অর্থাৎ মুণ্ডা বা শবর গোষ্ঠীর সমশ্রেণীর বলিয়াই মনে হয়।

আর রিজ্‌লী সাহেবের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যে মানভূম হইতে তাড়িত হইয়াই 'মাল' জাতি প্রথমে বাংলা দেশে যায় ইহাও যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। সম্ভবতঃ যে-কালে 'মাল' জাতি মানভূমে প্রবেশ করে তাহারই অব্যবহিত অগ্রপশ্চাৎ তাহাদের অপর দলগুলি বা উদ্বৃত্ত অংশ পূর্ব্বাভিমুখে গিয়া ক্রমে বাংলা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়। অন্ততঃ বঙ্গে জাতিভেদ-প্রথা সুদৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বেই কিংবা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকা কালেই 'মাল' জাতি বঙ্গে গমন করে, এবং বাঙালী জাতির নিম্ন স্তরে মিশিয়া যায়, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। আর মানভূমের মালেরা ইহার বহুকাল পর পর্য্যন্ত এখানেই ছিল, ইহা "সরাক্" জাতির কিম্বদন্তী হইতে অনুমান হয়। পরে ক্রমে অন্য জাতির আগমনে,—হয়ত কুড়মিদের আগমনে এবং তাঁহাদের ও "ভূমিজ" প্রভৃতি আদিম জাতির চাপে—'মাল' জাতির কতক অংশ এই জেলার উত্তর ভাগে আশ্রয় লয়; এবং কতক আরও উত্তরে সাঁওতাল পরগণায় এবং কতকাংশ পশ্চিম-বঙ্গেও গমন করে। বর্ত্তমানে মানভূম জেলায় যে প্রায় দশ হাজার 'মাল' অবশিষ্ট আছে তাহারা কেবল এই জেলার উত্তরাংশে ঝরিয়া নিরসা ও রঘুনাথপুর থানার এলাকাতেই বাস করিতেছে; এবং সাঁওতাল পরগণায় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রায় ৯ হাজার 'মাল' ও সাড়ে ছয় হাজার 'মাল'-জাতীয় "মৌলিক" বাস

পাড়ার একটি প্রস্তর-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

পাকবিড়রার জৈন-মন্দিরে একটি জিন-মূর্ত্তি।

পাড়ার অপর একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

করিতেছিল তাহারা মানভূম জেলা হইতে সত্তর-আশী বৎসর পূর্ব্বে তথায় গিয়াছে—কিম্বদন্তী এইরূপ।*

তার পর সরাক জাতির কথা। সরাক জাতির গঠন ধর্ম্মবিশ্বাস-মূলক; সুতরাং সম্ভবতঃ উহাদের মধ্যে নানা-প্রকার জাতীয় উপাদান বর্ত্তমান। তবে অঙ্গসৌষ্ঠব দৃষ্টে উহাদের মধ্যে আর্য্য-শোণিতের প্রাদুর্ভাব আছে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান কালে মানভূম জেলার উত্তর-পূর্ব্বে রঘুনাথপুর, পাড়া ও গৌরাঙ্গডি থানার এলাকায় 'সরাক'দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। আর দক্ষিণে ও পশ্চিমে চাণ্ডিল ও চাস থানার এলাকাতেও কতক সরাকের বাস এখনও আছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীতে এই জেলায় প্রায় সাড়ে দশ হাজার সরাকের বাস ছিল। তন্মধ্যে রঘুনাথপুর থানার এলাকায় ৫,৪৩১; পাড়া থানায় ৩,৩৪৪; গৌরাঙ্গডি থানায় ৬০৫, চাস থানায় ৫৪৭ এবং চাণ্ডিল থানায় ৩৯৩; ইহা ছাড়া পুরুলিয়া থানার এলাকায় ১৯ জন, তোপচাঁচি থানায় ৪ জন, ঝালদা এলাকায় ২ জন ও নিরসা থানায় ১ জন সরাক বাস করিত। কিন্তু এক সময় এই জেলার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম—সব দিকেই এই সরাক জাতির প্রভাব ও বসতি ছিল। এখনও নানা স্থানে প্রাচীন মন্দিরের এবং জৈন ও বৌদ্ধ মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। উত্তর-পূর্ব্বে তেলকুপি ও চেলিয়ামা এবং গৌরাঙ্গডি, উত্তর-পশ্চিমে ছেছগাঁও ও বেলোঞ্জা; দক্ষিণ-পূর্ব্বে পাকবিড়রা ও বুদ্ধপুর, দক্ষিণ-পশ্চিমে বোড়াম, ডুলমি, দেওলি, সুইসা ও সফারণ, এবং মধ্যভাগে পাড়া, ছররা, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও সরাকদের মন্দিরগুলির সুন্দর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অনেক নিদর্শন বর্ত্তমান। এই সমস্ত মন্দিরের গঠনপ্রণালী এক দিকে উড়িষ্যার রেখদেউলের অনুরূপ এবং অপর দিকে কোঞ্চ, দেও প্রভৃতি গয়া-জেলার মন্দিরগুলির সঙ্গে কিছু সাদৃশ্যযুক্ত। আর কোন-কোন বিষয়ে রাজপুতানা, গুজরাট প্রভৃতি দেশের মন্দিরাদির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যও দেখা যায়। বিগত ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীমান নির্ম্মল-কুমার বসু মানভূম জেলার কয়েকটি মন্দিরের বিবরণে এ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত মন্দির ও মূর্ত্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সুপারিন্টেনডেন্ট্ বেগ্‌লার সাহেব সত্তর বৎসর পূর্ব্বে সেগুলির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাই

* ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীর পর মালদের জেলা-ওয়ারি জনসংখ্যা লিপিবদ্ধ হয় নাই। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আদমসুমারীতে মানভূম জেলায় ৯,৪৩৮ জন 'মাল' (যার মধ্যে ৭,০৫৫ জন 'মল্লিক' উপাধিধারী ছিল), এবং ৪৬৮ জন মৌলিক বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; আর সাঁওতাল পরগণায় ৮,৯৭৪ জন 'মাল' এবং ৬,৪৬৬ জন মৌলিক এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

মানভূম জেলার তেলি জাতি

মানভূম জেলার কুম্ভকার (গ্রাম, নদীয়াড়া)

মানভূম জেলার কুড়মি জাতি

এ-পর্য্যন্ত একমাত্র বিশদ বিবরণ। ছোটনাগপুরের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার ডাল্‌টন্‌ সাহেব এ-সম্বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আপন মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বহু পুরাকাল হইতে এই জেলায় ভূমিজ জাতির প্রাধান্য থাকে; পরে জৈন সরাকেরা খ্রীষ্টের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে মানভূম জেলায় আগমন করে ও নির্ব্বিবাদে মন্দিরাদি স্থাপন করে। পাকবিড়রায় যে বৃহৎ জিন-মূর্ত্তি আছে সেটি চতুর্ব্বিংশতি জিন-বীরের মূর্ত্তি। ইহাই সেখানকার সবচেয়ে পুরাতন জৈন-ধ্বংসাবশেষ এবং খৃষ্টপূর্ব্ব পাঁচ কিংবা ছয় শত বৎসর আগেকার। কোলার ও ডাল্‌টন্‌ সাহেবের মতের সামঞ্জস্য করিয়া কুপলাণ্ড সাহেব মানভূমের ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব আনুমানিক পাঁচ-ছয় শত বৎসর হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই জেলায় সরাকদের প্রাধান্য ছিল।

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মানভূম জেলায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হয় এবং দশম খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা হয়। এই জেলার হিন্দু-দেবদেবীর পুরাতন মন্দিরগুলির অধিকাংশ ঐ-সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে সম্ভবতঃ অসভ্য ভূমিজেরা কোনও অজ্ঞাত কারণে অনেকগুলি মন্দির ধ্বংস করে এবং হিন্দুদিগকে উৎপীড়িত ও বিপর্য্যস্ত করে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ঐ সময় পশ্চিম ও উত্তর হইতে ভূমিজ কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্যান্য নূতন দলের আবির্ভাবে এইরূপ ঘটে। এ অনুমান কত দূর সত্য তাহা বিশেষ গবেষণা দ্বারা হয়ত নির্ণয় করা যাইতে পারে।

মানভূম জেলার জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষগুলি, তথাকার প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে গবেষণায় যথেষ্ট উপাদান জোগাইতে পারে। এখানকার প্রাচীন 'সতীস্তম্ভ', 'বীরস্তম্ভ' ও 'ভাজ্রি' এবং ভূমিজদের সমাধি-প্রস্তরগুলি বিশেষ অনুশীলনযোগ্য।

তার পর প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের কথা। সরাক জাতির কথা উত্থাপন করিতে গিয়া গ্রন্থাগার ও পুরাতন পুঁথি সম্বন্ধে একটি কথা স্বতঃই মনে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক জৈনমন্দির ও মঠে হস্তলিখিত পুঁথি রাখিবার প্রথা ছিল। এ জেলার জৈন মঠ-মন্দির ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত অনেকগুলি বিনষ্ট হইয়াছে; কতক হয়ত সরাকদের মধ্যে যাহারা বিভিন্ন জেলায় চলিয়া গিয়াছে তাহারা সঙ্গে লইয়া গিয়াছে; এবং হয়ত এখানকার সরাকদের গৃহে কিছু থাকিতে পারে। পুরাতন পুঁথির যথাযথ অনুসন্ধান করিলে সরাকদের গৃহে না হউক ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত

মানভূম জেলার গোয়ালা জাতি

মানভূম জেলার ভূঁইয়া

মানভূম জেলার কুড়মি জাতি

জাতিদের গৃহে ও মন্দিরাদিতে কিছু পুরাতন গ্রন্থ, এমন কি তাম্রশাসনও হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। আমি রাঁচী-জেলায় পুরুষানুক্রমে উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের গৃহে অনেকগুলি পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছিলাম ও কয়েকখানা সংগ্রহ করিয়াছিলাম; ও উড়িষ্যার কোন মন্দিরে তাম্রশাসন যত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে এরূপ দেখিয়াছি। মানভূম জেলায় অনুসন্ধান করিলে এইরূপ পুরাতন অপ্রকাশিত পুঁথির—এমন কি তাম্রলিপির উদ্ধার হওয়া অসম্ভব নয়। সংস্কৃত ভাষায় এক সময় ভারতবর্ষের গেজেটিয়ার শ্রেণীর বিবরণ পদ্যে লিখিত হইত, এবং এই মানভূম জেলায় অন্ততঃ একখানা ঐরূপ গ্রন্থ লেখা হইয়াছিল। তাহার নাম "পাণ্ডব-দিগ্বিজয়"; গ্রন্থকারের নাম রামকবি, তিনি শিখর-ভূমি বা পঞ্চকোটের রাজসভার কবি ছিলেন। ঐ পুস্তকের রচনাকাল ১৩৭০ সন এরূপ লেখা আছে। কিন্তু সেটা কোন্ অব্দ তাহা নির্ণয় করা কঠিন। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রদত্ত ঐ পুঁথির সামান্য বিবরণ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি অনুমান করেন যে ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অর্থাৎ আজ হইতে দুই শত বৎসর পূর্ব্বের রচিত। আশা করি এই মানভূম জেলার কৃতবিদ্য অনুসন্ধিৎসুদের যত্ন ও চেষ্টায় আরও এইরূপ মূল্যবান্ প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার হইবে।

এখানে অপর একটি গবেষণার বিষয় প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্ব এবং প্রস্তরগাত্রে বা ধাতুফলকাদিতে উৎকীর্ণ লিপি (এপিগ্রাফীর)। এই দুই বিষয়েও এ জেলায় বিশেষ কোনও অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে এ-সব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর উপাদান সংগ্রহ করা নিতান্ত কঠিন হইবে বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমে পার্শ্ববর্ত্তী রাঁচী জেলায় কুশানসম্রাটদের কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা, বহুসংখ্যক পুরী-কুশানমুদ্রা এবং তৎপরবর্ত্তী কালের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, এবং প্রস্তরে ও ধাতুফলকে উৎকীর্ণ লিপিও পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব সীমানায় বাঁকুড়া জেলাতেও গুপ্তাব্দের মুদ্রা ও অন্যান্য মুদ্রা এবং শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। মানভূম জেলা যখন বহুকাল হইতে জৈন ও বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, তখন এ সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান এখানে না পাওয়া গেলে সাতিশয় বিস্ময়ের কারণ হইবে। অনুসন্ধানের অভাবেই এখনও এ-সব অনাহৃত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সর্ব্বশেষে সাহিত্যিক উপাদানের কথা। প্রত্নতত্ত্ব ও জাতীয় তত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা ছাড়াও এ-জেলার বর্ত্তমান বিভিন্ন জাতিদের সামাজিক ইতিহাস, বিভিন্ন ধর্ম্মমত

ও পূজাপ্রণালী প্রভৃতির তথ্যানুসন্ধান এবং তাহাদের বিভিন্ন গ্রাম্যবুলি (patois), পল্লী-সঙ্গীত, লোকনৃত্যের পদ্ধতি, জনশ্রুতি বা কিম্বদন্তী, ব্রতকথা, উপকথা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারিলে বাংলা-সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইতে পারে। আনন্দের বিষয়, শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ মহাশয় মানভূম জেলায় এইরূপ তথ্য সংগ্রহের সম্মানিত পথ-প্রদর্শক হইয়াছেন। তিনি ভূমিজ-বীর লালসিংহের জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়া তথাকথিত চূহাড় ভূমিজ জাতির উপর আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে চরিত্রবলে, সাহসে, সমর-কুশলতায়, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় ও বুদ্ধিমত্তায় ভূমিজ-সর্দ্দার লালসিংহ সভ্যতর জাতির অনেক প্রখ্যাতনামা বীরপুরুষের সমকক্ষ ছিলেন এবং লালসিংহের বুদ্ধিমতী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাপরায়ণা বীর জননীও অনেক খ্যাতনাম্নী আর্য্যনারীর পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্যা ছিলেন। বস্তুতঃ সভ্য জাতিদের মধ্যে যেমন সময়ে সময়ে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া নূতন আদর্শ ও ভাব-সম্পদ দ্বারা আপন আপন জাতি বা সমাজকে বেগে ঠেলিয়া উন্নতির পথে অনেকটা অগ্রসর করাইয়া দেন, অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য জাতি বা সমাজেও কখনও কখনও সেইরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন এবং সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বজাতিকে উন্নতির পথে ধাক্কা দিয়া খানিকটা ঠেলিয়া দেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে পারিলে কেবল যে দেশের লুপ্ত ইতিহাসের আংশিক উদ্ধার হয় তাহা নয়; আদিম নিবাসীদের প্রতি অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা ও প্রীতি উদ্রিক্ত হয় এবং বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইয়া দেশের ও জাতির মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

পরিশেষে, এই সম্পর্কে সাহিত্যচর্চ্চার আর একটি প্রণালীর সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিব।

উপন্যাস কিংবা কথা-সাহিত্য রচনায় যাঁহাদের রুচি বা ঝোঁক আছে তাঁহারা এই সব আদিম জাতির মধ্যে উপন্যাস ও কথা-সাহিত্য প্রণয়নের অভিনব উপাদান পাইতে পারেন। স্নেহমমতা, প্রেমভক্তি, বাৎসল্য, শৌর্য্য-বীর্য্য, সৎসাহস, ধর্ম্মানুরাগ, সৌন্দর্য্যস্পৃহা ও রস-রূপের বোধ প্রভৃতি যে-সমস্ত বৃত্তি প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক সেগুলি ভূমিজ সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিদের মধ্যেও অল্পবিস্তর প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সুতরাং সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উপকরণ এই সমস্ত জাতির কৃত্রিমতা-হীন সরল জীবনেও পাওয়া যাইতে পারে। তবে সে উপকরণ যথাযথ সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাদের জীবন-ধারার সহিত সম্যক্ পরিচয়ের দ্বারা তাহাদের প্রতি আন্তরিক প্রাণস্পর্শী সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে হইবে,—কবির সহিত "শুচি করি মন" আর্য্য অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, সবাকার হাত ধরিতে হইবে,—বিভেদ ভুলিয়া "একটি বিরাট হিয়া" জাগাইয়া তুলিতে হইবে,—সকলকে সাদরে একই মাতৃযজ্ঞে আহ্বান করিতে হইবে,—ডাকিতে হইবে—

> "এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত সব অপমানভার।
> মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
> সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে।
> আজি ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।"*

---

* বিগত ১৮ই মে তারিখে পুরুলিয়ায় হরিপদ-সাহিত্য-মন্দিরের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণের দ্বিতীয় অংশ।

গুহাচিত্র

(গল্প)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

(১)

সে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী।

ভারতের মধ্যদেশে প্রবল-প্রতাপান্বিত বৌদ্ধ নৃপতি ধর্ম্মরাজের রাজত্ব, সুদূর দক্ষিণে সে-রাজ্যের সীমারেখা শেষ হইয়াছে। রাজ্যের প্রতি নগর উপনগরে এক অভিনব সমৃদ্ধির চিহ্ন। বহিঃশত্রুর উপদ্রব নাই, অশ্বমেধ-যজ্ঞ বন্ধ হইয়া অন্তর্ব্বিবাদও হ্রাস পাইয়াছে। ক্ষত্রিয়েরা দলে দলে শস্ত্র ত্যাগ করিয়া পীতবসন পরিয়া বিহারবাসী হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা চতুর্ব্বর্গ ও চতুরাশ্রমকে ধরিয়া আছে বটে, কিন্তু নূতন সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে তাহাদের ধর্ম্মের রূপও বদলাইতেছে। শূদ্র সাম্যবাদের বলে সমাজের উচ্চস্তরের দিকে দ্রুত অগ্রসর। বৈশ্য রাজ-শক্তির আশ্রয়ে দিকে দিকে বাণিজ্যপোত লইয়া ফিরিতেছে। দেশ-বিদেশ হইতে অর্থ আনিয়া স্বগৃহ ও স্বদেশ পূর্ণ করিতেছে। সে-বাণিজ্যের সংস্পর্শে দেশের সর্ব্বপ্রকার শিল্প সজীব। সে-কারণে রাজকোষ পূর্ণ, ধর্ম্মের প্রত্যেক পীঠস্থান সমৃদ্ধিশালী। বর্ষার তৃণগুল্মের মত দিকে দিকে বিহার ও চৈত্যের সৃষ্টি হইতেছে। জনসাধারণের জীবনে অদম্য প্রফুল্লতা, বেশভূষায় অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব, বাসভবনে ললিতকলার অপরূপ ঐশ্বর্য্য। বড় বড় নগরগুলিতে সর্ব্বপ্রকারের বিলাস পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। নরনারীর দেহে বহুমূল্যের আভরণ, বহুবর্ণের পোষাক, বিচিত্র অঙ্গরাগ। নগরে নগরে বহু ভাস্কর, স্থপতি, চিত্রকর, কবি, নাট্যকার, গায়ক, বাদক নিজ নিজ শিল্পের সাধনা করিতেছে। সুরম্য হর্ম্ম্যরাজিতে সুকণ্ঠ ও সুদর্শন নট এবং সুকণ্ঠ ও সুকুমার-কায়া নটীদের বাস। তাহারা নৃত্যগীত অভিনয় দ্বারা নগরের জীবন সরস করিয়া রাখিতেছে।

ধর্ম্মরাজের রাজধানীতে আজ বিপুল উৎসব। রাজপুত্র প্রসেনজিৎ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং মদ্ররাজ-কন্যা সুভদ্রার সহিত তাঁহার বিবাহের বাগ্দান হইয়া গিয়াছে। আজ দিবারম্ভ হইতে নগরে যে আনন্দের স্রোত বহিয়াছে, বোধ হয় অযোধ্যায় রামচন্দ্রের অভিষেকের সময়ও তাহা হয় নাই। সন্ধ্যায় রাজ-প্রাসাদের মনোরম উদ্যান-বাটিকাতে অভিনয় ও নৃত্য চলিতেছে। রাজকুমার সারাদিন প্রাসাদে ছিলেন, এখন দুই-এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু সহ অভিনয়-দর্শনের আনন্দে ডুবিয়া পড়িয়াছেন। সে-অভিনয়ে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নটী বিজয়-মালিকা নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সুমধুর সঙ্গীতে উদ্যান-বাটিকা মুখরিত হইতেছে। যুবরাজের যে-সকল বন্ধু এ-অভিনয়ে নিমন্ত্রিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহারা নিজেদের জীবন কৃতার্থ মনে করিতেছে। বিজয়-মালিকার সুডৌল গৌরদেহ নানাবর্ণে রঞ্জিত ও নানা গন্ধে অভিষিক্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পাইতেছে। আর তরুণ দর্শকমণ্ডলীর চিত্তগুলি চকোরের মত তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

যুবরাজের ধনুকের মত বাঁকা ভ্রূযুগলের নীচে বিশাল ভ্রমরকৃষ্ণ দুইটি চক্ষু অতি গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে—বিজয়-মালিকাকে নয়; তাহাদের নিরীক্ষণের বিষয়, বিজয়-মালিকার পার্শ্ববর্ত্তিনী নৃত্যশীলা তরুণী নটী, মীনা। মীনার দেহখানি বেতসলতিকার মত দীর্ঘ, ক্ষীণ, অথচ অপরিসীম কোমলতায় ভরা। বিজয়-মালিকার মত তাহার বসনভূষণের আড়ম্বর নাই, কিন্তু যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। কণ্ঠে এক ছড়া মুক্তার হার, তাহার সঙ্গে ময়ূর-কণ্ঠী বর্ণের একটি রেশমের ফিতা বাঁধা। হাতে দুই গাছা করিয়া, এবং বাহুতে এক গাছা করিয়া সরু স্বর্ণবলয়। চুলের খোঁপার উপর অর্দ্ধস্ফুট চন্দ্রমল্লিকার সুরচিত একটি

ছোট মালা। কানে পুষ্পকুণ্ডল। দেহের উর্দ্ধভাগ অনাবৃত, কটিদেশ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বেগুনী রেশমের মধ্যে সোনালী জরীর রেখাযুক্ত নিচোল। সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় কটিদেশের উপর তিন-লহরীবিশিষ্ট একটি অপরূপ মেখলা ;—বড় বড় প্রবালের মাঝে ছোট মুক্তা গাঁথা। পায়ের গুল্‌ফদেশ ঘিরিয়া সোনার নূপুর। কপোলে অগুরু, বক্ষে চন্দন এবং পদতলে অলক্তের লেখা।

কিশোরীর নৃত্যভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাহার ও তৎসংলগ্ন রেশমের ফিতাটি মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে থাকে ; রমণীয় চন্দ্রহারটি ধীরে ধীরে আছড়াইয়া পড়ে। এক-একবার কিংশুকদলের মত তাহার সুকোমল চরণ দুটি ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। যুবরাজের উজ্জ্বল আয়ত চক্ষুদুটি অনিমেষ ভাবে সে-দৃশ্য নিরীক্ষণ করে।

বিজয়-মালিকা সাজিয়াছিল এক আর্য্যরাজমহিষী ; মীনা হইয়াছিল নাগরাজকন্যা। বিজয়-মালিকা সঙ্গীতে সকলের মনোহরণ করিয়াছিল ; মীনার নাগনৃত্য যুবরাজের হৃদয়ের অন্তস্তলে এক অনুভূতপূর্ব্ব পুলকের শিহরণ বহাইয়াছিল। তাহার ক্ষীণ কোমল দেহখানি এক-একবার সর্পভঙ্গীতে বাঁকিয়া পড়ে, এক-একবার সর্পের মত সঙ্গীতের প্রভাবে স্তিমিত হইয়া থাকে ; আবার সর্পের মাথা-তোলার ভঙ্গী করিয়া এক-একবার উন্নত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

কি অপরূপ, কি মনোমুগ্ধকর সে সর্পনৃত্য।

হয়ত বিজয়-মালিকা বাস্তবিকই সে-অভিনয়ের চন্দ্র ; কিন্তু মীনা তাহারই পাশে অতি উজ্জ্বল, অপরিসীম মাধুর্য্য-ভরা, একটি তারা।

(২)

অভিনয়শেষে, প্রস্ফুট যূথীবিতানের নীচে প্রস্তরাসনের উপর প্রসেন সমাসীন, তাঁহার পায়ের কাছে বঙ্কিম ভঙ্গীতে মীনা বসিয়া আছে। বাহিরে নির্ম্মল জ্যোৎস্নাধারা সমস্ত উদ্যান প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে।

যূথিকার গন্ধের সহিত কিশোরীর অঙ্গরাগ ও দেহ-সৌরভ মিলিয়া প্রসেনের প্রাণ এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরিয়া দিতেছে। সে মুগ্ধভাবে মীনার লম্বা লম্বা, চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি নিজ দুই হাতের মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে, মুগ্ধনেত্রে সে আবছায়ার মধ্যে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া কথা বলিতেছে। মীনা যেন মানবী নয় : যেন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার একটা ঝলক, সুমধুর সঙ্গীতের একটা মূর্চ্ছনা, সুকোমল পুষ্প-কোরকের একটু সৌরভ। যেন সুদূরের একটা মনোরম আশা, কিশোর-প্রাণের একটা রঙীন কম্পন, নব-বসন্তে তরুণী ধরিত্রীর একটা ব্রীড়া-কুণ্ঠিত আনন্দোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

মীনার স্নিগ্ধ দুইটি চক্ষু অসীম কৃতার্থতার সহিত যুবরাজের প্রতি চাহিয়া আছে। মৃদু বাতাসে তাহার কানের পুষ্পকুণ্ডল দুটি কাঁপিতেছে।

প্রসেন বলিলেন, "মীনা, তুমি বড় সুন্দরী। আমি জীবনে তোমার দেহের মত এমন সুকুমার একটি দেহ দেখি নি।"

লজ্জায়, গৌরবে মীনার শির নত হইল। সহসা, কি জানি কেন, তাহার পশম-পেলব পক্ষ্মরাজি অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িল। প্রসেন তাহার বেপথুমানা দেহযষ্টিখানি নিজের আরও কাছে টানিল।

তার পর সহসা ঈষৎ কম্পিত, অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "মীনা, তোমাকে আমার যুবরাণী করব। আমার রাজ্যের তুমি রাণী হবে।"

মীনার সুবিন্যস্ত কেশদাম প্রসেনের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। তীব্র উচ্ছ্বাসে তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। ভয়ার্ত্ত কবুতর যেমনভাবে নীড়ের আশ্রয় লয়, তেমনই করিয়া মীনা প্রসেনের আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মীনা মাথা তুলিয়া বলিল, "যুবরাজ, আমার সঙ্গে কেন উপহাস করছেন ?"

যুবরাজ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "উপহাস কি রকম ?"

মীনা বলিল, "মদ্র-দুহিতা সুভদ্রা আপনার যুবরাণী এবং এ-রাজ্যের ভাবী রাণী। অযথা কেন এ অনভিজ্ঞা বালিকাকে ছলনা করছেন, যুবরাজ ?"

যুবরাজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "সে বিবাহ হবে না।"

মীনা ধীরে ধীরে বলিল, "সাত দিন পরে মদ্র-দুহিতা মহাসমারোহে এসে পৌঁছবেন, তখন আমাদের নাট্যাভিনয় হবে।"

প্রসেন একটু ক্ষুণ্ণভাবে মীনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার কথা বিশ্বাস করছ না, মীনা?"

মীনা নতমুখে নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। যুবরাজ নির্ব্বাক। মৌনভাবে শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা আসিয়া তাহাদের শিরে পড়িতে লাগিল। মৌনভাবে চন্দ্রমল্লিকার মধুর সৌরভ তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আকুল করিয়া তুলিল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকিয়া যুবরাজ বলিলেন, "মীনা, তুমি আমায় সাহায্য করতে পারবে?"

মীনা মাথা তুলিয়া প্রসেনের মুখোমুখী হইয়া বসিল।

প্রসেন তাহার নিকট এক গূঢ় ষড়যন্ত্রের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। মীনার চোখে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ দেখা দিল।

তার পর দুইটি তরুণ মস্তিষ্কের ভিতর বহু কাল পর্য্যন্ত অনেক কূটবুদ্ধি খেলিতে লাগিল। সে-রাত্রে এক ছদ্ম দূত ধর্ম্মরাজের অলীক বার্ত্তা বহন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে মদ্র-দেশের অভিমুখে ধাবিত হইল।

সেদিন মধ্যরাত্রে যখন রাজরথ নির্জ্জন পথের উপর দিয়া মীনাকে লইয়া চলিল, তখন চক্রনেমির সঙ্গে সঙ্গে নানা অসম্ভব কল্পনায় তাহার মাথাটিও ঘুরিতে লাগিল। গৃহ-দ্বারে রথ থামিলে মীনার বৃদ্ধা মাসী তাহাকে লইতে আসিয়া অবাক হইয়া গেল। বলিল, "কোথায় পেলি এ মুকুট? এর মধ্যে যে সব হীরা বসানো। কোথায় পেলি এ কণ্ঠহার? এত বড় মুক্তা তো কখনও দেখি নি। কোথায় পেলি এ জরিদার রেশম? এ ত সাধারণ লোকের নয়!"

মীনা প্রাণের উচ্ছ্বাসের সহিত মাসীর কাছে সে-সন্ধ্যার সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিল। শুধু ষড়যন্ত্রের কথা বলিল না। বলিল না যে সে নিজহাতে নাট্যশালার অভিনেতা রোহিতাশ্বকে দূতের ছদ্মবেশ পরাইয়া দিয়াছে।

আনন্দে বৃদ্ধার ক্ষীণ চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আনন্দে সে মীনাকে বক্ষে চাপিয়া বলিল, "হয়ত আমাদের সুদিন আসবে। হয়ত তোর কোল আলো ক'রে রাজপুত্র শোভা পাবে। ভগবান্ তথাগত তোকে সুখী করুন।"

রাত্রিতে বৃদ্ধা এক-একবার শুনিতে পাইল, মীনা ঘুমের ঘোরে প্রবল উচ্ছ্বাসের সহিত কত কি বলিয়া যাইতেছে।

(৩)

প্রভাতে নগর-তোরণের সানাইয়ের বাদ্যে যুবরাজ প্রসেনজিতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তরুণ যুবক স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রভেদ অনুভব করিতে পারিল না। সানাইয়ের সঙ্গীতের রেশটি যেন তেমনই মধুর এক স্বপ্নস্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া ছিল। সহসা সমস্তটা স্বপ্ন শতগুণ মাধুর্য্যে ভরিয়া তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল।

মীনা রাজমহিষী, সে রাজ্ঞী। মীনার শিরে অপূর্ব্ব রত্নকিরীট, কণ্ঠে অপূর্ব্ব রত্নহার, কটিতে অপূর্ব্ব রত্নমেখলা, মুখে দিব্য জ্যোতি। সে যেন মানবী নয়, যেন তাহার গৃহ-চূড়ে চিত্রিত কিন্নরীর মত চিরযৌবনা, চিরানন্দে উচ্ছ্বসিত।

মীনা! পুষ্পিতা বেতসলতার মত ক্ষীণা কোমলা, সুরভিতা! নব অনুরাগে বেপথুমানা। আজ বিবাহ-বন্ধনে তাহার বাহুলগ্না।

মীনা! ঐ ক্ষীণাঙ্গী, ভীরুনয়না কিশোরী নটী আজ গৌরবময়ী রাজরাণী।

যুবরাজ বহুক্ষণ স্মৃতির নেশায় মশগুল হইয়া রহিল। তাহার চন্দননির্ম্মিত বহুকারুকার্য্যখচিত পর্য্যঙ্কের উপর হইতে বিচিত্র বর্ণের শয্যাবরণ শ্লথ হইয়া ভূতলে পড়িল।

যুবরাজ স্বপ্নাবেশময় দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। দেখিলেন, গৃহের ভিতরের ছাদে বিশাল শ্বেতপদ্ম, তাহার মধ্যের কোরক, কোরকের প্রতিটি কোষ। বাতায়ন-পথে বাহিরে দেখিলেন, শিরীষবৃক্ষের শাখায় ময়ূর-যুগল বসিয়া আছে। ময়ূরের গলা এক-একবার ফুলিয়া উঠিতেছে, প্রভাত-সূর্য্যের আলোকে পুচ্ছের চন্দ্রকগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দূরে দেখা যাইতেছিল, একটা পত্রহীন কিংশুকবৃক্ষ বহুপুষ্পে মণ্ডিত হইয়া আকাশের কোলে রক্তচ্ছটার সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রসেনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি দৃশ্যের ভিতর এক কিশোরীর সুকুমার দেহখানির স্নিগ্ধ আভা অপূর্ব্বরূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

প্রভাতের উজ্জ্বল কিরণ-সম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রসেন-জিতের হৃদয় মীনার মনোরম স্মৃতিতে রাঙিয়া উঠিতে লাগিল।

যুবরাজ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্যানে পাদচারণা করিলেন। প্রাসাদের দাসদাসীরা ভাবিল, বুঝি আসন্ন বিবাহের প্রতীক্ষায় যুবরাজ উন্মনা হইয়া পড়িয়াছে। বুঝি মদ্ররাজ-দুহিতা সুভদ্রার চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আকুল।

কিন্তু যুবরাজ চিন্তাকুলচিত্তে ভাবিতেছিলেন, দূত কি যথাসময়ে মদ্রদেশে পৌছিবে? তাহার ছদ্মনামে ছদ্মবেশে কি মদ্ররাজ ভুলিবেন? রোহিতাশ্ব অভিনেতা, এটুকু অভিনয় ঠিকভাবে করিতে পারিবে না? মদ্ররাজ কি নিজের দূত পাঠাইবেন? তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ সমস্ত রহস্য ভেদ করিয়া ফেলিবেন এবং পরিণাম অতি কঠোর হইবে। কেননা তিনি বৌদ্ধ হইলেও ক্ষমা কাহাকে বলে কোনও দিন জানেন না।—কিন্তু দূতমুখে যে-বার্ত্তা প্রেরিত হইয়াছে তাহার পর কোনও আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন নৃপতি পুনরায় বাক্‌বিনিময় করিবে না। দূতমুখে ধর্ম্মরাজ জানাইয়াছেন, যুবরাজ প্রসেনজিৎ মদ্ররাজকন্যা সুভদ্রাকে যুবরাণী করিতে অসম্মত। যদি মদ্ররাজ তাঁহার কন্যাকে প্রধানা মহিষী করিবার অভিলাষ ত্যাগ করেন তবে বর্ষান্তে প্রসেনজিতের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারিবে।

রোহিতাশ্ব রাজদূতের মত ঠিক ঠিক সে সন্দেশ প্রদান করিতে পারিবে তো? হয়ত মদ্ররাজ তাহা শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইবেন; তবে দূত অবধ্য, রোহিতাশ্ব অক্ষত-দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে।

দিন যতই বাড়িতে লাগিল, যুবরাজের চিত্তচাঞ্চল্যও বাড়িয়া চলিল। যুবরাজ উদ্যান ত্যাগ করিয়া সারথী রাহুলকে ডাকিলেন এবং চতুরশ্ব-সম্বলিত রথে আরোহণ করিয়া তিনবার নগর অতিক্রম করিলেন। কিন্তু আজ নগরের বিচিত্র দৃশ্য যুবরাজের চিত্ত আকর্ষণ করিল না। শ্রেষ্ঠী শ্রাবক এক শত গোশকট লইয়া বাণিজ্যার্থ সুদূর গান্ধার যাত্রা করিতেছে। শত শত ভৃত্যেরা কোনও শকটে শাল্য, ভল্ল, তরবার প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র, কোনটাতে পরিধেয় বস্ত্র ও শয্যাদি, এবং কোনটাতে আহার্য্য ও পানীয় রাখিতেছে; অপর শকটগুলি নানাবিধ পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ করিতেছে। শ্রাবক বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, এবং সমাগত বন্ধুবর্গের বিদায়-অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতেছে। যুবরাজের রথ দেখিয়া শ্রাবক রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু যুবরাজ সারথীকে অন্য পথে রথ চালিত করিবার আদেশ দিলেন, শ্রাবকের সাক্ষাৎকার করিলেন না।

অপর পথে দেখা গেল যুবরাজের যৌবরাজ্যাভিষেকের জন্য আগত নানা দেশীয় রাজপ্রতিনিধি ও রাজদূতেরা হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া নগর সন্দর্শন করিতেছে। প্রত্যেকের বিচিত্র পোষাক, বিচিত্র শিরস্ত্রাণ। প্রসেন এক জনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সারথীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ শ্বেতবসন-পরিহিত, শ্বেত-উষ্ণীষ-শোভিত লোকটি কোন্ দেশীয়? রাহুল বলিল, সে গৌড়রাজের প্রতিনিধি। প্রসেন কৌতূহল দমন করিয়া রথ অন্য পথে চালিত করিলেন।

সে-পথে দেখিলেন, নানা বর্ণের ঝালর শোভিত এক রথে যুবরাজের বন্ধু মন্ত্রিপুত্র অনিরুদ্ধ চলিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা বিজয়-মালিকা। অনিরুদ্ধ রথ থামাইয়া প্রসেনজিৎকে অভিবাদন করিলেন, বিজয়-মালিকা নতশিরা হইল; প্রসেন অভিবাদন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু রথ থামাইলেন না।

সহসা কি কারণে তাঁহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিয়া সারথীকে বলিলেন, "মীনার গৃহে চল।"

মীনা কে? সারথী জানে না।

যুবরাজ অবাক।

মীনা অভিনেত্রী।

নাট্যসমাজে তো তার কোনও নাম নেই!

মীনার খোঁজের জন্য এক জন রথভৃত্য, অনিরুদ্ধের রথের পশ্চাতে ছুটিল। সে বিজয়-মালিকার নিকট হইতে মীনার বাসস্থানের সন্ধান আনিল। যুবরাজের রথ সেদিকে চলিল।

কি অপূর্ব্ব মীনার আবাস-ভবনটি! সম্মুখে কালো পাথরের মসৃণ চারিটি স্তম্ভ। প্রত্যেক স্তম্ভের মাথায় ও নীচে পাথরে-কাটা এক-একটি শতদলপদ্ম। স্তম্ভের মধ্যভাগে সমান্তরাল-রেখা, তাহার মাঝখানে একটা করিয়া অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম। স্তম্ভের পর ছোট একটা বারান্দা, বারান্দার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আনন্দ

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিতরের ছাদ শ্বেতবর্ণের, তাহাতে নানাবিধ মনোরম রেখাচিত্র। বারান্দার পর চতুষ্কোণ একটি ঘর, তাহার দরজা অর্দ্ধবৃত্তাকার। উপরের বৃত্তার্দ্ধ ঘুরাইয়া পাথরে এক ছড়া পুষ্পহার কাটা হইয়াছে। দরজার কাঠের মধ্যে দুইটি ময়ূর-ময়ূরী, তাহাদের ঘিরিয়া গভীর বন। নীচের ঘরের পাশ দিয়া উপরে সিঁড়ি উঠিয়াছে, তাহার ধাপগুলি শুভ্র।

মীনার গৃহখানি যেন মীনারই প্রতীক!

যুবরাজের ভৃত্য সিঁড়ি বাহিয়া উপরের বারান্দায় গিয়া মৃদু আহ্বান করিল। ভিতর হইতে এক বৃদ্ধা আসিয়া দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্যের প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধা কি বলিল, যুবরাজ শুনিল না, কিন্তু সে বৃদ্ধার ডান হাতের নিষেধ-মুদ্রাটি লক্ষ্য করিল। হাতের তালুটি চিৎ করিয়া কনিষ্ঠা মণিবন্ধের দিকে আনিয়া, মধ্যমা ও অনামিকা একত্র বাঁকাইয়া, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠকে কঠিনভাবে সোজা করিয়া ধরিয়া জানাইল, "নাই।" ঐ অঙ্গুলি-সঞ্চালনে একটা অবর্ণনীয় রিক্ততা ব্যক্ত করিল।

ভৃত্য আসিয়া বলিল, মীনা গৃহে নাই। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রাজদূত আসিয়া তাহাকে প্রাসাদে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে।

যুবরাজ অসীম বিস্ময়ে ক্ষণকাল ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাজার আজ এ-সময়ে তাহাকে আহ্বান করিবার তো কোনও কারণ নাই।

যুবরাজ পুনরায় ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন, রাজপ্রাসাদ হইতে রথ আসিয়াছিল কি না। ভৃত্য উত্তর আনিল, 'না'।

যুবরাজের রথ শশব্যস্তে প্রাসাদের দিকে ধাবিত হইল।

(৪)

রাজার গুপ্তচর যদি বায়ুর মত সর্ব্বত্র সঞ্চরণ না করিল, তবে আর সে রাজা কেমন? ধর্ম্মরাজের গুপ্তচরগণও যদি সর্ব্বত্র না যাইত তবে তিনি প্রবল-প্রতাপান্বিত নৃপতি হইতে পারিতেন না। যখন মীনা রঙ্গমঞ্চ ছাড়িয়া যুবরাজের সঙ্গে উদ্যানে গিয়াছে, তখন এক জন চর ও দুই জন চরী তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা কোন ষড়যন্ত্র সন্দেহ করে নাই। তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল মীনা কি-পরিমাণ পারিতোষিক পায় তাহাই রাজাকে জানানো। মীনা যখন যুবরাজের নিকট বিদায় লইয়া সোজা গৃহে না গিয়া জনশূন্য নাট্যমঞ্চের দিকে চলিল, তখন দূতের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল। সে অন্তরালে থাকিয়া রোহিতাশ্বের ছদ্মবেশ ধারণ দেখিল। মীনা যখন তাহাকে তাহার বার্ত্তার কথা স্মরণ করাইয়া দিল, এবং সে-বার্ত্তা নিজে আগাগোড়া আবৃত্তি করিল, তখন দূতের কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না।

রোহিতাশ্ব নগর-দ্বার অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই ধরা পড়িল। তখন দেখিল নিজের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় রাজার কাছে গিয়া সব খুলিয়া বলা। মধ্যরাত্র অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই রোহিতাশ্ব রাজদূতের সঙ্গে রাজসকাশে গেল।

প্রভাতে বন্দীর সঙ্গীত রাজার নিদ্রাভঙ্গ করিল না, কেন-না, তাহার বহু পূর্ব্বেই রাজা শয্যাত্যাগ করিয়াছিলেন এবং গুপ্তচরের নিকট আবার সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত শুনিতেছিলেন। চর রাজগৃহ ত্যাগ করিবার সময় লক্ষ্য করিল, রাজার চক্ষু অগ্নিবর্ণ, মুখে দারুণ ক্রোধের চিহ্ন। সে ভীতমনে ধীরে ধীরে নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

যুবরাজ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া প্রাসাদের এক জন প্রহরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মীনা ওপরে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"রাজসকাশে?"

"হ্যাঁ।"

"তার সঙ্গে কে আছে?"

"সঙ্গে কেউ নেই।"

"মহারাজ কি বিশ্রাম করছেন?"

"না, তিনি বিচারে বসেছেন।"

"কার বিচার?"

"মীনার।"

সহসা যুবরাজের ঘনকৃষ্ণ চোখদুটি কাতর হইয়া পড়িল। তিনি সশঙ্ক পদক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। প্রত্যেকটি পাদক্ষেপ যেন বলিতে লাগিল, "সে যুবরাজ নয়, সে এ-রাজ্যের ভাবী রাজা নয়, সে অপরাধী,—সে কৃপার ভিখারী।"

ধীরে ধীরে সে পাদক্ষেপে রাজার গৃহতলের কাছাকাছি গিয়া থামিল। সিঁড়ি শেষ না হইতেই হঠাৎ সব নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। মনে হইল এতক্ষণ যে পদদ্বয় যুবরাজকে উপরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, বুঝি তাহারা সহসা পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

(৫)

তিন মাস পরের কথা।

এক গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে এক জন তরুণ বৌদ্ধভিক্ষু এক বিস্তৃত প্রান্তরের উপর দিয়া ধীরপদে চলিতেছিল। তাহার সারা দেহ ঘর্ম্মাক্ত, অতিশয় ক্লান্ত। গাত্রাবরণের পীতবর্ণ পায়ের কাছে গৈরিক আভা ধারণ করিয়াছে। তাহার ডান হাতের নীচে ঘাড় হইতে একটি ভিক্ষাপাত্র ঝুলিতেছে, সে হাতে একটি দণ্ড। বাঁ-হাতে ছোট একটি কমণ্ডলু, জলে ভরা। তাহার মুখে গভীর বিষাদের ছায়া।

প্রান্তরটি বৃক্ষহীন, তাই রৌদ্রের প্রতাপ এত বেশী। ভিক্ষু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও মানুষের মুখ দেখে নাই। সে যে অতি সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে তাহা তাহার পোষাকের ও দেহের অবস্থা দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভিক্ষুর গন্তব্যস্থল পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি পাহাড়। দীর্ঘ যাত্রার পর আজ প্রভাতে দূর আকাশ-কোলে সে-পাহাড় দেখিতে পাইয়া ভিক্ষুর চিত্ত আশায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাই দ্বিপ্রহরের দারুণ রৌদ্রেও পথচলা বন্ধ হয় নাই। সে সঙ্কল্প করিয়াছে, আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছিবেই।

প্রথম মনুষ্য দর্শনেই ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিল পার্ব্বত্য বিহার কত দূর, এবং কোন্ পথে সেখানে যাইতে হয়। পথিক ভিক্ষুকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া পথের সন্ধান দিল।

যখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশে নামিয়া পড়িয়াছে, তখন পরিব্রাজক দীর্ঘ পথের শেষে, অস্তগামী সূর্য্যকে পশ্চাতে রাখিয়া এক শৈলচূড়ায় উপবেশন করিল। তাহার নীচেই তাহার বহু-ঈপ্সিত বিহারমালা পর্ব্বতগাত্রের ভিতর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিতি করিতেছে। দুই পর্ব্বতের মধ্য-স্থলে সুগভীর উপত্যকা। নিম্নে নদী। বর্ত্তমান সময়ে শুধু বালুকা ও উপলরাশিতে পরিণত। স্থানটি জনপদের কোলাহলের বহু দূরে, নিবিড় শান্তিতে পূর্ণ।

ভিক্ষু সতৃষ্ণনয়নে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পর্ব্বতগাত্রে খোদিত গুহাশ্রেণী নিরীক্ষণ করিল, তার পর ধীরে ধীরে পর্ব্বতচূড়া হইতে নামিয়া নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে গেল। সেখান হইতে প্রস্তরের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল, সম্মুখে এক মনোরম চৈত্য, মধ্যে পদ্মাসনস্থ বিশাল বুদ্ধ-মূর্ত্তি। ভিক্ষু পাদুকা ত্যাগ করিয়া পাশের জলাধারে গিয়া কমণ্ডলুতে জল লইয়া হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিল। তার পর বুদ্ধ-মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া আরাধনায় রত হইল। বুদ্ধদেহের সৌম্য ভাব, চক্ষুর গভীর নির্ভীক দৃষ্টি, হস্ত-পদের অসীম স্থৈর্য্য যুবকের ক্লান্ত হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিল। সে স্থির-দৃষ্টিতে বহুক্ষণ ধরিয়া সে মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল, তার পর গুহার সম্মুখ ভাগে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এক জন ভিক্ষু আসিয়া তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী এক বিহারে লইয়া গেল এবং পানাহার প্রদান করিল। নবাগত ভিক্ষু আহার করিতে করিতে দেখিল, যে, উহার দ্বারদেশে ও অভ্যন্তরে এমনভাবে কয়েকখানি দর্পণ রাখা হইয়াছে যে একের প্রতিচ্ছায়া অপরে পড়িয়া পশ্চিমাকাশ হইতে শুল্র সূর্য্যালোক প্রাচীরগাত্রে প্রতিফলিত করিতেছে, এবং প্রাচীরের পাশে উচ্চ কাষ্ঠাসনে দাঁড়াইয়া এক জন ভিক্ষু বর্ণসহযোগে তুলিদ্বারা চিত্র করিতেছে। ভিক্ষু বিস্মিত হইয়া দেখিল, সে এক রাজপ্রাসাদের চিত্র, সেখানে রাজা, রাণী, পরিচারক, পরিচারিকা, সখী সভাসদ প্রভৃতির অতি স্বাভাবিক সমাবেশ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল অজন্টা (তাই এ বিহারের নাম)—বিহারের অধিকাংশ ভিক্ষুই চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী।

সন্ধ্যায় সে বিহারবাসী ভিক্ষুদের সহিত চৈত্যে উপাসনা করিল। উপাসনার প্রত্যেকটি শব্দ প্রস্তররাশির মধ্যে অতি গভীর ভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভিক্ষুর হৃদয় উদাত্ত-ভাবে ভরিয়া দিল।

উপাসনার পর ভিক্ষু বিহারের অধ্যক্ষের সাক্ষাৎকারে গেল। অধ্যক্ষ স্থবির, তাহাকে দেখিবামাত্র অবাক হইয়া চাহিলেন। বলিলেন, "ভিক্ষু, তুমি তো সাধারণ মানব নও, তোমার কপালে যে রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্ন।" তরুণ

ভিক্ষু ক্ষণকাল অধোবদনে থাকিয়া স্থবিরের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিল। সে মহারাজ ধর্ম্মরাজের পুত্র, প্রসেনজিৎ। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিল। ভগবান্ তথাগতের বাণী পাইয়া রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া পীতবসন ধারণ করিয়াছে। সে এই মনোরম বিহারে থাকিয়া আধ্যাত্মিক সাধনা করিতে ইচ্ছুক।

স্থবির কৃপাভরা দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তরুণ ভিক্ষু, তোমার ত্যাগ অতি মহান্। ভগবান তথাগত তোমাকে শুভবুদ্ধি দিয়েছেন। কিন্তু বল তো, সংসারে তোমার বিরাগ উৎপন্ন হবার কারণ কি? তুমি এত বিমর্ষ কেন?"

প্রসেন বলিলেন, "দেব, সংসার বড় দুঃখময়। মানুষের হৃদয় বাসনায় ভরা, কিন্তু জগৎ সে-বাসনা পূর্ণ করা দূরে থাকুক, তার পরিবর্ত্তে দারুণ ব্যথা দিয়ে হৃদয় ভেঙে দেয়। ভগবান তথাগত জীবের জন্য যে নির্ব্বাণের পথ নির্দ্দেশ করেছেন, আমি তা অনুসরণ করতে বের হয়েছি।"

স্থবির প্রসেনকে বিহারের একটি কুঠরী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষু, তুমি কোনও ললিতকলার অনুশীলন করেছ? চিত্র, ভাস্কর্য্য স্থাপত্য—?"

প্রসেন বলিলেন, যে, তিনি চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন।

স্থবির বলিলেন, "ভিক্ষু, ভগবান্ অমিতাভ জীবকে রূপের ভিতর দিয়ে, অরূপে নিয়ে যান। তোমাকে রূপসৃষ্টি-দ্বারা প্রথম চিত্তশুদ্ধি সাধন করতে হবে।"

প্রসেন সে-প্রস্তাবে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

স্থবির এক জন ভিক্ষুকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া প্রসেনের জন্য এক প্রাচীরের একটুকু অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বলিলেন, সেখানে তাঁহার কলার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। তবে প্রাচীর-গাত্রে চিত্রিত করিবার পূর্ব্বে তাহা রেখাঙ্কিত করিয়া প্রথমে স্থবিরকে দেখাইতে হইবে।

প্রসেন সে-প্রস্তাবের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। তার পর স্থবিরকে প্রণিপাত করিয়া বিদায় লইলেন। স্থবির লক্ষ্য করিলেন, ভিক্ষুবেশ ধারণ করিলেও তাঁহার চালচলন রাজপ্রাসাদের।

প্রসেন নিজ কুঠরীতে গিয়া একটি সামান্য শয্যা রচনা করিলেন এবং পার্শ্বে কমণ্ডলু দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্রটি রাখিলেন। এক জন বৃদ্ধ ভিক্ষু আসিয়া একটি দীপ ও একপাত্র তৈল দিয়া গেল। প্রসেন সে বৃদ্ধের সাহায্যে একখণ্ড শ্বেত দেবদারু-ফলক ও একটি লেখনী সংগ্রহ করিলেন; ভাবিলেন, প্রভাতে উঠিয়াই চিত্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হইবেন।

কিন্তু মধ্যরাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া তাঁহার চোখে আর ঘুম আসিল না। তিনি দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

স্থবিরের মুখে চিত্রাঙ্কনের প্রস্তাব শোনা অবধি তাঁহার মস্তিষ্কে একটা চিত্র গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে-চিত্র তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয়, সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক এক ঘটনার। তিন মাস পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদের সোপানে দাঁড়াইয়া বজ্রাহতের মত তিনি তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহারই কারণে রাজসম্পদ ছাড়িয়া ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর সে-চিত্রের পরিকল্পনা এমন ভাবে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল যে তাঁহার পক্ষে স্থির হইয়া থাকা অসম্ভব হইল। তিনি উঠিয়া দীপ জ্বালাইলেন, এবং লেখনীদ্বারা কাষ্ঠফলকে চিত্রের রেখাপাত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে নিম্নের উপত্যকাভূমিতে যখন বহু প্রকারের পাখী কলরব করিয়া উঠিল, তখন প্রসেন চিত্র ছাড়িয়া উঠিলেন। বাহিরে অরুণালোকের মধ্যে তিনি চিত্রখানা লইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে অসীম তন্ময়তা। যেন তিনি এ জগতের নয়, যেন কোন্ দূরের স্বপ্নরাজ্যে তাঁহার চিত্ত বিচরণ করিতেছে।

চিত্র দেখিয়া তাঁহার চিত্ত সন্তুষ্ট হইল।

চিত্রখানি রাজা ধর্ম্মরাজের অন্তঃপুরস্থিত একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপের। তাহার চারিদিকে সরু স্তম্ভ দিয়া ঘেরা। মধ্যে ঈশদুন্নত বিচারাসনে রাজা সমাসীন। রাজাকে ঘিরিয়া রাজপুরীর দাসীরা বসিয়াছে।

২ নং অজন্টা-গুহার প্রাচীর-চিত্র

বিচার শেষ হইয়াছে। রাজা দণ্ডবিধানে উদ্যত। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে উন্মুক্ত তরবার। সম্মুখে তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া, নতজানু হইয়া লুণ্ঠিত হইয়া আছে—এক তরুণী নর্ত্তকী।

তরুণীর হস্তে ও বাহুতে বলয়, কণ্ঠে রত্নহার, তাহা হইতে গ্রন্থিবদ্ধ রেশমের ফিতা পৃষ্ঠদেশে বিছাইয়া পড়িয়াছে, কটিতে ত্রিলহরীযুক্ত মেখলা, পরিধানে রেখাঙ্কিত নিচোল, পায়ে নূপুর। তাহার অবনমিত শির দুই হাতের কনুইয়ের উপর ন্যস্ত। তাহার বঙ্কিম দেহযষ্টির নীচে নাভিদেশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

মেঝের উপর কয়েকটি প্রস্ফুট চন্দ্রমল্লিকা ছড়ানো।

তরুণী অধোবদনা। কিন্তু তাহার প্রসারিত অঙ্গুলি, তাহার এলায়িত বাহুযুগল, তাহার কুণ্ডলীকৃত দেহলতা,—প্রত্যেকটির ভিতর দিয়া যেন একটা সকরুণ ভিক্ষা রাজার পদতলে লুটিয়া পড়িতেছে।

রাজা কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন না?

রাজার বামপার্শ্বে এক বৃদ্ধা দাসীর শুধু দক্ষিণ হস্তটি দেখা যাইতেছে, তাহার আঙুলগুলি নিষেধ-মুদ্রায় হেলানো। হাতের তালুটি কাৎ করিয়া, এক দিকে কনিষ্ঠা অনামিকা ও মধ্যমাকে বাঁকাইয়া অপর দিকে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠকে কঠিন-ভাবে সোজা করিয়া ধরিয়া অসীম নৈরাশ্যের ব্যঞ্জনা দিয়া দেখাইতেছে, "না! না!"...

প্রভাতের উপাসনা শেষ হইলে প্রসেন স্থবিরের নিষ্প্রভ চক্ষু দুটির নিম্নে চিত্রটি রাখিল। স্থবির বলিলেন, "এত শীঘ্র!" বলিয়া চিত্রের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। চিত্র দেখিয়া তিনি গভীর বিস্ময়ে রাজপুত্রের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "এ চিত্রে ভগবান বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু এতে প্রাণের গভীর অনুভূতি আছে। রাজপ্রাসাদে যুবরাজ চিত্রবিদ্যার সাধনায় নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল ব্যয় করেছিলেন।—ভিক্ষু, আমি তোমার চিত্র দেখে প্রীত হয়েছি, তুমি ধীরে ধীরে একে প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত করবে।"

কৃতজ্ঞতায় তরুণ ভিক্ষুর চোখ-দুটি ছলছল করিয়া উঠিল।

তার পর অতি শান্তকণ্ঠে স্থবির বলিলেন, "ভিক্ষু, এই তোমার জীবনের ব্যথার কারণ?"

প্রসেন ভগ্নকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হাঁ, দেব।"

স্থবির পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শান্তভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সংসার ব্যথারই আলয়। একমাত্র নির্ব্বাণই তার পরিসমাপ্তি। ভিক্ষু, তুমি ধন্য, আজ রাজসম্পদ ত্যাগ ক'রে ভগবান্ তথাগতের শরণাপন্ন হয়েছ। ভগবান্ তোমার সাধনা সফল করুন।"

গুরুর আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া ভিক্ষু ধীরে ধীরে শান্ত পাদক্ষেপে নিজ বিহারে ফিরিলেন। বিহারদ্বারে আসিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষু-দুটি তাঁহার অঙ্কিত চিত্রটির উপর নিশ্চলভাবে নিবিষ্ট করিয়া রাখিলেন।

কাল তাঁহার মুখে যে-বিষাদের কাল ছায়া দেখা গিয়াছিল, আজ প্রভাতের আলোকে তাহার পরিবর্ত্তে একটা অব্যক্ত আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।*

* অজন্টা-গুহার একটি চিত্র অবলম্বনে লিখিত।

অজন্টা-গুহার অধিকাংশ চিত্রই বুদ্ধজীবনী বা বুদ্ধজাতক অবলম্বনে অঙ্কিত। তবে কয়েকটি চিত্র আছে, তাহাদের সম্পর্কিত কোনও পুরাকাহিনী খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সেরূপ একটি চিত্র লইয়া এই কাল্পনিক আখ্যায়িকা রচনা করা হইয়াছে।

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র

আমাদের দেশে অধিকাংশ পিতা পুত্রকে বি-এ বা বি-এসসি অবধি কষ্টেসৃষ্টে যে-ভাবে হউক পড়ান। ইহার পর বাঙালীর সংসারে অর্থোপার্জ্জনের প্রশ্ন দেখা দেয়। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান তাঁহারা সরকারী চাকুরী পান। অবশিষ্টকে সওদাগরী আফিস বা অন্য পথ দেখিতে হয় এবং অদভাবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়। যাঁহারা চাকুরী করেন এবং উচ্চ আশা রাখেন, তাঁহারা অবসর সময়ে কিছু পড়িতে ইচ্ছা করেন এবং যাঁহারা বেকার বসিয়া থাকেন তাঁহারাও চুপ করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে কিছু পড়া ভাল মনে করেন।

এই সমস্যার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কিছু সাহায্য করেন কি না দেখিতে হইবে। ইউনিভার্সিটি ল-কলেজ দিনের মধ্যে তিন বার আইন পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহার যেরূপ সুবিধা তিনি সেইরূপ ক্লাসে যোগদান করিতে পারেন, যেমন Early Morning Class, Late Morning Class ও Evening Class. আইনরূপ অমৃত বিতরণ করিবার উদার ব্যবস্থা। এম-এ ও এম-এস্‌সি ক্লাস দিনের বেলায় হয়, যে-সময় আফিস বসে বা লোককে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় থাকিতে হয়। সুতরাং পূর্ব্বে যাহাদিগের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া আইন ক্লাসে যোগদান করিতে হয়। ওকালতিতে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যতীত সকলকে কি দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

যাহাদের অবস্থার জোর বা প্রতিভা আছে তাহারা আইনের ক্লাস দিনের বেলায় হইলেও পড়িতেন। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় যখন দিনের মধ্যে তিন বার আইন পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন সন্ধ্যার সময়ে এম-এ ও এম-এসসি ক্লাস খুলিবার ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা হইলে শিক্ষার্থীকে অনন্যোপায় হইয়া আইন পড়িতে হইবে না। সব বিষয়ে না হইলেও কার্য্যকরী বিষয়ের, যেমন—ফলিত-রসায়নশাস্ত্র, ফলিত-পদার্থ-বিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সন্ধ্যার সময়ে ক্লাস খোলা উচিত।

মহিলা-সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রীগণের মধ্যে শ্রীমতী আরতি সেন ও অর্চ্চনা সেনগুপ্তা একই নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীমতী বিদ্যা শেঠী পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। স্থানীয় হিন্দু মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা ও প্রাণিতত্ত্ব তাঁহার পরীক্ষার বিশেষ বিষয় ছিল। তিনি তিনটি সন্তানের জননী।

কুমিল্লা-নিবাসী পরলোকগত সুরেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা চারুনলিনী দত্ত তাঁহার কন্যা শ্রীমতী অনিলা দত্তের সহিত এ-বৎসর আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীমতী আরতি সেন

শ্রীমতী বিদ্যা শেঠী

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(১৭)

সোনার স্বপ্ন-প্রাসাদ হইতে অন্ধকার পথে বাহির হইয়া অরুণ যেমন দিশাহারা হইয়া গেল, তেমনই শীত-সন্ধ্যায় ধূম-কুজ্ঝটিকার মত বিষাদের আবরণ তাহার অন্তর আবৃত করিল; সে অনুভব করিল, শৈশবের অপরূপ স্বর্গরাজ্য হইতে দুইটি দেববালা তাহাকে বাহির করিয়া দিল যৌবনের অজানা ভীতিসঙ্কুল পথে। গভীর রাতে যখন সে বাড়ি ফিরিল, প্রাসাদ, উদ্যান, চারি দিকের জীবনস্রোত গূঢ় রহস্যময় ভীতিপ্রদ মনে হইল। শুইবার পূর্ব্বে আয়নাতে নিজের মুখ দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। শৈশবের সরল সৌকুমার্য্য নাই, তাহার অন্তরবাসী কবি-যুবকেরও পরিচয় এ মুখে নাই; গণ্ডের পাণ্ডুরতায়, চিবুকের শীর্ণতায়, চক্ষের কৃষ্ণছায়ায় এ কোন্ অজানা মানুষের মূর্ত্তি।

আবার ফাল্গুন মাস আসিল। পলাশবৃক্ষ রক্তপুষ্পভারে আনত। গাছের শাখায় নবপত্রদলের মধ্যে পাখীরা নীড় বাঁধিতেছে। পুষ্পবনে মৌমাছিদলের গুঞ্জরণের বিরাম নাই। বৃক্ষের কাণ্ডে প্রতি বৎসর চক্রচিহ্নে যেমন বৃক্ষের জীবনেতিহাস লিখিয়া যায় তেমনই প্রতি বসন্তঋতু অরুণের জীবনপটে পুরাতন চিত্রের উপর নব বর্ণের স্বপ্ন-ছবি অঙ্কিত করে। এ বসন্তের বাতাস অরুণের অন্তরের বিষাদ-কুজ্ঝটিকা উড়াইয়া দিতে পারিল না।

দেহে মনে করুণ বিহ্বলতা। অরুণ উদাসী, সুদূরের পিয়াসী। তাহার কিছু ভাল লাগে না। নিয়মিতভাবে সে কলেজে যায়, নোট লেখে, পড়া মুখস্থ করে, বন্ধুদিগের সহিত গল্প করে, সকল কাজ যেন কলের পুতুলের মত করিয়া যায়; আনন্দ কোথাও নাই। এই চলন্ত দিন-রাত্রির কলরোলের মধ্যে তাহার অস্তিত্বের ধারা যেন সহসা স্তব্ধ হইয়া যায়; গুহাবদ্ধ নির্ঝরিণীর ন্যায় কোন আনন্দময় প্রাণশক্তি তাহার দেহে-মনে শৃঙ্খলাবদ্ধ; একটা মূক বেদনা বক্ষের পঞ্জর ঠেলিয়া ওঠে; মনে হয় পারিপার্শ্বিক জীবনস্রোতের সহিত তাহার যোগ নাই, সে একাকী, সে বিচ্ছিন্ন। কয়েকটি বন্ধু ছাড়া, সে ক্লাসের অন্য ছাত্রদিগের সহিত কথা বলে না। কেহ বলে, সে দাম্ভিক; কেহ বলে, এ তাহার কবিয়ানা।

একদিন শিশির তাহাকে বলিল—অরুণ, তুমি বড় সেল্‌ফ্‌-কন্‌সাস্‌ হয়ে উঠছ। অরুণ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—ঠিক বলেছ, আমার সেল্‌ফ্‌কে জানবার চেষ্টা করছি। বস্তুতঃ এতদিন তাহার জীবনধারা জগতের বিরাট প্রাণ-স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া অজানা আনন্দে অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, এখন সে এই জীবন-স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়, দুই স্রোতের বিপরীত টানে আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে।

অজয় একদিন বলিল—কি হয়েছে তোর? টেনিস খেলতে আসিস্ না কেন? সব সময়ই মহাচিন্তিত, যেন পৃথিবীর সব সমস্যা সমাধানের ভার তোর ওপর।

অরুণ মৃদু হাসিয়া বলিল—ভাই দুপুরে রোজ বড় মাথা ধরে, তাই বিকেলে খুব লম্বা বেড়িয়ে আসি। টেনিস খেলতে আর ভাল লাগে না।

অজয় বিরক্ত হইয়া বলিল—এ সব বেশী কবিতা-পড়ার ফল। অরুণের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া অরুণের ঠাকুমা উদ্বিগ্না হইলেন। বংশের এই কুলপ্রদীপের জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই শঙ্কান্বিত। তিনি শিবপ্রসাদকে ডাকিয়া বলিলেন—ওরে, অরুণের নিশ্চয় একটা ভারী অসুখ করবে। কিছু খেতে চায় না, কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে, চোখে কালি পড়েছে, বাগানে চুপ ক'রে বসে থাকে, মুখ ফুটে কিছু বলে না।

ডাক্তার আসিয়া সকল প্রকার পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন—অসুখ কিছু নয়, বড় বেশী পড়ে, অত পড়াশোনা কমাতে হবে, চেঞ্জে যাওয়া দরকার। চেঞ্জে পাঠিয়ে দিন, তা না হ'লে নারভাস্ ব্রেকডাউন হ'তে পারে।

শিবপ্রসাদ চিন্তিত হইয়া বলিলেন—কোথায়, দার্জ্জিলিঙে পাঠাব ?

ডাক্তার বলিলেন—দার্জ্জিলিং, অতি সুন্দর জায়গা, কোন সমুদ্রতীরেও পাঠাতে পারেন।

একমাত্র স্বর্ণময়ী বুঝিলেন, অরুণের মনোজগতের আলোড়নেই তাহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িতেছে। তিনি স্নেহস্বরে অরুণকে বলিলেন—অরুণ, তুমি রোজ সন্ধ্যায় একবার এস; আমি কারুর সঙ্গে একটু গল্প করতেও পাই না।

অরুণ প্রতিসন্ধ্যায় বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া মামীমার নিকট আসিত। তিনি তাহাকে রান্নাঘরের সম্মুখে ছাদে বসাইয়া গল্প করিতে বসিতেন। কোন দিন বা উমাকে ডাকিয়া বলিতেন, অরুণের সঙ্গে একটু গল্প কর্ না, আমি রান্নার কাজগুলো সেরে আসি।

উমা কিন্তু গল্প করিতে চাহিত না। সে বলিত—আমার সামনে পরীক্ষা, আর আমি এখন গল্প করতে বসি। আগামী মার্চ্চ মাসে সে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেছে।

উমা চলিয়া যাইত। অরুণ ম্লান হাসিয়া বলিত—মামী, তোমার কাজ সেরে এস, তার পর নিশ্চিন্ত মনে গল্প করা যাবে।

—কি খাবে অরুণ ?

—না, মামী, কিছু খাব না।

—আচ্ছা, একটু সরবৎ ক'রে দি, কেমন ?

হাতের কাজ ফেলিয়া মামীমা গল্প করিতে বসিতেন। আপন সংসারের সুখ-দুঃখের কথা লইয়াই গল্প সুরু হইত, তার পর মামীমা বলিতেন, দিল্লী-সিমলার সুখের দিনগুলির কথা, নিজ গ্রামের কথা, স্কুলের কথা, কত মধুর স্মৃতি!

অরুণের মন বেশ হাল্কা হইয়া উঠিত।

(১৮)

ছোট বাড়িটি ঘেরিয়া অনন্ত সমুদ্রের অবিরাম কল্লোল-ধ্বনি। সম্মুখে সোনালী বালুচরে সমুদ্র-তরঙ্গ কখনও ভীমগর্জ্জনে আছড়াইয়া পড়ে, কখনও শুভ্র ফেনপুঞ্জে কলহাস্যে ছড়াইয়া যায়।

কিছুদিন হইল অরুণ পুরীতে আসিয়াছে, একা। একা আসিবে, এই সর্ত্তে সে পুরীতে আসিতে রাজী হইয়াছিল।

সমুদ্র সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। প্রথম যেদিন সমুদ্র দেখিল, সে বিস্মিত বা মুগ্ধ হইল না। সমুদ্রের যে অসীমতা, বিরাট নর্ত্তন, অপূর্ব্ব বর্ণভঙ্গিমা সে কল্পনা করিয়াছিল, সে রূপ না দেখিতে পাইলেও, ধীরে ধীরে সে সমুদ্রকে ভালবাসিয়াছে, প্রতিদিন সমুদ্র নব নব সুন্দর রূপে প্রকাশিত। সমুদ্রের ঝোড়ো বাতাসে বিষাদের কালো যবনিকা খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে, জল স্থল আকাশ নব আনন্দালোকে উদ্ভাসিত। দেহে-মনে সে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতি-প্রভাতে সুনীল জলে আলো-ভরা দিন বিকশিত হইয়া ওঠে শ্বেতপদ্মের মত, কে যেন সোনালী খাম খুলিয়া একখানি নীল চিঠি অরুণের হাতে দিয়া যায়; প্রতিসন্ধ্যায় অলক্তক-রাঙা সমুদ্রের অতলতায় সূর্য্য অস্ত যায়, দিগ্বধূদের কণ্ঠে দোলে রক্ত-প্রবালের মালা; সমুদ্র-সঙ্গীতমুখর নিশীথিনী শান্তিপ্রদায়িনী।

ভোরের বাতাসে অরুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। খাটটি জানালার ধারে। বিছানায় শুইয়াই দেখা যায়, বালুচর সমুদ্রে মিশিয়াছে, যেন সোনালী শাড়ীর স্বচ্ছ নীল আঁচল সুদূর দিগন্তে প্রসারিত। জানালা দিয়া নীলাম্বুর খণ্ডিত রূপ দেখিয়া মন ভরে না। তাড়াতাড়ি একটি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া অরুণ শুধু-পায়ে বাড়ি হইতে বাহির হইল।

জনহীন সমুদ্রসৈকত। রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ভিজা বালি ভোরের আলোয় ঝিকিমিকি করিতেছে। পশ্চিমের আকাশ স্নিগ্ধ নীল মেঘে ছাওয়া। ঢেউগুলি অতি শান্তভাবে তটভূমিতে ভাঙিয়া পড়িতেছে, অতি মৃদু কল্লোলধ্বনি,—ঘুমন্ত শিশুর দিকে চাহিয়া মাতা যেমন অতি মৃদুস্বরে সন্তানের নাম উচ্চারণ করেন, শিশুকে জাগাইবার জন্য নয়, শুধু আপন সন্তানের নাম-ডাকার আনন্দে।

এ নির্ম্মল উষায় অরুণ অন্তরে গভীর শান্তি অনুভব করিল। স্তব্ধ নীলাকাশ হইতে দিগন্তবিস্তৃত শান্ত সিন্ধুজল পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাপী সহজ সরল আনন্দ পরিব্যাপ্ত, সদ্য-জাগা শিশুর হাসির মত।

এক হাসির শব্দে অরুণ চমকিয়া চাহিল। অদূরে এক তরুণীর আবছায়াময় রঙীন মূর্ত্তি আকাশ-সিন্ধুর নীলপট-ভূমিকায় আঁকা। অরুণ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, এই অজানা তরুণী অকারণে হাসিয়া উঠিল, অথবা, সমুদ্রের তরঙ্গকল্লোলে এ হাস্য। সে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

কালো চুলের রাশি কুণ্ডলী করিয়া আলগা খোঁপা বাঁধা, সদ্যজাগরণফুল্ল মুখে নবোদিত সূর্য্যের আভা, হাল্কা সবুজ রঙের শাড়ী, পায়ে কার্পেটের চটিজুতা, ঘুম ভাঙিতেই তরুণীও তাড়াতাড়ি আসিয়াছে সমুদ্রে অরুণোদয় দেখিতে।

মেয়েটি অরুণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, সঞ্চারিত বল্লরীর মত। উজ্জ্বল চক্ষুতারকায় স্বচ্ছ অতলতা। শ্যামলোজ্জ্বল মুখে লাবণ্যের মায়ামন্ত্র। আবার অতি মৃদু হাসির শব্দ। অরুণের সর্ব্বশরীর চমকিয়া উঠিল। হাসি নয়, বালির ওপর অলস গতিতে চলার ছন্দে চটিজুতার খস্‌খস্ ধ্বনির সহিত হাতের বেলোয়ারী চুড়িগুলির ঝঙ্কার।

রক্ত-মেঘের অন্তরালে সূর্য্যের উদয় হইল। কল্লোলে উল্লাসে রজতশুভ্র হাস্যে সূর্য্য-হসিত সিন্ধু বেলাভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে বহু দূর বেড়াইয়া অরুণ সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজপথ দিয়া আসিতেছিল। দূর সমুদ্র-কল্লোলধ্বনির সহিত ঝাউগাছগুলির সন্ সন্ শব্দ, আষাঢ়ের মেঘ-মেদুর আকাশ রিমঝিম করিতেছে।

পিছন হইতে কে তাহাকে ডাকিল, তোমার নাম অরুণ? অবাক হইয়া সে তাকাইয়া দেখিল, এক বর্ষীয়সী মহিলা, সালঙ্কৃতা, সুসজ্জিতা, তাহার দিকে আসিতেছেন।

—হাঁ, আমার নাম অরুণ।

—আমারও তাই তখন মনে হ'ল। ক'দিন ধ'রে তোমায় খুঁজছি।

—আপনি?

—হাঁ, স্বর্ণ তোমার কথা আমায় লিখেছে, তোমার স্বর্ণমামীমা।

—ও, বুঝেছি।

—স্বর্ণ আমার বন্ধু, আমরা একসঙ্গে সিমলা দিল্লী বহুদিন কাটিয়েছি। স্বর্ণ লিখেছে, তুমি এখানে একা আছ, তোমার খুব লোনলী লাগছে, আমরা যেন দেখা-শোনা করি।

—আমার মোটেই লোনলী লাগছে না, আমি এখানে একা থাকতেই ত এসেছি।

—না, না, ও ভাল নয়, ইয়ংম্যান, সব সময় সোসাইটিতে থাকবে।

—সোসাইটি থেকে পালাবার জন্যেই ত এখানে আসা।

—কি জানি বাপু, আমি ত এ ক'দিনে হাঁপিয়ে উঠেছি, সারাক্ষণ সমুদ্রের ডাক আর বাতাস হু হু ক'রে বইছে, লোকে কথা বলতে না পারলে পাগল হয়ে যাবে যে। আর এত বালি ওড়ে, টেবিল চেয়ার বিছানা সব বালিতে কিচকিচ করে। কি সুখে যে লোকে সমুদ্রে আসে, দার্জ্জিলিং নৈনিতাল অনেক ভাল। এস, এস, এই সামনে আমাদের বাড়ি।

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে অরুণকে বসাইয়া মিসেস্ মল্লিক ডাকিলেন—বেবি! বেবি!

বেবী-নাম্নী এক অষ্টাদশী হিল-উঁচু জুতার খটখট ছন্দে ঘরে ঢুকিয়া অরুণের দিকে স্মিতমুখে চাহিল।

—এই, ইনি অরুণ, found at last!

—বা, মা, কাল রাতে তোমায় বললুম না, কাল আমি ওঁকে ডিস্‌কভার করেছি, তোমার আগে। কাল সকালেই দেখে মনে হয়েছিল, স্বর্ণমাসীমার চিঠির বর্ণনা মিলছে, তার পর কাল সন্ধ্যায় যখন দেখলুম, সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একা, like a lost soul—

—মামী আমার খুব বর্ণনা ক'রে পাঠিয়েছেন, দেখছি। কিন্তু আপনাদের সম্বন্ধে ত কিছুই আমাকে লেখেন নি।

—এটি আমার মেয়ে মল্লিকা, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে বি-এ পড়ছে। অরুণকে কিছু খেতে দে, বেবি।

—তোমার খানসামাটি ত সকাল থেকে পলাতক মা, বাহাদুরকে দিয়ে যা-হয় কিছু রাঁধাবার চেষ্টা করছিলুম।

—আচ্ছা, আমি দেখছি। আজ কি বাড়িতে স্নান করলি?

—না, আজ আমার চুল স্যাম্পু করার দিন যে, নোনা জলে চুলগুলি যা হচ্ছে।

—বস বস অরুণ, তোরা গল্প কর্।

মল্লিকা অরুণের পার্শে সোফায় আসিয়া বসিল। লেস্-বসান নীচু গলা জ্যাকেট, গলায় রঙীন কৃত্রিম পাথরের লম্বা মালা, কানে মুক্তার দুল, হাতে সোনার চুড়িগুলির সহিত বেলোয়ারী চুড়ি, হাল্কা নীলরঙের শাড়ীতে সোনার আঁচলা ; পিঠে ঈষদার্দ্র কালো চুলের বন্যা।

স্বচ্ছ চোখ দুইটি নাচাইয়া মল্লিকা বলিল—কেমন লাগছে সমুদ্র ?

—প্রথমে ভাল লাগে নি, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই ভাল লাগছে।

—ঠিক, আমারও তাই। আমরা এসেছি সাত দিন হ'ল। আমিই মাকে জোর ক'রে নিয়ে এলুম। মা দার্জ্জিলিং যেতে চান ; আমি বললুম, পাহাড় দেখে মা চোখ প'চে গেছে, চল ; সমুদ্র কখনও দেখি নি।

—আমারও এই প্রথম সমুদ্র দেখা।

—দেখে এমন খুব আশ্চয্যি লাগে না, তবে স্নান, ও! সমুদ্র-স্নান ডিলিসাস্. আর সমুদ্রের মাছ খাওয়াও খুব চলছে—খুব স্নান করা হয়—কত ক্ষণ ?

—আমি, আধঘণ্টা তিন কোয়াটার জলে থাকি।

—আমি ত এক ঘণ্টার কম উঠি না। রোজ চোখ মুখ রাঙা ক'রে বাড়ি আসি, আর মার কাছে বকুনি খাই, দুখানি শাড়ী ত ছিঁড়েছে। দুপুরবেলাটা বড় ভাল লাগে, কতক্ষণ আর হাঁ ক'রে সমুদ্রের ঢেউ গোণা যায় !

—বই পড়তে পার।

—ভাল ডিটেকটিভ নভেল আছে ? খুব থ্রিলিং ?

—ডিটেকটিভ নভেল নেই, ভাল কবিতার বই দিতে পারি।

—কবিতা—ওঃ—আমার মোটেই ভাল লাগে না।

অরুণের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মল্লিকার কণ্ঠে এমন সহজ কৌতুকের সুর যে তাহার কোন কথায় রাগ করা যায় না।

অরুণ হাসিয়া বলিল—কবিদেরও ভাল লাগে না !

—It depends—উহুঁ—না, কবিরা বেশ ইন্‌টারেষ্টিং হয়—কবি নাকি তুমি ?

—না, কবি হ'তে চাই, কিন্তু—

—কিছু মনে ক'রো না, আমার যা মনে হয়, বলে দি, মনের কথা আমি চেপে রাখতে পারি না, তাই মা বলেন—

মা, কি বলেন বেবি, বলিয়া মিসেস্ মল্লিক প্রবেশ করিলেন।

—মা, তুমি বল না, আমি বড় বাজে বকি।

—তোমার সঙ্গে যে পাঁচ মিনিট গল্প করবে, সে-ই তা বুঝতে পারবে—ওর বড় খোলা মন। অরুণ, গল্প কর তোমরা, আমাকে মিসেস্ সেনের বাড়ি একবার যেতে হবে। বাহাদুরকে চা আনতে ব'লে দিয়েছি, বেবি। চা না খেয়ে যেও না তুমি, আর বিকেলে এখানে এসে চা খাবে, যেন ভুলো না, তোমার সঙ্গে গল্পই হ'ল না।

মিসেস্ মল্লিক চলিয়া গেলেন।

পেয়ালাতে চা ঢালিতে ঢালিতে মল্লিকা বলিতে লাগিল—দুই-এক জন কবি আমার খুব ভাল লাগে, যেমন কীটস্, শেলী। আমাদের কনভেণ্টের সিষ্টার এমিলি, ও, কি শেলীর ভক্ত, আমি ত প্রাইজে দুখানা শেলী পেয়েছি, আবার জিজ্ঞেস করবেন, পড়েছ, 'ক্লাউড' কবিতা মুখস্থ করেছ ? ক চামচ চিনি ? সুন্দর কবিতা 'ক্লাউড'—

I bring fresh showers for the thirsting flowers

From the seas and the streams ;

অরুণ বলিল—এই সমুদ্রের তীরে বসেই ত কবিতা প'ড়ে সবচেয়ে এনজয় করা যায়—

—রক্ষে কর, আমার ডিটেকটিভ নভেল বেঁচে থাক।

চা খাওয়ার শেষে অরুণ যখন মল্লিকার নিকট বিদায় লইল, আকাশে আষাঢ়ের নব স্নিগ্ধ মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, সমুদ্রের গুরুগুরু ধ্বনি মাদলের শব্দের মত। অরুণের অন্তরেও নববর্ষা নামিয়া আসিল, তৃষিত পুষ্পদলের জন্য যে মেঘ নদী সমুদ্র হইতে শীতল বারিধারা সঞ্চিত করিয়া আনিল, তাহারই স্নিগ্ধ আবির্ভাব তাহার হৃদয়ের দিগন্তে।

অপরাহ্ণে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখিতে অরুণ যথাসময়ে মিসেস্ মল্লিকের বাড়িতে উপস্থিত হইল। বেহারা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ড্রয়িংরুমে বসাইল। মেমসাহেব কোথায় চায়ের নিম গয়াছেন, বেবী-বাবা শীঘ্রই আসিতেছেন। মল্লিকার আসিতে দেরি হইতে লাগিল। প্রসাধন কিছুতেই মনের মত হইতেছে না। কোন

রঙের ব্লাউজের সহিত কোন্ রঙের শাড়ী পরা যায়, মাতার অনুপস্থিতিতে এ সমস্যার সহজ সমাধান হইতেছে না।

নানা খাদ্যভরা বৃহৎ প্লেট হাতে করিয়া সুচিস্মিতা মল্লিকা ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল। অর্থাৎ, দেরিটা যেন খাবার তৈরি করিবার জন্যই হইতেছিল। প্লেটে আমিষ ও নিরামিষ স্যাণ্ডউইচ্, সামুদ্রিক মৎস্যের নানাপ্রকার খাবার।

—Excuse me. দেরি হয়ে গেল আস্‌তে, অনেক ক্ষণ ব'সে আছ ?

—তোমার এই দুটো ফটোর অ্যালবাম দেখা শেষ হ'ল। এসব তোমার তোলা ফটো ?

—বেশীর ভাগ।

—বেশ সুন্দর ত।

—ফটো-তোলা সুন্দর, না মেয়েগুলি ?

—দুই-ই।

ছোট গোলটেবিলে মল্লিকা বসিল অরুণের মুখোমুখি। শ্যামলোজ্জ্বল মুখশ্রী, কচি ধানের চিকণ আভার মত; উঁচু করিয়া চুল বাঁধা বলিয়া কপাল চওড়া দেখাইতেছে, নাকটি একটু মোটা; মুখের ডৌল বড় সুকুমার, অনতিপক্ক ফলের মত বিম্বাধর; সবচেয়ে আশ্চর্য্য টানা কালো চোখ দুইটি, আয়ত নয়নে যেমন হাস্য-কৌতুকের ছটা তেমনই অপূর্ব্ব স্বচ্ছতা।

চা খাওয়ার শেষে মল্লিকা ফটো অ্যালবামগুলি লইয়া অরুণের পাশে আসিয়া বসিল। কন্‌ভেণ্ট স্কুলের ও কলেজের নানা সহপাঠিনী ও শিক্ষয়িত্রীর ছবি; সিমলা, দিল্লী, নানা স্থানের প্রাকৃতিক শোভা ও পথ দৃশ্য রহিয়াছে। মল্লিকা অফুরন্ত গল্প করিয়া চলিল—কোন্ মেয়েদের সঙ্গে তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব; কোন্ পিক্‌নিকে কি হাস্যকর ঘটনা ঘটিয়াছিল; সিমলাতে বসন্তাগমে কত বর্ণের ফুল ফোটে; কোন্ ফিরিঙ্গি মেয়ের পিতামাতার বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে, মেয়েটি পিতার তত্ত্বাবধানে আছে, অথচ মাতার সহিত মাঝে মাঝে কি কৌশলে লুকাইয়া দেখা করে; এক-বার দিল্লীর চকে বাজার করিতে গিয়া মল্লিকার গলা হইতে সোনার হার খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, আবার কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া গেল; কলেজে তাহার কোন্ প্রফেসারদের ভাল লাগে না; কোন্ পিয়ানো-বাদককে সে শ্রেষ্ঠ মনে করে; মোজার্টের মিউজিক সে কিরূপ ভালবাসে; এইরূপ কত সামান্য গল্প, তুচ্ছ কথা, অরুণ মুগ্ধচিত্তে শুনিতে লাগিল অপরূপ কাহিনীর মত।

মল্লিকা যখন চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসে, রাঙা সরু ঠোঁটের ওপর মোটা নাক বিশ্রী দেখায়, কিন্তু যখন সে কথা বলে, তাহার মুখ পরম সুন্দর হইয়া ওঠে, চোখে শ্যামল ধরণীর স্বপ্ন-অঞ্জন লাগে, গলার হার, কানের দুল ঝিকিমিকি করে। তুচ্ছ কথা বলার অবসরে কখন মল্লিকার সরল মুখে কোন্ অমৃতময় সৌন্দর্য্যালোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এ অপূর্ব্ব অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য সে কখনও কাহারও মুখে দেখে নাই। অরুণের দেহ মন চমকিয়া উঠিল।

রাতে যখন অরুণ বিদায়গ্রহণ করিল, মল্লিকা বলিল—কাল সকালে কি করছ ? স্নান করবার সময় তোমায় ডেকে নিয়ে যাব, সাড়ে ন'টা, কেমন !

—আচ্ছা, মেনি থ্যাঙ্কস্।

সম্মুখে অন্ধকার পথে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া অরুণ বহুক্ষণ বাড়িটির দিকে চাহিয়া রহিল।

একটা হাসির ধ্বনি। ফাস্নি নয়, নয় মা।

সে ফানি নয়। কলিকাতার কেহ অরুণকে এরূপভাবে বর্ণনা করিলে, সে তাহার সহিত দেখা করিত না; কিন্তু এই সমুদ্রতীরের জল স্থল আকাশের কি যাদু আছে। ফানি নয়, কথাগুলি গানের সুরের মত গ্রহতারাবেষ্টিত নিশীথ-গগনে বাজিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে সাড়ে আটটার সময় অরুণ সমুদ্রস্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাড়ির সম্মুখে চঞ্চলভাবে ঘুরিতেছিল। বালি ও সমুদ্রের জলে কাপড় জামা গৈরিকবর্ণ হইয়া ওঠে, ছিঁড়িয়া যায়; সেজন্য সে স্নানের জন্য একটি মোটা কাপড় ও গেঞ্জি আলাদা রাখিত; আজ ময়লা কাপড়-জামা পরিল না, ফর্সা কাপড় ও পাঞ্জাবী পরিয়া মল্লিকার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় নয়টার সময় মল্লিকা আসিয়া ডাক দিল—মিষ্টার পোরেট, প্রস্তুত! একটু সকাল ক'রে এলুম, মাকে ব'লে এসেছি, আজ দেড় ঘণ্টা স্নান।

—আমি প্রস্তুত। চলো।

—পোষাক আন নি ?

—না, ওসব আনি নি।

মল্লিকার খানিকটা বিলাতী সাজ সজ্জা। সঙ্গে বেহারার হস্তে ছাতা ও বড় তোয়ালে।

—জুতো প'রে নাও, আসবার সময় বালি তেতে উঠবে।

—ভিজে পায়ে বালির ওপর দিয়ে আসতে বেশ লাগে। চলো।

তাহারা কিছুদূরে স্নান করিতে চলিল। অদূরে সাহেবদের ছেলেমেয়েরা মাথায় তালপাতার টুপি পরিয়া স্নান করিতেছে।

অরুণ স্নান-বিলাসী। বাড়ির পুষ্করিণীতে সে বহুক্ষণ সাঁতার কাটিয়া স্নান করে। কিন্তু সমুদ্রে স্নান যেন মাদকতাময়। প্রথম ঢেউ শুভ্রফেনায় পায়ের উপর লুটাইয়া পড়ে, দ্বিতীয় ঢেউ বুকে আসিয়া আঘাত করে, তৃতীয় ঢেউ শুভ্রহাস্যে কণ্ঠ জড়াইয়া দূরে আরও দূরে টানিয়া লইয়া যাইতে চায়, চতুর্থ ঢেউ সমস্ত দেহ দোলাইয়া দেয়, মাথার উপর উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। তার পর দোলার পর দোলা। নেশা লাগিয়া যায়।

আজ সমুদ্র-কল্লোলের সহিত মল্লিকার হাস্যদীপ্ত চাউনি, উল্লাসধ্বনি, সরল কৌতুক মিলিয়া সমুদ্র-স্নান অপূর্ব্ব মধুর হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ তাহারা সাঁতার কাটে, ঢেউয়ে দোলা খায়; তার পর তীরে বসিয়া গল্প করে, রোদ পোহায়; আবার দুরন্ত ধীবর বালক-বালিকার মত আবেগে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

বেহারা সঙ্গে ঘড়ি আনিয়াছিল। সে জানাইল, প্রায় দুই ঘণ্টা হইয়াছে। চোখ মুখ রাঙা করিয়া শ্রান্ত হইয়া অরুণ ও মল্লিকা জল হইতে উঠিল বটে, কিন্তু তাহাদের স্নানের নেশা তখনও মেটে নাই।

তিন দিন পরে।

উদাস দ্বিপ্রহর। বিজন সাগরতীর। সূর্য্যাহসিত শান্ত সিন্ধু। বসুন্ধরার হিরণ্যঅঞ্চলের মত প্রসারিত বালুচর। তীরপ্রান্তে একটি বৃহৎ নৌকা পড়িয়া রহিয়াছে, যেন আরব্যোপন্যাসের কোন দৈত্য বৃহৎ জুতা ফেলিয়া গিয়াছে, সে জুতা পরিতে পারিলে পর্ব্বত বন নদী সমুদ্র পার হইয়া কেশবতী রাজকন্যার দেশে পৌছান যায়।

তটের নিকট তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র শুভ্র, তার পর একটু পাটলবর্ণ, তার পর স্নিগ্ধ সবুজ, তার পর দিগন্তে ঘন নীল, যেন নানাবর্ণের নক্সা-করা একটি পারস্য-কার্পেট সুদূর গগনসীমান্ত পর্য্যন্ত ঝলমল করিতেছে। নৌকার আড়ালে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া অরুণ শেলী পড়িতেছিল।

Many a green isle needs must be
In the deep wide Sea of Misery,

—বা, গ্রাণ্ড, বলিয়া কে হাততালি দিয়া উঠিল।

অরুণ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল নৌকার ওধারে বালুর গর্ত্তে পা ডুবাইয়া মল্লিকা বসিয়া আছে।

—তুমি।

—হাঁ, আমি, এলুম লষ্ট সোল উদ্ধার করতে। গ্রীন আইল-এর সন্ধান পেলে ?

—এতক্ষণ পাচ্ছিলুম না, এবার পেয়েছি, সুতরাং শেলী বন্ধ, এবার মল্লিকা-কথা আরম্ভ হোক।

—কি ফাজিল ছেলে, এস এদিকে।

—তুমি উঠে এস, গল্পের মনসুন নামুক।

—বা, আমি কেমন পা ডুবিয়ে বালিতে বসেছি।

অরুণকে উঠিয়া যাইতে হইল। নৌকায় ঠেস দিয়া দুই জনে বসিল পাশাপাশি। আকাশ হাল্কা কালো মেঘে ছাইয়া আসিল।

—হাত দেখতে জান ? দেখ দেখি আমার হাত।

মল্লিকার হাতটি অরুণ নিজের হাতে তুলিয়া লইল। শিশুর মত নরম তুলতুলে হাত, লম্বা আঙুলগুলি সুন্দর, নখগুলি সুন্দর কাটা, ঈষদ্রক্ত।

—ওই হাত দেখা হচ্ছে!

—এই ত হাত দেখছি, সুন্দর হাত, আর্টিষ্টের হাত।

—ঠাট্টা !

—ঠাট্টা নয়, আচ্ছা বলছি, তুমি বেশ ভাল বাজাতে পার।

—তা, পিয়ানো মন্দ বাজাই না, একটা পিয়ানো থাকত এখানে, আর বেহালা—

—বেহালা বাজান ভাল লাগে?

—I adore.

—আমি একটা বেহালা এনেছি, এতদিন বাক্স হ'তে বার করাই হয় নি।

—চল, নিয়ে এস।

—এখন?

—আচ্ছা, আজ সন্ধ্যায় বাজাতে হবে কিন্তু। আর কি, আর কি দেখ্‌ছ হাতে?

—দেখ্‌ছি আর সাত দিনের মধ্যে কাচের চুড়িগুলি সব ভেঙে যাবে, আর সেই সঙ্গে একটি যুবকের হৃদয়ও ভাঙবে।

—কে? তার হৃদয় কি কাচ দিয়ে গড়া?

—সে তোমায় ভালবাসে কিন্তু তুমি তাকে ভালবাস না।

মল্লিকা গম্ভীর হইয়া উঠিল, মৃদুস্বরে বলিল—তুমি কেমন ক'রে জানলে?

—বা, আমি যে হাত দেখ্‌তে জানি।

হাত টানিয়া লইয়া মল্লিকা বলিল—তোমায় আর হাত দেখতে হবে না। তাহার মুখ ছলছল করিয়া উঠিয়াছে, মেঘ-ঢাকা সমুদ্রের মত।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। নৌকার আড়ালে দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মল্লিকার স্তব্ধ গম্ভীর রূপ দেখিলে অরুণের কেমন ভয় হয়।

—কি হ'ল তোমার?

—না, কিছু নয়। মাঝে মাঝে মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। শোন, উমার চিঠি পেয়েছি আজ।

—উমার?

—হাঁ, এক সময়ে সে আমার খুব বন্ধু ছিল।

—বা, বেশ জোর বিষ্টি হ'ল। ব'সে ব'সে একটু ভেজা যাক।

বহুক্ষণ বিষণ্ণমুখে বসিয়া থাকিবার মেয়ে সে নয়। উচ্ছ্বসিত ভাবে সে গল্প শুরু করিল।

অপূর্ব্ব, আনন্দময় দিনরাত্রি, অঘটন ঘটনের স্বপ্নভরা। সত্তার নবজন্ম। জীবন-সমুদ্রে আনন্দের বান ডাকিয়া আসিয়াছে। অরুণের অস্তিত্বের ধারা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে আলোর বন্যায় উপছে-পড়া শরতাকাশের পেয়ালার মত। এত দিন সে চলিয়াছে আপন রহস্যে একাকী, আজ সে জীবনের সকল দুঃখ সমস্যার কথা ভুলিয়া গেল, শুধু অনুভব করিল, এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকায় পরমানন্দ।

অরুণ ও মল্লিকা দুই বিভিন্ন জগতের। অরুণ যেমন মল্লিকার মত কৌতুকময়ী, প্রাণ-ভরা বিলাসচঞ্চল স্বাধীন-প্রকৃতির মেয়ে দেখে নাই, মল্লিকাও সেইরূপ অরুণের মত গম্ভীর, চিন্তাশীল, ভাবপ্রবণ কবি-প্রকৃতির ছেলে দেখে নাই। পরস্পর পরস্পরের নিকট পরম রহস্যময়।

মল্লিকার প্রকৃতি এত সরল, স্বচ্ছ, অরুণ সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ছোট মেয়ের মত সে প্রচুর খাইতে ভালবাসে, খাবারের গল্প করে; নানা রঙীন বেশে অলঙ্কারে সাজিতে ভালবাসে বন্য নারীর মত; ছুটিতে, সাঁতার কাটিতে, চেঁচাইতে, উচ্চ হাসিতে, অকারণে শব্দ করিতে ভালবাসে। তাহার দেহে যেমন প্রচুর স্বাস্থ্য তাহার মনে তেমনই প্রচণ্ড স্বাধীনতা, সে কিছু লুকাইতে, বানাইয়া বলিতে পারে না, এই তারুণ্যমণ্ডিত সহজ স্বাধীনতা তাহাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়াছে।

তাহার অফুরন্ত প্রগলভতা, তুচ্ছ ঘটনার বর্ণভঙ্গিমা, হাস্যকৌতুকের অবিরাম ধারা, প্রাণের খুশীর ঝলমলানি, বাঁচিয়া থাকার উদ্দাম উল্লাস—এ যেন বসন্ত ঋতুতে ফুলের অজস্রতা, গিরি-ঝর্ণার বিরামহীন সঙ্গীতধ্বনি, নীলাম্বুর উচ্ছ্বসিত কল্লোল,—উন্মুক্ত-প্রকৃতির মত স্বাভাবিক সুন্দর।

নারীপ্রকৃতিকে বিচার বা বিশ্লেষণ করিবার শক্তি অরুণের তখনও হয় নাই। সে মুগ্ধ হইয়া যায়। এ তরুণীর প্রাণ-কল্লোলে তাহার জীবন ছন্দিত হইয়া উঠে। মেঘকজ্জল দিনগুলি যেন তাহারই প্রসারিত চক্ষের কৃষ্ণ তারকার স্নিগ্ধতা, সমুদ্রগীতমুখর রাত্রিগুলি যেন তাহারই আনত আঁখিপক্ষের নিবিড় রহস্য।

দিনের পর দিন সহজ আনন্দে কাটিয়া গেল; কোন হিসাব রহিল না।

অরুণ চিঠিটি পাইল দুপুরবেলায়। চিঠি পড়িয়া সে

বিছানায় শুইয়া পড়িল। এ কি তাহার আনন্দ-ভোগের শাস্তি! সমস্ত দিন সে বিছানাতে চুপ করিয়া শুইয়া কাটাইল। সমুদ্রতীরে যাইতে ভয় করিল। দেহ-মন বড় ক্লান্ত। সন্ধ্যায় সে কোনরূপে মিসেস্ মল্লিকের বাড়িতে আসিয়া পৌছিল। ড্রয়িংরুমের সম্মুখে বারান্দায় আসিতে, শুনিতে পাইল, মাতা ও কন্যার কথাবার্ত্তা হইতেছে।

—বেবি, তুই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস, অরুণের সঙ্গে অত মেশা ভাল নয়।

—দেখ মা, কথাটা স্পষ্ট ক'রে বল না, অত ঘুরিয়ে বলার কিছু দরকার নেই।

—শোন্, মহেশ লিখেছে, আসছে শনিবার সে আসতে চায়, মানে, সে শনিবারে আসছে, যদি কোন কারণে আমরা বারণ ক'রে না লিখি।

—তাই বল না, তোমার মহেশ আমার বন্ধুত্বটা পছন্দ করতে না পারেন।

—সেটাও ভাবতে হবে। দেখ অত বড় লোকের ছেলে রাজী হয়েছে, তার দিকটা ত দেখা দরকার। আর আমার মনে হয় অরুণ তোর সঙ্গে লাভ-এ পড়েছে, আমার ত চোখ আছে, আমি নিশ্চয় বলতে পারি, ও তোকে ভালবাসে।

—আচ্ছা যদি ভালই বেসে থাকে, কি হয়েছে তা'তে?

—ওর তরুণ জীবন, ছেলেটি বড় ভাল, বড় সিরিয়স।

—মা, স্পষ্ট কথাটা বল না কেন, তোমার ভয়, পাছে তোমার মেয়েটি ওকে ভালবাসে, আর তোমার এমন সাধের সম্বন্ধটি ভেঙে যায়।

—তোকে নিয়ে আমি পারলুম না, বেবি চুপ কর্, কে যেন আসছে।

পাংশুমুখে অরুণ ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল।

মল্লিকা স্মিতমুখে বলিল—হ্যালো, সারাদিন তোমায় দেখি নি, মুখ এত শুক্‌নো, অসুখ?

অরুণ মল্লিকার দিকে চাহিল না, মিসেস্ মল্লিককে বলিল—আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এলুম, আমি কাল সকালে চলে যাচ্ছি।

সমস্যার এত সহজ সমাধান হইবে, মিসেস্ মল্লিক ভাবেন নাই। তিনি খুশী হইয়া উঠিলেন।

কণ্ঠে একটু বিস্ময়ের সুর আনিয়া বলিলেন—হঠাৎ কাল?

অরুণ ধীরে বলিল—হাঁ, এখানে বহুদিন থাকা হয়ে গেল, বাড়ি থেকে যাবার তাগাদা এসেছে। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, ছুটিটা বড় আনন্দেই কাটল।

মল্লিকা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে উচ্চ হাসিয়া বলিয়া উঠিল—এই তোমার কথাই হচ্ছিল, মা বলছিলেন,—

—বেবি!

মিসেস্ মল্লিক অরুণকে বলিলেন—কালই যাচ্ছ? স্বর্ণকে ব'লো আমাদের কথা, দেখি কলকাতায় যদি যাই দেখা করব। সুবিধে হ'লে এস একবার সিমলার দিকে। তোমায় বড় ভাল লাগল, এখন কিছুই আদরযত্ন করতে পারলুম না। কাল সকালেরট্রেনে যাবে? ডিনার খেয়ে যাও, ব'স তোমরা গল্প কর, আমাকে একবার মিসেস্ সেনের বাড়িতে যেতে হবে।

অনর্গল বকিয়া মিসেস মল্লিক সহসা চলিয়া গেলেন, অরুণের বিদায়গ্রহণ করাও হইল না।

মল্লিকা বলিল—চল অরুণ বাহিরে, ঘরে বড় গরম মনে হচ্ছে।

দুই জন নিঃশব্দে বাহির হইল, ঝাউবন অতিক্রম করিয়া রাজপথ পার হইয়া বালুচরে গিয়া বসিল। অন্ধকার রাত্রি, আকাশ তারায় ভরা, উদ্বেলিত সমুদ্রে একটা অদ্ভুত আলো মাঝে মাঝে ঝিকিমিকি করিয়া উঠিতেছে।

—হঠাৎ কাল যাবে?

—আজ বাড়ি থেকে চিঠি পেলুম, বড় দুঃসংবাদ।

—কি?

—আমার বোনের বড় অসুখ।

—প্রতিমার! কি হ'ল?

—কি অসুখ লেখে নি, গত পাঁচ দিন ধ'রে জ্বর ছাড়ছে না আর আমি এখানে—

—আমারও একটা দুঃসংবাদ শোন। আসছে শনিবার মহেশ মজুমদার আসছেন।

—কে তিনি? তোমার ফিয়াঁসে?

—মা তাই ভাবেন, তিনিও ওইরূপ আশা ক'রে আছেন, কিন্তু আমি এবার তাঁর আশা ভঙ্গ করছি।

—কেন ?

—কেন, আমার খুশী, ও!

—দেখ, হয়ত তোমার মা আমার নামে বদনাম দেবেন।

—পাগল! তুমি সে ভয় ক'রো না।

সহসা মল্লিকা অরুণের হাত নিজের হাতে টানিয়া লইল। তাহার মুখ ছলছল করিতেছে, স্বচ্ছ চোখ অশ্রু-বাষ্পময়।

—Ships that pass in the night ব'লে একটা কবিতা পড়েছ ?

—না।

—অন্ধকার অনন্ত সমুদ্রে দুইটি জাহাজ ক্ষণিকের জন্য পাশাপাশি এসে চলে গেল, আবার তাদের দেখা হবে কিনা কে জানে! আচ্ছা শীতের মরসুমী ফুল-ফোটা দেখেছ, রঙের কত বাহার কিন্তু ক'দিনই বা থাকে। পৃথিবীতে আনন্দ বড় ক্ষণস্থায়ী, ঈশ্বর এমন করেন কেন ?

দুই জনে স্তব্ধ বসিয়া রহিল। তাহাদের অস্তিত্বের ক্ষুদ্র বিন্দু ঘিরিয়া কোন অতলস্পর্শ অনাদি শক্তির বন্যা সৃষ্টির ভাষাতীত বেদনা ও আনন্দে গর্জ্জমান অন্ধকারে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহারই ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে লক্ষ্যহীন পথযাত্রার গান।

মল্লিকা চকিতপদে দাঁড়াইয়া উঠিল। অরুণ তাহার পার্শ্বে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—চল তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না, চলো তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি, তা না হ'লে হয়ত তুমি এই সমুদ্রের ধারে সারারাত কাটাবে।

অরুণের বাড়ির নিকট আসিতে, মল্লিকা তাঁহার অতি নিকটে আসিয়া তাহার হাতে একটি চুম্বন করিল।

অরুণ বিস্মিতভাবে মল্লিকার দিকে চাহিল, তাহার চিরস্বচ্ছ চোখে আজ অন্ধকার সমুদ্রের রহস্য।

কিন্তু মল্লিকার অশ্রু অরুণের হাতে পড়িতে তাহার রুদ্ধ অশ্রুচঞ্চল দুই চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। সে মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মল্লিকা বলিল—জানি, তুমি আমায় ভুলে যাবে, কিন্তু মল্লিকা মল্লিক যে হৃদয়হীনা নয়, সেই কথা তোমায় জানিয়ে গেলুম,—না, না, তোমায় আসতে হবে না, আমি একা যেতে পারব। au revoir !

চোখের জল মুছিয়া অরুণ যখন চাহিল, মল্লিকা অদৃশ্য হইয়াছে।

রাত্রি আরও নিবিড় অন্ধকারময়, সমুদ্রের আহ্বান আরও গম্ভীর রহস্যময় হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

প্রশান্ত মহাসাগরে

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল, এম্‌-এ

পূর্ব্ব-দিগন্তের মহাসাগরের তীরে অচিরাৎ যে এক রাষ্ট্রবিপ্লব ধূমায়িত হইয়া উঠিতে পারে, পৃথিবীর রাজনীতি-বিশারদগণ সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ এক মত। জাপানের সাম্রাজ্য-লালসা তুষানলের মত বৃদ্ধি পাইতেছে। জীহোল ও মাঞ্চুরিয়া স্বাধিকারে আনিয়া জাপানের শক্তি ও সাহস দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র অধিকতর রাজ্যবিস্তার তাহার এই সাম্রাজ্যক্ষুধা কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত করিতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের সুবিস্তীর্ণ বক্ষে মৃত্যুর উন্মাদনায় উন্মত্ত যুক্ত-রাষ্ট্র আপনাদের নৌ-বিভাগের শৌর্য্যবীর্য্য দেখাইবার জন্য যে কৃত্রিম জলযুদ্ধ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে প্রতিপক্ষগণ সাবধান হইবে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ছ-হাজার মাইল পরিমিত স্থানের মধ্যবর্ত্তী বিপুল জলরাশি আমেরিকার বিশাল রণপোত-সমূহের চঞ্চল গমনাগমনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। জাপান কি স্থির থাকিতে পারে? তাহার পণ অভিমান-দগ্ধ কুরুরাজ দুর্যোধনের মত। তাহারও ত ঐশ্বর্য্যের প্রদর্শনী দেখাইবার বাসনা থাকিতে পারে? সুতরাং জাপানও অবিলম্বে আমেরিকা-অধিকৃত ফিলিপাইনের পূর্ব্বসীমার অবিচ্ছিন্ন জলরাশি ভেদ করিয়া আপনার রণোন্মত্ত রণপোতগুলি কৃত্রিম জল-যুদ্ধে পাঠাইবে। তৎপূর্ব্বে জাপানীরা আপনাদের বীর্য্যবত্তার পরিচয়স্বরূপ উত্তর চীনের কিয়দংশে বলপূর্ব্বক আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছে, তাহাদের সাহস ও বিক্রম অমিত। ফিলিপাইন ও আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী স্থানের জার্ম্মেনীর অপহৃত দ্বীপপুঞ্জগুলি বর্ত্তমানে জাপানের অধিকারে আছে। ইহারা আমেরিকা ও ফিলিপাইনের মধ্যে এক অভেদ্য প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে। সুতরাং জাপানের সীমানা অতিক্রম করিয়া তৎপরে আমেরিকাকে ফিলিপাইনে আসিতে হয় এবং হইবে; আমেরিকার পক্ষে এ-এক অনতিক্রমণীয় অসুবিধা।

প্রশান্ত মহাসাগরের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি যখন এইরূপ তখন আমেরিকা ফিলিপাইনের স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করিল। গত ১৪ই মে অধিবাসিগণের ভোটগণনা দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হইবে ধার্য্য করা হয়; কিন্তু সহসা ওরা মে "সাক্‌দালিষ্টা" নামক চরমপন্থী দল এক বিদ্রোহের সূত্রপাত করিলেন; তাঁহারা সেনেটের প্রেসিডেণ্ট ম্যানুয়েল কোয়েজন ও সুপরিচিত রাষ্ট্রনেতা সারজিয়ো অসমেনার সম্মিলিত দলের পরিচালিত গবর্ন্মেণ্ট ও পরিকল্পিত রাষ্ট্রবিধির বিরোধিতা করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছেন। এই বিদ্রোহে ৬০ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। তখন গভর্ণর-জেনারেল মার্ফি, সিনেটর কোয়েজন, সেনানায়ক মেজর জেনারেল পার্কার প্রমুখ ব্যক্তিগণ আমেরিকায় অবস্থান করিতেছিলেন। 'সাক্‌দালিষ্টা' দল অনেকটা কমিউনিষ্ট-মতবাদী; তাঁহারা পরিকল্পিত রাষ্ট্রবিধি-অনুযায়ী দশ বৎসর অপেক্ষা না করিয়া অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করিয়াছেন। ঘটনার সময়ে 'সাক্‌দালিষ্টা' দলপতি বেনিগ্‌নো র‍্যামস্‌ টোকিয়োতে ছিলেন এবং প্রভাবশালী জাপানীদের "নৈতিক সহানুভূতি" (moral support) অর্জ্জন করিতে ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্য অনেকে মনে করেন, এই বিদ্রোহের অন্তরালে জাপানের প্রভাব আছে; কিন্তু জাপান প্রকাশ্যভাবে তাহা অস্বীকার করিয়াছে। অনেকে ইচ্ছা করেন, অবিলম্বে বেনিগ্‌নো র‍্যামসকে জাপান হইতে বিতাড়িত করা হউক। অন্য দিকে সিনেটর কোয়েজন "ন্যাসিওন্যালিষ্টা" দলভুক্ত। তাঁহার বাসনা রাষ্ট্রবিধি প্রবর্ত্তিত হইলে অপর জননায়ক শাসন-পরিষদের 'স্পীকার' ম্যানুয়েল রক্সাস আমেরিকায় ফিলিপাইনের প্রতিনিধি হন। ইনি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। অনেকের ধারণা এই প্রস্তাবিত বিল কার্য্যকর হইলে দেশের শর্করা-শিল্প ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হইবে; ইহাও নাকি বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। যাহা হউক, বিদ্রোহের পূর্ব্বে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা এই রূপ ছিল।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগর ও চীন উপসাগরের মধ্যে অবস্থিত। ইহার ক্ষেত্রফল ১১৫,০২৬ বর্গ-মাইল। অ-খ্রীষ্টান অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে, কলিঙ্গ আপাইয়ায়ো, বণ্টক, ইফুগ্নায়ো ও মোরোগণ প্রসিদ্ধ। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তামাক, চিনি, নারিকেল, পান ও চাউল প্রধান।

রাষ্ট্র-নেতা ম্যানুয়েল কোয়েজন্; ইনিই প্রথম প্রেসিডেণ্ট হইবেন বলিয়া অনেকের ধারণা।

এই দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্ব-ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয় নাবিক ম্যাগেলীন কর্ত্তৃক এই দ্বীপ আবিষ্কৃত হওয়ার পর কিছুকাল গত হইলে ইহা স্পেনের সম্পূর্ণ শাসনে আসে। তদবধি এই অঞ্চলের অনেক অধিবাসী খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। ১৮৯৭ সালে স্পেনের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন হইয়া ফিলিপাইন গণতন্ত্র ঘোষণা করে। পর বৎসর যুক্তরাষ্ট্র স্পেনীয় নৌবাহিনী ধ্বংস করিয়া ম্যানিলা করায়ত্ত করে। কয়েক বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের ফলে জেনারেল স্মিথের নিকট ফিলিপাইন পরাজিত হয়। স্মিথ তাঁহার সৈন্যগণকে আদেশ দিয়াছিলেন, "আমি কাহাকেও বন্দী

কাগাইয়ান প্রদেশের অধিবাসী

করিতে চাই না, হত্যা করিতে চাই, পুড়াইয়া দিতে চাই"; এবং তাহারই ফলে স্ত্রী, পুরুষ ও বালক একত্রে ছয় লক্ষ ফিলিপিনো নিহত হয়; কিন্তু যথারীতি যুদ্ধে লোকক্ষয় হওয়া সত্বেও তৎকালীন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছিলেন, ইহা সহসা-প্রেরিত এক ঐশ্বরিক দান, ইহার জন্য আমেরিকার স্পৃহা ছিল না।*

* এই দ্বীপ আমেরিকার হস্তগত হইলে তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট উইলিয়াম ম্যাক্‌কিন্‌লে বলিয়াছিলেন, "The truth is I did not want the Philippines and when they came to us as a gift from the gods I did not know what to do with them···I walked the floor of the White House night after night···I went down on my knees and prayed Almighty God for light and guidance···And one night late it came to me···There was nothing left for us to do but to take them all and to educate the Filipinos, and uplift and civilize and Christianize them···"—News-Week, May, 1935.

১৮৯৯ সাল হইতে অর্থাৎ স্পেনের সহিত সন্ধি হওয়ার পর হইতে আমেরিকা ফিলিপাইনের স্বাধীনতার দাবি মানিয়া আসিতেছে; গত ১৯১৬ সালে ইহা অনুমোদন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসেও মতামত গৃহীত হয়।*

ফিলিপাইনের পার্ব্বত্য প্রদেশের কলিঙ্গ-বালিকা

কিন্তু ১৯২৯ সালে ইহা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়; যুক্ত-রাষ্ট্রের যে-সকল কৃষি-প্রতিষ্ঠান ফিলিপাইনের রপ্তানী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছিল না, তাঁহারা যাহাতে সেই রপ্তানী দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসে তাহার আয়োজন করেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় ১৯২৯ সালে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ যাহাতে ফিলিপাইন স্বাধীন হয় তাহার আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিলেন, কেননা এই দ্বীপ স্বাধীন হইলে তাঁহাদিগকে আর এই বিদেশীপণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিপাইনের পণ্যদ্রব্যের আমদানী একেবারেই তাঁহারা রহিত করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হুভার এই আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন; অবশেষে নানা বাগবিতণ্ডার পর ফিলিপাইনের ভবিষ্যৎ শাসন-বিধির একটি খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'হাউসে' "হেয়ার বিল" ও সেনেটে "হয়েস্-কাটিং" বিল উপস্থাপিত করা হইল। উভয়ত্রই 'হেয়ার-হয়েস্-কাটিং' বিল মানিয়া লওয়া হইল, অর্থাৎ ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দেওয়া হউক ইহা 'হাউস' ও 'সেনেটে' স্বীকৃত হইল; কিন্তু প্রেসিডেন্ট হুভার তাঁহার 'ভিটো' শক্তির সাহায্যে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহার দুই ঘণ্টার মধ্যে হাউসে প্রেসিডেন্টের এই আদেশ অমান্য করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল; চার দিন পরে সেনেটেও অনুরূপ ফল ফলিল; সুতরাং হুভারের

ধানের ক্ষেতে বণ্টক-কৃষক

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১৯৩৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি এই প্রস্তাবিত বিল কার্য্যকর করিবার অনুমতি হইল। তদনুসারে দশ বৎসর পরে ফিলিপাইনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে এবং বর্ত্তমানে ইহা কোন কোন বিষয়ে আমেরিকার

* "It has always been the purpose of the people of the United States to withdraw their sovereignty over the Philippine Islands and to recognize their independence as soon as stable government can be established therein."

অধীনে থাকিবে ইহা স্বীকৃত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইনকে আমেরিকার একটি নৌ-ঘাঁটিরূপে পরিগণিত করিবার পরিকল্পনাও ইহাতে ছিল। এই সব কারণে ফিলিপাইন শাসন-পরিষদ হেয়ার-হয়েস্-কাটিং বিল মানিয়া

ফিলিপাইনের পার্ব্বত্য প্রদেশের আপাইয়ায়ো জাতির নৃত্য

লইতে অস্বীকৃত হইলেন। সেনেটর কোয়েজন ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন।* ফিলিপাইনের শাসন-পরিষদও অনুরূপ অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।† সুতরাং কোয়েজন ও অন্যান্য নেতার অধীনে একটি বিশিষ্ট দল আন্দোলন চালাইবার জন্য আমেরিকায় প্রেরণ করিবার কথা স্বীকৃত হইল।

ফিলিপিনোগণ নানা কারণে এই বিলের বিরোধিতা করেন। প্রথম, ব্যবসাগত। আমেরিকা ইহাদের নিকট হইতে চিনি, শণ, ও নারিকেল তৈল বহুল পরিমাণে আমদানী করে; তাহা রক্ষার বিশেষ বিধিব্যবস্থা এই প্রস্তাবিত শাসন-বিধিতে নাই; এই দেশকে আমেরিকার নৌ-ঘাঁটি রূপে পরিগণিত করিবার ব্যবস্থাও এই বিলে আছে; অধিবাসীবৃন্দের তাহাতে ঘোরতর অসম্মতি হয়। ফিলিপাইনকে কোন প্রকার কর প্রবর্ত্তন না করিয়া আমেরিকার উৎপন্ন দ্রব্য আমদানী করিতে বাধ্য করার কথা ইহাতে আছে; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার বিষয়েও দেশবাসীর কিছু-না-কিছু আপত্তি ছিল; আমেরিকার কৃষককুলের হিতকামনার প্রতি মুখ্য দৃষ্টি রাখিয়া যে এই বিল রচিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণ একমত। ইহার ফলে আমেরিকার সহিত এই দেশের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ যে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিশেষে, আমেরিকা যে এখানে তাহার সৈন্য-সন্নিবেশ বা নৌঘাঁটি স্থাপন করিবে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিকর; কেন-না তাহাতে ফিলিপাইন যুদ্ধকালে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারিবে না, এবং যদি তাহাকে কখনও আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে সেই আন্তর্জ্জাতিক সন্ধিসূত্র ছিন্ন করিতে হইবে, (আমেরিকার সহিত প্রশান্ত মহাসাগরে কোনও শক্তির যুদ্ধ বাধিলে এই অবস্থার উদ্ভব হইবেই হইবে)। আবার জাপানের ভয়ে ফিলিপাইনকে এই শেষোক্ত আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি স্থাপন না করিলে কিছুতেই চলিবে না। এই মতের

স্বাধীনতা পাইলে ফিলিপিনোগণ প্রাচ্যের এই প্রকার সনাতন জীবন-যাপন-প্রথা গ্রহণ করিবে বলিয়া বিপক্ষ দল আশঙ্কা করেন

* "It is not an independence bill at all, it is a tariff bill directed against our products ; it is an immigration bill directed against our labour."—*Foreign Policy Report*, Jan. 1934.

† "That the Philippines Legislature in its own name and in that of the Filipino people inform the Congress of the United States that it declines to accept the said law in its present form".—9th Philippine Legislature, 3rd Session.

ভোটাধিকার প্রাপ্ত ফিলিপিনো মহিলাবৃন্দ স্বাধীনতার সপক্ষে ভোট দিতেছেন

দিলেও কোনও শত্রুর হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করা আমেরিকার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। ইহাতে আমেরিকার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা দেওয়ায় ফিলিপাইন কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আমেরিকার কোনও শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান না-ও করিতে পারে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

যাহা হউক, এই প্রস্তাবিত শাসনবিধি যুক্ত-রাষ্ট্রের শাসনবিধির অনুরূপে গঠিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্টের প্রতিনিধি-স্বরূপ এখানে এক জন হাই কমিশনার থাকিবেন, দশ বৎসরের জন্য যুক্ত-রাষ্ট্র এই দেশের পররাষ্ট্র-বিভাগ, অর্থ, উপনিবেশ, বৈদেশিক ব্যবসা এবং বৈদেশিক ঋণ প্রভৃতি বিভাগ পরিচালন করিবেন; আপাততঃ এখানে আমেরিকার নৌঘাঁটি থাকিবে। দশ বৎসর অন্তে ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জুলাই ফিলিপাইন পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে। তখন আমেরিকার সৈন্য এদেশে থাকিতে দেওয়া হইবে না।

ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা আজ চরিতার্থ হইয়াছে। ভোট গণনা দ্বারা ফিলিপিনোগণ আপনাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু অন্য দিকে মিস্ মেয়ো প্রমুখ প্রতিক্রিয়া-পন্থী দলও ফিলিপাইনের স্বাধীনতার বিপক্ষতা করিয়া আসিয়াছে। "বিভীষিকার দ্বীপ" (Isles of Fear) নামক গ্রন্থে মিস মেয়ো ফিলিপাইনকে কলঙ্কের কালিমায় রঞ্জিত করিয়াছে; সেনেটর টাইডিংস্-ও আক্ষেপ করিয়াছিলেন স্বাধীনতা পাইলে এই দেশ প্রাচ্যের জীবিকা-অর্জ্জনের সনাতন পন্থা অবলম্বন করিবে; তাঁহার মতে এ-ধরণের জীবন-যাপন যেন অতি জঘন্য। যাহা হউক, এই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া-পন্থীদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বার লক্ষ অধিবাসী স্বাধীনতার সপক্ষে এবং মাত্র চল্লিশ হাজার বিপক্ষে ভোট দিয়াছে। যে-সকল ফিলিপিনো মহিলা সম্প্রতি ভোটাধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারাও সপক্ষে ভোট দিয়াছেন।

সপক্ষে কেহ কেহ বলেন যে এখানে আমেরিকার ঘাঁটি থাকিলে জাপান কর্ত্তৃক ফিলিপাইন আক্রমণের ভয় থাকিবে না; কিন্তু তাহা সত্য নহে, কেন-না, জাপান ও আমেরিকায় যুদ্ধ বাধিলে জাপান ফিলিপাইনস্থ আমেরিকার সৈন্য-ঘাঁটি আক্রমণ করিবেই করিবে। কেহ বলেন, জাপানের সহিত যুদ্ধকালে নিরপেক্ষতার সন্ধি করিলে জাপান তাহা নিশ্চয়ই মানিয়া চলিবে; প্রতিপক্ষ বলেন, জাপানের নিকট এরূপ ব্যবহার আশা করা বৃথা, তাহা হইলে সে চীনের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, সুযোগ পাইলে এ-ক্ষেত্রেও তাহাই করিবে।

যাহা হউক, এই সব প্রতিবাদের বাণী বহন করিয়া যে-দল আমেরিকায় আসিয়াছিলেন তাঁহারা বিলের কোনও-না-কোন-অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন; তদনুযায়ী গত ১৪ই মে তারিখে অধিবাসিগণের মতামত সংগ্রহের নিমিত্ত ভোট গণনা করা হয়। এক কোটী তেত্রিশ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভোট দিয়াছেন। সুতরাং যুক্ত-রাষ্ট্র অবিসম্বাদে ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিবেন, না দিয়াও উপায় নাই; কেন-না আমেরিকা ও ফিলিপাইনের মধ্যে সমুদ্রপথে জাপান জার্ম্মানীর নিকট হইতে অপহৃত দ্বীপগুলি দিয়া এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে। ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা না

ফিলিপাইনের কৃষক শণ শুকাইতেছে

ফিলিপাইন স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলে পর পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবং বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী অমিততেজা জাপানের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া রাজনৈতিক মহলে এক চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে অসীম শক্তিশালী জাপানের সহিত সখ্যতা ও আন্তর্জাতিক সন্ধি-সম্বন্ধ স্থাপন করিলে ফিলিপাইনের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, ম্যানিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগের অধ্যাপক পিয়ো ডুরান্ তাঁহাদের অন্যতম। জাপানের রাজছত্রতলে মিত্ররূপে সম্মিলিত হইয়া দিগন্তপ্রসারী পূর্ব্ব-এশিয়ায় 'মনরো নীতি' অনুসরণের পরিকল্পনা ইনি হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন এবং সম্প্রতি "ফার্ ইষ্টার্ণ রিভিউ" নামক পূর্ব্ব-দিগন্তের সুবিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।* কে বলিবে ইহার ফলে আর একটি "ফিলিপিনোকুয়ো"র উদ্ভব হইবে না? যাহা হউক, এই পরিকল্পনা সফল করিবার পথে যথেষ্ট বিঘ্ন আছে। ইংরেজ-অধিকৃত ভারত-সাম্রাজ্য কি জাপানের এই মনরো-আবিষ্কৃত প্রীতি, প্রণয় ও প্রেমের বন্ধনে স্ব-ইচ্ছায় বিজড়িত হইতে চাহিবে? কেন-না কোবে মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে ডক্টর সুন-ইয়াৎ-সেন বলিয়াছিলেন, "We ought to study pan-Asia-

* "It is the conduct of and the contact with our neighbors of the Orient that will ultimately be the decisive factor in shaping the future national policies of the Philippine Islands,...her national life will be irresistibly linked with theirs and that with them the Philippines will rise or fall in the impending conflict of the Pacific Ocean. The time is now ripe for us to join hands with them in the formulation of a Monroe Doctrine for the Orient. To adopt another course... would justify the charge of our being traitors to the high cause of the colored races in the East."—Feb. 1935.

পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসানে এশিয়ায় এই জাপানী মনরো-নীতির প্রথম সমর্থন করেন। জাপানের ভাইকাউণ্ট কানেকোর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন যে আমেরিকার এই মনরো-নীতির প্রবর্ত্তন-না-থাকিলে দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা আজ অব্যাহত থাকিত না। তিনি বলিয়াছিলেন—"If Japan will proclaim such an Asiatic Monroe Doctrine, after the Peace of Portsmouth, I will support her with all my power." এই আন্দোলন বর্ত্তমানে যথেষ্ট বলবতী হইয়াছে এবং এমন-কি সুদূর ভারতবর্ষেও ইহার সমর্থক সেতুবন্ধের অভাব নাই।

প্যাগসঞ্জন নদীতে নারিকেলের বোঝা

nism in order to solve the problem of how the oppressed Asiatic nations can be enabled to oppose the strength of Europe." এই কারণে ভারত-কর্তৃপক্ষের এ-বিষয়ে অসম্মতি থাকিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট যে-যে দেশে জাপানের অধিনায়কত্বে মনরো-নীতির অনুসরণ করা হইবে, তাহাদের মধ্য হইতে ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ-গুলি বাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যেন সমগ্র এশিয়ায় এমন কি সুয়েজ যোজকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা বলবতী হয়। যাহা হউক, এই আশার তুলনায় বহু দূরাবস্থিত মাউণ্ট ফুজির উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে কোন তীক্ষ্ণ লোলুপ দৃষ্টি কি তুষারধবল হিমালয়ের পদচুম্বিত বিস্তীর্ণ শ্যামল ভূখণ্ডের উপর সাধারণের অলক্ষ্যে নিপতিত রহিয়াছে না?

ভারতবর্ষ

স্বর্গীয় ডাক্তার ঈশানতোষ মিত্র—

দিল্লীর স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ঈশানতোষ মিত্র মহাশয় গত ৭ই আষাঢ় পরলোক গমন করিয়াছেন। চিকিৎসায় তাঁহার খুব সুনাম ছিল। সে হিসাবে দিল্লীর বিখ্যাত ডাক্তার আন্সারী মহোদয়ের পরই তাঁহার নাম করা যাইতে পারে। কঠিন রোগে তাঁহার চিকিৎসাধীন থাকিতে পাইলে লোকে তৃপ্তি পাইত ও নিশ্চিন্ত হইত। তিনি খুব স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক ছিলেন। ১৯১২ সাল হইতে দিল্লীতে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি রাজপুতানার বিভিন্ন প্রদেশে (জয়পুর, ইন্দোর, বেওয়ার, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে) প্রায় পনের বৎসর কাল সরকারী চাকরিতে থাকিয়া সে-সব অঞ্চলে বহু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। বিচক্ষণ চিকিৎসক বলিয়া রাজপুতানা অঞ্চলে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় ডাক্তার ঈশানতোষ মিত্র

তিনি বঙ্গজননীর ক্রোড়ে লালিত-পালিত হন নাই। সুদূর লাহোর অঞ্চলে তাঁহার জন্ম ও শিক্ষালাভ হয়। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন না। অধিকন্তু, বাল্যেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। কেবল মাত্র নিজের অধ্যবসায়বলে তিনি জীবনে সাফল্যলাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বোপার্জ্জিত প্রভূত ধন-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি শুধু যে প্রবাসী বাঙালীদের গৌরব-স্থানীয় ছিলেন তাহা নয়, তাঁহার মত দৃঢ়চেতা ও স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ এখনকার দিনে দুর্ল্লভ। তাঁহার কর্ম্মের আদর্শ প্রবাসী বাঙালীদের অনুকরণীয়। হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-অবাঙালী সকলকেই তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন। স্থানীয় জন-হিতকর সকল কাজের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। দিল্লীর বহু পুরাতন বাঙালী বালকবিদ্যালয়ের (Bengali Boys' High School) এর তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক, পরিচালক ও হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙালীদের বিশেষ ক্ষতি হইল এবং দিল্লীর জনসাধারণ একজন প্রকৃত সুচিকিৎসক হারাইলেন।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

—

বিদেশ

আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মিলন—

সম্প্রতি স্পেনদেশে আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাড্রিড, সালামাঙ্কা, সেভিল ও বার্সিলোনা শহরে মোট বার দিন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। কংগ্রেসে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তেত্রিশটি দেশের পাঁচ শত জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ষাট জন বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী প্রতিনিধি ছিলেন। এই অধিবেশনে গ্রন্থাগারের উন্নতি-বিষয়ক নানা বিষয়ে আলোচনা হয় এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। ভারতের প্রতিনিধিরূপে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেন। প্রথম দিনই তাঁহাকে ভারতের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হয়। তাঁহার অভিভাষণ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার অভিভাষণের পর ভারত গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। মাড্রিড রাজপ্রাসাদে, স্পেনদেশের সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট, পররাষ্ট্র সচিব এবং যে যে শহরে অধিবেশন হইয়াছিল সেখানকার মেয়র, প্রাদেশিক গবর্ণর, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ন্যাশনাল বিবলিওথেকা সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমার মুনীন্দ্র দেব কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে বিলাত গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ম, বোডলিয়ান, অক্সফোর্ড, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ও গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন। কংগ্রেসের পর তিনি ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মিলনের প্রতিনিধিবৃন্দ

শিশুদের আমোদ-বিধানকল্পে রাষ্ট্র-সংঘের প্রচেষ্টা—

অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও সিনেমার প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিদিন সিনেমার গৃহে যে-সমস্ত অভিনয় হইয়া থাকে তাহার দর্শকদের মধ্যে অল্প বয়স্কের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। অন্যান্য শহরের কথা ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র কলিকাতাতেই প্রায় ত্রিশটির বেশী সিনেমা গৃহ আছে। গড়পড়তা হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, প্রতি সিনেমা গৃহেই প্রায় হাজারের বেশী সংখ্যক আসন আছে। রাত্রি সাড়ে ন'টার অভিনয় বাদ দিয়া অন্যান্য অভিনয়ে যে পরিমাণ দর্শক হয় তাহার ঐভাগ দর্শক অপরিণতবয়স্ক। সুতরাং সিনেমা এখানেও শিশুমনের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রচুর সুযোগ পাইতেছে। বর্ত্তমানে সমস্ত দেশেই সিনেমা-সম্পর্কে শিশুদের লইয়া বিশেষ সমস্যা জাগিয়াছে। ভারতবর্ষেও সময় আসিয়াছে যখন এই আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের শিশুমঙ্গল সমিতির অধিবেশনে এই সমস্যার বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে এবং একটি কৌতূহলজনক বিবৃতিও প্রকাশিত হইয়াছে।

গত বৎসর অধিবেশনে শিশুমঙ্গল সমিতি স্থির করেন যে, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শিশুদের আমোদ-বিধানের জন্য সিনেমার প্রচলন-সমস্যা আলোচনা করিবেন এবং সেই মর্ম্মে শিশুমঙ্গল সমিতির সমস্ত দেশ-গুলিকে এই বিষয়ে খবরাখবর দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিভিন্ন দেশ হইতে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা ভিত্তি করিয়াই উল্লিখিত বিবৃতি রচিত হইয়াছে।

চিত্রদর্শনোপযোগী বয়স

কতকগুলি দেশে (আমেরিকা, ভারতবর্ষ, জাপান ইত্যাদি) বয়সের তারতম্যের হিসাবে সিনেমা দেখার অনুমতি লইবার কোনই আইন নাই; আবার কতকগুলি দেশে সিনেমা দেখা সম্বন্ধে বয়সের সীমা স্থির করা আছে—বেলজিয়মে ১৫ বৎসর বয়সের কম দর্শকদের সিনেমা দেখা নিষেধ; তুর্কীতে ১২ বৎসরের কম বয়সের বালক-বালিকারা সিনেমা গৃহে যাইতে পায় না। যুক্তরাজ্যে নিয়ম, যে-সমস্ত ছবি বোর্ড অব্ সেন্সর সার্ব্বজনীন ভাবে দর্শনীয় না বলেন সে সকল ছবিতে ১৬ বৎসরের কম বালক-বালিকারা পিতামাতার সঙ্গে ব্যতীত যাইতে পায় না। শিশুমঙ্গল সমিতির মতে এই নিয়মগুলির কোনটাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। কেন-না এর ফলে, হয়ত যে-সমস্ত ছবি শিশুদের দেখা উচিত নয় তাহা তাহারা দেখে এবং যে ছবিগুলি বিশেষ করিয়া তাহাদের দেখা উচিত তাহা তাহারা দেখে না। মা-বাপের উপরও এই কর্ত্তব্য একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন নয়, তাহার কারণ ছবির ভাল মন্দের খবর সকল সময়ে ঠিকমত তাহাদের কাছে পৌঁছায় না এবং অনেক স্থলে পাছে শিশুরা তাহাদের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া গৃহে দুষ্টামী করে, সেই ভয়ে সিনেমাতেও শিশুদের সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়।

শিশু-দর্শকের সংখ্যা

কোন কোন দেশে শিশু-দর্শকের সংখ্যা কম, তেমনই আবার কোন কোন দেশে শিশু-দর্শকের সংখ্যা এত বেশী যে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তাহারা সিনেমায় যাইবেই। জাপানে ১২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, শতকরা ৩৯ বালক এবং শতকরা ৩১ বালিকারা সিনেমা দেখার অভ্যাস করিয়াছে। লণ্ডনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৯,০০০ শিশুর মধ্যে শতকরা ৭৭ জন সিনেমা দেখিতে অভ্যস্ত এবং শতকরা ৩০টি শিশু সপ্তাহে একবার সিনেমা দেখে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১১,০০০,০০০ শিশু সিনেমা দেখে।

শিশুমনের উপর সিনেমার প্রভাব

বিভিন্ন দেশ হইতে যে সমাচার পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে শিশু-মনের উপর সিনেমার প্রভাব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে, দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন বিদ্যালয়ের শিশুদের লইয়া এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান হয়, তাহাতে প্রকাশ—

(১) নীতিবিরুদ্ধ ছবিগুলি শিশুরা প্রায়ই বুঝে না, বরং তাহাদের বিরক্তি উদ্রেক করে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে দুই-একটি শিশুর অনিষ্ট করিলেও বেশীর ভাগ সময়েই এই ছবিগুলির দ্বারা শিশুদের অপকার হয় না; (২) সিনেমাতে যাহা দেখে শিশুরা খেলাতে তাহার অনুকরণ করে বটে, কিন্তু সিনেমার এই প্রভাব শুধু খেলাতেই নিবদ্ধ থাকে; এবং সময়ের সঙ্গে ক্রমশঃ তাহা ভুলিয়া যায়; (৩) ঠিকমত উদ্দীপনা পাইলে, শিশুরা মনের কোণে সিনেমার জ্ঞান রাখিয়া দেয় ও তাহা বিদ্যালয়ের পাঠের মত ব্যবহার করিতে পারে; (৪) সিনেমার একটি খারাপ প্রভাব কিন্তু শিশুমনের উপর সব সময়েই লক্ষিত হয়। প্রায়ই শিশুরা সিনেমা দেখিয়া ভয় পাইয়া থাকে এবং সেই ভয় হইতে স্বপ্ন দেখে; (৫) কোন জিনিষের সঠিক অবগতি দিবার জন্য, কিংবা শিশুদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিবার জন্য কার্য্যকরী যন্ত্র হিসাবে সিনেমা ব্যবহৃত হইবার যোগ্য।

বেলজিয়াম, ইতালী এবং রোমানিয়ার প্রতিনিধি কিন্তু (১) এবং (২) সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে বেলজিয়াম-প্রতিনিধি বলিয়াছেন, তাঁহার দেশে যে সমস্ত অপরাধী শিশুদের আদালতে বিচারের জন্য আনা হয় তাহাদিগের অপরাধের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, যে প্রায়ই ঐ সমস্ত অপরাধের মূল কারণ সিনেমার ছবি দেখার ফল।*

শিশুদের জন্য বিশেষ অভিনয়ের বন্দোবস্ত

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, রুমানিয়া ইত্যাদি কতকগুলি দেশের বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে যে, শিশুদের জন্য বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন মাঝে মাঝে করা হইয়া থাকে, কিন্তু এ বিষয়ে গুরুতর এবং একটানা ভাবে কিছুই বন্দোবস্ত নাই। আর্থিক অসঙ্গতিই ইহার আসল বাধা। শনিবারের দুপুর বেলা 'ম্যাটিনী'র বন্দোবস্ত প্রায় সমস্ত শহরেই আছে কিন্তু সেগুলিতে শিশুদের উপযোগী ছবির একান্ত অভাব, সুতরাং সুফল লাভ সুদূরপরাহত।

কি ধরণের ছবি শিশুরা ভালবাসে

সাধারণতঃ সমস্ত দেশেই দেখা যায় যে, বালকেরা দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ ও বালিকারা রূপকথার ছবি দেখিতে ভালবাসে। যাহা হউক, এ বিষয়ে এখনও কোনরূপ সন্তোষজনক গবেষণা হয় নাই।

শিশুদের উপযোগী ছবি প্রচলনের ব্যবস্থা

এ পর্য্যন্ত কোন দেশেই শিশুদের উপযোগী ছবির ব্যবস্থা করা হয় নাই। কোন কোন দেশে শিশু সাহিত্য বা পরীর গল্প হইতে ছবির বিষয় লওয়া হইলেও তাহা এমন ভাবে তৈয়ারী হয় যে, শিশুদের অপেক্ষা তাহা তাহাদের জনক-জননীরই বেশী ভাল লাগে। এই বিষয়ে শিশুমঙ্গল সমিতির সদস্যেরা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—আজকাল সিনেমার ঝোঁক হইয়াছে শিশুদের উপেক্ষা করিয়া বয়স্কের আনন্দ বিধান করা। এর ফলে, শিশুরা সিনেমার আসল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সিনেমার দ্বারা যাহাতে পারিবারিক আনন্দ-বিধানের সুবিধা হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। সেই হেতু সমস্ত পরিবারের পক্ষে এক সঙ্গে দেখিবার যোগ্য ছবির আয়োজন করা সমীচীন।

শিশুদের শিক্ষণীয় ছবির ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা গেলেও যাহাতে শিশুরা আমোদ উপভোগ করে এরূপ ছবি তৈয়ারীর কাজ উপেক্ষিতই হইতেছে। শিশুমনকে আনন্দ দেয়, বর্ত্তমানে এরূপ ছবির সত্যই একান্ত অভাব। আর্থিক সমস্যাই ইহার কারণ। বর্ত্তমানে চিত্র তৈয়ারীর খরচ প্রচুর সুতরাং খরচের জন্য দর্শনীর মূল্যও বেশী করিতে হয় অথচ বেশী দর্শনী দিয়া ছবি দেখা শিশুদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কম খরচে শিশুদের উপযোগী ছবি তৈয়ারী করিতে হইবে। ইহাতে শিশু-দর্শকের সংখ্যা বাড়িবে সন্দেহ নাই, কেননা সরল ভাবে সরল গল্পে বিবৃতি শিশুরা যে-কোন ভূষিত চিত্রের চেয়ে বেশী পছন্দ করে।

আধুনিক যুগে শিশুদের জন্য বিশেষ চিত্রের প্রচলন করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দর্শনীর মূল্য কম করিতে হয় বলিয়া অবশ্য শিশুদের জন্য বিশেষ চিত্রের অভিনয় গোড়া হইতেই অর্থের দিক দিয়া বিশেষ সাফল্যলাভ নাও করিতে পারে তথাপি ইহা সত্য যে, চাহিদা ক্রমশঃই বাড়িবে। কোন কোন দেশে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও চিত্র-ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় এরূপ অভিনয় অর্থের দিক হইতে সাফল্য করিয়াছে। শিশুদের উপযোগী চিত্রাভিনয়ের অনুষ্ঠানে এইরূপ সহযোগিতাই চিত্র-প্রদর্শকগণের আর্থিক সাফল্য লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

শিশুমঙ্গল সমিতির মতে, শিশুদের আমোদ-বিধানের জন্য সিনেমার প্রচলন সম্বন্ধে আলোচনার আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কেননা সমস্ত দেশের শিশুদের মানসিক হিতসাধনের সমস্যা ইহাতে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সমিতি স্থির করিয়াছেন যে ভবিষ্যৎ অধিবেশনেও এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে আলোচনা হইবে।

সম্প্রতি মাদ্রাজের 'গার্ডিয়ান' নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে যাহাতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে শিশুদের উপযোগী শিক্ষণীয় সিনেমা দেখান হয় তাহার জন্য "মোশান পিক্‌চার সোসাইটী অব ইণ্ডিয়া"র প্রতিনিধিবর্গ বোম্বাইয়ের শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর

---

* ভারতে বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক রীতি প্রচলিত থাকায় এখানে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের এইরূপ নীতিবিরুদ্ধ সিনেমা-চিত্র দেখায় অনেক ক্ষতি হইতে পারে; সুতরাং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের বালক-বালিকাদের যেখানে নীতি দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, সেইস্থলে ভারতে তাহার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। অতএব তাহাদিগকে এইরূপ ছবি দেখাইবার পূর্ব্বে অভিভাবকগণের সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত—প্রবাসীর সম্পাদক।

এস. টি. কম্বলীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সোসাইটীর কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া তাঁহারা অবশেষে প্রস্তাব করেন—

(১) বর্ত্তমানে এই প্রাদেশিক সরকারের অধীনে চিত্রাদি দ্বারা নানা দ্রব্য দেখাইয়া যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে (visual education) শিশুগণের উপযোগী সিনেমা তাহার অঙ্গীভূত হওয়া উচিত।

(২) শিক্ষণীয় সিনেমা প্রস্তুতির জন্ম সরকারের সাহায্য দেওয়া উচিত।

(৩) যে-সব থিয়েটার কোম্পানী শিক্ষণীয় সিনেমা দেখায় তাহাদিগকে শুধু এই কারণে আমোদ-কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

(৪) "বোর্ড অব ফিল্‌ম সেন্সরে" ভারতীয় মোশান পিকচার সোসাইটীর প্রতিনিধি থাকিবে।

(৫) "বোর্ড অব ফিল্‌ম সেন্সর"-এর শিক্ষণীয় সিনেমার চিত্রাবলী পরীক্ষা করিবার জন্ম কোনোরূপ "ফি" লওয়া উচিত নয়।

(৬) ভারতীয় মোশান পিকচার সোসাইটী শিক্ষকগণকে এ-বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্ম গবন্মেণ্টের সহিত একযোগে সহযোগিতা করিতে রাজী আছেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেরও বোম্বাইয়ের এই প্রণালীর অনুকরণ করা উচিত।

সম্প্রতি চীনও নির্দ্দোষ ছবি দেখাইবার আয়োজন করিয়াছে। গত ১৯৩২ সালে বিশিষ্ট চীনা বৈজ্ঞানিক ও চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ন্যাশনাল ফিল্‌ম সোসাইটি ফর এডুকেশন" নামক প্রতিষ্ঠানটি বর্ত্তমানে চীনের সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্ম মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিদেশাগত চিত্রগুলিকে দোষমুক্ত (censor) করিয়া সিনেমা প্রদর্শনের মধ্য দিয়া চীনের জাতীয় জীবন গঠন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সোসাইটি ফিল্‌ম-প্রস্তুতকারকগণের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা "ইণ্টারন্যাশন্যাল রিভিউ অব এডুকেশন্যাল পিকচারস" নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে তাঁহারা চুরি ও ব্যভিচার প্রভৃতির যে ছবি তোলা হয় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন, তাঁহাদের মতে ইহা চীনাদের সমূহ ক্ষতি করিবে এবং বর্ত্তমানে করিতেছে।

এই সোসাইটী বলেন যে, এরূপ দুর্নীতিপরায়ণ চিত্র দেশ হইতে দূরীভূত করা হউক। তাঁহাদের ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। ভারতেরও এই পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

বাংলা

বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সভা

গত বৈশাখ মাসে মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন হয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতিত্ব করিতে আমন্ত্রিত হন। সেই অধিবেশনে অনেক সদস্য বীরসিংহ গ্রামে গিয়া পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিপূজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পল্লীগ্রামের এমনই অবস্থা যে বহু আয়োজন না করিয়া হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইলে সকলের বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বীরসিংহ যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। ইতিমধ্যে ঘাটাল মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ সাহা মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রূপে বীরসিংহে অতিথি-সমাগমের অতি উত্তম ব্যবস্থা করেন। মেদিনীপুর সদর হইতে লরী-যোগে প্রায় চুয়ান্ন মাইল পার হইয়া বীরসিংহ পৌঁছান যায়। চন্দ্রকোণা পর্য্যন্ত রাস্তা মন্দ নয়, তার পর বেশ খারাপ। পথে একটি লরী খারাপ হওয়ায় যাত্রীদল প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আসেন। অন্য তিনটি লরী ও সভাপতি ডাঃ কালিদাস নাগকে লইয়া শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস্, যথাসময়ে বীরসিংহে উপস্থিত হন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সাহা মহাশয় তাঁহাদের সাদরে সভাস্থলে লইয়া যান। বিদ্যাসাগর-স্মৃতিস্তম্ভে প্রথমে অর্ঘ্যদান, তার পর তাঁর বাস্তুভিটা প্রদক্ষিণ ও পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ বয়সের ভৃত্যটি এখনও বর্ত্তমান, তার সাহায্যে অনেক জিনিষ দেখা গেল। যে গোয়াল-ঘরের পাশে বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূমিষ্ঠ হন
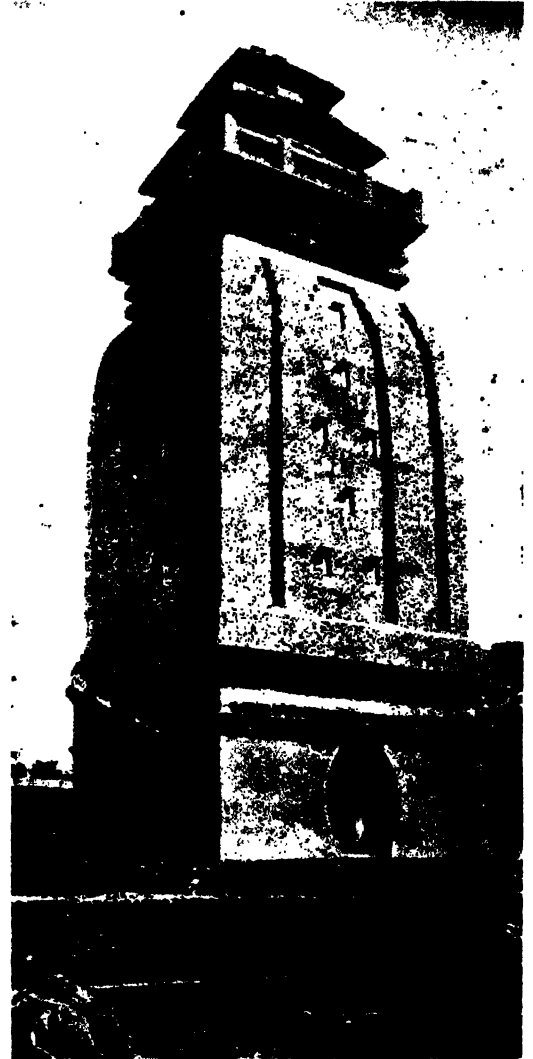
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি-মন্দির

দেশবন্ধু-স্মৃতি-দিবসে তাঁহার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য-দান উৎসব
বাম দিক হইতে -স্যর নীলরতন সরকার (সভাপতি), শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু
ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়
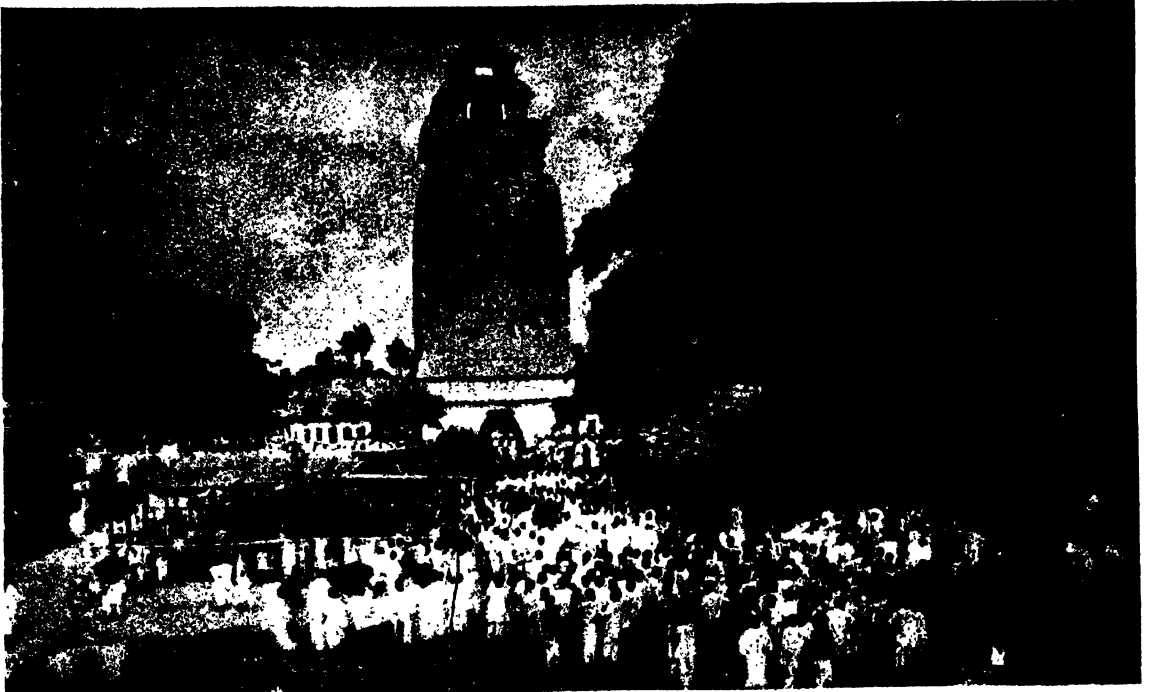
দেশবন্ধু-স্মৃতি-মন্দিরের উৎসর্গ-সভা

বাঁকুড়ায় পিপলস ব্যাঙ্কের দ্বার-উন্মোচন উৎসব। মধ্যস্থলে উপবিষ্ট সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সেই চালাটির এবং আসল পৈত্রিক কুটীরের অবস্থা শোচনীয়। তাঁহার জননী ভগবতী দেবীর কুটীর ও পুত্র নারায়ণচন্দ্রের ভিটা বাগান ইত্যাদি এখনও দেখা যায়, কিন্তু সংস্কার ও সংরক্ষণের চেষ্টা না করিলে শীঘ্র এ সব স্মৃতিচিহ্ন লোপ পাইবে। যে দ্বিতল চালাটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় পল্লী-গ্রন্থাগার করিয়াছিলেন, সেখানে আসিয়া সকলেই পরম তৃপ্তি লাভ করেন। গ্রামের প্রতিকূল পক্ষের কাছে নানা নিগ্রহ ভোগ করা সত্ত্বেও উদারপ্রাণ বিদ্যাসাগর মুমূর্ষু গ্রামে প্রাণসঞ্চার করিতে কি চেষ্টাই না করিয়াছেন! কিন্তু আজ তাঁহার জন্মভূমির অবস্থা দেখিয়া অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। ম্যালেরিয়া মহামারীতে এ অঞ্চল উজাড় হইয়াছে। পথে আসিতে দেখা যায়, বড় বড় ইঁটের বাড়ি কঙ্কালের মত পড়িয়া আছে। একমাত্র আনন্দের নিদর্শন পুণ্যব্রত বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবীর নামে উচ্চ-বিদ্যালয়টি, যেখানে আমরা আশ্রয় পাইয়াছিলাম এবং যে-স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ তাঁহাদের উদার আতিথ্যে ও সেবায় আমাদের মুগ্ধ ও কৃতার্থ করিয়াছেন। বর্ষায় এই গ্রাম প্রায় পথবিহীন কর্দ্দমসাগরে পরিণত হয়; তাই তীর্থযাত্রীদের জন্য গাড়ী পাল্কী ইত্যাদি কত যান-বাহনের আয়োজন ও স্নান ভোজনের অতি পরিপাটি ব্যবস্থা ইঁহারা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে স্কুলের মধ্যেই একটি ভাল নলকূপ আছে বলিয়া ভরসা করিয়া সকলেই জল খাইতেছিলেন। এ বৎসর রজত-জুবিলী-ফণ্ড হইতে ২০০০৲ টাকা ভগবতী দেবী স্মৃতি বিদ্যালয়ে দান করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। গ্রামবৃদ্ধের মুখে শোনা গেল, এই গ্রামের একটি শিশু-কন্যা বিধবা হইবার পর তার শোচনীয় অবস্থায় আকুল হইয়া বিদ্যাসাগরের মহীয়সী জননী উপযুক্ত পুত্রকে চিরবৈধব্যরূপ অমানুষিক কুপ্রথা দূর করিয়া বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন। বাংলার তথা ভারতের সামাজিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় মহা সংগ্রাম বীরসিংহের বীরশিশু একা আরম্ভ করেন এবং ১৮৫৬ সালে মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে বিধবা-বিবাহ-সমর্থক বিল পাস করান। আজ সারা দেশ ও হিন্দুমহাসভা এই উদার নীতির সমর্থন করিয়া এবং অবলাদের রক্ষণ ও নারীশিক্ষার নব নব আয়োজন করিয়া ভবিষ্যদ্দর্শী ঋষি বিদ্যাসাগরেরই পদানুসরণ করিতেছে। সভাপতির অভিভাষণে অধ্যাপক কালিদাস নাগ এই কথাই সকলকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করান এবং বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। এইখানে আমাদের মস্ত ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিদ্যাসাগর-ভবন আমরা রক্ষা করিতে পারি নাই, এবং তাঁহার জন্মগ্রাম বীরসিংহেও উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আমরা করি নাই। অথচ এই দরিদ্র পল্লীর উদার সন্তান বিদ্যাসাগর গর্ব্বিত নগরী কলিকাতার জনসাধারণের জন্য শিক্ষা অন্নবস্ত্রের 'দান-সাগর' করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর কলেজ আজও তাঁহার ঔদার্য্যের প্রতীক হইয়া আছে। অথচ এই নগরীতে ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র কত দিন অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে কাটাইয়া কি কষ্টে লেখাপড়া

হাফলঙে নাগাদের মধ্যে চা-পান প্রচার প্রচেষ্টা

নাগাদের মধ্যে চা-পান প্রচার সভা

করিয়াছেন! তাঁহার মহৎ প্রাণের উপযুক্ত প্রতিদান বিদ্যাসাগর দিয়া গিয়াছেন তাঁহার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া। তাঁহার কাছে এই উদারতার নূতন দীক্ষা লইয়া গর্ব্বিত নগরী পল্লীর সেবায় যদি নামে তবেই এ-দেশের কল্যাণ হইবে, এই জাতি আবার উঠিবে। সর্ব্বোপরি মাতৃ-জাতির সেবার আদর্শ ও প্রেরণা বিদ্যাসাগরের কাছে নূতন করিয়া আমাদের লইতে হইবে, ইহা স্মরণ করাইয়া অধ্যাপক নাগ একটি কবিতায় স্মৃতিতর্পণ শেষ করেন। এই তীর্থযাত্রা সার্থক করিবার জন্ত তিনি বিশেষ ভাবে মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং বাংলা ভাষার সেবক কবি সুধাংশুকুমার হালদার ও তৎপত্নী সুলেখিকা শ্রীমতী ইলা দেবীকে (ইনি ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী) তাঁহাদের স্নিগ্ধ আতিথ্যের জন্ত ব্যক্তিগত ভাবে ধন্তবাদ দেন। সুধাংশু বাবু গ্রামবাসীদের সহিত মিশিয়া তাঁহার অমায়িকতায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এবং দিগিন্দ্রবাবু শেষপর্য্যন্ত তাঁহার সৌজন্ত ও সহৃদয়তায় সকলকে আপ্যায়িত করেন!

শ্রী—

চা-পান প্রচার প্রচেষ্টা—

চা মানুষের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়, উচ্চ-নীচ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই এখন তাহা উপলব্ধি করিতেছেন। এমন কি, সুদূর পল্লীবাসী নিরক্ষর সাদাসিধে কৃষকও আজ চায়ের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছে। কারণ, চা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বিশুদ্ধতর এবং দামে অধিকতর সস্তা পানীয় দুর্লভ। এক পয়সায় পাঁচ পেয়ালা পর্য্যন্ত চা পাওয়া যায়। ইহা আবার পুরা স্বদেশী জিনিস।

দৃষ্টি

(ব্রাউনিঙের Christina হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

উচিত ছিল না তার সে চাহনি হানা মোর 'পরে,
না ছিল যাচনা যদি প্রাণে তার মোর প্রেম তরে!
পুরুষ (বলিতে চাও বল) কত আছে ত এমন,
সে যদি তাদের কাছে পরাণের সর্ব্ব-আবরণ
ঘুচাইত, ক্ষতিবৃদ্ধি তাহাদের হ'ত নাক তায়;
সে ফেরুপালের সনে গণে নাই জানি সে আমায়।
চৌদিকে ফিরায়ে আঁখি বাছিয়া নিল সে মোরে সবে,
অবাধে আঁখির ফাঁদে বাঁধিল সে আমারে নীরবে!

কি বলছি? শুধু অকারণে মোরে বিঁধিল কেবল
দিঠি তার? কি কহিব, নাহি মোর ভাষার সম্বল,
পারিব না বাখানিতে বক্ষে মোর হানিল কি বাণী
নয়ন-অশনি তার, ক্ষণপ্রভা, এই শুধু জানি,
— নয় তাহা বাঁধা-বুলি, সিন্ধু যথা শূন্য সিকতায়
ঝিনুকের কুচিগুলি অবহেলে ছড়াইয়া যায়;
সে দান নহে ত কভু প্রেমোচ্ছল আত্মনিবেদন,
সাগর চাহে না কিছু, তাই এ বদান্য বিতরণ।

কি দুর্গতি আমাদের সে কথা জানেন অন্তর্য্যামী!
তবু অধঃপাতে মোরা একেবারে যাই নাই নামি।
আসে শুভ ক্ষণগুলি, হোক্ তারা যতই বিরল,
তবু নিরুদ্দেশ নয়, কল্যাণকিরণে ঝলমল
অন্তরের গুপ্তধন ব্যক্ত করে। ধরা পড়ে চোখে
জীবনের সত্য মিথ্যা পাশাপাশি তাদের আলোকে।
ছুটিতেছি কোন্ পথে অভ্রান্ত নির্দ্দেশে দেয় বলি,
—জয়শ্রীর বক্ষে, কিম্বা আপনার ধ্বংসমুখে চলি'।

গভীর নিশীথ রাত্রে ফোটে হেন দামিনী স্ফুরণ,
কিম্বা দিবা দ্বিপ্রহরে ওঠে জলি রুদ্র হুতাশন,
সে অনলে পুঞ্জীভূত যশোমান ভস্ম হ'য়ে যায়,
স্ফীতবক্ষ ঔদ্ধত্যের উচ্চশির ধূলায় লুটায়।
তারি মাঝে হয়ত বা অন্তরের ক্ষীণ ফল্গুধারা
শুধু বারেকের তরে যেমনি হয়েছে বন্ধহারা,
অমনি সে জীবনের স্পন্দহীন বালুকা-বিথারে
মৃতসঞ্জীবনীধারা ঢালি তারে চায় বাঁচাবারে।

সংশয় কর কি তুমি, যে মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে সে মোরে
বেঁধেছিল একটি মাত্র কটাক্ষের সুনিবিড় ডোরে,
অনুভব করেনি সে,—জনমে জনমে আত্মা তার
ধায় অভিসার-পথে, ইহলোকে থামিয়া আবার
ছুটিবে সে অন্তহীন সরণিতে? শুধু এ ধরায়
থামিল সে, প্রেমপথে বাঞ্ছিতের দেখা যদি পায়;
একমাত্র সত্যকার দোসরের সনে পরিচয়
লভে যদি, হবে না কি পরাণে পরাণে বিনিময়?

তা যদি না হয় তবে জানি তার জনম বিফলে,
হারাবে সে নিত্যকাল যাহা সে হারাল এক পলে।
হয়ত রয়েছে সুখ ভাগ্যে তার—সুখ বল যদি
এ ধরার প্রতিপত্তি,—তবু সে হারাবে নিরবধি
শ্রেষ্ঠ ধন, সেই প্রেম, যার লাগি আসা অবনীতে।
সংশয় কি হয় তব, অনুভবে পারে নি জানিতে,
—যে নিমেষে চাহিল সে মোর পানে, অমনি দু-জনে
ছুটি নি কি আঁখিপথে দোঁহারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে?

সত্য বটে, পরক্ষণে পার্থিব প্রতিষ্ঠা অহঙ্কার
চিরতরে নিল মুছি সেই আলো নয়নে তাহার।
বুদ্ধিভ্রংশ হয় যা'তে শয়তান সে বিধান করে,
নতুবা যে এ ধরণী স্বর্গ হ'ত আমাদের তরে,
ভ্রমিতাম দু-জনায় আনন্দের নন্দন-বিপিনে!
যে জন মঙ্গলবিধি বিধাতার নিতে পারে চিনে
তার অকল্যাণ তরে দুষমন্ সতত উদ্যত,
আক্রোশের যোগ্য পাত্র বুঝি আর নাই তার মত!

জানি সেই বিধিলিপি লিখিলেন যাহা অন্তর্য্যামী,
—সে আমারে হারায়েছে, তাহারে পেয়েছি তবু আমি।
তার প্রাণ মিশে গেছে প্রাণে মোর, পূর্ণ আমি তাই,
পরিপূর্ণ এ জীবনে কোনো খেদ কোনো দৈন্য নাই।
বাকী দিনগুলি শুধু প্রমাণ করিবে—দু-জনার
কত শক্তি স্বাতন্ত্র্যে ও সম্মিলনে। যবে এ-ধরার
কোনো প্রয়োজন আর রহিবে না, লঘু পক্ষ ভারে
যাবে চলি চক্রবাক্ পরপারে প্রফুল্ল অন্তরে।

পারিভাষিক শব্দের বানান

[বাংলা পরিভাষা সঙ্কলনের নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা পারিভাষিক শব্দের বানান সম্বন্ধে নিম্নবর্ণিত রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই রীতি কেবল পরিভাষায় নহে, সকল বাংলা শব্দেই গ্রহণীয় কিনা, বিবেচ্য। বাংলা বানানে যে বিকৃতি আছে, তাহার যথাসম্ভব শোধন আবশ্যক। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে 'অপার' (upper), 'ক্লব' (club) সর্ (sir) প্রভৃতি বানান প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজকাল অনেকে লেখেন, 'আপার, ক্লাব, স্যার'। অথচ হিন্দী, মরাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় এখনও 'অপার, ক্লব, সর্' চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতিও এই বানান মঞ্জুর করিয়াছেন। আ-কারের দ্বিবিধ প্রয়োগ না করিয়া শব্দভেদে অ-কারেরই দ্বিবিধ উচ্চারণ করা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, যথা—(বিবৃত) club=ক্লব, (সংবৃত) ball=বল। হিন্দীতে বক্র আ-কার বুঝাইতে ঐ-কার প্রয়োগ করা হয়, যথা hat=হৈট। পরিভাষা-সমিতি এই উচ্চারণের জন্য একটি নূতন স্বরবর্ণ ও তাহার যোজ্য চিহ্ন রচনা করিয়াছেন। বাংলা উচ্চারণে শ ষ স অভিন্ন। কিন্তু বিদেশী শব্দে sh ও s বুঝাইবার জন্য আমরা শ ও স সহজেই কাজে লাগাইতে পারি, যথা 'শার্ট, ডিশ, সেল, ক্লাস'। হিন্দী, মরাঠী, গুজরাটীতে রেফের পর অনাবশ্যক দ্বিত্ব নাই। বাংলাতেও এই রীতি গ্রহণ করা সুবিধাজনক।]

সংজ্ঞা

বিবৃত অ — *cut*-এর *u*
সংবৃত অ — *cot*-এর *o*
সরল আ — *car*-এর *a*
বক্র আ — *cat*-এর *a*

হস্ চিহ্ন—অযুক্ত-ব্যঞ্জনান্ত দেশীয় ও বৈদেশিক শব্দের শেষে হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক। যথা—ফাঁক, খোপ, মোরগ ; ক্লোরিন, ভিনিস। কিন্তু যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে অন্ত্য বর্ণে হস্ চিহ্ন বিধেয়। যথা—ফট্, চিট্‌চিট্ ; কিপ্ (*Kipp*), হল্ (*Hull*)।

যুক্ত-ব্যঞ্জনান্ত বৈদেশিক শব্দের শেষে হস্ চিহ্ন বিধেয়। যথা—পাল্প্, ভেণ্ট্, নেপ্‌ল্‌স্।

শব্দের মধ্যস্থিত অক্ষরে হস্ চিহ্ন দেওয়া বা না দেওয়া যাইতে পারে। যথা—ফল্‌সা, জামরুল ; সল্‌ফাইড, নেপচুন।

বিবৃত ও সংবৃত অ—অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ (cut-এর u) বুঝাইবার জন্য আ-কার প্রয়োগ অবিধেয়। স্থানভেদে অ-কারের বিবৃত ও সংবৃত (cot-এর o) উভয় উচ্চারণই হইতে পারে। বিবৃত : যথা—সোডিয়ম, ইউরেনস (সোডিয়াম, ইউরেনাস নয়)। সংবৃত : যথা—নিয়ন, ইয়র্ক্।

বক্র আ—বৈদেশিক শব্দে যদি বিকল্পে সরল-আ (car-এর a-র অনুরূপ) বা বক্র-আ (cat-এর a-র অনুরূপ) উচ্চারিত হয় তবে বাঙ্গালায় আ লেখাই বিধেয়। যথা—আফ্রিকা, পটাসিয়ম। কিন্তু বক্র উচ্চারণ স্পষ্ট হইলে অ্যা এই নূতন বর্ণ ও ্যা চিহ্ন প্রয়োজ্য। যথা—অ্যাবার্ডিন, ক্যালসিয়ম।

ণ, ন—বৈদেশিক শব্দে ণ বর্জ্জনীয়। কিন্তু কয়েক স্থলে বাঙ্গালা টাইপের বশে চলিতে হইবে, যথা—ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ।

s, sh—বৈদেশিক শব্দে s স্থানে স, sh স্থানে শ বিধেয়। যথা—পটাসিয়ম (potassium), পটাশ (potash)। ষ অনাবশ্যক। s স্থানে ছ অবিধেয় (আরছেনিক নয়, আর্সেনিক)। st স্থানে স্ট এই নূতন যুক্তাক্ষর আবশ্যক, যথা—স্টকহল্‌ম্।

f, v, w, z—f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ও ভ অথবা ব চলিবে। যথা—ফ্রান্স্, কেল্‌ভিন বা কেল্‌বিন। w প্রচলিত বানানে লেখা যাইতে পারে। যথা—উইলসন, ওয়েল্‌স্। z স্থানে অধোরেখাযুক্ত জ় বিধেয়। যথা—বেন্‌জ়িন।

রেফের পর দ্বিত্ব—যদি শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয় জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে, অন্যত্র হইবে না। যথা—কার্ত্তিক, বার্ত্তা ; কিন্তু বর্তমান, পর্দা, ঊর্ধ্ব, সর্ব, কর্ম, ফর্মা, আর্য।

যুক্ত ব্যঞ্জন—বৈদেশিক শব্দে যথাসম্ভব দুইটির বেশী ব্যঞ্জন যুক্ত না করাই ভাল। ইলেক্‌ট্র্‌ন না লিখিয়া ইলেকট্রন লেখা বিধেয়।

শ্রীরাজশেখর বসু

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীবিমানবিহারী ভট্টাচার্য্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্ব-রাজ ও আত্মরক্ষাসামর্থ্য

ভারতবর্ষ—তাহার উপর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব এবং তাহার বাণিজ্য—কি প্রকারে চিরকালের জন্য ইংরেজের করতলগত রাখা যায়, এপর্য্যন্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া, তাহাকে স্বশাসন-অধিকার দিবার অছিলায়, বহু ইংরেজসমষ্টি তাহার উপায় চিন্তা ও উপায় বিধান করিয়া আসিতেছে। পার্লেমেণ্টের হাউস অব্ কমন্স তাহা যথাশক্তি করিয়া ভারতশাসন বিলটাকে হাউস অব্ লর্ডসের কাছে পাঠাইয়াছে। সেখানে লর্ডেরা বজ্র আঁটুনি আরও শক্ত করিতেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহা করা প্রাকৃত জনের পক্ষে স্বাভাবিক। তাহারা পরমহংসদিগের মত ত্যাগী হইবে, বুদ্ধদেবের মত হিতৈষী হইবে, এ আশা আমরা করি না। কিন্তু মিথ্যা যুক্তি লর্ডেরা প্রয়োগ করিলে তাহাদের কপটতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয়। বলিলেই যে তাহারা সাধু বনিয়া যাইবে এবং আমরা ইষ্টলাভ করিব, এমন নহে। তথাপি বলা দরকার। তাহাদের সব ভণ্ডামির মুখোস টানিয়া ফেলিতে গেলে একটা প্রকাণ্ড বহি লিখিতে হয়। তাহা পারা যাইবে না। একটা-আধটা মাত্র দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দিয়া থাকি।

লর্ড এমথিল এক সময়ে মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন এবং অল্পকাল গবর্ণর-জেনার‍্যালের পদে এক্‌টিনিও করিয়াছিলেন। হাউস্ অব্ লর্ড্‌সে ভারতশাসন বিলের আলোচনার সময় তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই মামুলী কপট যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেন, যে, যে-পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা করিতে না-পারে, রক্ষাকার্য্যের জন্য সমুদ্রপার হইতে আগত অন্য জাতির সেনাদলের উপর নির্ভর করে, তত দিন ঐ দেশ স্বশাসনের অধিকার পাইতে পারে না। এই যুক্তিটি অকপট হৃদয়ে সরল মনে কেহ প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে ইহা অনুমান করাই সঙ্গত যে, সেই ব্যক্তি ভারতবর্ষকে আত্মরক্ষা করিতে দিতে ইচ্ছুক—তাহার আত্মরক্ষায় বাধা দিতে চায় না, বরং তাহাকে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধবিদ্যা শিখাইতে চায়। অনেক ইংরেজ এই যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। মনে করা যাক্, যে, তাঁহারা সরল মনে তাহা করিয়াছেন। এখন দেখা যাক্, কাজে কি করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যুদ্ধ করিতে সমর্থ ও যুদ্ধ শিখিতে ইচ্ছুক কয়েক কোটি লোক পাওয়া যাইতে পারে। তাহাদের মধ্য হইতে যথেষ্টসংখ্যক সিপাহী সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ শিক্ষাদানের পর সর্ব্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কেন দেওয়া হয় না, সমুদ্রপার হইতে সৈন্য আমদানী কেন করা হয়? সবাই জানে কি কি কারণে গোরা আমদানী করা হয়। কারণগুলার মধ্যে ইহা একটা নয়, যে, ভারতবর্ষে যথেষ্ট ও উৎকৃষ্ট যোদ্ধা পাওয়া যায় না। এদেশে যে যথেষ্ট এবং খুব দক্ষ ও সাহসী যোদ্ধা পাওয়া যাইতে পারে, ইংরেজদের লেখা হইতেই তাহার বিস্তর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। দুটি দিতেছি।

সর্ আয়্যান হামিল্টন এক জন বিখ্যাত ইংরেজ সেনানায়ক। তিনি রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁহার "A Staff Officer's Scrap-book during the Russo-Japanese War" নামক পুস্তকের প্রথম ভলুমের ৮ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "There is material in the north of India and in Nepaul sufficient and fit, under good leaderslip, to shake the artificial society of Europe to its foundations," etc.

অর্থাৎ "ভারতবর্ষের উত্তর অংশে ও নেপালে এরূপ যথেষ্ট-সংখ্যক ও যোগ্য যুদ্ধ করিবার লোক আছে যাহারা সুনেতার পরিচালনায় ইয়োরোপের কৃত্রিম সমাজকে ভিত্তি পর্য্যন্ত টলাইয়া দিতে পারে।" তাঁহার ভারতবর্ষের অন্যান্য

অংশের অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি কেবল উত্তরাংশ ও নেপালের কথা বলিয়া থাকিবেন।

ইহা গেল ভারতীয় সিপাহীরা ইয়োরোপে কি করিতে পারে তাহার কথা। গত মহাযুদ্ধে তাহারা ইয়োরোপে কি করিয়াছিল, তাহাও দেখাইতেছি। লর্ড বার্কেনহেড্ এক সময়ে বিলাতী গবর্ন্মেণ্টে ভারত-সচিব ছিলেন। ভারতবন্ধু বলিয়া তাঁহার কোন অপবাদ ছিল না। তিনি তাঁহার একটি পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"The winter campaign of 1914-15 would have witnessed the loss of the Channel ports but for the stubborn valour of the Indian corps....Without India, the war would have been immensely prolonged, if, indeed, without her help it could have been brought to a victorious conclusion. ...India is an incalculable asset to the mother country."

(Quoted in Mr. George Lansbury's *Labour's Way with the Commonwealth*, page 51.)

তাৎপর্য্য। ১৯১৪-১৫ সালের শীতের যুদ্ধ-কালে ভারতীয় সৈন্য-দলের অটল পৌরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে ইংলিশ চ্যানেলের পোতাশ্রয় বা বন্দরগুলি হারাইতে হইত (অর্থাৎ সেগুলি জার্ম্যানদের হস্তগত হইত)।...ভারতবর্ষের সাহায্য ব্যতিরেকে বাস্তবিকই যুদ্ধটা যদিবা আমরা শেষ পর্য্যন্ত জিতিতাম (অর্থাৎ না-জিতিবার সম্ভাবনাই ছিল বেশী), তাহা হইলেও ইহা অতি দীর্ঘকালব্যাপী হইত।...মাতৃদেশের পক্ষে ভারতবর্ষের মূল্য গণনার অতীত।

অন্য বিস্তর ইংরেজের মত লর্ড বার্কেনহেড ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের "মাদার কাণ্ট্রি" অর্থাৎ মাতৃদেশ বলিয়াছেন। কি ধৃষ্ট মিথ্যা কথা! যাহা হউক, তাহাতে আমাদের কিছু আসিয়া যায় না। ভারতবর্ষের সিপাহীদের সাহায্য ব্যতিরেকে যে ইংরেজরা যুদ্ধ জিতিতে পারিত না, তাহা এক জন ইংরেজের পক্ষে যতটা স্পষ্ট কথায় স্বীকার করা সম্ভব, লর্ড বার্কেন্‌হেড্ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের টাকা না পাইলেও যে ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধ জয় অসাধ্য বা দুঃসাধ্য হইত, তাহা ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের পার্লেমেণ্ট-নেতা ল্যান্স্‌বেরী সাহেবের পূর্ব্বোল্লিখিত নূতন বহির একটি বাক্য হইতে বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"It is calculated that the war cost India in all some £ 207,500,000, and this forms a part of her present debt."* Page 51.

"ইহা গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের ৩১১,২৫,০০,০০০ (তিন শত এগার কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা ব্যয় হইয়াছিল।"

অতএব, বুঝা যাইতেছে, যে, আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে ভারতবর্ষে যোদ্ধারও অভাব হইবে না, অর্থেরও অভাব হইবে না।

একটা কথা উঠিতে পারে, ভারতবর্ষে সিপাহী পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেনানায়ক কোথায়? তাহার উত্তর সোজা। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে বড় বড় সেনাপতির জন্ম হইয়াছে। এখনও শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে ভারতীয়েরা অতি দক্ষ সেনাপতি হইতে পারে। গত মহাযুদ্ধে যে ভারতীয় সিপাহীরা ইংলণ্ডকে পরাজয় হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা অনেক সময় ভারতীয় নেতাদের নেতৃত্বেই করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধে জার্ম্যানরা বিস্তর ইংরেজ নেতাকে মারিয়া ফেলে। তাহাদের জায়গায় ভারতীয় নেতাদিগকে সৈন্যচালনা করিতে হইয়াছিল, যদিও তাঁহাদের রাজার কমিশন ("Kings' Commissioh") ছিল না।

আমরা দেখিলাম, ভারতবর্ষে সিপাহী ও সেনানায়ক দু-ই পাওয়া যাইতে পারে। যথেষ্ট সিপাহী ও নায়ক সংগ্রহ ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে ইংলণ্ড কি করিয়াছেন, দেখা যাক্।

ভারতবর্ষকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিবার জন্য ইংলণ্ডের উচিত ছিল, যত দ্রুত সম্ভব ভারতে ইংরেজ সৈন্য ও সেনানায়কের সংখ্যা কমান এবং তাহাদের স্থানে দেশী সৈন্য ও দেশী নেতা নিয়োগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে উৎকৃষ্টতম শিক্ষা ও অস্ত্র দান করা। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। বরং সিপাহী-বিদ্রোহের পরে ইহার বিপরীত নীতিই অনুসৃত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত দেশী নেতারা কেবল যে সিপাহীদের নেতৃত্ব করিত তাহা নহে, অনেক ইংরেজ সৈন্যেরও নেতৃত্ব করিত। সিপাহী-বিদ্রোহের পর এই নেতাদের পরিবর্ত্তে ইংরেজ-নেতা নিযুক্ত হয়, কতকগুলি জাতি ও শ্রেণী হইতে সৈন্য লওয়া বন্ধ করা হয়, শতকরা যত সিপাহী প্রতি যত গোরা সৈন্য লওয়া হইত তাহার (গোরা সৈন্যের) হার বাড়ান হয়, এবং সিপাহীদিগকে গোলন্দাজী বিভাগে কাজ দেওয়া বন্ধ করা হয়। সত্য বটে, বর্ত্তমানে সিপাহীদিগকে সর্ব্বপ্রকার গোলন্দাজী হইতে

---

* *Joint Committee Reports*. No. 10, p. 40, November 16th, 1933.

বঞ্চিত করা হয় না—কিন্তু সকল রকম গোলন্দাজী করিতে দেওয়াও হয় না। ইহাও সত্য বটে, যে, আজকাল রাজার কমিশনপ্রাপ্ত সেনানায়ক হইবার অধিকার অল্পসংখ্যক ভারতীয়কে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা দিয়া বৎসরে যতগুলি ভারতীয়কে নেতৃত্বের কাজ দেওয়া হয়, তাহাতে যে কোনকালেই সমগ্র ভারতীয় সৈন্যদলে প্রধান সেনাপতি হইতে নিম্নতম নায়কগণ সবাই দেশী হইবে না, ইহা সরকার পক্ষ হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা ১৩৪১ সালের চৈত্রের প্রবাসীর ৮৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম, "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সমরসচিব মিঃ টটেনহামকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে উত্যক্ত করায় তিনি উত্তর দিয়াছেন, যে, 'জন্মাবধি জড়বুদ্ধি ('Congenital idiot') ছাড়া সবাই বুঝে, যে এখন যে-ভাবে ভারতীয়করণ (Indianization) চলছে, তাতে কোন কালেই সম্পূর্ণ ভারতীয়করণ হবে না', অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম অফিসার পর্য্যন্ত সবাই ভারতীয় হইবে না।"

সিপাহী-বিদ্রোহের পর যাহা করা হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া ল্যান্সবরী সাহেব তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত নূতন পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"Indians have been told by us time and again that they were unfit for responsible self-government because they were unable to defend themselves against foreign attack. Their reply to this was, of course, that if we really wanted them to be able to govern themselves we would, as quickly as possible, train them for self-defence. In fact, our policy has been exactly the opposite. Indians did not suffer from lack of warlike qualities when we first went there. Our policy, however, since 1858 has been inspired by fear and distrust of Indians. The Peel Commission was appointed to inquire into the organization of the Indian Army in 1859. Lord Ellenborough, who had been Governor-General of India, and Lord Elphinstone, Governor of Bombay, in giving evidence before the Committee paid high tribute to the martial qualities of the Indian people and both concurred in the opinion that *because* of the quick adaptability of the Indians to the use of war weapons, Great Britain should prevent them from handling or using them." P. 71.

তাৎপর্য্য। "ভারতীয়দিগকে আমরা বার-বার বলিয়াছি, যে, তাহারা দায়িত্বপূর্ণ স্বশাসনের অযোগ্য, কারণ তাহারা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ। তাহার উত্তর তাহারা, অবশ্য, এই দিয়াছে, যে, যদি আমরা সত্য সত্যই তাহাদিগকে স্বশাসনে সমর্থ দেখিতে চাই তাহা হইলে আমরা যত শীঘ্র সম্ভব যেন তাহাদিগকে আত্মরক্ষায় শিক্ষা দান করি। কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের রাষ্ট্রনীতি ঠিক্ ইহার বিপরীত হইয়াছে। আমরা যখন প্রথম ভারতে যাই, তখন ভারতীয়দের যুদ্ধোপযোগী গুণের অভাব ছিল না। কিন্তু ১৮৫৮ সাল হইতে আমাদের রাষ্ট্রনীতি ভারতীয়দিগকে ভয় ও অবিশ্বাস-প্রণোদিত হইয়া আসিয়াছে। ১৮৫৯ সালে ভারতীয় সৈন্যদলের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পীল কমিশন নিযুক্ত হয়। তাহার সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান উপলক্ষ্যে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারাল লর্ড এলেনবরা ও বোম্বাইয়ের গবর্ণর লর্ড এলফিনষ্টোন ভারতবাসীদের যুদ্ধোপযোগী গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা করেন এবং উভয়েই একমত হইয়া বলেন, যে, যেহেতু ভারতীয়েরা অতি শীঘ্র যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া থাকে, অতএব গ্রেট ব্রিটেনের তাহাদিগকে ঐ সব অস্ত্র নাড়াচাড়া বা ব্যবহার করিতে না-দেওয়া উচিত।"

ভারতীয় সৈন্য ও ভারতীয় সেনানায়ক যথেষ্টসংখ্যক লওয়া হয় না, তাহা দেখাইয়াছি। যাহাদিগকে লওয়া হয়, তাহাদেরও শিক্ষা যে কয়েক বৎসর আগেও পৃথিবীর আধুনিকতম ও উৎকৃষ্টতম রকমের হইত না, তাহা ১৯২৬ সালের ২৩শে মার্চের পাইয়োনীয়র মেলে দেখিতে পাই (তখন পাইয়োনীয়র ইংরেজদের সম্পত্তি ও ইংরেজদের সম্পাদিত সামরিক বিষয়ে ওয়াকিফ-হাল কাগজ ছিল)। যথা—

"As a matter of fact, *The Pioneer* believes that not only is the army in India and the Indian army deficient in war stores, but is also compelled to do its training with poor rifles, old machine-guns, decrepit Lewis guns and transport which exists on paper alone."

তাৎপর্য্য। "বস্তুতঃ পাইয়োনীয়র বিশ্বাস করে, যে, ভারতবর্ষে স্থিত সৈন্যদলের এবং তথাকার দেশী সৈন্যসমষ্টির কেবল যে যথেষ্ট যুদ্ধসামগ্রীর অভাব আছে তাহা নহে, তাহারা অধিকন্তু শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ কাযা অপকৃষ্ট রাইফল, পুরাতন মেশিন-কামান, পঙ্গু লুইস-কামান এবং কেবল কাগজে বিদ্যমান যানবাহন দ্বারা চালাইতে বাধ্য হয়।"

এখন সম্ভবতঃ শিক্ষাব্যবস্থা উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। কিন্তু তাহা এখনও আধুনিকতম বটে কি?

এই ত গেল স্থলযুদ্ধ দ্বারা ভারতের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। রণতরী-বিভাগে এবং এরোপ্লেন-যুদ্ধ-বিভাগে মুষ্টিমেয় ভারতীয় সৈন্য ও নায়কও আছে কি?

ভারতবর্ষের বেলায় বলা হইয়া থাকে, এই দেশ স্বশাসন অধিকার পাইতে পারে না, যেহেতু ইহা আত্মরক্ষায় অসমর্থ। কিন্তু ব্রিটেন যখন কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকাকে

স্বশাসন অধিকার দিয়াছিল, তখন তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল কি ? তখন তাহারা আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশ যুদ্ধবিভাগের উপর নির্ভর করিত না কি ? বস্তুতঃ এখনও যদি আমেরিকা কানাডাকে এবং জাপান অষ্ট্রেলিয়াকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহারা ব্রিটিশ-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

শুধু তাহাদের কথাই বা বলি কেন ? ইয়োরোপের ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ক্ষুদ্র অনেক স্বাধীন দেশ প্রবল বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অসমর্থ (গত মহাযুদ্ধে বেলজিয়ম একা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই)। তা বলিয়া ইংরেজরা ত বলে না, যে, ঐ দেশগুলির স্বাধীন থাকিবার অধিকার নাই।

সর্ব্বশেষে ইহাও বলা দরকার, যে, গ্রেট ব্রিটেন ত স্বয়ং গত মহাযুদ্ধে একা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়াছিল। তাহাকে ভারতবর্ষের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষ না-হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া তাহার ধনজন ইংরেজদের করায়ত্ত ছিল। কিন্তু ইহা ত সুবিদিত সত্য, যে, আমেরিকার টাকা ও আমেরিকার মানুষ ভিন্ন ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ "মিত্রদেশসমূহ" জার্মেনীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিত না।

অতএব, যখনই যে-কোন ইংরেজ বলিবে, ভারতবর্ষ সমুদ্রপারের একটি জাতির সৈন্যদল ব্যতিরেকে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, অতএব তাহার স্বশাসক হইবার অধিকার নাই, তখনই তাহাকে কপট কুতার্কিক বলিবার অধিকার আমাদের আছে।

দেশরক্ষার মানেটাও প্রণিধানযোগ্য। স্বাধীন দেশ-সকলের যুদ্ধবিভাগ আছে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত। ভারতবর্ষে যুদ্ধবিভাগ আছে বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ভারতের ইংরেজাধীনতা রক্ষার জন্য, ইংরেজ জাতির জমীদারী ভারতবর্ষকে ইংরেজের রাখিবার জন্য—ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নহে।

—

ইহা কি বাঙালীবিরাগের একটি দৃষ্টান্ত ?

এলাহাবাদের লীডর প্রেস হইতে "চারুচরিতাবলী" নামক একটি হিন্দী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার বিজ্ঞাপন তথাকার দৈনিক লীডর কাগজে, ও অন্য কাগজে, দেখিয়াছি। তাহার গুণাগুণ আমাদের আলোচ্য নহে। এই বহিখানিতে উনিশ জন অধিক বা অল্প প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিষয়ে প্রবন্ধ আছে বলিয়া বিজ্ঞাপনে দেখিলাম। তাঁহাদের নাম—মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ("মালব্য" নহে), শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট, লালা লাজপৎরায়, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু, শ্রীবিট্ঠলভাই পটেল, সরদার বল্লভভাই পটেল, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, সর্ তেজবহাদুর সপ্রু, মহারাজা সাহেব মহমুদাবাদ, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, শ্রী সী. ওয়াই. চিন্তামণি, শ্রীভগবান দাস, রাজা সাহেব কালাকাঙ্কর, পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী, পণ্ডিত শ্রীধর পাঠক, শ্রী শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ, এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। ইঁহারা সকলেই লিখিবার মত কাজ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে দশ জন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের লোক। বাকী নয় জনের মধ্যে দুই জন বিলাতের, তিন জন গুজরাটের, দুই জন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ও এক জন পঞ্জাবের মানুষ, এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্ম বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে হইয়া থাকিলেও তাঁহাকে পঞ্জাবেরও বলা যাইতে পারে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ব্রিটেন, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বাংলা দেশ অপেক্ষা আগ্রা-অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী না হইলেও পুস্তকখানিতে কোন বাঙালীর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা হয় নাই, কিন্তু ঐ সব দূরবর্ত্তী ভূখণ্ডসমূহের কাহারও কাহারও সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে। অবশ্য পুস্তকটির প্রকাশক ও লেখকেরা বাঙালীকে বাদ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এরূপ করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্তের কোন প্রমাণ নাই, এবং এই পুস্তকটি হিন্দীর লেখক ও হিন্দীর পাঠকদের বাঙালীদের প্রতি মনোভাবের ঠিক্ পরিচায়কও না-হইতে পারে। আপনা হইতে, স্বভাবতঃ বা অকস্মাৎ (accidentally) পুস্তকটি হইতে বাঙালী বাদ পড়িয়া গিয়া থাকিলে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই জন্য, যে, বাঙালীরা আপনাদিগকে ও আপনাদের শীর্ষস্থানীয় লোকদিগকে ভারতীয় মহাজাতির যেরূপ একটি অবর্জ্জনীয় অঙ্গ বলিয়া মনে করেন, ভারতীয় মহাজাতির অন্তর্ভূত অন্যান্য জাতিরা হয়ত তাহা মনে করেন না।

যে উনিশ জনের কথা বহিটিতে লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এক জনেরও সমান যোগ্য বা দেশসেবানিরত ব্যক্তি বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, পুস্তকটির প্রকাশক ও লেখকেরা এরূপ মনে করেন কিনা, জানি না। যোগ্যতা ও দেশসেবার উল্লেখ এই কারণে করিতেছি, যে, বহিখানির একটি হিন্দী বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, "সব নামগুলি এইরূপ ব্যক্তিদের যাঁহারা আপনাদের যোগ্যতা, দেশসেবা প্রভৃতি দ্বারা আপনাদের দেশবাসীদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

বাঙালীদের বিশেষ কোন দোষ বা দোষাবলীর জন্যই তাঁহাদের কেহই যদি তাঁহাদের হিন্দী-ভাষী দেশবাসীদিগের হৃদয়ে স্থান না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বাঙালীদিগকে তাহা সংশোধন করিতে হইবে।

—

"চণ্ডীদাস-চরিত"

বাকুড়া জেলায় "চণ্ডীদাস-চরিত" নামক একখানি পুরাতন পুঁথির অনেকগুলি পাতা আবিষ্কৃত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আষাঢ়ের প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাসের যেরূপ স্থান, ঐরূপস্থানীয় অন্য কোন দেশের কোন কবির সম্বন্ধে "চণ্ডীদাস-চরিতের" মত নূতন কোন পুস্তক বা তথ্য আবিষ্কৃত হইলে সেই দেশে তাহার যতটা আলোচনা হইত, বঙ্গে "চণ্ডীদাস-চরিত" সম্বন্ধে বা তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ সম্বন্ধে তত আলোচনার আশা করা যায় না। কেন করা যায় না, তাহার আলোচনা করিব না। সুখের বিষয় এই, যে, রবীন্দ্রনাথ ইহা পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসা ও অভিমত দ্বারা 'চণ্ডীদাস-চরিত' ধন্য হইল। যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বিস্মিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ সেন রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে ছিলেন। কোথায় দূর ছাতনায় বসিয়া নব্য ভাব পাইলেন, এটা আরও আশ্চর্য্যের কথা। এক ঐতিহাসিক আমাকে লিখিয়াছেন পুঁথীখানা ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে লেখা। কারণ, 'অন্তরতম' কথা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে ছিল না।"

পুঁথিখানি আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক ও তদ্বিধ অন্য বিশেষজ্ঞেরা যে-সব আভ্যন্তরীণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পুস্তকের কাল নির্ণয় করেন, তা ছাড়া অমুদ্রিত পুঁথির জরাজীর্ণতা প্রভৃতিও বিবেচনা করেন। আমরা এই পুঁথিটির চেহারা যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে তাহা ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে লেখা মনে হয় নাই। তার চেয়ে পুরাতন মনে হইয়াছে।

যোগেশ বাবুর চিঠিতে যে ঐতিহাসিকের উল্লেখ আছে, তাঁহার মতে পুঁথিটি ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে লেখা এই কারণে, যে, উহাতে 'অন্তরতম' কথাটির প্রয়োগ আছে, এবং তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। মুদ্রিত সব বাংলা বহি এবং আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত সব অমুদ্রিত বাংলা বহি আমরা পড়ি নাই; সুতরাং 'অন্তরতম' কথাটির প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আকাশে উদয়ের পূর্ব্বে বাংলা বহির কোন লেখক করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানে আছে,

> "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুল' না রে তাঁয়;
> থাকিলে তাঁহার সঙ্গে পাপ তাপ দূরে যায়।
> হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে?"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনিষ্ঠের নিকট হইতে এই কথাটি ধার করিয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন! কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত লেখকেরাও ইহা রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ঋণ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিতে অনৈতিহাসিক আমরা অসমর্থ। 'অন্তর' 'অন্তরতর' ও 'অন্তরতম' শব্দগুলির প্রয়োগ প্রাচীন সংস্কৃতে পাওয়া যায় (আপ্টের সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান দেখুন)। এই সংস্কৃত কথাগুলি ব্যবহার করিবার অধিকার আধুনিক কোন বাঙালী লেখকের যেমন আছে, অপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণ সেনেরও সেইরূপ ছিল।

'নব্য ভাব' কৃষ্ণ সেনের পুঁথিটিতে কিছু আছে বটে; কিন্তু পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহার নানা ব্যাখ্যান ও প্রবন্ধে মধ্যযুগের সাধকদের বাণীসমূহের মধ্যে নব্য ভাবের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। তাহার দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে, এই সাধকেরা কালে আধুনিক। বস্তুতঃ আমরা যাহা-কিছু আধুনিক মনে করি, তাহাই আধুনিক নহে।

নূতন বৈজ্ঞানিকআবিষ্কারমূলক নবরচিত পারিভাষিক

শব্দ যদি কোন বহিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বলা চলে, যে, বহিখানি ঐ আবিষ্কারের পরে লেখা, পূর্ব্বে নহে।

—

স্মৃতিসভায় অপ্রাসঙ্গিক তুলনা

আলবার্ট হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের যে স্মৃতিসভা হইয়াছিল, তাহাতে এক জন বক্তা, রাসবিহারী ঘোষ যে চিত্তরঞ্জন দাসের চেয়ে বড় আইনজ্ঞ ছিলেন, ইহার প্রমাণ-স্বরূপ গোখলের এই মর্ম্মের একটি উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন, যে, বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে রবীন্দ্রনাথের মত কবি, প্রফুল্লচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিক এবং রাসবিহারীর মত আইনজ্ঞ নাই। কিন্তু রাসবিহারীর সহিত চিত্তরঞ্জনের তুলনা করিবার কি প্রয়োজন স্মৃতিসভাতে ছিল? ঐ বক্তাই আরও বলেন, বাঙালীদের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা চিত্তরঞ্জন অধিকতর সম্মানের স্থান পাইয়াছেন, কারণ চিত্তরঞ্জন স্বরাজ লাভের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ করেন নাই। এই তুলনারই বা কি প্রয়োজন ছিল? এরূপ তুলনার দ্বারা, যিনি যাহা তার চেয়ে ছোটও হন না, বড়ও হন না। স্মৃতিসভা এরূপ আপেক্ষিক আলোচনার স্থান নহে। স্থান-কালের কথা বাদ দিয়াও এরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক মনে করি।

—

শ্রাদ্ধবাসরে ও স্মৃতিসভায় নৃত্য ও কীর্ত্তন

সম্প্রতি কোন কোন শ্রাদ্ধবাসরে ও স্মৃতিসভায় মেয়েদের নৃত্য হইয়াছিল, কাগজে দেখিতে পাই। মেয়েদের সব রকম নৃত্যের বিরোধী আমরা নহি, সুরুচিসঙ্গত ও শোভন নৃত্যে আমরা দোষ দেখি না। কিন্তু পরলোকগত কাহারও শ্রাদ্ধবাসরে বা স্মৃতিসভায় নৃত্য অশোভন এবং স্থানকালের অনুপযোগী।

এরূপ উপলক্ষ্যে কীর্ত্তন অবশ্যই হইতে পারে। কিন্তু তাহা এরূপ হওয়া উচিত নয় যাহার সহজ অর্থ আদি-রসাত্মক। তাহার নিগূঢ় অর্থ আধ্যাত্মিক, কেহ কেহ ইহা বলিতে পারেন বটে; কিন্তু এই নিগূঢ় অর্থ সাধারণ শ্রোতারা জানে না, বুঝে না, এবং তাহাদিগকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও কীর্ত্তনকালে কেহ করেন না। সুতরাং এরূপ কীর্ত্তন শ্রাদ্ধবাসরের ও স্মৃতিসভার কেবল যে অনুপযোগী ও অশোভন তাহা নহে, ইহা যে-কোন স্থানে ও কালে সর্ব্বসাধারণের অনুপযোগী। ইহা কেবল আধুনিক মত নহে। মনস্বী ভক্ত বৈষ্ণবের মন্তব্যও ইহার সমর্থনার্থ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। একটি উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীধনপতি সূরি শ্রীমদ্‌ভাগবতের গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকা লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন:—

"পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক বর্ণিত এই রাসক্রীড়া পরমহংসগণই আদরে শ্রবণ করিবেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞানে অজ্ঞ অপক্কহৃদয় জনের পক্ষে এই রাসলীলা শ্রবণ নিষিদ্ধ, যেহেতু এই শ্রীরাসলীলোৎসব সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সারভূত। ইহা অতিশয় গূঢ় হইতেও গূঢ়তম; সুতরাং প্রাকৃত লালসাতুর অপজনের পক্ষে এই শ্রীরাসলীলা শ্রবণ নিষিদ্ধ। কারণ ইহা অপ্রাকৃত প্রেমময়ী লীলা হইলেও ইহাতে প্রাকৃত রসের সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া সহসা অসৎভাবের উদয় হইতে পারে।"—কাশিমবাজার সংস্করণ, ১৬৩১ পৃষ্ঠা।

রাসলীলা সম্বন্ধে কথিত এই মত আদিরসাত্মক অনেক পদ ও কীর্ত্তনেও প্রযোজ্য।

—

জার্মেনীতে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী

মান্দ্রাজের সাপ্তাহিক দি গার্ডিয়ানের (*The Guardian*এর) ২৭শে জুনের সংখ্যায় এই খবরটি বাহির হইয়াছে:—

"Tagore's books in the German language brought in more royalties than in any other, and these royalties were employed by the poet for his International University at Santiniketan. But his pacific philosophy is taboo to all good Nazis, and as a result his royalties have dwindled and Santiniketan is a sufferer thereby."

"রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জার্ম্মান ভাষায় অনূদিত বহিগুলির বিক্রী হইতে তাঁহার অন্য ভাষায় অনূদিত বহিসকল অপেক্ষা মুনফা বেশী পাইতেন এবং তিনি তাহা বিশ্বভারতীর জন্য ব্যয় করিতেন। কিন্তু তাঁহার শান্তিপ্রবর্ত্তক দার্শনিক মত সমুদয় খাঁটি নাৎসীর পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু; সেই জন্য জার্মেনীতে তাঁহার বহির কাটতি কমিয়া যাওয়ায় মুনফাও কমিয়াছে, সুতরাং শান্তিনিকেতন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"

আমরা জানিতাম, জার্মেনীতে তাঁহার বহিগুলির অনুবাদ খুব বেশী বিক্রী হইত এবং তাহাতে তাঁহার প্রাপ্য অংশ বহু লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মান মুদ্রা মার্কের বিনিময়মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় ঐ প্রভূত মুনফা অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে; নতুবা আজ বিশ্বভারতীর কোনই আর্থিক অসচ্ছলতা থাকিত না। আমরা যাহা

জানিতাম তাহা ঠিক্ কি না স্থির করিবার নিমিত্ত কবিকে মান্দ্রাজের কাগজখানির উক্ত সংবাদটি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং এ-বিষয়ে ঠিক তথ্য কি জানিতে চাহিয়াছিলাম। উত্তরে কবি লিখিয়াছেন :—

"জর্ম্মনিতে আমার বই বিক্রি সুরু হয়েছিল প্রবল বেগে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। অবশেষে যখন হিসাব মেটাবার সময় এল তখন মার্কের এমন অধঃপতন হোলো যে তাকে [মুনফার প্রভৃত সমষ্টিকে] টাকায় পরিণত করতে গেলে এক আঁজলাও ভরে না। সমস্ত আয় জর্ম্মনিকেই দান করে এলুম। তার [মার্কের] মূল্য যদি হ্রাস না হোতো তা হলে বিশ্বভারতীর জন্যে আজ আমাকে ভিক্ষের ঝুলি বয়ে বেড়াতে হোতো না। আজ আমার বই সেখানে কী পরিমাণে বিক্রি হয়, এবং তার গতি কোন্ পথে আমি কিছুই জানি নে। এই টুকু জানি আমার তহবিলে এসে পৌছয় না। সেজন্য দুঃখ করে ফল নেই, কেন না লাভের অঙ্ক বেশি হবার প্রত্যাশা করি নে,—বস্তুত য়ুরোপের হাটে আমার বই বিক্রির মুনফা তর্কের অতীত, হিসাবের খাতাটা দর্শনশ্রবণের অগোচরে। আমার পক্ষে হিটলারের প্রয়োজনই হয় না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে একদা এমন দিন ছিল যখন কালিদাস প্রভৃতি কবি রসজ্ঞ মহলে তাঁদের কাব্যের প্রচার হলেই খুসি হতেন। আমার দুঃখ এই যে বিক্রমাদিত্যের ঠিকানা পাওয়া যায় না। তখন এক জন কোনো অসাধারণের উপর ভার ছিল সর্ব্বসাধারণের হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করা। পাই কোথায় তেমন রাজা। এমন যদি হোতো সাধারণের মধ্যেই শক্তি ও ভক্তি অনুসারে যাঁর যখন খুসি পরিতোষ প্রকাশের জন্য কবিকে পারিতোষিক পাঠাতেন তা হলে কপিরাইট আগলানোর মত বণিগ্‌বৃত্তি সরস্বতীর মন্দিরে অশুচিতা বিস্তার করত না। রুচিও আছে রৌপ্যও আছে জনসমাজে এমন সমাবেশ দুর্ল্ভ নয় অথচ তাঁরা দুটাকা পাঁচশিকার পরিমাণেই তাঁদের দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেন—তার ফলে যাঁদের রুচি আছে অথচ সামর্থ্য নেই দণ্ডটা তাঁদেরই নিষ্ঠুর ভাবে ভোগ করতে হয়। বাণীকে সোনার দরে বিক্রির বৈশ্যরীতি বর্ব্বরতা একথা মানতেই হবে।"

আমরা গত মহাযুদ্ধ শেষ হইবার অনেক পরে যখন ১৯২৬ সালে জার্মেনী গিয়াছিলাম তখনও সেখানে রবীন্দ্র-নাথের বহির খুব বিক্রী দেখিয়াছিলাম। কয়েক জায়গায় এক হোটেলে তাঁহার সঙ্গে ছিলাম; দেখিতাম, সকাল বিকাল তাঁহার টেবিলে তাঁহার বহিগুলির জার্মান অনুবাদ হোটেলের চাকরচাকরাণীরা পর্য্যন্ত কিনিয়া স্তূপাকারে রাখিয়া গিয়াছে, সেগুলিতে তাঁহার নাম স্বাক্ষরের অনুগ্রহের জন্য। তাহা দেখিয়া পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম, "আপনি এক-একটা দস্তখতের কিছু একটা মূল্য ধার্য্য করলে কিছু অর্থাগম হ'ত।" কিন্তু তিনি এই বণিগ্‌বৃত্তির ইঙ্গিত গ্রহণ করেন নাই।

—

বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার

গত মাসে আলবার্ট হলে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরানীর সভানেত্রীত্বে বঙ্গে নারীহরণের প্রতিকারার্থ একটি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন লিখিয়াছেন, আমরাও বলিয়াছি লিখিয়াছি, পুনঃ পুনঃ বলিতে লিখিতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাজও করিতে হইবে।

নারীরা আপনাদিগকে রক্ষা করুন, পুরুষেরাও তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন। নারীরক্ষা ব্যতিরেকে সমাজস্থিতি অসম্ভব।

বাঙালী অনেক বিষয়ে অধম তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচারের জন্য বাঙালী পুরুষ ও নারীরা যে পরিমাণে দায়ী তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহাদিগকে করিতে হইবে, তাহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিদের সহিত তুলনায় যতটা অধম, তার চেয়ে বেশী হীনতা স্বীকার করাও ঠিক্ নয়। কোন কোন সভায় ও খবরের কাগজে অনেক বার বলা হইয়াছে, পঞ্জাবে ও অন্য কোন কোন প্রদেশে বঙ্গের মত নারীহরণ হয় না। তাহা ঠিক্ নয়। ইহা আমরা কয়েক বার পুলিস রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছি। যথা—১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে ১০৬ পৃষ্ঠায় আমরা লিখিয়াছিলাম :—

"...in Bengal, in 1932, there were altogether 693 cases of crimes against women. The numbers of such

crimes in the Panjab and the United Provinces of Agra and Oudh in the same year, according to the police administration reports of those provinces, are given in the subjoined table.

Province.	Population	Crimes against women in 1932.
Panjab	23,580,852	504
U. P.	48,408,763	711
Bengal	50,114,002	693

"The figures for other provinces for the year 1932 are not before us. But there is an impression in the public mind that crimes against women prevail to a great extent in Sind and the N.-W. F. Province also."

১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণের প্রবাসীর ৩০০ পৃষ্ঠায় আমরা লিখিয়াছিলাম :—

"পঞ্জাবের ১৯৩২ সালের পুলিস-বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায়, সে, সেখানে ঐ বৎসর নারীহরণ ও তদ্বিধ অপরাধের সংখ্যা ছিল ৫০৪। পঞ্জাবের লোকসংখ্যা ২,৩৫,৮০,৮৫২। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ১৯৩২ সালের পুলিস রিপোর্ট অনুসারে ঐ বৎসর তথায় ঐ প্রকার অপরাধের সংখ্যা ছিল ৭১১। ঐ প্রদেশের লোকসংখ্যা ৪,৮৪,০৮,৭৬৩। লোকসংখ্যা বিবেচনা করিলে পঞ্জাবে এই দুর্নীতির পরিমাণ বেশী।"

'প্রবাসী'তে ইহা যখন লিখি তখন বঙ্গের ১৯৩২ সালের সংখ্যাগুলি হস্তগত হয় নাই। 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে লিখিবার সময় সংখ্যাগুলি পাইয়াছিলাম। তাহা হইতে বুঝা যায়, আগ্রা-অযোধ্যায় এইরূপ অপরাধের প্রাদুর্ভাব বঙ্গের চেয়ে অধিক, পঞ্জাবে ততোধিক।

বাঙালীর কলঙ্ক অপনোদনের জন্য ইহা লিখিতেছি না। সত্য যে কলঙ্ক, তাহার কালিমাই যথেষ্ট। তাহাকে অজ্ঞতাবশতঃ অতিরঞ্জিত করা অনুচিত ও অনাবশ্যক।

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও মুসলমান সম্প্রদায়

কি অবস্থায় কি প্রকারে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, ভারতশাসন বিলের ২৯৯ ধারায় তাহা বিবৃত করা হয়। উহা পরে ৩০৪ ধারায় পরিণত হইয়াছে। ঐ ধারাটি পরিবর্ত্তনের এরূপ সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে, মুসলমানদের এবং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সর্ব্বদাই ইহা বলিবার সুযোগ থাকিবে, যে, সর্ত্তটি পূর্ণ হয় নাই। এ বিষয়ে বাক্যব্যয় বৃথা। কারণ, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ও মুসলমান সম্প্রদায় উভয়েই চান যে বাঁটোয়ারাটা স্থায়ী হয়। তবে যদি কখনও এমন অবস্থা ঘটে যে উভয়েই বুঝিতে পারেন, যে, বাঁটোয়ারাটার দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থের ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তন সহজেই হইবে। যদি শুধু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টই বুঝেন, যে, তাহাতে ব্রিটিশ জাতির স্বার্থের ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলেও বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন হইবে। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা কথা দিতেছেন বটে—"প্লেজ" (pledge) দিতেছেন বটে, যে, মুসলমানদের সম্মতি ব্যতিরেকে উহা কখনই পরিবর্ত্তিত হইবে না; কিন্তু "প্লেজ" ত ব্রিটেন ভারতবর্ষকে অনেক দিয়াছিলেন, তাহার কয়টা রক্ষিত হইয়াছে? এই সব অ-পালিত অঙ্গীকারগুলির তালিকা দেওয়া অনাবশ্যক। কেবল একটা কথা এখানে পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ভারতবর্ষের অন্যতম বড়লাট পরলোকগত লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালের ২রা মে লণ্ডনস্থ ভারত-সচিবকে লিখিয়াছিলেন—

"I do not hesitate to say that both the Governments of England and of India appear to me, up to the present moment, unable to answer satisfactorily the charge of having taken every means in their power of breaking to the heart the words of promise they had uttered to the ear."

ইহার উত্তর ইংরেজরা এখনও দিতে পারিবেন না।

অতএব মুসলমানদিগকে রাজপুরুষেরা যে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, তাহা সত্ত্বেও বাঁটোয়ারা পরিবর্ত্তন করিবার উপায় রাজপুরুষেরা সহজেই আবিষ্কার করিতে পারিবেন যদি কখনও ব্রিটিশ জাতির স্বার্থহানি নিবারণের বা স্বার্থের সিদ্ধির জন্য তাহা আবশ্যক হয়।

ইহা মুসলমানেরাও বুঝেন। সেই জন্য তাঁহারা বিলের ৩০৪ ধারাটাই এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে বলিতেছেন যাহাতে তাঁহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে বাঁটোয়ারাটার পরিবর্ত্তন করা না চলে। কিন্তু তাহাতেই কি মুসলমানেরা নিরুদ্বেগ হইতে পারেন? যাঁহারা আইন করিতেছেন, তাঁহারা আইন বদলাইতে পারেন না? বদলাইতে গেলেই মুসলমানরা অবশ্য প্রতিবাদ করিতে পারেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পার্লেমেণ্ট যেমন এখন সাতাইশ কোটি অমুসলমানের (অন্ততঃ ২১ কোটি অনবনত হিন্দুর) প্রতিবাদ গ্রাহ্য করিতেছেন না, তেমনই তখন আট কোটি মুসলমানের প্রতিবাদও অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

অতএব, অঙ্গীকার বা আইনের ধারা কিছুতেই পরিবর্ত্তন আটকাইবে না, যদি ব্রিটিশ জাতির স্বার্থহানি নিবারণ বা স্বার্থরক্ষার জন্য পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। কারণ, বাঁটোয়ারাটা করা হইয়াছে মূলতঃ মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নহে, ব্রিটিশ স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

২৯৯ ধারার জন্য ক্রন্দন।—*The Hindustan Times.*

যাহা হউক, ইংরেজরা এখন রাজার জাতি এবং মুসলমানেরা অতীতে ছিলেন রাজার জাতি ও বর্ত্তমানে বাদশাহের "দোস্ত"—তাঁহাদের পরস্পরের বুঝাপড়া নিজেদের মধ্যেই করুন ; আমরা দেখি শুনি।

দেখিতেছি শুনিতেছি দেশী রাজ্যের নরেশরা টুঁ শব্দ করিলেই ব্রিটিশ জাতি শুনিতে পাইতেছেন এবং তাঁহাদিগকে খুশী করিতে চেষ্টা করিতেছেন, মুসলমানেরাও কিছু বলিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের তোয়াজ আরম্ভ হইতেছে। ইহাতে ব্রিটিশ জাতির প্রভূত সাহস ও শক্তি বা সদাজাগ্রত চতুরতা, কোন্‌টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ? ন্যায়-অন্যায়ের কথা এরূপ রাষ্ট্রনৈতিক খেলার ক্ষেত্রে তোলা মূঢ়তা।

মুসলমানরা সম্মিলিত না স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চান, তাহা বলিবার স্বাধীনতা তাঁহাদের অবশ্যই আছে। কিন্তু তাঁহারা অন্য দিকে একটি স্বাধীনতা হারাইতেছেন। তাঁহারা অমুসলমানকেও মোক্তার উকিল ব্যারিষ্টার ডাক্তার শিক্ষক ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে পারেন ও পারিবেন, কিন্তু অমুসলমানকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না। মুসলমান সম্প্রদায় ইহা স্থির করেন নাই, যে, তাঁহাদের অমুসলমান আইনজীবী ডাক্তার শিক্ষক প্রভৃতি তাঁহাদের অনিষ্ট করিয়াছে, কিন্তু অমুসলমান প্রতিনিধি অনিষ্ট করিবেই, কার্য্যতঃ তাঁহাদের দ্বারা ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে।

মুসলমানরা কেবল একটি বিষয়ে আলাদা হইতে চাহিতেছেন। কিন্তু অন্য নানা বিষয়ে তাঁহারা অমুসমানদের সহিত সম্পর্ক বেশ ভাল করিয়াই রাখিতে চান। মুসলমান জুতা বিক্রেতা এবং পোষাক বিক্রেতা ও নির্মাতা অনেক আছেন। অনেক মুসলমান পুস্তকাদি সেলাই করেন ও বাঁধেন। অনেক মুসলমান ছাপাখানায় কাজ করেন। অনেকে রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। নৌকা চালান অনেকে। এইরূপ আরও অনেক কাজের নাম করা যায় যাহা করিতে গিয়া মুসলমানরা অমুসলমানদের সংস্রবে আসেন এবং যাহাতে অমুসলমানদের সঙ্গে আলাদা হইলে তাঁহাদের খুব ক্ষতি অনিবার্য্য। সুতরাং এই সব কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা অমুসলমান-নিরপেক্ষ হইতে চাহিবেন না। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে তাঁহারা অমুসলমানদের প্রতি একান্ত অবিশ্বাস দেখাইতেছেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা বোধ হয় ধরিয়া রাখিয়াছেন, যে, তাঁহাদের প্রতি অমুসলমানদের মনোভাব পূর্ণমাত্রায় প্রতিবেশিজনোচিতই থাকিবে।

আগে লিখিয়াছি, সম্মিলিত বা পৃথক্ নির্ব্বাচন মুসলমানরা চান কিনা তাহা বলিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। কিন্তু একটি অধিকার কাহারও নাই, তাঁহাদেরও নাই ;—তাহা অপরকে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা ও দাবি। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হইত, যে, প্রত্যেক সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকসংখ্যা অনুসারে তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা হইলে তাহার ন্যায্যতা কতকটা স্বীকার করা যাইত। কিন্তু

লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যে-যে প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সেই সেই প্রত্যেক স্থানেই তাঁহারা সংখ্যানুসারে প্রাপ্য প্রতিনিধি অপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি পাইয়াছেন, এবং এই অতিরিক্ত সংখ্যা হিন্দুদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য সংখ্যা হইতে কিছু বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত প্রদেশে বহু কোটি হিন্দুর বাস। মাত্র কয়েক লক্ষ লোকের বসতি সিন্ধু ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দুদিগের প্রাপ্য প্রতিনিধি অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আলাদা প্রতিনিধিসংখ্যা বণ্টন হিন্দুরা চান নাই। কিন্তু বাটোয়ারাতে যখন তাহাই করা হইয়াছে, তখন হিন্দুদের ইহা চাহিবার অধিকার আছে, যে, সকল প্রদেশেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অনুসারে তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হউক। হিন্দুদিগকে বঞ্চিত করিয়া যে অন্যায় ও অপমান করা হইয়াছে, তাহা চিরস্থায়ী হউক, ইহা চাওয়া কাহারও উচিত নহে—চাহিবার অধিকার কাহারও নাই।

—

স্বাধীনতায় যাহা হয় অনুগ্রহে তাহা হয় না

ভারতবর্ষে যে-সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতীয় মহাজাতির স্বাধীনতা না-চাহিয়া কেবল চাকরীর ভাগ ও অন্য স্বার্থসিদ্ধি চাহিতেছেন, তাঁহাদিগকে আগে আগে জানাইয়াছি আবার জানাইতেছি, যে, স্বাধীন সভ্য দেশগুলির মধ্যে যেগুলি অনগ্রসর, শিক্ষায় ও ধনশালিতায় তাহাদের অধিবাসীদের সহিতও ভারতবর্ষের লোকদের তুলনা হয় না—ভারতবর্ষ বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। প্রমাণ দিতেছি।

ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব মণ্টেগু ও ভূতপূর্ব্ব বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ডের স্বাক্ষরিত মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে আছে, "The immense masses of the people are poor, ignorant, and helpless far beyond the standard of Europe," "ভারতবর্ষের বিশাল জনসমষ্টি ইয়োরোপের মানের সহিত তুলনার অতীত রূপে দরিদ্র, অজ্ঞ ও অসহায়।" জয়েণ্ট সিলেক্ট কমীটির রিপোর্টে আছে, "The average standard of living is low and can scarcely be compared with that of the more backward countries of Europe," "ভারতের লোকদের অন্নবস্ত্রবাস-গৃহাদি গড়ে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং ইয়োরোপের অনগ্রসর দেশগুলিরও ঐ সমুদয়ের সহিত তুলনা করা যায় না।"

এখন দেখাইতেছি, যে, আমেরিকায় যাহাদের উপর এখনও এরূপ ভীষণ অত্যাচার হয়, যে, তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও কখন কখন জীবিত অবস্থায়, বিনা বিচারে, সন্দেহ বশতঃ, পুড়াইয়া মারা হয়, সেই কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের অবস্থা ভারতবর্ষের উন্নততম জা'তের চেয়েও শিক্ষা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এই নিগ্রোরা আফ্রিকার অসভ্য আদিম অধিবাসী। স্বদেশে তাহাদের সাহিত্য, এমন কি বর্ণমালাও ছিল না। তাহাদিগকে আফ্রিকা হইতে ধরিয়া আনিয়া আমেরিকায় দাস (slave) রূপে খাটান হইত। ১৮৬৫ সালে তাহাদের দাসত্বমোচনের সময় পর্য্যন্ত আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রে এইরূপ আইন ছিল, যে, কেহ নিগ্রোদিগকে লেখাপড়া শিখাইলে তাহার কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড, বেত্রাঘাত-দণ্ড হইতে পারিত। নিগ্রোরা লেখাপড়া শিখিলে তাহাদের জন্যও এইরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার পর তাহাদের উপর অত্যাচার সত্ত্বেও এই অসভ্যজাতীয় লোকদের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে শুনুন। ১৯৩০ সালে আমেরিকার যে সেন্সস লওয়া হয় তদনুসারে নিগ্রোদের মধ্যে শতকরা ৮৪ জন লিখিতে পড়িতে পারে। স্বাধীন দেশের সুযোগ ও সুব্যবস্থায় ৬৫ বৎসরে অসভ্য নিগ্রোদের এই উন্নতি হইয়াছে। আর সভ্য ভারতবর্ষে বহু সহস্র বৎসরের পুরাতন বর্ণমালা ও সাহিত্য থাকা সত্ত্বেও, স্বাধীনতার অভাবে, শতকরা ৯২ জন লিখিতে পড়িতে পারে না, এবং হিন্দুদের মধ্যে কোন জাতির, কিংবা পার্সী বা দেশী খ্রীষ্টিয়ান কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই শতকরা ৮৪ জন লিখিতে পড়িতে পারে না। নিগ্রোদের নিজেদের অনেক স্কুল কলেজ আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, জগদ্বিখ্যাত নেতা আছে, প্রসিদ্ধ লেখক আছে; সঙ্গীতে তাহারা অগ্রসর। আবার ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বহু ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানও তাহাদের আছে।

অনুগ্রহ ভারতবর্ষের কোন সম্প্রদায় বা জাতিকে স্বাধীন আমেরিকার লাঞ্ছিত নিগ্রোদের সমান শিক্ষিত ও আর্থিক

বিষয়ে সন্ততিপন্ন করিতে পারে নাই, পারিবে না। স্বরাজ ব্যতিরেকে কোন দিকে নিগ্রোদের সমান উন্নতিও কোন সম্প্রদায়ের হইবে না।

অতএব, যে-সব সম্প্রদায় ও জাতির নেতারা স্বার্থপরতা, অদূরদর্শিতা, অজ্ঞতা বা অন্য কোন কারণে স্বরাজপ্রচেষ্টা হইতে নিজ নিজ দলকে নিবৃত্ত ও বিমুখ রাখিয়াছেন, তাঁহারা সমগ্রভারতীয় মহাজাতির অনিষ্ট ত করিতেছেনই, নিজ নিজ সম্প্রদায় ও জাতির লোকদেরও অনিষ্ট করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। কারণ, সভ্য স্বাধীন দেশের অনগ্রসরতম সম্প্রদায় ও জাতিও আমাদের অগ্রসরতম জাতিদের চেয়েও শিক্ষা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে উন্নত।

—

সাম্রাজ্যের কনিষ্ঠ অংশীদার ভারতবর্ষ !

হাউস অব লর্ডসের একটি বক্তৃতায় লর্ড জেটল্যাণ্ড বলিয়াছেন, যে, তিনি ভারতবর্ষের সহিত এক কনিষ্ঠ অংশীদারের সহিত ব্যবহারের মত ব্যবহার করিতে পারেন— যে অংশীদারের বহুবৎসর ব্রিটিশ জাতির সাহায্য ও
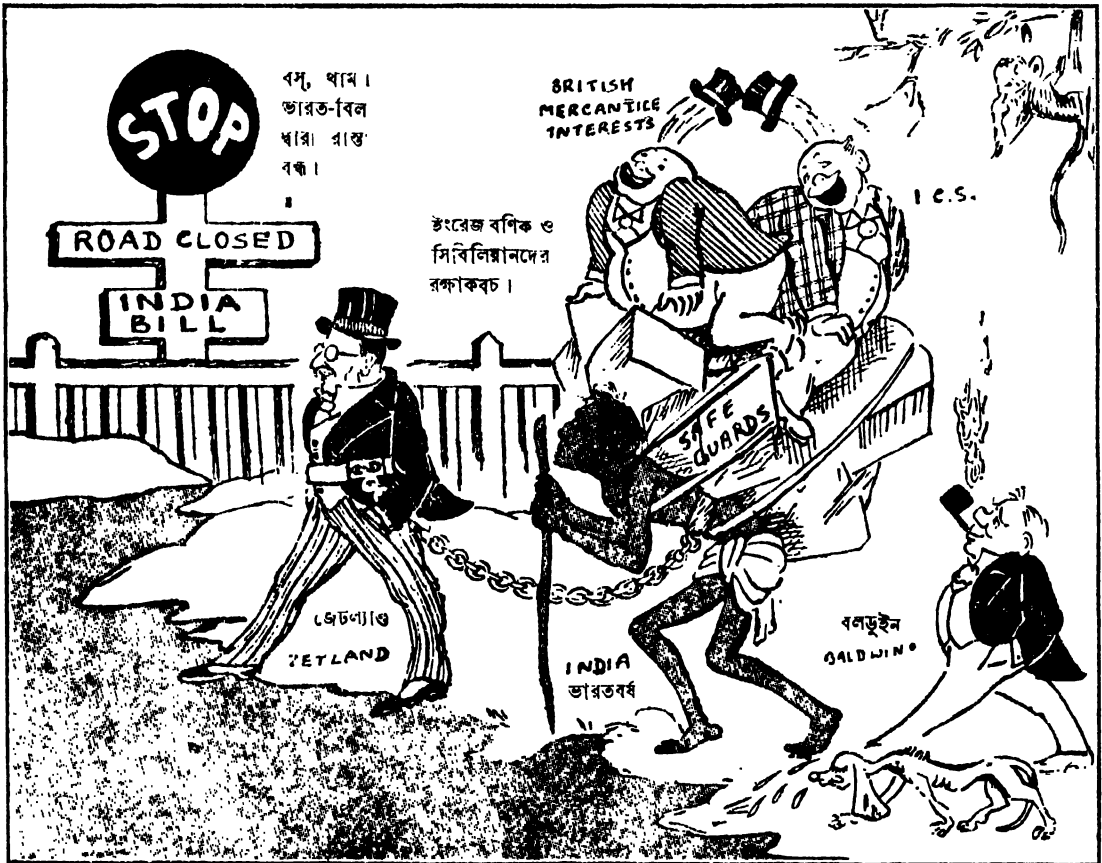
"In his speech in the House of Lords, Lord Zetland said that he could treat India as a junior partner who for many years would need their aid and guidance."

"The Marquess of Crewe declared that the India Bill is the right milestone for the Government to stop and that India could realize the spirit which caused the Government to go thus far and no further."

লর্ড জেটল্যাণ্ডের কনিষ্ঠ অংশীদার ভারতবর্ষ।—*The National Call.*

পরিচালনার প্রয়োজন হইবে! তাঁবেদারকে অংশীদার বলাটা মন্দ পরিহাস নয়। ভারতবর্ষ কি হিসাবে কনিষ্ঠ হইল, তাহাও খুব সহজে বুঝা যায় না।

লর্ড জু বলেন, ভারতশাসন বিলটি গবর্মেণ্টের পক্ষে থামিবার ঠিক মাইল-প্রস্তর, এবং গবর্মেণ্ট যে কি ভাব হইতে আর অধিক অগ্রসর হন নাই তাহা ভারতবাসীরা উপলব্ধি করিতে পারিবে। অবশ্যই পারিয়াছে!

লর্ড জুদের ভান ও ভারতীয়দের উপলব্ধির মধ্যে প্রভেদ এই, যে, তাঁহারা বলিতেছেন ভারতীয়দিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দানে তাঁহারা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এখন থামা দরকার; আমরা ভাবিতেছি ভারতীয়দের হাত-পা যথেষ্ট বাঁধা হইয়াছে, এখন থামা দরকার!

—

"বিশ্বকোষ"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "বিশ্বকোষের" দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার ২৩শ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। এই সংস্করণের ১৯শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার একমাত্র ও কৃতী পুত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ বসু পরলোকগত হন। এই দুর্বিষহ শোক সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় এবং অক্ষুণ্ণ দক্ষতার সহিত, বৃহৎ গ্রন্থখানির উৎকর্ষ বজায় রাখিয়া, বিশ্বকোষের তিন সংখ্যা মাসে বাহির করিতেছেন। বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় সংস্করণটি তাঁহার পুত্রের স্মৃতির সহিত চিরকাল জড়িত হইয়া থাকিবে। প্রথম সংস্করণ শেষ হইবার অব্যবহিত পরে পুত্রটি জন্মগ্রহণ করে বলিয়া পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথেরই আগ্রহে, বিদ্যাবত্তায় ও কর্ম্মকুশলতায় দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ আরব্ধ হয়।

বিশ্বকোষ পড়িলে এত বিষয়ে এত জ্ঞান লাভ করা যায়, যে, ইহার অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষা লাভের সমান মনে হয়।

—

বিহারে পর্দ্দার উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা

গত ৮ই জুলাই বিহারে পর্দ্দা-উচ্ছেদ দিবসে নানাস্থানে পর্দ্দাবিরোধী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিহারে এখনও পর্দ্দার প্রকোপ বেশী। সেই জন্য এইরূপ প্রশংসনীয় চেষ্টার প্রয়োজন আছে। প্রথম যে-বৎসর যে-দিন পর্দ্দা-উচ্ছেদ প্রচেষ্টা আরব্ধ হয়, সেই দিনকার একটি ঘটনার কথা এখন মনে পড়িতেছে। উহা, যত দূর মনে পড়ে, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমাকে বলিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক মহিলার সঙ্গে একটি মহিলা শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শোভাযাত্রা ও সভার অধিবেশন শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি নিজের বাড়ি খুঁজিয়া ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ, তিনি কখনও বাড়ির বাহির হন নাই, সুতরাং রাস্তা হইতে তাঁহাদের বাড়ি ও তাহার দ্বার দেখিতে কেমন তাহা তিনি জানিতেন না, এবং হিন্দু নারীর শ্বশুর ও স্বামীর নাম করিতে নাই বলিয়া তাঁহাদেরও নাম বলিতে পারিতেছিলেন না। শেষে অন্য একটি তাঁহার পরিচিতা মহিলা তাঁহার শ্বশুরের নাম বলায় তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

বাংলা দেশে ধনী লোক ছাড়া গ্রামসমূহে অন্য লোকদের মধ্যে বেশী পর্দ্দা আগেও ছিল না, এখনও নাই। শহরে ছিল বটে, এখনও অনেকটা আছে। হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের মধ্যে পর্দ্দা বেশী। বাংলা দেশে পর্দ্দার বিরোধিতা প্রথম করেন ব্রাহ্মসমাজ। পরে, অসহযোগ-আন্দোলনে নারীদের যোগ, গৃহস্থদের নিজের মোটরগাড়ী ও ট্যাক্সি, এবং বস্ ও ট্রামে যাতায়াতে ব্যয়ের অল্পতা, কন্যাদিগকে একটু বেশী বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিতে হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে শিক্ষাদানের প্রয়োজন প্রভৃতি নানা কারণে বঙ্গে পর্দ্দা কমিয়া আসিয়াছে। এমন কি, কোন কোন মুসলমান মহিলাকেও বোরখা না পরিয়া রাস্তায় চলিতে দেখা যায়।

—

দু-কোটি টাকার সেতু

গঙ্গার উপর কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যে নূতন সেতু হইবে তাহাতে দু-কোটি টাকা খরচ হইবে। ইহার ঠিকা কে পাইবে তাহা লইয়া অনুমান চলিতেছে। ভারতবর্ষের অনেক ঠিকাদার এবং ভারতের বাহিরের ন্যূনকল্পে ছয়টি দেশের বহু ঠিকাদার, তাহারা কত টাকায় সেতুটি প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, তাহা জানাইয়াছে। এখন গবর্মেণ্ট

কাহাকে এই প্রভূত লাভের কাজটি দিবেন, লোকে তাহাই ভাবিতেছে। বাংলা স্বাধীন দেশ হইলে ইহা কোন বাঙালীকেই দেওয়া হইত। পরাধীন বলিয়া বাঙালীর ইহা পাইবার অধিকার নাই বলিতেছি না। অন্য ঠিকাদারদের সমান টাকায় কাজটি ভাল করিয়া করিয়া দিতে পারে এমন বাঙালী ঠিকাদার আছে, কিন্তু বাঙালী বলিয়াই হয়ত উহা কোন বাঙালী পাইবে না।

—

চীনে নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা

চীন দেশে নিয়ম হইয়াছে, যে, ছাত্রদিগকে এই সর্তে গ্র্যাডুয়েট হইতে দেওয়া হইবে, যে, তাহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করিবে। আমরা বহু বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি, যে, আমাদের দেশের লেখাপড়া-জানা লোকদের নিরক্ষর লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া একটি কর্ত্তব্য—ঋণপরিশোধ হিসাবে কর্ত্তব্য। চীনে আর একটি নিয়ম হইয়াছে, যে, দোকানের ও কারখানার মালিকদিগকে তাঁহাদের নিযুক্ত লোকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এরূপ নিয়ম আমাদের দেশেও হওয়া উচিত। সর্ব্বোপরি চীনে নিয়ম হইয়াছে, যে, ১৯৩৬ সালের ১লা মের পর যে-কেহ একখানি চৈনিক ভাষার বর্ণপরিচয় পড়িতে না পারিবে, তাহার অর্থদণ্ড হইবে।

আমাদের দেশে এই রকম সব আইন করাইবার চেষ্টা কেহ করিবার ইচ্ছা করিলে তাঁহার পক্ষে এড্‌ভোকেট-জেনার‍্যালের মত লওয়া ভাল, যে, এরূপ চেষ্টা সিদীশন বিবেচিত হইবে কি না।

—

লাহোরে শহীদগঞ্জের গুরুদ্বারা সম্বন্ধে শিখ-মুসলমান সংঘর্ষ

ধর্ম্মের জন্য যাঁহাদের প্রাণ যায়, তাঁহাদিগকে শহীদ বলে। মুসলমানী আমলে লাহোরের একটি জায়গায় একাধিক শিখ শহীদ হইয়াছিলেন বলিয়া উহা শহীদগঞ্জ নামে এবং তথাকার গুরুদ্বারা (শিখদের ধর্ম্মমন্দির) শহীদগঞ্জ গুরুদ্বারা নামে পরিচিত। তরু সিং নামক এখানকার এক জন শহীদের আখ্যায়িকা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "কথা" নামক পুস্তকে "প্রার্থনাতীত দান" শীর্ষক কবিতায় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

> "পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
> বন্দী শিখের দল—
> শহীদগঞ্জে রক্ত-বরণ
> হইল ধরণীতল।
> নবাব কহিল—শুন তরু সিং
> তোমারে ক্ষমিতে চাই।
> তরু সিং কহে, মোরে কেন তব
> এত অবহেলা ভাই?
> নবাব কহিল, মহাবীর তুমি
> তোমারে না করি ক্রোধ,
> বেণীটি কাটিয়া দিয়ে যাও মোরে
> এই শুধু অনুরোধ।
> তরু সিং কহে, করুণা তোমার
> হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
> যা চেয়েছ তার বেশি কিছু দিব—
> বেণীর সঙ্গে মাথা।"

এই কবিতাটির পাদটীকায় কবি লিখিয়াছেন, "শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্ম্মপরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়।"

পঞ্জাবে যখন শিখেরা রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী ছিল, তখনকার কোন সময় হইতে অদ্যাবধি প্রায় ১৭০ বৎসর এই গুরুদ্বারা শিখদের অধিকারে আছে। পূর্ব্বে ইহার এক অংশ মুসলমানদের দ্বারা মসজিদরূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা লইয়া মোকদ্দমা হয়, এবং পঞ্জাবে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টেরই উচ্চতম আদালত হাইকোর্ট রায় দিয়াছেন, যে, শিখরা ইমারৎসহ সমস্ত স্থানটির মালিক। গত মাসে কথা রটে, যে, উহার এক অংশ শিখরা ভাঙিয়া ফেলিবে। (পরে তাহা ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।) কতকগুলি মুসলমান বলপূর্ব্বক তাহা বন্ধ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া গুরুদ্বারার সম্মুখে জনতা করিতে থাকে। শিখেরাও কৃপাণ লইয়া—শিখমহিলারা পর্য্যন্ত তরবারি হাতে করিয়া—পাহারা দিতে থাকে। হতাহত কে কত জন হইয়াছে বা না হইয়াছে, তাহার সংবাদ দৈনিক কাগজে দ্রষ্টব্য। শুনা যায়, গবর্মেণ্ট সশস্ত্র

পুলিস এবং সিপাহী ও গোরা আমদানী করিয়া মোতায়েন রাখায় অবস্থাটা এখন ঠাণ্ডা আছে। তাহা সুসংবাদ।

পঞ্জাব গবন্মেণ্ট এই উপলক্ষ্যে যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহা অদ্ভুত এবং অশুভ ফল সূচনা করে। তাঁহারা এই মর্ম্মের কথা বলেন, যে, গুরুদ্বারার সবটিতে শিখদের আইনানুযায়ী অধিকার আছে বটে, কিন্তু তাহার এক অংশ ভাঙিয়া ফেলিয়া মুসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার এবং ভবিষ্যতে তাহা হইতে কোন কুফল ফলিলে তাহার নৈতিক দায়িত্ব (moral responsibility) শিখদের।

যাহারা শিখদের আইনসঙ্গত অধিকারে বাধা দিতে চাহিয়াছিল তাহারা অশান্তির জন্য মোটেই দায়ী নহে!

কোন ইমারতের উপর আইনসঙ্গত অধিকার অধিকারই নহে, যদি অধিকারী তাহা ইচ্ছামত দান বিক্রী পরিবর্ত্তন করিতে না-পারে, যদি তাহা সম্পূর্ণ বা অংশতঃ ভাঙিতে না-পারে, যদি তাহাতে নূতন কিছু যোগ করিতে না-পারে, বা একেবারে ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে অন্য ইমারৎ নির্ম্মাণ করিতে না-পারে। সুতরাং, পঞ্জাব গবন্মেণ্ট আইনসঙ্গত অধিকারের সঙ্গে একটা "নৈতিক" সর্ত্ত জুড়িয়া দিয়া অন্যায় করিয়াছেন। শিখরা পঞ্জাবে ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে এই গুরু-দ্বারাটির অধিকারী আছে।* সুতরাং শিখদের ইহা ভাঙিবার বা ইহার সম্বন্ধে অন্য কিছু করিবার অধিকার আছে। ইহা এক সময়ে মসজিদ থাকিলেও দেড় শত বৎসরের উপর সেভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। মুসলমানদের পক্ষে জন্তু-বিশেষের মাংস অপবিত্র ও নিষিদ্ধ। শিখদের পক্ষে কিন্তু তাহা ভক্ষণ বৈধ। এই শহীদগঞ্জ গুরুদ্বারার কোথাও শিখরা শতাধিক বৎসরের মধ্যে এই জন্তু বা তাহার রক্তমাংস অস্থি আনে নাই, বলা অসম্ভব। নানা দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে ইহার এককালীন-মসজিদত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার সম্পর্কে সংঘর্ষের জন্য দায়ী সেই মুসলমানেরা যাহারা শিখদের দ্বারা তাহাদের আইনানুসারে অধিকৃত সম্পত্তির ব্যবহারে বাধা দিতে গিয়াছিল এবং পুলিসের লাঠির দ্বারা তাড়িত হইয়াছিল। পঞ্জাব গবন্মেণ্ট হাঙ্গামার "নৈতিক দায়িত্ব" শিখদের ঘাড়ে না চাপাইয়া ঐ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাইলেই তাহা সঙ্গত ও সমীচীন হইত।

ইতিহাসে যদি ইহা দেখা যাইত, যে, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের উপর উপদ্রব করে নাই ও করিতেছে না, কেহ কাহারও ধর্ম্মমন্দির দখল, নষ্ট, অপবিত্র করে নাই বা করে না, তাহা হইলে তাহা মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইত ও গৌরবের বিষয় হইত। কিন্তু ইতিহাস এই প্রকার উদারতায় উজ্জ্বল না হইয়া তাহার বিপরীত আচরণে কলঙ্কিত। এই কলঙ্ক হইতে মুসলমান সম্প্রদায় যদি মুক্ত থাকিত, যদি তাহারা কখনও অন্য কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরে হস্তক্ষেপ, তাহা ধ্বংস, তাহা অধিকার, বা তাহার উপকরণ মসজিদ আদি নির্ম্মাণে ব্যবহার না-করিত, তাহা হইলে এ-বিষয়ে অপরকে উপদেশ দিবার অধিকার তাহাদের থাকিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে অধিকার তাহাদের নাই। অন্য কোন সম্প্রদায়ের আছে কি নাই, তাহা এখানে বিবেচ্য নহে।

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যাহা ইয়োরোপে তুরস্কের রাজধানী ছিল সেই ইস্তাম্বুলে (কন্‌স্টাণ্টিনোপলে) সেণ্ট সোফিয়ার গির্জ্জা মুসলমানদের দ্বারা মসজিদে পরিবর্ত্তিত হয়। এখন যদি খ্রীষ্টীয়ানেরা তাহা তাহাদের সাবেক গির্জ্জা ছিল বলিয়া তুর্কদের তাহার যথেচ্ছ ব্যবহারে বাধা দিতে চায় বা আপত্তি করে, তাহা হইলে তাহা "নৈতিক" ওজুহাতে কোন নিরপেক্ষ লোকের সমর্থনযোগ্য হইবে না। বহুপূর্ব্বে হিন্দুদের যে-সব মন্দির অন্যেরা ভাঙিয়াছে বা অন্য কাজে লাগাইয়াছে তাহা লইয়া এখন হিন্দুরা ঝগড়া বাধাইলে তাহার "নৈতিক দায়িত্ব" হিন্দুদের হইবে, অহিন্দু অধিকারীদের হইবে না। হিন্দুদের কোন গোরুর উপর যদি মুসলমানদের আইনসঙ্গত অধিকার কোন প্রকারে জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে হিন্দুরা এ-দাবি করিতে পারে না, যে, মুসলমানরা গোরুটির কেবল ঠিক্ সেই রূপ ব্যবহার করিবে যেমন হিন্দুরা গোরুর প্রতি করা উচিত বলিয়া থাকে। হিন্দুদের কোন ভূতপূর্ব্ব মন্দির বা তাহার ভিটা কোন প্রকারে অহিন্দুদের আইনসঙ্গত অধিকারে থাকিলে যেমন হিন্দুরা তাহার ব্যবহারের সম্পর্কে হিন্দুজনোচিত ব্যবহারের সর্ত্ত বা দাবি করিতে পারে না, সেইরূপ মুসলমানদের কোন ভূতপূর্ব্ব মসজিদও যদি অমুসলমানদের আইনসঙ্গত অধিকারে থাকে, তাহা হইলে মুসলমানদেরও ইহা বলিবার অধিকার নাই, যে, সেই ইমারতটি মুসলমানদের হাতে থাকিলে তাহারা তৎসম্বন্ধে

* পঞ্জাব হাইকোর্টের রায়ে আছে :—

"The history of the institution is given at length in the judgment of the learned President, and also in Ext : 0.59, a report prepared in July 1883 by Syed Alam Shah, Extra Assistant Commissioner, who mentions the traditional history. The place commemorates Bhai Taru Singh, who, with other Sikhs, was executed by the Mohammedan Governor of Lahore in 1746. He was considered a martyr and hence the name Shahid Ganj. It is clear that a building, which had previously been a mosque, was seized by the Sikhs when the Bhangi confederacy attained power, and Maharaja Ranjit Singh took a great interest in this Gurdwara."

যেরূপ আচরণ করিত অমুসলমানদিগকেও তাহাই করিতে হইবে।

যাহা প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর মসজিদরূপে ব্যবহৃত হয় নাই, আইনানুসারে অন্য প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে, এত দিন পরে মালিকদের দ্বারা সেই ইমারতটির স্বেচ্ছানুযায়ী ব্যবহারে বাধা দিবার প্রবৃত্তি কেন হইল তাহার বর্ণনা করা অনাবশ্যক। পঞ্জাব গবন্মেণ্ট যে পুলিস ও সৈন্য আমদানী করিয়া মুসলমানদিগকে শিখদের আইনসঙ্গত অধিকারে বাধা দিতে দেন নাই, তাহার জন্য ঠিক্ যেন মুসলমানদের নিকট মাফ চাহিবার নিমিত্ত শিখদের ঘাড়ে "নৈতিক দায়িত্ব" চাপাইয়া দিয়াছেন! অবশ্য, পঞ্জাব গবন্মেণ্ট যে মুসলমানদিগকে শিখদের অধিকারে বাধা দিতে দেন নাই, শিখ নারী ও পুরুষদের স্বাধিকাররক্ষার সামর্থ্য সাহস ও প্রবৃত্তি তাহার মূলীভূত কারণ বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

"ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সংবাদ সমিতি"

কলিকাতায় যে "ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সংবাদ সমিতি" ("Indian Science News Association") স্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভারতবর্ষে ও বঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারের সাহায্য হইবে। এই সমিতি স্থাপনে এবং ইহার জন্য জ্ঞানানুরাগীদের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভকল্পে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রথম হইতে চেষ্টা করিতেছেন। গত মাসে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিতে না পারিলেও তাঁহার একটি বক্তৃতা পঠিত হয়। সমিতি "সায়েন্স এণ্ড্ কল্‌চার" (Science and Culture) নাম দিয়া একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতেছেন। ইহার যে দুই সংখ্যা বাহির হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে, ইহাতে বিজ্ঞানের সকল শাখার অন্তর্গত নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকিবে এবং তদ্ভিন্ন সংস্কৃতি (culture) বিষয়ক কিছু লেখাও ইহাতে থাকিবে। সমিতি এইরূপ বাংলা পত্রিকা এবং পুস্তক-পুস্তিকাও বাহির করিবার আশা করেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বক্তৃতার বন্দোবস্তও সমিতি করিবেন। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিকেশব ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতারা সায়েন্স এণ্ড কল্‌চার পত্রিকা খানি দুই বৎসর বিনা মূল্যে ছাপিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং বিদ্যানুরাগী সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অজ্ঞাত থাকিতে চান এরূপ এক জন দাতা ছয় হাজার টাকা, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দুই হাজার টাকা এবং সর্ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সমিতিকে এক হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বোধনা-নিকেতন

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে স্থাপিত বোধনা-নিকেতন গত ১লা জুলাই তাহার প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব করিয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদিকা শ্রীমতী কণিকা দেবীর উৎসাহ ও চেষ্টায় উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে একটি বটবৃক্ষ রোপিত হয় এবং তাহার নাম রাখা হয় বোধনা-বট। উলুবেড়িয়ার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস ও তাঁহার তিন জন বন্ধু বোধনা-সমিতিকে বোধনা-নিকেতনের নিকট ২২৪ বিঘা জমি বিনামূল্যে দান করিয়াছেন। ঝাড়গ্রামের রাজাও পূর্ব্বে সমিতিকে এইরূপ সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করিয়াছিলেন। তাহাতেই তদুপরি নিকেতন প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইয়াছিল। অপরিণতমস্তিষ্ক ও জড়বুদ্ধি বালক-বালিকাদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য পরিচালিত এই বিদ্যালয়টি সর্ব্বসাধারণের সর্ব্ববিধ সাহায্য পাইবার উপযুক্ত। ইহার সম্বন্ধে সমুদয় তথ্য ভবানীপুরের ৬-৫ বিজয় মুখুজ্যের গলি ঠিকানায় ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, কে চিঠি লিখিলে জানিতে পারা যায়। সাহায্যও তাঁহার নিকট প্রেরিতব্য।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা দেশ ভাষায় লইবেন, সুতরাং তদুপযোগী সকল প্রকার পুস্তকও বাংলায় লিখিতে হইবে এবং বাংলার সাহায্যেই শিক্ষাও দিতে হইবে। তাহার জন্য বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিধ বহু পারিভাষিক শব্দ, প্রচলিত না থাকিলে, রচনা করিতে হইবে। তদর্থে যোগ্য লোকদিগকে লইয়া কমীটি গঠিত হইয়াছে। গণিতের কমীটি ২৭ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন এবং তাহার ভূমিকায় তাঁহারা যেরূপ নিয়ম অনুসরণ করিয়া কাজ করিতেছেন তাহাও বিবৃত করিয়াছেন। তাহা আলোচনার যোগ্য।

বাণীপীঠ ও নারীশিক্ষা-পরিষদ

দেশে প্রচলিত বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এইরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প যেখানে প্রধানতঃ অবসর-সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে, মধ্যবিত্ত পরিবারের কুমারী, সধবা ও বিধবাগণ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া সংসারের অভাব-অনটনের কথঞ্চিৎ সমাধান করিতে পারেন।

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দুঃস্থা মহিলাদিগের অনুরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করায় জন্য ডায়োসেশন কলেজের ভূতপূর্ব্ব

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র বাগছী প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মী বিদ্যাসাগর বাণীভবনের তৎকালীন অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবীর নেতৃত্বে ১৯৩৪ সনের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা ৯ নং নারিকেলবাগান লেনে "বাণীপীঠ" নামে একটি নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি বাড়িতে একটি ক্ষুদ্র ছাত্রীনিবাসেরও পত্তন করা হয়। শিক্ষার্থিনীগণের অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যালয়ের বেতন ও ছাত্রীনিবাসের ব্যয়ের হার যথাসম্ভব সুলভ করা হয় এবং বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম অবস্থা হইতেই কয়েকটি অনাথা মেয়েকে বিনা ব্যয়ে ছাত্রীনিবাসে ও বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয়। বিদ্যালয়স্থাপনের সূচনা হইতেই কয়েক জন অভিজ্ঞ অধ্যাপক বিনা বেতনে অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন।

দেশে এখন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর যথেষ্ট অভাব এবং শিক্ষিতা নারীগণের উপার্জ্জনের পথ সেইদিকেই সমধিক প্রশস্ত। সেই জন্য এই নব প্রতিষ্ঠানে প্রধানতঃ উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবারই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষারও আয়োজন করা হয়; প্রথমতঃ মাত্র দুইটি ছাত্রী লইয়া এই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু ছাত্রীর সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় এপ্রিল মাসে ৬১, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে একটি ত্রিতল গৃহে বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস স্থানান্তরিত করা হয়। পরে ইহাতেও স্থানসঙ্কুলান না হওয়াতে উক্ত বাড়ির সংলগ্ন ৬ নং বাদুড়বাগান লেনে দুইটি বাড়ি ভাড়া লওয়া হয় এবং তথায় শিল্পবিভাগ এবং প্রাথমিক শ্রেণী ইত্যাদি স্থানান্তরিত করা হয়।

গত বৎসর এই বিদ্যালয় হইতে ত্রিশটি ছাত্রীকে বিভিন্ন ট্রেনিং বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহাদের সকলেই উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ট্রেনিং বিদ্যালয়সমূহে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে।

সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর নেতৃত্বে ছাত্রীদিগকে নানাবিধ হাতের কাজ, ফার্ষ্ট-এড ও হোম-নার্সিং প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিল্প, ফার্ষ্ট-এড্ ও হোম-নার্সিঙে অনেক ছাত্রী দক্ষতা লাভ করিয়া পদক ও প্রশংসাপত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে সাধারণতঃ অধিকবয়স্কা মহিলাগণকে অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাট্রিক পাস করাইবার জন্য বিভিন্ন কোচিং ক্লাস খোলা হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে উন্নততর প্রণালীতে শিক্ষাদানের নিমিত্ত এই বৎসরে শিশুশ্রেণীসমূহও খোলা হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে "বাণীপীঠের" ক্রমিক উন্নতি তথা মেয়েদের শিক্ষার জন্য আকুল আগ্রহ দেখিয়া ইহার কর্ম্মিগণ দেশে ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্য শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর পরিচালনায় গত ১০শে জানুয়ারী এক সভায় 'নারী শিক্ষা-পরিষদ্" নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সভায় পরিষদের ভবিষ্যৎ কার্য্য-সূচির পরিকল্পনা করা হয়। পরে একটি কার্যানির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইলে পরিষদের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী প্রভৃতি প্রণয়ন করা হয়।

এরূপ প্রতিষ্ঠান দেশে যত অধিক হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। আশা করি দেশবাসীর সহায়তা লাভে দিন-দিন এই প্রতিষ্ঠানটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া দেশের তথা মাতৃজাতির একটি বিশেষ অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইবে। যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা বাণীপীঠের অর্গ্যানাইজিং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন লাহিড়ীকে চিঠি লিখিতে ও সাহায্য পাঠাইতে পারেন।

—

"বঙ্গীয় মহাকোষ"

ইংরেজীতে (এবং অন্য প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য ভাষায়) সর্ববিদ্যা-বিষয়ক এন্সাইক্লোপীডিয়া নামক বড় ও ছোট অনেক কোষ আছে। আমরা তাহার কোন-কোনটি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, সকলের চেয়ে বড় যে এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা তাহাতে এমন কোন কোন জিনিষ পাওয়া যায় না যাহা ক্ষুদ্রতর কোষে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কোন একখানি কোষকে যত বড়ই করা যাক্ না কেন তাহাকে সকল জ্ঞানের আধার করা অসম্ভব। এক সঙ্কলকসমষ্টি যাহা যাহা জানা আবশ্যক বা অনাবশ্যক মনে করেন, অন্য এক সঙ্কলকসমষ্টি তাহা তত আবশ্যক বা অনাবশ্যক মনে না-করিতে পারেন। এই জন্য কোন ভাষার সাহায্যে নানাবিধ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেমন একই বিষয়ে বহু গ্রন্থের প্রয়োজন, তেমনই একাধিক সর্ব্ববিদ্যা-বিষয়ক কোষেরও আবশ্যক। এই কারণে, আমরা "বিশ্বকোষ" থাকিতেও "বঙ্গীয় মহাকোষ" আবশ্যক মনে করি। ইহা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রধান সম্পাদকতায় বহুসংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তির সহযোগিতায় যত্নের সহিত সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইতেছে। আমরা এপর্য্যন্ত ইহার চারি সংখ্যা পাইয়াছি। তাহাতে সর্ব্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠা আছে। চতুর্থ সংখ্যাটি অন্যান্য সংখ্যার মত উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম চিত্র সহ সুমুদ্রিত। ভারতীয়দের ও বাঙালীদের যাহা জানিতে কৌতূহল হয় এবং যাহা জানা আবশ্যক এমন অনেক জিনিষ ইংরেজী এন্সাইক্লোপীডিয়া-সমূহে পাওয়া যায় না। এরূপ অনেক বিষয় বঙ্গীয় মহাকোষে পাওয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন এন্সাইক্লোপীডিয়া মাত্রেই যাহা পাওয়া যায়, তাহাও পাওয়া যাইবে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রবেশিকার শিক্ষা ও পরীক্ষা বাংলায় করাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা অন্য বহু বিষয় কোষ-গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিয়া সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

—

শিক্ষায় ও গবেষণায় বাঙালী

কয়েক বৎসর বাঙালী ছাত্রেরা কোন কোন সরকারী কার্য্যবিভাগে নিয়োগের জন্য সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতা-মূলক কোন কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না-হওয়ায় বা উত্তীর্ণ হইয়াও নিম্নস্থানীয় হওয়ায় এইরূপ একটা ধারণা কাহারও কাহারও হয়, যে, বাঙালী ছেলেদের মস্তিষ্কের অবনতি হইয়াছে। আমাদের সেরূপ ধারণা হয় নাই। যে তথ্যের উপর ঐরূপ ধারণা প্রতিষ্ঠিত, তাহার অন্য অনেক কারণ থাকিতে পারে, এবং ইহাও অবশ্য ঠিক, যে, বাঙালী ছাত্রেরা অনেকে জ্ঞানলাভের জন্য পরিশ্রম কম করে। কিন্তু বাঙালী ছেলেদের বুদ্ধি কমিয়া গিয়াছে, ইহা সত্য নহে।

আমাদের এই মতের সমর্থনে আমরা কয়েক বার দেখাইয়াছি, যে, জার্মেনীতে শিক্ষালাভের জন্য তথাকার একটি পরিষদ ভারতীয় ছাত্রদিগকে যতগুলি বৃত্তি দেয়, তাহার যতগুলি বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা এপর্য্যন্ত পাইয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের ছাত্রছাত্রীরা তার চেয়ে বেশী পায় নাই, বরং কম পাইয়াছে। ঐ জার্ম্মান পরিষদের বাঙালীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোন কারণ নাই। আমরা একাধিক বার আর একটি বিষয়ও বিবেচনা করিতে বলিয়াছি। বৈজ্ঞানিক কোন কোন বিষয়ে গবেষণার জন্য বোম্বাইয়ের লেডী টাটা ট্রাষ্টের ট্রাষ্টীরা বিদেশীদিগকে কতকগুলি এবং ভারতীয় গবেষকদিগকে কয়েকটি বৃত্তি প্রতিবৎসর দিয়া থাকেন। যে-সব ভারতীয় গবেষক এপর্য্যন্ত এই বৃত্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা কম নয়। এক্ষেত্রেও বাঙালীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোন কারণ নাই। এ-বৎসর যে দশ জন ভারতীয় বিদ্যার্থী বৃত্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ছয় জন বাঙালী। যথা—নীরদচন্দ্র দত্ত এম্‌-এস্‌সি, মাধবচন্দ্র নাথ এম্‌-এস্‌সি, রামকান্ত চক্রবর্ত্তী এম্‌-এস্‌সি, নলিনবন্ধু দাস বি-এস্‌সি, এবং ধীরেন্দ্রকুমার নন্দী পিএইচ-ডি। ইঁহারা সকলেই মাসিক দেড় শত টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন।

—

"বঙ্গীয় শব্দকোষ"

দুটি এন্সাইক্লোপীডিয়ার বিষয় এ-মাসে লিখিয়াছি। "বঙ্গীয় শব্দকোষ" সম্বন্ধেও কিছু লেখা কর্ত্তব্য। ইহা এন্সাইক্লোপীডিয়া নহে, সাধারণ অভিধান। ইহা সমাপ্ত হইবার পর সকলের চেয়ে বড় বাংলা অভিধান হইবে। ইহার সঙ্কলয়িতা অধ্যাপক পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা শান্তিনিকেতন হইতে বাহির করিতেছেন। তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি এতবড় একটি কাজ একা করিতেছেন এবং দরিদ্র হইলেও নিজের ব্যয়ে অভিধানটি প্রকাশ করিতেছেন। এক-একটি শব্দের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় প্রয়োগের যত দৃষ্টান্ত তিনি দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার বহু অধ্যয়ন ও শ্রমশীলতায় চমৎকৃত হইতে হয়। এ-পর্য্যন্ত ইহার ২৩টি খণ্ড বাহির হইয়াছে। তাহাতে "কটাক্ষ" ও "কটাখ" পর্য্যন্ত শব্দগুলি পাওয়া যায়। ইহা সমুদয় বিদ্যালয় ও কলেজে রাখা কর্ত্তব্য। কলেজ বলিতেছি এই জন্য, যে, কলেজের ছাত্রছাত্রীদিগকেও বাংলা পড়াইতে ও পড়িতে হয়।

—

বাংলা ও আসামের ব্যবহারজীবীদের কন্‌ফারেন্স

গত মাসে কলিকাতায় ব্যারিষ্টার ছাড়া অন্য ব্যবহারজীবীদের যে কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যে-সব প্রস্তাব ধার্য্য হয়, নীচে তাহার কয়েকটি প্রদত্ত হইল।

"নিখিল বঙ্গ ও আসাম ব্যবহারজীবী সমিতি" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা ও রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে।

উকিল হইতে যাঁহারা এড্‌ভোকেট হইয়াছেন সেই সমস্ত এডভোকেট, ভকিল ও উকিল এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

ভারতে একটি স্বাধীন "বার" খুলিতে হইবে। কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাপেলেট কোর্টে যাঁহারা ওকালতী করেন তাঁহাদিগকে আদিম বিভাগে কাজ করিতে দিতে হইবে। কলিকাতায় একটি সিটি সিভিল কোর্ট স্থাপন করিতে হইবে। বিচারক-পদে আইন-ব্যবসায়ীগণকে লইতে হইবে। ১৯২১ সালের পূর্ব্বে যেরূপ কোর্ট-ফী ছিল, সেইরূপ কোর্ট-ফী কমাইতে হইবে। ষ্ট্যাম্পের মূল্যও ১৯২১ সালে যেরূপ ছিল, সেইরূপ করিতে হইবে। বঙ্গে নারী-হরণ ও নারী-নির্য্যাতন বিশেষ পরিমাণে হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা যাইতেছে। ল-কলেজে আইন পড়াইবার কাল তিন বৎসরের স্থলে দুই বৎসর করিতে হইবে। প্রেসিডেন্সী শহর ছাড়া অন্যত্র আদালতে বাংলায় যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তাহা বাংলাতেই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

—

আবিসীনিয়া ও ইটালী

আবিসীনিয়ার অপরাধ অনেক—কোনটা আগে বলিব? আফ্রিকায় ঐ দেশ অবস্থিত। তথাকার অন্য কোন দেশ স্বাধীন নাই (মিশরও ঠিক্ স্বাধীন নহে)। পরাধীন-দেশপূর্ণ এরূপ মহাদেশে হাবসীরা স্বাধীন থাকিবে, এটা বড় বেমানান। অতএব, সৌন্দর্য্যের উপাসক ইটালী আবিসীনিয়াকে মানানসই করিয়া দিবে, তাহার স্বাধীনতা লুপ্ত করিবে। আর একটা অপরাধ এই, যে, হাবসীরা অনেকে খ্রীষ্টিয়ান হইলেও সভ্য ইয়োরোপীয় ঢঙের খ্রীষ্টিয়ান নহে, এবং এটা অত্যন্ত বড় অপরাধ, যে, তাহারা ইয়োরোপীয়দের মত ফিকে লাল না হইয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মানুষরা কেন স্বাধীন থাকিবার আস্পর্দ্ধা করিবে? ইহাও অসহ্য যে আগে একবার ইটালী তাহাদিগকে সায়েস্তা করিতে গিয়া যুদ্ধে হারিয়া আসিয়াছিল। তাহার প্রতিশোধ লওয়া চাই। আবিসীনিয়ার আর একটা অপরাধ এই, যে, অতীতের রোম নিজের পূর্ব্বেকার সাম্রাজ্য স্মরণ করিয়া আবার বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে চায়, এবং আবিসীনিয়া রোমের আধুনিক সাম্রাজ্যভুক্ত হইতে চাহিতেছে না। আবিসীনিয়ার আরও নানা অপরাধ থাকিতে পারে। এখন কেবল আর একটা মনে পড়িতেছে—সে অস্ত্রসম্ভারে দরিদ্র ও দুর্ব্বল। একদা এক ছাগশিশু ব্রহ্মার কাছে নালিশ করে, যে, সবাই তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। ব্রহ্মা বলেন, বাপু হে, তুমি যেরূপ নিরীহ ও দুর্ব্বল তাহাতে আমারও সেইরূপ ইচ্ছা হইতেছে। পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার জন্য,

জাতিতে জাতিতে ঝগড়া বিনা যুদ্ধে সালিসীদ্বারা মিটাইয়া দিয়া যুদ্ধ নিবারণের জন্য, লীগ অব নেশুন প্রতিষ্ঠিত হয়। আবিসীনিয়া তাই লীগের কাছে বার-বার আপীল করিতেছে। কিন্তু প্রবলের বিরুদ্ধে লীগ কি করিবে? ব্রিটেন ও ফ্রান্স লীগের প্রধান সভ্য। তাহারা উভয়েই সাম্রাজ্যের মালিক। তাহারা যে প্রকারে সাম্রাজ্য গড়িয়াছে, বাড়াইয়াছে, ইটালীর সেই উপায় অবলম্বনে বাধা তাহারা দিতে পারে না, চায় না—বিশেষতঃ যখন আবিসীনিয়ার চেয়ে ইটালী শক্তিশালী এবং ইটালী ইয়োরোপে, আবিসীনিয়া আফ্রিকায়। ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে প্যারিসে, প্রধানতঃ আমেরিকার অন্যতম সেক্রেটরী কেলগ সাহেবের উদ্যোগে, ১৫টা প্রধান প্রধান দেশের মধ্যে এই মর্ম্মের একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যে, তাহারা অন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধানে যুদ্ধের সাহায্য লওয়া গর্হিত মনে করে এবং পরস্পরের সম্পর্কে জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অবলম্বিত নীতি (policy) হিসাবেও যুদ্ধকে বর্জ্জন করিতেছে। স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে ইটালী ও আমেরিকা উভয়েই ছিল। আবিসীনিয়া তাই কেলগ-চুক্তির দোহাই দিয়া আমেরিকাকে শান্তিরক্ষা বিষয়ে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছিল। আমেরিকা কিছুই করে নাই, করিবেও না—সে নিজের ঘর সামলাইতে ব্যস্ত।

আর এক রকম ভণ্ডামির সূত্রপাত হইয়াছে। বলা হইতেছে, সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজে করিয়া বা অন্য প্রকারে বিবদমান জাতিদের কাহাকেও অস্ত্রনির্ম্মাতারা অস্ত্র সরবরাহ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইটালী ইয়োরোপে, এবং তাহার নিজের অস্ত্রের কারখানা আছে। তাহাকে সুয়েজের পথে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে না, আবিসীনিয়াকেই তাহা করিতে হইবে। সে তাহা করিতে না-পাইলে বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ কেমন করিয়া চালাইবে? তা ছাড়া তাহার ধনবল কম। কত অর্থই বা সে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য দিতে পারে? জাপান ধনশালী ও প্রবল; তাহার অস্ত্রক্রয়ে বাধা জন্মাইবার প্রবৃত্তি ও সাহস ইয়োরোপের অস্ত্রনির্ম্মাতা জাতিদের হয় নাই। চীন প্রবল না হইলেও আবিসীনিয়ার মত ছোট ও দরিদ্র নহে। সুতরাং সেও অস্ত্র কিনিতে পাইয়াছে ও পাইতেছে।

ইংলণ্ড, অবশ্য নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, ব্রিটিশ-সোমালিল্যাণ্ডে সমুদ্রতটে আবিসীনিয়াকে কিছু জায়গা দিতে চাহিয়াছিল। তাহাতে কিন্তু আবিসীনিয়ার জলপথ দিয়া যুদ্ধ-সামগ্রী আমদানী করিবার সুবিধা হইত। ইটালী ইংলণ্ডের এই বদান্যতায় রাজী নয়।

ইটালী অবিসীনিয়া অভিমুখে সৈন্য পাঠাইয়া চলিতেছে।

—

শান্তিবাদ প্রচার ও সমর্থন

বড় বড় দেশগুলির গবর্মেণ্টের মন্ত্রী দূত প্রভৃতি যুদ্ধসজ্জা কমান, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি নানা উপায়ে পৃথিবীতে স্থায়ী ভাবে শান্তি রক্ষা ও স্থাপনের কথা অনেক বৎসর ধরিয়া চালাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কে যে প্রতিদ্বন্দ্বী বা সম্ভাবিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপেক্ষাকৃত হীনবল করিবার জন্য কৌশল অবলম্বনার্থ কথা চালান নাই, তাহা বলা শক্ত। সুতরাং সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির ফলে যে ব্যর্থতার উদ্ভব হয়, এ-পর্য্যন্ত তাহাই হইয়াছে।

পৃথিবীর গবর্ন্মেণ্টপক্ষীয় লোক নহেন এরূপ কতকগুলি আদর্শানুরাগী (idealist) মনীষী আছেন যাঁহারা বাস্তবিক জাতিতে জাতিতে শান্তি চান। তাঁহারা লেখা বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা সকল দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধবিরাগী ও শান্তির অনুরাগী করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্পাদক ও গ্রন্থকার আঁরী বারবুস্ (Henri Barbusse) আগামী নবেম্বর মাসে প্যারিসে শান্তিবাদের সমর্থক একটি কংগ্রেসের আয়োজন করিতেছেন। সকল দেশের লোকদের সমর্থন এই কংগ্রেসের উদ্যোক্তারা চান। সকল দেশের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে উপস্থিত হইবেন, উপস্থিত হইতে না-পারিলে নিজ নিজ বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইবেন। কবিসার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, কবি ও স্বরাজপ্রচেষ্টার অন্যতমা নেত্রী সরোজিনী নাইডু, এবং পত্রিকাসম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আপাততঃ উদ্যোক্তারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিতে সম্মতি পাইয়াছেন।

নবেম্বরের পূর্ব্বেই প্যারিসের অনতিদূরবর্ত্তী ইটালীর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু কোন মহৎ আদর্শই এক দিনে প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হয় নাই। অধর্ম্মকে যে কপটতার মুখোস পরিতে হয়, তাহার দ্বারাও সে ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার করে। গবর্মেণ্টপক্ষীয় লোকেরা মনে শান্তি না চাহিলেও মুখে যে শান্তিকামী সাজে, তাহাতেই শান্তিবাদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। এমন সময় আসিবে, যখন রাষ্ট্রনেতা রাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতদিগকেও কপটতা পরিহার করিয়া অকপটভাবে শান্তিসমর্থক হইতে হইবে।

—

সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ নির্ব্বাচন

আমেরিকা সকলের চেয়ে বড় ফেডারেশান। সেখানে সেনেট ও প্রতিনিধিসভা উভয়ের সদস্যেরা সাক্ষাৎভাবে নির্ব্বাচকদের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। ব্রিটেন প্রভৃতি দেশেও সাক্ষাৎ নির্ব্বাচন প্রচলিত। ভারতবর্ষেও এ-পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে কোন কুফল হয়

নাই। এখানকার গবর্মেণ্টও তাহার সমর্থক। তথাপি ভারতশাসন বিলে কৌন্সিল অব ষ্টেট ও য়্যাসেমব্লী উভয়েরই সদস্যদের পরোক্ষ নির্ব্বাচনের—প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির দ্বারা নির্ব্বাচনের—ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হাউস অব্ কমন্স পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থা মঞ্জুর করেন। এক্ষণে হাউস অব লর্ডসে স্থির হইয়াছে, যে, কৌন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য-নির্ব্বাচন ভোটরেরা স্বয়ং সাক্ষাৎ ভাবেই করিবে। ব্রিটেনের স্বার্থহানি ইহাতে না-হইয়া হয়ত বরং আরও উত্তমরূপে তাহা রক্ষিত হইবে। কিন্তু য়্যাসেমব্লীর সদস্য-নির্ব্বাচন পরোক্ষভাবেই হইবে! নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার এরূপ খিচুড়ি আর কোথাও নাই।

—

বঙ্গের তিনটি সমস্যা

অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহে বাংলার তিনটি প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ।

প্রথমটি আর্থিক।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করিবার আয়োজন চলিতেছে। এই অবস্থায় বাঙ্গালা দেশের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হইবে। এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশের মোট রাজস্ব ৩৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে টাকা থাকিবে তাহার পরিমাণ ১১ কোটি টাকার বেশী হইবে না। এই ১১ কোটি টাকা রাজস্ব দ্বারা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে পাঁচ কোটি বঙ্গবাসীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে। এদিকে নূতন শাসনতন্ত্রে বোম্বাই প্রদেশের ১৬ কোটি টাকা রাজস্ব হইবে। এই টাকায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ বোম্বাইবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করা হইবে। বোম্বাইয়ের অনুপাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে কমপক্ষে ২০ কোটি টাকা রাজস্ব দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হইবে না। এই সকল আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের আমলে অন্যান্য সকল প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালা দেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা একটি ঘাটতি প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। ঋণ করিয়া শাসনকার্য্য চালান হইতেছে। ইহা সত্ত্বেও এরূপ বলা হইতেছে যে, নব-গঠিত সিন্ধু ও উৎকল ঘাটতি প্রদেশগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহার কিয়দংশ বাঙ্গালা দেশের নিকট হইতে লইতে হইবে।

বঙ্গের দ্বিতীয় গুরুতর সমস্যা উহার সীমা লইয়া।

বাঙ্গালা দেশের বহু স্থান বিহার ও উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের ক্ষতি হইয়াছে এবং শিক্ষা সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার দিক দিয়াও বাঙ্গালা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যে কারণে ও যে নীতি অনুসারে উড়িষ্যাকে বিহার হইতে পৃথক করা হইতেছে, ঠিক সেই কারণে এবং সেই নীতিতে বাঙ্গালার কয়েকটি ঐশ্বর্য্যশালী ও স্বাস্থ্যকর জেলাকে পুনরায় বাঙ্গালা দেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হইতে বঙ্গের তৃতীয় সমস্যার উদ্ভব।

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে সম্প্রদায়গুলির সম্পর্কে যে সামঞ্জস্য করা হইয়াছে, তাহা মোটামুটি লক্ষ্ণৌ-চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটি[illegible] প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা এই সামঞ্জস্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দুগণকে শক্তিহীন করিয়া রাখিবার জন্যই একটি সম্প্রদায়-বিশেষের দাবি মানিয়া লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায় এই প্রদেশে সংখ্যায় অধিক। তাঁহারা যদি আইনের বলে প্রাধান্য রক্ষা ও ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যপদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখার দাবি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বঙ্গদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় অল্প সম্প্রদায় অতএব আসন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখার দাবি তাঁহারা করি[illegible] পারেন। তথাপি তাঁহারা সে দাবি করিতেছেন না। এরূপ অবস্থা[illegible] মুসলমানগণ যদি তাঁহাদের দাবি প্রত্যাহার করেন, তাহা হই[illegible] এখনও যুক্তনির্ব্বাচনের ভিত্তিতে প্রকৃত গণতন্ত্র গঠন সম্ভবপর হই[illegible] পারে। মিঃ জিন্না প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, মুসলমানদের জন্য আসন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া এবং প্রাপ্তবয়স্ক সকলকেই ভোটাধিকার দিয়া যুক্ত-নির্ব্বাচন স্বীকার করা যাইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা হইলে বাঙ্গালা ও পঞ্জাবে স্থায়ীভাবে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য প্রতিষ্ঠি[illegible] হইবে। এই কারণেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এরূপ সময়ে নিজেদের মতে এবং নিজেদের মধ্যে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য।

সমস্যাগুলি যে গুরুতর তাহা আমরাও বলি। কিন্তু আমাদের ধারণা এই, যে, যখন ব্রিটিশ জাতি বা তাহাদের কোন সময়ের নেতারা বুঝিবে যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষিত ও ব্রিটিশ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, বরং উল্টা ফল ফলিতেছে, তখন উহা পরিবর্ত্তিত বা পরিত্যক্ত হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। হিন্দুরা নিজেদের কাজের দ্বারা ব্রিটিশ জাতির এই বোধ জন্মাইতে পারেন, বাক্যের দ্বারা নহে। অন্য দুটি সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা স্বয়ং গবর্মেণ্ট-নিরপেক্ষভাবে কি করিতে পারি, তাহা স্থির করা চাই, এবং সঙ্গে সঙ্গে মেস্টনী ব্যবস্থার ও বঙ্গের আয়তন হ্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলনও চালান চাই।

—

লিবার্যাল ও কংগ্রেসওয়ালাদের সহযোগিতার প্রস্তাব

মডারেট নামে অভিহিত লিবার্যালদিগের অন্যতম নেতা পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় কংগ্রেস-ওয়ালা ও লিবার্যালদের একযোগে কাজ করিবার কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন—

লিবার্যাল দল নূতন শাসনবিধি হইতে জাত যে কোনও বিপদ দূর করিতে কংগ্রেসওয়ালাদিগের সহিত একত্র কার্য্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। কিন্তু যাঁহারা লিবার্যাল দলের কার্য্যনীতির প্রতি সকল সময়ে অসৎ উদ্দেশ্য আরোপ করেন, এ-অবস্থায় তাঁহাদের নিকট হইতেই প্রথম আহ্বান আসা উচিত। এ-অবস্থায় বিরুদ্ধ মনোভাব বা বিভাগের কথাই উঠিতে পারে না। দুই বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্য্যপদ্ধতিতে অমিল থাকিলেও উদারনৈতিক দল সকল সময়ে তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী দলের স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগের প্রশংসা করেন। কংগ্রেসের সদস্যগণ বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে কার্য্য করিতেছেন এবং উদারনৈতিক দল এতকাল ধরিয়া যাহা করিয়া

দিতেছেন, এই দুইয়ের মধ্যে তিনি কোন তফাৎ দেখিতে পাইতেছেন যদি একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার জন্য কোনও গঠনমূলক করা হয়, তবে উদারনৈতিক দল নিশ্চয়ই তাহা অগ্রাহ্য । কিন্তু যাঁহারা উদারনৈতিক দল সম্বন্ধে ভুল মত পোষণ তাঁহাদের কার্য্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদেরই ানয়ন করা উচিত।

ও মনে হয়, অসহযোগ নীতি স্থগিত রাখার ংগ্রেস যাহা যাহা করিতেছেন, অগ্রসর লিবার্‌য়্যালরাও করিয়া থাকেন, বা করিতে পারেন; অন্য ন্যাশন্যালিষ্টরাও পারেন। সুতরাং সকলেরই পরস্পরের সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য।

—

হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়

হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়

ঝরিয়ার বাঘদীঘি কয়লার খনিতে গত ২৯শে জুন খাদের ভিতরের গ্যাসের বিস্ফোরণে ১৯টি মানুষের প্রাণ গিয়াছে এবং ৭ জন আহত হইয়াছে। তাহারা সম্ভবতঃ সারিয়া উঠিবে। এই দুর্ঘটনা ঐ দিন রাত্রি প্রায় ৯টার সময় ঘটে। রাত্রে যে ১৫০ জন শ্রমিকের কাজ করিবার পালা, তাহারা যখন কাজ করিতেছিল, তখন তাহাদের উপরওয়ালা শ্রমিকের এই আশঙ্কার কারণ ঘটে, যে, একটা বিপদ আসন্ন। সেই জন্য সেই ১৫০ লোককে খনি হইতে উঠিয়া আসিতে বলা হয়। তাহার পর খনির সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়কে বিপৎসম্ভাবনা জানান হয়। তখন তিনি শ্রমিকপ্রধানকে সঙ্গে লইয়া অবস্থানির্ণয় করিতে এবং, আবশ্যক হইলে, যে দু-জন খালাসী ও দু-জন দমকলওয়ালা তখনও খনির ভিতর কাজ করিতেছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে নীচে নামেন। তখন ভীষণ শব্দে বিস্ফোরণ হয় এবং হরিসাধন বাবুর ও শ্রমিকপ্রধানের মৃতদেহ খনির মুখ দিয়া বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়। আগে যে ১৫০ জন শ্রমিককে খনি ত্যাগ করিতে বলা হয়, তাহাদের কতক লোক তখনও খনি-মুখে ভিড় করিয়া ছিল। খনি-মুখ দিয়া উদ্গত অগ্নিশিখায় তাহাদের মধ্যে ২১ জন দগ্ধ হয়। তাহার মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। খনির মধ্যে মৃত ৫০জনের দেহ উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই; কারণ আগুন জ্বলিতে থাকায় নীচে নামা অসাধ্য।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়ের ও শ্রমিকপ্রধানের আসন্ন বিপদেও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য সকলেই তাঁহাদের বীরত্বের ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করিবেন। অন্য লোকটির নামধাম ও জীবনবৃত্তান্ত কিছু জানা যায় নাই। হরিসাধন বাবু সন ১৩০০ সালের ২৫শে ফাল্গুন, ১৮৯৪ সালের ৯ই মার্চ্চ, বেহালায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার কালীতলায় যে বেচু চাটুজ্যের নামে একটি রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে, তিনি তাঁহার অন্যতম বংশধর। তিনি ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কয়েক বৎসর পরে ১৯২৩ সালে খনি-এঞ্জিনীয়ার (mining engineer) হন। প্রথমে বাগদীঘির খনিতেই শিক্ষানবীসী করেন। যখন ১৯৩০ সালে ঝরিয়ায় খনি ধসিয়া যায়, তখন তিনি যথাসময়ে সাবধান করিয়া দিয়া দুই-তিন হাজার লোকের প্রাণরক্ষা করেন।

অল্প বয়সে এরূপ মানুষের মৃত্যু শোকাবহ; কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা এই, যে, তিনি বীরের মত প্রাণ দিয়াছেন। যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয় নাই। বিস্ফোরণ এরূপ প্রচণ্ড হইয়াছিল, যে, তাঁহার মৃতদেহ খনিমুখ হইতে ৩০০ ফুট দূরে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং সেখানে পাওয়া যায়।

—

ডাক-বিভাগের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা

ডাক-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনার‍্যাল উহার আয় বাড়াইবার নানা চেষ্টা করিতেছেন। তাহা করুন। কিন্তু পোষ্টকার্ড ও চিঠির মাশুল, পুস্তকাদি মুদ্রিত জিনিষের প্যাকেটের মাশুল, রেজিষ্টারীর খরচ, মনিঅর্ডারের কমিশন ও ভ্যালুপেয়েবলের কমিশন কমাইয়া আগেকার মত না-করিলে আয় যথেষ্ট বাড়িবে না। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে লোকদের শীঘ্র শীঘ্র চিঠি ও মনিঅর্ডারের টাকা পাইবার, ও সেবিংস

ব্যাঙ্কের টাকা শীঘ্র পাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। কলিকাতা হইতে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামের কথা দূরে থাক্, কলিকাতার এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় ডাকে চিঠি যাইতে কখনও কখনও যত সময় লাগে, কাশী যাইতে তার চেয়ে বেশী লাগে না। এদিকেও উন্নতি আবশ্যক। ডাকঘরের আয় হইতে টেলিগ্রাফ টেলিফোনের ঘাটতি মিটানও অনুচিত।

—

বিশ্বভারতীর কার্য্য

বিশ্বভারতীর ১৯৩৪ সালের রিপোর্ট হিসাবপরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত হিসাব সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর কাজ সম্বন্ধে যাঁহারা নানা বিষয়ে ঠিক্ সংবাদ চান, তাঁহাদের এই রিপোর্ট পাঠ করা উচিত।

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষতা ছাড়িয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা উপলক্ষ্যে রিপোর্টে তাঁহার যে প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা যেমন সত্য, তেমনই শোভন।

কর্ম্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীভবনের প্র-নেত্রী প্রতিমা দেবী এবং পাঠভবনের অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রমোহন সেন ইয়োরোপের অনেক শিক্ষালয় ও অন্যান্য হিতসাধক প্রতিষ্ঠান দেখিয়া সম্প্রতি ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বিশ্বভারতীর কাজে লাগিবে।

বিদ্যাভবনের কার্য্যবিবরণে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "দাদূ" গ্রন্থের এবং তাঁহার ও অন্য অনেকের অন্যান্য রচনার উল্লেখ আছে। "দাদূ" প্রকাশিত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানির পরিচয় পরে দিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীনিকেতনে এত ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাজ হইতেছে, যে, তাহা সংক্ষেপে বলা যায় না। কেবল বিভাগগুলির নাম করিতেছি। গ্রাম সংগঠন, চিকিৎসা ও প্রসূতিচর্য্যা প্রভৃতি, গ্রাম্য-বিদ্যালয়সমূহ, ব্রতী বালক দল, কৃষি বিস্তার ও উন্নতি, বার্ষিক অনুসন্ধান, শিক্ষাসত্র, পণ্যশিল্প, বয়ন, চর্ম্মশিল্প, লাক্ষালেপন, পুস্তক বাঁধাই, বাটিক কাজ, অলঙ্কার-নির্ম্মাণ ও মীনা, সূচীর কাজ, ছুতারের কাজ, চিনির কারখানা, খামার, গবাদির খাদ্য-উৎপাদন, গোশালা, ছাগশালা, পক্ষিশালা, পতিত জমী উদ্ধার এবং বাঁশ নলখাগড়া ও সাবোই ঘাসের চাষ, আবহ তথ্য পর্য্যবেক্ষণ।

—

বঙ্গে সরকারী ব্যয় সংক্ষেপ

বাংলা গবন্মেণ্ট ব্যয়সংক্ষেপের জন্য শিক্ষা-বি[illegible] জন্যই জন-কতক অধ্যাপক এবং এক জন ইনস্পে[illegible] ব্যবস্থা করা উঠাইয়া দিয়াছেন। আশা করি, তাহাতে কো[illegible]ধক। তাঁহারা কাজ যায় নাই। নিতান্ত অপব্যয় ডিবিজন্যাল [illegible] সত্যপদ নির্দ্দিষ্ট পদের বেতন দানে হয়। এই পদগুলি তুলিয়া [illegible] এই সমস্তার উচিত। এত বেশী সিবিলিয়ান না-রাখিয়া দেশী [illegible] সম্প্রদায় [illegible] করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারাই বেশ কাজ চালান যায়।

—

"মানসারে"র দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"যাঁরা দেশী [illegible] চর্চ্চা করেন তাঁরাই জেনে সুখী হবেন, যে, [illegible] আচার্য্য প্রসন্নকুমার 'মানসারে'র যে ইংরেজী তর্জ্জমা করিয়াছেন তাহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে সংশোধিত আকারে—

"বাস্তুশিল্প সম্বন্ধে প্রাচীন পুঁথির পাঠভেদ নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চিরকালই আছে এবং থাকবেও, কিন্তু তা ব'লে বাস্তুশিল্প সম্বন্ধে যাঁরা কিছু জানতে চান আচার্য্য মহাশয়ের বই যে তাঁদের পক্ষে ভারি উপযোগী হবে তাতে সন্দেহ নেই। নানা সমালোচনার ধাক্কা সামলে বাস্তুশিল্পের এই বৃহৎ সংস্করণ যে এদেশের থেকে পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে, এ অত্যন্ত আশার বিষয়। প্রাচীন ভারতের গৌরব হচ্ছে তার বাস্তুশিল্পের নমুনা। সমস্ত নিয়ে তার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রসন্নকুমার আচার্য্যের বইখানি মূল্যবান উপদেশে পরিপূর্ণ। এই বইখানির বহুল প্রচার হয়েছে এবং আরও হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

ইহা সুসংবাদ। বাংলা দেশে ভারতীয় স্থাপত্যের প্রপ্যাগাণ্ডা খুব হয়, কিন্তু অধ্যাপক আচার্য্যের সম্পাদিত মানসারের অমূল্য সংস্করণটির কথা কম লোকেই জানেন বা বলেন। যাহা হউক, অন্যত্র যে ইহার আদর হইয়াছে, তাহা সন্তোষের বিষয়।

—

চিত্রপরিচয়

"শতেক বরষ পরে [illegible] বঁধুয়া আইল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস"

চণ্ডীদাসের এই পদাবলীতে যে মধুর মিলনোল্লাসের বিকাশ, শিল্পী তাহাই "শত বর্ষ পরে" চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পল্লী-বধূ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা | সখীপরিবৃতা শকুন্তলা | শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৪২

৫ম সংখ্যা

মাটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঁখারির বেড়া-দেওয়া ভূমি : হেথা করি ঘোরাফেরা
সারাক্ষণ আমি-দিয়ে ঘেরা
বর্ত্তমানে।
মন জানে
এ মাটি আমারি,
যেমন এ শালতরু সারি
বাঁধে নিজ তলবীথি শিকড়ের গভীর বিস্তারে
দূর শতাব্দীর অধিকারে।
হেথা কৃষ্ণচূড়াশাখে ঝরে শ্রাবণের বারি
সে যেন আমারি।
ভোরে ঘুমভাঙা আলো, রাত্রে তারাজ্বালা অন্ধকার
যেন সে আমারি আপনার
এ মাটির সীমাটুকু মাঝে।
আমার সকল খেলা সব কাজে
এ ভূমি জড়িত আছে শাশ্বতের যেন সে লিখন।

হঠাৎ চমক ভাঙে নিশীথে যখন
সপ্তর্ষির চিরন্তন দৃষ্টিতলে
ধ্যানে দেখি কালের যাত্রীর দল চলে
যুগে যুগান্তরে।
এই ভূমিখণ্ড 'পরে
তারা এল তারা গেল কত।
তারাও আমারি মতো
এ মাটি নিয়েছে ঘেরি'
জেনেছিল একান্ত এ তাহাদেরি,
কেহ আর্য্য কেহ বা অনার্য্য তারা
কত জাতি নামহীন, ইতিহাসহারা।
কেহ হোমাগ্নিতে হেথা দিয়েছিল হবির অঞ্জলি,
কেহ বা দিয়েছে নরবলি।

এ মাটিতে একদিন যাহাদের সুপ্ত চোখে
জাগরণ এনেছিল অরুণ আলোকে
বিলুপ্ত তাদের ভাষা।
পরে পরে যারা বেঁধেছিল বাসা,
সুখে দুঃখে জীবনের রসধারা
মাটির পাত্রের মতো প্রতিক্ষণে ভরেছিল যারা
এ ভূমিতে,
এরে তারা পারিল না কোনো চিহ্ন দিতে।
আসে যায়
ঋতুর পর্য্যায়,
আবর্ত্তিত অন্তহীন
রাত্রি আর দিন;
মেঘ রৌদ্র এর পরে
ছায়ার খেলেনা নিয়ে খেলা করে
আদিকাল হ'তে।

কালস্রোতে

আগন্তুক এসেছি হেথায়
সত্য কিম্বা দ্বাপরে ত্রেতায়
যেখানে পড়ে নি স্থায়ী লেখা
রাজকীয় স্বাক্ষরের একটিও রেখা।
হায় আমি,
হায় রে ভূস্বামী,
এখানে তুলিছ বেড়া,—উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ
এ মাটিতে সে-ই র'বে লীন
পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে। তারপরে!
এই ধূলি র'বে পড়ি আমি-শূন্য চিরকাল তরে॥

২রা আগষ্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

"কাল্‌চার"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত জ্যৈষ্ঠের (১৩৪২) 'প্রবাসী'তে একস্থানে ইংরেজী "কাল্‌চার" শব্দের প্রতিশব্দ রূপে "কৃষ্টি" শব্দের ব্যবহার দেখে মনে খট্‌কা লাগল। বাংলা খবরের কাগজে একদিন হঠাৎ-ব্রণের মতো ঐ শব্দটা চোখে পড়ল, তার পরে দেখলুম ওটা বেড়েই চলেছে। সংক্রামকতা খবরের কাগজের বস্তি ছাড়িয়ে উপর মহলেও ছড়িয়ে পড়ছে দেখে ভয় হয়। 'প্রবাসী' পত্রে ইংরেজী অভিধানের এই "অবদান"টি সংস্কৃত ভাষার মুখোস প'রে প্রবেশ করেছে, এটা নিঃসন্দেহ অনবধানতাবশত। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যে "অবদান" শব্দটির যে প্রয়োগ দেখতে দেখতে ব্যাপ্ত হ'ল সংস্কৃত শব্দকোষে তা খুঁজে পাই নি।

ভাষা যে সব সময়ে যোগ্যতম শব্দের বাছাই করে কিম্বা যোগ্যতম শব্দকে টিকিয়ে রাখে তার প্রমাণ পাই নে। ভাষায় চলিত একটা শব্দ মনে পড়ছে "জিজ্ঞাসা করা"। এ রকম বিশেষ্য-জোড়া ওজনে ভারী ক্রিয়াপদে ভাষার অপটুত্ব জানায়। প্রশ্ন করা ব্যাপারটা আপামর সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য অথচ ওটা প্রকাশ করবার কোনো সহজ ধাতুপদ বাংলায় দুর্লভ এ কথা মানতে সঙ্কোচ লাগে। বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপকে ক্রিয়ার রূপে বানিয়ে তোলা বাংলায় নেই যে তা নয়। তার উদাহরণ [illegible], ঠ্যাঙানো, কিলোনো, ঘুষোনো, গুঁতোনো, চড়ানো, লাথানো, জুতোনো। এগুলো মারাত্মক শব্দ সন্দেহ নেই, এর থেকে দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট উত্তেজিত হ'লে বাংলায় "আনো" প্রত্যয় সময়ে সময়ে এই পথে আপন কর্ত্তব্য স্মরণ করে। অপেক্ষাকৃত নিরীহ শব্দও আছে, যেমন আগল থেকে আগ্‌লানো; ফল থেকে ফলানো, হাত থেকে হাতানো, চমক থেকে

চম্‌কানো। বিশেষণ শব্দ থেকে, যেমন উল্‌টা থেকে উল্‌টানো, খোঁড়া থেকে খোঁড়ানো, বাঁকা থেকে বাঁকানো, রাঙা থেকে রাঙানো।

বিদ্যাপতির পদে আছে, "সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।" যদি তার বদলে—"কি জিজ্ঞাসা করই অনুভব মোয়" ব্যবহারটাই "বাধ্যতামূলক" হ'ত কবি তাহ'লে ওর উল্লেখই বন্ধ করে দিতেন।* অথচ প্রশ্ন করা অর্থে সুধানো শব্দটা শুধু যে কবিতায় দেখি তা নয় অনেক জায়গায় গ্রামের লোকের মুখেও ঐ কথার চল আছে। বাংলা ভাষার ইতিহাসে যাঁরা প্রবীণ তাঁদের আমি সুধাই, জিজ্ঞাসা করা শব্দটি বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে বা লোকসাহিত্যে তাঁরা কোথাও পেয়েছেন কি না।

ভাবপ্রকাশের কাজে শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে কাব্যের বোধশক্তি গদ্যের চেয়ে সূক্ষ্মতর এ কথা মান্‌তে হবে। লক্ষিয়া, সন্ধিয়া, বন্দিনু, স্পর্শিল, হর্ষিল শব্দগুলো বাংলা কবিতায় অসঙ্কোচে চালানো হয়েছে। এ সম্বন্ধে এমন নালিশ চলবে না যে ওগুলো কৃত্রিম, যেহেতু চল্‌তি ভাষায় ওদের ব্যবহার নেই। আসল কথা, ওদের ব্যবহার থাকাই উচিত ছিল; বাংলা কাব্যের মুখ দিয়ে বাংলা ভাষা এই ত্রুটি কবুল করেছে। ("কব্‌লেছে" প্রয়োগ বাংলায় চলে কিন্তু অনভ্যস্ত কলমে বেধে গেল!) "দর্শন লাগি ক্ষুধিল আমার আঁখি" বা "তিয়াষিল মোর প্রাণ"—কাব্যে শুন্‌লে রসজ্ঞ পাঠক বাহবা দিতে পারে, কেন না ক্ষুধাতৃষ্ণাবাচক ক্রিয়াপদ বাংলায় থাকা অত্যন্তই উচিত ছিল, তারই অভাব মোচনের সুখ পাওয়া গেল। কিন্তু গদ্য ব্যবহারে যদি বলি "যতই বেলা যাচ্ছে, ততই ক্ষুধোচ্ছি অথবা তেষ্টাচ্ছি" তাহ'লে শ্রোতা কোনো অনিষ্ট যদি না করে অন্তত এটাকে প্রশংসনীয় বলবে না।

বিশেষ্য-জোড়া ক্রিয়াপদের জোড় মিলিয়ে এক করার কাজে মাইকেল ছিলেন দুঃসাহসিক। কবির অধিকারকে তিনি প্রশস্ত রেখেছেন, ভাষার সঙ্কীর্ণ দেউড়ির পাহারা তিনি কেয়ার করেন নি। এ নিয়ে তখনকার ব্যঙ্গরসিকেরা বিস্তর হেসেছিল। কিন্তু ঠেলা মেরে দরজা তিনি অনেকখানি ফাঁক ক'রে দিয়েছেন। "অপেক্ষা করিতেছে" না ব'লে "অপেক্ষিছে", "প্রকাশ করিলাম" না ব'লে "প্রকাশিলাম" বা "উদ্‌ঘাটন করিল"-র জায়গায় "উদ্‌ঘাটিল" বল্‌তে কোনো কবি আজ প্রমাদ গণে না। কিন্তু গদ্যটা যেহেতু চল্‌তি কথার বাহন ওর ডিমক্রাটিক বেড়া অল্প একটু ফাঁক করাও কঠিন। "ত্রাস" শব্দটাকে "ত্রাসিল" ক্রিয়ার রূপ দিতে কোনো কবির দ্বিধা নেই কিন্তু 'ভয়' শব্দটাকে "ভয়িল" করতে ভয় পায় না এমন কবি আজও দেখি নি। তার কারণ ত্রাস শব্দটা চল্‌তি ভাষার সামগ্রী নয়, এই জন্যে ওর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসামাজিকতা ডিমক্রাসিও খাতির করে। কিন্তু "ভয়" কথাটা সংস্কৃত হ'লেও প্রাকৃত বাংলা ওকে দখল ক'রে বসেছে। এই জন্যে ভয় সম্বন্ধে যে প্রত্যয়টার ব্যবহার বাংলায় নেই তার দরজা বন্ধ। কোন্ এক সময়ে "জিতিল" "হাঁকিল" "বাঁকিল" শব্দ চলে গেছে, "ভয়িল" চলে নি—এ ছাড়া আর কোনো কৈফিয়ৎ নেই।

বাংলা ভাষা একান্ত আচারনিষ্ঠ। সংস্কৃত বা ইংরেজী ভাষায় প্রত্যয়গুলিতে নিয়মই প্রধান, ব্যতিক্রম অল্প। বাংলা ভাষার প্রত্যয়ে আচারই প্রধান, নিয়ম ক্ষীণ। ইংরেজীতে "ঘামছি" বলতে am perspiring ব'লে থাকি, "লিখছি" বল্‌তে am penning বলা দোষের হয় না। বাংলায় ঘামছি বল্‌লে লোকে কর্ণপাত করে কিন্তু কলমাচ্ছি বল্‌লে সইতে পারে না। প্রত্যয়ের দোহাই পাড়লে আচারের দোহাই পাড়বে। এই কারণেই নূতন ক্রিয়াপদ বাংলায় বানানো দুঃসাধ্য, ইংরেজীতে সহজ। ঐ ভাষায় টেলিফোন কথাটার নূতন আমদানি, তবু হাতে হাতে ওটাকে ক্রিয়াপদে ফলিয়ে তুল্‌তে কোনো মুস্কিল ঘটে নি। ডানপিটে বাঙালী ছেলের মুখ দিয়েও বের হবে না, "টেলিফোনিয়েছি" বা "সাইক্লিয়েছি"। বাংলা গদ্যের অটুট শাসন কালক্রমে কিছু কিছু হয়তো বা বেড়ি আল্‌গা ক'রে আচার ডিঙোতে দেবে। বাংলায় কাব্য-সাহিত্যই পুরাতন এই জন্যেই প্রকাশের তাগিদে কবিতায় ভাষায় পথ

---

* "বাধ্যতামূলক" নামে যে একটা বর্ব্বর শব্দ বাংলাভাষাকে অধিকার করতে উদ্যত, তার সম্বন্ধে কি সাবধান হওয়া উচিত হয় না? কম্পল্‌সরি এডুকেশনে বাধ্যতা ব'লে বালাই যদি কোথাও থাকে সে তার মূলে নয় সে তার পিঠের দিকে বা কাঁধের উপর, অর্থাৎ ঐ এডুকেশনটা বাধ্যতাগ্রস্ত বা বাধ্যতাচালিত। যদি বল্‌তে হয় "পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা কম্পল্‌সরি নয়" তাহ'লে কি বলা চলবে "পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা বাধ্যতামূলক নয়?" সৌভাগ্যক্রমে "আবশ্যিক" শব্দটা উক্ত অর্থে কোথাও কোথাও চলতে আরম্ভ করেছে।

অনেক বেশী প্রশস্ত হয়েছে। গদ্য-সাহিত্য নূতন, এই জন্যে শব্দসৃষ্টির কাজে তার আড়ষ্টতা যায় নি। তবু ক্রমশ তার নমনীয়তা বাড়বে আশা করি। এমন কি, আজই যদি কোনো তরুণ লেখক লেখেন, "মাইকেল বাংলা-সাহিত্যে নূতন সম্পদের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিলেন" তা নিয়ে প্রবীণরা খুব বেশী উত্তেজিত না হ'তে পারেন। ভাবীকালে আধুনিকেরা কতদূর পর্য্যন্ত স্পর্দ্ধিয়ে উঠবেন বল্‌তে পারি নে কিন্তু অন্তত এখনি তাঁরা "জিজ্ঞাসা করিলেন"-এর জায়গায় যদি "জিজ্ঞাসিলেন" চালিয়ে দেন তাহ'লে বাংলা ভাষা কৃতজ্ঞ হবে। যাঁরা প্রাকৃত বাংলায় লেখেন তাঁদের লিখ্‌তে হবে, জিজ্ঞাস্‌লেন, জিজ্ঞাস্‌ব, জিজ্ঞেসেছি, জিজ্ঞেসেছিলেম, জিজ্ঞেসছ, জিজ্ঞাসি। জিজ্ঞাসা কথাটাই স্বভাবত কিছু ভারিক্কি, তার কোনো উপায় নেই।

"লজ্জা করবার কারণ নেই" এটা আমরা লিখে থাকি। "লজ্জাবার কারণ নেই" লেখাটা নির্লজ্জতা। এমন স্থলে ঐ জোড়া ক্রিয়াপদটা বর্জ্জন করাই শ্রেয় মনে করি। লিখ্‌লেই হয় "লজ্জার কারণ নেই"। "প্রুফ সংশোধন করবার বেলায়" কথাটা সংশোধনীয়, বলা ভালো "সংশোধনের বেলায়"। সহজ ব'লেই গদ্যে আমরা পুরো মন দিইনে, বাহুল্য শব্দ বিনা বাধায় যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ে। আমার রচনায় তার ব্যতিক্রম আছে এমন অহঙ্কার আমার পক্ষে অত্যুক্তি হবে।

ভাষার খেয়াল সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত আমার প্রায় মনে পড়ে। ভালো বিশেষণ ও বাসা ক্রিয়াপদ জুড়ে ভালোবাসা শব্দটার উৎপত্তি। কিন্তু ও দুটো শব্দ একটা অখণ্ড ক্রিয়াপদ রূপে দাঁড়িয়ে গেছে। পূর্ব্বকালে ঐ "বাসা" শব্দটা হৃদয়াবেগসূচক বিশেষ্যপদকে ক্রিয়াপদে মিলিয়ে নিত। যেমন ভয় বাসা, লাজ বাসা। এখন হওয়া করা পাওয়া ক্রিয়াপদ জুড়ে ঐ কাজ চালাই। "বাসা" শব্দটা একমাত্র হৃদয়বোধ-সূচক; হওয়া, পাওয়া, করা তা নয়। এই কারণে 'বাসা' কথাটা যদি ছুটি না নিয়ে আপন পূর্ব্ব কাজে বহাল থাকত তাহ'লে ভাবপ্রকাশে জোর লাগাতো। "এ কথায় তার মন ধিক্কার বাস্‌ল" প্রয়োগটা আমার মতে "ধিক্কার পেল"-র চেয়ে জোরালো।

এবারে সেই গোড়াকার কথাটায় ফেরা যাক। "কৃষ্টি" কথাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বাংলা ভাষার পায়ে বিঁধেছে। চিকিৎসা করা যদি সম্ভব না হয় অন্তত বেদনা জানাতে হবে। ঐ শব্দটা ইংরেজী শব্দের পায়ের মাপে বানানো। এতটা প্রণতি ভালো লাগে না।

ভাষায় কখনো কখনো দৈবক্রমে একই শব্দের দ্বারা দুই বিভিন্ন জাতীয় অর্থজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, ইংরেজীতে কাল্‌চার কথাটা সেই শ্রেণীর। কিন্তু অনুবাদের সময়েও যদি অনুরূপ কৃপণতা করি তবে সেটা নিতান্তই অনুকরণ-প্রবণতার পরিচায়ক।

সংস্কৃত ভাষায় কর্ষণ বলতে বিশেষভাবে চাষ করাই বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গযোগে মূল ধাতুটাকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাচক করা যেতে পারে, সংস্কৃত ভাষার নিয়মই তাই। উপসর্গভেদে এক কৃ ধাতুর নানা অর্থ হয়, যেমন উপকার বিকার আকার। কিন্তু উপসর্গ না দিয়ে কৃতি শব্দকে আকৃতি প্রকৃতি বা বিকৃতি অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। উৎ বা প্র উপসর্গযোগে কৃষ্টি শব্দকে মাটির থেকে মনের দিকে তুলে নেওয়া যায়, যেমন উৎকৃষ্টি, প্রকৃষ্টি। ইংরেজী ভাষার কাছে আমরা এমনি কী দাসখৎ লিখে দিয়েছি যে তার অবিকল অনুবর্ত্তন ক'রে ভৌতিক ও মানসিক দুই অসবর্ণ অর্থকে একই শব্দের পরিণয়-গ্রন্থিতে আবদ্ধ করব?

বৈদিক সাহিত্যে সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, তাতে শিল্প সম্বন্ধেও সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে। "আত্ম-সংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।" এ'কে ইংরেজী করা যেতে পারে, Arts indeed are the culture of soul। "ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে"—এই সকল শিল্পের দ্বারা যজমান আত্মার সংস্কৃতি সাধন করেন। সংস্কৃত ভাষা বল্‌তে বোঝায় যে ভাষা বিশেষভাবে cultured, যে ভাষা cultured সম্প্রদায়ের। মরাঠি হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটাই কাল্‌চার অর্থে স্বীকৃত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাস (Cultural history) কৈষ্টিক ইতিহাসের চেয়ে শোনায় ভালো। সংস্কৃত চিত্ত, সংস্কৃত বুদ্ধি cultured mind, cultured intelligence অর্থে কৃষ্টচিত্ত কৃষ্টবুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রয়োগ সন্দেহ নেই। যে মানুষ cultured তাকে কৃষ্টিমান বলার চেয়ে সংস্কৃতিমান বল্‌লে তার প্রতি সম্মান করা হবে।

অন্নসমস্যা ও গো-পালন

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ বাঙালীর অন্নসমস্যা ও তাহার সমাধান লইয়া আমি বিব্রত আছি। আমি বরাবর ভারতবর্ষময়—বাংলার ত কথাই নাই—ঘুরিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, সেই অভিজ্ঞতার বলেই এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি—চক্ষু বুজিয়া, আরাম-কেদারায় বসিয়া ভাবুকের ন্যায় এই সব প্রশ্নের মীমাংসায় ব্রতী হই নাই, হাতে-কলমে করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহাই সাধারণের নিকট প্রকাশ করি। এই অন্নসমস্যার মূলে ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল কেমিকেলের পত্তন। বৎসর-সাতেক পূর্ব্বে কলিকাতার সন্নিকটে সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান কলাশালায় যে গোশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার একটি স্থূল বিবরণ দিয়া গো-পালনের ভিতর অন্নসমস্যার কতখানি সমাধানের পথ আছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বাংলা গবর্ণমেন্টের প্রচেষ্টায় ১৮৮০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া সাইরেন-সেষ্টার (Cirencester)-এ কৃষি শিখিবার জন্য বৃত্তি দিয়া বাংলার যে-সব সেরা যুবককে পাঠান হয় সেই সম্পর্কে কিছু বলিতেছি। এই কথার উল্লেখ বহু স্থানে করিয়াছি, তবুও উহার পুনরুল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

স্যর এস্‌লি ইডেন যখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন তখন তিনি বৎসরে ৫০০ পাউণ্ড খরচ করিয়া দুইটি কৃষি-বৃত্তির প্রবর্ত্তন করেন। এই বৃত্তিদ্বারা প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন সর্ব্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান হইত। এক এক জন ছাত্রের পিছনে ২৫০ পাউণ্ড খরচ হইত। তখনকার দিনে এক শত পাউণ্ডের মূল্য এখনকার তিন শত পাউণ্ডের সমান। প্রথম বারে যান এক জন মুসলমান ও এক জন হিন্দু। মুসলমান ভদ্রলোকটি বিহারের সৈয়দ সহ্‌কৎ হোসেন। হিন্দু ভদ্রলোকটির নাম অম্বিকাচরণ সেন। তাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়া যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহাদের অর্জ্জিত কৃষিবিদ্যা কোন কাজে লাগাইবার সুযোগ হইল না। তাঁহারা হইলেন ষ্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ্। তার পর ক্রমে ক্রমে গেলেন অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল রায়, নৃত্যগোপাল মুখার্জ্জী ও ভূপালচন্দ্র বসু প্রভৃতি। ইঁহারা আমার সমসাময়িক। ফিরিয়া আসিয়া ইঁহাদের অধিকাংশেরই করিতে হইল ডেপুটিগিরি। ব্যোমকেশ বাবু হইলেন ব্যারিষ্টার, আর গিরীশ বসু স্কুল-মাষ্টারীর দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের কৃষিশিক্ষা দেশের কোন কাজেই লাগিল না। এই প্রকারে দেশের কয়েক লক্ষ টাকা অকারণ অপচয় হইল। বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া সেই শিক্ষার দ্বারা এদেশের কৃষির বিশেষ উন্নতি করা চলে না। বিলাতে ও আমেরিকায় প্রত্যেক ভদ্রলোক কৃষক ১০০ কিংবা ২০০ একর জমি লইয়া চাষবাস করেন; তাঁহারা শিক্ষিত ও বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়া চাষ করেন। তাঁহারা 'জেণ্টল্‌মেন ফার্ম্মা'র বলিয়া পরিগণিত অর্থাৎ ভদ্র চাষী। আমাদের দেশের চাষীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড জমি, এক বা দেড় একরের বেশী হইবে না; অধিকন্তু চাষীরা নিরক্ষর, এই জন্য বিলাতী চাষের প্রণালী ও আদর্শ এখানে চালান যায় না। দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল বিলাতী শিক্ষা আমদানী করিলেই তাহা কদাচ ফলবতী হয় না। এই দেশের মধ্যেই যে-সকল জায়গায় চাষ-আবাদ উন্নত প্রণালীতে হইতেছে, সেই সকল জায়গা হইতে শিখিয়া আসিয়া কয়েকটি গ্রাম লইয়া ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র করিয়া সেই ভাবে ফসল উৎপাদন করিয়া আমাদের চাষীদের দেখাইতে পারিলেই দেশের কৃষিকার্য্যের প্রকৃত উন্নতি হইবে। আমাদের বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির আত্রাই কেন্দ্র হইতে এই প্রকার

কৃষিকার্য্যের প্রচেষ্টা হইতেছে। বাংলার যুবকগণ উহা দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

এই কৃষিকার্য্যের সঙ্গে গো-পালন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। গোধন কৃষকের প্রধান সহায় ও সম্পদ। বাংলার চাষীরা যে অনাহারে মরিতেছে, ইহার একটা প্রধান কারণ তাহাদের গো-সম্পদের হীন অবস্থা। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গো-পালন এবং দুধের ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি হইতেছে, বিশেষতঃ ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড এবং ডেনমার্কে গো-পালন এবং দুগ্ধের ব্যবসায় যে-ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহা আদর্শস্থানীয়। বিলাতে অর্জ্জিত কৃষিবিদ্যার জ্ঞান এদেশে কার্য্যকরী না হইলেও গো-পালন সম্বন্ধে শিখিবার যথেষ্ট আছে, এবং উহা শিক্ষা করিয়া এদেশে হাতে-কলমে প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রও প্রচুর রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের Cirencester (সিসেষ্টার) বৃত্তিতে যে টাকা অপচয় হইয়াছে, উহা এদেশের যুবকদের বিলাতে গো-পালন শিক্ষায় ব্যয়িত হইলে হয়ত অনেকটা কার্য্যকরী হইতে পারিত। প্রকৃত পথ জানা না থাকায়, বাঙ্গালী যুবকেরা মাঝে মাঝে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গো-শালা (dairy firm) খুলিয়াছেন, কিছুদিন বাদে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাহাদের সকলেরই অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে কলিকাতার এই দুধের ব্যবসায়ও প্রায় সমগ্র ভাবে পশ্চিমাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে।

৬৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন কলিকাতায় প্রথম আসি, তখন প্রায় সমস্ত গোয়ালাই বাঙালী ছিল। কিন্তু আজকাল বাঙ্গালী গোয়ালা কলিকাতায় একরূপ অদৃশ্য হইয়াছে। অথচ পশ্চিমারা দুধের ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া করিয়া বিলক্ষণ দু-পয়সা রোজগার করিতেছে। বাঙালী গোয়ালাদের এই অন্তর্ধানের হেতু কি? বারো-তের বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় ।৷৹ মূল্যেও এক সের খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া কঠিন হইত। তখন রাস্তায় মাঝে মাঝে খাবারওয়ালাদের দোকানে সাইনবোর্ডে দেখিয়াছি "জলমিশ্রিত দুগ্ধ প্রতি সের চারি আনা," আজকাল এই প্রকার আছে কিনা জানি না। ১৯২৬-২৭ সালে বহুবাজারের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ মিল্ক ইউনিয়ন মফঃস্বল হইতে দুধ আনাইয়া উহা পাস্তরাইজ করিয়া পাঁচ-ছয় আনা সের দরে বিক্রয় করিতেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা তিন-চার আনা দরে বিক্রয় করিতেছেন। খাঁটি দুধ কলিকাতায় এখন যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং বেশ সস্তা দরেই পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, ইহার একমাত্র কারণ, কলিকাতার অলি-গলিতে পশ্চিমা গোয়ালার আবির্ভাব। ইহারা কি ভাবে কলিকাতায় গো-পালন করে? ইহারা বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সাধারণতঃ গর্ভিণী গাভী, মহিষ লইয়া আসে। কলিকাতায় গোচারণের মাঠ নাই; এই গোয়ালারা গরু-মহিষকে বাঁধিয়া রাখিয়া খাওয়ায়। কিন্তু দুধের জন্য গরুর আবশ্যক খোরাক বিষয়ে পুরাপুরি তদ্বির করে, এবং গরু যাহাতে বেশী দুধ দেয় সেই ভাবেই উহার খাদ্য নিয়ন্ত্রিত করে। স্থানাভাবে গরু-চরানোর অসুবিধা হয় বলিয়া সকালে-বিকালে গরু লইয়া ব্যায়াম-হিসাবে খানিক ক্ষণ পায়চারি করায়। কিন্তু ইহারা যে-ভাবে গো-পালন করে তাহা কখনই আদর্শ এবং অনুকরণীয় নয়। যদিও ইহারা বাড়ি-বাড়ি গরু লইয়া দুধ দুহিয়া সস্তা দরে খাঁটি দুধ দিয়া আসে তবু এই দুধের স্বাদ উত্তম হয় না, দুধ তেমন পুষ্টিকর হয় না। আমাদের সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালার দুধ যাঁহারা ক্রয় করেন, সর্ব্বদাই তাঁহাদের এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে "কলিকাতায় খাঁটি দুধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে, তবে এরূপ দুধ পাওয়া যায় না।" কলিকাতায় পশ্চিমা গোয়ালাদের দুধ উত্তম না-হওয়ার কারণ, দুধের উৎকর্ষের প্রতি ইহাদের নজর থাকে না, কি করিয়া অধিক দুধ পাওয়া যাইতে পারে কেবল সেই দিকেই তাহাদের নজর থাকে এবং সেই প্রকার খাদ্য গাভীদের খাওয়ায়। ইহাতে গাভীদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, দুই-তিন-চার বিয়ান দুধ দেওয়ার পরই তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তখন হিন্দু হইয়াও এই গোয়ালারা গাভীর অত্যন্ত অযত্ন করে, এবং শেষে কসাইদের নিকট বিক্রয় করে। গাভী হইতে অধিক পরিমাণে দুধ লওয়ার জন্য ইহারা বাছুরকে দুগ্ধ হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করে, এবং তাহার ফলে এই গো-শিশু উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শীর্ণকায় হইয়া অকালে মারা যায়। কিন্তু ইহাতে গোয়ালার কিছুই আসে যায় না, কারণ সে এই মৃত বাছুরের চামড়া দিয়া কৃত্রিম বাছুর তৈরি করিয়া লয়, এবং গাভীর সামনে

রাখে। গাভী এই কৃত্রিম বাছুরকেই তাহার আপন বৎস ভাবিয়া পরম স্নেহে চাটিতে থাকে, এবং ইহাতে তাহার পালানে দুধ আসে। গোয়ালা তখন সম্পূর্ণ দুধটাই দুহিয়া লইতে পারে। ভারতবর্ষে গাভীদের মধ্যে এই স্বাভাবিক সংস্কার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাছুর গাভীর সামনে না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পালান হইতে দুধ দোহা যায় না। এই জন্যই বাছুর মরিয়া গেলে কৃত্রিম বাছুর তৈরি করার রেওয়াজ হইয়াছে। কিন্তু বিলাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এরূপ ব্যবস্থা চলিত হইয়াছে যে বাছুর ছাড়াই গাভী দুধ দিতে পারে। সেখানে বাছুর প্রসব হইবার পরই তাহাকে তৎক্ষণাৎ গাভী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হয়, এবং গাভীর সঙ্গে তাহার আর কোন সম্পর্ক রাখা হয় না। বাছুরকে তাহার মাতা হইতে বিযুক্ত করিয়া হাতে করিয়া দুধ খাওয়ানো হয় এবং ভালরূপে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে গাভী ও বাছুর একে অপরের উপর নির্ভরশীল না হইয়াই ভালরূপ থাকিতে পারে। ভারতবর্ষে অবশ্য এই ব্যবস্থা কখনও কার্য্যকর হইবে না, এবং কাহারও এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা তেমন আবশ্যক বোধ করে না।* যাহা হউক, কলিকাতার গোয়ালারা খাঁটি দুধ সস্তায় বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেও উক্ত-প্রকার গো-পালনের দ্বারা কখনও গোজাতির উন্নতি হইতে পারে না, এবং ঐ ভাবে গো-পালন দ্বারা ব্যবসাও প্রসার লাভ করিবে না ইহা ঠিক। অধিকন্তু এই ব্যবসায়ের জন্য গোয়ালাদের যে নির্দ্দয় ব্যবহারের কথা উপরে বিবৃত করিলাম তাহাতে এই খাঁটি দুধ খাইতেও প্রবৃত্তি হয় না। এই প্রকার গো-পালনের দ্বারা ভাল ভাল গাভী একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং গাভীটি মরিয়া গেলে বা কসাইয়ের হাতে পড়িলে, এই উত্তম শ্রেণীর গাভীর বংশটিও সম্পূর্ণ বিলোপ হইয়া যায়। এই গোয়ালারা দুগ্ধশূন্য গাভীর খোরাক যোগান ব্যয়সাধ্য বলিয়া উহার প্রতি যে অযত্ন করে অথবা বাছুর-প্রতিপালন ব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহাকে যে অনাহারে মরিতে দেয় বাস্তবিক পক্ষে আর্থিক দিক দিয়াও তাহা ক্ষতিজনক। ইহাতে ব্যবসায়ের লোকসানই হয়, লাভ হয় না, ইহা অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়াছে। নিম্নোক্ত হিসাব হইতে পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আট দশ সের দুধ দেয় এরূপ একটি ভাল গাভীর হিসাব ধরুন। কলিকাতায় এইরূপ একটি গাভীর বর্ত্তমান মূল্য ২০০৲।২২৫৲ টাকা হইবে। গাভীটি অন্ততঃ তিন শত দিন দুধ দিবে। তিন শত দিনে সে গড়ে পাঁচ সের হিসাবে দুধ দিবে। এই হিসাবে তিন শত দিনে ১,৫০০ সের দুধ হয়। এই ১,৫০০ সের দুধের মূল্য টাকায় চার সের হিসাবে ৩৭৫৲ টাকা, গাভীটির জন্য দৈনিক খরচ গড়ে ৷৵০ হিসাবে ১৮৭৷০। এক্ষণে যদি গাভীটিকে ঠিকমত যত্ন করা হয় তবে এই গাভী হইতে কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহার হিসাব নীচে দিতেছি:—

১। দুধ দেওয়া বন্ধ করিলে যদি গাভী কসাইয়ের নিকট বিক্রয় করা হয়—

ব্যয়		আয়	
গাভীর মূল্য	২০০৲	দুধের মূল্য	৩৭৫৲
গাভীর জন্য খাদ্য		দশ মাসে বাছুরের মূল্য	১০৲
খরচ ইত্যাদি	১৮৭৷০	দুগ্ধহীন গাভী বিক্রয়	
		হইলে তাহার মূল্য	২০৲
	৩৮৭৷০		
			৪০৫৲
		বাদ খরচ	৩৮৭৷০
		লাভ	১৭৷৵

২। যদি পুনরায় দুগ্ধবতী হওয়া পর্য্যন্ত গাভী রাখা হয়—

* "The English method of handfeeding the calves is not ordinarily adopted by Indians, moreover, the Indian cow will not allow her calf to be taken away from her. If it is done, she will never milk as well or for as long a period as she would if she was allowed her calf. English cows have generations of training at the back of them, and the separation from their calves does not injure them. It will take generations of training to make the Indian cow do without her calf. It is not advisable for any one to try it. If properly treated, the cow will give more milk, with her calf than she will do without it."
—*Tweed's Cowkeeping in India*, pp. 137-38.

ব্যয়		আয়	
গাভীর মূল্য	২০০৲	দুধের মূল্য	৩৭৫৲
দুধ-দেওয়াকালীন খাদ্য		বাছুরের মূল্য	১৪৲
খরচ ইত্যাদি	১৮৭॥০	গাভী পুনঃ দুগ্ধবতী	
চারি মাস দুগ্ধহীন থাকা কালীন ব্যয় মাসিক ৭॥০ হিসাবে	৩০৲	হইলে মূল্য	২০০৲
			৫৮৯৲
		বাদ খরচ	৪১৭॥০
	৪১৭॥০		
		লাভ	১৭১॥০

উপরিউক্ত হিসাব হইতেই দেখা যায় গাভী দুধ বন্ধ করা মাত্রই তাহাকে বিক্রয় করিলে বা অযত্ন করিলে তাহাতে লোকসান ছাড়া কোনই লাভ নাই। আমাদের দেশে শহরে বা মফস্বলে দুগ্ধ-ব্যবসায় ভালরূপ না-চলার কারণ যে গরুর অযত্ন এবং অব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয় ইহা খুবই সত্য।

খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালা

খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণ যাহাতে মনে-প্রাণে কৃষকের সহিত এক হইতে পারে তজ্জন্যই প্রতিষ্ঠানে গোশালা ও কৃষির ব্যবস্থা অনুভূত হয় এবং তজ্জন্য ছোটখাট ভাবে একটি গোশালা স্থাপন করা ও সেই সঙ্গে ই এর ব্যবস্থা করা হয়। বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠান গোশালায় প্রাপ্তবয়স্কা তেরটি গাভী আছে; তাহার মধ্যে সাতটি সবৎসা এবং দুধ দিতেছে। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বলদ পাঁচটি, বক্না তিনটি; কৃষি ও গাড়ী টানার জন্য ষাঁড় ও বলদ পাঁচটি এবং 'ব্রিডিং বুল্' একটি, মোট পশু সংখ্যা ৩৪টি। প্রত্যেকটিরই বিশেষত্ব বুঝিবার জন্য এবং সম্যক পরিচয়ের সুবিধার জন্য নাম দেওয়া হইয়াছে। গাভীগুলির নাম এই প্রকার—রেবা, চিত্রা, কৃষ্ণা, নীলা, শীলা, শুক্লা, ছায়া, গঙ্গা ইত্যাদি।

গোশালার মূলধন

গোশালার মূলধনের সঠিক হিসাব করা কঠিন; কারণ ইহার আয় মূলধনের সহিত যুক্ত হওয়ায় উহা ক্রমশই বাড়িয়াছে। তবে প্রথমে গোশালা আরম্ভের সময় মোটামুটি এই প্রকার ছিল—

গাভী ও বলদের মূল্য	১৮০০৲
গোশালা নির্ম্মাণ, হাতে ঘাস-কাটা মেশিন ইত্যাদি	৯৫০৲
	২৭৫০৲

ইহা ছাড়া গোশালার প্রায় দশ বিঘা জমি গরুর খাদ্য এবং কৃষির জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। উহার কোন মূল্য ধরা হয় নাই।

মাসিক আয়ব্যয়

বাৎসরিক হিসাব অনুযায়ী মাসিক গড়ে মোটামুটি আয়ব্যয় যাহা হয় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—

ব্যয়		আয়	
খাদ্য	১৭৫৲	দুগ্ধ ২৬ মণ	২৬০৲
গোশালার জন্য নিযুক্ত কর্ম্মী, শ্রমিক, দুগ্ধ-বিতরণ-কারী গোয়ালা ৬ জন	৯০৲	পশুখাদ্য বিক্রয় (নিজস্ব গোশালার জন্য) এবং কৃষিজাত অন্যান্য সব্জী প্রভৃতি বিক্রয়	৮০৲
রেলভাড়া ও অন্যান্য	৮৲	গাড়ীভাড়া খাটান	৫৫৲
মজুর কৃষক ও গাড়োয়ান ৫ জন	৭৫৲		৩৯৫৲
	৩৪৮৲		
উদ্বৃত্ত—	৪৭৲		
	৩৯৫৲		

গরুর খাদ্য

গরুর খাদ্য সাধারণতঃ কাঁচা ঘাস, চুনী (কাঁচা ছোলার গুঁড়া) বা কলাই, গমের ভুষি ও খইল। দুগ্ধবতী গাভীদিগকে বিশেষ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে কলাই-সিদ্ধ অথবা চুনী, তিসির খইল, গুড়, লবণ এবং ছাতু খাওয়ানো হয়; হজমী হিসাবে অল্প কিছু (এক বা দেড় তোলা করিয়া) গন্ধক-গুঁড়া গুড়ের সহিত খাওয়ানো হয়। প্রসব হওয়ার পর প্রথম দুই-তিন সপ্তাহ গাভী দুধ কম দেয়; তৃতীয় চতুর্থ সপ্তাহ হইতেই দুধের প্রকৃত পরিমাণ বুঝা যায়, এবং সেই অনুযায়ী তাহার খাদ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতে হয়। একটি দশ সের দুধওয়ালা গাভীকে নিম্নোক্ত খাদ্য দেওয়া হয়—

চুনী (ছোলার গুঁড়া)	/২॥০
অথবা কলাই-সিদ্ধ	/৪
তিসির খইল	/১
গমের ভুষি	/২॥০

গুড়	৴৯৹
ছাতু	৴৷৹
লবণ	৴৴৹
গন্ধক-গুঁড়া	২৷৷ তোলা

ইহা ছাড়া ছোট করিয়া কাটা বিচালী আট-নয় সের অথবা কাঁচা ঘাস কুড়ি-পঁচিশ সের অথবা অনুপাত অনুযায়ী দুই-ই মিলাইয়া খাওয়ানো হয়। খাদ্য-প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পৃথক পৃথক পাত্রে খইল ও চুনী পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখা হয়। কাটা বিচালী এবং ঘাসের সহিত খইলের জল ভালরূপে মিলাইয়া উহাতে ভিজানো চুনী, শুক্‌না ভুষি ও লবণ বেশ ভাল করিয়া মিলাইয়া পরিষ্কার পাত্রে অথবা সিমেণ্ট করিয়া বাঁধানো টবে গরুকে খাইতে দেওয়া হয়। গন্ধক গুড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়ানো হয়। জলের সহিত ছাতু ও গুড় দিয়া সরবতের মত করিয়া পানীয় হিসাবে খাওয়ানো হয়, তাহা ছাড়া প্রচুর জল খাইতে দেওয়া হয়। গোশালায় গরুর খাদ্যপাত্রের নিকট প্রত্যেক গরুর জন্যই একটি করিয়া জলপূর্ণ টব আছে যাহাতে গরু ইচ্ছামত জল পান করিতে পারে। ইহা ছাড়া গোশালার প্রাঙ্গণে সৈন্ধব লবণের বড় বড় চাকা রাখা আছে, গরু ইচ্ছামত নুন চাটিয়া লইতে পারে। গাভীর দুধ কমার সঙ্গে সঙ্গে এই খাদ্যের পরিমাণও সেই অনুপাতে কমাইতে হয়। কাঁচা গিনি ঘাস অধিক পরিমাণে খাইয়া হজম করিতে পারিলে গরুর দুধ বেশী হয়, স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। রেবা নামক গাভীটি তাহার তৃতীয় বিয়ানের সময় কখনও কখনও দৈনিক এক মণ পর্য্যন্ত কাঁচা ঘাস খাইয়াছে, এবং চোদ্দ সের পর্য্যন্ত দুধ দিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে এই গাভীটির অষ্টম বিয়ান চলিতেছে। এই বৎসরও সে সাত-আট সের পর্য্যন্ত দুধ দিয়াছে।

গাভী সংগ্রহ

কলিকাতার বিভিন্ন গো-হাট হইতে আবশ্যক-মত গাভী কেনা হইয়া থাকে। গাভীগুলি দুগ্ধবতী অবস্থায় ক্রয় করা হয়। গাভী দৈনিক যত সের দুধ দেয়, সেই হিসাবে সাধারণতঃ ২০৲ টাকা দরে গাভী কেনা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ষোল-সতের টাকা দরে দুইটি গাভী ক্রয় করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া গোশালাতেই জন্মিয়াছে এইরূপ গাভী চারিটি রহিয়াছে, এই গাভীগুলিও উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং ছয়-সাত সের হিসাবে দুধ দিতেছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে কিনিবার সময় গাভীটি যে-পরিমাণ দুধ দিত, একমাত্র পরিচর্য্যার ফলে অল্পদিন মধ্যেই তদপেক্ষা অধিক দুধ দিতেছে। কোন-কোন স্থলে অবশ্য ইহার সামান্য ব্যতিক্রমও দেখা গিয়াছে।

দুগ্ধ দোহন ও বিক্রয়

ভোর পাঁচটায় এবং অপরাহ্ণ চারিটায় দুই বার দোহন করা হয়। পরিষ্কার বাল্‌তিতে দোহন করিয়া আবৃত পাত্রে ঢালিয়া রাখা হয়, পরে ওজন করিয়া পাত্র সিল করিয়া বিক্রয়ার্থ পাঠান হয়। দোহনকারীর হস্ত ও নখের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। বাছুরকে তাহার শক্তি অনুযায়ী প্রচুর দুধ খাইতে দেওয়া হয়। কখনও কখনও বাছুরের চোখ হইতে জল গড়াইয়া জলের দাগ হয়। ইহা পুষ্টির অভাবের চিহ্ন। ছোট ছেলে-মেয়েরও ঐ রোগ দেখা যায়। প্রথমে জল পড়ে, পরে পুঁজ হয়, তাহার পর চক্ষু খারাপ হয় ও শেষে মৃত্যু হয়। সময়-মত পুষ্টিকর খাদ্য দিলে সহজেই রোগ উপশম হয়।

আজকাল প্রতিদিন ৩৫।৩৬ সের দুধ গোশালা হইতে পাওয়া যাইতেছে। গড়পড়তা সাধারণতঃ এইরূপই পাওয়া যায়। ইহার কতক অংশ খাদি প্রতিষ্ঠানের আশ্রম-সংলগ্ন পাকশালায় খরচ হয়, বাকী দুধ কলিকাতায় গৃহে গৃহে পাঠাইয়া বিক্রয় করা হয়।

খাদ্যসংগ্রহ

গরুগুলির জন্য ঘাস বিচালী যথাসম্ভব কলাশালায় উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিছু শাকসব্জী ছাড়া নয় বিঘা জমিতেই পশুখাদ্য বপন করা হইতেছে। ইহার মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল—

গিনি ও নেপিয়ার ঘাস	২½ বিঘা
জোয়ার, ধান, গম ইত্যাদি	৪ ”
শাকসব্জী	২½ ”
	৯ বিঘা

শাকসব্জীর মধ্যে কিছু আশ্রমের পাকশালায় যায়, কিছু বিক্রয় হয় এবং কিছু গোশালায় যায়। আশ্রমের পাকশালায়

তরিতরকারী বাছা ও কুটার পর ঐগুলির একটা বড় অংশ পড়িয়া থাকে এবং উহার সমস্তই গোশালায় দেওয়া হয়—উহা গরুর পরম উপাদেয় খাদ্য।

সার ব্যবহার

গোশালার নিকটেই পাকা চৌবাচ্চা আছে। উহাতে গো-মূত্র এবং গোশালার মেঝে-ধোয়া জল আসিয়া জমে। গোবর গোশালার নিকটেই একটি বড় গর্ত্তে জমানো হয়, এবং আবশ্যকমত পচাইয়া ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। গো-মূত্রাদির দ্বারা যখন চৌবাচ্চা পূর্ণ হইয়া উঠে তখন উহা তুলিয়া গোবরের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়, অথবা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। গো-মূত্র বিশেষ উপকারী সার, এবং গরুর জন্য ঘাস-উৎপাদনে সদ্যসদ্যই ব্যবহার করা যায়।

খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালার মোটামুটি বিবরণ উপরে দেওয়া গেল। খাদিকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মশক্তি প্রধানতঃ নিযুক্ত। আনুষঙ্গিক কাজ হিসাবে গোশালার প্রতিষ্ঠা হইলেও উহা বর্ত্তমানে একটি আদর্শ গোশালায় পরিণত হইয়াছে। উষা গ্রামের পাদরী উইলিয়ম গোশালা দেখিয়া তাঁহার "উষাগ্রাম" নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন "I was proudly shown the dairy where the animals are treated with human care." ইহা খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ত্যাগী, অনন্যসাধারণ কর্ম্মযোগী শ্রীমান সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হেমপ্রভার অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তির নিদর্শন-স্বরূপ।

আদর্শ গোশালার সঙ্গে কৃষিকার্য্য একান্ত আবশ্যক—যে-কোন উদ্যমশীল যুবক, একা অথবা কয়েক জনে মিলিয়া কলিকাতার সন্নিকটে দশ-পনর বিঘা জমি লইয়া উহাতে চাষ-আবাদ ও গো-পালন একসঙ্গে করিতে পারেন এবং নিজেদের উপজীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। প্রতিষ্ঠান-গোশালা তাহারই পরীক্ষামূলক নিদর্শন; উদ্যোগী কর্ম্মিগণ এখানে আসিয়া হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে পারেন।

বাংলার গরুর অবস্থা দেখিয়া আমার মন স্তব্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে আমি বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির তালোড়া-কেন্দ্রের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া এই প্রবন্ধ লেখাইতেছি। আমার সম্মুখে বিস্তৃত মাঠের উপর গরুগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে—এই গরুগুলির চেহারা দেখিতেছি আর আমার অন্তর কাঁদিয়া উঠিতেছে। দেখিলেই মনে হয় কোন পুষ্টিকর খাদ্য ইহারা পায় না। চরিয়া বেড়াইয়া ঘাস খাইতে যে শক্তি ইহাদের ব্যয় হয়, সেই শক্তিটুকু পরিপূরণের উপযুক্ত খোরাক ইহারা পায় না আর প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা ঘাস খায় বলিলেও অত্যুক্তি হয়। ঘাস এত ক্ষুদ্র ও রসহীন যে তাহা আহরণ করিতে দাঁত ক্ষয় হইয়া তাহার খাদ্যসংগ্রহশক্তি কমাইয়া দেয়। ইহার কারণ কি? একমাত্র কারণ আমাদের আলস্য। সত্য বটে, অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা গরুকে খাদ্য দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিকমত করে না; তাহারা এত অলস, এবং এই আলস্যের পিছনে তাহাদের অজ্ঞানতা এত অধিক যে চেষ্টা ঠিক পথে চলে না। বাল্যকালে দেখিয়াছি গ্রামে গ্রামে প্রায়ই গৃহস্থেরা গরুর জন্য সম্বৎসরের বিচালীর গাদা দিয়া রাখিত। এখন পাড়াগাঁয়ে তন্নতন্ন করিয়া দেখি বিচালীর গাদা রাখা আছে বটে, তবে তাহা পালিত গরুগুলির পক্ষে খুবই কম। ঘরে ঘরে ঢেঁকি ছিল—গৃহস্থেরা ধান ভানিত। কাজেই ক্ষুদ কুঁড়া প্রভৃতি ভাতের ফেন জলের সহিত মিশাইয়া গরুকে দেওয়া হইত। উহা গরুর একটি পুষ্টিকর খাদ্য। বর্ত্তমানে এই খাদ্য গরু কোথায় পাইবে—ধান-কলগুলির কল্যাণে সমস্ত ঢেঁকি উঠিয়া যাইতেছে। গৃহস্থের বাড়ির খাদ্যের যে-অংশ ফেলিয়া দেওয়া হইত (যেমন আনাজ-তরকারীর খোসা, আম-কাঁঠালের খোসা) তাহা গরুর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু উহা যত্ন-সহকারে গরুকে জোগাইবে কে? আজকাল গৃহস্থবাড়ির গৃহলক্ষ্মীরা গো-সেবা অর্থাৎ গোয়াল পরিষ্কার করা হইতে গরুর জাব প্রস্তুত করা ইত্যাদি কার্য্য করিতে নারাজ, ফলে গৃহস্থ-বাড়িতে গোপালন ও তাহার পরিচর্য্যার ভার চাকর-বাকরদের উপর ন্যস্ত হইতেছে। অধিকাংশ বাড়িতেই গরু নাই। ফলে পাড়াগাঁয়ে দুগ্ধ না কিনিলে মিলে না, এবং কিনিতে হইলেও বেশী

ভাগই মুসলমান চাষীদের নিকট হইতে কিনিতে হয়। কিন্তু তাহারাও গো-পালন সম্বন্ধে অজ্ঞ; উপযুক্ত খাদ্যাভাবে তাহাদের অস্থিকঙ্কালসার গাভীগুলি আধ সের তিন পোয়া, বড় জোর এক সেরের বেশী দুধ দেয় না। কিন্তু আবার কয় জন গৃহস্থেরই বা এমন সচ্ছলতা আছে যে প্রত্যহ নগদ পয়সা দিয়া দুগ্ধ কিনিতে পারে; যেটুকু পারে তাহাও আবার শিশুদিগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুন্দরবন-অঞ্চলের স্থানে স্থানে সামান্য মুদির দোকানে সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত জমাট দুধ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। আমার বাল্যকালের বাংলা এবং এখনকার বাংলায় কত প্রভেদ! তখন প্রত্যেক হিন্দুগৃহস্থ—ধনী, মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র—গাভীকে সাক্ষাৎ ভগবতীজ্ঞানে পূজা করিত, যত্ন করিত। কিন্তু এখনকার গৃহলক্ষ্মীরা কি গোয়ালে গিয়া এই প্রকার গো-সেবা করিতে প্রস্তুত? তাঁহারা ত গোয়াল দেখিয়া আঁত্‌কাইয়াই মূর্চ্ছা যাইবেন। ইহার ফলে বাংলা দেশে শতকরা ৯৫ জনের ঘরে দুধের চেহারাই দেখা যায় না। কিন্তু পঞ্জাব অঞ্চলে প্রত্যেক গৃহস্থ বা কৃষক অন্ততঃপক্ষে একটি গাভী বা মহিষ পোষে, তাহাদিগকে প্রচুর খাদ্য যোগায় এবং তাহাদের দুধ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নিজেরা ব্যবহার করে, ঘৃতাদি প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। গ্রামে যদি কোন পথিক কোন গৃহস্থের নিকট একটু পানীয় জল চায় তাহা হইলে সে অবাক হইয়া জলের পরিবর্ত্তে এক গ্লাস দুগ্ধ দিয়া থাকে।

কলিকাতার সন্নিকটে (আট-দশ মাইল দূরে) প্রচুর জমি পড়িয়া আছে। উদ্যমশীল যুবকগণ কয়েক বিঘা জমি লইয়া গো-পালন ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। চাই কেবল উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম। ব্যারাকপুর, পলতা প্রভৃতি অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে জমি ভাড়া লইয়া কয়েক জন পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান প্রচুর শাকসব্জী তরিতরকারী উৎপাদন করিয়া বেশ দু-পয়সা রোজগার করিতেছে। যে-সকল বাঙ্গালী যুবক দেশ-বিদেশে গিয়া কৃষিবিদ্যা-শিক্ষার জন্য ব্যস্ত তাঁহারা এই সকল সংবাদ রাখেন না। হ্যাট-কোট পরিয়া বা পরিচ্ছন্ন ধুতি শার্ট পরিয়া চেয়ার-টেবিলে বসিয়া হুকুম জারি করিয়া যাঁহারা কেবল কুলী-মজুরের দ্বারা কাজ করাইবেন, তাঁহাদের লাভ হওয়া দূরের কথা বিস্তর লোকসান দিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে প্রাচীন গৃহিণীরা এখনও যে-ভাবে গো-সেবা করেন অর্থাৎ নিজ হাতে গোয়াল পরিষ্কার করা, গরুর জাব দেওয়া ইত্যাদি কাজ করেন—যুবকদের সেই কথা মনে রাখিয়া কায়িক পরিশ্রম করিতে হইবে। এ-বিষয়ে খনার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। উহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

> খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
> তার অর্দ্ধেক হাতে ছাতি
> ঘরে বসে পুছে বাত
> তার ঘরে সদাই হা-ভাত।*

* এই প্রবন্ধের উপকরণ প্রতিষ্ঠানের এক জন হাতে-কলমে অভিজ্ঞ কর্ম্মী কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মৃত্যু ও অমৃত

শ্রীকালিদাস নাগ

মুখর দিনের মৃত্যুপারে
দেখা দিল মৌন নিশা নিয়ে তার রহস্য অপার।
অসীম আকাশভরা গ্রহ তারা নক্ষত্রের দল
কৃপা-নেত্রে চাহে যেন ক্ষুদ্র এই ধরিত্রীর পানে।
এক দিকে সংখ্যা-হারা সৃষ্টির প্রবাহ
অন্য দিকে নরনারী—
ক্ষণিকের হাসি কান্না ঘেরা এ-জীবন!
কবে তা'রা কেন তা'রা উঠিল ভাসিয়া
কোন্ ভুলে-যাওয়া সৃষ্টি-সমুদ্র মন্থনে?
কেহ বলে হলাহল কেহ বলে অমৃত এ প্রাণ
অর্ব্বাচীন মানবের দুর্ব্বোধ্য নিয়তি!

তারো আগে প্রাণ ছিল এ ধরারে ঘেরি
আদিম পঙ্কের মাঝে লতাগুল্ম কৃমি কীট দল
বেঁচেছে মরেছে কত সাক্ষ্য দেয় অঙ্গার প্রস্তর
উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি-কক্ষে সিন্ধুবাসী প্রাণীর কঙ্কাল
লক্ষ লক্ষ যুগ পারে মৃত্যুর বিজয়গর্ব্ব-রেখা।
সে প্রাণের সে মৃত্যুর চিহ্ন আছে ব্যথা শুধু নাই।

পশু এল শব্দ নিয়ে ফুটাল ধ্বনির স্বরগ্রাম
ক্ষুধা তৃষ্ণা হর্ষ ভয় লোভ হিংসা কতই রাগিণী
পশু শিখাইল নরে ভাঙ্গাচোরা ঠাটে:
পশু-নর প্যান্ দেখি বেণু-মন্ত্রে সঙ্গীতের গুরু
তার কাছে মানবের প্রথম সাধনা
মানব সূতিকা-গৃহে পশু ধাত্রী। পশু দেবদেবী
ছেয়ে আছে বুঝি তাই আমাদের ধর্ম্মশিল্পমাঝে?

কান্না নিয়ে এল নরশিশু
ধ্বনির বেসুরো তারে সঞ্চারিল সুরের সোহাগ,
দরদী আলাপে তার
ফুটাইল কালে কালে সুরের সঙ্গতি।

কিন্নর কেমনে হ'ল আদি কলাবৎ
কপি-নর কোন্ সাধনায় হল কবি
শোক তার শ্লোকরূপে করিয়া অমর?

নিযুত বৎসর আগে, মঙ্গলীয় ভূমে,
যবদ্বীপে কপাল-কঙ্কালে দিল দেখা
মানবের সুপ্রাচীন জনম-পত্রিকা।
সেথা হ'তে বিস্তারিল নিজবংশ শাখা-প্রশাখায়
উত্তরে দক্ষিণে আর পূরবে পশ্চিমে
এক নর-গোষ্ঠী ভিন্ন আবেষ্টনবশে
শ্বেত কৃষ্ণ পীত আদি বর্ণ ভেদ করি
ছাইল ধরার বুক
গাহিল নূতন ছন্দে সৃষ্টি-ধ্রুবপদ।

বিংশতি সহস্র বর্ষ আগে
মৃত্যু দিল হানা
নির্ম্মম তুষার নদ রূপে!
ধুক্ ধুক্ করে প্রাণ, এতটুকু বুকের উষ্ণতা
বাষ্প হয়ে শূন্যেতে মিলায়!
বাহিরে জমাট মৃত্যু শুভ্র শ্বেত সমাধির মত
মাটি নাই জল নাই তৃণটুকু নাই
তার মাঝে নর নারী মরেছে বেঁচেছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে উৎকণ্ঠার শেষ।
সূর্য্যের নীরব আশীর্ব্বাদে
নড়েছে তুহিনরাশি সরে গেছে মৃত্যু আবরণ
জলের উচ্ছল কলতানে
কত সিন্ধু, হ্রদ, নদী নাচিয়াছে গীতছন্দসম।
আদি দেব সূর্য্যের বন্দনা
সবিতাগায়ত্রীমন্ত্র মুখরিছে তাই দেখি সাহিত্যপুরাণ

রচি প্রস্তরের প্রহরণ
সে যুগের নরনারী গড়েছে অদ্ভুত চিত্রশালা—
রচেছে সুরঙ্গ গুহা, সুনিপুণ লেপচিত্র দিয়ে
পশু-অরি পশু-মিত্র পশু দেবদেবী
ফুটায়েছে তুলির লিখনে
নিখুঁৎ সুন্দর!

প্রস্তর-যুগের শেষে শিকারী মানব
ধাতু-প্রহরণ ধরি গৃহচারী রূপে দিল দেখা।
ফুটিল কুটীরক্ষেত্র পশুযূথ পণ্যের পশরা;—
নদীমাতৃকার শিশু
নদী বেয়ে দেশে দেশে করিল মিতালি
বিচিত্র শিল্পের কত আদান প্রদান
নগ সিন্ধু সমুদ্রের পারে।
টায়েগ্রীস্ ইউফ্রেটীস্ নীল নদী নীরে
উর্ব্বরিয়া ওঠে
মানবের চিত্তক্ষেত্র অপূর্ব্ব সৌষ্ঠবে।

মিশরে মরণ-বেদী জীবনেরে ছাপাইয়া রয়।
মৃত্যুপারে কোন্ লোক? কিবা তার দিশা?
এই নিয়ে গবেষণা।
সমাধিরে কেন্দ্র করি অপূর্ব্ব সভ্যতা
উঠিল গড়িয়া।
সুমেরিয়া ইলামে ইরাণে
নক্ষত্রের মৌন ভাষা, মৃৎপাত্রের অমর গীতিকা
কারুকার্য্যে মুখরিত হ'ল।
হারাপ্পা মহেঞ্জ-দারো করিল ইঙ্গিত
হারানো মিতালি রেখা দীপ্ত হয়ে ফুটিল আবার।
মহাদেশে মহাদেশে দেখি
নিবিড় নাড়ীর যোগ, সুদূর অতীত কাল বাহি
গোত্রে গোত্রে পরিণয়
নব নব জাতির গঠন।

অনার্য্য, দ্রাবিড়, আর্য্য যুঝেছে মিশেছে পাশাপাশি
রচেছে বিচিত্র লিপি—পড়িতে জানি না!

যে নদী গড়েছে সব, সে আবার ভেঙ্গেছে নির্ম্মম
ধ্বংসরূপিণীর তেজে!
মহাপ্লাবনের গান, মরিতে মরিতে
রচেছে মানব তাই;
পলিমাটি মরুবুকে ডুবেছে সবাই
বীজ যেন মৃত্তিকার তলে
অঙ্কুরিয়া উঠেছে আবার
লক্ষ লক্ষ নর-রক্তবীজ
ধ্বংস-দেবিকার খড়্গ অবহেলি যেন
মরেছে বেঁচেছে বার-বার।

চেতনা লোকের কোন্ অনবদ্য ঊষা
জাগাল মানবচিত্ত
এই ভারতের সিন্ধুতীরে!
ধীরে ধীরে তমিস্রার নেপথ্য সরিল
দেখি বেদী দেখি বেদ আর্য্যদর্শনের জাগরণ
আলোকের অগ্নির বন্দনা
মিত্র বরুণের গাথা
ইন্দ্র নাসত্যের পূজা—কোন্ নব চেতন-প্রতীক?
গভীর আস্তিক্যবোধ ফোটে ধীরে ধীরে;
আছে নিশা তবু জানি দিবা এল বলে
আছে হিংসা হানাহানি, আছে শান্তি তারই পাশাপাশি
আছে মৃত্যু তবু তারে আচ্ছাদিয়া রয়
অসীম অমৃত লোক!

এ নূতন প্রাণ-ঋক্ মুখরিল অনন্ত আকাশে
গর্জ্জি ওঠে মানবের ভীরু চিত্তবীণা
অনন্ত আশায় দীপ্ত উদাত্ত সঙ্গীতে।
অপরূপ মীড়ে মূর্চ্ছনায়
মন্দ্র মধ্য স্বর-গ্রাম ছাড়ি
শেষ সপ্তকের মাঝে ঝঙ্কারিল প্রাণের বন্দনা।
মুক্ত কণ্ঠে গায় নর নারী—
সে মহান্ত পুরুষেরে দেখিয়াছি বুঝিয়াছি আজ
"যস্য ছায়ামৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ"—

মৃত্যু তাঁর ছায়া তাই ডরিব না আর
রুদ্রের দক্ষিণ মুখে অমৃতের অনুপম আভা
দিয়াছে পরম শান্তি
খণ্ড জীবনের মাঝে অখণ্ড নির্ভর।

তাই বলে মরণের হয় নাই শেষ
যুগে যুগে এসেছি মরিয়া
কভু আত্মীয়ের ক্রোড়ে ভুঞ্জি দীর্ঘ আয়ু
কভু চকিতের দণ্ডে
প্রকৃতির উদাসীন ধ্বংসের খেলায়।
প্লাবনে দাহনে যুদ্ধে মহামারী কোপে,
সর্ব্বনাশা ভূকম্পনে,
তলায়েছি ক্রূর মৃত্যু-সাগর অতলে।
ভীসুভিয়াসের ভীতি মনে আছে আজও

প্রশান্ত সাগর তার অশান্ত নর্ত্তনে
ধসায়েছে তলদেশ,
আমেরিকা জাপানের ধ্বংসের কাহিনী
আজো নাড়া দেয় বুকে,
নর-নারী বৃদ্ধ শিশু হাজারে হাজারে
নিষ্পেষিত হয়ে গেল সেদিন ভারতে
কেউ দীপ্ত দিবালোকে, কেউ ম'ল কালরাত্রি মাঝে!

তবু বুঝে গেছি মোরা—
প্রকৃতি নিষ্ঠুর পরিহাসে
বলে নাই শেষ কথা
তাহার উপরে আছে প্রাণের অদম্য সৃষ্টিলীলা।
আত্মার গভীরে তাই জাগে
জরামৃত্যুজয়ী এই আনন্দ উদার॥

আমার দেখা লোক

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

"হিতবাদী" আপিস এবং "বেঙ্গলী" আপিস একই বাড়িতে ৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে ছিল, সেই জন্য আমি সুরেন্দ্র বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। মণিরামপুরে তাঁহার বাটীতেও অনেকবার তাঁহার কাছে গিয়াছি। সুরেন্দ্র বাবুর আত্মজীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তির পর সমস্ত সংবাদপত্রেই তাঁহার জীবনকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক লেখা অনাবশ্যক। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদের সময় তিনি বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ তরুণ বাঙ্গালীর নিকট দেবতার আসন পাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য মফস্বলে, চার-পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকও সভাক্ষেত্রে সমবেত হইত। তাঁহার সঙ্গে কাব্যবিশারদ মহাশয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ৺গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, মৌলবী আবুল হোসেন, ডাক্তার গফুর প্রভৃতি মফস্বলে বক্তৃতা করিতে যাইতেন। আমিও অনেকবার তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তবে দূরে কোথাও যাই নাই। হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত রেলপথের পার্শ্বে যে-সকল সভা হইত, আমি সেই সকল সভাতে যাইতাম। একবার তাঁহার সঙ্গে একটা সভাতে গিয়া ভীষণ বিপদে পড়িয়াছিলাম এবং তাঁহারই কৃপায় সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলাম। সভাটা হইয়াছিল সেওড়াফুলির কালী-বাড়িতে। সভাতে বোধ হয় চার-পাঁচ হাজার লোক হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু সভাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়, কৃষ্ণকুমার বাবু ও গীষ্পতি বাবু বক্তা হিসাবে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম—বক্তা হিসাবে নহে, শ্রোতা বা দ্রষ্টা হিসাবে।

কারণ পূর্ব্বে আমি কখনও কোন সভাতে বক্তৃতা করি নাই। সভাপতি সুরেন্দ্র বাবু আসন গ্রহণ করিলে পর, তাঁহার আদেশে, এক জন স্থানীয় ভদ্রলোক বক্তাদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া সভাপতির টেবিলে রাখিয়া দিলেন। তিনি যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাব্যবিশারদ মহাশয়, কৃষ্ণকুমার বাবু এবং গীষ্পতি বাবুর নামের পরেই আমার নামটিও লিখিয়া দিয়াছিলেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল, রামপুরহাট স্কুলের হেড মাষ্টার, সুকণ্ঠ-গায়ক বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল" এই গানটি গাহিলেন। তার পর সুরেন্দ্র বাবু বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতা করিবার সময় তিনি একটা বড় মজার ভুল কথা বলিয়াছিলেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি "তোমরা সকলে স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার কর, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা তোমাদের মঙ্গল করিবেন" এই কথা বলিতে গিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—"দুর্গেশ-নন্দিনী দুর্গা তোমাদের মঙ্গল করিবেন।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিয়া মাত্র কাব্যবিশারদ মহাশয় বলিলেন—"ওকি বললেন? বলুন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিম বাবুর একখানি নভেল।" সুরেন্দ্র বাবু তাহা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? আমি দুর্গেশনন্দিনী বলেছি নাকি? ওটা ভুল হয়ে গেছে।" কথাবার্ত্তাটা অনুচ্চ স্বরেই হইয়াছিল, মঞ্চের উপর উপবিষ্ট লোকছাড়া আর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। উহার কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি চন্দননগরের সভাতেও ঐরূপ "শাস্ত্রের বিধান" বলিতে গিয়া "শাস্ত্রের ব্যবধান" বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। চন্দননগরের সভাতেই তাঁহার মুখে প্রথম বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনি। সভাতে কয়েক জন সাহেব ছিলেন, তাই সুরেন্দ্র বাবু প্রথম ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়াই অমনি সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ দুইটি সভা ব্যতীত অন্য কোন সভাতে ভুল বলিতে শুনি নাই। এইবার আমার বিপদের কথা বলি। কৃষ্ণকুমার বাবু, বিশারদ মহাশয় ও গীষ্পতি বাবুর বক্তৃতার পর সভাপতি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া আমাকে বক্তৃতা করিতে আদেশ করিলেন। সেই বিরাট সভা, তাহার উপর ভারতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী সুরেন্দ্র বাবু এবং আমার মনিব কাব্যবিশারদ মহাশয় উপস্থিত! আমি সুরেন্দ্র বাবুকে বলিলাম যে, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি কখনও বক্তৃতা করি নাই। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। বলিলেন, "হিতবাদীতে প্রবন্ধ লেখেন ত, তাই মুখে বলুন না, বক্তৃতা হয়ে যাবে। যারা লিখতে পারে, তাদের আবার বক্তৃতার ভাবনা কি?" আমার সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় কালীবাড়িতে দেবীর আরতি আরম্ভ হইল, কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে সভার কার্য্য বন্ধ রহিল। সেই সময়টা সুরেন্দ্র বাবু আমাকে বারংবার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আরতি শেষ হইলে তিনি আবার আমার নাম করিয়া বক্তৃতা করিতে আদেশ করিলেন। আমি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইলাম বটে, কিন্তু আমার কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল না। খুব আস্তে আস্তে দুই চারিটা কথা বলিলাম। সুরেন্দ্র বাবু বারংবার বলিতে লাগিলেন—"বাঃ বেশ ত বলছেন।" পাঁচ-সাত মিনিট পরে আমার ভয়টা একটু কমিয়া গেল,—গলার আওয়াজও একটু জোর হইল—ক্রমে ক্রমে কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর সুরেন্দ্র বাবু হাততালি দিতে লাগিলেন, উৎসাহে আমার মুখ খুলিয়া গেল—আমি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলাম। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, আমি সেই প্রথম দিনেই পঞ্চাশ মিনিট বক্তৃতা করিয়াছিলাম এবং সেই বিরাট জনতা নিস্তব্ধ হইয়া সেই বক্তৃতা শুনিয়াছিল। বক্তৃতা শেষ করিয়া যখন বসিলাম, তখন মনে হইল, আমি যেন দশ-পনর দিন উপবাস করিয়া আছি—শরীর এতই দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। আমি বসিবামাত্র সুরেন্দ্র বাবু আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "আপনি এমন সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারেন, আর বলিতেছিলেন কখনও বক্তৃতা করেন নাই?" আমি মনে মনে বেশ বুঝিলাম যে, সুরেন্দ্র বাবুই আমাকে বক্তা বানাইয়া ছাড়িলেন। তাহার পর অনেক সভাতে তাঁহাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়াছি, কিন্তু সেরূপ ভয় হয় নাই। কিরূপে বক্তা তৈয়ার করিতে হয়, তাহা সেদিন সুরেন্দ্র বাবুর কার্য্যে বুঝিতে পারিলাম। এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে কংগ্রেস হইয়াছিল, তাহাতে স্বর্গীয়

দাদাভাই নৌরোজী

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য ছিলেন, সখারাম বাবু "হিতবাদী"র সম্পাদকের পাস এবং আমি রিপোর্টারের পাস লইয়া কংগ্রেসে গিয়াছিলাম। সেইখানে ভারতের The grand old man বর্ষীয়ান মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার লিখিত অভিভাষণ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়াছিলেন

মিঃ গোখ্‌লে।

আমি মহামতি গোখলেকে তাহার পূর্ব্বে একবার প্রেসিডেন্সি কলেজে দেখিয়াছিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে শেক্সপীয়ারের একখানা নাটক ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। আমার এক বন্ধু তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করিতেন। তিনি আমাকে একখানা পাস দিয়াছিলেন। মিঃ গোখ্‌লে সে সময় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া তিনিও থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সার পি, সি, রায়ের পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন। পশ্চিম-ভারতের আর এক জন মহাত্মাকে একবার মাত্র দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তিনি

লোকমান্য তিলক।

সখারাম বাবু লোকমান্য তিলকের আদেশে কলিকাতায় শিবাজী-উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথম বৎসরের উৎসব টাউন হলে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসর "পান্তীর মাঠে" হইয়াছিল। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক সেই উৎসবে বোধ হয় সভাপতি হইয়াছিলেন। আমি সখারাম বাবুর সঙ্গে উৎসব-ক্ষেত্রে গিয়া মহামতি তিলককে দেখিয়াছিলাম। কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি

ডবলিউ. সি. বোনার্জ্জি

মহাশয়কেও আমি একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। সে দর্শন কোন সভাতে নহে—তাঁহার পার্ক ষ্ট্রীটের আবাসে। আমাদের সেই সময় হাইকোর্টে একটা মামলা হইতেছিল। আমার পিতা সেই মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ লইবার জন্য ডবলিউ. সি. বোনার্জ্জির খুল্লতাত রেভারেণ্ড শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে একখানা পরিচয়-পত্র লইয়া ডবলিউ. সি. বোনার্জ্জির নিকটে গিয়াছিলেন। বাবা এক জন বেহারা দ্বারা আগমন-সংবাদ পাঠাইলে বোনার্জ্জি সাহেব কক্ষান্তর হইতে আমাদের কক্ষে আসিয়া বাবাকে নমস্কার করিলেন। বাবা মনে করিয়াছিলেন যে বোনার্জ্জি সাহেব বোধ হয় সাহেবী কেতায় 'গুড মর্ণিং' বলিয়া সেলাম করিবেন এবং ইংরেজীতে কথা কহিবেন। কিন্তু বোনার্জ্জি সাহেব পুরাদস্তর দেশীয় প্রথায় করজোড়ে কপাল স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিলেন এবং বাঙ্গালাতে কথা কহিয়াছিলেন। আমরা প্রায় এক ঘণ্টা তাঁহার কাছে ছিলাম, তন্মধ্যে আদালত-সংক্রান্ত দুই-একটা শব্দ ব্যতীত একটিও ইংরেজী শব্দ বলেন নাই। তাঁহার পোষাকটা কিন্তু সাহেবী ছিল—সাদা ফ্লানেলের প্যাণ্টলান ও কামিজ। তিনি বাবার কাছে তাঁহার খুড়ার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। আমরা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি আবার বাবাকে নমস্কার করিলেন, আমরাও প্রতিনমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। এখনকার বোধ হয় সতের-আঠার বৎসর পূর্ব্বে চুঁচুড়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে কুমিল্লার শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত সভাপতি হইয়াছিলেন। অখিল বাবুকে সভাপতির আসন প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ নেতা

রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর।

তিনি ঐ প্রস্তাব উত্থাপনকালে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"আমি কিছু দিন কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে মাষ্টারী করিয়াছিলাম। আমি স্বশুরে বাঙ্গাল, তাই কলিকাতায় একটা অকালপক্ব ছাত্র এক দিন আমাকে প্রশ্ন করিল—Sir বাঙ্গাল কোন্ gender? আমি তাহাকে বলিলাম—বাঙ্গাল masculine gender, উহার feminine বাঙ্গালী; তোমরা যাহাদিগকে বাঙ্গালী বল, তাহারা ত স্ত্রীলোক। যদি দেশে কেহ পুরুষমানুষ থাকে তবে সে বাঙ্গাল। আজ আমি এই সভাতে এক জন পুরুষের মত পুরুষকে সভাপতির আসন দিবার প্রস্তাব করিতেছি।" "হিতবাদীর" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সংস্কৃত কলেজে যদুনাথ বাবুর ছাত্র ছিলেন। যশোহরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের পর একদিন তিনি কি

একটা কার্য্যে "হিতবাদী" আপিসে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কাছে আসিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার গোঁফ ছিল, কিন্তু সেদিন হিতবাদী আপিসে দেখিলাম গুম্ফহীন মুণ্ডিত মস্তক। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহাকে মাথার চুল ও গোঁফ ফেলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মজুমদার মহাশয় বলিলেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়া ঝকমারি করিয়াছিলাম, তাই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি।" যশোহরের ঐ সম্মেলনের কয়েক দিন পূর্ব্বে পাঁচকড়ি বাবু "নায়কে" শিক্ষিতা মহিলাদিগের সম্বন্ধে কি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, সেই জন্য যশোহরের এক শ্রেণীর যুবক পাঁচকড়ি বাবুর প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া, তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে অপমান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে মজুমদার মহাশয়কে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, "সভাপতি হইয়া ঝকমারি করিয়াছিলাম।" উপরে চুঁচুড়ার যে প্রাদেশিক সম্মেলনের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চুঁচুড়ায় আর একবার প্রাদেশিক সম্মেলন হইয়াছিল। সেই সম্মেলনে বহরমপুরের

রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর

সভাপতি হইয়াছিলেন। সেই সভাতে আমি ফরিদপুরের বাবু

অম্বিকাচরণ মজুমদার

মহাশয়কেও দেখিয়াছিলাম। ইঁহাদিগকে আমি সভাস্থলে দেখিয়াছি এবং তাঁহাদের বক্তৃতাও শুনিয়াছি, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছুই আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি না। তাঁহারাও "আমার দেখা লোক"। তাই এই প্রবন্ধে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিলাম। আমার পিতা যখন বর্দ্ধমান নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, তখন শ্যামসায়রের বড় ঘাটের উপরেই যে দ্বিতল বাটী আছে, সেইটাতে আমাদের বাসা ছিল। আমি তখন বালক মাত্র, আমার বয়স তখন সাত-আট বৎসর। একদিন দেখিলাম যে, বাটীতে রন্ধনের ও জলখাবারের কিছু বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে। মাতাঠাকুরাণীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম আমাদের বাড়িওয়ালা

বাবু জগবন্ধু ঘোষ

সপরিবারে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। কে তিনি, জিজ্ঞাসা করাতে মা বলিলেন, তিনি হাকিম। আমরা তাঁহার বাড়িতেই বাস করিতেছি। সে হাকিম অর্থে মুন্সেফ, জজ, কি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তাহা বুঝি নাই। পরে বাবার নিকট শুনিয়াছিলাম যে তিনি স্বনামধন্য হাইকোর্টের উকীল স্যর রাসবিহারী ঘোষের পিতা। তিনি যখন সপরিবারে বর্দ্ধমান জেলায় তাঁহাদের গ্রাম তোড়কোনায় যাইতেন, তখন বর্দ্ধমানে নামিয়া আমাদের বাটীতে "প্রসাদ পাইয়া" অর্থাৎ আহারাদি করিয়া যাইতেন। বর্দ্ধমান শহর হইতে তোড়কোনা অনেক দূর, সেই জন্য তিনি বর্দ্ধমানে 'ব্রেক জার্নি' করিতেন। দুইবার কি তিনবার আমাদের বাসাতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। সম্ভবতঃ হাইকোর্টের সুদীর্ঘ অবকাশের সময়ই তিনি দেশে যাইতেন। স্বদেশী যুগের আর এক জন খ্যাতনামা ব্যক্তি—

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

মহাশয়ের সহিত আমার নানা কারণে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়—বোলপুরে শান্তিনিকেতনে ত্রিশ কি বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। যখন রবীন্দ্র বাবু শান্তিনিকেতনে আট-দশটি বালককে লইয়া "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রকুমারকে সেই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সেই সময় আমি দুই তিনবার বোলপুরে গিয়া শান্তিনিকেতনে আট-দশ দিন করিয়া বাস করিয়া আসিয়াছি। উপাধ্যায় মহাশয় সেই সময় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শিক্ষকতা করিতেন। শুনিয়াছি তিনি অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন। উপাধ্যায় মহাশয় রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টান ছিলেন। কিন্তু গৈরিক বস্ত্র বহির্ব্বাস পরিধান করিতেন, নিরামিষ আহার করিতেন। শান্তিনিকেতনের অদূরে শালবনে একটি তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে তিনি বাস করিতেন, স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। তখন আমি জানিতাম না যে, আমার সতীর্থ চন্দননগরের বর্ত্তমান মতের ও পণ্ডিচেরীর ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় উপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনীপতি। উপাধ্যায় মহাশয়ই একদিন আমাকে কথায় কথায় বলিলেন যে, তাঁহার খুড়তুত ভগিনীর সহিত সাধু বাবুর বিবাহ হইয়াছে। সাধুবাবুর শ্বশুরের সহিত আমার

আলাপ ছিল। তাঁহার নাম ছিল তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হুগলীতে ওকালতী করিতেন। উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, তারিণী বাবু তাঁহার ছোট কাকা, পিতার কনিষ্ঠ সহোদর। কলিকাতার রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপাধ্যায় মহাশয়ের পিতার সহোদর ছিলেন। উপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীচরণ ও ভবানীচরণ ব্যতীত তাঁহাদের বাটীর আর কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। উপাধ্যায় মহাশয় বোলপুর হইতে আসিয়া কলিকাতায় যখন "সন্ধ্যা" নামক দৈনিক সংবাদপত্র বাহির করেন, তখন তাঁহার সহিত আমার সর্ব্বদাই দেখা হইত। তাঁহার বিলাতযাত্রার পাঁচ-ছয় দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে চন্দননগরে আমাদের বাটীতে লইয়া গিয়াছিলাম। সেদিন বৈকালে চন্দননগর পুস্তকাগারে তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। তিনি সকালে আমাদের বাটীতে আহার করিয়া অপরাহ্ণ কালে সভাতে বক্তৃতা করেন। বাটীর মধ্যে আহারের স্থান হইলে আমি যখন বহির্বাটীতে তাঁহাকে ডাকিতে গেলাম, তখন তিনি বলিলেন, "আমাকে এইখানে বাহিরে ভাত দিলে ভাল হইত। সন্ন্যাসীর গৃহস্থের অন্তঃপুরে গমন করা নিষিদ্ধ।" আমি তাঁহার সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলাম না, তাঁহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলে তিনি মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমি আপনার বড় ছেলে।" মা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তুমি সত্যিই আমার বড় ছেলে। তোমাকে দেখে আমার দেবিনের মুখ মনে পড়ে।" দেবেন্দ্র নামে আমার এক অগ্রজ সহোদর ছিলেন, ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। মা বলিলেন, "উপাধ্যায় মহাশয়ের মুখ অনেকটা তোমার দাদার মত।" অপরাহ্ণ কালে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পুস্তকাগারে লইয়া গেলাম। বক্তৃতার বিষয় ছিল "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম"। তিনি বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমবেত সকলের অনুরোধে ইংরেজীতেই বক্তৃতা করেন। আমার মনে হয় "সন্ধ্যা" কাগজ তিনি বিলাত হইতে আসিয়া বাহির করিয়াছিলেন। "সন্ধ্যা" গ্রাম্য ভাষাতে লিখিত হইত, সাধু ভাষার সংস্রব মাত্র ছিল না। "হিতবাদী"তে বিশুদ্ধ ব্যাকরণ-সম্মত সাধুভাষা ব্যবহৃত হইত। সেই জন্য কাব্যবিশারদ মহাশয় "সন্ধ্যা"র ভাষাকে মেছুনীর ভাষা বলিতেন। "সন্ধ্যা"তে যে-সকল লেখা বাহির হইত, তাহা আজকালকার দিনে একেবারে অচল। ভাষা হিসাবে নহে, রাজবিদ্বেষ হিসাবে। ঐ সকল প্রবন্ধে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যেরূপ সুতীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইত, এখন তাহার শত ভাগের এক ভাগ কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর এবং স্বত্বাধিকারীর কারাদণ্ড ও ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত অবধারিত। "সন্ধ্যা" প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে প্রকাশিত হইত; উহা গরম গরম লেখার জন্য এক শ্রেণী পাঠকের বড়ই প্রিয় ছিল। রাজবিদ্বেষের অপরাধ হইতে "সন্ধ্যা" নিষ্কৃতি পায় নাই। কয়েকটা লেখার জন্য "সন্ধ্যা"র বিরুদ্ধে রাজবিদ্বেষের অভিযোগ হওয়াতে উপাধ্যায় মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইলে তিনি পুলিস আপিসে গিয়া আত্মসমর্পণ করেন। ঐ আত্মসমর্পণের দিন তিনি চেলির কাপড় ও টোপর পরিয়া গিয়াছিলেন। পুলিস-আদালতে মামলা চলিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন—"আমাকে আটক করিয়া রাখে, এমন জেল এখনও তৈয়ারী হয় নাই।" তাঁহার এই স্পর্দ্ধা সত্যে পরিণত হইয়াছিল, মামলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতার

বেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পিতৃব্য ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন, কিন্তু সাহেব ছিলেন না। বাটীতে কাপড় পরিতেন, সভা-সমিতিতে যাইবার সময় চোগা, চাপকান ও প্যাণ্টুলান পরিধান করিতেন। শুনিয়াছি তাঁহার বাটীর মহিলারা নাকি আলতা পরিতেন এবং অন্তঃপুরবাসিনী ছিলেন। কালীচরণ বাবু সিমলাতে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সিমলার বাসাতে তিন-চারি দিন গিয়াছিলাম, কিন্তু একদিনও তাঁহার বাটীর কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাই নাই। চন্দননগরে একটা সভাতে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাকে বলিতে তাঁহার আবাসে গিয়াছিলাম। এই উপলক্ষেই আমি কয়েক বার তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। সভার দিন বেলা দুইটা কি তিনটার সময় আমাদের বাড়িতে তাঁহাকে লইয়া যাই। বাটীতে আমার পিতার

সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইল, উভয়ে বেলা সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইল। সভাতে যাইবার পূর্ব্বে বাবা তাঁহাকে একটু জলযোগ করাইয়া সঙ্গে করিয়া সভাতে লইয়া গেলেন। তিনিও ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই সভাতে একটা বড় মজার ব্যাপার হইয়াছিল। ঐ সভায় প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, চন্দননগর গোন্দলপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এক সভা হইয়াছিল। কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ মিঃ এন. ঘোষ সেই সভাতে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। চন্দননগরের বড়সাহেব বা শাসন-কর্ত্তা সেই সভাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, এইরূপ কথা ছিল। পাঁচটার সময় সভা আরম্ভ হইবার কথা, ছয়টা বাজিয়া গেল, বড়সাহেবের দেখা নাই। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও যখন বড়সাহেবের আগমনের কোন লক্ষণই লক্ষিত হইল না, তখন তদানীন্তন মেয়র ৺ দিননাথ চন্দ্রকে সভাপতি করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় বড়সাহেব আসিয়া দেখিলেন সভার কার্য্য চলিতেছে। দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "আমি সভাপতি, আমার অনুপস্থিতে সভা হইতেছে কিরূপে?" তখন সভার সম্পাদক বড়সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, বক্তাকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে বলিয়া, পূর্ণ এক ঘণ্টা বিলম্বে সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়, আরও বিলম্ব হইলে তাঁহার অত্যন্ত অসুবিধা হইত। কালীচরণ বাবু যে সভাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই সভাতেও সেই বড়সাহেবই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পাঁচটার সময় সভা আরম্ভ হইবার কথা, আমরা কালী বাবুকে লইয়া সাড়ে চারিটার কিছু পরে সভাতে গিয়া দেখি, বড়সাহেব আসিয়া সভাপতির আসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন, পাঁচ-সাতটি বালক ব্যতীত সভাতে আর কেহ নাই। বেলা পাঁচটার কিছু পূর্ব্বে সভার সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত হইলে, বড়সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "আমি বেলা চারিটার সময় আসিয়া বসিয়া আছি, তোমাদের এত বিলম্ব হইল কেন?" এই সভাতে সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে, বড়সাহেব অন্য এক ভদ্রলোককে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। গোন্দলপাড়ার সভাতে দেড় ঘণ্টা বিলম্বে আসিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় এই সভাতে তিনি এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। ফরাসী সাহেবদের punctuality-জ্ঞান এই ঘটনাতেই বুঝিতে পারা যায়। এইবার আর এক জন সেকালের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও খ্রীষ্টানের কথা বলিয়া এই বর্ণনা শেষ করিব। তিনি

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে।

আমরা তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলাম। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমরা হুগলী কলেজে যখন ভর্ত্তি হই, তখন লালবিহারী দে কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি চন্দননগরে বাস করিতেন, নিজের গাড়ী ছিল, প্রত্যহই সেই গাড়ী করিয়া কলেজে যাইতেন। সুতরাং আমাদের বাল্যকাল হইতেই আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি, অবশেষে তাঁহার ছাত্র হইবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছিলাম। আমরা তাঁহার কাছে সাত মাস কি আট মাস পড়িয়াছিলাম, তাহার পর তিনি পেন্সন লইলেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ছিলেন। গোঁফ-দাড়ি কামান, মাথার চুল লম্বা ঘাড় পর্য্যন্ত, কিন্তু অতি পাতলা। তিনি সাদা প্যাণ্টলান ও কাল চাপকান পরিধান করিতেন; মাথায় brimless bever hat-এর মত একটা কাল রঙের উঁচু টুপি, এই ছিল তাঁহার পরিচ্ছদ। তিনি এক পারসিকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দে সাহেব স্বয়ং ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাঁহার পুত্রকন্যারা জননীর মত গৌরবর্ণ ছিল। তাঁহার তৃতীয় পুত্র হর্ম্মসজী টেগোর দে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িত। হর্ম্মসজীকে তাহার পিতা মাতা বাড়িতে "হমূলু" বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও তাহাকে ঐ নামেই ডাকিতাম। হমূলু বাঙ্গালা বুঝিতে পারিত, কিন্তু পড়িতে বা বলিতে পারিত না। বাবুর্চি খানসামার কাছে হিন্দী শিখিয়াছিল, তাই হিন্দী বলিতে পারিত। দে সাহেব তাঁহার পুত্রদের নাম পারসিক ও বাঙ্গালা মিশাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বড় ছেলের নাম ছিল লালু লালবিহারী দে, মধ্যম পুত্রের নামটা আমার মনে নাই, তৃতীয় পুত্রের নাম হর্ম্মসজী টেগোর দে, ছোট পুত্রের নাম সোরাবজী টেগোর দে। কন্যাদের নাম শুনি নাই। লালবিহারী দের *Bengal Peasant Life* বা গোবিন্দ সামন্ত এবং *Folktales of Bengal* সেকালের

দুইখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল। উত্তরপাড়ার স্বনামপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবার ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালী কৃষক-পরিবারের নিখুঁত বর্ণনা কেহ বাঙ্গালা বা ইংরেজী ভাষায় লিখিতে পারিলে লেখক এক হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। পুরস্কারের আশাতে অনেকে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লালবিহারী দের গোবিন্দ সামন্তই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। যখন ঐ পুস্তক প্রকাশিত হয়, তখন লালবিহারী দে এবং মিঃ রো উভয়েই হুগলী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। "গোবিন্দ সামন্ত" প্রকাশিত হইলে রো সাহেব নাকি উহার সমালোচনায় বলিয়াছিলেন "written in baboo English" অর্থাৎ বাঙ্গালীর ইংরেজী ভাষায় লিখিত। ইহার কিছুদিন পরে রো এবং ওয়েব উভয় শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক মিলিত হইয়া একখানি ইংরাজী ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। সেই ব্যাকরণ সাধারণতঃ 'Row's Hints' নামে খ্যাত। ঐ পুস্তক প্রকাশিত হইলে লালবিহারী দে তাঁহার সম্পাদিত "বেঙ্গল মিস্লেনি" নামক ইংরেজী মাসিক পত্রে ঐ ব্যাকরণের সমালোচনায় অসংখ্য ভাষার ভুল ও ব্যাকরণের ভুল দেখাইয়াছিলেন। সমালোচনার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন, "যাঁহারা বাঙ্গালীর লেখাকে 'বাবু ইংলিশ' বলিয়া বিদ্রূপ করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, বাঙ্গালীর মধ্যে এমন বিশুদ্ধ ইংরেজী লেখক আছেন, মেসার্স রো এণ্ড ওয়েব কোম্পানী যাঁহার জুতার ফিতা খুলিবারও অযোগ্য।"

এই ঘটনার পর এক দিন নাকি হুগলী কলেজে লালবিহারী দের সহিত রো সাহেবের হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং রো সাহেব লালবিহারী দের সহিত এক কলেজে অধ্যাপনা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে চলিয়া যান। লালবিহারী দে সুবর্ণবণিকের পুত্র। তাঁহার বাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার এক পল্লীগ্রামে। আমার পিতা যখন বর্দ্ধমানে স্কুলের ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন, তখন পাঠশালা পরিদর্শন করিতে সেই গ্রামে যাইতেন। সেই গ্রামের এক জন ভদ্রলোক বাবাকে লালবিহারী দের "ভিটা" দেখাইয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লালবিহারী, দে দীর্ঘকাল চন্দননগরে বাস করিয়াছিলেন। আদালতের ঠিক পশ্চিমে যে ভগ্ন অট্টালিকা আছে, তিনি তাই ভাড়া লইয়া বাস করিতেন। আমার পিতার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল, বাবা তাঁহাদের গ্রামে মধ্যে মধ্যে যান শুনিয়া তিনি বাবাকে গ্রাম সম্বন্ধে কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেন। গ্রামের বাহিরে সেই বকুলগাছটা আছে কি না, খোঁড়া গুরু মহাশয়ের কেহ আছে কি না, দক্ষিণপাড়ায় নাপিতদের বাটীতে কেহ আছে কি না, সেকালের মত ঘটা করিয়া বারোয়ারি পূজা হয় কি না প্রভৃতি সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতেন। শৈশবের লীলাক্ষেত্র জন্মভূমির কথা ধর্ম্মান্তরগ্রাহী পুরাদস্তর সাহেব হইয়াও বৃদ্ধ ভুলিতে পারেন নাই!

আমার এই বর্ণনা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, বৃদ্ধ বয়সে সুদীর্ঘ অতীত জীবনের কথা চিন্তা করিলে একটির পর একটি কত মুখই মনে পড়ে, কত বিস্মৃতপ্রায় ঘটনার চিত্র আবার মানসপটে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। লিখিতে লিখিতে কত লোকের কথা লিখিব মনে করিয়া হয়ত ভুলিয়া গিয়াছি, আবার যাঁহার কথা দুই চারি ছত্রে সারিব মনে করি, তাঁহার কথা আর শেষ হইতে চায় না। হয়ত এই লেখা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইবার পর এমন অনেকের কথা মনে পড়িবে, যাহা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা উচিত ছিল, যাহা উল্লেখ না করাতে এই প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইল। কিন্তু নিরুপায়। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তির উপর জুলুম চলে না।
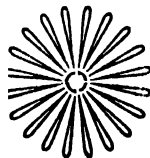
সুবিমলের ব্যবসায়

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

ছোট শহর—পল্লী বলিলেও চলে।

যাঁহারা ধনী তাঁহারা শিক্ষিত নন, যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা ধনী নন। শিক্ষিতও নয় ধনীও নয় এমন লোকের সংখ্যাই বেশী। যাহারা স্থায়ী অধিবাসী তাহারা মহাজন, দোকানদার, চাষা, মুটে, মজুর। যাঁহারা ভাড়াটিয়া বাসিন্দা তাঁহারা হাকিম, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, মাষ্টার, কেরানী।

ছোট শহর—সামান্য কারণেই হৈ চৈ পড়িয়া যায়—অতুল মুন্সেফ মদন উকীলকে ধমকাইয়া দিয়াছে, নিত্য মাষ্টারের ক্লাস হইতে গোবর্দ্ধন জানালা ভাঙিয়া পালাইয়াছে, জনার্দ্দন পাল নবীন ডাক্তারকে ধারে কাপড় বেচে নাই, মধু কেরানী মেয়ের বাড়ি তত্ত্ব পাঠাইতে লক্ষ্মী-পোদ্দারের নিকট স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিয়াছে—এমনই কত কি। কিন্তু এ সবও নগণ্য হইয়া পড়িল যেদিন রটিল যে রায়-বাহাদুর এখানে বাড়ি করিতেছেন।

এমন দুর্ম্মতি ত পূর্ব্বে কাহারও কখনও হইয়াছে শোনা যায় নাই। বাহির হইতে এ শহরে যাঁহারা জুটিয়াছেন, তাঁহাদের মনে ত এ কল্পনা জাগিতেই পারে না। মামলা-বাজের কাছে একটা হোটেলের যে কদর, এঁদের কাছে এ শহরের তার চেয়ে বেশী কিছু কদর হইতে পারে না। তাঁহারা রোজগার করিতেই এ শহরে আসিয়াছেন—পয়সা খরচ করিয়া বাড়িঘরদোর বাগান-বাগিচা করিবেন এখানে! কেন—দেশে কি তাঁহাদের কিছু নাই? এমন পরামর্শ রায়-বাহাদুরকে দিলেন কে?

তবে রায়-বাহাদুর লোক খুব ভাল, দু-দিনেই বেশ জমাইয়া তুলিয়াছেন। সবার সঙ্গেই মেলামেশা—যেন তালপুকুরের পাড়ে ঝড়ের সন্ধ্যায় ছেলেবেলায় আম কুড়াইবার সময় হইতেই পরিচয়—এমন গলাগলি ভাব! হ্যা—একেই ত বলে বৈঠকখানা। সেখানে উঁচু নীচু ভেদাভেদ নাই—মস্ত একটা ফরাস, যেন তাস-খেলার ক্লাব। কেউ পায়ের ধুলা লইতে হাত বাড়াইলে দাঁতে জিব কাটিয়া রায়-বাহাদুর চেঁচাইয়া উঠেন—হাঁ, হাঁ, কর কি, কর কি, বামুন-কুলে জন্মেছি—এটা খুবই ঠিক, কিন্তু এতকাল সরকারের গোলামী ক'রে হয়ে গেছি শূদ্দুর,—বস্ শোধবোধ!

প্রতি-সন্ধ্যায় চায়ের আসর। নিত্য নূতন পদলাভ, আনন্দজ্ঞাপনের ধুম পড়িয়া যায়। মিউনিসিপালিটির কমিশনার, লোক্যাল বোর্ডের মেম্বর, জেলখানার ভিজিটার, স্কুল-কমিটির অডিটার, ডাক্তারখানার ট্রেজারার—দেখিতে দেখিতে রায়-বাহাদুরের কত কাজ জুটিল—ইস্তক চালতা-বাগান ফুটবল-ক্লাবের পেট্রন।

বিপুল আয়োজন—বিরাট প্রচেষ্টা!

দি মীন-বর্দ্ধন কোম্পানী লিমিটেড—মূলধন দশ লক্ষ টাকা। উদ্দেশ্য মহৎ, দেশের মৎস্য-বৃদ্ধি। মাছ ছাড়া বাঙালীর চলে না। চরখা দরিদ্র ভারতবাসীর লজ্জা-নিবারণের প্রতীক, সমগ্র ভারতের জাতীয় পতাকায় তাহার স্থান। প্রভিনশিয়াল অটোনমি আসুক, মাছ বাঙালীর ক্ষুধানিবারণের প্রতীক, বাংলার জাতীয় পতাকায় থাকিবে মাছ।

কি আবেগময় বিজ্ঞাপন, পাঠ করিতে চোখে জল আসে, জিহ্বায় জল ঝরে, পেটে ক্ষুধা জাগে।

"সৃষ্টির সেই আদি যুগে—মানব যখন 'প্রলয় পয়োধি জলে' নিমগ্ন—তখন নারায়ণ 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' অনন্তশয়ন হইতে জাগিয়া, 'প্রাণপ্রিয়' লক্ষ্মীকেও সঙ্গসুখদান হইতে বঞ্চিত করিয়া, মীনরূপে ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই শুভদিন হইতে মীন-নারায়ণ মানবের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত। এই মীন-নারায়ণকে উদরে প্রেরণ করিয়া রসনায় তৃপ্তি, হৃদয়ে ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া, কত সাধু পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। আবার এই মীন-নারায়ণ বিকৃত গলিত রূপে কত দুষ্কৃতকে বিনাশ করিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? ভগবানের সেই

আদি রূপ—তাঁহার চরণে শতকোটি প্রণাম। এই রূপ শুধু 'সম্ভবামি যুগে যুগে' নয়, সম্ভবামি দিনে দিনে, সম্ভবামি পলে পলে। তিনি ছিলেন না, এ অবস্থা কখনও ছিল না; তিনি থাকিবেন না এ অবস্থা কখনও হইবে না।

কিন্তু 'ভূতলে অধম বাঙালী জাতি'। 'সাগর মেখলা' 'নদী বহুলা' খাল-বিল-প্রচুরা এই বাংলা দেশ দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। মৎস্য—হায়! আজ সে-ও 'আসে পোস্তে'।

বাঙালী, আর কত কাল মোহনিদ্রায় অচেতন থাকিবে? উঠ, জাগ। মীন-নারায়ণকে আবাহন কর। বাংলার নদনদী, খালবিল, দীঘি-সরোবর, ডোবা-পুকুর, নালা নর্দ্দমা সর্ব্বত্র এই মীন-নারায়ণকে প্রতিষ্ঠিত কর। ঘরে ঘরে মীন-নারায়ণের ছড়াছড়ি দেখিলে লক্ষ্মীও অচলা হইবেন। গৃহলক্ষ্মীগণ সন্তুষ্ট হইবেন।"

ব্যবস্থার প্রস্তাব চমৎকার। বাংলায় মৎস্যের চাষ করিতে হইবে। শুধু তাই নয়। বঙ্গোপসাগর হইতে তিমি, হাঙ্গর প্রভৃতি বড় বড় মাছ যাহাতে বাংলার খাল-বিলে প্রবেশ করিতে পারে—কিন্তু, সাবধান, পলুসে পুঁটিও নালা নর্দ্দমা হইতে সাগরে না যাইতে পারে—সে বন্দোবস্ত করা হইবে।

ডিরেক্টরদের বোর্ড—ইংরেজীতে যাহাকে বলে রিপ্রেজেন্‌টেটিভ। হারাধন চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল, উকিল: প্রিয়সখা সেনগুপ্ত বি-এ, বি-টি, মাষ্টার: অভয়াচরণ মিত্র এম-বি, ডাক্তার; এককড়ি ঘোষ মোক্তার; লক্ষীকান্ত শাহ, ব্যাঙ্কার. শচীবল্লভ বণিক, মার্চেন্ট; সর্ব্বোপরি আমাদের রায় নন্দলাল রায় বাহাদুর, রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

— বোর্ডে এক জন একস্‌পার্ট —

—বল কি মাষ্টার, নদীর জল আর মাছ—এদের সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয়. এতেও কি আমরা একস্‌পার্ট হলুম না? আবার একস্‌পার্ট—

যুক্তি অকাট্য—মাষ্টারের মুখের কথা মুখেই থাকিয়া যায়।

মোক্তার ঘোষ পোঁ ধরেন,—মাষ্টার কিনা—মনে করে ডিগ্রী না থাকলে—

এম্-এ, বি-এল উকিল বলেন—ডিগ্রীর দামটা নেহাৎ কম নয় হে—

এম্-বি ডাক্তার বিধান দেন—তবে মাষ্টার কিনা—নিজের উপর বিশ্বাস নাই। ইস্কুলে পড়ানো ভারি ত কাজ—এ ত আর রোগীকে ড্রাগ দেওয়া নয়! ওর-ই চাপরাস আনতে যায় ট্রেনিং কলেজে!

এমনি ভাবে বোর্ডের মিটিং চলে।

—আমি প্রস্তাব করছি যে 'দি মীন-বন্ধন লিমিটেডে'র চীফ অর্গেনাইজারের পদে শ্রীমান্ সুবিমলচন্দ্র—

রায়-বাহাদুরকে শেষ করিতে হইল না। তড়িদ্বেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন মোক্তার ঘোষ—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এ প্রস্তাব সমর্থন করছি। অ্যাঁ—বলেন কি রায়-বাহাদুর, নিজের ছেলেকে দেবেন কোম্পানীর কাজে! আপনি ইচ্ছা করলে ছেলেকে একটা বড় রকম চা—

—বাঙালীর ছেলেকে চাকুরীর নেশা ছাড়াতে হবে। ভুলে গেছেন—বাণিজ্যে বসতে—

—তবে যে শুনেছিলেম তিনি দার্জ্জিলিং গিয়েছেন—

—শুনেছিলেন ঠিক, তবে পরেরটুকু শোনেন নি। উঁচু জায়গায় উঠলেই মেজাজ উঁচু হয়, ছেলে বলেন—চাকুরী—যত বড়ই হউক ষোল-আনা ইংরেজের যুগে তুমি করেছ করেছ। কিন্তু এই এক-পাই স্বরাজের যুগেও আমি করব না। মিনিষ্টার হওয়ার চান্স নষ্ট করতে পারি না!

মাষ্টার আওড়ায়—হু-এভার এম্‌স্ য্যাট্ স্কাই—

—লক্ষ্য ছোট করতে নেই, সুবিমলকে আমি দোষ দিই না—রায়-বাহাদুর বলতে থাকেন—তবু যদি ছেলেদের এ নেশা ছাড়ে!

—এদিকে যে গরিবের ঘরে নেশা বেড়ে উঠছে রায় বাহাদুর—উকিল বাধা দিয়ে বলেন—বড়মানুষের ঘরে জন্মাই নি, বড়মানুষ শ্বশুরও জোটাতে পারি নি। তাই চুপি-চুপি ল' পাস ক'রে শামলা-মাথায় দিলুম। চাকরীর নেশা আমাদের পায় নি; কিন্তু বড়ছেলেটা সে দিন তার মাকে বলছে শুনছিলুম—দিন উল্টে গেছে মা, এখন গরিবের ছেলেও পরীক্ষা পাস ক'রে বড় চাকরী পেতে পারে। বিয়ের প্রস্তাবটা এখন সিকেয় তুলে রাখ। একটু নিরবিচ্ছি পড়াশুনা

করতে দাও।—বুঝলুম ছেলেটাকে নেশায় ধরেছে, থাকুক দিনকতক।

—তাহ'লে আপনাদের কোন আপত্তি—

—আপত্তি? বিলক্ষণ! এ ত আমাদের পরম সৌভাগ্য—

শ্রীযুক্ত সুবিমল রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইলেন।

সপ্ত ডিঙ্গি মধুকর নয়, মাত্র তিনটি।

চাঁদ সওদাগর গিয়াছিলেন বাণিজ্য করিতে, সুবিমল যাইতেছেন—হ্যাঁ এও বাণিজ্য বইকি? চাঁদ দিয়েছিলেন সাগর পাড়ি, সুবিমল ঘুরিবেন খাল নালা বিল আর নদীতে।

বাদল শেষ হইয়াছে—নদী ভরা কূলে কূলে।

জেলেরা এখন হইতেই কাজে লাগিয়াছে—শিবপুরের জেলেরা পনর হাজার টাকায় কাজলা বিল ইজারা লইয়াছে। ইহাদের সাহস কত। শিবপুরে ত পনর ঘর জেলেই নাই। আর এদের মূলধনই বা কি? আর জমিদারটা কি বোকা! "দি মীন-বর্দ্ধন কোম্পানী লিমিটেড" বেশী টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, জমিদার রাজী হন নাই, বলেন—আজ তিন পুরুষ এরাই ইজারা নিচ্ছে—এদের বঞ্চিত করতে চাই নে।

—এরা যে টাকা দেবে তার গ্যারাণ্টী কি?

—এদের মুখের কথা—আজ পর্য্যন্ত কথার খেলাপ হয় নি; এরা মূর্খ, ধর্ম্ম মানে, আইন জানে না। জমিদারের খাজনা—দিতেই হয়। তিন বছর পার হ'লেই তামাদি—এটা এখনও শেখে নি। বাপ দিতে না পারে ছেলে দেবে। এ বৎসর লোকসান হয় দেবে না, যে-বছর লাভ হয় সুদ সুদ্ধ শোধ করবে।

রায়-বাহাদুর বেশী হাঁকিলেন।

জমিদার হাসিয়া বলিলেন—লোভ দেখাবেন না রায়-বাহাদুর, আমি জমিদার—মহাজন নই।

এর পর আর আলাপ চলিল না।

সুবিমল যাইতেছেন এই কাজলা বিলে।

বজরায় সুবিমল। বজরাটি ইংরেজীতে যাকে বলে—ওয়েল ফার্নিশ্‌ড্‌। সামনের কামরাটি আপিস; একটি ডেক-চেয়ার, একখানি টেবিল, একটা গ্রামোফোন, একটা হারমোনিয়ম, একটা টাইপরাইটার, দুই প্যাক তাস, একটা ষ্টোভ, একটা কেট্‌লি, তিন-জোড়া চায়ের পেয়ালা পিরিচ, একটা টি-পট, এক রীম কাগজ। দ্বিতীয় কামরা শয়ন-কক্ষ—পর্দ্দা-টাঙানো, ভিতরে কি আছে দেখা যায় না।

দুই নম্বর একটি বড় ডিঙ্গি—ইহাতে আছেন হরিপদ সেন, সুবিমলের সঙ্গে এক ক্লাসে নয়, এক কলেজে পড়িতেন, বেশী-দূর এগোতে পারেন নি, সম্প্রতি "দি মীন-বর্দ্ধন কোম্পানী"র ষ্টেনোগ্রাফার, এক পাড়াতেই বাড়ি, ভাল গাইতে পারেন, ভাল টাইপ করিতে পারেন। তিন নম্বর ডিঙ্গি—রসুই-ঘর বলা চলে, একটি বামুন ও একটি চাকর আছে।

বিশাল বটবৃক্ষ—মহীরুহ। বহুদূর হইতে দেখা যায়।

বটগাছকে কেন্দ্র ধরিয়া ক্ষুদ্র একটি চর—চারি দিকে জল, যত দূর দৃষ্টি যায়, দূরে দিগন্তরেখায় বৃক্ষের সারি। চরে যত জেলে আড্ডা গাড়িয়াছে—সংখ্যায় দুই শত; বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। কেহই স্থির বসিয়া নাই: কেহ জাল বুনিতেছে, কেহ বাঁশ চাঁচিতেছে, কেহ কঞ্চি কাটিতেছে, কেহ বাট্‌না বাটিতেছে, কেহবা মাছ কুটিতেছে, কেহ বা রান্না করিতেছে, কেহই অলস বসিয়া নাই, যে যার নির্দ্দিষ্ট কাজে ব্যস্ত।

সুবিমলচন্দ্র এই চরে অবতরণ করিলেন। দুই শত জেলে, কৃষ্ণকায়, নিরক্ষর, বাঙালী—একটা ব্যবসায়ে রত; একমন, একপ্রাণ, তর্ক নাই, দাঙ্গা নাই, মামলা নাই, মোকদ্দমা নাই, আপিস নাই, কেরানী নাই—আশ্চর্য্য!

সুবিমলচন্দ্র ও তাঁহার সহকারী চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ বলে না—আসুন, বসুন; কেহ প্রশ্ন করে না—কি চান, কাকে চান। সবাই মুখ নত করিয়া আপন আপন কাজে রত। কেহ কেহ বা মুখ তুলিয়া একবার চাহে, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র—আবার যে যার কাজে লাগিয়া যায়। ছোট ছোট বালকগণও ইহাদের দেখিয়া কৌতূহল প্রকাশ করে না।

অগত্যা সুবিমলই উপযাচক হইয়া এক জনকে বলিলেন—আমি তোমাদের সর্দ্দার মাতব্বরের সঙ্গে একটু আলাপ করব।

—ও মথুর সর্দ্দার! এক বাবু তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন—অমনি হাঁক পড়িল। দুই বিঘা জমি পর হইতে আর এক জন হাঁক ছাড়িল। তার পর আর এক জন। এমন ভাবে চরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে হাঁক পৌছিল। মিনিট-কয়েক পরে মথুর আসিয়া দাঁড়াইল। সর্দ্দার বটে, উন্নত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বাব্‌রী চুল—দেখিলে ভয় হয়। প্রায় ভূমি পর্য্যন্ত নত হইয়া করজোড়ে নমস্কার করিয়া মথুর জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা—

হরিপদ উত্তর করিলেন—আমরা এসেছি তোমাদের কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে। ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত সুবিমলচন্দ্র রায়, এঁর পিতা ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট :—

মথুর সর্দ্দার ভূত ভাল করিয়াই চেনে, পুব দিককে বাবুরা যে পূর্ব্ব বলে, তাহাও সে জানে। তবে এই ভূতপূর্ব্ব কি জিনিষ সে কখনও শোনে নাই। তবে ম্যাজিষ্ট্রেট নাম সে শুনিয়াছে, জিলার মা-বাপ, জমিদার-বাবু বছরে দু-বার সেলাম দিতে সদরে ছুটিয়া যান, উকীলবাবুরা শাম্‌লা মাথায় না দিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইতে পায় না, এমন কত কি! ম্যাজিষ্ট্রেট নাম শুনিয়া মথুরের কেমন একটা ভয় হইল। সে-বার ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছিলেন এদের গাঁয়ে, পঞ্চায়েৎ বসিয়াছিল, তার পরই চৌকীদারী ট্যাক্সের হার গেল বেড়ে। এবার পাঠিয়েছেন ছেলে—আবার কি নূতন ট্যাক্স? মথুর সতর্ক হইল, বলিল—কাজ-কারবার আর কি দেখবেন বাবু, নদীতে কি আর মাছ আছে? না-পাওয়া যায় তত বড়, আর না-পাওয়া যায় তত বেশী। ওরে ও গদাই, যা ত বাবা, মাঝের চাঁইয়ের বড় মাছটা বাবুদের নৌকায় দিয়ে আয়।

—ওটা ত ওখানে নেই বাবা—

যে উত্তর দিল সে শ্রীমান গদাধর নয়। সুবিমল দেখিলেন এক তরুণী, স্বল্প বস্ত্রে তাহার যৌবনের উন্মেষ বৃথাই ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই চরে অপরিচিত বাবুদের দেখিবার কোন কল্পনা কিশোরী করিতে পারে নাই। সে যেন হঠাৎ মুসড়াইয়া গেল। তরকারীর ঝুড়িটা মাথায় তুলিয়া এক হাতে বৈঠায় ভর দিয়া সে নৌকা হইতে নামিল। মথুর আগাইয়া গিয়া মেয়ের মাথা হইতে ঝুড়ি নামাইল, বলিল—এ যে অনেক বেগুন দেখছি, হাটে কিনেছিস্ বুঝি?

—হাটে এত আসে নাকি? ও-পাড়ার গোব্‌রা কাকা দিয়েছেন। বিলপারের হারু জেঠা দিয়েছেন এগারটা কুমড়ো, গাংকূলের নিধু-দা' দিলেন চৌদ্দটা লাউ, সব নৌকায়—কুমড়োগুলো কি বড় আর কি টক্‌টকে লাল—

—তোর লাউ-কুমড়োর গল্প এখন থাক—মাছটা কি হ'ল ক্ষেমী? আসতে-আস্‌তে বুঝি দেখলি মাছটা চাঁই ভেঙে তোর মামার বাড়ি যাচ্ছে, না? ওরে ও গদাই—

—গদাইকে মিছামিছি ডাক্‌ছ বাবা, মাছ ওখানে নেই—

—কি হ'ল?

—চুরি—

—বলিস কি? গদা ত পাহারায় ছিল—

—ছিলই ত। কে না বল্‌ছে? তবে তা চুরি নয়—

—তবে কি?

—ডাকাতি।

—তুই করেছিস্ বুঝি?

—নইলে আমি জান্‌ব কি ক'রে? জমিদার-বাড়ির রাঙা-দিদি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন—পথে দেখা। ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—চরে যাচ্ছিস্ বুঝি? চালডাল নিয়ে? বললাম—তাই, তবে দু-চারটা আনাজও আছে। সঙ্গে ত কত মিঠাই-মণ্ডা নিয়ে যাচ্ছ পথে খাবার জন্যে। নেবে একটা গরিবের লাউ-কুম্‌ড়ো?—ব'লে বড় একটা লাউ উঁচু ক'রে ধরলুম। রাঙাদিদি হেসে বল্‌লেন—ভালবেসে দিচ্ছিস্ দে, একটা মাছের মুড়ো পেলে বেশ হ'ত। কমলাগঞ্জে যেতে যেতে হয়ত হাট ভেঙে যাবে। আমি উত্তর করলুম—এত দূর যেতে হবে কেন? ডাঙ্গায় হেঁটে ত যাচ্ছ না—যাচ্ছ জলে—মাছের অভাব কি? জামাইবাবুকে নাম্বিয়ে দাও না, এক ডুবে পাঁচটা রুই তুলবে।—একি জেলে-বাড়ির জামাই পেলি? জমিদার-বাড়ির জামাইয়ের এত মুরদ নেই. গো ক্ষেমী—হাসিয়া রাঙাদিদি তার বরকে বললেন—ওগো শুনছ, মাছের মুড়োর জন্যে জলে নাব্‌বে, না লাউ মুগ খাবে? রাঙাদিদির ওগোকে আর কিছু বলতে দিলাম না। আমি বল্‌লাম—জেলের মেয়ের কাছে

মাছের মুড়োর কথা তুলে শেষে ডালি খাবে? আমার যে কলঙ্ক হবে দিদি। তোমরা এগোও, রূপগাঁয় পৌঁছবার আগেই মুড়ো দিয়ে আসব। তার পর বাবা তোমার চরে এই ডাকাতি।—ক্ষেমী তার ডাগর চোখ তুলে বাপের দিকে চাইল।

ধীবর-কন্যা সত্যবতীকে দেখিয়া হস্তিনাপুরের রাজার টনক নড়িয়াছিল। সুবিমল রাজা নয়, টনকও তার নড়ে নাই। তবে রাত্রিতে যেন তার ভাল ঘুম হইল না।

একটা জেলেডিঙি, শুধু সুবিমল আর ক্ষেমঙ্করী, সুবিমল জাল টানিয়া তুলিয়াছে, ক্ষেমী কোমরে আঁচল গুঁজিয়া জাল হইতে মাছ খুলিয়া নৌকায় ফেলিতেছে।—সুবিমল বিছানায় উঠিয়া বসিল, বার দুই তিন হাতে চোখ রগ্‌ড়াইল—কই, কোথাও কিছু নাই। ক্ষেমঙ্করী তখন শিবপুরের ভাঙা কুঁড়েতে শুইয়া।

পরদিন প্রাতঃকাল, বজরা মাঝনদীতে, চা-পর্ব্ব শেষ হইয়াছে, হরিপদ বলিল—চলুন, এইবার নৌকা ছাড়ি, এখন রওয়ানা হ'লে দুপুরের পূর্ব্বেই—

—না হে না, এরই মধ্যে যাব কি? ব্যবসা করতে এসেছি, অমনই অমনই চলে যাব? তার উপর জায়গাটা ত মন্দ নয়।

সুবিমল বাহিরে আসিল, দেখিল, একটি ডিঙি আসিতেছে—হাল ধরিয়া কে? ক্ষেমী না?

সুবিমল হাতছানি দিয়া ডাকিল—নৌকা কাছে ভিড়িল।

—ডাঙায় যাচ্ছ বুঝি?

নতমুখে ক্ষেমী উত্তর করিল—আজ্ঞে।

—লাউ-কুমড়ো—

—না আজ আর লাউ-কুমড়ো নয়, দু-শ মরদের লাউ-কুমড়ো রোজ রোজ পাব কোথা বাবু? আজ কচু—ক্ষেমঙ্করী কচুর স্তূপের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করিল।

—চরে যাওয়ার একটু দরকার আছে। আমায় নিয়ে যাবে ক্ষেমু?—

—আমার নৌকা মাল বোঝাই, তা বোঝার উপর শাকের আটি, তবে এক কথা বাবু, লাউ কুমড়োর মত স্থির হয়ে বস্‌তে হবে—নড়েছেন কি পড়েছেন।

উৎসাহিত হইয়া সুবিমল বলিল—ভয় নেই ক্ষেমু, আমি নড়ব না।

—আসুন।

অতি সাবধানে ক্ষেমঙ্করীর হাত ধরিয়া সুবিমল বজরা হইতে ডিঙিতে অবতরণ করিল।

হরিপদ কি বলিতে যাইতেছিল—মুখে ফুটিল না। যখন তার হতভম্বতা কাটিল, তখন নৌকা প্রায় চরে লাগিয়াছে। সুবিমলের স্বপ্ন অর্দ্ধেক সফল হইয়াছে।

সেইদিন সন্ধ্যা।

রায়-বাহাদুর অর্গানাইজারের রিপোর্ট পাইলেন—

মাননীয় দি মীন-বর্দ্ধন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন এই, সুখচরে সমবেত জেলেদের সর্দ্দার মথুর দাসের সহিত আজ এই কণ্ট্র্যাক্ট করা হইল, যে, তাহারা যত মাছ ধরিবে, কুড়ি টাকা মণ দরে আমরা সমস্তই কিনিব, তাহারা অপর কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না। প্রথম চালান লইয়া গদাধর দাস আপনার নিকট যাইতেছে। জিলার সদর, কলিকাতা, দার্জ্জিলিং, শিলং প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা মাছ পাঠাইতে পারিবেন—কোনই অসুবিধা হইবে না। গদাধর দাস কর্ম্মঠ যুবক, সে ষ্টেশনে প্যাকিং ইত্যাদি করিয়া দিবে। প্রেরিত পঞ্চাশ মণের মূল্য এক সহস্র মুদ্রা। মথুর দাস বলিল—প্রথম বিক্রীর টাকাটা ৺কালীপূজার জন্য কিছু রাখিয়া বাকী তাহারা সর্ব্বদাই জমিদার-সেরেস্তায় জমা দিয়া থাকে। সুতরাং আপনি ঐ টাকা গদাধরের সঙ্গে দরোয়ান দিয়া জমিদারের সেরেস্তায় পৌঁছাইয়া দিবেন। ৺কালীপূজার জন্য আমি এখানে টাকা দিয়াছি। তাহা এখন কাটিয়া রাখিবার দরকার নাই। ভবিষ্যতে সুযোগ-মত রাখা যাইবে। ইহার পর প্রতিবার যে মাছ যাইবে, তাহার মূল্য অর্দ্ধেক এখানে, অর্দ্ধেক জমিদার-সেরেস্তায় ইহাদের নামে জমা হইবে। জমিদারের প্রাপ্য শোধ হইলে পর সর্ব্বদাই এখানে টাকা দিতে হইবে। সুতরাং

প্রত্যহ যাহাতে এইখানে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পাই সে বন্দোবস্ত করিবেন। ইহাতে অন্যথা হইলে বড়ই ক্ষতি হইবে। ইতি

নিবেদক

শ্রীসুবিমলচন্দ্র রায়

পুনরায় ডিরেক্টর-সভা।

মোক্তার ঘোষ উৎসাহে উৎফুল্ল। বলিলেন—সুবিমল বাবু একটা জিনিয়স্। মাছের ব্যবসায় গেলেন যেন একবারে—

—সাত পুরুষের জেলে—উকীল পাদপূরণ করিলেন।

—অমন ক'রে বাপ-পিতামহ তুলে গালাগালি দেবেন না। এই দেখুন পৈতে, কত সাত পুরুষ এর বোঝা বইছি কে জানে?—এক গাল হাসিয়া রায়-বাহাদুর বলেন।

এ-সবে মোক্তার ঘোষের কান দিবার অবকাশ নাই। তিনি আপন মনে হিসাব কষিতেছেন—কুড়ি টাকা মণ, ইয়া বড় বড় মাছ, কলকাতায় চৌদ্দ আনা, শিলঙে এক টাকা, দার্জ্জিলিঙে পাঁচশিকা। ট্রান্‌শিপমেণ্ট কস্ট আছে।—আচ্ছা নিদেন সব বাদ দিয়ে নিট তিন শিকি নেয় কে? দুই শিকিতে কিনে তিন শিকি বিক্রী—পঞ্চাশ পারসেণ্ট লাভ! সোজা নয়। রোজ পঞ্চাশ মণ—হাজার টাকায় কিনে দেড় হাজার টাকা। লাভ রোজ পাঁচ শত, মাসে পনর-হাজার। ছ-মাসেই ছয়-পনর নব্বই—এ যে লক্ষ টাকা!

এম-বি ডাক্তার বাধা দিলেন, বলিলেন—ফরাসে সতরঞ্জির উপর ধবধবে চাদর আছে, মোক্তার মশাই। তুমি লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছ, ছেঁড়া কাঁথায় না শুলে এ স্বপ্ন দেখবার অধিকার হয় না।

—এ স্বপ্ন নয় ডাক্তার—ঘোষ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—এ হিসাবের কথা—রীতিমত আঁক কষে। মাষ্টারকে না হয় জিজ্ঞেস কর।

মাষ্টার বলিলেন—আঁক অনেক কষেছি ভাই, ওতে কিছু হয় না। এক শিকিতে এক সের দুধ কিনে দুই আনা দরে বিক্রী ক'রে সেণ্ট-পারসেণ্ট লাভ দাঁড় করাতে ছটাক দুধে কয় ছটাক জল দিতে হয়, এক্ষুনি তা ব'লে দিতে পারি, কিন্তু কই, আজ পর্য্যন্ত কিছু হ'ল না, কেবল ক্ষতিই দিচ্ছি—

—তুমি কি আবার দুধের ব্যবসা ধরলে নাকি? মোক্তার প্রশ্ন করেন।

—সে ত রোজই করছি। তবে নেহাৎই জলের দরে।

—হেঁয়ালী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মাষ্টার—রায়-বাহাদুর বলেন।

—কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি রায়-বাহাদুর—উকিল বলেন।—তুমি যে গোড়ায় বড় ভুল করলে মাষ্টার। ম্যাট্রিকুলেশনের পর কেন আই-এ-টা পাস করলে? তাই না তোমার বাবার মনে আশা জাগল—ছেলে আমার কাঁচা সোনা; একটা কিছু হবে। চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে ফেল করলেই ত তিনি বলতেন—পড় বাবা দু-এভার ষ্টীলস—এত দিনে ঘোষের মত ডাকসাইটে মোক্তার—

—দুঃখ করবেন না মাষ্টার বাবু। ছোট জায়গায় বড় জিনিষকেও ছোট হ'তে হয়, নইলে ধরে না।—মার্চ্চেণ্ট প্রবোধ দেন—এই দেখুন না আমার বড় ছেলে, নাম দস্তখৎ করতে তিনবার কলম ভাঙে, আমার সব কারবার দেখছে। মজুরি দিই লাভের এক আনা, তাতেই একটা ডেপুটি মুন্‌সেফের বেতন হয়। আর মেজছেলেটা,—পোড়া স্কুল হ'ল, দিলুম, জলপানি পেয়ে পাস করলে। কোথায় কোন পগারে পড়ে আছে। বৌমাকে সঙ্গে নিতে বললে বলে—যা বেতন পাই, তাতে ত কুলবে না বাবা। নিজে ত অকেজো হয়েছি-ই, শহুরে বাবু ক'রে আবার ওকে অকেজো করি কেন? •

এমনই অনেক আলোচনার পর স্থির হইল—বেকার বন্ধু ব্যাঙ্ক হইতে প্রত্যহ হাজার টাকা উঠাইয়া এ ব্যবসায় নিয়োগ করিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ক্ষমতা দেওয়া হউক।

মানুষের আত্মীয়তা হয় মেলামেশায়—লোকে এই রূপ বলে। রাত্রিতে জেলেরা জলে নামে, মাছ ধরে। ভোরবেলা ক্ষেমঙ্করী গ্রাম হইতে এটা-ওটা-সেটা লইয়া

আসে। তার পর মথুর, গদাই, ক্ষেমঙ্করী উপস্থিত হয় সুবিমলের বজরায়।

কলিকাতা হইতে একটা কল আসিয়াছে, তীরে জলের কিনারায় তাহা বসানো হইয়াছে; মাছ ওজন হয়, জেলের দল ভিড় করিয়া দেখে, হরিপদ হিসাব রাখে। তার পর মাছ লইয়া গদাই যায় শহরে, টাকা লইয়া ক্ষেমঙ্করী যায় গ্রামে, মথুর বসে, তামাক খায়, দু-চারটা খোশগল্প বলে।

আত্মীয়তা জমে নাই কি করিয়া বলা চলে?

একদিন সুবিমল বলিল—সর্দ্দার, রোজ রোজ এতগুলো টাকা দিয়ে ক্ষেমুকে একা একা পাঠাচ্ছ—

—ভয় নেই বাবু, জেলের মেয়ের হাতে বৈঠা, মাছ-বঁটি, কেউ সাহস ক'রে এগোবে না—মাথা চৌচির হয়ে যাবে যে। —আচ্ছা বাবু, শহরে থাকেন, খবরের কাগজ পড়েন, শুনছি দুনিয়ার খবর নাকি ঘরে ব'সে পান। হামেশাই ত শুনেন, গুণ্ডারা মেয়ে ধরে নিয়ে যায়, জেলের মেয়েকে নিয়েছে এ কখনও শুনেছেন কি?—বলতে বলতে সর্দ্দারের বুক ফুলিয়া উঠে।

এক মাস পর। কয়েকটা নৌকা এসে চরে ভিড়িয়াছে। সব কয়টাই মালে ভর্ত্তি; কোনটায় ইট, কোনটায় চুণ, সুরকি, কোনটায়-বা বাঁশ, বেত, খড়।

ভোরের বেচা-কেনা শেষ হইয়াছে। গদাই মাছ লইয়া চলিয়া গিয়াছে। মথুর প্রশ্ন করিল—এ সব কি হবে?

—একটা বাংলো তুলবো—সুবিমল উত্তর করিল।

—কি তুলবেন?

—বাংলো, নিজের থাকবার জন্যে একখানা ভাল ঘর। নৌকায় থেকে থেকে আর ভাল লাগছে না সর্দ্দার। এ জায়গাটা বেশ, ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না—এখানেই থেকে যাব ভাবছি। এ চরটা তাই আমি কিনলুম। ভয় নেই সর্দ্দার, তোমাদের কাজের কোন অসুবিধা হবে না।—একটা বড় কাগজ টেবিলে পেতে সুবিমল বললে—এই দেখ, এতে সব আঁকা আছে। তোমাদের সঙ্গে যাহোক ব্যবসার একটা সম্পর্ক দাঁড়াল ত। এইবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করব। এই দেখ এখানে থাকবে আমার বাংলো। এই যে বড় ঘরটা দেখছ এটা হবে তোমাদের থাকবার আড্ডা, আর এই যে এই ঘর—এটার নীচে ব'সে চলবে তোমাদের কাজ, রোদ বাদলে তোমাদের কষ্ট পেতে হবে না, কাজেও বাধা হবে না। আর চরের এই ভাগটায় জলে লোহার শিক দিয়ে হবে বড় একটা চাঁই। বারো মাস মাছ রাখা চলবে। তাড়াতাড়ি বেচে ফেলতে হয় ব'লে তোমরা দাম বড় কম পাও। বর্ষায় ধরে রাখবো, শীতের সময় বেচবো বেশ চড়া দামে।

মথুর হাঁ করিয়া শুনিল, ভাবিল—বাবু এ-সব বলে কি।

সুবিমল লক্ষ্য করিল সর্দ্দারের বিমূঢ়তা, বলিল—অবসর মত এ আলাপ হবে একদিন তোমার সঙ্গে। এখন তুমি এক কাজ কর ত সর্দ্দার। তোমাদের কাজের কোন অসুবিধা না হয়, এমন একটা ঠাঁই দেখিয়ে দাও, মালপত্তর-গুলো ত নামুক। হরিপদ, তুমি যাও ত সর্দ্দারের সঙ্গে, হিসেব-মত মালগুলো বুঝে নেওয়ার ব্যবস্থা কর।

তাহারা চলিয়া গেল। বজরায় সুবিমল আর ক্ষেমঙ্করী, দু-জনে একা। এমন ত বড় হয় না। দু-জনেই নীরব। সুবিমল ভাবে—ক্ষেমঙ্করী যেন কি বলিতে চায়। ক্ষেমঙ্করী ভাবে বাবুর এ কি মতি-গতি হইল। নীরবতা ক্রমে অসহ্য হইয়া পড়িল। ক্ষেমঙ্করীই ডাকিল—বাবু

—কি

—সত্যি-সত্যিই এ চরে থাকবেন আপনি?

—কেন, তোমার কি আপত্তি আছে? জায়গাটা ত বেশ—

—কিন্তু, খাবেন কি?

—রোজ রোজ যা খাই—

—পাবেন কোথা?

—তুমি জুটিয়ে আনবে।

—বাবু—বড় বড় চোখ তুলিয়া ক্ষেমঙ্করী সুবিমলের মুখের উপর রাখিল।

সুবিমল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, ধীরে ধীরে ক্ষেমঙ্করীর দিকে অগ্রসর হইল, দুই হাতের মুঠোয় তাহার একটি হাত ধরিয়া তুলিল, তার পর মোলায়েম সুরে বলিল—তুমি কি আমার ঘর করবে না ক্ষেমু?

ক্ষেমঙ্করী দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল।

আবার ডিরেক্টার-সভা।

সুখচরে মাছের কারবারে এই কয় মাসেই বেশ লাভ দাঁড়াইয়াছে।

এম-এ, বি-এল প্রস্তাব করেন—বৎসর পূর্ণ হইবার জন্য অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। ছয় মাসের জন্যই একটা ডিভিডেণ্ট ঘোষণা করা হোক।

মার্চেণ্ট বণিক বলিলেন—তার পূর্ব্বে একটা মোটা রিজার্ভ ফণ্ড রাখা দরকার।

মোক্তার ঘোষ বলেন—সুবিমল বাবুর জন্যে একটা ভাল রকম অনরেরিয়ম। তাঁর উদ্যম ও বুদ্ধিতেই না এই লাভ।

মাষ্টার হিসাব করিলেন অতি সোজা, শতকরা পঁচিশ টাকা রিজার্ভ ফণ্ড, পঁচিশ টাকা আপিস খরচ, পঁচিশ টাকা ডিভিডেণ্ট আর পঁচিশ টাকা সুবিমল বাবুর অনরেরিয়ম।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এ ব্যবস্থা স্থির হইল।

—হরে, তোর চা হ'ল?—রায়-বাহাদুরের গলাটা একটু ধরা নয়? তাঁর সে প্রাণখোলা হাসি কই?

—সাফল্যের উৎসব কিন্তু সব মাটি, আজকে আপনার শরীরটা যেন ভাল নয়—উকীল বলিলেন।

—ঠিক শরীরের অসুখ নয় ভাই, মনের। পড় ভাই এই চিঠিখানা, হরিপদ লিখেছে—রায়-বাহাদুর হাত বাড়াইয়া উকীলের হাতে চিঠিখানা দিলেন।

উকীল পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

ভিতরে ভিতরে সুবিমল বাবু এত দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহা আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাই নাই। বিকাল বেলা একটা বজরা দেখা দিল কিন্তু চরে ভিড়িল না। সূর্য্য অস্ত গেলে তবে সেটা চরে লাগিল। দুই জন বাবু অবতরণ করিলেন। সুবিমল বাবু অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, তারপর আমায় বলিলেন—হরিপদ, আজ রাত্রিতে ক্ষেমঙ্করীর সঙ্গে আমার বিবাহ, তুমি হবে বেষ্ট ম্যান্। আমি ত অবাক। কোন কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তিনি আরও বলিলেন—বামুনের ছেলে আর জেলের মেয়েতে বিয়ে বৈধ করবার জন্যে ডাঃ গৌড়ের স্পেশ্যাল ম্যারেজ য়্যাক্ট্। এই ইনি হলেন রেজিষ্ট্রার। ব'লে এক বাবুকে দেখালেন।

—সেই চিরন্তন প্রশ্ন, পুরুষ আর নারী—ডাক্তার মন্তব্য করিলেন।

—আগুন আর ঘি—মার্চেণ্ট ভাষ্য করিলেন।

উকীল পড়িতে লাগিলেন—

তার পর তিনি বলিলেন—বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কাউকেও কিছু জানাই নি, বুঝতেই পারছ। তাঁরা হয়ত শুনলে মনে ব্যথা পাবেন। ক্ষেমঙ্করীকে ত রোজ দেখছ—রূপের মোহে অন্ধ হয়ে এ কাজ করছি, অন্ততঃ তুমি এ কথা বলতে পার না। এইবার আমি প্রশ্ন করিলাম—তবে এ কাজ করছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন—জীবনে এক জন সহকর্ম্মিণী নিলুম, এর বেশী কিছু নয়। পনর মিনিট মধ্যেই বিবাহ রেজেষ্টরী হইয়া গেল। তার পর রাত্রিতে নারায়ণ-শিলার সম্মুখে যথারীতি হিন্দু অনুষ্ঠান হয়, কলিকাতার দুই নম্বর বাবু পুরোহিতের কাজ করেন।

—সুবিমল বাবু ত ল' পড়েন নি, কাজ করলেন যেন পাকা উকীলের। ভবিষ্যতে কোন গোলযোগের পথ রাখলেন না—উকীল গম্ভীর ভাবে বলিলেন।

—কাঁচা কাজ করবার লোক তিনি কখনই নন।—মোক্তার ঘোষ বলিলেন।

উকীল পড়িতে থাকেন—

পরদিন ভোরে মথুর সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা। সে বলিল—দুঃখ করছেন কেন বাবু। তবে জামাইবাবুর মান আমি রাখব। শুনেছি তাঁর বাপ জিলার হাকিম ছিলেন। কিন্তু মাসকাবারে পয়সা না দিলে বাসার চাকরটিও চলে যায়। আমি চৌদ্দ মৌজার সর্দ্দার। এই কয় মাস দেখলেন ত, হাজার লোক আমার কথায় ওঠে-বসে। জামাই আমার লায়েক, তাকে বাইশ মৌজার সর্দ্দার করব। লাখ জেলে তার ডাকে জড় হবে।

—ব্রেভো! আপনি মুসড়ে গেছেন কেন রায়-বাহাদুর।—মোক্তার ঘোষ বলিলেন।

—মথুর সর্দ্দার ঠিকই বলেছে। সমাজের উপর আমাদের কি প্রভাব? এরা হচ্ছে খাঁটি লীডর অব্ মেন্। মাছের

ব্যবসা যিনি করবেন তিনি ধীবর-কন্যাকে বিবাহ কেন করবেন না?

—আই কনগ্রেচুলেট্ ইউ, রায়-বাহাদুর। মহাত্মা গান্ধীর চেয়েও যে আপনি বড় রিফর্মার। তিনি গন্ধবণিক হ'য়ে চালাচ্ছেন হরিজন আন্দোলন আর তাঁর ছেলে বিয়ে করলেন বামুনের মেয়ে। কিন্তু সুবিমল বাবু যা করলেন—স্প্লেন্ডিড—বামুনের ছেলে বিয়ে করলেন জেলের মেয়ে। মোক্তার ঘোষ হাঁকিলেন—ওরে হরে, শুধু চা নয়, মা-ঠাক্রুণকে বল একথালা মিষ্টি দিতে।—তারপর সভার কেতায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—উইথ্ ইওর কাইণ্ড পারমিশন্ আমি একটা য়্যামেণ্ড্মেণ্ট্ প্রস্তাব করছি যে ডিভিডেণ্ড হ'তে পাঁচ পারসেণ্ট কমিয়ে মিসেস রায়কে অনরেরিয়ম দেওয়া হোক।—তার পর দুই হাত জোড় করিয়া রায়-বাহাদুরের দিকে বাড়াইয়া বলিলেন—আপনি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি দিন, মিসেস্ রায়কে আনবার জন্যে আমি এখনই যাত্রা করি। একটা গ্রাণ্ড রিসেপশন্, রাইট রয়েল ষ্টাইল। তুমি মেনু ঠিক কর ডাক্তার, আর মাষ্টার, তোমার ছেলেদের দিয়ে একটা গার্ড অব অনার।

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(২) ভেনিসের পথে

জাহাজে চড়বার আগে আমাদের দশটার সময়ে হাজিরা দিতে হবে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য, এই রকম একটা পত্র জাহাজ কোম্পানীর তরফ থেকে আমাদের দিয়েছিল। বুধবার ২৩শে মে, যথাসময়ে প্রবোধ বাবু তাঁদের গাড়ী ক'রে আমাকে জাহাজঘাটায় পৌঁছে দিলেন। বোম্বাই বন্দরের কর্ত্তারা বাক্স-পিছু এক টাকা ক'রে মাশুল নিলে। মালগুলো এক কুলির হেপাজৎ ক'রে দিলুম—সে-ই আমার ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে তবে তার মজুরী নেবে; তার নম্বরটা দেখে রাখলুম। তার পরে প্রবোধ বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডাক্তারের ঘরে ঢুকলুম। "পইঠেল যাত্রী, নাহি নিসারা।" বোম্বাই বন্দরে বসন্ত হ'চ্ছিল, তাই টীকা না নিলে কাউকে বোম্বাই ছাড়তে দেবে না, এ খবর আমাদের আগেই দেওয়া হ'য়েছিল, ক'লকাতার মিউনিসিপালিটী থেকে আমি যে টীকা নিয়েছি তার বিজ্ঞাপক পত্র সঙ্গে ক'রে এনেছিলুম, সেইটা দেখে আর নাড়ী টিপে ডাক্তার আমায় ছেড়ে দিলে। তার পরে পাথরের তৈরী বিরাট ব্যালার্ড পিয়ার-এর লাগাও জাহাজ—"কন্তে রস্সো।" পাসপোর্ট দেখিয়ে জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা গেল।

জাহাজখানা মস্ত। আমার জলপথে ভ্রমণ বেশী হয় নি, তবে ইংরেজদের ফরাসীদের আর ডচেদের জাহাজে চ'ড়েছি। ইটালীয়ানদের এই জাহাজটা মস্ত বড়, ১৭০০০ টনের উপর। ইটালী (ত্রিয়েস্ত, ভেনিস বা জেনোয়া) থেকে বোম্বাই, কলোম্বো, সিঙ্গাপুর, শাংহাই যাতায়াত করে। হাজার যাত্রী নিয়ে যায়, এরূপ বিরাট ব্যাপার। প্রথম শ্রেণী আছে, দ্বিতীয় শ্রেণী আছে, ডেক আছে, আর তৃতীয় শ্রেণীকে এরা একটু মোলায়েম ক'রে নাম দিয়েছে, Classe Seconda Economica অর্থাৎ "শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণী।" এটা গরীব snobdomকে একটু তোয়াজ করা। শেক্স্পীয়র যে বলেছিলেন What is in a name ইত্যাদি তিনি রসিক হুসিয়ার আর জ্ঞানী পুরুষ হ'য়েও এখানে ভুল ক'রেছিলেন; আমাদের মারামারি চোদ্দ আনা তো নাম নিয়েই।

পঁচিশ পাউণ্ড—তিন-শো চল্লিশ টাকা—আন্দাজ খরচ ক'রে বোম্বাই থেকে ভেনিস পর্য্যন্ত একখানি এই "শস্তার

দ্বিতীয় শ্রেণী”র টিকিট কিনেছি। এই শ্রেণীতে দু-শোর উপরে যাত্রী যাচ্ছে। বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়বার দিন—বুধবার বেলা দশটা থেকে একটা পর্য্যন্ত জাহাজের মধ্যে যেন সব বিশৃঙ্খলা। প্রথম শ্রেণীর ডেক হ'ল সব শ্রেণীর যাত্রীদের আড্ডা, জমায়েৎ হবার স্থান। জাহাজ-ঘাটায় জাহাজের সামনে কতকগুলি যাত্রীর আত্মীয় আসবার অনুমতি পেয়েছে; আবার কেউ কেউ জাহাজের উপরেও এসেছেন। জাহাজের উপরে, নীচে, তর-বেতর লোক। গত বারের চেয়ে এবার দেখলুম, ভারতীয় মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশী,—যাত্রী, যাত্রীদের আত্মীয়-বন্ধু। সকলেই শাড়ী-পড়া, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে, চলনে-বলনে ইউরোপীয় মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চ'লবার চেষ্টা কোথাও কোথাও যেন একটু বেশী রকম প্রকট ব'লে মনে হ'ল। কতকগুলি ভারতীয় মেয়ের পোষাকের শালীনতা দেশী শাড়ীর সুন্দর রুচিময় বর্ণসমাবেশ বড় মিষ্টি লাগল, তাদের কমনীয়তা নারীসুলভ কোমলতাকে যেন আরও সুন্দর ক'রে তুলেছিল। কিন্তু হাল ফ্যাশানের—অর্থাৎ পারসী ফ্যাশানের গাউনের অনুকারী নানা বিদেশী, জাপানী, ফরাসী চিত্রবিচিত্র করা সিল্কের উদ্ভট উৎকট পাড় আর আঁচলা-ওয়ালা সাড়ীর চলও কম নয়। আমাদের বেনারসী ছাপা-গরদ মারহাট্টী সাড়ী, ঢাকাই সাড়ীগুলির পাশে এগুলো দেখে মনে হয়, যেন ঠোঁটে-গালে-মুখে রঙ-মাখা খুব সপ্রতিভ চালাক চতুর চটপটে চুলবুলে মেয়ে আমাদের গৃহস্থ ঘরের কুমারী বৌ ও গৃহিণীদের পাশে দাঁড়িয়ে উপর-চটকে বা আলগা-চটকে তাদের নিষ্প্রভ ক'রে দিচ্ছে।

এই জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে ভারতবর্ষের দুই-এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যাচ্ছেন। শ্রীযুক্ত জবাহিরলাল নেহরুর স্ত্রী শ্রীমতী কমলা নেহরু চিকিৎসার জন্য চ'লেছেন, সঙ্গে আছেন তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার অটল। বিখ্যাত মাড়োয়ারী ধনকুবের ও দাতা শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা আছেন, সঙ্গে তাঁর কতকগুলি বন্ধু ও আত্মীয়। দু-এক জন রাজা-রাজড়াও আছেন। জাহাজ ছাড়বার হৈচৈয়ের মধ্যে, জরী আর লাল-সবুজ-সাদা জগজগা লাগানো ফুলের মালার বোঝা গলায় বহু ভারতীয় ব্যক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই রকম মালা-গলায় দু-চার জন ইউরোপীয়ও আছেন। একটা জিনিস চোখে লাগতে দেরী হয় না,—সাধারণতঃ ইউরোপীয় পুরুষদের পাশে আমাদের ভারতীয় পুরুষদের—বিশেষতঃ একটু বয়স্ক যাঁরা তাঁদের—কি রকম পেটমোটা অসৌষ্ঠব-পূর্ণ চেহারার দেখায়। দু-চার জন ভারতীয় তরুণ আর নবযুবক অবশ্য আছে, তাদের বেশ লম্বা ছিপছিপে গড়ন আর বুদ্ধি শ্রীমণ্ডিত মুখ দেখলে অমনিই মনে একটা আনন্দ আসে। এ রকম বাঙালীও একটি-দুটি আছে। আমার মনে হয়, চিন্তাব্যাধি, আর ব্যায়ামের অভাবেই এ রকমটা হবার কারণ।

জাহাজ ছাড়বার পূর্ব্বেই, বাঙালী চেহারা বেছে বেছে দু-তিন জনের সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। দু-জায়গায় ঠক্‌লুম—এক জন মালয়ালী আর এক জন তেলুগু। চেহারা দেখে তাদের জন্মভূমি কোন্ প্রদেশে এটা স্থির ক'রতে না পারলেও আলাপ জমতে দেরী হ'ল না। বিদেশে থেকে বহু অভিজ্ঞতার ফলে আমার একটা দৃঢ় ধারণা দাঁড়িয়ে গিয়েছে—এক রকমের পোষাকে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ লোককে, বিশেষতঃ শিক্ষিত লোককে, ধরা মুস্কিল, যে সে কোন্ প্রদেশের লোক; কখনও কখনও ধরা একেবারে অসম্ভব। অবশ্য কতকগুলো extreme type—চরম বা অন্তিম রূপের কথা আলাদা। সাধারণতঃ আরব, ইরাণী, পাঠান, এদের ভারতীয় ব'লে ভুল হয় না। কিন্তু বাঙালী ব'লে মালবারীকে ভুল হয়, গুজরাটী বা পাঞ্জাবীকে বাঙালী ব'লে ভুল হয়, হিন্দুস্থানীকে দখিনী ব'লে ভুল হয়। এর থেকে বোঝা যায় আমাদের বাহ্য আকারগত একটা সাধারণ ভারতীয়তা আছে।

ইটালীয়ানদের জাহাজ। খালাসীরা, জাহাজের খানসামা আর চাকরেরা, সব ইটালীয়। খালি ধোপারা চীনে, মেথররা ভারতীয়, আর শুনলুম বয়লারের আগুনে কয়লা দেয় যারা, সেই ষ্টোকারদের কতকগুলি হচ্ছে পাঠান। খালাসীগুলা খুব মজবুত চেহারার লোক, একটু বেঁটে, একটু মোটাসোটা যণ্ডামার্ক চেহারার; গায়ের রঙ অনেকের আমাদের মাঝামাঝি রঙের (অর্থাৎ না উজ্জ্বল গৌরবর্ণ না শ্যামবর্ণ) ভারতীয়ের মতই। গায়ের রঙে দু-এক জন ইটালীয় যাত্রীকে একটু ফর্সা-ধরণের ভারতবাসী থেকে পৃথক্ করবার জো নেই। খানসামা

আর ক্যাবিনের চাকররা সাধারণতঃ একটু রোগা পাতলা, অপেক্ষাকৃত বেঁটে চেহারার।

মোটের উপর এদের ব্যবস্থা ভাল। ইটালীয়ানরা আগে অত্যন্ত নোংরা, কুড়ে আর অকেজো জাত ব'লে পরিচিত ছিল; এরা কথার ঠিক রাখতে পারত না। মুসসোলিনী এসে এই জাতকে চাবুক মেরে চাঙ্গা ক'রে তুলেছেন। আগে ইটালীয়ানদের যাত্রী-জাহাজ ছিল না; দেখতে দেখতে এই কয় বছরে ইটালীয়ান যাত্রীর জাহাজগুলি খুব লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর সব জাহাজের চেয়ে শীগ্‌গির নিয়ে যায়, ভাল খাওয়ায়, আর সস্তা; লোকপ্রিয় হবে না কেন? ইংরেজের জাহাজে পী. এণ্ড-ও প্রভৃতিতে—জাহাজ কোম্পানী কোনও অভদ্রতা না ক'রলেও, ওসব জাহাজে রাজার জাত ইংরেজের একাধিপত্য; ভারতীয়দের বাধো-বাধো ঠেকে, রাজপুরুষ বা রাজার মেজাজের ইংরেজ যাত্রীদের পক্ষে ভারতীয় প্রজার সঙ্গে সমান-সমানকে যেমন তেমনি ব্যবহার করা ধাতে সয় না। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অবশ্য কখনও খারাপ হয় নি, তবে অন্য ভারতীয় যাত্রীদের সঙ্গে খিটিমিটি হবার কথা শুনেছি। পক্ষান্তরে, ইউরোপের ইটালীয়ান বা অন্য জাতের সঙ্গে আমাদের রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নেই; আর তাদের মধ্যে ইউরোপীয় ব'লে একটু অহমিকাভাব থাক্‌লেও, প্রকৃতিতে ইংরেজদের বিপরীত, অর্থাৎ দিল-খোলা মিশুক জাত ব'লে, তারা আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে প্রস্তুত থাকে। ইংরেজ ছাড়া জাপানী, ডচ, ইটালীয়, ফরাসী—এতগুলো জাতের যাত্রী-জাহাজ চলছে; প্রতিযোগিতার বাজারে মানুষকে ভদ্র ক'রে দেয়। ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যে যারা হিন্দু তাদের অনেকে নিরামিষাশী; তাই এরা ঘটা ক'রে বাইরে প্রচার করে, নিরামিষভোজীদের জন্য এদের ভাল ব্যবস্থা আছে। মোটের উপর ইটালীয়ান লাইন ভারতবাসীদের কাছে প্রিয় হ'য়ে উঠছে ব'লে মনে হ'ল।

আমাদের এই জাহাজটি একটি ক্ষুদ্র জগৎ, বিশেষ ক'রে এই শস্তার সেকেণ্ড ক্লাস। প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে বোধ হয় এত বেশী জাতের আর এত রকমারী লোক নেই। প্রথম, ইউরোপীয় ধরা যাক: ইটালীয়ান মেয়ে আর পুরুষ আছে অনেকগুলি, ইংরেজ আছে; ডচ আছে, জার্মান, নরউইজীয়, হঙ্গেরিয়ান, ফরাসী আছে। আমেরিকানও আছে। চীনা আর ভারতীয়; ভারতীয়দের মধ্যে গুজরাটী, মারহাট্টী, পাঞ্জাবী, তামিল, কানারী, মালায়ালী, বাঙালী, আসামী, হিন্দুস্থানী। স্মোকিং-রুম বা সাধারণ বৈঠকখানায় যেখানে যাত্রীরা চুরুট খায়, তাস খেলে, কিছু পান করে, গল্পগুজব করে, চিঠি লেখে, বই পড়ে, সেখানে আর তিনটে খোলা ডেক আমাদের জন্য আছে। সেখানে একটু ঘুরে ফিরে বেড়ালেই নানা ভাষার ঝঙ্কার কানে আসে; ইটালীয়ান যাত্রী আর খালাসীরা ইটালীয়ান বলছে; ভাষাটা স্বরবর্ণের বাহুল্যে এমনিই মোলায়েম যে যতই ভড়বড় ক'রে বলুক না কেন, এর পূর্ণতা আর মিষ্টতা যায় না; ফরাসীর মিঠে আওয়াজও কানে আস্‌ছে; আমেরিকানের ইয়াংকি-সুলভ নাকী সুরে বলা ইংরেজীও কর্ণপীড়া উৎপাদন করছে; গুটিকতক ডচ আর জার্মান পরিবার চলেছে, তাদের বয়স্ক পুরুষ আর মেয়েরা, আর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা ডচ আর জার্মান বল্‌ছে; সপরিবারে কতকগুলি চীনা যাত্রী চলেছে, তারা প্রায়ই এক কোণে নিজেদের মধ্যেই থাকে,—আপসে তারা উত্তর-চীনায় অথবা ইংরেজীতে কথা কয়, ইংরেজীতে কথা কয় কারণ চীনারা আবার অনেকে পরস্পরের প্রাদেশিক ভাষা বোঝে না, আমাদেরই মতন। এ ছাড়া বাঙলা, হিন্দুস্থানী, তামিল, গুজরাটী, মারহাট্টীও শোনা যায়। একেবারে ইহুদী-পুরাণোক্ত বাবেল-এর আকাশগামী স্তম্ভ আর কি! কিন্তু এতগুলি ভাষা হ'লে কি হয়,—সব ভাষা ছাপিয়ে, এমন কি জাহাজের মালিক আর কর্ম্মচারী আর কামগারদের ভাষা ইটালীয়ান ভাষাকেও ছাপিয়ে, একটি ভাষারই জয়জয়কারই দেখা যাচ্ছে; সেটি হ'চ্ছে ইংরিজী ভাষা। ইংরিজী যে একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা, বিশ্বসভ্যতার বিশ্বমানবের প্রথম ও প্রধান ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংরিজী আর খালি ইংরেজের সম্পত্তি নয়। জাহাজের সমস্ত ছাপা বা টাইপ করা নোটিস বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে ইটালীয়নের পাশে ইংরিজীকেও একটা স্থান দিতে হ'য়েছে; প্রায়ই সেটা ইটালীয়ানের তুল্যমূল্য। রোজানা খানার ফিরিস্তি রোজ রোজ জাহাজেই ছাপানো হয়, দুপুরের খাওয়া আর

সাঝের খাওয়ায় কি কি পদ দেবে,—তা সেটা ছাপানো হচ্ছে, এক দিকে ইটালীয়ানে, অন্য দিকে ইংরিজীতে। জাহাজের খানসামারা চাকররা অল্পবিস্তর ইংরিজী সকলেই বলে। খালাসীরা যেখানে ব'সে ছুটির সময়টা আড্ডা দিচ্ছে, সেখানে তাদের মধ্যে দু-এক বচন ইংরিজী শুনছি। রাত্রে যাত্রীদের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হ'চ্ছে, সমস্ত ইংরিজী আশ্রয় ক'রে। বিভিন্ন জাতের লোকে পরস্পর কথা কইছে, বেশীর ভাগই ইংরিজীতে। ইংরিজীকে বর্জ্জন ক'রে কেবল হিন্দী দিয়ে ভারতের ঐক্য বিধান করা কঠিন হবে, আমার মনে হয় অসম্ভব হবে। কারণ ওদিকে যতই হিন্দীর বজ্র আঁটুনি দেবার চেষ্টা মহাত্মাজী করুন না কেন, ভিতরে ভিতরে ইংরিজীর প্রভাব ঢুকে সব ভাষাকে —তাদের কথ্য রূপকে—ইংরিজী রসে ভরপুর ক'রে দিচ্ছে, তাদের নিজের সারকে বার ক'রে দিয়ে নিজ বৈশিষ্ট্য থেকে তাদের বিচ্যুত ক'রে দিচ্ছে, হিন্দীর বজ্র আঁটুনি ইংরিজীর সামনে ফস্কা গেরো হ'য়েই দাঁড়াবে। আমাদের কি ভাল লাগে না-লাগে সে কথা নয়, ব্যাপারটা কোন্ দিকে গতি নিচ্ছে সেইটেই বিচার্য্য। আধুনিক সভ্যতা মানেই ইংরিজী—একে বাদ দিয়ে আর হয় না—আধুনিক সভ্যতার দেবী পায়ে হেঁটে চলেন না, তাঁর বাহনকে খুশী মনে আবাহন না করি বর্জ্জন করতে পারি না।

এত বিভিন্ন জাতের লোক, কিন্তু অতি সহজেই এরা তিনটি মুখ্য ভাগে পড়ে গিয়েছে—ইউরোপীয়, ভারতীয়, চীনা; তিনটি বিভিন্ন সভ্যতার নিজ নিজ কোঠা বা কামরা বা কোটরে যেন যে যার জায়গা ক'রে নিয়েছে। পৃথিবীতে এখন চারটে বিভিন্ন আর বিশিষ্ট সভ্যতা বা সংস্কৃতি বিদ্যমান; গ্রীক আর রোমান সভ্যতার আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত, জার্ম্মানিক ও স্লাব জাতির কর্ম্মশক্তি আর ভাবুকতা দ্বারা পুষ্ট ইউরোপীয় সভ্যতা; মুসলমান সভ্যতা, ভারতের মিশ্র আর্য্য-অনার্য্য হিন্দু সভ্যতা আর চীনা সভ্যতা। মুসলমান সভ্যতাকে গ্রীক হেলেনিষ্টিক সভ্যতার উপর আরবের ধর্ম্মের প্রভাবের ফল ব'লতে পারা যায়, ইউরোপীয় সভ্যতারই একটি গ্রাম্য বা প্রান্তিক সংস্করণ একে বলা চলে। হিন্দু সভ্যতা আর চীনা সভ্যতা একটু স্বতন্ত্র; চীনের উপরে হিন্দু মনের ছাপ পড়েছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে, কিন্তু চীনা সভ্যতা মুখ্যতঃ বস্তুতান্ত্রিক; হিন্দু পরে যেমন ভাববিলাসী বা ভাবপ্রবণ হ'য়ে দাঁড়ায় চীনা সভ্যতা কখনও সেরকমটা হয় নি। যাক্, এখন কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতারই জয়জয়কার; মুসলমানী সভ্যতা আরবের মনোভাব থেকে মুক্ত হ'য়ে সর্ব্বত্রই ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে মিশে যাবার চেষ্টা করছে, তুর্কি, ইরাণে, এমন-কি মিসরেও সেই রকমটা দেখা যাচ্ছে। ভারতের মুসলমান পনের আনা তিন পাই ভারতীয়, এক পাই যেটুকু সে আরব থেকে তার ইসলাম থেকে পেয়েছে সেটুকুও আবার ভারতের রঙে র'ঙে গিয়েছে। ভারতীয় আর চীনা সভ্যতার উপর ইউরোপের প্রভাব এখন ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। তবুও বহুদিনের ইতিহাস, বহু দিনের সংস্কার;—চীন আর ভারত একেবারে আত্মসমর্পণ করতে চাচ্ছে না, কিন্তু হেরে আসছে, সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে যাবার পূর্ব্বে এই দুই প্রাচীন জাতি চেষ্টা ক'রে দেখছে কতটা আপোস সম্ভব। একটু তলিয়ে দেখলেই স্বীকার করতে হবে আমাদের বাস্তব জগতে তো বটেই, ভাবজগতেও এবং এই ভাবজগতের প্রধান প্রকাশ সামাজিক জীবনেও আমাদের এই অবস্থা দ্রুত এসে প'ড়ছে। জাহাজে বা অন্যত্র ইউরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের অবাধ মেলামেশার নানা অন্তরায় থাকায়, বাধা পাওয়ার দরুন আমাদের মধ্যে আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক কূর্ম্মবৃত্তি একটু এসে যাচ্ছে; গায়ের রং, ধর্ম্ম, সামাজিক রীতিনীতি, মানসিক প্রবণতা,—আর সব চেয়ে বড় আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হরিজন; এই সব কারণেই ইউরোপীয়ান আমাদের সঙ্গে মিশতে পারে না, আমাদের দু-চার জন আত্মবিস্মৃত হ'য়ে খুঁড়িয়ে বড়লোক হ'তে চেষ্টা ক'রে শেষটায় ঘা খেয়ে ফিরে আসে—মোটের উপর আমরা অনেকটা আলাদাই থেকে যাই, ঈসপের মাটীর হাড়ী—আর পিতলের হাড়ীর গল্পের মাটীর হাড়ীর মত আমরা স'রে থেকেই ভাল থাকি।

চীনা আর ভারতীয়ে বেশ মিল হওয়া উচিত, কিন্তু তাও যেন ততটা হয় না। যেটুকু হয়, তা প্রাচীন কিছুকে অবলম্বন ক'রে নয়—বৌদ্ধ চীনা আর ভারতীয়ের মিল সেটা নয়। সেটা হ'চ্ছে ইউরোপীয় মনোভাবপ্রাপ্ত,

ইউরোপের চাপে ক্লিষ্ট দুই আধুনিক এশিয়াটিক জাতির দেশহিতৈষণাদ্বারা (কচিৎ বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতি দ্বারা) অনুপ্রাণিত শিক্ষিত দুই-চারি জনের ভাব-সম্মেলন। চীনের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির ঐক্য নেই,—বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্রে যে যোগটুকু ছিল, যুগধর্ম্মের ফলে সে যোগসূত্র প্রায় ছিঁড়ে গিয়েছে। ভাষা, ঐতিহ্য, বোধ, বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতি আমাদের প্রতি-স্পন্দন, সবই আলাদা। চীনের ভাষা, মনোভাব, ঐতিহ্য বুঝে তার সঙ্গে আলাপ ক'রলে বন্ধুতা ক'রলে একটা আধিমানসিক মৈত্রী ও আত্মীয়তা-বোধ আসতে পারে, সেটা হয় তো খুব গভীর জিনিস হ'য়ে উঠ্‌তে পারে; যেমন প্রাচীন কালে ২০০০|১৫০০|১০০০ বছর আগে ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে চীন ভারতকে কল্যাণ-মিত্র ক'রে বরণ ক'রে নেয়, ভারতের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ-সাধন ঘটে। কিন্তু আজকাল আর সেটা কতদূর হ'তে পারবে? এই জাহাজে যে চীনারা যাচ্ছে, তারা আলাদা ব'সে থাকে। ইউরোপীয় মেয়েদের সঙ্গে শাড়ীপরা ভারতীয় মেয়েদের কোথাও কোথাও আলাপ, কথাবার্ত্তা হচ্ছে দেখছি, কিন্তু লম্বা গাউন-পরা চীনা মেয়ে কারু সঙ্গে ভারতীয় (বা ইউরোপীয়) মেয়ের আলাপ হ'তে দেখি নি। আমাদের ক্যাবিনে আমরা চার জন যাচ্ছি—কানপুর থেকে একটি তেবারী ব্রাহ্মণ ছোকরা, বাপ অবসরপ্রাপ্ত আই-এম-এস্ ডাক্তার, ছেলেটি যাচ্ছে বিলেতে ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং প'ড়তে; একটি পাঞ্জাবী হিন্দু ছোকরা, এর বাপ-মা ইউরোপে বেড়াতে যাচ্ছেন, তাঁরা আছেন সেকেণ্ড ক্লাসে, এ সঙ্গে যাচ্ছে; আর আমি; এই তিন জন ভারতীয়; আর একটি চীনা ছোকরা, কান্‌টন থেকে লণ্ডনে অর্থশাস্ত্র প'ড়তে যাচ্ছে। চীনা ভাষা আর সাহিত্য সম্বন্ধে আমি খোঁজ রাখি, নিজের নামটা চীনা অক্ষরে লিখতে পারি, তার পরিচয় পেয়ে এর মনে আমার সম্বন্ধে একটা আত্মীয়তা-বোধ এসে গিয়েছে। একদিন ছেলেটি তার স্বজাতীয়দের মধ্যে ব'সে আছে, হাতে একখানা চীনা পত্রিকা; সেখানা তার কাছ থেকে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলুম, পরিচিত চীনা অক্ষরও দু-চারটে ধরা গেল; পত্রিকাখানার ছবি দেখে আর রোমান অক্ষরে লেখা ইউরোপীয় নামের ছড়াছড়ি দেখে বুঝলুম, এটায় আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে; চীনা ভাষা আর সাহিত্যে আমার interest বা প্রীতি আছে দেখে, অন্য চীনাগুলি একটু সচেতন হ'য়ে উঠল কিন্তু হায়, এ বিষয়ে আমার পুঁজি এত কম যে ভদ্রভাবে আলাপ করা চলে না। তবুও আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই পরিচয় থাকলে, অর্থাৎ সংস্কৃতিগত পরিচয় একটু গভীরতর হ'লে, মিলটা আরও অন্তরঙ্গ হ'তে পারত।

ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির আর বিভিন্ন শাসনের অধীন লোকেরা কিন্তু এক; কথাটা ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, নানা ভাষায় আর বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হ'লেও, ইউরোপে একটি জাতি আর একটিমাত্র সংস্কৃতি বিদ্যমান। তাই ইউরোপীয়ানরা ভারতীয় বা চীনার সামনে এক। এশিয়ার ভারতীয়, চীনা, আরব এক নয়, বিভিন্ন ভাষারও বটে বিভিন্ন সংস্কৃতিরও বটে; তাই ইউরোপের সামনে আমরা এক নই,—বিক্ষিপ্ত, বহু।

জগতের গতি যে ভাবে চ'লেছে, তাতে মনে হয়, সকলকে যদি কোনও কিছু এসে এক করতে পারে তা সে হচ্ছে ইউরোপীয় সংস্কৃতি। যেহেতু এই ইউরোপীয় সংস্কৃতি এখন সর্ব্বগ্রাসী। চীনের ভারতের ইস্লামের সংস্কৃতিতে বড় যা-কিছু আছে তাও এর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না, তাকেও নিয়ে হজম ক'রে নিজের পুষ্টিসাধনে এই সভ্যতা যত্নবান,—সেই হেতু একে আমরা আর ইউরোপের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ না ক'রে রেখে, "ইউরোপীয় সভ্যতা" নাম না দিয়ে, "আধুনিক সভ্যতা" বা "বিশ্বসভ্যতা" নাম দিতে পারি; এতে ক'রে আমাদের আত্মসম্মান একেবারে যাবে না, কারণ আমাদের মনে এই বোধ থাকবে যে এই বিশ্বসভ্যতায় আমাদের আহৃত উপাদানও আছে। চীনেরও তেমনি এতে-সরিকানি-স্বত্ব থাকবে—যদিও এর ছাঁচটা গ্রীসের আর ফ্রেঞ্চ জার্মান ইটালীয়ান ইংরেজ স্পেনিশ রুষ প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপের কতকগুলি জাতের দ্বারা ঢালা হয়েছে। আমাদের ভারতীয় সভ্যতা, এই বিশ্বসভ্যতার প্রাদেশিক রূপ না হোক্, বিশ্বসভ্যতার আর আমাদের দেশের জলবায়ু ইতিহাস মনোভাব থেকে উৎপন্ন ভারতীয় সভ্যতার একটি মিশ্রণে পর্য্যবসিত হবে।

বিশ্বসভ্যতার যে রূপ যে দিক্ বা যে আদর্শ জাহাজের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিভাত হ'চ্ছে তার মূলসূত্র হচ্ছে—Eat, drink and be merry, খাও পিও, ঔর—মৌজ করো নয়, হল্লা মচাকর ফুর্ত্তি করো। অবশ্য জাহাজ আধ্যাত্মিক বা আধিমানসিক সাধনার জায়গা নয়। বিশ্বসভ্যতার দুটো দিক আছে—শিশ্নোদর-পরায়ণতার দিক বা ইন্দ্রিয়ের দিক, আবার অতীন্দ্রিয় বা ভাবজগতের বা আধ্যাত্মিক জগতের সাধনার দিক। মানসিক সাধনা এই দুইয়ের মধ্যকার সংযোগশৃঙ্খল। ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয় এই দুইয়ের মধ্যে আমাদের হিন্দু জীবন বা হিন্দু আদর্শ একটা সমন্বয় করবার চেষ্টা করেছিল এবং আমার মনে হয়, করতে সমর্থও হ'য়েছিল। দৈনন্দিন জীবনে লোকচক্ষে দুটো দিকেরই পূর্ণ প্রকাশ থাকা দরকার, যেমন বাড়ীতে আর সব ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে একটি ঠাকুরঘর থাকা দরকার, যার দ্বারা অহরহঃ অতীন্দ্রিয় জগতের কথা, বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে নিহিত রহস্যের কথা আমাদের চোখের সামনে থাকতে পারে। বিশ্বসভ্যতার এই sense of the mystery, এই রহস্য সম্বন্ধে সচেতন-ভাব, এখন দুর্লভ বস্তু হয়ে প'ড়ছে। ইউরোপ বা আমেরিকায় কোথাও সহৃদয় ভাবুক লোকের অভাব ঘটে নি, কিন্তু সাধারণ লোকে জীবনে তার আবশ্যকতা আর অনুভব ক'রছে না। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম দ্বারা এদিকে কিছু আর হ'ল না, রোমান কাথলিক ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানের ঘটা একটা মোহ এনে মনপ্রাণকে আবিষ্ট করে দেয় বটে, কিন্তু কোনও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের theology বা ঈশ্বরবাদ, গভীরতম রহস্যবোধের পরিপোষক নয়। আমার মনে হয়, এদিক থেকে বিশ্বসভ্যতাকে ভারতবর্ষের দেবার কিছু আছে; বিশ্বসভ্যতা তাকে নেবে কি না, নিতে পারবে কি না, নিয়ে বিশ্বমানবের জীবনে তাকে কার্য্যকর ক'রে সার্থক ক'রে তুলতে পারবে কি না, সে আলাদা কথা, কিন্তু একটা আশার কথা—বিশ্বসভ্যতার যারা প্রধান চিন্তানেতা (আমি রুশদেশকে বাদ দিয়ে বলছি, কারণ সেখানকার সম্বন্ধে রকমারি খবর আমরা পাচ্ছি, ঠিক ব্যাপারটি কি তা আমরা জানি না), তাঁরা প্রায় সকলে জীবনের পূর্ণতার জন্য এই রহস্যবোধের আবশ্যকতা উপলব্ধি ক'রছেন, এবং কিসে জনসাধারণের মধ্যে আধিভৌতিক আর আধিমানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক বোধ বা অনুভূতি আনতে পারেন আর তার আনুষঙ্গিক দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি করতে পারেন, তার জন্যও চেষ্টিত হ'চ্ছেন।

তথা-কথিত শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণী, অর্থাৎ সত্যকার তৃতীয় শ্রেণী হ'লেও, জাহাজে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভাল, এবং প্রচুর। অবশ্য ফার্ষ্ট ক্লাসের মত অত বেশী পদ হয় না, কিন্তু যা-হয় তা যথেষ্ট। চার বেলা খাওয়া; সকালে ৭টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত বালভোগ—চা, কফি, চকলেট, যা চাই এবং যত চাই, পরিজ, রকমারি ডিম, হ্যাম, বেকন, রুটী, কেক, মাখন, মার্মালেড; দুপুরে ১২টা ১টায় মধ্যাহ্নভোগ,—৪।৫টা পদ; বিকালে সাড়ে চারটেয় চা, সঙ্গে অনুপান রুটী মাখন কেক মার্মালেড জ্যাম; আবার রাত্রে ৭টা ৮টায় নৈশ ভোজ, ৫।৬টা পদ। এ ছাড়া ইচ্ছা হ'লে নিজের পয়সা খরচ ক'রে যখন-তখন রকমারি পানীয় সেবা চলছে। জাহাজে আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থাও আছে; গ্রামোফোন হরদম চলছে, কোনও রাত্রে যন্ত্রসঙ্গীত, কোনও রাত্রে জুয়াখেলার ঘুঁটি ফেলে কাঠের ঘোড়ার দৌড়, আর এই দৌড়ের উপরে বাজী রাখা; ডেকের উপর, খোলা ডেকে প্রায় সারাদিন চার জন ক'রে লোক deck quoit খেলছে—দু-দলে তিনটে তিনটে ছটা ক'রে কাঠের চাকার আকারে ঘুঁটি লম্বা লাঠির আকারের একটা ব্যাট দিয়ে ঠেলে দেয়, ডেকের কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে ঘ'ষড়ে ঘ'ষড়ে ঘুঁটি চ'লে যায় কতকগুলি বিভিন্ন নম্বর দেওয়া ঘরে, নম্বর অনুসারে খেলোয়াড় দান পায়। এমনি এদের জীবন কিছু মন্দ নয়, কিন্তু এই জাহাজে একটা নাচিয়ে আর নাচুনীর দল যাচ্ছে, তারাই কতকটা উপদ্রব আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। এই দলে হঙ্গেরীয় আছে, জার্মান, ইটালীয়, রুষ, আমেরিকান অনেক জাতের লোক আছে। জনকতক কম-বয়সী হঙ্গেরিয়ান নাচুনী জাহাজের কতকগুলি খুদে অফিসার, উঁচুদরের খানসামা আর জনকতক যাত্রীকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে—তাদের দ্বারাই যা এখানে-ওখানে-সেখানে অনভ্যস্ত ভারতীয় চোখে বেলেল্লাগিরি ব'লে লাগছে তাই হ'চ্ছে। ইউরোপে উত্তর-ইউরোপের জার্মান স্কাণ্ডিনাভিয়ান প্রভৃতি

"নর্ডিক" জাতি-সুলভ blond অর্থাৎ সুগৌর চেহারার একটা আদর আছে—নীল চোখ, সোনালী চুল, লম্বা ছিপছিপে চেহারা। কালো চুলওয়ালা মেয়ে আর পুরুষদের কাছে এই সোনালী চুল একটা কাম্য বস্তু; অনেকে তাই রঙ ক'রে চুল সোনালী রঙের ক'রে নেয়। নর্ডিক জাতের ছোট ছেলেপুলেদের মাথার চুল অনেক সময়ে সাদা হয়, flaxen বা শনের রঙের চুল একে বলে; বড় হ'লে এই শনের নুড়ো চুল সোনালী হ'য়ে যায়। হঙ্গেরীয় নাচুনী জনকয়েক হাইড্রোজেন পারক্সাইড লাগিয়ে চুল সাদা ক'রে বেড়াচ্ছে। এদের পোষাক-আসাক চলনের চঙ সমস্ত দেখে এরা কি শ্রেণীর মেয়ে তা বুঝতে বেশী দেরী লাগে না।

আমাদের সেকেণ্ড ঈকনমিক ক্লাসে সাঁতার কেটে নাইবার জন্য একটা চৌবাচ্চা ক'রে দিয়েছে। একটা খোলা ডেকের অর্দ্ধেকটা নিয়ে, কাঠের পাটাতন জুড়ে একটা খুব বড় বাক্স বা সিন্দুক হ'য়েছে, এটা প্রায় এক-মানুষ-সমান উঁচু, আর এতে ঘেঁষাঘেঁষি না ক'রে কুড়ি-পঁচিশ জন লোক দাঁড়াতে পারে। এই সিন্দুকটার ঢাকনা নেই; এইটেই হ'ল চৌবাচ্চা; এইটের ভিতরে একপ্রস্থ খুব মোটা তেরপল দিয়ে ঢেক দেওয়া হ'য়েছে আর তার পরে পাইপে ক'রে সমুদ্রের জল এনে এটা ভর্ত্তি করা হ'য়েছে। এই হ'ল swimming pool. গরমের দিন, সারা দিনই প্রায় সাঁতারের পোষাক প'রে মেয়ে পুরুষ এই জলে দাপাদাপি মাতামাতি ক'রছে; দেহের সৌষ্ঠব দেখাবার অবকাশ প্রচুর এতে, কিন্তু এই নাচুনীর দল, আর তাদের অনুগত পুরুষেরা, আর অন্য মেয়ে আর পুরুষ যাত্রী জনকতক স্নানের ব্যাপারটাকে একটু অশোভন ক'রে তোলে। অবশ্য ইউরোপীয় জীবনে এ জিনিষ খুবই সাধারণ, তাই এদের কারও চোখে তেমন লাগে না।

জাহাজে ছোট ছেলেমেয়ে গুটিকতক আছে, তাদের মধ্যে একটি চীনে খোকা আর একটি নরউইজীয় খুকী, এদের দেখলে সবাই আদর করে। চীনে শিশুটি পাঁচ ছয় মাসের মাত্র, টেবো-টেবো গাল, মোটাসোটা, চোখ নয় যেন দুটি রেখা টানা; কোলে নিলেই কোলে আসে; ইটালীয়ান খালাসী, ভারতীয় মেয়ে যারা যাচ্ছে তারা, অন্য যাত্রী, সবাই পেলেই একটু আদর করে। একটি ছোট চীনে মেয়ে এর ঝি বা আয়ার মত আছে, খোকাকে কোলে নিয়ে ডেকে উঠলে হয়। নরউইজীয় খুকীটি একটি আন্তর্জাতিক শিশু; এর বাপ নরউইজীয়, মা রুষ; বাপ আর মায়ের ভাষা আলাদা, কিন্তু দু-জনে ইংরিজিই বলে, শিশুটিও তার বাপ-মার কাছে কেবল ইংরিজি শিখছে। বাপ-মা, দু-জনেই অতি সুন্দর চেহারার—বাপ একেবারে খাঁটি Nordic বা উত্তর-ইউরোপীয় ঢঙের, দীর্ঘকায়, ছিপছিপে গড়ন, সোনালী চুল, নীল চোখ, সুন্দর মুখশ্রী; মা-টিও তেমনি দীর্ঘাকৃতি, তন্বী,—স্বামী স্ত্রী দু-জনের চেহারায় মানিয়েছে সুন্দর; আর ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয়, খুব সুখী স্বামী স্ত্রী এরা; মেয়েটিও তেমনি ফুটফুটে; বছর-খানেক কি বছর-দেড়েক বয়সের হবে। মেয়েটির নাম Rita—রীতা, টল্‌তে টল্‌তে ডেক দিয়ে যখন চলাফেরা করে, তখন সকলেই ওকে কোলে ক'রে চটকাতে, আদর ক'রতে চায়। আমি কাগজে জন্তু-জানওয়ারের ছবি এঁকে দিয়ে এর সঙ্গে একদিন ভাব ক'রে ফেললুম; তখন আর ছাড়বে না, খালি বলে, আরও এঁকে দাও। কতকগুলি রুষ মেয়ে আর পুরুষও যাচ্ছে, এরাও বোধ হয় নাচের দলের। সাধারণতঃ এরা প্রত্যেকে তিনটে-চারটে ক'রে ভাষা জানে, কাজেই একটু পরিচয় না হ'লে কে কি তা জানা যায় না। এদের বিষয়ে জানতে, এদের সঙ্গে ভাব ক'রতে অবশ্য ইচ্ছা হয়, কিন্তু এরা যে শ্রেণীর, যে স্তরের লোক তাতে এদের সঙ্গে মিশতে একটু বাধো-বাধো লাগছে।

জাহাজের এই শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় মানুষ প্রায় কেহই নেই। এক অতি মোটা রোমান কাথলিক পাদ্রী যাচ্ছে; এই গরমে সর্ব্বাঙ্গে একটা কালো রঙের পশমের কাপড়ের বৃহদায়তন আলখাল্লায় ঢেকে স্মোকিং-রুমের একটা কোণে ব'সে থাকে। লোকটা কি ক'রে পাদরীর কাজ চালায় তা জানতে কৌতূহল হয়; চোখে-মুখে জ্যোতি নেই, নোংরা, মুখে অনেক দিন অন্তর কামানোর দরুন খোঁচা-খোঁচা দাড়ী। গলায় একটা শিকল, তা থেকে একটি রূপায় তৈরী ছোট ক্রুশ, তাতে যীশুর মূর্ত্তি। পাদরীটি জাতে পোলীয় শুনে আলাপ

ক'রলুম ফরাসীতে ; ইংরিজী জানে না। এর সঙ্গে কথা কওয়াও মুস্কিল, কারণ মুখগহ্বর থেকে অর্দ্ধেক কথা বা'র হয় না,—কথা কইছে, না ঢুলছে যেন। (প্রসঙ্গতঃ বলেও রাখি, মোটা লোক, চেয়ারে ব'সে ব'সে বদন ব্যাদান ক'রে প্রায় সারাক্ষণ একে ঘুমোতেই দেখা যায়)। আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, তিনি "মাঁশ্বরী" অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়াতে পাদরীর কাজ করেন, পঁচিশ বছর সেদেশে কাটিয়েছেন, এবার পাঁচ বছর পরে দেশে ফিরছেন। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান কত, আর রোমান কাথলিকই বা কত তা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি বললুম যে ভারতবর্ষে এখন খ্রীষ্টান বড়-একটা কেউ হয় না, তবে যারা হ'য়েছে তাদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত তারা সাধারণতঃ প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের হ'য়ে থাকে, আর গরীব অশিক্ষিত যারা আগে থেকেই পোর্ত্তুগীসদের আমল থেকে খ্রীষ্টান হ'য়েছিল তারাই কাথলিক রয়ে গিয়েছে। পাদরী তাতে একটু হেসে ব'ললে—"হুঁ, প্রটেস্টাণ্ট হ'লে অনেক সুবিধা।" আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"তার মানে ?" পাদরী আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বললে—"প্রটেস্টাণ্টদের মধ্যে ডাইভোর্সের সুবিধা আছে।" এই সব বিষয়ে পাদরী-বাবা ব'সে ব'সে ভাবেন তা হ'লে। তবে গাঁধীজীর খোঁজ নিলে,—কথায় বোঝা গেল তাঁর প্রতি খুব শ্রদ্ধা আছে।

আর একটি কাথলিক পাদরী যাচ্ছে বয়সে ছোকরা, আর এক জন কাথলিক সন্ন্যাসিনী। এরা দু-জনে ইটালীয়ান। পোলিশ পাদরীটী আমায় ব'ললে, যে ছোকরা পাদরীটি গিয়েছিল জাপানে, সেখানে এত বেশী মন দিয়ে জাপানী ভাষা প'ড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে যে তার শরীর খারাপ হয়ে গেল, এখন দেশে ফিরছে শরীর ভেঙে যাওয়ার দরুন। ব'লে লোকটা অকারণ হাসতে লাগল।

জন-চারেক ইংরেজ চলেছে, ৩৫ থেকে ৩৮ কি ৪০এর মধ্যে বয়স, এরা বোধ হয় ভারতবর্ষেই বিভিন্ন স্থানে কাজ করে, অল্প-স্বল্প হিন্দুস্থানী সবাই জানে—এরা এক টেবিলেই ব'সে খায়, আর কারও সঙ্গে বড় মেশে না।

মোটের উপরে খুব উঁচু শ্রেণীর বিদেশী কারও সঙ্গে আলাপ হ'ল না। এই শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণীর হাওয়াটা উঁচু দরের নয়। এক লম্বা-চওড়া অষ্ট্রিয়ানের কাছ থেকে ভিয়েনার খবর নিচ্ছিলুম। সে জিজ্ঞাসা করলে জার্মান জানেন কি, যে ভিয়েনায় যাচ্ছেন ? আমি জার্মানে ব'ললুম, "অল্প একটু জার্মান বলি, একটু পড়ি, কাজ চালিয়ে নেবো।" তখন সে আমায় বলে, "দেখুন, আমি ভিয়েনার নাড়ী-নক্ষত্র সব জানি, যদি কেউ আপনাদের যায়-টায়, আমায় খবর দেবেন।" কথা আর এগোলো না, ভাবলুম, এ পাণ্ডাগিরি করতে চায় নাকি ? মহাত্মাজীর ভক্ত সেই সুইস ফরাসীটার সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা ক'রলুম, কিন্তু ভদ্রলোক বেশীক্ষণ সময় নিজের লেখা নিয়ে থাকেন (গাঁধীজীর সম্বন্ধে কিছু বই লিখছেন না কি ?) আর খুব বিশেষ মিশুক ব'লে মনে হ'ল না।

আমেরিকান ছোকরা যেটি গাঁধীজীর কাছ থেকে আসছে সেটি একটু মুখচোরা লোক, তবে আশা হয় তার সঙ্গে কথা ক'য়ে কিছু আনন্দ আর কিঞ্চিৎ তথ্য হয়তো পাবো। আর বাকী সব তাস-পেটা, নাচ-গান, বিয়ার বা ককটেল খাওয়া, এই সব নিয়েই আছে। সুন্দর চেহারার তরুণ-তরুণীর অভাব নেই ; আবার গুণ্ডা আর গাড়োয়ান চেহারারও দু-চার জন আছে, তারাও খুব জমিয়ে নিয়ে হৈ চৈ ক'রতে ক'রতে চ'লেছে।

একটি জার্মান-সুইস ভদ্রলোক যাচ্ছেন, শুনলুম ইনিও গাঁধীজীর ভক্ত হ'য়ে ভারতবর্ষে ছিলেন। লোকটিকে বোম্বাইয়ে দেখি ; মাঝারী চেহারা, কিন্তু কতকটা Uncle Sam-এর মত দাড়ী—Uncle Sam-এর দাড়ীর চেয়ে একটু বেশ লম্বা দাড়ী। শুনলুম লোকটি ভাল ফোটোগ্রাফার, ভারতবর্ষ থেকে নানা রকমের বহু শত ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছে, হয় তো কোনও বই প্রকাশ ক'রবে। কতটা আধ্যাত্মিকতার মালিক এ তা বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে এক রাত্রে এর ধরণ দেখে আমরা জন-কয়েক ভারতীয় একটু মজা অনুভব করি। পাশার দান ফেলে সেই দান ধ'রে ধ'রে ছ'টা কাঠের ঘোড়াকে নিয়ে রেস্ খেলা হ'চ্ছে, যাত্রীদের অনেকে এক-একটা ঘোড়ার উপর এক শিলিং ক'রে টিকিট ধ'রে বাজী খেলছে। তিন

তিন বার খেলা হ'ল; যাদের নম্বরের ঘোড়া পাশার দানের জোরে আগে উৎরে গেল, তাদের মধ্যে সব টিকিটের টাকাটা (জাহাজের খানসামাদের জন্য শতকরা দশ ক'রে কেটে নিয়ে) বেঁটে দেওয়া হ'ল। দাড়ীওয়ালা জার্মান-সুইসটির বড় সাধ, একবার সে-ও একটা ঘোড়ার নম্বর ধ'রে। কিন্তু কোনও কারণে সে বড্ড ইতস্ততঃ ক'রতে লাগল, টিকিট কিনি, কি না কিনি। যেন অনুচিত কাজ ক'রতে যাচ্ছে, এই ভাবে টিকিটের টেবিলের কাছে একবার ক'রে যায়, আবার কি ভেবে হ'টে আসে। তার এই অনিশ্চিত ভাব, আর সঙ্গে সঙ্গে একদাড়ী মুখের মধ্যে সংশয় আর ভয় মেশানো এক অপূর্ব্ব ভঙ্গী, এটা আমাদের ক'জনের কাছে বড়ই মজার লাগছিল। ছুটো রেস সে এই ভাবে টিকিট না কিনে কাটিয়ে দিলে, কিন্তু যখন দেখলে যে প্রথম ছুটো রেসে যারা জিতলে তারা এক শিলিং বা তিন লিরা দিয়ে একবার ৩৫ লিরা আর একবার ২৭ লিরা ক'রে জিত্‌লে, তখন তৃতীয় রেসের বেলা আর থাকতে পারলে না, দমকা একখানা টিকিট কিনে ফেললো। বোধ হয় তার দিকে চেয়ে আমাদের হাসিটা আর বাঙলা আর হিন্দীতে আমাদের মন্তব্যটা একটু জোরেই হ'চ্ছিল, তাই সে আমাদের দিকে একটু মিট-মিট ক'রে তাকাতেও লাগল। শেষে এই রেসের ফল যখন জানানো হ'ল, তখন দেখা গেল, তার পয়সাটা নষ্টই হয়েছে। তার জন্য হাসির মধ্যেও আমাদের একটু দুঃখ হ'চ্ছিল।

ঈকনমিক সেকেণ্ডের ভারতীয় যাত্রীদের মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়—এক, যারা বয়সে বৃদ্ধ, মাতব্বর, বিলেতে যাচ্ছেন বেড়াতে বা দেখতে, সঙ্গে সঙ্গে কোনও বিষয়ে নোতুন আলো পেতে; এ রকম জন দু-তিন আছেন, তার পর আমাদের মতন, আধা বয়সের, হয়তো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছি, ইউরোপের হালচাল অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একটু পর্য্যালোচনা ক'রে দেখাও যাবে; আর তিন—নানা বয়সের ছাত্র। যারা পরীক্ষা দেবে—তা অতি তরুণ থেকে আধবুড়ো পর্য্যন্ত, ইউনিভার্সিটীর ছোটখাটো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থেকে বিজ্ঞান কি চিকিৎসাশাস্ত্র কি অর্থনীতিতে উচ্চকোটির গবেষণা ক'রে নাম করা যাঁদের উদ্দেশ্য। মেয়েদের মধ্যে কতকগুলি ছাত্রী-পদবাচ্যা, আর বাকী স্বামী বা পিতা বা ভ্রাতার সঙ্গে ইউরোপে তীর্থদর্শনে চ'লেছেন। এঁদের মধ্যে, ভারতীয় যাত্রীদের সভায় দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লোকেদেরই পসার বেশী, কারণ এঁরা বেশীর ভাগই "পারদর্শী"—অর্থাৎ কিনা সাগর-পারের দেশ দর্শন ক'রে এসেছেন। আমাদের এই দলে ব'সে ব'সে আড্ডা দেওয়া, রাজা উজীর মারা হয় খুব, তবে খুব গভীর কথা উঁচু কথা নিয়ে জটলা করার স্থান এই শস্তার সেকেণ্ড ক্লাসের বৈঠকগুলি ঠিক নয়। এখানে বড় দরের সমস্যা নিয়ে ওজনদার মন্তব্য হয় না, তবে দিল-খোলা হাসি আর জীবনের নানা বিষয় অবলম্বন ক'রে টিপ্পনী কাটা আছে।

একটা বিষয়ে আমরা ভারতীয় যাত্রীরা বেশ আরামের সঙ্গে চ'লেছি,—এই জাহাজে পোষাকের কড়াক্কড় নেই। ইউরোপের লোকেরা অনেক বিষয়ে বেশ সংস্কারমুক্ত, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তারা বড়ই গতানুগতিকতার অনুসরণ ক'রত। বিগত লড়াইয়ে তাদের মধ্যে পরিচ্ছদ বিষয়ে কতকগুলি সংস্কার এনে দিয়েছে। শর্ট বা হাফ-প্যাণ্ট তার মধ্যে একটি, নরম কলার আর একটি। পোষাক বিষয়ে কানুন মেনে চ'লতেই হবে, না হ'লে সেটাকে অমার্জ্জনীয় সামাজিক পাপ ব'লে ধরা হবে, এ রকম ধারণা এখনও ইংরেজের মধ্যে কিছু কিছু আছে। পোষাকের কড়াক্কড় বজায় রাখা, বিশেষতঃ সন্ধ্যার নিমন্ত্রণ-সভায় অভিজাত বা পদস্থ ইংরেজের কাছে তার জাতিধর্ম্মের এক অনপনেয় নিশানা। ইংরেজ ফৌজী অফিসার, বড় পদের অন্য কর্ম্মচারী,—স্বদেশে বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন, দু-তিন জন একত্র থাক্‌লেই আর তার জন্য লড়াই হাঙ্গামা হুজুতের মতন অন্য কোনও বাধা না ঘ'টলে, ঈভ্‌নিং ড্রেসের ফোঁটা আর ছাপ সর্ব্বাঙ্গে মেখে তবে নৈশ ভোজে ব'সবে,—নইলে জাত যাবে। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মেখে ফোঁটা কেটে ছাপ মেরে খালি ভারতীয় গোঁড়া হিন্দুই ব'সে থাকে না; এ ছাপ ফোঁটা বিভূতি কাপড়-চোপড়ের কড়াক্কড়ি নিয়মকে আশ্রয় ক'রে অন্য জাত বা অন্য ধর্ম্মের লোকেদের মধ্যেও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে—বোধ হয় আমাদের ছাপ-ফোঁটা বিভূতির চেয়ে আরও জোরের সঙ্গে—রাজত্ব ক'রছে। বিগত মহাযুদ্ধ এসে সব ওলটপালট ক'রে দিলে। কম কাপড়ের,

কাপড়-চোপড় বিষয়ে একটু ঢিলে-ঢালা ভাবে চলার সুবিধা আর আরাম সকলেই বুঝলে। ইউরোপেও বড্ড বেশী কাপুড়ে' হ'য়ে থাকার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন দেখা দিয়েছে, এমন কি একেবারে বিবস্ত্র হ'য়ে কিছু কাল দলবদ্ধ ভাবে কোনও বনের উপকণ্ঠে বাস করার রেওয়াজও ইউরোপে এসে যাচ্ছে। এই Nudism বা নগ্নতাচর্য্যা জার্মানীতে খুবই প্রকট, অনেক সাধারণ গৃহস্থ আর রুচিবাগীশের কাছে এটা একটা আতঙ্কের কথা হ'য়ে উঠেছে। মেয়ে পুরুষের নাইবার পোষাকে এখন এই Nudismই যেন একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে এসে গিয়েছে। The cult of the body—শরীরসাধন—এই ধুয়া এই সব মত ও চর্য্যার পিছনে; এর জন্য প্রাচীন গ্রীক জাতিরও দোহাই পাড়া হয়। যাক ওসব হ'চ্ছে গভীর কথা; আমরা আপাততঃ এই জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে আরবসাগরে আর লোহিত-সাগরে হাফ-পাণ্ট বা পাতলুন, কামিজ বা গেঞ্জি, আর মোজা না প'রে খালি পায়ে চপ্পল বা চটি বা কাম্বিসের জুতো প'রে পরম আরামে আছি। প্রায় সব ইউরোপীয় এই alfresco পোষাক প'রে দিনরাত কাটাচ্ছে; খালি পায়ে চটি, শর্ট বা পেণ্টুলেনের উপরে হাতকাটা গলা-খোলা কামিজ—ব্যস, এই পোষাকেও ডিনার খেতে পর্য্যন্ত ইংরেজ, জার্মান, ইটালীয়ান, ভারতীয় কারু বাধছে না। ইংরেজের জাহাজ হ'লে পোষাকে এতটা ঢিলাঢালা হওয়া বোধ হয় ঘ'টত না। এই গরমে ডেকের উপরও কলার টাই এঁটে দুটো অন্ততঃ জামা—একটা কামিজ একটা কোট গায়ে চ'ড়িয়ে মোজা আর ফিতে-আঁটা জুতো পায়ে প'রে, ব'সে ব'সে ঘামতে হ'ত আর ক্যাবিনের ভিতরে গরমে এই রকম পোষাকে মূর্চ্ছা যাবার মত অবস্থা হ'ত। আমাদের শ্রেণীতে এক জন স্কচ পাদরী চলেছেন, গলায় উল্টা কলার পরা। প্রথম রাত্রে নৈশ ভোজের টেবিলে এলেন full canonicals চ'ড়িয়ে—কাল কোট প্রভৃতি সব যেমনটি দস্তুর তেমনটি প'রে। কিন্তু তিনি একা প'ড়ে গেলেন। তার পর থেকে তিনি লাউঞ্জ সুট প'রেই আসেন। খ্রীষ্টানীর সহিত ব্রিটিশ আভিজাত্য দুই-ই বজায় রাখবার সাধু চেষ্টা তিনি ক'রে-ছিলেন, কিন্তু "জমানা বিগড় গিয়া"—তাঁকেও মেনে নিতে হ'ল। ভূমধ্যসাগরে পঁহুছিলে পরে পোষাক বিষয়ে এই রাম-রাজত্ব থাকবে কি-না জানি না কিন্তু ভূমধ্যসাগরে একটু ঠাণ্ডা প'ড়বে, তখন টাই কোট লাগাতে কষ্ট নেই।

ভারতীয়দের মধ্যে দু-জন ভদ্রলোক যাচ্ছেন আসাম জোড়হাট থেকে। এঁদের এক জন হ'চ্ছেন আসামের সুপরিচিত কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত কুলধর চলিহা, অন্য জন জোড়হাট অঞ্চলের জমীদার শ্রীযুক্ত গুণগোবিন্দ দত্ত। কুলধর বাবুর গলায় অসুখ, তাঁর জোরে কথা বলার শক্তি ক'মে গিয়েছে, তার চিকিৎসা করবার জন্য আর একটু ইউরোপ দেখবার জন্য তিনি যাচ্ছেন। তাঁর বন্ধুরও উদ্দেশ্য একটু ইউরোপ দেখা। ভিয়েনাতে এঁর চিকিৎসা হবে। ভারতের রোগীদের চিকিৎসার জন্য ইউরোপে ভিয়েনা একটা প্রধান স্থান হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কুলধর বাবু আর তাঁর সঙ্গী যখন বোম্বাইয়ে জাহাজে উঠলেন, তাঁরা ধুতী পাঞ্জাবী প'রেই উঠলেন। সে জন্য কেউ অবশ্য কিছু গ্রাহ্যই করে নি, আমরা অনেকে প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখেছি। চলিহা মহাশয়ের সঙ্গে আমি হিন্দীতে আলাপ সুরু ক'রলুম, তিনিও বেশ হিন্দীতে উত্তর দিলেন। যখন শুনলুম তিনি আসাম থেকে আসছেন, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে বাঙলাই চ'লছে। ইনি দেশাত্মবোধযুক্ত ব্যক্তি, সমীক্ষাশীল, এঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ আছে।

বাঙালীদের মধ্যে আছেন আমাদের মুখুজ্যে—ভদ্রলোক ভারতীয়-অভারতীয় সকলকে নিয়ে বেশ জমিয়ে চলেছেন। ক'লকাতায় বাড়ী, মোটরকারের কারবার করেন, পুরাতন গাড়ী ইংলণ্ড থেকে কিনে ক'লকাতায় আনিয়ে বিক্রী করেন। মাঝে মাঝে বিলেতে যেতে হয়। গোলগাল নাদুস-নুদুস চেহারা, চাল-চলনে কথাবার্ত্তায় এমন একটা ভদ্রতা আর অন্যতা, এমন একটা দিলখোলা ভাব আছে যে সবাই এঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এদিকে খুব হুসিয়ার লোক, অনেক কিছুর খবর রাখেন, গল্প-গুজবে হাসি-ঠাট্টা-মস্করায়ও কম নন। উপরে খোলা ডেকে deck quoit খেলার সর্দ্দার ইনি—ইটালীয়ান, গ্রীক, ইংরেজ, ভারতীয়, জার্মান, সবাই প্রায় সারাদিন এই খেলা খেলছে—জাহাজে ব্যায়াম ক'রে খিদে করবার এই একমাত্র উপায়; খেলুড়েদের মধ্যে মুখুজ্যেই প্রধান। আমরা এক টেবিলেই খেতে বসি, সেখানেও

মুখুজ্যে আসর জমিয়ে রাখেন। মুখুজ্যের চেহারায় আর মুখেতে "তরুণী" ফিল্‌ম্‌-এর মানুকের মত একটু ছেলে-মানুষী-মাখা সারল্য থাকায় ভদ্রলোককে চট্‌ ক'রে সকলকার প্রিয় ক'রে তোলে। এ রকম সহযাত্রী পাওয়া আনন্দের কথা। আর এক জন বাঙালী যাচ্ছেন—সেন মহাশয়। ইনি তের বৎসর পূর্ব্বে প্রথম বিলেত যান, আমিও সে সময়ে লণ্ডনে ছিলুম। সামসময়িক আর দু-চার জনের কথা তুলে আমাদের প্রথম আলাপ জ'মল। সেন মহাশয় ক'লকাতার কাষ্টম্‌স-বিভাগে কাজ করেন; বেশ পড়াশুনো আছে, রসবোধ আছে, অনেক কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তাঁর হ'য়েছে; সব্বাইয়ের সঙ্গে বেশ মেশেন, নানান বিষয়ে রকমারি খবর তিনি আমাদের দেন, আর মাঝে মাঝে বেশ পাকা মন্তব্য করেন। ইনি বেশী বাজে বকেন না; কিন্তু এঁর সঙ্গে আলাপ করাটা বেশ উপভোগ্য। বাঙালী যাত্রীদের মধ্যে ইনি আমাদের একটি মস্ত asset. আর এক জন আছেন, বেশ সদালাপী, বিলেতে থেকে একাউণ্টেন্সি পড়েন ছুটিতে দেশে এসেছিলেন, আবার ফিরছেন; ইনি একটু ভোজন-বিলাসী, মুখুজ্যে-মশাই এঁর নাম দিয়েছেন "ব্যারন-অফ-গ্যাস্ট্রনমি" সংক্ষেপে "ব্যারন"।

একটা বিষয় দেখে বেশ আনন্দ হয়—deck quoit খেলায় ভারতীয়েরা পুরোদস্তর যোগ দিয়েছে। শরীর-চালনায় ভারতীয়েরা কাতর, এই রকম একটা কথা শোনা যেত; কিন্তু সারা দিন ধ'রে দেখা যাচ্ছে ভারতীয়েরা এই খেলার আসর গরম রেখেছে, বিশেষতঃ জন-কয়েক বাঙালী, মারাঠী আর দক্ষিণা ছেলে। এক জন গ্রীক ছোকরা, জন-কতক ইটালীয়ান, মাঝে মাঝে জন-কতক রুষ, জার্মান, কচিৎ কখনও এক জন ইংরেজ—এদেরও খেলতে দেখা যায়। এতে ভারতীয়দের সম্বন্ধে লোকের ধারণা ভালই হয়।

অন্য জাতের লোকেরা একটু চুপচাপ ক'রেই চ'লছে, হয় ঘুমুচ্ছে নয় ডেক-চেয়ারে ব'সে ব'সে বই নিয়ে প'ড়ছে। লাহোর থেকে এক জন ধনী চামড়ার ব্যবসায়ী যাচ্ছেন, তিনি স্কুলে কখনও পড়েন নি, ইংরিজী উর্দ্দু অভিধান নিয়ে ব'সে ব'সে ইংরিজী শব্দ সংগ্রহ ক'রছেন। ভদ্রলোকের এই প্রশংসনীয় অধ্যবসায় দেখে তার ব্যবসারও যে বেশ বাড়-বাড়ন্ত তা সহজেই বোঝা যায়। পাঞ্জাবী তরুণ স্বামী-স্ত্রী দু-জন যাচ্ছেন; পাঞ্জাবী হিন্দু, মেয়েটির বয়স আঠার-কুড়ি হবে, খুব সুশ্রী দেখতে, স্বামীটির বয়স পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে; ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয় নূতন বিবাহিত; এরা নিজেদের নিয়েই মশগুল, এদের চালচলন দেখে আমাদের দ্বারা এদের নামকরণ হ'য়েছে "কপোত-কপোতী" বা love-birds।

২৩শে মে বোম্বাই ছেড়েছি, ৩০শে সুয়েজের খাল দিয়ে পোর্ট-সাইদ আর ৩রা জুন ভেনিস। জাহাজের পর্ব্বটা এই ভাবেই শেষ হবে ব'লে মনে হয়—ব'সে ব'সে নানান জাতের মেয়ে পুরুষের দৈনন্দিন জীবন-পদ্ধতি দেখা, তা সব সুন্দর বা শোভন নয়, আর নানা বিষয়ে চিন্তা করা আর খেয়াল দেখা।

এ কয়দিন সমুদ্র আর আকাশ চমৎকার ছিল, জাহাজ একটুও দোলে নি, যেন পুকুরের উপর দিয়ে এসেছে। বর্দ্ধন মহাশয় এক সাধক মহাপুরুষের ভক্ত; তাঁর বিশ্বাস এই মহাপুরুষটি তাঁকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন ব'লেই ঝড়ঝাপটা হয় নি। মহাপুরুষটি আমাদের বিরিঞ্চি বাবার একই আখড়ার নয় তো?

মা

শ্রীআশালতা সিংহ

১

প্রথম নব-জীবনের সূত্রপাত হইল সরম-রাগরক্ত এক গোধূলিবেলায়। ফাল্গুনের স্নিগ্ধ উদ্ভাসিত অপরাহ্ন। গোধূলি-লগ্নে বিবাহ। বেলা পড়িয়া আসিতে না আসিতেই কনের মা আসিয়া তরুণী মহলে তাড়া দিলেন, "ওরে তোরা বাজে গল্প রেখে এইবার কনে সাজাতে ব'স না মা। গোধূলি-লগ্নে বিয়ে, দেরি আর কত। সময় হয়ে এ'ল ব'লে। চপলাদি ভাই তুমি সেই নটরাজ শাড়িখানা বার কর। কি বলছ? বেনারসী না পরলে বিয়ে হবে কেমন করে? না না, আজকাল আর ওসব চলন নেই। কালে কালে দিন সময় কতই না বদলে যায়। এই দেখ না আমাদের সময় বিয়ের চেলি ব'লে যে কাপড় দেওয়া হ'ত, সে কেবল হাতে-কাটা সুতোর একখানা কাপড় মাত্র। হলুদ দিয়ে সধবারা তার পাড় রাঙিয়ে দিত। আর দেখ্, সোনার সঙ্গে মিলিয়ে বেশ ক'রে ফুলের গয়না পরিয়ে দিস। চুল এখন বিনুনি ক'রে বাঁধতে নেই, এলো খোঁপায় রেশমী ফিতে জড়িয়ে দিস।"

ফুলচন্দন এবং রত্নালঙ্কারে সুন্দরী অরুণাকে যখন মেয়েরা অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়া তুলিল, তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। রাঙা আভায় চারিদিক ছাইয়া গেছে। অদূরে বিপুল বাদ্যোদ্যমের সহিত বর আসিবার বাজনা শোনা যাইতেছে। বেলা অরুণার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিল, "আজ বাসরে শেলীর অনুবাদ সেই গানখানা গাস ভাই, নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে, তটিনী মিশিছে সাগর সনে।" কনের মাসী আসিয়া কহিলেন, "এখন গল্প করিস নে অরু। গৌরীপুজোয় ব'স্। নটরাজ শাড়ি পরেছিস। নৃত্যতাণ্ডব শিব কাপড়ের রেখায় রেখায় শাড়ির পাড়ের ভাঁজে ভাঁজে পায়ের তলায় লুটাচ্ছেন। যদি জীবনে এমনই পেতে চাস, শীগ্গীর গৌরী-পুজোর আসনে গিয়ে বোস। বি-এ পাস কনেরও গৌরী-পূজো না করলে পরিত্রাণ নেই।"

কনে অরুণা লজ্জিত হইয়া কহিল, "আমি কি করব না বলেছি।"

অরুণার বয়স বেশী নয়। আঠার ছাড়াইয়া সবেমাত্র উনিশে পড়িয়াছে। শিশুকাল হইতে তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অপরিসীম মেধাবী চিত্ত। তাহাদের পরিবার উন্নত ও উদার। পিতা কখনও কন্যা এবং পুত্রকে প্রভেদ করেন নাই। মাতা তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত সযত্নে গৃহের কাজ, পরিজনের সেবাযত্ন শিখাইয়াছেন। সেই তাঁহাদের বড় আদরের, বড় গর্ব্বের অরুণার আজ বিবাহ। যে ছেলেটির সহিত স্থির করিয়াছেন সে প্রতিযোগী পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে। নাম সন্তোষ। দেখিতে অতিশয় সুশ্রী।

বাসর-রাত্রিতে অরুণার মুখে ইংরেজী এবং বাংলা দুই রকম গানই সন্তোষকুমার শুনিতে পাইল। এস্রাজের মীড় টানার তারিফ করিল, সেতারের গৎ মুগ্ধ অভিভূত হইয়া শুনিল এবং এই ঊনবিংশবর্ষীয়া তন্বী সুন্দরীর হাত হইতে ফুলের বরণমালা পাইয়া নিজের জীবনকে ধন্য মানিল। নিজের ভবিষ্যতকে সুখস্বপ্নের সহিত উপমিত করিল।

অরুণার মুখেও লজ্জিত অপরূপ আভার সহিত সুখের একটা ব্রীড়াচঞ্চল আন্দোলন দেখা গেল।

তার পরে পিতৃগৃহ ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়িতে আসিয়া অরুণা দেখিতে পাইল ছোট্ট সংসার। তাহার স্বামীর মা ছাড়া আর কেহ নাই। আর তাহার বিধবা শাশুড়ীরও এই একমাত্র ছেলে ছাড়া অন্য কোন সুখ, অন্য কোন অবলম্বন, অন্য কোন ছেলেমেয়ে নাই। তাহার স্বামী জীবনের এই পচিশটা বছর মা ছাড়া আর কাহাকেও জানিত না।

মা আসিয়া চোখের জল, বোধ করি আনন্দাশ্রু, মুছিতে মুছিতে বৌ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। ফুলশয্যার রাত্রিতে অজস্র ফুলে সমাচ্ছন্ন কক্ষে নিভৃতে বসিয়া সন্তোষকুমার

মিনতি করিয়া কহিল, "আচ্ছা অরুণা আস্তে আস্তে একটা গান করবে। কি যে মিষ্টি লেগেছে তোমার গান, বলতে পারি নে।"

অরুণা সঙ্কোচে এবং সুখে কিছু কাল নিঃশব্দে রহিল। তাহার পর মৃদু কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু আমি তো শুধু-গলায় গান করতে পারি নে। তোমাদের এখানে এস্রাজ কিংবা হার্মোনিয়াম নেই ?"

সন্তোষ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে থাক্। না, ওসব যন্ত্রের মধ্যে কোনটাই এখানে নেই। তা ছাড়া মা জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হবেন।"

"কি বলছো বুঝতে পারছি নে। গান বুঝি উনি পছন্দ করেন না ?"

সন্তোষ অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া কহিল, "কি জানো, সেকেলে মানুষ, ওঁদের সংস্কারে আঘাত দেওয়া···তাই তো আমি বলছিলুম বাজনা না হ'লে যদি না চলে তবে থাক্। যদি এমন হ'তে পারত, তুমি গুন-গুন ক'রে গাইতে, কেবল তুমি আমি ছাড়া কেউ শুনতে পেত না।"

অরুণা চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে তাহার পরিপূর্ণ সুখের মাঝে একখানি ছায়াপাত হইল। সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। তখনই বুঝিয়া লইল, এখন হইতে অনেক বিধি-নিষেধের মধ্যে তাহাকে বাস করিতে হইবে। গান শুনিতে এমন ভালবাসা সত্ত্বেও স্বামী যখন এতই সহজে আপনাকে দমন করিয়া লইলেন, মায়ের সংস্কারে পাছে এতটুকু আঘাত লাগে বলিয়া ও পথ দিয়াও গেলেন না, তখন তাঁহারই স্ত্রী হইয়া অতঃপর তাহাকেও অনেক কিছু হইতে নিবৃত্তি শিখিতে হইবে।

ক্ষণকাল পরে আস্তে আস্তে কহিল, "আচ্ছা আমার সৌভাগ্য ক্রমে বা দুর্ভাগ্য ক্রমেই হোক আমি যে বি-এ পাস করেছি, এ খবরটা কি মা জানেন না ?"

"জানেন বইকি। আমি কিছুতেই বিয়ে করতে সম্মত হচ্ছিলুম না, অথচ প্রায় দু-তিন বছর আগে থেকেই মা ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছিলেন। শেষে তোমার অজিতদা তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আনলেন, তাঁর কাছে সব কথা শুনে আমার এমন ভীষণ লোভ হ'ল, তার ওপর তোমার ফটোখানা দেখেই মা'র কাছে প্রায় নিমরাজী-গোছের হয়েছি এমনই ভাব প্রকাশ পেল। মা হাতে স্বর্গ পেলেন। তুমি যদি এম-এ, পি-আর-এস হ'তে তাহ'লেও তিনি বোধ করি লেশমাত্র আপত্তি করতেন না।"

"মা তোমাকে খুব ভালবাসেন, নয় ? আর তুমি ?"

"আমি ? এতদিন আমার জগতে একটি মাত্র সূর্য্য ছিল। তাঁকে ছাড়া বিশ্বজগতে আর কিছুই জানতুম না। আজও তাই জানি। কেবল তার সঙ্গে তোমাকেও জেনেছি। আমার জীবনের আকাশে চাঁদ উঠল।"

তরুণী নববধূ খুব সুখী হইতে পারিল না। আজ মিলন-মহোৎসবের রাত্রিতে যে কেবল একটি মাত্র মুখকে কেন্দ্র করিয়াই আরতি হইবার কথা। সেখানে চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণের কাছে সূর্য্যের আলো তো স্থান পাইবার কথা নহে। সে যে একেবারে অনাবশ্যক।

২

দুই বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

অরুণার স্বামী রংপুরে বদলী হইয়া আসিয়াছেন। এই স্থানটার জলবায়ু তেমন ভাল নহে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আছে। সময়টা পৌষ মাস। শীতের কনকনে হাওয়া দিতেছে। বসিবার ঘরে আরাম-কেদারায় পায়ের উপর শাল চাপা দিয়া সন্তোষ বসিয়া আছে, এবং অদূরে ষ্টোভ ধরাইয়া অরুণা ওটপরিজ তৈয়ারী করিতেছে। ডাক্তারের কাছে শুনিয়াছিল এই বস্তুটা নাকি অত্যন্ত উপকারী ও বলকারক, তাই সন্তোষের জন্য করিতেছিল। তাহার স্বামীর আশ্বিন মাসে ম্যালেরিয়া হইয়াছিল, তাহার পর অরুণা যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইয়াছে। কুড়ি দিনের ছুটি লইয়া তাহাকে হাওয়া বদলাইতে পুরী পাঠাইয়াছে, তথাপি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এখনও সারিয়া উঠিতে পারেন নাই। সন্তোষ চেয়ারে চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল এবং মাঝে মাঝে আড়চোখে ষ্টোভটার পানে চাহিতেছিল। তাহার সমস্ত মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল এক পেয়ালা সোনার রঙের সুন্দর গরম চায়ের জন্য। কতদিনের অভ্যাস। কিন্তু জানে অরুণার কড়া শাসনে তাহা হইবার জো নাই। তাহার বদলে খাইতে হইবে দুধ এবং চিনি দিয়া তৈয়ারী

করা বিশ্রী বিস্বাদ ওটপরিজ। এক সময়ে আর থাকিতে না পারিয়া কহিল, "আচ্ছা বিকেলে না-হয় খাব না, কিন্তু কেবল সকালবেলায় যদি খুব পাতলা এক পেয়ালা চা খাই। তাতে কি কিছু আসে যায়? ম্যালেরিয়ায় চা উপকারী।"

অরুণা হাতের কাজ রাখিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, "কে তোমাকে বলেছে? তা ছাড়া তোমার তো ম্যালেরিয়া সেরে গেছে। যা আছে, সে কেবল দুর্ব্বলতা, চায়ে কি পুষ্টিকর জিনিষ আছে আমাকে বোঝাও দেখি।"

সন্তোষ কি বুঝাইবে কিছুই যখন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, এমন সময় চাকরটা দ্বারপ্রান্ত হইতে কহিল, "মা একবার ডাকছেন বাবু।"

"যাই, শুনে আসিগে।" সন্তোষ উঠিল।

"কিন্তু বেশী দেরি ক'রো না যেন। সমস্ত জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে।"

মায়ের মহল বাড়ির দক্ষিণ দিকে। একখানি তাঁর শয়ন-ঘর। আর একখানি ছোট ঘরে পূজা-আহ্নিকের সাজসরঞ্জাম আছে। আর তাহারই এক পাশের একখানা ঘরে সংসারের স্পর্শ বাঁচাইয়া শুচিতা রক্ষা করিয়া তাঁর রাঁধিবার আয়োজন। ক্ষুদ্র ভাঁড়ার। আরও টুকি-টাকি কত জিনিষ। সন্তোষ সামনের ঘরখানায় ঢুকিবামাত্র দেখিতে পাইল শ্বেতপাথরের থালাতে ফুলকো লুচি, কপিভাজা, বাধাকপির তরকারি, পায়েস রাখিয়া মা পাখা-হাতে বাতাস করিতেছেন। চাকর আনন্দর হাতে ধূমোত্থিত চায়ের পেয়ালা। সন্তোষ আর কথাটিমাত্র না কহিয়া পেয়ালার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া আসনে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "আজ কি ব্যাপার মা ?"

"ব্যাপার কিছুই নয় বাছা। কাল বিকেলে তোর ঘরের দিকে গেছলুম, দেখি বৌমা খোলা-সুদ্ধ ডিম, শাক পাতা কতকগুলো কি সেদ্ধ ক'রে তোকে দিচ্ছেন। আর লাল মোটা রুটি। জিজ্ঞেস করতে বললেন, এই সবেতেই গায়ে বল হয়। আজকালকার ডাক্তারেরা নাকি বার করেছেন কোন জিনিষের খোসা ফেলতে নেই। ময়দা চেলে পরিষ্কার করতে নেই। ডিম ভাল ক'রে সেদ্ধ করতে নেই। মাগো, ঐ সব অখাদ্য-কুখাদ্যগুলো খেতে তোর কষ্ট হয় না সন্তোষ? সেই যে এতটুকু বেলা থেকে দেখেছি দু-বেলা ঠিক সময়ে চা'টি না পেলে রাগারাগি করতিস। কিন্তু বৌমা বললেন, 'আমি নিয়ম ক'রে দিয়েছি, চায়ের বদলে এক বেলা ওট্ আর এক বেলা ওভ্যালটিন।' অত সবের নামও জানি নে।"

সন্তোষ অনেক দিন পরে মায়ের হাতের রান্না পরম তৃপ্তির সহিত খাইতে খাইতে কহিল, "আমিও জানি নে মা। এদিকে যে প্রাণ যায়। সারাদিন ঐ নিয়ে আছে। কবে কোন্ কালে আমার একটুখানি জ্বর হয়েছিল সেই জন্য আজও আমাকে এবেলা এক রকম ওবেলা এক রকম ওষুধ খেতে হচ্ছে। তা ছাড়া—"

"না বাছা তা ব'লো না। বৌ মা আমার গুণবতী। কেমন ক'রে স্বামী-সেবা করে তা তো চোখের উপর স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। তবে আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের মনে হয়, যা খেয়ে তৃপ্তি পায় তাই ক'রে দিই। তৃপ্তিতেই অনেকখানি কাজ হয়। রাতদিন ডাক্তারী কেতাব ঘেঁটে কি হবে।"

আনন্দর কাছে অরুণা সকালবেলাকার সমস্ত ব্যাপারটা সালঙ্কারে শুনিল। তাহার পর একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আনন্দ ওঘর থেকে আমাকে সেলায়ের কলটা এনে দাও, আর ওঁর পুরনো শার্ট আর মোজাগুলো।" সন্তোষ যখন কাছারি হইতে আসিল তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, তথাপি সেই প্রায়ান্ধকার আলোকেও স্ত্রীকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেলাই করিতে দেখিয়া কহিল, "ওগো, মুখ তোল। কি এত জরুরি সেলাই যে চোখদুটিকে এমন ক'রে পীড়ন করছ।" অরুণা মুখও তুলিল না, কথাও বলিল না। সন্তোষ সেলাইয়ের কলের কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমাকে কেন এত উতলা কর তুমি? বল, কথার উত্তর দাও।"

স্বামীর গভীর প্রেমার্দ্র দৃষ্টির দিকে তাহার অভিমান-করুণ চোখ তুলিয়া সে কহিল, "কি হয়েছে?"

"কেন আমাকে তুমি এমন ক'রে নিলে অরুণা? সারাদিন ভাবছ, আমার শরীর কিসে ভাল থাকবে। সমস্ত সময়টা লাগিয়েছ আমার সেবা করতে, আমার পথ্য তৈরি করতে, আমার আরামের শত সহস্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটিতে। আবার বিকেলে যে-সময়টা তোমার খোলা হাওয়াতে বেড়ান উচিত, তখন অন্ধকার ঘরের কোণে

বসলে আমারই কতকগুলো জামাকাপড় মেরামত করতে। বল তোমাকে কি শাস্তি দেওয়া যায় ?"

সকালের ব্যাপারটা মনে পড়িতেই অরুণার অভিমান শতধা হইয়া উঠিল। কহিল, "আমার সেবাকে তুমি তো অত্যাচারই মনে কর তাই—"

"না গো, তা মনে করি নে। আমাদের বাগানে রোজ সকালবেলায় সেই যে একটুখানি গোলাপী রঙের স্থলপদ্ম ফোটে দেখেছ তো ? তোমার সেবাকে আমি ঠিক তাই ভাবি, কেবল কুণ্ঠিত হই নিজের অযোগ্যতা ভেবে।"

"তুমি কেবল কাব্য ক'রে কথা বলতেই শিখেছ, তা-ই যদি না হবে তাহলে সকালবেলায় আমাকে না-জানিয়ে মায়ের মহলে যেয়ে চা খেয়ে এলে, আর যা তোমার পক্ষে খুব অপকারী সেই সব খেলে। একবারও ভাবলে না আমি এই নিয়ে কত ভেবেছি, কত পড়েছি। জানো শরীর ভাল রাখতে হ'লে আমাদের কোন্ কোন্ শ্রেণীর ভিটামিন কতখানি ক'রে খাওয়া দরকার। ধর আধ-সেদ্ধ ডিমের মধ্যে শাকসব্জী সেদ্ধ, অপরিষ্কার মোটা আটার রুটির মধ্যে—"

সন্তোষ একটুখানি হাসিয়া কহিল, "মা তোমার মত বিদুষী ন'ন, অত হাইজিনও জানেন না, অত পড়াশোনাও নেই, তবুও তিনি যে মা একথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন ? আমি তাঁর যত্ন-ক'রে-রাঁধা খাবার না খেলে তাঁর মনে কতখানি লাগত তা কি বুঝতে পার না ?"

অরুণা অস্ফুট স্বরে বলিয়া ফেলিল, "আর জেনেই বা কি করব, অজ্ঞ সেকেলে মেয়েমানুষদের মনের ধারা বদলানো যায় না, কিন্তু তুমি···"

সন্তোষের চোখের কোমলতা শুকাইয়া উঠিল, অরুণার ধৃত হাতখানা সে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "আর আমি কি, আমিও সেই অজ্ঞ সেকেলে মেয়েমানুষের ছেলে। অরুণা, নিজের মনের মাঝে একটু বিনয় রেখে যদি বুঝতে শিখতে মানুষকে তাহলে বুঝতে···"

অরুণা কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "মায়ের বিষয়ে কোন কথা হ'লেই তুমি যেন খেপে ওঠ। তোমার সমস্ত যুক্তি বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু আমি তাঁর উপর কখনও কোন দুর্ব্যবহার করি নি। আমি কেবল বলতে চাইছিলুম, যতই স্নেহ থাক তার সঙ্গে জ্ঞান আর শিক্ষার দরকার। এই যে সেবারে তোমার টাইফয়েডের সময় দু-জন নার্স আর আমি দিবারাত্রি তোমার কাছে থাকতুম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ, ফলের রস, টেম্পারেচারের চার্ট সমস্তই আমি নিয়মিত ক'রে যেতুম। অত মনের উদ্বেগ সত্ত্বেও। কিন্তু তোমার মা দিন আর রাত চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারে উপবাসী হ'য়ে ঠাকুর-ঘরে আর তুলসীতলায় পড়ে থাকতেন। কোনই কাজে আসতেন না।"

সন্তোষ কাছারির পোষাক বদলাইতে বদলাইতে কহিল, "তুমি বুঝতে পারবে না অরুণা।"

"কি বুঝতে পারব না ?"

"এই যা নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক ক'রছ। তুমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়ে মেয়েদের মধ্যে ফার্ষ্ট হয়ে বি-এ পাস ক'রেছ। তার পরে যদি এম-এ পড়তে, তার পরে যদি পি-আর-এস হ'তে তবুও বুঝতে পারতে না। কিন্তু একদিন হয় তো বুঝবে···"

"তাই না কি ? কবে বুঝব ?"

সহসা অকৃত্রিম হাস্যে অরুণার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিল, "যাও যাও, আর ঝগড়া করতে হবে না। কোন্ দিকে যে আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ এইবারে অনেকটা বুঝতে পারছি।"

"বুঝতে পারছ ? আচ্ছা দাঁড়াও, আরও ভাল ক'রে বলছি।" তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মিষ্টস্বরে কহিল, "কবে বুঝতে পারবে জান, যেদিন মা হবে।"

অরুণা এবারে সত্যসত্যই অভিমান ভুলিয়া গিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা, থাম। কিন্তু চা খাবার অতই যদি লোভ, একটিবার মুখ ফুটে আমাকে বললেই পারতে। এবেলা তুমি আসবার আগেই আমি লিপ্টন থেকে সবচেয়ে ভাল চা আনিয়ে রেখেছি, যখন ও-জিনিষ না খেয়ে থাকতেই পারবে না, তখন যতদূর সম্ভব ভাল ক'রে তৈরি ক'রে দিই। তুমি হাত মুখ ধুয়ে পাখার তলায় একটুখানি ব'সো, আমি পাঁচ মিনিটে হাজির ক'রে দিচ্ছি।"

৩

মিনিট-পনর পরে স্বামীর সম্মুখে চা ও খাবারের

গলাটা অগ্রসর করিয়া দিয়া অরুণা কহিল, "তখন আমার কথায় অত রেগে গেলে, কিন্তু সত্যি ক'রে বলো তো আমাকে কতখানি ছাড়তে হয়েছে।"

"কিসের ?"

"বাবা সখ ক'রে কত গান শেখালেন। বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে আমার অবসর ছিল না, আজ এদের বাড়িতে গান শোনাবার সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ, কাল ওরা আসবে গান শুনতে, পরশু যেতে হবে অমুক পার্টিতে, কিন্তু অত যে, সে সমস্তই বিয়ের সঙ্গে জলাঞ্জলি হয়ে গেল। তা'ও অনেকের শুনেছি, স্বামী গান ভালবাসেন না, ওসকল বিষয়ে রুচি নেই, কিন্তু আমার তা তো নয়, তুমি এত ভালবাস তবু—"

"তবু মায়ের জন্যে। কিন্তু অরুণা, সেই যে গভীর রাত্রিতে কোন কোন দিন চাঁদ অস্ত গেলে, ছাদের ম্লান অন্ধকারে তোমাকে দিয়ে এস্রাজ বাজিয়ে তোমার মৃদু কণ্ঠের একটুখানি গান শুনি, আমার পক্ষে সে-ই অমৃত। তার বেশী আমি চাই নে। অরুণা তুমি কিছু মনে ক'রো না, আমি জানি প্রকাশ্যে অনেকের সামনে গান-বাজনা করলে মা মুখে কিছু বলবেন না, কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন। এই একটুখানি দুর্ব্বলতা তাঁর তুমি মেনে চল। ভেবে দেখ তিনি তোমাকে কত স্নেহ করেন, পারত-পক্ষে কখনও কোন বিষয়ে তোমাকে ক্লেশ দেন না। গান-বাজনা কি আর খারাপ জিনিষ···তবে কি জান সেকেলে মানুষ, ওঁরা আবাল্য যে শিক্ষা এবং সংস্কারের মধ্যে মানুষ হয়ে এসেছেন আজ সেটা এক নিমেষে কাটিয়ে উঠবেন কি ক'রে। আর করবেই তো ভবিষ্যতে। আমার যদি মেয়ে হয়, তাকে আমি খুব গান শেখাব। কেবল যে-কটা দিন মা আছেন, একটু মানিয়ে চলা, এই মাত্র।

অরুণা কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাহার স্বামীর পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, তোমার মায়ের প্রত্যেক বিষয়ে তোমার এত সতর্ক সজাগতা এমন শ্যেনের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এক-এক সময় বুঝতে পারি নে সত্যি।"

"বুঝতে নিশ্চয়ই পারবে কোন সময়। ছোটবেলাকার কত কথাই কত সময়ে মনে পড়ে যায়। আমার স্কুল থেকে ফিরতে চারটে বেজে যেত, তিনটের সময় থেকে ষ্টোভে কম-আঁচে চায়ের জল চড়িয়ে রেখে মা পথের দিকের জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন। শীতের দিনে আমি ঘুমিয়ে পড়লে, ভোরে পাছে ঠাণ্ডা লাগে সেই ভয়ে রাত্রি থেকে মাথার কাছে ওয়েষ্টকোট, অলেষ্টার, জুতো মোজা গুছিয়ে রাখতেন।"

অরুণা হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া খাবারের আলমারিটা গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে কহিল, "তোমার খাওয়া হ'ল? চলো একটু বাগানে বেড়িয়ে আসিগে। আমার হাতের কাজকর্ম্ম সারা হয়ে গেছে। আমার জীরানিয়ামের গাছটায় একটা নতুন কুঁড়ি হয়েছে জান? আর রজনীগন্ধার একটি গুচ্ছ যা চমৎকার ফুটেছে! সন্ধ্যেবেলায় তুলে এনে ফুলদানিতে ক'রে তোমার লেখার টেবিলে দেব।"

৪

আরও দু-বছর পরের কথা—

বৎসর-খানেক হইল অরুণার শাশুড়ীর কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। সে বৎসর গ্রহণের স্নান উপলক্ষ্যে পুত্র এবং পুত্রবধূর সঙ্গে তিনি কাশীর গঙ্গাতীরে স্নান করিতে যান। তীর্থের মোহ তাঁহাকে এমনই পাইয়া বসিল যে গ্রহণ ফুরাইল, সন্তোষের ছুটি ফুরাইল, সে আসিয়া মাকে কহিল, "মা এবারে ফিরে না গেলে মুস্কিল। পরশু আমাকে কাছারীতে যোগ দিতে হবে।"

সন্তোষের মা কহিলেন, "তোরা যা বাছা। আমি আরও দু-মাস থাকি। রাঙাদি আছে, কায়েত-পিসী আছে। আহা কি চমৎকার, বাবার আরতি দর্শন, দশাশ্বমেধ ঘাটে কথকতা, গঙ্গাস্নান—"

সন্তোষ দু-একবার ইতস্তত করিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাহলে তোমার বৌ তোমার কাছে থাক। তোমাকে দেখাশোনা করবে। একা এ বয়সে কি তোমার থাকা হয়?

কিন্তু সন্তোষের মা কথাটা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, "পাগল হয়েছিস সন্তোষ! বৌমাকে এখানে রেখে একা তুই থাকতে পারবি ঐ শূন্য ঘরে। যে নাকি আবার একবার আমার বৌমার হাতের সেবাযত্নের স্বাদ পেয়েছে, সে পারবে ঠাকুর চাকর নিয়ে একা বাড়িতে!"

সন্তোষ ও অরুণা ফিরিয়া আসিল। তাহার দিন-

পনর পরে হঠাৎ তারে খবর পাইল মা আরতি দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া বুকে বেদনা বলিয়া হঠাৎ শুইয়া পড়েন, তাহার ঘণ্টা দুই পরেই হার্ট-ফেল হইয়া সব শেষ হইয়া যায়।

যাক্ এ সকল অতীতের কথা। এখন বর্ত্তমানে ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে। সময়টা শীতকাল। অরুণার শয়ন-কক্ষের একাংশে দোলনায় পশমের মোজা এবং টুপিতে আপাদমস্তক আবৃত হইয়া একটি নবজাত শিশু শুইয়া আছে। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আলোর নিকটে পশম এবং কাঁটা লইয়া অরুণা কি একটা বুনিতেছে। সন্তোষ বোধ করি বাহিরে গিয়াছিল, এইমাত্র বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। আলনায় ছড়ি ও ওভারকোটটা রাখিয়া দিয়া কহিল, "কি করচ? খোকা ঘুমিয়েছে। তাহলে এই অবসরে একটা গান শোনাও না অরুণা। মনটা তেমন ভাল নেই। তোমার গান শুনতে ইচ্ছে করছে।"

"না না, খোকার এই মাফ্‌লারটা আমাকে আজ-কালের মধ্যেই শেষ করতে হবে। এক জোড়া মোজাও বোনা চাই শীগ্‌গীর। যা ঠাণ্ডা পড়েছে।"

সন্তোষ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "খোকার পোষাকে একটা আলমারী বোঝাই হয়ে গেছে। ওর ক'জোড়া মোজা আছে বল ত? গুণে শেষ ক'রে উঠতে পার? এইটুকু ক্ষুদে মানুষটি কতই প'রে শেষ ক'রে উঠতে পারবে!"

অরুণা নিবিষ্ট মনে সেলাই করিতে করিতে কহিল, "না না, তুমি বুঝছ না, আছে অনেকই। কিন্তু সব দিক দিয়ে সুবিধে হয়, ঠিক এমনটি বেশী নেই। কোন জামাটার হয়ত রঙটা এত বেমানান, কোনটা যদিবা পছন্দসই হয়, গায়ে ঢিলে হয়। পরাতে গেলেই চলচল করে, সে ভারি বিশ্রী দেখায়।"

সন্তোষ অন্যমনস্ক হইয়াছিল। বাহিরের শীতার্ত্ত অন্ধকার রাত্রির দিকে চাহিয়া কহিল, "অরুণা একটা কানাড়া সুর গাও না। সেই যে—নীরব করে দাও হে তোমার—"

"ঐ যাঃ, তোমার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে আমার ঘর পড়ে গেল! বড্ড বকাও তুমি। না না, গান এখন নয় গো। লক্ষীটি, অন্য সময় শুনবে। তুমি জান না, খোকাটা কি দুষ্টু, আর কি পাতলা ঘুম ওর। একটু গানের শব্দ পাবে কি ঘুম ভেঙে যাবে। উঠে যেয়ে আমাকে জ্বালাতন করবে। এখন আমার কত কাজ বাকী রয়েছে যে, খোকার চাদরগুলো ইস্ত্রী ক'রে রাখতে হবে। ওর দুধ খাবার বোতলটা ধুয়ে রাখতে হবে, কি বলছ?...কেন ঝি আছে কি করতে, ওমা! কি যে বলো ঠিক-ঠিকানা নেই তার। শুনলে না সেদিন ডাক্তার দাস ব'লে গেলেন নিজের মুখে যে, ছেলেদের খাওয়ানোর বোতল আর তার রবারের মুখীগুলি যেন মা-লক্ষ্মীরা নিজের হাতে পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে রাখেন। ঝি-চাকরের হাতে এর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে না ব'সে থাকেন। এর থেকেই যত—"

"তাহ'লে তোমার একবারেই অবসর নেই বলো।" সন্তোষের মুখে চাপা হাসির উজ্জ্বলতা।

"হাসছ যে বড়! সে কি আর ব'লে দিতে হবে, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ না।"

দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অরুণা সেলাই করিতে করিতে মুখ না তুলিয়াই সহসা কহিল, "আহা, আমার শাশুড়ী যাওয়ার আগে যদি খোকাকে দেখে যেতে পেতেন, তাঁর বড় সাধ ছিল—"

সন্তোষের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণার মোচড় দিয়া উঠিল।

অরুণা হাতের সেলাই ফেলিয়া নিঃশব্দ লঘু পদ-সঞ্চারে উঠিয়া খোকার দোলনার নিকট গিয়া তাহাকে মৃদু মৃদু দোলা দিতে দিতে অস্ফুট স্বরে কহিল, "তোমার যে কত লেগেছে তা বুঝতে পারি, আমি তো ভাবতেই পারি নে খোকার জীবনে এমন এক সময় আসবে, যখন আমি থাকব না। অথচ জানি জগতের নিয়মে তাই হয়ে আসছে। এইটুকু ছেলে, এত নিঃসহায়, এখন আমি এক দণ্ড না দেখলে ওর চলে না। অথচ একদিন—"

অরুণা দোলনায় একটুখানি দোল দিয়া পালঙ্কের উপর খোকার শয্যার শিয়রের কাছে একটি টিপয়ে তাহার ছোট গরম ওভারকোট, শাল, মোজা এবং টুপি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। "জান, খোকার বড় সর্দ্দি হয়েছে। কি ক'রে যে ঠাণ্ডা লাগলো বুঝতে পারি নে। এত সাবধানে রাখি তবু—। এই দেখ না সকালে, খুব ভোরে ওর ঘুম ভেঙে

য়ে। পাছে ওকে তুলে নিয়ে কাপড়-জামার আলনার কাছে গিয়ে পরাতে গেলে ঠাণ্ডা লাগে, সেই ভয়ে মাথার কাছে সব গুছিয়ে রাখছি। শহরে ঘরে ঘরে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, কি যে হবে তাই ভাবছি।"

"এত কেন যে ভাব বুঝতে পারি নে। ওসব কিছুই হবে না খোকার। ও কেবল তোমার কল্পনার ভয়।"

৫

তাহার পরে দিন-পনর কাটিয়া গেছে।

কয়েক দিন হইতে দুর্জ্জয় শীত এবং তাহার সঙ্গে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। সন্তোষের বাড়ির সামনে একখানা মোটর দাঁড়াইল। বাহিরের সদরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু ঘরে কেহ নাই। গৃহস্বামী অত্যন্ত অস্থির হইয়া বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মোটর দাঁড়াইবার শব্দ শোনামাত্র সন্তোষ তাড়াতাড়ি গেটের কাছে নামিয়া আসিল। সিভিল সার্জ্জেন এবং এক জন নার্স গাড়ী হইতে নামিলেন।

"আপনি আরও এক জন নার্সের জন্য আমাকে ফোন করেছিলেন মিঃ বসু?"

"হ্যা, আর এক জন নার্স ভারি দরকার। আমার স্ত্রী আর কিছুই পেরে উঠ্‌ছেন না। তিনি মনের ভয়ানক উৎকণ্ঠায় এক রকম পাগলের মত হয়ে গেছেন। তাঁর ওপর নির্ভর ক'রে সেবা-শুশ্রূষার কোন কাজই আর তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।"

"খোকা এখন কেমন আছে?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। চলুন, ভিতরে গিয়ে দেখবেন চলুন। আমার মনে হচ্ছে ওর নিঝুম ভাবটা আরও বেড়েছে।"

নার্সকে আহ্বান করিয়া বলিল, "আসুন মিসেস রায়। উঃ, কি শীত আর বাদল পড়েছে, রোদ না উঠলে মনে একটুও আশা হচ্ছে না। আপনি মনে করছেন আমাদের কুসংস্কার, কিন্তু তা নয়। আমার কেন জানি না খালি খালি মনে হচ্ছে রোদ না উঠ্‌লে—"

"কি বাজে বকছেন মিঃ বসু, নিজের ছেলের অসুখ হয়েছে বলেই কি এত উতলা হয়ে পড়তে হয়। আপনি নিজে এক জন শিক্ষিত পুরুষমানুষ হয়ে যদি এমন করেন তাহ'লে আপনার স্ত্রী যে আরও করবেনই। আসুন।"

তিন জনে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ভিতরের দিক্‌কার একখানি ঘরে ঢুকিল। সে ঘরে স্তিমিত আলো। শুভ্র বিছানার উপর একটি ক্ষুদ্র শিশু ঘুমাইয়া আছে, এক জন নার্স আলোর নিকট ঝুঁকিয়া হাতের রিষ্টওয়াচটার সেকেণ্ডের কাঁটার দিকে চাহিয়া শিশুর নাড়ীর স্পন্দন গুণিতেছে।

"কেমন দেখলেন?"

"আমার মনে হচ্ছে ক্রমশঃ ভালর দিকে যাচ্ছে। আপনি দেখুন। এই খাতাটায় টেম্পারেচারের চার্ট এবং আরও অন্যান্য বিষয় সমস্তই লেখা রয়েছে।"

"দেখছি। দেখুন, আপনি ততক্ষণ একটু গ্লুকোজ্ তৈরি করুন।"

ডাক্তার শিশুর শয্যাপাশে বসিয়া বহুক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "মিঃ বোস, আর কোন ভয় নেই। ভগবানের দয়ায় আপনার ছেলের জীবনের আশঙ্কা কেটে গেছে। আপনি যেটাকে নিঝুম ভাব ব'লে ভয় করেছিলেন, সেটা আর কিছুই নয়, ক্লান্ত শরীরের গাঢ় ঘুম। আপনার স্ত্রী কই? এ ঘরে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি নে। যান তাঁকে শীগ্‌গীর খবর দিয়ে আসুন। আমি বলছি, কাল সকালবেলা উঠে নিশ্চয় দেখবেন, পুব দিকের ঐ খোলা জানালাটা দিয়ে আপনার ঘরে রোদ এসে পড়েছে।"

সন্তোষ স্ত্রীর খোঁজে গিয়া দেখিল, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মাঝে সেই দুর্জ্জয় শীতে কাপড়ের অঞ্চল মাত্র গায়ে দিয়া অরুণা তুলসীতলায় ধ্যানস্তব্ধের মত বসিয়া আছে।

"কি পাগলামি করছ? শেষে নিজে অসুখ বাধিয়ে একটা কাণ্ড ক'রে বসবে নাকি? ঘরে চল, শোন, ডাক্তার গুপ্ত এসেছেন। বললেন, তোমাকে শুনিয়ে দিতে, খোকা ভাল আছে। তার আর কোন ভয় নেই।"

"তুমি এইমাত্র খোকার ঘর থেকে আসছ?"

"হ্যা।"

"সে আমার বেশ শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে তো?"

"খুব ঘুমোচ্ছে।"

"আর এক জন নার্স এসেছে? ঠিক ঠিক ফলের রস, গ্লুকোজ, ওষুধ সমস্ত পড়ছে তো?"

"হ্যাঁ, সমস্তই ডাক্তারের কথামত সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে।"

"আচ্ছা, তুমি চল, আমিও যাচ্ছি এখনই।"

সন্তোষ চলিয়া গেল। অরুণা গলায় বস্ত্রাঞ্চল জড়াইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতে করিতে কহিল, "ভগবান, তুমি রক্ষা কর। আর কিছুতেই আমার বিশ্বাস নেই।"

ন্যায়পরিচয়*

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

বঙ্গভাষায় ন্যায়দর্শনের আলোচনার কথা উঠিলে প্রথমেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নাম মনে হয়। ন্যায়সূত্রের বাৎস্যায়ন ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি রচনা করিয়া তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে, ন্যায়শাস্ত্রের এক জন যথার্থ মর্ম্মবিদ্‌ তাহা তাঁহার ঐ গ্রন্থ দেখিয়া পণ্ডিতসমাজ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই পত্রিকাতেই ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার সুযোগ বর্ত্তমান লেখকের হইয়াছিল। আনন্দের বিষয়, আজ এই বিষয়েই তাঁহার আর একখানি ঐরূপই পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্‌ তর্কবাগীশ মহাশয়কে প্রবোধচন্দ্র বসুমল্লিক অধ্যাপক-রূপে নিযুক্ত করেন। তিনি এই অধ্যাপক-রূপে ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যান করেন তাহাই বর্ত্তমান পুস্তকের আকারে জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলীর পঞ্চম গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে ন্যায়সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির নাতিসংক্ষিপ্ত ও নাতিবিস্তৃত, অথচ যথাযথ পরিচয় দিবার জন্য তর্কবাগীশ মহাশয় বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, এবং তাহা তাঁহার সফল হইয়াছে। ইহাতে মোট বারটি অধ্যায় এবং একটি আটান্ন পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা আছে। এই ভূমিকায় তর্কবাগীশ মহাশয় "ন্যায়শাস্ত্রে বাঙ্গালীর জয়ে"র কথা বলিতে গিয়া স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে, রঘুনাথের নব্যন্যায়-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের পঠন-পাঠন অব্যাহত ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মিথিলায় উদয়নাচার্য্যের ন্যায় বঙ্গদেশে ও দক্ষিণ রাঢ়ায় সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়কন্দলীর প্রণেতা শ্রীধরভট্ট ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহার পর রঘুনাথের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে আরও অনেক ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। ইহা দেখাইয়া তর্কবাগীশ মহাশয় ক্রমশ, মিথিলার নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায় ও নব্যন্যায়, বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি, শ্রীচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনাথের মিথিলাযাত্রা ও অধ্যয়ন কাল, নবদ্বীপে তাঁহার নব্যন্যায় প্রতিষ্ঠা, ও তাঁহার কৃত দীধিতির ব্যাখ্যাকারগণ,—এই সমস্ত বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা করিয়া একটি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। নব্যন্যায় প্রচারের এই সাধারণ পরিচয় দিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় দেখিয়াছেন যে, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি ও তাহার ব্যাখ্যা প্রভৃতি, যাহা নব্যন্যায় নামে প্রচলিত তাহা সমস্তই গৌতম-প্রকাশিত মূল আন্বীক্ষিকী বিদ্যারই ব্যাখ্যা। ইহার পর প্রাচীন ন্যায়ের কথা তুলিয়া তিনি অক্ষপাদের পরিচয় ও ন্যায়সূত্রের রচনাকালের আলোচনা করিয়াছেন। এ আলোচনার কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। ইহার পর ন্যায়সূত্রের ভাষ্য, বার্ত্তিক, ও টীকাকার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে নব্যন্যায়ের অসাধারণ পণ্ডিত গুপ্তিপাড়ার চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন কালে ন্যায়সূত্র কেবল তর্কশাস্ত্রই (logic) ছিল, পরে বৌদ্ধযুগে উহাকে দর্শনশাস্ত্র করা হইয়াছে। তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য (পৃ. ৫৪):—"এই অভিনব মত কোনরূপেই গ্রহণ করা যায় না।" ন্যায়সূত্রের প্রথম সূত্রে 'প্রমাণ' 'প্রমেয়' প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হয় ইহা বলিয়া কিরূপে ঐ মুক্তি হয় ইহা দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে। এখন "যিনি উক্ত প্রথম সূত্র ও দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন, তিনি পরে যে, তাঁহার প্রথম সূত্রোক্ত আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বও অবশ্যই বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রও পূর্ব্বে ছিল না, (কারণ তাহাতে মুক্তির কথা আছে)—ইহা বলিতে গেলে সেই প্রাচীন ন্যায়সূত্র গ্রন্থের প্রয়োজন অভিধেয় ও সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করা হয় না। শারীরক ভাষ্যে (১।১।৪) ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যও প্রচলিত ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রটিকে 'আচার্য্য-প্রণীত ন্যায়সূত্র বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন।"

আলোচ্য পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে তর্কবাগীশ মহাশয় ন্যায়সূত্রকার গৌতমের মতে মুক্তি কি তাহা আলোচনা করিয়াছেন। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম মুক্তি। বেদান্ত মতের ন্যায় ন্যায়-বৈশেষিক মতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপও নহে, আনন্দস্বরূপও নহে। সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি যেমন আত্মার বিশেষ গুণ, জ্ঞান বা চৈতন্যও তাহার তেমনি একটি বিশেষ গুণ, এবং ইহা নিত্য নহে, ইহা কখনো থাকিতেও পারে, না-ও পারে। ধর্ম্ম হইতে সুখ, আর অধর্ম্ম হইতে দুঃখ হয়; ধর্ম্ম-অধর্ম্ম না থাকিলে সুখ-দুঃখও থাকে না। তাই যদি ধর্ম্ম-অধর্ম্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় তবে সুখ-দুঃখেরও অত্যন্ত উচ্ছেদ এইরূপ আত্মার বুদ্ধি বা জ্ঞান-প্রভৃতি অন্যান্য যে সব বিশেষ গুণ আছে তৎসমুদয়ের উচ্ছেদ হইলে ঐ অবস্থাই মুক্তি। ইহা হইতে জানা যায় যে, এই মতে

---

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ প্রণীত, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ (যাদবপুর, ২৪ পরগণা) হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৫৮+৩১৭, মূল্য ২৷০ টাকা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কল্কি-অবতার

—শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
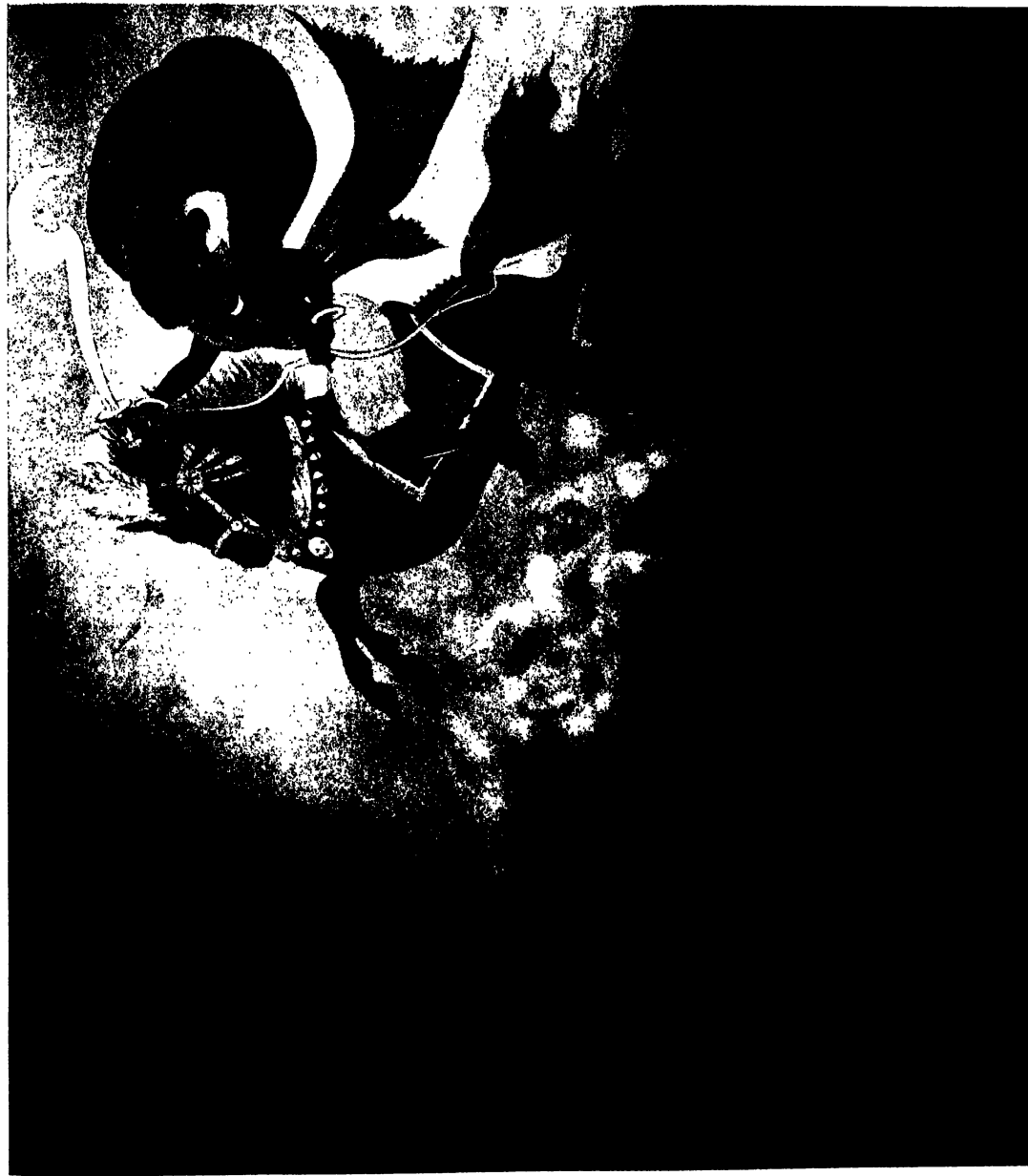
আত্মার সুখ-দুঃখের অতীত এক অবস্থাবিশেষই মুক্তি। এখানে একটা কথা মনে করিবার আছে। আত্মার যদি সমস্ত বিশেষ গুণের উচ্ছেদই হইয়া যায়, তবে তাহার থাকে কি? অগ্নির যে সমস্ত গুণ আছে সেগুলি যদি নষ্ট হইয়া যায় তবে অগ্নি আর থাকে না। নৈয়ায়িকেরা বলিবেন, অনিত্য পদার্থের সম্বন্ধে এই দোষ আসিতে পারে, কিন্তু আত্মার সম্বন্ধে নহে, কারণ আত্মা নিত্য, কেননা তাহা নির্ব্বিকার। সাংখ্য-বৌদ্ধদের মতে গুণ ও গুণী বা দ্রব্যের বস্তুত ভেদ নাই, তাই গুণের অভাবে গুণীরও অভাব, অগ্নির গুণের অভাবে অগ্নিরও অভাব। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকমতে গুণ ভিন্ন, গুণী ভিন্ন, তাই গুণের অভাবে গুণীর অভাবের হেতু নাই। জ্ঞান-প্রভৃতি সমস্ত বিশেষ গুণের উচ্ছেদ হইলে আত্মার তখন স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি হয়। ইহাই মুক্তি। যদি ইহাই হয় তবে বলা যাইতে পারে অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্মানুভূতি বা মুক্তির সহিত এ মুক্তির বস্তুত ভেদ নাই, যদিও নামত আছে। এখানে গৌড়পাদের (৩.৪৬) এই কথাটা মনে হয়:—

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা॥

ইহাই মনের অমনীভাব, নির্ব্বাণ—চিত্তের নির্ব্বাণ, কৈবল্য, ইহাই সকলশূন্য নিরাকার পদ, বিষ্ণুর পরম পদ, এবং ইহাকেই তো বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা মনে হয়, কেবল শাস্ত্রকারদের প্রক্রিয়া বা ভাষার ভেদ।

যাহাই হউক, ইহার পর তর্কবাগীশ মহাশয় আলোচ্য বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়া মুক্তির উপায়ের কথা আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে মুক্তি বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বস্তুত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এখন এই দুঃখ কিসে হয় দেখিতে হইবে। দেখা যায় জন্ম থাকিলেই দুঃখ হয়, অতএব দুঃখের কারণ জন্ম। আবার জন্মের কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ('প্রবৃত্তি')। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হয় রাগ ও দ্বেষ ('দোষ') হইতে। আর রাগ ও দ্বেষ হয় মিথ্যা জ্ঞান হইতে। অতএব মিথ্যা জ্ঞান গেলে রাগ ও দ্বেষ যায়, রাগ ও দ্বেষ গেলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যায়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম গেলে জন্ম যায়, এবং জন্ম গেলে আর দুঃখ থাকে না। ইহাতে দেখা যাইবে দুঃখের একবারে গোড়ায় রহিয়াছে মিথ্যা জ্ঞান বা অজ্ঞান, অবিদ্যা। অজ্ঞানই দুঃখ বা বন্ধের মূলে ইহা ভারতের দর্শন শাস্ত্রসমূহের সাধারণ কথা,—যদিও এই অজ্ঞানের প্রকার সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

মুক্তি হয় আত্মার। এই আত্মা কি, ইহার স্বরূপ কি, প্রধানত তাহাই আলোচিত হইয়াছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এখানে বিবিধ যুক্তি দেখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়, বা দেহ, বা মন আত্মা হইতে পারে না। তৃতীয় অধ্যায়ে ন্যায়দর্শনের এবং আনুষঙ্গিক ভাবে পাতঞ্জল দর্শনাদির যুক্তি উল্লেখ করিয়া আত্মা যে নিত্য এবং তাহার পুনর্জ্জন্ম আছে তাহা অতি সরল ভাবে লিখিত হইয়াছে। লেখক এ সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনের প্রধান যুক্তিকে এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন:—"নবজাত শিশুর মুখে হাস্য দেখিলে তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহার হর্ষ জন্মিয়াছে, এবং তাহার রোদন শুনিলে তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহার শোক জন্মিয়াছে। কারণ তাহার হর্ষাদি ব্যতীত ঐরূপ হর্ষাদি জন্মিতে পারে না; কারণ ব্যতীত কখনও কার্য্য জন্মে না। সুতরাং কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণের যথার্থ অনুমান হইয়া থাকে। অতএব নবজাত শিশুর ঈষৎ হাস্য দ্বারা তাহার কারণ হর্ষ অনুমিত হয়। এবং তাহার রোদন দ্বারা তাহার কারণ শোকও অনুমিত হয়। তাহা হইলে তখন সেই নবজাত শিশুর যে, কোনো বিষয়ে অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে ইহাও অনুমিত হয়। কারণ, অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তিতে যে সুখ জন্মে তাহার নাম হর্ষ, এবং অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি বা বিয়োগে যে দুঃখবিশেষ জন্মে তাহার নাম শোক। সুতরাং কোন বিষয়ে একেবারেই অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে কখনই কাহারও হর্ষ বা শোক জন্মিতে পারে না। কোন বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া না বুঝিলেও কাহারও সে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। সুতরাং নবজাত শিশুও যে, কোন বিষয়কে তাহার ইষ্টজনক বলিয়া বুঝিয়াই তদ্বিষয়ে অভিলাষী হয় এবং সেই বিষয়ের প্রাপ্তিতে হৃষ্ট এবং অপ্রাপ্তিতে বা বিয়োগে দুঃখিত হয়, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু নবজাত শিশু ইহজন্মে সেই বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া কিরূপে বুঝিবে? ইহজন্মে সেই বিষয়কে পূর্ব্বে কখনও ইষ্টজনক বলিয়া অনুভব না করায় ইহজন্মে সে বিষয়ে তাহার ঐরূপ সংস্কারও তো জন্মে নাই। সুতরাং তাহার ঐরূপ স্মৃতিও জন্মিতে পারে না। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নবজাত শিশুর সেই আত্মা পূর্ব্বজন্মে তজ্জাতীয় বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া অনুভব করিয়াছে, এবং তজ্জন্যই তাহার ঐরূপ সংস্কার থাকায় ইহজন্মে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার ঐরূপ স্মৃতি উৎপন্ন করে। তাহার ফলে তাহার পূর্ব্বানুভূত তজ্জাতীয় বিষয়ে অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাহা হইলে নবজাত শিশুর সেই আত্মা যে, পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছে এবং সেই আত্মারই অভিনব শরীরাদি-সম্বন্ধরূপ পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য।" আবার নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্যপানের প্রবৃত্তি দেখিয়াও তাহার পুনর্জ্জন্ম বুঝিতে পারা যায়। কেহ কিছু ভাল বুঝিলেই তাহা করিতে ইচ্ছা করে, অন্যথা তাহা নিজের ইচ্ছায় করে না। নবজাত শিশু যখন প্রথম স্তন্য পান করে তখন বুঝিতে হইবে যে, সে তাহা ভাল বলিয়া মনে করে। কিন্তু কেমন করিয়া সে তাহা মনে করিতে পারে? পূর্ব্বে উহা জানা না থাকিলে হইতে পারে না। অতএব মানিতে হয়, শিশু পূর্ব্বের জন্মে স্তন্য পান করিয়া বুঝিয়াছিল তাহা ভাল, তাহার সে সংস্কার ছিল, বর্ত্তমান জন্মে সেই সংস্কার বশতই সে আবার স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হয়।

তর্কবাগীশ মহাশয় বহু গ্রন্থ হইতে ইহার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়ই যুক্তি দিয়া এই বিষয়টিকে সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন।

অতিপ্রামাণিক গ্রন্থকারগণের মধ্যে কেহ-কেহ বলিয়া গিয়াছেন যে, কণাদ ও গৌতমের বস্তুত অদ্বৈতবাদই অভিপ্রেত ছিল, তবে সাধারণ লোকে প্রথমত অদ্বৈত পথে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া তাঁহারা দ্বৈতমতে শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহারা সমস্ত শাস্ত্রের একটা সমন্বয় ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যেমন বাদরায়ণ সমগ্র উপনিষদের যাহা হয় একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন—যদিও বলা যায় না যে, সমস্ত উপনিষদে সমস্ত বিষয়ে একই কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্র-রচনার প্রয়োজনই হইত না। বহু গ্রন্থকার এরূপ সমন্বয় করিয়াছেন, করিতেছেন, এবং করিবেনও। এই সমস্ত সমন্বয়কে আমরা সেই-সেই সমন্বয়কারেরই মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু যাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রের সমন্বয় করা হয় তাঁহাদের বা তাঁহাদের কৃত শাস্ত্রের মত বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। সমন্বয় মানে সোজা কথায় কিছু ছাড়িয়া ও কিছু লইয়া আপোসে একটা কিছু রফা করিয়া লওয়া। ইহাতে সমস্ত পক্ষের সব কথাটা ঠিক-ঠিক ভাবে পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে যিনি সমন্বয় বা রফা করেন তাঁহার কথা। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। ঋষিদের মধ্যে কেহ বলিয়াছিলেন, আগে সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। এক জন বলিয়াছিলেন আগে অসৎই ছিল। অপর এক জন বলিলেন আগে সৎই ছিল। ইনি বিচার করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, কিরূপে আগে অসৎ থাকিতে পারে, অসৎ হইতে কি সৎ হয়? তাই স্বীকার করিতেই হইবে আগে সৎই ছিল। এ সবই ঋষিদের কথা। কোন্ ঋষি বড়, আর কোন্

ঋষি ছোট? কে প্রামাণিক, কে বা অপ্রামাণিক? একের কথা অগ্রাহ্য হইলে অন্যেরও তাহা কেন অগ্রাহ্য হইবে না? সবই অগ্রাহ্য হইলে কিছু দাঁড়ায় না। তাই চাই সমন্বয় অর্থাৎ রফা। ঋষিদের পরবর্ত্তীরা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, সতের তাৎপর্য্য এই, অসতের তাৎপর্য্য এই, সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না—ইহার তাৎপর্য্য এই। (যাহার নাম-রূপ স্পষ্ট হয় নাই তাহা অসৎ, যাহার হইয়াছে তাহা সৎ।) কথা হইতেছে মূল ঋষিদের মনে যে ঠিক এই কথাটিই ছিল তাহা কে বলিল? ইহা হইতেও পারে, না-ও হইতে পারে, নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। তথাপি মানুষে সমন্বয় করে, নানা কারণেই না করিয়া পারে না। কিন্তু সমন্বয়ের গতি হইল ইহাই। বলিয়াছি, কণাদ ও গৌতমকে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্তরূপে অদ্বৈত-বাদীর মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তর্কবাগীশ মহাশয় চতুর্থ অধ্যায়ে বৈশেষিক ও ন্যায়সূত্র হইতে উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ কথা ঠিক নহে, তাঁহারা উভয়েই ছিলেন দ্বৈতবাদী।

যেমন বেদান্ত বা মীমাংসা মতের মূল বেদ বা শ্রুতি কণাদ ও গৌতমের মতেরও কি সেইরূপ কোনো মূল আছে, অথবা ইহা তাঁদের "বুদ্ধিকল্পিত"? পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রশ্নেরই আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের পুরাণ-উপপুরাণে এ দর্শন, সে দর্শন এ মত, সে মত; এ তন্ত্র, ও তন্ত্র; ইত্যাদির নিন্দা-প্রশংসা, অথবা উহাদের সহিত শ্রুতির কোনো সম্বন্ধ বা বিরোধ আছে কি না, ইহার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের এই সমস্ত বিষয়ে কিরূপ ধারণা ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি। তাঁহাদের সকলেরই যে, এক মত ছিল না তাহাও বুঝা যায়। এইরূপে এই সমস্ত উক্তি আমাদের আলোচনায় সাহায্য প্রদান করে। কিন্তু অনেক সময়ে এই জাতীয় উক্তি যে, বিদ্বেষবশত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বিচার করিয়া এই সমস্তকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে হইবে। ঐ জাতীয় গ্রন্থে আছে বলিয়াই নির্ব্বিচারে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সমগ্রই শাস্ত্রমূলক বা বেদমূলক, অথবা সমগ্রই গৌতম-কণাদের "বুদ্ধিকল্পিত" এ প্রতিজ্ঞা করা চলে না। তর্কবাগীশ মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন, গৌতম ও কণাদ বহু স্থলে শাস্ত্র বা বেদের কথা বা প্রামাণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে কে বলিতে পারে যে, তাঁহারা শ্রুতি জানিতেন না, বা তাহা মানিতেন না, অথবা ঐ ঐ প্রসঙ্গে লিখিত তাঁহাদের উক্তিগুলি বুদ্ধিমাত্রকল্পিত? কিন্তু যাহা কিছু ঐ উভয় দর্শনে আছে তৎসমস্তই বেদমূলক ইহা কি আমরা বলিতে পারি? পরমাণুবাদ (নীচে দেখুন) বা সমবায় প্রভৃতি কি শ্রুতিমূলক? "সমস্ত আর্ষমতেরই মূল বেদ" ইহা ধরিয়া লইলে ও কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাও কি আমরা একবারে সুনিশ্চিত ভাবে ধরিয়া লইতে পারি? বেদবিরুদ্ধও আর্ষমত কি পাওয়া যায় না?

শ্রুতি বা বেদান্তের মতে ইচ্ছা-প্রভৃতি মনের ধর্ম্ম, আত্মার নহে, কেন না আত্মা অসঙ্গ; কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে ঐ সমস্ত আত্মারই ধর্ম্ম, অতএব কিরূপে এখানে বলা যাইতে পারে যে, এই ন্যায়-বৈশেষিক মত বেদমূলক? তর্কবাগীশ মহাশয় এই জাতীয় কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ন্যায়-বৈশেষিক মতের অনুকূলে শ্রুতিসমূহ উদ্ধৃত করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য এবং তাহারই উপযুক্ত। যদি প্রতিজ্ঞা করা হয় যে, ন্যায়-বৈশেষিক মত বেদমূলক তবে এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। শ্রুতির যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইবে না তাহা কে বলিল? সমস্ত আচার্য্যই তো এইরূপ করিয়া আসিয়াছেন। দুরাগ্রহ ত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, অনেক স্থলে তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায়-বৈশেষিকের অনুকূলে করা শ্রুতির ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত না হইয়া সুসঙ্গতই হইয়াছে। একই বিষয়ে উপনিষদে ভিন্ন-ভিন্ন মত প্রতিপাদক উক্তি রহিয়াছে, যেমন ভিন্ন-ভিন্ন ভাষ্যকার ভিন্ন-ভিন্ন শ্রুতিকে মুখ্য ও গৌণভাবে গ্রহণ করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ন্যায়-বৈশেষিকেরও অনুকূলে এইরূপ কোনো-কোনো মত শ্রুতিমূলক বলিয়া প্রতিপাদন করা শক্ত হয় না। পাঠকেরা এই অধ্যায়ে অনেক অদ্বৈত শ্রুতির ন্যায়-বৈশেষিক মতের অনুকূল ব্যাখ্যা দেখিতে পাইবেন।

ন্যায়-বৈশেষিকে একটি বিশেষত্ব তাহার আরম্ভবাদ বা পরমাণুবাদ। তর্কবাগীশ মহাশয় ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহা আলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছেন। কথা উঠিয়াছে ইহার মূল বেদে বা উপনিষদে পাওয়া যায় কি না। যেমন আজকাল কোনো আলোচনা উঠিলেই তাহার প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার জন্য বেদের দিকে অনুসন্ধানের ইচ্ছা হয়, তেমনি পূর্ব্বে কোনো বিষয়ের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বেদের সহিত যে-কোনো রূপে হউক একটা সম্বন্ধ দেখাইবার আগ্রহ ছিল। যাঁহারা বেদ মানিতেন তাঁহাদের নিকট বেদের এইরূপই একটি প্রভাব ছিল। যুক্তিবাদী হইলেও কেবল যুক্তি দিয়া ইঁহারা তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। জৈন-বৌদ্ধদের এ বন্ধন ছিল না। পরমাণুর কথা বলিতে গিয়া জৈন-বৌদ্ধরা বেদে তাহার মূল আছে কি না ইহা মনে করিবারও কোনো প্রয়োজন মনে করেন নাই, যুক্তি-তর্কের বলেই তাহা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কণাদ ও গৌতমেরও কথায় তাহার বৈদিকতার কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু উদয়নাচার্য্য তাহার বৈদিক মূল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্বে তা শ্ব ত র উ প নি ষ দে (৩.৩) নিম্নলিখিত মন্ত্রটি আছে:—

"বিশ্বতশ্চক্ষু রুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈ-
র্দ্যাবা ভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥"

এই মন্ত্রটি মূলত ঋ গ্বে দে র (১০.৮১.৩) এবং এক-আধটু পাঠভেদের সহিত অন্যান্য অনেক বেদে আছে, যথা বা জ স নে য়ি-স ং হি তা ১৭.১৯; অ থ র্ব্ব বে দ-স ং হি তা, ১৩.২.২৬; তৈ ত্তি রী য়-স ং হি তা, ৪.৬.২.৪; মৈ ত্রা য় ণী-স ং হি তা, ২.১০.২।

আলোচনার সুবিধার জন্য ঋগ্বেদ হইতে (১০.৮১.২) ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রটিও তুলিতেছি:—

"কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং
কতমৎ স্বিৎ কথাসীৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা
বি দ্যামৌর্ণোন্ মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥"

ইহার সোজা অর্থ এই যে, (যেমন কুম্ভকার প্রভৃতি কোনো পাত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে কোনো স্থানে থাকিয়া মাটি দিয়া তাহা নির্ম্মাণ করে সেইরূপ) বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মার কি অধিষ্ঠান ছিল, উপকরণই বা ছিল কি, এবং কিরূপেই বা তাহা ছিল, যাহা হইতে তিনি (নিজের) মহিমায় ভূলোক উৎপাদন করিয়া দ্যুলোককে প্রকাশ করিয়াছেন?

ইহারই পরে "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রটি বলা হইয়াছে। ইহার সরল অর্থ এইরূপ হইতে পারে—সেই এক দেব যাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র, মুখ সর্ব্বত্র, বাহু সর্ব্বত্র, এবং চরণও সর্ব্বত্র তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক নির্ম্মাণ করিতে গিয়া বাহু ও 'পতত্রের' দ্বারা নির্ম্মাণ করেন।

ঋ গ্বে দে র এক স্থানে (১০.৭২.২) আছে "ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্ম্মার ইবাধমৎ"—'ব্রহ্মণস্পতি কামারের মত এই সবকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।' এখানে 'উৎপাদন করিয়াছিলেন' ইহা "সম অধমৎ"

ইহার ভাবার্থ মাত্র। আসল অর্থ হইতেছে '(লৌহাদি) তাতাইয়া বা গলাইয়া মূর্ত্তি করিলেন।' আলোচ্য মন্ত্রেও আমাদিগকে এইরূপ বুঝিতে হইবে। বিশ্বকর্ম্মা বাহু ও 'পতত্র' দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে গড়িলেন।

এখন 'পতত্র' শব্দের অর্থ কি তাহাই বিচার্য্য। ঋগ্বেদে সায়ণ ও বাজসনেয়ি-সংহিতায় উবট বলেন উহার অর্থ 'পদ' বা 'পা'। কিন্তু তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে সায়ণ এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় মহীধর বলিয়াছেন উহার অর্থ অনিত্য পঞ্চভূত ("পতনশীলৈরনিত্যৈঃ পঞ্চভূতৈরুপাদানকারণৈঃ" – সায়ণ)। উদয়নাচার্য্য বলিতে চাহেন উহার অর্থ পরমাণু, পতনশীল অর্থাৎ গমনশীল বলিয়া তাহা 'পতত্র'। ইঁহার মতে এইখানেই পরমাণু-বাদের মূল বেদে পাওয়া গেল।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে আলোচ্য স্থলে 'পতত্র' শব্দের আসল অর্থটি বহুকাল হইতে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে, এবং তজ্জন্য বহু কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

বৈদিক ও লৌকিক উভয় সাহিত্যেই 'পতত্র' শব্দের অর্থ 'পক্ষ'। এই দুইটি পর্য্যায় শব্দ। যেমন 'পক্ষ' শব্দে আমরা অনেক স্থানে পার্শ্ব' বুঝি (যেমন, "স্তম্বেরমা উভয়পক্ষবিনীতনিদ্রাঃ"- রঘুবংশ, ৫.৭২), মনে হয়, আলোচ্য স্থলেও 'পতত্র' শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে। অথবা 'বাহুপাশ' অর্থও হইতে পারে। এখানে একটা কথা ভাবিবার আছে। এই অর্থ হইলে বহুবচন না দিয়া দ্বিবচনই দেওয়া উচিত ছিল। ইহা ভাবিবার বিষয়; তবে বৈদিক ভাষায় বচনের নিয়ম কখনো কখনো শিথিল দেখা যায়।

তর্কবাগীশ মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন "অবশ্য উদয়নাচার্য্যের উক্তরূপ ব্যাখ্যা অন্য সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই ও কখনও করিবেন না, ইহা স্বীকার্য্য।"

যাহাই হউক, ইহার পরে পরমাণুবাদের অনুকূলে ও প্রতিকূলে নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া পরিশেষে তাহা স্থাপন করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করিতে পারা যায়। দুইটি পরমাণুর পরস্পর সংযোগ না হইলে কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না। কিন্তু তাহার কোনো অংশ বা অবয়ব না থাকায় সেই সংযোগ হইতে পারে না। পরমাণুবাদের ইহা একটা দোষ, এবং ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ইহাকে এইরূপে পরিহার করিতে চাহেন (পৃ. ১০৯):— "সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ দেখিয়া সংযোগ মাত্রই তাহার আশ্রয়দ্রব্যের অংশ-বিশেষেই জন্মে, সুতরাং নিরংশ দ্রব্যের সংযোগ জন্মিতেই পারে না, ইহা অনুমান করিতে পারা যায় না। "কারণ নিরংশ পরমাণু অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তাহার সংযোগও ঐ প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে।" কিরূপে? যেমন সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ দেখা যায় সেইরূপ ঐ সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব-সমূহেরও সংযোগ দেখা যায়, এবং ইহাও দেখা যায় যে, অবয়ব-সমূহের বিভাগ হইলে পূর্ব্বোৎপন্ন সংযোগেরও ধ্বংস হয়। ঠিক এই দৃষ্টান্তেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, "সেই সমস্ত দ্রব্যের যে চরম অবয়ব বা চরম সূক্ষ্ম অংশ, তাহাও অপর চরম অবয়বের সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই অতি সূক্ষ্ম অবয়বদ্বয়ের বিভাগ হইলেই সেই সংযোগের ধ্বংস হয়। অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নিরবয়ব দ্রব্যদ্বয়েরও সংযোগ জন্মে।" (পৃ. ১১০)। পরমাণু সিদ্ধ হইলে এইরূপ বলিতে পারা যাইত, কিন্তু নিরবয়ব দ্রব্যের সংযোগ যুক্তিতে আসে না, এবং সেই জন্যই পরমাণুরই সিদ্ধি হয় না। নিরবয়ব আকাশের সহিত নিরবয়ব আত্মার বা নিরবয়ব আত্মার সহিত নিরবয়ব মনের সংযোগ কণাদ ও গৌতম মানিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই যুক্তি নৈয়ায়িক-বৈশেষিকের নিকট উপাদেয় হইলেও অন্যবাদীরা ইহা মানিতে বাধ্য নহেন। "নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইলে অপর পরমাণুর সহিত উহার সংযোগও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে," ইহা ঠিক. কিন্তু অ-পরমাণুবাদী নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

তর্কবাগীশ মহাশয় এ বিষয়ে আরও বহু আলোচনা করিয়া এই অধ্যায়ে ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত অসৎকার্য্যবাদ, ও ঈশ্বর যে জগতের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন তাহাই যুক্তিপ্রদর্শনে দেখাইয়াছেন।

কণাদ নিজের ছয় পদার্থের মধ্যে, এবং গৌতম নিজের ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ না করিলেও 'আত্মা' শব্দেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর এই উভয়কেই বুঝান গিয়াছে। বেদান্তাদির সহিত তুলনা করিয়া ন্যায়-বৈশেষিক-মতে এই ঈশ্বরের কথা সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে ন্যায়-দর্শনের প্রমাণ পদার্থ ও নবম অধ্যায়ে ঐ প্রমাণের পরীক্ষা, ও দশম অধ্যায়ে ন্যায়দর্শনের মতে বেদের প্রামাণ্যপরীক্ষা ও তাহার স্থাপন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত এখানে বৈশেষিক ও অন্যান্য দর্শনেরও কথা আলোচিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনে আত্মা, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ এই বারটি পদার্থকে প্রমেয় বলা হয়। একাদশ অধ্যায়ে পদার্থগুলি কি তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে ন্যায়দর্শনের ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয়ের আলোচনা করিয়া অবশিষ্ট সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, ও নিগ্রহস্থান এই চতুর্দ্দশ পদার্থের ক্রমশ সংক্ষিপ্ত আলোচনা অন্তিম দ্বাদশ অধ্যায়ে সহজ ভাষায় করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি যিনি পড়িবেন তাহাকেই বলিতে হইবে দার্শনিক সাহিত্যের ইহা একখানি অমূল্য সম্পদ। আমারা এজন্য তর্কবাগীশ মহাশয় ও জাতীয় শিক্ষাপরিষদ উভয়েরই নিকট কৃতজ্ঞ।

দিনেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অকস্মাৎ কাল দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ আশ্রমে এসে পৌঁছল। শোকের ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে আনুষ্ঠানিকভাবে যে শোকপ্রকাশ করা হয় তার প্রথাগত অঙ্গ যেন একে না মনে করি। বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রীরা সকলে দিনেন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে জানত না— কর্ম্মের যোগে সম্বন্ধও তাঁর সঙ্গে ইদানীং এখানকার অল্প লোকের সঙ্গেই ছিল। অধ্যাপকেরা সকলেই এক সময়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও তাঁর সঙ্গে স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ তাঁদের ঘনিষ্ঠ হ'তে পেরেছিল।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে শোকের কোনো প্রতিকার নেই তাকে নিয়ে সকলে মিলে আন্দোলন ক'রে কোনো লাভ নেই এবং আত্মীয়বন্ধুদের যে-শোক, অন্য সকলের মনে তার সত্যতাও প্রবল নয়। এই মৃত্যুকে উপলক্ষ্য ক'রে মৃত্যুর স্বরূপকে চিন্তা করবার কথা মনে রক্ষা করা চাই। সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত ক'রে এমন কোনো কোণ নেই যেখানে প্রাণের সঙ্গে মৃত্যুর সম্বন্ধ লীলায়িত হচ্ছে না; এই যে অনিবার্য্য সঙ্গ, এ যে শুধু অনিবার্য্য তা নয়, এ না হ'লে মঙ্গল হ'ত না। দুঃখকে মানতেই হবে, শোক দুঃখ মিলন বিচ্ছেদ উন্মীলন নিমীলনেই সমাজ গ্রথিত—এই আঘাত অভিঘাতের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির প্রক্রিয়া চল্‌ছে। এর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব যে কঠোরতা আছে সেইটি না থাকলেই যথার্থ দুঃখের কারণ হ'ত। সমস্ত জগৎ জুড়ে মানুষের মধ্যে অপরিসীম দুঃখ, আমরা তার সৃষ্টির দিকটা মহত্ত্বের দিকটাই দেখব, তার মধ্যে যে অপরাজিত সত্য সে তো অবসন্ন হন না—অথচ মানুষের দুঃখের কি অন্ত আছে? মৃত্যুকে যদি বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখি তা হ'লেই আমরা অসহিষ্ণু হয়ে নালিশ করি এর মধ্যে মঙ্গল কোথায়? এই দুঃখের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে, নইলে দুর্ব্বলতায় সৃষ্টি অভিভূত হ'ত— দুঃখ আছে ব'লেই মনুষ্যত্বের সম্মান। দুঃখের আঘাত বেদনা মানুষের জীবনে নানান কান্নায় প্রকাশ; ইতিহাসের মধ্যে যদি দেখি তা হ'লে দেখব অপরিসীম দুঃখকে আত্মসাৎ ক'রে মানুষ আপন সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সে সব এখন কাহিনীতে পরিণত। ইতিহাসে কত দুঃখ প্লাবন ঘটেছে, কত হত্যাব্যাপার কত নিষ্ঠুরতা—সে সব বিলুপ্ত হয়েছে, রেখে গেছে দুঃখবিজয়ী মহিমা, মৃত্যুবিজয়ী প্রাণ—মৃত্যুর সম্মুখ দিয়ে প্রাণের ধারা চলেছে—এ না হ'লে মানুষের অপমান হ'ত। মৃত্যুর স্বরূপ আমরা জানি নে ব'লে কল্পনায় নানা বিভীষিকার সৃষ্টি করি। প্রাণলোককে মৃত্যু আঘাত করেছে কিন্তু বিধ্বস্ত করতে পারে নি—প্রাণের প্রকাশে অন্তরালে মৃত্যুর ক্রিয়া, প্রাণকে সে-ই প্রকাশিত করে। সম্মুখে প্রাণের লীলা, মৃত্যু আছে নেপথ্যে।

অনেকে ভয় দেখায় মৃত্যু আছে, তাই প্রাণ মায়া। আমরা বলি, প্রাণই সত্য, মৃত্যুই মায়া; মৃত্যু আছে

তৎসত্ত্বেও তো যুগে যুগে কোটি কোটি বর্ষ ধ'রে প্রাণ আপনাকে প্রকাশিত ক'রে আসছে। মৃত্যুই মায়া। এই কথা মনে ক'রে দুঃখকে যেন সহজে গ্রহণ করি; দুঃখ আছে, বিচ্ছেদ ঘটল, কিন্তু এর গভীরে সত্য আছে এ কথা যেন স্বীকার ক'রে নিতে পারি।

আশ্রমের তরফ থেকে দিনেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যা বলবার আছে তাই বলি। নিজের ব্যক্তিগত আত্মীয়বিচ্ছেদের কথা আপনার অন্তরে থাক্—সকলে মিলে তা আলোচনা করার মধ্যে অবাস্তবতা আছে, তাতে সঙ্কোচ বোধ করি। আমাদের আশ্রমের যে একটি গভীর ভিত্তি আছে, তা সকলে দেখতে পান না। এখানে যদি কেবল পড়াশুনোর ব্যাপার হ'ত তাহ'লে সংক্ষেপ হ'ত, তা হ'লে এর মধ্যে কোনো গভীর তত্ত্ব প্রকাশ পেত না। এটা যে আশ্রম, এটা যে সৃষ্টি, খাঁচা নয়, ক্ষণিক প্রয়োজন উত্তীর্ণ হ'লেই এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হবে না সেই চেষ্টাই করেছি। এখানকার কর্ম্মের মধ্যে যে-একটি আনন্দের ভিত্তি আছে, ঋতু-পর্য্যায়ের নানা বর্ণ গন্ধ গীতে প্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টায় আনন্দের সেই আয়োজনে দিনেন্দ্র আমার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম তখন চারিদিকে ছিল নীরস মরুভূমি—আমার পিতৃদেব কিছু শালগাছ রোপণ করেছিলেন, এ ছাড়া তখন চারিদিকে এমন শ্যাম শোভার বিকাশ ছিল না। এই আশ্রমকে আনন্দনিকেতন করবার জন্য তরুলতার শ্যাম শোভা যেমন, তেমনি প্রয়োজন ছিল সঙ্গীতের উৎসবের। সেই আনন্দ উপচার সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্র। এই আনন্দের ভাব যে ব্যাপ্ত হয়েছে, আশ্রমের মধ্যে সজীবভাবে প্রবেশ করেছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে এর মূলেতে ছিলেন দিনেন্দ্র—আমি যে সময়ে এখানে এসেছিলাম তখন আমি ছিলাম ক্লান্ত, আমার বয়স তখন অধিক হয়েছে—প্রথমে যা পেরেছি শেষে তা-ও পারি নি। আমার কবি-প্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্দ্র। অনেকে এখান থেকে গেছেন সেবাও করেছেন কিন্তু তার রূপ নেই ব'লে ক্রমশ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের রূপ এ তো যাবার নয়—যত দিন ছাত্রদের সঙ্গীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন চলবে, তত দিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হ'তে পারবে না, তত দিন তিনি আশ্রমকে অধিগত ক'রে থাকবেন—আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভুলবার নয়। এখানকার সমস্ত উৎসবের ভার দিনেন্দ্র নিয়েছিলেন, অক্লান্ত ছিল তাঁর উৎসাহ। তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রে কেউ নিরাশ হয় নি—গান শিখতে অক্ষম হ'লেও তিনি ঔদার্য্য দেখিয়েছেন—এই ঔদার্য্য না থাকলে এখানকার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হ'ত না। সেই সৃষ্টির মধ্যেই তিনি উপস্থিত থাকবেন। প্রতিদিন বৈতালিকে যে রসমাধুর্য্য আশ্রমবাসীর চিত্তকে পুণ্য ধারায় অভিষিক্ত করে সেই উৎসকে উৎসারিত করতে তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। এই কথা স্মরণ ক'রে তাঁকে সেই অর্ঘ্য দান করি যে-অর্ঘ্য তাঁর প্রাপ্য।

[শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩২, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ]

বিক্রমপুর ইছাপুরা গ্রামের কয়েকটি শ্রীমূর্ত্তির পরিচয়

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ইছাপুরা উত্তর-বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বাস। গ্রামটি কত দিনের প্রাচীন তাহা বলা কঠিন। এই গ্রামের চারি দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এক সময়ে এই গ্রাম বেশ সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু কালক্রমে নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া বাঘ-ভালুকের আবাসভূমি হইয়া উঠে। গ্রামের

গোপাল-মূর্ত্তি—ইছাপুরা

বৃদ্ধগণ এখনও একটি স্থানকে 'বাঘাতলী' বলে। কালীপাড়া, বজ্রেশ্বর, শাহবাজনগর প্রভৃতি বিক্রমপুরের প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রামগুলি একে একে পদ্মাগর্ভে বিলীন হইলে পর, সেখানকার অধিবাসীরা এখানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাহার আগে, এখানে পুরাতন ভট্টাচার্য্য, বণিক্‌ ও কয়েক ঘর মুসলমানের বাস ছিল।

ইছাপুরা গ্রামের মধ্যভাগে 'লোহারপুকুর' নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুকুর হইতে অনেক শ্রীমূর্ত্তি ও প্রাচীন প্রত্ন-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও পাওয়া যাইতেছে।

এই পুকুরের উত্তর পাড়ে শুক্লাম্বর গোস্বামীর ভদ্রাসন অবস্থিত ছিল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয় ইছাপুরা গ্রামেই বাস্তুভিটা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। এখন ইঁহার বংশধরেরা নিকটবর্ত্তী শিয়ালদি গ্রামে বাস করিতেছেন।

লোহারপুকুর হইতে নিখুঁত যে দুইটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল তাহার একটি ইছাপুরা গোস্বামী-বাড়িতে সযত্নে পূজিত হইতেছে; অপর যে সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত মাধব-মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছিল, বর্ত্তমানে উহা শিয়ালদি গোস্বামী-বাড়িতে স্থাপিত আছে, উহা চন্দ্রমাধব নামে প্রসিদ্ধ। গ্রামের লোকেরা বলেন যে তাঁহারা শুনিয়া আসিতেছেন যে এই মূর্ত্তি দুইটি পুকুরের জলে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে, উক্ত শুক্লাম্বর গোস্বামীর প্রতি চন্দ্রমাধবের স্বপ্নাদেশ হয় যে, তিনি উক্ত পুষ্করিণী হইতে উত্থিত হইবেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রকৃতই নাকি চন্দ্রমাধবের গুরুভার প্রস্তর মূর্ত্তি উক্ত পুষ্করিণীতে ভাসমান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

শুক্লাম্বর গোস্বামী মহাশয় মহাসমারোহে চন্দ্রমাধব দেবের বিগ্রহ আপনার বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত করেন ও যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করেন। গোস্বামী মহাশয়ের কোন কৃতী শিষ্য তাঁহাকে শিয়ালদি গ্রামে বিস্তর নিষ্কর ভূমি দান করেন, তখন তিনি শিয়ালদি গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও শিয়ালদি গ্রামেই বাস করিতেছেন।

বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে অনেক দেব-দেবীর মূর্ত্তি

...ওয়া যায়। ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তির সংখ্যাই বেশী। ...ধিকাংশ মূর্ত্তিরই কোন-না-কোন অংশ ভগ্ন।

সৌভাগ্যের বিষয়, শ্রীচন্দ্রমাধব দেবের মূর্ত্তিটি তদ্রূপ নহে। ...ন সুঠান সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।
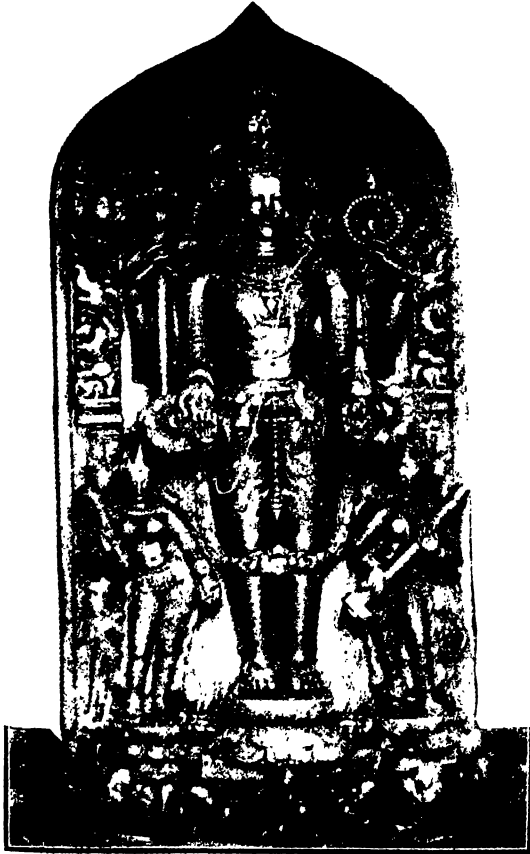
চন্দ্রমাধব-মূর্ত্তি—শিয়ালদি

...যে নিপুণ শিল্পী এমন করিয়া পাথর খুদিয়া এইরূপ অনিন্দ্য ...সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি গঠন করিয়াছে তাহার পরিচয় আমাদের ...নিকট চিরদিনই অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে।

শ্রীচন্দ্রমাধব-দেবের মুখমণ্ডল প্রশান্ত, ভাবব্যঞ্জক, নয়ন-...যুগল আয়তোজ্জল, ভ্রূযুগল সুবঙ্কিম, নাসিকা উন্নত সূক্ষ্ম, ও ...ললাট প্রশস্ত। বিকশিত শতদলের উপর মাধব দণ্ডায়মান। ...চালচিত্রেও অনেক মূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিটি উচ্চতায় ...সাড়ে তিন হাত এবং প্রস্থে দুই হস্ত পরিমিত। মাধবের দক্ষিণ পার্শ্বে ধনসম্পদদায়িনী কমলা, আর বাম পার্শ্বে বীণাহস্তে বিদ্যাদায়িনী বীণাপাণি।

বালক কৃষ্ণ ও যশোদা—ইছাপুরা

ঊর্দ্ধে কীর্ত্তিমুখ। তাহার নিম্নে দুই দিকে অপ্সর-যুগল। দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধ হস্তে গদা, তাহার নিম্ন হস্তে পদ্ম, বামার্দ্ধে চক্র, আর নিম্নে শঙ্খ ধৃত। পদনিম্নে বাহন গরুড়, পার্শ্বে উপাসকমণ্ডলী। হস্তে অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠে আভরণ, কর্ণের দুই দিকে কুণ্ডল। গলদেশে বলিরেখা, দৃষ্টি আনত, সুন্দর শান্তিপূর্ণ ও ধ্যানস্তিমিত। মস্তকে নানা কারুকার্য্যখচিত মুকুট। এই শ্রীমূর্ত্তিটিকে বাসুদেব, ত্রিবিক্রম বা উপেন্দ্র নামে অভিহিত করা যায়। ইহা পুরাণোক্ত বিধি। 'কালিকা-পুরাণ', 'অগ্নিপুরাণ', 'পদ্মপুরাণ' এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রেও এই মূর্ত্তির ধ্যান আছে। ধ্যানটি সাধারণ এবং সকলেই জানেন বলিয়া উল্লেখ করিলাম না। এই মূর্ত্তিটির নাম চন্দ্রমাধব কেন হইল বুঝিলাম না। বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি প্রকার মূর্ত্তির মধ্যে মাধব নাম আছে বটে, তাই মনে হয়, মাধব নামের সহিত চন্দ্র যোগ করিয়া ভক্ত গোস্বামী মহাশয় মূর্ত্তিটির বিশেষত্ব প্রকাশের জন্যই এই নামকরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচন্দ্রমাধবের কথা বলিলাম। এইবার ইছাপুরা গোস্বামী-বাড়িতে আর যে দুইটি মূর্ত্তি আছে, তাহার কথা বলিব। একটি মূর্ত্তি বালগোপালের। নিকষ কালো কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। এইরূপ মূর্ত্তি অসাধারণ নহে। বাংলা দেশের নানা স্থানেই এইরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে বংশীধারী শ্রীগোপাল মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। মূর্ত্তিটির বয়স দেড় শত হইতে দুই শত বৎসরের মধ্যে, এইরূপ অনুমান করা যায়।

লোহারপুকুর- ইছাপুরা

অপর মূর্ত্তিটির সম্বন্ধে নিঃসন্দেহরূপে কোন কথা বলা কঠিন। এই মূর্ত্তিটির ন্যায় আরও অনেকগুলি মূর্ত্তি একটি প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের সহিত সংলগ্ন ছিল। ইছাপুরা গ্রামনিবাসী শ্রীমান্ পবিত্রকুমার গোস্বামী আমাকে বলিয়াছেন যে, মন্দিরটি ভাঙিয়া ফেলিবার সময় অনেক মূর্ত্তি নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সেই মন্দিরটির গায়ে আরও অনেক পৌরাণিক চিত্র খোদিত ছিল। এইবার মূর্ত্তিটির দিকে লক্ষ্য করুন।

আমরা দেখিতেছি—একজন মহিলা একটি শিশুকে শাসন করিতেছেন। কে এই শিশু? সম্ভবতঃ মা-যশোদা বালক শ্রীকৃষ্ণকে তাহার দুষ্টামির জন্য শাসন করিতে ব্যাকুল হইয়া কাপড় দিয়া বাঁধিতে চলিয়াছেন। তিনি এক হাতে বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়াছেন, অপর হাত দিয়া শিশুর হাতটি চাপিয়া ধরিয়াছেন। মা-যশোদার অলঙ্কার, সাজসজ্জা, কাপড় পরিবার ভঙ্গী সকলই একাদশ শতাব্দীর অন্যান্য শ্রীমূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্যব্যঞ্জক। শিশুর মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, ডান হাতে খেলার গদা। মা-যশোদার কর্ণভূষণ, কেশবিন্যাস এবং মাথার অলঙ্কারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আর লক্ষ্য করুন তাহার কাপড়খানার প্রতি। কাপড় পরিবার রীতি, বাঙালী মেয়েদেরই মত। গলার হার, হাতের বাজু ও চুড়ি, কটিদেশের ভূষণ—এ যুগেও অচল নয়। এই মূর্ত্তির চক্ষু, নাসিকা, গণ্ডদেশ, চিবুক প্রভৃতি তক্ষণ-শিল্পের অনুপম নিদর্শন। মুখের ভিতর লাবণ্যশ্রী ঢল ঢল করিতেছে, মাতৃস্নেহের অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রমাধব মূর্ত্তি ও বালগোপাল মূর্ত্তিটি পুকুরের জলে ভাসিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া গ্রামবাসীরা বলেন এবং একটা কিছু অলৌকিকত্বের আরোপ করিতে যাইতেছেন। আমি তাহার বিরোধী। পুরাতন কাগজপত্র ও দলিল ইত্যাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে, একবার বিক্রমপুরে কাজীর হাঙ্গামা নামে একটি হাঙ্গামা হয়। সে-সময়ে অনেকেই নিজ নিজ বাড়ির বিগ্রহ পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতি জলাশয়ে কিংবা গ্রামান্তরে লইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন, হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে পর পুনরায় মূর্ত্তি তুলিয়া আনিয়া পূজা করেন। এই সমুদয় মূর্ত্তির অধিকার লইয়া সময় সময় গোলযোগ হইত। এইরূপ একটি গোলযোগের প্রমাণ-স্বরূপ আমি মৎপ্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাসে" দুই জন সাক্ষীর লিখিত সাক্ষ্যের প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে তাহার একটির প্রতিলিপি পুনরায় প্রকাশ করিলাম, তাহা পড়িলেই আমার অনুমানের যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে।

"এহি মত দেখীছি কল্কিকান্ত ঠাকুর ও জয়দেব ঠাকুর ও মণি ঠাকুর এই তিন জন তিন হিসা করিয়া ঈশ্বর সেবা করিছেন * * * বাসইল গ্রামে সেবাতে অর্ণত্র থাকিয়া

আশীত তাহা সমান তিন অংশ করিয়া লইতেন দষ দিন করিয়া এক একজন পূজা করিছেন পরে কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর বাসইল গ্রতে ঠাকুর লইয়া **ইছাপুরা গ্রামে গেলেন** তৎপর **কাজীর হাঙ্গামাতে ঠাকুর পুষ্কর্ণিতে জলে থুইলেন পুর্ণরায় তুলিয়া ঠাকুর সেবা করিলেন** ইহা সেওয়ায় আর কিছু না জানি ইতি সন ১১৫৫ তেরিখ ৩০ জ্যৈষ্ঠ। শ্রীগঙ্গানারায়ণ সাং বাসইল। বএস অষ্টআশী বৎসর ইতি চন্দ্রমাধব ঠাকুর হকি কত।"

কাজীর হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে শ্রীমূর্ত্তি কয়টি পুকুর হইতে তুলিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার দরুনই এইরূপ জনরব প্রচারিত হইয়াছিল।

এখানে লোহারপুকুর সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। এই পুকুরটি অতিশয় প্রাচীন। গ্রামবাসীরা এখনও ইহার মধ্য হইতে অনেক মূর্ত্তির অংশবিশেষ পাইয়া আসিতেছেন। আমার মনে হয়, যদি এই পুষ্করিণীটি খনন করা যায় তাহা হইলে বিক্রমপুরের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। এ বিষয়ে ইছাপুরা ইউনিয়ান বোর্ড সহজেই হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। তাহা হইলে গ্রামবাসীদের যেমন জলের অভাব দূর হয় তেমনই বিক্রমপুরের ঐতিহ্য তত্ত্বের দিক্ দিয়াও একটি মহৎ কল্যাণ সাধিত হয়। আশা করি তাঁহারা এ বিষয়ে শীঘ্রই উদ্যোগী হইবেন।*

* এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি ইছাপুরা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বি. এম. পাল ফটোগ্রাফার তুলিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন।

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

(৯)

মমতাকে দেখিয়া গোপেশ বাবুর অত্যন্ত বেশী রকম পছন্দ হইয়া গেল তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার সুন্দরী পুত্রবধূর যে কিছু দরকার ছিল, তাহা নয়। রূপের চেয়ে রূপা যে ঢের বেশী স্থায়ী জিনিষ তাহা এতকাল এই পৃথিবীতে বাস করিয়া তিনি অতি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী। তবে সব টাকাটাই নগদ পণরূপে পতিদেবতার হস্তগত না হইয়া, খানিকটা অন্ততঃ বরাভরণ, আসবাব, দানসামগ্রী হিসাবে তাঁহার ঘরে উঠিলে তিনি খুশী হন। মমতাকে গহনা দিতে যে মা বাবা কার্পণ্য করিবেন না, তাহা স্বামী-স্ত্রী দুই জনেই ধরিয়া লইয়াছিলেন। মমতা একমাত্র সন্তান না হোক, একমাত্র কন্যা ত বটে? তাহাকে কি আর গা সাজাইয়া গহনা না দিয়া মায়ের মন উঠিবে? তবে নগদ দশ হাজার দিতেছে বলিয়া বরকে জিনিষপত্র বেশী দিতে যদি না চায়?

তবু মমতার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া অতখানি খুশী হওয়ারও একটা কারণ ছিল। দেবেশের মেজাজখানি বেশ সাহেবী ধরণের। এখন পর্য্যন্ত বাপ-মায়ের কথা সে খানিক খানিক শুনিয়া চলে বটে, কিন্তু বাপ-মাও এখন পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ অমত যাহাতে, এমন কিছু তাহাকে দিয়া করাইবার চেষ্টা করেন নাই। বিলাত যাইবার সখ তাহার অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু বাপের এমন সংস্থান নাই যে তাহাকে পাঠাইতে পারেন। তাঁহার ছেলে মাত্র ঐ একটি, কিন্তু মেয়ে আছে গুটি-পাঁচেক। তিনটির তাঁহার মধ্যে বিবাহ হইয়াছে, বিবাহ দিতে অবশ্য দেশের জমিজমা বাড়িঘর সবই মহাজনের কাছে বাঁধা পড়িয়াছে। কলিকাতার বাড়িটিও এবার হয় বাঁধা দিতে না-হয় বিক্রী করিতে হইবে, কারণ চতুর্থ কন্যাটিও প্রায় অরক্ষণীয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে ছেলেকে বিলাত পাঠাইবার খরচ কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? অতি শুভক্ষণে এই বিবাহের প্রস্তাবটি আসিয়াছে। নামে মাত্র সুদে যদি সুরেশ্বর গোপেশ বাবুকে দশ হাজার টাকা ধার

দেন, তাহা হইলে আপাততঃ সব সমস্তারই সমাধান হইয়া যায়। বাড়ি তিনি বাঁধা রাখিতে চান, তাহাতে ক্ষতি নাই। বিবাহ দেবেশ করিবে বলিয়াই মনে হয়। এখন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয় বে-দখল হয় নাই বলিয়াই তাহার পিতা-মাতার বিশ্বাস। সুতরাং মমতার মত সুন্দরী একটি তরুণীকে ভাবী পত্নীরূপে কয়েক দিন ধ্যান করিতে পাইলে, সহজে আর ঐ মানুষটিকে সে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিবে না। কয়েক দিন মেলামেশা করার সুবিধাও সে পাইবে। নিতান্ত বিলাতের মায়াবিনীদের মায়ার ফাঁদে পড়িয়া, সব-কিছু যদি ভুলিয়া না যায়, তাহা হইলে গোপেশ বাবু এবং তস্য গৃহিণীর ঐ দশ হাজার আর ফেরৎ দিতে হইবে না। কোনো দিক দিয়াই এতকাল এই দম্পতীটি আধুনিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু পৃথিবীতে অর্থের দরুন যত মতের পরিবর্ত্তন হয়, এতটা আর কিছুতেই হয় না। যে-গোপেশ-গৃহিণী বিবাহের আগে বর ও কন্যার চাক্ষুষ পরিচয় হওয়াকেও মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন, তিনিও ভাবিতে এখন আরম্ভ করিয়াছেন যে সুরেশ্বর এবং যামিনীকে বলিয়া-কহিয়া যদি খানিকটা হাল্‌কা রকম কোর্টশিপের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে বিবাহটা নিশ্চিতভাবে ঘটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়িয়া যায়। মমতা এবং দেবেশ যদি একটু চিঠি-লেখালেখিও করে, তাহাতেই বা কি এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়?

সুরেশ্বরের অবশ্য কোনো কিছুতেই আপত্তি ছিল না, মেয়ের বিবাহ হইলেই হয়। ডাক্তারে আজকাল তাঁহাকে নানা প্রকার ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন হইতেও পারে যে তিনি আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। তখন যামিনীর হাতে পড়িয়া মমতার কি গতি হইবে কে জানে? যা না তাঁহার অপূর্ব্ব মতামত! তাঁহার মত ধনী স্বামী পাইয়াও যামিনী যে সুখী হন নাই, সেটা সুরেশ্বর স্ত্রীর অতিবড় অপরাধ বলিয়াই ধরিতেন। মেয়ের বিবাহের ভার যদি যামিনীর হাতে পড়ে, তাহা হইলে কোন এক কপর্দ্দকহীন কেরানীর ঘরেই মমতাকে তিনি পাঠাইয়া দিবেন। মেয়েরও বুদ্ধিশুদ্ধি মায়েরই মত, সেও যে বিশেষ আপত্তি করিবে তাহা মনে হয় না। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে সুরেশ্বর আদরিণী কন্যার একটা সুব্যবস্থা করিয়া যাইতে চান। সুজিতও নেহাৎ ছোট, তাহার উপর কিছু ভরসা করা চলে না। আর তাহার সহিত মা বা বোনের এখনই যখন বনিবনাও নাই, ভবিষ্যতে ত আরও থাকিবে না।

বিকালে জলযোগটা একটু গুরুতর রকমই হইয়াছিল, সুতরাং রাত্রের খাওয়াটা অতি সংক্ষিপ্ত করা দরকার। এই উপলক্ষ্য ধরিয়া সুরেশ্বর আবার আজ যামিনীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যামিনী তখন মমতার ছাড়া গহনাগুলি গুছাইয়া লোহার সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিতেছিলেন। জিনিষগুলি অতি মূল্যবান, বেশীক্ষণ বাহিরে ফেলিয়া রাখিতে ভরসা হয় না।

সুরেশ্বরকে দেখিয়া যামিনী একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কোনো কথা না বলিয়া যেমন কাজ করিতেছিলেন, তেমনই করিতে লাগিলেন।

সুরেশ্বর খাটের উপর বসিয়া বলিলেন, "খুকিকে দেখে বুড়ো যা খুশী, একেবারে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে আর কি? সত্যি আজ ওকে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল।"

যামিনী অল্প একটু হাসিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না।

স্ত্রীর উৎসাহের অভাব দেখিয়া সুরেশ্বরের মেজাজ অল্পে অল্পে চড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এত শীঘ্রই চেঁচামেচি আরম্ভ করিলে আসল কাজে বাধা পড়িয়া যাইবে। অতএব যথাসাধ্য নিজেকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "তার পর দেবেশকে কবে ডাকছ?"

যামিনী উদাসীনভাবে বলিলেন, "আমার আর ডাকাডাকি কি? তোমার যেদিন সুবিধা তুমি ডেকো।"

সুরেশ্বর একটু বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "কেন তুমি ডাকলে কি ক্ষতিটা? এ-সব কাজ বাড়ির গিন্নিরা করলেই শোভন হয়।"

যামিনী একটু কঠোরভাবে বলিলেন, "বাড়ির গিন্নির পছন্দ-মত ত সব ব্যবস্থাটা হচ্ছে না, তখন তাকে আর মাঝপথে টেনে আনা কেন? যা করতে চাও তা নিজেরাই কর।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "হুঃ, ঐ রাগেই গেলে। কেন আমার কি মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবলে কোনো দোষ আছে? না আমার ভাল-মন্দ জ্ঞান তোমার চেয়ে কম?"

যামিনী বলিলেন, "জ্ঞান বেশী কি কম, সে আলোচনা ক'রে লাভ কি? তোমার আর আমার মতামত ত এক রকম নয়?"

সুরেশ্বর না রাগিতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যথেষ্টই রাগিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সুর চড়াইয়া বলিলেন, "তা হোক আলাদা রকম। আমার মতেই না-হয় এবার কাজ হোক, বাংলা দেশে চিরকাল তাই-ই ত হয়ে আসছে।"

যামিনী বলিলেন, "দেখ তোমার শরীর ভাল নেই, আমারও নেই। বাজে কথা নিয়ে রাগারাগি ক'রে কি হবে? দরকারী কথা কিছু থাকে ত বল, না-হয় যে যার চুপ ক'রে থাক। তোমার মতে তুমি যা খুশী কর, তাতে বাধা দেবার ক্ষমতাও আমার নেই, প্রবৃত্তিও নেই, এ ত তুমি ভাল ক'রেই জান?"

কাছে আসিলেই যামিনী যে তাঁহাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিদায় করিয়া দিতে চান, ইহাতে সুরেশ্বর মনে মনে অত্যন্ত অপমান বোধ করেন। রাগও হয় তাঁহার অত্যধিক। কিন্তু এ অবস্থার কি প্রতিকার তাহা তিনি ভাবিয়া পান না। পরস্পরের প্রতি যে-অনুরাগ থাকিলে এক দিনের অদর্শনই মানুষের কাছে ভীষণ হইয়া ওঠে, তাহা এই দুইটি মানুষের মধ্যে একেবারেই নাই। অথচ স্ত্রীকে জীবন হইতে একেবারে বাদ দিলে সুরেশ্বরের এখনও চলে না, নানাদিকে এখনও যামিনীর উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়। যামিনীর রকম দেখিয়া কিন্তু তাঁহার মনে হয়, সুরেশ্বরকে বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন তাঁহার কোনও দিক দিয়া নাই। এ অবস্থাটা স্বামীমাত্রেরই অত্যন্ত অসহ্য, সুরেশ্বরের ত বিশেষ করিয়া, কারণ, নিজের সম্বন্ধে ধারণা তাঁহার অতি উচ্চ। স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া বিশেষ দরকার বলিয়া তাঁহার ধারণা, কিন্তু উপায় ত কিছু খুঁজিয়া পান না? এক তাঁহার খাওয়া-পরা বন্ধ করা যায়, বা তাঁহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়া আর একটা বিবাহ করা যায়, তাহা হইলে যামিনী একটু সায়েস্তা হন। কিন্তু সিভিল আইনের খপ্পরে পড়িয়া, এমন ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলি হইতেও সুরেশ্বর বঞ্চিত। তাহা ছাড়া সত্যই এ ধরণের কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার স্বভাবেই নাই। অত হাঙ্গাম পোহাইবে কে? আর মেয়েও যে তাহা হইলে তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইবে? এ চিন্তাও তাঁহার অসহ্য। কাজেই রোজ রাগারাগি করা আর চীৎকার করা ছাড়া উপায় কি?

সুতরাং খাটের উপর আরও চাপিয়া বসিয়া তিনি গর্জন করিয়া উঠিলেন, "আমার যা-খুশী করায় বাধা দেবার ক্ষমতা দুনিয়ার কারও নেই, তোমার ত নেই-ই। আমি কি কারও খাই পরি? আমি বলছি দেবেশ পরশু আসবে, এখনই লিখে পাঠাচ্ছি আমি গিয়ে। তার আদর-যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি যেন না-হয়, এই এক কথা ব'লে দিলাম।" বলিয়া তিনি খাট হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যামিনী বলিলেন, "বাড়িতে ডেকে অনাদর করাটা ত ভদ্রতা নয়, সুতরাং দেবেশকেও অনাদর করা হবে না তা বলাই বাহুল্য।"

যামিনীকে কিছুতেই চটাইতে না পারিয়া সুরেশ্বর উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আমি রাত্রে কিছু খাবটাব না, কেউ যেন এই নিয়ে আমায় জ্বালাতে না যায়।" তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

যামিনী গহনা-তোলা শেষ করিয়া লোহার সিন্দুকটা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া, তাহার ধারে গিয়া বসিলেন। দিনের পর দিন এই একভাবে চলিয়াছে। আরও কতদিন চলিবে তাহাই বা কে জানে? কি ভীষণ মরুভূমির মধ্যেই যামিনীর জীবনপথ আসিয়া শেষ হইল?

মাতার অন্তিমকালে তাঁহাকে একটু সান্ত্বনা দিতে গিয়া, যামিনী যে আজীবন কি শাস্তি নিজের জন্য বরণ করিয়া লইতেছিলেন, তাহা সেই অতীত দিনে তিনি ভাল করিয়া বুঝেন নাই। জীবন হইতে প্রেমকে চিরনির্ব্বাসন দিলেন, ইহাই তিনি ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু শান্তি আত্মসম্মান সকলই যে চিরকালের মত তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে, তাহা ত ভাবেন নাই?

খানিকটা নিজের মনেই যেন বলিলেন, "মেয়েকে এই হাড়কাঠে বলি দিতে আমি কিছুতেই দেব না, তা যা থাকে আমার কপালে।"

বাস্তবিক তাঁহার কপালে ইহার অপেক্ষা বেশী শোচনীয় আর কিই বা ঘটিতে পারে? সুরেশ্বর সত্যই কিছু তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন না বা ধরিয়া মারিতে পারেন না?

পারিলেই যেন এক দিক দিয়া ভাল হইত। নিত্য এই অপমান, এই গ্লানি তাহা হইলে চুকিয়া যাইত। দারিদ্র্য তাঁহার অভ্যাস নাই, কিন্তু এই লাঞ্ছনাজড়িত ঐশ্বর্য্যভোগ অপেক্ষা দরিদ্রভাবে জীবনযাপন সহস্রগুণে কি ভাল হইত না?

এমন সময় একখানা চিঠি হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া মমতা ডাকিল, "মা।"

নিজের অদৃষ্ট-চিন্তা হইতে যামিনী জোর করিয়া যেন নিজেকে ফিরাইয়া আনিলেন। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি মা?"

মমতা চিঠিখানা তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "মা দেখ, ছায়া আমাকে কাল নেমন্তন্ন করেছে।"

যামিনী চিঠি লইয়া পড়িয়া দেখিলেন। ছায়াই লিখিয়াছে। কাল তাহার জন্মদিন, তাই তাহার মাসীমা ছায়ার কয়েক জন বন্ধুকে একটু জলযোগ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

মমতা অত্যন্ত উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, আমি যাব ত?"

যামিনী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা যেও, রাত হবার আগেই ফিরে এস কিন্তু।"

মমতা বলিল, "তা ত আসবই। এ ত আর রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ নয়, চা খাবার শুধু।"

"আচ্ছা মা, লুসিকেও কি নিয়ে যাব? ও তা না হ'লে একা একা ব'সে কি করবে?"

যামিনী বলিলেন, "ছায়া থাকে পরের বাড়ি, উপরি লোক নিয়ে গেলে হয়ত অসুবিধা হ'তে পারে। লুসি ঘণ্টা দুই-তিন কি আর একলা থাকতে পারবে না?"

মমতা ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "আচ্ছা, তাই থাকবে না-হয়। আমি যাব কার সঙ্গে মা?"

মা বলিলেন, "কার সঙ্গে আর যাবে মা, বাড়ির গাড়ীতে নিজেই যেও। নিত্যকে সঙ্গে দেব এখন।"

মমতা চলিয়া গেল। ছোটখাট ব্যাপারই তাহাদের তরুণ জীবনে কতখানি। কাল ছায়ার বাড়ি যাইবে, এই ভাবনাই মমতাকে এখন অধিকার করিয়া বসিল। কি কাপড় পরিবে, কি গহনা পরিবে, তাহাই কতবার করিয়া ভাবিল। ছায়ার ত গহনাকাপড় বিশেষ কিছু নাই, তাহার বাড়িতে বেশী সাজ করিয়া যাওয়া ভাল দেখাইবে না।

অলকা মুটকী কিন্তু প্রাণপণে সাজিয়া আসিবে, তাহা মমতা লিখিয়া দিতে পারে। তাহাদের ক্লাসের মেয়েদের ছাড়া আর কাহাকেও ছায়া বলিয়াছে কিনা কে জানে? বাহিরের অচেনা ছেলেদের সামনে বাহির হইতে মমতার বড় লজ্জা করে, অভ্যাস নাই কিনা?

লুসি তখন খাটের উপর বসিয়া একখানা নভেলের পাতা উল্টাইতেছিল। মমতাকে দেখিয়া বলিল, "বেশ আছিস্ ভাই দিদি, নিত্যি পার্টি, নিত্যি নেমন্তন্ন। বড়লোক হওয়ার সুখ আছে।"

মমতা বলিল, "সুখ ত কত। এই রকম জড়ভরত সেজে যত বুড়ো আর টেকোর সামনে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে ভারি ভাল লাগে আর কি?"

লুসি বলিল, "সে ত আর রোজ না? এর পর বুড়ো আর টেকোর ছেলে যখন আস্‌বে তখন খুব ভাল লাগ্‌বে।"

মমতা তাহাকে একটা চড় মারিয়া বলিল, "যাঃ, ভারি ফাজিল হয়েছিস্। এত পাকামি তোর আসে কোথা থেকে?"

লুসি বলিল, "কোথা থেকে আবার আসবে? বয়স বাড়ছে না কম্‌ছে? চিরদিনই কি আর খুকি থাকব? তোমার বর যে নিজে আসবে তোমায় দেখতে, তা বুঝি জান না? তোমার বিন্দু-পিসীমার কাছে শুনলাম যে?"

মমতা মুখ লাল করিয়া চুপ করিয়া রহিল। ব্যাপারটা কি জানি কেন তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। মায়ের যে ইহাতে বিন্দুমাত্র সম্মতি নাই, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, এবং মনটাও তাহার এই কারণে বিরূপ হইয়া যাইতেছিল। বিবাহের চিন্তা, বরের চিন্তা, প্রেমে পড়ার চিন্তা, এই বয়সের কোন্ মেয়ের মাথায় না আসে? কিন্তু এই রকম ঘটকালির বাঁধা পথে কি মমতার রাজপুত্রের আগমন ঘটিবে? তাহার মন যেন একেবারে মুখ ফিরাইয়া লইল।

লুসি বলিল, "দিদি ভাই, তুই বড় ছেলেমানুষ কিন্তু। আমি হ'লে—"

মমতা বলিল, "তুমি হ'লে কি করতে? চার পা তুলে নাচতে?"

লুসি বলিল, "চার পা তুলে না নাচি, দু-পা তুলে ত নাচতামই। কিন্তু আমি ত আর তোমার মত সুন্দরী নই, আমার জন্যে অত ছুটে ছুটে বরও আসবে না।"

মমতা বলিল, "আহা, আমার সৌন্দর্য্যের জন্যেই বর ছুটে আসছে আর কি? আসছে ত বাবার টাকার লোভে।"

লুসি বলিল, "তা হোক না? আসল দিকটা দেখ না, নকলটা বাদ দিয়ে।"

মমতা তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "তুই থাম ত, খালি বিয়ে আর বিয়ে। সে যখন হবে তখন হবে। কাল সন্ধ্যাটা কি ক'রে কাটাবে বল দেখি?"

লুসি বলিল, "সে দেখা যাবে এখন। না-হয় পিসীমার সঙ্গে কোথাও বেড়িয়ে আসব।"

রাত্রি হইয়া আসিল। সুরেশ্বর সত্যই রাত্রে কিছু খাইলেন না। যামিনী নামে মাত্র খাইতে বসিয়া উঠিয়া গেলেন। ছেলেমেয়েরা যথারীতি খাইতে বসিল, এবং খাইয়া-দাইয়া উঠিয়া গেল।

মমতা আর লুসি নিজেদের ঘরে গিয়া আজ শুইল। যামিনী আপত্তি করিলেন না, দুই সখীর গল্পে বাধা দিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন কাল ছায়ার বাড়ি যাওয়া লইয়া সুরেশ্বর আবার গোলমাল না বাধান। দিনের দিন তাঁহার স্বভাব যা হইতেছে, তাহা আর বলিবার নয়। স্থির করিলেন, তিনি নিজেই লুসি, মমতা, এবং এক জন ঝিকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইবেন। তাহার পর মমতাকে যথাস্থানে নামাইয়া দিলেই হইবে।

(১০)

ভাবী কুটুম্বের সঙ্গে বেশী হৃদ্যতা করিতে গিয়া সুরেশ্বরের শরীরটা পরদিনেও ভাল শোধরাইল না। সকালে উঠিলেন না, মাথা ভার হইয়া আছে, গা কেমন করিতেছে। চাকর তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া তাড়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া যামিনীকে খবর দিল। যামিনী নিজেই তাঁহার ঘরের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মমতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যা ত মা, দেখে আয়। যদি শরীর বেশী খারাপ হয়ে থাকে, তাহ'লে ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে হবে।"

মমতা সবে তখন চা খাইয়া উঠিয়া লুসির সঙ্গে কি একটা বিষয়ে গভীর তর্ক জুড়িয়াছে, মায়ের আদেশে সে লুসিকে টানিতে টানিতেই গিয়া সুরেশ্বরের শুইবার ঘরে উপস্থিত হইল।

সুরেশ্বর মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিলেন। পায়ের শব্দে বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যামিনী আসিয়াছেন। মমতাকে দেখিয়া বিরক্তিটা চট্ করিয়া মুখ হইতে মুছিয়া লইয়া বলিলেন, "কি মা-লক্ষ্মী, সকালবেলাই যে সদল-বলে?"

মমতা বলিল, "তুমি উঠলে না, কিচ্ছু না, তাই দেখতে এলাম কি হয়েছে। ডাক্তারবাবুকে কি ফোন্ করব বাবা?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তা এক বার করলে হয়, মোটেই ভাল বোধ করছি না।"

মমতা বলিল, "তুমি কি কিছুই এখন খাবে না বাবা, উঠবেও না?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "দেখি ডাক্তার কি বলে আগে।"

মমতা লুসিকে লইয়া চলিয়া গেল। যামিনী তাহার কাছে সব শুনিয়া তখনই টেলিফোন করিয়া ডাক্তারকে খবর দিলেন। নিজে যাইবেন কি না স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কাল রাত্রেই একটা রাগারাগির মত হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহাকে দেখিলে সুরেশ্বর যদি আবার উত্তেজিত হইয়া উঠেন, তাহা হইলে না যাওয়াই ভাল। আবার না যাওয়ার জন্য যদি সুরেশ্বর চটিয়া যান, সেও এক ভাবনা। অবশেষে অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, ডাক্তার আসিলে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই যাইবেন। এক জন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে সুরেশ্বর জোর করিয়াই মেজাজটা ঠাণ্ডা রাখিবেন।

ডাক্তার আসিতে বেশী দেরি করিলেন না। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, বহুকাল সুরেশ্বরের পারিবারিক চিকিৎসকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। খবর পাইয়া যামিনী বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "এই যে আসুন, উনি শোবার ঘরেই রয়েছেন, এখনও উঠেন নি।"

ডাক্তার তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে? খাওয়া-দাওয়ার কিছু অনিয়ম হয়েছিল নাকি?"

যামিনী বলিলেন, "তা খানিকটা হয়েছে বটে।"

দুই জনে সুরেশ্বরের শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "ওঁর এখন বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার, শরীরের গতিক তত ভাল নয়। খাওয়া-দাওয়ার যাতে কোনো অনিয়ম না হয়, ঘুম যেন ঠিক-মত হয়, এই দুটো বিষয়ে আপনি খুব লক্ষ্য রাখবেন। ওঁর স্বভাব ত জানি, সামনে ভাল খাবার দেখ্‌লে কিছুতেই লোভ সাম্‌লাতে পারেন না, আপনারই এখন শক্ত হওয়া দরকার।"

যামিনীর হাসি আসিতে লাগিল। তাঁহার শক্ত হইয়া ত কত লাভ। তিনি একটা কথা বলিলে, তাহার উল্টা কাজ করার উৎসাহ সুরেশ্বরের চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। যে স্ত্রী তাঁহার জন্য কণামাত্রও ব্যস্ত নয়, তাহার কথা শুনিয়া চলিবার অপমান স্বীকার সুরেশ্বর কখনও করিবেন না, আর যেই করুক। কথাটা শুনিলে তাঁহার নিজের ভাল হইবে কিনা সেটা ভাবিবারই কথা নয়।

সুরেশ্বর ডাক্তারকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। চাকরকে ডাকিয়া চেয়ার দিতেও বলিলেন। যামিনীকে দেখিয়া তাঁহার রাগ হইল বটে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করিবার কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

চাকর তাড়াতাড়ি দুইখানা চেয়ার আনিয়া হাজির করিল। ডাক্তারবাবু বসিলেন, যামিনীও একবার বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া, চেয়ারটা খাটের আর এক পাশে টানিয়া লইয়া বসিলেন।

ডাক্তার যথারীতি পরীক্ষা ও প্রশ্ন করিলেন, এবং যথারীতি ব্যবস্থাও দিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "কয়েক দিন চুপচাপ বিশ্রাম করতে হবে, একেবারে বাড়ি থেকে বেরবেন না, শোবার ঘর ছেড়েও যদি না বেরোন ত ভাল।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "দেখা যাক, কতদূর কি করতে পারি। বিশেষ জরুরি কাজ ছিল কতগুলো এই সময়।"

ডাক্তার বলিলেন, "সে-সব এখন পেছিয়ে দিতে হবে। শরীর আগে, তার পর অন্য সব। খাওয়া-দাওয়াও যেমন বল্‌লাম, তার থেকে এদিক-ওদিক করবেন না।"

সুরেশ্বর হতাশ ভাবে আবার খাটের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "উপায় যখন নেই, তখন আর কি করা যাবে?"

ডাক্তার বাহির হইয়া চলিলেন, যামিনীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিলেন। সিঁড়ির কাছে আসিয়া একটু উদ্বিগ্নভাবেই ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "কেমন দেখলেন ওঁকে?"

ডাক্তারবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "খুব বেশী ব্যস্ত হবার মত এখনই কিছু হয় নি, তবে খুব সাবধানে থাকতে হবে। অনিয়ম আর চলবে না। একটু ব্লাড-প্রেশারের ভাব দেখা যাচ্ছে।"

এই ব্যাধিটি এই বংশে পুরুষানুক্রমিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং রোগের নাম শুনিয়া যামিনী যে খুব নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিলেন, তাহা বলা চলে না। কিন্তু চিন্তা করিয়াই বা তিনি কি করিতে পারেন? ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইবে।

"তা হ'লে আসি. আজ শুধু লিকুইডের উপরেই থাকেন যেন," বলিয়া ডাক্তার নামিয়া গেলেন।

যামিনী নিজের ঘরে গিয়া সুরেশ্বরের চাকরকে ডাকিয়া পাঠাইয়া, কি কি খাবার কর্ত্তার ঘরে যাইবে, তাহা বলিয়া দিলেন।

খানিক বাদে চাকরটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু ডাকছেন।"

যামিনী একটু বিস্মিত হইয়া আবার সুরেশ্বরের ঘরে ফিরিয়া চলিলেন। সুরেশ্বর তখন মুখ-হাত ধুইয়া, উঠিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া আছেন। যামিনীকে দেখিয়া বলিলেন, "ব'সো, চা-টা খাওয়া হয়েছে?"

এতখানি ভদ্রতার কারণ বুঝিতে না পারিয়া যামিনী বলিলেন, "হ্যাঁ, হয়েছে।" তিনি খাটের এক পাশে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুরেশ্বর বলিলেন, "এই কাল কথাই হচ্ছিল কিনা দেবেশকে ডাকবার, তার কি করবে?"

যামিনী বলিলেন, "খুব ত তাড়া নেই, তুমি একটু সুস্থ হয়ে ওঠ, তারপর দেখা যাবে।"

ডাক্তারের উপদেশের বহরে সুরেশ্বর একটু দমিয়া গিয়াছিলেন, বেশী মেজাজ না দেখাইয়া বলিলেন, "আবার

বেশী দেরি করা ভাল না, নানারকম বাধা-বিপত্তি ঘট্‌তে পারে। যোগ্য ছেলে, আরও অনেকের চোখ আছে ওর উপর। আমার এমন ত কিছু অসুখ নয়, আজকের দিনটা শুয়ে পড়ে থাকলেই সামলে যাব। আমি বল্‌ছিলাম যেমন কাল ডাকার কথা ছিল, তাই না-হয় ডাকা যাক্।"

সুরেশ্বরকে চটিবার কোনো সুযোগ দিবার ইচ্ছা যামিনীর একেবারেই ছিল না। তিনি বলিলেন, "বেশ তাই কর। চিঠি লিখে দাও।"

সুরেশ্বর খুশী মনে চিঠি লিখিতে বসিলেন, যামিনী বিষণ্ন মনে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

মমতার বিকালে নিমন্ত্রণে যাওয়ায় একটু মুস্কিল ঘটিবে। এই অবস্থায় যামিনী ত বাহিরে যাইতে পারেন না। পাঁচ মিনিট পরে পরে যে-কোনো ছুতা করিয়া সুরেশ্বর এখন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতে থাকিবেন, নিজে অসুস্থ হইয়া থাকিলে বাড়িসুদ্ধকে অস্থির করিয়া তোলা তাঁহার নিয়ম। নিজে যখন আরামে না থাকেন, তখন অন্য কাহারও আরাম তিনি সহ্য করিতে পারেন না। মমতাকেও ডাকিতে পারেন, কিন্তু সে বেড়াইতে গিয়াছে বলিলে তত বেশী কিছু বলিবেন না। অথচ মমতা বেচারীকে নিরাশ করিবার ইচ্ছা যামিনীর একেবারেই ছিল না। এমনিতেই সে বাড়ি হইতে কোথাও বাহির হইতে পায় না, যদি বা একটা সুযোগ ঘটিল, তাহাও না মাঠে মারা যায়। কি করিবেন, যামিনী ভাবিয়াই পাইলেন না।

এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত দিক হইতে সাহায্য আসিয়া পৌঁছিল। সুজিত হঠাৎ আসিয়া বলিল, "মা আমার একবার গাড়ীটা দরকার বিকেলে।" কয়েক দিন আগে তাড়া খাইয়া, সুজিত এখন কোথাও যাইতে হইলে ভদ্রতা করিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসে।

যামিনী বলিলেন, "কোথায় যাবে? তোমার দিদিরও ত আজ এক জায়গায় যেতে হবে।"

সুজিত বলিল, "আমাদের ক্লাসের দীনবন্ধুর কাছে একবার যেতে হবে, কয়েকখানা বই আনবার জন্যে।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ পাড়ায় তাদের বাড়ি?"

সুজিত বলিল, "কালীতলার কাছে।"

ছায়ার মাসীর বাড়ি বেনেটোলায়। যামিনী আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তাহ'লে মমতা আর তুমি একসঙ্গেই যাও, ওকে নামিয়ে দিয়ে তবে তুমি দীনবন্ধুর বাড়ি যেও, আবার ফিরবার সময় তুলে নিয়ে এস। আটটার বেশী দেরি যেন না-হয়।"

ব্যবস্থাটা সুজিতের মোটেই পছন্দ হইল না। ইহারই মধ্যে মেজাজটা তাহার খুব বনিয়াদী হইয়া উঠিয়াছিল। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কোথাও যাইতে হইলে, তাহার যেন মাথা কাটা যাইত। মেয়েরা বাড়ির ভিতর থাকিয়া পুরুষদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিবে, এই ছিল তাহার স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বিধান। তবে এখনও ত নিজের ধারণাগুলি অন্যের উপর খাটাইবার সুবিধা পায় নাই, কাজেই তাহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক কাজ করিতে হয়। দিদিকে লইয়া যাইবার তাহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহা না করিলে নিজের যাওয়া বন্ধ হয়, অগত্যা তাহাকে রাজী হইতে হইল।

সুরেশ্বর সারাটা দিন বাড়ির সকলকে, বিশেষ করিয়া যামিনীকে, ব্যস্ত করিয়া রাখিলেন। মমতা, সুজিত, লুসি, ঝি-চাকর, আশ্রিতবর্গ, সকলেই পালা করিয়া তাঁহার ফরমাস খাটিতে লাগিল। বিকাল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া যামিনী বলিলেন, "আমি বসছি এখন এখানে, খোকা খুকী খানিকটা ঘুরে আসুক। সারাদিন বাড়িতে বন্ধ হয়ে থাকা ভাল নয়।"

সুরেশ্বর রাজী হইলেন, কারণ ছেলেমেয়ের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাতে কখনও তিনি আপত্তি করিতেন না। যামিনী মমতাকে একটু আড়ালে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "এই নে মা চাবি, শীগগির ক'রে কাপড়চোপড় প'রে নে গিয়ে।"

মমতা চলিয়া গেল। লুসি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। "দেখি ভাই দিদি, আজ কি প'রবে?"

মমতা কাপড়ের আল্‌মারি খুলিতে খুলিতে বলিল, "যাহোক একটা কিছু প'রে গেলেই হবে আজ।"

লুসি বলিল, "ও মা, কেন? চায়ের নেমন্তন্নে যাচ্ছ, বেশ ভাল ক'রে ড্রেস্ ক'রে যাও। কাল যেমন উপকথার রাজকন্যা সাজলে, আজ তেমনি মেমসাহেব সাজ। তোমার ত সব রকমই আছে।"

মমতা বলিল, "না ভাই। ছায়া-বেচারীর সাজপোষাক কিছুই নেই, তার ঘরে গিয়ে বড়মানুষী দেখালে বড় বিশ্রী হবে। এমনি সাদাসিদে কাপড় প'রেই যাই।"

লুসির মোটেই কথাটা পছন্দ হইল না। নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে, যাহার যেমন পোষাকপরিচ্ছদ আছে, সে তেমন পরে, যাহার বাড়ি যাইতেছে তাহার কি আছে না-আছে, সে ভাবনা ভাবে না। দিদির সব-তাতেই বাড়াবাড়ি।

মমতা সাজিবেই না যখন, তখন তাহার চুলগুলি ফুলাইয়া-ফাঁপাইয়া, যথাসাধ্য বড় একটা এলো খোঁপা বাঁধিয়া দিয়াই লুসি নিশ্চিন্ত হইল। মমতা গহনা যা পরিয়া থাকে, তাহার উপর কিছুই পরিল না। বাছিয়া বাছিয়া একটা লাল বুটি-দেওয়া ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া পরিয়া বসিল। কপালে লুসি একটা কুঙ্কুমের টিপ পরাইয়া দেওয়াতে আপত্তি করিল না।

যামিনী এক ফাঁকে আসিয়া মেয়ের প্রসাধন দেখিয়া গেলেন। বলিলেন, "বেশ হয়েছে। লুসির এখন বেলাটা কাটে কি ক'রে?"

লুসি বলিল, "দাও না পিসীমা, ঐ কালো আলমারির চাবিটা, আমি সব কাপড়চোপড় গুছিয়ে দিই। তুমি না বলছিলে সব বড় অগোছাল হয়ে আছে?"

কালো কাঠের আলমারিতে যামিনীর এবং মমতার রেশমের কাপড়-চোপড়গুলি থাকিত; এই সব নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লুসির ভারি আনন্দ। মমতা যতক্ষণ বাড়ি থাকিবে না, এই উপায়ে সে দিব্য সময় কাটাইয়া দিতে পারিবে।

এমন সময় সুরেশ্বর নিজের ঘর হইতে হাঁক দিয়া উঠিলেন। যামিনী ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছেন, এই সন্দেহ হওয়া মাত্রই তাঁহার মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়া গিয়াছে।

যামিনী চাবীর রিংটা তাড়াতাড়ি লুসির হাতে দিয়া বলিলেন, "এই মোটা চাবীটা ঐ আলমারীর, দেখিস যেন বাইরে কিছু পড়ে না থাকে।" তিনি আবার সুরেশ্বরের ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

সুজিতও প্রস্তুত হইয়া আসিল। নিত্যকে ডাকিয়া লইয়া মমতা সুরেশ্বরের ঘরের দরজার সামনে দিয়াই নীচে চলিয়া গেল, তিনি কিছু উচ্চবাচ্য করিলেন না। মেয়ের অঙ্গে সাজসজ্জার কিছু প্রাচুর্য্য দেখিলে অবশ্য তাঁহার মনে একটু সন্দেহ হইলেও হইতে পারিত।

সুজিত সামনে ড্রাইভারের পাশে গিয়া বসিল, ভিতরে বসিল মমতা এবং নিত্য। গাড়ীটা সিডান, এই যা রক্ষা, খানিকটা পর্দ্দা বজায় রাখিয়াই যাওয়া যায়। মমতা কোথায় যাইবে, তাহা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া, সুজিত সারাপথ আর ঘাড়ই ফিরাইল না।

ছায়ার বাড়ি আবিষ্কার করিতে একটু ঘোরাঘুরি করিতে হইল, কারণ বাড়িটা বড়রাস্তার উপরে নয়, একটুখানি গলির ভিতরে। সুজিত গাড়ীতেই বসিয়া রহিল, ড্রাইভার নামিয়া গিয়া বাড়িটা দেখিয়া আসিল। তাহার পর মমতা এবং নিত্যকে লইয়া সে-ই আবার পৌঁছাইতে চলিল। সুজিত অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া শূন্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আমি আটটার সময় আসব, তখন যেন আর দেরি না হয়।"

নোংরা দুর্গন্ধ গলির ভিতর তিনতলা পুরনো একটা বাড়ি। এক-এক তলায় এক-এক জন ভাড়াটে। ছায়ার মাসীমা দু-তলায় থাকেন। ড্রেনের এবং নর্দ্দমার মিশ্রিত গন্ধে মমতার দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

সদর দরজার সামনে আসিয়া ড্রাইভার বলিল, "এই বাড়ি।" দরজার কড়াটাও সে সজোরে নাড়িয়া দিল।

একতলাবাসিনী একটি ছোট মেয়ে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। বছর পাঁচ বয়স, কিন্তু পরিচ্ছদের কোনো বালাই নাই। মমতাকে দেখিয়া বলিল, "সব্বাই উপরে চলে গেছে।"

অনাহূত ভাবেই উপরে চলিয়া যাইবে কিনা, মমতা ভাবিতেছে, এমন সময় তিন-চার সিঁড়ি এক-এক লাফে অতিক্রম করিয়া একটি যুবক নামিয়া আসিল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, গায়ের রংটা শ্যামবর্ণ। মমতাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "এই যে, এইদিক দিয়ে আসুন।"

মমতা প্রতিনমস্কার করিল বটে, তবে কথা কিছু বলিল না। অপরিচিত ছেলেদের সঙ্গে কথা বলিতে তাহার বড় লজ্জা করিত। চিরকাল একলা। একলা থাকিয়া এ বিষয়ে তাহার কোনো অভ্যাস হয় নাই।

ড্রাইভার ফিরিয়া গেল। মমতা ও নিত্য যুবকটির পিছন পিছন সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

উপরে ঘর মাত্র তিনটি। দুইটি মাঝারি, একটি অত্যন্ত ছোট। তিনটিই শয়নকক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে আজ একটিকে বসিবার ঘরে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

তক্তাপোষ বাহির করিয়া দিয়া শতরঞ্চির উপর চাদর পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। ঘরের এক কোণে পুরাতন একটি টেবিল, আর একপাশে গোটা দুই বড় ট্রাঙ্ক, তাহা আজ একটা ছিটের দোলাইয়ের তলায় আত্মগোপন করিয়াছে। আর জিনিষপত্র যাহা ছিল, তাহা বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছে।

অলকা এবং তাহাদেরই ক্লাসের শুভ্রা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ঘরের এক কোণে বসিয়া আছে। পাশের ছোটঘর হইতে উঁকি মারিয়া ছায়া বলিল, "আমি এখনই যাচ্ছি। তুই ঐ ঘরে বোস ভাই।"

(ক্রমশঃ)

পালিপিটকে ব্রাহ্মণ্য-দর্শনবাদের কথা

শ্রীহারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য, এম-এ

পালিপিটকগুলি প্রাচীন ভারতের সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। উহাতে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে-সকল বিষয় প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-জগতের একটি চিত্র পরিকল্পনা করিতে পারি। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী, কাজেই পালিপিটকের তথ্যগুলি হইতে তদানীন্তন ভারতের ঐতিহাসিক পরিকল্পনা সহজেই আয়াসসাধ্য। বর্ত্তমানে আমরা পালিপিটকে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ্য-দর্শনবাদের আলোচনা করিব। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেই উত্তর ও মধ্য ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল এবং বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়টি প্রবল সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল; এই ছয়টি সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈন সম্প্রদায় আজও বর্ত্তমান আছে। পিটকগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, লোকে "আত্মা ও কর্ম্মফলে" বিশ্বাস করিত। দীঘনিকায়ের পুথপাদসুত্তে আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ পুথপাদ 'আত্মা' সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের মতামত বুদ্ধদেবের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন। তাহাদের বিশ্বাস দেহের অভ্যন্তরে একটি সূক্ষ্ম পুরুষ রহিয়াছে। এই সূক্ষ্ম পুরুষ যখন কোন উচ্চলোকে বিহার করে তখন মানুষের সমাধি হয়, আর এই পুরুষ মানুষের দেহ ত্যাগ করিলে মানুষের প্রাণ নষ্ট হয়; মানুষের দেহে এই পুরুষ বা আত্মা না থাকিলেই মানুষ চেতনাহীন হইয়া পড়ে।* আত্মার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা হইয়াছে। 'আত্মা' সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়াছিল, বুদ্ধদেব আত্মা-সম্বন্ধে যাবতীয় বাদবিতণ্ডা ও মতবাদের বার-বারই নিন্দা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, পালিপিটকের এই তথ্যগুলি হইতে আমরা হিন্দুর ষড়দর্শন ও উপনিষদের আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্বের সন্ধান পাইতে পারি। পিটকে আত্মার আকৃতি-প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল গবেষণার উল্লেখ আছে তাহার অনেকগুলি ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের সঙ্গে মেলে। লোকে তখন কর্ম্মফলের উপরে স্বর্গ নরক ও পরজন্ম নির্ভর করে এইরূপ বিশ্বাস করিত, এবং এই ভয়ে সশঙ্ক থাকিত। (সংযুত্ত নিকায় ২, ৩, ২৪-২৬) পিটকের দীঘনিকায়ে ব্রহ্মজালসুত্তে বুদ্ধদেবের মুখে আমরা ব্রাহ্মণ্য-দর্শনবাদের বিস্তৃত বিবরণী পাই। "ঈশ্বর ও আত্মা" সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শনবাদে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে মূলতঃ আটটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; এই আটটি শ্রেণীর মধ্যে আবার ৬২ প্রকার বিভিন্ন মত ছিল; প্রধান আটটি শ্রেণী:—(১) সস্সতবাদা, (২) একচ্চ সস্সতিকা—একচ্চ অসস্সতিকা, (৩) অন্তান্তিকা, (৪) অমরবিক্খেপিকা (৫) অধিচ্চ-সমুপন্নিকা (৬) উদ্ধম-আঘতনিকা (৭) উচ্ছেদবাদা (৮) দিট্ঠ ধম্ম নিব্বানবাদা।

(১-৪) সস্সতবাদা—ইঁহাদের ধারণা সমস্ত বহির্জগৎ ও মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। ধ্যানে মানসিক তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়া তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে ইঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে উপস্থিত হইয়াছে।

(৫-৮) একচ্চ সস্সতিকা—একচ্চ অসস্সতিকা—ইঁহাদের

* দীঘনিকায় ১, ৯।

ধারণা কতকগুলি আত্মা অবিনশ্বর, আর কতকগুলি আত্মা নশ্বর ; ইহাদের চারিটি বিভিন্ন মত :—

(ক) পরমব্রহ্ম অবিনশ্বর কিন্তু জীবাত্মা অবিনশ্বর নহে। (খ) দেবতা অবিনশ্বর কিন্তু জীবাত্মা নহে। (গ) মহিমময় কতিপয় দেবতা অবিনশ্বর আর কেহ অবিনশ্বর নহে। (ঘ) বাহ্যদেহ অবিনশ্বর নহে কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম হৃদয়, মন বা জ্ঞান বলিয়া কিছু আছে তাহা অবিনশ্বর।

(৯-১২) অন্তানন্তিকা—ইঁহারা চারি প্রকার বিভিন্ন যুক্তিতে জগতের সসীমতা ও অসীমতার মীমাংসা করেন ;

(ক) এই জগৎ সসীম ; (খ) এই জগৎ অসীম। (গ) এই জগৎ ঊর্দ্ধ ও অধঃ দিকে সীমাবিশিষ্ট কিন্তু মধ্যভাগে সীমাহীন। (ঘ) এই জগৎ সসীম বা অসীম কিছুই নয়।

(১৩-১৬) অমর বিক্খেপিকা—ইঁহারা পাপপুণ্যের বিচার করিতে চাহেন না, তাহার চারিটি কারণ আছে :—

(ক) তাহাদের ভয়, যদি তাহাদের সিদ্ধান্ত ভুল হয় তবে তার জন্য শাস্তিস্বরূপ দুঃখ পাইতে হইবে। (খ) হয়ত তাহারা পাপপুণ্যের বিচার করিতে গিয়া সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়িবে। (গ) হয়ত তাহারা বাদী-প্রতিবাদীর মনোমত কৌশলে উত্তর দিতে পারিবে না। (ঘ) চতুর্থ কারণ তাহাদের অসৎ প্রেরণা ও নির্বুদ্ধিতা।

(১৭-১৮) অধিচ্চ-সমুপ্পন্নিকা—ইহারা দুই প্রকার যুক্তিদ্বারা আত্মা ও জগৎ 'বিনা কারণে' উৎপত্তি হইয়াছে এই ধারণায় বিশ্বাসী।

(১৯-৫০) উদ্ধম-আঘতনিকা—ইহারা পরজন্মে বিশ্বাসী। এই সম্বন্ধে তিনটি ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন অনুমানের অবতারণা হইয়াছে।

(ক) প্রথম ধারণা—মৃত্যুর পর সচেতন আত্মা—এই অনুমান ষোলটি যুক্তির উপর স্থাপিত।

(১) আত্মার রূপ আছে। (২) আত্মা রূপহীন। (৩) আত্মার রূপ আছে অথচ আত্মা রূপহীন। (৪) আত্মা রূপী বা রূপহীন কিছুই নহে। (৫) আত্মা অনন্ত। (৬) আত্মা সসীম। (৭) আত্মা সসীম ও অসীম দুই-ই। (৮) আত্মা সসীম বা অসীম কিছুই নহে। (৯) আত্মা একটি উপায়ে চৈতন্যময়। (১০) আত্মা দুইটি উপায়ে চৈতন্যময়। (১১) আত্মার চৈতন্য সসীম। (১২) আত্মার চৈতন্য অসীম। (১৩) আত্মা সর্ব্বতোভাবে সুখী। (১৪) আত্মা সর্ব্বতোভাবে দুঃখী। (১৫) আত্মা সর্ব্বতোভাবে সুখী ও দুঃখী দুই-ই। (১৬) আত্মা সুখী বা দুঃখী কিছুই নহে।

(খ) দ্বিতীয় ধারণা—মৃত্যুর পর আত্মা অচেতন অবস্থায় থাকে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আটটি 'অনুমান' দেওয়া হইয়াছে।

(১) আত্মার রূপ আছে। (২) আত্মা রূপহীন। (৩) আত্মার রূপ আছে—অথচ আত্মার রূপ নাই। (৪) আত্মা রূপী বা রূপহীন কিছুই নহে। (৫) আত্মা অসীম। (৬) আত্মা সসীম। (৭) আত্মা সসীম ও অসীম দুই-ই। (৮) আত্মা সসীম বা অসীম কিছুই নহে।

(গ) তৃতীয়—মৃত্যুর পর আত্মা চৈতন্য ও অচৈতন্য এই দুইয়ের মাঝামাঝি এক অবস্থায় থাকে।

(৫১-৫৭) উচ্ছেদবাদা—ইহাদের বিশ্বাস আত্মা যদিও আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে থাকিবে না ; ইহাদের অনুমান সাতটি :—

(১) মৃত্যুর পর আত্মা থাকিবে না। (২) পরবর্ত্তী জীবনের পর আত্মা থাকিবে না। (৩) অনেক জীবনের পরে আত্মা থাকিবে না।

(৫৮-৬২) দিট্‌ঠ-ধম্মনিব্বানবাদা —'সুখবাদী' — ইঁহারা পাঁচ ভাবে এই দৃশ্য জগতে জীবাত্মার মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করেন—

(১) পঞ্চেন্দ্রিয়ের সম্যক্ পরিতৃপ্তির দ্বারা। (২) অনিসন্ধিৎসু মানসিক ধ্যান (প্রথম স্তর) (৩) ধ্যানযোগের দ্বিতীয় স্তর—যখন মনের অনিসন্ধিৎসা দূর হয় তখন পূর্ণ শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়। (৪) ধ্যানযোগের তৃতীয় স্তর—মানসিক শান্তি হইতে এমন এক অবস্থায় পৌঁছান যায়, যেখানে সুখ-দুঃখ, আনন্দ বা নিরানন্দ কিছুই পৌঁছায় না। (৫) ধ্যানযোগের চতুর্থ স্তর—তৃতীয় স্তরের অবস্থার সঙ্গে পূর্ণ পবিত্রতা।

আলোচনা

"শব্দগত স্পর্শদোষ"

শ্রীবীরেশ্বর সেন

শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য উল্লিখিত শীর্ষক প্রবন্ধে Spoonerism সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে একাধিক কথা বা ভাব মনের মধ্যে একত্র অবস্থান করার ফলে সেই সকল কথা বা ভাব উলট্‌পালট্‌ হইয়া বাহির হয়, তাহাতে Spoonerism হয়—যেমন make tea স্থলে take me. এইরূপ উলট্‌পালট্‌ দুই-একবার দুই-এক জন লোকের অন্যমনস্কতাবশতঃ হইতে পারে। কিন্তু স্পুনার যে-সকল বাক্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহার একটাও বোধ হয় অন্যমনস্কতার ফলে হয় নাই। তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াই লোকের হাস্যোদ্রেক করিবার জন্য সেই সকল বাক্য রচনা করিয়াছিলেন। এক জন লোক জব্বলপুরের কালীনাথ বাবুর কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া বলিয়া ফেলিল কালীনাথপুরের জব্বলবাবু। শ্রোতারা ইহা শুনিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল কিন্তু পরে ইচ্ছা করিয়াই অনেকে প্রস্তুত করিল—গোপীজোরের মুলোমোহন বাবু, মধুগাছার সুলতান মুখুজ্জে, চক্রভূষণ ফণিবর্ত্তী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাপড় পরা এবং সিঙ্গাড়া-কচুরি স্থলে কাপর পড়া এবং সিঙ্গারা-কচুড়ি Spoonerism এর অন্তর্গত নহে। রাঢ় অঞ্চলে ও পূর্ব্ববঙ্গে অনেক লোকে র স্থানে ড় এবং ড় স্থানে র উচ্চারণ করিয়া থাকে। কাপড়কে কাপর এবং কচুরিকে কচুড়ি বলা তাহারই ফল। উই-কে রুই, উপকথাকে রূপকথ, ওঝাকে রোঝা বলা এই শ্রেণীর ভুল।

মনোর্থ-কে মনোরথ লেখা বা বলাও Spoonerism নহে। হিন্দুস্থানীরা অর্থকে অরথ্‌ এবং তীর্থকে তীরথ্‌ বলিয়া থাকে। এই অরথ ই কোনমতে সংস্কৃতে প্রবেশলাভ করিয়া মনোর্থ-কে মনোরথ করিয়াছে। মনোরথ শব্দ কিন্তু বহুকাল হইতে সংস্কৃতে প্রচলিত। কালিদাসও শকুন্তলায়—মনোরথানাম···তটপ্রপাতাঃ লিখিয়াছেন। আমি এতকাল এই শব্দটা বুঝিতে পারি নাই। কয়েক মাস হইল শাস্ত্রী-মহাশয়ের লিখিত প্রবাসীর এক প্রবন্ধ হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি জানিয়াছি।

দুইটা শব্দে ধ্বনিগত কিছু সাদৃশ্য আছে যেমন,—grammar and graham. ইহার যদি একটা বলিতে গিয়া আর একটা বলিয়া ফেলা যায় তাহা হইতে বাস্তবিক শব্দগত স্পর্শদোষ হয়।

খাইতে যাইতে প্রভৃতি বহু তুম্‌ প্রত্যয়ান্ত পদ চলিত ভাষায় খেতে, যেতে এইরূপ হয়। কিন্তু চাইতে, গাইতে প্রভৃতি স্থলে চেতে, গেতে হয় না, কেন-না এগুলির মূলধাতুতে এক-একটা হ আছে, যথা:—চাহ, গাহ। এইরূপ ভুলেও Spoonerism নাই।

লইয়াছি স্থলে নিয়াছি লিখিয়া শরচ্চন্দ্র কোনই ভুল করেন নাই। তিনি কেবল 'নিয়াছি' রূপকে সাধু ভাষায় প্রচলিত করিয়াছেন মাত্র।

উদ্বেলিত, অধীনস্থ, নিঃশেষিত প্রভৃতি পদ ব্যাকরণ-সম্মত নহে। কিন্তু শশঙ্কিত পদ ব্যাকরণ অনুসারে নিষ্পন্ন হইতে পারে। মেঘদূতে অনুরূপ—গর্জ্জিত, অঙ্কিত, কুঞ্চিত, প্রেঙ্খিত শব্দ দ্রষ্টব্য।

কালিফোর্ণিয়ার বার্বাঙ্ক নামক উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ Potato and Tomato একত্র করিয়া যে গাছ ও ফল সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার নাম তিনি Pomato রাখিয়াছিলেন—Potatomato নহে।

"আমার দেখা লোক"

শ্রীঅন্নদানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি 'প্রবাসী'তে শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ধারাবাহিক-ভাবে "আমার দেখা লোক" নামে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিতেছেন। বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় তিনি "সেকালের শিক্ষা-বিভাগের শীর্ষস্থানীয়, সর্ব্বজনপরিচিত ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়" মহাশয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

যোগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে তাঁহার যখন ছোট ছিলেন তখন একবার ভূদেবের চুঁচুড়ার বাড়িতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ তাঁহাদের "তিন সহোদরকে একখানা থালাতে করিয়া জলখাবার দিলে ভূদেব বাবু এক গাছা লাঠি লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "শালারা যদি খাবার নিয়ে কুকুরের মত কামড়াকামড়ি করিস, তাহ'লে লাঠিপেটা করব।" এখানে বলা প্রয়োজন যে, "শাল" কথাটির ব্যবহার সম্পূর্ণ-রূপেই যোগেন্দ্র বাবুর কল্পনাপ্রসূত এবং ভিত্তিহীন। অহেতুক নির্দ্দোষ শিশুদিগকে কুৎসিত গালি দিয়া ভীতিপ্রদর্শন সম্পূর্ণরূপেই ৺ভূদেব বাবুর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। যোগেন্দ্র বাবু তখন নিতান্ত বালক ছিলেন, সকল কথা সঠিক তাঁহার মনে না থাকাই সম্ভব। তদ্ভিন্ন আমাদের দেশে সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাও কথাবার্ত্তার মধ্যে "শালা", "বেটা" ইত্যাদি বাক্য যেরূপ অসঙ্কোচে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে এতকাল পরে লিখিবার কালে যোগেন্দ্র বাবুর পক্ষে এরূপ ভ্রম কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু ভূদেব বাবুকে ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে তাঁহার নিকটতম আত্মীয়বর্গ অথবা যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন সেইরূপ নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিগণ কেহ কখনও দেখেন নাই। নিতান্ত বিরক্ত হইলে কখনও কখনও তিনি সেকালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত একটি তিরস্কার-বাক্য ব্যবহার করিতেন। এ বিষয়ে কেহ ইচ্ছা করিলে ৺ভূদেব বাবুর পুত্র ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিরচিত "ভূদেব চরিত," ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা দেখিতে পারেন।

যোগেন্দ্র বাবু আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, "ভূদেব বাবু কখনও সাদা ধুতি বা সরু পাড়ের কাপড় পরিতেন না, তিন আঙুল চারি আঙুল চওড়া কালা রেলপাড়, মতিপাড়, বা কাশীপাড় শাড়ী পরিতেন। তিনি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন, সাধারণতঃ আটচল্লিশ ইঞ্চ চওড়া বস্ত্র ব্যবহার করিতেন; কিন্তু এত অধিক বহরের শাড়ী সহজে পাওয়া যাইত না, তাই হরিশ ভড় তাঁহার আদেশ-মত কাপড় বুনিয়া দিত।" এ-কথাগুলিও তিনি কেন লিখিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। ৺ভূদেব বাবু সার্কাসের ক্লাউন বা থিয়াটারের বিদূষক ছিলেন না যে চওড়া পাড় শাড়ী পরিয়া থাকিবেন। তাঁহার নিকটতম আত্মীয় যাঁহারা দীর্ঘকাল তাঁহার সাহচর্য্যে কাটাইয়াছিলেন এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা এখনও

নিতান্ত অল্প নহে। ৺ভূদেব বাবুর দ্বিতীয়া পুত্রবধূ (৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী এবং যোগেন্দ্র বাবুর খুড়ীমা) এবং তাঁহার পৌত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর (মদীয় মাতৃদেবী) নিকট প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যোগেন্দ্র বাবুর পক্ষে খুবই সহজ ছিল। তাঁহারা উভয়েই ৺ভূদেব বাবুর শাড়ী-পরার সংবাদে নিরতিশয় বিস্মিত হইয়াছেন এবং তাহার প্রতিবাদ জানাইতেছেন। তাঁহাদের কথামত যোগেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বোক্ত কথা দুইটির প্রতিবাদে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। ৺ভূদেব বাবুর বাটীতে কখনও বিদেশী বস্ত্রের আমদানী ছিল না। তখনকার দিনে দেশী মিলের সৃষ্টি না হওয়ায় সর্ব্ববিধ বস্ত্রাদি, শুধু ধুতি ও শাড়ী নহে, বালিসের ওয়াড় এবং বিছানার চাদরও, ফরাসডাঙ্গার তাঁতি দ্বারা বুনাইয়া লইয়া ঐ সুবৃহৎ পরিবারে ব্যবহৃত হইত। সেজন্ত কাহাকেও সংবাদ দিবার প্রয়োজন হইত না। পারিবারিক ঐ সকল বিষয়ে কোন ভার তিনি স্বহস্তে রাখিতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্র-বধূই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন।

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(১৯)

পুরী হইতে কোন চিঠি না লিখিয়াই অরুণ হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ি পৌঁছিয়াই সে প্রতিমার ঘরের দিকে ছুটিল। প্রতিমার রোগপাণ্ডুর শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বুকে যেন গভীর বেদনা অনুভব করিল। অরুণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল প্রতিমাকে একা ফেলিয়া আর কখনও সে কোথাও বেড়াইতে যাইবে না।

—কেমন আছিস টুলি, কপাল ত ঠাণ্ডা, জ্বরটা বোধ হয় গেছে।

প্রতিমার টানা চোখ দুইটি আরও বড় আরও কালো হইয়া উঠিয়াছে।

—বা, দাদা, তুমি কখন এলে? কই মোটা হয়েছ কই? খুব কালো ত হয়েছ।

—কেমন আছিস আজ?

—আজ সকালে ত শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে। জ্বর কাল থেকে গেছে।

—যাক্ জ্বরটা গেছে।

—তুমি আসছ জেনেই বোধ হয় তাড়াতাড়ি পালিয়েছে। জানো দাদা, আমাকে কিছু খেতে দেয় না। আমি কিন্তু আজ সাবু খাব না, কিছুতেই।

—না, না, ডাক্তারেরা যা বলছে তাই খেতে হবে বইকি।

—রেখে দাও তোমার ডাক্তার। ভারি ত বিদ্যে। প্রথমে হ'ল টাইফয়েড, তার পর প্যারাটাইফয়েড, ঠাকুমা ত ভেবে অস্থির, তার পর কাল যখন জ্বর ছেড়ে গেল তখন রক্ত-পরীক্ষার ফল এল, ম্যালেরিয়া, এই ত তোমাদের ডাক্তার।

—কুইনাইন খেয়েছিস?

—ও সব কিছু খাচ্ছি না। আমি ডালমুট খাব।

অসুখে ভুগিয়া প্রতিমা যেন সাত বছরের আবদারে মেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। অরুণ স্নেহকরুণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

—বা, পুরীর গল্প কিছু বল্‌ছ না, সমুদ্র কেমন লাগল; ওণ্ডারফুল!

—তুই শীগগীর সেরে ওঠ তার পর তোকে নিয়ে পুরী যাব বেড়াতে। আহা, বিছানা থেকে উঠিস্ না।

—বা, সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে ভাল লাগে! দাদা পুরী নয় সিমলে; কাকা বলেছেন, এবার সিমলা নিয়ে যাবেন পূজার ছুটিতে; ভাগ্যিস অসুখটা হ'ল। আমার কিন্তু ডালমুট—

ঠাকুমা ঘরে প্রবেশ করিতে প্রতিমা চুপ করিয়া গেল। ডালমুট সম্বন্ধে কোন আলোচনা আর অগ্রসর হইল না।

অরুণ ঠাকুমাকে প্রণাম করিয়া বলিল—আচ্ছা, ঠাকুমা আমাকে এত দেরি ক'রে খবর দিতে হয়।

—আমি ত রোজ বলছি, ওরে, অরুকে একটা চিঠি দে, তা আমার কথা কেউ কানে তোলেই না। তা তোমার বন্ধুরা খুব সেবা করেছে।

—কে ? অজয় ?

—অজয় এসেছিল দু-দিন খোঁজ নিতে। আর তোমার ওই কবি-বন্ধুটি রোজ এসেছে, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, তার আবার বাড়াবাড়ি, এক গাদা ফুল কিনে আনা কেন পয়সা খরচ ক'রে, আমাদের বাগানে ত কত ফুল পচছে। তোমার ওই হরিসাধন ছেলেটি বড় ভাল, সেই ত সব করলে, রাতজাগা—

—হরিসাধন ? কে ?

—দাদা যেন কি, হরিসাধন-দাদাকে তুমি চেন না, তোমার ক্লাসফ্রেণ্ড !

—খুব শুশ্রূষা করেছে ছেলেটি, কোন পাস-করা ডাক্তার অত করতে পারত না।

—আমাদের সঙ্গে যে পড়ে ?

—হ্যাঁগো, হরিসাধন-দাদা।

অরুণ প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার চোখ দুইটি উজ্জ্বল, অধর আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অজয়ের মনে পড়িল হরিসাধনের সহিত তাহার ভাব করিবার ইচ্ছা হইলেও পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে নাই। সে প্রায়ই ক্লাসে আসে না। নিঃশব্দে আসে ক্লাসের শেষ বেঞ্চিতে বসে, বড় চুপচাপ থাকে। শুধু-পা, মোটা কাপড় ও সাদা টুইলের শার্ট পরা, বেশভূষার কোথাও একটু বাহুল্য নাই। স্কুলে সে যেরূপ অতি সহজ বেশে আসিত কলেজেও ঠিক সেইরূপ ভাবে আসে। কিন্তু তাহার দেহের কাঁচা সোনার গৌরবর্ণের জন্য অতি সাধারণ বেশভূষাতেও তাহাকে চোখে পড়ে। মুখখানি অতি শান্ত, চোখ দুইটি মাঝে মাঝে জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া ওঠে। নম্র দীনতার সহিত অপূর্ব্ব তেজভরা মূর্ত্তি। সে ছেলেটি হঠাৎ কিরূপে প্রতিমার রোগগৃহে প্রবেশ করিল ও দাদা হইয়া উঠিল! অরুণ উৎসুক ভাবে ঠাকুমার মুখের দিকে চাহিল।

ঠাকুমা বলিলেন—হ্যাঁ, হরিসাধন তোমার সন্ন্যাসী-মামার উপযুক্ত শিষ্য বটে !

—জানো দাদা, সন্ন্যাসী-মামা এসেছেন।

—সত্যি ! কোথায়, কোথায় তিনি !

—বোধ হয় গঙ্গাস্নান করতে গেছেন।

—বহুদিন পর এলেন।

—তিনি যে দামোদরের বন্যাপীড়িতদের সেবা করবার জন্যে কাশ্মীর থেকে এসেছেন দু-বছর হ'ল। বর্দ্ধমানের কোন গ্রামে হরিসাধন-দাদার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

—জানিস অরু, সেবানন্দ এসে আমায় রক্ষা করেছেন। সেদিন দুপুরে হঠাৎ মেয়ের জ্বর গেল বেড়ে, মেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আমি ত ভয়ে মরি। তোর কাকাকে জানিস্ ত, সে বললে, আমি মেমসাহেব নার্স এনে দিচ্ছি, ভাল নার্সিং দরকার। সেদিন বিকেলে হঠাৎ তোর সন্ন্যাসী-মামা এসে হাজির হলেন। আমি বুঝলুম ঠাকুর এযাত্রা রক্ষা করেছেন, আর ভয় নেই। সেবানন্দ কিছুতেই মেমসাহেব নার্স আনতে দিলেন না। তিনি হরিসাধনকে ডেকে পাঠালেন। ওদের নাকি এক সেবক-সমিতি আছে। সবার বাড়ি-বাড়ি গিয়ে শুশ্রূষা করা তাদের কাজ।

—হরিসাধন-দাদা এখনও এল না ঠাকুমা, আমায় যে ব'লে গেল সকালে আসবে।

—ওই তোর সন্ন্যাসী-মামা আসছেন অরু।

নগ্নপদ গেরুয়া রঙের বস্ত্র ও আলখাল্লা-পরা, সুঠাম দীর্ঘ দেহ শান্ত শ্যাম মুখশ্রী, শান্ত চোখে একটু ক্লান্তির ছায়া, কালো চুলের রাশি ঘাড়ে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সহস্র লোকের মধ্যে একটি বিশেষ ব্যক্তিরূপে সন্ন্যাসী-মামাকে প্রথমেই চোখে পড়ে, কর্ম্ম-সেবকের সম্মুখে মাথা ভক্তিতে নত হইয়া আসে।

অরুণ সন্ন্যাসী-মামার নগ্নপদের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। সেবানন্দ অরুণকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন—খোকা, খুব বড় হয়ে উঠেছিস্ ত, মাথায় আমার সমান-সমান ; বা গোঁফের রেখাটি বড় সুন্দর, তবে এখনও তা' দেবার মত হয় নি। খুব পড়াশোনা করছিস শুনলুম।

প্রতিমার মাথায় হাত বুলাইয়া তিনি বলিলেন—বা, মা, জ্বর ত নেই, জ্বর চলে গেছে।—দূর হ, দূর হ জ্বর—আর অসুখ আসবে না, কিন্তু কুইনাইন খেতে হবে, মনে আছে।

—আমি কুইনাইন খাব না।

—আমি কুইনাইনের ওপর মন্তর পড়ে দেব, সন্দেশের মত মিষ্টি হয়ে যাবে। বড় বড় আপেল এনেছি। চল্ খোকা, তোর পড়ার ঘর দেখি গে।

সন্ন্যাসী-মামা অরুণের মাতার সহোদর। তিনি শিব-প্রসাদের সহপাঠীও ছিলেন। কলেজে পাঠের সময়ই তাঁহার

অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। বি-এ পড়ার সময় হঠাৎ তিনি একদিন সকলের অজ্ঞাতে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তখন কেহ বলিয়াছিল, পরীক্ষা দিবার ভয়ে তিনি পলাতক; কেহ বলিয়াছিল, কোন তরুণীর প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি উদাসী। সেদিন যে মুক্তিকামী যুবক জগৎ, জীবন, মানবাত্মা সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া পরম বেদনায় দিশাহারা হইয়া গৃহ-পরিবার সুখ-সম্পদ ত্যাগ করিয়া অজানা পথে বাহির হইয়াছিলেন, দশ বৎসর পর তিনি সন্ন্যাসী 'সেবানন্দ' রূপে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে যাহারা পূর্ব্বে উপহাস করিয়াছিল, তাঁহার নামে নানা মিথ্যা গুজব রটনা করিয়াছিল, তাহারাই তখন ভক্তিভরে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া নানা প্রার্থনা জানাইল, কেহ চাহিল আপন সন্তানের ব্যাধির জন্য ঔষধ, ধনসম্পদলাভের সহজ উপায়, কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কেহ প্রশ্ন করিল, মুক্তি কোন্ পথে। সেবানন্দ স্মিতমুখে বলিয়াছিলেন, তিনি মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিতে আসেন নাই, তিনি নিজে মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছেন, সকলকে সেবা করিয়া। মানব-সেবাই পরম ধর্ম্ম।

দীর্ঘ জীবন ধরিয়া তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সাধু ভক্তের সঙ্গলাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর যখনই বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ বন্যা কোন দুর্দ্দিন আসিয়াছে, তখনই তিনি দেশে ছুটিয়া আসিয়াছেন, দুঃস্থ গ্রামবাসিগণের সেবা করিবার জন্য।

ভারতে যুগে যুগে যে সাধক-সন্ন্যাসিগণ সত্য ধর্ম্মের সন্ধানে গৃহ-পরিবার ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, নির্জ্জনে নিজ সাধনায় ধর্ম্মের কোন মহিমান্বিত রূপ উপলব্ধি করিয়া আবার লোকসমাজে ফিরিয়া আসিয়াছেন, কোন বিশেষ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতে বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে নয়, ধর্ম্মের সহজ সত্যগুলি সরল কথায় বলিয়া মানব-সেবা করিয়া নির্ম্মল জীবনযাপন করিয়া গৃহবাসীর জীবন ধর্ম্মময় করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, সন্ন্যাসী-মামা সেই সাধকদের দলের।

অরুণ তাঁহাকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিল। বাল্যকালে তাঁহাকে সে এক রহস্যময় পুরুষ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যাদুকর বলিয়া জানিত, আজ তিনি দুঃখীর সেবকরূপে, সত্য পথের যাত্রীরূপে, আত্মার আত্মীয়রূপে নব-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া উঠিলেন।

আষাঢ়ের অন্ধকার রাত্রি। অরুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। মনে হইল, মধ্যরাত্রি হইবে। ঝম্-ঝম্ বৃষ্টির শব্দ।

বারিধারার ঝর-ঝরধ্বনি মৃদু হইয়া আসিল। কোথা হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীত ধ্বনি আসিতেছে!

সচকিত হইয়া অরুণ বিছানা হইতে উঠিল, বারান্দায় বাহির হইল। বৃহৎ প্রাচীন প্রাসাদ নিদ্রা-ভরা অন্ধকারময়। এ বৃষ্টি-মুখর অন্ধকার রাত্রে কে গান গাহিতেছে নীড়ে-জাগা পক্ষীশাবকের মত। অরুণ দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল। বিমুগ্ধ হইয়া দেখিল, বারান্দার পূর্ব্ব কোণে পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া এক কম্বলের আসনে বসিয়া সন্ন্যাসী-মামা মুদিত নয়নে ভজন-গান করিতেছেন। এ গান অপরূপ। এ কণ্ঠ দিয়া গান গাওয়া নয়, প্রদীপের তৈলময় সলিতা যেমন আপনাকে পুড়াইয়া আলো জ্বালায় তেমনি এ গানের সুরে সাধক আত্মার আনন্দ ও বেদনা মূর্ত্তি লাভ করিতেছে। উষার বাতাসে বিকচোন্মুখ পদ্মের মত অরুণের মন কাঁপিতে লাগিল। ভিজে মেজেতে সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। এ কি পবিত্র গভীর অনুভূতি। তাহার সমস্ত দেহ-মন কোন্ অতল রসের তিমিরে ডুবিয়া যাইতেছে।

সংস্কৃত মন্ত্র হয়ত বেদের কোন গান। হিন্দী ভজন। ধ্যানী গায়ক গাহিয়া চলিয়াছেন, যেন সমস্ত সৃষ্টি একটি সুর-শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিতে চায়।

আর্দ্র বাতাসে ভিজে মাটির গন্ধ, জুঁইফুলের গন্ধ। কালো মেঘের ফাঁকে সোনার ধারার মত সূর্য্যের আলো। তামসী রাত্রি প্রভাত হইল। অরুণ অনুভব করিল তাহার অন্তরেও যেন নব সূর্য্যোদয় হইতেছে।

গান শেষ করিয়া সেবানন্দ যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অরুণের দুই চক্ষু অশ্রুতে ঝকমক করিতেছে, সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

—তুই এখানে বসেছিলি? শুনছিলি গান!

—হ্যাঁ মামা, কি সুন্দর আপনার গলা।

—আমার গলা সুন্দর নয় রে, চেয়ে দেখ, কি সুন্দর এই প্রভাত, কি সুন্দর এই পৃথিবী, চির-সুন্দরের স্পর্শ মনে পেলে সব সুন্দর হয়ে ওঠে।

—এখন কি গঙ্গা-স্নানে যাবেন?

—হ্যাঁ রে।

—আমিও যাব।

—আমি হেঁটে যাব, অত হাঁটতে পারবি ?

—খুব পারব।

—আচ্ছা চল, বিষ্টি থেমেছে।

পথে যাইতে যাইতে অরুণ গানগুলি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিল। মামার রহস্যময় জীবনের নানা তথ্য জানিতেও সে উৎসুক, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না।

—ওই ভজনটি আমায় শিখিয়ে দিতে হবে।

—আচ্ছা রে আচ্ছা, গলায় শুধু সুর থাকলে হবে না রে, ভক্তি চাই।

— ও গান কে লিখেছেন ?

—এ সব গান কে লিখেছেন, তা কেউ জানে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ভক্তের পর ভক্তের মুখে এ গান চলে এসেছে। যিনি প্রথম লিখেছিলেন তিনি সব সময় তাঁর নাম দিয়ে যান নি। তিনি প্রেমদাস ছিলেন, না জ্ঞানদাস ছিলেন, অথবা কোন অখ্যাত ঋষি, অজ্ঞাত বাউল ছিলেন, তাতে কি আসে যায়। তিনি তাঁহার হৃদয়ের যে ভক্তি দিয়ে গেছেন, সেই ত গানের প্রাণ।

—মামা, আপনার কি সুন্দর আনন্দের জীবন। আমারও ইচ্ছে করে—

—খোকা, বড় হ'লে বুঝবি, এ জীবনে আনন্দ যেমন দুঃখ-বেদনাও তার চেয়ে কম নয়, শরীরের দুঃখ নয় রে, মনের দুঃখ, মনের। কতটুকু আমরা মানবকে সেবা করতে পারছি, কতটুকুই বা আলো জালাতে পারলুম।

(২০)

অপরাহ্ণে জয়ন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, মলিন মুখ, মলিন বেশ। জয়ন্তের মূর্ত্তি দেখিয়া অরুণ বিস্মিত হইল। সুসজ্জিত কবিয়ানা নাই। অরুণের হাত ধরিয়া জয়ন্ত বলিল—চল ভাই, তোমার ছাদের ঘরে। এ যেন স্কুলের সেই সরল ছেলেমানুষ জয়ন্ত, কলেজের উদীয়মান আধুনিক কবি নয়।

জয়ন্ত একটু হতাশ স্বরে আবেগের সহিত বলিল—আমি ঠিক করেছি, আর কবিতা লিখব না, কবিতা-লেখা ছেড়ে দিলুম।

অরুণ একটু ভীত হইয়া বলিল—কি হ'ল তোমার; এ তোমার সাময়িক অবসাদ। না, না, কবিতা-লেখা ছাড়বে কেন, তোমার মধ্যে খুব প্রমিস রয়েছে।

—হাঁ, আমার হৃদয়টা কবির বটে, কিন্তু যা বলতে চাই তা ঠিক-মত বলতে পাচ্ছি কি ? আমার চেয়ে তুই ভাল কবিতা লিখিস। তোর যে 'সমুদ্রের মায়া' কবিতা আমায় পাঠিয়েছিস্, চমৎকার হয়েছে, বিশেষতঃ ওই তরুণীর চলার ভঙ্গীর উপমাটি।

-কোন্ উপমা ?

সোনালী বালুকার উপর খস্-খস্ শব্দে অলসগতিতে সে চলে যায়, তাহার গতি-ভঙ্গীতে কোন কবিতা-ছন্দের তরঙ্গায়িত আন্দোলন, ধ্বনির বন্ধন মুক্তি লাভ করে।

-কিন্তু তোর কি হয়েছে বল্ দেখি ?

-বললুম ত, বিদায় কবিতা, বিদায়।

-কিন্তু, কাব্য-লক্ষ্মী তোকে ছাড়বে কেন ?

—সে ত ছেড়ে চলে গেছে।

—বুঝেছি, সেই পাশের বাড়ির মেয়েটি, কি হ'ল ?

—দশ দিন হ'ল, তার বিয়ে হয়ে গেছে।

—ও, তাই বল্। তারা ত বৈদ্য। তোর সঙ্গে ত বিয়ে হ'তে পারত না। একদিন ত তার বিয়ে হ'তই, যত শীগগীর তার বিয়ে হয়ে যায় ততই ভাল।

—একটা গল্প লিখব ভাবছি। এ-সব সামাজিক কুসংস্কার ভাঙতে হবে।

—আত্মচরিত লিখবি ? ব্যর্থ প্রেম !

—প্রতি গল্পই কি লেখকের আত্মানুভূতি নয়।

—যাক্, ও নিয়ে আর মন খারাপ করিস না।

পাশের বাড়ির একটি মেয়ের সহিত জয়ন্তের প্রেমের একটা অস্পষ্ট ধারণা অরুণের ছিল; জয়ন্ত সবিস্তারে সে কাহিনী বলিতে সুরু করিল। প্রতিদিন বিভিন্ন রঙের শাড়ী পরিয়া বেণী দুলাইয়া কিশোরীটি জয়ন্তের ঘরের সম্মুখ দিয়া স্কুলের গাড়ীতে উঠিতে যায়, গাড়ী সরু গলিতে আসিতে পারে না, গলির পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়; এই মুহূর্ত্তের জন্য জয়ন্ত সমস্ত প্রভাত প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। কখনও তাহাকে সে দেখিয়াছে, ছাদে চুল দোলাইয়া বেড়াইতেছে, কখনও দেখিয়াছে, জানলার গরাদে মাথা

ঠেকাইয়া পথের দিকে চাহিয়া আছে, যেন কোন অনাগত পথিকের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে। মাঝে মাঝে চোখে চোখ পড়িয়াছে, মেয়েটি হাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কখনও কথা বলা হয় নাই। প্রেম মনে-মনে হইলেও, মেয়েটি যে তাহাকে ভালবাসিয়াছে, এ-বিষয়ে জয়ন্তের সন্দেহ নাই। মেয়েটি আশ্চর্য্য সুন্দরী।

অরুণ মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, জয়ন্ত যে গর্ব্ব করিয়া বেড়াইত তাহার কবিতা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতামূলক, ইহা সেই অভিজ্ঞতা!

অরুণ গম্ভীর ভাবে বলিল—দেখ ভাই, প্রেম ও সৌন্দর্য্য কবির আত্মার সৃষ্টি। ও মেয়েটি উপলক্ষ মাত্র।

জয়ন্ত হতাশভাবে বলিল, আমি কি আর ভালবাসতে পারব ভাবিস! পারব না।

—ভালবাসা হচ্ছে প্রেমিকের অন্তরের। যেমন ধর, সূর্য্যালোকে আছে সাত রং। আজ প্রভাতে সূর্য্য যে-মেঘ রাঙিয়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করলে, সে-মেঘ যদি জল হয়ে ঝরে পড়ে যায়, তাহ'লে কি সূর্য্য তার কোন নূতন মেঘ রাঙাবে না, নব সৌন্দর্য্যালোক সৃষ্টি করবে না, সে কি বলবে, আমার রঙের ভাণ্ডার উজাড় হয়ে গেল? যত দিন তোর অন্তরে প্রেম থাকবে, তত দিন তোকে ভালবাসতেই হবে, কবিতা লিখতেই হবে।

—ঠিক বলেছিস্। তোর উপমাগুলি বড় সুন্দর। পুরীর খবর কি বল?

—আমার কি আর সে বরাত।

পুরীর কথা জানিতে জয়ন্ত বিশেষ কিছু উৎসাহ প্রকাশ করিল না; আপন ব্যথিত হৃদয়ের কাহিনী আবার সুরু করিল। অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, জয়ন্ত তাহার পাশের বাড়ির মেয়েটিকে যতটুকু জানিতে পারিয়াছে তাহা অপেক্ষা কত ঘনিষ্ঠভাবে মল্লিকার সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে; মল্লিকার কথা ভাবিলে তাহার অন্তর উদাস হইয়া যায়; এই বাড়ির সারি, এই নগর পথ সব বড় ছোট, বড় চাপা মনে হয়; সে কোন্ অনন্তের আভাস পাইয়াছে। প্রেম কি?

হরিসাধনের আর দেখা নাই। ঠাকুমা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। প্রতিমা একদিন কাঁদিয়া ফেলিল। সন্ন্যাসী-মামা বলিলেন—ভাবিস্ না, অসুখ হ'লে আমি জানতে পেতুম।

সকালে উঠিয়াই অরুণ হরিসাধনের সংবাদ লইতে চলিল। ছোট গলির ভিতর পুরাতন ছোট দোতলা বাড়ি। দরজার কড়া নাড়িতেই হরিসাধন বাহির হইয়া আসিল।

—অরুণ! এস এস।

—বেশ ভাই, তোমার দেখাই নেই, আমরা ভেবে মরি, অসুখ হ'ল বুঝি।

—আমি খবর পেলুম, তুমি এসেছ, প্রতিমারও জ্বর ছেড়ে গেছে।

—বা, সেজন্যে আর আসবে না। বড় অন্যায় করেছ।

—আরে ভাই, আমার কি সামাজিকতা করবার সময় আছে। এ দু-দিন এক কলেরা-রোগী নিয়ে পড়েছিলুম, বাঁচাতে পারলুম না, এই দু-ঘণ্টা হ'ল শ্মশান থেকে আসছি।

—তাহ'লে তোমার ত এখন বিশ্রাম দরকার। তুমি বিকেলে নিশ্চয় এসো, রাতে খাবে।

—না, না, আমার বিশ্রাম করা হয়ে গেছে। তুমি চল, ঘরে বসবে, তুমি না খেয়ে গেলে দিদি রক্ষে রাখবেন না।

মাটির অঙ্গন। মধ্যে একটি চাঁপা-ফুলের গাছ ঘেরিয়া সান্-বাঁধান বেদী।

উঠান পার হইয়া সরু সিঁড়ি দিয়া অরুণ দোতলায় উঠিল। হরিসাধন তাহাকে একটি ছোট ঘরে বসাইল। ঘরে চেয়ার-টেবিল আসবাব কিছুই নাই। তকতকে মেজের উপর মাদুর পাতা। জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিতে হইল। ঘরের এক কোণে কাঠের ছোট বেদীর উপর রামকৃষ্ণ পরমহংসের বাঁধানো ছবি ফুলের মালা জড়ানো; বেদীর সম্মুখে ধূপাধারে কয়েকটি ধূপকাঠি অর্দ্ধেক জ্বলিয়া নিবিয়া গিয়াছে। দেওয়ালে শ্রীচৈতন্য, বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র, নানা মহাপুরুষের ছবি ও দেবদেবীর পট ঝুলিতেছে। দক্ষিণ দিকে দেওয়ালে-সংযুক্ত কাঠের তাকগুলিতে কলেজের বইগুলি সাজান।

—তোমার ঘরটি ভারী সুন্দর, মন্দিরের মত মনে হয়।

—এর মধ্যে সাজানোর যা সৌন্দর্য্য দেখ্ছ, সে-সব আমার

দিদির হাতের। দিদিকে ডাকি, তিনি কতদিন তোমায় দেখতে চেয়েছেন।

বয়স বাইশ-তেইশ হইবে। মুখখানি তারুণ্য ও প্রসন্নতায় পূর্ণ, অথচ এমন স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য আছে যে তাঁহার সম্মুখে কোন চপলতা করিতে সাহস হয় না। দুই চোখে গভীর মমতার সহিত করুণতা মেশান। হাতে সোনা-বাঁধান শাঁখা ও তিন গাছি করিয়া সোনার চুড়ি, কাল-পাড়-ওয়ালা কাপড়খানি ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা বেশ ভারী। সদ্যস্নাতা দিদি যখন ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, প্রভাতের আলো-ভরা ঘরখানি আরও উজ্জ্বল নির্ম্মল হইয়া উঠিল। বয়সে দিদি অরুণের অপেক্ষা কয়েক বৎসর বড় মাত্র; অরুণের মনে হইল, দিদি যেন তাহার চেয়ে অনেক বড়, তাহার অতি পূজনীয়া, দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। তাড়াতাড়ি উঠিয়া অরুণ দিদিকে প্রণাম করিল।

—থাক্ ভাই, অত ঘটা ক'রে দিদিকে প্রণাম করতে হবে না।

অরুণের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

হরিসাধন বলিল—বা তুমি যে দিদি হ'লে।

—বস ভাই, দাঁড়িয়ে রইলে যে। সাধনকে কতদিন বলেছি, তোমায় একবার নিয়ে আসতে। 'অরুণ' ব'লে আমার এক ভাই ছিল, তোমার মতই সুন্দর দেখতে ছিল, আজ মনে হচ্ছে আমার সেই হারানো ভাইকে আবার পেলুম।

—আমার দিদি নেই, আমিও দিদি পেলুম।

—এ দিদি বড় গরিব, দুঃখিনী; এ দিদিকে পেয়ে লাভ নেই, লোকসানই হবে।

হরিসাধন বলিল—আচ্ছা, দিদি চুপ কর দিকি।

—ঠিক বলেছিস, নিজের দুঃখের কথাই বলতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। বস ভাই, আমি খাবার নিয়ে আসি।

—আমি খেয়ে এসেছি।

—তা কি হয়, দিদিকে প্রণাম করলে, খেতে হয়।

নানা প্রকারের খাবার ও ফল-সাজান কাঁসার বড় থালা হাতে লইয়া দিদি আবার আসিলেন।

—এত আমি খেতে পারব না, দিদি।

—খুব পারবে ভাই, আমি বসছি, তুমি গল্প করতে করতে খাও।

—বা, হরিসাধনের খাবার কই? আমরা ভাগাভাগি ক'রে খাই, কেমন।

—ও এখন খাবে, তাহলেই হয়েছে। ওর এখনও পূজো করা হয় নি।

নিমন্ত্রিত অতিথির মত বসিয়া অরুণকে সব খাবার খাইতে হইল। বিদায়ের সময় দিদি বলিলেন—মাঝে মাঝে এস ভাই।

হরিসাধনের গ্রন্থস্তূপ হইতে একখানি বই লইয়া অরুণ বলিল—এই বইখানি পড়তে নিচ্ছি।

—কি, ম্যাৎসিনির Duties of Man ("মানবের কর্ত্তব্য")। বইখানি তুমি পড় নি, নিয়ে যাও। বইখানি আমি রোজ খানিকটা পড়ি, চমৎকার বই।

—তাহ'লে ত বইখানি নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

—না, না, তুমি পড়। তা না হ'লে দুঃখিত হব।

অরুণকে হরিসাধন গলির মোড় পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। বলিল—দিদিকে কেমন লাগল? দিদি তাহার গর্ব্বের জিনিষ।

—এ রকম দিদি পাওয়া মহা সৌভাগ্য। খুব ভাল লাগল।

—তবে দিদির জীবন বড় দুঃখের, একদিন সে-গল্প তোমায় বলব। মাঝে মাঝে এস ভাই। ধার্ম্মিকদের, পুণ্যবতীদের ঈশ্বর এত দুঃখ দেন কেন জানি না। দিদি বলেন, তিনি দুঃখ দেন বলেই ত সব সময়ে তাঁর নাম করি, তাঁকে ভুলে যাই না।

পথে চলিতে চলিতে অরুণ ম্যাৎসিনীর বইখানি উল্টাইতে লাগিল, একটি লাইন তাহার চোখে পড়িল, Your first duties are to humanity.

৭

পরদিন প্রভাতে অরুণ অজয়দের বাড়ি গেল। চার-পাঁচ দিন কলিকাতায় আসিয়াছে, একবার অজয়দের বাড়ি যায় নাই, এ-কথা ভাবিয়া যেমন লজ্জিত তেমনই ভীত হইয়া উঠিল।

বাড়িতে ঢুকিতেই চন্দ্রা তাহার হাত ধরিয়া বলিল—অরুণদা, আমার ঝিনুক কই—ঝিনুক। এ মা, কি কালো হয়ে গেছ!

অরুণ লজ্জিত হইয়া বলিল—ঝিনুক ত আনা হয় নি, একেবারে ভুলে গেছি।

—কি ভোলা মন তোমার বাপু! তোমাকে নিয়ে পারা গেল না।

—আচ্ছা, একটা ভাল পুতুল কিনে দেব।

—পুতুল কে চায়! তার চেয়ে—আচ্ছা সে বলবখ'ন।

চন্দ্রা বুঝিল, একটি দামী উপহার আদায় করিবার এই মহাসুযোগ। কোন তুচ্ছ জিনিষের নাম হঠাৎ না বলিয়া, সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিতে চায়।

—জানো, দিদি স্কলারশিপ পেয়েছে, কলেজে ভর্ত্তি হবে, সব কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে অরুণ চন্দ্রার নিকট রায়-পরিবারের সকল খবর সংগ্রহ করিতে লাগিল।

উমা হাসিয়া বলিল—কি সৌভাগ্য, এতদিন পরে মনে পড়ল।

উমার হাসি অরুণের বড় ভাল লাগিল। সে ভয় করিয়াছিল, হয়ত উমা গম্ভীর মুখে কোন ব্যঙ্গ করিবে।

অরুণ হাল্কাস্বরে বলিল —বা এতদিন কি ?

—এসেছ ত পাঁচ দিন হ'ল। জানি।

—খবর ত সব ঠিক জান দেখছি।

—চাও ত পুরীর খবরও কিছু বলতে পারি।

আজ উমা কৌতুকময়ী, পরিহাসচঞ্চলা।

অরুণ গম্ভীরভাবে বলিল—পুরীর আবার খবর কি, চারিদিকে ধূ ধূ করছে বালি, আর সমুদ্রের তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে।

—তাই নাকি, নেকী মেয়েটির সঙ্গে খুব ত ভাব জমিয়েছিলে।

—মরুভূমিতে সঙ্গীর অভাবে মানুষ সিংহের সঙ্গেও ভাব করে। হার্টি কন্‌গ্রাচুলেশন্। কত টাকার স্কলারশিপ ?

—শোন, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। কলেজে আমি পড়বই। মা এক রকম রাজী হয়েছেন, কিন্তু বাবা আপত্তি করছেন।

—কেন ?

—সে আমি জানি না। তোমায় একটু বুঝিয়ে রাজী করতে হবে তাঁকে।

হেমবাবুর ইচ্ছা, কোন সুপাত্র দেখিয়া উমার শীঘ্র বিবাহ দেওয়া। তাঁহার শরীরের অবস্থা ত কিছুই বলা যায় না। উমা এখন বিবাহ করিতে চায় না। হেমবাবুর ভয়, কলেজে পড়িলে উমা আরও স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়া উঠিবে।

—চল, কি কি পড়ব, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। একটা খুব ভাল গান শিখেছি।

উমার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় এক বেতের চেয়ারে অরুণ বসিল। উমা একটি ছোট টুলে তাহার মুখোমুখি বসিল।

বর্ষার আকাশে মেঘ ও সূর্য্যালোকের লীলা। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি হয়, আবার ঝলমল আলোয় চারিদিক ভরিয়া যায়। এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে অরুণের অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়
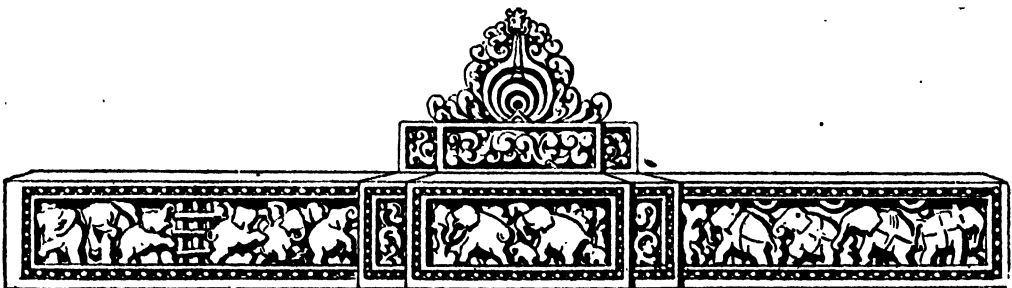
দাদূ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা। ৯ ইঞ্চি লম্বা ৫৫/৮ ইঞ্চি চৌড়া পৃষ্ঠার ৬৭৬+১৬ পৃষ্ঠা।

বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শাস্ত্রী, এম্-এ, মহাশয় এই গ্রন্থখানি লিখিয়া বাংলা-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য ও গৌরব বাড়াইয়াছেন এবং যাঁহারা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে উদার আধ্যাত্মিক উপদেশের ও ভক্তিপ্রসূত বাণীর সন্ধানে ফিরেন তাঁহাদিগকে আনন্দের একটি উৎস দেখাইয়া দিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। জড়বস্তুর উপমা দিয়া বলা মার্জ্জনীয় হইলে বলিতে হয়, ইহার গান, উপদেশ ও বাণী সমস্তই স্বর্ণরেণু ও হীরককণা।

ইহার সূচীপত্রই দশপৃষ্ঠাপরিমিত। তাহার পর রবীন্দ্রনাথের লেখা ১০ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি ভূমিকা আছে। তাহার নীচে লেখা আছে, "এই ভূমিকাটি ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল।" তাহার পর ক্ষিতিমোহন বাবুর নিজের লেখা ১১৬ পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা। ইহাতে জীবনী-পরিচয় ও দাদূর স্বকথিত সাধনার পরিচয় আছে। অতঃপর শিষ্যদের কাছে প্রাপ্ত দাদূর বর্ণনা, দাদূর বর্ণিত পূর্ব্ব ভাগবতগণ, দাদূর শিষ্যপরিচয়, দাদূসম্পর্কীয় গ্রন্থমালা ও বিশেষজ্ঞগণ, সাম্প্রদায়িক বর্গ ও সাধকবর্গ, দাদূসংগ্রহপরিচয়, উপক্রমণিকা পরিশিষ্ট (শূন্য ও সহজ), নিবেদন, দাদূবাণীর বহু অঙ্গে বিভক্ত প্রথম হইতে ষষ্ঠ প্রকরণ, সবদ (সঙ্গীত), প্রশ্নোত্তরী, মাধুকরী, পথের গান, সহজ ও শূন্য, সীমা ও অসীম, দাদূ ও রহীম খান খানা, ও তথনার সপ্তমত সম্বন্ধে ভক্ত তুলসীদাস, এবং সর্ব্বশেষে বিস্তৃত বর্ণানুসারে নামসূচী ও গানের সূচী আছে।

এই গ্রন্থটি রচনা করিবার নিমিত্ত ক্ষিতিমোহন বাবুকে নানা প্রদেশে, শহরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তের সহিত সদ্ভাব স্থাপন দ্বারা নানা উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বাড়িতে বসিয়া পরিশ্রম ত আছেই। গ্রন্থখানি বহুবর্ষব্যাপী দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম এবং আত্মিক সাধনার ফল।

দাদূর বাণী ও গান কিছু উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা দমন করিলাম—কারণ, বাছাই করিয়া ২।১টি উদ্ধৃত করা দুঃসাধ্য।

র. চ.

সরল ধাত্রীশিক্ষা ও কুমারতন্ত্র—শ্রীসুন্দরীমোহন দাস প্রণীত। সপ্তম সংস্করণ। প্রকাশক শ্রীপ্রেমানন্দ যোগানন্দ দাস, ৫৭।১।১এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০ মাত্র। পৃঃ ৮০+৩৭৭।

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের নাম বাংলা দেশে সুপরিচিত। ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যেরূপ গভীর, লেখার ভঙ্গীও সেইরূপ সরল ও চিত্তাকর্ষক। আলোচ্য পুস্তকখানির যে সপ্তম সংস্করণ হইয়াছে ইহাতেই সাধারণ্যে তাহা কিরূপ আদর লাভ করিয়াছে বুঝা যায়।

বর্ত্তমান সংস্করণে কয়েকটি অতিরিক্ত বিষয় দেওয়া হইয়াছে। বাঙালী মেয়েদের উপযোগী কয়েকটি ব্যায়াম দিয়া ডাঃ দাস বর্ত্তমান সংস্করণটিকে আরও উপযোগী করিয়াছেন।

বাংলা দেশে যে-সকল মহিলা ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন, অথচ যাঁহাদের পক্ষে ইংরেজী গ্রন্থ পড়া সম্ভব নয়, বিশেষ করিয়া তাঁহাদের পক্ষে ইহা অমূল্য গ্রন্থ হইয়াছে।

আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীশ্রীলোকনাথমাহাত্ম্য—শ্রীকেদারেশ্বর সেনগুপ্ত সঙ্কলিত। প্রকাশক রায়গুপ্ত এণ্ড কোং, ঢাকা। মূল্য ১৮০

বারদীর শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তাঁহার এক জন ভক্ত গুরুর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন প্রসঙ্গে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে লৌকিক, অলৌকিক অনেক কাহিনীই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মচারীর ভক্তগণ গ্রন্থটি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

হস্তরেখা বিচার—পণ্ডিত শ্রীসুধাসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য (জ্যোতি-রঞ্জন) প্রণীত। মূল্য ১।০।

এই পুস্তকে সহজেই হাত-দেখার প্রণালী চিত্র দিয়া বুঝান হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নিয়মের সমন্বয়ে অতি সরল ভাষায় হাত-দেখা শিক্ষার ও বিচারের এইরূপ উচ্চাঙ্গের পুস্তক অতি অল্পই বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থে পণ্ডিত মহাশয় অনেক নূতন বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে কোন্ ব্যক্তি কোন্ কার্য্যের উপযোগী কতকটা তাহা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে; সাংসারিক সুখ, ভাগ্য, ধন, মান, ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ লোকে যাহা জানিতে চায় তাহা ইহাতে সচিত্র হস্তের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সাধারণ পাঠকের পাঠোপযোগী হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

সুরের বীণ—শ্রীমতী সরোজিনী চৌধুরী প্রণীত গীতি-পুস্তক। প্রকাশক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, বি-এ, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা। মূল্য ৮০।

রচনাগুলিতে কথার মূল্য নিরূপণ করিবার অবসর নাই; সুরের নাম দেওয়া আছে, স্বরলিপি নাই, সেজন্য ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবারও উপায় নাই। মনে হয় সুরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গানগুলি ভালই হইবে।

বিদ্যুৎ—শ্রীআশালতা সেন প্রণীত কবিতা-পুস্তক। প্রকাশক শ্রীসুকৃতরঞ্জন গুপ্ত, অবিনাশ গুপ্ত এণ্ড সন্স, ৩, আসক লেন, ঢাকা। মূল্য পাঁচ সিকা।

প্রকাশক কিছু কিছু ছাপার ভুলের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন।

সুতরাং "আমার এ ছোট মালাগাছি আজি তাই, ব্যর্থ সাধকের গলায় পরাতে চাই," "সুখে আর দুঃখে দ্যুলোকে ভূলোকে", "হৃদয়-শোণিত নিঙারি তব সুধা যে করিল দান" কিংবা "হও আত্মভ্রষ্টা অনন্তশরণ দীপ্ত নিজ মহিমায়" প্রভৃতি যদি ছাপার ভুলের জন্ত হয় তাহা হইলে কবিকে প্রশংসা করিবার অবসর মিলে। কবির মনে সুর আছে, কিন্তু তাহা এখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠে নাই, অসাবধানতায় অনেক স্থলে ভাবের ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়াছে। 'কারায় বারো মাস' কবিতার কতকগুলি ঋতুর বর্ণনা খুব চমৎকার। 'শ্রী' কবিতাটিও সুখপাঠ্য।

তোমার অক্ষয় ঝাঁপি অফুরান বহে প্রসাধন
বিচিত্র তোমার আলিম্পন

প্রকৃত কবি-মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়।

পথভ্রষ্ট—শ্রীদেবানন্দ শর্ম্মা প্রণীত। শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ফরিদপুর পপুলার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থ একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। বিপ্লববাদ দেশের যুবক-সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করিয়া সর্ব্বনাশের পথে টানিতেছে, গ্রন্থকার ইহা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। একটা বিশেষ নীতিকে নাটকের আবরণে প্রচার করিতে চাহিলে, নাটকের যে পরিণতি ঘটে, আলোচ্য গ্রন্থে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নাটকীয় পাত্র পাত্রী সকলেই যেন এক-এক জন প্রচারক, নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিবার জন্ত তাহারা সাহিত্যের রাজপথে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, ফলে কোন চরিত্রই স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কোন চরিত্রেই নাটকীয় মহিমা বা সৌন্দর্য্য বিকাশ লাভ করে নাই। পুস্তকের গানগুলি মোটেই ভাল হয় নাই এবং পুস্তকের ভাষাও অসঙ্গত ভাবোচ্ছ্বাসের দরুন বিরক্তিকর এবং প্রায় সর্ব্বত্রই নিতান্ত আড়ষ্ট।

শ্রী কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

তাঁর চিঠি—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ সংকলিত। প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পোঃ সৎসঙ্গ, পাবনা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০৭ পৃঃ, মূল্য ১।৹ টাকা।

বইখানার নাম শুনিয়া অনেকের মনে হইতে পারে, হয়ত বা কোন বাল-বিধবা অকাল-বৈধব্যে সান্ত্বনা পাইবার জন্ত স্বামীর সঞ্চিত চিঠিগুলি সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাহা নয়। ইহাতে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কতকগুলি চিঠি পাবনা সৎসঙ্গের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সংকলিত হইয়াছে। গুরুর নাম গ্রহণ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ; তাই বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে গোড়াতেই সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

সংকলয়িতা ভূমিকায় লিখিতেছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের এক একখানি চিঠি আলোক-বর্ত্তিকার মত কিরূপে কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা ছাড়া ভাষায় বুঝান অসম্ভব।" 'যতীন দা'—নামক এক জন শিষ্যকে ঠাকুর লিখিতেছেন, "যদি কম আয়াসে —কে ৪।৫ হাজার টাকা একযোগে দিতে পারেন, দেবেন, দেখবেন মন যেন তার জন্ত বিধ্বস্ত না হয় এই আমার কথা।" (২৮ পৃঃ)। যার জন্ত ঠাকুর টাকা চাহিতেছেন, তার নামটি এখানে উহ্য; তবে, বর্ত্তিকার আলো স্পষ্ট। সংকলয়িতা আরও লিখিতেছেন, "জীবনের গূঢ় মুহূর্ত্তে তাঁর অমৃত লেখনী-নিঃসৃত প্রত্যেকটি চিঠি যেন জীবন্ত আবির্ভাব।" সুবোধ নামক একটি শিষ্যকে ঠাকুর লিখিতেছেন, "তোমার থাকা খাওয়া যেন চিরদিন থাকে—তাঁর পাওয়াও যেন তোমার কাছে চিরদিন থাকে আর এ পাওয়াটা যেন ইংরাজি মাসের ৫ই-৭ইর ভিতর পাওয়াই যায়।" (৩৭ পৃঃ)। ভূমিকারই আর এক স্থানে সংকলয়িতা বলিতেছেন, "যেরূপ অবস্থার জন্ত চিঠিগুলি লিখিত তাহা যেন সেই-সেই অবস্থার আর্ত্ত মানবের জন্তে আশা, উদ্দীপনার সুরে চিরন্তন কালের জন্ত tuned হইয়া আছে।" উদাহরণ, খলিল নামক একটি মুসলমান জিজ্ঞাসুকে ঠাকুর লিখিতেছেন, "ভাই, হামেসা চিঠি লিখো, আর সময় পেলেই আসতে চেষ্টা ক'রো। আর এই সময় মাকে Initiate করতে পারলে বড়ই ভাল হ'ত মনে হয়।" (৯৪ পৃঃ)।

ঠাকুরের ভাষায় দু-একটি সাঙ্কেতিক চিহ্নও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, "আমার আন্তরিক R. S. ও আলিঙ্গন জানবেন।" (১২ পৃঃ) R. S. মানে কি? বোধ হয়, Radhaswami (রাধাস্বামী)। কারণ, স্থানান্তরে এই শব্দটিও ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—"আমার রাধাস্বামী জেনো, আর সৎসঙ্গীকে দিও।" (২৬ পৃঃ)। এই 'রাধাস্বামী' আবার সংক্ষিপ্ত হইয়া বাংলায় শুধু 'রা' হইয়া থাকেন। যথা—"আমার আন্তরিক রা—জানবেন।" (৩০৫ পৃঃ)। 'রা' 'রাধাস্বামী' ও 'R. S.'—একুনে এ কয়টি শব্দের অর্থ কি? বোধ হয় 'ভালবাসা'; কারণ, রাধাস্বামী (কৃষ্ণ) ভালবাসার অবতার!

বন্দনা-নামক একটি শিষ্যাকে 'তৃষ্ণাক্লিষ্ট' ঠাকুর লিখিতেছেন, "আমি বোধ হয় এমনতর ভালবাসা পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে বা ভাগ্য নিয়ে জন্মি নাই না বন্দনা?" (৮৩ পৃঃ) সত্য হইলে বড়ই দুর্দ্দৈব, সন্দেহ নাই!

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কেলিস্ ডিরেক্টারী ১৯৩৫—কেলিস্ ডিরেক্টারী লিমিটেড, ১৮৬ ষ্ট্রাণ্ড, লণ্ডন।

কেলিস্ ডিরেক্টারী লিমিটেড কোম্পানি ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় হইতে ইঁহারা নানারকমের ডিরেক্টারী প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য ডিরেক্টারীর মধ্যে জগতের নানা দেশের শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক ও জাহাজ কোম্পানি যত আছে তাহাদের লইয়া ইঁহারা একটি স্বতন্ত্র ডিরেক্টারী প্রকাশ করিতেছেন। ইহার নাম—*Kelly's Directory of Merchants, Manufacturers & Shippers of the World, 1935.* ইহা দ্বারা বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-পরিচালনায় বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য ও বিজ্ঞাপনও ইহাতে মুদ্রিত হয়। স্বদেশের ও বিদেশের ব্যবসায়গত নানা তথ্য এই একখানি ডিরেক্টারীতে সম্যক পাওয়া যাইবে। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

য.

ইথিয়োপিয়ার সমর-সজ্জা

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল, এম-এ

বিশ্ব-জাতি-সঙ্ঘ যে কিরূপ অক্ষম, তাহা চীন ও জাপান এবং আবিসীনিয়া ও ইতালীর বিবাদ-মীমাংসা করিতে তাহার অসামর্থ্য এবং যথাক্রমে জাপান ও জার্মেনীর রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভ্য-পদ ত্যাগ ও নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের অসাফল্য প্রভৃতি ব্যাপার হইতে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে। গত বৈশাখ সংখ্যার প্রবাসীতে আবিসীনিয়ায় এই ইউরোপীয় শক্তিবর্গের পরিস্থিতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল, যে, জাতি-সঙ্ঘের মধ্যস্থতায় আবিসীনিয়া ও ইতালীর মধ্যে বিবাদের উপর যবনিকাপাত হইয়াছে, কিন্তু যথার্থই বিবাদ-ভঞ্জনের

রস-তফারীর রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে: সিংহাসনারূঢ় সম্রাজ্ঞী

কোনও লক্ষণ অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই ; অধিকন্তু দুই দেশের মধ্যে শত্রুতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয় এবং উভয়েই পূর্ণ উদ্যমে সমরায়োজনে ব্যাপৃত। লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ যে আগামী শরৎকালের মধ্যে আবিসীনিয়ায় সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে এবং এই বিষয়েই নাকি লাভাল ও এণ্টনি ইডেনের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। যাহা হউক,

বহু স্বাভাবিক সম্পদে সমৃদ্ধ আবিসীনিয়া বা ইথিয়োপিয়া প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় রাষ্ট্রদের মধ্যে অন্যতম। বর্ত্তমান ইথিয়োপিয়ার সম্রাট জুদার বীরকেশরী হেল সেলাসী পৌরাণিক যুগের রাজ্ঞী শেবার বংশধর বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। ইউরোপের বহু রাষ্ট্রের লোলুপদৃষ্টি আফ্রিকায় কৃষ্ণকায় জাতির এই একমাত্র স্বাধীন রাজ্যের

রস-তফারীর রাজ্যাভিষেক

সাড়ে-সাত ফুট লম্বা ড্রাম-মেজর

উভয় পক্ষের কেহই আপোষে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে না পারায় অগত্যা আবিসীনিয়ার সম্রাট এই ব্যাপারে জাতি-সঙ্ঘকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার ইচ্ছা, নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা একটি কমিশন গঠিত হয় এবং এই কমিশন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উভয় দলের মতামত সংগ্রহ করিয়া তাহা জাতি-সঙ্ঘে পেশ করেন; তাহাতে জাতি-সঙ্ঘ যাহা স্থির করিবেন তাহাই মানিতে হইবে। আবিসীনিয়ার এই প্রস্তাবে ইতালী বিশেষরূপে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল; এরূপ হইলে জার্ম্মেনী ও জাপানের ন্যায় ইতালীও জাতি-সঙ্ঘ ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। প্যারিসে অবস্থিত আবিসীনিয়ার রাজদূত এই ব্যাপারের উপর মন্তব্য করিয়া জাতি-সঙ্ঘে নিম্নলিখিত বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন—

"Since the Ethiopian Government's appeal to the League of Nations the situation has gone from bad to worse, and agression upon the independence and integrity of Ethiopia seems to be imminent."

অর্থাৎ, জাতি-সঙ্ঘের নিকট আবিসীনিয়ার আবেদনের পর হইতেই ঘটনা খুবই খারাপ হইয়াছে এবং ইহাতে ইতালীর আবিসীনিয়া আক্রমণ করা অনিবার্য্য রূপে সম্ভবপর হইবে।

ইডেন ও মুসোলিনীর সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে ইতালীর পররাষ্ট্র-বিভাগের এক বিশিষ্ট অফিসার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে আবিসীনিয়া ইতালীকে হুমকী দেখাইবে না এইরূপ কিছু না-হওয়া পর্য্যন্ত ইতালী তাহার উপনিবেশ হইতে সৈন্যদল

সরাইয়া লইতে পারে না বা লইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে হেগ্-স্থিত অন্তর্জাতিক বিচারালয়ে এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য যে কমিশন বসিতেছে মূল বিরোধের মীমাংসা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। এই কমিশনও ব্যর্থ হইয়াছে। ইহা হইতে অনায়াসে প্রতীয়মান হয় যে আবিসীনিয়া-সম্পর্কে ইতালীর জেদের অন্ত নাই।

রিক্তপদে সম্পূর্ণ আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রবিভূষিত হাবসী সৈন্য

লণ্ডনের "মর্ণিং-পোষ্ট" নামক সংবাদপত্র বলিয়াছে যে আবিসীনিয়ায় "প্রোটেক্‌টোরেট" স্থাপনের অধিকার ব্যতীত ইতালী সন্তুষ্ট হইবে না। ইতালীর প্রধান উদ্দেশ্য, ইরিট্রিয়া ও আদিস-আবাবার পশ্চিমে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া রেলপথ প্রতিষ্ঠা করা এবং দ্বিতীয়তঃ হাবসীদের রাষ্ট্র-শাসন ব্যাপারে ইতালীয় পরামর্শদাতা-নিয়োগের কথা; সম্রাট তফারী এই দুই প্রস্তাবের কোনটিতেই সম্মত নহেন। "ডেলী টেলিগ্রাফ" বলিয়াছে যে মরোক্কোর আদর্শে সেলাসীকে নামে মাত্র রাজা রাখিয়া সামরিক প্রোটেক্‌টোরেট স্থাপন করাই ইতালীর একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহা হউক এইরূপ কোন অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ইতালীর সামরিক আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। কাগলিয়ারী হইতে সৈন্যদল নিয়মিতভাবে যাত্রা করিতেছে; দুইটি কাল-কোর্ত্তা বাহিনীকে নেপলসের নিকট শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রেরণ করা হইবে। বর্ত্তমানে ইরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে প্রায় ৪০,০০০ ইতালীয় সৈন্য আছে; ইহা ব্যতীত মুসোলিনী আরও ৫৮,০০০ সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছেন; শোনা যায়, লক্ষ লক্ষ ইতালীয় সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে। কিন্তু ইতালীর ঔপনিবেশিক সহকারী-সচিব এ্যালেসান্‌ড্রো অন্যরূপ বলিয়াছেন,
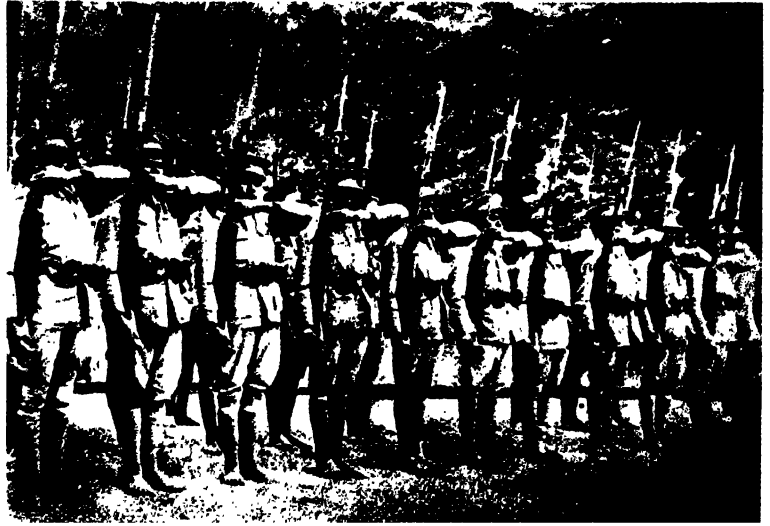
সম্রাটের অশ্বারোহী সৈন্যগণ

'It is a problem of vast importance embracing the whole European civilizing mission, not merely security for our own lands.'

অর্থাৎ, আফ্রিকায় শুধু আমাদের অধিকার কিরূপে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় আবিসীনিয়ার ব্যাপারটি সেই সংক্রান্ত নহে, সমগ্র ইউরোপের সভ্যতা-প্রচারক জাতিদের ইহা একটি ভাবিবার বিষয় এবং তাহাদেরই ইহার নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য।

সম্রাটের দেহ-রক্ষী

অন্য দিকে আবিসীনিয়ার অনাড়ম্বর সমরায়োজনের কাহিনী নিরপেক্ষ বৈদেশিক সংবাদপত্রসমূহে বর্ণিত হইতেছে; আমেরিকার এক জন সাংবাদিক কিছুদিন পূর্ব্বে রস-তফারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথায় বহু বিষয় আলোচিত হয়; তাহার কিয়দংশ অবিকৃত ভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন—

"A Belgian military officer barked hoarse commands. In the dusty, walled courtyard outside Emperor Haile

সম্রাটের রাজনীতি-বিশারদ মন্ত্রীমণ্ডলী

Selassie's rambling stone palace barefoot natives shuffled a slovenly drill."

অর্থাৎ, আবিসীনিয়ার বেলজিয়ান সৈন্যাধ্যক্ষ কর্কশ কণ্ঠে সৈন্যদলকে প্রস্তুতের আদেশ দিলেন। সম্রাট হেল সেলাসীর পাষাণ-প্রাসাদের বহির্ভাগে ধূলিধূসর ভূখণ্ডে রিক্তপদ হাবসীগণ শৃঙ্খলাহীন ভাবে ড্রিল করিতে সমবেত হইল।

ইহার দুই দিন পরে তিনি দেখিয়াছেন জিবুতি হইতে রেলযোগে বেলজিয়াম ও চেকোস্লোভাকিয়ার নিকট হইতে ৪০০ মেশিন-গান্, ২০,০০০ বন্দুক ও ৬,০০০,০০০ গুলী আমদানী করা হইতেছে। সম্রাট তাঁহাকে বলিয়াছেন,

বেলজিয়ামের মেজর পোলেট সম্রাটের সৈন্যগণকে শিক্ষা দেন

স্ত্রী ও পুরুষ সকলকেই অস্ত্র-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে বটে কিন্তু কৃষ্ণকায় হাবসী মাতারা প্রধানতঃ শুশ্রূষাকারিণীর

কার্য্য করিবেন ("the ebony-coloured matrons will stay in the rear and act as nurses")। সমরায়োজনের কথার মধ্যে সম্রাট সহসা কিরূপ চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এই সাংবাদিকের বর্ণনা হইতে তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইবে।*

ইউরোপ হইতে গোলা-বারুদ আমদানী করা হইতেছে

এদিকে ইতালী-আবিসীনিয়ার বিরোধ উপলক্ষ্য করিয়া অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রবর্গের মধ্যেও যথেষ্ট চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ইংরেজগণ তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চলের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়া বিবাদ-মীমাংসা করিতে চাহিয়াছিলেন; ইতালী তাহাতে রাজী হয় নাই। সম্রাট হেল সেলাসীও কৌশলে যুক্ত-রাষ্ট্রের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। মুসোলিনী-ইডেন ও জাতি-সঙ্ঘের সম্পাদক এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিবের মধ্যে এই সংক্রান্ত অনেক গোপনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। শুনা যায়, এতদঞ্চলে ইংরেজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অপ্রত্যক্ষভাবে আবিসীনিয়াকে সাহায্য করিতেছেন।* কোনও ফরাসীপত্র ঘোষণা করিয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে যে "আরবের লরেন্সে"র মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে সেই লরেন্স না-কি এখনও জীবিত আছেন এবং ব্রিটিশ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া না-কি হাবসীদিগকে উত্তেজিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছেন। শোনা যায়, ফ্রান্সও না-কি ইতালীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে এবং ইতালীর রাজ্য-প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধক হইবে না।†

গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষগণ

* "The gold-flecked brown eyes of Haile Selassie, glinted angrily; 'Abyssinia', he rasped in French, never will accept a state of unofficial war, such as occurred when Japan carried out her operations in Manchuria We will resist immediately."

অর্থাৎ, "সম্রাট হেল সেলাসীর চক্ষুর্দ্বয় রাগে জ্বলিতে লাগিল। ফরাসী ভাষায় তিনি বলিলেন, আবিসীনিয়া জাপান-মাঞ্চুরিয়া সংঘর্ষের ন্যায় কোনও বে-সরকারী যুদ্ধ-বিগ্রহ কিছুতেই মানিয়া লইবে না। আমরা সমুচিত বাধা দিবই দিব।"

* এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ইতালীর কোনও সংবাদপত্র এক তীব্র মন্তব্য করিয়াছে—

'If it is war Britain is looking for instead of peace, she can have it' *Otobre* (October) blared. 'In a few hours we would destroy all the defenses of Malta and make it an uninhabitable rock.'—*News-week.*

"'অটোবর' লিখিয়াছে, যদি ব্রিটেন শান্তির পরিবর্ত্তে যুদ্ধ চায় ত তাহাই হউক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা মালটা-দ্বীপ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে একটি অ-বাসোপযোগী পাষাণ-স্তূপে পরিণত করিব।"

† "The newspaper (ফ্রান্সের সরকারী পত্র *The Temps*) characterized Italian expansion in Africa as legitimate." —*News-week.*

"ফরাসী দেশের টেম্প্‌স্ নামক সংবাদ-পত্র সংবাদ দিতেছেন যে ফরাসীরা আফ্রিকায় ইতালীর প্রসার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত করেন।"

ঢাল ও বর্ষাধারী নগ্নপদ হাবসী সৈন্য

কথাবার্ত্তার মধ্যেও উভয় পক্ষই যথাযথ ভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন।

আবিসীনিয়া না-কি সমরায়োজনে অধিকতর উৎসাহী বলিয়া মুসোলিনী স্থির করিয়াছেন যে আবিসীনিয়ার সীমান্তে আরও সৈন্য সমাবেশ করিতে হইবে। তদনুসারে আরও হাজার হাজার সৈন্যের তলব হইয়াছে। সম্ভবতঃ নয় লক্ষ সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। মুসোলিনী আপনার বিমান-পোতে চড়িয়া ইরিট্রিয়া গমন করিবেন ও স্বয়ং সৈন্য-পরিদর্শন ও সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বিখ্যাত আল্লাইনী সৈন্যদলকে আফ্রিকায় পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী ১৫ হাজার লোককে মজুত রাখা হইয়াছে এবং ১০ খানি সাবমেরিন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। বোমাবর্ষণকারী তিন শত বিমানপোত শীঘ্রই আফ্রিকায় রওনা হইবে। উক্ত বিমানপোতগুলি সহকারী-সমরসচিব জেনারেল ভালির অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইবে; বিমানপথ হইতে আবিসীনিয়াকে অনায়াসে বিপর্য্যস্ত

আমেরিকার পররাষ্ট্র-বিভাগের সচিব মিঃ ফিলিপ আমেরিকার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন; শান্তির মধ্যে এই বিবাদের মীমাংসা হউক ইহা তাঁহাদের অভিপ্রায়; এই ঘটনা প্রধানতঃ ইউরোপীয় সমস্যা; সুতরাং ইহাতে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না। সেক্রেটরী কর্ডেল হালও ইউরোপীয় প্রতিনিধিবর্গের সহিত এই বিষয়েরই না-কি আলোচনা করিয়াছেন। জাপানও আবিসীনিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। তবুও কিছুদিন পূর্ব্বে এই দুই দেশের মধ্যে যে বৈবাহিক-সম্বন্ধ ঘনীভূত হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা ইউরোপীয় শক্তিবর্গের বিরোধিতায় ছিন্ন হইয়াছে এবং জাপ-সম্রাটের হাবসীদের প্রতি যে সহানুভূতির কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সরকারীভাবে অস্বীকৃত হইয়াছে। প্রকাশ্যভাবে জাপানের নিকট হইতে সম্রাট অস্ত্র-আমদানীর জন্য চুক্তি করিয়াছেন; বোধ হয় সেই জন্য জাপানের বিখ্যাত "ব্ল্যাক ড্রাগন" সমিতি মুসোলিনীর পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন; তাহারই ফলে ইতালী না-কি একটু দমিয়া গিয়াছে এবং রাষ্ট্র-সঙ্ঘের মধ্যস্থতা মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছে। তথাপি বর্ত্তমানে মীমাংসার

স্থানীয় গভর্ণর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত 'ইর্‌রেগুলার' সৈন্যগণ সম্রাটের আহ্বানে সৈন্যদলে যোগ দিয়াছে। ইহারা ইউরোপীয় যুদ্ধ-প্রথায় অশিক্ষিত

ফ্লোরেন্সের রাজপ্রাসাদ হইতে মুসোলিনী ফাসিষ্ট সম্প্রদায়কে সম্ভাষণ করিতেছেন

করিবার পরিকল্পনায় এই নীতি অবলম্বিত হইতেছে। এমন কি যত সৈন্যের প্রয়োজন হইবে, তত সৈন্য আফ্রিকায় প্রেরিত হইবে বলিয়া মুসোলিনী ঘোষণা করিয়াছেন।*

অন্য দিকে আবিসীনিয়ার সম্রাট তারযোগে "নিউইয়র্ক টাইম্‌স" পত্রে জানাইয়াছেন যে আক্রান্ত হইলে আবিসীনিয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিবে। সম্রাটের জ্ঞাতি-ভগিনী প্রিন্সেস হেস্‌লা টামান্না বর্ত্তমানে নিউইয়র্কে অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন গত ছয় বৎসর ধরিয়া আবিসীনিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে; গিরি-গহ্বরে ও সুড়ঙ্গ-পথে প্রচুর বিস্ফোরক দ্রব্য লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে। মালভূমির স্থানে-স্থানে. গভীর গর্ত্ত ও পরিখা খনন করা হইয়াছে। বিমানপোতে আক্রান্ত হইলে ইহার মধ্যে আশ্রয় লওয়া হইবে। স্বয়ং শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন ও সাত লক্ষ সেনা পরিচালনা করিবেন।

* তিন শত সিনেটরকে সম্বোধন করিয়া মুসোলিনী বলিয়াছেন "...But I wish to add immediately in the most explicit and solemn manner that we will send out all the soldiers we believe necessary."

অর্থাৎ, আমি পরিষ্কার কথায় আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি যে যত সৈন্যের প্রয়োজন হইবে আমরা আফ্রিকায় তত সৈন্য প্রেরণ করিব।
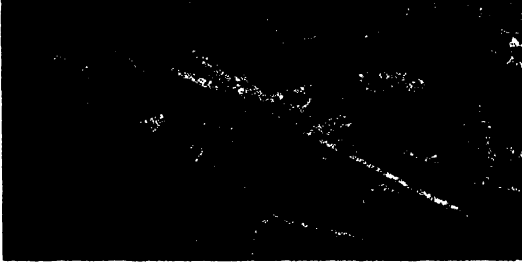
হাবসী-সৈন্যেরা মেশিন-গান চালনা শিখিতেছে

হাবসী সম্ভ্রান্ত নেতাদের সৈন্যগণও সম্রাটের আহ্বানে যোগ দিয়াছে। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া সম্রাট ঘোষণা করিয়াছেন যে ক্রীতদাসরূপে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই বরণীয়। যুদ্ধ সংঘটিত হইলে আবিসীনিয়ার শেষ অধিবাসীটি পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে। সম্রাট তফারী বলিয়াছেন—

"Soldiers, follow the example of your warrior ancestors and young and old, united, face the invader. Your sovereign will be among you and will not hesitate to shed his blood if necessary for Ethiopia and her independence."

অর্থাৎ, "সৈন্যগণ, তোমরা তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের বীরত্বকাহিনী অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধ ও যুবক সম্মিলিতভাবে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হও; তোমাদের সম্রাট তোমাদের সঙ্গেই থাকিবেন এবং প্রয়োজন হইলে ইথিয়োপিয়ার স্বাধীনতারক্ষাকল্পে আপনার শোণিতদানে কুণ্ঠিত হইবেন না।"

স্বর্গীয়া মনোরমা দেবীর আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

[গত ১০ই শ্রাবণ ৪৩ নং ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট ভবনে স্বর্গীয়া শ্রীমতী মনোরমা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান তাঁহার স্বামী ও তাঁহার পুত্রকন্যা পুত্রবধূ জামাতা পৌত্রী ও দৌহিত্রীগণের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। তাহার অঙ্গস্বরূপ শ্রীমতী মনোরমা দেবীর প্রিয় কয়েকটি গান গীত হয়। তাহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মাতৃদেবীর সম্বন্ধে তাঁহার ও তাঁহার ভাইভগিনীদের লিখিত কিছু জীবনকথা পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভগবচ্চরণে প্রার্থনা নিবেদন করেন। তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্র ও ভক্তবাণী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে ও তাঁহার সঙ্গীদিগের দ্বারা কীর্ত্তনের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।]

উদ্বোধন

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

যিনি চরিত্রগুণে, সেবাগুণে, স্নেহ-ভালবাসার গুণে, এই শোকার্ত্ত সন্তানগণের, পতির ও বন্ধুজনের জীবন যেন ক্রয় করিয়া গিয়াছেন, যিনি গৃহিণীরূপে, গৃহের সম্রাজ্ঞীরূপে, এবং তদপেক্ষাও পবিত্রতর যে সহধর্ম্মিণীর পদ, সেই সহধর্ম্মিণীরূপে সুদীর্ঘ কাল আমাদের পূজনীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি লইয়া সকলে এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

পৃথিবীতে থাকিতে যিনি এই গৃহের আলোকস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ ছিলেন, আজ তিনি অদেহী আত্মাগণের সঙ্গে, দেবদেবীগণের সঙ্গে, জ্যোতির্ম্ময় আত্মারূপে বিদ্যমান। কিন্তু তিনি দূরে নহেন। দেহে থাকিতে তাঁহার হাস্যময়ী আনন্দময়ী মূর্ত্তি এই গৃহের সকলকে সুখী রাখিত, সকলের সেবাতে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিত; এক সময়ে তাঁহার সেই হাস্যময়ী আনন্দময়ী মূর্ত্তি আমাদের সকলের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের বিষয় ছিল। আজ তিনি তাঁহার অশরীরী চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে এখানে উপস্থিত হইয়া প্রিয়জনকে প্রীতি ও সন্তানগণকে স্নেহ দান করিতেছেন, বন্ধুজনকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। এক দিকে কোমলতা ও প্রফুল্লতা, অপর দিকে সাহস, স্বাধীনতা ও দৃঢ়তা—এই উভয় গুণের সমাবেশে ভূষিত তাঁহার আত্মা, এখন দেহের বাধা হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত। চক্ষু এখন তাঁহাকে দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার চিন্ময় উপস্থিতি সত্য। কর্ণ এখন তাঁহার স্বর শুনিতে পায় না বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা হইতে প্রীতি স্নেহের আবেগ, ভালবাসার ঝলক এই পৃথিবীর প্রিয়জনদের দিকে আসিতেছে, ইহা সত্য। আমাদের মুখের কথা তাঁহার কাছে বলিবার উপায় নাই বটে;

কিন্তু হৃদয় তাঁহাকে যাহা কিছু বলিতে চায়, যত দুঃখ, আনন্দ, আশা, ভয়, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, প্রাণের যত কিছু কথা নিবেদন করিতে চায়, সে-সকল তাঁহার অশরীরী আত্মাকে গিয়া স্পর্শ করিবে, ইহা সত্য। দেহ নাই ইহা সত্য বটে; কিন্তু দেহ নাই, এ কথা স্মরণ করিবার দিন আজ নয়। আত্মা আছেন, আত্মা আমাদের কাছেই আছেন, আত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন অক্ষুণ্ণ আছে, এখন হইতে আত্মার মধ্য দিয়া হৃদয়ের যোগ অনুভব করিব, ও রক্ষা করিব, এ আশা আমাদের প্রাণে আছে,—এ জন্যই আজিকার এ অনুষ্ঠান।

মৃত্যু এক নূতন জীবন। যিনি এখান হইতে চলিয়া গেলেন, তাঁহার পক্ষে নূতন জীবন। দেবদেবীগণ যে লোকে বিহার করেন, সেখানে তাঁহার নূতন জীবন হইল; শরীরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি নূতন, চিন্তা নূতন, ভাব নূতন, কর্ত্তব্য নূতন হইল। পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ নূতন হইল।

কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীতে থাকেন, তাঁহাদের জন্যও প্রত্যেক মৃত্যু যেন নূতন জীবন আনিয়া দেয়। ভক্তেরা, কবিরা, অনুভব করেন, সেই জীবনদেবতা তাঁহার নানা বিধির দ্বারা আমাদের এই জীবনেই কত জন্মজন্মান্তর ঘটাইয়া দেন। তাঁহার এই কন্যাকেও তিনি, বাল্যে পিতামাতার স্নেহের দ্বারা, যৌবনে পতির ভালবাসার দ্বারা, সন্তানগণের প্রতি নিজ স্নেহের দ্বারা, সংসারের নানা দায়িত্ব বহনের দ্বারা, সন্তান-বিয়োগের ও দুঃখ-সংগ্রামের দ্বারা, কত ভাবে যেন এই পৃথিবীতেই নব নব জন্ম দান করিয়াছিলেন। আবার এখন এই পরিবার হইতে **তাঁহাকে** তুলিয়া লইয়া, তাঁহার প্রিয়জনদের পার্থিব জীবনকে তিনি কত নবীভূত করিয়া দিতেছেন। গৃহের প্রত্যেক বস্তু, যাহা তিনি স্পর্শ করিয়াছিলেন, ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আজ কত পবিত্র মনে হইতেছে। গৃহের শিশুগুলি তাঁহার স্নেহের ধন বলিয়া তাহাদের আরও ভাল করিয়া ভালবাসিবার জন্য, স্নেহ দিবার জন্য, মন উৎসুক হইতেছে। ঘরের যত কাজ পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে একত্রে করা হইয়াছে, সে-সকলের মধ্যে মন, এখন তাঁহার সঙ্গ চায়, ও তাঁহার চিন্ময় সঙ্গ লাভ করে। প্রত্যেক কাজে 'তোমার মনের মত হইতেছে কি না' বার-বার মন এ কথা জিজ্ঞাসা করে। তিনি এই পৃথিবীর যে-যে স্থানে, যে-যে গ্রামে নগরে বাস করিয়াছেন, যে-যে স্থানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, সেই সেই স্থান এখন তাঁহার আত্মীয়গণের নিকটে পবিত্র স্মৃতিতে পূর্ণ হইয়া কত প্রিয় হইবে। যে দামোদর নদ পার হইবার সময় বন্যার মধ্যেও তাঁহার চিত্ত অকম্পিত ছিল, সেই দামোদর এখন তাঁহার স্মৃতিতে জড়িত হইয়া যেন তীর্থে পরিণত হইবে। মৃত্যুর স্পর্শে আমাদের হৃদয় অধিক কোমল হয়, পৃথিবীর ভালবাসাগুলির প্রভাব মনের উপর অধিক প্রবল হয়, মানুষের মূল্য মন অধিক অনুভব করে, জীবনের গভীরতা বর্দ্ধিত হয়।

জীবনের উপরে শোক যেন এক নূতন রঙের আলোক আনিয়া দেয়। এই শোকের শিক্ষা, জীবনে এই নূতন ভাব, নূতন আলো, সযত্নে গ্রহণ ও সযত্নে রক্ষা করিতে হয়। আমাদের জীবনের প্রভু যিনি, ইহপরলোকের জীবনের এক দেবতা যিনি, তাঁহারই প্রেমের বিধিতে শোকের মধ্য দিয়া আমরা এই নূতন ভাব, নূতন আলো পাই। আজ এই গৃহে তাঁহার সেই আলো পড়িয়াছে। গোধূলির ঈষৎ-ছায়াযুক্ত গম্ভীর আলোর মত, পবিত্র শোকের গম্ভীর বর্ণ, এই গৃহের সকল বস্তুকে, সকল হৃদয়কে, ব্যাপ্ত করিয়াছে। এ সময়ে তিনি সকলের প্রাণে তাঁহার পবিত্র স্পর্শ দিন। আত্মার সত্যতা, অমরলোকের সত্যতা, আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধের চিরন্তন সত্যতা, এ সকলের অনুভূতি প্রাণে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, পরলোকের ঐ পবিত্র গম্ভীর আলোকে হৃদয়গুলিকে উদ্ভাসিত করিয়া, তিনি এখন আমাদিগকে তাঁহার উপাসনার জন্য প্রস্তুত করিয়া লউন। পরলোকস্থ ভক্ত আত্মাগণ, দেবাত্মাগণ, আমাদের সহায় হউন। যাঁহাকে লইয়া আমাদের এ পবিত্র অনুষ্ঠান, তিনি স্বয়ং আমাদের সহায় হউন। তাঁহার প্রিয় সঙ্গীত আমরা গান করি। পৃথিবী আনন্দময়, মধুময়; আমাদের জীবনধারা অবিরাম গতিতে সেই পরম প্রেমময়ের সুখাসাগরের সন্ধানে চলিয়াছে,—তাঁহার প্রিয় এই সকল অনুভূতির দ্বারা আমরা আমাদের হৃদয় পূর্ণ করি। তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

অতঃপর তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করেন।

[ইহার পরের সঙ্গীত, "নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে।"]

শেষ প্রার্থনা

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হে পরম মঙ্গলময়, তোমার ভক্তেরা বলিয়াছেন, মৃত্যু দেহী আত্মার জন্য মুক্ততর রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেয়; মৃত্যু আবার সেই মুক্ত দ্বার দিয়া আমাদের জন্য সেই রাজ্যের জ্যোতি, সেই রাজ্যের বার্ত্তা আনিয়া দেয়। দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যিনি এখন তোমার ক্রোড়ে বিহার করিতেছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের এই শ্রদ্ধা নিবেদন তাঁহার আত্মাকে স্পর্শ করুক, তাঁহাকে একটু তৃপ্তি দান করুক। আজ শুধু সেই একটি আত্মাকে নয়, পরলোকস্থ সকল পূজ্য আত্মাকে, সমুদয় সাধুভক্তকে, সমুদয় পিতৃপুরুষকে, আমরা হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাঁহাদের দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া, তোমার মুখ-জ্যোতিতে জীবিত থাকিয়া, আমাদের এই প্রিয়জনের নূতন জীবন নিত্য আনন্দে, শান্তিতে পূর্ণ থাকুক, আমাদের সঙ্গে তাঁহার আত্মার যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকুক। আমরা অন্তরে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি ও তাঁহার সান্নিধ্য-অনুভূতি রক্ষা করিয়া যেন আমাদের সংসারের সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি, আমাদিগকে তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীমতী মনোরমা দেবী

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীসীতা দেবী
শ্রীশান্তা দেবী শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

জীবমাত্রেরই সংসারের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অবলম্বন মা। সুতরাং জননীকে মানুষ যে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলেছে, এর ভিতর অত্যুক্তি কিছু নেই। হয়ত সকল স্নেহশীল সন্তানই মনে করে যে তার মায়ের তুল্য মা পৃথিবীতে আর হয় নি। সেটা মনে করা স্বাভাবিক। তাই আজ আমাদের মায়ের সঙ্গে কোনো মায়ের তুলনা করব না; কেবল আমাদের হৃদয়ের যতটুকু ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি তাঁর গুণবর্ণনায় আপনা হতে প্রকাশিত হবে, তাতে বাধা দেব না। মায়ের সম্বন্ধে যেটা নিজেদের দিকের কথা তা সমাজকে জানান সম্ভব নয়, জানাবার চেষ্টাও করব না। যে কথা বললে সমাজের লোক মাকে একটু ভাল করে চিন্‌বেন সেই কথাই একটু বল্‌তে চাই। শৈশব হ'তে মাতা, পত্নী ও গৃহিণী রূপে তাঁর যে ছবি মনে আঁকা হয়ে আছে, তারই কয়েকটি আভাস খুলে দেখাতে চেষ্টা করব। কিন্তু যেমন ক'রে বলা উচিত, তেমন ক'রে বলবার ক্ষমতা আমাদের নেই, সুতরাং আমাদের অঙ্কিত তাঁর চিত্র অসম্পূর্ণ বলেই ধরতে হবে।

আমাদের মা শ্রীমতী মনোরমা দেবী বাঁকুড়া জেলার কুমারডাঙ্গা গ্রামনিবাসী স্বর্গগত হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। বাংলা দেশে কন্যার উপর কন্যা জন্মালে তার আদর-যত্ন বড় হয় না। কিন্তু আমাদের মা বল্‌তেন যে যদিও তাঁর পিতার পাঁচ-ছয়টি কন্যা-সন্তান পরে পরে জন্মগ্রহণ করেছিল তবুও তিনি পিতৃস্নেহে কন্যাদের সর্ব্বদা ঘিরে রাখতেন; নিজে কখনও তাঁদের এক দিনের জন্যও অনাদর করেন নি, অন্য কেউ করলে ক্রুদ্ধ হ'তেন। মার কাছে শুনেছি তাঁর তৃতীয়া ভগ্নীর জন্মের পর আত্মীয়েরা তাঁর নাম 'ক্ষান্তমণি'-জাতীয় রাখতে চেয়েছিলেন। তাতে দাদামশায় রাগ ক'রে তার নাম জ্যোতির্ম্ময়ী রেখেছিলেন। পৈত্রিক সে গুণ আমাদের মা পরিপূর্ণ রূপে পেয়েছিলেন; কারণ পুত্রশোকের আঘাতে শেষজীবনে যখন সংসারের সকল কিছুই তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখনও পুত্রকন্যা, পৌত্রী-দৌহিত্রী ও অন্যান্য প্রিয়জনকে তিনি অহর্নিশি সকল অমঙ্গল হ'তে রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। আমাদের নিজেদের কিংবা আমাদের সন্তানদের কোন সামান্যতম অসুস্থতার সংবাদ ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারলে মার চাঞ্চল্যের সীমা থাকৃত না, তিনি আহার নিদ্রা সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে তাকে আগলে ব'সে থাকৃতে চাইতেন, এবং পৃথিবীর যত সম্ভব ও অসম্ভব কারণ খুঁজে বেড়াতেন এই অসুস্থতার জন্য। তাই আমরা আজকাল বাড়িতে কারুর কিছু হ'লে প্রাণপণে চেষ্টা

করতাম মার কাছ থেকে সে খবর গোপন রাখবার জন্য। কিন্তু তাতেও নিস্তার ছিল না। মার অভিমান ও রাগ গর্জ্জে উঠত যখন তিনি শুনতেন যে তাঁর কাছ থেকে কারুর অসুস্থতার কথা গোপন করা হয়েছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমাকে ত কেউ কিছুই বলে না, আমি করব কি ক'রে কারুর জন্যে?" যখন শরীর ভাল ছিল তখন মা তাঁর পুত্রকন্যাদের অসুখবিসুখে একলা রাতের পর রাত জেগে সেবা করতেন। তাঁর কষ্টসহিষ্ণুতা আশ্চর্য্য ছিল।

তিনি স্বজনের বা পরের দুঃখকষ্ট লাঘবের চেষ্টা চিরদিন করেছিলেন, কিন্তু নিজে শোকে দুঃখে ভগ্ন দেহ-মনের অবস্থাতেও কখনও কাতরতা দেখান নি, বা অন্যের কাছে সাহায্য বা সান্ত্বনা চান নি। শোকে সংসারের যত সুখ ত্যাগ করেছিলেন, তা ত্যাগ করবেন বলেই করেছিলেন, গ্রহণ করবার ক্ষমতার অভাবে করেন নি। মার মনে ভীরুতা বা দৌর্ব্বল্যের স্থান ছিল না।

শেষ বিদায়ের সময়েও তিনি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে হেসেছিলেন পৌত্রী ও দৌহিত্রীদের মুখের দিকে চেয়ে। তাদের হাতের দেওয়া ফুল যাবার কয়েক ঘণ্টা আগে নিজের চুলে নিজেই পরেছিলেন; বলেছিলেন, "নাতনীর দেওয়া শাড়ীটা আমায় পরিয়ে দাও।"

মানুষের শৈশবের স্মৃতির কেন্দ্র সর্ব্বদাই তার মা। তাই আজ সেই বিগত দিনের দিকে যখন চোখ ফেরাই, ছবির পর ছবি মনের দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে ওঠে। তার ভিতর মায়ের মূর্ত্তিটাই সব চেয়ে স্পষ্ট আর বড়। সন্তানের কাছে সেগুলির মূল্য মায়ের ছবি বলেই, কিন্তু অন্যের কাছে খুলে ধরলেও তার খানিকটা মূল্য আছে। যাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে আমরা আজ এসেছি, তাঁর মধ্যে কি বিশিষ্টতা যে ছিল, তা এই ছবিগুলির ভিতর দিয়ে খুব স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায়।

যখন আমরা খুব ছোট, তখন আমাদের ভারি একটা গর্ব্বের বিষয় ছিল, আমাদের মায়ের সৌন্দর্য্য। তিনি যে আর সকলের চেয়ে বেশী সুন্দরী এবং সুকেশী, এ ধারণায় কেউ আঘাত দিলে আমরা মর্ম্মান্তিক চটে যেতাম, সে কথা এখনও মনে পড়ে। তাঁর কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্ব মিষ্টতাও ছিল আমাদের আর এক গর্ব্বের জিনিষ। কিছু বড় হবার পর মায়ের সম্বন্ধে গর্ব্ব করবার আর একটি জিনিষ আমরা আবিষ্কার করেছিলাম, সেটি তাঁর সাহস। বাঙালীর মেয়ের ভীরুতার অপবাদ মা সম্পূর্ণ মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন করতে পেরেছিলেন।

বাবা বলেন, "তোমাদের মাকে আমি যখন প্রথম (তাঁহার ১৬।১৭ বৎসর বয়সে) কলিকাতায় লইয়া আসি, তখন বাঁকুড়া পর্য্যন্ত বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে হয় নাই। আমরা একখানি গরুর গাড়ীতে বাঁকুড়া হইতে রাণীগঞ্জে আসিয়াছিলাম প্রায় ১৫ ক্রোশ। রাণীগঞ্জে পৌঁছিবার ঠিক আগেই দামোদর পার হইতে হয়। দামোদরে কখন কখন হঠাৎ বন্যা হয়—বিশেষতঃ বর্ষার প্রারম্ভে। আমিও গ্রীষ্মের ছুটির পর বর্ষার প্রারম্ভেই তাহাকে কলিকাতা আনিতেছিলাম। দামোদরে গাড়ী নামিবার পর নদীর জল অল্প অল্প বাড়তে লাগিল। যখন নদীগর্ভে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন উভয় সঙ্কট—অগ্রসর হইলেও বিপদ না-হইলেও বিপদ হইতে পারে। জল গাড়ীর চাকার অর্দ্ধেকের উপর ডুবাইয়াছে। ক্রমশঃ গাড়ীর উপরে যে খড় ও বিছানা পাতা ছিল, তাহাও ভিজিতে আরম্ভ হইল। যাহা হউক, কোন প্রকারে দ্রুত গাড়ী চালাইয়া আমরা তীরে পৌঁছিলাম। তাহার পূর্ব্বেই কিন্তু চাকা দুটা প্রায় সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছিল ও বিছানা ভিজিয়া গিয়াছিল। আমরা ডাঙ্গায় উঠিতেই দেখিলাম, বন্যা খুব বেশী বাড়িয়া গেল। নদীগর্ভে আমরা দু-জন এবং গাড়োয়ান ও বলদ জোড়াটি ছাড়া আর কেহ সাহায্য করিবার ছিল না। কিন্তু তোমাদের মা বিচলিত, ভীত বা উদ্বিগ্ন হন নাই।"

৪০ বৎসর আগে মেয়েদের পথে-ঘাটে একলা চলা অভ্যাস ছিল না, এবং তখন রেলের লোকেরা এখনকার চেয়ে অশিষ্ট ছিল। এই সময় মা একবার পূজার ছুটিতে দুটি দুগ্ধপোষ্য শিশু নিয়ে চুণার যাচ্ছিলেন। ছুটির ভীড়ে বাবা ট্রেনে উঠতে পারেন নি। কাজেই নিকটবর্ত্তী একটা ষ্টেশনে মাকে ষ্টেশন-মাষ্টারকে ও গার্ডকে টেলিগ্রাম করেন। মা সেই ষ্টেশনে শিশুদের নিয়ে নামেন এবং লগেজ ইত্যাদি নামান এবং বাবার অপেক্ষায় অনেক রাত্রে অনেক ঘণ্টা ষ্টেশনে বসে থাকেন। মা তাতে ভয় পান নি।

এলাহাবাদে প্রায় ২৫ বৎসর আগে যে বিরাট প্রদর্শনী হয়,

আমরা মা বাবার সঙ্গে তা দেখতে গিয়েছিলাম। একদিন দেখবার সময় এক জন বিশাল আকৃতি পঞ্জাবী পাঠান অসাবধানতা কিংবা অশিষ্টতার জন্য তাঁর এক কন্যার শাড়ী পা দিয়ে মাড়িয়েছিল। মা তাকে দুই একবার সরে যেতে বলেন। সে না সরাতে মা তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন। সেদিন সঙ্গে অভিভাবক কেউ ছিলেন না।

সেই বৎসরই এক ভদ্রপরিবারের সঙ্গে আমরা আগ্রা দেখতে গিয়েছিলাম; বাবা সঙ্গে ছিলেন না। একদিন রাত্রে বাসা-বাড়িতে চোর আসে। মা সেই অচেনা দেশে অজানা নূতন বাড়িতে রাত্রে উঠে চোরদের তাড়াতে যান। চোরেরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

মার নিজেরই যে শুধু সাহস ছিল তা নয়, অন্যের সাহসকেও তিনি উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে জান্‌তেন। তাঁর মামার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার এক অরণ্যসঙ্কুল গ্রামে। শহর থেকে অনেক মাইল পায়ে হেঁটে মা তাঁর মামাদের সঙ্গে শৈশবে সেই জামজুড়ি গ্রামে যেতেন। সেখানে পথে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। এই পথে জামজুড়ির গোয়ালার মেয়েরা দুধ নিয়ে শহরে বেচতে যেত, এবং ভালুকের সঙ্গে মুখোমুখি হ'লে কি আশ্চর্য্য সাহস এবং উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বিপদ থেকে মুক্ত হ'ত, তার বর্ণনা মায়ের মুখে সহস্রবার শুনেছি। তাঁর দিদিমা প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে কি রকম লাঠি হাতে ক'রে বাঘের আক্রমণ থেকে নিজের গোয়ালের গরুবাছুর রক্ষা করতে গিয়েছিলেন, তার গল্পও মা খুব গর্ব্বের সঙ্গে করতেন।

বিপদের মুখে হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়াকে মা অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। নিজে কখনও সঙ্কটকালে বুদ্ধি হারান নি, এটা আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করেছি। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা যখন ছয় মাসের শিশু, তখন মা এক বার বাঁকুড়া যাচ্ছিলেন। বাবা সঙ্গে ছিলেন না, এক জন বন্ধু অভিভাবক রূপে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। তখন দামোদরে বন্যা এসেছে। মা শিশুদের নিয়ে যে নৌকায় উঠলেন তাতে অসম্ভব ভীড় হ'ল, এবং লোকজনের ঠেলাঠেলিতে এক জন জলে পড়ে গেল। সামনেই মা শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন। লোকটি প্রাণের দায়ে সেই শিশুরই একখানা হাত ধরে ফেল্‌ল। মা যদি তখন উপস্থিতবুদ্ধি হারাতেন, তা হ'লে শিশুকন্যাকে বাঁচান যেত না, কারণ সেই লোকটির টানে শিশুটিও জলে পড়ে যাচ্ছিল। নৌকাসুদ্ধ লোক যখন হৈ চৈ করতে ব্যস্ত, মা তখন মেয়েকে বাঁচাবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে নিজেই প্রাণপণে সেই লোকটিকে ধরে রাখলেন। তখন অন্য লোকেরা সাহায্য করতে এগিয়ে এল এবং তাকে জল থেকে তুলে ফেল্‌ল। মা'র বয়স তখন ২২ বৎসর মাত্র।

এলাহাবাদে কখন কখন এমন বাড়িতে আমরা বাস করেছি, যার ধারে কাছে জনমনুষ্যের বসতি নেই। তদুপরি সাপ, হায়েনা, চোর, ডাকাত প্রভৃতির উৎপাত যথেষ্ট ছিল। এমন স্থানেও মাকে কখন বুদ্ধি হারাতে দেখি নি, বা ভয় পেতে দেখি নি। একটা বাড়িতে আমরা, বাবার এক বন্ধুপরিবারবর্গ ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে, একত্র থাকতাম। একদিন রাত্রে উঠানে একটা বড় সাপ বেরোনোতে বাড়ির সকলে চেঁচামেচি ক'রে উঠলেন। মা ঘরের ভিতর ছিলেন, তাড়াতাড়ি একটা বিছানার চাদর আর দেশলাই হাতে ক'রে বার হয়ে এলেন। পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ঐদুটি জিনিষ তিনি কেন নিয়ে এসেছিলেন। মা বল্‌লেন, "অন্ধকার রাত্রি, চোখে ত কিছু দেখা যায় না; তাই ভেবেছিলাম চাদরটায় আগুন লাগিয়ে দেব, যদি দরকার হয়। তা হ'লে সব স্পষ্ট দেখা যাবে।"

সাহসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাও তাঁর স্বভাবে প্রচুর পরিমাণে ছিল। কারও দেখাদেখি কোন কাজ করাকে তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তিনি যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সকল দিক দিয়েই সমর্থ, তা সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। ঝি-চাকর ছেড়ে গেলে তখনই তার জায়গায় অন্য লোক রাখতে ভালবাসতেন না। বল্‌তেন, "ওরা না হলেও যে আমার সংসার অচল হবে না, তা সবাই দেখুক।"

অথচ আজকালকার দিনের মত চাকরদাসীকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের একটা যন্ত্র মাত্র তিনি মনে করতেন না। যারা তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে, সেই সব ঝি-চাকরকে মা চিরদিন মনে করে ভালবাসতেন। 'মাতাভিখ' ব'লে মা'র এক জন চাকর ছিল। সে কি রকম প্রভুভক্ত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিল এবং তার কি রকম সময়জ্ঞান ছিল, মা তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধবের কাছে সে গল্প করতেন। ৩৫ বৎসর আগে গণেশ মহারাজ বলে মা'র এক পাচক ছিল। সে গত বৎসর

শ্রীমতী মনোরমা দেবী

শ্রীমতী মনোরমা দেবী

শ্রীমতী মনোরমা দেবী

কলকাতায় এসেই মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। মা যখন এলাহাবাদ ছেড়ে আসেন তখন মার গোয়ালিনী বড়ই দুঃখে কাতর হয়ে বলেছিল, "মা-জী যদি (এলাহাবাদের নিকটেই যমুনার পরপারে) নইনী পর্য্যন্ত যেতেন, ত আমি দুধ দিয়ে আস্তাম; কিন্তু কলকাতা পর্য্যন্ত ত যেতে পারব না।"

গণেশ মহারাজের ছোট একটি মেয়ে ছিল। সে রোজ সকালে আমাদের সঙ্গে বাটি নিয়ে দুধ সুজি খেতে বস্ত, মার নিজের ছেলেমেয়েদের মত সমানে সমানে। এই শিশুটির কচি মুখের গল্প শুনতে এবং তা পরকে শোনাতে মা খুব ভাল বাসতেন।

আমাদের মাতুল বলেন যে যখনই তাঁরা দেশ থেকে আসতেন প্রতিবারই মা তাঁর বাপের বাড়ি ও মামাবাড়ির গ্রামের সব লোকের কথা, এমন কি খয়রা, বাউরীদের কথাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। কারুর অসুখ কি মৃত্যুর কথা শুনলে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে শোক প্রকাশ করতেন। কুমারডাঙ্গার গঙ্গা পরামাণিক নামে এক ব্যক্তির চিকিৎসা করাবার সঙ্গতি ছিল না; মা তার চিকিৎসার জন্য অনেক ঔষধ মামার হাতে পাঠিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনেও মা তাঁর ছোট ভাইকে গ্রামের সকলের ও অতি শৈশবের সঙ্গিনীদের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন।

আমাদের স্নেহশীলা মা যখন সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্র হয়েছিলেন তখন যে তাঁর সন্তানসেবা, পতিসেবা ও বাৎসল্যের সীমা থাক্‌বে না তা সহজেই বোঝা যায়। যখন আমরা তিন জন অতিশিশু তখনই আমাদের বাবা বাংলা দেশ ছেড়ে দূর প্রবাসে প্রয়াগধামে চলে যান। তারও অনেক আগে ছেলেমেয়েদের জন্মের পূর্ব্বেই বাবা যখন ব্রাহ্মসমাজে আসেন, তখনই পনের-যোল বৎসর বয়সে বাবার আদর্শকে সত্য ব'লে বুঝে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সাহায্য করবার জন্য মা বাবার সঙ্গে বাঁকুড়া থেকে কল্‌কাতায় চলে আসেন। এতে দেশে তাঁর খুব নিন্দা হয়েছিল। কিন্তু জ্ঞাতিরা যদিও ভেবেছিলেন যে মা বাবার সমস্ত টাকা একলা ভোগ করতে কল্‌কাতা গিয়েছেন, তবু দেখা গিয়েছিল এখানে মা নিজেদের জন্য নিজে রন্ধনাদি ক'রে উদ্বৃত্ত টাকা বাঁকুড়ার সংসারে পাঠাতেন। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে মা তিনটি শিশু-সন্তান নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে প্রয়াগে কাহারও সাহায্যের আশা না রেখে গিয়েছিলেন। বন্ধুজনে মাকে অযাচিত সাহায্য যে কেউ করেন নি তা নয়, কিন্তু মা কখনও কাহারও সাহায্যভিক্ষা করেন নি। তিনি ছ'টি সন্তানকে মানুষ করেছিলেন শুধু স্তন্য দিয়ে নয়, তাদের সকল প্রয়োজন, সকল অভাব মিটিয়ে। সে দেশে বছরের মধ্যে তখন ছ-মাস রাঁধুনী পাওয়া যেত না, কাজেই ছ-মাস ধ'রে মার হাতের রান্নাই বাড়ির সকলে দু-বেলা খেয়েছি। শুধু যে আমরা খেয়েছি তা নয়, তখনকার দিনে আতিথ্যকে মানুষ একটা অবশ্যকর্ত্তব্য বলেই জান্‌ত ব'লে আমাদের বাড়িতে সারা বছরই অতিথির ধুম লেগে থাক্‌ত। বাঙালী, মরাঠা, পঞ্জাবী, সিন্ধী, হিন্দু মুসলমান কত বন্ধু-বান্ধব যে আমাদের সাদাসিধা গৃহস্থালীর ভিতর এসে মার সযত্ন সেবা গ্রহণ ক'রে গেছেন বলা যায় না। তাঁরা ধনী লক্ষপতি কি দরিদ্র ভবঘুরে, গৃহী কি সন্ন্যাসী, একক কি সপরিবার, মা তার বিচার করতেন না, সকলকে সমানভাবে স্বামী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে একই অন্ন পরিবেশন ক'রে একই ভাবে যত্ন করেছেন। তাঁর সঙ্গে পুত্র-কন্যাদেরও সেবা করতে শেখাতেন। কত বন্ধু আমাদের গৃহে তিন-চার মাস ছ-মাস পর্য্যন্ত শুধু পরম আত্মীয়ের মত নয়, পরম আত্মীয় হয়ে গিয়ে থেকেছেন। মা তাতে এতটুকু অসন্তুষ্ট ত হনই নি, তাঁদের চিরদিনের মত আপনার ক'রে রাখতেই চেয়েছেন। মনে আছে এমন অনেক অতিথি আমাদের বাড়ি এসেছেন, যাঁদের পরবার দ্বিতীয় বস্ত্র নেই, গায়ের একটা কম্বল নেই। সে-সব অতিথির প্রতিও মা কখন বিমুখ হন নি। তাঁরা অশোভন আচরণ করলেও মা সেটা হাসি গল্প ক'রে উড়িয়ে দিতেন।

আমাদের বাবা দরিদ্র ছিলেন না, তাঁর অবস্থা সচ্ছলই ছিল। তবু মা মিতব্যয়িতা পছন্দ করতেন ব'লে ছেলেবেলা আমরা আধুনিক জীবনযাত্রার আড়ম্বর জান্‌তাম না। মা'র সংসারের সহস্র কাজের ভিতর মা তাঁর ছেলেমেয়েদের সকলের পরিচ্ছদ নিজের হাতেই সেলাই ক'রে দিতেন, তাঁর একটা সেলাইয়ের কল পর্য্যন্ত বহু দিন ছিল না। মা'র হাতের একটি-একটি ক'রে ফোঁড়-তোলা জামাকাপড় আমরা তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পরেছি। দরজির সেলাই কালেভদ্রে পেতাম। নিজের সংসারের খরচ বাঁচিয়ে মা যেটুকু সঞ্চয় করতেন, তা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির আত্মীয়-স্বজন কত লোকের

সাহায্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। আমরা যখন অতি শিশু তখনই মা আমাদেরও মাসে চার আনা আট আনা পয়সা দিয়ে সঞ্চয় করতে শেখাতেন। সেই পয়সা জমে টাকা হ'লে আমাদের বল্‌তেন দুর্ভিক্ষ, স্বদেশী-প্রচার প্রভৃতি কাজে নিজেদের নামে দান করতে।

মা শিশুকালে বাঁকুড়ার পিত্রালয়ে এবং বিবাহের পর সেখানেই এক বাঙালী পাদ্রীর স্ত্রীর কাছে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন। তিনি সাত বৎসর বয়সে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তেন এবং তাঁর ভগিনী ও সঙ্গিনীদের রামায়ণ-জ্ঞানের পরীক্ষা নিতেন, এ গল্প তাঁর মুখে শুনেছি। আমাদের পিতামহ বাবার পনর-ষোল বৎসর বয়সে মা'র সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এর পর কোনো কোনো ধনী পরিবারে মা'র বিবাহের কথা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের মাতামহী, পিতামহের কথা স্মরণ ক'রে এবং বোধ হয় মা'রও ইচ্ছা তাই বুঝে অন্যত্র মা'র বিবাহ দিতে রাজি হন নি। মা নিজেই আমাদের কাছে এ গল্প করেছিলেন। বারো-তের বৎসর মাত্র বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। কিছুকাল পরে বাবা নিজে তাঁকে বাংলা অনেক দূর পর্য্যন্ত পড়িয়েছিলেন এবং ইংরেজীও কতকগুলি বই পড়িয়েছিলেন। এ ছাড়া আমরা শিশুকালে এলাহাবাদে মাকে মিস রডরিক নামের এক জন মিশনরী মেমের কাছে পড়তে এবং মিস ল্যাংলি ব'লে অন্য এক জন মেমের কাছে বাজনা শিখতে দেখেছি। মা নিজের চেষ্টায় হিন্দী শিখেছিলেন, এবং হিন্দী বেশ ভাল ব্যাকরণসঙ্গত বলতে পারতেন, উচ্চারণ ঠিক্ হিন্দুস্থানী মহিলাদের মত হ'ত।

আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে তিন জন বোধ হয় মা'র কাছেই বাংলা ও ইংরেজী প্রথম পাঠ করতে শিখেছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেও মা তাঁর প্রথম পৌত্রীকে বাংলা লিখতে ও পড়তে শেখাতেন। নাতনীদের গান শেখানো ও ছবি আঁকতে শেখানো তাঁর একটা খুব প্রিয় কাজ ছিল।

হিন্দী পড়ার অভ্যাস মা কলকাতা আসার পরও কিছু রেখেছিলেন। তিনি তুলসীদাসকৃত রামায়ণ পড়তেন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় এলাহাবাদে যে উর্দ্দু শিখেছিলেন ও কয়েকখানা উর্দ্দু বই পড়েছিলেন, কলকাতায় আসার পর তার চর্চ্চা ছিল না। তিনি কলকাতায়, স্বাস্থ্যভঙ্গের পর, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কিছু সংস্কৃত শিখেছিলেন এবং কালিদাসের মূল শকুন্তলা পড়তেন ও বুঝতে পারতেন।

রোগশয্যায় শুয়ে মা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রবিবাবুর এই বৎসরে প্রকাশিত বইগুলি কতক পড়েছিলেন।

আমরা শিশুকালে জ্ঞান হবার পর দিদিমাকে দেখি নি, ঠাকুরমাকেও অতি অল্প দিনই কাছে পেয়েছি। কিন্তু দিদিমা ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনা পুতুল খেলা আমাদের হয় নি ব'লে আমরা এ বিষয়ে একেবারে বঞ্চিত ছিলাম না। আজ পর্য্যন্ত যত উপকথা ব্রতকথা শুনেছি, যত যাত্রাগান গ্রাম্য ছড়া মনে পড়ে, তার প্রায় সমস্তই মা আমাদের ছেলেবেলায় শত শত বার শুনিয়েছেন। মাটির পুতুল ময়দার পুতুল গড়ে মা আমাদের সঙ্গে সকল কাজের মধ্যেও নিত্য শিশু হয়ে খেলা করেছেন; চার-পাঁচ মাস আগে পর্য্যন্ত সেই সব গল্প গান ছড়া মা সুবিধা পেলেই তাঁর নাতনীদের শোনাতেন। পুরাতন স্বদেশীসঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীতের কত গান মা তাঁর সুমধুর কণ্ঠে ভাবের সহিত আমাদের গেয়ে শুনিয়েছেন।

মা স্বাভাবিক অতি মধুর কণ্ঠ, কল্পনাশক্তি, কবিত্বশক্তি ও তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন। যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা পেলে এবং জীবনসংগ্রামে ও শোকে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে না পড়লে মা সুগায়িকা এবং সম্ভবতঃ সুলেখিকা নাম রেখে যেতে পারতেন। তাঁর গল্প করবার ও গল্প বলবার ক্ষমতা আশ্চর্য্য ছিল। নিজ জীবনের কত ছোট ছোট স্মৃতিকথাকে তিনি যে তাঁর দরদমাখা প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-বন্ধুর কাছে জীবন্ত ক'রে তুলতেন তা বলা যায় না। এখনও সে-সব গল্প মনে হ'লে মনে হয় যেন মাকে আমরাও শিশুবেশে পুকুরে, বাগানে, জঙ্গলে, কড়াইসুঁটির ক্ষেতে খেলা ক'রে বেড়াতে দেখেছি। মা তাঁর মাসী, মামী, ঠাকুরমা, দিদিমা, মামা, জ্যেঠা সকলকার কথা আমাদের কাছে এমন ক'রে বলতেন যেন তাঁরা সকলেই এই খানিক আগে এখানে ঘুরে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর বহু অসম্পূর্ণ রচনার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালবাসবার এবং অতি নিকটে অনুভব করবার যে স্বাভাবিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা সুলেখক ব'লে পরিচিত বহু লোকের নেই। সুশৃঙ্খল ক'রে সাজানোর এবং চিরাচরিত বাঁধাধরা পদ্ধতির অনুসরণ করার চেষ্টা তাঁর লেখায়

ছিল না ব'লে তা ছাপানো হয় নি। সতের-আঠারো বৎসর আগে শান্তিনিকেতনে "শ্রেয়সী" ব'লে একটি হাতের লেখা কাগজ ছিল। তাতে মায়ের লেখা দু-একটি আছে বোধ হয়। এ ছাড়া তাঁর একটি ভাল কবিতা ছাপানো হয়েছিল সেটি তিনি প্রায় ৩১।৩২ বৎসর আগে তাঁর এক শিশুপুত্রের মৃত্যুতে লিখেছিলেন। তিনি প্রকৃতির ক্রোড়ে বাঁকুড়া জেলা'র স্বাভাবিক বন্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে শৈশব কাটিয়েছিলেন, যৌবনে প্রয়াগধামের গঙ্গাযমুনার ত্রিবেণীধারার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পান করেছিলেন এবং সমস্ত মন দিয়ে তাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর অসম্পূর্ণ রচনাবলী হ'তে তা বোঝা যায়। কিন্তু বিধাতা তাঁর জীবনে কঠোর সংগ্রাম যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই লিখেছিলেন বলেই হয়ত তাঁর স্বাভাবিক শক্তিগুলি বিকশিত হয় নি। আমাদের বাবা যখন যৌবনকালে উপবীত ত্যাগ করেন, তখনই মাত্র পনর-ষোল বৎসর বয়স থেকে মা উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীর মত বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সকল সংগ্রামে সমানে শক্তি দিয়ে এসেছেন। মনে পড়ে শিশুকালে দেখেছি মা বাবার কথাকে বেদবাক্যের মত সত্য ব'লে মনে করতেন এবং বাবার বিরুদ্ধতা যারা একতিলও করেছে, তাদের দিকে কখনও প্রসন্ন মনে তাকাতেনও না। কাজেই তিনি যে বাবার বহু দিকে সংস্কারপ্রবণ মনের সর্ব্বপ্রধান সহায় হবেন, তা সহজেই বোঝা যায়। মার মুখে তাঁর যে-সব নির্য্যাতনের ইতিহাস শুনেছি, তাতে মনে হয়, এই সময় অনেক দিকে দৈহিক ও মানসিক দুঃখ বাবার চেয়ে মাকেই বেশী পেতে হয়েছে। আমাদের পিতামহী মাকে ভালবাসতেন এবং জ্ঞাতিরা বাবাকে 'ত্যাজ্যপুত্র' করতে বলাতে কিছুতেই রাজি হন নি। কিন্তু তবুও এই সময় মাকে অপরের হাতে বহু দুঃখ পেতে হয়েছিল। ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র হয়েও মা নির্যাতনে দমেন নি, আপন সত্য হ'তে এক চুল বিচলিত হন নি। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁর যে অদম্য জেদ দেখেছি, সেটা তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠারই রূপান্তর মাত্র।

মা'র সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা মনে হয় যেন অন্য সকল প্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রবল ছিল। অন্যের অসৎ বা অন্যায় আচরণ যেমন তিনি সহ্য করতে পারতেন না, তেমনই তাঁর নিজের আচরণ ও ব্যবহারের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের ব্যতিক্রম হ'তে দিতেন না। তিনি দৃঢ়চিত্ত ও জেদী ছিলেন—কিন্তু তাঁর কোনও কার্য্যে বা সংকল্পে সত্য বা ন্যায়ের অতিক্রম হ'তে পারে, তা বুঝলে সে কার্য্য বা সংকল্প সেই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করতেন।

বাবার সততা ও সাধুতা বিষয়ে মা'র কিরূপ উচ্চ ধারণা ছিল, তাঁর রসবোধের একটি গল্প হ'তে বোঝা যায়। মা একবার আমাদের বলেছিলেন, "জানিস্, তোদের বাবার বন্ধুদের একটা সভা আছে, সেখানে সবাই নিজেদের নিজেদের দোষ স্বীকার করে। সভার দিনে সব চেয়ে বেশী পাপী কে হয় জানিস ?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কে ?"

মা বললেন, "কে আবার ? তোদের বাবা !"

এই কথা ব'লে মা হেসে লুটিয়ে পড়লেন।

প্রথম যুগের সংগ্রামের পর এলাহাবাদে মা কিছুকাল তাঁর স্বাভাবিক আনন্দময় জীবন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর আরম্ভ হ'ল আরও নূতন নূতন সংগ্রামের পালা। এগুলি আমাদের নিজেদের চোখে দেখা।

স্বদেশী আন্দোলনের দু-বছর আড়াই বছর পরে বাবা চাকুরী ছেড়ে দেন এবং স্থির করেন যে এর পর আর পরের চাকুরি করবেন না। তখন আমরা পাঁচ ভাই বোন খুব ছোট ছোট, সকলের শিক্ষাও আরম্ভ হয় নি। বাবা ধনীর সন্তান ছিলেন না, তাঁর হাতে এমন কিছু উদ্বৃত্ত সঞ্চিত টাকা ছিল না, যাতে চাকুরি ছাড়া একটি মাসও সংসার চলতে পারে। শুধু মা কিছু সঞ্চয় ক'রে বাঁকুড়ায় একটি বাড়ি কিনে রেখেছিলেন। তবু নিঃস্ব অবস্থায় বাবার চাকুরিতে ইস্তফা দেওয়ায় মা বিন্দুমাত্রও আপত্তি করেন নি—সম্মতি দিয়েছিলেন। কলেজ কমিটির সঙ্গে মতান্তর হওয়াতে বাবা চাকরি ছেড়ে দেন। তাই সত্যবাদিতা, আদর্শানুসারিত্ব, ন্যায়পরায়ণত্ব ও স্বাধীনচিত্ততা রক্ষা করবার জন্য বাবা যে-কোনো অসুবিধা বা বিপদে পড়ুন না কেন, মা তার সম্মুখীন হ'তে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। 'প্রবাসী' কাগজ কিছুদিন আগেই বেরিয়েছিল, চাকুরি ছাড়ার পর বাবা মডার্ন রিভিয়ু বার করেন। এই কাগজ দুটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে এদেরই সাহায্যে সংসার নির্ব্বাহ করার চেষ্টা করা হ'বে স্থির হ'ল। বাবা বলেন, আমাদের মা'র চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বাবলম্বন ছাড়া এই কাগজ দুটির কোনোটিই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হ'তে পারত না।

আমরা এলাহাবাদ ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম। সেখানে তিন-চার বিঘা জমিওয়ালা বাড়িতে সর্ব্বদা চাকর-দাসী রেখেই মা'র থাকা অভ্যাস ছিল। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যও ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারতেন। যদিও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তিনি ছিলেন না, তবু দারিদ্র্যের মধ্যেও কখনও তিনি থাকেন নি। কিন্তু এখানে এসে মা দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হবে ধরে নিলেন। তাই প্রথম থেকেই তিনি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ছোট একখানি বাড়ি নিয়ে সামান্য ঠিকা ঝি ও রাঁধুনী রেখে সকল বিষয়ে ব্যয়সংক্ষেপ ক'রে চলতে লাগলেন। যাতে স্বামীকে ঋণে জড়িত হ'তে না হয়, তাই তিনি এত সাবধানে চলতেন। কিন্তু এই ব্যয়-সংক্ষেপের কষ্ট তাঁর জীবনে তাঁকে কোনো দুঃখই দিতে পারে নি। তিনি আপনার প্রিয়জনদের শান্তি, সম্মান ও শিক্ষাকে আর্থিক সুখের চেয়ে অনেক বড় মনে করতেন। তাই যখন ওই বাড়িতেই আফিস খুলে বাবার নিজস্ব কারবার সুরু হ'ল, তখন সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যের উপর মা আফিসের যাবতীয় কাজ তদারক করতে আরম্ভ করলেন। প্রথম যখন প্রয়াগে 'প্রবাসী' বাহির হয় এবং পরে মডার্ণ রিভিয়ু বাহির হয় তখন থেকেই মা আফিসের কাজে কিছু কিছু সাহায্য করতেন। এমন কি তাঁর সন্তানরা একটু বড় হ'তে-না-হ'তেই তাদের দিয়েও কাগজের মোড়কে টিকিট লাগানো, দড়ি বাঁধা প্রভৃতি অতি ছোট কাজগুলি করিয়ে নিতেন। বাবা বলেন, যে, আমাদের মায়ের ঈশ্বরের উপর নির্ভর, সত্য ও ন্যায়ে অনুরাগ, দেশভক্তি ও তাঁর (আমাদের বাবার) উপর বিশ্বাস না থাকলে পত্রিকা-পরিচালনরূপ ব্যয়সাধ্য ও সঙ্কটবহুল কাজে তিনি হাত দিতে পারতেন না।

কলকাতায় এসে আফিসের সমস্ত হিসাব দেখবার ভার মা নিলেন। প্রতিদিন পাঁচটার পর সুদক্ষ ম্যানেজারের মত মা খাতাপত্র সমস্ত বুঝে নিতেন, এতটুকু এদিক-ওদিক হবার উপায় ছিল না। প্রায় দশ বার বৎসর ধ'রে মা প্রত্যহ প্রবাসী আফিসের এই হিসাব দেখা ও চেক করার কাজ ক'রে এসেছেন। অনেক কর্ম্মচারী মা'র এত কড়া তদারকে বিরক্ত পর্য্যন্ত হতেন। একই কাজের জন্যে দু-বার বিল ক'রে টাকা নেবার চেষ্টা মা যে ধ'রে ফেলতেন, এরূপ সত্য ঘটনার কথা বাবার কাছে শুনেছি। প্রায় ১৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের পর থেকে তাঁকে আর আফিসের কোন সংস্রব রাখতে দেওয়া হয় নি।

মাকে এবং বাবাকে আমরা জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করতে দেখেছি এবং সেই জন্যই বিলাতী মিলের ধুতি শাড়ী আমাদের কোনো দিন পরা অভ্যাস হয় নি। আমরা যতটা জানি, মা শেষ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ ছাড়া কোনো বিদেশী জিনিষই কখন ব্যবহার করতেন না। বাঁকুড়া জেলার তসরের শাড়ী, বাঁকুড়ার বাসন, এই সব তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রাখীবন্ধনের সময় মা আমাদের সঙ্গে বসে নিজে স্বদেশী রেশমে রাখী তৈরি ক'রে বালিকার মত হাস্যমুখে বন্ধুবান্ধবের বাড়ি বাড়ি বেঁধে বেড়াতেন। স্ত্রীপুরুষ কিছু বিচার করতেন না, সকলকেই পরমাত্মীয়ের মত রাখীর সুতা পরিয়ে দিতেন। মাকে সারাজীবনে নিজের জন্য নিজে দু-চার খানার বেশী সৌখীন কাপড় কিনতে দেখি নি। অপরকে ভাল কাপড় কি জিনিষ কিনে উপহার দিতে কিন্তু তিনি খুব ভালবাসতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় এক জন মুসলমান ভদ্রলোক বাঁকুড়ায় স্বদেশী প্রচার করবার জন্যে আমাদের বাঁকুড়ার বাসা-বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। তাঁর আহারাদির পর চাকরেরা বলল, "আমরা এঁটো বাসন মাজব না।" মা বললেন, "তোমরা না মাজ মেজো না, আমি মাজছি।" ব'লে নিজেই এঁটো বাসনগুলো তুলে আনলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন-তখন শোনা যেত, আজ আমাদের বাড়ি খানাতল্লাস হবে, কাল বাবাকে গ্রেপ্তার করবে ইত্যাদি। এই সমস্ত ভয়ে মা বিচলিত হতেন না। বাবা বলেন, সত্য কথা ব'লে বা লিখে তার ফলের সম্মুখীন হ'তে না চাওয়ার ভীরুতা মা দেখতে পারতেন না। বাবার গ্রেপ্তার ও বিচারাধীন হওয়ার সম্ভাবনা অনেকবার হয়েছিল, মা সে উদ্বেগ দৃঢ়চিত্তে সয়েছেন। কিন্তু মনে হয় এই সকল দিন হতেই ভিতরে ভিতরে উদ্বেগ মা'র স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে দিতে লাগল। বন্ধুভাবে গোয়েন্দা পুলিস প্রায় দিবারাত্র বাবার উপর কড়া নজর রাখত, অন্য ভাবে ত রাখতই। মা'র মন অতিরিক্ত সন্দেহে সজাগ হয়ে উঠল, সকলকে আপনার জন ব'লে আর বিশ্বাস করতে পারতেন না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন একটা সর্দ্দির ওষুধের পাঁচনের

সঙ্গে বেলেডোনার শিকড় মুদীর দোকান থেকে ভুল ক'রে আনায় এবং বাবা সেই পাঁচন খাওয়ায় পুলিস বাড়ির চাকরাণীর উপর তম্বী করে। পাঁচনটা খাওয়ার ফলে বাবা কিছুদিন মাথার অসুখে ভুগলেন। মায়ের আশঙ্কা ভয়ানক বেড়ে গেল। তিনি সব কাজের উপর আবার স্বহস্তে রন্ধন সুরু ক'রে দিলেন, ঠিক করলেন প্রিয়জনদের চাকরদাসীর সেবার মধ্যে আর ছেড়ে দেবেন না। কারণ তাঁর সন্দেহ হ'ল, কেউ ইচ্ছা করেই বাবাকে বিষ দিয়েছে। পরের জীবনে যদিও সকলের জন্য এমন ক'রে আর করতে পারেন নি, তবু অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থাতেও মৃত্যুর তিন-চার মাস আগে পর্য্যন্তও অধিকাংশ দিন তিনি নিজের জন্য নিজেই রন্ধন করেছেন। চাকরদাসীর রান্না প্রায় কোনোদিনই খান নি, আত্মীয়-স্বজনের রান্না প্রয়োজন হ'লে খেয়েছেন। তিনি সহজে কাহারও সেবা গ্রহণ করেন নি। মৃত্যুর দিনেও নিজের কাজ সব নিজে করতে চেয়েছেন এবং কিছু কিছু করেছেন। অর্থ কি সেবা তিনি পরমাত্মীয়ের নিকটও সহজে নিতেন না।

মা'র জীবনে প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদ-আশঙ্কা যত ক্ষতি করেছে এমন আর কিছু করে নি। ইতিপূর্ব্বেই তিনি দু-বার পুত্রশোকের বেদনা সহ্য করেছিলেন। তবু তিনি কর্ত্তব্যবোধে সর্ব্বদাই সাময়িক বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নিজে ক'রে দিয়েছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের এই উদ্বেগের মধ্যেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের শিক্ষার জন্য বিদেশে যাবার প্রয়োজন হ'ল। সংসারে উদ্বৃত্ত টাকা ছিল না। তবু মা বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায় এবং নিজের সর্ব্বজয়ী শুভকামনায় বিশ্বাস করতেন ব'লে অল্প বয়সের সন্তানকেই ইউরোপে পাঠিয়ে দিলেন। বিদেশের খরচ সমস্ত চালাতে হবে ব'লে নিজেদের ব্যয় আরও সংক্ষেপ করলেন। প্রয়োজন হ'লে নিজের অলঙ্কারও বিক্রয় ক'রে দিয়েছেন। এদিকে সন্তানবিরহ দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হয়ে উঠল, ইউরোপে মহাসমর বেধে যার উদ্বেগ বেড়ে গেল; কিন্তু তারই মধ্যে অন্য সন্তানদের নানা জায়গায় রেখে শিক্ষা দিতে হ'ল; সর্ব্ব কনিষ্ঠটি রইল শান্তিনিকেতনে এবং মধ্যম পুত্র বেঙ্গল লাইট হর্স ক্যাম্পে। মা প্রায় দু-বছর অধিকাংশ দিন স্বামী পুত্রকন্যা ছেড়ে থাকতেন। কিন্তু এই দারুণ দুঃখ ও উদ্বেগের মধ্যেও তিনি ছেলেদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থার বদল করতে বলতেন না।

মনে হয়, তাঁকে এতখানি বিচ্ছেদ-বেদনা পেতে দেওয়া ভুল হয়েছিল। এমন না হ'লে হয়ত মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেই তাঁর স্বাস্থ্য চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যেত না। হয়ত তিনি নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পেতেও পারতেন, যদি না এর উপর কনিষ্ঠ সন্তানের চির-বিচ্ছেদের ব্যথা অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত তাঁর স্নেহদুর্ব্বল বিরহ-কাতর বুকে এসে লাগত। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইউরোপ থেকে ফিরলে তাঁর মুখে যে অপূর্ব্ব আনন্দজ্যোতি ফুটে উঠেছিল, তা চিরদিনের মত অন্ধকার হয়ে গেল যখন তার এক মাস পরেই আমাদের ছোট ভাই প্রসাদ মা'র কোল ছেড়ে চলে গেল। এর পরেও কিন্তু নিজের খুব অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি মধ্যম পুত্রকে কেম্ব্রিজে পাঠিয়েছিলেন।

মায়ের ভিতর সত্যকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। অপরের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা করা, কিংবা গুণীজনের, ধনীজনের, ও বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে জোর ক'রে আলাপ করবার চেষ্টা করা অথবা নিজের সম্পদ যা আছে তার থেকে বেশী দেখাবার স্পৃহা প্রভৃতি দুর্ব্বলতা তাঁর একেবারেই ছিল না। নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের যথার্থ বন্ধু-বান্ধবদের নিয়েই তাঁর জগৎ গঠিত ছিল। অথচ তিনি পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, বা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও মূর্খ লোকদের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে সময় অতিবাহন করতে মোটেই পারগ ছিলেন না। পরোপকার করলে নিঃশব্দে করতেন, কাহারও প্রতি রাগ বা ঘৃণার কারণ ঘট্‌লে তার সংস্রব নিঃশব্দেই ত্যাগ করতেন। নিজের বাড়তি সময় বই ও খবরের কাগজ পড়া, ছবি আঁকা সেলাই কিংবা গল্প কবিতা লেখা, কি গান বাজনায় কাটাতেন। নিজের তাঁর একটা মনের জগৎ আলাদা ছিল, যেখানে যে-সে ঢুকতে পারত না। কিন্তু অহঙ্কার ও আত্মগরিমাও সেখানে ছিল না। তিনি তাঁর লেখার কি দোষ আছে ব'লে দেবার জন্যে নিজের কন্যাদেরও প্রায় অনুরোধ করতেন। এতে তিনি কোন লজ্জার কারণ দেখতে পেতেন না।

স্বাধীনতা প্রাণের হ'লে মানুষ যে ভাবে চলে, মা সেইভাবে চল্‌তেন। মা কোন প্রথা বা রীতির দোহাই দিয়ে কোন কাজ

করতেন না। ভাল বুঝলে তাকে ভাল বলতেন, মন্দ বুঝ্‌লে মন্দ বল্‌তেন, চিন্তা ও কার্য্যে পরের নিয়ম তিনি মান্‌তেন না।

যে-সব কাজে বাংলার মা বাঙালীকে গত কয়েক শতাব্দী ধ'রে ক্রমাগত যেতে বারণ ক'রে এসেছেন—প্রধানতঃ আত্মরক্ষামূলক কারণ দেখিয়ে—আমাদের মা সে-জাতীয় বারণ কোন বিষয়ে আমাদের করেন নি। বাল্যকাল থেকেই সাহসের কাজে যেতে আমরা মায়ের অনুমতি পেয়েছি।

যুদ্ধের সময় মা তাঁর মেজছেলেকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হ'তে উৎসাহই দিয়েছিলেন। এখনও তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন আগেও তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে মুষ্টিযুদ্ধ অভ্যাস রাখে কি না।

পরমুখাপেক্ষী না হওয়া, কোন অপমান বরদাস্ত না করা, বিপদে কাতর না হওয়া প্রিয়জনকে সকল অমঙ্গল হ'তে রক্ষা করা, ও নিজের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত কাজের আনন্দে যাপন করা মায়ের কাছে যথার্থ জীবন ছিল। উচ্চ আকাঙ্ক্ষার আলেয়ার আকর্ষণে যারা নানা রকম চেষ্টা করে, মোহমুক্ত মানুষ কার্য্যশক্তি ব্যবহার ক'রে চল্‌লে তাদের চেয়ে উপরের স্তরে থাকৃতে পারে। মায়ের আমাদের যশ কি ঐশ্বর্য্যের মোহ ছিল না। অনাবিল আনন্দে তিনি যা করতেন করেছেন। আনন্দেই বহু ত্যাগ করেছেন। এই জন্যে বহু শোক-দুঃখের ভিতরেও তাঁর হাসি ম্লান হয় নি, অভাব তাঁকে ম্রিয়মাণ করতে পারে নি। জয়ের অগ্নিকণা তাঁর প্রাণের ভিতর জন্মাবধি জ্বলন্ত ছিল। জীবন তাঁর সেই জন্য শোকে আনন্দে রোগে স্বাস্থ্যে বিজয়-অভিযানের মত সগৌরবে অতিবাহিত হয়ে গেছে।

পৃথিবীতে কিছুই হারায় না। মা'র জড়দেহ হারায় নি, আকাশে বাতাসে জলে মৃত্তিকায় মিশে গিয়েছে। তেমনই তাঁর আত্মার সৌন্দর্য্যও অক্ষয়। এই চিন্তাই আমাদের সান্ত্বনা দিক তাঁর বিচ্ছেদ-দুঃখের মধ্যে। ষোল বৎসর কনিষ্ঠ সন্তানের বিরহে পৃথিবীর সকল সুখ—এমন কি প্রাণধর্ম্মের অধিকাংশ প্রয়োজনও—ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর অন্য সন্তানসন্ততিদের বুক পেতে রক্ষা করবার জন্যই যেন বেঁচে ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল এবং সে বিশ্বাস সত্য বলেই মানতে ইচ্ছা করে, যে মা'র সর্ব্বজয়ী শুভ ইচ্ছার, মা'র চির-জাগ্রত কল্যাণদৃষ্টির তলে সন্তানের কোনো অকল্যাণ হ'তে পারে না। তিনি নিজ ব্রত উদযাপন ক'রে চলে গেছেন। আকাশ জুড়ে আজও তাঁর প্রসন্ন, চিরহাস্যময় কল্যাণদৃষ্টি আমাদের উপর ছড়িয়ে পড়ছে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে যেন তা অনুভব করতে পারি। আকাশে বাতাসে মৃত্তিকায় পুষ্পপল্লবে জলস্রোতে সমস্ত পৃথিবীতে যিনি অণুতে অণুতে মিশে গিয়েছেন সেই মাকে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সকলের ভিতর যেন চিরদিন মনে রাখি। যেন আজীবন তাঁর আত্মার অবিনশ্বর মাধুর্য্যে বিশ্বাস রাখি।

পরলোকগতা মনোরমা দেবীর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

পুরাতন একটা কথা আছে—

ভূতে ভব্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

অর্থাৎ অতীতের মধ্যেই ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের কোনো বিরোধ নাই। অতীতের মধ্যেই ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা। উভয়েই উভয়ের সঙ্গে যুক্ত। তেমনি ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের কোনই বিরোধ নাই, ইহলোক ও পরলোক উভয়ে পরস্পরে যুক্ত। এই যোগ অনুভব না করিলে শ্রাদ্ধাদি সকল অনুষ্ঠানই অর্থহীন শ্রাদ্ধ অর্থ যাহা শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্দ্দিকে আলোক থাকিলেও, নয়ন-বিনা আমরা তাহা পাই না। ধ্বনি যদি আসে, তবে তাহা গ্রহণ করিতেও কর্ণ চাই। তেমনি পরলোকের যে সত্য, তাহা অনুভব করিতে চাই শ্রদ্ধা। ইহলোকের ও দেহের সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে একমাত্র আমাদের শ্রদ্ধা। কাজেই শ্রদ্ধা

দ্বারাই আমরা পরলোককে উপলব্ধি করি, তাই পরলোকের জন্য শ্রাদ্ধ।

তর্পণ

আজ যিনি পরলোকগত তিনি আর তাঁহার ব্যক্তি-বিগ্রহের মধ্যে নাই। বিশ্ববিগ্রহের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তি-বিগ্রহ আজ নিমজ্জিত। তাই তাঁহার তৃপ্তির জন্য আমাদিগকে আজ বিশ্বকে তৃপ্ত করিতে হইবে। ইহাই হইল তর্পণ। তাই আমাদের তর্পণ-মন্ত্র—

"দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিম্হগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবা পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে।"

সকলেই আজ তৃপ্ত হউক। দেব যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া দীন হীন সর্ব্ব প্রাণী আজ তৃপ্তি লাভ করুক। ক্ষুধিত তৃষিত পাপ-রত ধর্ম্ম-রত সবারই আজ তৃপ্তি হউক।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।"

সবারই আজ পরম তৃপ্তি হউক। (কালে) যে সব কোটি কোটি কুল বিগত হইয়াছেন এবং (স্থানে) আজও নানা দেশের নানা দ্বীপের যাঁহারা অধিবাসী, সবারই আজ তর্পণ হউক। সবার তৃপ্তিতেই তাঁর তৃপ্তি, কারণ তাঁহার বিগ্রহ আজ বিশ্ববিগ্রহেই বিলীন।

পিতৃগণকে নমস্কার

ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্তু অদ্য
যে পূর্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজসি আ নিষত্তা
যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু।

যাঁহারা পরলোকগত তাঁহারাই পিতৃগণ। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা আমার জ্যেষ্ঠ বা যাঁহারা আমার কনিষ্ঠ তাঁহাদের সকলকেই আজ নমস্কার। তাঁহাদের কেহ বা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত কেহ বা ঐশ্বর্য্যহীন। আজ তাঁহারা সকলেই এখানে সমাগত, তাঁহাদিগকে আজ নমস্কার।

যে চ ইহ পিতরো যে চ নেহ
যাংশ্চ বিদ্ম যাঁ উ চ ন প্রবিদ্ম।

আজ যে-সব পিতৃগণ এখানে সমাগত আর যাঁহারা এখানে উপস্থিত নাই, যাঁহাদের জানি আর যাঁহাদের না জানি, তাঁহাদের সকলকেই আজ নমস্কার।

ত আগমন্তু ত ইহ শ্রুবন্তু
অধিব্রুবন্তু তে অবন্তু অস্মান্।

তাঁহারা আজ সকলেই এই শ্রাদ্ধক্ষেত্রে আগমন করুন, তাঁহারা আমাদের অন্তরের কথা শ্রবণ করুন। আমাদের বাণী যদি অন্তরের কথা প্রকাশে অসমর্থ হয় তবে আমাদের হইয়া তাঁহারাই আজ বলুন, তাঁহারা আমাদিগের অন্তরের কামনা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।

তাঁহারা আজ আমাদের অন্তরে সত্য চেতনা ও বাণী প্রেরণ করুন। আজ আমাদের চেতনাকে বিশ্বসত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। শ্রদ্ধায় সাত্ত্বিকতায় আমাদিগকে সার্থক করুন।

পরলোক-প্রয়াণ

হে পরলোকগত, তুমি তো কায়া মাত্র নও। তুমি প্রাণ। এই প্রাণলোক হইতে নবপ্রাণলোকে তুমি আজ উত্তীর্ণ। সেখানে কি তুমি একা? সেখানে সকল পরলোক-বাসী পিতৃগণ প্রেমে ও আত্মীয়তায় তোমাকে আজ বরণ করিয়া লইবেন।

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভি
র্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।

যে চিরন্তন পথে আমাদের পিতৃগণ চিরদিন প্রয়াণ করিয়াছেন সেই পথেই আজ তুমি অগ্রসর হইয়া যাত্রা কর।

সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেনে-
ষ্টা পূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্।

সেই পরম ব্যোমধামে তুমি আপন পুণ্য কর্মের বলে গিয়া পিতৃগণের সহিত মিলিত হও।

হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি
সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ।

যাহা কিছু মলিন তাহা আজ ত্যাগ করিয়া যাও, আজ শোভন দীপ্ত পুণ্য তনু লইয়া সেই স্বর্গলোকে গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হও।

শ্রাদ্ধ

জীবন ও মৃত্যুকে যদি পরস্পরে যুক্ত করিয়া দেখি তবেই হয় সত্য দৃষ্টি। জীবন ও মৃত্যুকে বিযুক্ত করিয়া দেখিলে

উভয়ই হইয়া উঠে ভয়ঙ্কর। একটি পূর্ণতাকে খণ্ডিত করিলে দুইটি খণ্ডিত অংশ রাহু ও কেতুর মত দেখায় ভীষণ।

যথাংশ্চ রাত্রী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।
যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।
যথা ভূতং চ ভব্যং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।

"দিন ও রাত্রি যুক্ত হইয়া যেমন ভয় ও বিঘ্নের অতীত, তেমনি হে আমার প্রাণ, তুমি ভয় পাইও না।

যুক্ত আকাশ ও পৃথিবী যেমন ভয় পায় না ও বিঘ্নে বিপন্ন হয় না, তেমনি হে আমার প্রাণ, ভয় পাইও না।

যেমন ভূত ও ভব্য যুক্ত হইয়া সকল ভয় ও বিঘ্নের অতীত, তেমনি হে আমার প্রাণ ভয় পাইও না।"

যে মৃত্যুকে ঋষি ও তপস্বীরা ভয় করেন তাহা এই মৃত্যু নহে। তাঁহারা যে মৃত্যুকে ভয় করেন তাহাকে লোকে "মৃত্যু" বলিয়াই মনে করে না, তাহাকে লোকে "জীবন" বলিয়াই ভুল করে। সেই মৃত্যু হইল অন্ধকার ও অসত্যের সাথী। তাই তাঁহাদের প্রার্থনা—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতংগময়

"অসত্য হইতে সত্যে আমাকে উপনীত কর, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে আমাকে উপনীত কর, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে আমাকে উপনীত কর।" অর্থাৎ সেই মৃত্যু হইল অন্ধকার ও অসত্য।

যে মৃত্যুতে সাধারণ লোক ভীত তাহাতে সত্যদর্শী তপস্বিগণের বিন্দুমাত্রও ভয় নাই। জন্মও যেমন তাঁহাদের আনন্দ মৃত্যুও তেমনি তাঁহাদের আনন্দ।

আনন্দাদ্ধ্যেবখল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

"আনন্দ-স্বরূপ হইতেই সকল চরাচর উৎপন্ন। আনন্দই এই সৃষ্টির মূলাধার। এই জীবনে সেই আনন্দেই জীবসকল জীবিত রহে, এবং মৃত্যুতে সেই আনন্দের মধ্যেই গমন করে ও তাহাতে বিলীন হয়।"

আমরা ক্ষুদ্র হইলেও সর্ব্বচরাচরের নিয়ন্তা সেই পরমেশ্বরের সন্তান। কাজেই এই বিশ্বপ্রকৃতির বড় বড় শক্তি আমাদের সেবা করে সেই পরমপিতার শাসনে।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ইহাঁর ভয়েই অগ্নি আমাদিগকে তাপ দেয়, ইহাঁর ভয়েই সূর্য্য আমাদিগকে উত্তাপ দেয়, ইহাঁর ভয়েই মেঘ ও বায়ু আমাদের সেবা করে ও অবশেষে মৃত্যুও ধাবিত হইয়া চলে আমাদের সেবা করিতে।

মৃত্যু ধাবিত হইয়া আবার কোন্ সেবা করিবে?

রাজার পুত্র এক প্রাসাদে বাস করিয়া সেই স্থানের সকল সুখ সম্ভোগ শেষ করিলে রাজারই আদেশে রাজার ভৃত্য আসিয়া সেই প্রাসাদ হইতে রাজপুত্রের বাহির হইবার জন্য দ্বার দেয় মুক্ত করিয়া। এই জীবন-প্রাসাদের দ্বারপাল হইল মৃত্যু। সে যদি যথাকালে প্রভুর নির্দ্দেশে ধাবিত হইয়া দ্বার খুলিয়া না দিত তবে আমাদের এই জীবনই হইত কারাগার। মৃত্যু হইতেও এই জীবন হইত ভয়ঙ্কর মৃত্যুর অন্ধকূপ। প্রাচীন কালে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ দণ্ড ছিল কাহাকেও একটি কক্ষে প্রবেশ করাইয়া তাহার দ্বার গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া। যদি বাহিরে যাইবার এই মুক্ত দ্বার না থাকিত তবে এই জীবন কি ভীষণ অন্ধকূপ! মৃত্যুই হইল জীবনের এই মুক্তদ্বার।

তাই যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে দেখি মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

মরিষ্যামি মরিষ্যামি মরিষ্যামীতি ভাষসে।
ভবিষ্যামি ভবিষ্যামি ভবিষ্যামীতি নেক্ষসে।

"শুধু বলিতেছ, মরিব, মরিব, মরিব। হইব, হইব, আবার নূতন করিয়া হইয়া হইয়া উঠিব, এই সত্যটি কেন প্রত্যক্ষ কর না?"

তাই এই মর্ত্ত্য-দেহ ছাড়িয়া অমর্ত্ত্য-দেহপ্রাপ্তি একটি মহামহোৎসব।

দেহাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তো নব এব মহোৎসবঃ।

আসিতেছে যে জীবন তাহার কত বড় সম্ভাবনা তাহা আজ আমাদের অনুমানেরও অতীত। আজ এই যে দেহাবসান ইহা তো—

শান্তে শান্তং শিবে শিবম্।

সেই পরম শান্তির মধ্যে এই যে শান্ত বিলয়, পরম

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাজপুতানার মরুপ্রান্তরে

কল্যাণের মধ্যে এই যে কল্যাণ-প্রবেশ, তাহাই এক মহা যোগ।

মৃত্যুর দ্বার খুলিয়া যে নবজীবনের মধ্যে আজ প্রবেশ, সেই জীবনের কোনো সম্ভাবনাই আমাদের জ্ঞানের গম্য নহে। তবে এই কথা বুঝি যে এই জীবনে যখন আসিয়াছিলাম তখনও তো কিছু জানিয়া বুঝিয়া চুক্তি করিয়া আসি নাই। তবু যে প্রেম আনন্দ ও পূর্ণতা এই জীবনে পাইলাম তাহা তো চিন্তারও অতীত ছিল। আর এমন যে পরিপূর্ণ এই জীবন তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে কি এক মহাশূন্যতায়? তাই কি এই জীবনের মধ্যে এত প্রেম, এত আনন্দের আয়োজন? ইহা অসম্ভব। অতিবড় নাস্তিক্য বুদ্ধিতেও এ-কথা মনে আসে না।

ঋষিরা জীবন ও মৃত্যুকে একই বিরাটের মধ্যে যুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। তাহাই হইল আসল প্রাণ। তাহা এক অবিচ্ছিন্ন বিরাট।

প্রাণায় নমো যস্য সর্ব্ব মিদং বশে।
যো ভূতঃ সর্ব্বস্যেশ্বরো যস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

সেই প্রাণকে নমস্কার বিশ্বচরাচর যাহার অধীন। যাহা নিখিল চরাচরের ঈশ্বর, যাহাতে সব কিছু প্রতিষ্ঠিত।

বৎসরের যেমন দোল-লীলা চলিয়াছে শীত-গ্রীষ্মে, তেমনি সেই বিরাট প্রাণের দোল-লীলা চলিয়াছে জীবন-মৃত্যুতে। যখন জীবনরূপে তিনি আসেন, তখন দেখি তাঁর প্রসন্ন মুখ। যখন মৃত্যুরূপে তিনি দূরে যান তখন দেখি তাঁর গহনকৃষ্ণ কেশ-পাশ।

এই দোল-লীলায় যখন তিনি জীবন রূপে নিকটে আসেন তখনও তাঁহাকে নমস্কার। যখন মরণরূপে তিনি দূরে সরিয়া যান তখনও নমস্কার।

নমস্তে অস্তু আয়তে নমো অস্তু পরায়তে।

নিকটে আসিতেছ যে তুমি, হে প্রাণ, তোমাকে নমস্কার। দূরে সরিয়া যাইতেছ যে তুমি, হে প্রাণ, তোমাকে নমস্কার।

পরাচীনায় তে নমঃ প্রতিচীনায় তে নমঃ।

দূরে যখন তুমি চলিয়াছ, হে প্রাণ, তখনও তোমাকে নমস্কার। আমার দিকে আসিতেছ যখন তুমি, হে প্রাণ, তখনও তোমাকে নমস্কার।

প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা প্রাণং দেবা উপাসতে।

মৃত্যুও এই প্রাণ, দুঃখ-তাপ-রোগ-শোকও এই প্রাণ, এই বিরাট প্রাণকেই দেবতারা করেন উপাসনা।

কিন্তু দৃষ্টিশক্তিহীন মন আমাদের ভয় পায়। একটি স্তন যখন শূন্য হইয়া আসে তখন মাতা শিশুকে আর একটি স্তনে সরাইয়া নিতে চান; শিশু কাঁদিয়া উঠে। মনে করে সবই বুঝি গেল। মৃত্যুতেও আমাদের ত্রাস ঠিক সেইরূপ।

স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে।
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়া স্তনান্তরে ॥

আবার রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী—

তুমি ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও বাম হাত হ'তে ডানে।
আপনার ধন আপনি হরিয়া কি যে কর কেবা জানে ॥

জন্ম মরণ হইল তাঁর শুধু এক দিকের ক্রোড় হইতে আর এক দিকের ক্রোড়ে নেওয়া। দক্ষিণ হইতে বাম ক্রোড়ে বাম হইতে দক্ষিণ ক্রোড়ে নেওয়া। জানি না বলিয়াই এই মিথ্যা ত্রাস।

এই সত্যই বলিতে গিয়া মহাত্মা কবীর বলিলেন—

জনম মরণ বীচ দেখ অংতর নহী
দচ্ছ ঔর বাম যূঁ এক আহি।

"চাহিয়া দেখ জনম মরণের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই, মায়ের দক্ষিণ আর বাম কোল তো একই কথা।"

তাই তো ঋষি বলিয়াছেন—

নমস্তে অস্তু আয়তে নমো অস্তু পরায়তে।

তাই নমস্কার করিয়াছেন—

পরাচীনায় তে নমঃ প্রতীচীনায় তে নমঃ।

ইহাই তো সত্য দৃষ্টি, যোগনেত্রে দেখিবার বিষয়। জন্ম মৃত্যুকে যে এমন ভাবে যুক্ত করিয়া দেখা তাহার জন্য চাই বিরাট ও মুক্ত দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি সাধনা ছাড়া কি সহজে মেলে? তাই এমন সময়ে আমরা ঋষি সাধক ও ভক্ত জনের বাণী খুঁজি। আমাদের দৃষ্টি যেখানে ভয়ে ত্রাসে দুঃখে দৈন্যে অবসন্ন, তাঁহাদের দৃষ্টি সেখানে প্রেমে অভয়ে আনন্দে ভরপুর।

আজ তাই প্রাচীন কালের একটি সাধক-পরিবারের শ্রাদ্ধতিথির কয়টি বাণী স্মরণ করা যাউক।

দাদূর পত্নী যখন পরলোকগমন করিলেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গরীবদাস ও কনিষ্ঠ পুত্র মস্কিন দাস তাঁহাদের মাতার

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন যাহা বলিলেন তাহা আজও আমাদের নিত্যস্মরণীয়।

সেবানন্দময়ী করি হতী সদা সব জন দুঃখ দূর।
স্মরণি সব আয়ে বিথা লই কেম ভরে চিত উর।

"মা আমাদের ছিলেন সেবানন্দময়ী, সেবাতেই ছিল তাঁহার আনন্দ। সদাই তিনি সকল জনের দুঃখ দূর করিতেই থাকিতেন ব্যস্ত। আজ সবাই অন্তরের ব্যথা ও শূন্যতা লইয়া তাঁহারই স্মরণে এখানে উপস্থিত। আজ কেমন করিয়া সকলের শূন্য চিত্ত ও হৃদয় হয় পূর্ণ ?"

বহুত সেবা সে মাতু করি অরুভী বহুত আজ হোয়।
শোক মীচ অরু ক্ষয় শূন্যতা সব কেম ভব পূরণ হোয়।

"জীবনে তো মাতা আমাদের বহু সেবা করিয়াছেন, কিন্তু আজও যে তাঁর বহু সেবা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন। আজ তাঁহার অভাবেই যে আমাদের এই শোক ও মৃত্যুর ক্ষয় ও শূন্যতা এই সবই বা কেমন করিয়া হয় পূর্ণ ?"

পৃথিবীতে থাকিতেও তিনি সবার সব দুঃখ দৈন্য শূন্যতা দূর করিতে নিত্যই ছিলেন যত্নবতী। কিন্তু তখন তাঁহার শক্তি ছিল পরিমিত। তাঁহার ভাণ্ডারে আর তখন কত বৈভবই বা ছিল যে সবার সব দুঃখ তিনি দূর করিতে পারেন ? আজ তিনি বিশ্বজননীর প্রেমের ভাণ্ডারে প্রবিষ্ট। আজ তাঁর আর কিসের অভাব ?

পরম বৈভব কোঠার কূঁহী পয়ান করি আজ সোয়।
দৈন্য বিথা সব রংক শূন্যতা ভব কূ্যা ন পূরণ হোয়।

"পরম বৈভবের ভাণ্ডারের মধ্যেই আজ জননী আমাদের করিয়াছেন প্রবেশ। তবে কেন আজ আর আমাদের সব দৈন্য ব্যথা অকিঞ্চন শূন্যতা পূর্ণ না হইবে ?"

আজ প্রেমানন্দময়ী জগৎজননীর প্রেমলোকে গিয়া তিনি পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়া আমাদিগকে ভুলিয়াই যাইবেন এমন কি কখনও হয় ?

সব জনকুঁ তো বিন জমাড়্যা জিমতী কবী ন মাতা।
জক্ত অন্ন সব তজ গয়ী মাতা জ্যাঁ সদানন্দ অন্নদাতা।

"মায়ের স্বভাবই ছিল এই যে সবাইকে না খাওয়াইয়া তিনি কখনই পারিতেন না খাইতে। আজ তিনি জগতের এই সামান্য অন্ন ত্যাগ করিয়া এমন পূর্ণতার ভূমিতে গিয়াছেন যেখানে সদানন্দ ভগবানই নিত্য বিরাজিত অন্নদাতা রূপে।"

এই জগতের সামান্য অন্নও যিনি সকলকে না দিয়া খাইতে পারিতেন না ; আজ কি তিনি সেই পরমানন্দময়ী জননীর কাছে পরম-অন্ন পাইয়া সকলকে না দিয়াই খাইতে পারেন ?

আতম অন্ন লভি প্রেমী সো আপে ন সব চিত মাহী।
লোভ জগতি অলোভ রহী জো অমৃত লোকি লুভহী।

"পরমাত্মার সেই আধ্যাত্মিক অন্ন লাভ করিয়া প্রেমময়ী মাতা আমার কি সকলের চিত্তে সেই অন্ন পরিবেষণ করিতেছেন না ? লোভজগতে সারাজন্ম যিনি ছিলেন লোভের অতীত, অমৃতলোকে গিয়া তিনি কি হইয়া গেলেন লোভী ?"

আজও হয়তো তিনি নিরন্তর তাঁহার সেই আধ্যাত্মিক পরম-অন্ন আমাদের দিতে উদ্যত রহিয়াছেন। সেই অন্ন ধারণ করিতে পারি এমন কোনো আধার আমাদের মধ্যে না থাকাতেই মা আমাদের তাহা পরিবেষণ করিতে পারিতেছেন না। তাই নিজেও সেই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। শ্রদ্ধা-বিনা তো সেই পরম-অন্ন গ্রহণ করা যায় না। তাই শ্রাদ্ধদিনে সেই শ্রদ্ধার পাত্রখানি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। এই পাত্রে আজ মাতার দান গ্রহণ করিয়া যেন তাঁহাকে দুঃখমুক্ত করিতে পারি।

ক্ষণ ক্ষণ মঁ আরে অন্ন সো জাগত রহু চিত উর।
সচেত সরধা অংজলি বিনা ব্যর্থ হোই দান পূরা।

"প্রতি ক্ষণেই নিরন্তর সেই অন্ন আসিতেছে। অতএব, জাগ্রত হও আমার চিত্ত, জাগ আমার হৃদয়। সচেতন শ্রদ্ধা-অঞ্জলি না থাকাতেই আজ মায়ের সেই পরিপূর্ণ দান গ্রহণ করা যাইতেছে না। তাঁহার এমন ব্যাকুলতা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।"

আজ শ্রাদ্ধতিথি। আমাদের সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি-লাভের শ্রদ্ধার জীবনপাত্র-লাভের তিথিও আজ হউক। আজ যেন আমরা মায়ের সেই আশীষ লাভ করি। মাতার পরিবেষণ করা অমৃত লাভ করিয়া আজ যেন আমরা মায়ের অন্তরের দুঃখ দূর করি, আমাদেরও সব শূন্যতা পূর্ণ করি।

কনিষ্ঠ পুত্র ভক্ত মসকীন দাস বলিলেন—

* এই বাণীগুলি রাজস্থানের পশ্চিম ভূভাগবাসী ভক্তদের দ্বারা রক্ষিত। তাঁহাদের গুজরাতী বুলী ইহাতে মিশিয়া যাওয়ায় ভাষা হিসাবে ইহা বিকৃতরূপ। তবু ভাবের অপরূপতার জন্য এই সব বাণীকে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

আজু শ্রাধ নহী, করম কাংড কছু, গভীর বিথা নিবেদুঁ তোহি।
আজ বাণী কহু, মেটৌ বিথা সব, অংগ পরশ ক্ষেরো মোহি॥
উচ্চ মাথ মম, নম্র বিনত করু, (জঁ্যা) ঠহরৈ কৃপারস ধারা।
তর্ক বচন হরু, নতিকুঁ সাচ করু, চেতি প্রণত হোহু সারা॥

"আজ একটা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান তিথি মাত্র নয়, আজ একটা কর্ম্মকাণ্ডের ও অনুষ্ঠানের আড়ম্বর দেখাইবার তিথি নয়। হে মাতা! অন্তরের গভীর ব্যথা আজ তোমাকে নিবেদন করিবার দিন। আজ তোমার অন্তরের সান্ত্বনা-বাণী কহিয়া কহিয়া আমার সকল ব্যথা দেও মিটাইয়া, আজ আমার সকল তপ্ত অঙ্গে বুলাও তোমার নিঃশব্দ প্রেম-পরশ। আজ অহঙ্কারে উচ্চ মাথা আমার কর নম্র ও প্রণত, যেন সেই নম্রতার শ্রদ্ধার আধারে কৃপারসধারা পারে সঞ্চিত হইতে। আজ আমাদের সকল তর্ক, ব্যর্থ বচন দাও দূর করিয়া। আজ আমাদের প্রণতিকে সত্য কর। আজ আমাদের প্রাণ-মন নম্র হইয়া চিত্তের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্য নমস্কার পূর্ণ হইয়া উঠুক।"

ভারতীয় শিল্প ও তাহার আধুনিক গতি

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

শিল্প রসাত্মক

শিল্পের রূপ বিচিত্র; গতিশীলতায় জীবনের অভিব্যক্তি; শিল্প গতিমান ও প্রাণবান। শিল্পী বিচিত্ররূপে তার কল্পনাকে মূর্ত্ত করে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন আবেষ্টনে, শিল্পসৃষ্টি বিচিত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছে।

এই বৈচিত্র্যের মধ্যে মূলগত ঐক্য কি? আমাদের শাস্ত্রকার বলেন, "কাব্য হইল রসাত্মক বাক্য।" অলঙ্কার-শাস্ত্রের এই উক্তি অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি রেখা, বর্ণ, আকৃতি বা গঠন(line, colour and form) সহযোগে যে রসাত্মক সৃষ্টি তাহাই হইল শিল্প। চিত্র, ভাস্কর্য্য ও নানারূপ শিল্প মনের মধ্যে রসের উদ্রেক করে। চিত্র, ভাস্কর্য্য বা কোনো কারুশিল্প রেখা, বর্ণ, ও আকার সমাবেশে উৎপত্তি। শিল্পের বিচার করিতে হইবে, তার রসের দিক হইতে; রস হইল 'ইমোশ্যন', কোনো বস্তু দর্শনে মনে যে অনুভূতি জাগায়।

শিল্প ও সার্ব্বজনীনতা

এক দল সমালোচক বলিয়া থাকেন, আর্ট বা শিল্পের ভাষা সার্ব্বজনীন। সার্ব্বজনীন এই শব্দের অর্থে তাঁহারা এই মনে করেন যে, শিল্পের সুন্দর নিদর্শন যে-কোনো ব্যক্তির

জল-তোলা (উড্ এনগ্রেভিং),
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কালীঘাটের পটুয়া (উড এনগ্রেভিং)
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

যখন পুলক সঞ্চার করে তখনই তাহরা সার্থকতা—কবি যেরূপ সঙ্গীত সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—More than meets the ear.

গ্রীক ও ভারতীয় শিল্প

আর্ট সার্ব্বজনীন এ-কথা প্রায়ই ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পের তুলনামূলক সমালোচনায় শোনা যায়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইউরোপীয় শিল্প সার্ব্বজনীন, ভারতীয় শিল্প নহে। তাঁহারা কারণ দর্শাইয়া থাকেন, এপোলো বা ভেনাসের মূর্ত্তি অধিকাংশেরই বুঝিতে কষ্ট হয় না এবং তাহা কাছে তার মনোহারিত্ব প্রকাশ করিবে, অর্থাৎ তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, অমুক বস্তু সুন্দর এবং কেন সুন্দর। আমি এ মত সমর্থন করি না। আমি মনে করি শিল্পের বৈচিত্র্যের ন্যায় তাহার ভাষারও বৈচিত্র্য আছে। শিল্পের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে তাহার ভাষা অনুশীলন করা দরকার। কোনো দেশের শিল্প বুঝিতে গেলে তাহার চাবি-কাটি পাওয়া দরকার। প্রথম-দৃষ্টিতেই যাহা বুঝা গেল না, তাহা নিকৃষ্ট, এরূপ ধারণা করা ভুল; আর যাহা বুঝা গেল, তাহাই যে ভাল হইবে, তাও নয়। তিক্ত মধুর ইত্যাদি পঞ্চ রস আছে, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কোনো বস্তু জিহ্বায় স্পর্শ করাইলে, সকলের কাছেই তার স্বাদ ধরা পড়িবে। বলিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না, অমুক বস্তুর অমুক রস। চিত্র বা ভাস্কর্য্যের স্বরূপ এরূপ নয়, তাহা বুঝিবার জানিবার প্রয়োজন হয়। অনেক রং সম্মুখে রাখিলে শিশুরা নাকি সর্ব্বাগ্রে লাল রং গ্রহণ করে। এই আকর্ষণী শক্তি হইতে এই যুক্তি দেওয়া চলে না, যে, লাল রং সকল রঙের সেরা। তেমনই যে চিত্র বা ভাস্কর্য্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা যে শ্রেষ্ঠ এরূপ ভাবিবার কোনো কারণ নাই। শিল্পের সৌন্দর্য্য যে সবটা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহা নহে, সুন্দর বস্তু চক্ষুকে কতকটা আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু তাহাই শেষ নহে; চক্ষু-দ্বার দিয়া অন্তরে

কুটীর (উড এনগ্রেভিং)
আবদুল মৈন

গৃহনির্ম্মাণ (উড্ এনগ্রেভিং)
শ্রীতারক বসু

মনোহর, কিন্তু ভারতের নটরাজ বা প্রজ্ঞাপারমিতা সেরূপ সকলে বুঝিতে পারিবে না। গ্রীক-মূর্ত্তি যে সাধারণের কাছে প্রিয় এবং বোধগম্য, তাহার কারণ, গ্রীক-ভাস্কর্য্য ভারতীয় ভাস্কর্য্য অপেক্ষা প্রকৃতিকে অধিক অনুগমন করে, কাজেই যাহাদের কল্পনা প্রকৃতির ভিতরে সীমাবদ্ধ তাহারা গ্রীক-ভাস্কর্য্যকে নিশ্চয়ই উচ্চতর স্থান দিবে। আমি অবশ্য বলিতেছি না যে আমাদের গ্রীক-শিল্প অনুশীলন করার প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্প, তাহার বিভিন্ন আদর্শ অনুসারে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। গ্রীক্‌রা ছিল পৌত্তলিক; পুতুলকেই তাহারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত, এবং তাহার ভিতরে মানুষের শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াছে। গ্রীক্-মূর্ত্তিতে দৈহিক সৌন্দর্য্যের পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্প গ্রীক-শিল্প হইতে একেবারে পৃথক। ভারতীয়েরা মূর্ত্তিপূজা করিলেও তাহারা গ্রীকদের মত পৌত্তলিক ছিল না। তাহাদের মূর্ত্তিপূজার পিছনে একটা দার্শনিক তত্ত্ব বা ধ্যান ছিল। ধ্যান রূপ পাইয়াছে দেবদেবীর মূর্ত্তিতে। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহার যবনিকা উত্তোলন করিয়া দেখান হইল ধ্যানের তাৎপর্য্য। অদৃশ্য জগতের বার্ত্তা আনা, অরূপকে রূপ দেওয়া, অসীমকে সীমাবদ্ধ করার যে চেষ্টা, ইহাকে বলা হয় শিল্পের transcendentalism বা অতীন্দ্রিয়তা। গ্রীস চায় এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরই পূর্ণতা।

ভারত ও প্রকৃতি

ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ রীতি। এক বস্তুর সহিত প্রকৃতির অপর বস্তুর সাদৃশ্য অনুসারে বিশেষ 'টাইপ' বা আকৃতির সৃষ্টি হয়।

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সহিত পশুপক্ষী, ফুল, লতা, পাতা, প্রভৃতির সাদৃশ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভারতে এক অভিনব সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্য উপমাপ্রিয়। সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে উপমার ছড়াছড়ি, বলা হয় উপমা কালিদাসস্য। চম্পক-অঙ্গুলি, পদ্মপলাশ-লোচন, পটলচেরা চোখ, হরিণ-নয়ন, তিলফুলজিনি নাসা,
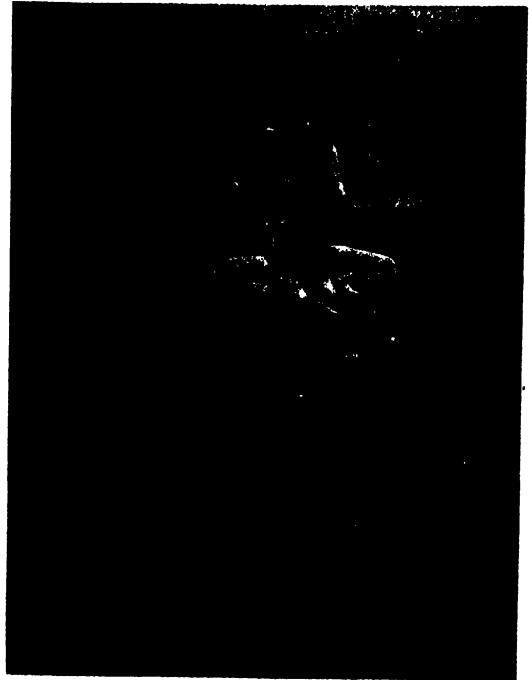
ঝড় (প্লেট এনগ্রেভিং)
শ্রীইন্দু রক্ষিত

প্রসাধন (রঙীন উড্‌কাট)
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল, বৃষস্কন্ধ, করকমল, চরণকমল, ভুজঙ্গসদৃশ মাথার বেণী, সিংহ-কটী, গোমুখ-সদৃশ পৃষ্ঠদেশ, কবাট বক্ষ, দেহলতা—ইত্যাদি উপমা সাহিত্য ও শিল্পে মানবদেহের সৌন্দর্য্য স্থচিত করিয়াছে। এই যে সাদৃশ্য আনয়ন করা, ইহা নিছক কবি-কল্পনা নয়, ইহা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের ফল। ভারতীয় শিল্পের এই যে বিশেষ প্রকাশরীতি, অভিনব প্রকাশভঙ্গি ইহাকে বলা হয় কনভেনশনাল আর্ট। পৃথিবীর সকল প্রাচীন শিল্পই অল্পবিস্তর কন্‌ভেনশনাল। আমাদের প্রাচীন চিত্রের সহিত এ বিষয়ে প্রাচীন ইটালীয়ান চিত্রের বা গথিক শিল্পের তুলনা চলে। গ্রীক্ শিল্প খুব রিয়্যালিষ্টিক হইলেও কন্‌ভেনশনালিজম একেবারে ত্যাগ করে নাই, যেমন গ্রীক্‌-মূর্ত্তির চক্ষুর তারকা নাই।

ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য

যে মনোবৃত্তি ও কল্পনা হইতে ভারতের কাব্য নাটকাদি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্র সৃষ্টি করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। কালিদাসের কুমারসম্ভব, শকুন্তলা কি মেঘদূত পড়িতে পড়িতে অজন্টা এলোরা কিংবা অন্য কোনো প্রাচীন চিত্র যেন মানসপটে ভাসিয়া উঠে। আবার অজন্টা কিংবা এলোরা গুহার ভাস্কর্য্য বা চিত্র দর্শনে মনে হয় যেন কালিদাসের নরনারীরা প্রস্তরে বর্ণে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাসের কাব্যে যে আবহাওয়া যে সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আমি আমাদের প্রাচীন শিল্পে আরও সুস্পষ্টভাবে অনুভব করি। অনেকেই কালিদাসের কাব্য উপভোগ করিয়াছেন। মল্লিনাথের সাহায্য ব্যতিরেকেই হয়ত তাঁহার কাব্যে প্রবেশ করা চলে, কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে আমাদের বোধশক্তি কমিয়া আসে কেন? ভারতীয় শিল্প হীন এই কথা বলিতে অনেকের বাধিতে পারে, তাই শিষ্টাচার-সম্মত মন্তব্য শোনা যায় "বুঝিতে পারি না"।

যাত্রী (লিনোকাট)
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারত বিদেশের শিল্পকে গ্রহণ করিয়াছে। বিদেশের শিল্প ভারতে নবরূপ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই একটি বিশেষ শক্তি আছে, যে, পরকে হজম করিয়া নিজের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশাইয়া লয়। কবির উক্তি উল্লেখ করিয়া বলা যায়, "শক, হুন, আর পাঠান মোগল একই দেহে হ'ল লীন।"

প্রাচীন পারসিক, গ্রীক্, মোগল সকল জাতি হইতে ভারত শিল্প-সম্ভার গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু নূতন রূপে আবার তাহা অপেক্ষাও অধিক ফিরাইয়া দিয়াছে।

আঙিনা
শ্রীসুশীল সেন

রাজা রবিবর্ম্মা

ইউরোপীয় জাতির সংঘর্ষে ভারত প্রথম একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল; ভারতীয় জীবন তখন নিষ্প্রভ; ইউরোপের উজ্জ্বল আলোকে কিছুকালের জন্য চক্ষু ঝলসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ ছিল শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা। ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য্য তখন ছিল সকলের কাছে অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত। ইউরোপীয় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিল্পী হইলেন রাজা রবিবর্ম্মা। তাঁহার চিত্র ইউরোপীয় শিল্পসম্মত হইলেও ভারতীয় রূপ তাঁহার কাছে কিয়ৎ পরিমাণে উন্মোচিত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন শক্তিশালী শিল্পী।

অবনীন্দ্রনাথ

এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় শিল্পের এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছে; সকলেই জানেন, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ইহার সূচনা করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পধারায় ভারতীয়, ইউরোপীয়, চীনা ও জাপানী পদ্ধতির সম্মিলন হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে এই নূতন গোষ্ঠীর শিল্পিগণ এই শিল্প-ধারাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি বিলাতে যে ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী হইয়া গেল, তাহাতে শিল্প-সমালোচকরা সারা ভারতের শিল্প-পদ্ধতির একটা ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল এই নূতন পদ্ধতির শিল্পাদর্শকে অনেক উচ্চে তুলিয়াছেন, ভারতীয় সৌন্দর্য্য-নীতিতে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন শিল্পীর নেতৃত্বে, কলিকাতায়, শান্তিনিকেতনে, মান্দ্রাজে, অন্ধ্র প্রদেশে, লক্ষ্ণৌয়ে, লাহোরে ও দিল্লীতে বিভিন্ন শিল্পাদর্শে বিভিন্ন পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। সকলকে বিনা-বিচারে গ্রহণ করিতে পারা যাইবে কিনা ভাবিবার বিষয়; অনেক শিল্পীর কাজে আর সৃজনীশক্তি যেন পাওয়া যাইতেছে না। তাহারা যেন ঘূর্ণাবর্ত্তে নিজের চারি দিকেই ঘুরিয়া মরিতেছে।

বহু শিল্পীর কাজ ও তাহার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহাদের কাজে মনে হয়, তাঁহারা যেন রঙের

পাতিহাঁস (উড এনগ্রেভিং)
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কুজ্ঝটিকা রচনা করিয়া নিজের অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া রাখার চেষ্টা করেন।

চিত্র-সমালোচনা

চিত্রের বাজারে মূল্য আছে। ছবি আঁকা হইলে তাহাকে বাজারে চালাইতে হয়, সেজন্য চিত্র-সমালোচকের সাহায্য লওয়া হয়। সৌন্দর্য্যনীতির সম্যক্ পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায় না। আধুনিক শিল্পের তুলনামূলক সমালোচনা বিশদভাবে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক শিল্পীদের সম্বন্ধে যাহা আলোচনা হইয়া থাকে, তাহা মনে হয় পৃষ্ঠপোষকতামাত্র। বিভিন্ন শিল্পীর দোষগুণ বিচার করিয়া কোনো সমালোচক দেখান নাই। এরূপ সমালোচনায় আঘাত আছে, কারণ মিথ্যা জিনিষ ধরা পড়িবে। শিল্পীদের এরূপ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি থাকা দরকার। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের সমালোচনা আছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের সমালোচনা পাইতে পারি; কিন্তু আধুনিক চিত্রের তুলনামূলক পক্ষপাতহীন সমালোচনা হয় নাই বলিলেই হয়; যাহা হইয়াছে, তাহাকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না।

রোজার ফ্রাই বা ক্লাইভ বেলের যে চিত্র-সমালোচনা পড়িয়াছি, তাহা মনে হয় সাহিত্যের দিক হইতেও উপভোগ্য বস্তু। রোজার ফ্রাই ব্রিটিশ চিত্রশিল্পীদের সম্বন্ধে সম্প্রতি যে নূতন বই লিখিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডের চিত্রকলার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্যনীতি বিশ্লেষণ করিয়া ইংলণ্ডের চিত্রকলা ইউরোপের চিত্রকলার সঙ্গে তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইংরেজ হইলেও স্বদেশের চিত্রকলার মিথ্যা স্তুতি করেন নাই।

ফরাসী লেখক এলি ফর *History of Art* চারি ভল্যুমে সমাপ্ত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইতে হয়, তাঁহার লেখার পদ্ধতির জন্য—বইয়ে এত সাহিত্য-রস রহিয়াছে। লেখক প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাবাসীদের চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে জীবিত শিল্পীদের আলোচনাও স্থান পাইয়াছে। এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যে, এই পুস্তকে বাংলার নয়া পদ্ধতির কথা এবং আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে কেবল অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ইউরোপের আধুনিক চিত্রকলা

পৃথিবীর কোনো দেশের শিল্পী আধুনিক কালে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতে পারে না। চলা-ফেরার সুবিধা এবং ছাপাখানার দৌলতে এক দেশের চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রণালী অন্য দেশে আর অজ্ঞাত থাকিতেছে না। প্রাচ্য দেশের শিল্প একদিন পাশ্চাত্যে অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত ছিল। কেবল কয়েক জন মুষ্টিমেয় ওরিয়েণ্টালিষ্ট পণ্ডিত অনুকম্পাভরে এশিয়ার শিল্পের আলোচনা করিতেন। আজকাল অনেক স্থানে এশিয়ার শিল্প ইউরোপে স্থান পাইয়াছে এবং ইউরোপের শিল্পীরা এশিয়ার শিল্পদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। চীন-জাপানের চিত্রকলা, ভারতের চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য এখন ইউরোপে অবজ্ঞাত নয়।

গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপের চিত্রজগতে যে বিদ্রোহ হয় তাহার সুত্রপাত হয় ফ্রান্সে। এই নূতন শিল্পীদের বলা হয় ইম্প্রেসনিষ্ট, ইহার পর পর আসিল পোষ্ট-ইম্প্রেসনিষ্ট, কিউবিষ্ট, এক্স্প্রেসনিষ্ট, ফিউচারিষ্ট ইত্যাদি। তাঁহারা যে সকলেই শিল্পজগতে কিছু দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা নহে—তাঁহাদের অনেকেরই ছিল ভাঙনের নেশা; কিন্তু এই ভাঙনের ভিতরেই শিল্পে এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়াছে।

রিনেসাঁসের পর হইতে ইউরোপ চলিয়াছিল রিয়্যালিজ্ম্ বা বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে—উনবিংশ শতাব্দীতে ক্যামেরা আবিষ্কৃত হইলে তাহারা দেখিল প্রকৃতিকে নকল করার চেষ্টা তাহাদের ব্যর্থ। ক্যামেরা অতি সহজেই সে কাজ

করিতে সমর্থ হইল। তার পরে তাহারা ছুটিল নূতন রাজ্য আবিষ্কারের জন্য—এশিয়া তাহাদের সেই সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল।

কিউবিষ্ট-গোষ্ঠীর স্থাপয়িতা পাবলো পিকাসো ছিলেন স্পেন-দেশীয়; তাঁহার শিল্প রূপ পাইয়াছিল প্যারিস শহরের আওতায়। তিনি প্রতিভাশালী শিল্পী ছিলেন। তাঁহার শিল্পনীতি চিত্রজগতে স্থায়ী আসন পায় নাই, কিন্তু চিত্র ছাড়া অন্যবিধ শিল্পে কিউবিজমের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিউবিজমের সরল রেখা, স্থাপত্যের ও গৃহের আসবাবে এক নূতন পরিকল্পনার সন্ধান দিয়াছে।

সেজান, গগ্যাঁ, ভ্যানগগ আধুনিক দলের উপর প্রভাব কম বিস্তার করেন নাই। এই তিন জনের উপর, বিশেষ করিয়া ভ্যানগগের উপর, এশিয়া কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। ইঁহাদের চিত্রে বিশেষ করিয়া স্থান পাইয়াছে ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকুশলতা, যাহা এশিয়ার চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য। ইঁহাদের চিত্রের গঠন-পরিকল্পনাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। চিত্রে আলঙ্কারিক দিক (decorative element) খুব প্রবল।

বাংলার আধুনিক চিত্রকলার নব রূপ

ইউরোপের এই নূতন দলের প্রভাব বাংলার নব্য গোষ্ঠীর অনেকের উপরে পড়িয়াছে। সর্ব্বাগ্রে নাম করিতে হয় গগনেন্দ্রনাথের, তিনি কিউবিজ্‌মকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া ভারতীয় করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার কিউবিষ্ট-প্রথায় অঙ্কিত চিত্র দেখিলে মনে হয় না যে ইহা ধার-করা। তিনি বিভিন্ন রঙের সমাবেশে মনোহর মায়াজাল রচনা করিয়াছেন। তাঁহার আর এক ধরণের চিত্র—কালো রঙের বিভিন্ন স্তর ব্যবহার করিয়া চিত্র রচনা, ইহাও ইউরোপ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই চিত্রেও তাঁহার কলাকৌশল ও শিল্প-প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক সমালোচনা হইয়াছে। আমি সে-সকল অভিমত সমর্থন করি না। কবি রবীন্দ্রনাথ ও চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ একেবারে দুই পৃথক ব্যক্তি। তাঁহার ছবির উৎপত্তি হইল তাঁহার হাতের লেখা কবিতার খাতা হইতে। কাটাকুটি লাইন নানা রেখায় সম্বদ্ধ করিয়া তিনি রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। কাজেই চিত্রের মূল হইল ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকুশলতায়। চিত্রে রং ও রেখা লইয়া নানারকম খেলা দেখা যায়, কখনও সরল রেখায় অভিব্যক্ত কিউবিজ্‌মকে স্মরণ করাইয়া দিবে, কখনও রং ও রেখায় কোনো বস্তুর মনের ছাপ দিবে—ইম্প্রেসনিষ্টদের স্মরণ করাইবে। কখনও রং ও রেখার খেলায় বস্তুর রূপ হারাইয়া গিয়া কল্পনার য়্যাব্‌স্ট্রাক্ট রূপ প্রকটিত করে। এই শেষোক্ত চিত্র রুশীয়-পোলিশ শিল্পী ওয়াসিলি ক্যান্‌ডিন্‌স্কির (Wassily Kandinsky) এক্‌সপ্রেসনিজম্‌কে স্মরণ করাইয়া দিবে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিত্র বিচার করিলে আমার মনে হয়, এক্‌সপ্রেসনিজমের দিকেই ঝোঁক বেশী। পারলো পিকাসোর কিউবিজমকে এক জন ইংরেজ-সমালোচক intellectual pastime (বুদ্ধিবৃত্তির বিনোদন) এবং poetry of mathematics (গণিতের কবিতা) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক চিত্র সম্বন্ধে তেমন কিছু বলা যায় কি? কবিতার জন্ম হয় হৃদয়ে, কিন্তু এই জাতীয় চিত্রের জন্ম হৃদয়ে নহে, মস্তিষ্কে।

রবীন্দ্রনাথকে কোনো ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠীর ভিতরে ফেলা যায় না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং গোষ্ঠী পরিচয় নিজের কাজেই। অন্য কোনো শিল্পীর কাজে এই জিনিষ পাওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার চিত্রাঙ্কণ-প্রণালী অভিনব এবং মৌলিক।

নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার শিল্পীরা যে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী তাহাতে সন্দেহ নাই; তাঁহার নিকট হইতে এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার কাব্য হইতে চিত্রকরেরা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ সে-কথা স্বীকার করিয়াছেন।

ইউরোপের ইম্প্রেসনিষ্ট চিত্র হইতে অনুপ্রাণিত দৃশ্যচিত্র আজকাল মাঝে মাঝে প্রদর্শনীতে দেখিয়া থাকি, তবে ইহার পরিপূর্ণতা এখনও লাভ হয় নাই, কিছুকাল অপেক্ষা করিলে হয়ত এই ধরণের দৃশ্যচিত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইব। এই সকল দৃশ্যচিত্রে প্রকৃতির সরসতা ও সজীবতা বিদ্যমান। এ-সব চিত্র এখনও মনে হয় যেন কতকটা পরীক্ষাধীন।

নব্য গোষ্ঠীর কয়েকটি শিল্প বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা উচিত। ইহা শিল্পের আধুনিক গতিকে প্রবহমান রাখিয়াছে, এচিং, উড্‌-এনগ্রেভিং ও লিথো চিত্রকলার নূতন অধ্যায় সূচিত করিতেছে।

কাননে যদিও অনেক তরু জীর্ণপ্রায় কিন্তু নূতন অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে। নূতন অধ্যায় আমাদের চিত্রকলায় আবার সূচিত হইবে। এই যে অতিনূতন শিল্পীরা আগতপ্রায় তাহারা চায় প্রকৃতির ভিতর আবার ফিরিয়া যাইতে প্রেরণালাভের জন্য। অজন্টা, এলোরা, মোগল রাজপুত শিল্প তাহাদের কণ্ঠে দিয়াছে শক্তি, প্রকৃতি দিবে নূতন প্রাণ।*

* তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সভায় পঠিত

তৃতীয় তরঙ্গ

শ্রীবিমল মিত্র

ভাবিয়া দেখিয়াছি: জীবনটা কিছুই নয়, কেবল বিধিবদ্ধ কয়েকটি দিনের ইতিহাসভরা পৃষ্ঠা! সেই সকালের সূর্য্যোদয়ের ঘটা আর সন্ধ্যার সেই অস্তগমনের নিয়মানুবর্ত্তিতা! কোনও দিন এতটুকু এদিক-ওদিক হইবার জো নাই, অভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধাধরা! সারা জীবনটা তো এমনই কাটিয়া গেছে। পিছন ফিরিয়া দেখিলে সবই অন্ধকার—শুনাইবার মত গল্প তাহাতে নাই; ক্ষীণাতিক্ষীণ কয়েকটি পায়ের দাগ, তাও আজ বুঝি নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে!

স্কুলের বারান্দায় বসিয়া একমনে তাহাই ভাবিতেছিলাম।

মফস্বলের স্কুল—হেডমাষ্টার আমি, বেশ তো আছি—পরিবার নাই—ছেলেপুলে নাই—সারা জীবনটা আঙুলের ফাঁক দিয়া কখন যেন পলাইয়া গেল। ইচ্ছা ছিল সবই করিব। একটি প্রীতিমতী স্ত্রী; লক্ষ্মীর মত তাহার ছায়াপাতে আমার সংসার স্বর্গ হইয়া উঠিবে, আর তাহারই সঙ্গে কয়েকটি শিশুর কলগীতিতে ভরিয়া উঠিবে আমার গৃহাঙ্গন। সবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হয় নাই!...সামর্থ্য ছিল কিন্তু অর্থে কুলায় নাই।

পিছনের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলাম—রাইচরণ—

রাইচরণ নিকটেই কোথায় ছিল, শশব্যস্তে উত্তর দিল—আজ্ঞে আন্‌ছি—

অর্থাৎ তামাক সাজিয়া আনিতেছি। আহুক—ও-জিনিষটা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, আর ছাড়িতে পারি না। সামনের খোলা মাঠের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেছে—সামনের তেঁতুলগাছটার ফাঁক দিয়া অনেক দূরে ইছামতী নদীটি দেখা যায়। আরও ওদিকে নদীটা যেখানে মোড় ঘুরিয়াছে, ঠিক সেই বাঁকের মুখেই বাঁশতলার শ্মশান। হাওয়াটা সোজাসুজি সেইদিক হইতেই আসিতেছে।...হঠাৎ যেন কেমন একটা অনমুভূত চেতনা অনুভব করিলাম। এমন কিছুই না। ওই দিগন্তবিসারী মাঠ, ওই প্রবহমান নদী আর দূরে বাঁশতলার শ্মশানের অদ্ভুত ঘুমন্ত সৌন্দর্য্য—আর এই নির্জ্জীব রাত্রি—সব মিলিয়া আমাকে বড় নিঃসঙ্গ করিয়া তুলিল। বড় নির্জ্জন—বড় একা! এমন ভাবনা এই প্রথম নয়—তবু আজই যেন আবার তাহারা পুনরুল্লেখ করিয়া দিল। মনে হইল, আর এক মুহূর্ত্তও যেন এখানে থাকিতে পারিব না—যেদিকে দু-চোখ যায় ছুটিয়া চলিয়া যাই।

যেন জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি......

কালই ছেলেদের ছুটি হইয়া যাইবে; গরমের ছুটি। এই নির্জ্জন নিঃসঙ্গ পুরীতে কেমন করিয়া কাটাইব কি জানি। সারাদিন ছেলেদের কলকাকলীর মধ্যে ডুবিয়া থাকি—টিফিনের সময় ছেলেদের হৈ চৈ—ছেলেদের বয়সোচিত চাঞ্চল্য বেশ লাগে। আড়ালে থাকিয়া উহাদের প্রত্যেকের গতিবিধি—প্রত্যেকের অস্থিরচিত্ততা লক্ষ্য করি। আমাকে উহারা ভয় করে—তবু উহাদের ছাড়িয়া যেন থাকিতে পারি না। এমন লম্বা একটা ছুটি—রাইচরণকে লইয়া কোথাও বাহির হইয়া পড়ি। যেখানে হোক—বিদেশে, পশ্চিমে ট্রেনে চড়িয়া অনেক দূর—অনেক দূর—

হঠাৎ মনে হইল, ছেলেটি আসিতেছে। মাথাটা কাটিয়া

রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি রক্তে লাল—দুর্ব্বল পায়ে যেন আর হাঁটিতে পারে না। ভয়ে সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিল; যেমন বসিয়াছিলাম তেমনই বসিয়া আছি—মুখে একটা কথা নাই; লাল মুখ—চোখের উপর সেই লাল আভা পড়িয়াছে—বাঁশতলার শ্মশান হইতে যেন এইমাত্র উঠিয়া আসিয়াছে। বড় ভয় করিতে লাগিল। কেহ কোথাও নাই—শহরের প্রান্তে এই স্কুল—সামনের তেঁতুলগাছ—দূরের বাঁশতলার শ্মশান—আর ঠিক তারই পাশে বহমান নদী—এই পরিত্যক্ত স্কুল-বাড়ির বারান্দায় একা আমি—আর সামনে রক্তাক্ত একটি ছেলের ছায়ামূর্ত্তি—

আমার চোখের সম্মুখ হইতে কালো একটি যবনিকা উঠিয়া গেল।

ছেলেটি আসিতেছে—আমার সামনের সিঁড়ি দিয়া উঠিল। উপরে উঠিয়া আমার দিকেই আসিতেছে। ঠিক সেই রকম মুখ, সেই আকৃতি—অবিকল সে-ই! এতটুকু তফাৎ নাই কোথাও—হঠাৎ দেখি: আমার গায়েও রক্ত লাগিয়া গিয়াছে। এ আমার কি হইল! রাত্রির একটানা বাতাসে যেন কি নেশা আছে। আমার আপাদমস্তক একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নিজেকে যেন আর বিশ্বাস নাই। এই মুহূর্ত্তে আমি যেন পাগল হইয়া যাইতে পারি। সারা জীবনের পথ অতিবাহনে কোথাও যেন এক মুহূর্ত্তের বিশ্রাম পাই নাই—কোনও দিন যেন কাহারও ভালবাসার ছায়াতলে নিজেকে নিরাপদ ভাবিতে পারি নাই।—একটি দীর্ঘশ্বাসের দীর্ঘসূত্রতায় জীবনটা কাটাইয়া দিয়াছি—স্নেহ নাই, প্রেম নাই—অকিঞ্চিৎকর এই জীবনের মূল্য। মৃত্যু-কঠোর যন্ত্রণার বিনিময়ে যাহা কিনিতে হয় মৃত্যুতেই তাহার পরিসমাপ্তি!

—ও মাষ্টার মশাই—মাষ্টার মশাই—নিন্—

সম্মুখে চাহিতেই দেখি—রাইচরণ।

হুঁকাটি বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে; হুঁকার মাথায় কলিকার উপর আগুন; সেই আগুনের আভায় রাইচরণের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। মুখখানিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এতখানি বড় বড় গোঁফ—কয়দিন দাড়ি কামায় নাই। আগুনের আলোয় মুখখানিকে বড় বীভৎস দেখাইতেছিল। সেই গোঁফের ফাঁক দিয়া দাঁত বাহির হইল।...

—এই নিন্, ডেকে ডেকে আপনার সাড়াই নেই মশাই, বেশ ঘুমোচ্ছিলেন, কিন্তু যেন সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়বেন না, তত ক্ষণ তামাক খান্, ভাত হ'লেই ডাক্‌বো—

বেশ ভাল করিয়া একবার ধোঁয়া টানিলাম। গল্ গল্ করিয়া ধোঁয়া বাহির হইল।

ধোঁয়া বাহির হয় কি না দেখিয়া তবে রাইচরণ যাইবে। ধোঁয়া দেখিয়া রাইচরণ চলিয়া যাইতেছিল; ডাকিলাম—একটা কথা ছিল রাইচরণ—

রাইচরণের সঙ্গে আমার অনেক কথা থাকে, তা রাইচরণ জানে।

বলিল—দাঁড়ান্, ভাতটা তবে চাপিয়ে আসি—

রাইচরণ চলিয়া গেল। পরম নিবিষ্ট চিত্তে হুঁকা টানিতে লাগিলাম। অন্ধকারের মধ্যেও ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলি দেখিতে পাই—ডাইনীর জটার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে। নিতান্তই আলস্য-বিলাসে গা এলাইয়া দিলাম।

আজ মনে পড়িল: কতদিনের ছাড়িয়া-আসা ঘরের কথা; অনাত্মীয়, আত্মীয়, পরিজনদের কথা—যাহারা বহুদিনের ব্যবচ্ছেদে চিরকালের মত পর হইয়া গিয়াছে; আজ আর তাহাদের কাছে কিছু দাবি করিবার অধিকার নাই। নিজের শরীর, মন তাহাকেও আজ কি জানি কেন—আর বিশ্বাস করিতে পারি না। এক আছে রাইচরণ আপদে বিপদে, শেষ-জীবনটার কয়েকটি দিন রাইচরণের সাহচর্য্য আমার জীবনে অপরিহার্য্য এবং অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বারো টাকা মাহিনার বেয়ারা—অথচ উহার সেবার কি মূল্য কষা যায়? ওই রাইচরণ আমার জীবনের প্রথম ও পরম বিলাসিতা। অপরিমেয় দারিদ্র্যের মধ্যেও যেন বিধাতার পরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ!

রাইচরণ আসিয়া সামনে দাঁড়াইল—বলুন—সব বেটা চোর মশাই, ছ-আনা ক'রে সের নিলে বেগুনের—তা নিবি নে—কিন্তু সব ক'টি একেবারে পেকে—

রাইচরণ কথাটা আর শেষ করিল না। বলিলাম—তা'তে আর কি হয়েছে, পোড়াতে দাও—বেগুন-পোড়া খেতে বেশ লাগবে'খন্—

রাইচরণ শশব্যস্তে চম্‌কাইয়া উঠিল—আরে বাপ্ রে, আজকে না আপনার জন্মদিন?

অগত্যা স্বীকার করিতে হইল যে জন্মদিনে দগ্ধ বেগুন খাওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ! কিন্তু আশ্চর্য্য রাইচরণের স্মৃতি-শক্তি—কবে কথায় কথায় কি কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম ওর ঠিক মনে আছে।

বলিলাম—যা বলছিলাম রাইচরণ এই তো লম্বা গরমের ছুটি, চলো না তীর্থ-টীর্থ ক'রে আসি দু-জনে—বৃন্দাবন, মথুরা, পুষ্কর, সাবিত্রী—

রাইচরণ উঠিয়া বসিল—চলুন কালই মশাই, আমি এখনই রাজি—সত্যি তো?

—সত্য না তো কি মিথ্যে? বলিলাম—আজই গেলে ভাল হ'ত—শুধু ইস্কুলের ছুটির জন্যে যা দেরি, কাল তো ছুটি, চলো পরশু বেরিয়ে পড়ি—

রাইচরণ বলিল—বেশ।

তার পর খানিক থামিয়া বলিয়া উঠিল আমি একটা ফন্দি এঁটেছি মশাই—

বলিলাম—কি, শুনি?

—সব্বাই তো বলে মশাই—কামিখ্যেতে নাকি লোকদের ভেড়া ক'রে রাখে, হেন-তেন কত কি!···আমার একবার দেখতে ইচ্ছে করে মশাই, বুঝলেন,···দেখেই আসি না সত্যি না মিথ্যে—কি বলেন?

প্রশ্নটি করিয়া রাইচরণ কৌতূহলী নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। ইহার কি উত্তর দিব? মনে মনে বলিলাম—ভেড়া হওয়ার বাকী আছে কি? অর্থের দাস, ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করি। স্বাধীনভাবে এতটুকু কিছু করিতে হইলেই চাই সই। মেষ হওয়াও ইহা অপেক্ষা যে অনেক ভাল।

হাসিয়া জবাব দিলাম—বেশ তো, দেখেই আসা যাক্ স্বচক্ষে—সত্যি কি না—

ক্রমে অনেক রাত্রি হইয়াছে।

খাটের উপর ঘুমাইয়াছিলাম—হঠাৎ চট্ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি। নীচে মেঝের উপর রাইচরণ শুইয়া। মনে হইল: রক্তাক্ত ছেলেটি আবার আসিতেছে। টপ্‌টপ্ করিয়া রক্তের ফোঁটাগুলি মেঝের উপর পড়িতেছে। কাটা মাথাটা এক হাতে চাপিয়া ছেলেটি আমার দিকে আসিতেছে! রক্তে ঘর ভাসিয়া গেল! নিস্তব্ধ ঘরে কেমন একটা গুঞ্জন উঠিল; রাত্রের আবহাওয়া যেন সেই সুরে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে। চোখের সামনে ছায়ামূর্ত্তির রক্তাপ্লুত অবয়ব যেন বাস্তব হইয়া উঠিল। সব মিথ্যা—সত্য নয়, সত্য নয়—মনের মধ্যে হাজার সংশয় সন্দেহও আমাকে এতটুকু স্থির-বুদ্ধি করিতে পারিল না। মনে হইল—কি যেন উহার আমাকে বলা হয় নাই—রাত্রি হইলেই তাই আসে—কিছু বলিবার জন্য কাছে আসিয়া দাঁড়ায়—কিছু অভিযোগ, কিছু দাবি, নয়ত কৃতজ্ঞতা!···

মনে পড়িল সমস্ত ঘটনাটা; কেমন করিয়া সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়াছিল—পড়িয়া রক্তাক্ত মেঝের উপর কেমন করিয়া ছটফট্ করিতেছিল—

হঠাৎ ছেলেটি একেবারে বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই চীৎকার করিয়া উঠিয়াছি—রাইচরণ—রাইচরণ—

—আজ্ঞে—বলিয়া রাইচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমার তখন কথা বন্ধ। কি হইতে কি হইয়া গেল, যেন ভোজবাজি! ভয়, লজ্জা, বিস্ময় সব মিলিয়া আমাকে নির্ব্বাক করিয়া দিল। সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি যেন তখনও সত্য ব্যাপারটি উপলব্ধি করিতেছিলাম—চোখ আমার লক্ষ্যশূন্য—শিরায় শিরায় রক্তের প্রচণ্ড গতি—গা বহিয়া ঘাম ঝরিতেছে···

রাইচরণ আলো জ্বালিল। বলিল—আনছি—

অর্থাৎ তামাক সাজিয়া আনিতেছি—বলিয়া বাহির হইয়া গেল। আসুক—আজ আর ঘুম আসিবে না—আজ রাত্রিটা জাগিয়া কাটাইতে হইবে।

হারিকেন লইয়া বারান্দায় আসিলাম। আসিয়া চোখে মুখে ভাল করিয়া জল দিলাম। হু হু করিয়া দক্ষিণ দিক হইতে হাওয়া আসিতেছে—ইজি-চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলাম। রাত্রির দুঃস্বপ্নের পর যেন প্রভাতের প্রসন্নতা অনুভব করিতেছি—

রাইচরণ তামাক সাজিয়া দিয়া গেল—।

বলিলাম—তুমি শোও গে যাও, আমি খানিক পরে যাচ্ছি।

রাইচরণ বলিল—দেখবেন, ঠাণ্ডা লাগাবেন না আবার—যে শরীর আপনার—

রাইচরণ যেন আমার গুরুমশাই। দণ্ডে দণ্ডে

সতর্ক-বাণী শুনিতে শুনিতে আমি অস্থির। অথচ সারা জীবনে এমন ভালবাসা, এমন সতর্ক-বাণী কাহারও কাছে পাই নাই। আজ রাইচরণ আছে—খাওয়া-দাওয়ার এতটুকু অনিয়ম করিতে দেয় না—রাইচরণের পাল্লায় পড়িয়া শরীর-পালনের বিধি-নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে চলাফেরা করিতে হয়—এতটুকু বাহির হইলেই রাইচরণের বকুনি আছে; একটু যদি কোনও দিন অনিয়ম করি—রাইচরণ মুখ গম্ভীর করিয়া বলে—পর ব'লেই আমার কথা শোনেন্ না, গিন্নী-মা থাকলে—

ইহার পর আর কথা নাই। শেষ-জীবন এই যে শান্তি, এই যে নীড় বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা—প্রথম জীবনে ইহার আভাস পাই নাই এতটুকুও। সেদিন যদি পাইতাম তাহা হইলে ঠিক এমন করিয়া হয়ত জীবনের পরিসমাপ্তি হইত না।...

দেখিতে দেখিতে আকাশ কালো হইয়া আসিতেছে। চাঁদ ডুবিয়া গেল। এতক্ষণে যেন পৃথিবী জুড়িয়া নিবিড় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে...

মাথার উপর দিয়া কয়েকটি পাখী উড়িতে উড়িতে ওদিকে চলিয়া গেল।

মনে হইল, অতীতের অরণ্য হইতে উহারা যেন বর্ত্তমানের লোকালয়ে ফিরিয়া আসিতেছে। চুপ করিয়া কান পাতিয়া রহিলাম।...যেন কবেকার ছাড়িয়া-আসা অতীতের পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি; অতীতের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছি।...সেদিন সেই কৈশোরের দিনগুলি করুণ মূর্ত্তি লইয়া আবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল...নিজের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিলাম।

থাকিতাম পরের বাড়িতে—খাইতাম আর এক বাড়িতে। দয়া করিয়া আমায় মানুষ করিবার ভার তাঁহারা লইয়াছিলেন—তাহাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ! কিন্তু এখন ভাবি! আমাকে মানুষ করিবার অতটা সদিচ্ছা তাঁহাদের না থাকিলেই ভাল হইত—

এখনও মনে আছে: সে ঘরটায় আগে থাকিত চূণ-সুরকী। গরমের দিন রাত্রে মনে হইত যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে।

সকালবেলা স্কুল। জামা-কাপড় পরিয়া এক মাইল হাঁটিয়া এক বাড়িতে খাইতে হইবে—তার পর সেখান হইতে ইস্কুল। প্রকাণ্ড বাড়ি—আত্মীয়, পরিজন, অতিথি-অভ্যাগতে ভরা। রান্নাঘরে গিয়া অতি বিনীত স্বরে ভাত চাহিলাম। স্থূলাঙ্গী বামুন-মাসী তখন রান্নায় ব্যস্ত। আমাকে দেখিয়াই বলিল—দূর দূর—বাবুদের এখনও খাওয়া হ'ল না, উনি নবাব এলেন—

বলিলাম—দাও বামুন-মাসী, আজ সকাল-সকাল ইস্কুল—

কথাটা শুনিয়াই বামুন-মাসী গরম হাতা লইয়া ছুটিয়া আসিল—তবে রে ছোঁড়ার নিকুচি করেছে—

পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলাম। ঝির কাছে শুনিলাম বাবুদের সরু চালের ভাত হইয়া গেছে, আমাদের জন্য মোটা চালের ভাত তখনও চাপান হয় নাই। সে-ভাত হইতে এখনও অনেক দেরি আছে।

সেদিন না-খাইয়াই দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া ইস্কুলে গেলাম। দেড় মাইল রাস্তা—রৌদ্র আর বৃষ্টিতে পথের অবস্থা শোচনীয় হইয়া আছে। শরীরের অবস্থা আরও শোচনীয়। মাথা ঘুরিতেছিল—ইস্কুলের ছুটির পর কেমন করিয়া পথ হাঁটিতেছি কিছুই টের পাইতেছি না। কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছি ঠিক নাই। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। দেহের শিরা-উপশিরাগুলি যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। কান দুটি গরম হইয়া গেল। কি করিয়াছি কিছুই মনে নাই। শুধু মনে আছে আমি হাঁটিতেছি—পথের পর পথ হাঁটিতেছি...কিন্তু কোন্‌দিকে যে যাইতেছি তাহার ঠিক নাই। সন্ধ্যা হইয়া গেল—হঠাৎ কোথায় কাদায় পা পড়িতেই আমি পড়িয়া গেলাম।

সহসা চেতনা হইল—

লাগিয়াছে খুব—মাথাটায় বেশী লাগিয়াছে। কিন্তু সে-লাগার জন্য চিন্তা নয়; জামা-কাপড় কাদায় একেবারে মাখামাখি হইয়া গেল—এ-লইয়া বাড়িতে ঢুকিব কেমন করিয়া। এ-অবস্থা দেখিলে দয়া করা দূরের কথা জ্যাঠামশাই মারিয়া খুন করিবে। যে-বাড়িতে থাকিতাম, জামা-কাপড় পাইতাম সেই বাড়ি হইতে। মনে হইল কনুইয়ের কাছে কোটটা যেন ছিঁড়িয়া গিয়াছে।...আমার মাথা গোলমাল হইয়া গেল।...আমার কথা বিশ্বাস করিবে কে?

চোখের সামনে জ্যাঠামশাইয়ের বীভৎস মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল।···সেই পরিচিত বেতের আঘাতের শব্দ যেন কানে শুনিতে পাইলাম; দুই হাতে থান-ইট লইয়া দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে—কোনও কোনও দিন রাতে ফেল করিয়াছি বলিয়া ভাত খাইতে পাই নাই। হয়ত এ-সব আমার ভালর জন্যই—কিন্তু রক্ষা এই: পৃথিবীতে এমন ভাল করার লোক অতি অল্প।

তার পর সেই কাদামাখা জামা লইয়া আসিতেছি। বাড়ির কাছে আসিয়া পা যেন আর চলিতে চায় না। কেমন করিয়া ঢুকি—হঠাৎ দেখা হইলে কি কৈফিয়ৎ দিব।

আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া খিড়কীর দরজা দিয়া ঢুকিলাম; সে দিকটায় বাগান অন্ধকার; বেশ সন্তর্পণে আসিতেছি···হঠাৎ কানে আসিল—কে রে?

মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে যেন এক নিমেষে রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়া গেল।

—কথা বলছিস্ না—কে?—পণ্টু বুঝি?

কাছে আসিতেই দেখিলাম—রাণুদি'—

রাণুদি'কে দেখিয়াই আর থাকিতে পারিলাম না—অসহায়ের মত কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাণুদি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিল—প'ড়ে গিছ্‌লি বুঝি? তা কাঁদছিস্ কেন?

কেন যে কাঁদিতেছিলাম তা কি আমিই জানি? রাণুদি'র হাতের স্পর্শে কান্না যেন আরও প্রবল হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত ঘটনাটা রাণুদি'কে বলিলাম।

শেষকালে বলিলাম—তোমার পায় পড়ি রাণুদি—জ্যাঠামশাইকে ব'লে দিও না—

রাণুদি বলিল—তবে আগে পায়ে পড়—

কি ভাবিয়া রাণুদি'র পায়ের উপর হাত দিতে গেলাম—রাণুদি দুই হাত দিয়া আমায় তুলিয়া ধরিল। হাসিয়া বলিল—দূর ন্যাকা ছেলে—একটু বুদ্ধি নেই তোর?···

তার পর সে-রাত্রে রাণুদি'র চেষ্টায় কেমন করিয়া সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল। তার পর দিন জামা-কাপড় ফর্সা অবস্থায় আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত।···রাণুদি না থাকিলে সেদিন যে কি ছিল আমার কপালে, তা আমিই জানি।

তার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে···

জাঁকজমক করিয়া রাণুদি'র বিবাহ হইয়া গেল। বর-কনে চলিয়া যাইবার সময় মোটরের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম; কিন্তু রাণুদি একবারও চাহিয়া দেখিল না। মনে আছে: সেই অভিমানে খুব কাঁদিয়াছিলাম দিনকতক। রাণুদি'র চিঠি আসিয়াছে শুনিলে কান পাতিয়া থাকিতাম: চিঠিতে আমার কথা আছে কি না? মনে মনে রাণুদি'কে কত ডাকিতাম।

তখন শীতকাল। কয়েক দিন ধরিয়া জ্বর হইয়াছিল সবে সেদিন পথ্য করিয়াছি—

জানালা হইতে দূরে করমচা-গাছের দিকে চাহিতে চাহিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—আকাশের সাদা-কালো মেঘে কখন অজ্ঞাতে একটি সুকঠিন বজ্র তৈরি হইতেছিল, টের পাই নাই।

হঠাৎ জ্যাঠামশাইয়ের ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

থর-থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বৈঠকখানায় গিয়া হাজির হইলাম। সবে মাত্র জ্বর হইতে উঠিয়াছি—দুর্ব্বলতায় চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

জ্যাঠামশাইয়ের পাশে বেতের ছড়িটার উপর নজর পড়িল। কিন্তু—কি জানি কেন—জ্যাঠামশাই সেটি স্পর্শ করিল না!

কাছে যাইতেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—এটা কি?

নজর করিতেই দেখি: সর্ব্বনাশ! আমার কবিতার খাতাখানা তাঁহার সামনে খোলা। মনের খেয়ালে কখন কি লিখিতাম। শরৎ লইয়া, জন্মভূমি লইয়া, মা লইয়া এমনই কত কি লইয়া! রাণুদি'র জন্য যখন কান্নায় গলা বন্ধ হইয়া যাইত তখন রাত জাগিয়া পদ্যাকারে যাহা লিখিতাম, তখন সেগুলিকে 'কবিতা' বলিতাম!···আমার নিজের জীবন হইতে প্রিয়তর জিনিষটির দুর্গতির কথা ভাবিয়া আমার চোখে জল আসিবার জোগাড় হইল।

—এটা কি? কে লিখেছে? উত্তর দে। জ্যাঠামশাইয়ের কণ্ঠে যেন বিষ আছে।

ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম—আমার—

হুঁম্—বলিয়া জ্যাঠামশাই চুপ করিলেন।

হয়ত আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া শাস্তি হইতে রেহাই পাইলাম; কিন্তু সে-শাস্তির বদলে যে-শাস্তি পাইলাম তাহা এ-জীবনে ভুলিতে পারিলাম কই?

চেয়ার হইতে উঠিয়া জ্যাঠামশাই বলিলেন—আয়—

বারান্দায় গিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া বলিলেন—এই নে, পোড়া, নিজে হাতে পোড়া—নিজে পোড়ালে চিরকাল মনে থাকবে—ভাবছিস্ কি ?

কি আর ভাবিব ? ফস্ করিয়া একটা মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া দেশলাই-কাটি জ্বলিয়া উঠিল ; তার পর যত ব্যথা, যত বেদনা, যত গোপন কথা খাতার পাতায় আবদ্ধ ছিল, সব জমাট্ ধোঁয়ার আকারে আকাশ-বাতাস প্লাবিত করিয়া দিল। নিজের চোখে সমস্ত দেখিলাম, কিন্তু যখন অসহ্য হইল ঘরে ছুটিয়া আসিলাম। মনে আছে: বালিশে মুখ গুঁজিয়া কতদিন ধরিয়া সে কি কান্না ! সেদিন 'পণ্টু' বলিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া শান্ত করিবার লোক ছিল না।···

তার পর যবনিকা উঠিলে দেখা গেল: শহরের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

কি একটা পর্ব্বের উপলক্ষে আমার ছুটি—কর্ত্তাদের আফিস। তাড়াতাড়ি বাজার করিয়া ফিরিতেছিলাম ; এক হাতে সংসারের যাবতীয় দ্রব্য। আলু পেঁয়াজ হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড়-কাচা সাবান, সমস্ত ! আর এক হাতে আছে: জীবন্ত শিঙ্গি, কই, আর আমাদের মত বাড়তি লোকেদের জন্য কুচো মাছ !

বাজার করিতে করিতে দেরি হইয়া গেছে।

তাড়াতাড়ি বউবাজারের রাস্তাটা পার হইতেছিলাম।

রাস্তা পার হইতে গিয়া ট্রাম লাইনে কেমন করিয়া এক পাটি জুতা লাগিয়া গেল।

অতর্কিত এই বাধা পাইয়া একেবারে সোজা রাস্তার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলাম।

হঠাৎ কোথা দিয়া কি হইয়া গেল ; হাতের বাজার হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে।

দেখি: আমার চারি দিকে আলু পেঁয়াজ বেগুন রাস্তার উপর গড়াইতে গড়াইতে চলিয়াছে। দূরে অনেক দূর পর্য্যন্ত—যেখানেই চাই, দেখি: গড়াইতে গড়াইতে অজানার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে পেঁয়াজ আলু আর বেগুনের দল। আর ইহাদেরই পাশাপাশি কই, শিঙ্গি, মাছগুলি সুবিধা পাইয়া রীতিমত হাঁটিতে সুরু করিয়াছে।

কিন্তু আর একটি জিনিষ নজরে পড়ে নাই। উপরে চাহিয়া দেখি: দু-পাশে ট্রাম, বাস, লরি, সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া গেছে। দু-পাশেই গাড়ীর সমুদ্র ; অজস্র চাকা, চাকার পর চাকা, চাকার যেন আর শেষ নাই। জনতা-বহুল কলিকাতার রাস্তায় হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটিয়া সমস্ত গতি-প্রবাহ এক নিমেষে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। হঠাৎ সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে—রাস্তার সমস্ত লোক, এবং গাড়ী ভরা সবাই আমাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। এক মুহূর্ত্তে যেন আমি বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছি।

অপরিচিত কাহারা আমাকে তুলিয়া রীতিমত বকিতে সুরু করিল—খুব বেঁচে গেছ খোকা, এমন অসাবধানে রাস্তায় চলতে আছে ?···তোমার বাড়ি কোথায় ? কোথায় লেগেছে, দেখি ?···ইত্যাদি।

তাহারাই আলু, বেগুন, পেঁয়াজ, মাছ কুড়াইয়া আবার পুঁটুলি বাঁধিয়া দিল।

হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকিল—পণ্টু—

ফিরিয়া চাহিয়া দেখি—রাণুদি' !

রাণুদি মটর হইতে নামিতেছে। এখন চেহারাও অনেক বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। যেন আরও অনেক বড় হইয়াছে, মোটা হইয়াছে, রং ফরসা হইয়াছে ; রাণীর মত দেখাইতেছে।

মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আমার আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। কিছু কথা বলিতে পারিলাম না।

রাণুদি কাছে আসিয়া সেই রকম মাথায় হাত দিয়া বলিল—কি রে, লেগেছে খুব ?

কি যে হইল, বেশ ছিলাম, রাণুদি'কে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলাম।

—কাঁদিস্ নে, নিজে প'ড়ে কি নিজে কাঁদতে আছে ?···

তার পর আমার হাত ধরিয়া রাণুদি বলিল—আয়—

কাপড়টা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল ; সেই ছেঁড়া কাপড়ে দুই হাতে বাজার লইয়া মোটরে গিয়া উঠিলাম। চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে মোটরটা ; জড়সড় হইয়া একদিকে বসিলাম !

রাণুদি বলিল—ভাল হ'য়ে বোস—

ভাল হইয়া বসিলাম।

রাণুদি বলিল—অত অন্যমনস্ক হ'য়ে পথে চলতে আছে ? যদি গাড়ী চাপা পড়তিস্ ?

মনে মনে বলিলাম: ভাগ্যিস্ এমন অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিলাম। সেই এক দিন, আর এই এক দিন। এমন করিয়া না-পড়িলে তো রাণুদির দেখা পাইতাম না।

গাড়ী চলিতেছে; কতদিন কাঁদিতে কাঁদিতে রাণুদি'কে ডাকিয়াছি, অথচ এমন পাশে বসিয়াও রাণুদি'র মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছি না—কত কথা বলিব বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম—কিন্তু এখন কথা ফুটিতেছে না কেন? রাণুদি কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, হুঁ, হাঁ করিয়া উত্তর দিতে লাগিলাম।

রাণুদি বলিল—বাড়িতে বাজার রেখে চল্ তুই, আমার সঙ্গে যাবি, আমার বাড়ি—

গলির মোড়ের মাথায় মটর দাঁড়াইল। আমি এক ছুটে বাড়িতে বাজার ফেলিয়া দিয়া আবার আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। একদিনে যেন আমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; গাড়ী ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। রাস্তার পর রাস্তা—রাস্তার লোকজন সবাই সসম্ভ্রমে রাণুদি'র গাড়ীকে পথ করিয়া দিতেছে। নিজের গর্ব্ব হইতে লাগিল, রাণুদি'র পাশে বসিয়া রাণুদি'র মোটরে চড়িয়া রাণুদি'র বাড়িতে চলিয়াছি—আমার সমান কে?

প্রকাণ্ড এক বাড়ির সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল।

লোকজন যে যেখানে ছিল সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; চাকর-বাকর দরোয়ান সবাই রাণুদি'কে দেখিয়া মাথা নীচু করিয়া সেলাম করিল। সেদিকে না চাহিয়া রাণুদি আমার হাত ধরিয়া বলিল—আয়—

কত ঘর পার হইয়া শেষে এক জায়গায় গিয়া থামিতে হইল।

রাণুদি বলিল—বোস্—

চকচক্ করিতেছে গদি-আঁটা চেয়ার, তাহাতে বসিয়াছি। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি: বিচিত্র জিনিষপত্রের সমারোহ; মাথার উপরে পাখা, আলো; দেয়ালের ছবি, আলমারীর পুতুল, টেবিলের ফুল—সবই বিচিত্র। বিস্ময়ে আমার দু-চোখ ভরিয়া উঠিল।

রাণুদি' সাজ-পোষাক বদ্‌লাইয়া আসিয়াছে। বলিল—হাত-পা ধুবি চল্—

হাত-পা ধুইয়া আসিলাম। তার পর আসিল খাবার। রাণুদি'র সামনে বসিয়া খাবার মুখে তুলিতে কেমন লজ্জা করে।

রাণুদি বুঝিতে পারিয়াছে। বলিল—দিদির সামনে লজ্জা কিসের?···মুখে তোল—

খাইতে খাইতে রাণুদি কত কথা বলিতে লাগিল:

—চেহারা তোর ভারি রোগা হ'য়ে গেছে, যে-বাড়িতে আছিস্ ওরা বুঝি খুব খাটায়? ওদের বাড়িতে যদি তোর থাকতে কষ্ট হয়, তবে আমার এখানে চলে আসবি, এখানে থাকবি খাবি-দাবি—বেশ তো বুঝলি?···হ্যাঁ, তুই আবার বুঝবি, তুই যা বোকা—এক পা চলতে গেলে দু-বার হোঁচট্ খাস্! আর দেখ লেখাপড়া করবি ভাল ক'রে; লেখাপড়া না শিখলে কেউ ভালবাসবে না, সবাই মুখ্যু বলবে—মন দিয়ে লেখাপড়া করবি,—আর ভাল কথা, তুই ভগবানকে ডাকিস্ তো? ডাকিস্ না? কি বোকা ছেলে রে! ডাকবি—রোজ ভগবানকে একবার ক'রে ডাক্‌বি; বলবি: হে ভগবান, আমায় ভাল কর, আমি যেন সৎপথে থাকি, সত্যি কথা বলি!···বল্‌বি এই সব কথা, বুঝলি? এই দেখ্ না টাকাই বল্, কড়িই বল্, এই সব, ইচ্ছে করলে একদিনে ভগবান কেড়ে নিতে পারে—পারে না?

আরও কি কি কথা রাণুদি বলিয়া গেল, সব মনে নাই!

কি একটা কাজে রাণুদি ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। আমি এটা-ওটা দেখিতে দেখিতে ঘরের বাহিরে আসিলাম। অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য চারি দিকে—একবার দেখিলে কৌতূহল মিটে না! প্রকাণ্ড বাড়ি কোন্‌দিকে চলিতেছি ঠিক নাই! এ-সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, ও-সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে কত ঘর পার হইয়া আসিয়াছি। বারান্দা দিয়া বেড়াইতেছি—সামনে বাগান। ফুল তুলিতে যাইতেছিলাম—উপরে চাহিয়া দেখি: একটা পাখী খাঁচার ভিতর বসিয়া আছে। চমৎকার পাখীটি—লাল দেহের রং—পাখীর রঙীন্ লেজটি খাঁচার বাহিরে পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে!

কি যে কৌতূহল হইল, আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে লেজ ধরিয়া টান দিয়াছি। টানিতেই পাখীটি কর্কশ স্বরে ক্যাঃ-ক্যাঃ করিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে। বেশ মজা লাগিল। কিন্তু হঠাৎ পিছন হইতে কে ছুটিয়া আসিয়া খপ্ করিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিল।

বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধরিয়া ডাকিতে লাগিল—মঙ্গল সিং, মঙ্গল সিং—

সাজপোষাক-পরা লাঠি-হাতে হিন্দুস্থানী দরোয়ান আসিয়া সেলাম করিল।

লোকটা আমায় জিজ্ঞাসা করিল—কে তুই? কোত্থেকে এলি?

ভয়ে ভয়ে অস্ফুট স্বরে বলিলাম রাণুদি এনেছে—

—রাণুদি কে?

রাণুদি'কে তাহারা চিনিতে পারিল না। হাত ছাড়িয়া দিয়া লোকটি আমার কান ধরিল—বলিল—আয়, আয় আমার সঙ্গে—

কান ধরিয়া লোকটি আমায় টানিয়া লইয়া চলিল। কোথায় লইয়া যাইতেছে কে জানে। মনে হইল: রাণুদি বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকি। একটা ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া লোকটি বলিল—যা, মঙ্গল সিং, রাণীমাকে গিয়ে খবর দিয়ে আয়—বল্ যে চোর পাক্‌ড়েছি।

খানিক পরেই দেখি: রাণুদি আসিতেছে। রাণুদি'কে দেখিয়াই লোকটি একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল—আজ্ঞে রাণীমা, এই দেখুন আপনার চাকরদের কীর্ত্তি, হাজারটা চাকর আপনার বাড়িময় পাহারা দিচ্ছে—ব'সে ব'সে মাইনে খাচ্ছে, কাজ করবার নামে সব এক-একটা অপদার্থ, রাস্তার লোকজন চোর বাটপাড় কোথা দিয়ে কে ঢুকছে—এই দেখুন—আমি যদি না দেখতুম—

হঠাৎ যেন বোমা ফাটিয়া উঠিল। বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে রাণুদি বলিয়া উঠিল—ছাড়ুন—

লোকটি সেই শব্দেই আমার হাত ছাড়িয়া দিল।

তার পর রাণুদি আমায় কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—তোকে এরা কিছু বলেছে পল্টু?

রাণুদি'র মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িলাম—না।

রাণুদি'র বজ্রকণ্ঠে আবার কথা বাহির হইল—যান্ এখান থেকে, আপনার নিজের কাজ দেখুন—ঘরে গিয়া রাণুদি'র মূর্ত্তি বদলাইয়া গেল। হাসিয়া বলিল—তুই একটা আস্ত পাগল—

দুপুরবেলা স্নান সারিয়া খাওয়া-দাওয়া করিলাম। রাণুদি সামনে বসিয়া খাওয়াইল। রাণুদি'র ছোট ছেলেমেয়ে দু'টি যেন মোমের পুতুল; এক নিমেষে আমি তাহাদের পল্টু-মামা হইয়া গেলাম।

বিছানা পাতিয়া দিয়া রাণুদি বলিল—নে ঘুমো এখন, বিকেলবেলা তোকে গাড়ীতে করে' বাড়ি পাঠিয়ে দেব—

কত বেলা হইয়াছে কি জানি—রাণুদির ডাকে আবার ঘুম ভাঙিল। বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। হাত মুখ ধুইয়া আসিতেই রাণুদি আবার বসিয়া বসিয়া খাওয়াইল। তার পর বলিল—এই নে, এই কাপড়টা তোকে দিলুম, দিদির উপহার—

তার পর থামিয়া বলিল—বল্ দিকি নি, দিদির উপহারের ইংরেজী কি হবে?

অনেক ভবিয়া বলিলাম—Sistei's—আর বলিতে পারিলাম না।

রাণুদি'র ছোট ছেলেটি বলিল—আমি বলবো মা?

—না, তোমায় আর বলতে হবে না, তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিল—লেখা-পড়া ভাল ক'রে মন দিয়ে শিখবি এখন থেকে, তবে না পাঁচ জনে ভাল বলবে—লেখাপড়া না শিখলে পরের বাড়ির দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হবে—আর এই নে…

বলিয়া রাণুদি দু'টি টাকা আমার হাতে দিল—এই নে, নিজের কাছে রেখে দিস্। ইস্কুলে যখন খিদে পাবে তখন মাঝে মাঝে কিছু কিনে খাস্—এখন এই থাক্, পরে আরও দেব, পকেটে রাখ, হারিয়ে ফেলিস্ নে আবার—

কাপড়টা দেশী, তাঁতে বোনা, জরির পাড়; ভাল করিয়া মুড়িয়া লইলাম।

রাণুদি বলিল—কবে আসবি আবার? পরশু ঠিক? চিনতে পারবি?

মাথা নাড়িলাম। রাণুদি'র আদেশমত সরকার-মশাই আসিল। দেখিলাম সকালের সেই লোকটি; এবার কিন্তু বেশ আদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল। বাঃ দিব্যি ছেলে, এস খোকা সোনা-ছেলে—এস…

আমাকে অতি যত্নে মোটরে লইয়া গিয়া বসাইল, বলিল—ব'সো, আয়েস ক'রে।

বাড়ির ঠিকানাটা সরকার-মশাইকে বলিয়া দিলাম।

গাড়ী চলিতেছে—চলিতেছে, কোথায় চলিতেছে কি

জানি! নিজের ভাবনায় মশগুল্! অনেক দিন পরে রাণুদি'র সঙ্গে দেখা, মনে হইল আর একটা কবিতার খাতা করিব। নহিলে এ-আনন্দ কেমন করিয়া নিজের মনের মধ্যে চাপিয়া রাখি! নিজের শরীরের মধ্যে যেন শিহরিয়া উঠিতেছিলাম—ভয়ে নয়, আনন্দে! গাড়ী তেমনি চলিতেছে, কোথা দিয়া চলিয়াছে জানিবার দরকার নাই—যখন হোক পৌঁছিবে নিশ্চয়ই।

হঠাৎ দেখি গাড়ী কখন থামিয়াছে।

সরকার-মশাই মোটর হইতে নামিল; বলিল—আয়, নেমে আয়।

বলিলাম—এখানে কেন? এখানে তো আমাদের বাড়ি নয়।

সরকার-মশাই আর বাক্যব্যয় না করিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিল। চালাকী করতে হবে না—নেমে পড়ো।

আস্তে আস্তে মোটর হইতে নামিলাম। সরকার-মশাই বলিল—দেখি ওটা! বলিতে বলিতে আমার হাত হইতে কাপড়টা কাড়িয়া লইল।

বলিলাম—কাপড় যে আমার।

সরকার-মশাইয়ের মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। কোথাকার কে চাল নেই, চুলো নেই, এক কথায় অমনি কাপড়—দানছত্তর পেয়েছিস্। জানিস্, সকালবেলায় তোর জন্যে আমার যত দুর্গতি।

বলিয়া সরকার-মশাই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বলিল—আর যদি কখনও ওবাড়ি-মুখো হবি তো দেখিস্। বলিতে বলিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটিল এক নিমেষে. চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম. চারি দিক শূন্য, কোথাও একটা অবলম্বন নাই। রাণুদি'র কথামত সেদিন ভগবানকে ডাকিবার কথা মনে আসে নাই। মনে হইয়াছিল, তখন যদি কেহ পল্টু বলিয়া ডাকিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, তবেই হয়ত সান্ত্বনা পাইব। তার পরে রাণুদি'র সঙ্গে আর দেখা করি নাই।

• •

দীর্ঘ-জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ কাটাইয়া দিয়াছি। সব জিনিষই ভুলিতে বসিয়াছিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে হঠাৎ আবার সমস্ত গোলযোগ হইয়া গেল। আবার নামিয়া আসিলাম সেই পুরাতন নিঃসঙ্গতায়। আমার জীবনের অকৃতকার্য্যতার চেতনা-বোধে! নূতন আঘাত লাগিয়া পুরাতন ক্ষত আবার আরক্ত হইয়া উঠিল।

কেমন করিয়া ঘটিল সে-কথা কেউ জানে না! তবু ঘটিয়াছে—অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সিঁড়ি হইতে পড়িয়াই ছেলেটি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। রক্তে মেঝেটা ভাসিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটি যেমন আকস্মিক, তেমনই বীভৎস। কল্পনায় শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই একটু আগে ছেলেটি খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে। এক মুহূর্ত্ত আগে আকাশ-বাতাসের সঙ্গে ছিল তাহার প্রাণবায়ুর যোগাযোগ, ছিল নক্ষত্রের গতিবিধিতে নিয়ন্ত্রিত। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের স্বাদও পাইয়াছে। নীল আকাশের সীমাহীন বিস্তৃতিতে ছিল ওর দৃষ্টি প্রসারিত; একটি তৃণ, একটি ফুল, একটি তারা ইহাদের সবাকার সঙ্গে উহার অস্তিত্বও ছিল বাস্তব। এখন আর তাহা নাই।

ছেলেটিকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার পরও অনেক ক্ষণ বসিয়া বসিয়া ইহাই ভাবিয়াছি।

ছেলেদের ছুটি হইয়া গেল।

সবাই চলিয়া গিয়াছে; ঘরের ভিতর রাইচরণ বসিয়া বসিয়া নিজের কাজ করিতেছে। সমস্ত স্কুল-বাড়ি নিস্তব্ধ। আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঝের উপর রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে! আশ্চর্য্য! মৃত্যু—আকস্মিক মৃত্যুর অভূতপূর্ব্বতা হঠাৎ যেন আমাকে ভয়-চকিত করিয়া দিল। মনে হইল: তখনও যেন পাশাপাশি কোথাও ছেলেটি ঘুরিতেছে। দুপুরের সেই একটানা নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন রাত্রের মোহ আছে। ভুল ভাঙিবার জন্য চারি দিকে চাহিলাম। কেহ কোথাও নাই।

মনে পড়িল: ওই ছেলেটিকেই বুঝি কয়েক দিন আগে একবার শাস্তি দিয়াছিলাম। কি অপরাধে মনে নাই! সে কি কান্না! কান্না দেখিয়া নিজেই করুণায় আর্দ্র হইবার ভয়ে ঘরে আসিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলাম। গায়ে এতটুকু হাত তুলি নাই। অভিমানী ছেলেটির সে-কান্না দেখিয়া যেন অনেক দিন আগের নিজেকে মনে পড়িয়াছিল। একদিন রাণুদি'র সান্ত্বনাবাণীতে ঠিক অমনি করিয়া আমিও কাঁদিয়াছিলাম।...

উপরের দিকে চাহিয়া দেখি: ভাঙা রেলিঙের ফাঁকটি যেন তখনও বিকৃত-মস্তিষ্কের মত হা হা করিয়া হাসিতেছে। পৈশাচিক সে হাসি। চোখ বুজিয়া রহিলাম। কেন এমন হইল? কিসের জন্য? সেই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সমস্ত স্কুল-বাড়িটি যেন একটা প্রেতপুরীতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। বাড়ির প্রত্যেকটি ইট-কাঠ যেন সজীবতা পাইয়াছে। সবাই আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে—ওই—ওই যে!

মনে হইল যেন আমিই অপরাধী। ভাঙা রেলিং এতদিন ধরিয়া কেন মেরামত হয় নাই। কেন এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখি নাই? সেই কালো রক্তের দাগ যেন আরও কালো হইয়া উঠিতেছে; মনে হইতেছে—মৃত্যু যেন শ্বাপদ-সতর্ক পায়ে ঘনাইয়া আসিতেছে। প্রকাণ্ড পাখীর মত মৃত্যু যেন হিম-শীতল পাখা বিস্তার করিয়া আকাশ পৃথিবী অন্ধকার করিয়া আমার চারি দিকে নামিতেছে।

সমস্ত ঘটনাটা যেন ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। কেন এমন হয়? এই যে মৃত্যু—এক মুহূর্ত্ত আগে কে সে-কথা কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? সেই দ্বিপ্রহরের প্রাখর্য্যের মধ্যে যেন রাত্রির স্বপ্নময়তা, রাত্রির রহস্য নামিয়া আসিল। কেন এমন হয়?

ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে কে আমার আশপাশ হইতে বলিয়া ওঠে—জল—জল···

বিকালবেলা খবর পাইলাম—শেষ!!!

কেন জানি না, মনে হইল—কোথায় যেন গ্রন্থি বাঁধিয়াছে। ঠিক সেই দিনাতিবাহনের সুমার্জ্জিত সুশৃঙ্খল গতি-প্রবাহ আর নাই। বাহিরের আঘাত যেন নিজের গত জীবনের সব দুর্ব্বলতা সব ব্যর্থতা আবার উন্মুক্ত করিয়া দিল। ঠিক এমন সময়ে এমন আকস্মিকতা এবং অনিবার্য্যতার আবির্ভাব যেন মিথ্যা! যেন কোন্ অজ্ঞাত অপরাধ করিয়াছি।···কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছি, দায়িত্ব-বোধে অবজ্ঞা করিয়াছি—নহিলে হয়ত এমন ঘটিত না। সারাটা দিন অনুশোচনার আর অন্ত রহিল না!···

সন্ধ্যাবেলা আর কোনমতেই ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

চটিজোড়া পায়ে দিয়া বাহির হইলাম। কোন্‌দিকে চলিয়াছি ঠিক নাই। উদ্দেশ্যহীন গতিতে পা চালাইয়া চলিয়াছি। এতটুকু জীবনীশক্তি যেন আর শরীরে সঞ্চিত নাই। রাস্তার পর রাস্তা—বাজার—থানা—কোন্ দিকে চলিয়াছি ঠিক রাখিবার দরকার নাই। মনে হইল: আজ বাসায় না ফিরিলেও চলে। সারা রাত মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইলে হয়ত সান্ত্বনা পাইব। সারা জীবনে কাহাকেও আত্মীয়তা-পাশে আবদ্ধ করিতে পারি নাই। যাহারা নিকটতম ছিল তাহারা চলিয়া গিয়াছে। তবু যাহাদের কাছে পাইয়া নিজের বিগত ব্যর্থ দিনগুলির কথা ভুলিয়াছিলাম—আজ তাহাদের দিক হইতেই ব্যবধান আসিল। সে দুরতিক্রম্য ব্যবধান যেন সরাইবার আর কোনও উপায় রাখি নাই। এমনি করিয়া ব্যর্থতা আসিয়া যেন আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে কখন ষ্টেশনের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ট্রেনের শব্দে চমক ভাঙিল। প্রখর আলো জ্বালিয়া ট্রেনটি ভীমবেগে আসিতেছে!···আসিয়া থামিল—আবার খানিক পরে ছাড়িয়া দিবার শব্দও পাইলাম। ষ্টেশনের আশেপাশে ঘুরিয়া বাড়ির দিকে ফিরিতেছিলাম।

···এই যে মশাই, আপনিও এসেছেন।

চাহিয়া দেখি: রাইচরণ—তাহার একহাতে তেলের বোতল, অন্য হাতে বাজার···

রাইচরণ বলিল—দেখে আসুন ষ্টেশনে। কি কাণ্ড—অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে মশাই। ছেলের খবর পেয়েই এসেছে তা'র মা—মরার খবর পেয়েই—একেবারে···

বলিলাম—কে?

সে-কথার উত্তর না দিয়া রাইচরণ বলিল—শীগগীর আসবেন, ভাত নিয়ে ব'সে থাকবো···

হন্ হন্ করিয়া ষ্টেশনের দিকে গেলাম। মনে হইল আমিই অপরাধী—অপরাধী আমি! সেই ভাঙা রেলিঙের ফাঁকটি যেন বিকৃত মস্তিষ্কের মত হা হা করিয়া হাসিতেছে। সে হাসি এখানেও শুনিতে পাইতেছি। চারি দিকে সব-কিছু আকাশ, বাতাস, গাছপালা আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া যেন বলিতেছে—ওই—ওই যে—

কাছে গিয়া দেখি: রীতিমত জনতা জমিয়া গিয়াছে। কোনও বড় ঘরের মহিলা নিশ্চয়ই। চাপরাশি, দরোয়ান, লোকজন কিছুরই অভাব নাই। অতি সন্তর্পণে উঁকি

মারিতে গেলাম। ডাক্তার ইতিমধ্যেই আসিয়া গিয়াছে—বরফ দেওয়া হইতেছে—

ভাল করিয়া চাহিতেই কেমন যেন··· নিমীলিত দু'টি চোখের উপর দৃষ্টি স্থির করিলাম—কে? নিজের মনে মনে প্রশ্ন করিলাম—কে? কোথায় দেখিয়াছি? হঠাৎ যেন ভীড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল—এতটুকু চোখ চাহিয়াছে।···

হঠাৎ বুকের ভিতর অসহ্য একটা যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। পলক-শূন্য দৃষ্টিতে যেন রাজ্যের কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে।··· আর সন্দেহ রহিল না—রাণুদি—

তার পর কখন কোন্ ফাঁক দিয়া বাড়ি আসিয়াছি, নিজেই জানি না। বাড়ির কাছে আসিয়া মনে হইল: পিছন হইতে কে যেন 'পন্টু' বলিয়া ডাকিল—এক মুহূর্ত্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

আর খা'নক পরেই ট্রেন ছাড়িয়া দিবে। প্লাটফরমের উপর রাইচরণের চোখ ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। বলিলাম—যেখানেই থাকি, চিঠি ঠিক পাবে—ভেবো না রাইচরণ—

চাকুরিতে রিজাইন্ দিয়া চলিয়াছি। অথচ কালও কি সে-কথা জানিতাম? আবার নূতন এক হেডমাষ্টার আসিবে আমারই জায়গায়—আবার তেমনই সমস্ত চলিবে। পৃথিবীর নিয়মানুবর্ত্তিতায় এতটুকু কোথাও বাধিবে না!···সুশৃঙ্খল গতিবিধিতে কেহ হয়ত কোনও অস্পষ্ট ফাঁক লক্ষ্যও করিবে না। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই—তবু আমার মনে বিস্ময়ের আজ সীমা নাই।

সমস্ত ঘটনাটা ভাবিবার মত মনের পরিস্থিতি নাই। তবু বেশ বুঝিতেছিলাম: কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মত এই যে ঘুরিয়া-মরা ইহার যেন আর শেষ হইবে না। আমার জন্ম-মুহূর্ত্তের রাশি-নক্ষত্রের সঙ্গে যাহা চিরতরে নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে তাহা খণ্ডিবার যেন আর উপায় নাই।

ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল।

রাইচরণ কাছে আসিয়া বলিল—শরীরের দিকে আপনি একটু নজর রাখবেন—আর—

আর বলিতে পারিল না। আস্তে আস্তে প্লাটফরমের সীমা ছাড়াইয়া গাড়ী অনেক দূর চলিয়া আসিল। দোকান, বাজার, বনজঙ্গল, তার পর দেখা গেল স্কুল-বাড়ির ছাদ। আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। সেই দিকে চাহিয়া এক জনকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিলাম—কেবল তোমার ক্ষতি করিয়া গেলাম—আমায় ক্ষমা করিও—

স্বরলিপি

গান

নমো নমো শচীচিত্তরঞ্জন সন্তাপভঞ্জন
নবজলধরকান্তি ঘননীল অঞ্জন
নমো হে নমো নমো।
নন্দনবীথির ছায়ে
তব পদপাতে নব পারিজাতে
উড়ে পরিমল মধু রাতে
নমো হে নমো নমো।
তোমার কটাক্ষের ছন্দে মেনকার মঞ্জীর বন্ধে
জেগে ওঠে গুঞ্জন মধুকর গঞ্জন
নমো হে নমো নমো॥

—"শাপমোচন"—

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার।

| { সা রা গা জ্ঞা ‖ গা জ্ঞা পা পা \| ধা -া পা পা \| ধা -া পা পা \| জ্ঞা -া গা গা
{ ন মো ন মো ‖ শ চী চি ত্ত \| র ন্ জ ন \| স ন্ তা প \| ভ ন্ জ ন

| গা ^গপা পা পা | পা পা প -ক্ষা | ধা -া -া -া | -া -া -া -া | পা ধা পা পা |
| ন ব জ ল | ধ র কা ন্‌ | তি ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ঘ ন নী ল |

| পা -গা গা সা | গা গা -পা পা | গা রা গা রা | সা -া -া -া | -া -া -া রা |
| অ ন্‌ জ ন | ন মো ০ হে | ন মো ০ ন | মো ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

| গা গা -পা পা | গা রা গা রা | সা -া -া -া } | -া -া -া -া ||
| ন মো ০ হে | ন মো ০ ন | মো ০ ০ ০ } | ০ ০ ০ ০ ||

|| র্সা -া র্সা র্সা | র্সা -া -র্সা -া | না -র্রা র্সা -া | -া -া -া -ক্ষা | ধা না র্সা না |
|| ন ন্‌ দ ন | বী ০ থি র্‌ | ছা ০ য়ে ০ | ০ ০ ০ ০ | ভ ব প থ |

| ধনা -া ধা -া | পা ধা না ধা | পধা -া পা -া | ক্ষা পা ধা পা | ক্ষা ক্ষা গা গা |
| পা০ ০ ত্তে ০ | ন ব পা রি | জা০ ০ ত্তে ০ | ও ড়ে প রি | ম ল ম ধু |

| রগা -া রসা -া | -া -া -া রা | গা গা -পা পা | গা রা গা রা | সা -া -া -া |
| রা০ ০ ত্তে০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ন মো ০ হে | ন মো ০ ন | মো ০ ০ ০ |

| -া -া -া -রা | গা গা -পা পা | গা রা গা রা | সা -া -া -া | -া -া -া -া |
| ০ ০ ০ ০ | ন মো ০ হে | ন মো ০ ন | মো ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

| পা পা গা গা | পা -ক্ষা ধা পা | ধা -র্সা র্সা -া | -া -া -া -া | র্সা র্রা র্গা র্রা |
| তো মা র ক | টা ০ ক্ষে র | ছ ন্‌ দে ০ | ০ ০ ০ ০ | মে ন কা র |

| র্গা -া র্রা র্রা | র্সনা -র্রা র্সা -া | -া -া -া -া | না র্সা র্রা র্সা | র্রা -া র্সা র্সা |
| ম ন্‌ জী র | ব০ ন্‌ ধে ০ | ০ ০ ০ ০ | জে গে ও ঠে | গু ন গু ন |

| না র্সা না না | ধনা -া ধা ধা | পা পা -া পা | গা রা গা রা | সা -া -া -া |
| ম ধু ক র | গ০ ন জ ন | ন মো ০ হে | ন মো ০ ন | মো ০ ০ ০ |

| -া -া -া -রা | গা গা -পা পা | গা রা গা রা | সা -া -া -া | -া -া -া -া |||
| ০ ০ ০ ০ | ন মো ০ হে | ন মো ০ ন | মো ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |||

বর্ষামঙ্গল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

১

আজি বরষণ-মুখরিত শ্রাবণ রাতি।
স্মৃতি বেদনার মালা একেলা গাঁথি।
হায় আজি কোন্ ভুলে ভুলি'
আঁধার ঘরেতে রাখি দুয়ার খুলি,
মনে হয় বুঝি আসিবে সে
মোর দুখ-রজনীর সাথী॥
আসিছে সে ধারাজলে সুর লাগায়ে.
নীপবনে পুলক জাগায়ে।
যদিও বা নাহি আসে
তবু বৃথা আশ্বাসে
ধূলি 'পরে রাখিব রে
মিলন-আসনখানি পাতি॥

২

মনে হোলো যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে,
মরুতীর হ'তে সুধাশ্যামলিম পারে।
পথ হ'তে আমি গাঁথিয়া এনেছি
সিক্ত যূথীর মালা
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ ঢালা,
লজ্জা দিয়ো না তারে॥
সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে
বনে বনে,
পথহারানোর বাজিছে বেদনা
সমীরণে।
দূর হ'তে আমি দেখেছি তোমার
ঐ বাতায়ন-তলে
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে,
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখী
ঝড়ের অন্ধকারে॥

দিনেন্দ্রনাথ

শ্রীঅমিতা সেন, বি-এ

শেলী একটি ছোট কবিতায় বলেছেন—

> "Music, when soft voices die,
> Vibrates in the memory,
> Odours, when sweet violets sicken
> Live within the sense they quicken.

গুণীর গান যখন থেমে যায়, কোমল সুরের মীড়গুলি নীরব হয়ে যায়, সুরের রেশটি তখনও শ্রোতার প্রাণের মধ্যে অনুরণিত হ'তে থাকে। ফুল ঝরে যায়, সৌরভ তখনও মনকে আকুল করে।

এই পৃথিবীর প্রাঙ্গণে বহু জনের সঙ্গেই ত আলাপ পরিচয় হয়, কিন্তু দৈবাৎ এক-একটি মানুষের দেখা মেলে—যাঁদের হৃদয়ের সৌরভ, তাঁরা দূরে চ'লে গেলেও, প্রাণকে নিবিড় অনুভূতিতে পূর্ণ ক'রে রাখে।

আমাদের দিন্‌দা ছিলেন এম্‌নি এক জন মানুষ। যে কেউ তাঁর কাছে গিয়েছে তাকেই তিনি স্বতঃস্ফূর্ত নিবিড় স্নেহে আপ্লুত করেছেন। ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র জ্ঞানী-গুণী খ্যাত-অজ্ঞাতের ভেদ সে স্নেহের কাছে ছিল না। সহজে ভালবাসবার এক আশ্চর্য্য দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে তিনি এসেছিলেন; যতদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন, অকৃপণভাবে অযাচিতভাবে বিলিয়ে গিয়েছেন তাঁর নির্ম্মল মধুর অনাবিল ভালবাসা। তাই আজ তাঁর অভাব আমাদের কাছে এমন গভীর, এমন নিবিড়, এমন প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে।

দিনেন্দ্রনাথের অতি নিকটে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সঙ্গীতশিক্ষা নিয়েই এই পরিচয়ের সুরু, তার পর সেই পরিচয় তাঁর স্বাভাবিক স্নেহের আকর্ষণে অতি অল্পকালের মধ্যেই আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছে। যদিও জানি, যতখানি তাঁর কাছে পেয়েছি তার কিছুই প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই, তবু তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে তাঁর স্নেহের মধ্যে, তাঁর অতীত স্মৃতির মধ্যে নিজেকে অনুভব ক'রে নেবার একটু সান্ত্বনা, একটু তৃপ্তি আছে।

প্রথম যখন বোলপুরে যাই, আমার বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র। দিন্‌দার বিরাট শরীর দেখে, তাঁর সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে তাঁকে একটু ভয়ে ভয়ে এড়িয়েই চল্‌তাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারা গেল যে মানুষটি নিতান্তই আমাদের দলের লোক। সেই সময় তিনি শিশু-বিভাগের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে "বাল্মীকি-প্রতিভা" গীতাভিনয় করাচ্ছিলেন। দেখেছি তিনি শিশুর দলে শিশু হয়ে মিশে যেতেন, কোথাও বাধ্‌ত না। শিশুরাও তাঁকে চিনে ফেলেছিল। আমরা ছোট ছেলেমেয়েদের দল তাঁর কোলের কাছে ব'সে গান শিখতাম, দস্যুদলের গানগুলো ছেলেরা যেমন উপভোগ করত তিনিও তেমনই মনেপ্রাণে উপভোগ করতেন, এবং অন্যের কাছেও উপভোগ্য ক'রে তুলতেন। দস্যুদলের সঙ্গে লম্ফঝম্ফ ক'রে তাদের যখন অভিনয় শেখাতেন, তখন তাঁকেও একটি বিরাট শিশু বলেই মনে হ'ত, আবার বালিকার পাঠ শেখাবার সময়ে তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরে ও করুণ রসের অভিনয়ে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এই সময়ে আশ্রমবাসী আবাল-বৃদ্ধ প্রত্যেকেই, "শিশু-বিভাগের ঘরে দিন্‌দা এসেছেন," এই খবরটি কানে গেলে আর স্থির থাকৃতে পারতেন না, কাজ ফেলে ছুটে আসতেন। এই গীতিনাট্যটি একমাত্র তাঁরই শিক্ষার গুণে সুঅভিনীত হয়েছিল।

এই অভিনয় হয়ে যাবার পর আমি দিনেন্দ্রনাথের কাছে নিয়মিতভাবে গান শিখতে আরম্ভ করি। আরও অনেকেই তাঁর কাছে গান শিখতে আসতেন এবং সেই সূত্রেই তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করেছেন।

গান শেখবার সময়ে দিনেন্দ্রনাথ সাধারণতঃ কোনও যন্ত্র ব্যবহার করতেন না। গান গেয়ে যেতেন, আমরা দুই-একবার শুনে পরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গানটি গাইতাম। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত গানের সুরের প্রত্যেকটি সূক্ষ্মতম কাজ আমাদের সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত না হ'ত, তত ক্ষণ কিছুতেই তিনি নিরস্ত হ'তেন না। সকল ছেলেমেয়ের শেখবার ক্ষমতা সমান ছিল না, কিন্তু কখনও তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌তে দেখি নি। কিছুতেই যেন তাঁর

বিরক্তি হ'ত না, কেবল একটি বিষয় ছাড়া। সে আর কিছু নয়, ভুল সুর তাঁর কানে গেলে তিনি সইতে পারতেন না। যত ক্ষণ সেটাকে শুধ্‌রে ঠিক সুরে গাওয়াতে না পারতেন তত ক্ষণ যেন শিশুর মতই চঞ্চল হয়ে পড়তেন। গানে তাঁর ক্লান্তি কখনও দেখি নি।

তিনি কারও সাম্‌নে নিজেকে জাহির করতে ভালবাস্‌তেন না। অতবড় সঙ্গীতজ্ঞ হয়েও গান করতে বল্‌লে যেন কতকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। তাঁর মধুর গম্ভীর কণ্ঠ যে শ্রোতার পক্ষে এক অপরূপ বিস্ময় ছিল, এ কথা স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে গেলেই যেন অত্যন্ত সঙ্কোচবোধ করতেন। অনেক ব'লে-কয়েও যখন গান তাঁকে দিয়ে গাওয়াতে পারা যেত না, তখন একটা ওষুধ ছেলেরা বের করেছিল। রবীন্দ্রনাথের একটা গান অত্যন্ত বিকৃত ক'রে গাইতে আরম্ভ করলেই আর রক্ষা ছিল না, খানিক ক্ষণ ছট্‌ফট্‌ ক'রে শেষে আর থাক্‌তে না পেরে, "থাম্‌ থাম্‌, ও কি হচ্ছে ?" ব'লে চেঁচিয়ে উঠতেন,—তার পর গানের পালা সুরু হ'তে আর বিলম্ব ঘট্‌তো না।

ছল চাতুরী কপটতা তাঁকে কখনও স্পর্শ করে নাই। শিশুর স্বচ্ছতা তাঁর চোখে-মুখে জ্বল্‌-জ্বল্‌ করত, সেই চিরনবীন শৈশব নিয়েই তিনি চলে গেছেন।

গানের ক্লাস করতে গিয়ে শুধু গানই হ'ত না। তাকে ক্লাস বললে ক্লাসের চপলতাপরিশূন্য স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য এবং ক্লাসের কর্ণধার-মহাশয়ের অভ্রভেদী মর্য্যাদা এবং শব্দভেদী প্রতিষ্ঠার মাহাত্ম্য নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ হবে। গান শেখা হয়ে যাবার পর দিনুদা নানা রকমের গল্প করতেন; শুধু দিনুদাই নয় আমরাও তাঁর সঙ্গে গল্প করতাম; অসঙ্কোচে গল্প করতাম। কোথাও বাধা ছিল না—না বয়সের, না জ্ঞানের, না অনুশাসনের। ছোটদের সঙ্গে তিনি এমনই প্রাণ খুলে গল্প করতে ভালবাসতেন। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "হ্যাঁ দিনুদা, আপনি ত অতবড়, তবে আমাদের মত ছোটদের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসেন কেন ?" হেসে বললেন, "দেখ্‌, ছোটদের সঙ্গেই আমার বেশী মেলে; যারা খুব প্রবীণ, খুব পাকা, তাদের কাছে গেলেই ভয়ে আমার কেমন সব ঘুলিয়ে যায়।"

গানের ক্লাস করতে গিয়ে অনেক সময়ে তাঁর কাছে অনেক বইও পড়েছি। দিনেন্দ্রনাথকে সকলে সঙ্গীতবিশারদ বলেই জানেন, কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে তিনি নানা ভাষাবিৎ ছিলেন, নানা বিষয়ে তাঁর অভিনিবেশ ছিল। অধ্যয়ন তাঁর জীবনের একটা বিশেষ আনন্দের আশ্রয় ছিল। কয়েকটি ভাষা তিনি নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তার মধ্যে ফরাসী, ইংরেজী, সংস্কৃত ও মৈথিলী ব্রজবুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতন ছেড়ে আস্‌বার বছর দুই আগে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি ফার্‌সী পড়তে আরম্ভ করেন এবং হাফেজ থেকে কবিতা বাংলা-কবিতায় অনুবাদ করেন। সে কবিতায় বড় চমৎকার সুর দিয়েছিলেন। দিনেন্দ্রনাথের বিশেষ উৎসাহের বিষয় ছিল নানা দেশের ইতিহাস ও ভূগোল। "Geographical Magazine" খুলে নানা দেশের ভূবৃত্তান্ত পড়তেন, ছবি দেখতেন আর বল্‌তেন, "দেখ্‌, দেশভ্রমণ করবার বড় সখ ছিল। সে তো আর পূর্ণ হ'ল না, তাই এই সব দেখেই দুধের সাধ ঘোলে মেটাই।"

নাট্যকলায় তাঁর দক্ষতার কথা আগেই বলা হয়েছে। "ফাল্গুনী," "বিসর্জ্জন," "রাজা" প্রভৃতি নাটকে তাঁকে রঙ্গভূমির উপরে যিনিই দেখেছেন তাঁকে আর এ বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। আবৃত্তিও যে তাঁর আশ্চর্য্য সুন্দর হবে সে ত সহজেই অনুমান করা যায়। কত কবিতা তাঁর মুখে শুনেছি। তিনি অত্যন্ত কাব্যানুরাগী ছিলেন। বই খুলে একবার বল্‌লেই হ'ল "পড়ুন না দিনুদা!" কি আশ্চর্য্য ক'রেই না তিনি আবৃত্তি করতেন! তাঁর মুখে কবিতা শুনলে সেটি আর ব্যাখ্যা ক'রে বুঝবার দরকার হ'ত না। আমরা ছিলাম যেন তাঁর মধুচক্র। নিজে তিনি কবিতাটির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করতেন, এবং কাব্যমঞ্জরীর অনাস্বাদিত মধুরস আহরণ ক'রে আমাদের শিশুচিত্তকোষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ক'রে তুল্‌তেন সেই মধু রস।

কেবল তাই নয়। সময়ে সময়ে তাঁর ক্লাসে রসনাতৃপ্তিকর রস-পরিবেষণেরও ব্যবস্থা হ'ত।—শুধু চাওয়ার অপেক্ষা। এমন ক্লাস আর কোথাও কেউ পায় নি।

এম্‌নি ভাবে গানে-গল্পে হাসিতে-আমোদে পাঠে-আবৃত্তিতে সব দিক দিয়ে তিনি একটি রসচক্র রচনা ক'রে রেখেছিলেন।

তা'বলে যেন কেউ মনে না করেন, তাঁর ক্লাসে শুধু মজাই

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হ'ত বা কাজে অবহেলা ক'রে তাঁর সঙ্গে আমরা কেবল হাসিঠাট্টা করতে পেতুম। লেশমাত্র শৈথিল্য তিনি ঘটতে দিতেন না। যে-সময়ে যে-কাজটি করবার কথা, ঠিক সেই সময়ে সেই কাজ তিনি নিজে করতেন, অন্যকে দিয়েও করাতেন। দুপুরবেলা কলাভবনে একটার সময় দিনুদার রিহার্সেল নেবার কথা; আমরা সব কে কোথায় আছি একটু দিবানিদ্রার চেষ্টায়,—ঠিক সেই সময় রৌদ্রের ঝাঁঝ মাথায় ক'রে দিনুদা এসে উপস্থিত, আর এসেই হাঁকডাক সুরু

ক'রে দিতেন। ভয়ে ভয়ে আমরা তাড়াতাড়ি খাতাপত্র হাতে এসে জুটলে গান সুরু হ'ত। প্রত্যেকের খাতায় গানগুলি ঠিকমত তুলে নেওয়া চাই, ফাঁকি দিয়ে কাজ ফেলে রেখে এর কাঁধের উপর দিয়ে ওর পিঠের উপর দিয়ে দেখে কোন মতে কাজ সারলে চল্‌বে না। পঁচিশ-ত্রিশ জনকে একসঙ্গে গান শেখাতে বসেও দিনুদার কান পড়ে আছে সুরের নিখুঁত টানের উপরে—কোন্ কোণায় কে এতটুকু বেসুর ক'রে ফেল্‌ল, তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলতেন, আর, আগেই যেমন বলেছি,—ঠিক সুরটি আয়ত্ত না-করা পর্য্যন্ত কিছুতেই তার নিস্তার ছিল না। দিনুদাকে আমরা ভালবেসেছি, তাঁকে না-ভালবাসা আমাদের সম্ভব ছিল না, কিন্তু সেই ভালবাসার সুবিধা নিয়ে তাঁর প্রতি কোনো চপলতা কোন অ-সমীহতা প্রকাশ করার রাস্তা আমাদের ছিল না। বিপুল একটা সাগর-গম্ভীর ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল, যার সামনে এলে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে মাথা আপনিই নত হয়ে যায়।

বড় গায়ক এবং রবীন্দ্রনাথের "সকল গানের ভাণ্ডারী" বলেই দিনেন্দ্রনাথকে সকলে জানেন। কিন্তু তাঁর একটু বিশেষত্ব ছিল, সেটি স্পষ্ট উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি।

সাধারণতঃ বড় গায়করা এক-এক জন সঙ্গীতকলার এক এক বিশেষ দিকে দক্ষতা অর্জ্জন করেন। কেউ ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের এক ভাগ, কেউ অন্য ভাগ ভাল জানেন, কেউ করেন কীর্ত্তন, কেউ বা বাউল ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতেই মাতিয়ে দেন। বাংলা গানের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে, রবীন্দ্রনাথের গানের একটা বৈশিষ্ট্য, আবার সুরসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের আর এক রকমের কায়দা। এই সব বৈচিত্র্য অনুসারে গুণীদেরও শ্রেণী-বিভাগ করা যেতে পারে।

দিনেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ছিল এই যে সব রকমের গানই তিনি অনায়াসে এবং দক্ষতার সঙ্গে গাইতে পারতেন। ক্লাসিক্যাল হিন্দী সঙ্গীতেও তিনি অল্প শিক্ষা অর্জ্জন করেন নি। বাউল ভাটিয়ালী গাইবার সময় মেঠো সুরের আদি ও অকৃত্রিম ভাবটি কেমন অনায়াসে তিনি প্রকাশ করতেন। না, আপনিই তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসত, চেষ্টা ক'রে কিছুই যেন তাঁকে করতে হ'ত না। কীর্ত্তন তাঁর মুখে শুনলে চোখে জল আসত। আবার দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান গাইবার জুড়ি তাঁর কেউ ছিল কি না আমি জানি না। এ কথা বল্‌লেই বোধ হয় অনেকের কাছেই আশ্চর্য্য লাগ্‌বে যে ছেলেবেলায় দিনেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং নিজের গানগুলি তাঁর মুখে শোনাবার জন্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে নিয়ে বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন।

শুধু ভারতীয় সঙ্গীতই নয়, ইউরোপীয় সঙ্গীতেও দিনেন্দ্রনাথের জ্ঞান ও দক্ষতা ছিল। বিলাতে এই সঙ্গীতের মোহে আকৃষ্ট হ'য়েই তাঁর ব্যারিষ্টার হওয়া আর ঘটে ওঠে নি। ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞ যাঁরা ভারতীয় সঙ্গীতের রস আস্বাদন করতে চেয়েছেন, তাঁরা দিনেন্দ্রনাথের শিষ্যত্বলাভে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছেন।

দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি তাঁকে অমর ক'রে রাখ্‌বে। স্বরলিপি লিখ্‌তে তাঁকে দেখেছি চিঠিলেখার মতন; কোনো যন্ত্রের সাহায্য নিতেন না, গুন্-গুন্ করেও গাইতেন না, সুর তাঁর মাথার মধ্যে খেলা ক'রে বেড়াত, তিনি শুধু কাগজে কলমে তার প্রতিলিপি লিখে যেতেন অতি সহজে, অবলীলাক্রমে,—সেও যেন এক খেলা। খুব ছোটবেলায় লোরেটো স্কুলে পড়বার সময় তিনি স্কুলে পিয়ানোর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর এস্রাজ-বাজানো যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা কখনও ভুলতে পারবেন না। এস্রাজ বাজিয়ে আপন-মনে যখন গান করতেন তখন গঙ্গাযমুনার ধারার মত যন্ত্র ও কণ্ঠনিঃসৃত সুরের ধারা এক হয়ে মিশে যেত।

এইবার তাঁর একটি দিকের কথা বল্‌ব, যে-কথা তিনি ফুলের গোপন মধুগন্ধের মতন নিজের ভিতরেই লুকিয়ে রেখেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি সম্ভ্রম এবং নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত অতিরিক্ত সঙ্কোচ বশতঃ কিছুতেই তিনি তাঁর নিজের লেখা প্রকাশ হ'তে দেন নি। তাঁর অবর্ত্তমানে, বিশেষতঃ তাঁর বিনা-অনুমতিতে, সেটি প্রকাশ ক'রে তাঁর স্মৃতির প্রতি কোনো অপরাধ করছি কি না আমি জানি না। কিন্তু এটি এমনই মধুর জিনিষ যে সকলকে এর ভাগ দিতে না-পারলে তৃপ্তি হয় না, সে-জন্যে সে অপরাধ স্বীকার করেই নিলাম; জানি, তাঁর গভীর স্নেহের কাছে আমার সব চপলতা সমস্ত প্রগল্‌ভতার ক্ষমা আছে।

তিনি এক জন উঁচুদরের কবি ছিলেন। তাঁর পিতামহ

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের মতন তিনিও রাশি রাশি ফুল ফুটিয়ে দক্ষিণে হাওয়ায় সব ঝরিয়ে দিতেন—কিছুই সঞ্চয় করতেন না, একটি কুঁড়িও না। কত অজস্র কবিতা তিনি লিখেছেন—আমরা তাঁর হাতবাক্স খুলে টেনে বার করেছি—তখন হয়ত প'ড়ে শুনিয়েছেন। কিছুদিন পরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কই দিন্দা, আপনার সেই কবিতাটা?" নিশ্চিন্ত মুখে বললেন, "ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি ত।" শুনে আমরা খুব রাগ করতাম। দু-একটি কবিতা রয়ে গেছে—বাংলা কাব্যসাহিত্যে অতুলনীয়। বই ছাপাতে বললে বল্তেন, "দেখ, ছাপানোর মোহ একটা বড্ড নেশা,—ওর মধ্যে না-যাওয়াই ভাল। ছাপিয়ে কি হয়? এই ত, আমি পড়লুম, তুই শুনলি, বেশ হ'ল, আবার কি?"

নিজের রচনা সম্বন্ধে দিনেন্দ্রনাথের এই পরিপূর্ণ আসক্তি-হীনতায় রবীন্দ্রনাথের "হে বিরাট নদী"র কয়েকটি চমৎকার লাইন মনে করিয়ে দেয়:—

"কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়,
নাহি শোক নাহি ভয়,
পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়
যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।

একদিন দেখি আলমারীতে নানা বইয়ের মধ্যে "বীণ" ব'লে ছোট্ট একখানি বই। তার ইতিহাসও একদিন শুনলাম, ছেলেবেলায় নাকি নিতান্ত দুর্ম্মতিবশতঃ ওই কাজটি ক'রে ফেলেছিলেন। তার পরে বোধোদয় হ'লে, একদিন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে গিয়ে যেখানে যত "বীণ" ছিল সব একসঙ্গে ক'রে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ওই একখানি কেমন ক'রে লুকিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে আমি সেটি টেনে বার করলুম এবং বলাই বাহুল্য, অধিকার করলুম। সেই "বীণ" এখনও আমার কাছে রয়ে গেছে, তার ঝঙ্কার কাব্যরসিককে মোহিত করবে।

দিনেন্দ্রনাথের স্বরচিত গানগুলি সুরের অভিনব মাধুর্য্যে ও বৈচিত্র্যে বাংলা গানের ভাণ্ডারে এক অপরূপ দান। যে বিপুল প্রতিভা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, যদি প্রকাশের অবসর দিতেন, তবে তাঁর সমতুল্য কবি ও সঙ্গীত-রচয়িতা বাংলা দেশে বেশী থাকৃত না। কিন্তু তিনি তাঁর আশ্চর্য্য প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখলেন সঙ্গীতচর্চ্চা ও স্বরলিপিলিখনের অন্তরালে। সারা জীবন দিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সাধনা ক'রে গেলেন। আজ যে রবীন্দ্রনাথের গান বাংলা দেশে এবং বাংলার বাহিরেও এত অজস্র প্রচার হয়েছে এর গৌরব দিনেন্দ্রনাথেরই, আর কারও নয়। কবিগুরু ত গান লিখে শিখিয়ে ছেড়ে দেন; মনে ক'রে রাখা বা প্রচারের দায়িত্ব তাঁর নয়। এই গানের জন্য সমস্ত বাংলা দেশ দিনেন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। সঙ্গীতভারতীর পূজাবেদীতে নিজেকে নিঃশেষে আহুতি দিয়ে গেলেন এই ভক্ত পূজারী।

আনন্দের উৎস ছিলেন তিনি, গানের ঝরণাতলায় খেলা ক'রে তাঁর দিন গেছে। তাঁর জীবনের সুরটি তাঁর এই একটি গানেই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে—

"খেলা যদি নাহি হয় শেষ
তাহে নাহি মোর দুঃখলেশ।
খেলেছি ধরার বুকে
এই স্মৃতি বহি' সুখে
ভাসাবো তরণী লখি' সেই অজানার দেশ।
সুর যদি নাহি পাই খুঁজি,
আমার বেদনা লহ বুঝি।
নয়ন ভরিয়া দেখি
ভাবি কি মধুর এ কী
নিয়ে যাবো প্রাণ ভরি তোমার সুরের রেশ।"

তিনি ছিলেন গানের রাজা। যে-দেশে গান কখনও থামে না, হাসি কখনও মলিন হয় না, সেই নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছ আনন্দের দেশে, মধুরতর গানের রাজ্যে তিনি চলে গেছেন। শোক করব না তাঁর জন্যে। তাঁর সেই সদানন্দ হাস্যময় দীপ্যমান মুখখানি আর কখনও দেখতে পাব না। তাঁর মধুর স্নেহময় কণ্ঠস্বর আর কখনও কানে বাজবে না, তাঁর কাছে ব'সে আর কখনও গান শিখব না, এ কথা ভাবলে মন অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যতখানি পেয়েছি, এই কি কম সৌভাগ্য? কেবলই দিয়েছেন, ঝরণার মত উচ্ছলিত আনন্দের বেগে কেবলই বিলিয়ে দিয়েছেন, কিছু বাকী রাখেন নি, বিনিময়ে কিছু ফিরে চান নি। এমন একটি আশ্চর্য্য মানুষের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলাম, সেই আনন্দের স্মৃতি পথের সম্বল হয়ে রইল।

বাংলা

বেলিয়াঘাটা সাধারণ সমিতি—

বেলিয়াঘাটা সাধারণ সমিতি (সাধারণ পুস্তকাগার) ১৩০৭ বঙ্গাব্দে

বেলিয়াঘাট সাধারণ পুস্তাকাগার

স্বর্গীয় কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র বসু এবং স্থানীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টায় সমিতির একতল গৃহ নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান বৎসর সমিতির দ্বিতলগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতলগৃহ নির্ম্মাণে শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী পোদ্দারের চেষ্টা ও উদ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ২২শে আষাঢ় সমিতির পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন এবং ক্ষেত্রনাথ-জ্যোতিন্দ্রনাথ স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "বেলেঘাটা একটি ব্যবসায়ের স্থান বলিয়াই পাঠাগার স্থাপন এবং বিদ্যার প্রসার সাধনের উপযুক্ত স্থান, কারণ যে স্থান ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নত সেই স্থানে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ের ভিতর দিয়াই জাতির উন্নতি অবনতি সূচিত হয়। ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলি দখল করিবার জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে রেষারেষি মারামারি করে। সকল দেশই ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টায় ব্যস্ত।

'আমাদের দেশে শিক্ষা ততদূর অগ্রসর হইতেছে না কারণ আমাদের দেশ বাণিজ্যক্ষেত্রে মোটেই অগ্রসর হইতেছে না। গত ১৯২১ সন হইতে ১৯৩১ সনের গণনায় দেখা যায় যে, মাত্র শতকরা ৯ জন শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা কিছুই নয়। শিক্ষাবিস্তারে পুস্তকাগারের বিশেষ প্রয়োজন।'

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর সভা ভঙ্গ হয়।

পরলোকে হেমেন্দ্রলাল রায়—

কবি ও কথাশিল্পী হেমেন্দ্রলাল রায় গত ১৭ই আষাঢ় ৪৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বাল্যকালে সিরাজগঞ্জ ও রংপুর বা পাবনাতে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি অধুনালুপ্ত দৈনিক সংবাদপত্র হিন্দুস্থানে"র সহকারী সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। সাপ্তাহিক বাঁশরী" প্রকাশিত হইলে হেমেন্দ্রলাল প্রথম হইতেই তাহার ভার গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক ফুলের ব্যথা" প্রকাশিত হয়। দেড় বৎসর পরে হেমেন্দ্রলাল সাপ্তাহিক মহিলা" পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। মহিলা" বন্ধ হইয়া গেলে তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচার বিভাগের ভার গ্রহণ করেন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ রচনায় বিশেষ সহায়তা করেন। সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্রবাণী"র এবং 'হবিজন" পত্রিকার তিনি সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাঁহার 'ঝড়ের দোলা" উপন্যাস, 'মায়াজাল" 'মণি দীপা' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ এবং কয়েকখানি গল্পপুস্তক প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্রলালের লিখিত আরব্য উপন্যাসের শোভন সংস্করণ সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। হেমেন্দ্রলালের 'গল্পের মায়াপুরী'ও শিশু সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। হেমেন্দ্রলাল মৃত্যুর পূর্ব্বে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের বিজ্ঞাপন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার লেখা বন্ধ ছিল না।

পরলোকে নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত—

নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত পুরুলিয়া অঞ্চলে এক জন খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ অসুখে ভুগিয়া সম্প্রতি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সরকারী শিক্ষাবিভাগে উচ্চ বেতনে চাকুরি
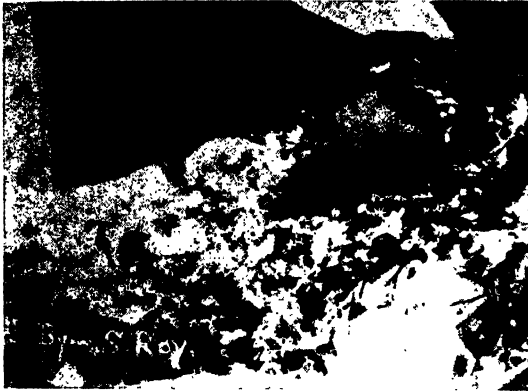
নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত

করিতেন। এই চাকুরি ছাড়িয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। রাজনীতিক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সেবায়ও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কার আন্দোলন চালাইয়াছিলেন।

পরলোকে সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু—

সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু সম্প্রতি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন
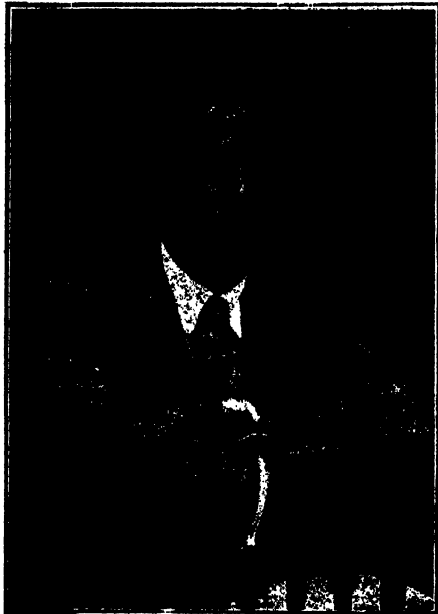
সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

করিয়াছেন। তিনি এক জন উদীয়মান সাংবাদিক ছিলেন। তিনি প্রথমে 'ফরওয়ার্ড' ও অন্যান্য খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করেন। পরে ইউনাইটেড প্রেসের অধীনে চাকুরি লইয়া দিল্লী গমন করেন। দিল্লী ও সিমলা হইতে তিনি সংবাদ সরবরাহ করিতেন। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন।

পরলোকে অশ্রুমতী দেবী—

সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অশ্রুমতী দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শিক্ষিতা ও

অশ্রুমতী দেবী

সঙ্গীতজ্ঞা ছিলেন। তিনি পুত্রকন্যাদের ও অন্যান্যদের সঙ্গীত-বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। তিনি 'সঙ্গীত কৌমুদী' নামক একখানি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

বিদেশ

ম্যালেরিয়ার তত্ত্বানুসন্ধানে বাঙালী—

পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া রোগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের মৃত্যু ঘটে। ম্যালেরিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে। একটি রোম নগরে ও অপরটি সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুরের গবেষণাগার লীগ অফ্ নেশন্সের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে। প্রাচ্য দেশগুলির চিকিৎসকগণ

শ্রীঅমিয়কুমার অধিকারী

প্রতি বৎসর সিঙ্গাপুরে একত্র হইয়া ম্যালেরিয়া বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন। গত বৎসর হইতে সিঙ্গাপুরে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই বৎসর দক্ষিণ-ভারতের এক জন ডাক্তার নিজ ব্যয়ে তথায় গিয়া উক্ত আলোচনায় যোগদান করেন। প্রতি বৎসর লীগ অব নেশন্স বার জন ম্যালেরিয়ায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে সিঙ্গাপুরে একত্র কাজ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন ও সুযোগ্য ব্যক্তিগণকে বৃত্তিও দিয়া থাকেন। এবারে সেই বৃত্তি পাইয়াছেন বি, এন, রেলওয়ের সহকারী ম্যালেরিয়াবিৎ ডাক্তার শ্রীঅমিয়কুমার অধিকারী। ভারতবর্ষে লীগ অব নেশন্সের এই বৃত্তি পাইবার প্রথম গৌরব ডাক্তার অধিকারীই লাভ করিলেন।

ডাক্তার অধিকারী গত এপ্রেল মাসে সিঙ্গাপুরে গিয়াছিলেন। সেখানে চীন দেশ হইতে দুই জন, জাপান হইতে এক জন, হল্যাণ্ড হইতে এক জন, আমেরিকা হইতে এক জন, শ্যামদেশ হইতে এক জন, সিঙ্গাপুরের সৈনিক বিভাগের এক জন, ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেলমেন্টের এক জন ও ভারতবর্ষ হইতে দুই জন ডাক্তার সমবেত হইয়াছিলেন। ইহ ছাড়া রুশিয়, হল্যাণ্ড ও ইটালী হইতে তিন জন চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপকও আসিয়াছিলেন। ইঁহারা এপ্রিল ও মে মাসে সিঙ্গাপুরে নানা রূপ পরীক্ষা করিবার জন্য যে তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন, জুন মাসে তাহা কার্য্যস্থলে পরীক্ষা করিবার জন্য যবদ্বীপ ও মালয় উপদ্বীপের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে নানা কাজ করিয়া ডাক্তার অধিকারী পূর্ব্বে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এবারে নূতন অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দেশবাসীর অধিকতর উপকার করিতে পারিবেন।

বিদেশে বাঙালীর কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৯২২ সনে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কিছুকাল কলিকাতা মেডিকেল কলেজে হাউস ফিজিসিয়ানের কার্য্য করিয়া
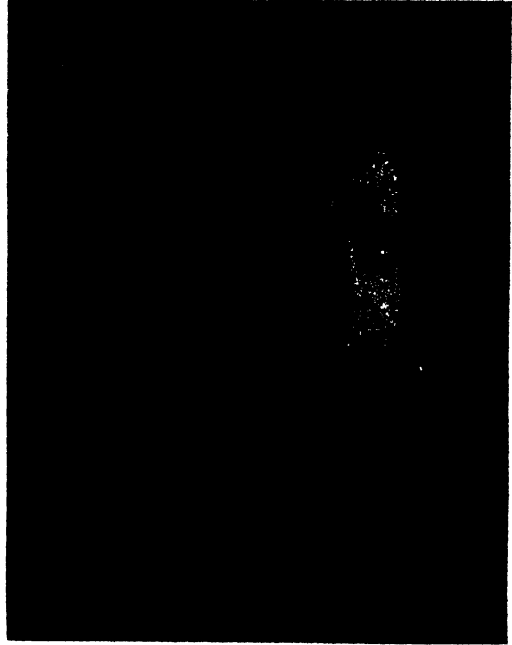
শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ রায়

চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্ত্রীরোগের বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি গত বৎসর এই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য বিলাত গমন করেন। সেখানে একটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ অফ্ অবষ্টেট্রিক্‌স্ এণ্ড গাইনোকোলজির সভ্য পদ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব সকলের অনুকরণীয়। তিনি লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেষ্টারের হাসপাতালগুলির কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী প্রমীলা গোখলে ইতিপূর্ব্বে পুণা ভারতীয় নারী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি নাগপুর সংস্কৃত কলেজ হইতে বঙ্গের সংস্কৃত

শ্রীমতী প্রমীলা গোখলে

য্যাসোসিয়েশনের কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম এই উপাধি পাইলেন। তিনি মরাঠী ও সংস্কৃত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিয়া বহু পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতী হালিমা খাতুন এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আসাম প্রদেশে

শ্রীমতী হালিমা খাতুন

মুসলমান মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রীমতী অমলাপ্রভা দাস এ বৎসর কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-টি পরীক্ষায় সমগ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান

শ্রীমতী অমলাপ্রভা দাস

শ্রীমতী মঞ্জরী দাসগুপ্তা

এবং ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি গত বৎসর স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহা ছাড়া, বাংলায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া "বঙ্কিমচন্দ্র-স্মৃতি-স্বর্ণপদক" লাভ করেন।

গত মাসে এই অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছিল যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রীগণের মধ্যে শ্রীমতী আরতি সেন ও অর্চ্চনা সেনগুপ্তা একই নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদটিতে একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। 'অর্চ্চনা সেনগুপ্তা' স্থলে 'শ্রীমতী মঞ্জরী দাসগুপ্তা' হইবে। শ্রীমতী মঞ্জরী বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রী। তিনি পরীক্ষায় এইরূপ উচ্চস্থান লাভ করিয়া মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐ স্কুল হইতে শ্রীমতী অমিতা গুপ্তা ও শ্রীমতী মীরা লাহিড়ী কৃতিত্বের সহিত এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় যথাক্রমে মাসিক পনর ও দশ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

অবসর-প্রসঙ্গ

এ-দেশে বৎসরে-বৎসরে হাজার-হাজার নতুন লোক চায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আবার অনেকেই ইহার নিন্দা করেন। সমালোচকগণ বোধ হয় কোনও দিন একটু কষ্ট করে ভাল দেশীয় চায়ের স্বাদ জানবার চেষ্টা করে নি। বিশুদ্ধ ও মধুর পানীয় হিসাবে চা খুবই উপভোগ্য।

চা-পানের অভ্যাস ভারতবাসীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর কিনা এ প্রশ্ন যখন ওঠে, তখন চায়ের উপকারিতায় যথেষ্ট সুবিদিত প্রমাণ থাকা স্বত্বেও, সে-বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা এখনও নির্ম্মূল হয় নি। যে ফুটান জলে চা তৈরি হয় সে জল ত ফোটাবার দরুণই সমস্ত রোগ-বীজাণু থেকে মুক্ত হয়। স্বাস্থ্যের দিক থেকে শরীরযন্ত্রের জন্য বিশুদ্ধতম জল গ্রহণের সব চেয়ে ভাল উপায় হ'ল দিনে-রাতে নিয়মিতভাবে কয়েক বার চা পান করা। কৃষিজাত আর কোন জিনিষকে মানুষের গ্রহণযোগ্য করার জন্যে এত সূক্ষ্মভাবে যত্ন যে নেওয়া হয় না, এ কথা ত সবাই জানে।

চা-খাওয়ার অনেক পদ্ধতি আছে। পানীয় হিসাবে চা যত বেশী জনপ্রিয় হ'য়ে উঠছে, নানা নতুন ধরণে চা পান করবার পদ্ধতিও তত লোকে খুঁজে বার করছে। এক পেয়ালা চা, সামান্য 'সুতার' করবার জন্যে একটু টাটকা নেবুর রস দিয়ে পান ক'রেই আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারি।

আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের পক্ষে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা চা আদর্শ পানীয়। ঠাণ্ডা চা তৈরি করা অত্যন্ত সহজ। আধ সের জলের জন্য দু চামচ চা নিলেই হবে। যথারীতি চা তৈরি ক'রে, একটি পাত্রের ভেতর বরফের ওপর সেই গরম চা ঢালতে হবে। তারপর পছন্দ-মত দুধ ও চিনি মিশিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হবার পর সে চা পান করা উচিত। চা যে রকম ভাবে ইচ্ছা তৈরি করে পান করা যায়, শুধু আসল জিনিষটা যেন ভারতবর্ষের নিজস্ব হয়, কারণ ভারতের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর চা কোথাও পাওয়া যায় না।

এ কথা সত্য যে নিত্যকার পানীয় হিসাবে চা আমাদের প্রগতিশীল যুগের অপরিহার্য্য অংশ হ'য়ে আছে। কে এ কথা অস্বীকার করবে?

যে কোনও ঋতুতে, যে কোনও সময়ে, যেখানেই আমরা থাকিনা কেন, বন্ধুর সঙ্গের মত আমরা এই পরম তৃপ্তিকর পানীয় কামনা করি। চা দুর্লভ-ও নয় মহার্ঘ্য-ও না।

বিখ্যাত কোনও ইংরেজ লেখক ঠিকই বলেছেন যে চায়ের সঙ্গে সত্যের প্রগতির তুলনা হয়। প্রথমে সবাই করেছে সন্দেহ, তারপর পরিচিত হবার চেষ্টায় দিয়েছে বাধা; খ্যাতির প্রচারের সঙ্গে রটিয়েছে কুৎসা। কিন্তু তবু শেষে কালের অপ্রতিহত প্রভাবে নিজস্ব মাহাত্ম্যেই তার হয়েছে জয়।

আমাদের দেশের মৃত্তিকাতেই চায়ের জন্ম। আমাদের দেশের লোকেরাই তা চাষ করে। ব্যবহারের যোগ্য ক'রে তোলেও তারাই। ভারতে উৎপন্ন চা পৃথিবীর সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ লোক সমাদরে পান করে। পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশকে সত্যই আমরা এই অপূর্ব্ব জিনিষ উপহার দিয়েছি।

চা শ্রান্তিহর ও তেজস্কর সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ লোকে শুধু সেই কারণেই চা পান করে না। লোকে পরম তৃপ্তিকর বলেই চায়ের প্রতি এত অনুরক্ত। সকল ঋতুতে সকল সময়ে ব্যবহার করা যায় বলে, অব্যর্থভাবে মেজাজ ভাল ক'রে তোলে বলেই চায়ের এত আদর। চা আমাদের জীবনের একটি প্রয়োজন বটে, কিন্তু ওটা মধুর প্রয়োজন।

কনফুসিয়াস্ তাঁর শিষ্যদের একবার বলেছিলেন, "তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যদি তোমার দ্বারে আসে তাকে একপাত্র চা দিও বিনামূল্যে"। পিপাসায় যে কাতর তাকে স্নিগ্ধ সঞ্জীবনী সুধার মত চায়ের পাত্র দেবার মত অতিথেয়তার শোভন নিদর্শন আর কি হ'তে পারে!

কোন বিখ্যাত চা-রসিক বলেছেন—"এই অমূল্য পানীয় নব-জীবনের দুঃখের পাঁচটি কারণেরই মূলোচ্ছেদ করে।"

কাঁচা অবস্থায় কিংবা পানের উপযোগী ক'রে প্রস্তুত হবার পর চায়ে কোন প্রকার মাদক গুণ বিন্দুমাত্র থাকে না। তা সত্ত্বেও চা'কে নেশা হিসাবে গণ্য ক'রে অনেকে অত্যন্ত ভুল করেন। চা নেশা ত নয়ই বরং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের অস্বাস্থ্যকর পিপাসা জয় করতে চা সাহায্য করে। ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের ভেতরও চা-পানের অভ্যাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চা একমাত্র ভারতবর্ষেই উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয়।

এ দেশের লোক এককালে এখনকার মত এত বেশী চায়ের কদর বুঝত না। তখন যারা চায়ের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল তাদের ধারণা ছিল চা শুধু শীত কালেই সেব্য, গরম চায়ের পাত্র নিঃশেষ করার পর যখন উষ্ণতাটি সমস্ত ছড়িয়ে পড়ে ভারী আরাম দেয় সেই জন্য। কিন্তু আজকাল চা-পানের কোন নির্দ্দিষ্ট ঋতু বা সময় আছে ব'লে কেউ মনে করে না।

সত্য কথা বলতে গেলে, গ্রীষ্মকালে সমস্ত পানীয়ের মধ্যে একমাত্র চা-ই আমাদের শরীর ঠাণ্ডা রাখতে পারে। চা সকল ঋতুতে আদর্শ পানীয়।

নূতন কোন খাদ্য বা পানীয় সম্বন্ধে তর্কের মীমাংসা করবার সব চেয়ে ভাল উপায় হ'ল জিনিষটিকে একবার নিজে পরীক্ষা করে বিচার করা।

চা পানীয় হিসাবে জনপ্রিয় হতে বাধ্য। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে সস্তা অথচ মধুর এবং তেজস্কর পানীয়ের জন্য সকলেই ব্যাকুল; সেখানে চায়ের আদর ত হবেই। এ দেশের চা-প্রীতির প্রসার খুব বেশী দিন আগে থেকে আরম্ভ হয় নি, কিন্তু বহুদিনের মধ্যে এর চেয়ে আশাপ্রদ ঘটনা কিছু আমাদের চোখে পড়েনি।
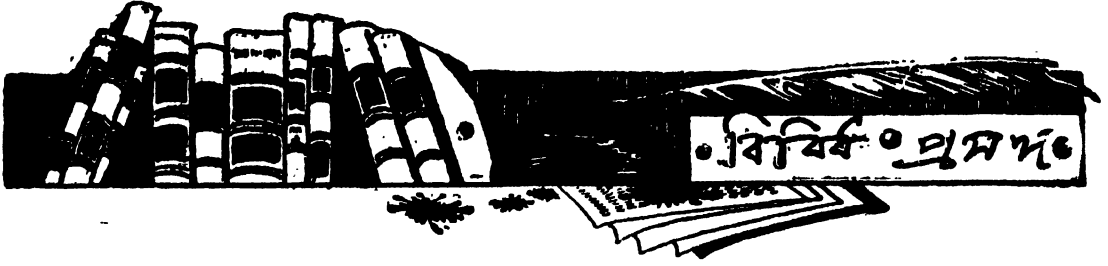
ভারতমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

গত মাসে বোম্বাইয়ে পুনা ও বোম্বাইয়ের ভারতমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন বা উপাধিদান অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এবার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সর্ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ উপাধিদান-সভার সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার এক স্থানে তিনি বলেন :—

এস. এন. ডি. টি ভারতমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান-অনুষ্ঠান, ১৯৩৫

উপবিষ্ট (বাম হইতে) ১। শ্রীমতী ইরাবতী কার্বে, ২। লেডি ঠাকরসী, ৩। মিঃ এস. এস. পাটকর (চ্যান্সেলর), ৪। সর্ সি. ভি. রামন, ডি-এসসি, এফ্-আর-এস, ৫। অধ্যাপক ডি. কে. কার্বে (প্রতিষ্ঠাতা)

যে-কেহ স্বদেশভক্ত, যে-কেহ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনোযোগী, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের নারীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ শিক্ষালাভের গুরুত্ব অনুভব করিবেন। আমার যুবা বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা [illegible] ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি ঐতিহাসিক তথ্যগুলি [illegible] চিন্তা করিতে বলি। আপনারা আপনাদিগকে সুধান, ৩৫ কোটি মানুষ আমরা—আমাদের বহুযুগব্যাপী সংস্কৃতি আছে, বিদ্যা ও কৃতিত্বের ঐতিহ্য আছে—এহেন আমাদের আজ এরূপ অবস্থা কেন ঘটিয়াছে? দশাটা যে কিরূপ, তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। তাহা আপনারা সবাই জানেন। আমার মতে প্রশ্নটির উত্তর এই :—আমরা আমাদের নারীদিগকে অবনত অবস্থায় রাখিয়াছি, আমরা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের জন্মস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছি—সেই স্বত্ব জ্ঞান আহরণের অধিকার, জীবনের শ্রেয়ের পথ জানিবার অধিকার। যে-জাতির অর্দ্ধেক লোক অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে মজ্জিত, সে-জাতি কখনও উত্থানের আশা করিতে পারে না, সুখসমৃদ্ধির আশা করিতে পারে না।

ইহা সুবিদিত সত্য, যে, ছোট ছেলে বা মেয়ে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা পিতার চেয়ে মাতাই গঠন করেন। মাতাই উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের চরিত্র—দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক চরিত্র—গঠন করেন। (ইংরেজীর তাৎপর্য্য।)

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কেবল ছাত্রীদের জন্য। ইহাতে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় দেশভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। গত বারের প্রবেশিকা পরীক্ষা মরাঠী, গুজরাটী, হিন্দী, সিন্ধী,

তেলুগু, কন্নাড ও বাংলাতে লওয়া হইয়াছিল। ইংরেজীও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শিক্ষণীয় বিষয়। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এম্‌-এ ও ডক্টরেটের সমান শিক্ষাও এই বিশ্ববিদ্যালয় দিয়া থাকেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের স্বর্গীয় সর্‌ বিঠলদাস ঠাকরসী ইহাতে ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন। অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে দানের এই একটি সর্ত্ত ছিল, যে, ইহার কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে ঐরূপ মূলধন সংগ্রহ করিবেন। যত দিন তাঁহারা তাহা করিতে না পারেন, তত দিন তাঁহারা প্রদত্ত মূলধনের সুদ বার্ষিক ৫২,৫০০ টাকা পাইবেন, এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে ১৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়া গেলে ঠাকরসী মহাশয়ের প্রদত্ত ১৫ লক্ষ পাইবেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহার উইলের ট্রাষ্টীরা কয়েক বৎসর সুদ দিতে থাকেন। তাহার পর তাঁহারা উহা বন্ধ করেন। আমি যে-বৎসর বোম্বাইয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান-সভায় সভাপতি হই, তখন আমি আমার বক্তৃতায় এই সুদ বন্ধ করা কাজটির বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও ঠাকরসী মহাশয়ের ট্রাষ্টীদের মধ্যে এই ব্যাপারটি লইয়া হাইকোর্টে মোকদ্দমা দায়ের হইয়া গিয়াছিল। সুখের বিষয়, মোকদ্দমা চালাইতে হয় নাই, উভয় পক্ষে মিটমাট হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক সুদ ৫২,৫০০ টাকা পাইতে থাকিবেন, এবং যথাসময়ে আসল ১৫ লক্ষও পাইবেন। পুনার অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কারবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা; তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীমতী ইরাবতী কারবে ইহার রেজিষ্ট্রার।

বাংলা দেশে নারীশিক্ষার জন্য ঠাকরসী মহাশয়ের মত এত বড় দান এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। স্বর্গীয় বিহারীলাল মিত্র মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে বার্ষিক ৪৮০০০ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহা কি ভাবে খরচ করিতেছেন, অবগত নহি।

—

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র বসু

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র বসু

প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা কৃতী, ইন্দোরপ্রবাসী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র বসু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, এবং ইহাতে অধ্যাপনাও করিয়াছেন। তিনি ইন্দোরে একটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, এবং তদ্ভিন্ন রাজপুতানা ও মধ্যভারতের ইণ্টারমীডিয়েট শিক্ষা-বোর্ডের সভাপতি এবং আগ্রা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। এ বৎসর লীগ অব নেশুন্সে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের যে-কয়জন ডেলিগেট বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন, ইন্দোরের প্রধান মন্ত্রী রায়-বাহাদুর এস্‌ এম্‌ বাপ্না তন্মধ্যে এক জন। বসু মহাশয় তাঁহার পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত জেনিভা যাইবেন।

—

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র গুহ

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র গুহ আর এক জন কৃতী প্রবাসী বাঙালী। ইনিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ছিলেন এবং পরে এখানে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এখন তিনি বাঙ্গালোরে প্রধানতঃ স্বর্গীয় জমশেদজী নাসেরবাঞ্জী

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র গুহ

টাটার প্রভৃত দানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে জৈব রসায়নী বিদ্যার (অর্গ্যানিক কেমিষ্ট্রীর) অধ্যাপক। আগামী বৎসর মার্চ্চ মাসে তিনি প্রতিনিধিরূপে ইউরোপের জৈব রাসায়নিক গবেষণার কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত যাইবেন। আগামী জানুয়ারিতে ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইবে, গুহ মহাশয় তাহার রাসায়নিক-বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

তিনি জৈব রসায়নী বিদ্যার নানা দুরূহ শাখায় কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ বহুসংখ্যক গবেষণা করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এসসি ও এম্-এসসিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার পর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরিচালনায় তিন বৎসর বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ছাত্ররূপে গবেষণা করেন এবং ১৯২৩ সালে গবেষণার বলে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ঐ বৎসরই বিলাতের তিন জন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক তাঁহার এগারটি মৌলিক গবেষণা সম্বলিত প্রবন্ধ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে ডি-এসসি উপাধির যোগ্য বলায় তিনি ডি-এসসি উপাধি প্রাপ্ত হন। গত বৎসর মুদ্রিত তাঁহার গবেষণার একটি তালিকায় দেখিতেছি, তিনি তখন পর্য্যন্ত ষাটটি বিষয়ে গবেষণা করিয়াছিলেন। তাহার পর আরও করিয়াছেন। অনেক জার্ম্যান ও অন্যান্য বিদেশী বৈজ্ঞানিক রসায়নীবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তাঁহার গবেষণার বিস্ময়ের সহিত প্রশংসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিন জন ভিন্ন ভিন্ন বৎসর রসায়নে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন।

ডক্টর গুহ সুশিক্ষক। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত।

শাড়ীর জয়যাত্রা

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী সম্প্রতি পুনর্ব্বার বিলাত গিয়াছিলেন ও ফিরিয়া আশিয়াছেন। এবার সেখানে থাকিবার সময় তিনি লণ্ডনের ত্রৈমাসিক এসিয়াটিক রিভিয়ু পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় শাড়ীর অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি মোহেন-জো-দাড়োর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া শাড়ীর ক্রমিক পরিবর্ত্তনও বিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যে, এখন লণ্ডনে পরিচ্ছদের দোকানে শাড়ী-পরিহিত মোমের নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে অনুমান হয় ইউরোপে শাড়ীর ফ্যাশন চলিবে। নয় বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন চেকোস্লোভোকিয়ার রাজধানী প্রাগে যাই, তখন দেখিতাম আমাদের দলের একটি শাড়ী-পরিহিতা মহিলা কেমন করিয়া শাড়ী পরেন সে সম্বন্ধে অধ্যাপক ডক্টর ভিণ্টরনিজ্ মহাশয়ের (তখন ইহলোকবাসিনী) পত্নীর খুব কৌতুহল হইয়াছিল।

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী লিখিয়াছেন, ভারতীয় মহিলারা এখন প্রায় সব প্রদেশেই শাড়ী পরেন, এবং সিংহলে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ গৃহীত হইবার পর আবার অনেকে শাড়ী পরিতেছেন।

তিনি ১৯৩২ সালে পারস্য-ভ্রমণের সময় দেখিয়াছেন, সেখানে ইরানের বিস্তর নারী ইউরোপীয় পরিচ্ছদের অনুরাগী হইলেও জরথুষ্ট্রমতাবলম্বিনীরা শাড়ীই পছন্দ করেন।

বর্ত্তমান। অতীত।

তাঁহার মতে ভারতবর্ষে শাড়ী পরিবার প্রধান রীতি পাঁচটি—পার্সী বা গুজরাটি, মরাঠী, মান্দ্রাজী, বাঙালী ও নেপালী, এবং তাহার মধ্যে তাঁহার মতে এখন মান্দ্রাজী রীতি সমধিক জনপ্রিয়।

কাপাসের সুতা, তসর, রেশম প্রভৃতি নানা উপাদানে শাড়ী প্রস্তুত হয়। শাড়ী বয়নের প্রধান প্রধান কেন্দ্রের উল্লেখ লেখিকা করিয়াছেন। খাঁটি ঢাকাই মসলিন এখন আর পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদের বালুচরী শাড়ীর এক সময়ে খুব বেশী আদর ছিল। উহা এখন আর পাওয়া যায় না—উহার শেষ শিল্পীর কয়েক বৎসর হইল মৃত্যু হইয়াছে।

লেখিকার প্রবন্ধের সহিত অতীত এক যুগের নারী-পরিচ্ছদের একটি ছবি (বোধ হয় অজন্টা-চিত্রাবলী হইতে অনুকৃত) এবং বর্ত্তমানে শাড়ী পরিবার একটি রীতির ছবি আছে। তাহা ক্ষুদ্রতর আকারে এখানে দেওয়া হইল।

মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তৈলচিত্র স্থাপন

বেদান্তরত্ন মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুর পর আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যের লেখা দুটি প্রবন্ধও 'প্রবাসী'তে বাহির হইয়াছে। তাহার দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব কথা নিঃশেষ হয় নাই। তাঁহার

বেদান্তরত্ন মহেশচন্দ্র ঘোষের তৈলচিত্রের ফোটোগ্রাফ।

জীবন ঘটনাবহুল না হইলেও নানাদিক্ দিয়া মূল্যবান ছিল। এই জন্য তাঁহার একটি জীবনচরিত পুস্তকাকারে বাহির হওয়া আবশ্যক।

গত ১৮ই শ্রাবণ শনিবার ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত শিবনাথ স্মৃতিমন্দিরের পুস্তকাগারে তাঁহার একটি তৈলচিত্র স্থাপিত হয়। ইহা তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী বিনোদিনী চৌধুরানী প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। মহেশবাবুর তৈলচিত্র শিবনাথ স্মৃতিমন্দিরের পুস্তকাগারে স্থাপন করিবার কারণ এই, যে, তাঁহার ক্রীত ও অধীত বহু ভাষার দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক ছয় হাজার গ্রন্থ তিনি এই পুস্তকাগারে দান করিয়া

যান। এই গ্রন্থগুলির মূল্য কুড়ি হাজার টাকা হইবে। তদ্ভিন্ন, তাঁহার ক্রীত ও অধীত নানাবিধ কাব্য ও উপন্যাসাদির গ্রন্থও ছিল। তৎসমুদয় অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। তিনি ধনী লোক ছিলেন না, সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করিতেন। পড়িবার জন্য বহি কিনিতেন, ঘর সাজাইবার জন্য নহে। বিদেশী ডাকে তাঁহার বহি আসিত না, এমন কোন সপ্তাহ যাইত কিনা সন্দেহ; কোন কোন সপ্তাহের বিলাতী ডাকের দিন ডাকের পিয়াদা একা তাঁহার বহির মোট আনিতে না পারায় মুটিয়ার মাথায় চাপাইয়া আনিত। তিনি বাংলা, বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত, পালি ইংরেজী, গ্রীক, গুজরাটী, আবেস্তার ভাষা, এবং বোধ হয় হিব্রু জানিতেন। বহু ধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। উপনিষদ্, গীতা, বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বাইবেল সম্বন্ধে তিনি অনেক সারবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত সটীক ও সানুবাদ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও ছান্দোগ্য উপনিষদ তাঁহার মৃত্যুর পর পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি চরিত্রগুণে, জ্ঞানবত্তায় এবং শিক্ষাদান-প্রণালীর উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। বীজগণিত সম্বন্ধে তিনি ছাত্রদের জন্য একখানি উৎকৃষ্ট ইংরেজী বহি লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিখ্যাত লোক ছিলেন না বলিয়া কোন প্রকাশক তাহা তাঁহার নিকট হইতে পাইবার চেষ্টা করেন নাই, এবং তিনিও চিরকুমার থাকায় ও অর্থাগম সম্বন্ধে তাঁহার ব্যগ্রতা না-থাকায় নিজেও তাহা প্রকাশ করেন নাই। তিনি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা উত্তম রূপে জানিতেন এবং রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন—দরিদ্র রোগীদিগকে নিজ ব্যয়ে পথ্যও দিতেন। সকল জনহিতকর কর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ ছিল, এবং যথাসাধ্য তাহার জন্য দান ও পরিশ্রম করিতেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন—এরূপ বিদ্বান ছিলেন, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজপরিদর্শক প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কলেজ পরিদর্শন করিয়াছি, কিন্তু মহেশবাবুর মত পণ্ডিত কোথাও দেখি নাই।" কিন্তু পণ্ডিত বলিয়া তিনি নীরস শুষ্ক প্রকৃতির লোক ছিলেন না; তাঁহার নির্ম্মল অট্টহাস্য দেখিবার ও শুনিবার জিনিষ ছিল। এরূপ একটি মানুষের কোন এক বয়সের চেহারা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিবে এমন একটি চিত্র সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য স্থলে স্থাপিত হওয়া আনন্দের বিষয়। ইহা তাঁহার দেহের চিত্র। তাঁহার জীবনচরিত ও তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইলে তাঁহার অন্তরের চিত্রও পাওয়া যাইবে।

—

সর্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

পচাত্তর বৎসর বয়সে সর্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তিনি বিদ্বান ও কৃতী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং নিজেও বিদ্বান ও কৃতী ছিলেন।

সর্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

তাঁহার পিতা ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী কলিকাতার অন্যতম বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাংলা পাটীগণিত আমরা বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম এবং যৌবনে প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহার নিকট ইংরেজী সাহিত্যের কোন কোন বহি

পড়িয়াছিলাম। দেবপ্রসাদ বাবুর অন্যতম অনুজ ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। দেবপ্রসাদ বাবু এটর্নী ছিলেন। এটর্নীদের মধ্যে যাঁহারা লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখিতেন ও রাখেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বেসরকারী লোকদের মধ্যে তিনিই প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হন। তিনি ভারত-গবন্মেণ্টের প্রতিনিধিরূপে একবার জেনিভা ও আর একবার দক্ষিণ-আফ্রিকা গিয়াছিলেন। তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের ও দক্ষিণ-আফ্রিকা ভ্রমণের বৃত্তান্ত-পুস্তক দুখানি বাংলা সাহিত্যের ভ্রমণকাহিনী বিভাগ পুষ্ট করিয়াছে। শিক্ষাসংক্রান্ত ও জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। সুরাপাননিবারিণী সভার তিনি এক জন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। নিঃস্ব অসহায় আতুরদের জন্য "দি রেফিউজ" নামক যে প্রতিষ্ঠানটি আছে, তাহার সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

ইটালী-আবিসীনিয়া সম্বন্ধে ব্যঙ্গচিত্র

অনেকেই অনুমান করিতেছেন, যে, ইটালী আফ্রিকায় যেরূপ বিস্তর সৈন্য পাঠাইতেছে এবং বিষাক্ত গ্যাস-আদিপূর্ণ বোমা আকাশ হইতে নিক্ষেপের জন্য এরোপ্লেনের আয়োজন যেরূপ করিতেছে, তাহাতে আবিসীনিয়ায় সেপ্টেম্বর মাসে বর্ষা থামিলেই ইটালী সেই দেশ আক্রমণ করিবে। ইহা অতি শোচনীয় ও লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু ইহা লইয়া ইংলণ্ডে ও ইটালীতে রঙ্গতামাসাও হইতেছে। ইংলণ্ডের দূত মিঃ ঈডেন, যুদ্ধ যাহাতে না হয়, সেই জন্য ইটালীকে ঠাণ্ডা করিবার নিমিত্ত তাহাকে ব্রিটিশ সোমালীল্যাণ্ডের কিয়দংশ দিতে চাহিয়াছিলেন। মুসোলিনী তাহাতে রাজী হন নাই, এবং ইংলণ্ডেও বিস্তর লোক মিঃ ঈডেনের কাজে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সেই অসন্তোষ লণ্ডনের ডেলী এক্সপ্রেসের একটি ব্যঙ্গচিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। চিত্রে কল্পনা করা
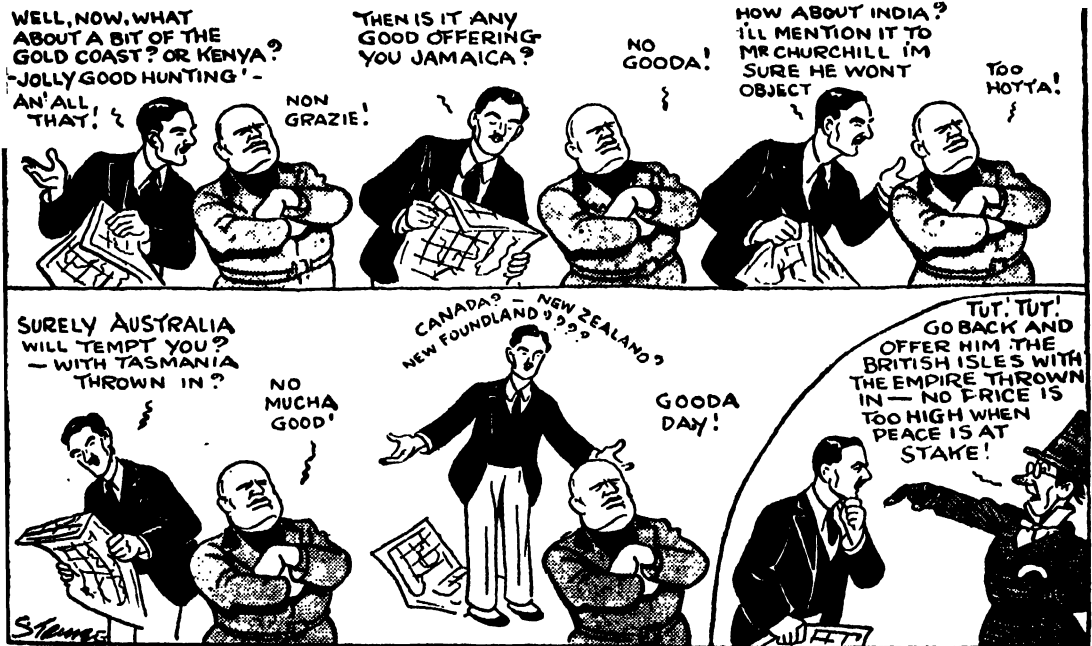
ঈডেন (মুসোলিনীর প্রতি)—এটা নেবেন? এটা? এটা?.....

—লণ্ডনের "ডেলী এক্সপ্রেস" হইতে
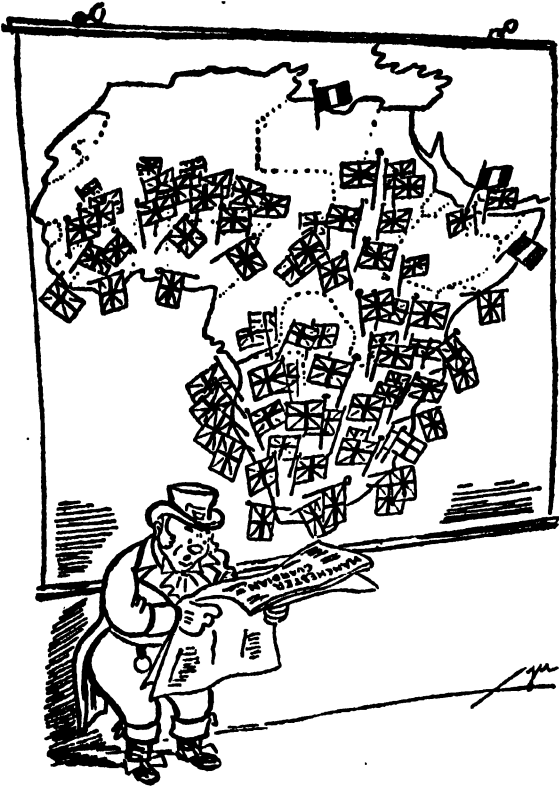
ইটালীর আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তার-লালসায় জনবুল বিস্মিত।
—ইটালীর "পোপোলো ডি রোমা" হইতে

হইয়াছে, মুসোলিনীকে সুধান হইতেছে, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের কোন্ অংশ তাঁহাকে দিলে তিনি সন্তুষ্ট হন।

ইংরেজরা নিজে আফ্রিকার বিস্তর দেশ দখল করিয়া সেখানে নিজেদের জয়পতাকা উড়াইয়াছে, অথচ আফ্রিকায় ইটালীর সাম্রাজ্যবিস্তারচেষ্টাকে উন্মাদ বা বাতিক বলিতেছে। সেই জন্য ইটালীর একটি কাগজ একটি ব্যঙ্গচিত্র মুদ্রিত করিয়াছে।

রায় সাহেব রাজমোহন দাস

বিরাশি বৎসর বয়সে ঢাকায় রায় সাহেব রাজমোহন দাসের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যৌবনে সামান্য বেতনে পুলিস-বিভাগের এক জন অধস্তন কর্ম্মচারী ছিলেন; কার্য্যদক্ষতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও চরিত্রের গুণে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। পেন্স্যন পাইবার পর তিনি নানা প্রকারে সমাজসেবায় নিরত হন। তাঁহার একটি কাজ তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিবে। আসাম ও বঙ্গের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি নামক যে সমিতি আছে, তাহার জন্য তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এখনও দেশব্যাপী অর্থকষ্টের সময়েও যে এই সমিতির প্রায় সাড়ে চারি শত বিদ্যালয় ও প্রায় আঠার হাজার ছাত্রছাত্রী আছে, তাহা বহুপরিমাণে তাঁহার পরিশ্রম ও কার্য্যনৈপুণ্যের ফল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হন। তখন হইতে আর সমিতির জন্য কাজ করিতে পারেন নাই।

অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জমীর উপযোগী ধান্য

বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যে, তাঁহার প্রিয় ছাত্র যবদ্বীপ-(জাভা-)বাসী শ্রীমান্ সুব্রত বলেন, যে, তাঁহার দেশে "গগ" নামক এক প্রকার ধান্য আছে, তাহা অনাবৃষ্টিতেও শস্য উৎপাদন করে। ঐ ধানের বীজ আনাইয়া আমাদের দেশে ডাঙ্গা জমীতে এবং অনাবৃষ্টির সময় অন্য জমীতেও লাগাইয়া দেখা অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহার ফলন আর্দ্র ও জলা জমীর উপযুক্ত ধান্য অপেক্ষা অবশ্য কম হয়। কিন্তু শস্য কিছুই না-পাওয়ার চেয়ে কম পাওয়া ভাল।

এখানে একটি অবান্তর কথা বলিতেছি। এই শ্রীমান্ সুব্রতের নাম যদিও সংস্কৃত, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম ইস্‌লাম। জাভার ইস্‌লামধর্ম্মী অনেকের এইরূপ নাম আছে, যথা "শাস্ত্রবিদগ্ধ"। কারণ, ইঁহাদের ধর্ম্মমত ইস্‌লামীয় হইলেও ইঁহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতবর্ষীয়। ইঁহারা আরব, তুর্ক, ইরানী, মুঘল, বা পাঠানের মুখস পরিতে ব্যগ্র নহেন।

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের দুটি ব্যবস্থা

কলিকাতার বেলগাছিয়া পল্লীস্থিত পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় আমাদিগকে দুটি বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচর করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার আবশ্যক অংশ নীচে উদ্ধৃত করিলাম।

বিদ্যামন্দিরের গত বর্ষের পুরস্কারবিতরণ-সভায় সভাপতিরূপে আপনি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "যেহেতু এই

বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদিগকে প্রাইভেট ছাত্ররূপে পরীক্ষা দিতে হয় এবং সেই কারণে যোগ্য হইলেও ছাত্রগণ সরকারী বৃত্তি লাভে বঞ্চিত হয়, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এই ত্রুটি দূরীকরণের জন্য পরীক্ষোত্তীর্ণ যোগ্যতম ছাত্রের জন্য অন্ততঃ একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করুন।" আপনার এই অনুরোধের প্রত্যুত্তরে বিদ্যামন্দিরের রেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার মহাশয় ঐ সভাস্থলেই একটি বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, আপাততঃ উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যে ছাত্রটি গড়ে শতকরা অন্ততঃ (৭০) সত্তর নম্বর রাখিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাহাকে দশ টাকা হিসাবে দুই বৎসর কাল এই বৃত্তিটি প্রদান করা হইবে। গত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় শ্রীমান্ দেবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এইরূপ নম্বর পাইয়া এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় এ বৎসরকার বৃত্তিটি তাহাকেই দেওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।"

এরূপ ব্যবস্থা করায় বিদ্যামন্দিরের ভাল ছাত্র পাইবার সম্ভাবনা বাড়িবে, এবং অন্ততঃ একটি ভাল ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কলেজে পড়িতে পারিবে।

অন্য ব্যবস্থাটিতে কলেজের ছাত্রগণের পণ্যশিল্প শিখিবার সুবিধা হইবে। তাহা এই :—

বেকার সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির কিছু কিছু কাজ করিতেছেন। এ বৎসর তাঁহারা কলিকাতার কলেজগুলির ছাত্রগণের সুবিধার জন্য শিল্পশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য আপাততঃ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭টা পর্যন্ত কয়েকটি ক্লাস বসিবে। তাহাতে আপাততঃ বহি বাঁধাই, পশমী কাপড় বুনা, চামড়ার কাজ, ও সাবান তৈরি করিতে শিখান হইবে। শিক্ষা অবৈতনিক—নামমাত্র ভর্ত্তি-ফি লাগিবে। প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ অনায়াসে এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারেন। ছাত্রগণের উৎসাহ দেখিলে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ব্যবস্থা অধিকতর ব্যাপক করিয়া গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছুক আছেন। বিদ্যালয়ের উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যাদি ফেরী করিয়া যাহাতে ছাত্রগণ কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া অন্ততঃ তাঁহাদের কলেজের বেতন সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে। এ বিষয়ে বিশেষ সংবাদ জানিবার নিমিত্ত বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষকের সহিত অপরাহ্ণ ২॥টা হইতে ৪॥টার মধ্যে বিদ্যালয়ে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। ঠিকানা—পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির, ৫।১, এলাইচণ্ডী রোড, বেলগাছিয়া ; ফোন ৩০১৮ বড়বাজার।

—

"শিশুভারতী"

বালকবালিকারা বিদ্যালয়ে যাহা শিখে তা ছাড়াও যাহাতে আরও অনেক বিষয় আনন্দের সহিত শিখিতে পারে তাহার নিমিত্ত ইংরেজীতে বালকবালিকাদের অভিধান (Children's Dictionary), জ্ঞানের গ্রন্থ (The Book of Knowledge), প্রভৃতি বহু খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থ আছে। অন্য কোন কোন পাশ্চাত্য ভাষাতেও সম্ভবতঃ আছে। "শিশুভারতী" বাঙ্গলায় এই রকম পত্রিকা বা গ্রন্থ। পত্রিকা বলিতেছি এই জন্য, যে, মাসিকপত্রিকার মত ইহার এক এক সংখ্যা মাসে মাসে বাহির হয়, এবং পরে সেগুলি বাঁধাইয়া রাখা যায়। ইহাতে বিস্তর একরঙা ও বহুবর্ণ চিত্র থাকে। কৃতবিদ্য লোকেরা ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে প্রবন্ধ লেখেন। কোন বাংলা পত্রিকা ইহার মত পুরু উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা হয় না, খুব কম বাংলা বহির কাগজ ইহার মত। ইহার ছাপাও উৎকৃষ্ট। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস ইহার প্রকাশক এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইহার সম্পাদক।

—

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

বঙ্গের কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে—যেমন বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুরশিদাবাদ। তাহার উপর এগুলির অধিকাংশে ভীষণ বন্যা হইয়াছে। এই জেলাগুলির যে-যে স্থানে লোকেরা অন্নবস্ত্রের অভাবে ও বন্যায় বিপন্ন হইয়াছে, সেই সকল স্থানে তাহাদের সাহায্য করা গবন্মেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু গবন্মেণ্ট তৎপর হইলেও অনেক সময় এরূপ বিপন্ন লোক থাকে, যে, তাহারা দৈহিক শ্রমে অনভ্যস্ত বলিয়া বা ভিক্ষা-গ্রহণে সঙ্কোচ বোধ করে বলিয়া সাহায্য পায় না। গবন্মেণ্ট যে সর্ব্বত্র চটু করিয়া তৎপর হন, তাহাও নয়। এই সব কারণে বেসরকারী সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

—

বঙ্গের জেলাসমূহে স্বাভাবিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

লোকদের মধ্যে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যা বেশী হইলে উভয় সংখ্যার প্রভেদ হইতে স্বাভাবিক লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বুঝা যায়। অন্য স্থান হইতে আগত আগন্তুকদের আগমনেও কোন স্থানের লোকসংখ্যা বাড়িতে পারে। তাহা স্বাভাবিক লোকসংখ্যাবৃদ্ধি নহে। ১৯৩৩ সালে বঙ্গের কোন্ জেলায় স্বাভাবিক লোকসংখ্যাবৃদ্ধি কত হইয়াছিল, তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল। ১৯৩৪ সালের অবস্থা জানিতে বিলম্ব আছে, ১৯৩৫এর অবস্থা তার চেয়েও পরে জানা যাইবে।

জেলা।	হাজারকরা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি।	জেলা।	হাজারকরা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি।
মুরশিদাবাদ	১৪·০	পাবনা	৬·০
নোয়াখালি	১০·৫	বাখরগঞ্জ	৫·৭
চব্বিশ-পরগণা	৯·৮	ময়মনসিং	৫·৬
দার্জ্জিলিং	৯·৪	হুগলী	৫·২
ত্রিপুরা	৯·২	নদীয়া	৫·১
মালদহ	৯·১	চট্টগ্রাম	৫·০
বীরভূম	৮·৯	বর্দ্ধমান	৪·৮
হাবড়া	৭·৪	রাজশাহী	৪·৬
মেদিনীপুর	৭·২	খুলনা	৪·৪
ঢাকা	৬·৫	দিনাজপুর	৩·৩
জলপাইগুড়ি	৬·৪	রঙ্গপুর	২·০
বাঁকুড়া	৬·০	ফরিদপুর	১·৯
		বগুড়া	১·৪

কেবল কলিকাতায় ও যশোর জেলায় জন্মের চেয়ে মৃত্যু বেশী হইয়াছিল। কলিকাতায় হাজারে জন্ম হইয়াছিল ২০·৮ এবং মৃত্যু ২৫·১, এবং যশোর জেলায় জন্ম ১৯·৬, মৃত্যু ২৫·৫।

—

বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু অংশসমূহ

উপরে যে-সব জেলায় ১৯৩৩ সালে স্বাভাবিক লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি দেখান হইয়াছে, তাহা সেই সব জেলার সব অঞ্চলে হয় নাই; অনেক অঞ্চলে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক হইয়াছে। সেইগুলি ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চল। কোন্ জেলার কত বর্গমাইল ক্ষয়িষ্ণু এবং ক্ষয়িষ্ণু অংশ জেলার শতকরা কত ভাগ, তাহা নীচের তালিকায় দেখাইতেছি।

জেলা	ক্ষয়িষ্ণু মোট বর্গমাইল	শতকরা ক্ষয়িষ্ণু অংশ
বর্দ্ধমান	৫০৫	২১·৬
বীরভূম	১২১	৭·১
বাঁকুড়া	৭৫৬	২৮·৮
মেদিনীপুর	১০১৪	১৯·৩
হুগলী	২৫৬	২১·৫
হাওড়া	১০	১·৯
২৪-পরগণা	২৫	·৫
নদীয়া	৫১৫	১৭·৯
মুরশিদাবাদ	৬	·৩
যশোর	২৬৩৩	৯০·৭
খুলনা	৩৬৫	৭·৮
রাজশাহী	৮৩১	৩১·৮
দিনাজপুর	৫৪৮	১৩·৯
জলপাইগুড়ি	৩৩৪	১১·৪
দার্জ্জিলিং	৯০	৭·৪
রঙ্গপুর	৬৬৬	১৮·২
বগুড়া	৬০২	৪৩·৫
পাবনা	৫৫৬	৩০·৬
মালদহ	২৪৯	১৪·১
ঢাকা	০	০
মৈমনসিং	৯৬১	১৫·৪
ফরিদপুর	১০৬৭	৪৫·৩
বাখরগঞ্জ	৭	·২
চট্টগ্রাম	১৩৯	৫·৪
নোয়াখালি	২৪১	১৫·[illegible]
ত্রিপুরা	০	০

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ১৯৩৩ সালে জেলাসমূহের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী বর্গমাইল ক্ষয়িষ্ণু ছিল যশোর জেলায়; তাহার পর ফরিদপুরে ও মেদিনীপুরে। কোন্ জেলার শতকরা কত অংশ ক্ষয়িষ্ণু ছিল, তাহা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, যশোরের শতকরা ৯০·৭ অংশ, ফরিদপুরের ৪৫·৩, বগুড়ার ৪৩·৫ ও রাজশাহীর ৩১·৮ অংশ ক্ষয়িষ্ণু ছিল।

—

বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মৃত্যুর হার

সম্প্রতি বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে ১৯৩৩ সালের যে স্বাস্থ্য-বিবরণ (Bengal Public Health Report) প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুসারে ধর্ম্মসম্প্রদায় হিসাবে বঙ্গে মৃত্যুর তালিকা এইরূপ :—

সম্প্রদায়	মৃত্যুর সংখ্যা	হাজারকরা হার	পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা বৃদ্ধি
খ্রীষ্টিয়ান	২,৫১৩	১৪·০	৭·৭
হিন্দু	৪৯৭,১৪১	২৩·১	১৩·২
মুসলমান	৬৬৭,৪০৯	২৪·৩	২০·৯
বৌদ্ধ	৩,১৪৮	১৯·৬	১·০
অন্যান্য	২৭,৬৭৪	৫১·৪	৮·০

—

পুরুষ ও নারীর মৃত্যুর হার

স্ত্রীপুরুষ ভেদে মৃত্যুর হার বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, পাঁচ হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষ অপেক্ষা নারীর মৃত্যুর হার বেশী। যথা—

বয়স	পুরুষ	নারী	তারতম্য
	(প্রতি হাজারে)		(পুরুষ বেশী +, নারী বেশী −)
শিশু*	২০৪·৫	১৯৫·৪	+৪·৬
১—৫	২৮·৩	২৮·০	+১·০
৫—১০	১২·৮	১৩·৭	−৬·৬
১০—১৫	৮·২	৮·০	+২·৫
১৫—২০	১১·২	১৩·৯	−১৯·৪
২০—৩০	১১·১	১৪·৭	−২৪·৫
৩০—৪০	১৪·২	১৫·৮	−১০·১
৪০—৫০	২১·৪	২০·৫	+৪·৪
৫০—৬০	৩৬·৩	৩৫·০	+৩·৭
৬০ ঊর্দ্ধে	৮০·৯	৭৮·৮	+২·৭

১৫ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সেই নারীগণের মাতৃত্বের কাল। এই সময়েই বাংলার নারীদিগের মৃত্যুর হার ও সংখ্যা বহুল পরিমাণে পুরুষের মৃত্যুর সংখ্যা ও হার ছাড়াইয়া যায়। মাতৃত্বের দায় বহন করিতেই যে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এ কথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সরকারী বিবরণ হইতে ইহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। প্রসবকালে ও প্রসবের পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে নারীমৃত্যুর সংখ্যা মাত্র ১৪,২২৮। চৌদ্দ দিন অতিক্রান্ত হইবার পর প্রসূতির মৃত্যু হইলে এই তালিকায় ধরা হয় না। সুতরাং মাতৃত্বের ফলে বাংলা দেশে কত নারী অকালমৃত্যু বরণ করিয়া লইতেছে, তাহা নির্ণয় করা হইতেছে, একথা বলা চলে না।

—

বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রোগে মৃত্যু

বাংলায় কোন্ রোগে কত লোক ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক-গমন করিয়াছে তাহার তালিকা এইরূপ

রোগের নাম	মৃতের সংখ্যা	অনুপাত (হাজার-করা)
ম্যালেরিয়া	৪১৩,৯২২	৮·৩
অতিসার জ্বর	১১,০২৬	·২
ঘাম-জ্বর	৪,৪৯৮	·১
পালা-জ্বর	৫,১৭৩	·১
কালাজ্বর	১৩,৪৪৭	·৩
অন্তবিধ জ্বর	৩৬৪,৩২৭	৭·৩
(সর্ব্বপ্রকার জ্বর	৮১২,৩৯৩	১৬·৩)
আমাশয়	২৫,৯৮০	·৫
উদরাময়	২০,৭১৭	·৪
ইনফ্লুয়েঞ্জা	৫,২২৩	·১
নিউমোনিয়া	৩৭,৩৩৭	·৭
যক্ষ্মা	১৪,৮০২	·৩
অপরাপর শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কীয়	২৪,৮১১	·৫
(সর্ব্বপ্রকার শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কীয়	৮২,১৭৩	১·৬)
কলেরা	২৯,২৪২	·৬
বসন্ত	১৫,৪২৬	·৩
প্লেগ	১	·০০,০০২
অপঘাত	২১,১৬৬	·৪
অপরাপর	১৯০,৭৮৭	৩·৮
মোট	১,১৯৭,৮৮৫	২৪·০

* প্রতি হাজারে জন্মের সংখ্যায়

বাংলা দেশে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যত লোক মরিয়াছে, তাহার দুই-তৃতীয়াংশের মৃত্যু হয় নানাবিধ জ্বরে। অথচ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নিবার্য্য রোগ বলিয়াই গণ্য। অপঘাত মৃত্যু ২১,১৬৬র মধ্যে আত্মহত্যায় পুরুষ ১,২৮০ ও নারী ১,৬১৩ মরিয়াছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা নারীই বেশী।

—

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ

অনেকগুলি জেলায় দুর্ভিক্ষ ও বন্যাজনিত বিপদ্ হওয়ায় যাঁহারা সবগুলিতেই সাহায্য দিবার মত অর্থ ও কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে পারিবেন ও করিবার আশা রাখেন, তাঁহারা তাহা অবশ্য করিবেন। আমরা কেবল বাঁকুড়ার কথা এখানে লিখিতেছি এই জন্য, যে, আমাকে বাঁকুড়া-সম্মিলনীর সভাপতি করা হইয়াছে এবং সম্মিলনী দুর্ভিক্ষে বিভিন্ন লোকদের সাহায্যার্থ যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারও সভাপতি আমাকে করিয়াছেন। এই কমিটির আবেদন বর্ত্তমান মাসের 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপন-সমূহের মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। যাঁহারা বিপন্ন লোকদের সাহায্যের জন্য টাকা প্রভৃতি পাঠাইবেন তাহা দয়া করিয়া আমার নামে প্রবাসী আফিসের ঠিকানায় (আমার বাসার ঠিকানায় নহে) পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব। মনিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠাইলে প্রেরক ডাকঘর হইতেই রসীদ পাইবেন, আফিসে স্বয়ং বা লোক মারফৎ পাঠাইলে মুদ্রিত স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া হইবে। আফিসের ঠিকানা ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

—

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অকালে শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যুতে বঙ্গদেশ সঙ্গীতসম্পদে পূর্ব্ববৎ সমৃদ্ধ রহিল না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। জীবনের ২৫ বৎসর

তিনি শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতশিক্ষাদানের নিমিত্ত ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে বিস্তর ছাত্রছাত্রী তাঁহার নিকটে রবীন্দ্রনাথের গান শিখিয়াছেন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁহার শিক্ষাদান-ক্ষমতা ও স্নেহে তাঁহার প্রতি অনুরাগী ছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন সুগায়িকা, কল্যাণীয়া শ্রীমতী অমিতা সেন, তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয়বিধ সঙ্গীতে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এরূপ ছিল, যে, রবীন্দ্রনাথ নিজের গানের যে সুর দিতেন তাহা স্বয়ং ভুলিয়া গেলেও দিনেন্দ্রনাথ কখনও ভুলিতেন না। এই জন্য কবি যে তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গীতাবলীর ভাণ্ডারী ও কাণ্ডারী বলিয়াছেন, তাহা অতি সত্য কথা।

তিনি যে কেবল সংগীতজ্ঞ ও সুগায়ক ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার সংস্কৃতি, সৌজন্য ও নানাবিষয়ক জ্ঞানও উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি সুরসিক, মজলিসী লোক ছিলেন। তাঁহার অট্টহাস্য তাঁহার পিতামহ ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের হাস্য মনে পড়াইয়া দিত।

—

বঙ্গের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা

১৯৩৩ সালে বঙ্গের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে নীচে একটি তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা হইতে বঙ্গের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা বুঝা যাইবে।

প্রদেশ।	হাজারকরা জন্মের হার	হাজারকরা মৃত্যুর হার	শিশুদের মৃত্যুর হার
বাংলা	২৯·৫	২৪ ০	২০০·১
মান্দ্রাজ	৩৭·৭২	২৩·৬৬	১৮৪·৯৪
বোম্বাই	৩৬·৩৯	২৪·৭৯	১৬০·৬৬
আগ্রা-অযোধ্যা	৩৯·২২	১৮·৬৯	১৩৭·৮৮
পঞ্জাব	৪৪·৪৪	২৮·১৬	১৯২·৫৫
মধ্যপ্রদেশ	৪৪·২৫	২৬·৫৫	২০০·০৭
বিহার-উড়িষ্যা	৩৫·৭	২২·১	১৩৫·২
উ. প. সীমান্ত	৩০·০৫	২১·২৮	১৩৭·৩৬
ব্রহ্ম	২৯·৮৩	১৮·৭১	১৯২·২৬
আসাম	৩১·০৪	২০·৩১	১৬৩·৪৬

জন্মের হার হইতে মৃত্যুর হার বাদ দিলে দেখা যাইবে, যে, ১৯৩৩ সালে হাজারকরা স্বাভাবিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল বঙ্গে ৫·৫, মান্দ্রাজে ১৪·০৬, বোম্বাইয়ে ১১·৬০, আগ্রা-অযোধ্যায় ২০·৫৩, পঞ্জাবে ১৬·২৮, মধ্যপ্রদেশে ১৭·৭০, বিহার-উড়িষ্যায় ১৩·৬, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৮·৭৭, ব্রহ্মদেশে ১১·১২ এবং আসামে ১০·৭৩। সুতরাং বঙ্গেই লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার সকলের চেয়ে কম।

অতঃপর শিশুমৃত্যুর হার বিবেচনা করিলে দেখা যায়, তাহাও বঙ্গে সকলের চেয়ে বেশী। মধ্যপ্রদেশ বঙ্গের কাছাকাছি যায় বটে, কিন্তু সেখানে জন্মের হার বঙ্গের দেড়গুণ বলিয়া তথায় স্বাভাবিক লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বঙ্গের তিনগুণেরও অধিক।

—

বঙ্গের স্বাস্থ্যহীনতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা

১৯৩৩ সালের বার্ষিক স্বাস্থ্য-রিপোর্ট হইতে যে কয়টি তালিকা দিলাম, তাহা হইতে বঙ্গের স্বাস্থ্যহীনতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা বুঝা যাইবে। বঙ্গের দারিদ্র্যের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতিও তাহার সঙ্গে জড়িত। সমগ্র দেশটির আর্থিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নতি কি কি উপায়ে হইতে পারে, তাহা স্থির করিবার ও উপায় অবলম্বন করিবার লোক চাই। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক জেলার ও তাহার প্রত্যেক ক্ষয়িষ্ণু অংশের উন্নতির উপায় স্থির ও অবলম্বন করিবারও লোক চাই। জেলাগুলির নাম দেখিলেই বুঝা যাইবে, যে, ক্ষয়িষ্ণুতা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ানদের বাসস্থান-নির্ব্বিশেষে হইয়াছে। অতএব সকলকে সমগ্র দেশটির এবং সমগ্র জেলার ও তাহার ক্ষয়িষ্ণু সব অংশের হিতচেষ্টা করিতে হইবে।

—

বঙ্গে বন্যা

বঙ্গে সম্প্রতি প্রধানতঃ বর্দ্ধমান জেলায়, এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী প্রভৃতির কোন কোন অংশে বন্যায় অগণিত লোক বিপন্ন হইয়াছে। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের অন্নকষ্ট হইয়াছে, তাহার উপর কত লোকের ঘরবাড়ি পড়িয়া ভাসিয়া গেল ও গবাদি পশু মারা গল বা ভাসিয়া গেল, তাহার হিসাব করা কঠিন। এখন গবর্ন্মেণ্ট ও জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টায় বিপন্ন লোকদের

আপাততঃ যে কষ্ট হইয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে। কিন্তু স্থায়ী প্রতিকার যে-নাই, তাহা নহে। আমেরিকা, জার্মেনী ও অন্য কোন কোন সভ্য দেশে মানুষ বিজ্ঞানবলে ও অর্থবলে বন্যাকেও বশে আনিতেছে। আমাদের দেশেও তাহা মানুষের সাধ্যের বাহিরে নহে।

নূতন ভারত-গবর্মেণ্ট আইন

নূতন ভারত-গবর্মেণ্ট বিল পার্লেমেণ্টের দুই অংশ হাউস অব কমন্স ও হাউস অব লর্ডসের মঞ্জুরী পাইয়া পরিশেষে ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের সম্মতি পাইয়াছে। ইহা এখন আইনে পরিণত হইয়াছে। যাহারা ইহার দ্বারা শাসিত হইবে, যাহাদের হিতাহিত ইহার উপর নির্ভর করিবে, তাহারা ইহা চায় কিনা, তাহা আইনের বিলাতী কর্ত্তারা জানিতে চায় নাই। তাহারা কেবল নিজেদের বর্ত্তমান প্রভুত্ব ও অর্থাগম কিসে রক্ষিত হয় ও বাড়ে তাহাই দেখিয়াছে, এবং ক্রমশঃ বিলটার ধারা যত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সমস্তই সেই উদ্দেশ্যে হইয়াছে। ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহ বলিতেছে, ইহা ব্রিটিশ জাতির একটা মস্ত অবদান ("great achievement") এবং ভারতবর্ষের প্রতি তাহাদের বিশাল সদাশয়তা ও বদান্যতা হইতে উৎপন্ন একটি কর্ম্ম ("an act of great generosity")। ধন্য ব্রিটিশ ভণ্ডামি ও কপটতা, বা ধন্য ব্রিটিশ আত্মপ্রতারণা!

একটা ব্রিটিশ কাগজ বলিয়াছে, যে, এই আইনটা দ্বারা ব্রিটিশ পক্ষের অঙ্গীকার রক্ষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোকেরা কিন্তু মনে করে, যে, ব্রিটিশ-পক্ষ হইতে যত অঙ্গীকারভঙ্গ হইয়াছে, এটা তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অনিষ্টকর। কারণ, ইহা, ভারতবর্ষের স্বশাসক-অবস্থা লাভ আগে যত কঠিন ছিল, তদপেক্ষা অনেক অধিক কঠিন করিল; ইহা ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন ও বৃদ্ধির অনতিক্রমণীয় বাধা সৃষ্টি করিল; এবং ইহা ভারতবর্ষের পুরুষনারীর মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে, ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে, জমিদার ও রায়তদের মধ্যে, দেশীরাজ্যের রাজা ও প্রজাদের মধ্যে সদ্ভাব ও মিলন স্থাপন বা বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে তাহাদের মধ্যে ঈর্ষা দ্বেষ অসদ্ভাব ও ভেদ বাড়াইবে, সুতরাং মহাজাতীয় স্বরাজ্য ও উন্নতিলাভের জন্য সম্মিলিত চেষ্টার পরিপন্থী হইবে।

ভারতবর্ষের প্রকৃত মানবহিতকামী ও দেশভক্তদিগের কঠোর পরীক্ষা আরম্ভ হইল

একটা ব্রিটিশ কাগজ লিখিয়াছে, যে, আইনটা যদি ভারতবর্ষে শান্তি ও সম্পদ আনয়ন না-করে, তাহা হইলে দোষটা হইবে সম্পূর্ণ ভারতীয়দের! কাহাকেও বরফ-গলা জলে চুবাইয়া রাখিয়া যদি বলা যায়, "এতেও যদি তোমার শীত না ভাঙে তা হ'লে দোষী তুমিই", তাহা হইলে সে ব্যক্তি তামাসাটা উপভোগ করে না। হাত-পা বাঁধিয়া কোন ব্যক্তিকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া যদি বলা হয়, "তুমি যদি এতেও ওলিম্পিক দৌড়ে প্রথম পুরস্কার না-পাও, তার জন্য দায়ী ত একা তুমিই", তাহা হইলে তাহার পক্ষে যুগপৎ কিংচিন্তিতব্যবিমূঢ়, কিংবক্তব্যবিমূঢ় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া বিচিত্র নহে।

বদান্যতা ?

বিলাতী পার্লেমেণ্টের হাউস অব লর্ডসে যখন ভারত-গবর্মেণ্ট বিলের আলোচনা হইতেছিল, তখন একটি সংশোধক প্রস্তাবের সমর্থনকল্পে লর্ড ম্যান্সফীল্ড বলেন :—

As we are giving this new constitution to India of our own free will, and it is not being extorted from us by force, it would be only reasonable that we should have as a result some form of imperial preference in India.

তাৎপর্য্য। যে হেতু আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় এই শাসন-প্রণালী ও বিধি ভারতবর্ষকে দিতেছি, ইহা বলপূর্ব্বক আমাদের নিকট হইতে লওয়া হইতেছে না, সেই জন্য ইহা যুক্তিসঙ্গতই হইবে, যে, যদি ইহার ফল-স্বরূপ আমরা আমাদের ভারতবর্ষে প্রেরিত পণ্যদ্রব্য অন্য বিদেশী পণ্যদ্রব্যের চেয়ে সুবিধাজনক দরে বিক্রী করিতে পারি এবং ভারতীয় জিনিষও সুবিধাজনক দরে আমদানী করিতে পারি।

উদ্ধৃত বক্তৃতাংশের মূলে ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্সের দাবি আছে। তাহার মানে, ভারতবর্ষ, ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া, বিদেশ হইতে আমদানী যত জিনিষের উপর বাণিজ্যশুল্ক বসায় তাহার মধ্যে বিলাতী জিনিষের উপর কম হারে ঐ শুল্ক বসাইবে, যাহাতে বিলাতী জিনিষ অন্য বিদেশী জিনিষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সস্তায় ভারতবর্ষে বিক্রী হইতে পারে; এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী যে-যে জিনিষের উপর

বাণিজ্যশুল্ক বসান হয়, তাহা বিলাতে রপ্তানী হইলে তাহার উপর কম হারে ঐ শুল্ক বসিবে যাহাতে বিলাতের লোকেরা তৎসমুদয় অন্য বিদেশীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সস্তায় পায়। অর্থাৎ ব্রিটেন আমাদিগকে যে শাসনপ্রণালী ও বিধি দিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য দুই দিক্ দিয়াই অন্য বিদেশ অপেক্ষা সুবিধা চান।

কোন দানকে তখনই "ফ্রী গিফ্‌ট" (স্বেচ্ছাকৃত দান) বলে যখন কেহ তাহা ভয়েও করে না, লোভেও করে না।

প্রথমতঃ দেখা যাক্, ব্রিটেন আমাদিগকে যাহা দিলেন তাহা না-দিলে তাঁহার কোন ক্ষতি অনিষ্ট অসুবিধা হইবে এই ভয়ে দিলেন কি না।

এই আইনটার মুসাবিদার পূর্ব্ব হইতে প্রায় পাস হওয়া পর্য্যন্ত মিঃ র‍্যামজি ম্যাকডন্যাল্ড প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সাড়ে চারি বৎসর পূর্ব্বে একটি বক্তৃতায় বলেন :—

Supposing we do not do this, what are the prospects? Repression and nothing but repression. And it is a curious repression, a very uncomfortable repression and a kind of repression from which we shall get neither credit nor success."

তাৎপর্য্য। মনে করুন আমরা ভারতবর্ষকে নূতন শাসনপ্রণালী ও বিধি দিলাম না, তাহা হইলে ভবিষ্যৎটা কিরূপ হইবে? ভারতীয়দিগকে দমন এবং দমন ভিন্ন আর কিছুই নয়। এবং ইহা অদ্ভুত রকমের দমন, অত্যন্ত অস্বস্তিজনক দমন এবং এরূপ দমন যাহা হইতে আমরা সুখ্যাতি পাইব না, সিদ্ধিও পাইব না।

একটা অবান্তর কথা বলি। মিঃ ম্যাকডন্যাল্ড কি মনে করেন যে নূতন ভারত-গবন্মেণ্ট আইনটার ফলে ভারতবর্ষে দমননীতি বজায় রাখিতে ও অধিকতর জোরে চালাইতে হইবে না? তাহা হইলে দমননীতিপ্রসূত যে সব আইনের মিয়াদ এই বৎসর শেষ হইবার কথা, সেগুলা আবার পাস করিবার আয়োজন কেন হইতেছে? যাক্ সে কথা।

মিঃ ম্যাকডন্যাল্ড ঐ বক্তৃতায় আরও বলেন :—

If we are prepared to march our soldiers from the Himalayas to Cape Comorin, then refuse to allow us to go on. If we are prepared to subdue by force not only the people, but the spirit of the time, then refuse to allow us to proceed. If we are prepared to stage for the whole world to behold the failure of our political genius and at the same time provide it with a spectacle which will bring our name and our fame very low, indeed, then refuse to allow us to go on.

তাৎপর্য্য। যদি আমরা আমাদের সৈন্যদিগকে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যুদ্ধাভিযান করাইতে প্রস্তুত থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে নূতন ভারত-গবন্মেণ্ট আইন প্রণয়ন কার্য্যে অগ্রসর হইতে দিতে অস্বীকার করুন। যদি আমরা বলপ্রয়োগ দ্বারা কেবল ভারতবর্ষের লোকদিগকে নহে পরন্তু যুগভাবকেও বশীভূত করিতে প্রস্তুত থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে দিতে অস্বীকার করুন। যদি আমরা সমস্ত জগতের দেখিবার জন্য আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার ব্যর্থতার অভিনয় করিতে প্রস্তুত থাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ দৃশ্য জগৎকে দেখাইতে প্রস্তুত থাকি যাহাতে আমাদের নাম যশ বাস্তবিক অত্যন্ত হীন অবস্থা পাইবে, তাহা হইলে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে দিতে অস্বীকার করুন।

ভারতবর্ষকে নূতন ভারত-গবন্মেণ্ট আইন না-দিলে বক্তা যেরূপ বিপদ ও কুফলের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেরূপ আশঙ্কার কারণ সত্যসত্যই ছিল বা আছে কিনা, তাহা বিচার্য্য নহে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে, যে-মন্ত্রিমণ্ডলের তিনি প্রধান ছিলেন তাঁহাদের এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল, এবং তাহার প্রভাবেই তাঁহারা ভারতবর্ষকে নূতন শাসনবিধি দিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে ফ্রী গিফ্‌ট বা স্বেচ্ছাকৃত দান বলা যায় না।

কিন্তু যদি ইহা আশঙ্কা হইতে উদ্ভূত না-ই হয়, তাহা হইলেও কি ফ্রী গিফ্‌ট্ বলা যায়? বিনিময়ে কিছু পাইবার আশায় মানুষ যদি কিছু দেয় তাহাকে বদান্যতা বলে না, তাহা বাণিজ্য। স্বর্গ-লাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ যে ভাল কাজ করে, মহাভারতে তাহাকে পর্য্যন্ত বাণিজ্য বলিয়া তাহার নিন্দা করা হইয়াছে। লর্ড ম্যান্সফীল্ড ভারত-গবন্মেণ্ট আইনের বিনিময়ে ভারতীয়দের কাছ থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা, আর্থিক লাভ চান। ইহাকে কি প্রকারে ফ্রী গিফ্‌ট্ বলা যাইবে?

ভারত-গবন্মেণ্ট আইনটা ভয়-প্রসূত, না লোভপ্রসূত, সে প্রশ্নের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, যে, লর্ড ম্যান্সফীল্ড বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন। উহাতে এরূপ সব ধারা আছে যাহার জোরে ব্রিটেন আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে অন্য বিদেশী জাতিদের চেয়ে সুবিধা পাইবেই; প্রত্যেক স্বাধীন জাতি নিজেদের পণ্যশিল্প, কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য, জাহাজ প্রভৃতি রক্ষা করিবার ও বাড়াইবার জন্য যে-সব সংরক্ষণোপায় অবলম্বন করে ও করিয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সম্পর্কে তাহা করিতে পারিবে না, আইনটাতে তাহার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং ইংরেজরা নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির অপব্যবহার দ্বারা যাহা বলপূর্ব্বক লইয়াছে, তাহা চাওয়া কেন?

আইনটাতে যদি ঐরূপ ধারা ও উপায়-নির্দ্দেশ না থাকিত, তাহা হইলেও কি উহা ভারতবর্ষের পক্ষে এরূপ ভাল জিনিষ, যে,

তাহার বিনিময়ে কোন ইংরেজ ভারতবর্ষের কাছে কিছু চাহিতে পারে? কখনই নহে। লর্ড মান্সফীল্ড বলিয়াছেন, আমরা নিজের শক্তিতে কিছু আদায় করিয়া লইতে পারি নাই, ইংরেজরা দয়া করিয়া কিছু দিয়াছেন। তাহা হইলে ব্রী গিফ্‌ট্‌টির চেহারা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাদের দয়ার মানে তাঁহাদের স্বার্থই সম্পূর্ণ রক্ষা, আমাদের মঙ্গলজনক কিছু পাইতে হইলে আমাদের আদায় করিয়া লইবার মত শক্তি চাই।

বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের নবপ্রকাশিত অভিপ্রায়

বাংলা-গবন্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগ গত ২৭শে জুলাই বাংলা দেশের শিক্ষাসম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য যতগুলি ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সব গুলি ছোট অক্ষরে ছাপিলেও প্রবাসীর দশ পৃষ্ঠা লাগিবে বোধ হয়। এত দীর্ঘ একটি লেখার সংক্ষিপ্ত অথচ সম্যক্ সমালোচনা সম্ভবপর নহে। এই জন্য এবার আমরা কয়েকটি বিষয়ে কিছু বলিব। পারি ত ভবিষ্যতে আরও কিছু লিখিব।

বলা হইয়াছে :—

"Exactly a hundred years ago, the famous Resolution of the Government of India gave a new direction and a strong impetus to education in India. Since then the growth of education in Bengal has been rapid."

বাংলা দেশে শিক্ষার বৃদ্ধি বা বিস্তার দ্রুত হইতেছে বা হইয়াছে কি না, তাহা বিচার্য্য। যাহারা শিক্ষা পায় তাহাদের অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষা পায়। সুতরাং এক শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কিরূপ ছিল এবং এখন কিরূপ আছে, তাহার আলোচনা করিলেই চলিবে।

মেজর বামনদাস বসুর কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে শিক্ষার একখানি ইতিহাস (*History of Education in India under the Rule of the East India Company*) আছে। তাহার নূতন সংস্করণের ১৬-১৭ পৃষ্ঠায় আছে :—

The late Mr. Keir Hardie, in his work on *India*, (p. 5), wrote :

"Max Muller, on the strength of official documents and a missionary report concerning education in Bengal prior to the British occupation, asserts that there were then 80,000 native schools in Bengal, or one for every 400 of the population. Ludlow, in his history of British India, says that 'in every Hindu village which has retained its old form I am assured that the children generally are able to read, write, and cipher, but where we have swept away the village system, as in Bengal, there the village school has also disappeared'."

সর্ টমাস মনরো ১৮১৩ সালে পার্লামেণ্টে সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছিলেন, যে, ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ("a school in every village") আছে।

ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক ও কবি ডক্টর এডওয়ার্ড টমসন তাঁহার ১৯৩০ সালে প্রকাশিত *The Reconstruction of India* নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"Nevertheless, there was more literacy, if of a low kind, than until within the last ten years."

এইরূপ আরও ঐতিহাসিক মত উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। এই সমুদয় বিবেচনা করিলে কি বলা যায়, যে, বঙ্গে শিক্ষার প্রসার দ্রুত হইয়াছে? বরং ইহাই কি সত্য নহে, যে, শিক্ষার বিস্তৃততম ক্ষেত্র প্রাথমিক জ্ঞানবিস্তারক্ষেত্রে শিক্ষা আগেকার চেয়ে সংকীর্ণতর হইয়াছে?

এক সময় বঙ্গে ৮০,০০০ বিদ্যালয়, প্রত্যেক ৪০০ বাসিন্দা-প্রতি একটি বিদ্যালয়, ছিল। তাহার মানে তখন বঙ্গের লোকসংখ্যা ৩,২০,০০,০০০ ছিল। এখন ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গের লোকসংখ্যা ৫,০১,১৪,০০২। এখন প্রতি ৪০০ জন লোক হিসাবে একটি বিদ্যালয় চাহিলে ১২৫২৮৫টি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয়। তাহার জায়গায় (১৯২৭-২৮ হইতে ১৯৩১-৩২ সালের পঞ্চবার্ষিক বঙ্গীয় শিক্ষা রিপোর্ট অনুসারে) আছে—

বিশ্ববিদ্যালয়	২
আর্টস্ কলেজ	৪৯
বৃত্তিশিক্ষা কলেজ	১৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩১২৬
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬১১৬২
বিশেষ বিদ্যালয়	৩০৫০
সরকার-অননুমোদিত বিদ্যালয়	১৬৩০
মোট	৬৯,০৩৬

ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে বঙ্গে যে ৮০,০০০ বিদ্যালয় ছিল, তাহার অধিকাংশ ছিল পাঠশালা। সুতরাং এখন লোক-সংখ্যাবৃদ্ধি হেতু ১২৫২৮৫টি পাঠশালা হইলে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে অবস্থা তখনকার সমান হয়। এখন কিন্তু আছে

তখনকার অর্দ্ধেকের কম। এখন প্রত্যেক ৮২০ জন বাসিন্দা প্রতি একটি পাঠশালা আছে। ইহাকে দ্রুত শিক্ষাবিস্তার কিংবা মন্থর শিক্ষাবিস্তার, কিছুই বলা যায় না।

প্রকৃত দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর মোটামুটি যখন চল্লিশ বৎসর বাকী ছিল তখন জাপানে উহার সম্রাটের আদেশে, অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত শিক্ষা বিষয়েও, নব যুগের আরম্ভ হয়। তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যে, তাঁহার সাম্রাজ্যে বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম একটিও থাকিবে না, এমন পরিবার একটিও থাকিবে না যাহাতে অপোগণ্ড শিশু ভিন্ন কেহ নিরক্ষর। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। এখন জাপানে পুরুষজাতীয় শতকরা ৯৯ জন এবং স্ত্রীজাতীয় শতকরা ৯৮ জন লিখনপঠনক্ষম, নিরক্ষর কেবল কচি খোকা-খুকীরা। ইহা মোটামুটি ৭৫ বৎসরের চেষ্টার ফল।

আফ্রিকার নিগ্রোদের নিজের কোন সাহিত্য, এমন কি বর্ণমালাও, ছিল না। এইরূপ অসভ্য অবস্থায় তাহারা ধৃত ও আমেরিকায় দাসরূপে বিক্রীত হয়। ১৮৬৫ সালে আমেরিকায় তাহাদের দাসত্বমোচন হইবার পূর্ব্বে সে দেশে তাহাদের শিক্ষার সুবিধা ছিল না (এখনও সেখানে আমেরিকার শ্বেতকায়দের সমান সুবিধা তাহাদের নাই); অধিকন্তু অনেকগুলি রাষ্ট্রে এইরূপ আইন ছিল, যে, কেহ নিগ্রোকে লেখাপড়া শিখাইলে তাহার জরিমানা, কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত-দণ্ড হইতে পারিত, এবং যে নিগ্রো শিক্ষা পাইত তাহারও ঐরূপ শাস্তি হইত। এ বিষয়ে মেজর বামনদাস বসুর কোম্পানীর আমলে শিক্ষার ইতিহাসের ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৮৬৫ সালের ডিসেম্বরে দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া তবে ঐ সব রাষ্ট্রের নিগ্রোরা আইন ভঙ্গ না করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারিত। তাহার পর ১৯৩০ সালে আমেরিকার যে সেন্সস গৃহীত হয়, তাহাতে দেখা যায়, যে, সেই দেশে শতকরা ৮৩·৭ জন আমেরিকান নিগ্রো পুরুষ ও স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে। ইহা প্রধানতঃ ১৮৬৫ হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত ৬৫ বৎসর ব্যাপী শিক্ষালাভের ফল। ভারতবর্ষে লিখন-পঠনক্ষমত্ব ব্রিটিশ-অধিকারের পর অপেক্ষা ব্রিটিশ-অধিকারের পূর্ব্বে অধিকতর বিস্তৃত ছিল, এবং ভারতবর্ষের বর্ণমালা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা কয়েক সহস্র বৎসরের পুরাতন। ব্রিটিশ রাজত্বও প্রায় দুই শত বৎসরের হইতে চলিল। এখন সমগ্র ভারতে লিখনপঠনক্ষম মানুষ মোটামুটি শতকরা আট জন, এবং বঙ্গে শতকরা এগার জন। ব্রিটিশ রাজত্বে ইহাকেই দ্রুত শিক্ষাবিস্তার বলা হইতেছে।

জোসেফ ষ্টালিন প্রণীত "The State of the Soviet Union" নামক পুস্তকে রাশিয়ায় পঞ্চবার্ষিক উন্নতিবিধায়ক প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষাবিস্তারের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :—

সর্ব্বত্র সার্ব্বজনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার ফলে, ১৯৩০ সালের শেষে শতকরা ৬৭ জন লিখনপঠনক্ষম থাকার জায়গায় ১৯৩৩ সালের শেষে শতকরা ৯০ জন লিখনপঠনক্ষম হয়; অর্থাৎ তিন বৎসরে শতকরা লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা ২৩ বাড়ে।

১৯২৯ সালে সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ১৪৩৫৮০০০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল, ১৯৩৩ সালে হয় ২৬৪১৯০০০।

বাংলা দেশে, শুধু বিদ্যালয়ে নহে, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও সর্ব্ববিধ বিদ্যালয়ে ১৯২৮-২৯ সালে ২৬২৫২২২ জন ছাত্রছাত্রী ছিল, ১৯৩১-৩২ সালে তাহা হয় ২৭৮৩২২৫। বঙ্গে শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ধরিলে মোট সংখ্যা ও সংখ্যাবৃদ্ধি আরও কম হয়। ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, যে, রাশিয়ার লোকসংখ্যা বঙ্গের তিনগুণের কিছু বেশী। কিন্তু তাহা হইলেও সেখানকার শিক্ষাবিস্তার এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের চেষ্টার সম্মুখে, আশা করি, লজ্জায় মুখ লুকাইতে বাধ্য হইবে না।

জোসেফ ষ্টালিন রাশিয়ার "একছত্র" নেতা অর্থাৎ যাহাকে বলে ডিক্টেটর। অতএব, কেহ কেহ, বিশেষতঃ ইংরেজরা ও তাহাদের অনুগৃহীত চাকরেরা, মনে করিতে পারে, যে, তিনি নিজের দেশের কৃতিত্ব বাড়াইয়া বলিয়াছেন। অতএব অন্য সাক্ষী উপস্থিত করিতেছি। রাশিয়ার বলশেভিকরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও অন্যান্য সব ধর্ম্মের বিরোধী। সুতরাং খ্রীষ্টীয় মিশনরীদের রাশিয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য রাশিয়ার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট বিবেচিত হইবে না। ডক্টর ষ্টানলী জোন্স ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি

Christ and Communism নামক একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছেন। তাহাতে রাশিয়ানদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

In spite of the clouds we can see that they are making amazing progress: for instance, their literacy has gone up from thirty-five per cent in 1913 to eighty-five per cent today; instead of 3,500,000 pupils in 1912 there are now over 25,000,000 pupils and students: the circulation of daily papers is twelve times what it was in the Tzarist days.

তাৎপর্য্য। মেঘমালা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে তাহাদের প্রগতি বিস্ময়কর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাহাদের লিখনপঠনক্ষমত্ব ১৯১৩ সালে শতকরা ৩৫ ছিল, এখন হইয়াছে শতকরা ৮৫; ১৯১২ সালে ছাত্রছাত্রী ছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষ, এখন হইয়াছে আড়াই কোটির উপর, দৈনিক কাগজগুলির কাট্‌তি সম্রাটের আমলে যাহা ছিল এখন তাহার বারো গুণ হইয়াছে।

বঙ্গে ইংরেজ প্রভুত্বের আরম্ভ ১৭৫৭ সাল ধরিলে এ পর্য্যন্ত উহার স্থায়িত্ব ১৭৮ বৎসরব্যাপী হইয়াছে। ১৯৩১ সালে গত সেন্সস গৃহীত হয়। তখন উহার স্থায়িত্ব ছিল ১৭৪ বৎসরব্যাপী। তখন বঙ্গে শতকরা ১১ জন পুরুষ-নারী লিখনপঠনক্ষম ছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয় কমাইবার প্রস্তাব

শিক্ষাবিভাগ প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ সব রকম বিদ্যালয়ই কমাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এখন কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি কমাইবার প্রস্তাবটারই আলোচনা করিব।

১৯৩২ সালে ৬১১৬২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, এখন কিছু বাড়িয়া থাকিবে। তাহা কমাইয়া শিক্ষাবিভাগ মাত্র ১৬০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় রাখিতে চান।

আমরা আগে দেখাইয়াছি, যে, ব্রিটিশ-অধিকারের আগে প্রাথমিক শিক্ষালাভের যে সুবিধা ও সুযোগ বঙ্গের বালক-বালিকাদের ছিল, তাহার সমান সুবিধা ও সুযোগ দিতে হইলে এখন ১,২৫,০০০এর উপর পাঠশালা চাই। কিন্তু শিক্ষাবিভাগ বলিতেছেন, ১৬০০০ই যথেষ্ট হইবে। আমরা তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি।

সরকারী মন্তব্যে আছে, ১৯৩২ সালে পাঠশালা-সমূহে ২১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ছিল। শিক্ষাবিভাগ আশা করেন, তাহাদের ১৬০০০ পাঠশালায় ১৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রী হইবে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদেরই হিসাবমত দুই লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। কোথায় বঙ্গে সার্ব্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত হইবে, কোথায় অন্ততঃ ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পাইবে, না কলমের এক আঁচড়ে ৪৫ হাজার পাঠশালা লুপ্ত হইবে ও দু-লাখ ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে! কর্ত্তারা যে বলিতেছেন, তাঁহাদের প্রস্তাবিত প্রত্যেক পাঠশালায় ১২০ জন ছাত্রছাত্রী হইবে (এবং তবে মোট ১৯ লাখ ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাইবে), তাহার নিশ্চয় কি? ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এক দুই তিন চারি মাইল হাঁটিয়া পাঠশালা যাইবে ও আবার অতটা হাঁটিয়া বাড়ি আসিবে, কর্ত্তাদের হিসাব এইরূপ অদ্ভুত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা সকলকে বা অধিকাংশকে অবৈতনিক শিক্ষা দিবেন না, অথচ নিয়ম করিবেন, যে, একবার কোন ছেলে বা মেয়ে পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলে তাহাকে অন্ততঃ চারি বৎসর পড়িতেই হইবে। এইরূপ কড়া নিয়মের ভয়েই ত অনেক বাপ-মা শিশুদিগকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিতে ইতস্ততঃ করিবে।

কর্ত্তারা পাঠশালার সংখ্যাহ্রাস, শিক্ষালাভের সুযোগ সঙ্কোচ, ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাহ্রাস এই অজুহাতে করিতেছেন, যে, তাঁহাদের প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে যাহারা শিক্ষা পাইবে, তাহারা ভাল শিক্ষা পাইবে—এখনকার শিক্ষা অকেজো, এমন কি অনিষ্টকর। দুর্ভিক্ষের সময় যদি কোন দেশের কর্ত্তা বলেন, আমি কতকগুলি লোককে রাজভোগ দিব, বাকী লোকেরা অনশনে থাক্ না কেন, মরুক না কেন? তাহা হইলে এরূপ প্রস্তাব সম্বন্ধে কি মনে হয়? তার চেয়ে সকলকেই মোটা ভাত ও নুন দেওয়া ভাল নহে কি? আমাদের দেশে জ্ঞানের ও শিক্ষার দুর্ভিক্ষ বিদ্যমান। এ অবস্থায় শিক্ষা-বিভাগের প্রস্তাব আমাদের বিবেচনায় গর্হিত।

বর্ত্তমানে, যে ৬১১৬২টি পাঠশালা আছে, তাহার মধ্যে কোন কোন গ্রামে ও শহরে কয়েকটা অনাবশ্যক হইতে পারে, তেমনি আবার অন্য অনেক গ্রামে ও শহরে নূতন পাঠশালার প্রয়োজন আছে। সুতরাং হরেদরে পাঠশালার সংখ্যা আবশ্যকের অধিক বলা যায় না। একেবারে ৪৫০০০টা ছাঁটিয়া ফেলা দরকার ইহা কোন মতেই বলা যায় না। জোর এই কথা বলিতে পারেন, যে, আর বেশী পাঠশালার প্রয়োজন নাই, এবং

সরকারী পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টেও এইরূপ সিদ্ধান্তই করা হইয়াছে, হ্রাস আবশ্যক বা উচিত বলা হয় নাই। তিন প্রকারের যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া উক্ত রিপোর্টে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে, "It may be said with confidence that there are in Bengal at present nearly as many school-units for boys as are needed"; "দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ইহা বলিতে পারা যায়, যে, বঙ্গে বালকদিগের জন্য যতগুলি বিদ্যালয় আবশ্যক প্রায় ততগুলি আছে।" প্রায় কথাটি লক্ষ্য করিবেন। তাহার মানে, যে, আরও কিছু চাই, অন্ততঃ অনাবশ্যক অধিকসংখ্যক বিদ্যালয় নাই। এই বাক্যটি "Quinquennial Review of the Progress of Education in Bengal for the years 1927-28 to 1931-32" নামক সরকারী রিপোর্টের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে। ইহা বালকবিদ্যালয় সম্বন্ধে উক্ত; বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা যে একান্ত অযথেষ্ট তাহা বলাই বাহুল্য।

কর্ত্তারা পাঠশালাগুলি কমাইতে চান নানা কারণ দেখাইয়া। তাহার একটা কারণ এই, যে, সেগুলির অধিকাংশ অকেজো। তাহার সোজা উত্তর, সেগুলিকে কেজো করুন না? আপত্তি হইবে, টাকা নাই। উত্তর—সরকার নিজের প্রয়োজন, খেয়াল ও ইচ্ছা হইলে কোটি টাকাও, ধার করিয়াও, যখন খরচ করিতে পারেন, তখন এক্ষেত্রেই টাকা নাই কেন? কিন্তু ধরিয়া লইলাম, বর্ত্তমান ব্যয়ব্যবস্থায় শিক্ষার জন্য টাকা যথেষ্ট দেওয়া যায় না। তাহা হইলে ব্যবস্থা বদলান উচিত। এত জন মন্ত্রীর কি আবশ্যক? ডিবিজন্যাল কমিশনারদের পদগুলির কি আবশ্যক? আরও অনেক অনাবশ্যক পদ আছে। তার পর, বেতনের বহর এরূপ কেন? প্রবলপরাক্রান্ত জাপান-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসিক দেড় হাজার দু-হাজার টাকা (জাপানী মুদ্রা ইয়েনের বিনিময়-মূল্য পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া টাকায় ঠিক পরিমাণ দেওয়া গেল না), আর আমাদের মন্ত্রী, সেক্রেটারী, কমিশনার, কলেক্টর, জজ, ডিরেক্টর, ইন্সপেক্টর-জেনারাল, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি তাঁর চেয়ে বড় ও দায়িত্বপূর্ণ কি কাজ করেন, যে, তাঁর চেয়ে মোটা বেতন পান?' আমাদের বিবেচনায়, তাঁহাদের বেতন খুব কমান উচিত, কমান যাইতে পারে, ও কমাইলেও সমান যোগ্য লোক পাওয়া যাইতে পারে।

পাঠশালা এবং তদপেক্ষা উচ্চতর বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার ব্যয় নির্ব্বাহের আরও অনেক উপায় আছে। যেমন, গবর্ন্মেণ্ট নিয়ম করুন, কেহ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করিলে তাঁহাকে কৈসর-ই-হিন্দ স্বর্ণমেড্যাল দেওয়া হইবে, মধ্যবাংলা বা মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য রায় সাহেব বা খান্ সাহেব করা হইবে, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য রায় বাহাদুর বা খান্ বাহাদুর করা হইবে, কলেজের জন্য রাজা, মহারাজা, নবাব, বা নাইট করা হইবে, ইত্যাদি।

ইংরেজীতে বলে, ইচ্ছা থাকিলেই পথ থাকে (Where there is a will there is a way)। সকল বালক-বালিকাকে, অন্ততঃ ক্রমশঃ অধিকতরসংখ্যক বালক-বালিকাকে, শিক্ষা দিবার ইচ্ছা গবর্ন্মেণ্টের থাকিলে তাহা অসাধ্য ত নহেই, দুঃসাধ্যও নহে। পক্ষান্তরে শিক্ষার ক্ষেত্র সংকীর্ণ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকিলে, সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করাও অসাধ্য নহে।

শিক্ষাবিভাগের মন্তব্যটিতে নানা আন্দাজী কথা আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ত্রয়োদশ প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে, "These 60,000 probably do not produce 60,000 literates in the year," "এই ৬০,০০০ প্রাথমিক পাঠশালা বোধ হয় বৎসরে ৬০,০০০ লিখন-পঠনক্ষম লোক তৈরি করে না"। বর্ত্তমান পাঠশালাগুলিকে অকেজো অপবাদ দিবার জন্য এটা একটা আন্দাজ মাত্র। অন্য দিকে আমরা সর্ব্বাধুনিক পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাইতেছি, যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের চতুর্থ শ্রেণীতে ১৯৩১ সালে মোট ১১৮৭৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। তাহারা অন্ততঃ তিন বৎসর কিছু লিখিয়াছে কিছু পড়িয়াছে ও তাহার পর চতুর্থ শ্রেণীতে পৌঁছিয়াছে, এবং ১৯৩২, ১৯৩৩, ১৯৩৪, ১৯৩৫, প্রত্যেক বৎসরেও ঐরূপ লক্ষাধিক বালকবালিকা অন্যূন তিন বৎসর শিক্ষালাভের পর চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়াছে। সুতরাং ষাট হাজার পাঠশালায় ষাট হাজার বালকবালিকাও প্রতি বৎসর লিখন-পঠনক্ষম হয় না, ইহা কেমন করিয়া মানিয়া লইব? বাজে

কথা সরকারী চাকরো বলিলেও তাহা বাজে কথার বেশী কিছু নহে !

জেলাগুলির মধ্যে পাঠশালা বণ্টন

যে ১৬০০০ পাঠশালা সরকার রাখিবেন বা স্থাপন করিবেন, ও চালাইবেন, তাহাও যে শীঘ্র হইবে এমন নয়। মন্তব্যটিতে অনেক ভাল ও লম্বাচৌড়া কথা আছে। কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে, যে, সব কাজ শীঘ্র একবারে করা যাইবে না, ক্রমশঃ করা হইবে। সেটা অমূলক নয়। কারণ, ভাঙা যত সোজা, গড়া তত সোজা নয়। ৬০০০০ পাঠশালা উঠাইয়া দেওয়া অসাধ্য নহে, কিন্তু ১৬০০০ ভাল পাঠশালা গড়িয়া তোলা তত সহজ নয়। যাহা হউক, ধরিয়া লইলাম, যে, এই ১৬০০০ পাঠশালা নিশ্চয়ই বাংলা দেশ পাইয়া ধন্য হইবে। সেগুলি কোন্ জেলায় কয়টি থাকিবে ? সরকারী মন্তব্য হইতে তাহার তালিকা দিতেছি। ইহার মধ্যে কিন্তু কলিকাতা নাই। কেন ?

জেলা।	পাঠশালার সংখ্যা।	বর্গমাইলে জেলার আয়তন	কত বর্গমাইলে একটি পাঠশালা
বৰ্দ্ধমান	৫২৫	২৭০৫	৫·৮২
বীরভূম	৩১১	১৬৯৯	৫·৫
বাঁকুড়া	৩৭০	২৬২৫	৭·৫
মেদিনীপুর	৯৩৩	৫২৪৫	১১·৫
হুগলী	৩৭১	১১৮৮	৩·০
হাবড়া	৩৬৬	৫২২	১·৯
২৪-পরগণা	৯০৪	৫২৫৭	৭·৩
নদীয়া	৫১০	২৮০১	৬·২
মুর্শিদাবাদ	৪৫৬	২০৯১	৪·৯
যশোর	৫৫৭	২৯০২	৫·৩
খুলনা	৫৪২	৪৬৮৯	৮·৮
রাজশাহী	৪৭৬	২৬০৯	৫·৫
দিনাজপুর	৫৮৫	৩৯৪৮	৬·৯
জলপাইগুড়ী	৩২৭	২৯৩২	৯·০
দার্জিলিং	১০৬	১২১২	...
রংপুর	৮৬৫	৩৪৯৬	৪·০
বগুড়া	৩৬২	১৩৮৪	৩·৮
পাবনা	৪৮২	১৮১৮	৪·০
মালদহ	৩৫১	১৭৬৪	৫·২
ঢাকা	১১৪৪	২৭১৩	২·৫
মৈমনসিং	১৭১০	৬২৩৭	৩·৭
ফরিদপুর	৭৮৭	২৩৫৬	৩·০
বাখরগঞ্জ	৯৭৯	৩৫২৩	৩·৬
ত্রিপুরা	১০৩৬	২৫৯৭	২·৫
নোয়াখালি	৫৬৮	১৫১৮	২·৭
চট্টগ্রাম	৫৯৯	২৫৭০	৪·২
পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম	৭০	৫০০৭	...
মোট	১৬২৯৭	৭৭৫২১	

কোন্ জেলায় কত বর্গমাইলে একটি করিয়া পাঠশালা থাকিবে, তাহার ফর্দ্দ দেখিয়াই মনে হয়, অনেক জায়গায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে যাইতে ৩।৪ ও আসিতে ৩।৪ মাইল হাঁটিতে হইতে পারে—যেমন মেদিনীপুরে প্রায় প্রতি ১৪ বর্গ-মাইলে এক একটি পাঠশালা থাকিলে এবং পাটীগণিত অনুসারে ৩×৪=১২ বা ৩×৫=১৫ হইলে হাঁটিবার পথের অনুমান ঐ রকমই দাঁড়ায়। কিন্তু কর্তারা প্রত্যেক জেলার একটি একটি অংশের মধ্যস্থলে পাঠশালা খুলিবেন বুঝাইবার জন্য সেই অংশগুলি বৃত্তাকার হইলে তাহার ব্যাস কত এবং চৌকা হইলে তাহার মধ্যবিন্দু হইতে সীমা পর্য্যন্ত ন্যূনতম ও অধিকতম দূরত্ব কত তাহার তালিকা দিয়াছেন। বৃত্তাকার হইলে ব্যাস ১ হইতে ১½ মাইল হইবে, এবং চৌকা হইলে মধ্যবিন্দু হইতে সীমা পর্য্যন্ত ন্যূনতম দূরত্ব ১ হইতে ১¼ ও অধিকতম দূরত্ব ১·৪ হইতে ২·৭৬ মাইল হইতে পারে, তাঁহারা ধরিয়াছেন। কিন্তু যদি ৫ হইতে ১০ বৎসরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে কম করিয়া পাঠশালা যাইবার সময় এক মাইল ও সেখান হইতে বাড়ি আসিবার সময় এক মাইলও হাঁটিতে হয়, তাহা কেমন সুসাধ্য তাহা বঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের পথঘাটের অবস্থা যিনি জানেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। যাতায়াতে ২+২ চারি মাইল বা ২½+২½ পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম আরও কঠিন। মনে রাখিতে হইবে, অনেক পথ মেঠো, পার্ব্বত্য, জঙ্গলাকীর্ণ ; অনেক স্থলে নদী নালা খাল বিল আছে। এরূপ পথে এক মাইল পথও একা চলা শিশুদের পক্ষে দুঃসাধ্য এবং বিপজ্জনক। তাহারা সবাই সহচর চাকর কোথায় পাইবে, পিতা বা অন্য গুরুজনরাই বা দু-বেলা তাহাদের যাতায়াতের সঙ্গী কেমন করিয়া হইবেন ? কর্তারা জেলার প্রত্যেকটি অংশের মধ্যবিন্দু হইতে হাঁটিবার পথের দূরত্ব গণনা করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যবিন্দু বনজঙ্গলে, পাহাড়ের চূড়ায়, নদীগর্ভে বা জনহীন বিস্তৃত প্রান্তরে পড়িলে পাঠশালা কি সেখানে স্থাপিত হইবে ?

কর্তারা প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় তুলিয়া দিয়া সব পাঠশালায় সহশিক্ষা চালাইবেন বলিতেছেন। যে যে জেলায় আট নয় দশ বৎসরের বালিকার উপর অত্যাচার করায় বহু নরপিশাচ দণ্ডিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জেলাসমূহে বালিকারা একা এক মাইল গ্রাম্য পথও অতিক্রম নির্ভয়ে নিরাপদে কেমন করিয়া করিবে ?

বালিকা-পাঠশালালোপের প্রস্তাব

পাশ্চাত্য সব দেশে এবং জাপানে, যেখানে অবরোধ-প্রথা নাই, সেই সব স্ত্রীস্বাধীনতার দেশেও বালিকাদের জন্য আলাদা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে (অবশ্য সহশিক্ষাও আছে), আর আমাদের এই অবরোধ-প্রথার দেশে কর্তারা প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয় উঠাইয়া দিতে চাহিতেছেন ! আমরা

অবরোধপ্রথার পক্ষপাতী কিংবা সহশিক্ষার বিরোধী নহি। কিন্তু সহশিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বালিকাদের জন্য পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই-ই থাকা উচিত ও একান্ত আবশ্যক।

পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে দেখিতে পাই, বিদ্যালয়ে শিক্ষাধীন বালিকাদের মোট সংখ্যা ৫৫৪৪৯৮-এর মধ্যে ৯৪৬৮৩ জন বালকবিদ্যালয়ে পড়িত। ইহা হইতে সব বা অধিকাংশ বালিকার বালকবিদ্যালয় বা মিশ্রিত বালকবালিকাবিদ্যালয়ে পড়িবার সম্ভাবনা অসম্ভাবনা ঠিক্ অনুমিত হইতে পারিবে।

সাধারণ পাঠশালা ও মক্তব

সরকারী মন্তব্যে প্রথমে বলা হইয়াছে, যে, আর সাধারণ পাঠশালা ও মক্তব দু-রকম প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে না, সবগুলিকে একশ্রেণীভুক্ত ও সাধারণ পাঠশালা করা হইবে। ইহা পড়িয়া ভাবিতেছিলাম, সরকারের এরূপ অসাম্প্রদায়িক সুবুদ্ধি কি প্রকারে হইল। তাহার পর কতক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িলাম :—

In schools where a majority of the pupils are Moslem the title of Maktab, traditionally attached to Islamic primary schools, might be given, while in the larger centres of population, where some of the foregoing arguments have less force, it may be found of advantage to have separate schools for girls and for Moslem pupils.

তাৎপর্য্য। যে-সব বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী মুসলমান, তথায় সেগুলিকে ইস্লামীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিরাগত মক্তব নাম দেওয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি।

তাই বলুন! পল্লী-অঞ্চলে যে-যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী সেখানে কেবল মক্তবই থাকিবে এবং হিন্দু ছেলে-মেয়েরা তাহাতেই পড়িতে বাধ্য হইবে, তাহাদের জন্য সাধারণ পাঠশালা থাকিবে না। আবার বড় বড় জনাকীর্ণ জায়গাতেও মুসলমানদের জন্য মক্তব থাকিবে। অর্থাৎ মুসলমানদের সুবিধা ও মনোভাব গ্রামে ও শহরে সর্ব্বত্র বিবেচিত হইবে। হিন্দুদিগকে পুছিবার কি আবশ্যক!

—

মধ্যইংরেজী বিদ্যালয় লোপের প্রস্তাব

মন্তব্যের আর একটি প্রস্তাব এই, যে, মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়গুলি আর থাকিবে না। তাহার জায়গায় মধ্যবাংলা বিদ্যালয় থাকিবে। ইংরেজীর উপর শিক্ষাবিভাগের বড় বিরাগ। অথচ ইহা ইংরেজের শিক্ষাবিভাগ!

বলা বাহুল্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়েও কর্ত্তারা ইংরেজী পড়িতে ও পড়াইতে দিবেন না।

—

গ্রামানুরাগ বর্দ্ধনের ওজুহাত

এই সমস্ত করিবার প্রস্তাব নাকি হইতেছে লোকদের মধ্যে বাল্যকাল হইতে গ্রামানুরাগ বাড়াইয়া গ্রামের লোকদিগকে গ্রামেই রাখিবার চেষ্টায়। আমরাও গ্রাম উজাড় করিবার বা হইবার বিরোধী। কিন্তু গ্রামের লোকদিগকে গ্রাম্য রাখিয়া, তাহাদিগকে বাহিরের জগতের সব খবর প্রভাব ও সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিয়া গ্রামগুলিকে জনাকীর্ণ রাখিতে চাই না। সেগুলি সম্পূর্ণ নবীভূত পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, জাগতিক হাওয়া সেখানে বহাইতে হইবে—সেগুলিকে সংস্কৃতির দ্বারা উন্নত লোকদের বাসযোগ্য করিতে হইবে। একটা কোন পাশ্চাত্য ভাষা না শিখিলে আমরা বাংলার বাহিরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে পারি না, এবং তাহা না-রাখিলে গ্রামসকলের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। সুতরাং ইংরেজী জানা চাই-ই।

তা ছাড়া, একটা দেশের শিক্ষাপদ্ধতি এমন হওয়া চাই, যে, ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিক মধ্য উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের এক-একটার শেষে থামিতে পারে, বা উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষালয়ে যাইতে পারে। ইংরেজী বাদ দিলে তাহারা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়েই থামিতে বাধ্য হইবে। বঙ্গের অধিকাংশ লোক পল্লীগ্রামে বাস করে। গবন্মেণ্ট কি চান, এই গ্রাম্য লোকদের সবাই বা অধিকাংশ উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আশা ত্যাগ করুক? এ বড় চমৎকার বাসনা!

আর, ইংরেজী শিখান বন্ধ করিলেই যে লোকে গ্রামে থাকিবে, শহরে আসিবে না, এ বড় অদ্ভুত যুক্তি। এই কলিকাতা শহরে যে বহু লক্ষ হিন্দুস্থানী, বিহারী, নেপালী, ভুটিয়া, পাহাড়ী, ওড়িয়া প্রভৃতি শ্রমিক ও ভৃত্য আছে, তাহারা কি ইংরেজী অধ্যয়নরূপ দুষ্কর্ম্মের শাস্তিস্বরূপ কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইয়াছে?

—

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসব

গত ৩০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসব হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার জন্য যে নূতন দুটি গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অন্য পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

—

চা

চায়ের গুণ দোষ সম্বন্ধে এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার নূতন (চতুর্দ্দশ) সংস্করণে "টী" প্রবন্ধে কিছুই লেখা নাই! একাদশ সংস্করণে আছে :—

"*Effect on Health.*—The effect of the use of tea upon health has been much discussed. In the days when China green teas were more used than now, the risks to a professional tea-taster were serious, because of the objectionable facing materials so often used. In the modern days of machine-made black tea, produced under British supervision, both the tea-taster and the ordinary consumer have to deal with a product, which, if carefully converted into a beverage and used in moderation. should be harmless to all normal human beings."

ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, অনেকগুলি সর্ত্ত পূর্ণ হইলে তবে চা "নর্ম্যাল" অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রকারের মানুষের পক্ষে অ-ক্ষতিকর হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক উক্ত প্রকারে চা প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে পারে কি না এবং "নর্ম্যাল" কিনা, তাহা বিচার্য্য।

চেম্বার্সের এন্সাইক্লোপীডিয়াতে আছে:—

"*Chemistry.*—As a beverage the refreshing qualities of tea are well known. It exhilarates the system, dispels fatigue and sleepiness, and stimulates the mental powers. These properties are generally believed to be due chiefly to the active principle therein. Tea is also held to be rich in the water-soluble vitamin B. As a beverage it is in great favour with weak and old persons, also among the poor, who find that by using tea they consume less solid food.* But if tea is used to excess it produces flatulent indigestion, increased pulsations of the heart, and nervousness; the imagination is excited and sleeplessness follows. These conditions cause a certain degree of fatigue, which induces the patient to have recourse to tea again to brace up the system, as drunkards resort to spirits in the morning for a similar purpose."

"Tannin precipitates both albumen and peptone, and in this way doubtless hinders digestion. It also stops secretion from the mucous membrane, and so retards the pouring out of the digestive products."

"When tea is allowed to stand five minutes before pouring off the infusion, which is the time allowed by tea-tasters, probably only one-fifth the tannin is extracted. But when allowed to stew a long time, as is too often the case in poor households, a much larger percentage of tannin is extracted."

—

পাটের কথা

পাটের চাষ আমাদের দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে আমরা পাটের চাষ, গাঁট-বাঁধা, রপ্তানি ও মিলের যে বিস্তার দেখিতে পাই, তাহা পাশ্চাত্য অন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিরাট কারখানার যুগের অঙ্গ রূপেই গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে পাটের চাষ, সুতাকাটা বা বয়ন কুটীরশিল্প হিসাবেই বাংলায় চলিত, এবং এই ব্যবসায়ের লাভলোকসানের উপর লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা, বা ধন ঐশ্বর্য্য নির্ভর করিত না। কিন্তু অন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের শহরে শহরে কেন্দ্রীভূত বহু বিপুল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল ও লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী চাষ আবাদ ছাড়িয়া কারখানার কার্য্য সুরু করিল। এই সকল লোক আপনাদের স্বদেশজাত খাদ্যদ্রব্য ও মোটা মালের উপর নির্ভর করিয়া আর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইল না। দূর দেশ হইতে আমদানি খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য ব্যতীত ইহাদের চলিল না। ফলে যেমন পাশ্চাত্যের কারখানা-প্রস্তুত মাল দুনিয়ার বাজার ছাইয়া ফেলিল, তেমনি শত শত জাহাজ ক্রমাগত সমুদ্র পার হইয়া এই সকল লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও কারখানার কাঁচা মাল সরবরাহ করিতে লাগিল। এই যে বিরাট অন্তর্জাতিক বিনিময়, ইহার মালপত্র উপযুক্তরূপে গাঁট বাঁধিবার বা বস্তাবন্দি করিবার জন্য চট ও থলির চাহিদা অসম্ভব বাড়িয়া গেল। তদুপরি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর গুলিগোলা হইতে আত্মরক্ষার জন্যও অসংখ্য বালি ও মাটি ভর্ত্তি চটের থলির আবশ্যক হইতে লাগিল। সমুদয় খরিদ্দারমণ্ডলীর চাহিদায় বাংলার চাষা সব ছাড়িয়া পাট ধরিল এবং পাটের ব্যবসা ও চটকলে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আত্মনিয়োগ করিল। এই গেল এক অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, মহাযুদ্ধের অবসানে, প্রথমত খুব খানিকটা কেনা-বেচা হইয়া দুনিয়ার ব্যবসায়ে মন্দা পড়িল। কারণ সকল দেশের মুদ্রার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়া, পরস্পরের উপর বিশ্বাস হারান ও ধারের লেন-দেন বন্ধ হওয়া ও সকল দেশের স্বদেশীশিল্প-সংরক্ষণবাদ ও তজ্জাত বিদেশী বর্জ্জন। নিজের দেশের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেরাই উৎপাদন করিবার চেষ্টা এবং ভিন্ন দেশের মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ বশতঃ অন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভাঁটা পড়িল। ইহার ফলে জগদ্ব্যাপী বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইল, ও তাহার ফলে ক্রয়-বিক্রয় আরও কমিয়া গেল। চট ও থলির চাহিদা কমিয়া কমিয়া পাটের ব্যবসা অচল হইতে বসিল। ইংরেজ বণিক সস্তায় পাট বেচিতে সুরু করিল। তাহাতে অপরাপর দেশের চট ও থলির খরিদ্দাররা ভাবিল, সস্তায় পাট কিনিয়া নিজের দেশেই কল বসাইয়া চট ও থলি প্রস্তুত করা যাক। শীঘ্রই জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চটের কাজ সুরু হইল। ইংরেজ কারখানাওয়ালা কলিকাতায় ও ডাণ্ডিতে প্রমাদ গণিল। পাটের দাম বাড়াইলে বিক্রয় হয় না বা মাড়োয়ারী কিংবা ভাটিয়ারা দুনিয়ার বাজারে সস্তায় পাট বেচিয়া বাজার মন্দা করে। দর কমাইলে নিজেদের কারখানার মাল বিক্রয় হয় না, অপরে স্বদেশে কারখানা স্থাপন করিয়া চট তৈয়ার করে। উভয়সঙ্কট! একমাত্র উপায় এমন কিছু করা যাহাতে সত্য সত্যই পাটের দাম চড়িয়া বিদেশীর কারখানা অচল হয় এবং কলিকাতা ও ডাণ্ডির কারখানা পুরাদমে চলে। এর উপায় কি? এ বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বে দেখা যাক পাট ও চটের রপ্তানি কি প্রকার হয়।

* ইহা ক্ষুধামান্দ্য উৎপাদনের পরিচায়ক।

বৎসর	পাট	চট	চট শতকরা
	(হাজার টন হিসাবে)		কত ভাগ
১৯২১-২২	৪৬৭	৬৪১	৫৮
,, ২২-২৩	৫৭৮	৬৭২	৫৪
,, ২৩-২৪	৬৬০	৭৪৭	৫৩
,, ২৪-২৫	৬৯৬	৮১২	৫৪
,, ২৫-২৬	৬৪৭	৮১১	৫৬
,, ২৬-২৭	৭০৮	৮৬০	৫৫
,, ২৭-২৮	৮৯২	৮৮৫	৫০
২৮-২৯	৮৯৮	৯১১	৫০
,, ২৯-৩০	৮০৭	৯৫৮	৫৫
,, ৩০-৩১	৬২০	৭৬৬	৫৫
,, ৩১-৩২	৫৮৭	৬৬৩	৫৩
,, ৩২-৩৩	৫৬৩	৬৮০	৫৫
,, ৩৩-৩৪	৭৪৮	৬৭২	৫৭

(মডার্ণ রিভিউ, আগষ্ট ১৯৩৫)

দেখা যাইতেছে যে পাটের রপ্তানি বাড়িয়া কমিল এবং পুনরায় (বিদেশের নূতন স্থাপিত কারখানার চাহিদায়) বাড়িল। চট কিন্তু পড়িয়া আর উঠিল না। রপ্তানি কোন্ দেশে কত হয় দেখিলেই ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার বুঝা যাইবে। পাট কোথায় কত যায় দেখা যাক।

দেশের নাম	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
	(টন হিসাবে)	
	ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে	
ব্রিটেন	১২৯৫১১	১৭৭৩৮২
হংকং	৩৪৪৪	৩৪৫৪
অষ্ট্রেলিয়া	১৪৪২	৮৪০
ব্রিটিশ মোট	১৩৪৪০৮	১৮১৬৭৬
	অপর দেশে	
জার্ম্মেনী	১২১৭১০	১৭৪৯২০
ইটালী	৩৭৪৬৫	৬৫০৭৬
আমেরিকা	৩৫৯৪৯	৫১৭০১
ফ্রান্স	৬৮৯১৪	৮৩৬৬৬
ব্রেজিল	১৩২৮৭	১৯০৩৩
জাপান	১৪৪৯২	১৭৩৪৫
বেলজিয়াম	৪০৬৭৮	৫১২১৮
হল্যাণ্ড	২১৯৭৪	২৭৬৮০
মিশর	৫৪০১	৮৮৯৮
সুইডেন	৩১৮০	৫৩৯০
চীন	৬৭৮৭	৭০৬৩
আর্জেণ্টাইন	৭১৪১	৮৫১১
গ্রীস	১৫৯৫	১৭০৫
মেক্সিকো	১৩৪	২৮৫
স্পেন	৪২৩১১	৩৫৬২৫
পর্টুগাল	২৭৩৫	১০২৭
	৪২৩৭৫৬	৫৫৯১৪৩

(মডার্ণ রিভিউ, আগষ্ট ১৯৩৫)

সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে উপরিউক্ত হিসাব অনুযায়ী ৪৭২৬৮ টন পাট অধিক রপ্তানি হইল এবং অপরাপর দেশে হইল ১৩৫৩৯০ টন অধিক। একা জার্ম্মেনীই ৫৩২১০ টন অধিক ক্রয় করিয়াছে। অপরাপর দেশ যদি আমাদের সস্তার পাট এইরূপে কিনিয়া কারখানা চালাইতে থাকে তাহা হইলে অচিরাৎ যে তাহারা নিজেদের কারখানার চটই আমাদের বেচিয়া ডাণ্ডি ও কলিকাতার সর্ব্বনাশ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? অতএব পাটচাষ কমাইয়া ইংরেজদের নিজেদের কারখানা বাঁচান উচিত নহে কি?

কিন্তু চাষীর ইহাতে কি লাভ? গাঁটের পাট ও চটের দরের সহিত কাঁচা পাটের দর মিলাইয়া হয়ত দেখা যাইবে, যদিও গাঁটের পাট ১৯১৯ সাল হইতে ১৯৩০ অবধি ৩০০৲ হইতে ৫৮৬৲ টন দরে বিক্রয় হইয়াছে ও চটের দর হইয়াছে ৪৬৫৲ হইতে ৭৬৮ টাকা—কাঁচা পাটের দর ১৩৪৲ হইতে ২৮৪৲ টাকার উপরে যায় নাই। অর্থাৎ বণিক যতই লাভে মাল বেচুক বা যতই লোকসান দিক, চাষীর যায়-আসে না। সুতরাং যদি কোন স্থানে পাটের পরিবর্ত্তে অপর, সমান বা অধিক লাভের, কোন ফসল না বোনা যায়, তাহা হইলে সে স্থলে পাটচাষ কমানর কোন অর্থ হয় না। নানা দেশে চটকল ও পাটের চাহিদা বাড়িলে শেষ অবধি চাষীর লাভ—বণিক ও কারখানাওয়ালার যাহাই হউক। এই সকল কারণে মনে হয় যে, যদিও কারখানাওয়ালা বা বণিককে সাহায্য করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পাপচেষ্টা নহে, তবুও সে সাহায্য চাষীর খরচে বা তাহার ক্ষতি করিয়া যাহাতে না হয় তাহা করা প্রয়োজন।

আর একটি কথা। শুনা যায় যে পাটের চাষ কমান-না-কমান চাষীর স্বেচ্ছানুযায়ী হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ঠিক করিয়াছেন। তাহা হইলে যে শুনা যায় বিক্রমপুরে ও চাঁদপুরে ১৩ জন ও ১৪ জন চাষীর উপর এই সম্পর্কে সমন জারী হইয়াছে, সে কথা কি মিথ্যা? অ.

—

কাগজের উপর আমদানি-শুল্ক

আমদানি মালের উপর রাষ্ট্রের তরফ হইতে যে শুল্ক বসান হয়, তাহার প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম,

পরোক্ষভাবে রাজস্ব আদায়, ও দ্বিতীয়, স্বদেশে প্রস্তুত মালের সহিত প্রতিযোগিতায় যাহাতে বিদেশের মাল অল্প মূল্যে বিক্রী না হইতে পারে তাহার চেষ্টা অর্থাৎ দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ। শুল্ক কত দূর অবধি রাজস্বের জন্য এবং কোথায় শুল্কবৃদ্ধির ফলে সংরক্ষণ-কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহা হঠাৎ বলা চলে না। অবশ্য শুল্ক অধিক হারে বসান সত্ত্বেও যদি বিদেশী মাল দেশে আমদানি হইতে থাকে তাহা হইলে সংরক্ষণ-কার্য্য সুসাধিত হইতেছে না বুঝা যায় এবং শুল্কলব্ধ অর্থকে রাজস্ব হিসাবেই ধরা উচিত। সংরক্ষণমূলক শুল্ক বসাইলে তাহা হইতে রাজস্ব অধিক আসা উচিত নহে; কারণ রাজস্ব অধিক হওয়ার মানে, যে বিদেশী জিনিষের উপর শুল্ক বসান হইয়াছে সেই মাল বেশী পরিমাণে দেশে প্রবেশ করিতেছে ও বিক্রী হইতেছে।

কাগজের উপর যে শুল্ক আছে তাহা সংরক্ষণের দোহাই দিয়া উচ্চ হারেই আছে। সুতরাং এ কথা অবশ্যমান্য যে ভারতে যে সকল রকমের কাগজ এখনও প্রস্তুত হয় না এবং যেগুলি অদূর ভবিষ্যতে প্রস্তুত হইবে বলিয়া বোধ হয় না, সেই সকল রকমের কাগজের উপর শুল্ক ততটুকুই রাখা উচিত যতটুকু শুধু রাজস্ব বাবদ ক্রেতার নিকট আদায় করা ন্যায়সঙ্গত। খবরের কাগজের কাগজ, অর্থাৎ যেমন প্রবাসীর বিজ্ঞাপনে যে-জাতীয় কাগজ ব্যবহৃত হয় এবং তার চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর কাগজ, এ দেশে প্রস্তুত হয় না। অধিক মূল্যের ছবি ছাপিবার কাগজ, মলাটের বহুবিধ কাগজ ইত্যাদি নানা প্রকার কাগজ এ দেশে প্রস্তুত হয় না। যে-ক্ষেত্রে কাগজের মূল্যের উপর পুস্তকাদি পাঠের ব্যয় বহু পরিমাণে নির্ভর করে, সে-ক্ষেত্রে, রাজস্বের কিছু ক্ষতি হইলেও, জ্ঞানবিস্তারের জন্য কাগজের উপর শুল্ক কমান উচিত। ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ লাভ অনেক সময় পরোক্ষ ভাবে জাতীয় লোকসানে দাঁড়াইয়া যায়। রাজস্ব এরূপ ভাবে কদাপি সংগ্রহ করা উচিত নয়, যাহাতে জাতীয় উন্নতি কোন প্রকারেও বাধা পায়।

আমাদের দেশে যে-সকল কাগজের কারখানা আছে তাহাদের অবস্থা বেশ ভাল। বিদেশী মাল শুল্কবর্জ্জিত ভাবে বা অল্প শুল্ক দিয়া আমদানি হইলে ইহারা নিজেদের তৈয়ারী কাগজের দাম কিছু কমাইতে বাধ্য হইবে। ইহাদের চালনা-কার্য্য যদি কিছু পরিমাণ ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া করা হয়, এবং এই সকল কারবারের অংশীদারগণ যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে আরও অল্প মূল্যে কাগজ বেচিয়াও এই সব কারখানা সচ্ছলতার সহিত চলিতে থাকিবে। যেখানে দেশের গরিব ক্রেতা পুস্তকাদি অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে, সেখানে সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয়ে অধিক লাভ অথবা অধিক ব্যয় করিবার কাহারও কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া কাগজের রকমারী শুল্কের হ্রাস-বৃদ্ধির আলোচনা হওয়া উচিত। ধনিক বণিক ও জনসাধারণ তিনের মধ্যে জনসাধারণের মঙ্গল সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হওয়া উচিত। অ.

স্থাপত্য বিদ্যালয়

প্রাচীন কালে ভারতীয় স্থাপত্য ভারতের গৌরবের বস্তু ছিল। এখনও আমাদের দেশের পুরাতন মন্দির, মসজিদ, রাজপ্রাসাদ, কেল্লা, কবর প্রভৃতির ভিতর অসাধারণ স্থাপত্য-কৌশলের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তাজমহল, কোনারক, শ্রীরঙ্গম, দিলওয়ারা আজকাল আর নির্ম্মিত হয় না। কারণ ভারত স্বাধীনতা হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শিল্পগৌরবও হারাইয়া বসিয়াছিল। বিগত প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে যে সকল ইমারত গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রায় সবগুলিই নিকৃষ্ট পাশ্চাত্য ধরণের, শিল্পের দিক দিয়া মিশ্রিত- বা অজ্ঞাত- জাতীয়। কারণ, ভারতে ইউরোপীয় প্রভাব বিস্তারের প্রথম শতাধিক বৎসর, ইউরোপের কোন উঁচু দরের স্থপতি এদেশে আসিয়া কার্য্য করেন নাই। ইংলণ্ডের অতি সাধারণ লোকেরাই আসিয়া এদেশে পাশ্চাত্য শিল্প, বিজ্ঞান, প্রভৃতির ব্যবহার ও চর্চ্চা প্রচার আরম্ভ করেন। শিল্পে আবার ইংলণ্ড ইউরোপে উচ্চ স্থান পায় না। ফলে এ দেশে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের ভাল রকম কিছু নমুনা গড়িয়া উঠে নাই। এ অবস্থায় আমাদের নিজেদের শিল্প অনাদরে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ইংরেজ শিক্ষকও না পাওয়ায়, ভারতীয় সদ্যোজাত "কনট্রাক্টর"গণ নানা রীতির স্থাপত্যশিল্পের অবাধ মিশ্রণে যে সকল সর্ব্বরূপগুণবর্জ্জিত প্রাসাদ অট্টালিকা ইত্যাদিতে ভারতের নগরগুলি পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন, তাহাদের যথার্থ কদর্য্যতা আমরা মাত্র কিছুদিন হইল সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। কারণ বর্ত্তমান শতাব্দীতে ভারতের ঐতিহাসিকগণ আবার নিজেদের নষ্ট শিল্পের গুণাগুণ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারত নূতন করিয়া নিজের শিল্পকলা-সাহিত্য প্রভৃতিতে গৌরব অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজপ্রণোদিত মেকি-পাশ্চাত্য চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে আরম্ভ করিয়াছে।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যে-সকল লোক ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অল্পদিন হইল স্থাপত্য বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি সভায় শ্রীশ বাবু বলেন, যে, বিদ্যালয়ে শুধু যে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা নহে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্থাপত্যের নক্সা তৈয়ার করিয়া দেওয়া এবং নির্ম্মাণ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা প্রভৃতি কার্য্যও গ্রহণ করিবেন। তাহা

ব্যতীত, কংক্রীটে ঢালাই গৃহনির্ম্মাণের অলঙ্কার প্রভৃতিও সরবরাহ করিবেন। শ্রীশবাবু আরও বলেন যে ভারতীয় স্থাপত্যে নানা রীতির মিশ্রণ এবং ইউরোপের নিকৃষ্ট অনুকরণ বন্ধ করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও ইচ্ছা জাগিয়াছে। ইহা করিতে হইলে, রাজমিস্ত্রী, ছুতার মিস্ত্রী, ভাস্কর, চিত্রকর, প্রভৃতি সকল লোককেই ভারতীয় বহু শিল্প নূতন করিয়া শিখিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, শুধু শিক্ষিত যুবকদের কিছু কিছু মূলসূত্র শিখাইয়া ছাড়িয়া দিলেই এ কার্য্য সুসাধিত হইবে না। সর্ব্বত্র যাহাতে ভারতীয় শিল্পনীতি কার্য্যক্ষেত্রে বজায় থাকে তাহার জন্য শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল কারিগরের মধ্যেই এই নূতন অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে হইবে। উপরওয়ালাদের সহানুভূতিও আকর্ষণ করিতে হইবে। এবং দেশের সকল লোকের মধ্যেও শিল্পে স্বাদেশিকতা জাগ্রত করিতে হইবে। এই কার্য্য শুধু স্থাপত্যের দিক দিয়া করিলেই হইবে না, কারণ এ জাগরণ সর্ব্বক্ষেত্রে না হইলে পূর্ণ হইবে না। সুতরাং এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, জাতীয় শিক্ষার কার্য্য, রাষ্ট্রের কার্য্য, অর্থনৈতিক কার্য্য যে-সকল লোকের উপর ন্যস্ত আছে, সকলের মধ্যেই ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করিতে হইবে। ভারতীয় চিত্রকলা আজ বহু বৎসর শেখান হইতেছে, তবুও দেশের লোক বিদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ দেখাইতেছেন। ব্যবসাদার-দিগের ক্যালেণ্ডার, বিজ্ঞাপন, নক্সার পছন্দ প্রভৃতি দেখিলেই একথা বুঝা যায়।

প্রথমেই কিন্তু ভারতীয় স্থাপত্য কি তাহা বুঝা চাই। তজ্জন্য প্রাচীন বাস্তুশিল্পের জ্ঞান চাই। তাহা বিশেষ করিয়া প্রাচীন "মানসার" গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। অ

ইংলণ্ডে দরিদ্রের জন্য গৃহনির্ম্মাণ

ইংরেজদের শাসিত ভারতবর্ষে দুই শত বৎসর ধরিয়া "সভ্যতার" ও "আধুনিকতার" বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা, নিবাসস্থান, চিকিৎসা, রাস্তাঘাট, চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে এ দেশের লোকের অবস্থা ইউরোপের দরিদ্রতম দেশের তুলনায় সবিশেষ নিকৃষ্ট। ইংলণ্ডের তুলনায় যে কি, তাহা ঠিক ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। ইংলণ্ডে লোকে বেকার অবস্থায় গবর্ন্মেণ্টের খরচে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, বিনা খরচায় শিক্ষালাভ করে, সুচিকিৎসা পায়। ইংলণ্ডের প্রত্যেক অলি-গলি সুনির্ম্মিত এবং ইংলণ্ডের লোকে ডাকাত কাহাকে বলে তাহা প্রায় জানেই না এবং চোরের উৎপাত সে-দেশে থাকিলেও অল্প আছে। আমাদের সকল দুর্দ্দশার কারণ যে ইংলণ্ড এ কথা আমরা বলিতে পারি না; কারণ আমরা নিজেও, আমাদের ইতিহাসের ধারাও কতকটা। সংবাদপত্রে দেখা গেল, যে, লণ্ডনের দরিদ্র লোকদের বাসস্থানগুলিকে, যাহাকে "স্লাম" বলে, ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়া আরও অধিক স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর করিয়া তুলিতেছেন। ইহার জন্য লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল (অর্থাৎ লণ্ডনের জেলা-বোর্ড) সাত দফায় দশ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করিয়া ৬০০০ হাজার লোকের থাকিবার সুব্যবস্থা করিতেছেন। অর্থাৎ জনা-পিছু প্রায় আড়াই হাজার টাকা খরচ করিয়া এই কার্য্য হইতেছে। এই খবর পাঠ করিয়া মনে হয় যে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট কত অল্পে কোন বিষয়ের সুব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া মানিয়া লন। ইহা এ দেশের জল-হাওয়ার দোষ, অথবা আমাদেরই পক্ষে অল্প কিছুই যথেষ্ট এই বিশ্বাসের ফল, তাহা কে বলিবে? ভারত-গবর্ন্মেণ্ট পরোক্ষ ভাবে জনসাধারণের হিতকর বিভিন্ন কার্য্যে যে অর্থব্যয় করেন না, তাহা নহে। সামরিক রেলরাস্তা, অন্যান্য রাস্তাঘাট, পি ডব্লিউ. ডি.র শত শত বহুমূল্য অট্টালিকা, রাজকর্ম্মচারী পুলিস সেনাদল প্রভৃতির বাসস্থান ইত্যাদিতে গবর্ন্মেণ্ট শত শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন ও এখনও ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু শিক্ষা, চিকিৎসা, দরিদ্রের বাসস্থান, গ্রাম্য অসামরিক রাস্তাঘাট প্রভৃতিতে এরূপ ব্যয় করিবার "সামর্থ্য" গবর্ন্মেণ্টের নাই। শুনা যায় যে টাকায় কুলায় না। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট রাজস্ব বন্ধক রাখিয়া যে টাকা ধার করেন অর্থাৎ যে ধারের সুদ ও আসল রাজস্ব হইতে দেওয়া হয় বা হইবে, তাহার পরিমাণ বহু শত কোটি টাকা। ইংরেজ নিজে যে খরচ প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহার জন্য অর্থসংগ্রহে বরাবরই বিশেষ পারগ। তবে এ দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-কল্পে যে খরচ অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহার জন্য অর্থ জোটে না কেন? সভ্যতা ও আধুনিকতার প্রেরণা ইংরেজরাজ সম্ভবতঃ ইংলণ্ড হইতেই আহরণ করেন। সে প্রেরণা জাহাজে আসিতে আসিতে এরূপ পরিবর্ত্তিতরূপে কেন ভারতে উপস্থিত হয়? ইংরেজের নিকট লোকে ইংরেজী আদর্শই আশা করে। কিন্তু ইংলণ্ডীয় ধরণে শাসনকার্য্য এ দেশে হয় কি? ধরা যাউক, আমরা খুবই অপদার্থ, কিন্তু তাহাতে গ্রামে রাস্তা-গঠন, বিনামূল্যে চিকিৎসা, বড় বড় সরকারী দরিদ্রনিবাস, স্কুলস্থাপন প্রভৃতি সম্পাদন এমন কি ঋণ করিয়া করিতে কি বাধা? ইংরেজের ইংরেজী আদর্শ ও সুনাম রক্ষার জন্য এ সকল ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অ.

বিজ্ঞাপন-দাতাদের প্রতি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসী ২১শে ভাদ্র এবং কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসী ৬ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে আশ্বিন মাসের, এবং ১লা আশ্বিনের মধ্যে কার্ত্তিক মাসের বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি প্রবাসী-কার্য্যালয়ে পৌঁছান আবশ্যক।

কর্ম্মকর্ত্তা—প্রবাসী

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৪২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মিলন-যাত্রা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চন্দন-ধূপের গন্ধ ঠাকুর-দালান হ'তে আসে।
শান-বাঁধা আঙিনার একপাশে
শিউলির তল
আচ্ছন্ন হতেছে অবিরল
ফুলের সর্ব্বস্ব নিবেদনে।
গৃহিণীর মৃতদেহ বাহির প্রাঙ্গণে
আনিয়াছে বহি';
বিলাপের গুঞ্জরণ স্ফীত হয়ে উঠে রহি' রহি'।
শরতের সোনালি প্রভাতে
যে আলো ছায়াতে
খচিত হয়েছে ফুলবন
মৃতদেহ আবরণ
আশ্বিনের সেই ছায়া আলো
অসঙ্কোচে সহজে সাজালো।।

জয়লক্ষ্মী এ ঘরের বিধবা ঘরণী
আসন্ন মরণকালে দুহিতারে কহিলেন, "মণি,
আগুনের সিংহদ্বারে চলেছি যে দেশে
যাব সেথা মিলনের বেশে।
আমারে পরায়ে দিয়ো লাল চেলিখানি,
সীমন্তে সিঁদুর দিয়ো টানি'।"

যে উজ্জ্বল সাজে
এক দিন নববধূ এসেছিল এ গৃহের মাঝে,
পার হয়েছিল এ দুয়ার,
উত্তীর্ণ হ'ল সে আরবার
সেই দ্বার সেই বেশে
ষাট বৎসরের শেষে।
এই দ্বার দিয়ে আর কভু
এ সংসারে ফিরিবে না সংসারের একচ্ছত্র প্রভু।
অক্ষুণ্ণ শাসনদণ্ড স্রস্ত হ'ল তার,
ধনে জনে আছিল যে অবারিত অধিকার
আজি তার অর্থ কী যে।
যে আসনে বসিত সে তারো চেয়ে মিথ্যা হ'ল নিজে।
প্রিয়-মিলনের মনোরথে
পরলোক-অভিসার-পথে
রমণীর এই চিরপ্রস্থানের ক্ষণে
পড়িছে আরেক দিন মনে॥

আশ্বিনের শেষভাগে চলেছে পূজার আয়োজন;
দাসদাসী-কলকণ্ঠ-মুখরিত এ ভবন
উৎসবের উচ্ছল জোয়ারে
ক্ষুব্ধ চারি ধারে।
এ বাড়ির ছোটো ছেলে অনুকূল পড়ে এম্-এ ক্লাসে,
এসেছে পূজার অবকাশে।

শোভনদর্শন যুবা, সব চেয়ে প্রিয় জননীর,
বউ-দিদিমণ্ডলীর
প্রশ্রয়-ভাজন।
পূজার উদ্যোগে মেশে তারো লাগি' পূজার সাজন ॥

একদা বাড়ির কর্ত্তা স্নেহভরে
পিতৃমাতৃহীন মেয়ে প্রমিতারে এনেছিল ঘরে
বন্ধুঘর হ'তে ; ছিল তখন বয়স তার ছয়,
এ বাড়িতে পেল সে আশ্রয়
আত্মীয়ের মতো।
অনুদাদা কত দিন তারে কত
কাঁদায়েছে অত্যাচারে।
বালক রাজারে
যত সে জোগাত অর্ঘ্য ততই দৌরাত্ম্য যেত বেড়ে ;
সদা-বাঁধা খোঁপাখানি নেড়ে
হঠাৎ এলায়ে দিত চুল
অনুকূল ;
চুরি ক'রে খাতা খুলে'
পেন্সিলের দাগ দিয়ে লজ্জা দিত বানানের ভুলে।
গৃহিণী হাসিত দেখি দু-জনের এ ছেলেমানুষি,
কভু রাগ কভু খুশি,
কভু ঘোর অভিমানে পরস্পর এড়াইয়া চলা
দীর্ঘকাল বন্ধ কথা-বলা ॥

বহুদিন গেল তার পর
প্রমির বয়স আজ আঠারো বছর।
হেনকালে একদা প্রভাতে
গৃহিণীর হাতে
চুপি চুপি ভৃত্য দিল আনি'
রঙীন কাগজে লেখা পত্র একখানি।
অনুকূল লিখেছিল প্রমিতারে
বিবাহ-প্রস্তাব করি' তারে।

বলেছিল, "মায়ের সম্মতি
অসম্ভব অতি।
জাতের অমিল নিয়ে এ সংসারে
ঠেকিবে আচারে।
কথা যদি দাও, প্রমি, চুপি চুপি তবে
মোদের মিলন হবে
আইনের বলে ॥"

দুর্বিষহ ক্রোধানলে
জয়লক্ষ্মী তীব্র উঠে দহি'।
দেওয়ানকে দিল কহি'
"এ মুহূর্ত্তে প্রমিতারে
দূর করি' দাও একেবারে।"
ছুটিয়া মাতারে এসে বলে অনুকূল,
"করিয়ো না ভুল;
অপরাধ নাই প্রমিতার,
সম্মতি পাই নি আজো তার।
কর্ত্রী তুমি এ সংসারে,
তাই ব'লে অবিচারে
নিরাশ্রয় করি দিবে অনাথারে হেন অধিকার
নাই, নাই, নাইকো তোমার।
এই ঘরে ঠাঁই দিল পিতা ওরে,
তারি জোরে
হেথা ওর স্থান
তোমারি সমান।
বিনা অপরাধে
কী স্বত্বে তাড়াবে ওরে মিথ্যা পরিবাদে ॥"

ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের বহ্নি দিল মাতৃমন ছেয়ে,
"এইটুকু মেয়ে
আমার সোনার ছেলে পর করে,
আগুন লাগিয়ে দেয় কচি হাতে এ প্রাচীন ঘরে!

অপরাধ! অনুকূল ওরে ভালোবাসে এই ঢের,
সীমা নেই এ অপরাধের।
যত তর্ক করো তুমি, যে যুক্তি দাও না
ইহার পাওনা
ওই মেয়েটাকে হবে মেটাতে সত্বর।
আমারি এ ঘর,
আমারি এ ধনজন,
আমারি শাসন,
আর কারো নয়
আজই আমি দিব তার পরিচয়॥"

প্রমিতা যাবার বেলা ঘরে দিয়ে দ্বার
খুলে দিল সব অলঙ্কার।
পরিল মিলের শাড়ি মোটা সুতা বোনা।
কানে ছিল সোনা,
—কোনো জন্মদিনে তার
স্বর্গীয় কর্ত্তার উপহার—
বাক্সে তুলি' রাখিল শয্যায়,
ঘোমটায় সারামুখ ঢাকিল লজ্জায়॥

যবে হ'তে গেল পার
সদরের দ্বার,
কোথা হ'তে অকস্মাৎ
অনুকূল পাশে এসে ধরিল তাহার হাত
কৌতূহলী দাসদাসী সবলে ঠেলিয়া সবাকারে;
কহিল সে, "এই দ্বারে
এতদিনে মুক্ত হ'ল এইবার
মিলন-যাত্রার পথ প্রমিতার।
যে শুনিতে চাও শোনো,
মোরা দোঁহে ফিরিব না এ দ্বারে কখনো॥"

২২ আগষ্ট, ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

লোকবৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন জনপদে লোকসংখ্যা অত্যধিক বাড়িলে মাটি ও জল এবং উদ্ভিদ ও মানুষের পরস্পরের জীবনযাত্রায় যে সমতা প্রকৃতি পোষণ করে তাহার ব্যত্যয় ঘটে।

একদা সিন্ধুনদের তীরে যে বিপুল সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ঐ প্রদেশ শুষ্কতাপ্রাপ্ত হওয়াতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহার কঙ্কালাবশেষ আজ মাঝে মাঝে বালুকাস্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত হইতেছে। যখন আলেকজাণ্ডার পঞ্জাব-বিজয়ে আসিয়াছিলেন তখন সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী বনভূমি হইতে আহৃত কাষ্ঠ-সমুদায়ের তৈয়ারী নৌ-বাহিনীতে তিনি নদীপথে নামিয়া জেডরোসিয়াতে ফিরিয়াছিলেন। বনভূমি বিনষ্ট হওয়ায় সিন্ধুপ্রদেশ ক্রমশঃ শুষ্ক হয়। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়েই ঐ প্রাচীন সভ্যতার পতন।

অতীত যুগে যেমন মোহেন-জো-দাড়ো ও হারাপ্পা মানুষের অপরিণামদর্শিতা ও প্রকৃতির দণ্ডবিধানের সাক্ষ্য দেয়, তেমনই বর্ত্তমান যুগে আগ্রা ও মথুরা প্রদেশের ক্রমিক বালুকাভূমিতে রূপান্তর কৃষিবিস্তারের সঙ্গে অরণ্য ও গোচারণ-ভূমির বিনাশ-সাধনের বিষময় ফলের সাক্ষ্য দিতেছে। কুশীনারা, কপিলাবস্তু ও বৈশালী যে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল তাহাও বনজঙ্গলে আজ আচ্ছাদিত। এখানে মরুভূমি নহে, অরণ্যভূমির আক্রমণ মানুষকে পরাস্ত করিয়াছে। যুগে যুগে মানুষ সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাটিকে বিধ্বস্ত করিয়া অনুর্ব্বর করিয়াছে; গোচারণ ও বনভূমি ধ্বংস করিয়া কাঁটাবনে পরিণত করিয়াছে; সমগ্র প্রদেশের গাছপালা, ঘাস ও বন্যজন্তুর উচ্ছেদ করিয়া আবেষ্টনকে বংশপরম্পরার নিকট প্রতিকূলতর করিতেছে। বসুন্ধরার প্রতি যুগপরম্পরাব্যাপী অত্যাচারের ফলে দেশের উর্ব্বরতা ও আবহাওয়ার সরসতা নষ্ট হয়। হিমালয়, বিন্ধ্য-পর্ব্বত, নীলগিরি ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের পাদদেশে অথবা ছোটনাগপুরের উপত্যকাভূমিতে যে দ্রুতগতিতে বনজঙ্গল ভূমিসাৎ হইতেছে তাহার ফলে ভারতবর্ষে নদীর বন্যা বাড়িয়াছে, নদনদী ক্ষীণতোয়া হইতেছে, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বহু অর্থের দ্বারা তৈয়ারী কুল্যাগুলি পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতেছে। যুক্তপ্রদেশ, গোয়ালিয়র, বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নদীতটে অবাধ গোচারণ ও গো-ক্ষুর আঘাতের ফলে ঘাসের আচ্ছাদনের অপকর্ষ ও বিনাশ হেতু গভীর খাদ ও গলির সৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টিপাতের পর বহু যুগের সঞ্চিত নদীর উর্ব্বরতা ধুইয়া ঐ খাদ ও গলিপথে নদীস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। ফলে মাটির উর্ব্বরতা হ্রাস ও নদীরও অবনতি। শ্রীকৃষ্ণের লীলানিকেতন, ভারত-প্রসিদ্ধ ব্রজভূমি, আজ ধ্বংসের মুখে। রাজপুতানার মরুভূমি তাহার একটি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লেলিহান জিহ্বা যুক্তপ্রদেশের অতিপ্রাচীন সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রেরণ করিয়াছে। সমগ্র মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে আজ মাটি বিশুষ্ক। আগ্রা ও মথুরা জেলায় কূপের জলরেখা এত নিম্নে অবতরণ করিয়াছে যে গোজাতি জল তুলিবার পরিশ্রমে কাতর। স্থানে স্থানে গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে মাটির আভ্যন্তরীণ জলরেখা পঞ্চাশ ফুট নামিয়া গিয়াছে। ঐ প্রদেশের কৃষি এখন এমন বিপন্ন যে এঞ্জিনিয়ারগণ মাথা খুঁড়িয়া সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছেন না।

আর এক দিক হইতে নদী ও জলপথের অবরোধ হেতু প্রাকৃতিক বিপ্লব যে দেশকে ধ্বংস করে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলা দেশের পাঁচ ভাগের দুই ভাগে জঙ্গল ও জলাভূমির প্রসার ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। এখানেও বাঁধ বাধা, রেল ও রাস্তা নির্ম্মাণ লোকসংখ্যাবৃদ্ধিহেতু প্রাকৃতিক কেন্দ্র-চ্যুতিকে বেশী করিয়া প্রকট করিতেছে। ফলে বাংলা দেশেও প্রকৃতি প্রতিহিংসা লইয়াছে আজ ৬০০০০ গ্রামকে বিধ্বস্ত করিয়া। বাংলার নদীর পুনরুদ্ধার সম্বন্ধেও এঞ্জিনিয়ারগণ অধিক আশা দিতে পারিতেছেন না।

একটা নগর, একটা বাজার বা একটা সেতু নষ্ট হইলে পুনরায় তাহা গড়া যায়। কিন্তু কোন দেশের সরসতা, উর্ব্বরতা ও জলনিকাশের সহজ প্রণালী বিনষ্ট হইলে দেশকে পুনর্গঠন করা যায় না। মানুষের প্রভুত্বের পর, হয় মরুভূমি

না হয় জঙ্গল, এই রীতিই যুগে যুগে কৃষিপ্রধান সভ্যতার পতন নির্দ্দেশ করে। জল, গাছপালা, ঘাসের বিরুদ্ধে মানুষের ব্যভিচারের ফলেই সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পতন। ভারতের মত এমন কোন দেশ নাই যেখানে এতগুলি সাম্রাজ্য ও সভ্যতার শ্মশান চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতির বহুযুগলব্ধ, সূক্ষ্ম সমতা ও সুষমার অবহেলার জন্যই বিভিন্ন আবেষ্টনে সভ্যতা বসুন্ধরার গাত্রে একটা বিস্ফোটকের মত উঠিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে।

মানুষের সভ্যতা মাটির সহিত, গাছপালার সহিত, কীট-পতঙ্গ জন্তুর সহিত, জল ও বনভূমির সহিত অচ্ছেদ্য ও জটিল বন্ধনে জড়িত। পর্ব্বতে বনানীরক্ষা, সানুদেশে ফলের বাগান ও উপত্যকাভূমিতে গোচারণভূমির পুষ্টিসাধন, সমতলভূমিতে সংরক্ষণশীল চাষের ব্যবস্থা পরস্পরকে সাহায্য করে, মানুষেরও সম্পদ বৃদ্ধি করে। ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নতি তখনই সম্ভব যখন দেশের বিভিন্ন পর্য্যায়ে আবেষ্টনের বিচিত্র শক্তি অনুযায়ী পর্ব্বত, সানুদেশ ও সমতলক্ষেত্রে বৈষয়িক জীবনের একটা সামঞ্জস্য ফিরিয়া আনিতে পারা যায়। গ্রাম ও নগরের উন্নতি, কৃষিশিল্প ও বনানী রক্ষা, গোধন উন্নতি ও গোচারণভূমি রক্ষা, ইহাদিগের মধ্যে বিরোধ যেমন ভারতবর্ষের বৈষয়িক জীবনের বিশেষত্ব, তেমনই অপর দিকে দেশের প্রাকৃতিক শক্তির ব্যত্যয় ঘটাইয়া আমাদিগকে সম্পদহীন করিতেছে।

নিম্নলিখিত তালিকাটির সাহায্যে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দৈন্য সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক শক্তির সহিত সমবায় ও সমন্বয় সাধনে মানুষের সম্পদবৃদ্ধির তুলনা করা হইল। ভারতবর্ষে কি শস্যক্ষেত্রে, কি গোচারণভূমিতে, কি পর্ব্বতগাত্রে, কি নদীতটে প্রাকৃতিক শক্তির শোষণ ও অপব্যয় প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া আজ দিকে দিকে জল, মাটি, উদ্ভিদ ও জীবজগতের মধ্যে একটা অসমতা সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ তাই পদে পদে প্রকৃতির নিকট লাঞ্ছিত ও বিপর্য্যস্ত।
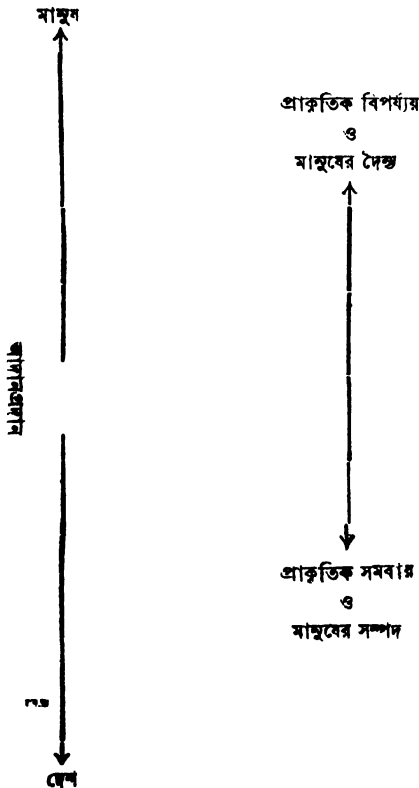
মাটির উর্ব্বরতা নাশ।
বনজঙ্গলের উৎপাটন।
ঘাসের আচ্ছাদন বিনাশ।
মাটির শুষ্কতা বৃদ্ধি। বালুকা ও ক্ষার বৃদ্ধি।
সহজ জল-সরবরাহের পথ নিরোধ।
নদনদীর গতি হ্রাস ও বিনাশ। নদীর বন্যা।
গ্রামভিটায় জঙ্গল বৃদ্ধি ও জলপথে জলকচু। মশক বৃদ্ধি। ম্যালেরিয়া।
বন্যজন্তু, পাখী ও মাছের বিনাশ।
গোধন হানি।
মানুষের অনাহার ও পল্লীগ্রাম ক্ষয় ও কতকগুলি স্ফীত নগরীর আবির্ভাব।
রোগবৃদ্ধি।
জন্মহার হ্রাস ও মৃত্যুহার বৃদ্ধি।

সংরক্ষণশীল কৃষি ব্যবস্থা। সার দেওয়া ও যাবতীয় পরিত্যক্ত দ্রব্যের মাটিতে প্রত্যাবর্ত্তন।
গোচারণ-ভূমির রক্ষা ও উন্নতি সাধন।
বনানীরক্ষা, রোপণ ও উন্নতিসাধন।
পর্ব্বতগাত্রে ফলের চাষ।
বৃষ্টি, নদী ও মাটির আভ্যন্তরীণ জল রক্ষা।
কীটপতঙ্গের সহিত বৈজ্ঞানিক সমবায়ে শস্য ও মানুষের ব্যাধি নিবারণ।
নদ-নদীর সংরক্ষণ।
বন্যজন্তু ও পাখী রক্ষা।
গোজাতির উন্নতিসাধন।
পল্লীগ্রাম ও নগরের সমবায়।
কৃষি, গোচারণ, ও কারখানা শিল্পের সমন্বয়।
মানুষের সম্পদ ও জীবনকাল বৃদ্ধি।

মানুষের প্রাচীন আবাসে বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবজগতের বন্ধনীগুলির সহিত যে মানুষের জীবনযাত্রা ও কল্যাণ নিবিড় ভাবে গ্রথিত, শুধু তাহা নহে। বন্ধনীগুলি মানুষের জীবন, কর্ম্ম ও অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়াছে। বন্ধনীর সবগুলি মানুষের আয়ত্তও নহে, এমন কি জ্ঞানগম্যও নহে। জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের আদানপ্রদান গভীরতর ও সূক্ষ্মতর হইতে চলিয়াছে। এই আদানপ্রদান রক্ষা ও পরিপোষণের দ্বারাই মানুষের সভ্যতা বসুন্ধরার বক্ষে চিরস্থায়ী হইতে পারে। যেখানেই আদানপ্রদানের ব্যত্যয় ঘটে, প্রকৃতির সহিত সমবায়ের পরিবর্ত্তে শোষণ অধিক হয়, প্রকৃতি হন তখন বিরূপা। পরিণামদর্শী মানুষ প্রকৃতির সব স্তরের সব পর্য্যায়ের শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া, শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের নহে, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিবার আয়োজন করে। পুরাতন সভ্যতা রক্ষার একমাত্র উপায় যেখানে মানুষ বসুন্ধরাকে রিক্ত করিতেছে সেখানে বিশ্বের সমস্ত শক্তির সহিত মৈত্রীস্থাপন। এই সমবায় সত্য সত্যই কি বিশ্বের সেই বিরাট সমবায়ের ছায়া নহে, যে সমবায় প্রকৃতিতে সুষমা আনিয়াছে মাধ্যাকর্ষণ, আলোক, উত্তাপ, কাল, দূর, নক্ষত্রগণের প্রভাব প্রভৃতির সামঞ্জস্য বিধানে? আর এই সুষমাই কি যুগে যুগে মানবের অন্তঃকরণে সত্য ও কল্যাণের আদর্শ জাগায় নাই?

শিশুর দৌত্য

শ্রীতারাপদ মজুমদার

উত্তর-কলিকাতার একটি নাতিপরিসর গলির মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র দোতলা বাড়ির একটি বাতায়নে একদা প্রভাতে এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার নায়ককে পাওয়া গেল।

নাম বিধুভূষণ দাঁ, প্রতিবেশীদের নিকট সার্ব্বজনীন বিধ্‌দা। নাদুস-নুদুস কালো-কোলো চেহারা, মুখে হাসিটি লাগিয়াই রহিয়াছে, কিসের হাসি চট্ করিয়া বলিবার জো নাই। মার্জ্জার-বিনিন্দিত গুম্ফগুচ্ছ-যুগলের পার্শ্বে সেই হাসি যেন লীলাময় হইয়া উঠে।

কিন্তু বিধ্‌দার মনে সুখ নাই। গত বৎসর সূতিকাগার হইতে শূন্যক্রোড়ে বাহির হইয়া তাহার পত্নী যে-শয্যাগ্রহণ করিয়াছে, সে-শয্যা সে কালেভদ্রে ত্যাগ করে এবং ছোট ছেলেটি তাহার পাঁচ বৎসরের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে যাহা সুচারুরূপে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা ক্রন্দন। সুতরাং বিধ্‌দা'র মনে সুখ না-থাকিবারই কথা। হাত পুড়াইয়া রান্না করিয়া বহুবাজারের পৈতৃক ছাতার দোকানখানি তাহাকে দেখিতে হয়।

বৈচিত্র্যবিহীন জীবন বিধ্‌দা অতিকষ্টে টানিয়া চলিয়াছে।

আজ সকালেও আহারাদি করিয়া বিধ্‌দা তাহার শয়ন-কক্ষে আসিয়া গায়ে পাঞ্জাবিটা চড়াইতেছে, এমন সময় চিরমধুর একটি কঙ্কণশিঞ্জিতে কর্ণকুহর তাহার শীতল হইয়া গেল। চাহিয়া যাহা দেখিল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই অপূর্ব্ব!...ও বাড়িটায় ভাড়াটিয়া আসিয়াছে দেখিতেছি। কোথা হইতে আসিল? আলাপ-পরিচয় করা খুবই উচিত ত! হাজার হউক প্রতিবেশী...

কিন্তু 'দড়াম' করিয়া যখন ও-বাড়ির জানালাটি বিধ্‌দা'র মুখের উপরেই বন্ধ হইয়া গেল, তখন চমকিয়া সে প্রকৃতিস্থ হইল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া আলমারী হইতে তাড়াতাড়ি তহবিল বাহির করিতে যাইবে পল্টু আসিয়া উপস্থিত। ছেলেটির মুখখানি সর্ব্বদাই ভার, দেখিলে মনে হয় যেন এইমাত্র মার খাইয়া আসিল। পিতার মুখের দিকে সম্পূর্ণভাবে না-চাহিয়াই বলিল—মা ডাকৃছে একবারটি।

বিধ্‌দার মনের মধ্যে তখন কি ঝড় বহিতেছিল, সে-ই জানে, তহবিল সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। স্ত্রীর শাড়ীগুলি

টান মারিয়া মারিয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিতেছে, এবং মুখে তাহার বহুপ্রকার বিরক্তিসূচক উক্তি!

বেচারী পণ্টু! এক ধমক দিয়া বিধুদা তাহাকে বলিল—কি দরকার কি নবাবজাদীর? জ্বালিয়ে খেলে বাবা তোমরা দুই মায়ে-বেটায়!

কান্নার দম পণ্টুতে দেওয়াই থাকে। চাবিটি টিপিয়া দিবার অপেক্ষা! 'ভ্যাঁ' করিয়া কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তহবিল অবশেষে বিধুদা পাইল। দেরাজের মধ্যে রাখিয়া আলমারী খুঁজিলে হায়রান হইতে হয় বইকি! গৃহিণীর মোকররী-সর্ত্তে শয্যাগ্রহণ ও পুত্রের ক্রন্দনে পারদর্শিতা-প্রদর্শন, এই দুইয়ে বিধুদা'র মস্তিষ্ক বোধ হয় আর বেশী দিন অবিকৃত রাখিবে না। নিজে সে কত দিক্ দেখিবে? শয়নকক্ষখানির যে শ্রী হইয়াছে, ভদ্রলোকের এক মুহূর্ত্তকাল ইহাতে থাকা চলে না। ছবিগুলির উপর এক যুগ হইতে হাত পড়ে নাই, ধূলা ও ঝুলে সেগুলির যা অবস্থা হইয়াছে! দেওয়ালগুলিতে কোন্ তিন চার বৎসর পূর্ব্বে একবার রং পড়িয়াছিল, তাহার পর সেদিকে এ যাবৎ কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। আলমারীটার কার্নিশ, চেয়ারের হাতল ভাঙিয়া নিরুদ্দিষ্ট। বন্ধুবান্ধব অবশ্য কেহই এ ঘরে আসে না, কিন্তু অন্য বাড়ির দৃষ্টিপথে ত এই কক্ষখানি সম্পূর্ণ উলঙ্গ ভাবেই আত্মসমর্পণ করে। ছি, ছি, লোকেই বা কি ভাবে? শার্শির কাচগুলি যেন অর্থাভাবেই লাগানো হইতেছে না! একটার খড়্খড়ি ত গোঁয়ারের মত স্থির হইয়া গিয়াছে, উঠিবার নামটি নাই। নাঃ, আমোদিনীকে লইয়া আর চলে না। এক টিন সবুজ পেণ্টের আর কতই বা দাম, যে, তাহার জন্য তাহার ছাতার দোকানের গণেশটি উল্‌টাইয়া যাইবে! একবার স্মরণ করাইয়া দিলেই ত সে কোন্‌দিন পেণ্ট আনিয়া জানালাগুলির হৃতশ্রী উদ্ধার করিয়া ফেলিত!··· খড়খড়িগুলির দুরবস্থা সুষ্ঠুভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বিধুদা অনুমান করিল, ও-বাড়ির জানালাটা বীররসে রুদ্ধ হইলেও আদিরসাশ্রিত মধুর নিঃশ্বাসের একটি মেদুর গন্ধ যেন সেখান হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু পাজি ঘড়িটা ওদিকে সানুনয়ে টিক টিক্ করিয়া দোকানে যাইবার তাগিদ্ দিতেছে। বিধুদার আর অপেক্ষা করা চলে না, হাঁকিল—অ ঝি, আমার চুলের বুরুশটা কোথায় গেল বাছা, পাচ্ছি না যে?

জানালার নিকট এমন ভাবে বিধুদা হাঁকিল যেন ও-বাড়ি হইতেই ঝি আসিবে এবং জানালার গরাদের সহিত আবদ্ধ আয়নাতে সে কেশবিন্যাস সুরু করিয়াছে!

ঝি আসিল না। কোনও কালে আসিবে না বিধুদা তাহা জানিত; সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কক্ষ ত্যাগ করিল। নীচে নামিবার সময়ে স্ত্রীর আহ্বান মনে পড়িতে একবার তাহার নিকট না-গিয়া সে থাকিতে পারিল না।

চিররুগ্না কঙ্কালসার পত্নী। মাথার চুলগুলি কবে উঠিয়া গিয়াছে। শুষ্ক গণ্ডদ্বয়ের উপর কোঠরগত অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়।

—ডেকেছ কেন? বিধুদা প্রবেশ করিল।

—ব'সো একটু। বলছিলাম কি ধর্ম্মতলার সেই ডাক্তারকে আজ একবার ডাকবে? আমি ত আর বাঁচব না, ছেলেটির কথা ভেবেই···

—দেখি, পাই তবেই ত। শরীর কি তোমার ভাল ঠেক্‌ছে না? ভয় কি, ভাল হয়ে যাবে।···পণ্টু কোথায় গেল?

—তুমি বকেছিলে না কি, কাঁদতে কাঁদতে নীচে চলে গেছে। হ্যাঁ ভাল আর আমি হয়েছি। যে ক'দিন বাঁচব, শুধু তোমার এই ভোগ। হ্যাঁ গো, আমি মরে গেলে তুমি আবার···

—কি আবার পাগলামি সুরু করলে। দোকান যেতে হবে না বুঝি আজ?

স্বামীর দক্ষিণ হস্তখানি লইয়া খেলিতে খেলিতে আমোদিনী বলিল—তুমি যাই বল না বাপু, পেরমাই আমার ফুরিয়েছে। পণ্টুর আমার কি যে হবে! তুমি আবার বিয়ে করো বাপু, আমার কিছু দুঃখ নেই। বলিয়া ধীরে অতি ধীরে সে উঠিয়া বসিল,—কিছুই দেখতে শুনতে পারি নে আমি, উঃ, তোমার কি ছিরী হয়েছে আজকাল!

বিধুদা ক্ষিপ্রকণ্ঠে কহিল—আবার উঠে বস্‌লে কেন? মাথা ঘুরবে এক্ষুণি!

—শুয়ে ত দিন-রাতই রয়েছি, বসি একটু, আমোদিনী স্বামীর বুকের কাছে মাথাটি আনিল। তার পর কি একটা

উদগ্র বাসনায় মুখখানিকে ধীরে ধীরে স্বামীর মুখের দিকে উঠাইল।

ব্যাধিক্লিষ্টা অনাদৃতার কয়েকটি লোলুপ মুহূর্ত্ত!

পরক্ষণেই মুখ নামাইয়া আমোদিনী ধীরে ধীরে পুনরায় শুইয়া পড়িল।

অবশেষে পণ্টুর সঙ্গেই একদিন পারুলের আলাপ জমিয়া উঠিল। ম্লান শীর্ণ ছেলেটির মুখের প্রতিটি রেখায় অবহেলার ছাপ। পারুলের অন্তর একটি নিবিড় মমতায় ভরিয়া গেল। শার্শির পার্শ্বে তাহাকে দেখিতে পাইয়া পারুল ডাকিল—অ খোকা!

খোকা একবার মিটিমিটি চাহিয়াই মুখ লুকাইল। তারপর ধীরে ধীরে উঁকি মারিতেই পারুল আবার ডাকিল—অ খোকাবাবু!

ওষ্ঠাধরের একপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা ফুটাইয়া খোকাবাবু আবার মুখ লুকাইল।

হাতে কাজ না থাকিলে মানুষ সময় লইয়া ছিনিমিনি খেলে; পারুল আবার ডাকিল—খোকামণি!

এবারে পণ্টুর অনেকখানি লজ্জা কাটিয়া গিয়াছে এবং আহ্বানকারিণীর সম্বোধনে যেন যথেষ্ট খাতিরের আস্বাদ পাওয়া যাইতেছে, বিস্ময়স্মিত মুখখানি বাহির করিল।

—তোমার নাম কি খোকাবাবু?

—আমার নাম? হি-হি, আমার নাম পণ্টু।

—বাঃ, বেশ নাম ত! তুমি আমাদের বাড়ি আস্‌বে?

নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া পণ্টু বলিল—তোমাদের বাড়ি! চোখে মুখে যেন তাহার অবিশ্বাসের ছায়া। কিন্তু পারুলের মৃদুস্মিত আননে সন্দেহের কিছু পাইল না। বলিল—কোথায় তোমাদের বাড়ি?

হাসিয়া পারুল বলিল—কেন এই যে, তোমাদের এই দরজার সুমুখেই আমাদের দরজা। আস্‌বে? যাও নীচে নামো গে···যাচ্ছ? বাঃ, পণ্টুবাবু বড় ভাল ছেলে, আচ্ছা, আমি নীচে যাচ্ছি।

নির্ব্বাক বিস্ময়ে কক্ষের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে পণ্টু হাঁফাইয়া পড়িয়াছে! উঃ কত বড় ঐ আয়নাখানা! এই, এই এত বড়, পণ্টুর ডবল্, তিন ডবল্, চার ডবল্ বড়! গদি-আঁটা বেঞ্চিখানা কত সুন্দর, তাহাদের বাড়িতে ওখানি থাকিলে পণ্টু সারা দুপুরটা উহাতে কত ডিগবাজি খাইতে পারিত! আল্‌মারীতে কত রকমের কাপড়,—লাল, নীল, সবুজ! তাহার মায়ের অত নাই। ঘড়িটা মেঝের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একেবারে পণ্টুর সমান, না বোধ হয় আরও উচ্চ। কোন্ এক সময় তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে ও-পাশের ছোট একখানি টেবিলের উপর। গভীর আতঙ্কে তাহার ক্ষুদ্র বক্ষখানি কাঁপিয়া উঠিতেই পাংশুমুখে সে পার্শ্ববর্ত্তিনী পারুলকে জড়াইয়া ধরিল।

পারুল তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তাহার ত্রাসের হেতু বুঝিতে পারিল, সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—ভয় কি, ওটা তুলোর সিঙ্গী, এই দেখ, আমি ওর গায়ে হাত দিচ্ছি, ও তো জ্যান্ত নয়।···তুমি যদি রোজ আমাদের বাড়ি এস, তোমাকেও অম্‌নি একটা তৈরি ক'রে দেব।

পণ্টু ঘাড় নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিল, সে আসিবে।

তার পর পারুল-প্রদত্ত লজেঞ্চ চুষিতে চুষিতে পণ্টু এক সময় তাহাদের গার্হস্থ্য-জীবন সম্বন্ধে পারুলের বহু প্রশ্নের জবাবদিহি যথাসাধ্য করিয়া ফেলিল। যাইবার সময়ও ছোট একটি কৌটায় লজেঞ্চ পূর্ণ করিয়া লইয়া যাইতে ভুলিল না।

ঈদের ছুটিটা প্রবাসে পড়িয়া থাকিয়া অপব্যয় করিবার মত সংসাহস নির্ম্মলের নাই, ছুটিয়া আসিয়াছে কলিকাতায়। পারুলের কক্ষে পণ্টুকে দেখিয়া বলিল—ছেলেটি কে?

··একটা মজা হয়েছে কিন্তু···

—তা পূর্ব্বেই অনুমান করেছি, এখন বলদিকি? ওদিকে যে তোমার বাহনটি উস্‌খুস্ করছে, ওকে ছুটি দিয়ে ফেল না?

পণ্টুর দিকে চাহিয়া পারুল বলিল—বাড়ি যাবে?

প্রশ্ন বাহুল্য, পণ্টু সম্মতি জানাইয়া তৎক্ষণাৎ পলাইয়া গেল।

সোফায় গা ঢালিয়া দিয়া নির্ম্মল চুরুট ধরাইল, অতঃপর?

—সবিস্তারে, না সংক্ষেপে?

—সবিস্তারেই হোক্, সম্ভব হ'লে সালঙ্কারে!

পারুলও কম যায় না, সুরু করিল, প্রভাতের মাধুরিমা তখনও মুছিয়া যায় নাই, পাপিয়া না ডাকিলেও বায়সকুলের

সমবেত সঙ্গীতে পাড়াখানি তখন মুখরিত, এমন সময় সে আমায় দেখিতে পাইল···

—এবং মজিয়া গেল···

—তুমিই বল তবে,···টিপ্পনি কাট্‌তে খুব ওস্তাদ, ধৈর্য্য যদি থাকে একটুও!

—ত্রুটি মার্জ্জনীয়। আচ্ছা, বল্‌তে থাক।

তার পর হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া পারুল আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিল, বিধ্‌দা'র নির্ল্লজ্জ ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার স্বীয় অভিজ্ঞতা এবং পন্টুর নিকট অবগত তাহাদের গার্হস্থ্য-কাহিনী। উপসংহারে জিজ্ঞাসা করিল—বাবাকে ব'লে এ বাড়ি ছাড়তে হবে না কি, কালো বেরালে যা তাক্ করছে?

গম্ভীর কণ্ঠে নির্ম্মল বলিল—বেরালটার কিন্তু শিকার-জ্ঞান আছে বল্‌তে হবে, ইঁদুরেই তাক্ করেছে, ছুঁচোতে নয়।

মুখ 'হাঁড়ি' করিয়া পারুল কহিল—তুমি ভাবছ এই সব শুনলে আমি রাগ করব? মোটেই না। সে মেয়েই নই আমি।

—তার পরিচয় ফোলা গালেই পাচ্ছি, তা শিকারী বেরালের ছানাটিকে অত প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন? বাচ্ছার সন্ধানে সে যে সর্ব্বদাই হানা দেবে! তা ছাড়া ঐটুকু বাচ্ছার দ্বারাও ত দৌত্যকার্য্য সুসম্পন্ন হবে না?

—দৌত্য না হাতী, তুমি থাম ত!

—আমি থামলেই কি সব দিক্ থেমে যাবে? একদিন ছেলেটি এসে যখন বল্‌বে, আজ আমাদের বাড়ি যেতে হবে, তখন?

—ওর বাপের ক্ষমতা, মুখ ভেঙে দেব না!

—আঃ হা, ঐখানেই ভুল করছ পারু। ওর বাপেরই ত ক্ষমতা, ছেলের আবার ক্ষমতা কি! তা ছাড়া দূত অবধ্য।

অপ্রতিভ পারুল কথাবার্ত্তার মোড় ফিরাইবার চেষ্টায় বলিল—যাও যাও, ও সব নোংরা কথা বাদ দাও! এখন তোমার খবর সব বল। তোমাদের কলেজের মিষ্টার পল্ দেখছি আজকাল মাসিকের পৃষ্ঠায় খুব 'ক্রয়েড' চড়াচ্ছেন,··· শাস্ত্রী-মশায়ের বিয়ে হয়ে গেল আবার? আমি ছাই দেখতেও পেলাম না,···ললিতবাবুর কেমন বরাত দেখ, ছেলে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাইস্-প্রিন্সিপাল হ'য়ে গেলেন।······

আমোদিনীর জন্য ধর্ম্মতলার ডাক্তারকে ডাক দিবার অঙ্গীকার বিধ্‌দা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার শয়নকক্ষখানির 'পঙ্কোদ্ধার' সে মনোযোগ সহকারেই করিয়াছে। যথেষ্ট পরিশ্রম ও যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া কক্ষখানিকে দর্শনোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা তাহার প্রশংসনীয়। দোকান যাইতে আজকাল তাহার প্রায়ই বিলম্ব হইয়া যায়।

সেদিন সকালে দুই-তিনটি ডাক দিবার পর যখন ও-বাড়ির জানালা হইতে পন্টু মুখ বাড়াইল, তখন বিধ্‌দা'র বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অননুভূতপূর্ব্ব শিহরণ তাহার সর্ব্বশরীরে খেলিয়া গেল; বলিল—ওঃ, তুমি যে আজকাল ভারী মাতব্বর লোক হয়েছ দেখছি, বাড়ি ডিঙ্গিয়ে আলাপ করতে শিখেছ? তা এখন বাড়ি এস, তোমাকে খাইয়ে দিয়ে আমি বেরুব যে?

পন্টু আসিল। ও-বাড়ি সম্বন্ধে বিধ্‌দারও কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল। ও-বাড়িতে তাহার মাসীমা, মাসীমার মা ও বাবা কয়েকটি দাসদাসীসহ বাস করেন। মধ্যে মাত্র দুই দিন আর একটি লোককে সে দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরিচয় জানিতে পন্টুর কৌতূহল হইলেও সাহস হয় নাই। চশমাপরা লোকটির অবস্থিতিতে পন্টুর ও-বাড়িতে প্রায়শঃ গতিবিধিও সংযত হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, পন্টুর মাসীমা তাহাকে খুবই ভালবাসে, প্রত্যহ কত লজেঞ্চ দেয়, একটি সিংহী বানাইয়া দিবে বলিয়াও তাহার নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ। বিধ্‌দা আরও জানিতে পারিল যে মাসীমা পন্টুর নিকট এ বাড়ি সম্বন্ধেও দুই-একটি প্রশ্ন মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে, যথা পন্টুর মাতাকে বড় একটা দেখা যায় না কেন, পন্টুর পিতা কি করেন?

অপরিসীম স্নেহে পন্টুকে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া লইয়া বিধ্‌দা জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল—আমি কি করি জিজ্ঞেস করতে তুমি কি বলেছিলে?

—বলেছিলাম বাবার একটা ছাতার···

প্রচণ্ড ধাক্কায় ক্ষুদ্র শিশুটিকে ঠেলিয়া দিয়া বিধ্‌দা গর্জ্জাইয়া উঠিল—বাঁদর কোথাকার! এত বড় ধিঙ্গী হ'লেন, একটু খবরাখবরও যদি ঠিক ঠিক রাখে! আমার ছাতার দোকান আছে, না? দশটা পাঁচটা ছাতার দোকান করতে যাই

বুঝি ? মাস গেলে দেড়-শ টাকা ক'রে নিয়ে আসি ছাতা বিক্রী ক'রে ?

পন্টু টাল সামলাইতে না পারিয়া ওদিকের আলমারীর গায়ে পড়িয়া গিয়াছিল। হাতের লজেঞ্জের কৌটাটি তাহার কোন্ সময়ে পড়িয়া খুলিয়া গিয়াছে। পিতার ক্রোধোদ্রেকের অর্থ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না, করুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া হয়ত অবশ্যম্ভাবী প্রহারের আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন! কৌটার ভিতর হইতে একখানি ভাঁজ-করা খাম নির্গত হইয়া বিধ্‌দা'র পদপ্রান্তে নিপতিত! সেখানিকে কুড়াইয়া বলিল—এ কার চিঠি ?

না জানি আবার কি নির্যাতন সুরু হইবে ? পন্টু ভয়ে ভয়ে অস্ফুট স্বরে বলিল—মাসীমা তোমায় দিতে বলেছে,...

বিধ্‌দা এক গাল হাসিয়া ফেলিল ; মুখের বিরক্তি-রেখাগুলি নিমেষে মিলাইয়া গিয়াছে। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। খামখানিকে সযত্নে খুলিতে খুলিতে বিধ্‌দা বলিল—তোমাকে খুব লেগেছে না কি পন্টু ? উঠে এস লক্ষ্মী বাবা আমার। নানান্ দিকের ঝামেলায় মাথার ঠিক থাকে না কি না...

বিধ্‌দা'র চক্ষু দুইটি ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসে বুঝি ! রুদ্ধশ্বাসে সে পড়িতেছে :—

"প্রিয়তম,

কি নিষ্ঠুর তুমি! একেবারে নীরব হয়ে রয়েছ, আর আমি এদিকে মুহূর্ত্ত গুণ্‌ছি। ওগো, কিছুই যে ভাল লাগে না আমার !

পারু—"

হর্ষোচ্ছ্বাসে বিধ্‌দা'র বত্রিশটি দাঁত বাহির হইয়া গেছে, শ্মশ্রুবহুল মুখখানি হইতে আহ্লাদ যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। পন্টুর দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার মাসীমা তোমায় খুব ভালবাসে, না পন্টু ?

ছোট ঘাড়টিকে অতিরিক্ত আনত করিয়া পন্টু বলিল—খু-উ-ব।

—আমিও তোমাকে কত ভালবাসি, না।

এ বিষয়ে পন্টুর প্রভূত সন্দেহ, কিন্তু ক্ষণ পূর্ব্বের নিদারুণ অবস্থাটা স্মরণ করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তুমিও।

—হ্যাঁ, তুমি খুব লক্ষ্মীছেলে। তোমাকে একটা 'হাওয়া-গাড়ি' কিনে দেব'খন, এই মেঝেয় চালাবে, কেমন ?

অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল—তোমার মাকে যেন এই চিঠির কথা ব'লো না ?

পন্টু অভয়দান করিল, বলিবে না।

সেদিন আর বিধ্‌দা'র দোকান যাওয়া হইল না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উৎকট চেষ্টা করিয়া নিরতিশয় কষ্টে একটা প্রত্যুত্তর খাড়া করিল এবং পরদিনই পন্টুর দৌত্যে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিল।

চা পান করিতে করিতে নির্ম্মল সকালের ডাক দেখিতে-ছিল। একখানি চিঠি পড়িতে পড়িতে সে বিজলীস্পৃষ্টের মত স্থির হইয়া গেল, পেয়ালা-সমেত তাহার দক্ষিণ হস্তটা ত্রিশঙ্কুর ন্যায় টেবিল্ ও মুখের মধ্যবর্ত্তী পথে অচল, অটল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেলে সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ক্ষুদ্র একখানি চিঠি—

"দেখুন ভদ্রতা শেখাবার জন্যে আমাকেই হয়ত এক দিন চাবুক নিয়ে যেতে হবে আপনার বাড়ি। ছিঃ।"

সুপরিচিত হস্তাক্ষরে লেখিকাকে তাহার চিনিতে বিলম্ব হয় নাই, এবং কাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা তাহাও সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

পত্রখানিকে পূর্ব্ববৎ ভাঁজ করিয়া খামে পুরিতে যাইবে, দ্বারদেশে তাহার আপাত গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধা দাসী! সরস হাসিতে দন্তহীন মুখখানি তাহার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—মা-মণির আমার খোকা হয়েছে, বাবু ?

অপ্রতিভ নির্ম্মল হাসিয়া জবাব দিল—না বিশুর মা ; তবে আজ আমি একবার কোলকাতা যাচ্ছি, কাল-পরশু ফিরবো, বুঝ্‌লে ?

* * *

নির্ম্মলকে দেখিয়াই পারুল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—যা ভাবছিলাম তাই, এতে কেউ না-এসে পারে ? শেষটায় তোমার কথাই ফল্‌ল দেখছি! পন্টুই দূতের কাজটা করলে ! এই নাও 'মহাভারত'! উঃ, আমি শুধু ছুটোছুটি করছিলাম, অথচ বল্‌তেও বাধছিল কারুকে !

'মহাভারত'ই বটে, দীর্ঘ চারিপৃষ্ঠাব্যাপী সকরুণ আবেদন! উচ্ছ্বাসে, আবেগে ব্যথায় উদ্বেল!

"প্রেয়শি!

আজ আমার কি আনন্দের দিন। জানি না কার মুখ দেখিয়া আজ প্রাতক্কালে শর্য্যা ত্যাগ করেছিলাম। কিরূপে যে আমার সময় জাপিত হইতেছে, তাহা এই দিনহিন পত্রে কি করে বুঝাইব।... ...

* * *

এই খুদ্রাদোপিখুদ্র, কি আপনার শ্রিচরণে উপস্থীত হইবার ভরষা করে। আপনি যে দয়া করে আমাকে শরন করিয়াছেন, তাহার জন্য সত্যিই আমার নিত্য করিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

* * *

আপনার দাযানুদায

শ্রি বিধুভুশন দাঁ।"

পত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই নির্ম্মল সহানুভূতি প্রকাশ করিল, বাছা রে!

পরে পারুলের দিকে চাহিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল—আশ্রিত প্রতিপালিকার প্রেমলিপিখানি দাসানুদাসের নিকট গেল কি ক'রে?

—অনুমানে, অনুমান কেন সত্যিই তাই, আমি তোমাকে চিঠিখানি লিখেছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে দাসানুদাসটিকেও। মৎলব ছিল ওর খানা পণ্টুর মারফৎ পাঠিয়ে দেব। পণ্টু ভুল ক'রে তোমার খানা নিয়ে গেছে, যার উত্তরে এই গদগদ নিবেদন! আর ওরখানায় দিব্যি তোমার ঠিকানা লিখে ডাকে দিয়েছি।

—হ্যাঁ, সে নোটিস্খানা আমি সকালেই পেয়েছি।...ওকি, অমন করছ কেন? পত্নীর যন্ত্রণাবিকৃত মুখের প্রতি চাহিয়া নির্ম্মল ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মুখে হাসি টানিয়া আনিতে আনিতে পারুল বলিল—কিছুই নয়, তুমি নীচে যাও, ঝিকে বলো মা'কে একবার ডেকে দিক্।

* * *

সকালবেলায় পারুলের পিতা বাড়িময় হাঁকাহাঁকি সুরু করিয়াছেন—ওরে ও সনাতন, ব্যাটাকে কাজের সময় যদি পাওয়া যায় একটু, সনাতন রে, নাঃ, আমাকেই যেতে হ'ল দেখছি।

গৃহিণী তাঁহার ভোলানাথ স্বামীকে চিনিতেন, ভাঁড়ার-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—কেন, কি দরকার কি তা'কে এখন?

—বাঃ, বেশ মানুষ তুমি যা হোক। তাইতেই বলি যেদিক্‌টায় না চাইব, সেই দিকেই...জামাইবাবাজীকে একটা তার পাঠাতে হবে না? কোন্ ভোরবেলায় আমি লিখে ব'সে রয়েছি, ব্যাটা ভুলেও যদি আমার সুমুখে একবার...

—তোমার কি হুঁসবুদ্ধি একেবারেই গেল, নির্ম্মল কাল বিকেলেই এসেছে না?

সনাতন আসিয়া পড়িয়াছিল, হাসিতে হাসিতে বলিল—আর আমি যে সকাল থেকে তিনবার আপনাকে তামাক দিয়ে এসেছি বাবু, আর আপনি বল্‌ছেন কিনা আপনার সুমুখেই আমি যাই নাই?

—যায়্ যাঃ, ব্যাটা মিথ্যে কথার জাহাজ একটি, জামাই এসেছেন কালকে, একবার তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিস্?

—কাল সন্ধ্যের সময় কা'র সঙ্গে গল্প করছিলেন?

—তাই ত রে,...আচ্ছা একবার তামাক দিবি চল,... হ্যাঁ রে আমাদের খোকাবাবুকে দেখেছিস্? কেমন চেহারা হয়েছে বল্ দেখি? ঠিক রাজপুত্তুরের মত না?

—জামাইবাবুর কাছ থেকে আমরা ত মিষ্টি খাবার টাকা নেব?

বৃদ্ধ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—খবরদার! বাবাজীর কাছে কেউ আব্দার করতে যেয়ো না। টাকা ভারি সস্তা হয়েছে, না?

গৃহিণী বাধা দিলেন—বাঃ, তাই ব'লে ওরা মিষ্টি খাবে না? আলবাৎ খাবে। খাব না বল্‌লেই হ'ল আর কি!... আয় আমার সঙ্গে কত মিষ্টি খেতে পারিস্ দেখব'খন। দশটা টাকা হ'লে হবে তোদের দু-জনের?

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে নিজের কাজে মন দিলেন।

বেলা তখন ন'টার কাছাকাছি। দরজায় কড়া নাড়িতেই বিধুদা' হাঁকিল—কে হ্যা?

—বাবু একবার ইদিকে আসুন।

দরজা খুলিয়া বিধ্‌দা দেখিল পাশের বাড়ির চাকরটি একখানি থালায় রাশীকৃত সন্দেশ লইয়া দণ্ডায়মান। বিধ্‌দা'র সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বলিল—আমাদের ডিপুটিবাবুর মেয়ের একটি খোকা হয়েছে কাল রাত্রে, তাই এই মিষ্টি পাঠালেন।

—ডিপুটীবাবুর মেয়ের, কোন্ মেয়ের ?

—বাবুর ত ঐ একটিই মেয়ে, আর একটি ছেলে আছেন, তিনি বিলেতে।

—ওঃ, আচ্ছা দিয়ে যাও। অদূরবর্ত্তী নির্ম্মলের দিকে দৃষ্টি পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল—উনি কে ?

—উনি বাবুর জামাই।

নির্ম্মল ইচ্ছা করিয়াই সম্মুখে আসিয়াছিল।

বিধদা'র কালো মুখখানি তখন মড়ার মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

উপরে আসিলে আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিল—ও-বাড়ি থেকে মিষ্টি দিয়ে গেল বুঝি ? পল্টু বলছিল ওর মাসীমার একটি খোকা হয়েছে। আমার ত যাবার ক্ষমতা নেই, নইলে গিয়ে দেখে আসতাম। ছেলে খুবই ভাল হবে। মা কত সুন্দরী !

—মা সুন্দরী ? বিধ্‌দা প্রতিবাদ করিয়া, যে দেখে নি তারই কাছে ব'লো। রূপ ত ধরে না, রংটা কটা হ'লেই ত তোমাদের কাছে সব সুন্দরী, তবু যদি মুখ-চোখের গড়ন ভাল হ'ত ! ডিপুটীবাবুর মেয়ে কিনা, ও-সব নামেই বিকোয় !··· আরে ছ্যাঃ।

বিধ্‌দা'র এই পক্ষপাতিত্বের কারণ আমোদিনী খুঁজিয়া পাইল না, বলিল—তুমি বলছ কি গো, অমন সুন্দরী যে বড়-একটা চোখে পড়ে না !

পল্টু এতক্ষণ মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মাতার আদর কুড়াইতেছিল, সাগ্রহে বলিল—না বাবা, তুমি দেখ নি তাই বলছ। মাসীমা খুব সুন্দর।—

দেওয়ালে লম্বমান একখানি ক্যালেণ্ডারের মনোহারিণী একটি তরুণী-প্রতিকৃতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—মাসীমা ওই ওর চেয়েও ভাল, না মা ?

অর্দ্ধ স্বগতভাবে পুনরায় বলিল—মাসীমার মুখখানা এক-এক সময় কেমন লাল টকটকে হয়ে ওঠে। সেদিন তাকে বাবার চিঠিখানা দিতেই···

শয্যাশায়িতা আমোদিনী অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উঠিয়া বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—চিঠি !

বিধ্‌দা তখন ক্ষিপ্রচরণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ—সারথি ও শিক্ষাগুরু

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মহাভারত মহাকাব্য ও মহানাটক। তাহার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু ঐ গ্রন্থে তাঁহার বাল্যজীবনের, কৈশোরের অথবা কৌমার অবস্থার কোন বিস্তারিত বিবরণ নাই। তাঁহার বাল্যচরিত্র অথবা শৈশব-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। মহাভারতে তাঁহার আবির্ভাব পরিচিত ব্যক্তির ন্যায়, যেন তাঁহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। মহাভারতে যখন তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায় তখন তিনি যুবা পুরুষ, প্রকৃতপক্ষে দ্বারকার রাজা, যদিও তাঁহার পিতা বসুদেব জীবিত ছিলেন। পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যুধিষ্ঠির, ভীম এবং অর্জ্জুনের জননী পৃথা অথবা কুন্তী বসুদেবের ভগিনী, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা। পাণ্ডবেরা ও বাসুদেব মামাতুত-পিসতুত ভাই। অর্জ্জুনে ও শ্রীকৃষ্ণে বিশেষ বন্ধুত্ব। শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান দ্বারকা, পাণ্ডবেরা থাকিতেন ইন্দ্রপ্রস্থে। প্রবাদ আছে—ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লীর পুরান কেল্লা। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে যাতায়াত করিতেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের তিনটি স্মরণীয়

কার্য্যের উল্লেখ আছে। প্রথম, খাণ্ডববন-দাহন। অগ্নিদেব ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছিলেন। অল্পাহারে তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। সাত বার তিনি বৃহৎ খাণ্ডববন গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সাত বার ইন্দ্র মুষলধারায় বৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন। অগ্নি জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং পার্থ অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি নিজের উদ্দেশ্য সার্থক হইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শনচক্র এবং অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনুক ও যুগল অক্ষয় তূণীর উপহার প্রদান করিলেন। পর্য্যাপ্ত আহার করিয়া অগ্নির ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল, খাণ্ডববন ভস্মীভূত হইল, দেবরাজ ইন্দ্র সসৈন্যে পরাজিত হইলেন। সম্ভবতঃ যে স্থানে খাণ্ডববন ছিল সেই স্থলে খাণ্ডবপ্রস্থ নামক লোকালয় স্থাপিত হইল।

দ্বিতীয় ঘটনা অলৌকিক। যুধিষ্ঠিরের অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞের পর দ্যূতক্রীড়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। দ্যূতের ব্যসনে যুধিষ্ঠির এরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন যে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। একে একে চারি ভ্রাতা, অবশেষে দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া হারিলেন। দুর্য্যোধনের আদেশে দুরাত্মা দুঃশাসন রজস্বলা, একবসনা অশ্রুমুখী দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভাস্থলে আনয়ন করিল। কর্ণ দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন, তুমি পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর সমুদয় বস্ত্র গ্রহণ কর। পাণ্ডবেরা উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিয়া অধোমুখে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর সেই জনপূর্ণ সভামধ্যে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইল। সভাস্থলে তাঁহার লজ্জা রক্ষা করিবার কেহ নাই জানিয়া অবগুণ্ঠিতমুখী রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী কাতর হৃদয়ে কেশবকে স্মরণ করিলেন, পরিত্রাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। যাজ্ঞসেনীর করুণ মিনতি মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণের কর্ণকুহরে শ্রুত হইল। দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষিত হইল। পাপাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসন আকর্ষণ করিয়া স্তূপাকার করিল কিন্তু নিঃশেষ করিতে না পারিয়া ক্ষান্ত হইল।

তৃতীয় ঘটনা দুষ্টের দণ্ড। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময়ে রাজসূয়-যজ্ঞ সমাধা হইলে সভাস্থলে সমবেত রাজগণের মধ্যে বাসুদেবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ইহা দেখিয়া চেদিরাজ শিশুপাল ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নানা দুর্ব্বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়। অপর রাজারা শিশুপালকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু শিশুপাল আরও উদ্ধত ভাবে বাসুদেবের গ্লানি করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত রাজন্যবর্গকে ধীর স্বরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তিনি চেদিরাজের মাতার নিকটে তাঁহার পুত্রের শত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সে সংখ্যা পূর্ণ হইয়া চেদিরাজ তাহার অধিক অপরাধ করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহাদিগের সমক্ষেই শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বৃত্ত চেদিরাজকে বধ করিবেন। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করিলেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন তিনি দুষ্কৃতকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হন। ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত।

দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও তাহার পর এক বৎসর অজ্ঞাত-বাসের পর পাণ্ডবেরা দ্যূতখেলার শাস্তি হইতে মুক্তি পাইলেন। তাঁহারা প্রতারিত, অপমানিত হইয়া ভিক্ষুকের ন্যায় বনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা কোনরূপ অমর্ষ প্রকাশ করিলেন না, ন্যায্য প্রাপ্যের অপেক্ষা কিছু অধিক চাহিলেন না। বন্ধুবান্ধব ও অপর লোকের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অত্যন্ত ধীর ভাবে সমস্ত কথা আলোচনা করিলেন। রাজ্যের একাংশ পাণ্ডবদের প্রাপ্য। কিন্তু শান্তির কথায় দুর্য্যোধন কর্ণপাত করিলেন না, কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না। উভয় পক্ষে অপর রাজাদিগের সহায়তা প্রার্থিত হইতে আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন একই দিবসে দ্বারকায় উপনীত হইলেন। প্রাচীন আর্য্য কবিদিগের মানবের মনোরাজ্যের অভিজ্ঞতা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মানব-প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ঘটনা-সংযোগের বিচিত্র কৌশল, এরূপ নাটকীয় বিকাশ (dramatic development) অপর সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই একটি ঘটনার কৌশল লক্ষ্য করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যাহ্নভোজনের পর শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। সেই কক্ষে দুর্য্যোধন প্রথমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অহঙ্কৃত প্রকৃতির অনুযায়ী তিনি শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশে বহুমূল্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অর্জ্জুন তাঁহার পরে আসিয়া বিনয়নম্র ভাবে, যুক্তকরে কেশবের পদতলে উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইয়া প্রথমে অর্জ্জুনকে ও তাহার পরে দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী এ কথা দুর্য্যোধন গোপন করিলেন না। সহাস্যবদনে কহিলেন, যাদব, আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই তুল্য সৌহার্দ্দ ও সম্বন্ধ, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি, অতএব আমার পক্ষ আপনার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আপনার কথায় আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই কিন্তু কুন্তীকুমারকে আমি প্রথমে নয়নগোচর করিয়াছি। আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব, কিন্তু বালককে প্রথমে বরণ করা উচিত।

ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে কৌন্তেয়, অগ্রে তোমার বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদ সেনা এক পক্ষে থাকিবে, অপর পক্ষে আমি সমর-পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করিব। তুমি কাহাকে গ্রহণ করিবে?

অর্জ্জুন ইহা শুনিয়াও জনার্দ্দনকে বরণ করিলেন। দুর্য্যোধনের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি প্রবলপরাক্রান্ত সৈন্যবল প্রাপ্ত হইলেন। নিরস্ত্র, যুদ্ধবিমুখ বাসুদেবকে লইয়া কি লাভ?

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যালাপ অতি মধুর। তিনি চতুরশিরোমণি, রাজকার্য্যে, লোকব্যবহারে অদ্বিতীয় কুশলী। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তিনিও দুর্য্যোধনকে সুযোধন বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

পরে অপরের অসাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি তাঁহাকে নিরস্ত্র জানিয়াও মনোনীত করিলেন কেন? অর্জ্জুন কহিলেন তিনি একাকী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে পরাজয় করিতে মনন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সারথ্য স্বীকার করেন ইহাই তাঁহার অনুরোধ। শ্রীকৃষ্ণ স্বীকৃত হইলেন।

এই বীর যুগের আর্য্যগণ শান্ত, ভীত হিন্দু ছিলেন না। এখন অনেক হিন্দু স্বাধীনতার ছায়া দেখিলে আতঙ্কে সঙ্কুচিত হন। আর্য্যগণ যথার্থ পুরুষ, উন্নত, বলিষ্ঠ আকৃতি, কঠিন মাংসপেশী। দর্পিত স্বভাব, অসঙ্কোচে মুক্তকণ্ঠে গর্ব্ব করিতেন। মহাভারত পাঠ করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। রোমানেরাও তাঁহাদের তুল্য গর্ব্বিত ছিল না। এরূপ চিন্তাশীল ও জ্ঞানবান জাতিও আর ভূমণ্ডলে দেখা যায় নাই।

যুদ্ধবিগ্রহ নিবারণ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। শান্তি-রক্ষার জন্য উভয় পক্ষে দূত যাতায়াত করিতে আরম্ভ হইল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দৌত্য স্বীকার করিয়া কৌরবদিগের নিকট গমন করিলেন। এই পর্ব্বাধ্যায়ের নাম ভগবদ্‌যান। ধীর, সংযত ভাবে, সুযুক্তি প্রয়োগ করিয়া সমবেত রাজা-দিগের ও প্রবীণ কৌরবদিগের সমক্ষে দেবকীনন্দন পাণ্ডব-দিগের যথার্থ প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রার্থনা করিলেন। অনেকেই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের দৃঢ় সঙ্কল্প কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া শেষে কহিলেন,

> যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ কেশব।
> তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্ণ পাণ্ডবান্ প্রতি।

হে কেশব, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণ ভূমিভাগ বিদ্ধ করা যায়, পাণ্ডবগণকে তাহাও প্রদান করিব না।

ভারতে এমন কেহ নাই যাহার নিকট এই উক্তি অবিদিত। পরস্বলুব্ধ প্রবঞ্চকের ইহাই চরম বাক্য।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াই দুর্য্যোধন ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি দামোদরকে বন্দী করিবার মন্ত্রণা করিলেন। দূতের অঙ্গে হস্তক্ষেপ নিষেধ ইহা তিনি বিবেচনা করিলেন না। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, তুমি কি কেশবের পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই? বৎস, হস্ত দ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না, পাণিতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না, মস্তক দ্বারা কখন মেদিনী ধারণ করা যায় না এবং বল দ্বারা কখন কেশবকেও গ্রহণ করা যায় না।

ভূপতিগণ ও অপর অনেকে সভামধ্যে উপস্থিত ছিলেন। জনার্দ্দন উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধন, তুমি আমাকে একাকী মনে করিয়াছ? এই দেখ, পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণি, আদিত্য, রুদ্র, বসু ও ঋষিগণ এই স্থানেই বিদ্যমান আছেন।

ভগবান বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গনে অর্জ্জুন যে মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলেন ইহা সেই সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর করাল মূর্ত্তি নহে, তথাপি ভূপালগণ ভয়াকুলিত চিত্তে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অনুনয়ে ভগবান তাঁহাকেও এইরূপ দেখিবার নিমিত্ত দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিলেন সে বিষয়ে

কি কিছুই বলিবার নাই, কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই? ইহা কি একটা সাধারণ ঘটনা? স্বয়ং ভগবান যদি তোমার কোচমান কিংবা শোফর হন তাহা হইলে কি তোমার মনে হইবে যে এরূপ নিত্য ঘটিয়া থাকে? পুরাকালে রথ ও সারথির উল্লেখ নানা স্থানে পাওয়া যায়। রোমানরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া রোমে প্রত্যাগত হইলে প্রধান বন্দীরা সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষদিগের রথচক্রের পশ্চাতে রজ্জু অথবা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া নীত হইত। এক জন বিচক্ষণ জর্ম্মান লেখক, ডাক্তার উইলহেলম গ্রীগর, প্রাচীনকালে পূর্ব্ব-ইরানের সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়াছেন। মহাত্মা জরথুষ্ট্রের সহিত এই সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। ডাক্তার গ্রীগর বহু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে অবস্তা জাতি, বৈদিক কালের আর্য্যজাতি, এবং হোমরের পূর্ব্বযুগের আকিয়ান জাতি সারথিকে ভৃত্য বিবেচনা করিত না, বরং রথী সারথিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সঙ্গী মনে করিত। ঋগ্বেদে কথিত আছে, রাজকন্যা মুদ্গলিনী যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার স্বামী মুদ্গলের রথ চালনা করিয়াছিলেন। ইলিয়ড মহাকাব্যে কাপানিয়সের পুত্র ষ্টেনেলস ডাইওমিডিসের সারথি হইয়াছিলেন। প্রায়ামের উপপত্নীর পুত্র সেব্রিওনিস হেক্টরের সারথি। শল্য স্বয়ং রাজা, তিনি কর্ণের সারথি; কর্ণ নিহত হইলে শল্য কৌরব-সেনার সেনাপতি হইলেন। কিন্তু ডাক্তার গ্রীগর চিরকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারথি অথবা হোমরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। তুলনার পক্ষে মহাভারতের যুগ হোমরের যুগের অপেক্ষা আধুনিক নহে। রথী ও সারথির প্রাধান্য যেমন ইলিয়ডে সেইরূপ মহাভারতে।

কুরুক্ষেত্র এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট তীর্থস্থান। সেই অতিবিশাল সমরক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডব সেনা ব্যূহিত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। কৌরব-সেনাপতি মহামতি পিতামহ ভীষ্ম, অর্জ্জুন পাণ্ডব-সেনাপতি। অশ্বের বল্গা হস্তে বাসুদেব। আদেশ হইবা মাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। ভীষ্ম উচ্চস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন, বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলেন, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ ধ্মাত করিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন, অচ্যুত, উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর। কৃষ্ণ সেইরূপ করিলেন। পার্থ দেখিলেন অপর পক্ষে অনেকেই আত্মীয়, তাঁহাদিগকেই বধ করিতে হইবে। তাঁহার চিত্ত অবসন্ন হইল, চক্ষু জড়িমাজড়িত হইল, দেহ কম্পিত হইল, মুখ শুষ্ক হইল, গাণ্ডীব তাঁহার হস্ত হইতে স্রস্ত হইয়া রথে পতিত হইল। ধনঞ্জয় যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

তৎক্ষণাৎ সারথি শিক্ষাগুরু হইলেন। সর্ব্বক্ষয়কারী যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা শ্রুত হইল। যুদ্ধের সংঘর্ষ ও কোলাহল শ্রুত হইল না। উভয় সৈন্য প্রথম অস্ত্রাঘাতের অপেক্ষা করিতেছিল কিন্তু কেহ আঘাত করিল না। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় যে-পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হইল সে-পর্য্যন্ত কেহ অস্ত্র উত্তোলন করিল না। ত্রস্ত, চমৎকৃত, অভিভূত হইয়া সব্যসাচী শ্রীভগবানের রুদ্র বিশ্বরূপ দেখিলেন, যাহাতে বিশ্বচরাচর বিস্মিত হইতেছে এবং মহারথীসমূহ যাহার আস্যে প্রবেশ করিতেছেন। এই ভীতিবিধায়ক, আদিঅন্তমধ্যরহিত অনন্তমেয় বিরাট বিশ্বরূপ আর কেহ দেখিল না। এরূপ অলৌকিক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা আর কোন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতে যত প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা ও উপদেশ আছে তাহার মধ্যে এক মহত্তম ও উচ্চতম শিক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিবৃত হয়। এই কথা স্মরণ করিলে যুদ্ধের কাহিনী সমস্তই অলীক ও রূপক বিবেচনা হয়। যুদ্ধক্ষেত্র, সমবেত অক্ষৌহিণীসমূহ মায়ার ন্যায়, ইন্দ্রজালের ন্যায়, মনের মরীচিকার ন্যায় অন্তর্হিত হয়। সৈন্য নাই, সেনাপতি নাই, যুদ্ধের কোন আয়োজন নাই। দেহের অন্তরস্থ আত্মা রথ, ভগবান সেই রথের সারথি, তিনি সেই রথ জীবনের ও জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে চালনা করিয়া আত্মাকে বিজয়ী করেন। মহাকাব্য মহাভারত যে মহাযুদ্ধের আধার তাহা কাল্পনিক রূপক মাত্র।

তাহা নহে। ভগবদ্‌গীতা যেরূপ সত্য কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধও সেইরূপ বাস্তব। ভোজবিদ্যার কৌশল এই যে এরূপ মহতী শিক্ষা এরূপ অভাবনীয় স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষার উপযুক্ত স্থান তপোবন, আর্য্য ঋষিগণ শান্ত উপবন আশ্রমে শিষ্যদিগকে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব শিখাইতেন। গীতা মূল মহাভারতের অঙ্গ বিবেচনা হয় না। ভাষার গৌরব গাম্ভীর্য্যে, ছন্দের উদার মন্দ্রে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। গীতা মহাভারতের পরে রচিত ও কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এমন স্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। বুদ্ধদেবের

শিক্ষায়, বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিক্ষুদিগের ধর্ম্মপ্রচারে বৈদিক ধর্ম্ম শিথিলমূল হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠা, তাঁহাদের প্রাধান্য হ্রাস হইতেছিল। সহস্র সহস্র লোক সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল। গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা প্রতিবাদ করা ও তাহাকে নিষ্ফল করা। শাক্যমুনির শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, অহিংসা পরমো ধর্ম্ম। গীতায় শ্রীভগবান শিখাইতেছেন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ কেবল বৈধ নহে, অবশ্যকর্ত্তব্য। কে কাহাকে বধ করে? দেহ নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু যিনি দেহে বাস করেন কাহার সাধ্য তাঁহাকে বধ করে?

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

শস্ত্রসমূহ এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, ইহাকে দাহ করিবার সামর্থ্য অগ্নির নাই, জল আত্মাকে আর্দ্র করিতে অপারগ, এবং বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে অক্ষম।

বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্ব হইতে আর্য্য জাতির মধ্যে কর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল, কিন্তু তিনি এই বিষয়ে নূতন তত্ত্ব প্রচার করিলেন। তিনি শিখাইলেন মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কর্ম্মের কঠিন পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করা। কর্ম্মফল হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, যেমন তুমি বপন করিবে সেই অনুসারে তোমাকে ফল সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাই কর্ম্মমত। কারণ একবার সঞ্চালিত হইলেই কর্ম্ম তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। কারণ ও কার্য্যের যে পর্য্যায় তাহাই কর্ম্ম এবং কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফল অনিবার্য্য। বুদ্ধদেব অকাট্য যুক্তির দ্বারা এই মত সমর্থন করেন। কর্ম্মকর্ত্তার কোন উপায় নাই, কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। যে কর্ম্ম করে সুফল অথবা কুফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে, এবং জন্ম হইতে জন্মান্তরে কর্ম্মের দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর শৃঙ্খল তাহাকে বহন করিতে হইবে। কোন মধ্যস্থ অথবা রক্ষকের নিকট কোনরূপ সহায়তা পাইবার আশা নাই। তাহার মুক্তি অথবা যন্ত্রণাভোগ তাহার স্বেচ্ছাধীন। সে ভিন্ন তাহার অদৃষ্টলিপির নিয়ন্তা আর কেহ নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অভিন্ন জড়িত নহে, মানুষ ইচ্ছা করিলে কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিতে পারে। ফলের কামনা না করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে, কর্ম্মফল ভগবান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পিত হইতে পারে। ইহাই মহৎ, অতি উদার নিষ্কাম কর্ম্ম, কামনারহিত কর্ম্মের আচরণ। যে ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া শস্য বপন করিয়াছে ফসল সে না লইয়া দেবতাকে উৎসর্গ করিতে পারে। কার্য্য-কারণের অলঙ্ঘ্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। যে কর্ম্ম করে তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে না। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এই আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ কিন্তু তাহার দায়িত্বও লাঘব হয়। অনেক যজ্ঞে, ব্রতে ও ক্রিয়ায় এই অনুসারে মন্ত্রাদি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গীতায় যে শিক্ষা তাহার অনুযায়ী পুরোহিত এইরূপ মন্ত্র আবৃত্তি করান যে ব্রত অথবা যজ্ঞের ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতেছি—শ্রীকৃষ্ণায় অর্পামি।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল শিক্ষা নিরাকরণ ব্যতীত ভগবানের ধরাতলে আবির্ভাব সম্বন্ধে, অর্থাৎ অবতারবাদে গীতায় স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। পুরাণে দশাবতারের উল্লেখ আছে, বেদে অথবা উপনিষদে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। জয়দেব ও শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্রে এই দশ অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই, বলরামের আছে। এই দশ জনই কেশবের অথবা নারায়ণের শরীর, অবতার। দশের সংখ্যা এইরূপ— মীন, কূর্ম্ম, শূকর, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, হলধর, বুদ্ধ ও কল্কি। সর্ব্বশেষে যাঁহার নাম তিনি ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন। গীতার যে শ্লোক সর্ব্বদা উদ্ধৃত ও আবৃত্ত হয় তাহাতে ভগবানের মর্ত্ত্যে আবির্ভাবের কারণ স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনকে কহিতেছেন, আমি জন্মমরণরহিত এবং সর্ব্বভূতেশ হইয়াও নিজ মায়াকে অবলম্বনপূর্ব্বক জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহার কারণ ও উদ্দেশ্য বিশদ রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

পালন ও দমনের এই আদর্শ অবতার সংখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যায় না। প্রথম তিন অবতার স্পষ্টতঃ প্রাণীর উৎপত্তি এবং বিবর্ত্তনবাদের সহিত সংপৃক্ত। নৃসিংহ মূর্ত্তি কতক পশু, কতক মনুষ্য, স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইয়া

হিরণ্যকশিপুকে নখ দ্বারা দীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। বামন কপটাচারে বলিকে ছলনা করিয়া তাঁহাকে রসাতলে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু বলি যে দুষ্কৃতকারী এমন কথা কোথাও লিখিত নাই। পরশুরাম একবিংশতি বার ধরাতল নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিবার পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র তাঁহার দর্প হরণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র যথার্থ অবতার। কোটি লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে, রামলীলায় প্রতি বৎসর তাঁহার জীবনচরিত অভিনীত হয়। রামরাজ্য স্বর্গতুল্য। রাম সাধুকে রক্ষা ও দুষ্টকে দমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভাই, যুগপৎ দুই অবতারের আবির্ভাব। হলধরের কীর্ত্তির মধ্যে স্মরণ হয় তিনি হলদ্বারা যমুনা নদীকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের তুল্য অহেতুকী দয়ার অবতার ভূমণ্ডলে আর কেহ আবির্ভূত হন নাই। নিজের সম্প্রদায় হইতে তিনি বৈদিক যজ্ঞ ও পশুবলি একেবারে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। জয়দেবে—

> নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
> সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্,
> কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।

হিন্দু দেবতাদিগের মধ্যে বুদ্ধের আর স্থান নাই, বৌদ্ধ হিন্দুর অস্পৃশ্য।

ভবিষ্যতে আর এক অবতার আবির্ভূত হইবেন। ইহুদী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমানদিগের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস আছে। দশম অবতার কল্কি, তিনি ম্লেচ্ছসমূহকে নিধন করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইবেন।—

> ম্লেচ্ছ নিবহনিধনে কলয়সি করবালম্,
> ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্,
> কেশব ধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।

ধূমকেতুর ন্যায় করাল করবাল—এই তুলনা স্মরণীয়।

বাইবেল গ্রন্থে ঈশ্বরের উক্তি—Vengeance is mine, I will repay।

ভগবদ্গীতা উপনিষৎ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর্য্য ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহাই বহুল-প্রচলিত এবং সর্ব্বজনবিদিত। বেদ প্রায় নাম মাত্র, কোটি লোকের মধ্যে এক জনের আছে কি না সন্দেহ। উপনিষদসমূহ অত্যন্ত কঠিন ও দুর্ব্বোধ, অতিঅল্পসংখ্যক লোকই পাঠ করিয়া থাকে। পুরাণ বৃহদাকার সহজবোধ্য গ্রন্থাবলী, কিন্তু পুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ। ভগবদ্গীতা প্রায় প্রত্যেক হিন্দুরই গৃহে আছে এবং উহার শ্লোকসমূহ সর্ব্বত্র পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। ইহা খোরদে অবস্তা, বাইবেল এবং কোরাণের ন্যায়। গীতার বাণী শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত, উহার জ্ঞান গভীর। যে বিচিত্র অবস্থায় গীতা কথিত হয় তাহা ব্যতীত স্মরণ করিতে হয় যে উহার প্রথম শ্রোতা এক ব্যক্তি মাত্র এবং একমাত্র উদ্দেশ্যে এই অতুলনীয় শিক্ষা প্রদত্ত হয়। অর্জ্জুন বহুসংখ্যক সেনার সেনাপতি, তিনি যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই শিক্ষা দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন। জগতের সকল ধর্ম্মে যে-সকল শিক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা প্রথমে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকেই প্রদত্ত হয়। বুদ্ধদেব কেবল শিষ্যদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। অপর লোকের সহিত তিনি আবশ্যকমত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু তিনি বহুলোকের সমক্ষে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন না। যীশুখ্রীষ্টের সর্ব্বোত্তম শিক্ষা The Sermon on the Mount, তাঁহার অল্পসংখ্যক শিষ্যদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে এবং বিশাল জনতা দেখিয়া যীশুখ্রীষ্ট তাহাদের অজ্ঞাতে পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। সেখানে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া উপবিষ্ট হইলে এবং দ্বাদশ শিষ্য সমবেত হইলে তিনি তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভগবদ্গীতা কথিত হইবার কালে শ্রোতা ও শিষ্য একমাত্র অর্জ্জুন। অগণিত সৈন্যদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও এক বর্ণ শুনিতে পায় নাই। এখন কোটি কোটি লোক সেই শিক্ষা আবৃত্তি ও অভ্যাস করিতেছে।

কেবল গীতা বিবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য ও শিক্ষকতা সমাপ্ত হয় নাই। প্রাচীন আর্য্য কবিগণের কল্পনা ও জ্ঞানশক্তি অসীম এবং তাঁহাদের সৃষ্টির তুলনা নাই, কিন্তু তাঁহাদের মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতাও অপরিমেয়। তাঁহারা জানিতেন মানুষ সকল অবস্থাতেই মানুষ, স্বয়ং ঈশ্বরও মানব-শরীর পরিগ্রহ করিলে মানুষের সহজাত দুর্ব্বলতা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। মনুষ্য-আকারে কেহ দোষশূন্য হইতে পারে এ কথা তাঁহারা মানিতেন না। রক্তমাংস অস্থি মেদের শরীর নির্ব্বিকার হইতে পারে না। মহাভারতে

ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মানবচরিত্র নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা নাই। শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়ের সাক্ষাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তিনি যুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিবেন না এবং নিরস্ত্র ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং দুইবার ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ অবহার হইবার পূর্ব্বে ভীষ্মের পরাক্রমে পাণ্ডব অনীকিনীসমূহ দলিত, মথিত, ক্ষুব্ধ, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ভীষ্মের বীর্য্য ও অর্জ্জুনের মৃদুতা দেখিয়া মধুসূধন ক্রোধান্বিত হইয়া বজ্রতুল্য ক্ষুরধার সুদর্শন-চক্র উদ্‌ভ্রামণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাকবি বর্ণনা করিয়াছেন নারায়ণের নাভি-জাত পদ্মের ন্যায় বাসুদেবের বাহুরূপ নালে সুদর্শন-স্বরূপ পদ্ম শোভা ধারণ করিল। ধনুর্ব্বাণ-হস্তে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে শান্তনুতনয় শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়া কহিলেন, হে জগন্নিবাস, আমাকে অবিলম্বে রথ হইতে পাতিত কর! অর্জ্জুন দ্রুতগতি জনার্দ্দনের পশ্চাতে গিয়া তাঁহার পীন বাহুযুগল ধারণ করিলেন। 'মহাবায়ু যেরূপ বৃক্ষ লইয়া গমন করে তদ্রূপ মহাত্মা বাসুদেব সমধিক ক্রোধান্বিত চিত্তে অর্জ্জুনকে লইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইলেন।' অর্জ্জুন তাঁহার বাহু ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করিলেন এবং দশম পাদক্ষেপ সময়ে তাঁহার গতি রোধ করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া রথে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। দ্বিতীয়বার যুদ্ধের নবম দিবসে আবার সেই ঘটনা। আবার সেই মহারথী ভীষ্মের অদ্ভুত বীর্য্য, বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ভীষ্মশরে ক্ষতবিক্ষত হইলেন। এবার সুদর্শন গ্রহণ করিবারও বিলম্ব সহিল না। কশা-হস্তে কেশব রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভীষ্মের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রণস্থলে কোলাহল উঠিল, ভীষ্ম হত হইলেন, ভীষ্ম হত হইলেন! আবার অতি কষ্টে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত করিলেন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন, কহিলেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী কহিবে। বাসুদেব নিবৃত্ত হইলেন। এই সকল ঘটনায় শ্রীকৃষ্ণের আচরণ সাধারণ মানবের ন্যায়।

দেশদেশান্তরে যে-সকল লোকগুরুকে লোকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বন্দনা করে তাঁহাদিগের মধ্যে কৃষ্ণচরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও জটিল। গীতায় তিনি যেরূপ ভাব ধারণ করিয়াছেন এরূপ কুত্রাপি কোন অবতার বা জগদ্‌গুরু করেন নাই। তিনি এমন কথা বলেন নাই যে, তিনি ও ঈশ্বর এক, অথবা তিনি বিষ্ণুর পূর্ণ কিংবা অংশাবতার; তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বয়ং, ইহাই তাঁহার মুক্ত ও দৃঢ় বাণী। যুগে যুগে ধরাতলে তাঁহারই আবির্ভাব হয়, তিনিই শিষ্টের পাতা ও অশিষ্টের শাস্তা। তাঁহারই উদ্দেশে কর্ম্মফল ও পুণ্যফল উৎসর্গীকৃত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকলার সংখ্যা এত অধিক, তাঁহাতে পরস্পর-বিসম্বাদী এত প্রকার ভাব লক্ষিত হয় যে সাধারণ নিয়মাদি বা বিশ্বাস দ্বারা তাঁহার চরিত্রতত্ত্ব কোনমতে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা করা যায় না। মানবশরীরে তাঁহার সহিত বুদ্ধদেবের অথবা যীশুখ্রীষ্টের কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। তাঁহারা উভয়ে সর্ব্বত্যাগী, শ্রীকৃষ্ণ কিছুই ত্যাগ করেন নাই। তিনি রাজপুত্র এবং স্বয়ং রাজার তুল্য, তাঁহার পিতা নামমাত্র রাজা। তাঁহার যেরূপ পদ তিনি সেইরূপ সুখৈশ্বর্য্যে বাস করিতেন। তাঁহার বহু পত্নী, পুত্র ও প্রপৌত্র। বিষয়বুদ্ধিতে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি চতুর, ক্ষমতাশালী, লোকব্যবহারে কুশলী। সত্য কথা বলিতে হইলে, তিনি আবশ্যক হইলে, কূটাচরণও করিতেন। ভীমের গদাঘাতে উভয় ঊরু ভঙ্গ হইয়া দুর্য্যোধন রণভূমিতে পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিয়াছিলেন। কয়েকটি অভিযোগ সত্য। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে কথিত হইয়াছে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের মুখে কৃষ্ণচরিত্র শ্রবণ করিয়া সন্দিহান চিত্তে গীতার উক্তি পুনরাবৃত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মণ, ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্তই জগদীশ্বর ভগবান অবনীতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার এরূপ নিন্দনীয় আচরণের অভিপ্রায় কি? উত্তরে শুকদেব বলিলেন,—

> ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
> তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।

ঈশ্বরদিগের ধর্ম্মাতিক্রম এবং সাহস দেখা গিয়াছে। তেজস্বী-দিগের তাহাতে দোষ হয় না। অগ্নি যেমন সমস্তই ভোজন করিয়া থাকেন, তেমনই ঈশ্বরের কোন বিষয়ে দোষ সম্ভবে না।

এই যুক্তি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ

নিয়মের বহির্ভূত এবং সাধারণ মনুষ্যের দোষগুণ হিসাবে তাঁহার চরিত্র বিচার করিতে পারা যায় না।

মহাভারতে সারথ্য ও শিক্ষাগুরুর পদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন ও কৈশোর অবস্থার কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ না করিলে তাঁহার পূর্ণ বিচিত্র চরিত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায় না। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, কোন দেশের ইতিহাসে অথবা কল্পিত পৌরাণিক ইতিবৃত্তে এমন আর কোন ব্যক্তির নাম দেখিতে পাওয়া যায় না যাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর লীলা এবং পূর্ণ যৌবনের অলৌকিক কীর্ত্তি উপমিত হইতে পারে। যেরূপ ভগবদ্গীতা আর্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, সেইরূপ তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কাহিনীর অসংখ্য গান ভারতের সর্ব্বত্র গীত হইতেছে। মহাভারত এবং মহাভারতীয় গীতার ন্যায় ভাগবতও অমূল্য গ্রন্থ। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ গীতার তুল্য অনুপাতে বিরচিত। গীতায় ভগবান যেরূপ অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিয়াছেন, ভাগবতে কেশব উদ্ধবকে তদনুরূপ গভীর তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর অবস্থা এরূপ কৌশলপূর্ণ রূপকে আবৃত যে সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া কদর্থ করিয়াছে। আর্য্য ও তৎপরবর্ত্তী হিন্দু জাতি ধর্ম্মপ্রবণ, তাহারা কিরূপে বৃন্দাবন-লীলার অসৎ অর্থ গ্রহণ করিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই লীলাই ভক্তি ও ভগবৎ প্রেমের প্রধান আধার। গোপাল-তাপণী উপনিষদ ভাগবতের পরে রচিত। উহাতে বৃন্দাবন-লীলার রূপকার্থ অতিশয় দক্ষতা ও কৌশলের সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেরূপ ভগবদ্গীতা পাঠ করিবার সময় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সম্বন্ধে চিত্ত সংশয়াকুল হয়, বৃন্দাবন ও ব্রজলীলা সম্বন্ধেও সেইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। সকলই কি কল্পনার মায়া, রূপকের গূঢ়ার্থপূর্ণ ছলনার ? এখানেও কবিকৌশল, প্রকৃত অর্থ চেষ্টা করিয়া বুঝিতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় অনেক শব্দের দ্ব্যর্থ, অনেক শব্দের নানা অর্থ। গোপী শব্দের অর্থ গোপকন্যা, আবার ঐ শব্দে মায়া বুঝায়। মাধবের মুরলীধ্বনি ওঁ, ওঙ্কার অথবা প্রণব শব্দ। শ্রীকৃষ্ণের বাস সর্ব্বদাই পীতবর্ণ এবং তাঁহার কান্তি নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, কমল নয়ন। ইহাতে কি সূচিত হইল ? সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্—তাঁহার নয়নদ্বয় সুন্দর কমলের ন্যায়। তিনি মেঘাভ, স্ফুরিত বিদ্যুৎবিশিষ্ট আকাশের ন্যায়। অর্থান্তরে, মেঘযুক্ত আকাশ তাঁহার কায়া, বিদ্যুৎ তাঁহার বাস।

এই শঙ্খচক্রধারী মহাযোগী মহাপুরুষকে কল্পিত দেবতা বলিয়া অলীক বিবেচনা করা যাইতে পারে না। ভগবদ্গীতা এবং ভাগবতকে মিথ্যা বলিবার সাধ্য নাই ; জগতে ধর্ম্মসাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ দুর্লভ। চারিখানি গস্‌পেল্‌ দ্বারা যেমন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে যীশুখ্রীষ্ট বর্ত্তমান ছিলেন, সেইরূপ উক্ত দুই গ্রন্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রমাণিত হয়। তাঁহার জন্মকাল নিরূপণ করিতে পারা যায় না, কারণ অতি প্রাচীনকালে কোন বিশেষ সময় হইতে অথবা কোন রাজার সিংহাসনারোহণ হইতে অব্দ সংখ্যা করিবার প্রথা ছিল না। শক অথবা শালিবাহন নৃপতি হইতে শকাব্দা আরম্ভ ; সে অল্পকালের কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, জন্মাষ্টমী অথবা গোকুলাষ্টমীতে ভারতের সর্ব্বত্র উৎসব হয়। তাঁহার সংক্রান্ত নানা অলৌকিক ব্যাপার লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী। তাঁহার পুরুষকার অসামান্য, তেজস্বিতা অসীম। তিনি বিষ্ণুর অবতার হইলেও মানুষ এবং তাঁহার মানবচরিত্র গোপন করিবার কোথাও কোন চেষ্টা হয় নাই। কিশোর কৃষ্ণের বংশী Pied piper of Hamelin-এর বাঁশীর অপেক্ষা অনেক গুণের। সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবৎ-প্রেমে মত্ত হইবার জন্য মুরলীর আহ্বান। যৌবনে সেই বংশীধারী গীতা ও ভাগবতের দৈবজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। বৃন্দাবনে তিনি ভক্তি ও প্রেমমার্গ প্রদর্শন করিলেন, দ্বারকা এবং কুরুক্ষেত্র সমরভূমিতে তিনি জ্ঞানমার্গ নির্দ্দেশ করিলেন। আমরা শ্রবণ করি, বিস্মিত হই, অবনত মস্তকে সবিনয়ে তাঁহার বন্দনা করি। গোপালতাপণীর অতি মধুর শ্লোকে তাঁহার স্তুতি করি।—

নমঃ কমলনেত্রায়, নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায়, কমলাপতয়ে নমঃ।

কমলনেত্রকে নমস্কার, কমলমালীকে নমস্কার, কমলনাভকে নমস্কার, কমলাপতিকে নমস্কার করি !

স্বপ্ন

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

সজল পাতার বুকে আনন্দ উছল মুখে
নব পুষ্প ভার
সমীরে সুগন্ধ ঢেলে পথ চায় অক্ষি মেলে
মধুমক্ষিকার
প্রভাতের রশ্মি লেগে তরুগুল্ম ওঠে জেগে
কুঞ্জবীথি দোলে
মালতী কি আপনার অসহ মাধুর্য্য-ভার
ফেলে তার কোলে।

সজল শিশিরময় পাতার আড়ালে রয়
সিক্ত রেণুরাশি
প্রদোষে আঁধারে মাখা যে ছিল গোপনে ঢাকা
ওঠে পরকাশি।
আজি বসন্তের দিনে যারা এল পথ চিনে
এ কানন ছায়
শুধু ক্ষণকাল রয়ে ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে
ঝরে যাবে হায়

বর্ষে বর্ষে কতবার আসিবে বসন্ত তার
মুগ্ধ সমীরণে
কত রক্ত কিশলয় হবে নিত্য রূপময়
এই কুঞ্জবনে।
সম্মুখের কাল হ'তে, কত হর্ষ স্বপ্নস্রোতে
বসন্তের ডাকে
নবীন মাধুরী লয়ে বিকশিবে পুষ্প হয়ে
পল্লবিত শাখে।

তবু কোনো দিন আর এ মধুমালতী তার
মেলিবে না ছবি
এই স্নিগ্ধ কিশলয় আর কোনো দিন নয়
নয় এ মাধবী।

এ নিকুঞ্জে সে বিরহে বেদনা যাবে না বহে
নূতন প্রভাতে
আজিকার গন্ধখানি ফিরায়ে দিবে না আনি
নির্ঝরিত স্রোতে।
ঘুরে ঘুরে মধুমাসে কত শত বার আসে
মল্লিকা মাধবী
তবু এই আজিকার মাধবী ও মল্লিকার
শেষ হবে সবই।

যে আনন্দ সত্য হয়ে বিকশিল মূর্ত্তি লয়ে
নিখিলের দ্বারে
সে যখন আর বার মিলায় মাধুরী তার
স্বপ্ন পারাবারে
সে বিচ্ছেদে বিশ্বময় কিছু না বেদনা রয়
কিছু নাই ক্ষতি
নিত্য নব সৃষ্টিকার অবিনাশী করে তার
নশ্বর মূরতি

অক্ষয় এ বিশ্বখানি চিরপূর্ণ ব'লে জানি
তবু কেন হায়!
আছে তার অঙ্গে লিখা স্বপ্নময় মরীচিকা
মৃত্যু-বেদনায়।
যত রূপ যত আলো আজ চোখে লাগে ভালো
কোথা তারা আছে
বিস্মৃতির তমস্রোতে কোথা যায় কোথা হ'তে
ঘোর স্বপ্নমাঝে।

তাই কাঁদে চিত্ত-বীণা যা আছে তা আছে কি-না
বুঝিবারে চায়
নিত্য যাহা বিশ্বমাঝে সত্য হয়ে ফুটিয়াছে
যখনই মিলায়।

"ষ্টারভেশ্যন"

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

পৌষের প্রভাত। অনেক ক্ষণ উজ্জ্বল রৌদ্রের পর শীতের কনকনে ভাবটা একটু কমিয়া আসিয়াছে। একটা ছোট পালি করিয়া নূতন গুড়ের পাটালি সহযোগে মুড়ি খাইতে খাইতে সূর্য্যকান্ত ওরফে স্থজি চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ পেয়ারাগাছের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতেছিল। সুমিষ্ট পাটালির আস্বাদ পাইয়াও তাহার মনে ক্ষোভ জাগিতেছিল এখনই পাড়ার কোন ছেলে কোন সুযোগে গাছে উঠিয়া পাতার আড়ালের বড় ও পাকা পেয়ারাটি লইয়া যাইবে। স্থজির সব চেয়ে ইহাই আশ্চর্য্য মনে হইতে লাগিল কাল বিকালে যখন সে গাছে উঠিয়াছিল তখন অমন সুন্দর পেয়ারাটি কি করিয়া তাহার নজর এড়াইয়াছিল।

মুড়ির পালি ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ গাছে ওঠা স্থজির পক্ষে কিছুই শক্ত নহে। কিন্তু সমস্যা এই যে তাহার বাপের আসিবার সময় হইয়াছে, আর তাহার বাপও নীচে আসিয়া দাঁড়াইবেন। তখনই বলিয়া বসিবেন, 'নেমে আয়, বাঁদর'; সে বাঁদর না হইলেও তাহাকে নামিয়া আসিতে হইবে।

স্থজি মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই বাপেদের যদি কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে! পেয়ারা—বিশেষতঃ বড় এবং পাকা পেয়ারা—দেখিলে কাহার না তাহা পাড়িতে ইচ্ছা হয়? বাবারও নিশ্চয়ই হয়। পাছে লোকে কিছু বলে তাই তিনি পাড়েন না। বেশ হইত যদি বাবা পেয়ারা পাড়িতে গাছে উঠিতেন, আর তাঁর বাবা আসিয়া পড়িয়া নীচে হইতে বলিতেন, বাঁদর, নেমে আয় শীগ্‌গির। সূর্য্যকান্ত হিসাব করিয়া দেখিল, তাহার বাবার প্রায় ফিরিবার সময় হইয়াছে। এখন গাছে ওঠা মোটেই নিরাপদ নহে। কাজেই সাবধানে থাকিতে হইবে যেন কেহ আসিয়া পাড়িয়া লইয়া না যায়। বাবা ত এখানে প্রায় সর্ব্বক্ষণই বসিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাতে কোন লাভ নাই। তাঁহার সম্মুখেই যদি কেহ গাছে চড়ে তাহা হইলেও তিনি তাহাকে নিষেধ করিবেন না। কাজেই স্থজিকেই সতর্ক থাকিতে হইবে।

সূর্য্যকান্ত যখন এবম্বিধ গবেষণায় ব্যস্ত এমন সময় চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে তাহার বাবা আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে তাঁহারই বয়সী এক ভদ্রলোক।

সূর্য্যকান্তের দিকে ফিরিয়া তাহার বাবা বলিলেন—কে বল্ দিকি স্থজি? কি করেই বা জান্‌বি! তোরা তখন কোথায়?

স্থজি বিস্মিতভাবে আগন্তুকের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।

আগন্তুক মৃদু হাসিয়া বলিলেন—এটি তোমার পুত্ররত্ন বুঝি? কিন্তু নামটি স্থজি কেন উপেন?

উপেন অর্থাৎ সূর্য্যকান্তের পিতা বলিলেন—এই ত সবে স্থজি দেখলে। আরও কত এখনও বাকী আছে।

বলিতে বলিতে উভয়ে চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিয়া আসিলেন।

এক জন আগন্তুকের সম্মুখে স্থজি বলিয়া সম্বোধিত হওয়ায় বালক একটু অপমানিত জ্ঞান করিল। সেও পিছন পিছন চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিয়া আসিয়া বলিল—আমার নাম শ্রীসূয্যকান্ত মল্লিক, স্থজি নয়।

আগন্তুক প্রফুল্ল মুখে বলিল—তাহ'লে তোমার বেশ নাম। সূর্য্যকান্ত বেশ ভাল নাম। আমি যে-ক'দিন এখানে থাকব তোমাকে 'শ্রীসূর্য্যকান্ত' ব'লে ডাকব।

পরে সূর্য্যকান্তের পিতার পানে ফিরিয়া বলিল—এ ত তোমারই অন্যায়, উপেন। সূর্য্যকান্তকে স্থজি কর তুমি কোন্ অধিকারে?

লুপ্ত মান প্রায় পুনরুদ্ধার করিয়া সূর্য্যকান্ত অনেকটা বিজয়গর্ব্বে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। এ সংবাদ ভিতরে রাষ্ট্র হইতে দেরি হইল না যে বাহিরে এক জন বাবু আসিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে সূর্য্যকান্ত বলিয়া ডাকিয়াছেন—স্থজি বলিয়া নহে।

পরক্ষণেই দুয়ারের আশপাশে তিন-চারি প্রকারের

মূর্ত্তির সমাগম হইল। তাহারা সকলেই সূর্য্যকান্তের ভাই-ভগিনী।

আগন্তুক ডাকিল—এস সব, এদিকে এস। লজ্জা কি? আমি তোমাদের কাকা হই।

লজ্জা তাহারা তেমন বেশী করিতেছিল না। আগন্তুকের আহ্বান শুনিয়া যেটুকু সঙ্কোচের ভাব ছিল তাহাও কাটিয়া গেল। সাহস করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করার মত তাহারা চট্ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিল। আগন্তুক তখন তাহার ক্যাম্বিসের ব্যাগ খুলিয়া তাহার উদরের মধ্য হইতে কতকগুলি লজঞ্চুস্ ও বিস্কুট বাহির করিয়া সকলকে ভাগ করিয়া দিল।

তাহাদিগকে নাম জিজ্ঞাসা করাতে, এক জন বলিল সাবু, অপরে বার্লি, তৃতীয় শটি।

আগন্তুক হাসিয়া বলিল—শিশুখাদ্য আর বড়-একটা বাকী রাখ নি, উপেন? মেলিন্সফুড, হর্লিক্‌স ইত্যাদি বুঝি অনাগতদের মধ্যে আছেন?

উপেন বলিল—না, ওঁরা সব শহরের ছেলেমেয়েদের জন্য। এ সব গ্রামে এখনও ওঁদের প্রবেশ নিষেধ।

আগন্তুক একটু চিন্তার ভান করিয়া বলিল—তা'হলে?

উপেন বলিল—নামের জন্য আট্‌কাবে না, ভাই। এখনও এরারুট আছেন। তার পর আছেন কুইনিন্—সেও পল্লীগ্রামের এক প্রকার খাদ্যবিশেষ। এ সব নাম কি সাধে রেখেছি ভাই। এরও একটা ইতিহাস আছে।

আগন্তুক বলিল—তাই বল। কি ইতিহাস?

উপেন বলিল—বল কেন ভাই, পেট থেকে পড়তেই বড়টিকে ম্যালেরিয়ায় ধরল। ডাক্তার বললেন, শুধু দুধ দেবেন না। সাবু ধরান্, সঙ্গে একটু দুধ মিশাবেন। পাছে এ শিক্ষাটুকু ভুলে যাই, সেজন্য দ্বিতীয়টির নাম সাবুই রাখা গেল এবং তাকে সাবুই খাওয়ানো হ'তে লাগল। ম্যালেরিয়া থেকে সে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাক্ আর না পাক্, শারীরিক শক্তি থেকে অনেকখানি নিষ্কৃতি পেল। আমার ভায়রাভাই হোমিওপ্যাথ। সে উপদেশ দিলে ছেলেদের বার্লি খাওয়ালে সহজে হজম হবে, বলও পাবে; ম্যালেরিয়াও হবে না। তারই ফলে হ'ল বার্লি। তার পর খেয়ালের বশে ঐ ভাবেরই নাম রাখা হ'তে লাগল। এই হ'ল নামের ইতিহাস। এখন জামা জুতো ছাড়। হাত-মুখ ধুয়ে জল খাও; তার পর দুপুরে আশ মিটিয়ে গল্প করা যাবে'খন।

আগন্তুক বলিল—হাত-মুখ ধোয়াই আছে। এখন একটু চা খাওয়াও ভাই; রাত জেগে আস্‌ছি। খাবার এখন থাক। চা খেয়ে চল একটু গাঁ-টা ঘুরে আসি। হ্যাঁ, ভাল কথা। চা খাও ত?

উপেন। চা খাই নে, তবে জোগাড় ক'রে রাখতে হয়।

আগন্তুক তখন সূর্য্যকান্তের পানে চাহিয়া বলিল—যাও ত সূর্য্যকান্ত, মায়ের কাছ থেকে চা নিয়ে এস।

লজঞ্চুস্, বিস্কুট, তার উপর সাধুনাম। সূর্য্যকান্ত খুব খুশী হইয়াই ভিতরে গেল।

মিনিট-দশেক পরে সূর্য্যকান্ত চা লইয়া ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে সাবু, টাট্‌কা মুড়ি ও নারিকেলের নাড়ু লইয়া আসিল।

উপেন বলিল—এই আমাদের বিস্কুট, ভাই। কিছু মনে ক'রো না।

এক মুঠা মুড়ি খাইয়া চায়ে চুমুক দিয়া আগন্তুক বলিল—এই বিস্কুট খেয়েই যদি দেশে রয়ে যেতাম তোমার মতন, ভাই!

উপেন উদাস হাসির সহিত বলিল—সেই পুরাতন কথা—

> নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
> ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।

চা পান শেষ করিয়া দুই বন্ধু বাহির হইয়া গেল।

২

আগন্তুকের নাম শৈলেন। এই গোপালপুরেই বাস। এখানকার মাইনর-স্কুলে পড়িয়া দুই জনেই দুই ক্রোশ হাঁটিয়া নৈহাটি গিয়া এণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি হয়। উপেন এণ্ট্রান্স পাস করিয়া পাঠ সমাপ্ত করে। শৈলেন কলিকাতায় গিয়া বি-এ ও ল পাস করিয়া আত্মীয়তা-সূত্রে পশ্চিমে দু-এক জায়গায় বসিবার চেষ্টা করিয়া শেষে আবার ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে।

শৈলেন আজ দশ বৎসর পরে দেশে আসিয়াছে। দেশে আপনার জন আর কেহ নাই। সামান্য জমিজমা যাহা

আছে তাহা বিক্রয় করিয়া যদি কিছু পায় সেই চেষ্টায় আসিয়াছে। সে-কথা এখনও তোলে নাই। কত কাল পরে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা। প্রথমেই কি স্বার্থের কথা তোলা যায়?

পথে যাইতে যাইতে দুই বন্ধুতে স্বল্প কথাবার্ত্তাই হইল। পূর্ব্বস্মৃতি ও চিন্তার স্রোতে শৈলেনের মুখের কথা কোথায় ভাসিয়া গেল। কোথাও পুরাতন স্থানের অবিকৃত পূর্ব্ব রূপ তাহাকে বাল্যের কত কথাই মনে করাইয়া দিল। কোথাও বা পুরাতনের নূতন রূপ তাহাকে ব্যথিত করিল। যেখানে ছায়াভরা বন ছিল—যাহার মধ্যে দুই বন্ধুতে কত স্তব্ধ দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্ণ কাটাইয়াছে, সেখানে আজ ছেলেদের ছুটাছুটি করিবার ও ফুটবল খেলিবার মাঠ হইয়াছে। প্রতি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় এখন সেই স্থান চঞ্চল বালকগণের উচ্চহাস্য ও দ্রুতধাবনে শব্দিত হইতেছে। যেখানে তাহার বাল্য ও কৈশোর কত হর্ষ ও বিষাদের মধ্যে কাটিয়াছে, সেখানে আজিকার ক্রীড়াশীল বালক-বালিকাগণ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে চাহিতে লাগিল। তাহাদের কেহই আজ তাহাকে চেনে না। সেও তাহাদিগকে আজ জানে না। শৈলেনের মনে আঘাত লাগিল। তাহার মনে অনুশোচনা জাগিল। কেন সে বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া দেশে আসে নাই? এমন যুবক বৃদ্ধ সে কয়েকটিকে দেখিল যাহাদের কোন দিন সে এখানে দেখে নাই। তাহারা আজ এই বালক-বালিকাদিগের পরম আত্মীয় হইয়া গিয়াছে। আর সে আজ পর হইয়াছে। এমন করিয়াই পর আপন হইয়া যায়, আপন পর হয়।

দুই-এক জন এই গ্রামেরই বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা কুশল প্রশ্ন করিলেন। পুরাতন নিয়মে বাড়ির সকলের কুশল প্রশ্ন করিলেন। শৈলেনের তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া গেল! নদীর তীরে আসিয়া জুতা খুলিয়া নদীর জলে একবার নামিয়া সেই জল তুলিয়া একবার মুখে দিবার লোভ শৈলেন সম্বরণ করিতে পারিল না।

সিক্ত হস্তে সিক্ত পদে জল হইতে উঠিয়া শৈলেন আবার জুতা পরিল এবং দুই জনে দক্ষিণ দিকে একটু দূর পর্য্যন্ত গেল। একটু পরেই উপরে পুরাতন মাইনর স্কুল। এই পুরাতন অর্দ্ধভগ্ন গৃহে কত ছাত্র আসিয়াছে, কত গিয়াছে। আবার কত আসিবে কত যাইবে। ভিতরের ঐ তৃণশ্যামল ভূমি, ঐ ছায়াবহুল বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ এখনও যেন ছাত্রদের আহ্বান করিতেছে। পিছনের সেই পুরাতন বকুল বৃক্ষ এখনও তেমনই অজস্র পুষ্প, সস্নেহ ছায়া দান করিয়া আসিতেছে।

দু-জনে ভিতরে আসিয়া তৃণশ্যামল ভূমিখণ্ডের উপর বসিল। মন ছুটিয়া গেল সুদূর সেই কৈশোরের দিনে যখন বাতাসের আগে আগে প্রাণ ছুটিয়া চলিত, লঘু পক্ষভরে বুঝি-বা মেঘের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিত যেখান হইতে ধরণীর ধূলি যেন কোথায় মিলাইয়া যাইত। কর্কশ বন্ধুর প্রান্তর। উন্নতাবনতাঙ্গ পর্ব্বতসঙ্কুল ভূমিখণ্ড স্নিগ্ধ শ্যামলশ্রী-মণ্ডিত সমতল ক্ষেত্র বলিয়া প্রতিভাত হইত।

শৈলেন ভাবমুগ্ধকণ্ঠে বলিল—এমন শান্তির স্থান বুঝি আর নাই। কেন এতদিন এখানে আসি নি তাই ভাবছি।

উপেন বলিল—বেশী এলে হয়ত এমন শান্তি পেতে না। আমি এখানে বরাবর আছি তাই তোমার দৃষ্টিতে একে দেখতে পাচ্ছি নে।

শৈলেন। কত কাল হয়ে গেল, তবু যেন মনে হয় এসব মাত্র সেদিনকার ঘটনা। যেন সেদিন ওই ফার্ষ্ট ক্লাসে বসে গেছি; এখনও ক্লাসে গেলে চোখ বুঁজে সেই জায়গায় গিয়ে বসতে পারি। হেডমাষ্টার-মশায়ের কথাবার্ত্তা, তাঁর কান-মলা ও সস্নেহ চাপড়, অন্যায় করলে তাঁর বেতের আস্ফালন যেন সাম্‌নে ভাসছে।

উপেন। তার পর প্র্যাক্‌টিস্ কেমন চল্‌ছে বল। ভাগলপুরেই ত আছ এখন?

শৈলেন। আর কোথায় যাব, বল? কুক্ষণে জ্যেঠশ্বশুরের কথায় বাংলা দেশ ছেড়ে তাঁর কার্য্যস্থান মুঙ্গেরে যাই। সেখানে কিছু হ'ল না। তার পর দুটো জায়গা বদলে শেষটা ভাগলপুরে এসে বসেছি। এ বয়সে আর জায়গা বদ্‌লাতে সাহস হয় না। এখানে তবু হাকিমদের দয়ায় মাসে মাসে দুই-চারটা কমিশন পাই। প্র্যাকটিস্ নেই বললেই হয়। রাত্রে দুটা ছেলে পড়াই। ভাগ্যে মতিবাবুর ছাত্র ছিলাম তাই ইংরেজী অঙ্ক দুটো বিষয়ই এক রকম চালিয়ে নিতে পারি। প্রত্যেক বছরেই দুটি ছেলে পাই।

এত করেও অর্দ্ধেক মাসের বেশী খরচ চালাতে পারি নে। শেষের দিকটায় কেবল এ নেই, সে নেই!

উপেন। সেদিন মতিবাবু তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। বলছিলেন—শৈলেন দেশই ছেড়ে দিলে একবারে। বহুকাল আসে নি। খবর-টবর পাস্ কিছু? খবর ত প্রায় নেই বললেই হয়—তাই তাঁকে বললাম। অবশ্য একথা তখন ভাবতাম - উকিল মানুষ, বিদেশে আছ, না-জানি কত সুখেই আছ। মুখেও হয়ত সে ভাবটা কিছু প্রকাশ করেছিলাম। মতিবাবু তাই শুনে বল্‌লেন—আহা তাই হোক্, সুখে-স্বচ্ছন্দেই থাক্। বুদ্ধিমান সে বরাবরই, নিজের পথ নিজে ক'রে নেবেই।

শৈলেন। নিজের পথ যা করেছি তা আর ব'লো না, ভাই। মতিবাবু অবশ্য কসুর করেন নি কিছু। পাসও ক'রে গেলাম। সেই পুঁজিতে কলেজেও এক রকম মন্দ করি নি জান। কিন্তু হ'লে হবে কি? ভাগ্য যাবে কোথায়? মতিবাবু যে শুধু কড়া হেডমাষ্টার ছিলেন, তা নয়। তিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাও ছিলেন। একটা দিনের কথা আমার সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে। তুমি সেদিন ক্লাসে ছিলে কি না সে-কথা মনে নেই। ডিক্‌টেশ্যনের ক্লাস তখন। বানান-ভুল বা গ্রামার-ভুলের উপর তাঁর কি রকম রাগ জান ত? ষ্টারভেশ্যন বানান লিখেছিলাম Starvasion; যেমন খাতা নিয়ে গেছি টেবিলের কাছে, আর যাবে কোথায়! 'গাধা, ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ছ, এখনও ষ্টারভেশ্যন বানান ভুল'—ওই না ব'লে সিংহবিক্রমে চুলের মুটি ধ'রে টেবিলের উপর মাথাটি চিৎ ক'রে ফেল্‌লেন, আর খড়ি দিয়ে বেশ জোরেই কপালের উপর ষ্টারভেশ্যনের শুদ্ধ বানান "Starvation" লিখে দিলেন। সেই যে কপালে লিখে দিলেন ষ্টারভেশ্যন, সে লেখা আর মুছল না।

কথাটায় দু-জনেই খানিকটা হাসিল। কিন্তু সে হাসি প্রাণহীন।

উপেন বলিল—চল যাই, বেলা হ'ল।

দু-জনে তখন উঠিল।

সোজা পথ হইতে ডান দিকে খানিকটা গেলেই মাইনর-স্কুলের পুরাতন হেডমাষ্টার মতি বাবুর বাড়ি। তিনি আজ পর্য্যন্ত ঐ স্কুলে ছেলেদের প্রায় তিন পুরুষ পড়াইয়া আসিতেছেন।

শৈলেন বলিল—চল একবার স্যরের সঙ্গে দেখাটা ক'রে যাই। আর হয়ত সময় না হ'তেও পারে।

উপেন বলিল—বেশ, চল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই জনে মতিবাবুর বাড়ির সম্মুখে পৌঁছিল।

সাধারণ পাকা একতলা পুরানো বাড়ি। প্রাঙ্গণ বাড়ির হিসাবে যেন একটু বড়। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপ—খড়ের চাল।

মতি বাবু বৃদ্ধ; কিন্তু এখনও দেখিলে মনে হয় শরীরে বিলক্ষণ বল আছে। বড়দিনের ছুটি। বাড়ির সম্মুখে বাগানে বসিয়া কাজ করিতেছেন।

শৈলেন ও উপেনকে দেখিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন। দু-জনেই প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মতি বাবু উভয়কে বসিতে বলিলেন। চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় একখানা চৌকি বিছানো ছিল; তাহার উপরে একখানা পুরানো পাটি পাতা। গুরু বসিতে ছাত্রদ্বয় তাঁহার অনুমতি পাইয়া এক প্রান্তে বসিল।

ভাগলপুর ত বাংলা দেশ বলিলেই হয়। সেখানে চাউল, আটা, ঘি, মাছ ইত্যাদির দর কি, ভাগলপুরে গাই যে লোকে বলে সেখানকার গরু কি সত্যই বিখ্যাত; ওকালতি বেশ ভাল রকমই চলিতেছে ত ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরে খানিক সময় কাটিল। উঠিবার সময় কথায় কথায় উপেন বলিয়া ফেলিল—স্যর, ও ত এত বুদ্ধিমান্ ছিল; ওকালতিতে তেমন সুবিধে করতে পারল না। টিউশনি ক'রে খেতে হয়। ও বলছিল কি জানেন স্যর? এক দিন ও ষ্টারভেশ্যন বানান ভুল করে; তাই নাকি আপনি ওর কপালে খড়ি দিয়ে বিধাতাপুরুষের মত ষ্টারভেশ্যনের ঠিক বানানটা লিখে দেন। সেই যে কপালে ষ্টারভেশ্যন লেখা রইল, আজ পর্য্যন্ত, তাই 'ষ্টার্ভ' করতে হচ্ছে।

মুহূর্ত্তে মতিবাবুর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তিনি ম্লান মুখে বলিলেন—হ্যাঁ, শৈলেন, তাই নাকি? তা হ'লে ত অনেকগুলি ছেলেপুলে নিয়ে বড় কষ্টে আছিস? আহা!

সঙ্গে সঙ্গে মতিবাবুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

শৈলেনের চোখের কোণও যেন ভিজিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করিয়া মতিবাবুর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম

করিয়া শৈলেন উঠিয়া পড়িল। একটু যেন ধরা-গলায়—তা হ'লে এখন আসি স্তর—বলিয়া বাহিরে আসিল।

পথে আসিয়া দু-জনেরই মনে হইল ও-কথাটা মতিবাবুকে না বলিলেই বুঝি ভাল হইত।

শৈলেন একবার পিছন ফিরিতে দেখিল মতি-মাষ্টার তখন তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতেছেন। তাঁহার চোখের দুটি কোণ জলে চিক্ চিক্ করিতেছে।

সাম্‌নেই মোড়। মোড় ফিরিয়া শৈলেন জোরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। উপেন হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিল।

মতি-মাষ্টারের চোখে জল তাহাদের দু-জনের কেহই পঠদ্দশায় কল্পনা করিতে পারিত না।

নারীর শেষ উক্তি

(ব্রাউনিঙের A Woman's Last Word হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।

মিছে দু-জনে যুঝিয়া মরি, তর্কে কিবা ফল!
থাক্ বচসা, থামুক্ আঁখিজল।
সকলি ঠিক্ হোক্ তেমনি যেমন ছিল আগে,
নয়নকোণে নিদুটি যেন লাগে।

বল্‌গা-হারা বাণীর পারা অসহ অকরুণ
কি আছে ভবে এমন নিদারুণ?
শ্যেনসম ভীষণ হও উগ্র হই আমি
আপনা ভুলি তর্কে যবে নামি।

ওই দেখ না দর্পভরে আসিছে বাজপাখী,
ক'য়ো না কথা, তর্ক রাখ ঢাকি।
কপোল 'পরে কপোল রাখি নিবার মুখরতা
মোদেরে ঘেরি রহুক্ নীরবতা।

বিতণ্ডায় সত্য হায় মিথ্যা হয়ে যায়
তোমার কাছে। যেও না ধরি পায়
মনসাতলে, তুলিয়া ফণা রয়েছে কাল ফণী
শোন নি তার ভীষণ গুমরনি?

বিষ-বিটপী শাখার পরে দুলিছে রাঙাফল,
পাড়িতে তারে যেও না তরুতল।
সেথায় গেলে জনম তরে আমি অথবা তুমি
হারাব মোরা এই স্বরগভূমি।

নিঃশেষিয়া দিনু তোমারে জীবন যৌবন,
অর্পিলাম এ মোর তনু মন
তোমারি হাতে; যেমন খুশী আমারে তুমি লহ
তোমারি নাথ, রহিনু অহরহ।

আজিকে নয়, এ নিশি শেষে আসিবে দিবা যবে
জানি বাসনা পূর্ণ মোর হবে।
রহিল দুখ কবরতলে আজি এ রজনীতে
আঁখি-আড়ালে অন্তর নিভৃতে।

পরাণ-বঁধু, মানে না মানা অবোধ আঁখি হায়,
দু-ফোঁটা জল ফেলিতে তবু চায়।
প্রেমবান্ধব স্পর্শাতুর নিদ্রা ঘন ঘোর
জানি চেতনা হরিয়া লবে মোর।

ব্রহ্মদেশের ছেলেমেয়ে

শ্রীসুরুচিবালা রায়

সকালবেলা জানালা দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়লো, আমাদের প্রতিবেশীদেরই ছোট একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। ছোট একটি প্লেটের উপর খানিকটা ক'রে খাবার সাজিয়ে ও তার উপর একটি ক'রে ফুল রেখে প্রতিবেশীদের বাড়ি বিলোতে চলেছে, তার পেছনে তাদের বাড়ির ঝি'র হাতেও একটি ট্রে'তে ক'রে ঐ রকম প্লেট সাজানো। ছোট মেয়েটির পরনে লাল টুকটুকে রেশমী লুঙ্গী, মাথায় জড়ানো ফুল, এবং পায়ে সোনার মল। তার ছোট খোকন-ভাইটির আজ সাত দিন বয়স হয়েছে, আজ প্রথম তাকে দোলনায় চ'ড়ানো হবে, আজিকার এই মিষ্টি বিলোনো তারই জন্য।

এই যে ছোট্ট শিশুটি এখন নিতান্ত অসহায় ভাবে চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে আছে, মাস-দুয়েক হ'তে হতেই, একে নাচের তাল শেখানো আরম্ভ হয়ে যাবে, তার দিদিরা এবং মা-মাসীরা তার কচি কচি হাত দু'খানি আস্তে আস্তে এপাশে-ওপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, সুর ক'রে ক'রে গান গাইতে থাকে, বুদ্ধি জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই যে সুরটি শিশুর কান এবং মনকে প্রথম অভিনিবিষ্ট ক'রে তোলে, সে সুর শিশুটি কখনও ভোলে না, একটু বড় হয়ে পাঁচ-ছ মাস বয়স যখন তার হয় তখন তার পাশে ব'সে, মা এবং দিদিরা যখন ওরকম সুরে গান গাইতে থাকে, শিশুটি তখন তার কচি কচি গাল দুটিতে মৃদু মৃদু হাস্তে হাস্তে আপনিই কি চমৎকার ক'রে হাত দুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচের ভাব ফুটিয়ে তোলে, যে, চোখে দেখলে আর আশ্চর্য্য না-হয়ে থাকা যায় না! ক্রমে ক্রমে শিশুটি যখন আরও বড় হ'তে থাকে অর্থাৎ দেড় বছর দু-বছর বয়সের হয়; তখনই গ্রামোফোনের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিংবা দাদা-দিদিদের গানের সঙ্গে সঙ্গে, কি সুন্দর ক'রেই শিশুটি নাচতে থাকে! একটি দুটি নয়, এদেশে প্রত্যেকটি ঘরে প্রত্যেকটি শিশুই এই রকম।

এই রকম ক'রে নেচে গেয়ে লাফালাফি ছুটোছুটি ক'রে শিশুটি পাঁচ-ছ বছরের হ'য়ে তখন থেকেই তার শিক্ষা আরম্ভ হয়—সাধারণতঃ গরিব গৃহস্থঘরের ছেলেরা এই বয়সেই নিকটস্থ ফুঙ্গি চাউঙ্গে (ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম) গিয়ে থাকে। সেখানে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্ম্মশিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে, সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইখানে তাদের কখনও অনাবশ্যক কুঁড়েমি করতে দেওয়া হয় না, সূর্য্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে স্তোত্রপাঠ শেষ ক'রে ছেলেরা নিত্য নিয়মিত ভাবে ভিক্ষায় বেরোয়, পাড়ায় পাড়ায় প্রতি ঘরে ঘরেই তাদের জন্য ভাত-তরকারী রাঁধাই আছে,—সেগুলো আশ্রমে নিয়ে এলে, বেলা এগারটার সময় ছেলেদের আগে খাইয়ে তার পর ফুঙ্গিরা, অবশিষ্ট যা-কিছু থাকে নিজেরা তাই ভাগ ক'রে খান। দ্বিপ্রহরে স্কুলে পাঠাভ্যাসের পর বিকালে বাজার করা, আশ্রম পরিষ্কার রাখা, নিকটস্থ নদী থেকে জল তোলা, এবং নানা রকম খেলাধুলোর পর আহারাদি শেষ ক'রে আবার সন্ধ্যার পর স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হয়, ফুঙ্গিরা বিকালে কখনও আহার করেন না, ছেলেদের জন্য এই বেলা আশ্রমেই রান্না হয়, পাড়াতেই বাড়ি হ'লে কোন কোন ছেলে বাড়িতেই গিয়ে খেয়ে আসে।

এই রকম ক'রে ফুঙ্গি চাউঙ্গে থেকে যে-সব ছেলে মানুষ হয় এবং দীর্ঘদিন এই ফুঙ্গিদের সঙ্গেই থাকে, ফুঙ্গিরা সযত্নে তাদের সকল রকম শিক্ষাই দিয়ে থাকেন, এবং ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত বিষয়ই এদের আয়ত্ত হয়ে যায়। কোন কোন ছেলের মন এই সব সুন্দর সংসর্গে থেকে ক্রমে এমনই হয়ে যায়, যে, সে আর সংসারাশ্রমে ফিরে যায় না; এই সব আশ্রমে মেয়েদের কোন স্থান নেই, ফুঙ্গি চাউঙ্গে পড়বার অধিকার মেয়েরা পায় না। ফুঙ্গি চাউঙ্গে গিয়ে বাস করবার এবং পড়বার অধিকার মেয়েরা পায় না সত্য, কিন্তু অন্যান্য স্কুল এবং পাঠশালা ইত্যাদিতে ছেলেরা এবং মেয়েরা একই সঙ্গে পাঠাভ্যাস ক'রে থাকে। মিশনরীদের কয়েকটা স্কুল ছাড়া, মেয়েদের পৃথক স্কুল কোথাও নেই।

আজকাল ইংরেজী-শিক্ষিত অনেক পিতামাতা তাঁদের

ছেলেদের ফুঙ্গি চাউঙ্গে পড়তে দেন না, প্রথম থেকেই তাদের ইংরেজী স্কুলে পাঠিয়ে দেন। স্কুলে গিয়ে এদের ইংরেজী ভাষাটা শিক্ষার দিকেই ঝোঁক হয় বেশী, এবং স্কুলে যাবার বছর-খানেক পর থেকেই, শুদ্ধ-অশুদ্ধ নানা রকম উচ্চারণ ক'রে এবং অনেক ভুল ক'রে ক'রে ইংরেজীতেই এরা পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন করতে আরম্ভ করে,—তার পর আরও দু-তিন ক্লাস পড়তে পড়তেই, কাজ চালিয়ে যাবার মত ইংরেজী ভাষা এরা বেশ বলতে পারে।

বর্ম্মা ছেলেমেয়েরা সদাই সদানন্দ,—জন্মাবধিই এরা আনন্দের মধ্যেই মানুষ হ'তে থাকে। মানুষের জীবনের সব চেয়ে যা বড় দুঃখ, আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়ে থাকা, আমাদের দেশে এই রকম এক-একটা মৃত্যু, সংসারটাকে কতদিন যা আর মাথা তুলতেই দেয় না, প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবেরাও এই সময়ে সময়োচিত দুঃখিত ব্যবহারে এবং আরও কত ভাবে বাড়িটিকে যেন কত কাল ধরেই দুঃখের কালো একটি ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। কথাবার্ত্তায় চলাফেরায় আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের আসা-যাওয়ায়, সকল কিছুতেই যেন প্রতিনিয়তই নূতন নূতন ক'রে দুঃখ বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। মৃত্যু এদের দেশেও আছে, দুঃখ বেদনা শোক তাপ সে সব মানুষ মাত্রেরই আছে, কিন্তু সে শোক এঁরা চাপা দিতে জানেন, শোকে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে থাকা এদেশে কখনও দেখি নি। আলো বাতি ফুল সাজসজ্জা এবং খেলায় মৃতের গৃহে যেন একটি উৎসবের সমারোহ পড়ে যায়। উজ্জ্বল বেশে বন্ধুবান্ধবদের আগমনে এবং চা সিগারেট ইত্যাদি দিয়ে ওঁদের পরিতৃপ্ত করা, এগুলি এদেশের সামাজিক নিয়ম। মনের ভিতর যত শোকই থাক, সুসজ্জিত গৃহে বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা করা এদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

বোধ হয়, এত বড় শোকটি এত সহজে জীবনের মধ্যে সহনীয় ক'রে নিতে পারার জন্যই, অন্য কোন রকম দুঃখ বেদনা এরা গ্রাহ্যই করে না। ছোট ছোট শিশুরা এই জন্যই একটা সহজ আনন্দ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, এবং এই আনন্দই ওদের সারা জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্যের সহস্র অভাবেও ক্লিষ্ট ক'রে ফেলে না। এমন একটি সুন্দর সন্ধ্যা বাদ যায় না, যেদিন না দেখতে পাই পাড়ার সব হৃষ্টপুষ্ট ফুলেরই মত সুন্দর কচি কচি ছেলেমেয়েগুলি বাড়ির সম্মুখের রাস্তায় সবাই মিলে গ্রামোফোনের অনুকরণে গান গাইছে, এবং পোয়ে নাচের মত সমস্ত দেহখানিতে ময়ূরের প্যাখম তোলার চেষ্টা ক'রে ক'রে নাচছে এবং এমন একটি সুন্দর চাঁদিনী রাতও বাদ যায় না, যেদিন না স্কুলের তরুণ ছেলেদের দেখতে পাই, বেহালা এবং ম্যাণ্ডোলিন কিংবা ব্যাঞ্জো নিয়ে নিয়ে সমস্ত শহরের রাস্তা ঘুরে ঘুরে কত রাত অবধি গান গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে। পরীক্ষায় ফেল হ'লেও এদের তত দুঃখ হয় না, যত দুঃখ হয়, শহরের একটি পোয়ে-নাচ দেখতে না পেলে কিংবা জ্যোৎস্না-রাতে বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে গানের আড্ডায় যোগ দিতে না পেলে। ফুটবল খেলা, সাঁতার কাটা - সব কিছুতেই এদের সমান উৎসাহ। বিকেলে নদীর চরে বেড়াতে গেলে দেখতে পাই দলে দলে ছেলেরা ইরাবতীর বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁতার কাটছে, সারাদিনের কাজের পর বৈকালিক আহার সমাপ্ত হলেই এদের স্নানের নিয়ম। নদীর বিস্তৃত চরে এখানে-ওখানে কোথাও ছেলেরা, কোথাও মেয়েরা দল বেঁধে স্নান করতে এসেছে, মেয়েরা কেউ কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ বা পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে গল্প করতে করতে কাপড়-কাচা, সাবান-মাখা শেষ ক'রে নিয়ে, স্নানশেষে কলসী মাথায় নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে, ছোট ছোট মেয়েদের মাথায়ও একটি করে কলসী, আনন্দোজ্জ্বল দীপ্ত মেয়েগুলি অবলীলাক্রমে কলসী ভ'রে জল নিয়ে বাড়ি যায়, গান গাইতে গাইতে আবার দল বেঁধে সব ফিরে আসে, বাড়ির যত জলের প্রয়োজন, তার বেশীর ভাগ এই ছোট মেয়েরাই চার বারে পাঁচ বারে নিয়ে পূরণ ক'রে দেয়। অবশ্য সাধারণ গৃহস্থ ঘরেই এ রকম হয়, সরকারী কর্ম্মচারীদের বাড়িতে জল দেবার জন্যে কুরঙ্গী পানিওয়ালা আছে, বাড়ির যত জলের প্রয়োজন, তারাই তা তোলে। কোন কোন বিশেষ দিনে বা গরমের দিনে প্রায়ই দেখা যায়, পাড়ার বয়স্থা মেয়েরা সবাই নিজেদের পাড়ার ফুঙ্গি চাউঙ্গে জল দিতে যাচ্ছে, এক-একটি দলে ত্রিশ-চল্লিশটি সুসজ্জিতা তরুণী, সবারই মাথার কলসী ধবধবে সাদা পাতলা কাপড়ে ঢাকা, এই দিনটিতে অনেক সরকারী কেরানীর মেয়েরাও এদের সঙ্গে যোগ দেয়, কেন-না, ফুঙ্গি চাউঙ্গে জল দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবার লোভ সবারই আছে।

কোন বড় বড় পূজা-পার্ব্বণের আগে কতবার দেখেছি

স্কুলের বড় বড় ছেলেরা, নিজেরা আলাদা ক'রে পূজো করবে ব'লে চাঁদা তুলতে বেরিয়েছে, সুন্দর সুসজ্জিত পোষাক, হাতে রূপোর একটি বাটি, মুখে মিষ্টি হাসি এবং মিষ্টি কথা, দেখলেই স্নেহের উদ্রেক হয়, সবাই এদের অন্যত্র যা দেয় তার চেয়ে বেশীই কিছু দিয়ে থাকে। সেগুলো দিয়ে এরা সাধারণতঃ ফায়ার বিস্তৃত অঙ্গনটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে নিয়ে, মনোমত ভাবে সাজিয়ে তাতেই পূজো করে। শহরের লোক নিজেদের পূজো শেষ ক'রে ওদের ওখানেও দেখতে যায়। ফায়ার সম্মুখস্থ বেদীটি (বলা বাহুল্য বর্ম্মাদেশে মন্দিরকেও ফায়া বলে, এবং বুদ্ধদেবকেও ফায়া বলে) নানা রকম খাদ্যে এবং ফুলফলের নৈবেদ্য দিয়ে সাজানো হয়েছে, নানা রকম কেক বিস্‌কুট চকলেট এবং আরও যা-কিছু পাওয়া যায়, সকল কিছুই ফায়ার সম্মুখে ভোগের জন্য দেওয়া হয়। কাছে ব'সে ছেলেরা সব গান-বাজনা করছে; অতিথি-অভ্যাগতকে সসম্মানে সরবৎ পান করতে দিচ্ছে, আরও ছোটখাটো উৎসবের আয়োজন আছে। সানন্দে এবং ভক্তিপ্লুত চিত্তে অতিথিরাও এ পূজোয় যোগদান করেন। অতি গম্ভীর সরল উদার, আকাশচুম্বী বিশাল ফায়া, নীচে অথই জলে কানায় কানায় ভরা স্বচ্ছ সুন্দর ইরাবতী, এর মাঝে এই তরুণদের এই পূজার আয়োজন,—কি সুন্দরই যে লাগে!

ফায়ার সঙ্গে পরিচয় এদের অতি ছোট বয়স থেকেই করানো হয়ে থাকে। আমাদের দেশে যেমন ব্রাহ্মণ ছেলেদের উপবীত দেওয়া হয়ে থাকে, এদের তেমনই প্রত্যেকটি ছেলেরই 'সিমপিউ' হয়ে থাকে। এ বিষয়ে গরিব-দুঃখীদের ঘরেও যেমন ওরা সর্ব্বস্ব ব্যয় করেও আয়োজন ক'রে থাকে, বড় বড় জমিদার বা উকিল ব্যারিষ্টার জজদের ঘরেও তেমনই ছেলেদের এই সিমপিউতে যথেষ্ট ব্যয় করা হয়। আমাদের দেশে বিবাহাদি উৎসবে যেরূপ খরচ করা হয় এদের সিমপিউতেও তেমনই করা হয়ে থাকে। এই সিমপিউ হচ্ছে বুদ্ধদেবের অনুকরণে সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসগ্রহণ, এবং সন্ন্যাসীদের আশ্রমেই দিনকয়েক থেকে, প্রভাতে ভিক্ষে ক'রে এনে একবেলা ক'রে খাওয়া। এই সিমপিউতে বড়লোকদের ঘরে ক'দিন ধরেই যে রাজোচিত উৎসব হয়ে থাকে, তা দেখবার জিনিষ।

বঙ্গদেশে ক্ষয়রোগ

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জার্ম্মেনী

ক্ষয়রোগ বঙ্গদেশে যে-ভাবে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ভয় হয় যে ইহাও অচিরে বাঙালী জাতির ধ্বংসের এক কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, বিশাল প্লীহাযুক্ত উদর ও অস্থিচর্ম্মসার দেহ বাংলার জনসাধারণের সাধারণ রূপ বলিয়া বহুদিন হইতেই জানা আছে। বহু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও অগণিত পোষ্ট-আপিসের কুইনাইন থাকা সত্ত্বেও বাংলার এই রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। কালাজ্বর আসাম ও উত্তর-বঙ্গে জনক্ষয় করিয়া এখন একটু প্রশমিত হইয়াছে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর কৃপাও মাঝে মাঝে বিকট রূপেই দেখা যায়। ইহার উপর যদি ক্ষয়রোগ কৃপা প্রকাশ করেন, তবে বোধ হয় বঙ্গদেশে শতকরা এক জন লোকও আর সুস্থ থাকিবে না।

প্রতি জেলাবোর্ডেই ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি নিবারণের ও জনসাধারণের বিশুদ্ধ দ্রব্যাদি পাইবার ব্যবস্থা আছে। কতক বোর্ডে কুষ্ঠনিবারণ এবং চিকিৎসারও সুব্যবস্থা আছে। কিন্তু অধিক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ক্ষয়রোগ নিবারণের কোন ব্যবস্থা নাই। ইহার হয়ত একমাত্র কারণ এই যে, ক্ষয়রোগের প্রতিষেধক কোনও ঔষধ বা ইন্‌জেকৃশ্যন নাই। থানায় থানায় স্যানিটরী ইন্‌স্পেক্টরগণ কুইনাইন বিলাইয়া এবং টীকা ও কলেরার ইন্‌জেকৃশ্যন দিয়াই রোগ-নিবারণের কার্য্য সমাধা করেন। জনসাধারণকে রোগ

সম্বন্ধে শিক্ষাদানই যে রোগ-নিবারণের একটি প্রকৃষ্ট উপায় তাহা আমাদের স্মরণ থাকে না। অনেকে হয়ত বলিবেন যে জনসাধারণ শিক্ষিত না হইলে রোগ সম্বন্ধে শিক্ষাদান সম্ভবপর নহে। ইহা কোন ক্রমেই স্বীকার্য্য নয়। ইউরোপেও বহু অশিক্ষিত লোক আছে—বহু বিষয়ের তাহারা কিছুই জানে না। ইহা আমার কল্পনাপ্রসূত উক্তি নহে—এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তাহা স্বীকার করেন, এবং যে-কোন ভারতবাসী এখানকার নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সংশ্রবে আসিয়াছেন তিনিই জানেন। ইহা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ইউরোপীয় দেশসমূহে অন্য দেশের প্রোপাগাণ্ডা মিনিষ্টার আছেন এবং তিনি নিজের দেশকে অন্য দেশের চক্ষে সর্ব্বদাই বড় করার চেষ্টা করেন। সুতরাং সেন্‌সস্ এবং ষ্টাটিষ্টিক্‌সও সেইভাবে সংশোধন করেন। আর আমাদের দেশে হয় ঠিক বিপরীত। ভারতীয়রা সব বিষয়েই হীন ইহাই ভারতের বাহিরের দেশসমূহে প্রচারের জন্য রিপোর্টগুলিও সেইভাবে তৈয়ারী হয়। আর সেই রিপোর্টে আস্থা স্থাপন করিয়া আমরা ভাবি, অন্য দেশের তুলনায় আমরা কিরূপ অশিক্ষিত! যত বেশী অশিক্ষিত আমরা নিজেদের ভাবি, ততটা কিন্তু আমরা নই। বিদেশে আসিলে তাহা সহজে বোধগম্য হয়। শিক্ষিত হউক বা অশিক্ষিত হউক, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইহাদের মস্তিষ্কে বহুবার বহুরূপে প্রবেশ করান হয়—গভর্ণমেণ্ট করে। আর আমাদের দেশে জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য মোটেই চেষ্টা করা হয় না। চেষ্টা করিলে যে কোন ফল হইবে না ইহা অসম্ভব। মৌখিক জ্ঞানদানের জন্য কোনও প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, যদি লোকের মস্তিষ্ক থাকে। সমস্ত মস্তিষ্ক এই দেশেই আশ্রয় লইয়াছে ইহা ত স্বীকার করা যায় না।

যাহা হউক, প্রচারকার্য্য স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্ম্মিগণের চিন্তার বিষয়। ইহা মনে হয় যে সাধারণকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান করা ব্যতীত এ ভয়াবহ রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোনও উপায় নাই। এ-পর্য্যন্ত ইহার কোনও উপযুক্ত চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নাই—কোনও ফলপ্রদ প্রতিষেধকও নাই। কিন্তু তবুও ইউরোপীয় দেশসমূহ এ রোগকে বহুল পরিমাণে দমন করিতে পারিয়াছে সাধারণের শিক্ষা ও বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান দ্বারা। ইহাদের প্রচার-বিষয়ক ও প্রতিষ্ঠান-সম্বন্ধীয় আলোচনাই এ-প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

প্রথমে বিবেচ্য, ইহারা কি শিক্ষা দান করে। জার্ম্মান বিশেষজ্ঞগণের মতে খাদ্যাভাব, উপযুক্ত সূর্য্যালোকের অভাব, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুষ্ট বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা প্রভৃতি কারণ দেহের রোগ-নিবারণী শক্তির হ্রাস করে। তার পর কোনও ক্ষয়রোগীর সংস্পর্শে আসিলে দেহ সহজেই ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এখন আলোচ্য বিষয়, এই সব কারণ আমাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য কিনা।

খাদ্যাভাব বঙ্গদেশে এখন খুবই হইয়াছে। তাহার অর্থ ইহা নহে যে, সকলেই অনশনে দিনযাপন করি। বৈজ্ঞানিক মতে খাদ্যাভাব মানে বুঝায় পুষ্টিকর ও শরীরের ইষ্টজনক খাদ্যের অভাব। পাকস্থলী একটি থলিয়া মাত্র—ইহা লৌহদ্বারাও পূর্ণ করা যায় অথবা স্বর্ণদ্বারাও পূর্ণ করা যায়। আমরা এখন লৌহদ্বারাই পূর্ণ করিয়া থাকি—স্বর্ণ-নির্ণয়ের ক্ষমতা আমাদের নাই। রেস্তরাঁর চপ, কাটলেট, চা, ছাত্রগণের সর্ব্বনাশ সাধন করে,—অতিরিক্ত ভেজাল দ্রব্য সংযুক্ত আহার মেসের বাঙালীর ও অবস্থাপন্ন লোকের অনিষ্ট করে, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই চাকর-ঠাকুরের উপর নির্ভর করেন বলিয়া;—মাতৃদুগ্ধাভাব বা অতিরিক্ত পেটেণ্ট ফুড শিশুর স্বাস্থ্য ধ্বংস করে। আমরা হয়ত অনেকেই ঐরূপ অনিষ্টকর খাদ্য পেট ভরিয়া খাই এবং ভাবি খুবই খাইলাম, কিন্তু খাইলাম সত্যই বিষ এবং তাহার ফল হইল এই যে পেটের রোগে যন্ত্রণা পাইতে লাগিলাম, সতের-আঠার বছর বয়সে ডিস্‌পেপসিয়া হইল, বহুপ্রকার দেশী-বিলাতী ঔষধ সেবন করিলাম, এদিকে পুষ্টির অভাবে শরীর ধ্বংস হইতে লাগিল—তার পর পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সে অকালবৃদ্ধ সাজিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সেই সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমাদের পিতৃপিতামহগণের ত এরূপ দুর্দ্দশার কথা শুনিতে পাই না। তাঁহারা রেস্তরাঁয় কখনও আহার করেন নাই। রেস্তরাঁর উৎপত্তি অতি আধুনিক। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতেই ইহার উৎপত্তি। কিন্তু ইউরোপীয় রেস্তরাঁর ও আমাদের কলিকাতার অলিতে-গলিতে রেস্তরাঁর অনেক প্রভেদ। কলিকাতার রেস্তরাঁতে কখনও ভাল খাবার পাওয়া যায় না, সেটা আমাদের রেস্তরাঁ-ওয়ালাদিগের শিক্ষার দোষে ও স্বাস্থ্য-কর্ত্তাদিগের ত্রুটির জন্য—নহিলে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের

ডাক্তারের কলেরা হয়? কিন্তু ইউরোপে প্রায় সবাই রেস্তরাঁতেই প্রধান আহারগুলি সমাধা করে—সখের খাওয়া নয় কলিকাতার মত। এগুলি স্বাস্থ্য-কর্ত্তাদের বিশেষ কড়া নজরে থাকে। তাহা ছাড়া রেস্তরাঁ-ওয়ালাদের দেশপ্রীতিও আছে। তাহারা জানে যে দু-পয়সা বেশী লাভ করিতে গেলে দেশের লোকেরই স্বাস্থ্য ধ্বংস হইবে এবং তাহারা জানে কোন্ প্রকার খাদ্য কিরূপ স্বাস্থ্যকর। বিস্ময়ের বিষয়, ছোট ছোট পেনসেনের গৃহকর্ত্রীরাও কোন্ খাদ্যে কত ক্যালরি (calory) আছে বেশ বলিতে পারে। সখ করিয়া সস্তায় রেস্তরাঁয় খাইতে গিয়া আমরা নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করি।

ইহা ছাড়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আর একটি কারণে স্বাস্থ্যবান্ ছিলেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ দ্রব্য পাইতেন। তখন ভেজালের অত প্রাচুর্য্য ছিল না। কর্পোরেশন ও জেলাবোর্ড কঠোর আইন দ্বারা উহা দমনের চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু সফল হওয়া খুবই কঠিন। এ বিষয়েও প্রচারকার্য্য আবশ্যক—লোকের যাহাতে আবার পূর্ব্বকালের সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসে। এখানে যে-কোন ব্যবসায়ী যে-কোন দ্রব্য, বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য, দিবার সময় উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেয়। আমাদের দেশে ক্রেতাদেরই উত্তমরূপে দেখিয়া লইতে হয়, নতুবা ঠকিতে হইবে। এদেশে যাহা সম্ভব আমাদের দেশে তাহা অসম্ভব হইবে কেন?

আর শিশুদের স্বাস্থ্যের এখন প্রধান অন্তরায় মাতৃ-দুগ্ধাভাব। মায়েদের নিজেদের শরীর ভাল না থাকিলে শিশুর দেহের পুষ্টি হইবে কি করিয়া। মায়েদের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ারও কারণ খাদ্যাভাব। মায়েদের গর্ভাবস্থায় আমাদের অনেকেরই স্মরণ থাকে না যে তখন তাঁহাদের এক আহারেই দুইটি দেহের পুষ্টি সাধন করিতে হয় এবং প্রসবের পর ভুলিয়া যাই যে প্রসবের সময় অন্যূন এক সের রক্ত শরীর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত আহার্য্যদ্বারা তাহা পূরণ না-করিয়া অনেকে আমরা ম্যানোলা, ভাইব্রোনা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের আশ্রয় লই। কিন্তু সকলেই জানেন, উহাদের ফল কিরূপ ক্ষণস্থায়ী। শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধ আজকাল প্রায় আকাশ-কুসুম হইয়াছে। যাহা হউক, মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলেই আমাদের গৃহে তৎক্ষণাৎ আসে একটা ফিডিং বোতল, স্পিরিট ল্যাম্প ও একটি পেটেণ্ট ফুড—এলেনবেরী বা গ্লাক্সো বা অন্য কিছু। ইহা অপেক্ষা অনিষ্টকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে। আমরা ইহা ভুলিয়া যাই যে ঐ সব ফুডের আবির্ভাব দশ-পনর বছর পূর্ব্বে হয় নাই। ঐ সময় হইতেই শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকা দূরে থাকুক, ক্রমশই খারাপ হইতেছে। শিশুদিগের লিভার খারাপ আগে খুব কমই শোনা যাইত, এখন ইন্‌ফ্যানটাইল লিভার বহু দেখা যায়। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া যদি আমাদের শিশুর খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা অনুতাপের বিষয় আর কি আছে। যত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ই থাকুক না কেন, শুষ্ক দুগ্ধ ও সাধারণ গো-দুগ্ধের প্রভেদ অনেক। আমরা সাধারণ বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত শুষ্ক গোদুগ্ধের সাহায্য লই অতি বিচিত্র ব্যাপার। কেবল শুষ্ক দুগ্ধই নহে, উহাদের সহিত হজমী ঔষধও থাকে। ঐ সব হজমী ঔষধ শিশুর স্বাভাবিক হজমী শক্তি লোপ করিয়া দেয়। ইহা আমার আবিষ্কার নহে, বিশেষজ্ঞ শিশু-চিকিৎসকগণের মত। সুতরাং আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মাতৃদুগ্ধের পর গোদুগ্ধই শিশুর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য। অবশ্য গোদুগ্ধ শিশুর ভিন্ন-ভিন্ন বয়সে ভিন্ন-ভিন্ন অনুপাতে জল ও শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হয়। শিশুর খাদ্য-বিভ্রাটই অধিক পরিতাপের বিষয়। আমাদের পিতৃপিতামহগণ পেটেণ্ট ফুড না খাইয়াই বাঁচিয়া ছিলেন এবং আমাদের সন্তানগণ পেটেণ্ট ফুড খাইয়াও মরিতেছে। এ কোন্ সভ্যতার অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি? মহেঞ্জো-দারো, তক্ষশীলা, সারনাথ প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্ব সভ্যতার নিদর্শন, আর এখনকার বাঙালীর স্বাস্থ্য আমাদের পূর্ব্ব সভ্যতার পাশ্চাত্য ছায়ার অনুকরণ করার পরিণাম। ভারতের পক্ষে তাহার নিজের সভ্যতাই বজায় রাখা ঠিক নয় কি? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা আহার করিতেন তাহা যে সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিল তাহার প্রমাণ তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও পরমায়ু। আমরা যদি আবার পূর্ব্বকালের বিশুদ্ধ আহার পাইতাম, তবে বোধ হয় সহস্র ভিটামিন, প্রোটিন, ফ্যাট, কার্ব্বোহাইড্রেট, ক্যালোরি তাহার কোনও ত্রুটি ধরিতে পারিত না।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় সূর্য্যালোক। সূর্য্যালোকের অভাব

আমাদের দেশে কোনও কালেই নাই, কিন্তু আমরাই অতিরিক্ত সভ্যতার দ্বারা অভাব আনয়ন করিয়াছি। আমাদের এখন সর্ব্বক্ষণ বেশবিন্যাস করিয়া থাকিতে হয়, পাছে অসভ্যতা প্রকাশ পায়। বাড়ির ভিতরে খালি গায়ে থাকিতে পারি। কিন্তু কলিকাতার অধিকাংশ বাড়ির অভ্যন্তরে বেশীক্ষণ সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। কিন্তু তাহা করিলেই বা, সূর্য্যালোক উপভোগের পক্ষে মুক্তপ্রাঙ্গণই শ্রেয়। সেই জন্য ইউরোপে সব 'বাথ'-এর সৃষ্টি। এরা বৎসরে মাত্র তিন মাস গ্রীষ্মকাল পায়। তখন স্কুল, ইউনিভারসিটি প্রভৃতি বন্ধ থাকে এবং কার্য্যকারক বহুলোক অবসর গ্রহণ করে। সবাই বাথ-এ যায়—সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যালোক ভোগ করে, স্নান করে, আমোদ-প্রমোদ করে, শরীর সুস্থ রাখে। আমাদের স্নান অন্ধকার কলঘরেই সমাধা হয়। আমাদের গঙ্গা আছে, এতগুলি স্নান করার স্কোয়ার আছে, খুব ভীড় ত দেখা যায় না। পুরুষ কয় জন তবু দেখা যায়, স্ত্রীলোক ত নয়ই। আমাদের দেশে অনেকের পক্ষে স্নান করার সময় ঘটিয়া উঠে না বটে, কিন্তু যাঁহাদের সময় আছে তাঁহারাও মুক্ত স্থানে স্নান করেন না শ্লীলতাহানির ভয়ে। পুরুষের সভ্যতাহানির ভয় বোধ হয় আমাদের দেশের বিশেষত্ব এবং সেই জন্যই বোধ হয় 'লালিমা পাল' পুং-এর উৎপত্তি। এরা অতিসভ্য জাত, প্রায় সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়াই স্ত্রীপুরুষে স্নান করে ও সূর্য্যালোক উপভোগ করে। আমাদের দেশে গামছা পরিয়া স্নান করিলেই মিস্ মেয়োর পুস্তকে অসভ্যতার নিদর্শন রূপে স্থান পায়। আমাদের এখনও অতিসভ্য হওয়ার সময় আসে নাই। তবে সপ্তাহে দু-একবার গঙ্গা-স্নান করা খুবই ভাল। স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক স্নানের স্কোয়ার থাকাও আবশ্যক। তবে পুরুষমানুষ হইয়া সভ্যতার অজুহাতে সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যালোক উপভোগ করিতে না-পারা যে কোন্ সভ্যতার লক্ষণ বুঝিতে পারি না। আমরা সূর্য্যের দেশে থাকি বটে, কিন্তু তাহার সুবিধা গ্রহণ করি কই?

তৃতীয় আলোচ্য বিষয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম। বঙ্গদেশে অতি বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তিবর্গ আছেন। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা সমস্ত দিন চুপচাপ বসিয়া থাকেন, পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত অর্থ ভোগ করেন। আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ চালাইতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেও হয়। আবার যাঁহাদের অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, সাধারণতঃ তাঁহাদের আবার উপযুক্ত খাদ্যাভাব ঘটে। কাজেই এই সব পরিবারেই ব্যাধি হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য-বিষয়ক জ্ঞান ও তত্ত্বাবধান এই সব পরিবারেই বেশী প্রয়োজনীয়। জার্ম্মেনীতে ঠিক এরূপ অবস্থা নাই, কেননা ইহাদের কাহারও বৃহৎ পরিবার থাকে না। একান্নভুক্ত পরিবার ইহাদের অজ্ঞাত। কিন্তু যে-পরিবার বেকার, তাহারা সরকার হইতে সাহায্য পায়। আমাদের দেশে এরূপ সাহায্য স্বপ্নবিশেষ। তার পর কোনও ফ্যাক্টরীতে বা অন্য কোথাও কেহ আট ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারে না। আমাদের দেশে সে নিয়ম থাকিলেও অনেকে রাত্রে কাজ করে অর্থের লোভে, যদিও বাঙ্গালী মজুর খুব কম আছে। এই অতিরিক্ত পরিশ্রম বন্ধ করা খুবই শক্ত। যাহা হউক, ইহা খুব বেশী অনিষ্ট করে বলিয়া মনে হয় না।

পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয়, বিশুদ্ধ বায়ু। বিশুদ্ধ বায়ু কলিকাতার অনেক পুরাতন জনবহুল অঞ্চলে মোটেই নাই। সকালে ও সন্ধ্যায় রন্ধনশালার কয়লার ধোঁয়া কোনও চিমনি দিয়া সোজা উপরে না উঠিয়া সমস্ত বায়ুতে ছড়াইয়া পড়ে; রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের আবর্জ্জনায় রাস্তার বায়ু মলিন; যেখানে-সেখানে মলমূত্র, কাশ, থুথু প্রভৃতি নিক্ষেপ হেতু দুর্গন্ধে বায়ুর প্রতি কণা দুষ্ট হয় এবং সেই বায়ু প্রতি মিনিটে সতের-আঠারো বার করিয়া আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি। কত যে বিষাক্ত পদার্থ ভিতরে যাইতেছে এবং শরীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার অন্ত নাই। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, ইহা কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত গৃহের রন্ধনশালা সর্ব্বোপরি থাকা উচিত বা রন্ধনশালায় উচ্চ চিমনির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। গৃহকর্ত্তার বোঝা প্রয়োজন যে চিমনি গৃহের এক অতি প্রয়োজনীয় অংশ। চিমনিশূন্য-গৃহ ইউরোপে একটিও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তার পর রাস্তার আবর্জ্জনা বা মলমূত্র অথবা নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ বন্ধ করিতে হইলে জনসাধারণের সাহায্য প্রয়োজন এবং জনসাধারণকে ঐ সব কার্য্যের অতি শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞানদান

করাই স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তব্য। রাস্তার ডাষ্টবিন বা 'এখানে প্রস্রাব করিও না' বিজ্ঞাপন যে ফলপ্রদ নহে তাহা ত অতি স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু যখনই জনসাধারণ বুঝিবে এক-কণা নিষ্ঠীবন হইতে সহস্র সহস্র বীজাণু বায়ুতে ছড়াইয়া পড়ে, সহস্র মানব শ্বাস-প্রশ্বাসে তাহা ভিতরে লয়, প্রত্যেকেই বীজাণুর বিষক্রিয়ায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে, এক জন লোকের মুহূর্ত্তের অবহেলায় এক কণা নিষ্ঠীবন নিক্ষেপের জন্য সহস্র সহস্র মানব প্রাণত্যাগ করিতে পারে এবং সেই লোকই এই পাপের ভাগী হয়—তখন সকলেই যেখানে-সেখানে থুথু কাশ ফেলিতে ইতস্তত করিবে; পরে ইহাই অভ্যাসে দাঁড়াইবে, যাহা এখন ইউরোপে হইয়াছে। প্রথমেই সকলে এ কথা বিশ্বাস করিবে না, কবিকল্পনা বলিয়া মনে করিতে পারে; কিন্তু উপযুক্ত যুক্তি ও ছবি দ্বারা বার-বার বুঝাইলে লোকে বিশ্বাস করিবে না যে ইহা অসম্ভব।

জনসাধারণ যখন ইহা বুঝিতে পারে যে টীকা লওয়া প্রয়োজন এবং লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবৎসরই টীকা লইতেছে, তখন ইহা তাহারা বুঝিবে না কেন যে বায়ু দূষিত হইলে তাহাদেরই অনিষ্ট সাধন করে। বুঝাইবার খুব বেশী চেষ্টা করা হয় বলিয়া মনে হয় না। টীকা লইলে বসন্ত হয় না যত লোক জানে, তাহার বোধ হয় এক-শতাংশ লোকও জানে না যে একটি মাত্র ক্ষয়রোগীর যেখানে-সেখানে কাশ-নিক্ষেপহেতু বহু শত লোক ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয় এবং ক্ষয়রোগ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে শরীর সর্ব্বদাই সুস্থ ও সবল রাখা কর্ত্তব্য। রেলের কামরায় 'থুথু ফেলিও না' লেখা থাকা সত্ত্বেও ত থুথু ফেলা বন্ধ হয় না। থুথু যে কি অনিষ্ট করে তাহা না জানিলে বিজ্ঞাপনে কি করিবে। কই ইউরোপে ত কোথাও ঐরূপ বিজ্ঞাপন দেখি নাই। বিজ্ঞাপনে কোনও ফল না-হওয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আমরা ঐ বিজ্ঞাপনই দিই—যেন অন্য দেশের লোক জানিয়া যায় যে এখানে ঐরূপ বিজ্ঞাপন প্রয়োজন। লোক-দেখান ছাড়া উহার আর কি আবশ্যকতা আছে জানি না। লোকদের এ সমস্ত তথ্য অবগত করার ভার কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগের। এ দেশেও মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্য-বিভাগই প্রচার কার্য্য করে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, এখানে ইহারা অন্তঃপ্রেরণা লইয়া কাজ করে, আর আমাদের দেশে কেবল মাত্র মাস-মাহিনার খাতিরে লোকে কাজ করে। দেশপ্রিয়তা থাকিলে বোধ হয় আজ আমাদের বঙ্গদেশের এতদূর অধঃপতন হইত না।

অপর বিবেচ্য বিষয়, ক্ষয়রোগীর সংস্পর্শে অন্য কাহাকেও না-আসিতে দেওয়া। ইহা বড়ই কঠিন ও কষ্টদায়ক, বিশেষতঃ বাঙালীর মত স্নেহ-প্রবণ জাতের। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে রোগীই আমাদের অতি আপন—রোগের সঙ্গে যথেষ্ট শত্রুতা। যতটা সম্ভব রোগকে বাঁচাইয়া চলা বিশেষ কর্ত্তব্য। এ দেশে ক্ষয়রোগী সবাই স্যানাটোরিয়ামে থাকে। যত দিন পর্য্যন্ত কাশিতে জীবাণু থাকে তত দিন বাড়িতে যাইতে দেওয়া হয় না। বীজাণু উপর্য্যুপরি দুই সপ্তাহ না পাওয়া গেলে বাড়িতে যাইতে দেওয়া হয়। তবে কিছু দিন পরে পুনরায় স্যানাটোরিয়ামে আসিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে স্যানাটোরিয়াম নাই। রোগী বাড়িতেই থাকেন, সুতরাং রোগ ছড়াইয়া পড়ার যথেষ্ট সুবিধা হয়। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কিছুই থাকিতে পারে না। যুদ্ধের পর জার্ম্মেনীর এলাকা প্রায় বঙ্গদেশেরই সমান হইয়াছে, লোকসংখ্যাও প্রায় বঙ্গদেশের সমান। ক্ষয়রোগ এখন খুব কমিয়াছে। একমাত্র কলিকাতায় যত ক্ষয়রোগ হয়, সমগ্র জার্ম্মেনীতে এখন তাহা অপেক্ষাও কম ক্ষয়রোগ হয়। অথচ জার্ম্মেনীতে বিভিন্ন শহরে অন্যূন পঞ্চাশটি öffentliche বা সাধারণ স্যানাটোরিয়াম আছে। তিন সহস্র দরিদ্র রোগী উহাতে স্থান লাভ করিতে পারে। কিন্তু ইহাতেও ইহারা সন্তুষ্ট নয়। ইহা না কি তাহাদের পক্ষে অনেক কম। এই সমস্ত স্যানাটোরিয়ামে রোগীর পিছনে যাহা ব্যয় হয় তাহা যোগায় Kranken Kasse (kranken = রোগ, kasse = জমা) ও Versicherungs Anstalt (বা ইনসিওরেন্স কোম্পানী)। এখানে আইনতঃ প্রতি শ্রমিক ও কার্য্যকারকেরই মাস-মাহিনা হইতে শতকরা হিসাবে অতি অল্প কিছু Kranken Kasse বা Versicherungs Anstalt কাটিয়া লয়—যে উপায়ে আমাদের দেশে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের জন্য কাটা হয়। কাহারও অসুখ হইলে সেখানকার Kranken Kasse অথবা Versicherungs Anstalt-এ যাইতে হয় এবং তথা হইতে তাহাদের অনুমতি-পত্র লইতে হয়। সেই পত্র দেখাইয়া তাহারা যে-কোনও চিকিৎসালয়ে

স্থান পাইতে পারে। পরে ঐ সব চিকিৎসালয়ে রোগীর জন্য যাহা ব্যয় হয় তাহা Kranken Kasse বা Versicherungs Anstalt হইতে আদায় করে। সাধারণের অর্থে সাধারণের চিকিৎসা হয়, অথচ কাহারও এককালীন অধিক ব্যয় করিতে হয় না। যাহারা বেকার, সুতরাং ঐ সব প্রতিষ্ঠানে কিছুই দেয় না, তাহারা সাহায্য পায় সরকার হইতে। এখানে বেকার লোক অনাহারে বা বিনা-চিকিৎসায় মারা যায় না।

আমাদের দেশে আপিসের চাকরি করেন এমন বহু লোক আছেন। ইঁহারাই মধ্যবিত্ত এবং অর্থাভাবে ক্লিষ্ট। ইঁহাদের অনেকেই চিকিৎসা করাইতে অক্ষম এবং রোগের প্রাদুর্ভাবও ইঁহাদের মধ্যে বেশী। প্রতি আপিসেই Kranken Kasse খোলা যাইতে পারে। মাসিক বেতন হইতে শতকরা দুই-তিন টাকা কাটিয়া রাখিলে কাহারও অতিশয় অর্থাভাব ঘটে না। অথচ ঐরূপ পঞ্চাশ-ষাট জন কার্য্যকারকের মাহিনা হইতে বৎসরে অন্যূন ১২০০ টাকা জমিতে পারে। যদি তাহাদের মধ্যে ছয় জনেরও কঠিন ব্যাধি হয় এক বৎসরে (যদিও এত বেশী রোগ হওয়া অসম্ভব) তাহা হইলে প্রত্যেকেই চিকিৎসার জন্য ২০০ টাকা পাইতে পারেন। ঐ টাকায় আমাদের দেশে যথাসম্ভব চিকিৎসা চলিতে পারে, অবশ্য ৬৪ টাকা দর্শনী দিয়া নয়, সাধারণ চিকিৎসালয়ে। ক্ষয়রোগের স্যানাটোরিয়াম নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সরবরাহ করিতে পারেন আমাদের ধনীরা। আমাদের দেশে ধনীদিগের দান ত অজ্ঞাত নহে। স্যানা-টোরিয়ামে কয়েকটি আসন বেকার বা অতি দরিদ্রদের জন্য থাকিতে পারে। উহাদের খরচ যোগাইবেন ধনীরা—এখানে সরকার সেই অর্থ দেয়, কিন্তু আমাদের দেশে ত আর তাহা সম্ভব নহে। অন্যান্য আসনের খরচ Kranken Kasse-এর অনুরূপ প্রতিষ্ঠান দিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থায় প্রতি কার্য্য-কারকেরই সুচিকিৎসা চলিতে পারে এবং সেই সময় তাঁহাদের পরিবারের খরচ চলিতে পারে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের অর্থে। যিনি মাসিক ৫০ টাকা বেতন পান, তাঁহার যদি দুই-তিন টাকা Kranken Kasse ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের জন্য কাটা যায়, তবে বোধ হয় বিশেষ অর্থাভাব ঘটে না। অথচ যদি তিনি গুরুতর পীড়িত হন, তখন তাঁহার হাহাকার করিতে হয় না। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর টাকা পাইবে তাঁহার পরিবার তাঁহার মৃত্যুর পর। কিন্তু যদি দুই-তিন মাস তিনি পীড়িত অবস্থায় বাঁচিয়া থাকেন, তখন কি উপায়—স্বর্ণালঙ্কার এখন আর অনেকেরই নাই। তখন সাহায্য করিতে পারে Kranken Kasse—ইহা বোধ হয় যে কোনও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সুবক্তা এজেণ্টগণ স্বীকার করিবেন। আমাদের দেশে এখন ধনীর সাহায্য প্রয়োজন অতি দরিদ্রের জন্য এবং মধ্যবিত্ত লোকের সাহায্য প্রয়োজন তাঁহাদের নিজেদের সাহায্যের জন্য। গভর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকিলে ফল কি!

বঙ্গদেশে ক্ষয়রোগের একমাত্র স্যানোটোরিয়াম যাদবপুর। সেখানে আর কয় জন রোগীর স্থান হইতে পারে? উপযুক্ত স্যানাটোরিয়ামের অভাবে কত লোক যে চিকিৎসা করাইতে পারে না, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ রোগ ত আর এক দিন ডাক্তার দেখাইয়া ও প্রেসক্রিপশনের ঔষধ খাইয়া ভাল হইবার নহে। দীর্ঘ দিন স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসা আবশ্যক। যে-দেশে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়ার আশা কম, সে-দেশে নিজেরাই নিজেদের সাহায্য না করিলে আর উপায় কি।

এই প্রকার বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে জার্ম্মানরা তাঁহাদের দেশীয় গবেষকগণের নিকট হইতে। এখানে প্রতি শহরেই Öffentliche Gesundheitspflege বা সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্বাগার বর্ত্তমান। উহার সঙ্গে একটি করিয়া মধ্যাকৃতি মিউজিয়ম আছে। তাহাতে বহু রকমের বড় বড় ছবি এবং মোমের ও সেলুলয়েডের প্রতিকৃতি আছে; সাধারণ প্রাঞ্জল ভাষায় সমস্ত তত্ত্ব বোঝান আছে। মিউজিয়ম প্রতিদিনই খোলা থাকে। একটি বড় বক্তৃতা-কক্ষ আছে। ছুটির সময় বাদে অন্য সময় প্রতিদিন এক বা দুই ঘণ্টা বক্তৃতা হয়। বড় বড় অধ্যাপকগণ বক্তৃতা দেন। ছাত্র এবং জনসাধারণ সকলেই শুনিতে পারে। এইরূপে ইহারা স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। প্রতি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা করিতে বাধ্য। ইহা ছাড়া আবার Gesundheits Polizei বা স্বাস্থ্য-সহায়ক পুলিস আছে। তাহারা কসাইখানা, বাজার, খাদ্য-বিক্রেতার দোকান প্রভৃতির উপর এবং প্রতি গৃহবাসীর স্বাস্থ্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ইহা ছাড়া আমাদের মিউনিসিপালিটির মত Gesundheits Rat আছে। আমাদের দেশেও ত প্রায় এই সব ব্যবস্থাই আছে। কিন্তু সবই যেন প্রাণহীন। থাকিতে হয় তাই আছে—কাজের কোনও অনুপ্রেরণা নাই। প্রতি

জেলাবোর্ড যদি একটি করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্বাগার মিউজিয়ম ও বক্তৃতা-কক্ষ রাখেন, তবে বোধ হয় সাধারণের অনেক উপকার হয়। প্রতি জেলাবোর্ড স্বাস্থ্য-বিভাগের জন্য যত ব্যয় করেন, তাহা হইতে কিছু আজে-বাজে খরচ কম করিয়া ক্রমশঃ ঐরূপ একটি বিভাগ খুলিতে পারেন। অথবা স্থানীয় ধনী ব্যক্তিরাও সাহায্য করিতে পারেন। জনসাধারণের স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পাইলেই, বাংলার সাধারণ স্বাস্থ্যের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইবে।

যাহা হউক, স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞানদান করিয়াই ইহারা ক্ষান্ত হয় না। ক্ষয়রোগের নির্ণয় যাহাতে অতি প্রারম্ভেই হয় তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছে। প্রতি বড় বড় শহরে এবং বড় বড় ফ্যাক্টরীতে একটি করিয়া Tuberkulose Fürsorgestelle (Fursorge = যত্ন, stelle = স্থান) আছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য ক্ষয়রোগের নির্ণয়। কেহ শরীরের কোন গ্লানি বোধ করিলে Fürsorgestelleতে যায় অথবা মফঃস্বলের ডাক্তাররা সন্দেহ হইলেই রোগীকে Fürsorgestelleতে পাঠায়। বড় বড় ডাক্তার দ্বারা রক্ত, প্রস্রাব, কাশ প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয় এবং ফুসফুসের এক্স-রে ফটো তোলা হয়। পরীক্ষায় কিছু না পাওয়া গেলে ব্যক্তিবিশেষকে সপ্তাহ অন্তর, পক্ষান্তর বা মাসান্তর আসিতে বলা হয়। যখনই রোগ ধরা পড়ে, তখনই তাহাকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠান হয়। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় কিছু না পাওয়া গেলে, তাহাকে রোগমুক্ত বলা হয়। বহু লোক প্রত্যহ এই সব স্থানে আসিয়া পরীক্ষা করাইয়া যায়। জেনার মত ক্ষুদ্র শহরেই প্রত্যহ প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক পরীক্ষা করাইয়া যায়। আমাদের দেশেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা অসম্ভব নয়। কলিকাতায় ত নিশ্চয়ই হইতে পারে, বহু মফঃস্বল শহরেও ইহা করা সম্ভব। কেননা এখন অনেক স্থানেই এক্স-রে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। শহরে বহু স্বাধীন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী আছেন—তাঁহারা হয়ত সপ্তাহে দুই-চার ঘণ্টা করিয়া প্রত্যেকেই বিনামূল্যে কাজ করিতে রাজী হইবেন, যদি সরকারী হাসপাতাল হইতে তাঁহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পান।

যাঁহারা আমাদের দেশে ক্ষয়রোগের চিকিৎসা করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই জানেন যে বহু বিলম্বে রোগী চিকিৎসাধীন হয়। তখন করণীয় আর কিছুই থাকে না, থাকে কেবলমাত্র মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণা। কিন্তু এখানে অন্যরূপ। জেনার স্যানাটোরিয়ামে পঞ্চাশটি আসন আছে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকের অবস্থাই আশাপ্রদ। ইহার কারণ কেবলমাত্র Fürsorgestelle—সেখানে অতি প্রারম্ভেই রোগনির্ণয় হইয়া যায়, কাজেই চিকিৎসাও সহজ হইয়া পড়ে। সুতরাং এখন এখানে ক্ষয়রোগ সে-রকম ভীতিপ্রদ রোগ নহে। প্রায় সমস্ত রোগীই আরোগ্য-লাভের আশা রাখে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগনির্ণয় হইলে, আমাদের দেশেও নিশ্চয়ই ঐরূপ হইবে। Fürsorge-stelle'র অনুরূপ প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে হওয়া উচিত। যদি শহরের ডাক্তারগণ ইচ্ছা করেন এবং হাসপাতাল ও মিউনিসিপালিটির সাহায্য পান, তাহা হইলে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা অসম্ভব নয়।

ইহা ছাড়াও ইহাদের আর একটি প্রতিষ্ঠান আছে Kinder Klinik বা শিশু-স্বাস্থ্যাগার। প্রতি শহরেই এইরূপ প্রতিষ্ঠান আছে এবং প্রত্যেক মাতাই তাহার শিশুকে মাঝে মাঝে এখানে পরীক্ষা করান। প্রতি শিশু কিরূপ বড় হইতেছে, ওজন দৈর্ঘ্য প্রভৃতি ঠিক আছে কি না এবং অন্য কোনও রোগ আক্রমণ করিল কি না সমস্তই পরীক্ষা করা হয়। শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্ন লওয়াও এদেশে ক্ষয়রোগ কম হওয়ার এক কারণ। গোড়া হইতে শরীর ঠিক রাখিলে কোনও ব্যাধি হঠাৎ শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে না। আমাদের দেশে অনেকের শিশুকাল হইতেই ক্ষয়রোগ হয়—যৌবনে ধরা পড়ে, কিন্তু তখন বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রতি শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই পিতামাতার যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন এবং কোনও বৈষম্য দেখিলেই ডাক্তারের সাহায্য লইতে পারেন। শিশুই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। আমাদের দেশে একেই ত জন্ম হইতে এক বৎসরের মধ্যে প্রতি পাঁচটি শিশুর একটি করিয়া মারা যায়। তার উপর যদি ক্ষয়রোগের আক্রমণ হয়, তবে পরিণাম অতি শোচনীয়। এখন আমাদের দেশে বহুপ্রকার প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে গড়িয়া উঠা অসম্ভব। কিন্তু Fursorgestelle'র অনুরূপ একটি

প্রতিষ্ঠানেই শিশুর পরীক্ষাও চলিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হইবে, শিশু যেন কখনও ক্ষয়রোগীর সংস্পর্শে না আসে। সুতরাং ভিন্ন পরীক্ষাগার অতি আবশ্যক। এখানে শিশুকে কোনও ক্রমেই ক্ষয়রোগীর সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া হয় না।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহাদের সাহস। জেনার Tuberkulose Klinik'এ প্রতি রোগীকেই এক্স-রে ছবির সাহায্যে বুঝান হয়, তাহার রোগ কিরূপ ভীষণ ও কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহারা তাহা হাসি-মুখেই শোনে। কিন্তু আমি আমার ব্যবসায়কালে দেখিয়াছি, আমি নিজেও কোন রোগীকে স্পষ্ট বলিতে পারিতাম না যে তাহার ক্ষয়রোগ হইয়াছে, অন্য ডাক্তারকে বেশী বলিতে শুনি নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা ধারণা করি ক্ষয়রোগ মানেই মৃত্যু। কাজেই কোনও ডাক্তার যখন রোগীকে বলে 'তোমার ক্ষয়রোগ হইয়াছে' আমরা হয়ত সকলেই শুনি বিচারক অপরাধীকে বলিতেছে 'তোমার ফাঁসি হইবে।' কিন্তু সত্যই ত তাহা নহে। এখানে বহু ক্ষয়রোগী ত ভাল হয়ই, আমাদের দেশেও ত অনেক ভাল হয়। আমাদের দেশে আরোগ্য না হওয়ার প্রধান কারণ রোগ প্রাথমিক নির্ণয় না হওয়া এবং উপযুক্ত স্যানাটোরিয়াম না থাকা। কাজেই ক্ষয়রোগ হইয়াছে শোনার পর হইতেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ত ভাল নয়। এই ভীষণ ব্যাধির উপর আবার মানসিক ব্যাধি হইলে চিকিৎসা আরও কঠিন হইয়া পড়ে। আমাদের চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদিগের কর্ত্তব্য প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করা এবং যথাসম্ভব সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। গোপন করিয়া লাভ নাই। বরং গোপন করিলেই অন্যান্য অজ্ঞানী চিকিৎসকেরা রক্তপিত্ত, হাঁপানি, পুরাতন কাশ প্রভৃতি বহু রকমারি বিশেষণ দিতে প্রয়াস পায়। জন-সাধারণের উচিত কোনও সন্দেহ হইলে ডাক্তার দেখান এবং ডাক্তার একটু সন্দেহ করিলে তখনই চিকিৎসা-ব্যবস্থা করা। যেহেতু এক ডাক্তার ক্ষয়রোগ বলিয়া নির্ণয় করিল, অমনই তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া অন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটে। ইহা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ডাক্তার সর্ব্বজ্ঞ নহে, ভুল হওয়া সম্ভব। কিন্তু যাহার ভুল হয়, তাহার নিজের দ্বারাই সেটা সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি। চিকিৎসা অনেকটা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে তাহারই আশ্রয় লওয়া উচিত এবং সর্ব্বদাই তাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলা উচিত। ইহাতেই ভাল ফল হয়। এদেশে ডাক্তার-অন্বেষণ ব্যাপার একেবারেই নাই। সেই জন্য চিকিৎসা-বিভ্রাটও হয় না। এখানে চিকিৎসার এক বিশেষ সম্ভ্রান্ত ভাব আছে যাহাতে রোগী নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহার সমস্ত ভার ডাক্তারের উপর অর্পণ করিতে পারে। আর আমাদের দেশে সর্ব্বদাই শঙ্কা থাকে এই বুঝি ডাক্তার মারিয়া ফেলিল। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আমাদের দেশের এখন অতীব দুঃসময়। এই সময়ই ত ব্যাধি আক্রমণ করিবে। কিন্তু আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত যাহাতে ক্ষয়রোগ আর অগ্রসর না হইতে পারে। জনসাধারণ, চিকিৎসক, মিউনিসিপালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি একযোগে চেষ্টা করিলে এই ভয়াবহ রোগের গতিরোধ হইবে নিশ্চয়। যুদ্ধের পর জার্ম্মেনীতে যক্ষ্মা অতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এখন অনেক কম। ফ্রান্সে ক্ষয়রোগ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। ইতালীও ইহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বঙ্গদেশে সম্ভব হইবে না কেন? আমাদের সব সময়ই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে এ রোগের কোনও প্রতিষেধক বা নিশ্চিত চিকিৎসা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। কেবল মাত্র দেহের সবিশেষ যত্নদ্বারা এ রোগ হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়। দেহকে সর্ব্বদা সুস্থ রাখার চেষ্টা করিলে বহুপ্রকার রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রেও আছে 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং'।

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

১১

মমতা ঘরে ঢুকিতেই অলকা তাহার হাত ধরিয়া এক টানে নিজের পাশে বসাইয়া দিল। ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল, "আচ্ছা নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলাম বাবা, মুখ বুজে বসে থাকতে থাকতে চোয়ালে খিল ধরে গেল।"

মমতা স্বাভাবিক গলাতেই বলিল, "কেন, কেউ তোকে কথা বলতে বারণ করেছে নাকি?"

তাহাদেরই ক্লাসের আর একটি মেয়ে বীরা, মমতাকে একটা চিম্‌টি কাটিয়া বলিয়া উঠিল, "এই চুপ, ওরা শুদ্ধসুদ্ধ পাশের ঘরে বসে আছে, শুনতে পাবে।"

বাধ্য হইয়াই গলাটা একটু নামাইয়া মমতা বলিল, "এমন কি কথা আমরা বল্‌ছি যে ওরা শুনলে চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে?"

অলকা বলিল, "ছায়াটা মোটেই আস্‌ছে না, লোকের বাড়ি এসে নিজেরাই হৈ চৈ করা যায় নাকি? কি যে করছে কে জানে? তা তুই এ-রকম বেশে এসেছিস্‌ কেন? এটা ত জন্মদিনের উৎসব, শ্রাদ্ধ ত নয়?"

মমতা যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই. অলকার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত গহনা, পরনে দামী চাঁপাফুল-রঙের ক্রেপের শাড়ী, পায়ে পাঞ্জাবী জরির জুতা। মুখের রংটাও সবটাই স্বাভাবিক নয় বোধ হয়। এই সাদাসিধা ঘরে, অন্য মেয়েগুলির পাশে তাহাকে উৎকট রকম অশোভন দেখাইতেছে। ভাগ্যে সে নিজে লুসির কথা শুনিয়া এক গা গহনা পরিয়া আসে নাই! ছায়া বেচারী গরিবের মেয়ে, বড়-জোর একখানা শান্তিপুরী কি ফরাসডাঙার শাড়ী পাইয়াছে জন্মদিনে। তাহারই ঘরে, তাহাকে নিজের ঐশ্বর্য্যের বহর দেখাইতে যাওয়াটা যে রীতিমত কুরুচির পরিচায়ক সে জ্ঞান মুটুকি অলকার কোনো দিনই হইবে না।

সবসুদ্ধ আট জন মেয়ে আসিয়াছে। পাঁচ জন ত তাহাদের ক্লাসেরই. অন্য তিন জন পাড়ারই মেয়ে বোধ হয়। তাহারা এদের চেনে না, ইহারাও তাদের চেনে না, কাজেই তুই দলই চুপচাপ বসিয়া আছে, অথবা নীচু গলায় নিজেদের মধ্যেই কথা বলিতেছে। মমতাও একটু যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

এমন সময় ছায়া আসিয়া ঢুকিল। চুলটা খুব পরিপাটি করিয়া বাঁধা, কপালে চন্দন, পরনে চওড়া লালপাড় দেশী শাড়ী। এই তাহার সাজ। আর ইহার চেয়ে বেশী মূল্যবান সজ্জা তাহার জুটিবেই বা কোথা হইতে?

মমতা তাহার হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কাজ হয়ে গেল ভাই?"

ছায়া বলিল, "হয়েছে। তোরা বুঝি তখন থেকে চুপচাপ বসে আছিস্‌?"

অলকা বলিল, "তা কি করব? তুই ত আলাপও করিয়ে দিয়ে গেলি না?"

ছায়া লজ্জিত ভাবে অতিথিদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের আলাপ করাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। নিমন্ত্রণ-কর্ত্রীর কাজটা তাহাকে দিয়া বেশী ভাল ভাবে হইবার নয়, তাহার স্বভাবে লজ্জা ও সঙ্কোচ অত্যন্ত বেশী। তবু সে ছাড়া আর যখন অভ্যাগতদিগকে আদর-অভ্যর্থনা করিবার কেহ নাই, তখন তাহাকেই কাজটা করিতে হইবে।

বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো সদাসর্ব্বদা জ্বলে না, আজকার মত অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলো জ্বালার পর এই আড়ম্বরহীন ছোট ঘরখানিরও শোভা খানিকটা যেন বাড়িয়া গেল। মেয়েরা এখন এ উহার সঙ্গে খানিক খানিক কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এক জন প্রৌঢ়া মহিলা ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন, "একটু গানটান হোক না? তুই না বল্‌ছিলি ছায়া, যে তোদের ক্লাসে দু-তিন জন মেয়ে বেশ গান করতে পারে?"

মেয়েরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ছায়া পরিচয় করিয়া দিল,

"ইনি আমার মাসীমা। এই মমতা, এই অলকা, এই শ্যামা, এই ধীরা, এই শোভনা।"

মমতারা একে একে ছায়ার মাসীমাকে প্রণাম করিল। অলকার প্রণাম করাটা বিশেষ আসে না, সে কোনোমতে নীচু হইয়া একটা নমস্কার করিয়া কাজ সারিয়া লইল।

ঘরের কোণে ছোট একটা বক্স-হার্মোনিয়ম্ ছিল, ছায়া সেটা টানিয়া আনিল।

মমতা বেশ গাহিতে পারে, অলকা বহুকাল ওস্তাদের কাছে গান শিখিতেছে, অতএব ধরিয়া লইতে হইবে, সে ভালই গাহিতে জানে। ধীরার ত সুগায়িকা বলিয়া স্কুলে নামই ছিল, ছায়া তাহাকেই প্রথমে গাহিতে অনুরোধ করিল।

ধীরার ন্যাকামি করা স্বভাবে ছিল না। গান গাহিতে সে পারেও ভাল, সুতরাং গাহিতে বলিলেই গাহিত। অলকা অবশ্য সেটাকে বলিত ঢং। যে যেখানে গাহিতে বলিবে অমনি হাঁ করিয়া চেঁচাইতে হইবে নাকি? আজ এখানে আসিয়া অবধি আয়োজনের দৈন্য দেখিয়া সে চটিয়া আছে, তাহার মতে এই দীনহীন গৃহে তাহাকে এবং মমতাকে ডাকিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া ছায়া ভাল কাজ করে নাই। ধীরা করুক গান, মানসম্ভ্রম-জ্ঞান তাহার একেবারেই নাই, অলকা কখনই নিজেকে অতটা খেলো করিবে না।

ধীরা বেশ ভালই গাহিল। মাসীমা তাহার খুব প্রশংসা করিলেন। পাড়ার একটি মেয়ে বলিল, "চমৎকার ত তুমি গাও ভাই, নিশ্চয় তোমার গান একদিন রেকর্ডে উঠবে।" অলকা ইহাতে আরও চটিয়া গেল, যদিও কেন তাহা ভাল করিয়া বুঝা গেল না।

ছায়া হার্মোনিয়মটা অলকার দিকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "তুমি এইবার একটা গান কর না ভাই?"

অলকা মিহি গলায় বলিল, "যা কষ্ট পাচ্ছি ভাই ফ্যারেন্জাইটিস্ হয়ে, আমার দ্বারা আজ আর হবে না।"

মমতা বলিল, "কর্ না ভাই, আস্তে আস্তে করিস্, এখানে ত আর তোকে বেশী চেঁচাতে হবে না?"

অলকা কিছুতেই রাজী হইল না। তখন সকলের অনুরোধে মমতাই গান আরম্ভ করিল।

ধীরার মত মমতার গলার জোর অত বেশী ছিল না, কিন্তু কণ্ঠের মিষ্টতা তাহারই ছিল বেশী। ছোট ঘরখানিতে যেন সুধাস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

গাহিতে গাহিতে হঠাৎ মমতার চোখ পড়িল দরজার ওধারে। সেই শ্যামবর্ণ যুবকটি বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহার গান শুনিতেছে। তাহার নিজের গলাটা একটু কাঁপিয়া গেল।

ছায়াও তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া যুবককে দেখিতে পাইল। ফিস্‌ফিস্ করিয়া মমতার কানের কাছে বলিল, "অমরদা গান ভয়ানক ভালবাসে ভাই, ভাল গান শুনলে ওর আর জ্ঞান থাকে না। ও নিজেও চমৎকার গান করে ভাই।"

মমতা নিজের গান শেষ করিয়া নীচু গলায় বলিল, "ওঁকে বল না ভাই গান করতে, আমরা এতক্ষণ করলাম গান, আমাদের ত শুনতে পাওয়া উচিত?" কথাটা বলিয়াই তাহার অনুশোচনা হইল, হয়ত এতটা প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করা ঠিক হইল না।

ছায়া তাহার মাসীমাকে বলিল, "অমরদাকে বল না মাসীমা একটা গান করতে।" অমরেন্দ্র মাসীমারই সম্পর্কে ভাসুরপো হয়।

মাসীমা হাসিয়া উঠিয়া গিয়া অমরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিলেন। সে একটু লজ্জিত ভাবেই ঘরে ঢুকিয়া মেয়েদের নমস্কার করিল। ছায়া সকলের সহিত একজোটে তাহার আলাপও করাইয়া দিল।

গান করিতে অমরও কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। অলকা ভাবিল এই সব গরিব লোকদের চালচলনই এক রকম, নিজেরাই নিজেদের উপযুক্ত মূল্য দিতে জানে না। তাহাদের সোসাইটিতে এমন যখন-তখন নিজেকে খেলো করার রেওয়াজ নাই।

অমরেন্দ্র সত্যই অতি সুগায়ক। মমতা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন চমৎকার গান আর কখনও সে শুনিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। দরিদ্র ঘরে কত রত্ন যে লুকান থাকে, বড়মানুষের ছেলে হইলে সারা কলিকাতায় ইহার যশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

একটা গান শেষ হইবামাত্র ছায়াকে বলিয়া সে অমরকে আবার গান ধরাইল। অত উৎসাহ প্রকাশ করা ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিবারও তাহার অবসর রহিল

না। উপরি উপরি তিনটি গান করিয়া তবে অমর ছাড়া পাইল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আর দেরি করা চলে না। রাত্রিতে খাইবার নিমন্ত্রণ ত নয়, চা খাইবার নিমন্ত্রণ মাত্র। কিন্তু খাওয়ার আয়োজন দেখিয়া অলকার ত চক্ষুস্থির! এই নাকি চা খাওয়া? সব আছে, খালি চা-টাই নাই। অবশ্য চাহিলে হয়ত পাওয়া যাইত, কিন্তু চাহিতে আবার যাইবে কে?

পাশের ঘরে, মাটিতে আসন পাতিয়া জায়গা করা হইয়াছে। সেখানে গিয়া সকলে বসিল। ছায়াকে তাহার সঙ্গিনীরা ছাড়িল না, তাহাকেও বসিতে হইল বন্ধুদের সঙ্গে। মাসীমা এবং অমর পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মমতা ভাবিল এ ছেলেটি ত বেশ, কোনো কাজ করিতে বাধা অনুভব করে না। বাড়িতে তাহার বাবা বা ভাই পরিবেশন করিতেছেন, ভাবিতেই তাহার হাসি পাইল।

লুচি, বেগুন-ভাজা, ছানার ডাল্‌না আর পায়েস্‌। সবই মাসীমার হাতের তৈরি, খাইতে ভালই হইয়াছে। আরও আছে, ঘরে তৈয়ারী মালপোয়া। এটি ছায়ার নিজের হাতে প্রস্তুত। অলকা বলিল, "ছায়ার এ বিদ্যেও আছে দেখছি।"

মাসীমা বলিলেন, "বাঙালী গেরস্ত-ঘরে রান্নাবান্না না শিখলে কি চলে মা? এখন ত তবু তোমরা সব স্কুল-কলেজে যাও, তাই ঘরের কাজ শিখবার তত সময় পাও না, আমরা ত সাত-আট বছর বয়স থেকে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে রান্না করতে শিখেছি।"

অলকা ভাবিল ভাগ্যে সে ঐ রকম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহার এত যত্নের এনামেল্‌-করা ছুঁচলো আঙুলের নখগুলির তাহা হইলে কি দশাই না হইত! মাগো!

ধীরা বলিল, "আমার দিদি খুব ছোটবেলায় রান্না শিখে-ছিলেন। সত্যিই সাত-আট বছর বয়সে তিনি এক-এক দিন সংসারের সব রান্নাই ক'রে রাখতেন। তবে হাঁড়ি কড়া নামাবার জন্যে অন্য লোক ডাকতে হ'ত।"

খাওয়া ত চুকিয়া গেল, মেয়েরা আবার উঠিয়া আসিয়া আগের সেই ঘরটিতে বসিল। ছায়া সামান্য কিছু উপহারও পাইয়াছে, সেইগুলি সকলে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। সুরেশ্বরের অসুখের উৎপাতে মমতা কিছুই আনিতে পারে নাই, সেজন্য তাহার বড়ই লজ্জা করিতেছিল সে-ই ছায়ার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বড়মানুষের মেয়ে। সকলেই উপহার দিল, অথচ সে কিছু দিল না, ইহাতে ছায়া কি মনে করিয়াছে কে জানে? অবশ্য সে নিমন্ত্রণ পাইয়াছেও একটু অসময়ে, কিন্তু তখনও জিনিষ কিনিবার সময় নিশ্চয়ই ছিল।

সে ছায়ার কানে কানে বলিল, "বাবার একটু অসুখ ব'লে আমি তোর জন্যে কিছু আন্‌তে পারি নি ভাই। আমি পরে পাঠাব।"

ছায়া বলিল, "আহা, এ কি ট্যাক্স নাকি? না দিলেই বা কি?"

মমতা বলিল, "ট্যাক্স কেন হ'তে যাবে? আমার বুঝি আর কিছু দিতে ইচ্ছে করে না?"

অলকা নিজে একটা 'সিরোপার্লে'র নেকলেস আনিয়াছিল। মমতা কি দেয় দেখিবার জন্য তাহার বেজায় উৎসাহ ছিল, কারণ সকল ক্ষেত্রেই একমাত্র মমতাকে সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য বলিয়া মনে করিত। কিছুই সে আনে নাই দেখিয়া অলকা খানিকটা অবাক হইয়া গেল।

আটটা বাজিতে আর দেরি নাই, মমতার গাড়ী হয়ত এখনই আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার আগে আসিল অলকার গাড়ী। সকলের কাছে বিদায় লইয়া ছায়াকে অনেক শুভইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া খট-খট করিতে করিতে অলকা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। পাড়ার মেয়েরাও একটি-দুটি করিয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

মমতা ঘড়ি দেখিল আটটা বাজিয়া গিয়াছে। সুজিত এখনও আসে না কেন? বেশী রাত করিলে বাবা আবার রাগারাগি না আরম্ভ করেন।

আরও পনর মিনিট কাটিয়া গেল, তবু গাড়ীর দেখা নাই। মমতা বারান্দা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রাস্তা দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু গলিটা সোজা নয়, বড় রাস্তা হইতে খানিকটা ঘুরিয়া আসিয়াছে, এখান হইতে কিছু দেখা যায় না।

হঠাৎ বাহির হইতে অমর বলিল, "সুজিতবাবু আপনাকে নিতে এসেছেন।"

সুজিতকে বাবু বলায় মমতার অত্যন্ত হাসি পাইল

কোন্ পথে ?

কিন্তু হাসিলে পাছে অমরেন্দ্র তাহাকে অভদ্র মনে করে, এই ভয়ে সে গম্ভীর হইয়াই রহিল। ছায়ার মাসীমাকে প্রণাম করিয়া এবং অন্য সকলের কাছে বিদায় লইয়া সে নামিয়া চলিল। তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে চলিল অমরেন্দ্র।

সুজিত অত্যন্ত বিরক্ত মুখ করিয়া গাড়ীতে বসিয়া আছে। মমতা ও নিত্য গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরি হ'ল কেন রে?"

সুজিত প্রথমে কোনই উত্তর দিল না। মমতা আবার প্রশ্ন করাতে গোঁজমুখ করিয়া বলিল, "যা না ছিরির গাড়ী! এর চেয়ে গরুর গাড়ীও ভাল।"

ড্রাইভার বুঝাইয়া বলিল, গাড়ীর ইঞ্জিনের কি একটু গোলমাল হইয়াছে। মাঝে একবার একেবারেই অচল হইয়াছিল, সে আপনার যথাবিদ্যায় উহা মেরামত করিয়া এতদূর লইয়া আসিয়াছে, এখন মানে মানে বাড়ি পৌছিলে হয়।

সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল, কিন্তু গাড়ী আবার চলিতে নারাজ। ড্রাইভার নামিয়া আবার ইঞ্জিন পরীক্ষা করিল, এটা-সেটা একটু ঠিক করিল, কিন্তু যন্ত্রদানব তখনও বিমুখ, চলিবার ইচ্ছা তাহার নাই। খালি ঘড় ঘড় শব্দ করে, কিন্তু যেখানকার জিনিষ সেখানেই থাকিয়া যায়।

মমতা উদ্বিগ্ন, নিত্য ভীত এবং সুজিত চটিয়া আগুন। নীচু গলায় ইহারই মধ্যে সে গালাগালি আরম্ভ করিয়াছে। মমতার তাহার হইয়া লজ্জা করিতে লাগিল। কি অপদার্থ ছেলে, নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, জানে খালি অন্যের উপর তম্বি করিতে। অমরেন্দ্র না-জানি এই অপূর্ব্ব চিজ্‌টিকে কি মনে করিতেছে।

ড্রাইভার তৃতীয় বার চেষ্টা করার পর বলিল গাড়ীটাকে খানিক দূর ঠেলিয়া লইয়া গেলে চলিতে আরম্ভ করিতে পারে। সুজিত যেখানে ছিল, সেখান হইতে এক ইঞ্চি না নড়িয়া আদেশ করিল কুলী ডাকিয়া আনিতে। সে সুরেশ্বর রায়ের ছেলে, সে কি গাড়ী ঠেলিবে নাকি?

অমরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "কুলী আবার কি হবে? আমিই খানিকটা ঠেলে দিচ্ছি," বলিয়া কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া সে গাড়ী ঠেলিতে আরম্ভ করিল।

মমতা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, ইহার দেখি সব গুণই আছে, গায়েও জোর কেমন! খোকাটার গালে তাহার চড় মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কেমন নবাবের মত বসিয়া আছে দেখ না, যেন দুনিয়াসুদ্ধ তাহার চাকর।

রাস্তার এক বিড়িওয়ালারও কি কারণে উৎসাহ হইল, সেও নামিয়া আসিয়া অমরেন্দ্রের সঙ্গে গাড়ী ঠেলিতে আরম্ভ করিল। এতক্ষণে গাড়ীটার মত বদলাইল। সে স্থির করিল ইহার পর নিজেই চলিবে। অমরেন্দ্র তখন নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। নিজের বনিয়াদীত্ব দেখাইবার জন্য সুজিত বিড়িওয়ালাকে একটা আধুলি বকশিশ করিয়া দিল।

বাড়ি পৌছিতে তাহাদের খানিকটা রাতই হইয়া গেল! মমতা খুব ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিতে লাগিল। যদিও দেরি হওয়ার দোষটা তাহার বিন্দুমাত্রও নয়, তবু সেকথা বাবাকেও বোঝান যাইবে না। তিনি একে অসুস্থ, তাহার উপর রাগারাগি বকাবকি করিয়া যদি রাত্রেও না ঘুমান, তাহা হইলে তাঁহারও অসুখ বাড়িয়া যাইবে, এবং মায়েরও যন্ত্রণার শেষ থাকিবে না।

সিঁড়ির মুখের ঘর অন্ধকার। মমতা আশ্বস্ত হইয়া ভাবিল, বাঁচা গেল, বাবা তাহা হইলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

যামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত হ'ল কেন রে?"

মমতা বলিল, "গাড়ী খারাপ হয়ে গিয়েছিল মা। আমরা অনেক হাঙ্গাম ক'রে এসেছি।"

১২

লুসি শয়নকক্ষে তখনও জাগিয়া শুইয়া আছে। পার্টি কেমন হইল, কত মানুষ আসিল, কে কি পরিয়াছিল, কে কি বলিল, সব না-শুনিয়া সে কি ঘুমাইতে পারে? মমতা ঘরে ঢুকিতেই জিজ্ঞাসা করিল, "তুই না বলেছিলি ভাই যে আটটার সময় ফিরে আসবি?"

মমতা কাপড় বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে বলিল, "আমি কি করব ভাই, গাড়ী বিগড়ে যত হাঙ্গাম হ'ল। বাবা কিছু রাগারাগি করেন নি?"

লুসি বলিল, "না। তোর সেই টেকো বুড়োর বাড়ি থেকে কি একটা চিঠি এসেছে, তাতে পিসেমশাই এত খুশী হয়েছেন যে সন্ধ্যার পর রাগারাগি করতেও আর তাঁর মনে থাকে নি। ও কি শুচ্ছিস্ যে এরই মধ্যে? খাবি না?"

মমতা বলিল, "খেয়েই ত এলাম, আবার খাব কি? আমি কি রাক্ষস?'

লুসি বলিল, "সে ত শুধু চা খেয়েছিস্, তাতেই পেট ভ'রে গেল?"

মমতা তাহার পাশে শুইয়া পড়িয়া বলিল, "লুচিটুচি অতগুলো খেলাম, আবার এই রাতে খাওয়া যায় নাকি?"

তাহার পর ফিস্‌ফিস্ করিয়া আরম্ভ হইল পার্টির গল্প। ঘটে নাই ত কিছুই, মাতব্বর মানুষ হইলে এই সন্ধ্যাটির বিষয় বলিবার মত কোনো কথাই হয়ত খুঁজিয়া পাইত না। অথচ দুইটি কিশোরীতে গল্প চলিল অনর্গল, পূর্ণ একটি ঘণ্টা ধরিয়া। কে কি বলিল, কে কি গান করিল, কে কেমন দেখিতে, গল্প নিজের গুণেই ক্রমে যেন জমিয়া উঠিতে লাগিল।

যামিনী খানিক পরে আসিয়া বলিলেন, "এবার ঘুমো বাছারা, আর রাত জাগিস্ নে, কাল আবার সারাটা দিন হৈ হৈ করেই যাবে।"

মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা? কাল কি?"

যামিনী বলিলেন, "কাল আবার উনি এক জনকে বিকেলে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন কিনা?" তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "এদিককার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিস্ মা, আজ আমি ওঘরে থাকব। নিত্যকে বলব এ-ঘরে শুতে?"

নিত্যর বিপুল নাসিকাগর্জ্জন মমতার ঘুমের ভারি বাধা জন্মায়। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না মা না, আমরা দু-জন রয়েছি, কিছু ভয় করবে না আমাদের।"

যামিনী চলিয়া গেলেন। সুরেশ্বর নিজে ঘুমাইতে না পাইলে যামিনীকেও পারতপক্ষে ঘুমাইতে দেন না। ছেলেমেয়েকেও জাগাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আবার মায়াও হয়। তাহার চাকর এবং যামিনীকে আজ রাত্রে জাগিয়াই কাটাইতে হইবে, তাহা তাঁহারা জানিয়াই রাখিয়াছেন। তবে দেবেশকে নিমন্ত্রণ করিতে পাইয়া সুরেশ্বর কিছু খুশী হইয়াছিলেন, তাহার উপর গোপেশবাবু তাঁহার নিমন্ত্রণ-পত্রের উত্তরে এমন এক অতি অমায়িক চিঠি লিখিয়াছেন যে সুরেশ্বর একেবারে গলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রাত্রে ঘুমাইয়া পড়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। এখন ত ঘুমাইয়াই আছেন, বারোটার পর না জাগেন, তাহা হইলেই রক্ষা। যামিনী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া, ক্যাম্পখাটের বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সে রাত্রে আসলে ঘুম হইল না খালি সুজিতের। তাহার অত্যন্তই রাগ হইয়াছিল, তবে সেটা কাহার উপর, তাহা সে নিজেও ভাবিয়া পাইতেছিল না। যাহা হউক, সেটা কাহারও উপর ভাল করিয়া ঝাড়িতে না পারিয়া, তাহার মাথাটা এমন গরম হইয়া রহিল যে রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমান একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সকালেই আবার হতভাগা ড্রাইভার গাড়ীটাকে লইয়া কারখানায় দিয়া আসিল। ইহাও সুজিতের রোষের আগুনে খানিকটা ঘৃতাহুতি দিল।

সারারাত সুরেশ্বর সত্যই ঘুমাইয়াছিলেন, এবং মেজাজটাও তাঁহার ভালই ছিল। শরীরটাও অতএব খানিকটা সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু স্বভাব যাইবে কোথায়? কতক্ষণে স্ত্রীর সহিত কিছু একটা লইয়া কথা-কাটাকাটি করিতে পারিবেন, তাহারই সুযোগ খুঁজিয়া তিনি যেন বসিয়াছিলেন।

যামিনী ইচ্ছা করিয়াই সারা সকালটা রান্নাবাড়ি এবং ভাঁড়ার-ঘরে কাটাইয়া দিলেন। উপরে গিয়া ঝগড়া করিবার মত উৎসাহ তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও আর ছিল না। সুরেশ্বরের চিম্‌টিকাটা কথা শুনিলে, সহস্র চেষ্টাতেও বিরক্তি তিনি দমন করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি জানিতেন, সুতরাং তাঁহার সান্নিধ্য একেবারে পরিহারই করিয়া চলিতেছিলেন। মাঝে মাঝে লুসি বা মমতাকে দিয়া দরকারী কথা দুই-চারিটা বলিয়া পাঠাইতেছিলেন।

মমতার মন আজ বড় ভার হইয়া আছে। অতিথিটি যে কে, এবং কেন তাঁহার শুভাগমন হইতেছে, তাহা জানিতে মমতার বাকী নাই। লুসি থাকিতে সংবাদদাতার অভাব নাই। লুসির উৎসাহেরও অন্ত নাই, মমতা ধনীর কন্যা, তাহার উপর যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী হয়, তাহা হইলে পার্থিব সুখের চরম শিখরে চড়িতে আর তাহার বাকি রহিল কি? কিন্তু মমতা বয়সে তাহার চেয়ে বড় হইলে কি হয়? এখনও যেন খুকীই থাকিয়া গিয়াছে। নিজের ভাল-মন্দও নিজে বুঝিতে পারে না। এই বিবাহের সম্ভাবনায় তাহার মনে

আনন্দের লেশমাত্র নাই। বাপের উপর সে রীতিমত চটিয়া গিয়াছে। কলেজ খুলিতে মাত্র আর এক সপ্তাহ বাকী, কোথায় পড়াশুনার ব্যবস্থা সব ভাল করিয়া করিবেন, না কোথাকার এক ভুঁড়িওয়ালা বুড়োর ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেলেন! মমতা বিবাহ এখন কিছুতেই করিবে না, বাবা কেন যে অনর্থক এমন করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। আই-এ'তে কি কি 'সব্‌জেক্ট' লইবে তাহা নির্ব্বাচন করিতেই সে ব্যস্ত, ভাবী স্বামী-নির্ব্বাচনে তাহার উৎসাহ নাই। যামিনী যদি কিছু আগ্রহ দেখাইতেন, তাহা হইলেও মমতার মনটা একটু অনুকূল হইলেও হইতে পারিত, বলা যায় না। কিন্তু মায়ের যে মত একেবারেই নাই, তিনি যে এই ব্যাপার লইয়া দুঃখই পাইতেছেন, তাহা মমতা বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়া তাহার মন একেবারে বিমুখ হইয়া গিয়াছে।

দুপুর শেষ হইতে চলিল। সুরেশ্বর আর সহ্য করিতে না পারিয়া চাকর দিয়া যামিনীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। যামিনী রান্নাঘর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাকছ কেন?"

সুরেশ্বর স্বভাবসিদ্ধ কলহের সুরে বলিলেন, "ডেকে এমন কি অপরাধ হয়েছে? দরকারও ত মানুষের কিছু থাকতে পারে?"

কিছুতেই চটিবেন না, যামিনী এক রকম পণই করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি শান্তভাবেই বলিলেন, "সেই দরকারটা কি তাই ত জিজ্ঞেস করছি।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "ভদ্রলোকের ছেলেকে চা খেতে ত ডেকে পাঠালে, জোগাড়জাগাড় ঠিকমত হয়েছে ত? এসে না মনে করে কি এক উজ্‌বুকের বাড়ি এলাম।"

যামিনী কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলেন, "না, তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হবে ব'লে ত মনে হচ্ছে না। বাঙালীর ছেলে বই আর কিছু ত নয়? তাঁকে অবাক ক'রে দেবার মত কিছু ঘটবে না সম্ভবতঃ।"

কথার সুরে একটু যে শ্লেষ আছে তাহা সুরেশ্বর ধরিয়া ফেলিলেন, ঝাঁঝিয়া বলিলেন, "নিজের জাঁকেই গেলে। কিসের যে এত জাঁক তাও যদি বুঝতাম—"

আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, যামিনী বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু অনর্থক বক্‌বক্ ক'রো না। বিন্দু-ঠাকুরঝির মাথা ধরেছে, নূতন রান্নার লোকটাকে সব জিনিষ একটা-একটা ক'রে বোঝাতে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে ব'সে ঝগড়া করার সময় আমার নেই। তাহ'লে সব কাজ মাটি হবে। খুকীকে এখনও চুল বেঁধে দিতে হবে, আমার নিজের কাপড়চোপড় বদ্‌লাতে হবে, গা ধুতে হবে। দরকারী কথা কিছু থাকে ত বল, না হ'লে আমি চল্‌লাম।"

যামিনী এমনভাবে কথা প্রায়ই বলেন না, সুরেশ্বরকে বাজে বকিবার যথেষ্ট অবসরই সচরাচর দিয়া থাকেন। সুরেশ্বর ঠিক কি করিবেন, অতঃপর কোন্ পথে নূতন কলহের আমদানী করিবেন, তাহা স্থির করিবার আগেই যামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কচিছেলের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া গেলে যেমন মন খুঁৎ খুঁৎ করে, ঝগড়াটার পূর্ণ পরিণতি লাভে বাধা পড়ায় সুরেশ্বরেরও তেমনই মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল, কিন্তু সত্যসত্যই কাজ পণ্ড হইবার ভয়ে তিনি আর যামিনীকে ডাকিতে ভরসা করিলেন না।

কিন্তু একলা চুপ করিয়া বসিয়াই বা কতক্ষণ মনে মনে গজরান যায়? অতএব চাকরকে ডাকিয়া একটু গালাগালি করিলেন, সুজিতকে ডাকিয়া একবার ধমকাইয়া দিলেন। তাহার পর মমতা এবং লুসিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, অবশ্য বকিবার উদ্দেশ্যে নহে।

মমতা মায়ের আদেশমত তখন সবে গা ধুইয়া বাহির হইয়াছে, লুসি গা ধুইতে গিয়াছে। বাপের ডাকে খোলা চুলটা ঢিপি করিয়া জড়াইয়া ভিজা তোয়ালে হাতেই সে তাঁহার শয়নকক্ষে গিয়া হাজির হইল। সুরেশ্বর মেয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন, "কি মা, এই চান ক'রে এলি নাকি?"

মমতা বলিল, "এই ত গা ধুয়ে বেরুলাম বাবা, লুসি এখনও গা ধুচ্ছে। তুমি ডাকছ কেন?"

কেন যে ডাকিয়াছেন তাহা সুরেশ্বর নিজেও জানেন না। তাঁহাকে বাড়ির লোকে দু-দণ্ডও ভুলিয়া থাকে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকে সচেতন করিয়া রাখাই তাঁহার ডাকিয়া পাঠানোর উদ্দেশ্য, অবশ্য সেটা তলাইয়া নিজেও ঠিক বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ। মেয়ের কথার উত্তরে বলিলেন, "তা যাও মা, চুল বেঁধে কাপড়চোপড় ভাল ক'রে প'র গিয়ে। আজ

আবার বাইরের লোকজন আসবে কি না? আর দেখ লুসিকেও বেশ ভাল কাপড়চোপড় গহনাগাঁটি পরতে বল্‌বে। সে যদি না এনে থাকে ত তোমার মাকে বল্‌বে তাকে কিছু কিছু আলমারী থেকে বার ক'রে দিতে। এক বাড়ির দুই মেয়ে দু-রকম সাজলে ভাল দেখায় না। একটি ছেলে আসছে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে, তার সঙ্গে বেশ খোলাখুলি ভাবে আলাপ করবে, লজ্জা বা সঙ্কোচ ক'রো না। সে ওসব ভালবাসে না, গান-বাজনা করতে বল্‌লে অবশ্য করবে।"

বাপের এতখানি অনাবশ্যক উপদেশ পাইয়া মমতা একটু ভীতভাবেই ঘর হইতে চলিয়া গেল। আগন্তুকের প্রতি মনটা তাহার আরও বিরক্ত হইয়া গেল। কে না আসিতেছেন নবাবপুত্র তাহার জন্য বাবার কাণ্ড দেখ না?

যাহা হউক, সে বাপের মুখের উপর ত কিছু বলিতে পারে না? কাজেই ঘরে ফিরিয়া গিয়া সাজ-সজ্জায়ই মন দিল। লুসিকেও ডাকাডাকি করিয়া স্নানের ঘর হইতে বাহির করিল। যামিনীর কাছে চাবি চাহিয়া আনিয়া দু-জনে যথেচ্ছ শাড়ী, ব্লাউস টানিয়া বাহির করিয়া খাটের উপর রঙের বন্যা বহাইয়া দিল। অনেক গবেষণার পর লুসি একটি গাঢ় সবুজ রঙের দক্ষিণী শাড়ী বাছিয়া লইল, মমতা সান্ধ্য মেঘের মত হাল্কা লালরঙের একখানা রেশমের কাপড় বাছিয়া লইল, তাহাতে চওড়া সুরাটি জরির পাড় বসান। চুলবাঁধা কাপড়-পরা খুব উৎসাহ সহকারে চলিতে লাগিল।

যামিনী মাঝখানে একবার আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন। তিনি তখন গা ধুইতে যাইতেছিলেন। বলিলেন, "করেছিস্ কি রে? এ যে একেবারে শাড়ীর বাণ ডাকছে।"

মমতা বলিল, "আমরা আবার তুলে রাখব মা গুছিয়ে। তুমি যাও শীগগির, লোকজন এসে পড়লে বাবা এখুনি বক্‌বক্ করতে সুরু করবেন। শুধু আমাকে সেই বড় মুক্তোর কণ্ঠীটা দিয়ে যাও, আর লুসিকে গলার জন্যে একটা কিছু দাও।"

যামিনী তাহাদের প্রার্থিত জিনিষ বাহির করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। নীচে চাকর ঝি, মালী সবাই মিলিয়া বিপুল কোলাহল সহকারে ড্রয়িং-রুম এবং ডাইনিং-রুম সাজাইতে লাগিল। কেবলমাত্র দেবেশকে একলা অতিথি-রূপে ডাকিলে সে হয়ত সঙ্কোচ অনুভব করিতে পারে, তাই সুরেশ্বর নিজের ছোট ভাই শিশিরকে এবং মিহির, প্রভা এবং বেটুকেও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। দেবেশ শুধু যে কন্যাটিকেই যাচাই করিবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে কন্যার আত্মীয়-স্বজন সকলকেই যাচাই করিবার সুবিধা পাইবে। অতিথিদের আসিবার সময় হইয়া গিয়াছে, কর্ত্তা, গৃহিণী, ছেলে-মেয়ে সকলেই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। একখানা গাড়ী ত কারখানায়, আর একটা গাড়ী, যেটি সুরেশ্বরের নিজস্ব বাহন, তাহা মিহিরদের আনিতে গিয়াছে, কারণ তাহাদের গাড়ী নাই। শিশির বড়মানুষ, সে নিজের গাড়ীতেই আসিবে। দেবেশকে প্রথমে গাড়ী পাঠাইবেন সুরেশ্বর ভাবিয়াছিলেন, তাহার পর ভাবিলেন, অতটা আধিক্যতা এখনই ভাল নয়, ছেলেটা ভাবিবে যে সে না জানি কোন্ সাত রাজার ধন এক মাণিক। বাড়ি ফিরিবার সময় না-হয় সুরেশ্বর তাহাকে নিজের গাড়ীতে পাঠাইবেন।

প্রথমেই আসিল মমতার মামার-বাড়ির দল। প্রভা কথা বলে একাই এক-শ'র সমান, সে আসিবামাত্রই তাহার হাসিতে এবং গল্পে বাড়ি মুখরিত হইয়া উঠিল। এমন কি সুরেশ্বরেরও মুখের এবং মনের উপরের মেঘ অনেকখানি কাটিয়া গেল।

তাহার পরই আসিল দেবেশ। তাহার গাড়ী নাই, কাজেই সে ট্যাক্সি করিয়া আসিয়াছে। সাধারণতঃ সে হিসাবী মানুষ, কিন্তু আজ তাহাকে গুটি-তিন টাকা খরচ করিতেই হইয়াছে, কারণ জমিদার-বাড়িতে কিছু ভাবী জামাই ট্রামে চড়িয়া আবির্ভূত হইতে পারে না?

দেবেশ আসিতেই সুরেশ্বর নীচে নামিয়া গিয়া, তাহাকে আদর করিয়া বসাইলেন। শিশির তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়া তাঁহার বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর ভাল নাই, অথচ দেবেশকে একেবারে মেয়ে-মজলিসে ফেলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে পারেন না। শিশির থাকিলে সে-ই তাঁহার প্রতিনিধি হইতে পারিত, মিহির হাজার হউক অন্য পরিবারের মানুষ, কন্যার মামা মাত্র।

যাহা হউক, সুরেশ্বর উপরে খবর পাঠাইয়া দিলেন,

সকলকে নীচে আসিবার জন্য। নিজে বসিয়া অতিথির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। দেবেশ মানুষটি ছোটখাট, তবে রোগা বলিয়া তাহাকে কিছু খারাপ দেখায় না। রংটা বাপের চেয়ে ফরসা, এমন কি বাঙালীর পক্ষে ফরসাই। চোখে চশমা, বেশভূষায় খুব ফিট্‌ফাট।

ছেলেমেয়েদের লইয়া যামিনী, মিহির, প্রভা সকলে প্রায় একসঙ্গেই নামিয়া আসিলেন। দেবেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাড়াইল, সুরেশ্বর সকলের সঙ্গে তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন। একসঙ্গে আধ ডজন প্রায় নমস্কার করিয়া তাহার পর বেচারা দেবেশ আবার বসিতে পাইল।

সকলের অলক্ষ্যে সে একবার মমতাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। চশমা চোখে থাকায়, সে চট্ করিয়া কাহারও কাছে ধরা পড়িল না। ভাবিল মেয়েটির রং খুব ফরসা বটে, অবশ্য সবটাই নিজস্ব, কি তুলির কাছেও কিছু ধার করা তা বলা শক্ত। মুখটা যতটা নিখুঁৎ বলিয়া শুনিয়াছিলাম, তাহা ত বোধ হইতেছে না। নাকটা আরও সুগঠিত হইলে ভাল হইত। মুখের ভাবটাও যুবতীসুলভ নয়, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চারিদিকে কেমন তাকাইতেছে দেখ না, ঠিক যেন কচি খুকি। অন্য মেয়েটি দেখিতে তত সুন্দরী নয়, কিন্তু মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে খুব চালাক-চতুর। কিন্তু ভাবী শাশুড়ীটি ত দিব্য দেখিতেছি। এত বয়সে চেহারার এমন জলুশ সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির দেখিতেছি। মোটের উপর মামীশাশুড়ী এবং তাঁহার মেয়ের ধরণ-ধারণই দেবেশের চোখে ভাল লাগিল। যামিনী এবং মমতা উভয়েই সুন্দরী, কিন্তু এক জন যেন পাষাণ-প্রতিমা, আর এক জন সবে যেন শৈশব-স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়াছে।

যামিনীর প্রথম-দর্শনে দেবেশকে বিশেষ ভাল লাগিল না। বড় বেশী কৃত্রিমতা, যেন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, স্বাভাবিকতা কোথাও নাই। পান থেকে চুণ খসিলেই যেন ইহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে।

বেটু এবং সুজিত হাসি চাপিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে, অতিথি হইতে যথাসাধ্য দূরে বসিয়া রহিল। সুরেশ্বরের কাছে ধমক খাইবার ভয়েই তাহারা ঘরে আসিয়াছিল, না হইলে অতিথিটির সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ তাহাদের মনে ছিল না। ক্রমশঃ

কমল

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

—তবু জানিলাম,—কিছু না কহিলে বাণী—
সে-কথাটি, যাহা শুধু তুমি আমি জানি
মনে মনে। যে কথা নিদ্রায় জাগরণে,
ধ্যানে জ্ঞানে ফিরে ছুটি উন্মুখ যৌবনে।
গোধূলির লাজরক্ত উচ্ছ্বসিত আলো
দু-জনের মুখে পড়ি দোঁহারে বুঝালো
"এই যে!"—কেবল এই দুটি মাত্র কথা।
পুলকরোমাঞ্চপুষ্পভারঅবনতা
শীর্ণ তনুলতাখানি আকুঞ্চিত করি
চলে গেলে!—আঁধারে ছাইল বিভাবরী
পশ্চাতের ব্যবধান। তবু যতটুক
দেখা যায়,—দেখি। পরে ফিরাইয়া মুখ
সুধাস্নিগ্ধ পূর্ণ বক্ষে চলে যাই ঘরে।
শ্রান্তি-ক্লান্তি চিত্ত হ'তে কোথা যায় স'রে!

যে-সন্ধ্যা সবারই কর্ম্মে ফেলে যবনিকা,
মোর তরে সে-ই নব জীবন ভূমিকা
রচি দেয় স্বপ্নে তব। দিবা অবসানে
থাকিতে কি পারি? তাই এসেছি সন্ধানে,
কোথা সে শান্তির ছবি।—হায় রে দুরাশা!
—ঐ তো ফুরায়ে গেল লোক যাওয়া-আসা;
গেল আলো, কালিমায় সবই গেল ঢাকি
আঁখিতে মিলাল না তো কালো দুটি আঁখি!
সম্মুখে শীতল রাত্রি মসীকৃষ্ণ গাঢ়,
নিষুপ্ত বিচ্ছেদদাহ দীপ্ত হবে আরও;
কোথা নিদ্রা, কোথা তার সৃষ্টিবিস্মরণী
সম্মোহ! যেমন ছিল রয়েছে তেমনি
তোমার ভাবনা। পুন আসিবে প্রভাত,
আবিল বিক্ষুব্ধ করি তুলিবে নির্ঘাত
দিবসের শতপাকে হৃদয়ের তল,—
তারও 'পরে র'বে তুমি অমল কমল॥

ব্রহ্মসূত্রম্ বা বেদান্তদর্শনম্—দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ; শঙ্করভাষ্য, ভামতী ও কল্পতরু টীকা এবং ভাষ্য ও ভামতীর বঙ্গানুবাদসহ, পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং পণ্ডিত শ্রীচারুকৃষ্ণ তর্কতীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ; ৬নং পার্শিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত ; মূল্য ২৲ টাকা।

মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রীতে বেদান্তের সকল তত্ত্ব সংক্ষেপে বিন্যস্ত করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জগতের ব্রহ্মকারণ-বাদ স্থাপন ও দ্বিতীয় পাদে বৌদ্ধাদি পরমতসকল খণ্ডন করিয়াছেন, এজন্য দার্শনিকগণের নিকট এই অংশত্রয়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় ; এবং এজন্যই ইহা আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও টোলের বিবিধ পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু আচার্য্যের ভাষ্য প্রসন্নগম্ভীর হইলেও, এই সকল স্থলে এত তর্কবহুল যে ভামতীর সাহায্য ভিন্ন আচার্য্যের যুক্তির সম্পূর্ণ অনুসরণ প্রায় অসম্ভব ; আবার ভামতীর দুরূহত্ব ভুক্তভোগীমাত্রেরই পরিজ্ঞাত। সম্পাদক মহাশয় বহু বৎসর পূর্ব্বে ভাষ্য ও ভামতীর বঙ্গানুবাদ সহ চতুঃসূত্রী প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; গত বৎসর দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ এবং এই বৎসর দ্বিতীয় পাদ পূর্ব্বোক্তভাবেই প্রকাশিত করিয়া বেদান্তদর্শন অধ্যয়নের পথ সুগম করিয়াছেন ; এজন্য তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন।

কিছুদিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজ হইতে ভামতীর ইংরেজী অনুবাদসহ চতুঃসূত্রী প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভামতীর অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে কোনও ভাষায়ই হয় নাই ; যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, যে সম্পাদক ও অনুবাদক পণ্ডিতদ্বয় ভামতীর বঙ্গানুবাদে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন ; বিশেষতঃ দুরূহ স্থানে ভামতীর তাৎপর্য্য এত সহজবোধ্য করিয়াছেন যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ভিন্ন তাহা সম্ভব হয় না।

ব্রহ্মসূত্রে বেদব্যাসের প্রকৃত অভিপ্রায় নিরূপণের জন্য সূত্রের দ্বারা সূত্রার্থনির্ণয়পদ্ধতিসকল আচার্য্যেরই অনুমোদিত হইলেও শঙ্কর মতেই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুসৃত হইয়াছে, এবং এই জন্য ঐ মতে সূত্র-সকলের বিবিধ প্রকার সঙ্গতি স্বীকৃত হইয়াছে ; কিন্তু ভারতীতীর্থ প্রভৃতির গ্রন্থে উল্লিখিত থাকিলেও ঐ সকল সঙ্গতি সাধারণের জ্ঞাত নহে ; পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে সূত্রসঙ্গতি প্রদর্শন করিলেন, তিনি যেরূপ বিশদভাবে তাহা করিলেন এরূপ ইতিপূর্ব্বে কেহ করেন নাই ; এজন্যও তিনি ধন্যবাদার্হ।

ভূমিকাতে সম্পাদক-মহাশয় গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধদিগের এবং বৈদিক বৌদ্ধমতের অস্তিত্ব বিষয়ে যে-সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পণ্ডিত-মণ্ডলীর বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত এবং ২৫, মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

ইহা রায়-বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়ের জীবনী। কি অদম্য চেষ্টার ফলে রায়-বাহাদুর সুধীসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ডাক্তারী ব্যবসায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজসংস্কারে, ধর্ম্মপ্রাণতায় ও চরিত্রের মহত্ত্বে চুণীলাল অতি উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং লোকসমাজের মঙ্গলের জন্য চুণীলালের জীবন-আখ্যায়িকার প্রয়োজন আছে। গ্রন্থকার সেই প্রয়োজনীয় কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল ও তেজস্বী, বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক এবং আখ্যানভাগ সুবিন্যস্ত। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

সৈয়দ আহ্‌মদ—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রণীত এবং ২৩, ক্রেমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে বুলবুল পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ; তিনি মুসলমানদিগের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিতে এবং নূতন শক্তিতে মুসলমান-সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টা ও উৎসাহে মুসলমান-সমাজে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিয়াছে। গত উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যে-সকল মুসলমান কর্ম্মবীর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সুতরাং এইরূপ মহাপুরুষের জীবনী সকলেরই প্রণিধানযোগ্য ; গ্রন্থকার সরল ভাষায় এই চরিতাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মাঝে মাঝে অত্যধিক ফারসী শব্দ ব্যবহার না করিলে গ্রন্থের ভাষা আরও সহজবোধ্য হইত। গ্রন্থকারের বর্ণনার মধ্যে বড় বেশী উচ্ছ্বাস রহিয়াছে, উহা না থাকিলেই ভাল হইত। পুস্তকের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

স্পর্শের প্রভাব—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। প্রকাশক—শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৫নং কার্ত্তিক বসু লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। পৃ. ২৩৫।

বইখানি উপন্যাস। আখ্যানভাগ চরিত্রবহুল, কিন্তু নায়িকা জ্যোৎস্নার অন্তর্দ্বন্দ্বই ইহার প্রাণবস্তু। এক দিকে অপরিসীম স্বামী-প্রেম, অন্য দিকে অভিজাত-বংশের কঠোর মর্য্যাদাবোধ ও পিতার প্রতি গভীর স্নেহ। এই বৃত্তিগুলির নিদারুণ সংঘাত নানা ঘটনাবিন্যাসের মধ্য দিয়া অতি মনোহর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখক শেষকালে এই বিরোধের সুসমঞ্জস পরিণতিও ঘটাইয়াছেন। প্রধান চরিত্রগুলি, বিশেষতঃ জ্যোৎস্নার

মধ্যে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখিতে পাই। এই প্রকার ছবি বর্ত্তমান সাহিত্যে অচল হইয়া উঠিতেছে। দু-এক জন যাহা মাঝে মাঝে চেষ্টা করেন, ক্ষমতার অভাবে তাহা ব্যর্থ ও হাস্তকর হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সাহিত্যের গতানুগতিকতার মধ্যে আলোচ্য পুস্তকখানি তাই পাঠকের নিকট নূতন ও উপভোগ্য বোধ হইবে। সুরুচি এবং আদর্শের প্রাচীনতা বজায় রাখিয়াও যে আধুনিক উপন্যাস লেখা চলে এবং তাহাতে রসসৃষ্টি কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না, ধীরেন্দ্রনারায়ণের উপন্যাস তাহার পরিচয় দিবে। বিভিন্ন টাইপ আঁকিতেও লেখকের দক্ষতা আছে; এত চরিত্রের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই বেশ পৃথক ও স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে; আবার ক্লান্তিকর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেরও কোথাও প্রয়োজন হয় নাই। পুস্তকের ভাষা গোড়ার দিকে কিছু আড়ম্বরপূর্ণ হইলেও শেষে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল হইয়া উঠিয়াছে। ছাপা বাঁধাই ভাল।

বাস্তবের দু'পৃষ্ঠা—প্রসাদ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—শ্রীসুবোধ মৈত্র, কল্যাণ পাবলিশিং হাউস, ১৮।২।১ অনরেট ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। পৃ. ১৫১।

কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। গল্প কোনটিই নহে, লেখক উদ্ভট খেয়ালে খানিকটা অসম্বদ্ধ প্রলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আড়ষ্ট রচনাভঙ্গী, ভাষার দৈন্য, অজস্র বানান-ভুল, এবং রুচির জঘন্যতা বইটাকে সাহিত্য-রসিকের অপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। বইয়ের ভূমিকায় প্রসঙ্গে লেখক যে বাস্তবতার দোহাই পাড়িয়াছেন, লেখার মধ্যে বাস্তবের লেশমাত্র পরিচয় পাওয়া গেল না।

শ্রীমনোজ বসু

নিরালায়—প্রমথনাথ রায়। মডার্ণ পাবলিশিং সিণ্ডিকেট, ৩৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

নিরালায়, মৃত্যু, ডাক্তার আর হাওয়া বদল—এই চারটি ছোটগল্পে বইখানি ১১১ পাতায় শেষ হইয়াছে। গল্পগুলির প্লট অতি সাধারণ, এবং সবগুলি এক হিসাবে একই ধরণের নিরাশ প্রেমের কাহিনী। তবে বইখানি সুলিখিত বলিয়া পাঠে বরাবরই বেশ একটু তৃপ্তি পাওয়া যায়। কাগজ, বাঁধাই, ছাপা সবই ভাল।

ঋতুরূপ—শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ, বি-এসসি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲।

ছয়টি ঋতুর আনাগোনায় ক্ষণিক মিলনের সঙ্গে সুচির বিরহের যে রূপটি বাস্তিতে থাকে লেখক একটি গীতিনাট্যে তাহা ধরিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

পরিকল্পনাটি সুষ্ঠু এবং গীতিনাট্যের প্রাণস্বরূপ যে-গান সেগুলিও সুরচিত; ফলে বইখানি ভালই লাগিল। সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট; সবুজ কালিতে প্রায় নির্ভুল ছাপা।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ (ভাষাতত্ত্ব)—মুহম্মদ এনামুল্ হক্, এম্-এ, পিএইচ-ডি প্রণীত। প্রকাশক—কোহিনুর লাইব্রেরী, অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মূল্য এক টাকা মাত্র।

গ্রাম্য ভাষার শব্দসঙ্কলন ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনেক দিন পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও অন্যান্য কোন কোন পত্রিকার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। কিছুদিন হইল বিস্তৃতভাবে ও স্বতন্ত্র গ্রন্থের ভিতর দিয়া এইরূপ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। ১৩৩৪ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষগণ শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র গোপ মহাশয় সঙ্কলিত 'ত্রিপুরা জিলার কথ্যভাষা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। দুই-তিন বৎসর হইল শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয় লিখিত নোয়াখালীর চলিত ভাষা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক আলোচনাপূর্ণ বিস্তৃত প্রবন্ধ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত এনামুল হক্ মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে আটটি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্টে সরল সাধারণ ভাবে চট্টগ্রামের কথিত ভাষার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ব্যাকরণ, উচ্চারণ, অর্থ প্রভৃতি বিষয়ে এই ভাষার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ব্যাপকভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে চট্টগ্রামের প্রায় এক সহস্র প্রবাদ ও প্রবচনের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা চট্টগ্রামের চলিত ভাষার নমুনা হিসাবে বিশেষ উপযোগী। তবে সাধারণ ভাষায় অপ্রচলিত শব্দের অর্থনির্দ্দেশের অভাবে এই তালিকার অনেক স্থল সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে। চট্টগ্রামের চলিত ভাষার দিগ্‌দর্শন হিসাবে ও ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার উপযোগী উপকরণের সংগ্রহ হিসাবে গ্রন্থখানি যথেষ্ট মূল্যবান্ সন্দেহ নাই। গ্রন্থমধ্যে—বিশেষ করিয়া স্বরব্যঞ্জন পরিবর্ত্তনরীতির আলোচনা প্রসঙ্গে—ভাষা-তত্ত্বানুমোদিত রীতি অবলম্বিত হইলে ইহার মূল্য আরও বর্দ্ধিত হইত। ভাষা অর্থে বুলি শব্দের বহুল প্রয়োগ এবং 'ন্থাক্করা শব্দ', 'ত্রাক্করা শব্দ' (পৃ. ৪৯), নিষেধিনী (পৃ. ৭৩) প্রভৃতি ভাষা-সাক্ষ্য ও ব্যাকরণ-দুষ্টির নিদর্শন গ্রন্থখানির মর্য্যাদা কিছু ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

গীতার উপদেশ—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহা একখানি গীতা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পুস্তক। ইহাতে গীতার মূল শ্লোকগুলি নাই। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি স্বতন্ত্রভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে সমন্বয়-ভাবের একান্ত অভাব।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

ফরাসী-বিপ্লবে রুশো—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। দাম এক টাকা।

আজিকার এই বিংশ শতাব্দীর ফরাসী সভ্যতার মূলে ভলটেয়ার প্রভৃতি যে-কয়জন চিন্তাশীল মনস্বীর জ্ঞান-গরিমা ও ভাব-সম্পদ অন্তর্নিহিত আছে, তাহার মধ্যে রুশোর পুরুষকার ও চিন্তাধারা অন্যতম। রুশোর Confessions, Emile, Contract Sociale, Nouvelle Heloise, Return to Nature প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। তিনি একাধারে যেমন চিন্তাশীল ও ভাবুক ছিলেন, তেমনি আবার নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোকও ছিলেন। মানুষ যে কখন কি ভাবে একটি মহত্ত্বের পথ অবলম্বন করিয়া ধন্য হয়, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। যে মানুষ সারা জীবন পাপ ও বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছে, সেও একদিন হঠাৎ এক সুবর্ণ-সুযোগে জীবনের সমস্ত ধারা একেবারে বদলাইয়া ফেলে। এমনই ঘটনা আমরা টলষ্টয়ের জীবনে পাইয়াছি, সুইডেনবার্গের জীবনে পাইয়াছি, রুশোর জীবনে পাইয়াছি, আর পাইয়াছি অনেক বড় বড় লোকের জীবনে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজী, ফরাসী ও জার্ম্মানীর সাহিত্যে যে অভিনব Romanticism এর সূত্রপাত আরম্ভ হয়, তাহার মূলেও রুশোর এই চিন্তাধারা। যে ফরাসী-বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা, যে Reign of Terror, September Massacre প্রভৃতি ঘটনা সমস্ত সভ্য জগতের উপর নিগূঢ় ছাপ মারিয়া দেয়, তাহার মূলেও রুশোর এই চিন্তাধারা। যেমন শেলি না জন্মাইলে ব্রাউনিং জন্মাইত না, Alastor লেখা না হইলে Pauline লেখা হইত না, তেমনি রুশো পৃথিবীতে না আসিলে সাহিত্যের রোমাণ্টিক যুগ আসিত না,

জার্ম্মানীর Transcondentalism-এর যুগ আসিত না। ফরাসী জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে, ফরাসী শাসনতন্ত্র, রাষ্ট্রজীবন, ও জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে রুশোর নাম চিরদিন অমর অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যে ভলটেয়ার একদিন রুশোর প্রধান শত্রু ছিলেন তিনিও শেষ জীবনে রুশোর বাণীর অর্থ ও তাৎপর্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন। রুশোর জীবনের এই সমস্ত প্রধান ঘটনা লেখক বেশ খুলিয়া লিখিয়াছেন। লেখকের লিখিবার নৈপুণ্য ও কলাকুশলতা আছে।

ছেলেদের মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় প্রণীত ও ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

মারাঠার নাম করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে শিবাজীর কথা। সেই মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর যাবতীয় জীবন-কথা লেখক ছেলেদের উপযোগী ভাষায় সুন্দর উপাখ্যান আকারে লিখিয়াছেন। শিবাজীর জীবনের কোন কথাই লেখক বাদ দেন নাই, অথচ সমস্তই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। বইয়ের ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল।

পদ্মা—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও ১২নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত কবিতার বই। কিন্তু কোথাও কবিতার গন্ধ মাত্র নাই।

আস্‌বে উদাস শ্বাস্‌বে হুতাশ,
ছাড়বে শুধু বুক ফাটা শ্বাস.

পড়িতে পড়িতে অসহ্য লাগে।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

শান্তিনিকেতনের মুলু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পরলোকগত শ্রীমান্ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ডাকনাম ছিল মুলু]

ছাত্র মুলু

দুর্গম স্থানে যাইবার, অজানা লক্ষ্য সন্ধান করিবার প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক উৎসাহ আছে, বিশেষতঃ যাদের বয়স অল্প। এই যাত্রাকালে নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া পদে পদে বাধা অতিক্রম করাই আমাদের প্রধান আনন্দ। কেন না, এই রকম নিজের শক্তির পরিচয়েই মানুষের আত্মপরিচয়ের প্রবলতা।

এই কারণে আমার মত এই যে, শিক্ষার প্রথম ভূমিকা সমাধা হইবার পরেই ছাত্রদিগকে এমন পাঠ দিতে হইবে যাহা তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। অথচ শিক্ষক এই কঠিন পাঠ তাহাদিগকে এমন কৌশলে পার করাইয়া দিবেন যে, ইহা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য না হয়। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রণালী এমন হওয়া উচিত, যাহাতে ছাত্রেরা পদে পদে দুরূহতা অনুভব করে, অথচ তাহা অতিক্রমও করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের মনোযোগ সর্ব্বদাই খাটিতে থাকে এবং সিদ্ধিলাভের আনন্দে তাহা ক্লান্ত হইতে পায় না।

এখানকার বিদ্যালয়ে আমি যখন ইংরেজী শিখাইবার ভার লইলাম, তখন এই মত অনুসারে আমি কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পঞ্চম, চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী শিক্ষার দায়িত্ব আমার হাতে আসিল। তৃতীয় শ্রেণীতে আমি যে সকল ইংরেজী রচনা পড়াইতে সুরু করিলাম, তাহা সাধারণতঃ কলেজে পড়ানো হইয়া থাকে। অনেকেই আমাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, এরূপ প্রণালীতে শিক্ষা অগ্রসর হইবে না।

মুলু আমার এই ক্লাসের ছাত্র ছিল। পড়াতে সে কাঁচা এবং পড়ায় তাহার মন নাই বলিয়া তাহার সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল। শিশুকাল হইতেই তাহার শরীর সুস্থ ছিল না বলিয়া প্রণালীবদ্ধভাবে পড়াশুনা করার অভ্যাস তাহার ঘটে নাই। এই জন্য নিয়মিত ক্লাসের পড়ায় মন দেওয়া তাহার পক্ষে বিতৃষ্ণাকর এবং ক্লান্তিজনক ছিল।

বাল্যকালে ক্লাসের পড়ায় আমার অরুচি নিরতিশয় প্রবল ছিল, একথা আমি অনেকবার কবুল করিয়াছি। এই জন্য প্রাচীন বয়সে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াও, পাঠে কোনো ছাত্রের অমনোযোগ বা অরুচি লইয়া ক্রোধ বা অধৈর্য্য আমাকে শোভা পায় না। পাঠে যাহাতে ছেলেদের মন লাগে একথা আমি বিশেষভাবে চিন্তা না করিয়া থাকিতে

পারি না; অর্থাৎ পাঠে অনবধান বা শৈথিল্যের জন্য সকল দোষ ছেলেদেরই ঘাড়ে চাপাইয়া ভৎর্সনা এবং শাস্তির জোরে মাষ্টারির কাজ চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব।

সেই জন্য আমার ক্লাসের ইংরেজী পড়ায় মুলুর মন লাগে কি না তাহা আমার বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল। যেরূপ আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল, মুলুর মন লাগিতে কিছুই বিলম্ব হইল না। কোনো কোনো ছেলে কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিবার ভয়ে পিছনের আসনে বসিত। কিন্তু মুলুর আসন ছিল ঠিক আমার সম্মুখেই। সে দুরূহ পাঠ্য বিষয়কে যেন উৎসাহী সৈনিকের মত স্পর্দ্ধার সহিত আক্রমণ করিতে লাগিল।

আমার ক্লাসে ছেলেরা যে বাক্যগুলি নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করিত, ঠিক তাহার পরের ঘণ্টাতেই এণ্ড্রুজ সাহেবের নিকট তাহাদিগকে সেই বাক্যগুলিরই আলোচনা করিতে হইত। মুলু এই সব বাক্য লইয়া ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করিল। সেই সকল প্রবন্ধ সে এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে উপস্থিত করিত। এমন হইল, সে দিনের মধ্যে তিনটা চারিটা প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল।

প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এই যে তাহার উৎসাহ হঠাৎ এতদূর বাড়িয়া উঠিল তাহার কারণ আছে। প্রথমতঃ, আমার ইংরেজী ক্লাসে আমি কখনই ছাত্রদিগকে বাংলা প্রতিশব্দ বলিয়া দিয়া পাঠ মুখস্থ করাই না। প্রতিপদেই ছাত্রদিগকে চেষ্টা করিতে দিই। এই চেষ্টা করিবার উদ্যমে মুলুর চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা তৃপ্ত হইত। আমি যতদূর বুঝিয়াছিলাম, বাহির হইতে কোন শাসন বা তাগিদ সম্বন্ধে মুলু অসহিষ্ণু ছিল। তাহার পরে, তাহাদের পাঠ্য বিষয় বিশেষরূপ কঠিন ছিল বলিয়াই মুলু তাহাতে গৌরব বোধ করিত। এই কঠিন পাঠে তাহাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা সে অনুভব করিয়াছিল। এই জন্য ইহার যোগ্য হইবার জন্য তাহার বিশেষ জেদ ছিল। আর একটি কথা এই, যে, আমি নুম্যান, ম্যাথ্যু আর্নল্ড, ষ্টিফেন্সন্ প্রভৃতি লেখকের রচনা হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া, তাহাকে পড়াইতাম, তাহার মধ্যে

গভীর ভাবে ভাবিবার কথা যথেষ্ট ছিল। এই কথাগুলি কেবলমাত্র ইংরেজী বাক্য শিক্ষার উপযোগী ছিল, এমন নহে। ইহাদের মধ্যে প্রাণবান্ সত্য ছিল,—সেই সত্য মুলুর মনকে যে আলোড়িত করিয়া তুলিত তাহার প্রমাণ এই যে, এইগুলি কেবলমাত্র জানিয়া ইহার অর্থ বুঝিয়াই সে স্থির থাকিতে পারিত না; ইহাতে তাহার নিজের রচনা-শক্তিকে উদ্রিক্ত করিত। কাঠে অগ্নি সংস্পর্শ সার্থক হইয়াছে তখনি বুঝা যায় যখন কাঠ নিজে জ্বলিয়া উঠে। ছাত্রদের মনে শিক্ষা তখনি সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝি, যখন তাহারা কেবলমাত্র গ্রহণ করে এমন নহে, পরন্তু যখন তাহাদের সৃজনশক্তি উদ্যত হইয়া উঠে। সে শক্তি বিশেষ কোনো ছাত্রের যথেষ্ট আছে কি নাই, সে শক্তির সফলতার পরিমাণ অল্প কি বেশী, তাহা বিচার্য্য নহে, কিন্তু তাহা সচেষ্ট হইয়া ওঠাই আসল কথা। মুলু যখন তাহার নবলব্ধ ভাবগুলি অবলম্বন করিয়া দিনে দুটি তিনটি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল, তখন এণ্ড্রুজ সাহেব তাহার মনের সেই উত্তেজনা লইয়া প্রায় আমার কাছে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন।

এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানসিক উদ্যমশীল বালক অল্প কিছু দিন আমার কাছে পড়িয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহাকে কোনো একটা বাঁধা নিয়মে টানিয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন; ইহার নিজের বিচার-বুদ্ধি ও সচেষ্ট মনকে সহায় না পাইলে ইহাকে বাহিরে বা ভিতরে চালনা করা দুঃসাধ্য। সকল ছেলে সম্বন্ধেই একথা কিছু না কিছু খাটে এবং এই জন্যই প্রচলিত প্রণালীর শিক্ষাব্যাপারে সকল মানবসন্তানই ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয় এবং জবরদস্তি দ্বারা তাহার সেই স্বাভাবিক বিদ্রোহ দমন করিয়া তাহাকে পীড়া দেওয়াই বিদ্যালয়ের কাজ। বাহ্য শাসন সম্বন্ধে মুলুর সেই বিদ্রোহ দমন করা সহজ হইত না বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং ইহাও আমার বিশ্বাস ছিল যে, অন্তত ক্লাসে ইংরেজী পড়া সম্বন্ধে আমি তাহার মনকে আকর্ষণ করিতে অকৃতকার্য্য হইতাম না।

শান্তিনিকেতনে প্রসাদের শ্রাদ্ধ-বাসরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৬।

এখানে যারা একসঙ্গে এসে মিলেচি, তাদের অনেকেই একদিন পরস্পরের পরিচিত ছিলুম না; কোন্ গৃহ থেকে কে এসেচি, তার ঠিক নেই। যে দিন কেউ এসে পৌঁছল, তার আগের দিনেও তার সঙ্গে অসীম অপরিচয়। তার পরে একেবারে সেই না-জানার সমুদ্র থেকে জানা-শোনার তটে মিলন হ'ল। তার পরে এই মিলনের সম্বন্ধ কতদিনের কত না-দেখা-শুনোর মধ্যে দিয়েও টিঁকে থাকবে। এই জানাটুকু কতই সঙ্কীর্ণ, অথচ তার পূর্ব্বদিনের না-জানা কত বৃহৎ।

মায়ের কোলে যেম্নি ছেলেটি এল, অম্নি মনে হ'ল এদের পরিচয়ের সীমা নেই; যেন তার সঙ্গে অনাদি কালের সম্বন্ধ, অনন্তকাল যেন সেই সম্বন্ধ থাকবে। কেন এমন মনে হয়? কেননা, সত্যের ত সীমা দেখা যায় না। সমস্ত "না" বিলুপ্ত করেই সত্য দেখা দেয়। সম্বন্ধ যেখানেই সত্য, সেখানে ছোট হয় বড়, মুহূর্ত্ত হয় অনন্ত; সেখানে একটি শিশু আপন পরম মূল্যে সমস্ত সৌরজগতের সমান হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে কেবল জন্ম এবং মৃত্যুর সীমার মধ্যে তার জীবনের সীমা দেখা যায় না, মনের মধ্যে আকাশের ধ্রুবতারাটির মত সে দেখা দেয়। যার সঙ্গে সম্বন্ধ গভীর হয় নি, তা'কে মৃত্যুর মধ্যে কল্পনা করতে মন বাধা পায় না, কিন্তু পিতামাতাকে, ভাইকে, বন্ধুকে যে জানি, সেই জানার মধ্যে সত্যের ধর্ম্ম আছে—সেই সত্যের ধর্ম্মই নিত্যতাকে দেখিয়ে দেয়। অন্ধকারে আমরা হাতের কাছের একটুখানি জিনিষকে একটুখানি জায়গার মধ্যে দেখতে পাই। একটু আলো পড়্বামাত্র জানতে পারি যে, দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যা-কিছু ভয়ভাবনা, সে কেবল অন্ধকার থেকেই হয়েচে। সত্য সম্বন্ধ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই আলো ফেলে এবং এই আলোতে আমরা নিত্যকে দেখি।

হৃদয়ের আলো হচ্চে প্রীতির আলো, অপ্রীতি হচ্চে অন্ধকার। অতএব এই প্রীতির আলোতে আমরা যে সত্যকে দেখ্তে পাই, সেইটিকে শ্রদ্ধা করতে হবে; বাহিরের অন্ধকার তাকে যতই প্রতিবাদ করুক, এই শ্রদ্ধাকে যেন বিচলিত না করে। সত্যপ্রীতির কাছে অল্প ব'লে কিছু নেই, সত্যপ্রীতি ভূমাকেই জানে। সংসার সেই ভূমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, মৃত্যু সেই ভূমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে থাকে, কিন্তু প্রেমের অন্তরতম অভিজ্ঞতা যেন আপনার সত্যে আপনি বিশ্বাস না হারায়।

ভুবনডাঙ্গা প্রসাদ বিদ্যালয়

আমাদের যে অতি প্রিয়, প্রিয়দর্শন ছাত্রটি এখানে এসেছিল—না-জানার অতলস্পর্শ অন্ধকার থেকে জানার জ্যোতির্ময় লোকে—এল তার জাগ্রত জীবন্ত ঔৎসুক্যপূর্ণ চিত্ত নিয়ে, আমাদের কাজ কর্ম্মে* সুখে দুঃখে যোগ দিলে — আজ শুন্‌চি সে নেই। কিন্তু যেই শুনলুম সে নেই, অমনি তার কত ছোট ছোট কথা বড় হয়ে উঠে আমাদের মনের সামনে দেখা দিলে। ক্লাসে যখন সে পড়ত, তখন সেই সেবার সময়কার বিশেষ দিনের বিশেষ এক-একটি সামান্য ঘটনা, বিশেষ কথায় তার হাসি, বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে তার উৎসাহ, এসব কথা এতদিন বিশেষভাবে মনে ছিল না, আজ মনে পড়ে গেল। তার পরে ছেলেদের আনন্দবাজারে যে-সব কৌতুকের উপকরণ† সে জড় করেছিল, সে সমস্ত আজ বড় হয়ে মনে পড়েচে।

বড়লোকের বড়কীর্ত্তি আমাদের স্মরণক্ষেত্রে আপনি জেগে উঠে। সেখানে কীর্ত্তিটাই নিজের মূল্যে নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু এই বালকের যে-সব কথা আমাদের মনে পড়চে, তাদের ত নিজের কোন নিরপেক্ষ মূল্য নেই। তারা যে বড় হয়ে

* "সে একজন দক্ষ অধিনায়করূপে ছাত্রদের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিল।" "সাহিত্যসভায় তাহার মুখে হাস্যরসের কবিতা শুনিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইত।" শ্রীকালীমোহন ঘোষ। "বড় ছোট কোন ছেলেকেই সে নিয়মপালনে ত্রুটি হ'লে ক্ষমা করত না। তার সময়ে শ্রম খুব ভাল চলেছিল।"—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

† "গত বছরের ছেলেদের আনন্দবাজারে সেই যে প্রত্নতত্ত্ব-সংগ্রহের দোকানের 'রামের পাদুকা', 'ভীমের গদা' প্রভৃতির একটা বিবরণ 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, তার প্রধান উৎসাহী উদ্যোগী ছিল মুলু।",—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

"সেবার, গত বৎসর, ২রা বৈশাখ আনন্দবাজারের দিন তারই উৎসাহ এবং কথামত আমরা এক দোকান করলাম—প্রত্নতত্ত্বাগার। তাতে অনেক অপূর্ব্ব পৌরাণিক জিনিষ ছিল। রামের পাদুক, সীতার পায়ের ধূলি, অশোকের হস্তলিপি, চণ্ডীদাসের চুল ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এসব যোগাড় করতে আমাদের বিশেষ কষ্ট পেতে হয় নি। মুলুর বুদ্ধি অনুসারে এসব পৌরাণিক জিনিষ আধুনিক কালের ব্যক্তি-বিশেষদের নিকট হ'তে যোগাড় হয়েছিল।"—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

উঠেছে সে কেবল একটি মূল সত্যের যোগে। সেই সত্যটি হচ্চে সেই বালকটি স্বয়ং। পূর্ব্বেই বলেচি, সত্য ভূমা। অর্থাৎ বাইরের মাপে, কোনো প্রয়োজনের পরিমাণে, তার মূল্য নয়—তার মূল্য আপনাতেই। সেই মূল্যেই তার ছোটও ছোট নয়, তার সামান্য চিহ্নও তুচ্ছ নয়—এই কথাটি ধরা পড়ে প্রেমের কাছে।

তোমাদের সঙ্গে সে যে হেসেছিল, খেলেছিল, একসঙ্গে পড়েছিল, এ কি কম কথা! তার সেই হাসি খেলা, তোমাদের সঙ্গে তার সেই পড়াশোনা, মানুষের চিরউৎসারিত সৌহার্দ্য-ধারারই অঙ্গ, সৃষ্টির মধ্যে যে অমৃত আছে, সেই অমৃতেরই অংশ। আমাদের এখানে তোমাদের যে প্রাণপ্রবাহ, যে আনন্দপ্রবাহ বয়ে চলেছে, তার মধ্যে সেও তার জীবনের গতি কিছু দিয়ে গেল, এখানকার সৃষ্টির মধ্যে সেও আপনাকে কিছু রেখে গেল। এখানে দিনের সঙ্গে দিন, কাজের সঙ্গে কাজ, ভাবের সঙ্গে ভাব, প্রতিদিন যে গাঁথা পড়চে, নানা রঙে নানা সুতোয় মিলে এখানে একটি রচনাকার্য্য চলচে। সেই জন্যে এখানে আমাদের সকলেরই জীবনের ছোট বড় নানা টুকরো ধরা পড়ে যাচ্চে; সেই বালকেরও জীবনের যে অংশ এখানে পড়েচে, সমস্ত আশ্রমের মধ্যে সেইটুকু রয়ে গেল, এই কথাটি আজ তার শ্রাদ্ধ-দিনে মনে করতে হবে।

তা ছাড়া তার জীবনের কীর্ত্তিও কিছু আছে এখানে। ভুবনডাঙ্গার গরীবদের জন্যে সে এখানে যে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে গেছে, তার কথা তোমরা সবাই জান। চাঁদা সংগ্রহ করে আমরা অনেক সময় মঙ্গল অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু তার চেয়ে বড় হচ্চে নিজের সাধ্য দ্বারা, নিজের উপার্জ্জনের অর্থ দ্বারা কাজ করা। নৈশবিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে মুলু তাই করেছে। সে পুরানো কাগজ নিজে বোলপুরে বয়ে নিয়ে বিক্রী করে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করত। সে নিজে তাদের শেখাত, তাদের আমোদ দিত। এ সম্বন্ধে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের কোনো সাহায্য সে নেয় নি। এই অনুষ্ঠানটি কেবল যে তার ইচ্ছা থেকে প্রসূত, তা নয়, তার নিজের ত্যাগের দ্বারা গঠিত। তার এই কাজটি, এবং তার চেয়ে বড়, তার এই উৎসাহটি, আশ্রমে রয়ে গেল।

পূর্ব্বে বলেছি, অপরিসীম অজানা থেকে জানার মধ্যে মানুষ আসবামাত্রই সেই না-জানার শূন্যতা এক নিমেষে চলে যায়—সেই না-জানার মহা গহ্বর সত্যের দ্বারা নিমেষে পূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরের মধ্যে বুঝতে পারি, আমাদের গোচরতা এবং অগোচরতা, দুইকেই ব্যাপ্ত করে সত্যের লীলা চল্‌চে। অগোচরতা সত্যের বিলোপ নয়। পাবার বেলায় এই যে আমাদের অনুভূতি, ছাড়বার বেলায় একে আমরা ভুলব কেন? ঢেউয়ের চূড়াটি নীচের থেকে উপরে যখন উঠে পড়ল, তখন সত্যের বার্ত্তা পেয়েছি; ঢেউয়ের চূড়াটি যখন উপর থেকে নীচে নেমে পড়ল, তখন সত্যের সেই বার্ত্তাটিকে কেন বিশ্বাস করব না? এক সময়ে সত্য আমাদের গোচরে এসে "আমি আছি" এই কথাটি আমাদের মনের মধ্যে লিখে দিলে—তার স্বাক্ষর রইল; এখন সে যদি অগোচরে যায়, অন্তরের মধ্যে তার এই দলিল মিথ্যা হবে কেন? ঋষি বলেচেন—

> "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
> ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

এই শ্লোকটির অর্থ এই যে, মৃত্যু সৃষ্টির বিরুদ্ধ শক্তি নয়। এই পৃথিবীর সৃষ্টিতে যেগুলি চালক শক্তি, তার মধ্যে অগ্নি হচ্চে একটি; অণু পরমাণুর অন্তরে অন্তরে থেকে তাপরূপে অগ্নি যোজন বিয়োজনের কাজ করচে; সূর্য্যও তেমনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণকে এবং ঋতু সম্বৎসরকে চালনা করচে। জল পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবহমান, বায়ু পৃথিবীর নিশ্বাসে নিশ্বাসে সমীরিত। সৃষ্টির এই ধাবমান শক্তির মধ্যেই মৃত্যুকেও গণ্য করা হয়েচে। অর্থাৎ মৃত্যু প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাণকে অগ্রসর করে দিচ্চে—মৃত্যু ও প্রাণ এই দুইয়ে মিলে তবে জীবন। এই মৃত্যুকে প্রাণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিভক্ত করে দেখলে, মিথ্যার বিভীষিকা আমাদের ভয় দেখাতে থাকে। এই মৃত্যু আর প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিরাট ছন্দের মধ্যে আমাদের সকলের অস্তিত্ব বিধৃত হয়ে লীলায়িত হচ্চে; এই ছন্দের যতিকে ছন্দ থেকে পৃথক্ করে দেখলেই তাকে শূন্য করে দেখা হয়, দুইকে অভেদ করে দেখলেই তবে ছন্দকে পূর্ণ করে পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মৃত্যুতেই এই যতিকে ছন্দের অঙ্গ বলে দেখা সহজ হয়—কেননা, আমাদের প্রীতির ধনের বিনাশ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

এ জন্যে শ্রাদ্ধের দিন হচ্চে শ্রদ্ধার দিন, এই কথা বলবার দিন যে, মৃত্যুর মধ্যে আমরা প্রাণকেই শ্রদ্ধা করি।

আমাদের প্রেমের ধন স্নেহের ধন যারা চলে যায়, তারা সেই শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে দিক, তারা আমাদের জীবনগৃহের যে দরজা খুলে দিয়ে যায়, তার মধ্য দিয়ে আমরা শূন্যকে যেন না দেখি, অসীম পূর্ণকেই যেন দেখতে পাই। আমাদের সেই যে অসত্যদৃষ্টি, যা জীবন-মৃত্যুকে ভাগ করে ভয়কে জাগিয়ে তোলে, তার হাত থেকে সত্যস্বরূপ আমাদের রক্ষা করুন, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের অমৃতে নিয়ে যান।

দৈব-ধন

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দেব

প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারেরা সময় সময় এমনই জটিল নাটকীয় সমস্যার সৃষ্টি করিতেন যে শেষে মানব-চরিত্র দ্বারা কিছুতেই তার সমাধান হইত না। সর্ব্বশেষ দুঃখে তাই স্বর্গ হইতে দেবতার আবির্ভাব করাইয়া ঘটনার মিল খাওয়াইতেন।

জমিদার হরিবিলাস এই গ্রীক নাটকীয় পদ্ধতি অবগত ছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু আয়ের বিশ গুণ অতিরিক্ত ঋণ করিয়া যখন তাহা পরিশোধের আর কোনও পার্থিব উপায়ই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না, তখন ক্রমাগত চিন্তা করিতে করিতে শেষটায় স্থির সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হইলেন যে একদিন-না-একদিন আধিদৈবিক সাহায্যে নিশ্চয়ই তিনি এই বাড়তি ঋণ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেন।

ভগবান শুধু নাকি তাহাদিগকেই সাহায্য করেন যাহারা নিজে আত্মোন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকে। তাই দৈব-শক্তি বিকাশের পথ সুগম করিবার অভিপ্রায়ে সাত পুরুষের শহরস্থিত বাস্তুভিটা ছাড়িয়া তিনি পল্লীগ্রামের এক কাছারী-বাড়িতে গিয়া স্থায়ী আস্তানা গাড়িয়া বসিলেন।

দুষ্টলোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে পাওনাদারদের তাড়নায়ই হরিবিলাস শহর ছাড়িয়া গিয়াছেন; কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায়, হরিবিলাসের বৈঠকখানার অতি প্রাচীন কৌচ-কেদারায় নবাবী-আমলের এত বেশী ছারপোকা সঞ্চিত ছিল যে কোনো পাওনাদারই তাগাদায় গিয়া অধিকক্ষণ সেখানে বসিয়া অপেক্ষা করিতে পারিত না। আবার অনেক ক্ষণ অপেক্ষা না করিলে হরিবিলাসের সহিত সাক্ষাৎকারও ঘটিত না, যেহেতু প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি সন্ধ্যাহ্নিকে ব্যাপৃত থাকিতেন। বাসস্থান পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে হরিবিলাস প্রকাশ্যে বলিতেন যে জমিদারী হইতে নিজে অনুপস্থিত থাকায় নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে, রীতিমত উশুল-তহশীল হয় না, যা-ও বা কিছু হয় তার বেশীর ভাগই নায়েব-গোমস্তার পেটে যায়। মনে মনে কিন্তু তাঁর ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে ঐ দুর্গম পর্ব্বত-জঙ্গলাকীর্ণ পাড়াগাঁয়ের কোন-না-কোন নিভৃত প্রদেশ হইতে নিশ্চয়ই একদিন পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত গুপ্তধন হস্তগত হইবে, এবং সেই অর্থেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইবে। দৈবের গতিই বিচিত্র।

শহর হইতে চল্লিশ মাইল দূরে হরিবিলাসের জমিদারীর এক প্রকাণ্ড চক। ঐ চকের মাঝে লম্বায় পাঁচ মাইল জুড়িয়া নিশুতি নামে একটা বিল ছিল। বিলের তিন পাড় ঘিরিয়া উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী। শুধু একটি পাড় ঢালু হইয়া সোমাই নদীর সহিত মিশিয়াছে। বর্ষায় বিলের জল থই থই করিতে থাকে। সামান্য বাতাসেই সেই অগাধ জলরাশি লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ তুলিয়া সতী-হারা শিবের ন্যায় প্রলয় তাণ্ডবে মাতিয়া উঠে। উন্মত্ত আক্ষেপে নৌকা, আরোহী, বনবাদাড় যাহা কবলে পায়, ধ্বংসোন্মুখ আলিঙ্গনে তাহাই কুক্ষিগত করিয়া ফেলে। এই ভয়ঙ্কর বিল সম্বন্ধে সে-অঞ্চলে প্রবাদ ছিল,

'সব বিল নাড়ে-চাড়ে,
নিশুতি বিল প্রাণে মারে।'

শীতকালে কিন্তু বিলের এই অগাধ জলরাশি শুকাইয়া যাইত। শুধু, পাহাড়ে নদী পাটুলি চকচকে রূপালী ছুরির মত শুষ্ক নিশুতির বুক চিরিয়া কলকল রবে সোমাই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িত। পাটুলির দুই পাড় জুড়িয়া তখন বহুদূর বিস্তৃত দূর্ব্বাঘাস পথিকের নয়নের সম্মুখে সবুজ পর্দ্দা টানিয়া রাখিত।

পরিপূর্ণ বর্ষায় নিশুতি বিল যাহার দোহাই মানে বলিয়া সে-অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, তিনি হিন্দুর কোন দেবতা বা সাধু-সন্ন্যাসী নহেন- মুসলমান পীর শহীদা বাদশা। বাদশাজী কবে যে নিশুতি বিলের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার কোনও নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু আধিপত্য এমনই প্রবল ছিল যে এতকাল পরও নিশুতির তীরে অবস্থিত বাদশার মোকামে কাপড়-ঢাকা কবর সেলাম না-করিয়া সে-বিলে কেউ নৌকা চালায় না বাঁচ গেলে না। সর্ব্বাগ্রে, 'জয় বাবা শাহীদা বাদশার জয়' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া তবে নেয়েরা বিলে পাড়ি জমাইতে সাহস করে। মোকামের পাশেই নৃপুর কৈবর্ত্তের স্থাপিত জেলেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালীর একখানা খড়ো চালা-ঘর। কালী বলিতে যে সিঁদুর-মাখানো পাথর ছিল, কীর্ত্তন গাহিয়া তাহার চারিদিক প্রদক্ষিণ না-করিয়া জেলেরা নিশুতি বিলে জাল ফেলিত না।

'সায়রে ফেলিনু জাল
এ জাল যেন ছেঁড়ে না
পাগল হাওয়া রুখে দাঁড়া পাগলী মা!'

কালী-বাড়ির প্রাঙ্গণে এক হাত ব্যাসবিশিষ্ট বিশ-পঁচিশ জোড়া কাঁসার করতাল, খোল সহযোগে ভাবোচ্ছ্বাসে অল্পপ্রাণ বর্ণগুলি মহাপ্রাণ লাভ করিয়া গায়কদের মুখ দিয়া যখন বাহির হইতে থাকিত তখন 'পাঘ্লী'-মায়ের কৃপায় জাল না ছিঁড়িলেও অনভিজ্ঞ শ্রোতার কর্ণ-পটহ ছিন্ন হইয়া যাইত।

এই নিশুতি বিলের তীরে কোন্ যুগের তৈরি ইটের ভাঙা দেওয়াল ও টিনে-ছাওয়া কাছারী-ঘরটাই হরিবিলাস নিজ শয়নকক্ষে পরিণত করিলেন। সাঙ্গপাঙ্গ, চাকর-বেয়ারা ইত্যাদির জন্য সারি সারি খড়ের ঘর নির্ম্মিত হইয়া কাছারী-বাড়িটা একটি হাটের চেহারা ধরিল।

জমিদারীতে পদার্পণ করিয়াই হরিবিলাস পরম উৎসাহে নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞে মাতিয়া উঠিলেন। অর্থাৎ, সুবৃহৎ ডিরেক্টরী পাঁজি দেখিয়া শ্রীশ্রীগরুড়গোবিন্দ ঠাকুরের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এক উদ্দেশ্য—তাঁর ঐশ্বর্য্যের বহর দেখিয়া প্রজাদের তাক্ লাগিয়া যাউক; অপর উদ্দেশ্য—এত সব দেব-দেবীকে খুশী রাখিতে পারিলে পুণ্যের পুঁজি ডিপোজিটে থাকিয়া একদিন-না-একদিন বরাতের উপর দৈব-ধনের চেক কাটিয়া দিতে পারে।

নৃপুর কৈবর্ত্তের প্রপৌত্র অশীতিপর বৃদ্ধ দয়াল মাঝি ছিল সেই চকের একটা অঞ্চলের মোড়ল। 'গুণী' বলিয়া সমাজে সে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। লোকটি 'চাউল-পড়া' * জানে; চোরাই মাল বাহির করিতে 'বাটি-চালানোয়' † সিদ্ধহস্ত, বিলের জল দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারিত নীচে কি পরিমাণ মাছ আছে। ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র, প্রেত-পরী, ডাক-ডাকিনীর উপর ছিল তার অসাধারণ প্রতিপত্তি। কিন্তু এই সব ছাপাইয়াও তার যশ ছিল মনসার ভাসান-কীর্ত্তনে। গ্রামের বৃদ্ধেরা বলিয়াছে যে বহুকাল আগে কেবল নমশূদ্রের বাড়িতে ষোড়শোপচারে নৌকা-পূজা হইয়াছিল। তেত্রিশ কোটির মধ্যে নন্দী-ভৃঙ্গী ইত্যাদি লইয়া প্রায় এক শত দেবতার মূর্ত্তি বিশাল মনসা-প্রতিমার চতুর্দ্দিকে গড়িয়া 'নৌকা-পূজা'র প্রকাণ্ড কাঠামো তৈরি হইয়াছিল। তিন দিন ব্যাপিয়া পূজা চলিবে। মহিষ হইতে আরম্ভ করিয়া পাতি-নেবু পর্য্যন্ত বলির ব্যবস্থা! দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টাই ভাসান-গান চলিয়াছে। দূর দেশ হইতে পাঁচ দল কীর্ত্তনীয়াকে বায়না করিয়া আনা হইয়াছে। কাঠামোর সম্মুখে সুবৃহৎ আসরে তাহাদের কীর্ত্তন চলিয়াছে। দয়ালের বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। তাহার

---

* চোর-নির্ণয়ের জন্য সন্দেহজনক ব্যক্তিদিগকে মন্ত্র পড়িয়া চাউল খাইতে দিলে যে সত্য চোর তারই গলায় সে-চাউল আটকাইয়া যায় বলিয়া একটা সংস্কার আছে।

† চোরাই মাল বাহির করিবার জন্য কোনও একটা বিশেষ দিনে একটা বিশেষ রাশি নক্ষত্রযুক্ত লোক কাঁসার বাটিতে হাত ছোঁয়াইয়া রাখিলে বাটিটা নাকি মন্ত্রবলে আপনা হইতে চলিয়া যেখানে চোরাই মাল লুকান আছে সেখানে গিয়া থামিয়া যায়—এইরূপ একটা অন্ধ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

যশও তখন মোটেই ছড়াইয়া পড়ে নাই। সুতরাং সম্মুখের সেই আসরে ভাসান গাহিতে সে 'পাচে'র অনুমতি পাইল না। তাই আসর হইতে প্রায় দুই শত হাত দূরে কাঠামোর পশ্চাতেই তার ছোট খাটো দল লইয়া সে ভাসান-কীর্ত্তন জুড়িয়া দিল। তার গানের আসরে যদিও শ্রোতা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া দয়ালকে মনসার মহিমা-কীর্ত্তনে ঠেকাইয়া রাখে কার সাধ্য? আলখাল্লা কোমর হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত ঘাগরার মত দোলাইয়া, হাতে চামর, মাথায় পাগড়ী, পায়ে নূপুর বাজাইয়া অবিরাম এক দিন এক রাত্রি দয়াল-ওঝা ভাসান গাহিয়া চলিল। শেষরাত্রে লখীন্দরের মৃত্যু-বর্ণনা আরম্ভ হইল। সাঁতালি পর্ব্বতে লোহার বাসর-ঘরে সদ্যপরিণীত মৃত পতির উদ্দেশে বেহুলার মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপ মূর্ত্ত করিয়া শোকাপ্লুত কণ্ঠে দয়াল-ওঝা যখন গাহিল—

"লোহার বাসর-ঘর হারাইনু প্রাণেশ্বর,
জাগো জাগো পাইক-প্রহরী।
প্রভু মোর নাগে খাইল আমারে নিদ্রায় পাইল
ঝাটে জানাও শ্বশুর গোচরি॥
দেবী সনে ঘোর বাদ অতি বড় পরমাদ
তবুও বাঁচিতে ছিল সাধ!
কালি রাখিনু আমি অতি যতনে স্বামী
আজি রাত্রি ঠেকিল প্রমাদ॥"

তখন নাকি মনসার কাঠামো কাঁপিতে কাঁপিতে অন্য সব প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়ার আসর পিছনে করিয়া দয়াল-ওঝার আসরের দিকে মুখ ফিরাইয়া আপনা-আপনি উঠিয়া দাঁড়াইল! ঘটনাটি হাল-আমলে জীবিত কেহ যদিও স্বচক্ষে দেখে নাই, কিন্তু বাপ-ঠাকুরদাদার মুখে সকলেই এই কাহিনী শুনিয়াছে। সেই হইতে আশপাশের গ্রামগুলিতে দয়াল-ওঝার অসীম প্রভাব। এমন কি দূরেও কাহাকে সাপে কামড়াইলে দয়াল-ওঝার ডাক পড়িত। খবর পাওয়া মাত্রই অস্নাত কিংবা অভুক্ত থাকুক, দয়াল ছুটিয়া গিয়া নূতন কাপড় আর জলের হাঁড়ি লইয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির 'বিষ ঝাড়ি'তে লাগিয়া যাইত। নূতন কাপড় রোগীর দেহে ধোপার পাটে যেমন আছড়ায় তেমনই আছড়াইতে আছড়াইতে গলা ফাটাইয়া গান ধরিত।

"বেনিয়া বেনিয়া— লখাইরে!
আরে, কোন্ সাপে মারূলে কামড় মাথার মণি চাইয়া—"

এ-হেন দয়াল মাঝি ছিল জমিদার হরিবিলাসের মোড়ল। আশী বছরের থুড়থুড়ে বুড়া বিশেষ ঘোরা-ফেরা করিয়া পাড়া তদারক করিতে পারিত না সত্য, কিন্তু ঘরে বসিয়াই যখন যাহা বলিয়া দিত অন্য প্রজারা প্রাণপণে তাহা তামিল করিত। একটি বিষয়ে কিন্তু দয়ালের সামর্থ্য ছিল যুবকের ন্যায়। এই বৃদ্ধ বয়সেও ডিঙিতে চড়িয়া প্রতি রাত্রিতে নিশুতি বিলে মাছ ধরিতে কেহই তার সমকক্ষ ছিল না।

সে-বার পূজার আগে জমিদার হরিবিলাসের টাকার বেজায় টানাটানি পড়িল। একে জমিদার-বাড়ির পূজা খুব জাঁকজমক ত করিতেই হইবে। তাহার উপর সদর খাজনার তারিখও নিকটবর্ত্তী। যেমন করিয়া হউক, প্রজাদের কাছ হইতে আরও টাকা আদায় করা চাই-ই। অথচ মুখ ফুটিয়া প্রজাদের নিকট টাকা চাহিলে ইজ্জৎ থাকে না।

নায়েব, গোমস্তা, দয়াল মাঝি প্রমুখ জনকয়েক মোড়ল, বড় প্রজা সেদিন জমিদারের বৈঠকে হাজির। গড়গড়ার নল ফুঁকিতে ফুঁকিতে নায়েব রাধাগোবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া হরিবিলাস বলিলেন—"বুঝলে, গোবিন, আর কয়েকটা দিন পরেই গাদি গাদি টাকা হাতড়ে তোমরা হয়রান হ'য়ে যাবে।"

কর্ম্মচারী প্রায় সকলেরই কয়েক মাসের মাহিনা বাকী পড়িয়াছে। টাকার কথা শুনিয়া তাই তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

মুখের ধোঁয়া ছাড়িয়া হরিবিলাস বলিলেন "তোমরা শোনো নি বুঝি?—নিশুতি বিলের তিন ধারে আমার যে-সব পাহাড় দেখ্‌ছ, সেগুলির মধ্যে কেরোসিন তেলের খনি আছে। কামাচ্‌কাট্‌কার সেই যে নামজাদা ঈগল কোম্পানী—তারা আশী লক্ষ টাকা সেলামী আর ফি-বছর বারো লক্ষ টাকা খাজনা দিয়ে সমস্ত মহালটাই বন্দোবস্ত নিতে চায়।"

সেই দিনই কলিকাতার ফ্রেণ্ডস্ ষ্টোর হইতে চার শত টাকার কাপড়-চোপড় সরবরাহ করিয়া ইংরেজী টাইপ-করা একখানা চিঠি হরিবিলাসের নামে আসিয়াছিল।

হরিবিলাস এক জন বেয়ারাকে বলিলেন, "দেখা না গুপ্ত, ঐ যে তাদেরই একখানা চিঠি পড়ে রয়েছে। শুধু কি ঐ একখানা? চিঠির পর চিঠি টেলির উপর টেলি ঝেড়ে আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে! ভাবছি পূজার পরই কলকাতা গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা পাকাপাকি ক'রে আসব।

নায়েব-গোমস্তা সবই বাংলা-নবীশ। প্রজারাও ইংরেজী জানে না। চিঠিতে কি লেখা আছে জানিতে পারিল না। তবে জমিদারের কথাতেই বুঝিতে পারিল যে তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত! জোত-জমা বসত-বাড়ি সব যদি ঈগল কোম্পানী বন্দোবস্ত নেয় তবে নানা ফন্দি-ফিকিরে তাহাদিগকে উদ্বাস্তু করিবে। তাহারা তখন মাথা রাখিবার ঠাঁই পাইবে না। ধানের সবুজ মাঠে বসাইবে রেল-লাইন, পাহাড়ের মাথায় চড়িবে ক্রেন টিউব। ছায়াশীতল নির্জ্জন পল্লীগুলি কুলি-মজুরের কোলাহল, কলের আওয়াজ আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। তার চেয়ে ধার-কর্জ্জ করিয়াও জমিদারকে আরও টাকা দিয়া হাতে পায়ে ধরিলে হয়ত তাঁর মত পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু আগেই এ-সম্বন্ধে নায়েব বাবুদের সহিত একটু সলা পরামর্শ দরকার। উপস্থিত নায়েব-গোমস্তাদের চোখের ইঙ্গিতে একটু দূরে লইয়া গিয়া প্রজারা এই আশু বিপদ হইতে উদ্ধারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। জমিদারের কাছে বসিয়া রহিল শুধু দয়াল। হরিবিলাসের কথা শুনিয়া তাহারও মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। আশী বছরের পরিচিত এই নিশুতি বিল, পূর্ব্বপুরুষের ভিটা, অসীম প্রতিপত্তি সব ছাড়িয়া এই বৃদ্ধবয়সে সে যাইবে কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে একটা কথা তাহার মনে পড়িল। একদিন সে-কথাটা জমিদারের কানে না তুলিয়া কি বোকামিই না সে করিয়াছে! হরিবিলাসকে একা পাইয়া দয়াল এখন সেই কথা পাড়িল।

"কাজ কি হুজুর, এ সব ফেসাদে! এই নিশুতি বিলে যা ধন আছে, মালিক ইচ্ছা করলে সেই দিয়েই অমন দু-দশটা তেল-কোম্পানী নিজে কিনে নিতে পারেন।"

হরিবিলাস তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন—"বলিস্ কি দয়াল? নিশুতিতে আবার টাকা কোথায়?—খালি ত জল!"

দয়াল চারি দিকে চোখ ফিরাইয়া একবার ভালরকম দেখিয়া নিল, নিকটে আর কেউ আছে কিনা। তার পর হরিবিলাসের প্রায় কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিল, "বললে হয়ত বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু এই নিশুতিতেই মা-মনসার অগাধ ধন লুকানো আছে!"

মনসার ধন?—হরিবিলাস একবার অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন। কিন্তু যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই মনে হইতে লাগিল যেন দৈব-ধন প্রাপ্তির সময় তাঁর নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। দেব-ক্রিয়া, পূজা-অর্চ্চনায় কোনদিন তিনি এতটুকু কসুর করেন নাই। দেবতারা নিশ্চয়ই তার প্রতি প্রসন্ন। এর উপর আবার 'মনসার ধন'-প্রাপ্তিটাও নিতান্ত আকাশ-কুসুম বলিয়া মনে হইল না। মনসার ধনে কত লোক রাজা হওয়ার গল্প তিনি ছেলেবেলা হইতে মুখে মুখে শুনিয়া আসিতেছেন। আবার ঐ কাঁচা-খেকো দেবতার কোপে পড়িয়াও কত ধনী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

—মনসুর শেখ মুসলমান বটে, কিন্তু তার প্রতিও নাকি মনসাদেবীর অসীম কৃপা ছিল। একদিন নদীর পাড়ে মনসুর গরু চরাইতেছিল। এমন সময় দেখে নদী দিয়া মস্তবড় একখানা নৌকা চলিতেছে। নৌকা হইতে পরমাসুন্দরী এক রমণী তাহাকে ডাকিয়া বলিল— 'মনসুর, যদি টাকা নিবি ত যা কাছে আছে তাই নিয়ে নদীর আরও কিনারে এগিয়ে আয়। মনসুরের কাছে তখন আর কি থাকিবে? মাথায় একটা টুপি আর ছোটখাটো একটা বাঁশের ছাতা। নদীর কিনারে গিয়া তাই পাতিয়া ধরিল। নৌকা ভিড়াইয়া রমণী তখন সোনার মোহর আর টাকায় সে-দুটি ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। লোভ বাড়িয়া যাওয়ায় মনসুর বাড়ি হইতে গোটাকয় ঝুড়ি আনিয়া টাকা লইবার জন্য ছুটিল। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখে রমণী আর নৌকা দুই-ই অন্তর্দ্ধান হইয়াছে।

—টাকা-কড়িতে রামধন চক্রবর্ত্তীর সংসার জমজম্ কিন্তু সে-বার শ্রাবণ মাসে মনসাপূজায় পদ্মফুল দিতে ভুলিয়া গেলেন। প্রথমে বলির পাঁঠা আটকাইয়া গেল। তার পর দুই মাস যাইতে-না-যাইতেই একদিন দুপুর রাতে চক্রবর্ত্তীর ঘরের মেঝের নীচে একটা ভীষণ শব্দ শোনা গেল। প্রভাতে মেঝে খুঁড়িয়া দেখা যায় প্রকাণ্ড একটা সুড়ঙ্গ ঘরের

নীচে হইতে সোজা গিয়া পাশে পদ্মপুকুরে নামিয়াছে। মনসার ধনের ঘড়া রামধনের গৃহ হইতে পুকুরের পদ্মবনে চলিয়া গেল। সেই হইতে রামধন ফকির!

—এই প্রকার কত কাহিনী চকিতে হরিবিলাসের মনে পড়িয়া গেল। নিশুতি বিলে হরিবিলাসের সাত পুরুষের অধিকার! ঘোর বর্ষায় ঝড়-তুফানে এত কাল ধরিয়া নিশুতি বিলে মাল-বোঝাই কত নৌকা ডুবিয়াছে। কে বলিতে পারে যে সে-সব নৌকার ধনরাশি এখনও পাটুলি নদীর গর্ভে আত্মগোপন করিয়া রহে নাই? ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মনসার কৃপা হইলে বিলের মালিক হরিবিলাসই বা তাহা পাইবে না কেন?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া হরিবিলাস বলিলেন—"কিন্তু দয়াল, মায়ের কৃপা না হ'লে ত সে-ধন আমি পাব না!"

দয়াল উত্তর করিল—"মায়ের কিরপা এক রকম হ'য়েই আছে।"

তখনই আবার চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীচু গলায় বলিল—"কারও কাছে বেফাঁস না করেন ত একটা খবর বলি। রাত-বেরাত ডিঙি চড়ে এই নিশুতি বিলে আমি মাছ ধরে বেড়াই। দুপুর রাতে কত কিছুই চোখে পড়ে, কিন্তু শহীদা বাদশার দয়ায় আজও কোন বিপদে পড়ি নি। কিছুদিন ধ'রে এক আশ্চর্য্য ঘটনা লক্ষ্য ক'রে আসছি। শনি-মঙ্গলবার অমাবস্যা-রাতে নিশুতির বুকে একসঙ্গে বহু 'পিরদীম্' ভেসে উঠে। ও আর কিছুই নয়, মা-মনসার ধনের সিন্দুক সব 'পিরদীম' মাথায় ক'রে জলের উপর দেখা দেয়। যদি মালিকের জন্যই না হ'বে, তবে এতদিন ওগুলো দেখি নি কেন?"

দৈব-ধন-প্রাপ্তির প্রবল ঝোঁক হরিবিলাসের মগজে চাপিয়াছিল। আগ্রহের সহিত বলিলেন—"তুই ত মস্ত বড় গুণী, দয়াল! সিন্ধুক ধরতে পারবি?"

"মায়ের দয়া আর মনিবের হুকুম হ'লে এ আর তেমন শক্ত কাজ কি, হুজুর! সিদ্ধপুরুষ নেপুর মাঝি ছিলেন আমার ঠাকুর্দ্দার বাবা, মায়ের 'কিরপায়' নিজেও গুণী ব'লে একটু নাম কিনেছি। 'পিরদীমের' কাছ ঘেঁসে আগে সব সরষের ছিটে। তার পর সিন্দুক ঘিরে জলের উপর যদি একটা মন্তরের বেড়া দিতে পারি, তবে আর যায় কোথা? সিন্দুক কিছুতেই তলাতে পারবে না।"

আশায় হরিবিলাসের মন নাচিয়া উঠিল। হাঁ, যদি কেউ পারে তবে এই দয়ালের মত গুণীর দ্বারাই তা সম্ভব!

"তবে তাই কর্, দয়াল! আসছে কালীপুজায় ঘোর অমাবস্যা। ঐদিন তৈরি হ'য়ে থাকিস্। যদি সিন্দুক ভেসে ওঠে - প্রদীপ দেখা যায়—তবে ধ'রে ফেল্‌বি।"

দু-জনের ভিতর যুক্তি-পরামর্শ হইল। অপর কেহ জানিল না; কারণ নাকি 'তিন কানে মন্ত্রনাশ!'

পরদিন হইতে হরিবিলাস পূজা-অর্চ্চনার ফর্দ্দ বাড়াইয়া দিলেন। দয়ালও মন্ত্র-তন্ত্র সব ঝালাইয়া লইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে অমাবস্যা তিথি উপস্থিত হইল। কার্ত্তিক মাসের শেষ—বিলের জল অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। দয়াল আজ দিনের বেলায় রাতের কাজ সারিয়া রাখিতেছে। রাত্রিকালে সিন্দুক ধরিতে হইবে, তাই বিকালে পাহাড় হইতে প্রায় পোয়া মাইল দূরে বিলের একটা দিক ঘেরিয়া গোটাকয় খুঁটি পুঁতিল। সেই সব খুঁটির সহিত মাছ ধরিবার বেড়াজাল বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন ভোরে জাল গুটাইয়া মাছ তুলিয়া লইলেই হইবে। মাছ-ধরা দয়ালের কিছুতেই বাদ পড়িতে পারে না। তার উপর এখন কার্ত্তিক মাস—বিলে অজস্র মাছ মরিতেছে!

কাছারী-ঘরটা বিলের খুব কিনারে। সন্ধ্যা হইতেই কাছারী-ঘাটে ডিঙি বাঁধিয়া দয়াল হরিবিলাসের পায়ের কাছে বসিয়া রহিল। কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া বাড়ি হইতে সর্ষপ, লোহার টুক্‌রা, শূয়োরের দাঁত ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে আনিয়াছে। হরিবিলাসও কাছারী-ঘরের বারান্দায় একখানা আরাম-কেদারায় বসিয়া বিলের দিকে কড়া নজর রাখিলেন। মাঝে মাঝে একটা দূরবীণ চোখে লাগাইয়া দেখিতেছিলেন, প্রদীপ কখন ভাসিয়া উঠে। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খুব জোর এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যদিও থামিয়া গেল কিন্তু অন্ধকার খুবই ঘনাইয়া আসিল। ঠায় একই জায়গায় বসিয়া থাকায় মাঝে মাঝে হরিবিলাসের চোখ দুটি তন্দ্রায় জড়াইয়া আসিতেছিল। চোখ রগড়াইয়া জোরে ঘুম তাড়াইতেছিলেন। প্রায় দুপুর রাতে হঠাৎ হরিবিলাস

দয়ালের কাঁধ টিপিলেন। দয়ালও বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। হরিবিলাসের হাতের স্পর্শ পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"দেখছিস্ দয়াল, কাছারী-বাড়ির ঠিক সোজা নিশুতির উপর কিছু দেখছিস্?"

চোখ দুইটি আবার বেশ ভালরকম মুছিয়া লইয়া দয়াল দেখিল, সত্যই নিশুতি বিলের বুকে চার-পাচটা প্রদীপ ক্রমাগত ঘুরিতেছে!"

"এই কিন্তু সময়, দয়াল! এখনই উঠে পড়।"

"যন্তরটা আর একবার চোখে লাগিয়ে দেখুন, হুজুর! সত্যিই 'দৈবী পিদ্‌দীম্' না আর কিছু!"

"আর দেখতে হবে না। আমি অনেক ক্ষণ থেকেই দেখছি। প্রদীপ সব একই জায়গায় ঘুরছে। যদি মানুষিক প্রদীপ হ'ত তবে বাতাসে ভাসতে ভাসতে এত ক্ষণ কোথায় চ'লে যেত!"

হরিবিলাস ঠিকই বলিয়াছেন। আরও কিছু সময় লক্ষ্য করিয়া দয়ালও দেখিল প্রদীপগুলো সেই একই জায়গায় ঘুরপাক খাইতেছে।

আর বিলম্ব নয়। মনে মনে মনসাকে স্মরণ করিয়া বিড়-বিড় মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে দয়াল ডিঙি অভিমুখে অগ্রসর হইল। ঠিক সেই সময় দেয়ালের ফাটল হইতে একটা কালো পেঁচা দয়ালের মাথার উপর উড়িয়া আসিয়া ডাক ছাড়িল —। যাত্রাকালে অমঙ্গল-দর্শনে দয়াল থম্‌কিয়া দাঁড়াইতেই হরিবিলাস সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় নেই দয়াল! এ লক্ষ্মী-পেঁচা। রোজ ঐ ফাটল থেকে বেরিয়ে ঘরের ভেতর আমার লোহার সিন্দুকের উপরে বসে।"

দয়াল গিয়া ডিঙিতে চড়িল। প্রদীপ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। হরিবিলাস কান পাতিয়া রহিলেন। সব নিস্তব্ধ। প্রায় কুড়ি মিনিটের পর বিলের জলে ঝুপ্-ঝাপ্ শব্দ হইল। যেন একটা লোক জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ সব নিবিয়া গেল। সিন্দুক পাইয়া তবে দয়াল নিশ্চয়ই জলে ঝাঁপ দিয়াছে। এখন তলাইয়া না গেলেই হয়! কোন রকমে পাড়ের কাছে টানিয়া আনিতে পারিলেই রক্ষা! আরও কিছু সময় কাটিল। এই বাদলা-রাতেও দরদর করিয়া ঘাম ছুটিতেছিল। ঐ একটা লোকের সাঁতার-কাটার শব্দ কানে বাজিতেছে না? শব্দটা ক্রমেই কাছারী-বাড়ির দিকে আগাইতেছিল। উল্লাসে হরিবিলাস গলা ছাড়িয়া ডাকিলেন—"দয়াল, দয়াল!"

প্রায় ত্রিশ হাত দূরে 'ভূ ভূ' একটা আওয়াজ শোনা গেল। হরিবিলাস টর্চ্চ টিপিলেন। ঐ যে, একহাতে ডিঙি-নৌকায় ভর রাখিয়া অপর হাতে জলের নীচে কি একটা ভারি জিনিষ টানিতে টানিতে দয়াল অতিকষ্টে তীরের দিকে সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হইতেছে। হরিবিলাসের আর ধৈর্য্য রহিল না।

"কি পেলি রে, দয়াল! সিন্দুক না ঘড়া?"

তীরের দিকে আগাইতে আগাইতে দয়াল বলিল—"সিন্দুক নয়, ঘড়াও নয়, কর্ত্তা! ইয়া মোটা দুটো রুই আর কাতলা।"

মাথায় হাত দিয়া হরিবিলাস বসিয়া পড়িলেন।

দয়াল বলিয়া চলিল—"কম 'কেলেশ'টা দিয়েছে নাকি। ডিঙি থেকে জলে লাফিয়ে প'ড়ে তবে ধরলুম। ধরেও ডিঙিতে তোলা গেল না। লাফিয়ে ডিঙি ভেঙে ফেলে আর কি!"

হরিবিলাস এখন রাগিয়া টং হইয়া গিয়াছেন। "মাছ কি রে ব্যাটা? শুধু হাতে মাছ ধরলি কি ক'রে?"

"শুধু হাতে নয়, হুজুর! জালে আটকা পড়েছিল।"

হরিবিলাস গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"জাল? তবে রে ব্যাটা ছুঁচো, ডিঙিতে ক'রে লুকিয়ে জাল নিয়ে গিয়েছিলি বুঝি? ফাঁকি দেবার আর জায়গা পাও নি?"

"দোহাই কর্ত্তা! মা-মনসার দিব্যি! ডিঙিতে ক'রে কিছুই নিয়ে যাই নি। বিকেলে পাটুলি নদীর উজানে পাহাড়ের কাছেই বিলের খানিকটা জায়গা বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, রাতে যে-সব মাছ আটকা পড়বে, কাল ভোরে সেগুলো তুলে নেব। তা সন্ধ্যে থেকেই জোর বৃষ্টি নামল কি না, তাই পাহাড়ী জল ছুটে তোড়ের মুখে খুঁটিগুলো সব উপ্‌ড়ে জালটা ঐখানে নিয়ে এল।"

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া হরিবিলাস বলিলেন—"বটে, জালের ঠ্যাং বেরিয়েছিল কিনা, তাই তাতে ভর ক'রে জলের উপর একই জায়গায় এত ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলে!"

"ঠ্যাং বেরোয় নি, হুজুর! পাটুলির মুখে ভাঁটি-সোতে ভাসতে ভাসতে সাম্‌নের ঐ দহটায় আট্‌কা পড়ে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল।"

"আমি, তুই—দু-জনেই চোখের মাথা খেলুম নাকি? প্রদীপ দেখলুম যে?"

"হেঃ-হেঃ আজ দেওয়ালী কিনা! উজান-বাঁকেই মেয়ে-ছেলেরা কোথাও জলে 'পিদ্দীম' দিয়েছিল। তারই গোটাকয় জালের সঙ্গে গাঁথা পড়েছে।"

এর উপর আর কথা চলে না।

পাড়ে উঠিয়াই আজিকার অকৃতকার্য্যতার আসল কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে দয়ালের মত গুণীর মোটেই বিলম্ব হইল না।

"তাই ত বলি, অমনটা হবে কেন?—ঠিক, আজ অমাবস্যা বটে, কিন্তু শনিবার নয়, মঙ্গলবারও নয়— বিষ্যুৎবার! সিন্ধুক ভাস্‌বে কেন্?—হুজুর একবার পাঁজিটা ভাল ক'রে দেখে নেবেন, এ বছরে তেমন দিন-তিথি আর কবে পড়ল।"

মজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড আশ্রয়ের ন্যায় হুজুরের এখন এই আশ্বাসটুকুই সম্বল।

বাঙালীর স্থাপত্য

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

কোন জাতির জীবনকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখা যায় না। মানুষের আহার-বিহার, সাহিত্য, শিল্পকলা সবই তাহার জীবনের অন্তরতম ভাব প্রকাশ করে। সেই জন্য কোনও জাতির মর্ম্ম বুঝিতে হইলে তাহার সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিলে যেমন সেটি বুঝা যায়, শিল্পকলা বা স্থাপত্য পরীক্ষা করিলেও তেমনই বুঝা যায়। যদি আমরা উনবিংশ শতাব্দী এবং আধুনিক কালে বাঙালীর স্থাপত্যরীতি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহা হইলে ঐ সময়ের মধ্যে বাঙালীর
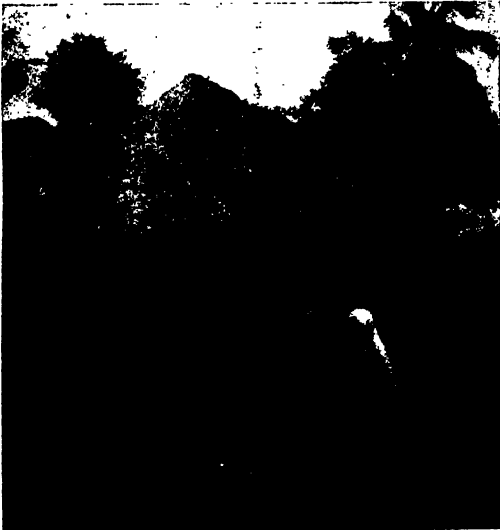
পশ্চিম-বাংলার চালাবাড়ি—দক্ষিণেশ্বর

গৌড়ীয় শৈলীর মন্দির

একখানি পশ্চিমী ধরণের বাড়ি

অন্তরে যে-সকল ভাবের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। বস্তুতঃ বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসে যে-সকল তথ্য পাওয়া যায়, স্থাপত্যের ইতিহাসও আমাদিগকে সেই সকল একই তথ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

বহু প্রাচীন কাল হইতে পশ্চিম বাংলার ঘরবাড়ি গড়িবার একটি বিশেষ শৈলী প্রচলিত ছিল। পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ জেলায় খড়ের চালের বাড়িতে লোকে বাস করে। অধিক বৃষ্টির জন্যই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক, চালাবাড়ি গড়িবার সময়ে চালটিকে চেপটা না-করিয়া হাতীর পিঠের মত কতকটা গোলাকার করা হয়।

ইহা বাংলা, এবং বিশেষ করিয়া রাঢ় দেশের বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এই ধরণের বৃত্তের ভাবাপন্ন ছাত পাওয়া যায় না। অথচ গড়নটি সুন্দর বলিয়া মোগল যুগে ইহা বাংলা দেশ হইতে রাজপুতানায় আমদানী করা হইয়াছিল। সেখানে ঘরের পাশে ছোট ছোট বারান্দার ছাত এখনও বাংলার অনুকরণে বৃত্তাকার করা হইয়া থাকে এবং তাহাকে "বঙ্গালী ছত্রি" নাম দেওয়া হয়।

বাংলা দেশে পূর্ব্বকালে অধিকাংশ লোক খড়ের চালের বাড়িতে বাস করিত। কোঠাবাড়ি গড়িবার ক্ষমতা সকলের হইত না এবং লোকে তাহা বেশী পছন্দও করিত না। খড়ের চালের বাড়ি ঠাণ্ডা হয়, এবং ইট তৈয়ারী করা অপেক্ষা মাটির দেওয়াল দেওয়া সহজ কাজ। সে-জন্য কোঠাবাড়ি বেশী হইত না, এবং কোঠাবাড়ি গড়িবার কোনও বাঁধাধরা নিয়মও দেশে স্থাপিত হয় নাই। বাঙালীর বাড়িতে গল্পগুজব করিবার জন্য রক, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মের জন্য খোলা ছাত এবং মেয়েদের সুবিধার জন্য ঢাকা-বারান্দার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কোঠাবাড়ি গড়িবার সময়ে কর্ত্তারা বিশেষ করিয়া এ-সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। ফলতঃ কোঠাবাড়িগুলি কয়েকখানি ঘর, ঢাকা-বারান্দা, রক ও ছাতের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইত। তাহাতে শিল্পের বিশেষ স্থান ছিল না। বাড়িগুলি সুন্দর দেখানোর চেয়ে বাসিন্দাদের আরাম ও সুবিধার দিকে কর্ত্তারা বেশী নজর দিতেন। প্রয়োজনের বোধে যাহা গড়িয়া উঠে তাহাকে সুন্দর করিবার চেষ্টা না করিলেও
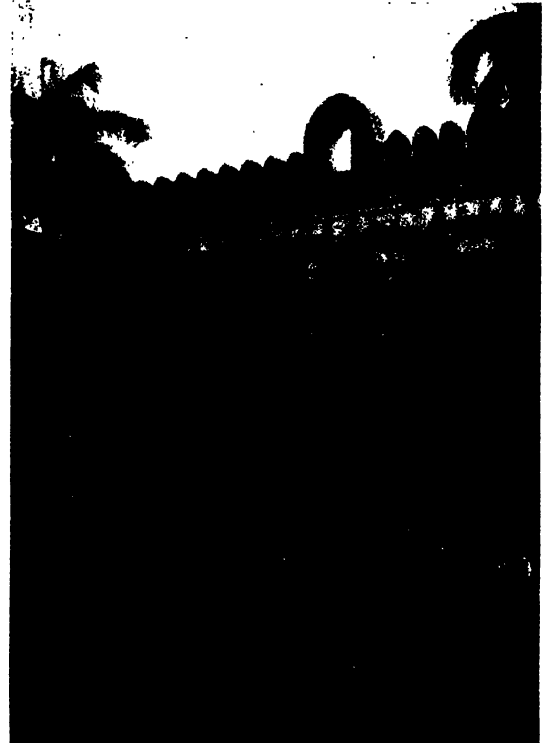
স্থাপত্যে দেশী ভাবের প্রবর্ত্তন—বাগবাজার

তাহার মধ্যে একটি স্বাভাবিক সরলতা ও সৌন্দর্য্য আসিয়া পড়ে। গ্রামের মধ্যে আমরা যে-সকল কোঠাবাড়ি দেখিতে পাই তাহাদের এমনই একটি অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য আছে। বৃত্তাকার চালাবাড়ির মত কোঠাবাড়িও বাঙালীর স্থাপত্যের একটি বড় উপাদান।

দেশী ও বিলাতীর সংমিশ্রন—দক্ষিণেশ্বর

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা দেশে গ্রাম্য জীবন ক্রমশঃ ভাঙিয়া যাইতে লাগিল এবং ধনী ও শিক্ষিত লোকেরা উত্তরোত্তর গ্রাম ছাড়িয়া শহরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। শহরে সকলের অবস্থা ভাল, তাহা ছাড়া খুব ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া মাটির দেওয়াল ও চালাবাড়ি গড়িলে শহরের স্বাস্থ্যহানি হইবে ভাবিয়া সকলে কোঠাবাড়ির দিকে বেশী মন দিলেন। কোঠাবাড়ির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার দিকে সকলের দৃষ্টি গেল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রাজপুতানায় যে-সকল পাথরের
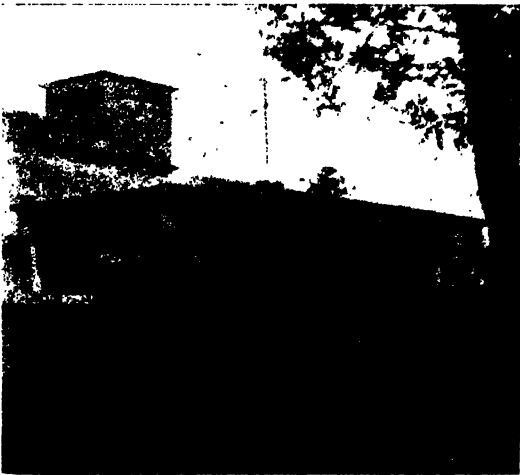
বাংলা দেশের কোঠাবাড়ি

বা ইটের বাড়ি তৈয়ারী হয় তাহার মধ্যে বাংলা দেশের চালের অনুকরণে রচিত একটি উপাদান দেখা যায়। রাজপুতানার স্থপতিগণ ভারতের অন্য একটি প্রদেশ হইতে সুশ্রী জিনিষ আমদানী করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বাংলা দেশে শহরবাসীরা যখন কোঠাবাড়ি সজ্জিত করিবার ইচ্ছা করিলেন তখন তাঁহারা প্রচলিত চালাবাড়ি হইতে কোনও উপাদান না লইয়া একেবারে সাগরপার হইতে সজ্জা আমদানী করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ শিক্ষিত ও ধনী লোক ইংরেজের অনুকরণ করিতে পারিলে আপনাকে সভ্য মনে করিতেন। সেই মনোভাবের বশে তাঁহারা কোঠাবাড়িগুলিকে বিলাতী থাম, তোরণ, সারসি, খড়খড়ি প্রভৃতি দিয়া সুসজ্জিত করিতেন।
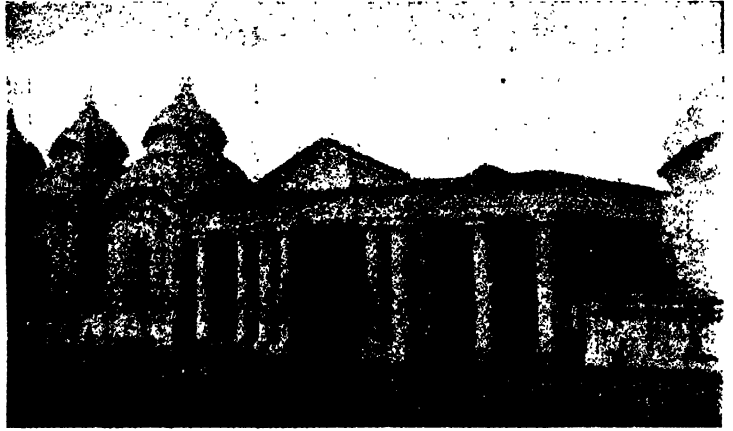
বিলাতী থাম অথবা স্থাপত্যের অন্যান্য উপাদানের এক-একটা বিশেষ অর্থ আছে। স্থাপত্যের ভাষায় এগুলি যেন এক-একটি অর্থপূর্ণ শব্দ। বাঙালীর কাছে বৃত্তাকার চাল যেমন গ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহার মনে গ্রামের শান্ত নিবিড় জীবনের স্মৃতি বহিয়া আনে, ইংরেজের কাছেও তেমনই কোনও থাম গ্রীসের মন্দিরের অথবা গ্রীকসভ্যতার সংযম ও দৃঢ়তার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কোনও তোরণ আবার তেমনই রোমের ঐশ্বর্য্যময় যুগের বীরদৃপ্ত স্মৃতি বহন করিয়া আনে। ইউরোপীয়েরা যখন ঘরবাড়ির মধ্যে বিভিন্ন স্থাপত্যের উপাদান সংযোজিত করেন তখন তাহার অর্থসঙ্গতির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে।
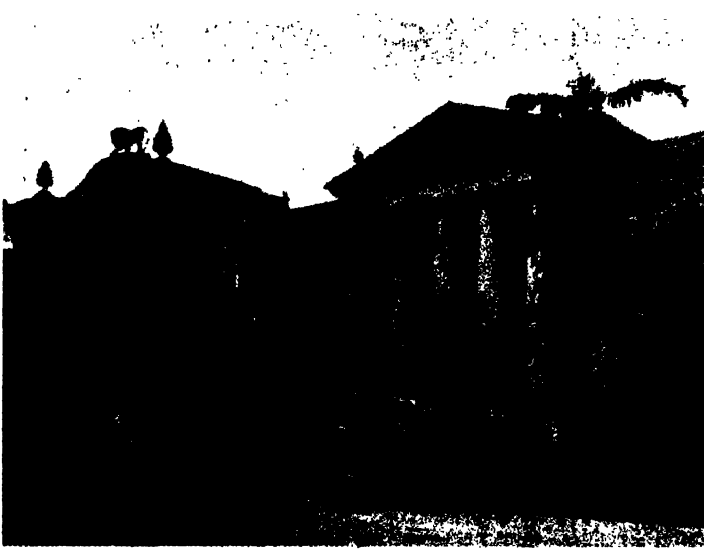
জোড়াসাঁকোয় ইউরোপীয় রীতিতে নির্ম্মিত প্রাসাদ

শিক্ষিত ইউরোপীয়ের জীবনে গ্রীস ও রোমের স্মৃতি আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের মত সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। সেই জন্য তাঁহারা যখন গ্রীক বা রোমান স্থাপত্যের উপাদান ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পক্ষে অসঙ্গতিদোষের সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু বাঙালী যখন স্থাপত্যের ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিল তখন তাহার ব্যবহারে নানাবিধ ভুলভ্রান্তি হইতে লাগিল। যে অলঙ্কার শুধু গৃহের নীচের অঙ্গে দিলে অর্থ হয় তাহাকে দ্বিতলে, ত্রিতলে পর্য্যন্ত যুক্ত করা হইতে লাগিল। ফলতঃ ইউরোপকে অনুকরণ করিতে গিয়া স্থাপত্যের বিষয়ে বাঙালী যথেষ্ট মূর্খতার পরিচয় দিল।

অবশ্য এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। যে-ভাষা মানুষে সদাসর্ব্বদা ব্যবহার করে না, সে-ভাষায় সৎ সাহিত্য রচনার চেষ্টা করিলে তাহা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। গ্রীসে রোমে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রাচীন মন্দির, সমাজগৃহ, স্তম্ভ, মঠবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয়ের কাছে সেগুলি জীবন্ত বস্তু, বইয়ে শেখা জিনিস নয়। কিন্তু বাঙালীর জীবনে এ-সকল পদার্থ বিদ্যমান নহে। বাংলার চালাবাড়ি, গ্রামের শিবমন্দির, দেউল—এই সকলই তাহার কাছে জীবন্ত বস্তু। কিন্তু তাহা হইতে স্থাপত্যের উপাদান সংগ্রহ না করিয়া যখন সে নির্জ্জীব পুস্তকমালা হইতে তাহা সংগ্রহের চেষ্টা করিল, অথবা ইংরেজদের নির্ম্মিত বাড়ির অনুকরণ করিতে লাগিল, তখন একটি আড়ষ্ট এবং সময়ে সময়ে ভ্রান্তিপূর্ণ শিল্পবস্তুর সৃষ্টি হইল। বাঙালী যে মনে মনে ইংরেজের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছিল, নিজের গ্রাম্যজীবনের প্রতি তাহার মমতা কমিয়া গিয়াছিল, ইহাই স্থাপত্যে অনুকরণপ্রিয়তার মূলে বিদ্যমান ছিল। এই মনোভাবের ফলে বাঙালী নিজের দেশী কোঠাবাড়িকে শুধু সভা দেখাইবার জন্য যেন ইংরেজী পোষাক পরাইয়া দিল।

সুখের বিষয়, কিছুদিন হইতে দেশে স্বদেশী ভাবের উন্মেষ হইয়াছে। সেই সঙ্গে স্থাপত্যের মধ্যে ইউরোপের অনুকরণপ্রিয়তার বিষয়ে মন্দা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বোধ হয় বাগবাজারের বোসেদের বিখ্যাত প্রাসাদে (৬৫, বাগবাজার ষ্ট্রীট) আমরা স্বদেশী ভাবের প্রথম সূচনা দেখিতে পাই। সেখানে বাড়ির গড়নে ইউরোপীয় প্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও স্তম্ভের আকারে এবং সজ্জায় দেশী উপাদানের আমদানী

ঠাকুর-দালানে গথিক রীতিতে সজ্জিত জোড়া থাম

করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করা এই ক্ষেত্রে বোধ হয় প্রথম হয়। কিন্তু ইহা দেশে বিস্তীর্ণভাবে সঞ্চারিত হইতে অনেক সময় লাগিল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বসুবিজ্ঞানমন্দির রচনার সময়ে স্থপতিদের এ-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল বোঝা যায়। বিজ্ঞান-মন্দিরটিতে ইউরোপীয় অলঙ্কার সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া উত্তর-ভারত হইতে সাজসজ্জা আমদানী করা হইয়াছে।
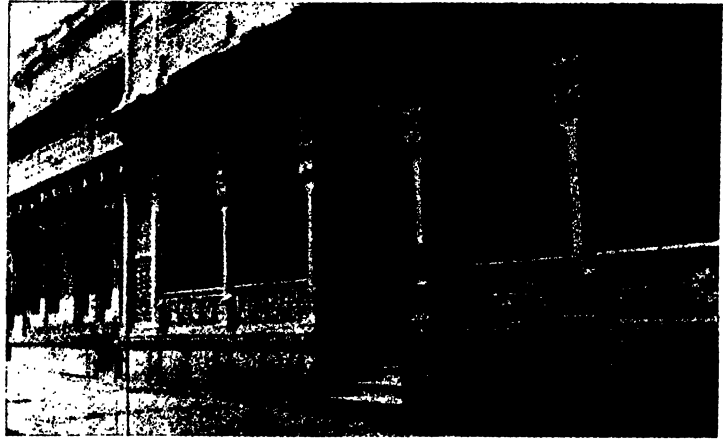
আধুনিক কালের অলঙ্কারবহুল ভারতীয় স্থাপত্য

তাহার পরে কিছুদিন কাটিয়া যাইবার পর বিগত দশ বৎসরের মধ্যে স্বদেশী ভাবটি বাংলার স্থাপত্যে বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য সুপরিচিত স্থপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেকাংশে দায়ী। তিনি কাগজপত্রে প্রচার করিয়া স্থাপত্যে স্বদেশী ভাবকে খানিক পুষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু নবপ্রবর্ত্তিত স্বদেশী স্থাপত্যের মধ্যে এখনও কিছু খাদ মিশ্রিত আছে বলিয়া মনে হয়। বাঙালী যেমন অনুকরণপ্রিয়তার বশে কোঠাবাড়িকে ইউরোপীয় পোষাক পরাইয়াছিল, এখন মনে হইতেছে সেই ভাবেই সে যেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে স্থাপত্যের নানা উপাদান আমদানী করিয়া কোঠাবাড়িকে দেশী পোষাক পরাইবার চেষ্টা করিতেছে। বাড়িগুলির গড়নে বিশেষ কিছু নূতনত্ব দেখা যায় না। নবপ্রবর্ত্তিত স্বদেশী স্থাপত্যে সংযমের অভাব প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ স্তূপ, উত্তর-ভারতের প্রাসাদ, উড়িষ্যার তোরণ অথবা দুয়ার, এই সমস্ত বস্তুর এক-একটি অঙ্গ একই বাড়িতে একটির পর একটি চাপাইয়া আড়ম্বরবহুল করা হয়। এই সকল ঘরবাড়ি যেন উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকে, "আমরা ইউরোপীয় নহি, ইউরোপীয় নহি।" কিন্তু উগ্রভাবে বলার মধ্যেই যে তাহার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে তাহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই।

বাড়ির চেহারায় বৌদ্ধ প্রভাব

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে, অথবা বিভিন্ন কালের স্থাপত্যের উপাদান একত্র করায় কোনও দোষ নাই; কিন্তু যদি তাহারা মূল বস্তুটিকে অলঙ্কারের আতিশয্যে ঢাকিয়া ফেলে তাহা হইলে স্থাপত্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ধরা যাউক, একটি গৃহ এমনভাবে গঠন করা হইল যে তাহাতে শান্তি ও বিশ্রামের ভাব প্রতিফলিত হয়। ভাল স্থপতি হইলে এরূপ গৃহের সজ্জায় শুধু সেই অলঙ্কারই ব্যবহার করিবেন যাহার দ্বারা গৃহগঠনের মূল কথাটি আরও স্পষ্ট, আরও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু শান্তির

ভারতীয় স্থাপত্যে নানাবিধ অলঙ্কারের সংমিশ্রণ

নীড়ে যদি হঠাৎ কতকগুলি যুদ্ধের চিত্র আঁকা হয়, অথবা তাহার চূড়ায় এমন কোন পদার্থ যোগ করা হয় যাহা দর্শকের মনে অদম্য উচ্ছ্বাসের ভাব আনয়ন করে তবে গৃহের সহিত তাহার সজ্জার সামঞ্জস্য থাকে না।

শুধু অসামঞ্জস্য নয়, অসংযমও স্থাপত্যকে দুর্ব্বল করিয়া থাকে। কোনও বাড়িতে যদি এত অলঙ্কার থাকে যে বাড়ির গড়ন হইতে আমাদের দৃষ্টি সরিয়া গিয়া অলঙ্কারের দিকে বেশী নিবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে স্থাপত্যের চেয়ে তার সজ্জার জাঁকজমকই বড় হইয়া দাঁড়ায়। যে দেহ সুন্দর তাহাকে সজ্জিত করিতে অলঙ্কারের আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। অলঙ্কারের বাহুল্য দেখিলেই সন্দেহ হয় যে গড়নে বোধ হয় দুর্ব্বলতা আছে, তাহাকে ঢাকিবার জন্য সজ্জার এত আয়োজন করা হইয়াছে।

স্বদেশীয়ানার প্রথম স্রোতে নানাবিধ ভুলভ্রান্তি হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে বাঙালী এই ভাবটিকে ক্রমশঃ কাটাইয়া উঠিতেছে। আমরা বাঙালী। আমাদের নিজের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া যে-সকল ঘরবাড়ি গড়িয়া উঠিবে, তাহাই যে খাঁটি স্বদেশী—একথা বলিবার মত সাহস বাঙালী ক্রমে ক্রমে লাভ করিতেছে। বালিগঞ্জ অঞ্চলে কতকগুলি বাড়ি দেখিয়া তাহা মনে হয়। সেগুলি স্বদেশীয়ানার অত্যাচার ক্রমশঃ কাটাইয়া উঠিতেছে। তাহাদের সাজসজ্জায় নানা প্রদেশের স্বদেশী উপাদান থাকিলেও সেগুলি সাজানোর মধ্যে খাঁটি সৌন্দর্য্যবোধের আভাস পাওয়া যায়।

কলিকাতায় বালিগঞ্জ অপেক্ষা বোলপুর শান্তিনিকেতনে নব-প্রবর্ত্তিত স্থাপত্যের মধ্যে ইহা আরও স্পষ্টভাবে সূচিত হয়। শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য-রীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর। তিনি ভাল চিত্রকর ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার রচিত ঘরবাড়ির মধ্যে আড়ম্বরের বাহুল্য নাই। যতটুকু অলঙ্কার প্রয়োজন ততটুকু অলঙ্কারই তিনি প্রয়োগ

কোঠাবাড়ির আধুনিক সংস্করণ—অলঙ্কারের আতিশয্য হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্তিলাভ করিয়াছে।

করিয়া থাকেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যরীতি এখনও কোন স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে নাই। এখনও সময়ে সময়ে সৌন্দর্য্যবোধ এবং প্রয়োজনের মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়। সেই জন্য বোলপুরের কয়েকখানি গৃহ শিল্পের দৃষ্টিতে সুন্দর হইলেও বাসিন্দাদের পক্ষে সম্যকরূপে আরামপ্রদ হয় নাই। নবজাত শৈলীর মধ্যে এরূপ ভুলভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী এবং ইহা জীবন্ত বলিয়াই

প্রবাসীর সচিত্র ক্রোড়পত্র, আশ্বিন

হারকুলেনিয়াম

নেপল্‌স-উপসাগরের সৌন্দর্য্য সর্ব্বজনবিদিত। "নেপ্‌লস্‌ দেখিয়া মরিও"("See Naples and die") এই প্রবাদবাক্য সুপরিচিত। বিসু-বিয়াস আগ্নেয়গিরি ও লাভা-আবৃত হারকুলেনিয়াম ও পম্পিয়াই নগর এইখানকার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে এই দুইটি নগর ধ্বংস হয়, এ কথা সকলেরই সুবিদিত। পম্পিয়াই শহর কিছুকাল পূর্ব্বে খনন করা হইয়াছিল; হারকুলেনিয়ামের খননকার্য্যও সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

'বাঙালীর স্থাপত্যের" শেষ
অংশ ৮৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

হারকুলেনিয়াম

হারকুলেনিয়াম

পেত্রা
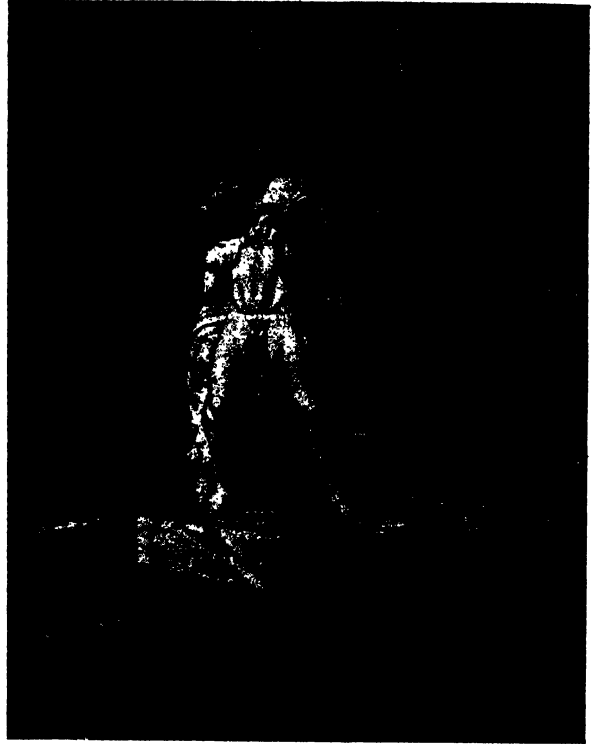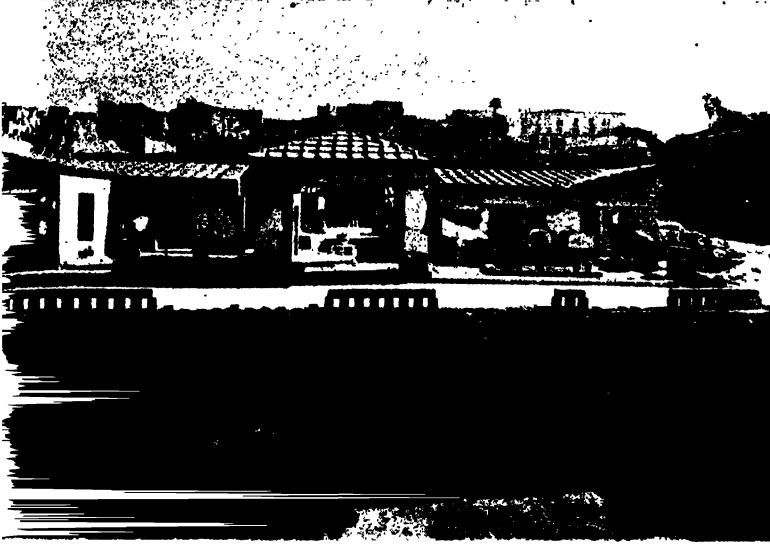
আমাদের দেশের অজন্টা-এলোরার মত অন্যান্য দেশেও পর্ব্বত কাটিয়া প্রস্তুত মন্দির স্তম্ভ ইত্যাদি রহিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত পেত্রানগরীর ধ্বংসাবশেষ ইহাদের অন্যতম— ইতিহাসের দিক দিয়াও ইহার মূল্য স্বল্প নয়।

পেত্রানগরী বর্ত্তমানে অর্দ্ধবিস্মৃত হইলেও এসীরিয়ার অসুর-বাণি-পালের সময় ইহা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এবং এই নগরীজয়ের জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে সমরা-য়োজন করিতে হইয়াছিল। আলেকজান্দারও এই নগরী আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু ধনসম্পদ লাভ করিয়াই তিনি তুষ্ট হন্ পেত্রা ঐ সময় একটি বিখ্যাত নগরী। সিরিয়ার হামাদ বা উত্তর-আরবের মরুভূমির এই নগরী হেজাজ রেলওয়ের পশ্চিমে পড়ে, এবং ইজিপ্ট, সীরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও আরবের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন পথে ইহার অবস্থান। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পেত্রার উত্থান এবং পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ব্বে ইহার পতন পর্য্যন্ত সময়ে সমগ্র পশ্চিম-এশীয় দেশসমূহে ইহার খ্যাতি বহুদূরপ্রসারী ছিল। সেমেটিক জাতি নেবিসিয়গণ কর্ত্তৃক ইহা সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হয় এবং ক্রমশ ইহা রোমান-দিগের দুর্গস্থলে পরিণত হয়।
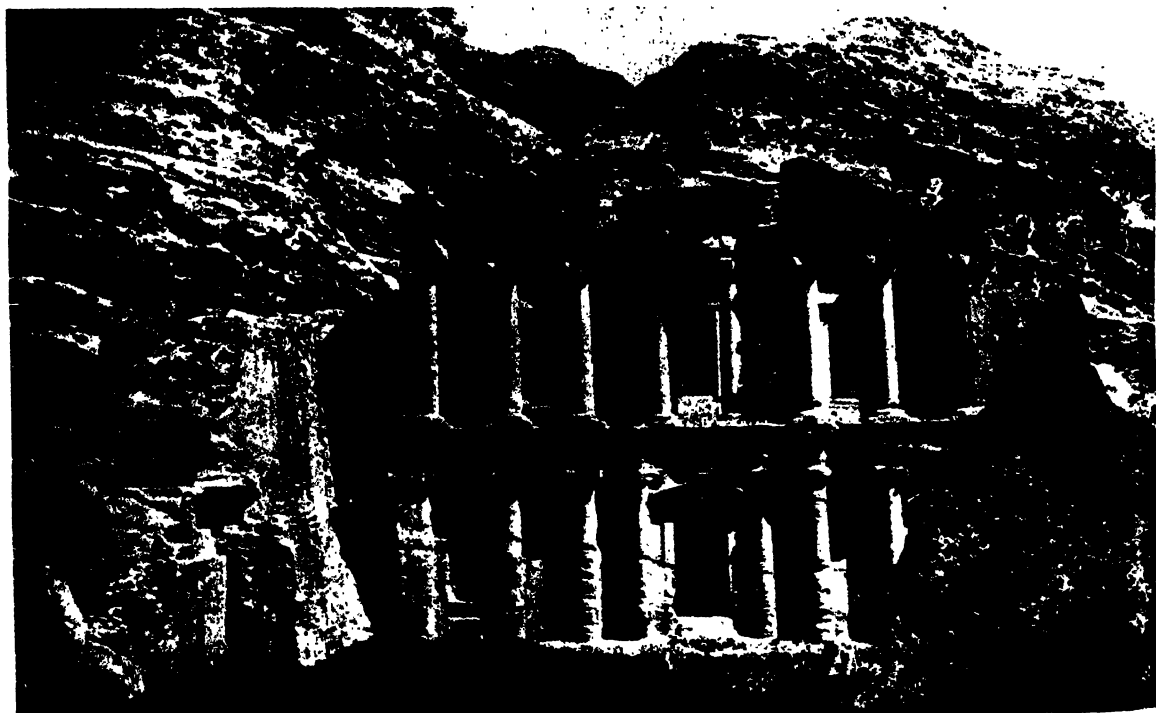
চায়াবাজীর জন্ম প্রাচ্য জগতেই এবং অশেষ দুর্গতি সত্বেও এখনও জাভা ও বালি দ্বীপে 'ওয়ায়াং' ও আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে এর চলন আছে। ইউরোপে নূতন প্রথায় এই চায়াবাজীর প্রবর্ত্তন হইয়াছে। প্রচণ্ড আলোক, বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত পর্দ্দা—এই সকলের দ্বারা চায়াবাজী প্রদর্শন হইতেছে। চিত্রে চায়াবাজীর দুইটি দৃশ্য এবং তাহার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণস্থিত মঞ্চ দেখান হইয়াছে।

সম্প্রতি তিনজন ভারতীয় বৈমানিক বোম্বাই হইতে কেপটাউন (২০০০০ মাইল) যাত্রা করিয়াছেন। ইহাদের পথের অনেক খবর গত দুই মাসের সংবাদ-পত্রে বাহির হইয়াছে। ইহাদের নাম খাঁ, দালাল এবং পোচখানাওয়ালা।
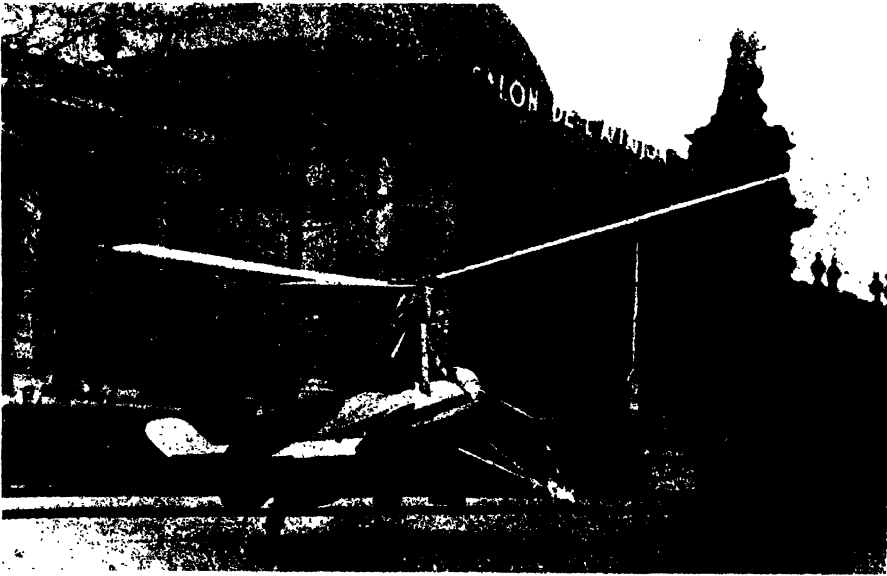
মোটর শোভাযাত্রা

বোম্বাইতে জুবিলি উপলক্ষে সুসজ্জিত মোটরের শোভাযাত্রা ও প্রদর্শনী। নানা কোম্পানির মোটর অভিনব ভাবে সজ্জিত. হইয়া শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিল।

মোটর শোভাযাত্রা
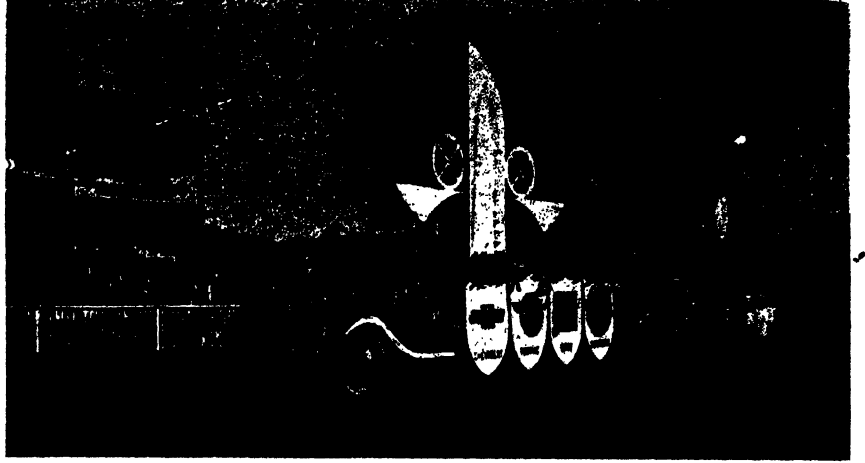
অক্সফোর্ডের বাচখেলার ছাত্রী দল। ইঁহারা এই বৎসর কেম্ব্রিজের ছাত্রী দলকে হারাইয়াছেন।
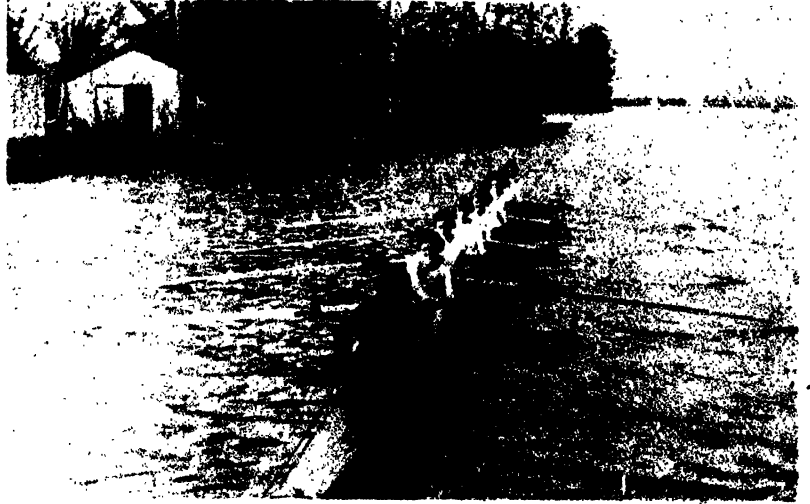
বোম্বে ভাটিয়া মেয়েদের খেলার প্রতিযোগিতার এক অংশ।

শীঘ্র সর্ব্ববিধ অসুবিধা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, আশা করা যায়।

বাংলা দেশে স্বদেশী-স্থাপত্যের মধ্যে যে প্রাণের আভাস পাওয়া যায় তাহা বিশেষ আশাপ্রদ। এ জীবনধারা এখনও কোন স্থির আকার ধারণ করে নাই বটে, তবে আমরা যতই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইব, যতই আমাদের মন ইউরোপের পদানুসরণ অথবা প্রাচীন ভারতের অনুকরণ পরিত্যাগ করিবে, যতই বাহিরের জগতে আমরা জাতীয় জীবনকে নিজেরা গড়িবার ও ভাঙিবার শক্তি লাভ করিব, ততই অন্যান্য শিল্পের মত আমাদের স্থাপত্যও প্রাণবান্ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সসর্পিল

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, বি-এ

১

বিবাহ হইয়াছে এই সেদিন…

শক্তিধর কুমীরমড়ার হাট হইতে ফিরিতেছিলেন। সম্বন্ধটা আসিয়াছিল প্রায় পথ থেকেই। জ্ঞাতিরা যাহাই বলুক—বিবাহ হইতে বাধা পড়িল না। ছেলের বাপ না থাকুক, কি হইয়াছে তাহাতে? অমন বনিয়াদী ঘর,—পয়সাও ত আছে বিস্তর। অতএব মেয়ের বিবাহ দিতে শক্তিধর পিছ-পাও হইলেন না।

কুসুম একবার আপত্তি তুলিয়াছিল—মা-মরা মেয়েটাকে অমন দূর দেশে বনবাস দেবে দাদা? তা-ছাড়া শুনি ছেলের নাকি বাপ নেই?

শক্তিধর বলিলেন—বাপ না থাক, ছেলের মাথার উপর ঠাকুর্দ্দা আছে। পয়সাও যথেষ্ট! তা ছাড়া, বুঝলি কিনা—ঠাকুরের যখন ইচ্ছে তখন আর—

তখন আর আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। কাজেই মাধুরীর বিবাহ হইয়াছিল প্রায় নির্ব্বিঘ্নেই।…

মাধুরী শ্বশুরবাড়ি আসিয়া অবাক হইয়া গেল। প্রকাণ্ড তিনমহলা বাড়ি। সদরে কাছারী-ঘর—সরকার চাকরদের থাকিবার আস্তানা। তার পর প্রকাণ্ড উঠান,—উঠানের সম্মুখেই মস্ত ঠাকুরদালান। গত তিন পুরুষ ধরিয়া ওখানে দুর্গোৎসব হইয়া আসিয়াছে। ঠাকুরদালান পার হইয়া ভিতরে ঢুকিলেই অন্দর। সারি সারি ঘরগুলি। প্রকাণ্ড দরদালান। এক কোণে একটি লক্ষ্মীর পট। তাহার উপর সিন্দুরের ফোঁটা পড়িয়াছে অনেক। দরদালানের আলিসার এক কোণে একটি পেঁচা চোখ বুজিয়া ঘুমায়।

বধূ তুলিতে আসিয়াছিলেন দাক্ষায়ণী নিজে আর কয়েকটি আত্মীয়া মেয়েছেলে। মায়ে-ছেলেয় গলা জড়াইয়া সেদিন কি কান্না! ধীরুর বাপ এ বিবাহ দেখিতে পারিল না, সেই শোক যেন কাহারও অন্তরে বাধা মানে না। এই অশ্রু-সজল মুহূর্ত্তে হঠাৎ এক জনের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি ভাসিয়া উঠিল। ধীরু তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিল—দাদু!

হ্যাঁ দাদু-ই। অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ ধীরুর ঠাকুর্দ্দা দয়াল। চীৎকার করিয়া তিনি বাড়ি মাতাইয়া তুলিলেন—ওরে নাতবৌ এয়েছে রে, শাঁক বাজা, শাঁক বাজা, উলু দে!…

শেষে মেয়েদের সহিত নিজেই বলিয়া উঠিয়াছিলেন—উলু…উলু…উলু…

সুন্দর মানুষ এই দয়াল! বয়সের প্রখরতায় মাথার চুলগুলি প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে। শুভ্র ভ্রূ-যুগলের তলায় বড় বড় চোখদুটি এক সঙ্গে সাহস ও শক্তির সঞ্চার করে। এমন একদিন ছিল যখন এই বৃদ্ধের প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। তখন এক শত জন লাঠিয়াল তাঁহার সর্ব্বক্ষণ মোতায়েন থাকিত। নিজেরও হাতে লাঠি খেলিত মন্দ নয়। একদিনের কথা বলিতেছি: দয়াল অন্দরে আসিয়া একটুমাত্র

বসিয়াছেন, এমন সময় এক জন সদর হইতে ছুটতে ছুটতে আসিয়া বলিল --বড়বাবু উড়ো চিঠি!

--উড়ো চিঠি, কই দেখি— ?

চিঠিটায় চোখ বুলাইয়া লইয়া দয়াল একটু হাসিয়া বলিলেন—ও বিট্লে সর্দ্দার? আচ্ছা দেখি কি করতে পারে। আমার রাজত্বে থেকে আমারই বাড়িতে ডাকাতি? দেখে নেব—

তাহার পর সেই এক শত জন লাঠিয়ালের মধ্যে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে লাঠিয়ালের দল লইয়া দয়াল বাহির হইয়া পড়িলেন। সেদিন অন্দরে মেয়েদের মধ্যে কি অপরিসীম শঙ্কা। বৈকালেই সবাই ঘরে খিল আঁটিয়া রহিল। কাহারও মুখে আর রা বাহির হইল না।

...মাঠের উপর দিয়া যাইতে যাইতে পুরাতন গড়ের নিকট আসিয়া দয়াল দেখিতে পাইলেন গড়ের খালের মধ্য দিয়া শন্ শন্ করিয়া দুইখানি নৌকা আসিতেছে। তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। লাঠিয়ালদের বলিলেন—তোরা এইখানে দাঁড়িয়ে থাক। দরকার হ'লে আসিস।

তাহার পর নিজেই ঝপ্ করিয়া জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে নৌকার গলুই ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়া ডাকাতদের এক জনের হাতের লাঠি কাড়িয়া লইয়া সাঁই সাঁই করিয়া মাথার উপর ঘুরাইয়া লইয়া পটাপট মারিতে আরম্ভ করিলেন। অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণ খট্‌খট্ খটাখট্ শব্দ চলিল। দু-এক জন ঝুপ্‌ঝাপ্ জলের ভিতর পড়িল। নৌকা দুখানি আসিয়া তটে ভিড়িল। তাহার পর ডাকাতের দলের সহিত লাঠিয়ালদের কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিবার পর তাহারা ডাকাতদের বাঁধিয়া ফেলিল। দয়ালের মাথার একদিক একটু কাটিয়া গিয়াছিল—ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।... সর্দ্দার সেইদিকে তাকাইয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ওঃ বড়বাবু আর নয়! খুব হয়েছে। এবার থেকে আপনার দাস হয়ে থাকবো।

কথাটা নিতান্ত সত্যই। চৌধুরী-বাড়ির খবর যাহারা রাখিত তাহারাই সর্দ্দারকে দেখিয়াছিল। সদর-বাড়ির পার্শ্বে একদিকে একটি গোলপাতার কুঁড়ে তৈয়ারী করিয়া তাহাতে সর্দ্দার থাকিত। প্রতিদিন সকালে দৃষ্টি দিলে দেখা যাইত, সর্দ্দার তাঁহার কুঁড়ের সম্মুখের স্থানটিতে ডন-বৈঠক দিতেছে অথবা লাঠি ঘোরাইতেছে। দীর্ঘজীবন সে এবাড়ির সবার রক্ষার জন্য বাঁচিয়া থাকিয়া এই অল্প দিন হইল মারা গিয়াছে।

* * *

দয়ালের একদিন অমনিই ছিল! কিন্তু আজ সে গৌরব লুপ্তপ্রায়। পূর্ব্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পাকুল হইয়া পড়ে। তাঁহাকে সে-কথা না জিজ্ঞাসা করাই ভাল। এমনিই একদিন আশ্বিনের সন্ধ্যায় পাঁচখানি ডিঙি ধানচাল বোঝাই হইয়া গঙ্গার শান্ত, শীতল, বুকের উপর দিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। দয়ালের ছোট ছেলে বিধু ছিল এমনি একটি ডিঙীর ভিতর। তাহার সহিত বহুৎ টাকাকড়ি ছিল। তাহার পর আকাশের ঝোড়ো কোণে যে একখণ্ড মেঘ ছিল তাহা যে এক তুমুল তুফান তুলিল তাহাতে দয়ালের ভাগ্যতরী এবং পুত্ররত্ন দুই-ই ডুবিয়া গেল।

একথা এখনও মনে পড়িলে ক্ষোভে দয়াল বুক চাপড়ায়। এ শোকে সান্ত্বনার ভাষা তাহার জীবনে মিলে নাই।

২

মাধুরীকে যে ঘরখানি দেওয়া হইল তাহা ধীরুর ঠাকুমার ঘর। মস্ত বড় একখানি খাট ঘরখানি জোড়া করিয়া আছে। বেশ উঁচু খাটখানি। কাঠের ধাপে চড়িয়া তবে উঠিতে হয়। ঘরের অপর দিকে একটি সাবেকী সিন্দুক। মস্ত বড় একটি তালা তাহার আংটায় ঝুলিতেছে।

ধীরু ফুলশয্যার দিন তাহাকে বলিয়াছিল যে এই ঘরখানি তাহার ঠাকুমার ছিল। এই খাটখানিতেই তিনি শুইয়া থাকিতেন। তাঁর নাকি মৃত্যু হইয়াছিল এক আশ্চর্য্য দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া। সেই হইতে দয়াল আর এ ঘরের মধ্যে আসেন না। মাধুরীর গায়ে যে-সমস্ত গহনা দেওয়া হইয়াছিল সেগুলিও অধিকাংশ ঠাকুমার। কি ভারী সে গহনাগুলি! পুরাতন ধাঁজের তৈয়ারী। গহনার ভারে মাধুরী দুই হাত তুলিয়া হাঁপাইয়া পড়ে।

সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া মাধুরী বাহির হইতেছিল।

হঠাৎ দরজার ফাঁকে সাদা মতন লম্বা কি একটি জিনিষ দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া শাশুড়ীকে ডাকিয়া আনিল।

শাশুড়ী দাক্ষায়ণী সেটি দেখিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন—আচ্ছা কি এটা বল দিকি বউমা। কেমন সেয়না ঘরের মেয়ে তুমি দেখি?

মাধুরী বার-বার করিয়া দেখিয়া বলিল—ও বুঝেছি মা, এটা সাপের খোলস, না?

দাক্ষায়ণীর মুখে অর্থপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। মাধুরী অবাক হইয়া গেল। সে বলিল—সাপের খোলস রয়েছে, তা হ'লে এ ঘরে সাপ এসেছিল?

দাক্ষায়ণী বলিলেন—সাপ এসেছিল কেন—সাপ ত এ ঘরেই রয়েছে!

ঘরে সাপ রহিয়াছে! ঘরে আবার কেহ সাপ পুষিয়া রাখে নাকি? মাধুরী বিস্ময়ের স্বরে বলিল—ঘরে সাপ রয়েছে তবে তাকে মেরে ফেলা হয় না কেন, মা?

দাক্ষায়ণী বিস্ফোরকের ন্যায় ফাটিয়া পড়িয়া বলিলেন—ওমা বল কি? এমন কথা আর মুখে এনো না। মা যে আমাদের এ ভিটের বাস্তু-দেবী! ছিঃ ছিঃ, এখুনি নাকে কানে হাত দিয়ে মা'র কাছে ঘাট মান। নতুন বউ! আর অমন কথা ব'লো না, শেষে অমঙ্গল হবে।

শেষে দাক্ষায়ণী বলিলেন—এই দেবতার কৃপায় নাকি একদিন এ-বাড়ির সুদিন ছিল। যত কিছু ধনরত্ন তাহা সমস্তই একদিন এই দেবতার সুনজরে আসিয়াছিল। আবার একদিন দেবতা বিমুখ হইয়াছিলেন বলিয়া ক্রমশঃ পড়তা খারাপ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তবুও দেবতা এ-ভিটা ত্যাগ করেন নাই। পুত্রের বিবাহ দিয়া দাক্ষায়ণী ভাবিতে-ছিলেন আবার পুরাতন দিনগুলি ফিরিয়া আসিবে। আবার গঙ্গার জলে সাতটি ডিঙি ঠিক তেমনই করিয়া ভাসিতে থাকিবে।...

কিন্তু মাধুরীর বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। এই সর্প-সঙ্কুল বাড়িটির মধ্যে সে কি করিয়া থাকে? বাড়ির বাহিরে অনেক সময় সর্প থাকে। সে সর্পের অত্যাচার সহ্য করা যায়। কিন্তু ঘরের ভিতরে যদি দিবারাত্র সর্প লুকাইয়া থাকে তাহা হইলে সে এক অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ। ঐ প্রকাণ্ড সিন্দুকটির পাশে কখনও কিছু নড়িয়া উঠিলেই মাধুরীর প্রাণ উড়িয়া যায়। ঘরের ভিতর সে এটাওটা করিয়া বেড়ায় আর সন্দিগ্ধচিত্তে ঐ সিন্দুকটির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। তাহার কেবলই মনে হয় ঐ বুঝি খুট্ করিয়া শব্দ হইল—ঐ বুঝি সিন্দুকের পাশে সাদা চক্র-চিহ্নিত লেজটির একটু অংশ দেখা গেল।

কথাপ্রসঙ্গে শাশুড়ী মাধুরীকে বলিলেন যে এই বাস্তু-দেবীকে বড়-একটা দেখা যায় না। দিনের বেলা কখনও ঐ সিন্দুকটির পার্শ্বে গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকেন আর রাত্রি হইলে বাহির হইয়া যান। কেহই তাঁহার গমন-পথ লক্ষ্য করে নাই। একদিন কেবল সকলে এই দেবীকে দেখিয়াছিলেন।

সেই দিন দাক্ষায়ণীর শাশুড়ী মারা যান। বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। দাক্ষায়ণী ঘাট হইতে কাপড় কাচিয়া আসিয়া শাশুড়ীর ঘরে ঢুকিতেছিলেন অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবেই। হঠাৎ তিনি চৌকাঠের কাছে আসিয়া বিস্ময়ে দুই হাত পিছাইয়া গেলেন।...মা একেবারে ফণা তুলিয়া চৌকাঠের উপর রহিয়াছেন। দুধ-হলুদে গায়ের রঙ, তাহার উপর চক্রের চিহ্ন। ফণাটির উপর সিন্দুরের রেখা জ্বল জ্বল করিতেছে।

তখনই তিনি গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন। দেবী মিলাইয়া গেলেন। কিন্তু সেই রাত্রেই বিপদ ঘটিল।

৩

মাধুরীর এ-স্থানটা নেহাৎ মন্দ লাগিতেছিল না।

বাংলা দেশের এক প্রান্ত হইলেও ইহার যেন একটি নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে। অনেক দিন সন্ধ্যায় জানালার ধারে বসিয়া দেখিতে দেখিতে সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কাছে ও দূরের গাছপালাগুলি দেখিতে তাহার বড়ই ভাল লাগে। বাংলা দেশের লতাপাতার মধ্যে কেমন যেন একটা বন্য বর্ব্বরতা আছে। এখানে কিন্তু সেরূপ নাই। সারি সারি শাল, মহুয়া হরিতকী গাছগুলোর ভিতর কেমন যেন একটা সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। দেখিলে তৃপ্তি পাওয়া যায়। এখানকার মাটির রংও আলাদা। কেমন একটু লাল্‌চে। মাধুরী শুনিয়াছে দূরে নাকি ঐ গ্রামখানি পার হইয়া যাইবার পর পাহাড় আছে। ধোঁয়ার মত তার একটু অস্পষ্ট রেখা এখান হইতেও চোখে আসে

একদিন বৈকালে হঠাৎ বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল—সবাই বলিল পাহাড়ে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাধুরীর ইহা ভারী ভাল লাগিল। বাংলা দেশের মেয়ে। পাহাড়ের কল্পনা তাহার মনে কেমন এক স্বপ্নের আমেজ আনে।

সেদিন বৈকালে তাহার এক নূতন জিনিষ নজরে পড়িল। একদল সাঁওতাল নরনারী বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া, কাঁধের উপর বাঁকে করিয়া বেতের ঝাঁপি লইয়া নানা গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শাশুড়ী মাধুরীকে ডাকিয়া লইয়া ছাদের উপর হইতে দেখাইতে লাগিলেন। খেজুর-ছড়ি কাপড়, ঠেঙা করিয়া পরা—মাথায় পালক গোঁজা। কারুর বা হাতে জল-সুঁদীর ফুল।...

ঝাঁপির ভিতর হইতে নানান রকমের সাপ বাহির করিয়া তাহারা খেলাইতে বসিল। কেহ কেহ আবার তাহাদের ঘিরিয়া নাচিতে সুরু করিল। দাক্ষায়ণী বলিলেন—একে ঝাঁপান-গান বলে। এদেশের লোকের কাছে এ গান মনসা-পূজার গান নামে পরিচিত।

তিনি এই সাঁওতালগুলির সম্বন্ধে আরও কত অদ্ভুত গল্প বলিলেন। তিনি বলিলেন নাকি ইহাদের ভারী অদ্ভুত স্বভাব। ইহারা কখনও কখনও দুষ্টামি করিয়া বাড়িতে সাপ চালিয়া দিয়া যায়। আবার কখনও কখনও বাড়ি হইতে সাপ চালিয়া লইয়া যায়। ওদের ঐ বাঁশীর পিউ-পিউয়ের মধ্যে কি এক সম্মোহন-শক্তি আছে। বিষধর সর্পও সুরের মূর্চ্ছনায় পাগল হইয়া ঘরের বাহির হইয়া যায়।...

খেলা শেষ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইতে যাইতে রাত্রি হইয়া গেল। মাধুরী আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ঘর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে ইহার মধ্যে। ঘরে আসিয়া বিছানাটি একটু ঝাড়িয়া গুছাইয়া ঠিক করিয়া লইতেছিল—ধীরু ক'দিন কোথায় গিয়াছিল আজ আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ দালানের পথে দয়ালের চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—ও নাতবউ কি করছিস ভাই! এই সন্ধ্যেবেলাতেই দরজা ভেজিয়ে দিয়েছিস?

মাধুরী অভিমান-স্ফুরিত কণ্ঠে বলিল—ওমা, দরজা ত খোলাই রয়েছে! আপনি বড় মিথ্যা কথা বলেন দাদু! দেখুন না? কেউ আছে নাকি এখানে?

দয়াল বলিলেন—নাঃ নেই। তাকে কি আর রেখেছিস ভাই। তাকে খাটের পিছনে লুকিয়ে ফেলেছিস এতক্ষণে। আমরা কি আর তোদের সঙ্গে পারি ভাই?

দয়াল হাতে একটি মাটির সরায় করিয়া দুধ আর কয়েকটি কলা লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সেইগুলি সিন্ধুকটির নীচে রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন।

মাধুরী সেই দিকে তাকাইয়াছিল।

প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন—সেই অবধি আর তোদের ঘরটায় আসতে মন হয় না ভাই। আজ মা'র এই সেবাটা দিতে এসেছিলুম। ওঃ, তুই বুঝি সমস্ত জানিস না নাতবৌ! তা কি ক'রে জানবি বল? তুই হলি নতুন লোক। কিন্তু দেবতা আমাদের বড় ভাল রে! বড় ভাল। কোন দিন কারুর অনিষ্ট করেন নি। যদিও আছেন অমন এখানে কত পুরুষ ধরে। এখানে অমন কত লোককে লতায় কেটেছে কিন্তু আমাদের কোনদিন কিছু হয় নি। হয়েছিল। অবিশ্যি একদিন হয়েছিল। মা'র কাছে ত্রুটি হয়েছিল আমাদের অনেক। মা তাই তার প্রতিফল দিলেন। গিয়েছিলুম অনেক দূর। দু-দিন বাড়ি ছিলাম না। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে এসে ঘরে ঢুকছি এমন সময় ধীরুর ঠাকুমা খাটে শুয়ে শুয়ে মনে হ'ল কাৎরে উঠলেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেখতে গিয়ে দেখি খাটের বাজুর পাশে লেজটি একবার দেখিয়ে তিনি মিলিয়ে গেলেন। তখনই ওঝা ডাকা হ'ল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

মাধুরী বলিল—একটা কথা বলবো দাদু বলবো? আমি আর এ ঘরে থাকতে পারবো না। আমায় যদি কোন দিন কামড়ে দেয়।

দয়াল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—চুপ চুপ নাতবৌ! অমন কথা মুখে আনতে নেই ভাই। তোর কোন ভয় নেই, মা তোর কোন অনিষ্ট করবেন না। ভয় না করলে বরং তুই ভালই থাকবি। ধীরুর ঠাকুমা ভয় করতো তাই অমনি হ'ল। মা যে বাস্তুদেবী রে! বাসুকির মত আমাদের সবাইকে মাথায় ক'রে রেখে দিয়েছেন। মা কি আমাদের অনিষ্ট করতে পারেন?

৪

রাত্রে শুইতে আসিয়া মাধুরীকে ধীরু বলিল—তোমার নাকি বড় লতার ভয় হয়েছে? তুমি দাদুকে বলেছ এ ঘরে আর থাকবে না।

মাধুরী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—সত্যি তোমার পায়ে পড়ি, কিছু মনে ক'রো না। আমাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবে? আমার বড্ড ভয় করে।

ধীরু রুখিয়া উঠিল—ভয় করে? তুমি আচ্ছা ভীতু ত? আমাদের ত কোনদিন কামড়ায় নি? আর জান ত, অত ভয় করলে শেষকালে কোন্ দিন—

ঠিক এমনি সময় ঘরের অপর দিকে রক্ষিত সিন্দুকটি খট্ খট্ করিয়া নড়িয়া উঠিল।

ধীরু চোখ দুটি বড় বড় করিয়া বলিল—শুনতে পাচ্ছ?

মাধুরী বলিল—সত্যি কি বল দিকিনি? দিনে রাতে যখন-তখন যে-ভাবে সিন্দুকটা নড়ে ওঠে। আমার যা ভয় করে। কি ক'রে অমন হয়? লতায় নড়িয়ে দেয়, না?

ধীরু হাসিয়া বলিল—লতায় কি ক'রে নড়াবে? সে ত থাকে ঐ ওপাশের গর্ত্তের মধ্যে। তা ছাড়া তারা কি অত বড় সিন্দুকটা নাড়াতে পারে? কি ব্যাপার জান? লোকে বলে সিন্দুকটার প্রাণ আছে। আপনি নড়ে-চড়ে।

মাধুরী অবাক হইয়া ধীরুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল: সিন্দুকের প্রাণ আছে? কাঠগুলি কি সজীব? আপনার ইচ্ছায় অঙ্গবিস্তার করিতে পারে? তাহা হইলে ঐ বিরাট-গহ্বর সিন্দুকটি তাহাকে কোনদিন গিলিয়া খাইবে না ত? বলা যায় না, হয়ত ইহারা স্বীকার করিতেছে না—আজ পর্য্যন্ত উহা কত লোককে গিলিয়া খাইয়াছে! তাহা হইলে ত বড় ভীষণ। যদি এ বাড়িতে সর্ব্বদা এইরূপ সশঙ্কিত থাকিতে হয় তাহা হইলে মাধুরীর জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিবে।

ধীরু মাধুরীর দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল—বেশ বড্ড ভয় পেয়ে গেছ ত? খুব মেয়ে যা হোক। শোন প্রাণট্রান ওসব কিছু নয়। সব বাজে। মানে ব্যাপারটা এই যে সিন্দুকটা যে-কাঠের তৈরি তার একটা গুণ হচ্ছে এই যে জোলো হাওয়া লাগলে ঐ কাঠগুলো হঠাৎ ফুলে মোটা হয়ে ওঠে। আবার শুকনো বাতাস লাগলে সেইটে শুকিয়ে ছোট হয়ে যায়। এই ছোট হয়ে যাবার সময় সিন্দুকটা নড়ে ওঠে আর খট্ খট্ শব্দ হয়।

মাধুরী স্বামীর মুখের দিকে বিহ্বল ভাবে তাকাইয়া রহিল। সে যে ইহার কিছু বুঝিতে পারিল তাহা মনে হইল না। জোলো হাওয়ায় যে কি করিয়া কাঠ বাড়িয়া যায় এবং তাহা আবার ছোট হইয়া গিয়া ঐ অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করে তাহা তাহার নিকট প্রচ্ছন্ন—প্রহেলিকার ন্যায় মনে হইতে লাগিল। সে স্বামীর বাহুর উপর মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চোখ বুজিয়া ফেলিল। ধীরুও আর কোন উত্তর না পাইয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রি তখন কত হইয়াছিল, কে জানে! হঠাৎ তাহাদের দুই জনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দয়াল দরজা ঠেলিতেছিলেন।

ধড় ফড় করিয়া ধীরু উঠিয়া পড়িয়া বলিল—কে দাদু? কি হয়েছে?

দয়াল বাহির হইতে বলিলেন—একবার বাইরে এসে শোন!

ধীরু বাহিরের দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। মধ্যরাত্রের চাঁদ আকাশের একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। দালানের মধ্যে দেওয়ালগিরির আলোক মিটির, মিটির করিয়া জ্বলিতেছে। চারিদিকে নির্ম্মম নিঃশব্দতা।

দয়াল বলিলেন—শুনতে পাচ্ছিস নে ভাই, বাঁশীর শব্দ—ঐ যে—

ধীরুকে আর বলিতে হইল না। সে বাহিরে আসিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল।

ধীরু বলিল—বুঝতে পেরেছি। সেই সাঁওতালগুলো, না? আচ্ছা সয়তান ত? বাঁশীর ডাকে বাস্তু চেলে নিয়ে যাবে, না? কিন্তু ব্যাটারা কি ক'রে জানতে পারলে বলুন ত, দাদু?...

দয়াল আপন-মনে বলিলেন—জানতে পারে ওরা।

ঠিক সেই সময় আবার পিউ পিউ করিয়া বাঁশীর শব্দ চারিদিক মাতাইয়া তুলিল। একবার মনে হইল এই নিকটে—বাড়ির পাশেই বাজিতেছে। আবার তখনই সে শব্দ মিলাইয়া দূরে চলিয়া গেল। যেন দূরে মাঠ পার হইয়া গ্রামের প্রান্ত হইতে করুণ সম্মোহন সুরটি ভাসিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে আবার নিকটেই যখন বাঁশী বাজিয়া

উঠিল তখন যেন মনে হইল সুরের রেশে সারা বাড়িটি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ধীরু বলিল—আজ সর্দ্দার থাকলে এখুনি ব্যাটাদের দেখে নিতুম।

দয়াল বলিলেন না থাক। আমিই দেখছি। দে ত লাঠিগাছটা।

তাহার পর লাঠি লইয়া দরজা খুলিয়া দয়াল বাহির হইয়া গেলেন। ধীরুও তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিল।

সারা মাঠটার উপর দয়ালের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে লাগিল। 'আয় কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে দেখি ?'

সমস্ত মাঠময় ঘুরিয়াও তিনি কাহারও দেখা পাইলেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তখনই বাঁশীর শব্দ থামিয়া গেল। আর বাজিল না।

দয়াল কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া ঘোরাঘুরি করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। ধীরুও আসিল। সে রাত্রে আর কোন গোলমাল হইল না।

৫

পরদিন সকালে দয়াল সদর-বাড়ির রকে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন যে ঐ সাঁওতাল সাপুড়েগুলো নাকি ভয়ানক পাজি। তাঁর মা'র বাপের বাড়িতে নাকি একদিন ঐ রকম একটা সাপুড়ে সাপ খেলাইতে আসিয়াছিল। বাঁশী বাজাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সে সাপ খেলাইতেছিল তখন এক জনের দৃষ্টি পড়ে যে বাড়ির ভিতর হইতে বাস্তুসাপটি ইত্যবসরে চুপি চুপি আসিয়া তাহার অর্দ্ধোম্মুক্ত ঝাঁপিটির ভিতর ঢুকিয়া পড়িতেছে।... তখনই গিয়া তাহারা সাপুড়েটিকে ধরিল, কিন্তু কিছুতেই সে স্বীকার করিল না। ঝাঁপি বন্ধ করিয়া, বাঁশী বাজাইয়া আবার সে আপনার পথে চলিয়া গেল। সেই হইতে নাকি তাহাদের পড়তা খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

ঠিক এমনি সময়ে জীবন গোয়ালা আসিয়া বলিল—বড়-বাবু একবার গোয়াল-ঘরটার দিকে যাবেন। মা-ঠাকরুণ কি বল্‌ছেন।

দয়াল তখনই উঠিয়া পড়িলেন। গোয়াল-ঘরের নিকট আসিলে জীবন তাহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া একটি গাইকে দেখাইল।

গাইটির দিকে তাকাইয়া তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি বসিয়া পড়িলেন।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়। সাপে গরুর বাঁট কাণা করিয়া দিয়া গিয়াছে। দুধের লোভ সর্পের এতই বেশী যে গরুর বাঁট হইতে তাহা শুষিয়া লইবার জন্য এই অদ্ভুত কাণ্ড বাধাইয়াছে।

দয়াল বলিতেছিলেন—কাল আমি মা'কে অমন ক'রে দুধ আর কলা খাইয়ে এলুম, তবুও মার লোভ কমল না শেষে এই রকম একটা কাজ করলেন !

তাহার পর উঠিয়া পড়িয়া ধীরুকে বলিলেন -- তা নয় রে ভাই ! এতদিন মা এই ভিটেয় আছেন কোনদিন কিছু করলেন না, আর হঠাৎ আজ করবেন। তা নয়। ঐ সাঁওতাল ব্যাটারা বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে মা'র মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে। যাঃ, মা এইবার সর্ব্বনাশ ক'রে ছাড়বেন দেখছি।

কিছুক্ষণ কলকোলাহলের মধ্যে কাটিবার পর দয়াল গো-বদ্যি ডাকিবার জন্য গ্রামান্তরে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু বদ্যি আসিবার বহুপূর্ব্বে গাইটি মাটি লইল। বিষের ক্রিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

সেদিন বাড়িতে নানা হট্টগোলের মধ্য দিয়া কাটিল। গরুটিকে ভাগাড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া স্নানাহার সারিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। কিন্তু বৈকালে আর একটি কাণ্ড বাধিল।

জীবনের ছোটছেলেটা দাওয়ায় শুইয়াছিল, হঠাৎ চিলের মত চেঁচাইয়া উঠিল। কি কামড়াইয়া থাকিবে সন্দেহ হওয়ায় তাহার বউ বিষপাথরটা আনিয়া গায়ে দিতে তাহা নাকি এক স্থানে বসিয়া গিয়াছে।

সংবাদ পাইয়া দয়াল তখনই ধীরুকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যই সর্পাঘাতের চিহ্ন পরিস্ফুট। কি ভাগ্য তখনই হাতচালা আসিয়া গিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি হাতে মন্ত্রপূত তৈল লইয়া তাহার গা-ময় বুলাইতে লাগিল। শেষে এক স্থানে আসিয়া হাত থামিয়া গেল। সেইখানটিতে দংশন হইয়াছিল।

দয়াল জোড়হস্তে মা'কে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সাঁওতাল সাপুড়ের দুষ্ট বুদ্ধিতে এ কি বিপদ ঘটিল!

হাত সেই স্থানটিতে প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিল। ছেলেটি চোখ চাহিল। হাতচালা হাত তুলিয়া লইয়া বলিল—বিষ উঠিয়া গিয়াছে। সময়ে বিস-পাথর দেওয়া হয়েছিল ব'লে বাঁচলো, তা না হ'লে বাঁচান দায় হ'ত।

৬

উপরের ঘটনার পর সাত-আট দিন কাটিয়া গিয়াছে। এ কয়দিন দেবতা আর কাহারও উপর অত্যাচার করেন নাই। ব্যাপারটা যেন অনেকটা সহিয়া গিয়াছে। এ-বিষয় লইয়া আর কেহ বড়-একটা উচ্চ-বাচ্য করে নাই।

রাত্রে ধীরু মাধুরীকে বলিল—তুমি তাহ'লে কি বাবার কাছে যাবে ঠিক করেছ?

মাধুরী একটু লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া বলিল না।

ধীরু বলিল—কেন বল ত? সাহস বেড়ে গেছে নাকি?

মাধুরী বলিল—হ্যাঁ সত্যি, আমার আর আজকাল ভয় করে না। তাছাড়া বাড়ি গিয়ে আর ভাল লাগবে না। জানলে?

ধীরু একটু হাসিল। বলিল—বাবা এত? কিন্তু সিন্দুকটা যদি এখনই ঘড় ঘড় ক'রে ওঠে ত—

মাধুরী তাহাকে আর বলিতে না দিয়া বলিল—সত্যি ঐটাকে আমার বড্ড ভয় বাপু। কি এক ভুতুড়ে সিন্দুক রেখে দিয়েছ—

ধীরু কোন উত্তর করিল না। হয়ত তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। মাধুরীও চুপ করিয়া রহিল। অল্পক্ষণ ধীরুর উত্তরের আশায় অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তখন সেও চোখ বুজিল। কিন্তু কিছুক্ষণ ঐরূপ ভাবে চোখ বুজিয়া থাকিবার পরও তাহার ঘুম আসিল না। কত কি অসংলগ্ন কল্পনা তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল: এই ঘরে ধীরুর ঠাকুমা থাকিতেন। তিনি একদিন মাধুরীর মত ছোট্ট একটি বধূ ছিলেন। তাহারই মত তিনি এই ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যে গহনাগুলি আজ মাধুরীর গায়ে রহিয়াছে একদিন সেগুলি তাঁহার গায়ে শোভা পাইত। এই খাটটির উপর তিনি শুইয়া থাকিতেন। ইহার উপর শুইয়া থাকিয়া একদিন তিনি সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।...শুনিয়াছিল নাকি তিনি অনুপমেয় সুন্দরী ছিলেন। চাঁপাফুলের মত রং ছিল তাঁহার।...এ গহনাগুলি তাঁহার শ্রীঅঙ্গে না-জানি কিরূপ মানাইত।...মাধুরীর চোখে বুঝি আবার তন্দ্রার আমেজ আসিল। কিন্তু ঘুম হইল না। তাহার মনে হইল যেন মশা কামড়াইতেছে। দেখিল সত্যই! সেদিন মশারিটি ফেলিয়া দিয়াছিল—কিন্তু টাঙাইয়া দিতে ভুল হইয়া গিয়াছে, তাই মশা কামড়াইতেছে। পাখার হাওয়ায় মশা তাড়াইয়া দিয়া সে একটু চোখ বুজিল।

ঘুম হইল না। চোখ খুলিয়া উপরে মশারির ফ্রেমটার দিকে তাকাইতেই তাহার মনে হইল কি যেন একটা তাহাতে জড়ান আছে। হয়ত মশারির দড়িগুলাই অমনি হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মশারির দড়ি ত অত মোটা হইবে না। আবার ও কি? ও যে পাক খুলিয়া যাইতেছে। তবে—তবে কি—

মাধুরী বুঝিল আর তাহার এ যাত্রা নিস্তার নাই। এ ঠিক সে-ই। দুধ-হলুদে গায়ের রং—তাহার উপর চক্র-চিত্রিত। ফণাটির উপরে সিন্দুরের লেখা। মাধুরী ঘামিয়া উঠিল। ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া সে কাঁপিতে লাগিল। স্বামীকে গা ঠেলিয়া যে ডাকিবে তাহার শক্তি ছিল না। কণ্ঠে আর তাহার ভাষার স্ফুরণ আসিল না! তাহার মনে হইল যেন সেটি তাহার দিকে ক্রমশঃ আরও ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মা'র নাম করিতে করিতে সে চোখ বুজিল।

আলোচনা

ইংলণ্ডযাত্রায় রামমোহন রায়ের সহযাত্রী পরিচারকবর্গ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের আলোচনার উত্তরে আমি দেখাই যে রামমোহন রায়ের সঙ্গে শেখ বক্সু, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাস,—এই তিন জন ভিন্ন অন্য কেহ বিলাত গিয়াছিল তাহা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে আমি ইহাও বলি যে, রামমোহন রায় ও তাঁহার সঙ্গীদের পাসপোর্ট-সম্পর্কিত কাগজপত্র ভারত-সরকারের দপ্তরখানায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে এইরূপ মনে করিবারও কোন হেতু নাই। তবুও নিশ্চিত হইবার জন্য আমি বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিসে এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইয়াছি। এখানে বলা প্রয়োজন, বিলাতযাত্রীদের জন্য কোম্পানী যে-সকল ছাড়পত্র মঞ্জুর করিতেন তাহার নকল যথাসময়ে বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইত। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দপ্তর বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়া আপিসে রক্ষিত আছে। আমার অনুরোধে, এই দপ্তরে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, মিস এল্ এম্ এনষ্টি যে তথ্য আমাকে পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

Bengal Public Consultations, 15 Septr. to 15 Octr., 1830.

Consultation 12 Octr. 1830 (entry following No. 95).

"The Secretary reports that an order for the reception on board the *Albion* of a Native Gentleman named Rammohun Roy, proceeding to England, was granted on the 7th instant on an application duly made by him for the purpose."

Bengal Public Consultations, 19 Octr. to 16 Nov., 1830.

Consultation 16 Novr. 1830 (entry following No. 36).

"The Officiating Secretary reports that orders for the reception of......the undermentioned individuals as passengers proceeding to the ports and places specified have been issued on application duly made for the purpose by the individuals themselves or by others in their behalf on the dates subjoined .....on the *Albion*, Ramrutton Mookerjee, Hurrichurn Doss and Sheik Buxoo, 15th November, proceeding to England in attendance on Rammohun Roy on the *Albion*."

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ১৮৩০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্য্যন্ত দপ্তর পরীক্ষা করিয়া ইণ্ডিয়া আপিসেও, আমি যে-দুইখানি পাসপোর্ট আবিষ্কার করিয়াছিলাম তাহা ভিন্ন অন্য কোন পাসপোর্টের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ঐ দুখানি ছাড়া অন্য কোন ছাড়পত্র যে রামমোহন বা তাঁহার সঙ্গীদের জন্য লওয়া হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহ। ইহার পরও যদি কেহ বলেন, রামমোহনের সহিত শেখ বক্সু, রামরত্ন ও রামহরি দাস ভিন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তি বিলাত গিয়াছিল তবে এই উক্তি প্রমাণ করিবার দায়িত্ব তাঁহার।

এই স্থলে যতীন্দ্রবাবুর একটি অসতর্ক উক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"এলবিয়ন জাহাজে যাঁহারা বিলাতে গিয়াছেন বলিয়া ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে উল্লেখ আছে এবং উক্ত জাহাজ বিলাত পৌঁছিলে পর যাঁহাদের নাম বিলাতের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সকলের নাম পাসপোর্টে পাওয়া যায় না।"

এইরূপ উক্তির কোন ভিত্তি নাই। বিলাতযাত্রাকালে এদেশের কোনও সংবাদপত্রে রামমোহনের সঙ্গীর "নাম" প্রকাশিত হয় নাই এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস বিলাত পৌঁছিলে সেখানকার কোনও সংবাদপত্রে তাহাদের "নাম" ও "সংখ্যা" প্রকাশিত হয় নাই। বিলাত পৌঁছিয়া রামমোহন প্রথমে লিভারপুলে অবতরণ করেন এবং সেখানে কয়েক দিন থাকেন। এই সময়ে স্থানীয় সংবাদপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বাহির হয়। লিভারপুলের এই সকল সংবাদপত্রের ফাইল বর্ত্তমানে বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। আমি সেগুলি অনুসন্ধান করাইয়াছি। কিন্তু এই সকল বিবরণে রামমোহনের সঙ্গীদের নাম বা সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ছাড়া আমি 'এশিয়াটিক জর্নাল' নামক একখানি বিলাতী সাময়িক পত্র দেখিয়াছি; তাহার ১৮৩১ সনের মে সংখ্যায় Home Intelligence"-বিভাগে (পৃ. ৪৪) 'এলবিয়ন' জাহাজের যাত্রীদের—রামমোহন ও কতকগুলি সাহেব-মেমের—নাম আছে এবং এই সকল নামের শেষে "six servants" লেখা আছে। ইহা 'এলবিয়ন' জাহাজের সকল যাত্রীর মোট পরিচারকের সংখ্যা,—রামমোহনের পরিচারকের সংখ্যা নয়।

যতীন্দ্রবাবু যদি কোন সমসাময়িক দেশী বা বিলাতী সংবাদপত্রে রামমোহনের সঙ্গীদের নাম ও সংখ্যা পাইয়া থাকেন, তবে সেই সকল কাগজের নাম প্রকাশ করা উচিত ছিল, নতুবা কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া—গবর্ন্মেণ্টের দপ্তর অসম্পূর্ণ এইরূপ উক্তি করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।

কৃ-ষ্টি ও সং-স্কৃ-তি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

Culture of mind অর্থে কৃ-ষ্টি শব্দ প্রচলিত হয়েছে। গত ভাদ্রের "প্রবাসী"তে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি তুলেছেন।

বোধ হয়, প্রথমে আমি কৃ-ষ্টি শব্দ প্রয়োগ করি। সে দশ-বার বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি এখনও কৃ-ষ্টি লিখে থাকি। সং-স্কৃ-তি দেখেছি, কিন্তু আমার মনে লাগে নি। সং-স্কৃ-তি ও সং-স্কা-র অর্থে এক। সং-স্কা-র শব্দের নানা অর্থ আছে। মেদিনীকোষ তিনটি মূলার্থ দিয়েছেন,—প্রতিযত্ন, অনুভব, মানসকর্ম। কৃ-ষ্টি শব্দের এত ব্যাপক অর্থ নাই।

অমরকোষে পণ্ডিত শব্দের বত্রিশটি সমার্থ শব্দ আছে। তন্মধ্যে কৃ-ষ্টি একটা। মেদিনীকোষ কৃ-ষ্টি শব্দের দুইটা অর্থই ধরেছেন; পুংলিঙ্গে

'বুধ', স্ত্রীলিঙ্গে 'আকর্ষ'। ভূমির কর্ষণ হয়, চিত্তভূমিরও কর্ষণ হ'তে পারে। রামপ্রসাদ তার সাক্ষী।

পশ্চিমদেশের সংস্পর্শে সে দেশের নানা সংস্কার (idea) আসছে, নূতন নূতন শব্দও রচিত হ'চ্ছে। ভাগ্যক্রমে কৃ-ষ্টি নব-রচিত নয়, কিন্তু অর্থে অবিকল culture.

—

চণ্ডীদাস-চরিতে সংশয়

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখিত চণ্ডীদাস-চরিত শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। রায় মহাশয় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও অনুশীলন করিতেছেন। তাঁহার নিকট বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কীয় যাবতীয় সঠিক সংবাদ পাইবার প্রত্যাশা করা যায়। গত ৫ই শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণে সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু সময়াভাবে আলোচনার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সে যাহা হউক, আলোচ্য বিষয়ে অপর পক্ষের কএকটা কথা এখানে সংক্ষেপে বিজ্ঞাপিত হইল।

ভূমিকাভাগে লিখিত হইয়াছে, "একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে, রাধা-কৃষ্ণলীলা 'কৃষ্ণকীর্তন' নাম হয়ে গেছে।" এ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন-গণের অভিপ্রায় কিন্তু অন্যরূপ।

(ক) ৺ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল-রচিত চণ্ডীদাস-চরিতে (১৩১১), 'কৃষ্ণকীর্ত্তন পুস্তক প্রণীত হইতে পারে, পারে কেন খুব সম্ভব হইয়াছিল... যাহা হোক চণ্ডীদাসের পুস্তকের নাম গীতচিন্তামণিই হউক বা কৃষ্ণকীর্ত্তনই হউক, তিনি যে ধারাবাহিক রূপে কৃষ্ণচরিত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' (পৃ. ১০০)

(খ) ৺ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিদ্যাপতি (১৩০১) পুস্তকে লিখিয়াছেন, 'তিনি (চণ্ডীদাস) কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে যে কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।' (পৃ. ৫০)

(গ) ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী কৃত চণ্ডীদাসের সমালোচনা, 'রসিকশেখর শ্রীচৈতন্য তাঁহার (চণ্ডীদাসের) পদ যত শুনিতেন ততই উন্মত্ত হইতেন। তথাপি তাঁহার পূর্ণগ্রন্থ কৃষ্ণকীর্ত্তন পাওয়া যায় নাই, কয়েকটি খণ্ডকবিতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে।' (নব্যভারত, ১৩০০ ফাল্গুন)

(ঘ) ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত মহাজন পদাবলীর (১২৮০) ভূমিকার এক স্থানে আছে, 'পদাবলী ব্যতীত চণ্ডীদাসের আর কোন গ্রন্থ আছে কি না জানা যায় না। কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে একখানি গ্রন্থ ছিল, কোন কোন পুস্তকে এই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই সকল পদাবলী সংগ্রহের নামই কৃষ্ণকীর্ত্তন কি না কে বলিবে।' (পৃ. ৪৬)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত দুইখানা পুথিই কীর্ত্তনের তাল বিষয়ক। উহাতে উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত পদের ১০টা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে। সরকার ঠাকুরের একটি পদে পাওয়া যায়, চণ্ডীদাস অনুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকিতেন।

পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব
জিনিয়া যাহার গান।
অনুখন কী র্ত্ত না ন ন্দে মগন
পরম করুণাবান। (প ক ত, ১।১।১৪)

কেহ কেহ মনে করেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কীর্ত্তন আদৌ নহে, ঝুমুর।' পণ্ডিতগণের মতে কিন্তু এই ঝুমুর-ধামালী দেশী সঙ্গীতের পরিণতিতেই উৎকৃষ্টতর কীর্ত্তনের উৎপত্তি। আর ঝুমুর অর্ব্বাচীনও নয়, ছোটলোকের গানও নয়। আবুল-ফজল যে সাতখানি সঙ্গীত-পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, ঝুমর তাহার একখানি।* গোবিন্দদাসের পদে,—

মদনমোহন হরি মাতল মনসিজ
যুবতী-যূথ গায়ত ঝু ম রি। (প ক ত, ৩।২৭।১০)

বিদ্যাপতিতে,—

গাবই সহি লোরি ঝু ম রি মজন
আরাধনে জাএ। (পরিষৎ সং পৃ. ৪৭৮)

মধুররসাত্মক বর্ণাদি নিয়ম-বর্জ্জিত ঝুমর-সঙ্গীত প্রাচীন, শিষ্ট-সমাজে গীত হইত এবং নৃপগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিত, তাহারও প্রমাণ আছে। এ অবস্থায় কৃষ্ণকীর্ত্তন নামকরণ কি বড়ই বিসদৃশ হইয়াছে?

পুথি: কৃষ্ণপ্রসাদের পুথির ৮০ পাতা তিন দফায় পাওয়া গিয়াছে। অত পুরু মসৃণ দেশী কাগজের পুথি যোগেশবাবু দেখেন নাই, লিখিয়াছেন। পাতাগুলি একই পুথির অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিলিপির, এক হাতের লেখা কি-না, প্রাপ্তিস্থান এক কিংবা একের অধিক ইত্যাদি নিশ্চয়ই তিনি রীতিমত চর্চ্চাইয়া এবং কাগজ ভাল রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অনুমান করিতে পারি।

কথা-বস্তু: কাশীর ফেরত দেবীদাস ও চণ্ডীদাস নগরপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সমস্বরে গান ধরিয়াছেন। জন্মভূমির প্রতি:

এবার জাগহ জনমভূমি।
জাবে কি জনম কাঁদিএ।
জাগ জাগ মা জনমভূমি।
চাঁদ জাগিছে নীল গগনে
কুসুম হাসিছে কুঞ্জকাননে
জাগাতে জগৎ মধুর তানে
জাগেন জগৎ স্বামী।
জাগ জাগ মা জনমভূমি।

বাসলীর প্রশ্নের উত্তরে চণ্ডীদাস,

মোরা যত দুঃখ পাই তাহে ক্ষতি নাই
দুঃখ হয় দেখি দেশের দুর্গতি।

এ যেন সেই সে-দিনকার স্বদেশী যুগের অপরিস্ফুট অভিব্যক্তি। গানেও যেন সে-যুগেরই সুরের রেশ বিস্পষ্ট। দুঃখের বিষয় শত বর্ষ পূর্ব্বে ঈদৃশ জাগরণের ইতিহাস অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

অতঃপর বাসলীর প্রত্যাদেশে দেবীদাস তাঁহারই পূজারী নিযুক্ত হইলেন। চণ্ডীদাস ও-দিকে রামীকে উত্তরসাধিকা পাকড়াইয়া সহজ-ভজনে মন দিলেন, এবং অবসরমত রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীতি রচনা করিয়া নিত্যাকে শুনাইতে থাকিলেন। অল্প দিনের মধ্যে চণ্ডীদাসের গীতের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। বিষ্ণুপুরের রাজা রামী ও চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করিয়া দূত পাঠাইলেন। ইঁহারা সামান্য গায়ক নহেন বলিয়া, ছাতনার রাজা দূতকে ফিরাইয়া দিলেন। এই লইয়া ছাতনার রাজা হাম্বীর উত্তর রায়ের সহিত বিষ্ণুপুর-রাজ গোপাল সিংহের যুদ্ধ বাধিল। বড়ই বিষম কথা। গৌড়ীয় সহজ-ধর্ম্মের বিকাশই মহাপ্রভুর পরে; এমন কি কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরেও বলা যাইতে পারে। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসের সহিত সহজ-সাধনের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, এবং উত্তরসাধিকা রামী রজকিনী অথবা নিত্যার একান্ত প্রয়োজনাভাব। ওমালী (L. S. S. O'Malley) সাহেবের

* ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত আইন-ই-আকবরী, পৃ. ১১৯।

উক্তি হইতে জানা যায়, ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রী অ°) শঙ্খ রায় সামন্তভূমি অধিকার করেন এবং তাঁহারই পৌত্র হামীর উত্তর রায় তৎপ্রদেশের সীমা বৃদ্ধি করিয়া উহার রাজা হন।† বাসলীর প্রাচীনতম মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত ইষ্টকলিপিতে হামীর উত্তর রায়ের কাল ১৪৭৫ শক (১৫৫৩ খ্রী অ°)। পদ্মলোচনের পুথি অনুসারে হামীর উত্তর রায় ১৩৮৭ শকে (১৪৬৫ খ্রী অ°) বা তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। [পুথিখানা কিন্তু ৬০।৭০ বৎসরের বেশী পুরান নয়।] আবার এই নবাবিষ্কৃত কৃষ্ণপ্রসাদের পুথিতে হামীর উত্তর রায়কে ১২৮০ শকে (১৩৫৮ খ্রী অ°) পাওয়া যাইতেছে। আর বিষ্ণুপুর-রাজ গোপাল সিংহের সময় ১৭.২-১৭৪৮ খ্রী অ°। এ-ক্ষেত্রে জোড়া-তাড়া দিবার চেষ্টা করিলে অনেক কিছুরই কল্পনা করিতে হয়। অর্থ-সাদৃশ্যে 'গোপাল সিংহের কানাই মন্ত্রে (১৩৪৫-১৩৫৮ খ্রী অ°) উন্নয়ন তাহারই অন্যতম নিদর্শন।

কথাপ্রসঙ্গে চণ্ডীদাস বিষ্ণুপুরের রাজাকে বলিয়াছেন, যে-দিন ঘোর অত্যাচারী মহামুদি (মুহম্মদ-বিন্-তুঘলক, ১৩২৫-১৩৫১ খ্রী অ°) পিতৃহত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎপূর্ব্ব দিবসে আমার জন্ম হয়। কৃষ্ণপ্রসাদের অবলম্বন তাঁহার প্রপিতামহ উদয়-সেনের গ্রন্থ। উদয়-সেনই বা সামন্তভূমির নিবিড় জঙ্গলে বসিয়া তাঁহার ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বের সংবাদ কি উপায়ে সংগ্রহ করিলেন, জানা নিতান্ত আবশ্যক।

যাহা হউক চণ্ডীদাস রাসে ও দোলে বিষ্ণুপুরে গাহিতে যাইবেন, এই সর্ত্তে ছাতনা ও বিষ্ণুপুরে সন্ধি হয়। চণ্ডিদাস বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিতেছেন, ইত্যবসরে গৌড়েশ্বর সিকন্দর শাহের (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রী অ°) দূত রহমন চণ্ডীদাসকে লইয়া যাইবার জন্য সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামীসহ চণ্ডীদাস পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রহমনের সহিত অনেক কথা হইল, তাহার একটা,

সকলি মানুষ শুনহে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। ইত্যাদি

ইহা যে সর্ব্বজন-পরিচিত 'শুন হে মানব ভাই / সবার উপর মানুষ বড় / তাহার উপরে নাই।' কবিতাংশের অনুকৃতি।

একদিন সন্ধ্যার পর খবর পাওয়া গেল, নির্জ্জন কাননাভ্যন্তরে পাষাণময়ী কালী-প্রতিমার সম্মুখে এক ষোড়শী রূপসীকে বলি দিবার উদ্যোগ হইতেছে। যুবতীর প্রতিবাদে যুবা তান্ত্রিকের উক্তি,

কাপুরুষ হয় জেই অলস অজ্ঞান।
নন্দের নন্দন হয় তারি ভগবান।
জত দিন ছিল না এদেশে কৃষ্ণভজা।
সবাই স্বাধীন ছিল এদেশের রাজা।
জখনি সে জয়দেব কৃষ্ণনাম ধরে।
তখনি জবন আসি ঢুকে তোর ঘরে।

বস্তুতঃ বাঙালীর অন্তরে তখন এতটা স্বদেশানুরাগ জাগিয়াছিল কি? বার্ত্তা পাইয়াই চণ্ডীদাস ছুটিলেন এবং যুবকের উদ্যত খড়্গ কাড়িয়া লইয়া যুবতীকে যূপকাষ্ঠ হইতে মুক্ত করিলেন। পরে উভয়ের পরিচয় লইয়া তাহাদিগকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত ও বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন। মেয়েটির নাম রমাবতী ও পুরুষের নাম রূপচাঁদ, নিবাস চন্দননগর। এখন প্রশ্ন হইতেছে, শক্তির উদ্দেশে স্ত্রীলোককে বলি দিবার ব্যবস্থা তন্ত্রশাস্ত্রে আছে কি? কাপালিক অঘোর ঘণ্ট কর্ত্তৃক করালী সমীপে মালতীর বধোদ্যমের বিবরণ আছে বটে, তবে সেটা নাটকীয় পরিকল্পনা। গৌড়যাত্রীরা ক্রমে মানকর হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে অজয়-তীরে গিয়া উপনীত হইলেন। চণ্ডীদাস আকাশ-বাণীতে শুনিলেন,

ব্রহ্মণ্যপুরের মাঝে মুন্ময়বাসিনী।
বাসলী জে বিশালাক্ষী সেই হই আমি।
হেথায় নান্নুর গ্রামে হই জে পূজিতা।
চল বৎস গ্রামে মোর আমি তোর মাতা।

অজয় উত্তীর্ণ হইয়া বোলপুর এবং তথা হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী নান্নুরে রাত্রি প্রহরেকের সময় চণ্ডীদাস সদলবলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বাসলীর পূজারী দেবনাথ ভাবিলেন, নবাবের সেনা বুঝি দেবমূর্ত্তি সহ মন্দির ভাঙিতে আসিয়াছে। সাকুলীপুরবাসীরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। চণ্ডীদাস তখন মন্দির-দ্বারে ধ্যানমগ্ন। যবন-ভ্রমে তাঁহার উপর শরবর্ষণ হইতে লাগিল। হঠাৎ মন্দির-দ্বার খুলিয়া গেল, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কেহ দেখিল না। চণ্ডীদাসকে না পাইয়া রহমন লোকগুলাকে বাঁধিতে হুকুম দিলেন এবং চণ্ডীদাসকে বাহির করিয়া না দিলে তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিবেন বলিলেন। শুনিয়া দেবনাথ বলিয়া উঠিলেন,

কাটিয়া ফেলিতে সবে বলিলে ত বেশ।
মোরাও মানুষ বটি নহি ছাগ মেষ।

রামী ব্যতীত চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সকলে একপ্রকার হতাশ হইল। তার পর,

চণ্ডির চরিত্র আর কি লিখিবি ভাই।
বলরে প্রাণের বন্ধু তুমারে সুধাই।
বিধাতা তুমার পুথি মিলাইল বেশ।
নান্নুরে আরম্ভ করি নান্নুরেতে শেষ।

চণ্ডীদাসের ব্রহ্মণ্যপুরের মুন্ময়বাসিনী বাসলী যে [বীরভূম]-নান্নুরে পূজিতা বিশালাক্ষীও সেই আমি তোমার আরাধ্যা, সেখানে চল, আকাশ-বাণীতে এই কথা শুনার মধ্যে; এবং [ব্রহ্মণ্যপুর]-নান্নুরে আরম্ভ করিয়া [বীরভূম]-নান্নুরে চণ্ডীদাসের জীবলীলা সাঙ্গ হওয়া উক্তিতে গ্রন্থকারের উভয় কূল রক্ষার প্রয়াস, একটা রফানামার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। পূজারী দেবনাথের উত্তরটা ঠিক যেন 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি ত মেষ!' এর মতই শুনায়।

রাত্রি-প্রভাতে মন্দির-দ্বার খোলা হইলে দেখা গেল, চণ্ডীদাস অক্ষত দেহে দেবীর পূজায় রত রহিয়াছেন। পুনরায় সোল্লাসে যাত্রা আরম্ভ হইল; এবং যথাসময়ে চণ্ডীদাস পাণ্ডুয়ায় আসিয়া পৌঁছিলেন। রামীর রূপলাবণ্য দেখিয়া সুলতান মুগ্ধ হইলেন। চণ্ডীদাসকে গোপনে হত্যার আয়োজন ব্যর্থ হইল; অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। পরিশেষে সিকন্দর চণ্ডীদাসের পরম ভক্ত হইয়া পড়িলেন। আদর-আপ্যায়নে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে কবি সসম্মানে বিদায়গ্রহণ করিলেন। তথা হইতে রমার পিত্রালয় রঙ্গনাথপুরে গেলেন; এবং রঙ্গনাথপুরের দক্ষিণে গঙ্গা পার হইয়া মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত মিলিত হইলেন। ইহার পর তাঁহারা কেন্দুলীতে আসেন। পুথির প্রাপ্ত অংশে এই পর্য্যন্ত আছে।

পদ্মলোচন ও উদয়-সেনের পুথিতে চণ্ডীদাসের পিতার নাম নিত্যনিরঞ্জন, মাতার নাম বিন্ধ্যবাসিনী; কিন্তু পরলোকগত ব্রজসুন্দর সান্যাল সংগৃহীত ১৩৭৩ শকের পুথিতে যথাক্রমে ভবানীচরণ ও ভৈরবী।* অথচ রামীর পিতামাতার নামে ঐক্য আছে। ইহারই বা অর্থ কি? কৃষ্ণপ্রসাদের পুথিতে গৌড়ের দরবার হইতে ফিরিবার পথে চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ। আর সাহিত্য-পরিষদের ২৩৭৫ সংখ্যক পুথিতে গৌড়েশ্বরের আজ্ঞায় কবির বধদণ্ড হয়। ইহার কোনটিকে

† Bankura District Gazetteer (1908), p. 173.

* ৺ব্রজসুন্দর সান্যাল-বিরচিত চণ্ডীদাস-চরিত, পৃ. ৯।

গ্রহণ এবং কোন্‌টিকেই বা বর্জন করা যাইবে? [আমরা অন্যত্র দেখাইতে প্রযত্ন করিয়াছি, কবিদ্বয়ের মিলন সম্পূর্ণ কাল্পনিক *] এখন দেখা দরকার, এই শ্রেণীর পুথি কতটা নির্ভরযোগ্য। অধিকন্তু একের তা অপরে আরোপের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। অধুনাতন একখানা চণ্ডীদাস নাটকের ২।৩টা নামও কৃষ্ণপ্রসাদের পুথিতে পাওয়া যাইতেছে মীমাংসা বাঞ্ছনীয়।

—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মন্তব্য

শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন-রায় বিদ্বদ্বল্লভ তিনচারিটি বিবেচ্য তর্ক তুলেছেন। আমি যথাসাধ্য উত্তর লিখছি।

(১) "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নাম। তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের গীতিকাব্যের পুথী আবিষ্কার করেন। বড়ু সে কাব্যের কি নাম রেখেছিলেন, জানা নাই, পুথীর গোড়ার ও আগার পাতা পাওয়া যায় নাই, কাব্যের মধ্যেও নাম নাই। পুথীর আবিষ্কর্তা "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নাম রেখেছিলেন, এবং সে নামে ১৩২৩ সালে পুথী ছাপা হয়েছে। আমার মতে নামটি সার্থক হয় নাই। পুথীতে কৃষ্ণের গুণবর্ণন, মাহাত্ম্যকীর্তন নাই, কৃষ্ণনাম কীর্তনও নাই। ১৩২৩ সালের পূর্বে বড়ুর পদ অজ্ঞাত ছিল। রায়-মহাশয় যাঁদের মন্তব্য তুলেছেন, তাঁরা আর এক চণ্ডীদাসের কতকগুলা পদ পেয়েছিলেন, সে চণ্ডীদাস তাঁদের মন্তব্যের লক্ষ্য ছিল। সহজে বুঝি, অজ্ঞাত গ্রন্থের নামকরণ হ'তে পারে না।

(২) বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মশক। পুথীর বিবরণ ও কবির পরিচয় দিলে সম্পাদকের কর্তব্য সমাপ্ত হয়। তার পর, পাঠক ও সম্পাদক এক পাঠশালার পড়ুয়া হয়ে পড়েন। সম্পাদক সর্বজ্ঞ নহেন, কবির মতামতের জন্য দায়ীও নহেন। আমি "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথীর বিবরণ দিয়েছি। পুথী সংক্ষেপ করে'ছি। আমার কর্তব্য শেষ করে'ছি। "পর্যালোচন" অবশ্য আমার। এ সম্বন্ধে তর্ক থাকলে, এবং তর্কের হেতু থাকলে, আমি সমাধানে যত্ন ক'রতে পারি। ছাতনায় থেকে উদয়-সেন দিল্লীর বার্তা কেমনে পেলেন, এর উত্তর তিনিই দিতে পারতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসবার উপায় নাই। এখন যাঁর যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমন কল্পনা ক'রতে পারেন, চণ্ডীদাসের জন্মশক মিথ্যাও বলতে পারেন। কিন্তু ব'লবার আগে বলবত্তর বিরোধী প্রমাণ দরকার হবে, ব'লতে হবে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে চণ্ডীদাসের জন্ম হয় নাই।

(৩) হামীর-উত্তর-রায়। "বাসলী-মাহাত্ম্যে" ১২৮৭ শকে (১৪৬৫ খ্রি-অ) পদ্মলোচন শর্মা লিখেছিলেন, ছাতনার রাজা হামীর-উত্তর দেবীদাস ও চণ্ডীদাসকে বাসলীপূজায় নিযুক্ত করে'ছিলেন। [এখানে বর্তমান পুথীর বয়স নিয়ে তর্ক ক'রব না, রায়-মহাশয়ের অনুমানও বিনা হেতুতে মানব না।] চণ্ডীদাস-চরিতের মতে হামীর-উত্তর ১২৭৯ শকে (১৩৫৭ খ্রি-অ) ছিলেন। অর্থাৎ পদ্মলোচন শর্মার প্রায় শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। দুই মতে বিরোধ পাচ্ছি না। কিন্তু (১) ওমালী সাহেব "বাঁকুড়া গেজেটিয়রে" লিখেছেন, ছাতনার বর্তমান রাজবংশের আদি রাজার নাম শংখ-রায় ছিল। তিনি ১৩২৫ শকে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পৌত্রের নাম হামীর-উত্তর-রায় ছিল। একথা সত্য হ'লে হামীর-উত্তর প্রায় ১৩৭৫ শকে (১৪৫৩ খ্রি-অ) ছিলেন। কিন্তু কথাটার প্রমাণ কি? যতদূর জানি, কিছুই না। বাঁকুড়ার এক কালেক্টর সাহেব ছাতনার রাজার কাছে বংশবৃত্তান্ত চেয়েছিলেন, রাজার ইংরেজীনবিশ এক বৃত্তান্ত দিয়েছিলেন। সে ইংরেজী বৃত্তান্ত কালেক্টরি দপ্তরে আছে, আমি পড়ে'ছি। আমি এই বৃত্তান্ত ধরে' ছাতনায় যেয়ে শুনি, আদি রাজার নাম নিঃশঙ্কনারায়ণ। এই রাজার শক খুজে খুজে হয়রান হয়েছি। কিন্তু শুনেছিলাম, পিতামহের নাম পৌত্র গ্রহণ ক'রতেন। এর লিখিত প্রমাণও আছে। হয়ত নিঃশঙ্কনারায়ণ শংখ-রায় হয়েছেন, এবং তিনিই প্রথম হামীর-উত্তর। ইংরেজী রিপোর্টের ১৩২৫ শক স্থানে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ পড়ুন, অন্ধকারে আলো ঢুকবে। (২) ছাতনার বাসলী আদি 'থানে'র প্রাচীরের ইটে ১৪৭৫ শক (১৫৫৩ খ্রি-অ) লেখা আছে। বাসলীর মন্দির পাথরের ছিল, এককালে বাইরের প্রাচীরও পাথরের ছিল। কারণ, ভিতরে ঢুকবার দুইটি দ্বারই পাথরের, এখনও দাঁড়িয়ে আছে। দেশে পাথরের অভাব ছিল না, রাজার প্রতাপের ও বাসলী-ভক্তির অভাব ছিল না। প্রাচীর গাঁথবার পাথর জুটে নাই? সে যাহাই হ'ক, ১৪৭৫ শকে বাইরের প্রাচীর গাঁথা হয়েছিল। প্রাচীরের কাল হ'তে মন্দির-প্রতিষ্ঠার কাল, প্রতিষ্ঠাতা রাজার কাল-অনুমান সিদ্ধ হয় না। (খ) কোন কোন ইটে শক ব্যতীত "ছাতনা নগরেশ" লেখা আছে, কোন কোন ইটে রাজার নাম লেখা আছে। সে নাম "উত্তর রায়" স্পষ্ট, "হাম্বীর উত্তর রায়"ও স্পষ্ট। কিন্তু এই নামের পূর্বে কি লেখা আছে, প'ড়তে পারা যায় না। ধরি, নামটি হামীর-উত্তর-রায়। তা হ'লে কি হামীর-উত্তর-রায়. ১৪৭৫ শকে ছিলেন? এখানে ওমালী সাহেব থই পাবেন না, পদ্মলোচন ও উদয়-সেনও পাবেন না। বাসলীর দে-ঘরিয়াদের পুরুষগণনা ও রাজবংশলতা মিথ্যা হয়ে যাবে। এই সব বিসম্বাদ ঘুচাবার এক উপায় আছে। যে রাজা মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করে'ছিলেন, ইটে তাঁর নাম স্মৃত হয়েছে; আর, ১৪৭৫ শকে মন্দির সংস্কৃত ও বহিঃপ্রাচীর নির্মিত হয়েছে। বই-এর মলাটে গ্রন্থকারের নাম লেখা থাকে, নীচে শক বা সাল লেখা থাকে। সে শকে বা সালে গ্রন্থের উৎপত্তি, কেহ এ অর্থ করেন না। [সাহিত্য-পরিষদে শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আমাকে বলে'ছিলেন, তাঁর কাছে ছাতনার রাজবংশলতা আছে। তিনি সেটা প্রকাশ ক'রলে বড় ভাল হয়।]

(৪) চণ্ডীদাসের পিতামাতার নাম। রায়-মহাশয় ৺ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল রচিত "চণ্ডীদাস-চরিতে"র উল্লেখ করে'ছেন। আমি বইখানা পাই নি। তাতে নাকি আছে, সান্ন্যাল মহাশয় ১৩৭৩ শকে লিখিত এক পুথীতে পেয়েছিলেন, চণ্ডীদাসের পিতার নাম ভবানীচরণ, মাতার নাম ভৈরবীসুন্দরী। সে পুথী না পেলে ঐ শকে বিশ্বাস ক'রতে পারি না। "কৃষ্ণকীর্তনে"র ভূমিকায় রায়-মহাশয়ও এই সংবাদ অশ্রদ্ধা করে'ছেন। কিন্তু দেখছি, "চণ্ডীদাস-চরিতে"ও প্রকারান্তরে ভবানী ও ভৈরবী নাম আছে। কবি লিখেছেন, পার্বতীচরণের বংশে দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের জন্ম হবে। তাঁর স্ত্রীর নাম কমলকুমারী। নানুরে পার্বতী-চরণ সংসারবিরাগী হয়ে চণ্ডীদাসের সহিত পাণ্ডুআয় গেলেন, যুবতী স্ত্রী মনের দুঃখে লুকিয়ে ভৈরবী-বেশে সেখানে উপনীত হলেন। এই ভৈরবী ত্রিশূল-হস্তে ওসমানের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করে'ছিলেন। [আমি পাণ্ডুআর অনেক কথা বাদ দিয়েছি।] উপাখ্যানের ধারাই এই, এক সূতা নানা রঙ্গে নানাজনের মুখ দিয়ে বেরয়। কিন্তু ভবানী-ভৈরবী কিংবা পার্বতী-ভৈরবী ১৩৭৩ শকে আবির্ভূত হ'তে পারেন নি। কারণ দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের ভাবা দুই শত বৎসরের সেদিকের নয়। যখন উদয়-সেন লিখেছিলেন, তখনও লোকে মনে রেখেছিল, দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের বাঁ হাতে ৬টি আঙুল ছিল।

আমি "কৃষ্ণকীর্তন" আশ্রয় করে' "চণ্ডীদাস" নামে এক নাতি-বিস্তৃত প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদে পড়ে'ছিলাম। প্রবন্ধটি এই বৎসরের পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। শব্দার্থ ২য় সংখ্যায় ছাপা হ'চ্ছে। সে প্রবন্ধে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর খুজেছি। "সঠিক" পেয়েছি কি না, সুধীগণ বিচার ক'রবেন। তাতে

* হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, ২য় ভাগ, পৃ ৩-১২।

"চণ্ডীদাস-চরিত" হ'তে চণ্ডীদাসের জন্মশকটি নিয়েছি। সম্প্রতি সেটা ধরে' চ'লতে হবে।

এ-সম্বন্ধে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ 'প্রবাসী'তে ছাপা হইবে না।— 'প্রবাসী'র সম্পাদক।

চা-পান বিস্তারের চেষ্টা

শ্রীহট্ট জেলার দুহালিয়া গ্রাম হইতে মৌলবী মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে "চা-পান প্রচেষ্টা" বিষয়ক একটি স্বাক্ষর-বিহীন লেখা প্রকাশিত হওয়ায় সে বিষয়ে আমাদিগকে নানা প্রশ্ন করিয়াছেন। লেখকের নাম বা নামের আদ্য অক্ষর কোন লেখায় না থাকিলে তাহা সম্পাদকীয় বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু আলোচ্য লেখাটি সম্পাদকীয় নহে। উহা লেখকের নাম বা নামের আদ্য অক্ষর ব্যতিরেকে প্রকাশিত হওয়ার জন্য সকল অবস্থায় 'প্রবাসী'র সমুদয় মুদ্রণব্যবস্থাদির সম্যক্ তত্ত্বাবধান করিতে আমার অসামর্থ্য দায়ী। সে ত্রুটি আমার আছে।

চা-পান সম্বন্ধে আমার নিজের মতের আভাস শ্রাবণের প্রবাসীতেই বিবিধ প্রসঙ্গে আছে। চা-পানের অভ্যাস আমার নাই, কিন্তু চা-কে আমি তাড়ি বা মদের সমশ্রেণীস্থ মনে করি না বলিয়া, কোথাও কেহ আমাকে সৌজন্য দেখাইবার নিমিত্ত চা দিলে তাহা কিঞ্চিৎ পান কখনও করি না, এরূপ নহে। আমি চিকিৎসক বা রাসায়নিক নহি। কিন্তু আমার ধারণা এই, যে, যেরূপ ভাবে চা প্রস্তুত করিলে উহা অনিষ্টকর হয় না আমাদের দেশের দরিদ্র ও অল্পবিত্ত মধ্যশ্রেণীর লোকদের পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য—হয়ত অসাধ্য। সুতরাং তাহাদিগকে চা ধরাইবার চেষ্টার আমি সমর্থক নহি। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসীর সম্পাদক।

গ্রন্থাগার-পরিচালনায় নব পন্থা

শ্রীনক্ষত্রলাল সেন

গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন হইলেও সার্ব্বজনিক গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হইয়াছে বর্ত্তমান যুগে। প্রাচীনকালে রাজা-রাজড়া ও ধনীদের গ্রন্থাগার ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহা ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি—সাধারণের তাহাতে কোন অধিকার ছিল না। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা পূর্ব্বে অল্প ছিল এবং পুস্তকের চাহিদাও ছিল কম। বর্ত্তমান যুগে গণতন্ত্র স্থাপিত হইবার ফলে শিক্ষার প্রসার এবং তাহার ফল-স্বরূপ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে সংস্কার-আইন (Reform Bill) পাস হইবার ফলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দেশে তখনও শিক্ষার প্রসার বেশী হয় নাই। এক জন রাজনৈতিক নেতা এই উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, 'এখন আমাদিগকে আমাদের প্রভুদের শিক্ষা দিতে হইবে।' ('We must now educate our masters') কিন্তু গ্রন্থাগার স্থাপিত হইলেও গ্রন্থাগার-ব্যবহারে জনসাধারণের অধিকার স্থাপিত হইতে বহু বৎসর লাগিয়াছে। প্রথমতঃ, সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির গ্রন্থাগারে প্রবেশের অধিকার ছিল। পরে অনেক চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অবাধে পুস্তক পড়িবার অধিকার সাব্যস্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে গ্রন্থাগার-স্থাপনের উদ্দেশ্য গ্রন্থ-সংরক্ষণ নহে,—জনসাধারণের মধ্যে অবাধে গ্রন্থের রস পরিবেষণ, জ্ঞান-বিতরণ ও আনন্দ দান এবং অবসরের সুব্যবহারে সাহায্য করাই বর্ত্তমান কালে গ্রন্থাগার-পরিচালনার মূলমন্ত্র। গ্রন্থাগার-পরিচালনার যে-সব অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সফল করা। গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনায় আমেরিকা জগতের শীর্ষস্থানীয়। এই সব পন্থার সৃষ্টি হইয়াছে প্রধানতঃ আমেরিকায়, অন্যান্য সব দেশেও এই সব প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। বর্ত্তমানে লাইব্রেরী-পরিচালন-বিদ্যা বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।

আমরা কিন্তু জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের স্থান কোথায়, সে-বিষয়ে ঠিক ধারণা এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদের দেশে ছোট ছোট লাইব্রেরীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের ব্যবস্থা সবই মামুলী ধরণের। অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এই বিষয়েও আমরা

সনাতন-পন্থী। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাসমূহ যে খুব ব্যয়সাপেক্ষ তাহাও নহে, অথচ উহাদের সাহায্যে অতি সুশৃঙ্খল ভাবে গ্রন্থাগারের কার্য্য পরিচালনা করা যায়। কিন্তু এই সব ব্যবস্থার বিষয় জানিতে কিংবা তদনুসারে কার্য্য করিতে আমাদের কোন আগ্রহ নাই।

ইউরোপ ও আমেরিকায় লাইব্রেরীগুলি সাধারণতঃ গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে, মিউনিসিপালিটির খরচে, অথবা ব্যক্তি-বিশেষের অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হইয়াছে। জনসাধারণের তাহাতে অবাধ গতি। কাহারও কাহারও এক জন জামিনের দরকার হয় মাত্র। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ও বড়োদার সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর বই পড়িতেও কোনরূপ চাঁদা দিতে হয় না।

ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র খোলা তাকে বই রাখার পদ্ধতি (open access system) প্রচলিত। এই ব্যবস্থানুযায়ী বইগুলি বন্ধ আলমারীতে না রাখিয়া খোলা তাকে রাখা হয় এবং পাঠকদের অবাধে শেল্‌ফের নিকট গিয়া ইচ্ছামত পুস্তক বাছিয়া আনিবার অধিকার দেওয়া হয়। ইহাতে পুস্তক-নির্ব্বাচনে কিরূপ সহায়তা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার ফলে কত অপঠিত, অজ্ঞাত গ্রন্থের পাঠক জুটিয়া যায়; কত অব্যবহৃত গ্রন্থের শেল্‌ফ-কারা হইতে মুক্তি ঘটে। খোলা তাকে বই রাখার প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে গ্রন্থাগার-নির্ম্মাণে কিছু বিশেষত্ব থাকা দরকার। সাধারণতঃ লাইব্রেরী-ঘর কতকগুলি কামরায় বিভক্ত না-করিয়া একটি বড় হল-ঘর নির্ম্মাণ করা হয়। বইয়ের শেল্‌ফগুলি ঘরের চারিদিকে দেওয়াল ঘেঁষিয়া সাজান থাকে। পাঠকগণ যাহাতে মেঝের উপর দাঁড়াইয়া মইয়ের সাহায্য না লইয়া বই নামাইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে শেল্‌ফগুলি সাড়ে সাত ফুটের বেশী উঁচু করা হয় না। শেল্‌ফ ছাড়াইয়া দেওয়ালের উপরের দিকে বড় বড় জানালা করা হয়; তাহাতে আলো-বাতাস আসিবার অসুবিধা হয় না। বইগুলি খোলা আলমারীতে রাখিলে যে কেবল পাঠকদের সুবিধা হয়, তাহা নহে—বইগুলিও ভাল থাকে। লাইব্রেরী হইতে বাহির হইবার জন্য একটি দরজা রাখা হয় এবং সেই দরজার নিকট 'চার্জ্জিং ডেস্ক' থাকে। সেইখান হইতে বই বিলি করা হয়। পাঠকদের পড়িবার টেবিল লাইব্রেরীর মাঝখানে রাখা হয় এবং গ্রন্থাগারিক এইরূপ স্থানে বসেন যেখান হইতে লাইব্রেরী-ঘরের সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। লাইব্রেরী হইতে বাহির হইবার জন্য "ল্যাম্বার্টস্ উইকেট গেট" (Lambert's Wicket Gate) নামে এক বিশেষ গেটের সৃষ্টি হইয়াছে। খোলা তাকে বই রাখার প্রচলন সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে ইহাই বলিতে চাই যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই প্রথা প্রবর্ত্তনে ফল খারাপ হয় নাই। আমাদের দেশেও কয়েকটি লাইব্রেরীতে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

এই ত গেল লাইব্রেরী-গৃহ পরিকল্পনার কথা। কিন্তু গ্রন্থই হইল গ্রন্থালয়ের প্রাণস্বরূপ। গ্রন্থের উপযুক্ত ব্যবহারের উপরই গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। এই জন্য গ্রন্থগুলি সুনির্ব্বাচিত হওয়া দরকার এবং এরূপ ভাবে সাজান থাকা উচিত যাহাতে পাঠকগণ অনায়াসে পুস্তক খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে সুচারুভাবে পুস্তকের বিভাগ (classification) করা দরকার। আমাদের দেশে পুস্তক-বিভাগের বিশেষ কোন রীতি নাই। অনেক স্থলে পুস্তকের কোন বিভাগ না-করিয়া পুস্তক ক্রয় অনুসারে ক্রমিক নম্বর দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে সব বিষয়ের বই একসঙ্গে থাকে। কোন কোন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করিয়া ক্ষান্ত হন এবং বই কেনা হইলে উপরিউক্ত বিভাগসমূহে ফেলিয়া বইয়ের নম্বর দিয়া থাকেন। প্রত্যেক বিষয়ের যে বিভাগ ও উপবিভাগ আছে সে-বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। উপরিউক্ত কোন প্রথাই বিজ্ঞান-সম্মত নহে। বইগুলি এরূপ ভাবে রাখা দরকার যাহাতে প্রত্যেক বিষয়ের বিভাগ এবং উপবিভাগের বইগুলি পর্য্যন্ত একসঙ্গে সাজান থাকে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। বিজ্ঞান একটি বিষয় (class), ইহার নানা বিভাগ আছে; যেমন গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি। আবার প্রত্যেক বিভাগের উপবিভাগ (sub-division) আছে। গণিতের মধ্যে আছে, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি, কিন্তু শাখা, উপশাখা অনুসারে বিভাগ না করিয়া বিজ্ঞানের কেবল মোটামুটি একটি ভাগ করিলে গণিত, রসায়ন, ভূতত্ত্ব প্রভৃতির বই একসঙ্গে রাখিতে হয়। ইহাতে সহজে

পুস্তক বাহির করিবার কিংবা প্রত্যেক বিষয়ের বিভাগ ও উপবিভাগে কি কি বই আছে তাহা সহজে ধরিবার উপায় থাকে না। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সুতরাং কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পুস্তকের বিভাগ করা দরকার। পুস্তক-বিভাগের নানা প্রথা আছে: তন্মধ্যে চারিটি উল্লেখযোগ্য:—যথা ব্রাউন-উদ্ভাবিত "Subject Classification," কাটার-প্রবর্ত্তিত "Expansive Classification, আমেরিকার Library of Congress Classification ও ডিউয়ির "Decimal System of Classification"। ইহার মধ্যে ডিউয়ির দশমিক শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। আমেরিকার লাইব্রেরী-পরিচালনা বিশেষজ্ঞ ডক্টর মেলভিল্ ডিউয়ি এই প্রথা উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই প্রথানুসারে জগতের বহু লাইব্রেরীর পুস্তকের বিভাগ করা হইয়া থাকে। এই প্রথানুসারে পুস্তক বিভাগ করিতে হইলে দশমিক বিন্দুর সাহায্য লইতে হয় বলিয়া ইহাকে Decimal System বলে। ডিউয়ি বিশ্বের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারকে দশটি বিষয়ে (class) বিভক্ত করিয়াছেন। বিষয়গুলির নাম ও প্রত্যেকের নম্বর নীচে দেওয়া হইল।

০০০	সাধারণ গ্রন্থ	(General Works)
১০০	দর্শন	(Philosophy)
২০০	ধর্ম্ম	(Religion)
৩০০	সমাজতত্ত্ব	(Sociology)
৪০০	ভাষাতত্ত্ব	(Philology)
৫০০	বিজ্ঞান	(Natural Sciences)
৬০০	ব্যবহারিক বিজ্ঞান	(Useful Arts)
৭০০	ললিতকলা	(Fine Arts)
৮০০	সাহিত্য	(Literature)
৯০০	ইতিহাস (ভূগোল, জীবনী ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সমেত)	(History, including geography, biography & travels)

প্রত্যেক বিষয়ের নয়টি বিভাগ ও প্রত্যেক বিভাগের উপ-বিভাগ আছে। বিষয়, বিভাগ ও উপবিভাগ বুঝাইতে হইলে সাধারণতঃ তিনটি রাশি ব্যবহার করিলেই চলে। শতকের ঘর বিষয় সূচনা করে; যেমন ৫০০ বলিতে বিজ্ঞান বুঝায়। দশকের ঘর বিভাগ (division) সূচনা করে; ৫১০ নং (৫০০+১০) বিজ্ঞানের প্রথম বিভাগ গণিত বুঝায়। এককের ঘর উপবিভাগ (sub-division) বুঝায়; যেমন ৫১১ নং (৫০০+১০+১) বলিলে বিজ্ঞানের প্রথম বিভাগ অঙ্কশাস্ত্রের প্রথম উপবিভাগ পাটীগণিত বুঝায়। তিনটির অপেক্ষা বেশী রাশির দরকার হইলে তিনটি রাশির পর দশমিক বিন্দু দিয়া তাহার পর অন্য রাশি বসাইতে হয়। যেমন ভূতত্ত্বের নম্বর ৫৫০; কিন্তু ভারতীয় ভূতত্ত্বের নম্বর হইবে ৫৫৫·৪। এইরূপ ভাবে পুস্তক-বিভাগ করিলে কোন্ নম্বরে কোন্ বই অথবা কোন্ বইয়ের কত নম্বর হইবে সহজেই বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রত্যেক বিভাগ কি উপবিভাগের যদি একই নম্বর থাকে—যেমন সব পাটীগণিতের নম্বর ৫১১—তবে কোন বিশেষ গ্রন্থকারের বই কিরূপে বাহির করা যাইতে পারে? কারণ, পাটীগণিতের বই অনেক গ্রন্থকারের আছে। ইহার উত্তর এই যে, প্রত্যেক বইয়ের নম্বরের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও একটি বিশেষ নম্বর দেওয়া হইয়া থাকে। এই দুইটি নম্বর মিলাইয়া 'কল্-নম্বর' বলা হয়। এই নম্বরের সাহায্যে বই বাহির করা যাইতে পারে। এই প্রথানুসারে পুস্তক-বিভাগ ভারতবর্ষের কোন কোন লাইব্রেরীতে, যথা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে, প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কেহ কেহ নিজের সুবিধার জন্য ইহার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত এস. আর. রঙ্গনাথন, এম-এ, এফ-এল-এ 'কোলান্ সিষ্টেম' নামে এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই পন্থানুযায়ী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর পুস্তকের বিভাগ করা হইয়াছে। কোলান্ (:)-এর সাহায্যে এই পন্থায় পুস্তক বিভাগ করা হইয়া থাকে।

পুস্তক-বিভাগ করা হইলে পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিতে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। পুস্তক-নির্ব্বাচনে পাঠকদের সাহায্য করিতে হইলে ভালরূপে পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করা দরকার। আমরা সাধারণতঃ বইয়ের আকারে প্রস্তুত তালিকার সহিত সুপরিচিত। ইহাকে 'বুক-ক্যাটালগ' বলা হইয়া থাকে। এইরূপ তালিকার নানা অসুবিধা আছে। কোন কোন লাইব্রেরীর তালিকা ছাপান থাকে:

অধিকাংশ লাইব্রেরীতেই হাতে-লেখা তালিকা রাখা হয়। ছাপান তালিকা থাকিলেও হাতে লিখিয়া নূতন পুস্তকের নাম যোগ করিতে হয়, কারণ ঘন ঘন তালিকা ছাপান চলে না এবং পুস্তকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে। হাতে-লেখা তালিকাতে পুস্তক-ক্রম-অনুসারে পুস্তকের নাম তালিকাবদ্ধ করিতে হয়। তাহাতে পুস্তকের নাম সহজে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। আবার বই হারাইয়া গেলে তালিকা হইতে নাম কাটিয়া দিতে হয়।

এই সব অসুবিধা দূরীকরণের জন্য আজকাল কার্ডে লিখিয়া পুস্তকের তালিকা প্রস্তত করা হইয়া থাকে। ইহাকে 'কার্ড-ক্যাটালগ' বলা হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থানুসারে ছোট ছোট কার্ডে পুস্তকের নাম লেখা হইয়া থাকে। এক-একখানা কার্ডে একখানার বেশী বইয়ের নাম লেখা হয় না। কার্ডগুলির আকার সাধারণতঃ ৫×৩ ইঞ্চি হইয়া থাকে। প্রত্যেক কার্ডে বইয়ের নাম, নম্বর, গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থ-প্রকাশের বৎসর, সংস্করণ, খণ্ড প্রভৃতি লিখিত থাকে, প্রত্যেক বইয়ের জন্য সাধারণতঃ তিনখানা কার্ড লিখিত হইয়া থাকে। একখানা কার্ডে গ্রন্থকারের নাম সকলের উপরে লিখিত থাকে; নীচে বইয়ের নাম থাকে। ইহাকে 'অথর্-কার্ড' বলে। দ্বিতীয় কার্ডে বইয়ের নাম সকলের উপরে লিখিত থাকে। ইহাকে 'ফাইল-কার্ড' বলে। তৃতীয় কার্ডে যে বিষয়ের বই সেই বিষয়ের নামে সকলের উপর লিখিত থাকে। ইহাকে 'সবজেক্ট-কার্ড' বলা হয়। সমস্ত কার্ড বর্ণানুসারে কাঠের ছোট ছোট কুঠরীতে (cabinet) রাখা হয়। কার্ডগুলির নীচে ছিদ্র থাকে; সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটি পিত্তলের দণ্ড ঢুকাইয়া দিয়া কার্ডগুলি একত্র করিয়া রাখা হয়। ইহাতে কার্ডগুলি বিশৃঙ্খল বা স্থানান্তরিত হইতে পারে না। কোন নূতন বই আসিলে দণ্ডটি খুলিয়া সেই বইয়ের কার্ডগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া আবার আটকাইয়া রাখা হয়। কোন বই হারাইয়া গেলে বা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িলে, সেই বইয়ের কার্ডগুলি অনায়াসে খুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পাঠকদিগের নানা দিক হইতে পুস্তক-নির্ব্বাচনের সুবিধার জন্য এতগুলি করিয়া কার্ড লিখিত হইয়া থাকে। কোন পাঠক হয়ত বইয়ের নাম জানেন, গ্রন্থকারের নাম জানেন না। তিনি ফাইল-কার্ডের সাহায্যে বইয়ের নাম ও নম্বর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন। আবার কেহ হয়ত গ্রন্থকারের নাম জানেন; কিন্তু গ্রন্থের নাম জানেন না। তিনি 'অথর-কার্ড'-এর সাহায্যে পুস্তক বাছাই করিতে পারেন। যিনি বইয়ের নাম কিংবা গ্রন্থকারের নাম উভয় বিষয়েই অজ্ঞ, তিনি 'সবজেক্ট-ক্যাটালগে'র সাহায্যে পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে পারেন। যাঁহারা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়াছেন তাঁহারা 'কার্ড-ক্যাটালগে'র সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত আছেন।

এইবার পুস্তক লেন-দেনের কথা। আমাদের দেশে এ-বিষয়ে 'লেজার' প্রথায় কাজ হইয়া থাকে। বই লেন-দেনের সময় 'ইস্যু-রেজিষ্টারে' বইয়ের নম্বর, নাম, গ্রাহকের নাম, বই লওয়ার তারিখ, বই ফেরৎ দেওয়ার তারিখ, গ্রাহকের স্বাক্ষর, লাইব্রেরীয়ানের স্বাক্ষর প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে এক-একখানা বই দিতে অনেক সময় লাগে। কোথাও কোথাও প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য আলাদা পৃষ্ঠা থাকে; সেই পৃষ্ঠা খুঁজিয়া বাহির করিতেও কিছু সময় লাগে। আবার কোন কোন স্থলে তারিখ অনুসারে সকল গ্রাহকের নাম পর-পর লিখিত হয়। ইহাতে বই ফেরত আসিলে গ্রাহকের নাম খুঁজিয়া বাহির করিতে কিছু সময় নষ্ট হয়। আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় কার্ডের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তক লেন-দেনের সুবিধা হইয়াছে। লাইব্রেরীর প্রত্যেক বইয়ের পিছনের মলাটের সঙ্গে একটি কাগজের পকেট আঁটা থাকে। ইহাকে 'বুক-পকেট' কহে। এই পকেটে একখানা কার্ড থাকে; তাহাকে 'বুক-কার্ড' বলা হয়। এই কার্ডে বইয়ের নাম ও নম্বর লিখিত থাকে। ইহা ছাড়া গ্রাহকের নম্বরের একটি ঘর এবং বই লওয়ার তারিখের একটি ঘর থাকে। ইহা ছাড়া বইয়ের পিছনে মলাটের সম্মুখস্থ সাদা পাতায় আর একখানা সাদা কাগজ আঁটা থাকে। তাহাকে 'ডেট্-স্লিপ' বলে। এই স্লিপের উপরিভাগে বইয়ের নম্বর এবং বই কতদিন রাখা চলিবে তাহা লিখিত থাকে এবং বই দিবার তারিখের অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর থাকে। প্রত্যেক গ্রাহককেও একখানা করিয়া কার্ড দেওয়া হয়। তাহাকে 'বরোয়ার্স কার্ড' বলে। এই কার্ডে গ্রাহকের নম্বর, নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকে; ইহা ব্যতীত বই বিলির এবং ফেরতের তারিখের একটি করিয়া ঘর থাকে। গ্রাহক নিজের ইচ্ছামত পুস্তক বাছাই করিয়া নিজের কার্ড

(Borrower's card) এবং বইখানা 'চার্জ্জিং ডেস্কে'র ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে দেন। (পুস্তক-বিলিকে লাইব্রেরী-বিজ্ঞানের ভাষায় 'চার্জ্জিং' বলা হয়)। সেই কর্ম্মচারী বইয়ের পকেট হইতে বুক-কার্ড বাহির করিয়া লইয়া তাহাতে 'বরোয়ার্স কার্ডে' লিখিত গ্রাহক-নম্বর লিখিয়া লন এবং 'ডেট্ ষ্ট্যাম্প' দ্বারা বুক-কার্ড, গ্রাহকের কার্ড ও 'ডেট্-স্লিপে' সেই দিনের তারিখ ছাপিয়া দেন। গ্রাহককে তাঁহার কার্ডসমেত বইখানা দেওয়া হয় এবং বুক-কার্ডখানা বই দিবার তারিখ অনুসারে সাজাইয়া রাখা হয়, বই ফেরত আসিলে গ্রাহকের কার্ডে ফেরৎ দিবার তারিখ ছাপিয়া দেওয়া হয় এবং বুক-কার্ড পুনরায় বইয়ের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। এই উপায়ে অল্প সময়ে ও সুশৃঙ্খল ভাবে পুস্তক লেন-দেন হইয়া থাকে। 'ডেট্-স্লিপ হইতে কোন্ পুস্তকের কিরূপ চাহিদা, কোন্ বই কত জন গ্রাহক পড়িল তাহা সহজেই হিসাব করিতে পারা যায়। আধুনিক লাইব্রেরী-ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি লইয়া যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(২১)

সেকেণ্ড ইয়ার আরম্ভ হইল বর্ষার অবিশ্রাম ধারাবর্ষণে। পুরী হইতে আসার পর সমুদ্রের অসীমতার আভাসে অরুণের অন্তর পূর্ণ ছিল, কলিকাতা বড় ছোট, ঘরবাড়ি বড় চাপা, পথগুলি বড় সঙ্কীর্ণ মনে হইত। যখন কালো মেঘের স্তূপে আকাশ অন্ধকার, দিনের আলো ম্লান, রাত্রির তমিস্রা সজল গভীর হইল, অরুণের নিকট পৃথিবী আরও ক্ষুদ্র হইয়া আসিল বটে, কিন্তু অন্তরে কোন্ অজানা শক্তির আলোড়ন।

ফার্ষ্ট ইয়ারের নবাগত ছাত্রগুলির দিকে চাহিয়া অরুণ ভাবিল সে কত বড় হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ, এই এক বৎসরে তাহার দেহমনের বিকাশ অতি দ্রুত হইয়াছে। নিত্য নব অনুভূতি, অভিনব অভিজ্ঞতা; রহস্যময় পৃথিবী, বিচিত্র মানবজীবন।

সহস্র সহস্র প্রবাল পুঞ্জীভূত হইয়া যেমন অতল সমুদ্রের উপর প্রবাল-দ্বীপের সৃষ্টি হয়, তেমনই দেহে মনে নব নব অনুভূতির সম্মিলনে মানস-সমুদ্রে সত্তার যে অপরূপ সৃজন চলিতেছে এই অত্যাশ্চর্য্যকর সৃষ্টিরহস্য অরুণ যখন অস্পষ্ট অনুভব করে, সে দিশাহারা হইয়া যায়, অপূর্ব্ব পুলক, অজানা বেদনা, অনাগত ভবিষ্যতে কোন্ অলক্ষ্য দুরাশা।

সমুদ্রস্তনিত পুরীর দিনগুলিতে ছিল আকাশভরা আলো, জলধির অনন্ত সুনীল বিস্তার, মল্লিকার কলহাস্য গল্প-গুঞ্জরণ।

শ্রাবণের মেঘকজ্জল দিবসগুলির ঝরঝর গানে সেই দিনগুলির স্মৃতি মিশিয়া গেল, গানের শেষে যেমন গানের সুর ঘরের নীরবতায় বাজিয়া মন উদাস করিয়া তোলে। সমুদ্রের স্মৃতি অরুণের অন্তরে অসীমতার বিহ্বলতা জাগায়। মল্লিকার কলকথা স্তব্ধ, কিন্তু অরুণের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে ভাল-বাসিবার, ভালবাসা পাইবার তৃষ্ণা। তাহার নয়নে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, নারীর গতিভঙ্গীতে কি সৌন্দর্য্য, নারীর কৃষ্ণনয়নের দৃষ্টিতে কি রহস্য, কণ্ঠের স্বরে কি মাধুর্য্য!

বর্ষা যখন তাহার মেঘময়ী কবরী গুটাইয়া শ্রাবণের শেষ-রাত্রে ভরানদীর ছলছল গীতে বিদায় লইল, শরতের বৃষ্টিধৌত নির্ম্মলাকাশে কোন্ জ্যোতির্ম্ময়ের রূপ প্রকাশিত হইয়া উঠিল। কলেজের দিনগুলি কাটিতে লাগিল স্বপ্নের মত।

ভোরবেলায় পাখীর ডাকে অরুণের ঘুম ভাঙিয়া যায়। তাহাদের বাগানে পাখীর সংখ্যা যেন বাড়িয়া গিয়াছে। কত বিচিত্র বর্ণের পাখী, উষায় কোথা হইতে আসে, আবার আলোর সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া চলিয়া যায়!

বাগান অন্ধকারময়। অরুণ শিশির-ভেজা ছাদে যায়।
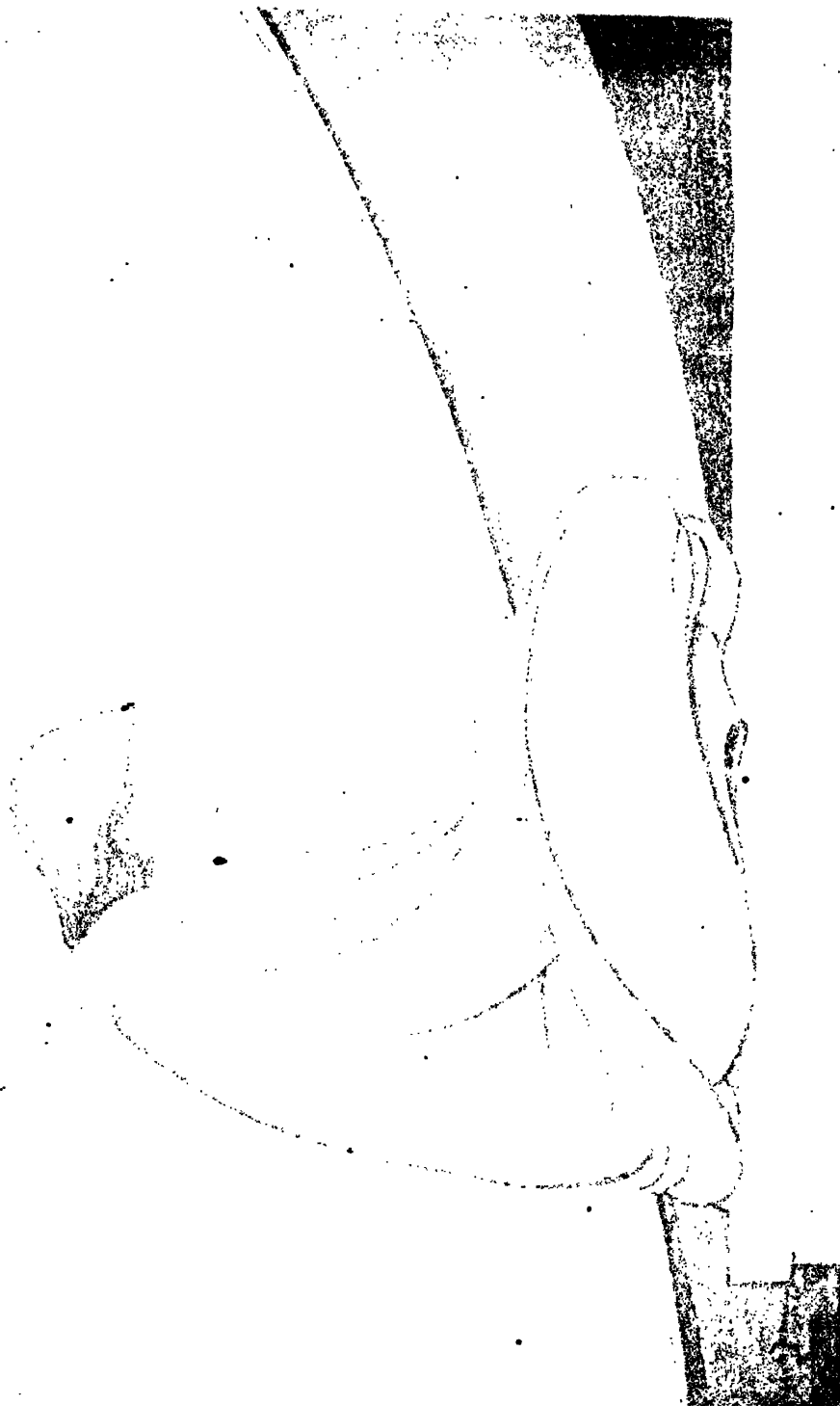
কোনদিন পূর্ব্বাকাশ বিদীর্ণ ডালিমের মত রক্তিম বর্ণ, কোন দিন বা হাল্কা ধূসর মেঘে ঢাকা। উষার অস্পষ্ট আলো বড় নির্ম্মল, বড় স্নিগ্ধ, চারি দিকে অপূর্ব্ব স্তব্ধতা, মাঝে মাঝে উড্ডীয়মান পক্ষিগণের কাকলি ও পক্ষসঞ্চালন-ধ্বনি।

অরুণ গুন্ গুন্ করিয়া গান গায়, সন্ন্যাসীমামার নিকট হইতে শেখা কোন ভজন, বাউলের গান, রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাতী সঙ্গীত। সন্ন্যাসীমামার কথা তাহার মনে পড়ে। ঘন বর্ষার মধ্যেই তিনি সুদূর কাশ্মীরে পাড়ি দিলেন। এক স্থানে বহুদিন তিনি থাকিতে পারেন না। তাঁহার মনে কোন যাযাবর বিহঙ্গ অশান্ত ডানা নাড়িয়া ছটফট্ করিয়া ওঠে। অরুণ ভাবে, হয়ত এই প্রভাতে সন্ন্যাসীমামা কাশ্মীরের কোন হ্রদের তীরে দেওদার-বনবেষ্টিত পর্ব্বতে বসিয়া পূর্ব্বদিকে চাহিয়া গান ধরিয়াছেন, সূর্য্যের প্রথম স্বর্ণরশ্মি তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ রাঙাইয়া তুলিয়াছে, সন্ন্যাসীমামার ধ্যানরত আনন দীপ্ত করিয়াছে, হ্রদের জল ঝিকিমিকি করিতেছে। অরুণের ইচ্ছা করে, সে-ও পরিব্রাজক হইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

প্রভাতের আলোক দীপ্ত হইয়া ওঠে। পরিব্রাজকের স্বপ্ন মিলাইয়া যায়। অরুণ প্রতিমার সন্ধানে যায়। প্রভাতে তাহার যে পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা আছে তাহার তদারক করে। ডাক্তার কডলিভার অয়েল খাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, ঔষধটির গন্ধ বা স্বাদ প্রতিমার মনোরঞ্জক নয়; অরুণ উপস্থিত না থাকিলে ঔষধ খাইতে প্রতিমা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভুলিয়া যাইবে।

সকালে অরুণ সিঁড়ির পাশে ছাদের ছোট ঘরে পড়িতে বসে। পড়িতে হয়, পরবলয় অতিপরবলয়ের বর্ণনা; বায়নোমিয়াল থিওরেম; এথেন্সের গৌরব-যুগ, পলোপনেসিয় সংগ্রাম, আলেকজান্দারের বিজয়যাত্রা; সিলজিস্‌ম্; টেনিসনের কবিতা।

কোন প্রভাতে পড়ায় মন বসে না। শরতের আকাশে মেঘগুলি বলাকাশ্রেণীর মত আনাগোনা করে। সমুজ্জ্বল আকাশে কি চঞ্চলতা, কি আকুলতা, বহিঃপ্রকৃতি হাতছানি দিয়া আহ্বান করে। অনন্ত আলোক-সমুদ্র হইতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ভাঙিয়া পড়ে পৃথিবীর বুকে, সবুজে হরিতে শ্যামলা ধরিত্রী সৌন্দর্য্যে উপছিয়া ওঠে।

ক্যামেরার সাহায্যে কোন বস্তুর কিরণকেন্দ্র (focus) স্থির করার পর বস্তুটি দূরে সরিয়া গেলে ফটোগ্রাফারকে যেমন আবার নূতন করিয়া কিরণকেন্দ্র নির্দ্ধারণ করিতে হয়, অরুণকে সেইরূপ প্রতিবৎসর বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ পাতাইতে হয়, তাহার তরুণ অন্তর যে সুদূরের পথিক।

কোনদিন সে লাইব্রেরীর কোন গ্রন্থ পড়িয়া সকাল কাটাইয়া দেয়—টুর্গেনিভের অন দি ইভ, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, মেটারলিঙ্কের ব্লু বার্ড, ভিক্টর হুগোর টয়লার্স অফ্ দি সি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের নানা রস-সাহিত্য।

সকালের পড়া বেশীক্ষণ হয় না। কলেজ এগারটায়; কোন দিন দশটায় অঙ্কের ক্লাস থাকে। তাড়াতাড়ি খাইয়া ছুটিতে হয়। খাবার সময় ঠাকুমা তদারক করিতে আসেন।

—অরুণ, আস্তে খা। ঠাকুর আর একটা মাছভাজা দিয়ে যাও।

—না, ঠাকুমা, আর দরকার হবে না।

—ব'স্ দই আনছে। আজ দইটা ভাল জমে নি।

আবার পায়েস আছে নাকি?

—হাঁ করলুম পায়েস। টুলির যা খাওয়া হয়েছে, তবু পায়েস খেতে ভালবাসে।

প্রতিমা আসিয়া বলে—দাদা, গাড়ী ক'রে যাও। হীরা সিং ত দিব্যি গেটে ব'সে বিড়ি টানছে। তোমার ত এগারটায় ক্লাস।

—না, না, গাড়ীর দরকার নেই।

অতবড় গাড়ী হাঁকাইয়া কলেজে যাইতে অরুণের কেমন লজ্জা করে। হয়ত দেখিবে, সে গাড়ী হইতে নামিতেছে আর হরিসাধন নগ্নপদে কলেজের গেটে ঢুকিতেছে।

(২২)

প্রথম ঘণ্টা অঙ্কের ক্লাস। অনেক সময় আই-এ ও আই-এস্‌সি ছাত্রদের একসঙ্গে ক্লাস হয়। এই সময় অজয়ের দেখা পাওয়া যায়। অজয়কে ডাকিয়া অরুণ পিছনের বেঞ্চে বসে। প্রফেসার বোর্ডে অঙ্ক লিখিয়া দেন। তাড়াতাড়ি অঙ্কটি কষিয়া অরুণ খাতাটি অজয়ের দিকে ধরে, অজয় টুকিয়া লয়। তার পর দুই জনে গল্প করে। অজয়ের সহিত গল্পের বিষয় বেশী খুঁজিয়া পায় না। অজয় যে-সকল সস্তা ইংরেজী ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে অরুণ সেগুলিকে সাহিত্য-পর্য্যায়-ভুক্ত মনে করে না। ফুটবল হকি খেলার গল্প হয়।

ইংরেজীর ক্লাসে অরুণের একদিকে বসে শিশির সেন. অপরদিকে দ্বিজেন মিত্র। দুই জনেই স্কলারশিপ পাওয়া ভাল ছেলে। শিশির সেন অনর্গল বইপড়ার গল্প করে। টেনিসন সম্বন্ধে ব্রাডলে কি লিখিয়াছেন, শেলীর কতগুলি জীবনী সে পড়িয়াছে, ম্যাথু আর্ণল্ডের কোন্ মতের সহিত সে একমত হইতে পারে না ইত্যাদি। শিশিরের আর লাজুকতা নাই, এখন তাহার প্রগ্‌লভতায় ক্লাসের সকলে অস্থির, নির্লজ্জভাবে সে আপন বিদ্যা জাহির করে। দ্বিজেন চুপচাপ থাকে, মাঝে মাঝে বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনি দেয়, পড়াশোনায় সে শিশির অপেক্ষা কিছু কম নয়। এই দুই জনের মধ্যে বসিয়া অরুণ হাঁপাইয়া ওঠে ; ইংরেজীর ক্লাসগুলি তাহার ভাল লাগে না।

একদিন অরুণ নিজের ক্লাসে না গিয়া, থার্ড ইয়ারের ছাত্রদের দলে মিশিয়া কবি মনোমোহন ঘোষের ইংরেজী ক্লাসে প্রবেশ করিল। ছাই-রঙের স্যুট-পরা, সুঠাম দীর্ঘ দেহ, শ্যামল শীর্ণ মুখ রাত্রির মত রহস্যময়, রেখাঙ্কিত প্রশস্ত ললাট, বিরল কুঞ্চিত কেশ, স্বপ্নছায়াঘন ক্লান্তিময় চোখ দুইটি অদ্ভুত, মনোমোহন ঘোষ যখন ক্লাসে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন, সকলে স্তব্ধ মন্ত্রমুগ্ধ, এ যেন কোন সৌন্দর্য্যস্বর্গচ্যুত অভিশপ্ত কবি মলিন পৃথিবীর বাস্তবতায় ব্যথিত, বিচ্ছিন্ন, একাকী, গম্ভীর মহিমায় বসিয়া আছেন। কবিতা পড়িতে পড়িতে তাহার শ্রান্ত বিষণ্ণ চোখ দুইটি জ্বলিয়া ওঠে, বুঝি হৃত-সৌন্দর্য্যালোকের কোন আনন্দ-ছবি ক্ষণিকের জন্য ভাসিয়া ওঠে। হৃদয়শতদলবাসিনী কবিতালক্ষ্মী সাধকের নয়নে মূর্ত্তি ধরিয়া ওঠে। অরুণের মানসনয়নে সেই জ্যোতির্ম্ময়ীর আনন্দরূপ একটু ঝলসিয়া যায়। কীট্‌সের কবিতা।

"Yes, I will be the priest, and build a fane
In some untrodden region of my mind,
Where branched thoughts, new grown
with pleasant pain
Instead of pines shall murmur in the wind."

অরুণ হইবে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর পুরোহিত. দুঃখময় পৃথিবীতে সে রচনা করিবে মানবাত্মার জয়গান।

মনোমোহন ঘোষের ক্লাস স্বপ্নের মত শেষ হইয়া যায়। তার পর লজিকের ক্লাস বা ইতিহাসের ক্লাস।

মধ্যে এক ঘণ্টা ছুটি থাকিলে অরুণ কমন্-রুমে গিয়া বসে। লাইব্রেরীতে সারাক্ষণ পড়িতে ভাল লাগে না। জয়ন্ত তাহাকে দেখিতে পাইলেই নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া যায়, তাহার নানা পারিবারিক দুঃসংবাদ বলে। জয়ন্তের পিতা হরিদ্বার হইতে পত্র দিয়াছেন, সেখানে তিনি কোন রোগে পীড়িত। পীতাম্বর কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন বটে. কিন্তু দিন দিন তিনি অত্যন্ত কঞ্জুস হইয়া যাইতেছেন, অবশ্য জয়ন্তের সকল খরচের টাকা তিনি চাহিলেই দেন, কিন্তু সানন্দচিত্তে দেন না। এদিকে দোকানের কিছুই ব্যবস্থা হইতেছে না, পীতাম্বর তাহাদিগকে যে-কোন দিন তাড়াইয়া দিতে পারেন। অরুণ নীরবে জয়ন্তের দীর্ঘ কাহিনী শোনে, সমবেদনা প্রকাশ করে। জয়ন্তের প্রতি তাহার সপ্রেম করুণা জাগে। পাশের বাড়ির মেয়েটির বিবাহ হইয়া যাওয়াতে জয়ন্ত মুষড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার মত তরুণ কবিপ্রকৃতির যুবক কোন-না-কোন মেয়েকে মনে মনে ভাল না-বাসিয়া থাকিতে পারে না।

কলেজে দুই ঘণ্টা ছুটি থাকিলে বা শীঘ্র কলেজ ছুটি হইয়া গেলে, সকলে দল বাঁধিয়া হিন্দু হোষ্টেলে শিশির সেনের ছোট ঘরে যায়। শিশির দোতলায় একটি ছোট ঘর পাইয়াছে। অন্ধকার ঘর, পূর্ব্বদিকে একটি জানালা, সেদিকে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং অতিকায় দৈত্যের মত অন্ধকার ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া, দুই দিকে কাঠের দেওয়াল ; পশ্চিম দিকের দরজা অন্ধকার করিডরের ওপর।

এই ঘরটি নেশার মত সকলকে টানে। এ নেশা গল্প করিবার, তর্ক করিবার, অবিশ্রাম ধূমপান ও চা পান করিবার নেশা ও হল্লা করিয়া উচ্ছ্বসিত হাস্য করিয়া প্রফেসারগণের সম্বন্ধে নানা মন্তব্য করিবার নেশা। সকলে জমাট হইয়া গল্প চীৎকার করিবার সুবিধা কলেজে নাই।

অরুণ বাণেশ্বরকে টানিয়া লইয়া যায়. জয়ন্ত দ্বিজেন সুহাসও আসে। শিশিরের ইচ্ছা কেবলমাত্র অরুণ তাহার ঘরে গিয়া তাহার বক্তৃতা শোনে, কিন্তু অন্য সকলে আসিলে আপত্তি করিতে পারে না, সকলে তাহার ঘরে আসিয়া গল্প করিতেছে ভাবিয়া গর্ব্বও অনুভব করে।

কোন বিষয়ে তর্ক সুরু হইলে আর থামিতে চায় না বাণেশ্বর তর্কনিপুণ, শ্লেষবাণসিদ্ধ শিশিরেরই শেষে হার হয়, রাগিয়া সে উল্টাপাল্টা কথা বলিতে আরম্ভ করে

বাণেশ্বর যে কিরূপে না-রাগিয়া তর্ক করিতে পারে ভাবিয়া সে অবাক হয়।

নানা বিষয়ে অকারণে তর্ক—মোহনবাগানের খেলা, শরৎচন্দ্রের নূতন উপন্যাস, প্রফেসারের পড়ান, কোন্ মোটরকারের কি দাম, থিয়েটারের অভিনয়, অভিনেত্রীদের রূপ, ক্রিকেটের রেকর্ড, রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতা, কোন্ সিগারেট উৎকৃষ্ট।

প্রতি-বিষয়ে বাণেশ্বরের মত স্থির, অতি স্পষ্ট, যেন সে সকল বিষয় ভাবিয়া শেষসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।

একদিন অরুণ বাণেশ্বরকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল আচ্ছা, বাণেশ্বর, তুই কি সত্যি বিশ্বাস করিস, ঈশ্বর নেই?

বাণেশ্বর অরুণের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বক্র হাসি হাসিল, এ যেন কোন্ পাদ্রীসাহেব মানবকে নরক হইতে ত্রাণ করিতে আগত।

অরুণ হাসিয়া বলিল এটা তোর pose, নয়?

বাণেশ্বর বলিল তার চেয়ে সহজ কথায় বল্ না, আমার চাল্। দেখ, চাল্ আমি দিই না। এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে। তুই প্রমাণ করতে পারিস, ঈশ্বর আছেন? তোমরা বল, ঈশ্বর মঙ্গলময় আনন্দময়, তাহ'লে এত দুঃখ কেন? তুমি বলবে দুঃখ না থাকলে ইত্যাদি। বাণেশ্বর উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

অরুণ বলিল রবীন্দ্রনাথের "ধর্ম্ম" বইখানা পড়েছিস?

-দেখ অরুণ, রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন বা উপনিষৎ কি বলেছেন আমি শুনতে চাই না। এই গুরু-ভজার দল দেশের সর্ব্বনাশ করল। তুই নিজে ভেবে কি সিদ্ধান্তে আসতে পারিস, তাই বল্। নিজের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি সবচেয়ে বড়।

-আমি বোঝাতে পারছি না, কিন্তু আমি অনুভব করতে পারি, এ অনুভব করবার, যেমন গানের সুরের আনন্দ শুধু অনুভব করা যায়। তুই যদি আমার সন্ন্যাসী-মামার গান শুনতিস!

--আবার কোন সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়লি নাকি?

—তিনি আমার মামা হন।

অরুণের পাংশুমুখ দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বাণেশ্বর বলিল, কিছু মনে করিস না। কিন্তু এই ভাবের কুহেলিকায় স্বপ্নের মায়াজালে সত্য ঢাকা পড়ে। পৃথিবীকে দেখতে হবে সত্যের আলোকে। সত্যকে জানতে পারলে শক্তি জাগবে। নীটসের একখানা বই তোকে পড়তে দেব।

আচ্ছা, আমিও তোকে একখানা বই পড়তে দেব, দেখি কে কাকে convert করতে পারে।

-ওই ত তোদের ধর্ম্ম, দলভারি করা চাই। সত্যের পথে একা যেতে হবে। কোন বই তার পথ দেখাতে পারে না।

অরুণ সেদিন অনুভব করিল, বাণেশ্বরকে সে ভালবাসে, বাণেশ্বরের জন্য তার মনে ব্যথা লাগে। পিতার সহিত বিবাদ, পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহার অশান্ত আত্মা নাস্তিক হইয়া গিয়াছে। নাকটি খাঁড়ার মত আরও উগ্র, দেহ আরও শীর্ণ, চোখ দুইটির দৃষ্টি আরও বক্র তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। স্নেহময় পরিবারের মধ্যে প্রেমপূর্ণ গৃহে বাস করিলে বাণেশ্বর বদলাইয়া যাইবে। অরুণ ভাবে, হয়ত যতীনের দিদির নিকট লইয়া যাইতে পারিলে কোন স্নেহময়ী কল্যাণী নারীর স্পর্শ জীবনে লাভ করিলে বাণেশ্বর শান্তি পাইবে।

•

কলেজের ছুটির পর অরুণ কিছুক্ষণ টেনিস খেলে। খেলা বেশীক্ষণ হয় না। সন্ধ্যায় অজয়দের বাড়ি যাইতে হয়।

উমা কলেজ হইতে আসে শ্রান্ত; কোনদিন তাহার মাথা ধরে। মাথা ধরা লইয়াই সে মাতাকে সাহায্য করিবার জন্য রান্নাঘরের কাজে লাগিয়া যায়। অরুণ তাহাকে রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বাহির করে।

উমা, তোমার বেড়ান দরকার, আজও মাথা ধরেছে নাকি?

ফ্রি এয়ার, কি বল অরুণ? কিন্তু আমরা ত ফ্রি উইমেন নয়।

-বল ত গাড়ীটা নিয়ে আসি, গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবে?

—থাক, শরীরের অত তোয়াজে দরকার নেই, আমাদের এই ছাদের হাওয়া খেলেই চলবে।

বাড়ির পিছন দিকের ছোট ছাদে দুই জনে ধীরে পায়চারি করিয়া বেড়ায়। পরস্পর কলেজের গল্প বলে, উপন্যাসের

কোন নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ হয়, নূতন গানের সুর লইয়া আলোচনা চলে, প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার কথা, অকারণে হাস্য, অপূর্ব্ব কৌতুক। মল্লিকদের বড় বাড়ির পিছনে সূর্য্য অস্ত যায়, ছাদের বালি-খসা হলদে দেওয়াল কাঞ্চন-বর্ণের হইয়া ওঠে, আকাশে অপরূপ মায়াময় আলো, গলির কদম্ববৃক্ষের পাতাগুলি বাতাসে কাঁপে, একে একে সন্ধ্যাতারা ফোটে, মিত্তিরদের বাড়িতে শাঁখ বাজিয়া ওঠে। দিনের নানা তুচ্ছ কর্ম্মে ক্লান্ত চিন্তাক্লিষ্ট মন এই সন্ধ্যার আলোয় কল্পলোক রচনা করিতে চায়। কোন্ স্বপ্নের উমা জাগিয়া ওঠে। এই একসঙ্গে বেড়ানটুকু অরুণের বড় ভাল লাগে, মনে গভীর শান্তি আনন্দ অনুভব করে, এ অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তগুলি যেন স্বর্ণসন্ধ্যায় কণ্ঠহার হইতে খসা অমূল্য মণিমাণিক্য।

পড়ার ঘরে আলো জ্বলিলেই বেড়ানো বন্ধ করিতে হয়। প্রতিদিন কলেজের পড়া তৈরি করা সম্বন্ধে উমা অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠাবতী। অরুণের কোন অনুরোধ বা পরিহাস সে গ্রাহ্য করে না। শীঘ্র বাড়ি ফিরিতে অরুণের ইচ্ছা হয় না, রান্নাঘরের দ্বারের সম্মুখে বেতের মোড়ায় বসিয়া সে মামীর সহিত গল্প করে, অথবা অকারণে প্রদোষান্ধকারময় পথে ঘুরিয়া বাড়ি ফেরে।

বেশী রাত করিয়া বাড়ি ফেরা চলে না। প্রতিমার সকাল-সকাল খাওয়া উচিত। অরুণ না বাড়ি ফিরিলে প্রতিমা খাইতে চায় না, বলে, দাদা আসুক, একসঙ্গে খাব। কোন ছুতায় অনিয়ম করিতে পারিলে ছোট খুকীর মত সে খুশী হইয়া ওঠে।

রাত্রে খাওয়ার পর অরুণ প্রতিমার ঘরে গিয়া তাহার সহিত গল্প করে। প্রতিমাকে শীঘ্র শুইতে বলিয়া দোতলার পড়ার ঘরে যায়। শিশির সেনের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সে নানা বই কিনিয়াছে। নিজের লাইব্রেরীটি মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখে। আরও কত বই কেনা দরকার। রাতে আর কলেজপাঠ্য পুস্তক পাঠ হয় না, কোন চিন্তাশীল প্রবন্ধ বা সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাস পড়িতে বসে। বেতের ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়ান ভাবে অরুণ পড়ে রাস্কিনের সিসেম এণ্ড লিলিজ, কার্লাইলের ফ্রেঞ্চ রিভলুাশ্যন বা উইলিয়াম মরিসের নিউজ ফ্রম নো হোয়ার। পড়িতে পড়িতে তাহার মন কোন্ স্বপ্নলোকে চলিয়া যায়, মানব-সভ্যতার এক সুমহান্ আনন্দময় ভবিষ্যতের চিত্র মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠে। অরুণ ভাবে এক মহাবিপ্লব, তার পর পৃথিবীর শান্তিময় আনন্দময় যুগের আরম্ভ হইবে, ধনী-নির্ধন প্রভেদ থাকিবে না, প্রতি মানব স্বাধীন, প্রেমিক, আনন্দপূর্ণ।

পড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া সে দক্ষিণমুখী প্রশস্ত বারান্দার অন্ধকারে চুপ করিয়া বসে। মোটা আইয়োনিক থামগুলি পাষাণীভূত দৈত্যের মত স্তব্ধ দাঁড়াইয়া; ঝিলিমিলির মাথায় কোন পাখী বাসা বাঁধিয়াছে, সহসা জাগিয়া চমকিয়া ওঠে; তারাভরা নির্ম্মল আকাশে সাদা হাল্কা মেঘ ঘুরিয়া বেড়ায়; মৃদু বাতাস বয়, অন্ধকার বাগান মর্ম্মরিত হইয়া উঠে, সরু গলিতে বরফওয়ালা হাঁকিয়া যায়—চাই কুলপি বরফ; শরৎ-রাত্রি থম থম করে।

এই সময় অরুণের চিন্তা করিবার, স্বপ্নের জাল বুনিবার সময়, কত আজগুবি কল্পনা, অসম্ভব আশা, অপরূপ ভাবনা।

অরুণ ভাবে, বড় হইয়া সে কি করিবে। কত অদ্ভুত প্ল্যান মাথায় আসে, কিছুই সে স্থির করিতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে তাহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ নদীয়ার গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এক ধনী আত্মীয়ের বাড়ি থাকিয়া বহুকষ্টে সামান্য লেখাপড়া শেখেন, তার পর এক ইংরেজ বণিকের আপিসে সামান্য কাজ পান, অসামান্য বিষয়বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতার গুণে ধীরে ধীরে তিনি বড় ইংরেজ কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দী হন, লক্ষপতি হইয়া উঠেন, এই পুরাতন বাড়ির প্রথমাংশ তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত। অরুণও কি সেই লক্ষপতি মহাভারত ঘোষের মত বড় ব্যবসাদার হইবে, এখন ত দেশে বুদ্ধিমান কর্ম্মপটু বণিকের প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়া অরুণ হয়ত আবার ঘোষ-বংশের নব গৌরবময় যুগ আনিবে। কিন্তু আপন বংশকে বড় করিয়া তুলিবার কথা, লক্ষপতি হইবার কথা সে ভাবিতে চায় না, সে ভাবে মানবজাতির কল্যাণময় যুগের ও শান্তির কিরূপে প্রতিষ্ঠা হইবে। মানব-সভ্যতার মঙ্গলময় নবযুগ যাহারা আনয়ন করিবে, সে তাহাদের দলে থাকিতে চায়।

হয়ত সে বড় কবি হইবে। কবিতা সে লেখে না, কিন্তু

যে-কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছে তাহা প্রশংসিত হইয়াছে। দু-একটি বিখ্যাত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক তাহার কবিতা ছাপাইতেও ইচ্ছুক। সে যাহা অনুভব করে তাহা ঠিকরূপে ব্যক্ত করিতে পারে না। পৃথিবীর বহু প্রসিদ্ধ কবি তাহার বয়সে কিরূপ কবিতা লিখিয়াছেন, নিজের কবিতার সহিত সেগুলি মিলাইয়া দেখে। কোন শরৎ-প্রভাতে কোন বসন্ত-মধ্যাহ্নে, মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, পৃথিবীর কোন নবযুগ যেন তাহার নিকট বাণী চাহিতেছে, মানবসন্তান রক্তকলুষিতা যুদ্ধাগ্নিদগ্ধা বিষাদিনী সভ্যতা-লক্ষ্মী যেন তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন—কবি তুমি দাও সত্যবাণী, তুমি গাও প্রেমের গান, কামানের গর্জ্জনের উপর উঠুক তোমার ঐক্যের মৈত্রীর স্বপ্নকথা। অরুণ ভাবে সে হইবে জনগণের স্বাধীনতার মিলনের কবি।

কোথায় সে স্বাধীনতা? চারি দিকে কেবল জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা, শক্তির লালসা, সংঘাত, রক্তপাত।

ভাবিতে ভাবিতে অরুণ শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

কোন রাতে নারিকেল বৃক্ষগুলির প্রান্তে চাঁদ ওঠে। আম নিম কদম্ব নানা বৃক্ষময় বাগানে জ্যোৎস্না মায়াজাল বোনে। অর্দ্ধভগ্ন শেওলা-ধরা মর্ম্মর-মূর্ত্তিতে হট হাউসের ফাটা কাচগুলির উপর চন্দ্রালোক ঝিকমিক করে, পুষ্প-সুরভিত আলোছায়াঘন প্রাচীন উদ্যান রূপকথার মায়াপুরীর মত।

অরুণ তাহার বেহালা লইয়া বসে। অতি হাল্কাভাবে ছড়ির টান দেয়, কর্কশ শব্দ হইলে এই অপূর্ব্ব শরৎ-নিশীথিনীর অতি সূক্ষ্ম মায়াজাল বুঝি ছিন্ন হইয়া যাইবে। শিবপ্রসাদের একটি পুরাতন গ্রামোফন ও ইউরোপীয় ক্লাসিক সঙ্গীতের বহু রের্কড আছে; সেইগুলি বাজাইয়া অরুণ কতকগুলি সুর ও গান শিখিয়াছে, ক্রাইসলারের লিবেস্ লাইড, ভাগনারের মাইষ্টারসিঙ্গারে প্রাইজ গান, বিটোফেনের সোনাটা। আচ্ছা, বিটোফেনের পঞ্চম সিম্ফনির প্রথমে, কে দ্বারে করাঘাত করিতেছে, সে প্রেম না মৃত্যু?

কণ্ঠসঙ্গীত অপেক্ষা যন্ত্রসঙ্গীতে অরুণ গভীর আনন্দ পায়, কোন কথাতীত অতল সুরের সাগরে সত্তা ডুবিয়া যায়।

কোন রাত্রি তপ্ত, বায়ুহীন। গাছের পাতা নড়ে না। আকাশের তারাগুলি দপ্ দপ্ করে, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপশিখার মত। চারিদিক স্তব্ধ; মৃত্যুর মত। সম্মুখের আকাশ তারায় ভরা, পিছনের আকাশ কালো মেঘে ছাওয়া।

সহসা নিস্তব্ধ রাত্রি যেন শিহরিয়া ওঠে, বৃষ্টি আরম্ভ হয়; কিন্তু বাতাস একটু নাই। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা নিষ্কম্প বৃক্ষপত্রগুলিতে ঝরিয়া পড়ে, শুষ্ক তৃণে বৃক্ষপত্রাচ্ছন্ন পথে পড়িয়া ঝমঝম শব্দ হয়, কে যেন মল বাজাইয়া আসিতেছে। বৃষ্টির বেগ ধীরে কমিয়া আসে, ঝর ঝর শব্দ ক্ষীণ হয়; আবার বৃষ্টি প্রবল বেগে আসে, চারি দিকে ঝম্ ঝম্ আকুল ধ্বনি, মনে হয় কে যেন মল বাজাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, আবার চঞ্চল পদে ফিরিয়া আসিল, তাহার নূপুরধ্বনি, কঙ্কণের ঝঙ্কার আকাশে বাতাসে বাজিতেছে। অরুণের মনে পড়ে, মল্লিকার কলহাস্য প্রাণের আনন্দোচ্ছ্বাস, সাগরের সঙ্গীত।

বৃষ্টি থামিয়া যায়, আবার চারি দিক স্তব্ধ। কিন্তু এ স্তব্ধতা বৃষ্টি-পূর্ব্বের স্তব্ধতার মত শূন্য তৃষ্ণাপূর্ণ বেদনাময় নয়। এ সজল গভীর নীরবতা কোন অশ্রুত সঙ্গীতময়। বিশ্বের মর্ম্মস্থলে যে সঙ্গীত-সমুদ্র নিত্যকাল আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে, নীহারিকার শুভ্র ধারা হইতে লক্ষ লক্ষ গ্রহতারকায় যে সঙ্গীত-বন্যা প্রবাহিত, যে সঙ্গীতের ছন্দে সুরে বৃক্ষে তৃণে লক্ষ লক্ষ জীবে প্রাণ বিকশিত চঞ্চল, সেই বিশ্বব্যাপী সঙ্গীতের একটু রেশ বুঝি অরুণ শুনিতে পাইল শরৎ-রাত্রির ক্ষণেক বৃষ্টিধারার ঝম্ ঝম্ শব্দে।

সঙ্গীতলক্ষ্মী, তুমি জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হও। তোমার আনন্দলোকে সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব সকল বিভেদ সংঘাত সমস্যা দূর হইয়া যায়। তোমার অমৃতময় সুর-সমুদ্রতীরে আমাকে আহ্বান কর। বেদনাপীড়িত মানবাত্মার উপর নামিয়া আসুক তোমার সুরসুধা গ্রীষ্মতাপিত শুষ্ক ধরণীর উপর বর্ষার ধারার মত। নয়নে দাও সুরের মায়াকজ্জল, সৃষ্টি নব দিব্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

ক্রমশঃ

মংপুর সিঙ্কোনাক্ষেত্র ও কুইনাইন কারখানা

ম্যালেরিয়ার কৃপায় কুইনাইনের নাম অনেকেই জানে, কিন্তু কোথা হইতে ইহা কেমন করিয়া আসে তাহা অল্প লোকেই জানে বা জানিতে চায়। অথচ কুইনাইন প্রস্তুত করা ভারতবর্ষের একটি বড় পণ্যশিল্প, এবং ভবিষ্যতে ইহা আরও বড় হইতে পারে। কারণ, এদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহার তুলনায় সামান্য কুইনাইনই ব্যবহৃত

শ্রীযুক্ত ডক্টর মনমোহন সেন, ডি-এস্‌সি

হয়, এবং যত কুইনাইন ব্যবহৃত হয় তাহার সামান্য অংশই এখানে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ পৌণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হয় এবং তাহার দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক বাহির হইতে আসে। এই আমদানী কুইনাইনের দাম প্রায় পচিশ লক্ষ টাকা। দুই লক্ষ পৌণ্ড কুইনাইন ভারতবর্ষের সব ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত লোকের চিকিৎসার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নহে। কারণ, এই দেশ বোধ হয় পৃথিবীতে সকলের চেয়ে অধিক ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত। সমুদয় পৃথিবীতে বৎসরে ম্যালেরিয়ায় ৩৫ লক্ষ লোক মরে—শুধু ভারতবর্ষেই মরে ১০ লক্ষ, এবং আক্রান্ত হয় দশ কোটি। এক এক জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকের সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য যত কুইনাইন আবশ্যক, তাহা হিসাব করিলে বৎসরে ১৫ লক্ষ পৌণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হওয়া দরকার। এ বিষয়ে নানা বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ প্যাট্রিক হেহিরের মতে ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য অন্যূন ৯৭০০০০ পৌণ্ড কুইনাইন আবশ্যক। ডাক্তার বেণ্টলী শুধু বাংলা দেশের জন্যই এক লক্ষ পৌণ্ড আবশ্যক বলিয়াছিলেন। এই সকল সংখ্যা বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, ভারতবর্ষে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার চেষ্টা আরও কত বিস্তার লাভ করিতে পারে। বিস্তার লাভ করিবার সম্ভাবনা আরও বেশী এই জন্য যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষেই সেই সিঙ্কোনা গাছের চাষ সফল হইয়াছে যাহার ছাল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়।

মংপুর বাজার

এই গাছটি ভারতবর্ষের স্বভাবজ উদ্ভিদ নহে। ইহা প্রথমতঃ দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, বোলিভিয়া, একুয়াডর প্রভৃতি কয়েকটি দেশের জঙ্গলে জন্মিত। তথাকার আদিম অধিবাসীরা ইহার ছালের গুণ জানিত। কারণ, পেরুর ভাষায় ইহাকে কুইনাকুইনা বলা হইত। কুইনার অর্থ ত্বক্ এবং কুইনাকুইনার অর্থ ঔষধের গুণবিশিষ্ট ত্বক্। ঐ দেশগুলি স্পেন কর্ত্তৃক বিজিত হইবার কিছু কাল পরে স্পেনীয় পুরোহিতেরা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ইহার গুণ অবগত হন। ১৬৩৯ সালে তথাকার স্পেনীয় রাজপ্রতিনিধির স্ত্রী সিঙ্কনের কৌণ্টেস্ ইহার ত্বক্‌চূর্ণ সেবন করিয়া জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহার নাম অনুসারে গাছটি সিঙ্কোনা নামে পরিচিত হয়। তখন ত্বক্ হইতে কুইনাইন্ নিষ্কাশিত ও পৃথক করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। তিনি ত্বক্‌চূর্ণেরই ব্যবহার স্বদেশ স্পেনে প্রচলিত করেন। স্পেনীয় জেসুইট পুরোহিতেরা বহু দেশে ইহার গুণ পরিজ্ঞাত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে চীনদেশে পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইহার এইরূপ ব্যাপক ব্যবহারে দক্ষিণ-আমেরিকায় স্বভাবজ এই গাছগুলি

মংপু হইতে দৃষ্ট দূরে তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশিখরের আভাস

মংপুর নিকটে তিস্তা

একেবারে নিঃশেষ হইবার উপক্রম হয়; কারণ, তথাকার স্পেনীয় শাসনকর্ত্তারা ইহার সংরক্ষণ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। অন্যত্র ইহার উৎপাদনের চেষ্টা হইতে থাকে।
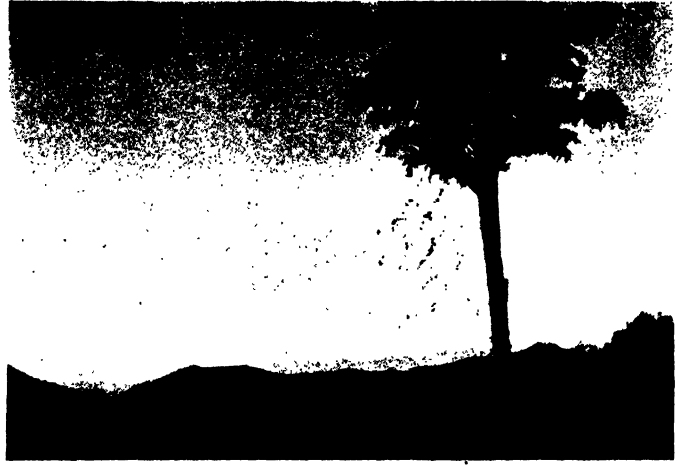
ফ্রেঞ্চ, ডচ ও ইংরেজদের অধিকৃত অনেক দেশে খুব ম্যালেরিয়া ছিল। তাহারা নিজ নিজ সাম্রাজ্যে সিঙ্কোনা গাছটি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র, সব রকম মাটিতে, সব রকম জলবায়ুতে জন্মে না; যেখানে জন্মে, সেখানেও ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বহু যত্ন করিতে হয়। ফ্রেঞ্চদের চেষ্টা সফল হয় নাই। ডচদের অধিকৃত যবদ্বীপে ইহা এরূপ সফল হইয়াছে, যে, পৃথিবীতে ব্যবহৃত সমুদয় কুইনাইনের শতকরা ৯০ অংশ যবদ্বীপ হইতে চালান হয়। ইংরেজরা ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয়, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, জামেকা, ত্রিনিদাদ ও অন্য কোন কোন দেশে ইহা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করে। একমাত্র ভারতবর্ষেই এই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যত্র চূড়ান্ত চেষ্টা হইয়াছিল বলা যায় না। কারণ কোথাও কোথাও যেমন সিংহলে, ইহা হয়ত জন্মিতে পারিত, কিন্তু চা ও রবারে লাভ বেশী হয় বলিয়া ইহার চাষ পরিত্যক্ত হয়। তা ছাড়া, প্রথম দু-বৎসর ইহা হইতে কিছু লাভ পাওয়া যায় না, কেবল মূলধন আবদ্ধ থাকে; এবং যত জায়গায় চাষ করা হইবে তাহার দ্বিগুণ জায়গা ইহার জন্য রাখিতে হয়, কারণ একই জমীতে ইহা বহু বৎসর পুনঃপুনঃ চাষ করিলে ভাল বাড়ে না, এই জন্য অন্য ফসলের সহিত

মংপুতে কুইনাইন ফ্যাক্টরীর দৃশ্য

ইহার চাষ সফল হয়। ১৮৭৫ সালে প্রায় ৩০ লক্ষ চারা উৎপন্ন হয়। এই সফলতার প্রশংসা রয়্যাল বটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ ডাঃ এণ্ডার্সন এবং তাঁহার পর ঐ কাজে অধিষ্ঠিত মিঃ জর্জ কিংএর প্রাপ্য। ডাঃ এণ্ডার্সন নূতন তাজা বীজ সংগ্রহের জন্য যবদ্বীপে স্বয়ং গিয়াছিলেন। ১৮৯৮ সাল নাগাদ সিঙ্কোনা-ক্ষেত্রটি বর্ত্তমান কেন্দ্র মংপু পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ১৯০০ সালে সিকিমের সীমান্তে, কালিম্পং হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে মন্সং নামক স্থানে আর একটি সিঙ্কোনা-ক্ষেত্র স্থাপিত হয়। ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে, এবং ত্বকের পরিমাণও বাড়িতে থাকে। যাট বৎসর আগে উহা ৪০,০০০ পৌণ্ড ছিল, এখন উহা ১২ হইতে ১৪ লক্ষ পৌণ্ড। দুটি সিঙ্কোনা-ক্ষেত্রের মধ্যে মন্সংটিই বড়। ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ এক জন ও সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ দু-জন; মংপুর ক্ষেত্রটির কার্য্যাধ্যক্ষ এক জন এবং সহকারীও এক জন। ইহাঁরা ছাড়া অবশ্য অনেক ওভার্সীয়ার ও সব্-ওভার্সীয়ার আছেন।

সিঙ্কোনা গাছ নানা জা'তের। এক জা'তের গাছ ৫০ ফুট বা তার চেয়েও বেশী উঁচু হয়, এবং ইহার ছাল লাল। কিন্তু ইহার ছালে কুইনাইন কম থাকে বলিয়া এখন ইহার পরিবর্ত্তে ছালে অধিকতর কুইনাইন বিশিষ্ট অন্য জা'তের গাছ লাগান হয়। আগে কলম করিয়া নূতন নূতন গাছ বসান হইত, এখন বীজ হইতেই নূতন চারা উৎপন্ন করা হয়। বীজগুলি অত্যন্ত ছোট ও অত্যন্ত হাল্কা—দেখিতে তুষের বা খোসার মত। ৭০,০০০ বীজের ওজন এক ঔন্স। বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্‌গম হয় ছয় সপ্তাহে।

অনেক চারা প্রথম বৎসরেই শুকাইয়া যায়, ও তাহার জায়গায় নূতন চারা বসাইতে হয়। তিন বৎসর পরে যখন গাছগুলি চার-পাঁচ ফুট উঁচু হয়, তখন আলোক ও বাতাসের অবাধ প্রবেশের নিমিত্ত অনেক শাখা কাটিয়া ফেলা হয়। এই

ইহার চাষ পর্য্যায়ক্রমে করিতে হয়। সত্তর বৎসরের অধ্যবসায়ের ফলে ভারতবর্ষে সিঙ্কোনার চাষ ও কুইনাইন প্রস্তুতির ব্যবসা সফল হইয়াছে।

প্রধানতঃ লেডী ক্যানিঙের চেষ্টাতেই ভারতবর্ষে ইহার চাষ আরব্ধ হয়। ইহা কৌতুকজনক যে তাঁহার নামের সঙ্গে একটি অতি মিষ্ট ও একটি অতি তিক্ত দ্রব্যের নাম জড়িত। কিন্তু অবস্থাভেদে উভয়ই উপাদেয়! ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসচিব মিঃ ক্লেমেণ্ট্‌স্ মার্কহ্যামকে বীজ সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ-আমেরিকায় পাঠান। দক্ষিণ-আমেরিকানদের ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহার কাজটি বেশ সোজা হয় নাই, কিন্তু তিনি কোন প্রকারে কিছু বীজ সংগ্রহ করেন। তাহা লইয়া ১৮৬১ সালে মান্দ্রাজের নীলগিরি পর্ব্বতে ও ১৮৬৪ সালে বঙ্গের দার্জিলিং জেলায় চাষ আরম্ভ হয়। প্রায় ঐ রকম সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ হইতে পেরুতে নানাবিধ প্রাণী সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত মিঃ চার্লস লেজার নামক এক জন ইংরেজ একটি ভাল জা'তের সিঙ্কোনার কিছু বীজ জোগাড় করেন। তিনি অর্দ্ধেক বিক্রী করেন যবদ্বীপের ডচ্‌দিগকে এবং অর্দ্ধেক ভারতের ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টকে। এই বীজগুলিও নীলগিরির ও দার্জিলিং জেলার সিঙ্কোনাক্ষেত্রে প্রেরিত হয়।

বঙ্গে কতকগুলি স্থানে ব্যর্থ চেষ্টার পর সিঞ্চল পাহাড়ের পার্শ্বদেশে দার্জিলিঙের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি স্থানে

কাটা ডালগুলি হইতে ছালের ফসল পাওয়া যায়। কখন কখন গাছগুলি খুব কাছাকাছি জন্মিলে কতকগুলি গাছকে একেবারে উপড়াইয়া ফেলা হয়। এগুলি হইতেও ছাল পাওয়া যায়, এবং এই প্রকারে প্রতি বৎসরই কিছু ছাল সংগৃহীত হয়।

গাছগুলি—বিশেষতঃ অনেকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট থাকিলে—দেখিতে বড় সুন্দর। পাতাগুলি হরিৎ ও রক্তবর্ণ। বসন্তকালে সিঙ্কোনার ফুল হয়। সেগুলি সাদা বা গোলাপী-বেগুনী রঙের, এবং অতিশয় সুগন্ধ। কুইনাইন কেবল ছালেই থাকে, কাঠ, পাতা বা ফুলে থাকে না। গাছগুলি চারি বৎসরের হইলে তখন ছাল হইতে খুব বেশী কুইনাইন পাওয়া যায়, এবং তাহার চার-পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে।

ত্বক্ সংগ্রহের নানা প্রণালী আছে। একটি প্রণালী অনুসারে একস্থান হইতে বৃত্তাকারে ছাল তুলিয়া লওয়া হয়। তাহার পর কিছু জায়গা বাদ দিয়া আবার বৃত্তাকারে ছাল তোলা হয়। কিম্বা উপর হইতে নীচের দিকে লম্বা ছালের ফালি কাটিয়া লওয়া হয়। বৃক্ষের যে-যে জায়গা হইতে ত্বক্ কাটিয়া লওয়া হয়, তাহা শৈবালে ঢাকিয়া দেওয়া হয়, এবং সেই সব স্থানে পুরাতন ছালেরই মত উৎকৃষ্ট ও গুণবিশিষ্ট নূতন ছাল গজায়। আর এক প্রণালীতে গাছগুলিকে গোড়া ঘেঁষিয়া কাটিয়া ফেলা হয়, এবং কাটা জায়গার কাছাকাছি অনেক ডাল বাহির হয়। তাহার দু-একটি রাখিয়া অন্য সব ডাল কাটিয়া ফেলা হয়। কর্ত্তিত কাণ্ডগুলি হইতে ত্বক্ সংগৃহীত হয়। গাছগুলিকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া তাহা হইতে ত্বক্ সংগ্রহ আর একটি পদ্ধতি। মূল, কাণ্ড ও শাখাগুলিকে ছোট ছোট টুকরায় কাটিয়া, সেগুলিকে ছোট ছোট কাঠের মুগুর দিয়া আঘাত করা হয়। এই কাজ ছোট ছেলেরা করে। মুগুরের আঘাতের ফলে ছাল সহজেই ছাড়িয়া আসে। তার পর ছালগুলিকে রোদে বাতাসে শুকাইতে দেওয়া হয়। বর্ষায় শুকান হয় চালার নীচে তাকের উপর থাকে-থাকে রাখিয়া।

মংপুতে প্রভাত

তাহাতে ছালগুলির উপর বৃষ্টি পড়ে না, কিন্তু চারি দিক হইতে বাতাস লাগে।

পূর্ব্বকালে ত্বকচূর্ণই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। ত্বক্ হইতে কুইনাইনের আবিষ্কার ১৮২০ সালে দু-জন ফ্রেঞ্চ রাসায়নিক করেন। মংপুতে সিঙ্কোনা-ত্বক্ হইতে কুইনাইন নিষ্কাশন ও প্রস্তুতির নিমিত্ত কারখানা স্থাপিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। মিঃ উড নামক এক জন ইংরেজ রাসায়নিককে কুইনাইন প্রস্তুতির একটি পদ্ধতি বাহির করিবার নিমিত্ত পাঁচ বৎসরের জন্য মংপুতে আনা হয়। তিনি তাহা করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অন্য একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন যদ্দ্বারা সিঙ্কোনা-ত্বকের সব আল্কালয়েডগুলি নিষ্কাশিত করা যায়। তাহা জরঘ্ন সিঙ্কোনা (Cinchona Febrifuge) নামে বিক্রীত হইত। তার পর তিনি আরও একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন, তাহা এখনও অনুসৃত হয়। এখন জরঘ্ন সিঙ্কোনা (সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ) নামক যে পীতাভ চূর্ণ বিক্রীত ও ব্যবহৃত হয়, তাহা কুইনাইনের চেয়ে সস্তা কিন্তু সমান-ফলপ্রদ। তবে তাহাতে বমনেচ্ছা ও মাথাঘোরার উপক্রম কুইনাইনের চেয়ে বেশী হয়।

কুইনাইন-প্রস্তুতির কারখানা ভারতবর্ষে দুটি আছে। বড়টি মংপুতে অবস্থিত। ইহা দু-জন বাঙালী অফিসারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে।

এখানে শতাধিক শ্রমিক কাজ করে। তাহাদের মধ্যে

মংপুতে সিঙ্কোনা-ক্ষেত্রের এক অংশ

দু-তিন জন ছাড়া আর সবাই নেপালী। গত যাট বৎসরে কারখানাটি ক্রমশঃ খুব বড় হইয়াছে। ১৮৭৫ সালে ৫০ পৌণ্ড সিঙ্কোনা জরম্ন প্রস্তুত হয়, ১৮৮৩তে হয় ১০০০০ পৌণ্ড। ১৮৮৮ সালে কুইনাইন প্রস্তুতি আরম্ভ এবং ৩০০ পৌণ্ড প্রস্তুত হয়। এখন কুইনাইন হয় বৎসরে ৫০০০০ পৌণ্ড এবং জরম্ন সিঙ্কোনা ২৫০০০ পৌণ্ড।

কুইনাইনের গুণ যাহাই হউক, উহা অত্যন্ত তিক্ত, এবং যখন মিষ্ট জিনিষকেও বেশী চটকাইলে তাহা তিক্ত হইয়া উঠে, তখন এই প্রবন্ধ আর বেশী লম্বা না করাই ভাল। কিন্তু কেহ যেন মনে না-করেন, যে, কুইনাইনের কারখানা

মংপুতে সিঙ্কোনা-ত্বক্ শুকাইবার কতকগুলি চালা

যেখানে অবস্থিত সেই মংপু গ্রামটি ভারি তিক্ত। এবং কেহ যদি মনে করেন, যে, সেখানকার প্রত্যেকটি মনুষ্যও তদ্রূপ, তাহা হইলে আরও বেশী ভুল করা হইবে।

বাস্তবিক কিন্তু মংপু একটি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার নৈসর্গিক শোভা অতি মনোহর। ইহার মনোজ্ঞতা এত অধিক, যে, প্রকৃতি-দেবী যেন ইহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন, এইরূপ মনে হইতে পারে। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০০ ফুট উচ্চ একটি পর্ব্বতের উপর অধিষ্ঠিত। দুটি নদী ইহার দুই দিক্ ধৌত করিয়া প্রবাহিত। কিছু দূরে তাহারা মিলিত হইয়া বিশাল তিস্তার বক্ষে গিয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, বৃহদায়তন জলরাশির মত বিস্তৃত সমতল ভূমি দিগ্‌বলয় পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিমে স্তরে স্তরে পর্ব্বতমালা সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে মেঘশিশুগুলি লুকোচুরি খেলিতেছে—মনে হয় যেন পর্ব্বতশিখরসমূহও মধ্যে মধ্যে সেই ক্রীড়ায় যোগ দিতেছে। আরও ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় বিশেষতঃ মেঘমুক্ত দিবসে তুষারাবৃত পর্ব্বতচূড়া একটির উপর একটি, তদুপরি আরও একটি···মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, প্রাতে সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল সুবর্ণের মত দীপ্যমান, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রজতাভ। পর্ব্বতগাত্র অনুর্ব্বর পাষাণসমষ্টি নহে, পরন্তু নানা উদ্ভিদের সমবায়ে নয়নানন্দদায়ক হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত। রক্তাভ পত্রশোভিত বিস্তৃত সিঙ্কোনা-ক্ষেত্রের পরেই নানাবিধ অন্যান্য বৃক্ষের অরণ্যানী, তাহার পর আবার সিঙ্কোনা-ক্ষেত্র, তাহার পর আবার বনানীর কত বনস্পতি, কত ক্ষুদ্রায়তন বৃক্ষরাজি, কত লতা, কত ফুল দর্শকের চক্ষুকে তৃপ্ত করে।

স্থানটি শান্তিপূর্ণ ও নিস্তব্ধ। এখানে বড় একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও কারখানাপ্রধান শহরের মত কোলাহল ও পাপ-অশুচিতা এখানে নাই। শ্রমিকরা এখানে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া কতকগুলা লম্বা চালায় থাকিতে বাধ্য হয় না। তাহারা পরিবারী হইয়া বাস করে। প্রত্যেক পরিবারের আলাদা কুটীর এবং আহার্য্য উৎপাদন ও পশুপালনের জন্য তৎসংলগ্ন ভূখণ্ড আছে। ইহারা প্রধানতঃ নেপালী। ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী খুব সাদাসিধে। একবার প্রাতে ও একবার মধ্যাহ্নে কয়েক মুঠা ভাজা ভুট্টা এবং একটা বড় বাটি চা ইহাদের প্রধান ভোজ্যপানীয়। অধুনা তাহারা—বিশেষতঃ নারীরা—পরিচ্ছদ ও বেশভূষায় একটু বেশী মন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সততা তাহাদের প্রধান গুণ। তাহারা প্রধানতঃ হিন্দু, অল্পসংখ্যক বৌদ্ধও আছে। কালীপূজা তাহাদের প্রধান পর্ব্ব।

[মংপুর কুইনাইন কারখানার শ্রীযুক্ত ডক্টর মনমোহন সেন কর্ত্তৃক লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। মূল ইংরেজী প্রবন্ধটি মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত হইবে।]
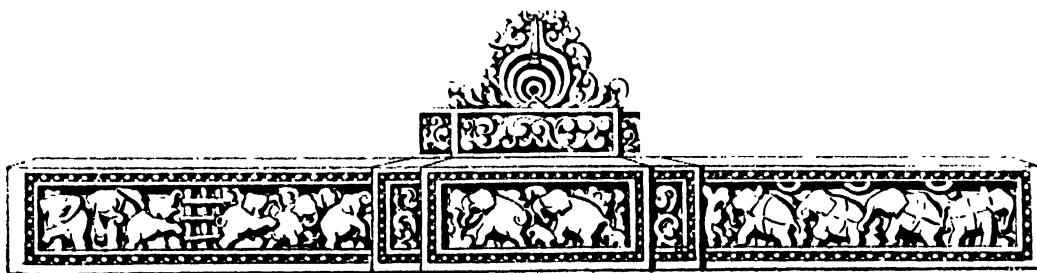
বন্যাসঙ্গিনী

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

ষ্টেশন থেকে কিছুদূরে ট্রেন দাঁড়াল। এদিকটায় এখনও বন্যার জল এসে পৌঁছয় নি। ষ্টেশনে জায়গা কম, নিরাশ্রয় বুভুক্ষু জনতা আজ চার দিন হ'ল ওখানকার এলাকায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। তা ছাড়া পানীয় জল নোংরা, মাষ্টার-মশায় সাবধান ক'রে দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ আর মড়ক আরম্ভ হয়ে গেছে।

এক দল স্বেচ্ছাসেবক গাড়ী থেকে লাইনের ধারে নেমে পড়ল। এর পরের গাড়ীতে চাল ডাল আলু কাঠ কাপড় আর কলেরা ও ম্যালেরিয়ার ঔষধ এসে পড়বে এমন ব্যবস্থা করা আছে। তার জন্য এখানেই কোথাও অপেক্ষায় থাকতে হবে। বহু জায়গায় সেবাসমিতির কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

কিন্তু চারিদিকে চেয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখা গেল, কেবলমাত্র জলামাঠ, বিনষ্ট ধানের ক্ষেত, কোন কোন গ্রামের অস্পষ্ট চিহ্ন। আর কিছু না। রেলপথের বাঁধের ওপর ঝড়ের মত তীব্র বাতাস সন্ সন্ ক'রে বয়ে চলেছে। নবীন বাবু কিয়ৎক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন নদীটা পশ্চিম দিকে, নয়?

স্বেচ্ছাসেবকরা মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। কেউ জানে না নদী কোন্ দিকে। মাষ্টার-মশাই ছাড়া আর সবাই অনভিজ্ঞ।

নবীন বাবু পুনরায় বললেন শুনতে পাচ্ছ দূরে জলের উচ্ছ্বাস? বোধ হয় ঐদিকে, ঐ যেন দেখা যাচ্ছে, নয়? ঐদিক থেকেই ত ঝড় আসছে। ওটা বোধ হয় মেঘ, কেমন?

কেউ আর উত্তর দিল না। সকলের কৌতূহলী চক্ষু কেবল চিন্তাকুল হ'য়ে দিগন্ত-বিস্তার জলামাঠের দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সুরেশ্বর পশ্চিম দেশের ছেলে, বন্যার অভিজ্ঞতা বিশেষ তার নেই। সে বললে -মাষ্টার-মশাই, আমাদের থাকার ব্যবস্থা কোথায় হবে? মানুষের চিহ্নও ত কোথাও নেই।

নবীন বাবু হাসলেন। বললেন—থাকবার জন্যে ত আস নি হে, এসেছ কাজ করতে। আমাদের অনেককেই ভেলার ওপরে ভেসে রাত কাটাতে হবে। কুড়ি সালের বন্যার চেহারা যদি তুমি দেখতে হে—

—আমরা যাব কোন্ দিকে এখন?

— চল, লাইনের পশ্চিম দিক দিয়েই যাবার চেষ্টা করি। কি বল হে অবনী,—তুমি দেখছি ভয় পেয়ে গেছ।

সকলের সঙ্গেই নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু আসবাব ছিল। সেগুলি সবাই পিঠের দিকে তুলে নিলে। অবনী কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললে—ভয় নয় মাষ্টার-মশাই, ভাবছি সাঁতারটা শিখে নিয়ে ভলাণ্টিয়ারি করতে এলেই ভাল হ'ত।

অন্যান্য ছেলেরা হেসে উঠে বললে—এইটেই ত ভয়ের চেহারা অবনীবাবু।

পশ্চিম দিকে পথ নেই। ষ্টেশন ঘুরেই যেতে হবে, নইলে পথের দাগ পাওয়া যাবে না। সবেমাত্র এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, পথ পিছল। বেলা জানা যায় না, হয়ত বারোটা হবে। ঘন মেঘে আকাশ পরিব্যাপ্ত। মাঝে মাঝে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে শকুনির পাল। স্বেচ্ছাসেবকের দল কেমন যেন ভারাক্রান্ত মনে রেলপথ ধ'রে চলতে লাগল।

কুড়ি সালের বন্যায় এসেছিলুম স্বেচ্ছাসেবক হয়ে।—নবীন বাবু বলতে লাগলেন, তখন কলেজে পড়ি। তমলুকের এক গ্রামে যে দৃশ্য দেখেছি, ভুলব না কোনদিন।

সবাই চলতে চলতে তাঁর কথায় উৎকর্ণ হয়ে রইল। তিনি বললেন—বছর কুড়ি বাইশ বয়সের একটি মরা মেয়েকে একটা প্রকাণ্ড বাঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আশ্চর্য্য এই যে, বাঘটাও বানের জলে ভাসা, দুর্ভিক্ষপীড়িত। থানার জমাদারকে ডেকে এনে বন্দুক দিয়ে সেটাকে মারা হ'ল… একটি গুলিতেই ঠাণ্ডা! যেন বসেছিল সে মরবারই অপেক্ষায়। ওঃ সে দৃশ্য কখনও ভুলব না।

কিছুদূর এসে ষ্টেশনে জনতা দেখা গেল। তারা সবাই দরিদ্র। নবীন বাবু বললেন—ওরা সর্ব্বস্বহারার দল। কাছে যাব না, ঘিরে ধরবে। আমাদের কাছে কিছু নেই, এখন একথা শুনলে ওরা অপমান করবে আমাদের, পেটের জ্বালায় ওরা মরিয়া। ঐ দেখ ডাকছে আমাদের, ওদিকে আর এগিয়ে কাজ নেই। ভূমিকম্প আর বন্যা, এ দুটো মানুষের সমাজের সকলের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে।

ষ্টেশনে এসে ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানা গেল, রাত্রের দিকে এদিকে জলপ্রবাহ আসতে পারে কারণ, আজ সকালে আবার সাত জায়গায় নদীর বাঁধ ভেঙেছে। দশ মাইলের মধ্যে প্রায় তেরখানা গ্রাম ভেসে মিলিয়ে গেছে। মৃত্যুর সংখ্যা এখনও জানা যায় নি। নৌকো ছাড়া পায়ে হেঁটে সাহায্য বিতরণ করার কোনো উপায় নেই। অল্প খানিকটা পথ মাত্র পায়ে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাবধান থাকবেন আপনারা, পুলিস-পাহারা আর পাওয়া যাবে না, কাল থেকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব বড্ড বেড়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে?

আজ্ঞে না।

তবে ত মুস্কিলে ফেললেন। এ ছাড়া জল বাড়লে এদিককার শেয়ালগুলো ক্ষেপে যায়, ক্ষ্যাপা শেয়াল হঠাৎ কামড়ালে কিন্তু শিবের অসাধ্য! জলের তাড়া খেয়ে জঙ্গলের জানোয়ারগুলো সব লোকালয়ে এসে ঢুকেছে। এদেশে আর বাস করা চলে না মশাই, প্রকৃতির কাছে মার খেয়ে খেয়ে জাতটার অধঃপতনের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

কথাটা এমন কিছুই নয়, কিন্তু উপস্থিত সকলে এখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে যেন এর একটা গভীর সত্যকে উপলব্ধি করতে লাগল।

কথাবার্ত্তা চলছে এমন সময় কোথা থেকে দুটো লোক ব্যাকুল হ'য়ে এসে মাষ্টার-মশায়ের কাছে কেঁদে পড়ল, ও বাবু, সব্বোনাশ হ'ল আমাদের, সাপে কামড়েছে বাবু, কর্ত্তা আমাদের আর বাঁচে না,—বাবুগো তুমি বাঁচাও।

নবীনবাবুর দল চঞ্চল হয়ে উঠল। মাষ্টার-মশায় বললেন—থাম্ থাম্, চেঁচাস নে। যা এখান থেকে। কে হয় তোর?

—আজ্ঞে বাবু আমার বাবা।

—বয়েস কত?

—তা ষাইট হবে বাবু। বাঁচাও বাবু, পায়ে পড়ি—

—যা দড়ি দিয়ে বাঁধগে। বাপের কথা পরে, এখন মা-বোনকে সামলাগে যা। মাষ্টার-মশাই বললেন—হ্যাঁ মশাই গো, এই সাত দিনে অন্ততঃ পঁচিশটে মেয়ে চুরি হয়ে গেল। কে কা'র খবর রাখছে! যা বেটারা, দাঁড়াস নে এখানে। আপনারা খুব সতর্ক থাকবেন, বন্যার সাপ মানুষ দেখলেই কামড়ায়। ওদের গর্ত্তগুলোও যে গেছে জলে ভর্ত্তি হয়ে। ব'লে ষ্টেশন্ মাষ্টার-মশাই অকারণে হাসতে লাগলেন।

লোকগুলো কাঁদতে কাঁদতে চ'লে যাচ্ছিল, নবীন বাবুরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লেন। যদি বা লোকটাকে বাঁচানো যায়।

কিন্তু অনেক চেষ্টা-চরিত্র, অনেক তুক্‌তাকের পরেও বৃদ্ধকে কোন রকমেই বাঁচানো গেল না। নবীন বাবু এবং তার সঙ্গী ছেলের দল গভীর বেদনা নিয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে অন্যত্র চ'লে গেলেন। বন্যার মৃত্যু কেবল জলেই নয়।

পরের ট্রেনে যখন রসদ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম এসে পৌঁছল তখন বেলা আর বাকী নেই। কল্‌কাতা থেকে উৎসাহী যুবকের দল এসে হাজির। গাড়ী থামতেই জনতার কোলাহল সুরু হ'ল। ক্ষুধায় উন্মত্ত যারা তারা গাড়ী আক্রমণ করলে। তারা বাধা মানে না, তাদের অপমান-বোধ নেই। কল্‌কাতা-কেন্দ্রের সবাই প্রায় নবীনবাবুর পরিচিত। তিনি সদল-বলে গিয়ে জনতাকে সংযত করতে লাগলেন।

এদিকে ঘণ্টাখানেক এমনি ধস্তাধস্তি, ওদিকে কয়েক জন ছেলে ইতিমধ্যে গিয়ে নৌকার ব্যবস্থা ক'রে এল। আগামী কাল প্রভাতে দূরের গ্রামগুলির দিকে অভিযান করতে হবে। যত দূরে হেঁটে যাওয়া যায়, ঠেলাগাড়ীতে আর কুলির পিঠে রসদ যাবে।

দুর্য্যোগের আর শেষ নেই। হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, তীব্র বাতাস, পিঠে-বাঁধা পুঁটুলি- এমন অবস্থায় নবীন বাবু এবং তাঁর সঙ্গী এগার জন যুবক পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে বর্ষাকালের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ক্ষ্যাপা শেয়াল এবং সাপের ভয়ে সবাই ছিল সতর্ক। গাছের

ভাল কয়েকটা ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা গেছে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় সেগুলি ব্যবহার করার শক্তি কুলোবে কি না এই ছিল আন্তরিক প্রশ্ন।

নবীন বাবুর মুখে-চোখে চিন্তার ছায়া। প্রতি মুহূর্তেই তাঁদের কর্ত্তব্যের চেহারাটা কঠিনতর হয়ে উঠ্‌ছে, নানাদিকে নানান্‌ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ছেলেদের মধ্যে উৎসাহটা কিছু স্তিমিত।

বহু কষ্ট এবং পরিশ্রমের পর মাইল-তিনেক পথ পার হয়ে এক গ্রামের কয়েকটা চালাঘর পাওয়া গেল। ষ্টেশনমাষ্টার-মশাই এর সন্ধান নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন। ঘরগুলির দারিদ্র্যের চেহারা সুস্পষ্ট। ঝড় জলের পক্ষেও নিরাপদ আশ্রয় নয়। তবু এ ছাড়া আজকের রাত্রে আর গতি নেই। যেন কিছু দুর্ল্ভ বস্তু আবিষ্কার করা গেছে, এমনি ভাবে সুরেশ্বর প্রমুখ ছেলেরা দ্রুতপদে এসে চালার উপরে উঠ্‌ল।

একটা প্রকাণ্ড কুকুর একধারে চুপ ক'রে বসেছিল, সে ডাক্‌লও না, উঠ্‌লও না, তেমনি করেই ব'সে রইল। গোলমাল শুনে পাশের একখানা কুটুরী থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। লোকটার মুখে প্রকাণ্ড পাকা দাড়ি, পাকা চুল, পরনে একখানা লুঙ্গি লোকটি মুসলমান। নবীনবাবু এগিয়ে এসে বললেন --আজ আমরা রাত কাটাবো এখানে মিঞা-সায়েব। জায়গা দেবে ত?

বৃদ্ধ সবিনয়ে হাসলে। বললে --কষ্ট হবে, আপনারা ভদ্দল্লোক। কল্‌কাতা থিগে এসছেন?

--হ্যাঁ, মিঞাসাহেব। বুঝতেই পাচ্ছ কি জন্যে আসা। কুকুরটা রাতের বেলা হঠাৎ কাম্‌ড়ে দেবে না ত?

--না বাবু, ওর আর কিছু নেই। উপোস ক'রে ক'রে -- ব'লে ব্যথিত দৃষ্টিতে প্রান্তরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে বৃদ্ধ একবার তাকালো।

অবনী বললে --তোমার এখানে কে কে আছে মিঞা।

কেউ না, একাই থাকি বাবু। ইস্তিরি ম'রে গেছে, ছেলেটা চাকরি করে আসানসোলে রেলের কারখানায়। আমি আজও এই চালাটার মায়া কাটাতে পারি নি। তবে এইবার বোধ হয় পারব, নদীর বাঁধ ভেঙেছে। --ব'লে সে এক রকম অদ্ভুত হাসি হাসলে।

হারিকেন্‌ লণ্ঠন গোটা-চারেক সঙ্গেই ছিল, আলো জ্বালা হ'ল। সুরেশ্বর বললে---এখানে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যাবে মিঞা?

--ভিজে কাঠ বাবু, চল্‌বে? রাঁধবেন বুঝি?

---হ্যাঁ, রাঁধব। জল পাব কেমন ক'রে?

বৃদ্ধ হাসলে। বললে জল ত আছে কিন্তু আমার জল···আপনারা হিঁদু---

নবীন বাবু বললেন-- এখন আর হিঁদু নয়, এখন কেবল মানুষ। বেশ, দরকার হ'লে জল চাইব। তোমার খাবারও আমাদের সঙ্গে হবে, মিঞাসায়েব।

কুকুরটা মুখ তুলে একবার বক্তা ও শ্রোতার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। বৃদ্ধ তার পিঠ চাপড়ে সস্নেহে বললে -বাবুরা তোকে ফাঁকি দেবে না, বাবুরা ভাল। বুঝলি রহমন?

--ওর নাম রহমন বুঝি? --অবনী সবিস্ময়ে বললে।

--আদর ক'রে ডাকি বাবু।--ব'লে বৃদ্ধ কাঠ আর জলের ব্যবস্থা করতে গেল। লোকটি বড় ভাল।

ঘর দুখানার জান্‌লা-কপাট বলতে কিছু নেই। ভিতরে প্রবেশ করার সাহস কারও ছিল না। পোকামাকড়, সাপখোপ, এমন কি ক্ষ্যাপা শিয়ালের অবস্থিতিও অসম্ভব নয়। এই দাওয়ার ধারেই যেমন ক'রে হোক আজকের রাত কাটাতে হবে। এগারটি ছেলে আর নবীন বাবু সেই ব্যবস্থার দিকেই মনঃসংযোগ করতে লাগলেন।

কাঠ এল, জলের ব্যবস্থা হ'ল। বৃদ্ধ নিঃশব্দে তাদের সুবিধা ক'রে দিতে লাগল; মুখে চোখে তার একটুও উদ্বেগ নেই। অতিথিগণের প্রতি আদর-আপ্যায়নেরও আতিশয্য দেখা গেল না। কুকুরটা এগিয়ে এসে বসলো। অর্থাৎ, তাকে যেন কেউ ভুলে যায় না, সেও সকলের এক জন।

বিপিন বললে --যদি বন্যা আসে, তুমি এর পর কোথায় যাবে মিঞা?

শাদা মাথার চুল আর দাড়ির ভিতর দিয়ে এই বিচিত্র বৃদ্ধ মুসলমানের হাসির রেখা আবার দেখা গেল। তার অর্থ আছে, কিন্তু সেটা রহস্যে ভরা। বন্যায় পৃথিবী প্লাবিত হ'লেও তার এই সায়াহ্নকালের অটল ধৈর্য্য একটুকু ক্ষুণ্ণ

হবে না—সে-হাসির মধ্যে এ-অর্থটুকুও বোধ হয় লুকিয়ে ছিল। তবু সে মৃদুকণ্ঠে বললে—আল্লার হুকুম যেদিকে হবে বাবু।

কথাটা সামান্য ও সুলভ। কিন্তু এত বড় সত্য সংসারে বোধ হয় আর কিছুই নেই। সবাই মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল। এর পরে বিপিনের আর কিছু বলবার ছিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি ঘনিয়ে এল। জোরে বৃষ্টি নামল, তার সঙ্গে ঝড়ের বাতাস। সম্মুখের বিশাল প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে বিক্ষুব্ধ বর্ষার দুরন্তপনা চল্‌ছে, কিন্তু তার কিছুই দেখা যায় না। দাওয়ার এক প্রান্তে কাঠের আগুন অতিকষ্টে জ্বালানো হ'ল। পথশ্রমে সবাই অবসন্ন, তবু আহারের আয়োজন না করলে কিছুতেই চল্‌বে না। দাওয়ার এক ধারে চালার নীচে দিয়ে জল পড়তে লাগল। রাত্রি অতিবাহিত করা এখন প্রবল সমস্যা।

পরম উপাদেয় ভোজ্য রুটি, আলুসিদ্ধ আর নুন—সবাই মিলে অপরিসীম আগ্রহে আহার করলে। বৃদ্ধ খেয়ে অশেষ আশীর্ব্বাদ জানালে, এবং রহমন সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে এই পরোপকারীর দলের দিকে একবার চেয়ে এক পাশে গিয়ে ব'সলো। আহারাদির পর শোবার পালা। কিন্তু সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নয়। ঠিক হ'ল, প্রতি দফায় আট জন ঘুমোবে, চার জন ব'সে থাকবে। এমনি ক'রে তিন দফায় রাত্রি কাটবে। কুকুরটা থাকাতে সকলের মনে একটু সাহসও হ'ল। একটা আলো সমস্ত রাত জ্বালানোই থাকবে।

প্রথম দফায় নবীন বাবু প্রমুখ আট জন জলের ছাট বাঁচিয়ে দেয়াল ঘেঁষে জায়গা সঙ্কুলান ক'রে নিলেন। পা ছড়ান যাবে না জায়গা বড় সঙ্কীর্ণ। তবু পা গুটিয়ে কাৎ হয়ে তাঁরা চোখ বুজলেন। হাতঘড়িটা দেখে সুরেশ্বর বললে—রাত এখন ন'টা।

তৃতীয় দফায় রাত শেষ হবে। যারা পাহারায় বসেছিল তাদের চোখেও তন্দ্রা নেমে এসেছে। আলোটা জ্বলছে। দাওয়ার নীচে থেকেই সুদূর প্রান্তরের সীমানা সেখানে অন্ধকারের পর অন্ধকারের দল। প্রেতপুরীর মত পৃথিবী নীরব, কেবল দূর-দূরান্তরের ঝিল্লী ও দাদুরীর আওয়াজ নিরন্তর নিশীথিনীকে বিদীর্ণ ক'রে চলেছে। বৃষ্টির শব্দ আর শোনা যায় না।

যারা পাহারায় বসেছিল, তাদের মধ্যে একটি ছেলে হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে আচম্‌কা তাকালো। অস্পষ্ট আলোয় এক ছায়ামূর্ত্তির দিকে চেয়ে বললে—কে তুমি, কি চাও?

গলার আওয়াজটা তার অস্বাভাবিক রূঢ় আর উচ্চ। নবীন বাবু এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে বসলেন।—কে হে কালু, কোথায় কে? আরে, কে তোমরা?

বলতে বলতেই দেখা গেল একটি লোক ছোট একটা তোরঙ্গ মাথায় নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে একটি বার-তের বছরের কিশোরী মেয়ে।

লোকটি বললে—চলেই যাচ্ছিলাম, আলো দেখে এলাম এদিকে বাবু, একটু জায়গা দেবেন আপনারা, রাতটুকু কাটিয়ে যাব?

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। বিপিন বললে—কোথা থেকে আসছ তোমরা?

আসছি তারকপুর থেকে। জলে গ্রাম ঘিরে ফেললে, সন্ধ্যে থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি, এবারে বন্যে ভয়ানক বাবু! আমার নাম ঈশ্বর, এটি আমার মেয়ে; এর মা নেই।

মেয়েটি এবার বললে—দাও না বাবুরা একটু জায়গা, কাল সকালেই চ'লে যাব।

নবীন বাবু এবার তাড়াতাড়ি বললেন—এস মা এস, এখানে আমরাও যা, তোমরাও তাই। এস ভাই ঈশ্বর, নামাও তোমার তোরঙ্গ। অনেক দূর হাঁটতে হয়েছে, কেমন?

ঈশ্বর বললে—হ্যাঁ বাবু, প্রায় বিশ মাইল আসতে হ'ল।

—বিশ মাইল! দূর পাগল, এইটুকু মেয়ে বিশ মাইল—মাইলের জ্ঞান তোমার খুব দেখছি।

ঈশ্বর বললে বিশ্বাস যাবেন না বাবু, আটখানা মাঠ পার হয়ে এলাম···আমার মেয়ে আরও বেশী হাঁটে।

সবাই স্তম্ভিত হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। নবীন বাবু কেবল অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—রাত কত হে সুরেশ্বর?

হাতঘড়ি দেখে সুরেশ্বর বললে—তিনটে বাজে মাষ্টার মশাই।

তোরঙ্গটা নামিয়ে সেই বলিষ্ঠ লোকটা একপাশে বসলো। মেয়েটা বসলো তার পাশে। গায়ে একটা পুরনো জামা, পরনে খাটো একখানা শাড়ী, মাথায় খোঁপা চূড়ো ক'রে বাঁধা, হাতে দু-গাছা রুলি। রূপ তার তেমন নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যটা ভাল।

নবীন বাবু বললেন—তোমার নাম কি মা?

মেয়েটি বললে—আমার নাম ভুনি।—এই ব'লে সে বাপের কাছে ঘেঁষে ছোট তোরঙ্গটায় হেলান্ দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং মিনিট-পাঁচেক পরেই দেখা গেল, ঘুমে সে নেতিয়ে পড়েছে, নাক ডাক্‌ছে।

নবীনবাবু বললেন—বাড়ি কোন্ গ্রামে বললে?

বাড়ি নেই বাবু, এখন আসছি তারকপুর থেকে। সেখানে ক্ষেতে জল ছেঁচতাম। বাপ-বেটির ভাত-কাপড় জুটে যেত।

দেশ কোন্ জেলায়?

—মানভূঁয়ে। সে অনেক দিনের কথা।—ঈশ্বর বললে, দু-বছর ধান হ'ল না, জমিদারকে জমি ছেড়ে দিয়ে গেলাম বাঁকুড়ো। পেটের দায়ে নিলাম কারখানায় কাজ। সেখানে ওলাউঠোয় ছোট ছেলেটা ম'রে গেল। বউ বললে আর এদেশে নয়।

—তার পর?

ঈশ্বর বললে—পায়ে-হাঁটা দিয়ে গেলাম মেদিনীপুর। সেখানে রতনজুড়ির হাটে সোম-শুক্কুরে তরকারি বেচতে বসলাম, এই মেয়েটা তখন দু-বছরের। চোৎ মাসের দিনে গাঁয়ে লাগল আগুন, মশাই গো, ঘর বাঁচাতে পারা গেল না, ঘরসুদ্ধু বউটা আগুনে মো'লো। দূর হোক গে, মেদিনীপুর আর ভাল লাগল না। মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গরিবের জীবন, বাবু।

নবীন বাবু বললেন—মেয়েটাকে ত বড় ক'রে তুলেছ ভাই, এই তোমার লাভ!

ঈশ্বর হেসে বললে—ওটাও মরবে একদিন, ও কি আর থাকবে! সেবার ডুবে গিয়েছিল কাঁসাই-নদীতে, এক জন মাঝি তুললে টেনে; বলব কি বাবু, একবার হারিয়ে গেল খড়্গপুরে। মেয়েটার জান্ বড় শক্ত। সেই যে ছাব্বিশ সালের বন্যে, মনে আছে,ত বাবু, গিয়েছিলাম খতম্ হয়ে··· ও বেটিকে গাছে চড়িয়ে দিয়ে আমি ভেলায় চেপে রইলাম, সেবার তোমাদের দেশের এক বাবুর দয়ায় মেয়েটা বাঁচলো।—এই ব'লে সে চুপ ক'রে গেল।

সুরেশ্বর ব্যগ্রকণ্ঠে বললে—এবার কোথায় যাবে ঈশ্বর?

ঈশ্বর হাসতে লাগল। এ যেন তার কাছে বাহুল্য প্রশ্ন। এর জবাব দেওয়া সে দরকারই মনে করে না। শুধু বললে আপনারা কি এদিকে কাজ করতে এসেছ?

নবীন বাবু বললেন—কাজের কূল কিনারা পাই নে, তা এলুম যদি কিছু উপকার করতে পারি।

চাল-ডাল বিলোবে, কেমন! একখানা ক'রে কাপড় আর কম্বল, এই ত?—ব'লে ঈশ্বর হাসতে লাগল। তার হাসি, তার ভঙ্গী, তার কণ্ঠস্বর যেন জগতের সমস্ত বদান্যতাকে নিঃশব্দে বিদ্রূপ ক'রে দিলে, এর পরে আর পরোপকারের আতিশয্য প্রকাশ করা চলে না। নবীন বাবু নীরব হয়ে গেলেন।

শেষরাত্রির ঘোলাটে অন্ধকারে বাইরের দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর তখনও স্পষ্ট হয় নি। ছেলেরা সবাই জেগে বসেছিল। তারা বোধ হয় ভাবছে, বন্যার প্রবাহে আসে অনেক পাপ অনেক অন্যায়। জল একদিন নানা খাতে পালিয়ে যায় বটে, কিন্তু রেখে যায় মানুষের লজ্জা, কলঙ্ক, দুষ্প্রবৃত্তি, রোগ আর দারিদ্র্য। যারা বাঁচে তাদের জীবনব্যাপী মৃত্যু আর ধ্বংস। ঐ অশিক্ষিত নির্বোধ লোকটার হাসির ভিতরে হয়ত এ-কথাটাও ছিল!

চাপা কান্নার শব্দে সবাই সজাগ হয়ে উঠ্‌ল।

নবীন বাবু বললেন—কে হে, কে কাঁদে? কোথায়?

এদিক-ওদিক সবাইকে তাকাতে দেখে ঈশ্বর হেসে বললে আমার মেয়েটা গো মশাই, ঘুমোলেই ভুনি কাঁদে, ওর তিন বছর বয়েস থেকে এই অভ্যেস। থাক্, থাক্ বাবা—এই আমি আছি ব'সে। ব'লে সে তার মেয়েটার গায়ে বার-দুই হাত চাপড়ালে।

সুরেশ্বর বললে—কাঁদে কেন? অসুখ?

—না বাবু, স্বপন দ্যাখে। ওর বোধ হয় একটু মাথার দোষ আছে···দুঃখু পেয়ে পেয়ে—আমার হাতখানা ওর গায়ের ওপর থাকলে আর কাঁদে না। এই ভুনি, ওঠ

বাবা—আলো ফুটল এবার।—ঈশ্বর তার মেয়েকে আবার একবার নাড়া দিলে।

ভোর হয়ে এল। মিঞা-সায়েব আর তার কুকুর দু-জনেই এল বেরিয়ে। দূরে চেয়ে দেখা গেল, মাথায় মোটঘাট নিয়ে একদল স্ত্রী-পুরুষ আর ছেলেমেয়ে মাঠ পার হয়ে ষ্টেশনের দিকে চলেছে। বোঝা গেল, বন্যার তাড়না। সকলে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল। এ ঘর ছেড়ে দিয়ে সকলকেই এবার পালিয়ে যেতে হবে। ভুনি তার বাপের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে কোন নালিশ, কোন উদ্বেগ নেই, মৃত্যুর ভয় এই কিশোরীকে একটুও চঞ্চল করে না, তার জীবনের সঙ্গে এ যেন সহজেই জড়িয়ে গেছে। শাড়ীর আঁচলটা কোমরে বেঁধে নিয়ে সে বললে—চল বাবা। বেশ ঘুমিয়েছি, এবার খুব হাঁটব।

মিঞা-সায়েব যা পারল সঙ্গে নিল। কুকুরটাও হাই তুলে প্রস্তুত হয়ে পথে নামল। ঈশ্বর তার তোরঙ্গটা মাথায় তুলে নিয়ে বললে—চল মিঞা, তোমার সঙ্গেই এগোই। আয় লো ভুনি, আজ কিন্তু খুব হাঁটতে হবে, বুঝলি ত?

ভুনি বললে—পারব, চল বাবা।

নবীন বাবুর দল নৌকা আর রসদের বিলিব্যবস্থায় কাজে নামবেন। সুতরাং তাঁরাও বেরোলেন ওদের সঙ্গে। ভোরের বর্ষার আর্দ্র ঠাণ্ডায় সকলের শীত ধরেছে। দূরে এবার বন্যার জলের শব্দটা স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল।

মিঞা-সায়েব পিছন ফিরে তাকালো না, মায়ামোহে বশীভূত সে নয়। এক সময় বললে—এ বন্যে কিছু নয়, বুঝলে ঈশ্বর, দেখতে যদি ছিয়ানব্বই সালের জল—ব'লে সে কোন্ সুদূর অতীতের দিকে একবার তাকালো।

নবীন বাবু বললেন—জলের বিপদ ভয়ানক, এর চেয়ে মারাত্মক সংসারে আর কিছু নেই, কি বলো মিঞা?

—ঠিক বলেছ বাবুজী।—ব'লে মিঞা হাঁটতে লাগল।

ভুনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—হ্যাঁ বাবা—?

—কি মা?—তার বাপ জিজ্ঞাসা করলে।

জলে বিপদ বেশী, না আগুনে?

তার অদ্ভুত প্রশ্নে সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। সামান্য তার কৌতূহল, কিন্তু তার কথায়, তার চলনে, তার চোখের চাহনিতে আজকে এই সর্ব্বপ্লাবিনী বন্যার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারাটা সকলে মুহূর্ত্তের জন্য একবার অনুভব ক'রে নিলে। বন্যায় তার জন্ম, বন্যার প্লাবনে ভাসা তার জীবন।

ঈশ্বরের বলিষ্ঠ বক্ষের ভিতরটা কিশোরী কন্যার এই প্রশ্নে অত্যুগ্র উত্তেজনায় পলকের জন্য একবার আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ল। অতীত কালের একটা ঘটনা স্মরণ ক'রে কম্পিত কণ্ঠে সে বললে—জলে বিপদ নেই বাবা…এই ত বেঁচেই আছি, কিন্তু আগুনের বিপদ…

কথা শেষ করতে সে পারলে না; আগুনে তার বুক পুড়েছে, তার জীবন পুড়েছে,—কেবল নিমীলিত চক্ষে চেয়ে ভুনির হাত ধ'রে সকলের সঙ্গে সে পথ হাঁট্‌তে লাগল।

স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত একটি চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোসামারু
চীন সাগর

কল্যাণীয়েষু

দিনু, কোথায় আছিস্ জানি নে। এ চিঠি যখন পৌঁছবে তখন নিশ্চয় তোদের ইস্কুল খুলেছে। তোদের শালবাগানে আষাঢ়ের নব মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তোদের জামগাছ-গুলোতে মেঘ্‌লা রঙের ফল ফলেছে, প্রান্তরলক্ষ্মী সবুজ রঙের আঁচল দিগন্তে বিস্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে। তোর বেণুকুঞ্জের সভাতে এস্‌রাজে মেঘ-মল্লারের সুর লেগেছে। আমি তো কিছু কালের জন্য চ'লে এলুম, আমাদের আশ্রমের আনন্দ-ভাণ্ডারের চাবিটি তোর কাছেই রইল, সকালে বিকালে শিশুগুলোকে সুরের সুধা বণ্টন করে দিস্।

এবারে আশ্রমে চিঠি লেখবার লোকের অভাব নাই·· খবর খুব বিস্তারিত রকমেই পাবি সন্দেহ নেই; আমি এবার চিঠি লেখায় সময় দিতে পারব না। সবুজপত্র যদি বেঁচে থাকে তবে তারি পত্রপুটে আমার লেখা দেখতে পাবি। যা-কিছু অবকাশ পাই তর্জ্জমা এবং বক্তৃতা লেখায় কাটাতে হবে। এখন পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়েছি সুতরাং তোদের দিকে আমার পশ্চাৎ করতে হবে। কাল রাত্রে ঘোরতর বৃষ্টি বাদল সুরু হ'ল। ডেকের কোথাও শোবার জো ছিল না। অল্প একটুখানি শুক্‌না জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্দ্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম "শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে" তার পরে "বীণা বাজাও" তার পরে "পূর্ণ আনন্দ" কিন্তু বৃষ্টি আমার সঙ্গে সমান টক্কর দিয়ে চল্‌ল—তখন একটা নূতন গান বানিয়ে গাইতে লাগলাম। শেষকালে আকাশের কাছে হার মেনে রাত্রি ১২টার সময় কেবিনে এসে শুলাম। গানটা সকালেও মনে ছিল (সেটা নীচে লিখে দিচ্চি) "বেহাগ তেওরা।" তুই তোর সুরে গাইতে চেষ্টা করিস্ তো। আমার সঙ্গে মেলে কিনা দেখব। ইতিমধ্যে মুকুলকে ও পিয়ার্সনকে শেখাচ্চি। মুকুল যে নেহাৎ গাইতে পারে না তা নয়, সে সহজ সুরে আসর জমিয়েছে।

গান

তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি
হৃদয়মাঝে বিছাও আনি' ॥
রাতের তারা, দিনের রবি,
আঁধার আলোর সকল ছবি,
তোমার আকাশভরা সকল বাণী
হৃদয়মাঝে বিছাও আনি' ॥

তোমার ভুবন-বীণার সকল সুরে
হৃদয় পরাণ দাও না পূরে।
দুঃখ সুখের সকল হরষ
ফুলের পরশ, ঝড়ের পরশ
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি
হৃদয়মাঝে দিক না আনি' ॥

আশ্রম-বালকদের আমার আশীর্ব্বাদ ও বন্ধুদের অভিবাদন।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

রবিদাদা।

আমার পক্ষিনিকেতনের কথা

শ্রীসত্যচরণ লাহা

আধুনিক সভ্য জগতে ইতর জীবের জ্ঞানপ্রণোদিত শিক্ষাদীক্ষার গুণে পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের সৌহার্দ্দ্যসূত্রে গ্রথিত হইবার উপযুক্ত অবসর পাওয়া যাইতেছে সন্দেহ নাই। বনে জঙ্গলে স্বাভাবিক আবেষ্টনে ইহাদের অযথা হিংসা বা হত্যা না হয়, এমন কি অত্যধিক জঙ্গলবিনাশ হেতু ইহারা আশ্রয়চ্যুত হইয়া দেশবিশেষে নিতান্ত বিরল-দর্শন এবং ভীতিগ্রস্ত না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য শিক্ষিত মানব-সমাজে আন্দোলন চলিতেছে; স্থানীয় শাসনতন্ত্রের মনোযোগ এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া বিধিনিয়মের সাহায্যে প্রতিকারের ইঙ্গিত বিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত আন্দোলন ও সংরক্ষণপ্রচেষ্টার মূলে যে জীবজন্তুর প্রতি মানুষের অনুরাগ এবং সহৃদয়তা অন্তর্নিহিত তাহা বলা বাহুল্য। বিদ্যাচর্চ্চার ফলে ক্রমশঃ যতই আমাদের উপলব্ধি হয় প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে জীবের লীলাখেলা অভিনয়ের যথেষ্ট সার্থকতা আছে, মানুষ সম্বন্ধেও অথবা মনুষ্যসমাজের হিতসাধনে এই সার্থকতা অনেক ক্ষেত্রে নিতান্ত কম নয়, ততই জীবজন্তুর প্রতি আমাদের মমতা ও অনুরাগ দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠে। পাখীর প্রতি কিন্তু বিশেষ করিয়া মানব-হৃদয়ের আকর্ষণ সহজে বুঝা যায়,—সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও কলাবিদ্যার দিক হইতে সে সর্ব্বতোভাবে মানুষের ইন্দ্রিয়বিনোদনের বস্তু সন্দেহ নাই। তাহাকে খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া অথবা সুকৌশলে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে মানবসংসর্গে রাখিবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার বিচিত্র জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে রহস্যভেদের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম আবেষ্টনের
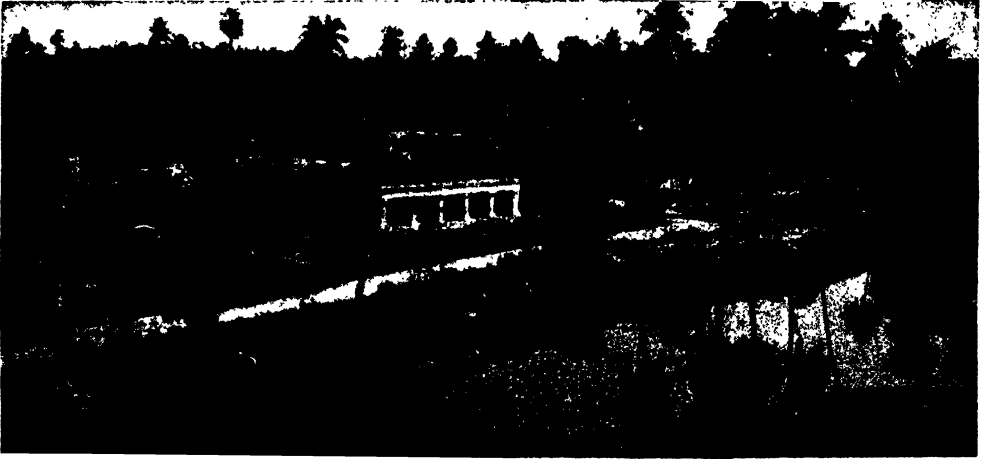
বৃক্ষবীথিকা ও দীঘিজলাশয় পরিবেষ্টনীর মধ্যে পক্ষিনিকেতন

মধ্যেও পরীক্ষণকার্য্যে ব্রতী হওয়া এখনকার বৈজ্ঞানিক যুগে কিছু বিচিত্র নয়। পিঞ্জর-বিহঙ্গের চর্চ্চায় চীন, জাপান-বাসীর কৃতিত্বের কথা তুলিবার আবশ্যক নাই, ইউরোপ এবং আমেরিকায় পক্ষিভবন অথবা পাখীর আশ্রমের

সভ্য জগতে চিড়িয়াখানা, মীনসরীসৃপাগার ও কীটপতঙ্গ বাঁচাইয়া রাখার উপযোগী ব্যবস্থায় নানা ছোটবড় জীবের আচারব্যবহার সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, জীববিদ্যার অনুশীলনে উহা কম সহায়ক নয়। এই

পক্ষিনিকেতনের আবেষ্টন

সুব্যবস্থার কথাও তুলিতে চাই না, এই সমস্ত দেশের চিড়িয়াখানাগুলির মধ্যে পক্ষিপালনের যথাযথ বন্দোবস্ত আছে; ইহারা সকলেই যে গভর্ণমেণ্টপৃষ্ঠপোষিত এমন বলা যায় না, পক্ষিসংরক্ষণের নিমিত্ত নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও আছে যেখানে জীববিদ্যা অনুশীলনের সুবিধা পাওয়া যায়। আমাদের দেশের সরকারী চিড়িয়াখানাগুলির কার্য্যকারিতা বিশিষ্ট আইনকানুনে সীমাবদ্ধ; বিজ্ঞানের গবেষণায় ও রহস্যভেদে তাহাদের সহযোগিতার প্রসার বা পরিধি সম্বন্ধে কিছু বলা নিস্প্রয়োজন, পক্ষিপালন ও সংরক্ষণের কথা তুলিয়া আমার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে গেলে বোধ করি উহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পাখীর জীবনধারণের অনুকূল ও উপযোগী পরিবেষ্টনীর মধ্যে তাহার দৈনন্দিন জীবনলীলার সুবিধা প্রদান না করিতে পারিলে পক্ষিপালনের মুল উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হয়। পল্লীগ্রামের উদ্যানবাটিকায় আমার পক্ষিগৃহগুলির অবস্থিতি এই কারণেই সমীচীন বিবেচনা করিয়াছি। উদার আকাশ, বাতাস, দীঘির জলহিল্লোল, শম্পপ্রাঙ্গণ, বৃক্ষবীথিকা, ফুল, ফল, সুপরিসর জলাশয়বেষ্টনী,—এতগুলি নৈসর্গিক উপকরণ অল্পবিস্তর একত্র মিলিয়া যে অপরূপ আবেষ্টনের সৃষ্টি করে পাখীর পক্ষে তাহা কম প্রেয় এবং অনুকূল নয়। এইরূপ আবেষ্টনে পাখীর সঙ্গে মানুষের সৌহার্দ্দ্য বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়; পাখীর চরিত্রগত ভীরুতা ও ত্রাস নিবারণের ব্যবস্থায় কিঞ্চিৎ বিচক্ষণতার প্রয়োজন হয় বটে, পিঞ্জর এবং লোহার জালঘেরা পক্ষিগৃহের সঙ্কীর্ণতার বাহিরে তাহাকে যতদূর সম্ভব স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের সুবিধা দিতে পারিলে তাহাকে অনায়াসে মানুষের সঙ্গে বিশ্বস্ত-সূত্রে আবদ্ধ করা চলে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়

সোনাজঙ্ঘা ষ্টর্ক

বেশ হৃদয়ঙ্গম করি যে অনেক পাখীর বুদ্ধিবৃত্তি মানুষের সংসর্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠে; মানুষের যত্নে আদরে লালিত-পালিত হইয়া শিক্ষাদীক্ষ্য গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করে না। নানা বন্য হাঁস, সোয়ান (Swan), রাজহংস (Bar-headed Geese), "করকরা" (Demoiselle Crane), ধনেশ পাখী, ময়ূর,

চকোর এবং তাহার সমবংশীয় ফেজেণ্ট (Pheasant) পাখী আমার উদ্যানপরিবেষ্টনীর মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিহার করে,—অবশ্য তাহাদের আংশিক পক্ষচ্ছেদের প্রয়োজন হইয়াছে বটে, তাহাদিগকে কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় না এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা স্বেচ্ছায় আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আবাসে রাত্রিযাপনের জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে। নিশাচর হিংস্র জন্তুর হাত এড়াইবার জন্য কেবল রাত্রে নিরাপদ স্থানে তাহাদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। প্রথম প্রথম কয়েক দিন তাহাদিগকে তাড়াইয়া সন্ধ্যায় তাহাদিগের আবাসগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইত, ক্রমশঃ এরূপ করিবার আর প্রয়োজন হইল না, কারণ তাহারা মানুষঘেঁষা হইয়া গিয়া মানুষের যত্ন ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিতে লাগিল। ক্ষুধা বোধ করিলে ধনেশ পাখীগুলা রক্ষীদিগের ঘরে একেবারে গিয়া উপস্থিত হয় এবং চীৎকারশব্দে তাহাদের অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করে। ষ্টর্ক (Stork)-বংশীয় "সোনা-জঙ্ঘা" বিহঙ্গ মানুষের আহ্বানে ছুটিয়া কাছে উপস্থিত হয়;

বাসযষ্টির উপর উপবিষ্ট ধনেশ পাখী

ময়ূর আতপতাপনিবৃত্তির জন্য অট্টালিকার স্নিগ্ধ মর্ম্মরতলে নিরালায় বিশ্রাম করে; পুকুরঘাটে যখন পরিচারিকা ভোজন-পাত্র পরিষ্কার করিতে উদ্যত হয়, সোয়ানগুলি ভুক্তাবশেষ কাড়িয়া খাইবার জন্য তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলে; বন্য রাজহংস দল বাঁধিয়া শষ্পপ্রাঙ্গণে উদ্যানকর্ম্মরত মালীদের সন্নিকটে নিঃশঙ্কচিত্তে শষ্পভক্ষণে লিপ্ত থাকে। এই সমস্ত পাখীর দৈনন্দিন জীবনলীলা মানবাবাসের কৃত্রিমতার মধ্যেও যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে নিরবচ্ছিন্ন নৈসর্গিক আবেষ্টনে তাহারা প্রত্যেকেই রক্ষিত না হইয়া থাকিলেও, পালনগুণে তাহা বিশেষরূপে খর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এমন বলা যায় না, বরং বিহঙ্গচরিত্রের যদি কিছু পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি, মানুষের সংস্পর্শে শাসনসংরক্ষণের বিধিপালনের ফলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির যতটুকু পরিচয় আমরা
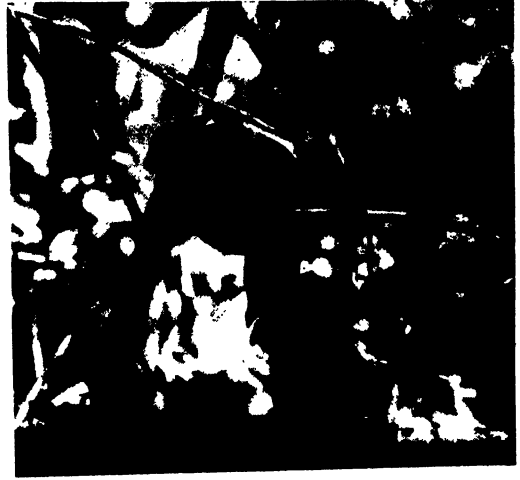
নৈশনিদ্রাভিলাষী ফেজেণ্ট বিহঙ্গ

পাই, এই বুদ্ধিবৃত্তি যে দেশকালপাত্রভেদে পাখীর মজ্জাগত এবং স্বভাবসুলভ নয় এমন কে বলিতে পারে? পক্ষিপালনের সুব্যবস্থায় তাহার মনোবৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হইয়া আমাদের গোচরে আসে; বনে জঙ্গলে, মানবালয়ের ত্রিসীমানার বাহিরে পাখীর নাগাল পাওয়া কঠিন, তথায় তাহার চরিত্রগত বৃত্তিগুলির পরিচয়লাভের আশা দুরাশা মাত্র। ধনেশ পাখীগুলার জন্য রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা আছে আমার উদ্যান-বাটিকার বারাণ্ডায় যেখানে প্রতিসন্ধ্যায় তাহারা স্বেচ্ছায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ভূমির উপর লাফাইতে লাফাইতে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া একেবারে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসযষ্টির উপর উঠিয়া বসে। কোন শৃঙ্খল অথবা বন্ধনীর দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখার প্রয়োজন হয় না; প্রত্যূষে বাটীর দ্বারোদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উদ্যানে বাহির হইয়া পড়ে এবং সারাদিন গাছে গাছে বিচরণ করে। ফুলের

পাপড়ি তাহাদের প্রিয় খাদ্য; পোকামাকড় এবং ভেকের সন্ধানেও তাহাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতে পাই; ভূমির উপর অবতরণ করিয়া লাফাইতে লাফাইতে অনেক সময় তাহারা খাবার খুঁজিয়া বেড়ায়। অতি শৈশব অবস্থা হইতে মানবহস্তপালিত বিহঙ্গশিশু যতই বড় হইতে থাকে, তাহার মানুষের ভয় ততই বিলোপ পায়, তাহার মেজাজ কিঞ্চিৎ রুক্ষ হইয়া পড়ে। অপরিচিত মানুষ তাহার কাছে আসিলে দেহের পালক ফুলাইয়া, চঞ্চুসঞ্চালনেও তাহার বিরক্তিভাব ব্যক্ত করিতে থাকে। আমার পিঞ্জরপালিত পার্ব্বত্য "বসন্ত" পাখী (Barbet) দুরন্ত শিশুর ন্যায় এইরূপ অভদ্র ব্যবহারের পরিচয় দিতে অগ্রগণ্য। ইহা অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্রকায় আরও কয়েকটা পাখী অল্পবিস্তর এইরূপ আচরণে অভ্যস্ত,—তাহাদের উল্লাস বুঝা যায় যখন কোন অল্পবয়স্কা বালিকা তাহাদের খাঁচার সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায়; মানুষকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলে। সিলভার ফেজেণ্টটি (Silver Pheasant) পিঞ্জরের বাহিরে উদ্যানে স্বেচ্ছায় যখন বিচরণ করে, মানুষের সান্নিধ্য তাহার অপ্রীতিকর হয় না বটে, মানুষের মাথায় আবরণ অথবা টুপি থাকিলে তাহার বিরক্তিভাজন হইয়া উঠে, তখন তাহাকে চঞ্চু এবং পদনখরে বিদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি তাহার কোথা হইতে আসিয়া জুটে!

মুক্ত প্রকৃতির প্রাঙ্গণে জীবের সহিত জীবের অহরহঃ সংঘর্ষ ও জীবনসংগ্রামের ধারণা আমাদের অনেকের আছে, সেই ধারণা লইয়া পাখীর মধ্যেও পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব বুঝিয়া উঠা কঠিন হয় না। আমার পক্ষি-গৃহগুলির মধ্যে যদিও তাহাদের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কৃত্রিমতার ভিতর যতদূর সম্ভব পাখীর অনুকূল, সহজ আবেষ্টনের দিক হইতে তাহার জীবনযাত্রার উপযোগী উপকরণ ও আহার্য্যবস্তুর ব্যবস্থা করা হইয়াছে, পাখীর

পক্ষিনিকেতনের প্রধান পক্ষিগৃহ

উহার কেশগুচ্ছ অথবা অঙ্গুলির অগ্রভাগ চঞ্চুপুটে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য তখন তাহারা ব্যস্ত হইয়া উঠে। কুক্কুটবংশের কয়েকটা বিভিন্ন ফেজেণ্ট পাখী আমার সুপরিসর পক্ষিগৃহে মানুষের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়; কোন অপরিচিত ব্যক্তি সেই গৃহে হঠাৎ প্রবেশ করিলে তাহার প্রতি বিরক্তি ও বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিতে বিশেষরূপ পটু,—তাহার পায়ে ঠোক্করাইয়া, গায়ে পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, অঙ্গুলিনখরে তাহার বস্ত্র বিদীর্ণ করিয়া সেই দ্বন্দ্বকলহনিবারণে ইহা বাস্তবিক পক্ষে কার্য্যকরী হইয়াছে এমন মনে করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমাকে বিশেষ সতর্কতার সহিত অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শুধু যে আহার্য্যবস্তুর অনটন বা অকুলান হইলেই দ্বন্দ্বকলহের সূত্রপাত হয় এমন নহে, মানুষের মত পাখীর মেজাজ সকল সময়ে ঠিক থাকে না, তাহার ব্যবহারেও এই মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়; নীড়ারম্ভ কালে প্রাকৃতিক নিয়মের বশে পাখীর শরীরে যে বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার চরিত্রে প্রায়ই

প্রধান পক্ষিগৃহের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জ
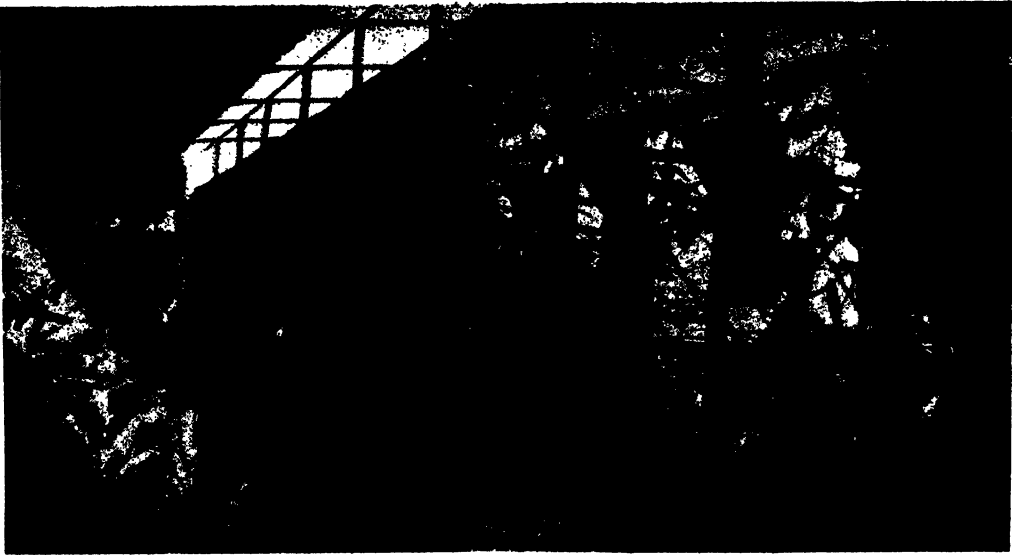
পক্ষিগৃহের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

পক্ষিগৃহের অভ্যন্তর (আংশিক দৃশ্য)

তাহা ফুটিয়া উঠে,--শুধু যে রূপে, সঙ্গীতে, লীলাঞ্চিত গতি-ভঙ্গীতে ইহা ব্যক্ত হয় তাহা নহে, দাম্পত্য জীবনের চারি পার্শ্বের অভাব আকাঙ্ক্ষা লইয়া স্বার্থান্ধ পক্ষিমিথুন আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তির তাড়নায় অপরিসীম হিংসাকলহপরায়ণ হইয়া পড়ে। পাখীর মধ্যে পরস্পর খাদ্যখাদক সম্বন্ধও আছে, আপাতদৃষ্টিতে ইহা অনেক সময় বুঝা যায় না। একবার ক্ষুদ্র জাতির ধনেশ (Grey Hornbill) সম্পর্কে ধারণা লইয়া আমাকে ঠকিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। কতকগুলি ছোট পাখীর সঙ্গে আমার পক্ষিগৃহের একটি সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে তিনটি ধনেশ ছয় মাস যাবৎ রক্ষিত ছিল; ছোট পাখীর প্রতি তাহাদের দুর্ব্যবহার ক্ষণেকের জন্যও আমি লক্ষ্য করিতে পারি নাই। তাহাদিগকে নিরীহ মনে করিয়া আমি পক্ষিগৃহের প্রশস্ত হলটিতে নানা ছোটবড় বিহঙ্গের সঙ্গে একত্রে ছাড়িয়া রাখিতে যখন সাহসী হইলাম তখন আমার কণামাত্র সন্দেহ হয় নাই যে তাহারা তাহাদের সুবৃহৎ চঞ্চুপুটে ছোট পাখী ধরিয়া গিলিয়া খাইবে। অল্প দিনের মধ্যেই কিন্তু আমার এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা লাভ হইল; স্বচক্ষে যদিও আমি তাহাদিগকে পাখী ধরিয়া গিলিয়া খাইতে দেখি নাই, প্রতি দিনই আমার ছোট পাখীগুলির সংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে অনেক সুশ্রী পাখী ছিল, তাহারা এমন ভাবে অন্তর্হিত হইতে লাগিল যে সেই ধনেশ ব্যতীত তাহার হেতু বুঝিয়া উঠা কঠিন। ধনেশকে পুনরায় স্বস্থানে আটকাইয়া রাখার সঙ্গে সঙ্গে যখন আর কোন ক্ষতি ঘটিল না তখন চাক্ষুষ প্রমাণাভাব সত্ত্বেও ধনেশকে দায়ী না করিয়া থাকা যায় না। পক্ষিপালনের অভিজ্ঞতা বাস্তবিক এক্ষেত্রে আমার প্রীতিকর হয় নাই। এইমাত্র জীবের জীবনসংগ্রামের উল্লেখ করিয়াছি। নৈশবিহারী, হিংস্র জীবজন্তু অন্ধকারের সুযোগ গ্রহণ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে আহার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার পক্ষিগৃহের অভ্যন্তরে সযত্নরক্ষিত পাখীগুলি স্বতঃই এই সমস্ত জীবজন্তুর লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ইহারা বাহির হইতে পাখীর ভীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, অনেক সময় সন্ত্রস্ত পাখীগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভয়ে প্রাণ হারায়। পক্ষিগৃহরচনায় গৃহের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা পাখীর জীবনধারণের অনুকূল বা প্রতিকূল হিসাবে যথেষ্ট বিবেচিত হইলেই চলিবে না, জীবের জীবনসংগ্রামের দিক হইতে
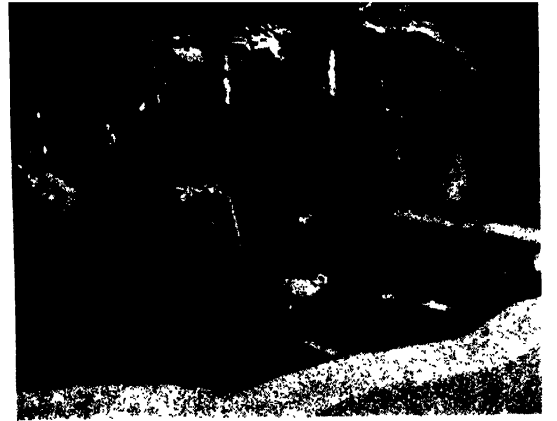
পক্ষিগৃহের অভ্যন্তরে আহারনিরত পাখী

পক্ষিগৃহের আভ্যন্তরীণ বাধাবিপত্তি সম্বন্ধে যেমন ভাবিয়া দেখা দরকার, বাহিরের পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও পক্ষিসংরক্ষণের প্রতিকূল উৎপাত ও বিপদের অবশ্যম্ভাবিতার প্রতিকার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। আমার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে পক্ষিগৃহরচনার খুঁটিনাটি

বিচার করিতে চাই না, কৃত্রিম আবেষ্টনের মধ্যে পাখীর অনুকূল আহার্য্য অথবা পক্ষিপালনের অসংখ্য বাধাবিপত্তি লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, এ সম্বন্ধে যতটুকু ইঙ্গিত করিতে সাহসী হইয়াছি তাহা আমার আয়াসলব্ধ অভিজ্ঞতার ফল সন্দেহ নাই, ইহা হইতে মনে করি আমার পক্ষিনিকেতনের সাফল্যকল্পে আমার যত্ন, পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বন যে অকারণ বা নিরর্থক নয় তাহা মোটামুটি উপলব্ধি হইবে।

মহিলা-সংবাদ

কুমারী সুবীরা দে এই বৎসর মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্‌সি পরীক্ষায় জুলজি (Zoology)তে সসম্মানে (with honours) প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের দৌহিত্রী ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নীবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডক্টর বিমানবিহারী দে মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা জায়সবাল (বর্ত্তমানে লাল-সহধর্ম্মিণী) পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন মেধাবী ছাত্রী। তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত গমন করিয়াছিলেন। সেখানে থাকিয়া উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি উপাধি লাভ করেন। তিনি শিক্ষা-বিজ্ঞানেও একটি ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। শেষে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাটনা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা পাটনার বিখ্যাত ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবালের অধীনে ব্যারিষ্টারের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বিহার-উড়িষ্যায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার। সংস্কৃত সাহিত্যেও শ্রীমতী জায়সবাল বিশেষ অনুরাগী। তিনি ইতিমধ্যে ভাসের একখানি নাটক অনুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীমতী সুবীরা দে

শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা জায়সবাল

পশ্চিমযাত্রিকী

শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ

বিলাসপুরের পথে। আজ ১২ই জুন ১৯৩২। আমরা—আমি ও আমার স্বামী, কাল বিকালে কলকাতা ছেড়ে আজ এত দূরে এসে পড়েছি এখন বেলা ছ-টা। রাত্রে কোন কষ্ট হয় নি। ট্রেন বড় দুলছে, লেখা যায় না। কলে জল নেই। কুঁজো থেকে জল ঢেলে, কুলকুচো ক'রে মুখ ধুয়ে এক বাটি জল খেয়ে বসে আছি। জলের বন্দোবস্ত হ'লেই হয়, একেবারে স্নান ক'রে ফেলি। জলের অপেক্ষায় চুলে ঝুঁটি বেঁধে বসে আছি। কাল বিকালে খড়্গপুর ষ্টেশন থেকে দুটা বড় বড় মালদহ-আম কিনেছিলুম। আকারে এক-একটি মাঝারি খরমুজ বললেই চলে। ছ-আনা জোড়া নিলে, খেতে কেমন হবে জানি না। ট্রেন মাঝে মাঝে মাঠের মাঝেই থেমে যাচ্ছে, হয়ত লাইন ঠিক নেই। আজকের সারাদিনও এই ভাবেই গেল। পথে দিনের বেলায় মধ্য-প্রদেশের ভেতর দিয়ে বড় কষ্টে সময় কাটাতে হয়েছে। অসহ্য গরম, মুখে ভিজে তোয়ালে চাপা দিয়ে ব'সে আছি। যেমন গরম হাওয়া, ধূলাও তেমনি। সন্ধ্যার পর একটু ঠাণ্ডা হ'ল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়া গেল।
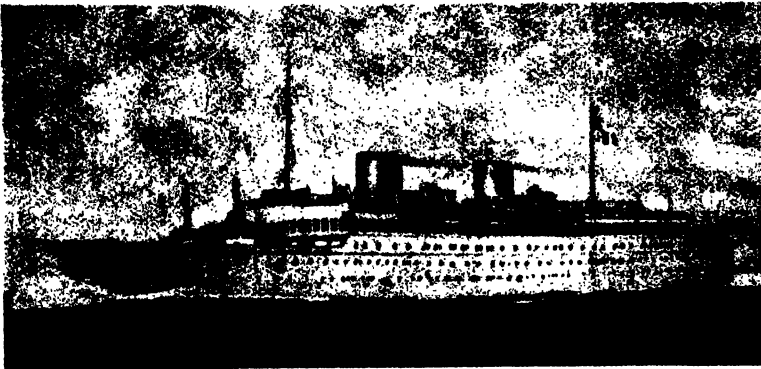
ভিক্টোরিয়া জাহাজ

পরদিন ১৩ই জুন বেলা ৯টা আন্দাজ বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনে এসে ট্রেন থামল। ষ্টেশনে আমাদের আত্মীয় শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও বন্ধু মিষ্টার সোমজি দু-জনেই দুখানা গাড়ী নিয়ে হাজির। দু-জনেরই মনের ইচ্ছা তাঁদের বাড়িতে গিয়ে স্নানাহার ক'রে তবে জাহাজে উঠি। অবশেষে স্থির হ'ল শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে আমরা স্নান ক'রে ও মিষ্টার সোমজির বাড়িতে খেয়ে টমাস কুকের আপিসে গিয়ে জাহাজের টিকিট ও অন্যান্য জিনিসের সব বন্দোবস্ত ক'রে তবে জাহাজঘাটে যাব। ভারী লগেজগুলি ষ্টেশনেই টমাস কুকের লোকের জিম্মায় দিলুম। পরে এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী সব কাজ সেরে জাহাজঘাটে গিয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। চারিদিকে লোক গিসগিস করছে। বিস্তর যাত্রী, তাদের বন্ধুবান্ধবের ভীড়ও তেমনি। সবাইকে সবাই বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে। বেশীর ভাগ মেয়েদের দেখলুম চোখ ছল ছল করছে, সত্যি কথা বলতে কি নিজের মনের অবস্থাও বড় ঠিক ছিল না। এই সব দেখে-শুনে প্যাঁচার মত মুখ ক'রে এক পাশে ব'সে রইলুম। আমাদের দুটি দল হ'ল, এক দিকে মেয়ে, অন্য দিকে পুরুষ। দু-দিকে দুটি ঘেরা জায়গায় ডাক্তার ও ডাক্তারণী বসে আছেন। তাঁরা একবার ক'রে বুড়ী ছুঁয়ে নাড়ী টিপে দেখে আমাদের শরীরগতিক কেমন বুঝলেন। সামনে টেবিলের উপর জাহাজের যাত্রীদের নামের লিষ্টছাপান কাগজ রয়েছে, সেই দেখে ও জিজ্ঞাসা ক'রে মিলিয়ে নিয়ে আমাদের ছাড়লেন। যাত্রীর দল ব্যালার্ড পীয়ারে জাহাজের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড জাহাজ, মাঝে মাঝে বিকট স্বরে ভোঁ বাজছে, পেটের নাড়ীভুঁড়ী উঠছে। ওপর থেকে সিঁড়ি নামিয়ে দিয়েছে। সিঁড়ির গোড়াতেই ভীমদর্শন কড়া সার্জেণ্ট। ছাড়পত্র দেখে তবে

সব চমকে ওপরে উঠতে দিচ্ছে। সিঁড়ির শেষে আর এক জন আছেন। তিনিও এই কাজ করছেন। টমাস কুকের কুলীরা কতক মালপত্র নিয়ে আগেই উঠেছিল, পরে কতক নিয়ে আমরা উঠলুম। বন্ধুবান্ধবের দলও জাহাজখানির ভেতর দেখবার জন্য আলাদা টিকিট কেটে ওপরে উঠে এলেন। জাহাজের এক জন কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে কেবিন দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, কেবিনের নম্বর ১৬১ ও ১৬২। কয়েক দিনের জন্য ভাড়াটে ঘরটিতে লগেজ মেলাতে ব'সে গেলুম। ঘরের আসবাব, দুখানা বিছানা করা খাট, মেঝের সঙ্গে আটকান। কোনমতেই নড়ান যায় না। তিনটি বড় দেরাজওয়ালা একটি টেবিল (কাপড়চোপড় রাখবার জন্যে), একটি চা খাবার ছোট টেবিল, একটি আয়নাওয়ালা ওয়ার্ড্রোব আলমারী, একটি কুশন-সমেত বড় কোচ, একটি ছোট ওয়েষ্ট পেপার বাসকেট। খাটের দু-পাশে দুটি ছোট ছোট আলমারীর মতন। এর ভেতর চেম্বার পট রাখা যায়। ওপরে জলের ছোট কাচের কুঁজো ও গেলাস।

কেবিনের ভেতর পাখা নেই। অসহ্য গরম বোধ হ'তে লাগল। দুটি খাটের ওপর ছাদ থেকে দুটি হাঁড়ি ঝুলছে। তার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। একটি মাত্র জানালা (port hole) তাও বন্ধ ক'রে দিয়ে গেল। যাবার সময় কেবিন-বয় আমার মুখের সামনে দুটা হাত ঘুরিয়ে ব'লে গেল 'নো ওপেন্'। সে বেচারী ইটালীয়ান, ভাল ইংরেজী বলতে পারে না, কি করবে। বলতে ভুলে গেছি, আমাদের জাহাজখানির নাম M. V. Victoria. ইটালীয়ান নাম "মতো নাভে ভিক্তোরিয়া।" ষ্টীমে চলে না, মোটর-বোটের মত এন্‌জিন আছে। জাহাজ প্রায় বেলা একটা আন্দাজ ঘাট থেকে ছাড়লো। দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই সামনে থেকে বোম্বাই শহরের হাইকোর্ট, তাজমহল হোটেলের চুড়ো, গীর্জ্জা, ঘরবাড়ি, লোকজন সব একাকার হয়ে গিয়ে চারি দিকে নীলজল থৈ থৈ করতে লাগল। ব্যালার্ড পীয়ারের বন্ধুর দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল ওড়াতে লাগলেন, অনেক দূর থেকে শুধু রুমালগুলি দেখা যেতে লাগলো। ঠিক যেন এক ঝাঁক সাদা পায়রা উড়ছে। জাহাজের ভেতরটা এবার ভাল ক'রে দেখে মনে হ'ল একটি সাজান বড় হোটেল কে যেন জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। এমন

এডেন—মৎস্যনারী

সময় দুপুরের খাওয়ার ঘণ্টা পড়লো। জাহাজ তখন রীতিমত দুলছে। খাবার ঘরে গিয়ে চক্ষুস্থির। প্রকাণ্ড হল, তাতে নানা জাতের প্রায় দুশো লোক একসঙ্গে খেতে বসেছে। হলের সামনের ও পেছনের দেওয়াল খুব পালিশওয়ালা কাঠের, তাতে পেতলের তৈরি মানুষ, গাছপালা হরিণ এই সব বসিয়ে ছবির মত করা হয়েছে। সামনেই ব্যাণ্ড বাজছে। ইটালীয়ান সুর আমার বেশ লাগলো। খাওয়া-দাওয়া খুব ভাল; অনেক রকম থাকে, অত খাওয়া যায় না। খেতে ব'সে খালি মনে হ'তে লাগলো চেয়ারের তলায় কে যেন কেবলই ঠেলা মেরে কাৎ ক'রে ফেলবার চেষ্টা করছে। বুঝলুম সমুদ্র উৎপাত সুরু করেছেন। খাওয়া সেরে বাইরে 'ডেকে' এলুম। এসেই সমুদ্রের হাওয়াটায় কেমন একটা আঁসটে গন্ধ ও গরম ভাপ পেলুম। খাবার ঘরটি সব কুলিং সিষ্টেমে তৈরি।

স্ফীংস

ভেতরে খানিক ক্ষণ থাকলে বাইরের গরম অনুভব করা যায় না। ডেকে খানিকটা হেঁটে বেড়াব মনে করলুম, কিন্তু মাথাটা ঘুরতে লাগলো; বিরক্ত হয়ে ড্রয়িং-রুমে এসে একটা গদীওয়ালা চেয়ারে ব'সে রইলুম। ষ্টুয়ার্ড সামনে কফির পেয়ালা এনে হাজির। তাকে ব'লে দিলুম আমার ওসবে দরকার নেই। সে চলে গেল। যাবার সময় দু-বার ফিরে ফিরে আমায় দেখে গেল। বিরক্ত হলুম, আ ম'লো যা, আমি একটা হাতী না ঘোড়া? এত দেখবার কি আছে রে বাপু। মরছি নিজের জালায়। একটু পরেই দেখি যে তার কফির ট্রে রেখে একটা প্লেটে ক'রে কয়েকটি পাতিলেবু ও বরফের টুকরো নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে গেল ও এবারে ফিরে যাবার সময় সামনের জানালাটা ভাল ক'রে খুলে পর্দ্দা সরিয়ে দিয়ে গেল যাতে মুখে বেশ হাওয়া লাগে আর বরফের কুচি মুখে রাখবার জন্যে ব'লে গেল। তখন বুঝতে পারলুম আমার যে গা বমি-বমি করছে, সেটা ও আগেই টের পেয়েছিল, কাজেই যাবার সময় অত দেখছিল। এ-সব কাজে এরা খুব তৎপর। এই ধরণের অসুখে জাহাজে মোটামুটি সেবা মন্দ হয় না। ব'সে থাকতেও কষ্ট হ'তে লাগল, শেষকালে আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল গোটা জাহাজখানা এইবেলা ঘুরে দেখে বেড়াই না? মনটাও অন্য দিকে যাবে, আর তা হ'লে গা-বমিও ক'রবে না। এক টুকরো বরফ মুখে পুরে সিঁড়ি-বেয়ে টলমল ক'রে নেমে দোতালায় ত এলুম, ওমা! চতুর্দ্দিকে তখন ভূমিকম্প সুরু হ'য়ে গেছে, মনে জোর ক'রে ষ্টুয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করলুম, থার্ড ক্লাসের রাস্তাটা দেখিয়ে দাও ত, আমি একবার ওদিকটা দেখ্‌ব। ষ্টুয়ার্ড দেখিয়ে দিতেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আবার একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে থার্ড ক্লাসের ডেকের উপর এসে পৌছলুম। বেশী দূর যেতে হ'ল না, সাম্‌নেই একটা চেয়ার ছিল তার উপর ধপাস ক'রে ব'সে পড়তেই বমি সুরু হ'য়ে গেল। খাবার সময় যা-যা জিনিস খেয়েছিলুম, সমস্তই পরের পর সাজিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু পরে আশপাশে নজর পড়তেই দেখি সকলেরই আমার মত অবস্থা। সকলের হাতে এক গ্লাস ক'রে জল ও একখানা ক'রে তোয়ালে, আর সবাই ডেকের দু-ধারের নর্দ্দমার ধারেই চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে গেছে। চারিদিকে খালি বমির দুর্গন্ধ, খালাসীরা অনবরত জল দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে। গতিক বড় সুবিধার নয় বুঝে আমরা দু-জন ষ্টুয়ার্ডের হাত ধরে টল্‌তে টল্‌তে কোন রকমে নিজেদের ক্যাবিনের ভিতর এসে

রামেশিসের মূর্ত্তি

বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়লুম। বিছানার পাশের দেওয়ালে বোতাম টিপ্‌তেই ষ্টুয়ার্ট ও ষ্টুয়ার্ডেস এসে আমাদের দু-জনের কাপড় ছাড়িয়ে মুখ ধুয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

বালিস থেকে মাথা তুল্‌তে গেলেই মাথা ঘুরে যায়। কাঠের পালিশ-করা কড়ির ওপর ঢেউয়ের ছায়া পড়েছে; বন্ধ পোর্ট-হোলের কাঁচের ওপর জোরে জোরে জলের ধাক্কা লাগতে সুরু হ'ল, শুয়ে শুয়ে তাই দেখ্‌ছি আর ভাব্‌ছি সেই জন্যই বন্ধ করবার সময় বলেছিল "নো ওপেন্‌"। তেতলার উপর কেবিন, তার জানালার ওপরও জল উঠছে— মাঝে মাঝে মনে হ'তে লাগল

এডেন — ক্যাম্প টাউন

খাটখানা আমার বুঝি কাৎ ক'রে দিলে ফেলে। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম, সকল দিকই তুল্‌ছে। ঘরে একটুও বাতাস নেই। দু-জনেই প'ড়ে আছি, উঠে বস্‌বার ক্ষমতা নেই। এক জন লাঠি ও এক জন ছাতার বাঁটের সাহায্যে হাওয়ার হাঁড়ি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সমস্ত শরীরে বাতাস লাগাচ্ছি। বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে বাড়ির নানা রকম সুখ-সুবিধার কথা মনে প'ড়ছে, তৎক্ষণাৎ মনকে বোঝাচ্ছি একটু কষ্ট না করলে কি ক'রে অতসব দেশ দেখব? জাহাজমুগ্ধ লোকের ত এই অবস্থা। এই রকম ক'রে আড়াই দিন কেটে গেল। জাহাজে ওঠবার সময় বন্ধু সোমজি কিছু ভাল এলফোঞ্জ আম দিয়েছিলেন, সেগুলি কেবিনেই ছিল। এই দু-দিন খালি আম ও নেবুর সরবৎ খেয়েছিলাম।

আজ ১৬ই জুন, জলের অবস্থা একটু ভাল। আমি কোন রকমে আঁচলখানা কোমরে জড়িয়ে, লিফ্‌ট্‌ বেয়ে ওপরে এসে ডেক-চেয়ারে চোখ বুজে ব'সে আছি। আজ সকলে উঠে ব'সেছে ও পরস্পরের মধ্যে এই দু-দিন কার কি ভাবে কাট্‌ল সেই কথা আলোচনা ক'রছে। ওপরের ডেকে এসে ব'স্‌তে পারলে শরীর তবু ভাল মনে হয়। আরব্য-সাগরের ভিতর দিয়ে চ'লেছি, জলের রং ব্লুব্ল্যাক কালীর মত। ঢেউ-ভাঙা ফেনার দিকে দেখলে মনে হয় কে যেন বস্তা বস্তা পেঁজা তুলো জড়াচ্ছে। ভীষণ সৌন্দর্য্য, দেখলেই মাথা ঘুরছে। যত বেলা বাড়ছে জলের রং তত কালো দেখাচ্ছে। আজ সব কেবিনের পোর্ট-হোল খুলে দিয়েছে। শুন্‌ছি রাত ১২টায় জাহাজ এডেন বন্দরে পৌঁছবে এবং কাল সকাল ৮টায় ছাড়বে।

আজ ১৭ই জুন, এখন বেলা ২-১৫, মিনিট, আমি লাঞ্চ খেয়ে লিখতে ব'সেছি। জাহাজ কাল রাত ৩টার সময়ে এডেন বন্দরে পৌঁছেছিল, আজ সকাল ৭টায় ছেড়েছে। শরীরে তেমন যুত না থাকায় ডাঙ্গায় নেমে মোটে দেখি নি। আমরা এখন লোহিত-সাগরের ভিতর দিয়ে চ'লেছি। এক দিকে আফ্রিকা, অপর দিকে আরবদেশের তীরভূমি দূরে দেখা যাচ্ছে। অনবরত পশ্চিম দিকে চ'লেছি, জাহাজের ঘড়ি রোজ আধ ঘণ্টা ক'রে পেছিয়ে দিচ্ছে। শুন্‌ছি হাওয়ার উত্তাপ ক্রমশই বাড়বে, কারণ জলের দু-পাশেই মরুভূমি। এখন জলের রং ফিকে নীল; লোহিত কখন দেখব জানি না।

আমাদের পরম বন্ধু শ্রীঅবনীনাথ মিত্র মহাশয় সস্ত্রীক তৃতীয় শ্রেণীতে চলেছেন। তৃতীয় শ্রেণীকে এখানে সেকেণ্ড ইকনমিক্‌ বলা হয়। অবনী বাবুর কোন রকম সামুদ্রিক পীড়ার উৎপাত হয় নি, সুতরাং সমস্তই নির্ব্বিবাদে খেয়ে হজম করেছেন, তবুও পেটে যেটার নিতান্ত জায়গা হচ্ছে না, সেটার জন্য দুঃখ জানিয়ে বলছেন "তাই ত এটা ত কিছুতেই খেতে পারছি না। বেটারা ত পুরো ভাড়াটা আদায় করছে। ফেরবার আগে উস্থল করতে পারলে হয়। তাঁদের দিকে নানান জাতের

পিরামিডের সাধারণ দৃশ্য, কাইরো

ইংরেজদের ছোট ছেলে কথা কইছে। এরা আলুকে পোটেটো না ব'লে পতাতো বলে। আমাকে এক দিন "পতাতো ইন্ জ্যাকেং" অর্থাৎ খোসাসমেত সেদ্ধ-করা আলু খেতে দিয়েছিল। আজ দুপুরে খাওয়ার জন্য মটন্ কারী ও ভাত হুকুম করেছি। ইটালীয়ান বামুন পেরে উঠবে কিনা জানি না।

আমাদের সুয়েজ থেকে নেমে ঈজিপ্টে গিয়ে পিরামিড্ দেখবার কথা হ'চ্ছে। দেখা যাক্ কি হয়। জাহাজ থেকে অনেকেই দল ক'রে যাচ্ছে। আজ সকালে রান্নাঘরে গিয়ে পাউরুটি তৈরি দেখে এসেছি। রুটিগুলি সামুদ্রিক জন্তু— মাছ, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদির আকারে তৈরি হয়। মাখা ময়দাকে চটপট হাতের তেলোর সাহায্যে গ'ড়ে তার পর ইলেকৃট্রিক মেশিনের উত্তাপে সেঁকা হচ্ছে। মাথাটা এখনও একটু গোলমাল ক'রছে, ক্রমশঃ জাহাজে আর কোথায় কি আছে দেখতে হবে। এখন বিকাল ছয়টা, এই মাত্র জাহাজ-ডুবির রিহার্সাল হ'য়ে গেল। ঠিক পাঁচটার সময় হঠাৎ ভেঁা বেজে উঠলো, যাত্রীর দল সবাই জিনিষপত্র ঘরে ফেলে ডেকে গিয়ে লাইফ্ বেল্ট প'রে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন জোর ক'রে হাসি টিপে গম্ভীর হয়ে সকলের তদারক করলে, সবাই বেল্ট প'রে ঠিক্ ভাবে দাঁড়িয়েছে কিনা, যেন কতই বিপদ উপস্থিত। কয়েক মিনিট পরেই আবার ভেঁা বেজে উঠলো, সবাই বেল্ট খুলে হাসি লাগিয়ে দিলে।

জাহাজে এলে এ ধরণের মজা অনেক দেখা যায়। রোজ রাত্রে ডিনারের পর ঘর খালি ক'রে সিনেমা দেখায়, আমরা রোজই সিনেমা দেখছি। এডেন ছাড়বার পর মাঝে মাঝে সমুদ্রে বালির পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, রৌদ্রের আলো প'ড়ে মনে হয় যেন বরফের চাঁই ভাসছে। রাত্রে এই সব ছোট ছোট পাহাড়ের মাথায় লাইট্-হাউস্ দেখা যায়। জলে চাঁদের আলোও খুব পড়ছে। এত ভাল দৃশ্য দেখা সত্ত্বেও চারি দিকে

সহযাত্রী ও সহযাত্রিনী আছেন। তিনি সকলের সঙ্গেই দাদা-দিদি, খুড়ো, মামা, পাতিয়ে খুব হাসাচ্ছেন ও নানান ভাষায় কথা কইছেন। আজ এডেন থেকে এক টিন আনারস এনে আমায় দিয়েছেন। বাড়ি থেকে আসবার সময় মা সঙ্গে কিছু চিঁড়ে, গোটামসলার গুঁড়া ও নিজের হাতের তৈরি আমসত্ত দিয়েছিলেন। আজ তার থেকে কিছু অবনীবাবুকে দিলুম। তাঁর কাছ থেকে এক শিশি কাসুন্দিও পেয়েছিলুম, ডাইনিং সেলুনে সেটিকে টেবিলে দেখ্‌লেই অনেকে ভাগ বসাত। অবনীবাবু তাঁদের দিকের ইটালীয়ান রাঁধুনী-বামুনকে বাংলা ভাষায় ব'কে-ঝ'কে তালিম দিয়ে "আলুর দম" রান্না শিখিয়েছেন। জাহাজে এই রকম দুই-একটি লোক থাকলে অন্যান্য যাত্রীদের অনেক সুবিধা হয়। সেকেণ্ড ইকনমিকের দিকে বাবুয়ানীর বালাই নেই, সবাই ডেকের ওপর একটা ঢালা বিছানা ক'রে তাতে ব'সে তাস, পাশা, দাবা পিটছে। এক জন যাত্রী বক্সহারমোনিয়ম নিয়ে সা, নি, ধা, পা, সুরু করেছেন। বেশীর ভাগ সময় এঁদের ছাতেই কাটাতে হয়। ঘরে অসহ্য গরম, সব ঘরে আবার পোর্ট-হোল নেই।

জাহাজে কারুর শরীর খারাপ হ'লে পরস্পর পরস্পরকে দেখছে। এটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। ইটালীর মেয়ে ও পুরুষ সকলকেই দেখতে বেশ ভাল। এই জাহাজে খাবার সময় যারা বাজনা বাজায় ও পরিবেষণ করে, তারা সকলেই সুপুরুষ। এদের মুখে ইংরেজী কথা শুনলে মনে হয়

উপরে—এডেনের সাধারণ দৃশ্য ; মধ্যে—জলধারসমূহ; নীচে—পোষ্ট অফিস বে

শুধু জল আর জল দেখে মনটা মাঝে মাঝে কি রকম করে।

২১শে জুন। এই দু-দিনের মধ্যেই আমরা কায়রো শহর দেখতে যাবার জন্য টিকিটের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল্‌লুম। দেশে যেখানে যা চিঠি পাঠাবার ছিল ১৯শে জুন তারিখেই জাহাজের পোষ্ট অফিসে জমা দিয়েছিলুম। জাহাজের যাত্রীদের এই সব দেখানো-শোনানোর বন্দোবস্ত টমাস্ কুক কোম্পানীই ক'রে থাকে। এর জন্য স্বতন্ত্র টিকিট জাহাজেই পাওয়া গেল। জাহাজ সুয়েজ-খালে ঢুক্‌লে, সেখান থেকে নেমে আমাদের কায়রো যাবার কথা ছিল। সেই জন্য রাত্রে খাবার পর সিনেমা দেখে শুতে যাবার সময় আমাদের কেবিন-বয়কে ডেকে বল্‌লুম, রাত্রে জাহাজ যখন সুয়েজ-খালে ঢুকবে সে যেন আমাদের ডেকে দেয়। সে বললে জাহাজ এখনই সুয়েজের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কাজেই বিছানার মায়া পরিত্যাগ ক'রে তাড়াতাড়ি একটা ছোট স্যুটকেসে আমাদের দু-জনের ছাড়বার মতন জামা কাপড় ও দুইটি ছোট তোয়ালে, ছোট্ট এক কৌটা মশলা, একটি সাবান, ছোট এক শিশি আয়ডিন, গোটা-কয়েক তুলো-জড়ান কাঠি, এক শিশি হেয়ার লোশান, এক শিশি ব্লোরোদক ও মাথার চিরুণী ও বুরুশ ইত্যাদি কয়েকটি জিনিস নিয়ে, গরম কোট পরে ও হাতে ছাতা নিয়ে তৈরি হ'য়ে পোষ্ট আপিসের সামনে চেয়ারে ব'সে রইলুম। আমাদের মতন অনেকেই সেখানে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সঙ্গে কিছু ইজিপ্সিয়ান টাকাকড়ি নেওয়া

বৃষ্টির জলে পূর্ণ আধারসমূহ

হ'ল। জাহাজের পোষ্ট অফিসে চেঞ্জ পাওয়া যায়। একটু পরেই সুয়েজ শহরের আলো জাহাজ থেকে দেখা যেতে লাগল। জলের অত শব্দ ও ঢেউ কমে গেল। রেলিঙের ধারে এসে দেখে মনে হ'ল জাহাজ যেন একটা চওড়া নদীর মোহানায় এসে দাঁড়িয়েছে। জাহাজের ঠিক তলায় একটি মস্ত বড় কাঠের তক্তা ভাসছে। ওপর থেকে ইলেক্‌ট্রিক আলো পড়েছে। তার ওপরে সিঁড়ি নামিয়ে দিলে। তখন চারি দিকে খুব চাঁদের আলো। জলের ওপর মোটর-লঞ্চ ও তাদের লোকদের আরব্য ভাষায় তর্কাতর্কি, দর-কষাকষি, চেঁচামিচি শোনা যেতে লাগল। আমরা কায়রো-যাত্রীর দল রাত একটা দশ মিনিটের সময় (কলকাতা টাইম ভোর সাড়ে চারটা) সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা মোটর-লঞ্চের ওপর গিয়ে বসলুম। আরবী বোট-ম্যান তার হেঁড়ে গলায় চীৎকার ক'রে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজী ভাষায় আমাদের সকলকে ডেকে জানিয়ে দিলে যে আমরা যেন কায়রো শহরে নেমে গাইড ছাড়া কারুর কথায় না বিশ্বাস করি, কারুকে কোন কারণে যেন পয়সা না দিই, কেননা চারি দিকে সেখানে ঠগ-জোচ্চরের দল ঘুরে বেড়ায়। আমাদের যা-কিছু সব করবে টমাস কুক কোম্পানী। মোটর-বোট আমাদের হুস্ হুস্ ক'রে নিয়ে গিয়ে একেবারে সুয়েজ-বন্দরের মুখে নামিয়ে দিলে। সেখানে আমাদের জন্য চার-পাঁচখানা বুইক্ মোটর গাড়ী অপেক্ষা করছিল। আমরা দলের সকলে ভাগাভাগি ক'রে এক একটা গাড়ীতে উঠে পড়লুম। আমাদের গাড়ীতে আমরা তিন জন বাঙালী ও দু-জন আমেরিকান্ মহিলা ও ড্রাইভার—মোট এই ছ-জন ছিলুম। গাড়ী প্রথমে আমাদের সুয়েজের কাষ্টম আপিসে নিয়ে গেল। সেখানে আমাদের বাক্‌স-প্যাটরা ঘেঁটে খানাতল্লাসী ক'রে বুঝলে আমরা কি-রকম ধরণের লোক। তার পর পাসপোর্ট দেখে ছেড়ে দিলে। এ সব কারবার আমাদের বেশীর ভাগ ইসারাতে চলতে লাগল। কেননা এখানে লোকে ফরাসী ও আরবী ভাষা ছাড়া কথা কইতে পারে না। ইংরেজী খুব সামান্যই জানে। আমাদের গাড়ী এবার খুব জোর ছুটতে সুরু করলে। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় চারি দিকে দেখতে পেলুম কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপটে মরুভূমির ওপর জলের মত বালির ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আমরা সাহারা মরুভূমির এক অংশের ভেতর দিয়ে যেতে লাগলুম।

এখানে এরা সাহারা বলে না। নিউবিয়ান ডেজার্ট বলে। মানুষের নেড়া মাথায় প্রথমে ছোট্ট ছোট্ট চুল বেরুলে যেমন দেখতে হয়, চাঁদের আলোতে চারি দিকে মরুভূমির ধূ-ধূ করা বালির ওপর সেই রকম ছোট্ট ছোট্ট কাঁটাগাছ দেখতে পেলুম। তা ছাড়া আর কোন গাছ তখন নজরে পড়ল না। অদ্ভুত রকম শীত। হাওয়ার চোটে চোখে-মুখে বালি আসতে লাগল, ঠিক যেন ডেঁয়ে-পিঁপড়ের কামড়। বেশ চলছি, হঠাৎ ফট ক'রে চাকা ফাটল। পথে নেমে নতুন চাকা পরাতে আধ ঘণ্টা সময় লাগল। তার পর আবার ছুট। কত মাইল ঠিক মনে নেই, প্রায় আশী হবে, যাবার পর আমাদের মোটর ইজিপ্টের রাজধানী কায়রো শহরের স্যাভয় কন্টিনেণ্টাল হোটেলে এসে থামল। এই হোটেলেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য টমাস কুক কোম্পানী সব

বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিল। আমরা গাড়ী থেকে নামবা মাত্রই একটি বেঁটে, মোটা, গোলগাল লালটুকটুকে চেহারার লোক এগিয়ে এসে জানালে সে আমাদের গাইড। তার পরনে লম্বা সাদা ঢিলা পায়জামা, ধূসর বর্ণের গলা-খোলা কোট ও মাথায় কালো রেশমের গোছাওয়ালা লাল বনাতের ফেজ টুপি। অন্য এক জনও তার সঙ্গে সঙ্গে এল, শুনলুম ইনিও গাইড। এর চেহারা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। লম্বা-চওড়া লোক, রং শ্যামবর্ণ, পরণে ঢিলা সাদা ইজের, সবুজ লম্বা আলখাল্লা, পায়ে শুঁড়ওলা নাগরা। এক জন পিরামিড ও মসজিদ সম্বন্ধে বলতে পারবেন, অপর জন অন্যান্য খবর দেবেন। দু-জনেরই চেহারাখানা দেখে নিলুম। আমরা মেয়ের দল মেয়েদের বাথরুমে ঢুকলুম। বাবুরা তাঁদের দিকে গেলেন। মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসা গেল। চা এল ত টোষ্ট আসে না, টোষ্ট যদি বা পাওয়া গেল ত মাখন নেই, পেটে এদিকে তখন দারুণ খিদে। ব্যাপার কি জানবার জন্য আমাদের ভিতর এক জন তড়বড় ক'রে উঠে এসে দেখে বললে, চাকরবাকররা সব এই সবে ঘুম থেকে উঠেছে। তারা এখনও কাপড়চোপড় প'রে রেডি হ'তে পারে নি ত জিনিষ দেবে কি ক'রে। যাই হোক, ক্রমশঃ সবই পাওয়া গেল। চা, রুটি, ডিম, পরিজ ইত্যাদির সদ্ব্যবহার ক'রে আবার গাড়ীতে ওঠা হ'ল। আবার খানিক দূর পাড়ি দিয়ে একেবারে পিরামিডের তলায় এসে থামলুম। প্রচণ্ড রোদ, রাত্রের অত শীত তখন কোথায় পালিয়েছে। আমাদের জন্য সারবন্দি উট দাঁড়িয়ে আছে। এইবার ত উটে চড়তে হবে; মুস্কিল। সকলেই বেশ চ'ড়ে বসল, আমি ও মিসেস্ কাশীনাথ দু-জনে যুক্তি ক'রে একটা অদ্ভুত-গোছের ঘোড়ার গাড়ী, না-টাঙ্গা না-একা তাইতে চ'ড়ে হমেনস্ত হমেনস্ত করতে করতে চললুম। চতুর্দ্দিকে বালিতে আচ্ছন্ন হ'তে লাগল।

তার ওপর পক্ষীরাজছটির কৃপায় ঝাঁকুনিও কম

পিরামিড (দক্ষিণ প্রান্তে লেখিকা দণ্ডায়মান)

লাগছিল না। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের একটি এই পিরামিড! তা দেখা হ'ল, অদ্ভুত ব্যাপার এর ভেতরে যাবার রাস্তার দু-পাশে বড় বড় থাম ও তাদের মাথার ছাদগুলি দেখে অবাক হয়ে গেলুম। কোন পাথরের কোন জায়গায় জোড় নেই। সমস্তই বড় বড় এক এক খণ্ড পাথরের দ্বারা আলাদা আলাদা তৈরি। এক-একখানা পাথর বোধ হয় এক-একটি ঘরের মত বড়। গাইডের মুখে শুনলুম তখনকার দিনে এ-সব তোলবার জন্য ক্রেনের সৃষ্টি হয় নি। এ-সব কাজ একমাত্র বলবান ক্রীতদাসদের দ্বারাই সম্পন্ন হ'তে পারত। চারি দিক দেখে মনে হ'ল না-জানি কত ক্রীতদাসই ছিল ও তাদের ক্ষমতাই বা কেমন। এইখানে আমাদের ছবি তোলা হ'ল। ছবি তোলবার লোক সর্ব্বত্রই বেড়াচ্ছে। একবার হুকুম পেলেই হয়, ফট্ ক'রে তুলে, তাকে ছেপে যথাসময়ে তোমার কাছে হাজির করবে। ফটো তুলতে গিয়ে সে এক হাসির ব্যাপার, আমরাও চড়ব না, আর গাইডও ছাড়বে না, বলে কি ছবি তোলবার সময় অন্ততঃ একবার উটের পিঠে চড়তেই হবে। তাকে বোঝান গেল আমরা মাটিতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাতেই ভালবাসি। সে নাছোড়বান্দা, বললে উটের পিঠে নিতান্তই যদি না ওঠ ত, উটের লাগামটি হাতে ধ'রে তোমাদের 'হাস্‌ব্যাণ্ডে'র ঠিক পাশেই দাঁড়াও, তা হ'লে কায়দাটা মন্দ হবে না।—কি করি, পড়েছি যবনের হাতে, একবার ধরতে চেষ্টা করলুম, পোড়া উট এমন বিকট স্বরে ডেকে উঠল যে লাগাম ছেড়ে দিয়ে ব'লে—ফেললুম, না বাপু, কাজ নেই এ-সব কায়দায়। বাঙালীর মেয়ে, সকাল হ'লেই ভাঁড়ার বের ক'রে বঁটি পেতে কুটনোয় বসা অভ্যেস, এ হেন মনিষ্যি চোখে পিরামিড দেখছি তাই যথেষ্ট। স্বামীর অন্যান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখব এখন, তাঁর উটের লাগাম না ধরলেও চলবে। আমরা মিশরের মমী সেদিন আর দেখতে পাই নি, কারণ মিউজিয়াম বন্ধ ছিল। সেদিন সোমবার। টুটেনখামেনের সমাধি-মন্দিরও বাদ পড়ল, সে দেখতে গেলে লুক্সর যেতে হবে, এখান থেকে অনেক দূর।

ক্রমশঃ

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণ-ঘাতকের খড়্গে করিতে ধিক্কার
হে মহাত্মা, প্রাণ দিতে চাও আপনার,
তোমারে জানাই নমস্কার।

হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে,
রক্তাক্ত করিতে পূজা সঙ্কোচ না মানে।
সঁপিয়া পবিত্র প্রাণ, অপবিত্রতার
ক্ষালন করিবে তুমি সঙ্কল্প তোমার,
তোমারে জানাই নমস্কার॥

মাতৃস্তনচ্যুত ভীত পশুর ক্রন্দন
মুখরিত করে মাতৃ-মন্দির প্রাঙ্গণ।
অবলের হত্যা অর্ঘ্যে পূজা-উপচার—
এ কলঙ্ক ঘুচাইবে স্বদেশ মাতার,
তোমারে জানাই নমস্কার॥

১৫ ভাদ্র, ১৩৪২

শান্তিনিকেতন

বহির্জ্জগৎ

বিশ্বের রণসজ্জা

বিগত মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধরত জাতিগুলি সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শান্তিকামীরা সভাসমিতি করিয়া ঘোষণা করিলেন, প্রাণঘাতী যুদ্ধ করিয়া কোনও লাভ নাই, পৃথিবী হইতে যুদ্ধের ভাব লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা বুঝিলেন না, মানুষের মনোবৃত্তি
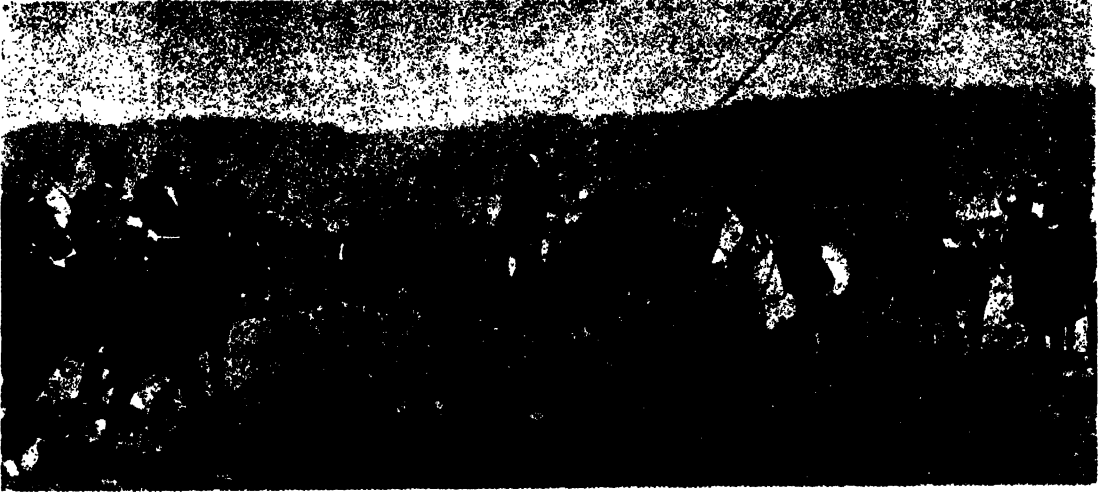
চেকোস্লোভাকিয়ার রণসজ্জা। কুচকাওয়াজ দর্শনের জন্ত প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিকের আগমন

বদলানো যায় না, তাই যুগে যুগে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম বা সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সংগ্রামের ভাব বর্ত্তমান। মানুষ যখন জাতিতে সংঘবদ্ধ হয় নাই, কতকগুলি সম্প্রদায় বা উপজাতিতে মাত্র বিভক্ত ছিল, তখন হইতে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্যে ইহাদের শক্তি পরীক্ষা হইত। পরে সংঘর্ষের ফলে যাহারা টিকিয়া থাকিল তাহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া এক একটি জাতির সৃষ্টি করিল। এই প্রকারে বর্ত্তমান জাতির (nation) উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমে তাহার অন্তর্ভুক্ত লোকসমষ্টির কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এখন আর এক জনের বা এক সম্প্রদায়ের

চীন জাপান সংঘর্ষ। সাংহাইয়ের পথে চৈনিক সেনার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

নিরস্ত্রীকরণ সভার প্রাকালে কোন ব্রিটিশ অস্ত্র-কারখানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত ছোট কামানের সারি

স্বার্থে আঘাত লাগিলে অস্ত্রে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় না, অন্ততঃ অগ্রসর হইবার রীতি নাই। এখন বিচারালয়ে পরস্পরের দ্বন্দ্ব-কলহের মীমাংসা হইয়া থাকে। কিন্তু জাতিতে জাতিতে স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। বিগত মহাযুদ্ধের পর প্রথমতঃ বিজেতা ও পরে বিজেতা বিজিত উভয়বিধ জাতিদের লইয়া রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—জাতিগুলির পরস্পরের কৃষ্টিগত মিলন স্থাপন ও বিনা যুদ্ধে বিবাদ-কলহের মীমাংসা করা। গত পনর বৎসর ব্যাপী রাষ্ট্রসংঘ তাহার উদ্দেশ্য সাধনে কতকটা সমর্থ হইয়াছেন সংবাদপত্র-পাঠকের তাহা নিশ্চয়ই অবিদিত নাই। তবে সমষ্টিগত ভাবে শান্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও এরূপ চেষ্টারও সার্থকতা আছে নিঃসন্দেহ।

আজ কয়েক মাস ধরিয়া ইটালী ও আবিসিনিয়ার যে সংগ্রামের আয়োজন চলিতেছে, তাহাতে সকলেই বিচলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে আবিসিনিয়া দুরধিগম্য থাকায় ইটালীর কর্ণধার মুসোলিনী ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী অক্টোবর মাসেই ইহার বিজয়-কার্য্য আরম্ভ হইবে। নানা অছিলায় আবিসিনিয়া করায়ত্ত করিয়া ইটালীকে সমৃদ্ধ করাই মুসোলিনীর উদ্দেশ্য। মুসোলিনীর বাণী জাতির আত্মাভিমানকে স্পর্শ করিয়াছে। উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার প্রস্তাব বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান কালে যতগুলি যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার মূলে দুইটি ধারা লক্ষ্য করি—(১) দুর্ব্বলের রাজ্য হরণ করিয়া বা তাহার নিকট হইতে স্বেচ্ছামত আর্থিক ও অন্যবিধ সুবিধা আদায় করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি ও (২) দুই প্রবল পক্ষের মধ্যে স্বার্থসংঘাত ও শক্তি পরীক্ষা। বিগত মহাযুদ্ধে দ্বিতীয় ধারা বলবৎ দেখিতে পাই। বর্ত্তমান ইটালী-আবিসিনিয়া দ্বন্দ্ব প্রথম ধারার প্রমাণ।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধের ভাব কায়েম করিয়া রাখার পক্ষে আর একটি ধারা কিছুকাল যাবৎ কার্য্য করিতেছে। গত মহাযুদ্ধে যখন ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি মিত্রশক্তিবর্গের সঙ্গে জার্ম্মানীর যুদ্ধ চলিতেছিল তখনও ইহাদের অস্ত্রনির্ম্মাণের কারখানাগুলি শত্রুমিত্র সকলকেই যুদ্ধের

ফ্রান্সের একটি সমরাঙ্গন। বিদ্রোহী টোড়া জাতির উপত্যকা (ফরাসী মরক্কো) ফ্রেঞ্চ রেসিডেণ্ট লুসিয়েন সাঁ ও সেনাধ্যক্ষগণ পরিদর্শন করিতেছেন।

ফ্রান্সের আর একটি সমরাঙ্গন। সাহারায় আরবীদিগের কুচ

সরবরাহ করিতেছিল। আবার যেখানেই কোনরূপ বিরোধ মীমাংসার জন্ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় এই কারখানাগুলির চাঁই সেখানে গিয়া যাহাতে পরস্পরের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা না-হয় তাহার চেষ্টা করে, এবং চেষ্টা সফল হইলে শত্রুমিত্র উভয় পক্ষের অস্ত্র-সরবরাহের অর্ডার লইয়া আসে। এই প্রসঙ্গে স্তর বেসিল জাহারফের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শায়েস্তা করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করিতে চান, বা অন্ত প্রবল পক্ষকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজে প্রবল হইতে চান, যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, তাহা সাধন করিবার জন্ত পূর্ব্বাহ্নেই প্রচুর আয়োজন থাকা দরকার। যুগে যুগে এই আয়োজন নানা আকার ধারণ করিয়াছে। আলেকজাণ্ডার রাজ্যজয়ের জন্ত যে আয়োজন করিয়াছিলেন, নেপোলিয়নের যুগে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। রামায়ণে আকাশ হইতে যুদ্ধ করিবার উল্লেখ পাই বটে, কিন্তু সে-যুগে ব্যোমযান আবিষ্কৃত হইয়াছিল কি-না তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই।

ফ্রান্সের ইন্দো-চীনের সেনাবৃন্দের লাংগসনে কুচকাওয়াজ (চীন-সীমান্ত হইতে ১০ মাইল দূরে)

বিগত মহাযুদ্ধের মহারথীবৃন্দ। জেনারেল জোফর ও জেনারেল ফস্। বামে কর্ণেল ভিগাঁ

কালিদাসের রঘুবংশে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া আকাশ-পথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে কবিকল্পনার বেশী কিছু বলিতে রাজী নন। সে যাহা হউক, এক রামায়ণ ছাড়া ব্যোমপথে গমনাগমন বা যুদ্ধের বর্ণনা আর কোথাও বোধ হয় নাই। ভারতবর্ষে হস্তিপৃষ্ঠে তরবারি চালনা করিয়া যুদ্ধ করা হইত। এই জন্ম রাজা পুরুকে পরাজিত করিতে আলেকজাণ্ডারের সৈন্তগণকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই কামান, বন্দুক, গোলাগুলি আবিষ্কৃত হইয়া যুদ্ধ ব্যাপারে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতিগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষে ভারতীয়দের যে-সব যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে জয়লাভের অন্ততম কারণ পাশ্চাত্য জাতিদের উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার। মোগল-আমলে ভারতবর্ষে সামন্তরাজগণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানেই রাজধানী স্থাপন করিতেন। 'দুর্গ' শব্দের উৎপত্তি হইতেই বুঝা যায় ইহা দুর্গম বা দুরবিগম্য স্থানে অবস্থিত। সে-যুগে ভরতপুর এইরূপ একটি দুরবিগম্য দুর্গ ছিল। বিশপ হেবার তাঁহার জর্নালে ইহার এবং ইহার অধিবাসীদের বীরত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তাঁহার ঐ স্থানে গমনের কিছুকালের মধ্যেই ইংরেজের কামান ও গোলাগুলির বিরুদ্ধে ইহার অধিবাসীরা আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইল। ভরতপুর-দুর্গ অবরোধ ও অধিকার ভারতে ইংরেজ-রণকৌশলের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যে জাতি যত শীঘ্র উন্নত ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র আয়ত্ত করিতে পারিবে তাহার জয়ও তত সুনিশ্চিত।

ভরতপুরের জাঠ সেনানীর শারীরিক বীরত্ব বা রণকৌশল নবাবিষ্কৃত অস্ত্রাদির সম্মুখে আদৌ কার্য্যকরী হয় নাই এই মাত্র বলিলাম। ইংরেজাধিকৃত সুদানে নীল নদের তীরে অমডারমান শহরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সেনাপতি লর্ড কিচেনারের অধীন ইংরেজ সৈন্তগণ বৈজ্ঞানিক অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিয়া বীর দরবেশ সেনানী নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছিল। ফিল্ড মার্শ্যাল ওল্‌সলী বলেন, বীরত্বে ও রণকৌশলে দরবেশ সেনানী

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি প্রদেশের নৌসেনার কুচকাওয়াজ

চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে জাতীয়-সোশিয়ালিষ্টগণের শোভাযাত্রা। ইহার পূর্ব্বে সামরিক বিভাগ, কম্যুনিষ্ট ও জাতীয়-সোশিয়ালিষ্ট এই তিন দলের মধ্যে বিশেষ সংঘর্ষ হয়। ইঁহারাই জয়লাভ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করায় মাৎস্যন্যায়ের শেষ হয়।

অতুলনীয় ছিল, কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সম্মুখে তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। একে একে সকলকেই মৃত্যুবরণ করিতে হয়।

ইহার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ইটালী প্রত্যেকে নব নব যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করিয়া বিগত মহাযুদ্ধে অস্ত্র-পরিচালন-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। ইহার
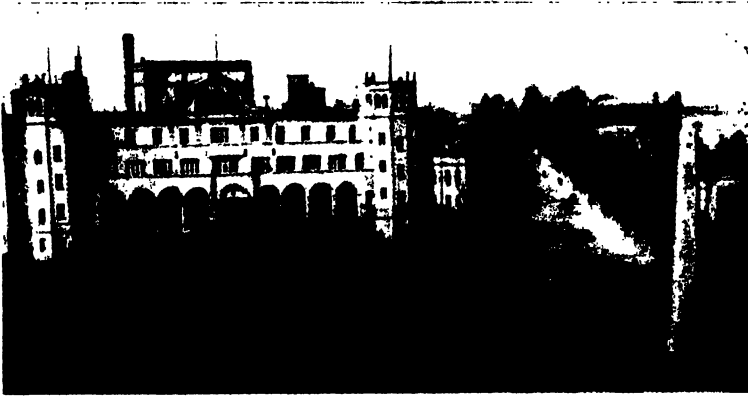
মুকডেন, য়ামাটো হোটেল। এইখানে বিদেশী দূত ও লীগ অফ নেশ্যনের প্রতিনিধিবর্গ মাঞ্চুরিয়ার চীন-রুশ-জাপান সংঘর্ষ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ফলে, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ ঘটিয়াছে। লক্ষ লক্ষ পরিবার অবলম্বন হারাইয়াছে; জগতের সর্ব্বত্র হাহাকার রব উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের কিছুকাল পরেই আবার জাতিগত ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিতে পাই। বড় বড় কামান, রাইফেল, গ্যাস, বোমা প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত রণসম্ভার যাহা বিগত মহাযুদ্ধে বিবদমান জাতিগুলির কাজে আসিয়াছিল তাহাতে আর যুদ্ধজয় সম্ভব নয়। তাই দেখিতে পাই, এক জন রণবিৎ একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

টিনসিন। জাপানী সেনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসীদিগের আতঙ্ক ও পলায়ন

"Supposing the other nations of the world refuse to rise to the spiritual heights which would foreshadow a Second Advent, the English-speaking peoples should welcome at least the advent of the internal combustion Engine. For the rifle, bomb and bayonet are as cheap and easy to obtain as the bow and arrow and they are more simple to handle. The war value of the Asiatics, the semi-Asiatics of Russia and of the Africans will, for generations to come, lie in mass tactics, and the horde. The war values of Northern Europe and America lie in the individuality of the fighter. These are biological characteristics. Unless civilization can speedily equip itself with more complicated and brainy weapons than rifles, bombs and bayonets the hordes may overwhelm the individuals. It will be another story if we can shift the implements of force from rifles and bayonets to aircraft, submarines and tanks. The British Empire and the United States can manufacture war engines on the grand scale: they are alive with young leaders of initiative and action the men of the North have a genius for handling and tending machines. In these respects Asiatics lag behind, and Africans are nowhere ... Therefore, it behoves every nation that has the will to live to put its military house in order forthwith...."

উপরের উদ্ধৃত অংশটি একটু দীর্ঘ হইলেও বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এক জন রণবিৎ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ত্রয়োদশ সংস্করণে (New Volume III) "war" (যুদ্ধ) শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই অংশ হইতে শুধু যুদ্ধ সংক্রান্তই নহে, প্রাচ্য জাতিদের প্রতি পাশ্চাত্য জাতিগুলির মনোভাব ইহাতে স্পষ্ট প্রকটিত হইয়াছে। যুদ্ধে অতঃপর আর কামান, বন্দুক, রাইফেল ব্যবহার করিলেই চলিবে না। কারণ এসব এখন শ্বেত কৃষ্ণ, উচ্চ নীচ, উন্নত অনুন্নত সকল জাতিই ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কৃষ্ণকায় জাতিগুলি দলবদ্ধ আক্রমণে পটু এবং এই সকল অস্ত্র ব্যবহার করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে যুঝিতে হইলে নূতন নূতন মারণ যন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইবে, রাইফেল বন্দুক ছাড়িয়া এরোপ্লেন, সাবমেরিন, যুদ্ধ ট্যাঙ্ক প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হইবে। ইউরোপীয় জাতিগুলির শীঘ্রই এই ভাবে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত [illegible]য়োজন।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার এই খণ্ডগুলির প্রকাশের তা[illegible] সময়। তখন সবেমাত্র লোকার্নো-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। [illegible]র্নো-চুক্তি

বাদল মেঘে মাদল বাজে

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ক্রুপের কারখানা। বিগত মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের অনেকগুলি এই কারখানার মধ্যেই প্রস্তুত হয়

চীন সেনানায়ক চ্যাং-কাই-শেক এবং তাঁহার পশ্চাতে চ্যাং-সু-লিয়াঙ্গ চীনা সেনা পরিদর্শনে ব্যাপৃত

সত্ত্বেও যাহাতে পাশ্চাত্য জাতিগুলি যুদ্ধাস্ত্র-নির্ম্মাণে বিরত না হয় এই প্রবন্ধে তাহারও ইঙ্গিত আছে।

আজ পাশ্চাত্য জাতিগুলি বাস্তবিকই প্রাচীন পথ পরিত্যাগ করিয়া এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে! মুসোলিনী ত সেদিন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আকাশ হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া তবে আবিসিনিয়াকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে হইবে। • পাশ্চাত্য জাতিগুলির নব নব আবিষ্কৃত যুদ্ধাস্ত্র, নৌবহর*

* প্রবাসী—মাঘ ১৩৪১ সংখ্যায় লেখকের "নৌবহরের কথা ও জাপানের দাবি" প্রবন্ধে পাশ্চাত্য জাতিগুলির নৌবহর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।
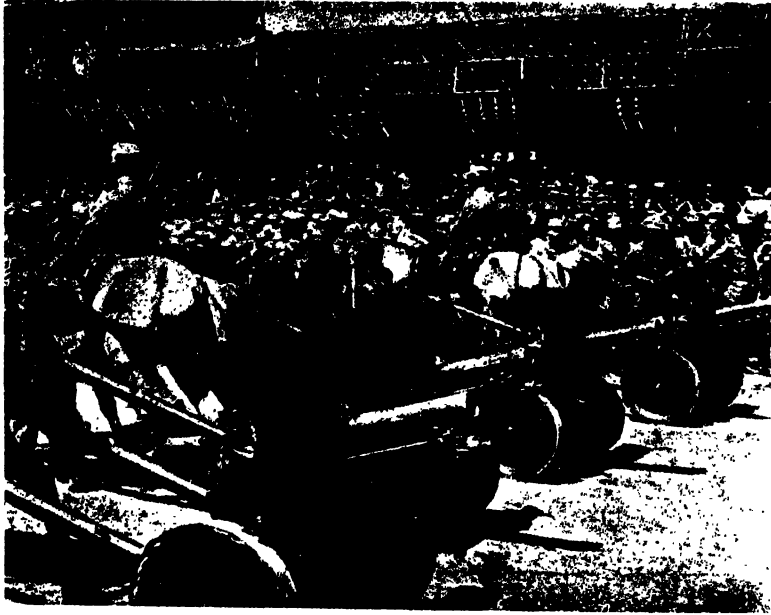
স্যানকিনের পার্লেমেণ্টের উন্মোচনের শোভাযাত্রায় চীন গোলন্দাজ সেনা

নূতনতম সৈন্য। আইরিশ স্বাধীন রাষ্ট্রের গোলন্দাজ সৈন্য

প্রভৃতি এত দ্রুত ও এত অধিক বাড়িয়া চলিয়াছে যে তাহা শুধু অনুন্নত কৃষ্ণকায় জাতিগুলিরই আতঙ্কের কারণ হয় নাই, পরন্তু পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রত্যেকেই অস্বস্তি বোধ করিতেছে, এবং কেহ কাহাকেও আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ইহার ফল কি বিষময় হইতে পারে গত মহাযুদ্ধে অহা বেশ বুঝা গিয়াছে। ভাবী মহাযুদ্ধ আসন্ন কি না কে বলিতে পারে?

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিদেশ

আন্তর্জাতিক মহিলা-সম্মেলন, ইস্তাম্বুল

তুরস্কের পূর্ব্বেকার রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল্ বর্ত্তমানে ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত। এই শহরে কিছুকাল পূর্ব্বে আন্তর্জাতিক মহিলা-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মহিলা প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। চীন ও জাপান ছাড়া তুরস্ক, ইরাণ, ইরাক, ভারতবর্ষ, ডামাস্কাস, বাগদাদ, আরব, মিশর, জামাইকা ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে মহিলা প্রতিনিধি প্রেরিত হন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃত্ব করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত হামিদ এ. আলি। তিনি সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করিয়া সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংবাদপত্রে এবং গত সেপ্টেম্বর সংখ্যা মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায়

মাদাম হোদা চেরাউ পাশা

অধিবেশনের একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মেলনে যে-সব বিখ্যাত মহিলা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মিশরীয় প্রতিনিধি-মণ্ডলীর নেত্রী মাদাম হোদা চেরাউ পাশার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি নানা কার্য্য দ্বারা মিশরীয় নারীদের মধ্যে স্বাজাতিকতাবোধের উন্মেষ করিয়াছেন। দেশের অন্তর্বিধ উন্নতিকল্পেও তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য।

সম্মেলনে রাষ্ট্রিক ও কৃষ্টিগত নানা আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন দেশের সমাজের উন্নতিবিষয়ক প্রস্তাবগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তুরস্ক-সরকার মহীয়সী মহিলাগণের চিত্র ও কোন কোন কার্য্য এই সকল ডাকটিকিটে মুদ্রিত করিয়াছেন।—ম্যাদাম কুরী (২য় সারির শেষ চিত্র), জেন অ্যাডামস্ (তৃতীয় সারির তৃতীয় চিত্র)

ইস্তাম্বুলে শ্রীযুক্তা হামিদ এ. আলি

জামাইকার কাফ্রীদের দুরবস্থা এবং তাহাদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের দুর্ব্যবহারের কথা ইহাদেরই প্রতিনিধি কুমারী মারষ্টমান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেন। শ্বেতাঙ্গ মহিলারা ইহার কিছু প্রতিবাদ করিলেও, এই বিষয়ক প্রস্তাবটি অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য,

মধ্যস্থলে শ্রীযুক্তা হামিদ এ. আলি

প্রাচ্যদেশের প্রতিনিধিগণ সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সকল দেশে যাহাতে নারীর সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় সে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। যে-সব দেশে ডিক্টেটরীর শাসন চলিতেছে সে-সব দেশের নারীর সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়াছিল। সভায় এক জাতির উপর অন্য জাতির আধিপত্য বিস্তার সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। প্রাচ্যের দেশসমূহের প্রতিনিধিদের ঐকমত্য উপস্থিত সকলেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল।

রুশিয়ায় বিমান-বিহার শিক্ষা—

আধুনিক বিমানপোত আবিষ্কারের পর হইতে পাশ্চাত্যের সকল

সূর্য্য-কিরণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বেলুনের ব্যবহার

ছয়টি রুশ যুবতী ২২,০০০ ফুট উচ্চে বিমান-পোত হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অক্ষতদেহে অবতরণ করিয়াছেন
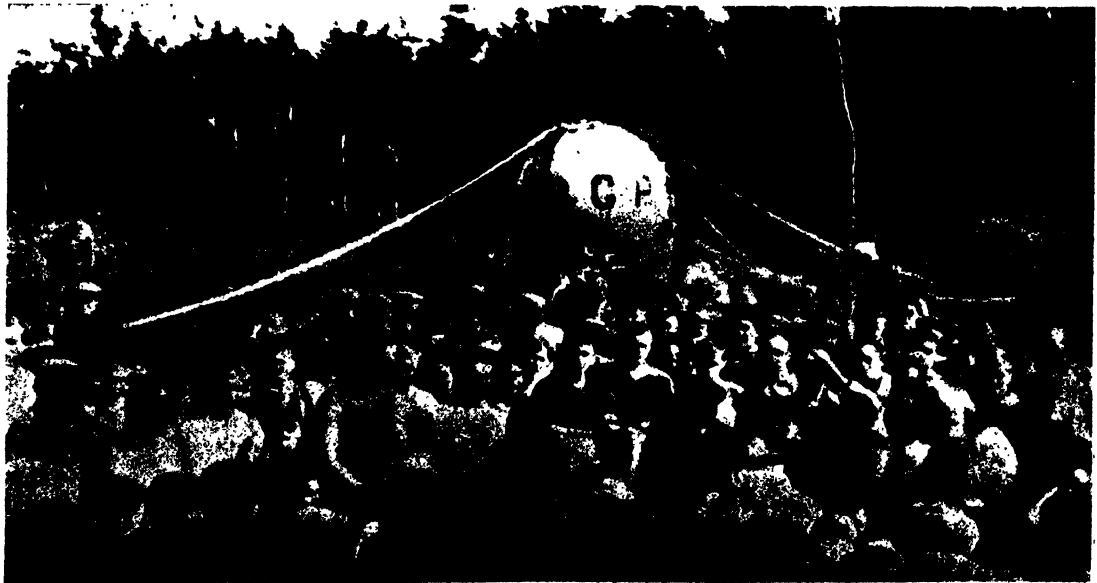
সূর্য্য-কিরণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণ-কার্য্য সম্পাদনের পর বেলুনে অবতরণ

দেশেই ইহার চালনা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ইহা দেশ-বিদেশে সংবাদ প্রেরণে ও যাত্রীর গমনাগমনে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার ব্যবহারে যুদ্ধেও কিরূপ ফল লাভ হইতে পারে গত মহাযুদ্ধে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল। ইদানীং প্রতীচীর রাষ্ট্রসমূহে নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনীর ন্যায় এক একটি ব্যোমবাহিনীও গঠিত হইয়াছে। স্বদেশ-রক্ষায় ও পররাজ্য অধিকারে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে এবং ইহাকে সরকারী সৈন্যবিভাগের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। ঐসব দেশে

ব্যক্তিগত ভাবেও লোকেরা বিমান-বিহার শিক্ষা করিতেছে। প্রায় প্রতিবৎসর বিমান-বিহারে নিপুণ লোকেরা এই বিষয়ক প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া থাকে।

গত কয়েক বৎসরে রুশিয়ায় বিমান-বিহার শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। সেখানে সহস্র সহস্র লোক রীতিমত বিমান-বিহার শিক্ষা করে। বিমান-পোত চালকের সংখ্যা এখন কয়েক সহস্র হইবে। সেখানে দেশরক্ষার অঙ্গ হিসাবেও একটি বিমান-পোত-বিভাগ খোলা হইয়াছে। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শত শত মহিলা বিমান-বিহার শিক্ষায় নৈপুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সম্প্রতি ছয় জন রুশ যুবতী বিমান-বিহারে অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বিমান-পোতে আরোহণ করিয়া বাইশ হাজার ফুট উচ্চ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অক্সিজেন যন্ত্র ব্যবহার না করিয়াই নিরাপদে অক্ষতভাবে ভূতলে অবতরণ করিয়াছেন। মস্কোর নিকটবর্ত্তী শিগ্‌কীতে তাঁহারা এই কৌশল প্রদর্শন করেন।

সেখানে আবার বিজ্ঞানের গবেষণা কার্য্যেও বিমান-পোত ব্যবহৃত হইতেছে। বহু ঊর্দ্ধে আকাশে বায়ুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য গবেষকগণ বিমান-পোত ব্যবহার করিয়া থাকেন। কমাণ্ডার প্রোকোফিয়েফ এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ সনে বিমান-পোতে ৬২,৩৩৫ ফুট উচ্চে উঠিয়াছিলেন। ইনি সম্প্রতি বিমান-পোতে দশ মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। এবারকার উদ্দেশ্য ছিল—সূর্য্য-কিরণ কি ভাবে ভূতলে পতিত হয় তাহা নিরীক্ষণ করা। তিনি তিন ঘণ্টা কাল ঊর্দ্ধে থাকিয়া এই সব নিরীক্ষণ করেন। তাঁহার গবেষণা বিজ্ঞানের একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিবে নিঃসন্দেহ।

ভারতবর্ষেও নিয়মিত ভাবে বিমান-বিহার শিক্ষার প্রচলন হইবে না কি?

ভারতবর্ষ

প্রবাসী বাঙালীর শিক্ষা-প্রচেষ্টা

বিহারে ভাগলপুর বিভাগের বিভিন্ন গ্রামে প্রায় দশ হাজার প্রবাসী বাঙালী বসবাস করিতেছে। তাহারা বিদ্যা, অর্থ, স্বাস্থ্য সকল বিষয়েই অনগ্রসর; উপরন্তু মাতৃভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া বাংলার সহিত তাহাদের কৃষ্টিগত সম্পর্কও ছিন্ন হইতে বসিয়াছে। কতিপয় কর্ম্মী ইহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে, বিশেষতঃ মাতৃভাষার চর্চ্চা বলবৎ রাখিবার উদ্দেশ্যে, ভাগলপুরের অন্তর্গত মনোহরপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ক্রমে এখানে ব্যবহারিক শিক্ষারও বন্দোবস্ত হইবে। এক জন সহৃদয় ব্যক্তি বিদ্যালয়ের জন্য তিন বিঘা জমি দান করিয়াছেন।

প্রবাসে কৃতী বাঙালী

শ্রীযুক্ত এস. কে. চট্টোপাধ্যায় রাজপুতানার পালানপুর ষ্টেটের শারীরবিদ্যা-বিষয়ের ডিরেক্টর (Director of Physical Education)। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় স্নায়ু-রোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ। তিনি গত গ্রীষ্মকালে আবু-পর্ব্বতে অনেক ইংরেজ কর্ম্মচারী ও সামন্ত রাজাকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। পালানপুরের মহারাজাও ইঁহার চিকিৎসায় বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এস. কে. চট্টোপাধ্যায়

বাংলা

কৃতী বাঙালী

শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার দত্ত, বি-এস্‌সি, গত জুলাই মাসে লণ্ডনের ইনকরপোরেটেড একাউণ্টেণ্ট পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার চিত্র গত সংখ্যায় ভ্রমক্রমে 'শ্রীঅমিয়কুমার অধিকারী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঢাকা অনাথ-আশ্রম

সহায়-সম্বলহীন বালক-বালিকাদের প্রতিপালনের জন্য ঢাকা নগরীতে ১৯০৯ সনে ঢাকা অনাথ-আশ্রম স্থাপিত হয়। বাংলা সরকার পুরাতন ও নূতন শহরের মধ্যবর্ত্তী বক্সীবাজার পল্লীতে পুষ্করিণী ও বৃক্ষাদি সমন্বিত দশ বিঘা জমি দান করেন। টাঙ্গাইলের দানশীলা রাণী দিনমণি চৌধুরাণী, সরকার এবং জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থে সুরম্য ও প্রশস্ত গৃহাদি নির্ম্মিত, হাসপাতাল ও কারখানা গৃহ স্থাপিত এবং পুষ্করিণীতে পাকা ঘাট বাঁধান হইয়াছে। এই আশ্রমে সাধারণ লেখাপড়া ব্যতীত তাঁতের কাজ, দর্জ্জীর কাজ, সেলাই, সঙ্গীত, মাটির কাজ, রান্না, পাট ও দড়ির বুনানি কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্ব্বে প্রায় শতাধিক বালক-বালিকা এখানে বাস করিয়া গিয়াছে—তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখন নানা প্রকার ব্যবসা ও চাকুরী দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। এখান হইতে অনেক মেয়ের বিবাহ দিয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহারা এখন সুখে

ঢাকা অনাথ-আশ্রম
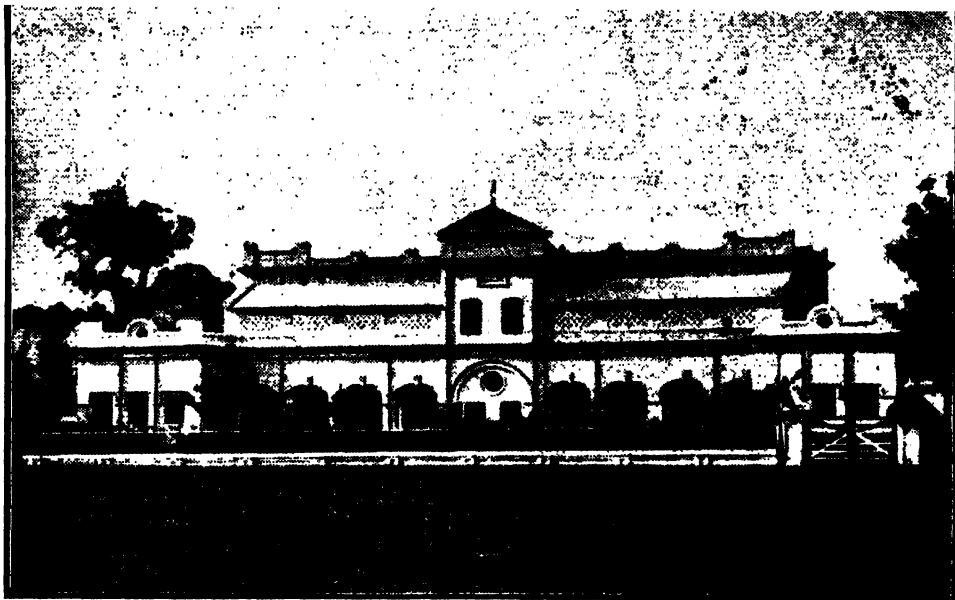
জীবন-যাপন করিতেছে। বর্ত্তমানে এই অনাথ আশ্রমে ২২টি বালক ও ২৪টি বালিকা বাস করিতেছে। তাহাদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার জন্য মাসে অন্যূন ৫০০ টাকার প্রয়োজন। এই অর্থের অধিকাংশই

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার

ডক্টর প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জনসাধারণের মাসিক চাঁদা ও এককালীন দান হইতে সংগৃহীত হয়। ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি হউক ইহাই কামনা।

বিদেশে বাঙালীর সম্মান—

এ-বৎসর বেলজিয়মের ব্রাসেল্‌স্ নগরে আন্তর্জাতিক সমাজ-বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারকে ইহাতে যোগদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সরকার-মহাশয়ের এই সম্মানে সকলেই গৌরব অনুভব করিবেন।

পরলোকগত গুরু দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর আবক্ষমূর্ত্তি। বোম্বাইয়ের ভাস্কর মিঃ ভি. ভি. ওয়াগ কৃত।

পরলোকে ডক্টর প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—

ডক্টর প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, পি-আর-এস্, পিএইচ-ডি, সম্প্রতি ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষাবিজ্ঞানে ও ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন; লিন্‌গুয়িষ্টিক্ স্পেকুলেশন অফ্ হিন্দুজ্ (*Linguistic Speculation of Hindus*, এবং ফিলজফি অফ স্যান্‌স্‌ক্রিট গ্রামার (*Philosophy of Sanskrit Grammar*) নামে দুইখানি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা—

ইনি প্রায়োপবেশন দ্বারা কালীঘাটে পশুবলির উচ্ছেদ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এবিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা

শবরী

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

অস্ত গেছে শ্রান্ত সূর্য্য ; সারা বিশ্ব ভরি
নিস্তব্ধ গভীর বাণী ফিরিছে শিহরি
মহামৌন স্বরে। নীল স্বচ্ছ পম্পানীর
প্রসারিত তটতলে প্রশান্ত গভীর
স্থির শব্দহীন, যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
সুনীল অঞ্চলখানি মূর্চ্ছিত বিধুর
ভূতলে পড়েছে খসি। দূর-পরপারে
বিসর্পিত বনরেখা নীলিমা সঞ্চারে
মিশিয়াছে মহানভোনীলে। বিথারিয়া
নীলমায়া নীলাম্বর পড়েছে ঢলিয়া
দিক্-চক্র তলে।

শ্রমণী শবর-বালা
সরোবর শিলাতটে একান্ত নিরালা
দাঁড়ায়ে নীরবে। পাণ্ডু তনু পরিক্ষীণ
সুকঠোর সাধনায়, পলক-বিহীন
প্রশান্ত নয়ন মেলি বহু বরষের
নিবিড় তপস্যা-শেষে বিশাল বিশ্বের
পানে রয়েছে চাহিয়া। নির্ণিমেষ নীল
ভরিয়াছে আজি তার সমগ্র নিখিল
সমগ্র অন্তর, অনন্ত সে নীলিমার
মাঝে শিহরিছে অপরূপ মূর্ত্তি কা'র
শান্ত সুগম্ভীর, রহস্য-মধুর স্বরে
আবাহন জাগে কার দূরে অনশ্বরে।
শবরী মুদিল আঁখি। নীলিমা-পরশে
স্বপন-বিহ্বল তনু নিবিড় হরষে
কাঁপে অনিবার। চারিদিক্ হ'তে তারে
নীলস্বপ্নময়ী ধরা যেন বাঁধিবারে
চাহে ব্যগ্র বাহু-ডোরে।

একি বিড়ম্বনা—
নীলিমা বাঁধিবে তারে! নিমীল-নয়না
তাপসী শবর-বালা স্বপ্ন পরিহরি
নীল স্বচ্ছ পম্পানীরে ধীরে অবতরি
সমাপ্ত করিল স্নান। কমণ্ডলু ভরি
পূত পম্পাসরোনীরে ফিরিল শবরী
মতঙ্গ-আশ্রম পথে। আসন্ন সন্ধ্যার
ম্লান ছায়া রচিয়াছে মোহ দুর্নিবার
ঘন বন মাঝে, সেথা পুন্নাগ তমাল
দীর্ঘচ্ছায়া-বিলম্বিত দেবদারু শাল
বিছায়েছে পুষ্পস্তরে দেবতা-কাঙ্ক্ষিত
বিচিত্র শয়ন। পত্রপুঞ্জে পল্লবিত
আনীল রহস্য-ছবি। বনপথ ধরি
বিতত বনানী প্রান্তে ফিরিল শবরী
বিজন কুটীর দ্বারে।

তরল আঁধারে
শিহরিয়া চলে রাত্রি বিটপী মাঝারে
পল্লব-নিলয়ে তা'র পক্ষ-বিধূনন
ধ্বনিছে মর্ম্মর স্বনে। বল্কল-বসন
আবরিয়া সর্ব্ব দেহে দাঁড়াল শবরী
স্বপ্ন-লীনা। স্মৃতি-পদ-চিহ্ন অনুসরি
চিত্ত তা'র ফিরে গেছে সুদূর অতীতে,
মহর্ষি মতঙ্গ যবে বিজন নিভৃতে

কহেছিল তা'রে—'ভদ্রে, অভীষ্ট তোমার
নয়নাভিরাম রাম, মহা তপস্যার
মাঝে পাইবে তাঁহারে ! চেতনা গহনে
নীরবে করিও ধ্যান'। বাজিল স্মরণে
সেই সুগম্ভীর বাণী। তাপসী শবরী
সন্তর্পণে ধীরে সপ্তপর্ণ শাখা ধরি
চাহিল সম্মুখে—কোথায় আরাধ্য তা'র !
বহু বর্ষ চলে যায় নৈরাশ্য-আঁধার
শুধু জাগে চারিভিতে। ব্যর্থতা-পীড়নে
কাঁদিল অন্তর, অশ্রুবারি দু-নয়নে
পড়িল ঝরিয়া।

· অটবী-শয়ন'পরে

সুগভীর অন্ধকার নামে স্তরে স্তরে
স্তবকে স্তবকে। সকরুণ ঝিল্লীস্বরে
দিগ্‌বধূ কাঁদিছে কোথা দূর-দিগন্তরে।
নীরব পাষাণ মূর্ত্তি বিজন আঁধারে
ধেয়ান-নিশ্চল তনু, তপস্যা মাঝারে
পাষাণী অহল্যা কিগো আজো নিমগন !
আজও কি আসে নি তার আরাধ্য-রতন
রাম। ধীরে অতি ধীরে সুষুপ্তি সাগরে
ডুবে গেল শ্রান্ত তনু। রুক্ষ ভূমি'পরে
লুটাল তাপসী। নিবিড় সে-নিদ্রা ভরি
নামিল অপূর্ব্ব স্বপ্ন—বর্ষ বর্ষ ধরি
নিভৃত অরণ্য-পথে নিমীল নয়নে
কে রমণী ছুটে চলে অশ্রান্ত চরণে।
তপঃক্লিষ্ট শীর্ণ তনু নিদ্রা-তন্দ্রা-হারা
নিরন্তর বেগে ধায় উন্মাদিনী-পারা।

অরণ্য-মেঘের মাঝে পত্রচ্ছেদ-ফাঁকে
নীলিমা-বিদ্যুৎ হানি নীলাকাশ ডাকে
তারে অন্তহীন পথে। বৈরাগিণী সুরে
তা'র নিত্য গৃহ-হারা অজানিত দূরে
চলিয়াছে নীল-অভিসারে। সন্ধ্যা আসে
নিবিড় বনানী ঘেরি' বিষণ্ণ বাতাসে
মর্ম্মরিয়া কাঁদে রাত্রি ; আকাশ ভরিয়া
নামে দুর্ভেদ্য আঁধার। রমণী ছুটিয়া
চলে অন্ধ দিশাহারা ; বনে বনান্তরে
রোদনের প্রতিধ্বনি ব্যথা-ক্লান্ত স্বরে
গুমরি' কাঁদিয়া মরে।

দীর্ঘ পথ-শেষে

বিক্ষত চরণে উত্তরিল অবশেষে
মুক্ত নীলাম্বর তলে। অন্তহীন নীল
নীরবে ভরিয়া দিল সমগ্র নিখিল।
নিষ্পলক নেত্রে নারী রহিল চাহিয়া,
ধীরে ধীরে নীলমায়া উঠিল দুলিয়া ;
ধীরে তা'র অপরূপ হ'ল রূপান্তর।
অপূর্ব্ব-শোভন-কান্তি আরাধ্য-সুন্দর
রাম দিল দেখা অনন্ত নীলিমা ভরি ;
তাপসী শবর-বালা উঠিল শিহরি
আনন্দ-জাগ্রত-তনু। সম্মুখে শ্রীরাম
সুনীল নীরদ-রূপ নয়নাভিরাম।
তপস্যা সার্থক আজি।

ধীরে অতি ধীরে

তখন জাগিছে উষা পুণ্য পম্পা-তীরে।

প্রবাসী বাঙালীর ভাষা-সমস্যা

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএইচ-ডি

ভারতবর্ষের "বাবু-ইংরেজী" যেমন খাঁটি ইংরেজদের কৌতুক ও রহস্তের খোরাক জুগিয়ে থাকে, প্রবাসী বাঙালীর ভাষা বা উচ্চারণও কলিকাতাবাসী বাঙালীর নিকট অনেকটা তেমনই আমোদজনক ব'লে গণ্য। দুটি ক্ষেত্রেই মূল কারণ একই। অর্থাৎ অশুদ্ধ ভাষা ও উচ্চারণ শ্রবণে কৌতুক বোধ করা, বা তাই নিয়ে রংতামাশা করা স্বাভাবিক। "বাবু ইংরেজী" সম্বন্ধে অনেকে সাফাই দিয়ে থাকেন যে ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নয়, অতএব বিদেশী ভাষা শুদ্ধ ভাবে লিখতে, বা বলতে না পারলে লজ্জিত হ'বার কিছু নেই ; বরং আমরা যে পরের ভাষা কষ্ট ক'রে শিখে থাকি সেইটাই আমাদের কৃতিত্বের পরিচয়। অবশ্য, প্রবাসী বাঙালীর সম্বন্ধে সেরূপ কোন ওজর চলে না, কারণ নিজের মাতৃভাষা ঠিকমত না-জানা কোন কালেই মার্জ্জনীয় অপরাধ ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে না।

প্রবাসী বাঙালীর ভাষা-সমস্যা শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেই সমাধান হবে না—তা বলাই বাহুল্য। সমস্যার গুরুত্ব সম্যক্ প্রণিধান করবার সময় আজ এসেছে, বিশেষতঃ আজকাল যখন হিন্দীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করবার কথা উঠেছে, কারণ প্রবাসী বাঙালীর মাতৃভাষা-চর্চ্চার পথে প্রধান অন্তরায় পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দী-উর্দ্দু শিক্ষার আবশ্যিকতা। প্রবাসী ছেলে-মেয়েদের শৈশব হ'তেই স্কুলে হিন্দী-উর্দ্দু, বা অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা শিখতে হয়, কাজেই বড় হ'য়ে তারা যদি বাংলার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বা উচ্চারণ-পদ্ধতি ভাল ক'রে আয়ত্ত করতে না পারে তাহ'লে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

এইখানে বলা দরকার যে প্রবাসী বাঙালীর ভাষা-সমস্যার দুটি দিক আছে,—প্রথমতঃ, উচ্চারণ-বিকৃতি, ও দ্বিতীয়তঃ, ভাষাসাঙ্কর্য্য। সাধারণতঃ হিন্দী-মেশানো মিশ্রভাষা নিয়েই রঙ্গ-রহস্য হয়ে থাকে, কিন্তু উচ্চারণ-বিকৃতি তার চেয়ে গুরুতর ব্যাপার। মোট কথা, বাংলার বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতিকে প্রবাসী বাঙালীকে যেমন ক'রেই হোক রক্ষা করতে হবে তা না বললেও চলে।

প্রথমে ধরা যাক্ ভাষাসাঙ্কর্য্য। প্রবাসজীবনের এক যুগ গেছে যখন পাটনা, কাশী, এলাহাবাদের মত কয়েকটি বাঙালীবহুল স্থান ছাড়া অধিকাংশ শহরে বাংলা ভাষা ক্রমে লোপ পাবার মত হয়েছিল। তখন নিজেদের মধ্যেও সকলে হিন্দীতে কথা কইতেন, ও হিন্দী-উর্দ্দু রীতিমত শিক্ষা করতেন। বাংলা চিঠিপত্র লিখতে বা পড়তে হ'লে এঁদের বিপদে পড়তে হ'ত। কিছু দিন পূর্ব্বে 'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্ণৌর 'বেঙ্গলী-ক্লাবে' একটি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। তাঁর একটি গল্প শুনে সকলেই আমোদ অনুভব করেছিলেন, সেটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন এক প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোক নিজে বাংলা লিখতে পড়তে জানতেন না ব'লে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ৺প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট নিজের স্ত্রীর পত্র পড়িয়ে নিতেন, ও তাঁকে দিয়েই উত্তর লেখাতেন। রামানন্দ বাবু আরও উল্লেখ করেছিলেন যে এক-কালে লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে বাঙালীরা থিয়েটার করার পূর্ব্বে নিজের নিজের ভূমিকা না কি ফারসী অক্ষরে লিখে মুখস্থ করতেন। এরূপ দৃষ্টান্ত শুনে এখন বিস্ময় লাগে, কিন্তু এক কালে তা মোটেই অসাধারণ ছিল না। জয়পুর অম্বরের কালীবাড়ির বাঙালী পুরোহিতেরা "হাম্ বাঙালী হায়," ব'লে বাঙালীত্ব জাহির করেন তা বোধ হয় অনেকেই স্বকর্ণে শুনে এসেছেন। এটি হ'ল মাতৃভাষা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হওয়ার চূড়ান্ত নিদর্শন, কিন্তু এর কাছাকাছি অবস্থা গত শতাব্দীতে অনেক জায়গায় দেখা যেত।

সুখের বিষয়, এই ধরণের দৃষ্টান্ত এখন বিরল। বাংলা একেবারেই লিখতে পড়তে পারেন না এরূপ বাঙালী

এখন অত্যন্ত দুর্লভ বললে ভুল হবে না। এখন ভাষাজ্ঞানের অভাবটাই বড় সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে ক্রমবর্দ্ধমান ভাবাসাঙ্কর্য্য। প্রবাসে থাকলে অধিকাংশ সময় স্থানীয় ভাষায় কথা কইতে হয় ও স্থানীয় লোকেদের সহিত উঠাবসা করতে হয়, সেই জন্য কেবল অভ্যাসবশে অপর ভাষার বাগ্‌বিন্যাস-প্রণালী ও বাচনিক ভঙ্গী বাংলা বলার কালেও ব্যবহার করা স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে অধিকাংশ প্রবাসী বাঙালী কয়েক পুরুষ যাবৎ বিদেশে বাস করছেন ও বাল্যাবধি অবাঙালীর মাঝে মানুষ হয়েছেন, সেজন্য স্থানীয় ভাষার প্রভাব তাঁদের উপর যে কত গভীর তা সাধারণ কলিকাতাবাসী অনুমান করতে পারবেন না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ভাষাসাঙ্কর্য্য ঠিক কতটা নিন্দার্হ? প্রশ্নটি কয়েক দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। প্রথম, ভাষাগত আদান-প্রদান চিরকাল সর্ব্বত্র দেখা গিয়েছে। বাঙালীর ভাষাও অন্যান্য ভাষার প্রভাব হ'তে মুক্ত নয়, বাংলাতেও ধার-ক'রে-নেওয়া শব্দ অসংখ্য আছে, কাজেই তর্কের খাতিরে বলা যায় যে প্রবাসী বাঙালী যদি সেই ঋণের বোঝা আরও একটু বাড়িয়েই দেন, তা হ'লে তা মারাত্মক অপরাধ ব'লে ধরা হবে কেন?

দ্বিতীয়, শিক্ষিত বাঙালী কথায় কথায় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতে লজ্জিত হন্ না, তাঁরাই আবার প্রবাসী বাঙালীর হিন্দীমেশানো ভাষা শুনে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেন। এ থেকে কি এই অনুমান করা যেতে পারে যে ইংরেজী বুক্‌নীতে কোন দোষ হয় না যেহেতু তা রাজভাষা, যত অপরাধ হয় শুধু হিন্দী শব্দ ব্যবহার করলে?

তৃতীয়, হিন্দুস্থানী ভাষা যখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হ'তে চল্‌ল, এবং বাংলা যখন সে সম্মান কখনও পেতে পারবে না, সেক্ষেত্রে হিন্দী বা উর্দ্দু হ'তে শব্দচয়ন কি বাঞ্ছনীয় নয়?

চতুর্থ, বিদেশী ভাষা হ'তে শব্দ ধার করার চেয়ে ভারতীয় ভাষা হ'তে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তা থেকে আর কিছু না হোক্ বাংলা ভাষার সহিত অন্যান্য দেশীয় ভাষার সংযোগ সম্ভব হবে। জাতীয়তার দিনে কি সেটা কম লাভের কথা?

পঞ্চম, বাংলা-সাহিত্যে 'ব্রজবুলি'র প্রভাব একদিন কম ছিল না। বলা বাহুল্য, সে ভাষাও ত বাঙালীর ধার করা। বিদ্যাপতি প্রভৃতি মৈথিল কবির ভাষা বাংলার নিজস্ব বলেই পরিগণিত হয়ে এসেছে—তার জন্য ত বাঙালী কখনও লজ্জিত হয় নি। মিথিলার ভাষা গ্রহণ করায় যদি লজ্জার কারণ না হয়ে থাকে, তা হ'লে হিন্দী শব্দ গ্রহণে আপত্তি কেন হবে?

উপরে যে যুক্তিগুলি তর্কের অজুহাতে দেওয়া হয়েছে তা বাহ্যতঃ নির্ভুল মনে হ'লেও, তার আসল গলদ হচ্ছে এই যে ভাষা-মিশ্রণের সীমা বা পরিমাণ নিরূপিত হবে কি ক'রে? অসংযত মিশ্রণের ফলে মাতৃভাষা শেষে একেবারে লোপ পেতে পারে। যদিও এটা ঠিক যে, প্রবাসী বাঙালীর হিন্দীমেশানো ভাষা অতিরিক্ত বিদ্রূপ পেয়ে এসেছে, তবু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে ঐরূপ মিশ্র ভাষার ভবিষ্যৎ পরিণতি বাংলা ভাষার পক্ষে মোটেই নিরাপদ হবে না। বাংলা ভাষার নিজস্ব স্বরূপ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়ে অপর ভাষার শব্দ দ্বারা অলঙ্কৃত ও পরিপুষ্ট হ'তে পারে সেদিকে প্রবাসী বাঙালীর দৃষ্টি রাখতে হবে।

হিন্দী-উর্দ্দু থেকে শব্দ কি রীতিতে, ও কতটা প্রবাসী বাঙালী গ্রহণ করতে পারেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক, তবে নিম্নলিখিত ইঙ্গিতগুলি এই সম্পর্কে ভেবে দেখা যেতে পারে :—

(ক) এমন বিশেষ্য পদ যার সহজ প্রতিরূপ বাংলায় নেই তা গ্রহণ করা অনুচিত হবে না, যথা :—আইন, আদালত, খুন, শহর, দখল, পর্দ্দা, ফাটক, সিঁড়ি, ছাত, রোশনাই, আর্জ্জি ইত্যাদি। যে-সব শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সাধারণতঃ প্রচলিত আছে তা ব্যবহার করা সঙ্গত নয়, যেমন :—ঘটির বদলে লোটা, মোষের বদলে ভৈঁসা, গরুর বদলে গৈয়া, কুকুরের বদলে কুত্তা, বেরালের বদলে বিল্লী, ছবির বদলে তসবীর, বাগানের বদলে চমন্‌, বাড়ির বদলে মাকান, বিষয়ের বদলে জায়দাদ, স্নেহের বদলে মুহব্বৎ, পরিহাসের বদলে দিল্লাগি, গাছের বদলে পেড় ইত্যাদি।

(খ) বিশেষণ পদ ধার করবার আবশ্যকতা কমই, শুধু সেই ক্ষেত্রে হিন্দী-উর্দ্দু বিশেষণ পদ গ্রহণ করা চলে যার ব্যবহারে ভাষার ভাবব্যঞ্জক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে, যথা :—সাধুর স্থলে ইমানদার, বুদ্ধিমানের স্থলে চালাক, বিশ্বাসঘাতকের স্থলে দাগাবাজ, অকৃতজ্ঞের স্থলে নিমকহারাম ইত্যাদি ব্যবহার করলে অনেক সময় ভাবার্থ সুপ্রকট হ'তে পারে।

কিন্তু অনর্থক হিন্দুস্থানী বিশেষণ পদ গ্রহণ করা সমীচীন নয়। প্রকাণ্ড বাড়ি না ব'লে আলিশান বাড়ি বলা, দয়ালু না ব'লে মেহেরবান বলা, সুন্দর না ব'লে দিলচম্প্ বলা, জ্বালাতন না ব'লে পরেশান বলা, নির্দ্দোষ না ব'লে বেগুনাহ বলা, অস্থির না ব'লে বেচৈন বলা বৃথা।

(গ) পশ্চিমাঞ্চলে বাঙালী ছেলে-মেয়েরা বাংলা বলার সময় অভ্যাসদোষে, বা অজ্ঞাতসারে হিন্দুস্থানী ক্রিয়াপদ অত্যধিক ব্যবহার করে। এইটি সব দিক দিয়ে আপত্তিকর। অপর ভাষার ক্রিয়াপদ গ্রহণ করলে মাতৃভাষার বিশিষ্ট রূপ ও ইডিয়ম্ বজায় রাখা যাবে না। পশ্চিমে অনেকের মুখেই সরুন-এর বদলে হটুন, পালাও-এর বদলে ভাগো, চীৎকার করার বদলে চেল্লানো, বিপদে পড়ার বদলে ফেঁসে যাওয়া, গোল করার বদলে শোর মাচানো, ঝক্‌মক্ করার বদলে চম্‌কানো, ঝরার বদলে টপকানো, খেয়ে ফেলার বদলে উড়িয়ে দেওয়া, গোনার বদলে গিন্‌তি করা, দিব্য করার বদলে কসম খাওয়া, ভাগ করার বদলে বেঁটে নেওয়া ইত্যাদি শোনা যায়।

(ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণ সম্বন্ধেও সাবধানতার প্রয়োজন আছে, যেহেতু ক্রিয়াপদ ও তার বিশেষণজ্ঞাপক হিন্দী শব্দ দ্বারা বাংলায় বাক্যগঠনরীতি আমূল পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে। অতএব অপর ভাষার ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়া-বিশেষণ দুই-ই বর্জ্জন করা দরকার। পশ্চিমে অনেকেই হরগিজ (কখনও), থোড়াই (কিছুই), হামেশা (সর্ব্বদা), জল্‌দী (শীঘ্র), আলবাৎ (নিশ্চয়), ফজুল (বৃথা), আলাগ (পৃথক), আয়সা (এমন), তায়সা (তেমন), যায়সা (যেমন), ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেন।

(ঙ) সম্বন্ধ বা সংযোগ-জ্ঞাপক অনেকগুলি হিন্দুস্থানী অব্যয় শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে—সেগুলির কোনই সার্থকতা বা মূল্য নেই। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই :— সে—যেমন তিনি মজাসে (আনন্দে) আছেন, করীব (কাছে), মাগার (কিন্তু), ইধার (এদিকে), উধার (ঐদিকে), ওয়াস্তে (জন্য), পেস্তার (পূর্ব্বে), তাবৃভী (তবু) ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে ভাষাসাঙ্কর্য্যের চেয়ে উচ্চারণ-বিকৃতিই অধিকতর ভাবনার কথা। অনেকেই জানেন যে, সাধারণ প্রবাসী বাঙালীর উচ্চারণ শুনে তিনি যে বাংলার বাইরে থাকেন তা সহজেই বোঝা যায়। এ কথা অবশ্য যাঁরা বাঙালীবহুল স্থানে, বা বাংলার নিকটে থাকেন তাঁদের সম্বন্ধে খাটে না। কিন্তু যাঁরা অপেক্ষাকৃত দূর প্রবাসে আছেন ও যাঁদের দেশের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়, তাঁদের উচ্চারণ প্রায়ই অদ্ভুত ধরণের মনে হয়। এর কারণ এই যে, স্থানীয় ভাষায় সর্ব্বদা বার্ত্তালাপ করার দরুন তাঁদের বাংলা উচ্চারণ বিকৃত হয়ে পড়ে। হিন্দী-উর্দ্দুর উচ্চারণ-প্রণালী যে বাংলার সহিত মেলে না তা বলাই বাহুল্য। ৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি গল্পে প্রবাসী বাঙালীর ভাষা ও উচ্চারণের হাস্যজনক নমুনা আছে। তাঁর একটি গল্পে 'ছুতিয়ে ভাগ' কথার উল্লেখ আছে। এখানে বলা দরকার যে, ছুতিয়ে দ্বিতীয় শব্দের হিন্দীঘেঁষা উচ্চারণ। এরূপ উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে।

তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে যে, খাস বাংলা দেশেও ত প্রত্যেক জেলার বিভিন্ন উচ্চারণ আছে, প্রবাসী বাঙালীর উচ্চারণও যদি একটু আলাদা ধরণের হয় তাতে ক্ষতিই বা কি, লজ্জাই বা কিসের? আসলে কিন্তু ব্যাপারটির অত সহজে নিষ্পত্তি হয় না। বাংলার প্রত্যেক প্রান্তের পৃথক উচ্চারণ থাকলেও সবগুলির মধ্যে স্বর ও ধ্বনির একটা মূল সাদৃশ্য আছে—সেটিকে বাংলা উচ্চারণের বিশিষ্ট রূপ বলা যায়। এইটি প্রবাসী বাঙালীর উচ্চারণে প্রায়ই থাকে না। কাজেই পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীর উচ্চারণ শুনে কলিকাতাবাসী যতটা না আমোদ পান, তার চেয়ে ঢের বেশী পান প্রবাসী বাঙালীর সহিত বাক্যালাপ ক'রে। হিন্দীঘেঁষা বাংলা উচ্চারণ যাঁরা শুনেছেন তাঁদের এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন সমস্যার কথা এই যে, হিন্দী শব্দ ত্যাগ করা যতটা সহজ, হিন্দীঘেঁষা উচ্চারণ ততটা নয়। জিহ্বা ও তালু এমনি ভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে কোন পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য নয়। প্রতিকার বাল্যাবস্থায়ই সম্ভব, কিন্তু পরিণত বয়সে অসম্ভব বলেই মনে হয়।

প্রবাসী বাঙালীর ভাষা ও উচ্চারণ বিকৃত হয়েছে কয়েকটি কারণে। প্রথম কারণ দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের অভাব। অধিকাংশ প্রবাসী বাঙালী কয়েক পুরুষ যাবৎ

বিদেশে বসবাস করছেন, ও দেশে আসা তাঁদের কদাচিৎ ঘ'টে উঠে, সেই জন্য বাংলা ভাষা ও উচ্চারণের সহিত অনেকেরই যথেষ্ট পরিচয় থাকে না।

দ্বিতীয় কারণ, অবাঙালীর সহিত সর্ব্বদা মেলামেশা। বিদেশে—বিশেষতঃ যেখানে বাঙালীর সংখ্যা অল্প, অবাঙালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়া স্বাভাবিক, তাই ক্রমাগত স্থানীয় ভাষায় বাক্যালাপ করার জন্য মাতৃভাষা চর্চ্চা করার সুযোগ অল্পই হয়।

তৃতীয় কারণ, বিদেশে বাংলা শিক্ষার বন্দোবস্ত করা সহজ নয়। দু-চারটি শহর ছাড়া অধিকাংশ স্থানে বাংলা স্কুল না-থাকায় ছেলেমেয়েদের ভাষা-শিক্ষা নামমাত্রই হয়। এর ফলে যা হয়ে থাকে তা সকলেই জানেন।

চতুর্থ কারণ, অনেক জায়গাতেই বাংলা লাইব্রেরী, ক্লাব প্রভৃতি নেই। বাংলা বই বা সাময়িক পত্রিকা পড়বার সুবিধা ও সুযোগ অনেকে পান না।

পঞ্চম কারণ, প্রবাসে অনেকেই—বিশেষতঃ ছোটরা, নিজেদের মধ্যেও সখ ক'রে হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কন। এরূপ অশোভন অভ্যাস অবশ্য আজকাল কমই দেখা যায়, কিন্তু এখনও একেবারে সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। এ বিষয়ে অভিভাবকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার।

বাংলার সাহিত্য ও কৃষ্টির সহিত যাতে প্রবাসী বাঙালীর যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন না হয়, সেই জন্যই প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সম্মেলনের অধিবেশন বৎসরে একবার মাত্র হয়ে থাকে, কাজেই তার প্রভাব সীমাবদ্ধ। সম্মেলনের প্রকৃত কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে মতবিভেদ থাকতে পারে না, কিন্তু প্রবাসী বাঙালীর শুধু সম্মেলন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না, আরও নানাবিধ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে।

প্রথম, অন্ততঃ একটি ক'রে পুস্তকালয় প্রত্যেক স্থানে থাকা উচিত ও সেই সঙ্গে একটি পাঠাগার থাকবে, তার জন্য যতগুলি সম্ভব বাংলা সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, বাংলার বাইরে এমন অনেক শহর আছে যেখানে যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন বাঙালী থাকা সত্ত্বেও কোন সাধারণ পাঠাগার নেই। এর কারণ অবশ্যই অর্থন্যূনতা নয়, শুধু উৎসাহ ও উদ্যমের অভাব।

দ্বিতীয়, বাঙালী ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সে ভাষাশিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা করতে হবে। এই সম্বন্ধে একটি কথা সম্মেলনের কর্ত্তৃকপক্ষগণের বিবেচনা করা আবশ্যক। হিন্দীপ্রচারের জন্য কাশী নাগরীপ্রচারিণী সভা যেমন হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের একাধিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত করেছেন, সম্মেলন কি তেমনি বাংলা পরীক্ষার প্রচলন করতে পারেন না? পরীক্ষান্তে প্রশংসাপত্র পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ছেলেমেয়েদের বাংলা শিক্ষা করবার উৎসাহ নিশ্চয় বৃদ্ধি পাবে। হিন্দী পরীক্ষায় তিনটি বিভাগ আছে—প্রথমা, মধ্যমা ও উত্তমা। সম্মেলন গোড়ায় অন্ততঃ ছোটদের জন্য 'প্রথমা' পরীক্ষার আরম্ভ করতে পারেন। এই পরীক্ষা যদি উপযুক্ত সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় তাহ'লে তা জনপ্রিয় হবে না কেন? প্রারম্ভে বাধাবিঘ্ন অনেক ঘটতে পারে, কিন্তু কোনটাই অনতিক্রমণীয় হবে না।

তৃতীয়, প্রত্যেক শহরে বৎসরে একাধিকবার সাহিত্য-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ও সেই সুযোগে ছোটদের আবৃত্তি করতে দেওয়া উচিত। অল্প বয়স হ'তে আবৃত্তি করতে শিখলে তাদের উচ্চারণের উৎকর্ষ সাধিত হবে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচনা-প্রতিযোগিতা যে খুবই ফলপ্রদ তা বলাই বাহুল্য।

চতুর্থ, পাশ্চাত্ত্যে যেমন ভাষাশিক্ষার জন্য গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে, বাংলার জন্যও সেরূপ দরকার। তার দ্বারা অবাঙালীও বাংলা শিখতে পারবেন, আর প্রবাসী বাঙালী ছেলেমেয়েরাও তার সাহায্যে উচ্চারণ, আবৃত্তি প্রভৃতি শিখতে পারবে।

পঞ্চম, এক বিষয়ে প্রবাসী বাঙালী খুব পশ্চাদ্বর্ত্তী নন্। সেটি হচ্ছে সখের অভিনয়। বাঙালীবহুল স্থানে একাধিক নাট্যসমিতি আছে। অভিনয়ের জন্য উপযুক্ত নাটক সচরাচর গৃহীত হয় না এই যা আক্ষেপ। যাই হোক্, অভিনয়ের দ্বারাও ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চ্চা হ'তে পারে।

ষষ্ঠ, বিবাহাদি সামাজিক আদান-প্রদান দ্বারাও দেশের সহিত যাতে যোগ থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া সুবিধা-মত মাঝে মাঝে ছুটিতে ছোটদের দেশে রাখা মন্দ নয়। এমন অনেকে আছেন যাঁরা সারা জীবনে দু-এক বারের বেশী দেশে যান কি-না সন্দেহ, সেটা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। এবার সম্মেলনের অধিবেশন

যে কলকাতায় হয় সেটা এদিক দিয়ে দেখতে গেলে খুবই যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল। মনে হয়, দু-চার বৎসর অন্তর একবার ক'রে বাংলার কোনখানে সম্মেলনের অধিবেশন আহূত হওয়া প্রার্থনীয়, যেহেতু সেই উপলক্ষে বহু প্রবাসী বাঙালী স্বদেশে একত্র হ'তে পারবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রবাসী বাঙালীর ভাষাসমস্যা উপেক্ষার বিষয় নয়। এ সম্বন্ধে প্রবাসী বাঙালীর নিজের যেমন গুরু দায়িত্ব আছে, তেমনি বাংলার জনসাধারণ ও সাহিত্যিকগণের ত একটা কর্ত্তব্য আছে, কারণ ভাষার যাতে বিকৃতি বা অবনতি না হয় তা সকল বাঙালীরই লক্ষ্য। প্রবাসী বাঙালী আজ অন্ন-সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু ভাষা-সমস্যাও যে তাচ্ছিল্যের ব্যাপার নয় তা বোঝবার দিন আজ এসেছে, কারণ জাতির বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি হারিয়ে জীবনযুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হ'লেও গৌরবের কথা নয়।

উর্ম্মিলা

শ্রীঅনিতা বসু

সীতা সহোদরা সতী লক্ষ্মণ-প্রেয়সী,
লো-সুন্দরী উর্ম্মিলা রূপসী,
সীতারাম মুখরিত বাল্মীকি-বীণায়
তব গান কেন গাহে নাই ?
কবিশ্রেষ্ঠ হে গুরু বাল্মীকি,
ছিল নাকি কোন ভাষা বাকি ?
উজাড় করিয়া দিলে সব রামগানে,
চাহিলে না বিরহিণী উর্ম্মিলার পানে !

*   *   *

তোমারে দেখিনু শুধু নব-বধূ-বেশে,
অযোধ্যা প্রাসাদদ্বারে মঙ্গলকলসে
বরণ করিয়া নিল পুরনারী তোমা,
সরমজড়িত পদে লজ্জাবতী সমা
কাঁপিয়া উঠিলে ধীরে স্নিগ্ধ সমীরণে।
চকিতে খুলিয়া গেল অলস গুণ্ঠন, কাজল নয়নে
ছল ছল শোভে জলভার,
দেখি নাই পরে আর বার !

বনে বনে পাহাড়ে কন্দরে
যবে ঘুরে ফিরে
রামানুজ লক্ষ্মণ নির্ভীক
রক্ষে চতুর্দ্দিক
পর্ণ ক্ষুদ্র কুটীরের, প্রহরীর মত নিশি দিন,
কেমনে কাটালে তুমি দিন ?
হে সুন্দরী বিরহিণী প্রিয়া,
বাঁধি নিজ হিয়া
নির্ম্মম সে প্রাসাদের কোন্ শিলাতলে ?
বিদায়ের কালে ?
হে উর্ম্মিলা, উর্ম্মিলা-বিলাসী,
চুমে নাই স্নেহে ভালবাসি
রঙিল নিটোল গালে তব ?
"প্রিয়তম, কেমনে একাকী বল রব ?"
শুধালে না তারে গলে ধরি,
অভাগিনী আহা মরি মরি !
সীতা সম চাহ নি কি সঙ্গে যেতে তুমি ?

চেয়েছিলে,…নিল না'ক সাথে !
উপক্ষিতা অভাগিনী বধূ,
তাই ভাবি শুধু,
দীর্ঘ বরষ তুমি কাটালে কেমনে ?
নিরালা গোপনে
সুবর্ণ মুকুরখানি বুঝি লো প্রসারি,
খুঁজিয়া মরিতে আহা মরি,
নিটোল গালের 'পরে,
বিদায়ের শেষ চিহ্ন তার !
দ্বাদশ বরষ ধরি ভ্রমি বনে বনে,
লক্ষ্মণ কাটাল দিন অগ্রজের সনে।
কেমনে কাটাল দিন উর্ম্মিলা অভাগী ?
সমব্যথাভাগী,
বিশাল প্রাসাদে আহা কেবা ছিল তার ?
শুষ্ক চোখে আপনার
বিদায় দানিল পুত্রে সুমিত্রা যেমনি,
পারিল কি উর্ম্মিলা তেমনি ?
তার পর বনবাস শেষে,
সন্ন্যাসীর বেশে
ফিরে এল যবে রাজপুরে,
উৎসব উঠিল ঘরে ঘরে !
কিন্তু কই শুনি নাই উর্ম্মিলার কথা
সে উৎসব দিনে ! মনোব্যথা
ঘুচিল কি তার মিলন পরশে ?
ঝরেছিল আঁখিধারা সলাজ হরষে ?
রামানুজ রামের আজ্ঞায়
নতমুখে…কোন কথা নাই,
সরযূর স্বচ্ছ জলে প্রবেশিল যবে,
অভাগী উর্ম্মিলা হায় বেঁচেছিল তবে ?
ওগো ঋষি কবি,
তাই আজও ভাবি,
ক্রৌঞ্চ-বিরহিণী দুখে কেঁদেছিল প্রাণ,
কাঁদিল না উর্ম্মিলার তরে। দিলে না'ক দান
বিরাট সে মহাকাব্যে একটুও ঠাঁই।
হে উর্ম্মিলা, তোরে ভুলি নাই,
উপেক্ষিতা অভাগী সুন্দরী,
স্মরণের প্রতি পৃষ্ঠা আছ পূর্ণ করি !*

* রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপেক্ষিতা পাঠ করিয়া

"আরসোলাও পক্ষী" ? "অল্পবেতনভোগী জাপানী প্রধান মন্ত্রীও মন্ত্রী" ?

ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা যায়, যে, তিনি স্কুল-ইন্সপেক্টররূপে একবার এক জন ধনী ও প্রভাবশালী জমিদারের সহিত দেখা করিতে যান। জমিদারটি বুঝিতে পারেন নাই স্কুল-ইন্সপেক্টর কি প্রকারের কর্ম্মচারী। পরে বেতনের কথা যখন সুধাইলেন, তখন উত্তরে বুঝিলেন ভূদেব বাবু দেড় জন বা দু-জন হাকিমের বেতন পান। বেতনের পরিমাণ হইতে জমিদার মহাশয়ের ধারণা হইল যে ভূদেব বাবুকে সম্মান দেখান উচিত। তখন মোড়া আনিতে হুকুম হইল ও ভূদেব বাবুকে বসিতে বলা হইল।

এই গল্পটি সম্পূর্ণ বা অংশতঃ সত্য বা মিথ্যা হইতে পারে। কিন্তু ইহা ঠিক, অনেকেই মানুষের বেতন বা অন্যবিধ আয় হইতে তাহার মূল্য ও মর্য্যাদা নির্ণয় করে—বিশেষতঃ আমাদের মত দেশে।

সুতরাং ভাদ্রের প্রবাসীতে (পৃ. ৭৫০) পাঠকেরা যখন পড়িলেন জাপান-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসিক ১৫০০।২০০০ টাকা, তখন কেহ কেহ ভাবিয়া থাকিবেন, "এ আবার কি রকম মন্ত্রী, কি রকম প্রধান মন্ত্রী ? কথায় বলে, 'আরসোলাও পক্ষী, খৈও জলপান !' এও দেখছি তাই। মাসে বেতন ত পান দেড় দু-হাজার টাকা—তিনি নাকি আবার প্রধান মন্ত্রী!" কেহ যদি এরূপ ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আরও বিস্ময়ের কারণ ঘটাইতে যাইতেছি।

আমরা যখন ভাদ্রের প্রবাসীতে জাপানী প্রধান মন্ত্রীর বেতনের পরিমাণ ঐরূপ লিখিয়াছিলাম, তখন আগে তাঁহার মাসিক বেতন যে এক হাজার ইয়েন ছিল এখনও তাই আছে মনে করিয়া এবং জাপানী মুদ্রা ইয়েনের বর্ত্তমান বাজার-দর বিবেচনা না করিয়া লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমরা এ বিষয়ে কলিকাতায় জাপানের কন্সল-জেনার‍্যালকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার ২৮শে ও ৩১শে আগষ্টের চিঠিতে জানাইয়াছেন, যে, জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বেতন, সংশোধিত হার ("revised scale") অনুসারে, মাসিক ৮০০ (আট শত) ইয়েন। গত ৩১শে আগষ্ট কলিকাতার মুদ্রাবিনিময়ের বাজারে এক শত ইয়েনের দাম ছিল গড়ে ৭৮।০ (আটাত্তর টাকা চারি আনা)। তাহা হইলে জাপানের প্রধান মন্ত্রীর মাসিক বেতন ৬২৬৲ (ছয় শত ছাব্বিশ) টাকা! কলিকাতাস্থিত জাপানী কন্সল-জেনার‍্যাল ইহাও জানাইয়াছেন, যে, জাপানের প্রধান মন্ত্রী বেতন ছাড়া কোন ভাতা পান না।

—

জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বেতন কম বটে, কিন্তু জাপানের শক্তি ও সম্মান কত অধিক !

জাপানের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের বেতন এই রকম কমই বটে। কিন্তু বেতনের অল্পতায় তাঁহার পদমর্য্যাদার কিছুই লাঘব হয় না। জাপান যে শিক্ষায়, জ্ঞানে, বাণিজ্যে, শিল্পে, জলে স্থলে আকাশে আত্মরক্ষাসামর্থ্যে ও পরাক্রমে এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্মানে এত বড়, তাহার একটা কারণই এই, যে, সেই স্বাধীন দেশে খুব বেশী দায়িত্বের দেশের কাজ করিবার নিমিত্ত যোগ্যতম লোকও অল্প বেতনে পাওয়া যায়। তাঁহারা মাতৃভূমির সেবা করিয়াই ধন্য।

ভারতবর্ষের অবস্থা ভাবুন।

খাস জাপানের আয়তন ১,৪৭,৫৯৩ বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা ৬,৪৪,৫০,০০৫। ভারতবর্ষের আয়তন ১৮,০৮,৬৭৯ বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮। জাপান স্বাধীন। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের অধীন। ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট

ও বড়লাট ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট, মন্ত্রিমণ্ডল ও ভারত-সচিবের অধীন। ভারতের প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলি—বঙ্গীয় ও অন্যান্য গবর্মেণ্টগুলি—ভারত-গবর্মেণ্টের অধীন। এই অধীনের অধীন, অর্থাৎ তস্য অধীন, প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির নিজস্বশক্তিহীন মন্ত্রীরা বৎসরে ৬৪,০০০ (চৌষট্টি হাজার) টাকা বেতন পান। জাপানের প্রধান মন্ত্রী পান বৎসরে ৭৫১২ (সাত হাজার পাঁচ শত বার) টাকা।

সে দিন আমাদের এক বন্ধু বলিতেছিলেন, ভারতবর্ষে বেতন কমাইবার কথা তুলিবেন না—বেশী বেতন না দিলে উৎকোচ গ্রহণ আরম্ভ হইবে বা বাড়িবে। কিন্তু আমাদেরই দেশে ত শাসন-পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীদের চেয়ে খুব কম বেতনে মুন্সেফ সদরালারা উৎকোচ গ্রহণ না করিয়া কাজ করেন। তাঁহাদের সুখ্যাতি, শিক্ষা ও যোগ্যতা উচ্চতর বেতনভোগী চাকরোদের চেয়ে কম নয়।

প্রকৃত কথা এই, যে, ব্রিটিশ শাসকেরা বেতন চান ও পান বেশী। কতকগুলি—অধিকসংখ্যক নয়—দেশী লোককে বেশী বেতন না দিলে ব্রিটিশ ও ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে বেতনের প্রভেদটা চোখে বড় বেশী লাগে; এবং বেশী বেতনভোগী কতকগুলি পোষমানান দেশী লোকের দরকারও আছে।

কংগ্রেসে যে প্রস্তাব হইয়াছিল, ভারতবর্ষে কোন সরকারী কর্ম্মচারীর বেতন মাসিক পাঁচ শত টাকার বেশী হইবে না, জাপানী দৃষ্টান্তের সহিত তাহার সামঞ্জস্য আছে। ভারতবর্ষের লোকদের জনপ্রতি গড় আয় জাপানীদের জন-প্রতি গড় আয় অপেক্ষা কম। সুতরাং আমাদের এই দরিদ্রতর দেশে সরকারী চাকরোদের বেতন জাপানী চাকরোদের চেয়ে কম বই বেশী হওয়া উচিত নয়।

জাপানে বহুসংখ্যক সরকারী চাকরোকে বেশী বেতন দিতে হয় না, এবং তাঁহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী আড়ম্বর ও বিলাসবিহীন অথচ শোভন, মার্জ্জিত ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক বলিয়া জাপান অত্যাবশ্যক শিক্ষাব্যয়, কৃষির উন্নতির ব্যয়, শিল্পোন্নতির ব্যয়, বাণিজ্যোন্নতির ব্যয় প্রভৃতি অধিক করিতে পারে। আমাদের দেশেও আমরা সরকারী সব ব্যাপারে এবং গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনে মিতব্যয়ী না-হইলে কখনও জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে পারিব না।

উচ্চ কতকগুলি পদের বেতন ভারতবর্ষে আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। যদি বা কচিৎ তাহার কোনটিতে অধিষ্ঠিত কোন কর্ম্মচারী তার চেয়ে কম বেতনে কাজ করিতে চান, তাহা হইলেও আইন না বদলাইলে তাহা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু আইন বদলাইবার ক্ষমতা তাঁহার বা অন্য কোন ভারতীয়ের নাই। এ অবস্থায় বিহারের অন্যতম মন্ত্রী সর্ গণেশদত্ত সিংহের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। তিনি মন্ত্রিত্বের বেতন যাহা পাইয়াছেন, তাহার অধিকাংশ দেশহিতার্থ দান করিয়াছেন।

—

ইহা কি ভারতহিত-প্রচেষ্টার আনুকূল্য ও প্রগতিসাধন?

খবরের কাগজে দেখিলাম এবং একটি মুদ্রিত পত্রীতেও তাহা আছে, যে, কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের "ত্রিদণ্ডী স্বামী বি এইচ বন মহারাজ" ব্রিটেনে ও ইউরোপে যে কাজ করিয়াছেন তাহার দ্বারা ভারতহিতচেষ্টা খুব সাহায্য পাইয়াছে ও অগ্রসর হইয়াছে ("the cause of India has been greatly helped and advanced")। এই কাজ যে লণ্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটীর পরিচালনায় সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার প্রেসিডেণ্ট খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী লর্ড জেটল্যাণ্ড এবং তাহার ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ("Preacher-in-charge") স্বামী বি এইচ বন। তিনি ধর্ম্মোপদেশ কি দিয়াছেন এবং কি ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন জানি না, এবং যদি জানিতাম তাহা হইলেও তাহার সমালোচনা করিতাম না। কিন্তু তিনি নিজ রাজনৈতিক যে মত লণ্ডনে একটি সভায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের জানা আবশ্যক; কারণ, কাগজে দেখিয়াছি সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে।

বিলাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশ্যন নামক একটি সভা আছে। ভারতবর্ষে বড় চাকরী করিবার পর মোটা পেন্স্যন লইয়া যে-সব ইংরেজ স্বদেশে গিয়া আরামে থাকেন ও ভারতের নুনের গুণ গান করেন, প্রধানতঃ তাঁহারা ইহার সভ্য। ভারতীয় কতকগুলি রাজা মহারাজা নবাবও সভ্য। ভারতবর্ষে স্বাজাতিক (ন্যাশন্যালিষ্ট) উদারনৈতিক সংঘ (National Liberal Federation), কংগ্রেস প্রভৃতি জনপ্রতিনিধিসমষ্টি যে-সব রাজনৈতিক মত ব্যক্ত ও আদর্শ পোষণ করেন,

তাহার বিরোধিতা করা এই সভার একটি প্রধান কাজ। এই সভায় গত ২৯শে জুন পার্লেমেন্টের সভ্য হিউ মল্‌সন্ সম্প্রতি আইনে পরিণত ভারত-গবর্মেণ্ট বিল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহা ঐ সভার মুখপত্র এশিয়াটিক রিভিয়ুর চলিত (জুলাই-সেপ্টেম্বর) সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে ভারত-গবর্মেণ্ট আইনটির সমর্থন ও প্রশংসা আছে। প্রবন্ধটি পঠিত হইবার পর তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই আলোচনায় স্বামী বি এইচ বনও যোগ দেন। তিনি বলেন :—

"I am not a politician, nor have I much interest in politics. On the other hand, I have come from India and have travelled as a religious monk all over my country, so constantly coming in contact with the people, not so much the politicians, but knowing the mentality and outlook of the people in general. What has been talked of the present Constitution that is coming into force very soon in our country? The common people think a little differently from the great politicians, who give so much of their time and brain to think out the best good of the country."

"Those people in India who have some education, who can read English fairly well, but do not give so much time to politics as the people here give, have a general knowledge of what is going on in the world, and especially Indian politics. Most of them think that reform has been very good and very practical under the present circumstances in our country, that further results will be very good provided there is genuineness and sincerity on both sides. That seems to be the general mentality now in our country, that the new Constitution will work very well provided the Ministers show their willingness to rise above party politics and really look on all the people of the country as their brothers and seek their real good."—Page 468.

বন স্বামীর এই অমূল্য কথাগুলির অনুবাদ করিব না। ভারতবর্ষের মুরুব্বি ইংরেজরা যাহা বলে ইহা তাহারই প্রতিধ্বনি। স্বামীটি বলিতেছেন, যে, (রাজনীতিচর্চ্চাকারীরা ছাড়া) দেশের অধিকাংশ লোক মনে করে, শাসনসংস্কারটা খুব ভাল হইয়াছে ("the reform has been very good")। এবং স্বামীটি বলিতেছেন যে দেশের লোক-দের সঙ্গে মিশিয়া নাকি তিনি ইহা জানিতে পারিয়াছেন। বড় বড় পলিটিশিয়ানরা তাহা করেন না কিনা, তাই তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন না! কিন্তু স্বামীটি নিজেই যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার আনাড়িত্ব ও অনধিকারচর্চ্চা বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন, তিনি যে শুধু পলিটিশিয়ান নহেন তাহা নহে, পলিটিক্সে তাঁহার বড় একটা রুচি নাই।

বন স্বামীটিকে খুব আড়ম্বরের সহিত অভ্যর্থনা করা হইবে, শুনিতেছি। লর্ড জেটল্যাণ্ড এখন ভারত-সচিব, এবং স্বামীটির মুরুব্বিও বটে। তাঁর কাছে অভ্যর্থনাটার খবর পৌছিবে, এবং তিনি ও অন্য ইংরেজরা তাহা হইতে বুঝিবেন, যে, স্বামী বন যে বলিয়াছিলেন, যে, দেশের অ-পলিটিশিয়ান অধিকাংশ লোক ভারতশাসন-সংস্কার আইনটাকে খুব ভাল মনে করে, তাহাই ঠিক্ এবং স্বাজাতিক (ন্যাশন্যালিষ্ট) কংগ্রেসওয়ালা ও উদারনৈতিকরা যাহা বলে, তাহা মিথ্যা।

—

বিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ সরকারী নীতি

গত ১লা আগষ্ট বহু সংবাদপত্রে বাংলা-গবর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগ হইতে বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে গবর্মেণ্টের অভিপ্রায় সূচক নানা মন্তব্যসহ একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাহার অনেক সমালোচনা হয়। ভাদ্রের প্রবাসীতেও হইয়াছিল। তাহার পর গত ২৫শে আগষ্ট কলিকাতার আলবার্ট হলে সর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ও তদনন্তর সর্ নীলরতন সরকারের সভাপতিত্বে সায়ংকালে ভবিষ্যৎ সরকারী শিক্ষানীতির প্রতিবাদ ও সমালোচনার্থ একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বহু বিদ্বান, মনস্বী ও শিক্ষাভিজ্ঞ ব্যক্তি যোগদান করেন। হল ও গ্যালারী পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অত্যন্ত বেশী ভীড় হইয়াছিল। সেই দিন যে সভা হইবে, তাহা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। যাঁহারা সভায় কিছু বলিবেন স্থির ছিল, তাঁহারা ১লা আগষ্ট প্রকাশিত বিবৃতিটিরই সমালোচনা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সে দিন সকালেই দেখা গেল, কোন কোন দৈনিকে সরকারী অন্য একটি শিক্ষাবিষয়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার সহিত ১লা আগষ্টের বিবৃতিটির কোন কোন প্রধান বিষয়ে বিশেষ প্রভেদ আছে। সুতরাং বক্তাদিগের পক্ষে আবার দুটিই মিলাইয়া পড়িয়া তদনুসারে নিজ নিজ বক্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করা আবশ্যক হইল। সকলের তাহা করিবার অবসর হইয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু সভার সমক্ষে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিবার ভার আমার উপর থাকায় আমাকে স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান

অবস্থাতেও তাহা করিতে হইয়াছিল, এবং আমার বক্তব্য যথাসাধ্য সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিলেও এক ঘণ্টা বলিতে হইয়াছিল। ইহাতে আমি স্বদেশবাসী বাঙালীদিগকে নানা দিক্ হইতে আমার বক্তব্য জানাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ৩১শে আগষ্টের অমৃত বাজার পত্রিকা প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এ বিষয়ে লিখিয়াছেন :—

"At the Albert Hall meeting it appeared that the organizers did not pay sufficient attention to that part of the new educational scheme which deals with primary education."

"আলবার্ট হলের সভার উদ্যোক্তারা শিক্ষাবিষয়ক নূতন স্কীমটির প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় অংশটি সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ করেন নাই মনে হয়।"

কিন্তু ইহাও লিখিয়াছেন :—

"Sj. Ramananda Chatterjee, the main speaker at the meeting, no doubt made an elaborate criticism of the entire scheme touching on all the different aspects."

"সভার প্রধান বক্তা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহ সমগ্র স্কীমটির বিভিন্ন সকল দিকের উল্লেখ করিয়া তাহার সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছিলেন বটে।"

ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই বক্তৃতার বিস্তৃত রিপোর্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কলিকাতার কাগজগুলির রিপোর্ট করিবার আয়োজন এত অযথেষ্ট ও নিকৃষ্ট যে মাত্র মাসিক কাগজের সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার সমগ্র রিপোর্ট বাহির হওয়া দূরে থাক্, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতাটি মুদ্রিত আকারে না পাইলে দৈনিক পত্রিকাগুলির পরিচালকেরা, দরকার মত তাঁহাকে দেশপূজ্য ইত্যাদি বলিলেও, তাঁহারও বক্তৃতারও চলনসই রিপোর্টও বাহির করিতেন না। আমাদের অভিজ্ঞতায় মান্দ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর ও এলাহাবাদের কাগজে কলিকাতা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রিপোর্ট দেখিয়াছি। প্রশ্ন হইতে পারে, "তুমিও কেন তোমার বক্তৃতা লিখিয়া ছাপাইয়া রিপোর্টারদিগকে দাও নাই?" আমার কৈফিয়ৎ এই, যে, আমি এক ঘণ্টায় যাহা বলি তাহা লিখিতে গেলে আমার পনর-ষোল ঘণ্টা লাগে—আমি ইহা অপেক্ষা দ্রুত লিখিতে পারি না; এক জন পেশাদার সাংবাদিক এবং যাহাকে বলিতেও হয় অনেক সভায়—তাহার এত অবসর এবং লিখিবার দৈহিক শ্রমের শক্তি কোথায়? এবং সব বক্তা যদি নিজেই সব লিখিয়াই দিবেন, তাহা হইলে তথাকথিত রিপোর্টাররা আছেন কি জন্য?

যাহা হউক, আমি যে বঙ্গদেশবাসী পঠনক্ষম সর্ব্বসাধারণকে আমার সব বক্তব্য জানাইতে পারিলাম না, ইহার জন্য ক্ষোভ হইতেছে। এখন চেষ্টা করিলেও লিখিতে পারিব না—যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সব মনে নাই।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা

বাংলার সরকারী শিক্ষাবিভাগ বঙ্গে ভবিষ্যতে শিক্ষা কি প্রকারে দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে যে মত ও বিবৃতি ১লা আগষ্ট ও ২৫শে আগষ্ট খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ২৫শে আগষ্টের জিনিষটি পরবর্ত্তী। সুতরাং কোন কোন বিষয়ে তাহাতে ব্যক্ত অভিপ্রায়েরই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। তাহাতে আছে—

"Provision should be made in all schools attended by Mussalman students for religious instruction and the teaching of Islamic subjects. Similar provisions should also be made for Hindu students."

"A beginning should be made in high schools to inculcate some religious and moral teaching."

তাৎপর্য্য। যে সব বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র পড়ে, তাহাতে ধর্ম্মোপদেশ দিবার এবং ইস্লামিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। হিন্দু ছাত্রদের জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।"

"উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে কিছু নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের আরম্ভ করা উচিত।"

ধর্ম্মশিক্ষাদান আমরা চাই, আমরা তাহার বিরোধী নই। কিন্তু সরকারী বিদ্যালয়ে—যেখানে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে—ধর্ম্মশিক্ষাদান ব্যবস্থার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। সরকারী বিজ্ঞপ্তিটিতে কেবল মুসলমান ও হিন্দুদের ধর্ম্ম শিখাইবার কথা আছে। কিন্তু কোন কোন বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টীয়ান, জৈন ও বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রীও আছে। তাহারা কেন ধর্ম্মশিক্ষা পাইবে না? বলিতে পারেন, বঙ্গে খ্রীষ্টীয়ান, জৈন ও বৌদ্ধের সংখ্যা কম, তাহাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের সমষ্টি কম, সুতরাং তাহাদের জন্য খরচ করা চলিবে না। এই যুক্তি যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে শুধু ধর্ম্মশিক্ষা নহে, অন্য সব রকম শিক্ষাতেও প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য সেই অনুপাতে খরচ করা উচিত, যে-অনুপাতে তাহারা

ট্যাক্স দেয়। এই নিয়ম অনুসারে এখন কাজ হয় না। হিন্দুরা বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের শতকরা ৮০ অংশ দেয়, এবং তাহাদেরই প্রদত্ত টাকা হইতে কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য যাহা খরচ হয়, কেবলমাত্র হিন্দুদের নিমিত্ত শিক্ষাব্যয়ের তাহা অন্যূন ১৫।১৬ গুণ। এই জন্য এরূপ আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক, যে, হিন্দুদের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে মুসলমানদিগকে তাহাদের ধর্ম্ম শিখাইবার বন্দোবস্ত হইতে যাইতেছে।

ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্।

ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান জড়িত। হিন্দুর অনুষ্ঠানে ও মুসলমানের অনুষ্ঠানে পার্থক্য এবং কোন কোন স্থলে বৈপরীত্য আছে। দু-রকমের অনুষ্ঠান দুই দল ছাত্রছাত্রীকে একই বিদ্যালয়ে শিখাইবার চেষ্টায়, শিক্ষার যে পরম বাঞ্ছনীয় ফল ঔদার্য্য পরমতশ্রদ্ধাসহিষ্ণুতা এবং মহাজাতির সকল অংশের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন, তাহা কি পাওয়া যাইবে? বরং তাহার উল্টা ফলই কি ফলিবে না? হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা কালীপূজা করিতে ও পাঁঠা বলি দিতে চাহিলে—এমন কি সরস্বতী পূজা করিতে চাহিলে, মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা কি বকরীদ ও কোন কোন পশু কোরবানী করিতে চাহিবে না? এখনই কি চায় না? একই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নানা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান শিখাইতে গেলে ভীষণ অশান্তি জন্মিবে।

যদি কোন বিদ্যালয়ে কেবল একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ছেলে-মেয়েরা পড়ে, তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ বটে, কিন্তু তাহাও সর্ব্বসাধারণের প্রদত্ত সরকারী রাজস্ব হইতে, অর্থাৎ সরকারী ব্যয়ে, দেওয়া অন্যায়, অনুচিত ও অধর্ম্ম হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই আবার উপসম্প্রদায়, শাখা-সম্প্রদায় আছে, এবং কোন কোন বিষয়ে তাহাদের মতপার্থক্য আছে। কোন্ মত শিখান হইবে? হিন্দুদের বৈষ্ণব মত, না শাক্ত মত, কোন্‌টি শিখান হইবে?

ভারতবর্ষে, বঙ্গে, নানা সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে আইন করিতে গেলেই রব তুলেন, "ধর্ম্ম গেল", "ধর্ম্ম গেল"। কোন একটি বিশেষ মত বা অনুষ্ঠান শিখাইতে গেলেই এরূপ রব উঠিবে না কি? এবং হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টীয়ান আদি ধর্ম্মের মত সরকারী বা সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত কোন বিদ্যালয়ে শিখাইতে গেলে, কোন্ মত শিখান হইবে, তাহার শেষ মীমাংসক গবর্ন্মেণ্ট হইবেন না কি? যাঁহারা সামাজিক আইন-প্রণয়ন সম্পর্কেও পরোক্ষ ভাবে গবর্ন্মেণ্টের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ আশঙ্কা করেন এবং তাহাতে নারাজ, তাঁহারা গবর্ন্মেণ্টকে সাক্ষাৎ ভাবে ধর্ম্মমতের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের মীমাংসক হইতে দিলে তাহাতে "ধর্ম্ম গেল" রবটা কেন উঠিবে না, বুঝিতে পারি না।

সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত সুনীতির উপদেশগুলি সমুদয় বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকসমূহের ভিতর দিয়া এবং শিক্ষকদের চরিত্র ও ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দ্বারা অবশ্যই শিখান উচিত।

জাপানের বিদ্যালয়সমূহের এই নিয়ম অনুসারে কাজ হইয়া থাকে।

—

জাপানী বিদ্যালয়সমূহে নীতিশিক্ষা আবশ্যিক, ধর্ম্মশিক্ষা নিষিদ্ধ

জাপানী বিদ্যালয়সমূহে সুনীতিশিক্ষাকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। জাপানী ভাষা, পাটীগণিত প্রভৃতির শিক্ষাদান তাহার পরবর্ত্তী। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

"Elementary schools are designed to give children the rudiments of moral education specially adapted to make of them good members of the community, together with such general knowledge and skill as are necessary for the practical duties of life, due attention being paid to their bodily development."

তাৎপর্য্য। বালকবালিকারা যাহাতে সমাজের ভাল সভ্য হইতে পারে তদুপযোগী নৈতিক শিক্ষার প্রারম্ভিক উপদেশ দান এবং তাহার সঙ্গে জীবনের কর্ত্তব্য কাজ করিবার জন্য আবশ্যক সাধারণজ্ঞান ও ও নৈপুণ্য, দৈহিক বিকাশে যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান সহকারে, তাহাদিগকে দিবার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অভিপ্রেত।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জাপানী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা দেওয়া হয় :—

"The subjects taught are morals, Japanese language. arithmetic, Japanese history, geography, science, drawing, singing, sewing (for girls only) and gymnastics. In the higher courses either one or more subjects out of handicraft, agriculture, industry, commerce, and domestic science (for girls only), are added, and if local circumstances make it advisable, handicraft in ordinary elementary schools and foreign languages and other useful subjects in higher elementary schools may also be taught."

তাৎপর্য্য। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ—নীতি, জাপানী ভাষা, পাটীগণিত, জাপানের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, রেখাঙ্কন, গান, সেলাই (কেবল

বালিকাদের জন্য), এবং ব্যায়াম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বিষয় যুক্ত হয়। যথা—কারিগরী, কৃষি, কারখানার পণ্যশিল্প, বাণিজ্য, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (কেবল বালিকাদের জন্য)। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে পরামর্শসিদ্ধ হইলে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কারিগরী এবং উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদেশীভাষাসমূহ ও অনান্য ফলপ্রদ বিষয়ও শিখান যাইতে পারে।

ইহা অনুধাবনযোগ্য, যে, নীতিশিক্ষাকে প্রথম ও প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে।

ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে জাপানের সরকারী নিয়ম নীচে উদ্ধৃত হইল।

"Religion is, on principle, excluded from the educational agenda of schools. In all schools established by the Government and local public bodies, and in private schools whose curricula are regulated by laws and ordinances, it is forbidden to give religious instruction or to hold religious ceremonies either in or out of the regular curricula."

তাৎপর্য্য। রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি অনুসারে, বিদ্যালয়সমূহের করণীয় কাজের তালিকা হইতে ধর্ম্মকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। গবর্মেন্টের দ্বারা ও স্থানীয় পৌরজানপদগণের প্রতিনিধিস্থানীয় মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমুদয় বিদ্যালয়ে, এবং যে-সকল বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় আদি সরকারী আইন ও নিয়মাবলী অনুসারে নিরূপিত হয় তৎসমূহে, নির্দ্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অঙ্গস্বরূপ বা তাহার বাহিরে, ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দান বা কোন ধর্ম্মের অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ।

মনে রাখিতে হইবে, জাপানে মসজিদের অদূরে বা সম্মুখে বাজনা লইয়া, গোরু কোরবানী লইয়া, বা এইরূপ অন্য কিছু লইয়া ঝগড়া, রক্তারক্তি নাই। সেখানে প্রচলিত প্রধান দুটি ধর্ম্মমত বৌদ্ধ ও শিন্টো। একই মানুষ উভয়ের অনুসরণ করিতে পারে ও করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বিরোধ ও বৈপরীত্য নাই। তথাপি জাপানী বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা নিষিদ্ধ।

—

ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিষয়ক ঔদার্য্য ও অসহিষ্ণুতা

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ধর্ম্মবিষয়ে সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ঔদার্য্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর সংখ্যায় (৪১৮ পৃষ্ঠায়) তাঁহার ইস্‌লামিক সাধনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরিয়া "আনন্দ বাজার পত্রিকা" স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত কথাগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মাথায় বড় বড় অক্ষরে ছাপিতেছেন :—

"বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা-কালী পাঁঠা খাবেন, আর শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এদেশে চিরকাল। যদি না-পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু'চার জনের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে হাড়-জ্বালাতন হ'তে হবে বুঝি?"

যাঁহারা 'বুড়ো শিব,' 'মা-কালী' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' মানেন এবং তাঁহাদিগকে সমশ্রেণীস্থ মনে করেন, তাঁহাদিগকে 'সরে পড়'বার হুকুম দিবার মত আস্পর্দ্ধা আমাদের নাই; কিন্তু যাহাদের মত অন্যবিধ, তাহারা 'দু'চার জন' নয়, কয়েক্ কোটি হইবে, এবং কাহারও হুকুমে সরিয়া পড়িবে না। এরূপ হুকুম দেওয়াটা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নহে। যদি তাহারা দু'চার জনই হয়, তাহা হইলেই বা তাহারা সরিয়া পড়িবে কেন? একমাত্র ভগবানের আদেশে সরিয়া পড়িতে পারে, অন্য কাহারও হুকুমে নহে। কিন্তু ভগবান নাস্তিককেও, মহাপাপীকেও, সরিয়া পড়িতে বলেন না।

ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের এমন অনেক উক্তি আছে, যাহা যে উপলক্ষ্যে উক্ত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ না করিয়া এবং অন্য যে-সব উপদেশের সঙ্গে উক্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া উদ্ধৃত করিলে তাঁহাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে ভ্রম হইতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামীজীর কথা সেরূপ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে কিনা, জানি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ এম্-এরা ও অন্যান্য শিক্ষিত লোকেরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে 'ধর্ম্মশিক্ষা' পান নাই। তাহাতেই যে রকম অসহিষ্ণুতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে বালকবালিকারা 'ধর্ম্মশিক্ষা' বিদ্যালয়ে পাইলে কি প্রকার মনুষ্যে পরিণত হইবে বলা যায় না।

—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা

নিজে প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণপণ করিয়াও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা যে কালীঘাটে পশুবলির উচ্ছেদ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার সদিচ্ছার প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতেও বলি। বলিদাতাদের সকলের বা অধিকাংশের ন্যায়বুদ্ধি ও করুণা তাঁহার প্রায়োপবেশন দ্বারা স্থায়ী ভাবে উদ্বুদ্ধ হইবে মনে করি না।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মার ছবি ৮৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

—

শক্তিপূজায় পশুবলি

যাহারা শক্তিপূজা করে না, পশুবলি বা কুষ্মাণ্ডইক্ষুদণ্ডাদি

কোন বলিই দেয় না, তাহাদের এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ জানিয়া তাহার অনুসরণ করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু শক্তিপূজক বলিদাতাদের তাহা জানা আবশ্যক। এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রানুসরণকারী সকলের একমত হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ হিন্দুর শাস্ত্র একটি নহে, শ্রুতিস্মৃতিপুরাণউপপুরাণভেদে অনেক, এবং সকল শাস্ত্রের মত এক নহে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত, যে, পশুবলি দিতেই হইবে, সকল শাস্ত্রের শক্তিপূজা-বিধি এরূপ নহে। ইহা আমরা সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বলিতেছি না। স্বর্গীয়া রাণী রাসমণির দৌহিত্র কলিকাতা ইঁটালীর জমিদার শ্রীযুক্ত বলরাম দাস ১৮৩২ শকাব্দে যে ব্যবস্থাপত্র অনুসারে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে তাঁহার নিজ দেবসেবার সময় পশুবলি উঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই ইহা লিখিত আছে। এই ব্যবস্থাপত্র সংস্কৃতে লিখিত এবং তাহার বাংলা অনুবাদও আছে। বাংলা অনুবাদের শেষ এইরূপ :—

"বৈধহিংসা কর্ত্তব্য নহে, বৈধহিংসাও রজোগুণের কার্য্য" এই প্রকার শ্রাদ্ধবিবেক টীকাকার গোবিন্দানন্দধৃত বৃহন্মনুবচনদ্বারা বৈধহিংসাও রজোগুণের কার্য্য, অতএব সাত্ত্বিকাধিকারীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ প্রতিপন্ন হওয়ায় বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক এবং শক্তিমন্ত্রোপাসক সাত্ত্বিকাধিকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত কালিকামূর্ত্তি পূজা ছাগাদি পশুঘাত পূর্ব্বক বলিদান ব্যতীত করিলে কোনই পাপ হয় না, পক্ষান্তরে পূর্ব্বপ্রদর্শিত পদ্মোত্তর-[illegible]ীয় পার্ব্বতীর বচনসমূহ দ্বারা ছাগাদিপশুঘাত পূর্ব্বক বলিদানের সহিত দেবতার অর্চ্চনা করিলে অর্চ্চনাকারীদের নরকজনক পাপ হয়, এইরূপ অবগত হওয়ায় তাহাদের কখনও ছাগাদিপশুঘাত পূর্ব্বক বলিদানের সহিত পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠাপিত কালিকামূর্ত্তির পূজা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের উত্তর। শকাব্দা ১৮৩২, ৫ই জ্যৈষ্ঠ।

এই ব্যবস্থাপত্রে কলিকাতার ত্রিশ, নবদ্বীপের সতর, ভট্টপল্লীর দশ, কাশীর নয়, এবং হরিদ্বারের তিন, মোট উনসত্তর জন শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রীয় আচারনিষ্ঠ পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। ইঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ এবং মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ চৌদ্দ জন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তদ্ভিন্ন মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, 'নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক' মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন কবিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযদুনাথ সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীভাগবতাচার্য্য স্বামী প্রভৃতি এই ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় অধ্যাপক পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ইহা ১৩২০ সালের আশ্বিনের প্রবাসীতে পুনর্মুদ্রিত করাইয়াছিলেন।

—

শিক্ষামন্ত্রীর অনুরোধ

গত ২৫শে আগষ্ট বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর হইতে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, খবরের কাগজে তাহা দেখিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রী মহাশয় এরূপ আলোচনা চাহিয়াছেন যাহাতে গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তব্যনির্ণয় করিতে পারেন। কিসে সরকার বাহাদুরের সুবিধা হইবে তাহা আমরা জানি না। তবে আমাদের দু-চারটা মত জানাইতেছি।

গবর্ন্মেণ্ট আগে ১লা আগষ্টের বিবৃতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬,০০০ করিবেন লেখেন। সমালোচনার প্রভাবে ২৫শে আগষ্টের বিজ্ঞপ্তিতে তাহা ডালপালা লইয়া ৪৮,০০০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। আমরা বলি, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাবিভাগ একটা কোন সংখ্যার দাস হইবেন না; প্রাথমিক বিদ্যালয় এতগুলি, মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় এতগুলি, মধ্যবাংলা বিদ্যালয় এতগুলি, উচ্চ-বিদ্যালয় এতগুলি, আগে হইতে এরূপ এক একটা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া অটল অচল হইবেন না। সরকারের টাকায় যতটা কুলায় ততগুলি প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ আদর্শ বিদ্যালয় তাঁহারা স্থাপন করুন ও চালান, কিন্তু বেসরকারী লোকদিগকে নিরুৎসাহ না করিয়া, দুস্মন না ভাবিয়া, তাঁহাদিগকেও বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করুন। কতকগুলি বিদ্যালয় উঠাইয়া দিতেই হইবে, গবর্ন্মেণ্ট এরূপ সিদ্ধান্ত ও প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করুন। যেখানে একটি বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবেন, সেখানে তাহার জায়গায় একটি উৎকৃষ্টতর বিদ্যালয় স্থাপন করুন, কিংবা স্থানীয় অন্য বিদ্যালয়ে তাহার ছাত্রেরা নিশ্চয় পড়িতে পারিবে, এরূপ বিশ্বাসযোগ্য আশ্বাস ও প্রমাণ প্রদান করুন। আমরা ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি, যে, বঙ্গে সওয়া লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইলে তবে এই দেশের লিখন-পঠনক্ষমদের বিস্তার ও পরিমাণ কোম্পানীর আমলের আগেকার সমান হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হ্রাসবৃদ্ধিসাধন সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয় সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য।

আমাদের মত ইহা বটে, যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষা, জ্ঞানদান, দেশভাষার মধ্য দিয়া হওয়া উচিত। কিন্তু তাহার মানে ইহা নহে, যে, ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে ইংরেজী পড়িতে হইবে না। ইংরেজী পড়া চাই-ই চাই। জাপান ত ইংলণ্ডের বা অন্য কোন দেশের অধীন নহে, অথচ, আগেই দেখাইয়াছি, যে, জাপানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিরই উচ্চতর শ্রেণীতে ইংরেজী বা অন্য বিদেশী ভাষা ধরান হয়। আমাদের দেশে ইংরেজীর আরও বেশী দরকার। জাপানী মধ্য-বিদ্যালয়গুলির কথা পরে বলিব। গবর্মেণ্ট ইংরেজী পড়ানর বিরুদ্ধে অভিযান পূর্ণমাত্রায় ত্যাগ করুন।

খোলাখুলি ভাবে বা প্রকারান্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয় সবগুলির বা অধিকাংশের মক্তবীকরণের সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি যাঁহাদিগকে অন্ধ করে নাই, মুসলমানদের মধ্যে পর্য্যন্ত এরূপ লোকেরা মক্তবগুলিকে জ্ঞান লাভের পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান মনে করেন না—বিচারক্ষম হিন্দুরা ত করেনই না। যদি মুসলমানদের মক্তব নামটি এবং মক্তবে প্রদত্ত অযথেষ্ট শিক্ষা ব্যতিরেকে না-চলে, তাহা হইলে মক্তব তাহাদের জন্যই থাক, অন্য অসাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়া বা প্রতিষ্ঠিত না করিয়া হিন্দু ছেলেমেয়েদিগকে অগত্যা মক্তবে যাইতে বাধ্য করা ঘোরতর অন্যায় ও অত্যাচার হইবে, এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ঘোষিত ধর্ম্মবিষয়ক নিরপেক্ষতার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে।

প্রাথমিক পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সমগ্র শিক্ষা-প্রণালীর এরূপ যোগসূত্র রাখুন, যাহাতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীগণ ধাপে ধাপে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যত দূর সাধ্য শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সভ্য দেশসমূহের শিক্ষা-প্রণালী এইরূপ। বাংলা দেশের অধিকাংশ লোক পল্লীগ্রামবাসী বলিয়া তাহাদিগকে পল্লীগ্রামেই পচিতে হইবে, ইহা বিধিলিপি নহে, এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বিধাতার স্থান অধিকার করিতে চাহিলে তাহা অনধিকারচর্চ্চা হইবে।

আমরাও বলি, গ্রামে যাও, গ্রামে থাক। কিন্তু সে কেমন গ্রাম? গ্রামের উৎকৃষ্ট আদর্শ মনে মুদ্রিত করিতে হইলে এবং তাহা বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষার আবশ্যক, তাহা গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না, শিক্ষাবিভাগের কল্পিত ভবিষ্যৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতেও পাওয়া যাইবে না। ইউরোপের গ্রাম আমরা দেখিয়াছি। আমাদের গ্রামগুলিকে সেইরূপ করিবার অবিরত চেষ্টা করিলে, তাহার পর মানুষকে সেখানে থাকিতে, যাইতে, বলা শোভা পাইবে।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতে গবর্মেণ্ট বিরত হউন। যদি মুসলমানরা একান্ত চান, তাহা হইলে কেবল মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অভিপ্রেত ও তাহাদেরই দ্বারা পূর্ণ বিদ্যালয়গুলিতে নিজেদের টাকায় তাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করুন। সরকারী টাকায় ইহা করানর মানে প্রধানতঃ হিন্দুর টাকার অপব্যবহার। তাহা দেশে শান্তি স্থাপনের অনুকূল নহে।

বালিকা-বিদ্যালয়গুলি গবর্মেণ্ট যেন একটিও উঠাইয়া না দেন। উহা আরও বাড়া একান্ত আবশ্যক। যে সব জায়গায় বালিকারা আপনা হইতে বালক-বিদ্যালয়ে যায় বা যাইবে, সেখানে বালক-বালিকাদের একত্র শিক্ষা চলুক। কিন্তু সহ-শিক্ষাকেই বালিকাদের শিক্ষার প্রধান উপায় করিবার সময় এখনও আসে নাই।

গত ১লা আগষ্ট প্রকাশিত গবর্মেণ্টের বিবৃতিটি পড়িলে মনে হয়, যেন, সরকারী মতে, বেসরকারী লোকেরা বিদ্যা[illegible] ও কলেজ স্থাপন ও পরিচালন করিয়া একটা কুকর্ম্ম, একটা অপরাধ, করিয়াছে। অবশ্য ঐ ছুটি সরকারী কাগজে স্পষ্ট করিয়া এরূপ কথা বলা হয় নাই। কিন্তু কথাগুলার সুরটার ব্যঞ্জনা ঐরূপ। অন্য সব সভ্য (এবং অবশ্য স্বাধীন) দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থাপক ও পরিচালক বেসরকারী লোকদিগকে তত্তদ্দেশের গবর্মেণ্ট এরূপ চক্ষে দেখেন না। শিক্ষার প্রসারক ও উৎকর্ষবিধায়ক লোকেরা সে সব দেশে উৎসাহই পায়। আমাদের দেশে গবর্মেণ্ট সমুদয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পুলিস-নামধারী পুলিস ও স্কুলপরিদর্শক নামধারী পুলিসের মুঠার মধ্যে আনিতে চান। যে রাজনৈতিক কারণে গবর্মেণ্ট ইহা করিতে চান, তাহার বিশদ বর্ণনা অনাবশ্যক। বর্ত্তমানে যত বেসরকারী শিক্ষালয় আছে, তাহাদের সবগুলিকে সর্ব্বদা তত্ত্বত্রাসত্রাসক দ্বারা মুঠার মধ্যে আনিতে ও রাখিতে হইলে উভয়বিধ যতসংখ্যক পুলিস

কর্ম্মচারীর দরকার, তত লোক রাখিবার মত টাকা বাংলা-গবর্মেণ্টের নাই। সুতরাং শিক্ষালয়গুলির সংখ্যা কমাইয়া দ্বিতীয় প্রকারের পুলিস কর্ম্মচারীরা যতগুলির খবরাখবর রাখিতে পারে, ততগুলি রাখা সোজা বুদ্ধি বটে; কিন্তু তাহাতে দেশের উন্নতি হইবে বা শান্তি বাড়িবে মনে করা ভুল।

—

বিঠলভাই পটেল প্রদত্ত লক্ষ টাকা

পরলোকগত ভারতসেবক বিঠলভাই পটেল মহাশয় তাঁহার উইলে বিদেশে ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর প্রচারকার্য্য চালাইবার নিমিত্ত এবং ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে স্বার্থপর বিদেশীরা যে-সব কুৎসা প্রচার করে, তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করিবার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই টাকা বা তাহার সুদ উক্ত কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য একমাত্র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে ভার দিয়া যান। কিন্তু যদিও পটেল মহাশয়ের মৃত্যু অনেক দিন হইল হইয়াছে, তথাপি সুভাষ বাবু এখনও ঐ টাকা পান নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে একটা গুজব খবরের কাগজের মারফৎ প্রচার করা হয়, যে, ঐ টাকা সুভাষ বাবুকে দিলে গবর্মেণ্ট তাহা বাজেয়াপ্ত করিবেন। অর্থাৎ কি না, গবর্মেণ্টের যদি ঐরূপ কোন অভিপ্রায় না-থাকে তাহা হইলেও গুজব যাহারা রটাইয়াছে তাহারা চায়, যে, যেপ্রকারেই হউক টাকাটা বাঙালী এবং গোঁড়া কংগ্রেসওয়ালাদের দলের বহির্ভূত সুভাষ বাবু যেন না-পান। এমন কোন আইন নাই, যাহার বলে গবর্মেণ্ট ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন, বিশেষতঃ যখন ঐ টাকা আইনবিরুদ্ধ কোন প্রণালীতে বা কাজে খরচ করিবার অভিপ্রায় সুভাষ বাবুর ছিল না, এবং তিনি তাহা সম্প্রতি প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেনও। ঐ গুজবটা পড়িয়াই আমাদের মনে হইয়াছিল, এ আর কিছু নয়, সুভাষ বাবুকে টাকাটা না-দিবার ফন্দী। তার পর সম্প্রতি কাগজে বাহির হইয়াছে, পটেল মহাশয় তাঁহার উইলের যে-যে বাক্যদ্বারা টাকাটি সুভাষ বাবুকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্য অর্থও হয় বোম্বাইয়ের বড় বড় আইনজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়াছেন। আমরা উইলের সেই অংশ পড়িয়াছি। আইনজ্ঞ নহি বলিয়াই বোধ করি উহার সোজা অর্থটাই বুঝিয়াছি, নিগূঢ় লুক্কায়িত অর্থটা ধরিতে পারি নাই। এবারও আমাদের মনে হইয়াছে, ইহাও সুভাষ বাবুকে টাকাটি না-দিবার আর একটা ফন্দী। তিনি কংগ্রেসের নিকট হইতে টাকা না চাহিয়া ও না লইয়া কেবল কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিদেশে ভারতকথা প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু অনুমতি পান নাই; ইহাতেও আমাদের সন্দেহ সমর্থিত হয়।

—

অন্নাভাবে ও বন্যায় বিপন্ন বাঁকুড়া

এ বৎসর ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ বন্যায় বিপন্ন হইয়াছে, বাংলা তাহার একটি। সবগুলিরই সাহায্য পাওয়া উচিত, এবং বড় বড় সমিতি প্রভৃতি তাহার চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গেরও অনেকগুলি জেলা বিপন্ন। তাহাদের সকলকে সাহায্য দিবার চেষ্টা বৃহৎ বৃহৎ সমিতি প্রভৃতির কর্ম্মীরা করিতেছেন। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরা কেবল একটি জেলার—বাঁকুড়ার—কিছু সেবা করিবার প্রয়াসী। কারণ, প্রবাসীর সম্পাদকের বাড় বাঁকুড়া, শক্তি ও অবকাশ কম; বাঁকুড়া সম্মিলনীর সভাপতি রূপে তাঁহাকে এই কাজে সাহায্য করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

পাঠকগণ বর্ত্তমান সংখ্যার বিজ্ঞাপনসমূহের মধ্যে বাঁকুড়া সম্মিলনীর আবেদন দেখিতে পাইবেন। টাকা, কাপড়, চাল, ঔষধ যিনি যাহা দয়া করিয়া দিবেন, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও ব্যবহৃত হইবে। পাঠাইবার ঠিকানা আবেদনে দেওয়া আছে।

আবেদনের সঙ্গে ১২ (বার) খানি ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি আছে। কয়েকটি ছবি দেখিয়া মনে হইবে, ইহা ত বনজঙ্গলের প্রাকৃতিক দৃশ্য। তাহা নহে; ওখানে গ্রাম ছিল, বন্যা নিশ্চিহ্ন করিয়া ধুইয়া লইয়া গিয়াছে, পাকা ইটের বাড়ি পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়াছে। যে কয়টি গ্রামের ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে। গৃহহীন, অন্নবস্ত্রহীন, সর্ব্বস্বান্ত, পীড়িত লোকদের কষ্টের অবধি নাই। অল্পসংখ্যক গৃহহীন গৃহস্থদিগকে সামান্য চালা বাঁধিতে সাহায্য করা হইতেছে। আরও অনেক নিরাশ্রয় লোকের গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য করিতে হইবে।

স্থানে স্থানে ওলাউঠা ও অন্যান্য পীড়া হইতেছে। অন্নাভাব ত আছেই। আবার শস্য না-হওয়া পর্য্যন্ত অন্নকষ্ট চলিবে, সুতরাং অনেক মাস ধরিয়া সাহায্যও দিতে হইবে।

—

বঙ্গের বৃহত্তম ও সঙ্গীন সমস্যা

সমগ্রভারতীয়, বৈদেশিক, অন্তর্জাতিক, জাগতিক নানা বিষয়ের আলোচনা আমাদের, বাঙালীদের, নিশ্চয়ই করা উচিত। প্রবাসীতেও আমরা তাহাও অল্পস্বল্প করি। কিন্তু আমরা মাসে একবার লিখি, আমাদের লিখিবার স্থান কম, শক্তি এবং সময়ও যথেষ্ট আমাদের নাই। এই জন্য এখন বাংলা দেশের পক্ষে যেটি সঙ্গীন সমস্যা, গবর্ন্মেণ্টের শিক্ষা-সংকোচ-অভিপ্রায়, সেই বিষয়েই বেশী লিখিতে হইতেছে—যদিও যাহা লিখিতেছি তাহা মোটেই যথেষ্ট নয়।

বাঙালীর যাহা অল্পস্বল্প কৃতিত্ব আছে, তাহা প্রধানতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যবিজ্ঞানললিতকলার ক্ষেত্রে, যাহা শিক্ষার প্রভাবেই বাঙালী করিতে পারিয়াছে। সেই শিক্ষার উপর ঘা পড়িতে যাইতেছে। এখন কোন বাঙালীর নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়।

—

বঙ্গে শিক্ষাসঙ্কোচচেষ্টা আকস্মিক নহে

বঙ্গে যে শিক্ষালয়সমূহের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা আকস্মিক নহে। ইহা একটা সমগ্র-ভারতীয় শিক্ষা-পলিসির প্রাদেশিক রূপ। উপরওয়ালার ইঙ্গিতে বা হুকুমে ইহা হইতেছে মনে করিবার কারণ আছে। তাহা আমরা গত ২৯শে আগষ্ট প্রকাশিত মডার্ণ রিভিয়ুর বর্ত্তমান সংখ্যায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে লিখিয়াছি, "ভারতবর্ষে ১৯৩২-৩৩ সালে শিক্ষা" নামক ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত সরকারী রিপোর্টে আছে :—

"A decrease of 2,445 in the number of institutions, taken by itself, need not give cause for alarm; possibly the reverse. . . . . . The large increase of 1,367 recognized institutions in Bengal, however, is of doubtful value, in view of the urgent need of improving those institutions which already exist."—*Education in India in 1932-33*, by Sir George Anderson, Educational Commissioner with the Government of India, page 2.

"প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যায় ২,৪৪৫ হ্রাস, অন্য কোন তথ্যের সহিত না-জড়াইয়া বিবেচনা করিলে, তাহাতে আতঙ্কগ্রস্ত হইবার আবশ্যক নাই—বরং সম্ভবতঃ তাহার উল্টা (অর্থাৎ উহা সন্তোষেরই কারণ)। বঙ্গে কিন্তু ১,৩৬৭টা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধিরূপ অত্যধিক বৃদ্ধির কোন মূল্য আছে কিনা সন্দেহস্থল, কেন-না যে সব প্রতিষ্ঠান আগে হইতে আছে তাহাদের উৎকর্ষসাধন অত্যন্ত জরুরী।"

মনে করুন, বর্দ্ধমান জেলার বিদ্যালয়গুলির উন্নতি-সাধন অত্যাবশ্যক। সেই উন্নতি যত দিন না হইতেছে, ততদিন দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি জেলার যে-যে অংশে বিদ্যালয় খুব কম, সেখানেও নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করা অনাবশ্যক! কিংবা একই জেলার কোন অংশে যদি বিদ্যালয় যথেষ্ট না-থাকে, তাহা হইলেও অন্য সব অংশের বিদ্যালয়গুলির উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যালয়বিরল বা বিদ্যালয়হীন অংশগুলিতে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন অবাঞ্ছনীয়! চমৎকার সিদ্ধান্ত!

বড়কর্ত্তা বিদ্যালয়ের সংখ্যাহ্রাসে যদি ভয়ের কারণ না দেখিয়া সন্তোষেরই কারণ দেখেন এবং কোথাও বৃদ্ধি হইলে যদি তাহার খুঁৎ ধরিতে উৎসাহ দেখান, তাহা হইলে কোন ছোটকর্ত্তা যে হ্রাস সাধনেই উৎসাহের সহিত লাগিয়া যাইবেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। বঙ্গীয় গবর্ন্মেণ্টকে কৃত্রিম মেস্টনী ফন্দীতে দরিদ্র করা হইয়াছে ও শিক্ষার জন্য তাহাকে অন্য প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের মত ব্যয় করিতে অসমর্থ করা হইয়াছে। এবং তাহার উপর আবার বঙ্গে বিভীষিকা-পন্থার আবির্ভাব হইয়াছে ও সরকারী ধারণা জন্মিয়াছে, বিদ্যালয়গুলির উপর যথেষ্ট নজর না-দেওয়া ইহার একটা কারণ। সুতরাং শিক্ষার জন্য বর্ত্তমান অযথেষ্ট ব্যয় না বাড়াইয়া সব বিদ্যালয়ের উপর নজর রাখিতে হইলে তাহাদের সংখ্যা কমান দরকার। ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের বড়কর্ত্তার ইঙ্গিত বা আদেশ বঙ্গে যে-ভাবে পালিত হইতে যাইতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে এই সব কথা মনে রাখা আবশ্যক।

—

বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা

১লা আগষ্টের বিবৃতিতে বলা হইয়াছিল, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি, ৬০০০০ হইতে কমাইয়া ১৬০০০ করা হইবে। ঐ বিবৃতিতে শাখা-বিদ্যালয়ের কোন কথাই ছিল না। ২৫শে আগষ্টের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে ঐ ১৬০০০টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটির দুটি শাখা থাকিবে, এবং তাহা হইলে মোট

১৬০০০+৩২০০০=৪৮০০০ বিদ্যালয় হইবে! ১লা আগষ্ট বলা হইয়াছিল ১৯ লক্ষ ছেলেমেয়ে শিক্ষা পাইবে, ২৫শে আগষ্ট বলা হইতেছে ৩৩ লক্ষ ছেলেমেয়ে শিক্ষা পাইবে! সমস্ত হিসাবই কিন্তু নির্ভর করিতেছে এই অনুমানের উপর যে ছেলেমেয়েরা প্রত্যহ যাতায়াতে ন্যূনকল্পে ৪।৫ মাইল গ্রাম্যপথ বা নদীনালা অতিক্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিবে*, এবং একবার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলে তাহাদিগকে চারি বৎসর পড়িতে আইন অনুসারে বাধ্য করা হইবে, এই বিভীষিকা সত্ত্বেও বাপমারা হৃষ্টচিত্তে সোৎসাহে ছেলেমেয়েদিগকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিবে†!

শাখা পাঠশালা

সমগ্র বাংলা দেশকে যে ১৬০০০ প্রাথমিক শিক্ষা-অঞ্চলে primary school areaতে) বিভক্ত করা হইবে, তাহার প্রত্যেকটির কেন্দ্রস্থলে একটি বড় চারিশ্রেণীবিশিষ্ট পাঠশালা থাকিবে। তা ছাড়া বেশী হাঁটিতে অসমর্থ ছোট ছেলেমেয়েদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক অঞ্চলের মধ্যে দুটি গ্রাম বাছিয়া লইয়া দুইশ্রেণীবিশিষ্ট দুটি শাখা পাঠশালা স্থাপিত হইবে। এই গ্রামগুলির ভাগ্য ভাল, এবং এই সংশোধিত প্রস্তাব ১লা আগষ্টের প্রস্তাবের চেয়ে ভাল। কিন্তু অঞ্চলে অন্য যত গ্রাম থাকিতে পারে, তাহাদের ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কি উপায় হইবে? তাহারা কি দোষ করিল? মনে রাখিতে হইবে, বঙ্গে গ্রাম আছে ৮৬৬১৮টি এবং শহর মাত্র ১৩৭টি। তাহা হইলে গড়ে এক-একটি শিক্ষা-অঞ্চলে প্রায় ৫½টি গ্রাম-নগর থাকিবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় অপচয় (Wastage)

সমগ্রভারতীয় শিক্ষারিপোর্টে, বঙ্গীয় শিক্ষারিপোর্টে, এবং আলোচ্য বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তিতে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে ওয়েষ্টেজ বা অপচয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মানে এই, যে, পাঠশালাগুলির নিম্নতম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যত থাকে, উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে তাহা ক্রমাগত কমিয়া উচ্চতম শ্রেণীতে খুব কম হইয়া দাঁড়ায়, এবং এই প্রকারে ছেলেমেয়েরা শেষ পর্য্যন্ত না-পড়ায় সময়ের ও শিক্ষাব্যয়ের অপচয় হয়, কারণ, সরকারী মতে, অন্যূন তিন বৎসর না-পড়িলে তাহারা লিখনপঠনক্ষম হয় না। প্রমাণ:—

"The position cannot be regarded as satisfactory; on an average, only 21 per cent of the boys enrolled in Class I reach Class IV (when literacy may be anticipated) three years later."—*Education in India in 1932-33*, page 33.

অর্থাৎ তিন বৎসর পড়িবার পর তবে ছাত্রেরা লিখন-পঠনক্ষম হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষামন্ত্রী বলেন তিন বৎসরও যথেষ্ট নয়।

১লা আগষ্টের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে:—

". . . . the overwhelming proportion of primary schools are lower primary schools with only three classes, and . . . . the great majority of the pupils never proceed beyond the infant class. Three years of schooling under such conditions is not sufficient to make a pupil permanently literate."

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনটি-শ্রেণীবিশিষ্ট নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়, এবং অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী শিশুশ্রেণীর উপরে উঠে না। এরূপ অবস্থায় তিন বৎসর শিক্ষা ছাত্রকে স্থায়ী ভাবে লিখনপঠনক্ষম করার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

ইহা যদি ঠিক্ হয়, ছাত্রেরা তিনশ্রেণীবিশিষ্ট পাঠশালায় তিন বৎসর পড়িয়াও যদি স্থায়ী রূপে লিখনপঠনক্ষম না-হয়, তাহা হইলে শিক্ষামন্ত্রী দুইশ্রেণীবিশিষ্ট ৩২০০০ শাখা-পাঠশালা খুলিবার প্রস্তাব কেন করিতেছেন? বর্ত্তমানে যদি তিন বৎসরেও ছেলেমেয়েরা লিখনপঠনক্ষম না-হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে এমন কি উৎকৃষ্ট শিক্ষক আমদানী ও এমন কি উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে, যে, তদ্দ্বারা দুই বৎসরেই ছেলেমেয়েরা লিখনপঠনক্ষম হইবে?

বলিতে পারেন, ছেলেমেয়েরা দুই বৎসর শাখা-পাঠশালায় পড়িয়া তাহার পর কেন্দ্রীয় বড় পাঠশালায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবে ও পরে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিবে। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা কোথায়?

২৫শে আগষ্টের বিজ্ঞপ্তিতে দেখিতেছি, দুটি শাখা-বিদ্যালয় সমেত প্রত্যেক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে চারিটি শ্রেণীতে নিম্নলিখিতসংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকিবে।

---

* "Each school will serve a population of 3,000 people or alternatively an area of 4 to 5 square miles." "Each area to serve a population of about 3,000, or an area not to exceed 5 square miles."—Communique of August 25, 1935.

† "Once a boy joins a primary school, he should be compelled to remain at school up to the end of the primary standard."—The same communique.

প্রথম	শ্রেণী	৯০
দ্বিতীয়	„	৬০
তৃতীয়	„	৩০
চতুর্থ	„	৩০

সমগ্র বঙ্গের সব কেন্দ্রীয় ও শাখা পাঠশালার মোট ছাত্রসংখ্যা এইরূপ ধরা হইয়াছে।

প্রথম	শ্রেণী	১৩৪৪০০০
দ্বিতীয়	„	৯৬০০০০
তৃতীয়	„	৪৮০০০০
চতুর্থ	„	৪৮০০০০

ইহাতে ত মনে হইতেছে, প্রথম শ্রেণীতে যত ছেলেমেয়ে পড়িবে, দ্বিতীয়তে তার চেয়ে কম, তৃতীয়তে দ্বিতীয়ের অর্দ্ধেক, এবং চতুর্থতে তৃতীয়ের সমান। তাহা হইলে, যাহারা প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল, তাহাদের সকলকে কি চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িতে বাধ্য করা হইবে না, বা বাধ্য করিতে পারা যাইবে না? না, স্থানাভাবেই তাহারা সবাই পড়িতে পারিবে না? প্রথম শ্রেণীতে যদি ১৩৪৪০০০ পড়ে ও চতুর্থে কেবল ৪৮০০০০, তাহা হইলে, সরকার যাহাকে অপচয় বলেন, সেই খুব ওয়েষ্টেজ্ বা অপচয় হইবে না কি?

—

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা

এরূপ তর্ক শুনিতে পাওয়া যায়, যে, অমুক প্রদেশে বিদ্যালয়সংখ্যা এত, বঙ্গে এত বেশী কেন? এরূপ তর্কের আলোচনার সময় মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই যথেষ্ট শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষোন্নতি হয় নাই। সুতরাং যদি বঙ্গে কোন রকমের বিদ্যালয় অন্য কোন প্রদেশের চেয়ে সংখ্যায় বেশীই হয়, তাহাও অনাবশ্যক নহে। প্রকৃত বিবেচ্য প্রশ্ন হইতেছে, এই, যে, শিক্ষা পাইবার বয়সের ছেলেমেয়েরা সবাই শিক্ষা পাইতেছে কিনা, না-পাইলে শতকরা কত পাইতেছে না? জাপানের নিয়ম লউন। সেখানে সব স্বাভাবিক-দেহ-মন-বিশিষ্ট ("normal") ৬ হইতে ১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে যাইবার বয়সের বালকবালিকা মনে করা হয়, এবং তাহাদের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবক তাহাদিগকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বা শহর ও গ্রামের কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়, বা বে-সরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা স্থাপিত প্রাইভেট বিদ্যালয়ে পাঠাইতে আইনত বাধ্য।

জাপানে ১৯৩২ সালে ৬ হইতে ১৪ বৎসরের ছেলেমেয়ে ছিল ১,০৩,৯২,৭৯৪ জন। তার মধ্যে ১,০৩,৪৪,৬৪২ জন অর্থাৎ শতকরা ৯৯·৫৪ জন বিদ্যালয়ে যাইত। তাহার আগেকার ৫ বৎসরে যাইত শতকরা ৯৯·৫১, ৯৯·৪৮, ৯৯.৪৫, ৯৯.৪৬, ও ৯৯·৪৪ জন।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিদ্যালয়সংখ্যা তুলনা করিবার সময় আরও মনে রাখিতে হইবে, যে, বাংলা দেশের লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশী, এখানকার গ্রামের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী, লোকসংখ্যার অনুপাতে শহরের সংখ্যা কম, এবং এই প্রদেশে মোটের উপর পাকা রাস্তার জন্য খরচ কম করা হয় বলিয়া এখানে এক এক মাইল রাস্তা যত বেশী লোককে ব্যবহার করিতে হয়, অন্য অনেক প্রদেশে তাহা করিতে হয় না।

কেন এই সব বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে বলিতেছি।

লোকসংখ্যা বেশী হইলে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বেশী হয়, সুতরাং তাহাদের জন্য বিদ্যালয় চাই বেশী।

প্রদেশ শহরপ্রধান না হইয়া গ্রামপ্রধান হইলে অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক বিদ্যালয় এই জন্য আবশ্যক হয়, যে, শহরে অল্প এক-একটু জায়গায় অনেক লোক ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকায় এক-একটি বিদ্যালয়ের দ্বারা যত লোকের কাজ চলে, ছড়া গ্রামঅঞ্চলে এক-একটি বিদ্যালয়ের দ্বারা তত লোকের কাজ চলে না।

লোকসংখ্যার অনুপাতে পাকা রাস্তা কম থাকার এবং পাকা রাস্তার জন্য কম খরচ হওয়ার মানে এই, যে, লোকের চলাচল বা যাতায়াতের সুবিধা কম; সুতরাং যাতায়াতের কম-সুবিধাবিশিষ্ট প্রদেশে বালকবালিকারা যাতায়াতের অধিক-সুবিধাবিশিষ্ট প্রদেশের ছেলেমেয়েদের মত কিছু দূরবর্ত্তী বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না, অতএব তাহাদের জন্য বেশী বিদ্যালয় আবশ্যক হয়।

এখন আমরা বঙ্গের সহিত এই সব বিবেচ্য বিষয়ে কোন কোন প্রদেশের তুলনা করিব। তুলনার বৎসর ১৯৩২।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	প্রাথমিক বিদ্যালয়-সংখ্যা
বাংলা	৫০১১৪০০২	৬১১৬২
মাদ্রাজ	৪৬৭৪০১০৭	৫২৩৭৪
বোম্বাই	২১৯৩০৬০১	১৪৮৫১

অতএব বোম্বাই ও মান্দ্রাজের লোকসংখ্যা বিবেচনা করিলে বঙ্গে ১৬০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় অত্যন্ত কম হইবে।

কোন্ প্রদেশে শহর ও গ্রাম কত এবং হাজারকরা কত মানুষ গ্রামে ও শহরে থাকে তাহার তালিকা :—

প্রদেশ।	শহর।	গ্রাম।	শহুরে।	গ্রাম্য।
বাংলা	১৩৯	৮৬৬১৮	৭৩'৫	৯২৬'৫}
বোম্বাই	২১৭	২৬৬৩৪	২২৪	৭৭৬
মান্দ্রাজ	৩৪০	৫১৪৮৭	১৩৫'৬	৮৬৪'৪
পঞ্জাব	১৯৯	৩৪৬৩০	১৩০'১	৮৬৯'৯

বাংলা দেশে শহরের সংখ্যা খুব কম, গ্রামের সংখ্যা খুব বেশী। ইহার লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের ও পঞ্জাবের আড়াই গুণেরও বেশী। তাহা মনে রাখিলে ইহার নগর-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত আরও কম মনে হইবে। এই প্রদেশে হাজারকরা শহুরে লোক খুব কম এবং গ্রাম্য লোক খুব বেশী। এই সব কারণে বঙ্গে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী হওয়া আবশ্যক।

তাহার পর পাকা রাস্তার কথা। কয়েক বৎসর হইল, রেলওয়ে ও মোটরের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে একটি সরকারী তদন্ত হয়। তাহার রিপোর্ট ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। সেই রিপোর্ট হইতে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী যত, এবং তাহাতে যত মাইল াকা রাস্তা ও মোটরের রাস্তা আছে, দু-ই বিবেচনা করিয়া কোথায় কত জন মানুষপ্রতি এক এক মাইল ঐরূপ রাস্তা আছে, তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল; এবং ১৯২৯-৩০ সালে কোন্ প্রদেশে সব রকম রাস্তার জন্ত সাধারণ রাজস্ব হইতে মোট কত লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল তাহাও দেখান হইল।

কত মানুষের জন্ত এক মাইল রাস্তা

প্রদেশ।	পাকা।	মোটর যোগ্য।	রাস্তার জন্ত মোট ব্যয়।
মান্দ্রাজ	১৯৫০	১৭২০	১৬৫ লক্ষ
বোম্বাই	২৩২৫	:৬৯০	৭১'৬ „
বাংলা	১৩৯৩২	:৩৯৩২	৫৮৮ „
আগ্রা-অযোধ্যা	৬১৬০	৬১৬০	৬৫'৮ „
পঞ্জাব	৫৮০০	২৪০০	১০৯'৬ „
বিহার-উড়িষ্যা	৯৫০০	৯৫০০	৫১'৭ „
মধ্যপ্রদেশ	৩০০:	২১৪৭	৫০'৩ „

এই তালিকা হইতে বুঝা যায়, বড় প্রদেশগুলির মধ্যে বঙ্গে সকলের চেয়ে বেশী লোককে এক এক মাইল রাস্তা ব্যবহার করিতে হয়, অর্থাৎ অন্ত সব বড় প্রদেশের মত এখানে প্রচুর যথেষ্ট দীর্ঘ রাস্তা নাই। তালিকাতে আরও দেখা যায়, যে, এখানে দু-রকম পাকা রাস্তার জন্ত মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা, ও পঞ্জাবের চেয়ে কম টাকা খরচ করা হয়। উভয় হিসাব হইতে সিদ্ধান্ত এই হয়, যে, বঙ্গে চলাফিরা অন্ত অনেক প্রদেশের মত সুসাধ্য নয়। অথচ, এখানে ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্ত অভিপ্রেত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমাইতেই হইবে!

বলিতে পারেন, বঙ্গে নদী আছে অনেক, নৌকায় চড়িয়া সহজে যাতায়াত করা যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কি সাঁতার দিয়া বা স্বয়ং নৌকা চালাইয়া বিদ্যালয়ে যাইবে, ও তাহা ঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়া আবার ছুটির পর নৌকা বাহিয়া বাড়ি যাইবে? প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর নৌকা ও বেতনভোগী মাঝি আছে কি? বিস্তর জেলা নদীবহুল নহে এবং তথাকার নদীতে বর্ষা ভিন্ন অন্ত সময়ে জল অতি সামান্ত থাকে। যথেষ্ট পাকা রাস্তা থাকিলে ও বিদ্যালয় নিকটবর্ত্তী হইলে অনায়াসে হাঁটিয়া যাওয়া যেমন সোজা, জলপথে যাতায়াত ত তাহা নহে। তা ছাড়া বঙ্গের জলপথও ত অনেক বুজিয়া ও কচুরী পানা জন্মিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, জলপথ বঙ্গের একচেটিয়া নহে।

—

অন্যরূপ বিদ্যালয়ের ও ছাত্রের সংখ্যা কমান

আমরা প্রধানতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কমাইবার সঙ্কল্পের বিষয়ই লিখিলাম। উচ্চ-বিদ্যালয়গুলি কমাইয়া ৪০০ করিবার প্রস্তাব ত আগে হইতেই হইয়া আছে। শুনিলাম, সরকারী সব কলেজে কম ছাত্র ভর্ত্তি করিবার সার্কুলারও পৌছিয়াছে। এই সমুদয় হ্রাসপ্রস্তাবের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

—

শিক্ষা-বিষয়ে বেসরকারী উদ্যম

লর্ড রিপনের আমলে যে শিক্ষা-কমিশন বসিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যমকে উৎসাহিত করা। এখন চেষ্টা হইতেছে উল্টা দিকে। প্রগতিশীল দেশসমূহে এরূপ চেষ্টা হয় না। আমরা আগে জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিবার সময় প্রাইভেট

বিদ্যালয়সকলের উল্লেখ করিয়াছি। প্রাচ্যে ঐ স্বাধীন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতে পর্য্যন্ত বেসরকারী উদ্যম বিশেষ উৎসাহ পাইয়া থাকে। সংখ্যা লউন :—

জাপানে ৪৬ (ছেচল্লিশ)টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তাহার মধ্যে ১৭টি গবর্ন্মেণ্টের, তিনটি "পব্লিক"—"সাধারণ", এবং ২৪ (চব্বিশ)টি প্রাইভেট বা বেসরকারী। সরকারী-গুলির ছাত্রসংখ্যা ২৭,৪২৮, সাধারণগুলির ১৫৩২, এবং প্রাইভেটগুলির ৪১,০২৫।

বঙ্গীয় গবর্ন্মেণ্ট শিক্ষার জন্য খুব কম ব্যয় করেন। অতএব বঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাইভেট উদ্যম খুব বেশী থাকা আবশ্যক। অথচ, গবর্ন্মেণ্টের প্রস্তাবসমূহ এরূপ যে তদ্দ্বারা প্রাইভেট উদ্যমের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইবে!

জাপানে ইংরেজী শিখান

জাপানের মত স্বাধীন দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়েও যে ইংরেজী শিখান হয়, তাহার উল্লেখ আগে করিয়াছি। বলা বাহুল্য, উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতেও ইংরেজী শিখান হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখান হয় :—

"Morals, civics, the Japanese language and Chinese classics, history (both Japanese and foreign), geography, a foreign language (either one of English, German, French or Chinese), mathematics, science, technical studies, drawing, music, practical work (carpentering, gardening, etc.) and gymnastics."

"নীতি, পৌরজানপদকর্ত্তব্য বিদ্যা, জাপানী ভাষা ও প্রাচীন চৈনিক সাহিত্য, জাপানী ও বিদেশী ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজী, জার্ম্যান, ফ্রেঞ্চ ও চৈনিক ভাষার একটি, গণিত, বিজ্ঞান, শিল্পবিষয়ক কিছু, রেখাঙ্কন, সংগীত, সূত্রধরের কাজ, উদ্যানপালকের কাজ প্রভৃতি কাধ্য, এবং ব্যায়াম।"

একটা অবান্তর কথা এখানে বলিতে চাই। জাপানীরা চীনদেশের অধিবাসী বা চীনবংশোদ্ভূত নহে। তথাপি, তাহাদের সভ্যতা বহু পরিমাণে চীন সভ্যতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া, চীনের সহিত জাপানের বিরোধ সত্ত্বেও জাপানে প্রাচীন চৈনিক সাহিত্য জাপানী মধ্যবিদ্যালয়ে পর্য্যন্ত অধীত হয়। ভারতবর্ষে ভারতীয় হিন্দুবংশোদ্ভূত এবং সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষাভাষী মুসলমানেরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের চর্চ্চা করিলে তাঁহাদের এবং সমগ্রভারতীয় মহাজাতির উপকার হইবে। ইংলণ্ডে ইংরেজরা খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া পুরাতন ইংরেজীর পরিবর্ত্তে হীব্রু ও গ্রীক পড়ে না; কেহ কেহ অবশ্য পড়ে—যেমন ভারতবর্ষে অনেক হিন্দুও ফারসী ও আরবী পড়ে। তাহা ভাল।

ছেলেমেয়েদিগকে বিদ্যালয়ে চারি বৎসর পড়িতে বাধ্য করা

শিক্ষামন্ত্রীর ২৫শে আগষ্টের বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, তেত্রিশ লক্ষ বালকবালিকার প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইবে। ১লা আগষ্টের বিবৃতিতে এবং ২৫শে আগষ্টের বিজ্ঞপ্তিতে আছে, যে, কোন বালক বা বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একবার ভর্ত্তি হইলে তাহাকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকিতে হইবে, এবং দরকার হইলে এই উদ্দেশ্যে আইন করা হইবে। আমাদের প্রশ্ন এই, যে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তেত্রিশ লক্ষ ভাবী ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদিগকে বাধ্য করিবার জন্য আইন করা ও কাজে লাগান যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ১লা আগষ্টের বিবৃতি অনুসারে এখনকার ২১ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক-দিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আইন কেন করা হয় নাই? বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে প্রধান একটা সরকারী নালিশ এই, যে, উহাতে বড় ওয়েষ্টেজ বা হয়, অর্থাৎ যত ছাত্রছাত্রী পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়, অধিকাংশ প্রথম বৎসরেই লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়, এবং দ্বিতীয় তৃতীয় বৎসর অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বৎসরে পৌঁছে অতি সামান্য অংশ। প্রশ্ন এই, চারি বৎসর পড়িতে আইনের দ্বারা বাধ্য করিবার এই সোজা উপায়টা থাকিতে তাহা আগে কেন অবলম্বিত হয় নাই?

মস্তব্যীকরণ

শিক্ষাবিষয়ে আধুনিক সময়ে বঙ্গীয় মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্ব নাই। তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষায় ও বিদ্যায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে অগ্রসর নহেন, শিক্ষার জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশী স্বার্থত্যাগ, দান, বা কষ্ট-স্বীকারও করেন নাই। অথচ, উপর্য্যুপরি বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী হইতেছেন মুসলমান। যোগ্যতম ব্যক্তি যদি কখনও মুসলমানই থাকেন বা হন, শিক্ষামন্ত্রী তাঁহাকেই অবশ্য করা

উচিত। কিন্তু মুসলমানকেই শিক্ষামন্ত্রী করিতে হইবে, এরূপ একটা দস্তুর জন্মাইবার কোন স্থায্য বা যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

ইহাতে মুসলমানদেরই পক্ষে অনিষ্টকর একটা কুফল ফলিতেছে। শিক্ষামন্ত্রী মুসলমান বলিয়া তাঁহারা অনেকেই গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রায়প্রসূত প্রগতি-বিরোধী শিক্ষানীতিরও দোষ দেখিতে পান না। অথচ শিক্ষার সংকোচে, শুধু হিন্দুরা নহে, মুসলমানেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

সরকারী শিক্ষারিপোর্টে বহু বার ইংরেজ শিক্ষাকর্ম্মচারীদের দ্বারা মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষার ও শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার নানা দোষ ঘোষিত হইয়াছে—যদিও গবর্ন্মেণ্ট এই সাম্প্রদায়িকতারই প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন! শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে কেহই যে এই সব দোষ দেখিতে পান না, তাহাও নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, বর্ত্তমান ১৯৩৫ সালের ২রা মে অমৃতবাজার পত্রিকায় মিঃ জোহাদর রহীম লেখেন :—

"A few words about Maktabs. I consider them even more harmful than the higher educational institutions. They are veritable institutions of segregation and deserve the strongest condemnation. They segregate the rising generations of the two great communities at a time when their minds are most pliant, most receptive and most impressionable and, hence, most capable of contracting an everlasting friendship which might have averted many communal troubles in their subsequent [illegible]s."

এই মনস্বী মুসলমান লেখক আরও বলেন :—

"Moreover, the money spent on the Maktabs is only a sheer waste of money. Because, many of these Maktabs, specially for girls, exist only in the registers and in many others the actual attendance falls far short of attendance as shown in the registers. The girls' classes usually being held within the purdah avoid detection of actual state of affairs by the inspecting officers."

অতঃপর তিনি বলেন :—

"Much useful purpose will be served by the amalgamation of the Maktabs with the primary schools."

কিন্তু যাহা হইতে যাইতেছে, তাহা ইহার ঠিক উল্টা। মক্তবগুলিকে অসাম্প্রদায়িক পাঠশালাগুলির মত না করিয়া, অসাম্প্রদায়িক পাঠশালাগুলিকেই যে অনেক ক্ষেত্রে মক্তবে পরিণত করা হইবে, তাহা আমরা ১লা আগষ্টের বিবৃতি হইতে ভাদ্রের প্রবাসীর ৭৫২ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। যাঁহারা গবর্ন্মেণ্টের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-পলিসি সম্বন্ধে আমাদের মত জানিতে চান, তাঁহারা আশা করি ভাদ্রের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গও পড়িবেন বা পড়িতেছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে যে, কতকগুলিকে নামতঃ ও বস্তুতঃ এবং অবশিষ্টগুলিকে বস্তুতঃ, মক্তবে পরিণত করা হইবে, তাহা ২৫শে আগষ্টের বিজ্ঞপ্তির নিম্নলিখিত বাক্যগুলি হইতে বুঝা যায় :—

"18. The primary school curriculum should be so revised on the lines of the present curriculum of Maktabs, which is practically identical with that in a general primary school, as to be suitable to both primary schools and Maktabs, and so organized as to provide the necessary variations in studies between primary schools and Maktabs."

সাধারণ পাঠশালা ও মক্তবে শিক্ষণীয় ও পাঠ্য যদি কার্য্যতঃ অভিন্নই হয়, তাহা হইলে, সংশোধন পূর্ব্বক, সাধারণ পাঠশালার শিক্ষণীয় ও পাঠ্যগুলিকে মক্তবের মতই কেন করিতে হইবে? সর্ব্বসম্প্রদায়ের ব্যবহার্য্য শিক্ষণীয় ও পাঠ্য বস্তু কেবলমাত্র মুসলমানদের শিক্ষণীয় ও পাঠ্য বস্তুর অনুরূপ করিয়া সংশোধন করিতে হইবে—ধর্ম্মবিষয়ে নিজ নিরপেক্ষতাঘোষক ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের আমলে ইহা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে লিখিত হইয়াছে!!! এইরূপ সংশোধন হইলে অমুসলমানদের দুঃখ ও অসুবিধা হইবে, কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, তাহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে না এবং তাহাদের সংস্কৃতি বা কৃষ্টিও লুপ্ত হইবে না; যদিও ইহাও ঠিক, যে, তাহাদের মন আনন্দ ও শান্তির সাগরে চিরমগ্ন হইবে না।

সেকণ্ডারী শিক্ষা-বোর্ড

গবর্ন্মেণ্ট একটি সেকণ্ডারী শিক্ষা-বোর্ড করিয়া উচ্চ-বিদ্যালয়গুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা লোপ করিতে চান, এবং অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষাও উঠাইয়া দিতে চান। ইহা হইলে উচ্চ-বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ইচ্ছামত কমান সহজ হইবে। তৎসমুদয়ের শেষ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীও কম হইবে, কলেজে পড়িতে ছাত্রছাত্রী কম যাইবে, ইত্যাদি।

অন্য কোন কোন প্রদেশে সেকণ্ডারী বোর্ড আছে, সত্য। কিন্তু অন্য সব প্রদেশে গবর্ন্মেণ্টই শিক্ষার জন্য বেশী খরচ করেন, বেসরকারী লোকেরা বা সমিতিসমূহ তার চেয়ে কম করে। (অবশ্য গবর্ন্মেণ্টের টাকাও দেশের লোকেরাই ট্যাক্সের আকারে দিয়াছে।) সেই জন্য তথায় সেকণ্ডারী বোর্ড তত অশোভন নহে, ইহা বঙ্গে যত অশোভন হইবে। বঙ্গে

ইহার মানে এই হইবে, যে, "তোমরা স্কুল স্থাপন করিবার ও চালাইবার জন্য টাকা দাও ও পরিশ্রম কর, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব করিব আমরা, এবং তোমাদের ইস্কুল আমাদের পছন্দসই না-হইলে আমরা তাহা উঠাইয়া দিয়া তোমাদিগকে শিক্ষার্থ ব্যয়তার বহনের দায় হইতে নিষ্কৃতি দিব।"

এবম্বিধ নানা কারণে আলবার্ট হলে ২৫শে আগষ্ট বহু-জনাকীর্ণ প্রভাবশালী জনসভায় সেকণ্ডরী বোর্ড সম্বন্ধে এই আশঙ্কা প্রকাশিত হয়, যে, উহার দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাইভেট উদ্যম বিনষ্ট হইবে, এবং সেই জন্য উহার প্রবল প্রতিবাদ করা হয়।

—

"ছাঁচে-ঢালা একঘেয়ে শিক্ষা"

১লা আগষ্টের বিবৃতিটিতে দুঃখ করা হইয়াছে, যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী "stereotyped and mechanical" (ছাঁচে-ঢালা এবং প্রাণহীন যন্ত্রবৎ) এবং "not meeting in full the changing needs and requirements of the province" "বঙ্গের পরিবর্ত্তিত নানা প্রয়োজনে যেরূপ বিবিধ শিক্ষা চাই, তাহা ইহা হইতে পাওয়া যায় না।" ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহার প্রধান কারণ দুটি। ভারতীয় মানুষদের সভ্য ভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য যত রকম জিনিষ আবশ্যক, ভারতবর্ষের লোকেরা নিজেই তাহা প্রস্তুত করিত—কেবল চাষ করিত ইহা মিথ্যা কথা। ইহা জানিবার বুঝিবার জন্য বেশী আয়াসস্বীকার বা ব্যয় করিতে হয় না, মেজর বামনদাস বসুর "রুইন অব্ ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ" পড়িলেই চলিবে। ভারতের পণ্যশিল্প যাহা ছিল, তাহার অবনতি ও প্রায় বিলোপ হইয়াছে। বর্ত্তমান কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রকমের জীবন যাপনের জন্য নূতন নূতন জিনিষও কিছু আবশ্যক বটে। তাহাও ভারতবর্ষ প্রস্তুত করিতে পারিত, যদি তাহার ব্যবস্থা করিবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাহার থাকিত। কিন্তু তাহা নাই। সুতরাং নানা পণ্যশিল্প ও নানা ব্যবসা বাণিজ্য কারবারে লোকদের আয় অন্য সব সভ্য দেশের মত এখানে হয় না, যুবকদিগকে চাকরী বা আদালতসম্পর্কীয় ওকালতী প্রভৃতি কাজের দিকেই যাইতে হয়। শিক্ষাপ্রণালীও তদনুরূপ একঘেয়ে হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, কোন-না-কোন রকম পরীক্ষা পাস না করিলে চাকরী প্রভৃতি ঐ কাজগুলিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, এবং পরীক্ষাগুলি সরকারী শিক্ষাবিভাগ বা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা নিয়মিত ও পরিচালিত। গবর্ন্মেণ্ট যে প্রকারে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাইভেট উদ্যমের পরিবর্ত্তে নিজ কর্ত্তৃত্ব পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেছেন, তাহাতে শিক্ষাপ্রণালীর ছাঁচে-ঢালা একঘেয়ে ভাব বাড়িবে বই কমিবে না। মানুষকে স্বাধীনতা না-দিলে শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন নূতন আদর্শ নূতন নূতন রীতি ও উপায় উপলব্ধ আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত হইবে কি প্রকারে? যাঁহারা শিক্ষা-বিভাগের নিম্নতম হইতে উচ্চতম পরিদর্শক ও নিয়ামকের কাজ করেন, তাঁহারা শিক্ষাবিষয়ে কী ও কতটুকু জানেন ও চিন্তা করেন? এ বিষয়ে কী প্রতিভা তাঁহাদের আছে? তাঁহারা যে যোগ্যতম তাহার প্রমাণ কোথায়? স্বয়ং অসিদ্ধ লোকেরা অন্যের সিদ্ধিলাভের সহায় হইতে পারে না। এই সব কর্ম্মচারী সকলেই অযোগ্য, ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু শিক্ষাবিষয়ে পন্থা-আবিষ্কারক ও পথ-প্রদর্শক হইবার মত যোগ্য তাঁহাদের মধ্যে কয় জন আছেন?

—

"বাংলা স্বশাসক প্রদেশ"!

১লা আগষ্টের বিবৃতিতে গোটা দুই রাষ্ট্রনৈতিক আছে। একটা এই, যে, বাংলা শীঘ্র "autonomous province" "স্বশাসক প্রদেশ", হইবে! মরীচিকা!!! ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে গবর্ণর ও তাঁহার অধীনস্থ সিবিলিয়ান ও পুলিস কর্ম্মচারীরা এখনকার চেয়েও নিরঙ্কুশ হইবেন। স্বরাট তিনি ও তাঁহারা হইবেন, দেশের লোকেরা বর্ত্তমান সময় অপেক্ষাও তাঁহাদের কৃপাধীন হইবে। এই দুরবস্থা বঙ্গেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুনা-চুক্তির কৃপায়।

—

"আমাদের প্রভুদিগকে শিক্ষাদান কর্ত্তব্য হইবে"

বিবৃতিটিতে দ্বিতীয় রাষ্ট্রনৈতিক কথা এই আছে, যে, যেহেতু বাংলা দেশ স্বশাসক হইবে, অতএব "'To educate our masters' will be more than ever a duty and a responsibility', "'আমাদের প্রভুদিগকে শিক্ষা দেওয়া"

আগেকার যে-কোন সময় অপেক্ষা অতঃপর আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব হইবে।' "টু এডুকেট আওআর মাষ্টার্স" বচনটি ঐতিহাসিক। লর্ড পামার্সটন যখন দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন, ভাইকাউণ্ট শেরব্রুক নামে পরিচিত রবার্ট লো তখন কার্য্যতঃ শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা হন। "We must educate our masters," "আমাদিগকে আমাদের প্রভুগণকে শিক্ষা দিতে হইবে," এই কথাগুলি উক্ত ভাইকাউণ্ট শেরব্রুক বলিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ উদ্ধৃত হয়। কিন্তু তিনি বাস্তবিক তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'It is necessary "to induce our future masters to learn their letters",' "আমাদের ভবিষ্যৎ প্রভুদিগকে বর্ণমালা চিনিতে লওয়ান দরকার।" যাহা হউক, উভয় বাক্যের ভাব একই। বক্তা ইহা বিশেষ করিয়া ১৮৬৬ সালের সংস্কার আইন (Reform Act) পাস হওয়া উপলক্ষ্যে বলেন। তাহাতে বিলাতে ভোটদাতার সংখ্যা বাড়ে, এবং সবাই জানে ইংলণ্ডের ভোটদাতারা যেবার যে রাজনৈতিক দলের লোককে বেশী সংখ্যায় পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করে, সেবার সেই দল হয় গবর্মেণ্ট। সুতরাং ভোটদাতারাই গবর্মেণ্টের স্রষ্টা, তাহারাই প্রভু। ছোটরা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া রাজনীতি বুঝিয়া ভোট দিয়া প্রভু হইবে, জন্য বিলাতে তাহাদিগকে "ভবিষ্যৎ প্রভু" বলা হইয়াছিল। এ সব কথা ইংলণ্ডে সাজে, স্বশাসক জাতিদের স্বাধীন দেশে সাজে। ভারতবর্ষের প্রভু বেচারা ভোটদাতারা ত নহে, প্রভু ইংরেজরা। তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার কথা মুখে বলা দূরে থাক, কোন ভারতীয়ের কল্পনা করাও উচিত নয়। কারণ, শিক্ষা দেওয়ার অর্থ কেবলমাত্র একটি নয়।

"প্রত্যেক বাঙালী শিশু যথাশক্তি বড় হইবে"!

১লা আগষ্টের বিবৃতিটিতে অনেক গালভরা কথা আছে। একটি এই :—

". . . the Government in the Ministry of Education are genuinely anxious that something should be done to better the conditions of education and so to train up the future generations that every Bengali child may reach, according to his aptitude and irrespective of his parents' position, the full measure of intellectual and moral achievement......"

অর্থাৎ গবর্মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী খাঁটি আগ্রহান্বিত এরূপ শিক্ষা দিতে, যাহাতে প্রত্যেক বাঙালী শিশু তাহার পিতামাতার অবস্থানির্ব্বিশেষে জ্ঞান ও চরিত্রের দিক্ দিয়া তাহার শক্তিসাধ্য অনুযায়ী পূর্ণ কৃতিত্বে পৌছিতে পারে।

কাহার কোন্ বিষয়ে আগ্রহ তাহার বিচারক অন্তর্দর্শী ঈশ্বর। আমরা মানুষ, অন্যের মনে কি আছে জানি না। সুতরাং সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি না।

আমরা দেখিতেছি, বিবৃতিটি চায় বঙ্গের গ্রাম্য শিশুরা পাড়াগেঁয়ে-মন-বিশিষ্ট ("rural-minded") হয়, এবং তাহাদের "urban bias" (শহরের দিকে ঝোঁক) না জন্মে। সেই জন্য গ্রাম্য শিশুদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা, উর্দ্ধপক্ষে মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষা, দিবার প্রস্তাব বিবৃতিটিতে আছে। আমরা বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করি না, যে, ইহাতে "প্রত্যেক বাঙালী শিশু" বা কোনও বাঙালী শিশু জ্ঞানবুদ্ধি ও চারিত্রিক কৃতিত্বের চরম সীমায় পৌছিতে পারিবে। প্রত্যেক শিশু ত পারিবেই না, খুব মেধাবী শিশুরা পারিবে না, মাঝারি রকমের শিশুরাও পারিবে না, এবং তাহাদের সংখ্যাই প্রত্যেক দেশে বেশী।

আমরা আগে লিখিয়াছি, বঙ্গে হাজারকরা ৯২৬৫ জন গ্রামে বাস করে। বঙ্গের গ্রাম্য লোকদিগের জন্য কেবল প্রাথমিক (বা উর্দ্ধপক্ষে মধ্য-বাংলা) বিদ্যালয়ের শিক্ষাই চরম মনে করিলে ও তাহারই ব্যবস্থা করিলে বুদ্ধিবিদ্যা ও অন্যবিধ সব দিক্ দিয়া শতকরা ৯৩ জন বাঙালীকে খাট করা হইবে, বামন করা হইবে।

শিক্ষা-বিবৃতিতে আর একটা লম্বাচৌড়া কথা

১লা আগষ্টের বিবৃতিতে আছে :—

"All the schools have been cast in the same mould and directed to the same end, so that individual aptitudes and gifts have often been crushed out and the potential soldier, explorer, saint a business man, inventor, farmer or artisan have generally been transformed into potential clerks."

তাৎপর্য্য। সব স্কুলগুলা এক ছাঁচে ঢালা হওয়ায় এবং একই লক্ষ্যের দিকে তাদের গতি হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের আলাদা আলাদা প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা পিষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়াছে, এবং যাহারা হয় ত যোদ্ধা, ভৌগোলিক অনুসন্ধাতা ও আবিষ্কারক, সাধুসন্ত, বড় কারবারী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র উদ্ভাবক, বড় কৃষিজীবী, বা কারিগর হইতে পারিত, তাহারা যাহাতে হয়ত কেরানী হইতেও পারে এইরূপ শিক্ষা পাইতেছে।

উত্তম কথা। কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষাদপ্তরের প্রস্তাবিত (প্রধানতঃ গ্রাম্য) শিক্ষাপ্রণালীতে মানুষ সেনানী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রোদ্ভাবক, ভৌগোলিক আবিষ্কারক কি প্রকারে বনিয়া

যাইবে, ইহা কেহ দেখাইয়া দিবেন কি? আমরা ত বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তির ত্রিসীমায় এরূপ কিছু পাইলাম না। বাংলা-গবন্মেণ্ট পুলিস কনষ্টেবল করিবার মত যথেষ্ট লোকও বঙ্গে খুঁজিয়া পান না, অথচ শিক্ষামন্ত্রী চান যোদ্ধা বানাইতে—অবশ্য কাগজে কলমে!

বেকার সমস্যা

১লা আগষ্টের বিবৃতিতে বেকার সমস্যারও উল্লেখ আছে। কিন্তু দেশে বেকার এম-এ, এম-এস্‌সি, বি-এ, বি-এস্‌সি, ইণ্টার পাস, ম্যাট্রিক পাস অগণিত থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক ও মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকের ও পরিদর্শকের কাজে বাংলা-নবীস লোকদিগকেই লওয়া হইবে, এই রকমই ত বুঝিয়াছি। কারণ, যাহারা ইংরেজী জানে, তাহারা 'শহরমুখো' (urban-minded) হইয়া পড়িয়াছে—তাহাদের দূষিত সংস্পর্শ হইতে বঙ্গীয় গ্রাম্য শিশুদিগকে (যাহারা বঙ্গের শিশুদের হাজারকরা ৯২৬ জন) রক্ষা করা আবশ্যক।

সুতরাং সরকারী এই কমিটির দ্বারা ইংরেজী-জানা বেকারেরা উপকৃত হইবে না। অন্য দিকে, যে অনেক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় উঠিয়া যাইবে, তাহার অনেক হাজার শিক্ষক বেকার হইবে।

দু-জন পুলিস-গোয়েন্দার দুষ্কর্ম্ম

পুলিসের দু-জন গোয়েন্দা দুষ্কর্ম্মের জন্য দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে যেমন এক-দিকে প্রমাণিত হয় না, যে, অন্য সব গোয়েন্দাও ঐ দু-জনের মত দুষ্কর্ম্ম করে, তেমনই ইহাও প্রমাণিত হয় না, যে, অন্যেরা কেহই এরূপ করে না।

ইহাদের এক জন মেদিনীপুরের এক (অবশ্য হিন্দু) ভদ্রলোক ও তাঁহার দুই পুত্রকে ফাঁসাইবার জন্য নিজে বোমা তৈরি করিয়া তাঁহার বাগানে পুঁতিয়া রাখে ও পরে পুলিসকে খবর দেয়। গ্রেপ্তার আদি লাঞ্ছনা ও কর্ম্মভোগ ঐ তিন জনের হয়। কিন্তু তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে জানা পড়ে, যে, গোয়েন্দাটাই বোমা তৈরি করিয়া বাগানে রাখিয়াছিল। তাহার শাস্তি হয়। আর একটা গোয়েন্দা এক জনের বাড়িতে একটা রিভলভার রাখিয়া দিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। সে লোকটারও শাস্তি হইয়াছে। এই দুটা লোক নিজের কুবুদ্ধিতেই এইরূপ করিয়াছিল কি না, তাহা নির্ণীত হয় নাই।

ডক্টর প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "আশুতোষ সংস্কৃত অধ্যাপক" ডক্টর প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ৪৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। এরূপ অকালমৃত্যু অতীব শোচনীয়। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

রায়সাহেব রাজমোহন দাস

রায় সাহেব রাজমোহন দাস তাঁহার ঢাকার বাটীতে ৮২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি যৌবনে সামান্য বেতনে পুলিস-বিভাগে প্রবেশ করেন। পরে চরিত্রগুণে ও কার্য্যদক্ষতা-প্রভাবে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে মনে রাখিবেন রায় সাহেব বলিয়া নহে, পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়াও নহে। তিনি পেন্সান লইবার পর, বঙ্গদেশ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির অবৈতনিক সম্পাদকরূপে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে বহু বৎসর প্রভূত পরিশ্রম করেন, তাহাই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ায় তিনি এই জনহিতকর কাজটি হইতে অবসর লইতে বাধ্য হন।

অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি

এই সমিতির গত ১৯৩৪-৩৫ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। গত বৎসর ইহার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৩১ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আঠার হাজারের উপর। বাণিজ্যের মন্দা ও অন্যান্য কারণে ইহার এখন বড় টাকার দরকার হইয়াছে। রিপোর্টের জন্য, সাহায্য পাঠাইবার জন্য এবং সব প্রয়োজনীয় সংবাদের জন্য পাঠকেরা কলিকাতার ৫৬ নং হারিসন রোড ঠিকানায় ইহার অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, এম্‌-এ, এম-বি,কে চিঠি লিখিতে পারেন।

পত্নীকে দেখিতে জবাহরলালের যাত্রা

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কমলা নেহরু চিকিৎসার জন্য ইউরোপ গিয়াছিলেন। তিনি

জার্মেনীতে আছেন। কন্যা ইন্দিরা সঙ্গে আছেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, যে, শ্রীমতী কমলা নেহরুর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সেই কারণে গবর্মেণ্ট পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে পত্নীকে দেখিতে যাইবার নিমিত্ত সুবিবেচনাপূর্ব্বক কারাগার হইতে মুক্তি দিয়াছেন। পণ্ডিতজীর পূজনীয়া মাতাও এলাহাবাদে খুব পীড়িতা। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি অবিলম্বে আকাশপথে এরোপ্লেন-যোগে ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীমতী কমলা নেহরুর সংবাদের জন্য অগণিত ভারতীয় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিবে। স্বর্গীয় পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু জীবদ্দশায় স্বদেশের কল্যাণার্থ দুঃখ বরণ করেন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলে—পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যাদ্বয় ও এক জামাতা, তাঁহার পথের পথিক হন। এরূপ একমন এক-প্রাণ পরিবার অধিক দেখা যায় না।

—

সংস্কৃত কলেজ কি বিপন্ন ?

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানীর আমলে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার আসন্ন মৃত্যুর গুজব ইতিপূর্ব্বেও রটিয়াছিল। খবরের কাগজে আবার সেইরূপ গুজব দেখিয়াছি। গুজব বলিতেছি এই জন্য, যে, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সংবাদপত্রসমূহ এখনও কোন খাঁটি খবর পান নাই। র কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা কতকটা এইরূপ। ত কলেজের বি-এ শ্রেণীর ছাত্রেরা সব আধুনিক "modern") বিষয় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবে, অর্থাৎ সংস্কৃত ছাড়া আর সব বিষয় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবে। কতকটা ন্যায়পরায়ণতা দেখাইবার নিমিত্ত গুজব ইহাও বলিতেছেন, যে, ইস্‌লামিয়া কলেজের বি-এ অনার্সের ছাত্রেরা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবে। এরূপ ন্যায়পরায়ণতা আমরা চাই না; আমরা এরূপ বলি না, এরূপ চাই না, যে, যেহেতু সংস্কৃত কলেজকে অঙ্গহীন ও পঙ্গু করা হইতেছে, অতএব ইস্‌লামিয়া কলেজকে সমান ভাবে অঙ্গহীন ও পঙ্গু করা হউক। আমরা বলি, ইস্‌লামিয়া কলেজ যেমন আছে তেমনি থাক এবং উহার শ্রীবৃদ্ধি হউক। কিন্তু কেবল হিন্দুদের জন্য এই একটি সরকারী কলেজ আছে. কেবল হিন্দুদের জন্য গবর্মেণ্ট যত খরচ করেন, কেবল মুসলমানদের জন্য তাহার অন্যূন ১৫।১৬ গুণ খরচ করেন, তথাপি হিন্দুদের সংস্কৃতির রক্ষক এই একটি মাত্র সরকারী কলেজ কেন পূর্ণাঙ্গ থাকিতে পাইবে না ?

যখন ১৯২৪ সালে সংস্কৃত কলেজের শতবার্ষিক উৎসব হয়, তখন তৎকালীন গবর্ণর স্পষ্ট ভাষায় এই প্রতিশ্রুতি দেন, যে, সংস্কৃত কলেজের অখণ্ডত্ব ও পূর্ণাঙ্গতা কখনও বিনষ্ট করা হইবে না। অবশ্য জানি, তাঁহা অপেক্ষা উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষের—এমন কি সম্রাজ্ঞী সম্রাটের—প্রতিশ্রুতিরও নাকি কোন মূল্য নাই. কেবল পার্লেমেণ্টের প্রতিশ্রুতির ও আইনের মূল্য আছে, ইহা পার্লেমেণ্টে কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া কেন ? কাছাকাছি দুটা কলেজ থাকিলেই যে একটাকে আর একটার শাখা বানাইতে হইবে বা একটাকে অঙ্গহীন করিতে এবং কালক্রমে বিলুপ্ত করিতে হইবে, ইহার কোন যুক্তিযুক্ততা নাই। আমরা ত অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজ দেখিয়াছি। সেখানে কাছাকাছি অনেক কলেজ আছে, কোনটা খুব বড়, কোনটা খুব ছোট; কই কোনটাকে ত ভাঙিয়া দেওয়া হয় না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটা "ব্যক্তিত্ব", একটা ভাবধারা চিন্তাধারা, একটা আদর্শ, আছে, বা থাকা উচিত। তাহা রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। সেগুলি ত দোকান নয়, যে, কোনটা হইতে চাল, কোনটা হইতে ডাল, কোনটা হইতে সুনলঙ্কা তেল, কোনটা হইতে বা মুড়িমুড়কি কিনিলেই হইল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ও তাহাতে শিক্ষালাভার্থীদের দিক্‌টাও দেখা চাই। এই কলেজ যদি পূর্ণমাত্রায় নিজস্ব ছাত্র না পান, তাহা হইলে সকল ছাত্রের উপর একটি আদর্শের ছাপ কেমন করিয়া দিবেন ? আর, যাহারা পূরা বেতন দিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে চায়, অন্য দুই কলেজের ছাত্র আমদানী করিয়া তাহাদের জন্য স্থানের অকুলান ঘটাইবার ন্যায্যতা কোথায় ? এই প্রকারে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রবেতনলভ্য আয় কমাইবার ন্যায্যতাই বা কোথায় ?

—

শিক্ষামন্ত্রীর একটি ভাল অভিপ্রায়

শুনিলাম, শিক্ষামন্ত্রী তাঁহার শিক্ষা-স্কীমটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত মৌলবী আব্দুল করিম, সর্ নীলরতন সরকার, সর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় সুবিবেচিত। আলোচনাটি হইলে, আশা করি, প্রত্যেকের মতামত ও তাহার কারণ প্রকাশিত হইবে। তাহা হইলে সেগুলি প্রকাশ্যভাবে আলোচিত ও বিবেচিত হইতে পারিবে। নতুবা যদি আধা-সরকারী ভাবে কেবল এই গুজব রটিত হয়, যে, বঙ্গের সমুদয় চিন্তাশীল ও শিক্ষাবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি স্কীমটির অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণ তাহা গ্রাহ্য না-করিতেও পারে।

—

রোম্যাঁ রোলাঁর মত

ভারতবর্ষে রোম্যাঁ রোলাঁর নাম অজ্ঞাত নহে। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক ও অন্য নানা বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, এবং অন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে তাঁহার মত মূল্যবান বিবেচিত হইয়া থাকে। তিনি জীবিত ভারতীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী এবং পরলোকগত ব্যক্তিদের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সে বিষয়ে সুভাষ বাবুর লিখিত একটি প্রবন্ধ সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা লিখিত হইবার পর সুভাষ বাবু তাহা ফরাসী মনস্বীকে দেখান ও তাঁহার দ্বারা অনুমোদিত করান। তাহার পর ছাপা হইয়াছে। সুভাষ বাবুর সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তিনি নিজের একখানি ও রবীন্দ্রনাথের সহিত একত্র তোলা একখানি ফোটোগ্রাফ উপহার দেন।

প্রতীচ্য ও প্রাচ্য রোম্যাঁ রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয়টির তিনি নাম দিয়াছেন, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন।" এই ছবিটি প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

সুভাষ বাবুর সহিত সাক্ষাৎকারের সময়, ভারতবর্ষে স্বরাজলাভ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেন। তাহার তাৎপর্য্য সুভাষ বাবুর প্রবন্ধে নিবদ্ধ হইয়াছে। পৃথিবীর সব দেশে ধনী ও নির্ধন, ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাহীন শ্রেণী-সমূহের মধ্যে তাহাদের অধিকার ও পারস্পরিক ব্যবহার সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন উঠিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে রোমাঁ্যা রোলাঁ মহাশয়ের মত সুভাষ বাবুর প্রবন্ধটি হইতে নীচে উদ্ধৃত হইল :—

I asked Mon. Rolland if he would be good enough to put in a nutshell the main principles for which he had stood and fought all his life. "Those fundamental principles" he said, "are (1) Internationalism (including equal rights for all races without distinction), (2) Justice for the exploited workers —implying thereby that we should fight for a society in which there will be no exploiters and no exploited-- but all will be workers for the entire community, (3) Freedom for all suppressed nationalities and (4) Equal rights for women as for men."

ইটালী ও আবিসীনিয়ার বিবাদ

লীগ অব নেশ্যন্সে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮ই ভাদ্র ইটালী আবিসীনিয়ার বিবাদের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যা কল্য ২১শে ভাদ্র বাহির হইবে। সুতরাং আজ ২০শে ভাদ্র পর্য্যন্ত যে খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কিছু একটা অনুমান করিতে হইবে। সে অনুমানের মূল্য বেশী নয় অথবা কিছুই নয়। এখন মনে হইতেছে, আবিসীনিয়াকে এই রকম একটা প্রস্তাবে সম্মত করিবার চেষ্টা হইবে, যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী আবিসীনিয়ার মুরুব্বি নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা আবিসীনিয়ার অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ "উন্নতি"র ব্যবস্থা করিবেন, ও ইটালীর স্বার্থরক্ষা করিবেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে আবিসীনিয়ার স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে, এবং তাহার নৈসর্গিক সম্পৎ-সমূহের সাহায্যে ইউরোপীয়েরা ধনী হইবে। আবিসীনিয়া এই প্রকার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে যুদ্ধ হইবে না; নতুবা হইবে। ইহা আমাদের অনুমান মাত্র।

—

স্বর্গীয়া কুমারী জেন এডাম্‌স্

কুমারী জেন এডাম্‌স্ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আমেরিকার সাধারণ লোকদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্য শিকাগো শহরে হল্ হৌস্ (Hall House) নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করেন ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসর তাহা পরিচালন করেন। জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য কেহ কোন বৎসর বিশেষ কিছু করিয়া থাকিলে এবং সকলের চেয়ে বেশী করিয়া থাকিলে তিনি "শান্তি নোবেল পুরস্কার" পাইয়া থাকেন। কুমারী এডাম্‌স্ এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। অন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে এবং তাঁহার স্বদেশের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বড় বড় রাজনীতিজ্ঞেরা

স্বর্গীয়া কুমারী জেন এডাম্‌স্

তাঁহার মত জানিতে চাহিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ লইতেন। এই পূতশীলা মহিলা আমেরিকার আধুনিক সময়ের

শীর্ষস্থানীয়া নারী, এবং জগতের সকল দেশের সকল যুগের অতিবরেণ্যা নারীদের মধ্যে অন্যতমা।

ইঁহার ছবি এখানে প্রকাশিত হইল।

সাংবাদিক বসন্তকুমার দাশগুপ্ত

কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক য়্যাড্‌ভান্সের সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতম সুদক্ষ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশগুপ্ত ৫৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে শুধু ঐ দৈনিকখানির নহে, বঙ্গের সাংবাদিক-মণ্ডলীরও ক্ষতি হইল। সংবাদ বাছাই ও সুসজ্জিত করা, বক্তৃতা সাঙ্কেতিক অক্ষরে দ্রুত লেখা, কঠিন বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা, পরিহাসাত্মক রচনা—নানা দিকে তাঁহার শক্তির পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই তিনি লিপিকুশল ছিলেন।

ফরাসী মনস্বী জগদ্ব্যাপীশান্তিকামী আঁরী বার্‌স্

আঁরী বার্‌স এক জন বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ গ্রন্থকার ও সংবাদপত্র-সম্পাদক ছিলেন। সম্প্রতি মস্কোতে নিউমোনিয়া রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। জগদ্ব্যাপী শান্তি স্থাপনের তিনি এক জন প্রধান প্রয়াসী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই উদ্দেশ্যে যে একটি অন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপিত হয়, রবীন্দ্রনাথ, সাণ্ডার্ল্যাণ্ড, রোম্যাঁ রোলাঁ, গিলবার্ট মারে প্রভৃতি মনীষীর সহিত তিনিও তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি আগামী নবেম্বরে প্যারিসে একটি অন্তর্জাতিক শান্তি-কংগ্রেসের অধিবেশনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, ও প্রবাসী-সম্পাদককে যোগ দিতে বলা হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে, ইটালী ও আবিসীনিয়ায় যাহাতে যুদ্ধ না বাধে এবং যাহাতে জগতের জাতিসমূহের সহানুভূতি আবিসীনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহার জন্য প্যারিসে একটি অন্তর্জাতিক সভার আয়োজনও তিনি করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে উক্ত চারি জনের সহানুভূতিজ্ঞাপক টেলিগ্রাম যাইবার কথা ছিল। কিন্তু ৩রা সেপ্টেম্বরের আগেই তাঁহার মৃত্যু হয়; সভা হইয়াছিল কিনা এখনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। প্রবাসী-সম্পাদকের টেলিগ্রাম ২রা সেপ্টেম্বর রোম্যাঁ রোলাঁ মহাশয়ের নামে প্রেরিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে আঁরী বার্‌সের আহ্বান ও অনুরোধ শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মারফতে আসিয়াছিল।

ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধিত ফৌজদারী আইন

বাংলা দেশকে নিরাপদ করিবার নিমিত্ত যে আইনটি ছিল, তাহা এই বৎসরের শেষে বাতিল হইবার আগেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবার আইনে পরিণত হইয়া সব বাঙালীকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিয়াছে। এখন সমগ্র ভারতের পালা। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের খসড়া উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহা চিরস্থায়ী আইনে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ভারতশাসনের জন্য বিলাতী পার্লেমেণ্ট যে নূতন আইন পাস্ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা যদি ভারতবর্ষকে বাস্তবিকই স্বশাসন-অধিকার দেওয়া হইত, তাহা হইলে ভারতের লোকেরা সন্তুষ্ট হইত, ভারতে শান্তি স্থাপিত হইত, এবং দমনের জন্য অভিপ্রেত কোন আইন আবশ্যক হইত না। দমনের সব উপায়গুলিকে নবীভূত করিবার উদ্যোগেই বুঝা যাইতেছে, ভারতের মালিক ইংরেজদের জানা আছে, যে, ভারতবর্ষকে স্বশাসনের অধিকার নূতন ভারত-গবর্মেণ্ট-আইনটার দ্বারা দেওয়া হয় নাই।

কম্যুনিষ্ট-আতঙ্ক

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধিত ফৌজদারী আইন উপস্থিত করিয়া তাহা চিরস্থায়ী আইনে পরিণত করিবার পক্ষে যে-যে কারণ দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি এই, যে, ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট-মত—যাহাকে সাম্যবাদ বলা হয়—দ্রুত প্রচারিত হইতেছে। আমরা কম্যুনিষ্ট নহি এবং রাশিয়ায় যে-উপায়ে কম্যুনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সমর্থনও আমরা করি না। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক, যে, কম্যুনিষ্টরা ন্যায়ানুগত সমাজগঠন করিবার জন্য

যাহা করিতেছে, সেই রকম চেষ্টা অন্যদিগকেও করিতে হইবে; নতুবা শুধু কম্যুনিষ্টদমন ফলপ্রদ হইবে না।

প্রস্তাবিত শাখা প্রাথমিক-বিদ্যালয়ে জাদুমন্ত্র ?

বর্ত্তমানে যে-সব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, শিক্ষাবিভাগ বলিতেছেন, যে, তাহাতে তিন বৎসর পড়িয়াও বালক-বালিকারা লিখনপঠনক্ষম হয় না। ঐ সব বিদ্যালয় রোজ ৪ ঘণ্টা করিয়া বসে। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের প্রস্তাবিত শাখা প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলি রোজ দু-ঘণ্টা বসিবে এবং তাহাতে ছেলেমেয়েরা দু-বৎসর মাত্র পড়িবে। অথচ তাঁহারা মনে করেন, বর্ত্তমান বিদ্যালয়ে তিন বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ চারি ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা পাইয়া ছাত্রছাত্রীরা যতটা অগ্রসর হইতে পারে না, তাঁহাদের প্রস্তাবিত শাখাবিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যহ দু-ঘণ্টা শিক্ষা দুই বৎসর পাইয়া তাহা অপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইতে পারিবে। তাঁহারা কি কোন জাদুমন্ত্র জানেন যাহার বলে ইহা ঘটিবে ?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা

ইহা আনন্দের বিষয়, যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই কুমারী করুণাকণা গুপ্তা তথায় ইতিহাসের লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ছাত্রীরূপে যেরূপ কৃতী হইয়াছিলেন, অধ্যাপিকারূপেও সেই সিদ্ধিলাভ করুন, আমাদের অভিলাষ এইরূপ।

কলিকাতা কর্পোরেশ্যন ও ট্রামওয়ে

গুজব রটিয়াছে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটী কলিকাতার ট্রামওয়েগুলি কিনিয়া লইবেন। লইলে খুব ভাল হয়। পৃথিবীর অনেক বড় শহরের ট্রাম ও বাস্ তথাকার মিউনিসিপ্যালিটীর সম্পত্তি। কলিকাতাতেও তাহা হইলে লাভের টাকাটা দেশে থাকিবে।

অসমীয়া ভ্রাতাদের জ্ঞাতব্য

"সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন :—

আসামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ। তেজপুরের বাঙ্গালী অধিবাসিগণ একটি বাঙ্গালা হাইস্কুল খুলিতেছেন, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। আসামে বাঙ্গালীর স্কুল হওয়াতে অসমীয়াদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য হইয়াছে। 'অসমীয়া' পত্রিকায় বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা দ্বারা তাঁহার বৃহত্তর বঙ্গের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবে। এই স্কুল খুলিবার বিরুদ্ধে আসামের সর্ব্বত্র আন্দোলন করিবার চেষ্টা হইতেছে। রায় বাহাদুর আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা এই স্কুল স্থাপন সমর্থন করাতে অসমীয়াগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

অসমীয়া ভ্রাতাদের জানা উচিত, বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশে বাঙ্গালা স্কুল অনেক আছে। সুতরাং তেজপুরে এই স্কুল স্থাপনে ভীত হইবার কিছু নাই।

গোরক্ষপুরে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

গোরক্ষপুরে স্বর্গীয় কবি অতুল প্রসাদ সেন্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের যে স্মরণীয় অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ একখণ্ড পাইয়াছি। কার্য্যবিবরণটি সুলিখিত। লোকে যাহা যাহা জানিতে চায়, ইহাতে তাহা আছে।

সিংহভূমকে উড়িষ্যাভুক্ত করিবার চেষ্টা

উৎকলের অন্তঃপাতী ভদ্রকের কতকগুলি লোক সিংহভূমের জনসাধারণের মধ্যে উৎকলীয় ভাষা চালাইয়া উহাকে উড়িষ্যার অন্তর্গত করিবার চেষ্টায় আছেন। যাহা যাহা অধুনা বাস্তবিক উড়িষ্যার অংশ উৎকলীয়েরা তাহা তাহা পাইয়াছেন। যাহা এখন উড়িষ্যা নহে, তাহাকে উড়িষ্যা বানাইবার চেষ্টা না করাই ভাল।

চায়ের বিজ্ঞাপন

আমাদের বিজ্ঞাপন-কর্ম্মচারীকে বলা আছে, কি কি রকমের বিজ্ঞাপন তিনি লইবেন না। চায়ের বিজ্ঞাপন লইতে তাঁহাকে অতীত কালে কখনও নিষেধ করা হয় নাই, বর্ত্তমানেও করা হয় নাই। অন্য বিজ্ঞাপনের জন্য যে হারে আমরা টাকা পাই, চায়ের জন্যও সেই হারে পাই। আমি স্বয়ং চা-পানে অভ্যস্ত নহি, এবং সর্ব্বসাধারণ চা-পানে অভ্যস্ত হয়, ইহাও আমি চাই না। কিন্তু চাকে আমি মদ, তাড়ি, আফিং, গাঁজা প্রভৃতির সমশ্রেণীস্থ মনে করি না বলিয়া তাহার বিজ্ঞাপন ছাপিতে আমি নিষেধ করি নাই, করিবও না। অন্য সব বিজ্ঞাপনের মত চায়ের বিজ্ঞাপনে যাহা লেখা থাকে, তাহার সত্যাসত্যতার দায়িত্ব লইতে আমি অসমর্থ। দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতাদের।

আসাম প্রদেশে বাঙালীর শিক্ষা

আসাম প্রদেশের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ৩২টি উচ্চ-বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টিতে অসমীয়া ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ১৭টিতে বাংলা ও অসমীয়া উভয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ১৭টির নীচের শ্রেণীগুলিতে কেবল অসমীয়া ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহাদের মাতৃভাষা অসমীয়া তাহাদের শিক্ষা অবশ্যই অসমীয়ার সাহায্যে দেওয়া উচিত। কিন্তু যে-সকল ছাত্রের মাতৃভাষা বাংলা তাহাদের শিক্ষা বাংলা ভাষার সাহায্যেই দেওয়া স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। ঐ ১৭টি বিদ্যালয়ে বাঙালী শিক্ষকের সংখ্যা কম, ইহা বলিয়া আসাম-গবর্ন্মেণ্ট নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। যথেষ্টসংখ্যক বাঙালী শিক্ষক নিযুক্ত করুন। আসাম প্রদেশের বাসিন্দাদের মধ্যে বাংলাভাষাভাষীদের সংখ্যা অন্য যে-কোন ভাষাভাষীদের চেয়ে বেশী, এবং তাহাদের অধিকাংশ তথাকার স্থায়ী অধিবাসী ও গবর্ন্মেণ্ট অন্য সকলের মত তাহাদের নিকট হইতেও ট্যাক্স পাইয়া থাকেন। সুতরাং অন্য সকলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য যেমন, তেমনি তাহাদেরও ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বন্দোবস্ত ও ব্যয় করিতে আসাম-গবর্ন্মেণ্ট বাধ্য।

রাজবন্দীদের ভবিষ্যৎ

রাজবন্দীদের সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে, সরকারপক্ষ ধরিয়া লন, যে, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ এবং খবরের কাগজওয়ালারা বা অন্য আন্দোলনকারীরা অজ্ঞ। সম্প্রতি বঙ্গের গবর্ণরও এই প্রকার কথা বলিয়াছেন। আমরা তাহা মনে করি না। গবর্ণর রাজবন্দীদের মধ্যে কতকগুলি যুবকের জন্য যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়াছেন, তাহাতে যদি তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়, ভাল। [illegible] আমরা বিশেষ কিছু আশা করি না।

যাহাদের শক্তি আছে ও যাহাদের শক্তি নাই—এরূপ উভয় পক্ষের মধ্যে তর্ক সুফলপ্রদ হয় না। সুতরাং আমরা তর্ক করিব না। কেবল ইহাই বলিব, যে, গবর্ন্মেণ্ট ভ্রমাতীত ও অভ্রান্ত কোন কালে ছিলেন না, এখনও নাই।

নূতন শিক্ষারিপোর্টে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা

১৯৩৩-৩৪ সালের বার্ষিক বঙ্গীয় শিক্ষারিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে এক বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে কোন্ রকম শিক্ষালয় বঙ্গে কত ছিল, এবং তাহাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বা কত ছিল, লেখা আছে। ১লা আগষ্টের বিবৃতিটিতে বলা হইয়াছে, যে, মোটামুটি ৬০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কমাইয়া ১৬০০০ করা হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ১৯৩৩-৩৪ সালেই তাহাদের সংখ্যা ছিল ৬৪৩২০; এখন আরও বাড়িয়া থাকিবে।

বঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার আসন বিলি

অন্য সমুদয় প্রদেশের মত বঙ্গের গ্রাম-অঞ্চলে ও নগর অঞ্চলে ব্যবস্থাপক সভার সাম্প্রদায়িক ও "সাধারণ" আসন গুলি বণ্টন করিয়া দিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে তাহাকে নাম দেওয়া হইয়াছে, ডিলিমিটেশ্যন কমিটি তাহার কাছে বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের যে প্রস্তাবগুলি যাইবে, তাহা চমৎকার। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা ত হিন্দুদের উপর খুব অবিচার হইয়াছেই, এখন আবার বাণিজ্যিক আসনগুলির বণ্টনেও হিন্দুদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

তাহার উপর, যে নগর-অঞ্চলে প্রধানতঃ শিক্ষিত হিন্দুরা ও তাহাদের নেতারা অধিকসংখ্যায় বাস করে, তাহাকে আসন কম দিয়া নিরক্ষরলোকবহুল গ্রাম-অঞ্চলে আসন বেশী দেওয়া হইতেছে।

কলিকাতার কথা ধরুন। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতার প্রতিনিধি, মোট নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ১১৪ জনের মধ্যে, ২ জন মুসলমান ও ৬ জন অমুসলমান, মোট আট জন। অতঃপর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা বাড়িয়া হইবে ২৫০। বাংলা গবর্ন্মেণ্ট ইহাতে কলিকাতাকে আগেকার সমান প্রতিনিধিও দিতে চান না—যদিও অনেক বেশী দেওয়াই উচিত। এখন দিবার প্রস্তাব করিতেছেন, ২টি মুসলমান-দিগকে এবং ৪টি "সাধারণ" অর্থাৎ প্রধানতঃ হিন্দুদিগকে। মুসলমানদের বেলায় কিছু কমিল না—হিন্দুর বেলায় কমিল। তাহাতে প্রতি ১৩১০০০ মুসলমান একটি, এবং প্রতি ১৯৯০০০ হিন্দু একটি আসন পাইল। এক এক জন মুসলমান দেড় জন হিন্দুর সমান! উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার ও উভয় প্রদত্ত ট্যাক্সের প্রভেদ ত ধরাই হয় নাই।

আরও যে-সব অবিচার হইয়াছে, তাহা সেপ্টেম্বরের মডার্ণ রিভিয়ুতে এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত দেখাইয়াছেন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

যাঁহারা বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত যাণ্মাসিক গ্রাহক আছেন, আশা করি, আগামী ছয় মাসের জন্যও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন এবং আগামী ছয় মাসের মূল্য ৩৷০ সওয়া তিন টাকা মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার কুপনে তাঁহাদের স্ব-স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে টাকা জমা করিবার পক্ষে অসুবিধা হয়।

যাঁহারা আগামী ৫ই আশ্বিনের মধ্যে টাকা পাঠাইবেন না, তাঁহাদের নামে কার্ত্তিক সংখ্যা ভিঃ-পিঃতে পাঠান হইবে। ঐ সংখ্যা ৬ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা অতঃপর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা সে-কথা দয়া করিয়া ৩রা আশ্বিনের পূর্ব্বেই আমাদিগকে জানাইবেন।

ভিঃ-পিঃতে টাকা পাইতে কখন কখন বিলম্ব ঘটে, সুতরাং গ্রাহকদের 'প্রবাসী' পাইতে গোলমাল হয়। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠান সুবিধাজনক। ইতি—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,

প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী।